

শিল্পী — শ্রীউষা সেনগুপ্ত

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্



আষাঢ়—১৩৬১

প্রথম খণ্ড | দ্বিচত্বারিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

সমাজ উন্নয়নে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর অবদান

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র কুণ্ডু এম্-এ, ডি-এস্-ই, ডি-এস্-ডব্লিউ

(১)

ভারতীয় সভ্যতা পল্লীকেন্দ্রিক। এখানকার সামাজিক আদর্শের মূলসূত্রগুলি গ্রামীণ পদ্ধতির পরিচায়ক। ভারতীয় চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির বিশ্লেষণ কর্‌লে দেখা যায় যে—যুগ যুগ ধ'রে গ্রাম সারা ভারতকে প্রেরণা জুগিয়েছে। প্রীতির ধর্ম, ভারতীয় দর্শন, সঙ্গীত, শিল্পকার্য্য—সব কিছুরই উৎস —নিভৃতপল্লী। তাই, ইংরেজ শাসনের সময়কার উপেক্ষিত পল্লীজীবনকে রাষ্ট্র সাহায্য ব্যতিরেকে সঞ্জীবিত করা—অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশীযুগের গঠনকর্মীদের। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বজায় রাখা জাতির অন্যতম লক্ষ্য ব'লে গণ্য হয়েছিল। স্বদেশীযুগের রাজনীতিকদের কথাই ছিল—সমাজ সংগঠন। আর তা তখনকার রাষ্ট্রের—ঔদাসীন্য সত্ত্বেও হয়েছিল সম্ভবপর। যে দেশের কৃষিই মেরুদণ্ডস্বরূপ, আর যেখানে শতকরা ৭০ জন লোক কৃষিজীবী, সে দেশের উন্নতি অবনতি নির্ভর করে কৃষির অবস্থার উপর। পল্লীর উন্নয়নের জন্য গঠনমূলক কাজের পথ প্রদর্শক ছিলেন দুইজন মণীষী—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী। রবীন্দ্রনাথ উদাত্তকণ্ঠে এই কথাই ঘোষণা করেছিলেন—"রাষ্ট্রের কর্ত্তা যিনিই হোন্ না কেন, আমাদের মর্মস্থল আমাদের সমাজে। সেই সমাজকে পুনরুজ্জীবিত কর্‌তে পার্‌লে যিনিই রাজা হোন-না-কেন, আমাদের কিছু আসে যায় না।"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বহির্জগতে শুধু একজন শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবেই পরিচিত ছিলেন না। তাঁর সুবিশাল জীবনের অনেকটুকুই অধিকার করে আছে—তাঁর গঠনমূলক কর্ম-প্রচেষ্টা। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য হোলো সমগ্র 'মানব মনের মন্ত্র-সংহিতা'। তিনি স্বয়ং ছিলেন স্বদেশের সংস্কৃতির জীবন্ত প্রতীক। আর তাঁর জীবনের বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ আন্‌তে চেয়েছিল—পল্লীর রূপান্তর। মানব-দরদী কবির প্রাণ ছিল অপর্য্যাপ্ত। তাই মুমূর্ষু ও অন্তঃসারশূন্য পল্লীসমাজে "যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হ'তে দীন"—সেখানে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন—ভগবানের

চরণ। ভারতের সংস্কৃতির বাহক রবীন্দ্রনাথ "এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে" মানুষকে নরদেবতা ব'লে সম্মান দেখিয়েছেন ও প্রতিটী মানুষকে রাজসম্মানে ভূষিত করেছিলেন। তাই, ব্যথিতের জন্য বেদনা, মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা, পল্লীর প্রতি সত্যিকারের টান,—তাঁর লেখার প্রতি ছত্রে ফুটে উঠেছে। ধূলিকণার প্রতি ছিল তাঁর অফুরন্ত দরদ। তিনি প্রণতি জানিয়ে বলেছেন :

> "শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর
> বলে যাব, তোমার ধূলির
> তিলক পরেছি ভালে।"

মানুষ রবীন্দ্রনাথ ইটকাঠের আধুনিক শহর থেকে দূরে শান্তিনিকেতন ও পরে শ্রীনিকেতন গ'ড়ে তুললেন। এখানে কবি কারিগরী-শিক্ষার সঙ্গে সমাজ-সেবার ব্যবস্থা করলেন। বর্ত্তমানে শ্রীনিকেতন ৮৫টী গ্রামে উন্নয়ন কাজ চালাচ্ছে। সেখানকার সাঁওতাল-অধ্যুষিত পল্লীগুলিও কবির দরদী মনের পরশ পেয়ে সজীবতা লাভ করলো। তিনি তাদের শুনিয়েছেন—"এসো তোমরা প্রার্থী নয়, কৃতীভাবে আমাদের সহযোগী হও, তাহলেই সার্থক হবে আমাদের এই উদ্যোগ। গ্রামের সামাজিক প্রাণ সুস্থ সবল হয়ে উঠুক। গানে, গীতে, কাব্যে, কথায়, অনুষ্ঠানে, আনন্দে, শিক্ষায় ও দীক্ষায় চিত্ত জাগুক।"

কবি ছিলেন—ধনীর দুলাল আর মহানগরীর অধিবাসী। তা হলেও তাঁর অন্তরাত্মার টান ছিল আসলে পল্লীর দিকে। তিনি বিশ্বপ্রেমিক ছিলেন বলে তাঁর মধ্যে ধনের অভিমান ছিল না। শিলাইদহে কবি জমিদারী দেখ্‌তেন, আর পদ্মার নিভৃতবক্ষে ব'সে কবিতার বান্ তুল্‌তেন।—রবীন্দ্রনাথকে অনেকে ভুল বুঝে বলেন—তিনি ছিলেন একজন কবিধর্মাবলম্বী চিন্তাবিলাসী 'পদ্মখাদক' ("Lotus-eater living in ivory tower")। আবার কেউ কেউ তাঁকে 'বার্ড অফ্ প্যারাডাইস' ব'লে বর্ণনা করেছেন। তিনি শুধুই কল্পনার রঙ্গীন পাখায় ভূলোকের বাইরে বিচরণ ক'রে ক্ষান্ত ছিলেন না—তাঁর সঙ্গে ছিল এই ধূলিধূসর ধরাধামের অবিচ্ছেদ্য বন্ধন; তাই তিনি সাধারণ মানুষের জয়গান গেয়েছেন ও ছায়াশীতল পল্লীর দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কবি কাব্যসৃষ্টির আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে বাস্তব জীবনকে এড়িয়ে যেতে চান নাই। তিনি শুধুই 'স্বদেশী-সমাজের' আদর্শ প্রচার ক'রে নিজ কর্ত্তব্যের সীমা-রেখা টানেন নাই। তিনি সুচিন্তিত পরিকল্পনা নিয়ে পল্লী-উন্নয়নের কাজ আরম্ভ করেছিলেন। এই দিক দিয়ে তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গঠনকর্মীদের অন্যতম। তাঁর সাহিত্য যেমন জগতে এক অপূর্ব বিস্ময়, তাঁর গঠনকর্মও জগতের এক দৃষ্টান্তস্থল। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশীযুগে রাখিবন্ধন প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। তাঁর আন্তরিক আগ্রহে সংস্কৃতি ও সাহিত্যের উন্নতি সাধনের জন্য জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গঠিত হয়। তাঁর পরিণত বয়সের গঠনমূলক অবদান—বিশ্বপরিচিত শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন ও বিশ্বভারতী। এতেই প্রতীয়মান হয় যে—রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা যা কিছুই স্পর্শ করেছে, তাকেই শ্রেষ্ঠত্বের পর্য্যায়ে উন্নীত করেছে। কর্মী রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবি-মানস ও অন্তর্জগতের আদর্শকে গঠনমূলক পরিকল্পনার সাহায্যে বাস্তব রূপদান করেছেন। তাই, তাঁর অসংখ্য কার্য্যাবলীর মাঝেও তিনি ১৯০৫ সালে বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর অন্যতম কর্মকর্তারূপে পল্লীগঠনমূলক কর্মের এক কার্য্যপদ্ধতি প্রস্তুত করেন। এই তালিকায় জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন কাজের মধ্যে এগুলি স্থান পেয়েছিল:—বয়স্কশিক্ষা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও সেবাশুশ্রূষা শিক্ষা, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য দুরারোগ্য ও ছোঁয়াচে ব্যাধির বিস্তার প্রতিরোধ করা, শিশুমৃত্যু নিবারণের উপায়, পানীয় জলের ব্যবস্থা, সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা, বন্যা দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সময়ে সাময়িক সাহায্যদানের ব্যবস্থা। ১৯২২ সালে কবিগুরু শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন ও নিজেই পল্লী-উন্নয়নের পথপ্রদর্শক হন। এ ছাড়াও, কবি স্বীয় তত্ত্বাবধানে ও অতুল সেনের সহায়তায় কালিগ্রাম পরগণায় তাঁর জমিদারীর অন্তর্গত—পতিসর, কামতা, রাণীনগর, সান্তাহার, রঘুনাথপুর, আত্রাই, আদমদিঘী প্রভৃতি গ্রামে পল্লী-উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করেন ও পাঁচদফা কর্মতালিকা প্রস্তুত করেন। কবি যেমন তাঁর কাব্য-জগতে কাঙ্গালিনী মেয়ের পাশে দাঁড়িয়ে উৎসবের আনন্দ স্রোতের মাঝে তার মলিন বসন দে'খে নীরবে অশ্রুপাত করেছেন—তেমনি তিনি বাস্তব জগতেও দীন-দরিদ্রের সেবার উদ্দেশ্যে উপরোক্ত কতকগুলি কেন্দ্রে 'সবহারাদের মাঝে' ছোট ছোট হাসপাতাল ও অবৈতনিক

চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। এই সমগ্র এলাকায় সে সময় এক জাগরণের সূচনা হয়েছিল বল্‌লে অত্যুক্তি হবে না। জনগণের নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য কতকগুলি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হয়েছিল। রাস্তাঘাট তৈরী ও পুকুর খনন প্রভৃতি কাজে পল্লীবাসীদের যথেষ্ট সংযোগিতা মিলতো। অনেক ক্ষেত্রে জনসাধারণ চাঁদা দিয়ে অথবা নিজেদের পরিশ্রমের দ্বারা সমবায় পদ্ধতিতে পল্লী-উন্নয়নের কাজে নিজেদের নিয়োগ করেছিল। অধিকাংশ জায়গায় রবীন্দ্রনাথ জমিদারীর আয় হ'তে খরচের সঙ্কুলান করতেন। এ ছাড়াও, পল্লীর সুদখোর মহাজন ও কাবুলিদের কবল হ'তে দরিদ্র প্রজাদের বাঁচাবার জন্য তিনি অতি স্বল্প সুদে ঋণদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রজাদের ঘরোয়া ও সামাজিক বিরোধের অবসানের জন্য তিনি সালিশীপ্রথার প্রবর্তন করেন। এক কথায় পল্লীজীবনের সামগ্রিক উন্নতি বিধানের জন্য রবীন্দ্রনাথ এক অভিনব অনুপ্রেরণা এনে দিয়েছিলেন—পল্লীবাসীদের মাঝে। এই সুবৃহৎ পরিকল্পনার প্রত্যেকটী কাজের উপর তাঁর কড়া নজর ছিল। পুরাদস্তুর সংসারীর মন নিয়ে ও নেহাৎ অকবির ন্যায় তিনি খরচপত্রের নিখুঁত হিসাব রাখার দিকে সজাগ দৃষ্টি দিতেন। কবি তখন স্বপ্নজগৎ ছেড়ে কর্মজগতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। রঙ্গময়ী কল্পনা দেবীর মোহিনীমায়া কাটিয়ে তখন তিনি সংসারের তীরে উপনীত।

কবির জীবন ছিল সবুজের নেশায় ভরপুর। তিনি আকণ্ঠ পান করেছেন—'বিশ্বের সকল পাত্র হতে আনন্দ মদিরাধারা'। তাঁর নিজের ভাষায় 'কতবার প্রাণ উঠিয়াছে গেয়ে—প্রচণ্ড উল্লাসে'। কবির চোখে সারা বিশ্বচরাচরে অনন্ত জীবনপ্রবাহের সঙ্গে অবিমিশ্র আনন্দের হিল্লোল বয়ে চলেছে। তাই, পল্লী-উন্নয়ন কাজেও তিনি আনন্দের পুরাপুরি বিকাশের উপদেশ দিয়েছিলেন। নিরানন্দ পল্লীজীবনের মাঝে আনন্দের ছোঁয়াচ লাগানোই তাঁর ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য। গ্রাম সংগঠনের কাজে এইটাই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ অবদান। পল্লীর কৃষকদের মুখ দিয়ে তিনি বলেছেন :—

> "আমরা চাষ করি আনন্দে
> মাঠে মাঠে বেলা কাটে—
> সকাল হ'তে সন্ধ্যে।"

কবি সমাজ উন্নয়নের কাজে কৃষির মূল্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই বৎসরান্তে হলকর্ষণের উৎসব আজও অনুষ্ঠিত হয়—শ্রীনিকেতনে। তিনি রাশিয়ায় সমবায় প্রথায় চাষের কাজ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন ও বলেছেন—"আজকার দিনে আমাদের কৃষিক্ষেত্রের কোন কিনারায় বলরামের দেখা নাই—তিনি লজ্জিত, যে দেশে তাঁর অস্ত্রে তেজ আছে সেই সাগরপারে তিনি চলে গেছেন। রাশিয়ার কৃষি বলরামকে ডাক দিয়েছে; দেখতে দেখতে সেখানকার কেদারখণ্ডগুলো অখণ্ড হয়ে উঠলো, তাঁর নূতন হলের স্পর্শে অহল্যা-ভূমিতে প্রাণ সঞ্চার হয়েছে।" রবীন্দ্রনাথের নির্দেশিত সমবায় প্রথা অধুনা এদেশে কার্য্যকরী হ'তে চলেছে। সমবায় নীতিতে চাষ ও শ্রমের মর্য্যাদা কবি প্রচার করেছেন—চাষীমজুরদের কাছে। যে চাষী নিজে বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করতে রাজী না হ'য়ে—পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টির আশা পোষণ করে, কবি তাকে বলেছেন—"তোমার গৌরব তাহে একেবারে ছাড়ে।"

প্রাচীন ভারতে মেলাকে কেন্দ্র ক'রে সারা দেশের সংস্কৃতি, নাচ গান ও ব্যবসায় বাণিজ্যের আদানপ্রদান ঘটতো। ভারতীয় মেলার সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দিক উপলব্ধি ক'রে কবি শান্তিনিকেতনে তাই একের পর একটী মেলা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছেন। এই ভাবে বার মাসে তের পরবের দ্বারা তাঁর সৃষ্ট পল্লী নাচগানে মুখরিত। কবি পল্লীসেবা কাজে নিজেকে ভুলে আত্মনিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন—বাঙ্গালার নিভৃত পল্লীতে জ্ঞানের আলো জ্বালতে। আর তাঁর আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ছিল—পল্লীগুলিকে সংস্কৃতি ও মাধুর্য্যের লীলানিকেতনে রূপান্তরিত করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি গঠনকর্মীদের মত একান্ত বিনয়ী ও নম্র হ'য়ে, যথাসম্ভব উচ্ছ্বাস ও আতিশয্য পরিহার ক'রে পল্লীবাসীদের সঙ্গে তাদের সুখ-দুঃখের ভাগী হ'তে উপদেশ দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে (৬, ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০) তাঁর অভিভাষণে পল্লীসেবা সম্বন্ধে যা বলেছেন—তা আজকালকার পল্লীকর্মী ও গঠনকর্মীদের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁর কথায়—"আমি তাই—যারা এখানে গ্রামের কাজ করতে আসেন তাঁদের বলি, শিক্ষাদানের ব্যবস্থা যেন এমন ভাব মনে রেখে না হয় যে ওরা গ্রামবাসী, ওদের

প্রয়োজন স্বল্প, ওদের মনের মতো ক'রে যা হয় একটা গেঁয়ো ব্যবস্থা করলেই চল্‌বে। গ্রামের প্রতি এমন অশ্রদ্ধা প্রকাশ যেন আমরা না করি। দেশের মধ্যে এই যে প্রকাণ্ড বিভেদ—একে দূর ক'রে জ্ঞানবিজ্ঞান কি পল্লী কি নগর সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে, সর্বসাধারণের কাছে সুগম ক'রে দিতে হবে। গ্রামের লোকেরা থাকুক তাদের ভূতপ্রেত-ওঝা তাদের অশিক্ষা অস্বাস্থ্য নিরানন্দ নিয়ে, তাদের জন্য একটুখানি যে-কোনো রকম আয়োজন করলেই যথেষ্ট, এরকম অসম্মান যেন গ্রামবাসীদের না করি। এই অসম্মান জন্মায় শিক্ষার ভেদ থেকে, মন অহংকৃত হয়, বলে, ওরা চালিত হবে আমরা চালনা করবো, দূর থেকে উপর থেকে। এর ফলে অনেক সময় শিক্ষিত পল্লীহিতৈষীরা চাষীদের কাছে এমন সব বিষয়ে মুখস্থকরা উপদেশ দিতে আসেন হয়ত সে বিষয়ে চাষীরা তাঁদের চাইতে ভালোই জানে। এর একটা দৃষ্টান্ত দিই।

এক সময়ে আমার মনে হয়েছিল যে শিলাইদহে আলুর চাষ বিস্তৃতভাবে প্রচলন করব। আমার প্রস্তাব শুনে কৃষিবিভাগের কর্তৃপক্ষ বল্‌লেন যে, আমার নির্দিষ্ট জমিতে আলুর চাষ কর্‌তে হ'লে এক-শ মণ সার দরকার হবে ইত্যাদি। আমি কৃষিবিভাগের প্রকাণ্ড তালিকা অনুসারে কাজ করলুম—এ সব দেখে আমার এক চাষী প্রজা বল্‌লে, আমার 'পরে ভার দিন বাবু—সে কৃষিবিভাগের তালিকাকে অবজ্ঞা ক'রেও প্রচুর ফসল ফলিয়ে আমাকে লজ্জিত করলে।

আমাদের শিক্ষিত লোকদের জ্ঞান যে নিষ্ফল হয়, অভিজ্ঞতা যে পল্লীবাসীর কাজে লাগে না, তার কারণ আমাদের অহমিকা, যাতে আমাদের মিল্‌তে দেয় না, ভেদকে জাগিয়ে রাখে। তাই আমি বারংবার বলি, গ্রামবাসীদের অসম্মান কোরো না। যে শিক্ষায় আমাদের প্রয়োজন—তা শুধু শহরবাসীদের জন্য নয়, সমস্ত দেশের মধ্যে তার ধারাকে প্রবাহিত কর্‌তে হবে। সেটা যদি শহরের লোকদের জন্য নির্দিষ্ট থাকে তবে তা কখনো সার্থক হতে পারে না। মনে রাখতে হবে শ্রেষ্ঠত্বের উৎকর্ষে সকল মানুষেরই জন্মগত অধিকার, গ্রামে গ্রামে আজ মানুষকে এই অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। আজ আমাদের সকলের চেয়ে বড় দরকার শিক্ষার সাম্য। অর্থের দিক দিয়ে এর ব্যাঘাত আছে জানি, কিন্তু এ ছাড়া কোনো পথও নেই। নতুন যুগের দাবী মেটাতেই হবে।"

কবির এই সব অমূল্য উপদেশাবলী আধুনিক কালের উন্নয়ন-কর্মীদের অকুণ্ঠচিত্তে অনুকরণীয়। তাঁর মহান সৃষ্টি শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন কর্মী রবীন্দ্রনাথের কর্মযোগের জয়ধ্বনি, তাঁর সমাজ-উন্নয়ন কল্পনার মূর্তপ্রতীক ও পল্লীর রূপান্তর রচনায় তাঁর আদর্শ ও বাস্তবতার অপূর্ব সমন্বয়।

(২)

জাতির জনক গান্ধীজী জগতের শ্রেষ্ঠ গঠনকর্মী। সাধারণ মানুষের মধ্যে আত্মচেতনা জাগিয়ে তোলা গান্ধীজীর অন্যতম অবদান। তিনিই সর্বপ্রথম তাদের নিয়ে আন্দোলন সুরু করেন। রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁর অবতীর্ণ হবার আগে জনসাধারণের সহযোগিতায় কোন কর্মপন্থা গৃহীত হয় নাই বললেই চলে। গান্ধীজী ১৯১৭ সালে সাধারণ মানুষের সহায়তায় চম্পারণে চাষীদের আন্দোলন, ১৯১৮ সালের খেড়া জেলার কৃষক আন্দোলন, ১৯১৯ সালের রাউলাট আইনের বিরোধিতা ও পরে পাঞ্জাব খিলাফৎ আন্দোলন আরম্ভ করেন। তাঁর ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৩০ সালের সত্যাগ্রহ আন্দোলন—এ সব পল্লীর সাধারণ মানুষের মাঝে অভাবনীয় আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের প্রাক্কালে গান্ধীজী ভারতের এই সুপ্ত শক্তিকে কাজে লাগানোর কথা সুস্পষ্ট-ভাবে জানিয়ে বলেছিলেন "যতক্ষণ না জনগণ (masses) সংগ্রামে যোগ দেয়, ততক্ষণ আমরা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব না। জনগণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন সঞ্চারিত করিবার জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায়কে লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে হইয়াছে।" তিনি বুঝেছিলেন—মাত্র মুষ্টিমেয় কতকগুলি শহরে লোক নিয়ে কাজ আরম্ভ করলে ও এর মধ্যে আন্দোলন সীমাবদ্ধ রাখলে সারা দেশে আন্দোলন প্রসার লাভ করতে পারবে না। তাই সাত লক্ষ পল্লীবাসীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ক'রে আন্দোলনের পরিধি দিলেন বাড়িয়ে। এই দিক বিবেচনা ক'রে তিনি বলেছেন—"ভারতের মুক্তি গ্রামের পর্ণকুটীরে।"

গান্ধীজীর চিন্তাধারা মানবতার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর চোখে সমগ্র মানব সমাজে এক চিরন্তন অভিন্নতা

বিরাজমান। তাই, তাঁর মতে জগতের একজন মানুষ যদি ক্ষুধার্ত্ত ও বিবসন অবস্থায় দিন গুজরাণ করে, তাহ'লে সমগ্র সমাজের কোন মানুষেরই বিত্তসঞ্চয়ের অধিকারী হওয়া ন্যায়-সঙ্গত হবে না। এই দিক দিয়ে গান্ধীজী জগতের সাম্য-বাদীদের সেরা। বর্ত্তমান কালের I. L. O. এরঅন্যতম যে মূলসূত্র—তাতে গান্ধী-আদর্শ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—"Poverty anywhere constitutes a danger to prosperity everywhere." সারা দুনিয়ার মাঝে একজনের দুঃখ-দারিদ্র্যের অর্থ হচ্ছে—সমগ্র পৃথিবীর মানুষের সেই পরিমাণে দুরবস্থা। মানব-দরদী সাম্যবাদী গান্ধীজী সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ-লেখক রাস্কিনের 'Unto the Last' প'ড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন ও তাঁর ভাবধারার উপর গান্ধীজী নিজ অর্থনীতির বনিয়াদ গেঁথেছেন। তিনি সমগ্র সমাজের অঙ্গ হিসাবে পল্লীর দুঃখ-দারিদ্র্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যে পল্লীর কল্যাণমূলক কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিলেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামকে অধিকতর কার্য্যকরী করার নিমিত্ত গান্ধীজী সাধারণ মানুষদের সংগঠন কাজ, যেমন—হরিজন আন্দোলন, গ্রাম উদ্যোগ, পল্লীপ্রত্যাবর্তন প্রভৃতি আরম্ভ করেন। তিনি সেগাঁও নামে এক ক্ষুদ্র পল্লীতে নিজ হস্তে সংগঠনমূলক কাজ সুরু করেন। তাঁর এই পল্লীগঠন আদর্শ তখন আসমুদ্রহিমাচল ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। গান্ধীজীর শেষ লক্ষ্য ছিল—স্বরাজ লাভ করা; আর তার সাধনপথে তিনি লক্ষ লক্ষ পল্লীবাসীর সহযোগিতা কামনা ক'রে তাদের উন্নয়নের দিকে অধিকতর নজর দিয়েছিলেন। এই দিক দিয়ে গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্মপন্থা পুরাপুরি বৈপ্লবিক। তিনি সমাজকে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত ক'রে গিয়েছেন। সারা পল্লীভারতে যে অকল্যাণ পুঞ্জীভূত, জন-শক্তির সহায়তায় তাদের একেবারে ধুয়ে মুছে ফেলার জন্যই তাঁর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি। তাঁর কার্য্যাবলী পল্লীসমাজের দ্রুত রূপান্তর ঘটাতে না পারলেও—তা পল্লীর জীবনধারার মৌলিক পরিবর্তন আনার প্রয়াসী। এতেই তিনি গঠনমূলক বিপ্লবী। তিনি খাদি সম্বন্ধে যে উক্তি করেছেন—তা হচ্ছে :—"It means a wholesale Swadeshi mentality, a determination to find all the necessaries of life in India and that too through the labour and intellect of the villages. That means a reversal of existing process." যে উদ্দেশ্য নিয়ে গান্ধীজী গ্রামকে কেন্দ্র ক'রে আঠার দফা গঠন-কাজের নির্দেশ দিয়েছিলেন—তা হচ্ছে শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। তাই তাঁর পদ্ধতি জগতের সকল জাতির পক্ষেই অনুকরণীয়। এই আঠার দফা :—(১) সাম্প্রদায়িক প্রীতি, (২) অস্পৃশ্যতা বর্জন, (৩) মাদকদ্রব্য বর্জন, (৪) খাদি, (৫) কুটীরশিল্প, (৬) পল্লীর স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা, (৭) বুনিয়াদি শিক্ষা, (৮) বয়স্ক শিক্ষা, (৯) নারীসমাজের কল্যাণ, (১০) জনস্বাস্থ্য শিক্ষা, (১১) মাতৃভাষা প্রীতি, (১২) রাষ্ট্র-ভাষা প্রচার, (১৩) অর্থনৈতিক সাম্য, (১৪) কৃষক শ্রেণীর উন্নতি, (১৫) শ্রমিক কল্যাণ, (১৬) আদিবাসী সেবা, (১৭) কুষ্ঠরোগীর শুশ্রূষা, (১৮) ছাত্রদের আত্মশিক্ষা।

গান্ধীজী তাঁর সার্বজনীন ও ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ গঠনপন্থায় যে আদর্শ সমাজের চিত্র এঁকেছেন—তাতে কেন্দ্রীভূত সামাজিক নিয়মের স্থান নাই। উক্ত আঠার দফা গঠনকর্মের কার্য্যকারিতার দ্বারা কেন্দ্রিকতা নিশ্চিহ্ন হবে। আর তার স্থান পূর্ণ করবে—বিকেন্দ্রীকরণ। তিনি আশা করেছিলেন—কৃষি, শিল্প, উৎপাদন-ব্যবস্থা, এমন কি শাসন কার্য্যেও বিকেন্দ্রীকরণ স্থান পাবে। গান্ধীজীর চরকা ও খাদি শুধু রাজনৈতিক প্রতীকই ছিল না, এদের মধ্যে তাঁর বিকেন্দ্রীকরণের বিজ্ঞান ও মানুষের আত্মনির্ভর-শীলতার আদর্শ অন্তর্নিহিত। জনগণের সহযোগিতায় যে ব্যবস্থা কার্য্যকরী হয়, সেইরূপ কার্য্যক্রমই—যথা, পঞ্চায়েৎ, কুটীরশিল্প প্রভৃতি বিকেন্দ্রীকৃত সমাজের ভিত্তি। গান্ধীজী দেখিয়েছেন যে গ্রামীণ জীবনে বিকেন্দ্রীকরণের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী। কারণ, গ্রামের শিল্প ব্যক্তিবিশেষের উদ্যোগে ও প্রচেষ্টার দ্বারা সংগঠিত ব'লে—সেখানকার শিল্পী হবে সম্পূর্ণ লাভের মালিক। আর এ নিয়মে ঘরে ঘরে সমৃদ্ধির প্রতিষ্ঠা হয়। কেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থায় ধনী মজুর খাটিয়ে পণ্য উৎপাদন করেন। তার ফলে তিনিই মুনাফার একমাত্র অধিকারী। যাদের গায়ের রক্তে তাঁর বিত্ত সঞ্চিত হলো—তারাই রইলো বঞ্চিত। এখানে শোষণ-ব্যবস্থা কায়েম হচ্ছে। অপরপক্ষে, গ্রামীণ অর্থনীতিতে শোষণের স্থান নাই।

গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য গান্ধীজী কতকগুলি সঙ্ঘ, যেমন নিখিল ভারত চরকা সঙ্ঘ,

প্রভৃতির মাধ্যমে গ্রাম্যশিল্পের গঠন ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করেছিলেন। গ্রামবাসীদের সৃষ্টি-প্রবণতাকে, তাদের আত্মনির্ভরশীলতা ও সৃজন-প্রতিভাকে কার্যাকরী করাই তাঁর উদ্দেশ্য। গ্রামের স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা ব্যতিরেকে পল্লীর উন্নতি সম্ভবপর নয়, তাই এ কাজ তাঁর গঠনমূলক কাজের অন্যতম। এই 'সাফাই' কাজের ভার তিনি মেথরদের উপর দিয়েই ক্ষান্ত হন নাই। যেহেতু পরিচ্ছন্নতা একটা মানবিক নীতি বিশেষ, সেইহেতু তিনি গ্রামবাসীদিগকে নিজেদের করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। অধিকাংশ পল্লীবাসী আজও অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য তিনি 'হিন্দুস্থান তামিল সঙ্ঘ' স্থাপন করেন। গান্ধীজী উপলব্ধি করেছিলেন যে অশিক্ষার দরুণ জাতির একটা বিরাট অংশের প্রতিভার অপচয় হচ্ছে—তাই অল্প সময়ে নিরক্ষর সমাজকে শিক্ষার আলোক-দানের উদ্দেশ্যে—দেশব্যাপী বয়স্কশিক্ষা, আবশ্যিক-শিক্ষা প্রভৃতির বিস্তারের কর্মপন্থা গ্রহণ করেন। ছেলেদের শিক্ষার জন্য তিনি বনিয়াদী শিক্ষার প্রচলন করেছিলেন। এই শিক্ষার দ্বারাই মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর প্রকাশ সম্ভব। তাই বুনিয়াদী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এখন সর্বজনস্বীকৃত।

গ্রামীণ অর্থনীতির অপরিহার্য্য অঙ্গ হিসাবে গান্ধীজী গো-সেবার ব্যবস্থা করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি 'গো-সেবা-সঙ্ঘ' স্থাপন করেছিলেন। 'কস্তুরবা গান্ধী স্মৃতি ট্রাষ্টে'র মাধ্যমে তিনি পল্লীর নারীসমাজের ও শিশুদের উন্নতি-বিধানের পরিকল্পনা করেছেন।

বিভিন্ন গঠনমূলক কর্মপদ্ধতির সমন্বয়ের জন্য গান্ধীজী একশ টাকা মাসোহারা দিয়ে সারাক্ষণের জন্য গঠনকর্মী নিয়োগ অনুমোদন করেছিলেন। এই সব কর্মীদের পাঁচবৎসর পর্য্যন্ত বেতন দেওয়া হবে। বছরে শতকরা কুড়িটাকা হিসাবে বেতন কমিয়ে এনে, পাঁচবছর পরে এদের ভাতা বন্ধ ক'রে দিয়ে এদিকে স্বাবলম্বী করে তুল্‌তে হবে। একজন গঠনকর্মীকে তার নির্দিষ্ট পল্লীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ঘটিয়ে, তাঁকে নিজের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা কর্‌তে হবে।

রবীন্দ্রনাথের ন্যায় গান্ধীজীর মতেও একজন আদর্শ গঠনকর্মী পল্লীর সুখদুঃখের অংশীদার হবেন। তাঁকে পল্লীর সব কাজেই হাত লাগাতে হবে। প্রয়োজন হ'লে নার্সের কাজ, ছেলেদের শিক্ষকতা, বিরোধের অবসানের জন্য সালিশী করা, এমন কি মেথরের কাজ পর্য্যন্ত সানন্দে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকা চাই। এই ভাবে পল্লীবাসীদের নিজের আদর্শে অনুপ্রাণিত ক'রে তুল্‌তে হবে। আজকাল যে জিনিষের সবচেয়ে বেশী অভাব, সেটা হচ্ছে পল্লীর জনসাধারণের সহযোগিতা ও তাদের কাজে অংশ গ্রহণেচ্ছুতা। তাই পল্লীবাসীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপনের দ্বারা তাদের বিশ্বাসভাজন হ'তে হবে। গঠন-কর্মবিধি পল্লীর অগণিত জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত কর্‌তে হবে। শুধু একজন কর্মীর দ্বারাই কি একটা পল্লীর বিবিধ সমস্যার সমাধান ও পল্লীউন্নয়নের বিপ্লব সাধন সম্ভব? এটা জানা দরকার যে প্রত্যেক মানুষের অন্তরে গঠনকর্মীর সত্তা সুপ্ত অবস্থায় বর্তমান। এই সত্তাকে উদ্বুদ্ধ ক'রে গঠনকর্মচালিত করাই একজন পল্লীকর্মীর মুখ্য কাজ। এ কাজের জন্য শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্‌মা পাওয়াটাই যথেষ্ট নয়; পল্লীর স্থানীয় অর্থনীতি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, জনগণের মনস্তত্ত্ব, অভাব অভিযোগ—প্রভৃতি বিষয়ে কর্মীর সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হওয়া দরকার। গঠনকর্মীকে পল্লীবাসীর সামাজিক জীবনের ও তাদের ব্যক্তিগত বিবিধ সমস্যার সমাধানের নির্দেশ দিতে হবে। অধুনা সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনায় সারা ভারতে ৪২৩৭ জন গঠনকর্মী, ৪৬টা প্রজেক্টে ও ২৩টা ব্লকে নিযুক্ত হয়েছেন। পরিকল্পনার সাফল্য সম্বন্ধে গান্ধীজী যে দৃঢ় মত পোষণ করেছিলেন তা এই যে—যদি গঠনকর্মী উপযুক্ত উদ্যম, উৎসাহ ও কর্মপটুতার সঙ্গে উন্নয়নমূলক কাজ সুচিন্তিত কর্মপন্থা নিয়ে পরিচালিত করেন, তা হ'লে অবহেলিত জনসাধারণের সমবেত প্রচেষ্টায় পল্লীর জীবনধারণপ্রণালীর বৃহত্তম বিপ্লব সাধন করা সম্ভব হবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু, এম্‌-এ, আই-এ-এস্‌ মহাশয়ের "Village Workers and Community Project (Seen from Gandhian angle of vision)" নামক ইংরাজী প্রবন্ধের ভাব-গ্রহণে রচিত।—লেখক।



কঙ্কণ

শ্রীযামিনীমোহন কর

কলিকাতার নামকরা ধনী ব্যবসায়ী মিষ্টার এন. সি. ডাট। লেকের ধারে আধুনিক ফ্যাশানের নতুন বাড়ী। তিনটে গাড়ী। ডালহৌসী স্কোয়ারে নিজের অফিস। দেখলে কে বলবে যে, দশবছর পূর্ব্বে তিনি ছিলেন স্কুল মাষ্টার। আজকে তাঁর স্মার্ট চেহারা, বিলিতী পোষাক দেখে কল্পনা করা যাবে না যে, একদিন তাঁর কোটরগত চোখ, তোবড়ান গাল ছিল—আর পরণে ছিল ময়লা ধুতি,তালি দেওয়া কোট। তখনকার নবীনচন্দ্র দত্ত নামটা লোকে ভুলে গেছে। বললে চিনতে পারে না। আজ তিনি মিষ্টার এন. সি. ডাট। স্কুল মাষ্টার নয়, শিল্পপতি।

বাপ ছিলেন কেরাণী। অল্প আয়। নবীন বি-এ পরীক্ষা দেবার পরই চোখ বুজলেন। ছেলের পাশের খবরও শুনে যেতে পারলেন না। নবীন পাশ করল বটে বেশ ভালভাবেই, কিন্তু পয়সার অভাবে আর পড়া হ'ল না। স্থানীয় স্কুলে অনেক কষ্টে একটা মাষ্টারী জুটিয়ে নিল। মাইনে চল্লিশ টাকা। সে আজ প্রায় ত্রিশ বছর আগেকার কথা।

মা ছেলের বিয়ের জন্য ব্যস্ত। শরীর ভেঙ্গে গেছে, সেই সঙ্গে মনটাও। সংসারের চাকা আর ঠেলতে পারে না। নবীন আপত্তি করে আয় কম। কিন্তু মনে মনে কল্পনা করে সুন্দরী কিশোরী, সলজ্জা সনম্রা বধূর চাঁদমুখ। দেড় বছর মাষ্টারী করছে। তখনও জীবনের আলো নিভে যায় নি, হৃদয় শ্মশান হয় নি। তাই আপত্তিটা তেমন জোরালো হয় না। শীঘ্রই মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

কপোত-কপোতী। দু'জনেরই মন রঙীন স্বপ্নে ভরপুর। নবীন চায় রেবাকে সাজাতে নব নব বস্ত্রে অলঙ্কারে। কিন্তু চল্লিশ টাকায় সংসারই চলে না। তবু একদিন রেবাকে প্রশ্ন করে নবীন, কি উপহার পেলে সে সুখী হয়। রেবা প্রথমে না, না, বলে। কিন্তু শেষে জানায়, একজোড়া কঙ্কণ পরবার তার বড় সাধ। পাশের বাড়ীর স্যাকরাদের বউ পরে। ভারী সুন্দর দেখায়।

নবীন দমে যায়। ভাল একজোড়া কঙ্কণের মূল্য শ' দুয়েকের কম নয়। বহু দোকানে জিজ্ঞেস করে। এর চেয়ে কমে আর হয় না। তার পক্ষে এ যেন আকাশকুসুম। কিন্তু বউ সখ করে চেয়েছে। শেষ পর্য্যন্ত সে সত্য সত্যই রেবাকে কঙ্কণ এনে দেয়। রেবা প্রশ্ন করে, টাকা কোথায় পেলে? নবীন হাসে, কোন উত্তর দেয় না।

তারপর দেশের অবস্থা গেল বদলে। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ। দিন আর কাটে না। রেবার দু'একটা ছোটখাটো গয়না যা ছিল, সব গেছে। ছেলের অসুখ। হাতে টাকা নেই। অভাব অনটনে সংসারের শান্তি চলে গেছে। রেবা হয়ে পড়েছে খিটখিটে। নবীনের মেজাজ সর্ব্বদাই তিরিক্ষি।

রেবা ঠিক করেছিল, যত অভাবই আসুক, কঙ্কণ সে বিক্রী করবে না। স্বামীর প্রথম প্রণয়োপহার। কিন্তু এখন না বিক্রী করেই বা উপায় কি? ছেলেটাকে তো বাঁচাতে হবে। তবে স্বামীকে দিয়ে বেচা—না তা সম্ভব নয়। মনে বড় ব্যথা পাবে।

স্যাকরাদের বউএর শরণাপন্ন হয় রেবা। কিন্তু পরদিন যা শুনলে তাতে সে স্তম্ভিত। কঙ্কণের ভেতরটা পেতল, ওপরে শুধু সোনার পাত। দাম খুব বেশী হয় তো ত্রিশ টাকা।

ক্রোধে ঘৃণায় রেবার মন বিষিয়ে ওঠে। লজ্জা করল না স্ত্রীকে ঠকাতে। পাঁচজনের সামনে তার মাথা হেঁট করাতে। কি ক্ষতি হ'ত এরকম উপহার না দিলে? যার মুরোদ নেই, পয়সা নেই, তার আবার সখ কেন?

রাগ পড়তে সে চিন্তা করে দেখল, তারই অন্যায় হয়েছে। ছিঃ ছিঃ, স্বামীর মনের দিকে চাইল না, আবেগ বুঝল না।

স্বামী মাষ্টার, গরীব অসমর্থ, কিন্তু প্রেম তো কম ছিল না। অপরাধী, জুয়াচোর, কিন্তু কেন? স্ত্রীর মুখে হাসি ফোটাবার জন্যই না?

রেবা মনকে প্রবোধ দেয় বটে, কিন্তু তবু কেমন খচখচ করতে থাকে। কঙ্কণ হাতে নিয়ে ভাবে। পরবে না। পরলেই এই সব কথা মনে পড়বে। বাক্সে তুলে রাখলে হয়ত' ভুলে থাকতে পারবে। কিন্তু চিরকাল সে কঙ্কণ পরে এসেছে। একদিনের জন্যও খোলে নি। খালি হাত দেখলে স্বামীই বা কি ভাববে। হয়ত' বুঝতে পারবে, সব জানতে পেরেছে সে। না, সেটা ঠিক হবে না। কঙ্কণ পরেই ফেলে রেবা।

স্কুল থেকে বাড়ী ফিরে নবীন দেখে ছেলের জ্বর বেড়েছে। হাতে পয়সা নেই। রেবার যা কিছু সামান্য গয়না ছিল, সব গেছে। বাকী শুধু কঙ্কণ। নবীন সেটা নিতে পারে না। জানে তা হলেই সব ফাঁস হয়ে যাবে। মনে ভাবে, রেবা জানে না তার অপরাধের কথা। স্বামী কি সুন্দর দামী কঙ্কণ দিয়েছে, এই মনে করে যদি রেবা তৃপ্তি পায়, তাতে সে বাদ সাধবে না।

ধারের চেষ্টায় নবীন বার হয়। কিন্তু কোথায় যাবে? খালি হাতে গরীব মাষ্টারকে কে ধার দেবে? অন্যমনস্ক হয়ে পথ দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ দেখা অনাদির সঙ্গে। সিনেমা দেখে বেরোচ্ছে। কলেজে চার বছর একসঙ্গে পড়েছিল। নবীনকে দেখেই অনাদি চিনেছে। কাছে এসে বললে, "কি খবর রে? অনেকদিন দেখিনি। চেহারা তো ঝোড়ো কাকের মত করেছিস। চল আমার বাড়ী।" আপত্তি করবার অবসর দেয় না। হাত ধরে তুলে নেয় নিজের গাড়ীতে। প্রকাণ্ড ব্যুইক।

অনাদির বাড়ীতে নেমে নবীন অবাক। এত ঐশ্বর্য্য! অথচ ক্লাসে একেবারে বাজে ছেলে ছিল অনাদি। বি-এ ফেল করে বলেছিল, "আমার সৌভাগ্য যে আমি পাশ করতে পারি নি, আর তোর দুর্ভাগ্য যে তুই পাশ করতে পেরেছিস।" তখন নবীন ভেবেছিল হিংসা। আজ দেখছে, ভবিষ্যদ্বাণী।

নবীন সঙ্কোচ বোধ করে। অনাদি ছাড়ে না। চা জলখাবার খেতে খেতে কত কথাই হয় দুই বন্ধুতে। পুরানো স্মৃতির রোমন্থন। নিজের অজ্ঞাতেই নবীন অভাব দৈন্যের কথা, ছেলের অসুখের কথা বলে ফেলে।

বিদায় দেবার সময় অনাদি তার হাতে একশ' টাকা গুঁজে দেয়। কোন আপত্তি শোনে না। আর বলে, মাষ্টারী ছেড়ে ব্যবসায় নামতে। যুদ্ধের বাজার। টাকা উড়ছে। সাহায্য করবে সে নিজে।

নবীন মাষ্টার চাকরী ছেড়ে নামল ব্যবসায়। সে আজ দশ বছর আগেকার কথা। তারপর দেখতে দেখতে ফেঁপে উঠল। কত গয়না, কত শাড়ী হয়েছে রেবার। বাড়ী গাড়ী কিছুরই অভাব নেই।

নবীন বলে রেবাকে, "তোমার কঙ্কণ জোড়াটা দাও। বদল করে দিই।"

রেবা উত্তর দেয়, "কেন? বেশ তো আছে।"

নবীন বলে, "পুরানো ফ্যাশান। ওটা ভেঙ্গে নতুন করে গড়িয়ে দিই।"

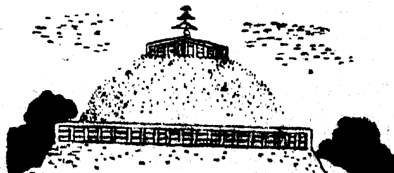
রেবা হেসে উত্তর দেয়, "ইচ্ছা হয়, নতুন একটা গড়িয়ে দাও। ওটা ভাঙ্গতে দেব না। তোমার প্রথম উপহার। কখনও হাত থেকে, খুলব না। চিতায় সঙ্গে দিও। খুলে নিও না যেন।"

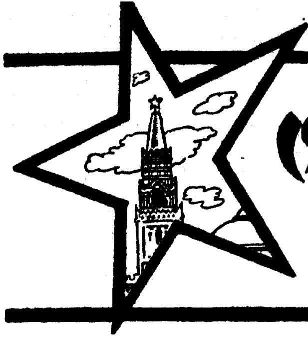
নবীন জেদ করতে সাহস করে না। যদি রেবা আসল কথাটা জানতে পারে। অপরাধীর মত চেয়ে থাকে রেবার দিকে।

রেবা হাসে। "কি অমনি রাগ হয়ে গেল?"

নবীন জোর করে মুখে হাসি টেনে আনে। বুকটা বেদনায় টনটন করতে থাকে।

মিষ্টার ডাট ভুলতে চান নবীন মাষ্টারকে। কিন্তু পারেন না। ঐ কঙ্কণ থাকে পথ আগলে।





সোভিয়েট দেশে

শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সুদূর সাইবেরিয়া-অঞ্চলের এক দীন-দরিদ্র মৎস্যজীবী-পরিবারে ১৮৭৩ সালে গ্রিগরী রাস্‌পুটিনের জন্ম। পরবর্ত্তীকালে সসাগরা রুশ-সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক-ভাগ্যাকাশে কুগ্রহের মত আবির্ভূত হয়ে অপ্রতিহত প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করলেও রাস্‌পুটিনের শৈশব-ইতিহাসের কথা আজ পর্য্যন্ত রহস্যে আবৃত রয়েছে। এ-সম্বন্ধে দেশে-বিদেশে নানা কিম্বদন্তীর প্রচলন থাকলেও, রাশিয়ার রহস্যময়-পুরুষ রাস্‌পুটিনের শৈশব-কাহিনীর কোনো সঠিক বিবরণ মেলেনি এ-যাবত। কৌতূহলী-ঐতিহাসিকদের গবেষণা-অনুসন্ধানের ফলে, শুধু এইটুকু জানা যায়, সারা যৌবন উদ্দাম-উচ্ছৃঙ্খলতা আর কন্দর্পের-অত্যাচারে কাটিয়ে রাস্‌পুটিন্ অবশেষে প্রৌঢ়-বয়সে মঠে যোগদান করে ধর্ম্ম-গুরু (Monk) সন্ন্যাসীর মুখোস পরেন। মঠে আশ্রয় নিয়ে ধর্ম্মের মুখোস আঁটলেও দুর্নীতি-পরায়ণ রাস্‌পুটিনের উচ্ছৃঙ্খলতার উপশম ঘটেনি···বরং তা বেড়ে ওঠে চতুর্গুণ! সাধু সেজে ধর্ম্মাশ্রমের থেকে ধর্ম্ম-কর্ম্ম, সাধন-ভজন এবং পূজার্চ্চনার ক্রিয়া-কলাপের অছিলায় হীন-চরিত্র রাস্‌পুটিন্ সুচতুর-কৌশলে উদ্দাম-উচ্ছৃঙ্খল লাম্পট্য-লীলায় প্রলুব্ধ-প্ররোচিত করে, শুধু মঠের উপাসিকা-সন্ন্যাসিনীদের নয়—তৎকালীন রুশ-সমাজের বহু নিরীহ-ধর্ম্মানুরাগিণী সম্ভ্রান্ত-অভিজাত বংশের এমন কি রাজ-পরিবারের বহু মহিলারা সর্ব্বনাশ সাধন করেছিলেন। শোনা যায়, দুশ্চরিত্র হলেও অসাধু রাস্‌পুটিনের ছিল এক বিচিত্র শক্তি···চুম্বকের মত প্রবল আকর্ষণ ছিল তাঁর সম্মোহন-ক্ষমতা···সে সম্মোহনী-মায়ার প্রভাব এড়ানো যে কোনো লোকের, বিশেষ করে মহিলাদের পক্ষে নাকি ছিল রীতিমত দুঃসাধ্য ব্যাপার! ক্ষণিকের হলেও, একবার যে কেউ পড়েছেন রাসপুটিনের নজরে, তাঁকেই শেষ পর্য্যন্ত, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে এই রহস্যময় রুশ-সন্ন্যাসীর পাপ-পঙ্কিল সম্মোহন-জালে। এমন কি পুণ্যশীলা-ধর্ম্মাতুরা মহিলাদের অনেককে একান্ত নিরুপায় অবস্থায় নিজেদের কুল-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে শোচনীয়ভাবে আত্মাহুতি দিতে হয়েছে দুর্নীতি-পরায়ণ রাস্‌পুটিনের লোলুপ-হুতাশনে! রাস্‌পুটিনের ধর্ম্মমতও ছিল রীতিমত বিচিত্র। তিনি প্রচার করতেন—'আগে পাপ করো, তবেই মিলবে পরমেশ্বরের করুণা! অনাচারের অনুসরণে মিলবে মোক্ষ!'

পাপানুষ্ঠানের বীভৎস-তন্ত্রানুশীলন এবং অভিনব সম্মোহনী-শক্তি ছাড়া অনাচারী রাস্‌পুটিনের আরো বিশেষ একটি অলৌকিক-শক্তি ছিল। শোনা যায়, অদ্ভুত এক ঐশ্বরিক-ক্ষমতাগুণে তিনি নাকি যে কোনো দুরূহ-দুরারোগ্য ব্যাধি, বিনা-ঔষধে মন্ত্রবলে অচিরে নিরাময় করে তুলতে পারতেন। সে-আমলে অভিজাত-রাজকর্ম্মচারীদের অপরিসীম ঔদাস্য-অবহেলা আর অব্যবস্থার ফলে পশ্চাৎপদ-রুশরাজ্যের



প্রবীণ রুশ সেনাধ্যক্ষ প্রিন্স নিকোলাই নিকোলাইভিচ্

সর্ব্বত্র ব্যাধির প্রকোপ লেগে থাকতো সর্ব্বদা···রাস্‌পুটিনের এই অলৌকিক ঐশ্বরিক-ক্ষমতার খবর পেয়ে রাশিয়ার দূর-দূরান্ত থেকে দলে-দলে রোগী এসে জড় হতে লাগলো তাঁর কাছে। লোকের মুখে-মুখে গুজব রটনা ছাড়া, রাস্‌পুটিনের মোহ-মুগ্ধ শিষ্য এবং ভক্ত-অনুচরবৃন্দের

মারফৎ তাঁর এই অদ্ভুত দৈব-শক্তির অপরূপ কাহিনী অর্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো সারা রাশিয়ায়—সে-কাহিনী শুনে কৌতূহলী হয়ে রুশ-দেশের অভিজাত-সম্প্রদায়ের লোকজন, এমন কি সম্ভ্রান্ত-পদস্থ রাজপুরুষদের অনেকে রাস্‌পুটিনের দোরে এসে রীতিমত ধন্না দিতে সুরু করলেও—রোগ-মুক্তির উদ্দেশ্যে !…এ হলো ১৯০৭ সালের কথা !

রাস্‌পুটিনের এই রহস্যময়-শক্তির কথা ক্রমে পৌঁছুলো গিয়ে রুশ-রাজদরবারে…সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাসের রাজ-অন্তঃপুরে ধর্ম্ম-ভীরু রাজমহিষী আলেক্‌জান্দ্রা ফিওডোরোভ্‌নার কাছে। রাজ-অন্তঃপুরে তখন দারুণ দুশ্চিন্তার আবহাওয়া…'জার্'-দম্পতির নয়নের মণি, চার কন্যার পর একমাত্র সন্তান, রাজ-পরিবারের শিশু-যুবরাজ 'জারেভিচ্' (Tsarevich) আলেক্সিস্ দুরারোগ্য-কঠিন রক্তস্রাবী-ব্যাধি 'হেমো-ফিলিয়া' (Hemophilia) আক্রান্ত হয়ে মরণাপন্ন অবস্থায়… দেশের এবং বিদেশের বড় বড় নামজাদা বৈদ্য-চিকিৎসকের দল সবাই হাল ছেড়ে দিয়েছেন। এমন সংকটের দিনে, সন্তানের জীবনের



পোলাণ্ডের যুদ্ধক্ষেত্রে জার্মান সেনাদের আক্রমণে রুশ সেনাদের পশ্চাদপসরণ

জন্য ব্যাকুল হয়ে রাণী আলেকজান্দ্রা অবশেষে সকাতর-আহ্বান জানিয়ে শক্তির অধিকারী রাস্‌পুটিনকে রাজ-অন্তঃপুরে আমন্ত্রণ করে আনলেন—দৈব-চিকিৎসার গুণে মৃত্যুশয্যাশায়ী-রাজপুত্রের রোগ-নিরাময় হয়, যদি রাস্‌পুটিন্ আসেন রোগাতুর-যুবরাজের রোগ-শয্যার পাশে। তারপর, রহস্যময় কোনো চিকিৎসা-পদ্ধতি বা অভিনব সম্মোহনী প্রক্রিয়ায় (Clairvoyance or Hypnotic power) অথবা অলৌকিক দৈব-শক্তির গুণে, যে-কারণেই হোক্, রাস্‌পুটিনের পদার্পণ করার সঙ্গে-সঙ্গেই অতি অল্পকালের মধ্যে মৃতপ্রায়-যুবরাজ আবার সুস্থ-নিরাময় হয়ে উঠতে সুরু করলেন। আরো আশ্চর্য্যের বিষয় যে, রাস্‌পুটিনের দর্শন-লাভের পর থেকেই রাজপুত্র আলেক্সিসের অসুখের বেদনা-গ্লানি-কষ্ট সব উত্তরোত্তর কমতে লাগলো এবং অচিরে রোগ-মুক্ত হয়ে তিনি আবার নব-জীবন লাভ করলেন। কি বিচিত্র রহস্যময়-উপায়ে রাস্‌পুটিন্ রুশ-রাজকুমারকে সারিয়ে তুলেছিলেন—তার সন্ধান আজো পর্য্যন্ত কেউ খুঁজে বার করতে পারেন নি। তবে সে-আমলে অনেকেরই বিশ্বাস জন্মেছিল যে অদ্ভুত এই ঘটনাটির মূলে অজানা কোনো ঐশ্বরিক-শক্তির অলৌকিক প্রভাব ছিল। এমনিভাবে রাস্‌পুটিনের অলৌকিক-ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে তৎকালীন রুশ জন-সাধারণ, দেশের অভিজাত-সম্প্রদায় এবং রাজ-দরবারের অনেকে বিশেষ সম্রাট নিকোলাস আর সম্রাজ্ঞী ফিওডোরোভ্‌না এমন অভিভূত হয়েছিলেন যে শেষ পর্য্যন্ত সেই ব্যভিচারী-লম্পট ধর্ম্মগুরুর একান্ত আনুগত্য স্বীকার করে নিতে তাঁদের মনে দ্বিধা জাগেনি; রাজ-মহিষী ফিওডোরোভ্‌নার অন্ধ-বিশ্বাস জন্মেছিল যে রাস্‌পুটিনের কৃপাতেই তাঁর পুত্রের জীবন-রক্ষা হয়েছে। তাই দুশ্চরিত্র হলেও রাস্‌পুটিন্‌কে তিনি দেবতার মত ভক্তি করতেন এবং অবিচল-নিষ্ঠায় তাঁর যা কিছু অন্যায়-আদেশ বিনা দ্বিধায় মেনে চলতেন। এমন কি রাস্‌পুটিনের দুর্নিবার উদ্দাম-উচ্ছৃঙ্খলতা এবং অনাচার ও অসংকোচে বরদাস্ত করে যেতেন! এমনিভাবে রাণী ফিওডোরোভ্‌নার উপর প্রভাব বিস্তার করার পর, ফন্দীবাজ রাস্‌পুটিন্ দিনে-দিনে রুশ-রাজদরবারে নিজের ক্ষমতা-প্রতিপত্তি সুদৃঢ় এবং কায়েমী করে তুললেন! অল্পকালের মধ্যেই কৌশলে পুত্রমোহাতুরা-ধর্ম্মান্ধ সম্রাজ্ঞী ফিওডোরোভ্‌নাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বেঁধে, তাঁরই সহায়তায় দুর্ব্বলচিত্ত-স্ত্রৈণ সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাস এবং রুশ-দরবারে রাজানুচর-অমাত্যদের বশীভূত করে রাস্‌পুটিন্ দেশের শাসন-যন্ত্রটিকে নিজের হাতের মুঠোয় এনে ক্রমে সুবিশাল রাশিয়ার রাজনৈতিক-ক্ষেত্রেও অপ্রতিহত-দাপটে একচ্ছত্র-ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বসলেন! সম্রাট নিকোলাস কিন্তু এমন স্ত্রৈণ এবং দুর্ব্বল চরিত্রের রাজ্যশাসক ছিলেন যে, সম্রাজ্ঞী ফিওডোরোভ্‌নাকে চটিয়ে ক্ষমতাগ্রাসী রাস্‌পুটিনের অন্যায়-অনাচারেরবিরুদ্ধে এতটুকু প্রতিবাদ বা আপত্তি তোলবার সাহস ছিল না তাঁর…বরং বিনা-বাক্যে মাথা হেঁট করে সম্রাজ্ঞী ফিওডোরোভ্‌নার অন্যায়-অনুরোধ, অবাধ-প্রশ্রয়দান, আর রাস্‌পুটিনের সব অনাচার-অপমান সহ্য করে চলতেন দিনের পর দিন। সম্রাটের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে সুচতুর রাস্‌পুটিন্ দোর্দণ্ড-প্রতাপে যথেচ্ছাচার চালাতেন। 'জার্' দ্বিতীয় নিকোলাস শুধু নামেই ছিলেন সম্রাট…রাজ-সিংহাসনের পাশে থেকে রাজ্য-শাসনের যা কিছু ব্যবস্থা সবই আসলে করতেন রাস্‌পুটিন্! এমনিভাবে ক্রমে রাস্‌পুটিনের প্রতাপ-প্রতিপত্তি এমনই প্রবল-প্রচণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে তাঁরই আদেশ মেনে চলতো দরবারের এবং রাজ্যের প্রত্যেকটি লোককে। সামান্য কোন কারণে রাস্‌পুটিনের এতটুকু বিরাগ-ভাজন হলেই ঘটতো তার সর্ব্বনাশ! সে-সময় রাস্‌পুটিনের খেয়াল-খুসি

রাজ্যের ছোট-বড় যে-কোনো রাজ-কর্মচারী, অনুচর, অমাত্য এবং সেনাধ্যক্ষ, সৈন্যদের কাজে বাহাল, বদলী বা বরখাস্ত করা হতো… সেজন্য সকলেরই মনে জাগতো বিদ্বেষের বহ্নি।…কিন্তু রাসপুটিনের কড়া-প্রতাপের ফলে এবং 'জার্'-এর চরম নির্লিপ্ততার দরুণ, কারো টুঁ শব্দ করবার উপায় ছিল না। তবে মুখে না প্রকাশ করলেও, মনে-মনে প্রজা এবং রাজকর্মচারীদের অনেকেই ক্রমেই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল রাজ্যের এই শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে! রাস্‌পুটিন্ কিন্তু এ-সব ব্যাপার নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাতেন না…রাজকার্য্যাদি পরিচালনার মাঝে একটু ফাঁক পেলেই নারী, সুরা ও বীভৎস অনাচারের স্রোত বইয়ে তিনি মেতে থাকতেন তাঁর উদ্দাম-উচ্ছৃঙ্খলতার লীলা-রঙ্গে!

একদিকে এই উচ্ছৃঙ্খল-দুর্নীতি-অনাচারের পঙ্কিল-স্রোত, আর এক-দিকে নিদারুণ শাসন-বিশৃঙ্খলার ফলে সাম্রাজ্যের অবস্থা দিন-দিন পরম শোচনীয় হয়ে উঠছিল……দেশের জন-সাধারণের মনে জ্বলতে সুরু করেছিল অসন্তোষ-বিদ্রোহের তীব্র বহ্নি! দুর্ব্বল সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাসের নির্লিপ্ত-উদাসীনতা, রাস্‌পুটিনের বীভৎস-ব্যাভিচারিতা ছাড়া রুশ-প্রজাদের বিক্ষোভের মূলে ছিল রাজ্যের প্রধান-মন্ত্রী ষ্টোলিপিনের নির্ম্মম-কঠোর দমন নীতির। ষ্টোলিপিনের শাসন-ব্যবস্থার ফলে অসহায়-দরিদ্র রুশ-কৃষিজীবীদের অবস্থা দিন দিন আরো সঙ্গীন হয়ে উঠলো! রাজানুগৃহীত গৃধ্নু জোত-দারের দল অবাধে দরিদ্র কৃষকদের সারবান জমিগুলি গ্রাস করতে লাগলো! শুধু কৃষিজীবী নয়, রাজ্যের দরিদ্র শ্রমিক-সম্প্রদায়ের দুর্দ্দশাও ক্রমে মর্ম্মান্তিক হয়ে দাঁড়ালো! ১৯১২ সালে সুদূর সাইবেরিয়ার 'লেনা' (Lena) সোনার খনিতে অবাধ-শোষণ, হাড়ভাঙা-খাটুনি আর অমানুষিক-অত্যাচারের প্রতিবাদে ছয় হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘট বাধিয়ে বসলো সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে! কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধে ধর্মঘটি শ্রমিকের দল যেদিন সোনার খনির কার্য্যালয়ে গিয়ে আপোষের আলোচনা চালিয়ে মিটমাটের ব্যবস্থা পাকা করতে চলেছে, তখন আচম্বিতে 'জার্'-এর সশস্ত্র শাস্ত্রী-বাহিনী আশপাশ থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে নিতান্ত নির্ম্মমভাবে নিরীহ-অসহায় নিরস্ত্র জনতার উপর বেপরোয়া বন্দুকের গুলি চালায়। অতর্কিতে এই গুলি-বর্ষণের ফলে পাঁচশো নিরীহ শ্রমিক হতাহত হলো সোনার খনির পথ-প্রান্তে পড়ে! অসহায়-নিরীহ শ্রমিকদের উপর শাস্ত্রীদের অকস্মাৎ এই নির্ম্মম-আক্রমণের খবরে সারা রুশদেশে দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সে বিক্ষোভের ফলে দাবানলের মত সারা রাশিয়ার বুকে ধর্ম্মঘটের সূচনা হয় রীতিমত ব্যাপকভাবে! তিন লক্ষ শ্রমিক যোগ দিয়েছিল সেদিনকার সে ধর্মঘটে! 'ষ্টেট্ ডুমা' (State Duma) বা রুশীয় রাজ-পরিষদগৃহে এ-প্রসঙ্গের আলোচনা হয়; কিন্তু সরকারের তরফ থেকে উদ্ধত জবাব আসে যে—প্রয়োজন হলে, ভবিষ্যতে বিদ্রোহীদের এমনি শিক্ষাই দেওয়া হবে আবার!

সরকারী তরফের এই উদ্ধত-উত্তরের ফলে পয়লা মে (May Day) তারিখে চার লক্ষ শ্রমিক বিক্ষুব্ধ হয়ে শুধু যে ধর্মঘট বাধিয়ে বসলো তাই নয়, বড়-বড় সভা এবং বিরাট মিছিল করে তারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী, দিনে আট ঘণ্টা করে খাটুনির সময় নির্দ্ধারণ, ধনী জমিদারদের জমিদারী বাজেয়াপ্ত করার দাবীও জানালো সদীপ্তকণ্ঠে!

শ্রমিকদের হুমকি-দাবীর পাল্টা জবাবে মালিকের দল তাঁদের কার-খানা বন্ধ করে দিলেন! হাজার-হাজার শ্রমিককে কাজ থেকে বরখাস্ত করা হলো। তবু রুশ-শ্রমিকদের সে-আন্দোলন দমানো গেল না। বরং শ্রমিকদের অদম্য মনোবল দেখে উৎসাহিত হয়ে রুশকৃষিজীবীরা এগিয়ে এসে দেশের ধনী জমিদারদের বিরুদ্ধে ব্যাপক-আন্দোলন সুরু করে দিলেন—রীতিমত সঙ্ঘবদ্ধভাবে!

এমনি সময়ে সৈন্যবাহিনীতেও বিক্ষোভ-আন্দোলনের ছোঁয়াচ লাগলো! তুর্কিস্থানে, বল্টিক সাগরের নৌ-বহর ঘাটিতে, আর সিবাস্তোপোলেও সেনাদলের মধ্যে ধূমায়িত হয়ে উঠলো বিদ্রোহের আগুন!

রাশিয়ার গণ-বিপ্লব আন্দোলনের মন্ত্রগুরু নেতা লেনিন এ সময়ে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস্ সহরের নিভৃত-নিরালা প্রান্তে সন্তর্পণে আত্মগোপন করে বসবাস করছিলেন। এর আগে ১৯০৫ সালে কৌশলে 'জার্'এর দুর্দ্ধর্ষ গোয়েন্দা-চরদের চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়ে এসে রুশ-বিপ্লবীদের গণ-আন্দোলনে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে স্বদেশে ফিরে এলেও, ১৯০৭ সালে রাজ-মন্ত্রী ষ্টোলিপিনের নির্ম্মম দমন-নীতির দাপট থেকে মুক্তি-সংগ্রামের মহৎ-সঙ্কল্পকে অক্ষত-অটুট ও সঞ্জীবিত রাখতে বিদ্রোহী বীর লেনিনকে আবার রাজ-গুপ্তচরদের শ্যেন-দৃষ্টি এড়িয়ে বিপদসঙ্কুল-পথে বিদেশে পালাতে হয়েছিল। আগের বারের মত এবারেও ফ্রান্সের প্যারিস্ সহরের বুকেই আত্মগোপন করে লেনিনকে দিন কাটাতে হয়। প্যারিসে বাসের সময় সুদূর-বিদেশের সেই গুপ্ত-ঘাঁটি থেকে রাশিয়ার বিপ্লবী-জনগণের কাছে বিচিত্র ফন্দী-কৌশলের সাহায্য নিয়ে লেনিন নিত্য-নিয়ত পাঠাতেন তাঁর সুচিন্তিত বিধিনির্দ্দেশ-পরিকল্পনাদি, আর গণ-বিপ্লব সফল করে তোলার সম্বন্ধে রচিত বিবিধ প্রবন্ধ-পুস্তিকা। স্বদেশের বাইরে বসে লেখা লেনিনের এই সব সুপরিকল্পিত নির্দ্দেশানুসারে তখন চলতো রাশিয়ার 'বল্‌শেভিক্'-বিপ্লবীদের রাজদ্রোহী-আন্দোলনের কার্য্যকলাপ। সুদীর্ঘ-কাল ধরে এমনিভাবে বিপ্লবের কাজকর্ম্ম চালানোর পর অবশেষে ১৯১১ সালে কিয়েভ (Kiev) সহরের এক রঙ্গালয়ে নাট্যাভিনয়ের আসরে, বিপ্লবী-আততায়ীর গুলিতে রাজমন্ত্রী ষ্টোলিপিনের প্রাণবিয়োগের পর রুশ-দেশে সক্রিয়ভাবে গণ-বিপ্লব আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণের একান্ত প্রয়োজন বুঝে, ১৯১২ সালের গ্রীষ্মকালে লেনিন ছদ্মবেশে অবিলম্বে চলে আসেন রাশিয়ার সীমান্তবর্ত্তী-রাজ্য গালিসিয়াতে। সেখান থেকে সুযোগ এবং সুবিধা-অনুযায়ী ফন্দী-কৌশলে রাজ-গুপ্তচরদের সজাগ-দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে নিজের দেশের এসে রুশ-বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগসূত্রে ঘটিয়ে গণ-আন্দোলন সার্থক করে তোলাই ছিল তাঁর আসল উদ্দেশ্য। আন্তরিক অধ্যবসায় এবং বিপ্লবী-সঙ্গীদের প্রাণপাত-প্রচেষ্টায় লেনিনের এই উদ্দেশ্য পরে সিদ্ধিলাভ করেছিল, তবে সে-সময়ে তিনি গালিসিয়ার গুপ্ত-ঘাঁটি-থেকেই তাঁর নির্দ্দেশ-পরিকল্পনা সব সুকৌশলে পাঠিয়ে দিতেন

রুশ-রাজ্যের বিপ্লবীদের কাছে। সংগ্রামের সূচনায় স্বদেশের প্রান্তসীমানায় লেনিনের সাহচর্য্য পেয়ে রুশ-বিপ্লবীদের উৎসাহ ও প্রেরণা বেড়ে উঠলো আরো···সব কিছু বাধা-বিপদ তুচ্ছ করে তাঁরা মেতে গেলেন দুর্নীতির গ্লানিতে ভরা রুশ-রাজশাসনের উচ্ছেদ-কল্পে।

এছাড়া সে-আমলের আরো এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা লেনিনের প্রবর্ত্তিত রুশ 'বল্‌শেভিক্'-বিপ্লবীদের মুখপত্র সুবিখ্যাত 'প্রাভ্‌দা' (Pravda) দৈনিক পত্রিকার প্রকাশ। রাশিয়ার প্রপীড়িত বিক্ষুব্ধ জন-সাধারণকে মুক্তিকামী গণ-বিপ্লবের নবীন-আদর্শে উদ্বুদ্ধ-সচেতন এবং সুশিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে সংগ্রামী-নেতা লেনিনের উৎসাহ-অনুপ্রেরণা ও সুযোগ্য-সম্পাদনায় ১৯১২ সালের ৫ই মে তারিখে রাশিয়ার অভিজাত-সহর সেণ্ট্‌ পিটার্স্‌বুর্গের (আধুনিক লেনিনগ্রাদ) থেকে এ-পত্রিকাখানি প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই অচিরে তখনকার শ্রমিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে এই গণ-বিপ্লববাদী পত্রিকা যে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, তা সত্যই অপূর্ব্ব! শোনা যায়, প্রতিদিন নাকি ৪০,০০০ এর বেশী কাগজ বিক্রী হতো সে-আমলে—এমনই অসম্ভব চাহিদা বেড়ে গিয়েছিল এই দৈনিক পত্রিকার। 'বল্‌শেভিক' বিপ্লবীদের মুখপত্র হলেও রুশ-জন-সাধারণের মধ্যে 'প্রাভ্‌দা' পত্রিকা পড়ার এমন প্রবল ঝোঁক দেখে স্পষ্টই বোঝা যায়—ওদেশের প্রজাদের মন কতখানি বিরূপ-বিদ্বেষী হয়ে উঠেছিল যথেচ্ছাচারী 'জার'এবং তাঁর অনুগত-অনুচর দুর্নীতিগ্রস্ত-স্বার্থান্বেষী অভিজাত-আমলা-অমাত্যবৃন্দের বিপক্ষে!

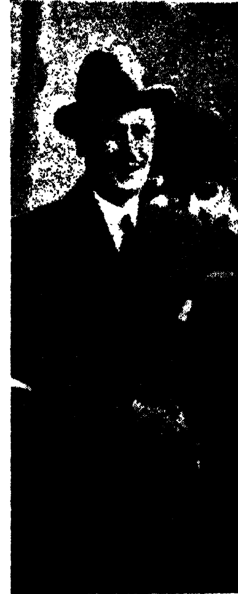
সুবিশাল রাশিয়ার সর্ব্বত্রই জন-সাধারণের মধ্যে গণ-বিপ্লববাদী 'প্রাভ্‌দা' পত্রিকাখানির এই অভাবনীয় প্রসার আর বিপুল জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে 'জার্' দ্বিতীয় নিকোলাস্ এবং রাজদরবারের সকলে সে-সময় রীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন! তাই রাজ্যের বুক থেকে বিপ্লবী-প্রজাদের বিদ্রোহ-প্রচেষ্টা সমূলে নিশ্চিহ্ন করার মানসে 'জার্' থেকে সুরু করে স্বার্থান্বেষী রাজপুরুষদের সকলেই রীতিমত সক্রিয় তৎপর হয়ে উঠলেন! বল্‌শেভিক্-আর বিদ্রোহী প্রজাদের শায়েস্তা করতে দেশে একের পর এক জারী হতে লাগলো নানান্ কঠোর বিধি-নিয়ম আর নির্ম্মম পরোয়না। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রপীড়িত প্রজাদের রাজদ্রোহী-আন্দোলন দমানো গেল না কোনোমতে···বরং গণ-বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠলো আরো প্রবল তেজে!

রুশ-প্রজাদের বিপ্লববাদ প্রচার করার অপরাধে 'জার্' দ্বিতীয় নিকোলাসের কঠোর আদেশে সে-আমলে মাত্র আড়াই বছরের মধ্যে এখান থেকে আবার বল্‌শেভিক্-বিপ্লবীদের মুখপত্র জনপ্রিয় 'প্রাভ্‌দা' পত্রিকাখানির প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আটবারই বিভিন্ন নামে ভিন্ন-ভিন্ন জায়গা থেকে প্রকাশিত করে বিপ্লবীদের দল তাঁদের এই দৈনিক-পত্রিকাটির প্রচার-ব্যবস্থা চালু রেখেছিলেন নিজেদের অদম্য-অধ্যবসায় এবং প্রাণপাত-প্রচেষ্টায়। রাজাদেশে সে-আমলে যতবারই মোটা-মোটা জরিমানা দাবী করে 'প্রাভ্‌দা' পত্রিকাটির প্রকাশনার ব্যাঘাত সৃষ্টি করা হয়েছে, ততবারই বিপ্লবী রুশ-শ্রমিকদের কষ্টার্জ্জিত অর্থানুকূল্যে জরিমানার সে-সব টাকা অচিরে মিটিয়ে দেশের জন-সাধারণ তাঁদের পরম-প্রিয় কাগজখানির মুদ্রণ-প্রচার অব্যাহত ও অপ্রতিহত রেখেছেন একনিষ্ঠ সাধনায়। এ-ভাবে নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে রাজ-দপ্তরের জরিমানার টাকা মিটিয়ে রুশ-প্রজাদের এই 'প্রাভ্‌দা' পত্রিকাখানিকে বাঁচিয়ে রাখার অসামান্য সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে—সে-যুগে 'জার' শাসক-গোষ্ঠী এবং স্বার্থান্বেষী অভিজাত-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ-সঞ্চিত গণ-বিদ্বেষের বিষ কতখানি ব্যাপক, সুতীব্র এবং তিক্ত হয়ে উঠেছিল দিনে-দিনে।

এমনিভাবে বল্‌শেভিক-বিপ্লবীদের সক্রিয়-সহায়তা এবং শিক্ষার গুণে রুশ-শ্রমিকদের মনে একতা আর রাজনৈতিক-চেতনার উন্মেষ দেখে দুর্ব্বল 'জার্'-সম্রাট এবং তাঁর দুর্নীতিগ্রস্ত রাজ-অনুচরের দল ক্রমে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিপত্তি হারানোর আশঙ্কায় রীতিমতই বিচলিত হয়ে উঠলেন। নিজেদের স্বার্থ আর ক্ষমতা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সারা রুশ-রাজ্য জুড়ে রাজা, রাজপুরুষের দল এবং দেশের ধনিক-সম্প্রদায় মুক্তিকামী-প্রজাদের উপর নির্ম্মম অত্যাচার চালাতে লাগলেন নিতান্তই অমানুষিকভাবে! সুদীর্ঘকাল ধরে প্রপীড়িত হলেও প্রজারা কিন্তু দমবার পাত্র নয়—রাজার শাসন যতই কড়া হয়ে উঠতে লাগলো—বিপ্লবীদের গণ-আন্দোলনের ঝড় ততই তীব্র-খর-দুরন্ত হতে সুরু করলো! সুবিশাল রুশ-সাম্রাজ্যের দিকে-দিকে ক্রমশঃই আত্মপ্রকাশ করতে লাগলো রাজদ্রোহী প্রজা-বিক্ষোভের লেলিহান-দাবানল! বাকুর তেলের খনিতে ধর্ম্মঘটকারী বিক্ষুব্ধ-শ্রমিকদের সঙ্গে রুশ-রাজ সরকারের চণ্ডনীতি-পন্থী সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনীর বাধলো তুমুল সংঘর্ষ! সে হাঙ্গামা দমনে অপারগ হয়ে, সঙ্গীন বিপদের ভয়ে রুশ-রাজ-সরকার জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে নিজেদের নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে রাজধানীর বুকে বিপুল সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী মোতায়েন রাখলেন অষ্টপ্রহর। বিপ্লবীদের মুখপত্র 'প্রাভ্‌দা' পত্রিকাখানির মুদ্রণ-প্রচারও রাজার আদেশে বন্ধ করে দেওয়া হলো—পাছে বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে পড়ে আরো প্রচণ্ড তেজে! রুশ-দেশের ঠিক এমনি দুর্য্যোগের সময় ১৯১৪ সালের আগষ্ট মাসে সারা ইউরোপ প্রকম্পিত করে বাধলো ঐতিহাসিক মহা-সমর। জার্ম্মানীর দুর্দ্ধর্ষ-মদমত্ত-সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইল্‌হেম্ (Kaiser Wilhelm II.) সদর্পে যুদ্ধ-ঘোষণা করে বসলেন তাঁরই অন্তরঙ্গ-সুহৃদ রাশিয়ার দুর্ব্বল-'জার্' দ্বিতীয় নিকোলাসের বিরুদ্ধে। বিদেশী শত্রুর এই অতর্কিত-আক্রমণের দাপট থেকে স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষার স্বার্থে সাময়িকভাবে নিজেদের গণ-আন্দোলনের দাবী-দাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে রুশ-জনসাধারণ দলে দলে এগিয়ে এসে 'জার্'-সম্রাটের সেনা-বাহিনীতে যোগ দিয়ে অস্ত্র ধারণ করে কোমর বেঁধে দাঁড়ালো দুরন্ত জার্ম্মাণ-বাহিনীর বিপক্ষে!

লোক-বলে বলীয়ান্ হলেও, 'জার্'-শাসিত রাশিয়া সে-আমলে যুদ্ধের ব্যাপারে প্রস্তুত ছিল না এতটুকু। কারণ, সুদীর্ঘকাল ধরে হীনশক্তি-বিলাসী-অবিবেচক স্ত্রৈণ-কুসংস্কারাচ্ছন্ন রাজার দুর্ব্বল-শাসনাধীনে থেকে রাজ্যের সর্ব্বত্র অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা, দুর্নীতি-অব্যবস্থা আর বিক্ষুব্ধ-

অরাজকতার ব্যাপক-প্রসারতায় সসাগরা রুশ-সাম্রাজ্যের অবস্থা দিনে-দিনে ক্রমশঃ এমনই শোচনীয়-অনুন্নত আর মর্ম্মান্তিক-পশ্চাদপদ হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে বলবার নয়। রাজা, রাজকর্ম্মচারীবৃন্দ এবং দেশের প্রজাদের অবহেলা-উদাসীনতার ফলে রাশিয়ার কল-কারখানা, শ্রম শিল্প-প্রতিষ্ঠান-গুলির এবং চাষ-বাস, কৃষি-ব্যবস্থার দুর্দ্দশা ঘটেছিল চূড়ান্ত রকমের… সেজন্য আধুনিক-প্রথায় যুদ্ধ চালানোর জন্য রণাঙ্গনে সৈন্যদের হাতে পর্য্যাপ্ত-পরিমাণে যুদ্ধাস্ত্র, গোলা-গুলি-রসদ, যান-বাহনাদি প্রভৃতি যে-সব সমর-সম্ভারের জোগান দেওয়া একান্ত প্রয়োজন—তারও অসুবিধা ছিল নিদারুণ! এ-সবের অভাব ছাড়াও ছিল বিলাসী-উচ্ছৃঙ্খল অপদার্থ রুশ-সেনাধ্যক্ষদের সমর-শাস্ত্রাভিজ্ঞতা আর অপটু-যুদ্ধ-পরিচালনা! ফলে ট্যানেনবার্গ (Tannenberg), পোলাণ্ড, বাল্টিক প্রদেশাঞ্চলের যুদ্ধে অমিতবিক্রমী জার্ম্মাণ-সেনাদের দুরন্ত-শক্তির দাপটে পরাজয়ের পর পরাজয়ের গ্লানিতে রুশ-রাজশক্তি রীতিমতই বিপর্য্যস্ত হয়ে উঠলেন। সুদীর্ঘ তিন বছর ব্যাপী এই যুদ্ধে লক্ষ-লক্ষ রুশ-প্রজা হতাহত হয়ে দেওয়ালী-রাতের অগ্নিদগ্ধ-পতঙ্গবাজির মতই অকাতরে প্রাণ-বিসর্জ্জন দিলো। এ ছাড়াও সমরাঙ্গনের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় দুঃসহ কষ্টভোগ এবং দুরারোগ্য মহামারী-মড়কের দুরন্ত-প্রকোপেও কত রুশ-বাসীর যে জীবনান্ত ঘটছিল তার ইয়ত্তা নেই। ওদিকে যুদ্ধক্ষেত্রের আওতার বাইরে দূরে স্বদেশের নিরাপদ-আশ্রয়ে সরে থেকে রাশিয়ার স্বার্থান্বেষী ধনিক এবং জমীদারের দল এই সুযোগে সুবিধা বুঝে সাধু এবং অসাধু উপায়ে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে যুদ্ধের বাজারে দু'হাতে মুনাফা লুঠতে লাগলো মনের আনন্দে। এই সব স্বার্থান্ধ অর্থ-পিশাচদের যথেচ্ছ মুনাফা-সংগ্রহের ফলে রুশ দেশের দীন-দরিদ্র শ্রমিক এবং কৃষকদের দুর্দ্দশা ক্রমেই হয়ে দাঁড়ালো মর্ম্মান্তিক শোচনীয়…এই সর্ব্বনাশা-যুদ্ধই দিনে-দিনে শেষে বিপর্য্যস্ত করে তুললো সারা রাশিয়ার আর্থিক-জীবন! 'জার্' নিকোলাসের আদেশে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ সুস্থ সক্ষম কৃষক ও শ্রমজীবী রুশ-প্রজাদের সৈন্য হিসাবে যুদ্ধক্ষেত্রে বাহাল রাখার দরুণ দেশের কল-কারখানার কাজ চালানো, আর ক্ষেত-খামারের ফসল-ফলানো ক্রমেই অচল হয়ে উঠলো! রাশিয়া জুড়ে দেখা দিলো নিদারুণ খাদ্যাভাব, বস্ত্রাভাব…দিকে-দিকে জাগলো মহামারী-মড়ক- হাহাকার… জন-সাধারণের মনে জ্বলে উঠলো অসন্তোষ-বিক্ষোভের আগুন! দেশের এমনি সঙ্গীন মুহূর্ত্তে প্রকাশ পেলো যে 'জার্'-সাম্রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রা ফিওডোরোভনা স্বয়ং নাকি নিজ-স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে জার্ম্মাণদের হাতে রুশ-দেশের ভার তুলে দেবার হীন-ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন… রুশ সমর-সচিব নাকি জার্ম্মানীর গুপ্তচর…দেশের অন্যান্য মন্ত্রীরা এবং সৈন্যাধ্যক্ষদের অনেকেই নাকি জার্ম্মান-সম্রাটের কেনা-গোলাম! এঁদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং গুপ্ত-চক্রান্তের ফলেই জার্ম্মানদের হাতে রাশিয়ার শোচনীয় পরাজয় ঘটছে বারবার! এমন কি 'জার্'-নিকোলাস্ এবং 'জারিনা' ফিওডোরোভ্‌নার মন্ত্রণাদাতা-ইষ্টগুরু অনাচারী রাস্‌পুটিনের নামেও কুখ্যাতি রটেছিল যে এই সব স্বদেশ-স্বার্থবিরোধী বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে তাঁর ছিল নিবিড় যোগাযোগ। তিনিও জার্ম্মানীর গুপ্তচর। সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে এসে রুশ-রাজপরিবারের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে ছলে-কৌশলে সুবিশাল রুশ-সাম্রাজ্যটিকে জার্ম্মানীর কবলে সঁপে দেওয়াই ছিল তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য! শোনা যায়, রহস্যময় এই সন্ন্যাসী-গুরুর নির্দ্দেশানুসারেই সম্রাজ্ঞী নাকি ফিওডোরোভ্‌না জার্ম্মানীর হাতে রুশ-সাম্রাজ্যের ভার তুলে দেবার হীন-ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। তাছাড়া 'জার' নিকোলাস্ যাতে কাইজার্ উইলহেমের আনুগত্য-স্বীকার করে জার্ম্মানীর সঙ্গে সন্ধি-সম্পর্ক পাতান—এই ছিল দুরাত্মা রাস্‌পুটিনের একমাত্র লক্ষ্য।…এ-বিষয়ে 'জার' নিকোলাস্‌কে রাজী করার জন্য সুচতুর রাস্‌পুটিন্ আপ্রাণ চেষ্টাও করেছিলেন সে-সময়। 'জার্' নিকোলাসের উপর রাস্‌পুটিনের প্রভাবও ছিল অসামান্য রকমের। তাঁরই প্ররোচনায় এবং কুমন্ত্রণানুসারে দুর্ব্বল-চিত্ত 'জার' নিকোলাস্



প্রিন্স ফেলিক্স ইউসুপোভ

জার্ম্মাণ মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে নিতান্ত অবিবেচকের মতই দুর্দ্ধর্ষ-রণকুশলী অভিজ্ঞ-বিচক্ষণ প্রবীণ-সেনাধ্যক্ষ গ্র্যাণ্ড ডিউক নিকোলাই-ভিচ্‌কে অকারণে সুসংবদ্ধ রুশ-সেনাবাহিনীর সর্ব্বাধিনায়কের পদ থেকে আচম্বিতে অপসারিত করে স্বয়ং সে-পদের গুরু-দায়িত্ব ভার নিয়ে সমরাঙ্গণে এগিয়ে যান—প্রবল-পরাক্রমী বিদেশী-শত্রুর বিরুদ্ধে সৈন্য-পরিচালনার উদ্দেশ্যে! লোকে বলে, রাশিয়ার পরম সঙ্কটের সময় গ্র্যাণ্ড ডিউক নিকোলাইভিচের মত অভিজ্ঞ-বিচক্ষণ রণকৌশল-বিশারদ সুপ্রবীণ-সেনাধ্যক্ষকে বিনাদোষে পদচ্যুত এবং অকারণে অপসারিত করার মূলে ছিল রাস্‌পুটিনের অভিষ্ট-সিদ্ধির জঘন্য চক্রান্ত। কারণ, যতদিন প্রবীণ-সেনাধ্যক্ষ গ্র্যাণ্ড ডিউক নিকোলাই

ভিচের হাতে ছিল রুশ-সৈন্যবাহিনী পরিচালনার ভার, ততদিন সাম্রাজ্যাভিলাষী কাইজারের জার্মাণ-সেনাদল যুদ্ধে তেমন বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারছিলেন না! কিন্তু সুচতুর রাসপুটিনের সুনিপুণ কারসাজিতে যেদিন গ্র্যাণ্ড ডিউক নিকোলাইভিচ্‌কে সরিয়ে দিয়ে 'জার্' নিকোলাস্ স্বয়ং অপটু হাতে রুশ-সৈন্যপরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন—সেই দিন থেকেই সূচিত হলো জার্মানদের যুদ্ধ-জয়ের সৌভাগ্য··· রাশিয়ার বরাতে জুটতে লাগলো শুধু পরাজয়ের গ্লানি-কলঙ্কের টিকা! এ-কাহিনীর কতখানি সত্য আর কতখানিই বা মিথ্যা, তার কোনো সঠিক হদিশ না মিললেও, অনেকের দৃঢ় ধারণা যে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে সুনিপুণ কৌশলে রুশ-রাজপরিবারের ইষ্ট-দেবতার আসনলাভ করলেও, রহস্যময়-পুরুষ রাসপুটিন আসলে ছিলেন ইতিহাস-প্রসিদ্ধা ছলনাময়ী-নারী মাতাহারির (Matahari) মতই জার্মানীর কূট-চক্রী ক্ষমতালোভী সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলহেমের নিয়োজিত সুদক্ষ-একজন রাজনৈতিক গুপ্তচর। কাইজারের নির্দ্দেশেই রাসপুটিন্ এসে আবির্ভূত হয়েছিলেন সে-যুগের রুশ-রাজদরবারে···সেখানকার সব কিছু খবরাখবর সংগ্রহ করে গোপনে জার্মানীতে তার তথ্য-বিবরণ পাঠানো ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। রাসপুটিনের পাঠানো সংবাদের উপর নির্ভর করে জার্মান-সম্রাট কাইজার সসৈন্যে এসেছিলেন রুশ-সাম্রাজ্য বিজয়-অভিযানে। কাইজারের অভিষ্ঠ-সিদ্ধির অন্তরায় হবার ফলেই রাসপুটিনের সুচতুর কারসাজিতে রণাঙ্গন থেকে বিচক্ষণ-প্রবীণ সেনাধ্যক্ষ নিকোলাইভিচের অপসারণ এবং 'জার্' নিকোলাসের অপটু-সৈন্যপরিচালনার দরুণ রুশ-রাজশক্তির পরাজয় ঘটে।···কিন্তু, এ-সবই হলো লোকমুখের গুজব···আসল কথা আজও রহস্যের কুয়াশায় ঢাকা রয়েছে!

সে যাই হোক্, রাসপুটিনের উদ্দাম-লাম্পট্য-লীলা আর যথেচ্ছাচারী-আচরণের ফলে রুশ-প্রজাদের মধ্যে অনেকেই ক্রমে বিশেষ অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন রহস্যময় এই সন্ন্যাসীটির উপর। বিদেশী-শত্রু জার্মানীর সঙ্গে রাসপুটিনের আঁতাতের কথা এবং দেশদ্রোহী চক্রান্তের সংবাদ প্রকাশ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই দেশের ধনী-দরিদ্র-অভিজাত সম্প্রদায়ের বহু লোকই রীতিমত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন তবে প্রকাশ্যে রাসপুটিনকে শায়েস্তা করার কোনো রকম ক্ষমতা বা সাহস ছিল না তাঁদের কারো! রুশ-রাজপরিবারের উপর ছদ্মবেশী-দুরাত্মা রাসপুটিন এমনই অসাধারণ মোহ-প্রভাব বিস্তার করেছিলেন যে তাঁর গায়ে হাত তোলা বা কোনো কাজের প্রতিবাদ জানানো কিম্বা অপমান করবার মত লোক জুটতো না তখন সারা রাশিয়ার কোথাও। ক্ষমতা-মদমত্ত রাসপুটিন্‌ও 'জার্' নিকোলাস্ এবং সম্রাজ্ঞী ফিওডোরোভ্‌না থেকে আরম্ভ করে কাউকেই এতটুকু সমীহ বা গ্রাহ্য করে চলতেন না···ছোট-বড়, পুরুষ-নারী সকলকেই তিনি নিতান্ত খাটো-চোখে দেখতেন—এমনই প্রচণ্ড ছিল তাঁর দম্ভ আর আত্মম্ভরিতা! কিন্তু সব কিছুরই সীমা আছে। প্রশ্রয় পেয়ে ক্রমেই রাজপরিবারে এবং অন্যত্র রাসপুটিনের এই যথেচ্ছ অনাচার-বেয়াদবী আর দৌরাত্ম্যের মাত্রা এমনই অসহ্য হয়ে ওঠে যে শেষে ১৯১৬ সালে 'জার্' বিরক্ত হয়ে নিকোলাসের নিকট-আত্মীয় প্রিন্স ফেলিক্স্ ইউসুপোভ্ (Prince Felix Yusupov), রুশ-সম্রাটের বিশিষ্ট-হিতাকাঙ্ক্ষী পুরিস্‌কেভিচ্ (Puriskevitch) এবং আরো কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী মিলে ষড়যন্ত্র করলেন যে কুচক্রী রাসপুটিন্‌কে ছলে-কৌশলে কোনো গুপ্ত-আশ্রয়ে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হবে। এভাবে রাসপুটিনের প্রাণবধ করায় একমাত্র কারণ ছিল যে এই রহস্যময়-দুরাত্মার মোহ-জাল থেকে বিমুগ্ধ-বিমূঢ় 'জার্' নিকোলাস্, সম্রাজ্ঞী ফিওডোরোভ্‌না এবং দেশের রাজশক্তিতে পুনরুদ্ধার করে বাঁচানো। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে ইউসুপোভ্, পুরিস্‌কেভিচ্ এবং 'জারের' আরো ক'জন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু-অনুচররা মিলে সহরের বাইরে-নিভৃত-নিরালা এক উদ্যান-ভবনের সুসজ্জিত ভোজশালায় অপরূপ সুন্দরী সম্ভ্রান্ত-অভিজাত-বংশের একটি মহিলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার লোভ দেখিয়ে লালসাতুর রাসপুটিনকে সুচতুর কৌশলে আমন্ত্রণ করে আনেন। সেখানে চলে উদ্দাম পান-ভোজনের পালা। সেখানে পান-ভোজনের সময় সুকৌশলে উল্লাস-মত্ত রাসপুটিনের সামনে ধরে দেওয়া হয় তীব্র বিষ মেশানো খাবার ও তরল মদের পাত্র···তার এতটুকু কণা মুখে গেলে নিমেষের মধ্যেই যে কোনো মানুষের মৃত্যু ঘটবে···এমনই কড়া সে-বিষের তেজ! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে—সেই সাংঘাতিক বিষাক্ত খাবার এবং মদ মুখে দেবার পরেও রাসপুটিনের দেহে সেই তীব্র বিষের কোনো কিছু প্রতিক্রিয়াই দেখা গেল না! জানি না, রহস্যময়-পুরুষ রাসপুটিনের সত্যিই কোনো অলৌকিক-ঐশ্বরিক ক্ষমতা ছিল কি না···তবে বিষাক্ত খাবারের থালা এবং মদের গেলাস নিঃশেষ করা সত্ত্বেও কোনো ক্ষতিই ঘটেনিকো তাঁর···বরং পরম উল্লাসে মেতে ছিলেন তিনি উদ্দাম-উচ্ছৃঙ্খলতার অবাধ আনন্দ-রসে! বিষ-মেশানো খাবার ও মদের পাত্র শেষ করার পরেও রাসপুটিনের জীবনান্ত ঘটলো না দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ষড়যন্ত্রকারী রাজ-অমাত্যেরা সবাই। হবারই কথা, কারণ, আমাদের-দেবতা নীলকণ্ঠ-শিবের মত, রাসপুটিন্‌ও যে কি উপায়ে তীব্র-হলাহল কণ্ঠে ধারণ করে প্রাণে বেঁচে রইলেন—কেউ সে-রহস্যের মীমাংসা করতে পারেনি আজও পর্য্যন্ত!

যাই হোক্, মদ্য আর খাবারে মেশানো তীব্র বিষে রাসপুটিনের প্রাণ-বিয়োগ ঘটলো না দেখে, প্রিন্স ইউসুপোভ্ এবং তাঁর সঙ্গীরা অবশেষে ক্ষেপে মরিয়া হয়ে উঠে উপর্য্যুপরি পিস্তলের গুলি চালিয়ে, লোহার ডাণ্ডা দিয়ে পিটে নিতান্তই নৃশংস-নির্ম্মমভাবে রহস্যময়-পুরুষ রাসপুটিনের জীবনান্ত করেন! তবে আশ্চর্য্যের বিষয় দেহে একরাশ পিস্তলের গুলির চোট্ লাগার পরেও রাসপুটিন্ কাবু হন্‌নি এতটুকু···বরং আততায়ীদের বেপরোয়া আক্রমণের দাপট এড়িয়ে অর্গল-বদ্ধ নিরালা উদ্যান-ভবনের ভোজন-কক্ষ থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচানো উদ্দেশ্যে তিনি ক্ষ্যাপা বন্য-পশুর মতই [illegible]-তেজে ছুটে বেড়িয়েছিলেন রীতিমতই সুদীর্ঘকাল ধরে। প্রাণ-[illegible]কুল হয়ে বেশ খানিকক্ষণ এমনিভাবে ঘরময় ছুটাছুটি এবং [illegible]টি করবার পর অবশেষে রাসপুটিনের শ্রান্ত-অবসন্ন-দেহ লুটিয়ে [illegible]ছিল ধরণীর ধূলায় উপরে! এমনি শোচনীয়ভাবেই শেষ হয়ে গিয়েছিল রাশিয়ার রহস্যময়-সন্ন্যাসী রাসপুটিনের জীবন!

ক্রমশঃ

সাংখ্যদর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

পুরুষ

জড়বাদিগণ জড় (matter) দ্বারা জগতের ব্যাখ্যা করেন। যে সমস্ত ব্যাপারকে মানসিক ব্যাপার বলা হয় (mental phenomena), সে সকলই তাহাদের মতে জড় কর্তৃক উৎপন্ন হয়। জড় হইতে ভিন্ন মনঃ অথবা আত্মা বলিয়া কোনও বস্তু তাহাদের মতে নাই। এ পর্য্যন্ত আমরা সাংখ্যদর্শনের যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহা হইতে মনে হইতে পারে, সাংখ্যকারও বুঝি জড়বাদী, তিনি অচেতন সত্ব, রজঃ ও তমঃ নামক দ্রব্যদিগের দ্বারা এই জগতের ভৌতিক ও মানসিক যাবতীয় ব্যাপারের ব্যাখ্যা করিতে চান। মানসিক ভাবগুলিও যখন অচেতন সত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণময়, তখন সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অতিরিক্ত কোনও বস্তুর অস্তিত্ব নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাংখ্যদর্শনে সত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের অতীত, তাহাদিগের হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্ম্মান্বিত আর এক শ্রেণীর দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকৃত। ইহাদের নাম পুরুষ। ইহাদের বর্জ্জন করিয়া জগতের ব্যাখ্যা হইতেই পারে না।

"পুরুষ" শব্দ উপনিষদেও ব্যবহৃত হইয়াছে। পুরিতে,—অর্থাৎ দেহের মধ্যে শয়ন করিয়া যিনি আছেন, তিনিই পুরুষ। উপনিষদের আত্মাই পুরুষ। কিন্তু সাংখ্যের পুরুষ দেহে শয়ন করেন না। দেহের সহিত তাঁহার একটা সম্বন্ধ কল্পিত হয় বটে, কিন্তু সে সম্বন্ধ বাস্তব নহে। সেই কল্পিত সম্বন্ধ হইতে জীবকে মুক্ত করাই সাংখ্যশাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

সত্ব, রজঃ ও তমঃ অচেতন, কিন্তু পুরুষ চেতন; সংখ্যায় অনন্ত। তাহার কোনও গুণ নাই, তাহা শুদ্ধ চিৎ মাত্র। জৈন দর্শনে আত্মার যে সমস্ত গুণের বর্ণনা আছে—অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত দর্শন, অনন্ত সুখ ও অনন্ত বীর্য্য—সাংখ্যের পুরুষে তাহাদের কিছুই নাই! সাংখ্যের পুরুষ নির্গুণ। বেদান্তে আত্মাকে সৎ, চিৎ ও আনন্দরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু সাংখ্য আত্মাকে আনন্দস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন না। কেন না আনন্দ ও সুখ অভিন্ন। সাংখ্য-মতে সুখ প্রকৃতির, পুরুষের নহে। বেদান্তের আত্মা একমাত্র, সাংখ্য বহু পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

বুদ্ধি অহংকার, মনঃ ও তাহাদের কার্য্য প্রকৃতির অন্তর্গত, পুরুষের নহে। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, কোনও কার্য্য করে না; তাহা দ্রষ্টা মাত্র, দৃশ্য হইতে স্বতন্ত্র। অন্তঃকরণে যাহা যাহা উদিত হয়, বস্তুর রূপ, তাহাদিগের মধ্যে সম্বন্ধ প্রভৃতি সকলই দৃশ্য—পুরুষ তাহা দর্শন করে মাত্র। এই দর্শনের ফলেই প্রকৃতির মধ্যে জ্ঞানের উদ্ভব হয়, কিন্তু তাহা অচেতন, পুরুষের মধ্যগত নহে। ইন্দ্রিয়-দ্বার পথে যাহাই মনঃ ও বুদ্ধির নিকট উপস্থিত হয়, তাহা সকলই অনাত্মিক, সমস্তই অচেতন। পুরুষ না থাকিলে এই সকল মানসিক প্রতিবিম্ব অনুভূত হইত না। কিন্তু তাহারা প্রকৃত পক্ষে সচেতন (Conscious States) নহে। দ্রষ্টার দৃষ্টি তাহাদের প্রতি পতিত হয় বলিয়া তাহারা অনুভূত হয়। আমাদের মনের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আমরা পুরুষের সাক্ষাৎ পাই না। আমাদের প্রতীতি (Perception), সম্প্রতীতি (Conception), অনুভূতি (Feeling) এবং কৃতির (Conation) তল দেশে কোনও স্থায়ী পুরুষের সাক্ষাৎ আমরা পাই না। এই অনুসন্ধানকারী "আমি"ও পুরুষ নহে। এই "আমি"র জ্ঞান প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত, যদিও এই জ্ঞানের স্ফুরণের জন্যও পুরুষের দৃষ্টি অপরিহার্য্য। কিন্তু দ্রষ্টার দর্শন হইতে যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, প্রকৃত পক্ষে তাহা দ্রষ্টাকে স্পর্শ করে না, যদিও তাহা "আমার জ্ঞান" এই ধারণা উৎপন্ন হয়। সুখ-দুঃখ প্রকৃতির, পুরুষের নহে—যদিও আমি সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছি, এই জ্ঞান হয়।

"সদা প্রকাশ-স্বরূপ" পুরুষের পরিণাম নাই। ইহা আলোক-স্বরূপ। ইহার আলোকেই প্রকৃতি আলোকিত হয় এবং তাহার অস্তিত্বের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। জ্ঞানের যাবতীয় রূপের মধ্যে পুরুষের "দৃষ্টি" বর্ত্তমান, কিন্তু তাহাকে

দেখা যায় না। তাহার অস্তিত্ব কেবল অনুমান দ্বারা জানিতে পারা যায়।

ক্যাণ্ট Empirical self এবং Transcendental self নামে দুইটি "আমি"র (অতীন্দ্রিয় ও প্রত্যক্ষ) কথা বলিয়াছেন। প্রত্যক্ষ "আমি" অতীন্দ্রিয় আমির উপরি ভাগ। বস্তুতঃ দুইটি আমি নাই। উপরি ভাগে যে আমি, তাহা তাহার তলস্থ অতীন্দ্রিয় "আমি" হইতে উদ্ভূত। যে সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ "আমি"তে দৃষ্ট হয়, "আমি"র অনুভূতি পর্য্যন্ত, তাহাদের সমস্তই উপরি ভাগের ব্যাপার। সে সমস্ত ব্যাপারকে সচেতন বলা হয় এবং বাহ্য ভৌতিক বস্তুদিগের হইতে তাহারা ভিন্ন বলিয়া পরিগণিত হয়। সাংখ্য শাস্ত্রেও দুইটি "আমি"র কথা আছে, একটির নাম "অহংকার", দ্বিতীয়টির নাম পুরুষ, কিন্তু তাহারা বিভিন্ন। অহংকারের উৎপত্তি প্রকৃতি হইতে। পুরুষ তাহা হইতে একান্ত ভাবে বিভিন্ন। অহংকার সচেতন বলিয়া প্রতীত হইলেও, তাহা অচেতন। চেতন পুরুষের দৃষ্টি-পাতেই তাহা সচেতন বলিয়া অনুভূত হয়। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে Mind (মনঃ) ও Soul (জীবাত্মা) সমার্থক। তাহা ভৌতিক দ্রব্য (matter) হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছা মানসিক বা আত্মিক ব্যাপার। তাহা ভৌতিক দ্রব্য হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। মনঃ ও ভৌতিক দ্রব্যের মধ্যে সম্বন্ধ কি, তাহা লইয়া পাশ্চাত্ত্য দর্শনে বহু দিন যাবৎ আলোচনা চলিতেছে। এক পক্ষ বলেন মনঃ ও জড় বস্তু যখন সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় পদার্থ, তখন উভয়ের মধ্যে কোনও প্রকার সম্বন্ধ কল্পনা করা যায় না। অথচ দেখা যায় মনঃ জড়বস্তুর জ্ঞান লাভ করিতেছে। ইহা দেখিয়া মনের উপর জড়ের ক্রিয়া আছে মনে হয়। আবার ইচ্ছা দ্বারা দেহ চালিত হইতেছে দেখিয়া জড়ের উপর মনের ক্রিয়া আছে বলিয়া মনে হয়। এই জন্য অনেক দার্শনিক মনে করেন প্রকৃত পক্ষে মনঃ ও জড় পদার্থের মধ্যে কোনও দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান নাই। উভয়ে এক জাতীয় বস্তু। কেহ বলেন জড়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, তাহা মানসিক পদার্থ, কেহ বলেন মনও জড় পদার্থ। সাংখ্য [illegible] স্বীকার করেন না। সাংখ্যের মতে বুদ্ধি, মনঃ [illegible] সকলই অচেতন—বাহ্য বস্তুর সজাতীয়। [illegible] ও তাহাদিগের হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন-জাতীয়। প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ হইতে পারে না, কেন না বিজাতীয় পদার্থদিগের সংযোগ অসম্ভব। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পুরুষের প্রতিবিম্ব বুদ্ধির উপর পতিত হয় বলিয়াই বুদ্ধি সচেতন বলিয়া প্রতীত হয়। এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব। ইহা হইতে কিন্তু মনে হয়, সাংখ্য মতে অচেতন প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ (বা সংঘর্ষ) না ঘটিলে—প্রকৃতির সংস্পর্শ প্রাপ্ত না হইলে, জ্ঞান ও অনুভূতির উদ্‌ভব হইতে পারে না।

জার্মান দার্শনিক ফিক্‌টে দ্বিবিধ দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে "অহং"ই একমাত্র বস্তু। এই অহমের মধ্যে সংবিদ্ নাই। তাহা অসীম। অনন্তে—প্রসারিত হইবার সময় তাহার মধ্যে এক বাধার (anstoss) উদ্‌ভব হয়। এই বাধার সহিত সংঘাতের ফলে অহমের মধ্যে সংবিদের উদ্‌ভব হয়।

সাংখ্যের পুরুষ চৈতন্য-স্বরূপ। সে চৈতন্যকে সংবিদ (Consciousness) বলা যায়, কিন্তু তাহা জ্ঞান নহে, তাহা আত্ম সংবিদও (Self consciousness) নহে, তাহা জ্ঞানের শক্যতা মাত্র। জ্ঞানের মধ্যে বিষয়ী ও বিষয় উভয়ই বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু পুরুষে তাহা নাই। প্রকৃতির সহিত পুরুষের তথাকথিত সংযোগ বা সংঘাত হইতে বিষয়ী ও বিষয়ের ভেদযুক্ত আত্মসংবিদ-সমন্বিত জ্ঞানের উদ্‌ভব হয়। প্রকৃতির সহিত সংযোগের ফল পুরুষের স্বাধীনতা ও বিভুত্বের অপহ্নব। জগৎ যে দুঃখময় রূপে প্রতীত হয়, হয়তো ইহাই তাহার কারণ। কিন্তু এই সংযোগ ও সাংখ্যমতে প্রকৃত নহে, কল্পিত। প্রকৃতির উপর পুরুষের প্রতিবিম্ব-পতনকেই সংযোগ বলা হয়। কিন্তু তাহা-দ্বারা প্রকৃত পক্ষে পুরুষের কোনও পরিণামই সংঘটিত হয় না।

পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েই দেশ ও কালের অতীত নিরবয়ব পদার্থ। সুতরাং উভয়ের সংযোগ দৈশিক ও কালিক সংযোগ নহে। জ্ঞানের মধ্যে তাহাদের সংযোগ সাধিত হয়। পুরুষের প্রতিবিম্ব বুদ্ধিতে পতিত হইলে "আমি দেখিতেছি" এইরূপ যে অনুভব হয়, তাহাই সংযোগ।

পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য সাংখ্যকার যে সকল যুক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহারা এই :

:) ত্রিগুণং অবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যং অচেতনং প্রসবধর্মি
্যক্তং, তথাপ্রধানং ; তদ্‌বিপরীতঃ তথা চ পুমান্।

(সাং কা—১১)

্যক্ত ও প্রধান (অব্যক্ত প্রকৃতি) উভয়ই সত্ত্ব-রজঃ-তমো-গুণাত্মক। তাহারা উভয়েই পরস্পর হইতে অবিবিক্ত বা অবিচ্ছিন্ন। (মহৎ, অহংকার প্রভৃতি সকলই প্রধানাত্মক), তাহারা উভয়ই বিষয়—জ্ঞানের বিষয়, সুতরাং বিজ্ঞান মাত্র নহে (যাহা বৌদ্ধেরা বলেন, তাহা নহে), বিজ্ঞান-বাহ্য। তাহারা সামান্য অর্থাৎ সাধারণ, সকলের পক্ষেই একরূপ। (বিজ্ঞানমাত্র হইলে, প্রত্যেকের বিজ্ঞান অন্যের বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন হইত। বিজ্ঞান সাধারণ নহে) উভয়েই অচেতন ও বিকারশীল। পুরুষ উহাদের বিপরীত। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যও (পুরুষ ও প্রধানের মধ্যে) আছে। উভয়েই হেতু-হীন, উভয়ই নিয়ত। আবার ব্যক্ত যেমন বহু, পুরুষও তেমনি বহু।

(২) সংঘাত-পরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদি-বিপর্যয়াৎ, অধিষ্ঠানাৎ, পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ, কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ ॥

সাং কা—১৭

যখন দেখিতে পাওয়া যায়, কতকগুলি বস্তু সংহত অর্থাৎ মিলিত হইয়া কার্য্য করিতেছে, তখন দেখা যায় তাহারা অন্য এক পদার্থের প্রয়োজন-সাধনের উদ্দেশ্যেই কার্য্য করিতেছে। সুতরাং যখন আমরা দেখি নানাবিধ পদার্থে গঠিত আমাদের দেহ এবং তন্মধ্যস্থ ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি ও অহংকার মিলিত হইয়া জ্ঞান, সুখ-দুঃখানুভূতি এবং চেষ্টা উৎপাদন করিতেছে, তখন এই মিলিত কার্য্য ইহাদের অতিরিক্ত কোনও পদার্থের প্রয়োজন-সাধনের জন্য অনুষ্ঠিত হইতেছে, ইহা অনুমান করা যায়। সেই পদার্থই পুরুষ।

জগতে দেখিতে পাওয়া যায় প্রত্যেক বস্তুর বিপরীত অন্য বস্তু আছে। সুখের বিপরীত দুঃখ, জ্ঞানের বিপরীত অজ্ঞান, [illegible] বিপরীত পাপ, স্থূলের বিপরীত সূক্ষ্ম। [illegible] অনুমান করা যায় যে অচেতন ত্রিগুণের বিপর[illegible] আছে। সুতরাং চেতন পুরুষের অস্তিত্ব সিদ্ধ।

যাহার অধিষ্ঠানবশতঃ দেহ-বুদ্ধি-অহংকার-মনঃ-বিশিষ্ট চেতন পদার্থরূপে প্রতীত হয় এবং যাহার অভাবে দেহ বুদ্ধি-অহংকার-ও-মনঃ-বিহীন অচেতন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাই পুরুষ।

সুখ ও দুঃখ ভোগ্য পদার্থ। অনুকূল বলিয়া সুখের এবং প্রতিকূল বলিয়া দুঃখের বেদন অনুভূত হয়। এই ভোক্তার ভাব প্রকৃতির নহে। তাহার জন্য অন্য এক পদার্থের প্রয়োজন। সেই পদার্থই পুরুষ।

অনেকের কৈবল্য-প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। কৈবল্যের অর্থ বুদ্ধি প্রভৃতির সম্যক নিরোধ। এই প্রবৃত্তি বুদ্ধ্যাদির হইতে পারে না। সুতরাং বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র কেহ আছেন, যিনি বুদ্ধি হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিতে প্রয়াসী ; তিনিই পুরুষ। বুদ্ধিই যদি আত্মা হইত, তাহা হইলে কৈবল্যের অর্থ হইত আত্মনাশ। কিন্তু আত্মনাশ কাহারও অভিপ্রেত হইতে পারে না।

(৩) ন ভূতচৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ,
সাংহত্যেপি চ সাংহত্যেপি চ ॥

সাংখ্য সূত্র—৫।১২৯

ন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ

সাং সূ—৩।২০

ভূতদিগকে পৃথক করিয়া দেখিলে তাহাদের মধ্যে চৈতন্য দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং তাহাদের মধ্যে চৈতন্য নাই। পঞ্চভূত মিলিত হইলে যে দেহাদি উৎপন্ন হয়, তাহাতে যে চৈতন্য দেখা যায়, তাহা ভূতের চৈতন্য নহে। কেন না সেই সকল ভূতের প্রত্যেকের মধ্যে চৈতন্য নাই। তাহা যদি না থাকে, তবে তাহারা মিলিত হইলে চৈতন্য আসিবে কোথা হইতে ? সে চৈতন্য পুরুষের। পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ।

(৪) দ্রষ্টৃত্বাদিরাত্মনঃ, করণত্বম্ ইন্দ্রিয়াণাং।

সাং সূ—২।২৯

ইন্দ্রিয়াদি করণ মাত্র, তাহারা জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে না। যিনি দ্রষ্টা, তিনি আত্মা।

(৫) প্রপঞ্চ মরণাদ্যভাবশ্চ। সাং সূ—৩।২১

দেহ যতদিন থাকে, ততদিন তাহার স্বভাবের অন্যথা হয় না। দেহের যদি স্বাভাবিক চৈতন্য থাকিত, তাহা হইলে সুষুপ্তি ও মরণরূপ চৈতন্যাভাব তাহাতে ঘটিত না। সুতরাং চৈতন্য দেহের নয়, পুরুষের—চৈতন্য যাহাতে স্বাভাবিক।

(৬) মদশক্তিবৎ চেৎ, প্রত্যেকপরিদৃষ্টে সাংহত্যে তদুদ্ভবঃ। সাং সূ—৩।২২

যে যে দ্রব্যে সুরাদি মাদক দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহাদের প্রত্যেকের মাদক শক্তির অভাব থাকিলেও, তাহাদের মিলন হইতে মাদকশক্তি উদ্ভূত হয়। সেইরূপ ভূতদিগের কাহারও মধ্যে চৈতন্য না থাকিলেও, তাহারা মিলিত হইলে চৈতন্যের উদ্ভব হইতে পারে, ইহা বলা যায় না। যে যে বস্তু মিশাইয়া মদ্য প্রস্তুত করা হয়, তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে সূক্ষ্মরূপে মাদকশক্তি আছে বলিয়াই মিলিত মাদক-দ্রব্যে মাদকশক্তি আবির্ভূত হয়। কিন্তু প্রত্যেক ভূতে যে সূক্ষ্মরূপে চৈতন্য আছে, ইহার প্রমাণ নাই।

(৭) অস্ত্যাত্মা-নাস্তিত্ব সাধনাভাবাৎ। সাং সূ—৬।১

আত্মার অস্তিত্ব শ্রুতি-প্রমাণ-সিদ্ধ। আত্ম-প্রতীতি হইতেও পুরুষের অস্তিত্ব অনুভূত হয়। ইহার বাধক প্রমাণ নাই।

(৮) আবার ""ষষ্ঠী ব্যপদেশাদপি।" (সাং সূ—৬।৩)—অর্থাৎ আমার বুদ্ধি, আমার দেহ প্রভৃতি স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ দ্বারাও দেহ, বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে স্বতন্ত্র পুরুষের অস্তিত্ব অনুভূত হয় বলিয়া জানা যায়।

"ন শিলা পুত্রবৎ ধর্ম্মি গ্রাহকমান বাধাৎ।"

সাং সূ—৬।৪

রাহুর শির ভিন্ন অন্য কোনও অঙ্গ নাই। শিলাপুত্রও (নোড়া) একখণ্ড প্রস্তর মাত্র। যখন রাহুর শরীর অথবা শিলাপুত্রের শরীর বলা হয়, তখন ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ হইলেও, রাহুর শিরই রাহু, সেই শির হইতে স্বতন্ত্র কোনও রাহু নাই এবং শিলাপুত্রের শরীর হইতে স্বতন্ত্র কোনও শিলাপুত্র নাই। সুতরাং "আমার দেহ", "আমার বুদ্ধি" যখন বলা হয়, তখনও যে আমি ও আমার দেহ এবং বুদ্ধি এক নহে, ইহা বল কিরূপে? এই প্রশ্ন যদি করা হয়, তাহা হইলে তাহার উত্তর হইবে যে রাহু ও শিলাপুত্র যে রাহুর শির ও শিলাপুত্রের শরীর হইতে অভিন্ন, তাহা প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু পুরুষ ও তাহার দেহ এবং বুদ্ধি যে অভিন্ন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। রাহুর শির ও শিলাপুত্রের শরীরের মধ্যে আমার শির ও আমার শরীর এরূপ বোধ নাই।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণের গ্রন্থে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত শ্লোকে পুরুষের স্বরূপের বর্ণনা আছে—

অমূর্ত্তশ্চেতনো ভোগী নিত্যঃ সর্ব্বগতোঽক্রিয়ঃ
অকর্ত্তা নির্গুণঃ সূক্ষ্ম আত্মা কাপিলদর্শনে।

ষড়্দর্শন সমুচ্চয় (মণিভদ্র)

কাপিল দর্শনে আত্মা অমূর্ত্ত, চেতন, ভোগী, নিত্য, সর্ব্বগতঃ অক্রিয়, অকর্ত্তা, নির্গুণও সূক্ষ্ম। প্রচলিত সাংখ্য মতে কিন্তু আত্মা প্রকৃতপক্ষে ভোগী কিনা, তাহাতে সন্দেহ আছে। ইহা পরে আলোচিত হইবে।

পুরুষের স্বরূপ প্রকৃতির স্বরূপের সম্পূর্ণ বিপরীত (ত্রৈগুণ্য বিপর্য্যয়াৎ)। (১) প্রকৃতি অচেতন, পুরুষ সচেতন; (২) প্রকৃতি সক্রিয় ও অনবরত পরিণামশীল, পুরুষ নিশ্চেষ্ট ও অপরিবর্ত্তনীয়। (৩) প্রকৃতি ত্রিগুণান্বিত। পুরুষ নির্গুণ, (৪) প্রকৃতি বিষয়, দৃশ্য; পুরুষ জ্ঞাতা, দ্রষ্টা। পুরুষ ইন্দ্রিয়াতীত, বুদ্ধির অতীত, দেশ ও কালের অতীত, কারণ তত্ত্বের অতীত। পুরুষের কোনও উৎপাদক কারণ নাই; কোনও কার্য্যও পুরুষ কর্ত্তৃক উৎপন্ন হয় না। পুরুষ অখণ্ড এক—যুতসিদ্ধাবয়ব এক, অথবা অযুত-সিদ্ধাবয়ব এক নহে, অখণ্ড অবিভাজ্য এক। বনের মধ্যে বহু বৃক্ষলতা থাকিলেও তাহা এক বন। বৃক্ষলতাগণ একত্র অবস্থিত হইলেও তাহাদের একত্ব-সাধক কিছু নাই। তাহাদের একত্ব যুতসিদ্ধাবয়ব একত্ব। পুরুষের একত্ব সেরূপ নহে। জীবদেহ নানা অঙ্গের সমষ্টি। তাহারা সকলে মিলিত হইয়া এক উদ্দেশ্যসাধন করে। তাহাদের একত্ব অযুতসিদ্ধাবয়ব। পুরুষের একত্ব সেরূপও নহে। পুরুষের কোনও অবয়ব নাই, অঙ্গ নাই। তাহা অবিভাজ্য অব্যক্ত প্রকৃতিরও অবয়ব নাই, কিন্তু সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ রূপ তিন অঙ্গ আছে, যাহারা মিলিত হইয়া এক বিশেষ উদ্দেশ্য—পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ—সিদ্ধ করে। পুরুষের অবয়ব নাই, অঙ্গও নাই। পুরুষ অখণ্ড এক।

পুরুষ শুদ্ধ চিৎ বা চৈতন্য। কিন্তু তা[illegible] জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় জ্ঞাতা জ্ঞেয়ের দ্বৈত আছে বুদ্ধির মধ্যে। এই দ্বৈত ভাব নাই। সেই জ্ঞান এই আমিত্বমূলক। প্রত্যেক

জ্ঞানই আমার জ্ঞান অনুভূতি-সংবলিত। এই জ্ঞানের মধ্যে বিষয়ী ও বিষয়-ভেদ আছে। কিন্তু শুদ্ধ চিৎস্বরূপ পুরুষে সে ভেদ নাই। তাহার 'অহং' বোধও নাই।

পুরুষ নির্ব্বিকার। তাহাতে কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। দেশ ও কালের ধারণা তাহাতে প্রয়োগ করা যায় না। সুতরাং তিনি সর্ব্বব্যাপী, বিভু, অথবা অনন্তকালব্যাপী, ইহা বলা তাঁহার পক্ষে উপযুক্ত হয় না। জন্ম-মৃত্যু, সীমাবদ্ধতা প্রভৃতি কাল ও দেশবাচী শব্দ তাহাতে প্রযোজ্য নহে।

বেদান্তের আত্মা ও সাংখ্যের পুরুষের ধারণার মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য থাকিলেও উভয় ধারণা সম্পূর্ণ এক নহে। বেদান্তের আত্মা সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ। ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি সাংখ্যের পুরুষে আনন্দ নাই। বেদান্তে একাধিক আত্মা নাই, সাংখ্যের পুরুষ সংখ্যায় অনন্ত। বেদান্তের আত্মা জ্ঞানস্বরূপ (সত্যং জ্ঞানং অনন্তং), কিন্তু সাংখ্যের পুরুষে চৈতন্য থাকিলেও জ্ঞান নাই। সাংখ্যের পুরুষের দৃষ্টিবশতঃ বুদ্ধিতে জ্ঞানের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু যাহাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, জ্ঞানের সেই সমস্ত উপাদান অচেতন, পুরুষের মধ্যে তাহারা নাই।

পুরুষের বহুত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য সাংখ্যে যে সকল যুক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহারা এই :

জন্মমরণ-করণানাং প্রতিনিয়মাৎ, অযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ,
পুরুষ বহুত্বং সিদ্ধং, ত্রৈগুণ্য বিপর্য্যয়াচ্চৈব।
সাং কা—১৮

প্রত্যেক ব্যক্তির জন্ম, মৃত্যু ও করণ ভিন্ন ভিন্ন, একসঙ্গে তাহাদের প্রবৃত্তি হয় না। ইহাদ্বারা পুরুষ যে বহু, তাহা প্রমাণিত হয়। পুরুষ ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রধান এক ; সুতরাং তাহার বিপরীত পুরুষ নিশ্চয়ই বহু। পুরুষের জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। সুতরাং এখানে যে জন্ম-মৃত্যুর কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা পুরুষের নহে—দেহের। পূর্ব্বে অসংবদ্ধ, পরে সংহতি-বিশিষ্ট দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও বেদনার সহিত পুরুষের যে সম্বন্ধ আবির্ভূত হয়, তাহাই জন্ম অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের সহিত সম্বন্ধই জন্ম। আর এই সম্বন্ধ-পরিত্যাগই মরণ। পুরুষের ভোগই যখন প্রকৃতির অভিব্যক্তির লক্ষ্য, তখন পুরুষ যদি এক হইত, তাহা হইলে অসংখ্য দেহ-সৃষ্টির কোনও প্রয়োজন থাকিত না। আবার এতাদৃশ জন্ম ও মরণ যেমন সকল দেহের এক সঙ্গে হয় না, তেমনি যতদিন দেহ বর্ত্তমান থাকে, ততদিন প্রত্যেক দেহস্থিত করণদিগের (বুদ্ধি, অহংকার, মনঃ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়) প্রবৃত্তিও একসঙ্গে হয় না। এই সকল দেহে অধিষ্ঠিত পুরুষ যদি একমাত্র হইত, তাহা হইলে একই সময়ে বিভিন্ন দেহে করণ-দিগের বিভিন্ন ক্রিয়া দৃষ্ট হইত না। এই সকল ক্রিয়া অনেক সময় বিপরীতমুখী। পুরুষ একমাত্র হইলে ক্রিয়ার এই বৈপরীত্য থাকিত না।

আবার দ্রষ্টা যখন ত্রিগুণান্বিত প্রধানের বিপরীত এবং প্রধান যখন এক, তখন দ্রষ্টা যে বহুসংখ্যক তাহা বলিতেই হইবে। বাচস্পতি মিশ্র এই কারিকার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"ত্রৈগুণ্য বিপর্য্যয় অর্থ তিন গুণের অন্যথাভাব। কোন কোনও সত্ত্বনিকায় (প্রাণীসমূহ) সত্ত্ববহুল (অর্থাৎ সত্ত্বগুণের আতিশয্যবান্), যেমন উর্দ্ধস্রোতঃ ত্রিকালজ্ঞ দেবতা প্রভৃতি কেহ কেহ রজোবহুল, যেমন মানবগণ ; আবার কেহ কেহ তমোবহুল, যেমন তির্য্যগযোনিগণ। এতাদৃশ ত্রৈগুণ্যের অন্যথাভাব সম্ভবপর হইত না, যদি পুরুষ একমাত্র হইত।"

"ত্রিগুণাদি-বিপর্য্যয় দ্বারা যে পুরুষের অস্তিত্ব ও বহুত্ব প্রমাণিত হইল, সেই পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ এবং তৎকর্ত্তৃক তাহার ভোগ সম্ভবপর কিনা, ইহা পরে আমরা দেখিতে পাইব।

সাংখ্যমতে পুরুষের জন্ম ও মৃত্যু নাই। অথচ জীবের পুনর্জ্জন্ম সাংখ্যদর্শনে স্বীকৃত এবং জন্মচক্র হইতে মুক্তিলাভই সাংখ্যের পরমপুরুষার্থ। এই পুনর্জ্জন্ম হয় জীবের, পুরুষের নহে। এই জীবতত্ত্ব পরে ব্যাখ্যাত হইবে। তাহা বুঝিবার পূর্ব্বে সাংখ্যের অভিব্যক্তিবাদ বোঝার প্রয়োজন।



ইংরাজ শাসনের পূর্ব্বে আমাদের শিক্ষা

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

আমাদের দেশে ইংরাজ প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপদ্ধতির সূত্রপাত হয় প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে। এই সময়টিতে দেশের জনসাধারণের মধ্যে কিরূপ শিক্ষা প্রচলিত ছিল, শিক্ষার কোনও ব্যাপক আয়োজন ও প্রচেষ্টা আদৌ ছিল কিনা, সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা আমাদের নাই। অনেকেই মনে করেন যে ভারত-ইতিহাসের এই সন্ধিমুহূর্ত্তে সাধারণ লোকেদের মধ্যে শিক্ষার বিশেষ সমাদর বা প্রসার ছিল না, স্থানে স্থানে শিক্ষার কিছু আয়োজন ছিল মাত্র, কিন্তু সমগ্রভাবে বলিতে গেলে আমাদের দেশ অশিক্ষা ও কুসংস্কারের তিমিরে আবৃত ছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ এই মত পোষণ করিয়াছেন এবং সযত্নে উহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় প্রচারও করিয়াছেন, আমাদের দেশবাসীরা হয়ত দেশের এরূপ অগৌরবের কথা মানিতে চাহেন না এবং এরূপ মতবাদ মিথ্যা প্রচার বলিয়া উড়াইয়া দেন, কিন্তু প্রকৃত অবস্থা যে কি ছিল, সে বিষয়েও তাঁহারা অবগত নহেন।

ইংরাজ শাসন যে সময়ে এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন মোগল রাজশক্তির পতন হইয়াছে এবং দেশে পূর্ণ অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করিতেছে। সেইজন্য এই সময়টিতে দেশের সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি পাওয়া বড় দুঃসাধ্য। সে সময়ে শিক্ষার বিস্তার কতটুকু ছিল, বিদ্যালয়গুলি কেমন ছিল এবং তাহাদের সংখ্যাই বা কত ছিল, কি প্রণালীতে কতখানি শিক্ষা দেওয়া হইত, এ সকলেরও সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। আমাদের নবাগত শাসকেরা দেশীয় শিক্ষার কথা বেশী কিছু জানিতেন না, জানিবার চেষ্টা বা অবসরও তাঁহাদের ছিল না, তাঁহারা ও তাঁহাদের সমর্থকেরা সংক্ষেপে এই কথা বলিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন যে ভারত ও ভারতবাসী ঘোরতর অজ্ঞ ও অসভ্য। মেকলে (Macaulay) এক কথাতেই তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিয়া দিলেন যে "A single shelf of a good European library was worth the whole literature of India and Arabia" (ইউরোপের ভাল যে কোনও গ্রন্থাগারের একসারি পুস্তকের মূল্য ভারত ও আরব দেশের সমগ্র গ্রন্থের সমকক্ষ)। শুধু ইংরাজ শাসকেরা নয়, তাঁহাদের আশ্রিত কোনও কোনও ভারতবাসী মেকলের মতাবলম্বী ছিলেন, এবং দেশীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির নিন্দা করিতে গিয়া অন্যায় ও মিথ্যা যুক্তির অবতারণাই করিতেন। এই সময়কার একটি ইংরাজী সরকারী বিবরণীতেও আছে, "Much has been written, both in England and in this country, about the ignorance of the people of India and the means of disseminating knowledge among them, but the opinions upon this subject are the mere conjectures of individuals, unsupported by any authentic documents, and differ so widely from each other, as to be entitled to very little attention."

(ভারতবাসীদের মূর্খতা সম্বন্ধে ও তাহাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে ইংলণ্ডে এবং এদেশে অনেক কথাই লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে প্রচারিত অভিমতসমূহ শুধু বিভিন্ন ব্যক্তির অনুমান মাত্র, তাহার সমর্থনে কোনও তথ্যবিবরণই নাই; এবং এগুলির পরস্পরের মধ্যেও এত বিপুল প্রভেদ দেখা যায় যে, এগুলি মনোযোগ দেওয়ারও যোগ্য নহে)।

ইহাতে এই কথা সরকারীভাবেই বলা হইয়াছে যে দেশের তৎকালীন অজ্ঞতা ও অশিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল সংবাদ প্রচারিত হইত, সেগুলি মূলতঃ কল্পিত ও নিরর্থক। কিন্তু আসল অবস্থাটি তবে কিরূপ ছিল?

শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তার সম্পর্কে আন্তরিক আগ্রহ কর্তৃপক্ষের ছিল না; এই বিশাল দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য বৃহৎ ও ব্যাপক চেষ্টাও হয় নাই। গত শতাব্দীর প্রথমভাগে দেশের কয়েকটি অঞ্চলের শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু অনুসন্ধান হয় এবং তাহার ফলাফল সরকারী বিবরণীতে প্রকাশিত হয়। তাহাদের সংখ্যা তিনটি। কিন্তু এগুলি হইতেও সারা ভারতের শিক্ষার কথা ঠিকভাবে জানা যায় না। তাহার কারণ, এই সকল অনুসন্ধান কার্য্য দেশের এক একটি অংশে মাত্র সীমাবদ্ধ ছিল, তাহার বহির্ভূত বিশাল ভূভাগের বিবরণ এগুলিতে নাই। সুতরাং সমগ্র ভারতের শিক্ষা সম্বন্ধে ধারণা ইহা হইতে করা চলে না, একটা মোটামুটি আংশিক চিত্র বা নমুনা (Sample) পাওয়া যায় মাত্র। শুধু তাহাই নয়, আরও বিশেষ অসুবিধা এই যে, অনুসন্ধান যে সকল অঞ্চলে হইয়াছিল, তাহাদের কোনও কোনটিরও তথ্য ও বিবরণ অংশত ভ্রান্ত ও অসম্পূর্ণ।

যে বিবরণীগুলির কথা বলিতেছি, উহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল পাদরী অ্যাডামের বিবরণী (Adam's Report)। এটির বিশেষ মূল্য ও গুরুত্ব এই যে, অ্যাডামের অনুসন্ধানকার্য্য এতটা আন্তরিকতা ও যত্ন সহকারে পরিচালিত হইয়াছিল, পূর্ব্বপ্রকাশিত বিবরণী দুইটির দোষত্রুটিগুলি তাঁহার বেলায় ঘটে নাই। সুতরাং তাঁহার প্রকাশিত তথ্যগুলি নির্ভুল ও প্রামাণিক বলিয়া গণ্য করা হয়। অথচ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে অন্য বিবরণীগুলির রচয়িতাদের ন্যায় ইনি রাজপুরুষ ছিলেন না, বেসরকারী ব্যক্তি ছিলেন। পাদরী হইয়া তিনি এদেশে আসেন এবং ভারতীয় প্রাচীন কৃষ্টি ও জ্ঞানের অনুরাগী হইয়া পড়েন। কলিকাতায় তিনি রাজা রামমোহন রায়ের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন, এবং সে সময়ে বাংলাদেশের বহু সমস্যা ও জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ

করেন, ও সে সময়কার ক্যালকাটা ক্রনিকল (Calcutta Chronicle) ও অন্যান্য সংবাদপত্রের সম্পাদকতা করেন। দেশীয় শিক্ষা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য ইনি বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিকের (Lord William Bentick) নিকট অনুমতি চাহিলে, বেণ্টিক তাঁহাকে সে অনুমতি সরকারীভাবে দেন। যে আদেশপত্রে এই অনুমতি দেওয়া হয় তাহার মধ্যে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মেকলে সে সময়ে বঙ্গদেশের শিক্ষা সংস্থার সভাপতি এবং বড়লাট-পরিষদের সদস্য থাকা সত্ত্বেও এই আদেশে তিনি নাম স্বাক্ষর করেন নাই।—

সরকারী অনুমোদন লাভ করিয়া অ্যাডাম অনুসন্ধানকার্য্যে প্রবৃত্ত হন; ১৮৩০ হইতে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার এই কার্য্য চলে, এবং ইহার ফলাফল পর পর তিনটি বিববরণীতে লিপিবদ্ধ হয়। উহাদের মধ্যে তৃতীয় বিবরণীটিই প্রধান। তখনকার বঙ্গ ও বিহার প্রদেশের পাঁচটি জেলা লইয়া এক সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলের শিক্ষা সম্পর্কিত পূর্ণ তথ্যাদি ইহাতে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া দেশীয় শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তার সম্বন্ধে তাঁহার নিজ সুচিন্তিত অভিমতও অ্যাডাম এই বিবরণীতে সন্নিবিষ্ট করেন। বিপুল অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ও সতর্কতাসহকারে তিনি এই অনুসন্ধান পরিচালিত করেন, যাহাতে কোনও ভুল না থাকে, কোনও অংশ বাদ না পড়ে, সেদিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনও কোনও স্থানে ঠিক কতগুলি বিদ্যালয় আছে এবং কত ছাত্র সেগুলিতে শিক্ষা পায়, তাহার সম্পূর্ণ হিসাব তিনি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, সে আক্ষেপ তিনি নিজেই করিয়াছেন। ইহার প্রধান কারণ এই যে, অনেক ক্ষেত্রে, অনুসন্ধানকারীদের যথেষ্ট বন্ধুত্ব ও সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাবসত্ত্বেও, গ্রামবাসীরা এরূপ তদন্তের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিত না। দেশের সেই পরিবর্ত্তন ও ক্রমবর্দ্ধমান দুঃখদারিদ্র্যের যুগে এ চেষ্টাকে তাহারা সন্দেহ ও ভয়ের দৃষ্টিতে দেখিত এবং ইহাকে সূত্র করিয়া কোন দিক হইতে কি নূতন উপদ্রব বা বিপদ আসিয়া পড়িবে, সেই আশঙ্কায় তাহারা বিদ্যালয়গুলির অস্তিত্ব গোপন রাখিবার চেষ্টা করিত। এইজন্য অ্যাডাম বলিয়াছেন যে তিনি যে সংখ্যাগুলি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, প্রকৃত সংখ্যা তাহার চেয়ে অধিকই হইবে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও, তাঁহার প্রদত্ত বিদ্যালয় ও ছাত্রের সংখ্যাই যদি গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলেও দেখা যায় যে আমাদের দেশবাসীরা এই সময়ে যতদূর অশিক্ষিত ছিল বলিয়া আমরা মনে করি, ঠিক তত অশিক্ষিত তাহারা ছিল না; বরং দেড়শত বৎসর ইংরাজ শাসনের পরেও দেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষের অঙ্ক যাহা পাওয়া যায়, তাহার চেয়ে শিক্ষিতের সংখ্যা বেশী ছিল।

এই বিবরণীতে আমরা দেখিতে পাই যে, উপরে যে অঞ্চলটির কথা বলা হইয়াছে, উহাতে মোট আড়াই হাজারের অধিক বিদ্যালয় ছিল, এবং সেগুলির শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩০ হাজারেরও বেশী। যে বয়সে ছেলেদের বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিবার কথা, সেই বয়সের সমগ্র বালকগণের ছয় ভাগের এক ভাগ বিদ্যালয়ে পড়িত, এমন ধরা যায়। বিদ্যালয়গুলির মধ্যে প্রকার ভেদ ছিল, বাংলা হিন্দী সংস্কৃত ও ফরাসী বিদ্যালয় ছিল, অল্পসংখ্যক ইংরাজী বিদ্যালয়ও সে সময়ে হইয়াছে। মেয়েদের শিক্ষার প্রচলন বেশী ছিল না, মেয়েদের স্কুল ও ছাত্রীর সংখ্যাও অল্প দেখা যায়। সমগ্র অঞ্চলটির লেখাপড়া জানা পুরুষদের মোট হিসাব ছিল শতকরা ১৮ ভাগ, অথচ সুদীর্ঘ ইংরাজ শাসনের পর ১৯৩১ সালে দেখা যায় যে সমগ্র অধিবাসীর মাত্র শতকরা ৮ ভাগ লেখাপড়া জানে,, বর্ত্তমানে এই অঙ্ক অবশ্য কিছু বাড়িয়াছে।

অবশ্য এ কথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, এই বিবরণীতে প্রদত্ত চিত্রটি সম্পূর্ণ দেশের নহে, একটি নির্দ্দিষ্ট অংশের মাত্র। কিন্তু দেশের সকল অংশের শিক্ষার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার উপায় যখন নাই, তখন একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের হিসাবটি দৃষ্টান্তস্বরূপ লইয়া সারা দেশের অবস্থা মোটামুটি অনুমান করিয়া লইতে হইবে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্যালয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে এই সময়কার খ্যাতনামা ইংরাজ লেখক ও রাজপুরুষদের কয়েকটি অভিমত উদ্ধৃত করিতেছি। মধ্যপ্রদেশ সম্বন্ধে ম্যালকম (Malcolm) তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন, "Private Schools both in towns and villages, are numerous" (সহর এবং গ্রামগুলিতেও বহুসংখ্যক বেসরকারী বিদ্যালয় আছে)। মারাঠাদের নিকট হইতে বিজিত অঞ্চলগুলি সম্বন্ধে এলফিনস্টোন (Elphnistone) লিখিয়াছে, "There are already Schools in all towns and many villages" (সকল সহরে এবং বহু গ্রামেই পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যালয়সমূহ রহিয়াছে)। বঙ্গদেশের বিষয়ে Ward বলিয়াছেন, "Almost all the larger villages in Bengal contain common Schools" (বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত বৃহত্তর গ্রামগুলিতে সাধারণ বিদ্যালয় আছে)। এ সকল হইতে এই সিদ্ধান্ত সহজেই করা যায় যে, অন্ততঃ সাধারণ লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ এবং লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা একেবারে নগণ্য ছিল না।

ছেলেদের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারেও বাঙ্গালার গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের যথেষ্ট চেষ্টা ও উৎসাহের পরিচয় আমরা পাই। অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যালয়গুলি স্থানীয় ধনী ব্যক্তি, জমিদার প্রভৃতি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পোষিত হইত, কিন্তু যেখানে সে সুবিধা ছিল না, সেখানে গ্রামের নিতান্ত স্বল্পবিত্ত গৃহস্থগণও ছেলেদের লেখাপড়ার জন্য নিজেদের সমবেত চেষ্টায় কায়ক্লেশে একটি বিদ্যালয় সংরক্ষণ করিতেছেন, এরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। বিশেষতঃ ঠিক এই সময়টিতে, মুসলমান রাজত্বের অবসান ও ইংরাজ প্রভুত্বের অভ্যুদয়ের যুগে, বাঙ্গালার সাধারণ লোকের আর্থিক দুর্দ্দশা চরমে পৌঁছিয়াছিল, সে কথা সকলেই জানেন। সেই অবস্থারও গ্রামে বিদ্যালয় রাখার ব্যয় যাঁহারা স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে যোগাইয়াছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই সামান্য ব্যয়ের জন্য তাঁহাদের কতদূর কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। অ্যাডামের বিবরণীতে এমন বহু দৃষ্টান্ত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার একটির উল্লেখ এখানে করিতেছি; ইহা নাটোরের কোনও গ্রামের এক ক্ষুদ্র বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের সমুদয় ব্যয়ভার গ্রহণের উপযুক্ত সঙ্গতিপন্ন কেহ গ্রামে ছিলেন না, তাই গৃহস্থগণের পরস্পর সহযোগিতায় বিদ্যালয়টি

চালানো হইত। গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু অধিবাসী যাঁহারা, তাঁহাদের চারিটি জ্ঞাতি পরিবার মিলিয়া বিদ্যালয়ের ঘর এবং শিক্ষকের থাকিবার ঘর দিয়াছিলেন, তা ছাড়াও তাঁহাদের দুইটি পরিবার মাসিক চার আনা হিসাবে এবং অপর দুইটি মাসিক আট আনা ও বার আনা হিসাবে শিক্ষককে দিতেন; ইহার অধিক দিবার সামর্থ্য তাঁহাদের ছিল না। তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাদের পরিবারের পাঁচটি শিশু বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিত। কিন্তু অত অল্প আয়ে ত শিক্ষকের চলে না এবং গ্রামের অন্য ছেলেদেরও লেখাপড়া চাই। দেখা যায় যে, এইরূপ একটি ছাত্র মাসে এক আনা দেয়, একজন তিন আনা এবং আরও পাঁচজন দেয় চার আনা হিসাবে। উপরন্তু তাহারা চাউল, তরিতরকারী মাছ, কখনও গামছা কাপড় ইত্যাদি রূপেও মাসে চার আনা আন্দাজ দিয়া থাকে। কিছুদূরে এক গ্রাম, বর্ষাকালে তাহার পথ জলমগ্ন হইয়া যায়, সেখানকারও পাঁচটি ছেলে বিদ্যালয়ে পড়িতে আসে; তাহাদের একটি পরিবারের দুইজন দুই আনা, অপর এক পরিবারের তিনজন চার আনা দেয়। ইহাই হইল বিদ্যালয়ের আয় এবং শিক্ষক মহাশয়ের মোট আর্থিক সম্বল। আর্থিক অনটন ও অসুবিধার মধ্যেও ভদ্রশ্রেণীর লোকের মধ্যে ছেলেদের লেখাপড়া শিখাইবার আগ্রহ কতদূর ছিল, এবং সেজন্য কতখানি অভাব কষ্ট তাঁহারা স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইতেন, ইহা তাহারই সুন্দর নিদর্শন। অ্যাডাম নিজেও এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহার বিবরণীতে সেগুলির প্রশংসা করিয়াছেন।

এই বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রেরা কিরূপ শিক্ষা পাইত, কি প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইত, শিক্ষাদানের উপকরণ সাজসরঞ্জামই বা কিরূপ ছিল, সে সব কথা এখন একটু আলোচনা করা যাক। অবশ্য ছেলেদের শিক্ষার জন্য যে সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি ছিল সেগুলিরই বিবরণ এখানে দেওয়া যাইবে ইহা ছাড়া আর এক শ্রেণীর শিক্ষালয়ও ছিল, হিন্দুদের সংস্কৃত চতুষ্পাঠী এবং মুসলমানদের ফারসী ও আরবী শিক্ষার মাদ্রাসা। এগুলিতে প্রধানতঃ উচ্চশিক্ষা দেওয়া হইত। দেশের প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ এই শিক্ষালয়গুলির সহিত যুক্ত থাকিতেন, প্রায়ই এগুলি রাজা, জমিদার ও সহৃদয় অর্থশালী ব্যক্তিদের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত হইত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলি ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনার কেন্দ্র ছিল বলিয়া ধর্ম্মপ্রাণ ধনীলোকে এগুলির পোষকতা করিতেন। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা এবং এগুলিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রের সংখ্যাও অল্প ছিল; বেশীর ভাগই ছেলেরা গ্রামের সাধারণ বিদ্যালয়ে অল্পশিক্ষিত শিক্ষক, গুরু বা মৌলবীর কাছে পাঠাভ্যাস করিত। এগুলির সংখ্যা এ সময়ে নিতান্ত অল্প ছিল না। দেশের সমস্ত ছেলের শিক্ষার পক্ষে পর্য্যাপ্ত না হইলেও, এরূপ প্রাথমিক বিদ্যালয় সর্ব্বত্র বহুসংখ্যক ছিল, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে যাঁহারা শিক্ষাদান করিতেন, তাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষাও ছিল অতি সামান্য, অনেকস্থলেই তাঁহারা যাহা ছাত্রদের শিখাইতেন, তাঁহাদের জ্ঞানও সেটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তেমনই তাঁহাদের আয়ও ছিল যৎসামান্য; অনেক ক্ষেত্রেই স্বল্প সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহস্থেরা তাঁহাদের সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য সামান্য যাহা দিতেন, তাহাই এই শিক্ষক মহাশয়দের সমগ্র পারিশ্রমিক ছিল। কিন্তু শিক্ষকদের আয় অল্প হইলেও সচরাচর সমাজে তাঁহাদের যথেষ্ট মর্য্যাদা ছিল। ম্যালকম নামক ইংরাজ লেখক মধ্যপ্রদেশে শিক্ষকদের আদরের একটি সুন্দর নীতির উল্লেখ করিয়াছেন; 'The town School-master is held in great respect, and has often an annual festival celebrated in his honour in the town, when he goes through the streets in procession with his pupils and a collection is made for him' (সহরের শিক্ষকের প্রভূত সম্মান। অনেক সময়ে তাঁহার সম্মানে সহরে এক বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়; ইহাতে তিনি শিক্ষার্থীদের লইয়া রাজপথে শোভাযাত্রা করিয়া যান, এবং তাঁহার জন্য অর্থ সংগৃহীত হয়)। শিক্ষকের জাতিবর্ণ সম্বন্ধে কোনও বিচার ছিল না, সব জাতির শিক্ষকই দেখা যায়। বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও অন্যান্য জাতির, এমন কি হিন্দুদের বিদ্যালয়ে মুসলমান শিক্ষকেরও দৃষ্টান্ত বিরল নহে। হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ কায়স্থ জাতীয় হইলেও, অন্যান্য শ্রেণীর বালকও যথেষ্ট ছিল। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে ছেলেরা শিক্ষকদের কাছে উচ্চতর জ্ঞানলাভ বা শাস্ত্রাধ্যয়নের সুযোগ পাইত না বটে, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার সাধনের জন্য এগুলি ছিল অতি প্রয়োজনীয় এবং কল্যাণকর, সুতরাং এই বিদ্যালয়গুলিকে জাতীয় শিক্ষার মেরুদণ্ড স্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারিত। শিক্ষার্থীরা এখানে মোটামুটি লিখিতে পড়িতে, অঙ্ক কষিতে শিখিত, কিছু পুরাণ উপাখ্যান শিক্ষা করিত; জমিদারী বা মহাজনী কাজের জন্য অথবা গৃহে যেটুকু জ্ঞানালোচনার সুযোগ বা আগ্রহ লোকের ছিল, তাহার পক্ষে এই শিক্ষাই যথেষ্ট বিবেচিত হইত।

বিদ্যালয়গুলির গৃহ এবং সাজসজ্জারও বিশেষ কোনও ব্যবস্থা ছিল না। কোনও কোনও স্থানে বিদ্যালয়ের একটি পৃথক চালাঘর থাকিলেও, বেশীর ভাগই বিদ্যালয় বসিত গ্রামের কোনও লোকের বা শিক্ষক মহাশয়ের বাটীতে; অনেক সময়ে গাছতলায়ও অধ্যাপনা চলিত। ছাত্রদের মধ্যে পুস্তকের প্রচলন ছিল না, শিক্ষক মুখে মুখে শিক্ষা দিতেন। ছেলেরা সচরাচর তালপাতায় লিখিত, তাছাড়া মাটীতে, কলাপাতায়, এবং কাগজে বা স্লেটে লেখাও কোথাও কোথাও চলিত। বিদ্যালয়ে পড়ানো হইত সকালে ও বিকালে, তবে বিভিন্ন স্থলে স্থানীয় লোকের প্রয়োজনে এ ব্যবস্থার তারতম্য হইত। ভর্ত্তি হইবার কোনও বাঁধাধরা সময় বা নিয়ম ছিল না; ছাত্রেরা যখন ইচ্ছা বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইত, এবং যতদিন সুবিধা ও অভিরুচি, শিক্ষকের কাছে পাঠাভ্যাস করিত। এই জন্য ঠিক শ্রেণীগত শিক্ষা চলিত না, প্রত্যেক ছাত্রের পাঠ বিভিন্ন ছিল, এবং পৃথক গতি ও পদ্ধতিতে সে পাঠ দেওয়া হইত। ইহাতে খুব অসুবিধা হইত না, কারণ সাধারণতঃ বিদ্যালয়গুলির আকার ছিল ক্ষুদ্র, ছয় সাত জন হইতে চৌদ্দ পনের জন বালক হয়ত পড়িত। বড় বিদ্যালয় হইলে শিক্ষক মহাশয় বিদ্যালয়ের পরিচালনা ও শিক্ষাদানের

ব্যাপারে তাঁহার কিছু শিক্ষাপ্রাপ্ত বয়স্ক শিক্ষার্থীদের সহায়তা গ্রহণ করিতেন। এই ব্যবস্থায় অনেক ক্ষেত্রেই যে বড় সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে কার্য্য হইত, তাহার পরিচয় আমরা পাই। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, ইংলণ্ডের শিক্ষার ইতিহাস যে মনিটরের শিক্ষাপদ্ধতির (Monitorial System) কথা আছে, তাহা আমাদের দেশের এই পুরাপ্রচলিত ব্যবস্থার অনুকরণেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সে সময়ে মাদ্রাজের পাদরী গুণী শিক্ষাবিদ্ অ্যাণ্ড্রু বেল (Dr. Andrew Bell) এই পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং দরিদ্র ছেলেমেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে ব্যয় ও ব্যবস্থারও দিক হইতে ইহা তাঁহার এত উপযোগী মনে হয় যে তিনি তাঁহার স্বদেশেও সাফল্যের সহিত ইহার প্রচলন করেন। যে বড় ছাত্রগুলি শিক্ষা দিত, তাহাদের বলা হইত মনিটর, এই জন্য ইহা মনিটারের পদ্ধতি বা মাদ্রাজ পদ্ধতি বলিয়া ইংলণ্ডে খ্যাত হইয়াছিল। আমাদের দেশের শিক্ষা, কৃষ্টি ও সমৃদ্ধির সম্পূর্ণ পতনের সময়েও, আমাদের নিজস্ব শিক্ষা প্রণালীতে অন্ততঃ এমন একটা বৈশিষ্ট্যও ছিল, যাহা সে সময়ে সারা বিশ্বে শ্রেষ্ঠ শক্তিপ্রতিষ্ঠাশালী আমাদের বিজেতা ইংরাজজাতি শিখিয়া লইতে দ্বিধাবোধ করেন নাই, ইহা যে বড়ই গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ব্যাপার, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

শিক্ষা, পাঠ্যতালিকা এবং অধ্যাপনা পদ্ধতির দিক হইতে এই বিদ্যালয়গুলির বিশেষ কোনও কৃতিত্বেরই দাবী ছিল না। শিক্ষক মহাশয়দের নিজেদের শিক্ষা এবং জ্ঞানই সীমাবদ্ধ ছিল, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাঁহারা যাহা পড়াইতেন, তাহাও আধুনিক দৃষ্টিতে যেমন সঙ্কীর্ণ ও অকিঞ্চিৎকর, তাঁহাদের শিক্ষাদান প্রণালীও ছিল তেমনই একঘেঁয়ে এবং প্রাচীন। বিদ্যালয়ে শাস্তির ব্যবস্থা বড় বহুল ও বৈচিত্র্যময় ছিল, নানা অদ্ভুত দৈহিক নির্য্যাতন বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক নিত্যকর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। দুই একটির কথা বলি। একটি ছেলেকে মাটীতে বসাইয়া, তাহার একটি পা ঘুরাইয়া তাহার কাঁধের উপরে তুলিয়া দেওয়া হইল, সেইভাবে তাহাকে থাকিতে হইবে। আবার এমনও দেখা যায় যে, প্রথমে যে ছেলেটি বিদ্যালয়ে পৌঁছিবে, তাহাকে এক ঘা বেত মারা হইবে, যে তাহার পরে আসিবে; তাহাকে দুই ঘা ; এই হিসাবে যে যেমন পৌঁছিবে, তাহার ভাগ্যে তত ঘা বেত। এই দণ্ড দিবার ভার প্রথমে উপস্থিত ভাগ্যবান ছেলেটির, কিন্তু সেও নিজ প্রাপ্য এক ঘা হইতে বঞ্চিত হয় নাই, যেন বিদ্যালয়ে আসার পুরস্কারই হইল বেত্রাঘাত। রাজনারায়ণ বসুর প্রসিদ্ধ 'সেকাল ও একাল' গ্রন্থেও এইরূপ নানা শাস্তির উল্লেখ রহিয়াছে, সেগুলির কথা সকলের সুবিদিত।

(আগামী বারে সমাপ্য)

লোকশিক্ষা ও যাত্রা

শ্রীবীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাইবেলে একটা কথা আছে, "Man does not live by bread alone,"—রুটীতে পেটের ক্ষুধা মিটতে পারে কিন্তু মনের ক্ষুধা মিটবে কিসে? চিন্তার আদানপ্রদান বা চিন্তা জগতের নতুন কিছুর আস্বাদনেই মনের ক্ষুধার তৃপ্তি হয়। আমাদের বাংলার অধিকাংশ লোকই অক্ষর-জ্ঞানবিহীন তারা আস্বাদন পাবে কিসের মাধ্যমে? গ্রন্থকার সকলের মনের পুষ্টির জন্য গ্রন্থ রচনা করলেন, কিন্তু অশিক্ষিত অধিকাংশ সাধারণ তার রস গ্রহণে সক্ষম হোল না।

এ প্রশ্ন কেবল আজকের নয় চিরন্তন,—তাই আগেকার দিনে কবিরা যে গান রচনা করতেন তা নিজেরাই কীর্ত্তন, তর্জ্জা, পাঁচালী, কথকতার মধ্যে দিয়ে সকলের পাতে পরিবেশন করতেন। নাট্যকার যে পালা রচনা করতেন তা যাত্রা বা অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে সর্ব্ব সাধারণেরই আনন্দবর্দ্ধন করতো, কিন্তু আজকের দিনে প্রকাশের এতো সুবিধা থাকা সত্ত্বেও মনোমত সাহিত্য ভাণ্ডারের মানসিক পুষ্টি থেকে অধিকাংশ মানুষ রয়ে গেছে বঞ্চিত। বাংলার নাটক আর নাট্যশিল্পের পরিধি কেবলমাত্র সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে ক'লকাতা আর গুটিকয় গ্রাম ও সহরের মাত্র কয়েকটি শিক্ষিত পরিবারের মধ্যে, আগেকার দিনের যে কথকতা, পাঁচালী, কীর্ত্তন ও তর্জ্জা জনসাধারণের আনন্দবর্দ্ধনের প্রধান উপকরণ ছিল তাও ধ্বংসোন্মুখ-প্রায়। তাই সাধারণ মানুষের নিরানন্দ মনকে সজীব করে তুলবার জন্য যাত্রার বহুল প্রসার ও প্রচার আবশ্যক। আবেদন বহুল কাহিনী যাত্রার মাধ্যমেই সকলের মানসিক পুষ্টি বিধান করতে পারে।

যুগের সঙ্গে সঙ্গে যেমন সাহিত্য ও চিন্তাধারার পরিবর্ত্তন ঘটেছে, তেমনি যাত্রাকেও আজ নতুন রূপ পরিগ্রহণ করতে হবে। যাত্রার জীবনে এইরূপ পরিবর্ত্তন নতুন নয়। যাত্রার আদিম যুগে এর মধ্যে অভিনয়াংশ ছিলই না বললেই চলে, নৃত্য আর ধর্ম্মসঙ্গীতকে একত্র করে যাত্রা নামে পরিবেশন করা হতো। পরে পালাকারেরা আবেদন বৃদ্ধির জন্য কিছু সংলাপ যোগ দিয়ে আজকের যাত্রার জন্ম দিয়েছেন, যাত্রা কথাটা কোথা থেকে এসেছে তার হদিশ পাওয়া কঠিন, তবে মনে হয় ধর্ম্মীয় শোভাযাত্রা থেকেই যাত্রা কথাটির উৎপত্তি হয়েছে। শোভাযাত্রার একটী বিশেষ অঙ্গ ছিল নৃত্য ও ধর্ম্মসঙ্গীত, এই সমন্বয়ই পরে যাত্রা নামে পরিচিতি লাভ করেছিল।

বাংলা যাত্রার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যাত্রার কাহিনী প্রায় সমস্তই পুরাণ, মহাভারত ও রামায়ণ থেকে নেওয়া

হতো, এমন একটা যুগও বাংলার জীবনে এসেছিল যখন কৃষ্ণ যাত্রার প্রবল প্রাধান্যে অন্যান্য যাত্রার প্রচার একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ধর্মকাতর বাঙ্গালীর মনে এর প্রভাব ছিল অপরিসীম, শেষের যুগে অবশ্য পালাকারেরা সামাজিক কাহিনীও যাত্রার মাধ্যমে প্রচার করতেন, কিন্তু তার মধ্যেও শেষ পর্য্যন্ত একটা ঐশিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করা হতো যাতে এর আবেদন সকলের মনে রেখাপাত করে।

যাত্রার প্রথম যুগে গোপাল উড়িয়ার বিদ্যাসুন্দর যাত্রা অত্যন্ত খ্যাতি-লাভ করেছিল। একটি ফুলওয়ালীর চরিত্রই এই পালার প্রধান আকর্ষণ। গোপাল উড়িয়া ছাড়াও আদিম যুগে জয়চন্দ্র, প্রেমচাঁদ, আনন্দ নামক আরও অনেক প্রতিভাশালী অধিকারী ছিলেন। যাত্রার জগতে কৃষ্ণ-লীলার বন্যা আনলেন শ্রীযুত কৃষ্ণকমল গোস্বামী, যাত্রার উন্নতিসাধন ও সম্প্রসারণে এঁর দান অবিস্মরণীয়। এঁর লেখা স্বপ্নবিলাস, বিচিত্রবিলাস, রাই উন্মাদিনী, ভরত মিলন, নিমাই সন্ন্যাস প্রভৃতি পালা আজও যাত্রা জগতের মুকুটমণি হয়ে আছে। পরবর্ত্তীকালে অন্যান্য যাত্রাকারেরা কৃষ্ণকমল রচিত পালাগুলির আরও উন্নতিবিধান করেছিলেন। যাত্রা-জগতের শিশুরাম অধিকারী, শ্রীদাম, সুবল, গোবিন্দ অধিকারীও সে যুগে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছিলেন। শিশুরাম ছিলেন রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের সামসাময়িক। পরবর্ত্তী যুগের পালাকারদের মধ্যে মুকুন্দ দাসের নাম সর্ব্বাধিক প্রসিদ্ধ। দেশের চরম দুর্দ্দিনে তাঁর স্বদেশী গান বাংলাকে জাগিয়ে তুলেছিল।

দেশের সাধারণের মানসিক পুষ্টির জন্য যাত্রার বহুল প্রচার আবশ্যক, —এবং এর দায়িত্ব শিক্ষিত সকলেরই। দেশের নিরক্ষর সাধারণেরা জাগতিক বিষয় সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ, তাই দৃশ্যকাব্যের মধ্যে দিয়েই তাদের সচেতন করা সম্ভব। দৃশ্যকাব্য বলতে মঞ্চস্থ অভিনয় বা যাত্রা উভয়ই বোঝায়, কিন্তু আমাদের মতো গরীব দেশের পল্লীগ্রামে মঞ্চস্থ অভিনয়ের সম্ভাবনা এতই কম যে যাত্রা ছাড়া অন্য কিছুর প্রচারের কোনই সম্ভাবনা নেই।

অনেকে বলেন যাত্রা যেন জমতে চায় না, তার না আছে দৃশ্যপট, না আছে নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টির সাজসজ্জা, সেইটাই যাত্রার বিশেষত্ব—তার মধ্যেই আছে যাত্রার নিজস্ব ভঙ্গিমা, আমার দরকার চিন্তার প্রসারের—তা যাত্রাতেই সম্ভব। মঞ্চে কাহিনীর চেয়ে ব্যবস্থাটা এতো বেশী জোরদার হয়ে পরে যে অনেক সময় চোখ ঝলসান সাজসজ্জাতেই নাটক উৎরে যায়, কিন্তু যাত্রায় এ ফাঁকির উপায় নেই। চারিদিকেই তোমাকে সতর্ক সহস্র চক্ষুর পাহারার মধ্যে অভিনয় করতে হবে—কাহিনী এখানে প্রধান, তার পরিবেশন। যাত্রায় আছে স্বীকৃতি—বেশ মাঠের মধ্যে এসে বলছো তুমি রাজা, তোমাকে রাজা বলেই মেনে নিলাম। এবার দেখাও তোমার রাজার মতো ব্যবহার। সেই ব্যবহার বা অভিনয়াংশের মধ্যেই কাহিনীর সঙ্গে মনের ঘটে সংযোগ—তাই আমার মতে যাত্রা একদিক দিয়ে মঞ্চস্থ অভিনয়ের শ্রেষ্ঠ।

কোলকাতার বাসিন্দা আমি, পেশাদারী মঞ্চের অভিনয় দেখবার সুযোগ হয়েছে অনেক। যাত্রা দেখেছি গ্রামেও, কিন্তু সম্প্রতি কোলকাতাতেও যাত্রা দেখবার সুযোগ হয়েছিল। যাত্রার নাম 'শচীদুলাল'—কসবা আদর্শ সমিতির সভ্যরা অভিনয় করেছিলেন। সখের অভিনেতা তারা—প্রত্যেকেই শিক্ষিত ও নিজস্ব বিভিন্ন পেশা আছে। সেদিনই দেখেছিলাম আবেদনবহুল কাহিনী যাত্রার মাধ্যমে কতোখানি চিত্তস্পর্শী হতে পারে তার চরম নিদর্শন। কিছুই নয়, অতিসাধারণ কাহিনী—নিমায়ের গল্প যা বাংলার প্রতিটি লোকের জানা। তবু অভিনয় ভঙ্গের পর সেদিন দর্শকদের মুখে যে পরম তৃপ্তির ছায়া দেখেছিলাম তা চিত্ত আকর্ষণে যাত্রার সাফল্যের চরম নিদর্শন। তাই লোকশিক্ষা প্রসারে এর প্রয়োগ একান্ত আবশ্যক। যাত্রায় সকলের সাথে সংযোগ রাখা যায়—সকলকে এর মর্ম্মকথা উপলব্ধি করান যায়। স্বীকার করছি যাত্রায় কতকগুলো টেকনিক্যাল মুস্কিল আছে—সেগুলো সংশোধন করে নিলেই হয়। আজকের অগ্রগতির দিনে তাকি খুবই অসম্ভব।

সবশেষে আর একটি কথা বলে রাখি, যে ভাবেই আমরা দৃশ্যকাব্যকে উপস্থিত করি না কেন—তার কাহিনী যদি জোরদার না হয় তাহলে সবই যাবে ডুবে। যদি কোন নাম-করা উপন্যাসকে যাত্রার মাধ্যমে পরিবেশন করা হয়—তাহলে অতিসাধারণ লোকের সামনে উপস্থিত করার আগে যথাবিহিত সম্পাদন আবশ্যক। তবে যাত্রার মাধ্যমে পৌরাণিক কাহিনী-গুলির আবেদনই যে সাধারণ লোকের কাছে সবচেয়ে আদরণীয় হবে তাতে কোনই ভুল নেই। একটা কথা আছে—"Aristotle approved of the choice of legendary themes for the Atlic drama because of the inherent Greek faith in the mythology of the country and its intimate connection with the traditional history of the people.

বাংলার সম্বন্ধেও ঠিক ঐ এক কথাই খাটে।

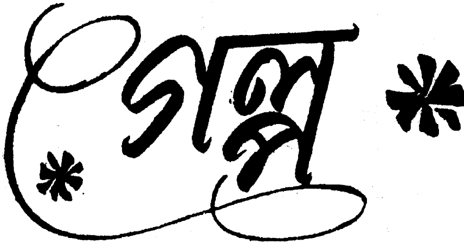


মনের কথার চিঠি

শ্রীবীণা দে

আদরিণী সখী আমার! অনেক কালের পরে
পেয়ে তোমার চিঠিখানি, মন যে কেমন করে।
মনে পড়ে কতদিনের কথা—কত শত—
লিখ্‌তে গিয়ে ভাষা খুঁজে পাইনে মনের মত।
তোমার আমার মাঝখানে ভাই অতল সমুদ্দুর
কোথায় সহর 'কল্‌ডোয়েল', আর কোথায় সে বোলপুর
পৃথিবীর এক প্রান্তে আমি, আরেক প্রান্তে তুমি—
ইউ, এস, এ,র 'আইদাহো' আর বাংলার বীরভূমি!
তবুও মনে হ'চ্ছে যেন—তোমার কাছেই বসে'
মন খুলে ভাই যা' খুসী তাই গল্প করছি কষে'···
হঠাৎ সূক্ষ্ম পর্দ্দাঘেরা কাঁচের জান্‌লা হ'তে—
দৃষ্টি পড়ে আছাড় খেয়ে, 'ক্লিভল্যাণ্ডে'র পথে
কোথায় শ্যামল আম কাঁঠালের ছায়া, খড়ের বাড়ী?
হেথা, রিক্তশাখা তুষার ঢাকা, ছুট্‌ছে মোটর গাড়ী!
হাঁটুর উপর কাপড়পরা, পাতার টোকা মাথে
কোথায় কালো রাখাল বালক বাঁশের বাঁশী হাতে?
আমেরিকান 'কাউ বয়' সব নীল পাৎলুন পরে'
হাঁটু ঢাকা জুতো পায়ে, বন্দুক হাতে ঘোরে।
নেইকো হেথা লক্ষ্মীমাসী পদ্মদাসার দল,
ঘর বাহিরের কাজকর্ম্ম সবই করছে কল!
ঘরঝাঁটানো, বাসনধোয়া ইলেক্‌ট্রিকেই হয়,
কাপড়কাচার বিরাট বোঝা বিজলীদাসীই বয়।
লাঙ্গল, বলদ, মুনীষ, মজুর, মাঠে কেউ না হাঁটে,
কলের দাঁতে কলের হাতেই মাটী ফসল কাটে।
বোনা, রোয়া, ঝাড়া, তোলা সবই হ'চ্ছে কলে,
কল-কুচনো আনাজ-পাতি আসছে ঘরে চলে'।
কুট্‌নোকোটা বাট্‌নাবাটার দ্বন্দ হেথায় নাই,
রন্ধনের সেই গন্ধ ছিরি ছন্দও নেই তাই!···
নেইকো হেথায় অশোক বকুল আম কদমের মায়া,
হেথা, মেপেল, হেজ্‌ল, উইলো শাখা রিক্ত তুষার-কায়া।
নেইকো হেথায় আতা, তোতা, ডালিমগাছের মৌ,
আমায় দেখে বলবে না কেউ 'গিন্নী' 'বড়বৌ'।
আমার, মাথায় শালের রুমাল বাঁধা, পায়ে জুতো মোজা,
হাতে গরম 'মীটন্‌স' পরে' চলছি "সোজা সোজা"
'গোল্ডেনরূল'এ বাজার করে' একাই ফিরি বাড়ী,
'ফিফ্‌থ এভিন্যু' সিক্সথ্‌ এভিন্যু পেরোই তাড়াতাড়ি।
সাথে গিয়েও হারিয়ে যেতাম বল্লভপুরের রথে—
এখন একাই ঘুরে বেড়াই আমেরিকার পথে।

মনের মাঝে যাই বা থাকুক,—মুখে সদাই হাসি—
'হ্যালো' 'হাউ ডু ইউ ডু'—যেন কতই ভালবাসি!
হাসতেও ভাই জানে এরা ভালবাসতেও জানে,
প্রাচুর্য্যের পাথারে যেন সবাই সাঁতার টানে।
নেইকো এদের দারিদ্র্য-দুখ, নেইকো ভাতের টান,
সবাই এরা পয়সা চেনে, পয়সাই ভগবান!
এদের মাঝে পড়ে আমি হাবুডুবু খাই,
আবার, কী করে যে উৎরে চলি—তাও জানিনা ভাই
আমিই কী সেই? সেই কী আমি? ভাবি ক্ষণে ক্ষণে
আবার ভাবি আমিই বা কে? দ্বন্দ্ব জাগে মনে।
যাঁর ইচ্ছায় চল্‌ছি মোরা তাঁর ইচ্ছাই সব
আমরা শুধু বাইরে দেখে করছি কলরব।
পরিবর্ত্তনময় এ জগৎ—সকল ইচ্ছাই তাঁর,
বদল দেখে মিথ্যা হাসি, মিথ্যা হাহাকার।
আমরা, সংসারের এই নাট্যমঞ্চে যা' অভিনয় করি,
সবের মূলেই আছেন জেনো নাটের গুরু হরি।
তাই, সব তোমারই ইচ্ছা' বলে জ্বালিয়ে দিলেম আলো
দেখলাম ভেবে—ভাবনা ছেড়ে পত্র লেখাই ভালো।
আগুন সাম্‌নে লিখ্‌ছি বসে' কাঠের তৈরী ঘর,
উনিশশো তিপ্পান্নর আজকে তেরোই ডিসেম্বর।
চারিদিকে লেগে গেছে খৃষ্টমাসডের ধুম,
ছেলে বুড়ো কারও চোখেই নেইকো যেন ঘুম!
কাগজ কাটা রঙীন পাতা ফুলের কী বাহার
উপহারের আয়োজনে ভুলেছে আহার।···
আমার মনের চোখে জাগে—নতুন ধানের মুঠি,
গোবর লেপা আঙ্গিনাতে লক্ষ্মীর চরণ দুটি;
নতুন ধানের নতুন চিঁড়ে, নতুন চালের পুলি,
নবান্নর উৎসবে মাতা বাংলার গাঁ গুলি।
নলেন গুড়ে নারকোল নাড়ু, চন্দরপুলি, মোয়া,
নতুন মুলো মটরশুঁটি, গরম গুড়ের ধোঁয়া।
নতুন গুড়ের সেই সন্দেশ, সেই পাটালি ভাই
কোথাও আর পেলাম নাকো মিষ্টি যতই খাই।
দেখলাম অনে-ক আহার, বাহার, সাজ, সজ্জা, টুপী,
কিন্তু একটা কথা তোমায়—বলছি চুপি চুপি—
যেথায় আছে—তাকিয়া ঠেসে বসা, বাটায় পান,
খোস গল্প, খোল-করতাল, কবিগুরুর গান,
যেথায় আছে পোষ-পার্বণ—মন চলে যায় তথা
ইতি—তোমার চিরদিনের বন্ধু "মনের কথা"।



দিবাভিসার

শ্রীগিরিবালা দেবী

পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বের কাহিনী বলতে বসেছি। এ প্রখর রৌদ্রালোকে অতীতের সেই মেঘাচ্ছন্ন দিনগুলির ক্ষীণ স্মৃতি এক একবার চোখের সামনে ভেসে আসে।

একালের মতন সেকালেও সুন্দর হাসিমাখা প্রভাত হয়েছিল।

চৌধুরী বাড়ীর সপ্তকন্যার সর্ব্বকনিষ্ঠা ঘেন্না বিহগকূজিত প্রভাতকে মুখর করে তারস্বরে ডেকে উঠলো "বড়দি, মেজদি, সেজদি, নদি, রাঙাদি, নতুনদি, তোমরা কি ঘুম থেকে উঠবে না গো? বেলা ঢের হয়েছে। দাদা যে আজ আসবে তা যেন কারোর মনে নেই?"

চকমিলানো কোঠা বাড়ীর মাঝের বড় ঘরখানায় মেয়েদের আড্ডা। সাতবছরের ঘেন্না কোলের সন্তান বলে আজো মার বিছানা ছাড়েনি। মা উঠে গেলে সে এসেছে দিদিদের সুখনিদ্রা ভঙ্গ করতে।

এদের সাতবোন চম্পার, একটিমাত্র ভাই প্রবীর কলিকাতায় কলেজে পড়ে। গ্রীষ্মের বন্ধে সে পুরীতে বেড়াতে গিয়েছিল। সুদীর্ঘ ছুটি প্রায় শেষ করে আজ গ্রামে ফিরছে। সেই জন্ম বাড়ীতে আনন্দের সীমা নেই। প্রবীরের তিন দিদি, বাকিগুলি ছোটবোন। সাতবোনের ভেতরে চারটি বিবাহিতা। বিত্তশালী বাপের মেয়ে বলে তারা তেমন শ্বশুরালয়ে যায় না। জামাইরাই মাঝে মাঝে শুভাগমন করে বিরহিণীদের বিরহের ব্যথা লাঘব করে।

সপ্তসমুদ্রের বৃদ্ধা ঠাকুরমা অত্যাপি বিত্তমান। তিনি আবার বিষম নারী-বিদ্বেষী। সেই জন্যেই বোধহয় 'বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসার' মতন তাঁর ভিটেয় সাত নাতনী ঘুঘু চরাতে উদ্যত হয়েছে।

যেমন হেলাফেলার জিনিষ, তেমনি ঠাকুরমা অশ্রদ্ধার সঙ্গে তাদের নাম করণ করেছেন, "অমুনা, ঝমুনা, নমুনা, সীমা, আন্না, ছিছি, ঘেন্না।"

নামের শ্রী যাই হোক না কেন, মেয়েরা যেন ক্ষ্যাপা নদীর উত্তাল তরঙ্গ, দিনরাত কলকল খলখল।

স্বচ্ছল সংসারের ঝিয়ারী মেয়েরা একটু বেশী বেলা পর্য্যন্ত ঘুমায়, তাতে কেউ দোষ ধরে না। কিন্তু দোষ না ধরলেও অসময়ে নিদ্রাভঙ্গে ঘেন্নার দিদিরা কেউ প্রীত হতে পারলো না।

বড় অমুনা নিদ্রাবিজড়িত চোখ মেলে বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠলো, "আঃ মরণ, ছুঁড়িটা যেন কাক ডাকতে লেগেচে। দিলে ভোরের ঘুমটুকু ভেঙে, এখন দিন ভোর মাথার যন্ত্রণায় আমি দগ্ধে মরবো"।

ঝমুনা সায় দিলে—"যা বলেছিস দিদি, আমারো তোর দশা।"

নমুনা বল্লে, "দাদা আসবে বলে আমরা নাচবো নাকি? যা না নতুন বৌয়ের কাছে সে আহ্লাদে আটখানা হচ্ছে। কৈ আমরা শ্বশুর বাড়ী থেকে এলে এমন তো হৈ হল্লা দেখি না?"

সীমার বছরখানেক হল বিয়ে হয়েছে। হৃদয়ের ভরানদীতে এখনো ভাঁটার টান আসেনি, নয়ন আজো স্বপ্ন ভারাতুর। জীবনের নবীন পটভূমি হ'তে রঙীন ছবি মুছে যায় নি।

সীমা বিছানায় বসে দুহাতে শিথিল খোঁপা জড়াতে জড়াতে হাসলো, "আমাদের আবার শ্বশুর বাড়ী, বছরে একমাস তার আবার ব্যাথানা। তা জামাইরা এলে এরা কিন্তু কম সমারোহ করে না। আমাদের ভিতরে নতুন বৌকে টানচো কেন বল দেখি? অগ্রহায়ণ মাসে দাদা বিয়ে করে রেখে গেচে বেচারাকে, আর আসচে জ্যৈষ্ঠের [illegible] আলাপ পরিচয়ই ভাল করে হয়ে ওঠে নি। তার আবার আহ্লাদে আটখানা?"

কিশোরী আন্না কুমারী হলেও তার জানবার বুঝবার কিছুই বাকী ছিল না। সে চোখ বুজে টিপে টিপে বল্লে, "ভাইবোনের বিয়ের বৌঠান এতদিন বাপের বাড়ীতে

টিকা ছিল বলেই না দাদা রেগে আসেনি। যেমনি ঠান এখানে এসেছে, অমনি খবর পেয়ে ছুটে আসচে। মার কাছেই ওদের ভাবের অভাব শুনলাম।"

বালিকা ছিছি দিদিদের রসালাপে কান না দিয়ে অসমস্ত ভাবে বিছানা ছেড়ে ঘেন্নাকে জিজ্ঞাসা করলো। গানের কাঁচামিঠে আম কটার কথা মনে আছে তো? কড়া দিয়ে বেঁধে দাদার জন্যে যা রেখে গিয়েছিলাম, এখুনি গিয়ে পেড়ে নিয়ে আসিগে।"

"গাছের যত আম পেকে ফুরিয়ে গেল, দাদার এবার কছু খাওয়া হ'ল না। কাঁচামিঠে আম কটা আমরা জনা দাদার হাতে দেব রাঙাদি।" বলতে বলতে ঘেন্না ছিছিকে বাহু বন্ধনে বেঁধে বাইরে টেনে নিয়ে চল্ল।

দ্বিপ্রহরে প্রবীর এসে পৌছিল। বাড়ীর একটিমাত্র ছেলের শুভাগমনে গৃহে আনন্দের উচ্ছ্বাস বয়ে গেল। পরিজনেরা প্রবাসীকে ঘিরে আরম্ভ করলো কত কুশল প্রশ্ন, কত পথের বিবরণ। সে মিলন-মেলায় একটিমাত্র প্রাণী কেবল উপস্থিত হ'তে পারলো না, সে প্রবীরের নবপরিণীতা বধূ রাজবালা।

বিয়ের সময় রাজু উনিশবছরের তরুণ বরকে লজ্জা সঙ্কোচে ভাল করে নিরীক্ষণ করতে পারেনি। তার অতনেত্র পথে যেটুকু প্রতিভাত হয়েছিল, তা এ কয়েক মাসের অদর্শনে মনের ভেতর হ'তে ঝাপসা হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে বাকা অক্ষরে সে তার কলেজে কাব্য পড়া বরকে গুটিকত চিঠি লিখেছে বটে, কিন্তু তাতে তার মুদ্রিত কমল হৃদয় বিকশিত হ'বার সময় পায়নি। তেরো বছরের বালিকার জীবনের গ্রন্থি এখনো খোলেনি, কোরক সবে ফুটি ফুটি করছে।

কলি না ফুটলেও পল্লীবালার কৌতুক ও কৌতূহল কম নয়।

রান্না ঘরে রাজু পুরাতন দাসী কুড়ানির মায়ের সাহায্যে কইমৌরী রাঁধছিল। মা গৃহপ্রতিষ্ঠিত নারায়ণ শিলার ভোগ চড়িয়েছিলেন ভোগের ঘরে। তখনো পাড়াগাঁয়ে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে অজ্ঞাতকুলশীল পাচক রাখার প্রচলন হয়নি। রন্ধন এবং নারিকেলের ও দুধের নানারূপ মিষ্টান্ন তৈরীর বাইরে যে আর একটা বৃহৎ জগৎ আছে মেয়েরা তার খবর রাখতো না।

ঠাকুমা বৃদ্ধা হয়ে কাজের বাইরে গিয়েছেন। পুজোর আয়োজন ও ভোগের ভার বর্তমান গৃহিণীর স্কন্ধে। তিনি আবার আমিষের ভার দিয়েছেন বধূকে। গোড়া থেকে না শিখলে শিখবে কবে? ছেলে বয়সই যে শিক্ষার সময়। কুড়ানী মার হিতোপদেশে রাজু রান্না করে, একদিন আলুনে, একদিন নুনে পোড়া, কখনো অর্ধসিদ্ধ, কোনদিন অসিদ্ধ।

মেয়েরা সহজে এদিকে ঘেঁষতে চায় না, নিত্য নিত্য হাতা বেড়ির ঠ্যালার ভয়েই নানা ছলছুতায় পিত্রালয়ে অবস্থান করা।

কুড়ানীর মা রান্না ঘর হ'তে বের হ'বা মাত্র রাজু আর স্থির থাকতে পারলো না। দ্বারান্তরালের ছিদ্রপথ দিয়ে তার চকিত চঞ্চল দৃষ্টি বাইরে প্রসারিত করে দিলে।

প্রবীর সামনের দালানের সিঁড়িতে বসে সমুদ্রের বর্ণনায় উন্মুখ। তার চারিদিকে বিস্মিত শ্রোতার দল।

কি বিরাট সমুদ্রের ঢেউ, কত বড় মাছ, জলচর জীবজন্তু, কড়ি শঙ্খ ঝিনুক শুনতে শুনতে রাজু তন্ময় হয়ে গেল। তার সুকুমার চিত্ত মুহূর্তে উধাও হলো সেই সুনীল সিন্ধু-সৈকতে—যেখানে তিমি হাঙর ঝাঁকে ঝাঁকে বিচরণ করে।

"ও বৌমা একি কাণ্ড, কইমাছ যে পুড়ে গেলো? শীগ্‌গির নাবিয়ে জলের ছিটে দাও। পোড়া গন্ধ বেরিয়েছে।" রাজু সচমকে ঘাড় ফিরিয়ে নিলে। ভয়ে লজ্জায় তার মুখ রাঙা হয়ে গেল। সত্যি সে টের পায় নি, পিছনের দরজা দিয়ে কখন কুড়ানীর মা ফিরে এসেছে।

কুড়ানীর মা বিরক্ত হয়ে রাজুকে ধিক্কার দিতে লাগলো—"দাদাবাবু কইমাছ ভালবাসে, তার ছিরি করলে বেশ। চলন-বিলে লোক ছুটিয়ে কর্ত্তাবাবু ছেলের তরে মাছ আনিয়েছিল, গিন্নীমা পই পই করে আমারে কয়ে দিচে, তুই দাঁড়িয়ে থেকে মাছ রান্না করাবি। আমি মরতে কেনই বা বাইরে গিয়েছিনু মা, এখন দাদাবাবু মুখে দিতে পারলে হয়? ভাগ্যি কেউ এধারে আসে নি, দিনমানে লুকিয়ে তোমার সোয়ামীরে দেখন তাহ'লে বের করে দিতো। তুমি এমন কম্ম আর কখনো কোর না বৌমা, এ বড় নিন্দের। এখন কাজে মন দাও। রাতে যত ইচ্ছে পরাণভরে সোয়ামীরে দেখো।"

অপ্রতিভ রাজু মাথায় আঁচল টেনে দিয়ে রন্ধনে মনোনিবেশ করলো।

রাত বারোটার পরে দেখা হ'ল দুজনার। নব বরবধূর গৃহে নিশীথে আলো জ্বালানো নিন্দনীয়। অতএব প্রদীপ নির্ব্বাপিত হ'ল। অন্ধকার হ'লেও কলেজে কাব্যপড়া প্রবীরের হৃদয়ে রংএর আলোর রসের আলোর অভাব ছিল না।

জ্যৈষ্ঠের শেষ কালবৈশাখীর ক্ষান্তবর্ষণ আকাশ নব-বর্ষার সজল মেঘমালায় প্রসাধন করছে। রজনী স্নিগ্ধ মধুগন্ধী।

ঘুমে ঢুলুঢুলু বধূর কানের পাশে মুখ নামিয়ে প্রবীর প্রথমেই আরম্ভ করে দিলে অনুযোগ অভিযোগের পালা, "তোমাদের ওখানকার বিয়েপর্ব্ব এত শীগ্‌গির মিটলো কেন? বৈশাখে দাদার বিয়ে, জ্যৈষ্ঠে মামার বিয়ে, আষাঢ়ে ছোট বোন শৈলির বিয়েটা একেবারে চুকিয়ে রাখলেই ভালো হোতো?"

বধূ চাপা স্বরে খিল খিল করে হেসে উঠলো, "কি বলছেন? শৈলি যে ঘেন্না ঠাকুরঝির বয়েসী। তার বিয়ের এখনো ঢের দেরী। দাদার বিয়েয়, মামার বিয়েয় আপনি আসেননি বলে সকলেই কত দুঃখ করলেন।

"দুঃখ করেছেন তাতে আমার স্বর্গলাভ হয়েছে। বেছে বেছে আমার ছুটির ভেতর সকলের বিয়ের তারিখ পড়েছিল। এত বড় লম্বা ছুটিটা একেবারে মাঠে মারা গেল। কদিনের জন্য আমি কখনো আসতাম না। মা কেঁদে কেটে চিঠি দিয়েছিল বলেই আসতে হোলো। যার নিজের বিয়ে পুরানো হয় নি, দিনের আলোয় বৌ দেখা হয় নি, তার কী পরের বিয়েতে পরের বাড়ী যেতে ভালো লাগে?"

অপরাধিনী রাজু ক্ষুণ্ণ হয়ে উত্তর দিলে, "পঞ্জিকায় বিয়ের দিন লেখা থাকলে ওঁরা কী করবেন বলুন? তবু সেখানে গেলে দিনের বেলায় আমাকে দেখতে পেতেন, এখানে তা হবার যো নেই?

"কেন নেই? দুপুরবেলা, খাওয়া হয়ে গেলে তুমি এই ঘরে চলে আসবে। আমি আগেই এসে থাকবো। তা হলেই দেখা হবে।"

"না, তা হয় না, কেউ যদি টের পায়? এখানকার খাওয়া মিটতে দুপুর গড়িয়ে যায়। খেয়ে-দেয়ে দিদিরা বারান্দায় কড়ি খেলতে বসেন। আপনি আসবেন কি করে? ওরা দেখে ফেলবে যে?"

"সে ভাবনা তোমার নেই! কেউ টের না পেলেই তো হোলো। তুমি কবে আসতে পারবে তাই বলো?"

বিপন্ন রাজু ক্ষণেক ভেবে উত্তর করলো, "আজ সবে এসেছেন, কদিন পরে দিন ঠিক করে বলবেন। আমার কিন্তু বড় ভয় করচে। কেউ টের পেলে আমি কোথায় লুকোবো?"

সেদিন দিবাভিসারের জল্পনা কল্পনা সেই অবধি হয়ে রইলো; কদিন পরে দিন ঠিক হোলো 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে।'

আষাঢ় আসতে দেরী হলো না।

সেদিন ভোর থেকে চারিদিক অন্ধকার করে বারিবর্ষণ সুরু হোলো। রইয়ে রইয়ে মেঘ গর্জন করছিল গুরু গুরু করে। পল্লীগ্রামের বর্ষা—চারিদিক জল কাদায় থই থই করছে। মাটির আঙ্গিনায় দেখতে দেখতে বৃষ্টির জল জমে গেল। ভরা দ্বিপ্রহরে ডোবায় নালায় ব্যাঙ ডাকছিল খ্যাঁনর খ্যাঁন।

চৌধুরীদের নিয়ম—ছেলেদের খাবার পর মেয়েরা খেয়ে দেয়ে কড়ি খেলতে বসে। চাকররা খেয়ে বাহির মহলে চলে যায়। নিম্নশ্রেণীর ঝিরা দুবেলার ভাত বেড়ে নিয়ে বাড়ী হতে খেয়ে আসে। সকলের শেষে খান—শাশুড়ী বধূকে নিয়ে আর রান্নাঘরের ঝি কুড়ানীর মা।

সবার খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে; বাকী তিনজনার ভাত বাড়া হয়েছে। কুড়ানীর মা পিঁড়ি পেতে ঠাঁই করে রেখেছে।

এমন সময় ভোগশালা হতে গৃহিণী ডাকলেন, "বৌমা ওবেলার ডালের গামলাখানা নিয়ে যাও। আমি যাচ্ছি; আমার এদিককার কাজ সারা হয়ে গেছে।"

বালিকাবধূর হাতে গৃহিণী দুইবেলার ডাল তরকারী দিতে ভরসা পান না, তাই দুই ভাগে রেখে দুইবারে দিয়ে দেন।

বধূ আজি অন্যদিনের চেয়ে ক্ষিপ্রগামিনী হয়েছে। এক কাজ করতে গিয়ে পাঁচ কাজ সেরে রাখছে। লিচুকাটা চারগাছা মল অবিরত বেজে চলেছে রুণুঝুনু। তার চপল চোখ বারবার প্রসারিত হচ্ছে তাদের শয়ন গৃহের বাতায়নে।

মন্দ মেঘধ্বনির সঙ্গে কি এক অজানা আবেশে ভীতা বিহ্বলা বালিকার হৃদয় কাঁপছে দুরুদুরু।

ভোগের ঘর উঠানের শেষ প্রান্তে।

বুকসমান ঘোমটা টেনে দুই হাতে ডালের গামলা নিয়ে আনতে মাঝপথে এসে এক বিপর্যয় ঘটে গেল।

ঘেন্না সুযোগ বুঝে ভাঁড়ার হ'তে খানিকটা আমের আচার চুরী করে দৌড়ে পালাবার সময় অতর্কিতে রাজুর ডালের গামলায় ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। শুধু পড়ে যাওয়া নয়, চীৎকার করে কেঁদে সারা বাড়ী কাঁপিয়ে তুলতে লাগলো।

নামে ঘেন্না হলেও সকলের ছোট বলে তার আদর খুব। তার কান্নায় কেউ স্থির থাকতে পারলো না। সবাই ছুটে এল। দাসদাসীরাও বাদ গেল না।

জলকাদায় ঘেন্না নেয়ে উঠেছে; গামলার কানা লেগে কপাল রাঙা হয়েছে। গামলার ডালও ছলকিয়ে নষ্ট হয়েছে অনেকটা। অসাবধানী বধূর এত বড় অপরাধ ননদিনীরা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখতে পারলো না। "বৌ কেন লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে ঘোড়ার মতো লাফিয়ে চলে? কপালে কি চোখ নেই? আহা ঘি সম্ব্যার দিয়ে রান্না, এতখানি ডালের কি অপচয়। বৌয়ের হাতে লক্ষ্মী, পায়ে লক্ষ্মী, কপালে রাজভাগ্যি। আর একটু হ'লে মেয়েটাকে যে শেষ করে দিতো; বাছার কপালটা দেখতে দেখতে সুপুরির মত ফুলে উঠলো।" ইত্যাদি।

মা ও দিদিরা 'ষাট সোনা' করে ঘেন্নাকে তুলে নিয়ে গেল। এক দিদি চুল মুছে দিতে লাগলো, অন্য দিদি গায়ের কাদামাটি ধুতে বসে গেল। কপালের সুপুরিটির জন্যে একজন ছুটলো চুণ হলুদ গরম করতে।

কিন্তু কেউ ভ্রূক্ষেপ করলো না আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃতা এক অবলা জীবের প্রতি। রাজু তখনো তেমনি পথের মাঝখানে দুই হাতে শক্ত করে গামলা চেপে ধরে ভয়ে থর থর করে কাঁপছিলো। সে যে কি করবে—কোথায় যাবে—তা যেন ঠাহর করতে পারছিল না।

সকলে সরে গেলে কুড়ানীর মা কাছে এসে চুপে চুপে ডাকলে, "বৌমা চলো রান্নাঘরে যাই। [illegible] পড়ে যেয়ো না। পা টিপে টিপে চলো। কি আদিখ্যেতা মা; দেখে বাঁচিনে; মেয়ে নাকাতে নাকাতে এসে শুতো দেলে। তাতে দোষ হল নি; যত দোষ পরের মেয়ের।"

কুড়ানীর মা দাসী হলেও তার হৃদয়ে মমতার অভাব ছিল না। মেয়ের বয়েসী মেয়েটিকে সে প্রাণভরে ভালবাসতো। দোষত্রুটি ঢেকে রাখতো আরো ভাল লাগতো তার রাজুর মুখে 'কুড়ানীর মা' শুনে।

রান্নাঘরে ঢুকে গামলা নামিয়ে রাজু মুখের কাপড় তুলতেই কুড়ানীর মা আর্ত্তনাদ করে উঠলো, "তোমার থুতনি বেয়ে রক্ত যে পড়ছে বৌমা, পাতলা গামলার কানায় কেটে গেচে। আমি ওদের ডেকে আনি, ওষুদ-বিষুদ লাগিয়ে দিক।"

যা ঘটে গেছে তারই লজ্জায় রাজু মরমে মরে রয়েছে; তার পরে আবার কাটাছেঁড়ার ব্যাপার নিয়ে সে আর তার লাঞ্ছনার সীমা বাড়াতে চায় না।

সে সবেগে ঘাড় নেড়ে মিনতি করতে লাগলো, "না কুড়ানীর মা, তোমার পায়ে পড়ি তুমি কারুকে কিছু বলো না। আমার তেমন লাগে নি, জলে ধুলে এখুনি সেরে যাবে! ওরা জানতে পারলে আরো কত বকবে আমাকে।"

ব্রাহ্মণ কন্যার পায়ে ধরার উল্লেখে কুড়ানীর মা জিভ কেটে রাজুর উদ্দেশে ঢিব ঢিব করে মেঝেয় বার কতক মাথা ঠেকালো। তারপর সখেদে বলতে লাগলো, "তুমি একি করলে বৌমা, এমনি ধারার কথা কইলে আমার যে পাপ হয়। তুমি এবার একটুখানি স্থির হয়ে বোসো দেকি, আমি বাগান থেকে দু'টো গাঁদাফুলের পাতা নিয়ে আসি গাঁদাপাতার রস দিলে ব্যাথা বিষ একদণ্ডে নরম হবে।"

কুড়ানীর মা গাঁদার পাতার সন্ধানে বের হওয়া মাত্র রাজু বাঁ হাতের তেলোয় চিবুক চেপে ধরে দ্বারের দিকে অগ্রসর হ'ল। কেউ কোথাও নেই। ঘেন্নাকে নিয়ে তখনো সকলে ঘরের ভিতরে জটলা করছে। মধ্যাহ্নে ক্ষণকাল বিরতি দিয়ে আবার বৃষ্টি ঝরছে ঝরঝর করে। ভেজা কাক ছাতে বসে কর্কশ স্বরে বিলাপ করছে।

রাজু সভয়ে তার শয়নগৃহের দিকে চোখমেলে চেয়ে রইলো। বৃষ্টির ছাটের জন্য দরজা জানালা অধিকাংশ বন্ধ। দুই একটা যা খোলা রয়েছে তা দিয়ে ছায়ান্ধকার ঘরের ভিতর ভালো দেখা যায় না। তবু রাজুর মনে হ'ল কে-যেন জানালার পাশ থেকে সরে গেল। আবার বোধ

হ'ল একটি আবছা মূর্ত্তি কোণের আয়নায় টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ছোট মেয়ের পরিচর্য্যা সেরে-তাকে শান্ত করে গৃহিণী যখন বধূকে নিয়ে খেতে বসলেন তখন বেলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। মেঘান্ধকারের সঙ্গে সন্ধ্যার অন্ধকার গলাগলি ধরে মিতালি পাতাচ্ছে।

আহারান্তে কর্ম্মরথের ক্ষণিক মন্থর গতির ফাঁকে রাজু কোন দিকে দৃকপাত না করে ছুটে গেল তার শোবার ঘরে।

ঘর শূন্য, সেখানে কেউ নেই। খাটের বিছানা ঈষৎ কুঞ্চিত। পাপোষের পাশে কাদার অস্পষ্ট চরণ চিহ্ন। চটিজুতো কটর-কটর করে কেউ যে অভিসারে আসে না, সেটা হৃদয়ঙ্গম করতে রাজুর বিলম্ব হ'ল না। কিন্তু যে এসেছিল তার অঙ্গের সৌরভে সারাটি ঘর ভরে রয়েছে। এমন তীব্র মধুর সুবাস সে কেমন করে রেখে গিয়েছে।

রাজু সরে গেল শিয়রের আয়নার টেবিলের কাছে। আম্মার বিয়ের সম্বন্ধ আসছে বলে সে নিত্যনৈমিত্তিক স্নানান্তে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একবাটি চন্দন সর্ব্বাঙ্গে মেখে থাকে। আজও মেখেছে; চন্দনের শূন্য বাটি পড়ে রয়েছে। কিন্তু চন্দনের স্নিগ্ধ কোমল গন্ধের সঙ্গে এ উগ্র গন্ধের মিল নেই।

টেবিলের টানা টানতেই রাজুর চোখে পড়লো সেখানে রয়েছে কয়েকটা অর্দ্ধপক্ক পেয়ারা। আর কিছু নেই।

কিন্তু আয়নার পেছনে কলাপাতায় লুকানো রয়েছে ও কি?

সন্তর্পণে কলারপাতা হাতে নিয়ে খুলতেই তার ভেতর হ'তে বের হ'লো, কয়েকটা কেয়াফুল।

ফুলগুলো বুকের সামনে ধরে রাজু অনিমেষে সেদিকে চেয়ে রইলো।

অশেষ লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও চিবুকের যন্ত্রণায় এতক্ষণ যে অশ্রুজল জমাট তুষারের মতো হয়ে গিয়েছিল, কিসের উত্তাপে দুই গাল বেয়ে তাই পড়তে লাগলো ঝরঝর করে।

বালিকার আকুল অশ্রু দিবাভিসার ব্যর্থের জন্যে না সহসা স্মরণপথে ভেসে আসা মা'র করুণমাখা মুখ মনে পড়ায়—অথবা চিরসাথী ছোট বোন শৈলিকে মনে পড়ায়। তা কে জানে?

বিষাক্ত বায়ুতে দেখি ভরেছে সীমানা—

প্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত এম্‌-এ

কলুষিত কালো পাতে
আঁকা হ'লো নাম
ইতিহাসে চিহ্ন আঁকিলাম।
ধ্বংস, হত্যা, অনাচার
হীনতারে করেছে অক্ষয়—
জীবনের পরিধিতে
নীচতার ঘৃণিত প্রশ্রয়!
প্রীতি নেই, প্রেম নেই,
কালো মেঘে
ছেয়েছে আকাশ,—
ভুলে গেছি
পাশা পাশি
একদিন করেছিনু বাস।

এই নদী, এই মাটি,
তোমার আমার ছিল দেশ—
তখনো তো জাগেনি বিদ্বেষ!
মুক্তিকামী
তুমি আমি
একই রঙে দেখেছি স্বপন—
মৃত্যু বীজ করিনি বপন।
আজ দেখি নদী বয়ে যায়—
তুমি আমি দাঁড়িয়েছি
দুই কিনারায়!
তোমার আমার মাঝে
হিংসা দ্বেষ দিয়ে যায় হানা,—
বিষাক্ত বায়ুতে দেখি ভরেছে সীমানা।

কাশ্মীর



শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ই প্রথম প্রকাশ্য প্রজা-বিদ্রোহ ও রাজদ্রোহিতা করা হয় এই জুম্মা
জিদে। অবশ্য এই সময় মহারাজ হরিসিং লণ্ডনে ছিলেন। গোল-
বিল বৈঠক থেকে ফিরে এসে তিনি এক বিবৃতিতে প্রজাদের শান্ত করার
ষ্টা করেন; কিন্তু তখন কাশ্মীরের রাজনৈতিক প্রবাহ চোলেছিল
ম্প্রদায়িক খাতে। তাঁর বক্তৃতায় কোন ফল হোল না, বরং ক্রমে
ান্দোলন বাড়তে লাগলো। এমনি এক জনসভায় আব্দুল কাদের নামে
ক পাঠান যুবক হিন্দু রাজশক্তির বিরুদ্ধে তীব্র সাম্প্রদায়িক ভাষায়
ারালো বক্তৃতা করায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং জনসাধারণের
ত্তেজনা এড়ানর জন্যে সেণ্ট্রাল জেলে গোপনে তাঁর বিচারের ব্যবস্থা হয়,



অমরনাথের পথে

নতা কিন্তু বিচারের তারিখ জানতে পারে এবং জেল আক্রমণ করে।
াদের কয়েকজন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হোলে বিক্ষোভ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ
রে এবং উত্তেজিত জনতা টেলিফোন লাইন কেটে দেয়, পুলিস ব্যারাকে
াগুন ধরিয়ে দেয় এবং বন্দী নেতাদের মুক্তির জন্য জেল ভাঙার চেষ্টা
রে। পুলিস বাধ্য হোয়ে গুলি চালায়, ফলে ২১ জন প্রাণ হারায়।
কাশ্মীরে প্রকাশ্য গণবিদ্রোহের এই হোল সূত্রপাত।

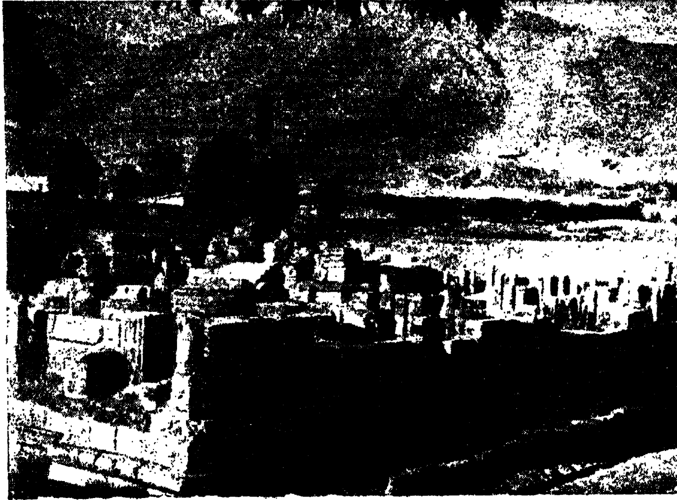
শ্রীনগরকে দেখতে হোলে যেমন বিতস্তার দুই তীরবর্তী সহরের
ভিতরের বিভিন্ন অংশ দেখা দরকার, তেমনি দেখা তার বিতস্তার বুকে
শীকারায় চড়ে তার দুই তীরের দৃশ্য। বিতস্তা নদীর জল-প্রবাহ
শ্রীনগরের ব্যবসা বাণিজ্যের মূল ধমনীস্বরূপ। ডাল হ্রদের স্বতঃ-
উৎসারিত জলরাশি ডাল দরজায় কাঠের ফটক দিয়ে বন্ধ রাখা হয় তার
অপচয় নিবারণের জন্যে। ডালের জল একটী খালে প্রবাহিত কোরে
তাকে ক্রমশঃ সংকীর্ণ কোরে সেখানে দু'টী কাঠের কটক করা হোয়েছে,
এঁর নাম ডাল দরজা। প্রথম দরজা খুললে ডালের জল তার মধ্যে ঢুকে



সোনামার্গের তুষারমণ্ডিত রুক্ষ ধূসর পর্বতমালা

দ্বিতীয় দরজা পর্য্যন্ত যায়, সঙ্গে সঙ্গে সেখানের জলের উচ্চতা প্রায় ৪।৫
ফিট বেড়ে যায়; জলের সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষমান শীকারা ও নৌকাগুলি
ও কটকের মধ্যে ঢোকে। তারপর প্রথম দরজা বন্ধ কোরে ডালের জল
আটকে রেখে, দ্বিতীয় দরজা খোলা হয় ধীরে ধীরে, জল বেশ খানিকটা

কমে ক্রমে "মার নালার" জলের সঙ্গে সমান হোলে ভেতরের নৌকা ও সীকারাগুলি যাবার জন্ম ফটক পুরো খুলে দেওয়া হয়। এইভাবে সারা-



অবন্তীপুরার ধ্বংসাবশেষের একাংশ

দিনই কিছুক্ষণ পর পরই ডালের জলকে এবং সেই সঙ্গে মার নালা ও বিতস্তার জলকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়, বিতস্তার জলকে আরও নিয়ন্ত্রণ করা হয় সপ্তম সেতুর পর মহারাজ প্রতাপসিংহ নির্ম্মিত ছত্তাবল বাঁধ দ্বারা। ১৯১৬ সালে নির্ম্মিত এই লোহার বাঁধটী বিতস্তার সমস্ত পরিসর জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। লোহার ফাঁকে মোটা কাঠের তক্তা দিয়ে জলের উচ্চতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সহরের ব্যবসায়ের প্রয়োজন মত জল নদীতে এই-ভাবে রাখা হয়, বাকী জল বাঁধের ওপর দিয়ে ছোট জলপ্রপাতের আকারে বয়ে যায়। বর্ষায় প্লাবনে বিতস্তার জল যাতে সমতল শস্য ক্ষেত্রের ক্ষতি না কোরতে পারে, এজন্যে উদ্বৃত্ত জল বার কোরে দেবার জন্য একটা বড় খালও আছে। সহরের দুই অংশের যোগাযোগ রাখবার জন্যে এখন বিতস্তা নদীর বুকে আছে সাতটী সেতু। এর এক একটী এক এক রাজার আমলে তাঁদের নামে বা তৎকালীন কোন জনপ্রিয় ব্যক্তির নামে তৈরী হোয়েছে। এদের নাম যথাক্রমে :—

১। আমীরা কদল—তৈরী করান আমীর খাঁ (১৭৭৩ খৃঃ অঃ) বর্ত্তমানে চলতি নাম "মীরা কদল"

২। হাব্বা কদল। তৈরী করান ইয়াকুব খান (১৫৫০ খৃঃ অঃ কেউ কেউ বলেন হব্বি সা) চলতি নাম 'হাবা' বা হাওয়া কদল

৩। ফতে কদল—তৈরী করান 'ফতে সা' (১৪৯৯ খৃঃ অঃ)

৪। জৈন কদল—তৈরী করান জৈন-উল-আবদীন (১৪২৬ খৃঃ অঃ) চলতি নাম জেন্না কদল

৫। আলি কদল—তৈরী করান আলি সা (১৪২৬ খৃঃ অঃ)

৬। নাওয়া কদল—তৈরী করান নূর-দীন-খান' (১৬৬৭ খৃঃ অঃ)

৭। সাফা কদল—তৈরী করান সয়েক-উদ্দীন খাঁন (১৬৭০ খৃঃ অঃ)

এই 'কদল' বা সেতুগুলির নির্ম্মাণ তারিখ থেকে শ্রীনগরের প্রথম অবস্থান ও ক্রমপ্রসারের ধারার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিতস্তা থেকে ডাল হ্রদে যেতে গেলে 'মার নালা' হোয়ে বিখ্যাত চীনার রূপের হাউস কোর্টের সারি পেরিয়ে ডাল দরজা দিয়ে যেতে হয়। ডাল দরজার পর আবার দুটো খাল ভিন্নমুখী হোয়ে গিয়ে ডালের বড় অংশে গিয়ে পড়েছে। তীরের কাছাকাছি ডাল হ্রদ, অগভীর, ডালের গভীরতা ৮ থেকে ২০ ফিট ; গ্রীষ্মে ও শীতে তা আরো কমে যায়। জলের ভেতর একরকম শৈবাল জাতীয় গাছ হয়—তার মূল হ্রদের তলার মাটীতে থাকে না, জলে ভাসে, এগুলি এত ঘন যে এর ওপর মাটী ফেলে ছোট ছোট শস্যক্ষেত্র তৈরী করা হয়। তরমুজ, বিলাতীবেগুন প্রভৃতি, নানা ফসল ফলে এই বাগানে। এমনি ভাসা বাগানগুলিকে চারদিকে দড়ি বেঁধে প্রয়োজন মত স্থানান্তরিত করা যায়। এই অস্থাবর স্থাবর সম্পত্তিগুলি সেজন্য মাঝে মাঝে চুরি যায়, সুন্দর ফলন্ত বাগানটী সকালে দেখা গেল চুরি গেছে—আর জায়গা নড় চড় হোলে এদের সনাক্ত করাও কঠিন—কাজেই ফসলের সময় মাঝে মাঝে জলের ওপর মাচা বেঁধে কৃষকেরা

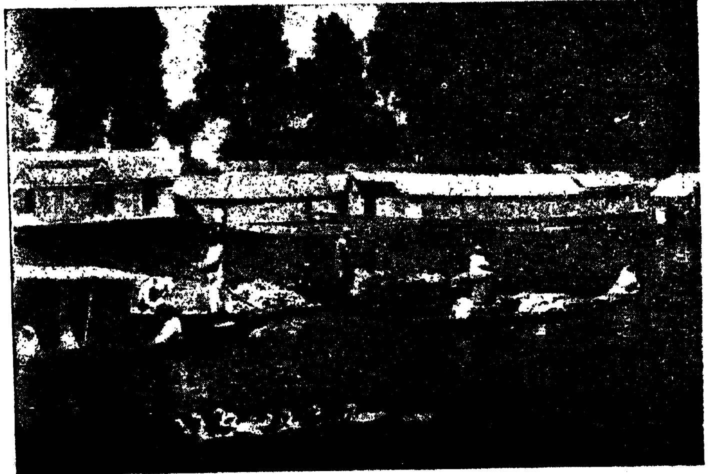


কিশোর মাঝি

সজাগ থেকে এই ভাসমান বাগানগুলি পাহারা দেয়। ডাল হ্রদটী উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৫ মাইল লম্বা, পূর্ব্ব পশ্চিমে চওড়া প্রায় আড়াই

ল। শ্রীনগরকে অনেকে ইউরোপের ভেনিসের সঙ্গে উপমা দেন জলপথের জন্যে। এ উপমা বাহুল্য নয়, বাস্তব। শ্রীনগরের পথের মূলধারা বিতস্তা ও তার কয়েকটা শাখা এবং ডাল হ্রদ ও অঙ্গীভূত বহু বিভক্ত জলপথ। আর এই পথের সবচেয়ে আরামপ্রদ, ীন ও দ্রুত মনে হোল সীকারা। দুজন মাঝখানে পাশাপাশি তে পারে এমনি চওড়া এই নৌকাগুলি ছাউনী দেওয়া। ছাউনীর রে চারধারে রঙ্গীন পর্দা, বোসবার আসনে স্প্রিংএর গদী, তা ার বর্ণাঢ্য বনাতে ঢাকা! এক, দুই বা তিনজন মাঝি ছোট দাঁড় দিয়ে এগুলি চালায়। মাঝির সংখ্যা ও সামর্থ্য হিসাবে এর । এগুলির নাম ট্যাক্সী সীকারা। ট্যাক্সী সীকারা বা যাত্রীবাহী কারাগুলিরও খুব জমকালো সব নাম আছে। তাদের মাথায় ফেয়ারী ন, ফ্লাইং কোর্টেন, মাই ডার্লিং, নূরজাহান, দিলখুস—এমন কি টমবয় পর্য্যন্ত। এদের সরকার-দিষ্ট ভাড়া প্রথম দু'ঘণ্টার জন্যে কারার ভাড়া।৵০ এবং প্রতি ঝির ॥৵০ হিসেবে, দু থেকে চার ার বেতন ৸০ হিসেবে। চার েক আট ঘণ্টায় মাঝি পিছু ৵০ হিসেবে অর্থাৎ ৪ থেকে ঘণ্টার জন্যে সীকারা ভাড়া লে দু'জন মাঝির নৌকায় গবে ১৸০ এবং সীকারা ভাড়া ০ মোট ৩৵০। সীকারায় াদ, নাসিম, নাগিন বা সালিমার গ—এদের যে কোনটায় গেলে তে হবে সীকারার জন্যে ৸০ ও ঝির জন্যে ১।৵০ হিসেবে অর্থাৎ ০। কিন্তু দাম দর কোরলে ৫৲ টাকায় প্রায় সমস্ত ডাল চক্কর দিয়ে নিসাদ, সালিমার দেখিয়ে আনে, পথে দূর থেকে নাসিম নাগিন বাগও দেখা যায়। এদেশের লোকের নিজেদের দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য যে সীকারা—তার সাজসজ্জা নাই, সাধাসিধে নৌকা, তেই জলের এপার ওপার কোরছে হয়ত কোন ৪।৫ বছরের বাচ্ছা লে, দাঁড়টা তার চাইতে বড়, কেউবা একটা লোহার কি এলুমিনিয়মের লা দিয়েই জল ঠেলছে। একখানা সীকারা নিয়ে শ্রীনগরের পূর্বধারে বাগের কাছ থেকে সহর দেখতে সুরু করা ভাল; এতে সীকারা ণের আনন্দ ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়, জল থেকে সহরের কটা ভিন্ন রূপ চোখে পড়ে এবং নদীর আশে পাশে প্রধান ও য়োজনীয় দ্রষ্টব্যগুলি সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়। আমরা অবশ্য কারায় ডালগেট দিয়ে মারসালা হোয়ে ঝেলাম বা বিতস্তায় চড়ে দিম সপ্তম সেতু এবং 'ছত্রাবল' বাঁধ পর্য্যন্ত গিয়েছিলাম, অভিন্ন ভিন্নমুখে মুন্সীবাগ পর্য্যন্ত গিয়েছিলাম। পাঠক এবং পর্য্যটকদের সুবিধার জন্য মুন্সীবাগ থেকে যাত্রা কোরলে কোন কোন প্রধান দ্রষ্টব্য কোন দিকে পোড়বে তা মোটামুটি বোলছি :—

বিতস্তার দক্ষিণে পোড়বে এই সব জায়গা—অমর সিং ক্লাব, ষ্টেট গেষ্ট হাউস, চার্চ্চ, শ্রীনগর ক্লাব, কাশ্মীর সরকারী এম্পোরিয়াম, ভিজিটারস ব্যুরো, জেনারেল পোষ্ট অফিস, পোষ্ট অফিসের পেছনে বাঁধের নীচের রেসিডেন্সী রাস্তায় রেডিও ষ্টেসন, সের-ই-কাশ্মীর পার্ক (সেখ আবদুল্লার নামে), তার ওপারে পোলো খেলার মাঠের ওপারে চীনার বাগানের ধারে সাহেবী হোটেল "নিডোজ", বাঁধের ওপর ঝেলামের তীরে লয়েড্স্ ব্যাঙ্ক, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, হাইকোর্ট, জেলা কোর্ট, এবং বাঁধের ওপরের দোকানসমূহ। তারপর আমীরা কদলের পর ডাইনে পড়ে নাগরিকদের কাঠ ও ইটের তৈরী বাসভবন, মারসালা,



বাজারের পথে পণ্যবাহী সাধারণ নৌগৃহ

বসন্তবাগ, বৈদ্যুতিক কারখানা, তারপর হাব্বা কদল, বা দ্বিতীয় পুল। হাব্বা কদল থেকে ফতে কদলে পর্য্যন্ত লোকজনের বাসগৃহ, ফতে কদলের পর সা হামদান মসজিদ ও তার পাদমূলে মহাকালীর মন্দির। ফতে কদল পেরিয়ে মহারাজগঞ্জ দুধারে নাগরিকদের ঘরবাড়ী।

বিতস্তার বাঁদিকে পড়বে :—তীরে বাঁধা হাউসবোট শ্রেণী (সহরের সান্নিধ্যের এবং রৌদ্রের প্রাচুর্য্যের জন্য শীতের আমেজ যখন থাকে তখন এখানের নৌকাগুলি বেশী আরামপ্রদ) কনভেন্ট কলেজ, একটা বড় মাঠ পেরিয়ে সরকারী রেশম কারখানা (বাইরের লোককে দেখতে দেওয়া হয়)। লালমণ্ডির যাদুঘর এবং তৎসংলগ্ন প্রতাপসিংহ সাধারণ গ্রন্থাগার, যন্ত্রমন্দির (observatory) জম্মু কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়, তারপর আমীরা কদল।

আমীরা কদল পেরিয়ে বাঁয়ে 'শেরগড়' প্রাসাদ, আইনসভা,

গদাধরের স্বর্ণ মন্দির। একটু ভেতরে প্রাসাদের পেছনে গান্ধী পার্ক, উসমান পার্ক, সরকারী মাঠ, খাদ্য নিয়ন্ত্রণ দপ্তর।

হাবা কদল পেরিয়ে বাঁয়ে পড়ে করণনগর, সরকারী হাঁসপাতাল, সরকারী পশম মিল। ফতে কদলের পর নূরজাহান নির্ম্মিত 'পাথর মসজিদ', তারপর নাগরিকদের বসতি। সপ্তম সেতুর পর বিতস্তার অনতিদূরে নগরের শুল্ক বিভাগের একটী দপ্তর। নগরের প্রবেশ পথে এখানে মালপত্র পরীক্ষা করা হয় ও শুল্ক আদায় করা হয়।

ঝেলাম থেকে ডাইনে 'মার নালায়' ঢুকলেও দু'ধারে বসতি, মন্দির,



ডালের একটি প্রান্তে

কাঠগোলা, হাউসবোট চোখে পড়ে, তারপর ডাল দরজা পেরিয়ে সোজা গেলে শীকারা গিয়ে পড়বে ডালের গাগরী বলে বা মূল ডাল হ্রদে; ডাল দরজা পেরিয়ে—বাঁয়ে বেঁকলে ছোট ছোট গ্রাম ক্ষেত ও গণ্ডগ্রাম রাণা-ওয়াড়ী পেরিয়ে ডালের অপর অংশে এসে পোড়বেন। সহরের দ্রষ্টব্যের মধ্যে এম্পোরিয়ামটি বর্ত্তমান সরকার স্থাপন কোরেছেন দেশের ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধির জন্যে। বিদেশীয়া কাশ্মীরের সমস্ত শিল্পগুলিকে একত্রে দেখতে পাবে এবং আসল জিনিষ একটা বাঁধা দামে পাবে, এই হোল এর উদ্দেশ্য। কাশ্মীরে যাত্রীদের যাওয়ার সাহায্য করা এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্য করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। জম্মু, দেরাদুন, সিমলা, নূতন দিল্লী, কোলকাতা, অমৃতসহর, বোম্বাই, মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ সহরে এর শাখা খোলা হোয়েছে। বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের ওপর বিরাট সৌধ কিছুদিন পূর্ব্বেও যা ছিল প্রবল প্রতাপ ইংরেজ রেসিডেন্টের বাসগৃহ, আজ তাই রূপান্তরিত হোয়েছে এম্পোরিয়ামে। বাড়ীটীর দরজার, ছাদের কাঠের কাজ দেখবার মত। প্রাঙ্গণের মধ্যেই একদিকে কারিগরেরা কাজ কোরছে। শাল, কার্পেট, নামদা, গাব্বা, পশু লোমের পোষাক প্রভৃতি পশমী জিনিষ, বিছানার চাদর, পর্দ্দা প্রভৃতি রেশমী জিনিষ, চমৎকার কাজ করা রূপার ও তামার জিনিষ, আখরোট কাঠের আসবাব পত্র, কাগজের মণ্ড থেকে তৈরী বিচিত্র বর্ণশোভিত নানা ছোট বড় জিনিষ (papier machie) উইলো গাছের তৈরী বিভিন্ন ধরণের বাক্স, সাজি প্রভৃতি কাশ্মীরের নিজস্ব শিল্প। শালের কাপড় কিছু বিদেশ থেকে আসে বা কলে তৈরী হয়, বাকী সবই কুটীর শিল্প। কাশ্মীরী শালের খ্যাতি বহুকাল থেকে বিশ্ববিদিত। রোম, পারস্য, ফরাসী প্রভৃতি সেকালের সৌখীন দেশ কাশ্মীরী শাল ব্যবহার কোরে গর্ব অনুভব কোরত। নেপোলিয়ান নীলবিজয়ের পর এই প্রাসাদোপম অট্টালিকা থেকে শ্রীনগরের প্রধান ব্যবসা-কেন্দ্র আমীরা কদলের সংলগ্ন 'সালচক' পর্য্যন্ত একটা প্রিয়তমা জোসেফিনের জন্য যৌতুক নিয়ে যান একখানা কাশ্মীরী শাল। জৈন-উল-আবদীনের সময়েই শাল শিল্পেরও প্রভূত উন্নতি হয়; কেউ কেউ বলেন তিনিই নাকি এর প্রথম প্রবর্ত্তক। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে এত বেশী শাল ইউরোপে রপ্তানী হোত যে ফরাসী সরকার এখানে শাল কেনা ও পরীক্ষার জন্যে একজন কর্ম্মচারী রাখতেন। যুদ্ধের পর রপ্তানী প্রায় বন্ধ হোয়ে যায় এবং তারপর আসে বিশ্বমন্দা। সম্প্রতি ধীরে ধীরে শাল শিল্প আবার প্রসার লাভ কোরছে। ইদানীং সোনা ও রূপার জরির পাড় দিয়ে এক নতুন ফ্যাশন সৃষ্টি করা হোচ্ছে। শালের জমি ও কাজের ওপর দাম নির্ভর করে। ২০৲ টাকা থেকে ২০০০৲ টাকা বা ততোধিক দামের শাল পাওয়া যায়। কলের তৈরী জমির কাপড়কে এরা বলে র‍্যাকেল—এগুলি সস্তা। পশমিনা তৈরী হয় তিব্বতের এক জানোয়ারের লোম থেকে। এগুলি সাধারণতঃ চরকা ও তাঁতে তৈরী; তাই নরম, গরম, হাল্কা অথচ দামী। সরকারী এম্পোরিয়ামে একখানা কার্পেট বোনা হোচ্ছে দেখলাম ছত্রিশটা রং মিলিয়ে। এটী তৈরী কোরতে প্রায় ছ'মাস লাগবে, তিন চারজন কারিগর অবিরাম কাজ কোরছে। বাজারে বিক্রী কোরলে নাকি ১৫।১৬ হাজার টাকা দাম হবে। শুনলাম এটী উপহার দেওয়া হবে পণ্ডিত নেহেরুকে। এর পূর্ব্বে নাকি এতগুলি রংএর সমন্বয়ে কোন কার্পেট তৈরী হয় নাই।



ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "শরৎ-পরিচয়"

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

গত চৈত্র মাসের ভারতবর্ষে "রেঙ্গুনে রবীন্দ্র-সংবর্ধনার মানপত্রটি কি শরৎচন্দ্রের রচিত?" নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। সেই প্রবন্ধে আমার বক্তব্য ছিল এই—রবীন্দ্রনাথ জাপান হ'য়ে আমেরিকা যাওয়ার পথে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে তারিখে রেঙ্গুনে গেলে সেখানকার প্রবাসী বাঙ্গালীরা স্থানীয় জুবিলী হ'লে তাঁকে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন। সংবর্ধনা সভায় রবীন্দ্রনাথকে যে মানপত্রটি দেওয়া হয়েছিল, সেটি শরৎচন্দ্রের রচনা এবং শরৎচন্দ্র নিজেও সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন—একথা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখে গেছেন। এরই বিরুদ্ধে আমি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি যে, শরৎচন্দ্র সে সভায় উপস্থিত ছিলেন না এবং মানপত্রটিও তাঁর রচনা নয়। আমার প্রধান যুক্তি এই যে, রবীন্দ্রনাথ রেঙ্গুনে যাওয়ার কিছুদিন আগেই শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন ত্যাগ করে দেশে চলে এসেছিলেন। আমার এ কথার সমর্থনে আমি শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুন-ত্যাগের আগের ও পরের চিঠিপত্রাদি উদ্ধৃত করে দেখিয়েছি। আমার এই প্রধান যুক্তিটি ছাড়া রেঙ্গুনের রবীন্দ্র-সংবর্ধনার মানপত্রটি উদ্ধৃত করেও বলেছি যে, ভাষার দিক থেকে দেখলেও এটি শরৎচন্দ্রের রচনা বলে মনে হয় না।

গত বৈশাখের "শনিবারের চিঠি"তে দেখলাম, আমার এই লেখার জন্য শ্রদ্ধেয় শ্রীসজনীকান্ত দাস মহাশয় আমাকে আক্রমণ করেছেন। সজনীবাবু আমার প্রধান যুক্তির ধার দিয়ে না গিয়ে, তিনি শুধু মানপত্রের ভাষার উল্লেখ ক'রে বলেছেন, ওর মধ্যে অশরৎচন্দ্রীয় এমন কিছু তিনি টের পান নি।

মানপত্রের ভাষার বিরুদ্ধে আমার যুক্তি ছিল—শরৎচন্দ্রের ভাষার মধ্যে যে মিষ্টতা,সরলতা ও সহজ-বোধ্য ভাব আছে,এতে তা নেই। তাছাড়া মানপত্রের ঐ অল্প একটু মাত্র পরিসরের মধ্যে অসংখ্যবার 'নব নব', ৭ বার 'আনন্দ', ৬ বার 'হৃদয়' ও একাধিকবার 'নিখিল', 'কাব্যবীণা', 'আলোক' প্রভৃতি আছে বলেও বলেছিলাম, শরৎচন্দ্রের কি বাল্যরচনা, আর কি পরিণত বয়সের রচনা—কোথাও তিনি এত অল্প পরিসরের মধ্যে একই শব্দের এত বেশি পুনর্ব্যবহার করেন নি। এই মানপত্রের মধ্যে একটি শব্দ আমার বড় চোখে ঠেকছে। সে শব্দটি হ'ল—"পরিস্পন্দিত"। শরৎচন্দ্রের রচনার মধ্যে কোথাও এই "পরিস্পন্দিত" শব্দের ব্যবহার দেখেছি বলে ত মনে পড়ছে না।

রেঙ্গুনের মানপত্রটি যে শরৎচন্দ্রের রচনা নয়, নানাভাবে আমি প্রমাণ করবার চেষ্টা করলেও,সজনীবাবু কিন্তু আমার কোনও যুক্তি খণ্ডন না করেই শুধু বলেছেন, এটি শরৎচন্দ্রের রচনা।

সজনীবাবু আর একটি কথা বলেছেন, আমার মত একজন তরুণের পক্ষে প্রবীণ ব্রজেনবাবুর ভুল দেখাতে যাওয়া উচিত হয় নি।

ব্রজেনবাবু তাঁর গবেষণামূলক কাজের জন্য বাঙ্গলা সাহিত্য-জগতে সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র। সেই হিসাবে তিনি আমারও অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়। কিন্তু তবুও তাঁর গবেষণা বা আবিষ্কারের মধ্যে কোথাও যদি কিছু ভুল হয়েছে বলে মনে করে থাকি, তা হলে সে সম্বন্ধে আলোচনা করবার অধিকার হয়ত আমার আছে।

ব্রজেনবাবুর শরৎ-সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়েই যখন কথা উঠেছে, তখন সজনীবাবুর প্রকাশিত এবং ব্রজেনবাবুর লিখিত "শরৎ-পরিচয়" গ্রন্থটি নিয়েই এখানে কিছু আলোচনা করি।

"শরৎ-পরিচয়" শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য-সংক্রান্ত একখানি ছোট বই। বইখানি যে ভাল, সে বিষয়ে কারও কোন সন্দেহ নাই। বিশেষ করে বইখানির "রচনাবলী" অধ্যায়ে শরৎচন্দ্রের কোন্ লেখা কবে কোন্ কাগজে প্রকাশিত হয়েছে, ব্রজেনবাবু অসাধারণ পরিশ্রম করে তার তালিকা প্রস্তুত করেছেন। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে গেলে বইখানির একান্ত প্রয়োজন।

এই বইয়ের দুএক জায়গায় ভুল আছে বলে আমার মনে হয়। অবশ্য যাঁরা গবেষণামূলক কাজ করেন, দু'এক ক্ষেত্রে তাঁদের ভুল হয়ে যাওয়া হয়ত স্বাভাবিক। তাই ব্রজেনবাবুকে কোনরূপ খাটো করবার মতলব না করে, যেগুলিকে আমি ভুল বলে ভেবেছি, এখানে শুধু তারই আলোচনা করছি।

"শরৎ-পরিচয়" গ্রন্থের ৪র্থ পৃষ্ঠায় ব্রজেনবাবু লিখেছেন—"প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শরৎচন্দ্র এফ, এ পড়িবার জন্য টি, এন, জুবিলী কলেজে প্রবিষ্ট হন। এই বৎসরই তাঁহার মাতা ভুবনমোহিনী দেবীর মৃত্যু হয় (নবেম্বর ১৮৯৫)। পর বৎসর টেস্ট পরীক্ষার কালে এমন একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিল, যাহার ফলে কলেজের কর্তৃপক্ষ শরৎচন্দ্রকে এফ, এ পরীক্ষা দিতে অনুমতি দেন নাই। ১৫৲ টাকা ফি সংগ্রহে অসমর্থ হইয়া তিনি পরীক্ষা দিতে পারেন নাই—এ কাহিনী ভিত্তিহীন।"

এই 'অপ্রীতিকর ঘটনাটি' কি এ সম্বন্ধে আমি একদিন ব্রজেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন—টেস্ট পরীক্ষার সময় পরীক্ষার হলে শরৎচন্দ্র যখন লুকিয়ে বই দেখে নকল করেছিলেন, তখন গার্ডের হাতে ধরা পড়ে যান। ফলে তাঁকে এফ, এ পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় নি।

পরীক্ষার হলে শরৎচন্দ্রের এই বই দেখে নকল করার মূলে যে তাঁর লেখাপড়া না করা, তারই সমর্থনে ব্রজেনবাবু লিখেছেন—"শরৎচন্দ্র লেখাপড়া অপেক্ষা বেশী মাতিয়া উঠিয়াছিলেন আমোদ-প্রমোদ, অভিনয় ও গান-বাজনায়। এই সময়ে তাঁহার দিন কি ভাবে কাটিতেছিল, সে

পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার তদানীন্তন প্রতিবেশী শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের রচনায় :—

'ভাগলপুরের খঞ্জরপুর মহল্লায় যখন শরৎচন্দ্রের পিতা তাঁহার তিনপুত্র এবং এক কন্যা লইয়া বাস করিতেন, তখন আমরা ছিলাম তাঁহাদের প্রতিবেশী। আমার অগ্রজ ৺রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন শরৎচন্দ্রের সহপাঠী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমি বলিতেছি ১৮৯৭ সালের কথা। শরৎচন্দ্র তখন সম্পূর্ণভাবে বেকার এবং সাংসারিক ব্যাপার হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত।' (পৃঃ ৪)

পরীক্ষা-হলে নকল করার বিষয় সম্বন্ধে পরে আলোচনা করব। এখন ব্রজেনবাবু যে বলেছেন "শরৎচন্দ্র লেখাপড়া অপেক্ষা বেশী মাতিয়া উঠিয়াছিলেন আমোদ-প্রমোদ, অভিনয় ও গান-বাজনায়" তারই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করছি—

ব্রজেনবাবুর হিসাব মতই কলেজে শরৎচন্দ্রের ছাত্রজীবন ছিল ১৮৯৫ ও ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ। এই সময় শরৎচন্দ্রের আমোদ-প্রমোদ, অভিনয় ও গান-বাজনায় দিন কেটেছিল বলে তিনি যতীনবাবুর রচনা উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু যতীনবাবু নিজেই ত বলেছেন—"আমি বলিতেছি ১৮৯৭ সালের কথা।" শরৎচন্দ্র এই সময় ছাত্রজীবন শেষ করে, সম্পূর্ণ বেকার। অতএব ব্রজেনবাবু তাঁর যুক্তির সমর্থনে যতীনবাবুর যে রচনা উদ্ধৃত করেছেন, তা এখানে অর্থহীন।

এ ত গেল। শরৎচন্দ্রের অধ্যয়নে যে অনুরাগ ছিল, এ কথা ক' পৃষ্ঠা পরেই ব্রজেনবাবু নিজেই আবার বলেছেন। ৭ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন—"মাতার মৃত্যুর পরে শরৎচন্দ্র যখন পিতার সহিত খঞ্জরপুরে বাস করিতেন, তখন নিরুপমা দেবী (বুড়ী) ও বিভূতিভূষণ ভট্টের (পুঁটু) সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ইঁহারা ছিলেন তাঁহার প্রতিবেশী। শরৎচন্দ্র তখন তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজের ছাত্র।...নির্ভীকতা, গল্পরচনায় দক্ষতা, অধ্যয়নানুরাগ ইত্যাদির জন্য সমবয়সীরা তখন শরৎচন্দ্রকে বিশেষ সমীহ করিয়া চলিতেন।"

এখানে দেখা যাচ্ছে, শরৎচন্দ্রের কলেজ জীবনে অধ্যয়নে অনুরাগ থাকার জন্য সমবয়সীরা তাঁকে সমীহ করছেন। এখানে কিন্তু আর লেখাপড়া অপেক্ষা আমোদ-প্রমোদ, অভিনয় ও গান-বাজনায় মেতে ওঠার কথা নাই। অতএব ব্রজেনবাবুর নিজের কথার মধ্যেই সঙ্গতি থাকছে না, পরস্পর-বিরোধী হয়ে যাচ্ছে।

কলেজে পড়ার সময় শরৎচন্দ্র কিরূপ গভীর ভাবে লেখাপড়া করতেন, সে সম্বন্ধে শ্রীনরেন্দ্র দেব তাঁর "শরৎচন্দ্র" গ্রন্থে লিখেছেন—

"মাতুলালয়ে অবস্থানকালে এফ, এ, পড়বার সময় শরৎচন্দ্রের উপর সে বাড়ীর ছেলেদের পড়াবার ভার অর্পিত হয়েছিল। ছেলেদের পড়িয়ে তবে নিজের পড়া। কাজেই শুতে তাঁর রোজই প্রায় রাত্রি একটা বেজে যেতো। সুতরাং সকালে উঠতেও বেলা হ'ত। এই বেলায় [illegible] অধিক রাত্রে শোওয়ার অভ্যাসটা শরৎচন্দ্রের পরবর্তী [illegible] সমান ভাবে বজায় ছিল।...

পড়াশুনায় শরৎচন্দ্রের একাগ্র অভিনিবেশ [illegible] তাঁর সম্পর্কীয় মাতুল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন—কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে বিজ্ঞান বিষয়ে পরীক্ষার পূর্ব দিন সন্ধ্যায় শরৎচন্দ্র তাঁর ছাত্রদের বলে গেলেন—কাল আমার পরীক্ষা, আমি পড়তে যাচ্ছি, আজ রাত্রে আর আমাকে তোমরা কেউ বিরক্ত করো না। যার যা পড়া জানবার আছে, কাল সকালে আমার কাছে গিয়ে জেনে এসো।

ঘরে আলো জ্বেলে মোটা মোটা বিজ্ঞানের বইগুলি নিয়ে দোর-জানালা বন্ধ করে পড়তে বসে গেলেন। তার পরদিন সকালে ছাত্রের দল দোর ঠেলে সে ঘরে গিয়ে দেখে তখনও আলো জ্বলছে, দরজা জানালা বন্ধ এবং শরৎচন্দ্র নিবিষ্ট মনে পড়ছেন। ছেলের দল ঘরে ঢুকতে তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন—এইমাত্র বারণ করে এলুম না, আজ রাত্রে তোমরা কেউ আমায় বিরক্ত কোরো না; আমি পড়াতে পারব না, তবু সব এলে কেন? ছাত্রের দল বিস্মিত হয়ে বললে—সে তো কাল রাত্রে কথা ছিল। আজ যে এখন সকাল হয়ে গেছে। শরৎচন্দ্র আসন ছেড়ে উঠে জানালা খুলে দিতেই ঘরের মধ্যে সকালের রৌদ্র এসে ছড়িয়ে পড়লো, তিনি ছেলেদের কাছে মনে মনে অপ্রতিভ হলেন।

সেবার কলেজে বিজ্ঞানের পরীক্ষাপত্রে শরৎচন্দ্রের উত্তর দেখে পরীক্ষক বিস্মিত হয়ে সন্দেহ করেছিলেন যে, এ ছেলেটি নিশ্চয়ই গোপনে বই দেখে টুকে লিখেছে। তিনি পুনরায় শরৎচন্দ্রকে সম্মুখে বসিয়ে নূতন প্রশ্ন দিয়ে পরীক্ষা করলেন। এবার শরৎচন্দ্র মুখেই তার উত্তরগুলি বলে দিয়ে পরীক্ষককে অধিকতর বিস্মিত করে দিলেন। তাঁর স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ। স্মৃতির এই প্রখরতা শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।"

উপরের এই উদ্ধৃতিটি থেকেও বেশ জানা যায় যে, শরৎচন্দ্র কলেজ-জীবনে মনোনিবেশ সহকারেই লেখাপড়া করতেন। অতএব ব্রজেনবাবুর পরীক্ষা হলে নকল করার সমর্থনে শরৎচন্দ্র লেখাপড়া অপেক্ষা আমোদ-প্রমোদ, অভিনয় ও গান-বাজনায় মেতে উঠেছিলেন, একথা সত্য বলে স্বীকার করতে পারি না।

এবার ব্রজেনবাবু যে বলেছেন—শরৎচন্দ্র টাকার অভাবে পরীক্ষা দিতে পারেন নি, একথা ভিত্তিহীন। আসলে ঐ 'অপ্রীতিকর ঘটনা' অর্থাৎ নকল করতে গিয়ে ধরা পড়ার ফলেই পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি পান নি—ব্রজেনবাবুর এই মত সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

শরৎচন্দ্র যে নকল করতে গিয়ে ধরা পড়েছিলেন, ব্রজেনবাবু কোথা থেকে একথা জানলেন, তাঁকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম। উত্তরে তিনি বলেছিলেন—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছ থেকে তিনি একথা জেনেছেন। অবশ্য উপেনবাবুও ১৩৫৭ সালের "শরৎ-স্মরণিকা"য় "শরৎচন্দ্রের ছোট মামা ও মামার বাড়ী" নামক প্রবন্ধে লিখেছেন—

"আমি যে আজ বিপ্রদাসের বিষয়ে কিছু লিখতে উদ্যত হয়েছি, তার কারণ মাত্র এই নয় যে, তিনি শরৎচন্দ্রের মাতুল ছিলেন; শরৎচন্দ্রের জীবনের একটা গুরুতর সঙ্কটকালে শরৎচন্দ্রকে তিনি [illegible] রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন, তার অভাব ঘটলে শরৎচন্দ্রের [illegible]

তার উবরক্ষেত্রে প্রবেশ করতেও পারত, প্রধানত এই কথাটাই আমি বাঙলা দেশের পাঠক সম্প্রদায়কে জানাতে ইচ্ছা করি।

যে সঙ্কটকালের কথা আমি উল্লেখ করছি, তার বিস্তৃতি শরৎচন্দ্রের ন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার দুই বৎসর পূর্ব হ'তে দুই বৎসর পর মোটামুটি চার বৎসর কাল।......

যে সঙ্কটকালের কথা বলছি, সে সময়ে শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলাল পাধ্যায় স্বাস্থ্যহীনতা এবং উপার্জনহীনতার জন্য ছিলেন নিরুপায়, শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ আত্মীয় স্বজন ছিলেন ভাগলপুর হইতে নানা তীস্থানে কার্যোপলক্ষে নিযুক্ত। সর্বোপরি ছিল সকল প্রকার বন্ধন ছিন্ন করে নৈষ্কর্মের পথে-ঘাটে-মাঠে ঘুরে বেড়াবার শরৎচন্দ্রের র প্রকৃতি। সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বিপ্রদাস গঙ্গোপাধ্যায়ের অভি-কোচিত কর্তব্যবোধের গুণে শরৎচন্দ্রকে সে সময়ে লেখা পড়ার র্মোচ্য কীলকে আবদ্ধ থাকতে হয়েছিল।

ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষায় উপস্থিত হবার ঠিক পূর্বে কি অবস্থায় এই লক উৎপাটিত হয়ে যায়, সে কথা এখানে অবান্তর। তবে তৎপ্রসঙ্গে এইটুকু বলা যেতে পারে যে, তৎকালীন এফ. এ. পরীক্ষার বশমূল্য মাত্র পনেরটি টাকা জোগাড় না হতে পারার দরুণ শরৎচন্দ্র র্স্ট আর্টস পরীক্ষা দিতে পারেন নি, এই মর্মে যে কাহিনী প্রচলিত ছে, তা আদৌ সত্য নয়। এমন কি, সেই কাহিনীর সৃষ্টি যত বড় কের দ্বারাই হয়ে থাকুক না কেন, তথাপি সত্য নয়। যে ব্যক্তি বৎসর ধরে কলেজের ফি এবং পাঠ্যপুস্তকের মূল্য জুগিয়ে শরৎচন্দ্রকে র্স্ট আর্টস পড়িয়েছিলেন, তিনি যে-কোন ব্যক্তিই হোন্ না কেন, মাত্র নরটি মুদ্রা ব্যয় করে শরৎচন্দ্রকে পড়ানোর ব্যয়ভার হতে নিষ্কৃতি ভ করা, অন্তত অর্থের দিক দিয়ে, তাঁর পক্ষে অধিকতর লাভজনক ন। তখনকার দিনে ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে হারে বাঙালীর পক্ষে চলনসই একটা কোনো কাজ জোগাড় করা শেষ কঠিন ছিল না।"

শরৎচন্দ্রের টেস্ট পরীক্ষা দানকালে "অপ্রীতিকর ঘটনা" ঘটার কথা এবং ১৫৲ টাকা ফি সংগ্রহে অসমর্থ হওয়ার কথা ভিত্তিহীন—ব্রজেন-বুর এই উক্তির মূলে যখন উপেনবাবু, তখন উপেনবাবুর লেখাটি য়েই আলোচনা করা যাক্।

উপেনবাবু লিখেছেন—"মাত্র পনেরটি টাকা জোগাড় না হতে পারার ণ শরৎচন্দ্র ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষা দিতে পারেন নি, এই মর্মে যে হিনী প্রচলিত আছে, তা আদৌ সত্য নয়। এমন কি, সেই কাহিনীর ষ্টি যত বড় লোকের দ্বারাই হয়ে থাকুক না কেন, তথাপি সত্য নয়।"

উপেনবাবুর এ কথার উত্তরে আমার বক্তব্য—এই কাহিনীর স্রষ্টা যে রৎচন্দ্র নিজেই। তিনি বহুবার [illegible] জায়গায় তাঁর এই অর্থাভাবে পরীক্ষা তে না পারার [illegible] ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট রিখে শরৎচন্দ্র [illegible] য়াকে যে চিঠিখানি লেখেন, তার ক জায়গায় লি[illegible] [illegible] ছিলাম, ২০টি টাকার জন্যে এগ্জামিন দিতে পারি[illegible]।"

শরৎচন্দ্র তাঁর "আত্মচরিত" নামক প্রবন্ধের মধ্যেও নিজে লিখেছেন—"আমার শৈশব ও যৌবন ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। অর্থের অভাবেই আমার শিক্ষালাভের সৌভাগ্য ঘটেনি। (বাতায়ন—শরৎ-স্মৃতি সংখ্যা, ১৩৪৪)

ঐতিহাসিক ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারকেও শরৎচন্দ্র একবার একথা বলেছিলেন। রমেশবাবু তাঁর "শরৎ-স্মৃতি" প্রবন্ধে সে কথার উল্লেখ করে লিখেছেন—"অর্থাভাবে পরীক্ষার ফি জোগাড় করিতে না পারায় তিনি এফ. এ. পরীক্ষা দিতে পারেন নাই।" (শরৎ-স্মরণিকা—১ম বর্ষ, পৃষ্ঠা ২৭)

শরৎচন্দ্র যে অত্যন্ত দরিদ্রের সন্তান ছিলেন এবং অর্থাভাবেই যে তাঁকে পড়া ত্যাগ করতে হয়েছিল, একথা শরৎচন্দ্র চন্দননগরের শ্রীহরিহর শেঠের কাছেও একদিন বলেছিলেন। (মাসিক বসুমতী—মাঘ ১৩৪৪)

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ড মিশন হোষ্টেলে এক ছাত্রসভায় শরৎচন্দ্র একবার গিয়েছিলেন। তাতে শরৎচন্দ্র ছিলেন সভাপতি, আর ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন প্রধান অতিথি। সেদিন সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র ছাত্রদের বলেছিলেন—"তোমরা সকলেই কলেজের ছাত্র। তোমরা উচ্চ-শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছ। তোমাদের মত বয়সে অর্থের অভাবেই আমাকে কিন্তু একদিন পড়া ছাড়তে বাধ্য হতে হয়েছিল।"

এ ছাড়া আরও অনেক জায়গায় অনেকের কাছেই তিনি অর্থাভাবে পরীক্ষা দিতে না পারায় তাঁর এই বেদনার কথা বলে গেছেন।

দ্বিতীয়তঃ উপেনবাবু বলেছেন—শরৎচন্দ্র এন্ট্রান্স দেবার দু'বছর আগে থেকে দু'বছর পর পর্যন্ত, এই চার বছর তাঁর মামা বিপ্রদাস গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিভাবকত্বে লেখাপড়ার দুর্মোচ্য কীলকে আবদ্ধ ছিলেন।

এ কথা সত্য নয়। কারণ (ব্রজেনবাবুর কথা মত) শরৎচন্দ্র ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমাংশেও হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে পড়েছিলেন। তারপর ঐ সনেই তিনি পুনরায় ভাগলপুরে এসে পরবর্তী ডিসেম্বর মাসে টি. এন. জুবিলী কলেজিয়েট স্কুল থেকে পরীক্ষা দিয়ে এন্ট্রান্স পাস করেন। পর বৎসর ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মাতার মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্র আবার মাতুলালয় ত্যাগ করে পিতার সহিত খঞ্জরপুরে গিয়ে বাস করতে থাকেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে শরৎচন্দ্র বড় জোর দেড় কিংবা দু' বছর তাঁর মামার অধীনে ছিলেন, চার বছর আদৌ নয়।

তৃতীয়তঃ উপেনবাবু বলেছেন—যে ব্যক্তি দুই বৎসর ধরে কলেজের ফি এবং পাঠ্যপুস্তকের মূল্য জুগিয়ে শরৎচন্দ্রকে ফার্স্ট আর্টস পড়িয়েছিলেন, তিনি যে কোন ব্যক্তিই হোক না কেন, মাত্র পনেরটি মুদ্রা ব্যয় করে শরৎচন্দ্রকে পড়ানোর ব্যয়ভার হ'তে নিষ্কৃতি লাভ করা অন্ততঃ অর্থের দিক দিয়ে তাঁর পক্ষে অধিকতর লাভজনক ছিল।

শরৎচন্দ্র তাঁর ছোটমামার অধীনে চার বছর লেখাপড়ার দুর্মোচ্য কীলকে আটকে ছিলেন—উপেনবাবুর এই কথাই যখন সত্য নয়, তখন বিপ্রদাসবাবু দুবছর কলেজের ফি জুগিয়ে ছিলেন কিনা, সে সম্বন্ধে আলোচনাই হতে পারে না। তবুও একথা বলা যেতে পারে যে, বিপ্রদাসবাবু যে দুবছরই কলেজের ফি জুগিয়েছিলেন, তার প্রমাণ কোথায়? শরৎচন্দ্র কলেজে পড়তে পড়তেই তাঁর পিতার সঙ্গে যখন খঞ্জরপুরে

চলে গেলেন, তখন থেকে যে শরৎচন্দ্রের পিতাই পুত্রের কলেজের ফি দেন নি, তারই বা বিরুদ্ধে প্রমাণ কই ?

চতুর্থতঃ উপেনবাবু বলেছেন—তখনকার দিনে এফ. এ. পাস করলে বিহারে বাঙ্গালীর পক্ষে চলনসই একটা কোন কাজ জোগাড় করা বিশেষ কঠিন ছিল না।

উপেনবাবুর এটা একটা যুক্তিই নয়। এফ. এ. কেন, তখনকার দিনে এনট্রান্স পাস করলেও চলনসই একটা চাকরী জোগাড় করা বিশেষ কঠিন ছিল না বলেই মনে হয়।

এই ত গেল উপেনবাবুর কথা। এখন আবার ব্রজেনবাবুতে ফিরে আসা যাক। ব্রজেনবাবু বলেছেন—শরৎচন্দ্র ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় এবং ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ছাত্রবৃত্তি পাসকে বর্তমানের উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষার সমান ধরলেও শরৎচন্দ্র ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ছাত্রবৃত্তি পাস করলে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে (অবশ্য ব্রজেনবাবুর কথা মত তখন যদি ডিসেম্বরে প্রবেশিকা পরীক্ষা হয়ে থাকে) প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার কথা। আর ছাত্রবৃত্তিকে এম. ই.র সমান ধরলে ১৮৯৩এরও দু বছর আগে পরীক্ষা দেওয়ার কথা। শরৎচন্দ্র ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা না দিয়ে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিচ্ছেন। তবে কি তিনি কোন ক্লাসে ফেল করেছিলেন! শরৎচন্দ্র কোন ক্লাসে যে ফেল করেছিলেন, ব্রজেনবাবু একথা বলেন নি। ফেল করা ত দূরের কথা শরৎচন্দ্র বরং ছাত্রবৃত্তি পাস করে জুবিলি স্কুলে গিয়ে পরের বছর যে ডবল প্রমোশন নিয়েছিলেন, একথা সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর "শরৎ-পরিচয়" গ্রন্থে লিখেছেন। (পৃঃ ৯৪)। শরৎচন্দ্র যদি ডবল প্রমোশনই নিয়ে থাকেন, তাহলে আরও একটা বছর যায় কোথায় ?

এখন দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্তমুন্সী তাঁর "দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্র" প্রবন্ধে কি লিখেছেন দেখা যাক্। দ্বিজেনবাবু লিখেছেন—"শরৎচন্দ্র…ইং ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মতিলালও এই সময়ে আবার কার্য ত্যাগ করিয়া দেশে সপরিবারে ফিরিয়া আসেন, কাজেই শরৎচন্দ্রকে হুগলী শহরে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়িবার জন্য ভর্তি হইতে হইল। তিনি ভর্তি হইলেন হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে (বর্তমান Class vii) ইং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে…। শরৎচন্দ্র এই স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ শেষ করিয়া প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন, কিন্তু এখানে তাঁহার প্রথম শ্রেণীর পড়া শেষ করার সুযোগ হইল না। এই সময়ে তাঁহার পিতার ঋণভার এরূপ বেশী হইয়া পড়িয়াছিল যে বিদ্যালয়ের বেতন যোগানো তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই এবং কিছুদিনের জন্য স্কুলে পড়াও বন্ধ করিতে হইয়াছিল।" ভারতবর্ষ—চৈত্র, ১৩৪৪।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে শরৎচন্দ্রের ভর্তি হওয়ার বৎসর ও শ্রেণী নিয়ে ব্রজেনবাবুর সঙ্গে দ্বিজেনবাবুর পার্থক্য আছে। দ্বিজেনবাবু ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাকে এম. ই.র সমান ধরেছেন। যাই হোক, তবে তাঁর এই কথাটা "কিছুদিনের জন্য স্কুলের পড়াও বন্ধ করিতে হইয়াছিল" বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়। তা হ'লেই ছাত্রবৃত্তিকে বর্তমানের উচ্চ প্রাথমিকের সমান ধরলেও ব্রজেনবাবুর হিসাব মত শরৎচন্দ্রের এক বছর, আর সুরেনবাবুর কথা মত ডবল প্রমোশন পেয়ে থাকলে দুবছর যে নষ্ট হয়েছিল, তার একটা হদিস্ পাওয়া যায়। এর থেকে আরও দেখা যাচ্ছে যে, শরৎচন্দ্র যখন তাঁর পিতার নিকটে ছিলেন, তখন তাঁর মামা পড়ার ব্যাপারে তাঁকে অর্থ সাহায্য করতেন না। অতএব স্কুলের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি কলেজে পড়ার সময়ও শরৎচন্দ্র তাঁর পিতার নিকটে যখন ছিলেন, তখন বিপ্রদাসবাবুর আর্থিক সাহায্য না করাই স্বাভাবিক।

তাছাড়া বিপ্রদাসবাবুকেই এই সময় তাঁদের সংসার চালাতে হ'ত। আর তাঁর আয়ও ছিল খুবই সামান্য। শরৎচন্দ্রের প্রবেশিকা পরীক্ষার মাত্র কয়েকটি ফির টাকার জন্যও তাঁকে হ্যাণ্ডনোট লিখে টাকা ধার করতে হয়েছিল। বিপ্রদাসবাবুর এই টাকা ধার করার কথা উল্লেখ করে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর "শরৎ-পরিচয়" গ্রন্থে লিখেছেন—

…"পরদিন সকালে বিপ্রদাস চললেন খঞ্জপুর। টাকা ঘরে নেই, সংগ্রহ করতে হবে। বাঙালীটোলা থেকে খঞ্জপুর মাইল দেড়েকের পথ। সেইখেনে গুলজারিলালের বাড়ি।

গুলজারিলালকে সবাই চেনে।…সে ছিল ভাগলপুরের সাইলক।…

বিপ্রদাস হ্যাণ্ডনোট লিখে টাকা নিয়ে এলেন। অতি অল্পবেতনে তিনি সবে চাকরিতে ঢুকেছেন। বৃহৎ পরিবার পালনের সামর্থ্যও সে সময়ে তাঁর ছিল না।

…গুলজারিলালের টাকার পয় ছিল। শরৎচন্দ্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলেজে প্রবেশ লাভ করেছিলেন।"

আর একটা কথা সুরেনবাবু লিখেছেন—"শুনতে পাওয়া যায় যে, অর্থের অভাবে শরৎচন্দ্র লেখাপড়া করতে পারেন নি এবং তার জন্যে তাঁর দূর এবং নিকট আত্মীয়েরাই দায়ী। কিন্তু তাঁর পিতৃদেব মতিলাল যে কেন দায়ী ছিলেন না, তা ঠিক করে বুঝে ওঠা কঠিন।"

সুরেনবাবুর এই কথা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, টেষ্ট পরীক্ষা নিয়ে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। বরং অর্থাভাবের কথাই তিনিও স্বীকার করেছেন। তবে অবশ্য অর্থাভাবে যে শরৎচন্দ্রের পড়া হয় নি, সেজন্য তিনি শরৎচন্দ্রের পিতার উপর দোষ চাপাতে চেয়েছেন। কার দোষ, কার দোষ নয়, সে আমার আলোচ্য নয়। আমার আলোচ্য শুধু এই যে, পরীক্ষার সময় সত্যিই অর্থাভাব হয়েছিল, না কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল।

শরৎচন্দ্র অর্থাভাবে পরীক্ষা দিতে পারেন নি, না টেস্ট পরীক্ষার সময় নকল করতে গিয়ে ধরা পড়ার ফলে পরীক্ষা দেবার অনুমতি পান নি, এর কোনটা সত্য ? এ সম্বন্ধে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে আমি একদিন প্রশ্ন করেছিলাম। উত্তরে তিনি বলেছিলেন—অর্থাভাবের কথাটাই সত্য। তবে টেস্ট পরীক্ষার সময় একটা গণ্ডগোলও অবশ্য হয়েছিল। এই বলে তিনি যে কাহিনীটি বলেছিলেন এখানে তা তাঁর আমার নিজের ভাষাতেই বলছি—

শরৎচন্দ্রের মাতামহ কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ভাগলপুরে ম্যাজিষ্ট্রেট অফিসে চাকরী করতেন। কেদারবাবুর মৃত্যুর (১৮৯২ খ্রীঃ) পর তাঁর পুত্র ঠাকুরদাস গঙ্গোপাধ্যায় ঐ অফিসে কাজ পান। কিছুদিন কাজ করার পর অফিসের সামান্য ক'টা টাকার গোলমাল নিয়ে ঠাকুরদাসবাবু মামলাতে অভিযুক্ত হন।

ভাগলপুরে গাঙ্গুলীদের এই সময় খুব নাম-ডাক ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। তাঁরা মামলায় বড় বড় উকিল ব্যারিষ্টার দিলেন। অনেকদিন ধরে মামলা চলল। আর এই মামলা চালাতে গিয়েই শরৎচন্দ্রের মামা ঠাকুরদাস ও বিপ্রদাসকে একেবারে নিঃস্ব হতে হয়েছিল। এ সময় এই গাঙ্গুলী বাড়ী নামে একান্নবর্তী পরিবার থাকলেও আসলে কেদারবাবুর মৃত্যুর পর তাঁর ভাইরা প্রায় পৃথকই হয়ে গিয়েছিলেন। কেদারবাবুর সেজ ভাই মহেন্দ্রবাবু (উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পিতা) তাঁর সংসার নিয়ে পূর্ণিয়াতেই থাকতেন। ছোট অঘোরবাবু থাকতেন—মালদহের চাঁচরে। তাঁর সংসার ভাগলপুরে থাকলেও ক'বছর পরে তিনি তাঁর দু'ছেলেকে নিজের কাছে রেখে পড়াবার জন্যে চাঁচরে নিয়ে গিয়েছিলেন। কেদারবাবুর মেজ ভাই তাঁর সংসার নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন।

শরৎচন্দ্রের প্রবেশিকা পরীক্ষার কিছু আগেই এই মামলার হাঙ্গামা চলেছিল। তাই শরৎচন্দ্রের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফি এবং ঐ সময় স্কুলে দেয় ক'মাসের মাহিনার টাকার জন্য বিপ্রদাসবাবুকে গুলজারী-লালের কাছে টাকা ধার করতে হয়েছিল।

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বড়দা মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও শরৎচন্দ্র এক সঙ্গে পড়তেন এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় দুজনেই দ্বিতীয় বিভাগে পাস হয়েছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করে মণিবাবু কলেজে ভর্তি হলেন, কিন্তু টাকার অভাবে শরৎচন্দ্রের আর ভর্তি হওয়া হল না। শরৎচন্দ্রের পড়া হবে না দেখে, মণিবাবুর মা কুসুমকামিনী দেবীর বড় দুঃখ হ'ল। এই সময় তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁদের ছোট ছেলেদের পড়াবার বিনিময়ে শরৎচন্দ্রের কলেজের মাহিনা দেবার ব্যবস্থা করলেন। এরই ফলে শরৎচন্দ্র কলেজে পড়তে পেরেছিলেন। শরৎচন্দ্র প্রতিদিন রাত্রে সুরেনবাবু ও তাঁর ভাই গিরিনবাবুকে পড়াতেন। এঁরা তখন স্কুলে নীচের ক্লাসে পড়তেন।

শরৎচন্দ্র এই ভাবে অপরকে পড়িয়ে নিজে পড়তেন। প্রায় বছরখানেক কেটে গেল। এমন সময় শরৎচন্দ্রের মা মারা গেলেন। শরৎচন্দ্রের পিতা ঘরজামাই হয়ে গাঙ্গুলী বাড়ীতেই বাস করতেন। তিনি এই সময় কাজ কিছুই করতেন না। শরৎচন্দ্রের মা মারা গেলে শরৎচন্দ্রের পিতা দেখলেন যে, এখানে থাকা আর ভাল দেখায় না। তাই তিনি পুত্র-কন্যাদের সঙ্গে নিয়ে ভাগলপুরের খঞ্জরপুর পল্লীতে গিয়ে বাড়ী ভাড়া করে বাস করতে লাগলেন। শরৎচন্দ্র তাঁর পিতার সঙ্গে গিয়ে সেখানে থেকেই লেখাপড়া করতে লাগলেন।

ক্রমে টেস্ট পরীক্ষার সময় হয়ে এল। তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজে আগে টেস্ট পরীক্ষা বলে কিছু ছিল না। যেকেও ইচ্ছা বা যারা পড়ত, তাদের সকলকেই অমনি পরীক্ষা দিতে পাঠানো হ'ত। শরৎচন্দ্রদের সময় থেকেই এই কলেজে টেস্ট পরীক্ষার প্রবর্তন হয়। ছাত্ররা পরীক্ষা দিতে চায় না, কলেজ কর্তৃপক্ষও পরীক্ষা না করে ছাড়বেন না—এই নিয়ে টেস্ট পরীক্ষার আগেও একটু গণ্ডগোল হয়েছিল। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ছাত্রদের টেস্ট পরীক্ষা দিতেই হ'ল।*

বিজ্ঞানের পরীক্ষার দিন শরৎচন্দ্র একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে বসলেন। শরৎচন্দ্র বিজ্ঞানের খুব ভাল ছাত্র ছিলেন। বিজ্ঞানের পরীক্ষার দিন শরৎচন্দ্র প্রায় অর্ধেক সময়ের মধ্যেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর লিখে দিয়ে বেরিয়ে এলেন। (অথবা পরীক্ষা দিতে দিতেই কোন অজুহাতে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে এসেছিলেন।)

পরীক্ষার হলে শরৎচন্দ্র দেখেছিলেন যে, তাঁর ক'টি বন্ধু ভাল লিখতে পারছেন না। তাই তিনি বেরিয়ে এসে কলেজ কম্পাউণ্ডেরই সংলগ্ন হোস্টেলে গিয়ে কাগজের স্লিপ করে তাতে উত্তর লিখে দরোয়ানের হাত দিয়ে পরীক্ষার হলের মধ্যে পাঠিয়ে দিতে লাগলেন। দরোয়ান অবশ্য শরৎচন্দ্রের শেখানো মত গার্ডের চোখ এড়িয়েই, শরৎচন্দ্র যাকে যাকে দিতে বলেছিলেন, তাদের কাছেই স্লিপ পৌঁছে দিচ্ছিল। কিন্তু সে ঘন ঘন যাতায়াত করতেই গার্ডের সন্দেহ হয়। বিজ্ঞানের অধ্যাপক সারদা ভট্টাচার্য নিজেই গার্ড দিচ্ছিলেন। দরোয়ানের উপর তাঁর সন্দেহ হওয়ায়, দরোয়ান যখন বেরিয়ে যায়, তার অনুসরণ করে তিনি হোস্টেলে গিয়ে দেখেন—শরৎচন্দ্র দিব্যি বসে বসে স্লিপে উত্তর লিখছেন।

সারদাবাবু শরৎচন্দ্রকে হোস্টেল থেকে কলেজের প্রিন্সিপালের কাছে ধরে নিয়ে এলেন। কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন তখন, শান্তিপুর-নিবাসী হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। তিনি অত্যন্ত নীতি-বাগীশ লোক ছিলেন। শরৎচন্দ্রের এই অন্যায় কাজের জন্য তিনি শরৎচন্দ্রকে টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ঘোষণা করবেন না বলে স্থির করলেন।

টেস্ট পরীক্ষার ফল বেরুল। সব ছেলেই পরীক্ষা দেবার অনুমতি পেল। পেলেন না কেবল শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্র আর কি করেন, নিরুপায় হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন।

এদিকে হরিপ্রসন্নবাবু শরৎচন্দ্রকে এফ.এ. পরীক্ষা দেবার অনুমতি দিলেন না বটে, কিন্তু তিনি অত্যন্ত নীতিবাগীশ লোক ছিলেন বলে, সর্বদাই বিবেকের দংশন অনুভব করতে লাগলেন। তিনি কেবলই ভাবতে লাগলেন, তাই ত একটা ছেলের জীবন নষ্ট করে দেব! এই সময় সারদাবাবুও আবার নিজেকে শরৎচন্দ্রের পরীক্ষা দিতে অনুমতি না পাওয়ার মূল ভেবে, শরৎচন্দ্র যাতে পরীক্ষা দিতে পারেন, তার জন্য হরিপ্রসন্নবাবুকে অনুরোধ করতে লাগলেন।

হরিপ্রসন্নবাবু জানতেন যে, শরৎচন্দ্র পড়াশুনায় ভাল ছেলে। পরীক্ষা দিলে পাস করবেনই। তাই তিনি কলেজের সম্মানের কথাটাও ভাবছিলেন।

এইভাবে অনেক চিন্তা করে পরীক্ষার ফি জমা দেবার আগের দিন, কি সেই দিন, হরিপ্রসন্নবাবু শরৎচন্দ্রকে ডাকালেন। শরৎচন্দ্র এলে হরিপ্রসন্নবাবু তাঁকে ফি-র টাকা এনে জমা দিয়ে যেতে বললেন।

শরৎচন্দ্র বাড়ীতে ফিরে গিয়ে তাঁর পিতাকে টাকার কথা বললেন। শরৎচন্দ্রের পিতা অমনিই ত বেকার ও ঘোরতর অভাবী। হঠাৎ একসঙ্গে পরীক্ষার ফি এবং ঐ সঙ্গে দেয় ক'মাসের কলেজের মাইনের টাকা পান কোথায়? তিনি সমস্ত টাকা জোগাড় করতে পারলেন না। শ্বশুরবাড়ী থেকে চলে আসায় তিনি সেখানেও আর কারো কাছে টাকা চাইতে গেলেন না। ফলে শেষ পর্যন্ত টাকা জোগাড় না হওয়ায়, শরৎচন্দ্র পরীক্ষার ফি আর জমা দিতে পারলেন না।

সুরেনবাবুর বলা এই কাহিনীটি বিশ্বাসযোগ্য বলে আমি মনে করি। শরৎচন্দ্র যে বিজ্ঞান খুব ভাল ভাবেই পড়াশুনা করতেন, শ্রীনরেন্দ্র দেবের লেখা শরৎচন্দ্রের কলেজে প্রথম বছরের বিজ্ঞানের পরীক্ষার কাহিনীটি বাদেও, শরৎচন্দ্রের পরবর্তী জীবনের ঘটনা থেকেও বলা যেতে পারে। শরৎচন্দ্র রাধারাণী দেবীকে একবার এক চিঠিতে লিখেছিলেন—"সাহিত্যের মধ্যে আমি কোনদিন তেমন আনন্দও পাইনে, যেমন পাই বিজ্ঞানের মধ্যে।" শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র একবার শরৎচন্দ্রের বাজে-শিবপুরের বাড়ীতে গিয়ে শরৎচন্দ্রের সেল্‌ফে অজস্র বিজ্ঞানের বই সাজানো দেখে এসেছিলেন। প্রেমেনবাবু "শরৎ-বন্দনায়" তাঁর এক প্রবন্ধের মধ্যে শরৎচন্দ্রের এই বিজ্ঞানের বইয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। শরৎচন্দ্র বিজ্ঞান সম্বন্ধে এত বেশি পড়াশুনা করেছিলেন যে, একবার তিনি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও লেখক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ভারতবর্ষে প্রকাশিত জড়জগৎ নামক একটি প্রবন্ধের সমালোচনা করে তাঁর দিদির নাম দিয়ে একটা প্রতিবাদ লিখতে চেয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে দেশ-বিদেশের বৈজ্ঞানিকদের মতামত উদ্ধৃত করে তিনি তখন তাঁর বন্ধু ও ভারতবর্ষের অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে একটি চিঠিও লিখেছিলেন।

যাই হোক, শরৎচন্দ্রের এফ.এ. পরীক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারে সুরেনবাবু ও উপেনবাবুর কথার মধ্যে সুরেনবাবুর কথাই নির্ভরযোগ্য বলে আমি মনে করি। উপেনবাবুর কথার মধ্যে জায়গায় জায়গায় যে সামঞ্জস্য নেই, ইতিপূর্বে আমি তা আলোচনা করেছি।

সুরেনবাবু এবং উপেনবাবু উভয়েই শরৎচন্দ্রের সম্পর্কীয় মাতুল। আর উভয়েই তখন অল্পবয়স্ক হলেও সুরেনবাবুই বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাছাড়া সুরেনবাবু এই সময় ভাগলপুরেই থাকতেন, কিন্তু উপেনবাবু ভাগলপুরে ছিলেন না। তিনি তখন অন্যত্র তাঁর অভিভাবকদের কাছে থেকে লেখাপড়া করতেন।

আমার এই বিস্তৃত আলোচনা থেকে এখন বলা যেতে পারে যে, শরৎচন্দ্র নিজে যে কথা বহুবার বহু জায়গায় বলে গেছেন—অর্থাভাবের জন্যই তিনি পরীক্ষা দিতে পারেন নি, এ কথাই সত্য। ব্রজেনবাবুর বর্ণিত "অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার" জন্য শরৎচন্দ্র এফ.এ. পরীক্ষা দেবার অনুমতি পান নি, এ কাহিনী ভিত্তিহীন। (আগামী বারে সমাপ্য)

গলতার গাদী

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

গলতার গাদী শ্রীসম্প্রদায়ের শ্রীরামানন্দী শাখার বৈষ্ণবগণের প্রসিদ্ধ পীঠস্থান। রাজস্থানে জয়পুর-নগরের কেন্দ্রস্থল হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে পূর্বভাগে যে শৈলমালা শোভিত রহিয়াছে, উহারই উপত্যকায় গলতা-আশ্রম বা গলতার গাদী বর্তমান জয়পুর-নগর নির্মিত হইবার পূর্বে অম্বরাধীশ মহারাজ পৃথ্বীরাজের সময় পয়োহারী বা পৈহারী কৃষ্ণদাসজীর দ্বারা স্থাপিত হয়। উত্তর-ভারতে (রাজস্থানে) গলতা ও দক্ষিণ-ভারতে তোতাদ্রি (নামান্তর নেঙ্গুনেড়ি, তেন্নিভেলী হইতে দশ ক্রোশ) যথাক্রমে শ্রীরামানন্দী ও শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণবগণের দুইটি প্রধান গাদী বা গুরুপীঠ।

মথুরার যমুনাতটস্থ বিশ্রামঘাটের পূর্বভাগে অনতিদূরে প্রসিদ্ধ প্রয়াগ-ঘাটের উপর আদি গলতা-আশ্রম স্থাপিত হয়। ইহারই শাখারূপে রাজস্থানে জয়পুরের পর্বতোপত্যকায় গলতার গাদী স্থাপিত হইয়াছিল এবং উক্ত গাদীর নামানুসারে কালক্রমে পর্বতের নামও গলতা-পর্বত হইয়াছে।

শ্রীরামানন্দ স্বামী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের (১৪৮৬ খ্রীঃ) কিছুকাল পূর্বে শ্রীরামানন্দ প্রয়াগে আবির্ভূত হইয়া শ্রীরামানুজাচার্যের ২২শ অধস্তনরূপে কিছু স্বতন্ত্রভাবে রামোপাসনা প্রচার করেন। কেহ কেহ বলেন,—তাঁহার নাম ছিল—'রামাচারী ব্রহ্মচারী'। কাশীতে থাকাকালে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণের নামের অনুকরণে 'আনন্দ'-শব্দ যোগ করিয়া লোকে রামাচারীকে 'রামানন্দ-স্বামী' বলিয়া ডাকিতেন। তদবধি তিনি 'রামানন্দ' নামে খ্যাত হন।

ডাঃ ফর্কুহার এর মতে ১৪০০-১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রামানন্দের আবির্ভাব-কাল। Vide an outline of the Religious literature of India—by Dr. J. N. Farguhar, 1381, Oxford 1920.

শ্রীরামানন্দের প্রধান বারজন শিষ্যের অন্যতম শ্রীঅনন্তাচারী মথুরায় বাস করিতেন। তথায় অনন্তাচার্যের 'অনন্তবাড়া' নামক এক সংস্কৃত বিদ্যালয় ছিল। উক্ত বিদ্যালয়ের নাম হইতে অদ্যাপি মথুরায় 'অন্তাপাড়া' নামক স্থান দৃষ্ট হয়। অনন্তাচারীর অন্যতম প্রধান শিষ্য দুগ্ধ আহরণ (ভিক্ষা) করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। এজন্য তিনি পয়োহারী বা অপভ্রংশে 'পৈহারী কৃষ্ণদাস' নামে বিখ্যাত হ'ন। ইনি একজন বিখ্যাত যোগিপুরুষ ছিলেন। ইঁহার যোগ-বিভূতির বহু অলৌকিক বৃত্তান্ত কিংবদন্তিরূপে প্রচারিত আছে।

গলতার গাদীর ইতিবৃত্ত

কথিত হয়, শ্রীশত্রুঘ্ন মথুরার প্রয়াগঘাটে আদি গোবিন্দদেবের এক ন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। এই মন্দিরে শ্রীসম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ আচার্য নাথমুনি ও শ্রীরামানুজাচার্য্য কিছুকাল অবস্থান করিয়া বৈষ্ণবধর্ম প্রচার রেন। পরবর্তীকালে পয়োহারী কৃষ্ণদাস উক্ত মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার রিয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন। তিনি উক্ত আশ্রমে অবস্থান-কালে াগসিদ্ধিবলে বহু গলিতকুষ্ঠ রোগীকে অলৌকিকভাবে রোগমুক্ত করেন। জন্য উক্ত মঠ 'গলতাশ্রম' (গলিতকুষ্ঠ রোগের চিকিৎসালয়) নামে ত হয়। এই সময় রাজস্থানে কানফট্-যোগিসম্প্রদায় বৈষ্ণবগণের পর অমানুষিক অত্যাচার করিতেন বলিয়া শুনা যায়। কথিত হয়, ম্বরাধিপতি পৃথ্বীরাজ তদানীন্তন প্রধান কানফট্-যোগীর অলৌকিক ভূতিদর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। যোগবল ও জবলে দৃপ্ত হইয়া কানফট্-যোগিগুরু প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি অন্ততঃ চজন বৈষ্ণবকে প্রত্যহ হত্যা করিবার পর দন্ত-ধাবন করিবেন।



মথুরার যমুনাতীরস্থ বিশ্রামঘাট হইতে প্রয়াগঘাট, শ্যামঘাট ও দাউজীর মন্দির পর্যন্ত দৃশ্য

এই কথা রাজস্থানের বহু সজ্জন-ব্যক্তি মথুরার বিখ্যাত বৈষ্ণব-যোগী অনন্তাচারীর নিকট জ্ঞাপন করিলে তিনি তাঁহার শিষ্য পয়োহারী-কৃষ্ণদাসকে ঐরূপ বৈষ্ণবদ্রোহ দমনার্থ রাজস্থানে প্রেরণ করেন। কৃষ্ণাচারী অত্যদ্ভুত যোগবলে কানফট্-গুরুকে স্বীয় পদানত করিলেন। তখন পৃথ্বীরাজও পয়োহারী কৃষ্ণাচারীর শিষ্যত্ব স্বীকার করেন এবং কান্‌ফট্‌গণকে পর্বত হইতে বহিষ্কৃত করিয়া উক্ত পর্বতের উপত্যকায় বৈষ্ণব-সেবাশ্রম নির্মাণ করিয়া দেন। মথুরার প্রয়াগঘাটের আদি-গলতাশ্রমের নামানুসারে শেষোক্ত নবনির্মিত বৈষ্ণব-সেবাশ্রমের নামও তখন 'গলতাশ্রম' হয়। পরবর্তীকালে ইহা শ্রীসম্প্রদায়ের শ্রীরামানন্দ-শাখার একটি প্রধান পীঠস্থানরূপে পরিণত হওয়ায় 'গলতার গাদী' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। পয়োহারী-কৃষ্ণদাস রাজস্থানে গলতা-গাদী প্রতিষ্ঠিত করিয়া মথুরায় চলিয়া আসেন।

পয়োহারী কৃষ্ণদাসের ২২ জন শিষ্যের অন্যতম শ্রীকীলদাসজী ১৪৮১ বিক্রম-সংবতে (১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে) রাজস্থানের 'বাঁদিকুই' ষ্টেসনের নিকটবর্তী 'বড়িয়াল' নামক গ্রামে এক ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাল্যকালের নাম ছিল—'সুখরাম'। তিনি অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রম-কালে উপনয়ন সংস্কার লাভ করিয়া অনন্তাচারীর প্রতিষ্ঠিত মথুরাস্থ সংস্কৃত-বিদ্যালয়ে অধ্যয়নার্থ আগমন করেন এবং ক্রমে পয়োহারী-কৃষ্ণদাসের সর্বপ্রধান শিষ্যরূপে পরিগণিত হন। সুখরাম বাল্যকালে সেরূপ মেধাবী ছাত্র ছিলেন না বলিয়া তাঁহার গুরু কৃষ্ণদাস একটি মন্ত্রপূত শৈল্যের (কীল) দ্বারা শিষ্যের জিহ্বায় 'সরস্বতী-বীজ' লিখিয়া দেন। সেইদিন হইতেই সুখরামের পাণ্ডিত্যপ্রতিভার বিকাশ হইতে থাকে এবং তিনি 'কীল-দাস' নামে প্রসিদ্ধ হন। বিদ্যাধ্যয়নের পর কীলদাস মথুরার গলতাশ্রমের দক্ষিণভাগে (বর্তমান কীলমঠ-গলিতে) একটি গুহার মধ্যে যোগানুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। পয়োহারী-কৃষ্ণদাসের দেহত্যাগের পর কীলদাসজী তদানীন্তন অম্বরাধিপতি



অম্বরের দুর্গ ও পুরাতন রাজধানীর দৃশ্য

সবাই-মানসিংহের প্রার্থনানুসারে গলতার গাদীতে গমন করেন এবং উক্ত গাদীর দ্বিতীয় আচার্যরূপে অভিষিক্ত হন। তথায় কিছুকাল অবস্থানের পর তথাকার আশ্রমের ভার নিজ-শিষ্য ছোট-কৃষ্ণদাসের উপর ন্যস্ত করিয়া কীলদাস পুনরায় মথুরায় প্রত্যাবর্তন করেন।

যোগী-কীলদাসজীর নানাপ্রকার সিদ্ধান্তর কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কথিত হয়, এক মাঘমাসের প্রাতঃকালে যমুনা-স্নানান্তে কীলজী সম্পূর্ণ নগ্নদেহে পদ্মাসন করিয়া যমুনাতটে উপবিষ্ট ছিলেন। সেই সময় আকবর-বাদসাহ কয়েকজন অনুচর-সহ ঘোড়ায় চড়িয়া নিকটবর্তী স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। বাদসাহ নগ্নদেহ যোগীকে দেখিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। সম্মুখস্থ এক ব্যক্তি ধ্যানমগ্ন যোগীর নাম 'কীলদাস' বলিয়া জ্ঞাপন করিলে আকবর ঐ যোগীর মস্তকে কীলক বিদ্ধ করিয়া তাঁহার যোগবল পরীক্ষা করিবার জন্য নিজ অনুচরগণকে আদেশ করেন। যোগীবরের মস্তকে কীলক বিদ্ধ করিবার বহু চেষ্টা-সত্ত্বেও তাহা ব্যর্থ হয়। আকবর ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া আহত হন এবং ঘোড়ার মৃত্যু

হয়। তখন বাদসাহ কীলদাসের নিকট অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কীলদাস আকবরকে অবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণপুরী মথুরা হইতে বহির্গত হইতে বলেন এবং মথুরাকে আকবরাবাদে পরিণত করিবার পরিকল্পনা চিরতরে পরিত্যাগ করিতে বলেন।

কথিত হয়, ইহার পর একদিন কীলদাসজী যোগবলে আকবরের দরবারে উপস্থিত হইয়া ক্ষুধার্ত সাধুরূপে খেচরান্ন ভোজন করিতে চাহিয়াছিলেন। খেচরান্ন রন্ধনের পর তাহা আবৃত পাত্রের মধ্যে কীলদাসের সম্মুখে আনীত হইল। পরিবেশনকারী ব্রাহ্মণ আবরণ উন্মোচন করিবামাত্রই দেখিতে পাইলেন, উহাতে খেচরান্নের পরিবর্তে ডাল ও চাউল অসিদ্ধ অবস্থায় পৃথক্ পৃথক্ রহিয়াছে। যতবার খেচরান্ন প্রস্তুত করিয়া পরিবেশন-কালে পাত্রের আবরণ উন্মোচন করা হইল, ততবারই অসিদ্ধাবস্থায় ডাল ও চাউল পৃথক্‌ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া আকবর অতিথি-সাধু-ভোজনের আশা পরিত্যাগ করিলেন। ইহা দেখিয়া কীলদাসজী আকবরকে বলিলেন—"আপনি হিন্দুস্থানের বাদসাহ হইয়াও একজন ভুখা ভিখারীকে একটু খিচুরী খাওয়াইতে পারিলেন



গাল্‌তা পর্বত—জয়পুর

না; তাজ্জব ব্যাপার!" তখন আকবর বলিলেন,—"এখন আমি বাদসাহ নহি, আপনারই অনুগ্রহের ভিখারী।" কীলদাস বলিলেন—"আপনি অন্তধর্মাবলম্বিগণকে নানা প্রলোভন দ্বারা ধর্মান্তরিত করিতেছেন। এই চেষ্টা সাময়িকভাবে খিচুরী প্রস্তুত করিবার ন্যায় সফল হইলেও পরিণামে ইহা আপনার শক্তির অতীত বলিয়া প্রমাণিত হইবে। অতএব আপনি অদ্য হইতে প্রতিজ্ঞা করুন, কখনো কাহাকেও ঐরূপ ভাবে ধর্মান্তরিত করিবেন না।" কথিত হয়, আকবর কীলদাসজীর এই উপদেশের সম্মান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অনুচরগণ কীলদাসের ভজন-গুহায় বিষধর সর্প নিক্ষেপ প্রভৃতি নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য করিতে থাকে; কিন্তু তাহাতেও উক্ত যোগিবরের কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই।

কীলদাস মথুরার প্রয়াগঘাটের গল্‌তাশ্রমের পুরাতন ভিত্তির উপর কোন ধনাঢ্য শিষ্যের দ্বারা একটি বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ করাইয়া ১৬৪৫ বিক্রম-সংবতে (=১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে) 'গল্‌তা-কুঞ্জ' নামক এক মঠ স্থাপন করেন। তিনি তথায় শ্রীবেণীমাধবজী, শ্রীরাম, শ্রীসীতা ও শ্রীরামানুজাচার্যের শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উক্ত মঠের সেবাভার নিজ-প্রবীণ-শিষ্য শ্রীমধুসূদনদাসজীর উপর ন্যস্ত করিয়া স্বয়ং গুহার মধ্যে ভজনে নিমগ্ন হন। কবি তুলসীদাস রাজস্থানের গল্‌তাগাদীর সেবা পরিপাটীর কথা শুনিয়া তদানীন্তন অধ্যক্ষ ছোট-কৃষ্ণদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তথায় গমন করিয়াছিলেন। তুলসীদাস মথুরায় কীলদাসজীরও দর্শন লাভ করেন এবং তাঁহারই আজ্ঞানুসারে 'কৃষ্ণগীতাবলী' রচনা করেন। মথুরার গল্‌তাশ্রমের প্রদত্ত বিবরণানুসারে কীলদাস ১৬৯১ বিক্রম-সংবতে (=১৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে) মথুরার 'ধ্রুবতীর্থে' দেহরক্ষা করেন।



শ্রীরামানন্দ স্বামী—বৃন্দাবন (প্রাচীন চিত্র হইতে গৃহীত)

মথুরার গল্‌তাগাদীর আচার্য-পরম্পরা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। গল্‌তাগাদীর প্রথমাচার্য যোগী কীলদাসজী (শ্রীরামানন্দের শিষ্য অনন্তাচার্য, তাঁহার শিষ্য পয়োহারী কৃষ্ণদাস, তাঁহার শিষ্য কীলদাস) ২। মধুসূদনদাস, ৩। কমলনয়নদাস, ৪। শ্রীপ্রিয়াদাস, ৫। সর্বেশ্বরদাস ৬। নারায়ণদাস, ৭। লক্ষ্মণদাস, ৮। রামপ্রসাদদাস, ৯। অমরদাস ১০। বরদরাজদাস, ১১। গরুড়ধ্বজদাস, ১২। মাধবাচার্য ও ১৩। পদ্মনাভাচার্য—বর্তমান মহান্ত।

গল্‌তা-পর্বত সম্বন্ধে অন্যবিবরণ

অন্য-বিবরণানুসারে শ্রীনারদের শিষ্য গালবমুনির আশ্রম রাজস্থানের উক্ত পর্বতে বিরাজমান থাকায় গালবমুনির নাম হইতে 'গল্‌তাশ্রম' বা 'গল্‌তা-পর্বত' হইয়াছে। গল্‌তা-পর্বত জয়পুর-নগরের সমতল-ভূমি হইতে প্রায় সাড়ে-তিনশত ফুট্ উচ্চ। গিরি-শিখরের সন্নিহিত স্থানে সূর্যদেবের একটি মন্দির আছে। বর্তমান জয়পুর-সহর হইতে 'পুরাণা-ঘাট' হইয়া গল্‌তা-পর্বত পর্যন্ত মোটর যান চলিবার সুন্দর পথ আছে। জয়পুর-সহর হইতে গল্‌তার দিকে যে-সোজা রাস্তা গিয়াছে, সেই পথে চলিয়া গল্‌তা-পর্বতে আরোহণের দ্বিতীয় দ্বার পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত এবং তথায় একপার্শ্বে কতিপয় ধর্মশালা আছে। পর্বতের উপর উঠিবার পথে ছয়টি বাঁক অতিক্রম করিবার পর একটি বিশ্রাম-মণ্ডপ আছে। তৎপরে আর একটি মণ্ডপ ও ধর্মশালা। অষ্টম বাঁকের পর হনুমানজীর



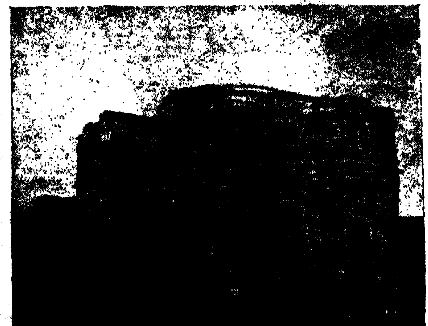
অম্বররাজ মানসিংহ

মন্দির ও সন্ত-নিবাস। এই স্থানের দক্ষিণদিকের পথ দিয়া পর্বত-শৃঙ্গের উপর উঠিলে সূর্য-মন্দিরে যাওয়া যায়। পূর্বোক্ত সন্ত-নিবাস বা সাধুগণের থাকিবার স্থানের পরেই গল্‌তা-ঘাট অর্থাৎ এই স্থান হইতে আবার পর্বতের নিম্নভাগে পূর্বদিকে নামিয়া গল্‌তার গাদী বা রামানন্দি-সম্প্রদায়ের পীঠস্থানে যাওয়া যায়। ঐ পথে নামিয়া ষষ্ঠ বাঁকের পর ধর্মশালা ও পদ্মকুণ্ড আছে। উহা ষট্‌কোণাকৃতি ও প্রস্তর-মণ্ডিত জলাশয়। ইহার দক্ষিণে রাজকুণ্ড। তৎপরে একটি বড় ধর্মশালা ও তাহার পরে গালব-মুনির আশ্রম। উক্ত আশ্রমের মধ্যে একটি প্রকোষ্ঠে দক্ষিণভাগে শিব ও পার্বতী-মূর্তি, বামভাগে গালবমুনি, বিষ্ণু ও ব্রহ্মার মূর্তি এবং শালগ্রাম-শীলা অধিষ্ঠিত আছেন। গালবমুনির আশ্রমের সম্মুখে পূর্বদিকে মুনির যজ্ঞকুণ্ড, ইহার জল শৈবালাবৃত। উক্ত কুণ্ড হইতে প্রায় পঞ্চাশটি সোপান অতিক্রম করিয়া নিম্নে আসিলে শিব-মন্দির ও একটি কুণ্ড পাওয়া যায়। এই কুণ্ডের নাম 'সূর্যকুণ্ড'। ইহার চল্লিশ ধাপ নিম্নে 'গোপাল-কুণ্ড' এই কুণ্ডদ্বয় 'গোমুখাধার-কুণ্ড' ও 'পাতালগঙ্গা' নামে কথিত হয়। উহার কিছু নিম্নভাগে হনুমানের মন্দির। উহার পূর্বোত্তরভাগে শ্রীসীতারামের মন্দির ও দক্ষিণে শ্রীগোপাল মন্দির। এই মন্দির দুইটি গল্‌তা-গাদীস্থ রামানন্দি-সম্প্রদায়ের সর্বপ্রধান মন্দির। উক্ত সীতারামের



শ্রীরামানুজাচার্য—পেরেম্বুদুরে অধিষ্ঠিত আচার্যের
প্রকটকালীয় মূর্তি ও বিজয়মূর্তি

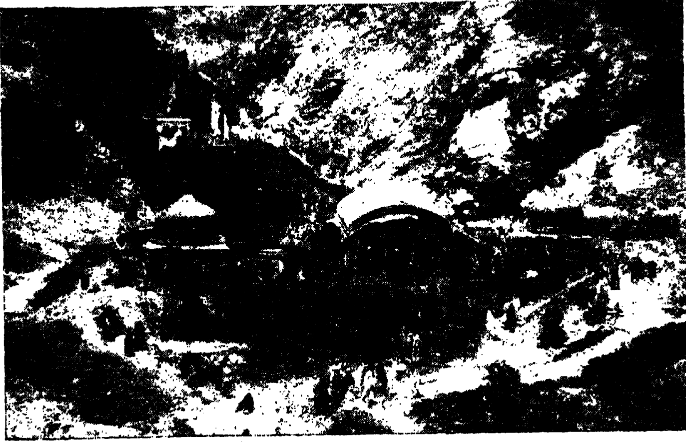
মন্দিরের মধ্যে পাঁচটী মন্দির আছে। তন্মধ্যে (১) শ্রীসীতারাম, (২) শ্রীরঘুনাথ, (৩) শ্রীরামকুমার, এই তিনটি মন্দির পূর্বাভিমুখী এবং (৪) শ্রীনৃত্যগোপাল, (৫) শ্রীরামগোপাল—এই দুইটী মন্দির দক্ষিণাভিমুখী। এই পঞ্চ মন্দিরের পূর্বদিকে 'নাভা-নিবাস' (নাভাদাসজীর গাদী) ও রামানন্দি-সম্প্রদায়ের মহন্তগণের গাদী আছে। আর, দক্ষিণদিকস্থ শ্রীগোপাল মন্দিরের উত্তরাভিমুখে 'শ্রীজ্ঞানগোপাল' (শ্রীরাধাকৃষ্ণ) বিগ্রহ বিরাজমান আছেন। ইহা ছাড়া মন্দিরের চতুর্দিকে বিভিন্ন স্থানে হনুমানের সাতটী মন্দির ও সাতটী কুণ্ড [(১) পদ্মকুণ্ড, (২) রাজকুণ্ড,



শ্রীগোবিন্দজীর ভগ্নচূড় মন্দির—শ্রীবৃন্দাবন।

(৩) যজ্ঞকুণ্ড, (৪) সূর্যকুণ্ড, (৫) গোপালকুণ্ড, (৬) রামকুণ্ড ও (৭) লালকুণ্ড] আছে। এখানে প্রাধান্যতঃ শ্রাবণ মাসে, কার্ত্তিক মাসে, শিবরাত্রিতে, শ্রীরামনবমীতে ও গ্রহণ-যোগে উৎসব হয় এবং মেলা বসে।

রাজস্থানের (জয়পুরের) গল্‌তার গাদীর আচার্য-পরম্পরা এই—১। কীলজী (১৬১৮ সংবৎ), ২। ছোট্-কৃষ্ণদাস, ৩। বিষ্ণুদাস, ৪। নারায়ণদাস, ৫। হরিদেবাচার্য (১৭১৫ সংবৎ) ৬। রামপ্রপন্নাচার্য, ৭। হরিয়াচার্য, ৮। শ্রিয়াচার্য, ৯। জানকীদাস (নামান্তর জানকী-শরণাচার্য, ১৮৪৯ সংবৎ), ১০। রামাচার্য, ১১। সীতারামাচার্য, ১২। হরিপ্রসাদাচার্য (ইনি গৃহস্থ হন), ১৩। হরিবল্লভাচার্য, ১৪। হরিশরণাচার্য (১৯৭৭ সংবৎ), ১৫। রামোদারাচার্য। ইনি বর্তমানে গল্‌তার গাদীর মহন্ত হইয়াছেন, কিন্তু ইনি পূর্ব-মহন্ত হরিশরণাচার্যের সাক্ষাৎ-শিষ্য নহেন ; মাড়োয়ারের লোয়াগড়'-নিবাসী জনৈক রামানন্দি-বৈরাগীর শিষ্য।



গল্‌তা পর্বতে গালবমুনির আশ্রম ও যজ্ঞকুণ্ড



জয়পুর—গল্‌তা পর্বতে গোপালকুণ্ড, বিভিন্ন মন্দির ও রামানন্দীয় গাদী

গল্‌তার গাদীতে বিচার-সভা

ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্যকার শ্রীপাদবলদেব-বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহিত জয়পুরস্থ গল্‌তার গাদীর কোনো ঘটনা-পরম্পরা ক্রমে সংস্পর্শ ঘটিয়াছিল। ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দজীর মন্দির আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিলে মন্দিরের সেবক-সম্প্রদায় শ্রীগোবিন্দ-দেবকে রাজস্থানে মির্জা রাজা প্রথম জয়সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র রামসিংহের সেবাশ্রয়ে স্থানান্তরিত করেন। শ্রীগোবিন্দজী রাজস্থানে নীত হইবার পূর্বে শ্রীরাধাকুণ্ডে ও কাম্যবনে ছিলেন। ১৬৯১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজধানী অম্বর হইতে প্রায় পাঁচ-ক্রোশ দূরবর্তী 'গোবিন্দপুরা'-পল্লীতে (শ্রীগোবিন্দজীর নামানুসারে পরবর্তিকালে খ্যাত) শ্রীগোবিন্দজীর অবস্থানের প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৬২৬ শকাব্দার মাঘী শুক্লা ষষ্ঠিতে (=১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে) শ্রীলবিশ্বনাথ-চক্রবর্তি-ঠাকুর শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবতের সুপ্রসিদ্ধ 'সারার্থদর্শিনী'-টীকা সমাপ্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারই ছাত্র শ্রীপাদবলদেব-বিদ্যাভূষণ ১৬৮৬ শকাব্দায় (=১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে) শ্রীশ্রীরূপগোস্বামিপাদের স্তবমালার টীকা রচনা করেন। সবাঈ-জয়সিংহ (দ্বিতীয়) ১৭৫৭ বিক্রম-সংবৎ (=১৭০০ খ্রীঃ) হইতে ১৮০০ বিক্রম-সংবৎ (=১৭৪৩ খ্রীঃ) পর্যন্ত জয়পুরের রাজসিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। শ্রীগোবিন্দজীর ১৭৭১ বিক্রম-সংবতে (=১৭১৪ খ্রীঃ) অম্বরে অবস্থান এবং তথা হইতে ১৭৭৩ বিক্রম-সংবতে (=১৭১৬ খ্রীঃ) জয়পুরের 'চন্দ্রমহল'-রাজপ্রাসাদের সম্মুখভাগে 'সূর্যমহলে' অধিষ্ঠিত হইবার প্রমাণ পুরাতন কাগজপত্র হইতে পাওয়া যায়। শ্রীগোবিন্দজীর সেবা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণগণই শ্রীবৃন্দাবনের প্রথানুযায়ী করিতে থাকেন। পৈহারী-কৃষ্ণদাসজীর অনুগত অম্বরাধিপতি পৃথ্বীরাজের সময় হইতে রাজস্থানের রাজন্যবর্গের উপর গল্‌তার গাদীর

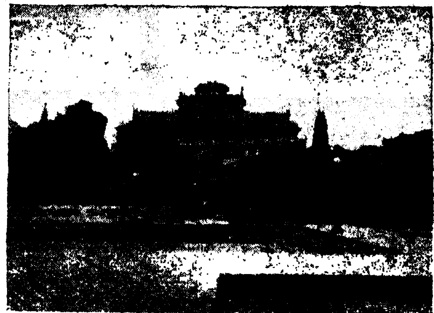
রামানন্দি-শাখার বৈষ্ণব-মহন্তগণের প্রবল আধিপত্য চলিয়া আসিতেছিল। জয়পুর-নরেশের প্রাসাদের অভ্যন্তরে গৌড়ীয়ার ঠাকুর শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয়গণের পদ্ধতি অনুযায়ী পূজিত হইতেছেন জানিয়া গল্‌তার গাদীস্থ মহন্তগণ তাঁহাদের অনুগত তদানীন্তন জয়পুর-নরেশকে জানাইলেন,—গৌড়ীয়গণ চতুঃসম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহেন; সুতরাং তাঁহাদিগকে শ্রীগোবিন্দজীর সেবাধিকার প্রদান করা উচিত নহে।১ ইহার কিছুকাল পূর্ব হইতে উত্তর-ভারতে একটা সাম্প্রদায়িক আন্দোলন সুরু হয়। শ্রীরামানন্দস্বামীর পর চতুর্থ-অধস্তন (রামানন্দ, অনন্তানন্দ, কৃষ্ণদাস, অগ্রদাস তচ্ছিষ্য নাভাদাস) শ্রীনাভাদাসজী (প্রায় ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম) তৎকৃত হিন্দী-ভক্তমালে চারিটি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে যে ছপ্পর ও দোঁহা রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি প্রথমে হরির চব্বিশ অবতার এবং তাহা হইতে কলিযুগে চতুর্ব্যূহ-রূপ চারিজন বৈষ্ণব আচার্যের অভ্যুদয়ের কথা বলিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে শ্রীরামানুজ—সর্বকামপ্রদ কল্পবৃক্ষ, শ্রীবিষ্ণুস্বামী—সংসার-সমুদ্র-উত্তরণের পোত (জাহাজ), শ্রীমধ্বাচার্য—ভক্তি-জলবর্ষণকারী মেঘ এবং শ্রীনিম্বার্ক—অজ্ঞান-কুজ্ঝটিকা-নিবারক সূর্য-সদৃশ। ইঁহারা চারিজন ভাগবত-ধর্মের স্থাপন-কারী এবং যথাক্রমে শ্রী-সম্প্রদায়, রুদ্র-সম্প্রদায়, ব্রহ্ম-সম্প্রদায়, ও সনকাদি-সম্প্রদায়ের আচার্য।২ সুতরাং উক্ত চারিজন বৈষ্ণবাচার্যের প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিচয়-পত্র প্রদর্শন করিতে না পারিলে কেহই বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী বলিয়া দাবী করিতে পারিতেন না। ডক্টর ফরকুহার সাহেব মনে করেন,—প্রায় ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর ভারতে চারি সম্প্রদায়ের ঐরূপ পরিকল্পনা প্রথমে রূপ গ্রহণ করে।৩

বালানন্দজী

সবাঈ-জয়সিংহের (দ্বিতীয়) রাজত্বকালে (১৭০০—১৭৪৩ খ্রীঃ) রামানন্দ-শিষ্য সুর-কুরানন্দের শাখায় (রামানন্দের পর ১০ম অধস্তন) গোবর্ধনবাসী ব্রজানন্দের প্রধান ও প্রবল প্রতাপশালী শিষ্য বালানন্দ (জন্ম—১৬৬৩ খ্রীঃ) চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদল-সংগঠন করেন। কথিত হয়, বালানন্দজী জয়পুর-নরেশের সেনাবাহিনীকে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা দান করিয়াছিলেন। কালান্তরে সেই সৈন্যগণ এক একটি সাম্প্রদায়িক আখড়ায় পরিণত হয়। বালানন্দ ১৭২৯ বিক্রম-সংবতে (=১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে) প্রয়াগে ও অন্যান্য স্থানে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আখড়া স্থাপন করেন। কেহ কেহ তাঁহাকে বর্তমানাকারে প্রকাশিত কুম্ভমেলার প্রবর্তক বলিয়াও মনে করেন। ১৮৮০ সংবতে (=১৮২৩ খ্রীঃ) লিখিত জয়পুরস্থ বালানন্দ গাদীর একটি দোঁহা হইতে এইরূপ জানা যায়;—

> স্বামী বালানন্দকো বল যশ তেজ প্রতাপ।
> দশনামী গোসাঈ সব ডরকর করত মিলাপ॥
> সম্প্রদায় চারোঁ জুটী রহেঁ জু লস্কর সঙ্গ।
> পরী ছাপ জব লস্করী বহুবিধি জীতে জঙ্গ॥
> দ্বারা অখাড়া বাঁধিয়াঁ স্বামী বালানন্দ।
> দ্রাবিড় দেশকে ধর্মকো উত্তর প্রগট সুছন্দ॥৪

জয়পুরে 'চাঁদপোল দরজা' নামক পল্লীতে অদ্যাপি 'বালানন্দজীকো আখড়া' অর্থাৎ বালানন্দের গাদী দৃষ্ট হয়। শ্রীবালানন্দ ও তদানীন্তন গল্‌তা মঠাধীশ শ্রীগোবিন্দজীর সেবাধিকারী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকে জানান যে—তাঁহারা যে পর্যন্ত চারিটি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের কোনো একটির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিচয়-পত্র এবং স্বসম্প্রদায়ের ভাষ্য প্রদর্শন করিতে না পারিবেন, সে পর্যন্ত তাঁহারা শ্রীগোবিন্দজীর সেবাধিকার লাভ করিতে পারিবেন না। এই বিষয়ের মীমাংসার জন্য জয়পুর নরেশ চারি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব পণ্ডিতগণের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণের একটি বিচার-সভা আহ্বান করিবার প্রস্তাব করেন।



চন্দ্রমহল—জয়পুর রাজপ্রাসাদ

শ্রীগোবিন্দভাষ্য

এই সংবাদ শ্রীধামবৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তদানীন্তন প্রধান ও বর্ষীয়ান্ আচার্য শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদের কর্ণগোচর হইল। তিনি তাঁহার নবোৎসাহী ছাত্র শ্রীবলদেবকে শ্রীকৃষ্ণদেব প্রমুখ কতিপয় বৈষ্ণব পণ্ডিতের সহিত জয়পুর পাঠাইলেন। গলতার পণ্ডিত সভায় উপস্থিত হইয়া শ্রীবলদেব প্রথমে বলিলেন,—গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের মূল প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতকেই বেদান্তসূত্রের ভাষ্য বলিয়া

১। এই ঘটনা ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন।

২। হিন্দী-ভক্তমাল, ২৯ সংখ্যা, ২৪০ পৃষ্ঠা; লক্ষ্ণৌ ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ।

৩। About A. D. 1500, if we may hazard conjecture; the theory of the four sampradayas took shape in the North.—An outline of the religion of India—by Dr. J. A. N. Farquhar, 1920, page 327.

৪। শ্রীবৈষ্ণবমতাব্জ ভাস্কর, পরিশিষ্ট ভাগ ১০১ পৃষ্ঠা, ৭১-৭৯ পয়ার; প্রয়াগ ১৯৮৪ সংবৎ।

নিরূপণ করিয়াছেন ; শ্রীজীব গোস্বামিপাদ-কৃত ষট্‌সন্দর্ভই তাহার প্রমাণ। কিন্তু ভিন্ন সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণের এই কথায় মন মানিল না। তাঁহারা গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বেদান্তভাষ্য গ্রন্থ দেখিতে চাহিলেন। তখন শ্রীবলদেব অনন্যোপায় হইয়া কয়েক দিনের মধ্যেই স্ব-সম্প্রদায়ের ভাষ্য দেখাইবেন বলিয়া সভায় প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং এই সঙ্কটে শ্রীগোবিন্দজীর শরণাপন্ন হইলেন। শ্রীগোবিন্দজীর স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীবলদেব অতি অল্পকালের মধ্যেই 'গোবিন্দভাষ্য' নামক ব্রহ্মসূত্রভাষ্য রচনা করিলেন। গল্‌তার পণ্ডিত-সভায় সেই ভাষ্য প্রদর্শিত হইল এবং বৈষ্ণব পণ্ডিতমণ্ডলী তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীবলদেবকে 'বিদ্যাভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করিলেন। শ্রীবলদেব তৎকৃত বেদান্ত-ভাষ্যের উপসংহারে ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"বিদ্যারূপং ভূষণং মে প্রদায় খ্যাতিং নিন্যে তেন যো মামুদারঃ।
শ্রীগোবিন্দস্বপ্ননির্দিষ্টভাষ্যো রাধাবন্ধুর্বন্ধুরাঙ্গঃ স জীয়াৎ॥"

অর্থাৎ যে মহান্‌ দাতা আমাকে 'বিদ্যারূপ' ভূষণ প্রদান করিয়া সেই 'বিদ্যাভূষণ' নামের দ্বারা আমার খ্যাতি লাভ করাইয়াছেন এবং শ্রীগোবিন্দমূর্তিতে আমার নিকট স্বপ্নযোগে বেদান্তরূপ নিজ বিগ্রহের ভাষ্য নির্ণয় করিয়াছেন, সেই রম্যমূর্তি শ্রীরাধানাথ শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন।

সেই সময় হইতেই জয়পুর, গল্‌তা, করৌলী, শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতির সেবাধিকার গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণেরই দৃঢ়ীকৃত হইল। কথিত হয়, গল্‌তা পর্বতের নীচে যে শ্রীবিজয়গোপাল-মূর্তি অধিষ্ঠিত আছেন, তাহা শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের স্থাপিত। বর্তমানে এই মূর্তির সেবা রামানন্দি-সম্প্রদায়ের দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে।

শিক্ষা-সমস্যা

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-টি

শিক্ষাটা বর্ত্তমানে সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। তাহা লইয়া দেশের 'মহাশয়' ব্যক্তিগণ যথেষ্ট চিন্তা করিতেছেন, মাঝে মাঝে সংবাদপত্রাদিতে প্রবন্ধাদিও প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলি সাগ্রহে পাঠ করিয়া বার বার মনে হইয়াছে সমস্যাটা কি তাহা সঠিক ভাবে কেহই অনুধাবন করেন নাই। নানা রূপ কমিটি নানা রূপ রিপোর্ট দিতেছেন—কেহ বলিতেছেন পাঠ্য-বিষয় বদলাইতে হইবে, কেহ বলিতেছেন শিক্ষকগণের পঠন-শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন ইত্যাদি। আজ বিশ বৎসর শিক্ষকতা করিয়া বহু পরিবর্ত্তনই দেখিলাম, দেখিতেছি,—আমার বিশ্বাস কোনরূপ শিক্ষাপদ্ধতি, কোনরূপ পাঠ্য দিয়াই বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে না ; কারণ প্রকৃত সমস্যাটা শিক্ষা-বিষয়ক নহে। সেকেলে প্রবর্ত্তিত কেরাণী সৃষ্টির জন্যে যে শিক্ষা ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে চালু হইয়াছিল, আজও প্রায় তাহাই আছে, তথাপি উনবিংশ শতাব্দীতে এই শিক্ষা লাভ করিয়াই অনেক বাঙালী বিশ্ববরেণ্য হইয়াছেন এবং অনেক বাঙালী ভারতে আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন কিন্তু সবই আছে অথচ আজ বাঙ্গালীর এ দশা কেন? কাজেই শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি থাকিলেও তাহা একমাত্র কারণ নয়। রোগটা প্রত্যক্ষ করিতেছেন অনেকেই, কিন্তু কারণটা অজ্ঞাত। আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আমরা যাহা দেখি তাহাই বিচার করি—তাহা 'মহাশয়' ব্যক্তিগণের কাজে লাগিতেও পারে সেজন্য তাহা লোকসমাজে জানাইতেছি। দূর হইতে জিনিষ ছোট দেখায়, কিন্তু নিকট হইতে বৃহৎ দেখা যায়। আমরা নিকট হইতে দেখি—আমার ব্যক্তিগত ভাবে দৃঢ় ধারণা এই যে শিক্ষা-সমস্যা কিছু নাই,—ইহা বর্ত্তমান সামাজিক সমস্যার একটি প্রতিচ্ছবি বা অঙ্গ মাত্র। কেন তাহাই বলিতেছি—

সাধারণ একটি ছাত্রের শিক্ষা কি ভাবে হয় তাহার খোঁজ অনেকেই জানেন না। পিতার আদেশে রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসিল, বিদ্যা বা শিক্ষার জন্যে নহে। পাশ করিলে ভবিষ্যতে চাকুরী হইবে এই আশায়। কারণ সমাজের মাপকাঠি অর্থ—অর্থই মান-সম্ভ্রম-প্রতিপত্তি দেয়। বিদ্যা, সততা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রভৃতি আজ সমাজে বোকামির নামান্তর মাত্র। উপরি পাওনাটা বুদ্ধির লক্ষণ—সেই জন্যই সংস্কৃত পণ্ডিতগণ আহাম্মক নামে খ্যাত—যেহেতু তাহারা সরল ও সৎ। শিক্ষকগণ বেকুব—যেহেতু তাহারা 'রাম কানাই'এর মত নির্ব্বোধ। বার বৎসর শিক্ষকতা করিলে তাহারা যাহা হয় তাহা সকলেই জানেন। রাম পাঠশালে পড়িতে পড়িতেই এ সব কথা শিখিয়া ফেলিল—এবং শিক্ষকের প্রতি সমস্ত শ্রদ্ধা হারাইয়া অবাধ্য হইল। শিক্ষক লোকটি বোকা, তাহার কথা শুনিবার যে কোন প্রয়োজন নাই তাহা জানা হইয়া গিয়াছে। প্রাথমিক পরীক্ষার কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে আসিল—দাগ-দেওয়া পরীক্ষা দিতে। শিক্ষক মহাশয়ই বলিয়া দিয়াছেন ভাল ছেলে শ্যাম যেখানে দাগ দেয়, সেখানে দাগ দিবি। কোন কোন প্রাথমিক শিক্ষক পরীক্ষা কেন্দ্রে ছাত্রদের একটু সাহায্য করিতে চান এরূপ অনুরোধ আমাকেই করিয়াছেন। রাম অসৎ উপায়ে প্রাথমিক পরীক্ষা পাশ করিয়া হাইস্কুলে আসিল। পাঠশালে সে যাহা শিখিয়াছিল তাহা এখানে আসিয়াও গরমিলে দাঁড়াইল। সে আসে যায় কিছু বুঝে না, বুঝিবার ইচ্ছাও নাই। ইমপর্টাণ্ট প্রশ্নের উত্তর না বুঝিয়া মুখস্থ করে। খোঁজ করে কোন শিক্ষক কোন প্রশ্ন করিয়াছেন—পরীক্ষার পূর্ব্বে তাহার নিকট পড়িতে যায়। কোন কোন শিক্ষকের এ বিষয়ে খ্যাতি থাকে, তাহারা প্রশ্ন পরোক্ষভাবে বলিয়া দেন বা ইমপর্টাণ্ট নামে উত্তর ঠিক করিয়া দেন। তথাপি বার্ষিক পরীক্ষায় ফেল করে, অভিভাবক ক্ষুব্ধ

...টির মেম্বর বা সেক্রেটারীর সুপারিশসহ দেখা করিয়া অনুরোধ ...ন. ছেলেরা ঘরে আগুন দিবে, বাসায় ঢিল ছুঁড়িবে ভয় দেখায়,—ছা...ষা হেডমাষ্টার প্রমোশন দিতে বাধ্য হন। এই রূপে দশম শ্রেণীতে ...। অসৎ উপায়ে পাশ করাটা অভিভাবক (সকলে নহে) অন্যায় ... করেন না, অনেক (সকলে নহে) শিক্ষকও মনে করেন না, বা ...তে বা পেটের দায়ে দেখিয়াও দেখেন না। পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা ...তে যায়—সেখানকার কমিটি চাহেন,—যাক্ না ছেলেরা পাশ করে, ...াকড়ি ক'রলে কেন্দ্রই থাকবে না, কোন স্কুলই ছাত্র পাঠাবে না। ...হারা নকল করাটা তুচ্ছ করেন—এমনও হয় যে টাইপ-করা ট্রানশ্লেসন ...র ঘরে বিতরিত হয়। ছোরার ভয়ে শিক্ষকগণ নকল ধরেন না, কেহ ...হ সাহায্যও করেন। এমনি করিয়া রাম ম্যাট্রিক বা স্কুল ফাইনাল ...শ করে। তাহার পর যেখানে হয় মামার জোরে চাকুরীতে ঢোকে। ...াষ্টাফিসে রাম চাকুরী করিলে পরের মাসিকপত্র বাড়ী লইয়া পড়িবে, ...হবিল তছরূপ করিবে, চিঠি ফেলিয়া দিবে, অনুযোগ করিলে সহি মিলে ...ই বলিয়া সেভিং ব্যাঙ্কের টাকা দিবে না—ইত্যাদি এবং অন্যত্র চাকুরী ...রিলে সুযোগ সুবিধা মত উপরি-পাওনাটা করিবে এবং লোহা কাঠ ...মেণ্ট ধান চাল যাহা পাইবে তাহাই চুরি করিবে—কারণ দায়িত্বজ্ঞান, ...র্ত্তব্যজ্ঞান, সততা, বিদ্যা, বুদ্ধি কোনটাই তাহার নাই—নিজের অজ্ঞতা ...াকিবার জন্য চালিয়াতি করিবে এবং খুব কাজের ভান দেখাইবে।

এহেন রামচন্দ্র উপরি-পাওনা স্ফীত হইলে সমাজের একজন বিশিষ্ট ...্যক্তি হইবেন, স্কুল কমিটির মেম্বর, লাইব্রেরীর সভাপতি ইত্যাদি। ...তাহার পুত্র স্কুলে পড়িতে যায়—পুত্র আসিয়া বলে মাষ্টার তাহাকে ফেল করিয়া দিয়াছে। রামচন্দ্র গর্জ্জিয়া উঠিল—এতবড় সাহস আমার ছেলেকে ফেল করায়? চাকুরীর খাতিরে পরদিন হেডমাষ্টার প্রমোশন দেন। রামচন্দ্র তার পরদিন মাষ্টারকে শিক্ষা দিতে ছোরা শাণিত করে··· ইহাই সামাজিক পরিস্থিতি।

অভিভাবক (সকলে নহে) চাহেন না, ছেলে বিদ্যা বুদ্ধি চরিত্র অর্জ্জন করুক, তাহারা চান পাশ করুক। তাহারাই (অশিক্ষিত হইলেও) স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি বা কর্ণধার, শিক্ষকগণ প্রশ্ন বলিয়া দেন, নকল ধরেন না, কেহ কেহ নকল করাটা অপরাধও মনে করেন না [অবশ্য সকলে নহে—এমন কি বেশী সংখ্যকও নহে)। ছাত্রেরা অসৎ উপায় অবলম্বনকে অন্যায় মনে করে না বরং Chivalry মনে করে। যদি বলেন মিথ্যা কথা—তবে বলিব—আমি জানি (প্রমাণ করিতে পারি না) অনেক শিক্ষক প্রাইভেট ছাত্রকে প্রশ্ন বলিয়া দেন,—নকল ধরেন না। এই সেদিন দেখি ইংরাজিতে সেকেণ্ড ক্লাস একজন এম, এ, কে হলের কর্ত্তা করিয়া পাঠাইলাম,—তিনি নির্ব্বিবাদে ছাত্রগণকে সব বলিয়া দিলেন···বলাটা অন্যায় এ ধারণাই তাঁহার নাই। এই ভদ্রলোক এখন কলেজের প্রফেসর। ইহাই প্রকৃত অবস্থা—অস্বীকার যাহারা করিবেন তাহাদের সঙ্গে আমি একমত নয়—এই দুর্নীতিপূর্ণ সমাজের প্রভাবে স্কুল প্রভাবান্বিত,—এই অবস্থায় বিদ্যার্জ্জন, চরিত্র-সৃষ্টি অসম্ভব, একান্তই অসম্ভব। [illegible] পরিবর্ত্তন ও শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনে কি করিবে? সরিষাও ভুতে পাইলে ভুত ছাড়াইবেন কি দিয়া।

ইহার উপরে আছেন 'মহাশয়' ব্যক্তিগণ—মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ প্রভৃতি। এইবারকার স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষাই তাহা প্রকাশ। Hundred foes can not make a wise dicision কলিকাতায় কয়েকটী ছেলে গোলমাল করিল, আর আ-ইফল—আন্দামান পরীক্ষা বন্ধ হইয়া গেল। অভিভাবকের লক্ষ লক্ষ টাকা জলাঞ্জলি হইল—যাহারা গোলমাল করিল, —তাহারা আস্কারা পাইল এবং ঠিক বুঝিয়া লইল, হল হইতে হৈ হৈ করিয়া বাহির হইলেই পরীক্ষা বন্ধ করা যায় এবং অতঃপর সর্ব্ববিধ প্রশ্নই অত্যন্ত কঠিন হইবে। তাহার পরেও আবার প্রশ্ন বাহির হইয়া গেল—অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রেরই সগোত্র যাহারা, তাহারা ভাই-ভাইপোকে প্রশ্ন বলিবেন না কেন? অর্থাৎ বর্ত্তমান সমাজ চাহে না, ছেলেরা মানুষ হোক, সমাজ চায় তারা পাশ করিয়া চাকুরী করুক, শিক্ষকগণ চালে পড়িয়া বা শিক্ষারগুণে চাকুরী রক্ষা করেন, শ্রীরামচন্দ্রের সগোত্রবর্গচালিত কর্ত্তৃপক্ষ, এবং রামের সগোত্রগঠিত সরকারী বা পর্ষ্যৎ কর্ম্মচারী মহল অক্ষম। এই অবস্থায় যে কোন রকম শিক্ষাই অসম্ভব।

কংগ্রেস সরকারই হোক্, সমাজতন্ত্রী বা সাম্যবাদী সরকারই হোক যদি কর্মীগণ অক্ষম, সততা ও কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন হয়—তবে সাধারণের দুঃখ ঘুচিতে পারে না, দেশের উন্নতি হইতে পারে না। নিজের ছেলে যখন উপরি-পাওনা করিতে পারে না—তখন বোকা বলিয়া আমরা তিরস্কার করি, কিন্তু যখন দায় পড়িয়া ঘুষ দিতে হয় তখন সরকার ও সরকারী কর্ম্মচারীর চতুর্দ্দশ পুরুষের উদ্ধার করি—আশ্চর্য্য!

রামচন্দ্রের ইতিহাস দ্বারা দেখাইতে চাহিয়াছি, যে শিক্ষা-সমস্যা বলিয়া কিছু নাই—সামাজিক-সমস্যারই ইহা একটা অঙ্গ মাত্র। এই সমাজ সংস্কৃত না হইলে শিক্ষা ব্যবস্থার কোন উন্নতি হইতে পারে না। অথচ বেশীদিনের কথা নয়, আমরা তখন ছাত্র (৩০ বছর আগে) একটি ছেলে নকল করিয়া ধরা পড়ায় অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া স্কুল ত্যাগ করিয়াছিল। আমরা নকল করার কথা চিন্তাও করিতে পারি নাই। আর আজ ভাল মন্দ ছেলে বলিয়া কিছু নাই, প্রায় সকলেই সুযোগ পাইলে নকল করে।

সে সময়ে হেড-মাষ্টার মহাশয়ের নিকট প্রমোশনের জন্য অভিভাবক যাইতে পারেন একথা কল্পনাও আমরা করিতে পারিতাম না। কিন্তু কেন এমন হইল?

দুইটি মহাযুদ্ধে অবশ্য পৃথিবীরই নৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, তথাপি ভারত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ভারতবর্ষ যেদিন আর্য্যধর্ম্মের ত্যাগ-মূলক সভ্যতা ত্যাগ করিয়া নতুনের মোহে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল, সেইদিনই সে নৈতিক বলে হারাইয়াছিল। শাসক-পালক জমিদার হইল শোষক, পীড়ক—গ্রাম হইল অবজ্ঞেয়, স্বার্থের উচ্ছ্বল্য গ্রাম শোষণ করিয়া নগরকে স্ফীত করিল। Industrialisation এর কৃপায় অর্থই হইল পরমার্থ,—আমরা জীবনের সমস্ত সৌজন্য ত্যাগ করিয়া চিনিলাম অর্থ, কিন্তু পশ্চাত্যের নাগরিকতা বোধ ও কর্ত্তব্য

নিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে পারিলাম না। অথচ বহু সম্বন্ধ বিশিষ্ট সমাজের ত্যাগও নিষ্ঠা ও সততাকে হারাইলাম। দুই নৌকায় পা দিয়া ডুবিতেছি—শিল্প প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বেকার সমস্যা ও দুর্নীতি বাড়িয়াই চলিতেছে। সেদিন একখানা দৈনিকের সম্পাদকীয় স্তম্ভে একটা ঘটনার উল্লেখ দেখিলাম কোন বাঙালী ছাত্র লণ্ডনের নিকটে কোন গৃহস্থের সঙ্গে বাস করিতেন। গৃহস্থ হাসপাতালে দুধ সরবরাহ করেন। একদিন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দুগ্ধ সংগ্রহ করিতে না পারিয়া গৃহস্থ বিমর্ষ, তখন বাঙ্গালী ছাত্র বলিলেন—ও সামান্য যেটুকু কম আছে জল দিয়ে ভরে দিন। গৃহকর্ত্রী কহিলেন—এখনও তোমাদের ১১০ বছর পরাধীন থাকা উচিত ছিল। হাসপাতালের রোগীর পথ্য—তাহাতে জল দিব এমন কথা উচ্চারণ করিতে পারিলে!—পাশ্চাত্য জগত কেন বাঁচিয়া আছে, আর আমরা কেন মরিয়াছি তাহা এই গল্পে সুস্পষ্ট প্রতিভাত। মরিয়াছি এবং মরিতে যাইতেছি তাহা সত্য কিন্তু উপায় কি?

আজ চারিপাশে ডিমোক্রেসির জয়ধ্বনি উঠিতেছে—অবশ্য মণীষী-বার্ণাড শ' বলিয়াছেন A Government by the people, for the people and of the people is as impossible as an army of field Marshals, ডিমোক্রেসি কেবল সেই ছেলেই চলিতে পারে যে দেশের জনসাধারণের নাগরিকতার জ্ঞান আছে,—এই কুশিক্ষিত দেশে চলিতে পারে এমন ধারণা বহু লোকেরই আছে কিন্তু আমার ন্যায় নির্ব্বোধের ন্যাই। এই অবস্থা হইতে স্বৈরাচারও ভাল, যদি স্বৈরাচারী ব্যক্তির কাণ্ডজ্ঞান ও কর্ত্তব্য বুদ্ধি ও সততা থাকে। জীবনের প্রান্ত সীমায় আসিয়া আজ মনটা কেবলই তারস্বরে বলে,—শিক্ষকতা ব্যতীত যদি কোন উপায়ে উদারান্নের সংস্থান করিতে পারিতাম! এই সংস্কার বিবেক শিক্ষাও বুদ্ধির বিরুদ্ধে কাজ করিয়া উদারান্ন সংস্থান করা আজ সত্যই দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে।

সমাধান কোথায় এই কথা চিন্তা করিয়াছি,—বহুবিদেশের শিক্ষাপদ্ধতি লইয়া মাথা ঘামাইয়াছি, কিন্তু সমাধান নাই বলিয়াই মনে হয়—তথাপি যাহা মনে হয় তাহাই বলিতে চাই—

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা হাস্যকর। কর্ত্তা নানা জন—সঙ্গতি নাই। পথও নাই। ৩২ হাজার টাকা ব্যয়ে Basic school হইল—ছাত্র ১৬ জন, শিক্ষক চারজন—মাসিক ব্যয় ২৬০৲। Special cadreএ জনৈক শিক্ষক এক মাইনর স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক ৭০৲ টাকায় নিযুক্ত হইয়া আসিলেন—উক্ত স্কুলেরই প্রধান শিক্ষকের বেতন ৫৫৲ টাকা। এরূপ হাস্যকর অবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই হইয়াছে।

যাহা হউক আমার স্থূল বক্তব্য এই যে, বর্ত্তমান সমাজের পরিবর্ত্তন না হইলে শিক্ষাপদ্ধতির উন্নতি সম্ভব নহে। কিন্তু সমাজের পরিবর্ত্তন করিবে কে? সেজন্য মানুষ সৃষ্টি করা প্রয়োজন—অথচ বিদ্যালয়ে মানুষ সৃষ্টির উপায় নাই। আজকার ছাত্র কালকার নাগরিক—কাজেই সমস্যা দুরূহ। এক্ষেত্রে ছাত্রকে সমাজের দুর্নীতিপূর্ণ পারিপার্শ্বিকতা হইতে বিচ্ছিন্ন করা ছাড়া পথ নাই। শিশুকে সমাজের বা পরিবারের বাহিরে আনিয়া শিক্ষা দিতে পারিলে কিছুটা সফলকাম হওয়া যায় যদিও তাহা সর্ব্বথা সম্ভব নয়—কারণ মন-বিজ্ঞানের বলে শিশু পিতামাতার নিকট হইতে দূরে গেলে ভাল হয় না! নানারূপ মানসিক ব্যাধির সম্ভাবনা। তথাপি উপায় কি? যত ব্যয়ই হৌক অন্ততঃ মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্ত ভার সরকারের গ্রহণ করা দরকার—কারণ এই বয়সটাই adolesence এবং চরিত্র এই সময়ই গড়িয়া উঠে। সমাজ ও পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে আবাসিক বিদ্যালয়ে আনিতে হইবে এবং সামরিক বিদ্যালয়ের কঠোরতা ও উপযুক্ত শিক্ষকের স্নেহ যত্নের মধ্যে রাখিয়া চরিত্রবান ও কর্ত্তব্যবোধসম্পন্ন করিয়া গড়িতে হইবে। আবাসিক বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার সরকার বহন করিবেন—অভিভাবকগণকেও বহন করিতে হইবে। তাহাতে বিদ্যালয়-সংখ্যা হ্রাস পায় তাহাও ভাল, কারণ কুশিক্ষা হইতে অশিক্ষা ভাল। সরকার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন না করিলে তাহার ফল হইবে এই যে, বড়লোকের গাধাছেলেও স্থান পাইবে কিন্তু গরীবের ভাল ছেলেও স্থান পাইবে না। বর্ত্তমান ষষ্ঠশ্রেণী পর্য্যন্ত প্রাথমিক ও সপ্তম হইতে আই-এ পর্য্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। বর্ত্তমানে বেশীর ভাগ বিদ্যালয় পল্লীঅঞ্চলে, সেখানকার বিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ যথেষ্ট শিক্ষিত নয়—এবং সে কমিটি বিদ্যালয়ের উপকার করেন না এমন নয়, তবে উপকার হইতে অনেক-ক্ষেত্রেই অপকার বেশী করেন। এ সকল বিদ্যালয় থাকে থাকুক—কিন্তু আবাসিক বিদ্যালয়ের মান উন্নত হইলে ইহাদেরও সুর ফিরিয়া যাইবে। সমাজের বাহিরে আসিয়া সত্যিকার শিক্ষালাভ করিয়া ছাত্রগণ যখন জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বিজয়গৌরবে সমাজের বুকে ফিরিয়া যাইবে, তখন সমাজেরও কল্যাণ হইবে এবং সমাজের চিন্তাধারারও পরিবর্ত্তন হইবে। বর্ত্তমানের ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্দ্ধে সমাজ তখন সামগ্রিক স্বার্থের কথা চিন্তা করিতে শিখিবে।

সাধারণতঃ দেখা যায় কতকগুলি বড়লোকের দুষ্ট ছেলে ছাত্রদলকে নষ্ট করে—সেরূপ ছাত্র সংখ্যায় নগণ্য, অথচ তাহারাই ছাত্র সমাজকে কুপথে চালিত করে এবং বাহবা পায়। অতএব শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রধান-শিক্ষক ও শিক্ষকগণকে প্রভূত ক্ষমতা দিতে হইবে—যাহাতে কোনরূপ কারণ না দর্শাইয়া তাহারা যে-কোন ছাত্রকে বহিষ্কৃত করিতে পারেন। অবশ্য বর্ত্তমানেও প্রধান-শিক্ষককে বহু ক্ষমতা খাতায়পত্রে দেওয়া আছে কিন্তু বাহিরের প্রভাবে তিনি তাহা প্রয়োগ করিতে পারেন না—যেহেতু স্ত্রী-পুত্র লইয়া তাঁহাকে বাস করিতে হয় এবং জীবনের ভয়ও আছে। ডিসেম্বর মাসে হেডমাষ্টারকে প্রায়শঃই খুন করিবার বা বাসায় আগুন লাগাইবার নোটিশ দেওয়া হয়, চরিত্রবান ছাত্র কেহ কেহ গুরুপত্নীকে আকাঙ্ক্ষা করিয়াও উড়ো চিঠি ছাড়েন—এসব ঘটনা বিরল নহে, তথাপি শিক্ষকদিগকে নিষ্ক্রিয় থাকিতে হয়। অবশ্য স্বৈরাচারী হেডমাষ্টার অন্যায় করিতে পারেন, কিন্তু তাহাও বর্ত্তমানের অপেক্ষা ভাল। শিক্ষকগণের শৈথিল্য বা অসুবিধা সম্বন্ধে হেডমাষ্টারের মন্তব্য অবশ্য গ্রহণীয় হইবে—নচেৎ কাজ হইতে পারে না। এরূপ ব্যবস্থায় হয়ত অত্যাচারী প্রধান-শিক্ষক অন্যায় করিবেন, কিন্তু তাহার সংখ্যা খুব বেশী হইবে মনে হয় না। আবাসিক বিদ্যালয়ে প্রত্যেক ছাত্রের

নামে একখানি বহি থাকিবে—তাহাতে তাহার সকলপ্রকার সুকর্ম্ম ও অপকর্ম্ম লিখিত থাকিবে এবং সেই বহি ও প্রধান-শিক্ষকের অনুমোদন ব্যতীত কেহ কোথায়ও চাকুরী পাইবে না, বা উচ্চশিক্ষালাভ করিতে পারিবে না। এই কঠোরতার উদ্দেশ্য ইহাই নহে যে ইহা চিরদিন চলিবে—অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিলেই কঠোরতা হ্রাস করা যাইতে পারে।— কমিশনের রিপোর্টে শিক্ষকগণের সামাজিক মর্য্যাদা বৃদ্ধির সুপারিশ করা হইয়াছে, কিন্তু বেতন ও ক্ষমতা বৃদ্ধি ব্যতীত কথায় বা লেখায় তাহা হইতে পারে না। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সম্মানার্হ, তাহার একমাত্র কারণ তাঁহার বেতন ও ক্ষমতা প্রচুর। তিনি স্কুলে আসিলে শিক্ষককে হাত কচলাইয়া হুজুর হুজুর করিতে হয়—ছাত্ররা দাঁড়াইয়া দেখে আর হাসে। ইহাতে শিক্ষকের মর্য্যাদাবৃদ্ধি হইতে পারে না—

প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিলে আপত্তির কিছু নাই, কিন্তু মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা উপযুক্ত পাত্রেই পড়া আবশ্যক —কারণ তাহারাই ভবিষ্যতের নাগরিক ও সমাজের কর্ণধার। তাহারা দুর্নীতিপরায়ণ ও মেরুদণ্ডহীন হইলে দেশের নিস্তার নাই। দেশে সত্যিকার মানুষ না জন্মাইলে দেশ উন্নত হয়না,—একথা সর্ব্ববাদিসম্মত অথচ বর্ত্তমান সরকার মানুষ সৃষ্টির জন্যে বা শিক্ষার জন্যে ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত—এবং তাহাকে গৌণ বলিয়া সরাইয়া রাখিয়াছেন ; কিন্তু এইটিই সর্ব্বাগ্রে গ্রহণীয় সমস্যা। উপযুক্ত মানুষের হাতে কর্ম্মভার না দিতে পারিলে তাহাদের সমস্ত সদিচ্ছা জলে ভাসিয়া যাইবে।

এই গেল সাধারণ অবস্থা ; তাহা ছাড়াও বর্ত্তমান সিলেবাস বা পাঠ্য-বিষয় এমন নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে অর্থ-পুস্তকের সহায়তায় ইংরাজি বাংলা ইতিহাস, ভূগোলে কিছুমাত্র জ্ঞান সঞ্চয় না করিয়া কেবল মুখস্থ বিদ্যায় পাশ করিতে পারে এবং আমরা পাশ করাইতেছি। আমরা জানি যাহারা পাশ করিতেছে তাহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ সামান্য ইংরাজির অর্থ বুঝে না বা দুইটি বাক্য শুদ্ধভাবে লিখিতে পারে না—কিন্তু কতকগুলি প্রশ্ন মাত্র মুখস্থ করিয়া রাখে এবং তাহাই ভাঙ্গাইয়া চুরাইয়া ৩৬ নম্বর পায়। অবশ্য অসাধুতা চলিলে সবরকম সিলেবাসই নিষ্ফল। তথাপি বর্ত্তমান অবস্থা Crammingকে উৎসাহ দিতেছে। ইতিহাস-প্রশ্ন এইবার খুব কঠিন হইয়াছে—কঠিন কথাটার বর্ত্তমান অর্থ বাঁধাধরা প্রশ্নের বহির্ভূত। আই, এ, এস্‌, প্রভৃতি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বাঙালীর স্থান নাই,—তাহার কারণ সিলেবাস ও পরীক্ষায় অসাধুতা। রবীন্দ্রনাথ যাহাকে 'স্বাধীন শিক্ষা' বলিয়াছেন তাহার এককণা অনুশীলনের স্থান বিদ্যালয়ে নাই। অতএব সিলেবাসের আমূল সংস্কার দরকার—তাহার মধ্যে প্রধান বিষয় হওয়া উচিত ছেলেরা নিজেরা লিখিতে বা অর্থবোধ করিতে পারে না। কাজেই free-composition এর জন্য অন্ততঃ শতকরা পঞ্চাশ বা পঁচাত্তর নম্বর থাকা দরকার,—পাঠ্যপুস্তক থাকিতে পারে আদর্শ হিসাবে কিন্তু তাহা অবশ্য-পরিক্ষণীয় না হইলেও ক্ষতি নাই। ইহা ব্যতীত আইন করিয়া অর্থপুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন—যেটুকু অর্থ বা নোট একান্তই প্রয়োজন তাহা মূল পুস্তকের সহিতই দেওয়া যাইতে পারে। অর্থপুস্তক কেবলমাত্র যে Cramming সহায়ক তাহাই নহে, তাহা ছাত্রদের মনন-শক্তি, (Originality) নষ্ট করিয়া দেয়। ছাপার হরফে যাহা লেখা আছে তাহার প্রতি সাধারণের মোহও প্রচুর—এমনকি ভুল ছাপা আছে তাহা দেখাইয়া দিলেও ছেলেরা শিক্ষকেরই বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে। ১৯২৫এর পূর্ব্বে পরীক্ষার ধরণটা অন্ততঃ ছাত্রদের মনন-শক্তিকে উন্নত করিত এবং কিছুটা ভাষাজ্ঞানও সৃষ্টি করিতে পারিত। যাহা হউক এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্র ইহা নহে,—সেজন্য পণ্ডিত ব্যক্তিগণ রহিয়াছেন।

বর্ত্তমানে ঘাটতি-পূরণ-পদ্ধতিতে যে সরকারী সাহায্য দেওয়া হয় তাহা শিক্ষকদের বেতন প্রভৃতিকে কতকটা আয়ত্তাধীন করিয়াছে বটে এবং বিদ্যালয়ের স্থিতিরও সহায়ক সন্দেহ নাই, কিন্তু বৃদ্ধির অন্তরায়। বিদ্যালয়ের কি প্রয়োজন সে বিষয়ে ইনস্‌পেকটরগণ উদাসীন, তাহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য কিসে কাটিয়া কুটিয়া সকলকে কম দেওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করা। অন্যান্য দেশে পরিদর্শনের কার্য্য বিদ্যালয়কে উন্নত ও বৃহৎ করিতে চেষ্টা করে। এদেশে তাহাদের কর্ত্তব্য খুঁৎ ধরা। বর্ত্তমানে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য যদি বিদ্যালয় গৃহের দরকার হয় তবে তাহা করিবার উপায় নাই,—টাকা বাঁধা আছে এবং তাহা নির্দ্দিষ্ট বৎসরে খরচ করিতেই হইবে। বৎসরান্তে টাকাটা পাওয়া যায়, কিন্তু সমগ্র বৎসর শিক্ষকের মাহিনা দিতে হয়। ফলে প্রাইজ দেওয়া, লাইব্রেরীর বই কেনা, এমন কি খেলাধূলা পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া পড়ে। হয় বিদ্যালয়কে পুরা স্বাধীনতা দেওয়া প্রয়োজন না হয় পুরা-পুরী সরকারী হওয়া দরকার—এই মধ্যপন্থাটা বৃদ্ধি ও বিস্তৃতির পরিপোষক নয়। তাহাছাড়া সরকারী অর্থ নানা ভাবে অপচয় হয়, যাহারা তদ্বির করে তাহারা পায়। যারা অসহায় তাহারা পায় না। Industrial School স্থাপনের নামে ১০,০০০ টাকা সরকারী সাহায্য আসিল—কিন্তু স্কুলও নাই, ছাত্রও নাই, এমনকি স্কুলগৃহও নাই—এমন দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এই টাকা আসিবার হেতু স্থানীয় কোন ব্যক্তি বড় সরকারী কর্ম্মচারী এবং বড়লোকের সঙ্গে দহরম মহরম। কলিকাতায় বসিয়া যাহারা শিক্ষাতরীর কর্ণ ধারণ করিয়া আছেন তাহাদের গ্রাম বা মফঃস্বলের কোন ধারণাই আছে মনে হয় না। তাহা থাকিলে ৫০০ ছেলের দুষ্টামীর জন্য ৫৮ হাজার ছাত্রের পরীক্ষা বন্ধ হইত না। গ্রামের একটি ছাত্রের কেন্দ্রে খাই-খরচ বাসাভাড়া প্রভৃতিতে অন্যূন পঞ্চাশটাকা ব্যয় হইয়াছে ; পুনরায় ইতিহাস পরীক্ষা দিতে যদ্যপি হইত আরও দশটাকা ব্যয় হইত। মোটের উপর সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাটা চলিতেছে জোড়াতালি দিয়া, ইহাকে সম্পূর্ণভাবে নূতন সাজে চালিতে হইবে—দেশের প্রয়োজন ও অবস্থা অনুযায়ী। বিলাতী এম, এডগণ বিলাতি সাজে সাজাইলে চলিবে না, সেটা কাফ্রি মেয়ের লিপষ্টিক ব্যবহারের মত হাস্যকর হইবে। ভারতের মাটিতে যে শিক্ষার বীজ নিহিত আছে, সেই শিক্ষা-প্রণালীকে যুগোপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং সরকার যদি তাহা না করিতে পারেন তবে দেশ ডুবিবে —ডুবিতেছে। সত্যিকার নাগরিক যদি না হইল তবে অরাজক ভারতে পাগলের রাজত্ব হইবে এবং ভারত বিক্রিত হইয়া যাইবে। এমন কোন দেশে সম্ভব যে পুরাতন অভিজ্ঞ শিক্ষকগণকে ছাঁটিয়া আজিকার গিন্নি সদ্য বি, এ পাশ গৃহবধূকে পরীক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছে? অনাচারের একটা সীমা আছে—সীমা লঙ্ঘন করিলেই বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। এমন কোন দেশ আছে, যেখানে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার সঙ্গে কোন সংযোগ নাই?

দেশের ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া যে অপ্রিয় স্বীকারোক্তি করিয়াছি তাহা অপ্রিয় তাহা জানি, কিন্তু সত্য সকলেরই পক্ষে প্রযোজ্য এমন নয়, অর্থাৎ সব অভিভাবক, সকল শিক্ষক, সকল কেন্দ্র পরিচালকগণই যে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেন এমন কথা আমি বলি নাই, এবং জানি যাহারা প্রশ্রয়ের পক্ষপাতী এমন লোকের সংখ্যা কম—কিন্তু দ্রুত বাড়িয়া যাইতেছে। গত বিশ বৎসরের মাঝে দুর্নীতির যে ব্যাপ্তি দেখিয়াছি তাহা আর বিশ বৎসরে দেশ ছাইয়া ফেলিবে—যদি না এখনও সাবধান হওয়া যায়। আমার দৃঢ় ধারণা শিক্ষা সমস্যাটা সামাজিক সমস্যারই একটা প্রতিচ্ছবি মাত্র, বর্ত্তমান সমাজ হইতে ছাত্রগণকে পৃথক না করিতে পারিলে সমস্ত প্রচেষ্টা নিষ্ফল হইয়া যাইবে। দেশের সরকারের পক্ষে অবিলম্বে প্রভূত অর্থব্যয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন।



জাগ্রত দেবতা

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

মহানন্দে সদানন্দ পণ্ডিত ঘাড়টা না বাঁকিয়েই হাতটা বাড়িয়ে দিতে যাচ্ছিলেন হুঁকোটা নিতে। মনটা আনচান করছিল দুটো সুখটান দেবার জন্য, কিন্তু তা আর হয়ে উঠলো না। হাঁ হাঁ করে উঠলেন তিনি, তামাকলুব্ধ প্রসারিত হস্ত স্তব্ধ হয়ে গেলো—করছো কি, করছো কি, ভাবতে দাও।

প্রবল যুদ্ধ চলেছে, কিস্তীর পর কিস্তী। গড়গড়ির অর্দ্ধোত্থিত গজরাজ শুণ্ড নামিয়ে সস্থানে বসে রইলেন, পুনর্মুষিক হয়ে দৃষ্টি বিনিময় করতে লাগলেন অপর পক্ষের অশ্বকুলোত্তমের সঙ্গে। দাবামহার্ণবের মত্ত তরঙ্গ প্রবলবেগে ধাক্কা দিচ্ছে স্বস্থানচ্যুত নৌবাহিনীকে।

ডাকাত পড়লেও বুঝি এতটা উত্তেজিত হোত না গাঁয়ের লোকেরা। বাবার স্থানে দাবাটা আজ জমেছে ভাল। পীঠদেবতা পঞ্চানন্দ মনের আনন্দে রাজা ও মন্ত্রীর উত্থান ও পতন দেখছেন, রাজ্যের ভাঙা ও গড়া। কবে তিনি পাষাণত্ব লাভ করেছিলেন সেই মুক্তি-নাট্যের প্রথম অঙ্কের ইতিকথা ভূতত্ত্ববিদরা বলতে পারবেন—কিন্তু পাষাণত্ব ত্যাগ করে সাক্ষাৎ দেবত্বলাভ বেশীদিনের নয়। তিনশো বছরের বটবৃক্ষতলের রঙ্গমঞ্চে পঞ্চানন্দকে প্রবেশ করতে যারা দেখেছিল তারা বেশীদিন পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়নি। তবে একথা ঠিক যে তাঁর বিভূতি বা শক্তি এখন আর গবেষণার বস্তু নয়। মুক্তি দিন আর না দিন, ভুক্তি দেন তিনি। অপুত্রকাদের কাছে তিনি জাগ্রত নিত্য সত্য। একই বিগ্রহে তিনি কখনো ধর্ম্মরাজ, কখনো বা শিবশম্ভুত্রিশূলী, কখনো বা বোঙ্গা ঠাকুর, কখনো বা মহামারীর মার দেবতা হয়ে পুজো পেয়ে এসেছেন।

গড়গড়িরা প্রথম যুদ্ধে লোহা বেচে যখন লাল হয়ে উঠলো, তখন ভালো করে কালো সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছিল বাবার চাতালটা। যাতে পঞ্চাশ ষাটজন লোক একসঙ্গে বসতে পারে, গাঁয়ের যৌথ বৈঠকখানার কাজ চলে যায়। দ্বিতীয় যুদ্ধের পর গঞ্জের বেঁটে মাড়োয়ারীটা ছোট একটা মন্দির তুলে দিলে তার উপর, বসিয়ে দিলে একটা চকচকে ত্রিশূল আর ভাঙা করোগেটেড টিন দিয়ে বানিয়ে দিলে একটা আচ্ছাদন। শত যুগান্ত আগের প্রস্তরীভূত শিলার মধ্যে যে বিগ্রহময় সত্তা আত্মগোপন করেছিল তা কি কেউ জানতো—যদি না কামারদের ছোট-বউ স্বপ্ন পেতো। গড়গড়িদের ধর্ম্মপ্রাণ বিপত্নীক সেজবাবুকে সেই ত প্রথম খবরটা দিলে শেষ রাতে যখন কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর খণ্ডিত চাঁদ ভোরের শুকতারার সঙ্গে মালা বদল করে পালাবে পালাবে করছে। সেই ছিল বাবার প্রথমা উত্তরসাধিকা—তারই কাছে মাদুলী নিতে আসতো কত লোকে দেশ দেশান্তর থেকে—বাবাই নাকি অপুত্রকাদের শেষ আশা। অবশ্য কামারদের ছোটবউ নাকি কিছুদিন পরে বাবার কোপে পড়ে চলে গিছলো কাশী না নবদ্বীপে কোথায়। দুষ্টলোকে বলেছিল যে তার সাগর শুকালো, মাণিক ফুরালো, সকলি গরল ভেল।

বড়ের চালটা সামলাও গড়গড়ি—বলে সদানন্দ সেই যে আত্মপ্রসাদমুখর মুখ ফেরালেন, সে মুখ অনেকক্ষণ আর ঘুরলো না। একসঙ্গে কানে এলো মোটরের হর্ণের শব্দ, আর আকাশের কাড়ানাকাড়ার দামামা আর দ্রিম দ্রিম। দিগন্তে ফুটন্ত তেলের কড়া যেন ফুটে উঠলো চড়বড় করে। আবছা আলোর অন্ধকারে ঝাপসা হয়ে এসেছে যে দিগ্বিদিক্ সেদিকে নজর ছিল না দাবাবিলাসীদের। সূর্য্যদেবের ঠিক পাটে বসার সময় না হলেও হাটের মাঝে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছে অপোগণ্ড মেঘের দল দিগবধূদের ঘোমটা খুলিয়ে। মেঘ-কন্যাদের গায়ে-পড়া ভাব দেখেই লজ্জায় তাকে মুখ লুকুতে হলো—দীর্ঘদীপ্ত দ্বিপ্রহরের রক্তসাক্ষর ঝরা দগ্ধ মুখ। ঈশানে নৈঋতে বৈশাখী বিকেলের বিষাণ মহাআণবিক হিংস্র প্রলাপে মানবদমনে বেজে উঠলো।

সদানন্দ তাকিয়ে বললেন—আরে এই দুর্য্যোগে আবার কে আসে—

বড় বড় ফোঁটায় বেশ ভিজে জবজবে হয়েই পঞ্চানন্দের ভক্তরা সামনের আটচালায় উঠলেন। মোটরটা ততক্ষণে আরো এগিয়ে এসেছে—যে আসছে সে যে দ্বিপদ মনুষ্য-জাতির অন্তর্ভুক্ত সে বিষয়ে সন্দেহ না থাকলেও গাড়ী চালিয়ে যে একা এলো সে যে শাণিতত্রিগুণা ভরতিযৌবনা নারী হতে পারে সে বিষয়ে ধারণাই করতে পারেননি বাবার ভক্ত সম্প্রদায়। চোখটা রগড়ে সদানন্দ বল্লে—মোটর চালিয়ে ভরসন্ধ্যেয় এই দুর্য্যোগে মেয়েছেলে আসবে—কালে কালে কতোই দেখবো—আবার গলায় কি ঝুলছে না ওটা—

গড়গড়িদের আশ্রিত মোসাহেব রাশু পণ্ডিত বললে—ঐ যে ডাক্তারদের যন্ত্র, বুকে পিঠে চোঙ বসিয়ে দেখে, নার্স বোধ হয়—

তার জ্ঞানের পরিধি ঐ পর্য্যন্তই।

সদানন্দ হুকোয় একটা টান দিয়ে বললেন—ওহে গড়গড়ি, ব্যাপারটা কি বল দিকিন্, গাড়ীটা দেখছি আর নড়ছে না, থেমে গেলো আমতলাতেই—

গড়গড়ি জবাব দিলেন—আচ্ছা বোকরেজ তুমি, কবরেজ হলে হবে কি, একেবারে বোকারাম, গাড়ী যাচ্ছিল এদিক দিয়ে, জল ঝড় এসেছে, একটু থেমেছে কি কলকব্জা বিগড়েছে, এতে আর আশ্চর্য্যি কি, তবে আমাদের এদিকে রাস্তাঘাটও তেমনি, লোকজনের যাওয়া আসাও কম, আর মেয়েছেলে একা গাড়ী হাঁকিয়ে যাচ্ছে, ভয় ডর নেই, তা আমার নাতজামাই বলে কলকাতায় নাকি এই রেওয়াজ—

সদানন্দ বললেন—জানো ত গড়গড়ি, বাবার স্থান-মাহাত্ম্য, তিন পুরুষ ধরে শুনে আসছি, সন্ধ্যের পর বাবার স্থানে পুত্রকামা ছাড়া কোন মেয়ে আসবে না—এলে একটা না একটা অনর্থ হবেই।

রাশু পণ্ডিত ফোড়ন্ দেয়—হ্যাঁ, মাতুলী কি সহজে মেলে, ভরসন্ধ্যেয় স্নান করে শুদ্ধ আচারে পাঁচটি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বেলে লাজলজ্জা পরিত্যাগ করে বাবার আরতি করলে তবেই বন্ধ্যাত্ব ঘোচে। আগে নিয়ম ছিল নাকি নৃত্য করতে হতো। গাছের উপরেই এক বটযক্ষিণী থাকেন কিনা। লোকে বলে তিমির অমার নিবিড় নিশুতি রাতে তার কালো ঘন চুল এলিয়ে ডামরী আর ঝামরী এই দুই সখীর সঙ্গে তিনি উলঙ্গিনী হয়ে নৃত্য করেন বাবার সামনে। পুরুষরা দেখলে না কি পাগল হয়ে যায়, মেয়েরা দেখলে ঘরে ফেরে না—

গড়গড়ি বললেন—হ্যাঁ, বাবার মাহাত্ম্য ত আছেই, আমাদের বংশের সেজকর্ত্তাই ত—

সাক্ষাৎ মহাপুরুষ, তবে কিনা বাবার শ্রীচরণে আমরা পড়ে আছি—শুনেছি নাগার্জ্জুন নামে এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসী বটযক্ষিণীর কাছে বর পেয়েছিলো রস বাঁধবার—

রস অতো সহজে বাঁধা যায় না হে কবরেজ—আজও অন্ধকার রাতে তালের রসের হাঁড়ি মানত্ করে রেখে যায় বাবার স্থানে ভক্তের দল। কিন্তু আশ্চর্য্য সকাল-বেলায় এই হাঁড়িয়ার এক ফোঁটাও কেউ দেখতে পায় না—কিন্তু নাড়ী ত দেখছো তিনপুরুষ, নিদেনও হাঁকো, পারো শরীরের রসকে বাগাতে না মনের রসকে—ওহে রসসিন্ধু-রাজ কবিরাজ জবাব দাও দিকিন্—নাও বৃষ্টি ত কমবে না দেখছি—চলো আমার ওখানেই, আর এক চাল বসবে—আরে এই যে।

যাকে নিয়ে এতো মাথাব্যথা, জল্পনাকল্পনা, সে অর্দ্ধেক মানবী না দানবী তা স্থির হবার আগেই আটচালায় সশরীরে উঠে এলো। দিনের শেষে ততক্ষণে সন্ধ্যার মায়ামন্থর রূপ বীতরূপা রাত্রির ঘন তমিস্রে কায়া বদলে নিচ্চে। ছায়ার মত নিঃশব্দে উঠে এলো সে, নিজেই কথা পাড়লে—এইটেইবোধহয় ঠাকরুণ-চক্ গ্রাম, বাবা পঞ্চানন্দের স্থান—

দলের মধ্যে গড়গড়ি মশাই মানসম্ভ্রমওয়ালা লোক, অবস্থার হীন হলেও মরাহাতী লাখ টাকা, সভ্যসমাজে যাতায়াত গতিবিধি আছে, বল্লেন—হ্যাঁ, তা আপনি—

আমায়, তুমিই বলবেন—

ভারী খুশী হয়ে গড়গড়ি জবাব দিলেন—সে তো নিশ্চয়ই, মা—

সদানন্দ চুপিচুপি নকুড়ের কানে কানে বল্লে—কর্ত্তা ত মেয়েছেলে দেখলেই গলে যান্—বাবার সেবায়েত কিনা—সেজবাবুর সাক্ষাৎ বংশধর—কান্ত মনে কলহ করি কঠিনা কুল কামিনী—যারা এদিক ওদিক যায়, তাদের

বশীকরণের মন্ত্রটা শিখেছিলেন যে এককালে—এখন অবশ্য বাবাই ভরসা।

গড়গড়ি জিজ্ঞাসা করলেন—কে মা তুমি—

দ্বারবাসিনীতে যে নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা হয়েছে তারই মেয়ে ডাক্তার আমি, নাম প্রমিতা রায়, নতুন এসেছি কলকাতা থেকে, একটা রোগী দেখতে গেছলুম, পথে জলঝড়ে গাড়ীর কলটা বিগড়ে গেলো, তাই থামতে হলো এখানে—আর তা ছাড়া অনেকদিন থেকেই বাবা পঞ্চানন্দকে একবার দেখবার ইচ্ছে ছিলো। আমাদের হাঁসপাতালে অনেকেই এঁর জলপড়া মাটিপড়া ভস্ম প্রলেপ নিয়ে যায় কিনা, বিশেষ করে গণ্ডগোল যখন পেকে ওঠে তখন আসে আমাদের কাছে, ভারী জাগ্রতদেবতা—না?

ভক্তি গদগদ হয়ে ওঠে গ্রামের লোকেরা—হ্যাঁ, সে কথা বলতে।

ডাগর চোখ দুটো একটু কৌতুহলের সঙ্গে তুলে প্রমিতা বলে—আপনারা এখনও বিশ্বাস করেন যে পঞ্চাননতলার মাটি মাখলে ছেলেদের রিকেট্ সেরে যায়, সান্নিপাতিক কাটে, ওর পুজোর ফুল মাদুলী করে ধরলে বন্ধ্যার সন্তান হয়, বলির পাঁটার কাঁচা রক্ত খেলে যক্ষ্মা সারে।

সকলেই শিউরে ওঠে—একী অলুক্ষণে কথা; আজকালকার ছেলেমেয়েরা হয়েছে কী—হে বাবা পঞ্চানন্দ, অপরাধ নিয়ো না—

সদানন্দ শুধু জবাব দেয়—চোখে দেখা যে দিদি।

চোখে দেখা, বলেন কি—পাঁচ পয়সার ভোগ চড়ালে জেতা মকর্দ্দমা হার হয়, সাক্ষীর মুখে মিথ্যা গলগল করে বেরিয়ে আসে, এমন কি রাতবিরেতে ভোগচড়ালে রাসলীলা শুধু দেখা যায় না, করাও যায়—

ডাক্তার, তায় মেয়েছেলে, নিজে মোটর হাঁকিয়ে এসেছে, তায় অল্প বয়স, দেখতে সুশ্রী তন্বী, পরিপাটি পরিচ্ছদ, সহরের লোক—গাঁয়ের ছেলেবুড়ো সবাই অভিভূত হয়ে শুনছিলো তার কথা, কিন্তু বাবা পঞ্চানন্দের স্থানে বসে বাবার বিরুদ্ধ কথা শুনতে হবে এমন দুর্মতির আভাস পেতেই চঞ্চল হয়ে উঠলো জনতা।

গড়গড়ি বল্লেন—থাক্ মা ওসব কথা।

কথা শেষ হতে না হতেই এমন একটি কাণ্ড ঘটে গেলো যাকে নাটকীয় বলাই চলে। সেই জলঝড় দুর্য্যোগের মাঝেই একটি রোগা কালো ক্ষীণ ছেলে কোলে ছুটে এলো এক চব্বিশ পঁচিশ বছরের মেয়ে। ছেলেটাকে বাবার স্থানে নামিয়ে দিয়েই উন্মাদিনীর মত মাথা খুঁড়তে লাগলো সেইখানে—নাও, নাও, সব নাও, এটাকে আর রাখো কেন?

তার পর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে ককিয়ে কাঁদে সে—রক্ষা করো, বাবা, রক্ষা করো, আমার যে আর কেউ নেই।

বিরহবিধুরা মাতার কান্নায় কোথায় যেন একটা চিরন্তনীর ছাপ ছিলো যা প্রমিতার মত মেয়েকেও অভিভূত করে ফেল্লে। সবাই হৈ হৈ করে উঠলো। পিছনে পিছনেই পাড়ার বেসরকারী গেজেট বিমলাঠাকরুণ এসে হাজির। বালবিধবা এই মুখরা বৃদ্ধাটির মুখের তোড়ের সামনে দাঁড়াতে স্বয়ং ঐরাবতও পারতেন না। পাঁচ গায়ের পাঁচ পাড়ায় ঘুরে পাঁচ কথা পঞ্চমুখে ব্যক্ত করাই শুধু তার পেশা ছিল না, দায়ে অদায়ে কাজে কর্ম্মে বুক দিয়ে পড়াটাও তাঁর নেশা ছিল। তিনি এগিয়ে গেলেন, কপালের রক্ত মুছিয়ে দিয়ে বল্লেন—অকল্যাণ করিসনি ছেলের, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ, জন্মমৃত্যু যে সবই তাঁরই হাতে, বাবা পঞ্চানন্দর দোর-ধরা ছেলে, তারই আশ্রয়ে আছে, তুই আমি কি কিছু করতে পারি—হতভাগা মহীনটা গেলো কোথায়?

মহীন একটি অতি সাধারণ নাম, কিন্তু প্রমিতার কাছে মনে হলো কোন অতীতের নৈঃশব্দে এ নামের সমগোত্রীয় একটি নাম লুকিয়ে আছে।

যেন একটা শক্ খেয়েই সে এগিয়ে গেলো। বললে দেখি কি হয়েছে।

মায়া তখনও পাগলিনীর মত বকে চলেছে—না, না, আমার ছেলেকে ছুঁতে দেবোনা, ও আমার—

ধমক্ দিলেন বিমলাঠাকরুণ—থাম্—

গড়গড়ি এগিয়ে গিয়ে বললেন—বাবা পঞ্চানন্দ আপনিই বড় ডাক্তার পাঠিয়ে দিয়েছেন, দেখতো মা একবার।

রোগীর অবস্থা দেখেশুনে প্রমিতা বল্লে—কেস্টা এগিয়েছে অনেকটা, বাবার স্থানের মাটির প্রলেপই মাটি করেছে, সেপ্টিক হয়ে ধনুষ্টঙ্কারে দাঁড়িয়েছে। গাড়ীটা

ঠিক থাকলে হাসপাতালেই নিয়ে যেতুম, শেষ চেষ্টা করে দেখতুম কিন্তু ফলাফল—তবু দেখি।

গড়গড়ি অভক্তের মতে বললেন—বিমলা, এখন ত ছেলেটিকে নিয়ে চল্—তা নাহলে এখানেই যে একটা কিছু ঘটে যায়—

হঠাৎ মায়া উঠে বল্লে—দেবে, তুমি আমার ছেলেকে ভাল করে দেবে, বাবা পঞ্চানন্দের দোর-ধরা ছেলে আমি কাউকে দেবোনা, ভাগ দেবো না, তুমি কে, তোমায় যে চিনি, তুমি ভাগ নিতে অসেছো, সব কিছুর ভাগ নিতে এসেছো, চলে যাও—তুমি শত্তুর।

প্রমিতা চুপ করে থাকে। বিমলাঠাকরুণ ওকে শান্ত করে। গড়গড়ি, সদানন্দ আর রাগু আলো দেখিয়ে নিয়ে যায়।

গড়গড়ি বলে—চলো দিদি, কিছু মনে করোনা, পাগলের বংশ, আর কি কষ্ট মেয়েটার, গরীব বাপ, ধার-ধোর করে মেয়েটার বিয়ে দিলে মহীনের সঙ্গে—প্রমিতা ভাবে—সব নামই কি এক নামে মিশেছে।

হ্যাঁ যা বলছিলাম, মহীন ছেলেটা ছিল ভালো, লেখা-পড়াও করতো বেশ, সাক্ষাৎ ধন্বন্তরির বংশ—ভবানন্দ কবিরাজের নাম ডাক তখন সমস্ত মহকুমা জুড়ে, এই সদানন্দদেরই জ্ঞাতি। নিদান্ হাঁকলে আর না হতো না—স্বয়ং মহামৃত্যুঞ্জয়ও ফিরে যেতেন—একবার হলো কি—কলকাতা থেকে এলো বড় ডাক্তার, আমাদের বড় তরফের বাড়ী—তখন আমাদের দবদবা দেখে কে, বল্লে—এই গোটাকতক ইনজেকসন্ দাও, রোগী তিন সপ্তাহে চাঙ্গা হয়ে উঠবে। জ্যাঠামশাই ডাকলেন ভবেন কাকাকে, বল্লেন—কোবরেজ, একবার নাড়ীটা দেখো ত—পাক্কা পঁয়তাল্লিশ মিনিট হাত ধরে বসে রইলেন তিনি। তার পরে উঠে এলেন কাকা—বল্লেন, বড়কর্ত্তা, আমার মুখ দিয়ে আর অপ্রিয় কথাগুলো নাই শুনলেন। জ্যাঠামশাই-এর মুখ শুকিয়ে গেছে, বাবা কাছেই ছিলেন—বল্লেন—তোমার কাজ রোগীর অবস্থা ব্যক্ত করা, বলেই ফেলো—

সোজা বল্লেন তিনি—এ নাড়ী প্রাণঘাতিকা, অমাবস্যা কাটিবে না। তারই নাতি হচ্ছে মহীন, ওর বাপের বড় ইচ্ছে ছিলো, মহীনকে পাশ করা ডাক্তার করিয়ে গাঁয়ে বসায়। আমার সঙ্গে কতো পরামর্শ করতো। আমি বলতাম—ছেলেকে কলকাতায় পাঠাবে, ধরো সেইখানে যদি কোন মেয়েকে ভালো লেগে যায়, বিয়ে করে পাশ করে কলকাতাতেই সে বসে। গাঁয়ের ছেলে গাঁয়ের ডাক্তারী যদি না করলো তাহলে আর আমাদের কি উপকার হলো, কি বলো দিদি—

প্রমিতা অন্যমনস্কভাবে জবাব দেয়—সে তো সত্যি; তার মনে মহীন নামটা তখনও অগ্নি-গোলকের মত জ্বলছে। গড়গড়ি বলেই চলেন—এই দেখোনা মায়ার ছেলে দুটো এইরকম করে এর আগেই গেছে—

প্রমিতা উত্তেজিত হয়ে বল্লে—হাঁসপাতালে পাঠান্ না কেন, এটা ক্রিমিন্যাল—শুধু জলপড়া তেলপড়ায় চলে না, বাবার স্থান, মার মাদুলী শিকেয় তুলে রাখুন।

গড়গড়ি ভারী গলায় উত্তর দেন—তুমি জানো ত দিদি, কটা হাসপাতাল দেশে আছে, কটা লোক যাবে, দেশের সর্ব্বাঙ্গ ঘা, কোথায় প্রলেপ লাগাবে, আজ না হয় ঐ ছেলেটাকে ওষুধ পথ্যি দিয়ে তুমি বাঁচিয়ে তুললে, তারপর, কী খাবে ও, কী পরবে, কী পড়বে, এর শিক্ষা দীক্ষা, তার চেয়ে তিলে তিলে না তলিয়ে একেবারে তলিয়ে যাক্, দুদিন মা চেঁচাবে, তার পর আর একটাকে কোলে নিয়ে বসবে, বাবা পঞ্চানন্দ বারে বারে কৃপা করবেন।

বৃদ্ধের গলার স্বর উত্তেজনায় কাঁপে। প্রমিতা স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে তার দিকে। তার মনে পড়ে বেশ কয়েক বছর আগের কথা। মফঃস্বল থেকে পাশ করে সে কলকাতায় মামার কাছে এসে আছে। মা মারা যাবার পর মেডিক্যাল কলেজে পড়াবার অজুহাতে সিভিল-সার্জ্জেন্ বাপ যুবতী কন্যাকে মামার কাছেই রেখে গিছলেন। মামী এটা সুনজরে দেখেন নি, বিশেষ করে ঐ ফাঁকে যখন তিনি নির্ব্বিঘ্নে দ্বিতীয় বার উদ্বাহ ক্রিয়া সুসম্পন্ন করলেন। আরো একটা কারণ ছিল। বিত্তবান পিতার সুগঠনা সুদর্শনা মেয়ের পাশে তাঁর সাদামাটা মেয়েগুলোকে বিশেষ মনোহারিণী মনে হতো না। প্রকাশ্যে বলবার কিছু ছিল না, কারণ তার খরচ তার বাপই দিতেন। অবশ্য স্বচ্ছল অবস্থার বাপমায়ের একমাত্র সন্তান ছিল প্রমিতা, মফঃস্বলের সহরে সহরে ঘুরে নিজের রূপগুণ ও ঐশ্বর্য্যের সম্বন্ধেও একটা অহঙ্কার এসে গিয়েছিলো। পার্টিতে

পিকনিকে চাঁদার খাতায়, দক্ষিণার দাক্ষিণ্যে সে ছিলো দরাজ হস্ত। কলকাতায় আসবার পর থেকেই সেই মুক্ত-হস্ততায় কিছু টান পড়েছিলো। হিসাবকরা টাকা আসতো মামামামীর কাছে, হাতখরচের বরাদ্দও কম, জবাবদিহী করতে হোত খরচার। মামী তাকে সুনজরে দেখতেন না এটা ঠিক্—বাবা, মেয়ে ত নয়, তালগাছ, এই সিনেমা যাচ্ছে, এই লাফাচ্ছে, এই নাচে যোগ দিচ্ছে, কি ধিঙ্গী মেয়ে, আমার ঘাড়েই যতো…

নিজেরই মেয়ে প্রমিতার অনুরাগিণী স্বপ্না বলতো—তার জন্য লাভ বই লোসকান্ নেইত মা—

তুই থাম্—

এমনি সময়ে সেইখানেই এসে জুটলো একটি ছেলে, নাম তার মহীন। সেও পড়ছে মেডিকেল কলেজে। তারই দুটি ছোট মামাতো ভাইকে পড়াবার ভার পেলে মহীন, রাত্তিরে খাওয়াটা আর সিঁড়ির নীচে চট দিয়ে আড়াল করা একটু থাকবার জায়গার বদলে। সিঁড়িটায় যে ইলেকট্রিক আলো ছিল তারই অস্পষ্ট আভা সাড়ে তিন হাত লম্বা চার হাত চওড়া সর্ব্বরন্ধ্রবিবর্জিত ড্রয়িংরুম কাম্ বেডরুম কাম্ ড্রেসিংরুমকে আলোকিত করতো, অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যেতো। সিঁড়ির আলোর নিয়ন্ত্রণকর্ত্রী ছিলেন প্রমিতার মামী, নিভতো জ্বলতো তাদের সুখসুবিধা মত।

সারাদিনের মধ্যে মহীন তার কোটরে থাকতো খুব কম সময়ই। ভোর ছটায় বাইরের হাইড্রেণ্টে চান্ সেরে নিয়ে সে বেরিয়ে যেতো ছেলে পড়াতে। পথে এক উড়িয়্যানন্দনের দোকানে দুপয়সায় এক কাপ চা ছিল বরাদ্দ। সমস্ত সকালটা কাটতো তিনটি মানবককে বকত্ব থেকে উদ্ধারের বৃথা আশায়। সেইখান থেকেই সে চলে যেতো কলেজে। দুপুরে এক ফাঁকে কাছাকাছি এক বিশুদ্ধ হিন্দু ভোজনালয়ে পবিত্র বা অপবিত্রের উর্দ্ধে উঠে বাহ্য অভ্যন্তরকে শান্ত রাখবার জন্য কিছু শুকনো অন্ন ও কিঞ্চিৎ জলীয় পদার্থ বদনগহ্বরে নিক্ষেপ করতো। বিশবছরের যুবকের প্রবল জঠরাগ্নি সে আহুতিতে প্রশমিত হতো কিনা সেটা গবেষণার বিষয়। সাড়ে চারটায় সে যেতো পড়াতে আর এক জায়গায়—বৈকালিক চা টা তাঁরাই দিতেন দয়া করে। সন্ধ্যার পর ফিরতো সে ধুঁকতে ধুঁকতে, বসতো দুটি শিশুকে নিয়ে। রাত্রি নটার পর মিলতো ছুটি—কল্পনা করবার, বিশ্রাম করবার, পড়বার অখণ্ড অবসর—যা বিঘ্নিত হতো পদে পদে চীৎকারে, ঝগড়ায় বেশী ভাগই প্রমিতাকে কেন্দ্র করে তার মামীর কুৎসিত আলাপনে। একত্র কদিন অসহ্য বোধ হলে সে বেরিয়ে পড়তো উত্তর কলকাতার ঘুরপাক খাওয়া রাস্তায় —যার প্রতিপদে জবচার্ণকের সহরের আদি ও অকৃত্রিম ইতিহাস। ফেরবার সময় প্রায়ই দেখতে পেতো বারান্দায় দাঁড়ানো এক দীর্ঘাঙ্গী মেয়ের কালো প্রফাইল্। কচিৎ কদাচিৎ যেদিন প্রমিতা ফিরতো দেরী করে, সেদিন একটা মৃদু সুগন্ধ আর হাইহিল জুতোর খট্‌খট্ শব্দ তাকে অবহিত করে দিতো নেপথ্যচারিণীর। তার সামনে দিয়েই সিঁড়িতে উঠে যেতো সে। গন্ধটা ক্লান্ত মহীনের শ্রান্ত শিরায় উপশিরায় স্নিগ্ধ প্রলেপের কাজ করতো। একদিন সে ভুলে উঠে গিয়ে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পথে ছড়িয়ে যাওয়া সুগন্ধির শেষটুকু ঘ্রাণ করবার প্রলুব্ধতায় মত্ত হয়ে উঠলো। হঠাৎ মুখ তুলে দেখে প্রমিতা দাঁড়িয়ে সিঁড়িতে ঈষৎ ঈষৎ হাসচে।

তার বিশেষ ভঙ্গীটির ইঙ্গিত যে প্রমিতার নয়নপথগামী হয়েছে সে কথা বুঝতে বাকী রইলো না। লজ্জায় ফিরে এসে সে বিছানায় শুয়ে পড়লো এক আচ্ছন্ন চেতনা নিয়ে। অবশ্য সেদিনও নয়, তারপরেও কোনদিন নয়, প্রমিতা তাকে কোনদিন আমল দেয়নি। কচিৎ কদাচিৎ দু একটা মামুলি কথা কয়েছে—দেখা ত হতোই না—সন্ধ্যার পরে মহীন ফিরতো সারাদিনই থাকতো না। শুধু মাঝে মাঝে প্রমিতা নিজে বা স্বপ্নাকে দিয়ে দু একটা বই বা নোট চেয়ে নিয়ে যেতো।

কিন্তু এই পরিবেশেই এমন একটা ঘটনা ঘটলো যাতে করে শুধু মহীনকে যেতেই হলোনা, লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে বিতাড়িত হতে হলো।

কদিন ধরেই মহীনের শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। তাই সকাল সকাল ফিরেই সে শুয়ে পড়েছিল। তখন বাড়ীতে কেউ ছিল না। কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে নিজেই জানে না। মাতাল অবচেতন মনে ততক্ষণ সে স্বপ্নে দেখছে এক রহস্য-ঘনা ইঙ্গিতময়ীকে—বসিয়া শিয়র পাশে নালার বেশর পরশ করিয়া ঈষৎ ঈষৎ হাসে বঁধু ঈষৎ ঈষৎ হাসে। এমন সময়

কি একটা অস্পষ্ট শব্দে তার স্বপ্নাতুরা তন্দ্রার ক্ষীণ তারটি ছিঁড়ে গেলো। কে এক স্বপন পশারিণী যেন হঠাৎ এসে থমকে গেলো। বোধ হয় নেপথ্যচারিণীর পিছনে আর এক সুচতুরার খরদৃষ্টি ছিল। গভীর অন্ধকারের মাঝে ঠিক সেই মহেন্দ্রক্ষণেই সিঁড়ির আলোটা জ্বলে উঠলো, দেখিয়ে দিলো ভোজবাজির মত অনারব্ধ এক ক্ষণিকের ইতিহাস। মামী চীৎকার করে উঠলেন—পোড়ারমুখীর কাণ্ডটা একবার সকলে স্বচক্ষে দেখে যাও—তাই বলি রোজ রোজ রাতে উঠে কোথায় যাওয়া হয় মেয়ের—বৃদ্ধ মামাও সবে যোগা-বাশিষ্ঠ নিয়ে বসেছিলেন, নেমে এসে এক বিরাশী সিক্কার চড় মারলেন মহীনকে—বেরোও, এখনি বেরোও, কুলাঙ্গার, অভদ্র লম্পট।

ভাগিনীকে টানিতে টানিতে নিয়ে এলেন—গ্রের অ্যানাটমিটা মাটীতে পড়ে রইলো, যেটা আনতেই সে নীচে নেমেছিল, ভেবেছিল মহীন নেই এবং হঠাৎ অসুস্থ মানুষটাকে অসময়ে শুয়ে থাকতে দেখে চমকে উঠেছিল। মহীন কোনদিনই তার মনে কোন রঙীন ঢেউ তোলেনি, তাকে নিয়ে তার কল্পনা উধাও হয়নি। কিন্তু সেই চরম অপমানের পরমক্ষণে সে যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল। প্রমিতা কিছু বলতে গিয়েছিল, মামী চেঁচিয়ে, কেঁদে, লাফিয়ে থামিয়ে দিয়েছিল তাকে—চুপ কর শতেক-খোয়ারী।

সারা রাত যমে মানুষে টানাটানি চললো। সেই আলো-হারা রাতেই নানারকমের ওষুধ ইন্‌জেকসান আনবার জন্য ছ'মাইল দূরে হাঁসপাতালে লোক ছুটলো—এলো অক্সিজেন, এলো সালফা পেনিসিলিন, অরিয়োমাইসিন্ কতো কী। সমারোহে রাজকীয় চিকিৎসার ত্রুটি রইলো না। সাধিকার মত তার মাথার শিয়রে বসে রইলো প্রমিতা, যমরাজ যেন ঐ তিনবছরের শীর্ণ শিশুটিকে নিয়ে যেতে না পারেন অমর্ত্যলোকে তাঁর স্বাধিকারের তীর-ভূক্তিতে। মায়া শুধু পাগলের মত হানটান্ করে—জানো দিদি, আমার আর কেউ নেই—

কেন ওর বাপ—

দিদিমা ঠাকরুণ বললেন—পোড়াকপাল—ছেলে কলকাতায় গেলো ডাক্তারী পড়তে, বাপের কত আশা, ভিটে বাড়ী বন্ধক দিয়ে টাকা [illegible] মেডিক্যাল কলেজে ঢোকালে—দুবছর যেতে না যেতেই কি হলো—ছেলে বাড়ীতে ফিরে এলো—লোকে বল্লে স্বভাব চরিত্তির নাকি খারাপ হয়ে গেছে—যে বাড়ীতে ছিল সেই বাড়ীরই বুঝি এক উড়নচণ্ডী গোছের মেয়ে ছিল—তার সঙ্গেই নাকি কি ঘটেছে—হাজার হোক্ সোমত্ত ছেলে মেয়ে, আগুন আর ঘি—তাই নাকি তাড়িয়ে দিয়েছে।

তারপর—জিজ্ঞাসা করে প্রমিতা। গলার স্বর যেন কোন সুদূর থেকে আসছে।

বাপ যে শুলো আর উঠলো না—দুবছর পক্ষাঘাত হয়ে পড়ে রইলো, মারা যাবার কয়েকদিন আগে ছেলেকে বল্লে—দেখ যা হয়ে গেছে তার জন্য ভেবে আর লাভ কি, জাত-ব্যবসা না করিস্, হোমিওপ্যাথী শিখে নে, নাড়ীজ্ঞানটাও আছে, আর রসিক গুপ্তর মেয়ে মায়া বড় ভালো, ওর হাতেই তোর ভার দিয়ে যাই। মহীন কোন কথা বলেনি, শুধু বাপের নির্দেশ অনুসারে কাজ করে গিয়েছিলো। এক সুতহিবুক যোগে পোড়া কার্ব্বাইডের গন্ধে মাতাল গ্যাস-লাইটের স্পষ্টদীপ্ত আলোয় মহীনের গলায় মায়ার মালা উঠেছিল, তার হাত কেঁপেছিল, মনও দুলেছিল। কিন্তু চব্বিশ বছরের ছেলেটির মনটি যে নড়েনি সে বিষয়ে সেদিনের পঞ্চদশীর সন্দেহ থাকলেও আজকের চতুর্বিংশবর্ষীয়ার কোন সন্দেহ ছিল না। তালই শুধু কাটেনি, তারও কাটা ছিল। মায়া মনে মনে একটা শক্ত আশ্রয় খুঁজতো, মহীনের ভেতর যেন সেটা পেতো না। প্রথম চার বছরে কোন সন্তান না হওয়ায় সে বাবার কাছে ধর্ণা দেয়, তার মন বলতো—সন্তান এলে হয়ত মহীন তার দিকে ফিরতে পারে। বাবার বরেই হোক্ বা জৈব নিয়মেই হোক পুন্নাম নরক থেকে ত্রাণের বার্ত্তা নিয়ে যে প্রথম এলো তাকে বেশী দিন ধরে রাখতে পারেনি মায়া। দ্বিতীয়টির বেলাতেও তাই ঘটলো। এবার সে বিশেষ করে মানত করে বর চেয়ে নিয়েছিলো। তিন বছর নির্ব্বিঘ্নে কেটেও ছিল, কিন্তু তার পরেই পুনরাবৃত্তি দেখে পাগল হয়ে উঠেছে। মহীন একেবারে উদাস না হলেও সবই ছেড়ে দিয়েছে গতানুগতিকতার উপর। শান্ত শিষ্ট মানুষ পাড়ায় পাড়ায় ওষুধ বিলিয়ে বেড়ায়, গ্রামে গ্রামান্তরে রাত কাটায়; সাতে পাঁচে থাকে না। এই উদাস নির্ব্বিকার ভাবটাই মায়ার ছিল চক্ষের শূল। সে না হয় বাঁধতে পারেনি, কিন্তু ঐ ছোট শিশুটীও কি ওর মনে দাগ কাটে

না। এক এক সময় বিমলা ঠাকরুণকে সে বলতো—পিসী—এআমার কি হোল—

ওরে, কলকাতার ডাকিনী রাক্ষুসীটার মোহ।

বাবা পঞ্চানন্দ কি তার প্রতিকার করতে পারেন না। ভাবে মায়া।

রাতের ঘোর তখনও আকাশে লেগে। পরম রমণীয় হয়ে উঠেছে পুবের দিকটা নতুনের আলো জাগা রহস্যের রং লেগে। ঘর থেকে বেরিয়ে এলো প্রমিতা। উদয় তীর্থে উদিতা হচ্ছেন নিষ্কলুষা উষা। কিন্তু আলোর পিছনে যে কালো, জীবনের পিছনে যে মৃত্যু, লাভের পেছনে যে লোভ তার দাম দেবে কে, হাসির মূল্য যে কান্নার মধ্যেই। মায়া এসে পাশে দাঁড়ায়,—নিঃশঙ্ক চিত্তে বলে—দিদি, খোকন এতক্ষণ একটু ঘুমুচ্ছে, তুমি যদি না আসতে দিদি—ভাবতেও গা শিউরে ওঠে, ভগবান পঞ্চানন্দই তোমায় টেনে নিয়ে এসেছিলেন—তোমার হাত দিয়েই ওকে নতুন করে পেলুম—ও তোমারই।

একটু ম্লান হেসে প্রমিতা বল্লে—সত্যি বলছিস্ বোন্—

দিদি—

হ্যাঁরে বাবা পঞ্চানন্দ বড় জাগ্রত দেবতা, না—

তা আর বলতে—যার ছেলে নেই তাকে ছেলে দেন, সব কামনা পূর্ণ করেন—

আচ্ছা চলি বোন্, আর ভয় নেই, সাবধানে রেখো ছেলেকে, নতুন ওষুধ পাঠিয়ে দেবো—আমার খোকনকে যেন ভুলোনা দিদি—

চুপ করে থাকে প্রমিতা, অনেকক্ষণ পরে বলে—ভুলবোনা এটা ঠিক—ভুলতে পারবোনা—

আবার কবে আসবে দিদি—আর একটিবার এসো, ওঁর সঙ্গে দেখাও হলোনা—

অকারণে কঠিন হয়ে ওঠে প্রমিতা বলে—বোধহয় আর আসা হবেনা, আমি আবার বিলেত যাচ্ছি পড়তে, কালই কলকাতায় ফিরবো—

দিদি, খোকনের নতুন মা তুমি, পুর্নজন্ম দিলে—প্রমিতা যেন শুনেও শোনেনা—কোন কথা না বলে সে সোজা গাড়ীতে উঠে বসে, স্টাট দিতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়।

উদাসীন্ মহীন ভিনগাঁ থেকে ফিরছে গুণগুণ করে গান করতে করতে, প্রমিতার সঙ্গে তার চোখোচোখি হয়—আলো ঠিকরে পড়ে—

আলো, আরো আলো, নতুন দিন জন্ম নিচ্ছে মানুষের মনে আর আকাশের কোণে।

বন্ধু তোমার তরে

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

আজি এ বাদরে ঝরে আঁখি জল
বন্ধু তোমার তরে
আকাশ বাতাস ফেলি নিশ্বাস
ঝিমরি গুমরি ম[illegible]

ধরণীর চোখে ঘুম নাহি আজ
পথ চেয়ে আছে আলু থালু সাজ
ব্যথায় কাতর কাঁপে তার স্বর
মরিয়ার কল স্বরে [illegible]

চমকি চমকি উঠে চকমকি
ও নহে বিজলী-মালা
আগ্নেয়গিরি বুক চিরি চিরি
উগারে তাহারি জ্বালা—
ঝিল্লী-মুখর তরু-মর্মর
কাঁদিয়া মিনতি করে।

কেতকী কদম ঢালে পরিমলে
গভীর গরজে মেঘ জলে স্থলে
ঘন ঘর্ঘরে আকাশ-অম্বরে—কাঁপাইয়া থরে থরে।

কথাশিল্পী চার্লস্ ডিকেন্স

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

এক শত বছর আগেকার লণ্ডন। তারই এক অপরিচ্ছন্ন বস্তীর মধ্যে একটা নোংরা ঘরে জুতোর কালি তৈরীর কারখানা। ঘরখানা যেমন অন্ধকার তেমনি ভাঙা-চোরা, মেঝেয় আর দেওয়ালে বড় বড় গর্ত্ত, আর সেই সব গর্ত্তে ইঁদুরের অবাধ আনাগোনা।

সেই ম্লান নিরানন্দ পরিবেশের মধ্যে ব'সে একটি এগারো বছরের সুকুমার বালক দিনের পর দিন হাতে কালি মেখে কৌটোর মধ্যে জুতোর পালিশ ভরে, টিনের গায়ে লেবেল লাগাতো, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। মাইনে পেতো সপ্তাহে ছ' শিলিং। পৃথিবীর সমস্ত আনন্দ, আলো আর স্ফূর্ত্তি থেকে বঞ্চিত বিচ্ছিন্ন হয়ে চার্লস্ ডিকেন্স্ জুতোর কালির কারখানায় ব'সে তাঁর যে-জীবন শুরু করেছিলেন, সে-জীবনে তখন ছিল না কোন স্বপ্ন, ছিল না উচ্চাশা, গভীর নৈরাশ্য আর অবসাদ তাঁকে সর্ব্বক্ষণ ঘিরে থাকতো, কোনক্রমে আধপেটা দু'টি খেয়ে প্রাণ-ধারণ করাই তখন ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।

অতি-সামান্য উপার্জ্জন। কিন্তু বালক ছিল বড় হিসাবী। গুণে গুণে পাই-পয়সাটি পর্য্যন্ত হিসাব করে খরচ করতো। রবিবারের জন্যে তারই মধ্যে বাঁচিয়ে গুছিয়ে অতিরিক্ত কিছু পয়সা মজুত রাখতো। সারা সপ্তাহের পর রবিবারটি ছিল বালকের কাছে স্বর্গবাসের দিন। ঐদিন সে তার ছোট ভগ্নীকে নিয়ে মা-বাবার কাছে যেতো।

তার মা-বাবা তখন ছিলেন জেলে। কোন অপরাধের জন্যে বা কুকর্ম্মের জন্যে তাঁদের জেল হয় নি। অনেক টাকা তাঁদের দেনা হয়েছিল এবং সে-দেনা তাঁরা পরিশোধ করতে পারেননি। তাই তখনকার দিনের আইন-অনুসারে তাঁদের অধমর্ণ-হাজতে রাখা হয়েছিল।

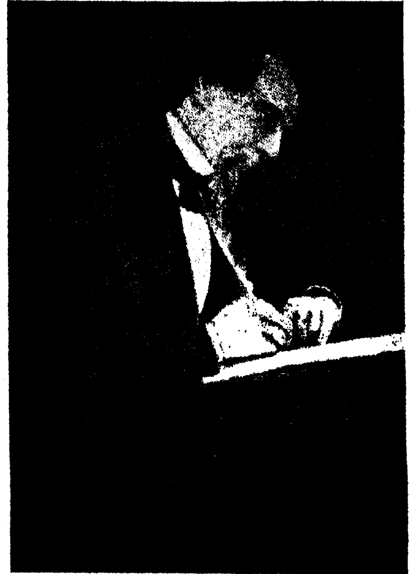
ছোট বোনটি এক বোর্ডিংএ থাকতো। তাকে সঙ্গে নিয়ে বালক ডিকেন্স প্রতি রবিবার তাদের বাবা-মার কাছে গিয়ে সারাদিন সেখানে অতিবাহিত করে সন্ধ্যার পর বোনটিকে বোর্ডিংএ রেখে নিজের নিরানন্দ-জগতে প্রত্যাবর্ত্তন করতো। রবিবার রাতে তার চোখে ঘুম নামতো না সহজে, দুই চোখ জলে ভ'রে উঠ্‌তো বারবার, ভগবান, এ অসহনীয় অবস্থায় আরও কতকাল কাটাতে হবে তাকে? বারংবার এই আকুল আকুতি তার প্রাণের মধ্যে গুমরে উঠ্‌তো।

পরবর্ত্তীকালে চার্লস্ ডিকেন্সের অনেক বিখ্যাত উপন্যাসের অখ্যাত আর দুর্ভাগা চরিত্রের মুখে ডিকেন্সের নিজের কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে বারংবার, "ভগবান, আর কতকাল, এমনি করে নিষ্পেষিত আর পদদলিত হ'য়ে জীবন কাটাবো, আমরা?"

* * * * *

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক চার্লস্ ডিকেন্স ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে পোর্টস্মাউথ জনপদে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বাবা জন ডিকেন্স সিভিল সার্ভিসের কেরাণী ছিলেন। ডিকেন্সের ছেলেবেলায় তাঁদের পারিবারিক অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। ডিকেন্সের যখন ছ' বছর বয়স তখন তাঁর বাবা লণ্ডনে এসে সংসার পাতলেন এবং এই সহরেই আরম্ভ হল ডিকেন্সের চরম দুঃখের দিন। অবশেষে দুঃখের অবসানে এই সহরেই শুরু হল তাঁর জীবনের জয় অভিযান। এই সহরে বসেই তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা লাভ করলেন অবশেষে।

কিছুদিন বেশ সুখে কাটল লণ্ডনে। তারপর ঘটল অর্থনৈতিক



চার্লস ডিকেন্স

বিপর্য্যয়। দেনার দায়ে আকণ্ঠ ডুবে গিয়েছিলেন জন ডিকেন্স। সামলাতে পারলেন না। কোন ফন্দী-ফিকির খাটাবার মতো ধূর্ত্ততা বা কূটবুদ্ধি ছিল না তাঁর। অধমর্ণ-আদালতে আত্মসমর্পণ করলেন। সস্ত্রীক হাজত বাসের দণ্ডাদেশ পেলেন। ভাগ্যচক্রের কি মর্ম্মন্তুদ পরিবর্ত্তন!

* * * * *

জুতোর-কালির শ্রমিকরূপে যে-জীবন ডিকেন্স অতিবাহিত করেছিলেন সেই জীবনের নানা ঘটনা, নানা চরিত্র তাঁর অনেক উপন্যাসের

মধ্যে প্রচ্ছন্ন হ'য়ে আছে। দলিত, নিপীড়িত মানবাত্মার যে-ক্রন্দনধ্বনি ডিকেন্সের সাহিত্যে শোনা গেছে তা লেখকের কল্পনার বস্তু নয়, তা তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আর নিজের অন্তর থেকে উৎসারিত সত্য-বস্তু। তাই তা সহজেই অমন প্রাণস্পর্শী।

একদিনের একটি ঘটনার কথা ডিকেন্স তাঁর জীবনীকার ফরস্টারের কাছে গল্প করেছিলেন। একদিন দুপুরবেলা খানিকক্ষণের ছুটি পেয়ে তিনি তাঁর লম্বা পাত্‌লুন আর বড় টুপিটা মাথায় দিয়ে পথে বেরুলেন। সাজ-পোযাকটা ভালই। কিন্তু পকেট একেবারে যাকে বলে গড়ের মাঠ। পথ চলতে চলতে তেষ্টা লাগল ভীষণ। ঢুকলেন এক পানীয়ের দোকানে। লম্বা টেবিলে নানা শরবৎ আর পানীয়ের বোতল সাজানো। এক গেলাস শরবতের ফরমাস দিলেন। তাঁর করুণ মুখ আর ক্লান্ত



ডিকেন্সের বাসভবন

চেহারা দেখে দোকানদারের স্ত্রী তাঁর দিকে এগিয়ে এলো, তাঁকে আদর করে এক গেলাস শরবৎ দিলে। শরবতের গেলাস হাতে নিয়ে ডিকেন্স এদিক ওদিক তাকালেন, তারপর ধীরে ধীরে গেলাসটি টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলেন। দোকানদার-ঘরণী প্রশ্ন করলে—"কি হল! খেলে না শরবৎ?" ম্লানমুখে ডিকেন্স বললেন—"পয়সা নেই। থাক। অন্য একদিন···।" দু' হাত বাড়িয়ে তাঁকে কাছে টেনে নিয়ে দোকানদারের স্ত্রী শরবতের গেলাসটি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বললে—"খাও। তুমি এক গেলাস শরবৎ খেলে আমরা গরীব হ'য়ে যাব না। খাও, লজ্জা কোরো না। তোমার নিশ্চয়ই খুব তেষ্টা পেয়েছে।"

নারীর এই কারুণ্যের স্মৃতি ডিকেন্স চিরদিন মনে রেখেছিলেন।

* * * * *

অন্ধকারের পর দিনের আলো দেখা দিলে। ডিকেন্স-পরিবারের জীবনে সুদিন এল। ডিকেন্সের বাবা অপ্রত্যাশিত ভাবে কিছু টাকা পেলেন। ঋণমুক্ত হয়ে তিনি পুনরায় পূর্ব্বের জীবনে ফিরে এলেন। বালক ডিকেন্স নোংরা কালির কারখানা থেকে বাড়ী ফিরে এসে স্কুলে ভর্ত্তি হলেন।

চৌদ্দ বছর বয়সেই তাঁকে লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়ে রোজগারের সন্ধানে বেরুতে হল। এক আইনজীবীর আপিসে সামান্য বেতনে কেরানীর পদে কাজে নিযুক্ত হলেন। অবস্থার ক্রীতদাস ছিলেন না তিনি, অবসর সময়



ছেলেবেলায় একদা তৃষ্ণার্ত ডিকেন্স এক সরবতের দোকানে সরবৎ পান করতে যান। চিত্রে শূন্য পকেট অপ্রস্তুত ডিকেন্স ও সরবৎ ব্যবসায়ীর দয়াবতী স্ত্রীকে দেখা যাচ্ছে—

অন্য কর্ম্মচারীরা যখন টেবিলের ওপর মাথা রেখে ঢুলতো, ডিকেন্স তখন নানা বই পড়া আর নানা ছোট খাটো কাজে নিযুক্ত থাকতেন। নিজের ভাগ্যকে নিজেই রচনা করবেন, এই ছিল তাঁর পণ। সিঁড়ির শেষ ধাপেই তিনি বসে' থাকবেন না, দীর্ঘদিন, সোপান শ্রেণীর সর্ব্বোচ্চ ধাপে তাঁকে উঠ্‌তে হবে। শর্ট হ্যাণ্ড শিখতে লাগলেন। যেমন করে এই বিদ্যা তিনি আয়ত্ত করলেন তার একটি নিখুঁত ছবি পাওয়া যায় তাঁর আত্ম-জীবনীমূলক উপন্যাস ডেভিড কপারফিল্ড্-এ।

উনিশ বছর বয়সে ডিকেন্স "মর্নিং ক্রনিক্ল্" সংবাদ-পত্রের পার্লামেণ্টের সংবাদ-পরিবেশকরূপে কাজে নিযুক্ত হ'য়ে অচিরকালেই তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন। সে-সময় তাঁর সমকক্ষ সংবাদ-পরিবেশক আর-কেউ ছিল না। তাঁর লেখনী থেকে যে—সকল সরস, যুক্তিপূর্ণ এবং বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য নির্গত হত সেগুলি পাঠকমহলে বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হয়ে উঠেছিল। সাংবাদিকরূপে তিনি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করলেন।

একুশ বছর বয়সে এক অননুভূতপূর্ব্ব প্রেরণার তাগিদে তিনি এমন একটি কাজ করলেন যার ফলে তাঁর জীবনের গতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হল, তাঁর জীবনের দিগন্ত এক নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হল। 'অপরের লেখা আর অপরের মতামত লিপিবদ্ধ করেছেন এতদিন! নিজের লেখা আর নিজের মনের কথা কি প্রকাশ করা যায় না? রাত্রির নিভৃত আকাশে বসে লিখেছিলেন ছোট একটি কৌতুক-রচনা। একদিন সেটিকে সযত্নে খামে মুড়ে পাঠিয়ে দিলেন এক মাসিক-পত্রের অপিসে।

নির্দ্ধারিত দিনে "মাসিক-পত্র" বার হল। এক কপি কাগজ কিনে কম্পিত বক্ষে রাস্তার কোণে দাঁড়িয়ে ডিকেন্স তার পাতা ওল্টাতে লাগলেন! এই যে! বেরিয়েছে তাঁর লেখা! কী অদ্ভুত আনন্দে স্পন্দিত হল তাঁর সর্ব্বাঙ্গ আর সর্ব্ব মন! আনন্দে আর গর্ব্বে দু'চোখ ঝাপ্সা হয়ে এলো। তাঁর Sketch by Boz নামক গ্রন্থে এই লেখাটি আছে—Mr. Minns & his Cousins.

সেই তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা। লেখার জন্যে অবশ্য কোন দক্ষিণা পেলেন না। কিন্তু প্রেরণা এসেছে মনে। পর পর কয়েকটি লেখা সেই পত্রিকায় প্রকাশ করলেন এবং জানালেন যে এইবার তাঁর জন্যে কিছু পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করা বোধ করি উক্ত পত্রিকার পক্ষে অসম্ভব হবে না। বেশী নয়, সামান্য কিছু পেলেই তিনি খুসী! কিন্তু পত্রিকাটির আর্থিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। তাঁরা ডিকেন্সকে পারিশ্রমিক দেবার মতো সঙ্গতি নেই জানিয়ে এক বিনয়-মধুর পত্র দিলেন। ইতিমধ্যে "ইভ্নিং ক্রনিক্ল্"-এ তাঁর লেখা বেরুতে আরম্ভ করেছে। মোটা পারিশ্রমিক পাচ্ছেন। নাম ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। ১৮৩৬ সালে দু'খণ্ডে Sketches by Boz প্রকাশিত হল। প্রকাশকরা মোটা রয়ালটি দিয়ে লেখককে পুরস্কৃত করলেন। ভাগ্য ফিরলো এতদিনে। সেই বছরে তিনি বিবাহ করলেন, তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "Pickwick Papers" লিখতে শুরু করলেন এবং সংবাদ পত্রের রিপোর্টারের কাজে ইস্তফা দিয়ে পুরোপুরি সাহিত্যের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন।

আজকের দিনে কোন নতুন লেখককে প্রচারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করবার যে-সকল সুযোগ সুবিধা আছে তখনকার দিনে তেমনতর কোন সুবিধা ছিল না। আত্মপ্রচারের কোন পথ ডিকেন্সের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। বাইরের কোন প্রচারকার্য্য তাঁকে এক পাও ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যায় নি, নিজের লেখনীর জোরে তিনি পাঠক সমাজে ধীরে ধীরে সুনিশ্চিত রূপে নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

"পিকউইক" যখন লিখতে আরম্ভ করলেন তখনো তাঁর আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না। প্রত্যেক মাসের লেখার জন্য পেতেন পনেরো পাউণ্ড! বেশী নয় মোটেই। কিন্তু তাতেই সন্তুষ্ট হতে হয়েছিল তাঁকে।



অভিনয়ের প্রতি ডিকেন্সের প্রবল অনুরাগ ছিল। প্রায়ই নানা নাটকে সখের অভিনয় করতেন। ছবিতে তাঁকে বেন জনসনের Every man in his humour নাটকে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যাচ্ছে

পত্রিকার মালিকদের কাছে দু'মাসের টাকা আগাম নিয়ে কয়েকটা জরুরী সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করেছিলেন। কিন্তু তারপর যা ঘটল, যে-কোন গ্রন্থকারের জীবনে তাকে অঘটন বলা যেতে পারে। প্রথম কিস্তি পিকউইক যে-মাসে প্রকাশিত হল সে-মাসে দপ্তরী মাত্র ৪০০ কপি বই বাঁধলো। চার পাঁচ মাসের মধ্যে হু হু ক'রে বিক্রি বেড়ে গেল। শেষ পর্য্যন্ত বিক্রয় দাঁড়ালো ৪০,০০০ কপি। তখনকার দিনে কল্পনাতীত ঘটনা। চব্বিশ বছর বয়সে ডিকেন্স দেশ-জোড়া খ্যাতিলাভ করলেন। সেই সঙ্গে অর্থও পেলেন প্রচুর। নিকোলাস নিকলবাই যখন লিখতে লাগলেন তখন তাঁর মাসিক পারিশ্রমিকের হার ১৫০ পাউণ্ড। তাছাড়া ছিল বইএর জন্যে পৃথক সেলামী এবং অন্যান্য পুরস্কার।

সম্মান পেয়েছেন অনেক লেখক, কিন্তু পাঠক সমাজের সর্ব্বান্তঃকরণের

স্নেহ আর প্রীতি ডিকেন্স যেমন পেয়েছিলেন তেমন আর কেউ বোধ করি পান নি। প্রিয় ছিলেন তিনি পাঠকের ; ছিলেন আপনজন। অপমানিত আর উপদ্রুত মানুষের শ্রেষ্ঠ উকিল ছিলেন তিনি। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির সঙ্গে পাঠকদের ছিল মনের মিতালি। অলিভার টুইষ্ট শুধু গল্পকথাই ছিল না, সে ছিল সবাইকার প্রতিবেশী। সকলেরই জানা এবং চেনা। ঘরে ঘরে তার আদর। সর্ব্বদেশের সে আত্মীয়।

* * * *

ডিকেন্সের বইগুলি পরপর বেরুলো এই রকম পর্য্যায়-ক্রমে—Sketches by Boz (১৮৩৫-৩৬) ; পিকউইক (১৮৩৭) ; অলিভার টুইষ্ট (১৮৩৮) ; নিকোলাস নিকলবাই (১৮৩৯) ; ওলড্ কিউরি-অসিটি শপ (১৮৪০-৪১) ; বার্ণেবাই রাজ (১৮৪১) ; মার্টিন চাজলউইট (১৮৪৪) ; ডম্বে এণ্ড সন (১৮৪৮) ; ডেভিড কপারফিলড্ (১৮৫০) ; ব্লীক হাউস (১৮৫৩) ; টেল অফ টু সিটিজ (১৮৫৯) ; গ্রেট এক্সপেক্টেশান (১৮৬১)।

১৮৪৬ সালে তিনি অল্প সময়ের জন্যে লণ্ডন ডেলি নিউজ পত্রিকার সম্পাদকরূপে কাজ করেন। ১৮৪৯ সালে নিজেই একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা বার করেন—"ঘরোয়া কথা।" বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে ন'বছর পত্রিকাটি চলেছিল। এই পত্রিকায় তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত রচনা ছাপা হয়।

জনপ্রিয় ও বশস্বী কথাশিল্পী ছাড়াও ডিকেন্স-এর আরও এক বিষয়ে প্রচণ্ড আগ্রহ আর নেশা ছিল। সেটি হচ্ছে, সাধারণ সভায় ও অনুষ্ঠানে তাঁর নিজের রচনা পড়ে শোনানো। টিকিট বিক্রি করে সেই সব পাঠ-চক্রের আয়োজন করা হত। বেশীর ভাগ টাকাই তিনি নানা সদুদ্দেশ্য আর সদনুষ্ঠানে দান করতেন। তাঁর লেখার পাঠ শোনবার জন্যেও ভীড় হত খুব। পড়তেনও চমৎকার। উদার কণ্ঠস্বরে নির্ভুল উচ্চারণের সঙ্গে যখন আবেগ মিশতো তখন সভাস্থল গমগম করত। শ্রোতারা নির্ব্বাক নিস্পন্দ হয়ে তাঁর পড়া শুনতো। ১৮৫৮তে তিনি এই কাজ নিয়ে এক দীর্ঘ সফর করলেন। গেলেন আমেরিকায়। পয়সা পেলেন আশাতীত। একদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পাঁচ সাতটা সভায় নিজের লেখা পড়েছেন। গলা ভেঙে গেল, শরীর দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। তবুও ক্লান্তি নেই তাঁর। বন্ধুরা বৃথাই তাঁকে অতিরিক্ত পরিশ্রম থেকে প্রতিনিবৃত্ত করবার চেষ্টা করেছে।

আর শুধু কি টাকা। যেখানে গেছেন, সেইখানেই রাজকীয় সম্মান পেয়েছেন। তাঁকে দেখবার জন্যে লোক ভেঙে পড়েছে। কাতারে কাতারে পথের দু'পাশে লোক দাঁড়িয়ে তাঁর যাত্রাপথে জয়ধ্বনি করেছে, আমেরিকায় যে কোন পাঠ-সভায় ৩০০ পাউণ্ডের কম টিকিট বিক্রি হয় নি। নিউ-ইয়র্কে গড়পড়তা প্রতি রাত্রে ৬০০ পাউণ্ড করে পেয়েছেন। ডিকেন্স যখন মারা গেলেন তখন তাঁর সম্পত্তি আর বিত্তের মূল্য এক লক্ষ পাউণ্ডের কম নয়।

সখের থিয়েটারের প্রতিও তাঁর গভীর আসক্তি ছিল। অনেকগুলি নাটকের প্রযোজক, পরিচালক এবং প্রধান অভিনেতা রূপে তিনি লণ্ডনে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন। এই প্রবন্ধের সঙ্গে অভিনেতা—ডিকেন্স রূপে যে ছবিখানা সন্নিবিষ্ট হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, বেন জনসনের Every Men in his Humour নামক বিখ্যাত নাটকে নায়কের ভূমিকায় ডিকেন্স অভিনয় করছেন।

* * *

সে-যুগের মানুষ তিনি, সে-যুগে ধনিকের অহঙ্কার, দরিদ্রের আর্ত্তনাদ, সবলের অত্যাচার, আর দুর্ব্বলের হাহাকার, মধ্যযুগীয় বর্ব্বরতা আর স্থূলতার শেষ গ্লানিমা আর পাপ লণ্ডন-সমাজের দিকে দিকে প্রতিফলিত হচ্ছে। তারই বিরুদ্ধে ডিকেন্স লড়াই করেছেন। মহৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত রচনার সহায়তায় তিনি হতভাগ্য আর সমাজ-বিড়ম্বিত দুঃস্থ মানুষের পক্ষে সওয়াল করেছেন। জগতের কাছে তাদের দাবী আর অভিযোগ পেশ করেছেন। তাঁর অলিভার টুইস্ট আর নিকোলাস নিকেলবাই সমগ্র বিশ্বের দরবারে সমাদৃত হয়েছে। এই দিক থেকে যে-কোন বড় সমাজ-সেবীর পর্য্যায়ভুক্ত হবার দাবী আছে তাঁর।

১৮৬৯ সালে তিনি "এডুইন ড্রুড-এর রহস্য" নামক উপন্যাসখানি লিখতে আরম্ভ করেন। সেই তাঁর শেষ লেখা এবং সে উপন্যাস তিনি সমাপ্ত করতে পারেন নি। হঠাৎ অসুস্থ হোয়ে পড়লেন এবং একদিনের মধ্যেই মারা গেলেন। মৃত্যুর আগের দিনেও যথারীতি প্রাত্যহিক জীবন-যাপন পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করেছেন। তবে সেদিন অন্যদিনের তুলনায় অনেক বেশী সময় লিখেছেন। লেখার পর বেড়াতে বেরুবেন এমন সময় সামান্য অসুস্থতা বোধ করলেন। বেড়ানো স্থগিত রেখে শয্যায় আশ্রয় নিলেন। উঠলেন না আর। কিছুক্ষণের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। পরের দিন, ১৮৭০ সালের ৯ই জুন তাঁর প্রাণবায়ু অনন্তের সঙ্গে মিশল। দেশের শ্রেষ্ঠ সুসন্তানদের যেখানে কবরিত করা হয় সেই ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবেতে তিনি সমাধিলাভ করেছিলেন।





মন্দির চূড়া

ফটো :—রমেন চট্টোপাধ্যায়



পাহাড়ে মেঘ

ফটো :—শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ওদের নিয়ে রওনা হ'তে পারে তবে বিকেলে অন্তত এসে পৌঁছুবে।

মণীন্দ্র। নাঃ। It was a mistake—my mistake—সুমির নয়, আমার ভুল। তার মাশুল হিসেবে সুমি আমাকে ভুলে গিয়ে থাকে—সে দুঃখ আমাকে সহ্য করতে হবে। কি করব? অবশ্য বাপের পক্ষে আনন্দের কথাও বটে। সঞ্জীব তাকে সব ভুলিয়ে দিয়েছে। সঞ্জীবকে পেয়ে সে সব ভুলেছে! নাঃ কাউকে পাঠাবার দরকার নাই।

কিছুক্ষণ সকলেই স্তব্ধ হইয়া রহিল

হঠাৎ বৃদ্ধই সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করিলেন

সুরেন! বড় বউ মা!

সুরেন। বাবা!

(প্রতিমা সামনে আসিয়া দাঁড়াইল)

মণীন্দ্র। নরেন একটা কথা বলে গেল। তোমরা কি মনে কর—তা সত্যি? Is it true? সঞ্জীব আমাদের সকলকে ঘৃণা করে? আমাকে পর্যন্ত?

সুরেন। না না—এতটা আমার মনে হয় না। নরেনের সঙ্গে সঞ্জীবের একটা বিরোধিতা আছে—বোধ করি দু'জনেই দু'জনের উপর বিরূপ—সে তো তুমি ভাল জান—আমি তো ছিলাম না। নরেন সুমি ছিল তোমার সঙ্গে—

মণীন্দ্র। না। সঞ্জীবের দোষ ছিল না তাতে। কোন দোষ ছিল না তার। কেস করতে গেলাম বর্দ্ধমান। দেশে যাই নি বারো বছর। নরেন সুমি দেশ দেখে নি। ওদের সঙ্গে নিয়ে গেলাম। তুমি বিলেতে। তোমার মা মারা গেছেন। কার কাছে রেখেই বা যাব। সরকারকে চিঠি লিখেছিলাম ষ্টেশনে আসতে। লোক রাখতে। he was a fool দুটো কুলি নিয়ে এসেছিল—আর আমাদের লটবহরের বোঝা সঙ্গে। সরকার একেবারে হতভম্ভ। নরেন সরকারকে বলে বসল—উল্লুক না কি আপনি? সঞ্জীব ছিল ষ্টেশনে। তার সঙ্গে আরও কটি ছেলে। কালো লম্বা ছেলেটি এগিয়ে এল। হেসে মিষ্টি ক'রে বললে—আপনাদের খুব অসুবিধে হয়েছে—তাই বলে কি ওঁর মত বয়সের লোককে উল্লুক বলতে হয়? বলুন তো আপনি ওঁর চেয়ে কত ছোট! নরেন চীৎকার করে উঠল you shut up—

সুরেন। শুনেছি। কিন্তু সরকার মশাইকে অপমান করবার জন্যে নরেন ও কথা বলে নি। ওর কথাবার্ত্তাই একটু বেখাপ্পা। ছেলে-বেলা মা মরে গেলেন—একটু ওয়াইল্ড হয়ে গেল। বিশেষ করে কটা কথা—

মণীন্দ্র। আমি জানি। মা তোমার বেঁচেও যতদিন ছিলেন—ততদিন তিনিই ওর এই ধারাটির পত্তন করে দিয়েছিলেন। তোমার পর দুটি সন্তান মারা গেল—তারপর হল নরেন—তোমার মা ওকে দুলাল করে তুললেন। ছেলেবেলায় তোমাকেও বলত কি উল্লুকের মত কাজ করছ!

সুরেন। কিন্তু ওর হৃদয় ভাল।

মণীন্দ্র। কিন্তু সঞ্জীবের সঙ্গে সহৃদয় ব্যবহার করেনি সে সেবার।

প্রতিমা। সঞ্জীববাবুরও ঠিক ওইভাবে উপদেশ দেওয়াটা ঠিক হয় নি।

মণীন্দ্র। সে উপদেশ দেয় নি, প্রতিবাদ করেছিল।

প্রতিমা। কিন্তু ঠাকুর-পো বলেন—(সে রজনীগন্ধার ডাঁটাগুলি—ফুলদানিতে সাজাইতে সাজাইতে কথাগুলি বলিল)

মণীন্দ্র। যা বলেন সেটা তাঁর কথা। আমি তার বাপ হয়ে অন্য কথা বলছি। তোমরা কল্পনা করতে পারবে না—ওর ওই কথায় ষ্টেশনের লোকেরা কি হয়ে গিয়েছিল। বুড়ো সরকার না পারে কাঁদতে, না পারে কথা বলতে। আমি ভেবে পাইনা কি বলব কি করব! সঞ্জীবই অবস্থাটাকে সহজ ক'রে দিলে! নরেন চীৎকার করে উঠল—shut up. শ্যামবর্ণ লম্বা ছেলেটি বড় বড় দুটি চোখ—হেসে এগিয়ে এল। নরেনের ধমক গায়ে মাখলে না। আমাকে প্রণাম ক'রে বললে—আপনি আসবেন শুনে আমরা দেখতে এসেছি। এই গ্রামেরই ছেলে আমরা। ছোট ষ্টেশন এখানে কুলী তো পাওয়া যায় না, দু'চার জন ছাড়া—তা আমরা বয়ে নিয়ে যাই না কেন? আমাদের জিনিষতো আমরা নিজেরাই নিয়ে যাই। আপনারা ট্রেনে এসেছেন—ক্লান্ত হয়েছেন। দশ বারো জন রয়েছি আমরা। সারাটা পথ নরেন গজ গজ করলে—অবশ্য ইংরাজীতে। খারাপ জায়গা dirty place—uncivilised people. বাড়ীতে জিনিষগুলি নামিয়ে দিয়ে সঞ্জীব—চমৎকার ইংরাজীতে বললে—You speak very nice

English—but master Ghosal-this place is not so dirty as you think—and we are not uncivilised. ঠিক তার পরের দিন নরেন এয়ার গান ছুঁড়ে মারলে ওকে।

প্রতিমা। সেটা ঠাকুরপো ওকে জেনে মারেন নি। দুপুর বেলা এয়ারগান নিয়ে বেরিয়েছিলেন—আম গাছে কে আম পাড়ছিল—উনি ভাল ক'রে দেখেন নি। আমাদের গাছ।

মণীন্দ্র। না, গাছটা আমাদের নয়, ওটা সঞ্জীবদেরই। অবশ্য আমাদের বাগানের গায়েই একবারে। পাড়াগাঁয়ে বাগান—অন্তত বড়গাছের বাগান পাঁচীল কি বেড়া দিয়ে ঘেরা থাকে না।

প্রতিমা। সে উনি জানতেন না। সেই ভেবে কেউ আম চুরি করছে দেখে—এয়ারগান ছুঁড়ে মেরেছিলেন। এয়ারগানের ছররাতে লাগেও না বেশী!

মণীন্দ্র। সঞ্জীবের বুকের মাংস কেটে ছররাটা বসে গিয়েছিল, সোন্না দিয়ে বের করতে হয়েছিল এবং বেশ রক্ত পড়েছিল। কিন্তু সে ওকে কিছু বলে নি। গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে হাত মুচড়ে এয়ারগানটি কেড়ে নিয়ে বলেছিল—আমি ওঁকে মারতে পারতাম। ওঁর থেকে আমার গায়ে জোর অনেক বেশী। কিন্তু আপনারা আমাদের গ্রামে একরকম অতিথি। আপনি শুধু বলে দেবেন—আমি চোর নই। গাছটা আমাদের।

সুরেন। থাক্ না বাবা ওসব কথা। Past is Past. সে সঞ্জীবও নেই—সে নরেনও নেই। সঞ্জীব আজ আমাদের সমাদরের পাত্র। ভগ্নিপতি। কিন্তু তবু সে ঠিক আমাদের সঙ্গে সেই ভাবে মিশল না—দূরে দূরে রইল—এইটেই বোধ করি নরেনকে বেশী লাগে! এক এক সময় আমারও মনে হয়—

মণীন্দ্র। কি মনে হয়? সঞ্জীব আমাদের ঘৃণা করে? আমাকেও ঘৃণা করে?

প্রতিমা। না বাবা। সে মানুষ সঞ্জীববাবু নন। ওটা ঠাকুরপোর ভুল।

মণীন্দ্র। (একটু স্তব্ধ থাকিয়া) আজও আমি তাই ভাবি। ভাবতে চেষ্টা করি। আমার কি এত বড় ভুল হবে? সঞ্জীবের একটা চেহারা আমি দেখেছি—তোমরা দেখ নি। সে চেহারা আমার চোখের উপর ভাসছে যে। সেবারের ঘটনা। জ্যৈষ্ঠ মাস, দুপুর রাত্রে প্রচণ্ড গোলমালে ঘুম ভেঙে গেল। ছাদে শুয়েছিলাম, উঠেই দেখি রাত্রির আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। গ্রামে কোথায় আগুন লেগেছে। সে আগুন দেখে মানুষের চীৎকার শুনে নরেন ভয়ে বিহ্বল হয়ে গেল; সুমি কেঁদে উঠল। ওদের বুঝিয়ে—আর্দ্দালির কাছে রেখে—আমি ছুটে বেরিয়ে গেলাম। হরিজন পল্লীতে আগুন—হয়তো আধঘণ্টার মধ্যে পাড়াটা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। চালে দেখলাম—জোয়ান মানুষদের মধ্যে ওই কালো লম্বা ছেলেটি, আগুনের সঙ্গে লড়াই করছে। আগুনের ছটা পড়েছে মুখে—বড় বড় চোখ দুটি যেন সে ছটায় জ্বলছে। নিচে পুকুর ঘাট থেকে সারিবন্দী ছেলে দাঁড়িয়ে হাতে হাতে জলের কলসী বয়ে আনছে। হঠাৎ ঘরের চালাখানা ধ্বসে পড়ল। সঞ্জীব লাফিয়ে পড়ল উঠোনে। একটা বাঁশের ডগার খোঁচায় পা জখম হল। তবু ভ্রূক্ষেপ নেই। আমি অবাক হয়ে গেলাম।

সুরেন। আপনি ওদের কিশোর-সংঘে দশটা বালতী কিনে দিয়েছিলেন। খেলবার জন্যে ফুটবল কিনে দিয়েছিলেন। সঞ্জীব ও গল্পটা দশবার বলেছে।

মণীন্দ্র। সেই সঞ্জীব আমাকেও ঘৃণা করে? নরেন বলে গেল।

সুরেন। না—না। ও কথা তো ওর বাড়িয়ে বলা—আমরা বার বার বলছি!

মণীন্দ্র। তবে তারা এল না কেন? একখানা চিঠি আমার জন্মদিনে—তাও দিলে না? সুমি আমাকে ভুলে গেল। She is lost to me—? অথচ। আজ গোপন করব না তোমাদের কাছে। সেই দিন—সেই রাত্রে আমি মনে মনে কল্পনা করেছিলাম—সঞ্জীব যদি ভাল ক'রে লেখাপড়া শেখে—বংশ ওদের ভাল—জমি জেরাতে স্বচ্ছল সংসার। ভাল লেখাপড়া শিখলে—এমনি ছেলেকেই জামাই করব। ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ পেলে সঞ্জীব, আই, এস, সিতে ফোর্থ হ'ল। বি-এস-সিতে কেমেষ্ট্রীতে ফার্ষ্ট হল। আমি তোমাদের সকলকে লুকিয়ে সুমিতার কাছে অহরহ সঞ্জীবের কথা বলেছি। প্রশংসা করেছি। তার অনুরাগ বাড়িয়ে তুলেছি।

(বাহিরের দরজায় কেহ কলিং বেল টিপিল)

কে সুরেন—দেখতো কে ?

(সুরেন বাহির হইয়া গেল)

(প্রতিমা আগাইয়া গিয়া দাঁড়াইল। ঘোষাল দাঁড়াইলেন)

মিঃ ঘোষাল। কোন গাড়ীর শব্দ তো—। তুমি পেয়েছ বউ মা ?

নেপথ্যে। আপনাদের বাড়ী থেকে আলো বেরুচ্ছে।

প্রতিমা। এ-আর-পির লোক।

মিঃ ঘোষাল। (বসিলেন) বেশী পাওয়ারের আলো লাগিয়েছ বুঝি ? খুলে ফেল। উৎসব টুৎসব যা করবে সন্ধের আগে শেষ করতে হবে। আর উৎসবই বা কেন ? জন্মদিন ! কিসের জন্মদিন ! মৃত্যু দিন এগিয়ে আসছে, তার জন্মদিন ! বন্ধ ক'রে দাও, সব বন্ধ করে দাও !

[সুরেন ফিরিয়া আসিল]

সুরেন—ওপরের বারান্দার আলোটা ভালো করে ঢাকা পড়ে নি।

প্রতিমা। বারান্দা তো তেরপলের পদ্দায় ঢাকা থাকবে।

মিঃ ঘোষাল। বলছি বন্ধ ক'রে দাও সব। cancel it—বলে দাও আমি অসুস্থ। আমার অসুখ। হবে না —জন্মদিন হবে না।

উত্তেজিতভাবে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। বাহিরে ট্যাক্সির হর্ন বাজিয়া থামিল। পরমুহূর্তে কলিং বেল বাজার সঙ্গে সঙ্গে সুমিতার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

সে সুমিতা। বাবা বাবা !

(প্রতিমা ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল)

প্রতিমা। সুমিতা। সুমিতা এসেছে !

(প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে সুরেন অনুসরণ করিল)

মিঃ ঘোষাল। ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন—উত্তেজিতকণ্ঠে ডাকিলেন—সুমি—সুমি—মা !

(সুমিতা প্রবেশ করিল)

(মিঃ ঘোষাল হাত বাড়াইলেন—সে আসিয়া বক্ষলগ্ন হইল)

সুমিতা ! বাবা ! বাবা ! (সে কাঁদিতে লাগিল)

মিঃ ঘোষাল। কাঁদছিস কেন মা ? কি হয়েছে ? সঞ্জীব ? সঞ্জীব কই ?

সুমিতা। সে আসে নি। সে এল না ! বাবা—

(সুরেন প্রতিমা ঘরে প্রবেশ করিল। সঙ্গে দু'জন চাকর বাক্স সুটকেস লইয়া ভিতরে চলিয়া গেল)

সুরেন। এত লট বহর নিয়ে এসেছিস কেন ? এই ব্ল্যাক আউটের রাত্রি। টেলিগ্রাম নেই, কিছু নেই—

সুমিতা। (বাপের বুকে মুখ রাখিয়াই বলিল) সেখানে আর আমি ফিরে যাব না। তাই সব জিনিষ নিয়ে এসেছি। সেখানকার সম্বন্ধ আমি শেষ ক'রে দিয়ে এসেছি !

মিঃ ঘোষাল। সুমি !

সুমিতা। (বাপের বুক হইতে মুখ তুলিয়া বলিল) সে আমাকে ঘৃণা করে, দাদাদের করে; বাবা তোমাকেও—তোমাকেও করে। আমি সম্বন্ধ শেষ করে চলে এসেছি।

ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। মিঃ ঘোষাল—তাহাকে অনুসরণ করিলেন।

মিঃ ঘোষাল। সুমি ! সুমি !

(ক্রমশঃ)

দিন দশটার কবিতা

প্রভাকর মাঝি

এখানে আকাশ নেই এখানে ফুলের গন্ধ নেই,
চোখে মুখে জেগে নেই তারুণ্যের বলিষ্ঠ শপথ।
ঘাসে ঘাসে নেই, আহা খসে-পড়া পাখীর পালক,
এখানে একক সত্য প্রত্যহের রুটির জগৎ।
ট্রামে বাসে হু হু করে এক পায়ে ছুটেছে জীবন,
ঘড়ির কাঁটার দিকে সতর্ক নজর পড়ে রয়।
জুতোর ঠোকর তুলে পেরিয়ে অনেক গুলো সিঁড়ি
যান্ত্রিক মানুষ চলে, আর চলে যান্ত্রিক সময়।
বীজগণিতের ছকে এখানে হিসেব ক'রে চলা,
নতুবা জোগাতে হয় বড়ো বেশী ভুলের মাশুল।
ভুলে যাই পৃথিবীকে ডুবে গিয়ে ফাইলের স্তূপে,
এখানে আকাশ নেই, এখানে নেইকো তারাফুল।
জীবন ফতুর হেথা দেনা করে' জীবিকার কাছে,
এখানে বিদ্যুৎ নয়, দুটো চোখে ক্ষুধা লেগে আছে।

শিশু-কল্যাণের আদর্শ

কুমারী পুষ্পদল ভট্টাচার্য্য

যুগে যুগে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা মনুষ্য সমাজকে বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষার উপায় চিন্তা করিয়াছেন। একদল চিন্তাশীল বলিলেন —জাতি, ধর্ম্ম ও শ্রেণী নির্বিশেষে সকল মানুষকে সমান অধিকার দিলে, সৌভ্রাত্রের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চলিলে সমাজ রক্ষা পাইবে। কিন্তু এই আদর্শ অবলম্বন করিয়াও যখন শান্তি আসিল না তখন আর একদল সমাজ-তত্ত্ববিদ বলিলেন—নারীর পরাধীনতাই সকল প্রকার সামাজিক অশান্তির মূল, তাহাদের স্বাধীনতা দাও, অবিলম্বে বিশ্বে শান্তি স্থাপিত হইবে। কিন্তু দেখা গেল—এই আদর্শও মানব-সমাজের বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি দূর করিতে পারিল না।

নিয়ত বর্দ্ধিত সামাজিক বিশৃঙ্খলা দূর করিতে গিয়া এইবার সমাজ-বিদ্‌গণের দৃষ্টি পড়িল শিশুর উপর। আজিকার শিশু-সমাজই আগামী-কালের মনুষ্য-সমাজের নিয়ন্ত্রক—সেজন্য যে কোন দেশের, যে কোন সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ হইল শিশু। শান্তিপূর্ণ সুসম্বদ্ধ ও উন্নত সমাজ-সংগঠনের জন্য তাই শিশুর যথাযোগ্য লালনপালন অতি আবশ্যক, ইহার অন্যথায় সমাজের ধ্বংস অনিবার্য্য। বর্ত্তমান যুগের বিশ্বের সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিই উপলব্ধি করিয়াছেন শিশুর কল্যাণেই সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণ নিহিত। এই জন্যই বর্ত্তমান শতাব্দীকে "শিশু-শতাব্দী" বলা হয়।

এইজন্যই আজ পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্যদেশের সকল প্রকার সমাজ-কল্যাণের পরিকল্পনার কেন্দ্রে রহিয়াছে—শিশু-কল্যাণের আদর্শ। প্রসিদ্ধ শিক্ষাতত্ত্ববিদ জন্ ডিউয়ি বলিয়াছেন—"শ্রেষ্ঠ ও বুদ্ধিমান পিতা-মাতা তাঁহাদের সন্তানের কল্যাণের জন্য যাহা যাহা চান, সমাজও তাহার সকল শ্রেণীর সকল শিশুর জন্য তাহাই চায়।" আজ আমরা উপলব্ধি করিতেছি সমাজের সকল শিশুই "আমাদের শিশু"—অতএব তাহাদের যথাযোগ্য লালনপালনের দায়িত্বও আমাদের অর্থাৎ সমাজের প্রত্যেক শিক্ষিত ও পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির। এইজন্যই প্রত্যক সভ্যদেশের রাজ্য-সরকার ও শিক্ষিত সমাজ শিশুকল্যাণ কার্য্যে বহু অর্থ, সেবক ও সময় নিয়োগ করিতেছেন।

পূর্ব্বে "শিশুকল্যাণ" বলিতে শিশুর জন্মের পূর্ব্বে ও পরে প্রসূতির ও শিশুর পরিচর্য্যা, শিশু-প্রদর্শনী ও এইরূপ কয়েকটি সাধারণ ব্যবস্থার কথা বুঝাইত। বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের, বিশেষতঃ মনস্তত্ত্ব ও শিশুপালন বিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সকলেই উপলব্ধি করিতেছেন যে শিশুকল্যাণ কার্য্য শিশুর সমগ্র জীবন লইয়াই পরিচালিত হওয়া উচিত। শিশুর সমগ্র জীবন বলিতে তাহার দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক জীবন বুঝাইতেছে। শুধু তাহাই নহে, শিশু কল্যাণের আদর্শ অনুযায়ী প্রাপ্ত-বয়স্ক ব্যক্তি ভিন্ন সকলেই শিশু।

Gestalt Psychologistগণ বলেন যে সুসম্বদ্ধ ব্যক্তি জীবন গঠনে শিশুর জন্মের পরের অবস্থাই শুধু নয়, তাহার জন্মের পূর্ব্বের অর্থাৎ তাহার মাতৃগর্ভে থাকাকালীন অবস্থারও প্রভাব থাকে। এইজন্য শিশুকল্যাণকামীরা একদিকে যেমন শিশুর যথাযোগ্য লালনপালন ব্যবস্থার আয়োজন করিতে চান অন্য দিকে তেমনি বিবাহেচ্ছু যুবক যুবতীকে শিশুমাতা হইবার যোগ্য শিক্ষা দানের ব্যবস্থাও করেন।

শিশুকল্যাণের এই বহু-বিস্তৃত আয়োজনকে আমরা মোটামুটি কয়েকটি ভাগে ভাগ করিতে পারি ; যথা—

১। শিশু-জন্মের পূর্ব্বের ও পরের ব্যবস্থা।

২। জন্মের পর হইতে বিদ্যালাভের বয়স, অর্থাৎ তাহার পাঁচ, ছয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সময়ের জন্য ব্যবস্থা।

৩। বিদ্যালাভের বয়সের—কৈশোর ও তরুণ জীবনের জন্য যথাযোগ্য কল্যাণকর ব্যবস্থা।

৪। শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকগ্রস্ত শিশুর লালন পালন ব্যবস্থা।

এ ছাড়া স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক যে কোন প্রকৃতির শিশুর যথাযোগ্য লালন পালনের ব্যবস্থা করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে :—

১। শিশুর উপযুক্ত আহার, বাসস্থান ও খেলাধুলার ব্যবস্থা।

২। তাহার শিক্ষা ব্যবস্থা, ও

৩। যথাযোগ্য চিকিৎসার আয়োজন।

এখন শিশুকল্যাণের এই সকল বিভিন্ন বিভাগের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য-প্রণালীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক।

প্রথম, শিশু-জন্মের পূর্ব্বের ব্যবস্থা—আজকাল এই ব্যবস্থা শুধু প্রসূতির স্বাস্থ্যের উন্নতি, তাহার আহার বিহারে যথাযোগ্য আয়োজনেই সীমাবদ্ধ নেই। সুযোগ্য পিতামাতা হইবার শিক্ষা বা ট্রেনিং, পারিবারিক পরিকল্পনার (Family Planning) শিক্ষা, গর্ভাবস্থায় প্রসূতির শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য-রক্ষার যাবতীয় আয়োজনও এই বিভাগের অন্তর্গত।

শিশুজন্মের পরের ব্যবস্থা পূর্ব্বে শুধু—প্রসবকালীন ও তাহার পর কিছুদিন পর্য্যন্ত প্রসূতি ও নবজাতকের শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষা কার্য্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। লোকে মনে করিত, ভাল প্রসূতি-সদন ও সুশিক্ষিত দাইয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিলেই এই বিভাগের সকল দায়িত্ব সম্পূর্ণ হইল। বাস্তব পক্ষে দায়িত্বের এই সবে মাত্র আরম্ভ হইল। আমাদের দেশের, শুধু আমাদের দেশে কেন, বোধহয় পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেরই বেশীর ভাগ লোকই দরিদ্র। এইসকল দরিদ্র পরিবারে

শিশুজন্মের কয়েকদিন পর হইতেই প্রসূতিকে সংসারের ও বাহিরের নানা পরিশ্রমের কার্য্যে এরূপ লিপ্ত হইয়া পড়িতে হয় যে তাঁহারা ইচ্ছাসত্ত্বেও শিশুর লালনের জন্য যথেষ্ট সময় দিতে পারেন না। আবার এমন অনেক গরীব ও মধ্যবিত্ত পরিবার আছে যেখানে মায়ের অবসর থাকিলেও অর্থাভাবে শিশুর যথোচিত যত্ন করা সম্ভবপর হয় না। এই সকল পরিবারের শিশুগণের যথোচিত লালনপালনের ব্যবস্থার জন্য আজকাল ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক স্থানে সরকার কর্তৃক পারিবারিক অর্থ সাহায্য (Family allowance) বা বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

শিশু যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পালিত হয় তাহারও প্রভাব ব্যক্তিজীবনে কম নয়। অথচ আজও পৃথিবীর অধিকাংশ শিশুকেই দরিদ্র গৃহের ও বস্তির অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যেই বর্দ্ধিত হইতে হয়। স্বাস্থ্যকর বাসস্থানের ব্যবস্থা না হইলে শিশুকল্যাণ কার্য্যের উন্নতিও ব্যাহত হইবে। এজন্য প্রত্যেক দেশেরই সরকারের সেই দেশের প্রত্যেক লোকের জন্য স্বাস্থ্যকর বাসস্থানের ব্যবস্থা করা উচিত।

পিতা মাতার দারিদ্র্য ও বেকার জীবনের প্রভাবও শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও উন্নতির পথে বাধা দেয়—এই জন্য বেকার সমস্যা সমাধান ও প্রত্যেক পরিবারে প্রয়োজন অনুযায়ী পারিবারিক বৃত্তিদানের জন্য সরকারী সাহায্য আবশ্যক।

এই বিভাগের আর একটি অতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হইল কর্ম্মী মায়েদের শিশু সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শিশুগৃহ বা crechesএর ব্যবস্থা। অল্প কয়েকটি কারখানা ভিন্ন অদ্যাপি ভারতের আর কোনখানে শিশুগৃহের ব্যবস্থা হয় নাই। বেচারী মা প্রতিদিন তাঁহার দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে সঙ্গে লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে যাইতে বাধ্য হন, কিন্তু সেখানে শিশুর প্রতি যথেষ্ট সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার সুযোগ না পাওয়ায় অনেক জায়গাতেই হয় রোগে, আর না হয় কোনও দুর্ঘটনার ফলে শিশুর মৃত্যু ঘটে। এই প্রকার শিশুমৃত্যু রোধ করিতে হইলে আমাদের প্রত্যেক পাড়ার ও মায়েদের কর্ম্মক্ষেত্রে সকল শ্রেণীর কর্ম্মী মায়েদের সুবিধার জন্য যথাযোগ্য শিশুগৃহের ও নার্শারী স্কুলের ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হইবে।

শিশুমঙ্গলের আর একটি বিভাগ হইল মাতৃমঙ্গলের ব্যবস্থা। মায়ের অকালমৃত্যুর ফলে শুধু নবজাতকের জীবনই বিপন্ন হয় না, তাঁহার অন্যান্য সন্তানদেরও যথাযোগ্য লালনপালনের অভাব হয় এবং সময় সময় মাত্র একটি নারীর মৃত্যুতে সমগ্র পরিবারটিই ধ্বংস হইয়া যায়। এজন্য সমাজের কর্ত্তব্য প্রসবের পর প্রসূতির আহার ও বিশ্রামের যথাযোগ্য আয়োজন করা। যতদিন না পূর্ণস্বাস্থ্য ফিরিয়া পান ততদিন কোনও জননী যেন দারিদ্র্যের অজুহাতে সংসারের বা বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্রে যাইতে বাধ্য না হন এই ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন প্রসূতির ও সদ্যজাতকের জন্য পুষ্টিকর আহার ও ঔষধের আয়োজন তো অত্যাবশ্যকীয়।

দেখা গিয়াছে মানুষের জন্মের পর হইতে পাঁচ, ছয় বৎসর বয়সের প্রভাব তাহার পরবর্ত্তী সমগ্র জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করে। ব্যক্তি-জীবনের সমস্ত বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির মূলে রহিয়াছে তাহার এই বয়সের প্রভাব। এই বয়সে পিতামাতার অতি আদর অথবা অনাদর শুধু শিশুর সাময়িক জীবন ধারাকেই ব্যাহত করে না, পরন্তু ব্যক্তির পরবর্ত্তী জীবন ও কার্য্যধারাকেও বিশৃঙ্খল ও অসম্বদ্ধ করিয়া দেয়।

এই জন্য পাঁচ ছয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুদের শিক্ষার জন্য যথেষ্ট নার্শারী স্কুল, তাহার সর্ব্বপ্রকার শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষের জন্য নানাবিধ খেলাধুলার আয়োজন, যথোপযুক্ত আহার বিহার, স্বাস্থ্য ও গৃহজীবনের ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক।

ইহার পরবর্ত্তী অধ্যায় হইল শিশুর বিদ্যালয়-জীবন। অধিকাংশ বিদ্যালয়েই মাঝারী বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদেরও দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। অল্পবুদ্ধি ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন বালকের জন্য যথাযোগ্য শিক্ষা ব্যবস্থা করা হয় না। এই জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়পড়তা হিসাবে না হইয়া প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রীর নিজস্ব ব্যক্তি জীবন গঠনে সাহায্য করে সেইদিকে সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে প্রত্যেক শিশুই অদ্বিতীয়, এজন্য প্রত্যেক শিশুকেই তাহার মধ্যে নিহিত গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধনের জন্য তাহার নিজস্ব প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। একদিকে যেমন অল্পবুদ্ধি বালকের প্রতি, অপরদিকে তেমনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি বালকের প্রতিও সযত্ন দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। শিশু জন্মের প্রথম ছয় বৎসরের ন্যায় যৌবনোদ্ভেদকাল বা কিশোর বয়সও মানুষের জীবনের একটি সংকটময় কাল। ব্যক্তি জীবন গঠনে এই বয়সের প্রভাবও সুদূরনিহিত। সেইজন্য কিশোর বালকবালিকার যথোচিত পালন ও শিক্ষা ব্যবস্থায় তাহাদের পিতামাতা ও সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব অতি কঠিন। শারীরিক ও মানসিক সকল প্রকার উন্নতির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া ইহাদের শিক্ষার, স্বাস্থ্যরক্ষার ও খেলাধুলার যথাযোগ্য আয়োজন করিতে হইবে। এই বয়সের বালকবালিকার উন্নতির জন্য আজকাল পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই "কিশোর আন্দোলন" বা "ইউথ মুভমেণ্ট" আরম্ভ হইয়াছে। এই সকল দেশের সরকারও আজকাল এই আন্দোলনের যথেষ্ট পৃষ্ঠ-পোষকতা করিতেছেন।

শিশুকল্যাণের আর একটি বিভাগ হইল শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকযুক্ত শিশুদের লালন ও শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য যে সকল শিশু জড়বুদ্ধি, অথবা কোনও প্রকার শারীরিক বা মানসিক রোগগ্রস্ত,—যেমন, অন্ধ, খঞ্জ, বধির বা দুর্ব্বলমস্তিষ্ক শিশু,—তাহাদের জন্যও বিশেষ ধরণের চিকিৎসা, আহার বিহার, খেলাধুলা ও শিক্ষা ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে প্রত্যেক শিশুই সমাজের নিজস্ব সম্পদ।

একগুঁয়ে, জেদী ও অন্যপ্রকার সমস্যাযুক্ত শিশুদের (প্রবলেম চাইল্ড) স্বভাব শোধরাইবার জন্য যথেষ্ট শিশু পরীক্ষাগার বা চাইল্ড ক্লিনিক গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই পরীক্ষাগারসমূহ যোগ্য শিশু-মনস্তত্ত্ববিদগণের পরিচালনায় থাকিয়া এই সকল সমস্যাযুক্ত শিশুর পরীক্ষা করিয়া তাহাদের যথাযোগ্য শিক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে তাহাদের পিতামাতাকে সাহায্য করিবেন।

আর একদল শিশু আছে যাহাদের উন্নতি নানা সামাজিক প্রতিবন্ধকতার জন্য ব্যাহত হয়। এই দলের মধ্যে আছে অবিবাহিত পিতামাতার সন্তান, অতি দরিদ্র পিতামাতার সন্তান—যাহাদের অতি শৈশব হইতেই জীবিকা অর্জ্জন করিতে হয়, এবং ক্রিমিনাল বা অপরাধী পিতামাতার সন্তান। অল্প কয়েকটি ব্যতিরেক ভিন্ন অধিকাংশ শিশুর অপরাধপ্রবণতা তাহাদের পিতামাতার দারিদ্র্য ও পারিপার্শ্বিক অস্বাস্থ্যকর অবস্থার সহিত যুক্ত থাকে। এজন্য এই শিশুদের কল্যাণের জন্য সর্ব্বাগ্রে তাহাদের পিতামাতার অবস্থার উন্নতি এবং অস্বাস্থ্যকর পল্লী সমূহের উন্নতি করা আবশ্যক, নচেৎ শুধু বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা দ্বারা অপরাধপ্রবণতা দূর করা সম্ভব নয়।

অবিবাহিত পিতামাতার সন্তান তাহাদের পিতা ও মাতার দোষে কষ্ট পায়, তাহাদের নিজের দোষে নয়। এই জন্য এই সকল শিশুও যাহাতে বিবাহিত পিতামাতার সন্তানের সমতুল্য শিক্ষা ব্যবস্থা ও অন্যান্য প্রকার সুযোগ সুবিধার অধিকারী হয় সেজন্য সকল প্রকার সামাজিক ব্যবস্থা করিলেই শুধু হইবে না, তাহাদের এই সকল অধিকার দিয়া আইনও প্রস্তুত করিতে হইবে।

শিশুশ্রম নিবারণের জন্য অবিলম্বে যথোচিত আইন হওয়া প্রয়োজন। সকল শ্রেণীর শিশুরই অন্ততঃ পনের ষোলো বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষালাভ অপরিহার্য্য করিতে হইবে। এই শিক্ষাদান পদ্ধতিও ধনী ও দরিদ্র নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক বালকবালিকার নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী করিতে হইবে।

যে সকল অপরাধী-শিশু তাহাদের অপরাধী পিতামাতার অথবা অন্য কোন প্রকার অসৎ-সংসর্গে মিশিয়া চুরী করা, পকেটমারা ইত্যাদি কুকার্য্য করিয়া আইনের চক্ষে দোষী প্রমাণিত হইয়াছে তাহাদের জন্য বিশেষ ধরণের, সাধারণ অপরাধীগণের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার, বিচার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহাদের শাস্তি না দিয়া দরদ ও সহানুভূতিপূর্ণ বিশেষ ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ইহাদের সৎ ও যোগ্য নাগরিক করিয়া তুলিতে হইবে।

এইভাবে সমাজের সকল শ্রেণীর সকল অবস্থার প্রত্যেক শিশুর সামগ্রিক কল্যাণের আয়োজনের নামই "শিশু-কল্যাণ" ব্যবস্থা। পরিবারের কল্যাণের সহিত শিশুর কল্যাণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। পূর্ব্বে সমাজ-সংস্কারকরা যে সকল পিতামাতা তাঁহাদের সন্তানের যথাযোগ্য লালনপালন করিতে অপরাক হইতেন তাঁহাদের নিকট হইতে শিশুকে সরাইয়া অন্যত্র রাখিবার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু এই সম্বন্ধীয় নানা পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে—পিতামাতার সাহচর্য্য ও গৃহের স্বাভাবিক পরিস্থিতিই শিশুর স্বচ্ছন্দ উন্নতির জন্য একান্ত প্রয়োজন। এইজন্য আধুনিক সমাজসেবীরা শিশুকে অন্যত্র সরাইয়া না লইয়া প্রতি গৃহের পরিস্থিতিই শিশুর উন্নতির অনুকূল করিয়া তুলিবার পক্ষপাতী। অনাথ বালকদেরও সাধারণ অনাথালয়ের আবহাওয়ায় না রাখিয়া তাহাদের জন্য "ফষ্টার হোম" বা পালন গৃহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই গৃহগুলি সরকার কর্ত্তৃক পরিচালিত হইলেই ভাল হয়। ইহাতে কোমল প্রকৃতির মাতৃভাবাপন্ন নারীদের পরিচালনায় ও স্বাভাবিক গৃহের আবহাওয়াতে রাখিয়া অনাথ শিশুদের পালনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এইরূপে সমাজের সকল শিশুর কল্যাণের জন্য সকল পরিবারের কল্যাণ ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমাজের প্রতিটি পরিবারের কল্যাণ হইলেই সমাজও অতি অবশ্য উন্নত হইবে। এই রকমে শিশু কল্যাণের যথাযোগ্য ও বিস্তৃত কার্য্যধারা অনুসরণ করিলেই বিশ্বের মানবসমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইবে। মনে রাখিতে হইবে, শিশুর কল্যাণেই জগতের কল্যাণ।

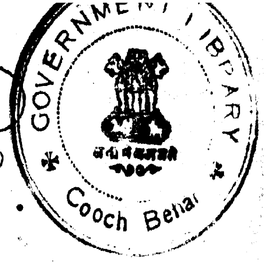
রজনীগন্ধা

কালিদাস রায়চৌধুরী

রজনীগন্ধা সযতনে তুলে আনি
আজও ভরে রাখি তোমার শূন্যস্থান ;
হঠাৎ বুঝি বা মিনে-করা ফুলদানি
সাদা মেঘে মেঘে দোলায় আকাশখান।
এই বাতায়নে দাঁড়ায়ে সেদিন কত—
উদ্বেল মনে নিকট অংগীকারে
ভরেছিলে রাত বিদ্যুৎ নিয়ে যত ;
স্মৃতি মন্থনে সুধা তাই বারে বারে।
ধরণীর বুকে প্রলয় মূর্তি জাগে

প্রাণ ধারণের গ্লানি দুঃসহ দেখি :
তারি মাঝে আসে নবজাত শিশু একি—
বনানীতে শোভা শাশ্বত অনুরাগে।
বিবর্ণ রাতে প্রদীপ্ত রাঙা সুরে
দেখে যাও কত রেখেছি রজনীগন্ধা—:
চাঁদ উঠলেই ছায়া ছবি কথা কবে ;
বিদিশা মায়ায় সকল জানব সন্ধ্যা।
মালবিকা এসো, ইমনের তালে তালে :
রজনীগন্ধা সোহাগের সুর ঢালে।

বিশ্বসাহিত্য



নরেন্দ্র দেব

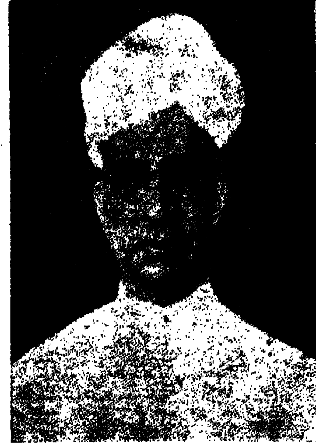
সর্বভারতীয় লেখক সম্মেলন

(পূর্বানুবৃত্তি)

১৬ই এপ্রিল সম্মেলন শুরু হবার কথা। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু সম্মেলন উদ্বোধন করবেন। ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি শ্রীসর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ সম্মেলনের সভাপতি পদ অলঙ্কৃত করবেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার শ্রীসি-পি-রামস্বামী আইয়ার সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাবেন। এটুকু আমরা পি-ই-এন প্রেরিত বিজ্ঞপ্তি ও পরে সংবাদপত্রেও দেখেছিলাম। কিন্তু সম্মেলনের কার্যসূচী সম্বন্ধে আমরা ১৬ই তারিখের মধ্যাহ্ন পর্যন্ত কিছুই জানতে পারিনি। ঐ সময়ের মধ্যে সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য প্রতিনিধিরা প্রায় সকলেই এসে পড়েছিলেন। পরস্পর পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করছিলেন—সম্মেলনের কার্যসূচী সম্বন্ধে আপনারা কিছু জানেন কি? উত্তরে সবাই এক কথাই বললেন; অর্থাৎ, তাঁরা কিছুই জানেন না। স্বেচ্ছাসেবকদের অফিসে খবর নেওয়া হল 'প্রতিনিধিদের ব্যাজ' ও 'সম্মেলনের কার্যসূচী' আমরা কখন পাবো?' তাঁরা জানালেন, 'আমরা এখনও কিছুই পাইনি। পেলেই আপনাদের জানাবো।'

কানাঘুসায় শোনা গেল পণ্ডিতজী সন্ধ্যার আগে আসতে পারবেন না। অতএব ১৬ই তারিখেও সারাদিন আমাদের আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে বেকার বসে থাকতে হবে বুঝতে পেরে অনেকেই বেরিয়ে পড়লেন চিদম্বরম মন্দির ও জনপদ ঘুরে দেখে আসতে। নূতন প্রতিনিধি দলের কয়েকজনের পাল্লায় পড়ে আমাকে আজ চিদম্বরম দর্শনে যেতে হল। সকালে ঘুম থেকে ডেকে তুললে দ্রাবিড়ী কণ্ঠের এক সুদৃঢ় হাঁক 'পেপার সার্!' চোখ মেলে চেয়ে দেখি তখনও ভাল ক'রে ভোর হয়নি। অন্ধকারের পাত্‌লা অবগুণ্ঠনে আন্নামালাই নগরী আবৃত। কাগজ এনেছে "ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস্"। দশপাতা ইংরাজী কাগজ। দাম: মাত্র ছ'পয়সা। আমাদের কলকাতা শহরে আটপাতা কাগজের দু' আনা দাম। ভাবলুম এর কারণ কি? যা' মনে হ'ল তা না বলাই ভাল। ছ'পয়সা দিয়ে একখানি কাগজ নিয়ে ইলেক্‌ট্রিক আলো জেলে পড়তে বসে গেলুম। কখন যে পূর্বাচলে অরুণের হাসি ফুটে উঠেছে টের পাইনি। মুক্ত বাতায়ন পথে সূর্যকিরণ এসে কাগজের উপর পড়ে ঝিক্‌মিক করছে দেখে উঠে গিয়ে যেই আলোর সুইচটি টিপে বাতি জ্বালিয়েছি, শিয়র থেকে পরিচিত কণ্ঠে কে যেন বলে উঠলো: "সুপ্রভাত মিঃ দেব। আমাকে বোধহয় চিনতে পারছেন না? আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার।"

সার সি, পি. রামস্বামী আইয়ার এখন আর তাঁর নামের পূর্বে 'সার্' উপাধিটি' ব্যবহার করেন না। তিনি এসেছিলেন প্রতিনিধিদের খোঁজ খবর নিতে। এডিনবরা পি-ই-এন কংগ্রেসে ইং ১৯৫০ সালে এঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল। ভারতের প্রতিনিধি ও আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে তিনি সেবারের আন্তর্জাতিক পি-ই-এন কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে এঁর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। তখন তাঁকে দেখেছিলুম ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান বাহাদুরের দরবারী



শ্রীসর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্
(ইনি বর্তমানে ভারতীয় পি-ই-এন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি এবং "সর্বভারতীয় লেখক সম্মেলনেরও" সভাপতি ছিলেন)

পোষাকে। শিরে দক্ষিণ ভারতীয় শিরস্ত্রাণ, পরিধানে পায়জামা ও আঙরাখা। সুপুরুষ তিনি। সে পোষাকে তাঁকে যেন একজন রাজা মহারাজা ব'লে মনে হচ্ছিল! কিছুদিন আগেও কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির একটি সভায় তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ভারতের প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন। সেদিনও ছিল তাঁর পরিধানে সেই রাজবেশ! কিন্তু আজ এসেছেন তিনি একান্ত দীন হীন বেশে—অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাতে। মস্তক অনাবৃত,

পরিধানে মান্দ্রাজের একজন অতি সাধারণ পথিকের মতো মুক্তকচ্ছ অর্ধবাস, বাংলায় যাকে 'লুঙ্গি' বলা যেতে পারে। গায়ে একটি সামান্য হাফশার্ট। পায়ে মান্দ্রাজী স্যাণ্ডেল। এ বেশে সার্ সি পি রামস্বামীকে কখনো দেখিনি। পোষাক যে মানুষের চেহারাকে কতখানি বদলে দেয় তার প্রমাণ পেলুম এবার। পরিচিত রামস্বামী আইয়ারকে আমি চিনতেই পারলুম না! তিনি যখন নমস্কার জানিয়ে কুশল প্রশ্ন করে চলে গেলেন, হঠাৎ তাঁর বড় বড় চোখ দুটির ধ্যানগম্ভীর দৃষ্টি আমাকে যেন চকিতে একটা মৈত্রের পরিচিতির ছোঁয়া দিয়ে গেল! কিন্তু তখন তিনি প্রতিনিধি মহলের অন্যদিকে চলে গেছেন। পরে অবশ্য সভাস্থলে পুনরায় দেখা হ'তে তাঁকে আমি অকপটে একথা জানিয়ে আমার ত্রুটি সংশোধন ক'রে নিয়েছিলুম। তিনি সব শুনে শিশুর মতো হাসতে লাগলেন। বললেন, 'তাহ'লে দেখছি



নাটমন্দির বা 'নটরাজ সন্নিধি'

দর্জিদের কাছে আমাদের রীতিমত কৃতজ্ঞ থাকা উচিত! চেহারাই তারা পাল্টে দেয় সাজ পোষাকের ভড়ং দিয়ে!'

কথাটা মিথ্যা নয়।

যাক্। তাড়াতাড়ি স্নান ও প্রাতরাশ সেরে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম চিদম্বরম্ মন্দিরে নটরাজ শিবের প্রলয় নাচনের ছন্দাবকাশে কোনও এক বিরাম মহূর্তের—অর্থাৎ, তালের ফাঁকে যমের মুখের সৌম্য মূর্তিটি দেখতে। ঘনশ্যাম তরুকুঞ্জ পরিবেষ্টিত এই সুগঠিত সুন্দর বিরাট মন্দিরটি একটি পবিত্র জলাশয় তীরে স্থাপিত হয়েছিল। কথিত আছে যে পুরাকালে ঋষি পতঞ্জলি ও ব্যাঘ্রপাদ মুনির তপস্যায় তুষ্ট হয়ে দেবাদিদেব মহাদেব এইখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদের বরদানের জন্য। তাঁরা প্রার্থনা করলেন—এই সৃষ্টি ও ধ্বংসের রহস্যলীলা আরবার জন্য। শিবশম্ভু তাপসদ্বয়ের এই প্রার্থনা শুনে প্রীত হয়ে নটরাজ মূর্তিতে নৃত্য করতে শুরু করলেন। এই দৈবী নৃত্যের তালে তালে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় বা ধ্বংসের যে লীলা একই সঙ্গে রুদ্র ও মধুর ছন্দে প্রকাশিত হ'য়েছিল তারই অবিস্মরণীয় স্মৃতির শোভন দেউল ভক্তগণের একান্ত আগ্রহে একদা এখানে নির্মিত হয়েছিল। তীর্থযাত্রীরা দলে দলে এ মন্দিরে এসে নটরাজের পূজা দিয়ে জীবন সার্থক হল মনে করেন। পল্লভ, চৌল, পাণ্ড্য ও নায়ক প্রভৃতি রাজন্যবৃন্দের বংশপরম্পরার অমিতদান ও পৃষ্ঠপোষকতায় এ মন্দির দিনদিন উৎকর্ষ লাভ করেছিল। স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, ঐশ্বর্যে ও সৌন্দর্যে এই দেব দেউল একদা অতুলনীয় হয়ে উঠেছিল।



নটরাজ

মন্দিরটি ১৩৫ বিঘে জমি অধিকার করে বিস্তৃত হয়েছে জানলে এর বিশালতা সম্বন্ধে কতকটা ধারণা হতে পারে। অসংখ্য বিমান ও চূড়ায় এ মন্দির পরিশোভিত। চারদিকে চারটি প্রশস্ত রাজপথে চারটি পৃথক পৃথক প্রবেশ দ্বারের উপর অপূর্ব কারুকার্যখচিত আকাশচুম্বী গোপুরম বা তোরণশীর্ষ। মন্দিরটির চার পাশ উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। দৈর্ঘ্যে হাজার ফুট ও প্রস্থে আটশ' ফুট। সমস্ত মন্দিরের গায়ে নানা দেব-দেবীর মূর্তি, নৃপতি, নর্তকী, বাদ্যকর এবং ঋষি মুনিদের প্রতিকৃতি ও [illegible] ফুল লতা পাতা ইত্যাদি অলঙ্কারিক কারুকার্যখচিত। মন্দির [illegible] যে বিশাল সরোবরটি তার নাম শিবগঙ্গা। শিবগঙ্গার চারিদিকে

পাষাণ সোপান ও স্তম্ভশ্রেণী ঘেরা অলিন্দ ! এখানকার প্রত্যেক মন্দিরই তিন মহলা। প্রথমেই নাটমন্দির, তার পর ভোগমন্দির, তারপরই গর্ভগৃহ বা বিগ্রহ দেউল। কিন্তু এ মন্দির পাঁচটি মহলে বা সভায় বিভক্ত। তার মধ্যে প্রধান হ'ল 'কণকসভা'। এইখানেই নটরাজের মূর্তি স্থাপিত। কণকসভার চূড়াটি স্বর্ণমণ্ডিত। কণক-সভার সামনেই 'নৃত্যসভা'। ছাপ্পান্নটি স্তম্ভ পরিবেষ্টিত এই নৃত্যসভায় অসংখ্য সুন্দর নৃত্যভঙ্গীযুক্ত নর্তকীদের মূর্তি খোদিত আছে। সরোবরের সন্নিকটে আর একটি 'নৃত্যসভা' আছে। এরও ভিত্তিমূলে লীলায়িত নৃত্য ছন্দে নর্তকীদের সুঠাম মূর্তি উৎকীর্ণ করা আছে। তারপরই 'রাজসভা'। সহস্র স্তম্ভ পরিবেষ্টিত এই রাজসভা দৈর্ঘ্যে ৩৫০ ফুট এবং প্রস্থে ২৭০ ফুট।

এখানে নটরাজ শিবের মন্দিরের পাশেই আছে 'গোবিন্দরাজ' বিষ্ণুর মন্দির। বোধকরি এরা এই তত্ত্বটাই প্রমাণিত করছে যে শিব ও বিষ্ণুর মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই। এরা একই দেবতাত্মা ! অতএব শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও বিরোধ থাকা উচিত নয়। কিন্তু, দুঃখের বিষয় মাদ্রাজ একদা রক্তাক্ত হ'য়ে উঠেছিল এই শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আত্মকলহের ফলে।

মন্দির দেখে ফিরতে অনেক বেলা হ'য়ে গেল। স্নানাহারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে সবাই আবার বেরিয়ে পড়লেন আন্নামালাই বিশ্ব-বিদ্যালয় পরিদর্শনে। ওঁরা বলেন ভারতবর্ষের মধ্যে এত বড় আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় নাকি আর নেই ! বারাণসীর হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ও নাকি এর তুলনায় অনেক ছোট। এই ছোটবড়র তর্ক মুলতুবি রেখে প্রতিনিধিরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাসে চড়ে স্বেচ্ছাসেবকদের তত্ত্বাবধানে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দ্রষ্টব্য যা কিছু সেগুলি দেখা শেষ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। কারণ, মধ্যাহ্ন ভোজনের পর প্রতিনিধিদের ঘরে ঘরে তিনদিনের সম্মেলনের কার্যসূচী, আসনের নম্বর ও নামলেখা প্রবেশপত্র, সম্মেলন-কর্তাদের পরিচয় পত্রিকা, প্রতিনিধিদের পরিচয় পত্রিকা ও ব্যাজ এবং পি-ই-এন সদস্যদের পরিচয় পুস্তিকা বিলি করা হয়েছিল। তাতে দেখা গেল যে বেলা সাড়ে তিনটের মধ্যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন শেষ করে নিয়ে আসতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সিণ্ডিকেট কক্ষে' পি-এন সদস্যদের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে পরিচয়ের জন্য।

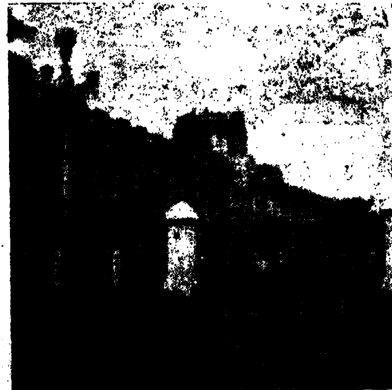
যথাসময়ে যথাস্থানে আমরা সকলে এসে সমবেত হলুম। শ্রীমতী ওয়াদিয়া এই সভায় তাঁর দুই যুগ্ম সম্পাদককে নিয়ে সভার কার্য পরিচালনা করছিলেন। শ্রীপি-জি-শাহ ও শ্রীএম আর জমুনাথন দু'জনেই খুব উপযুক্ত লোক। শ্রীশাহ গুর্জর প্রদেশের মানুষ। একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ, বি-এস-সি ডিগ্রী থেকে শুরু করে সি-আই-ই প্রভৃতি একাধিক সরকারি উপাধিও তাঁর আছে, বহু গ্রন্থও লিখেছেন, সম্মেলনকর্তাদের পরিচয় পত্রিকা থেকে এসব



আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়

জানা গেল। শ্রীজমুনাথন তামিল ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত। ইনি ট্রিচিনোপলির মানুষ। বেদ উপনিষদের ভাষ্য থেকে বহু যোগশাস্ত্র ও একাধিক ভারতীয় মহাপুরুষদের জীবনী তিনি রচনা করেছেন। সভায় কর্মকর্তারা প্রস্তাব করলেন—প্রত্যেক পি-ই-এন সদস্য তাঁর আসন থেকে মঞ্চের উপর উঠে এসে স্ব-স্ব পরিচয় নিজ মুখে বিবৃত করুন।

সদস্যরা লজ্জিত হয়ে পড়লেন। নিজ মুখে নিজের পরিচয় দেওয়ার যে কি বিড়ম্বনা—বোধ করি বোম্বাই ও মাদ্রাজের দুই সম্পাদকের সে জ্ঞানের অভাব ছিল। সমস্ত পি-ই-এন সদস্যের পরিচয় সংকলিত করে একখানি পুস্তিকা মুদ্রিত করা হয়েছে এই সম্মেলনের জন্য। সম্পাদকদের মধ্যে যে-কেউ সেই গ্রন্থ থেকে উপস্থিত সদস্যদের পরিচয় দিয়ে দিতে



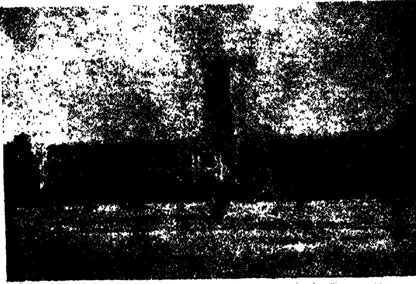
ত্রিবাঙ্কুর ছাত্রাবাস

পারতেন। তা' না-ক'রে ওঁরা আমাদেরই উপর নিজ পরিচয় স্বমুখে ব্যক্ত করবার আদেশ করলেন। মনে করলুম উঠে দাঁড়িয়ে করজোড়ে বলি—

"শুন শ্বশুর ঠাকুর ! শুন শ্বশুর ঠাকুর !
আমার পিতার নাম বিভার শ্বশুর !"

তবে আন্নামালাই নগর—বর্ধমান কাঞ্চীপুর নয়, আর আমিও বিদ্যাসুন্দর নই, কাজেই, শুধু নাম ধাম বলেই বসে পড়লুম। কিন্তু অনেক সৎসাহসী সদস্য আছেন দেখলুম, যাঁরা বেশ সপ্রতিভতায় তাঁদের কীর্তি কলাপের সুদীর্ঘ পরিচয় দিতে শুরু করলেন। কবে কি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কি কি উপাধি পেয়েছেন এবং কতগুলি পদক পেয়েছেন তাশুদ্ধ বলতে একটুও দ্বিধা করলেন না। কেউ কেউ তাঁদের রচনা প'ড়ে কোন্ কোন্ মনীষী কি কি ব'লেছেন তারও উল্লেখ করতে ছাড়লেন না!

যাক্, পরিচয়টা এভাবে আর পরস্পর হ'ল না। একতরফাই হল। তারপর বেলা চারটে থেকে সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত বৈকালীন জলযোগের ছুটি। সাড়ে ছটায় বিরাট সভামণ্ডপে সকলকে গিয়ে আসন নিতে হবে আদেশ ছিল। সন্ধ্যা সাতটায় সম্মেলনের উদ্বোধন হবে। যথাসময়ে মণ্ডপে গিয়ে দেখি বিরাট ব্যাপার। পাঁচ হাজার লোক বসবার মত সুসজ্জিত বিশাল সভামণ্ডপ। প্রত্যেক প্রতিনিধির নাম ও নম্বর আঁটা বেতের চেয়ারে নির্দিষ্ট আসন। তাদের আসনের আগে নিমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য নাম লেখা সরেশ কুশন চেয়ার। প্রতিনিধিদের আসনের



শাস্ত্রী হল

পশ্চাতে প্রায় সাড়ে চার হাজার স্থানীয় দর্শকদের আসন। তিনদিনের সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য খরচ তোলবার উদ্দেশ্যে প্রবেশ পত্র বিক্রয় করেছেন এঁরা মাথাপিছু সাড়ে সাত টাকা হিসাবে। প্রত্যেকটি আসন ভ'রে গিয়েছে। টিকিটের জন্য কাড়াকাড়ি ব্যাপার। দিল্লীর মসনদের তারকারা দেখা গেল 'সিনেমা স্টার'দের চেয়ে কম জনপ্রিয় নন।

আমরা শিক্ষিত হলেও এখনও যে সভ্য এবং ভদ্র হ'য়ে উঠতে পারিনি তার প্রমাণ পেলুম এই আসনের ব্যাপারে। শৃঙ্খলা রক্ষা করতে আমরা আজও শিখিনি। নিজেদের নম্বর ও নাম লেখা আসন ছেড়ে আগের লাইনে পাথার নিচের সুবিধাজনক আসন পছন্দ করে নিয়ে অনেকে এসে বসেছিলেন চেয়ারসংলগ্ন রিজার্ভেশান কার্ডগুলি বিবেকশূন্য ভাবে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে। বুঝুন, কি হয়রাণ হ'তে হয়েছে স্বেচ্ছাসেবকদের সেই সব আসনের মালিকদের বসাতে। ভাগ্যে কার্ডগুলি ছিঁড়ে ফেলে তাঁরা গিলে খেতে পারেন নি। একটু খোঁজাখুঁজি করতেই চেয়ারের তলায় এবং আসে পাশে পাওয়া গেল। যাঁরা বুদ্ধিমানের মতো কার্ডগুলি ছিঁড়ে নিয়ে পকেটে পুরে ফেলেছিলেন তাঁদের আর লজ্জিত হ'তে হল না; তবে উঠতে হ'ল। কারণ, প্রবেশপত্রখানি দেখাবার জন্য সবিনয় অনুরোধ আসবামাত্র তাঁরা বাধ্য হ'য়ে সেখানি বার করলেন এবং সীট খুঁজে না পাওয়ায় যেখানে হোক বসে পড়েছেন এই কৈফিয়ৎ দিলেন। স্বেচ্ছাসেবকেরা তাঁদের সেখান থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট আসনে বসিয়ে দিলেন। সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, অনেকেই তাঁদের অন্যায়-ভাবে অধিকার করা আসন ছেড়ে উঠতে চাইছিলেন না, কিন্তু, সে আসনের মালিকদের কঠোর ও প্রবল দাবীর ফলে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই তাঁরা আসন ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

ঘড়ির কাঁটা সাতটার ঘরে এসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীজহরলাল নেহেরু, শ্রীরাধাকৃষ্ণন্, শ্রীকৃষ্ণমাচারী প্রমুখ দিল্লীর দিকপালেরা এবং মান্দ্রাজের রাজপ্রমুখ, প্রধানমন্ত্রী প্রভৃতি কংগ্রেসদলপতিবৃন্দ মঞ্চে এসে প্রবেশ করলেন। তাঁদের আদর অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে এলেন শ্রীমতী ওয়াদিয়া ও শ্রী সি পি রামস্বামী আয়ার। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি



নৃত্যপটিয়সী রুক্মিণী দেবী

হিসাবে শ্রী সি পি রামস্বামী আয়ারের অভিভাষণ অতি উচ্চাঙ্গের ভাষা ও ভাবের সমন্বয়ে এত বেশি সুসমৃদ্ধ ও মনোজ্ঞ হয়েছিল যে সেই স্মরণীয় সন্ধ্যায় পরবর্তী বক্তৃতাগুলি সমস্তই সেই উচ্চসুরে বাঁধা হয়ে সমগ্র সভাটিকে একটা গভীর গাম্ভীর্য ও মর্য্যাদায় ভরে তুলেছিল।

এঁদের বক্তৃতাগুলি সবই পরদিন দক্ষিণ-ভারতের প্রায় সবকটি সকালের কাগজেই সচিত্র হ'য়ে বেরিয়েছিল। কেবল, বাংলাদেশের কাগজগুলি ছাড়া। দক্ষিণ-ভারতের আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ে এতবড় একটি "সর্বভারতীয় লেখক সম্মেলন" হয়ে গেল, যেখানে জহরলাল এসেছেন, রাধাকৃষ্ণন্ এসেছেন, বাংলার সংবাদপত্রগুলি ব্যাপারটাকে আমোল দেওয়ার যোগ্য বলেই মনে করেন নি। স্যর সি পি আয়ার কৈফিয়ৎ দিলেন, আমরা পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ও দার্শনিক শ্রী রাধাকৃষ্ণনকে নিমন্ত্রণ করে এনেছি—ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও উপরাষ্ট্রপতি

হিসাবে নয়, ওঁরা দু'জনেই বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থকার। ওঁদের রচনা জ্ঞানগর্ভ ও ভাবসমৃদ্ধ বলে !

জহরলাল ও রাধাকৃষ্ণন্ শুরু করলেন বটে সাহিত্য নিয়ে, কিন্তু শেষ করলেন রাজনীতির আবর্তে এসে। এ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বিশ্বের শান্তি, সাম্রাজ্যবাদ ও এশিয়ার অশান্তি কিছুই বাদ গেল না। সাহিত্য সভা শেষ পর্যন্ত হ'য়ে উঠলো রাজনীতির আসর। জহরলাল তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতার মধ্যে একটা বড় দামী কথা বলেছিলেন, ভারতের বর্তমান প্রগতিবাদী সাহিত্যিকদের সম্পর্কে। তিনি বললেন—দোহাই তোমাদের, তোমরা ভারতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করবার চেষ্টা করো। বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণ করবার বদ-অভ্যাসটা ছাড়ো। তিনি বললেন, আমি বড় দুঃখবোধ করি যখন দেখি, 'ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের' মধ্য দিয়ে যে নূতন দেশ ও নূতন জাতি গড়ে উঠছে, তাকে



আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার মাদ্রাজের রাজপ্রমুখ শ্রীপ্রকাশ

কেন্দ্র ক'রে আজও ভারতীয় কথা-সাহিত্যে কিছু লেখা হয়নি। অথচ কতনা রোমান্স, কতনা হৃদয়-বিদারক উত্থান পতন ও জীবন মৃত্যুর ইতিহাস এর মধ্যে নিত্য অহরহ জন্মলাভ করছে। কিন্তু, কোথা সে শক্তিশালী লেখক, যে এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে আশ্রয় করে এদেশে সাহিত্য সৃষ্টির এক নূতন অধ্যায় রচনা করে যাবেন ?

জহরলাল অতি-আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গেও কিছুটা পরিচিত আছেন জানা গেল। রাত্রি ন'টায় সম্মেলন শেষ হল। নৈশ-ভোজের পর রাত্রি দশটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা প্রতিনিধিদের চিত্তবিনোদনার্থে শ্রীনাগরাজন রচিত 'নন্দানার' শীর্ষক একখানি তামিল নাটক ইংরাজীতে অনুবাদ করে অভিনয় করলেন। এঁদের চেষ্টা প্রশংসনীয়, কিন্তু 'চৈতন্যলীলা' বা 'বিল্বমঙ্গল' যদি ইংরাজীতে অনুবাদ

ক'রে অভিনয় করা হয়, তাহ'লে সে যেমন বিসদৃশ লাগবে—শিবভক্ত হরিজন 'নান্দানার' শিবত্ব প্রাপ্তির পৌরাণিক কাহিনীও তেমনিই ইংরাজীতে অনুবাদ করার ফলে পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল।

দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ১৭ই এপ্রিল সকাল ৯টায় সেনেটহলের পরিবর্তে শাস্ত্রীহলেই পুস্তক প্রদর্শনী খোলা হল। মাদ্রাজের রাজপ্রমুখ শ্রীপ্রকাশ এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করলেন। রাধাকৃষ্ণন্ প্রভৃতি মহারথীরাও উপস্থিত ছিলেন। পুস্তক প্রদর্শনীর ব্যাপারটা এত বেশি সময় নিলে যে ৯-৪৫ মিনিটে গোখেল হ'লে যে বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যের উপর রামায়ণের প্রভাব নিয়ে আলোচনার কথা ছিল, তা আর গোখেলহ'লে না হ'য়ে শাস্ত্রীহলের দ্বিতলের প্রশস্ত বারান্দায় বসল। ৯-৪৫ মিনিটের বদলে প্রায় ১১টায় রামায়ণী আলোচনা শুরু হল। আলোচনা বর্ণানুক্রমিক ভাষা অনুসারে হবে বলে নির্দিষ্ট হয়েছিল। তাতে



পশুপতীশ্বর মন্দির

আসামের প্রতিনিধির নাম সর্বাগ্রে ছিল। কিন্তু, তিনি আসতে পারেন নি। কাজেই সেটা পড়া হ'লনা। তারপরেই ছিল 'বাংলা'। কাজেই প্রথম বক্তা হিসাবে আমাকেই উঠতে হল। শ্রীযুক্ত কাকা কালেল্‌কারের উপর সভার নেতৃত্ব করার ভার ছিল। কিন্তু, তিনি সর্বোদয় সম্মেলন উপলক্ষে গয়ায় আটকে পড়ায় এখানে আসতে পারেননি। কাজেই, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনই সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করলেন। আমাদের বলা হয়েছিল ২৫০০ শব্দের মধ্যে বক্তব্য শেষ করতে হবে। বক্তারা সেই হিসাবেই সকলে প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন। প্রবন্ধ ছিল আসামী, বাংলা, গুজরাটী, হিন্দী, কানাড়ী, মৈথিলি, মালয়ালাম, মারাঠী, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, তামিল, তেলেগু, উর্দু। কিন্তু, সময় না থাকায় এবং বক্তার সংখ্যা ১৪জন দেখে রাধাকৃষ্ণন্ প্রত্যেককে দশ মিনিটের মধ্যে বক্তব্য শেষ করতে বললেন। ২৫০০ শব্দ দশ মিনিটে বলা সম্ভব নয়। কাজেই, প্রবন্ধের বহু অংশ বাদ দিয়ে মাত্র কয়েকটি প্রধান পয়েন্ট নিয়েই ব'লতে হল। সকলে সবাই এ ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হচ্ছেন দেখে সভাপতি তাঁদের

বুঝিয়ে বললেন যে, প্রবন্ধগুলি সবই পুস্তকাকারে ছাপা হ'য়ে বেরুবে, সুতরাং আপনারা কেউ দুঃখিত হবেন না। কিন্তু সেই দশ মিনিট বলবারও নিরঙ্কুশ অবকাশ পেলেন না অনেকেই। নিচেরতলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সম্মুখে পণ্ডিতজী তখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। সহস্র যুবার উত্তেজনাপূর্ণ কলকণ্ঠ, হাততালি ও আনন্দ কোলাহল দ্বিতলের বারান্দায় ভেসে এসে রামায়ণী কথায় ব্যাঘাত উৎপাদন করছিল।

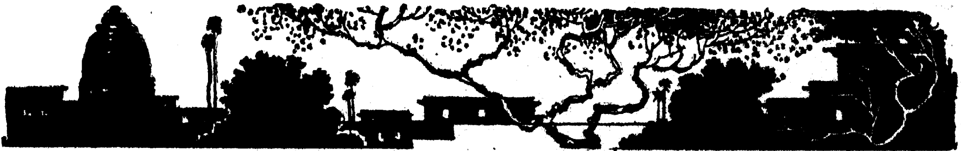
বিকেলে বেলা ১টা ৪৫ মিনিট থেকে ৩টে ৪৫ মিনিট পর্যন্ত 'ছোট গল্প ও তার পরিণতি' সম্বন্ধে আলোচনা ছিল গোখেল হলে। কিন্তু, সকালের সভা শেষ হ'তে সাড়ে বারোটা বাজায়, বিকেলের সভা শুরু হল প্রায় বেলা তিনটেয়। এ সভার সভাপতি ছিলেন জনাব হুমায়ুন কবীর। ইনিও দিল্লীতে ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তরের একজন প্রধান কর্মসচীব। বেলা চারটেয় সকলের আলোক-চিত্র গ্রহণ করা হবে এবং ৪.১৫ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য চ্যান্সেলার রাজা শ্রীমুথিয়া চেটিয়ারের চায়ের আসরে নিমন্ত্রণ আছে। সুতরাং সাহিত্য করবার সময় নেই, 'মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা' অনুসরণে কবীর সাহেবও মোট ১৬টি প্রবন্ধ আছে দেখে প্রত্যেককে পাঁচ মিনিট করে সময় দিলেন ছোট গল্প সম্বন্ধে তাঁদের বক্তব্য বলতে। অতএব বুঝতেই পারচেন ছোট গল্প সম্বন্ধে বক্তব্য কত ছোট হয়ে গেল। শ্রীমতী লীলা রায়ের ছোট গল্পের উপর লেখা প্রবন্ধটি পড়বার ভার পড়েছিল আমার উপর। শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবীর নিজে যত্ন ক'রে দেখে প্রবন্ধটির কোন কোন অংশ পড়া হবে দাগ দিয়ে দিলেন। প্রবন্ধটি আগে দেখবার বা পড়বার আমার সৌভাগ্য হয়নি। একেবারে সভায় উঠে প্রথম পাঠ পড়তে হল। এত তাড়া করেও সভা শেষ হ'তে ৫টা বাজলো। তারপর রাজাবাহাদুরের চায়ের আসর। ছোট গল্পের আসরের সকল আক্ষেপ রাজাবাহাদুরের চায়ের রাজকীয় আসরে এসে মিটে গেল। সন্ধ্যা ৬টায় শ্রীশ্রীপশুপতেশ্বরের সন্ধ্যারতি দেখতে যাবার কথা ছিল। শিবভক্তেরা গেলেন। এ মন্দিরটি বিশ্ববিদ্যালয় এলেকার মধ্যেই। আজ রাত্রের প্রধান আকর্ষণ ছিল দিল্লীর দেবতাদের সম্মুখে শ্রীমতী রুক্মিণী দেবীর 'কুমার সম্ভব' নৃত্য নাট্যের অভিনয়। আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই সর্বভারতীয় সাহিত্য সম্মেলনে এসে এবার সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছি রুক্মিণী দেবীর এই সর্বাঙ্গসুন্দর নৃত্যনাট্য দেখে। নৃত্যনাট্য শেষ করে ফিরতে রাত্রি ১২টা বেজে গেল।

আজ ১৮ই এপ্রিল। সর্বভারতীয় লেখক সম্মেলনের আজ শেষ দিন। সকালে সাড়ে আটটায় শাস্ত্রী-হলে "স্বাধীন ভারতে ইংরাজী ভাষার ভূমিকা" সম্বন্ধে আলোচনার কথা। শ্রী সি পি রামস্বামী আয়ার ছিলেন এই আলোচনার প্রধান বক্তা ও পরিচালক। ইংরাজী ভাষা যে স্বাধীন ভারত উপস্থিত ত্যাগ করতে পারে না তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই "সর্বভারতীয় লেখক সম্মেলন!" এখানে সব কিছুই পরিচালিত হল ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে। নইলে, অধিকাংশ লোক কিছুই বুঝতে পারত না। ১২৯টি ভাষার দেশ এই ভারতবর্ষ। তার মধ্যে আবার প্রধান ভাষা হ'ল বারোটি। সমগ্র ভারতবর্ষ একদিন হিন্দী বলতে, লিখতে ও পড়তে শিখলেও কোনও দিনই উচ্চশিক্ষিত হয়ে উঠতে পারবে না। কারণ, হিন্দী ভাষা আজও অপরিণত। এর ব্যাকরণ অবৈজ্ঞানিক। হিন্দী ভাষায় কোনও উচ্চতর জ্ঞান বিজ্ঞান সংক্রান্ত বই আজও লেখা হয়নি। সুতরাং ইংরাজী বর্জন করলে ভারতবর্ষের পক্ষে আত্মহত্যা করার সমান হবে। সারা বিশ্বের ভাষা আজ ইংরাজী। পৃথিবীর সঙ্গে যোগ রাখতে হলে ইংরাজী আমাদের শিখতেই হবে। চায়না, জাপান, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোচায়না, ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্মদেশ, মালয়, পশ্চিম পাকিস্থান, আফগানিস্থান, আরব, মিশর, ইরাণ, তুর্কী প্রভৃতি দক্ষিণপূর্ব ও নিকটপশ্চিম এশিয়ার অধিবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগও কোনও দিনই হিন্দীতে রক্ষা করা চলবে না। সুতরাং স্বাধীন ভারতবর্ষের পক্ষেও ইংরাজী অপরিহার্য। এটা সম্মেলনে সর্ববাদীসম্মতিক্রমেই স্বীকৃত হল। কেবল, কয়েকজন গোঁড়া অবুঝ উগ্র হিন্দী ভক্তরা এটা মানতে চাইলেন না।

তারপর, বেলা সাড়ে নটায় শুরু হ'ল "ইং ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যের প্রগতি" নিয়ে আলোচনা। বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যের প্রগতি নির্দেশে ১৮জন বক্তা ছিলেন। কিন্তু, ইংরাজী ভাষার মল্লযুদ্ধে এত বিলম্ব হয়ে গেল যে এ বিষয়টিকে সময়াভাবে যথাসম্ভব সংক্ষেপে সারতে হ'ল।

বিকেলে ছিল ভারতীয় সাহিত্যের সমস্যা ও পি-ই-এন প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা। এখানে আলোচনার মধ্যে বেশ একটু তিক্ততার সৃষ্টি হ'ল। যাঁরা তাঁদের বহুশ্রমে লিখিত প্রবন্ধগুলি সবটুকু পড়বার সুযোগ পেলেন না তাঁরা তো বিরক্ত হয়েই ছিলেন, পরে ভারতীয় পি-ই-এন প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক শ্রী পি জি শাহের দু' একটি মন্তব্যের ফলে অনেকেই পি-ই-এনের বিরুদ্ধে তাঁদের যা-কিছু অভিযোগ তা সভায় উপস্থিত করলেন। যাই হোক, বেলা পাঁচটার পর ভাইস-চ্যান্সেলারের চায়ের আসরে তৃপ্ত হয়ে সবার ক্ষোভ শান্ত হল। রাত্রে শাস্ত্রীহলে ছিল কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' অভিনয় ও আর একখানি তামিল নাটক। কিন্তু রাত্রি ৯টায় আমার ফেরবার ট্রেনে আসন রিজার্ভ ছিল বলে আমি এবং আরও অনেকেই পালিয়ে এলাম যে যার দেশের দিকে।

সমাপ্ত





পরিচালক—উপানন্দ

ইচ্ছাশক্তির বলে যাঁরা মহামানব হোলেন

নৈরাশ্যের কূলে দাঁড়িয়ে যারা ভগ্ন হৃদয়ে দূরপানে চেয়ে অদৃষ্টকে ধিক্কৃত করে আর লক্ষ্যহীন পথে বিচরণ করে—শেষে অকৃতী সৈনিকের মত মৃত্যুর কোলে আশ্রয় গ্রহণ করে, তারা সমাজ ও সভ্যতার পরম শত্রু—তাদের প্রতি কোন সহানুভূতির উদ্রেক হয় না। ইচ্ছা থাকলে মানুষ পারে না এমন কাজই নেই—আজ জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্র মানুষের গমনাগমন সম্ভব হোতে পেরেছে, গ্রহে উপগ্রহে যাবার জন্যে চলেছে তার একনিষ্ঠ সাধনা। এর মূলে কি আছে জানো?—ইচ্ছাশক্তি।

মানবসভ্যতার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে তোমরা দেখতে পাবে যাঁরা জগতে চিরবরণীয় ও স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকেরই অন্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছিল অদম্য ইচ্ছাশক্তি! এর প্রভাবে সহস্র বাধা-বিপত্তি অপসারিত করে তাঁরা কীর্ত্তিস্তম্ভ রেখে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়েছেন। তাঁদের দুঃখ কষ্ট, ব্যথা বেদনা, লাঞ্ছনা নির্য্যাতন ভোগ তোমাদের চেয়ে কোন অংশে ন্যূন ছিল না। কি ভাবে তাঁরা সাফল্য লাভ করলেন এ কথা যদি তোমরা অনুসন্ধান করো তা হোলে তোমাদের পক্ষেও জগতে বড় হওয়া সহজ হবে।

মানবসভ্যতার ভাবী ইতিহাসের তোমরাই এক একটি নায়ক। এ জন্যেই বলছি তাঁদের মত অসাধারণ ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে তোমাদের প্রত্যেককে মানুষের মত মানুষ হ'তে হবে। তোমরা মানুষ না হোলে জাতি ও সমাজ উন্নত হবে না। রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস নেতাজী সুভাষ প্রভৃতির জীবনী তোমাদের একমাত্র দিগ্‌দর্শন যন্ত্র—এরই সাহায্যে তোমাদের জীবন-তরণী পাবে আদর্শের সন্ধান কর্ম্মজগতের নব নব উপনিবেশ স্থাপন করবার জন্যে। মর্ত্ত্যজীবনেই যে দিব্য-জীবনের আবির্ভাব হয়, সাধারণ মানুষের মত জন্মগ্রহণ করে এঁরা তা দেখিয়ে গেছেন।

মহামতি আলেকজাণ্ডার বিশ্বজয় করতে চেয়েছিলেন, তাঁর আশা আকাঙ্খাও পূর্ণ হয়েছিল। তাঁর ভেতর ছিল সুদৃঢ় বিশ্বাস ও অদম্য ইচ্ছাশক্তি। তিনি গ্রীক্ দার্শনিক এরিষ্টটলের কাছে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। ষোল বছর বয়সে তিনি প্রথম যুদ্ধে নামলেন আর বত্রিশ বছর বয়সে হোলেন বিশ্বজয়ী বীর। রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়াস সিজর শৌর্য্য বীর্য্যের জন্য রোমের সর্ব্বোত্তম বরমাল্য 'ভি সি' লাভ করেছিলেন। খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৯ অব্দের ১২ই জানুয়ারী তারিখে রুবিকন নদী পার হয়ে জেলার যুদ্ধে বিজয় পতাকা উড়িয়ে বাণী দিলেন—'ভেনি, ভিডি, ভিসি' (আমি এলাম, আমি দেখলাম, আমি জয় করলাম)

সিজরই পাশ্চাত্য সভ্যতার জনক, আজও সমগ্র পৃথিবী তাঁরই চিন্তাধারায় অবগাহন করে নব নব সভ্যতার আবাহন করছে। তাঁর সমগ্রজীবন আর তাঁর সময়ের ইতিহাস আলোচনা করলে বুঝতে পারবে সিজরের জীবনীশক্তিই ছিল ইচ্ছাশক্তি। অলিভর ক্রমওয়েল অসাধারণ ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন পুরুষ। যখন তাঁর তেতাল্লিস বছর বয়স তখন এজহিলের যুদ্ধ হয়, এই ঘটনার মধ্য দিয়ে যুদ্ধ সমাপ্তির কিছু পরেই তিনি মহাশক্তিধর হয়ে গৌরবের উচ্চশিখরে আরোহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে রাজনীতি-বিশারদ আর সৈন্যাধ্যক্ষ। যা তাঁর অভিপ্রেত, তাই একমাত্র ইচ্ছাশক্তি বলে তাঁর করায়ত্ত হয়েছিল।

নেপোলিয়ান বোনাপার্টির জীবনী পাঠ করলে তোমরা দেখতে পাবে তিনি কৈশোর অবস্থা থেকেই নানা সংঘাতের ভেতর দিয়ে সর্ব্বোন্নত স্থান অধিকার করেছিলেন। সারা পৃথিবীর ওপর তাঁর আধিপত্য ও প্রভাব বিস্তারের মূলে আছে তাঁর অপরাজেয় আত্মার অদম্য ইচ্ছাশক্তি। চ্যাথাম কিভাবে বিশিষ্ট বাগ্মী হয়ে সমগ্র ইংলণ্ডকে বিস্ময়-বিহ্বল করেছিলেন তাও তোমাদের লক্ষ্য করবার বিষয়। তিনি দু'বার অভিধান নিবিষ্ট চিত্তে আগাগোড়া পাঠ করেছিলেন, আর অভিধানের প্রত্যেকটী শব্দ স্মরণে রাখতে অভ্যাস করেছিলেন। প্রত্যেকটী শব্দ, তার অর্থ, তৎসম ও তদনুরূপ শব্দ, তার বিপরীত শব্দ তিনি স্মরণ পথে সঞ্চিত করে রেখেছিলেন। তোমরা বোধ হয় জানো, শব্দসম্পদে সমৃদ্ধ না হোলে উৎকৃষ্ট কবি, বক্তা বা লেখক হওয়া যায় না। চ্যাথাম এই সত্য উপলব্ধি

করেই সাধনা করেছিলেন, আর পরবর্ত্তীকালে তাঁর বাগ্মিতায় যাদুকর হয়ে বাগ্মিতায় বিশেষ সাফল্য লাভ করেছিলেন। তিনি এমন ভাবে শব্দের জাল বুনে বক্তৃতার ভাষা ফুটিয়ে তুলতেন যাতে শ্রোতৃমণ্ডলী অভিভূত হয়ে পড়তো—তাঁর আচরণে, তাঁর ভাব ভঙ্গিমায়, তাঁর কণ্ঠে অভিব্যক্ত হোতো বিরাট ব্যক্তিত্ব। সমগ্র হাউস অব কমন্সকে তিনি প্রথমে দৃষ্টিপাত করেই সম্মোহিত করতেন।

ডিজ্‌রেলি বলতেন—'এখন নীরব হয়ে বসে আছি বটে কিন্তু এমন দিন আসবে যখন তোমরা শুনবে আমার কথা—' ইচ্ছাশক্তির ওপর অসাধারণ নির্ভরশীল হ'য়ে তিনি ইংলণ্ডের কৃতী সন্তান হয়েছিলেন, এ কথা খুব কমলোকেই জানে। তাঁর উপন্যাসগুলি পাঠ করলে দেখতে পাবে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলোর ক্রিয়াকলাপে ইচ্ছাশক্তির প্রভাবই প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছেন—'সুদীর্ঘ দিন চিন্তা করে শেষে এই সত্যে উপনীত হয়েছি যে, সুনির্দিষ্ট সঙ্কল্প ও বাসনা থাকলে যত বাধা বিপত্তিই আসুক না কেন, অতি নগণ্য মানুষের পক্ষেও বরেণ্য পুরুষোত্তম হওয়া যায়।'

নৈরাশ্য ও দারিদ্র্যকে অবলম্বন করে ফরাসী ঔপন্যাসিক বালজাক চল্লিশখানি উপন্যাস লিখেছিলেন,—এরূপ একনিষ্ঠ সাধনার ফলে তিনি পেয়েছিলেন কল্পনাতীত সাফল্য। দিনের পর দিন তাঁর লেখা বিভিন্ন পত্রিকা থেকে অমনোনীত হয়ে ফিরে এসেছে, তবুও তিনি একেবারে হাল ছেড়ে দেন নি। যতই আঘাত পেয়েছেন, ততই তাঁর বাসনা দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হয়েছে—কত রাত্রি দিনই না তিনি শুধু কাফি খেয়ে কলম ধরে সময় কাটিয়েছেন। দারিদ্র্যের তিক্ততম গ্লানি কতই না তিনি সহ্য করেছেন, তবু তাঁর সঙ্কল্প ছিল অটল—এম্নি করেই মানুষ বড় হয়।

রিচার্ড আর্করাইট তাঁত বুনতেন। তিনি কখন বিদ্যালয়ে যান নি। কিছুকাল পর চুলা তৈরী করা আর ক্ষৌর কার্য্য করার দিকে তাঁর বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়েছিল। ক্ষৌরকার্য্য করবার সময়েই তাঁর মনে এসেছিল তাঁত বোনার যন্ত্র কি ভাবে তৈরী করা যায়। তখন তিনি দারিদ্র্যলাঞ্ছিত, অসহায় ও কপর্দ্দকশূন্য। শেষে তাঁর মনের বাসনা পূর্ণ হয়েছিল। তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্র পেটেন্ট করে তিনি নিজের স্বত্বাধীনে রেখেছিলেন, আর এরই আনুকূল্যে লক্ষ্মীর বরপুত্র হয়েছিলেন। পঞ্চাশ বছর বয়সে তিনি ইংরাজী ব্যাকরণ অধ্যয়ন করলেন যাতে করে নির্ভুল ইংরাজী বলতে পারেন, শেষে তিনি ডার্বিশায়ারের সেরিফ ও নাইট উপাধিতে ভূষিত হয়ে ইংলণ্ডের অভিজাত সমাজে স্থান পেয়েছিলেন।

জার-শাসিত রুশিয়ার হাড়পাঁজরা বেরোনো জনসমাজকে যিনি ত্রাণ করে সোভিয়েট শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, সেই মহামতি মার্শাল স্তালিনও খুব নগণ্যভাবে জীবনযাত্রা আরম্ভ করেছিলেন, স্বজাতিকে তিনি কি ভাবে সম্রাটের স্বেচ্ছাচারিতার কবল থেকে উদ্ধার করবেন এই ছিল তাঁর বাসনা—শেষে সহায়সম্বলহীন এই মানুষটী কি ভাবে জারবংশের উচ্ছেদ সাধন করে রুশিয়ায় সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করলেন তা লক্ষ্য করবার বিষয়—দুর্গমের পথে তিনি দুর্লঙ্ঘ্যের সাধনা করে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তানরূপে সমাদৃত হয়েছেন।

আমাদের দেশেও এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঘরে বসে সাধনা করে বাণীর বরপুত্র হয়েছিলেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়করূপে তিনি আজ সর্ব্বত্র বন্দনীয় হয়েছেন। মহাত্মা গান্ধী অদম্য ইচ্ছাশক্তির বলে স্বাধীনতা-সংগ্রামের পরিচালনা করে শেষে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করে গেছেন। তিনিই ভারতীয় রাষ্ট্রের জনক। একমাত্র ইচ্ছাশক্তির আনুকূল্যেই জিন্না পাকিস্তান রাষ্ট্র রচনা করে গেছেন। নেতাজী সুভাষ নিঃস্ব অবস্থায় ভারতবর্ষ থেকে পলায়ন করে নিজের ইচ্ছাশক্তি বলে বিরাট আজাদ হিন্দ ফৌজ বাহিনী সংগঠন করে জন্মভূমিকে স্বাধীন করবার জন্যে অভিযান করেছিলেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহেঞ্জোদারো থেকে সৈন্ধবী সভ্যতার উদ্ধার সাধন, প্রমথনাথ বসুর মানভূমে লৌহখনি আবিষ্কার, আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের বেতার যন্ত্রের আবিষ্কার, রসায়ন জগতে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নব নব আবিষ্কার—এর প্রত্যেকটীর মূলেই আছে অদম্য ইচ্ছাশক্তি। তোমরা এই শক্তি অর্জ্জন করে ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান হবে এই আশাতেই এখানে এরূপভাবে প্রাবন্ধিক অবতারণা। এর পরে তোমাদের কাছে ইচ্ছাশক্তি অর্জ্জনের বিজ্ঞানসম্মত কৌশলগুলি নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

মহাবজ্রমণি

অধ্যাপক ডাঃ শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী

গল্পটি শুনি আমার এক প্রত্নতাত্ত্বিক বন্ধুর কাছে। বর্মায় তিনি নানা প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার কাজে অনেক জায়গায় ঘুরে ঘুরে কাটিয়েছিলেন। তাঁর কথাতেই বলি :

"তখন আমি বর্মার নানা জায়গায় পুরাণো বৌদ্ধ-মন্দির ও মূর্তি খুঁজে বেড়াচ্ছি। বৌদ্ধ ধর্মের ও শিল্পের একটি বিশেষ ধারার খবর ঐসবে পাওয়া যায়—আর যদি কোথাও কোনো পুরাণো বইটইর সন্ধান পাই তো কথাই নেই—ইতিহাসের অনেক লুপ্ত বিস্মৃত অধ্যায়ই তা'হলে উদ্ধার কোরতে পারি। যাইহোক এই রকম ঘুরতে ঘুরতে এক সময় লোকালয় থেকে অনেক দূরেই কিছুদিন আমাকে ও আমার একটি সহকারীকে কাটাতে হয়েছিলো। একটি পাহাড়ের গায়ে কিছু অস্পষ্ট আঁকাজোকা দেখে সেখানেই ছোট্ট ক্যাম্প্‌টি খাটিয়ে আমরা থাকতাম। সপ্তাহে সপ্তাহে একবার কোরে প্রায় দশ বার মাইল দূরে সবচেয়ে কাছেকার গ্রামটীম হতে যৎসামান্য খাদ্য যা পাওয়া

যায়—সংগ্রহ কোরে আনতে বেরোতে হতো। সপ্তাহ দুই যায়—ইতিমধ্যে একদিন আমার খেয়াল হলো আরও কিছু চড়াই উঠলে হয়তো আরও স্পষ্ট কোন গবেষণোপযোগী শিল্প-নিদর্শন পাওয়া যাবে। আমার সহকারীটি তার দুই তিন দিন আগে গ্রাম হ'তে ফেরার সময়ে পায়েতে পাথরের চোট্ লেগে প্রায় অচল অবস্থায় পড়ে গিয়েছিলো। সুতরাং একাই রওনা হলাম। খুব ভোরেই বেরিয়ে পড়েছিলাম কারণ যতটা সংক্ষেপে সম্ভব কাজ শেষ কোরে সন্ধ্যার পূর্বেই ক্যাম্পে ফিরে আসব স্থির কোরেছিলাম—একা মানুষ তো। কিন্তু অতি সতর্ক-থাকা সত্বেও ফেরার সময়ে প্রদোষের আলো-আঁধারিতে সব পথ কেমন গোলমাল হয়ে গেলো। প্রত্নতাত্ত্বিকের কৌতূহল নিয়ে অনেকটা চড়াই উঠে গিয়েছিলাম—কিন্তু দুই একটি ভগ্ন মূর্তির খণ্ড ছাড়া কিছুই পেলাম না। যাইহোক বেলা পড়ে এলে ফিরতি-পথে পা বাড়াতেই টের পেলাম যে অনেকটা ওপরেই চলে এসেছি—আর ওদিকে কাঠুরেদেরও যাতায়াত না থাকায় পথের কোনো বালাই-ই ছিলো না। আসার সময়ে যে-সব খড়ির চিহ্ন দিয়ে দিয়ে এসেছিলাম—সবই যেন কি রকম গোলমাল হ'য়ে গেলো। যাই হোক দেখতে দেখতে সন্ধ্যা নেমে এলো ও আমি নেমে এলাম অন্য কোনো অজানা সমতলে। চারিদিকে ঘোর বন। সঙ্গে যৎসামান্য খাবার-দাবার ছিলো, জলও ছিলো—টর্চ রিভলভারও ছিলো—তবু কেমন যেন বেশ "ভয়-ভয়" কোরতে লাগলো সেই অচেনা উপত্যকার বুকে—রাতের কালো শাড়ীর ঘোমটার গভীর কালো নিবিড় বনশ্রেণীর টানা পাড়ের ঘেরার ভিতর একা প্রাণী দাঁড়িয়ে। একটু ধাতস্থ হতেই প্রথম কথা মনে পড়লো—মশা-রাতে তো মশক-দংশনেই প্রাণ প্রায় যাবার জোগাড় হ'তে দেখলাম। মশক-প্রতিষেধক ক্রীমটিও ভুলে গেছি আনতে ক্যাম্প হ'তে। তা ছাড়া হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের ভয় তো আছেই। সুতরাং পূর্ব-অভিজ্ঞতাতে দুএকবার যা করতে হয়েচে—এবারও তাই কোরলাম। অর্থাৎ একটা খুব উঁচু দেখে গাছে সোজা চড়লাম। একবারে তার মাথায় চড়ে ছুটো ডালের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে নিলাম—আর ওরই মধ্যে যতোটুকু আরামে বসা যায় তার ব্যবস্থা কোরে নিলাম। জানো নিশ্চয় যে শিকারীদের শিক্ষাও আমাদের হয়। পুরাতনের সন্ধান আর হিংস্র জন্তু শিকার প্রায় কাছাকাছি কিনা।

এদিকে রাত ঘন হয়ে নেমে এলো। মাথার ওপরে রাতের চাঁদোয়ায় ঝিলিক-দেওয়া তারার বুটির সারি, আর নীচে চারিদিকে ঘোর অন্ধকারের সমুদ্র। ভালো কোরে চারিদিকে চেয়ে দেখতে লাগলাম—হঠাৎ দূরে যেন একটি প্রজ্জ্বলিত দীপের রেশ এসে চোখে লাগলো। চোখ রগড়ে বারবার তাকিয়ে দেখলাম, হ্যাঁ, সত্যিই ঈষৎ লম্পিত একটি আলোর বিন্দুই বটে! আশ্চর্য কতটা হলাম আর আনন্দ কতটা হোলো—অনুমান করলেই বুঝবেন। টর্চের আলো ফেলে হাতঘড়ি দেখলাম রাত সাড়ে দশটা বাজে। ভাবলাম নেমে সাহসে ভর কোরে এগিয়ে যেতে পারলে—ঐ দীপালোকের আশ্রয়ে অন্ততঃ রাতটা ঘুমিয়ে কাটাতে পারবো। অতএব মনে মনে 'দুর্গা'নাম স্মরণ কোরে গাছ হ'তে নেমে পড়লাম ও অতি সতর্কভাবে আস্তে আস্তে সেই আলো লক্ষ্য কোরে এগোতে লাগলাম, এক হাতে টর্চের আলো আর অন্য হাতে রিভলভার উদ্যত কোরে ধরে, মাঝে মাঝে টর্চ নিভিয়ে দিয়ে সামনের আলোটিকে ভালো কোরে দেখে নিতে লাগলাম। মনে হলো ওটা খুব দূরে নয়। মাঝপথ পার হয়ে আর একটু এগিয়েই পাশে কুল কুল শব্দে টর্চ ফেলে দেখি টলটলে স্বচ্ছ জলের একটি ছোট্ট ঝরণা বয়ে চলেছে। তার পরেই একটা ছোট খাড়াই—তার ওপরেই একটু সমতল ভূমি আর সেইখানেই এক ক্ষুদ্র কুটিরের আরও ক্ষুদ্র গবাক্ষ-পথে আলোর রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। উৎসাহিত পায়ে এগিয়ে কাছে এসে দেখি একটি ছোট কাঠের মন্দির, তার ছোট ঘুলঘুলিতে একটি গোলাকার কাঁচ বসানো—তার থেকেই আলোটা আসছে। মন্দিরের দরজায় ধাক্কা দিলাম—কোনো সাড়া শব্দ পেলাম না। তারপর উপরি উপরি তিন চার বার বর্মী-ভাষায় "খোলো—খোলো" বলে ধাক্কা দিলাম। কোনও ফলই হলো না। তখন মরীয়া হয়ে বেশ জোরে ধাক্কা দিতেই ভেতরের খিল ভেঙ্গে গেলো। আমি ঢুকে পড়লাম। ভেতরে ঢুকতেই দেখি সমুখেই একটি কাঠের বুদ্ধ-মূর্তি—প্রায় তিন ফিট হ'বে। আর প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের তেলের পোড়া পোড়া গন্ধের সঙ্গে আর একটা কি রকম পচা গন্ধ। ছোট্ট মন্দিরের ভিতর খুবই অল্প

জায়গা—কোনো মানুষকে দেখতে পেলাম না বা ঘরে কোন রকম আস্‌বাব-পত্রও নেই। আমি তো অবাক হয়ে গেলাম। অথচ প্রদীপ জ্বলছে। এবার প্রদীপটির দিকে ভালো কোরে চেয়ে দেখি সেটি একটু অদ্ভুত রকমের। একটা পাতলা লোহার নলের মুখে তেল জ্বলছে—মৃদু চিড়বিড় গন্ধও হচ্ছে। সেই নলটি মন্দিরের ছাদের দুটো বড় বড় কাঠের বরগার ওপর রাখা একটি কাঠের পিপের সঙ্গে সংযোজিত। বুঝতে পারলাম যাতে মন্দিরের আলো সর্বদাই জ্বলে, সেই জন্যই এই ব্যবস্থা। পূজারী নীচে লোকালয়ে গেলে হয়তো তিন চারদিন কেটে যায় ফিরে আসতে। কিন্তু পূজারী কই? মন্দিরের দুয়ারে তো ভিতর হ'তে খিল আঁটা ছিলো—আর কোনও দরজা টরজা আছে না কি? বুদ্ধ মূর্তিটি একটি অল্প উঁচু বেদীর ওপর বসানো ও বিগ্রহের মুখের ওপর প্রদীপের আলো একটু ব্যাঁকাভাবে এসে পড়েছে। মূর্তির আর সব অংশ আবছায়া আলো আঁধারে রয়েছে ও মূর্তির পিছন দিকে দেয়ালে একটু আড়াআড়িভাবে পড়েছে প্রতিমার দীর্ঘ ঈষৎ কম্পিত ছায়া। মূর্তির পায়ের কাছে টর্চ ফেলে দেখলাম এক জীর্ণ কম্বলাসনের নীচে একটি লোহার ছোট বাক্স রয়েছে—প্রত্নতাত্ত্বিকের সমস্ত কৌতূহল জেগে ওঠায় তৎক্ষণাৎ বাক্সটা টেনে এনে মন্দিরের কাঠের মেঝেতে বসে পড়লাম। বাক্স খুলতেই একটা তীব্র গন্ধ পেলাম। কাগজপত্র কীট হতে বাঁচাবার জন্য এই রকম গন্ধদ্রব্যের ব্যবহার আগে ছিলো। যাই হোক বাক্সের মধ্যে দেখলাম কয়েকটি বৌদ্ধ পুঁথি পালি ভাষায় লেখা। বিস্ময়ের মাত্রা বাড়তেই লাগলো—কারণ নিশ্চয়ই এখানে খুব পণ্ডিত পূজারী কেউ আছেন বা ছিলেন; তা না হলে বর্মায় পালি ভাষায় বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র কে পড়তে পারে! ধর্মপুস্তক ছাড়া আরও দুটি অন্য খাতা পেলাম। সেগুলির লেখার ধরণ দেখে ধর্মালোচনা বলে মনে হলো না। একটি পালিতে ও অন্যটি বর্মা ভাষায় লেখা। প্রথমটির পাতা ওলটাতে লাগলাম। বুদ্ধের নাম গান ও স্তবেই ভরা, কিন্তু একটু পড়েই লেখাটি কারুর আত্মজীবনী বলে মনে হলো। হঠাৎ এক জায়গায় পেলাম—"ভগবান বুদ্ধ যে-ভাষায় শান্তি ও মোক্ষের বাণী দিয়ে গেলেন সেই আমার ভাষা। এখানে গুরুর আদেশে পঁচিশ বৎসর সাধনা করবার পর যাবো ভগবান বুদ্ধের দেশে—সেই-ই আমার দেশ—সেইখানেই হবে আমার এই পার্থিব জীবনেই মোক্ষপ্রাপ্তি। আমি কে, কোথায় আমার জন্ম—সে সব ভুলেই গিছি—আমার জন্মভূমি সেই সাগর পারের দ্বীপ—যেন কোন স্বপ্নে দেখেছিলাম। আমার পরিচয় "আমি মোক্ষার্থী। আর সব মিথ্যা।" আর এক জায়গায় নজরে পড়লো—"এ মন্দির আমার নিজের হাতে তৈরী। দিনের পর দিন কাঠ কেটে, পাথর ভেঙ্গে আমি আমার এ সাধন-মন্দির নির্মাণ করেছি। পরে একটি মিস্ত্রী দূর গ্রাম হ'তে এসে ভক্তিভরে কিছু যোড়াইর কাজ সম্পন্ন কোরে দিয়ে গেছে—তার মোক্ষ হোক। আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় প্রাণী কেউ কোথাও নেই। এই সুদূর বিজনে কে-ই বা আসবে। এখানে কেবল আমি আর আমার চির আরাধ্য দেবতা ভগবান বুদ্ধ—আমার ইষ্ট দেবতার ধ্যানসুন্দর মূর্তির পদতলে খালি আমি—এখানে কেবল আমি আর আমার মোক্ষের স্বপ্ন। এখানে কোনো ভয়ই নেই আমার, কেন না গুরুদেবের দেওয়া "মহাবজ্র-মণি" আমি আংটি কোরে ধারণ করেছি। খাদ্যের জন্যও ভাবনা নেই—প্রকৃতি দিচ্ছেন নানা রকম ফল ও স্নিগ্ধ স্বচ্ছ স্রোতস্বিনীর জল।"

তারপর আমি বর্মী ভাষায় লেখা খাতাখানি তুলে নিয়ে পড়তে লাগলাম। এ খাতাখানি ভিন্ন লোকের লেখা বলে মনে হলো—কেবল তাই নয়, মনে হলো আগের পালি ভাষায় জীবনী-লেখক যেমন ভক্ত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলো—এই বর্মী ভাষায় জীবনী-লেখক কোনও গুরুতর অপরাধ বা পাপে লিপ্ত ছিলো ও পরে লোকালয় হতে পলাতক হয়ে এখানে আসে। তার লেখা থেকে যা' পড়লাম তাতে বুঝলাম যে সে খুব বেশী দিন আগেকার লোক নয়। কোনও মহাপাপের অবসাদে সে জগৎ হতে পালিয়ে এসে এই মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিলো। সেও এখানে কারুকে পায়নি—পূজারী-শূন্য মন্দিরে বুদ্ধের চরণতলে আত্মসমর্পণ কোরেছিলো। সে কিছুদিন তার আগে পাগলের মতো ভবঘুরে জীবন-যাপন কোরেছিলো—তখনই সাধুসঙ্গলাভ করে কিছুদিনের জন্য। ঐ সময়ই সাধুসঙ্গের ফলে তার অনুতাপ-দগ্ধ জীবনে ভগবানের করুণা-ধারায় স্নিগ্ধ হবার বাসনা জেগে ওঠে। সাধুর দলে যিনি ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ ও পরম ক্ষমতাবান্—তাঁরই কাছে

সে ব্যক্ত করে তার নিদারুণ অপরাধের কথা ও নির্দেশ পায় বুদ্ধের শরণ নেবার ও সঙ্গে সঙ্গে দেবতার মন্দিরে দিবারাত্রি অনির্বাণ দীপ প্রজ্জ্বলিত রাখতে। পাপ লাঘবের আশায় অনুতাপী এইভাবে প্রদীপটি জ্বেলেছিলেন। সে লিখছে—আমি যে প্রদীপ জ্বালিয়েচি তা আমার মৃত্যুর পরও অন্ততঃ পাঁচ বৎসর জ্বলবে। তথাগতের করুণা আস্তে আস্তে এই মহাপাপীর কঠিন হৃদয় স্পর্শ করছে—আমি ক্রমে শান্তি লাভ করছি—যা করেছি সে যেন আমার পূর্বজন্মের দুষ্কৃতি। বুদ্ধের করুণায় এ কোন পুণ্য স্থানের দর্শনলাভ কোরলাম—এ কোন মহাত্মার সাধন-মন্দিরে আশ্রয়লাভ কোরলাম—এ যেন আমার জন্যই অপেক্ষা করছিলো। জীর্ণ ভগ্নপ্রায় মন্দিরকে আমি আবার নতুন কোরে নির্মাণ করেছি—ভগবান তথাগতের পবিত্র প্রতিমারও সংস্কার-সাধন করেছি—আমার হাতের কারিগরীর সকল দক্ষতা দিয়ে। হৃদয় আমার আনন্দে পূর্ণ হয়ে রয়েছে—সত্যই কি দেবতার ক্ষমাভিক্ষা পাবো? যার এ মন্দির তিনি কোথায় জানি না। সেই মহাত্মার উদ্দেশ্যে নিত্য প্রণাম জানাই। তাঁর গ্রন্থগুলি এখানে আছে—আমি ঐগুলি পড়তে জানি না কিন্তু যতদূর সাধ্য যত্ন করছি। ভগবান তথাগত নিশ্চয়ই আমায় ত্রাণ কোরবেন।"

এই রকম পড়তে পড়তে এক জায়গায় পড়লাম—"কিন্তু এখানে একটি মস্ত ভয়—রাতে কাঠের ফাঁক দিয়ে বিরাট ভয়ঙ্কর পাহাড়ে সাপ আসে প্রায়ই দেখছি। বিশাল কালান্তক মূর্তি সর্পরাজ এসে ভগবান বুদ্ধের চরণতলে শুয়ে থাকে। মাঝে মাঝে তার সেই ভয়ঙ্কর কুণ্ডলীর মাঝে উদ্যতপ্রায় ফণা দেখে আমার বড়ই ত্রাস হচ্ছে। কাঠের ফাঁক বুঁজিয়েছি তবু কোথা হতে ঢুকছে। বোধহয় সুড়ঙ্গ করে ফেলেছে। ভোর হলে চলে যায়। এ কি আমার পরীক্ষা? অহিংসা গ্রহণ করেছি। মনে হয় সেই মহাত্মাই সাপ হয়ে তাঁর ইষ্টদেবতাকে পাহারা দিচ্ছেন। ওঁকে বিরক্ত না করলে বোধহয় কিছুই বলবেন না"—এই পর্য্যন্ত পড়েই হঠাৎ ভয়ে আমার শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেলো—তড়িৎগতিতে চতুর্দিকে চেয়ে দেখি বুদ্ধমূর্তির পেছনের জমাট অন্ধকারটা হঠাৎ যেন নাড়া পেয়ে কুণ্ডলী হতে বিরাট ফণা আমারই দিকে উদ্যত করে ভীষণ রোষভরে ফোঁস্ ফোঁস্ করছে। চক্ষের পলকে আমি তাক্ কোরে ত্রিশূলটারের ঘোড়াটা টিপে দিলাম। বিকট সাপটা মৃত্যু-যন্ত্রণায় মোচড়াতে মোচড়াতে স্থির হয়ে গেলো—এতো বড়ো ভয়ঙ্কর মূর্তি পাহাড়ে সাপ আমি খুব কম দেখেছি। তারপর আমি ভালো কোরে ঘরটি পরীক্ষা কোরতে লাগলাম। একটু অনুসন্ধান কোরতেই দেখি বুদ্ধমূর্তির বাঁ-কোণে কয়েকটি হাড় পড়ে আছে—মনুষ্য-কংকালেরই অংশ বলে মনে হলো—আর একটু পাশেই দেখলাম কাঠের দেয়ালের তল দিয়ে এক মস্ত সুড়ঙ্গ—বোধহয় সর্পরাজের ঐটিই আস্তানা ছিলো। আর একপাশে কাঠও অনেকটা ফাঁক হয়ে গেছে—জন্তু-জানোয়ারের আঁচড়া-আঁচড়ির ঠেলায় হয়েছে মনে হলো। বুঝতে পারলাম যে এই মন্দিরের দ্বিতীয় বাসিন্দার মৃত্যু খুব সম্ভব এই সর্প-দংশনেই হয়েছে আর তার হাড়-মাংস টেনে নিয়ে গেছে বন্য শেয়াল বা আর কোনও হিংস্র জানোয়ারে। কারণ অসুখ বিসুখের কথা সে কিছুই লেখেনি তার দিন-পঞ্জীতে—আর তাছাড়া মৃতের সম্পূর্ণ কংকালটাই তাহলে দেখা যেতো। ভাবতে ভাবতে তারপর সেই বিরাট মৃত সাপের কুণ্ডলীকৃত দেহ ও সেই মনুষ্য-কংকালের কয়টি অবশিষ্ট হাড়ের সমুখে, জীর্ণ মন্দিরের মধ্যে কিছুক্ষণ দুঃস্বপ্ন দেখার মতো স্তব্ধ অভিভূত হয়ে রইলাম। একটু সম্বিৎ ফিরতেই সহসা মনে হলো যে মন্দিরের প্রথম বাসিন্দা সন্ন্যাসীরও তো এখান হ'তে পঁচিশ বৎসর যোগ-সাধনা পূর্ণ করে—ভারতবর্ষ চলে যাবার কোনও কথা তার জীবনী-কথায় লেখা নেই? অথচ এই কথাই তো তার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। খুব সম্ভব তারও এই সাধন-মন্দিরে যোগাচারের পূর্ণ সমাপ্তি ঘটতে পারেনি। তবে—? সেও কি—? নাঃ—যদি সেও সাপের হাতে পড়তো—তাহলে দ্বিতীয় বাসিন্দা তার কোনো না কোনো সূত্র নিশ্চয় পেয়ে যেতো ও লিখতো।—তবে? আমার যেন ভূতে-পাওয়ার মতো নেশায় ধরে গিয়েছিলো। আবার সন্ন্যাসীর খাতাখানি নিয়ে বসে গেলাম। অনেক একঘেয়ে বুদ্ধ-স্তব ও অক্ষম কাব্য-চেষ্টা অতিক্রম কোরে এক জায়গায় চোখ পড়তেই আমি চমকে উঠলাম—"এখানে ইষ্টদেবতার চেয়েও যেন আমার নির্মিত এই মন্দিরটির চিন্তা আমায় ছেয়ে ফেলছে। বিষয়ী মানুষের মতো কেবল মন্দিরটির পারিপাট্যে বড় বেশী মন চলে যাচ্ছে—এই ক্ষুদ্র কুটিরের মায়ায় জড়িয়ে পড়ছি।" আর

এক জায়গায় রয়েছে—"এখান হ'তে অনেকটা ওপরে একটি অতি নির্জন পাহাড়ের গুহার আজ সন্ধান পেলাম—ঐটিই আমার সাধন-পীঠ করবো। বাঘের পায়ের চিহ্ন আছে—কিন্তু আমার কোনও ভয় নেই—গুরুদেবের দেওয়া "মহাবজ্রমণি" আমার সহায় !"

ভোর হয়ে এসেছিলো—তখনো মাথার ওপরে চিড়চিড় কোরে প্রদীপ জ্বলতে লাগলো। কি বিস্ময় ও রহস্য-ভেদের নেশা লেগে গিয়েছিলো বলতে পারিনে। ভোর হ'তেই রিভলভার বাগিয়ে চড়াইর দিকে এগোলাম খুব সাবধানে খড়ির চিহ্ন দিতে দিতে—সেই গুহার উদ্দেশ্যে। খুব সহজেই এবার সন্ন্যাসীর সাধন-পীঠের সন্ধান পেলাম। চারিদিকে গুল্ম ও পাহাড়ী ফুলের গাছের বনের মাঝখানে একটি ছোট্ট পাহাড়ের টিলা—তার চূড়ার ঠিক মধ্যেই একটি সরু গুহা। অতি সতর্ক পা ফেলে গুহার মুখে দাঁড়িয়ে টর্চ ভেতরে ফেলে দেখতে পেলাম একটি পাথরের আসনের ঠিক সমুখের দেয়ালেই সুন্দর একটি ধ্যানী বুদ্ধের ছবি আঁকা রয়েছে তেল-মাটি দিয়ে—জাপানী শিল্পোৎকর্ষের এক বিশিষ্ট নিদর্শন ! বিভিন্ন রংএর নিপুণ ব্যবহার ছিলো চিত্রে। গুহার ভিতরে জল হাওয়ার ঝাপটা খুব কম লাগে বলে নাম-বিহীন শিল্পীর সৃষ্টি লোকচক্ষুর অন্তরালে তখনো প্রায় অম্লান। গুহার ভেতরে এক জায়গায় একটা জল রাখবার কাঠের বাসন-মতো পড়েছিলো ও একটি বল্লম-জাতীয় জিনিষ। খুঁজতে খুঁজতে দু-একটা হাড়ের টুকরো পেয়ে গেলাম কিন্তু সেগুলো মানুষের কি জানোয়ারের তা' বুঝতে পারলাম না। আর কিছু না পেয়ে মনে মনে সেই অজানা সন্ন্যাসী-শিল্পীর প্রতি মাথা নত কোরে চলে আসছি—এমন সময় একটা ধাতব-দ্যুতির দীপ্তি ঠিকরে এসে চোখে লাগলো ও সঙ্গে সঙ্গে এই নির্জন বনবাসীর জীবন-নাট্যের ওপর একটা আলোর যবনিকা পড়ে গেলো।—সেই "মহাবজ্রমণির" আংটিটি পেয়ে গেলাম।"

এই সময় আমি বলে উঠলাম—"সেটা কোথায় ? সেটা কী ?" বন্ধু অল্প হেসে বললেন "ওটা একটা অতি দুর্লভ মণিই বটে—দামী আর বেশ বড়ো, তবে এর বালাটাতে বহু ধাতুর মিশ্রণ আছে মনে হয়। এই দেখ, আমিই সে-আংটি এখন ধারণ করে আছি।" বলে বন্ধু বাঁ হাতটি প্রসারিত কোরলেন। দেখলাম, মস্ত বড়ো একটা জ্বলজ্বলে ঈষৎ খয়ের রংএর মণি। এ রকম কোথাও দেখিনি। বললাম—"কিন্তু এ ধারণ কোরে কি হবে ? এ তো সে সন্ন্যাসীকে বাঁচাতে পারেনি।" বন্ধু মৃদু হেসে বললেন—"পারতো—যদি সন্ন্যাসী এটা কখনও না খুলতো।"

বললাম, "একথা কেন বলছো ?"

বন্ধু বললেন—"এ আংটিটা পেয়েছিলাম, গুহার প্রায় ছাতের কাছাকাছি দেয়ালে একটি ছোট গর্ত্তে। সন্ন্যাসী কোনো কারণে আংটিটা কোনো সময়ে খুলে রেখেছিলো ও সেই সময়েই সে মৃত্যুর কবলে পড়ে। এ মণি আমায় অনেক বার বিপদ হ'তে বাঁচিয়েছে। আংটি হাতে ফেরার সময়েই গুহার মুখে ব্যাঘ্ররাজের সঙ্গে দেখা—গুহাটা তারই আস্তানা বলে বোধ হলো।"

রুশ-জার্মাণ সংগ্রাম ও রুশীয় ছেলেমেয়েরা

শ্রীঅশোককুমার গুপ্ত

দুঃখ দিনের কালো মেঘে ঢাকা ১৯৪২ সালের রাশিয়া—যে রাশিয়ায় তখন লড়াই চলেছে জার্মাণদের সঙ্গে, কান্নার রোল উঠেছে আকাশে বাতাসে, শঙ্কা আর সন্ত্রাস এসে মাথা গুঁজেছে ঘরের আনাচে-কানাচে, ট্যাঙ্ক আর সৈন্যের ভারী জুতোর শব্দে মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে, আর বিদ্যালয়ের কবাট বন্ধ করে দিয়ে ছেলেরা এসে যোগ দিয়েছে রক্ষীবাহিনীতে দেশের স্বাধীনতা রক্ষায়, সেই সময়কার সেই সব রুশীয় ছেলেদের কার্য্যকলাপের কথাই এখানে বলা যাচ্ছে। কি ভাবে তারা পরাজয়ের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে সাহায্য করেছে, কি ভাবে তারা দেশের কাজে নিজেদের সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়েছিল সে সব কথা পড়লে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়।

জাতীয় সম্পদ রক্ষায় এমন কি ওদেশের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও অতিমাত্রায় সচেতন। তাদের এই সচেতনত্ব সব চেয়ে বেশী চোখে পড়েছে ১৯৪২ সালের রুশ জার্মাণ সংগ্রামের সময়। নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে, ভয়কে উপেক্ষা করে দল বেঁধে তারা মস্কোর রাস্তায় রাস্তায় জ্বলন্ত বোমা নিভিয়ে মস্কোকে আগুনের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। ১৩।১৪ বছর বয়স্ক ছেলেরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে বাড়ির ছাতের ওপর কিম্বা রাস্তায় রাস্তায় পাহারা দিয়েছে। সাইরেণ অথবা বোমার শব্দ কিছুই তাদের

ভীত করে নি। তারা বীর সৈনিকের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নানা আকারের বোমা পড়তে দেখেছে আর তক্ষুণি দৌড়ে গিয়ে সেগুলো অদ্ভুত কৌশলে নিভিয়ে দিয়েছে। এ কাজ করতে গিয়ে অনেকে আহত হয়েছে এবং অনেকে নিহতও হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও অপরে তার কর্তব্য থেকে বিরত থাকে নি। তখনকার স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা রাতের পর রাত জেগে সতর্ক পাহারা দিয়ে কত বোমা যে পড়া মাত্রই নিভিয়ে দিয়েছে তার আর ঠিক নেই। যত রকম কাজের ভেতর দিয়ে দেশের সেবায় এই সব ছেলে-মেয়েরা নিজেদের উৎসর্গ করেছিল আগুনে-বোমা নেভানো তাদের ভেতর প্রধান।

যুদ্ধকালীন সামাজিক অব্যবস্থার মাঝেও এই সব ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে নি। শৈশব থেকেই ওখানকার ছেলে-মেয়েরা এমন এক সুন্দর শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে একটু একটু করে বড় হয়ে উঠবার সুযোগ লাভ করে, যাতে করে যে কোন জরুরী অবস্থার মাঝে নিজেদের সুসংযত রেখে কাজ করে যেতে ওদের এতটুকুও কষ্ট হয় না। যুদ্ধের সময় দেশের অস্বাভাবিক অবস্থার দরুণ স্কুলগুলো সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে ছেলে-মেয়েরা অলস এবং অকর্মণ্য হয়ে ঘরে বসে থাকে নি। অলস এবং অকর্মণ্য হয়ে ঘরে বসে থাকতে তারা ঘৃণা বোধ করে। ওদেশের ছেলেদের একটি বৈশিষ্ট্য হোলো গোষ্ঠী-জীবনযাপন করা। নিজের সুখের জন্য কাজ করা ওখানে নিন্দনীয় বলে মনে করা হয়। যে ছেলে বাড়িতে, স্কুলে অথবা রাস্তায় একা একা থাকতে ভালবাসে তাকে সবাই অস্পৃশ্য বলে মনে করে। সেই একা থাকতে প্রিয় ছেলেকে সবাই 'নিরালা নেকড়ে' বলে ডাকে।

যুদ্ধের সময় স্কুলের ছেলে-মেয়েদের যখন পড়ার বই মুখস্ত করবার কোন তাগিদ ছিল না তখন তারা বন্ধ স্কুলগুলোতে বসে গেছে সারি সারি সেলাইএর কল নিয়ে সৈন্যদের জন্য নানাবিধ পোশাক তৈরী করতে। তারা সৈন্যদের জন্য তৈরী করেছে অন্তর্বাস, সার্ট, সামরিক সাজ পোষাক ইত্যাদি। আবার আহতদের জন্য কম্বল, মোজা ইত্যাদিও সেলাই করেছে প্রচুর পরিমাণে। শুধু সহরেই নয়, দেশের সর্বত্র তারা এই কাজ করেছে। যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম সম্বন্ধে এরা যথেষ্ট সচেতন। তাই তারা দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় লড়াই-রত হাজার হাজার সৈন্যদের সর্ববিধ সুখসুবিধার জন্য আপ্রাণ খেটে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র জোগাবার চেষ্টা করেছে। দর্জির কাজ ছাড়াও এরা সংগ্রহ করেছে সৈন্যদের জন্যে নানাবিধ উপহার সামগ্রী, যথা ভাল ভাল বই, দাড়ি কামাবার ক্ষুর, সুন্দর সুন্দর ছবি, সুস্বাদু চকোলেট, সুগন্ধি সাবান, রুমাল, লেখার কাগজ ইত্যাদি আরও অনেক রকমের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র।

দেশে যাতে খাদ্যাভাব না ঘটে, যুদ্ধরত সৈন্যেরা যাতে পেটভরে খেতে পায়, তার জন্য ওখানকার ছেলেরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। গ্রীষ্মকালে ক্যাম্পে গিয়ে গ্রীষ্মাবকাশ না কাটিয়ে অধিক খাদ্য ফলাতে তারা কাঠ-ফাটা রোদ্দুর অগ্রাহ্য করে মাঠে নেমে পড়েছে। ওদেশে জমি প্রচুর। তারা জমি থেকে আগাছা উপড়ে ফেলেছে। সৈন্যদের জন্য সংগ্রহ করেছে ব্যাঙের ছাতা, আর সোরেল গাছের পাতা প্রচুর পরিমাণে। রাশিয়ানরা এই দিয়ে সুপ তৈরী করে খায়। এ ছাড়াও তারা বাগান করে বাঁধাকপি, শশা, আলু, পেঁয়াজ প্রভৃতি ফলিয়েছে সৈন্যদের জন্য।

রুশ-জার্মাণ সংগ্রামের বীভৎসতা কারুর কাছেই অবিদিত নয়। কত নগর, কত জনপদ যে এ যুদ্ধে শ্মশান হয়ে গেছে তার আর ইয়ত্তা নেই। কত মানুষের কত বুকফাটা ক্রন্দনে যে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে তার হিসাব কে দেবে! রাশিয়ার বুকের ওপর যে দানবীয় হত্যালীলা এ যুদ্ধে সংঘটিত হয়ে গেল, ধ্বংসের যে তাণ্ডব নৃত্য অনুষ্ঠিত হোলো গোটা রাশিয়াটা জুড়ে, তার প্রামাণিক ইতিহাস স্বরূপ হয়ে আছে লক্ষ লক্ষ গৃহহারা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মর্মন্তুদ কাহিনী—কাহিনী কেবল রইল দানাবেঁধে যুদ্ধোত্তর রাশিয়ার ইতিহাসের পাতায় পাতায়। রাশিয়ার এমন একটিও পরিবার অবশিষ্ট ছিল না—যে পরিবার থেকে কেউ যুদ্ধে যোগদান করে নি অথবা আহত কিম্বা নিহত হয় নি। পরাজিত হয় নি তথাপি রাশিয়া। মরতে মরতেও বেঁচে গেছে। ব্যথাবিক্ষুব্ধ উত্তাল তরঙ্গের মাঝেও টলটলায়মান স্বাধীনতা তরণী পাক্ খেয়ে খেয়ে শেষটায় তীরে এসে ভিড়েছে। রাশিয়ার এই যে জয়, এই জয়ের মূলে রয়েছে রাশিয়ার প্রতিটি বালক-বালিকার অদম্য এবং অক্লান্ত সংঘবদ্ধ পরিশ্রম ও সুপ্ত জাতীয়তাবোধ।

যুদ্ধের পূর্বে যে সকল গুরুভার প্রাপ্তবয়স্ক যুবক এবং বৃদ্ধদের ওপর ন্যস্ত ছিল, যুদ্ধের সময় সে সকল গুরুদায়িত্ব অপ্রাপ্তবয়স্ক তরুণদের গ্রহণ করতে হয়েছিল। কারণ যুদ্ধের সময় প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক যুবক থেকে সুরু করে প্রৌঢ় পর্য্যন্ত সবাইকেই জীবন-মরণ পণ করে লড়তে হয়েছে জার্মাণদের সঙ্গে। ছেলেমেয়েদের এই যে দায়িত্বজ্ঞান, এর মূলে রয়েছে রুশীয় রাজনৈতিক শিক্ষার প্রভাব—যার ফলে তারা মনে-প্রাণে দ্রুত বেড়ে উঠবার সুযোগ লাভ করে। সমগ্র রাশিয়ার অধিবাসী যখন কেবলমাত্র জার্মাণ আক্রমণ ব্যর্থ করবার চেষ্টায় রাত-দিন সংগ্রাম চালিয়েছে, রুশীয় জন-শক্তি নিয়োজিত হয়েছে শুধু জার্মাণ অগ্রগতি ব্যাহত করতে, তখন মেয়েরা দল বেঁধে লেগে গেছে দেশের অন্যান্য কল্যাণকর কাজে। তারা নিয়মিত হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সেবা করেছে, আহত লোকদের চিঠিপত্র লিখে দিয়েছে। আহতদের গল্প কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছে। নেচে গেয়ে অভিনয় করে আহতদের মন প্রফুল্ল রাখবার চেষ্টা করেছে। তারা আহতদের অথবা যে সব সৈন্যেরা যুদ্ধক্ষেত্রে লড়ছে, তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করে তাদের ছেলে মানুষ করা থেকে সুরু করে সংসারের যাবতীয় কাজকর্মের ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে। শুধু সহরেই নয়, দেশের সর্বত্র তারা এই কাজ করেছে পরম আগ্রহ সহকারে।

যুদ্ধের সময় রুশীয় ছেলেদের সব চেয়ে আশ্চর্য্যজনক কাজ ছিল গরিলা হওয়া এবং সাধারণ সৈন্যদলের হয়ে গোপন সামরিক সংবাদ সংগ্রহ করা। যদিও রুশীয় সেনা বিভাগ অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেদের নিয়মিত বাহিনীতে গ্রহণ করে না তথাপি তারা আসত শত্রুপক্ষের নানাবিধ মূল্যবান গোপন সংবাদ নিয়ে। অফিসারগণ সানন্দে সে সব সংবাদ গ্রহণ করতেন।

এ কাজ করতে গিয়ে তারা যে অদ্ভুত সাহস ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে তার তুলনা কিশোর-জগতের ইতিহাসে সত্যিই বিরল। যুদ্ধের সময় রাশিয়ার কোন এক অঞ্চলে একদল জার্মাণ সৈন্য ট্যাঙ্কসহ একটি কাঠের বড় ব্রিজ পার হবার জন্য তোড়জোড় করছিল। রাশিয়ান গরিলাবাহিনী কোন মতেই তাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছিল না। জার্মাণরা রাজপথ এমনভাবে পাহারা দিচ্ছিল যে সেই পথে নদীর ধারে ব্রিজের কাছে যাওয়া বয়স্ক লোকদের পক্ষেও অসম্ভব। তখন দু'টি রুশীয় বালক পুরণো ময়লা জামা পরে হাতে মাছ ধরার ছিপ নিয়ে ধীরে ধীরে ব্রিজের দিকে এগোতে লাগল। তারা যেন নদীর ধারে মাছ ধরতে যাচ্ছে এম্‌নি ভাব। পকেটে কিন্তু আছে তাদের ছোট্ট কেরোসিনের টিন। ব্রিজের কাছে পৌঁছে তারা সাবধানে ব্রিজের চারদিকে কেরোসিন ছড়িয়ে দিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল, আর দেখতে দেখতে বিরাট কাঠের ব্রিজটি পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

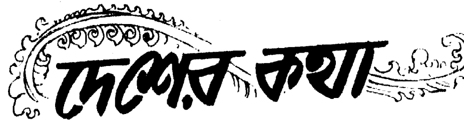
শত্রুপক্ষের গোয়েন্দা যাতে দেশের কোন ক্ষতি করতে না পারে সে দিকেও রুশীয় বালক-বালিকাদের দৃষ্টি থাকত সজাগ ও তীক্ষ্ণ। ভাঙা ভাঙা রুশ ভাষায় কথা বলতে শুনলেই তারা তাকে সন্দেহ করত। যুদ্ধের সময় পশ্চিম রাশিয়ার কোন একটি গ্রামে একদিন কতকগুলো মেয়ে মাঠ পরিষ্কার করছিল। এমন সময় তারা একটি লোককে দেখতে পেল তাদেরই দিকে এগিয়ে আসতে। মেয়েদের কেমন যেন একটু সন্দেহ হোলো লোকটিকে দেখে। লোকটি এগিয়ে আসতে মেয়েরা তার সঙ্গে নানা রকম গল্প গুজব জুড়ে দিল, আর কেউ কেউ বা ঠাট্টা তামাসাও করতে লাগল একটু একটু। তাদের উদ্দেশ্য হোল লোকটিকে আটকে রেখে গ্রামে রুশীয় সেনাদপ্তরে খবর পাঠান। তাদের ভেতর দুটি মেয়ে অন্যান্য মেয়েদের বোল্ল যে তারা জল আনতে যাচ্ছে। জল আনতে যাবার নাম করে তারা গ্রামের সেনাদপ্তরে গিয়ে লোকটির খবর জানিয়ে এলো। সৈন্যেরা খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি এসে লোকটিকে গ্রেপ্তার কোরল। পরে প্রমাণিত হোল যে, লোকটি শত্রুপক্ষীয়।

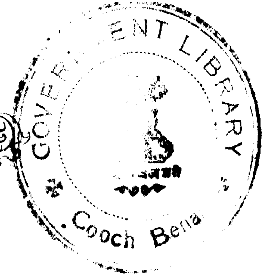
আর একদিন অপর একটি গ্রামে একটি জার্মাণ সৈনিক রুশ-সৈনিকের পোষাক পরে একটি রুশীয় ছেলেকে এসে জিজ্ঞেস কোরল—গাঁয়ে যে রুশ সৈন্যদলটি অবস্থান করছিল সে দলটি চলে গেছে কিনা এবং কোন্ পথে গেছে। লোকটির উদ্দেশ্য ছিল ছেলেটির কাছ থেকে জেনে নেওয়া রুশীয় সৈন্যদলটি সত্যিই সেখানে আছে কিনা। যদি না থাকে তবে তারা সে অঞ্চলে অবাধে প্যারাশুটবাহিনী নামিয়ে দিয়ে আক্রমণ চালাতে পারবে। ছেলেটির কিন্তু সন্দেহ হোল লোকটিকে। সে বোল্ল যে সৈন্যদলটি অবস্থান করছিল সে দলটি চলে গেছে, কিন্তু পথ দেখাবার বেলায় উল্টো পথ দেখিয়ে দিল। ছদ্মবেশী জার্মাণ সৈন্যটি এর পর হঠাৎ আগুন জ্বেলে কি একটা সংকেত করায় মেঘের আড়াল থেকে একটি যাত্রীবাহী বিমান দেখা দিল, আর তার ভেতর থেকে প্যারাশুট সৈন্য লাফিয়ে পড়তে লাগল। এই না দেখেই প্রাণপণ দৌড়ে ছেলেটি গ্রামের সেনাদপ্তরে এসে খবর দিল। খবর পেয়ে রুশসৈন্যদল দ্রুত সেথায় এসে সব কটি লোককেই গ্রেপ্তার কোরল। যে রুশীয় ছেলেটির বুদ্ধিমত্তার জন্য গ্রামটি শত্রু আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেল, তার নাম ভাসিয়া। এমন কত অগণিত ভাসিয়া যে যুদ্ধোত্তর রাশিয়ার ইতিহাসের পাতায় জড়িয়ে আছে অমরতার দাবি নিয়ে, তার আর ঠিক নেই। এদের সক্রিয় সাহায্য না পেলে আজকের রাশিয়ার ইতিহাস হয়ত অন্যভাবে লিখতে হাত আর সে লেখা হোত পরাজয়ের কলঙ্কমসীলিপ্ত।

দুপুর

শ্রীরণেশ মুখোপাধ্যায়

ঠিক দুপুর—ভারী দুপুর :
দম্‌কা হাওয়ার হল্‌কা ছোটে,
শুক্‌নো পাতা ধূলায় লোটে,
দূরে দূরে গাছে পাতার আড়ালে
ডাক্ ঘুঘুর :
ভরা দুপুর।
মাঠের ওপারে অলস—আকাশ ঘুম-কাতর,
সারা গায়ে তার ঝল্‌মল্ করে রোদ্দুর,
ছায়া ফেলে ফেলে রোদ পালায়,
কোন্ ঠিকানায় যায় কোথায় :
পাল-তোলা মেঘে ভর করে চলে
কোন্ সুদূর :
ঘোর দুপুর।
আকাশে মাটিতে মিঠে ঝিমুনির ছোঁওয়া লাগে,
রোদ্দুর ঝলকে বাতাসের বুকে গান জাগে
দিনের চোখের পাতাটি ভারী,
গোরু-ছাগলের টহলদারী,
রোদ্দুরে-দেওয়া কুলের আচারে
মন খুকুর :
বুড়ো দুপুর।





শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

প্রদেশ পুনর্গঠন—

ভারত সরকারের "মনের কথা মনই জানে"। তাঁহারা ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন সম্বন্ধে কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি পদদলিত করিবার পরে সময় সময় বিভিন্নরূপ কথা বলিয়াছেন। কিন্তু অন্ধ্র যে পথ অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা অহিংস বলা যায় না এবং অন্ধ্রকে স্বতন্ত্র প্রদেশ করিতে হইয়াছে। তাহার পরে—প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গের আন্দোলন ফলে—ভারত সরকার তিন জনে গঠিত এক সমিতি নিযুক্ত করিয়া ঐ বিষয়ের বিবেচনাভার সমিতির উপর অর্পণ করিয়াছেন। ইংরেজের আমলে সরকার বলিতেন, যখন কোন বিষয়ে আন্দোলন প্রবল হয়, তখন তাঁহারা কমিটী বা কমিশন গঠন করেন—বিলম্বে আন্দোলনের উত্তেজনা দূর হয়। ভারত সরকার সেই উদ্দেশ্য লইয়া কাজ করিয়াছেন কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে পরিণত বয়স্ক হৃদয়নাথ কুঞ্জরুকে সমিতির সভাপতি না করিয়া ফজল আলীকে সেই পদ প্রদানে অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গের আপত্তির কারণ ঘটিয়াছে। কারণ, তিনি বিহারী এবং তাঁহাকে বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের দাবী—যে দাবী কংগ্রেস কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছিল সেই দাবী—বিবেচনা করিতে হইবে। তাঁহার নিরপেক্ষতায় কোনরূপ সন্দেহ প্রকাশ না করিয়াও আমরা বলিতে পারি—যে ব্যবস্থায় লোকের মনে সন্দেহের উদ্ভব হইতে পারে, তাহা বর্জ্জন করাই শ্রেয়ঃ। মুরলীমনোহরপ্রসাদপ্রমুখ ব্যক্তিদিগের ব্যবহার না হয় উপেক্ষা করিতে পারা যায়, কিন্তু যিনি আজ ভারত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি সেই ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিহারে বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলকে হিন্দীভাষাভাষীতে পরিণত করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা নিরপেক্ষতার পরিচায়ক বলা যায় না।

সমিতি নিয়োগে নানা প্রদেশ নানা দাবী উপস্থাপিত করিতেছেন। বিহারের কথা বলা বাহুল্য। ইংরেজ বাঙ্গালীর আন্দোলনে যখন Settled fact বদল করিতে বাধ্য হয়, তখন বাঙ্গালীকে দুর্ব্বল করিবার অভিপ্রায়ে, বিহার ও উড়িষ্যা বাঙ্গালা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্র প্রদেশ করে এবং বাঙ্গালার বঙ্গভাষাভাষী—মানভূম, সাঁওতাল পরগণা, পুর্ণিয়ার একাংশ প্রভৃতি বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশকে প্রদান করে। তখনই কংগ্রেস সে ব্যবস্থা অসঙ্গত বলেন। যদি প্রকৃত ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠিত করিতে হয়, তবে বিহারের হিন্দীভাষাভাষী অঞ্চল যুক্ত-প্রদেশকে ও বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গকে দিয়া বিহারের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লুপ্ত করিয়া মিথিলা প্রদেশ গঠিত করা যাইতে পারে। কথায় বলে—

"যার ছেলে যত চায়
তার ছেলে তত পায়"

—বিহারের লোভ বাড়িয়াছে এবং বিহার পশ্চিমবঙ্গেরও কতকাংশ চাহিতেছে।

তাহার পরে উড়িষ্যা। উড়িষ্যার সহিত পশ্চিমবঙ্গের একটা মীমাংসার প্রস্তাব হইয়াছিল, পশ্চিমবঙ্গ সেরাইকেল্লা ও খরশোয়ানের উড়িষ্যাভুক্তি সমর্থন করিবে এবং উড়িষ্যার পশ্চিমবঙ্গের মানভূম প্রভৃতিতে দাবী স্বীকার করিবে। এ প্রস্তাব উভয় প্রদেশের কংগ্রেসী দলে হইলে—উড়িষ্যার গণতন্ত্র রাজনীতিক দল এক দাবী পেশ করিয়াছেন—

(১) মেদিনীপুরের কাঁথী ও ঝাড়গ্রাম মহকুমা দুইটি (২,৫০০ বর্গ মাইল)

(২) দাঁতন, নারায়ণগড়, বেলিয়াবেড়া, খড়গপুর ও মোহনপুর থানার এলাকা।

(৩) সদর মহকুমার ডেবরা ও পিংলা থানার এলাকা

(৪) নন্দীগ্রাম ও পাঁশকুড়া থানার এলাকা—

উড়িষ্যাভুক্ত করা হউক। আর উড়িষ্যাকে দেওয়া হউক—

(১) বাঁকুড়া জিলার সিমলাপাল, খাটরা ও রায়পুর থানার এলাকা

(২) মানভূমের চাণ্ডীল প্রভৃতি থানায়—১,১৫০ বর্গ মাইল স্থান।

(২) সিংহভূমের ৩,৯৯১ বর্গ মাইল স্থান

(৩) সেরাইকেল্লা ও খরশোয়ান।

ইহা ব্যতীত উৎকল সম্মিলনী অন্ধ্রের ও মধ্যপ্রদেশে কিছুর স্থানও দাবী করিয়াছেন। উড়িষ্যার প্রদেশ কংগ্রেস চাহিতেছেন—

(১) মধ্যপ্রদেশে নওড়াগড়, বাদমপুর, চন্দ্রপুর প্রভৃতি

(২) অন্ধ্রের যে ১,৬০০ বর্গ মাইল উড়িষ্যাভুক্ত করা স্বীকৃত হইয়াছিল

(৩) সেরাইকেল্লা ও খরশোয়ান রাজ্যদ্বয়।

তৃতীয় দফায় যে দুইটি রাজ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, সে দুইটির রাজারা উড়িষ্যাভুক্তিই চাহিয়াছিলেন এবং দুইটিতে উড়িয়াই রাজভাষা ছিল। অথচ লোকমত অগ্রাহ্য করিয়া ভারত সরকার ঐ উড়িয়া রাজ্যদ্বয় বিহারকে দিয়াছেন! অন্যান্য দাবী সম্বন্ধে যাহাই কেন বলিবার থাকুক না, এই রাজ্যদ্বয়ে যে উড়িষ্যার অধিকার সঙ্গত ও স্বাভাবিক, তাহাতে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই।

উড়িষ্যা সম্বন্ধে কি করা যায়, তাহা বহুদিন ইংরেজ সরকারের চিন্তার বিষয় ছিল। সম্বলপুর উড়িষ্যাভুক্ত করা হইবে কি না, অথবা উড়িষ্যাকে বাঙ্গালা হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইবে কি না, এই প্রশ্ন দীর্ঘ ১৪ মাস কাল বড়লাটের অজ্ঞাতে বিবেচিত হইয়াছিল। লর্ড কার্জ্জন বলিয়াছিলেন—ইহা "had been excongitated by the Secretaries and

Deputy Secretaries in their fourteen months of travel" এই সম্পর্কেই লর্ড কার্জ্জন মন্তব্য করিয়াছিলেন :—

"Departmentalism is not a moral delinquency. It is an intellectual hiatics—the complete absence of thought or apprehension of anything outside the purely departmental aspects of the matter under discussion."

আসামও দাবী জানাইয়াছে। আসামের কথা—ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত, নৃতত্ব সম্বন্ধীয় ও শাসন সংক্রান্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া কুচবিহার ও জলপাইগুড়ী পশ্চিমবঙ্গ হইতে লইয়া আসাম-ভুক্ত করা হউক। এমন কি দার্জ্জিলিং জিলার প্রতিও আসামের একটি প্রতিষ্ঠান লোলুপ দৃষ্টিপাত যে করে নাই, এমন নহে।

কাছাড় কিন্তু স্বতন্ত্র হইতে চাহিতেছে। বিহারে মিথিলাও স্বাতন্ত্র্য দাবী করিয়াছে ও করিতেছে।

এই সকল পরস্পরবিরোধী দাবীতে যে অনুসন্ধান সমিতিকে "বাঁশবনে ডোম কানা" অবস্থায় বিব্রত হইতে হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। তবে তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন—দাবী যত বড় করা যায়, প্রাপ্তি তত অধিক হইবার সম্ভাবনা।—To get an inch one must show cause for an ell,

উড়িষ্যার দাবী দুই প্রকার—কংগ্রেসের ও গণতন্ত্রদলের।

লক্ষ্য করিবার বিষয়—বাঙ্গালা বিভক্ত হইলেও বিহার, আসাম ও উড়িষ্যার একটি দল পশ্চিমবঙ্গেরও কতকাংশ দাবী করিতে ইতস্ততঃ করে নাই।

এমন কি কোন কোন পক্ষ বলিতেছেন, পশ্চিমবঙ্গ আয়তনে ক্ষুদ্র এবং সীমান্ত রাষ্ট্র। তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না রাখিয়া তাহাকে বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়া খাস কলিকাতা সর্ব্বভারতীয় সহর ও বন্দর করিয়া রাখা হউক। বাঙ্গালার যে সংস্কৃতি নবভারত রচনা করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না তাহা বিলুপ্ত করিবার জন্য যে আগ্রহ দেখা যাইতেছে, তাহা দেশের পক্ষে কল্যাণকর কি না, তাহা কি ভাবিয়া দেখিবার বিষয় নহে?

পশ্চিমবঙ্গের প্রসার-বৃদ্ধি—

ভাষার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের দাবী জানাইয়া অনুসন্ধান সমিতির নিকট বহু প্রতিষ্ঠান হইতে স্মারকলিপি প্রেরিত হইয়াছে। সে সকলের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কংগ্রেস সমিতির লিপি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক। ইহা প্রায় ২ শত পৃষ্ঠাব্যাপী এবং নানা তথ্যে পরিপূর্ণ। দেশ বিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গে যে কল্পনাতীত লোকসমাগম হইয়াছে এবং সেজন্য যে পশ্চিমবঙ্গের প্রসার-বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন, তাহাও এই লিপিতে বলা হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল অধিকার করিবার জন্য অভিযান করিবেন বলিয়া হাস্যাস্পদ হইয়াছিলেন। আবার যখন পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে ঐ সকল অঞ্চল দাবী করিয়া এক প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হয়, তখন প্রধান-সচিব কংগ্রেস পক্ষীয় সদস্য শ্রীশঙ্কর মিত্রকে পুরোভাবে রাখিয়া যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাতে ধানবাদ ও টাটানগর বাদ দিয়া বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অবশিষ্ট অংশ মাত্র দাবী করা হইয়াছিল। সুখের বিষয় স্মারক লিপিতে সেরূপ কোন প্রস্তাব নাই। সকল দিক বিবেচনা করিয়া—যুক্তির ভিত্তিতে বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলগুলির পশ্চিমবঙ্গ ভুক্তি দাবী করা হইয়াছে। দাবী এইরূপ :—

বিহার হইতে—

(১) পূর্ণিয়া জিলার অংশ (কুশীর পুরাতন খাত পর্য্যন্ত)—প্রায় ৩,৮০০ বর্গ মাইল—লোকসংখ্যা, প্রায় ১৯ লক্ষ

(২) মানভূম জিলার পুরুলিয়া ও ধানবাদ—প্রায় ৪,১২২ বর্গ মাইল; লোকসংখ্যা—প্রায় ২২ লক্ষ ৮০ হাজার

(৩) সাঁওতাল পরগণা (গড্ডা মহকুমা বাদে)—প্রায় ৪,৬৬৬ বর্গ মাইল; লোকসংখ্যা প্রায় ১৮ লক্ষ ৭০ হাজার

(৪) ধলভূম (সিংহভূমের অংশ)—আয়তন, প্রায় ১,১৬৭ বর্গ-মাইল; লোকসংখ্যা—প্রায় ৬ লক্ষ ১০ হাজার

(৫) সেরাইকেল্লা রাজ্যের বঙ্গভাষাভাষী অংশ—আয়তন, প্রায় ২ শত বর্গমাইল; লোকসংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ

(বিহার হইতে দাবীকৃত অংশের আয়তন প্রায় ১৩,৯৪৫ বর্গ মাইল; লোকসংখ্যা প্রায় ৬৭ লক্ষ ২০ হাজার)

উড়িষ্যা হইতে—

উত্তর বালেশ্বর—আয়তন, প্রায় ২৬০ বর্গ মাইল; লোকসংখ্যা—প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার।

আসাম হইতে গোয়ালপাড়া—আয়তন প্রায় ৩,৯৮৭ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা—প্রায় ১১ লক্ষ।

গারো পাহাড়—আয়তন, প্রায় ৫,১৬০ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা, প্রায় ২ লক্ষ

ইহা ভিন্ন কাছাড় ও ত্রিপুরা পশ্চিমবঙ্গ ভুক্ত করিতে বলা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে, গারো পাহাড় হইতে কাছাড় পর্য্যন্ত সংযোজক ভূমি-খণ্ড দিতে হইবে। এই দাবীর স্বরূপ—

ত্রিপুরা—আয়তন, প্রায় ৪,০৩২ বর্গ মাইল; লোকসংখ্যা—প্রায় ৬ লক্ষ ৪০ হাজার

কাছাড়—আয়তন, প্রায় ২,৬৯২ বর্গ মাইল; লোকসংখ্যা, প্রায় ১১ লক্ষ ২০ হাজার।

যে সকল যুক্তি অবলম্বন করিয়া এই দাবী করা হইয়াছে, সে সকল খণ্ডন করা দুঃসাধ্য বলিলে অসঙ্গত হয় না। এই সকল স্থানের লোক বাঙ্গালা ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করে এবং তাহারা বাঙ্গালীর সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী।

বলা হইয়াছে, ৫টি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া এই স্মারকলিপি রচনা করা হইয়াছে :—

(১) পৃথিবীতে বর্ত্তমানে মানবজাতির অবস্থায়—ঐক্য প্রতিষ্ঠা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন। এই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত ও অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে যে, কোন সম্প্রদায়ের মনে এমন বিশ্বাসের অবকাশ না থাকে যে সেই সম্প্রদায়ের ঐক্য অন্য কোন বা কোন কোন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক ক্ষুণ্ণ হইতেছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মন হইতে সেরূপ আশঙ্কাজনিত অসন্তোষের কারণ দূর করিতে হইবে।

(২) ভাষাগত ঐক্য দ্বারাই উল্লিখিত ঐক্য সহজে সাধিত হইতে পারে। মানবজাতির ইতিহাসে ইহার বহু প্রমাণ আছে।

(৩) ঐতিহাসিক সম্বন্ধ। কোন জাতির ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে যে ঐতিহাসিক সম্বন্ধ সৃষ্ট ও পুষ্ট হয়, তাহা সহজে নষ্ট হইতে পারে না।

(৪) অর্থনীতিক ও শাসন ব্যাপারের অবস্থা।

(৫) ভিন্ন ভিন্ন অংশের আয়তন সম্বন্ধীয় সাম্য যথাসম্ভব রক্ষা করা প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গ—দেশবিভাগের ফলে—ক্ষুদ্রায়তন হইয়াছে; অথচ ঐ কারণেই পূর্ব্ববঙ্গ হইতে এত হিন্দু নরনারী পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে যে, আয়তনের হিসাবে লোকসংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। অবস্থা এমন হইয়াছে যে, আগন্তুকদিগকে, স্থানাভাবহেতু। পুনর্ব্বসতির জন্য মাদ্রাজে এমন কি সুদূর ও দুর্গম আন্দামানেও পাঠাইতে হইতেছে। ফলে বাঙ্গালী জাতির ঐক্য-বন্ধন ছিন্নভিন্ন হইতেছে এবং কেন্দ্রী সরকারের অনেক অর্থের ব্যয় ও অপব্যয় হইতেছে। সেই অর্থে জাতির ও রাষ্ট্রের বহুবিধ উন্নতি-সাধন সম্ভব হইতে পারিত। স্থানাভাব হেতু কেবল অর্থনীতিকই নহে—সামাজিক ও নৈতিক ব্যবস্থাও বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইতেছে এবং তাহার অনিবার্য্য ফলে সমগ্র রাষ্ট্রের উন্নতির গতি অবনতির বাধায় প্রহত হইতেছে। বাঙ্গালীর ও পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি সবই বিপন্ন হইয়াছে ও হইতেছে। এই অস্বাভাবিক অবস্থার প্রতীকারে বিলম্ব হইলে জাতির শক্তি ক্ষুণ্ণ হইবে এবং ফলে জাতির পক্ষে যেমন রাষ্ট্রের পক্ষেও তেমনই, আত্মরক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে। জাতির ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া এই অবস্থার প্রতীকার করা প্রয়োজন।

কলিকাতা বন্দরের গুরুত্ব ও প্রয়োজন অসাধারণ। সেই বন্দরের উন্নতি যাহাতে কোনরূপে ক্ষুণ্ণ না হয়, সে জন্যও পশ্চিমবঙ্গের আয়তন-বৃদ্ধি প্রয়োজন।

বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গকে—তাহার প্রয়োজন হেতুও—না দেওয়া কেবল যে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পাপ তাহাই নহে, তাহার ফলে উভয় প্রদেশে যে অসন্তোষ স্থায়ী হইবে তাহা কোটরস্থিত বহ্নি যেমন বৃক্ষ হইতে সমগ্র বন নষ্ট করে তেমনই সমগ্র ভারতের ঐক্য নষ্ট করিতে পারে। রাষ্ট্রের বিপদ-সম্ভাবনা দূর করিতে হইলে পশ্চিম বঙ্গকে তাহার প্রাপ্য প্রত্যর্পণ করা কর্ত্তব্য। তাহা না করা—বিদ্বেষের পরিচায়ক বলিয়াই বিবেচনা করিতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের যে দাবী উপস্থাপিত করা হইয়াছে, তাহা কি ভাবে স্বীকৃত ও কার্য্যে পরিণত করা হয়, তাহার উপর সমগ্র ভারতের শক্তি ও উন্নতি নির্ভর করিবে এবং দেশের ভবিষ্যৎ কি হইবে তাহা বিবেচিত হইবে।

বাঙ্গালার আয়তন হ্রাস—

বাঙ্গালার আয়তন হ্রাস ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে চলিয়া আসিতেছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত হিসাব দেখিলে বুঝিতে পারা যায় এই সময়ের মধ্যে বাঙ্গালা হইতে ২ লক্ষ ১৭ হাজার ৪ শত ৫৬ বর্গমাইল স্থান বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্যান্য প্রদেশে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রধানতঃ রাজনীতিক কারণে ইহা করা হইলেও সে কারণ অন্যান্য কারণে গোপন করা হইয়াছে।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এক জন ছোটলাটের দ্বারা যে বাঙ্গালা প্রদেশ শাসিত হইত তাহা নিম্নলিখিত অংশে গঠিত ছিল:—

(১) বর্ত্তমান পশ্চিমবঙ্গ
(২) বর্ত্তমান পূর্ব্ব পাকিস্তান (৩০,৭৭৫ বর্গমাইল)
(৩) বিহার
(৪) উড়িষ্যা
(৫) ছোটনাগপুর
(৬) আসাম

প্রথমে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে, রাজনীতিক কারণে, আসাম বিচ্ছিন্ন করা হয়। তাহার পরে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গ আসামের সহিত সংযুক্ত করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ সৃষ্ট হয়। কিন্তু বাঙ্গালীর আন্দোলনফলে যখন বঙ্গ-বিভাগ বাতিল করিতে হয়, তখন পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ সম্মিলিত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বিহার ও উড়িষ্যা বাঙ্গালা হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং মানভূম, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি বঙ্গভাষাভাষী কয়টি অঞ্চল বিহার-সংলগ্ন করা হয়। তাহার পরে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে যে ভাবে দেশ বিভক্ত হয়, তাহাতে পূর্ব্ববঙ্গ পাকিস্তান রাষ্ট্রকে দেওয়ায় বর্ত্তমান পশ্চিম বঙ্গ বাঙ্গালা হইয়া আছে।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার আয়তন ২,৪৮,২৩১ বর্গমাইল ছিল; তখন তাহার লোকসংখ্যা—৬,৬৮,৫৬,৮৫৯। দুই বৎসর পরে শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া—এই তিনটি বঙ্গভাষাভাষী স্থান লইয়া স্বতন্ত্র আসাম প্রদেশ গঠিত হওয়ায় ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের লোকগননাকালে দেখা যায়—বিহার, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর প্রভৃতি লইয়া, বাঙ্গালার আয়তন—১,৮৬,২২২ বর্গমাইল ও তাহার লোকসংখ্যা—৬,৯৫,৩৬,৮৬৯।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বিহারে দুইটি মাত্র "ডিভিশন" ছিল—পাটনা ও ভাগলপুর। তখন মুঙ্গের, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, মালদহ ও সাঁওতাল পরগণা ভাগলপুর "ডিভিশনে" এবং ছোটনাগপুর (হাজারীবাগ, লোহারডগা, সিংহভূম ও মানভূম) বিহার বলিয়া বিবেচিত হইত না।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় আয়তন—১,৮৭,৩৩৬ বর্গমাইল ও লোক-সংখ্যা—৭,৪৬,৪৩,৩৬৩। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার আয়তন প্রায় ঐরূপ। কিন্তু লোকসংখ্যা—৭,৮৪,৯৩,৪১০।

ইহার পরে চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও নোয়াখালী আসাম ভুক্ত করিবার চেষ্টা আন্দোলনফলে ব্যর্থ হয়। কিন্তু ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে (২০শে জুলাই)

বঙ্গবিভাগ ঘোষিত হয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ সৃষ্ট হয়।

তাহার পরে বর্ত্তমান দেশবিভাগফলে, বাঙ্গালার (পশ্চিম বঙ্গের) আয়তন—৩০,৭৭৫৮ বর্গমাইল মাত্র। কেবল তাহাই নহে—ইহার উত্তর ও দক্ষিণ দুই অংশে স্থলপথে যোগ নাই।

ইহার লোকসংখ্যা কিরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

আয়তন হ্রাসের ফলে শাসনের কোনরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছে কি না, তাহাও বিবেচ্য।

ছাত্রদিগের অবস্থা ও ব্যবস্থা—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলার হইয়া ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ছাত্রদিগের অবস্থা ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন। পূর্ব্বে চাকরীর জন্য প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় বাঙ্গালী ছাত্ররা যেরূপ সাফল্য লাভ করিত, এখন কেন সেরূপ পারে না, সে বিষয়ে তিনি ছাত্রদিগের সহিত আলোচনাও করিয়াছেন। সম্প্রতি কতকগুলি ছাত্র লইয়া যে অনুসন্ধান হইয়াছে, তাহার ফল এখনও সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই বটে, কিন্তু জানা গিয়াছে, বহু ছাত্রের গৃহে বা কলেজে কোথাও মনোযোগ-সহকারে অধ্যয়নের সুযোগ নাই। আমাদিগের বিশ্বাস, শতকরা ৬০ জন ছাত্রছাত্রী পরিবারে যে অবস্থায় থাকিতে বাধ্য হয়, তাহাতে তাহাদিগের নির্জ্জন স্থানে পাঠে অখণ্ড মনোযোগ দান সম্ভব নহে। আবার তাহাদিগের মধ্যেই অনেককে "রেশন" আনিতে যাইতে হয় এবং ছাত্র বা ছাত্রী পড়াইয়া অর্থার্জ্জন করিতে হয়। এক দিকে এই অবস্থা—আর একদিকে ধনীর পুত্রকন্যাদিগের বিলাস! কোন কোন ছাত্রীর নাকি প্রসাধন সামগ্রীতে মাসিক শতাধিক টাকা ব্যয় হয়—বেশের কথা বলা বাহুল্য। তাহারা যেমন মোটর গাড়ী ব্যতীত যাতায়াত করে না, তেমনই তাহারা অধিক বেতন দিয়া গৃহে শিক্ষার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করে।

প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় ছাত্রদিগের বাস-ব্যবস্থা লক্ষ্য করিয়া ভ্যালেনটাইন চিরল মনে করিয়াছিলেন, সে ব্যবস্থায় সমাজে অসন্তোষের উদ্ভব ও ব্যাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। এমন কি ছাত্রাবাসে ("মেসে") দাগী দেখিয়া তিনি—দেশের অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞতাহেতু—মন্তব্য করিয়াছিলেন, কোন কোন ক্ষেত্রে ছাত্ররা বারাঙ্গনালয়ের ঘরে বাস করে! তখনও কলেজের ছাত্রাবাস হয় নাই। কেবল "হিন্দু হোষ্টেল" —ছিল। ছাত্ররা যে স্থানে পিতামাতার সহিত বাসের সুযোগ না পাইত অর্থাৎ মফঃস্বল হইতে আসিত সে স্থানে কলিকাতায় আত্মীয়কুটুম্বের গৃহে থাকিত অথবা এক এক দল "মেস" করিয়া তাহাতে বাস করিত। দরিদ্র ছাত্ররা দরিদ্রের মতই "মেসে" থাকিত; কিন্তু ছাত্রাবাসে দারিদ্র্যের পরিবেশ থাকিলেও অধ্যয়নের উপযুক্ত পরিবেশের অভাব ছিল না, বিলাসের পরিবেশ ছিল না। দুর্নীতি যে একেবারে ছিল না এমন নহে। ছাত্রদিগকে দুর্নীতিমুক্ত করিবার জন্য "সোসাইটী ফর দি হায়ার ট্রেনিং অব ইয়ং মেন" (বর্ত্তমান "ইউনিভার্সিটী-ইনষ্টিটিউট") প্রতিষ্ঠায় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ব্যক্তিরা উদ্যোগী হইয়াছিলেন। বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলার-রূপে তাঁহার অভিভাষণে কলিকাতার মত সহরে ছাত্রদিগের প্রলোভনের কারণের উল্লেখ করিয়াছিলেন। তখন ছাত্র ও ছাত্রীরা এক সঙ্গে অধ্যয়ন করিত না। তখন "সিনেমা" ছিল না—রঙ্গালয়ে গমন নিন্দনীয় ছিল—ইত্যাদি।

তখন বিজ্ঞান শিক্ষালাভের সুযোগ অল্পই ছিল। কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজ ও সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ বাদ দিলে আর কোন কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য আবশ্যক যন্ত্রাদি ছিল না বলিলেই হয়। কোন কোন ছাত্র বৌবাজারে মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান সভায় যাইয়া বিজ্ঞান সম্বন্ধে পাঠ লইত—বেতন যৎসামান্য ছিল।

কিন্তু তখন দারিদ্র্য থাকিলেও অধ্যয়নের পরিবেশ ছিল এবং অধ্যাপকদিগের সহিত ছাত্রদিগের ঘনিষ্ঠ ও মধুর সম্বন্ধ ছিল। বোধ হয়, সেই জন্যই তখন ছাত্রদিগের অসাফল্য অল্প ছিল।

ডক্টর ঘোষ দুঃখ করিয়াছেন, ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়কে তাহাদিগেরই প্রতিষ্ঠান মনে করে না। ইহা যে পরিতাপের বিষয় তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

কিছুদিন পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান রাজ্যপাল ছাত্রদিগকে স্বাবলম্বী হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি যে সময়ে বিদ্যালয়ে ছাত্র ছিলেন, সে সময়ে ছাত্রদিগের পক্ষে স্বাবলম্বনের অনুশীলন আদৃত ছিল। আশা করি, সে আদর্শ বর্ত্তমান ছাত্রসমাজে অবজ্ঞাত হয় নাই।

বর্ত্তমান সময়ে দেশে-প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্ত্তন যেমন প্রয়োজন, তেমনই অনিবার্য্য। ইংরেজী ভাষা এখনও আন্তর্জ্জাতিক প্রয়োজনে শিক্ষা করিতে হইবে। ছাত্রছাত্রীর মাতৃভাষা বাঙ্গালা অবশ্য তাহাদিগের শিক্ষার বাহন হইবে। সঙ্গে সঙ্গে যদি আবার সম্পদে দরিদ্র হিন্দী—রাষ্ট্রভাষা বলিয়া—শিক্ষা করিতেই হয়, তবে যে ছাত্রছাত্রীদিগের স্কন্ধে গুরুভার ন্যস্ত করা হইবে, তাহাও বিশেষভাবে বিবেচ্য।

যে অবস্থায় বর্ত্তমানে কলিকাতায় (হয়ত পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য সহরেও) ছাত্রদিগকে শিক্ষা লাভ করিতে হইতেছে, তাহার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। নূতন বিধানে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে "কল্যাণী"তে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত করিলে হয়ত কোন কোন ব্যক্তির মৃতপ্রায় আকাঙ্ক্ষা পুনর্জ্জীবিত হইবে—হয়ত কোন কোন লোকের ভাগ্যোদয়ের পথ রচিত হইবে—কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা সঙ্গত কি না, বিশেষভাবে বিবেচ্য। বর্ত্তমানে কলিকাতায় ছাত্র ও ছাত্রী সকলের অধ্যয়নের প্রতিকূল যে অবস্থা অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, তাহার প্রতীকারকল্পে কি করা যাইতে পারে, আমরা আশা করি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনভার যাঁহারা পাইয়াছেন তাঁহারা বিবেচনা করিবেন।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষকপরীক্ষার্থী—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ইংরেজ সরকারের উত্তরাধিকারসূত্রে যে পরিকল্পনা পাইয়াছিলেন, তদনুসারে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ গঠিত করিয়াছিলেন।

কিন্তু দুই বৎসর অতিবাহিত না হইতেই তাঁহারা আপনাদিগের কার্য্যের ব্যর্থতা অনুভব করিয়া পর্ষদের কার্য্যভার হাইকোর্ট হইতে সদ্য অবসর-গ্রহণকারী শ্রীগোপেন্দ্রনাথ দাসকে দিয়াছেন। এ কার্য্যে তাঁহার অভিজ্ঞতা আছে বলিয়া আমরা জানি না—যোগ্যতা আছে কি না, তাহা বলিবার সময় এখনও হয় নাই। তিনি কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, যখন ইতিহাসের প্রশ্ন পরীক্ষার পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন পরীক্ষার্থীদিগকে পুনরায় পরীক্ষা দিতে হইবে—নহিলে অবিচার হইবে। কিন্তু দুই দিন পরে তিনি আপনার রায় আপনি বাতিল করিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যখন পরীক্ষার পরে বহু পরীক্ষার্থী স্থানান্তরে গিয়াছে, তখন তাহাদিগকে আবার পরীক্ষা দিতে বাধ্য করিলে বহু পরীক্ষার্থীর সম্বন্ধে অবিচার হইবে ; সুতরাং পুনরায় পরীক্ষা গৃহীত হইবে না—যে পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, তাহাতেই কিরূপে যথাসম্ভব অবিচার হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়, তাহা তিনি বিবেচনা করিবেন। কোন্ ছিদ্রপথে বার বার প্রশ্ন প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা কিন্তু ধরা পড়ে নাই। পর্ষদের সদস্যদিগের পক্ষ হইতে কি কৈফিয়ৎ দেওয়া হইয়াছে,তাহার বক্তব্য—সরকার যে তাঁহাদিগকে দোষ দিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত। অবশ্য প্রশ্নপ্রকাশ ব্যাপারে তাঁহাদিগকে দায়ী করা হয়ত অসঙ্গত—কিন্তু বিদ্যালয়কে সাহায্য দানে ও পুস্তক নির্ব্বাচনে যে সকল অভিযোগ সরকার উপস্থাপিত করিয়াছেন, সে সকল খণ্ডিত করিতে হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "বি, টি" পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীরা অনেকে প্রশ্নে আপত্তি করিয়া যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে যে তাঁহাদিগের শিক্ষকের কার্য্যভার প্রাপ্তিতে অযোগ্যতা প্রতিপন্ন হইয়াছেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাঁহারা কেবল যে পরীক্ষাকক্ষ ত্যাগ করিয়াছেন, তাহাই নহে—যাঁহারা পরীক্ষা দিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে ভয় দেখাইয়া বিরত করিয়াছেন, যে ঘরে কয়জন পরীক্ষার্থিনী পরীক্ষা দিতেছিলেন জানালার উপর দিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগের খাতা ছিনাইয়া লইয়াছেন—পরীক্ষার্থিনীর অঙ্গে হস্তক্ষেপও করিয়াছেন! বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট যে দণ্ড ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা দুই বৎসর পরীক্ষা দিতে পারিবেন না। দণ্ডাদেশ প্রচারিত হইবার পরে তাঁহারা অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে প্রকাশ্যে ব্যবহারের জন্য অনুতাপ ব্যক্ত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে দ্বিধানুভব করেন নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকগণ ক্ষমা-প্রার্থনা—দণ্ড হিসাবে যথেষ্ট বিবেচনা করিলেও যে সকল পরীক্ষার্থী—শিক্ষক হইয়াও—চরম উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহারা কি সেই কার্য্যের দ্বারাই প্রতিপন্ন করেন নাই যে, প্রকৃত শিক্ষক হইবার জন্য যে সকল গুণের প্রয়োজন—সে সকল তাঁহাদিগের ধাতুতে নাই? পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই যে তাঁহাদিগের ধাতুগত ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিবে, ইহা মনে করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে কি? শিক্ষক নিয়োগে তাহাও বিবেচনা করা প্রয়োজন।

হোমিওপ্যাথী শিক্ষার কলেজ—

এ দেশে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার প্রসার অল্প নহে; কিন্তু আমেরিকায় এই চিকিৎসা শিক্ষার জন্য যেরূপ প্রতিষ্ঠান আছে, সেরূপ কোন প্রতিষ্ঠান এ দেশে নাই। যখন ডক্টর বেরিনী প্রমুখ ব্যক্তিরা এ দেশে এই চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করেন, তখনই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্র দত্ত প্রভৃতি ইহার প্রতি আকৃষ্ট হ'ন। ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকার যখন এলোপ্যাথী ত্যাগ করিয়া হোমিওপ্যাথী মতে চিকিৎসা আরম্ভ করেন, তখন তাঁহাকে অনেক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সহ্য করিয়া নিজ মত প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছিল। তাহার পরে মোহিনীমোহন বসু, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ব্যক্তিরা ইহার উন্নতি অধ্যয়ন করিবার জন্য আমেরিকায় গিয়াছিলেন। আজ য়ুরোপীয় পদ্ধতিতে সর্ব্বতোভাবে অভিজ্ঞ বহু চিকিৎসক এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করিয়া রোগীকে আরোগ্য করিতেছেন। দুঃখের বিষয়, এ দেশে এখনও ইহার শিক্ষার জন্য সর্ব্বাঙ্গপুষ্ট কলেজ নাই। এখন সেইরূপ একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে। গত ৮ই মে কলিকাতায় তিনটি কলেজের—

প্রতাপ অ্যাণ্ড হেরিং কলেজ

ডি, এন, দে মেডিক্যাল কলেজ

কলিকাতা হোমিওপ্যাথীক মেডিক্যাল কলেজ

—প্রতিনিধিরা এ বিষয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিবের (মিনিষ্টার অব ষ্টেট) সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রস্তাব এই তিনটি কলেজ যদি একযোগে একটি কেন্দ্রী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন, তবে তাহাকে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিবার জন্য অর্থাভাব ঘটিলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অর্থ-সাহায্য দিবেন এবং ভারত সরকারকেও সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করিবেন। প্রতিনিধিরা এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য মনে করিয়াছেন বটে, কিন্তু স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের পরিচালক-সঙ্ঘের বিনা সম্মতিতে সে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন নাই।

আমরা আশা করি, এই প্রস্তাবে কাহারও আপত্তি হইবে না। কারণ, ব্যক্তিগত স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া কেহই কলেজ পরিচালিত করেন না। কেবল তাহাই নহে, সকলেই যেমন হোমিওপ্যাথীর আদর বৃদ্ধি চাহেন, তেমনই আপনাদিগের প্রতিষ্ঠানের দৈন্য পদে পদে অনুভব করিয়া সেই দৈন্য দূর করিতে আগ্রহশীল। কেবল তাহাই নহে, সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত কলেজ হইলে যে সকল ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, সরকার তাহাদিগের যোগ্যতা ও অধিকার স্বীকার করিয়া লইবেন।

প্রস্তাব হইয়াছে, ছাত্রকে ৪ বৎসর ৬ মাস অধ্যয়ন করিতে হইবে এবং সেই সময়ের মধ্যে শরীর তত্ত্ব, চিকিৎসা, অস্ত্র-চিকিৎসা সবই শিক্ষা লাভ করা সম্ভব হইবে।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা-পদ্ধতির কত পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহা আমরা সকলেই লক্ষ্য করিতেছি। সেই উন্নতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিলে এবং গবেষণার সুযোগ না পাইলে চিকিৎসা-পদ্ধতির আবশ্যক উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। সেজন্য যেমন লোকের সহানুভূতি ও সাহায্য প্রয়োজন, তেমনই সরকারের

সহযোগ ও অর্থ-সাহায্য ব্যতীত কাজ সহজসাধ্য হইতে পারে না। প্রস্তাবিত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে আর আমাদিগের ছাত্রছাত্রীদিগকে শিক্ষার্থ বিদেশে যাইতে হইবে না এবং দেশে হোমিওপ্যাথীর আদর ও প্রসার বর্দ্ধিত হইবে।

আমরা আশা করি, লোকমত এই প্রস্তাব সমর্থন করিবে এবং বর্ত্তমান কয়টি কলেজের পরিচালকগণ ইহা সাগ্রহে গ্রহণ করিবেন।

দামোদরের জল-নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা—

দুইটি কথা আছে—"জলে না নামিলে সাঁতার শিখা যায় না"—আর "যে ছেলে সাপ ধরিতে পারে না, তাহার পক্ষে কেউটে সাপ ধরিবার চেষ্টা বিপজ্জনক।" দামোদরের জল-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার মত বিরাট, ব্যয়সাধ্য ও অনিশ্চিত ব্যাপারে কোন্ কথা মনে করা সঙ্গত, সে বিষয়ে মতভেদ আছে ও থাকিবে। তবে ইহা অনায়াসেই বলা যায় যে, যে ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার অভাব অসাধারণ, বিদেশী অনিশ্চিত সাহায্যে নির্ভর করা অনিবার্য্য, ব্যয় বিরাট—তথায় বিশেষ সতর্কতাবলম্বন ও অভিজ্ঞতার্জ্জনে ছোট ছোট কাজ প্রথম করা সঙ্গত। দামোদরের জল-নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টায় সেই আবশ্যক সতর্কতা ও অভিজ্ঞতার্জ্জনের চেষ্টা লক্ষিত হয় নাই। সেই জন্য ভুলভ্রান্তি অনেক হইয়াছে—নক্সা পরিবর্ত্তিত করিতে হওয়ায় বুঝা গিয়াছে ভুল হইয়াছিল (হয়ত ভুল ইচ্ছাকৃত বা স্বার্থ-প্রণোদিত নহে)। সরকারের হস্তক্ষেপ অনেক সময় অযথা বিলম্বের কারণ হইয়াছে।—ইত্যাদি। প্রথম ও বিরাট ভুল, ব্যয়ের যে হিসাব দেখাইয়া কাজ আরম্ভ করা হইয়াছিল, যত দিন গিয়াছে, তত তাহার বহর বাড়িয়াছে। কাজ শেষ হইলে যে উপকার হইবে, তাহা ব্যয়ের অর্থাৎ মূল্যের তুলনায় যথেষ্ট কি না, তাহা বলা দুষ্কর। সেই হিসাবে ভুলের জন্য কেহ দণ্ডিত হইয়াছে কি না, তাহা জানা যায় নাই।

কতকগুলি বিষয়ে বিরুদ্ধ সমালোচনার ফলে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর অনুসন্ধান সমিতি গঠিত হয়। সমিতি অনুসন্ধান করিয়া সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করিতে দীর্ঘ ৯ মাস অতিবাহিত করেন। গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধান-কার্য্যে বিলম্ব যে কার্য্যহানির কারণ তাহা বলা বাহুল্য—১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন সমিতি মন্তব্য দাখিল করেন। গত মে মাসের মধ্য-ভাগের পূর্ব্বে রিপোর্ট লোকসভার সদস্যগণ পাইতে পারেন নাই। এই বিলম্বে ও মধ্যে যে সকল ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহাতে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সভাপতি বীরেন্দ্রকুমার বসুর পাবলিক সার্ভিস কমিশনের রিপোর্টের বিষয় স্বতঃই মনে হয়। মূল রিপোর্ট সরকার পরিবর্ত্তিতরূপে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—তাঁহারা অন্য কোন রিপোর্টের বিষয় অবগত নহেন!

সে যাহাই হউক, মূল রিপোর্ট পেশ হইবার পরেই তাহার কতকগুলি মন্তব্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত ও লোকসভায় আলোচিত হয়—যে সকল মন্তব্য আলোচিত হয়—কোনার বাঁধে বহু অর্থের অপব্যয় সে সকলের অন্যতম। আলোচনার আর একটি বিষয়—প্রধান এঞ্জিনিয়ার নিয়োগে অযথা বিলম্ব এবং সেই জন্য বিরাট ক্ষতি। পার্লামেণ্টে যে সকল কথা বলা হয়, সে সকল রিপোর্টে নির্ভর করিয়া। কিন্তু রিপোর্টের মন্তব্যাদি প্রকাশের পূর্ব্বেই প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা লইয়া সরকার যেরূপ গবেষণা করিয়াছেন, ভুলের মূল সন্ধানে সেরূপ তৎপরতার ও আগ্রহের পরিচয় দিয়াছেন কি?

সরকার স্বীকার করিয়াছেন—প্রধান এঞ্জিনিয়ার নিয়োগে যে বিলম্ব ঘটিয়াছিল, তাহা দুর্ভাগ্যের বিষয়। কিন্তু সেজন্য কে দায়ী তাহা বলা সরকার কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন নাই। অথচ সরকার জনগণের প্রতিনিধিদিগের অধীন।

সরকার রিপোর্ট সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে এমন কথাও বলা হইয়াছে যে, তাঁহারা কমিটীর ৮টি প্রস্তাবের সবই গ্রহণ করিতে পারেন না। সরকারের কমিটীর মন্তব্যগুলির মধ্যে কয়টি নিম্নে প্রদত্ত হইল!—

(১) পরামর্শদাতাদিগের কাহাকেও ঠিকাদার অথবা মজুদ মাল প্রভৃতির পর্য্যবেক্ষক নিযুক্ত করা হইবে না।

(২) দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন কিরূপে গঠিত হইবে সে সম্বন্ধে নিয়ম করা অসঙ্গত হইবে না। সে বিষয়ে যদি নিয়ম করা না হয়, তথাপি সরকারের নির্দ্দেশে তাহা করা যায়।

(৩) কর্পোরেশনের মূল কার্য্যালয় কলিকাতা হইতে যে স্থানে কাজ হইতেছে তথায় স্থানান্তরিত করিতে অযথা বিলম্ব হইয়াছে।

প্রথম দফা বিবেচনা করিলে আতঙ্কিত হইতে হয়। কারণ, ইহাতে মনে করা যায়—পরামর্শদাতাদিগের মধ্যে কোন কোন ভাগ্যবানকে ঠিকাদারী দেওয়া হইয়াছে বা মাল পর্য্যবেক্ষণের ভার দেওয়া হইয়াছে। এই ছিদ্রপথে কত কোটি টাকা বাহির হইয়া যাইতে পারে (হয়ত বা গিয়াছে) তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

অনুসন্ধান কমিটীর রিপোর্ট ও সে সম্বন্ধে সরকারের কমিটীর মন্তব্য পাঠ করিলে বলিতে হয়—সব ঠিক নাই—there is something rotten.

কিন্তু অপব্যয় ও অপচয় ভুলেই হউক আর ইচ্ছাকৃতই হউক—ক্ষতি দরিদ্র দেশের জনগণের। যাঁহারা তাহাদিগের প্রতিনিধি এ ব্যাপারে কি তাঁহাদিগের দায়িত্ব নাই?

সরকার ও দুর্নীতি—

প্রধান মন্ত্রী হইবার পূর্ব্বে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলিয়াছিলেন, তিনি ক্ষমতা থাকিলে "কালো বাজারীদিগকে" প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতেন। কিন্তু ক্ষমতা পাইয়া তাঁহার "বদলে গেল মতটা।" এখন সরকারের যে সকল কর্ম্মচারী দুর্নীতিদুষ্ট, তাঁহাদিগকেও উপযুক্ত দণ্ডদান করা হইতেছে কি? সম্প্রতি যে অডিট রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে তৎকালীন ভারতীয় হাই-কমিশনার বাড়ীর জন্য যে কোম্পানীকে ২ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা অগ্রিম দিয়াছিলেন, সে কোম্পানীর মূলধন—মাত্র ২৭ টাকা। বলা বাহুল্য, বাড়ীও পাওয়া যায় নাই, টাকাও ফেরৎ পাওয়া যায় নাই। অথচ সেই হাই-কমিশনারকে প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় নাই। কেবল তাহাই নহে—ব্যাপারটি সম্বন্ধীয় দলিলপত্র সব পাওয়া যায় নাই। অবশ্য মনে করা অসঙ্গত নহে যে, সে সব নষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছিল।

জীপ গাড়ি ক্রয়ে, সমরসরঞ্জামের ঠিকার যেরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা ইতঃপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি।

সরকারের হিসাব রিপোর্টে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে মাত্র কয়টি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। স্বতঃই সন্দেহ হয়, ব্যবস্থার ত্রুটিতে বা দুর্নীতিদুষ্ট কর্ম্মচারী প্রভৃতির লোভে ভারতের দরিদ্র অধিবাসীদিগের কোটি কোটি টাকা প্রতি বৎসর নষ্ট বা অপহৃত হয়।

লোক-সভা যে টাকা ব্যয়ের জন্য মজুত করেন, সে টাকা যদি যথাযথ রূপে ব্যয়িত না হয়, তবে সে দায়িত্ব কাহার? যে মন্ত্রিমণ্ডল তাহার অপব্যয় নিবারণ করিতে পারেন না, সেই মন্ত্রীমণ্ডলের স্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার কোন অধিকার আছে কি?

দেখা গিয়াছে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে প্রয়োজনে মালগাড়ী প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্য অতিরিক্ত টাকা দেওয়া হয়; কিন্তু চুক্তিতে এমন কোন ব্যবস্থা নাই যে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গাড়ী দিতে না পারিলে সরবরাহকারী কোম্পানীকে সে জন্য দণ্ড দিতে হইবে!

যে সকল বিভাগ উন্নতিকর কার্য্যের ভার পাইয়াছে, সে সকল বিভাগের অভিযোগ—অর্থ বিভাগের বিধি-ব্যবস্থায় অনেক সময় বিলম্বজনিত ক্ষতি হয়। কিন্তু সেই সকল সতর্কতামূলক বিধি-ব্যবস্থা শিথিল হইলে আরও কত অপব্যয় হইত—লোককে কত ক্ষতি স্বীকার করিতে হইত, তাহা বিবেচনা করিলে বলিতে হয়—বিধি-ব্যবস্থার কঠোরতা বর্দ্ধিত করিলেই লাভ হয়।

উত্তর প্রদেশের সরকার যে অনুসন্ধান সমিতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার রিপোর্টে দার্শনিকোচিত ভাবে বলা হইয়াছে দুর্নীতি দূর করিবার উপায়—"to establish and maintain confidence in our own character and purpose......" এ সব বড় কথায় কাজ হয় না। দুর্নীতি দূর করিবার জন্য যে কঠোরতা অবলম্বন করিতে হয়, তাহা করিবার যোগ্যতা বা আগ্রহ সরকার দেখাইতে পারিতেছেন না। এই সরকার যে তাহা পারিতেছেন না, তাহার কারণ কি?

দেখা যাইতেছে, আশ্রিতবাৎসল্য, পোষ্য-পোষণস্পৃহা অনেক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর বা মন্ত্রীর স্থায়নিষ্ঠা নষ্ট করে। যে স্থানে সরকার স্থায়নিষ্ঠা দেখাইতে পারেন না, সে স্থানে সরকার যে দুর্নীতি দূর করিতে পারিবেন না, তাহা বলা বাহুল্য। সুতরাং অবস্থা দাঁড়াইতেছে—"শিরে কৈল সর্পাঘাত, কোথা বাঁধবি তাগা?"

খাদ্যোপকরণ নিয়ন্ত্রণ—

বোম্বাই প্রদেশে খাদ্য-শস্য নিয়ন্ত্রণ ত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে আজও এই অপ্রিয় ব্যবস্থা বহাল রহিল। অথচ জানা যাইতেছে, এ বার চাউলের অভাব নাই এবং ব্রহ্ম হইতে ভারত সরকার অনেক চাউল ক্রয় করিয়া সঞ্চয় করিতেছেন! পশ্চিমবঙ্গ সরকার বৎসরের পর বৎসর বিপুল ব্যয়ে—হিসাবে ক্ষতি দেখাইয়া—যে বিভাগটি বহাল রাখিয়া নানা প্রকারে ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতেছেন, তাহার বিলোপ কি বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘ পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে হইবার কোন আশা লোক করিতে পারে? এখন আবার নূতন কথা উঠিয়াছে, এই বিভাগের বিলোপ হইলে, বহুলোক বেকার হইবে। অথচ এই বিভাগটি যে অস্থায়ী তাহা জানিয়াই যাহারা ইহাতে চাকরী গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা জানিয়াই তাহা করিয়াছিল।—তাহাদিগের চাকরী যে তালপত্রের আশ্রয়ের মত অনিশ্চিত তাহাতে তাহাদিগের সন্দেহের অবকাশ ছিল না। পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য-শস্য-নিয়ন্ত্রণ প্রথার উচ্ছেদ সাধনের জন্য কয় বৎসর লোক আন্দোলন করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু বহুমতের শক্তি লইয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার সে বিষয়ে লোকমত অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছেন ও আসিতেছেন। ইহাই যদি "পপুলার" সরকারের দৃষ্টান্ত হয়, তবে আমলাতন্ত্র বা স্বৈর শাসন কিরূপ? খাদ্য-শস্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে যে নানারূপ দুর্নীতি দেখা দিয়াছে সে সকল সমাজের ও সরকারের পক্ষে কিরূপ অনিষ্টকর তাহাও বিবেচ্য। কিন্তু কে সে বিবেচনা করিবে?

ভেজালের জঞ্জাল—

কয় বৎসর হইতেই ডাক্তাররা লক্ষ্য করিতেছেন, ঔষধ ফলপ্রদ হয় না। জাল ঔষধ বাজারে আসল বলিয়া ব্যবহারই যে ইহার কারণ, তাহা সকলেই জানিতেন। কিন্তু এত দিন পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইহার প্রতীকারে আবশ্যক তৎপরতার পরিচয় দেন নাই। তাঁহারা সহসা যে জাল ধরিতে আগ্রহশীল হইয়াছেন, ইহা আনন্দের বিষয়। কয় দিনেই কলিকাতার নানা স্থানে জাল ঔষধ প্রস্তুত ও রক্ষার অভিযোগে কতকগুলি বাড়ীতে খানাতল্লাস হইয়াছে এবং জাল ঔষধের শিশি প্রভৃতি সরঞ্জামও পাওয়া গিয়াছে। এখন বিচারে কি হয়, তাহাই দেখিবার বিষয়। যাহারা জাল ঔষধ প্রস্তুত করে এবং যাহারা বিনাবিচারে তাহা ঔষধ বলিয়া চালায়, তাহারা মানুষের জীবন-নাশের জন্য দায়ী। তাহাদিগের কঠোর দণ্ড ব্যতীত এই দুর্নীতির অবসান ঘটিবে না। সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য-দ্রব্যে ভেজালের কথা বলিতে হয়। এমন অভিযোগও শুনা যায় যে, সরকারের গুদামে ও রেশন দোকানে চাউলে কাঁকর মিশান হয়—কৃত্রিম দাইল বিক্রয় হয়, আটায় তেঁতুলের বীজের সার মিশান হয়, চিনিতে ভেজাল দেওয়া হয়—সরকারের নির্দ্দিষ্ট দাম দিতে চাহিলে বলা হয়, "চিনি নাই"—এ সকল যে সরকারের কর্ম্মচারীদিগের অজ্ঞাত, এমন মনে করিলে তাঁহাদিগের বুদ্ধিতে ও যোগ্যতায় দোষারোপ করা হয়। জাল খাদ্য খাইয়া লোকের স্বাস্থ্যহানি হইতেছে, জাল ঔষধ রোগীর মৃত্যুর কারণ হইতেছে। এ বিষয়ে সরকারের প্রতীকার-তৎপরতার অভাব নিন্দার বিষয়। আমরা আশা করি, আজ যে প্রতীকার-তৎপরতা দেখা যাইতেছে, তাহা ত্যক্ত হইবে না এবং আইনের ছিদ্রপথে অপরাধীরা নিষ্কৃতিলাভের সুবিধা পাইবে না।

হিন্দুমহাসভা—

হায়দ্রাবাদে হিন্দুমহাসভার অধিবেশনে সভাপতি শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হিন্দু মাত্রকেই "শুদ্ধি" সম্বন্ধে মনোযোগী হইতে আহ্বান করিয়াছেন। তিনি বলেন, ভারতীয় সংবিধানে অধিবাসীদিগকে নিজ ধর্ম্মমত প্রচারের যে অধিকার প্রদান করা হইয়াছে, তাহা বিদেশীদিগের জন্য নহে—ভারতীয় মাত্রেরই সেই অধিকার আছে। দেখা যাইতেছে, এখনও খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকরা বহু অজ্ঞ ব্যক্তিকে নানা উপায়ে ধর্ম্মান্তরিত

করিতেছেন। রাজনীতিক্ষেত্রে পাকিস্তানকে আমেরিকার সাহায্য প্রদান এবং তুরস্কের সহিত পাকিস্তানের যুক্তি—এ সকলও বিবেচনা করিতেই হইবে। সকলেই জানেন, কাশ্মীরের হিন্দু অধিবাসীরা মুসলমান শাসকগণ কর্ত্তৃক ভীতিপ্রদর্শনের ফলে ধর্ম্মান্তরিত হইয়াছিল। কাশ্মীরে হিন্দু রাজা গোলাব সিংহের অধিকার প্রতিষ্ঠার পরে বহু ধর্ম্মান্তরিত মুসলমান হিন্দু সমাজে প্রত্যাবর্ত্তনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে "পণ্ডিতগণ" তাহাতে আপত্তি করায় কাশ্মীরে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকিয়া গিয়াছে।

এখনও খৃষ্টানরা ও মুসলমানরা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে অবাধে নিজ নিজ ধর্ম্মমতে দীক্ষিত করিতেছেন। হিন্দুর পক্ষে সেই অধিকার প্রযুক্ত করিতে কোন বাধা নাই—হিন্দুমহাসভা তাহাই সুপ্রযুক্ত করিবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন।

নির্ম্মলচন্দ্র হায়দ্রাবাদকে ভাষার ভিত্তিতে বিভক্ত করিবার প্রস্তাবও সমর্থন করিয়াছেন। সে প্রস্তাবের প্রয়োজন অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

পৌরপ্রতিষ্ঠান বাতিল—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার দীর্ঘকাল কলিকাতা কর্পোরেশন বাতিল করিয়া—নূতন আইনে সরকারের প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া অর্থাৎ স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের মূল নীতি ক্ষুণ্ণ করিয়া—তাহা আবার চালু করিয়াছেন। তাহার পরে কলিকাতা কর্পোরেশনের পরেই যে পৌর প্রতিষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সেই হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীও, সরকার ভার লইয়া পরিচালিত করিতেছেন। তাহার পরে একাধিক মিউনিসিপ্যালিটীর ভারও সরকার লইয়াছেন। অভিযোগ বা অছিলা—অব্যবস্থার ও দুর্নীতির। অথচ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মূল নীতি—প্রতিষ্ঠান ভুল করিলেও, বিশেষ কারণ ব্যতীত, সরকার তাহার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না; তাহারা ভুল করিয়া শিক্ষালাভ করিবে। সকল পৌরপ্রতিষ্ঠানেরই অর্থাভাব। বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা অনিবার্য্য এবং সরকারের পক্ষে ঘাটতী বাজেট যদি গৌরবজনক হয়, তবে পৌর-প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সে নিয়মের ব্যতিক্রম কি—

"আপনার বেলা লীলাখেলা,
পাপ লিখেছ পরের বেলা"

নহে? হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীতে কংগ্রেসী দলের প্রাধান্য দূর হইবার পরে—তাহার সভাপতিকে ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি করিয়া সরকার যে মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সমালোচনার বিষয় হইয়াছে। তথায় কংগ্রেসী প্রাধান্যের অবসানের পরে কি অবস্থার অধিক অবনতি ঘটিয়াছে? হাওড়ার পৌরপ্রতিষ্ঠান বাতিল করার সহিত রাজনীতির সম্বন্ধ থাকিতে পারে, এ কথা 'ষ্টেটস্‌ম্যান'ও মনে করিয়াছেন। যে সরকার এত দিনে জাল ঔষধ ব্যবহার ও খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দূর করিতে পারেন নাই, সেই সরকারের পক্ষে মিউনিসিপ্যালিটীর দুর্নীতিতে অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ কিরূপ মনে হয়? কলিকাতা কর্পোরেশন এখন যে ভাবে প্রদেশ কংগ্রেস সমিতির নির্দ্দেশে প্রভাবিত তাহাতে তাহার স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন কতটুকু বিদ্যমান, তাহা বলা দুষ্কর। যাহাকে "রুট মেজরিটী" বলা হয়, তাহাই তথায় কাজ করিতেছে। এমন কি কংগ্রেসের অধিবেশন-কালে "কল্যাণীর" জন্য কাউনসিলারদিগকে না জানাইয়া কর্পোরেশনের রোলারও প্রেরিত হইয়াছিল। সে বিষয়ে প্রশ্ন হইলে উত্তর দিতে সরল পন্থা অবলম্বিত হয় নাই।

পশ্চিমবঙ্গের সকল পৌরপ্রতিষ্ঠানকে একে একে যদি সরকার অধিকার করেন, তবে হয়ত নির্ব্বাচনে দল বিশেষের সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে লোকের অধিকার কি নষ্ট করা হইবে না?

যে ভাবে পশ্চাতের দ্বারপথে ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচনে পরাভূত ব্যক্তিদিগকে আদর করা হইয়াছে, পৌরপ্রতিষ্ঠান বাতিল করা কি সেই মনোভাবের পরিচায়ক।

কিন্তু তাহাতে দেশের প্রকৃত কল্যাণ হইবে কি না—গণতন্ত্রের স্থানে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে কি না, তাহা কে বলিবে?

কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট—

এবার কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট (ইংরেজের আমলের সিভিল সার্ভেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীন) ঘাটতী বাজেট পেশ করিয়া—পোর্টের প্রাপ্য শুল্ক পরিমাণ বর্দ্ধিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহাতে ব্যবসার ক্ষতি হইবে এবং লোককে অধিক শুল্ক দিতে হইবে। কিন্তু ট্রাষ্ট নানারূপ অভিযোগ তদন্ত করিবার জন্য যাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন (এঞ্জিনিয়ার জে, এন, দাশগুপ্ত) তিনি ১৯৫০-৫১ খৃষ্টাব্দে যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন, তাহাতে মনে হয়, পোর্ট ট্রাষ্টের জমী বিলির ব্যাপারে ট্রাষ্টের লক্ষ লক্ষ (হয়ত বা কোটি কোটি) টাকা ক্ষতি হইয়াছে। তিনি দেখাইয়াছেন, মাসিক ব্যবস্থায় বিলি করা জমীর উপর পাঁচতলা পাকাবাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে—এক জন বড় কর্ম্মচারী তাঁহার চাকরীর কথা প্রকাশ না করিয়া যে দামে ট্রাষ্টের জমী কিনিয়াছেন, তাহাতে লোক স্তম্ভিত না হইয়া পারে না। দাশগুপ্ত মহাশয়ের রিপোর্ট ধরিয়া কাজ করিলে—ট্রাষ্টের বাজেটে অনেক বাড়তী হইত; কিন্তু হয়ত বহু কর্ম্মচারীকে দুর্নীতির জন্য মামলা সোপর্দ্দ হইতে হইত। আমরা সেই রিপোর্টের প্রতি ভারত সরকারের মনোযোগ আকৃষ্ট করিতেছি। ভারত সরকার সেই রিপোর্টে বিবৃত ব্যাপারের প্রতীকার করিলে প্রাপ্য শুল্ক বাড়াইবার কোনই কারণ থাকিবে না। এই ব্যবসা মন্দার দিনে প্রাপ্য শুল্ক বর্দ্ধিত করা আমরা যেমন অসঙ্গত মনে করি, তেমনই বিবেচনা করি, যদি নির্ম্মমভাবে দুর্নীতি দূর করা না হয়, তবে ট্রাষ্টের ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল না হইয়া নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্নই হইবে। এ বিষয়ে ভারত সরকার কি করিবেন?

এবার কাশ্মীর—

এ বার পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিব কাশ্মীরে গিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়জন উপ-সচিব প্রভৃতির তথায় গমন হইয়াছে। শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর পরে—সেই মৃত্যুর রহস্য ভেদ না হওয়ায়—বিশ্বাসঘাতক শেখ আবদুল্লা

"আপনি আসিয়া ওয়াকিবহাল হউন" বলিয়া ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়কেই আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। চক্ষু চিকিৎসার জন্য তখন বিধানবাবু য়ুরোপ যাত্রা করিতেছেন। সেই জন্য তিনি বলিয়াছিলেন, নথীপত্র সব যেন ঠিক থাকে, তিনি য়ুরোপ হইতে ফিরিয়া সে আমন্ত্রণে কাশ্মীরে যাইবেন। এতদিনে তাঁহার কাশ্মীরে গমন হইল। কিন্তু হায়!—আজ আবদুল্লা কোথায়? আবদুল্লার সহিত বিধানবাবুর সাক্ষাৎ হইবে কি? এখনও কি শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু ব্যাপারে তাঁহার সন্দেহের কারণ হয় নাই? শ্যামাপ্রসাদকে কাশ্মীরে আটক করায় প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলালের কোন দায়িত্ব ছিল কি না, সে সম্বন্ধে কি বিধানবাবু কোন কথা বলিবেন?

সর্ব্বোপরি কথা, যে কাশ্মীরে বিধানবাবু গিয়াছেন তাহা কোন্ কাশ্মীর? তাহা কি কেবল কাশ্মীর উপত্যকা, লাডক ও জম্মু মাত্র নহে? কাশ্মীর রাজ্যের অবশিষ্ট যে অংশ পণ্ডিত জওহরলালের যুদ্ধ-বিরতির আদেশে এখন পাকিস্তানের হস্তগত (হয়ত বা আমেরিকার ব্যবহার্য্য হইবে) তাহার সম্বন্ধে কি ভারতের দাবী জাতি-সঙ্ঘকে উপহাররূপে প্রদান করা হইল?

কুচবিহারের তদন্ত—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কুচবিহারে গুলী চালনার তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশিত করেন নাই। কোন বা কোন কোন ব্যক্তির ত্রুটি বা অপরাধ প্রকাশে অনিচ্ছাই যে তাহার কারণ, এমন কথা না বলিলেও বলা যায়—কমিটীর রিপোর্ট গোপন করায় লোকমত অবজ্ঞা করা হইয়াছে। সংপ্রতি কুচবিহারে সভাপণ্ড হওয়ায় সেই কথা আবার উঠিয়াছে। সভায় অষ্টবজ্র সম্মিলনের কথা পূর্ব্বাহ্ণে ঘোষিত হইয়াছিল, প্রদেশ কংগ্রেস সমিতির সভাপতি স্বয়ং, সচিব খগেন্দ্র দাশ গুপ্ত, শ্যামাপদ বর্ম্মন, সত্যেন্দ্রকুমার বসু, উপসচিব সতীশচন্দ্র রায় সিংহ প্রভৃতির সভায় উপস্থিত থাকিবার কথা ছিল। কিন্তু উপস্থিত জনগণের তদন্ত কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশের দাবীতে যে অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহাতে সভা করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। ইতঃপূর্ব্বে চন্দননগরে অনুরূপ অবস্থায় সভা বন্ধ করিতে হইয়াছিল। জনমত অবজ্ঞা করা অসঙ্গত।

বৈদেশিকী

পূর্ব্ব পাকিস্তান—

ইংরেজ কবি লিখিয়াছেন, সত্য অনেক সময় উপন্যাস অপেক্ষাও বিস্ময়কর। তেমনই পূর্ব্ববঙ্গ যে আমাদিগের পক্ষে বিদেশ—ভিন্ন রাষ্ট্র তাহা মনে করিতে দুঃখ হইলেও সত্য। লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের কৌশলে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রমুখ ব্যক্তিরা সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে দেশ বিভাগে সম্মত হইবার পরে পূর্ব্ববঙ্গ পাকিস্তানের প্রধান অংশে পরিণত হইয়াছে এবং তদবধি ভারত রাষ্ট্রের সহিত পাকিস্তানের সম্বন্ধ যে মধুরই রহিয়াছে, তাহা নহে। উভয় রাষ্ট্রে বিভেদের অন্যতম প্রধান কারণ—ভারত রাষ্ট্র ধর্ম্মনিরপেক্ষ, পাকিস্তান ইসলামিক। পূর্ব্ব-পাকিস্তানে যে কিছুদিন হইতে জনগণের অসন্তোষ বর্দ্ধিত হইতেছিল, তাহার প্রমাণ মধ্যে মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল। অসন্তোষের প্রধান কারণ, দারিদ্র্য, অবাঙ্গালী মুসলমানদিগের প্রাধান্য, বাঙ্গালা ভাষা (অর্থাৎ বাঙ্গালী মুসলমানদিগের মাতৃভাষা) অবজ্ঞা করিয়া উর্দ্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সঙ্কল্প। সঞ্চিত অসন্তোষের প্রথম প্রবল প্রকাশ—মুসলমান তরুণতরুণীদিগের বাঙ্গালাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য আন্দোলন এবং সেই আলোলনে কয়জন আন্দোলনকারীর আহত হইয়া মৃত্যু। পাকিস্তানের কেন্দ্রী সরকার আন্দোলন দমনে রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেও তাহার শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করিবার মত রাজনীতিক বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেন নাই। ফল—নির্ব্বাচনে ক্ষমতাসম্ভোগকারী মসলেম লীগ দলের শোচনীয় পরাজয়। বাধ্য হইয়া পাকিস্তানের কেন্দ্রী সরকার বিরোধীদলের নায়ক ফজলুল হককে সচিবসঙ্ঘ গঠিত করিবার ভার দিলেন, কিন্তু আহত ব্যাঘ্র যেমন প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য আগ্রহশীল হয় তেমনই হইলেন। মসলেম লীগের সমর্থক সংবাদপত্রে মন্তব্য করা হইতে থাকে—হিন্দুরা, কম্যুনিষ্টদল ও ফজলুল হক—পাকিস্তানের শত্রু—এই ত্র্যহস্পর্শে এই ব্যাপার ঘটিয়াছে—এই তিন শত্রু পাকিস্তানের ধ্বংস কামনা করে।

ফজলুল হক নির্ব্বাচন শেষ হইলে পাকিস্তানের রাজধানী করাচীতে গিয়াছিলেন—ঢাকায় ফিরিয়া আসিবার পরে কলিকাতায় কয়দিনের জন্য আসেন। পূর্ব্ব পাকিস্তানে কিন্তু শান্তির বিরোধী অবস্থা সৃষ্ট হইতেছিল। এক দিকে নির্ব্বাচনে বিজয়ী বাঙ্গালী মুসলমান সম্প্রদায়—সংখ্যায় গরিষ্ঠ, কিন্তু উচ্চপদে অপ্রতিষ্ঠিত; আর এক দিকে মসলেম লীগের পরাভবে অপমানিত ও স্বার্থনাশ-সম্ভাবনায় আতঙ্কিত অবাঙ্গালী মুসলমানদল—সংখ্যায় অল্প, কিন্তু ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত। শেষোক্ত দলে কলিকাতার পুলিসের দোহা ও মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়াজ মহম্মদ খাঁন ছিলেন। প্রথমে চট্টগ্রাম অঞ্চলে কাগজের কলে হাঙ্গামা দেখা দিল—মূলে ছিল বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী বিরোধ। সে হাঙ্গামা তত প্রবল হইতে পায় নাই বটে, কিন্তু ফজলুল হকের অনুপস্থিতিতে নারায়ণগঞ্জে আদমজী পাট কলে যে হাঙ্গামা হইল তাহাতে যে ৫ শতেরও অধিক লোক—বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী মুসলমান—নিহত ও গৃহ বহু গ্রাম ভস্মীভূত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কলিকাতা হইতে ঢাকায় যাইয়াই ফজলুল হক ঘোষণা করিলেন, তিনি স্বয়ং ঘটনা সম্বন্ধে আবশ্যক অনুসন্ধান করিবেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালী মুসলমানরা সেই প্রতিশ্রুতিতে সন্তুষ্ট হইল; সংখ্যালঘিষ্ঠ অবাঙ্গালী মুসলমানরা শঙ্কিত হইল; হয়ত বা যাহারা হাঙ্গামা বাধাইয়াছিল, তাহারা আতঙ্কিত হইল এবং হয়ত তাহাদিগের মধ্যে কোন কোন সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন।

নির্ব্বাচনকালে ফজলুল হককে কুখ্যাত শহিদ সুরাবর্দীর সহযোগিতা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সুরাবর্দ্দী তখন করাচীতে—হাসপাতালে।

আমাদিগের বিশ্বাস, ফজলুল হক পূর্ব্ববঙ্গে যেরূপ জনপ্রিয় তাহাতে তিনি শান্তি স্থাপিত করিতে পারিতেন। সে চেষ্টাও তিনি করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে সে সুবিধা দেওয়া হইল না। তিনি পাকিস্তানের কেন্দ্রী সরকার কর্তৃক করাচী যাইতে আদিষ্ট হইয়া তথায় গমন করিলেন। তথায় মসলেম লীগ-সমর্থক সংবাদপত্রগুলিতে তাঁহার সম্বন্ধে বিষোদ্গার হইতে লাগিল এবং আমেরিকার সংবাদপত্রে তাহার সমর্থন হইল—এমন কি কলিকাতার ইংরেজ সমাজের মুখপত্রেও "ধরি মাছ না ছুঁই পানি" হিসাবে যাহা লিখিত হইতে লাগিল, তাহাতে ফজলুল হক সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব হয়ত ছিল। পাকিস্তান যে আমেরিকার সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে জওহরলালের অবিমৃশ্যকারিতায় কাশ্মীর রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন অংশে—গিলগিটে আমেরিকার ঘাঁটী হইবে এমন সম্ভাবনা ছিল। ফজলুল হক যে দলের নেতা সে দল ঐ চুক্তির বিরোধী—তাঁহারা মনে করিয়াছেন, ঐ চুক্তিতে পাকিস্তান "বিদেশীর পদে জীবন খোঁয়াবে।" কাজেই সে দলের প্রতি আমেরিকার বিদ্বেষ স্বাভাবিক। কিন্তু আমেরিকা প্রবলপক্ষ।

করাচী হইতে সংবাদ পাওয়া যাইতে লাগিল, মহম্মদ আলীর সহিত ফজলুল হকের আলোচনায় উত্তেজনার উদ্ভব হইয়াছে।

ফজলুল হক কলিকাতার পথে ঢাকায় ফিরিলেন। তাঁহার সচিবসঙ্ঘ বাতিল করিয়া পূর্ব্ব পাকিস্তানে গভর্ণরের শাসন প্রবর্ত্তিত হইল এবং গভর্ণর-পরিবর্ত্তন হইল। ফজলুল হক স্বগৃহে সশস্ত্র প্রহরীদিগের দ্বারা বেষ্টিত—বন্দী হইয়া রহিলেন। পাকিস্তান সরকারের পক্ষীয়গণ বলেন, পাছে কেহ তাঁহাকে আক্রমণ করে সেই জন্য সরকার তাঁহাকে সুরক্ষিত রাখিয়াছেন। কিন্তু এমন মনে করিবার কারণও থাকিতে পারে যে, তাঁহার নেতৃত্বে জনগণ গণতন্ত্রবিরোধী গভর্ণরী শাসনের বিরুদ্ধে উত্থিত হইলে সরকারকে পরাভব মানিতে হইবে, এই ভয়েই তাঁহাকে প্রকারান্তরে আটক রাখা হইয়াছে।

পূর্ব্ব পাকিস্তানে ধরপাকড় চলিতেছে—ছয় শতাধিক লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে—বড় বড় সহরে সৈনিকরা টহল দিয়া লোকের মনে ভীতি উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছে—তাহাদিগের মধ্যে নাকি আমেরিকানও আছে; বড় বড় গ্রামেও পুলিসবাহিনী মোতায়েন করা হইয়াছে। যাঁহারা পূর্ব্ব পাকিস্তানে বাঙ্গালা রাষ্ট্রভাষা রাখিবার জন্য নিহত হইয়াছিলেন, ফজলুল হকের সচিবসঙ্ঘ তাঁহাদিগের জন্য "সহিদ দিবস" উদ্‌যাপনের নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। গভর্ণর সে নির্দ্দেশ নাকচ করিয়াছেন। গভর্ণর শান্তি রক্ষার জন্য প্রতিবেশী প্রদেশ পশ্চিম-বঙ্গকে ও আসামকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু পাকিস্তানে লোককে সতর্ক করিবার জন্য হুঙ্কার করা হইতেছে। পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে প্রেরিত সংবাদ পরীক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। কিন্তু জানা গিয়াছে—তথায় যে ভাব লক্ষিত হইতেছে, তাহা কালবৈশাখীর পূর্ব্ববর্ত্তী শুদ্ধ ভাব। ঢাকা সহরে কয়দিনব্যাপী হরতাল। গভর্ণরী শাসনে মেদিনীপুরের নিয়াজ মহম্মদ খাঁনকে প্রধান সেক্রেটারী করা হইয়াছে। হিন্দুরা নিরপেক্ষতা পালন করিতেছেন বটে, কিন্তু হিন্দুরাও গ্রেপ্তার হইতেছেন। বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী উভয় সম্প্রদায়ে সম্বন্ধ অপ্রীতিদ্যোতক।

ফজলুল হক কলিকাতায় আসিয়া যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে মনে হইয়াছিল, তিনি সেই সকল কথাকার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ পাইলে উভয় বঙ্গে সম্প্রীতি স্থাপিত হইতে পারিবে এবং তাহার ফলে উভয় বঙ্গই উপকৃত হইত। হিন্দুর পক্ষে সসম্মানে পূর্ব্ববঙ্গে বাস সম্ভব হইবে, এমন আশারও অবকাশ ঘটিতে পারিত।

পূর্ব্ববঙ্গে গভর্ণরের শাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ায় গণতন্ত্রবিরোধিতা করা হইয়াছে, এই মত অনেকে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু পাকিস্তানের কেন্দ্রী সরকার সে বিষয়ে কর্ণপাত করেন নাই। মনে হয়, পূর্ব্ববঙ্গে কেন্দ্রী সরকারের সহিত জনমতের সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য্য। সে সঙ্ঘর্ষ কিরূপে আত্ম-প্রকাশ করিবে এবং তাহার ফল কি হইবে, তাহাই এখন লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ফজলুল হক গণতন্ত্রের নীতির উপর দণ্ডায়মান হইয়া পূর্ব্ববঙ্গের যে স্বাধীনতা চাহিয়াছিলেন, তাহা অসঙ্গত বলা যায় না। পাকিস্তানের প্রধান অংশ হিসাবে পূর্ব্বপাকিস্তান অবশ্যই তাহা দাবী করিতে পারে। সামরিক শক্তি কেন্দ্রের হস্তগত। সেই শক্তি প্রযুক্ত করিয়া পাকিস্তানের কেন্দ্রী সরকার হয়ত কিছুকাল পূর্ব্বপাকিস্তানকে যথেচ্ছা ব্যবহার সহ্য করাইতে পারেন, কিন্তু—আমেরিকা সে কাজে কেন্দ্রী সরকারকে সাহায্য করিলেও—লোকমত দলিত করিয়া দীর্ঘকাল কাজ করা সম্ভব নহে।

পশ্চিমবঙ্গ পূর্ব্বপাকিস্তানের সংবাদ লাভের ও নূতন অবস্থার পরিণতি দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে। সেই পরিণতির সহিত পশ্চিমবঙ্গের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ এবং তাহার উপর পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিবে।

নেপালে ভারতবিদ্বেষ—

গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ভারতের লোক সভার কয় জন সদস্য সম্প্রীতি সংস্থাপনের জন্য নেপালে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের তথায় গমন নেপালের কোন কোন দল বিদেশীর নেপালী ব্যাপারে হস্তক্ষেপের সূচনা বলিয়া ঘোষণা করেন এবং তাঁহারা বিমান ঘাঁটীতে উপনীত হইলে তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করা হয়—ইষ্টক-নিক্ষেপ হয়। নেপালী পুলিস কাঁদুনে গ্যাস ছাড়িয়া ও লাঠি চার্জ্জ করিয়া জনতাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করে। কয় জন লোক আহত হয়। ভারতীয় দলের দলপতি শ্রীরাধারমণ এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন—তাঁহারা কোন রাজনীতিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত নহেন; কৌতুহল পরিতৃপ্তি ও তীর্থদর্শনের প্ররোচনায় নেপালে গিয়াছিলেন। নেপালের সহিত ভারতের নানারূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বলেন, নেপালের উন্নতিতে ভারতের উন্নতি। বহু নেপালী তরুণ ও তরুণী বিক্ষোভ প্রকাশ জন্য পূর্ব্বাহ্ণেই বিমান ঘাঁটীতে সমবেত হইয়াছিল; কয় দিন ছাত্ররা লোককে বিক্ষোভ প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়া প্রচারকার্য্য পরিচালিত করিয়াছিল। নেপালী কংগ্রেস এই ব্যাপারে দায়িত্ব অস্বীকার করিয়াছেন।

ঘটনাটি সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা ভারতে হয় নাই; ভারত

সরকার এ বিষয়ে নেপাল সরকারের সহিত কোনরূপ আলোচনা করিয়াছেন কি না, তাহাও প্রকাশ নাই। ইহার প্রতিক্রিয়া নেপাল সরকারে ও ভারত সরকারে কিরূপ হইয়াছে, তাহাও জানিবার বিষয়।

যে সময় নেপালের সহিত ভারতের দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দৃঢ়তর করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে ও চেষ্টা হইতেছে, সেই সময় নেপালের এক সম্প্রদায়ের এইরূপ সন্দেহদ্যোতক মনোভাব যে দুঃখের বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। আরম্ভেই এই মনোভাব, যুক্তির দ্বারা, দূর করা আমরা প্রয়োজন মনে করি।

আয়র্লণ্ডে নির্ব্বাচন—

আয়ারের (অর্থাৎ আয়র্লণ্ডের যে অংশ বৃটিশ কমনওয়েলথে নাই সেই অংশের) প্রতিনিধি সভায় সদস্য নির্ব্বাচনে ডি ভ্যালেরার, "ফায়েনা ফেল" দলের প্রার্থীরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ভোট পাইয়াছেন বটে, কিন্তু "ফাইন গেল", শ্রমিক, কৃষক ও গণতন্ত্র—সকল দল একযোগে কাজ করিতে সম্মত হওয়ায় এবং স্বতন্ত্র ভাবে নির্ব্বাচিত কয় জন সদস্যও তাঁহাদিগের সহিত যোগদান করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করায়, সম্মিলিত দলের সদস্য-সংখ্যাই অধিক হইয়াছে। সে দলের দলপতি জন কষ্টেলো পূর্ব্বে একবার (১৯৪৮ হইতে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) প্রতিনিধি সভার নেতা ছিলেন। সেই কয় বৎসর বাদ দিলে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ হইতে এ পর্য্যন্ত ডি ভ্যালেরাই নেতৃত্ব করিয়া আসিয়াছেন। আয়ারে কম্যুনিজমের প্রভাব নাই এবং তাহার অধিবাসীরা এখনও রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মপ্রচারকদিগের প্রভাবাধীন। সেইজন্যই স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় যে ব্যবস্থা ধর্ম্মযাজকদিগের দ্বারা সমর্থিত হয় নাই তাহার কারণেই এক বার মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়াছিল। কর হ্রাসের প্রশ্ন আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু কর হ্রাসে যে জনগণের উন্নতিকর কার্য্য পরিচালন ক্ষুণ্ণ হইবে, তাহাও বিশেষ বিবেচ্য। আয়র্লণ্ডের যে অংশ এখনও বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত তাহা আয়ারের (স্বাধীন অংশের) সহিত মিলিত করিবার ইচ্ছাও ক্রমে আগ্রহে পরিণত হইতেছে। তাহার প্রধান কারণ, আয়ার স্বাধীনতা লাভের ফলে বৃটিশ শাসনের অনাচারের অবসান করিয়াছে এবং বৃটিশের সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মনোভাবের তীব্রতা হ্রাস পাইয়াছে। ইহা শুভ লক্ষণ—সন্দেহ নাই।

ভারতে বিদেশীর অধিকৃত অংশ—

ভারতে ফরাসী ও অন্য বিদেশী অধিকৃত অংশগুলিতে যে বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে, তাহা নিবৃত্ত করিবার জন্য বাহুবল প্রযুক্ত হইতেছে। কিন্তু তাহা নিবৃত্ত করিবার উপায়—বাহুবল নহে, সহানুভূতি। বাঙ্গালার চন্দননগর যে দীর্ঘকাল ফরাসীদিগের অধিকারে ছিল, তাহার কারণ, ইংরেজ শাসনে যে সকল অধিকার ভারতীয় নাগরিকগণ পাইত না তাহার কতকগুলি "সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার" নীতি-হেতু চন্দননগরে অধিবাসীরা পাইত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে চন্দননগর হইতে বাঙ্গালীরা ফরাসী সেনাদলে যোগদানের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন—ইংরেজ-শাসিত বাঙ্গালার লোক সে অধিকার পায় নাই। দেশ স্বায়ত্ত-শাসন লাভের পরে, পরিবর্ত্তিত অবস্থায়, অধিবাসীরা আর বিদেশীর শাসন সহ্য করিতে প্রস্তুত নহে। সেইজন্য পণ্ডিচেরীতে যে গণ-আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা ব্যাপ্তি-লাভই করিতেছে। গোয়ায়ও আন্দোলন চলিতেছে। জনমত উপেক্ষা করিয়া কোন শক্তি দীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করিতে পারে না। ভারতে যে সকল স্থান এখনও ফরাসীদিগের অধিকারে আছে, সে সকল সম্বন্ধে ফ্রান্সের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিরা আলোচনা করিতেছেন, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। এ দিকে ভারতে গ্রামের পর গ্রাম ফ্রান্সের অধিকার অস্বীকার করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেছে—সেজন্য অকাতরে ত্যাগ স্বীকার করিতেছে। আন্তর্জ্জাতিক জটিলতা সৃষ্টির আশঙ্কায় ভারত সরকার সেগুলিকে সরাসরি ভারতভুক্ত করিতে পারিতেছেন না বটে, কিন্তু ভারতের প্রধান মন্ত্রী গর্জ্জনের ত্রুটি করিতেছেন না। আমরা আশা করি, উভয় পক্ষের চেষ্টায় এ বিষয়ে সুমীমাংসা হইবে।

ইন্দো-চীন—

কলম্বো সহরে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার দেশসমূহের প্রধানমন্ত্রীদিগের যে সম্মিলন হইয়াছিল, তাহাতে ইন্দো-চীনের অবস্থায় উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া সমস্যা সমাধানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করা হইলেও সদিচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তাহার পরে দিয়েন-বিয়েন ফু দুর্গের পতন হইয়াছে। ফ্রান্সের সমরনায়কদিগের বিশ্বাস ছিল, দুর্গ এত সুরক্ষিত এবং ভিয়েত মিন সমর-সজ্জা এত তুচ্ছ যে, ভিয়েত মিন দ্বারা কখন ঐ দুর্গ গৃহীত হইতে পারিবে না। কিন্তু প্রতিপক্ষকে দুর্ব্বল মনে করার বিপদ এ ক্ষেত্রে প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই দুর্গের পতনেই হয়ত ইন্দো-চীনে ফ্রান্সের অধিকার নষ্ট হইবে না; কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, ইহাতে ফরাসী সেনাবলে যেমন হতাশার সঞ্চার অনিবার্য্য, ভিয়েত মিনের পক্ষে তেমনই টংকিং বদ্বীপ অঞ্চলে অধিকার দৃঢ় করা সম্ভব। আর একটি কথা—যে সকল ভিয়েতনামী নিরপেক্ষ থাকিয়া কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিবে, ভাবিতেছিল, তাহাদিগের সাহায্য, সহযোগ ও সহানুভূতি মূল্যবান এবং তাহা এ বার বিজয়ীপক্ষের লভ্য হইবার সম্ভাবনাই প্রবল।

ভিয়েৎমিন কোথা হইতে সমর সরঞ্জাম লাভ করিল, তাহা এখন ফ্রান্সের চিন্তার বিষয় হইয়াছে এবং ফরাসী সমরনায়কগণ মনে করিতেছেন—স্বাধীন চীন নিশ্চয়ই ঐ সকল যোগাইয়াছে। হয়ত এই সন্দেহে চীনের বিপদ ঘটিতে পারে এবং তাহা ঘটিলে আন্তর্জ্জাতিক জটিলতা ঘটিতে পারে। সন্দেহ যে স্থানে (সকারণই হউক বা অকারণই হউক) প্রবল হয়, তথায় আশঙ্কার কারণ থাকে—

"যা'র নদীর কূলে বাস,
তা'র ভাবনা বার মাস।"

সেই আশঙ্কাই শান্তির অন্তরায়।

সিংহলে ভারতীয়—

সিংহলে ভারতীয়-বিতাড়ন চেষ্টা যেন আরও উগ্র হইয়াছে। সিংহলে

যে সকল ভারতীয় সিংহলী বলিয়া পরিগণিত হইবার জন্য আবেদন করিয়া ব্যর্থকাম হওয়ায়—সম্পত্তিহীন হইয়াছে, তাহাদিগকে চাকরীতে ও রেশনে বঞ্চিত করিয়া—ভয় দেখাইয়া—কার্য্যোদ্ধারের যে চেষ্টা হইতেছে, তাহা ভারতীয় বিতাড়ন ব্যতীত আর কিছুই নহে। সিংহল সরকারের অবলম্বিত এই ব্যবস্থা গত জানুয়ারী মাসে ভারতের সহিত সম্পাদিত চুক্তির সর্ত্তের বিরোধী।

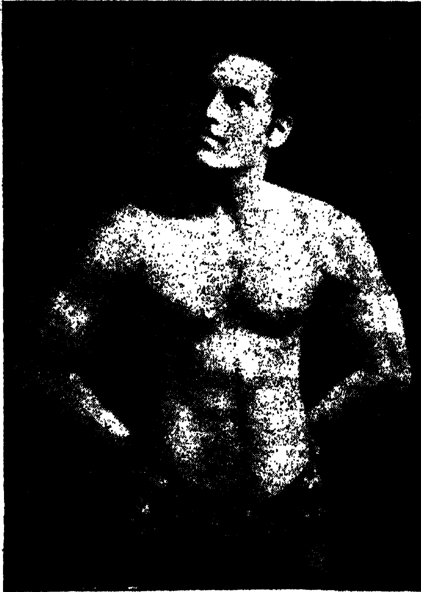
সুখের ও আশার বিষয়, ভারত সরকার সিংহল সরকারের এই নিষ্ঠুরতাব্যঞ্জক ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন এবং সিংহল হইতে ভারতে আগত শ্রমিকদিগকে সিংহলে প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি দিবেন না, স্থির করিয়াছেন। সিংহলের ভারতীয়-বিদ্বেষ যে ঔদ্ধত্যে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহা ভারতের সম্মানহানিজনক। সে সরকারের ব্যবস্থার প্রতিবাদে ভারত সরকার সমগ্র ভারতবাসীর সক্রিয় সাহায্য লাভ করিবেন। সিংহলের এই ব্যবস্থার মূলে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের কোনরূপ প্ররোচনা আছে কি না, তাহাও দেখিবার বিষয়।

আমরা আশা করি, ভারত সরকার কোন দেশের বা দলের প্রভাবে প্রতীকারের সঙ্কল্প বর্জ্জন করিবেন না—ভারতীয়দিগের অপমান সহ্য করিবেন না। ২২।২।৫১

স্বাস্থ্য-তত্ত্ব

শ্রীনীতিন মণ্ডল

সুদীর্ঘ সাধনার পর ভারত অর্জন করেছে তার স্বাধীনতা; জগতের কাছে নিজেদের মর্য্যাদা ও শক্তি প্রকাশের অবসর এসেছে। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না প্রাণের উন্মেষ আর স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্য!



নীতিন মণ্ডল

কিন্তু প্রত্যেকেই জানেন যে জাতীয় প্রাণশক্তি হচ্ছে চিরজাগ্রত তরুণদল। কিন্তু বাংলার তরুণ তথা ছাত্রদলের যুবোচিত ধর্ম্ম আশ্চর্য্যরূপে আজ অস্বাভাবিক এবং বিকৃত। নিজেদের প্রকৃত গতি সম্বন্ধে এদের প্রায় ১৫ আনাই নিঝুম, নিশ্চেতন। এদের বেশীর ভাগই চিন্তাহীন গড্ডালিকা স্রোতে ভেসে চলে, আর বাকীটা প্রকাশ করে অর্থহীন উচ্ছলতা। এদের ইচ্ছায় এসেছে কেমন যেন একটা জড়তা, এরা ভুলে গেছে সেই মহাশক্তির কথা যা এদের স্নায়ুতে, শিরায়, মাংসে, মজ্জায় রয়েছে ঘুমিয়ে। সেই শক্তিকে জাগাবার চেষ্টা না করে তারা প্রসাধন এবং কায়দা মাফিক অঙ্গ সজ্জায় ব্যস্ত।

একজন ১৮।২০ বছরের যুবকের বক্ষ ও পৃষ্ঠদেশ—হবে প্রশস্ত, গ্রীবা হবে দৃঢ় ও সতেজ, বাহুযুগল হবে সুগোল, নিটোল এবং শিরদাঁড়া থাকবে ঋজু। দীপ্তিময় চোখ ও সতেজ পদবিক্ষেপ দেবে ভবিষ্যত জীবনের সঙ্কল্পের আভাষ। কিন্তু বর্ত্তমানে ছাত্রদলের ও তরুণদলের অনেকে ইয়াংকীদের মতো স্বল্প কঁপানটাই আধুনীকতার চরম ওস্তাদী মনে ভাবেন। এরাই আবার ব্যঙ্গ বিদ্রূপের খোঁচায় যুক্তি আর সত্যকে ভুমিস্মাৎ করতে চায়। সুগঠিত শরীর বলতে যা বুঝি তা এদের মাঝে কদাচিত দেখা যায়, শরীর চর্চ্চার কথায় এরা কেঁদে করে ওঠে—পাই লবডঙ্কা ব্যাসানের মাপা চাল—তার ওপর আবার কসরৎ—এ্যাঃ। এদের দিক থেকে কথাটা যে—কতদূর মিথ্যে—তা-রেস্তোরা, রেস্টুরেন্টই প্রমাণ দেয়। যে সব ছাত্র স্কুলের গণ্ডী পার হবার পরেই—কলেজের গ্যালারিতে নিজেদের শোভিত করেন, এবং পথে মাঠে ট্রামে বাসে দিক বিজয়ী চালে চলাফেরা করেন, তাদের মধ্যে একটা অর্থহীন অহমিকার ভাব দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিন্তু আকর্ষণ করে না স্বাস্থ্য সমুজ্জ্বল দেহের শোভা। তাই তারা না পায় শুনতে অন্তরের ডাক, না পারে অনুসরণ করতে মহত্তর আদর্শকে। এঁরাই আবার কখনো রাজনীতি সমাজনীতি ইত্যাদির জন্য কলেজ লাইব্রেরী কিম্বা রেস্তোরা সরগরম করে বাজীমাৎ করবার উদ্ধত প্রয়াস করে থাকেন। যারা স্বাধীন

ভারতের মেরুদণ্ড, যারা হবে মরু জয়ের সৈনিক যাদের নিতে হবে দেশ-নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব—তারাই যদি বর্ত্তমানে চটকের ঘূর্ণাবর্ত্তে হাবুডুবু খায়—তবে দেশ কাদের ওপর নির্ভর করবে। গৌরবময় স্বর্ণপ্রসূ অতীতের ভারতবর্ষকে আবার সেই বাঞ্ছিত অবস্থায় নিয়ে আসবার জন্যে যারা হবে অনুপ্রাণিত তারা কোথায়? কোথায় সেই তরুণ—যারা শিবাজী, প্রতাপাদিত্য, গোবিন্দসিংহের মরণজয়ী সৈন্যদলের মতো দুর্দ্ধর্ষ বিক্রমে মায়ের দুঃখের শৃংখল মুক্ত করতে আগুয়ান হবেন। কোথায় সেই আদর্শের চমক এই ছাত্রদলের চোখে মুখে। পাঠ্যপুস্তক মুখস্ত করে হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে একটা তকমা মিলতে পারে, কিন্তু যে তীব্র পরীক্ষার দ্বন্দ্বের সাফল্য জীবনের জয়টীকা পাওয়া যায় সে পরীক্ষার জন্য উদগ্রাবতা কোথায়?

দুর্ব্বল অশক্ত স্বাস্থ্য নিয়ে পৃথিবীর কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে করা যায় না। যে কাজই করুন তাতেই স্বাস্থ্যের এবং সামর্থ্যের প্রয়োজন। অথচ সুস্বাস্থ্য তৈরি করার জন্য এমন কিছু মারাত্মক পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না।

২০ মিনিট—কেশবিন্যাসের চর্চ্চা করতে পারি আমরা, আর ১০।১৫ মিনিট বৈজ্ঞানিক নিয়মে হস্তপদ সঞ্চালন করতে না পারবো কেন? অনেকে হয়ত বলবেন ব্যায়াম করতে গেলে উপযুক্ত খাদ্যের প্রয়োজন আছে, আবার ঠিক ঠিক খাদ্যপ্রাণের সাথে শরীর তৈরীর সম্বন্ধও আছে নিঃসন্দেহ—কিন্তু রুইমাছ না হলে ভাত খাবো না একথা বলে ভাত একেবারেই না খাওয়াটা নিছক নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় নয় কি? কুচো-চিংড়ী বা শাকপাতা দিয়েও খেয়ে অন্ততঃ পেট তো ভরবে। তেমনি যারা শুধু ঘন মুসুরীর ডাল, ভাত, ডাল, রুটী এবং ভিজে ছোলা খেতে পান তারাও ব্যায়াম করতে পারেন।

সুতরাং যে যুক্তির আবর্ত্তনে দাঁড়িয়ে এই স্বচ্ছন্দবিহারী—উচ্ছৃঙ্খল বাঙালী তরুণেরা—নিজেদের এবং সেই সঙ্গে সমস্ত জাতিকে প্রবঞ্চিত করছেন তা নিতান্তই অর্থহীন অজুহাত। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিয়ে জোর করে বলতে পারি—যতখানিই শারীরিক বা আর্থিক অবস্থা খারাপ হোক না কেন—কিছুটা অঙ্গ সঞ্চালন করাটা কিছুতেই আটকায় না। এর জন্যে চাই মেজাজ, এর জন্য চাই নিজের দেহটাকে সত্যিকারের ভালবাসতে শেখা। যে মুষ্টিমেয় কয়জন বাঙালী সুপরিচিত হয়েছেন তাঁদের বেশীর ভাগই অতি সাধারণ মধ্যবিত্তশ্রেণীর। পৃথিবী দ্রুত এগিয়ে চলেছে, আমাদেরও সেই অগ্রগামীদের মাঝে স্থান করে নিতে হবে। আমাদেরও দিতে হবে স্বাধীনতার মর্য্যাদা। আন্তর্জ্জাতিক শক্তি পরীক্ষায় আমাদেরও হতে হবে জয়ী।

প্রতি মুহূর্ত্তেই স্বামিজীর সেই অমোঘ নির্দ্দেশ—যেন আমাদের অন্তরে অন্তরে প্রতিধ্বনিত হয়—"what our country now wants, are muscles of iron, nerves of steel and gigantic will which nothing can resist."

যেদিন আমরা সেই লোহার মত পেশী, ইস্পাতের মতো স্নায়ু এবং দুর্ব্বার মানসিক শক্তির অধিকারী হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একই পদবিক্ষেপে অগ্রসর হবো এবং বাংলা তথা ভারতকে নূতন প্রেরণা দিয়ে জীবন্ত করতে পারবো সেইদিনই আমাদের মহান স্বামীজীর বাণী প্রকৃত সার্থক হবে।

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে

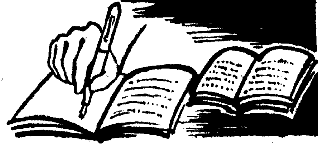
গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

বৈদূর্য আকাশ-বুক ঘন কালো মেঘেরা—পাখায়
ঢেকে ফেলে। সারি বাঁধে বলাকারা আনন্দে আশায়।
রোদ যায়, বৃষ্টি পড়ে—ঠাণ্ডা হাওয়া, সোঁদা গন্ধ মাটি;
কী কালো আঁধার নামে! সরীসৃপ যেন—পথ হাঁটি
কাজ শেষে ভেঙে পড়া দেহ মনে। পথ অন্ধকার,
বিদ্যুৎ চমকায় মেঘে—যেন তীব্র আলো জানালার।
আষাঢ়ের স্নিগ্ধ মেঘ এলো। মনে ভাবি, মেঘদূত
এবার পাঠাই তবে প্রিয়ার উদ্দেশে। কী অদ্ভুত!

কী আশ্চর্য স্বপ্ন-সাধ! ব্যর্থ যতো সুপ্ত কামনার
কুঁড়িগুলি দল মেলে যেন ভুঁই-চাঁপারা বর্ষার।
জটিল জীবন-যাত্রা সমস্যা-সংকুল একালের,
তবু মেঘ দেখে মন কিছুক্ষণ ফিরে চায় ফের
অতীতের সুখ স্বপ্নে। সুখ নেই কোনোখানে। তাই,
স্বগত উক্তির স্রোত: ব্যর্থ স্বপ্ন ব্যর্থ চিন্তাটাই
অশরীরী যক্ষ হয়ে মেঘ-বুকে যেন ছবি আঁকে—
প্রথম আষাঢ়ে প্রিয়া অলকায় প্রতীক্ষায় থাকে!

কতো নদী অরণ্য পর্বত, তারো পারে আরো কতো দূরে—
কোথা সে স্বপ্নের দেশ? জন্মেছিকি সেই যক্ষপুরে!

অনুবাদ সাহিত্য



একি স্বপ্ন !

অনুবাদক ঃ শ্রীজয়চরণ সরকার

গী. দ্য. মপাসাঁ

আমি তাকে উন্মাদের মত ভালোবেসেছিলাম।

কেন লোকে ভালবাসে? লোকে ভালবাসে কেন? কি অদ্ভুত! তখন মনে হয় পৃথিবীতে কেবল একজনই আছে! মনে তখন একমাত্র চিন্তা, অন্তরে একটিমাত্র কামনা, ওঠে কেবল ঐ একটিমাত্র নাম!—ঐ একটিমাত্র নাম, যা ঝর্ণাধারার মত অবিরল ধারায় অন্তরের গভীরতা থেকে উঠে আসছে। একটি মাত্র নাম, যা উচ্চারণ করে বার বার, উচ্চারণ করে সর্ব্বত্র বাধা-বন্ধহীন ভাবে, গুঞ্জন করে প্রার্থনা ধ্বনির মত!

আমাদের কাহিনীটা বলি।

তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তার কোমলতার ছায়ায় আমি বেঁচে ছিলাম, অনেক দিন কাটিয়েছিলাম। দিন কাটিয়েছিলাম তার তত্ত্বাবধানে, তার বাহুর নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে, তার পোষাকের অন্তরালে, তার কথায়। তার কাছ থেকে পাওয়া সব কিছুতে নিজেকে এত নিবিড় করে জড়িয়ে ফেলেছিলাম, এমন একটা আবরণ গড়ে ফেলেছিলাম চারপাশে—আমার আর দিনরাতের খেয়াল ছিল না; খেয়ালই ছিল না, আমি মরে গেছি, না এখনো এই পৃথিবীতে বেঁচে রয়েছি!

কিন্তু, তার পরে সে মারা গেল। কেমন করে?—আমি জানি না। তার পর, আর কিছুই জানি না আমি।

একদিন সন্ধ্যাবেলা সে ভিজতে ভিজতে বাড়ী ফিরল।—ভীষণ বর্ষা সেদিন। পরের দিন কাশতে সুরু করলে… এক সপ্তাহ ধরে কাশতে লাগল, তার পরে বিছানা নিল। কি ঘটছিল, তা আজ আর আমার মনে নেই; কেবল, ডাক্তাররা বার বার আসছিল, আর প্রেসক্রিপশন লিখে ফিরে যাচ্ছিল। নানা রকম ওষুধ আনা হচ্ছিল, আর জনকয়েক আত্মীয়া তাকে খাওয়াচ্ছিল সেগুলো। তার হাত দুটি উত্তপ্ত, কপালে যেন আগুন জ্বলছে, উজ্জ্বল চোখদুটি বেদনায় পরিপূর্ণ। আমি তার সঙ্গে কথা কওয়াতে সে-ও কথা কইল। কি বলেছিল—তা আমার মনে নেই। সব—সব আমি ভুলে গেছি! ওঃ! তার মৃত্যুকালীন সেই ক্ষীণ দুর্ব্বল দীর্ঘনিশ্বাসটি—আজও আমার পরিষ্কার মনে আছে। নার্স বললে—'ওহ্!' আমি সব বুঝলাম—সব বুঝলাম।

তারপরে আর কিছুই জানি না, কিছুই না। একজন পাদ্রীকে দেখলাম, তিনি আমাকে বললেন—'ও কি তোমার রক্ষিতা-স্ত্রী?'—আমার মনে হল তিনি তাকে অপমান করছেন। সে মারা যাওয়ার পরে আর তাকেও কথা বলার অধিকার কারো ছিল না। আমি তাঁকে ঘাড় ধরে বার করে দিলাম। আর একজন এলেন, কোমল, নম্র-প্রকৃতির লোক। তিনি আমাকে তার কথা বলায়—আমার চোখে জল এসে গেল।

শব-যাত্রা সম্বন্ধে তারা আমার সঙ্গে পরামর্শ করলে। তারা কি বলেছিল, তার কিছুই আমার মনে নেই। যদিও সেই শবাধারটা আমার বেশ মনে আছে। মনে আছে সেই শব্দ—যখন তারা তাকে তার মধ্যে পুরে পেরেক ঠুকছিল। ওহ্! ভগবান! ভগবান!

তাকে কবর দেওয়া হল! কবর! সে! ঐ ছোট্ট গর্ত্তটার মধ্যে! জনকয়েক লোক এসেছিল—তার সঙ্গিনীরা। আমি সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে এলাম।

পালিয়ে এসে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলাম—পরের দিন—ঘুরতে বেরিয়ে পড়লাম।

গতকাল আমি পারীতে ফিরেছি। যখন আমি আবার আমাদের ঘরটা দেখলাম, দেখলাম আমাদের ঘর, বিছানা, আসবাবপত্র—সকল কিছু, যা মৃত্যুর পরে মানুষের স্মৃতি বহন করে, তখন টাটকা শোকে এমন অভিভূত হয়ে পড়লাম, যেন সজোরে জানলা খুলে নীচের রাস্তায় লাফিয়ে পড়ছি! এই সব জিনিষের মধ্যে আমি বেশীক্ষণ থাকতে পারছিলাম না ; থাকতে পারছিলাম না এই দেওয়ালগুলোর মধ্যে, যেগুলো তাকে ঘিরে রেখেছিল, যেগুলোর আড়ালে সে বাস করে গেছে, যেগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে আছে তার হাজার হাজার অণু, যেগুলির প্রতিটি অপ্রত্যক্ষ রন্ধ্রে লুকিয়ে রয়েছে তার স্পর্শ, তার নিশ্বাস।

টুপিটা নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, হলের দরজার কাছে বড় আয়নাটার একেবারে সামনে পড়ে গেলাম। সে—ই এটাকে এখানে রেখেছিল, রোজ বেরোবার সময় যাতে পায়ের জুতো থেকে মাথার টুপী পর্য্যন্ত একবার চোখ বুলিয়ে নিতে পারে ;—তার প্রসাধন ঠিক নিখুঁত, সুন্দর হয়েছে কিনা, তাকে ভাল দেখাচ্ছে কিনা।

আয়নাটার সামনে একবার দাঁড়ালাম। এর উপরে কতবার তার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়েছে—কতবার—ক—ত বার! এটা নিশ্চয় তার ছায়া ধরে রেখেছে। সেই মসৃণ, উজ্জ্বল, শূন্য কাঁচটার উপরে চোখদুটো নিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছিলাম। এই কাঁচটার 'পরেই তার পূর্ণ চেহারা প্রতিফলিত হয়েছে, আমার মুগ্ধ চোখদুটির মত এই কাঁচটাও তার সর্ব্বাঙ্গ ঘিরে রেখেছিল। অনুভব করলাম, এই কাঁচটাকেও আমি ভালোবাসি। একবার স্পর্শ করলাম, কী ঠাণ্ডা। হায়! স্মৃতি! ওরে দুঃখিত প্রতিফলক, উষ্ণ প্রতিফলক, ভয়ঙ্কর প্রতিফলক!—কত যন্ত্রণাই না তোরা দিতে পারিস মানুষকে। ওঃ! তারা কী সুখী, যারা সব ভুলে যায়, ভুলে যায় এর উপরে কি ছিল, যে সব ঘটনা এর সামনে ঘটেছিল ; ভুলে যায় সকলকে, যারা এর পানে তাকিয়েছিল, যাদের এ ভাল বেসেছিল, প্রতিফলিত করেছিল নিজের বুকে। ওঃ! কী কষ্ট! কী কষ্ট আমার! হায়, স্মৃতি!

ইচ্ছে না করলেও, আপনা থেকেই গোরস্থানের দিকে চলতে লাগলাম। আমার চোখে পড়ল তার সাদাসিধে কবরটা। একটা পাথরের ক্রশের উপর লেখা রয়েছে :

মেয়েটি একজনকে ভালবাসিয়াছিল।
সে-ও মেয়েটিকে ভালবাসিত।
ইহার পরে মেয়েটির অকস্মাৎ
অকালমৃত্যু ঘটে।

এরই নীচে সে দিনে দিনে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে! কী সাঙ্ঘাতিক! উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলাম, তারপরে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। দেখলাম, ক্রমশঃ অন্ধকার হয়ে আসছে। আমার মনে একটা অদ্ভুত, উন্মত্ত ঈপ্সা জেগে উঠল, জেগে উঠল—হতাশ প্রেমিকের ঈপ্সা। ইচ্ছে হ'ল—সেই রাত্রি, সেই শেষ রাত্রি—তার কবরের উপর কেঁদে কাটাব। কিন্তু, আমাকে নিশ্চয় ধরে বা'র করে দেবে। কি করি আমি এখন! একটা চালাকি করলাম, সেই মৃত্যুপুরীতে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। ঘুরেই বেড়াচ্ছি, ঘুরেই বেড়াচ্ছি। আমরা যে শহরে বাস করি, তার তুলনায় এই শহর কত ছোট! তবুও এই মৃতেরা জীবিতদের চেয়ে কত বেশী। আমাদের বিরাট বাড়ী চাই, চওড়া রাস্তা চাই, চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত লোকেদের জন্যে আলো—হাওয়া—খেলা ঘর চাই ; আবার, ঝর্ণার জল, পিপের মদ থেকে সুরু করে সমতলভূমির রুটিও একসঙ্গে হাজির চাই!

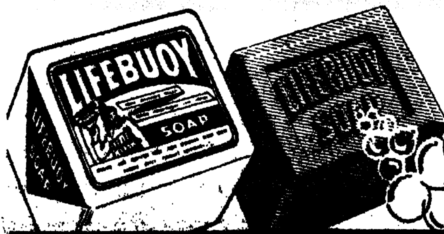
হঠাৎ দেখলাম গোরস্থানের শেষ দিকে, সবচেয়ে পুরণো অংশে এসে পড়েছি। এখানে তাদের জায়গা, যারা বহুদিন আগে মারা গেছে, এখন ক্রমশঃ মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। তাদের ক্ষীয়মান দেহের উপরে আজ যেখানে ক্রশ রয়েছে, কালই হয়ত নতুন অতিথির জন্যে সেখানে স্থান সঙ্কুলান করা হবে। বন্য গোলাপ আর বলিষ্ঠ, অন্ধকারাচ্ছন্ন সাইপ্রাস গাছে এদিকটা ভর্ত্তি।—মানব—রক্ত—মাংসে পরিপুষ্ট ম্লানমুখী, সুন্দরী উদ্যান।

আমি একা, সম্পূর্ণ একা। একটা সবুজ গাছের নীচে গুঁড়ি মেরে রইলাম, ঘন বিমর্ষ শাখা গুলির মধ্যে লুকিয়ে ফেললাম নিজেকে। জাহাজ ডুবি হওয়া লোক যেমন করে একটা তক্তাকে আঁকড়ে ধরে, তেমনি করে গুঁড়িটাকে আঁকড়ে ধরে অপেক্ষা করতে লাগলাম।


ময়লার বীজাণু থেকে প্রতিদিনই আপনার অসুখের সম্ভাবনা আছে


লাইফবয় মেখে এই সব বীজাণু ধুয়ে ফেলে প্রতিদিন নিজেকে রক্ষা করুন


লাইফবয়ের "রক্ষাকারী ফেনা" আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখে


LIFEBUOY
SOAP

অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল।

আমি আশ্রয় ত্যাগ করে আলতো ভাবে, ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে সেই মৃত-মানুষে পরিপূর্ণ মাঠের মধ্যে হাঁটতে লাগলাম। অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি সত্ত্বেও তার সমাধিটা আর খুঁজে পেলাম না! প্রসারিত হাতে প্রত্যেকটি প্রস্তরফলকে আঘাত করতে করতে এগিয়ে চললাম ;—হাত, পা, হাঁটু, বুক, এমন কি মাথা দিয়েও আঘাত করতে লাগলাম, তবুও তাকে খুঁজে পেলাম না! অন্ধের মত পথ হাতড়াতে হাতড়াতে চলতে লাগলাম। সেই সব পাথর, ক্রশ, লৌহ বেষ্টনী, ধাতুর মালা আর শুকনো ফুলের মালাগুলি আমি স্পর্শ করতে লাগলাম। অক্ষরের উপরে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে, আঙ্গুল দিয়ে আমি নাম পড়তে লাগলাম। কী রাত্রি! ওঃ! কী রাত্রি! আমি আর তাকে খুঁজে বার করতে পারলাম না!

চাঁদটাও দেখা যাচ্ছে না, ওঃ! কী ভয়ঙ্কর রাত্রি! আমি ভয় পেয়ে গেলাম ; দু'সারি কবরের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় গা ছমছম করতে লাগল।

কবর! কবর! কবর! কবর ছাড়া আর কিছু নেই! ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, পিছনে, চতুর্দ্দিকে সর্ব্বত্র কেবল কবর আর কবর! হাঁটু ব্যথা করতে লাগল ; আর হাঁটতে না পেরে একটা কবরের উপর বসে পড়লাম। আমার বুকের স্পন্দন শুনতে গেলাম, শুনতে পেলাম আরো একটা কিছু শব্দ। কি রকম একটা চাপা, নামহীন গুঞ্জন। শব্দটা কি আমার মাথার মধ্যে হচ্ছিল?—না, ঐ দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে?—না, মৃতদেহ পরিপূর্ণ ঐ রহস্যময় মাটির নীচে?

চারধারে তাকিয়ে দেখলাম। কতক্ষণ যে সেখানে ছিলাম, তা বলতে পারি না। ভয়ে পাথর হয়ে গেলাম, রোমাঞ্চে শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল, চিৎকার করতে চাইলাম, মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হলাম।

হঠাৎ মনে হল যে পাথরটার উপর আমি বসে আছি, সেটা নড়ে উঠল! নিশ্চয়ই এটা নড়ছে, যেন ক্রমশঃ উঠে আসছে! এক লাফে পাশের পাথরটার উপর চলে গেলাম। দেখলাম—হ্যাঁ, পরিষ্কার দেখলাম, আমার সদ্য-পরিত্যক্ত পাথরটা উপরে উঠে এসেছে! মৃতলোকটি পিঠটা ধনুকের মত বেঁকিয়ে পাথরটা ঠেলে বেরিয়ে এল। —একটি নগ্ন কঙ্কাল। রাতটা এত বেশী অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া সত্ত্বেও আমি তাকে পরিষ্কার দেখতে পেলাম।

ক্রশটির উপর লেখা রয়েছে :

> ইহা ফ্যাকুই আলিভাঁর
> কবর। সে দয়ালু, শ্রদ্ধাবান
> ও পরিবারের প্রতি মমতাময়
> ছিল। ঈশ্বরের অনুগ্রহে
> একান্ন বৎসর বয়সে সে
> পরলোকে গমন করে॥

মৃতলোকটিও সেই লেখাটি পড়ল, তারপর পথ থেকে একটা পাথর কুড়িয়ে নিল।—ছোট্ট, ছুঁচলো পাথর। অতি সতর্কতার সঙ্গে অক্ষরগুলি মুছতে লাগল। আস্তে আস্তে সমস্ত অক্ষরগুলো মুছে গেল। সে তার চোখের কোটর দু'টি দিয়ে কিছুক্ষণ সেই লেখা-মোছা জায়গাটার দিকে চেয়ে রইল। তারপর তার আঙ্গুলের হাড়ের ডগা দিয়ে পরিষ্কার অক্ষরে লিখতে লাগল।...ছেলেরা যেমন করে দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে দেওয়ালে লিখে বেড়ায়।

> ইহা ফ্যাকুই অলিভাঁর কবর।
> সে উত্তরাধিকারের জন্য লালায়িত
> হইয়া পিতার সহিত নির্দ্দয়
> ব্যবহার করিয়া তাঁহার অকালমৃত্যু
> ডাকিয়া আনে। সে স্ত্রীকে
> নির্য্যাতন করিয়াছে, পুত্রকন্যাদের
> অত্যাচার করিয়াছে, প্রতিবেশীদের
> সঙ্গে প্রতারণা করিয়াছে এবং
> সকলকেই ঠকাইয়াছে। একান্ন
> বৎসর বয়সে দুর্ভাগ্যের সহিত
> সে মারা যায়॥

লেখা শেষ হয়ে গেলে মৃতলোকটি নিঃস্পন্দ হয়ে নিজের কৃত-কর্ম্মের পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ঘুরে দেখলাম, সমস্ত কবরগুলিই খুলে গেছে, আর মৃতদেহরা সেগুলোর ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে তাদের কবরের উপর খোদিত কথাগুলি মুছে, নিজের হাতে সত্য ঘটনাগুলি লিখছে। দেখলাম, সকলেই প্রতিবেশীর উৎপীড়নকারী ; এরা সকলেই

দ্বেষী, অসাধু, প্রতারক, মিথ্যাবাদী—সকলেই নিন্দুক আর ঈর্ষ্যাপরায়ণ। তারা চুরি করেছে, প্রতারণা করেছে; সকল রকম নিন্দার্হ, ঘৃণার্হ কাজ করেছে এই সব পূজনীয় পিতা, বিশ্বস্ত স্ত্রী, প্রিয়পুত্র আর অকলঙ্কী কন্যা ও সাধু ব্যবসাদার। এই সব স্ত্রী-পুরুষ, জীবনকালে এরা সকলেই নিঃসন্দেহে অনিন্দনীয় ছিল।

তারা সকলে একসঙ্গে তাদের পরজীবনের ঘরের ছাদের উপর সত্য-কথা লিখছিল।—তাদের জীবনকালে অবিদিত সেই সাঙ্ঘাতিক, অথচ পবিত্র সত্য। হয়তো তারা এই সত্যগুলো না জানার ভাণ করত।

ভাবলাম, তাহলে আমার প্রিয়াও তার কবরের উপর নিশ্চয় কিছু লিখেছে! আমি নির্ভয়ে সেই সব অর্দ্ধোন্মুক্ত কবর, মৃতদেহ, আর কঙ্কালগুলির মধ্যে দিয়ে এঁকে-বেঁকে তার কবরের পানে ছুটলাম। আশ্চর্য্য! তক্ষুণি সেখানে পৌঁছে গেলাম! মুখটা চাদরে ঢাকা থাকা সত্ত্বেও তাকে চিনতে আমার কোন কষ্ট হল না। আর, যে পাথরটার উপর আগে লেখা ছিল:

> মেয়েটি একজনকে ভালবাসিয়াছিল।
> সেও মেয়েটিকে ভালবাসিত।
> ইহার পর মেয়েটির অকস্মাৎ
> অকাল মৃত্যু ঘটে॥

এখন তার উপরে লেখা রয়েছে:

> প্রেমিককে প্রতারিত করিয়া
> বাদলা-রাতে অভিসার-যাত্রার
> ফলে মেয়েটির ঠাণ্ডা লাগে,
> ফলে—সে মারা যায়॥

পরের দিন লোকেরা আমাকে অচৈতন্য অবস্থায় কবরের উপরে খুঁজে পেয়েছিল।

মন্দিরের ঘণ্টা

সুনীল বসু

ভাঙলো বহু বছরের স্তব্ধতা! আবার বাজলো ঘণ্টা—
খুঁজলো ভাঙনের পথে চলে যাওয়া মানুষদের,
খুঁজলো শোকের অব্যক্ত বেদনায় ঘুমিয়ে যাওয়া মানুষদের।
কেমন বাজছে ঘণ্টা, দুলছে, কেমন কাঁপছে আওয়াজ আর
যাচ্ছে দূরে!

তোমার কান্নাকে মুছে দাও এর ঘন আওয়াজের গম্ভীরে,
ভুলতে থাকো জীবনের বিদ্রূপকে, কেননা এর ধ্বনি
বিশ্বাসের লালিত্যকে আনে!

যেখানে বাদুড় চাঁদের গায়ে পাখা ঝাপ্টায়—সেখানে ফ্যালো
ধ্বংসের টুক্‌রো—
সেখানে ফ্যালো ধ্বংসের আবর্জনা—যেখানে রাতের পাখী
শোকে ফোঁপায়,

ছাখো, ছাখো, জাগছে মন্দিরের চূড়ো কত না গৌরবে—
উজ্জ্বল সততায় আর সৌন্দর্যে!
আত্মার রাজ্য সন্ধানের জন্য এসো, এসো হে মানব,
ঘণ্টার ধ্বনির ললিত সুরে তোমাদের প্রার্থনার বুকগুলি
পেতে দাও!

কেমন বাজছে ঘণ্টা কেমন গাইছে গান!
কেমন ফুটছে বাণী: "বিবর্তনে খোঁজ শাশ্বতকে!"
কেমন ব'লছে ঘণ্টা: "স্থিতির কোষেই সুপ্ত জঙ্গম!"

হাজার বছরের ভাঙলো স্তব্ধতা! বাজলো ঘণ্টা আবার—
সমস্ত নোংরামি থেকে যাও দূরে, ব'লছে ধ্বনি, নাও
আনন্দকে, চিরানন্দকে!

বিদেশী কবিতার অনুবাদ।

মেয়েদের কথা

পরিচালিকা—কল্যাণবাদিনী

স্বাধীন ভারতবর্ষে মেয়েদের অধিকার

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

পৃথিবীর বয়স হ'ল অনেক। মানুষের তৈরী সভ্যতারও বয়স কম হ'ল না। অন্য দেশের সভ্যতার কথা ছেড়ে দিই আমাদের ভারতবর্ষের সভ্যতার কত হাজার বছর বয়স—তাও ঠিক করে বলা শক্ত। কেন না, পুরাণ মহাভারত পড়লেও দেখি যে, তাতে অনেক সময় অনেকে বলেছেন, পুরাকালে এই রাজার সময়ে এই প্রথার উদ্ভব হয়; এই মুনি এই কথা বলেন; এই ঋষি এই বলছিলেন ইত্যাদি। তাতে মনে হয় আমাদের এই ভারতবর্ষের সভ্যতাও যেন অজানা কাল থেকেই চলে আসছে।

এই সব শাস্ত্র-অনুশাসন ও বহু যুগের সমাজের ধর্ম্মের ইতিহাস ভারতবর্ষের মানুষের শ্রুতি স্মৃতি ও পুঁথিতে ছিল। অর্থাৎ, মানুষ কানে শুনে মনে রেখেছিল, পুঁথিতে লিখে রেখেছিল। এই অনুশাসন ও নীতি যুগে যুগে বদলেছে এবং সমাজও চলার পথে পথে নতুন নতুন মত ও আচার-ব্যবহারকে সাথী করে নিয়েছে। এখনো সেইভাবেই তার গতিধারা চলেছে, কখনো গ্রহণ কখনো বর্জ্জন করে। কিন্তু আমরা ভাল করে একটু ভাবলেই দেখতে পাব তার মূল কাঠামোটা প্রায় ঠিকই আছে। অর্থাৎ, খুঁটিয়ে দেখলে জগতের অন্য অনেক সভ্যতার মতই এই সভ্যতা এবং সমাজ যদিও গড়ে উঠেছে পুরুষ এবং নারী উভয়কে নিয়েই, কিন্তু তাতে পুরুষই শাসক অনুশাসক, নীতিকার, সমাজপতি, পরিবারের গোত্রের প্রভু, যা বলা যায়—যে সংজ্ঞা দেওয়া যায়, সব।

আজো নানাশাস্ত্র সংহিতাকারের বহু বিধিনিষেধের ধারার সঙ্গে মনুসংহিতার প্রসিদ্ধ বিধান—পিতা কৌমারে, ভর্ত্তা যৌবনে এবং পুত্র বার্দ্ধক্যে রক্ষণাবেক্ষণ করবেন, ব্যবস্থা শেষে 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি' এই শ্লোকটাই যে-কোনো অধি-[illegible]র দাবীর বিপক্ষে প্রামাণ্য বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ সেই সেকাল থেকে আজো মেয়েরা 'মানুষ' নন, মেয়ে-মানুষ। সোজা কথায় পুরুষদের সম্পত্তি, দায় এবং ভার; ঘটীবাটীর মত যাকে দান করা যায়, ত্যাগ করা যায়, বহন করতে হয়! মানুষ মনে করে তাদের কোনো মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়নি, হয়ত দাবীও মেনে নেওয়া হয়নি। আশ্চর্য্য এই যে, ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগতভাবেও এই সব বিধিনিষেধ মেয়েরা চিরদিন মেনে এসেছেন এখনো মেনে চলেছেন।

তবু, মাঝে মাঝে আমাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়েছে, সমাজের রীতি নীতির অদলবদল হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, কোনো মেয়ের ইচ্ছায় তা হয় নি—তাও পুরুষই করেছেন। বাংলাদেশে যেমন শ্রীচৈতন্যদেব। তিনি প্রায় চারশো বছর আগে এক শ্রেণীহীন বৈষ্ণব সমাজ গড়ে তুলেছিলেন। যার গোড়ার কথা একেবারে আমূল পৃথক, পুরানো সমাজ থেকে। যে-সমাজে জাত নেই। তারা বৈষ্ণব। বৈষ্ণব মানুষের জাত শ্রেণী নেই। মেয়েরা 'মেয়ে মানুষ' নয়, তারা বৈষ্ণবী। বৈষ্ণবের মতই সমান তার সামাজিক অধিকার, পূজা, অর্চ্চনা, ধর্ম্মকর্ম্ম, বিগ্রহ-সেবায়। এ সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার ছিল। বিধবা-বিবাহেরও প্রচলন হয়েছিল। যদিও উচ্চবর্ণের বৈষ্ণবদের মধ্যে এই সব সংস্কার চলেনি। তবু, সমাজের এক অংশে এই বৈষ্ণব সমাজের—সাধুদের মত আজো জাত নেই, শ্রেণী নেই। তাঁরা কি জাত তা বলেন না, বলেন আমরা বৈষ্ণব। এতে দেখা গেল, সমাজে আরেকভাবে মানুষকে দেখা হচ্ছে, মেয়েদেরও।

এটা মুসলমান আমলের সংস্কার। উচ্চবর্ণের মধ্যে এই ধর্ম চললেও, সমাজের রীতি নীতিতে উচ্চবর্ণের বৈষ্ণব সমাজের লোকেরা এই সব প্রথা গ্রহণ করেননি। ব্রাহ্মণ্য,

সহমরণ, অনুমরণ, বৈধব্য-জীবনের কঠোরতা, কৃচ্ছ্রতার পূর্ণ প্রচলন ছিল।

এর পর ইংরাজ আমলে ১৭৭২ সালে এ যুগের অগ্রদূত মহাত্মা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হয়। তাঁর সময়েই দেশ প্রথম দেখতে পেল, মেয়েরা শুধু সম্পর্কীয়া জীব-বিশেষ নয়—মানুষ। সহমরণ বা সতীদাহ প্রথার অন্যদিক। যার সবটাই পতি-প্রীতি পতি-ভক্তি নয়—অনেকটাই সমাজ-অনুমোদিত হত্যা বা সমাজ-প্ররোচিত আত্মহত্যা। স্বামীর মৃত্যুর পর তথাকথিত ধর্ম্মের নির্দ্দেশে, অভিভাবকদের নির্দ্দেশে, লোকলজ্জাভয়ে আত্মহত্যা বলা যেতে পারে। এই প্রথা ভারতবর্ষের উত্তর থেকে দক্ষিণে সর্ব্বত্র ছিল। এছাড়া মেয়েদের প্রাণের মূল্যহীনতায় পরিচায়ক আর এক প্রথা ছিল। রাজপুতানায় শিশুকন্যা-হত্যা। কন্যার বিবাহে বরপক্ষের কাছে অপমানের ভয়ে রাজপুতদের মধ্যে এই প্রথা চলেছিল। এত কথা বলছি এই জন্য যে, সার কথায় মেয়েরা ছিলেন প্রাণের দিক থেকেও পুরুষ-অভিভাবকের ব্যক্তিগত সম্পত্তির মত। তাই, কন্যা হলে তাকে পিতামাতা মারতে পারতেন, বাঁচিয়ে রাখতে পারতেন। বিবাহিতা মেয়ে স্বামীর সম্পত্তি। তার জীবন স্বামীর জন্য। স্বামীর মৃত্যুতে তিনি নিষ্প্রয়োজন কিনা, সহমৃতা হবেন কিনা, তা তাঁর—অভিভাবক বা পুত্রেরা ঠিক করতেন।

রামমোহন রায়ের আন্দোলনের পরে শুধু বেঁচে আছে বলেই বেঁচে থাকতে দেওয়ার আশ্চর্য্য অধিকার মেয়েদের দেওয়া হ'ল! অর্থাৎ, পুরুষ বিশেষের জন্য—যে জীবন, সে-জীবন রাখা বা না-রাখার ভার এতদিন পুরুষ-সমাজের হাতেই ছিল। বেঁচে থাকার এই জন্মগত অধিকার সেদিন মেয়েরা পাবার আগে পুরুষসমাজে যে বিরুদ্ধ-আন্দোলন হয়, তা আজকের দিনের হিন্দুকোড্ বিলের চেয়ে বেশী বই কম হয়নি তা জানা গিয়েছিল। কিন্তু, মেয়েরা কি ভেবেছিলেন বা কি বলেছিলেন তা কেউ প্রকাশ করেননি। প্রকাশ না হলেও পরে দেখা গেল, সতীদাহ বা সহমরণ প্রথাটীও লোকাচার মাত্র।

এই সময়েই রামমোহন-প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম থেকে ব্রাহ্মসমাজ গড়ে উঠতে লাগল। দেশে ইংরাজী শিক্ষা ও রাজপুরুষদের প্রভাবও ছড়িয়ে পড়েছিল। খৃষ্টান মিশনারীদের দ্বারা তাদের ধর্ম্মের প্রচার ও শিক্ষার প্রচারও হতে লাগল। এই সব নানা রকম প্রভাব প্রচারের মাঝে বিদ্যাসাগর মহাশয় এসে দাঁড়ালেন শিক্ষা জ্ঞান ও দয়ার-সাগর হয়ে। এই এক শতাব্দীর মধ্যেই দুজন পুরুষ মানবিকতায় দৃষ্টি দিয়ে করুণাভরে মেয়েদের দিকে তাকালেন। সমাজের অত্যাচারের অনাচারের বিরুদ্ধে ঋজু হয়ে দাঁড়ালেন। বাঁচার অধিকারের পর, এ আরেক দৃষ্টিতে, আইনের দিক থেকে মানুষ বলে মেয়েদের গণ্য করা বিদ্যাসাগরের আগে আর কেউ করেননি।

একদিকে আইনের চোখেও আমাদের দুটী অধিকার করার দাবী জন্মাল। এর আগে অবধি আমরা সবসময়েই ব্যক্তিগতভাবে অধিকার পেয়েছি, ভোগ করেছি, এবং পাইনি বা বঞ্চিত হয়েছি।

এই অতি-পুরাতন কথা আবার বলার কারণ এই যে, আমরা তখন কত অসহায় ছিলাম এবং এখনো প্রতিদিনের কাজে জীবনে কত অসহায় আছি। জন্ম থেকে মৃত্যুকাল অবধি আমাদের পায়ের তলার মাটীটুকু, মাথার উপরে ছাদটী আর প্রতিদিনের মুষ্টি ভিক্ষা বা আহার আচ্ছাদন—কে দেবেন আমরা কিছুই জানিনা, পিতা পতি পুত্র থাকতে। যাঁরা ভাবতে জানেন তাঁরাই আমার কথা উপলব্ধি করতে পারবেন!

এই রাওবিল, দেশমুখবিল, হিন্দুকোডবিলের কথা উঠেছে আজ এই জন্যই, এই সব ভেবেই। এখানেও দেখা যাচ্ছে এই সব বিল মেয়েরা রচনা করেননি। অর্থাৎ, আমাদের হাতে আমাদের কিছুই নেই। সমাজপতি পুরুষের উদারতা বা সঙ্কীর্ণতা আমাদের চালনা করে। ব্যক্তিগতভাবে আমরা ধর্ম্মে কর্ম্মে সুখে দুঃখে পুরুষদের সঙ্গে থাকি মাত্র। দুঃখে-দারিদ্র্যে দুঃখ বহন করি, ঐশ্বর্য্যে সুখ ভোগ করি, কিন্তু কোনো রকম কর্ত্তৃত্ব আমাদের জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই নেই। কোনো বিধান বা নিয়ম আজ অবধি মেয়েরা রচনা করেননি। একটা কোনো তুচ্ছ বিধান ভেঙ্গে ফেলার ক্ষমতাও কখনো ছিল না।

কিন্তু, এই ভারতবর্ষেই হিন্দু সভ্যতার আর একদিক আছে, দক্ষিণভারতে। মনে হয় সেটা আর্য্য-সভ্যতা থেকে উদ্ভূত নয়—সেটা অতি পুরাতন দ্রাবিড় সভ্যতার অংশ। কেননা, কয়েক জায়গায় সে দেশে এখনো

মাতৃতন্ত্র সমাজ আছে এবং কয়েকটী রাজ্যও মাতৃতন্ত্র হিসেবে এখনো চলে। মাতৃতন্ত্র মানে, যেখানে পিতার মত পরিবারে মা-ই সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী মার বড় মেয়ে বা মেয়েরা। ওখানে পুরুষ উত্তরাধিকারী হ'ন না, সেইজন্য মামার ভাগিনেয়ীকে বিবাহ করার একটা প্রথা আছে। পাছে বোনের সম্পত্তি বাইরে চলে যায়। যদিও দাক্ষিণাত্যে সব জাতে বা সব জায়গায় এ প্রথা নেই। মালাবারে আছে, ত্রিবন্দ্রমে আছে। ত্রিবন্দ্রম রাণী-পরম্পরা রাজ্য। বড় মেয়েই রাজ্যাধিকারিণী হ'ন। ছেলে নয়। ছেলে থাকলেও নয়। আয়ার ও নায়ার জাতিরাও এই নিয়ম এখনো মেনে চলেন।

আমার বলবার কথা হচ্ছে এই, এ থেকে বোঝা যাবে, মেয়েদের সম্পত্তিতে অধিকার থাকলেও পরিবার পুরুষ-পরম্পরায় উত্তরাধিকারের মতই অভ্যস্ত নিয়মে চলে, কোনো বিপর্য্যয় বা অসুবিধা ঘটে না।

বরং বলতে পারি—মাদ্রাজিনী নারী, পারিবারিক জীবনে আমাদের দেশের মেয়েদের মত অন্নবস্ত্রের দায়ে লাঞ্ছিত হ'ন না। নারীতন্ত্র-সমাজ পুরুষতন্ত্রের চেয়ে কম নিষ্ঠুর ও অনেক উদার।

এই সব দেশের কথা থেকে আপনারা বুঝে নিতে পারবেন, ভারতবর্ষের এক এক দেশে, এক এক নিয়ম আছে। নানা সংহিতাকার নানা রকম মত দিয়েছেন। কিন্তু সমাজ চলে লোকাচার অনুসারে। মাত্র দরকারের সময় মুনিদের মত লোকেরা তুলে দেয়।

আমিও আপনাদের জানা এবং শোনা দরকার বলে সেই সব পুরোনো মনু, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য থেকে দু'একটী শ্লোক তুলে দিচ্ছি।

স্বায়ম্ভুব মনু বলেছেন—পুত্রকন্যাদের মধ্যে দায়াধিকারে অর্থাৎ উত্তরাধিকারে ধর্ম্মতঃ কোনো ভেদাভেদ নেই।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন—

"পিতু রুর্দ্ধ বিভক্তাতাংমাতাপ্যংশ সমং হরেৎ
ব্যবহারাধ্যায় দায়বিভা প্রকর।" ৮।১১০

এখানে মাতার ছেলেদের সঙ্গে সমানাংশ দাবীর কথা মেনে নেওয়া হয়েছে।

পরাশরের বিখ্যাত শ্লোক—

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।"

অর্থাৎ স্বামী সন্ন্যাসী হলে, ক্লীব হলে, পতিত হলে, অথবা মৃত্যু হলে, নষ্ট হলে, স্ত্রীলোক অন্য পতি গ্রহণ করতে পারবেন।

অবশ্য বিপক্ষ মতামতের শ্লোকও ঢের আছে।

কিন্তু নানা মুনির নানামতের দেশে সংহিতায় লেখা বহু বিধান থাকলেও, কার্য্যতঃ উত্তরাধিকার ত দূরের কথা মেয়েরা কখনোই কোনো মৌলিক অধিকারও পাননি। এই সব শ্লোকও যেমন মনেই আছে, আমরাও চিরকাল একইভাবে আছি।

এই জন্যই রাষ্ট্রে আইন করে মানুষের মৌলিক অধিকার না পেলে মেয়েদের অবস্থার কোনও পরিবর্ত্তন আশা করা যায় না। মানুষের মৌলিক অধিকার আইন-সঙ্গতভাবে পেলে বিধানসভায় পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে আমরা (মেয়েরা) প্রতিনিধি পাঠাতে পারব এবং বিধান রচনায়, যে বিধান মেয়ে পুরুষ উভয়ের জন্যই, তাতে অংশ গ্রহণ করতে পারব। আমাদের এই-অবস্থার গোড়ার কথাই এই, আমরা কখনো বলতে সাহস করিনি, কিম্বা কোনও বিধান ভাঙাগড়ার ইতিহাস জানতেও পারিনি।

এই কতকালের পুরানো পৃথিবী আর হাজার হাজার বছরের পুরোনো সভ্যতায় মেয়েরা যে একইভাবে রয়ে গেলেন সব দেশে সবকালে, ভেবে দেখলে এইটেই আশ্চর্য্য।

মাত্র ছয় বছর বয়সের স্বাধীন ভারতবর্ষে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের খানিকটা অধিকার দেওয়া হয়েছে।

এই সব বিষয় ভালো করে তলিয়ে বুঝে দেখার জন্যই মেয়েদের কাছে আমাদের দেশের মেয়েদের আগেকার ও এখনকার অবস্থার কথা বললাম।

আমাদের ছয় বছরের স্বাধীন ভারতবর্ষের নতুন সংবিধানে মেয়েরা, আমরা কি কি অধিকার পেয়েছি সেই কথা আলোচনা করব।

(১) প্রাথমিক বা গোড়ার অধিকার—বিধান তন্ত্র।

(২) সমানাধিকার।

রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তিকে আইনের সম্মুখে অসমান অধিকার দেবেন না। নরনারী নির্বিশেষে যে-কোনও ভারতবাসী আইনের কাছে রক্ষা দাবী করতে পারবেন।

১৫। রাষ্ট্র—জাতি ধর্ম শ্রেণী, দেশ জন্মস্থান নির্বিশেষে

সকল নরনারীকে ভোটের বিষয়ে সমান অধিকার দেবেন। কোনও ভেদাভেদ থাকবে না। কিন্তু রাষ্ট্র শিশু ও নারীদের বিশেষ সুবিধাদান-অধিকার নিজের হাতে রাখলেন। এই খসড়ায় কোনো আর্টিক্‌লই বিশেষ সুবিধার প্রয়োগ থেকে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না।

১৬। কর্ম্মক্ষেত্রে বা চাকুরীক্ষেত্রে নরনারী নির্বিশেষে সমান অধিকার থাকবে।

এখন আমি ১৪ উপধারার অধিকার আমরা মানুষ হিসেবে পেয়েছি তার কথা বলি। এতদিন পর্যন্ত আমরা রাষ্ট্রের চোখে কেবল মাত্র 'মেয়ে'ই ছিলাম, এখন 'মানুষ' বলে গণ্য হয়েছি। এই সমানাধিকার সমাজের কুব্যবস্থার অনেক প্রতিকার করতে পারবে যদি চেষ্টা করা হয়।

১৫ই উপধারায় আমরা পাচ্ছি পৌর অধিকার। যাতে শাসন ও বিধানসভায় (অতীতকালের ভাষায় রাজসভায়) আমরা আমাদেরই প্রতিনিধি পাঠাতে পারব। এই প্রতিনিধি নির্বাচন করার অধিকারকেই ভোট দেবার অধিকার বলা হয় আপনারা নিশ্চয় জানেন। ভোট দেবার অধিকার থাকার জন্য—বিধানসভায় আমাদের স্বার্থ এবং অধিকার রক্ষা করবেন এমন লোক আমরা নিজেরাই পছন্দ করে পাঠাতে পারব। অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে আমরা ঘরে বসে থাকলে বা দূরে থাকলেও আমাদের প্রতিনিধিরাই আমাদের লাভ-ক্ষতি, সুবিধা-অসুবিধা রাজদ্বারে অর্থাৎ ঐ সভায় জানাতে পারবেন। কোনো কিছু অন্যায় আইন পাশের ব্যবস্থা হলে প্রতিবাদ করতে পারবেন।

এই সম্পর্কে আপনাদের একটু পুরাণো কথা, বিলাতে মেয়েদের ভোটের অধিকারের কথা বলি। আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখনকার দিনে বিলাতে মেয়েদের ভোটের অধিকার নিয়ে যে আন্দোলন হয় সে আজ প্রায় ৪৪।৪৫ বৎসর আগের কথা। বাংলা ১৩১৪।১৫ সাল হবে। ইংলণ্ডে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন অ্যাস্কুইথ্‌। আন্দোলন-কারিণীদের মধ্যে প্রধানা ছিলেন মিসেস প্যাঙ্ক্‌হার্ষ্ট। সঙ্গে আরো অনেক মেয়ে ছিলেন অবশ্য। জেলে যাওয়া থেকে অনশন করা, সভাসমিতিতে গোলমাল করা, দিকে দিকে তীব্র আন্দোলন করা—মেয়েরা অনেক চেষ্টা করে-ছিলেন এই ভোটের অধিকার টুকু পাওয়ার জন্যে। কিন্তু কে বা কার কথা শোনে !! তখন 'ভোট' যে কা'কে বলে কিছু জানতামওনা, বুঝতামওনা ;—তবু তীব্র আগ্রহের সঙ্গে পড়তাম সংবাদপত্রে সেই আন্দোলনের কাহিনী। অধিকার তাঁরা কিছুতেই পেলেন না। পুরুষরা তো নির্বোধ নন্ যে, সভাসমিতিতে উপদ্রব করলেই আর অনশন করলে বা জেল খাটলেই এত কালের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব ছেড়ে দেবেন ? সে আন্দোলনে ইংলণ্ডের মেয়েরা কিছুই করতে পারলেন না।

তারপরে এলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ইংরেজী ১৯১৪ সালে। চার বছর ধরে যুদ্ধে প্রায় পুরুষ-শূন্য হয়ে গেল দেশ। দেশের অনেক কাজই পড়লো মেয়েদের ঘাড়ে। যে-কাজ মেয়েরা কখনো করেননি—কল-কারখানা যন্ত্রপাতির কাজ, ইঞ্জিনিয়ারের কাজ—একটু একটু করে শিখে নিয়ে করতে লাগলেন। এক কথায় বলা যায়, যুদ্ধ ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে মারা এবং মরা ছাড়া সামাজিক জীবনের অতি প্রয়োজনীয় প্রতিটি দুরূহ কাজেই মেয়েরা তাঁদের যোগ্যতা প্রমাণ করলেন। কিন্তু তাতেই তাঁরা যে যুদ্ধের পরই সমাজে তাঁদের মানবিক দায়িত্বের অধিকার পেলেন তা নয়। বহু চেষ্টা ও আন্দোলনের পরে ১৯২৬ সালে তাঁরা পেয়ে-ছিলেন ভোটের অধিকার।

পুরুষরা এতদিনে বোধ হয় মনে মনে স্বীকারও করলেন, যুদ্ধের সময় মেয়েদের কাজের ঋণ বা কৃতিত্বকে। কাজ করলেই তবে কাজ করার ক্ষমতা বাড়ে এবং নৈপুণ্যশক্তিও আসে। ইংলণ্ডের মেয়েরা তাঁদের ভোটাধিকার যোগ্যতার দ্বারা অর্জন করে নিয়েছেন বলা যায়।

আমেরিকাও অনেকদিন পরে মেয়েদের এই অধিকার দিয়েছে। ঐ সকল দেশের মেয়েদের স্বার্থত্যাগ, কর্মশক্তি এবং আন্দোলনই মেয়েদের ভোটাধিকার এনে দিয়েছে বলা চলে।

স্বাধীন ভারতবর্ষে আমরা যে এই অধিকার পেয়েছি, এ সম্বন্ধে আমাদের অবহিত হওয়া দরকার। এই অধিকারের দু'দিক্ আছে। প্রথম প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে পাঠাবার ক্ষমতা আমাদের আছে—, দ্বিতীয় প্রতিনিধি হয়ে যাওয়ার ক্ষমতাও আমাদের আছে। এরজন্য শিক্ষায় দীক্ষায় কৃতিত্বে চরিত্রে সকল দিক্ দিয়ে, যোগ্যতা অর্জন করা দরকার। এটিও একটি মস্তবড় অধিকার—যা' এতকাল কখনও আমাদের ছিল না।

যে-অধিকার থেকে এখন মেয়েরা আমরা পুরুষদের সঙ্গে বিধান সভায় আইন ভাঙ্গা গড়ার ক্ষমতা পেয়েছি।

এর পরে ১৬ উপধারায় আমরা পেয়েছি কাজকর্মের ক্ষেত্রে বা চাকুরীর ক্ষেত্রে সমান অধিকার—সমান বেতন, সমান পদ। যে-কোনও মেয়ে ইচ্ছা করলে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করলে যে কোনও দায়িত্বপূর্ণ সরকারী চাকরী পেতে পারেন। বেতনে বা পদে (কেবল মাত্র নারী বলে) পুরুষের সঙ্গে কোনও তারতম্য আর নেই। উপযুক্ত যোগ্যতাই বেতন এবং পদপ্রাপ্তির একমাত্র নির্ধারক স্থির হয়েছে।

এখন আমাদের ভাববার কথা এই যে, আমরা রাষ্ট্রে পূর্ণ মর্যাদায় অধিকার পেলেও সমাজে এখনও কোনও সহজ অধিকারও পাইনি। সমাজে সহজ অধিকার না থাকলে এই রাষ্ট্রীয় অধিকারকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ব করা কঠিন। আবার রাষ্ট্রীয় অধিকার আমাদের এতখানিই শক্তি দিয়েছে যে আমরা যোগ্যতার সঙ্গে একে গ্রহণ করতে পারলে—এই শক্তির সাহায্যেই আমরা আমাদের সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারব। আজকে আমাদের সামনে কর্তব্য রয়েছে—রাষ্ট্রীয় অধিকারকে সুসার্থক করে তোলা এবং সামাজিক অধিকারগুলি অর্জন করা। স্বাধীন ভারতবর্ষে সুস্থ বলিষ্ঠ সমাজ ও রাষ্ট্র চালনায় পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও অবহিত না হলে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর আদর্শের ভারত গড়ে উঠবে কি ?

কাঁটার লেশ

শ্রীমতী কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়

(১৮ ঘর)

১ম—১৮ সোজা, প্রতি বিজোড় কাঁটায় সোজা হবে।

২য়—৪ সোজা, সামনে সুতা জোড়া ১বার, ১ সোজা, সামনে সুতা জোড়া ৫বার, সামনে সুতা সোজা ১বার।

৪র্থ—৪ সোজা, সামনে সুতা জোড়া ১বার, ২ সোজা, সামনে সুতা জোড়া ৫বার, সামনে সুতা সোজা ১বার।

৬ষ্ঠ—৪ সোজা, সামনে সুতা জোড়া ১বার, ৩ সোজা, সামনে সুতা জোড়া ৫বার, সামনে সুতা সোজা ১বার।

৮ম—৪ সোজা, সামনে সুতা জোড়া ১বার, ৪ সোজা, সামনে সুতা জোড়া ৫বার, সামনে সুতা সোজা ১বার।

১০ম—৪ সোজা, সামনে সুতা জোড়া ১বার, ৫ সোজা, সামনে সুতা জোড়া ৫বার, সামনে সুতা সোজা ১বার।

১২শ—৪ সোজা, সামনে সুতা জোড়া ১বার, ৬ সোজা, সামনে সুতা জোড়া ৫বার, সামনে সুতা সোজা ১ বার।

১৪শ—৪ সোজা, সামনে সুতা জোড়া ১বার, ৭ সোজা, সামনে সুতা জোড়া ৫বার, সামনে সুতা সোজা ১বার।

১৬শ—৪ সোজা, সামনে সুতা জোড়া ১বার, ৮ সোজা, সামনে সুতা জোড়া ৫বার, সামনে সুতা সোজা ১বার।

১৮শ—৪ সোজা সামনে সুতা জোড়া ১বার, ৯ সোজা, সামনে সুতা জোড়া ৫বার, সামনে সুতা সোজা ১বার।

২০শ—৪ সোজা, সামনে সুতা জোড়া ১বার, ১০ সোজা, সামনে সুতা জোড়া ৫বার, সামনে সুতা সোজা ১বার।

২২শ—৪ সোজা, সামনে সুতা জোড়া ১বার, ১১ সোজা, সামনে সুতা জোড়া ৫বার, সামনে সুতা সোজা ১বার।

২৪শ—৪ সোজা, সামনে সুতা জোড়া ১বার, ১২ সোজা, সামনে সুতা সোজা ৫বার, সামনে সুতা সোজা ১বার।

২৫শ—১২ ঘর বন্ধ করুন, ১৮ সোজা। পুনরায় ২য় কাঁটা থেকে হবে। এই লেশটি ক্রশের বোনা রঙ্গিন সুতা দিয়ে বুনলে খুব সুন্দর দেখতে হবে। আপনারা বেশ সরু লোহার কাঁটা দিয়ে বুনবেন।





পিতামহ

বনফুল



(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

২৬

প্রজাপতিযুগল কবির ঘরে নিস্পন্দ হইয়া বসিয়াছিল। কবি তাহাদের দেখিতে পাইতেছিলেন না, কারণ তাহারা এবার টেবিল-বাতির শেডের উপর বসে নাই, কবির ঠিক মাথার উপর ছাতে বসিয়াছিল। মনে হইতেছিল পাশাপাশি যেন দুইটি বহুবর্ণরঞ্জিত চিত্র আঁকা আছে। কবি কিন্তু তাহা দেখিতে পাইতেছিলেন না, তিনি তন্ময় হইয়া লিখিতেছিলেন।

"যে আলেয়াকে কেন্দ্র করে' আমার স্বপ্নজীবনে ও বাস্তবজীবনে সত্য-মিথ্যার বিচিত্র লীলা মূর্ত্ত হয়েছে, দূরবীণের পরকলার ভিতর দিয়ে যার কাছে দৃষ্টির দূত পাঠিয়েছি দিনের প্রখর আলোকে, রাত্রির নিবিড় অন্ধকারেও—সেই আলেয়া দেখতে দেখতে সামান্য কেরোসিনের ডিবে হয়ে গেল আমার চোখের সামনে। শুধু তাই নয়, আমার ঘরের ভিতরে এসে দুর্গন্ধ এবং ধূমও বিকীরণ করতে লাগল সে যখন তখন। নিঃসংশয়ে বুঝলাম সে তার স্বামীকে ছেড়ে এসেছে, আত্মদান করেছে ওই নিত্য-নূতন-মোটর-বিহারী লোকটার কাছে, প্রেমের জন্য নয়, অর্থের জন্য! আলেয়ার প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়েছি ভাবি, কিন্তু দেখি কিছু সংশয় থেকেই যাচ্ছে: মনে হচ্ছে ওর মধ্যে এমন একটা কি আছে যা আমি এখনও ধরতে পারি নি—যা···অর্থাৎ ওর সম্বন্ধে মোহ গিয়েও যেন থেকে যাচ্ছে। আমি নিজে লাইফ-ইনশিওরেন্সের দালাল, ওকে আমার কোম্পানীর এজেণ্ট করে' নিয়েছি, যা কাজ পাই তার অর্দ্ধেক ওকেই দিই। প্রায় রোজই আসে ও আমার কাছে, ওর জন্যে অপেক্ষাই করি রোজ, কিন্তু সুখ পাই না, নাগালের মধ্যে পেয়েও মনে হয় পাই নি, নীচে সেই বলিষ্ঠ ছোকরা স্টিয়ারিং ধরে' বসে' থাকে, কখনও বুইক, কখনও হিলম্যান, কখনও ফোর্ড, কখনও বা অস্টিন। মনে মনে ভাবি ছিছি আলেয়া কতখানি নেবে গেছে! কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারি না। আলেয়া সামনে এসে দাঁড়ালে মনে হয় যেন কৃতার্থ হয়ে গেছি। শেষে একদিন আমাকেও নাবতে হল। যা এতদিন আভাসে-ইঙ্গিতে ঠারে ঠোরে বলবার চেষ্টা করছিলাম তা স্পষ্ট করে' বলে' ফেললাম একদিন।

"আলেয়া তুমি একদিন ট্যাক্সি করে' একা এস। ট্যাক্সি ভাড়া আমি দিয়ে দেব। ও লোকটাকে সঙ্গে করে' এন না!"

আলেয়া মুখ টিপে একটু হেসে চেয়ে রইল আমার দিকে। তারপর বললে—"হঠাৎ এ অনুরোধ?"

"তোমাকে আমি চাই। নীচে একজন পাহারাদার বসে' থাকলে তোমাকে পেয়েও যেন পাই না"

আলেয়া অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল যেন। ঘাড় ফিরিয়ে জানলার দিকে চাইলে একবার, চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত্ত। তার মুখের মৃদু হাসিটা নিবে গেল।

"আসবে?"

আমার দিকে ফিরে আবার কয়েক মুহূর্ত্ত চেয়ে রইল সে আমার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। মনে হল মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। "কথা বলছ না কেন! আসবে? আজই রাত্রে এস, এগারোটার পর অপেক্ষা করে থাকব"

"আপনার কাছ থেকে এ ব্যবহার প্রত্যাশা করি নি"

একটা রূঢ় সুর ধ্বনিত হল তার কণ্ঠস্বরে।

"আমি বহুকাল ধরে' তোমাকে চাইছি। তোমার বিয়ের আগে থেকে। তোমার যখন বিয়ে হ'য়ে গেল তখন—"

আবেগভরে সমস্ত কথা বললাম, মনে হল বললাম, কিন্তু

কি যে বললাম তা মনে নেই। সমস্ত শুনে নিস্তব্ধ হয়ে রইল আলেয়া।

"আসবে? এস, বুঝলে—"

"ভেবে দেখব"

উঠে দাঁড়াল সে।

"তোমার জন্য অপেক্ষা করব আজ রাত্রে"

কোন উত্তর না দিয়ে নেবে গেল। একটু পরে গাড়ি স্টার্ট করার শব্দ পেলাম, জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম প্রকাণ্ড দামী মোটরখানা চলে যাচ্ছে।

সেদিন সত্যিই অপেক্ষা করছিলাম তার জন্যে। দূরবীণ হাতে নিয়ে বসেছিলাম জানলার কাছে। হঠাৎ কি মনে হ'ল দূরবীণ দিয়ে অবন্ধনার ঘরটাও দেখতে লাগলাম। অবন্ধনার ঘর প্রায়ই দেখতাম রাতে বসে, যতক্ষণ না আলো নিবে যেত। অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল, বিশেষত শিখর সেন আসার পর থেকে। বারান্দার আলোটা জ্বলছিল সেদিন কেন জানি না। রাজমিস্ত্রি এসে অবন্ধনার দরজার সামনে কি যেন করছিল দিনের বেলা। কাঁচা সিমেণ্টে পাছে কেউ পা দিয়ে দেয় তাই বোধহয় আলোটা জ্বেলে রেখেছে···অবন্ধনার ঘরের কপাট খোলা···ঘরে আলো জ্বলছে না। তারপরই তাকে দেখতে পেলাম যে অবন্ধনাকে খুন করেছে···চুপি চুপি নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল। তখন ভাবতেই পারি নি যে ও অবন্ধনাকে খুন করবার জন্যে ঘরে ঢুকছে। অবন্ধনা যে মারা গেছে তা-ও আমি জেনেছিলাম অনেক পরে, কারণ একটু পরেই আমাকে কোলকাতা ছেড়ে চলে' যেতে হয়েছিল।···টং করে' ঘড়িতে একটা বাজল। মনে হ'ল আলেয়া আর আসবে না, শোওয়ার জোগাড় করছি এমন সময় একখানা মোটর এসে দাঁড়াল আমার বাসার সামনে। একটু পরেই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেলাম। উৎকর্ণ হয়ে উঠে দাঁড়ালাম, বুকের ভিতরটা কাঁপতে লাগল। আলেয়াই এসে ঘরে ঢুকল। দেখলাম সে-ও কাঁপছে!

"আমাকে বাঁচান আপনি—"

আমার পায়ের কাছে ভেঙে পড়ল সে। তাড়াতাড়ি তুলে সোফায় বসালাম।

"কেন, কি হয়েছে—"

"উনি এসেছেন"

"উনি মানে?"

"আমার স্বামী। এলাহাবাদ থেকে সোজা চলে এসেছেন মোটরে—"

"কে, নিরুপমবাবু?"

"হ্যাঁ—"

"তারপর? বিক্রমবাবু কোথা"

"তিনি নিজের ঘরে শুয়ে ঘুমুচ্ছিলেন। আমি আস্তে আস্তে উঠে বেরিয়ে এসেছিলাম আপনার কাছে আসব বলে। পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে কাপড় বদলাচ্ছিলাম এমন সময়ে কে যেন হুড়মুড় করে' বিক্রমবাবুর ঘরে ঢুকল। কপাটের ফাঁক দিয়ে দেখলাম উনি। আমি আর দাঁড়ালাম না, সোজা আপনার কাছে চলে' এসেছি। আপনি বাঁচান আমাকে—"

"নিশ্চয় বাঁচাব, ভয় কি"

"আমাকে কোলকাতার বাইরে নিয়ে চলুন। এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়। উনি হয় তো খোঁজ পেয়ে এখানেও চলে' আসবেন"

"এলেই বা। এটা কি মগের মুলুক। অত ভয় পাচ্ছ কেন"

"ওঁর হাতে একটা বন্দুক দেখলুম। না, না, কমলবাবু, বড্ড ভয় করছে আমার। চলুন, পালাই এখান থেকে। এখুনি চলুন"

"এখুনি? কোথায় যাব। কোলকাতার বাইরে গিয়ে থাকব কোথায়? হোটেলে থাকাটা কি ভাল দেখাবে?

"বিক্রমবাবুর মধুপুরে বাড়ি আছে একটা। সেখানকার মালী চেনে আমাকে, একবার গিয়েছিলাম কিছুদিন। সেইখানে যাই চলুন"

"আমি সঙ্গে থাকলে কেউ আবার কিছু বলবে না তো"

"কে কি বলবে। চলুন, এই ট্যাক্সিতেই বেরিয়ে পড়ি"

একটু ইতস্তত করছিলাম তবু।

আলেয়া হঠাৎ আমার হাত দুটো ধরে অনুনয় করতে লাগল, "চলুন, চলুন, আর দেরি করবেন না"

যেতে হল। অবন্ধনার খবর রাখবার অবসরই পেলাম না।

ফিরলাম এক মাসেরও পরে। আলেয়াকে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফিরলাম। আলেয়া একটা ইঁদারার ভিতর লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছিল। এসে শুনলাম অবন্ধনাও মারা গেছে। হঠাৎ যেন রূপান্তরিত হয়ে গেল সব। রাত্রি প্রভাত হ'ল, না দিবস রাত্রিতে উত্তীর্ণ হ'ল, স্বপ্ন বাস্তব হ'ল, না বাস্তব স্বপ্নে হারিয়ে গেল—তা জানি না। সব বদলে গেল কিন্তু। মনও। দূরবীণটা বিক্রি করে' দিলাম। নূতন একটা দূরবীণ পেলাম নিজের অন্তরে। সে দূরবীণ দিয়ে দেখতে লাগলাম আলেয়াকে নয়, সুনন্দাকে। হঠাৎ একদিন খবর পেলাম অবন্ধনার রহস্যময় মৃত্যুর কারণটা পুলিশ এখনও না কি আবিষ্কার করতে পারে নি। অনুসন্ধানের ভার পড়েছে না কি শিখর সেনের উপর। প্রথমটা বিস্মিত হলাম, তারপর মনে একটু কৌতুক জাগল। শিখর সেন? মনের অবস্থা যদি পূর্ব্বের মতো থাকত তাহলে হয় তো চেষ্টা করে' শিখর সেনের সঙ্গে দেখা করতাম। কিন্তু মনের সে অবস্থা ছিল না, শিখর সেনের সঙ্গে পথেও যদি দেখা হ'ত তাহলেও হয় তো বলতাম, কিন্তু যোগাযোগ হ'ল না। তখন শিখর সেনের মানসিক অবস্থা কি ছিল তা জানতে পারছি তার ডায়েরী থেকে। শিখর সেন লিখছে—"সমস্ত দিন দ্বন্দ্ব করেছি নিজের সঙ্গে। দ্বন্দ্ব করে' ক্ষত-বিক্ষত হয়েছি। মনের মধ্যে যে নির্ম্মম বিচারক বসে' আছেন তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে এক চুলও নড়তে চান না। তাঁর সিদ্ধান্ত অবন্ধনার মৃত্যু হওয়া উচিত। ওই পাপীয়সীকে মৃত্যুদণ্ড না দিলে অনেকের মৃত্যুর কারণ হবে ও। ব্যক্তিগত মায়ামমতার স্থান নেই কোন বিচারে। তিনি যেন সমস্তক্ষণ আমার কানে কানে বলছেন—শিখর সেন, বিচলিত হ'য়ো না। সমাজের রক্ষক তুমি, যারা অসহায়, যারা অন্যায়ভাবে পীড়িত, তারা তোমার উপর বিশ্বাস করে' আছে, তুমি বিশ্বাসঘাতক হবে? এর জন্যেই কি মাইনে খাচ্ছ তুমি? এই নির্ম্মম বিচারকের সঙ্গে তর্ক করছিল আমারই মনের আর একটা অংশ। ঠিক তর্ক করছিল না, দর্শনের উচ্চ শিখরে বসে' উচ্চাঙ্গের তত্ত্বকথা আওড়াচ্ছিল। সে বলছিল, তুমিও ক্ষতদোষে-দুষ্ট মানুষ, বিচার করবার কি অধিকার আছে তোমার? মানুষ কেন পাপের পথে পা বাড়ায় তা কি তুমি জান না? সে জ্ঞান তোমার যদি হয়ে থাকে তাহলে কি তুমি শাস্তি দিতে পার? তুমি ভালবাসতে পার, ক্ষমা করতে পার—শাস্তি দিতে পার না। অবন্ধনা নিজেই হয় তো নিজেকে শাস্তি দেবে একদিন। সায়ানাইডের শিশিটা কি দেখনি সেদিন? নির্ম্মম বিচারক বললেন, ওসব কিছু দেখবার দরকার নেই আমার। আমার কর্ত্তব্য আইন-অমান্যকারীকে আদালতে হাজির করে' দেওয়া। নিতান্তই তা' যদি না পারি এমন ব্যবস্থা করা যাতে ও আর বে-আইনী কাজ না করতে পারে। ব্যক্তিগত মায়ামমতার স্থান নেই এতে। ব্যক্তিগত ঘৃণা ভালবাসার প্রকোপে যে মানুষ কর্ত্তব্য থেকে বিচলিত হয় সে মানুষ নয়, অমানুষ। নির্ব্বিকার কর্ত্তব্যপরায়ণ মানুষই মানবতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।···সমস্ত দিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি···চোখের সামনে সেই সায়ানাইডের শিশিটাও মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে বারবার, আর মাথার শিওরে টেবিলের উপর রাখা সেই জলের গ্লাসটা। সমস্ত দিন পরে পরিশ্রান্ত হয়ে যখন ফিরছিলাম তখন ভাবতে ভাবতে আসছিলাম অবন্ধনাকে আবার একবার বোঝাব ভাল করে'। কিন্তু সে সুযোগ পেলাম না। নীচে দেখলাম সেই গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে, ড্রাইভার হর্ণ দিচ্ছে, অবন্ধনা নেবে এল, আমার দিকে চেয়ে একটু মুচকি হেসে বেরিয়ে গেল।··বোর্ডিং'য়ের জানলা কপাটে রং দিচ্ছে, সিঁড়ির রেলিঙেও রং দিয়েছে···উঠতে গিয়ে হাতে রং লেগে গেল। অবন্ধনার মুচকি হাসিটা মনে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল, সোজা গিয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়, রাতে কিছু খেলামও না, খাবার প্রবৃত্তি হল না। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। সকালে চাকরটা দেখলাম জাগাচ্ছে আমাকে। সাধারণত কেউ আমাকে জাগায় না, একটু অস্বাভাবিক মনে হল। বিরক্তও হলাম।

"কিরে, ডাকছিস কেন—"

"ওপরে যে নার্স মাইজি ছিলেন, তিনি মারা গেছেন"

"মারা গেছেন? বলিস কি—"

উঠে বসলাম তড়াক করে। চাকরটা বললে, "ওঁর ঘরের কপাট তো খোলাই থাকে, আমি রোজ ভোরে গিয়ে ওঁকে চা করে' দিয়ে আসি। আজও চা করে' ওঁকে ডাকলাম, কিন্তু কোন সাড়া পেলাম না। কয়েকবার ডাকাডাকির পরও যখন সাড়া পেলাম না, কি করব ভাবছি, একটা দমকা হাওয়ায় ওঁর মুখের পাতলা চাদরটা উড়ে গেল, মুখ দেখে ভয় হল, তাড়াতাড়ি ম্যানেজারবাবুকে খবর দিলাম। তিনি তাড়াতাড়ি গেলেন, গিয়ে দেখলেন, তারপর বললেন—মারা গেছেন। আপনাকে খবর দিতে বললেন। ম্যানেজারবাবু হাউ হাউ করে' কাঁদছেন বসে'। চলুন আপনি—"

গিয়ে দেখলাম অবু সত্যিই মারা গেছে। কি রকম যেন হতভম্ব হয়ে গেলাম। আমার মনে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ সঞ্চারিত হল। নির্ম্মম বিচারক বললেন—আপদ গেছে। কিন্তু আমার আর এক 'আমি' হায় হায় করতে লাগল! অবু, আমার অবু, আর তাকে দেখতে পাব না? আর সে কথা কইবে না?

আমার আচ্ছন্ন ভাবটা যখন কেটে গেল তখন দুটি জিনিস লক্ষ্য করলাম। অবন্ধনার মাথার কাছে যে জলের গ্লাসটা আছে সেটার ঢাকা খোলা, তাতে আধ-গেলাস মাত্র

জল রয়েছে, গ্লাসের গায়ে সবুজ রঙের দাগ—যে সবুজ রং বোর্ডিংয়ের চতুর্দ্দিকে লাগানো হচ্ছে সেই রং। পাশেই সায়ানাইডের শিশিটা খোলা, তাতেও রং। ভাল করে' লক্ষ্য করে দেখলাম, গ্লাসের গায়ে আঙুলের ছাপও উঠেছে। দ্বিতীয় যে জিনিসটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল—সেটি হচ্ছে একটি সুস্পষ্ট পায়ের দাগ। অবন্ধনার ঘরের চৌকাঠের সামনে খানিকটা জায়গায় কাল বিকেলে সিমেণ্ট দেওয়া হয়েছিল। সেই সিমেণ্টের উপর পায়ের স্পষ্ট দাগ রয়েছে।

অবন্ধনার মৃত্যুর সম্বন্ধে তদন্ত করবার ভার আমিই পেয়েছি। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট থেকে নিঃসন্দেহে জানা যাচ্ছে সায়ানাইড খেয়েই ওর মৃত্যু হয়েছে। ও কি নিজে ইচ্ছে করে সায়ানাইড খেয়েছে? তাহলে সে কথাটা কি ও লিখে যেত না? কাচের গ্লাসের গায়ে কার আঙুলের ছাপ রয়েছে? অবন্ধনার ডান হাতে সামান্য একটু রং ছিল বটে, কিন্তু ওর আঙুলের ছাপের সঙ্গে গ্লাসে যে ছাপ পাওয়া যাচ্ছে তার কিছুমাত্র মিল নেই। তাছাড়া ওই পায়ের দাগটাই বা কার? বোর্ডিংয়ের অনেকেরই আঙুলের ছাপ আর পায়ের ছাপ নিয়ে পাঠিয়েছি বিশেষজ্ঞের কাছে, যারা যারা অবন্ধনার ঘরে আসত সকলেরই—ম্যানেজারের, চাকরটার, আরও তিনজনের, সেই কালোবাজারীটাকে অ্যারেষ্ট করেছি, তারও আঙুলের ছাপ পায়ের ছাপ নেওয়া হয়েছে……

রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞ লিখছেন—যে পায়ের ছাপ সিমেণ্টের উপর পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে একজনেরও পায়ের ছাপ মেলে নি। আঙুলের ছাপও নয়।

আশ্চর্য্য, কার ছাপ তাহলে ওগুলো! একটা লোকের, না একাধিক লোক ছিল? রহস্যের সমাধান কিন্তু করতেই হবে। অবন্ধনা আত্মহত্যা করে নি। ওর খাবার জলের সঙ্গে কেউ সায়ানাইড মিশিয়ে দিয়েছে। কে সে? কেনই বা দিলে? ঘর থেকে একটি জিনিস তো চুরি যায় নি। প্রণয়-ঘটিত ঈর্ষা? প্রতিহিংসা? হতে পারে। অবন্ধনা যে সমাজে ঘুরে বেড়াত সে সমাজ ভদ্র সমাজ নয়। লোকটাকে কিন্তু আমি খুঁজে বার করবই।…"

শিখর সেন যে আমারই সহায়তায় শেষকালে হত্যাকারীকে খুঁজে বার করবে ও আমার কল্পনাতীত ছিল। ডায়েরীর যে অংশটুকু উপরে উদ্ধৃত করেছি ঠিক তার পরেই আমার সঙ্গে শিখরের দেখা হয়ে গেল রাস্তায়।

"তার পর, কি খবর, অনেকদিন দেখা হয় নি তোর সঙ্গে—"

শিখর দাঁড়িয়ে পড়ল। এতক্ষণ তার চোখের দিকে তাকাই নি, তাকিয়ে নির্ব্বাক হয়ে গেলাম। অমন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি আমি আর কখনও দেখি নি। আমার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েই রইল সে, অনেকক্ষণ কোন কথাই বলল না।

"কি করছিস আজকাল—"

"আমি? কি আবার করব!"—একটু হেসে উত্তর দিলে সে—"চাকরি করছি। না, আজকাল চাকরির চেয়ে বেশী কিছু করছি! অবন্ধনা মারা গেছে শুনেছিস তো? সেই যে নার্স একটি তেতালার ঘরে থাকত—সে কে জানিস? "অবু—"

"জানি, সব শুনেছি। যে রাত্রে সে মারা যায় সেই রাত্রেই আমি কোলকাতার বাইরে চলে যাই। তার মৃত্যুর একটু আগেই বোধহয় তুই ওর ঘরে ঢুকেছিলি, না?"

"আমি? না, সেদিন ওর ঘরে আমি যাই নি তো। এসেই শুয়ে পড়েছিলাম"

"কিন্তু সেদিন রাত এগারোটার পর আমি আমার ঘরের জানলায় দূরবীণটা নিয়ে বসেছিলাম। দেখলাম তুই অবন্ধনার ঘরে ঢুকছিস। স্পষ্ট দেখলাম"

ফ্যাকাসে হয়ে গেল শিখর সেনের মুখটা। তারপর সামলে নিয়ে বললে—"ভুল দেখেছিস। আমি সেদিন তেতালায় উঠিই নি—"

তারপর হেসে বললে, "পাগল না কি! রাত্রি এগারোটার পর ওর ঘরে আমি ঢুকতে যাব কেন!"

বলেই ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ, মনে হল যেন নূতন একটা আলোকপাত হল ওর মনে। তারপর হন হন করে' চলে গেল। আমার দিকে ফিরেও চাইলে না আর।

এর দিন সাতেক পরে দেখা হল উমেশ-মামার সঙ্গে। উমেশ-মামাও পুলিসে চাকরি করতেন। তিনি যা বললেন তা সত্যিই অপ্রত্যাশিত। সেদিন যখন শিখর হন হন করে' চলে' গেল তখন আমি মনে করলাম আমার কাছে ধরা পড়ে গিয়ে অপ্রস্তুত হয়ে গেছে বেচারা, আর হয়তো জীবনে আমার সামনে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু উমেশ-মামা বললেন, ও না কি নিজে গিয়ে ধরা দিয়েছে। নিজের পায়ের ছাপ আর আঙুলের ছাপ বিশেষজ্ঞের কাছে নিজেই পাঠিয়ে ছিল, সিমেণ্টের ওপর আর গ্লাসের ওপর যে ছাপ পাওয়া গিয়েছিল, তার সঙ্গে না কি হুবহু মিলে গেছে। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

"শিখর আছে কোথায় এখন?"

"হাজতে, পুলিশের হেপাজতে। ও নিজেই ইচ্ছে করে' না কি জেলে গিয়ে ঢুকেছে। বলেছে আমার মানসিক অবস্থা এমন যে যে কোনও মুহূর্তে আমি আবার খুন করতে পারি। আমাকে জেলের বাইরে রাখা নিরাপদ নয়"

আমার নিজেকে কেমন যেন অপরাধী বোধ হ'চ্ছে







যা দিনকাল পড়েছে তাতে প্রতিটি পয়সা বুঝে না খরচ করে উপায় নেই—সংসার চালানো এক দায়। সম্প্রতি আমার স্বামীর হঠাৎ একদিন বাজার করবার শখ হলো। ফিরলেন যখন তখন আমার ত মাথায় হাত! একটা বড় ডালডা বনস্পতির টিন এনে হাজির করেছেন!

আমি কিসে দুপয়সা বাঁচে তাই ভেবে সংসারের সব জিনিষ, মায় রান্নার জন্য স্নেহপদার্থ অবধি, সস্তায় খুচরো কিনছি, আর এদিকে ব্যবসাদার স্বামী আমার কিনে আনলেন বড় একটিন ডালডা বনস্পতি। বেহিসেবী আর কাকে বলে!

কিন্তু স্বামী ঠিক কাজই ক'রেছিলেন। পরে তাঁর সব কথা শুনে বুঝলাম যে রান্নার স্নেহপদার্থ সম্বন্ধেও অনেক কিছু শেখবার আছে…

"দেখ", স্বামী বললেন, "সংসারে আমাদের কাছে আমাদের তিনটি ছেলেমেয়ের চেয়ে বড় আর কিছুই নেই। তাদের স্বাস্থ্যের দামই আমাদের কাছে সব চেয়ে বেশী। খোলা অবস্থায় খুব দামী স্নেহপদার্থেও ভেজাল চলতে পারে। তা ছাড়া তাতে ধুলোবালি ও মাছি, ময়লা পড়ার দরুণ তা দূষিত হয়ে যেতে পারে।"

"রান্নার ব্যাপারে শুধু একটি কাজ করলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, সেটি হচ্ছে শীলকরা টিনে স্নেহপদার্থ কেনা, তার ভেতর বীজাণু ঢুকতে পারে না, তাই তা সর্ব্বদা খাঁটি ও তাজা থাকে।" স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলাম "তা বেছে বেছে ডালডা বনস্পতি কিনলে কেন?" তিনি বললেন যে ডালডা বনস্পতির প্রস্তুতকারীরা বিশ বছর ধরে এই জিনিষ তৈরী করে হাত পাকিয়েছে। একেবারে উৎকৃষ্ট জিনিষ ছাড়া আর কিছুই ডালডা তৈরীর কাজে ব্যবহার হয় না। প্রতিটি জিনিষ আগে পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়, আর তা উৎকৃষ্ট না হ'লে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। ডালডা বনস্পতিতে এখন ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' দেওয়া হচ্ছে।



আপনাদের সুবিধার জন্য ডালডা বনস্পতি ১০, ৫, ২ ও ১ পাউণ্ড বায়ুরোধক শীলকরা টিনে বিক্রি করা হয়। ডালডা বনস্পতি সর্ব্বদা তাজা ও বিশুদ্ধ অবস্থায় পাবেন আর এতে সবরকম রান্নাই চমৎকার হয়, খরচও কম।

আমার স্বামী জোর দিয়েই বললেন "যে জিনিষ পেটে যায় তা নিশ্চিত বিশুদ্ধ হওয়া চাই।" আমাদের বাড়ীতে এখন শুধু ডালডা বনস্পতিই ব্যবহার হয়—আপনিও তাই করুন।

আপনার দৈনিক খাদ্যে স্নেহপদার্থের কি দরকার?

বিনামূল্যে খবর জানবার জন্য আজই লিখুন:

দি ডালডা
এ্যাডভাইসারি সার্ভিস
পোষ্ট বক্স ৩৫৩, বোম্বাই ১

ডালডা বনস্পতি

রাঁধতে ভালো - খরচ কম



গাছ মার্কা টিন দেখে কিনবেন

HVM. 211-X29 BG

লাগল। একটা কথা কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম না। ও নিজেই যদি অবন্ধনার জলের গ্লাসে বিষ মিশিয়ে থাকে তাহলে ও অন্য লোকের পায়ের ছাপ আঙুলের ছাপ নিয়ে বেড়াচ্ছিল কেন? লোকের চোখে ধূলো দিবার জন্যে? নিজের নিতান্ত ব্যক্তিগত ডাইরীতে এ সব লেখার কি দরকার ছিল তাহলে? লোকের চোখে ধূলো দেওয়াই যদি উদ্দেশ্য হ'ত তাহলে কি সে নিজেই নিজের পায়ের ছাপ আঙুলের ছাপ পরীক্ষা করাতো? আমার যা মনে হচ্ছিল তা উমেশ-মামাকে বললাম।

উমেশ-মামা বললেন, "ও বলছে, 'আমি যা করেছি তা ঘুমের ঘোরে করেছি। সজ্ঞানে করি নি।' ঘুমের ঘোরে বিছানা ছেড়ে ও আগেও না কি উঠে যেত। ওটা একটা অসুখ, সম্নাম্বুলিজ্‌ম্, না কি একটা বিদঘুটে নাম ও অসুখের" আমি নির্ব্বাক হয়ে রইলাম।

মাস দুই পরে খবর পেলাম শিখরের ফাঁসী হয়ে গেছে। শিখর নিজের স্বপক্ষে কোনও উকিল নিযুক্ত করে নি। সে কেবল বলেছিল—"অবন্ধনার মৃত্যুর জন্যে আমি দায়ী। ওর অসংখ্য দুষ্কৃতির জন্য আমি ওর মৃত্যুকামনা করেছিলাম। সজ্ঞানে ওকে মারবার সাহস বা ক্ষমতা আমার ছিল না। তাই ঘুমের ঘোরে আমি ওকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি।…"

চুপ করে' বসে' বসে' ভাবছিলাম। শিখরের কথা নয়, আলেয়ার কথা। আলেয়ার মৃত্যুর জন্যও কি আমি দায়ী নই? বাগান-বাড়ির পিছনে সেই প্রকাণ্ড ইঁদারাটা কি আমিই তাকে দেখিয়ে দিই নি? আমি কি তাকে বলিনি—"অপমানে জর্জ্জরিতা হয়ে সীতা পাতাল-প্রবেশ করেছিলেন। আধুনিক যুগের সীতাদের যদি পাতাল-প্রবেশ করতে হয় তাহলে ইঁদারায় ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, জননী বসুন্ধরা তাকে নেবার জন্যে পাতাল থেকে সিংহাসন পাঠাবেন না?" বলেছিলাম অবশ্য রসিকতা করে'। স্বপ্নেও ভাবি নি সে রসিকতা এমন মর্ম্মান্তিক সত্য হয়ে উঠবে।…কল্পনা করছিলাম দূর আকাশে এরোপ্লেন উড়ছে, বিক্রমবাবু পাইলট্‌, আলেয়া যাত্রিণী, আমাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে…

হঠাৎ দুয়ারের কড়া নড়ল। উঠে কপাট খুলে' দিলাম। দেখলাম একজন পুলিশ অফিসার দাঁড়িয়ে আছেন।

"আপনার নাম কি কমল-কিশোরবাবু?"

"হ্যাঁ, কেন"

"আপনাকে অ্যারেষ্ট করতে এসেছি। এই দেখুন ওয়ারেণ্ট। মধুপুরে আপনি কি আলেয়া দেবীর সঙ্গে ছিলেন?"

কোনও উত্তর দিতে পারলাম না।

আমার পা দুটো থর থর করে' কাঁপতে লাগল কেবল।

গল্প লেখা শেষ করিয়া কবি বাতায়নের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার কেমন যেন দুঃখ হইতেছিল। যে চরিত্রগুলি এতক্ষণ তাঁহার কল্পনাকে আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল তাহারা কোথায় যেন মিলাইয়া গেল। নিজেই তিনি সব শেষ করিয়া দিলেন। হঠাৎ লক্ষ্য করিলেন, দুইটি অপূর্ব্ব প্রজাপতি তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ভাল করিয়া দেখিবার পূর্ব্বেই তাহারা বাতায়ন পথে বাহির হইয়া গেল।

২৭

মহাসমারোহে যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছিল। মহর্ষি পর্ব্বতের তত্ত্বাবধানে সামান্যতম ত্রুটি ঘটিবারও অবকাশ ছিল না। অধ্বর্য্যু, হোতা, ব্রহ্মা, অগ্নীৎ, প্রতিপ্রস্থাতা এবং মৈত্রী-বরুণ এই ছয়জন ঋত্বিক অভিনিবেশ সহকারের স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। আহরণীয় অগ্নির পূর্ব্বদিকে যথারীতি পাশুক বেদি এবং পাশুক বেদির উপর উত্তর বেদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। অধ্বর্য্যু উত্তর বেদির নাভিতে নূতন আহরণীয় অগ্নি স্থাপনের আয়োজন করিতেছিলেন। পুরাতন আহরণীয় হইতে অগ্নি আনিয়া উত্তর বেদির নাভিতে রক্ষিত হইয়াছিল, দুইজন মন্ত্রপাঠ করিয়া অরণি ঘর্ষণে ব্যাপৃত ছিলেন। পশু বন্ধনের জন্য অষ্ট-কোন কাষ্ঠ নির্ম্মিত যূপ ইতিপূর্ব্বেই প্রোথিত হইয়াছিল, যূপের মস্তকে চষাল নামক মুকুটটি শোভা পাইতেছিল. যূপকাষ্ঠকে ঘৃতলিপ্ত করিয়া যূপাঞ্জন কর্ম্মও সম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল। যে বালকটিকে যজ্ঞের পশুরূপে মহর্ষি পর্ব্বত মনোনীত করিয়াছিলেন তাহাকে যূপকাষ্ঠে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। সে কখনও নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছিল, কখনও বা সরবে ক্রন্দন করিতেছিল, কিন্তু কেহ তাহার দিকে দৃকপাত পর্য্যন্ত করিতেছিলেন না। সুন্দরানন্দের ধর্ম্মপত্নী সর্ব্বশুক্লা দেবী যজ্ঞফলের অংশভাগিনী হইবার নিমিত্ত আসিয়াছিলেন, তিনি না আসিলে যজ্ঞ অসম্পূর্ণ হইত। সুন্দরানন্দ ও সর্ব্বশুক্লা যথাস্থানে বসিয়া ঋত্বিকগণের আদেশ পালন করিতেছিলেন। যজ্ঞের কর্ম্ম যথাবিধি চলিতেছিল। বালকের রোদন, মন্ত্রসমূহের গম্ভীর ধ্বনি, উদাত্ত সামগান যজ্ঞমণ্ডপে এক অদ্ভুত বাঙ্ময় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিল। ঘৃতাহুতির ধূমে, যজ্ঞাগ্নির শিখায়, বিবিধ উপচার সম্ভারে ঋত্বিকগণের গম্ভীর মুখমণ্ডলে যেন যুগপৎ আশা ও আশঙ্কা সূচিত হইতেছিল। একটা অসম্ভব কিছু এখনই বুঝি সম্ভব হইবে।

সর্ব্বশুক্লা দেবী প্রথমে শুনিয়াছিলেন এই যজ্ঞে নর্ত্তকী সুরঙ্গমাকে না কি আহুতি দেওয়া হইবে। সংবাদটি তাঁহাকে প্রীত করিয়াছিল। কিন্তু দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া শ্রোণীগ্রামে তাঁহার শিবিকা যখন প্রবেশ করিল তখন কুলিশপাণির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। কুলিশপাণি

তাঁহাকে লইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে তিনি শুনিলেন মহর্ষি পর্ব্বত সুরঙ্গমাকে যজ্ঞের পশুরূপে মনোনীত করেন নাই। এক অসহায় শবর-বালককে সেজন্য না কি কিনিয়া আনা হইয়াছে। কুলিশপাণির সহিত এ বিষয় তাঁহার কিছু আলোচনাও হইয়াছিল। এ সংবাদে তাঁহার মনের ভিতর কি হইতেছিল তাহা জানিবার উপায় ছিল না, তাঁহার মুখভাবেও কোন পরিবর্ত্তন কেহ লক্ষ্য করেন নাই। রাজকুলবধূর মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বামীর পার্শ্বে যজ্ঞস্থলে তিনি শান্তমুখে বসিয়াছিলেন। তাঁহার সীমন্তের সিন্দুর-রাগ, তাঁহার ক্ষৌম বসনের দ্যুতি, তাঁহার অনবদ্য গম্ভীর সৌন্দর্য্য যজ্ঞস্থলের শোভা বৃদ্ধি করিতেছিল।

একাদশ দেবতার উদ্দেশ্যে একাদশটি প্রযাজ দিতে হয়। প্রথম দশটি প্রযাজে আহুতির উপকরণ আজ্য অর্থাৎ ঘৃত। একাদশ প্রযাজে আহুতির উপকরণ নিহত পশুর বপা অর্থাৎ উদরের অভ্যন্তরস্থিত চর্ব্বি। দশম দেবতা বনস্পতির উদ্দেশ্যে হোতা যখন আপ্রী মন্ত্র পাঠ করিতেছিলেন তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই বাহিরে পশুবধের আয়োজন চলিতেছিল। শমিতা (পশুঘাতক) মশাল হস্তে সেই বালককে প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন। এমন সময় অতিশয় দ্রুতবেগে, প্রায় ছুটিতে ছুটিতে, কুলিশপাণি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নাটকীয় ভঙ্গীতে প্রশ্ন করিলেন, "কুমার কোথায়—?"

"যজ্ঞস্থলে আছেন। বনস্পতির আহুতি দেওয়া হচ্ছে। এইবার হোতা আমাকে এসে পশুবধে নিয়োগ করবেন। কুমারও সঙ্গে থাকবেন। একটু অপেক্ষা করুন। আপনাকে বড় উত্তেজিত মনে হচ্ছে, ব্যাপার কি—"

"অতিশয় শোকাবহ। কুমারের সঙ্গে এখনই দেখা করা দরকার" তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে অধ্বর্য্যু, অগ্নীৎ, মহর্ষি পর্ব্বত এবং কুমার যজ্ঞস্থল হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

কুলিশপাণি অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "কুমার, একটি দুঃসংবাদ বহন করে' এনেছি—"

তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল।

"দুঃসংবাদ? কি দুঃসংবাদ—"

"নর্ত্তকী সুরঙ্গমা মারা গেছে"

"সুরঙ্গমা মারা গেছে? কি করে'?"

কুলিশপাণি বলিলেন, "আপনারা যজ্ঞে ব্যস্ত ছিলেন, আমি বনের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে কিছু সৈন্য নিয়ে প্রহরায় নিযুক্ত ছিলাম। খবর পেয়েছিলাম শবর-পল্লী থেকে কিছু শবর যুবক এসে এই যজ্ঞে বাধা সৃষ্টি করবে। হঠাৎ দেখতে পেলাম একটা ঝোপের অন্তরালে কি যেন নড়ছে। আশঙ্কা হল হয়তো কেউ লুকিয়ে আছে। কাছে একটা গাছ ছিল। লক্ষ্য করবার সুবিধা হবে বলে সেই গাছে উঠলাম। উঠে দেখলাম—যা দেখলাম তা ব্যক্ত করতে কুণ্ঠিত হচ্ছি। বিশেষত এ সময়ে—"

কুলিশপাণি ইতস্তত করিতে লাগিলেন।

কুমার বলিলেন, "নষ্ট করবার মতো সময় হাতে নেই। যা বলতে চাও অবিলম্বে বলে' ফেল"

"দেখলাম সুরঙ্গমা চার্ব্বাকের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে, আর চার্ব্বাক মাঝে মাঝে তাকে চুম্বন করছে। চার্ব্বাককে জীবিত বা মৃত ধরে' আনবার আদেশ আপনি আমাকে দিয়েছিলেন। এই দৃশ্য দেখে রাগে আমার শরীরের রক্ত টগবগ ক'রে ফুটে উঠল। আমার সঙ্গে খুব তীক্ষ্ণ একটা ছোরা ছিল। চার্ব্বাককে লক্ষ্য করে' সেটা নিক্ষেপ করলাম। কিন্তু সেটা লাগল গিয়ে সুরঙ্গমার বুকে। সুরঙ্গমা আর্ত্তনাদ করে' উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আমি গাছ থেকে লাফিয়ে পড়লাম। লাফিয়ে পড়বামাত্র চার্ব্বাক ব্যাঘ্র-বিক্রমে এসে আমাকে আক্রমণ করলে। সুতরাং তাকেও হত্যা করতে হল।"

মহর্ষি পর্ব্বত বলিলেন—"বৎস, তুমি দীর্ঘজীবী হও" সর্ব্বশুক্লাও স্বামীর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহার অধরে ও নয়নে ক্ষণিকের জন্য একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। কুলিশপাণি আগাইয়া আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। কেবল সুন্দরানন্দের মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না, তিনি প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

২৮

এক নির্জ্জন ঊষর প্রান্তর প্রখর সূর্য্যালোকে দ্যুতিমান হইয়া উঠিয়াছিল। মনে হইতেছিল যেন এক ক্ষুধার্ত্ত দীপ্তি চতুর্দ্দিকে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। কোথাও কোন শব্দ নাই, কোমলতা নাই, স্নিগ্ধতা নাই, দুঃসহ উজ্জ্বলতা ছাড়া আর কিছুই যেন নাই। আকাশে বাতাসে সেই নির্ম্মম স্বর্ণ-দীপ্তির সমুজ্জ্বল প্রদাহ যেন নিঃশব্দ জ্বালা রূপে জ্বলিতেছিল।

ধীরে ধীরে আকাশ হইতে যুগল দেবতা অবতীর্ণ হইলেন। একজন রূপবান পুরুষ, আর একজন রূপবতী নারী। মনে হইল মণি আর কাঞ্চন যেন মানবদেহ ধারণ করিয়াছে। কিছুক্ষণ কেহই কোন কথা বলিলেন না। কিন্তু একটি আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটিল। তাঁহাদের চরণস্পর্শে সেই ঊষর প্রান্তর ধীরে ধীরে শ্যামল হইয়া উঠিল।

পুরুষটি তখন বলিলেন, "বাণী, ঊষর প্রান্তরের মৃত্যু হল, জাগল শ্যামলতা, জন্ম নিল নূতন লোক। এই ঊষরতার তৃষিত মর্ম্মলোকে বসে' তুমি এতদিন যে আবির্ভাব কামনা করেছিলে তাই হয়তো মূর্ত্ত হ'ল। হ'ল কি?"

বাণীর নয়নের দৃষ্টি হাস্য-দীপ্ত হইয়া উঠিল। মণি হইতে যেন আলোক বিচ্ছুরিত হইল।

"হ'ল না"

"জানি হ'ল না। কোন দিন হবেও না বোধহয়। তাই এই শ্যামল প্রান্তরকে মরতে হবে আবার, জন্ম নিতে হবে আবার নূতন লোকে"

"যাদের নিয়ে আমরা এতক্ষণ ছিলাম তাদের কি হল"

"ওরাও নব-জন্মলাভ করতে চলেছে নূতন লোকে, নূতন পথে। ওই দেখ—"

"আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না"

"সূর্য্যটাকে নিবিয়ে দিই তাহলে খানিকক্ষণের জন্য"

পিতামহ একমুষ্টি ধূলি তুলিয়া লইয়া সূর্য্যের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া গেল।

পিতামহ আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"ওই দেখ, ওরা সব চলেছে ছায়াপথ ধরে'। ওই নিঃসঙ্গ উজ্জ্বল একক নক্ষত্রটি চার্ব্বাক, আর তাকে ঘিরে আছে যে নীহারিকা-পুঞ্জ তা হচ্ছে ওর স্বপ্ন, ওর কৌতূহল, ওর নাস্তিকতা, ওর অবচেতন মানসের কামনারাশি। বাঁদিকে যে নক্ষত্রগুচ্ছটি দেখতে পাচ্ছ, ওরা কে জান? মেঘমালতী, বর্ণমালিনী, সুরঙ্গমা, ধারামতী, নীলোৎপলা, তানে, অবন্ধনা আর আলেয়া। ওরা পরস্পর কেউ কাউকে চেনে না, একজনের কাছ থেকে আর একজনের দূরত্ব বহুকোটি যোজন, কিন্তু ওদের লক্ষ্য এক, তাই ওরা একগুচ্ছে ধরা পড়েছে। ওই দেখ সপ্তর্ষির নীচে কদ্রু, বিনতা আর গরুড়কে। কদ্রুর সর্প সন্তানরাও নব-রূপ ধরেছে ওই দেখ। ওদের ডান দিকে একটু নীচেই শুরু হয়েছে নূতন আকাশ-গঙ্গা, তার তরঙ্গে ভেসে চলেছে সুন্দরানন্দ, কুলিশপাণি, কালকূট, কমল-কিশোর, শিখর সেন আর বিক্রম। আর একটু দূরে ওই দেখ নিরুপম, মহাশকুন্ত আর গুণপতি। ওরা গঙ্গার স্রোতে ভাসে নি, ভাসতে পারেনি, তীরে দাঁড়িয়ে দেখছে শুধু। আর একটু দূরে ওই ছোট নক্ষত্রটীকে চিনতে পারছ? শিখরের মামা কয়াধুনাথ। তার পাশে দপ দপ করে জ্বলছে আগামী যুগের কবি। সব আছে, কেউ হারায় নি, কেউ হারায় না। ওদের নূতন জীবন-নাটকের নূতন দৃশ্য আবার রচনা করতে হবে আমাদের। চল—"

সহসা তাঁহারা দুইটি অপরূপ বিহঙ্গমে রূপান্তরিত হইয়া মহাকাশের দিকে পক্ষ-বিস্তার করিলেন। তাঁহাদের মিলিত কণ্ঠে আনন্দিত কাকলী ধ্বনিত হইল। সে কাকলী যেন বলিতে লাগিল—শেষ নেই, শেষ নেই, শেষ নেই, শেষ নেই।···

সমাপ্ত

পাট ও পীঠ

চন্দন গুপ্ত

সরোজ মুখার্জ্জি প্রযোজিত 'না' সম্প্রতি বিভিন্ন চিত্র-গৃহে প্রদর্শিত হইয়াছে। 'না' কথা-চিত্রের কাহিনী রচনা করিয়াছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। জমিদার তাঁর পুত্র ও ভাগিনেয়র বিবাহের জন্য পাত্রী নির্ব্বাচন করিতে পাঠান, নিজের পুত্র ও ভাগিনেয়কে। এই পুত্র ও ভাগিনেয় প্রায় সমবয়সী এবং বন্ধু-প্রতিম। জমিদার বাড়ীর রেওয়াজ, পাত্র নিজে তার স্ত্রীকে পছন্দ করিতে পারিবে না। তাই ঠিক হয়, পুত্র যাইবে তার পিস্‌তুতো ভাইয়ের বৌ দেখিতে, আর পিস্‌তুতো ভাই যাইবে তাহার মামাত ভাইয়ের বৌ দেখিতে। এই পাত্রী নির্ব্বাচনকে কেন্দ্র করিয়াই নাটকের মূলসূত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। জমিদার-পুত্র অল্প-শিক্ষিত—সামান্য লেখা-পড়া জানে মাত্র। কিন্তু ভাগিনেয় উচ্চশিক্ষিত। একটি বেনামী পত্র-দ্বারা ভাগিনেয় সবকিছু বানচাল করিয়া দেয় এবং পিস্‌তুতো ভাইয়ের জন্য সে যে মেয়ে দেখিতে গিয়াছিল তাহাকেই বিবাহ করিয়া সে অভিষ্ট সিদ্ধ করে। অপরদিকে জমিদার-পুত্র পিস্‌তুতো ভাইয়ের জন্য যে মেয়েটীকে দেখিতে গিয়াছিল সেই উচ্চশিক্ষিতা মেয়েটীর সহিতই শেষে তাহার বিবাহ হয়। একটা কিছু ঘটনার জন্যই যেন এইরূপ কিছু করা হইয়াছে। বাস্তবের সঙ্গে ইহার মিল না থাকিলেও পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি এই ব্যাপারকেই কেন্দ্র করিয়া একটি সুষ্ঠু নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে। যাহার ফলে, বহু ঘটনাচক্রের মধ্য দিয়া কাহিনী পরিণতির দিকে স্বাভাবিকভাবেই আগাইয়া গিয়াছে। কিন্তু যে চিঠির উপর এই কাহিনী গড়িয়া উঠিল সেই চিঠির সম্পর্কে কোনরূপ অনুসন্ধান হইল না। কে এই উড়ো চিঠি দিল? কোথা হইতে আসিল—জমিদার তাহা জানিবার চেষ্টা করিলেন না। অথচ জমিদারের চরিত্র যে ভাবে চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে এই এত বড় ব্যাপারটি তাঁহার পক্ষে নীরবে হজম করা বড়ই বিস্ময়কর। মোট কথা, জোড়া-তালি দিয়া চিঠির কথা চাপা দিয়া অন্যান্য ঘটনায় আসা হইয়াছে। চিত্র-নাট্য রচনার সময় একটু সতর্কতা অবলম্বন করিলে এই দৌর্ব্বল্য কাটাইয়া ওঠা যাইত। কাহিনীতে অসংখ্য নাটকীয় ঘটনার সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং বহু বিচিত্র-চরিত্রের সমাবেশ হওয়ায় আলোচ্য চিত্রটি উপভোগ্য হইয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও একথা বলিতে আমরা বাধ্য হইতেছি যে, বিচারের দৃশ্য সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। একটি মাত্র ক্ষুদ্র 'না' বলায় অতবড় মামলার নিষ্পত্তি হইতে পারে না। কেননা, মামলা যেখানে দায়রায় উঠিয়াছে সেখানে নিম্ন-আদালত ঘুরিয়া তবে দায়রায় আসিয়াছে। সরকারী উকিলের সওয়ালের পর কোন সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রাহ্য হইতে পারে না। কাহিনীর বৈচিত্র্যের কাছে চিত্র-নাট্যের দুর্ব্বলতা বিশেষভাবে চোখে পড়ে। পরিচালক কোন মারপ্যাচের মধ্যে না গিয়া গল্পটি সোজাসুজি বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ছবির যান্ত্রিক কাজ বৈশিষ্ট্য-বর্জ্জিত। অভিনয়ের কথা বলিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে সন্ধ্যারাণী ও বিকাশ রায়ের কথা উল্লেখ করিতে হয়। উভয়ের অভিনয় মাধুর্য্যে সমগ্র ছবিটি প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। রবীন মজুমদারের অভিনয় আমাদের আদৌ তৃপ্তিদান করে নাই। অন্যান্য



"না" চিত্রে হরিধন ও ছবি বিশ্বাস

ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস, মলিনা দেবী, রেখা চ্যাটার্জ্জি, জহর গাঙ্গুলী ও পদ্মা দেবী যথাযথ অভিনয় করিয়াছেন। হরিধন মুখোপাধ্যায়ের ঘটক কেবলমাত্র মাত্রাজ্ঞানবর্জ্জিত নয়—সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। শচীন গুপ্ত গায়ক হিসাবে যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন আলোচ্য চিত্রের সঙ্গীত-পরিচালক হিসাবে তাঁহার সে খ্যাতি অধিকতর বৃদ্ধিলাভ করিবে বলিয়া আমরা আশা করি।

*　　*　　*　　*

মুভি টেক্‌নিকের 'প্রফুল্ল' সম্প্রতি মুক্তিলাভ করিয়াছে। মহাকবি গিরিশচন্দ্রের এই সর্ব্বজন-পরিচিত নাটকটি ইতিপূর্ব্বেও চিত্রে রূপায়িত হইয়াছিল। মঞ্চে আজও এ নাটকের যথেষ্ট সমাদর রহিয়াছে। তাহার প্রথম এবং



"মা" ও প্রফুল্ল" চিত্রের দুটি বিশিষ্ট ভূমিকার অভিনেতা বিকাশ রায়
ফটো : কালীশ মুখোপাধ্যায়

প্রধান কারণ বাংলার নাট্যশালা আজও 'প্রফুল্ল'র প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। আলোচ্য নাটকের প্রত্যেকটি চরিত্র গার্হস্থ্য জীবনে আজিও আমরা প্রত্যক্ষ করি। কাজেকাজেই 'প্রফুল্ল' আমাদের নিকট আদরণীয় হইয়া আছে। জীবনের প্রতিচ্ছবিই—নাটকের প্রাণ-বস্তু। যে নাটকে মানবীয়-জীবনের আবেদন নাই, সে নাটক কখনই স্থায়ী আসন লাভ করিতে পারে না। কাজেকাজেই নাট্য-রচনার ক্ষেত্রে মানুষের জীবনের প্রকৃত ছাপ থাকার একান্ত প্রয়োজন। গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' একদিকে যেমন সিদ্ধ-রসসমন্বিত, অপর দিকে তেমনি সর্ব্বপ্রকার নাটকীয় সদ্‌গুণের অধিকারী। কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঘটনা আজ পুরাতন। সে যুগের আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি আজ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত।

পূর্ব্বেকার চিত্র-রূপায়িত 'প্রফুল্ল' অপেক্ষা মুভি টেক্‌নিক প্রযোজিত বর্ত্তমানের 'প্রফুল্ল' বহুলাংশে উন্নততর একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। 'প্রফুল্ল'র ন্যায় সুবৃহৎ ও ঘটনাবহুল নাটককে চিত্র-নাট্যে রূপান্তরিত করা দুরূহ কাজ। চিত্র-নাট্য রচনার কাজে পরিচালক চিত্ত বসু নিষ্ঠার পরিচয় দিলেও তিনি কয়েক জায়গায় যেমন গিরিশচন্দ্রের কয়েকটি অমর সংলাপ বাদ দিয়াছেন। অপর দিকে তেমনি কয়েকটি অতিরিক্ত কিছু দেখানর আশায় মূল নাটকের



প্রফুল্ল কথা-চিত্রে উমাসুন্দরীর ভূমিকায় সুপ্রভা মুখার্জী ও প্রফুল্লর ভূমিকায় সন্ধ্যারাণী

বুকে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। সংলাপ সম্পর্কে আমরা বলিতে পারি "মা তুমি রত্নগর্ভা, তোমার একছেলে মাতাল, একছেলে উকিল, একছেলে চোর" ইত্যাদি এবং উমাসুন্দরী যোগেশকে শান্ত করিবার জন্য যেখানে বলেন—'গিয়েছে আবার হবে বাবা।' যোগেশ তার উত্তরে বলেন—"কি গিয়েছে, কি হবে মা! টাকা গেলে টাকা হয়, কিন্তু আজ যে আমার নাম গিয়েছে মা।" এ সংলাপগুলি 'প্রফুল্ল'র ন্যায় সর্ব্বজন-পরিচিত কাহিনীতে সংযোজিত হওয়া উচিত ছিল। কয়েকটি দৃশ্যের বাড়াবাড়ি অত্যন্ত চোখে ঠেকিয়াছে যেমন—রমেশ দারোয়ানের সাহায্যে যোগেশকে

বাড়ী হইতে মারিয়া বাহির করিয়া দিতেছে। নাটকে আছে রমেশই ধাক্কা মারে। যোগেশের ন্যায় স্নেহবৎসল জ্যেষ্ঠের গায়ে হাত দেওয়াই নাটকের পক্ষে যথেষ্ট। ইহার জন্য দারোয়ানকে হুকুম দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। নাটকে আছে, জ্ঞানদা রাস্তায় পড়িয়া মরিতেছে। সেই রাস্তার মৃত্যুকে—গিরিশচন্দ্র অবস্থা বিপর্য্যয়ের মৃত্যু-রূপে দেখাইয়াছেন। আলোচ্য চিত্র-নাট্যে উহার সহিত দুর্ঘটনাও চিত্রিত করা হইয়াছে। এইগুলি সংযোজিত হওয়ায় মূল-নাটকের গতি ও প্রকৃতিকে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে।

অভিনয়ের কথা বলিতে গেলে, সর্ব্বাগ্রে জগমণির ভূমিকায় রাণীবালা ও মদন ঘোষের ভূমিকায় তুলসী চক্রবর্ত্তীর নাম উল্লেখ করিতে হয়। যোগেশের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস বিশেষ কোন কৃতিত্বের পরিচয় না দিলেও, তিনি মোটামুটি চরিত্রানুগ রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 'প্রফুল্ল'র ভূমিকায় সন্ধ্যারাণী সুঅভিনয় ও সংযমের দ্বারা চরিত্রটিকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছেন। রমেশের ভূমিকায় বিকাশ রায় যথাযথ রূপদান করিয়াছেন। অন্যান্য চরিত্রগুলির অভিনয় অনুল্লেখ্য। কাঙ্গালীচরণের ভূমিকা নির্ব্বাচনে অদূরদর্শিতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। সঙ্গীত পরিচালক কালিপদ সেন পুরাতন সুরগুলিকে যথাযথ বজায় রাখিয়া সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। শব্দ ও চিত্রগ্রহণের কাজ অতিসাধারণ।

* * * *

ফিল্ম রিফর্ম কমিটি অভিযোগ করিয়াছেন যে, ছবি সেন্সর করার সময় যে সকল অংশ কাটিয়া বাদ দেওয়া হয় অনেকে নাকি সেই বাতিল অংশ পরে জুড়িয়া দিয়া প্রদর্শন করিয়াছে। এতদ্‌সম্পর্কে গত ১৫ই মে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরদাস জালানের সভাপতিত্বে রাইটার্স বিল্ডিংস্-এ এক সভা হয়। স্বাস্থ্য-বিষয়ক ছবির নামে এক প্রকার নগ্নচিত্র প্রদর্শনের নিন্দা করিয়া বলা হয় যে, এই সকল চিত্র কেবলমাত্র চিকিৎসা-ব্যবসায়ীদের মধ্যেই যেন সীমাবদ্ধ থাকে।

* * * *

বর্ত্তমান বৎসরের শেষাশেষি সঙ্গীত নাটক একাডেমীর উদ্যোগে দিল্লীতে নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ভাষার বারোখানি নাটক অভিনয়ের আয়োজন করা হইবে। জানা গিয়াছে, এতদুদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রদেশকে নাটকাভিনয় করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হইবে। অনুমান করা হইতেছে, এই অনুষ্ঠানে প্রায় ৬৫ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। এই ব্যয়ের কিছু অংশ অবশ্য টিকিট বিক্রয়ের দ্বারা পাওয়া যাইবে এবং বাকী কিছু অংশ একাডেমী দিবেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য গ্রহণ করা ঠিক হইয়াছে। পৃষ্ঠপোষক, অনুগ্রাহক এবং অপর তিন শ্রেণীর সদস্য গ্রহণের জন্য ৫০০৲ ২০১৲ ৫০৲ ও ২৫৲ টাকা চাঁদা ধার্য্য করা হইয়াছে।

* * * *

সেনী সঙ্গীত সমাজ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় কুমারী রেখা সেনগুপ্তা তারাণা ও বাউল গানে প্রথম ও



কুমারী রেখা সেনগুপ্তা

ভাটিয়ালী গানে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। কুমারী রেখা অমৃতবাজার পত্রিকা ও যুগান্তরের ফটোগ্রাফার শ্রীপান্না সেনের ছাত্রী।



চিত্রনাট্য

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

চিত্রনাট্য নইলে সিনেমার ছবি বা গল্প হয় না, এটি হোলো সারা পৃথিবীর ফিল্মরাজ্যের একটা অকাট্য স্বতসিদ্ধ। কিন্তু বাংলা দেশের সিনেমায় ছবির যাঁরা ভাগ্যবিধাতা তাঁরা এই স্বতসিদ্ধের ব্যতিক্রম। ছবি দেখতে গিয়ে টাইটল-কার্ড বা পরিচয় লিপিতে একটা কথা নিশ্চয়ই আপনাদের চোখ এড়িয়ে যায় না। কথাটি হোলো : চিত্রনাট্য বা চিত্রনাট্যকার। প্রতিটি ছবিতেই চিত্রনাট্যকারের নাম বেশ বড় বড় হরফে লেখা থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যিনি পরিচালক, চিত্রনাট্যকার হিসেবে তাঁরই নাম দেখা যায়। তবু এ কথা নিঃসংশয়েই বলা চলে যে শতকরা অন্ততঃ ৯০টী ক্ষেত্রে এই নাট্যকার ব্যক্তিটীর কোন অস্তিত্বই নেই। অনেকটা অলঙ্কার হিসেবে একজনকে এই গৌরবের ভাগী করা হয়। আসল ব্যাপারটা সুইজারল্যাণ্ডের নৌ-সচিবের মতই অস্তিত্বহীন।

ঠিক এই কারণেই, ইংল্যাণ্ডে এবং আমেরিকায় যখন চিত্রনাট্য রচনার নিত্য নূতন পন্থা ও পদ্ধতির দিকে মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে, দীর্ঘ কাহিনী, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উপন্যাসকে সংক্ষেপে অথচ সর্ব্বরসপুষ্টভাবে চিত্ররূপ দেবার জন্যে নানাবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে, তখন আমাদের দেশে এক একটী ছোট গল্পের চিত্ররূপ দিতেই বার হাজার থেকে ১৪ হাজার ফীট ফিল্ম (সম্পাদকের কাঁচি চালানোর পর) লাগছে।

বাংলা দেশে ফিল্মশিল্পের আজ চরম দুর্দ্দিন। নানা কারণে তার মুনাফার অঙ্ক কমে গেছে। ফলে ছবি তৈরীর খরচা কমাবার জন্যে প্রযোজক এবং পরিচালকরা নাকি উঠে পড়ে লেগেছেন। তাঁদের সবিনয়ে এই কথাটি স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার যে একটী সুসম্বদ্ধ, সুলিখিত চিত্রনাট্যই হোলো ব্যয় সংক্ষেপের অমোঘ অস্ত্র। নইলে শুধু শিল্পীদের বা গল্প লেখকদের পারিশ্রমিকের অঙ্ক কমিয়ে ও স্বপ্নকে রূপ দেওয়া যায় না।

এ সব কথা যে আমাদের চিত্রপ্রযোজক বা পরিচালকরা জানেন না তা নয়। জানেন তাঁরা সবই। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে যে ব্যবস্থাটা চলিত হয়ে আছে সেটি সম্পূর্ণ অন্যরকম। একটা কাহিনী যদি মনোনীত হোলো, সঙ্গে সঙ্গে পরিচালক যেটাকে সংখ্যানুক্রমিক কয়েকটা দৃশ্যে ভাগ করে ফেললেন। এটার নাম হোলো Sequence of events —ঘটনার ধারাবাহিক পঞ্জিকাও বলতে পারেন। তারপর যদি কাহিনী-কারকে পাওয়া গেল ভালই, নয়তো অপর একজন লেখককে মূল কাহিনী এবং সেই ঘটনাপঞ্জি দিয়ে বলা হোলো, খুব তাড়াতাড়ি সংলাপ বসিয়ে ফেলুন। মুখে মুখে একটু আলোচনা করে হয়তো লেখককে বুঝিয়ে দিলেন কোন্ দৃশ্যটি তিনি কি রকমভাবে ফলিয়ে বা ফুটিয়ে তুলতে চান। ব্যস, ওই পর্য্যন্ত। মাসখানেক পরে লেখক সংলাপের খাতা নিয়ে ফিরে এলেন। পরিচালক, প্রযোজকরা শুনলেন। হয়তো দু একটা দৃশ্য অদল-বদল করবার নির্দ্দেশ দেওয়া হোলো। দিন কয়েক পরে লেখক তাঁর সংলাপের খাতায় পরিমার্জ্জিত সংস্করণ এনে পেশ করলেন পরিচালকের দরবারে। শুটিংএর দিন স্থির হোলো। শিল্পী নির্ব্বাচন সুরু হোলো। টাকার যদি অভাব না থাকে তাহলে এরপর বাংলা ছবির কাজ সুরু হতে দেরী হবার কথা নয়।

শুটিং-এর সময় পরিচালক দৃশ্যগুলিকে খণ্ডদৃশ্যে (Shots) ভাগ করে ফেললেন। আলোকচিত্র শিল্পীকে ডেকে বুঝিয়ে দিলেন কোন্‌টা long shot, কোন্‌টা 'mid close, কোনটা close up, কোন্ খানটায় 'প্যান' বা কোনখানে 'ট্রাক'…

আলোকচিত্রশিল্পীকে এই খণ্ডদৃশ্য বা shot সাধারণতঃ শুটিং-এর দিনই বুঝিয়ে দেওয়া রীতি। ফলে আলোকচিত্রশিল্পী বা ক্যামেরাম্যান খণ্ডদৃশ্যটীকে রূপায়িত করবার জন্যে সময় পেলেন হয়তো এক ঘণ্টা। এরি মধ্যে তাকে হয়তো long shot থেকে mid close-এ যেতে হবে। অর্থাৎ দীর্ঘ একটী ক্ষেত্র ছেড়ে চলে আসতে হবে অপেক্ষাকৃত অল্পপরিসরের মধ্যে। এই ক্ষেত্র পরিবর্ত্তন (Shifting of zones) যে কি রকম কঠিন এবং সময় সাপেক্ষ তা যাঁদের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা নেই তাদের বোঝান শক্ত। এর জন্যে পাঁচ দশ হাজার কিলোওয়াট আলো-গুলিকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা সরাতে হয়, দৃশ্যের সাজ-সজ্জা ও সরঞ্জাম (properties) প্রয়োজনমত কাছে বা দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়। মোটের ওপর টেকনিসিয়ানদের প্রায় সকলকেই কিছুক্ষণ প্রাণান্তকর পরিশ্রম করতে হয়। আগে থেকে ক্যামেরাম্যানের যদি এই খণ্ড দৃশ্যটী কল্পনা করা থাকে তা হলে কাজটা কিছু সহজসাধ্য হতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আলোকচিত্রশিল্পীকে এই ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই সব কিছু করে ফেলতে হয়। এর পর শিল্পীরা এসে সেট-এ দাঁড়ান। বার তিনেক sound এবং ক্যামেরার রিহার্সাল চলে। তার পরেই 'টেক' বা ছবি তোলা ও সেই সঙ্গে সংলাপটুকু শব্দ যন্ত্রে ধরে রাখা।

এমনি করে ছবি তোলা একদিন শেষ হয়। মোট ছবিখানি যে কত ফুটে গিয়ে দাঁড়াবে তার আনুমানিক হিসেব পর্য্যন্ত তখন করা শক্ত। কারণ সম্পাদনা বাকি এবং বিনাচিত্রনাট্যেই ছবিখানি তোলা হয়েছে। সে যাই হোক, এই ভাবে চিত্রগ্রহণ, তারপর সম্পাদনা প্রভৃতির পালা চুকলে ছবির পরিচয় লিপিতে পরিচালকই চিত্রনাট্যকার হিসেবে সগৌরবে তাঁর নিজের নাম জুড়ে দেন—বিশেষ যদি সংলাপ রচনা করে থাকেন বাইরের কোন লোক। মূলকাহিনীকার স্বয়ং যদি সংলাপ লেখেন এবং সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর যদি নাম এবং দাম দুই থাকে তা হলে অবশ্য এর ব্যতিক্রম ঘটে। তখন চিত্রনাট্যকার হিসেবে তাঁর নামই হয়তো পরিচয় লিপিতে স্থান পায়। কখনও নিছক সংলাপ লেখককেই চিত্র-নাট্যকার হিসেবে চালিয়ে দেওয়া হয়।

এই কথাগুলি সবিস্তার উল্লেখ করবার কারণ, কাহিনী বা সংলাপ রচনা কিংবা দৃশ্যগুলিকে খণ্ডদৃশ্যে বিভক্ত করা…এর কোনটিই চিত্রনাট্য নয়। অন্ততঃ হলিউড, ইংল্যাণ্ড অথবা রাশিয়ায় নয়।

খাঁটি চিত্রনাট্য সম্পূর্ণ আলাদা জাতের জিনিষ। এটি কেবল কাহিনীর নাট্যরূপও নয়, চিত্ররূপও নয়। চিত্র এবং নাট্য, ছবি আর সংলাপ, চোখ আর কর্ণে, হৃদয় এবং মস্তিষ্কে…সমস্ত মিলে ছবির পর্দ্দায় কাহিনীটি দর্শকের কাছে যে অখণ্ড রসরূপ ধারণ করে হাজির হবে, সত্যিকার চিত্রনাট্য তাঁরই একটা নিখুঁত ছক্। একাধারে অল্প এবং চারুশিল্প দুই অথবা কারিগরি বিদ্যা (technical knowledge) এবং সাহিত্য ও নাট্য রস বোধের অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সুকৌশল সমন্বয় ও প্রয়োগ। চিত্রনাট্যকার সমস্ত কাহিনীটিকে নাটকাকারে পরিবর্দ্ধিত করেই ক্ষান্ত হবেন না, কোন্ দৃশ্যটি, কি ভাবে আরম্ভ ও শেষ হবে এমনকি কোন্ খণ্ড দৃশ্যের আনুমানিক দৈর্ঘ্য কতখানি, কোথায় প্যান বা ট্রাক তাও তাঁকে বলে দিতে হবে।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ যে ভাবে ছবি তোলা বা তথাকথিত চিত্রনাট্য রচনা করা হয় তার সঙ্গে প্রকৃত চিত্রনাট্য রচনার পদ্ধতির

বাংলা ছবির ত্রুটির কারণটুকু বোঝা সহজ হবে। ওসব দেশে বড় বড় প্রযোজকদের 'উইনিটে' সিনারিও ডিপার্টমেণ্ট, Scripe ডিপার্টমেণ্ট ডায়লগ বা সংলাপ ডিপার্টমেণ্ট বলে আলাদা আলাদা কতকগুলি দপ্তর থাকে। ক্যামেরা, সাউণ্ড এসবের জন্তে আলাদা দপ্তর তো থাকেই। প্রযোজক বা ষ্টুডিওর মালিকরা নিজেদের পছন্দ বা রুচিমত গল্প কেনেন। তারপর সমস্ত বিভাগের কর্মীদের নিয়ে একটি প্রাথমিক আলোচনা বৈঠক বসে। গল্পটা সকলের সামনে পড়া হয়, অথবা সকলকে পড়তে দেওয়া হয়। পড়া শেষ হলে সুরু হয় আলোচনা। গল্পটির দোষ ত্রুটি বিশ্লেষণ করাই এই আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। চিত্রশিল্পী থেকে সুরু করে চিত্রনাট্যকার, পরিচালক সবাই নিজের নিজের দিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখেন যে এই কাহিনীর সম্ভাবনা কতটুকু বা কতখানি এবং কোন্ দিক থেকে। তারপর আলোচনা বৈঠকের সদস্য সংখ্যা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হতে থাকে। গল্পটার সম্বন্ধে সকলের মোটা-মুটি একটা সমর্থন পাওয়া গেলে প্রযোজক, আলোকচিত্রকর, শব্দযন্ত্রী আসর থেকে বিদেয় নেন, কারণ তখন আর তাঁদের করণীয় কিছু নেই। কেবল প্রযোজক হয়তো যাবার সময় পরিচালকের পিঠ চাপড়ে হাসতে হাসতে বলে যান; দেখো হে, দেড় লাখ পাউণ্ডের বেশী খরচ করবো না। কাঠামোটা যেন সেই হিসেবের মধ্যে থাকে।

এবার বাকি থাকেন তিনজন পরিচালক, চিত্রনাট্যকার এবং সংলাপ লেখক। আগেই বলেছি আমাদের দেশে অনেক সময় শুধু সংলাপ লিখেও অনেকে চিত্রনাট্যকার বলে পরিচয় দেন। কিন্তু ইংলণ্ডে, আমেরিকায় বা রাশিয়ায় সংলাপ-লেখককে চিত্রনাট্যকার বলা হয় না। যিনি চিত্রনাট্য রচনা করেন তিনিও অনেক সময় সংলাপ লেখেন এবং সেক্ষেত্রে আলোচনা দুজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। আবার অনেক সময় চিত্রনাট্যকার মূলকাহিনীর সংলাপগুলি যথাযথভাবে চিত্র-নাট্যে সন্নিবিষ্ট করলেও, নূতন বা অতিরিক্ত সংলাপ রচনার ভার দেওয়া হয় এক ব্যক্তির উপর। এ রকম ক্ষেত্রে পরিচয়-লিপিতে সে কথাটা স্বতন্ত্রভাবে জানিয়ে দেওয়া হয় এই ভাবে—Additional dialogues by···কেউ কারও প্রাপ্য প্রশংসার সুযোগ আত্মসাৎ করেন না। শেষোক্ত ক্ষেত্রেই আলোচনা চলে তিনজনের মধ্যে। এঁরা প্রথমেই দৃশ্য-পঞ্জিকা রচনার জন্তে ব্যস্ত হয়ে পড়েন না। গল্পটার মূল সুর কোনটি, কোন্ কোন্ ঘটনাগুলির উপর জোর দিলে ছবির সেই মূল সুর অথবা প্রতিপাদ্য বিষয়টা অনায়াসে দর্শক মন জয় করতে পারবে সেটি স্থির করেন নিজেদের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী। তারপর কি ভাবে গল্পটা বলা হবে, নায়ক-নায়িকা এবং পার্শ্বচরিত্রগুলির কোনটি কোনখানে নাট্যরস সৃষ্টির কাজে ঠিক কতখানি সাহায্য করবে তাই নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরে তর্ক-বিতর্কের তুফান ছোটে। এদেশে আমরা একখানা ছাপানো বইয়ের চিত্রনাট্য রচনা করতে হলেই মূলকাহিনীকার যে সব ঘটনার অবতারণা করেছেন সেগুলির কোনটিকেই বাদ দেবার সাহস পাই না; উপরন্তু নায়ক-নায়িকার বাল্যজীবন বা পূর্ব্বজীবনের যে সব ঘটনার ইঙ্গিত থাকে সেগুলিকেও একেবারে দৃশ্যাকারে দর্শকের চোখের সামনে দেখিয়ে দিতে না পারলে আমাদের মন খুঁত খুঁত করে। মূল কাহিনীতে যদি দুর্ভিক্ষ বা মহামারীর কোন ইঙ্গিত থাকে তা হলে হাজার দেড়েক ফুট ধরে "ফ্যান দাও" চীৎকার শুনিয়ে অথবা স্যাড়া গাছের (ষ্টুডিওর তৈরী) মাথায় চিল-শকুন বসিয়ে তবে খানিকটা তৃপ্তি পাই। কিন্তু ওসব দেশে যাঁরা চিত্রনাট্য রচনা করেন, তাদের প্রথমেই ঠিক করে নিতে হয়, কোন্ কোন্ বিষয়ের অবতারণা করবো এবং কোন্ বিষয়গুলি পরিহার করবো। যেগুলি ছবিতে স্থান পাবে সেগুলিকেই বা কি ভাবে প্রকাশ করা হবে তাও স্থির করে নেওয়া চিত্রনাট্য রচয়িতার আর একটা প্রধান কাজ। ছবির বা দৃশ্যগুলির এই form বা অভিব্যক্তির রূপারোপকে সিনেমার ভাষায় বলা হয় treatment. এই treatmentই চিত্রনাট্য রচনার সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ—ছবির দৈর্ঘ্য কমানো থেকে সুরু করে উৎকর্ষতাবৃদ্ধি পর্য্যন্ত সব কিছুরই মূল মন্ত্র এবং এ কাজটি একান্ত-ভাবে চিত্রনাট্যকারের। পরিচালক একশ দৃশ্যের আইডিয়া দিতে পারেন, কিন্তু সে আইডিয়াটিকে ফুটিয়ে তোলার সহজ ও সার্থক পথটা খুঁজে বার করতে হবে চিত্রনাট্যকারকে।

দুটী উদাহরণ দিয়ে আমার বক্তব্য বোঝাবার চেষ্টা করবো।

হলিউডে তোলা একটি ছবির গল্পের প্রায় শেষ দিকের ঘটনা ছিল এই রকম। নায়ক নৃত্যশিল্পী। জীবনে পর পর কয়েকটা কঠিন আঘাত পেয়ে তিনি নিউইয়র্ক ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন নানা দেশভ্রমণে। আজ প্যারিস, কাল ভিয়েনা, তার কিছুদিন পরে বার্লিন এবং বার্লিন থেকে তিনি ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন জনতার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য। কিন্তু জনতা তাঁকে নিষ্কৃতি দিল না। যে জায়গায় যান তাঁকে মঞ্চে আবির্ভূত হয়ে নাচতে হয় এবং প্রত্যেক জায়গাতেই অগণিত দর্শক তাঁর নৃত্য নৈপুণ্যে উচ্ছ্বসিত, বিহ্বল হয়ে ওঠে। ছবির প্রায় শেষ অধ্যায়ে এসে এতগুলি জাঁকজমক পূর্ণ বড় বড় সেট (দৃশ্যপট) দেখান ব্যয়সাপেক্ষও বটে এবং তাতেও ছবির দৈর্ঘ্যও প্রায় হাজার দেড়েক ফুট বেড়ে যাবার সম্ভাবনা। চিত্রনাট্যকার এই অধ্যায়টার রূপারোপ বা treatment করলেন এমন ভাবে যে তাতে সব সমস্যারই সমাধান হয়ে গেল।

ছবির পর্দায় আমরা দেখলাম, নায়ক ট্রেণে উঠলেন। ট্রেণের চাকা গড়াতে সুরু করলো। তারপর সুরু হোলো 'মণ্টাজ' বা সংক্ষিপ্ত একটি দৃশ্য। প্যারিসের একান্ত একটা নাটমঞ্চ (সেটা যে প্যারিস তা নাটমঞ্চের নাম থেকেই বুঝিয়ে দেওয়া হোলো), অসংখ্য দর্শকের সামনে নায়ক নাচছেন···মুগ্ধ চোখে দেখছে দর্শকরা। দ্রুত পট পরিবর্ত্তন হোলো: ভিয়েনা, বার্লিন, লণ্ডন···এই নামগুলি দ্রুত আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠতে লাগলো···শেষ কালে আবার আমরা দেখলাম ···মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে শুধু নায়ক···নৃত্যের বেশে। এবার প্রেক্ষাগার বা দর্শক কিছুই দেখবার দরকার হোলো না। কানে শোনা গেল আনন্দবিহ্বল জনতার মুহুর্মুহুঃ করতালির ধ্বনি···মঞ্চের ওপর এসে পড়তে লাগলো নানা আকারের ফুলের তোড়া আর মালা—

মাত্র কয়েক শত ফীটের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা দর্শকদের বোধগম্য করে দেওয়া হোলো। এরি নাম রূপারোপ বা treatment, চিত্র-নাট্যকারের প্রয়োজন বা কৃতিত্বও এইখানেই।

আর একবার ইংল্যাণ্ডের একটী প্রতিষ্ঠান তুর্গেনিভের একখানি বইয়ের চিত্ররূপ দেবার সঙ্কল্প করেন। বইখানির নাম: Torrents of Spring. কাহিনী আরম্ভ ১৮৪০ সালে, পরিসমাপ্তি ১৮৮০ সালে। মোট ৪০ বৎসরের ঘটনা। নায়ক প্রথম জীবনে একটী মেয়েকে ভালবাসেন, কিন্তু সে ভালবাসা সার্থক হবার আগেই আর একটী নারীর আবির্ভাব হয় তাঁর জীবনে। ঘটনাচক্রে এই দ্বিতীয়াই হন তাঁর জীবনসঙ্গিনী।

সুখে দুঃখে প্রায় ৪০টা বছর বিবাহিত জীবন যাপন করে নায়ক যখন বার্দ্ধক্যের রাজ্যে পা দিয়েছেন, সেই সময় প্রথমার কাছ থেকে পেলেন একখানি পত্র। প্রথমাও দাম্পত্যজীবন যাপন করছেন কোন্ দূর দেশের এক সহরে। চিঠিখানি পেয়ে হারানো স্মৃতি দোলা দিয়ে উঠলো মনের মধ্যে—কি হতে পারতো, আর কি হয় নি! প্রথমার মেয়ের বিয়ে, তাই পত্র নিয়ে তিনি নাগরকে সংবাদ দিয়েছেন। ছবি তুলতে গিয়ে সমস্যা হোলো দীর্ঘ চল্লিশ বছরের ব্যাপারকে কি ভাবে সংক্ষেপে অথচ মর্ম্মস্পর্শী করে রূপায়িত করা যায় তাই নিয়ে। তুর্গেনিভ পর পর যেমন যা ঘটেছিল নায়কের জীবনে তাই লিপিবদ্ধ করেছিলেন। উপন্যাসের একতৃতীয়াংশের পর আর প্রথমাকে দেখতে পাওয়া যায় নি। কিন্তু যে নারীচরিত্র গল্পের প্রাণ, ছবির একতৃতীয়াংশের পর তাকে যদি আর একটীবারও না চোখে দেখা যায় তা হলে উপন্যাসের কাজ চলে

বটে, কিন্তু ছবির দর্শকদের খুশী করা কঠিন। তারা শুধু কানে শুনতে রাজী নয়, চোখে দেখতে চায়। তা হলে কি ছবির মাঝামাঝি এসে প্রথমার দাম্পত্যজীবনের কতকগুলি দৃশ্যের অবতারণা করে দর্শকের দাবী মেটানো হবে? কিন্তু তুর্গেনিভের গল্পে প্রথমার দাম্পত্যজীবন ঠিক কি রকম ছিল তার কোন আভাসই নেই। তা ছাড়া ছবির দুই-তৃতীয়াংশের পর নূতন কতকগুলি চরিত্র আত্মদর্শন ও প্রতিষ্ঠা করাও রীতিমত সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। ছবির দৈর্ঘ্যও তাতে বেশ কিছু বেড়ে যায়। এখন উপায়?

উপায় খুঁজে বার করতে হোলো চিত্রনাট্যকারকে। তিনি যে চিত্রনাট্য রচনা করলেন, তাতে দেখা গেল: ট্রেণের কামরায় বৃদ্ধ নায়ক বসে যাচ্ছেন। ট্রেণ এসে বড় একটা ষ্টেশনে থেমেছে। অল্প কয়েকটি কথাবার্ত্তায় দর্শকদের বুঝিয়ে দেওয়া হোলো নায়ক এ ষ্টেশনে নামবেন না—তিনি বিবাহিত, যাচ্ছেন অন্য কোন জায়গায়। ট্রেণ ছাড়বার সময় হোলো। ঠিক সেই সময় প্ল্যাটফর্মে দেখা গেল আঠারো উনিশ বছরের একটা মেয়েকে হাত নেড়ে কাকে যেন বিদায় জানাচ্ছে। নায়ক আগে লক্ষ্য করেন নি, তা নইলে বোঝা যেত যে মেয়েটা তার বাপ-মাকে ট্রেণে তুলে দিতে এসেছে। হাসিখুশী মাখানো মুখ মেয়েটার, প্রাণ-প্রাচুর্য্যে একেবারে উথলে পড়ছে। কিন্তু বিগত যৌবন নায়কের হঠাৎ কি হোলো? তিনি যেন চমকে উঠলেন মেয়েটিকে দেখে—উৎকণ্ঠিত আগ্রহে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন প্ল্যাটফর্মের দিকে, কাঙাল যেমন মণিরত্নের ভাণ্ডার দেখে, ঠিক তেমনি করে। ঠোঁট দুটী বুঝি কেঁপে উঠলো মুহূর্ত্তের জন্যে…কিন্তু ট্রেণ তখন আবার চলতে শুরু করেছে—

বৃদ্ধ নায়ক আচ্ছন্নের মত ট্রেণের কামরায় বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর অন্যমনস্কের মত উঠে গেলেন ডাইনিং কারে। কামরার 'করিডর' দিয়েই ডাইনিং কারে যাওয়া যায়। সেখানে ঢুকে দেখলেন: এক প্রৌঢ় দম্পতি আহার করছেন। প্রৌঢ়াটী নায়কের জীবনের প্রথমা—যাঁকে নিয়ে গল্প। প্রৌঢ়টী তাঁর স্বামী। পরিচয় হোলো। প্রৌঢ়া বললেন: মেয়ের বিয়ে। শহরে যাচ্ছি কিছু কেনাকাটা করতে। মেয়ে এসেছিল ষ্টেশনে, আমাদের ট্রেণে তুলে দিতে। জানালে তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতুম। বিয়েতে কিন্তু তোমার যাওয়া চাই—আশীর্ব্বাদ করে আসবে নিজে গিয়ে। সামান্য কিছু খেয়ে নায়ক নিজের কামরায় ফিরে এলেন। বসলেন এসে নিজের জায়গাটিতে…মনে পড়লো, কিছুক্ষণ আগে প্ল্যাটফর্মের ওপর দেখা সেই মেয়েটিকে—ঠিক তার মায়ের মতন!

সঙ্গে সঙ্গে মন ভেসে গেল ৪০ বছর আগের সেই দিনগুলিতে—শুরু হোলো Flash Back—আসল কাহিনী।

ফ্ল্যাশ ব্যাক শেষ হবার পর নায়ক বাড়ী ফিরলেন। আলমারি খুলে বার করলেন ছোট একটা বাক্স। সেই বাক্স থেকে খুঁজে বার করলেন ছোট একটা ফ্রেম। যৌবন দিনের স্মৃতি, প্রথমার দেওয়া প্রীতি উপহার। সেইটাকেই পাঠিয়ে দিলেন প্রথমার মেয়ের বিয়ের আশীর্বাদী হিসেবে। নিজে গেলেন না…

বলা বাহুল্য তুর্গেনিভের গল্পটীর পরিসমাপ্তি ঠিক এরকম নয়। কিন্তু ছবির দর্শকের কাছে গল্পের একটা পরিসমাপ্তি চাই এবং সে পরিসমাপ্তি তাদের অনুভূতিকে দুলিয়ে দেওয়া চাই। তাই চিত্রনাট্যকার মূল কাহিনীর সূচনা ও সমাপ্তিকে এই ভাবে পরিবর্ত্তিত করে নিলেন। গল্পের মূল সুরটীকে কাব্যরূপ দেওয়াও হোলো এবং দর্শক জনসাধারণের চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জনের ব্যবস্থাও করা হোলো। সার্থক চিত্রনাট্যের সবকিছু নির্ভর করে এই পরিবর্ত্তন, পরিবর্জন এবং রূপারোপ বা treatment-এর ওপর।

—





[পূর্বপ্রকাশিতের সারাংশ :

যেদিন কালিকটের বন্দরে ভাস্কো-ডা-গামা প্রথম পদক্ষেপ করেছিলেন, সেদিন থেকেই প্রাচ্য-পৃথিবীতে এক নতুন ইতিহাসের সূচনা হল !

শুধু দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করেই পর্তুগীজেরা খুশি হতে পারল না। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ দেশ—যাকে ডা-গামা বলেছিলেন ভারতের স্বর্গ—যার স্বপ্ন দেখেছিলেন বিখ্যাত শাসনকর্তা আলবুকার্ক—সেই স্বর্গভূমি 'বেঙ্গালার' সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্য স্থাপন করতে না পারলে ভারতবর্ষে আসাই যে ব্যর্থ হয়ে যাবে! বাংলার দুটি শ্রেষ্ঠ বন্দর : একটি পোর্টো গ্র্যাণ্ডি চট্টগ্রাম—আর একটি পোর্টো পেকেনো সপ্তগ্রাম—যেমন করে হোক—এই দুটি বন্দরে বাণিজ্যের ব্যবস্থা করতেই হবে।

অতএব গোয়ার শাসনকর্তা স্বনামধন্য নুনো-ডি-কুন্‌হা বাংলার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করতে পাঠালেন তাঁর প্রতিনিধি আফোন্‌সো-ডি-মেলোকে—এই মহাকাব্যের যিনি মহানায়ক।

পথে ডি-মেলোর বহর ঝড়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। চট্টগ্রামের বন্দর ভেবে যে বন্দরে তিনি পৌঁছুলেন—তার নাম চাকারিয়া—মাতামুহুরী নদীর তীরে তার অবস্থান।

চাকারিয়ার নবাব খোদাবক্স খাঁ পর্তুগীজদের নিজের কাজে লাগাতে চাইলেন। ডি-মেলো অস্বীকার করলেন—ফলে দলবলশুদ্ধ ডি-মেলোকে বন্দী হতে হল নবাবের কারাগারে।

ইতিমধ্যে সপ্তগ্রামের বণিক শঙ্খদত্ত বেরিয়েছে দক্ষিণ পাটনে। তাঁর গুরু চন্দ্রনাথ মন্দিরের অন্যতম পূজারী সোমদেব। সোমদেব বহুদিন ধরে নিজের মনে একটা জ্বলন্ত উন্মাদনা অনুভব করে আসছেন। আবার নতুন করে দেশে তিনি হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন—ফিরিয়ে আনবেন ব্রাহ্মণ্য দেবতার অধিকার। শঙ্খদত্তকে তিনি চোখ-কান খোলা রাখতে বললেন। তাঁর আশা : পর্তুগীজ খ্রীশ্চান শক্তির সঙ্গে মুসলমানের সংঘর্ষ অনিবার্য। তা ছাড়া মোগল হুমায়ুন আর পাঠান শের খাঁর মধ্যেও একটা প্রচণ্ড সংগ্রামের পূর্বাভাস। হয়তো এর মধ্য দিয়েই হিন্দু-সাম্রাজ্যের সূত্রপাত হবে !

শঙ্খদত্ত বেরুল দক্ষিণ পাটনে—এসে পৌঁছুল পুরীর জগন্নাথ ধামে—নীলাচল তীর্থে। এইখানে এসে মন্দিরে সে গুপ্ত পূজা দেখবার সুযোগ পেল মহাদেব পাণ্ডার সাহায্যে। সেই গুপ্ত পূজায় দেবদাসীর নগ্ন-নৃত্যের ব্যবস্থা ছিল।

সেই নৃত্যে শঙ্খদত্ত দেখল এক আশ্চর্য নারীকে। দেহ দেখল না—দেখল এক কল্পনাতীত সৌন্দর্য, দেখল এক অপরূপ ছন্দোলীলাকে। যেন বিষাক্ত নেশার তীব্র সুরা পান করে সে ফিরে এল। ওই নারীকে তার চাই।

কিন্তু দেবদাসী সে—মন্দিরের শ্রেষ্ঠ নর্তকী। কেরল দেশের কন্যা—নাম তার শম্পা। কিন্তু এখন সে দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত—দেববধূ। তার কাছে যাওয়ার সুযোগ একমাত্র আছে রাজার এবং নৃত্যগুরুর। তা ছাড়া আর কেউ তার ওপর লোভ করলে তার মৃত্যু জল্লাদের খড়্গে।

লুব্ধ মোহগ্রস্ত শঙ্খদত্তকে একথা জানিয়ে দিল শম্পা নিজেই গোপনে।

কিন্তু শঙ্খদত্তের নেশা ধরেছে—মরণের নেশা! দিনের পর দিন সে-যেন উন্মাদ হয়ে উঠতে লাগল। তারপর রাঘব নামে দৈত্যাকার একজন ব্যাধের সঙ্গে তার দেখা হল। নিশীথ রাত্রে রাঘব শম্পাকে চুরি করে আনল—শঙ্খদত্ত শম্পাকে নিয়ে জাহাজ ভাসাল সমুদ্রে।

ওদিকে চাকারিয়ার একজন শ্রেষ্ঠী—নাম রাজশেখর—সোমদেবকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন তাঁর নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে। রাজশেখরের ঘরে আছে সুন্দরী একটি তরুণী কন্যা—সুপর্ণা তার নাম।

চাকারিয়ার কারাগারে বন্দী ডি-মেলোর অভিশপ্ত দিন কাটছে। এর মধ্যে চাকারিয়ার বন্দরে ডি-মেলোর ছত্রভঙ্গ বহরের দুটি জাহাজ এসে পৌঁছুল। সেই সঙ্গে এল দুজন পর্তুগীজ নাবিক—কোয়েল্‌ হো, আর ভ্যাস্‌কন্‌সেলস্‌।

এরা দুজনে চাকারিয়ার নবাবকে অর্থ দিয়ে সদলবলে বন্দী ডি-মেলোকে মুক্ত করতে চাইল। নবাব রাজী হলেন না। তখন নিতে হল এক দুঃসাহসিক পরিকল্পনা। ভ্যাস্‌কন্‌সেলস্‌ আর কোয়েল্‌-হো কারাগার থেকে পর্তুগীজদের পালানোর ব্যবস্থা করল। চেষ্টা ব্যর্থ হল—কয়েকজন পর্তুগীজ প্রাণ দিল নবাবের সৈন্যের গুলিতে—ডি-মেলো এবং বাকী সবাই ধরা পড়লেন—শুধু পালাতে পারলো একজন—সে ডি-মেলোর কিশোর ভাইপো প্রিয়দর্শন গঞ্জালো।

অন্ধকারে পাগলের মতো ছুটল গঞ্জালো—এসে আশ্রয় পেলো রাজশেখর শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে। রাজশেখর তখনি তাকে নবাবের কাছে পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিলেন—কিন্তু সোমদেব তা করতে দিলেন না। তাঁর মনে আরো একটা গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল।

অতএব গঞ্জালো আশ্রিত রইল রাজশেখরের বাড়িতে।

এই সোনালি চুল—চাঁদের মতো গায়ের রঙ—অপূর্ব দর্শন কিশোরটির প্রতি আকৃষ্ট হল সুপর্ণা। কেউ কারো ভাষা বোঝে না—কিন্তু অন্তরে অন্তরে অনুভব করে কিসের একটা নিবিড় সংযোগ! কিন্তু যা কুঁড়ি—তা আর ফুল হয়ে ফুটতে পারল না। তার আগেই একটা

বীভৎস ঘটনা ঘটল। দেশ জুড়ে যে মহাশক্তির বোধন ঘটাতে চাইছিলেন সোমদেব—তার সূচনা হল এক কালীপূজার রাত্রিতে। কালীর পায়ে সোমদেব বলি দিলেন গঙ্গালোকে। আর সেই ভয়াবহ দৃশ্যের সামনে আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সুপর্ণা।

আর ডি-মেলোকে মুক্ত করতে না পারার অসহ্য ক্রোধ আর জ্বালা নিয়ে জাহাজ ভাসিয়ে ফিরে চলেছিল কোয়েল্‌হো আর ভ্যাস্‌কনসেলস্‌। মাঝ সমুদ্রে তারা দেখতে পেল শম্ভদত্তের বহর। হিংস্র উন্মত্ততায় তাদের কামান গর্জে উঠল—কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্বলতে জ্বলতে ডুবে গেল শম্ভদত্তের জাহাজ। সমুদ্রের মধ্যে ছিটকে পড়ে অতলে ডুবতে ডুবতে একবার শুধু শম্ভদত্তের মনে হল: শম্পা? শম্পার কী হবে এখন?

এদিকে শেষ পর্যন্ত ডি-মেলো মুক্তি পেলেন। মুক্তি এনে দিল খাজা সাহেবুদ্দিন নামে একজন মুসলমান বণিক—পারস্পরিক স্বার্থসিদ্ধির চুক্তিতে।

কাহিনীর নতুন করে যবনিকা উঠল আরো কয়েক বছর পরে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের চাকা আর এক পাক ঘুরে গেছে। শের খাঁ আর হুমায়ুনের সংঘর্ষ নিকটতর হয়েছে আরো। খাজা সাহেবুদ্দিনের চেষ্টায় কাজ হয়েছে। গৌড়-বাংলার সঙ্গে বাণিজ্য-চুক্তির আশা পেয়েছেন নুনো-ডি-কুন্‌হা।

আবার আসতে হল আফনসো ডি-মেলোকেই। এবার চট্টগ্রামের বন্দরে মিলল তাঁর সাদর অভ্যর্থনা। কিন্তু চট্টগ্রামের শাসনকর্তা তো তাঁকে অনুমতি দিতে পারেন না। তার জন্যে চাই গৌড়ের সুলতানের অনুমোদন।

সুলতান নসরৎ শাহ আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন। তাঁর পুত্র ফিরোজকে হত্যা করে গৌড়ের সিংহাসনে বসেছেন মামুদ শা। কিন্তু ফিরোজের রক্তমাখা সিংহাসনে বসে অসহ্য মর্মজ্বালায় জ্বলছেন মামুদ শা—এক মুহূর্তও তিনি স্বস্তি পান না!

এই সময় চট্টগ্রাম থেকে অনুমতি পাবার আশায় উপঢৌকন নিয়ে হাজির হল ডি-মেলোর দূত আজেভেদো।

অনুমতি হয়তো মিলত, কিন্তু একটা মারাত্মক ভুল করেছিলেন ডি-মেলো। নবাবের উপঢৌকনের মধ্যে ছিল কিছু ইরাণী গোলাপ জল। এগুলো লুটের মাল—মক্কার আরবী বণিকদের জাহাজ থেকে লুট করেছিল পর্তুগীজেরা।

দেখেই ক্ষেপে উঠলেন মামুদ শা। তখনি আজেভেদোর প্রাণ যেত—যদি না আল্‌ফা হাসানী এবং একজন ফকির সুলতানাকে বারণ করতেন! আজেভেদোর স্থান হল কারাগারে।

মামুদ শা চট্টগ্রামে হুকুম পাঠালেন—এখুনি পর্তুগীজদের বন্দী করা হোক।

পর্তুগীজেরাও ইতিমধ্যে কিছু কিছু অন্যায় কাজ করছিল। সুলতানের অনুমতি পাওয়ার আগেই বে-আইনি ভাবে মাল আমদানি করছিল জাহাজে। বন্দরের কর্তৃপক্ষ টের পেয়েও লক্ষ্য করছিল নিঃশব্দে। মামুদশার হুকুম আসবা মাত্র বন্দরের প্রধান কর্মচারী খুদাবক্স ডি-মেলোকে নিমন্ত্রণ করলেন এক প্রীতিভোজে। সরল বিশ্বাসে ডি-মেলো নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। ভোজ যখন পুরোদমে চলছে—তখন নবাবের সৈন্য অকস্মাৎ উপস্থিত হল তাঁদের বন্দী করতে।

বিনা যুদ্ধে ধরা দিল না পর্তুগীজেরা। ভোজপর্ব শেষ হল রক্তস্নানে। দ্বিতীয়বার দলবল শুদ্ধ বন্দী হলেন আহত ডি-মেলো—শৃঙ্খল বদ্ধ করে তাঁদের পাঠানো হল গৌড়ে।

আর রাজশেখরের গুরু সোমদেব বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরছেন বাংলাদেশময়। তাঁর শক্তির মন্ত্রে কাউকে তো তিনি জাগাতে পারছেন না! সব চেয়ে মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে নদীয়ার কোন্‌ এক শ্রীচৈতন্যের হরি নাম—দেশের মানুষ তলোয়ার ফেলে খোল-করতাল তুলে নিয়েছে হাতে।

শিষ্য কেশবের ওপর সোমদেবের অনেকখানি আশা ছিল! সেখানেও তিনি দেখলেন ওই খোল করতালের তাণ্ডব! দুর্বিষহ মানসিক যন্ত্রণায় সেখান থেকেও পথে বেরিয়ে পড়লেন সোমদেব।

তারপর—]

—সতেরো—

"Vou falar com ela"

গঙ্গাসাগরে তীর্থস্নানে চলেছেন রাজশেখর শ্রেষ্ঠী।

এই তিন বছর ধরে বহু তীর্থই পরিক্রমা করেছেন তিনি। বহু দেবতার মন্দিরে হত্যা দিয়েছেন—ফেলেছেন বহু চোখের জল। হাজার হাজার মোহর ব্যয় করেছেন পূজো আর প্রণামীর পেছনে। কিন্তু অনুগ্রহ হয়নি দেবতার। সুপর্ণা আজো স্বাভাবিক হয়নি।

সেই কাল রাত্রি। মহাকালীর পায়ের কাছে একটি রক্তজবার মতো পর্তুগীজ কিশোরের ছিন্নমুণ্ড। নীল চোখ দুটি শাদা হয়ে গেছে মৃত্যুর ছোঁয়ায়—সোনালি চুলগুলো জটা বেঁধে গেছে কালো রক্তে। একটা চিৎকার করে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল সুপর্ণা।

জ্ঞান ফিরে এসেছিল—কিন্তু স্বাভাবিক সহজ বুদ্ধি আর ফিরে আসেনি তার। সেই থেকে আর একটি কথা বলেনি সুপর্ণা—এই তিন বছরের মধ্যেও না। যেন জন্ম থেকেই সে বোবা। দুটি আশ্চর্য উদাস ভাষাহীন চোখ মেলে সে বসে থাকে। সে চোখের ওপর দিয়ে একরাশ ছায়ার মতো ভেসে যায় চেনা-অচেনা মানুষের মুখ, আকাশের মেঘ-বৃষ্টি, চন্দ্র-সূর্য-তারা—দিনের আলো, রাত্রির অন্ধকার। কিন্তু চোখের সীমা ছাড়িয়ে তারা কোনো অনুভূতির মর্মকোষে গিয়ে দোলা লাগায়না। সুপর্ণা সব দেখে—অথচ কিছুই দেখেনা। যেখানে নানা রঙের একটি মন ঝলমল্‌ করত, এখন সেখানে বর্ণহীন একটা শাদা পর্দা ছাড়া আর কিছুই নেই।

এত শব্দ ওঠে পৃথিবীতে। এত মানুষ কথা বলে—হাসে, কাঁদে, গান গায়। পাখির গান বাজে, নদীর জল কল্লোল তোলে, পাতায় পাতায় বাতাস মর্মরিত হয়ে যায়, ঝম্‌ ঝম্‌ করে বৃষ্টি পড়ে—ক্রুদ্ধ আক্রোশে মেঘ গর্জায়। কিছুই শুনতে পায়না সে। বর্ণ-গন্ধ-শব্দ—সব তার কাছ থেকে নিঃশেষে হারিয়ে গেছে।

এক ভাবে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বসে থাকে। সারাক্ষণ কী একটা দেখতে থাকে—নইলে কিছুই দেখেনা। খাইয়ে দিলে খায়—নইলে উপোসেই হয়তো দিন কাটায়। বিস্ফারিত চোখে ঘুমের আভাস মাত্র নেই। ঘুমুতেও সে ভুলে গেছে।

পাণ্ডুর মুখখানা আরো পাণ্ডুর হয়ে গেছে। চোখের কোনায় নিবিড় কালির রেখা। সুপর্ণার মুখের দিকে

তাকিয়ে চাপা আগুনে পুড়ে খাক হয়ে যান রাজশেখর। সব অপরাধ তাঁরই। গুরুর আদেশ পালন করতে গিয়ে দেবতার অপমান করেছিলেন তিনি। শিবের বিগ্রহকে তিনি কলঙ্কিত করেছিলেন মানুষের রক্তে। তাই আজকে এই কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে তাঁকে। সুপর্ণার রোগমুক্তির জন্যেই মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তিনি—ভুলের ফলে পেলেন এই অভিশাপ।

তাই ক্রমাগত তীর্থে তীর্থে ঘুরছেন। দেবতার কাছে ক্ষমা চাইছেন বারবার। কিন্তু আজো অনুগ্রহ হয়নি দেবতার। হয়তো হবেওনা কোনোদিন।

দুপুরের রোদ চড়ছে নোনা নদীর ওপর। ধূ-ধূ করছে ও-পারটা—এ-পারে গাছপালার শ্যামল ছায়া। বিশাল নদীর ঘোলা জলের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সুপর্ণা।

রাজশেখর বললেন, বেলা বাড়ছে—বজরা বাঁধো এখানেই। খাওয়া-দাওয়া সেরে নিতে হবে।

মাঝিরা রাজী হল। ভাঁটার মুখে আরো খানিক এগিয়ে গেলেই নদী ক্রমশ সমুদ্রের রূপ ধরবে—বিস্বাদ নোনা হয়ে যাবে জল—কাদামাখা তীর পড়বে নদীর ধারে। খাওয়ার পর্ব এইখানেই সেরে নেওয়া ভালো। নৌকো চলল কূলের দিকে।

একটা জরাজীর্ণ শিব-মন্দির—ভাঙনলাগা কূলে তার অর্ধেকটা নেমে গেছে নদীর ভেতরে। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে পুরোনো বটগাছের ঘন-গম্ভীর ছায়া। কয়েকটা মোটা মোটা শাদা শিকড় এঁকে বেঁকে সাপের মতো চলে গেছে জলের মধ্যে। সেই বটগাছের শিকড়ে বজরা বাঁধলেন রাজশেখর।

ঠিক এই সময় ভাঙা মন্দিরটার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা লোক।

পাগল নিঃসন্দেহ। মাথায় জটার মতো লম্বা লম্বা চুল—মুখে বিশৃঙ্খল গোঁফ দাড়ি। কিছুক্ষণ উদ্‌ভ্রান্ত চোখে তাকিয়ে রইল সে। তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল: শ্রেষ্ঠী রাজশেখর!

চমকে লোকটার দিকে তাকালেন রাজশেখর। এখানে—এই দূর গঙ্গাসাগর অঞ্চলে কে তাঁকে চিনল এমন করে! তীক্ষ্ণ চকিত গলায় তিনি বললেন, কে—কে তুমি?

—আমাকে চিনতে পারছেন না?—যন্ত্রণাবিকৃত গলায় লোকটা বললে, আমি শঙ্খ—শঙ্খদত্ত!

শঙ্খদত্ত! কয়েক মুহূর্ত মুখ দিয়ে একটি শব্দ বেরুল না রাজশেখরের। তাঁর বাল্যবন্ধু—সপ্তগ্রামের বিখ্যাত বণিক ধনদত্তের ছেলে! তীব্র বিস্ময়ে তিনি বললেন, শঙ্খদত্ত! তুমি?

দু হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল শঙ্খদত্ত। তারপর হু হু করে কেঁদে ফেলে বললে, কারো দোষ নেই কাকা—নিজের পাপেরই আমি প্রায়শ্চিত্ত করছি!

* * * *

ভাঙা জাহাজের একটা মাস্তুলে চড়ে তিনদিন সমুদ্রে ভেসেছিল শঙ্খদত্ত। তারপর আশ্রয় মিলল একটা দ্বীপে। সেখানে কতগুলো অর্ধ-উলঙ্গ মানুষের সঙ্গে দু বছর অদ্ভুত জীবন কাটল তার। যখন মনে হচ্ছিল সে বুঝি পাগল হয়ে যাবে, সেই সময়ে কোথা থেকে মগেদের জাহাজ এল একটা। তারা শঙ্খদত্তকে উদ্ধার করল। শেষ পর্যন্ত গঙ্গাসাগরের কাছে তাকে নামিয়ে দিয়ে ভেসে চলে গেল পূর্ব সমুদ্রে।

এই প্রায় তিনটি বছর ধরে একটিমাত্র কথাই ভেবেছে শঙ্খদত্ত। নীলমাধবের দাসীকে চুরি করে এনেছিল সে—তাই এম্‌নি করে দেবতার অভিসম্পাত নেমে এসেছে তার ওপর। তাকে শাস্তি দিয়েছে দেবতার দণ্ড। কিন্তু একটা নির্মম প্রতিজ্ঞা সে-ও বয়ে এনেছে বুকের মধ্যে। ওই পর্তুগীজদের সে কোনো মতেই ক্ষমা করবেনা। যেমন করে হোক এর প্রতিশোধ সে নেবেই।

দু ধারে দিগন্ত-প্রসার নদী। হাওয়া দিয়েছে—ঘোলা জলে ঢেউ খেলছে—ভারী বজরাটা দুলছে ঢেউয়ের তালে তালে। নিঃশব্দে শুনে গেলেন রাজশেখর। একটি কথাও বললেন না।

দেবতার ক্রোধ। তাই বটে! তার হাত থেকে কারো নিস্তার নেই—শঙ্খদত্তেরও নয়।

নিজের কপালে দু হাত দিয়ে চুপ করে বসে রইল শঙ্খদত্ত। অন্যমনস্কভাবে তার দিকে তাকিয়ে তেমনি নিঃশব্দে বসে রইলেন রাজশেখর। আর বজরার জানালা দিয়ে বাইরের ঢেউ-জাগানো জলে নির্বাক সুপর্ণা কী যে দেখতে লাগল সেই-ই জানে।

কিছুক্ষণ পরে শঙ্খদত্তই স্তব্ধতা ভাঙল।

—গুরুদেবই ঠিক বলেছিলেন।

হঠাৎ যেন সাপের ছোবল খেয়ে চমকে উঠলেন রাজশেখর। অস্বাভাবিক গলায় বললেন, কে?

শঙ্খদত্ত আশ্চর্য হল।

—আমাদের গুরু। গুরু সোমদেব। তিনি বলেছিলেন, আজ শুধু আমাদের চুপ করে বসে থাকলেই চলবেনা। অনেক বড় কাজ করবার আছে—রয়েছে অনেক দায়িত্ব। দেশে মোগল-পাঠানের বিরোধ বাধছে—বিদেশী ক্রীশ্চানেরা বাড়িয়েছে লোভের হাত—চারদিকে দুর্যোগ ঘন হয়ে আসছে। এই-ই সুযোগ। এমন সুযোগ হেলায় হারালে চলবেনা। আমাদের তৈরি হয়ে নিতে হবে—যাতে এর ভেতর দিয়ে আবার আমরা হিন্দুর রাজত্ব ফিরিয়ে আনতে পারি—যাতে—

—শঙ্খ!

আরো অস্বাভাবিক গলায়, অদ্ভুত উত্তেজনার সঙ্গে শান্ত-স্তিমিত মানুষ রাজশেখর চিৎকার করে উঠলেন। ধক্ ধক্ করে জ্বলে উঠল তাঁর স্তিমিত চোখ : ও-কথা থাক শঙ্খ, ও-কথা থাক। গুরু সোমদেবের নাম আমার সামনে তুমি উচ্চারণ কোরোনা!

শঙ্খদত্তের বিভ্রান্ত দৃষ্টি আরো বিভ্রান্ত হয়ে উঠল : এ আপনি কী বলছেন কাকা! আমাদের গুরুদেব—

—বলেছি তো, তাঁর নাম আমি আর শুনতে চাই না।

—একি মহাপাপের কথা বলছেন কাকা! তিনি যে মহাপুরুষ!

ক্ষিপ্ত হয়ে রাজশেখর বললেন, তা জানি না। কিন্তু তিনি আমার সর্বনাশ করেছেন।

—কাকা!

তীক্ষ্ণ উত্তেজনায় রাজশেখর হাঁপাতে লাগলেন : তাঁর হিন্দুরাজ্য শুধু একটা উন্মাদের কল্পনা। অস্ত্র নেই—প্রস্তুতি নেই—শুধু অর্থহীন ক্ষ্যাপামি দিয়েই কেউ রাজ্য গড়তে পারে না। মহাশক্তিকে জাগানো শুধু কথার কথা নয়—তার আগে দেশের মানুষকে জাগাতে হয়। সে শক্তি সোমদেবের নেই।

—কাকা!—শঙ্খদত্ত এবার আর সম্পূর্ণ শব্দটা উচ্চারণ করতে পারল না। একটা অস্পষ্ট ধ্বনিই বেরিয়ে এল শুধু। এতদিন ধরে এ-কথাগুলো কি কখনো ভেবেছিলেন রাজশেখর? কখনো কি এত কথা এক সঙ্গে চিন্তা করেছিলেন তিনি? নিজেই বুঝতে পারলেন না। অথবা একটা প্রচণ্ড উত্তেজনার বৈদ্যুতিক ছোঁয়ায় তাঁর সমস্ত বিচ্ছিন্ন শৃঙ্খলাহীন ভাবনাগুলো এই মুহূর্তেই স্পষ্ট একটা ঘনীভূত রূপ ধরল। নিজেরই অপরিচিত তীব্র ভয়ঙ্কর ভাষায় তিনি বলে চললেন, হিন্দু রাজ্য! কোন্ হিন্দুর মাথাব্যথা পড়েছে তার জন্যে? রাজা হিন্দুও যা, মুসলমানও তাই। কোন্ হিন্দু শাসনকর্তা মুসলমানের চেয়ে কম অত্যাচার করে? হিন্দু রাজত্ব হলে হয়তো সোমদেবের সুবিধে হবে—যার খুশি তারই মাথা হাতে কাটতে পারবেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের তাতে কী লাভ? এখন বরং কিছু বাঁচোয়া আছে, কিন্তু তখন মনুর বিধানে পান থেকে চুণ খসলে শূলে চড়তে হবে লোককে।

এবারে আর কথা বলবার শক্তি ছিলনা শঙ্খদত্তের। বিস্মিত আতঙ্কে দুঃস্বপ্নের মতোই সে রাজশেখরের কথাগুলো শুনে যেতে লাগল।

—কাকে জাগাবেন গুরুদেব? দেশের অর্ধেক লোক আপ্ত বৌদ্ধ। চারদিকে চলেছে বৌদ্ধ তন্ত্র আর ব্যভিচার—মনুর বিধানের জন্যে কারো মাথাব্যথা নেই। একটা গ্রামে এসে মৌলবী বদনা ডিঙিয়ে দিয়ে যায়—গোটা গ্রামের মানুষ মুসলমান হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। মন্দির ভেঙে মস্‌জিদ তৈরী হয় তৎক্ষণাৎ—কালীর থান হয় পীরের দর্গা। শাস্ত্র মেনে চলা ক'টি হিন্দুর সন্ধান পাবেন গুরুদেব—যাঁদের নিয়ে তিনি লড়াই করবেন মুসলমানের সঙ্গে? দেশের মানুষকে দিনের পর দিন বৌদ্ধ আর মুসলমানদের কাছে ঠেলে দিয়ে আজ মিথ্যেই তিনি আকাশ-কুসুম তৈরি করছেন! মানুষ বলে যাদের কোনোদিন স্বীকার করা হয়নি—আজ কিসের জন্যে তারা ব্রাহ্মণের ডাকে সাড়া দিতে যাবে?

—আপনি সব জিনিসের খালি অন্ধকার দিকটাই দেখছেন শ্রেষ্ঠী।—ক্ষীণভাবে বললে শঙ্খদত্ত।

—অন্ধকার দিক?—কখনো নয়—উত্তেজনার উচ্ছ্বাসটাকে অনেকখানি পরিমাণে সংযত করলেন রাজশেখর : তোমার চাইতে আমি অনেক বেশি ভেবেছি শঙ্খ, অনেক বেশি দেখেছি। আর এটা বেশ বুঝতে পেরেছি হিন্দুর হাতে এদেশ আর কখনো ফিরবে না—কোনোদিনই না। এখন বল্লালী আমলের স্বপ্ন দেখাও পাগ্‌লামি।

—কিন্তু কিছু কিছু খাঁটি হিন্দু এখনো তো রয়েছেন। যাঁরা বঙ্গ-বরেন্দ্রভূমির রাজা জমিদার, তাঁরা অনেকেই তো নিষ্ঠাবান হিন্দু। তাঁরা যদি এক সঙ্গে দাঁড়ান—

—পাগল হয়েছ তুমি?—রাজশেখর অনুকম্পার হাসি হাসলেন : কেন দাঁড়াবে তারা—কী তাদের স্বার্থ? গৌড়ের মুসলমান সুলতান মাথার ওপর আছে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কতটুকু? খাজনা পাঠিয়েই খালাস। তারা স্বাধীন, নিশ্চিন্ত—যা খুশি করে বেড়ায়। আর তারা এক সঙ্গে দাঁড়াবে বলছ? পাশাপাশি দুটো চাক্‌লাদারের মধ্যেই জমি জায়গা নিয়ে খুনোখুনির অন্ত নেই—দুটো রাজাকে তুমি এক সঙ্গে মেলাতে চাও? এ-সব ভাবনা ছেড়ে দাও শঙ্খ। বণিকের ছেলে—ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়েই থাকো। এ সমস্ত মিথ্যে ভাবনায় সময় নষ্ট করে কোনো লাভ নেই।

—আর এই বিদেশী পর্তুগীজেরা?

—ওরা আসবে—সবাই আসবে। কাউকে ঠেকাতে পারবে না। দেশ বলে কিছু নেই—দেশের মানুষ বলেও কেউ নেই। কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কয়েকটা ছোট ছোট সমাজ আর চতুষ্পাঠী আগলে বসে আছে মাত্র। চারদিকে যখন সমুদ্র, তখন মাঝখানের কয়েকটা ছোট ছোট দ্বীপকে নিয়ে দেশ গড়া যায় না শঙ্খদত্ত।

আবার চুপ করে রইল শঙ্খদত্ত। কিছু বলতে পারল না—ভাষা খুঁজে পেলনা প্রতিবাদ করবার। একটা অবরুদ্ধ ক্রোধ বুকের মধ্যে বন্দী বুনো বেড়ালের মতো আঁচড়ে চলল। ঠিক এই মুহূর্তে রাজশেখরকে কোনো কঠিন কথা বলতে পারলে তৃপ্তি পেত সে—একটা মুখের মতো জবাব দিতে পারলে অনেকখানি কমতে পারত অন্তর্জ্বালা, কিন্তু—

আর—আর শম্পা! বুনো বেড়ালের আঁচড়গুলো

আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল—যেন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে লাগল তার হৃৎপিণ্ড। নিচের ফাটা ঠোঁটের ওপর সামনের দুটো দাঁত সজোরে বসিয়ে দিলে শঙ্খদত্ত। একটা মৃদু যন্ত্রণা শিউরে গেল—জিভে নোন্‌তা স্বাদ লাগল। রক্ত। তার নিজেরই।

নীরবতা। হাওয়ায় পাল তুলে বজরা চলেছে মন্থর মন্দাক্রান্তায়। নোনা নদীর খেয়ালী কলধ্বনি। পাশের জানলা দিয়ে দেখা গেল বজরার সঙ্গে সঙ্গে টিকটিকির মতো জলের ওপর গলা তুলে একটা প্রকাণ্ড কুমীর ভেসে চলেছে—হয়তো মানুষ-টানুষ কিছু জলে পড়বে এই আশায়। কুৎসিত কালো পিঠের উঁচু উঁচু চাকাগুলোর ওপরে শ্যাওলার হাল্‌কা আস্তরটা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার।

বিরক্তি ভরে দৃষ্টি সরিয়ে নিল শঙ্খদত্ত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চোখ গিয়ে পড়ল সুপর্ণার ওপর। বজরার একান্তে বাইরের দিকে তাকিয়ে এক ভাবেই বসে আছে। প্রাণহীন পাণ্ডুর মুখ। রুক্ষ চুলগুলো বাতাসে উড়ছে। এতক্ষণে শঙ্খদত্তের খেয়াল হল—একবারও তার দিকে ফিরে তাকায়নি সুপর্ণা—একবার হাসেনি—একটি কথাও বলেনি। সে আছে—তবু সে কোথাও নেই। নিঃশব্দ নির্বিকার একটি ছায়ার মতো নিজের মধ্যেই সে লীন হয়ে রয়েছে।

রাজশেখর লক্ষ্য করলেন। বললেন, সুপর্ণাকে তুমি কি চিনতে পারছ না?

—অনেক ছোট দেখেছিলাম, তবু না চেনবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু ও কি অসুস্থ?

গম্ভীর মৃদু গলায় রাজশেখর বললেন, ও পাগল হয়ে গেছে।

—পাগল!—শঙ্খদত্ত বেদনায় বিস্ময়ে বিহ্বলভাবে তাকিয়ে রইল: কী বলছেন আপনি?

—সে অনেক ইতিহাস, অন্য সময় বলব।—রাজশেখরের চোখ দুটো আবার চক চক করে উঠল: শুধু এইটুকুই বলতে পারি, তার জন্যে গুরুদেবই দায়ী।

—গুরুদেব!

—হাঁ, গুরুদেব! তাঁরই খেয়ালের দাম আমাকে এইভাবে দিতে হচ্ছে।—এবার চোখের কোণটা ভিজে আসতে লাগল রাজশেখরের: আজ তিন বছর ধরে একটি কথাও ও বলেনি। হয়তো কোনোদিনই আর বলবেনা। গুরুর পাপে দেবতার অভিশাপ ওকে চিরদিনের মতো বোবা করে দিয়েছে।

—চিকিৎসা—

—কোনো বৈদ্যের সাধ্য নেই। তাই তো তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছি। যদি দেবতার দয়া হয়, হবে—নইলে আমার ওই একমাত্র সন্তানকে বুকের কাঁটা করে নিয়েই বাঁচতে হবে, মরেও আমি শান্তি পাবনা।

টপ টপ করে জল পড়তে লাগল রাজশেখরের চোখ দিয়ে।

একবার সেই চোখের জলের দিকে তাকালো শঙ্খদত্ত—আর একবার তাকালো ছায়ার মতো প্রাণহীন—স্পন্দনহীন একটি আশ্চর্য ছবির দিকে। তারপর হঠাৎ বলে ফেলল: আমি ওকে কথা বলাব কাকা—আমি ওকে ফিরিয়ে আনব।

—পারবে?—উদ্বেলিত আবেগে রাজশেখর শঙ্খদত্তের হাত চেপে ধরলেন: পারবে তুমি?

কোথা থেকে শক্তি আর আত্মবিশ্বাস এল কে জানে! বিষণ্ণ বিবর্ণ ছায়াময়ীর দিকে দৃষ্টি একান্ত করে রেখেই শঙ্খদত্ত বললে, পারব।

(ক্রমশঃ)





স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস—

গত ৪ঠা জুন কলিকাতা মহাধিকরণে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রামাণ্য ইতিহাস রচনার পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঐ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ডাক্তার সেন ইতিহাস রচনার—সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য কমিটীর ভারপ্রাপ্ত। ডাঃ সেন দেশবাসী জনগণের সহযোগিতা কামনা করিয়া বলেন—দেশবাসীর সমর্থন ও সহানুভূতি লাভ করিতে পারিলে সম্পাদক-মণ্ডলী তাঁহাদের উপর ন্যস্ত বিরাট দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে সমর্থ হইবেন। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর ও উড়িষ্যা লইয়া যে আঞ্চলিক কমিটী গঠিত হইয়াছে অধ্যাপক সুনীতিকুমার তাহার সভাপতি। ৬জন সহকারী গবেষক লইয়া ১৯৫৩ সালের ১লা আগষ্ট হইতে কমিটী কাজ করিতেছেন।

ভেজাল খাদ্য ও ঔষধ—

ভেজাল খাদ্য ও ঔষধের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ হওয়ার পর হইতে এক মাসের মধ্যে এনফোর্সমেণ্ট পুলিসের সহযোগিতায় কর্পোরেশন-কর্মচারীগণ ভেজাল সন্দেহে প্রচুর ঘি, দালদা, সরিষার তেল, নারিকেল তেল, রেড়ীর তেল, গ্লুকোজ, চা, খয়ের ও ঔষধ হস্তগত করিয়াছে। ব্যবসায়ী সংস্থার কয়েকজন মালিকসহ ১লা জুন পর্যন্ত ২৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। হাওড়া ও শিয়ালদহ ষ্টেশনে বাহির হইতে আনীত সকল খাদ্যদ্রব্যের রসায়নিক পরীক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। বাজারেও খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষা করা হইতেছে। ধৃত ব্যক্তিদিগকে শাস্তিদানের জন্য কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনে উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় শীঘ্রই একটি অর্ডিনান্স জারি করা হইবে। এ বিষয়ে মেয়র শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায় ও পুলিশের ডেপুটী কমিশনার শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় একযোগে চেষ্টা করিতেছেন।

পূর্ববঙ্গের নূতন গভর্ণর—

পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ববঙ্গের নবনিযুক্ত গভর্ণর মেজর জেনারেল সৈয়দ ইসকান্দার মির্জা সি-আই-ই, ও-বি-ই বাংলার শেষ নবাব ফরিদুন সার বংশধর। মুর্শিদাবাদ নবাব পরিবারে জন্ম হইলেও তিনি শৈশবে একবার এবং দেশ বিভাগের ৫ বৎসর পূর্বে একবার বহরমপুর গিয়াছিলেন। ১৮৯৯ সালে বোম্বায়ে ইসকান্দার মির্জার জন্ম হয়। ১৯১৯ সালে বোম্বায়ে বি-এ পাশ করিয়া তিনি বিলাত যান ও স্যাণ্ডহার্স্টে শিক্ষালাভ করেন। ১৯২৬ সালে তিনি চাকরীতে প্রবেশ করেন। ১৯৪২ হইতে ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি পেশোয়ারের ডেপুটী কমিশনার ছিলেন ও বিপ্লব দমন করার জন্য বার্ষিক ৭২০ টাকা আজীবন পেন্সন লাভ করেন। ভারত বিভাগের পর তিনি পাকিস্তানে প্রতিরক্ষা দপ্তরে সেক্রেটারী হইয়াছিলেন। ইসকান্দার মির্জা নবাব মিরজাফরের নবম বংশধর। বাংলা দেশের অবস্থিত একটি বড় ওয়াকফ এষ্টেটের তিনি মাতোয়ালী—তাঁহার পিতা ফতে আলি মির্জাও ঐ এষ্টেটের মাতোয়ালী ছিলেন।

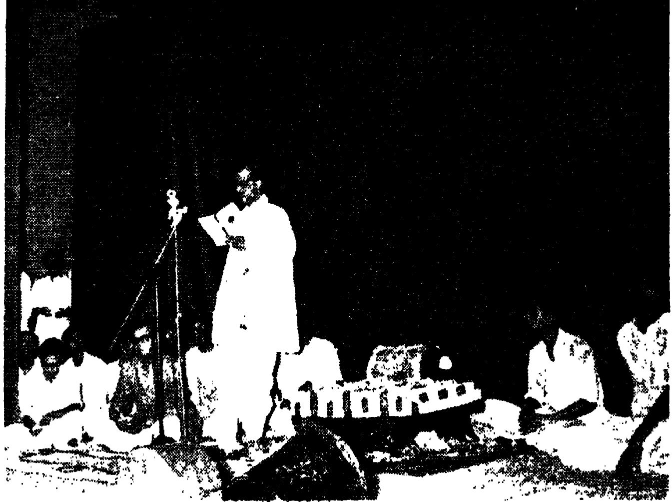
এন্যুইটী সার্টিফিকেট—

আগামী ১লা জুলাই হইতে ভারতসরকার ক্ষুদ্র সঞ্চয় পরিকল্পনার অংশ হিসাবে ১৫ বৎসর মেয়াদের এন্যুইটী সার্টিফিকেট বিক্রয় করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যাঁহারা এককালীন মোটা টাকা খাটাইয়া তাঁহাদের নিজেদের জন্য বা পোষ্যদের জন্য মাসে মাসে টাকা পাইতে চান, তাঁহাদের জন্য এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এককালীন সার্টিফিকেটে ৩॥০ হাজার টাকা, ৭ হাজার টাকা, ১৪ হাজার টাকা ও ২৮ হাজার টাকা বিনিয়োগ করিলে একমাস পর হইতে ১৫ বৎসর ধরিয়া মাসিক যথাক্রমে ২৫, ৫০, ১০০ ও ২০০

টাকা পাওয়া যাইবে। মাসিক যে টাকা পাওয়া যাইবে তাহা আয়করের আওতায় পড়িবে না। কোন একজন ২৮ হাজার টাকার বেশী মূল্যের বা ২ জন একত্রে ৫৬ হাজার টাকার বেশী মূল্যের সার্টিফিকেট কিনিতে পারিবেন না। কোন প্রতিষ্ঠান, কারখানা বা যৌথ প্রতিষ্ঠান হইতে ইহা ক্রয় করা চলিবে না।

সোনারপুর পরিকল্পনার সাফল্য—

সারা ভারতের মধ্যে পাম্পের সাহায্যে বিরাট জলাভূমির জল নিকাশের প্রথম পরীক্ষা হয় কলিকাতার দক্ষিণে সোনারপুর উত্তরভাগে। বিদ্যুৎ-চালিত পাম্প বসাইয়া তথায় ৩০ হাজার বর্গমাইল জলা জমির জল নিকাশ করিয়া ১৫ হাজার একর জমী উদ্ধার করা হয় ও প্রায় ১২ হাজার



মহাজাতিসদনে কবি-সংবর্ধনা। নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলন ১৩৬০ সালের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থরূপে নির্বাচিত করিয়াছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত 'সংবর্ত'। এতদুপলক্ষ্যে রবীন্দ্রজন্মোৎসবের অঙ্গ হিসাবে গত ১লা জ্যৈষ্ঠ সুধীন্দ্রনাথের বিশেষ সংবর্ধনার আয়োজন হইয়াছিল মহাজাতি সদনে। চিত্রে উদ্যোক্তাদের অনুরোধে সুধীন্দ্রনাথ 'সংবর্ত' হইতে কবিতা পাঠ করিতেছেন।

ফটো : শম্ভু সাহা





শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদা দেবীর নারীভক্তদের সম্মেলন

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট

একর জমীতে চাষ করা হয়। ঐ ব্যবস্থায় কয়েক হাজার লোক কাজ পাইয়াছে ও লক্ষ লোকের অন্ন সংস্থান হইয়াছে। গত বৎসর ১৪১৭ একর জমী চাষের জন্য লওয়া হয় ও ৯০৪ একর জমীতে চাষ করা হয়। সম্প্রতি ঐ সকল জমীর মালিককে প্রতি একর পিছু ৫ মণ ১০ সের করিয়া ধান দেওয়া হইয়াছে। গত ২৭শে মে কৃষিমন্ত্রী ডাঃ আর আমেদ তথায় যাইয়া ধান্য প্রদান ব্যবস্থার উদ্বোধন করিয়া আসিয়াছেন। ঐ অঞ্চলের জলাভূমিগুলি যে কোনদিন উদ্ধার হইবে, এ আশা কাহারও ছিল না।



আড়িয়াদহ মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠানে মন্ত্রী শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মল্লিক—

কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট দর্জিপাড়ানিবাসী শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মল্লিক ২৪ বৎসর ওকালতী করার পর সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি বিদ্যাসাগর, সিটি ও ডায়োসেসন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন এবং বিচারপতি এস-আর-দাস ও স্বর্গত শরৎচন্দ্র বসুর জুনিয়ার হিসাবে কাজ করিয়াছেন। তাঁহার পিতা স্বর্গত প্রিয়মাধব মল্লিক কলিকাতার খ্যাতনামা বীমাকর্মী ছিলেন এবং ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক, ডাক্তার অমিয়মাধব মল্লিক, পাটনার এডভোকেট সুশীলমাধব মল্লিক তাঁহার পিতৃব্য। তিনি হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ার অধিবাসী।

কীর্তনীয়ার সম্মান—

গত দোলযাত্রার সময় (১৩৬০) বীরভূম সাহিত্য সম্মেলনের কুড়মিঠায় পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের গৃহে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে বাঙ্গলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তনীয়া শ্রীনন্দকিশোর দাস মহাশয়কে 'কীর্তন রসসাগর' উপাধি দানের দ্বারা সম্মানিত করা হইয়াছে। অধ্যাপক ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত সম্মেলনের সভাপতিরূপে ঐ উপাধি দান করিয়াছেন। সাহিত্যরত্ন মহাশয়ও উক্ত কীর্তনীয়াকে এক রৌপ্যপদক দান করিয়াছিলেন।

আন্তর্জাতিক ছোট গল্প প্রতিযোগিতা—

কয়েকমাস পূর্বে আন্তর্জাতিক ছোট গল্প প্রতিযোগিতায় আঞ্চলিক বাঙ্গলা ভাষায় শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব ও শ্রীঅন্নপূর্ণা গোস্বামী দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া প্রত্যেকে ২৫০৲ টাকা, শ্রীদেবাচার্য তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া ১৫০৲ টাকা এবং শ্রীবাণী রায় চতুর্থ হইয়া ১০০৲ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন। লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকদের প্রায় কেহই এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেন নাই। ফলে প্রথম শ্রেণীর গল্প



শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব

না পাওয়ায় বিচারকমণ্ডলী কাহাকেও প্রথম বলিয়া ঘোষণা করেন নাই। পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক-লেখিকাদের আমরা অভিনন্দন জানাইতেছি।

বিশিষ্ট বিপ্লবীকে সাহায্য দান—

স্বদেশী যুগের অন্যতম বিশিষ্ট বিপ্লবী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সরখেল বর্তমানে অসুস্থ হইয়া সেবাগ্রামে বাস করিতেছেন।

লোকসভার সদস্য মধ্যপ্রদেশবাসী শ্রীমগনলাল বাগড়ী তাঁহার কথা শ্রীজহরলাল নেহরুকে জ্ঞাপন করায় প্রধানমন্ত্রী 'নেহরু অর্থভাণ্ডার' হইতে শ্রীযুত সরখেলকে মাসিক একশত টাকা সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বোম্বায়ে রেশন-প্রথার অবসান—

বোম্বাই রাজ্যে গত ১১ বৎসর ধরিয়া রেশন-প্রথা চলিতেছিল। ১৮ মাস পূর্ব হইতে তথায় ক্রমে ক্রমে রেশন প্রথা বর্জনের ব্যবস্থা হইতেছিল। শেষ পর্য্যন্ত ১১টি বড় সহরে শুধু চাউলের রেশন ছিল। ভারতসরকার ব্রহ্মের নিকট হইতে যে ৯ লক্ষ টন চাউল ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ৪ লক্ষ টন বোম্বাইকে দেওয়ায় গত ১লা জুন হইতে বোম্বায়ে রেশন প্রথা একেবারে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—

বিশ্বভারতীর সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ শান্তিনিকেতনবাসী পণ্ডিত শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১৯৫৪ সালের মার্চ মাস হইতে এক বৎসরের জন্য মাসিক ৭৫ টাকা বৃত্তি মঞ্জুর করিয়াছেন। ৮৭ বৎসর বয়স্ক হরিচরণ পণ্ডিত মহাশয় সারা জীবন ধরিয়া শব্দ-কোষ রচনায় নিযুক্ত ছিলেন। সাহিত্যিকদিগকে বৃত্তি দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি অর্থভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ও তাহা হইতেই এইরূপ বৃত্তি প্রদান করা হইতেছে; হরিচরণ বাবুর নিষ্ঠা ও কর্মশক্তি সারা জীবন সকলকে মুগ্ধ করিয়াছে।

মন্মথনাথ স্মৃতি হল উদ্বোধন—

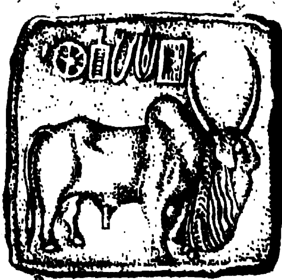
কলিকাতা ৬১।১ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীটে স্বর্গত যদুলাল মল্লিকের পুত্র স্বর্গত মন্মথনাথের স্মৃতিরক্ষার্থে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীবৃন্দাবন মল্লিক সঙ্গীত শিক্ষা কেন্দ্ররূপে একটি হল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। গত ২৯শে মে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের সভাপতিত্বে এক সভায় কলিকাতার মেয়র শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায় হলের উদ্বোধন করিয়াছেন। শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ বহু সুধী উৎসবে উপস্থিত হইয়া স্বর্গত মন্মথনাথের সঙ্গীত-প্রীতির প্রশংসা করেন ও তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য তাঁহার পুত্রগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পশ্চিমবঙ্গে হাতী-ধরা—

১৯৫৪ সালের শীতকালে জলপাইগুড়ী জেলায় ১৩টি হাতী ধরিয়া বিক্রয় করা হইয়াছে। প্রতি বৎসর শীতকালে ভুটান পর্বত হইতে জলপাইগুড়ী জেলায় হাতী আসে। এ বৎসর ১৬টি হাতী ধরা হইয়াছিল—তন্মধ্যে ২টি অত্যন্ত বৃদ্ধ বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয় ও একটি ধরার সময় মারা যায়। হাতী বিক্রয় হইতে পশ্চিমবঙ্গ ও ভুটান প্রত্যেক দেশের গভর্ণমেণ্ট ৪ হাজার ৬ শত করিয়া টাকা পাইয়াছে। শুধু শীতকালে একবার ঐ অঞ্চলে হাতী ধরা হইয়া থাকে। খেদা করিয়া হাতী ধরার পর হাতীকে উপযুক্ত ভাবে শিক্ষা দিয়া ও শান্ত করিয়া বিক্রয় করা হয়।

নববর্ষ—

ভারতবর্ষ এই মাসে দ্বিচত্বারিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। এই শুভক্ষণে আমরা শ্রদ্ধার সহিত ইহার প্রতিষ্ঠাতা, স্বর্গত সম্পাদকগণ ও উদ্যোক্তাদের কথা স্মরণ করি এবং যে সকল লেখক, পাঠক ও অনুগ্রাহকের কৃপায় আজও ভারতবর্ষ তাহার সম্মান অক্ষুন্ন রাখিয়া চলিয়াছে, তাহাদের অভিবাদন জ্ঞাপন করি। ভগবৎ কৃপায় আমরা যেন আমাদের পূর্বাচার্য্যগণের ধারা রক্ষা করিতে সমর্থ হই—সকলের নিকট এই প্রার্থনাই আজ জানাইয়া রাখিলাম।









শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

বাইটন কাপ ঃ

বোম্বাইয়ের টাটা স্পোর্টস ক্লাব ১-০ গোলে ওয়েষ্টার্ণ রেলদলকে হারিয়ে উপর্যুপরি দু' বছর বাইটন কাপ জয়ী হয়েছে। টাটা স্পোর্টস দল এ নিয়ে চারবার (১৯৪৯, ১৯৫০, ১৯৫৩ ও ১৯৫৪) বাইটন কাপ পেল। বেশীর ভাগ লোকই আশা করেছিলেন, রেলদল জয়ী হবে। কারণ প্রতিযোগিতায় আগাগোড়া রেলদল ভাল খেলেছিল। রেলদলের মার্জ্জিত এবং নৈপুণ্যপূর্ণ খেলা দর্শকদের মুগ্ধ করেছিলো। এবারের প্রতিযোগিতায় ক'লকাতার প্রথম বিভাগীয় লীগ প্রতিযোগিতার শীর্ষস্থানীয় দলগুলি বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। এ বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ভবানীপুর ক্লাব প্রথম রাউণ্ডের ২য় দিনের খেলায় ০-১ গোলে বারাকপুরের আর্মড পুলিশ দলের কাছে হেরে যায়। প্রথম দিনের খেলা ১-১ গোলে ড্র যায়। লীগের দ্বিতীয় স্থান অধিকারী কাষ্টমস কোয়ার্টার-ফাইনালে ০-১ গোলে করাচীর পাকিস্তান ইণ্ডিপেণ্ডেন্টস্ দলের কাছে হার স্বীকার করে। লীগের ৩য় স্থান অধিকারী মোহনবাগান কোয়ার্টার-ফাইনালে ০-২ গোলে নাগপুর ইউনাইটেড দলের কাছে পরাজিত হয়। চতুর্থ স্থান অধিকারী ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ২য় রিপ্লেতে পাঞ্জাব স্পোর্টস দলের কাছে ০-১ গোলে পরাজিত হয়। পুলিশ তিন দিনের চেষ্টায় আর্মড-পুলিশকে তৃতীয় রাউণ্ডে হারিয়ে চতুর্থ রাউণ্ডে ০-৩ গোলে টাটা স্পোর্টস দলের কাছে হেরে যায়। স্থানীয় দলগুলির মধ্যে শেষ আশা ছিল, পাঞ্জাব স্পোর্টস। চতুর্থ রাউণ্ডে তারা পরাজিত হয় ওয়েষ্টার্ণ রেলদলের কাছে ১-৩ গোলে। একদিকের সেমি-ফাইনালে টাটা স্পোর্টস ক্লাব ৩-১ গোলে করাচীর পাকিস্তান ইণ্ডিপেণ্ডেন্টস দলকে হারিয়ে দেয়। অপর দিকের সেমি-ফাইনালে ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে ২-০ গোলে নাগপুর ইউনাইটেড দলকে হারিয়ে টাটা স্পোর্টস দলের সঙ্গে ফাইনাল খেলায় মিলিত হয়।

দ্বিতীয় এশিয়ান গেমস ঃ

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের ম্যানিলায় রিজ্যাল মেমোরিয়াল ষ্টেডিয়ামে দ্বিতীয় এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়েছে। গত মে মাসের ১লা তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্রীড়ানুষ্ঠান আরম্ভ হয় এবং শেষ হয় ১০ই মে। এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত ১৮টি দেশ যোগদান করে।

সমস্ত প্রতিযোগিতার ফলাফলের উপর প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলির মধ্যে প্রথম চারিটি দেশের নাম—১ম জাপান (স্বর্ণপদক ৩৮), ২য় ফিলিপাইন (স্বর্ণপদক ১৪), ৩য় কোরিয়া (স্বর্ণপদক ৮), ৪র্থ ভারতবর্ষ (স্বর্ণপদক ৫)।

বিভিন্ন ক্রীড়ানুষ্ঠানের ফলাফল

ট্রাক এ্যাণ্ড ফিল্ড ইভেণ্টস :	১ম জাপান, ২য় ভারতবর্ষ, ৩য় পাকিস্তান
কুস্তি :	১ম জাপান, ২য় পাকিস্তান, ৩য় ফিলিপাইন
সুটিং :	১ম ফিলিপাইন, ২য় জাপান, ৩য় ইসরাইল
বাস্কেট বল :	১ম ফিলিপাইন, ২য় চীন, ৩য় জাপান
বক্সিং :	১ম ফিলিপাইন, ২য় জাপান, ৩য় কোরিয়া
ভারোত্তোলন :	১ম দঃ কোরিয়া, ২য় ব্রহ্মদেশ, ৩য় চীন
সন্তরণ :	১ম জাপান, ২য় ফিলিপাইন, ৩য় সিঙ্গাপুর
ফুটবল :	১ম চীন, ২য় কোরিয়া, ৩য় ইন্দোনেশিয়া
ওয়াটার পোলো :	১ম সিঙ্গাপুর, ২য় জাপান, ৩য় ইন্দোনেশিয়া।

দিল্লীতে ১৯৫০ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম এশিয়ান ফুটবল চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছিলো। কিন্তু এবারের প্রতিযোগিতায় ইন্দোনেশিয়া ৪-০ গোলে ভারতবর্ষকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। সংবাদে প্রকাশ, ভারতবর্ষ পেনাল্টিসহ চারটি গোল করার সুযোগ নষ্ট করে। ক'লকাতায় আমরা ভারতীয় ফুটবল দলের খেলার যে নমুনা দেখেছিলাম এবং ম্যানিলা যাওয়ার পথে ভারতীয় ফুটবল দলের যে শোচনীয় পরাজয়ের খবর পেয়েছিলাম তা থেকেই আমরা অবস্থার গুরুত্ব অনুমান করেছিলাম; তবে এ ধরণের শোচনীয় পরাজয় হবে কেউ ভাবেনি।

নিম্নলিখিত বিষয়ে ভারতবর্ষ স্বর্ণপদক লাভ করেছে—

পুরুষ বিভাগে

১১০ মিটার হার্ডল : ১ম সরণ সিং। সময় ১৪.৭ সে:
(নতুন এশিয়ান রেকর্ড)

হাইজাম্প : ১ম অজিত সিং। উচ্চতা ৬ফি: ৪৭/৮ ইঞ্চি

ডিস্‌কাস থ্রো : ১ম পর্দুমন সিং। দূরত্ব ১৪২ফি: ৩৫/৮ ইঞ্চি
(নতুন এশিয়ান রেকর্ড)

সট পুট : ১ম পর্দুমন সিং। দূরত্ব ৪৬ফি: ৪৫/৮ ইঞ্চি
(নতুন এশিয়ান রেকর্ড)

মহিলা বিভাগে

৪ × ১০০ মিটার রীলে : ১ম ভারতবর্ষ। সময় ৪৯.৫ সে:

ডেভিস কাপ খেলায় ভারতবর্ষ ঃ

১৯৫৪ সালের ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় ইউরোপীয় জোনের ২য় রাউণ্ডের খেলায় ভারতবর্ষ ৩-০ খেলায় অষ্ট্রিয়াকে হারিয়েছে। ভারতবর্ষ প্রথম দিনের খেলায় দু'টি সিঙ্গলসে জয়ী হয়ে ২-০ খেলায় এগিয়ে থাকে।

খেলার ফলাফল :

নরেশকুমার ৪-৬, ৬-৩, ৬-৪, ৭-৫ সেটে হান্স রেড্‌লকে (অষ্ট্রিয়া) পরাজিত করেন।

আর কৃষ্ণান ৬-০, ৬-২, ৭-৫ সেটে ফ্রাঞ্জ সাইকোকে (অষ্ট্রিয়া) পরাজিত করেন।

২য় দিনের ডবলস খেলায় ভারতবর্ষ জয়ী হয়। খেলার ফলাফল :

নরেশকুমার এবং নরেন্দ্রনাথ ৬-৩, ৬-৩, ৬-৪ সেটে ফ্রাঞ্জ সাইকো এবং হান্স রেড্‌লকে (অষ্ট্রিয়া) পরাজিত করেন।



১৯৫৪ সালের বাইটনকাপ বিজয়ী টাটা স্পোর্টস ক্লাব (বোম্বাই) ফটো : পান্না সেন

ইংলণ্ডের শোচনীয় হার ঃ

২৩শে মে বুদাপেস্তের পিপল'স ষ্টেডিয়ামে বিশ্ব-

অলিম্পিক ফুটবল চ্যাম্পিয়ান হাঙ্গেরী ৭-১ গোলে ইংলণ্ড একাদশ দলকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছে। হাঙ্গেরী দলের 'কপিবুক ফুটবল' খেলার সামনে ইংলণ্ডের রক্ষণভাগ সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে আত্মসমর্পণ করে। প্রথমার্দ্ধে হাঙ্গেরী ৩-০ গোলে এগিয়েছিল। দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলায় চার মিনিটে হাঙ্গেরী চারটে গোল দেয়। সাম্প্রতিক-কালের আন্তর্জাতিক খেলায় এত অধিক গোলে ইংলণ্ড কোন দলের কাছে হার স্বীকার করেনি। এ প্রসঙ্গে ইংলণ্ডের এই ধরণের শোচনীয় পরাজয়ের দুটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়—১৮৭৮ সালে গ্লাসগোতে স্কটল্যাণ্ডের কাছে ২-৭ গোলে এবং ১৮৮১ সালে ওভালে স্কটল্যাণ্ডের কাছে ইংলণ্ডের ১-৬ গোলে হার। জাতীয় ফুটবল খেলায় ইংলণ্ডের এ শোচনীয় পরিণতি সারা ইংলণ্ডবাসীকে মুহ্যমান করে তুলেছে।

১ মাইলে বিশ্বরেকর্ড ঃ

ইংলণ্ডের রোগার ব্যানিষ্টার ১ মাইল দূরত্ব পথ ৩ মিঃ ৫৯.৪ সেকেণ্ডে অতিক্রম ক'রে বিশ্বের নতুন রেকর্ড করেছেন। পূর্ব্ব রেকর্ড ছিল, ১৯৪৫ সালে সুইডেনের গাণ্ডার হাগ্‌ প্রতিষ্ঠিত ৪ মিঃ ১.৪ সেঃ। রোগার ব্যানিষ্টারের বয়স ২৪ বছর; তিনি সেণ্ট মেরী'স হাস-পাতালের ছাত্র।

ফুটবল লীগ ঃ

ক'লকাতায় ফুটবল মরসুম আরম্ভ হয়েছে কিন্তু খেলা দেখে লোকের মনে তৃপ্তি নেই। খেলায় জয়লাভের আনন্দ পুরোপুরি উপভোগ্য হয়, সেই সঙ্গে খেলা যদি ভাল হয়। বর্ত্তমান ফুটবল মরসুমে প্রথম বিভাগের লীগের খেলা খারাপ হওয়ার অন্যতম কারণ, বুটপায়ে খেলা। ভারতীয় ফুটবল খেলার বৈশিষ্ট্য আজ বুট পায়ে খেলার দরুণ খর্ব্ব হয়েছে। অথচ বুট বর্জন করা যায় না, আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলায় স্থান পেতে হ'লে বুটপায়ে ফুটবল খেলার অভ্যাস রীতিমত থাকা দরকার।

প্রথম বিভাগের লীগের খেলায় বর্ত্তমানে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ১০টা খেলায় ১৮ পয়েণ্ট; ২টো খেলা ড্র। বিপক্ষে গোল ২ এবং পক্ষে ১২।

মোহনবাগানের ১১টা খেলায় ১৮ পয়েণ্ট উঠেছে। ড্র ৪টে। গোল দিয়েছে ১১টা, গোল একটাও খায়নি।

ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত অপরাজেয় আছে। ওয়াড়ী বেশ খেলছিল, কিন্তু মহমেডান স্পোর্টিংয়ের কাছে হেরে গিয়ে একধাপ নীচে নেমে গেছে। তাদের ৯টা খেলায় ১৪ পয়েণ্ট।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "গৌড়মল্লার"—৪৲
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "দেবদাস" (১৮শ সং)—২৲,
"অনুরাধা-সতী ও পরেশ" (৮ম সং)—১৷০, "শেষ প্রশ্ন" (১৮শ সং)—৫৲
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত রহস্যোপন্যাস "ভূমধ্যসাগরের যাত্রী"—১৲, "শিখার সাধনা"—৸০
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা অনূদিত "টয়লার্স অব্‌ দি সী"—১৲, "বেন-হুর"—১৲
রঞ্জন প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "সংকরী"—৩৲
শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "কায়কল্প"—৩৲
প্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত "স্ব-নির্বাচিত গল্প"—৪৲
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত রহস্যোপন্যাস "বজ্র আর ভূমিকম্প"—১৷০, "মায়ামৃগের মৃগয়া"—[illegible]
শ্রীরবীন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত রহস্যোপন্যাস "তবে কে?"—৸০, "অভিশপ্ত কণ্ঠহার"—৸০
শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "রক্ত-বিপ্লবের এক অধ্যায়"—২৲
শ্রীছবি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "কাক-বন্ধ্যা"—৩৲
ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "হে মাধবী, দ্বিধা কেন"—২৲
শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী প্রণীত "মার্কটোয়েনের গল্প"—১৲
শ্রীনির্ম্মলা দেবী রত্নপ্রভা প্রণীত উপন্যাস "পূজারিণী"—১৷০
বুদ্ধদেব বসু ও প্রতিভা বসু প্রণীত "বসন্ত জাগ্রত দ্বারে"—৩৲
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার প্রণীত "পল্লী-গীতি কাব্যকথা"—৷৵০
শ্রীমনোজিৎ বসু প্রণীত "গল্পের মণিমেলা"—১৲
শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত প্রণীত "পাতালপুরীর আংটি"—১৲
দেবসাহিত্য কুটীর প্রকাশিত "ঠাকুরমার ঝুলি"—৩৲
[illegible] মিত্র প্রণীত উপন্যাস "সমান্তরাল"—২৷০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩৷১৷১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



শিল্পী—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

দূরের চিঠি

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস



শ্রাবণ—১৩৬১

প্রথম খণ্ড | দ্বিচত্বারিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

বাংলার সংস্কৃতি ও সাধনা

অধ্যাপক শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায় এম্.এ

আলপনা দিয়ে চমৎকার করে সাজানো হয়েছে পূজার মণ্ডপটি, পূজা-গৃহের দ্বারদেশে পূর্ণকুম্ভ। তাতে সিঁদুর দিয়ে আঁকা হয়েছে স্বস্তিক-মঙ্গলচিহ্ন। দুয়ারের দু'পাশে কলাগাছ, দরজার শীর্ষদেশে আম্রপল্লবের মালা। শোনা যাচ্ছে ঢাক-ঢোলের বাজনা, কাঁসর-ঘণ্টার রোল। মাঝে মাঝে বা শঙ্খধ্বনি। ওখানে আজ আবালবৃদ্ধবণিতার সমাগম, জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের মিলন। এই হল বাংলার উৎসবগৃহ। এমনিতর উৎসবের দিনটিতে বাঙালী শিল্পী, বাঙালী সুন্দরের পূজারী। উৎসব আর পূজাপার্বণের দিনে বাঙালীর মনের আনন্দ শতদল পদ্মের আকারে স্থান নেয় পূজামণ্ডপের মাঝখানে। সেদিন বাঙালীকে আমরা শুধু রূপের পূজারী হিসেবেই পাই নে, সেদিন তার অন্তরের মাধুর্য ও মাহাত্ম্যেরও পরিচয় পেয়ে থাকি। সেদিন বিশ্ব তার আত্মীয়, ঐক্য তার কাম্য, সেদিন কল্যাণধর্মে সে উদ্বুদ্ধ। আপন মনের আনন্দ অন্য সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবার জন্যে সেদিন তার অপরিসীম ঔৎসুক্য। উৎসবের দিনে বাঙালী শিবসুন্দরের পূজারী, বাংলার উৎসবে তাই শিবশক্তির সমন্বয়।

বাংলায় বারো মাসে তেরো পার্বণ, কাজেই সারা বছর ধরে এই রকম করে বাংলাদেশে চলে সুন্দরের সাধনা। পূজায় উৎসবে, পাল-পার্বণে, বাঙালী নানাভাবেই করে চলেছে সুন্দরের আরতি। সুন্দরের ধ্যানে সে মগ্ন, নব নব উপকরণে তার সুন্দরের অর্ঘ্য রচনা।

কিন্তু কেবল পূজাপার্বণেই বাঙালীর রূপচর্যার পরিচয় মেলেনি। বাঙালী তার জীবনের সকল পর্যায়েই বিশিষ্ট রূপচর্যার পরিচয় দিয়ে এসেছে। দৈনন্দিন জীবন-যাত্রাপ্রবাহের মধ্যেও বাঙালী চিরদিনই শিল্পী—সুন্দরের পূজারী। বাস করার খড়ের কুটীর, নিত্য ব্যবহারের বেত ও বাঁশের জিনিস বাঙালী সুন্দর করেই নির্মাণ করেছে। এমন কাপড় বুনেছে—যা একদিন কাঞ্চন তৌলে বোগদাদ রোম চীন কিনেছে—ঢাকার মসলিন সংগ্রহ করার জন্য দেশ-বিদেশের শত ডিঙ্গা বাংলার বন্দরে এসে ভিড় করেছে।

বাঙালী শিল্পীরা এই বস্ত্র শুধু ব্যবসায়ের জন্য তৈরী করেছে বলে মনে হয় না, তারা কলালক্ষ্মীর আরাধনার জন্য মসলিন তৈরী করেছিল। মসলিন প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বাঙালী তন্তুবায়ের অপূর্ব সাধনার পরিচয় মিলেছে। মসলিন-নির্মাতা ঢাকার তাঁতীদের যন্ত্রপাতি অতি সামান্যই ছিল—কোন অংশ জলে ভিজিয়ে, কোন অংশ ছায়ার ক্রমভেদে রৌদ্রতাপে শুকিয়ে নিয়ে, কখনও প্রখর সূর্যালোকে, কখনও বা মেঘের ছায়ায় মন্দীভূত রবি-কিরণে, কখনও বা ছায়াশীতল মাটির ঘরে বসে কাটুনীরা এই মসলিনের জন্য সুতা তৈরী করেছে। ভালো মসলিন নির্মাণের বেলায় ঐ বস্ত্র বুননির কোন কোন পর্যায় কেবল কুমারী নারীর কোমল সুন্দর হাতে ন্যস্ত হয়েছে, কিংবা কেবল পনেরো থেকে ত্রিশ বছরের মেয়েরা মসলিনের সান্ধ্য শিশিরের মত শ্রীকে ফুটিয়ে তুলেছে। বাস্তবিক, বাংলার শিল্পীরা মসলিন নির্মাণ উপলক্ষে যেন একটা মহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছে। এরূপ তপস্যা—সুন্দরকে প্রমূর্ত করে তোলার এরূপ সাধনা এই বাংলা দেশেই সম্ভব হয়েছিল। বাংলার মৃৎশিল্প, হাতীর দাঁতের তৈরী নানাবিধ জিনিসও বাঙালীর অসামান্য সাধনা ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় বহন করেছে চিরদিন।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালী সংস্কৃতিসম্পন্ন জাতি এবং শিল্পে ও সাহিত্যে, নাচ, গান ও ছবি আঁকায় বাঙালী তার বিশিষ্ট সৌন্দর্যবোধ ও সংস্কৃতির পরিচয় দিয়ে এসেছে। বাংলার জল-মাটির স্বাতন্ত্র্য এদেশের শিল্প-সাহিত্যকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করেছে। নদীমাতৃকতা, ঘনশ্যাম বনশ্রী, ষড়ঋতুর বৈচিত্র্য বাংলার সংস্কৃতির বিশেষত্বের মূলে। পলিমাটির তৈরী এই বাংলাদেশে সব দিক দিয়েই সোনার ফসল ফলেছে। তা সে ক্ষেতের ফসলই হোক, আর মনের ফসলই হোক। ভারতের অন্য কোনোখানের ফসলের সঙ্গে এদেশের ফসলের তুলনাই হয় না। অলঙ্কার নির্মাণে, আলপনা দেওয়ায়, নাচে গানে, বাদ্যযন্ত্র নির্মাণে, বাজনায়, সাহিত্যে, ধর্মে, স্থাপত্যশিল্পে ও ভাস্কর্যে বাঙালী আপন বিশিষ্ট কল্পনা ও সৃজনী প্রতিভার পরিচয় চিরদিনই দিয়ে এসেছে।

সুপ্রাচীন কালেই বাংলায় ধনীগৃহের জন্যে তৈরী হয়েছে মুক্তাখচিত হার, কানের কুণ্ডল, কর্ণাঙ্গুরী, অঙ্গুরীয়ক, বলয়, কেয়ূর, শঙ্খবলয়, মেখলা ইত্যাদি। এ সব অলঙ্কার মেয়ে পুরুষ সকলেই ব্যবহার করেছেন। সোনারূপার গহনা ছাড়াও এই বাংলায় অতি প্রাচীনকাল থেকে হীরামুক্তা-মণিখচিত নানারকমের অলঙ্কারও তৈরী হয়েছে—ধনীগৃহে তা ব্যাপকভাবেই ব্যবহার হয়েছে। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের বৌ-ঝিয়েরা পরেছেন শঙ্খবলয়, কিংবা কচি তালপাতার কর্ণাভরণ ইত্যাদি। কিন্তু এই সব সাধারণ জিনিসের তৈরী অলঙ্কারও বাংলার শিল্পীর হাতের স্পর্শ পেয়ে অসাধারণ সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

বাংলার সমাজে নাচ গানের সমাদর চিরদিনই ছিল। সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা যেমন নাচগানের চর্চা করেছে এদেশে, তেমনি উচ্চশ্রেণীর লোকেদের মধ্যেও নাচ গানের সমাদর হয়েছে। পাহাড়পুর, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি স্থান থেকে অসংখ্য পোড়ামাটির ফলক পাওয়া গিয়েছে—তাতে নানা ভঙ্গিতে নৃত্যরত মেয়ে পুরুষের অনেক ছবি দেখা যায়। সমাজের ওপরতলায় কি ধরণের নাচের প্রচলন ছিল তার নমুনা পাওয়া গিয়েছে প্রাচীন বাংলার নানান্ পাথরফলকে খোদাই করা দেবদেবীর মধ্যে, অপ্সরা, গন্ধর্বনারী ও মন্দিরনর্তকীর নাচের ভঙ্গিমায়। তাছাড়া, জয়দেবের স্ত্রী নৃত্য-বিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন, বেহুলা নাচে গানে অতুলনীয়া ছিলেন—এ সব কাহিনী সমাজের অভিজাতবরে নাচগানের সমাদরের পরিচয় দিয়েছে। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলে পাই—

> মুখে গীত গায় বেহুলা পায় ধরে তাল।
> মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল॥
> নৃত্যগীতে শূলপাণি হইল মোহিত।
> অনিমেষ নয়নে শিব চাহে কন্যার ভিত॥

দ্বিজ বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে—

> নৃত্য করে বিপুলা সুন্দরী।
> যত দেব হরষেতে বসি দেখে চারি ভিতে,
> কটাক্ষে মোহিল সুরপুরী॥

সমাজের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে নাচ গানের চর্চা বাংলায় বরাবরই ছিল, আজও আছে। বৌদ্ধগানে পাই—

> এক সো পদুমা চৌষঠ্‌ঠী পাখুড়ী
> তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী॥

অর্থাৎ,—

একটি পদ্ম তার চৌষট্টি পাপড়ি
তাতে চড়ে নাচে ডোম্বী ॥

ডোমের ঘরের মেয়েরা নাচে-গানে নিপুণা ছিল এবং সমাজের এই নীচের তলার লোকেরাই বাংলার লোকনৃত্যের ধারাকে আজও প্রাণবন্ত করে রেখেছে।

উৎসব আর আনন্দ-যজ্ঞ উদ্‌যাপন করবার জন্য বাঙালী তৈরী করেছে অসংখ্য বাদ্যযন্ত্র। কাঁসর, করতাল, ঢাক, বীণা, মৃদঙ্গ, বাঁশী প্রভৃতির প্রতিরূপ পাহাড়পুর প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত মাটির ফলকে কত যে পাওয়া গিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

প্রাচীন বাংলায় মন্দির ছিল অগণিত। কিন্তু বাংলাদেশের মন্দির পাথর দিয়ে বড় একটা তৈরী হত না, তার ওপর ছিল নদীর ভাঙন। তাই বাংলার মন্দির আজ আর বেশি টিকে নেই। কিন্তু মন্দির নির্মাণে বাঙালী এমন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় একদিন দিয়েছিল—যে জন্যে বাংলার মন্দির-নির্মাণের পদ্ধতিই যবদ্বীপ ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশের বিশিষ্ট মন্দির-স্থাপত্যের আসল প্রেরণা জুগিয়েছিল।

বাংলার ভাস্কর যে সব মূর্তি গড়েছে, তার সবগুলিই জাগ্রত ও ক্রিয়াশীল। বাংলার শিল্পীর নির্মিত বিষ্ণু, বুদ্ধ, অর্ধনারীশ্বর, মহিষমর্দিনী প্রভৃতিতে কোথাও স্তিমিত উৎসাহ বা অলস অপটুতা নেই। সব মূর্তিই একটা গতিবেগে শিহরিত, গতিমূলক ব্যঞ্জনার জাগ্রত শ্রী সকল মূর্তির মধ্যেই পরিস্ফুট। শিল্পসৃষ্টি করতে গিয়ে বাঙালী তার সৃষ্টির মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছে নিজের ভাবোচ্ছ্বাসকে। অন্তরে ধ্যানে যাকে পেয়েছে, রূপদান করেছে সেই ধ্যানলব্ধ মূর্তিকে। বাংলার শিল্পী সৃষ্টির ক্ষেত্রে বর্জন করেছে জ্ঞানপন্থাকে, অবলম্বন করেছে ভাবস্বপ্নকে। তাই তারা পাথরের বুকে কবিতা রচনা করতে পেরেছে, পাথর কুঁদে ভাবের ঝরণা বার করেছে। বাংলার শিল্পীর হাতে অহল্যাপাষাণীর পাষাণত্ব ঘুচে গেছে চিরকালের জন্য—শিল্পীর হাতের স্পর্শ পেয়ে অহল্যাপাষাণী এদেশে পরিণতি লাভ করেছে রূপলক্ষ্মীতে।

কলাপ্রসঙ্গকে বাংলার শিল্পী শুধু নক্সা মনে করে নি, তাই মূর্তি নির্মাণ করতে প্রবৃত্ত হয়ে মূর্তির মুখশ্রীতে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। বাংলার অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতে কেবল অলঙ্করণনৈপুণ্য নেই—দেবত্ব এখানে মানবত্বকে শিরোধার্য করেছে। বাংলার বিষ্ণুমূর্তি পাথরে খোদাই করা সুদূরের অচেনা অতিথি মাত্র নয়—সে মূর্তির মুখে আছে একটা পরিচ্ছন্ন শ্রী এবং ইঙ্গিত। এ মূর্তি ভক্তের সঙ্গে ক্রীড়ার জন্যে আকুল। বিষ্ণুপুরের মৃন্ময় তক্ষণকলার তুলনা কোথায়? বাংলার মহিষমর্দিনী দুর্গামূর্তিতে আছে একটা অনির্বচনীয়তা। বীরত্ব, করুণা আর স্নেহের সমাহারে সে এক অপূর্ব সৃষ্টি। এ মূর্তিতে আছে এমন একটা বিশিষ্ট শ্রী, যার ফলে ঐহিকতা ও অনৈহিকতার আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে এতে। চব্বিশ পরগণার মথুরাপুরে প্রাপ্ত লক্ষ্মীমূর্তি অজন্তার রচনাকেও হার মানিয়ে দেয়। এ মূর্তিতে ঐশ্বর্য আড়ম্বর নেই, কিন্তু গভীর ব্যঞ্জনা রয়েছে। লক্ষ্মীর মুখশ্রীর মধ্য দিয়ে কল্যাণকিরণ যেন ঝরে পড়ছে। মোটকথা, শিল্পসৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হয়ে বাংলার শিল্পীরা ভারতের অন্য সকল প্রদেশের শিল্পীদের রচনাপদ্ধতির অনুসরণ করে নি। বাঙালী তার নিজস্ব সৃষ্টির পথ উদ্‌ভাবন করে নিয়েছে। সব কিছুতেই একটা রসসঞ্চার করে বাংলার শিল্পীরা আনন্দ লাভ করেছে।

বাঙালীর জীবনে একটা বড় জায়গা জুড়ে আছে ব্রত উৎসব। এই ব্রত উৎসবকে কেন্দ্র করে বাংলার সংস্কৃতি-ধারা বিশেষভাবেই পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে। ব্রতের ইতিহাস বেশ প্রাচীন। কত প্রাচীন তা আজও স্থির হয় নি। তবে এ সকলের মধ্যে কতকগুলি যে বৈদিক যুগের আগে থেকেও বাংলায় প্রচলিত ছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। যখন বেদের সৃষ্টি হয় নি, তখনও সাধারণ লোকের মনের কামনা সহজ ভাষায়, সরল ক্রিয়ায় ব্রতকথাগুলির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। এখনও বাংলার পল্লী-অঞ্চলে নদীর ঘাটে, বৃক্ষচ্ছায়ায়, কখনও বা কুটীরপ্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে পল্লীরমণীরা নানাবিধ ব্রতানুষ্ঠান করে থাকেন। তখন নানারকম পূজার উপচারে তরুতল ও পূজাবেদিকা পূর্ণ হয়ে যায়, আলপনার শ্রীতে কুটীরের আঙিনা ঝলমল করতে থাকে—আনন্দে, ভক্তির রসে ও সকলের কল্যাণ-কামনায় ব্রতানুষ্ঠানকারিণীদের অন্তর পরিপূরিত হয়ে যায়। ব্রতানুষ্ঠান বাংলার নারীর মধ্যে শিল্পবোধ জাগিয়েছে, বাংলার নারীকে কল্যাণীমূর্তিতে উদ্ভাসিত করে তুলতে সহায়তা করেছে।

ব্রতে কামনাই সব—সকলে ভাল থাকবে, স্বামীপুত্র

আত্মীয়স্বজন সুখে ও নিরাপদে থাকবে, সংসারে সুখ ও শান্তি বিরাজ করবে—ব্রতে এই সব কামনাই প্রধান। এই কামনাকে ব্রতচারিণীরা তিন উপায়ে প্রকাশ করে থাকেন। ছড়ায়, আলপনায় ও ব্রতকথায়। এক একটি ব্রতে এক এক রকম ছড়া আবৃত্তি করা হয় এবং এক এক রকম ব্রতকথা হয়ে থাকে। প্রত্যেক ব্রতে বিশিষ্ট প্রকারের আলপনাও আছে। ব্রতের আলপনা কত বিচিত্র রকমের! —ঘরবাড়ী, চন্দ্রসূর্য, গাছ পাখী থেকে আরম্ভ করে পদ্ম, কলালতা, শঙ্খলতা, চালতালতা ইত্যাদি লতামণ্ডল—এবং শঙ্খ, চিরুণী, দর্পণ, হাঁস, হাতী, ঘোড়া, নৌকা, ধানছড়া ইত্যাদি কত চিত্র আলপনায়! আলপনা আঁকা হয় গুঁড়ো রং দিয়ে। কখনো কেবল চালের গুঁড়ো দিয়ে কাজ সারা হয়। কখনো কখনো অন্য আরও কয়েক প্রকারের গুঁড়ো ব্যবহার করা হয়। হলুদের গুঁড়ো, আবীর (লাল), শুকনো বেলপাতার গুঁড়ো (সবুজ), কাঠ কয়লার গুঁড়ো ইত্যাদিও আলপনা আঁকতে ব্যবহার করা হয়। সুপরিকল্পিত বর্ণ-সমাবেশের দরুণ এরূপ আলপনা উজ্জ্বল গালিচার মতই দেখায়। বাংলার নিজস্ব চিত্রশিল্পের পদ্ধতি এই আলপনার মধ্যে রূপ গ্রহণ করেছে। আলপনা আঁকতে প্রবৃত্ত হয়ে বাংলার নারী একই চিত্র দিনের পর দিন আঁকে না। মাঘমণ্ডলের ব্রতে সারা মাঘ মাস ভরে নিত্য নতুন আলপনা আঁকা হয়ে থাকে।

আলপনা আঁকার বেলায় শিল্পীর কল্পনাই সব। শিল্পীর মানস-সরোবরে তার নিজের আনন্দ শতদল মেলে ফুটে ওঠে, আর শিল্পী তখন তাকে রেখার মায়াজালে প্রমূর্ত করে তোলে। আলপনা আঁকার সময় বস্তুজগতের কথা মনেই থাকে না শিল্পীর—শিল্পীর দৃষ্টিও বস্তুজগতের প্রতি নিবদ্ধ থাকে না। তার দৃষ্টি তখন হয় অন্তর্মুখী। সে তখন ভাবের রূপকার—অন্তরের ভাবরস তার সৃষ্টির উৎস।

ছবি আঁকায় বাঙালী যে পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে, সমগ্র ভারতে তার তুলনা মেলা ভার। বাঙালী চিত্রকরেরা ভাবের রূপদান করেছে চিরদিন—এইখানে বাংলার চিত্র-শিল্পীর সৃষ্টির বিশেষত্ব। প্রাচীনকালের ধীমান বীতপাল, এ যুগের অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রমুখ শিল্পীরা কেউই বস্তুর প্রতিরূপ অঙ্কন করেন নি। অন্তরের ধ্যানধারণাকে তাঁরা রঙে রেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন। ছবি আঁকায় বাংলার শিল্পীর এমনিতর বিশেষত্ব ছিল বলে একদিন বিদেশী পর্যটক ফা হিয়েনের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। তিনি বাংলার চিত্রাঙ্কনরীতির ভূয়সী প্রশংসা করে গিয়েছেন তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে।

বাংলায় আঁকা ছবির প্রাচীনতম নমুনা পাওয়া গিয়েছে একাদশ দ্বাদশ শতকে। এর অধিকাংশই পাণ্ডুলিপি চিত্র, তালপাতার কিম্বা কাগজে হাতে লেখা পুঁথি সাজাবার জন্যে আঁকা। ছবিগুলি অতি অল্প জায়গার মধ্যে আঁকতে হয়েছে চিত্রকরকে। কিন্তু ছোট হলেও এই সব পুঁথিচিত্রের ভাব, পরিকল্পনা, রং রেখা সব কিছুই সুবৃহৎ প্রাচীর চিত্রের মতই। এই সব ছবি পুঁথির মলাটে কিম্বা কাগজের উপরে লেখার মাঝখানে সমান্তরাল করে আঁকা। এই সব ছবিতে আছে অপরূপ লালিত্য, চিত্রকরের আশ্চর্য সামঞ্জস্য-জ্ঞান, আর আছে আবেগ সঞ্চারিত করার ক্ষমতা। বাংলাদেশের পটের চিত্রও খুব প্রাচীন। তা থেকেই পরবর্তীকালের পটের ছবি উদ্‌ভূত হয়েছে, জন্ম নিয়েছে আলপনা। নিরলঙ্কৃত স্বাভাবিক সৌন্দর্য বাংলার পটচিত্রের অন্যতম বিশেষত্ব।

সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্র—তাতেও বাঙালীর অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেছে। বৈষ্ণব কবিরা সর্বত্র সংস্কৃত শাস্ত্রানুমোদিত অলঙ্কারের নির্দেশ মেনে চলেন নি, নতুন অলঙ্কার তাঁরা উদ্ভাবন করে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"বাউল গানে শাস্ত্রের বিপুল ভার নেই, অথচ কী গভীর তার ব্যঞ্জনা। এদেশের কীর্তন বাউল ভাটিয়ালি গানে খুব সাদা কথায় এমন অপূর্ব মানবীয় রস ফুটেছে যে কোথাও তার তল মেলে না, কূল মেলে না।" কৃত্তিবাসের রাম, রাবণ, সীতা—বাল্মীকির রাম, রাবণ, সীতা নন;— তাঁরা কৃত্তিবাসেরই সন্তান-সন্ততি। বাংলা সাহিত্যের শিব পুরাণের শিব নন। তিনি দরিদ্র কৃষকের প্রতিভূ, তাঁর গৃহস্থালীর চিত্রে বাংলার দরিদ্রগৃহের চিত্রই আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। হরগৌরীর বিবাহ আর কোন্দলে বাংলার সমাজচিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর দশপ্রহরণধারিণী মহিষাসুরমর্দিনী দেবী দুর্গাকে চণ্ডীমণ্ডপে স্থাপন করে যে ঐশ্বর্যের পূজা আমরা করি, সেই ঐশ্বর্যময়ী দেবীর সঙ্গে আমাদের নাড়ির বিশেষ যোগ নেই।

আমাদের চণ্ডী আমরা নিজেরাই সৃষ্টি করে নিয়েছি। মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথায় ও গানে, ছড়ায়, শিবায়নে, দুর্গামঙ্গলে, মনসামঙ্গলে, চণ্ডীমঙ্গলে ও অজস্র অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে আমাদের মানসী কন্যা দুর্গাকে আমরা আমাদের মনের মত করে সৃষ্টি করে নিয়েছি। গিরিকুমারী উমাকে বাংলার মেয়ে সাজতে হয়েছে। পুরাণ বা দেবী ভাগবত বাঙালী মাথায় ঠেকিয়ে চণ্ডীমণ্ডপে পাঠ করে বটে, কিন্তু মঙ্গলকাব্যে দেবী যে আপন সে পরিচয় বাঙালী মাত্রেই পায়। শাক্ত কবি দেবতাকে মর্ত্যের মানুষের আত্মীয়রূপে দেখেছে—শ্যামা জননীর কাছে আদর অভিমান ক্রোধ প্রকাশ করেছে। আগমনী গানে আর বিজয়া গানে বাংলার মাতৃহৃদয়ের আগ্রহ ও আর্তি ফুটে উঠেছে। পূজার সময় শরৎঋতুতে কন্যার পিতৃগৃহে আগমন সূচনাই আগমনী গান। আর কন্যাবিচ্ছেদকাতরা বাংলার মাতৃহৃদয়ের বেদনায় পরিপুষ্ট বিজয়া গান।

ধর্মসাধনাতেও বাঙালী তার সৃজনী প্রতিভা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। ভারত শাস্ত্রপন্থী, কিন্তু বাংলাদেশ শাস্ত্রের সংস্কারমুক্ত। অন্যান্য সাধনা যেখানে যাগযজ্ঞ উপকরণ আর শাস্ত্রাচারের ভারে, সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কের বিশ্লেষণে ধর্মকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে, বাংলার ধর্মসাধনায় তার ব্যতিক্রম দেখতে পেয়েছি। ধর্মের ক্ষেত্রে এখানে জীবনের দাবি-দাওয়া কখনও উপেক্ষিত হয় নি। প্রাণের প্রথম প্রার্থনা এসেছে এই বাংলা দেশেই। পশ্চিম ভারতের বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা যখন শাস্ত্রের বচন উচ্চারণ করেছেন, পূর্ব ভারতের এক সহজিয়া কবি তখন গেয়েছেন—

মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা,
কাজ নাই সখি তাদের কথায়
বাহিরে রহন তাঁরা॥

বলেছেন—

সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

বাংলার ধর্মসাধনায় বৈষ্ণব সাধক বালগোপালকে ঘরের ছেলে করে দেখেছেন; তাঁকে দয়িতরূপে কল্পনা করে তাঁর সঙ্গে মিলনের আকুতি প্রকাশ করেছেন। শাক্ত সাধক তার দেবতার সঙ্গে মাতৃসম্বন্ধ স্থাপন করেছে। ঘরের বেড়া বাঁধার সময় মেয়ের মূর্তিতে দেবতা এসে এই বাংলা-দেশের ধর্মসাধককে দেখা দিয়ে যান। এই বাংলার মাটিতে বাউলের সাধনা প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল একদিন। বাউল জাতিপংক্তি, তীর্থপ্রতিমা, শাস্ত্রবিধি, ভেদ আচরণ মানেন নি। মানবতত্ত্বই তাঁদের কাছে সার ছিল। মানবের মধ্যেই তাঁরা দেখেছেন বিশ্বচরাচর। তাই তাঁদের সাধনার মূলতত্ত্ব মানবপ্রেম। মানবপ্রেমিক বাউলের কণ্ঠে তাই আমরা শুনি—'আছে অন্ত এই মানুষে, বাইরে কোথাও নাই রে!'

বাউলেরা বলেন—সত্যকে লাভ করতে হবে, কিন্তু কোথায় পাব সেই সত্যকে? সেই সত্যস্বরূপ যিনি তিনি মানুষের অন্তর্যামী। যে মানুষের মধ্যে ব্রহ্মত্বকে উপলব্ধি করতে পারে, সে পরমদেবতাকে জানতে পারে। অতএব যে ব্যক্তি মানুষকে নিশ্চিত করে জানে, সে তাকে বৃহৎ বলে মনে করে। কারণ, সকল দেবতার অধিষ্ঠান তার শরীরে। বাউল তাই বলেন যে—এই যে মানবদেহ, এই হলো দেবমন্দির। ধর্মসাধনায় বাংলা মানুষকে ছোট করে দেখে নি কোনদিন।

পালপার্বণেও বাঙালীর বিশিষ্ট মানসপ্রবণতার পরিচয় রয়ে গিয়েছে। বাংলার দোল দুর্গোৎসব, পৌষ সংক্রান্তি, নবান্ন, রাস, সরস্বতী পূজা বাঙালীর নিজস্ব। অন্য প্রদেশের সঙ্গে এ সবের কোন যোগই নেই।

বাঙালী তার শিল্পে ও সংস্কৃতিতে এই যে এতটা বিশেষত্ব অর্জন করেছে, তার মূলে আছে দুটি কারণ। প্রথমত—বাংলার মাটি নানা জাতি ও সংস্কৃতির মিলনতীর্থ। উত্তরের আর্য ও দক্ষিণের দ্রাবিড় সংস্কৃতির মিলন এই বাংলায়। বাংলার রথযাত্রার সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় রথযাত্রার সাদৃশ্য আছে। বাংলার মঙ্গলানুষ্ঠানের উলুধ্বনি, নানাবিধ স্ত্রী-আচার প্রভৃতির সঙ্গে দক্ষিণের আচার অনুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। বিয়ের সময় বরকনে কলাপাতায় পুকুরখেলা করে, পুকুর থেকে মাছ ধরার অভিনয় করতে হয়—এ আচার দক্ষিণী আচার।

বাংলার সংস্কৃতিতে শুধু দক্ষিণ ভারতের সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে আমাদের এই সংস্কৃতিকে বিশেষত্ব মণ্ডিত করে নি। অনার্য সংস্কৃতির প্রভাবও এদেশের সংস্কৃতিকে বিশেষত্ব-মণ্ডিত হয়ে উঠতে অনেকখানি সহায়তা করেছে। খাসিয়া, মুণ্ডা, সাঁওতাল, রাজবংশী—এরা দেবতার আসনে বসিয়ে

গাছ-পাথরের পূজা করে থাকে। আমাদেরও অনেক পূজায়—অনেক ব্রত অনুষ্ঠানে গাছের ডাল পোঁতা হয়, ব্রাহ্মণ্য বহু দেবদেবীর পূজার অঙ্গ গাছের পূজা। আমাদের সকল শুভকাজের জন্যে লাগে আম্রপল্লবের ঘট, অনেক ব্রতেই লাগে ধানের ছড়।

কিন্তু বাঙালী কেবল আর্য-অনার্য সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী নয়। বাংলাদেশে কেবল সংস্কৃতি সমন্বয় হয় নি। নতুন সৃষ্টি করে বাঙালী তার সংস্কৃতিধারাকে পুষ্ট করে তুলেছে। অতীতের রোমন্থনে বাঙালী তার সৃষ্টির শক্তি নিঃশেষিত করে নি কোনদিন। নতুন উদ্ভাবনে সে তার ভাণ্ডার ভরে তুলেছে।

অতি অল্পকালস্থায়ী উপাদান বাংলার শিল্পীর সৃষ্টির উপকরণ। কিন্তু তাই দিয়েই বাংলার শিল্পীরা সুন্দরের আরাধনা করে চলেছে যুগ যুগান্ত ধরে। চালের গুঁড়োর আলপনা মুছে যায়; কাঠ খড়, বাঁশ মাটির আয়ুও অল্প। তবু বাংলার শিল্পীরা ঐ দিয়েই শিল্পসৃষ্টি করেছে এবং তাদের সংস্কৃতির ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছে। এ বড় কম কথা নয়! বনের ফুল শুকিয়ে যায়, কিন্তু মনের ফুল শুকায় না। বাঙালীর অন্তরে শিল্পবোধ ও সৌন্দর্যবোধের কায়েমি আসন। তাই নিজের হাতের পুরোনো সৃষ্টি বিনষ্ট হয়ে গেলেও বাঙালী আবার নতুন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। বাংলার শিল্প সংস্কৃতির ধারা তাই পুরাতনের পুনরাবৃত্তিতে পর্যবসিত হয় নি, নূতনত্বের প্রভায় বাংলার শিল্প-সংস্কৃতি চিরদিনই ভাস্বর।

পর্য্যটক

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

হয়ত' এখানে নয়, আরেক জগতে
ডানা মেলে যে পাখীটা উড়ে গেছে কাল,
মরু-ধূ-ধূ রাত্রির গাং-মোহনায়:
বাহি' প্রাণ-তরণীর ব্যথা-ক্ষত হাল!
সেই সে গোলাপ দেশে মন-মেয়ে মোর
ক্লান্তির আল্পনা এঁকে চলে যায়,
যেথা জাগে জীবনের যৌবনে ভোর;
ফুল-স্মৃতি ভুর-ভুর সুরভি হৃদয়॥
ক্যালেণ্ডারে পলাতক মৌমাছি-দিন
ডায়েরীর মৌচাকে করেছে বোঝাই—
ভ্রান্তির-মোম ভিজে স্বপ্ন রঙীন্
উষ্ণ নিঃশ্বাস শুধু; ভাবি সে কথাই।
কথার প্রদীপমালা সাজিয়ে দিলাম
আকাশ তারার মত। রজনীগন্ধার
শীর্ণ দুইটি বাহু বুকে জড়ালাম
সবুজ শাড়ীর দেহ, আহা, কি নশ্বর!
এ দেশ—ওদেশ ঘোরা আমি বিহঙ্গ
গ্রহ হতে উপগ্রহে; তবু অবশেষে
ফিরলাম, পুণ্যতোয়া-জাহ্নবী-বঙ্গ
জন্মভূমি-জননীর স্নেহ-অঞ্চলে হেসে॥

আলাকাটি

সনতকুমার মিত্র

রঙ্গিল নীল রাতে গুঁড়ো গুঁড়ো মুঠো তারা
কে ছড়ালো এই বুকে? ওই বুকে—আকাশের গায়:
একটি হাওয়ার ঢেউ-এ একটি হৃদয় যেই গুঁড়ো হয়ে যায়
সেই দেখে অত তারা নীল ওড়নার ভাঁজে কেন দিশাহারা?

যত ভুল জমা হোলো ক্ষমা নেই সীমা নেই তার:
রঙ্ দেখে হৃদয়ের প্রজাপতি ফুল থেকে ফুলে
ছুটে গেল, ভুলে গেল পরিবেশ। রঙ্ দেখে ভুলে
সাজালো অশ্রুমালা, জমা হোলো ভুলের পাহাড়।

সবুজ ঘাসের শীষে, শিরিষের শীষে শীষে সোনা
চড়ুই কুড়িয়ে ফেরে, বকের বলাকা ইসারায়
সন্ধ্যার গান গায়। এ হৃদয়ে ভালবাসা নাই;
নাই আলো, আশা নাই—মায়ামৃগ করে আনাগোনা।

দু'চোখের লোনা জলে হৃদয়ের এই মরু-তৃষা
এ কি মেটে? এইটুকু ছোট বুকে কেন এত ব্যথা?
হৃদয়ের যত প্রেম বিষাক্ত হয়ে গেল। শত ব্যাকুলতা
তাই আনে কবরের, মিশর মমির পরিভাষা।



অরণ্যানী

শক্তিপদ রাজগুরু

বরাকর ছাড়িয়ে ট্রাক ছ'খানা চলেছে মিহিজাম রোড ধরে। পাঁচ মাইলের মাথায় বাঁদিকে ভাঙ্গলাম। উঁচু নীচু গৈরিক প্রান্তর, পলাশফুল-কেঁদগাছের জটলা ভেদ করে চলে গেছে রাস্তাটা, ওপারে কর্মমুখর দামোদরভ্যালির বাঁধটা পড়ে রইল, মাঠের প্রান্তে একটা পাহাড়ী নদীর ধারে ট্রাকগুলো থামল। সভ্যজগতের কঠিন লোলুপ হাত এখানেও বিস্তারিত হয়েছে। মাইথন পাহাড়ের একপাশে খানিকটা ঠাঁই ডিনামাইটের আঘাতে ছিন্নভিন্ন নির্জন গৈরিক-চড়াই-উৎরাই, বুক ছেয়ে গেছে ঘন সবুজ শালবনের আস্তরণে, দুচোখ বিস্তার করে দিয়েও তার তরঙ্গায়িত বনভূমির অজানা রহস্যভেদ করা যায় না। আকাশের বুকে' জীবনের সঙ্কেত নিয়ে জঙ্গলের মাঝ দিয়ে চলেছে মাইথন থেকে হাইটেনসন লাইনগুলো কুলটি বার্ণপুর দুর্গাপুরের দিকে।

কয়েকবৎসর আগেও এখানে ছিল গভীর জঙ্গল। দিনের আলোতে দেখা যেত এই কাঁইবেড়ের ধারে চিতা-নেকড়ের দু'একটা বংশধরকে, সগৌরবে বনভূমির উপর কর্তৃত্ব করতে! ভিজে বালির বুকে আঁকাবাঁকা দাগের আখরে লেখা থাকত ময়াল সাপের ভ্রমণ কাহিনী। বৈকালের পড়ন্ত বেলায় সারা মাইথন পাহাড়সীমা—বনতল ময়ূরের ডাকে মুখর হয়ে উঠত, ঝাঁকড়া অশ্বত্থ বটগাছের বুকে ফিরে আসতো হাজারো পাখীর দল···কল-কাকলিতে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার ভরে উঠত।

আজ ?

মানুষের কুঠার নির্মমভাবে তার জীবনতন্ত্রীকে ছেদন করেছে, অতীতের পরশুরামের কুঠারের ধারও এদের কুঠারের তীব্র দীপ্তির সামনে ম্লান হয়ে গেছে।···যেখানে মানুষের পদচিহ্ন পড়ত না, যদিও বা পড়ত · তার প্রতিটি পদক্ষেপের ছাপে থাকত শঙ্কা অজানার প্রতি শ্রদ্ধা। আর আজকে ওদের ট্রাকের টায়ারের চাপে পাথরও গুঁড়িয়ে গেছে···বালুকণার বুকে সভ্যতার বিজয় কাহিনী লিখে যায় ওরা অজানা ভাষায় এই মাটির বুকে।

এখান থেকে সাতমাইল যেতে হবে আমাদিগকে। পিপলাতলি জঙ্গলের মাঝখানে। দশবছরের জন্য জঙ্গল ইজারা নিয়ে শালকাঠের গুঁড়ি কাটার কাজ, বরাকর নদীর ধারেই তার সীমানা সুরু। কুড়োল, টাইনা, তাঁবু রসদপত্র··· এবং কিছু কাঠকাটাই কুলি নিয়ে কতক গরুর গাড়ীতে, কতক হাঁটা পথে যাত্রা করলাম।

বেলা দুপুর হয়ে গেছে। আমি লোচনসিং···আর বুড়ো মুরমু তিনজনে বনে ঢুকলাম। লোচনসিং এর সঙ্গে বছর কয়েকই কাজ করছি। যুদ্ধের মরসুমে অণ্ডাল পানাগড় মিলিটারী বেসে সাপ্লাইএর কাজ করে বেশ দুপয়সা জমিয়ে···এইবার কাঠের ব্যবসায় নেমেছে। স্ফুর্তিবাজ লোক, বিয়ে থা করেছে কিনা জানি না···রকম সকম দেখে বোধও হয় না, হাসি হল্লার মধ্যে ডুবে থাকে কিন্তু এসবই যেন তার কাজ আদায় করবার ফন্দী। তার হাসির ঝলকে নির্জন বনভূমি মুখর হয়ে যায়·· একাঁধ থেকে রাইফেলটা ওকাঁধে নিয়ে আবার সুরু করে তার ছেলেবেলার গল্প—কবে কোনকালে হোসিয়ারপুরের এক ঘিঞ্জী মহল্লায়···একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছিল—ঝুলায় তাকে কবে ঝোটা (দোল) দিয়েছিল ইত্যাদি। মাঝে মাঝে হুঁ হাঁ দিয়ে চলেছি।

ক্রমশঃ বন গভীর হয়ে আসছে। এই জায়গাটা অপেক্ষাকৃত নিচু···সোল জমি। মাটিতে জলের আভাস দেখা যায়, জুতাও বসে যাচ্ছে মাঝে মাঝে।···বরাকরে নদীর দিকে বয়ে চলেছে একটা ছোট ঝর্ণা···শালবনের আশে পাশে মাটির বুকে সবুজ ঘাসের আস্তরণ।

মুখবুজে চলেছে পিছু পিছু মুরমু। লোচন সিং একে যোগাড় করেছে বরাকরের আশপাশ থেকে। এককালে

এই জঙ্গলের বাইরে ছিল ওদের বস্তি, ওর ভাই ভাইপো ছেলেরা অনেকেই চলে গেছে চিনকুঠিতে, না হয় লোহা কারখানায় খাটতে—ওই একা পড়ে আছে, বস্তি ছেড়ে চলে গেছে সবাই দামোদরভ্যালির বাবুদের কোয়ার্টার উঠেছে সেখানে, কড়ুয়াতেলের প্রদীপ জ্বলত যে মাটিতে, সেখানে আজকাল সন্ধ্যার অন্ধকার ভয়েও কাছে ঘেঁসতে পারে না জোরালো বিজলিবাতির ছটার কাছে।

শুধু মুরমুরাই নয় ···ওদের মাটির বুকে শিয়াল খরগোস যা কিছু ছিল, আজ তাদিকেও আশ্রয় খুঁজতে হয়েছে দূরের বনে, আর মুরমুরা জনতার ভিড়ে হারিয়ে গেছে, তারা উড়ে ছটকে পড়েছে কাটা গাছের পাতারই মত।

সারা মাথায় একটি কালো চুল নাই, সব পেকে উঠেছে, এককালে তার কোঁকড়ান বাবরি চুলের এবং বলিষ্ঠতার খ্যাতি ছিল সারা ডুংরীতে, আজ সে ডুংরীও কোনদিকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তার বয়সের সঙ্গে। সঙ্গে ওর শ্রীও বিলুপ্ত হয়ে আসছে।

'উদিকে যাবি নাই, জায়গাটো ভালো লয়, পা চালিয়ে চল ইখানটুকু।'

তার কথায় ফিরে চাইলাম, আমিও খেয়াল করিনি। বনের মধ্যে জলের নিশানা যেখানে আছে সমস্ত পশুরই ভিড় হয় সেখানে। বেলাও পড়ে আসছে। সুতরাং না দাঁড়িয়ে আমরাও চলতে সুরু করলাম।

ছোট পাহাড়ীর মাথায় খানিকটা ফাঁকা জায়গা, কালো কালো পাথর চাঁই বেঁধে রয়েছে, সেই শক্ত কঠিন পাথরের বুকে গজিয়েছে কয়েকটা কালোজামের গাছ। একদিকে উঠবার একটু পথ বাকি—তিনদিকই সোজা খাড়ি, নীচেই একটা ঝরণা···মাঝে মাঝে বড় বড় পাথর থাকার জন্য জল সর্বদাই জমে রয়েছে···টিলার মাথাতেই আস্তানা গাড়লাম, একটা তাঁবুতে আমি আর লোচন সিং, পাশেই কয়েকটা ঝুপড়ি শালগাছ পাতা এনে ঘণ্টাকয়েকের মধ্যে মাঝিরা চালা বানিয়ে ফেললে।

রাত্রি নেমে এসেছে বনভূমিতে। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে ফেউএর ডাক কানে আসে ··কখনও বনভূমির নীরবতা ভেদ করে জেগে ওঠে কার চাপা হুঙ্কার···দূরদিগন্তের মাথায় কয়েকটা তারা জ্বল জ্বল করছে।···

···ওপাশে মাঝিদের চালায় শালকাঠের আগুনে দু-একটা গুড়ি চাপা দিয়ে জাগিয়ে রেখেছে আগুনটাকে। কে একজন জোয়ান মাঝি গাইছে—

"বরুরে সিঙ্গারা ; লেগেজ লেগেজ সিঙ্গারা
জীবন চালা ; বেহইঞ ছিদ গিয়া
না তোরে কুড়ি করছে কাটা কুড়ি
হিরম বেগম রেহাইঞ আওয়েরা।

কোন প্রিয়া তাঁর গ্রামেরই একটি খোঁড়া মেয়ে। তার জন্য জীবনপণ করেও সে তুলে আনবে পাহাড়ের মাথা থেকে শিঞাপাতার সুন্দর ঝাড়। এতই ভালো লেগেছে সেই মেয়েটিকে···যে ঘরে একটি বৌ থাকা সত্ত্বেও সে তাকে বিয়ে করবে।

তাঁবুতে শুয়ে ঘুম আসে না। অনেক রাত্রি অবধি লোচন সিং কাঠ কাটার গুড়ি চালানী ব্যবস্থার সাপ্লাই নানা আলোচনা করে বেমালুম কম্বল দাড়ি অবধি চাপা দিয়ে নাকের বাঁশি সুরু করেছে। রাত্রি বেড়ে চলেছে। বিছানা ছেড়ে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

একটুকরো চাঁদের ক্ষীণ আভা বনভূমির মাথায় ছিটিয়ে পড়েছে, শীতের গুঁড়ি গুঁড়ি কুহেলীর সঙ্গে যেন আকাশের বুক থেকে তুষারকণার প্লাবন নেমে এসেছে, নীচে ঝর্ণার বুকে কিসের চক্ চক্ শব্দ, পিঙ্গল জ্বলজ্বলে দুটো চোখ সরে গেল বনের আড়ালে।

তাঁবুর মধ্যে থেকে সট্‌গানটা বার করে আনলাম। চারিদিক নীরব, সমস্ত বনভূমির বুকে কিসের যেন থমথমে একটা রহস্য, দিনের আলোয় এর কোথায় অবলুপ্তি ঘটে, গন্ধকের হলদে ছাপমাখা পাথরের স্তরে চাঁদের আলো পড়ে কি এক অপরূপ রং ধরেছে·· নীচে ঝরণার জলে কয়েকটা শব্দ। ··একটা···দুটো···বেশ বড় বড় হরিণ নেমে এসেছে, কালো চোখের চাহনিতে চারিদিক চেয়ে এ ওর গলায় মুখ ঘসছে! বন্দুকটা তুলতে যাবো, পিছনে কার হাতের চাপ পেয়ে ফিরে চাইলাম—মুরমুর।

হরিণ দুটোও কি যেন সন্দেহ করে মুহূর্ত মধ্যে লাফ মেরে আকাশের বুকে খানিকটা উঠে কোথায় লুকিয়ে গেল পাতার আড়ালে। হাত থেকে এমন শিকার চলে যাওয়ার জন্য রাগই হয়, কিন্তু কিছু বললাম না। ওপাশে তখনও লোচনসিং এর নাকের বাঁশি শোনা যাচ্ছে। বনের

শত সহস্র ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকেও তাকে ডুবিয়ে দিতে পারে নি' বলে মুরমু—

—"হুটোই মাদী হরিণ, বাচ্চা হবার সময় আসছে—ইসময় মারতে নাই।"

আগেকার গল্প করে সে, প্রথম জীবনে যেদিন হরিণ শিকার করে। তারই কাকার সঙ্গে এসেছে আহোরিয়া শিকারে এই পিপলতলির জঙ্গলে, ভিতরে ঢোকে কার সাধ্যি, বাইরে থেকেই জলের ধারে বসে আছি। হঠাৎ বুড়োর চোখে ভেসে ওঠে অতীতের দিনগুলো।

…"ধুয়ার মত একটা কি যেন আসছে, কিছুই ঠিক ঠাওর পেলাম না…একটো শব্দ…সোঁ…আমিও কাড়টোকে যুৎ করে লাগাই…কানভোর ছিলা টেনে দিলো ছেড়ে…হুঁতকি,পড়ল বাছাধন…রক্তে ভিজে গেছে মাটি, ইয়া শিং…ভরযোয়ান একটো মদ্দা শম্বর।"

অস্পষ্ট তারার আলোয় দেখতে পাই বৃদ্ধের চোখের তারায় সেই বিগতদিনের তারুণ্যের ক্ষণিক দীপ্তি, ওর বুক মথিত করে বার হয়ে আসে একটা দীর্ঘশ্বাস।

ভোর বেলাতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। নিস্তব্ধ বনভূমির পূবমাথায় অন্ধকার যবনিকাপারে ফুটে উঠেছে প্রথম আলোর ঝলকানি—সারাবনের বুকে হাজারো পাখীর ডাক…সে যেন এক মেলা বসে গেছে। গাছে গাছে শাখায় শাখায় পাখার ঝাপটানি। ঝরণার জলে দিনের আলোয় পড়ে ওদের প্রথম যাত্রার ছায়াছবি।

লোচন সিং তখন পাগড়ীর পাক বাঁধছে, কুলিরাও জেগে উঠেছে। গাছে কালই মার্কা মারা হয়ে গেছে কিছু, আজ থেকেই কাটাই সুরু হবে। শুয়ে রয়েছে মুরমু, বুড়ো বোধ হয় অনেক রাত অবধি জেগেছিল! তাই ওকে আর না জাগিয়েই দলবল নিয়ে বার হয়ে পড়লাম।

বছরের পর বছর নধর শ্যামল বনস্পতির বুকে এসেছে বর্ষা-বসন্তের মালাগাঁথা কত বছর, গাছের বল্কলের অন্তরালেও ওরা রেখে গেছে তাদের বুকে এঁকে এঁকে বছরের বিদায়ী মালার চিহ্ন, বিজ্ঞানীর চোখে তুমি বলবে "এনুয়্যাল রিং" কতবার ওর ডাল থেকে ঝরে গেছে কত পাতার শোভা, আবার এসেছে নবকিশলয়।…কিন্তু আজ থেকে ওর জীবনকাব্যে ছেদ পড়ল…সেই আনাগোনার। কুড়ুলের ঘায়ে একটা দীর্ঘশ্বাসে আর্তনাদে বনভূমি মুখর করে সে আছড়ে পড়ল শক্ত মাটির বুকে। ওরা ডালপালা সমস্ত ছেঁটে ফেলে ওকে ট্রাকবোঝাই করে—না হয় নদীর জলে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে সহরে তুলবে। শ্যামল বনশোভা—লাল মাটির স্পর্শ…বর্ষার শিহরণ—বসন্তের পড়ন্ত বেলায় কেকার মৃদু আলাপন…সব কিছু থেকে ও হল বঞ্চিত।

মানুষের টুকরো কথাবার্তা, কড়া তামাকের গন্ধ,…কুড়ুলের তীক্ষ্ণ আঘাতের শব্দ বনভূমির কোন সুরেই মেলে না। ওরা বনস্পতির বুকে মহানন্দে আঘাত করে চলেছে, সর্বংসহা ধরিত্রী চুপ করে মুখ বুজে সহ্য করে যাচ্ছে ওদের এই আঘাত। মাঝে মাঝে লোচনসিংএর খবরদারীর আওয়াজ শোনা যায়—"এ্যাই সামাল কে…"

…বনভূমি স্পন্দিত করে একটা দীর্ঘ শন শন শব্দ…আর একটা গাছ পড়ল।

একাই ফিরে আসছি টিলার দিকে, ওরা কাজ সেরে ফিরবে সেই বৈকালে, পাথরগুলোয় পা দিয়ে উপরে উঠে আসছি হঠাৎ নীচু চালাটার ভিতরে কার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে একটু থমকে দাঁড়ালাম। একটা কিসের যেন অস্ফুট আর্তনাদ,…গোঙানির মত শব্দ! তবে কি কোন বন্য জন্তুই মুরমুকে আক্রমণ করেছে? একটা ধ্বস্তাধ্বস্তির মত আওয়াজ, তাঁবুর মধ্যে ছুটে ঢুকলাম বন্দুকটা বার করে আনতে…কিন্তু বন্দুকটাও নাই। বার হয়ে এলাম তাঁবু থেকে…দেখি মুরমু নীচে নেমে চলেছে দ্রুতগতিতে। পাহাড়ের পাথরের পর পাথর টপকে টপকে পা দিয়ে নেমে চলেছে।

আমার ডাক শুনে একবার চাইল মাত্র, থামল না…ঝরণার পাশেই বনের মধ্যে ঢুকল। আমিও তার পিছু পিছু নামব কিনা ঠিক করতে পারছি না—হঠাৎ চালাটার মধ্যে নজর পড়তেই এগিয়ে এলাম, একটা মেয়ে—সাঁওতালের মেয়েই হবে…কতকগুলো পাতার উপর কাৎ হয়ে পড়ে রয়েছে…মুখ থেকে বার হয়ে আসছে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত…গাল বেয়ে কয়েকটা ফোঁটা রক্ত পাতার উপর পড়ে রয়েছে।…গলার কাছে সাঁড়াশীর মত একটা কালো দাগ। নাড়াচাড়া করেও কিছু ঠিক ঠাওর করতে পারলাম না · তবে মনে হোল বোধ হয় মুরমুর কঠিন নিষ্পেষণে ওর দম বন্ধ হয়ে গেছে,… প্রাণহীন দেহটা পড়ে রয়েছে। কিন্তু মুরমু…বৃদ্ধ সাঁওতালের মনে এত কি জ্বালা থাকতে পারে যার জন্য

সে হত্যা করে যাবে একে। বিস্তীর্ণ বনভূমির বুকে একটা মৃতদেহের পাশে থাকতে যেন ভয় করে।

মেয়েটার বয়স বেশী নয়, বোধ হয় তিরিশ হবে! স্বাস্থ্যও অটুট···কিন্তু তার জীবননাট্যের অতর্কিত এই যবনিকাপাতের কোন অর্থ-ই বুঝতে পারলাম না। নীচে বনের মধ্যে ওদিকে খবর দিতেই চললাম।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে, মুরমু আর ফেরেনি। তাঁবু এবং চালাগুলোর বুকে কি যেন বিষণ্ণতার একটা ছাপ, একটি মানুষের মৃত্যু এমনি করে অনেকের মনেই আনে তাদেরও মৃত্যুর পূর্বাভাষ। মুরমুর গাঁসুবাদে ভাইপোও ছিল কুলিদের দলে···

তার কাছেই ব্যাপারটা খানিকটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মেয়েটি মুরমুর একমাত্র সন্তান। চমকে উঠি··· মানুষের মনে কতখানি ঘৃণা কত জ্বালা থাকলে তবে সে তার একমাত্র সন্তানকে হত্যা করে নিজেও নিশ্চিত মৃত্যুর পানে এগিয়ে যেতে পারে। ডুংরী ছেড়ে যেতে বাধ্য হল সে, ওদের বাসস্থান জমিজমা সবই চলে গেল, বনেও অধিকার রইল না, নিঃসহায় ওই মেয়ের হাত ধরে মুরমু গেল সভ্য জগতে অন্নের সংস্থানে। বরাকর—আসানসোল, পানাগড় সর্বত্রই মুরমু ঘুরে বেড়ায় কোন কাজের সন্ধানে··· একটু আশ্রয়—দুমুঠো অন্নের প্রত্যাশায়।

চারিদিকে তখন যুদ্ধের কাজ চলেছে। খাটিয়ে মরদ সে ···কাজ একটা পেল মাটি কাটার—ছোট এক ঠিকাদারের কাছে। দিনান্ত পরিশ্রম করে মাত্র পাঁচসিকে পয়সা—হোক তবু মেয়েকে দুমুঠো খেতে দিতে পায়—মাথার উপর একটু আশ্রয় একটু নিশ্চিন্ততা মেলে।

মাসখানেক কেটে যাবার পর হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলায় কাজ থেকে ফিরে এসে ধাওড়াটায় কাউকে না দেখতে পেয়ে বিস্মিত হয়। আশে-পাশের কেউ তার কোনও খবরও বলতে পারে না।

কয়েকদিন কেটে গেল···মেয়ে আর তার ফিরে এল না···সেই সঙ্গে ঠিকেদারের জমাসরকারকে খুঁজে পাওয়া যায় না। ব্যাপারটা অনুমান করে সকলেই। বুড়ো সারণ মাঝি সান্ত্বনা দিতে আসে মুরমুকে—"সোমত্ত বয়সের মেয়ে ···এক কাজ করে ফেলাইছে··না হয় আবার ফিরে আসবেক"—

গর্জন করে ওঠে মুরমু—"না তার মুখ আর দেখবো নাই।" বিজাতের সাথে বার হয়ে গেইছে আবার সী আমার কে? দেখা হলে শ্যাষই করে দুব তাকে।"

সমস্ত দুঃখ সহ্য করেছিল মুরমু যার মুখ চেয়ে তার এই ব্যবহার ক্ষমা করতে পারেনি। পানাগড়ের জীবন তার ভাল লাগেনি। কাজ ছেড়ে বার হয়ে পড়েছিল পথে।

এতদিন সে মেয়ের সন্ধান করেই বেড়িয়েছে···আজ দেখা পেয়েছিল তার দুপুর বেলায়।

···রাত্রিটা কেটে যায় শুব্ধ নীরবতার মধ্য দিয়ে। মাঝে মাঝে শোনা যায় বনের শুকনো পাতায় কোন জন্তুর সতর্ক আনাগোনার শব্দ···মাঝিদের অস্পষ্ট কথাবার্তার টুকরো—নৈশ বাতাসে ওদের চুটির কাঁচা তামাকপোড়া গন্ধ কেমন যেন বিচিত্র পরিবেশের সৃষ্টি করে। ঘুম আসে না—চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই মেয়েটার মৃতদেহ···লোচনসিংও কেমন যেন আনমনা হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে।

···বনভূমির বুক থেকে অন্ধকার মুছে যায় সূর্যের প্রথম আলোকে। মাঝিরা 'দাকা' খেয়ে যন্ত্রপাতি নিয়ে বার হবার উপক্রম করছে'। লোচনসিংহ অন্যমনস্কভাবে পাগড়িটা জড়াচ্ছে।

···আজ পুরোনো বন কাটা হচ্ছে, লতায় লতায় জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে গাছপালা—কুড়ুলের কোপে আর্তনাদ করে পড়ছে···দীর্ঘদিনের পাতাঢাকা কুমারী মৃত্তিকায়—ব্যাকুল আবেগে স্পর্শ জানায় প্রথম আলো।

হঠাৎ একটা গুলির আওয়াজ—পর্বতশ্রেণীর বুকে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে বনভূমি কাঁপিয়ে তোলে—সকলেই সচকিত হয়ে উঠি · একটা অস্ফুট আর্তনাদ! ছুটে এলাম—কাঁচা শালপাতার স্তূপে পড়ে রয়েছে লোচনসিংহের রক্তাক্ত দেহটা···বরাকরের বালিয়াড়ি পার হয়ে একটা লোককে বন্দুক হাতে পালাতে দেখা যায়···'লোকটা মুরমু'

···পানাগড়ের ঠিকেদারের জমানবিশ লোচনসিংহ আজ জীবনের খতিয়ানে জমাখরচের পালা শেষ করে গেছে।

বনানীর শুব্ধ রহস্যের মাঝখানে বসে রয়েছি মূক হয়ে আমরা কয়েকটি প্রাণী, নেহাৎ অবাঞ্ছিতের মতই। লোচনসিংএর রক্তাক্ত দেহটা পড়ে রয়েছে। মুরমু দীর্ঘ

দশ বৎসরের সঞ্চিত আক্রোশের আজ শোধ নিয়েছে। একা তার মেয়ে নয়—তার মেয়েকে যে সর্বনাশের পথে নিয়ে গিয়েছিল—সেই অপরাধীকেও সে শাস্তি দিয়েছে। লোচনসিংহ তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেল বুকের রক্ত দিয়ে। তার আত্মা শান্তিলাভ করুক।

বনের শাখায় শাখায় বৈকালের সোনা রংএর রোদ··· বালুচরে ম্লান হয়ে আসছে দিনের সূর্য্য · সারা বনতলে চাপা মর্মর ধ্বনি··মনে হয় একটা প্রকৃতির বুক থেকে উঠে আসছে তৃপ্তির নিঃশ্বাস। মানুষ—প্রকৃতির বুক থেকে সৌন্দর্য্য···তার সন্তানদের পবিত্রতা··নিষ্ঠুর হাতে বিনষ্ট করে চলেছে, কিন্তু এর প্রায়শ্চিত্ত তাকে করতে হবে। লোচনসিংএর মৃত্যুতে প্রকাশিত—আজ সেই সত্যেরই আভাস···সোনা রংএর আখরে জাফরাণী মেঘের গায়ে··· বনভূমির মর্মরে তারই যেন প্রতিধ্বনি—তারই ঘোষণা।

···এর পর আর মুরমুরের কোন খবরই কেউ পায় নাই, পলাতকের মতই কোন অন্ধকার বনতলে তার শেষ শয্যা রচিত হয়েছে, ঝরাপাতা আর ঝরাফুল তার দেহকে আবৃত করে দিয়েছে, হয়ত বা কোন ক্ষুধার্ত পশুর তীক্ষ্ণ নখের আঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়েছে তার দেহ—সে রহস্য বনের অতলেই চাপা রইল।

ইংরাজ শাসনের পূর্ব্বে আমাদের শিক্ষা

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

একথা অস্বীকার করা চলে না যে, এই শিক্ষার মধ্যে বর্ত্তমান যুগের দৃষ্টিতে দোষ অনেক ছিল। শিক্ষকগণ অনেকেই অজ্ঞ এবং অযোগ্য ছিলেন, বিদ্যালয়ে জ্ঞানচর্চ্চার মানও উচ্চ ছিল না। কিন্তু ইহার প্রধান ও মূল্যবান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, লোকের মধ্যে ইহার যথেষ্ট আদর ও প্রসার ছিল, এবং শিক্ষার জন্য সাধারণের আগ্রহ ও যত্নের অভাব ছিল না। অতি ক্ষুদ্র গ্রামেও ছেলেদের শিক্ষার কিছু চেষ্টা, কিছু ব্যবস্থা হইত, তাহার বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। বিশেষতঃ ঠিক যে সময়ের যেটুকু বিবরণ আমরা পাই, তখন দেশে রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন ও দেশব্যাপী দারিদ্র্যের ফলে সাধারণ লোকে অতিশয় ক্লেশে কোনও মতে উদরান্নের সংস্থান করিতেছে, শিক্ষার জন্য যৎসামান্য ব্যয় করিবার সামর্থ্যও তাহাদের নাই। বিদ্যালয়গুলি অচল হইয়া পড়িয়াছে, অর্থাভাবে বহু বিদ্যালয় উঠিয়া গিয়াছে। ঠিক ঐ সময়ে যদি শিক্ষার এতটা প্রসার দেখা যায়, তবে তাহার পূর্ব্বে শিক্ষা যে আরও অনেক ব্যাপক এবং উন্নত ছিল, এরূপ অনুমান করিলে ভুল হয় না। এই সময়ের পর্য্যবেক্ষকগণও এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, অ্যাডাম যে কথা বলিয়াছেন, ইংরাজ রাজপুরুষের মধ্যেও পক্ষপাতশূন্য কেহ কেহ ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। মাদ্রাজের কালেক্টর ক্যাম্বেলের (Campbell) বিবরণ হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি। কিভাবে তাঁহার স্বদেশবাসীদের আধিপত্যের সঙ্গে দেশের অর্থ-নৈতিক অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে যাইতেছে এবং তাহার ফলে শিক্ষার জন্য অর্থ যোগাইবার শক্তি এদেশের লোকের ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, তাহারই প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

"This is ascribable to the gradual, but general impoveishment of the country. The means of the manufacturing classes have been of late years greatly diminished by the introduction of our own European manufactures···The transfer of capital of the country to Europeans restricted by law from employing it even temporarily in India···has likewise tended to this effect. The greater part of the middle and lower classes of the people are now unable to defray the expenses incident upon the education of their offspring, while their necessities require the assistance of their children as soon as their tender are capable of the smallest labour···In many villages, where formerly there were schools, there are now none, and in many others where there were large schools, now only a few children of the most opulant are taught, others being unable from poverty to attend or pay what is demanded." (দেশের সর্ব্বত্র ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্যের ফলেই এরূপ হইয়াছে। ইউরোপের কারখানায় প্রস্তুত জিনিষের প্রচলনের ফলে এদেশের শিল্পকার শ্রেণীগণ প্রভূত আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এদেশের টাকা ইউরোপীয়গণের হাতে চলিয়া গিয়াছে, আইন অনুযায়ী সে টাকা অস্থায়ীভাবেও এদেশে খাটানো তাহাদের নিষেধ, তাহাও এই দুর্দ্দশার একটি কারণ। মধ্যবিত্ত

ও নিম্নশ্রেণীর অধিকাংশ লোকই আর সন্তানদের শিক্ষার ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে পারে না, উপরন্তু অভাবের তাড়নায় শিশুগুলির কোমল দেহ সামান্য মাত্র দৈহিক পরিশ্রমের উপযুক্ত হওয়ামাত্র লোকে কাজ কর্ম্মে তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। অনেক গ্রামে পূর্ব্বে বিদ্যালয়-সমূহ ছিল, কিন্তু এখন আর নাই ; আরও বহু গ্রামে যেখানে বড় বিদ্যালয় ছিল, সেখানে ধনবান লোকদের দুই চারটি ছেলে মাত্র পড়ে, অন্যেরা দারিদ্র্যবশতঃ বিদ্যালয়ে পড়িতে ও তাহার ব্যয়ভার বহন করিতে অক্ষম)।

এ সব হইতে বুঝা যায় যে ইংরাজদের আগমনের কালে দেশে সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে শিক্ষা ছিল না তাহা বলা চলে না, এবং তাহার পূর্ব্বে অবস্থা আরও ভাল ছিল। অবশ্য ইহা বর্ত্তমান যুগের উন্নত শিক্ষা ছিল না। কিন্তু আমাদের ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে এই যুগের শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বিবেচনা করিতে বসিলে, আধুনিক মানদণ্ডে ইহার বিচার করা চলিবে না।—ছেলেদের শিক্ষাব্যাপারে যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা বর্ত্তমানে আমরা চালিত হই, পাশ্চাত্য জগতেও তাহার 'প্রথম সূচনা খুব বেশী দিনের কথা নহে। ইংরাজেরা যখন এদেশ অধিকার করে, সেই সময়ে ইংলণ্ডে ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে নূতন আন্দোলন ও প্রচেষ্টার সবেমাত্র সূত্রপাত হইয়াছে বটে, কিন্তু মোটের উপরে শিক্ষার ব্যাপ্তি, অধ্যাপনারীতি, বিদ্যালয়গুলির অবস্থা সব দিক দিয়া তুলনা করিলে এ দেশের অবস্থা যে নিতান্ত নিকৃষ্ট ছিল, এমন কথা বলা চলে না। আমাদের শিক্ষকগণের কঠোর দণ্ডবিধানের কথা বলিয়াছি, কিন্তু বেতের শাসনই সেকালে সর্ব্বত্র রীতি ছিল। ইংলণ্ডে এক প্রসিদ্ধ প্রধান শিক্ষকের কাহিনী সগর্ব্বে ঘোষিত হয়, রাগবী বিদ্যালয়ের ডাঃ আর্ণল্ড্ (Dr. Arnold of Rugby)। সুবিখ্যাত কবি ম্যাথিউ আর্ণল্ড্ (Matthew Arnold) ইহারই পুত্র, পিতার স্মৃতিতে ইনি এক সুন্দর কবিতাও লিখিয়া গিয়াছেন। সুযোগ্য শিক্ষক এবং শিক্ষা-বিদরূপে ডাঃ আর্ণল্ডের নাম তাঁহার স্বদেশে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া আছে। কিন্তু এই হেন লোকেরও শাসনের দাপটে বিদ্যালয় সর্ব্বদা কম্পমান থাকিত। কথিত আছে, তিনি যখন কোনও বালককে বেত মারিতে আরম্ভ করিতেন, তখন যে পর্য্যন্ত না ক্লান্ত হইয়া তাহাকে বসিয়া পড়িতে হইত, ততক্ষণ সেই প্রহার চলিত। শিক্ষাবিধির যুগপ্রবর্ত্তক মনীষীগণের কাহিনী পর্য্যালোচনা করিলেও ইউরোপীয় দেশগুলির শিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা হয়। আধুনিক শিক্ষাধারার পথপ্রদর্শক হইলেন পেষ্টালৎসি (Pestalozzi) ; সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি তাঁহার স্বদেশ সুইজারল্যাণ্ডে শিক্ষাবিষয়ে তাঁহার নব-প্রচেষ্টাগুলি কার্য্যকরী করিবার এবং তাঁহার মতবাদ প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু প্রথমে লোকের কাছে তাঁহার কিছুই সমাদর হয় নাই। দেশবাসীর আগ্রহ ও সহায়তার অভাবে তিনি প্রথমে যে বিদ্যালয়টি স্থাপিত করেন, তাহা উঠিয়া গেল। শুনা যায় যে পরে অভাবের দায়ে তিনি এক গ্রাম্য বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। সে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন গ্রামের মুচি, এবং মুচি প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের কাছে অযোগ্যতার অপরাধে জগজ্জয়ী শিক্ষাসংস্কারক পেষ্টালৎসির শিক্ষকতার কর্ম্মটি হারাইতে হইয়াছিল! পরে অবশ্য দেশে ও বিদেশে পেষ্টালৎসির প্রবর্ত্তিত শিক্ষানীতির প্রভূত সমাদর হয়। ইংলণ্ডের এই সময়কার সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থার পর্য্যালোচনা করিলেও বুঝা যায় যে অধিকাংশ স্থানেই শিক্ষকদের গুণ ও যোগ্যতা, অধ্যাপনা প্রণালী, শিক্ষাদানের পুস্তক ও উপকরণাদি, বিদ্যালয় গৃহের অবস্থা—এ সকলের যে কোনও বিরাট উৎকর্ষ ছিল, তাহা নহে। প্রখ্যাতনামা শিক্ষাবিদ মাইকেল স্যাডলার (Michael Sadler) লিখিয়াছেন যে বহু বিদ্যালয়ের গৃহের কোনও সুবিধা ছিল না, যে কোনও বাসগৃহ, কুটীর, গির্জ্জা, যেখানে হউক, একটি মন্দ, আলোবাতাসহীন ঘরে বিদ্যালয়ের কার্য্য চলিত। এখানে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে ইংলণ্ডের মত ঠাণ্ডা দেশে ভাল ও স্বাস্থ্যকর বিদ্যালয় গৃহের প্রয়োজনীয়তা আমাদের তুলনায় অনেক বেশী ; আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে খোলা বারান্দায় গাছতলায় বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা চলিতে পারে এবং ভাল ভাবেই হইতে পারে। শিক্ষক-মহাশয়দের বিদ্যা, গুণ ও চরিত্রের বিষয়ে প্রসিদ্ধ লেখকেরা যে সকল বিরূপ মন্তব্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে সাধারণভাবে তাঁহাদের সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা জন্মে না। বিশেষতঃ মেকলে তাঁহার অভ্যস্ত ওজস্বী ভাষায় ইংলণ্ডের তৎকালীন সাধারণ শিক্ষকদের এক অদ্ভুত বর্ণনা দিয়াছেন যে, অন্য কোনও কাজই যাহাদের জুটে নাই, 'কর্ম্মচ্যুত ভৃত্য, সর্ব্বস্বান্ত ফেরীওয়ালা', সমাজের যত ওঁচা দুশ্চরিত্র, নেশাখোর লোক গিয়া স্কুল খুলিয়া শিক্ষক হইয়া বসিত। অনেক বিদ্যালয়েই যে পাঠ দেওয়া হইত, তাহা অতি সঙ্কীর্ণ ও গতানুগতিক, খৃষ্টান ধর্ম্মের কয়েকটি শুষ্ক নীতি এবং উপদেশই ছিল উহার মূলবস্তু। ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিত হইত না, অনেকেই কোনও মতে কিছুদিন কাটাইয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করিত। ইংলণ্ডের প্রভূত শক্তি এবং সমৃদ্ধির এই যুগে অবশ্য সাধারণ ভাবে সে দেশের শিক্ষার অবস্থা আমাদের চেয়ে অনেক ভাল ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু আমাদের দেশের অতখানি চরম দুর্দ্দশার অবস্থায়ও আমাদের শিক্ষার যে চিত্রটি আমরা পাই, পাশ্চাত্য দেশগুলির তুলনায় তাহাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয় বলা চলিবে না। দুঃখের বিষয় এই যে, ঠিক এই সময় হইতেই অন্য দেশগুলিতে শিক্ষার অগ্রগতি হইল ত্বরিত ও শক্তিমান বেগে, শিক্ষার বহু আন্দোলন, বহু নূতন কার্য্যকরী পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা চলিল, জ্ঞানবিজ্ঞানের জয়ধ্বজা উড়িল। আর আমাদের দেশে যদিও ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন হইল, ইংরাজী স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, তথাপি শিক্ষার দিকে সমগ্রজাতির কতখানি উন্নতি হইয়াছে, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। অন্য অনেক দেশেই বাধ্যতামূলক শিক্ষা হইয়াছে, দেশে নিরক্ষরতা নাই, ইংলণ্ডে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন হয় গত শতাব্দীতে, কিন্তু আমাদের দেশে আজিও শতকরা প্রায় ৮৪ ভাগ লোক নিরক্ষর আছে। ইংরাজেরা যখন আমাদের অভিভাবক হইয়া বসিল, তখন নানা বাধা ও দেশব্যাপী দুঃখদারিদ্র্য সত্ত্বেও আমাদের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা কিরূপ ছিল, ইহা ও আমরা দেখিলাম। সুতরাং স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন মনে আসে যে, ইংরাজ

শাসনের সঙ্গে যদি দেশে ইংরাজী শিক্ষাবিধিরও প্রতিষ্ঠা না হইত, যদি আমাদের দেশীয় শিক্ষারই উপযুক্ত পরিবর্ত্তন ও সংস্কার সাধন করা যাইত, উন্নত দৃষ্টিভঙ্গীতে আধুনিক জ্ঞান ও সংস্কৃতির সহিত উহার সামঞ্জস্য সাধন করিয়া লওয়া হইত, তবে সে শিক্ষা কি আমাদের পক্ষে অধিক মঙ্গলকর হইত? তাহা কি আমাদের জাতীয় প্রকৃতি ও আদর্শের অধিক উপযোগী হইত এবং তাহাতে উন্নতির পরিমাণ কি বেশী হইত?

মানুষের সাধারণ বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা উত্তরে এই কথাই বলে যে নিঃসংশয়ে তাহা হইত, এবং ইহাই তখন আমাদের গ্রহণীয় একমাত্র শিক্ষাবিধি ছিল। অবস্থার চাপে পড়িয়া আমরা যে বিদেশী শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম, তাহার ফলে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে। দেশের সনাতন জাতীয় শিক্ষায় বহু অভাব ও ত্রুটি থাকিলেও চিন্তা ও যত্নসহকারে সেগুলি দূর করিয়া সেই শিক্ষাধারাকেই উন্নতির পথে চালিত করা উচিত, তাহার স্থলে বাহির হইতে আমদানী বিদেশী শিক্ষাব্যবস্থা চাপাইয়া দেওয়ার মত অনিষ্টকর কিছুই হইতে পারে না। খাদ্যব্যবস্থার সংস্কার করিতে গেলে, জাতির নিজস্ব অভ্যস্ত আহার্য্য এবং তাহার উপকরণগুলির কথাই প্রধানতঃ চিন্তা করিতে হয়, সেই খাদ্যই যাহাতে উপযুক্তভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া জাতির স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিধান করিতে পারে, সেই চেষ্টা করিতে হয়, খাদ্যসামগ্রী বিদেশ হইতে লইবার আবশ্যক হইলেও তাহা যতদূর সম্ভব দেশের অবস্থার উপযোগী হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়, দেশের খাদ্য অন্য দেশের অনুকরণে পরিবর্ত্তন করিয়া জাতির শক্তি ও স্বাস্থ্যের উৎকর্ষসাধন করা যাইবে, এমন ভ্রান্ত ধারণা কেহ পোষণ করেন না। শিক্ষার বেলায়ও এই কথাই খাটে। বর্ত্তমানকালে যে সমস্ত দেশে শিক্ষার দ্রুত প্রসার হইয়াছে, সেগুলির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেও দেখা যায় যে জাতির নিজস্ব পুরাতন শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও সম্প্রসারণের দ্বারা এবং উহার বাধ্যতামূলক প্রবর্ত্তনের দ্বারাই সে উন্নতি সম্ভব হইয়াছে, নিজ শিক্ষাব্যবস্থা ত্যাগ করার প্রশ্ন উঠে নাই। জাপানে গত শতাব্দীর শেষভাগে সম্রাটের এক আদেশ প্রচারিত হইল, যে কোনও গ্রাম, পরিবার বা ব্যক্তি পর্য্যন্ত অশিক্ষিত না থাকে, এই ভাবে শিক্ষার বিস্তার করা হউক। মাত্র ৩০ বৎসরে এই পরিকল্পনা প্রায় সম্পূর্ণ কার্য্যকরী হয়। ইউরোপের মধ্যে রুশ দেশ শিক্ষায় বড়ই পশ্চাৎপদ ছিল, অল্প কয়েক বৎসরে তাহাদের জাতীয় শিক্ষা শীর্ষে উন্নীত হইয়াছে। অন্য কথা কি, যে ইংরাজ শাসকেরা আমাদের দেশের শিক্ষায় এই গুরুতর অন্যায়টি করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের শিক্ষার গত শতাব্দীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেও ইহাই প্রমাণিত হয়। আমরা দেখিতে পাই যে ইংলণ্ডের যে 'স্বাধীন' বিদ্যালয়গুলি (Voluntary Schools) কোনও গুণ বা উৎকর্ষ ছিল না, প্রভূত অখ্যাতি ও নিন্দাই ছিল, প্রধানতঃ সেইগুলিকে অবলম্বন করিয়াই মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে সমগ্র দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি গড়িয়া উঠিল। বস্তুতঃ ইহাই সহজ, স্বাভাবিক ও প্রকৃত কল্যাণকর পন্থা। বিশেষতঃ যে দেশে অতীত কাল হইতে বিদ্যার অনুশীলন ও সমাদর হইয়াছে, যে দেশের প্রাচীন জ্ঞান ও সংস্কৃতি আজও সমগ্র জগতের প্রশংসার বস্তু, সে দেশের পুরাতন শিক্ষাকে মূলতঃ উৎপাটিত করিয়া তাহার স্থলে বিদেশী শিক্ষার চারা লাগাইবার সমর্থনে বিন্দুমাত্র যুক্তি নাই।

সে সময়কার বহু মনীষী ও সংস্কারকেরও এইরূপ ধারণা ছিল। ইংরাজ রাজপুরুষদের মধ্যে যাঁহারা নিরপেক্ষভাবে আমাদের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করিয়া এ দেশের মঙ্গলসাধনে ইচ্ছা পোষণ করিতেন, তাঁহারা এই অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অ্যাডাম ত আগাগোড়াই এই কথা জোর দিয়া বলিয়াছেন যে ভারতে জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি পুরাতন গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলির উপরেই গড়িতে হইবে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "To whatever extent such institutions may consist, and in whatever condition they may be found, stationary, advancing or retrograding, they present the only true and sure foundations on which any scheme of general or material education can be established. We may deepen and intend the foundations; me may improve, enlarge and beautify the supestructures; but these are the foundations on which the building should be raised." (এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির পরিমাণ যতই হউক এবং তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা যাহাই হউক, নিশ্চল, উন্নতিশীল বা অবনতিশীল যেরূপই হউক না, এইগুলিই হইল দেশের সাধারণ বাস্তব শিক্ষার পরিকল্পনা গঠনের একমাত্র যথার্থ ও সুনিশ্চিত ভিত্তি। আমরা সে ভিত্তিকে আরও বৃহৎ ও গভীর করিতে পারি, শিক্ষার সৌধটি অধিক উন্নত, বিশাল ও সুন্দর করিয়া গড়িতে পারি—কিন্তু তাহা এই ভিত্তির উপরেই নির্ম্মাণ করিতে হইবে)। দেশীয় বিদ্যালয়গুলির কিরূপে উন্নতি করিতে হইবে, শিক্ষকদের শিক্ষা ও যোগ্যতাবিধানের ব্যবস্থা করা যাইবে, মাতৃভাষায় উত্তম পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত করিতে হইবে—ঐ সকল বিষয়েই কার্য্যকরী প্রস্তাব তিনি দিয়াছিলেন এবং এগুলিকে প্রথমে দুই চারিটি জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে কার্য্যকরী করা হউক এমন পরামর্শও তিনি দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই প্রস্তাব কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা গৃহীত হয় নাই। তাঁহার পরে কয়েকজন বিচক্ষণ ইংরাজ রাজপুরুষ ভারতের বিভিন্ন স্থানের অভিজ্ঞতা হইতে অনুরূপ মত প্রকাশ করেন, বোম্বাইয়ের লাট এলফিনষ্টোন (Elphinstone), মাদ্রাজের মনরো (Munro) সীমান্ত প্রদেশের ক্লার্ক (Clark) ও টমসন (Thompson) ইত্যাদির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ক্লার্ক বলেন যে বহুকালের অভিজ্ঞতায় সর্ব্বত্র তিনি দেশীয় বিদ্যালয় দেখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস এই হইয়াছে যে "The people do desire to learn and that there is no backwardness in any class or any sect to acquire learning or to have their children taught" (লোকেরা যথার্থই শিক্ষা পাইতে চায়, এবং কোনও শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের লোকই শিক্ষা পাইবার বা সন্তানদিগকে শিক্ষা দিবার বিষয়ে পশ্চাৎপদ নহে)। এবং ইহাও

তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন যে "Modern educational institutions created by British officials were not keeping with the needs and sentiments of the people" (ইংরাজ সরকার প্রতিষ্ঠিত আধুনিক বিদ্যালয়গুলির দেশবাসীর প্রয়োজন ও সংস্কারের সহিত সামঞ্জস্য নাই)। তাঁহার পরবর্তী লাট টমসনের পিতা কলিকাতার একজন বিশিষ্ট পাদরী ও সংস্কারক ছিলেন। সে সময়ে তিনি ভারতে জাতীয় শিক্ষার এক পরিকল্পনা রচনা করিয়া বড়লাট লর্ড ময়রার (Lord Moira) নিকটে প্রেরণ করেন। উহাতে তিনি প্রস্তাব করেন "to utilise all existing and indigenous resources of an elementary character and to engraft onthis such organisations as European experiences might suggest" (প্রাথমিক ব্যবস্থার মধ্যে প্রচলিত দেশীয় যাহা কিছু আছে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে হইবে এবং তাহার সহিত ইউরোপীয় অভিজ্ঞতায় যাহা ভাল মনে হয় উহাও যুক্ত করিতে হইবে)। তাঁহারই সুযোগ্য পুত্র জেমস্ টমসন ভারতের নানা স্থানে সরকারী কার্য্য করিয়া শেষে সীমান্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। পিতার অনুরূপ তাঁহারও বিশ্বাস ছিল যে এদেশে শিক্ষার প্রকৃত বাহন হইল "the indigenous schools which are scattered all over the country" (দেশের সর্ব্বত্র ছড়ানো দেশীয় বিদ্যালয়সমূহ)। তাঁহার প্রস্তাব সামান্য সরকারী সমর্থনও পাইয়াছিল, বড়লাট লর্ড ডালহৌসী (Lord Dalhousie) ইহার প্রশংসা করেন ও বলেন যে টমসনের পরামর্শমত ব্যবস্থা শুধু তাঁহার নিজের প্রদেশে নহে, বাঙ্গালা ও বিহার প্রদেশেও বিস্তারিত হউক। তাঁহার অভিমত অনুযায়ী কার্য্য স্থায়ীভাবে চলে নাই, চলিলে ফল অন্যরূপ হইত, কিন্তু আমাদের শিক্ষার পক্ষে প্রকৃত কল্যাণকর এই পন্থাটি দেখাইবার জন্যও তাঁহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার ঋণ অনেক। প্রসিদ্ধ ১৮৫৪ সালের সরকারী বিবৃতিতে (Despatch of 1854) টমসনের শিক্ষাসংস্কার সম্বন্ধে ইহা স্বীকার করা হইয়াছিল যে, "the system for the promotion of general education throughout the country, by means of the inspection and encouragement of indigenous schools has laid the foundation of a great advancement in the education of the lower classes" (দেশীয় বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন ও উৎসাহদান করিয়া সারা দেশে শিক্ষাবিস্তার করিবার এই প্রণালী নিম্নশ্রেণীর লোকদের শিক্ষার বিশাল উন্নতির ভিত্তি স্থাপিত করিয়াছে)। কিন্তু এই নীতি অনুযায়ী কাজ হয় নাই। ইংরাজ সরকার চাহিলেন নূতন শিক্ষাপদ্ধতি, ইংরাজী বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইল, এমন কি শিক্ষার মাধ্যমও ইংরাজী হইল। পুরাতন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি সে প্রতিযোগিতায় স্থান না পাইয়া—অভাবে অবহেলায় উঠিয়া গেল। মহাত্মা গান্ধী ১৯৩১ সালে গোল-টেবিল বৈঠকে বলিয়াছিলেন, "I say without fear of my figures being challenged that to-day India is more illiterate than it was fifty or a hundred years ago, because the Indian administration, instead of taking things as they are, began to root them out" (আমার হিসাব যে ভুল প্রতিপন্ন হইবে না, সে বিষয়ে নিঃশঙ্কিত হইয়া আমি বলিতেছি যে ভারতবর্ষ পঞ্চাশ বা একশত বৎসর পূর্ব্বেও যাহা ছিল, বর্ত্তমানে তাহার চেয়ে অধিক অশিক্ষিত, কারণ ভারত সরকার যাহা ছিল, তাহা গ্রহণ না করিয়া উহাকে উৎপাটিত করিলেন)। উপরন্তু পুরাতনের সহিত যোগসূত্রটি সম্পূর্ণ ছিন্ন হইয়া যে ক্ষতি হইল, তাহা আর ঠিক সেইভাবে পূরণ হইবার আর সম্ভাবনা নাই।

জন্মান্তর

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

জানি না একদা কোন্ ভুবনের তীরে,
সুদূরের স্মরণীয় যুগল পথিক—
তুমি আর আমি এসে মিলিব আবার!
এ জীবনশেষে যদি থাকে জন্মান্তর—
পাই যেন একখানি মাটির কুটীর
ফুটাফুল, স্বচ্ছ, শ্যাম সরোবরতীরে
কোনো এক পল্লীপ্রান্তে স্নিগ্ধছায়াঢাকা,
নারিকেলকুঞ্জঘেরা, কূজন-গুঞ্জনে
চিরমুখরিত, বনপুষ্পসুরভিত,
সন্ধ্যাশঙ্খনিঃস্বন-উতল! সেথা তুমি
গিরিদরীবিহারিণী হরিণীর মত
সঞ্চরি' ফিরিও সদা। জীবনের গ্লানি,
দুঃখদৈন্য, ব্যথাজ্বালা, মৃত্যুর শিয়রে
থেকো জাগি' রজনীর শুকতারাসম!

ফিরে চল মাটির টানে

শ্রীঅজিতকুমার ভট্টাচার্য

আমাদের প্রিয়তম কবি মাটির বন্দনা গেয়ে বলেছেন—'ফিরে চল মাটির টানে।' তিনি আবার গেয়েছেন—'ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।' সেই মাটি-মায়ের সুখ-দুঃখ-বন্ধন-মুক্তির কথা শোনাবো।

আমাদের দেহ প্রকৃতির পাঁচটি উপাদানে গড়া। সেগুলির নাম—ক্ষিতি (মাটি), অপ্ (জল), তেজ (আগুন), মরুৎ (হাওয়া) ও ব্যোম (মহাশূন্য)। প্রকৃতির এই দান ভোগ করবার সমান স্বাধীনতা জগতের সমস্ত মানুষের থাকা উচিত। কিন্তু আমরা নিজেরাই তার গোলমাল করে বসে আছি। পৃথিবীতে অধিকাংশ মানুষের মাটির উপর স্বাভাবিক অধিকার নেই। গান্ধীজী বলতেন—'ভূমি তো সব গোপালকি।' কিন্তু সে অধিকার কয়েকজন ক্ষমতাশালী ধনী ব্যক্তির হাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ উপাদান 'ক্ষিতি' অনেকরকম বন্ধনের মধ্যে আটক পড়ে আছে। মাটিকে সেইসব বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য অনেক চেষ্টাই চলছে।

ভারতবর্ষের রামায়ণ-মহাভারতের যুগে ফিরে গেলে দেখবো—মাটির উপর দেশের প্রজার স্বাভাবিক অধিকার রয়েছে; সাধারণ মানুষ কৃষিকাজ করে ফসল তৈরি করছে। কৃষির উপর ভিত্তি করে নতুন সভ্যতা গড়ে উঠছে। রাজর্ষি জনক নিজেই হলচালনা করতেন। তাই তিনি তাঁর সবচেয়ে আদরিণী কন্যার নাম রেখেছিলেন—'সীতা' অর্থাৎ লাঙ্গলের হল। ওখানকার সর্বাপেক্ষা বড় আইন-রচয়িতা জৈমিনি ঋষি নির্দেশ দিলেন: জমি যে চাষ করবে, জমির স্বত্ব তারই। তবে দেশের শাসন-কার্য চালাবার জন্য অন্য বৃত্তিধারীর মত চাষীকেও উৎপন্ন ফসলের একটা ভাগ কর হিসাবে রাজ-সরকারে জমা দিতে হবে।

হাজার হাজার বছর এইভাবে কেটে গেল। তারপর আমরা সংবাদ পাই ইতিহাসের পাতায়—পাটলিপুত্রের সম্রাট মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের আমলের কথা। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর সময়—এখন থেকে প্রায় ২৩০০ বৎসর আগে—চন্দ্রগুপ্তের গুরু ও মন্ত্রী কৌটিল্য (চাণক্য-পণ্ডিত) আইন রচনা করলেন: জমি যে চাষ করবে, জমি তারই অধিকারে থাকবে। রাজকার্যের জন্য তাকে উৎপন্ন শস্যের ছয়ভাগের একভাগ কর দিতে হবে। তিনি এইসংগে একটি কঠোর ধারা জুড়ে দিলেন যে, চাষ না করে জমি ফেলে রাখলে তা বাজেয়াপ্ত হবে এবং অন্য লোককে দিয়ে দেওয়া হবে।

তারপর পাই ষোড়শ শতাব্দী অর্থাৎ ৪০০ বৎসর পূর্বের কথা। দিল্লীর মোগল-সম্রাট আকবরের রাজস্ব-মন্ত্রী রাজা টোডরমল প্রায় একই প্রকার আইন চালু করেছিলেন। তফাতের মধ্যে উৎপন্ন শস্যের তিন ভাগের একভাগ বা তার মূল্য রাজকোষে জমা দিতে হতো।

এমনিভাবে রাজা ও প্রজায় মিলে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠে দিন কাটছিল। দুঃখ-দুর্দশা ছিল না, তা নয়। তবু জমির মালিকানা, মাটির উপর অধিকার—মোটামুটিভাবে চাষীদের ও সাধারণ মানুষের হাতেই ছিল। রাজা বা সম্রাট উৎপন্ন শস্যের উপর কিছু কর পাবার মালিক ছিলেন মাত্র। কিন্তু ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর আম্রবনে দেশের স্বাধীনতা বিদেশী ইংরেজের হাতে লুপ্ত হয়ে যাবার পরই আসল দুর্দশা আরম্ভ হলো। ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে ক্লাইভ দিল্লীর বাদশাহ শাহ আলমের কাছ থেকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা বৃত্তির বিনিময়ে সুবে-বাঙলার (বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যা) দেওয়ানী নিলেন (১৭৬৫ খ্রীঃ)। এই রাজস্ব থেকে বাঙলার নবাবের জন্য বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকার বৃত্তি এবং দেশরক্ষার জন্য বার্ষিক ৫৩ লক্ষ টাকার ব্যয় বরাদ্দ ছিল। কোম্পানীর হাতে এলো রাজস্ব আদায় ও দেশরক্ষার ভার এবং নবাবের হাতে রইল বিচার ও শাসনের ভার। কোম্পানীর ক্ষমতা রইল—দায়িত্ব রইল না। অথচ নবাবের হাতে রইল দায়িত্ব—কিন্তু ক্ষমতা নয়। এদিকে কোম্পানীর কর্মচারীদের অত্যধিক লোভ এবং বাঙলার নায়েব মহম্মদ রেজা খাঁ ও বিহারের নায়েব রাজা সেতাব রায়ের যথেচ্ছ অত্যাচারে দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল (১৭৭০ খ্রীঃ)। বাংলা ১১৭৬ সালে এই দুর্ভিক্ষ হয়েছিল বলে একে ইতিহাসে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' বলে। অনাহারে ও মহামারীর আক্রমণে সেদিন বাঙলাদেশের তিনভাগের একভাগ লোক মারা যায়। বিদেশী বণিকের কুক্ষিগত মাটি-মা সেদিন তাঁর পুত্রকন্যাদের খাওয়াতে পারলেন না! এই মর্মান্তিক বেদনার ইতিহাস বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে অঙ্কিত করে গেছেন। ইংরেজ ঐতিহাসিক আডাম ব্রুক লিখেছেন যে, নির্মম শোষণের ফলে এই কয় বৎসরে বাঙলাদেশের লুণ্ঠিত ধনদৌলত প্রবল বন্যার মত লণ্ডনে এসে পৌঁছতে লাগল এবং তার ফলে ইংলণ্ডে সাফল্যের সহিত শিল্প-বিপ্লব (Industrial Revolution) ঘটল।

এরপর ওয়ারেন হেষ্টিংস এসে রাজস্ব-আদায়ের ব্যবস্থার কিছু সংস্কার করেছিলেন। তিনি রেজা খাঁ ও সেতাব রায়কে পদচ্যুত করে মুর্শিদাবাদ থেকে কোলকাতায় রাজকোষ নিয়ে চলে এলেন। তারপর 'রেভিনিউ বোর্ড' স্থাপন করে 'কালেক্টর' নামক ব্রিটিশ কর্মচারীদের উপর রাজস্ব আদায়ের ভার দিলেন (১৭৭৩ খৃঃ)।

সংস্কারের নামে আরো সর্বনাশ করলেন লর্ড কর্ণওয়ালিস। হেষ্টিংস নিয়ম করেছিলেন যে, জমির খাজনার পরিমাণ নিলামে চড়িয়ে যিনি সর্বোচ্চ মূল্য দিতে চাইতেন, তাকেই পাঁচ বৎসরের জন্য জমির খাজনা আদায়ের ক্ষমতা ও মালিকানা দেওয়া হতো। এতে প্রজার

উপর জুলুম তো হতোই, কোম্পানীর রাজকোষে অনেক সময় নিয়মিত টাকা এসে পৌঁছত না। তাই কর্ণওয়ালিস বিলাতের জমিদারী প্রথার অনুকরণে জমির খাজনার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিয়ে এক এক-জন আদায়কারীকে চিরস্থায়ী 'জমিদার' বলে স্বীকার করে নিলেন এবং জমির মালিকানা স্বত্ব প্রজার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে জমিদারদের হাতে দিয়ে দিলেন। জমির খাজনা বৃদ্ধি করা এবং জমি থেকে চাষী ও প্রজাদের উচ্ছেদ করার ক্ষমতাও জমিদারদের হাতে স্বাভাবিকভাবে এসে গেলো (১৭৯৩ খৃঃ)। মাটির অধিকার ইংরেজদের চক্রান্তে শিকলে বাঁধা পড়লো। দেশের মুষ্টিমেয় ব্যক্তির ঘরে দেশের মানুষের মা বন্দিনী হয়ে রইলেন। সাধারণতঃ পলাশীর যুদ্ধ থেকে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের 'সিপাহী বিদ্রোহ' পর্যন্ত যে সব লোক দেশের স্বাধীনতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরেজ সরকারকে সাহায্য করেছিল, তারাই আজকের অধিকাংশ জমিদারবংশের পূর্বপুরুষ।

ইংরেজ-রাজ গোটা বাঙলাদেশের (পূর্ব ও পশ্চিম) মাটির উপর প্রজার অধিকার ৩ কোটি ৯ লক্ষ টাকা বার্ষিক রাজস্বের পরিবর্তে লুঠ করে কয়েকটি জমিদারের হাতে তুলে দিয়েছিল। তারা আবার কিছু কিছু অংশের জমির খাজনা আদায়ের ভার অধীন কিছু লোকের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। তাদের বলা হয় পত্তনীদার। তারাও তাদের নিচে সে-পত্তনীদার, দর-পত্তনীদার প্রভৃতি স্তর সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেক স্তরের মধ্য-স্বত্বভোগীই আদায়ের খরচ ও লাভ পুষিয়ে খাজনা আদায় করছেন। ফলে যেখানে সরকার পাচ্ছেন মাত্র ৩ কোটি ৯ লক্ষ টাকা, সেখানে মধ্য-স্বত্বভোগী ও জমিদারদের স্বার্থ ও ক্ষুধা মেটাবার জন্য প্রজাকে ১৭ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা খাজনা আদায় দিতে হচ্ছে। এর উপর সুদ, মাথট, নজর, সেলামি, পুণ্যাহ, খারিজ, গোমস্তা-পাইকের বক্‌শিস প্রভৃতি বাবদ অতিরিক্ত টাকা প্রজাকে বহন করতে হয়েছে। খাজনা দিয়ে দাখিলা (রসিদ) না-পাওয়ার দরুণ কত নিরক্ষর প্রজার জমি নিলামে চড়েছে, তার সংখ্যা নেই। এখনো কত বাস্তুহীন চাষী ও মজুর গ্রামে গ্রামে রয়েছে, তার কথা কে জানে!

লর্ড কর্ণওয়ালিস গ্রামের মঙ্গলামঙ্গলের দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন, অথচ জমিদারদের উপর এ সম্বন্ধে কোনো আদেশ না দেওয়ায় দেশের কাজ করার জন্য তাদের কোনো সাক্ষাৎ দায়িত্বও রইল না। সেই থেকে দেশের সর্বনাশ ও ভাঙন শুরু হলো। বাড়তি আদায়ের টাকা থেকে সামান্য সংখ্যক জমিদার কিছু কিছু দেশের কাজ করেছেন। কিন্তু দেশের বিরাটত্বের ও প্রয়োজনের তুলনায় তা অতি সামান্যই। অধিকাংশ জমিদার প্রজার উপর নির্মম অত্যাচার করে, নিষ্ঠুর শোষণ চালিয়ে খাজনা আদায় করে ইমারৎ নির্মাণ করেছেন, শহরে টাকা উড়িয়েছেন, মদ্যপান ও বিলাসের চূড়ান্ত উপভোগ করেছেন। ফলে চাষী ও প্রজার আর্থিক মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে, জমিতে ফসলের উৎপাদন কমেছে, মহামারী ও দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামের শিক্ষিত ও ধনী ব্যক্তিরা শহরে পালিয়েছেন। গ্রামের কুটিরশিল্প ধ্বংস হয়েছে, জমির উপর কৃত্রিম চাপ বেড়েছে, গরীব লোক আরো গরীব হয়ে গেছে, চাষীর ঘাড়ে কোটি কোটি টাকার ঋণের বোঝা চেপেছে!

এইভাবে জমিদারী প্রথার মধ্যমে যে পীড়ন চলছিল, তার ফলে ভারতবর্ষে ভয়াবহ 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' (১৭৭০ খ্রীঃ) ও 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' (১৯৪৩ খৃঃ)। এই পৌনে দু'শো বৎসরের মধ্যে ছোটখাটো অজন্মা ছাড়াও ১৮৬৬, ১৮৭৩, ১৮৭৬ ও ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকটি বড় বড় দুর্ভিক্ষে দেশের অগণিত মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। অবশ্য এর জন্য ইংরেজ সরকারের শোষণও কম দায়ী নয়।

ইংরেজ সরকার তাদের স্বার্থে ১৮২০, ১৮৫৯, ১৮৮৫ ও ১৯০০খ্রীষ্টাব্দে কয়েকবার ভূমিসংস্কার আইন পাশ করেছেন। তাই তাতে প্রজার অতি সামান্যই উপকার হয়েছে মাত্র। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বায়ত্তশাসন আইন চালু হবার পর বাঙলাদেশের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক সাহেব যে সব 'প্রজাস্বত্ব' ও 'ঋণসালিশী' আইন পাশ করেছিলেন, একমাত্র সেই আইনের বলেই প্রজাদের জমির উপর মালিকানা স্বত্ব কিছুটা দৃঢ় হয় এবং চাষীরা ঋণভার থেকে অনেকাংশে মুক্ত হবার পথ পায়।

দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় কংগ্রেস ভারতের চাষীদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, দেশ স্বাধীন হবার পর কংগ্রেসের হাতে শাসন ভার এলে সর্বনাশা জমিদারী প্রথা আইন করে উচ্ছেদ করে দেওয়া হবে। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হয়েছে এবং প্রত্যেক প্রদেশে ও কেন্দ্রে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা দেশশাসন করছেন। এই শত বৎসরের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ভূমি-ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। বাঙলাদেশের ভূমি-ব্যবস্থা ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী জটিল বলে সমস্ত দিক খুব ভালোভাবে চিন্তা করে আইন রচনা করতে বিলম্ব ঘটেছে। বর্তমান ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে পশ্চিমবঙ্গের আইন সভায় কংগ্রেসী সরকার জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ আইন পাস করেছেন। এই আইনের মোটামুটি কথা হলো (১) সরকার ও প্রজার মধ্যে যতরকম মধ্যস্বত্ব আছে, তা সমস্তই লোপ হয়ে যাবে এবং প্রজা সরাসরি সরকারকে খাজনা দেবে। (খ) সমস্ত মধ্যস্বত্ব-ভোগীকে অন্যপথে জীবিকার্জনের সুযোগ দেওয়ার জন্য কিছু কিছু ক্ষতি-পূরণ দেওয়া হবে। যার যত বেশী আয় আছে, তিনি তত কম টাকা পাবেন। (গ) কোনো ব্যক্তিই মোট ৩৩ একরের বেশী জমি খাস-দখল রাখতে পারবে না। (ঘ) এর ফলে প্রায় ৪ লক্ষ একর বাড়তি জমি সরকারের হাতে চলে আসবে। সরকার আবার দেশের ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে প্রয়োজনমত সেই জমি বিলি করে দেবেন। (ঙ) যে বাড়তি খাজনা জমিদারের ব্যক্তিগত স্বার্থে খরচ হতো, সে টাকা এবার গ্রামের উন্নয়নের কাজে লাগানো হবে।

আগামী সন ১৩৬২ সালের শুভ ১লা বৈশাখ থেকে উক্ত আইন চালু করা হবে। পশ্চিমবঙ্গে ২৫ হাজার জমিদারী ও প্রায় ১৩ লক্ষ মধ্যস্বত্ব-ভোগী বিদ্যমান। সমস্ত স্বত্বের উচ্ছেদ করতে যে প্রাথমিক ব্যবস্থার দরকার তাহার কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। সমস্ত মধ্যস্বত্বভোগীকে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া, প্রত্যেকের ক্ষতিপূরণের হিসাব করা, টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা, প্রায় ৯০ লক্ষ একর জমির প্রজাস্বত্বের চূড়ান্ত রেকর্ড প্রস্তুতকরণ, খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা, কার্যালয় স্থাপন, কর্মচারীদের শিক্ষাদান প্রভৃতি কার্যে ১৯৫৪-৫৫ সালে প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। শীঘ্রই ৪জন ডেপুটি কালেক্টর, ২৮ জন সাবডেপুটি কালেক্টর, ৬০ জন সেটেলমেণ্ট কানুনগো, ৩০৪ জন তহশীলদার, ২৮৪ জন কেরানী, ১১৫৯ জন আরদালী পিওন প্রভৃতি কর্মচারী নিয়োগ করা হবে।

এই নূতন আইনের বলে দেশের চাষী ও প্রজারা জমির আসল মালিক হবে এবং মনে নূতন উৎসবের জোয়ার সৃষ্টি হবে। ফলে প্রত্যেক চাষীই আপন আপন জমিতে আরো বেশী করে ফসল উৎপাদন করার চেষ্টা করবে। দেশে খাদ্যের অভাব ঘুচবে, কুটির শিল্পের দিকে লোকের নতুন করে নজর পড়বে, রাস্তাঘাট সেচ প্রভৃতির উন্নতি ঘটবে। এইসব কাজ হলে গ্রামের সাধারণ লোকের আর্থিক অবস্থা ভালো হবে, গ্রামের সমাজও উন্নত হবে। আর একটা কথা: জমি নিয়ে এতোদিন ধরে গ্রামে গ্রামে যে সব মামলা-মোকর্দমা চলছিল, তার অবসান ঘটবে। গ্রামের সমাজ উন্নত ও সুন্দর হলে দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদেরও গ্রামের দিকে দৃষ্টি ফিরবে। তখন তারা মাটির টানে আবার গ্রামে ফিরে আসবেন।

গীতায় অহিংসার বাণী

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

তুমুল রণবাদ্য, অস্ত্রের ঝনঝনা, বীরত্বের আস্ফালন প্রকাশ করছে উন্মাদনা রক্ত-পিপাসার, হিংসা ও প্রতিহিংসার। কুরুক্ষেত্র মাত্র জ্ঞাতি-বিরোধ নিষ্পত্তির সমর-প্রাঙ্গণ নয়। ভারতের প্রায় সকল রাষ্ট্রের বীর রাজন্যবর্গ যুদ্ধ-কামী। মানের মূল্যে প্রাণ-বিনিময়ে কেহ কাতর নয়। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী ক্ষত্রিয় সেনা স্ব স্ব পক্ষের জয়লাভের শুভ সাধনায় প্রাণভয়ে আড়ষ্ট নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সারথী সখা অর্জুনের। তিনি প্রণোদিত করছেন মিত্রের সমর-প্রবৃত্তি।

হৃষিকেশ বল্লেন—যদি তুমি এই ধর্ম ও সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হও, তাহলে স্বধর্ম্ম এবং কীর্তি হবে বিনষ্ট। ফলে তুমি পাপ অর্জন করবে।*

মোট কথা মহাভারতের এই জ্যোতির্ময় অধ্যায়ের উদ্দেশ্য বীর পার্থকে সমর-সংকল্পে দৃঢ়মন করা। কাজেই সহজে মনে হয়—শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা অহিংসা নীতির পরিপোষক নয়। মনুষ্য-হৃদয়ে ক্ষাত্র-ভাব, সমর-লিপ্সা, যুদ্ধে অকুণ্ঠিত মনে শত্রুর প্রাণনাশ প্রভৃতি হিংসাত্মক শিক্ষার আয়োজন জগতের মহাগ্রন্থের উপদেশ।

অর্জুনের শৈথিল্য নিরাকরণের জন্য শ্রীভগবান বলেছেন—মরিলে স্বর্গলাভ, যুদ্ধে বিজয়লাভ করলে পৃথিবীর রাজ্য-ভোগ। অতএব হে অর্জুন যুদ্ধের জন্য কৃত-নিশ্চয় হও।†

তারপর বলা হল—সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয়কে সমান ভেবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তা'হলে পাপ তোমাকে স্পর্শ করবে না।‡

কিন্তু এই উত্তেজনার পরই নিষ্কাম কর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তার অব্যবহিত পূর্বে আত্মা অবিনশ্বর ও শাশ্বত এ সিদ্ধান্ত প্রচারিত হয়েছে। পূর্ণভাবে বিচার করলে নিঃসন্দেহ উপলব্ধি হয় যে দেহের বিনাশে আত্মার বিনাশ অসম্ভব এবং নিষ্কামভাবে যুদ্ধ-রূপ হিংসা কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য সেথায়—যেথায় ধর্ম এবং সাংসারিক কর্তব্য-বুদ্ধির বিশুদ্ধি সংরক্ষণ অসম্ভব যুদ্ধ ব্যতিরেকে।

সুতরাং এ সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত যে সকল অবস্থায় একান্ত অহিংসার ব্যবস্থা গীতার উপদেশ নয়। গীতার বাণী সারা হিন্দু-ধর্মের সার শিক্ষা। ধর্মযুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল না এদেশের নীতিতে। চতুর্বর্ণের ব্যবস্থায় ক্ষত্রিয় বর্ণের গুণকর্ম হিসাবে বিভাগ সূচনা করে এ নীতির পরিপোষণ।

গীতার অষ্টম অধ্যায়ে গভীর তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্টভাবে আমরা যাকে জীবন বা প্রাণ বলি, তাকে বিশ্লেষণ করলে কোন্ সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়? প্রথম তত্ত্ব ব্রহ্ম যিনি অক্ষর অর্থাৎ অবিনশ্বর—পরম অক্ষর—অনন্তকাল অপরিবর্তনীয় অবিনশ্বর। দ্বিতীয় তত্ত্ব—অধ্যাত্ম—স্বভাব, তার মূল নিজস্ব ভাব। তৃতীয় কর্ম। অব্যয় অক্ষরের স্বভাব কর্ম-লীলাশীল। ব্রহ্মের এই ভাবের স্ফুরণের ফল ভূতাদি চরাচর সৃষ্টি। চতুর্থ তত্ত্ব নিত্য উপলব্ধি করি। এই পরিদৃশ্যমান সৃষ্টি সদাই পরিবর্তনশীল লীলা-চঞ্চল। নামরূপ বিভেদ সৃষ্টি করতে সদাই প্রস্তুত, অথচ নিত্য-নবীন রূপ ছায়াবাজির ছবির মত সদাই পরিবর্তনের ছন্দ মাত্র। অথচ নশ্বর এই ছন্দ তরঙ্গ। অধিভূত—ভূতগ্রামের তরঙ্গ-স্রোতের অন্তরনিহিত সূত্র। এই পরিবর্তনের পরিবেশেও মানুষ উপলব্ধি করে অপরিবর্তনশীল শাশ্বত চেতনার। সে চেতনাকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য আমরা যজ্ঞ করি। যজন, পূজন, ধ্যান এবং চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধ উপলব্ধির মানসে। বিরাট সত্ত্বার সহজ জ্ঞান বোঝে না কে সে। অথচ সংস্কার সদাই সঙ্কেত করে এই অনিত্য অশাশ্বতের মূলে বিদ্যমান এক শাশ্বত নিত্য পুরুষকে। তাই পঞ্চমতঃ অধিদৈবতাও আমাদের এক তত্ত্ব। সেই অধিদেবতা প্রত্যেকের অন্তরে সন্নিবিষ্ট ঈশ্বর।

সুতরাং ব্রহ্ম তাঁর স্বভাব বা প্রকৃতির কর্মে ভূত সৃষ্টি করেন এবং সেই সৃষ্টির মাঝে উজ্জ্বল চেতনারূপে

---

* অথচেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি। ২।৩৩

† হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীন্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়। ২।৩৭

‡ সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি। ২।৩৮

অধিষ্ঠান করেন। সেই দেব-শক্তি প্রণোদিত করে জীবের বুদ্ধিকে মুক্তির পথে যাত্রার উদ্যোগে।

এই শিক্ষার পর বোঝালেন শ্রীকৃষ্ণ যে সেই ক্ষরভাব এড়িয়ে অন্তঃকালে তাঁকে অনুসরণ করলে মুক্তি পাওয়া যায়। এ দার্শনিক তত্ত্ব শিক্ষার শেষেও শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন—যে ভাব স্মরণ ক'রে মানুষ দেহ-ত্যাগ করে, সেই ভাবানুরূপ তার গতি হয় মৃত্যুর পর। সুতরাং সর্বকালে আমাকে অনুসরণ কর এবং যুদ্ধ কর। আমাতে মন ও বুদ্ধি নিবিষ্ট করে (যুদ্ধ করলেও) নিঃসন্দেহ আম'তেই মিলিত হবে। *

এর পর সংশয় থাকে না যে যুদ্ধ-বিরতি গীতার শিক্ষা নয়। জগতের ধারা একের কর্মে অন্যের রূপান্তর বেশ-পরিবর্তন। কিন্তু সে কার্য যখন অনিবার্য, অহিংসক বুদ্ধিতে কেবল কর্তব্যকর্ম হিসাবে, সমর-প্রবৃত্ত হয়ে প্রাণনাশ করা জীবনের এক কর্ম—ধর্মের ধারা সংরক্ষণের জন্য। ভক্তিকে জীবনের মূল-স্রোত করলে তার প্রভাবে সদাই ঈশ্বর চিন্তা হবে চিত্তের সাধনা। তেমন ব্যক্তি যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করবার সময় হিংসামূলক চিন্তায় মগ্ন থাকে না। যে ভাবে মানুষ মরণের সম্মুখীন হয় তার ভবিষ্যত জীবন হয় সেই ভাবের অনুরূপ। অভ্যাসবশে মৃত্যুকালে যোদ্ধার চিত্ত পূর্ণ থাকে যদি ভগবদ্‌চিন্তায় তার সদ্‌গতি অবশ্যম্ভাবী। না হলে হিংসা নিয়ে যাবে মৃতকে হিংসার নরকে।

অবশ্য এ-নীতি যুক্তিমূলক। কিন্তু এর সাধনা অসম্ভব মনে হয় আমাদের মত সংসারী জীবের পক্ষে। অর্জুন যে শিক্ষা লাভ করলেন, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর প্রত্যেক সৈনিক সে নীতির কিছুই জানতো না নিশ্চয়। তাই সাধারণভাবে মনে হয় ধর্ম সংরক্ষণের জন্য যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। গীতা সমর-বিরতি শিক্ষা দেন নি। তার কঠোরতা ও পরিণামের দুর্দশা অতিক্রম করবার কৌশল শিখিয়েছেন।

এই মর্মের শিক্ষা অন্যত্রও দেখি। বিশ্বরূপ দর্শনের পরও অর্জুন শুনলেন—অতএব তুমি ওঠ, যশলাভ কর এবং শত্রু জয় করে সমৃদ্ধ রাজ্য উপভোগ কর। এরা আমার দ্বারা পূর্বেই নিহত হয়েছে। সব্যসাচি তুমি নিমিত্ত মাত্র হও। *

মাত্র এই একটি শ্লোক হতে কোনো সিদ্ধান্ত হবে অবৈধ। সমস্ত গীতায় বলা হয়েছে—লাভালাভ, জয়াজয় সমান ভাবতে হবে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে যে ভবিষ্যতের কথা বল্লেন শ্রীকৃষ্ণ—তার অর্থ বুঝতে হবে অন্যান্য শিক্ষার সমন্বয়ে। পূর্ব উপদেশের প্রত্যাহার নয় এ শ্লোক। অর্জুন সাধারণ যোদ্ধা নন। তিনি বন্ধু। তাঁর মানসপটে ভাবী-কালের বিজয়-চিত্র উদ্ভাসিত হলে তিনি কর্তব্যচ্যুত হবেন বা সকল শিক্ষা বিস্মৃত হবেন না অন্তর্যামী তা জানতেন। তাঁকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছেন। সে মুহূর্তে তিনি বিশ্ববার্তা অবগত ছিলেন। জীবন ও মৃত্যু কর্মফলের পরিণতি। তাই যুদ্ধে যারা প্রাণ হারাবে কর্মফলে, তাদের নামের তালিকা অবিদিত ছিল না সর্বজ্ঞের সকাশে। সুতরাং এই একটি শ্লোক গীতার সকল শিক্ষার প্রত্যাহার নয় এ সিদ্ধান্ত ন্যায়ানুমোদিত।

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার শেষে আমরা অর্জুনের মুখে যে কথা শুনি তা হতে মনে হয় তাঁর ভ্রান্ত মনোভাব দূর হয়েছিল শিক্ষার শেষে। সে ভ্রান্তি ছিল যুদ্ধ সম্বন্ধে। সে মোহের কথা প্রথমেই শোনা গিয়েছিল বিষাদ যোগে। শেষে পার্থ বল্লেন—তোমার অনুগ্রহে মোহান্ধকার নিরাকৃত হওয়াতে, আমি স্মৃতিলাভ করেছি, আমার সকল সন্দেহই দূর হয়েছে। এক্ষণে তুমি যে বাণী প্রকাশ করলে আমি তার অনুধাবন করব। †

এ শ্লোকের পূর্ণ অর্থ গ্রহণ করলে—"বচনং তব—বাদ দেওয়া চলবে না। সে বচনকে পূর্ণভাবে নিতে হবে। আত্মা অবিনশ্বর। সারা সৃষ্টি ঈশ্বর-সূত্রে গাঁথা। তিনি সবার হৃদ্দেশে অবস্থিত—জীব যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। পৃথিবীতে কর্ম অনিবার্য। কর্মের ফলাফলে নিরাসক্ত হয়ে নিষ্কামভাবে

---

* যং যং বাপি স্মরণ্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিত। ৮।৬
তস্মাৎ সর্বেষু কর্মেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম। ৮।৭

* তস্মাৎত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুংক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্। ১১।৩৩

† নষ্টোমোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব। ১৮।৭৩

কর্ম করতে হবে। তার ধারা নির্ণয় করবে জ্ঞান। কিন্তু সকল জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয় যদি ভক্তিতে, জ্ঞান-নির্ণীত কর্ম হয় শুদ্ধ। এমন যার জীবন তার পক্ষে ধর্মের স্রোতকে প্রবাহিত রাখবার জন্য যুদ্ধও আবশ্যক। জীবন, মরণ—শাশ্বত, অশাশ্বত, কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তি সম্বন্ধে সম্যক দৃষ্টির বিমল জ্যোতিতে হিংসা কলুষিত করে না মনকে। হিংসার প্রশ্নই ওঠে না, যেথায় হন্তার প্রতীতি নিশ্চিত স্পষ্ট যে কর্মফলেই মৃত্যু বরণ করে নিহত। সে দেহত্যাগী অখণ্ড সৃষ্টির একাংশ, হন্তার নিজেরই অংশ। কিন্তু এসব কথা উপলব্ধি করা চাই বাণীকে সত্য ভেবে। ভক্তের পক্ষে মনে হিংসা রেখে মনকে প্রবোধ দিয়ে নরহত্যা করলে হিংস্র-অসত্যের প্রবৃত্তির বিকাশ। তার ফল দুর্গতি।

যখন নষ্টমোহ হলেন অর্জুন, তার অব্যবহিত পূর্বে ভগবান বল্লেন—আমাতে মনোনিবেশ কর, আমার ভক্ত হও, আমাকে যজন কর, আমাকে নমস্কার কর। আমি সত্যই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে তুমি আমার প্রিয়, তুমি আমাকেই পাবে। তুমি সকল ধর্ম (ক্ষাত্রধর্ম, সংসার ধর্ম, এ সকলে আসক্তি) পরিত্যাগ করে, মাত্র আমারই শরণ লও। শোক কর না। আমি তোমাকে সকল পাপ হতে মুক্ত করব।*

কোনো বিষয় আলোচনা করতে গেলে সে সম্বন্ধে সকল কথা বিবেচনা করা সঙ্গত। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় যুদ্ধের প্রেরণা আছে। অথচ অহিংসার স্পষ্ট কথা আছে বহু। তারা মোটেই পরস্পর-বিরোধী নয়। তাদের সমন্বয়ে গীতার প্রকৃত উপদেশ উপলব্ধি করতে পারা যায়।

যুদ্ধ হিংসা লোকক্ষয় প্রাণক্ষয় সুতরাং হিংসা। যুদ্ধের নির্দেশ, মাত্র গীতায় কেন, সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র জুড়ে। জাতীয়তা এবং জাতীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণ অসম্ভব যুদ্ধ ব্যতিরেকে। অপরাধীর শাস্তির মূলে থাকে তার চরিত্র সংশোধনের বাসনা। সঙ্ঘের নিরাময়তার জন্য দোষীকে কষ্ট দেবার ব্যবস্থা সমাজের কল্যাণের অভিপ্রায়ে। নিজের পুত্র কন্তার শাসনও তাদের ক্লিষ্ট করে, এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নাই। কিন্তু শাসন বিনা কি সদাচার সম্ভব?

জীবনের সকল কর্মের মতো যুদ্ধকে বিচার করতে হয়, কর্মীর উদ্দেশ্য এবং কর্ম-প্রণালীর মাধ্যমে। চিকিৎসক যখন পরের দেহে অস্ত্রোপচার করেন, সে কর্মের উদ্দেশ্য রোগীর মঙ্গলসাধন। সে উদ্দেশ্যে তাঁকে বহু ক্ষেত্রে রোগীর দেহের অংশ-বিশেষ ছেদন করতে হয়। তাঁর কর্ম হিংসামূলক নয়, পরের কল্যাণ সাধন, এ সিদ্ধান্ত সর্ববাদীসম্মত। আবার চিকিৎসকের কর্ম হিংস্রকের কুকর্ম হতে পারে, যদি তিনি অসদুদ্দেশ্যে ভণ্ডামীর মুখোস পরিধান করে ভ্রূণহত্যা করেন বা লোকের অঙ্গচ্ছেদ করেন। কর্মের উদ্দেশ্য বাদ দিয়ে কর্মের বিচার বৈধ নয়।

এ নীতি সমর-নীতির বৈধতা বিচারেও প্রযুজ্য। গীতার বাণী বিচার করতে গেলে তার পূর্ণ অনুশীলন প্রয়োজন। সংসারের কর্মধারা আদিকাল হ'তে আজিও এমন পরিবেশ সৃজন করেনি যেথায় মানুষ সকল অবস্থায় এমন কাজ করতে পারে যার ফলে অন্যের প্রাণে ব্যথা না লাগে। বহুর কল্যাণে একের নিগ্রহ অবশ্যম্ভাবী জগতের হিতে। গীতা ও ধর্মশাস্ত্র শিক্ষা দেয়—নিগ্রহকারীর কর্ম হতে হিংসার কণ্টক অপসরণের। আত্ম-নিগ্রহেও পরের নিগ্রহ নিরোধ করা সকল ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। দুর্বৃত্ত এক নিরপরাধ সাধুর অঙ্গে অস্ত্র নিক্ষেপ করছে। আততায়ীর হাত কেটে না দিলে, সাধুর প্রাণ রক্ষা অসম্ভব। এ-ক্ষেত্রে মন হ'তে বিদ্বেষ বিষ বিনষ্ট করে, মনকে হিংসার কুপথে না চালিয়ে, পরোপকারের সাধু উদ্দেশ্যে, আততায়ীকে আত্মীয় ভেবে, শাস্তি দিলে নিশ্চয়ই পাপার্জন হয় না। এক দেশের বিধর্মী নির্দয় জনতা, রণধারাবাহি যদি আসে উন্মাদ কলরবে দেশজয় করতে, তাদের বিনাশ কি অবৈধ—কৃষ্টি, সম্পদ, শিল্প, বাণিজ্য ও ধর্মকে ধ্বংশের মুখ হতে রক্ষা করবার সাধু সংকল্পে? গীতা বলছেন, নিষ্কাম ভাবে, ভক্তি প্রণোদিত হয়ে সে কার্য সম্পাদন করলে, হিংসা কলুষিত করে না মনকে।

মানুষের আরব্ধ কর্ম শেষ হয় না কর্মের শেষে। গান থামে, সুরের রেশ ঘোরে কর্ণকুহরে। চিত্র অপসারিত হ'লেও, পটে আঁকা রূপ ভেসে ওঠে মনে। কলহ থামলে তার সহগত হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা, বিজয়ের দাম্ভিক আত্ম-প্রসাদ,

---

* মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে। ১৮।৬৫
সর্ব্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ। ১৮।৬৬

পরাজয়ের অপমান এবং প্রতিহিংসার সঙ্কল্প বিদ্যমান থাকে চিত্ত ঘিরে। এই পরিণাম গড়ে মানুষের চরিত্র।

তাই শ্রীকৃষ্ণ শিক্ষা দিয়াছিলেন চিত্ত-জয়ের, যুদ্ধের প্রাক্কালে। ধর্মযুদ্ধ সাধারণের হিতের সদুদ্দেশ্যে রণ-রতি। যার কর্মফলে স্পৃহা নাই, মানাবমান, লাভালাভ বা জয়-পরাজয়ের পরিণাম যার চিত্তকে কলুষিত করতে পারে না, যুদ্ধ-ক্রিয়ার অমঙ্গল পরিণাম তাকে স্পর্শ করে না। কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও ঈশ্বরে শরণ বিগ্রহের অশুভ পরিণাম হতে মুক্ত হবার উপায়। অর্জুনের মোহ নষ্ট হয়েছিল সমগ্র বাণী-শ্রবণের পর। বিশ্বরূপ দর্শনের সৌভাগ্য ফলে। সুতরাং এ সিদ্ধান্ত নির্ভুল যে ধর্মযুদ্ধ পাপ নয়। তেমন সমর হিংসাত্মক নয়, যদি মন থাকে নিষ্কাম, চিত্ত শুদ্ধ থাকে ভক্তিতে এবং হত্যাকারী নিহতের জীবনের সাথে নিজ প্রাণের যোগসূত্রের চেতনার সন্ধান পায়।

যে নীতি সত্য কুরুক্ষেত্রের মহা-সমর-প্রাঙ্গণে, সে নীতি সত্য জীবের দৈনন্দিন ক্ষুদ্র সমর-প্রাঙ্গণ-সংসারে। তাই গীতার উপদেশ মানবের নিত্য কর্মের নীতি। জীবনটা দ্বন্দ্ব। মানব মাত্রেই সংগ্রাম-রত মন্দের সাথে। কিন্তু সে মন্দেরও স্রষ্টা তিনি, যিনি বিধান করেছেন পুণ্যকার্যের।

গীতা মাত্র দার্শনিক বা ধার্মিক তত্ত্ব বিবৃত করে নিরস্ত নয়। জীবনের কোন্ আচরণে সংসারের নিত্য কর্মের কুরুক্ষেত্রে শান্তি পাওয়া যায় এবং কোন্ সাধনায় মানুষ আপনার এবং বিশ্বের হিত সাধন করতে পারে, তার বিস্তারিত কর্ম তালিকা সমন্বিত বাণী এ যোগশাস্ত্র।

তাই শুনি—যিনি সর্বত্র আমাকেই দেখেন এবং আমাতেই সমস্ত দেখেন, তাঁর দৃষ্টিতে তো আমার অস্তিত্ব নাশ হয়না অর্থাৎ আমি তাঁর পরোক্ষ হই না এবং তিনিও আমার দৃষ্টির বাহিরে যান না।*

অবশ্য এ অবস্থা যোগ সাধনার পরিণাম। কিন্তু যাঁরা সংগ্রাম রত, জীবনের প্রতি ঘাতপ্রতিঘাতে তাঁদের পক্ষে এ নীতি সাধনার মন্ত্র। সংসারের প্রকৃত সমর-প্রাঙ্গণে তাঁদের নীতির প্রয়োজন। ঐ নীতির ফলে তাঁরা হিংসা তাণ্ডবের বাহিরে থাকতে পারবেন জগদীশ্বরের দৃষ্টির মাঝে থেকে। যদি দেশের জন সাধারণের মধ্যে ভ্রাতৃ প্রেম, বিশ্ব প্রেম জন্মে, আন্তর্জাতিক বা পররাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধের প্রয়োজনই থাকে না মানবের বিশ্বে।

মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে সকল কর্ম সাধনার জন্য যে সব স্পষ্ট উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তাদের সাধনায় সত্যই তো জীবন মধুময় হতে পারে। দেশের যাঁরা নেতৃস্থানীয় তাঁদের চরিত্র এ ভাবে গঠিত হলেও বিশ্ব শান্তি অবশ্যম্ভাবী। অর্জ্জুন হচ্ছিলেন বিজয়ীবীর, সাম্রাজ্যের কর্ণধার, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের সহকর্মী। প্রতিযুগে প্রতি রাষ্ট্রে প্রধানেরা যদি চরিত্রবান হন এবং প্রত্যেক দেশের লোককে চরিত্র গঠনে সহায়তা করেন উপদেশ ও প্রচারের ব্যবস্থায়, মানুষের বিশ্ব সদাচারী হবে নিঃসন্দেহ। ধর্মমূলক চরিত্র না গড়ে উঠ্‌লে জীবের সহজাত স্বার্থবুদ্ধি হিংসাবুদ্ধিকে বাড়িয়ে তোলে। এই অবহেলার ফলেই আজ হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী।

আমরা তেমন আদর্শ চরিত্রের একটি নির্ঘণ্ট পাই যখন শুনি—যার দ্বারা কোনো লোক সন্তপ্ত হয় না। অপর ব্যক্তির ব্যবহারেও যে সন্তাপ পায়না, হর্ষ, অসহিষ্ণুতা, ভয় এবং উদ্বেগ হতে যে মুক্ত, সে আমার প্রিয়। অনপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, ব্যথা হ'তে যে মুক্ত এবং সকল অনুষ্ঠিত কর্মে যে স্পৃহাহীন, যে আমার প্রিয়।*

নষ্টমোহ অবস্থা ব্যক্ত করবার পূর্বে ভগবান বলেছিলেন —তুমি আমার প্রিয়। কে প্রিয়তা অর্জ্জুন করতে পারে তার তালিকা দিয়েছেন দ্বাদশ অধ্যায়ে। সুতরাং নষ্ট মোহ হবার পূর্বে অর্জ্জনকে অধিকার করতে হয়েছিল ঐসব সদ্‌গুণ। অনপেক্ষ এবং স্পৃহা-হীন ব্যক্তি কামনা শূন্য। তাই ব্যর্থতায় তাঁর ক্রোধ জন্মে না। এবং তার পরিণামে মতি বিভ্রম, বুদ্ধিনাশ ঘটেনা। বিনাশের হাত হ'তে সে মুক্ত।

বলা বাহুল্য ব্যক্তি জীবনে যে আচরণ বরণীয়, সঙ্ঘ জীবনেও তার সার্থকতা। শান্তিকামী সমাজের নেতা হিংসার অভিযান হ'তে নিজেকে বিরত করতে বাধ্য। নেতৃত্ব ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হ'লে জনসাধারণের মধ্যে ধর্মনীতির প্রসার সম্ভব। প্রতিদিনের লাভ ও অভাব, প্রতিমুহূর্ত্তের

* যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি। ৬।৩০

* যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষ ভয়োদ্বেগৈ মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ। ১২।১৫
অনপেক্ষ শুচি র্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ। ১২।১৬

সঞ্চয় ও অভিজ্ঞতাই তো চরিত্রের মূল। দৃষ্টান্তও শিক্ষার এক উপাদান।

অর্জ্জুন ছিলেন সেনানায়ক, সারা বাহিনী মাত্র তাঁর আজ্ঞানুবর্তী ছিল না। তাঁর আচরণ ছিল তাদের অনুকরণীয়। তাই কি শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকেই অহিংসার বাণী শোনালেন? রণক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র রক্ত নদীর প্লাবনে বিষাক্ত হয় নায়কের নিষ্ঠুরতায়। এ কথা চিরদিন প্রমাণ করে মানবগোষ্ঠীর ইতিহাস। গীতাই শিখিয়েছেন—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেমন যেমন আচরণ করেন, অন্যান্য লোকও তেমনি কর্ম করে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে আচরণ কর্ত্তব্য বলে মনে করেন সাধারণ লোকও সেই ব্যবহারকে মনে করে কর্ত্তব্য।*

বলেছি কেবল নীতি ও তত্ত্ব সম্বলিত নয় শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা। স্পষ্ট নির্ঘণ্ট আছে আচরণের এ মহাবাণীতে। আস্তিক্য বুদ্ধি সহজ সংস্কার মানব প্রাণের এ কথা মেনে নিয়েছেন ভগবান। স্রষ্টার প্রকাশের অন্তরালে কেমন তাঁর বিভূতি, কিরূপ তাঁর অনন্ত সচেতন সত্তা—সে তত্ত্ব বাণীরূপে পরিবেশন করেছেন গীতা। বিচিত্র এ সৃষ্টি; তার এক স্রষ্টা আছেন এ জ্ঞান নিত্য, সরল এবং সহজ সবার প্রাণে। চরিত্র গঠনের পটভূমিতে সেই স্রষ্টার প্রতি ভক্তির একান্ত প্রয়োজনীয়তার নির্দেশ দিয়েছেন শ্রীহরি। বহুক্ষেত্রে দুর্দশার প্লাবনে সংসারের নিষ্ঠুর তাড়নায়, মনের সাথে, সহজ বুদ্ধির সাথে তর্ক করে মানুষ হয় নাস্তিক। ঈশ্বর না মেনেও মানুষ মোক্ষের পথে হ'তে পারে আগুয়ান। এ শিক্ষা ভগবান বুদ্ধের। কিন্তু মানুষ-দেবতার অবমাননা, অবহেলা, পেষণ ও উৎপীড়নে কোনো জীব জন্ম-মৃত্যু-জরা ব্যাধির ঘূর্ণীপাক হতে নিবৃত্তি লাভ করতে পারে না—এ শিক্ষা ব্রহ্মবাদী হ'তে ঘোর জড়বাদী অবধি সবার। কর্ত্তব্য কর্ম এবং শুভবুদ্ধির দ্বারা চিত্তশুদ্ধির যে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, পার্থ সারথি, সে নির্দেশ সমর্থন করতে বাধ্য সবাই—হ'কনা কেন বিভিন্ন তত্ত্বের পৃথক নাম।

অহিংসার প্রসঙ্গে আমি কতকগুলি উপদেশের উল্লেখ করেছি। গীতার সদাচারীর কর্ত্তব্য কর্মের আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত আলোচনার ফলে বুঝব—যুদ্ধক্ষেত্রে সমর-প্ররোচনার অন্তরে যে চরিত্রের মূল, তাকে উপেক্ষা করবার উপায় নাই। কারণ সম্যক দৃষ্টির ফলে মাত্র যুদ্ধকে অবশ্য কর্তব্য ভেবে অবশিষ্ট কর্তব্যানুষ্ঠানকে জলাঞ্জলি দিতে পারে না কোনো নায়ক।

হ'তে হবে সর্বভূতের প্রতি দ্বেষ-রহিত! হ'তে হবে মৈত্রী ভাবাপন্ন ও করুণ। আমিত্বের পরিমাপের বৃদ্ধি দিতে হবে বিসর্জন। অহঙ্কারবিহীন, সুখ দুঃখে সমচিত্ত এবং যে ব্যক্তি ক্ষমাশীল, সেই হয় ভগবানের প্রিয়।* ভগবান বাদ দিয়ে যে ব্যক্তি আদর্শের প্রতিষ্ঠা করে, সেও তো এ নীতি বর্জন করতে পারে না। জ্ঞানবাদী অভিজ্ঞতা মানে—এ কথা নিশ্চয় মানে যে পৃথিবী মাত্র তার বাসভূমি নয়। বৈরিতায় জন্মে বিরোধিতা—যা' সকল শুভ সাধনার পরিপন্থী। বৌদ্ধ নির্বাণ-কামী। বৈরিতা বাঁধন বাড়ায়, সখ্য বাঁধন কাটার পরিণাম। সুতরাং এ অহিংসার বাণী। মাত্র ভারতের আদর্শেরই সঙ্কেত নয়—এ বিশ্ব-বাণী। সম্রাট অশোক ভগবান বুদ্ধের অহিংসার মন্ত্র দেশ-বিদেশে প্রচার করে ভারতকে পুণ্য-ভূমি করেছেন বিশ্বে। প্রভু তাঁর উদার নীতির প্রচারের নির্দেশ করেছিলেন ধর্মের অঙ্গ। মৈত্রী ও করুণা পরের কল্যাণের শুভ আয়োজন।

তাঁর প্রিয়জনের যে পর্যায়ের ক্রম বিবৃত করেছেন শ্রীকৃষ্ণ, তার অন্য একটি বাণী উদ্ধার করব এ প্রসঙ্গে।

যিনি শত্রু এবং মিত্রে সমজ্ঞান তিনি আমার প্রিয়।†

অন্যত্র সদাচারের অনুশীলনে, অহিংসা, সমতা, তুষ্টির কথা শুনেছি।

অহিংসা গীতার বাণী, সম্যক অনুশীলনের ফলে এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নাই। জীবনের কর্মধারায় যেথা হিংসা অনিবার্য্য, সে কর্ম নিষ্কাম বুদ্ধিতে অহিংস চিত্তে সম্পন্ন করা কর্তব্য।

---

* যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে। ৩.২১

* অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাম মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহংকারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধি র্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ। ১২।১৩

† সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ। ১২।১৮

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "শরৎ-পরিচয়"

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ব্রজেনবাবু শরৎচন্দ্রের ব্রহ্মপ্রবাসে চাকরীর কথা সম্বন্ধে লিখেছেন— "নিঃসম্বল অবস্থায় শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে তাঁহার মাসীমা অন্নপূর্ণা দেবীর বাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। তাঁহার মেসোমশাই অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ... দুতিন মাস পরে বর্মা রেলওয়ের এজেণ্ট জন্ সাহেবকে অনুরোধ করিয়া তাঁহার আপিসে পঁচাত্তর আশী টাকার একটি চাকরীও সংগ্রহ করিয়া দিলেন। অঘোরনাথের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, অদূর ভবিষ্যতে শরৎচন্দ্রকে ওকালতি কার্যে বহাল করিবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই, ১৯০৫ সনের ৩০এ জানুয়ারি...তাঁহার মৃত্যু হয়। ..

মেসোমশাইয়ের মৃত্যুর তিন-চারিমাস পরে শরৎচন্দ্র সাহেবের সহিত ঝগড়া করিয়া এজেণ্ট আপিসের চাকুরীতে ইস্তফা দিয়াছিলেন। তিনি অতঃপর অন্নসংস্থান ব্যপদেশে রেঙ্গুন ছাড়িয়া উত্তর ব্রহ্মে গমন করেন। সেখানে আমহার্স্ট জেলার মৌলমিন-পেগুতে পি, ডবলিউ, ডির হিসাব-বিভাগে ডেপুটি এগ্জামিনার অব একাউণ্টস্ এম. কে. মিত্রের সুপারিশে সত্তর-আশী টাকার একটি চাকরী জুটিল (ইং ১৯০৫) ; তাঁহার উপরিওয়ালা কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ সি. কে. সরকার তৎকালে অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট এঞ্জিনিয়ার পি. ডবলিউ, ডি। কিন্তু দুই-তিন মাসের অধিককাল শরৎচন্দ্র এই পদে স্থায়ী হইতে পারেন নাই। তিনি তখন উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিতেছেন, শনি হইতে মঙ্গলবার তাঁহাকে বড় একটা আপিসে পাওয়া যাইত না।

শরৎচন্দ্র আবার রেঙ্গুনে ফিরিয়া আসিলেন। এবার তিনি রেলওয়ে বিভাগের এগ্জামিনার গঙ্গারাম কাউলের সাহায্যে তাঁহার অধীনে কেরাণীর পদলাভ করেন, দু-তিন মাসের পর এ চাকরিও তাঁহাকে ছাড়িতে হইল।

অতঃপর শরৎচন্দ্র উক্ত মিত্র (ঝামাপুকুর নিবাসী উকীল রামচন্দ্র মিত্রের পুত্র) মহাশয়ের বাড়ীতে কিছুদিন আশ্রয় গ্রহণ করেন। মণীন্দ্রবাবু পূর্ব হইতেই শরৎচন্দ্রকে জানিতেন, বিশেষ করিয়া তাঁহার সুকণ্ঠের অনুরাগী ছিলেন। তাঁহারই সহায়তায় শরৎচন্দ্র শেষে ডেপুটি একাউণ্টেণ্ট জেনারেলের আপিসে পাবলিক ওয়ার্কস্ একাউণ্টস্ বিভাগে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন।"

ব্রজেনবাবু শরৎচন্দ্রের চাকরী-জীবনের এই ইতিহাস কোথায় পেয়েছেন জানিনা। আমি কিন্তু সতীশচন্দ্র দাসের "শরৎ-প্রতিভা" গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের ব্রহ্মদেশে চাকরী-জীবনের কাহিনী অন্যরূপ দেখছি এবং সেইটাকেই আমি বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করি।

সতীশবাবু শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের বন্ধু। তিনি রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে এক বাড়ীতে কিছুদিন কাটিয়েও ছিলেন। এ সম্বন্ধে সতীশবাবু নিজেই লিখেছেন—"শরৎদা রেঙ্গুনে প্রবাসকালে আমার সঙ্গে অন্ততঃ ছয় সাত বছরের বন্ধুভাব ছিল, এমন কি কিছুদিন এক বাড়ীতেও বাস করিয়াছি। বোটাটং ষ্ট্রীটে ছিল আমাদের মেস, আমরা থাকতাম তিন তলায়, শরৎদা থাকতেন চার তলায়, অনেক সময় তিনি আমাদের মেসেই আসিয়া বসিতেন। আমাদের অনুরোধে কখনো কখনো দুএকটা কীর্তন গানও গাইতেন। শরৎদার নিকট হতে আমি দাবা খেলাও শিখিয়াছিলাম।" (শরৎ-প্রতিভা—পৃঃ ৫০)

এই সতীশবাবু রায় হেমেন্দ্রমোহন রায় বাহাদুরকে দিয়ে শরৎচন্দ্রের ব্রহ্মপ্রবাসে চাকরী-জীবনের ইতিহাসটি লিখিয়ে তাঁর গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করেছেন। হেমেন্দ্রবাবু শরৎচন্দ্রের সঙ্গে একই অফিসে চাকরী করতেন এবং শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয়ও ছিল। যেদিন অফিসের ভিতরে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সুপারিন্টেন্‌ডেণ্টের বচসা হয়, সেদিন হেমেন্দ্রবাবু শরৎচন্দ্রকে সাহায্য করেছিলেন। এই হেমেন্দ্রবাবু একটানা ৩২ বছর দক্ষতার সহিত কাজ করে সামান্য কেরাণী থেকে সিনিয়র ডেপুটী একাউন্টেণ্ট জেনারেলের পদে উন্নীত হয়েছিলেন। হেমেন্দ্রবাবু শরৎচন্দ্রের চাকরী-জীবনের ইতিহাস সম্বন্ধে লিখেছেন—

"Mr. Aghore Nath Chatterjee managed to get for him a temporary appointment in the office of the Auditor, Burma Railways through Mr. K. Bose, on accountant of that office. After the death of Mr. A. Chatterjee, Dr. Chatterjee (Sarat Chandra) stayed for sometime with Mr. Annada Prasad Bhattacharjee, an overseer in the Government House, Rangoon. Dr. Chatterjee served 1½ years in the office of the Auditors Burma Railways and had to resign his appointment. During this period he tried to become a lawyer, but as he could not pass the Burmese Language examination, his desire was not fulfilled. After leaving the service of Burma Railways, Dr. Chatterjee worked for some time as an Assistant with Mr. P. K. Mitter a Paddy merchant, Nyaunglebin, where he stayed for sometime in the house of Mr. Kishna Kumar Mukherjee near Railway Station. Dr. Chatterjee did not like the Paddy work and left this place. He then stayed with Mr. N. K. Mitter, at present

an Advocate of 'Pegu' for about 1½ years. During this stay, Dr. Chatterjee was extremely humorous and witty and used to entertain every body with his humorous and witty talk and songs and for this reason he was liked by all. Mr. N. K. Mitter requested his cousin Mr. M. K. Mitter, who was then Deputy-Examiner Public Works Accounts Burma, to arrange for an appointment for Dr. Chatterjee who then came to Rangoon to stay with Mr. M. K. Mitter in a house in Thompson Street, Rangoon.··· Mr. M. K. Mitter managed to obtain an appointment of a temporary clerk on Rs 30/- per mensem in July 1905 in the office of the Examiner, Public Works Accounts Burma for Dr. Chatterjee. He was then able to obtain through the Examiner a temporary appointment on Rs 50/- per mensem in August 1905 in the office of the Executive Engineer, Pegu Division, Pegu. This appointment lasted only for about 2½ months, when his services were dispensed with. He remained unemployed to the end of March 1906. He was retaken as a temporary clerk, in the office of the Examiner, Public Works Accounts Burma in April 1906, on Rs 50/- per mensem. For the satisfactory work his pay was raised to Rs 65/- per mensem from July 1906. After a year his pay was increased to Rs 80/- per mensem. In July 1909, his pay was fixed at Rs 90/- per mensem and this pay he drew until he resigned his appointment in April 1916 and returned to Bengal. He was all along a temporary clerk. In 1910 he applied for a permanent footing but as his age exceeded 30 years, he was not taken to the permanent establishment, but to speak the truth Dr. Chatterjee was not very serious to transfer his services to permanent establishment.

The office of the Examiner, Public Works Accounts, Burma was amalgamated with the office of the Accountent General Burma in 1911-12 and as a result, Dr. Chatterjee went to the office of the Accountant General Burma, Rangoon in Februry 1912.",

রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের চাকরী-জীবনের ইতিহাস সম্বন্ধে আমি ব্রজেনবাবুর বর্ণনা অপেক্ষা হেমেন্দ্রবাবুর বর্ণনাকেই বিশ্বাসযোগ্য বলেছি। কারণ হেমেন্দ্রবাবু যেমন সময়ের হিসাব দিয়ে দিয়ে শরৎচন্দ্র কখন কোথায় কত মাহিনা পেয়েছিলেন বলেছেন, ব্রজেনবাবু তা বলতে পারেন নি। ব্রজেনবাবু শরৎচন্দ্রের মাহিনার কথা যে দুবার উল্লেখ করেছেন, সেই দুবারই তিনি নির্দিষ্ট ভাবে না বলে, বলেছেন "পঁচাত্তর আশী টাকার একটি চাকরী" "সত্তর আশী টাকার একটি চাকরী।" এই দিক থেকে হেমেন্দ্রবাবু কিন্তু পরিষ্কার ভাবে বলেছেন। শুধু এই নয়, শরৎচন্দ্র বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের কাছে তাঁর মাহিনা সম্বন্ধে যা বলে গেছেন, সেই সব কথার সঙ্গে হেমেন্দ্রবাবুর বর্ণনার মিল হয়ে যাওয়ায়ও হেমেন্দ্রবাবুর বর্ণনা আরও সঠিক বলেই প্রমাণিত হয়। যেমন—শরৎচন্দ্র চন্দননগরের শ্রীহরিহর শেঠকে একবার বলেছিলেন—প্রথমে মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে চাকরীতে প্রবেশ করেছিলেন। (মাসিক বসুমতী—মাঘ ১৩৪৪)। শরৎচন্দ্র তাঁর বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকেও ২২.৩.১২ তারিখের এক পত্রে লিখেছিলেন—"৯০৲ টাকা মাহিনা পাই এবং ১০৲ টাকা allowance পাই।"

অতএব এই সব কারণে ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্রের চাকরী জীবনের ইতিহাস সম্বন্ধে ব্রজেনবাবুর বর্ণনা অপেক্ষা হেমেন্দ্রবাবুর বর্ণনাই যে বিশ্বাসযোগ্য একথা বলা যেতে পারে।

ব্রজেনবাবু লিখেছেন—"যৌবনে তিনি (শরৎচন্দ্র) নানা প্রকার নেশার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যে তাঁহার মনুষ্যত্ব এবং বিবেকবুদ্ধি লোপ পায় নাই, একথা অধিকাংশ লোকেই অবগত নহেন।" (পৃঃ ৬৬) অর্থাৎ ব্রজেনবাবু বলতে চান যে, শরৎচন্দ্র যৌবনে নানাপ্রকার নেশার বশীভূত হয়ে মনুষ্যত্ব এবং বিবেকবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিলেন—একথা অধিকাংশ লোকেই জানেন।

শরৎচন্দ্রের জীবনী-সংক্রান্ত লেখাগুলি থেকেই অধিকাংশ লোকে তাঁর যৌবনকালের কথা জেনেছেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র যৌবনকালে মনুষ্যত্ব ও বিবেকবুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়েছিলেন, এমন কথা ত কেউ লিখেছেন বলে মনে হয় না।

যাই হোক্, শরৎচন্দ্র যে কিরূপ মাতাল ছিলেন আর কিভাবেই যে তিনি তাঁর মদের নেশা ত্যাগ করেছিলেন, তারই একটা মুখরোচক কাহিনী ব্রজেনবাবু তাঁর গ্রন্থের মধ্যে পরিবেশন করেছেন। কাহিনীটি অবশ্য শরৎচন্দ্রের পরিচিত হরিদাস শাস্ত্রীর লেখা। ব্রজেনবাবু হরিদাসবাবুর লেখাটিই উদ্ধৃত করেছেন। কাহিনীটি এইরূপ—

"একদিন অত্যন্ত দুর্যোগের মধ্যে সকাল বেলায় দাদার বাজে শিবপুরের বাসা বাড়ীতে হাজির হইয়াছি।···

চা খাইতে খাইতে দাদা বলিলেন—শ্রীরামপুর থেকে সেদিন একটি মেয়ে এসেছিল, নাম···। অদ্ভুত মেয়ে—চেন কি?

—না, কি রকম অদ্ভুত মেয়ে?

—এসেই আমার জন্যে কিনা, অনেকদিন থেকে ইচ্ছা করছি

আপনার সঙ্গে দেখা করব। আত্মীয় বন্ধু যাকেই বলি, সেই বলে—তুমি ভদ্রঘরের মেয়ে, তুমি যাবে শরৎবাবুর সঙ্গে দেখা করতে—তোমার সাহস ত কম নয়, তা আপনি কি এমনি যে কোনও যুবতী মেয়ে আপনার কাছে আসতে পারে না?—শুনে বেশ কৌতুক বোধ হ'ল—বলিয়া দাদা হাসিতে লাগিলেন।

আমিও হাসিলাম। বলিলাম—আপনি কি জবাব দিলেন?

—হাঁ জবাব একটা দিলাম বই কি। বললাম—তাঁরা যদি দশ বছর আগেকার শরৎবাবু সম্বন্ধে একথা বলে থাকেন, ত আমি কিছু বলতে চাই নে। কারণ তখন আমি দিন রাতের মধ্যে কখনই প্রকৃতিস্থ থাকতাম না; সর্বদাই মদের নেশায় চুর। তবুও বলতে পারি অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায়ও কখনও কোন নারীর অমর্যাদা আমি করি নি—আর এখন ত আমি তোমাদের বড়দা—নির্ভয়ে আসবে।

—খুব বুঝি মদ খেতেন দাদা?

—হাঁ তাই। কিন্তু একদিনে ছেড়ে দিলাম, অর্থাৎ মাতাল আর হই নি।

—কি করে ছাড়লেন?

—আচ্ছা বলি শোন। আর এক চাটুজ্জে ও আমি আর আমাদের একটি বর্মী বন্ধু একসঙ্গে মদ খেতাম; বর্মী বন্ধুটির হঠাৎ হ'ল হার্টের অসুখ, ডাক্তার একেবারে মদ খাওয়া বন্ধ করে দিলেন। অফিসে ছুটি নিয়ে বাড়ী বসে চিকিৎসা করাতে লাগলেন। একদিন রাত্রি তখন ১১টা হবে, চাটুজ্জে এসে আমার দরজা ভাঙতে লাগলো—'ও শরৎবাবু! ও শরৎবাবু!' বুঝলাম দোকান বন্ধ হয়ে গেছে, পিপাসা বেড়েছে, কিছু মদ চাই। আমার ঘরে যা ছিল তাতে পিপাসার শান্তি হ'ল না। আরও চাই—চাটুজ্জে বললে, চল বর্মী বন্ধুর বাড়ী। প্রথমটা আমি রাজি হইনি, শেষে যেতেই হ'ল তার সঙ্গে। রাত্রি তখন ১টা হবে। অনেক ডাকাডাকির পর বন্ধু-গৃহিণী জানালা দিয়ে জানালেন—তাঁর স্বামী অসুস্থ, আমরা যেন দয়া করে চলে যাই। ডাকহাঁকে বন্ধুটিও জেগেছিল, এসে তার স্ত্রীকে অনুরোধ করতে লাগল—'দাও না খুলে, ঘরে ত একটা বোতল রয়েছে। ওরা থাক্ না—আমিত আর খাচ্ছি না।'—আমার কতকটা জ্ঞান ছিল, ফিরে আসতে চাইলাম, কিন্তু চাটুজ্জে রাজি হ'ল না। একটা ছোট বেতের টেবিলের পাশে তিনজন পাশাপাশি বেতের চেয়ারে বসেছি, সামনে মেটিঙের উপর বন্ধু-পত্নী বসে স্বামীকে পাহারা দিচ্ছেন, আমরা মদ খাচ্ছি। বন্ধু-পত্নীটি দিনের শ্রমে বোধ হয় ক্লান্ত ছিল, ঝিমুতে লাগলো দেখে চাটুজ্জে বর্মী বন্ধুটিকে ইসারায় এক পেগ নেবার অনুরোধ জানাল। আমি মানা করলাম, বর্মী বন্ধুটিও পত্নীকে দেখিয়ে অস্বীকার করলো। আরও দু' একবার মদ খাবার পরে দেখা গেল বন্ধু-পত্নী মেটিঙের উপর ঘুমিয়ে পড়েছে! চাটুজ্জে আবার অনুরোধ জানালে—এবার সে আর অস্বীকার না করে টেনে নিলে। দু'বারের পর তৃতীয় বারে নিজ হাতে পাত্র টেনে নিয়ে এক চুমুকে যখন নিঃশেষ করেছে, সঙ্গে সঙ্গে আঁ-আঁ বিকট শব্দ করে ঢলে পড়ল। ঐ শব্দে স্ত্রী জেগেপিলে সকলের ঘুম ভেঙে গেছে, সকলেই তার বুকের উপর লুটোপুটি করে এমনি কলরব তুললো, কোথায় গেল নেশা ছুটে। সেই রাত্রে থানা পুলিশ করে পরদিন তার শেষ গতি করে বাড়ী এসে প্রতিজ্ঞা করলাম, আর মাতাল হব না। চাটুজ্জেও প্রতিজ্ঞা করেছিল, কিন্তু রক্ষা করতে পারেনি। বলত হরিদাস, একটি ভদ্রলোক স্ত্রীপুত্র নিয়ে সুখে ঘুমোচ্ছিল, রাত একটায় দুটো মাতাল তাকে টেনে তুলে একেবারে মেরে এল! এর পরও যদি মাতালের বিবেক না আসে তবে আর কিসে আসবে? বলিয়া দাদা চুপ করিলেন।"

এই কাহিনীর মধ্যেকার অনেক কথাই অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব বলে মনে হয়। যেমন—

(১) একটি ভদ্রঘরের মেয়ে শ্রীরামপুর থেকে শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপুরের বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে বলছেন—"আপনি কি এমনি যে কোনও যুবতী মেয়ে আপনার কাছে আসতে পারে না?" একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের কাছে গিয়ে কোন অপরিচিত মহিলা কি ঐভাবে বলতে পারেন?

(২) শরৎচন্দ্র বলছেন, "দশ বছর আগে···তখন আমি দিন রাতের মধ্যে কখনই প্রকৃতিস্থ থাকতাম না। সর্বদাই মদের নেশায় চুর।"

আচ্ছা শরৎচন্দ্র যদি প্রকৃতিস্থ না থেকে দিন রাতের সব সময়েই মদের নেশায় চুর হয়ে থাকতেন, তাহলে তিনি সরকারী অফিসে দায়িত্বপূর্ণ পদে চাকরী করতেন কি করে? অথচ কাজে তাঁর সুনামও ছিল।

(৩) বর্মী বন্ধুটির হার্টের অসুখ হলে, ডাক্তার একেবারে মদ খাওয়া বন্ধ করে দিলেন এবং তিনি অফিসে ছুটি নিয়ে বাড়ী বসে চিকিৎসা করাতে লাগলেন। এই অবস্থায় আবার বর্মী বন্ধুর বাড়ীতে মদ থাকা কি সম্ভব?

(৪) মদের পাত্র শেষ করে সঙ্গে সঙ্গে ঐভাবে ঢলে পড়া ও মৃত্যুটাও কি সম্ভব?

যাই হোক্, শরৎচন্দ্র হরিদাসবাবুর কাছে এই কাহিনীটি বলেছিলেন, একথা সত্য হলেও কিন্তু এটি যে শরৎচন্দ্রের নিছক বানানো গল্প একথা হরিদাসবাবু আদৌ ধরতে পারেন নি। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন, তাঁরা সকলেই জানেন যে তিনি কিরূপ বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে গল্প বলতে পারতেন। তাঁর এই বানানো গল্প অপরকে নিয়ে যেমন হ'ত, তেমনি তিনি নিজের সম্বন্ধেও বানিয়ে বানিয়ে অনেক গল্প বলতেন। শরৎচন্দ্রের এই গল্পবলার এমনি কায়দা ছিল যে, তিনি যখন বলে যেতেন, তখন সহজে অবিশ্বাস হ'ত না। তবে তাঁর বন্ধুরা তাঁর এই স্বভাবের কথা জানতেন বলেই, তাঁর গল্পকে সন্দেহ না করে একেবারে অভ্রান্ত বলে মেনে নিতেন না। শরৎচন্দ্র তাঁর নিজের জীবনের সঙ্গে জড়িত এমনি দুটি গল্প, কবি শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়কে একবার বলেছিলেন। সাবিত্রীবাবু সেই গল্প দুটি "শরৎচন্দ্রের নিজের মুখে শোনা" নাম দিয়ে ১৩৫৭ সালের শরৎ-স্মরণিকায় প্রকাশ করেছেন। সাবিত্রীবাবু উপসংহারে লিখেছেন—শরৎচন্দ্র কথায় যাদুকর, এখনো সময় সময় মনে হয় এ তাঁর কথার যাদুকরী মাত্র। সত্যকার ঘটনা নয়, এও তাঁর বুঝি একটা গল্প রচনা।

শরৎচন্দ্র অপরকে নিয়ে যখন বানিয়ে গল্প বলতেন, তখন যাঁদের নিয়ে গল্প বলতেন তাঁরা শরৎচন্দ্রের পরিহাসের কথা ধরতে না পারলে, অনেক সময় তাঁরা রেগে যেতেন। শরৎচন্দ্রের এই স্বভাবের কথা উল্লেখ করে শ্রীদিলীপকুমার রায় এক জায়গায় লিখেছেন—"শরৎচন্দ্রের একটা স্বভাব ছিল মানুষকে ক্ষ্যাপানো। এ সময়ে তিনি ভারি হাম্বামি করতেন—চিঠিপত্রেও। এ ভঙ্গি হ'ল ফরাসি—প্রকৃতিতে ; এর নাম blague অর্থাৎ কিনা নিপুণভঙ্গীতে রটানো—যা আমরা বিশ্বাস করি না।" (ভারতবর্ষ—ফাল্গুন ১৩৪৪)

যা আমরা বিশ্বাস করি না অর্থাৎ মিথ্যাকে নিপুণভঙ্গীতে রটনা করার ফলে শরৎচন্দ্রের অনেক কথা ও কাহিনী অনেকেই সত্য বলে বিশ্বাস করে নিয়েছেন। কিন্তু একটু ভাল করে তলিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, সেগুলি নিছক বানানো গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়। এখানে এই ধরণের একটি উদাহরণ দেওয়া গেল—

শৈলেশ বিশী শরৎচন্দ্রকে একবার রাজলক্ষ্মীর কথা জিজ্ঞাসা করলে, শরৎচন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন, তিনি রাজলক্ষ্মীকে শৈবমতে বিয়ে করেছেন। শরৎচন্দ্রের এই কথাকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করে নিয়ে শৈলেশ বিশী তাঁর "বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবন প্রশ্ন" গ্রন্থে লিখেছেন—"তিনি তাঁকে বিয়ে করেছিলেন শৈবমতে। যেদিন সেই কথা তাঁর মুখে শুনলুম আমার সব অমৃতের সন্ধান বিষিয়ে গেল, নিজের অলক্ষ্যে চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে ক'ফোঁটা জল ঝরে পড়লো। আমি স্পষ্টই বললুম, এত বড় ভালবাসাকে আপনি বিয়ে করে অমর্যাদা করলেন? যেটা ছিল স্রোতের জল, স্বচ্ছ পুণ্যতোয়া ভাগীরথী, আজ সেটাকে বাঁধ দিয়ে করলেন একটা পুকুর, খানা, ডোবা! তিনি কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন—এ ছাড়া উপায় ছিল না, তা ছাড়া ও ছাড়ল না।

এতদিনে আমার সম্বিৎ ফিরে এলো, তখন বুঝিনি, না জেনে দাদার মনে আমি কী আঘাতই না দিয়েছি। এখন বুঝেছি—রাজলক্ষ্মী স্বামী চেয়েছিল—সে প্রেমিক চায় নি। গৌরীর মত তপস্যা করেই সে এই ভবঘুরে স্বামী লাভ করেছিল—রাজলক্ষ্মীর জীবনের পূর্ণতা স্বামী-স্ত্রীর প্রেম। এ অমৃত সকলের ভাগ্যে জোটে না।"

শরৎচন্দ্রের কথাকে শৈলেশবাবু এমনভাবে বিশ্বাস করেছেন যে, তিনি ত আবেগে কেঁদেই ফেলেছেন। অথচ শরৎচন্দ্র "এ ছাড়া উপায় ছিল না, তা ছাড়া ও ছাড়ল না" যতই বলুন না কেন, এ যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, শরৎচন্দ্রের স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীকে দেখলেই তা বলা যায়। হিরণ্ময়ী দেবীর মধ্যে রাজলক্ষ্মীর "র"ও নেই। হিরণ্ময়ী দেবী আজও জীবিতা, তাঁর সঙ্গে যাঁরা পরিচিত হয়েছেন, তাঁরা সকলেই জানেন যে, তিনি একেবারে গ্রামের একটি অশিক্ষিতা, অত্যন্ত সরল প্রকৃতির, এক অতি সাধারণ মহিলা। অথচ রাজলক্ষ্মীর আচার-ব্যবহার, শিক্ষা, নৃত্য-গীত, সাহস, চতুরতা প্রভৃতির যেন সীমা নাই।

শৈলেশবাবুর ন্যায় হরিদাস শাস্ত্রীও শরৎচন্দ্রের গল্পটিকে একেবারে সত্য বলেই মেনে নিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের মুখ থেকে যখন বেরিয়েছে, তখন তাকে আর সন্দেহ না করে অথবা তার আর সত্য-মিথ্যা যাচাই না করে, তিনি সেটিকে লিখে সাধারণকে উপহার দিয়ে গেলেন।

জীবনীকারদের কাজ হ'ল—এই সব লেখাকে অভ্রান্ত বলে মেনে না নিয়ে, এর সত্য-মিথ্যা যাচাই করে তবে তাকে জীবনীর মধ্যে দেওয়া। শরৎচন্দ্রের এই ধরণের বানানো গল্পের কথা উল্লেখ করে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাই তাঁর "শরৎ-পরিচয়" গ্রন্থে লিখেছেন—

"এমন বহু গল্পই প্রচলিত আছে, সেগুলির সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, শরৎচন্দ্র নিজেই সেগুলির উৎপত্তি স্থল।

...এগুলির সত্য মিথ্যা অনুসন্ধানের বিষয়।...শরৎচন্দ্রের জীবনী-কারের এই সকল তথ্যের সত্য মিথ্যা নিরূপণের একান্ত প্রয়োজন আছে।"

শিল্পী সতীশ সিংহের বাড়ীতে একবার শরৎচন্দ্রকে একজন প্রশ্ন করেছিলেন—আপনি কেন এবং কিভাবে সাহিত্য করতে এলেন? উত্তরে শরৎচন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন—রেঙ্গুনে থাকার সময় আমি প্রথমে একটা মুদিখানার দোকান করব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু আমার স্ত্রী বললেন, আমার দ্বারা নাকি দোকান হবে না। তিনি আমাকে পরখ করবার জন্যে কত টাকা করে মণ হলে, কত জিনিষের যেন একটা দাম জিজ্ঞেস্ করলেন। আমি বলতে পারলাম না। তাই আর দোকান করা হল না। তখন আর কি করি, অবশেষে সাহিত্য করতেই নামলাম।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়দের আড্ডায় শরৎচন্দ্র একবার গল্প করেছিলেন—

রবীন্দ্রনাথের এক বিশিষ্ট বন্ধু (তাঁরও পাকা দাড়ি ছিল) একবার বিলেত গেলে, সেখানকার অনেকে তাঁকেই রবীন্দ্রনাথ বলে ভ্রম করে। রবীন্দ্রনাথ কার মুখে এই কথাটা শুনে, বন্ধুটি ফিরে এলে তাঁকে বলেছিলেন—দেখুন, আপনি বিলেতে গেলে লোকে যে আপনাকে রবীন্দ্রনাথ বলে ভুল করেছিল, তার মূলে আপনার ঐ দাড়ি। অতএব লোকে যাতে না আর এরূপ ভুল করে, সেজন্যে আপনি অনুগ্রহ করে দাড়িটি এবার কামান।

বন্ধু বললেন—তা কি করে হয়! আমার এতদিনের সযত্ন বর্ধিত দাড়ি, কামাই কি করে!

তখন রবীন্দ্রনাথ বললেন—তাহলে এক কাজ করুন! কামাতে যদি সত্যিই মায়া হয়, তবে অন্ততঃ মেহেদি দিয়ে দাড়িটা ছোপান।

বন্ধুটি শুনে রেগে গিয়ে বললেন—অ্যাঁ, আমি কি মুসলমান, যে দাড়ি ছোপাতে যাব?

রবীন্দ্রনাথ যখন দেখলেন যে, বন্ধুটি দাড়ি না কামাতে, না ছোপাতে কিছুই চাইছেন না, তখন তিনিও রেগে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আড়ি করে বাক্যালাপই বন্ধ করে দিলেন।

এইরূপ নিজেকে এবং পরকে নিয়ে শরৎচন্দ্রের অসংখ্য বানানো মিছে গল্প তাঁর বন্ধু ও পরিচিত মহলে ছড়িয়ে রয়েছে। কেউ যদি এখন ভুল করে এই সব গল্পকে সত্য বলে বিশ্বাস করে কোথাও লিখে দিয়ে থাকেন

বা বলে থাকেন, তাহলে জীবনীকারের কর্তব্য হবে—সেই সব গল্পের সত্য মিথ্যা যাচাই করে তবে তাকে গ্রহণ করা।

তাছাড়া শরৎচন্দ্রের এই ধরণের গল্পগুলি যে নিছক পরিহাস করবার জন্যই মিছে করে বানানো, একটু চেষ্টা করলেই তা সহজে বোঝা যায়। কেননা শরৎচন্দ্র তাঁর একই গল্পকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনের কাছে ভিন্ন ভিন্ন রকমে বলে গেছেন। যেমন একটা উদাহরণ দিই—

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে ফিরে আসার পর অনেকদিন পর্যন্ত দাড়ি রেখেছিলেন। তারপর কেন যে দাড়ি ফেলে দিলেন, সে সম্বন্ধে বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে তিনি একদিন বলেছিলেন—একবার তিনি দিদির বাড়ী বেড়াতে গিয়ে তাঁর বাজে-শিবপুরের বাড়ীতে ফিরে আসছিলেন। ট্রেনে একজন মুসলমান তাঁর পাশেই বসেছিল, সে শরৎচন্দ্রের দাড়ি দেখে তাঁকে মুসলমান ভাবে। এই ভেবে সে শরৎচন্দ্রকে আর কিছু না বলেই—ভাই সাহেব পান নিন, বলে একখিলি পান দিতে যায়। এই ঘটনার পর শরৎচন্দ্র বাড়ী ফিরে এসেই সঙ্গে সঙ্গে দাড়ি কামিয়ে ফেলেন।

কংগ্রেসকর্মী হেমন্তকুমার সরকার আবার শরৎচন্দ্রের এই দাড়ি ফেলার গল্প শরৎচন্দ্রের নিজের মুখেই অন্যরকম শোনেন। এ সম্বন্ধে তিনি একজায়গায় লিখেছেন—"হাওড়ায় দাঙ্গা হওয়ায় ম্যাজিষ্ট্রেট শরৎচন্দ্রকেও তলব করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে নাকি মুসলমান মনে করায় তিনি ৪০ বৎসরের পোষা দাড়ি কামাইয়া ফেলিয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটকে শরৎদা নাকি বলেন,—হুজুর, হাওড়ায় মুসলমানের অভাব কি? আপনার যত ইচ্ছা গ্রেপ্তার করতে পারেন, কিন্তু এ ব্রাহ্মণ সন্তানকে নিয়ে টানাটানি কেন?" (বাতায়ন—শরৎস্মৃতি সংখ্যা ১৩৪৪)

আবার শরৎচন্দ্রের আর এক বন্ধু শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষাল লিখিয়াছেন,—শরৎচন্দ্র একদিন সার্ভেণ্ট সম্পাদক শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর আফিসে দেখা করতে গেছেন। শ্যামসুন্দরবাবুর ঘরে তখন অবিনাশবাবুর এবং আরও দুএকজন বসেছিলেন। এমন সময় শরৎচন্দ্র ঘরের মধ্যে এলে শ্যামসুন্দরবাবু বললেন—আরে শরৎবাবু যে, আপনার গোঁফদাড়ি কি হ'ল মশায়? ঐ সময় অপর একজন বললেন—এর মধ্যে কোন পলিটিক্যাল চাল নেই ত? শরৎচন্দ্র একটা চেয়ারে বসে হাসতে হাসতে বললেন—ধরেছেন মিথ্যে নয়? এবারে যে ধরপাকড় হচ্ছে, তাতে আমি লক্ষ্য করে দেখছি, হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানদেরই শাস্তি হচ্ছে বেশি। হিন্দুদের যে অপরাধে ছ'মাস কারাদণ্ড, দাড়ির জন্যে মুসলমানদের ঠিক সেই অপরাধেই এক বৎসর কারাদণ্ড। দাড়ির জন্যে যদি ছ মাস দণ্ড বেশি হয়, কাজ কি তাকে রেখে মশায়! তাই দিলাম ফেলে!

এখানে দেখা যাচ্ছে, শরৎচন্দ্র বন্ধুদের কাছে নিছক পরিহাস করবার জন্যই একই গল্পকে এক এক সময় এক এক রকম বলছেন। সত্যের সব সময়েই রূপ একটা। তার কখনও দ্বিরূপ নেই। অতএব এ গল্প যে নিছক পরিহাস করবার জন্যই বানানো তা সহজেই বলা যেতে পারে।

এখন আমার বক্তব্য হচ্ছে, ব্রজেনবাবু তাঁর গ্রন্থে হরিদাসবাবুর বর্ণিত কাহিনীটিকে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়ে ভুল করেছেন। এটি যে শরৎচন্দ্রের নিছক পরিহাস এবং বানানো গল্প হরিদাসবাবুর ন্যায় ব্রজেনবাবুও ধরতে পারেন নি।

এই সব ছাড়াও ব্রজেনবাবুর বইটির মধ্যে আরও দু একটি ছোটখাট ভুল আছে বলে মনে হয়। সেগুলি যেমন—

(১) ব্রজেনবাবু লিখেছেন—শরৎচন্দ্র ব্রহ্মদেশে দীর্ঘ বার তের বৎসর কাটাইয়া ছিলেন। কেবল ১৯১২ ও ১৯১৪ সনের শেষাশেষি অল্পদিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন।

কিন্তু তা নয়। শরৎচন্দ্র প্রায় ১০ বছর ব্রহ্মদেশে ছিলেন। ১৯১২ ও ১৯১৪ সন ছাড়া শরৎচন্দ্র আর একবার ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় এসেছিলেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে অল্পদিনের জন্য নয়, ছ মাসের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন এবং বাড়ীভাড়া নিয়ে কলকাতায় বাস করেছিলেন। ঐ সময় হঠাৎ তাড়াতাড়ি তাঁকে রেঙ্গুনে ফিরে যেতে হওয়ায় তিনি যাওয়ার সময় তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে যেতে পারেন নি। তাই সেই সময় তিনি তাঁর স্ত্রীকে রেঙ্গুনে পাঠিয়ে দেবার জন্য বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে ১৫. ২. ১৫ তারিখের এক চিঠিতে লিখেছিলেন—"এঁকে ত এবার পাঠানই চাই। আমারও চলে না—তাঁর ত প্রায় আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়াছে। এই চিঠি পাইবামাত্র একখানা টিকিট রিজার্ভ করিবার জন্য B. I. S. N. কে intimation দিয়ো, তাহারাই বলিয়া দিবে কোন জাহাজে berth পাওয়া যাইবে।"

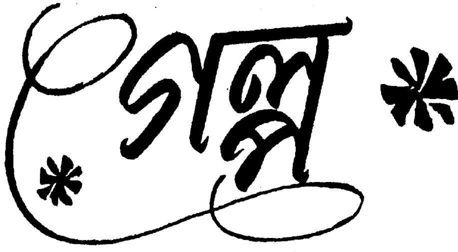
ব্রহ্মপ্রবাসকালে শরৎচন্দ্রের এই কলকাতায় আসা-যাওয়া প্রসঙ্গে রায় বাহাদুর হেমেন্দ্রমোহন রায় লিখেছেন—

"Dr. Chatterjee was not keeping very good health in Burma. He fell ill while at Nyaunglebin. He went to Calcutta on leave in November 1907 for 3 months for an operation and returned in February 1908. In October 1912 he proceeded again on leave on medical certificate and returned in November 1912. For his bad health he had to take again leave in June 1914, and came back in December 1914."

(২) ব্রজেনবাবু লিখেছেন—তিনি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে এগার শত টাকা দিয়া হাবড়া জেলার অন্তর্গত বর্তমান পানিত্রাস গ্রামে বড়দিদি অনিলা দেবীর বাটীর সন্নিকটে একখণ্ড জমি ক্রয় করিয়া গৃহ নির্মাণ করেন (ইং ১৯২৫)।

শরৎচন্দ্র হাওড়া জেলার যে গ্রামে জায়গা কিনে বাড়ী করেন তার নাম সামতাবেড়। শরৎচন্দ্রের দিদিদের গ্রামের নাম গোবিন্দপুর। গোবিন্দপুর ও সামতাবেড় পাণিত্রাসের পাশে অবস্থিত।

যাক্, এইখানেই আলোচনা শেষ। এখন আমার এই লেখার শেষে আবার আমি বলছি যে, শ্রদ্ধেয় ব্রজেনবাবুকে ছোট করার উদ্দেশ্য নিয়ে আমার এ প্রবন্ধ নয়। কালের বিচারে শরৎচন্দ্রের স্থান সাহিত্য-জগতে নিরূপিত হয়ে গেছে। তাই ব্রজেনবাবুর ন্যায় একজন খ্যাতনামা গবেষকের মতকে সমর্থন করতে গিয়ে পাছে আর কেউ না উক্ত ভুলগুলি করে বসেন, সেই জন্যই আমার এই আলোচনা। কোন সহৃদয় সাহিত্যিক যদি সত্যিকার যুক্তি দিয়ে ব্রজেনবাবুর বিরুদ্ধে আমি যে আলোচনা করেছি তা খণ্ডন করতে পারেন, তাহলে প্রসন্নচিত্তেই আমি আমার ভুল স্বীকার করে নেব।



ভগবান আছেন

আশাপূর্ণা দেবী

এই সকাল বেলাতেও মেয়েটা দিব্যি সহজ ভাবে খেলেছে, গান গেয়েছে, ঘুরে বেড়িয়েছে, পাঁচ ছ' বছরের হাসি খুসি চঞ্চল মেয়ে যেমন করে থাকে। তখন বোঝাই যায় নি শরীর খারাপ।

ভাত খাবার আগে হঠাৎ বুঝি গাটা একটু গরম ঠেকেছে, অমনি তার মা কি না তাকে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে রুগী বানিয়ে দিলো?

অবাক হয়ে গেলেন নিভাননী।

কচি ছেলের জ্বর, যতোক্ষণ ঘুরে বেড়ায় ততোক্ষণই ভালো, জ্বরাস্থর জব্দ করতে পারে না। শুয়েছে দেখলেই চেপে ধরে। এই সামান্য জ্ঞানটুকু নেই অলকার?

শুধু তাই?

স্কুলের গাড়ী ফিরিয়ে দিয়ে এসেই বামুন ঠাকুরকে অর্ডার হলো—ডাব আনতে আর ছানার জল করে রাখতে! এমন অনাসৃষ্টি ব্যাপার নিভাননী জীবনে দেখেন নি! ফ্যাসানের কি একটু মাত্রা থাকাও উচিত নয়? ছেলেপুলের সামনে নাম করতে নেই এমন সব শক্ত অসুখ বিসুখেই ছানার জল খাওয়াতে হয়, এই তো নিভাননীর জানা।

ডাক্তারে যেই রুগীকে দুধের বদলে ছানার জলের ব্যবস্থা দিয়ে যেতো, সেই বোঝা যেতো রোগ সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথ নিয়েছে। 'ছানার জল' নামটাই যেন অলক্ষুণে অপয়া। নিভাননী হাড়ে হাড়ে জানেন সেকথা।

তা' ছাড়া—সর্দ্দি জ্বরে ডাব ছানার জলই কি খুব সুপথ্য? গা গরম হয়েছে, ভাতের বদলে দুটো শুকনো মুড়ি খাক, না হয়তো দু'খানা গরম জিলিপি আর এক গেলাশ গরম দুধ খাক, আহার ওষুধ দুইই হবে।

এমন ইচ্ছে মতন খাবার জোটেই বা কতো জনের? কতো ঘরে ছেলেপুলে এক ফোঁটা দুধ পায় না, এক টুকরো মিশ্রী পায় না।—

কী কষ্টেই নিভাননী ছেলেপুলে মানুষ করেছেন!

কমগুলি ছেলেমেয়ে নয়, নিজের চারটি, আর মৃতা ননদের তিনটি। কষ্টই করলেন, সার্থক হলো না। নেমকহারামী করে চলে গেলো প্রায় সকলেই। যাক সে আক্ষেপও এখন চাপা পড়ে গেছে। যা দুঃসহ ছিলো, তা' সহজে সয়ে গেলো, যা মুখে আনা অসম্ভব ছিলো, তা' অপরের গল্পের মতো অনায়াসে বলা সম্ভব হয়ে গেলো। এখন আর সে সব কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করেন না নিভাননী। এখন সমস্ত প্রাণটা আবদ্ধ হয়ে আছে দেবু আর দেবুর দুটো মেয়ে ছেলের ওপর। কিন্তু তাই বলে তা'দের নিয়ে অসঙ্গত বাড়াবাড়ি করতে হবে? নিভাননীর প্রকৃতিতেই নেই সে জিনিষ।

বামুনঠাকুরের মুখে বৌয়ের অর্ডার শুনে বিরক্ত হয়েই ওপরে উঠে এলেন নিভাননী।

বিনা ভূমিকাতেই বলে উঠলেন—বামুনঠাকুরকে ছানার জলের কথা কি বলেছো বৌমা?

বৌ অলকা পিছন ফিরে মেয়ের বিছানা ঝেড়ে দিচ্ছিলো, শাশুড়ীর কথায় মুখটা একটু ফিরিয়ে স্থির স্বরে প্রতিপ্রশ্ন করলো—হ্যাঁ ছানার জল করতে বলে এসেছি, বলা অন্যায় হয়েছে?

—'ন্যায়' অন্যায়ের কথাতো কিছু হচ্ছে না বাছা, অমন ভাবে কথা কও কেন?

—কি জানি, আপনার কাছে তো আমার সব কাজই অন্যায় হয়ে দাঁড়ায় দেখি, তাই জিগ্যেস করেছি।

—দেখো বৌমা, ভাবি তোমাদের কথায় থাকবো না, কিন্তু না থেকেও তো বাঁচি না। বাব্‌লির অসুখে আমি কি করে নিশ্চিন্দি হয়ে থাকি? বলছি—তোমাদের এ সব কি কায়দা? জ্বরে ছুঁয়েছে কি শক্ত অসুখের বায়নাক্কা নিতে হবে? ছানার জল খাবার কি দরকার?

অলকা শান্ত সুরে বলে—তা' হলে কি দেবো বলুন? চারটি পান্তা ভাত?

বৌয়ের বাক্যি যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে।

নিভাননী ছিট্‌ফিটিয়ে উঠে বলেন—কথাগুলো একটু ভেবে চিন্তে বোলো বৌমা। পাগলও নই, ছন্নও নই যে, জ্বরো মেয়েকে পান্তা ভাতের ব্যবস্থা দেবো? কেন জগতে কি আর খেতে দেবার জিনিস নেই?

অলকা হাতের কাজ সারতে সারতেই বলে—থাকবে না কেন মা? জগৎ জুড়ে আছে। তবে কিনা জগৎ জোড়া খাবার জিনিসও যেমন আছে, জগৎ ভর্ত্তি খাবার লোকও তেমনি আছে। আমার মেয়েটাকে না হয় আমার ইচ্ছের বশেই চালালাম। তাতে তো কারুর ক্ষতি নেই?

শুনে চমকে চুপ করে যান নিভাননী।

বাবলি অলকার মেয়ে! তাই বটে।

সত্যি, কেন বলতে যান তিনি। বলাটা যখন খাটে না, তখন না বলাই উচিত। দেবুর মেয়ে ভালো থাকুক, রোগে ভুগুক, তাতে নিভাননীর কি? নিভাননীর নিজের কোল থেকেই যে তিন তিনটে ছেলেমেয়ে চলে গেছে, কি করতে পেরেছেন? যদিও তখন বড়ো আপসোস হয়েছিলো! উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে ভালোমত পথ্যির অভাবে প্রায় বেঘোরে গেলো ভেবে মাথা খুঁড়ে মরেছেন, কিন্তু এখন বুঝেছেন-ও সবই নিয়তি।

নইলে পুরানো কথা মনে পড়লে কি ধৈর্য্য রাখা যায়? বুবুর অসুখে কবরেজ ছানার জলের ব্যবস্থা দেওয়ায় গোয়ালার কাছে দৈনিক আধপোয়া করে দুধের বরাদ্দ করেছিলেন নিভাননী।...তা' সে বেশীদিন আর নিতে হয় নি।...দুধের প্রয়োজন ফুরোলে গোয়ালাটা আর সে দুধের দাম নিতে চায় নি। গোয়ালার এই মহানুভবতার কাহিনী একদিন বৌয়ের কাছে গল্প করছিলেন নিভাননী, বৌ আর সমস্ত গল্প ফেলে আধ পোয়া দুধ বরাদ্দর গল্প শুনে হেসেই খুন!

এমন অপূর্ব্ব কথা আর কখনো শোনে নি অলকা।

তবে? নিভাননীর ছেলেপুলে মানুষ করার সঙ্গে ওদের ছেলে মেয়ের যত্নর তুলনা?

তুলনা করে লাভ নেই, তুলনা করা শোভন নয়; তুলনা করা বোকামী। এতো বুঝে সুঝেও তুলনা করেন নিভাননী। করেন না, করে ফেলেন।

অবিরত মনের মধ্যে যে তর্কের ঝড় বইছে।

মুখে এক আধবার তার প্রকাশ হয়ে পড়বে বৈ কি!

বৌ খুব সভ্য ভদ্র মার্জ্জিত। ঝগড়া করে না, কথা কাটাকাটি করে না, শাশুড়ীর ভুল ধারণা শুধরে দেবার চেষ্টা করে না, শুধু এই রকম এক আধটি কথা কয়।

যে কথার গুণ হচ্ছে কেটে কেটে নুন লাগানো! বৌ বরাবর তো ঘর করে নি নিভাননীর কাছে। এতোদিন পুণায় কাজ করেছে দেবু, বিয়ে করে পর্য্যন্ত বৌকে সেইখানেই নিয়ে গিয়েছিলো। কিছুদিন হলো কলকাতায় বদলী হয়ে এসেছে।

আগে ছুটিছাটায় আসতো ঠিক বোঝা যেতোনা, এখন প্রতি মুহূর্ত্তেই আঘাত প্রতিঘাত।

চলে যাচ্ছিলেন নিভাননী, আবার দাঁড়ালেন। নাঃ—তবু মেয়েটাকে একটু ভালোকরে দেখে যাওয়া দরকার। তাঁর সাহায্য অলকা চায়না সত্যি, কিন্তু কর্ত্তব্যের ত্রুটিটুকু ধরতে ছাড়বেনা।

কাছে এসে বাব্‌লির কপালে হাত দিলেন। দিয়ে—বোধকরি রোগিণী এবং তার জননী দুজনকেই আশ্বাস দান হিসেবে বলেন—কই বৌমা, জ্বরতো বেশী নয়।

অলকা থার্মোমিটারটা ঝাড়তে ঝাড়তে ওঘর থেকে এঘরে আসছিলো, উত্তরে ঠাণ্ডাগলায় বললো—আমি তো বলিনি মা একশো ছয় জ্বর উঠেছে। কি হয়েছে না হয়েছে নিজেই দেখুন না হয়? থার্মোমিটার দিতে জানেন?

নিভাননী অবাক হয়ে গেলেন। অকারণে, আর এতো সহজে এতোখানি অপমান কি করে করে অলকা? আহত-স্বরে বললেন—জ্বর দেখতেও জানিনা? হঠাৎ জঙ্গল থেকে তোমাদের সহরে এসে পড়িছি—না কি ভাবো বলোতো?

—ভাবিনা কিছুই। নিজে দেখলে হয়তো, বিশ্বাস হবে তাই বলছি।

অলকার কথা শুনে মনে হয় মেয়ের জ্বরটা খুব বেশী প্রমাণ হলেই যেন ও সুখী হয়। জ্বর দেখা তাপমান যন্ত্রটিকে আলোর দিকে ধরে চোখ কুঁচকে বলে—তিন পয়েণ্ট চার।

তিন! এতোটা উঠেছে! জলধাটা ঠাণ্ডা হাতে ঠিক

বুঝতে পারেননি নিভাননী। কিন্তু অলকার কি আক্কেল! মেয়ের সামনে ফট্ করে বলে বসলো?

নিভাননীরা কখনো রোগীর সামনে জ্বর বৃদ্ধির মাত্রাটা ঠিক মতো উচ্চারণ করতেন না। কিছুটা রেখে ঢেকে বলতেন।

নিভাননী চোখ টিপে ইসারা করে একটু চড়াগলায় প্রশ্ন করলেন—কতো বললে? একশো?

অলকা কিন্তু এ ইশারা গায়েও মাখলোনা। স্বচ্ছন্দে উত্তর দিলো—তা'তো বলিনি। বললাম একশো তিন, পয়েণ্ট চার। ইচ্ছে করে ভুল শোনার কোনো মানে হয় না।

নিভাননীর মনে হলো কে যেন তাঁর গালে ঠাস্ করে চড় বসিয়ে দিলো।

ধীরে ধীরে নেমে এলেন নীচে।

মনটা আহত অপমানে জ্বালা করছে। তবু—কর্ত্তব্য চাড়া দিয়ে উঠলো মনে। নিজে খেতে বসার আগে একবার ওদের আমিষ রান্নাঘরে উঁকি মারতে গেলেন। নিজে খেতে বসবেন, কে জানে অলকা ভালো করে খাবে কিনা। মেয়েটা মুখের ভাত ফেলে শুতে গেলো। "বড়াভাজা খাবো" বলে একটু আগে ঠাকুরকে হুকুম করছিলো। সেই বড়াভাজা হলো, আর খেতে পেলো না বাছা।···অলকা কি আর খেতে চাইবে? হাজার হোক মায়ের প্রাণ তো!

নিভাননীরই যে একখুনি ভাতের পাথর টেনে নিয়ে বসতে হবে মনে করে মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। যতোই অলকা অগ্রাহ্য করুক শাশুড়ীকে, তবু খাওয়া দাওয়ার সময়টা না দেখে কি নিভাননী থাকতে পারেন?

দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন—অ ঠাকুর—তোমার মায়ের ভাত বেড়ে রাখো, মেয়ের অসুখ করেছে, নামতে দেরী হবে।

ঠাকুর কড়ায় খুন্তি নাড়তে নাড়তে বলে—ঠিক আছে ঠাকুমা, আপনি ব্যস্ত হবেন না।

হঠাৎ নিভাননী অকারণে রেগে ওঠেন। তিক্ত স্বরে বলেন—না তা ব্যস্ত হবো কেন? আমিও তোমাদের মতন মাইনে করা; কাজ-বোঝানো লোক কি না? তাই নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকবো।···তা'র মন প্রাণ ভালো নয়, দেখে শুনে খাওয়াতে হবেনা?···কই দেখি কি মাছ রেখেছো বৌমার জন্যে?···ও কি, কুল্লে ওই একখানা?···কেন?

ঠাকুর কড়ায়ে জল ঢেলে দিয়ে গম্ভীর ভাবে বলে—যেমন হুকুম হবে তাই করবো তো? এই তো—মা বলে গেলেন, ডিমের ঝাল' করে রাখছি।

নিভাননী থতমত খেয়ে বলেন—বলে গেছে বৌমা? কখন আবার নীচে এলো সে?···জানিনা বাবা।

নিজের ভাতের থালার সামনে বসে হঠাৎ দুই চোখ উপচে জল আসে নিভাননীর। আর অবাক লাগে বৌমার মনের ধরণ দেখে। মুখের ভাত ফেলে জ্বর এলো মেয়েটার, আর মা এসে রুচিমাফিক খাওয়ার বায়না করে গেছে! কি জানি কি অদ্ভুত মন এদের।

কিন্তু নিভাননীর কি স্বস্তি আছে?

খানিক পরে আবার উঠে আসেন। নাতনীর কাছে একটু বসলে যদি বৌ খেতে যেতে সময় পায়।···ওমা উঠে গিয়ে অবাক। ঠাকুর দোতলায় টেবিলে ভাত ঢাকা দিয়ে গিয়েছিলো, বৌ খেতে বসেছে, আর কাছে দেবু বসে চা খাচ্ছে।

—দেবু কখন এলি?

অবাক হয়ে জিগ্যেস ক'রেন নিভাননী।

দেবু তাড়াতাড়ি চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে বলে—হ্যাঁ, একটু আগেই এলাম। বাব্লিটার জ্বর শুনলাম—

নিভাননী সন্দিগ্ধ স্বরে বলেন—জ্বর তুই শুনলি কি করে?

—ওই যে ফোন্ করেছিলো—

—ফোন্ করেছিলো? বৌমা ফোন্ করেছিলো তোকে?

অলকা আপনমনে খেতেই থাকে।

দেবু বলে—হ্যাঁ একশো চারের ওপর জ্বরটা উঠেছিলো।···আমি একেবারে ডাক্তার সেনকে কল্ দিয়ে তবে এলাম।···এসে দেখছি জ্বরটা একটু নেমেছে।

নিভাননী ছেলের সামনে যেন একটু বুকের বল পান। অনুযোগের স্বরে বলেন—হ্যাঁগা বৌমা, এমন হয়েছে যে ওকে আপিস থেকে আনিয়েছো, আর আমি একটা মানুষ বাড়ীতে রয়েছি, এত্তোটুকু জানাওনি?

এবার অলকা কথা বলে—আপনাকে জানালে লাভটা কি হতো? উপায় কিছু বার করতে পারতেন?

—তোমাদের ধরণে পারিনা—নিভাননী রেগে ওঠেন —আমাদের ধরণে পারি ·· কুঁজোর ঠাণ্ডা জল মাথায় ঢেলে দেবো, হুস্ হুস্ করে মাথায় বাতাস দেবো, হু হু করে জ্বর নেমে যাবে।

—তা'হলে তো ডাক্তার সেনকে কল্ দেওয়া ভারী ভুল হয়ে গেছে।

বলে মৃদু হেসে উঠে যায় অলকা।

মেয়ের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে দেবনাথ বলে— —মার সঙ্গে ওভাবে কথা বলে লাভ কি? ওঁরা সেকেলে মানুষ, বোঝেন টোঝেন কম, চুপচাপ শুনে গেলেই তো হয়?

অলকা গম্ভীরভাবে বলে—বিরক্তিকর কথা শুনে বিরক্ত হবো না—এতো মহাপুরুষ যদি না হ'তে পারি করা যাবে কি বল?···ওপরে এতো মায়া দেখান, অথচ নাতি নাতনীর খাওয়া পরা, যা কিছু দেখেন, তাতেই তো বাড়াবাড়ি দেখে চমকে ওঠেন। রোগে একটু উচিত মতো পথ্যি দেবার হুকুম নেই।···"জ্বর এসেছে, ডাব ছানার জল কেন? মুড়ি দিতে পারো না?"—শুনলে যদি ভালো না লাগে আমার, কি করবে?"

গুম্ হয়ে যায় দেবনাথ।

মায়ের ওপর রাগ করে, কি বৌয়ের ওপর বিরক্ত হয়ে, কে জানে।—

সন্ধ্যার পর ডাক্তার সেন এলেন।

সর্দ্দিজ্বর, তা' হো'ক গোটাকতক পেনিসিলিন্ ইঞ্জেকশন্ দিয়ে দেওয়াই ভালো। অধিকন্তু ন দোষায়।

নিভাননী তখন সন্ধ্যাহ্নিক সেরে ঠাকুরের চরণ তুলসী নিয়ে বাব্লির মাথায় বুলিয়ে দিতে এসেছিলেন, দেবনাথ ব্যস্ত হয়ে বলে উঠেছিলো—"মা, ডাক্তার আসছেন!"

এ একটা ইসারা।

অর্থাৎ মা তুমি এখন প্রস্থান করো।

নিভাননীও ব্যস্তহাতে কটাচুলওয়ালা মাথার ওপর খানিকটা ঘোমটা টেনে সরে যান। দালানের জানলার আড়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দেখেন—আলোকোজ্জ্বল ঘরের মধ্যে অলকা বিছানায় বসে।

মাথার কাপড় সে না থাকাই, ডাক্তারের সঙ্গে আর স্বামীর সঙ্গে কথা কইছে স্বচ্ছন্দ ভাবে, কৌতুকের কথায় হেসে উঠছে!

বড়ো ডাক্তার চলে গেলো!

পিছন পিছন দেবু নামলো।

একজোড়া ভারী জুতোর মস্মস্ শব্দের পিছনে একজোড়া হালকা চটির শব্দ। যেন···বরদা তার বরাভয়কর বাণীর কাছে অসহায় জীবের সকাতর প্রার্থনার মৃদুবাণী।

এ রকম শব্দ শুনলেই বুকটা কেমন ছাঁৎ ছাঁৎ করে ওঠে। নিভাননী হরিনামের মালাগাছটা হাতে নিয়ে মনঃসংযোগের চেষ্টা করেন।

কিন্তু করতে পারেন না, কিছুক্ষণ পরেই আবার আর একজন ডাক্তার। এর মানে কি?

তবে তো ব্যাপার সোজা নয়। মালা কপালে ছুঁইয়ে উঠে পড়েন।

আবার দালানে দাঁড়িয়ে দেখেন।

এ ডাক্তার ইনজেকসান দিলো বাব্লিকে। নাঃ নিশ্চয়ই। নিভাননীর ভাঙা কপাল আবার ভাঙবার জোগাড় হচ্ছে।

ডাক্তার চলে যেতেই নিভাননী ছেলের হাত ধরে প্রায় কেঁদে ফেলে বল্লেন—তোরা কি আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছিস দেবু? আমার বাব্লির অসুখ কি বেশী?

—অসুখ বেশী হতে যাবে কেন? হাত ছাড়িয়ে নিলো দেবু।

—তবে যে ফুঁড়ে ওষুধ দিলো? উপরি উপরি ডাক্তার এলো? তোরা আমায় চাপ্‌ছিস—নিশ্চয় অসুখ বেশী!

—যাতে বেশী হয়ে না ওঠে তারই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ব্যস্ত হচ্ছো কেন মিছিমিছি?···বলে পিছন ফেরে দেবু।

নিভাননী আশা করছিলেন মেয়ের অসুখে বিমর্ষ দেবু মায়ের কাছে সহানুভূতির আশায় হয় তো একটু কাছাকাছি অন্তরঙ্গতায় এসে পড়বে। হয় তো কাতর হয়ে প্রশ্ন করবে—'মা কি হবে?'

"ভয় কি বাবা ভগবান আছেন" বলে ছেলেকে সস্নেহ সান্ত্বনা দেবেন নিভাননী।

ভাবতে গিয়ে হঠাৎ যেন খটকা লেগে যায়। ভগবান কি সত্যিই আছেন?

তা' যদি থাকেন, তাহ'লে নিভাননীর তিন তিনটি মেয়েছেলে থাকলো না কেন ?

কিন্তু আশ্চর্য্য! মনের মধ্যে এতো সংশয়, এতো অভিযোগ, তবু দুঃখের সময় বিপদের সময় বুকের মধ্যে কোথা থেকে যেন ভরসা জোগায়—'ভগবান আছেন'।

দেবনাথ নিজের কাজে চলে যাচ্ছিলো, নিভাননী আবার পিছু ডাকেন—অসুখটা কি বললো ডাক্তার ?

—বলবার কি আছে ? সাধারণ সর্দ্দি জ্বর! কালই ছেড়ে যেতে পারে!

এর চাইতে আশ্বাসের বা আনন্দের কথা আর কি আছে ? "সাধারণ জ্বর, কালই ছেড়ে যেতে পারে—"শুনে হরিলুঠ মানত করার মতো কথা। একথায় হঠাৎ এতো রাগ হয়ে যায় কেন নিভাননীর ?

শুধু একটু সর্দ্দি জ্বর ? ছোট ছেলেপুলের যা সর্ব্বদাই হয়ে থাকে! তার জন্যে এতো সমারোহ, এতো আড়ম্বর ?

থাকতে পারলেন না নিভাননী, বলে ফেললেন। বলা সঙ্গত হচ্ছে না বুঝেও "আপনি মোড়লের" মতো বলে ফেললেন—তবে ? তোদের কি সব তাতেই বাড়াবাড়ি দেবু ? বৌয়ের পরামর্শ শুনে শুনে তুইও উচ্ছন্ন গেলি একেবারে। "শুনলো সাড়া কি নিলো পাড়া।"···মেয়েকে একবেলা একটু জ্বরে ছুঁয়েছে কি সাত রাজ্যের ডাক্তার এনে জড়ো করছিস ? টাকা চারটী না হয় হয়েইছে, তাই বলে যেখেনে সেখেনে ছড়িয়ে ফেলে দিবি ? উচিত অনুচিত দেখতে হবে না ?

ঠিক এরকম না হলেও, এ ধরণের কথা তো বলেই থাকেন নিভাননী। কই দেবনাথ তো কখনো প্রতিবাদ করে না।

আজই হঠাৎ এতোবড় কথাটা বলে বসলো কেন ?

আজকের সারাদিনের উদ্বেগ অশান্তি ইত্যাদির ফল, না অলকার দীর্ঘদিনের সাধনার ফল ?

রুক্ষস্বরে বলে উঠে দেবনাথ—তা'হলে তোমার মতে উচিতটা কি মা ? তোমাদের মতন, পয়সা খরচের ভয়ে ছেলে মেয়েকে বিনা চিকিৎসায় ফেলে রেখে মরতে দেওয়াই উচিত কর্ত্তব্য ?

চমকে ওঠেন নিভাননী। বিস্ময়ার্ত্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন —কী ? কী বললি তুই ? পয়সা খরচের ভয়ে বিনা চিকিচ্ছেয় ছেলে মেরে ফেলেছি! আমি ? পয়সা খরচের ভয়ে ? এই কথা তুই বললি আজ ?

দেবু বেজার মুখে বলে—তুমি বলতে বাধ্য করলে মা।··· তোমার কাছেই শোনা, নিজে মুখেই তুমি বলেছো—বুবুর অসুখে অঘোর কবরেজের দুটো হজমি বড়ি, তা'ও জোটেনি নিয়ম করে।···আমি না হয় ছিলামনা, চোখের আড়ালে গিয়ে বসেছিলাম। বাবা তো তখন ছিলেন ?···অমলি জন্মের শোধ একটা ডালিম খেতে চেয়ে খেতে পায়নি, একথা সত্যি নয় ?

দেবুই কি নিষ্ঠুর ? অনেক দিন আগে মরে যাওয়া, ছোট্ট বোনটির কথা এভাবে তুলতে গিয়ে দুইচোখ তার অশ্রুসিক্ত হয়ে আসে কেন তবে ?···মমতা আছে। কিন্তু অবুঝকে মমতা করা কি নেহাৎ সহজ ?

বিলেত যাবার আগে ছোট্ট বোনটিকে অনেক পুতুল খেলনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিলো বেচারা, এসে আর দেখতে পায়নি অমলিকে। সেই দাগা সে ভুলতে চায়, মেয়ে যা চায় তাই দিয়ে।

সত্যিই প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে অমলা। নিভাননীই বলেছিলেন। বড়ো মর্ম্মজ্বালায়···কৃতী পুত্রের কাছে বর্ণনা করেছিলেন এই করুণ কাহিনী। সে বর্ণনার মধ্যে দুঃখের চাইতে বেশী ছিলো জ্বালা, আক্ষেপের চাইতে বেশী ছিলো স্বামীর ওপর অভিযোগ। কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন—দেবু যদি দেশের বাইরে গিয়ে না থাকতো, তা'হলে হয়তো অমলি বুবু পালাতে পারতো না।

হায়! নিজের নিক্ষিপ্ত শর যে এমন করে নিজের গায়ে এসে লাগবে সেকথা কি ভেবেছিলেন নিভাননী ?

রাগে দুঃখে সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠে তাঁর।

অকথ্য বিস্ময়ে আবার বলে ওঠেন—তুই একথা বলছিস দেবু ? বলতে তোর মুখে আটকালো না ? সংসারের অমন হাড়ির হাল হয়েছিল কার জন্যে ? তিনি তো রাজা উজির ছিলেন না যে, সহজে স্বচ্ছন্দে—ছেলেকে বিলেতে পাঠাবেন ? সংসারকে নিংড়ে ছিবড়ে করে সব সারটুকু পাঠাতে হয়নি তোকে ?

দেবনাথ উদ্ধত নয়, নিষ্ঠুরও নয়, তবু এতোখানি অপমান সেও গায়ে মেখে থাকে না, বলে—কাঙালের ঘোড়ারোগ হলে ওই রকমই হয় মা। এমন যাদের অবস্থা,

ছেলেকে বিলেত পাঠাবার সাধই বা তাদের হয় কেন? আশ্চর্য্য, সে ঋণ আর আমার শোধও হচ্ছেনা আজ পর্য্যন্ত!

নিভাননী মিনিট দুই অসাড়ের মতো তাকিয়ে বসে থেকে আস্তে আস্তে উঠে জপের মালাটা পেড়ে নেন।

চুপ করে বসে থাকাটা অস্বস্তিকর। লোকের চোখে পড়ে যেতে হয়, তার চাইতে এ একরকম সুবিধে। বসে থাকার একটা মানে দেখানো যায়।

দ্রুততালে ঘুরতে থাকে মালাটা। সংখ্যার ঠিকঠাক থাকেনা।

"কাঙালের ঘোড়ারোগ"—তাই বটে। আর সে রোগ হয়েছিলো শুধু একা নিভাননীরই।···বিলেত যাওয়ার কথায় দেবু 'অসম্ভব' বলে উড়িয়ে দিয়েছিলো, স্বামী শুধু লাঠালাঠি করতে বাকী রেখেছিলেন, তবু নিভাননী সংকল্পচ্যুত হননি।···ছেলে কৃতী হয়ে ফিরুক আবার সব হবে।·· স্বামীকে চুপ করিয়ে দেবার অস্ত্র ছিলো। তিনি যে তাঁর তিন তিনটে ভাগ্নে ভাগ্নীকে খাওয়াচ্ছেন পরাচ্ছেন, ইস্কুলের মাইনে দিচ্ছেন, তা'তে খরচ হচ্ছে না? নিভাননীর ছেলেমেয়ের ভাগ থেকে কাটাইতো যাচ্ছে সে খরচাটা? তবে নিভাননী কেন শোধ নেবেন না?

শোধ নেওয়া নিয়েই তো জগত। মায়ে একটা অবুঝ কথা বলে ফেললে ছেলে তার শোধ না নিয়ে ছাড়ে?

চোখ বুজে মালা ঘুরিয়ে যান নিভাননী।

তিনি স্বামীর ওপর শোধ নিয়েছিলেন, আজ ছেলে তাঁর ওপর শোধ নিলো।···কিন্তু—কিন্তু—এতো বড়ো অপমানের শেলটা যে মার বুকের ওপর বসিয়ে দিলি তুই, একবার ভাবলি না "ভগবান আছেন"!···ভাবলি না তাঁর আসল নাম "দর্পহারী"।

ভালো চিকিৎসা করালেই যদি নিয়তির হাত এড়ানো যেতো, তা'হলে আর রাজারাজড়ার ঘরে যম মাথা গলাতে পারতো না।

পাঁচটা ডাক্তার এনে ফেললেই কি 'সাধারণ জ্বর' 'অসাধারণ' হয়ে উঠতে আটকায়? তখন? কা'কে দোষ দিবি তখন? সন্তান-শোক যে কি জিনিস, তা যদি—

সহসা শিউরে উঠে 'ষাট ষাট' উচ্চারণ করে হাতের মালাটা শক্ত করে বাগিয়ে ধরেন নিভাননী।···যেন পাহাড়ে রাস্তায় অন্যমনা হয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ গভীর খাদের দিকে নজর পড়ে গেছে। ভাগ্যিস পড়ে যাননি!—উঃ! ভগবান আছেন!

ঘুম

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

নিওনের আলো রূপ সৌরভ তোমার বিলাসী ঘরে,
সুখশয্যার মসৃণ আয়োজন;
প্রহরে প্রহরে রঙের ঝলক্, লাল, নীল আভা কত!
তুমি দেখ রূপ, ঘন রাত্রির মাদকতা ভরা মন।
অন্ধকারের বুক ভরা কই জমাট মেঘের স্তূপ?
নিপীড়িত দেহ, নিস্তেজ মন ভার!
ক্ষুধা ক্লিষ্টের অনশন জ্বালা, ছিন্ন কাঁথায় শোওয়া—
ঘুমহারা দেব-শিশুদের হাহাকার?
ঘুমে ভরা রাত তোমার প্রহর, স্বপ্ন দেখায় কত!
স্বপ্নপুরীর ঐন্দ্রজালিক দেশ!

ভরা যৌবন সুখে টলমল উষ্ণ তনুর স্বাদ;
ঘুমে ভরা রাত—নিটোল গানের একটি সুরের রেশ।
কোলাহল জাগে রাত্রির বুকে, ভ্যাপসা ঘরের মাঝে,
ভাঙনের সুর মরা-কান্নায় নাকি?
মৃত্যুর ঘুম ভেঙে গেছে আজ—জীবনের আছে দাবি,
বহু বিনিদ্র জেগেছে জীবন, বুঝেছে ঘুমের ফাঁকি।
ঘুমহারাদের চীৎকারে তবু ঘুমের ব্যাঘাত নেই!
তোমার ঘরের বিজলী পাখার ঝড়ে—
হাওয়ায় হাওয়ায় ঘুমে অচেতন—জাগিলে দেখিতে পেতে
সুখ-শয্যার আভরণ গেছে উড়ে।

প্রতিভা-পরিচিতি

রাডিয়ার্ড কিপ্‌লিং

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক রাডিয়ার্ড কিপলিং তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবনের অনেক অংশ ভারতবর্ষে অতিবাহিত ক'রে বিলাতে গিয়ে লিখেছিলেন তাঁর বহুল-আলোচিত প্রসিদ্ধ গাথা—"East is East and West is West and the twain shall never meet !" অনেক সমালোচকের মতে তাঁর লেখার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের গন্ধ প্রচ্ছন্ন আছে ; একমাত্র নিজের দেশ ছাড়া অন্য কোন দেশের কোন ভাল জিনিষ তাঁর নজরে পড়েনি। এই নিবন্ধে সে সমালোচনার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। কিপলিং-এর জীবনের কিছু পরিচয় দেওয়াই এর উদ্দেশ্য।

একই পরিবারের চার কন্যা পর পর চারজন বিশেষ খ্যাতিমান, ধনবান, প্রতিষ্ঠাবান এবং ভাগ্যবান নাগরিককে বিবাহ করে পরম আরামে আর বিলাসিতায় ঘরকরণা করতে লাগল, এমন দৃষ্টান্ত সহজে পাওয়া যাবে না। কিপলিং-এর দাদা-মশায়ের সংসারে এমনি ঘটনাই ঘটেছিল।

জর্জ্জ ম্যাক্‌ডোনাল্ড-এর ছিল চার মেয়ে। প্রথমা কন্যা জর্জ্জিয়ানা বিবাহ করলেন এক শিল্পীকে। পরবর্ত্তী কালে হলেন সমাজনেত্রী লেডী বার্ণ-জোন্স। জর্জ্জিয়ানার নানা ছবি আর তৈলচিত্র ইংলণ্ডের লোকের কাছে অপরিচিত রইল না।

দ্বিতীয়া কন্যা এগ্‌নেস্‌ও এডওয়ার্ড পয়ণ্টার নামে এক বিত্তশালী চিত্রকরকে বিবাহ করলেন।

তৃতীয় কন্যা অ্যালিস্ লেক রাডিয়ার্ডের তীরে জন লকউড কিপলিং-এর সঙ্গে পরিচিত হলেন এবং ১৮৬৫ সালের প্রথম ভাগে লণ্ডনে তাঁদের বিবাহ হল।

কনিষ্ঠা লুইসার সঙ্গে বিবাহ হল অ্যালফ্রেড বলডুইনের। তাঁদের এক ছেলে, ষ্ট্যানলি বলডুইন পরবর্ত্তীকালে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। জর্জ্জ ম্যাকডোনাল্ড-এর জামাই ভাগ্য ভাল ছিল বলতে হবে।

বিবাহের পরেই আত্মীয়স্বজনের সচকিত এবং দুঃখবিহ্বল ক'রে দিয়ে লক্‌উড-কিপলিং সপত্নিবারে পাড়ি দিলেন কালা আদমির দেশ ভারতবর্ষে। বোম্বাই শহরের এক আর্ট কলেজে তিনি অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৬৫ সালে বোম্বাই সহর সমৃদ্ধির পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছিল। সহরটিকে ভেঙে চুরে নতুন করে গড়ে তোলবার নানা পরিকল্পনা এবং আয়োজন হচ্ছিল। সেই সব কাজে লকউড কিপ্‌লিং তাঁর মেধা আর কর্ম্মকুশলতাকে নিয়োজিত ক'রে অচিরকালেই দক্ষিণ ভারতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করলেন। সেই বছরেই ৩০শে ডিসেম্বর অ্যালিস কিপলিং একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। তাঁদের প্রথম পরিচয়ের সাক্ষী সেই কলস্রোতা রাডিয়ার্ড নদীকে স্মরণ ক'রে পিতামাতা পুত্রের নাম রাখলেন জোসেফ রাডিয়ার্ড কিপলিং।

শৈশবে একবার বিলাত ঘুরে এলেও রাডিয়ার্ড তাঁর শিশুকালের বেশী সময় ভারতের বহু জাতি ও বহু বর্ণ অধ্যুষিত এই বর্ণাঢ্য বন্দর



রাডিয়ার্ড কিপলিং

নগরে অতিবাহিত করেছিলেন এবং এই দেশের সামাজিক চালচলন, কায়দাকানুন আর বহু সংস্কার সম্বন্ধে ভালরকম ওয়াকিবহাল হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। গড়গড় ক'রে হিন্দি বুলি আওড়াতে পারতেন, গুজরাটিদের মতো পোষাক পরতে ভালবাসতেন, পাগড়ী আর চাপকান প'রে চৌপাটিতে মাঝে মাঝে উপস্থিত হ'য়ে তাঁর সঙ্গীসাথীদের কৌতুক উৎপাদন করতেন।

১৮৭১ সালে কিপলিং-দম্পতি দেশে গেলেন এবং ছুটি ফুরোলে

রাডিয়ার্ডকে সেখানে রেখে ভারতে ফিরলেন। বাবা মা এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে এই বিচ্ছেদ রাডিয়ার্ড অত্যন্ত কাতরতার সঙ্গে অনুভব করেছিলেন। তাঁর বাল্যবয়সের রচনার মধ্যে সে-কথা অনেক স্থানেই লিপিবদ্ধ হয়েছে। যাই হোক, মাসী জর্জ্জিয়ানা বার্ণ-জোন্সের কাছে তিনি ভালভাবেই লেখাপড়া শিখে "মানুষ" হোতে লাগলেন।

১৮৭৭ সালে তিনি ডেভনশায়ার ইউনাইটেড সার্ভিসেস কলেজে ভর্ত্তি হলেন। সেখানে অনেকগুলি ভারত-প্রবাসী ইংরাজদের ছেলেরা পড়ত। তাদের সঙ্গে ভারী বন্ধুত্ব হল রাডিয়ার্ডের। ভারতের গল্প বলতে আর শুনতে অত্যন্ত ভালবাসতেন তিনি। এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালেই রাডিয়ার্ড কবিতা লিখতে শুরু করেন। স্কুলের পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে সুনাম অর্জ্জন করেছিলেন প্রচুর। স্থানীয় মাসিক-পত্রে



জাপান পরিভ্রমণকালে জাপানের গলিঘুঁজির পথে রাডিয়ার্ড কিপলিং

তাঁর একটির পর একটি কবিতা ছাপা হচ্ছিল। কবিতাগুলির মধ্যে ছিল মননশীলতার অভ্রান্ত পরিচয়, বিপুল সম্ভাবনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

ভারতবর্ষে ব'সে বাবা-মা ছেলের এই লিখন-পটুতার খবর পেয়ে যেমন আনন্দ তেমনি গর্ব্ব অনুভব করলেন, পয়সা খরচ ক'রে তাঁরা ছেলের প্রথম কাব্য-গ্রন্থ ছাপালেন, নাম দিলেন—"ইস্কুল-পড়ুয়ার কবিতা।" বড়-ঘরের ঘরণী বড়-মাসীর ঘরে নানা বিদ্বজ্জনের সমাবেশ হত। রাডিয়ার্ড তাঁদের সঙ্গে আলাপ করতেন। তাঁদের মূল্যবান উপদেশগুলি মনের মধ্যে গেঁথে নিতেন। উদ্বুদ্ধ হতেন নিত্য নব প্রেরণায়।

* * *

১৮৮২ সালে রাডিয়ার্ড কিপলিং পুনরায় ভারতবর্ষে এলেন এবং পিতার চেষ্টায় লাহোরের সিভিল অ্যাণ্ড মিলিটারী গেজেট নামক বিখ্যাত পত্রিকায় একটি কাজ পেলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র সতেরো। বুদ্ধি ছিল ক্ষুরধার, পড়াশোনাও করতেন অবিরাম, যে কোন বিষয়ে লেখবার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ, কাজেই রাডিয়ার্ড কিপলিং-এর পক্ষে সাফল্য অর্জ্জন করা কঠিন হল না মোটেই। পাঁচ বছর ধরে এক বিবেকহীন, গুণগ্রাহিতায়-পরাঙ্মুখ, যন্ত্র-সমান সম্পাদকের অধীনে কাজ করলেন নিরলস অধ্যবসায়ের সঙ্গে।

উক্ত পত্রিকায় তাঁর নানা রচনা প্রকাশিত হল। সেই সব বর্ণ-সমুজ্জ্বল, মৌলিকতা-মণ্ডিত, অ-সাধারণ গল্প-কাহিনীগুলি নিমেষে পাঠক-



ব্যঙ্গ-চিত্রের তুলিকায় রাডিয়ার্ড কিপলিং

চিত্ত জয় করল। নিজের দেশেও সে-খবর গিয়ে পৌঁছোলো। ইংরাজ গল্পলেখকদের মধ্যে তাঁর স্থান নির্দ্দিষ্ট হল। তখন তাঁর বয়স মাত্র বাইশ।

এলাহাবাদের স্বনামখ্যাত পত্রিকা "পাইওনীয়র"-এর সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেবার পর কিপলিং-এর খ্যাতি দিনের পর দিন বাড়তে লাগল। সেই পত্রিকার বিশেষ সাপ্তাহিক সংস্করণে তাঁর বহু গল্প প্রকাশিত হল। নানা দেশ দেখবার, নানা মানুষকে চেনবার, নানা সমাজ-পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর মনে। সেই সময় দেশভ্রমণে বেরিয়ে প্রথমে ভারতবর্ষের নানা দুর্গম পাহাড় আর জঙ্গল পেরিয়ে বহু স্থানে পরিভ্রমণ করলেন। তার পর গেলেন চীনে, সেখান থেকে জাপান, অবশেষে আমেরিকায়। বিশ্ব-সফর শেষ ক'রে ইংলণ্ডের স্ট্রীট স্ট্রীটে এসে পৌঁছলেন।

আমেরিকার এক সংবাদ-পত্রের তরফে কাজ করবার ইচ্ছায় একবার রাডিয়ার্ড এক আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন। তারপর সানফ্রান্‌সিস্‌কোর এক পত্রিকায় যোগ দিয়ে বিড়ম্বনা ভোগ করেছিলেন কম নয়। তিন মাসের জন্যে পরীক্ষামূলকভাবে তাঁকে কাজে নিযুক্ত ক'রে সেই পত্রিকার সম্পাদক তাঁকে একটা বড়রকমের দেউলিয়া-মোকদ্দমার বিষয় লিখতে আদেশ করলেন। মামলার ব্যাপারটা জেনে নিয়ে কিপলিং তার সম্বন্ধে এক চমৎকার প্রবন্ধ রচনা করলেন। কিন্তু তার মধ্যে কোন কেচ্ছা বা ব্যবসাটি ফেল হবার কোন গুহ্য তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেল না। লেখাটি প'ড়ে সম্পাদক তো অগ্নিশর্ম্মা! কিপলিংকে ডেকে বললেন—"ওহে, চশমা-চোখে ছোকরা! তোমায় একটা উপদেশ দি শোন, তুমি সাংবাদিক হবে এ-কথা তোমার কুষ্ঠিতে লেখা নেই। তার চেয়ে বরঞ্চ জুতো তৈরী কর গে। হাত খুলবে। কলম ধরবার হাত তোমার নয়।"

* * *

সানফ্রান্‌সিস্‌কোর সেই মূঢ় সম্পাদকের কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন ক'রে রাডিয়ার্ড কিপলিং-এর কলম চলল দুর্নিবার বেগে। ম্যাক্‌মিলন কোম্পানী তাঁর "প্লেন টেল্‌স্" প্রকাশ করলেন। ভারতবর্ষের পটভূমিকায় আঁকা রেখা-চিত্র আর কাহিনীগুলির সংস্করণের পর সংস্করণ বিক্রি হোতে লাগল। তাঁর কাহিনীর মধ্যে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব নূতনত্বের আর লিখন-শৈলীর সন্ধান পেয়ে দেশ বিদেশের পাঠক চমৎকৃত হল। বহু বিচিত্র আর বিরাট ছিল তাঁর কল্পনার প্রসার! গভীর সমুদ্রের ফেনোচ্ছল লীলা তাঁর রচনার মধ্যে অপরূপ ভাষায় ফুটে উঠল, ইংলণ্ডের প্রাকৃতিক শোভা আর স্বগ্রাম সাসেক্স-এর অবারিত মাঠ আর সুনিবিড় ছায়া ধরা দিল তাঁর কলমের মুখে, ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজের দুঃখ বেদনা, আশা আকাঙ্ক্ষা, টমি অ্যাট্‌কিন্‌সদের বীরত্ব, ভারতীয় যোগীদের চিত্র —সারা পৃথিবী যেন নেমে এলো তাঁর রচিত পুস্তকাবলীর পাতায় পাতায়। শুধু শ্রেষ্ঠ লেখক বা কবিরূপেই নয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একজন শক্তিশালী নাগরিকরূপে তিনি সম্বর্দ্ধিত হলেন।

১৮৯১ সালে তিনি পুনরায় পৃথিবী-ভ্রমণে বেরুলেন, আফ্রিকায় সিসিল রোডস্-এর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতালেন। অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, সিংহল ঘুরে ভারতবর্ষে এসে পিতামাতার কাছে কিছুকাল অতিবাহিত করলেন। তারপর বিলাতে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে বিবাহ করলেন। নিউ-ইয়র্কের ওয়াল্‌কট ব্যালেষ্টিয়ারের মেয়ে মিস ব্যালেষ্টিয়ারকে ঘরণী ক'রে নিয়ে এলেন। জীবনে নতুন ক'রে জোয়ার এলো। এলো লেখবার নতুনতর প্রেরণা।

১৮৯৪ সালে বহু বিখ্যাত গ্রন্থ "জাংগল্ বুক" প্রকাশিত হল। পরপর বই বেরুতে লাগল। ক্যাপটেনস্ কারেজাস্, ষ্টকি কোং, কিম, গল্প-কাহিনী ইত্যাদি। সাংবাদিকরা তাঁকে ঘিরে ধরল। বিবৃতি চাই। এত যে লেখেন, কী পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে লেখেন? কি নিয়ম-কানুন?

পদ্ধতি? নিয়মকানুন? শুনে বিস্মিত হলেন কিপলিং। কোন পদ্ধতি বা নিয়মকানুন তিনি তো মানেন না! বললেন, "লেখবার যখন তাগিদ আসে ভিতর থেকে, তখনই লিখি। সাহিত্য-রচনায় আবার পদ্ধতি কিসের? লেখবার যখন ইচ্ছা জাগে তখন তাকে আর নিবারণ করা যায় না। আবার যখন ইচ্ছা না হয় তখন কিছুতেই কলম চলবে না।

* * * *

সাম্রাজ্য-গঠনকারী সিসিল রোড্‌স্-এর কাছে সাম্রাজ্যবাদের যে দীক্ষা কিপলিং পেয়েছিলেন তার পরিচয় তাঁর একাধিক রচনায় আর বহু বক্তৃতায় ফুটে উঠেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে তিনি যে সবধান-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, সমস্ত ব্রিটিশ জাতি তা শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনেছিল, যুদ্ধ যখন বাধলো তখন সমগ্র জাতিকে রণসজ্জায় সজ্জিত হবার যে আহ্বান তিনি জানিয়েছিলেন তা দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সাড়া



সাসেক্স প্রদেশে কিপলিংএর বাসভবন

জাগিয়েছিল। যতদিন যুদ্ধ চলেছিল ততদিন অবিশ্রান্ত গতিতে লেখনী চালনা করে তিনি জাতিকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন! বক্তৃতার পর বক্তৃতা দিয়ে জনসাধারণের মনোবল অটুট রাখতে সাহায্য করেছিলেন।

১৯০৭ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরূপে স্বীকৃতি অর্জ্জন ক'রে কিপলিং সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশজাতির গৌরবকে যে উজ্জ্বলতর করেছিলেন, তাতে আর সন্দেহ নেই।

ভারতের বহু অরণ্য-সঙ্কুল স্থানে ভ্রমণ করে রাডিয়ার্ড কিপলিং জন্তু-জানোয়ারদের চরিত্র আর মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্ময়কর জ্ঞান অর্জ্জন করেছিলেন। এ-সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক গল্প আছে। তখন তিনি লণ্ডনে বাস করছেন। লেখক হিসাবে নাম-ডাক তখনো বেশী হয়নি। জনসাধারণের কাছে তখনো তেমন পরিচিত নন। একদিন লণ্ডনের চিঁড়িয়াখানায় বেড়াতে গিয়ে দেখেন হুলুস্থুল ব্যাপার।—ভারতবর্ষ থেকে সম্প্রতি একটি হাতী আনা হয়েছে লণ্ডনের চিঁড়িয়াখানায়। সেই হাতীটা ক্ষেপে গেছে। কেউ তার কাছে এগোতে পারছে না। হাতীটা দু'তিন

দিন কিছু খায় নি। যদি মারা যায় তো চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষের ভীষণ বদনাম হবে। তাই পশুশালার অধ্যক্ষ খুবই মুষড়ে পড়েছেন।

হাতীর খাঁচার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন কিপলিং। সাধারণত হাতীকে খোলা জায়গায় পায়ে শিকল বেঁধে রাখা হয়। কিন্তু এ হাতী পাগলা হয়ে গেছে তাই তাকে মোটা গরাদ দেওয়া বেড়ার মধ্যে পায়ে শিকল বেঁধে রাখা হয়েছে। হাতীটার মুখ দিয়ে লালা নির্গত হচ্ছে। ছোট ছোট চোখ দুটো লাল। মাঝে মাঝে গর্জ্জন করছে ভীষণ।

অনেকক্ষণ ধরে কিপলিং হাতীটিকে লক্ষ্য করলেন। তারপর অধ্যক্ষকে ডেকে বললেন—"আমাকে যদি খাঁচার ভিতর যাবার অনুমতি দেন তো আমি ভিতরে গিয়ে ওকে শান্ত করতে পারি এবং ওকে খাওয়াতে পারি।"

অধ্যক্ষ কিপলিংকে চিনতে পারেন নি। বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বললেন—"একে তো হাতী নিয়ে মাথা খারাপ হবার যোগাড়, তারপর পাগলা হাতীর পায়ের তলায় পড়ে তুমি মর, আর দোসরা একটা ফ্যাসাদে পড়ি আমি।"

কিপলিং বললেন—"আপনি যাতে ফ্যাসাদে না পড়েন তার ব্যবস্থা করব। আমি মুচলেখা লিখে দিচ্ছি যে আমি স্বেচ্ছায় পাগলা হাতীর খাঁচার মধ্যে প্রবেশ করছি এবং আমি যদি প্রাণে মারা পড়ি তো সেজন্যে অন্য কেউ দায়ী নয়। এতে হবে না?"

অধ্যক্ষ কিছুক্ষণ হাঁ ক'রে কিপলিংএর মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন। লোকটার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ। সহকারী কানে কানে বললে—"দেখতে দোষ কি? হাতীটা শান্ত না হলে যে সমূহ বিপদ।"

কাগজ কলম এগিয়ে দিয়ে অধ্যক্ষ বললেন—"আচ্ছা, লেখো।"

লিখে দিলেন কিপলিং। বড় বড় হরফে নিজের নাম, বাপের নাম, ঠিকানা, সমস্ত লিখে দিলেন, তারপর বললেন—"আমায় একটা বড় কাপড় বা একটা তোয়ালে দিতে হবে।"

এলো লম্বা কাপড়ের টুকরো আর তোয়ালে। কাপড়ের টুকরোটাকে পাগড়ীর মতো ক'রে মাথায় জড়ালেন। তোয়ালেখানা লুঙ্গীর মতো কোমরে পরলেন। তারপর বললেন—"খোল খাঁচার দরজা।"

পশুপালক কম্পিত হাতে দরজা খুলে দিল। ভিতরে ঢুকলেন কিপলিং। খাঁচার ভিতর মানুষ দেখে হাতীটা শুঁড় ঘুরিয়ে ভীষণ চীৎকার করে উঠল। খাঁচার বাইরে যারা দাঁড়িয়েছিল, ভয়ে তারা বিশ হাত তফাতে সরে গেল। কিপলিংও সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে উঠলেন। তাঁর মুখ দিয়ে অনর্গল যে অদ্ভুত ভাষা নির্গত হতে লাগল, তা পশুশালার অধ্যক্ষ বুঝতে পারলেন না। সবাই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কিপলিং-এর কথা শুনে হাতীটা ধীরে ধীরে শুঁড় নামালো। কী আশ্চর্য্য! শান্ত হল তার ভঙ্গী! বড় বড় দুই কান নেড়ে সে যেন কিপলিং-এর কথা শুনতে লাগল।

আরও কিছুক্ষণ ধরে নানা ভঙ্গিমায় কিপলিং হাতীটার সঙ্গে কথা বললেন। তারপর তার কাছে এগিয়ে গেলেন। হাত বুলিয়ে দিলেন তার শুঁড়ে, কপালে, গলায়। দুই চোখ স্তিমিত করে হাতীটা দুলতে লাগল। আনন্দে আর আবেগে সে যেন গদ গদ হয়ে পড়েছে। কিপলিং তার মুখে খাবার তুলে ধরলেন। হাতী খেতে লাগল। আধঘণ্টায় সমস্ত আহার্য্য উজাড় করে দিলে।

খাঁচার ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন কিপলিং।

মহা খাতির তখন তাঁর। দু'হাত ধ'রে অধ্যক্ষ তাঁকে আপিস কামরায় নিয়ে গিয়ে বসালেন। বললেন—"মশায়, কি মন্ত্র পড়লেন? ভারতীয় মন্ত্র?'

পাগড়ী আর তোয়ালে খুলে রেখে কিপলিং বললেন—"বিশদ বিবরণ শুনে কাজ নেই। তবে আমি যা বললাম তা কোন মন্ত্র নয়, তা হচ্ছে ভারতবর্ষের পার্ব্বত্য-অঞ্চলের ভাষা। হাতীটা ওই ভাষা শুনতে অভ্যস্ত। আপনারা বলছেন, কোন ভারতীয় রাজা তাঁর পোষা হাতীকে আপনাদের উপহার দিয়েছেন। তা, হাতীর মাহুত কোথায়? সে সঙ্গে আসেনি?"

মাথা নেড়ে অধ্যক্ষ বললেন—"এসেছিল, কিন্তু আবার একটা বাড়তি খরচ ব'লে মাহুতকে আর রাখিনি। পরশু সকালে তাকে জবাব দিয়েছি। আগামী সপ্তাহে সে ভারতে ফেরবার জাহাজ ধরবে।"

কিপলিং হেসে বললেন—"হাতী পোষবার সখ আছে অথচ তার মাহুত রাখবেন না, তা হয় না। সেই মাহুতকে ফিরিয়ে আনুন। মাহুতকে না দেখতে পেলে হাতী খাবে না। না খেয়ে আর চীৎকার করে করে মারা পড়বে।"

বলা বাহুল্য, পশুশালার অধ্যক্ষ মশায় কিপলিং-এর উপদেশ অনুসারে কার্য্য করেছিলেন।



বিশ্বসাহিত্য

নরেন্দ্র দেব

জার্মাণ দেশের কয়েকটি প্রেমের গান

সাত আটশো বছর আগের কথা। য়ুরোপে তখন ক্রুশেডের যুগ। এ যুগের য়ুরোপের কথা আমরা যখন পড়ি, মনে পড়ে মহাভারতের মানুষগুলির আশ্চর্য ইতিহাস। শক্তি, সাহস, বীর্য ও পৌরুষ ছিল সে যুগের য়ুরোপের রাজপুরুষ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কাছে সবচেয়ে বড় সম্পদ। সে কালটাই ছিল যেন মহামানব বা অতিমানবের কাল। এই সময়টায় য়ুরোপের কত যে অসামান্য বীরপুরুষ, সাধু পুরুষ ও আত্মত্যাগী নরনারীর অলৌকিক কাহিনীর বিবরণ পাওয়া যায় তার সংখ্যা হয় না।

সেকালের এবং পরবর্তী কালেরও মানুষেরা ভোলে নি তাদের স্বজাতীয়দের সেই দুর্দমনীয় প্রবল স্বাধীন ইচ্ছা, মানুষের প্রতি তাদের চরম নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতা, তাদের সাম্রাজ্য-শাসনের নির্দয় দক্ষতা, তাদের অতৃপ্ত সমর-পিপাসা ও অক্লান্ত রণোন্মাদনা, বিপদ সংকুল কাজে নির্ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার একটা অদম্য উৎসাহ, জীবনে কোনও কিছু বৃহৎ ও মহৎ কাজ করে যাবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং প্রেমের জন্য দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে অকুতোভয়ে প্রাণ তুচ্ছ করে এগিয়ে যাওয়া। নারী ও পৃথিবী ছিল সেদিন একমাত্র বীরভোগ্যা।

সেযুগের সাহিত্যেও দেখা যায় এই সকল কাহিনীই ছিল উপজীব্য। সেকালের কবিরা ওই সব ব্যাপার নিয়েই কাব্য রচনা করতেন। আজকের মানুষের জীবন থেকে যুদ্ধ-পিপাসা যায়নি, কিন্তু বীর্য, শক্তি, বাহুবল ও পৌরুষ আজ আর তাদের নেই। নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতা আছে, কিন্তু অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবার সে দুর্নিবার জিদ নেই। সর্বরকম বিপদসংকুল কাজ এড়িয়ে চলাই বর্তমানের নীতি। জীবনে মহৎ কাজ কিছু করে যাবার আকাঙ্ক্ষা এখন বিরল। 'লুটে নাও যত পারো' রব উঠেছে চোরাকারবারী ব্যবসায়ী মহলে। একালের মানুষ যে সেকালের মানুষের চেয়ে কত নেমে গেছে এইখানেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এখন আর দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয় না—আদালতে মামলা রুজু হয়।

সে যাই হোক, প্রাচীন কবির গানে ও গাথায় অক্ষয় হয়ে আছে—তাঁদের কালের বহু বীরত্বকাহিনী ও প্রেমের চিত্তাকর্ষক রহস্য! কেবলমাত্র বর্তমান নিয়ে থাকলে অতীতের অপরিমেয় ঐশ্বর্য ভোগের সুযোগ মিলবে না আমাদের কোনও দিনই। মাঝে মাঝে সেকালের যবনিকা তুলে দেখলে বিস্ময়ে মুগ্ধ ও অবাক্ হয়ে যেতে হবে। সেই সব বীরপুরুষদের বর্ম চর্ম খুলে নিলে দেখা যাবে তাঁরাও আমাদেরই মত মানুষ ছিলেন। সেই খ্যাতি ও প্রতিপত্তি এবং প্রেম ও ঐশ্বর্যের কাঙাল!

একখানি জার্মাণ কাব্য সঙ্কয়নের কথা বলছি আজ। বইখানির নাম—"Des Minnesangs Frvhling" এর ইংরিজী অনুবাদ—"The spring of the songs of Love—প্রেম সংগীতের বসন্ত।" এ ধরণের কবিতাকে সমালোচকেরা বলেন 'রোম্যান্টিক' রচনা। কিন্তু এ কথা যে কত বড় ভুল তা রোম্যান সাহিত্য আলোচনা করলেই বোঝা যায়। খৃষ্টপূর্ব যুগে গ্রীস ও এথেন্স ছাড়া রোমে কাব্য সাহিত্যের কোনও অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং কবিতার আস্বাদ খৃষ্টপূর্ব রোম সম্ভবতঃ জানতোই না। অন্ততঃ জুলিয়াস সীজারের সময় পর্যন্ত বোধকরি নয়। কবিতার জন্ম কবে ওদেশে হয়েছিল তার কোনও সন তারিখ পাওয়া যায় না। তবে একথায় বলা চলে যে আড়াই হাজার বছর আগেও গ্রীস ও এথেন্সে এর অস্তিত্বের সন্ধান মেলে।

যাক সে প্রত্নতত্ত্বের কথা। কবিতার সন্ধান যেদিন থেকে পাওয়া গেছে তাতে দেখা গেছে যে প্রাচীন হলেও কবিতাগুলি বেশ ভাব-সমৃদ্ধ। বিশেষজ্ঞেরা বলেন এগুলি 'সেন্টিমেণ্টাল' কবিতা—জাতি কুলের দিক থেকে বরং তাকে 'টিউটনিক সাহিত্য' বলা চলে। কোনও বিশেষ দেশের সত্ত্ব-স্বামিত্বের দাবী খাটে না সেগুলির উপর। কবিতাগুলির আত্মা ও প্রাণ বিশুদ্ধ 'টিউটনিক' গোত্রীয়। যদিও এর ধ্বনি, ছন্দ, মাত্রা, যতি, মিল, ব্যঞ্জনা ও কল্পনা প্রভৃতি আঙ্গিক দেখলে এরা দক্ষিণ য়ুরোপের ঈষদুষ্ণ আবহাওয়ার মধ্যে লালিত বলেই মনে হয়। এই ভাবপ্রধান কবিতাগুলি মস্তিষ্ককে নাড়া দেওয়ার চেয়ে হৃদয়কেই দোলা দেয় বেশি। অর্থাৎ এগুলি বহির্মুখী নয়—অন্তর্মুখী। আধুনিক সমালোচকদের ভাষায় যাকে বলা চলে—এগুলি 'অবজেকটিভ' বা বস্তুতান্ত্রিক রচনা নয়, এগুলি 'সাবজেকটিভ' বা আত্মিক কাব্য। আর একটা কথা বলা যায় যে, এ রচনাগুলি খুব বেশি পুরাতন বলেই একে ঠিক 'ক্ল্যাসিক' কবিতা বলা চলে না, বরং 'গথিক' বা আদিম সরল ভাবাপন্ন রূঢ় কবিতা বলা চলে। অতি-আধুনিক বা যুদ্ধোত্তর কবিতা বলে এযুগে যে সব রচনা পত্রপত্রিকায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করছে—এগুলিকেও সেই দলেই ফেলা যায়। ক্ল্যাসিক রচনা আমাদের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতিকে পরিতৃপ্ত করে চিত্তশুদ্ধি ঘটায়, আর 'গথিক' রচনা নিয়ে যায় আমাদের মানসিকতাকে স্থূল বাস্তবের রাজ্যে। এক কথায় বলা চলে—ক্ল্যাসিক কবিতা মানুষকে দেবত্ব দান

করে, আর গথিক কবিতা দেবতাকে মানুষে পরিণত করে। এ জার্মাণ মনীষী ম্যাক্সমুলারের কথা।

সমালোচকদের বড় বড় বুলি ও ফাঁকা আওয়াজ ছেড়ে আসল কাজে হাত দেওয়া যাক এবার! ভেবে দেখুনতো হোমারের 'হেলেনা' আর দান্তের 'বিয়েত্রিচ্' কোন রসিককে না মুগ্ধ করবে? ভেনাস্ স্তে মেলোর মূর্তি বা 'ম্যাডোনা'র মর্মর সৌন্দর্য কার না দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করবে? 'মনালিসা'র ছবি বা 'ক্রুশবিদ্ধ যীশু'র প্রতিকৃতি কার হৃদয়কে না নাড়া দেবে? শিল্পের সার্থকতা সেইখানে। যে কবিতার অর্থ খুঁজতে গিয়ে পাঠকের কাছে সেটা দুর্বোধ্য হেঁয়ালী বলে মনে হবে, সে কবিতা যে রসের দিক থেকে ব্যর্থ রচনা একথা বলাই বাহুল্য। রচনা সেখানেই সার্থক হয়ে উঠবে, যেখানে কবিতাটি পড়তে পড়তে কবির মনোভাব তার পাঠকদের মনেও তদ্‌ভব ও তৎসম হয়ে সঞ্চারিত হবে।

যে জার্মাণ কাব্য-সঞ্চয়নখানির কথা বলছি সেখানিতে কুড়িটি জার্মাণ কবির রচনাসংগ্রহ স্থান পেয়েছে। এগুলি সব লেখা হয়েছিল ১১৭০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১২৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। এই সময়টাই য়ুরোপে 'ক্রুশেডের যুগ' বলে খ্যাত। অতএব এই কুড়িজন কবিকেই ক্রুশেড যুগের কবি বলা চলে। জার্মাণীতে তখন হোহেনস্তাউফেন বংশের সম্রাটেরা রাজত্ব করছেন। ক্রুশেড অভিযানে তাঁরাও যোগ দিয়েছিলেন। জার্মাণীর তখন সকলদিক দিয়েই অবস্থা খুব ভাল। কাব্যক্ষেত্রেও তার সে সময় বসন্তোদয়।

কাব্যসঞ্চয়নখানির অন্যতম সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত টাইক ভূমিকায় বলেছেন—"সে যুগে ভগবত-বিশ্বাসীরা ধর্মসঙ্গীত রচনা করেছিলেন, প্রণয়াভিভূতেরা প্রেমসঙ্গীত রচনা করেছিলেন, নাইটরা বীরত্ব, সংগ্রাম ও সুন্দরীদের ভালবাসার গান গেয়েছিলেন। বসন্তের আনন্দোজ্জ্বল রূপটি সবার মনকেই ছোঁয়া দিয়ে চঞ্চল করে তুলেছিল। এ আনন্দ উপভোগে কখনো ক্লান্তি আসে না। একদিকে দুঃসাহসিক দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ, আর একদিকে দুর্দান্ত সমরাভিযান, বীরবৃন্দের অমিত শক্তির পরিচয় যেমন সেদিনের সকল মানুষের বুকে একটা বিপুল গৌরবানুভূতি এনে দিয়েছিল, তেমনি ক্রুশেডের যুগে মানুষের ধর্মবোধও এত বেশী উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল যে ধর্ম ও উপাসনা মন্দিরের ছায়ায় এসে বাস্তবকে আড়াল করে কল্পনাকেই প্রভাবিত করেছিল। প্রতি প্রেমাবনত হৃদয়ও সেদিন প্রণয়মুখর হয়ে উঠে কাব্যের বসন্তকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। মানুষের এত বড় বাহাদুরী আর কিছুতে নেই। সে আদিরিপু কামকে জয় করে প্রেমের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। ছন্দমধুর ও ভাবসুন্দর কবিতা-সৃষ্টির গৌরবও তার এক অতুলনীয় কীর্তি!

দ্বাদশ শতাব্দীরও পূর্বের একটি রচনার কিয়দংশ এখানে আমরা উদ্ধৃত করছি। এর ভাষা যেমনি সরল তেমনি সাধারণ। [illegible] এর মধ্যে যে সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তা সর্বমানবের [illegible] সত্য। এর মধ্যে কল্পনার সূক্ষ্ম তত্ত্ব দিয়ে অতীন্দ্রিয় কিছু [illegible]বার চেষ্টা হয় নি। এর আগা গোড়াই সত্য বলে অতি সহজ কথায় বর্ণিত, সুতরাং কল্পনার রং সেই সত্যকে চাপা না দিয়ে বরং আরও বেশি করে ফুটিয়ে তুলেছে। কাব্যের প্রাণ-বস্তুই হ'ল সত্যানুভূতি, যা রচনার মধ্যে আন্তরিকতা নিয়ে আসে, এ কথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই। মিথ্যা যা তা মিথ্যাই। অলীক উচ্ছ্বাস কখনো পাঠকের চিত্ত স্পর্শ করতে পারে না। একটি কবিতা শুনুন।

"দিয়েছ' ব্যথা আমার বুকে
অনেকদিন ও অনেক বার,
পাবার লোভে' চেয়েছি মুখে
আমার যাহা নয় পাবার
হবে না কভু জীবনে জয়—
এ কথা বড়ই দুঃখময়!
আমি তো চাহি না স্বর্ণ রৌপ্য
চেয়েছি শুধুই একটি হৃদয়! (অজ্ঞাত)

কত সহজ, কত সরল, কত অনায়াস অভিব্যক্তি।

জার্মাণ প্রেমের কবিতার বিশেষত্বই হচ্ছে বসন্তের নির্মল আকাশেও তারা কালোমেঘ দেখতে পায়। একজন ভাবুক জার্মাণ যুবকের হৃদয় স্বভাবতই দুঃখের স্পর্শ ছাড়া কখনো নিরপেক্ষ সুখ অনুভব করতে পারে না। একটি ক্ষুদ্র গীতিকাই বলুন, অথবা প্রাচীন জার্মানীর প্রসিদ্ধ লোক-সাহিত্য জাতীয় মহাকাব্য "নাইবেলুঙ্", কিংবা জার্মানীর প্রাচীন মহাকবি উল্‌ফ্রামের 'পার্সিভ্যাল' বা 'হোলিগেল' প্রভৃতি দুর্দান্ত ভাবগম্ভীর কবিতা, এর যে কোনও একটি রচনা বিচার করে দেখলেই দেখা যাবে—সবেতেই একটু হাসিকান্নার চুনি পান্না মেশানো! একটু আলো-ছায়ার খেলা তাতে আছেই। আনন্দের মধ্যেও কি যেন একটা দুঃখের আশঙ্কায় অজানা বেদনার অনুভূতি, অথবা, অসীম দুঃখের ঘন অন্ধকারের মধ্যেও কোথায় যেন একটু আশার আনন্দ-দীপ মৃদু আলো দেখায়! আর, সমগ্র কাব্যের মধ্যে পাওয়া যায় আশ্চর্য এই পৃথিবীর দিকে কী যেন শুব্ধ গম্ভীর বিস্ময়ে অবাক হয়ে ভাবুক কবির চেয়ে থাকা।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত জার্মান মহাকাব্য "নাইবেলুঙ্" শেষ পর্যন্ত এই কথাই বলতে চেয়েছে যে—আনন্দের পর বেদনা অপরিহার্য।

যে কাব্যগ্রন্থখানির পরিচয় দিচ্ছি—তার মধ্যে যে সব কবিতা স্থান পেয়েছে, তাতে কেবলমাত্র প্রেমেরই প্রাধান্য বললে ভুল বলা হবে। এর মধ্যে আছে প্রেমাস্পদের প্রতি অবিচলিত বিশ্বাসের চিত্র, আছে আত্মমর্যাদার অপূর্ব দৃষ্টান্ত। প্রাচীন প্রেমের কবিতা যখন—তখন নিশ্চয় এ গুলি আদিরসাত্মক হবে—এ মনে করলেও ভুল করা হবে। প্রেম এখানে আধুনিক কবিদের রচনার মতো কেবলমাত্র দেহের লালসা বা কামনার উদগ্র প্রকাশ নয়, প্রেম এখানে সমস্ত মনটিকে ব্যাপ্ত করে ফেলেছে প্রেমাস্পদের শুভ চিন্তায়। এখানে প্রেমের সঙ্গে আছে শ্রদ্ধা, প্রীতি ও প্রিয়তমের মধুর স্মৃতি। তবু জানবো এ কাব্যসংগ্রহের অধিকাংশ রচনাই আনন্দরসে সিক্ত নয় বরং অশ্রুজলে ভেজা। হাসির বুকে কান্না,—কান্নার অন্তরে হাসি।

অবশ্য একথা অস্বীকার করা চলবে না যে উনবিংশ শতাব্দীর কবিদের

রচনার মধ্যেও এই একই জিনিসেরই পুনরাবৃত্তি দেখা গেছে, সুতরাং দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর রচনা আমাদের কাছে কিছুমাত্র অপরিচিত মনে হয় না। বরং একালের কবিতার দুরূহ দুর্বোধ্যতার তুলনায় এই প্রাচীন জার্মান কবিতাগুলি অনেক সরল, সাদাসিধা ও সহজবোধ্য। এর মধ্যে কোনও কঠিন প্রয়াসের পরিচয় নেই, বরং অত্যন্ত অনায়াস-জাত বলে মনে হয়। পাঠককে খুশী করবার বা চমক লাগাবার কোনও দুরভিসন্ধি খুঁজে পাওয়া যাবে না। নিজের পাণ্ডিত্য প্রচারের গুপ্ত বিজ্ঞপ্তিও নেই এর মধ্যে। সেদিনের কবিরা ছিলেন আত্মভোলা প্রেমিক।

দু'একটি কবিতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার দুশ্চেষ্টায়—কিছু অনুবাদ করে দিচ্ছি বটে এখানে, কিন্তু কাজটা একেবারেই সহজ নয়। যার ইংরিজী অনুবাদ করাও একান্ত কঠিন, তার বাংলা অনুবাদ যে দুঃসাধ্য একথা বলাই বাহুল্য। তবে যদি কোনও রকমে কবির প্রকৃত মনোভাবটা পৌঁছে দিতে পারি অনুবাদের মাধ্যমে সবার কাছে—সেইটেই হবে মূল কাব্যের দিগ্বিজয়। কারণ, কাব্যের শ্রেষ্ঠতা সেইখানেই প্রমাণ হয় যখন অনুবাদেও তার রসের হানি ঘটে না।

একটি কবিতার আরম্ভটা শুনুন—

"একাকী দাঁড়ায়েছিল একটি রমণী,
চেয়েছিল একদৃষ্টে—বনের ওপারে ;
প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে ছিল প্রণয়ীর,
কখন আসবে তার প্রেমমণি ?
দেখলো একটি পাখী উড়ে যায় আকাশের বুকে
ডেকে তাকে বলে, 'পাখী তুমি কত সুখী !
যখন যেখানে খুশী যেতে পারো উড়ে।
আমি যে বেসেছি ভালো, আমি বড় দুখী
পারিনে যে ছুটে যাই, মরি তাই প্রেমানলে পুড়ে !"
(Dietmar Von Eist)

আজকের দিনে আমাদের কাছে এ কবিতা নেহাৎ যেন 'পাখী সব করে রব' গোছ সাদাসিধে এবং 'জোলো' মনে হবে। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না, যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর জার্মান প্রেমিকেরা এই সব প্রেমের কবিতা নিয়েই রীতিমতো মশগুল হয়েছিলেন। মাত্র পঞ্চাশ ষাট বছর আগেও আমাদের দেশে এই শ্রেণীর প্রেমের কবিতাই প্রচলিত ছিল, যেমন—"যাও পাখী বলো তারে সে যেন ভোলেনা মোরে !"

ওরই মধ্যে একটু উঁচুদরের রচনা যা আছে তা' এই রকম—

আমার হৃদয় সূর্যের সম উঁচু
কারণ, একটি মেয়ে, যেখানেই থাক, তার
রূপের হয় না কম বেশ, স্বভাবের হয় না বদল,
সে করেছে মুক্ত মোরে সর্ব দুঃখ হতে।
তাকে দিতে পারি হেন ধন মোর কিছু নেই, প্রাণ ছাড়া,
কিন্তু প্রাণ যে তারই ! নহে মোর। সুন্দরী তবু আনন্দ শুধু দেয়।
আমার মনটা করে তোলে সে যে উঁচু
কত কি যে করে আমারই তরে সে যখনি ভাবি। (Reinmar)

ইংলণ্ডের রাণীর প্রতি যে জার্মানদের লোভ বরাবর ছিল তার প্রমাণ স্বরূপ আর একজন কবি বলেছেন—

"সারা বিশ্ব আমার হ'ত যদি
সাগর থেকে সুদূর রাইন নদী
সব করিতাম দান তারে, দিতাম প্রাণটাবধি,
ইংলণ্ডের রাণীকে মোর বুকে পেতাম যদি ! (অজ্ঞাত)

গান

শ্রীরবি গুপ্ত

কত যে সাধি গান জীবন ভরি' মম
হারালো সবি তারা জানি না প্রিয়তম ;
তোমার প্রাণে যদি একটি বাজে কভু
সবার বিফলতা ধন্য মানি তবু !

জীবন ডালা ভরি' সাধের ফুলগুলি
সাজায়ে সযতনে তোমার পায়ে তুলি ;
ধূলায় ঝরে কেহ, কেহ বা মূরছায়
একটি তবু যদি চরণ তব পায় !

আমার নিবেদনে, অর্ঘ যত মম
সাজাই দীপমালা শূন্যশিখাসম ;
একটি যদি ওঠে জাগিয়া আলোধারে
শূন্যশতদীপে জ্বালিতে সেই পারে !

প্রহর ভরি কত কত না মালাগাঁথা
কেবলি বেদনার অশ্রু-সুর-সাধা ;
জীবন-শিখা যদি ধরিয়া আলো তব
তোমারি উল্লাসে জাগো হে অভিনব।

সাংখ্যদর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

জগতের অভিব্যক্তি

পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানে অভিব্যক্তি এক বিস্তৃত স্থান অধিকার করিয়া আছে। সাংখ্যদর্শনও অভিব্যক্তির দর্শন। ইহার সহিত পাশ্চাত্য দর্শনের অভিব্যক্তির বিরোধ না থাকিলেও, ইহা ভিন্ন প্রকারের। ইমানুএল ক্যান্ট সূক্ষ্ম নীহারিকা হইতে জগতের উদ্ভব হইয়াছে—বলিয়াছিলেন। নীহারিকা অনিবিড়-সন্নিবিষ্ট পরমাণু-পুঞ্জের সমবায়। সাংখ্য মতে বর্ত্তমান জগৎ যে প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত, তাহাও সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামক অসংখ্য অতিসূক্ষ্ম দ্রব্যের সমবায়। তাহারা পরমাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, মন ও বুদ্ধি অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর। সূক্ষ্ম হইতে স্থূলত্বপ্রাপ্তিই সাংখ্যের অভিব্যক্তি। এই স্থূল কার্য্য। তাহা জগৎ সূক্ষ্মরূপে তাহার কারণ প্রকৃতির মধ্যে ছিল, তাহা হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে, ইহাই সাংখ্য মত।

প্রকৃতি হইতে এক দিকে যেমন জ্ঞানের করণদিগের, তেমনি জ্ঞানের বিষয়েরও উদ্ভব হইয়াছে।

জগৎ আদিতে কি অবস্থাপন্ন ছিল ইহা জানিতে অতি প্রাচীনকাল হইতেই মানব-মন উৎসুক-গ্রহ-উপগ্রহসমন্বিত সৌর জগৎ বর্ত্তমানে যে অবস্থায় আছে, চিরকালই কি সেই অবস্থায় আছে, অথবা কোন এক বিশেষ কালে ইহার সৃষ্টি হইয়াছিল? জগতের সৃষ্টি যদি কোনও সময় হইয়া থাকে, তাহা হইলে জগতের উপাদান নিচয় কি পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ছিল অথবা তাহাদেরও সৃষ্টি হইয়াছে? সাংখ্যের মতে জগতের সৃষ্টি হয় নাই, তাহার উপাদান সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ চিরকালই বর্ত্তমান আছে, তবে এক সময় ছিল যখন তাহারা অব্যক্ত ছিল জগৎরূপে প্রকাশিত হয় নাই। জগৎরূপে তাহাদের ব্যক্ত হওয়াই সৃষ্টি। কিন্তু ব্যক্তি বা সৃষ্টি একবার মাত্র হয় নাই। সৃষ্টি প্রবাহ অনাদি একবার সৃষ্টি হইয়াছে, সেই সৃষ্টির লয় হইয়াছে, আবার নূতন সৃষ্টি হইয়াছে; এই ভাবে সৃষ্টি ও প্রলয় অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। তাহার আদি নাই; অন্ত কোনও দিন আসিবে কিনা, কে জানে?

বর্ত্তমান কল্পের আরম্ভ কবে হইয়াছে, পঞ্জিকাতে তাহার উল্লেখ থাকিলেও সাংখ্যকার তাহা বলেন নাই। এই কল্পের পূর্ব্বে যে প্রলয়াবস্থা ছিল, তাহা ছিল সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা। তখন এই স্থূল জগৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ রূপে সূক্ষ্মাবস্থায় ছিল। সেই প্রলয়াবস্থা হইতে বর্ত্তমান জগতের জীবসমন্বিত জগতের উদ্ভব হইয়াছে। এই উদ্ভব হইয়াছে ক্রম অনুসারে। ক্রমানুসারে উদ্ভবই অভিব্যক্তি। সৃষ্টি ও প্রলয় যখন আদিহীন, তখন প্রথম সৃষ্টি কি ভাবে হইয়াছিল, সে প্রশ্নের অবকাশ নাই।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে যে অভিব্যক্তির কথা বলে, তাহার কোনও লক্ষ্য আছে, এ কথা বলে না; যদিও সরল হইতে জটিলের দিকে এবং নিম্ন হইতে উর্দ্ধ দিকে এ পর্য্যন্ত অভিব্যক্তি হইয়াছে, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সাংখ্যকার অচেতন প্রকৃতির মধ্যে অনুস্যূত (immanent) এক লক্ষ্যের বা উদ্দেশ্যের কথা বলিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যের জ্ঞান প্রকৃতির নাই, কেননা প্রকৃতি অচেতন। না থাকিলেও প্রকৃতির যাবতীয় কার্য্য এমন ভাবে চলে, যাহাতে তাহার মধ্যে অনুস্যূত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। এই উদ্দেশ্য পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ-সাধন। পুরুষ তাহাকে ভোগ করিবে, ইহাই প্রকৃতির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট উদ্দেশ্য। ভোগ অর্থে কেবল সুখ-দুঃখের ভোগ নহে; "জানা"ও একপ্রকার ভোগ। এই ভোগ দ্বারাই পুরুষের বন্ধন হয়; সেই বন্ধন হইতে তাহার মুক্তি সাধন ও প্রকৃতির উদ্দেশ্যের অন্তর্গত।

উদ্দেশ্য আছে, অথচ সেই উদ্দেশ্যের জ্ঞান নাই, ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ক্ষুদ্র বটবীজ হইতে যে বৃহৎ বটবৃক্ষের উদ্ভব হয়, আম্রবৃক্ষ উদ্ভূত হয় না, ইহা তো দেখিতে পাওয়া যায়। বটবীজ তো জ্ঞানহীন। তবুও মৃত্তিকার মধ্যগত বটবীজের প্রত্যেক ক্রমিক পরিবর্ত্তন বটবৃক্ষের দেহের গঠনের উপযোগী হইয়াই সংঘটিত হয়। ইহাই বটবীজের "প্রকৃতি"।

> সাংসিদ্ধিকী স্বাভাবিকী, সহজা, অকৃতা যা,
> প্রকৃতিঃসেতি বিজ্ঞেয়া, স্বভাবং ন জহাতি যা॥
>
> গৌড়পাদ

যাহা সাংসিদ্ধিক, স্বাভাবিক, সহজ ও অকৃত, যাহা নিজের ভাব ত্যাগ করে না, তাহাই প্রকৃতি। প্রকৃতির "প্রকৃতি"ও এইরূপ। কেহ কেহ বলিবেন বটবীজের নিজের মধ্যে কোনও সচেতন উদ্দেশ্য যদি না থাকে, তাহা হইলে তাহার বহিস্থ কোনও জ্ঞানময় পুরুষে সেই উদ্দেশ্য আছে; ঈশ্বর তাঁহার উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বটবীজ আপনার উদ্দেশ্য অনুসারে পরিণামিত করেন। সাংখ্যকার বলিবেন, এতাদৃশ ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ নাই। প্রকৃতির বাহিরে যে সকল পুরুষ আছে, তাহাদেরও এরূপ কোনও উদ্দেশ্য নাই। তাহার ব্যক্তিরিক্ত অন্যবিধ কোনও পুরুষও নাই। জগতের অভিব্যক্তির মূলে যে উদ্দেশ্য আছে, তাহার ধারক কোনও সচেতন জ্ঞানবান্ পুরুষের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই।

উপনিষদে কিন্তু জগৎসৃষ্টি মূলে এক জ্ঞানময় পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকৃত। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে "সদেব সোম্য ইদম্ অগ্রে আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং। তৎ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি।" হে সৌম্য, এই জগৎ অগ্রে এক অদ্বিতীয় সৎ স্বরূপেই বর্ত্তমান ছিল। সেই সৎ-স্বরূপ সংকল্প করিলেন "আমি বহু হই; আমি জন্মগ্রহণ করি।" এই

অদ্বিতীয় "সৎ" সাংখ্যেতে প্রধান কিনা, এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। বাদরায়ণ তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে বলিয়াছেন "না, এই সৎ প্রধান নহে।" ঈক্ষতে নাশব্দম্ (ব্র-সূ-১।৫)—কেন না এই সৎ ঈক্ষা করিয়াছিলেন। সাংখ্যের অচেতন প্রকৃতি ঈক্ষা বা সংকল্প করিতে পারে না।

মহতের অভিব্যক্তি

সাংখ্যমতে অভিব্যক্তির ক্রম এইরূপ—

মূলপ্রকৃতিঃ অবিকৃতিঃ। মহাদাদ্যাঃ প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকস্তু বিকারঃ। ন প্রকৃতিঃ ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ—সাংকা ৩।

মূল প্রকৃতি কোন পদার্থের বিকার নহে। মহৎ, অহংকার ও পঞ্চ-তন্মাত্র—এই সাতটি যেমন প্রকৃতি তেমনি বিকৃতি। অর্থাৎ প্রকৃতির বিকার মহৎ, মহতের বিকার অহংকার, অহংকারের বিকার পঞ্চ-তন্মাত্র, এই অর্থে মহৎ, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র বিকৃতি। প্রত্যেকটি তাহার পূর্ব্ববর্ত্তীর বিকার। কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকে আবার তাহার পরবর্ত্তীর কারণ, এই জন্য তাহাদিগকে প্রকৃতিও বলা হয়। সুতরাং সাতটি "প্রকৃতি-বিকৃতি।" ইহাদের পরে ১৬টি—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং উভয় সাধারণ মনঃ-এবং পঞ্চ স্থূল ভূত, এই ষোলটি—কেবল বিকার। তাহারা অন্য কিছুর কারণ নহে—তাহাদিগের হইতে অন্য কিছুই উদ্ভূত হয় না। তার পরে পুরুষ। পুরুষ প্রকৃতিও নহে, বিকৃতিও নহে। অর্থাৎ পুরুষ যেমন কিছুর কারণ নহে; তেমনি তাহার কোনও কারণও নাই। প্রকৃতির মতই স্বয়ম্ভু (Causa Sui) ও অনাদি।

"সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ। প্রকৃতে মহান্, মহতো অহং-কারঃ, অহংকারা পঞ্চতন্মাত্রাণি, উভয়ম্ ইন্দ্রিয়ং, মনশ্চ। তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূল ভূতানি, পুরুষ, ইতি পঞ্চবিংশতিঃ গণঃ। সাং সূত্র—১।৬১

আদিতে সত্ত্ব-রজঃ ও তমো গুণের সাম্যাবস্থা—যাহার নাম প্রকৃতি। প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহংকার; অহংকার হইতে এক দিকে পঞ্চতন্মাত্র, অন্যদিকে একাদশ ইন্দ্রিয়, তন্মাত্র হইতে স্থূলভূতগণ। এতৎ ব্যতীত পুরুষ। এই পঞ্চবিংশসংখ্যক "গণ"। এই পঁচিশটি পদার্থমাত্র জগতে আছে; ইহাদের অতিরিক্ত কোনও পদার্থই নাই। ইহারা দ্রব্য। ন্যায়দর্শন মতে দ্রব্য সংখ্যা নয়টি—পঞ্চভূত ও দিক্, কালঃ মনঃ ও আত্মা। ইহাদের মধ্যে পঞ্চভূত, মনঃ ও আত্মা সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অন্তর্গত। দিক্ ও কাল সাংখ্যমতে স্বতন্ত্রদ্রব্য নহে—তাহারা আকাশ প্রকৃতিভূত প্রকৃতির গুণ বিশেষ এই। (দিক্—কালাবাকাশাদিভ্যঃ। সাং-সূ—২।১২)। আকাশ পঞ্চতন্মাত্রের একটি—প্রকৃতি-বিকৃতি। দিক্ ও কাল আকাশের গুণ। এই জন্যই তাহারা আকাশের মত সর্ব্বব্যাপী ও নিত্য—নিত্যত্ব ও সর্ব্বব্যাপিত্বই বিভুত্ব। দিক্-ও-কাল-সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

অধ্যাপক দাসগুপ্ত বলেন—প্রলয়ান্তে যখন সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখন সমগ্র প্রকৃতি মহৎরূপে ব্যাকৃত হয় না। প্রকৃতি অসীম, তাহার একটি অংশ-মাত্র ব্যাকৃত হয়। অসীমের একটি অংশ তাহার বাহিরে গেলেও, অসীম অসীমই থাকে। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির ব্যাকৃত অংশ তাহার বাহিরে যায় না; প্রকৃতির মধ্যেই বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত অবস্থায় থাকে। প্রকৃতির অংশ-বিশেষের সাম্যাবস্থার, বিচ্যুতি ঘটিলেও, অবশিষ্ট অংশ সাম্যাবস্থাতেই থাকে। মহতের যখন আবির্ভাব হয়, তখন মূল প্রকৃতির আয়তন সংকুচিত হয় না। আবার মহৎ হইতে যখন অহংকারের উদ্ভব হয়, তখন যদিও মহতের অন্তর্গত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণকণাদিগের একাংশ অহংকারে রূপান্তরিত হয়, তথাপি তাহা দ্বারা মহতের পরিধির হ্রাস হয় না। অনন্ত অব্যক্ত হইতে নূতন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ কণিকা আসিয়া অহংকারে পরিণত মহৎকণিকাদিকের স্থান পূর্ণ করে। এইরূপে সমগ্র অভিব্যক্তিক্রম চলিতে থাকে।* যখন অভিব্যক্তির শেষ ক্রম উপস্থিত হয়, তখন তত্ত্বান্তর পরিণাম হয় না—এক তত্ত্ব হইতে তত্ত্বান্তরের উদ্ভব আর হয় না। তখন কেবল ভৌতিকও রাসায়ণিক পরিবর্ত্তনবশতঃ বস্তুর গুণের ব্যতিক্রম হয়।

ডাঃ শীল লিখিয়াছেন, যে সাংখ্যের অভিব্যক্তি হইতেছে সাম্যাবস্থার মধ্যেই বৈষম্যের আবির্ভাব, অবিশেষের মধ্যে বিশেষের বিকাশ, অযুত-সিদ্ধের (Incoherent) মধ্যে যুতসিদ্ধের (Coherent) উদ্ভব। ইহা বিভিন্ন অংশের সমবায় হইতে কোনও সমগ্র বস্তুর উদ্ভব নহে। আবার সমগ্র বস্তুর মধ্যে তাহার বিভিন্ন অংশের বিকাশও নহে। অপেক্ষাকৃত অল্প বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত, অল্পনির্দিষ্ট, অল্প-সংহত অবস্থা হইতে অধিকতর বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত, অধিকতর নির্দিষ্ট, অধিকতর সমগ্রতার বিকাশই অভিব্যক্তির ক্রম। প্রকৃতির মধ্যে থাকিয়াই এই সকল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়।

অসীম প্রকৃতির এক অংশমাত্র ব্যাকৃত হইয়া জগতে পরিণত হয়। ইহার অর্থ প্রকৃতি যেমন জগদ্রূপে পরিণত, তেমনি জগদতীত। চরক-সংহিতা মতে অব্যক্ত প্রকৃতি পুরুষ। এই পুরুষ যেমন জগতে অনুস্যূত (immanent), তেমনি জগদতীত (traus-cendent)।

প্রকৃতির প্রথম সন্তান মহৎ। মহৎ শব্দের অর্থ বৃহৎ। মহৎ শব্দ মহ্ ধাতু হইতে উদ্ভূত হইলে, উহার অর্থ হইতে পারে পূজনীয়। (মহ্ =পূজা করা)। অমরকোষে এক মহস্ শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে "উৎসব।" (মহ উদ্ধব উৎসবঃ)। আর এক "মহস্" শব্দ আমরা পাই সপ্তব্যাহৃতির মধ্যে (ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ সত্যং)। ৺উমেশ চন্দ্র বটব্যাল মহাশয় আদিম বৈদিক ভাষায় প্রচলিত এক মহস্ বা মঘস্ শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার অর্থ জ্যোতিঃ। অমরকোষে মহস শব্দের এক অর্থ "তেজঃ" বলিয়া লিখিত আছে।

মহৎ শব্দ বৃহৎ অর্থে যেমন ব্যবহৃত হয়, শ্রেষ্ঠ অর্থেও তেমনি ব্যবহৃত হয়। সাংখ্যদর্শনে "মহৎ" শব্দ-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বুদ্ধি সর্ব্ব-বস্তুর প্রকাশক জ্যোতিঃ-স্বরূপ। এই জন্যই সম্ভবতঃ বুদ্ধিকে মহৎ বলা হইয়াছে। প্রকৃতির পরিণামদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াও বুদ্ধি মহৎ নামের যোগ্য।

---

* History of Ind. Philo. P. 250

পাশ্চাত্য দর্শনে বুদ্ধি আত্মারই ধর্ম্ম। কিন্তু সাংখ্যদর্শনে তাহাকে প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত বলা হইয়াছে। প্রকৃতি অচেতন। সুতরাং বুদ্ধিও অচেতন। চেতন পুরুষের প্রতিবিম্ব তাহার উপর পতিত হইলে তাহাতে চেতনের ধর্ম্ম প্রকাশিত হয়।

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে মনস্বী ৺উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় সাংখ্য-দর্শন-সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। প্রবন্ধগুলি পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বটব্যাল মহাশয় মহৎকে প্রকৃতির বিকার বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে "প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সংযোগ সাধিত হইলে অর্থাৎ জ্ঞ-জ্ঞেয় নামক সাক্ষাৎকার সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে যে আদিম বীজস্বরূপ জ্ঞানের উদ্ভব হয়, সাংখ্যেরা তাহাকে বলে মহৎ। জ্ঞানের সেই আদিম অবস্থা হইতে আমরা এক্ষণে এতদূরে আসিয়া পড়িয়াছি, যে সম্প্রতি তাহার স্বরূপ নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে কঠিন।" তিনি আরও লিখিয়াছেন "সাংখ্যেরা যে সৃষ্টির কথা বলেন, তাহা বৈদিক সৃষ্টি নহে, দার্শনিক সৃষ্টি। তাহা স্থূলভূতের আবির্ভাবের ব্যাখ্যা। সাংখ্যের মতে প্রত্যেক মানুষ আপন স্থূলভূতের (অর্থাৎ সংসারের) সৃষ্টিকর্ত্তা। তুমি যে অলীক সূর্য্যকে দেখিতেছ বলিয়া মনে কর, তাহা তোমার সৃষ্টি নয় ত কাহার সৃষ্টি? তুমি মরিয়া গেলে আর সে সূর্য্য কোথায় থাকিবে? এমন কি তুমি চক্ষু মুদিলে সে সূর্য্য বিলুপ্ত হয়। প্রত্যেক নরনারীর আত্মায় প্রকৃতি সংযোগ জন্য যে প্রথম জ্ঞানের বিকাশ হয়, তাহার নাম "মহৎ"; তাহা প্রকৃতই তোমার আমার বুদ্ধি।" শ্রদ্ধাস্পদ বটব্যাল মহাশয়ের এই মতকে পাশ্চাত্য দর্শনে Solipsism বলে। কিন্তু ইহা যে সাংখ্যমত নহে, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ সাংখ্যদর্শনের কোনও ভাষ্যকার এই ভাবে মহতের ব্যাখ্যা করেন নাই। সাংখ্য প্রকৃতিকেও তাহা হইতে উদ্ভূত মহৎ, অহংকার, মনঃ প্রভৃতি সকলকেই দ্রব্য বলিয়াছেন। বুদ্ধিকে কিরূপে দ্রব্য বলিয়া গণ্য করা যায়, তাহা স্বতন্ত্র প্রশ্ন। কিন্তু সাংখ্য মতে বুদ্ধি দ্রব্য ভিন্ন অন্য কিছু নহে। সাংখ্য বাহ্য বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাসী। বুদ্ধি, মনঃ ও অহংকার যেমন দ্রব্য, পঞ্চতন্মাত্র ও স্থূলভূতগণও তেমনি দ্রব্য। তাহারা প্রত্যয় মাত্র (Ideas) নহে। বুদ্ধি হইতে তাহারা উদ্ভূত সত্য; কিন্তু, বুদ্ধিও দ্রব্য। বুদ্ধির উপাদান সত্ত্ব, রজঃ তমঃ বাহ্য দ্রব্যেরও উপাদান। সুতরাং বাহ্যদ্রব্যদিগকে প্রত্যয় বা বিজ্ঞান-মাত্র মনে করিবার সংগত কারণ নাই। তাহারা বাস্তব (real) পদার্থ বিজ্ঞানবাহ্য! কোনও বুদ্ধিতে তাহাদের জ্ঞান না হইলেও তাহাদের অস্তিত্বের অন্যথা হয় না।

বটব্যাল মহাশয় "মহৎ"কে ব্যক্তির বুদ্ধি বলিয়াছেন। সাংখ্য-কারিকার ভাষ্য ও টীকাকারের মতও তাহাই মনে হয়। কিন্তু মহৎ যদি ব্যষ্টিবুদ্ধি হয়, এবং ব্যষ্টিবুদ্ধি হইতে যদি প্রত্যেক মনুষ্যের অহংকার ও মনের উদ্ভব হয়, এবং ব্যষ্টি অহংকার হইতে যদি পঞ্চতন্মাত্র ও স্থূলভূতের উদ্ভব হয়, তাহা হইলে প্রত্যেকের জ্ঞাত বাহ্য জগৎ অন্যের জ্ঞাত জগৎ হইতে ভিন্ন হইবার কথা। পঞ্চতন্মাত্রগণ ও স্থূলভূতগণ যদি একই উৎস হইতে উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে প্রত্যেকের অহংকার হইতে উদ্ভূত তন্মাত্রগণ এবং সেই তন্মাত্রগণ হইতে উদ্ভূত স্থূলভূতগণ, অন্যের অহংকার হইতে উদ্ভূত তন্মাত্র ও তাহাদিগের হইতে উদ্ভূত স্থূলভূত হইতে ভিন্ন বলিতে হইবে। সুতরাং সকল মনুষ্যের গ্রাহ্য এক অভিন্ন জগতের সম্ভাবনা থাকে না। সাংখ্যদর্শনে প্রত্যেক মনুষ্যের জগৎকে অন্য মনুষ্যের জগৎ হইতে পৃথক বলিয়া কোথাও গৃহীত হয় নাই। এই জন্য সাংখ্যের 'মহৎ'কে ব্যষ্টিবুদ্ধি না বলিয়া সমষ্টিবুদ্ধি বলাই সংগত। এই সমষ্টিবুদ্ধিই হিরণ্যগর্ভ। "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেকো আসীৎ। স দধার পৃথিবীং দ্যাম্ উত ইমাং" (ঋগ্বেদ) বেদান্তী বলেন "যা প্রথমজস্য হিরণ্যগর্ভস্য বুদ্ধিঃ, সা সর্ব্বাসাং বুদ্ধীনাং প্রথমা প্রতিষ্ঠা, সেই মহান্ আত্মা ইত্যুচ্যতে।" প্রথমাজাত হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধি যাবতীয় বুদ্ধির প্রথম প্রতিষ্ঠা, তাহাই মহান্ আত্মা বলিয়া বেদে উক্ত হইয়াছে। কঠোপনিষদের "মনসস্তু পরা বুদ্ধি, বুদ্ধেরাত্মা মহান্ ততঃ"—এখানেও বুদ্ধির (ব্যষ্টিবুদ্ধির) পরে মহান্ আত্মার কথা বলা হইয়াছে। এই মহান্ আত্মাই হিরণ্যগর্ভ। হিরণ্যগর্ভই ব্রহ্মা—জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনিই সাংখ্যের মহৎ।

বুদ্ধি অধ্যবসায়। অধ্যবসায় শব্দের অর্থ নিশ্চিত জ্ঞান।

অধ্যবসায়ো বুদ্ধিঃ ধর্ম্মো জ্ঞানং বিরাগ ঐশ্বর্য্যম্।
সাত্ত্বিকমেতদ্রূপং, তামসমস্মাৎ বিপর্য্যয়ং। সাং কা—২৩

এই কারিকার ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন "অধ্যবসায়ো বুদ্ধিঃ, ক্রিয়া-ক্রিয়াবতোঃ অভেদবিবক্ষয়া।" অর্থাৎ অধ্যবসায় বুদ্ধির ক্রিয়া-রূপ। ক্রিয়া ও ক্রিয়াবান্ অভিন্ন বলিয়াই অধ্যবসায় ও বুদ্ধি অভিন্ন। তাহার পরে বলিয়াছেন "সর্ব্বো ব্যবহর্ত্তা আলোচ্য, মত্বা, অহমত্র অধিকৃত, ইতি অধ্যবস্যতি। ততশ্চ প্রবর্ত্ততে, ইতি লোকে প্রসিদ্ধম্। অর্থাৎ সকলেই বস্তুদিগকে ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ করিয়া, পরে মনন করিয়া, তাহার পরে ইহা আমারই এই অভিমান করিয়া তাহার পরে "ইহা আমার কর্ত্তব্য" এই অধ্যবসায় করে এবং তাহার পরে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। ইন্দ্রিয়দ্বারা বস্তু "সম্মুগ্ধ"রূপে গৃহীত হয়। সেইরূপ জ্ঞানই "আলোচন"। তাহার পরে মনের সংকল্প বিকল্প, তাহার পরে অহংকার ও সর্ব্বশেষে বুদ্ধির নিশ্চয় জ্ঞান হয়। ইহা হইতে দেখা যায়, বুদ্ধি যদি ব্যষ্টিবুদ্ধি হয়, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়, মনঃ ও অহংকারের পরে তাহার আবির্ভূত হইবার কথা। বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে ভেদ অনুভূত না হইলে, অধ্যবসায় ক্রিয়া হওয়া অসম্ভব। জ্ঞান, বিরাগ ও ঐশ্বর্য্য এবং তাহাদের বিপরীত, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য ইহারাও বুদ্ধির বিভিন্ন রূপ। ইন্দ্রিয়, মনঃ ও অহংকারের পূর্ব্বে ইহাদের আবির্ভাব সম্ভবপর নহে। সুতরাং মহৎকে ব্যষ্টিবুদ্ধি বলিয়া গণ্য করিলে অসংগতির উদ্ভব হয়। এই জন্য প্রকৃতি হইতে যে বুদ্ধির উদ্ভব হয়, সেই বুদ্ধি অথবা মহৎকে বিষয় ও বিষয়ীর ভিত্তি বৈশ্বিক (Cosmic) বুদ্ধি বলিয়া গণ্য করাই সংগত। এই মহৎ দ্বারা অব্যক্তমসাবৃত প্রকৃতি আলোকিত হয়, জ্ঞানে গ্রহণযোগ হয়। তাহার পরে অথবা সঙ্গে সঙ্গেই ব্যষ্টিবুদ্ধিসহ অহংকার, মনঃ ও ইন্দ্রিয়াদির আবির্ভাব হয়। ইহা স্বীকার না করিলে ব্যষ্টি জ্ঞানের ক্রম বোধগম্য হয় না।

কিন্তু বিশ্ববুদ্ধির সহিত সংযুক্ত কোনও বিশ্ব-পুরুষের অস্তিত্ব সাংখ্যশাস্ত্রে স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হয় নাই। সাংখ্য সূত্রের "ঈদৃশেশ্বর সিদ্ধিঃ সিদ্ধা" (৩,৫৭) সূত্রে যে ঈশ্বর স্বীকৃত, যিনি সর্ব্ববিৎ ও সর্ব্বকর্ত্তা (৩।৫৬) বলিয়া বর্ণিত, সাংখ্য কারিকায় তাঁহার উল্লেখ নাই। তিনি জন্য ঈশ্বর, নিত্য ঈশ্বর নহেন, জগতের সৃষ্টি কর্ত্তাও নহেন। কিন্তু মনুসংহিতা "আসীদিদং তমো ভূতং" ইত্যাদি শ্লোকে (১।৫) প্রকৃতির বর্ণনা করিয়া পরশ্লোকেই "মহা ভূতাদি ইদং ব্যঞ্জয়ন্" (মহৎ, অহংকার হইতে মহাভূতগণ পর্য্যন্ত সকল বস্তুর স্থূলরূপে প্রকাশক) "স্বয়ম্ভু ভগবানের" আবির্ভাবের কথা বলিয়াছেন। চরক সংহিতায় সাংখ্যদর্শনের যে বর্ণনা আছে, তাহাতেও এক পরমাত্মার কথা আছে। প্রাচীন সাংখ্যে যে এক পরম পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইত, ইহা হইতে তাহা অনুমান করা যায়।

প্রকৃতি অসীম, পুরুষও অসংখ্য। সৃষ্টির প্রারম্ভে "স্বয়ম্ভু ভগবান্" পুরুষ সমষ্টি বুদ্ধি বা মহৎ সহ ব্যষ্টি বুদ্ধিদিগের সহিত অহংকার, মনঃ, ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও মহাভূত দিগের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাদুর্ভূত হন, ইহা স্বীকার না করিলে সাংখ্য-দর্শনের মধ্যে যে অসংগতি আছে, তাহা দূরীভূত হয় না। বুদ্ধি, অহংকার, মনঃ, ইন্দ্রিয়, তন্মাত্র ও স্থূলভূত দিগের কালিকক্রমে একটার পরে আর একটির উদ্ভব কল্পনা না করিয়া তাহাদিগকে পূর্ণ অভিব্যক্ত জীবের বিশ্লেষণদ্বারা প্রাপ্ত মনে করিলেই এই অসংগতি দূরীভূত হয়।

সৃষ্টি প্রবাহ অনাদি। সুতরাং প্রথম সৃষ্টি বলিয়া কিছুরই কল্পনা করা যায় না। সৃষ্টি বলিতে বর্ত্তমান কল্পের প্রারম্ভই বুঝিতে হয়। এই সময়ে যখন মহতের উদ্ভব হয়, তখন সত্ত্বগুণ রজঃ ও তমঃকে অভিভূত করিয়াছে। এই অবস্থায়, পূর্ব্বকল্পের পুরুষদিগের যে সকল বুদ্ধি প্রলয়ে লীন ছিল, তাহারা উদ্বুদ্ধ হয় এবং যাবতীয় অবিচ্ছিন্ন বুদ্ধি-দিগকে ধারণ করিয়া মহৎ আবির্ভূত হয়। মহতের মধ্যে সকল ব্যষ্টিবুদ্ধিই বর্ত্তমান, কিন্তু এই সমষ্টি-বুদ্ধি ব্যষ্টি-বুদ্ধিদিগের সমষ্টি হইতে বৃহত্তর। সর্ব্ব ব্যষ্টি বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা-ভূমিকে মহৎ এবং ব্যষ্টি বুদ্ধিকে বুদ্ধি বলাই সংগত। মহৎই বিভু, ব্যষ্টি বুদ্ধি বিভু নহে।

মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্ব্বে অনুগীতা পর্ব্বাধ্যায় চত্বারিংশ অধ্যায়ে আছে "ইহ লোকে যে মহাত্মা গুহাশায়ী, বিশ্বরূপী, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের একমাত্র গতি, পুরাতন পরম পুরুষ মহৎ তত্ত্বের গতি সবিশেষ অবগত হইতে সমর্থ হন…তিনি বুদ্ধি তত্ত্বকে অতিক্রম পূর্ব্বক অবস্থান করেন, এবং সৃষ্টিকালে বিষ্ণু তুল্য হইয়া থাকেন।" (কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত ১৮৩৬ পৃঃ)। মহৎ তত্ত্ব ও গায়ত্রী মন্ত্রের "সবিতুঃ বরেণ্যংভর্গঃ" এক বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। গায়ত্রী সূর্য্য অথবা পরব্রহ্মের উপাসনা মন্ত্র, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে, কিন্তু শাস্ত্রে গায়ত্রী মন্ত্রের সবিতাকে ব্রহ্ম অর্থেই গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রচলিত সাংখ্যে অবশ্য ব্রহ্মের কথা নাই। কিন্তু চরকে বর্ণিত, সাংখ্য মতে অব্যক্তকে পুরুষ বলা হইয়াছে। অনুগীতা হইতে উপরে উদ্ধৃত অংশে মহৎতত্ত্বকে পরম পুরুষ বলা হইয়াছে। মহাভারতের অন্যত্র প্রকৃতিকে "পুরুষা বস্তু" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং গায়ত্রীর সবিতুবরেণ্যং ভর্গঃ ও মহৎ তত্ত্বকে এক বলিলে প্রাচীন সাংখ্য মতের সহিত বিরোধ হইবে না।

মহৎ শব্দের অর্থ অমরকোষে 'বৃহৎ' বলিয়া লিখিত আছে। 'মহ' ধাতুর এক অর্থ পূজা করা, সুতরাং মহৎ শব্দে পূজনীয় (বরেণ্য) বুঝায়। মহৎ শব্দের অন্য অর্থ জ্যোতিঃ, তেজঃ, বর্চ্চঃ। (আদিত্যান্তর্গতং বর্চ্চো, ভর্গাখ্যং)। সুতরাং "বরেণ্য ভর্গ" ও মহৎ শব্দ সমার্থক। "বরেণং ভর্গঃ"—পূজনীয় জ্যোতিঃ-স্বরূপ মহৎ। এই জ্যোতিঃ বুদ্ধির জ্যোতিঃ, তমোভূত প্রকৃতির তমোনাশক জ্যোতিঃ।

"সবিতু র্বরেণ্য ভর্গো দেবস্য ধীমহি" গায়ত্রীর এই চরণের অর্থ—"ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ প্রভৃতি লোক প্রসবিতা ব্রহ্মের বরণীয় জ্যোতির্ম্ময় রূপের ধ্যান করি। এই জ্যোতির্ম্ময় রূপই মহৎ। ব্রহ্ম যখন দীপ্তিমান, তখনই তিনি "দেব"; নির্গুণ ব্রহ্ম দেব নহেন। সুতরাং দেবস্য সবিতুঃর অর্থ ব্রহ্ম যে অবস্থায় বুদ্ধির জ্যোতিতে উদভাসিত সেই অবস্থাপন্ন ব্রহ্ম। ব্রহ্মের বরণীয় জ্যোতিকে অর্থাৎ "মহৎ" রূপে প্রকাশিত ব্রহ্মকে ধ্যান করি। তিনিই হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা। জগৎ স্রষ্টা। তারপরে "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদাৎ।" যিনি সকল ব্যষ্টি বুদ্ধির প্রতিষ্ঠাভূমি, তাঁহার নিকট হইতে যাবতীয় জীব তাহাদের ধী প্রাপ্ত হয়। হিরণ্যগর্ভই সমষ্টি বুদ্ধি। আমার বুদ্ধি, তোমার বুদ্ধি, রামের বুদ্ধি, শ্যামের বুদ্ধি, সকল বুদ্ধিই হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধির অন্তর্গত। ভূগর্ভস্থ জলরাশি যেমন প্রত্যেক কূপ, তড়াগ, বাপীতে তাহার জলপ্রেরণ করে, তেমনি সেই অনন্ত-বুদ্ধির আধার মহৎ তত্ত্ব আমাদের সকলের বুদ্ধিবৃত্তি আমাদিগকে প্রেরণ করেন। ব্যষ্টি বুদ্ধি তাঁহা হইতেই উদ্ভূত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবানের যে জীবভূত পরাপ্রকৃতির কথা আছে (৭।৮-৯) তিনিই মহৎ। ভূমিঃ, আপঃ, অনলঃ, বায়ুঃ, সব, মনঃ ও বুদ্ধি (ব্যষ্টি বুদ্ধি) ও অহংকার (যাহারা মহৎ হইতে উদ্ভূত,) তাহারা সেই পরা প্রকৃতিস্থ পুরুষের অপরা প্রকৃতি, পরা প্রকৃতি-কর্ত্তৃক বিকৃত। মহৎ তত্ত্বই সর্ব্বজীবরূপে প্রকাশিত। তাহা হইতেই (বৈশ্বিক অহংকার-সমন্বিত মহৎ তত্ত্ব হইতে) ব্যক্তির বুদ্ধি অহংকার ইন্দ্রিয়, সূক্ষ্মভূত, স্থূলভূত উদ্ভূত এবং তাঁহা দ্বারা বিকৃত। প্রলয়ে হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতই অব্যক্ত প্রকৃতিতে বিলীন হয়, অর্থাৎ সূক্ষ্ম অব্যক্ত অবস্থায় ফিরিয়া যায়। এই অব্যক্তের উর্দ্ধে আছেন পুরুষোত্তম, যিনি সমস্ত লোক ধারণ করেন। তিনি অব্যয় ঈশ্বর (গীতা ১৫।১৭) এই পুরুষোত্তমের কথা সাংখ্যশাস্ত্রে নাই। তিনি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বভূতের সুহৃৎ। তিনি অব্যক্ত প্রকৃতির মধ্যে অনুস্যূত, এবং মহৎ তত্ত্বে প্রকাশিত। কঠোপনিষদের ৩।১০-১১ শ্লোকে যে "বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ" র কথা আছে, তিনি মহৎ তত্ত্ব। উক্ত বল্লীর ৬ শ্লোকে "সত্ত্বাৎ অধি মহান্ আত্মা" অর্থাৎ বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ মহৎ তত্ত্বের কথা আছে। এবং ৭ম শ্লোকে অব্যক্তের পরে "ব্যাপক, অলিঙ্গ পরপুরুষের কথা আছে।

> ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ, মনসঃসত্ত্বমুত্তমম্।
> সত্ত্বাদধি মহান্ আত্মা মহতোঽব্যক্ত মুত্তমম্
> অব্যক্তাৎ পরঃপুরুষঃ ব্যাপকোঽ লিঙ্গ এব চ।
> যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বং চ গচ্ছতি

উত্তমসত্ত্ব ও বুদ্ধি যে অভিন্ন, তাহা সুস্পষ্ট। বুদ্ধির পরে যে আত্মা, তিনি মহৎ বা সমষ্টিবুদ্ধি বা হিরণ্যগর্ভ। মহান্ আত্মা যে অব্যক্ত হইতে উদ্ভূত পরপুরুষ বা পুরুষোত্তম তাহারই পরম রূপ। প্রাচীন সাংখ্যে সেই পর-মাত্মার কথা ছিল। ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁহাকে বর্জ্জন করিয়াছেন। কাল বিপ্লুত কিন্তু পরবর্ত্তী "কাপিল সূত্র" নামে প্রচারিত সাংখ্য-প্রবচন সূত্রেও তাঁহার উল্লেখ নাই। উপনিষদের মহান্ আত্মা সাংখ্যে অচেতন মহতে পরিণত হইয়াছেন। তিনিই গায়ত্রীর "সবিতুঃ বরেণ্যং ভর্গঃ।" প্রচলিত সাংখ্য মতের বিরোধী হইলেও ইহা অনুমান করিবার অধিকার আমাদের আছে।

মহৎ বা বুদ্ধির স্বরূপ কি? অহংকার বিযুক্ত মহতের মধ্যে বিষয় ও বিষয়ীর ভেদ নাই। যতক্ষণ অহংকার সহ বিষয়ীর ও বিষয়ের ভেদ উদ্ভূত না হয়, তৎক্ষণ তাহাকে জ্ঞান বলা যায় না। কিন্তু এই ভেদ তাহার মধ্যে শক্যভাবে প্রথম হইতেই বর্ত্তমান এবং অহংকার ও পঞ্চ-তন্মাত্রের উদ্ভব ও মহতের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই হয়। এই অহংকার বিশ্ব-অহংকার।

ভারতে বেকার-সমস্যার ভয়াবহ রূপ

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

"খবর বেরোয় দৈনিকে,
জোর মরেছে দশটি হাজার সৈনিকে।"

—নজরুলের এক বিখ্যাত কবিতার অখ্যাত দুটি লাইন।

যুদ্ধ চলছে। প্রভাতী কাগজে হয়তো চোখে পড়লো, গতকাল রণাঙ্গনে দশ হাজার সৈন্য মারা গেছে।

ছোট্ট টুকরো খবর। ব্যাপারটা ভাল বোঝা গেল না। কাগজে বড় বড় হেডিং দেওয়া যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ অনেক সংবাদ আছে। নতুন সেনাপতি আসছেন, নতুন যুদ্ধাস্ত্র পরীক্ষা হচ্ছে। স্থল ও বিমানবাহিনীর সহযোগে সাতদিন অহোরাত্র যুদ্ধের পর একপক্ষ হয়তো একটা টিলা দখল করলো। এর ওপর আছে যুদ্ধ সম্পর্কে রাজজ্যোতিষীর ভবিষ্যৎ বাণী, মোহনবাগানের খেলার খবর, উদয়শঙ্করের নাচের ছবি। তাছাড়া গেরস্ত মানুষের বাজারে যাবার তাগিদ, অফিসে যাবার তাড়াও আছে। বারো পাতা কাগজের অসংখ্য উজ্জ্বল সংবাদের গোলক ধাঁধায় দশ হাজার সৈনিকের মৃত্যুর সংক্ষিপ্ত খবরটা যেন হারিয়ে গেলো।

এভাবে সংখ্যা দিয়ে দেখলে তাই হবে। দশ হাজার একটা সংখ্যা, সংখ্যা আমাদের মনে তেমন করে দাগ কাটতে পারে না। দশ হাজার মরলো তো আর কি হল? অমন কত মরছে, যুদ্ধে অমন মরে।

কিন্তু যদি একবার আমরা ভাববার অবকাশ করে নিই দু'মিনিটের জন্যে। দশ হাজার লোক মরে গেলো! আমাদের গলিতে আঠারো-খানা বাড়ী, গত দশ বছরে মারা গেছে মোট এগারো জন। এই এগারো জনের মৃত্যুর পরবর্তী ইতিহাস কি অসহ্য নিরবচ্ছিন্ন শোকাবহ! আমাদের বাড়ীতে পাঁচ বছরের একটি শিশু তিন বছর হ'ল মারা গেছে। আজও তার মা প্রতিদিন অন্ততঃ একবার তার জন্যে চোখের জল ফেলেন। পথে, মাঠে, সিনেমায় হৃষ্টপুষ্ট কোন বালককে দেখলে আজ পর্য্যন্ত আমাদের বাড়ীর সবাইকার মন হু হু করে ওঠে।

আর কাল একদিনে দশ হাজার লোক মারা গেল। প্রাকৃতিক মৃত্যু নয়, অস্বাভাবিক মৃত্যু। শিশু বা বৃদ্ধের মৃত্যু নয়, পরিজন-প্রতিপালনকারী সমর্থ মানুষের মৃত্যু। এই দশ হাজারের মুখ চেয়ে তাদের পরিবারের নির্ভরশীল যে তিরিশ চল্লিশ হাজার উপার্জ্জনহীন অসহায় নরনারী বেঁচে রইলো, তাদের কি হবে?

বেকার-সমস্যা ঠিক এই শ্রেণীর। ভারতে বেকারের সংখ্যা সাত কোটি—শুধু একথা কথাচ্ছলে উচ্চারণ করলে বা একটানা পড়তে পড়তে শব্দ কটার ওপর চোখ বুলিয়ে গেলে বেকার সমস্যা কি স্বরূপে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়? সাত কোটি লোক কতগুলো, ক'জন, তাদের সত্যিকার দুঃখের পরিমাণ কতখানি?

যারা বেকার, শুধু উপার্জ্জনহীনতার লজ্জায় বা দৈন্যেই তারা ম্রিয়মাণ হয় না, কর্ম্মোৎসাহ নিয়োগের পথসন্ধানে ব্যর্থকাম হ'য়ে তারা নিজেদের সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়ে। ক্রমে তারা নিজেদের মনে করে অপদার্থ, মনে করে তাদের দ্বারা আর কিছু হবে না, মনে করে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, এ জীবন ব্যর্থ। নিজের সম্বন্ধে এই হতাশাবোধে বেঁচে থাকা একটা বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ পরিশ্রম করতে পারে, শ্রমশক্তি ফলপ্রসূ শক্তিসম্পদ! এই শ্রমশক্তির গৌরবে মানুষ সমাজের সম্ভাবনার প্রতীক। বেকার কিন্তু সমাজের ভারস্বরূপ।

আর তাদের ওপর নির্ভরশীল পরিজনবর্গ! বেকারদের অধোগতি এই সব অসহায় পরাশ্রয়ীকেও ঠেলে দেয় হতাশার অন্ধকূপে। মানুষ পৃথিবীতে মরবার জন্য আসেনি, প্রাকৃতিক সম্পদ মানুষকে সুখে স্বচ্ছন্দে বাঁচবারই প্রেরণা দেয়। কিন্তু বেকার ব্যক্তির পোষ্যেরা সুস্থ জীবন-যাপনের এই জন্মগত অধিকারটুকু একেবারেই হারিয়ে বসে।

বেকারী ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সৃষ্টি। প্রকৃতির দেওয়া সম্পদ সমবণ্টিত হলে সব মানুষের জীবন ধারণের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু ভাগ্যবানদের প্রাচুর্য্যের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার একাংশ আনুপাতিকভাবেই যেন রিক্ত হয়ে পড়ে। অল্প কয়েকজন সুবিধাবাদী বা মুনাফাখোর ছিনিমিনি খেলে অসংখ্য পরার্থজীবীর জীবন নিয়ে।

ভারতে এ পর্য্যন্ত ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাই চলছে। অসম ধনবণ্টন এদেশে সর্ব্বত্র পরিদৃশ্যমান। একদিকে ধনীদের বিলাস-সমারোহে অপচয়ের অন্ত নেই, অন্যদিকে অসংখ্য নিরন্নের হাহাকারে দেশের আকাশ বাতাস মুখরিত। জমিদার ম্যানেজারবাবু কাছারীতে আসছেন শুনে ছ'মাস পরে একমুঠো ভাত খাবার আশায় দলে দলে লোক তিনদিন অপেক্ষা করে থাকে*; বরোদার মহারাজা দেড়শো লোককে যে ভোজ দেন, তার থালা-বাটি-গেলাস ইত্যাদি সমস্ত বাসনপত্র সোনার।† এদেশের শতকরা ৮২ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে, ২৯ কোটি গ্রামবাসীর অন্ততঃ ১০ কোটি বৎসরের অধিকাংশ সময় দিনান্তে একবেলা খাওয়া জুটলেই নিজেদের ভাগ্যবান মনে করে। সম্বৎসর দু'বেলা খাওয়া তাদের কাছে স্বপ্নবিলাস।

বেকার বলতে যারা কর্ম্মক্ষম এবং কাজ করতে ইচ্ছুক, তাদের বোঝায়। ভারতে বেকারের সংখ্যা ঠিক কত বলা কঠিন, প্রজা সমাজ-তান্ত্রিক নেতা ডাঃ রামমনোহর লোহিয়ার মতে এ সংখ্যা সাত কোটি। এত বেশি না হলেও কাজ নেই এমন লোক এদেশে অন্ততঃ ৫ কোটি

* বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের "আরণ্যক"।

† কপূরতলার মহারাণী বৃন্দাদেবীর আত্মচরিত "মহারাণী"।

হবে। এ ছাড়া যারা প্রত্যেক বছর রোজগারের বয়সে পৌঁছায়, তাদের সংখ্যা ২৫ লক্ষ হবে ব'লে আমাদের ধারণা। ভারতের পরিকল্পনা-মন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ এই সংখ্যা ১৮ লক্ষ বলেছেন।

এ তো গেল পূর্ণ বেকারের কথা। পূর্ণ বেকার মানে যাদের একেবারেই কাজ নেই। ঝড়ের দিনে যে কোন আশ্রয়ই অমূল্য, সে হিসাবে আমাদের দরিদ্র দেশে যে কোন একটা কর্ম্মসংস্থান হ'লেই আমরা বেঁচে যাই। সাধারণতঃ এদেশে বেকার বলা হয় যাদের কিছুই জোটে নি।

কিন্তু শুধু এই পূর্ণ বেকারদের নিয়েই বেকার সমস্যা নয়। এদের দুর্ভাগ্য নিঃসন্দেহে বর্ণনাতীত। তবে এরা ছাড়া এদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি একটা বড় দল এদেশে আছে; তারা কাজ করে, কিন্তু সে কাজে তাদের পেট ভরে না। এরা অর্দ্ধ বেকার, প্রচণ্ড অভাবে অবিরাম পিষ্ট হয়ে এরা সপরিবারে তিলে তিলে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যায়। নিম্ন-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ওপরই যেন এই ছদ্মবেশী বেকারীর চাপ সর্ব্বাধিক। চিনির কলের মত মরশুমী কারখানায় যে সব শ্রমিক কাজ করে, সারা বছর চলবার মত আয় তাদের নেই। ছোটখাট শিল্পী, ফুরণের বা দিন-মজুরীর কারিগর এবং কারখানা-বহির্ভূত সাধারণ শ্রমিকদের এই অবস্থা।

কৃষির ওপর নির্ভর করে এদেশের শতকরা ৭০ জন লোক। চাষের কাজ চলে বছরে তিন চার মাস, বাকী সময় প্রায়ক্ষেত্রেই এরা কর্ম্মহীন থাকে। তার চেয়ে বড় কথা, যত লোককে আমরা চাষী বলে জানি, চাষের প্রয়োজনে তাদের একাংশই যথেষ্ট, অধিকাংশই বাড়তি, চাষের পক্ষে ভারস্বরূপ। কিছুটা বাইরে কাজ পাওয়ার অনিশ্চয়তার জন্য এবং কিছুটা নির্ব্বিঘ্ন ঘরবাসী জীবনযাপনের মোহে এরা ক্ষেতের সঙ্গে লেগে থাকে। মোটামুটি এদেশের কিঞ্চিদধিক ২৪ কোটি চাষীর মধ্যে ১৬ কোটিরও বেশি এই ভাবে অতিরিক্তের পর্য্যায়ে পড়ে।

এ ছাড়া কোন কোন সময় ব্যবসায়িক চক্রের আবর্ত্তনে মন্দার হিসাবে শ্রমিকেরা বেকার বা অর্দ্ধবেকার হয়, কখনও কখনও ধর্ম্মঘট ইত্যাদিতে তারা উপার্জ্জনের দিক থেকে হয় ক্ষতিগ্রস্ত।

আগেই বলা হয়েছে, মানুষের শ্রমশক্তি সম্পদ, বৈদ্যুতিক শক্তি বেশি উৎপন্ন হলে যেমন সম্পদ সৃষ্টির নিরিখে দেশের পক্ষে আশার কথা, মানুষের শ্রমশক্তি বেশি পাওয়া গেলেও তাই হওয়া উচিত। এই শক্তির অপচয় মানে সম্ভাব্য পণ্য উৎপাদন থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং বিনা অপরাধে একদল অসহায় মানুষের জীবন ব্যর্থ হয়ে যাওয়া। ব্যবস্থাপনার অভাবেই এই প্রচণ্ড সামাজিক ক্ষতি হয়। দেশের সম্পদের সদ্ব্যবহার এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিরোধ করতে পারে।

জাতীয় অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক কাঠামো না হ'লে সার্ব্বজনীন কর্ম্মসংস্থান একরকম অসম্ভব। এই কর্ম্মসংস্থান বলতে জীবনযাত্রার স্বাভাবিক ব্যয়ের সমপরিমাণ নিম্নতম আয়-স্তরেরই ইঙ্গিত করা হচ্ছে। ভারতের মত গরীব দেশে অসংখ্য লোকের কর্ম্মহীনতা কত যে ক্ষতিকর, তা ব'লে বোঝানো যায় না। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আদারকর একবার বলেছিলেন, ভারতের বেকারেরা ন্যায্য কাজ পেলে যে সম্পদ উৎপাদন করতে পারতো, তার দাম শুধু মুদ্রামূল্যে ভারতের কে[illegible] সরকারের এবং সমস্ত রাজ্যসরকারের আদায়ী কর-রাজস্বের সমষ্টির চেয়েও বেশি। এ ছাড়া ব্যক্তিগত কর্ম্মসংস্থানের সঙ্গে ব্যক্তিগত, পরিবার-গত, সমাজগত, এমন কি রাষ্ট্রগত জীবনের শান্তিশৃঙ্খলার সম্পর্ক আছে এবং ব্যক্তির আয় বাড়ায় দেশে অর্থের প্রচলনগতি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পরোক্ষ কর্ম্মসংস্থানের সম্ভাবনা আছে।

তবু, আগের কথা পুনরুল্লেখ করেই বলছি, বেকারীর জন্য পণ্য বা সম্পদ উৎপাদন না হওয়ায় যে ক্ষতি হয়, সে ক্ষতিকে সব চেয়ে বড় ক্ষতি বলা চলে না। আজ কাজ না থাকতে পারে, কাল কাজ পেয়ে একটু বেশি খাটলে বাড়তি উৎপাদনে সে ক্ষতি হয়তো পূরণ হয়ে যাবে। কিন্তু বেকারত্বের হতাশা যদি মানুষের কর্ম্মোৎসাহ গ্রাস করে, নিরালম্ব জীবনের গৌরব-বিবর্জ্জিত হীনতায় মানুষ যদি ছোট হয়ে যায় একটু একটু করে, সেটা অনেক বড় ট্র্যাজেডি।

ভারতে বেকার-সমস্যা অল্পবিস্তর আগেও ছিল। তবে সমস্যা আগে এতটা তীব্র মনে হ'ত না এই জন্যে যে, তখন পরাধীনতা বিড়ম্বিত ভারতবাসীর মন এতটা আত্মসচেতন বা সমাজ সচেতন হয়ে ওঠে নি। এখন আমরা ক্রমেই বুঝতে শিখছি, খাদ্য-বস্ত্র-আশ্রয়ের নিম্নতম প্রয়োজন না মিটলে বাঁচবার কোন মানে হয় না। এ প্রয়োজন মেটানো কর্ত্তৃপক্ষের সাধারণ কর্ত্তব্য। তাই বেকারীর বেদনায় আজ বিক্ষুব্ধ আন্দোলন সূচিত হচ্ছে।

যুদ্ধের ফাঁপা বাজারে বেকার সমস্যার চাপ যথেষ্ট কমে ছিল। ভারতে সামরিক-বেসামরিক হিসাবে নতুন কাজ পেয়েছিল প্রায় ৮০ লক্ষ লোক। প্রতিজন উপার্জ্জনশীল নিজেকে নিয়ে পাঁচজনের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিলে ৪ কোটি আন্দাজ লোকের তখন একটা ব্যবস্থা হয়েছিল।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ছাঁটাই সুরু হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে, অনেক প্রতিষ্ঠান দরজা বন্ধ করেছে। প্রায় ২০০ ভারতীয় ব্যাঙ্ক যুদ্ধের পরে ফেল পড়েছে, এগুলোতে জমা ছিল জনসাধারণের প্রায় ১০০ কোটি টাকা। এই ব্যাঙ্ক-সঙ্কটের প্রতিক্রিয়ায়ও অনেক শিল্পবাণিজ্য সঙ্কুচিত হয়েছে। তাছাড়া ইউনিয়নের জন্যই হোক আর যে জন্যই হোক, যে সব প্রতিষ্ঠানে ছাঁটাই হয় নি সেখানে নতুন লোক নেওয়া একরকম বন্ধ আছে। ইতিপূর্ব্বে বলা হয়েছে, সরকারী হিসাবেই এদেশে বছরে ১৮ লক্ষ করে কর্ম্মপ্রার্থী বাড়ছে। এর উপর আছে ৫০ লক্ষ পূর্ব্ববঙ্গীয় শরণার্থীর চাপ। কাজেই এ অবস্থায় ভারতে বেকার সমস্যা যে ক্রমেই অধিকতর ভয়াবহ হয়ে উঠবে, তা আর বিচিত্র কি ?*

---

* ভারতের বেকার সমস্যার ভয়াবহতা সরকারের নিজস্ব কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্রগুলির (Employment Exchanges) হিসাব থেকেই বোঝা যাবে। এসব কেন্দ্রে নাম লেখান সাধারণের পক্ষে কঠিন, গ্রামের লোক কমক্ষেত্রেই এগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। সরকারের হাতে কাজ অনেক, তাছাড়া বহু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রার্থীদের কর্ম্মসংস্থানের দিক থেকে সরকারকে সাহায্য করছেন সক্রিয়ভাবে। তবু গত ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে যে ৮০ লক্ষ লোক কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্রগুলিতে নাম রেজেষ্ট্রি করেছে, তাদের মধ্যে কাজ পেয়েছে মাত্র ২০ লক্ষের মত।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে ভারতের অর্থনৈতিক রূপান্তর ঘটবে এবং দেশের বেকার সমস্যার মোটামুটি সমাধান হবে, পরিকল্পনাকারদের এ আশা প্রবল। কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী থেকে সুরু করে রাজ্যিক উপমন্ত্রীরা পর্য্যন্ত আজকাল প্রায়ই ক্ষুণ্ণ গলায় বলে থাকেন, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্য্যকারিতা সম্পর্কে দেশের লোকের যতটা উৎফুল্ল হওয়া উচিত ছিল, তাদের ভাবভঙ্গিতে সে ভাবটা প্রকাশ পাচ্ছে না।' তাঁরা রাষ্ট্রের কর্ণধার, দুঃখিত তাঁরা হ'তে পারেন। কিন্তু কথাটা হচ্ছে, ব্যক্তি-নিরপেক্ষভাবে ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের ভালোর কথা ভাববার শিক্ষা বা সঙ্গতি কোথায় এদেশের মানুষের! যাহোক একটা কাজের খোঁজে যারা পাগল, একটানা অভাবের চাপে যারা মৃতপ্রায়, যাদের বর্ত্তমান অশ্রুসিক্ত, মন্থর—পণ্ডিত ব্যক্তিদের আঁকা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি তাদের সিমেণ্ট বাঁধানো মনকে কি করে স্পর্শ করবে? পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিভিন্ন খাত দেখিয়ে ৫৭½ লক্ষ লোকের কর্ম্ম-সংস্থানের আশা করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে, এ ছাড়াও দেশের কৃষি-শিল্প বাণিজ্যের প্রসারের ফলে উল্লেখযোগ্য কর্ম্মসংস্থান হবে পরোক্ষ ভাবে (Tertiary Sector)। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য সত্যি কত নতুন লোক কাজ পেয়েছে কে জানে, তবে সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের মনে হয়, বেকার সমস্যা কমার পরিবর্ত্তে এখন যেন তীব্রতর হয়ে উঠেছে।

পরিকল্পনা-কমিশন প্রথমে বেকার সমস্যাকে সাধারণ ভাবে গ্রহণ করে-ছিলেন, মূলতঃ দৃষ্টি দিয়েছিলেন দীর্ঘমেয়াদী হলেও দেশের পক্ষে সত্যকার কল্যাণকর কাজকর্ম্মের ওপর। কিন্তু বেকারদের সংখ্যা-বাহুল্য, দেশের রাজনীতি-অর্থনীতিতে ক্রমবর্দ্ধমান বেকারীর প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব, এ সব লক্ষ্য করে তাঁরা পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গিই যেন কিছুটা পালটে ফেলেছেন। ২০৬৯ কোটি টাকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এখন সম্প্রসারিত হয়ে ২২৪৪ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে, অতিরিক্ত ১৭৫ কোটি টাকা প্রধানতঃ বেকার সমস্যা সমাধানের ওপর জোর দিয়ে বরাদ্দ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, গৃহনির্ম্মাণ, রাস্তাঘাট তৈরী, ব্যবসায়ে সাহায্য, শিল্পের, বিশেষ করে কুটীরশিল্পের প্রসার ইত্যাদির ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়ে সরকার যদি সঙ্গদক্ষতার সঙ্গে অগ্রসর হন এবং সেই সঙ্গে দেশে যদি পুনর্গঠনের উপযোগী অনুকূল একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়, অবস্থার উন্নতি অবশ্যই সম্ভব।

মোটের ওপর বর্ত্তমানে যেখানে অভাবী মানুষের মিছিলে পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে, পরিকল্পনা নয়, পরিকল্পনার সাফল্যই সে রুদ্ধ পথ মুক্ত করতে পারে। সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ এবং বুদ্ধিজীবীরা আগে বলতেন পরিকল্পনা ছাড়া পরিকল্পনার সফলতা আসবে কি করে। ধৈর্য্য ধরে সুদিনের প্রতীক্ষা করবার সদুপদেশ দিতেন তাঁরা। আশার কথা, এখন তাঁদের মনোভাব তবু খানিকটা বাস্তবানুগ হয়ে উঠেছে।

শুধু ভারতবর্ষ নয়, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই এখন বেকার সমস্যার চাপে ক্লিষ্ট। অবস্থার দ্রুত অবনতি হচ্ছে বলে আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সংস্থা বা আই-এল-ও'র ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ ডেভিড মরস সম্প্রতি জগতের সমস্ত দেশের শাসনকর্ত্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে লিখিত এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে বেকার সমস্যা সর্ব্বাত্মক এবং প্রবলতর রূপ ধারণ করবে এরকম আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। কাজেই সকলেরই উচিত নিজের নিজের সম্ভাব্য উন্নতিমূলক পরিকল্পনাগুলোর বাস্তব রূপ-দানে আর একটুও বিলম্ব না করা।

আন্তর্জ্জাতিক সংস্থাসমূহের মারফৎ ভারতের মত পশ্চাদপদ অথচ সম্ভাবনাপূর্ণ দেশের পুনর্গঠনে বাহিরে উল্লেখযোগ্য সাহায্য এ যুগে স্বভাবতঃই আশা করা চলে। কিন্তু যুদ্ধোত্তর মন্দা সুরু হওয়ায় অবস্থা বর্ত্তমানে প্রতিকূল হয়ে উঠেছে, অন্যকে সাহায্য করার সঙ্গতি এখন বেশীর ভাগ দেশেরই নেই। ভারতকে এখন বাইরের আশা ছেড়ে নিজের চেষ্টাতেই আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। কাজটা যত কঠিনই হোক অবশ্য করণীয়, এ হিসাবে সরকারের দায়িত্ব বেশি হলেও দেশবাসীর দায়িত্ব কম নয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্য্যকারিতা এই সর্ব্বাত্মক প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল। দেশের লক্ষণীয় আর্থিক প্রগতি বেকার সমস্যা সমাধানের অনুপূরক। কাজেই এখন ভারতকে আত্মনির্ভরশীল করবার যে কোন প্রচেষ্টায় এতটুকু ত্রুটি ঘটা আত্মহত্যারই সামিল। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দামোদর বাঁধের মত অনেক বড় কাজ হচ্ছে, কিন্তু বেকার সমস্যা লক্ষণীয়ভাবে কমাতে না পারলে এসব কৃতিত্ব সত্ত্বেও দেশের শান্তি শৃঙ্খলা নিশ্চিত হবে বলে মনে হয় না।

না-পাওয়া

শ্রীপিনাকীরঞ্জন কর্ম্মকার

মোর মনে এলো মধুমাস
মরুতে জ্যোছনা ঝরে,
অজানা বাঁশীর বাণী
মোর স্বপনে আলাপ করে।
ফুলের সুরভি সম
কে যেন জীবনে মম

কাছে এসে দূরে সরে যায়
মিলন বাসর ঘরে,
আঁধারে জ্যোছনা ঝরে।
মরমে জ্বলে তারা-দীপ
পূর্ণিমা চাঁদ বাহিরে,
মোর স্বপনে আলাপ করে



ফটো :—এস্, কে. চ্যাটার্জ্জী

অলকার পথে

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস



ফটো :—গৌর দত্ত | অকাল-মৃত্যু | ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

সুমিতার সাধনা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় দৃশ্য

সঞ্জীবের বাড়ী

বাহিরের দিক

মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ী। ঘরগুলি মাটির দেওয়াল। দোতলা। দেওয়ালগুলি চূণ-কাম করা। বাহিরের অংশে—বাহিরের ঘরের কোণে একটি প্রশস্ত বারান্দা। পাকা মেঝে—সামনে পাকা গাঁথনী ইটের থাম—তাহার উপর টিনের ছাউনি। থামগুলির নিচের অংশ তিনভাগের একভাগ আলকাতরা দেওয়া। বারান্দায় উঠিবার সিঁড়ির দুই পাশে দুটি জাফরীতে দুটি ফুলের গাছ উঁকি মারিতেছে।

দাওয়ার উপর একখানি তক্তাপোষ পাতা। তাহার উপর সতরঞ্চি বিছানো। তক্তাপোষে বসিয়া আছেন, গ্রামের প্রবীণ চাটুজ্জেমশায়, তাহার পাশে বসিয়া আছে অমর নামক গ্রামের একটি যুবক। সে সঞ্জীবের ভক্ত এবং অনুগত। তাহাদের সামনে কাগজ কলম দোয়াত। পাশেই একটি টুলের উপর বসিয়া আছে হরিহর ভটচাজ গ্রামের পুরোহিত। দেওয়ালে ঠেস দিয়া কম্বলের আসনের উপর বসিয়া আছে সঞ্জীব। রুক্ষ চুল, শ্রান্ত দৃষ্টি, গলায় কাছা। অকস্মাৎ তাহার মাতৃবিয়োগ ঘটিয়াছে। এই সকালেই তাহারা শ্মশান হইতে ফিরিয়াছে। বাড়ীর ঝি প্রৌঢ়া বিধবা মাতু মধ্যে মধ্যে জলের ঘড়া লইয়া ভিতরে যাইতেছে। খালি ঘড়া লইয়া বাহিরে যাইতেছে। আবার আসিতেছে। বোঝা যায় সে বাড়ীর ভিতর জল দিয়া ধুইতেছে। তক্তাপোষে চাটুজ্জে তামাক খাইতেছেন। নিচের তরুণদের এক আধজন থামের আড়ালে গিয়া বিড়ি খাইতেছে।

প্রথমেই ঘড়া কাঁখে প্রবেশ করিল মাতু। সে আপনার মনেই বকিতে বকিতে ভিতরে চলিয়া গেল।

মাতু। আঃ আর জন্মে কত ঋণ করেছিলাম মুখুজ্জে ঠাকরুণের কাছে—আর সঞ্জীব দাদার কাছে। অঃ—তার হিসেব নিকেশ নাই গো! (বাড়ী প্রবেশের মুখে থমকিয়া দাঁড়াইল, সঞ্জীবের দিকে ফিরিয়া বলিল) খুব শোধটা নিলে ভাই দাদা!

প্রস্থান

তাহার কথার কেহ জবাব দিল না

ভটচাজ। (বলিলেন, মাথায় হাত বুলাইতেছিলেন তিনি) শ্রাদ্ধ তিন দিনেই করতে হয়। দশ দিন এক্ষেত্রে ঠিক শাস্ত্রানুমোদিত হবে না। উ-হু।

অমর। উ-হু কেন? ডাক্তার বলছে—হার্টফেলে মৃত্যু। হার্টফেল তো ব্যাধির মৃত্যু! আঘাত অপঘাতে মৃত্যুর শ্রাদ্ধ বিধান দিচ্ছেন কি বলে?

ভটচাজ। দেখ বাবা, সঞ্জীবের মাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে নিচেরতলায় সিঁড়ির দরজার মুখে। তিনি উপর তলা থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে নিচে পড়েছেন—সেটা তাঁর দেহের নানান স্থানের আঘাত চিহ্ন থেকে বোঝা যায়।

মাতু খালি ঘড়া লইয়া বাহিরে যাইতে যাইতে কথা শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল

মাতু। হ্যাঁ বাবা। মা আমার সেই মাথার সিঁড়িতে পড়েছেন। গুড় বের করতে গিয়েছিলেন। ওই প্রথম সিঁড়িতেই গুড়ের ভাঁড় হাতে পড়েছেন। প্রথম সিঁড়িতে ভাঁড় ভাঙা খোলা পড়ে আছে, গুড়ে সিঁড়ি মাখামাখি—তারপর গড়িয়ে গড়িয়ে পাঁচটা সিঁড়ি বেয়ে—গুড়ের ধারা নেমেছে।

ভটচাজ। হ্যাঁ। উপরের সিঁড়িতে পড়ে গড়িয়ে নিচে পড়েছেন—এবং—

অমর। হ্যাঁ হার্টফেল করেই পড়েছেন উপরের সিঁড়িতে—

ভটচাজ। প'ড়া—আঘাতের ফলে—হার্টফেল করেছেন এও তো হতে পারে বাবা! বাড়ীতে কেউ ছিল না—

মাতু। একটি প্রাণী না বাবা, একটি প্রাণী না। সঞ্জীব দাদা সকাল বেলা থেকে বউকে ব'কে ঝ'কে চলে গেল রঞ্জনপুর। সেখানে শেখেদের বাড়ী-ঘর পুড়ে গিয়েছে। এ দিকে বউ—

অমর। তুমি যাও মাতু দিদি, কাজগুলো সেরে ফেল। আপনার কাজ কর গিয়ে।

মাতু। তা তো করবই। অমর দাদা—বুকটা আমার কর্‌কর্‌ করছে—মায়ের দুঃখের কষ্টের কথা মনে করছি আর দুষছি শুধু নিজেকে। বলছি আবাগী—হতচ্ছাড়ি তুই গেলি কেন? তুই থাকলি না কেন? বউ চলে গেল। মা নিজে পাঠিয়ে দিলে বউকে। সঞ্জীবদাদা বারণ করে গেল, বউ কাঁদতে লাগল, মা বললে—তুমি যাও মা—আমি বলছি। রান্নার লোক চলে গিয়েছে—কাল কাউকে দেখে নোব। তুমি যাও। ইষ্টিশানে বউকে তুলে দিতে নোটন মান্দেরকে সঙ্গে দিলে। বাকী আমি ছিলাম—আমাকে ডেকে বললে—মাতু, রুইদাসদের জীবনের তিনটে ছেলের জ্বর। বউমা ওদের সাবু বার্লি পাঠাতো। বউ মা নিজে দিয়ে আসত। তা—তুই যা মা, নইলে তিন তিনটি মহাপ্রাণী খেতে পাবে না। না হয় যা তা খেয়ে রোগ বাড়াবে! আমি বললাম; আমার মনটা খুঁত খুঁত করে উঠল; বললাম—তুমি যে একলা থাকবে মা। তা বললে—তা থাকি। তুই যা। আমি বসে সেদ্ধ রাঙা আলু গুলো মেখে পিঠে তৈরী করে রাখি। তুই এলে রস তৈরী করব। সঞ্জীব কদিন থেকে পিঠে খেতে চাচ্ছে। আমি গেলাম। মতিচ্ছন্ন আমার। ফেরার পথে গোকরণের বউ—আমাদের বউয়ের নিন্দে করছিল—আমি থাকতে পারলাম না, বললাম—মাটির চাকতি গোবরের ঘুটে—আকাশের চাঁদের নিন্দে কর না। এই আমার সঙ্গে দশ কথা হয়ে গেল। ঝগড়া লেগে গেল। আমার দেরী হল। ফিরে এসে দেখি—; মা কখন ওপরে উঠেছিল গুড় নামাতে। নামাতে গিয়ে হয় মাথা ঘুরে, নয় পা পিছলে—পড়ে—।

চাটুজ্জে। তুই যা, মাতু তুই যা। তোর দোষ কি? তুই যা। কাজগুলো সেরে ফেল। যা।

মাতু। (মাথায় ঘোমটা একটু বাড়াইয়া দিয়া বলিল) যাই বাবাঠাকুর। এই যাই।

প্রস্থান

চাটুজ্জে। ভটচাজ, অমর যুক্তিযুক্ত কথা বলেছে। আঘাত-মৃত্যুর উপর তুমি বেশী জোর দিচ্ছ। আঘাত-মৃত্যুতে তিন দিনে শ্রাদ্ধ। কাল সন্ধ্যেতে বউঠান মারা গেছেন। খবর পেয়ে সঞ্জীব ফিরে শ্মশান কৃত্য সেরে বাড়ী এল এই বেলা আটটায়। এখন বেলা দশটা। আজ দু দিন। তারও অর্দ্ধেক সময় গত। কাল খেউরী। পরশু শ্রাদ্ধ। এতে ক্রিয়া হবে কি করে? জোগাড় চাই। তা ছাড়া বউমা কলকাতায়, তাঁর আসা চাই। এই তো টেলিগ্রাম করতে গেল। সেই টেলিগ্রাম পেয়ে তিনি আসবেন। একটা বিবেচনা করে কথা বল।

সঞ্জীব। (ম্লান হাসিয়া) এর বিবেচনা উনি আর কি করবেন কাকা। শাস্ত্র বিধান দিয়েছে তার যুক্তি দিয়ে। আর ব্যবহারিক সুবিধে অসুবিধে—আপনার আমার অসুবিধে শাস্ত্রের যুক্তির বাইরে—তাতে শাস্ত্রের বিধিকে বাদ দিতে হবে। আর সত্যি বলতে—এখানে—আমার মায়ের মৃত্যু, আঘাতে হয়েছে—না স্বাভাবিক ব্যাধিতে হয়েছে—এ নির্ণয় হবে আমার বিশ্বাসের উপর।

অমর। আমরাও তাই বলছি সঞ্জীব দা। সেটা নির্ণয় ভটচাজ মশায় করবেন না। আমাদের যা বিশ্বাস তাই ওঁকে গ্রাহ্য করতে হবে এবং সেই মত বিধান উনি দেবেন। কত বিস্ময়করভাবে হার্টফেলে মৃত্যু ঘটে, তা উনি ঠিক জানেন না। তাই উনি এ কথা বলছেন। উপর থেকে গুড় বের করে সিঁড়িতে পা দিয়েই হার্টফেল করেছে।

সঞ্জীব। না অমর। আঘাতেই আমার মায়ের মৃত্যু হয়েছে। (বিষণ্ণ হাসিয়া) ভটচাজ মশাই অতি রূঢ় কথাটাকে নরম করে বলেছেন। কথাটা আঘাত মৃত্যু নয়—অপঘাত মৃত্যু! শাস্ত্রের সংজ্ঞা তাই। আমার মত ছেলে যারা বিশ্বকল্যাণে প্রমত্ত—তাদের মায়েরা হয় অপঘাতে মরেন, নয়, নেহাত ভাগ্য যাঁদের ভাল ব্যাধিতেই যাঁরা মরেন তাঁরাও বিনা সেবায় মরেন। হয়তো মৃত্যু-তৃষ্ণাতে জল পান না। এর উপর যাদের পুত্রবধূ হন ধনীকন্যা এবং আধুনিকা—তাদের মৃত্যু হয় আরও নিষ্ঠুর ভাবে, (হাসিয়া) যেমন ভাবে আমার মায়ের মৃত্যু ঘটেছে।

সে কথা কয়টা বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল

সকলে স্তব্ধ হইয়া গেল। ওদিকে ভর্ত্তি ঘড়া কাঁখে লইয়া মাতু প্রবেশ করিল

মাতু। বিয়ের সময় মা বারণ করেছিল—দশবার বলেছিল—সঞ্জু—হাতী পুষতে হলে আগে পিলখানা গড়তে হয়। গোয়াল যাদের সম্বল—তাদের হাতী পুষতে নাই বাবা। সঞ্জু তখন কথা দিয়ে বসে আছে। বিয়ের

আগে থেকে বউয়ের সঙ্গে ভাব। বউ তখন বলেছিল—ওই মাটির ঘরেই থাকব আমি। তা-পারবে কেন?

চাটুজ্জে। মাতু এইবার তুই বকুনি খাবি। যা-ভেতরে যা।

মাতু। যাই বাবা যাই। সঞ্জীবদাদা শুধু বউয়ের দোষ দিয়ে গেল কিনা তাই বলছি। হাঁ, বউয়ের দোষ অনেক বাবা। অনেক। কিন্তু সঞ্জীবের দোষও যে অনেক। দিনরাত খুটিনাটি নিয়েঝগড়া করে বাবা। দিনরাত! তাছাড়া বিয়ে করলি যখন, তখন তার সাধ-আহ্লাদ না মেটালে হবে কেন। বউয়ের বাবা এই গাঁয়ের লোক, তার পেকাও দোতালা বাড়ী পড়ে আছে। দিতে চাইলে জামাইকে। মেয়ে কখনও মাটির বাড়ী থাকে নাই। জামায়ের অমুনি মান উথুলে উঠল। বাবার ভিটে ছেড়ে শ্বশুরের ভিটেতে বাস করব আমি!

বলিয়া সে ঘড়া কাঁখে আবার ভিতরে চলিয়া গেল

ভটচাজ। আমি তা হলে এখন যাই চাটুজ্জে।

অমর। আপনি গোড়া থেকে এমনি ভাবে আঘাত-মৃত্যু আঘাত-মৃত্যু করে কাজটা ঠিক করেন নি ভটচাজ মশায়। হলপ করে কেউ বলতে পারে না যে আঘাতেই জ্যাঠাইমায়ের মৃত্যু হয়েছে। হতেও পারে—আবার না হতেও পারে—সে ক্ষেত্রে এমন করে—

ভটচাজ। আমাকে দোষ মিথ্যে দিচ্ছ বাবা। সঞ্জীবের বিশ্বাস যখন তাই, তখন তার বিরুদ্ধে আমি যাই কি ক'রে বল! তুমি চাটুজ্জেকে ডাকতে গেছিলে বোধ হয়, ছিলে না, আমি বাড়ী ঢুকলাম। সঞ্জীব আমাকে দেখেই বললে কি জান? বললে—মা বাপের অপঘাত মৃত্যুতে সন্তানের প্রায়শ্চিত্ত বিধি কি ভটচাজ মশাই? আমাদের সমাজে বাঁধা গরু মরলে প্রায়শ্চিত্ত আছে। অনিচ্ছায় গো-বধ করলেও বারোমাস মৌনী থেকে—ভিক্ষে ক'রে বেড়াতে হয়, গরুর ডাক ডেকে—জানাতে হয় যে সে গোবধ করেছে। আর সন্তানের অবহেলায় মা বাপের মৃত্যুতে সন্তানের প্রায়শ্চিত্ত নেই? দেখুন, আপনি স্মৃতি দেখুন। প্রায়শ্চিত্ত না-থাকে নতুন বিধান সৃষ্টি করুন। এক্ষেত্রে—

বাহির হইতে বাইসিক্লের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল—
এবং ডাক ভাসিয়া আসিল—

টেলিগ্রাম!

সকলেই চকিত হইয়া বাহিরের দিকে চাহিল। টেলিগ্রাম পিওন স্থানীয় ব্যক্তি হরেন্দর আসিয়া হেঁট হইয়া প্রণাম জানাইয়া দাঁড়াইল

হরেন্দর। সঞ্জীবদাদাবাবুর নামে টেলিগেরাপ আছে!

সে টেলিগ্রাম ও খাতা পেন্সিল বাহির করিল

অমর। কে করলে টেলিগ্রাম? সঞ্জীবদা!

চাটুজ্জে। আঃ, আগে খুলে দেখ হে। কি বৃত্তান্ত!

অমর। (খাতাটা লইয়া সই করিয়া খাতা দিয়া টেলিগ্রামটা ছিঁড়িয়া ফেলিল) Sumita reached safely family starting Hazaribug today morning Join us earnest request. বউ-দি আজ হাজারিবাগ চলে গেলেন!

চাটুজ্জে। কি মুস্কিল! কাল যে খেউরি! কলকাতায় টেলিগ্রাম করতে গেল বিনয়, সে টেলিগ্রাম তো তিনি পাবেন না তা হ'লে!

অমর যখন টেলিগ্রাম পড়িতেছিল তখনই সঞ্জীব আসিয়া বাহির ঘরের দরজার মুখে সকলের পিছনে দাঁড়াইয়াছিল।

সঞ্জীব। (প্রস্থানোদ্যত হরেন্দরকে ডাকিয়া বলিল) হরেন্দর।

হরেন্দর। আজ্ঞে দাদাবাবু!

সঞ্জীব। এক মিনিট দাঁড়াও। তোমার কি আর কোথাও টেলিগ্রাম বিলি করবার আছে? না-এখান থেকেই আপিসে ফিরবে।

হরেন্দর। আপিসেই ফিরব। আর কিছু নাই।

সঞ্জীব। তা হলে—। (আগাইয়া আসিয়া তক্তাপোষের উপর হইতে কাগজ কলম লইয়া) কিছু লিখিয়া—কাগজখানি হরেন্দরের হাতে দিয়া বলিল—তা হ'লে এই কাগজখানা—তোমাদের আপিসে বিমলকে পাবে—টেলিগ্রাম করতে গেছে—তাকে দিয়ো। একটু তাড়াতাড়ি দিয়ো।

হরেন্দর। যে আজ্ঞে।

প্রস্থান করিল

চাটুজ্জে। হাজারিবাগে টেলিগ্রাম করতে লিখে দিলে? ভাল হ'ল। বোধহয় হাজারিবাগ ষ্টেশনে ষ্টেশন-মাষ্টারের কেয়ারে আর একটা টেলিগ্রাম করলে ভাল হয়। ষ্টেশনে নেমেও পেতে পারেন।

অমর। (চিন্তিতভাবে বলিল) কিন্তু রাত্রে ফেরবার ট্রেণ ?

চাটুজ্জে। গ্র্যাণ্ড কর্ডে ট্রেণ পাবেন—বম্বেমেল—দিল্লী এক্সপ্রেস—তুফান—সব বড় ট্রেণ গুলোই ওই লাইনে। হাজারিবাগ রোডে—থামেও সব গাড়ি। মুস্কিল হল—ব্রাঞ্চ লাইনের। আমাদের এ লাইন নামেই রেললাইন। আসলে—মালগাড়ীর সান্টিং লাইন—

সঞ্জীব। ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না কাকা। আমি টেলিগ্রাম করতেই বারণ করে দিলাম বিমলকে।

অমর। বারণ করে দিলে ?

সঞ্জীব। পরশু মায়ের শ্রাদ্ধ করতে হবে। অবশ্য তিল কাঞ্চন। তা হলেও খরচ তো কিছু আছেই। আমার হাতে সম্বল বলতে কুড়ি টাকা কয়েক আনা। এ থেকে দুটাকা আড়াইটাকা বাজেখরচ করা আমার উচিৎ হবে ? তোমরাই বল ?

ঠিক এই সময়ে বাহির হইতে সঞ্জীব ভায়া—বলিয়া ডাকিয়া প্রবেশ করিলেন সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ পরমেশ্বরবাবু। পরমেশ্বরবাবু গ্রামের দাদু! স্থূলকায় দেহ ; পাকা দাড়ি, পাকা গোঁফ, কপালে সিন্দুরের ফোঁটা, আগেকার কালের কালীভক্ত মানুষ। মাথার পাকা চুল কদম ফুলি করিয়া ছাঁটা। বিচিত্র চরিত্রের মানুষ। সে মানুষ আজ সমাজে বিরল। অতীতের অতিকায় মানুষ যাঁহারা—আজ লোপ পাইয়াছেন বলিলেই চলে তাহাদেরই একজন।

পরমেশ্বর। সঞ্জীব! ভায়া!

সঞ্জীব। পরম দাদু! এই সারারাত্রি শ্মশানে জেগে—এই বয়সে—

পরমেশ্বর। কালী কালী বল মন! কালী ব'লে—তুমি যা বলেছ ভায়া—তা মিছে বলনি! পরমেরও বয়স হয়। বয়স হয়েছে। শ্মশান থেকে এসে—পূজো করতে বসলাম—তা বসে ব'সেই ঘুমিয়ে গিয়েছি। আসতে দেরী হয়ে গেল!

পরমেশ্বরের কণ্ঠস্বর উচ্চ, কথা বলেন ঝোঁক দিয়া এবং আপনার মনে কথা বলিয়া চলেন।

সঞ্জীব। সেই তো বলছি দাদু। আপনি আবার কেন কষ্ট ক'রে এলেন ?

পরমেশ্বর। এলাম—? কেন এলাম ? ভায়া কাল রাত্রে শ্মশানে যাবার জন্তে এলাম—তখন এই কথা বললে ; আবার এখন এলাম তো বললে—কেন এলেন ? বলি হ্যাঁ ভায়া, পরম তো এখনও মরে নি। পরমের ধরমই তো এই!

সঞ্জীব। বসুন আপনি!

ভটচাজের টুলটি আগাইয়া দিল

পরমেশ্বর। (বসিলেন) কালী কালী বল মন। তারপর—শোন ভায়া, কাল থেকে বলব বলব করছি, বলবার ফাঁক পাই নি। বলছি—মা বেটি তো গেল, মনে খুব দুঃখ হয়েছে, তা—বলছি—দুঃখু টুখ্যু করোনা। মা সবারই মরে। আমার মা মরেছে সেই ছেলে বেলায়। বুয়েচ! হ্যাঁ। কালী কালী বল মন—তারা তারা বল! তা শ্রাদ্ধ—ভটচাজ বলছিল—তিন দিনে হবে ? তা—তাই কর। সিঁড়িতে গড়িয়ে পড়ে মৃত্যু—অপঘাতই বটে। গলায় দড়ি,—উঁচু জায়গা থেকে পড়া—গাছ থেকে—সিঁড়ি থেকে—ছাদ থেকে—

চাটুজ্জে। (তাড়াতাড়ি হুকা দিয়া তার মুখ বন্ধ করিতে চাহিল) তামাক খাও, খুড়ো!

পরমেশ্বর। কে ? হরিহর!

চাটুজ্জে। হ্যাঁ, তামাক খাও।

পরমেশ্বর। দাও। তা টেনে রেখেছ তো কিছু ? টানলে ধোঁয়া বেরুবে তো ? আর কড়া নয় তো ?

চাটুজ্জে। না-না। খাও তুমি!

পরমেশ্বর। খাব তো! সেদিন নটবর দত্তের দোকানে তামাক খেয়ে মাথায় জল দিতে হয়েছিল! জানতো—কড়া কিছু সয়না আমার ধাতে। ওরে বাবা—কড়া ধাতের জন্তে গাঁজা সইল না—মদ সইল না ;—তান্ত্রিক সাধনা—পিতলের পাত্রে নারকেল জল দিয়ে সারলাম—কালী কালী ক'রে ঐ কারণে কালী পেলাম না! কালী কালী বল মন! হ্যাঁ কি বলছিলাম—

অমর। (কথাটা চাপা দিবার জন্তে বলিল) হ্যাঁ তিন দিনেই হবে শ্রাদ্ধ!

সঞ্জীব। হ্যাঁ পরম দাদু ; আমার মায়ের এর চেয়ে বড় ভাগ্য আর কি হবে বলুন! অপঘাত মৃত্যু—

পরমেশ্বর। (মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া)

সঞ্জীব। (তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন) তুমি কেন আক্ষেপ করছ ভাই? (হাসিয়া উঠিলেন) রোগে ছমাস ভুগে—পিঠে ঘা হয়ে—চিঁচিঁ ক'রে চেঁচিয়ে নিজের ময়লা মাটি মেখে মরার চেয়ে তোমার মা খারাপ মরেছে সঞ্জীব? কালী কালী বল মন, তারা তারা বল! তা সঞ্জীব—এত বিদ্যে শিখে তোমার মনের এত ভুল ভাই। হায়-হায়-হায়। মরণ মরণ। সে রোগেই মরুক আর পড়েই মরুক, ঘরেই মরুক আর গাছতলাতেই মরুক—চিকিৎসা হয়েই মরুক আর চিকিৎসা না-হয়েই মরুক—। দাদু সব মড়াই শ্মশানে যায়—আর মরে সবাই সেই এক জায়গাতেই যায়। কাল নিয়ে কালীর কোলে ফেলে দিয়ে বলেন—ধর গিন্নী ধর।

"কালের বুকে নাচেন কালী—কালীর কোলে বিশ্বভুবন"—। হায় হায় হায়। কালী কালী বল মন! ওর জন্যে মনে খুঁত খুঁত কর না। মানুষ মরে গেলে যারা বেঁচে থাকে সেই সব মানুষের দিকে তাকিয়ে দেখো—তারা কি বলে। যার মরণে হায় হায় করে—জেনো তার মরণই ধন্য—আর যার মরণে লোকে বলে—আপদ গেল, তার গতি জেনো অগতিতে। দানসাগর তিলকাঞ্চন—দশ দিন তিন দিন—ভুয়ো—ভুয়ো। কালী কালী বল মন। ও নিয়ে যদি মন খারাপ কর ভাই—তবে তোমার লেখাপড়া শেখা আমার কালীসাধনের মত। ভুষো কালী—দোতের কালী মেখে দাঁত মেলে বসে থাকলাম। হয়ে যাক, কালী ব'লে তিনদিনেই শ্রাদ্ধ হয়ে যাক! জয় কালী!

সঞ্জীব। দাদু আপনার মন যদি পেতাম—তা হ'লে তো দুঃখ কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি পেতাম!

পরমেশ্বর। (মুখ তুলিয়া) সঞ্জীব!

সঞ্জীব। দাদু!

পরমেশ্বর। কালী বলে একবার কাছে আয় তো ভাই।

সঞ্জীব। দাদু!

পরমেশ্বর। কালী কালী বলে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব তুই—God—God বলে যেন সত্যি উত্তর দিস্!

সঞ্জীব। বলুন দাদু, কালী কালী বলেই সত্যি উত্তর দেব। গড গড বলে কেন?

পরমেশ্বর। (বারবার ঘাড় নাড়িয়া) উঁহু—উঁহু! কালী কালী বলোনা। যার নাম ভাজা চাল—তার নাম মুড়ি; যেখানেই ভাবের ঘরে ফাঁকি, সেখানেই মিথ্যে। কি বলে, আমি সেকালে এফ-এ পাশ করেছিলাম। আমি জানি—কালীর নামে লজ্জা পেতাম—মনে হ'ত হিদেন হয়ে গেছি। মড়া মড়া বলে রাম নামের মত বহু কষ্টে পঞ্চাশের পরে রামকৃষ্ণের দয়ায় কালী মেখে—কালী নাম নিয়েছি। আমরা বিশ্বাস করতাম God—তোমরা তাও করনা বোধ হয়। এম-এ পাশ—তাও ইংরিজীতে। তুমি ভাই এমনিই বল। কালী কালী বল মন।

সঞ্জীব। বলুন দাদু।

পরমেশ্বর। আধখানা তো বলেইছি কালী বলে। বলছি—ভাই, যে লেখাপড়া শিখেছ তুমি তাতে তো—মরা মানে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ; দেহের কল-অচল হওয়া; কি বলে অনেক কাল পড়েছি—ঠিক মনে নেই। তবে কালী বলে এটুকু মনে আছে যে—তারপর আর কিছু নাই—পরকাল না—স্বর্গ না, নরক না—মানে নট কিস্যু অর্থাৎ নাথিং।

সঞ্জীব। আমি যে হিন্দু দাদু—আমার সংস্কার এই। আমি মানি।

পরমেশ্বর। জয় কালী। দীর্ঘজীবী হও ভাই। মনের কালী ঘুচে যাক। কিন্তু ভাই যে সংস্কারের কথা তুমি বললে—তার কথা তোমার চেয়ে আমি বেশী জানি। এটা মানো? তার কারণ আমাদের সামনে সংস্কার অনেক বেশী শক্ত ছিল—আর তোমার মত ইংরিজি এত শিখিনি আমি।

সঞ্জীব। মানি।

পরমেশ্বর। তবে আমার কথা শোন, কালী বলে, বিশ্বাস করো ভাই। ভাই মৃত্যু মানুষের হয়; ব্যাধি আঘাত পতন—এ সব উপলক্ষ। একটাকে উপলক্ষ করে হয় মৃত্যু। ভাই আজ চিকিৎসাবিদ্যার উন্নতি দেখছ তো! বল তো ভাই—আগে যারা বিনা চিকিৎসায় মরেছে তাদের মৃত্যু তা হ'লে অকালমৃত্যু কিনা? কালী কালী বল ভাই। মনের কালী—বুকের ধোঁকা ঘুচিয়ে ফেল—আমি বেশী খবর রাখি এ সবের—আমি বলছি ভাই, মা তোমার পরম গতি লাভ করেছেন। আঘাত-মৃত্যু অপঘাত-মৃত্যু তোমার মায়ের পুণ্যকে এক বিন্দু ম্লান করতে পারিনি।

সঞ্জীবের চোখ সজল হইয়া উঠিল—সে উত্তর দিতে পারিল না

পরমেশ্বর। সঞ্জীব!

সঞ্জীব। আমার মনের ক্ষোভ মুছে গেল দাদু!

বিমল আসিয়া প্রবেশ করিল

বিমল। সঞ্জীবদা! তুমি টেলিগ্রাম করতে বারণ করেছ কেন? আমি টেলিগ্রাম ক'রে দিয়েছি।

সঞ্জীব। মিথ্যে খরচ করেছ বিমল, সুমিতারা কলকাতায় নেই। তারা আজই রওনা হয়ে গেছে হাজারিবাগ।

বিমল। সে কথা লিখলে না কেন? আমি হাজারিবাগেই টেলিগ্রাম করতাম।

অমর। (আগাইয়া আসিল) তোমার কথা আমি শুনব না সঞ্জীবদা। আমি হাজারিবাগে লোক পাঠাব।

সঞ্জীব। সে আসবে না অমর।

অমর। তুমি বউদির প্রতি অবিচার করছ।

সঞ্জীব। এই চিঠি দেখ। সে যাবার সময় ষ্টেশনে লিখে নোটনের হাতে দিয়ে গেছে। "আমি এখানে আর ফিরিব না। সংকল্প করিয়া যাইতেছি। তুমি দয়া করিয়া আমাকে বিরক্ত করিয়ো না!" আমি তবু টেলিগ্রাম করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কাল গিয়ে আজ সে হাজারিবাগ ছুটেছে। প্রমোদ-ভ্রমণে বেরিয়েছে—সে আসবে না অমর?

পরমেশ্বর। (সঞ্জীবের মুখের দিকে চাহিয়া) বউ তোর ঝগড়া করে চলে গেছে? কালী কালী বল মন। কালী কালী বল! হ্যাঁ-হ্যাঁ। শুনেছি বটে। পাড়ায় পাড়ায় ললনাকুল রসনা প্রায় বিবসনা হয়ে নৃত্যশীলা হয়ে উঠেছে বটে শুনে এলাম। কিন্তু তা' ব'লে লোক না পাঠালে কালী বলে চলবে না কেন? অন্যায় হবে! নিশ্চয় অন্যায় হবে। পাঠাও—পাঠাও—লোক পাঠাও! ও জাত হল অভিমানিনীর জাত। শিবকে ভয় দেখিয়ে বাপের বাড়ী গিয়ে দক্ষযজ্ঞ করে। সোনার হরিণের আবদার ধ'রে লঙ্কাকাণ্ড বাধায়। ওরে ওদের কাণ্ড বোঝে কে? কালী বলে—লোক পাঠিয়ে দে অমর। আমি বলছি। নেহাত না মানে সঞ্জীব—তুই সঞ্জীবকে লুকিয়ে লোক পাঠিয়ে দে। তারা তারা—সে যে আমাদের গাঁয়ের মেয়ে রে! মণি ঘোষালের বেটি। বড় ভাল মেয়ে—রাজার বেটি হয়ে বেছে বেছে শিবের গলায় মালা দিয়েছে। দে কালী বলে পাঠিয়ে দে!

সঞ্জীব। সে আসবে না দাদু!

পরমেশ্বর। তা না আসে না-আসবে। তাতেই বা কি? কালী কালী বল মন! ওরে তোদের কোষ্ঠীর জোটক আমি দেখেছিলাম। তোর থেকে সে বর্ণে শ্রেষ্ঠ, গণে ভারী। হবে—ঝগড়া হবে তোদের। ভারী ঝগড়া। কালী ব'লে—সেই হয় তো জিতবে রে! দে অমর, লোক পাঠিয়ে দে!

নটবর দত্তের প্রবেশ। গায়ে ফতুয়া—হাতে চাবীর গোছা। নটবরের বেশ একজোড়া গোঁফ আছে। বয়স চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ

নটবর। ময়দা চিনির পারমিট তো কঠিন ব্যাপার সঞ্জীববাবু। আপনার ওপর ভারী রাগ। বলে দরখাস্ত ক'রে সঞ্জীব আমাদের জ্বালিয়ে মারে। দিতে পারি—যা সাধারণকে দিই। আধ মণ ময়দা, দশ সের চিনি। তার বেশী না।

পরমেশ্বর। কি বললি নটা? দেবে না? সঞ্জীবের মায়ের শ্রাদ্ধ হবে—কালী বলে—ময়দার পারমিট দেবে না? ইংরেজের খয়ের খাঁয়েরা দেবে না?

নটবর। আধ মণের বেশী দেবে না!

সঞ্জীব। ঘি ময়দার কারবার আমি করব না নটবর। তা ছাড়া শ্রাদ্ধ করব আমি তিল-কাঞ্চন। খাওয়াব শুধু জ্ঞাতি, শ্মশানবন্ধু আর কাঠুরে। আমি অন্নের নেমন্তন্ন করব।

পরমেশ্বর। বাস্ বাস্। কালী কালী বলে—যা আছে তোমার তাই খাওয়াবে! নটা চাইনে ময়দা!

নটবর। আমি বলে এসেছি—এর পর সঞ্জীবের শ্বশুরের হুড়ো সামাল দিয়ো। সে আর কেউ নয় এ্যাড-ভোকেট এম-এন ঘোষাল ও-বি-ই! ভাবছে। গজ গজ করছে।

সঞ্জীব। দরকার নেই নটবর। ও কথা থাক। এখন তোমার সঙ্গে অন্য আমার কথা আছে।

নটবর। বলুন!

সঞ্জীব। আমার টাকা চাই। আমার হাতে মাত্র কুড়িটি টাকা আছে। পোষ্টাপিসে শ দেড়েক। কিন্তু-তাতে তো মাতৃদায় উদ্ধার হবে না—

নটবর। আপনার যা চাই আমি দোকান থেকে দেব। পরে দেবেন আপনি।

সঞ্জীব। না। আমি জানি, আমার শ্বশুর তোমাকে বলে রেখেছেন—যা দরকার আপনি দিয়ে যান যেন।

নটবর। কিন্তু আজও তো একপয়সার জিনিষও আপনি ধারে নেন নি সঞ্জীববাবু!

সঞ্জীব। আজও নেব না নটবর। কিছু মনে কর না। তুমি যদি তোমার জমির পাশে আমার যে জমিটা আছে সেটা কিনে আমাকে টাকা দাও—

নটবর। মাফ করবেন সঞ্জীববাবু। আপনি নগদ টাকা নেন আমার কাছে। আপনার কথার উপর টাকা দেব আমি। এই কত্তার সুমুখে বলছি—সে টাকা আপনার শ্বশুরের কাছে চাইব না আমি। আপনার জমি আমি কিনতে পারব না।

সঞ্জীব। না নটবর, সে আমি নেব না।

নটবর। জমি আপনি বেচবেন না। ও জমি গেলে এমনটি আর হবে না! আমার কথা শুনুন।

পরমেশ্বর। নটা!

নট। আজ্ঞে কত্তা! আপনি বুঝিয়ে বলুন সঞ্জীববাবুকে।

পরমেশ্বর। বলছি। তোকেও বলছি। কালী কালী বলে—বলছি। কালী কালী বলে—সঞ্জীব বেঁচে থাকুক—একশ বছর বেঁচে থাকুক। বলিহারি ভাই—ঠিক করেছ তুমি। কর—কালী বলে ওই সেরা জমিটাই দাও বেচে—মায়ের শ্রাদ্ধে। যাক সেরা বিষয়। আর নটা, নে, কালী কালী বলে—নিয়ে নে তুই নিয়ে নে ওই জমি। দে টাকা! কত দাম দিবি?

নট। আপনি বলছেন কর্ত্তা! বেশ তা' হ'লে আমি নিচ্ছি। ওখানে দুবিঘে জমি আছে সঞ্জীববাবুর। সাড়ে সাতশো বিঘে—আমি দেড় হাজার টাকা দেব।

পরমেশ্বর। কালী কালী-বল মন! তুই বেটা এই জন্মেই যক্কি জন্ম থেকে মুক্তি পাবি। দেবতা হবি। নিয়ে আয় দলিল—নিয়ে আয় টাকা। কালী কালী বলে—সঞ্জীব!

সঞ্জীব। দাদু!

পরমেশ্বর। কালী বলে—যেমন মন চায় মায়ের শ্রাদ্ধ কর। শুধু ওই ক্যাঙালী ব্যাটাদের ঠেসে পেট পুরে খাইয়ো। অমর! দাও সঞ্জীবকে না বলেই লোক পাঠিয়ে হাজারিবাগ। কালী কালী বল মন। অ-হ। শব্দটা? কালী বলে শব্দটা কিসের? এরোপ্লেন? অঃ—কুরুকুল নির্ব্বংশ—পাণ্ডব কুলে পাঁচটিতে ঠেকিয়ে কুরুক্ষেত্র শেষ হয়েছিল। এ ব্যাটারা কালী বলে বিলকুল ছারেখারে না দিয়ে থামবে না। ওরে অমর—লোক পাঠালি? কে গেল?

(ক্রমশঃ)

জননী সারদা

প্রভাময়ী মিত্র

প্রণাম প্রণাম জননী সারদা, প্রণতি অজুত লক্ষবার—
নবীন সূর্য্য অয়ন এসেছে শতাব্দী নত চরণে মার।
তিমির সঘন যখন গগন নাগনিঃশ্বাসে গরল ভোর,
সর্ব্ব অঙ্গ অবশ অচল পীড়িত মর্ম-বন্ধ-ডোর।
ধূলিধ্বজ উড়ে নভ মন্থিয়া, আবরিয়া দেয় আঁখির আলো,
মন কুয়াশায় আকুল পান্থ, পন্থ ঢেকেছে নিকষ কালো।

মরু-সাহারায় ফিরিছে ভুখারী, ক্ষুধাতৃষ্ণায় সংজ্ঞাহারা,
তুমি এলে মাতা করুণারূপিণী! আর্ত্তে বিতরি অমৃতধারা।
প্রসন্না মাতা পদ্মের পাতে পরসাদ পরমান্ন দিলে,
যুগে যুগে তুমি যোগাড্যা ওগো, নিঃস্বজনেরে কিনিয়া নিলে।

পরম পুরুষ প্রকৃতির পায়ে ঘুরে ফিরে ঐ শতেক বর্ষ,
বক্ষে বক্ষে বহে আনন্দ, জাগে মা জননী নবীন হর্ষ।

কাশ্মীর

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

প্রশস্ত পিচবাঁধান পথ পোলো মাঠের পাশ দিয়ে বিতস্তার প্রায় সমান্তরাল ভাবে গেছে—এর নাম রেসিডেন্সী রোড। এম্পোরিয়ামের প্রায় সংলগ্ন বেতার-কেন্দ্র ; তারপর শীকার দপ্তর, ভিজিটর্স ব্যুরো এবং অন্যান্য বড় বড় দোকান পাট এই রাস্তার ওপর। নদীর অপর তীরে লালমণ্ডির যাদুঘরটী খুব বড় নয় ; এখন বর্ত্তমান সরকারের নির্দ্দেশে এর পুনর্বিন্যাস চোলছে ; মাত্র ছুটী দালান (hall) সাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল। এরই অপরাংশে প্রতাপসিংহ সাধারণ পাঠাগার। পূর্ব্বের রাজপ্রাসাদ অনেক পূর্ব্বেই মহারাজের আমলে পরিষদ গৃহে রূপান্তরিত হোয়েছিল। বর্ত্তমান মহারাজ হরিসিং পরীমহল ও চশমাসাহী বাগান যাবার পথে করণসিং বুলেভার্দের ওপর পাহাড়ের কোলে ডাল হ্রদের তীরে বিস্তীর্ণ



সোনামার্গের পথে

এলাকায় তাঁর প্রাসাদে বাস কোরতেন (এখন এটীও রূপান্তরিত হোচ্ছে। কালের কি বিচিত্র গতি।) কাশ্মীরের রাজবংশের ইতিহাস আমরা বহু পূর্ব্বে ছেড়ে এসেছি. বর্ত্তমানের কাশ্মীরকে জানতে ও দেখতে হোলে তার ইতিহাসের ছেড়ে-আসা সূত্রকে আর একবার ধরা দরকার। বিশেষ কোরে এখানের ডোগরা রাজবংশের পতন ও শেখ আবদুল্লার শাসন ভার গ্রহণ, পাকিস্তানের আক্রমণ এবং তার প্রতিরোধ ও পরিণাম বর্ত্তমান সময়ের এই সব রাজনৈতিক গোলযোগ, যা এখন আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ফলে ক্রমশঃ জটিলতর রূপ নিয়েছে, এসব ভালভাবে বুঝতে গেলে ইতিহাসের অনুসরণ কোরতে হবে নিরপক্ষ দ্রষ্টা হিসাবে। মুসলমান সুলতানের মধ্যে জৈন-উল-আবদীন যেমন স্মরণীয় তেমনি বরণীয়। পূর্ব্ব সুলতানের প্রবর্ত্তিত হিন্দুদের ওপর ধার্য্য জিজিয়া কর তিনি তুলে দেন ও রাজ্যে গোহত্যা নিষিদ্ধ কোরে দেন। রাজ্যে বহু জলসেচ প্রণালী, সেতু, পথ প্রভৃতি তিনি নির্ম্মাণ করান, পূর্ব্বে ডাল হ্রদের জল সোজা বিতস্তায় এসে হাব্ব কদলের কাছ দিয়ে বেরিয়ে যেত। সুলতান জৈন-উল-আবদীন এই পথ বন্ধ কোরে ডাল দরজার মধ্য দিয়ে ডালের জল মারনালা দিয়ে বিতস্তায় ফেলার ব্যবস্থা করেন। এই খালের বা নালার তদানীন্তন নাম ছিল 'লছমা কুল' (কে জানে লছমন খাল কিনা), কিন্তু জৈন-উল-আবেদীনের নামে এর তৎকালীন নামকরণ হয়, জৈন গঙ্গা। বিতস্তার জল নানাভাবে আয়ত্তে রেখে যাতে প্লাবন বা অনাবৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতি না হয় তারও ব্যবস্থা ইনি করেন। এই সুলতান এত জনপ্রিয় ছিলেন যে অনেক হিন্দু সে সময় তাঁকে ভগবানের অবতার বোলতেন। ইনিই কাশ্মীরে রেশম শিল্প, কাগজ শিল্প, মণ্ড-শিল্প (Paper machine) প্রবর্ত্তন করেন এবং ১৪৬৬ খৃঃ অব্দে কাশ্মীরে সর্ব্ব প্রথম আগ্নেয়াস্ত্র প্রবর্ত্তন করেন। রাজকোশ থেকে নিজের জন্য কোন অর্থ তিনি নিতেন না ; নিজের আবিষ্কৃত তাঁমার খনির আয় থেকেই ব্যয় নির্ব্বাহ কোরতেন। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার তৎকালীন ইসলামী জগতে সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠ ছিল। শেষ জীবনে ছেলেদের আচার ব্যবহারে সংসারে বীতরাগ হোয়ে তিনি একাকী পণ্ডিত শ্রীবরের কাছে 'মোক্ষ উপায় গ্রন্থ' শুনতেন এবং যোগ-বাশিষ্ঠ পাঠ কোরতেন। ইনি অমরনাথ এবং হিন্দুদের অন্যান্য তীর্থও দর্শন কোরেছিলেন বোলে শোনা যায়। সম্রাট অশোকের পর এই সুলতান কাশ্মীরের সাধারণ আইনগুলি প্রজাদের জন্য পাথরের গায়ে উৎকীর্ণ কোরে প্রকাশ্য স্থানে রক্ষার ব্যবস্থা করেন। আজও জৈন-কদল বা জেনা-কদল (৪র্থ পুল), জৈন-পুরা, জৈনা মার্গ, জৈনাগীর, জৈনাকোট প্রভৃতি সহর ও স্থানের নামের মধ্যে দিয়ে এই শক্তিমান মহানুভব সুলতানের নাম স্মরণীয় হোয়ে আছে। শ্রীনগরের ৪র্থ ও ৫ম সেতুর মাঝে জৈন-উল-আবদীন তাঁর মায়ের সমাধি-সৌধ

করান। আজও হিন্দু ও মুসলমান বাড়ীতে কোন কঠিন ব্যাধি হোলে, —বিশেষ কোরে বসন্তের আবির্ভাবে এই সমাধির খানিকটা ভাঙ্গা ইটের টুকরো নিয়ে বাড়ীতে রাখে। এদের ধারণা এই কল্যাণময়ী নারীর আত্মা তাদের মঙ্গল কোরবেন। সুলতান জৈন-উল-আবদীনের জীবিতকালে পার্শ্ববর্তী 'চকেরা' কয়েকবারই কাশ্মীর অধিকারের চেষ্টা করে কিন্তু সুলতানের শৌর্য্যে অসমর্থ হয়। এই শক্তিমান সুলতান খোরাসান, তুর্কীস্থান, শীর্ষস্থান, মিশর, তুরস্ক, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশগুলির সঙ্গে দূত বিনিময় কোরেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর চকেরা কাশ্মীর দখল কোরে নেয় এবং এই চক রাজবংশের শেষ রাজা ইয়াকুব খানের কাছ থেকেই ১৫৮৬ খৃঃ অব্দে দিল্লীশ্বর আকবর কাশ্মীর অধিকার করেন।

ইয়াকুবখানের পত্নী হাবাখাতুন তাঁর দরদী কবিতার জন্যে আজও কাশ্মীরের কবি মহলে স্মরণীয়। প্রেম ও বিরহের ঘাত প্রতিঘাতে কৃষককুলের এই সাধারণ মেয়েটীর জীবন সাংসারিক দিক দিয়ে যেমন ব্যর্থ ও করুণ, কবি প্রতিভা এবং প্রেমের পরশে তেমনি সার্থক ও পূর্ণ হোয়ে উঠেছিল। দরিদ্র কৃষক পরিবারে শ্রীনগরের ৮ মাইল দক্ষিণে চণ্ডহর



ডালের বুকে ভাসা বাগান

গ্রামে অসামান্যা সুন্দরী এই স্বভাব কবি জন্ম গ্রহণ করেন। গ্রাম্য মক্তবে হয় পাঠ সুরু; কিন্তু শুধু কোরাণের বয়েতে এই শিশু কবির মন ভোরল না। তিনি পোড়ে ফেল্লেন সেখসাদীর 'করম' "গুলীস্থান বোস্তান, এবং নিজেও কবিতা রচনা কোরতে লাগলেন। এই সুকণ্ঠী সুন্দরী স্বভাব-কবির প্রতিভায় প্রতিবেশীরা মুগ্ধ হোলেন, কিন্তু দরিদ্র কন্যার কবি কি গায়িকা হওয়া শুধু অশোভন নয় অপরাধ। তাই বাপ মা অল্প বয়সেই মেয়ের বিবাহ দিলেন। সংসারের চাপে সঙ্গীতের উৎস যাবে শুকিয়ে এই আশাই তাঁরা কোরেছিলেন; কিন্তু কবির কাব্য কল্লোল থামলো না, সুরের নির্ঝরিণী শুকিয়ে গেল না, বরং যৌবনের জাগরণে তা পূর্ণতর প্রবলতর হোয়ে উঠলো; দয়িতের সঙ্গে মিলনের আকুল আবেগ, বিরহিণীর ব্যর্থ প্রেমের কান্না তার মধুকণ্ঠের মোহময় সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় মাঠে ঘাটে ঝঙ্কৃত হোতে লাগলো। যুবতী বধূর এই অসামাজিক আচরণ কোন শ্বশুর শাশুড়ী সইতে পারে? কাজেই সামাজিক, শারীরিক সব রকম শাস্তি ও শাসন সুরুহোল—গান বন্ধ কোরতেই হবে। সুরের ও সঙ্গীতের সাধনা যার মজ্জাগত, কার সাধ্য তাকে সংযত করে?

বিবাহ বন্ধনের এ বাধায় সে আরও ব্যাকুল হোয়ে উঠলো, মনে মনে হোল বিদ্রোহী। অবসর পেলেই নদীতে জল আনতে গিয়ে, নয় ত বনে কাঠ কুড়োতে গিয়ে তার অন্তরের অবরুদ্ধ আবেগকে উৎসারিত অবারিত কোরে দিত সুরের ঝঙ্কারে, সামাজিক সব শাসন সব সংস্কার শান্তি উপেক্ষা কোরে। এক শুভ লগ্নে 'কাঠকুড়ুনী' হাব্বার চোখোচোখি হোল দেশের সম্রাট ইয়াকুবখানের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গীতে ও সৌন্দর্য্যে সম্রাট মুগ্ধ হোলেন; হাব্বা বাঈ বা জুনী (চাঁদ) যেন ও এতদিনে খুঁজে পেল তার প্রিয়তমকে। সম্রাট ৫০০০ মুদ্রা হাব্বার স্বামীকে দিয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা কোরে হাব্বাকে নিজে বিবাহ কোরলেন। ঘুঁটে কুড়োনী সত্যিই হোল রাজরাণী। রাণী হাব্বা-বাঈ দেশ-বিদেশ থেকে সঙ্গীতজ্ঞদের আনিয়ে দেশে কাব্য ও সুরের নতুন কোরে সম্মান দিলেন এবং নিজে 'রাসল' নামে এক নূতন সুর সৃষ্টি কোরলেন। সহজকথ্য ভাষায় ছোট্ট গান লোল সঙ্গীতে (কতকটা ব্রজ ভাষার গানের মত) হাব্বাবাঈ গেঁথে গেছেন তাঁর বহু কথা ও ব্যথা; আজও তা কাশ্মীরী যুবক যুবতীর মুখে মুখে ফেরে। কিন্তু দুর্ভাগ্য নিয়ে যে জন্মেছে তার



লিদার নদী

ভাগ্যে স্বামী সোহাগ রাজ ঐশ্বর্য্য বেশীদিন সইল না, সম্রাট আকবরের সেনাপতি রাজা ভগবানদাস ১৫৮৬ খৃঃ অব্দে তাঁর স্বামীকে বন্দী কোরে নিয়ে গেলেন। বিরহিণী রাণী প্রাসাদ ত্যাগ কোরে নির্জ্জন বনকান্তারে ব্যথার রাগিনী গেয়ে গেয়ে ফিরতে লাগলেন। এই সময় গুরেজ অঞ্চলে কিষণগঙ্গা নদীর অপর পারে একটী ছোট পাহাড়ে এই সুকণ্ঠী রাজ সন্ন্যাসিনী একটী কুটীরে বাস করতেন—আজও ঐ পাহাড়টীর নাম "হাবাবল"। তার পর জীবনের সব তিক্ততা, রিক্ততা আকণ্ঠ পান কোরে তাঁর সঙ্গীতের সুরে সুরে তাদের ছন্দোবদ্ধ কোরে কাশ্মীর সাহিত্যের অন্যতম স্রষ্টা এই কবি আবার ফিরে এলেন শ্রীনগরের উপকণ্ঠে এক গ্রামে। শ্রীনগর থেকে ৫ মাইল দূরে পাণ্ডেথনের একটু আগে একটী ছোট গ্রাম পাণ্ডেচকের এক পর্ণ কুটীরে প্রকৃতির এই প্রিয়কন্যা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এই গ্রামে আজও তার সমাধি প্রায় অজ্ঞাত অবজ্ঞাত অবস্থায় পড়ে আছে। এই হাব্বা বাঈএর নামেই বিতস্তার দ্বিতীয় সেতুর নামকরণ হয় হাব্বাকদল।

আকবর মাত্র তিনবার কাশ্মীরে আসেন, কিন্তু তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর প্রায় প্রতি বৎসরই এই সুন্দর দেশে আসতেন এবং এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে সুন্দরতর কোরে সাজিয়ে তোলেন বিভিন্ন উদ্যান ও প্রমোদ ভবন নির্ম্মাণ করিয়ে। আজ মোগল উদ্যানের মধ্যে আচ্ছাবল, নিসাদবাগ, সালিমারবাগ, চসমাসাহী ও ভেরীনাগ বর্ত্তমান, কিন্তু জাহাঙ্গীরের আমলে শুধু ডালহ্রদের তীরেই এমনি উদ্যানের সংখ্যা ছিল ৭৭৭টী। জাহাঙ্গীরের পর সাজাহানের প্রতিনিধি শাসক (Governor) আলি মর্দ্দান পীর পঞ্চলের রাস্তায় ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত বহু সরাইখানা নির্ম্মাণ করান পথিক ও বণিকদের সুবিধার জন্য। ঔরংজেব মাত্র একবার কাশ্মীরে আসেন। তার পর মোগল শক্তির অবনতির সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীরেও রাজপ্রতিনিধিরাই সর্ব্বেসর্ব্বা হোয়ে ওঠে। শেষ মোগল সম্রাট মহম্মদসাহার (১৭১৯-১৭৪৮ খৃঃ অঃ) শেষ প্রতিনিধি ছিলেন



কাশ্মীর শিশু

আব্দুল মনসুর খাঁ। এই দুর্ব্বল শাসনের সুযোগ নিলে আফগান আহম্মদ সা দুরানী। ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে কাশ্মীর গেল আফগানদের হাতে। আফগান শাসকদের হাতে ১৮১৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত কাশ্মীরীদের গেছে দুর্য্যোগের ঘন রাত্রি, কারণ লুণ্ঠন, ধর্ষণ, হত্যা ছিল দুর্দ্ধর্ষ আফগানি শাসক সম্প্রদায়ের শাসনের নীতি। অত্যাচারিত হোয়ে এবং উৎপীড়নের ভয়ে বহু হিন্দু এ সময় দেশত্যাগ করে, মুসলমান প্রজারাও অতিষ্ঠ হোয়ে উঠেছিল। এই অত্যাচারিতের দলই পণ্ডিত বীরবল ধরের নেতৃত্বে মহারাজ রণজিত সিংহের শরণাপন্ন হোল কাশ্মীরের পরিত্রাণের জন্য। ১৮১৪ খৃঃ অব্দে মহারাজা রণজিৎ সিং নিজে পেছনে থেকে পুঞ্চ থেকে একদল সৈন্য দিয়ে এদের সাহায্য কোরলেন, কিন্তু সে অভিযান ব্যর্থ হোল। পরে ১৮১৯ খৃঃ অব্দে রণজিতের শ্রেষ্ঠ সেনাপতি মিশ্রী দেওয়ানচাঁদ এবং ডোগরা সর্দ্দার গুলাব সিং একত্রে কাশ্মীর আক্রমণ কোরে মহম্মদ আজিম খাঁকে বন্দী কোরে কাশ্মীরকে শিখ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। শিখ সাম্রাজ্য থেকে কিভাবে এ রাজ্য ডোগরা সর্দ্দার গুলাব সিংহের হাতে আসে তা পুর্ব্বেই বোলেছি। এখন দেখা যাক্ ঘটনার কি ঘূর্ণাবর্ত্তে আবার এই হিন্দুরাজবংশের হাত থেকে শাসন ক্ষমতা শেখ মহম্মদ আবদুল্লার হাতে চোলে গেল। মহারাজ গুলাব সিংহের পুত্র রণবীর সিংহের সময় থেকেই ইংরেজেরা কাশ্মীরকে নিজেদের মুঠোয় আনতে চেষ্টা করছিল—এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল গিলগিট গিরিবর্ত্ম নিজেদের হাতে রাখা, কিন্তু তিনি আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে ইংরেজদের আধিপত্য অস্বীকার করেন। এর ফলে ইংরেজ শাসক সম্প্রদায় রণবীর সিংহের নামে কুশাসনের মিথ্যা অভিযোগ এনে সুশাসনের অছিলায় কাশ্মীরে একজন ইংরেজ রেসিডেন্ট নিয়োগ কোরতে চাইল। তিনি এতে সম্মত হন নি। কিন্তু ১৮৮৫ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর তাঁর দেহত্যাগের পর উত্তরাধিকারী প্রতাপ সিংহকে সিংহাসন লাভের সৌভাগ্যের জন্য অভিনন্দনের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ সরকার জানিয়ে দিলে যে তাঁকে পরামর্শ দেবার জন্যে স্যার অলিভার সেণ্ট জনকে কাশ্মীরের রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করা হোল। বলা বাহুল্য মহারাজ প্রতাপ সিংহ স্বচ্ছন্দমনে এই নিয়োগ গ্রহণ কোরলেন না এবং পরবর্ত্তী রেসিডেণ্ট মিঃ প্লাউডেনের উদ্ধত ব্যবহারে তার সঙ্গে বিরোধ বেশ বেড়ে উঠলো। মিঃ প্লাউডেন প্রতাপ সিংহের বিরুদ্ধে কুশাসনের অভিযোগ এনে তাঁকে গদিচ্যুত করার চেষ্টা করেন। মহারাজ প্রতাপসিং বৃটিশের এই চক্রান্ত ব্যর্থ কোরে দিয়ে নিজেই রাজতন্ত্র বিলোপ কোরে মন্ত্রীসভা গঠন কোরে প্রজাদের হাতে শাসন ক্ষমতা দিয়ে রাজ্যে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন কোরলেন। নিজে হোলেন মন্ত্রীসভার সভাপতি। এর চেয়ে উগ্রতর কোন শাসন সংস্কার ব্রিটিশ কোরতে পারত না, কাজেই মহারাজ প্রতাপ সিংহকে সরাবার অজুহাতটা অকেজো হোয়ে গেল। তখন প্লাউডেন সাহেব এক চূড়ান্ত চক্রান্ত কোরলেন। প্রতাপ সিংহের সহোদর অমর সিংহকে প্রলুব্ধ কোরে তার দ্বারা প্রচার করালেন যে মহারাজা প্রতাপ সিংহ প্লাউডেনকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র কোরছেন এবং কতকগুলি জাল চিঠিপত্র দ্বারা তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। প্রতাপ সিংহ এ অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ করেন, কিন্তু যখন দেখলেন যে নিজের ভাই তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা ষড়যন্ত্রে ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে তখন ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া তার অন্য কোন উপায় রইল না। কুটচক্রী প্লাউডেন মহারাজ প্রতাপ সিংহের কাছ থেকে ১৮৮৯ সালের মার্চ্চ মাসে সিংহাসন ত্যাগের ঘোষণাপত্র সই করিয়ে নিলে। এখন আর শাসন ব্যাপারে মহারাজার কোন হাত রইল না, ইংরেজ রেসিডেণ্টের নির্দ্দেশে মন্ত্রীসভা শাসন পরিচালনা কোরতে লাগলেন। এই সময় একমাত্র বাঙলার অমৃতবাজার পত্রিকা বৃটিশের এই জঘন্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং জনমতকে এ বিষয়ে জাগ্রত কোরে তোলেন। এর ফলে ভারতের ও ইংলণ্ডের বিভিন্ন পত্রিকাতেও এ বিষয়ে তীব্র সমালোচনা আরম্ভ হয়। জনমতকে উপেক্ষা কোরে এত বড় নিন্দাকে

প্রশ্রয় দিতে ইংরেজ সরকারও সাহস কোরল না। তাই ১৯০৫ সালে মহারাজ প্রতাপ সিংহকে পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হোল। মহারাজ প্রতাপ সিংহ দরদী দূরদর্শী শাসক ছিলেন। খাদ্যশস্যের ওপর সমস্ত খাজনা তিনি তুলে দেন, কাশ্মীর রাজ্যের সমস্ত জমি তিনি জরীপ করিয়ে জমিতে প্রজাদের মালিকানাসত্ব স্বীকার কোরে নেন, জমির খাজনা বহু পরিমাণে কমিয়ে দেন এবং খাজনার কতকাংশ নগদ ও বাকী শস্য দিয়ে পরিশোধের ব্যবস্থাও তিনি করেন। কাশ্মীর ও গিলগিটে 'বেগার প্রথা' তিনি বন্ধ কোরে দেন। বৈদ্যুতিক শক্তির কারখানা মহারাজ প্রতাপ সিংহের আমলে প্রথম এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। কাশ্মীরের লুপ্তপ্রায় রেশম শিল্প এঁর চেষ্টায় পুনর্জীবন লাভ করে। মহারাজা প্রতাপ সিংহ অপুত্রক থাকায় ১৯২২ খৃঃ অব্দে তিনি যে নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করেন অমর সিংহের পুত্র সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হরিসিংহকে তার প্রধান সভ্য মনোনীত করেন। ইতিমধ্যে ইংরেজ রেসিডেন্টের শাসন আমলে বহু পাঞ্জাবী ও কাশ্মীরী ইংরেজী শিক্ষার সুযোগে কাশ্মীরের উচ্চ রাজপদগুলি অধিকার কোরে বসেছিল এবং তাদের আত্মীয় স্বজনেরা স্বাভাবিক ভাবেই ব্যবসা বাণিজ্য ও সরকারী চাকরীতে প্রাধান্য পেয়েছিল, এর ফলে কাশ্মীরের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মুসলমান যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা অসন্তোষের বহ্নি ধূমায়িত হচ্ছিল। যুবরাজ হরিসিংহও কাশ্মীরীদের বাদ দিয়ে বিদেশীদের এই আধিপত্য সুনজরে দেখতেন না—তাই হরি-সিংহের শাসন ব্যাপারে ক্ষমতা লাভে কাশ্মীরের শিক্ষিত সম্প্রদায় উৎফুল্ল হোয়ে উঠলেন। কাশ্মীরে গণ-আন্দোলন সুরু হয় মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মুসলমান যুবকদের দ্বারা—সরকারী চাকরী লাভই ছিল তার উদ্দেশ্য। ১৯৩০ সালে শ্রীনগরে একটী পাঠচক্রের প্রতিষ্ঠা করা হয়—শিক্ষিত বেকার মুসলমান যুবকেরা এখানে মিলিত হোয়ে বিদেশী এবং রাজপুতদের হাত থেকে কি ভাবে সরকারী চাকরী ছিনিয়ে নেওয়া যায় তারই আলোচনা কোরত। ইতিমধ্যে ১৯২৪ সালে মহারাজ প্রতাপ সিংহের মৃত্যু হয়। মহারাজ হরি সিংহ কাশ্মীরীদের দাবীর যুক্তিযুক্ততা মেনে নিয়ে আদেশ জারী করেন যে সমস্ত সরকারী কাজে শুধু কাশ্মীরী প্রজাকেই নিয়োগ কোরতে হবে। সরকারী বৃত্তি বা কোন আর্থিক সাহায্য শুধু কাশ্মীরী প্রজাই পাবে, কাশ্মীরী প্রজা কে তার কোন [illegible] না থাকায় বিদেশীর দল আত্মীয়স্বজনদের কাশ্মীরে আনিয়ে কাশ্মীরী [illegible] হরিসিংহের এই সদিচ্ছাপ্রণোদিত আদেশকে ব্যর্থ কোরে দিতে লাগলো। ফলে হরিসিংহ কাশ্মীরী প্রজার সংজ্ঞা ধার্য্য কোরে দিলেন। মহারাজা গুলাব সিংহের সিংহাসন লাভের পূর্ব্বে যারা কাশ্মীরে জন্মেছে বা বাস কোরত এবং সম্বৎ ১৯৪২ সনের পূর্ব্বে বাইরে থেকে যারা এসে কাশ্মীরেই বাস কোরছে তারাই হবে কাশ্মীরের প্রজা। এর ফলে রাজকর্ম্মচারীরা মনে মনে বিদ্রোহী হোয়ে উঠল এবং মহারাজার সমস্ত সদিচ্ছাপ্রণোদিত কল্যাণজনক আইন কানুনকে বানচাল কোরে দিতে লাগলো। এদিকে ১৯২৯-৩০ খৃঃ অব্দে আরম্ভ হোয়েছে বিশ্ব-ব্যাপী মন্দা—কাশ্মীরের জনসাধারণও এর হাত থেকে অব্যাহতি পায় নাই। আন্তরিকতাশূন্য রাজকর্ম্মচারীদের হৃদয়হীন ব্যবহার আর্থিক অভাবগ্রস্ত প্রজাদের মনে স্বতঃই অসন্তোষের বহ্নি জ্বালিয়ে তুললো; তার সঙ্গে যোগ দিলে শিক্ষিত মুসলমান যুবকদের সাম্প্রদায়িক প্রচার। হিন্দু ও রাজ-পুতেরাই শাসন ও সামরিক ব্যাপারে প্রাধান্য পায়, অথচ তারা সংখ্যালঘু—



নিথর জলের মুকুর (ডাল হ্রদ)

এই হোল এখানের প্রজা আন্দোলনের গোড়ার কথা। সাম্প্রদায়িকতা ছাড়া প্রাদেশিকতাও প্রবল হোয়ে উঠলো। জম্মু হিন্দু-প্রধান প্রদেশ, কাশ্মীর মুসলমান-প্রধান। জম্মুর অধিবাসীরা জমির মালিকানা সম্বন্ধে বেশী কিছু সুবিধা ভোগ করে, মহারাজ জম্মুর অধিবাসীদের ও রাজপুতদের প্রতি বেশী অনুগ্রহ দেখান—এমনি সব নানা কারণে এই দুই প্রদেশ তথা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ বেধে উঠলো। ১৯৩৪ সালে মহারাজ হরিসিংহ বিলাতে গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে যাবার প্রাক্কালে শাসনকার্য্য পরিচালনার জন্য ৪ জনের একটা ক্যাবিনেট বা মন্ত্রীসভা গঠন কোরে যান; তার মধ্যে একজনও মুসলমান ছিল না। শিক্ষিত মুসলমানদের এটা একটা ক্ষোভের কারণ হয়। এই সময় কাশ্মীরের রাজনীতি ক্ষেত্রে এলেন শেখ মহম্মদ আবদুল্লা। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এস্‌সি পাশ কোরে শ্রীনগরে এসে তিনি

পাঠচক্রে যোগ দেন এবং ১৯৩১ সালে যে ব্যাপক গণ আন্দোলন সুরু হয় তাতে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। ভারতের বুকে তখন যে আইন অমান্য আন্দোলন ও অসহযোগের আবহাওয়া চোলছিল তারই স্পন্দন এখানের রাজনৈতিক জড়জীবনের আলোড়ন আনলো। এই আন্দোলনের ফলে শ্রীনগরের সেন্ট্রাল জেল আক্রমণের সময় পুলিসের গুলীতে যে ২১ জন হত হয় সে কথা পূর্ব্বে বলেছি। এই সময় অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে শেখ আবদুল্লাকেও আইন অমান্যের জন্যে জুম্মা মসজিদে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৩২ সালের অক্টোবর মাসে শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে মুসলমানদের একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে—"জাম্মু ও কাশ্মীর মুসলিম কনফারেন্স।" এই সময় পাঞ্জাবে মুসলীম লীগের প্রবল প্রাধান্য—সেখানের ঝাঁজ এসে এই হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে মুসলমানী প্রজাদের বেশ উত্তপ্ত কোরে তুলছিল।

মহারাজ হরিসিংহ ইওরোপে বাল্যকাল থেকে মানুষ; তিনি দূরদর্শী এবং প্রগতিবাদী। ১৯৩৪ সালে ৭৫ জন সদস্য নিয়ে এক শাসন পরিষদ স্থাপনের ঘোষণা কোরলেন, তার নাম হোল "প্রজা-সভা"। এর মধ্যে ৩৩ জন হোল প্রজাদের নির্ব্বাচিত সদস্য, কিন্তু ১৯৩৬ সালের মে মাসে মুসলীম কনফারেন্স সম্পূর্ণ ভাবে নির্ব্বাচিত শাসনপরিষদ দাবী কোরে আন্দোলন সুরু করে। রাজ্যশাসন ব্যাপারে মহারাজার কোন ক্ষমতা থাকবে না, প্রজাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা সে ক্ষমতা লাভ কোরবেন—এই হোল দাবী। আজ পণ্ডিত নেহেরু শেখ আবদুল্লাকে যতই জাতীয়তাবাদী এবং দেশপ্রেমিক বোলে বিজ্ঞাপিত করুন, ভবিষ্যতের ইতিহাস একথা বোলবেই যে শেখ আবদুল্লা মহারাজ হরিসিংহের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সুরু করেন তা ইংরেজের ইঙ্গিতে চালিত পাঞ্জাবের মুসলীম লীগের অনুপ্রেরণায় (ইতিমধ্যেই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।) মহারাজ হরিসিংহ দেশীয় নৃপতিদের মধ্যে প্রথম প্রকাশ্যে বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের স্বাধীনতা দাবী করেন এবং ইংরেজকে কাশ্মীরের উত্তরের গিলগিট গিরিবর্ম্মে মাথা গলাতে দেন নি। (ভারতের মন্ত্রী-মিশনের কাছেও মহারাজ এ দাবী পুনরায় জানান।) এর ফলে ইংরেজ তাঁকে শাস্তি দিতে চেয়েছিল এবং তার অস্ত্র হিসেবে আবদুল্লাকে ব্যবহার কোরেছিল। শেষে ১৯৩৪ সালে মহারাজা ৬০ বৎসরের জন্যে বৃটিশ সরকারকে গিলগিট ইজারা দিতে বাধ্য হন; এর ফলে তাদের কাছে আবদুল্লার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। কাজেই এর পর আবদুল্লা মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্যের কথা প্রচার কোরতে আরম্ভ করেন। তিনি চেয়েছিলেন অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠা কোরতে—যাতে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে একসঙ্গে মিলে হিন্দু রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করা যায়। এই আন্দোলন জম্মুর চেয়ে মুসলমানগরিষ্ঠ কাশ্মীর উপত্যকাতে বেশী বেগবান হোয়ে ওঠে। এই মুসলীম কনফারেন্স রাজনৈতিক দলে এতদিন হিন্দুদের সভ্য হওয়ার অধিকার ছিল না। ১৯৩৮ সালের ২৮শে জুন শ্রীনগরে ৫২ ঘণ্টা প্রচণ্ড বিতণ্ডার পর শেখ আবদুল্লা এক প্রস্তাব পাশ করতে সমর্থ হন—যাতে বলা হয় সকল ধর্ম্মের লোকই মুসলিম কনফারেন্সের সভ্য হতে পারবে। মুসলমানগণ যেখানে বিপুল সংখ্যায় গরিষ্ঠ সেখানে এই প্রস্তাব এতদিন পরে কেন গ্রহণ করা হোল এইটাই আশ্চর্য্য। ১৯৩৮ সালে শেখ আবদুল্লা উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পণ্ডিত নেহেরুর সঙ্গে দেখা করেন, সম্ভবতঃ এই প্রস্তাব তার ফল। ১৯৩৯ সালের ১১ই জুন ভারতীয় কংগ্রেসের নেতাদের প্রভাবে "মুসলীম কনফারেন্সের" নাম পরিবর্ত্তন কোরে নূতন নামকরণ হয় "ন্যাশন্যাল কনফারেন্স"। ১৯৪২ সালে ভারতের বুকে জ্বোলল বিপ্লবের বহ্নি। আইন না মানা; বাঁধন ভাঙ্গার সে কল্লোল কিছু কিছু কাশ্মীরেও পৌছল। ১৯৪৪ সালে ন্যাশন্যাল কনফারেন্স ঘোষণা কোরলে—পল্লিপূর্ণ সাম্যবাদ তাদের লক্ষ্য। ইতিমধ্যে ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রের অন্যতম নায়ক মিঃ জিন্না মুসলমানগরিষ্ঠ এই রাজ্যে সাম্প্রদায়িকতার বহ্নি জ্বালাবার সুযোগ হারালেন না। তিনি কাশ্মীরে গিয়ে শেখ আবদুল্লা-বিরোধী মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত মুসলিম কনফারেন্সের সভায় তার স্বভাব সিদ্ধ বিষবাষ্প প্রয়োগ করেন। তিনি বল্লেন "মুসলমানদের যেমন এক আল্লা ও এক কলমা, তেমনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাদের অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন নিজস্ব এক প্রতিষ্ঠান হওয়াই যুক্তিসম্মত"। তিনি ভারতীয় কংগ্রেস প্রভাবিত মহম্মদ আবদুল্লাকে হীন ভাষায় আক্রমণ কোরে তাকে গুণ্ডার সর্দ্দার বোলে গালাগাল দেন। শেখ সাহেব তখন কাশ্মীরের ত্রাণকর্ত্তা, একমাত্র নেতা হিসেবে পূজিত। কাজেই এর ফলে জনসাধারণ জিন্না সাহেবের ওপর এমন ক্ষেপে ওঠে যে তিনি তাড়াতাড়ি কাশ্মীর ত্যাগ কোরতে বাধ্য হন। তাঁর নিরাপদে পলায়নের সাহায্য কোরতে সঙ্গে গিয়েছিলেন মকবুল শেরওয়ানী, যাঁকে পরে জিন্নারই সৃষ্ট পাকিস্থানী দল বারামুল্লায় ১৪টি গুলীর আঘাতে হত্যা করে।

১৯৪৫ সালের গ্রীষ্মকালে "শোপুরে" ন্যাশন্যাল কনফারেন্সের এক অধিবেশন হয়—এতে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, মৌলানা আজাদ, খান আব্দুল গফর খান প্রভৃতি ভারতীয় নেতৃবৃন্দ যোগ দেন। এই সঙ্গে ভারতের দেশীয়-রাজ্য-প্রজা-সম্মেলনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটীরও অধিবেশন হয়। এই অধিবেশন কাশ্মীরে সত্যকার গণ আন্দোলনের বীজ বপন করে, কারণ এই সম্মেলন জনসাধারণের মনে—জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগিয়ে তোলে। ভারতে যখন ক্যাবিনেট মিশন আসে (১৯৪৬ সালের মে মাসে) তখন ন্যাশন্যাল কনফারেন্স এক স্মারকলিপিতে ডোগরারাজবংশের হাত থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করে ও "কাশ্মীর ছাড়" আন্দোলন আরম্ভ করে। ডোগরা শাসনযন্ত্রকে অচল কোরে দেবার আন্দোলনের ফলে ১৯৪৬ সালের ২১শে মে কাশ্মীরে সামরিক আইনজারী করা হয় এবং জহরলালজীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ভারতমুখী শেখ আবদুল্লাকে পথেই গারহিতে গ্রেপ্তার করা হয়। এর ফলে গণ আন্দোলন আরও ব্যাপক হোয়ে পোড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে শাসকের রোষও উগ্রতর হোলো। সামরিক বাহিনীকে আন্দোলন দমনের জন্য ঢালাও হুকুম দেওয়া হোয়েছিল, কাজেই বহু ক্ষেত্রেই অমানুষিক, অহেতুক ও অন্যায় অত্যাচার হোয়েছিল। ৩রা জুন শেখ আবদুল্লার বিচারের দিন ধার্য্য হয়, পণ্ডিত জহরলাল তাঁর পক্ষ সমর্থনের জন্য জুন মাসে শ্রীনগর যাত্রা করেন। জহরলালজীর মত প্রভাবশালী ভারতীয় নেতার আগমনে রাজনৈতিক আন্দোলন আরো প্রবলতর হবে এই আশঙ্কায় কাশ্মীর সরকার তাঁকে কাশ্মীরে ঢুকতে নিষেধ করেন। তিনি এ আদেশ অমান্য করায় ১৯৪৬ সালের ২০শে জুন বেলা ৯॥০টায় শ্রীনগর থেকে ১০০ মাইল দূরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদের আদেশে তিনি দিল্লী ফিরে যাবেন বলায় কয়েকদিন পরে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। বিচারে শেখ আবদুল্লার ৫০০৲ জরিমানা এবং ৯ বৎসর কারাবাসের আদেশ হোল।

এর মধ্যে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেল। ১৯৪৭ সালে মহাত্মাজী প্রথম কাশ্মীর গেলেন এবং প্রধান মন্ত্রী শ্রীকাকের অনিচ্ছা সত্ত্বেও মহারাজার সঙ্গে দেখা কোরে ন্যাশন্যাল কনফারেন্সের সঙ্গে আপোষ করতে মহারাজকে অনুরোধ করেন। স্বাধীন ভারতে মহাত্মাজীর অনুরোধ আদেশেরই নামান্তর, কাজেই তা না মেনে মহারাজার উপায় ছিল না। এর ফলে প্রধান মন্ত্রী শ্রীকাক ১৯৪৭ সালের ১১ই আগষ্ট পদত্যাগ কোরলেন। শেখ আবদুল্লাও ২৯শে সেপ্টেম্বর মুক্তি পেলেন।

(ক্রমশঃ)



পরিচালক—উপানন্দ

ইচ্ছাশক্তি অনুশীলনের পথ

বাসনা বা ইচ্ছাকে যদি তোমরা তোমাদের মনোরাজ্যের অধীশ্বর করো, তা হোলে এর মন্ত্রীমণ্ডলের মধ্যে থাকবে চিন্তা, স্মৃতি, কল্পনা, বিশ্বাস, উৎসাহ, সাহস, মনের একাগ্রতা, ন্যায়, আশা, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও অনুরাগ। এরাই ইচ্ছারূপী রাজার পরামর্শদাতা ও সাহায্যকারী হবে। এরা থাকবে রাজার ডানদিকে আর বামদিকে যারা থাকবে তাদের নাম হচ্ছে সতর্কতা, শঙ্কা, সন্দেহ, বিস্মৃতি, বিচারবিভ্রম, আলস্য, গোঁড়ামি, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, মনের সঙ্কীর্ণতা আর অসন্তোষ। এরা বহু কাজ পণ্ড করে।

রাজাই সমস্ত মন্ত্রীমণ্ডল ও পরামর্শদাতৃগণের প্রভু, কিন্তু বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে পরামর্শদাতা বা মন্ত্রীদের এরূপ প্রভাব যে, রাজা কার্য্য পরিচালনায় কোন রকম মতামতই প্রকাশ করতে পারেন না। রাজা দুর্ব্বল হলেও, যে কোন পরামর্শদাতা বা মন্ত্রী বা মন্ত্রীমণ্ডলীকে হঠিয়ে দিয়ে, নিজেই নিজের মত করে কিছু কাজ করতে পারেন। ইচ্ছারও ইচ্ছা থাকা চাই।

তোমরা জানো, সব কাজেই মন্ত্রণাদাতারা কি অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করে রাজারাজড়ার ওপর। অনেক ক্ষেত্রে হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী হয়ে মানুষের দুর্দ্দশার কারণ হয়। তোমরা একটু পর্য্যবেক্ষণ করলেই বুঝতে পারবে ঐ সব পরামর্শদাতাদের মধ্যে কতকগুলি উৎকৃষ্ট ভৃত্য—কিন্তু তারা প্রভুত্ব পেলে, যা তা কাণ্ড ঘটিয়ে বসে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, অনেকেই সতর্কতার পরামর্শটা বড্ড বেশী শোনে, ফলে খুব বেশী পরিমাণে বেশী দূর এগোতে পারে না, জীবনে দুকুড়ি সাত বজায় করে পৃথিবী থেকে চলে যেতে চায়, এ জন্যে কোন মহত্তর আদর্শের সঙ্গে তাদের পরিচয় হয় না। অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করে সহজ জীবনযাত্রার অনুরাগী হয়ে বাঙালীর অধঃপতন হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে বঙ্গভূমিকে বলেছেন—

'সাত কোটী সন্তানেরে হে মুগ্ধা জননী,
রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করো নি।'

অদম্য শক্তিকে গ্রহণ না করলে জীবনের কোন বাধা বিপত্তি দূর করা যায় না। সব দিকে তব আর অতিরিক্ত সতর্কতাই [illegible] তা'তে জীবন গড়ে ওঠে না। বরং উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, আশা, উৎসাহ ও অনুরাগের পরামর্শ নিয়ে সাহসের সঙ্গে কাজ করা উচিত। তাতেই জীবনে উন্নতির বহু উর্দ্ধে ওঠা যায়। প্রথমবারে বিফলপ্রযত্ন হ'লে, দ্বিতীয়বার চেষ্টা করবে, দ্বিতীয়বার বিফল হ'লে তৃতীয়বার চেষ্টা করবে, তা'তেও অকৃতকার্য্য হোলে পুনর্ব্বার চেষ্টা করবে। ইচ্ছার অদম্যশক্তিকে সঞ্চয় করবে চিত্তের দৃঢ়তা ও একাগ্রতার সঙ্গে। এই শক্তি বলে তোমরা সিদ্ধ মনোরথ হবেই। চিত্তের দৃঢ়তা ও একাগ্রতার নামই অধ্যবসায়। অধ্যবসায়শীল হোতে হোলে ছেলেবেলা থেকেই অভ্যস্ত হওয়া দরকার। যার অধ্যবসায় নেই, তার শিক্ষালাভ হওয়া দুরূহ। যার ইচ্ছা নেই, তার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। যার আশা নেই, তার উন্নতি হয় না। কোন বিষয়ে একেবারে অকৃতকার্য্য হোলে আর হতাশ হয়ে পড়লে, ইচ্ছাশক্তির কৃপা পাওয়া যায় না। স্কটল্যাণ্ডের স্বাধীনতাপ্রিয় রবার্ট ব্রুস, মেবারের রাণা প্রতাপ, আফ্রিকার অজ্ঞাত ভূভাগ আবিষ্কারক কুড়ি বছরের ছেলে স্কটল্যাণ্ডের জোসেফ টমসন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতির জীবনী পড়লে বুঝতে পারবে, কি ভাবে তাঁরা ইচ্ছাশক্তির বলে কৃতী পুরুষ হয়েছিলেন।

মেলডন বলেছেন ইচ্ছাশক্তিকে আয়ত্তাধীনে আনতে গেলে উন্নত আকাঙ্ক্ষা অন্তরে পোষণ করে তার চর্চ্চা করা একান্ত দরকার। ডাঃ মার্টিন এডওয়ার্ডের মতে ইচ্ছাকে উচ্চ আদর্শে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে স্বাস্থ্যরক্ষার দরকার। তিনি বলেন—'অনেকে বলে এটা করতে পারছিনে, ওটা পারবো না—অত খাটে কে? এসব মনের দুর্ব্বলতার দরুণ ঘটে, আর এ দুর্ব্বলতার কারণ স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে লক্ষ্য না রাখা।' তাঁর মতে সকাল থেকে সুরু করে রাত্রে ঘুমুতে যাওয়া পর্য্যন্ত ঘড়ি ধরে একটা ছন্দের মধ্যে দিয়ে চলা দরকার। তা ছাড়া কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা ও আহারাদির সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া, দাঁতের যত্ন নেওয়া, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করা বিশেষ দরকার। দীর্ঘসূত্রিতা অত্যন্ত ক্ষতিকর। এ অভ্যাস যার আছে, তার ইচ্ছাশক্তি লাভ হয় না, আর সে মানুষের মত মানুষ হোতে পারে না। উইলিয়ম জি [illegible] বলেন—'ত্রিশ বছরের পর

বেশীর ভাগ মানুষ মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না—কোল কুঁজো হয়। এ লক্ষণ ভালো নয়। এ শ্রেণীর লোক কার্য্যক্ষম হোতে পারে না—এদের ইচ্ছাশক্তি দৃঢ় হোতে বাধা পায়—'

ইচ্ছাশক্তি যার রুগ্ন, সে নিজেও রুগ্ন। তবে শরীরের কোন যন্ত্র বিকল হওয়ার দরুণ রুগ্নতা প্রকাশ পেলেও, ইচ্ছার এরূপ অমোঘ শক্তি যে, শারীরিক রুগ্নতাকে পরাজিত করে, সে মানুষকে তার উন্নত লক্ষ্যস্থলে নিয়ে যায়। এ সম্বন্ধে কবি রবার্ট লুইস্ ষ্টিভেনসন কি বলেছেন জানো? তিনি বলেছেন—"চৌদ্দ বছর ধরে একদিনও আমার শরীর ভালো যায় নি। বিছানায় পড়ে থেকেছি রুগ্ন ক্লান্ত অবস্থায়। বিছানায় শুয়ে লিখেছি—রক্তস্রাব যখন হচ্ছে, কাস্‌তে কাস্‌তে যখন আমার দম আট্‌কে যাচ্ছে, দুর্ব্বলতার দরুণ মাথা ঘুরে পড়্‌ছে, তখনও লিখ্‌তে বিরত হই নি। প্রশান্ত সাগর কূলে এসে এখন অনেকটা সুস্থ হয়েছি, শরীর ভালো থাক আর মন্দই থাক, তা'তে আমার কিছু এসে যায় না—ইচ্ছাশক্তির বলে মনকে এম্নি ভাবে গড়েছি যে, বিছানায় পড়ে থেকেও কাবু হই নে আমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে—'

রোগে বিছানায় পড়ে থেকেও যে সুদৃঢ় ইচ্ছা বলে মানুষ সমাজ সংসারে বড় হয়ে উঠ্‌তে পারে, তার পরিচয় রেখে গেছেন ষ্টিভেনসন—যশের মন্দিরে তিনি আপনাকে মৃত্যুহীন অবস্থায় প্রতিষ্ঠা করেছেন আমাদের দেশের কবি রজনীকান্ত সেনও রোগশয্যায় পড়ে থেকে তাঁ কাব্যসাধনাকে ব্যাহত হোতে দেন নি। তোমরা এঁদের আদর্শ গ্রহ করে তোমাদের মনোরাজ্যে ইচ্ছাকে অধীশ্বর করে তুলবে, এই আশা পোষণ করি। অদম্য ইচ্ছাশক্তি অর্জ্জন করতে পারলে হিমালয়ের মত বাধা বিঘ্নও তৃণের চেয়ে লঘু হয়ে যায়। তোমরা এদিকে দৃষ্টি দেবে কি?

উত্তর মেরুতে

শ্রীকৃষ্ণধন দে

নীল জল আর তোলে না'ক ঢেউ
সব হয়ে গেছে সাদা বরফ,
প্রকৃতির বই খোলা পড়ে আছে,
মুছে গেছে যেন কালো হরফ!
চোখ ঝল্‌সানো মাথা-উঁচু সাদা পাহাড়ে
কোথা শ্যামছবি সবুজগাছের বাহারে?

বরফের বুকে পাগ্‌লা বাতাস
কেঁপে কেঁপে মরে শীত-কাতুর,
দিনের আলো যে নিবু-নিবু সদা
হলেও সেখানে দিনদুপুর!

বরফের ফাঁকে সীল মাছগুলো
মাঝে মাঝে দেয় ডুব-সাঁতার,
পেঙ্গুন পাখী সাগরের তীরে
দল বেঁধে বসে এক-কাতার,

বল্‌গা-হরিণ ঝাঁকড়ালো শিং নাড়ছে,
—বরফের গুঁড়ো উড়িয়ে নিশাস ছাড়ছে,
দাঁত-বের-করা সাদা ভাল্লুক
বরফে বরফে লালা ছড়ায়,
বরফ-গুহাতে গরজন তা'র
ঘুরে ঘুরে যেন পথ হারায়।

ঝিমুনো দিনের স্বপন-মাখানো
সেই দেশ রয় চির-শীতল,
দুপুর রাতের তপন-আভায়
আঁধার আকাশ হয় উজল;
যাবে একবার সেই দেশে তুমি বেড়াতে?
এই পৃথিবীর সব কিছু সেথা হারাতে?

ভুলে যাব ফোটা মুকুলের হাসি,
বনের পাখীর মধু-কূজন,
বরফের ঘরে চির-[illegible]
রইব [illegible]রা শুধু দু'জন!

আবদ্ধ



বাইরে গিয়ে খেলাধূলা যে চল্‌ছে নাকো আর,
তাইত খোকন দাঁড়িয়ে আছে মুখটি ক'রে ভার।

শ ক চ

গুগ্‌লি মাসি

নরেন চক্রবর্ত্তী

এক

বাবা খেতে বসেছেন, দাদা ভাতের জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে, মা দিশেহারা হয়ে পড়েছেন—অফিসের তাড়া। একটা ট্যাক্সি বাড়ীর সাম্‌নে ঘ্যাঁচ করে থেমে গেল। সকলেই অবাক্‌, এই অঘটন, বিশেষতঃ এমন সময়, কখনো তো ঘটে না! মা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বল্‌লেন—সঙের মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন টুনি, যা না, উঁকি মেরে দেখ্‌না এমন অসময়ে কোন্ অতিথ এলেন। আমার যাওয়ার দরকার হোল না, অতিথ নিজেই ভেতরে প্রবেশ করলেন। মহিলা, বয়স আন্দাজ পঞ্চান্ন বা ষাট। কপালে তিলক, গলায় মালা, গায়ে নামাবলি জড়ান, মাথায় চুলগুলি খুব ছোট করে ছাঁটা। রঙ বেশ ফর্সাই—বয়সের দরুণ বা একটু ময়লার আভাষ দিয়েছে। দু'হাতে দুটো ছোট বড় পোঁটলা।

সকলেই অবাক্‌, কেউ-ই চিন্‌তে পারলুম না।

অতিথি বল্‌লেন—নবগোপাল দত্তর বাড়ী তো এইটে?

বাবা ইতিমধ্যে খাওয়া সেরে নিয়েছেন। এঁটো হাতেই সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেন, বল্‌লেন—আজ্ঞে আমারি নাম।

তিনি বল্‌লেন—ঠিকানা জানা আছে বাবা, ভুল হবার কি জো আছে। তা কই, আমার খাঁদু মা কই?

মা দাদার জন্য একবাটি গরম ডাল নিয়ে যাচ্ছিলেন। ধপাস্ করে ডালের বাটিটা মেঝেয় ফেলে দিয়ে তাঁর পায়ের সাম্‌নে লুটিয়ে পড়্‌লেন। 'খাঁদু মা' বলে যখন ডেকেছেন তখন নিশ্চয় কোন নিকট-আত্মীয়, গুরুজন। বাটি থেকে ডালটা চল্‌কে আমার সাদা ধোপদোরস্ত কাপড়টাতে একেবারে বাসন্তী রঙ ধরিয়ে দিলে।

বৃদ্ধা বল্‌লেন—বেঁচে থাকো মা, বেঁচে থাকো। আমাকে হয়তো মা চিন্‌তে পারবে না, তোমার মামার বাড়ীর দেশের লোক আমি, তোমার মা আমাকে গুগ্‌লি দিদি বলে ডাক্‌তো—আমি যে মা তোর গুগ্‌লি মাসি। তিনি স্নেহভরে তুমি থেকে 'তুই' ধরে ফেলেছেন।

আনন্দে মা কেঁদে ফেলেন আর কি। বল্‌লেন 'আপনি আমাদের সেই গুগ্‌লি মাসি! দেখেছি আপনাকে খুব ছোটবেলায়—হঠাৎ চিন্‌তে পারি নি মাসি। কি ভাগ্যি মনে করে যে এসেছেন···ওরে টুনি সঙের মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন—যা না' ঘরের মেঝেতে একটা ধোয়া আসন পেতে দিগে যা না···আরে, ইনি আমার গুগ্‌লি মাসি যে।···আসুন গুগ্‌লি মাসি, ঘরের ভেতর আসুন। ওরে টুনি মাসির হাত থেকে পোঁট্‌লা দু'টো নে না, বুড়ো মানুষের কষ্ট হ'চ্ছে দেখ্‌ছিস না!

বলেই মা নিজে পোঁট্‌লা দু'টো হাতে নিলেন, আর মার গুগ্‌লি মাসি মার সঙ্গে ঘরের দিকে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়্‌লেন। বল্‌লেন—অ খাঁদু, গাড়ীর ভাড়াটা এখন দিয়ে দে তো—টাকা রয়েছে পোঁট্‌লার ভেতর।

মা চাইলেন পেছনে-দাঁড়ান হতভম্ব বাবার দিকে, বাবা চাইলেন মার আনন্দ উদ্ভাসিত মুখের দিকে। তারপর বাবা ছুটে ঘরে ঢুকলেন, ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, ট্যাক্সি ড্রাইভার দু'টাকা বারো আনা গুণে নিয়ে হর্ণটা বাজিয়ে দিল।

দুই

দাদার তো অফিস যাওয়া হয়েই উঠলো না, কারণ দই সন্দেশ, ডাব, এই সব আন্‌তে অত্যন্ত ব্যস্ত। আমার ইস্কুল যাওয়ার কথাতো উঠ্‌তেই পারে না, আমি বাড়ী না থাক্‌লে মা একা কত সাম্‌লাবেন!

দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে মার গুগ্‌লি মাসি এক গ্লাস ডাবের জল খেয়ে মেঝেতে গা টা এলিয়ে দিয়েছেন, মাও এতক্ষণে একটু নিঃশ্বাস ফেল্‌বার অবকাশ পেলেন। চুপি চুপি মার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—মা, তোমার এ গুগ্‌লি মাসিটি কে?

মা বল্‌লেন—খুব ছেলেবেলায় আমি ওঁকে দেখেছিলাম। আমার মামার বাড়ীর পাশের বাড়ীতে থাকেন। অল্প বয়সে বিধবা হ'য়ে বাপের বাড়ী আসেন, আর সেই থেকে শ্বশুর-বাড়ী যান্‌ নি। শ্বশুরের আর কেউ ছিল না, মরবার সময় গুগ্‌লি মাসিকেই সব লিখে দিয়ে যান্‌। গুগ্‌লি মাসিও সে টাকার খুব সদ্ব্যবহার করেন। পূজো পার্ব্বণ দান তাঁর তো লেগেই আছে। ওঁর কাছে সাহায্য পায় নি, মগরাপুরে এমন লোক নেই বল্‌লেই হয়। চেহারা তো আমার কিছুই মনে নেই, কিন্তু গুণের কথা এতো শুনেছি যে, মনে হয় সব সময়ই তিনি আমার চোখে ভাস্‌ছেন।

দাদা আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল। জিজ্ঞাসা করলে—হঠাৎ ইনি আমাদের বাড়ী এলেন কেন?

মা বল্‌লেন—উনি কিছুদিন তীর্থ করতে যাবেন, যাবার সময় কলকাতা হয়ে যাচ্ছেন। ছোট মামীমা বলে দিয়েছেন যখন কল্‌কাতায় আস্‌ছেন তখন যেন আমার সঙ্গে একবার দেখা করে যান, আর ওঁরও আমাকে দেখবার খুব ইচ্ছে হয়েছিল। তা হবেই তো, কত ছোট বেলায় দেখেছেন। দেখ্‌ টুনি, সঙের মতো খালি ঘুরে বেড়ালে হবে না, সব সময়ে গুগ্‌লি মাসির কাছে কাছে থাক্‌বি, যেন অযত্ন না হয়। অতবড় মানী গুণী লোকের অখাতির হলে নিজেদের আর দুঃখের সীমা থাক্‌বে না।

দাদা আর আমি গুগ্‌লি মাসির পরিচর্য্যার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলুম। না উঠে রক্ষা আছে, অমন মানী গুণী গুগ্‌লি মাসি!

দাদা জিজ্ঞাসা করলে—গুগ্‌লি মাসি ক'দিন থাক্‌বেন জানিস্‌।

আমি বল্‌লুম—মাকে উনি বলেছিলেন মাত্র দুটো দিন থাক্‌বেন।

দাদা একটু চিন্তিত হোল। তারপর বলে ফেল্‌লে—দুত্তোর যা থাকে বরাতে, দরখাস্ত করে দিই দু'দিনের ছুটির জন্যে। নতুন অফিসে ঢুকেছি আর সবে কাল মাইনে নিয়ে বাড়ী ফিরেছি বলেই যা একটু ভাবছিলুম।

দাদা চলে গেল পোষ্টকার্ডের খোঁজে আর আমি আস্তে আস্তে ঢুক্‌লুম শোবার ঘরে—খুব আস্তে, যদি গুগ্‌লি মাসির ঘুম ভেঙে যায়!

দেখি গুগ্‌লি মাসির ঘুম আগেই ভেঙে গেছে। তিনি বড় পোঁটলাটা খুলে কি সব জিনিষ মেঝেয় নামাচ্ছেন আর তুল্‌ছেন। আমাকে দেখেই ডাক্‌লেন—আয় রে দিদি, বোস্‌ আমার কাছে।

আমার বরাত ভাল, গুগ্‌লি মাসি আমাকে আদর করে ডেকেছেন। আমি ধপাস্‌ করে তাঁর গা ঘেঁসে বসে পড়লুম।

আমার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে তিনি বল্‌লেন—তোর মাকে দেখেছি তখন সে তোর চেয়েও ছোট, আজ তোকে দেখ্‌ছি। কত কথাই মনে পড়ছে তোকে কতো বল্‌বো। তোর মা আমার কাছে কত না আবদার করতো—আর কি অভিমানই না ছিল। একটু যদি তার আবদার পূরণ করতে দেরী হ'য়েছে তবে আর রক্ষে নেই—কান্না তার থামায় কার সাধ্যি। বলেই গুগ্‌লি মাসি হেসে উঠ্‌লেন, আর চোখ দুটো বড় করে সাম্‌নের দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে রইলেন যেন আগের সেই সব স্মৃতি চোখ দিয়ে অনুভব করছেন।

একটু সাম্‌লে নিয়ে গুগ্‌লি মাসি পোঁট্‌লার ভেতর হাতটা পুরে দিলেন, দেখি হাতের সঙ্গে বেরিয়ে এল এক-জোড়া দুল। আমার কাণে সে দু'টো পরিয়ে দিতে দিতে বল্‌লেন—দেখি রে কেমন মানায় তোকে এ দু'টো পরলে!

সর্ব্বনাশ! এ দুল কাণে দিলে মা কি আর রক্ষা রাখ্‌বেন, কিন্তু না-ই বা বলি কি করে? ইনি যে আমাদের গুগ্‌লি মাসি। মা যে কতো আবদার করে কত জিনিষ আদায় করে ছেড়েছেন এঁর কাছ থেকে, আর আমাকে তো আবদারই করতে হয় নি। কিন্তু বাবার মেজাজ যা কড়া, তিনি কি…

যাক্‌, আমার এ দুর্ভাবনা থেকে মা আমাকে রেহাই দিলেন। তিনি ঘরে ঢুক্‌লেন এক গ্লাস মিছরির সরবত হাতে করে।

'মাসি এইটুকু খেয়ে ফেল' বল্‌তেই নজরে পড়্‌লো আমার কাণে ঝুল্‌ছে নতুন দুটো দুল। তিনি আমার দিকে একবার চাইলেন—আমার মুখ ভয়ে একেবারে শুক্‌নো আমড়া, মাসির দিকে চাইলেন, তাঁর মুখ আহ্লাদে তরমুজের ফালি।

মা বল্‌লেন—একি মাসি, টুনিকে আবার—

কথা শেষ করতে দিলেন না গুগ্‌লি মাসি। বল্‌লেন—বলিস কি রে খাঁদু,তোর মেয়ে কি আমার পর হলো নাকি? তা তো জান্‌তুম না,জান্‌লে কি ছাই আস্‌তুম পরের বাড়ীতে, একান্ত আপনার জেনেই না এসেছিলুম! তুই যে ··

কথা আট্‌কে গেল, চোখ থেকে জল গড়িয়ে তাঁর শুক্‌নো গাল দুটোকে ভিজিয়ে দিলে।

মা তাড়াতাড়ি পা দু'টো জড়িয়ে ধরে বল্‌লেন—মাপ্‌ করো মাসি, আমি মাপ চাচ্ছি, তোমার নাত্‌নী, আমার কি অধিকার বল্‌বার। মা অধিকার ত্যাগ করলেন, তবে গুগ্‌লি মাসির মুখে হাসি ফুট্‌লো।

মাসি জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁরে খাঁদু, মেয়ের সম্বন্ধ-টম্বন্ধ দেখ্‌ছিস্‌ তো? এমন রাজকন্তের মতো মেয়ে যেন যার তার হাতে ধরে দিস্‌ নি। আর সম্বন্ধ পাকা হ'লেই আমাকে জানাস্‌—আমারও তো একটা কর্ত্তব্য আছে মা।

কর্ত্তব্যের আভাসটা কল্পনা করে মার গলার আওয়াজটা খুব গদগদ হয়ে উঠ্‌লো। সরবতের গেলাসটা মাসির মুখের কাছে ধরে বল্‌লেন—এইটুকু খেয়ে নাও মাসি—দুপুরে ভাল ঘুম হয় নি, মাথা ধরবে।

'যত্ন করে যে আমাকে বেঁধে ফেলছিস্‌ মা' বলে গুগ্‌লি মাসি মাথা ধরা বন্ধ করতে ব্যস্ত হলেন। গেলাসটা নামিয়ে রেখে আগের কথার খেঁই ধরে বল্‌লেন—কিন্তু বাঁধ্‌তে আমাকে পারবি নি মা, কাল সকালেই বৃন্দাবন রওনা। আজ সন্ধ্যেয় একবার কালিঘাট যেতে হবে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নিজের মনেই আবার বল্‌লেন—মায়ার বাঁধন কাটিয়ে ওঠা বড়ই শক্ত··· দীনবন্ধু, মায়ারই বাঁধনে বেঁধেছ সংসার, দাসখত লিখে দিয়েছি পায়।

দেখ্‌লুম মার চোখ জলে ভেসে গেছে।

—তিন—

রাত্রে কালিঘাট থেকে ফিরে এলেন মাসি এক গাদা জিনিষ নিয়ে। মার হাতের শাঁখা, ছোট বোন পুসির খেল্‌না, বাবা দাদার জন্যে বাহারি কলম, আমার টিপ··· আরও কতো কি।

জিনিষগুলি সব ভাগ-বট্‌রা করে দিয়ে গুগ্‌লি মাসি জলখাবার খেতে বস্‌লেন। বিধবা মানুষ, রাতে তো আর কিছু খান্‌ না—শুধু আধ সের দুধ, একটা পাকা পেঁপে আর দু'টো সেন মশায়ের দোকানের সন্দেশ।

জল খাওয়া শেষ করে গুগ্‌লিমাসি মাকে বল্‌লেন—জামাইকে একবার ডাক্‌ তো খাঁদু, আমার একটা বিশেষ কথা আছে। বাবা এলে তিনি ছোট পোঁট্‌লাটা টেনে বার করলেন। পোঁট্‌লাটা খুলতে বেরুল একটা সেকেলে ধরণের ক্যাশবাক্স, ডালাটা খুলতে দেখা গেল তাতে ভর্ত্তি রয়েচে অনেকগুলি সেকেলে ধরণের গয়না।

গুগ্‌লি মাসি বাবাকে বল্‌লেন—দেখ বাবা, আমি যাচ্ছি তীর্থ করতে, পথ-ঘাটের কথা কিছুই বলা যায় না। এই গয়নাগুলো তোমার কাছেই বাবা রাখ্‌তে হবে। বাড়ীতে রেখে আস্‌তে সাহস হ'লো না, আমার ভাইপোটার নজর খালি আমার টাকার দিকে, আমার অবর্ত্তমানে কি যে করে বস্‌বে বলা যায় না। দেশে কারও কাছে রাখ্‌লেও নিস্তার নেই, ঘুণাক্ষরে টের পেলে তাকে অতিষ্ঠ করে তুলবে। তাই অনেক ভেবে, খাঁদুর মামীর সঙ্গে অনেক শলা পরামর্শ করে তোমার কাছেই রেখে যাবো ঠিক করেছি। যতদিন না ফিরি, এগুলো তোমার কাছেই রেখো বাবা। আর এর মধ্যে যদি টুনির বের কোন ঠিক হয়ে যায়, এর মধ্যে যে কোন একটা গয়না বেছে নিয়ে আমার আশীর্ব্বাদ বলে টুনিকে যৌতুক দিও।

বাবা গয়নাগুলো দেখে আর মাসিমার কথা শুনে একেবারে থ। খানিকটা দম্‌ নিয়ে ধীরে ধীরে বল্‌লেন—বড়ই দায় চাপালেন মাসিমা ঘাড়ে। যা হ'ক, ভার যখন দিচ্ছেন তখন বইতেই হবে। দু'টো ফর্দ করে ফেলি, একটা আমার কাছে থাক্‌, একটা থাক্‌ আপনার কাছে। ফিরে এসে মিলিয়ে নেবেন।

গুগ্‌লি মাসি বল্‌লেন—ফর্দ যদি করতে হয়, আমি চলে গেলে কোরো বাবা, নকল রাখবার আমার দরকার

নেই। তোমাকে তো আমি অবিশ্বাস করছি না বাবা—অবিশ্বাস করলে কি আর এই দশ পনের হাজার টাকার গয়না রেখে যেতে পারতুম! হ্যাঁ, আর একটা কাজ করতে হবে বাবা, কাল সকাল ন'টায় আমার গাড়ী, বেরোতে হবে অন্ততঃ আটটায়। বেশী টাকা আমি সঙ্গে আনি নি, কিন্তু এখন ভাব্‌ছি আরো কিছু টাকা সঙ্গে রাখা দরকার। তুমি কাল সকালেই এই হার ছড়াটা বেচে আমাকে স' তিনেক টাকা এনে দেবে, আর বাকি টাকা তোমার কাছেই রেখে দেবে।

বলে প্রায় ভরি ছয়েকের একটা নেক্‌লেস্ ক্যাশবাক্স থেকে বার করে বাবার হাতে দিতে গেলেন।

বাবা বল্‌লেন—থাক্, থাক্, গয়না রেখে দিন, গয়না বেচ্‌তে হবে না। তিনশো টাকা আমার থেকেই আপনাকে দিচ্ছি—আপনি ফিরে এসে যা হয় ব্যবস্থা করবেন।

তারপর মার দিকে চেয়ে বল্‌লেন—হাতবাক্সর ভেতর মাইনের টাকাটা কাল রেখেছি, তার থেকে তিনশো টাকা এখনই মাসিমাকে এনে দাও, সব গুছিয়ে নিতে হবে তো।

... ...

পরের দিন সকাল বেলা গুগ্‌লি মাসি তীর্থযাত্রা করলেন। এবার আর ট্যাক্সি নয়, পোঁট্‌লাটা হাতে নিয়ে বাস ধরবার জন্য রওনা হলেন। বাবা দাদাকে বল্‌লেন—যা না মণ্টু, পোঁট্‌লাটা হাতে নে, আর মাসিমাকে বাসে তুলে দিয়ে আয়। মাসিমা বল্‌লেন—না বাবা, সারা পথই তো একলা যেতে হবে, এটুকুতে আর দোসর কেন? মাসিমা পথের দিকে এগুলেন, চোখে জল ঝরছে; মা ঘরের দিকে ফিরলেন তাঁরও চোখ্ ছল্ ছল্ করছে। দু'দিনেই কি মায়ায় বেঁধে ফেলেছেন গুগ্‌লি মাসি, আমি তাই ভাব্‌তে লাগ্‌লুম। বাবা মাকে বল্‌লেন—আমাকে একটু তাড়াতাড়ি খেতে দিও, যাবার সময় একবার ব্যাঙ্কটা হয়ে যাবো—গয়নাগুলো Safety volt এ জমা দিয়ে আসি—পরের ঝক্কি নিজের কাঁধে রাখা ঠিক নয়।

—চার—

দুপুরে খাওয়া দাওয়া শেষ হলে মা চিঠি লিখতে বসলেন তাঁর মামার বাড়ীতে। অনেক কাল পরে আমার বাড়ীর সম্পর্ক ঝালাই করছেন—অনেক কথাই লিখ্‌লেন, শেষে লিখ্‌লেন গুগ্‌লি মাসির কথা—লিখ্‌লেন না কেবল গয়নার বিষয়। ভয়, যদি কোন রকমে পাঁচ কাণ হয়ে কথাটা গুগ্‌লি মাসির ভাইপোর কাছে পৌঁছয়!

দিন কতক পরে সে চিঠির উত্তর এল—

...তোর চিঠি পড়ে অবাক্ হলুম। গুগ্‌লি মাসি তো মাস খানেকের ওপর নিউমোনিয়া হয়ে মারা গেছেন। এখানকার মেয়ে ইস্কুলে অনেক টাকা দিয়ে গেছেন, বাকি সবই পেয়েছে তাঁর ভাইপো, সে-ই খুব ঘটা করে পিসির শ্রাদ্ধ করেছে...তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে এক বুড়ী তাঁর কাছে এসে বাস করছিল, গুগ্‌লি মাসির সঙ্গে নাকি তার কোন তীর্থে আলাপ হয়েছিল। সে গ্রামের সকলের সঙ্গে খুব মিশ্‌তো, আর তার কথাবার্ত্তাও ছিল খুব মিষ্টি, কিন্তু পরে বোঝা গেল তাঁর স্বভাব ভাল ছিল না। গুগ্‌লি মাসি মারা গেলে তাঁর হাতবাক্সটা নিয়ে সে একদিন উধাও হয়। বাক্সে প্রায় শ' দুই টাকা ছিল।...

চিঠিতে সেই বুড়ীর চেহারার যা বর্ণনা ছিল তা হুবহু আমাদের গুগ্‌লি মাসির।

মা চিঠিটা বাবার হাতে দিলেন, বাবা আগাগোড়া পড়ে মার হাতে ফেরত দিলেন।

বাবার মুখ দিয়ে একটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরুলো। মা চিঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমার দিকে কট্‌মট্ করে চাইলেন।

বল্‌লেন—খুলে ফেল্ দুল। বুড়ো ধাড়ী মেয়ে কানে কেমিকেলের দুল ঝুলিয়ে সঙ্ সেজে বেড়াচ্ছেন।

বিখ্যাত লেখকদের মজার গল্প

ভবেন্দু ভট্টাচার্য্য

তোমরা লেখা গল্প তো কতই পড়। কত মজার গল্প। কিন্তু যাঁরা এই সব গল্প লেখেন তাঁদের জীবনের মজার ঘটনাগুলো জান? কত ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে কত মজার ঘটনা ঘটে। ক'জন বিশ্ববিখ্যাত লেখকের জীবনের ক'টা ব্যাপার বলছি শোন, শুনলেই বুঝতে পারবে।

লেখকদের কাজ হ'ল লেখা। কিন্তু এক এক সময় এই লেখা নিয়েই লাঠালাঠি বেধে যায়।

আমি অবশ্য হাতের লেখার কথাই বলছি।

লেখার হাত ভাল হ'লেই যে হাতের লেখা ভাল হবে এমন কোন কথা নেই। অনেক বড় বড় লেখকের এমন হাতের লেখা আছে যা নাকি পড়তে গেলে কান্না পায়। এমন কি এক সময়কার লেখা পড়ে, আর এক সময় পড়তে গিয়ে তাঁরা নিজেরাই হিম্‌সিম্ খেয়ে যান্।

তোমরা শুনলে আশ্চর্য হবে, সেক্সপীয়ারের মতো অমন যে নামকরা লেখক তাঁর হাতের লেখাও এ হাঙ্গামা হ'তে বাদ পড়ে নি। হাতের লেখার গোলমালে সেক্সপীয়ারের লেখা অনেকগুলো কথার মানে অনেক তা-বড় তা-বড় পণ্ডিতই বহু মাথা ঘামিয়েও ঠিক করতে পারেন নি। একজন হয়তো জানালেন একটা। আর একজন অমনি চোখ পাকিয়ে জবাব দিলেন—আরে মূর্খস্য মূর্খ, ওটা নয় এটা।

হথর্ণ একজন বিশ্ববিখ্যাত লেখক। হাতের লেখাটিও এমন বিখ্যাত ধরণের যে বহুৎ মাথা চুলকেও তাঁর লিখে যাওয়া অনেকগুলো গল্পই আজ পর্যন্ত পড়ে উঠতে পারা যায় নি। আর তাই ছাপাও সম্ভব হয় নি। আমাদের দেশের বিখ্যাত লেখক "পথের পাঁচালী"-স্রষ্টা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতের লেখাও তেমন সুবিধের ছিল না। অনেকটা পিঁপড়ের পায়ে কালি মাখিয়ে কাগজে ছেড়ে দেওয়া গোছের ছিল তাঁর হাতের লেখা। সেই লেখা পড়তে গিয়ে এক এক সময় কম্পোজিটারদের কালঘাম ছুটে যেত, এমন কি এক এক সময় তাঁর নিজেরও।

এই বিশ্রী হাতের লেখার দোষে জেমস্ জয়েসকে কি রকম বিপদে পড়তে হয়েছিল শোন। লেখক হিসাবে জেমস্ জয়েসের খ্যাতি যথেষ্ট, তাঁর লেখা তোমরা বড় হয়ে পড়বে। তখন অবশ্য জেমস্ জয়েস খ্যাতনামা হন্ নি, এমন কি লেখকও হন নি।

গত প্রথম মহাযুদ্ধের সময়। সেন্সারের ভয়ানক কড়াকড়ি। লণ্ডনে মেল মারফৎ একদিন একটি মোটা-সোটা খাতা এসে পৌছল।

খাতাটা খুলে পড়তে গিয়ে তো সেন্সার বিভাগের কর্মচারীদের চক্ষু ছানাবড়া। রহস্যময় দুর্বোধ্য লেখা। সেন্সার বিভাগের হর্তা কর্তারা খাতাটির পাঠোদ্ধার করতে গিয়ে হিম্ সিম্ খেয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা সাব্যস্ত করলেন এ নিশ্চয়ই শত্রু পক্ষকে সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা কোন রিপোর্ট।

অবশেষে হস্তলিপি-বিশারদদের ডাকা হ'ল। অনেক মাথা ঘামল। শেষে মুখে হাসি ফুটল তাঁদের। জানালেন—সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা এটা কোন গোপনীয় রিপোর্ট নয়, এটা একটা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি। আর এইটিই হ'ল জেমস্ জয়েসের বিখ্যাত উপন্যাস—"ইউলিসিস্"।

এক একজন লেখক তো নিজের লেখা নিয়ে গল্প তৈরীই করেন। যেমন নাট্যকার জর্জ বার্ণাড শ। তখন জর্জ বার্ণাড শ'র নাম কেইবা জানতো! কিন্তু নিজের নামটি ছোট করে—জি-বি-এস নাম দিয়ে খবরের কাগজে আধা-বিজ্ঞাপন আধা-বিবৃতি গোছের এমন গল্প ফাঁদলেন যে চারিদিকে তাঁকে নিয়ে হৈ চৈ পড়ে গেল।

আর মানুষ মার্ক টোয়েন। যেমন মজার মানুষ, তেমনি তাঁর মজার লেখা। তাঁকে নিয়ে যে কত গল্প সৃষ্টি হয়েছে তার আর সীমা সংখ্যা নেই। কোন কথার জবাব যেমন ছিল তাঁর জিবের আগায়, তেমনি ছিল কলমের ডগায়।

এক সময় মার্কটোয়েন একখানা পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। একদিন এক গ্রাহক মার্কটোয়েনকে এক অদ্ভুৎ প্রশ্ন করে পাঠালেন। ডাক মারফৎ পত্রিকা পাওয়ার পর তিনি নাকি প্যাকেট খুলে দেখেন পত্রিকার ভেতর একটি মাকড়সা। গ্রাহক মশাই তাই জানতে চেয়েছেন, এই যে পত্রিকার ভেতর মাকড়সার দেখা পাওয়া গেল এটা শুভ না অশুভ লক্ষণ? আসলে কিন্তু গ্রাহক ভদ্রলোক ভেবেছিলেন এমন এক অদ্ভুৎ প্রশ্ন করে মার্কটোয়েনকে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দেবেন।

রসিক মার্কটোয়েনও পিছু হটবার পাত্র নয়। পত্রপাঠ জবাব দিলেন—পুরনো গ্রাহকেরা যদি পত্রিকার পাতায় মাকড়সার দেখা পান তা হ'লে তাঁদের পক্ষে ওটা শুভ কি অশুভ কোন লক্ষণই নয়। কোন্ ব্যবসায়ী বিজ্ঞাপন দিয়েছে বা দেয়নি মাকড়সাটা পত্রিকার ভেতর তারই খোঁজ করছে। যারা দেয় নি, ও তাদের দোকানের দরজায় গিয়ে জাল বুনবে, কারবার খতম করবে, আর পরম শান্তিতে সারা জীবন সেখানে বাস করবে।

মুখের মতো জবাব পেয়ে গ্রাহক তো থ।

আর একজন লেখকের একটি মজার গল্প বলে শেষ করি। ইনি কেমন এক মজার ফ্যাসাদ বাধিয়েছিলেন শোন।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল। নিউ ইয়র্ক-সান্ পত্রিকার অফিসের সামনে ভীষণ ভীড়। কি ব্যাপার? না, সেদিন এই পত্রিকার প্রথম পাতায় বড় বড় হেড্ লাইনে একটা আশ্চর্যকর খবর বার হয়েছে। সেই খবরে জানা যায়, দু'জন বায়ুযানচালকসহ আটজন ইংরেজ নাকি বেলুনে আটলান্টিক পার হয়েছেন। ওয়ালেস থেকে এসে পৌঁচেছেন সাউথ ক্যারলিনায়।

তখনকার দিনের পক্ষে এ ছিল সত্যিই এক আশ্চর্যকর খবর। কাজেই লোকের আগ্রহের সীমা নেই। পত্রিকার বিশেষ সংস্করণ পর্যন্ত পঞ্চাশ সেণ্ট দামে হু হু করে কেটে গেছে। লোকে আরও ভালভাবে ব্যাপারটা জানতে চায়।

পত্রিকার মালিক এ সম্বন্ধে আরও ভালভাবে খবর যোগাড়ের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। খবর নিয়ে জানা গেল, এরকম কোন বেলুনই ওয়ালেস কিংবা কোথাও থেকে এসে পৌঁছয় নি। কিন্তু কে কার কথা শোনে! খবর তখন ছাপা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। বাইরে হৈ চৈ-এর শেষ নেই।

মালিক মশাই খাপ্পা হয়ে সম্পাদকের কাছে কৈফিয়ৎ তলব করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—তিনি এই উদ্ভট খবরটি পেলেন কোথায়?

বিপদগ্রস্ত সম্পাদক জবাবে জানান—তিনি এই বিচিত্র খবরটি পেয়েছেন এর লেখকের কাছ থেকে। তিনি নাকি সাউথ ক্যারলিনা থেকে তার একটু আগেই এ খবরটি পান।

মালিক বললেন—পাকড়াও এ খবর যে পাঠিয়েছে তার লেখককে।

হন্ত দন্ত হয়ে সম্পাদক ছুটলেন তাঁকে পাকড়াতে।

পাকড়ালেনও শেষ পর্যন্ত! জিজ্ঞাসা করলেন—এ খবর আপনি পেলেন কোথায়? কেই বা তৈরী করল—কেই বা পাঠাল?

খবরটির লেখক বেশ সপ্রতিভভাবে জানিয়ে দেন—কেই বা তৈরী করবে—আর কেই বা পাঠাবে, আমিই তৈরী করেছি—আর আমিই পাঠিয়েছি।

তা হ'লে মিথ্যে! সব এই লোকটা বানিয়েছে। সর্বনাশ! সম্পাদক ছুটতে ছুটতে এসে মালিককে সব কথা খুলে বললেন।

সমস্ত শুনে রাগে দুঃখে পত্রিকার মালিকের তো নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হ'ল। বাইরে গোলমাল সমানে চলেছে। আচ্ছা এক ধাপ্পাবাজীতে পড়া গেছে! মালিক চিৎকার করে হুকুম দেন—কথ্খনো ওই লেখক লোকটাকে আর ঢুকতে দেবে না। কি লোকটার নাম?

—কি যেন বিশ্রী নামটা, হ্যাঁ—হ্যাঁ মনে পড়েছে—সম্পাদক বলে ওঠেন—এড্গার এ্যালেন পো।

এই এড্গার এ্যালেন পোই কিনা একদা বিশ্ববিখ্যাত লেখক হয়েছিলেন।

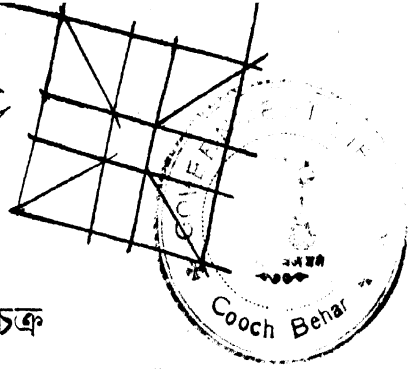
বাইশে শ্রাবণ

শ্রীপান্নালাল মাইতি

বাইশে শ্রাবণ—
আশার সমাধি লয়ে, জাগে ঐ ধরার প্রাঙ্গণ ॥
বেদনার বিষ বাষ্পে, মূর্চ্ছি পড়ে ধরণী আতুর
হায় কবি, তুমি কতো দূর?
বসন্তের বাসন্তী নিশি, শরতের শুভ্র শেফালিকা
আষাঢ় সজল সন্ধ্যা—হেমন্তের গোধূলির টিকা
তোমা সাথে হারায়েছে বাণী
হে মহান্ কবি, মোরা জানি

মরণের রথচক্রে, মৃত্যুহীন মহাপারাবারে
তোমার জীবনতরী, ভাসিয়া চলেছে অভিসারে ॥
তবু তব বিচ্ছেদের বেদনার, দুর্বিসহ জ্বালা
সহিতে পারে না তাই, শ্রাবণের এতো অশ্রুঢালা।
নীপের নিকুঞ্জে আজি, তাই জাগে এতো কাণাকাণি
কদম্ব কেশর কীর্ণ, বনবীথি তাই মূকবাণী ॥
তাই তব, নব-যাত্রা মহাদিনে, অশ্রু অর্ঘ্য হারে
স্মরণ করি যে বারে বারে ॥

জ্যোতিষিক



শ্যামাপ্রসাদের জন্মচক্র

জ্যোতি বাচস্পতি

গত বৎসর ৯ই আষাঢ় তারিখে শ্যামাপ্রসাদ আমাদের ছেড়ে চ'লে গেছেন। সুদূর প্রবাসে আত্মীয়স্বজনের সংশ্রবহীন্ অবস্থায় সহানুভূতিশূন্য পরিবেশে এই মহান্ আত্মার দেহাবসান প্রত্যেক বাঙালীকে ব্যথিত করেছে। তাঁর এই অকাল প্রয়াণে ভারতবর্ষের বিশেষ ক'রে বাংলা দেশের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে তা বলবার নয়। দেশে নেতার অভাব নেই, কিন্তু তাঁর মত সাধুসঙ্কল্প ও ন্যায়নিষ্ঠ নেতা ক'জন আছেন কে জানে। আজ তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে জ্যোতিষের মধ্য দিয়ে তাঁর এই মহনীয় ব্যক্তিত্বের কী আভাষ পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা ক'রে তাঁকে স্মরণ করতে চাই।

জন্ম হয়েছিল তাঁর ১৩০৮ সালের ২২শে আষাঢ়, শনিবার, ইংরাজি ১৯০২ সালের ৬ই জুলাই (সিভিল মতে রাত্রি বারটার পর বলে ৭ই) রাত্রি ২টা ৪৮ মিনিটে। স্ফুট সমেত তাঁর ছক হয় এই রকম—

লং ১৪।৫২ রু ২৫।১১ ব ৭।৫ র ২১।৩৪	কে ২৭।২৮	চ ২২।১২
বু ১।৫০ বং শু ৯।৩৩		
ম ৩।৩৮	রা ২৭।২৮	শ ২০।৩৮ বং বৃ ১৪।৫৫ বং প্র ২১।১৫ বং

১০ম—১০।১।২১	১১শ—১১।৩।৩	১২শ—৪।৯।১২
লং ১।১৪।৫২	হর্ষ ২।১০।১৭	প্লু ৩.৪।৯

এই রাশিচক্রের ভাগ্যনিয়ন্তা গ্রহ শুক্র। শুক্র কর্কটে বুধযুক্ত হ'য়ে আছে। বৃষ লগ্নের বুধ-শুক্রের যোগ একটি শ্রেষ্ঠ যোগ। মঙ্গল ও আংশিক ভাগ্যনিয়ন্তা এবং ঐ মঙ্গলও আছে কন্যায় বুধের ক্ষেত্রে।

এই রাশিচক্রে প্রথমেই দৃষ্টি পড়ে দশমস্থ চন্দ্র ও লগ্নস্থ রুদ্রের উপর। এই চন্দ্র ও রুদ্রের প্রভাব শ্যামাপ্রসাদের জীবনে বিশেষ ভাবে অভিব্যক্ত হয়েছিল—কারণ তারা দুটি প্রধান কেন্দ্রে তো আছেই, তাছাড়া এই দুটি গ্রহের সঙ্গেই ভাগ্যনিয়ন্তা শুক্রের প্রথম সংযোগী প্রেক্ষা আছে।

দশমস্থ চন্দ্র কর্মবহুল জীবন সূচনা ক'রে। এ সম্বন্ধে "কোষ্ঠী দেখায়" যা লিখিত হয়েছে তা উদ্ধৃত করছি।

"দশমস্থ চন্দ্র অনুগৃহীত হ'লে, কর্মে পরিবর্তনের দ্বারা জাতকের উন্নতি হয়। রবি, বৃহস্পতি অথবা শনির দ্বারা অনুগৃহীত হ'লে, জাতক বিশেষ যশ ও প্রতিষ্ঠা পেয়ে থাকেন। বংশগত অবস্থার দ্বারা তাঁর উন্নতির সাহায্য হয় এবং পিতামাতার তরফ থেকে জাতক উপকৃত হন। জনসাধারণের মধ্যে জাতকের খ্যাতি অবশ্যম্ভাবী।"

লগ্নস্থ রুদ্র অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সূচক। নিজের মতের উপর দৃঢ় নিষ্ঠা এর একটা প্রধান ফল। যে কোন দিকে হোক্ এই রুদ্র অসাধারণ শক্তি সূচনা ক'রে এবং জাতক নিজের শক্তিমত্তা ও প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যে সাধারণ থেকে স্বতন্ত্র হ'য়ে ওঠেন। রুদ্র যাঁর লগ্নে থাকে তিনি হয় বর্তমান যুগের অগ্রবর্তী—না হয় পশ্চাদবর্তী হ'য়ে থাকেন, কাজেই সমসাময়িক অবস্থার সঙ্গে তিনি প্রায়ই নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেন না।

শ্যামাপ্রসাদের আষাঢ় মাসে জন্ম সুতরাং তাঁর মধ্যে একটা দ্বন্দ্বভাব ছিল। তিনি একই সময়ে বর্তমান যুগের অগ্রবর্তী এবং পশ্চাদবর্তী হতে চাইতেন। একদিকে যেমন তাঁর ছিল সংস্কারপ্রিয়তা, অন্যদিকে তেমনি ছিল প্রাচীন ঐতিহ্য রীতিনীতি ও সংস্কৃতির প্রতি মমত্ববোধ। তি... পুরাতনকে একেবারে ছেঁটে ফেলে আধুনিক প্রগতিবাদীদের মত প... যা কিছু সব নস্যাৎ করাকে প্রগতিশীলতা বলে মনে করতে পা... আবার শুধু পুরাণোটাকেই আঁকড়ে ধরে নতুনকে অবজ্ঞা... তাঁর ধাতে সহ্য হ'ত না। তিনি আসলে চাইতেন পুরা...

নতুন ইমারত গড়ে তুলতে। তাঁর বৃষ' লগ্ন, রবির সঙ্গে শনির ঘনিষ্ঠ অপোজিশন এবং চন্দ্রের সঙ্গে শনির ঘনিষ্ঠ সেক্সটাইল প্রেক্ষা—এ সবগুলিই যেমন পুরাতনের দিকে আকর্ষণ নির্দেশ ক'রে তেমনি রবি চন্দ্রের ট্রাইন, কুম্ভরাশিস্থ চন্দ্র, চন্দ্রের সঙ্গে লগ্নপতি ও ভাগ্যনিয়ন্তা শুক্রের সংযোগী প্রেক্ষা এসবই তাঁর সংস্কারপ্রিয়তা সূচনা ক'রে। শুক্র ভাগ্যনিয়ন্তা হওয়ায় এবং তৃতীয়ে বুধযুক্ত হ'য়ে থাকায় এ দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সজাগ ছিলেন এবং নিজের মধ্যে তার সমন্বয় ক'রে নিজের একটা সুস্পষ্ট মতবাদও গড়ে তুলেছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু বাইরের অবস্থার সঙ্গে তাঁকে এ নিয়ে বরাবরই যুদ্ধ করতে হয়েছে। এই প্রভাবের জন্যই তিনি কংগ্রেস কিম্বা হিন্দু মহাসভা কোথাও স্থির থাকতে পারেন নি।

শ্যামাপ্রসাদের ভাগ্যনিয়ন্তা ছিল শুক্র। শুক্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে "ফলিত জ্যোতিষের মূলসূত্রে" যা লিখেছি এখানে তা একটু উদ্ধৃত ক'রে দিলুম।

"শুক্র অবস্থাভিজ্ঞ, ইঙ্গিতজ্ঞ। কোন্ জায়গায় কী ভাবে কাজ করলে তা সব চেয়ে ফলপ্রদ হবে, শুক্রের মত তা বুঝতে আর কোন গ্রহই পারেন না। সেই জন্য সমাজে, সভায়, সংসদে, কর্মস্থলে সর্বত্রই তাঁর আদর। তাঁর পটুত্ব, তা সে বাক্‌পটুতাই হোক্ আর কর্মদক্ষতাই হোক্, কেউই অস্বীকার করতে পারে না···শুক্রের সব কাজ সুকৌশলে সম্পন্ন···কাজ সু-সমাধা করতে হলে যে পটুত্বের প্রয়োজন তা একমাত্র শুক্রেরই আছে। শুক্রই প্রকৃত কর্মযোগী এবং সেইজন্য জ্ঞানযোগী বৃহস্পতির মত তাঁকেও গুরু ব'লে অভিহিত করা হয়েছে।···শ্রীভগবান গীতায় বলেছেন "যোগঃ কর্মসু কৌশলম" কর্মকুশলতাই যোগ—শুক্র সেই কর্ম যোগী।"

শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন প্রকৃত কর্মযোগী। কোন অবস্থাতেই কর্ম ছাড়া তিনি থাকতে পারতেন না। অসুস্থ অবস্থাতেও কর্মচিন্তা ছাড়তে তিনি অস্বস্তি বোধ করতেন।

শ্যামাপ্রসাদের শুক্র ছিল তৃতীয়ে। শুক্র তৃতীয়ে থাকলে জাতকের মধ্যে আশাবাদীর ভাব প্রকট হয় এবং তিনি সামাজিক ও শিষ্ট ব্যবহার ভালবাসেন। শালীনতার দিকে তাঁর বিশেষ লক্ষ্য থাকে, তাঁর কথা-বার্তা ও ভাবভঙ্গী সুমিষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী হয়। এমন কি শত্রুর সঙ্গে ব্যবহারও শিষ্টতা বা শালীনতার সীমা অতিক্রম করে না। বচসায় তাঁর তীক্ষ্ণ শ্লেষ মর্মভেদী হলেও তাতে কদর্যতার স্পর্শ থাকে না। শ্যামাপ্রসাদকে যাঁরা জানতেন তাঁরা স্বীকার করবেন তাঁর মধ্যে এসব গুণগুলিই ছিল। তৃতীয়স্থ শুক্রের আর একটা ফল হচ্ছে কলাশিল্প, সাহিত্য ইত্যাদির সৌন্দর্য সম্বন্ধে সহজ জ্ঞান—কিন্তু সেই সঙ্গে তার ব্যবহারিক উপযোগিতার দিকটাও লক্ষ্য এড়ায় না। এছাড়া তৃতীয়স্থ আয। ব্যবসায়বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বেরও সূচক।

তোমা শুক্র তৃতীয়ে থাকায় তাঁর ভ্রাতা ভগ্নী ও আত্মীয়স্বজনের হে মহান্ ··· ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল এবং উক্ত শুক্র ষষ্ঠপতি হওয়ায় ···পরও তাঁর ব্যবহার সদয় ও মমতাপূর্ণ ছিল।

আত্মীয়-স্বজন বা আশ্রিত-প্রতিপাল্যের জন্য তাঁকে মধ্যে মধ্যে ঝঞ্ঝাট ও অশান্তিও ভোগ করতে হয়েছে। তার কারণ ঐ শুক্র কুপ্রেক্ষিত হয়েছে চন্দ্রও প্রজাপতির দ্বারা শুক্র ভাগ্যনিয়ন্তা হ'লে মানুষ সাধারণতঃ শান্তি-প্রিয় ও আনন্দ প্রিয় হয়। শ্যামাপ্রসাদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি, অন্তরের অন্তরে তিনি শান্তিই কামনা করতেন, কিন্তু দশমস্থ চন্দ্র ও সপ্তমস্থ প্রজাপতি ও ষষ্ঠস্থ রাহু তাঁকে সুস্থির থাকতে দেয় নি। বিশেষতঃ লগ্নস্থ রুদ্রের সঙ্গে শুক্রের প্রথম সংযোগীপ্রেক্ষা থাকায় তাঁর ন্যায়নিষ্ঠা এত প্রবল ছিল যে, তার কাছে অপর সন্ধান কামনাই ছিল তুচ্ছ। বস্তুত লগ্নে রুদ্র থাকায় ন্যায় ও সত্যের দিকে তাঁর একটা দুর্বার আকর্ষণ ছিল। অন্যায় বা অসত্যের সঙ্গে রফা করা তাঁর ছিল প্রকৃতি-বিরুদ্ধ।

লগ্নস্থ রুদ্র দৃঢ়নিষ্ঠা ও নেতৃত্বের শক্তি দেয় বটে, কিন্তু তা একটু আত্মকেন্দ্রিকও ক'রে। তাতে ক'রে জাতক নিজের মত ও পথ প্রায়ই শ্রেষ্ঠ ব'লে মনে করেন। এটা প্রভুত্ব-প্রিয়তার সূচকও বটে। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদের কোষ্ঠীতে শুক্র ভাগ্যনিয়ন্তা হওয়ায় তাঁর শ্রেষ্ঠতা-বোধ বা প্রভুত্ব-প্রিয়তা কখনও শালীনতার সীমা অতিক্রম করে নি।

শ্যামাপ্রসাদের লগ্নস্থ রুদ্রের সঙ্গে দশমস্থ চন্দ্রের এবং সপ্তমস্থ প্রজাপতির অশুভ প্রেক্ষা ছিল; এর ফলে তাঁর ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে জনপ্রিয়তার একটা সংঘর্ষ মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হ'ত, তার জন্য কিছু অশান্তিও তিনি ভোগ করেছেন, কিন্তু শুক্রের প্রভাব প্রবল হওয়ায় তা তাঁকে বিচলিত করতে পারে নি। দশমস্থ চন্দ্র তাঁকে জনপ্রিয়তার দিকে আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু রুদ্র লগ্নে থাকায় সস্তা জনপ্রিয়তা তিনি কখনই পছন্দ করেন নি—এবং কোন প্রলোভনেই তিনি তাঁর নিজস্ব নীতি ত্যাগ করতে রাজী ছিলেন না। এমন কি জনতার অপ্রিয়ভাজন হ'তে হবে জেনেও তিনি যা সত্য ও ন্যায়সঙ্গত ব'লে মনে করেছেন, সে পথ অনুসরণ করতে দ্বিধা করেন নি।

রুদ্রের আর একটি প্রকৃতি আত্মপ্রত্যয় বা আত্ম-নির্ভরতা। রুদ্র পূর্ণ সত্যের উপাসক এবং সব রকম কৃত্রিমতার একান্ত বিরোধী। সেইজন্য অপরের সহযোগ তিনি কমই পান। একান্তে সম্পূর্ণ নিজের উপর নির্ভর ক'রে তাঁকে অগ্রসর হ'তে হয়। রুদ্রের আসল উদ্দেশ্য আপন সত্যের অনুসরণ এবং তার জন্য যে কোন সমাজ, সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মতের মিল না হ'লে, তিনি তা তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করেন। কোনরকম রফা বা আপোষ করার প্রবৃত্তি তাঁর মধ্যে নেই। যে কোন সমাজের মধ্যে থেকেও রুদ্র কার্যতঃ নিঃসঙ্গ, স্বতন্ত্র থাকেন। তাঁর উপর দ্বিধা সঙ্কোচ বা ভয় কোন প্রভাব স্থাপন করে না। রুদ্র দ্রষ্টা-তাঁর মধ্যে সমালোচকের ভাব প্রবল। কিন্তু সে সমালোচনা মোটেই ঈর্ষা-বিদ্বেষ-প্রসূত নয়। সব জিনিষকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে তিনি তার মধ্য থেকে সত্য-তত্ত্ব পেতে চান। রুদ্রের এই প্রকৃতির জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশ ক'রে তার আচরণের মূল উৎস নির্ণয় করতে তাঁর পটুত্ব অসাধারণ।

রুদ্রের এই প্রকৃতি "ফলিত জ্যোতিষের মূলসূত্র" থেকে উদ্ধৃত হ'ল।

যাঁরা শ্যামাপ্রসাদের জীবন পর্যালোচনা করেছেন, তাঁরাই দেখতে পাবেন শ্যামাপ্রসাদের মধ্যে রুদ্রের প্রভাব কত প্রবল ছিল।

শ্যামাপ্রসাদের শুক্র ভাগ্যনিয়ন্তা হ'য়ে কর্কটে থাকায় তাঁর মধ্যে সামাজিক প্রকৃতি পরিস্ফুট ছিল এবং তাঁর অনুচর পরিচর ও পরিচিতের সংখ্যা ছিল অগণ্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও লগ্নস্থ রুদ্রের জন্য তিনি সামাজিক হ'য়েও স্বতন্ত্র ছিলেন। সমাজে থাকলেও সমাজ তাঁকে বাঁধতে পারে নি। তাঁর নীতি ছিল ব্যক্তিত্ববাদের নীতি। ফল যাই হোক, কোন অবস্থা কোন পরিবেশেই তিনি ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিতে রাজী ছিলেন না। তাঁর দৃঢ় সত্যপ্রিয়তা ও ন্যায়নিষ্ঠায় এই ব্যক্তিত্ববোধ মিলিত হ'য়ে তাঁর যে মহনীয় ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছিল তা সকলেরই সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

শ্যামাপ্রসাদের সাধুসংকল্প, নিষ্ঠা এবং মহান ব্যক্তিত্ব থাকলেও তিনি যা করতে পারতেন তা পারেন নি শুধু অনুকূল পরিবেশের অভাবে। পরিবেশ এবং উপযুক্ত সহযোগী বা সহকর্মীর ব্যাপারে তাঁর ভাগ্য ভাল ছিল না। তাঁর ষষ্ঠস্থ রাহু দশমদর্শী, দশমস্থ চন্দ্র লগ্ন ও ষষ্ঠপতি শুক্রের, লগ্নস্থ রুদ্রের এবং সপ্তমস্থ প্রজাপতির অশুভ প্রেক্ষায় পীড়িত। তা ছাড়া তাঁর দশমপতি শনি অষ্টমস্থ। অবশ্য তা দশম ভাবে পূর্ণদৃষ্টি করেছে এবং দশমস্থ চন্দ্রের সঙ্গে তার সুপ্রেক্ষা ও শুভসম্বন্ধও আছে—কিন্তু রবির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ অশুভ প্রেক্ষা এবং বৃহস্পতির সঙ্গে তার যোগ—এগুলি অশুভ ফল নির্দেশ ক'রে। ষষ্ঠস্থ রাহু নির্দেশ ক'রে উপযুক্ত সহকর্মীর অভাব এবং বিচিত্র কারণে কর্মের প্রকৃতি বা ক্ষেত্রের পরিবর্তন। এই যোগে অনেক সময় অধীনস্থ ব্যক্তিদের অবহেলা, অপটুতা, অসাধুতা, প্রভৃতির জন্য তাঁর সঙ্কল্প সিদ্ধি ব্যাহত হয়েছে এবং সহকর্মী বা সহযোগীদের প্রতিকূলতায় বিরক্ত হয়ে তিনি কর্মত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন।

এ হিসাবে প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাব থাকে ৬০ বর্ষ পর্যন্ত। দেশের দুর্ভাগ্য যে তার আগেই তাঁকে মৃত্যু বরণ করতে হ'ল।

তার এই শোচনীয় মৃত্যুর নির্দেশ তাঁর রাসিচক্রে থেকে যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে অষ্টমস্থ শনি রবির ঘনিষ্ঠ কুপ্রেক্ষায় পীড়িত এবং দ্বাদশ পতি মঙ্গল দৃষ্ট। তাঁর অষ্টমপতি বৃহস্পতি অষ্টমে থেকে শনি যুক্ত এবং মঙ্গল দৃষ্ট। বৃষ লগ্নের একটা বিশেষ ফল এই যে, অষ্টমস্থান, অথবা অষ্টমপতি যদি শনি, রাহু কিম্বা মঙ্গল দ্বারা পীড়িত হয়, তাহ'লে জাতকের দূর প্রবাসে স্বজন-বিরহিত স্থানে মৃত্যু হয়। দশমপতি শনি অষ্টমে থেকে রবির দ্বারা ঘনিষ্ঠভাবে কু-প্রেক্ষিত হওয়ায় একটা ফল রাজরোষে মৃত্যু অর্থাৎ কোন প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তি বা রাজ সরকারের শত্রুতা তাঁর মৃত্যুর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণ হওয়া সম্ভব। তা ছাড়া এই যোগ চিকিৎসা-বিভ্রাট বা কু-চিকিৎসায় জাতকের মৃত্যু নির্দেশ ক'রে। শ্যামাপ্রসাদের এই আকস্মিক শোচনীয় মৃত্যুর যদি নিরপেক্ষ তদন্ত হত তাহলে নিশ্চয় এ-কথা প্রকাশ পেত যে, যে কোন কারণেই হোক্ তাঁর চিকিৎসার ত্রুটি নিশ্চয় হয়েছিল।

মৃত্যু সময়ে শ্যামাপ্রসাদের বিংশোত্তরী কেতুর দশায় মঙ্গলের অন্তর্দশা চলছিল, তা শুরু হয়েছিল ১৯৫৩ সালের ২০শে মে এবং শেষ হ'ত ১৭ই সেপ্টেম্বর। যাঁরা জ্যোতিষ একটুও জানেন তাঁদের বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই অন্তর্দশা প্রবল রিষ্টসূচক। এই সময় নৈসর্গিক দশা ছিল রবির এবং তা শেষ হ'ত ২৩শে জুলাই ভৃগুর অষ্টোত্তরী মঙ্গলের দশায় রবির অন্তর্দশা চলছিল। এগুলিও রিষ্টজনক। এ সময় গোচরও বিরুদ্ধ ছিল। শনি ছিল কন্যায় জন্মরাশি থেকে রন্ধ্রগত—তা জন্মকালীন রবিকে দৃষ্টি দ্বারা এবং লগ্নকে প্রেক্ষা দ্বারা পীড়িত করছিল। তা ছাড়া রাহু ছিল মকরে—জন্মরাশির দ্বাদশে থেকে লগ্নকে পূর্ণ-দৃষ্টিতে দেখেছিল। সুতরাং গোচরও স্বাস্থ্য ও জীবনী শক্তির পক্ষে বিরুদ্ধ ছিল।

জানি আজ এ প্রশ্নে কোন লাভ নেই, কিন্তু তবু এ প্রশ্ন মনে ওঠে যে, শ্যামাপ্রসাদের এই যে নিয়তি এ কি অনিবার্য ছিল? কিম্বা চেষ্টা করলে এ নিবারিত হ'তে পারত? আমার মনে হয়, এ সময় গুরুতর রিষ্টযোগ ছিল বটে কিন্তু পূর্বাহ্নে যত্ন ও সতর্কতার দ্বারা হয়ত এ নিয়তি এড়ান যেতে পারত, কেন না তার রবি, শনি, রাহু ও কেতু চন্দ্রের দ্বারা সুপ্রেক্ষিত এবং অষ্টমপতি স্বক্ষেত্রে থেকে রবির সঙ্গে সম্বন্ধ করেছিল। এ যোগ আয়ুর্বলের সূচক। বিরুদ্ধ যোগগুলি প্রবল ছিল সেপ্টেম্বর পর্যন্ত; যদি তা অতিক্রান্ত হ'ত তাহ'লে অন্ততঃ আরও দশ বারো বৎসর তাঁকে আমাদের মধ্যে রাখতে পারতুম। কিন্তু সে অনুশোচনায় আজ আর লাভ নেই, আজ শুধু এইটুকুই কামনা করব যে বাংলার তরুণেরা তাঁর জীবন দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হ'য়ে নিজেদের চরিত্র গ'ড়ে তুলুক।





দুঃস্বপ্ন

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

আপনারা অনেকেই জানেন বিচিত্র রকমের দুঃস্বপ্ন দেখা আমার একটা ব্যাধি—স্বপ্ন অবশ্য স্বপ্নই, কিন্তু তাহাও মাঝে মাঝে বেশ সুষ্ঠু ও স্বাদু হইয়া দেখা দেয়। জীবনে অক্ষম বলিয়াই বোধ হয় স্বপ্নটা দেখি বড় বড়—কখনও হিটলার, ষ্ট্যালিন—কখনও আইসেনহাওয়ার, মা সেতুং এঁদের সঙ্গে দেখা শোনা ও কথাবার্ত্তা হয়।

যেমন সেবার স্বপ্ন দেখিলাম, নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিকগণের সহিত চলচ্চিত্র তারকাগণের ফুটবল খেলা—মোহনবাগান মাঠে। পরের দিনেই হিটলারের সহিত দেখা হরিদ্বারের এক গিরিগুহায়।

সম্প্রতি একটা স্বপ্ন দেখিয়াছি—বিচিত্র এবং অদ্ভুত, জনসমাজে প্রকাশ না করিলে ব্যত্যয় ঘটিতে পারে তাই জানাইতেছি।

শীতের দিনে বনভোজন করিয়া ফিরিয়াছি সন্ধ্যায়—বনভোজনের ভোজনটা গুরুপাক ছিল—খিঁচুড়ি ও ছাগ মাংস। রাত্রে সম্ভবতঃ বায়ুর প্রকোপে স্বপ্নটা দীর্ঘ হইয়া থাকিবে। প্রহরেকের পরে সম্ভবতঃ ঘুমাইয়াছিলাম—

বিস্তীর্ণ মাঠের মাঝে, উঁচু ডাঙ্গার উপরে বসবাস। সরকারী জিপগাড়ী মাঝে মাঝে এই রাস্তায় যায়। সেদিন সকালে রোদে বসিয়া চা খাইতেছি একখানা আকাশনীল জিপ আসিয়া থামিল—সঙ্গীন সহ বন্দুকধারী পুলিশ ও পুলিশ সাহেব। দরজায় খিল দিবার মানসে চা এর বাটী সহ পালাইতেছিলাম—সেপাই হাঁকিল। খাঁড়া রহ, সাহেব আয়া—

খাঁড়া রহিলাম। সাহেব আসিয়া কহিলেন—আপনি নবকৃষ্ণ বটব্যাল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—

—আপনি হেডমাষ্টার স্কুলের?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—

—আপনাকে যেতে হবে এক্ষুণি আমার সঙ্গে—

—আজ্ঞে, চুরি ডাকাতি কিছু ত আমি করিনি—

—তা নয় তা নয়, উপর থেকে হুকুম, আপনাকে আজ সন্ধ্যার মধ্যে কলকাতা পৌছে দিতেই হবে—

—কেন? গিন্নি, ছেলেপুলে এদের কোথায় রেখে যাই—বাজার হাট, দোকান দেনা, দুধের দাম—

হুঙ্কার দিয়া সাহেব কহিলেন—অত শত জানিনে মশায়, যেতে হবে। ভালয় ভালয় যাবেন কিনা সেইটে পরিষ্কার করে বলুন—

—আজ্ঞে—মন্দয় মন্দয় যাবার সংকল্প আমার নেই। তবে কেন নিয়ে যাবেন? আমার এই দেহটা দিয়ে কি হবে? ৺কালীমাতার বলির অভাব আছে কিনা—এ গুলো ত নিশ্চয়ই জানেন।

সাহেব হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া কহিলেন—ও তা জানেন না! কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার শম্ভুবাবু পদত্যাগ ক'রেছেন।

—কেন?

—ছেলেরা তাঁকে তিনরাত্রি ঘিরে রেখে দিয়েছিল পাশ করবার জন্যে, পাঠ্যপুস্তক কমাবার জন্যে মোটর ধরে রেখেছিল—ফেল করালে হত্যা করবে বলে ভয় দেখিয়েছিল, সেই জন্যে ছেড়ে দিয়েছেন—এখন আপনি ছাড়া এ পদের যোগ্য ব্যক্তি আর নেই। আপনাকে যেতে হবে—

আমি সভয়ে কহিলাম—প্রতি ডিসেম্বরে আমারও ও রকম কত হয়। আর প্রাণের ভয়টা আমারও ত আছে—

—তা ত আছেই, সকলেরই আছে, তাই বলে পদটা ত খালি থাকতে পারে না। তা ছাড়া সকলেরই মত ডিমোক্রেসীর আদর্শটা আপনিই ভাল বোঝেন—

বিশ্ববিদ্যালয়কে ডিমোক্রেটিক করে গড়ে তুলতে হবে—দেশের ভবিষ্যৎ গড়তে হবে—

—যা নেই তা গড়বো কি ক'রে ?

—মানে ?

—যে দেশের ভবিষ্যৎই নেই, তার আবার ভবিষ্যৎ গড়া যায় নাকি ?

—নেই ত নেই, মশায় চলুন—আমরা পুলিশ অত শত বুঝিনে, উপরওয়ালার সঙ্গে বুঝবেন।

—আজ্ঞে, চা'র কাপটা রেখে আসি—

অতএব আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার হইলাম—প্রথম দিনেই প্রাঙ্গণে দলে দলে ছাত্রগণ সমবেত হইয়া নানারূপ ধ্বনি করিতে লাগিল—আমাদের দাবী মানতে হবে। জুলুম বাজি চলবে না। সকলকে পাশ করাতে হবে—টাকার অপব্যয় চলবে না।

আমি ভয়ে কাঁপিতেছিলাম—একজন কর্ম্মচারী আসিয়া কহিল—ছেলেরা হল্লা করছে, আপনাকে একবার যেতে হয়—

—একটা ডেপুটেশন এলে দেখা করতে পারি—অত লোকের মাঝে যেতে বড় ভয় করে।

কিছুক্ষণ বাদে পুনরায় সংবাদ আসিল—আমাকে অবিলম্বে ছাত্রদিগের সম্মুখীন হইতে হইবে, তাহা না হইলে তাহারা সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তচ্‌নচ্‌ করিয়া দিবে এবং আমাকে সারারাত্রি আটকাইয়া রাখিবে—

একটু বহুমূত্রের আভাস পাইতেছিলাম তাই আরও ভীত হইলাম। অতএব যাইতে হইল। ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম—ছাত্রবন্ধুবান্ধবীগণ, আমি বৃদ্ধ, বেশী কিছু বলিবার বা করিবার অবসর আর নাই। আমি নূতন—আপনাদের কি কি দাবী তাহা যুক্তি সহ বলিলে আমি চিন্তা করিয়া পরে কাজ করিতে পারি। আপনারা একে একে যুক্তি সহ দাবীর কথা শান্তভাবে বলুন—

ছাত্রসংসদের সম্পাদক বলিলেন—বিশ্ববিদ্যালয় চলে প্রধানতঃ ছাত্রদত্ত বেতনে ও সরকারী অর্থে। ছাত্রদত্ত বেতন শতকরা ৭০ ভাগ, সরকারী তথা সাধারণের অর্থ ৩০ ভাগ। অথচ সিনেট ও সিণ্ডিকেটে ছাত্র প্রতিনিধি নেই,—গণতান্ত্রিক জগতে এর চেয়ে বড় প্রতারণা আর কি হ'তে পারে ? সাধারণ বলতে জনসাধারণ, তাদের প্রতিনিধিও নেই। অতএব আমাদের দাবী অন্ততঃ ৭০ ভাগ ছাত্র-প্রতিনিধি নিয়ে নূতন সভা গড়া হউক।

প্রশ্ন করিলাম—তা হ'লে ভাইস্‌চ্যান্সেলর, পরীক্ষক, প্রশ্ন-কর্ত্তা কারা হবে ?

—ছাত্রদের ভোটে ঠিক হবে—

—ছাত্ররাই তা হ'লে ত পরীক্ষক, প্রশ্নকর্ত্তা হবে—

—ডিমোক্রেসীর আদর্শ অনুসারে তাই ত হওয়া উচিত, আমাদের দাবী সেই গণতান্ত্রিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যতদিন এই দাবী সমর্থিত না হয় আমাদের সংগ্রাম চলবে—

প্রতিধ্বনি হইল—দাবী মানতে হবে—সংগ্রাম চলবে—

—আর কি বক্তব্য আপনাদের ?

আর একজন সদস্য কহিলেন—অর্থনৈতিক দুর্দ্দিনে ছাত্র পড়ান ব্যয়সাধ্য, তার উপর যদি বার বার ফেল করিয়ে অভিভাবকের অর্থব্যয় করা হয় তবে তা গর্হিত। ছাত্রদের বেশী সংখ্যায় এবং সম্ভব হলে সব পাশ করাতে হবে। প্রতি একশত নম্বরে ৫ পেলেই পাশ ধ'রতে হবে—

আমি বলিলাম—কিন্তু যদি সারা বৎসর সিনেমা দেখে ও নাঁকি সুরে গান গেয়ে বহু ছাত্র ৫ নম্বরও না পায় তা হ'লে ?

সদর্পে ছাত্রবন্ধু কহিলেন—এই ধারণার আমি প্রতিবাদ করি, যারা পেটের অন্ন পায় না তারা সিনেমা দেখ্‌বে কোথা থেকে ? যারা শীতের বস্ত্র পায় না, তারা গান করবে কি করে ? এ বদনাম দেওয়া নির্লজ্জ অহমিকা ও অপভাষণ—

—কেন ? শোনা যায়, ক্যালকুলাসের বই বিক্রি করে অনেকে সিনেমা দেখে—

—"শোনা যায়" কোন যুক্তি নয়। 'দেখা যায়' সেটাও যুক্তি নয়, কারণ যারা রঙীন চশমা এঁটে বসে আছেন তারা ভুলই দেখবেন। যা হোক, যদি ৫ পাশ নম্বর ধরলেও দেখা যায় বহুসংখ্যক ছাত্র ফেল করছে' তবে ৩ কে পাশ নম্বর ধরতে হবে—আমাদের দাবী মান্‌তে হবে—

প্রতিধ্বনি হইল—মান্‌তে হবে—

—আর কোন বক্তব্য আছে ?

একজন মহিলা-ছাত্রী কহিলেন—গত কয়েক বৎসরই দেখা যায় পরীক্ষার হলে ছাত্রীগণের প্রসব বেদনা দেখা যায়

এবং তাতে তাদের জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে সন্তান-সম্ভাব্য পরীক্ষার্থিনীদের পাশ বলে গণ্য করা হোক্—

আমি কহিলাম—০ যদি পাশ সংখ্যা থাকে তবে এ এমন সমস্যা কিছু নয়।

আরও অনেকে অনেক দাবী জানাইলেন। রাত্রি তখন বারটা—আমি ডিমোক্রেসির আদর্শ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি অতএব কহিলাম—আপনাদের সমস্যা একটি। যদি আপনাদের প্রস্তাব মত ৭০ ভাগ ছাত্র নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি গঠিত হয় তবে আপনারাই সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রিত করতে পারবেন। পাশ, ফেল, প্রশ্ন-পরীক্ষক সবই আপনারা ঠিক করবেন। আমাকে না রেখে আপনারাই ভাইসচ্যান্সেলর নিযুক্ত করতে পারবেন—আপনাদের একজনকেই। অতএব এই সমস্যাই প্রকৃত সমস্যা। আমি আমাদের ডিমোক্রেটিক সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে আপনাদের জানাবো। আপনারা আজ যান, অত্যন্ত ঠাণ্ডা পড়েছে—

জয়, বটব্যাল কি? জয় লবকেষ্ট কি? ধ্বনির পরে ছাত্রগণ চলিয়া গেল।

ডিমোক্রেসির মূল আদর্শ হইতেছে—সাধারণের সরকার, সাধারণের রচিত সরকার এবং সাধারণের জন্য। (Govt. for the people, of the people, by the people) অতএব ডিমোক্রেটিক বিশ্ববিদ্যালয় অর্থে ছাত্রের বিশ্ববিদ্যালয়, ছাত্রদের দ্বারা রচিত এবং ছাত্রদের জন্য। করদাতা ছাত্রেরাই তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবে। সুতরাং স্থির হইল ছাত্রদিগের নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা শতকরা ৭০ ভাগ হইবে এবং সেইরূপেই সিণ্ডিকেট ও সিনেট রচিত হইয়াছে ;—যুক্ত সভায় আমি যুক্ত করে বলিয়াছিলাম—আমাকে ছাড়িয়া দিন, বাসায় অবলা গৃহিণী অসহায় শিশুদিগকে রাখিয়া আসিয়াছি, সেখানে যাইয়া দেখা শোনা করি। কিন্তু তাহা হয় নাই, ছাত্রদের দাবী যে ডিমোক্রেটিক বিশ্ববিদ্যালয় যিনি রচনা করিয়াছেন তিনিই প্রথম ভাইসচ্যান্সেলর থাকিবেন। দাবী—অতএব মানিতেই হইল।

সেদিনের সভায় প্রশ্নকর্ত্তা ও পরীক্ষক নিযুক্ত হইবার কথা ছিল এবং পরীক্ষা সম্বন্ধীয় আইন-কানুন নূতন করিয়া স্থির হইবে। নিম্নতম পাশের নম্বর শতকরা কত হইবে ইহাই লইয়া বিতর্ক উপস্থিত হইল—সকলে একমত হইলেন না। যাহা হউক সাব্যস্ত হইল ০ 'গোল্লা' পাশনম্বর হইবে।

আমি কহিলাম—বন্ধুগণ, গোল্লা যখন পাশ নম্বর স্থির হইল তখন পরীক্ষা ব্যপদেশে এত শ্রম ও অর্থব্যয়ের প্রয়োজন কি? শূন্য সকল ছাত্রেই পাইবে, অতএব পরীক্ষা অপচয় মাত্র; প্রফেসর লেকচারার রাখাও নিরর্থক। বিশ্ববিদ্যালয়ের এ সকল খরচ যদি বাঁচিয়া যায় তবে আপনাদের মাহিনাও যথেষ্ট কমিয়া যাইবে এবং কলিকাতায় বসিয়া চালানী মৎস্য ও কাঁকর চাউল খাইবার প্রয়োজন নাই।

সকলে একবাক্যে 'সাধু সাধু' বাক্যে আমার বুদ্ধির তারিফ করিলেন। উৎসাহিত হইয়া কহিলাম—আমরা ভোটে ডিগ্রি স্থির করিব এবং তাহাই হইবে ডিমোক্রেটিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ অবদান।

সকলে একবাক্যে সম্মতিদান করিলেন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্ত্তন সাধিত হইল বলিয়া দেশে দেশে কাগজে কাগজে হৈ হৈ পড়িয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে ঘরে ঘরে এম, এ; পি আর, এস; পি এইচ-ডি হইয়া গেল এবং পৃথিবীর শিক্ষিতের হার লইয়া যখন ষ্ট্যাটিষ্টিকস্ বাহির হইল তখন দেখা গেল বঙ্গদেশই একমাত্র দেশ, যে দেশের সকলেই (সেণ্টপারসেণ্ট) কেবলমাত্র শিক্ষিত নয় একেবারে গ্র্যাজুয়েট। পৃথিবী অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল—এম, বি; বি, ই; এম, ডি; কোনরূপ লোকেরই আর অভাব নাই—আমি এই অপরিসীম কীর্ত্তির কর্ত্তা, অতএব আমার নাম দেশে দেশে প্রচারিত। বটব্যাল বলিতে এখন আমিই একমাত্র ব্যক্তি—শিক্ষা বিষয়ে ইতিমধ্যেই ইউরোপ আমেরিকায় কয়েকটি সভায় আহূত হইয়াছি এবং বিশেষ বিশেষজ্ঞরূপেই।

কিন্তু অভাগ্যের ভাগ্যে এত সহিল না—

সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের ঘরে বসিয়া আছি। শরীরটা ভাল নয়, বেয়ারা আসিয়া সংবাদ দিল জনৈক ভদ্রলোক কোন ব্যাপার লইয়া দেখা করিতে চান। আমি বলিলাম—শরীরটা ভাল নেই, দরখাস্ত দিয়ে যেতে বল। পরে ডেকে পাঠাব—

বেয়ারা ফিরিয়া আসিয়া বলিল—তিনি দেখা

ক'রবেনই। বকাবকি কচ্ছেন—ডিমোক্রেটিক জগতে দেখা ক'রবেন না মানে ?

—তবে ডাকো বাবা—

ভদ্রলোক প্রবেশ করিয়া কহিলেন—যদি দরখাস্তেই সব জানাতে পারবো তবে খরচ করে এখানে আসবো কেন ?

আমি কহিলাম—কেন কার্ডে দেখলাম, আপনি এম, এ, পি, এইচ, ডি।

—তা হ'লেই লিখতে পারি বুঝি ? সাত হাজার পাঁচশ চৌত্রিশ ভোট পেয়েছিলাম, নাম সই করতে না পারলে কি হয়, তা জানেন মশাই ?

—আজ্ঞে জান্‌লাম—

—জান্‌লাম কি ? ভোটের এম, এ, পিএইচ, ডি, লেখা পড়ার সঙ্গে তার সম্পর্ক কি ? আপনি ভাইস্‌-চ্যান্সেলর, তা জানতেন না বুঝি ?

—আজ্ঞে আমিও ত ভোটের ভাইস্‌-চ্যান্সেলর—সেটা ত বুঝছেন। যদি তাই হয়, তবে সব জান্‌তে হবে এমন কি কথা—

—হাঁ৷ হাঁ৷—ঠিক বলেছেন।

যাহাই হোক ভদ্রলোক কি যেন বলিয়া গেলেন মনে নাই। তিনি বাহির হইতে না হইতেই এক ভদ্রলোক উন্মাদের মত ছোরা হাতে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া আমাকে আক্রমণ করিতে আসিলেন। আমি সভয়ে কহিলাম—কি, কি, ব্যাপার কি বলুন ?

—আমার ছেলে ফিরিয়ে দাও, নইলে তোমার নিস্তার নেই ?

—সে কি ? আপনি বসুন, ব্যাপারটা শুনি—

—আপনাদের ডাক্তার একটা পুকুরের পঁচা পাঁক খাইয়ে আমায় ছেলেটাকে মেরে ফেলেছে—

—পাঁক খাওয়াবে কেন ? হাতুড়ে বদ্যিদের—

—হাতুড়ে বদ্যি—সে ডাক্তার একজন এম, ডি—

—এম, ডি একজন ডাক্তার, সেকি পঁচা পাঁক খাওয়াতে পারে।

—মিথ্যে বলছি মশায়—ছেলে মরে গেল, সেও কি মিথ্যে নাকি ?

—আচ্ছা দেখি একটা এন্‌কোয়ারী কমিশন করে—

—ছেলে দিন ফিরিয়ে, নইলে নিস্তার নেই। এদের সব ডাক্তার করেছেন মনে নেই সে কথা ?

—আজ্ঞে আছে, বসুন। পাঁক কেন খাওয়ালে—

—পাঁকের বৈশিষ্ট্য গবেষণা করেই তিনি এম, ডি। শুধু তাই, ছেলেগুলোকে একে একে মারছে—সেদিন একজন এসে কাশীবাবুর ছেলেটার পেটচিরে মেরে ফেল্‌লে—আর একজন সেদিন হরিবাবুর স্ত্রীব গলগণ্ড চিকিৎসা করতে এসে গলাটাই কেটে বাদ দিয়ে গেল।

—এ সব ত সাংঘাতিক—

—আপনি, মশাই আপনি এই সব যমদূতকে ডাক্তার করে পাঠিয়েছেন। তার শাস্তিটা এবার গ্রহণ করুন। ভদ্রলোক ছোরা উদ্যত করিলেন—আমি পিছন দিয়া পলাইয়া বারান্দায় গেলাম—যদি আত্মরক্ষা করা যায়।

সিঁড়ি দিয়া এক ভদ্রলোক এক অতিকায় লাঠি হাতে উঠিয়া আসিয়া কহিলেন—আপনি বটব্যাল ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—

—দিন, আমার যথাসর্ব্বস্ব ফিরিয়ে দিন—এই দেখুন যথাসর্ব্বস্ব ত গেছেই, মাথা দিয়ে রক্ত পড়ছে দেখুন—

প্রচুর রক্তপাত হইতেছে। বলিলাম—তাই ত খুবই রক্ত পড়ছে, আপনি আসুন, হাসপাতালে নিয়ে যাই। পরে কথা শুনবো—

—ও হাসপাতাল আর যমের দোরে আমি যাবো না। শুনুন, জীবনের যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে একটা বাড়ী করেছিলাম, বি, ই, সি, ই, ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে। আজ গৃহ প্রবেশের দিন—পুত্রকন্যা সব নিয়ে গৃহ প্রবেশ করতে গিয়েছিলাম, সমস্ত বাড়ী হুড়মুড় করে ঘাড়ের উপর এসে পড়লো। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সব চাপা পড়ে মরেছে, আমি ভাঙ্গা মাথা নিয়ে ব'লতে এসেছি বটব্যাল সাহেব, তুমি কি ক'রেছ—এমনি করে সব ইঞ্জিনিয়ার তৈয়ারী করে তুমি মানুষ খুন করছো—

আর একজন ছুটিয়া আসিতেছে—দেশী বয়লার ফেটে পাটের কলে আগুন লেগে গেছে—হাজার লোক পুড়ে মরেছে—

আর একজন চিৎকার করিতেছে—ব্রিজ ভেঙ্গে গাড়ী নদীতে পড়ে গেছে। সব লোক মরেছে—

পুনরায় আর একজন চিৎকার করিতেছে—দেখুন

দেখুন, শিক্ষকরা কি শিখিয়ে দিয়েছে, ছেলেটা কিসে কিসে মিশিয়ে বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে—

—শুনুন শুনুন মশায়, মাষ্টার মশায়রা শেখাচ্ছে, তোগলক কলম্বসের বেয়াই—মহাত্মা গান্ধী একজন এস্কিমো—

—আরও মশায় শুনুন—পণ্ডিতরা শেখাচ্ছে, ব'য় আকার ব'য় আকার মানে গএ আকার ধএ আকার—এরা সব এম, এ, পি এইচ, ডি।

চিৎকার হইতেছে—জজের বিচার শুনুন—ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ শুনুন—

চারিপাশে মহাগোলমাল আরম্ভ হইতেছে, দলে দলে লোক আসিয়া নানারূপ দুর্ঘটনার সংবাদ দিতেছে—

রক্তাপ্লুত ভদ্রলোক কহিলেন—দেখুন, দেখুন বটব্যাল সাহেব, আপনি কি করেছেন দেশের। দেশের লোক ত সব মরতে চলেছে, এদের বাঁচান—

আমি ভীত এবং বিরক্ত হইয়াছিলাম, শরীরও খারাপ, কহিলাম—এখন আমি বাঁচাব কি করে? ভোটের জোরে সব ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট হ'য়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় ত ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান, দেশের যে সরকার সেও ত ভোটেই হ'য়েছে। তারা যদি লেখাপড়া না জানেন, তাহলেও ত সরকার চল্‌বে, আর বিশ্ববিদ্যালয় চলবে না এটা কি একটা কথা হল? আপনারা ত সকলেই জানেন,—hundred fools can not make a wise decision, তবুও ত সেই শতাধিক নির্ব্বোধের হাতে এতগুলি দেশ লোকের ভবিষ্যৎ ছেড়ে দিয়েছেন এবং আপনাদের দাবী অনুসারেই ত আমি আদর্শ ডিমোক্রেটিক ভাবে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলে অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করেছি।

—আমরা দাবী করেছি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার ছেলেকে ফেল করালে আপনারা লাঠি নিয়ে তাড়া করেছেন, খুন ক'রবেন ভয় দেখিয়েছেন। কাজেই নতুন ক'রে বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি করতে হয়েছে—সকলকেই পাশ করাতে হয়েছে। আর আপনারাই ত সরকার সৃষ্টি করেছেন ভোট দিয়ে—তাঁরাই ত সব ক'রছেন, আমি নিমিত্ত মাত্র।

—আমাদেরই দোষ—

—আজ্ঞে হ্যাঁ, টাকা খেয়ে ভোট দিয়ে এম, এল, এ করেছেন, মন্ত্রী করেছেন, তারা কাঁকর খাওয়াচ্ছে, গিন্নিদের হাফ্‌প্যাণ্ট পরাচ্ছে, তাতে চিৎকার করলে চলবে কেন? আপনারা ভোটে আমাকে ভাইস্‌চ্যান্সেলর করেছেন, আপনারা চেয়েছেন ছেলেরা পাশ করুক, লেখাপড়া চাননি—তাই দেশ ভর্ত্তি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক তৈরী করেছি—এখন গলা কেটে ফেল্‌লে, লাঠি নিয়ে আস্‌ছেন কেন?

রক্তাপ্লুত আহত লোকটি লাঠি উদ্যত করিয়া কহিল—বটে, যত দোষ আমাদেরই—আমরাই সব করেছি, তবে তোমরা মাইনে খেয়ে কি করছো?—

তাঁহার ভীমকায় লাঠি উঠাইয়া তিনি আমার উপরে চালাইতে গেলেন কিন্তু কেমন করিয়া সেটা যেন একটা থামে আসিয়া লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার ও অ্যার্কিটেক্ট রচিত বিশ্ববিদ্যালয় প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। নীচে যাহারা হৈ চৈ করিতেছিল তাহারা একে একে চাপা পড়িতেছে, সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া গড়াইয়া নীচে পড়িল, —কোথা হইতে একটা কাঠের কড়ি আমার বুকের উপর আসিয়া পড়িল—নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে, চূণ বালি ধ্বসিয়া মুখে নাকে ঢুকিয়া শ্বাস বন্ধ করিয়া দিতেছে—আমি মরিতেছি—মরিলাম।

জাগিয়া দেখি—বেলা হইয়াছে। কনিষ্ঠ পুত্রপ্রবর বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া নাকের মধ্যে আঙ্গুল গলাইয়া দিয়াছে—বলিতেছে,—বাবা, ওৎ,—



দেশের কথা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস—

বর্ষাধিক কাল হইতে শুনা যাইতেছে, খণ্ডিত ভারতের কেন্দ্রী সরকার ও প্রদেশ সরকারসমূহ ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিস্তৃত ইতিহাস রচনায় অবহিত হইয়াছেন। যে সরকারের প্রেরণায় ও প্ররোচনায় ভারতের বিদ্যালয়-পাঠ্য একখানি প্রকৃত ইতিহাস আজও রচিত হয় নাই, সেই সরকারের এই উদ্যোগলক্ষণ কিরূপ হইবে, বলা যায় না। বিশেষ দেশ এখন খণ্ডিত—যে অংশ পাকিস্তানে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে যে সংগ্রাম হইয়াছে, তাহা বর্জ্জন করিলে ইতিহাস একান্তই অসম্পূর্ণ রহিবে এবং তাহার মূল্যও যৎসামান্য হইবে। সে যাহাই হউক—চেষ্টা হইতেছে। প্রথমে যে কমিটী গঠিত হইয়াছিল তাহার সম্পাদক হইয়া সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ঘোষণা করিয়াছিলেন। এখন দেখা যাইতেছে, পশ্চিমবঙ্গেও এক সমিতি গঠিত হইয়াছে। তাহার সভাপতি ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও উপকরণ-সংগ্রহকারী—ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন। রাজনীতিক আন্দোলনে কেহই যোগদান করেন নাই—অবশ্য কেহই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বাধীনতা-সংগ্রামের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। সুনীতিকুমার ভাষাতত্ত্বে খ্যাতিলাভ করিয়া এখন পশ্চিমবঙ্গের ব্যবস্থাপক সভায় সভাপতিত্ব পাইয়াছেন এবং ডক্টর রাধাকৃষ্ণণকে আদর্শ পুরুষ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ পাথীর কথা হইতে ঐতিহাসিক গবেষণাও করিয়াছেন। আমরা কেবল কামনা করি, যে ইতিহাস রচিত হইবে তাহা পর্য্যাপ্ত উপকরণ লইয়া সহানুভূতির আগ্রহে রচিত হইবে—অসমগ্র উপকরণে কেবল অর্থব্যয়ে নহে।

সম্প্রতি সভাপতি সুনীতিকুমারের উপস্থিতিতে উপাদান-সংগ্রহকারী সুরেন্দ্রনাথ এক সাংবাদিক-সম্মিলনে তাঁহার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন।

সভাপতি আক্ষেপ করিয়াছেন—অর্থের অভাব, সংগ্রহকারী আক্ষেপ করিয়াছেন—উপকরণের অভাব। সভাপতি বলিয়াছেন, কেন্দ্রী সরকার সুরেন্দ্রনাথকে যে পারিশ্রমিক দিতেছেন, তাহা কাজের তুলনায় যথেষ্ট নহে। তবে সে পারিশ্রমিকের পরিমাণ না জানিলে তাঁহার মতের সমালোচনা করা সঙ্গত নহে। তিনি পরিমাণের উল্লেখ করেন নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রথম বৎসরে ১০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়া দ্বিতীয় বৎসরে ২০ হাজার দিয়াছেন। এই টাকার কোন অংশ সভাপতি ও সমিতির সদস্যগণ পাইবেন কি না এবং পাইলে তাহা কি ভাবে বণ্টন করা হইবে, তাহা প্রকাশ করা হয় নাই। যে সমিতি পশ্চিমবঙ্গে, উড়িষ্যায় ও আসামে উপকরণ সংগ্রহাদি করিবেন, সেই সমিতি কেন্দ্রী সরকার, উড়িষ্যা সরকার ও আসাম সরকারের নিকট হইতেও অর্থ সাহায্য পাইতেছেন কি?

সুরেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, আমেরিকায় "গদর" দলের ও জাপানে রাসবিহারী বসুর কার্য্যবিবরণ সমিতির হস্তগত হইয়াছে—ইংরেজ সরকারের অনেক কাগজপত্রও পাওয়া গিয়াছে—কিন্তু যে সকল ব্যক্তির নিকট উপকরণ আছে, তাঁহারা যদি সে সকল সমিতিকে না দিয়া "কৃপণের ধনের" মত রাখেন, তবে তাহা অসঙ্গত কাজ হইবে।

এ বিষয়ে আমরা সুরেন্দ্রবাবুকে একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন, অথবা যাঁহারা সে সংগ্রামের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন তাঁহারা যদি বিশ্বাস করিতে পারেন, প্রদত্ত উপকরণের প্রকৃত সদ্ব্যবহার করা হইবে এবং উপকরণদাতাকে তাঁহার প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হইবে, ইতিহাসে একদেশদর্শিতাদোষ থাকিবে না—তবেই তাঁহাদিগের উপকরণ প্রদানের প্রেরণা আসিবে। সুরেন্দ্রনাথ সে বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন কি?

সুরেন্দ্রনাথের বিবৃতিতে আমরা দুঃখিত হইয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, আজ অনেকের মনে নাই—

(১) মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় স্বাধীনতা-সংগ্রামে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন;

(২) দ্বারবঙ্গের মহারাজা ও বরদার গায়কবাড়—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও বিপিনচন্দ্র পালেরই মত সরকারের সন্দেহ-ভাজন ছিলেন।

(৩) আর্য্য সমাজ ও রামকৃষ্ণ মিশন পুলিসের সন্দেহভাজন ছিল।

সুরেন্দ্রনাথের এ সকল হয়ত জানা ছিল না; কিন্তু রাজনীতিক আন্দোলনের ইতিহাস যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহাদিগকে এ সব কথা বলা—পিতামহীকে স্তন্যপান করিতে শিখাইবারই মত। কারণ—

(১) দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই এই সংগ্রামে সৈনিক ও সেনাপতি যোগাইয়াছে—ধনীরাও নহে, দরিদ্ররাও নহে—বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

(২) দ্বারবঙ্গের মহারাজাদিগের মধ্যে কেবল লক্ষ্মীশ্বর ও বরদার গায়কবাড়দিগের মধ্যে কেবল শিয়াজীরাও এই সংগ্রামে অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন। আবার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিপিনচন্দ্র পাল—উভয়কে পুলিস একশ্রেণীভুক্ত করিত না—সন্দেহের মাত্রাভেদ ছিল।

(৩) আর্য্য সমাজ ও রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে পুলিসের সন্দেহ সর্ব্বজন-বিদিত—"There needs no ghost, to tell us this."

এই সকল "আবিষ্কার" যে "গবেষণার" ফল, তাহার জন্য কিরূপ অর্থব্যয় সুনীতিকুমার উপযুক্ত মনে করেন।

সুরেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, পরিকল্পিত ইতিহাস কংগ্রেসের ইতিহাস হইবে না ; কারণ, কংগ্রেসের ইতিহাস আছে! তিনি যদি পট্টভি সীতারামিয়ার পুস্তক ইতিহাস পদবাচ্য মনে করেন, তবে তিনি ভুল করিবেন। উহা বাঙ্গালীর অবদানের গুরুত্ব অস্বীকার করিয়া একটি দলের প্রশংসাকীর্ত্তন। কংগ্রেসের মধ্য দিয়া কি ভাবে জাতীয় সংগ্রাম-সাধনা পুষ্ট হইয়াছিল, তাহা এখনও লিখিত হয় নাই।

বলা হইয়াছে, পরিকল্পিত ইতিহাসে হিংসাদ্যোতক প্রচেষ্টার বিবরণ থাকিবে। যদি কংগ্রেসের প্রকৃত ইতিহাস রচিত হয়, তবে তাহা ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের একটি মূল্যবান অধ্যায় হইবে, সন্দেহ নাই।

সুরেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রভৃতিও আলোচ্য বিষয় হইবে। কিন্তু এ সকল গণ-আন্দোলন হইলেও তীতুমীরের "গোলা খাণডালা" ও ওহাবী বিদ্রোহ—গণ-আন্দোলন কি না, সন্দেহ। বরং বাঙ্গালার নীল বিদ্রোহ (১৮৬০ খৃষ্টাব্দ) গণ-আন্দোলন বলিতে হয়। বহু স্থান হইতে বহু শীর্ণ জলধারা আসিয়া যেমন জলপ্রপাতের ও নদীর সৃষ্টি করে—নানা কারণে নানা ক্ষেত্রে উদ্ভূত আন্দোলন তেমনই সম্মিলিত হইয়া স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে পরিণতি লাভ করে। সেই হিসাবে পূর্ব্বোক্ত স্থানীয় আন্দোলন উল্লেখযোগ্য।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ কেন পরিকল্পিত ইতিহাসের আরম্ভকাল ধরা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কারণ, পলাশীর যুদ্ধ জাতির স্বাধীনতা-লাভ-প্রয়াস বলা যায় না। পিশাচ-প্রকৃতি সিরাজদ্দৌলার অত্যাচারে জর্জ্জরিত কয়টি প্রসিদ্ধ হিন্দু ও জৈন পরিবার—মীরজাফরের বিশ্বাস-ঘাতকতার সুযোগ লইয়া—বিদেশীর সাহায্যে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন—দেশের বা জাতির স্বাধীনতার জন্য নহে। ফল ভয়াবহ হইয়াছিল। অনুরূপ কারণে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহও সর্ব্বতোভাবে স্বাধীনতা-সংগ্রাম বলা যায় না। কারণ, বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়—

"A Mahomedan priest with pretended visions, and assumed miraculous powers,—a Mahomedan king his dupe and accomplice,—a Mahomedan clandestine embassy to Mahomedan powers of Persia and Turkey resulting,…"

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা-সংগ্রামের আরম্ভ নহে। কারণ, তখন জাতীয়তার পাবনী ধারা প্রবাহিত হয় নাই। বিশেষ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে দেশ পরাধীনতার নূতন শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হইয়াছিল—মুসলমানের শৃঙ্খলের সঙ্গে ইংরেজের শৃঙ্খল জড়িত হইয়াছিল। তাহার ফলে অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহার বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

"...জাফর গুলী খায় আর ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেস্‌প্যাচ লেখে। বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।"

তবে ইতিহাস লিখিতে হইলে একটি সময় হইতে লিখিতে হইবে। সেই হিসাবেই, বোধ হয়, ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ আরম্ভকাল ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

পরিকল্পিত ইতিহাস রচনার জন্য অর্থের অভাব অবশ্যই হইবে না। কারণ, সরকার ইহার জন্য দেশের লোকের অর্থ ব্যয় করিবেন। বরং অর্থের অপব্যয় হইতে পারে। দামোদরের জল-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনায়, জীপ গাড়ী ক্রয়ে, গভীর জলে মৎস্য ধরার ব্যবস্থায়—অপব্যয়ের অভাব হয় নাই। পাছে অর্থব্যয় অল্প হয়, সেইজন্য পশ্চিমবঙ্গের কমিটীর সভাপতি ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আরম্ভেই বলিয়াছেন—যে টাকা দেওয়া হইতেছে, তাহা যৎসামান্য—উপেক্ষণীয়!

উপাদানেরও অভাব হইবে না—যদি সেজন্য উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত-ভাবে সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়। তাহা যে হইতেছে, এমন প্রমাণ আমরা এখনও পাই নাই। কিন্তু বলা প্রয়োজন, যাঁহারা কার্য্যভার পাইয়াছেন ও সেজন্য পারিশ্রমিক পাইতেছেন, তাঁহারা যদি মনে করেন, লোক সাগ্রহে তাঁহাদিগের দ্বারস্থ হইয়া উপকরণ দিয়া আসিবে, তবে তাঁহারা ভুল করিবেন।

যখন লিখিত হইবে, তখন ইতিহাস যথাসম্ভব পূর্ণাবয়ব ও নির্ভরযোগ্য হয়, ইহাই আমাদিগের কামনা। সেই জন্যই আমরা অবলম্বিত ব্যবস্থার ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া—সে সকলের সংশোধনকল্পে—সমালোচনা করিলাম। বিবেচনা করিয়া কাজ করিলে পরিকল্পিত ইতিহাস অধিক নির্ভরযোগ্য হইবে, এমন মনে করা অসঙ্গত নহে। কেহই অভ্রান্ত নহে—মনে করিয়া ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা ঐতিহাসিকের মনোবৃত্তি লইয়া কাজ করিবেন, ইহাই আমাদিগের কামনা।

আসামে বাঙ্গালী—

পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে—বিশেষ প্রতিবেশী-রাষ্ট্র বিহারে, উড়িষ্যায় ও আসামে বাঙ্গালীদিগের সম্বন্ধে প্রাদেশিক সরকারগুলিও যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন, তাহা কি বাঙ্গালী-বিতাড়নের ষড়যন্ত্র বলিয়া অভিহিত করা যায়, বিহারে বাঙ্গালীদিগের সম্বন্ধে যে সব অন্যায়দ্যোতক ব্যবস্থা হইয়াছে, সে সকলের মধ্যে লোক-সেবক সঙ্ঘের প্রতি অত্যাচারে বিশেষ ভাবে প্রকট হইয়াছে ; উড়িষ্যায়—পুরীতে সমুদ্রকূলেও বাঙ্গালী-দিগের লাঞ্ছনার বিবরণ সংবাদপত্রে বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়। কিন্তু আসামের যে অংশ বাঙ্গালীদিগের দ্বারা অধ্যুষিত, তথায় বাঙ্গালীদিগের প্রতি সরকারের কুব্যবহার সেরূপ আলোচিত হয় না। বোধ হয়, কোন কোন বাঙ্গালীর বিশ্বাস—আসামে বাঙ্গালীদিগের সংখ্যা নগণ্য। কিন্তু তাহা নহে—"ইনষ্টিটিউট অব ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিস্টিক্স" যেমন দেখাইয়াছেন, বিহারের জনগণনার বিবরণ নির্ভরযোগ্য নহে, আসামের বাঙ্গালীরাও তেমনই প্রতিপন্ন করিয়াছেন, বর্ত্তমান আসাম প্রদেশে—বাঙ্গালীর সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশ, উপজাতীয়দিগের সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশ, আর অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ আসামী। অথচ আসামীয়া প্রথমে ইংরেজের ভেদনীতির ফলে ও পরে কংগ্রেসী সরকারে প্রভুত্ব লইয়া বাঙ্গালীদিগের প্রতি

অনায়াসে দুর্ব্যবহার করিতেছে—গৌহাটীর মত সহরেও "বাঙ্গাল খেদা" আন্দোলন চলিতেছে। দেশ-বিভাগ যে নীতিতে হইয়াছে তদনুসারে শ্রীহট্টের যতগুলি জিলা ভারত রাষ্ট্রের প্রাপ্য সেগুলির মধ্যে কয়টি আসাম সরকার ও কেন্দ্রী সরকার দাবীও করেন নাই—পাছে আসাম প্রদেশে বাঙ্গালী-প্রভাব প্রবল হয়! এইরূপে অধিকার ত্যাগ আর কখন কোথাও হইয়াছে কি না, সন্দেহ।

কাছাড়বাসীরা বাঙ্গালী—তাহারা কেবল অবজ্ঞাতই নহে, পীড়িতও বটে। সম্প্রতি (গত ১৯শে ও ২০শে জুন) করিমগঞ্জে যে আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহার প্রচারপত্র হইতে, আমরা কয়টি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি—

(১) শিক্ষা ও স্বাস্থ্য—

(ক) ভারতীয় সংবিধানের সুস্পষ্ট নির্দ্ধারণ অগ্রাহ্য করিয়া আসাম রাজ্যের কোন কোন বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলে বঙ্গভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান-প্রথা রহিত করা হইতেছে। বাঙ্গালাভাষাভাষীর সংখ্যা হ্রাস করা ও বাঙ্গালা ভাষা উৎখাত করাই ইহার উদ্দেশ্য। বঙ্গভাষাভাষী গোয়ালপাড়া জিলায় ১৯৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দে (অর্থাৎ দেশে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠার সময়) ২৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাঙ্গালায় শিক্ষা প্রদান করা হইত; ১৯৫০-৫১ খৃষ্টাব্দে ঐরূপ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩টিতে দাঁড়াইয়াছে। সরকারী সাহায্য বন্ধ করা প্রভৃতি ইহার কারণ। আসামের বাঙ্গালী অধ্যুষিত অঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহে বাঙ্গালা ব্যবহারের পথ নানারূপে বিঘ্নকঙ্করকণ্টকিত করা হইয়াছে ও হইতেছে।

(খ) বাস সম্বন্ধীয় ও ভাষাগত নানারূপ অযৌক্তিক যুক্তিতে বাঙ্গালী ছাত্রছাত্রীদিগকে বৃত্তি, কলেজে প্রবেশাধিকার প্রভৃতিতে বঞ্চিত করিয়া উচ্চ শিক্ষালাভের পথ সঙ্কীর্ণ করা হইতেছে।

(গ) ভিন্নভাষাভাষী ছাত্রছাত্রীদিগের অবশ্য শিক্ষনীয় ভাষারূপে কেবল অসমীয়া ভাষা—সরকারী আনুকূল্যে পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহে প্রচলিত করা হইয়াছে। বাঙ্গালা ঐরূপ মর্য্যাদায় বঞ্চিত।

(ঘ) অসমীয়া ভাষা আসাম প্রদেশের রাষ্ট্রভাষা না হইলেও বাঙ্গালার মত সমৃদ্ধ ভাষা ও নানা উপজাতীয় ভাষা অবজ্ঞা করিয়া—প্রদেশের নাম আসাম এই ছল ধরিয়া, সরকারে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসামীরা অসমীয়া ভাষা—সমগ্র প্রদেশে প্রচলিত করিতেছেন। ভারত রাষ্ট্রের প্রাপ্য কতকাংশ ত্যাগের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

কাছাড় রেল ষ্টেশনের নাম বাঙ্গালায় লিখিত থাকিবে—রেলওয়ে বোর্ডের এই নির্দ্দেশও পদদলিত হইয়াছে এবং সরকারী ইস্তাহার প্রভৃতিতে কেবল অসমীয়া ভাষা ব্যবহৃত হওয়ায় লোকের অসুবিধার অন্ত নাই।

(২) ডমিসাইল অর্থাৎ প্রদেশের নাগরিকের অধিকার লাভ ব্যাপারে দেখা যায়, আসাম রাজ্যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও পার্ব্বত্য অঞ্চলসমূহে কোন স্থানে পুরুষানুক্রমে বাস করিলেও বাঙ্গালী তাহার বাঙ্গালীত্ব (ভাষা ও সংস্কৃতি) বর্জ্জন না করিলে সাধারণতঃ আসামের নাগরিকের সংবিধান-সম্মত অধিকার লাভ করিতে পারেন না।

(৩) ক, সরকারী চাকরীতে অসমীয়াদের জন্য অগ্রাধিকার দেখা যায়। দেশবিভাগের সময় ভারতে—(আসাম প্রদেশে) চাকরী করিতে ইচ্ছা-জ্ঞাপনকারী বহু বাঙ্গালী চাকরীয়াকে অবৈধ ভাবে চাকরীচ্যুত করা হইয়াছে। অনেকে চাকরীতে নিযুক্ত হইতে পারেন নাই।

(খ) বিহারের মত, আসামেও তৈল কোম্পানী, চা-বাগান প্রভৃতি বেসরকারী শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হইতে বাঙ্গালী বিতাড়ন আরম্ভ হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহার পশ্চাতে সরকারের প্রচ্ছন্ন প্রভাব বা গোপন নির্দ্দেশ আছে।

(গ) রেল, ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগ প্রভৃতি কেন্দ্রী সরকারের অধীন হইলেও আসামে এই সকলে বাঙ্গালী নিয়োগের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত করা হইতেছে।

বাঙ্গালা ত্রিপুরা রাজ্যের ভাষা হইলেও এবং ত্রিপুরা রাজ্য আসামভুক্ত না হইলেও তথায় যে সকল সরকারী বিজ্ঞাপনপত্রাদি প্রচারিত হয়, সে সকলে—কোন অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় কারণে—অসমীয়া ভাষাই ব্যবহৃত!! ইহা কি বিস্ময়কর নহে?

(৪) বঙ্গভাষার প্রচার সঙ্কুচিত হওয়ায় আসামে বাঙ্গালা সাহিত্যের অনিষ্ট ঘটিতেছে। আসামে বাঙ্গালীদিগের বঙ্গভাষা সম্পর্কে অবদানের দৈন্যই তাহার প্রমাণ।

(৫) যে সকল বাঙ্গালী আসামের যে অংশ পাকিস্তানে গিয়াছে সে সকল হইতে এবং পাকিস্তানের অন্যান্য অংশ হইতে আসামে উদ্বাস্তু হইয়া আসিয়াছে, তাহাদিগের পুনর্ব্বাসন ও তাহাদিগকে সাহায্যদান ব্যাপারে—ভার আসাম সরকারের উপর থাকায়—বাঙ্গালীরা আবশ্যক সদ্ব্যবহার পাইতেছে না। বলা বাহুল্য শিক্ষা, চাকরী প্রভৃতিতে তাহারা অধিকারে বঞ্চিত।

চা-বাগানে পুনর্ব্বাসন চেষ্টা যে লক্ষ লক্ষ টাকা অপব্যয়ের পরে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা কেন্দ্রী সরকারের উপমন্ত্রী শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ করিমগঞ্জে স্বীকার করিয়াছেন এবং উদ্বাস্তু শিবিরের দুরবস্থা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত কারণসমূহের জন্য আসামের বঙ্গভাষাভাষীরা করিমগঞ্জে "আসাম-ত্রিপুরা-মণিপুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্মেলনে" সমবেত হইয়া আসামের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল, ত্রিপুরা ও মণিপুর—সম্মিলিত করিয়া স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের কথা সরকারকে জানাইয়াছেন। তাঁহারা যে বাধ্য হইয়াই "পূর্ব্বাচল প্রদেশ" প্রতিষ্ঠার দাবী পুনরায় করিতেছেন, তাহা বলা বাহুল্য।

আসামের বঙ্গভাষীদিগের প্রতি আসাম সরকারের ব্যবহার ও কেন্দ্রী সরকারের উপেক্ষা বাঙ্গালী মাত্রেরই উদ্বেগের ও প্রতিবাদের বিষয়।

আসামে বাঙ্গালা ভাষা—

সেক্সপীয়র বলিয়াছেন—"Conscience does make cowards of us all"—আসামের আসামী-প্রধান সচিবসঙ্ঘ তথায় বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালীর প্রতি যে অনাচার করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা তাঁহাদিগের অজ্ঞাত নাই; কারণ—তাহা ইচ্ছাকৃত এবং তাঁহারা জ্ঞানপাপী। সেইজন্য

করিমগঞ্জে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্মিলনে এবং ভাষার বন্ধনে (আসাম প্রদেশের) বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল. ত্রিপুরা ও মণিপুর বন্ধ করিবার আন্দোলনে তাঁহাদিগের অবস্থা ঘটিয়াছিল—

"Like Brutus midst his slumbering host
Summon'd to die by Caesar's ghost."

যেদিন করিমগঞ্জে সম্মেলন শেষ হয়, সেই দিনই আসামের প্রধান-সচিব—দুইজন সহসচিব সহ—(একজন বাঙ্গালী) ত্র্যহস্পর্শে শিলচরে উপনীত হইয়া সহরের এক প্রান্তে এক সভা করেন। কেন্দ্রী সরকারের বাঙ্গালী উপমন্ত্রী অরুণ গুহের সহিত তাঁহার কোন আলোচনা হয় নাই। পরে—বোধ হয় করিমগঞ্জের সকল সংবাদ পুলিসের নিকট অবগত হইয়া—তাঁহারা করিমগঞ্জে গমন করেন। প্রধান-সচিব বাঙ্গালা ভাষার প্রশংসায়—ব্রহ্মপুত্রের বন্যার মত—বন্যা বহাইয়া সকলকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন—"যেটার যতই অভাব, ততই সেটা বল্‌তে হ'বে।"

বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর প্রতি আসাম সরকারের বৈষম্যমূলক ব্যবহার প্রদেশ-বিভাগ-কমিশনে প্রেরিত বিবৃতিতে ও সম্মেলনে যে ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় সপ্তসিন্ধুর সম্মিলিত সলিলেও সে কলঙ্ক প্রক্ষালিত হইবে না। প্রধান-সচিব বলিয়াছেন—রবীন্দ্রনাথের ভাষাকে হত্যা করিতে পারে? আমরা জানি, বাঙ্গালা ভাষা হত্যা করিবার সাধ্য আসামের বিষ্ণুরাম মেধীর—রূপনাথ ব্রহ্ম ও বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগেও—নাই। কিন্তু তাঁহারা যে সে চেষ্টা করিতেছেন না, এমন কথা কি বলিতে পারা যায়?

এই প্রসঙ্গে আমরা বিষ্ণুরামকে দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব—

(১) এ কথা কি সত্য যে, তাঁহার আসামী ডেপুটী কমিশনার কেন্দ্রী সরকারের উপমন্ত্রীর সহিতও বাঙ্গালায় আলাপ করিতে ঘৃণা বা লজ্জানুভব করিয়াছিলেন?

(২) কেন্দ্রী উপমন্ত্রীকে (বাঙ্গালী) অবজ্ঞা ও অপমান করিবার জন্য তাঁহার দুর্গত শিবির পরিদর্শনকালে এক জন ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীও উপস্থিত ছিলেন না?

এই ডেপুটী কমিশনারের ও কর্ম্মচারীদিগের পদোন্নতি হইয়াছে কি?

বিষ্ণুরাম অবশ্যই অবগত আছেন, বাঙ্গালী ছাত্র-ছাত্রীরা আসামে মেডিক্যাল কলেজে স্থান পায় না বলিয়াই পরলোকগত অরুণকুমার চন্দের কন্যা কল্যাণী জয়ন্তীকে কলিকাতায় থাকিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইতেছে।

ধৈর্য্যচ্যুত প্রধান-সচিব বলিয়াছেন—কোন কোন লোক বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে—"আমাদিগের মধ্যে বিভেদ ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছে।" ইহারা কাহারা? যে সকল বাঙ্গালী তাঁহাদিগের ব্যবহারে অপমানে ও অসুবিধায় আসামে বাঙ্গালীর প্রাপ্য অধিকার লাভের চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারাই যে স্বার্থহানিশঙ্কিত আসামী সচিবদিগের চক্ষুঃশূল তাহা বলা বাহুল্য। তিনি হয়ত রবীন্দ্রনাথের নাম শুনিয়াছেন—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যাঁহাদিগের উত্তরাধিকারী সেই বৈষ্ণব কবিগণ, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির রচনার সহিত কোন পরিচয় করিবার যোগ্যতা তাঁহার আছে কি?

প্রধান-সচিবের উক্তি মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করিতে পারে না।

করিমগঞ্জে—সীমান্ত স্থানে বক্তৃতার পরে ফিরিয়া সচিবরা পাথারকান্দীতে এক সভা করেন এবং তাহাতে বাঙ্গালী-সচিব বৈদ্যনাথই প্রধান অভিনেতা হইয়াছিলেন। কিন্তু—

"প্রখর রবির কর শিরে সহ্য হয় হে—
তা'র তাপে বালু তাপে, পদে সহ্য নয় হে।"

তিনি চতুর অভিনেতার মত তিন বার মঞ্চে পদাঘাত করিয়া বলেন—যে সচিবত্ব স্বীকার করিলে তাঁহাকে মাতৃভাষা বর্জ্জন করিতে হয়, তিনি সে সচিবত্বে তিন বার পদাঘাত করেন। কিন্তু তিনি প্রধান-সচিবকে তুষ্ট করিতে ভুলেন নাই। তিনি বলেন, তিনি প্রধান-সচিবের মাতৃভাষা অসমীয়াকে বড় ভালবাসেন—কিন্তু তিনি তাঁহার মাতৃভাষা বাঙ্গালা ভাষারও অনুরাগী।

ঈশ্বর গুপ্ত বলিয়াছেন, "মাতৃসম মাতৃভাষা!" যে মানুষ অপরের ভাষাকে স্বীয় মাতৃভাষার সহিত সমান ভালবাসেন, তিনি কিরূপ লোক? কেহ কেহ পত্নীর মাতাকেও মাতার মত ভক্তি করেন—কিন্তু বৈদ্যনাথই দেখাইলেন, সচিবরা প্রধান-সচিবের মাতৃভাষাকেও স্বীয় মাতৃভাষার মত বিবেচনা করেন বা তাহাই বলেন।

প্রধান সচিব ও বিষ্ণুরাম বৈদ্যনাথের সহ-সচিব রূপনাথ ব্রহ্ম বৈদ্যনাথের কথায় তাঁহাকে বাহবা দেন।

কিন্তু সচিবদিগের কথা কি বাঙ্গালীদিগের পক্ষে ক্ষতে ক্ষারক্ষেপের মতই হইবে না? কারণ, সচিবরা যতক্ষণ তাঁহাদিগের বিভেদমূলক নীতির পরিবর্ত্তন না করিবেন—যতক্ষণ বাঙ্গালীদিগকে আসামে নাগরিকের সকল অধিকার না দিবেন, ততক্ষণ বাগাড়ম্বরে বাঙ্গালীকে ভুলাইবার চেষ্টা কখনই সফল হইবে না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট নূতন নিয়মে জানুয়ারী মাসে উপস্থাপিত করা হইবে। ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কাজ চালাইবার জন্য এক বাজেট পেশ ও গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে ঘাটতি দেখা যায়। বর্ত্তমান বাজেট ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত কাজ চালাইবার জন্য বলিয়া আমরা ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিব না। বাজেট সিনেটের যে অধিবেশনে উপস্থাপিত করা হয়, তাহাতে বাঙ্গালার প্রসার-বৃদ্ধির প্রস্তাব হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের ও বাঙ্গালা বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তার কার্য্যকাল শেষ হওয়ায় তাঁহাদিগের পুনর্নিয়োগের প্রস্তাব হয়। রেজিষ্ট্রার সরকারী কাজে কার্য্যকাল শেষে এক বৎসরের জন্য রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং আরও এক বৎসর চাকরী করিবার জন্য আবেদন করায় পূর্ব্ব আইনে গতায়ুপ্রায় সিণ্ডিকেট তাঁহাকে আরও এক বৎসর চাকরীতে রাখিবার কথা বলিয়াছিলেন। সরকার নির্দ্দেশ

দিয়াছেন; আগামী অক্টোবর মাসে তাঁহাকে বিদায় লইতে হইবে। ইঁহার কার্য্যকালে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষা সম্বন্ধে নিয়ম পালিত হয় নাই—সিণ্ডিকেটের অনুমতি না লইয়াই "সার্ভিস" ডাকটিকিট ব্যবহৃত হইয়াছে—ইত্যাদি; সরকার যাঁহাদিগকে বয়সের আধিক্য হেতু চাকরী হইতে বিদায় দেন, তাঁহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যালয়ের কাজে নিযুক্ত করা সঙ্গত কি না, তাহা বিবেচ্য।

যিনি বাঙ্গালা বিভাগের পরিচালক তিনি ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তীর সম্বন্ধে নানারূপ সমালোচনা হইয়াছে। চাকরীর সর্ত্তানুসারে অধ্যাপককে যে কয়টি বক্তৃতা দিতে হয় ও কলেজে যে সব কাজ করিতে হয়, সে সকল করা হইয়াছে কি না, তাহা সরকার জানিতে চাহিয়াছেন।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সিণ্ডিকেট সে সকল জিজ্ঞাসা না করিয়াই অধ্যাপকের কার্য্যকাল এক বৎসরের জন্য বর্দ্ধিত করিতে বলিয়াছেন!

সিণ্ডিকেটের কর্ত্তব্যে অবহেলা হইলে যে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকদিগের নিকট হইতে আবশ্যক কাজ আদায় করিতে পারেন না, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিশ্ববিদ্যালয় সর্ব্বতোভাবে সরকারের অধীন হয়, ইহা কখনই অভিপ্রেত হইতে পারে না। সেই জন্যই আমরা মনে করি, যাঁহারা নির্ব্বাচনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্য্য পরিচালনের ভার পাইয়াছেন, তাঁহারা যেন কোনরূপে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনবহিত না হ'ন এবং যোগ্যতা ব্যতীত অন্য কোন কারণে নিয়োগে সম্মতি না দেন।

আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান রেজিষ্ট্রার ও বাঙ্গালা বিভাগের বর্ত্তমান কর্ম্মকর্ত্তার সম্বন্ধে কয়টি কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছি। কর্ত্তব্যানুরোধেই আমাদিগকে এই সকল কথা বলিতে হইয়াছে। নানা বিভাগে—নানা জনের সম্বন্ধে অভিযোগের উল্লেখ করা যাইতে পারে। আপাততঃ আমরা ভাইস-চান্সেলার মহাশয়কে অনুরোধ করি, তিনি যেন প্রতি বিভাগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান জন্য সমিতি নিযুক্ত করেন—কণ্ট্রোলারের বিভাগ ও বাঙ্গালা বিভাগ হইতে তিনি কাজ আরম্ভ করিলে ভাল হয়।

উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন—

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ভারত রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী।

তিনি মনে করেন, তিনি অভ্রান্ত। সেই জন্য তিনি ধৈর্য্যহারা হ'ন। শ্যামাপ্রসাদ তাঁহার সেই দৌর্ব্বল্যে কশাঘাত করিয়া এক দিন লোকসভায় বলিয়াছিলেন—ধৈর্য্যচ্যুত হওয়া জওহরলালের সনাতন অধিকার।

লোকসভায় কয় জন সদস্য কিছুদিন পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তুদিগের পুনর্ব্বাসন সম্বন্ধে কতকগুলি ত্রুটি দেখাইবার উদ্দেশ্যে ও সে সকলের প্রতীকারের আশায় প্রধান মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা তাহার পরে সে সম্বন্ধে আন্দোলন করায় জওহরলাল এক বিবৃতিতে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তিনি (প্রধান মন্ত্রী) যখন তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, পশ্চিম পাকিস্তান অর্থাৎ পঞ্জাব হইতে আগত উদ্বাস্তু-সমস্যা ও পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তু-সমস্যা একরূপ নহে এবং সেই জন্যই কেন্দ্রী সরকার প্রথমে পঞ্জাবীদিগের সমস্যায় অধিক অবহিত হইয়াছিলেন এবং এখন পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগতদিগের সমস্যায় বিশেষ রূপ অবহিত হইয়াছেন—তখন তাঁহার কথায় নির্ভর করিয়া সন্তুষ্ট থাকা সাক্ষাৎকারীদিগের কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু তবুও যে তাঁহারা আন্দোলন করিতেছেন, সে কার্য্য উদ্দেশ্যমূলক। জওহরলাল তাঁহাদিগের কার্য্যে রাজনীতিক বা অন্য উদ্দেশ্য আরোপ করিয়াছেন।

কিন্তু আজ যদি বলা হয়, তিনি পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদিগের সম্বন্ধে আশানুরূপ সহানুভূতি দেখান নাই, তবে কি তাহা অসঙ্গত হইবে? পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান গভর্ণর ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় তাহাদিগের দুর্দ্দশা মোচনের জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন।

কেন্দ্রী সরকারের প্রদত্ত কোটি কোটি টাকা কিরূপে ব্যয়িত হইয়াছে?

পণ্ডিত জওহরলাল কেন্দ্রী পুনর্ব্বাসন মন্ত্রীকে ও পশ্চিমবঙ্গের পুনর্ব্বাসন সচিবকে "সার্টিফিকেট" দিয়াছেন। কিন্তু তিনি আসামের কথা বলেন নাই কেন? আসামে কাহার বুদ্ধিতে চা-বাগানে উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছিল? তাহাতে যে লক্ষ লক্ষ টাকা অপব্যয়িত হইয়াছে, তাহাও আমরা ক্ষমা করিতে পারি; কিন্তু যে সহস্র সহস্র জীবনের অপচয় হইয়াছে, সে দায়িত্ব কাহার? কেন্দ্রী সরকারের উপমন্ত্রী শ্রীঅরুণ গুহ স্বীকার করিয়াছেন, সে ব্যবস্থা ব্যর্থ হইয়াছে।

বহু লোককে পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে প্রেরণ-চেষ্টার ব্যর্থতার জন্য পণ্ডিত জওহরলাল—সরকারী অব্যবস্থা গোপন করিয়া দুষ্ট লোকের অভিসন্ধিমূলক প্ররোচনাকে দায়ী করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি—

(১) আসামে পুনর্ব্বাসন সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে কেন্দ্রী সরকারের উপমন্ত্রী কি তাঁহাকে কোন বিবৃতি দেন নাই? তিনি কি দেখিয়া আসিয়াছেন?

(২) উড়িষ্যা সরকারের কোন সচিব কি স্বীকার করেন নাই, কোনরূপ সুষ্ঠু ব্যবস্থা না করিয়া উদ্বাস্তুদিগকে উড়িষ্যায় প্রেরণফলে তাহারা নানারূপ অসুবিধা ও দুর্দ্দশা ভোগ করিয়া ফিরিয়া গিয়াছে?

(৩) বিহারে বাঙ্গালীরা কিরূপ ব্যবহার পাইয়াছে, তাহা বাঙ্গালীর প্রতি বিহারের মনোভাবেই বুঝিতে পারা যায়।

অতি অল্পদিন পূর্ব্বেও 'ষ্টেটসম্যান' পত্রে ফুলিয়ায় পুনর্ব্বাসনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যে সব পত্র প্রকাশিত হইয়াছে! সে সব কি পণ্ডিত জওহরলালের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছে?

'ষ্টেটসম্যান' বাঙ্গালী আন্দোলনকারীর মুখপত্র নহে, ইংরেজ সম্প্রদায়ের মুখপত্র—বাঙ্গালীদিগের নহে।

জওহরলালের বিবৃতি যে একটি সুপরিকল্পিত আন্দোলনের ফল তাহার প্রমাণ—

(১) যেদিন তিনি দিল্লীতে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, সেই দিনই কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব (পশ্চিমবঙ্গে পুনর্ব্বাসনের জন্য

দায়ী) অনুরূপ বিবৃতি দিয়াছেন। ইহা কাকতালীয় কি না, কে বলিতে পারে? পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব বলিয়াছেন—

"Ordinarily things are fairly satisfactory. Of course, we cannot satisfy everybody or every group of people, but we are trying our level best."

তাঁহার উক্তিতে যে সতর্কতা আছে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়—তিনি বলেন, "সাধারণতঃ" ব্যবস্থা "মোটামুটী সন্তোষজনক"। অবশ্য তাঁহাকে কর্ম্মচারীদিগের বিবরণে নির্ভর করিতে হয়।

(১) পণ্ডিত নেহরুর বিবৃতির পরে—কেন্দ্রী সরকারের পুনর্ব্বাসন মন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন ২০০০ কথার এত বিবৃতি দিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন?

"Despite many handicaps," "our achiements in West Bengal has not by any means been negligible."

তিনি কতকগুলি সরকারী সংখ্যা দেখাইয়াছেন। কিন্তু তাহারা কি সকল ত্রুটি আবৃত করিতে পারিবে? যাহা প্রত্যক্ষ তাহা বিশ্বাস্য—ইহা কি তিনি অস্বীকার করিতে পারিবেন?

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সরকারী বিবৃতিত্রয়ের উত্তরে যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা পাঠান্তে তাহার প্রতিবাদ করিবার জন্য পণ্ডিত জওহরলাল, পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিব ও কেন্দ্রী পুনর্ব্বাসনমন্ত্রী কি বলেন বা বলিতে পারেন, তাহা জানিবার জন্য কেবল বাঙ্গালার নহে—কেবল ভারত রাষ্ট্রের নহে—ভারত রাষ্ট্রের বাহিরেও লোক উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিবে। কারণ—অভিযোগ—"মানব-জীবন লয়ে এ কেবল(ই) হেলাফেলা!"—অনিচ্ছায় হইলেও হইয়াছে।

উদ্বাস্তু-সমাগম ও দেশরক্ষা—

পাকিস্তানের উদ্দেশ্য কি? পাকিস্তান আমেরিকার সহিত চুক্তি করিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিকতার অনুরাগী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও তাহাতে আতঙ্ক প্রকাশ না করিয়া পারেন নাই। অথচ তিনি আমেরিকার নিকট হইতে নানা প্রকারে ভারত রাষ্ট্রের জন্য সাহায্য লইয়াছেন ও লইতেছেন। কম্যুনিষ্ট চীনের প্রধান মন্ত্রীকে ভারতে আমন্ত্রণ করায় আমেরিকা যে ভারতের উপর বিরক্ত হইয়াছে, তাহাও দেখা যাইতেছে। পাকিস্তানের সরকারী নেতারা বলিয়াছেন—কাশ্মীর সমস্যার সমাধান ব্যতীত ভারতের সহিত পাকিস্তানের স্থায়ী মৈত্রী স্থাপিত হইতে পারে না। কাশ্মীর রাজ্যের কাশ্মীর, জম্মু ও লাডক ব্যতীত আর সমগ্র অংশ গ্রাস করিয়াও তাঁহারা তৃপ্ত নহেন—আরও চাহি।

ফজলুল হক ভারত রাষ্ট্রের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করেন নাই—কলিকাতায় তাঁহার বাড়ী আছে। তিনি মসলেম লীগকে পরাভূত করিয়া পূর্ব্ব পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া পূর্ব্ব পাকিস্তানে গভর্ণরের শাসন অর্থাৎ স্বৈর শাসন প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী মহম্মদ আলী বলিতেছেন হয়ত ফজলুল হককে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে আদালতে অভিযুক্ত করা হইবে।

পূর্ব্ববঙ্গে যে অবস্থা—যে ভাবে শত শত লোককে বিনা বিচারে বন্দী করা হইতেছে, তাহাতে ভীত হিন্দুরা গৃহাদি ত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে আসিতেছেন। উদ্বাস্তু-সমস্যার জটিলতা বর্দ্ধিত হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ভারত সরকার উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের সুব্যবস্থা আজও করিতে পারেন নাই—এই অবস্থায় আবার উদ্বাস্তু সমাগম আরম্ভ হইয়াছে। ভারত সরকার এখন কি করিবেন, দেখিবার বিষয়।

প্রকাশ, পাকিস্তানের কেন্দ্রী-সচিব ডক্টর মালেকের যে সকল মালপত্র কলিকাতা হইতে চুয়াডাঙ্গায় প্রেরিত হইতেছিল, পরীক্ষাকালে সে সকলের মধ্যে নদীয়া সীমান্তের ২১খানি নক্সা ধরা পড়িয়াছে। সে সকলে সীমান্তের কোন্ কোন্ স্থানে হিন্দুর সংখ্যা ও কোন্ কোন্ স্থানে মুসলমানের সংখ্যা অধিক তাহা দেখান হইয়াছে; সামরিক ঘাঁটী, পুলিসের আস্তানা ও পথও দেখান আছে। যাহারা ঐ সব মাল শিয়ালদহে পাঠাইবার জন্য আনিয়াছিল—তাহাদিগের নিকট পাকিস্তানের কলিকাতাস্থ ডেপুটী-হাইকমিশনারের লিখিত একখানি পত্র ছিল। তাহাতে বলা হইয়াছে, ডক্টর মালেক ভারত রাষ্ট্র ছাড়িয়া পাকিস্তানবাসী হইয়াছেন, তিনি তাঁহার আসবাবপত্র পাকিস্তানে লইতেছেন—সকলে যেন সে বিষয়ে তাঁহাকে নিয়মানুগভাবে সাহায্য করেন।

যে সকল আসবাব প্রেরিত হইতেছিল, সেই সকলের মধ্যে একটি আলমারীতে ঐ সব নক্সা পাওয়া গিয়াছিল।

এখন জিজ্ঞাস্য—ইহা কি পর্ব্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ মনে করা অসঙ্গত? সীমান্তের এই নক্সা কে, কিরূপে সংগ্রহ করিয়াছে এবং কেনই বা তাহা পাকিস্তানে প্রেরিত হইতেছিল, সে বিষয়ে ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি করিতেছেন? এই সম্পর্কে যে কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, এমন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। অবশ্য কোন রাষ্ট্রের পরিচালকগণ এরূপ বিষয়ে মন্ত্রগুপ্তি বর্জ্জন করেন না—করা সঙ্গতও নহে। কিন্তু এই ব্যাপারে যে লোকের মনে উদ্বেগের ও আতঙ্কের উদ্ভব অনিবার্য্য, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

আসামে সীমান্তবর্ত্তী স্থানে সরকারের ব্যবহারে যে অসন্তোষের উদ্ভব হইয়াছে, তাহার বিষয় আমরা বলিয়াছি। এ বার নদীয়া সীমান্তের কথা।

গত ৭ই হইতে ১১ই আষাঢ় পাঁচ দিনে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ১৫১টি পরিবার (৫৭৩জন লোক) শিয়ালদহ ষ্টেশনে আসিয়াছে। ইহারা গ্রামবাসী হিন্দু। পূর্ব্ব পাকিস্তানে আর্থিক দুরবস্থা এবং ফজলুল হকের দলকে দলিত করিবার জন্য যে স্বৈরশাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাতে গ্রামাঞ্চলেও সামরিক ও পুলিসী অত্যাচারে—ইহারা চলিয়া আসিয়াছে।

অবস্থা যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে হিন্দুদিগের ভারত রাষ্ট্রে আগমন বর্দ্ধিত হইবে—মনে করা অসঙ্গত নহে। সেজন্য ভারত সরকারকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

ভারত সরকারকে ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বিশেষভাবে প্রস্তুত থাকিতে হইবে—দেশরক্ষার জন্য। সে বিষয়ে সতর্কতা সর্ব্বনাশে পরিণত হইতে পারে। মনে রাখা প্রয়োজন—শান্তি যত কাম্যই কেন হউক না, তাহা দাসত্বের বিনিময়ে লাভ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ।

"God give us peace, not such as
lulls to sleep,
But sword on thigh and brow with
purpose knit."

শান্তির জন্য যদি যুদ্ধের প্রয়োজন হয়, তবে তাহা অপরিহার্য্য—তাহা ধর্ম্ম। পাকিস্তানের মন্ত্রী ডক্টর মালেকের আলমারীতে যে সকল নক্সা পাওয়া গিয়াছে, সে সকল যেন ভারত সরকারকে সতর্ক করিয়া দেয়। এইরূপ নক্সা সামরিক কার্য্যে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন হয় এবং সেইজন্য যাহাতে কোন ভিন্ন দেশ সেরূপ নক্সা লইতে না পারে তাহার উপায় সকল রাষ্ট্রই—আত্মরক্ষার্থ—করিয়া থাকে।

শ্যামাপ্রসাদের স্মৃতিরক্ষা—

এক বৎসর পূর্ব্বে বন্দিদশায় কাশ্মীরে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে দেশে যে বিক্ষোভ লক্ষিত হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবী করা হইয়াছিল। ভারত সরকার সে দাবী মানিয়া কাজ করেন নাই।

শ্যামাপ্রসাদের গুণমুগ্ধ স্বদেশীয়গণ তাঁহার স্মৃতিরক্ষার আয়োজন করিতেছেন! জম্মুর অধিবাসীরা প্রস্তাব করিয়াছেন, যে গৃহে আবদুল্লা সরকার শ্যামাপ্রসাদকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা কিনিয়া জাতীয় সম্পদরূপে রক্ষা করা হউক। দিল্লীর অধিবাসীরা বলিতেছেন, যে ঘড়ী-ঘরের নিকট তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তথায় স্মারক স্তম্ভ রচিত হউক। পশ্চিমবঙ্গে প্রস্তাব হইয়াছে, তাঁহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হউক এবং তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশরূপে একটি অর্থনীতির প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করা হউক।

ভারতীয় অর্থনীতির অধ্যয়ন ও অধ্যাপনের প্রয়োজন যে অত্যন্ত অধিক, তাহা বলা বাহুল্য। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে ভারতীয় অর্থনীতির স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হইত না—ইংরেজের পুস্তক পাঠ করিয়া এ দেশের ছাত্ররা যাহা শিখিত, তাহা দেশের প্রয়োজনোপযোগী ছিল না। তখন ফশেটের পুস্তক বি, এ, পরীক্ষায় অর্থনীতির পুস্তকরূপে পাঠ্য ছিল।

তাহার পরে তিন জন ভারতীয় ভারতীয়-অর্থনীতির চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—

(১) বোম্বাইএ মহাদেবগোবিন্দ রাণাড়ে

(২) মাদ্রাজে জি, স্বুব্রহ্মণ্য আয়ার

(৩) বাঙ্গলায় রমেশচন্দ্র দত্ত

রমেশচন্দ্রের কাজ স্মরণীয়। ইনি ইংরেজের শাসনে ভারতের আর্থিক অবনতি প্রতিপন্ন করিয়া যে দুইখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, সে দুইখানি অতুলনীয় এবং উপকরণের খনি। সে সম্বন্ধে অরবিন্দ লিখিয়াছিলেন—

"Without the Economic History and its damning story of England's commercial and fiscal dealings with India we doubt whether the public mind would have been ready for the Boycott. In this one instance it may be said of him that he not only wrote history but created it."

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রমেশচন্দ্রের নামে অধ্যাপক নিয়োগের প্রস্তাবও গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে প্রস্তাব অদ্যাপি কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই।

শ্যামাপ্রসাদের স্মৃতিরক্ষার্থ ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাতে রমেশচন্দ্র লেকচারের ব্যবস্থাও করা যাইবে। পরিকল্পিত প্রতিষ্ঠানের গৃহনির্ম্মাণজন্য আনুমানিক ব্যয় ৫ লক্ষ টাকা হইবে। আবশ্যক অর্থের জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন প্রচারিত হইতেছে। শ্যামাপ্রসাদ পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান রাজ্যপালের ছাত্র ছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলার। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলার, ভাইস-চান্সেলার ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি যে আবেদন প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে যে সমগ্র দেশের অধিবাসীদিগের মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে, এ আশা অবশ্যই করা যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজ প্রভৃতির অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীরা যে দেশের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া এই কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য দিতে অগ্রসর হইবেন, এ আশা কখনই দুরাশা নহে।

শিশু-স্বাস্থ্য-নিকেতন—

শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ—সমাজের অমূল্য সম্পদ। যাহাতে তাহারা সুস্থ ও সবল নাগরিক হইতে পারে সেজন্য আবশ্যক ব্যবস্থা করা সমাজের কর্ত্তব্য ও সরকারের দায়িত্ব। কলিকাতার হাসপাতালগুলিতে রোগাক্রান্ত শিশুদিগের চিকিৎসার যে ব্যবস্থা আছে, তাহাও আবশ্যকানুরূপ নহে। সম্প্রতি কলিকাতায় আপাততঃ নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য লইয়া একটি শিশু-স্বাস্থ্য-নিকেতন প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইতেছে—

(১) সুস্থ ও রুগ্ন উভয়বিধ শিশুর তত্ত্বাবধান ও পরিচর্য্যা;

(২) শিশুদিগের রোগ নির্ণয় ও রোগ নিবারণ;

(৩) শিশুদিগের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবহিত করা;

(৪) শিশুদিগের স্বভাব ও চরিত্র গঠন সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন করা ও তাহাদিগের মধ্যে সে বিষয়ে শিক্ষা প্রচার করা;

(৫) চিকিৎসা ব্যবসায়ীদিগকে ও শুশ্রূষাকারী ও শুশ্রূষাকারিণী-দিগকে বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা;

(৬) জনসাধারণের ও চিকিৎসকগণের মধ্যে শিশু-স্বাস্থ্য সম্পর্কে জ্ঞানের প্রসারবৃদ্ধি করা;

(৭) শিশুদিগের রোগ, রোগ প্রতীকার ও চিকিৎসা সম্পর্কিত সমস্যাসমূহের সমাধান জন্য আলোচনার ব্যবস্থা করা।

কলিকাতার অন্যতম প্রসিদ্ধ শিশু-চিকিৎসক ডক্টর ক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরী এই কার্য্যে উদ্যোগী হইয়া এই প্রতিষ্ঠানের জন্য নগদ এক লক্ষ

টাকা ও ৫০ হাজার টাকার সাজসরঞ্জাম দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া আরম্ভে ৩০ হাজার টাকা দিয়া জনসাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠানের গৃহের জন্য ২ বিঘা জমী দিয়াছেন। এই জমীতে যে গৃহ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা হইয়াছে তাহাতে প্রথমে ১৫০টি শিশুর থাকিবার ব্যবস্থা হইবে। বর্ত্তমানে শিশু চিকিৎসার নানারূপ উন্নতি হইয়াছে এবং চিকিৎসার জন্য নানা যন্ত্রাদি ও সরঞ্জাম প্রয়োজন।

প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রাথমিক ব্যয় ২০ লক্ষ টাকা ও তাহার পৌনঃপৌনিক বার্ষিক ব্যয় ৫ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। কার্য্যের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া—জাতির কল্যাণকল্পে সকলে ইহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবেন, এমন আশা করা অসঙ্গত নহে। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারক শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী কার্য্যকরী সমিতির সভাপতি ও প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডক্টর নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত সহকারী সভাপতি হইতে সম্মত হইয়াছেন। ষ্ট্রাণ্ড রোডে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ায় ও সমিতির কার্য্যালয় কলিকাতা ৫৬।২, ক্রীক রোয় অর্থ পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে এইরূপ প্রতিষ্টান নাই—ভারত রাষ্ট্রে আছে কি না সন্দেহ। অথচ এইরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। আমাদিগের প্রস্তাব—এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যেন গবেষণার ব্যবস্থা থাকে এবং গবেষণাফল ও পর্য্যবেক্ষণ-বিবরণ প্রতিষ্ঠানের মুখপত্রের মাধ্যমে সকল সভ্য দেশে—বিশেষ প্রাচীতে প্রকাশ করা হয়। কারণ, এইরূপ প্রতিষ্ঠানের কার্য্যক্ষেত্র কলিকাতায় ও পশ্চিমবঙ্গে থাকিলেও ইহার গবেষণাফলে সমগ্র সভ্যজগতের লোক উপকৃত হইতে পারে।

চীনের প্রধানমন্ত্রী—

আন্তর্জ্জাতিক হিসাবে এ মাসের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা—ভারত-সরকারের আমন্ত্রণে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাইএর কয় দিনের জন্য ভারতে আগমন। ইনি যে চীনের প্রধানমন্ত্রী তাহা দুর্ব্বল ও পরপীড়ন-জর্জ্জরিত চীন নহে—বিদেশীদিগের অনুগৃহীত চিয়াং কাই-সেকের চীনও নহে। ইহা পুনরুত্থিত চীন। গল্প আছে—ফিনিক্স নামক পক্ষী আপনার চিতা রচনা করিয়া তাহাতে আপনাকে দগ্ধ করে এবং দেহভস্ম হইতে নবযৌবনে পুনরাভির্ভূত হয়। চীনের তাহাই হইয়াছে। আজ চীন তিব্বতও অধিকার করিয়াছে এবং পৃথিবীর শক্তিশালী দেশসমূহের সভায় তাহার উপযুক্ত আসন পাইয়াছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যে নূতন চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাইকে আমন্ত্রণ ও সম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন, তাহা আমরা সুলক্ষণ বলিয়া বিবেচনা করি।

এশিয়া বহুদিন শ্বেতাঙ্গদিগের শোষণক্ষেত্র ছিল—ভারতবর্ষ শাসনের স্থান ছিল। আজ অবস্থা পরিবর্ত্তিত। সঙ্গে সঙ্গে আজ এশিয়া বুঝিতেছে—এশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্যে বন্ধন রহিয়াছে।

এই সময় আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে—এশিয়ার আত্মরক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। সেই কারণে আমরা চীনের প্রধানমন্ত্রীর ভারতে আগমনে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি। তাহার গুরুত্ব অন্যত্রও অনুভূত ও স্বীকৃত হইয়াছে—তবে সে অন্য ভাবে। চীন কম্যুনিষ্ট মতাবলম্বী। সেই জন্য তাহাকে রাশিয়ার সমগোত্র মনে করিয়া আমেরিকা ও ইংলণ্ড প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী (ধনিকবাদ—সাম্রাজ্যবাদের রূপান্তর) দেশসমূহ তাহার প্রতি বিদ্বিষ্ট। আমেরিকা যে পাকিস্তানের সহিত চুক্তি করিয়াছেন, কম্যুনিষ্ট মতবাদের গতিরোধ করা তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে চীনকে স্বীকার করিয়া লইয়া ভারত রাষ্ট্র যেমন সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছে, তেমনই সেই "অপরাধের" জন্য আমেরিকার অপ্রীতিভাজন হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে এখন আমেরিকাই প্রধান।

আমরা আশা করি, চীনের সহিত মৈত্রীবন্ধনে ভারতের যেমন চীনেরও তেমনই উপকার হইবে।

২০শে আষাঢ়, ১৩৬১

জীবন

সন্তোষকুমার অধিকারী

মৃত্যুকে জেনেছি ধ্রুব, জীবনের চেয়ে সত্য বলে।
সময়ের স্বর্ণকূলে বার বার তাইত একাকী
জীবনের ঢেউ গুণে গেছি। আকাশে ছড়িয়ে আঁখি
তাই দেখি জীবনের ভঙ্গুর মুহূর্তে কত ছলে
একান্ত উজ্জ্বল করে। মৃত্যুকে জেনেছি সীমাহীন
দুর্নিবার···তাই নিত্য জীবনের সহাস্য যৌবনে
পেয়েছি আনন্দ আশা। হৃদয়ের কপোত কূজনে
করেছি লালন ; জানি এ জীবন হবে না বিলীন
একেবারে কোনদিন। আকাশের মৃত্যু মেখলায়
প্রাণের প্রত্যূষসূর্য্য প্রতিদিন আসে আর যায়।
নিঃশব্দ কঠিন তার কম্প্রহীন নির্ভুল চরণে
জীবনের স্বর্ণধূলি বার বার হেলায় ছড়ায়,
মৃত্যুকে জেনেছি সত্য, ক্ষমাহীন ; তবু মনে মনে
জীবনকে ভালোবাসি হৃদয়ের তপ্ত বেদনায়।

অনুবাদ সাহিত্য



নিঃসঙ্গ দিন

আরস্কিন কলডওয়েল

অনুবাদ—শিশির সেনগুপ্ত

সাত দিন ধরে কুয়াশা ঘিরে আছে ঘরবাড়ী মাঠ গাছ পাথর। ধূসর-ধূমে মলিন হয়ে আছে সারা গা। পাথরের ঢিপিগুলো মাঠের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। আর কুয়াশা যবনিকার অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেছে দক্ষিণের দিকে পর্বতশ্রেণী। গতকাল মানুষ প্রমাণ উঠে গিয়েছিল কুয়াশা, প্রায় এল্‌ম গাছের মাথা অবধি। কিন্তু আজ রবিবার, সেই কুয়াশা আবার নেমে এসেছে। ঘরের কাঁচের জানলায় দরজায় অবধি জলে আবছা হয়ে উঠেছে।

বাগানের ভিজে ঘাস মাড়িয়ে মেয়েটি দ্রুতপায়ে বাড়ীর ভিতর গিয়ে ঢুকল। রান্নাঘরের দরজা সন্তর্পণে খুলে তেমনি নিঃশব্দে বন্ধ করে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল খানিক।

বগলের ঠেকো লাঠিটা তুলে এক ঘা মারলে বুড়ী তাকে। গাল দিলে প্রাণভরে।

মেয়েটি এক লাফে রান্নাঘরের আর এক পারে পালিয়ে গেল।

ঘরের ভিতর কুয়াশায় মাকড়শার জালগুলিতে জল চক্‌চক করছে। মেঝে অবধি ভিজে উঠেছে।

'আমার জন্য জাম তুলে নিয়ে আয়। যাবি আর নিয়ে আসবি। নয়ত এই লাঠি দিয়ে আজ তোর মাথা শেষ করব।'

'এখুনি যাচ্ছি।'

'ছুটে যা আবাগী, মর.না গিয়ে।'

ঝুড়িটা নিয়ে মেয়েটি ছুটে চলে গেল। বাগানের পর মাঠে নেমেই ছুটতে লাগল। চুল ভিজে উঠছে সপসপে হয়ে। আর দুই চোখ ফেটে কান্না আসছে প্রবল বেগে। ভেড়াদের জমি পেরিয়ে নদীর ওপারে জামবাগান। নদীর পাড় বরাবর বড় রাস্তা ধরে চলে গেছে সহরের দিকে।

ভিজে জাম কুড়োতে লাগল মেয়েটি। জানে ত তাড়াতাড়ি না ফিরতে পারলে আবার তার কপালে ঐ ঠেকো লাঠির মার আছে। বুড়ী এতক্ষণে বোধ হয় রান্নাঘরের মুখে ওঁৎ পেতে বসে আছে—রাগে গরগরে হয়ে।

দূর থেকে দেখা যায় বড় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে ছুটন্ত মোটরের সারি। এখানে নিবিড় বন। বৃহৎ বনস্পতিদের বাস। বরফ ঢাকা গাছ কাটে শীতকালে কাঠুরের দল, যখন নিবিড় আঁধার অরণ্য তুষারে শুভ্র হয়ে ওঠে। কিন্তু এখন চারিদিক নির্জন। কেউ কোথাও নেই। সব থেকে কাছের গাঁ অন্ততঃ বিশ ক্রোশ এখান থেকে। এ বনপথে কেউ চলে না এখন। শুধু পক্ষীরাজ হাওয়া গাড়ীতে ঝড়ের মত চলে যায় তারা—যারা বেড়াবার নেশায় মেতে এই দেশ দেখতে আসে।

এর আগে কখনো বড় রাস্তা অবধি যায় নি সে। বুড়ী তাকে যেতে দেয় না। কিন্তু এখান থেকে মোটরের আওয়াজ কানে আসে। ক্বচিৎ শোনা যায় ছেলেমেয়ের উচ্চকণ্ঠ হাসি।

জাম কুড়োতে কুড়োতে মনে হোল তার যেন একখানি মোটর থেমে গেছে পথের ধারে। সেইখান থেকে সে শুনতে পেল তাদের হাসির প্রতিধ্বনি বনময়। আরো তাড়াতাড়ি জাম কুড়োতে লাগল সে।

ঝুড়ি ভর্তি করতে দুপুর গড়িয়ে গেল। তখন তাড়াতাড়ি করে সে যেতে লাগল ভিজে পথে।

পাহাড়ের কোল দিয়ে মাঠের পারে নদীর দিকে যেতে যেতে আবার সেই হাসি-কাকলীর উচ্চশব্দ কানে এল তার। পায়ে চলা সাঁকো ধরে আসতেই কুয়াশার পাতলা আবরণের

ভিতর দিয়ে সে দেখতে পেল তাদের পাঁচ ছটি ছেলেমেয়েকে ছোট খালের দিকে।

সাঁকো পার হয়ে তাদের কাছ বরাবর গিয়ে পড়ল মেয়েটি। প্রথমে ভেবেছিল সে হয়ত বা মাছ ধরতে এসেছে এরা। কিন্তু না, সাঁতার কাটছে সবাই। জলে ঝুপঝাপ করে হাত পা ছুঁড়ছে।

কুয়াশা পাতলা হয়ে আসছে বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে। একটি ছেলে ও একটি মেয়েকে তীরে উঠে আসতে দেখলে সে।

দুটি চোখে বিশ্বের বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে রইল মেয়েটি বিহ্বল হয়ে। বুকের ভেতর যেন হাপর চলছে। সারা শরীর অদ্ভুত রোমাঞ্চে থর থর করে কাঁপছে।

মেয়েটি তীরে উঠেই মাঠের পথে ছুটে এল। তারপর ছেলেটিকে উদ্দেশ করে বল্লে—'তুমি আমায় ধরতে পারবে না জিমি।'

পরণের পোষাক খুলে নাইতে নেমেছিল। তেমনিভাবেই সে ছুটে মাঠের দিগন্ত জোড়া কুয়াশায় হারিয়ে গেল।

অন্য ছেলেমেয়েগুলি তখনো জল-লীলা করছে সকৌতুকে আনন্দে।

নদীর পারে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল এই মেয়েটি। এমন হয় তো কখনো দেখেনি সে—ভাবেনি। কিন্তু ঐ ত ওরা। কি করছে সব ত দেখছে সে। কি বলছে সব ত শুনতে পাচ্ছে। মনে হচ্ছে এসব মিথ্যে কুহক। তার এই বয়েস অবধি কোনদিন সমবয়সী ছেলেমেয়ের সঙ্গে সে মেশেনি। ঐ বয়সের ছেলেরা বুঝি অমনি হয়। কী অদ্ভুত লাগছে ভাবতে।

শরীরের এত ক্ষুধার্ত আগ্রহ আর তার সহ্য হয় না। ছুটে গিয়ে ওদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে সে। অমনি করে হাসি আনন্দে মেতে উঠবে। ভুলে যাবে সব। কিন্তু ছাঁত করে উঠল বুকটা। হাতের ভারী ঝুড়িটা নজরে পড়তেই তার চমক ভাঙল। ভয়ে সে দ্রুতপায়ে ছুটতে লাগল বাড়ীর দিকে—যেখানে বুড়ীটা তার অপেক্ষায় বসে আছে।

তার হাত থেকে ঝুড়িটা ছিনিয়ে নিয়ে বুড়ী লোভীর মত খেতে লাগল তখুনি। আর মেয়েটি নিজের ঘরে গিয়ে দরজা দিলে।

বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগল। ঐ সুদূর মাঠের পারে নদীর জলে লীলামত্ত যুবক যুবতীদের যে মধুদৃশ্য দেখে এসেছে সে, তার অমৃতে মন মত্ত হয়ে উঠেছে। জগৎ-জোড়া কুয়াশার পর্দা তুলে তার ব্যর্থ যৌবনকে কে এমন লোভ দেখালে আনন্দের। এ-জানলা ও-জানলা করে ঘুরে বেড়াতে লাগল মেয়েটি বন্দিনী বিহঙ্গীর মত। একবার কুয়াশার পর্দা তুলে দিলে এখান থেকেই সে দেখতে পেত মাঠ। সেই মাঠের পারে নদী। আর সেই নদীর তটে স্নানরত হাস্যরত মাধুরীরত নগ্ন সৌন্দর্য লীলা।

ঘরে থাকতে পারলে না সে। আবার সন্তর্পণে দুয়ার খুলে বাগানে গিয়ে পড়ল। সেখান থেকে মাঠ। মাঠের শেষে নদীপাড়। পাহাড়ের কোল ঘেঁসে যেতে যেতে কতবার কান পেতে সে শুনতে চেষ্টা করলে। ইচ্ছে করলে তাদের কাছে ধরা দিতে। আর রোমাঞ্চে তার শরীর বেতসপাতার মত কাঁপতে লাগল অধীরতায়।

নদীর তীরে পৌছে চারিপাশে চেয়ে দেখলে সে। তারা ত কেউ নেই। এদিকে ওদিকে চারিদিকে তাকালে সে। কোন চিহ্ন রেখে যায়নি তারা। হয়ত বা এতক্ষণে তাদের মোটর অনেক মাইল চলে গেছে তাকে ছেড়ে, তাকে ফেলে রেখে।

হতাশায় কাঁদতে লাগল মেয়েটি। কুয়াশায় ঢাকা জগতের শূন্যতার দিকে তাকিয়ে তার আশাহত হৃদয় ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল। কোথাও কেউ কি নেই, যার সঙ্গে সে কথা কইতে পারে। যার সঙ্গে পরণের কাপড় খুলে নিরাবরণ হয়ে অমনি মধুর আনন্দে মেতে পৃথিবী ভুলতে পারে।

নিঃসঙ্গ নদীর মতই দোসরহীন তার তরুণী দেহ। সে ভার আর যেন সে বইতে পারে না।

দুপুরের পর আবার কনকনে ঠাণ্ডা পড়ছে। শরীর শিউরে উঠছে আর্দ্র হয়ে।

কী কথা বলেছিল ওরা। কেমন মধুর করে হেসেছিল। কুয়াশার আড়ালে আমন্ত্রণ করে সেই যে নগ্ন সুন্দর যুবতী হেসেছিল—আমায় ধরতে পারবে জিমি ?

ঘরে ফিরে এসে বিছানায় মুখে কাপড় গুঁজে কাঁদতে লাগল মেয়েটি। বুড়ীটা জানতে পারেনি এই যা রক্ষে।

পড়ন্ত বিকেলে উঠে বসল মেয়েটি। ঘরময় পায়চারী করে বেড়াতে লাগল। কুয়াশায় সব আঁধার হয়ে গেছে। তাকে দেখবার কেউ নেই। সেও কাউকে দেখতে পাবে না। এইবার যেন মনে হচ্ছে সকালের সেই সব মিথ্যে। সবই বুঝি তার মনের ভুল। শুধু সেই আশ্চর্য হাসির শব্দই সত্য।

রাত হোল। বুড়ী খেয়ে দেয়ে ঘুমুল। তখন সে চোরের মত চুপি চুপি আবার মাঠে গিয়ে দাঁড়াল।

অন্ধকারে পায়ের নীচের ঘাস দেখা যায় না। শুধু চারিপাশে অন্ধকার। আর কুয়াশার আর্দ্র আলিঙ্গন। পাহাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে শুনতে পেল মোটরের আওয়াজ। প্রাণ খুলে হাসতে গেল মেয়েটি। কিন্তু হাসি তার মনেই মিলিয়ে গেল।

মাঠ পেরিয়ে বড়ো রাস্তায় গিয়ে পড়ল সে। সেইখানে দাঁড়িয়ে মোটরের আওয়াজে কান পেতে রইল। কিন্তু সেই কুয়াশাবৃত নিশীথ রাত্রে কোনদিকেই কোন শব্দ নেই।

পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে খুব কাছ থেকে হাসাহাসির শব্দ পেল সে। সেই মন দোলানো সকালের হাসি। শরীরে রোমাঞ্চ জাগালো উদ্বেল আনন্দময়। অন্ধকারের অন্তরালে একটি মেয়েলি কণ্ঠ কাকে যেন হাসির স্বরে ডাকছে, আমায় ধরতে পারবে জিমি? সেই সঙ্গে একটি পুরুষ কণ্ঠ।

তারপর তার চারিপাশে গানের মত বাজতে লাগল হাসি। তেমনি উথল, তেমনি তরঙ্গময়, তেমনি পুলকিত। সেই হাসির শব্দে দেখতে পেল মেয়েটি। দেখলে নদীর জলে তারা সবাই স্নান করছে। জলের ঝাপটা দিয়ে খেলা করছে মত্ত হয়ে। ঘাসের উপর শুয়ে হাসছে—গল্প করছে তারা। পরণে কিছু নেই। নিলাজ নগ্ন শরীর। সব তার সমবয়সী। তারই মত ছেলেমেয়েরা।

কিন্তু এই অন্ধকারে কোথায় খুঁজবে সে তাদের। শব্দময় অন্ধকারে তারা এত কাছে কিন্তু এত দূরে।

কখন আসবে তাদের গাড়ী। অপেক্ষায় অধীর হয়ে উঠছে শরীর-মন। পথের মাঝখানেই দাঁড়িয়ে আছে ত সে। যাতে সহজেই চোখে পড়ে। কিন্তু কোথায় তারা!

সকালের হাল্কা কুয়াশায় একখানি যাত্রী গাড়ী তাকে পথের মাঝখানে দেখে থামল। অন্ধকারে কোন উল্কাগতি মোটরে তার তরুণ দেহকে দলিত করে চলে গিয়েছে। প্রাণহীনা পড়ে আছে পথে। সারা শরীর নগ্ন। মুখে একটি অপূর্ব হাসি বিকশিত হয়ে আছে। মোটরের সাড়ায় আসন্ন আসঙ্গ-লিপ্সায় যে হাসি তার দেহের তটে তটে কুলপ্লাবী হয়ে উঠেছিল, সে হাসির শেষ রশ্মি তখনো মেলায় নি তার অধর থেকে।

স্মরণে *

অনুপম রায়

আজ তুমি ফিরে এসো, এসো ফিরে আবার মিল্টন,
নতুন সত্তায় দীপ্ত; সারা দেশ তোমার প্রত্যাশী।
অন্তরাত্মা আজ তার বদ্ধ-জলা, স্থির জলরাশি—
ক্লেদাক্ত পংকের মতো: বেদী-স্তম্ভ, দৃপ্ত বাহু-মন,
কবোষ্ণ গৃহের সুখ, প্রেমের আশ্চর্য্য কুঞ্জবন
আজ তারা হারায়েছে অতীতের শান্তি-তৃপ্তি-হাসি।
উদ্‌ভ্রান্ত আমরা হায়! এসো—এসো ফিরে, হে সন্ন্যাসী—
তরাও অজস্র দানে শক্তি-মুক্তি, মনন-জীবন!

তারার মতন দীপ্ত বহুদূরে তোমার হৃদয়;
তোমার উদাত্ত কণ্ঠে ঝড় ওঠে সমুদ্রের স্বরে:
স্বর্গ সম নিষ্কলুষ অন্তহীন গৌরবে অক্ষয়—
তেমনি পরমানন্দে জীবনের রাজপথ' পরে
তোমার সহজ গতি; তবু কী আশ্চর্য মনে হয়—
তৃণ-তুচ্ছ কর্তব্যেও হেলা নেই তোমার অন্তরে!

* মিলটনের উদ্দেশে লিখিত ওয়ার্ডসওয়ার্থএর একটি বিখ্যাত কবিতার ভাবানুবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের চতুষ্পাঠী

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

বঙ্গদেশ চিরকাল সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি সমাসক্ত। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে বঙ্গদেশ সংস্কৃত শিক্ষায় ভারতবর্ষে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল এবং নবদ্বীপ এককালে ভারতের অক্সফোর্ড নামে অভিহিত হয়েছিল। গুপ্তিপাড়া, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানেও শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ টোলে সহস্র সহস্র ছাত্র নিরন্তর সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি পাঠে নিরত থাক্তেন। পণ্ডিত মহাশয়েরা ছিলেন সমাজের শিরোমণি, দেশের শ্রেষ্ঠ ভূষণ, গরিষ্ঠ আলো। এখনো মহামহোপাধ্যায় বা মহামহোপাধ্যায়কল্প শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মহাশয়েরা কয়েকজন প্রাচীন কালের সেই কীর্তিধ্বজা বহন করে আছেন। তাঁদের দিকে তাকালে এখনও স্বতঃই অনুভূতি জাগে—এদের গুরুপরম্পরায় শত ২ বৎসর আগে ভারতের শ্রেষ্ঠ গীতি-কাব্যকার জয়দেব, ছান্দসিক গঙ্গাদাস সেন, দার্শনিক শ্রীধর, আয়ুর্বেদবিদ্ চক্রদত্ত, বৈয়াকরণ জুমর নন্দী, কবি গৌড়াভিনন্দ প্রভৃতি ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা এ বঙ্গদেশেই জন্ম পরিগ্রহ করে বঙ্গজননীর মুখ উজ্জ্বল করে গেছেন। কিছুদিন আগে মনীষীপ্রবর বঙ্গদেশের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক পণ্ডিত চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ মহাশয়ের মৃত্যুতে জননীর ফুল্ল হাসি যেন অনেকটা স্তিমিত হয়ে গেছে। তাঁর শিষ্য, প্রশিষ্য প্রভৃতি এবং অন্যান্য বড় পণ্ডিত যাঁরা এখনও অবশিষ্ট আছেন, তাঁদের পরে সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর অবস্থা ও ফলতঃ প্রকৃত সংস্কৃত শিক্ষার ভবিষ্যৎ কি হবে, তা ভেবে দেখ্বার দিন এসেছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এখন আর নেই যে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে সান্ত্বনা লাভ করবো। এখন সমস্ত প্রচেষ্টা আমাদের নিজেদের উপরেই নির্ভর করে।

সংস্কৃত জগতের শ্রেষ্ঠ ভাষাসমূহের জননী। সংস্কৃত ভারতের সমস্ত ঐতিহ্য, কৃষ্টির বাহক। সংস্কৃত ও ভারতীয় সংস্কৃতি সমার্থক; সংস্কৃত ভারতীয়মাত্রেরই পৈত্রিক সম্পদ। এ অমূল্য সম্পদ্ বিবৃদ্ধির উপায় কি ?

প্রথমেই বলা দরকার যে এখনও দেশের লোকের চোখে ইংরাজী আমলের রঙ্গীণ কাঁচ পরানো রয়েছে—তার ভেতর দিয়ে সমাজের নেতৃস্থানীয়, এমন কি—খ্যাতনামা শিক্ষাতত্ত্ববিদ্গণের অনেকেও সংস্কৃতের প্রকৃত স্বরূপ দেখ্তে পান না। অনেকে আবার স্বকীয় প্রতিষ্ঠা-হারানোর ভয়ে সংস্কৃতের উৎকর্ষের অপলাপ বা তার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। অনেকে প্রকৃতই এর উৎকর্ষের বিষয়ে অবগত-ও নন। এ শেষোক্ত ব্যক্তিদের কাছে আমি সবিনয়ে কিছু নিবেদন করতে চাই।

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্রস্থল পশ্চিম বঙ্গীয় সরকারের সংস্কৃত শিক্ষা পরিষৎ। এই পরিষদের আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষা, শুধু বঙ্গদেশে নয়, নিখিল ভারতে দীর্ঘকাল ধরে সংস্কৃতের শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা বলে সম্মান লাভ করে এসেছে। এ পরিষদ্ ১৯৪৮ সালে নব নাম পরিগ্রহ করেছে—মাননীয় বিচারপতি ডক্টর শ্রীযুক্ত বিজকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে সংগঠিত পনের জনের সংস্কৃত শিক্ষা অনুসন্ধান সমিতির রিপোর্টের ফলে। আগে এই পরিষদ্ যথাক্রমে কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েসন (১৯৩২ সাল পর্যন্ত) এবং বঙ্গীয় সংস্কৃত এসো-সিয়েশন নামে (১৯৪৮ সাল পর্যন্ত) পরিচিত ছিল। ১৮৮৭ সালে সমস্ত টোলের সমবায়ে প্রথম সরকারী সংস্কৃত পরীক্ষা আরম্ভ হয়।

আমরা যারা সংস্কৃত শিক্ষার দীন-সেবক হয়ে নিজেদের জীবনকে চিরধন্য মনে করি, তারা সত্যি দেখ্তে পাই—পণ্ডিত মহাশয়দের যে চারিত্রিক বলিষ্ঠতা এবং জ্ঞানের প্রকর্ষের জন্য তাঁরা সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, সে ঔজ্জ্বল্য এখনও আছে অক্ষুণ্ণ। পুরুষ থেকে পুরুষান্তর নানা স্বাভাবিক বিরুদ্ধতার মধ্যেও যে জননীর সেবা করে তাঁরা অকাতরে জাগতিক বা আর্থিক অভ্যুন্নতিকে অঙ্গুলিহেলনে পাশে সরিয়ে দিয়েছেন, সে জননীর মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটিয়ে তোলার জন্য এখনও তাঁরা কত বদ্ধপরিকর। ফলতঃ, বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে—দেশবাসী সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি উদাসীন বা অনাদরশীল—এ ধারণা একান্ত ভ্রান্ত।

বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের বিগত পাঁচ বৎসরের ইতিহাস থেকেই এ তথ্য সম্যক্ উপলব্ধি হবে। ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত এই পরিষদের অফিসে প্রাপ্ত পত্রের সংখ্যা গড়পড়তা ৫১৬ খানার অধিক হতো না, উত্তর যেত তেম্নি। কিন্তু বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে সে সংখ্যা এখন এসে দাঁড়িয়েছে দৈনিক ১৫০ খানা পত্রের আদান-প্রদানে। ফলে বিগত আর্থিক বৎসরে বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের অফিস থেকে উনত্রিশ হাজার পত্রের আদান-প্রদান হয়েছে।

১৯৪৮ সাল থেকে ক্রমান্বয়ে টোলের ছাত্র সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৪৮ সালে ৩৪৫৩, ৪৯ সালে ৭৮৪৯, ৫০ সালে ৮০৭৭, ৫১ সালে ৭৬১৫, ৫২ সালে ৭৩৬১, এবং ৫৩ সালে সাড়ে আট হাজার ছাত্র পরিষদের সংস্কৃত পরীক্ষা দিয়েছে। বর্তমান বৎসরে এ ছাত্র সংখ্যা দশ হাজারে উন্নীত হয়েছে। পরীক্ষা কেন্দ্রও ১৯৪৮ সাল [illegible] বঙ্গদেশে ও বঙ্গদেশের বাইরে সর্বসমেত ১০টী বেড়েছে। বঙ্গদেশে ২২টী এবং বঙ্গদেশের বাইরে ৩০টী, সর্বসমেত [illegible] কেন্দ্রে—ভারতের সর্বত্র—আসামের ডিব্রুগড় থেকে পশ্চিম ভারতের পোর বন্দর, কাশ্মীর থেকে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত আমাদের পরীক্ষা গৃহীত হচ্ছে।

সরকারী বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষৎ থেকে বৎসরে ২৬৭ খানা প্রশ্নপত্র প্রস্তুত হয়। এ সকল প্রশ্নপত্রে আবার বহু বিভাগ উপবিভাগ আছে। কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে এর অধিক প্রশ্নপত্র বিরচিত হয় না। আমাদের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ছাত্র সংখ্যা কম সত্য; কিন্তু ছাত্রেরা সকলেই বংশ-পরম্পরাগত বিদ্যার অনুশীলন করেন বলে প্রত্যেক প্রশ্নপত্র সেই সেই বিষয়ক জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ পরিমাপক স্বরূপে শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক রচনা করা হয়।

১৯৪৮ সালের পূর্বে সংস্কৃত এসোসিয়েসানের পরিচালনার জন্য যে ব্যয়ভার সরকার বহন করতেন, ১৯৪৮ সালে তা' সমধিক পরিমাণে বর্ধিত হয়েছে। মোটের উপর—পশ্চিমবঙ্গের ১৫৪টী টোলে মাসিক ৭৫।৫০৲ টাকা বৃত্তি এবং ১২৫টী টোলে বাৎসরিক একশত টাকা বা পঁচাত্তর টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়। ছয় শতাধিক চতুষ্পাঠীতে মহার্ঘ-ভাতা প্রদান করা হয়। প্রায় সমস্ত বৃত্তিপ্রাপ্ত টোলে আসবাব-পত্র ও পুস্তক ক্রয়ের জন্য অতিরিক্ত আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে রেজেষ্ট্রীকৃত পণ্ডিত মহাশয়গণের সংখ্যা তিন শতের অধিক ছিল না। সম্প্রতি কেবল পশ্চিম বঙ্গেই প্রায় ষোল শত পণ্ডিতের নাম রেজেষ্ট্রীকৃত হয়েছে—যাঁরা চতুষ্পাঠীর অধ্যাপনায় নিয়োজিত আছেন। ফলতঃ—পূর্ববঙ্গের বহুসংখ্যক পণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গে এখন অবস্থান করছেন। এঁরা সকলে প্রাণের থেকেও সংস্কৃতকে অধিক ভালবাসেন বলে এঁদের নিয়ে পশ্চিমবঙ্গীয় সরকারী সংস্কৃত শিক্ষা-পরিষদের কর্মব্যস্ততার অন্ত নেই। এ সমস্ত পণ্ডিত মহাশয়দের সঙ্গে পরিষদের নিত্য সম্পর্ক। এতদ্ব্যতীত, কাশ্মীর থেকে কুমারিকা পর্যন্ত আসমুদ্রহিমাচল সমগ্র পণ্ডিতসমাজের সঙ্গে বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, বিশেষতঃ, হৃদয়ের সংযোগ। এর একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, এ বৎসরও ভারতের বিভিন্ন স্থল থেকে মৌখিক উপাধির জন্য তাঁদের অনেক ছাত্র আমাদের কলিকাতা পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হয়েছেন। আমাদের সংস্কৃত পরীক্ষার্থী ছাত্রদের মধ্যে দুই—তৃতীয়াংশ অবাঙ্গালী ছাত্র। ফলে, প্রতিদিন দেশী বিদেশী বহু-সংস্কৃত ছাত্র এবং অধ্যাপকমণ্ডলীর নিত্য সংযোগস্থল সরকারী সংস্কৃত পরিষদের কার্যালয়ে শতাধিক অভ্যাগতের ভিড় জমে। যাতায়াতের দিক্ থেকে অসুবিধাজনক স্থানে একটী ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বর্তমানে পরিষৎ কার্যালয় অবস্থিত হলেও সংস্কৃতশিক্ষাপিপাসু পণ্ডিতমণ্ডলীর হৃদয়ের স্পন্দনে ও উৎসাহে ঐ নিরানন্দ স্থানও আনন্দমুখর হয়ে উঠে।

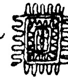
সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি বিরূপ যাঁরা, তাঁদের সংস্কৃত শিক্ষা-প্রসারণের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে যুক্তি এই যে সংস্কৃতের ছাত্র সংখ্যা কম—সাধারণ শিক্ষার তুলনায় ত বটেই, কাজেই অর্থ ব্যয় এর জন্য বাহুল্য মাত্র। ওঁরা ভুলে যান যে সংস্কৃত তত্ত্ব ও তথ্যের ধারক, ভারতীয় সভ্যতার আবহমান-কাল থেকে বাহক ও আন্তর্জাতিক মর্যাদার পোষক, এ সংস্কৃত বিষয় সর্বজনসাধ্য নয়। আর্থিক সমুন্নতির অভিলাষী যাঁরা, তাঁদের জন্য অর্থনীতি, ব্যবসাবাণিজ্যমূলক শিক্ষা তো আছেই—স্বভাবতই সাধারণ লোক তার দিকে ছুটবেই। কিন্তু পারিবারিক শিক্ষাগুণে বা আধ্যাত্মিক ভাব সম্পদের অধিকার বলে বা অন্য কোনও কারণে যাঁরা অর্থের প্রতি আকৃষ্ট হতে রাজী নন, যাঁরা দেশের সম্পদ্ বিবৃদ্ধির জন্য আত্মত্যাগে বদ্ধপরিকর, তাঁদের দিকে তাকাতে চিন্তাশীল দেশবাসী বিমুখ হবে কেন? সংখ্যা দিয়ে শ্রেষ্ঠ জিনিষের মূল্য নির্ধারণ হয় না। কোহিনুর পথে ঘাটে পড়ে থাকে না।

বঙ্গ বিভাগের ফলে বিশিষ্ট পণ্ডিত মহাশয়দের অনেকেই আজ উদ্বাস্তু পণ্ডিতরূপে পশ্চিমবঙ্গে অত্যন্ত বিপন্ন ও দুঃস্থ অবস্থায় জীবন যাপন করছেন। পশ্চিমবঙ্গেও বা ভারতের অন্যান্য স্থানেও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বিকৃত ফলে সংস্কৃত শিক্ষার ধারকবাহক পোষক পণ্ডিতমণ্ডলীর আর্থিক ব্যবস্থা প্রায় উৎখাত। আজীবন পশ্চিমবঙ্গনিবাসী মহামহোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ বরিষ্ঠ পণ্ডিত মহাশয়গণও আর্থিক বিপর্যয়ে বিপন্ন। এঁদের বিপুল শাস্ত্রজ্ঞান সংরক্ষণের এবং শিষ্য পরম্পরাক্রমে অনুক্রমণের একমাত্র উপায় আর্থিক সাহায্য সংপ্রদান পূর্বক এঁদের জাগতিক বৈক্লব্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখা।

আজ সৌভাগ্যক্রমে বঙ্গদেশের কোনও কোনও অঞ্চলে সংস্কৃত-শিক্ষা সংপ্রসারণের প্রভূত প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ বিষয়ে কর্মোদ্দীপনা আমাদের পরম হিতের কারণ। এ প্রসঙ্গে কুচবিহারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য স্থানেও জনসাধারণের ঈদৃশ উৎসাহ একান্ত কাম্য। বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের এর থেকে আনন্দের বিষয় আর কিছুই নেই।

সংস্কৃত শিক্ষা সংপ্রসারণের দিক থেকে আর দুটী একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়, তন্মধ্যে একটী দুরন্ত রাক্ষসের মত বিস্তৃততম বদন ব্যাদান করে সমস্ত সংস্কৃত শিক্ষাকে গ্রাস করতে বসেছে। এ শেষোক্ত অভাব হচ্ছে মুদ্রিত সংস্কৃত পুস্তকের দুষ্প্রাপ্যতা। বাজারে সংস্কৃত বই নেই বললেই হয়। একদিকে অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা সংস্কৃত পঠনকারী ছাত্রসংখ্যার ন্যূনতা—অন্যদিকে, বর্তমান বাজারে ব্যয়ের অপরিমিত অচিন্তনীয় বাহুল্য—কে আজ এ দুর্দিনে সংস্কৃত শিক্ষার প্রকৃষ্ট হিতৈষী রূপে ভাগবত কৃপায় দেখা দেবেন? আগে যে পুস্তক মুদ্রণে পাঁচশত টাকা ব্যয় হতো, এখন সেই বই ৩,৫০০ পঁয়ত্রিশ শত টাকায়ও মুদ্রিত হয় না। জনকল্যাণের জন্য কে বা কারা এ অর্থব্যয়ে কুণ্ঠবোধ করবেন না? এরূপে প্রথমতঃ চতুষ্পাঠী সমূহের পাঠ্যপুস্তক পর্যন্ত আজ ছাত্রদের কাছে অপ্রাপ্য। অন্যান্য ছাত্রেরা যেখানে মুদ্রিত পুস্তক, নোট বই, গাইড বই, পুস্তকাগারের বই প্রভৃতির সাহায্যে বিনা আয়াসে পাঠাভ্যাস করছেন, সে ক্ষেত্রে টোলের ছাত্রগণকে হাতে নকল করে বা মুখে মুখে শুনে অতি কষ্টে পড়তে ও পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে হচ্ছে। এমন কি—অধিকাংশ গ্রন্থাগারেও এ বইগুলি পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ, এতদ্ব্যতীত সংস্কৃতের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলিও আজকাল প্রায়ই মুদ্রিত নেই। তৃতীয়তঃ—শ্রদ্ধেয় বর্তমান পণ্ডিতমহাশয়গণের লিখিত বহু পুস্তকও আজও অমুদ্রিত অবস্থায় পড়ে আছে। মুদ্রণের কোনও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই বলে তাঁরা অনেকেই লেখাতে উৎসাহবোধ করেন না। যে জ্ঞান ভাণ্ডার তাঁরা বহন করে বেড়াচ্ছেন, তার অন্ততঃ কিছু অংশ উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে যেতে তাঁরা নিজেরা সকলেই সমুৎসুক, কিন্তু তাকে মুদ্রিত করে স্থায়ী সম্পদে পরিগণিত করার কোনও প্রচেষ্টাই আজ পর্যন্ত আমরা করি নি। সে জন্য এই সব জ্ঞান—সাধকদের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই এ অমূল্য রত্নভাণ্ডার যে চিরন্তরে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে, তার থেকে দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে? চতুর্থতঃ অসংখ্য মূল্যবান্ সংস্কৃত পুঁথি আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি। এ সকলের মুদ্রণও অবিলম্বে অত্যাবশ্যক। অন্য অভাব—সুষ্ঠু প্রচারের। সংস্কৃত-রসিক হিতৈষী বন্ধুজনের এ বিষয়েও বিশেষ অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

আণবিক বোমার দানবিক বিক্রম থেকে জগৎকে বাঁচাতে গেলে ভারতীয় আদর্শ জগতে সংপ্রচার করাই একমাত্র উপায়। এ আদর্শের শ্রেষ্ঠ দর্পণ সংস্কৃত-সাহিত্য। এ দর্পণের মধ্য দিয়েই কেবল ভারত-জননীর বদনদ্যুতি প্রকৃতভাবে প্রতিফলিত হয়। এ সংস্কৃত শিক্ষার শ্রেষ্ঠ স্থান ভারতীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত চতুষ্পাঠী। তজ্জন্য এ চতুষ্পাঠী সমূহের সংরক্ষণ ও বিবৃদ্ধিই দেশের প্রকৃত হিতকামী সকলেরই অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।



মেয়েদের কথা



পরিচালিকা—কল্যাণবাদিনী

একান্নবর্তী সংসার-যাত্রায় নারী

নীলিমা শ্যাম

বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি এই নারী। নারীকে অনেকেই মহীয়সী আখ্যা দিয়েছেন, নারী যখন আপনাতে আপনি পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেন তখনই তাঁর মহিমা প্রকাশ পায়, কিন্তু যে নারী সংসার যাত্রায় নির্য্যাতিতা তাঁর মহিমা প্রকাশ তো দূরের কথা—স্বভাবসিদ্ধ যে ভাল গুণ, তাও নষ্ট হয়ে যায়। তাই সংসারে নারীকে প্রথমে আপনার প্রতিষ্ঠা করে নিতে হয়, নিজেরই গুণে এবং সহিষ্ণুতায়। তারই জন্য তাঁকে সুদক্ষা অভিনেত্রীও হতে হয় ক্ষেত্র বিশেষে। যেমন ধরুন, মস্তবড় সংসার। আত্মীয়পরিজনে ভরপুর। বড় ছেলেটির বিয়ে দেওয়া হোলো। বউটি রূপে লক্ষ্মী প্রতিমা। বিয়ের আগে রূপ দেখা হোলো, কিন্তু গুণের খবর প্রকাশ পায় বিয়ের পরে। এবার দেখা যাক, গুণ কি রকম, বৃদ্ধা শাশুড়ী এতদিন কোনও রকমে সংসারের হাল ধরে ছিলেন, এখন বৌমার হাতে সব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান। বৌটিও বিশেষ বুদ্ধিমতী। শাশুড়ীর হাত থেকে একসঙ্গে সব ভার তুলে নিলেন না, অথচ সংসারের প্রত্যেকটী খুঁটিনাটী কাজ নিজের হাতেই করছেন। অথচ প্রত্যেক বিষয়েই জিজ্ঞেসা করছেন শাশুড়ীকে। "দেখুন তো মা এটা হলো কিনা? ওটা কীরকম হবে আপনি একটু দেখিয়ে দিন্।" ইত্যাদি—শাশুড়ীও বেশ খুশী। মনে মনে ভাবেন, বৌমা আমারই কাছে শিক্ষা নিচ্ছেন।

অথচ সমস্ত কাজই বৌমার জানা আছে, তিনি যা করছেন তাতে কোনও ত্রুটী নেই। তবুও একটু অনভিজ্ঞতার ভাণে ছাত্রীর পদ গ্রহণ করা মাত্র। তারপর ধরুন বাড়ীর কর্ত্তাদের কার কি রকম মেজাজ, ঠিক সেই রকম ভাবে চলা। বড়কর্ত্তা মাছের মুড়ো ভালবাসেন, তাঁকে মাছের মুড়ো দেওয়া উচিত। অথচ বাড়ীর ছোট ছেলেটিও সমানভাবে ঐ জিনিষটি ভালোবাসে, তাকেও ক্ষুণ্ণ করা চলে না। তখন বৌটি পালা করে দেওয়া সুরু করলেন একে একদিন আর ওকে আর একদিন। দুজনেই খুশী। মেজো ননদটী বেশী সিনেমা ভক্ত। কিন্তু বাড়ীতে কারুর সম্মতি নেই। এদিকে বৌদি যদি এর একটা ব্যবস্থা না করে দেন তাহলে হচ্ছে না। বেচারী বৌদি কি আর করেন, নিজের হাত খরচার পয়সা থেকে চুপি চুপি ননদকে দিয়ে বলেন—"দেখো রোজ রোজ আমি দিতে পারবো না, মনে থাকে যেন, মাসে একদিন দেবো," ননদ তাতেই খুশী। আপাততঃ যখন পাওয়া গেছে, বৌদির প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠ্‌লো। কিন্তু শাশুড়ী জিজ্ঞেস করলেন মেয়েকে দেখ্‌ছেন না কেন? বৌমা তখনি উত্তর দিয়ে দিলেন "আমাকে বলে গিয়েছে মা, ওর এক বান্ধবীর বাড়ীতে যাচ্ছে, এখনই এলো বলে—।"

শাশুড়ীও নিশ্চিন্ত হলেন, ভাবলেন বৌমা যখন বল্‌ছেন তখন কি আর অন্য কোথাও যেতে পারে? কয়েক দিন পর ছোট ননদ স্কুলের পারিতোষিক বিতরণীতে আবৃত্তি করবে। তার নাকি একখানা বেনারসী শাড়ী চাই। বৌদি কি আর করেন, বহু যত্নে তুলে রাখা বিয়ের দেড়শো টাকা দামের শাড়ীখানি গোমড়া মুখ ননদের হাতে হাসিমুখে তুলে দিয়ে কর্ত্তব্য সাধন করেন। ছোট ননদ খুব খুশী। এমন বৌদি কয়জনের হয়। এর পর আসা যাক চাকরদের ব্যাপারে, এখানেও আধিপত্য চাই। হয়ত কোনও দিন রান্নাঘরে গিয়ে দেখ্‌লেন অক্লান্ত পরিশ্রম করে ভৃত্য পঞ্চু ও ঠাকুর তেওয়ারী একরাশ ভাত ও অবশিষ্ট সামান্য তরকারী নিয়ে বসেছে খেতে। বৌমা গিয়ে বল্লেন—আহা, তোমাদের জন্য কিছুই নেই দেখ্‌ছি, খাবে কি দিয়ে? বৌটি ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে কলা বের করে আনেন, দুধের কড়া থেকে একটু দুধ ঢেলে আনেন কিংবা একটু আচার অন্ততঃ একটু তেঁতুল আর গুড় এনে ওদের সামনে ধরেন, "নাও খাও। আমাকে বল্লেও তো পারতে, আজ তোমাদের জন্য কিছুই নেই।" কৃতজ্ঞতায় ভৃত্য ও ঠাকুরের মন গলে যায়। আহা রূপে গুণে যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী আমাদের এই নূতন বৌমা। এই তো গেল পরিজনদের কথা। এবারে দেখা যাক—বৌটির স্বামী কি বলেন, ভদ্রলোকের ভয়ানক সন্দেহ-বাতিক। বৌকে ভালোবাসেন যথেষ্টই, কিন্তু ব্যারামের মত ঐ দুর্ব্বলতা। সুন্দরী বৌ—কে কোন দিক থেকে বৌটির মন কেড়ে নেবে সেই ভয়েই বেচারা অস্থির। বাড়ীতে গুরুজনেরা রয়েছেন তাই বৌয়ের উপর কর্ত্তৃত্ব করারও তেমন সুবিধে হয় না। গোপনে গোপনে মনে দারুণ অস্বস্তির যন্ত্রণা পান। এক্ষেত্রে বৌটিকে তার মন জুগিয়ে চলতে হয়, আবার গুরুজনদেরও অবহেলা করা চলে না। শাশুড়ী এসে বল্লেন—"বৌমা এখানে নূতন সার্কাস এসেছে, আমার ইচ্ছে তোমাকে নিয়ে দেখতে যাই। তুমি তো কোথায়ও বেরোও না, চল, কাল ও বাড়ীর খোকার মা তাঁর বৌদের নিয়ে যাচ্ছেন এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে।" বৌটি শাশুড়ীর ইচ্ছায় বাধা দেয় না, বলে, "হ্যাঁ মা, আপনার সঙ্গে কোথায়ও যেতে আমার খুব ভাল লাগে।" "বেশ তো? বেশ। কি মজাই না হবে। অনেক দিন সার্কাস দেখিনি।" শাশুড়ী

হাসেন, সত্যি বৌটি একেবারে ছেলেমানুষ। কিন্তু রাত্রি যত গভীর হয়ে আসে ততই বৌটির মনের কোণে অস্বস্তি জমে ওঠে। অনুমতি পাবো, কিনা। রাত্রির অন্ধকারে চুপি চুপি স্বামীর অন্তরঙ্গ হয়ে আসে বৌটি। অনেক কথাবার্ত্তার পর বলে, "এখানে সার্কাস এসেছে জানো?" "হ্যাঁ, কেন বলো তো? যাবে নাকি তুমি?" কৌতূহল প্রকাশ করেন স্বামী। "হ্যাঁ, মা বল্‌ছিলেন, ওঁর সঙ্গে যাওয়ার কথা, কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞেস না করে তো কোথাও যেতে পারি না।" অনেকটা অনুমতি ভিক্ষার ছলে বল্লেন বৌটি। স্বামীটিও মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করলেন, বল্লেন "যেতে চাও যাও, কিন্তু জানোই তো এই ভীড়ে তোমাকে যেতে দেখলে আমার ভাল লাগবে না।" বৌটির স্বামীর মনের কথা বুঝতে দেরী হয় না, অতএব ঐখানেই যবনিকা টেনে দিয়ে বল্লেন, "আচ্ছা, যাওয়ার সময় যাওয়ার কথা ভাবা যাবে, এখন ঘুমিয়ে নেওয়া যাক কি বলো!"

পরের দিন যথাসময়ে শাশুড়ী কাপড় পাল্‌টে নিয়ে আসেন বৌমার ঘরে, কিন্তু এ কি—বৌমা অনবরত মাথায় "ওডিকোলন" দিচ্ছেন, আর বিছানার উপর এপাশ ওপাশ করছেন, "কি হলো বৌমা?" ব্যগ্রতা নিয়ে প্রশ্ন করেন শাশুড়ী। "কিছু নয় মা, আমার আগের (মানে বিয়ের আগের) সেই মাথা ব্যথাটা হয়েছে। "ওডিকোলন" দিচ্ছি সেরে যাবে।" শাশুড়ী বল্লেন "আহা তাহলে তোমার যাওয়া হোলো না, অথচ ওদের কথা দিয়েছি না গিয়েও পারছি না।" বৌমা ব্যস্ত হয়ে বল্লেন—"না মা আপনি যান, আমার বরাত মন্দ তাই আপনার সঙ্গে যাওয়া হলো না।" খানিকটা আফশোষ করে গন্তব্য পথে রওনা হন শাশুড়ী।

এ ভাবেই বুদ্ধিমতী মেয়েরা দুদিক রক্ষা করে চলতে পারেন। যে মেয়ে অপরের মনস্তত্ব বুঝতে যতো পটু হন তিনি তত আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করতে পারেন। এতে দাসীত্বের গ্লানি নেই, আছে শুধু সহিষ্ণুতা পরিশ্রম এবং বুদ্ধি কৌশলের অপরিসীম আনন্দ।

নারী-জীবনের আদর্শ

শ্রীসবিতা চৌধুরী

চরিত্র গ'ড়ে তুলতে হ'লে একটি আদর্শকে অবলম্বন বা অনুসরণ করতে হয়। আদর্শ-হীন জীবন যেন নিরুদ্দেশ পথের যাত্রী। জীবনকে উপলব্ধি করতে গেলে তাকে নিজের আয়ত্তের মধ্যে সংযত এবং সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে। এই সমৃদ্ধি আসবে সেই আদর্শের অনুপ্রেরণা থেকে। আদর্শ কেউ নিজের মা, ঠাকুরমা বা দিদিমাদের মধ্যেও পেতে পারেন, কেউ কেউ হয় ত উন্নততর কোনও বিখ্যাত নারীর জীবন থেকেও পেতে পারেন। এটা নির্ভর করে প্রত্যেকের নিজের মানসিক রুচিবোধের উপর।

শিল্পীর ছাঁচের ওপর যেমন প্রতিমার সৌন্দর্য্য নির্ভর করে, তেমনি চারিত্রিক মাধুর্য্য এবং জীবনের উন্নয়ন সবই নির্ভর করে মানুষের মনের আদর্শের উপর। ভাল-মন্দ বিচার করে যাঁরা যত নিখুঁৎ আদর্শ গ্রহণ করতে পারবেন, তাঁরা জীবনে ততই সাফল্য লাভ করতে পারবেন। জীবনটাকে একটা বাঁধা-ধরা নিয়ম-কানুনের মধ্যে না আনলে বা আদর্শের কাঠামোর মধ্যে না ফেলতে পারলে অনেক অশান্তি বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে জীবনে।

আজকাল অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় মেয়েরা লেখাপড়া শিখছেন, রীতিমত উচ্চ-শিক্ষা লাভ করছেন, কিন্তু জীবনের কোনও স্থির লক্ষ্য নিয়ে চ'লছেন না। উচ্চশিক্ষিতা বা শিক্ষাহীনা প্রায় সকলের মুখেই এক কথা শুনি, "বিয়ে করব না।" কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায়—তাঁদের মধ্যে শতকরা নব্বুই জনই চাকরী ছেড়ে বা চাকরী নিয়েই বিয়ে ক'রে বসছেন। তা'ও আবার জীবনের ৣ অংশ কাটিয়ে দেবার পর। এইভাবে বিয়ে করে সংসারী হ'য়ে তাঁরা সামাজিক বা সাংসারিক কল্যাণের কাজ কতটা করে থাকেন? বাঙ্গালী স্বল্পায়ু, কাজেই বেশী বয়সে সন্তান হ'লে তাদের মানুষ করে তোলার দায়িত্ব তাঁরা কতটুকু পালন ক'রতে পারেন?

একটা স্থির-লক্ষ্য নিয়ে জীবন শুরু করা ভাল। নানা দিকে মনকে বিক্ষিপ্ত ক'রে ছড়িয়ে দিলে মনের শান্তি নষ্ট হয়। নিজের অশান্তি তখন পারিপার্শ্বিক সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করে—এবং সবার শান্তি-ভঙ্গের কারণ হয়।

সংসারের দুর্য্যোগে যখন মন হ'য়ে পড়ে বিভ্রান্ত, তখন আদর্শের অনুপ্রেরণা মনে এনে দেয় শক্তি। যেন, দিক্‌ভ্রান্ত নাবিককে ধ্রুবতারা আলো দেখায় পথ।

সেকালে ছোট ছোট মেয়েদের বিয়ে হ'ত, বুদ্ধি পরিণত হবার আগেই তাঁদেরকে সংসারের পরীক্ষাগারে প্রবেশ করতে হ'ত। এ ক্ষেত্রে তাঁরা শক্তি পেতেন কোথা থেকে? তাঁদের মধ্যে সুমাতা বা সুগৃহিণীর অভাব ছিল না!

শিশুকাল থেকে তাঁরা মা ঠাকুরমার কাছে সীতা, সাবিত্রী এবং দময়ন্তীর উপাখ্যান শুনেছেন। বার-ব্রত, পুজো-পার্ব্বণের মধ্যেও আদর্শ-নারীর জীবন কেমন হওয়া উচিৎ—সে-বিষয়ে অল্প-বিস্তর শিক্ষা পেয়ে এসেছেন। তা' ছাড়া সংসারে কী ভাবে চললে লোকের প্রশংসা অর্জ্জন করা যায়, কী কারণে লোকের নিন্দাভাজন হ'তে হয়, এ-সব বিষয়ে তাঁরা ছোট্ট জীবনেও অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রে আসতেন! শ্বশুর-বাড়ীতে এসে তাঁরা শ্বশুর শাশুড়ীকে বাবা মার মতই মনে ক'রে নিতেন অতি সহজে। কাজেই যা কিছু ভুল-ত্রুটি সহজভাবে মেনে নিতে বা সংশোধন করিয়ে নিতে তাঁদের বেগ পেতে হ'ত না।

তাঁরা রামায়ণ মহাভারত থেকে মোটামুটি নারীর আদর্শ বিষয়ে শিক্ষা লাভ ক'রে আসতেন। ব্রত-পূজার মাধ্যমে তারা প্রার্থনার ছলে বলতেন, "দশরথের মত শ্বশুর পাব…লক্ষণের মত দেওর পাব…সীতার মত সতী হব, শিবের মত পতি পাব…দ্রৌপদির মত রাঁধুনী হব…ইত্যাদি।"

এই সব প্রার্থনার মধ্যে তাঁরা সন্ধান পেতেন নারী জীবনের আদর্শের। সীতার মত সহিষ্ণুতা, পাতিব্রত্য—শিবের ঘরণীর মত স্বামী সৌভাগ্যে ভাগ্যবতী হওয়া, দ্রৌপদীর মত রন্ধনে নিপুণতা লাভ করা—এই সবই ছিল তাঁদের জীবনের প্রেরণা শক্তি। শত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও এই শক্তি তাঁদের মনে এনে দিত ভরসা, তাঁরা ভেঙ্গে পড়তেন না।

আধুনিক নারী-জীবনে সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী ছাড়াও আদর্শ বা অনুসরণীয় নারী-জীবনের দৃষ্টান্ত যথেষ্ট আছে। কিন্তু আমার মনে হয়, এ-সব মেয়েদের মনে তেমন নিষ্ঠা নেই। চিত্তের একাগ্রতাকেই নিষ্ঠা বলে। এই নিষ্ঠা না থাকলে আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা বা আকর্ষণ কিছুই আসে না।

বর্ত্তমানের নারীরা যত উচ্চশিক্ষিতাই হন না কেন, তাঁদের নিজস্ব রুচি অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট পথ বেছে নিয়ে চলতে হ'বে এবং সে-পথ যে কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট পথ হওয়া চাই। সে পথে তাঁদের জীবন সার্থকতা লাভ করবেই। সে পথ হ'তে পারে আদর্শ-জননীর, আদর্শ জায়ার, কিংবা আদর্শ সমাজ সেবিকার এবং এর থেকেই আসবে, সংসার, সমাজ এবং দেশের কল্যাণ!

উলের প্যাটার্ন

কুমারী গী[illegible]ণী ঘোষ

তেঁতুলপাতা প্যাটার্ন

এই প্যাটার্নটি করিতে ৯ ঘর হিসাবে ঘর লইতে হইবে। তিনটি কাঁটা লাগিবে।

১ম লাইন—"২ উল্টা ৭ সোজা" এইভাবে শেষ পর্য্যন্ত বুনিতে হইবে।

২য় লাইন—"২ সোজা, ২ উল্টা, ১ উল্টা (কাঁটায় পশম ২ বার জড়াইয়া), ১ উল্টা, ১ উল্টা (কাঁটায় পশম ২ বার জড়াইয়া) ২ উল্টা।"

৩য় লাইন—"২ উল্টা, ২টি ঘর অপর কাঁটায় তুলিয়া পিছনে রাখিতে হইবে, এইবার কাঁটায় দুইবার জড়ান ঘরটি কাঁটা হইতে ফেলিয়া দিলে একটি বড় ঘর হইবে, তখন এইটি সোজাভাবে বুনিতে হইবে। আবার ১ সোজা। এবারে জড়ান ঘরটি অপর কাঁটায় তুলিয়া সামনে রাখিয়া দিয়া পরের ২ ঘর সোজা। এইবার জড়ান ঘরটি পূর্ব্বের মত খুলিয়া সোজাভাবে বুনিতে হইবে।"

৪র্থ লাইন—"২ সোজা ৭ উল্টা।"

৫ম লাইন—"২ উল্টা ৭ সোজা।"

৬ষ্ঠ লাইন—২য় লাইনের ন্যায়।

আঁশ প্যাটার্ন

এই প্যাটার্নটিতে তিনটি কাঁটা লাগিবে। ১৩টি ঘর উঠিয়ে এইভাবে বুনিতে হইবে।

১ম লাইন—১ উল্টা সব সোজা।

২য় লাইন—১ সোজা সব উল্টা।

৩য় লাইন—১ উল্টা, ইহার পর সব সোজা এইভাবে বুনিতে হইবে—"২ ঘর অপর কাঁটায় তুলিয়া পিছনে রাখিয়া ১ ঘর বুনিয়া লইয়া তোলা ২ ঘর বুনিতে হইবে। এবার ১ ঘর অপর কাঁটায় তুলিয়া সামনে রাখিয়া ২ ঘর বুনিয়া তোলা ১ ঘর বুনিতে হইবে।"

৪র্থ ও ৬ষ্ঠ লাইন—২য় লাইনের ন্যায়।

৫ম লাইন—১ম লাইনের ন্যায়।

৭ম লাইন—১ উল্টা, সব সোজা এইভাবে—১ ঘর অপর কাঁটায় তুলিয়া সামনে রাখিয়া ২ ঘর বুনিয়া ঐ ঘরটি বুনিতে হইবে। ২ ঘর অপর কাঁটায় তুলিয়া পিছনে রাখিয়া ১ ঘর বুনিয়া ঐ ২ ঘর বুনিতে হইবে।

প্রথম প্যাটার্নটি ফ্রকের উপরে এবং দ্বিতীয়টি সোয়েটারে করিলে ভাল হয়।



পাট ও পীঠ

শ্রীচন্দন গুপ্ত

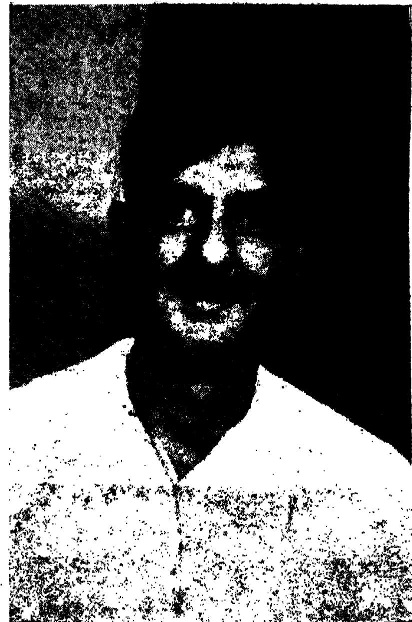
তথ্য ও বেতার-মন্ত্রী ডাঃ বি, ভি, কেশকারের পক্ষ হইতে সম্প্রতি সংসদে প্রদত্ত এক বিবৃতি হইতে জানা যায় যে, ভারত সরকার ন্যাশনাল ফিল্ম বোর্ড বা জাতীয় চলচ্চিত্র পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিষদের অধীনে একটী চলচ্চিত্র শিক্ষালয় বা ফিল্ম ইনিষ্টিটিউট এবং ফিল্ম প্রডাকসন্ ব্যুরো বা চলচ্চিত্র উৎপাদন সংস্থা স্থাপিত হইবে। মূলতঃ চলচ্চিত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন এবং প্রাদেশিক ফিল্ম সেন্সর অফিসগুলির পরিচালনা করিবেন। চলচ্চিত্রের সংলাপ, কাহিনী, দৃশ্যাবলী এবং ব্যয় প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে এই পরিষদ চলচ্চিত্র উৎপাদনকারীদের পরামর্শ প্রদান করিবেন। এই পরিষদের অধীনে একটি গ্রন্থাগার এবং একটি গবেষণাগার থাকিবে। প্রয়োজনানুসারে পরিষদ উপদেষ্টার কাজ করিবেন। পরিষদের অধীনস্থ চলচ্চিত্র শিক্ষালয়ে প্রযোজনা, আলোক-চিত্র, শব্দ-নিয়ন্ত্রণ, সম্পাদনা এবং উৎপাদনের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকিবে। প্রতিবারে ছয়জন করিয়া শিক্ষার্থী গ্রহণ করা হইবে। পরিচালনা, আলোক-চিত্র ও শব্দ-গ্রহণ প্রত্যেক বিভাগে দুইজন করিয়া শিক্ষার্থী গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

*　　*　　*　　*

এই বৎসরের শেষের দিকে দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সঙ্গীত নাটক একাডেমীর উদ্যোগে যে নাট্যোৎসবের আয়োজন হইতেছে, তাহাতে এ পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ৪৫০টী আবেদন পত্র পাওয়া গিয়াছে। তেলেগু ভাষায় অভিনয়ের জন্য ২৩৪টি, মারাঠি—৮২, হিন্দী—৩৫, কানাড়ী—২৭, গুজরাঠি—২০, তামিল—১২, ওড়িয়া—১২, এ ছাড়া কাশ্মীর, পাঞ্জাবী, মালয়ী ও সংস্কৃত ভাষায় ১০টির কম করিয়া আবেদন পত্র আসিয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বাংলা দেশে যেখানে নাট্যচর্চ্চা অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় সমধিক, সেখান হইতে মাত্র ১৮টি আবেদন পত্র আসিয়াছে। সারা ভারতের মধ্যে একমাত্র বাঙলা দেশেই দীর্ঘকাল ধরিয়া পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ ও যাত্রার দলগুলি একদিকে যেমন নাট্য-সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিয়াছে, অপরদিকে তেমনি নাট্যকলার পুষ্টিসাধনে সর্ব্ববিধ চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। বাংলার নাট্য-সাহিত্য, নাট-মঞ্চ ও অভিনেতৃগোষ্ঠী আজিও সারা ভারতের গৌরবস্থল। নাটক অভিনয়ের দ্বারা বাঙ্গালা-বাঙ্গালী বহুদিন হইতে তাহাদের কৃষ্টি-সাধনার কথা প্রচার করিয়া আসিয়াছে। আজ প্রতিযোগিতায় পরাঙ্মুখতার কারণ বোধহয়, ঐতিহ্যের মানদণ্ডকে তাঁহারা নমিত করিতে নারাজ। একাডেমী যেভাবে নাট্যোৎসবের আয়োজন করিতেছেন, তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত বোধহয় বাংলার প্রতিযোগীর সংখ্যা ১৮টীর উর্দ্ধে যাইবে না।

*　　*　　*　　*

গত ১৮শে জুন সোমবার রূপ-মঞ্চ কার্য্যালয়ে শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে চিত্র-সাংবাদিক ও শিল্পীগণের



শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

এক সভায় প্রবীণ সাংবাদিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা' সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ মহাশয়কে সম্বর্দ্ধনা জানান হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন, নাট্যকার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। শ্রীযুক্ত ঘোষ অভিনন্দনের উত্তরে বলেন—"শিল্পীদের আমি আন্তরিক ভালবাসি। কারণ, দুঃখকষ্টের জগতে এঁরা আমাদের যেমন আনন্দ দান করেন অন্য দিকে তেমনি এঁরা আমাদের নানা শিক্ষাও দিয়ে থাকেন। অনেকে মনে করেন, এঁরা খুব সুখী। কিন্তু মানুষকে এঁরা আনন্দ দিয়ে নিজেরাও কম দুঃখ ভোগ করেন না। এঁদের জীবনেও অজস্র দুঃখ আছে। অভাব অভিযোগও আছে। আমি তাঁদের চিনেছি বলেই যখনই তাঁদের কিছুমাত্র উপকার করার সুযোগ পেয়েছি, করেছি। দুস্থ শিল্পীদের সাহায্যানুষ্ঠানে যখনই ডাক দিয়েছেন—যোগ দিয়েছি।"

*　　*　　*　　*

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ফিল্ম সেন্সর বোর্ড ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩ হইতে জানুয়ারী, ৫৪ পর্য্যন্ত ২,৩৯১খানি ছবি পরীক্ষা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে ৭৩খানি ছবি রিভাইজিং কমিটি কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণের প্রদর্শনযোগ্য বলে বিবেচিত ২,৩৩৮ এবং কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের নিকট প্রদর্শনযোগ্য ২৮খানি ছবি ছাড়পত্র পাইয়াছে। মোট ২,৩৬৪খানি ছবি সর্ব্বসমেত সেন্সর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়াছে। ৩৮১খানি ছবি ছাঁট্‌কাটের পর প্রদর্শনযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। ৯২,১৮০ ফুট বিভিন্ন ছবির বিভিন্ন অংশ হইতে কাটিয়া বাদ দেওয়া হইয়াছে। বর্জ্জিত অংশের মোট দৈর্ঘ্যের পরিমাণ প্রায় একখানি পুরা ছবির দৈর্ঘ্যেরই অনুরূপ। প্রযোজক, কেন্দ্রীয় সেন্সর বোর্ড ও জনসাধারণের কাছ হইতে আবেদন আসায় সেন্সর আইনের ২৬ ধারার ৯(ক) উপধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারকে ১৯খানি ছবি রি-সেন্সর বা পুনরায় পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইয়াছে। ১টি ছবির সম্বন্ধে সেন্সর বোর্ড যে নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন তাহা সংশোধিত হয় এবং ৭খানি ছবির আবেদন অগ্রাহ্য করা হয়। অংশ বিশেষ বাদ দিয়া ৫খানি ছবিকে সেন্সর সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। রিভাইজিং কমিটি কর্ত্তৃক ৫খানি ছবি পরীক্ষিত হয়। ইহার মধ্যে একখানি ছবি সর্ব্বসাধারণের প্রদর্শন-যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হওয়ার পর পুনঃ পরীক্ষায় উহা কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য বলিয়া সার্টিফিকেট লাভ করে। ৭৪৭খানি ছবি শিক্ষামূলক হিসাবে অনুমোদন লাভ করে। আলোচ্য বৎসরে ১৪২৯খানি ছবিকে পুনরায় অনুমোদন করার জন্য আবেদন আসে। তন্মধ্যে ১০৬০খানি ছবিকে পরীক্ষা না করিয়াই অনুমোদনপত্র দেওয়া হইয়াছে। ১২খানি ছবি পরীক্ষা করিবার পর কিছু কিছু অংশ বাদ দিয়া অনুমোদন লাভ করে। ২খানি ছবি অনুমোদন লাভের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

*　　*　　*　　*

নয়া-দিল্লী প্রবাসী সাহিত্যিক শ্রীদেবেশ দাশের অষ্টম-বর্ষীয়া কন্যা কুমারী অনুরাধা কথকনৃত্যে পারদর্শিতা দেখাইয়া বাংলার বাহিরে বাঙ্গালীর নাম উজ্জ্বল করিতেছে। গত বৎসর জয়পুরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে



কুমারী অনুরাধা দাশ

প্রদর্শিত তাহার নৃত্য ভারত সরকারের ফিল্মস্ ডিভিসন কর্ত্তৃক চলচ্চিত্রে তুলিয়া সমগ্র ভারতে ১৯৫৩ সালের শ্রেষ্ঠ ঘটনাবলির একটি বলিয়া ডকুমেণ্টারি ফিল্মে সর্বত্র

প্রচারিত হইয়াছে। কোরিয়া হইতে ভারতীয় কাষ্টোডিয়ান সেনাদল প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাহাদিগকে দিল্লীতে যে নাগরিক অভ্যর্থনা দেওয়া হয়, তাহাতে বাঙ্গালী শিল্পীগণের মধ্যে এক কুমারী অনুরাধাকেই অংশ গ্রহণ করিতে নিমন্ত্রণ করা হয়।

সম্প্রতি কলিকাতায় অনুরাধা দুরূহ ঝাপতালে তাহার নিখুঁত, তাললয়পূর্ণ এই নৃত্য প্রদর্শন করিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছে।

* * * *

উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর ব্রিটেনের সিনেমা শিল্পের পক্ষে অত্যন্ত দুর্দ্দিন গিয়াছে। বর্ত্তমানে সেখানে নাকি সুদিনের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ১৯৩৯ সালে সেখানে ৯৯ কোটি লোক সিনেমা দেখিয়াছিল কিন্তু ১৯৫৩ সালে সেখানে ১২৮ কোটি ৪০ লক্ষ লোক নাকি সিনেমা দেখিয়াছে। খ্যাতনামা শিল্পী সমন্বয়ে যে সকল ছবি তোলা হইয়াছে, সেই সকল ছবিতেই বিশেষ করিয়া দর্শকদের ভীড় হইয়াছে। বড় বড় চিত্র-প্রদর্শনকারী বা ছবিঘরের মালিকেরা বেশ মোটা রকমের মুনফা করিয়াছে। ব্রিটেনে কিছুদিন হইতে আমেরিকান ছবিগুলি যথেষ্ট প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল। এখন কিন্তু ধীরে ধীরে সে প্রাধান্য কমিয়া আসিতেছে ও ব্রিটীশ ফিল্ম যথাযোগ্য সমাদর ও মর্য্যাদালাভে সমর্থ হইতেছে। পূর্ব্বে ব্রিটেনে শতকরা ৮০ ভাগ আমেরিকান ছবি দেখান হইত। এখন সেই স্থলে শতকরা ৬৬ ভাগ আমেরিকান ছবি দেখান হইতেছে। একদিকে ব্রিটীশ ফিল্মের আয়ের পরিমাণ যেমন শতকরা ৩৲ টাকা বাড়িয়াছে, অপরদিকে আমেরিকান ফিল্মের আয়ের পরিমাণ শতকরা ৫৲ টাকা কমিয়াছে।

স্মৃতি-কথা

অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায় এম-এ-এফ, এন-আই

১০ বছর অতীত হতে চলল আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র চিরকালের জন্য বাংলাদেশ হ'তে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। বৎসরের পর' বৎসর আমরা তাঁর মৃত্যুতিথিতে তাঁর বরণীয় স্মৃতির উপাসনা করতে এবং তাঁর আত্মার উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে সম্মিলিত হয়ে আসছি। গুরুর স্মৃতি তর্পণে শিষ্যের ডাক পড়লে তা কোন কালেই উপেক্ষা করা চলে না। নতুবা এ দায়িত্ব গ্রহণে আমার অধিকার আছে মনে করি না। এককালে পাঠ্যাবস্থায় মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ কাব্য পড়তে হয়েছিল; এই উপলক্ষে তার প্রথম শ্লোকটি আমার মনে পড়ছে। রঘুবংশের প্রারম্ভেই কবি লিখছেন:

ক সূর্য্য প্রভবো বংশ ক চাল্পবিষয়ামতিঃ
তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুডুপেনাস্মি সাগরম্॥

অর্থাৎ সূর্য্যবংশ হল কত মহান এবং শক্তিমান, আর তিনি লেখক হলেন কত অল্পমতিসম্পন্ন ব্যক্তি; তাঁর পক্ষে সূর্য্যবংশের বর্ণনা করবার প্রয়াস হচ্ছে—ভেলায় চেপে সমুদ্র পার হবার চেষ্টার অনুরূপ। কালিদাসের পক্ষে এরূপ উক্তি অতিরিক্ত বিনয় প্রকাশের পরিচয় সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার পক্ষে আপনাদের নিকট আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনীর সমালোচনা করতে গেলে এক্ষেত্রে কালিদাসের উক্তিটি যে বাস্তব ও খাঁটি সত্যে পরিণত হবে সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। কেন না আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের আদর্শের ও আমাদের বর্তমান জীবন যাত্রার আদর্শের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে তাকে মহাসাগরের ব্যবধানের সঙ্গে তুলনা করলে হয়ত বিশেষ অত্যুক্তি হবে না।

এ প্রসঙ্গে আমার মনে আরো একটি সমস্যার উদয় হচ্ছে। পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধতর্পণের মত এ সাম্বৎসরিক স্মৃতি তর্পণের সার্থকতা কোথায়, এ সম্বন্ধে হয়তো অনেকেরই কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। কেউ কেউ হয়ত মনে করেন এ শুধু একটা মামুলী ব্যাপার ও বাহিক আড়ম্বর। আমাদের বেশীর ভাগ অনুষ্ঠানেই সহৃদয়তা ও আন্তরিকতার এত অভাব ও মৌখিকতা এবং গতানুগতিকতার এত প্রভাব যে এরূপ মনে করা কিছুই অস্বাভাবিক নয়। মহৎ ব্যক্তিদের জয়ন্তী ও স্মৃতি বার্ষিকীর অনুষ্ঠানগুলি যে উৎসব হিসাবে গণ্য হয় না, কিংবা জাতীয় বা আত্মগৌরবের বিজ্ঞাপন হিসাবে প্রচারিত হয় না, এ প্রমাণ করা সত্যই দুষ্কর। এতে পূজিতের কোন প্রীতি উৎপাদন হয় কিনা জানি না, তথাপি এরূপ সাম্বৎসরিক স্মৃতি পূজার অনুষ্ঠানে যে আমাদের আত্মোন্নতি বিধানের একটি প্রকৃষ্ট উপায় রয়েছে একথা অস্বীকার করা চলে না। সত্য বটে, এরূপ সাময়িক ক্ষণস্থায়ী আলোচনায় বক্তা, উদ্যোক্তা এবং শ্রোতাদের মনে বিশেষ কোন নৈতিক বা আধ্যাত্মিক প্রভাবের সৃষ্টি না হতে পারে, কিন্তু 'মরা মরা' বলে অবশেষে রাম নাম উচ্চারণ করে উদ্ধার

লাভ করার নজীর আমাদেরই শাস্ত্রে রয়েছে। সুতরাং মহাপুরুষদের নাম কীর্ত্তন ও জীবনী আলোচনার যে যথেষ্ট সার্থকতা আছে এ নিয়ে আর প্রতিবাদ করা চলে না।

প্রথমেই বলেছি, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন যাত্রার আদর্শে ও আমাদের জীবন যাত্রার আদর্শের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যবধান কিসের? আমাদের জীবনের আদর্শ বা প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে একমাত্র যেন তেন প্রকারেণ জীবিকা অর্জ্জন। এ জীবিকা-অর্জ্জনের প্রচেষ্টায় অনেকক্ষেত্রে যে সব পন্থা আমরা অবলম্বন করি তা অর্থনীতির অনুযায়ী হলেও সব সময়ে ধর্ম্মনীতি সম্মত হয় না। দেহ-রক্ষা ও প্রাণধারণের প্রয়োজনে জীবিকা অর্জ্জন অপরিহার্য্য, একথা মানতে হবে; কিন্তু এ প্রয়োজনের কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা আমরা গড়তে চাই না। ফলে, আমাদের সমগ্র জীবনব্যাপী চলেছে এ জীবিকা-অর্জ্জনের জন্য এক বিরামবিহীন সংগ্রাম এবং ছুটোছুটি। এই প্রাণধারণের বা আত্মরক্ষার প্রয়োজন মানুষ আর পশু উভয়ের পক্ষে সমান। কিন্তু পশুর প্রয়োজন যেখানে থাকে সীমাবদ্ধ, মানুষের প্রয়োজন সেখানে যায় সকল সীমার বাঁধন ছাড়িয়ে। একেই বলা হয় মানুষের স্বার্থবৃত্তি বা স্বার্থবুদ্ধি। এরই ফলে আজ পৃথিবীব্যাপী মানুষের স্বার্থে স্বার্থে লেগেছে সংঘাত, লোভে লোভে বেড়ে চলেছে প্রবল সংগ্রাম, দেশে দেশে জেগে উঠেছে এক আসুরিক শক্তির নির্লজ্জ ও নিষ্ঠুর আস্ফালন। এই হচ্ছে আমাদের আধুনিক জীবন যাত্রার নমুনা।

প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের আদর্শ ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি তাঁর প্রয়োজনকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে তাঁর স্বার্থবৃত্তি বা স্বার্থবুদ্ধিকে পরার্থবৃত্তি বা ধর্ম্ম বুদ্ধির প্রভাবে পরাভূত করে রেখেছিলেন। তাই জীবিকা অর্জ্জন ছিল তাঁর জীবন যাত্রার একটি ক্ষুদ্র অঙ্গবিশেষ—তিনি আপন নিজস্বকে পরের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বিলীন করে দিয়েছিলেন; তাই তাঁর স্বার্থ পরিণতি লাভ করেছিল পরার্থে। পরের দুঃখদৈন্যকে আপন দুঃখদৈন্যে তিনি বরণ করে নিয়েছিলেন; নিজের খণ্ড ব্যক্তিত্বকে দেশবাসী সকল দীন দরিদ্রের মধ্যে বিলীন করে এক অখণ্ড ব্যক্তিত্বের অপরূপ অনুভূতি লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। যাকে আমাদের শাস্ত্রে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলে গেছে, সে জ্ঞানের সন্ধান পেয়েছিলেন তিনি;

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধিসাত্ত্বিকম্॥

এতেই ছিল তার মহত্ত্ব এবং মনুষ্যত্ব। তাই দেখেছি নিজের সুখ সুবিধার জন্য সামান্য মাত্র ব্যয়েও তিনি কুণ্ঠিত হতেন বা কৃপণতার পরিচয় দিতেন; অথচ পরের জন্য অকাতরে দানকরা ছিল তাঁর পক্ষে খুব সহজ এবং স্বাভাবিক। আপন মাপকাঠিতে নির্দ্দিষ্ট নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সামান্য মাত্র ব্যয়কে ও দরিদ্রকে বঞ্চনা বা চুরির সামিল বলে তিনি গণ্য করতেন। তাই নিজের শোবার বা বসবার ঘরে বৈদ্যুতিক পাখা ব্যবহার করতে তাঁকে কখনো দেখিনি— দারুণ গ্রীষ্মের সময়েও। সহজ সরল গরীব বাঙ্গালীর পোষাককে করেছিলেন তিনি নিজের অঙ্গভূষণ। এর ফলে অনেক সময়ে তাঁকে অনেক জায়গায় যে লাঞ্ছনা পেতে হয়েছিল তা তিনি নির্ব্বিকারচিত্তে উপেক্ষা করেছেন। এমন কি তা নিয়ে আমোদ বা রসিকতা করাই ছিল তাঁর অভ্যাস। এমন কয়েকটি ঘটনার কথা আমি পরে বলব।

প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে আমাদের আর একটি গুরুতর ব্যবধানের এখানে উল্লেখ করব। সে হচ্ছে—আমরা সংসারের পথে সাধারণতঃ চলাফেরা করি নানারকম মুখোস পরে, সে ইচ্ছা করেই হোক বা অবস্থার বিপর্য্যয়ে পড়েই হোক। ফলে আমাদের আসল মানুষটি ঢাকা পড়ে থাকে কৃত্রিমতার আবরণে। সাজে গোজে, চালে চলনে, আলাপে পরিচয়ে, নানা ছদ্মবেশে আমরা চেষ্টা করি নিজেকে বাড়িয়ে তুলতে। ঘরে বাইরে তাই আমাদের খাঁটি মানুষটি থাকে সদাসর্ব্বদা আড়ালে; তার দেখা পায় শুধু জনকয়েক অন্তরঙ্গ বন্ধু। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রের সংস্পর্শে যাঁরা কখনো এসেছেন তাঁরা সবাই স্বীকার করবেন যে এ কৃত্রিমতার ভান হতে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ ভাবে নির্মুক্ত। ছোট বড়, ধনী দরিদ্র, পরিচিত অপরিচিত সকলের কাছেই তিনি ছিলেন অবারিত দ্বার এবং সকলেই তাঁর মধ্যে সেই এক সহজ সরল সাদাসিদে মানুষটির সন্ধান পেত। বাংলাদেশের একজন নামজাদা লোক হয়েও নামের বদনাম কখনো তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাই তাঁর কাছে উপস্থিত হতে কারো কোন ভয়, বিস্ময় বা সঙ্কোচ ছিলনা!

অর্থ, ক্ষমতা এবং পদবী হচ্ছে আমাদের নিকট মনুষ্যত্বের মাপকাঠি। তাই আমরা অশান্ত উত্তেজনায় এদেরই অন্বেষণে দিনরাত ছুটোছুটি করি; সবাই আমরা আজ সুবিধাবাদী ও সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাহীন এবং মিথ্যার আশ্রয়েই আমাদের প্রাত্যহিক জীবন উঠেছে গড়ে। প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন অর্থের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন; নিজের আয়ব্যয়ের হিসাবের ভার তিনি দিতেন তাঁর কোন অনুগত শিষ্যের উপর। ক্ষমতার ব্যবহারে তিনি ছিলেন অনভ্যস্ত; এর ভারও পড়ত তাঁর অধীন সহকর্ম্মীদের উপর। প্রেসিডেন্সী কলেজে যখন তিনি রসায়নের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন, তখন সকল সরকারী কাজকর্ম্মের ভার চাপিয়েছিলেন তাঁর সহকর্ম্মী চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী মহাশয়ের উপর। এ উপলক্ষে রহস্য করে তিনি বলতেন—তাঁর বিবেকবুদ্ধির চাবিকাঠি রয়েছে চন্দ্রবাবুর হেপাজতে। বিজ্ঞানকলেজে ও তাঁর অফিসের কাজ সব করে দিতেন অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র মিত্তির মহাশয়। কর্ত্তাগিরি করা ছিল তাঁর স্বভাবের প্রতিকূল। সেবা এবং ত্যাগ ছিল যাঁর জীবনের ব্রত, অর্থ এবং ক্ষমতা যে তাঁর কাছে হেয় হবে, এ কিছুই অস্বাভাবিক নয়। পদবীর সম্মানও ছিল তাঁর নিকট তুচ্ছ; তাই কোন রাজদরবারে বা উচ্চপদস্থদের সভা-সমিতিতে তাঁকে কখনো উপস্থিত হতে দেখিনি। তিনি ছিলেন সাধারণের লোক; সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ নিয়েই ছিল তাঁর কাজ কারবার। তাই দুর্ভিক্ষে, বন্যায়, ঝড়ে, ভূমিকম্পে, মহামারীতে বা অন্য কোন প্রাকৃতিক উৎপাতে যেখানে সাধারণ মানুষ বিপদগ্রস্ত হয়েছে সেখানেই প্রফুল্লচন্দ্র অগ্রণী হয়েছেন তাদের বিপদ্মুক্ত করতে। এ কারণেই বলেছি আমাদের জীবনযাত্রার আদর্শের ও তাঁর জীবনের আদর্শের মধ্যে রয়েছে এক বিরাট ব্যবধান; স্বার্থের এবং পরার্থের

ব্যবধান ; ভোগের ও ত্যাগের ব্যবধান ; খাঁটি মনুষ্যত্বের এবং তার ছদ্মবেশের ব্যবধান।

আপন শিষ্যদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ছিল মধুর—গভীর শ্রদ্ধা, স্নেহ ও প্রীতির আদান প্রদান। শিষ্যরা ছিল তাঁর নিকট সচিব এবং সখা। শিষ্যদের কৃতিত্বে ছিল তাঁর অপরিসীম আনন্দ। তাই প্রায় সবাইকে তিনি বলতেন—

"সর্ব্বত্র জয়মন্বিষেৎ, পুত্রাদ্ (শিষ্যাদ্) ইচ্ছেৎ পরাজয়ম্"

তাঁর শিষ্যদের মনে তিনি যে কত বড় স্থান অধিকার করে আছেন তা আজ হয়তো কারো অজানা নেই। গুরুশিষ্যের মধ্যে এরূপ গভীর ও মধুর সম্বন্ধ বর্ত্তমান যুগে বিরল বললে অত্যুক্তি হয়না।

প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন বিজ্ঞানী ; রসায়নে ছিল তাঁর অসাধারণ জ্ঞান। অনেকেই জানেন যে বিজ্ঞানের জ্ঞানের দুটো ধারা বা কাণ্ড আছে, সে হচ্ছে তার দার্শনিক ধারা এবং প্রয়োগের ধারা, অথবা বিজ্ঞানের জ্ঞানকাণ্ড এবং কর্ম্মকাণ্ড। এ উভয় কাণ্ডের সমন্বয়েই বিজ্ঞান করে মানুষের প্রকৃত কল্যাণ। কিন্তু বিজ্ঞানের জ্ঞানকে শুধু ধ্যানধারণায় বা গবেষণাগারের চতুর্সীমায় আবদ্ধ করে রাখলে তাতে বিজ্ঞানসেবীর বা মানুষের মনের অন্ধকার ঘুচতে পারে, কিন্তু সমাজের কোন কল্যাণ তাতে বড় ঘটে না। আবার একমাত্র বিজ্ঞানের প্রয়োগ নিয়ে মেতে উঠলে সুখসুবিধার অনেক উপায় মিলে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাতে বিজ্ঞান হয় বিপথগামী। যার ফলে মানুষে মানুষে প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ, এমন কি বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ বিগ্রহের সৃষ্টি হয়ে সমাজ এবং মানুষ চলে অবনতি ও ধ্বংসের পথে। এরই নিদর্শন আজ দেখা দিয়েছে এটম্‌বোমা ও হাইড্রোজেন বোমার বিভীষিকায়। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এ সত্যের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তাই তিনি একদিকে যেমন ভারতীয় রাসায়নিক গোষ্ঠীর সৃষ্টি করে এবং ভারতীয় রাসায়নিক সমিতির প্রতিষ্ঠার পোষকতা করে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের জ্ঞানবিস্তারে অধ্যাপক হিসাবে এবং গবেষক হিসাবে তাঁর অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করে গেছেন, সেরূপ অন্যদিকে শিল্পী হিসাবে বেঙ্গলকেমিকেল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিকেল কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি বিধান করে বিজ্ঞানের জ্ঞানকে প্রয়োগ ও কর্ম্মের পরিণতি দানের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছেন। বাংলার বহুকর্ম্মীর অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে আজ এই বিশাল প্রতিষ্ঠান হতে। বাংলাদেশে প্রফুল্লচন্দ্র এই প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন সন্দেহ নাই।

মানুষের অবমাননাকে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র গুরুতর অপরাধ-বলে গণ্য করতেন। তাই হিন্দু সমাজের জাতিভেদের বিরুদ্ধে ছিল তাঁর প্রবল প্রতিবাদ। অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতি বিধানের ব্যবস্থায় তিনি ছিলেন সকলের অগ্রণী। এ নিয়ে সনাতন-পন্থীদের সঙ্গে এক সময় তাঁর বহু বাদ-প্রতিবাদের সৃষ্টি হয়। আমার মনে পড়ে তখন প্রফুল্লচন্দ্র "বাঙ্গালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন ; সনাতন-পন্থীরা অমনি "পি, সি রায়ের মস্তিষ্কের অপব্যবহার" নাম দিয়ে বঙ্গবাসী পত্রিকায় তার পাল্টা জবাব দেন। এ হচ্ছে মহাত্মাজী প্রবর্ত্তিত অস্পৃশ্যতা নিবারণ আন্দোলনের বহু আগেকার সময়কার—১৯০৭ এবং ১৯০৮ ইংরেজীর কথা—অর্থাৎ প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের সময়। সব চেয়ে মজা হোত এই যে—যখনই তাঁহার বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজের সনাতন-পন্থীরা কোন কাগজে কিছু লিখতেন, তিনি নিজেই সে কাগজখানি হাতে করে লেবরেটরীতে এসে আমাদের ডেকে বলতেন, দেখ্ দেখ্, আমাকে গালাগালি করে এরা কি সব লিখছে। এর জবাব লিখে দিতে হবে।

কোন জিনিষের অপচয় তিনি মোটেই দেখতে পারতেন না। ঘরে পাখা চলছে বা বাতি জ্বলছে অথচ ঘরে লোক নেই, লেবরেটরীতে টেবিলে Burner জ্বেলে রেখে ছেলেরা কোথাও গেছে, কিম্বা কলে অযথা জল পড়ে যাচ্ছে, এ যদি তিনি দেখতে পেতেন তবে আর রক্ষা ছিল না। এমন কি, বিজ্ঞান কলেজে আমি যখন তাঁর অধীনে সহকর্ম্মী হিসাবে অধ্যাপনার কাজ করছি, তখনও এ নিয়ে তার কাছে বহু গালি-গালাজ ও চড়চাপড় খেয়েছি। যদি প্রতিবাদ করতাম—ছেলেরা করছে বা কোন কর্ম্মচারীর অনবধানতায় এ সব ঘটছে, তার জন্য আমাকে দায়ী করছেন কেন? তার ফলে হোত আরো দু এক ঘা বেশী চড়চাপড়ের ব্যবস্থা। উত্তরে তিনি বলতেন—তোমাদেরই তো ছেলে ; তোমাদেরই তো কর্ম্মচারী ; যেমনটি শিক্ষা দিচ্ছ তেমনটিই তো হবে। মনে মনে বলতাম—আচ্ছা কাজীর বিচার বটে ; আমরাই যেন বিজ্ঞান কলেজে রসায়ন বিভাগের কর্ত্তা, তিনি কেউই নন। আসলে অবশ্য বুঝতে পারতাম তাঁর তিরস্কারের ভিতর মানে ছিল। আজ চারদিকে শুনতে পাই এবং ঘটনাতেও ঘটতে দেখি যে স্কুলের কলেজের ছাত্রেরা অত্যন্ত দুর্বিনীত হয়ে উঠেছে। এর জন্য আমরা শিক্ষকেরা ও যে কতকাংশে দায়ী একথা অস্বীকার করা চলে না। আমাদের দেখেইতো ছাত্রেরা শিখবে। আমরা নিজেরা যদি ভাল দৃষ্টান্ত বা শিক্ষা দিতে না পারি, ছাত্রদের কাছ থেকে ভাল ব্যবহার প্রত্যাশা করা নীতিশাস্ত্রের বিধানে লেখে না।

জিনিষপত্রের অপচয় সম্পর্কে তিনি এত সাবধান ছিলেন যে, তার দু'একটি উদাহরণ না দিলে আপনারা এর ধারণা করতে পারবেন না। খামে করে যে সব চিঠি পত্রাদি তাঁর কাছে আসতো তার চিঠির কাগজে যদি কোন পাতা খালি থাকত, সে পাতাগুলি তিনি ছুরি দিয়ে কেটে যত্নের সঙ্গে রেখে দিতেন। তাতেই অনেক সময় তাঁর চিটি লেখার কাজ চলে যেত।

সময়ের অপচয়েও তিনি ছিলেন খুব সতর্ক। যদিও ছোট সবাই তাঁর সঙ্গে নিঃশঙ্কচিত্তে দেখা করতে পারত, তথাপি এর একটা বিশিষ্ট সময় তিনি ধার্য্য করে রাখতেন। প্রাতে ৮টা অবধি ছিল তাঁর লেখা পড়ার সময়। এ সময়ে কেউ যেয়ে তাঁকে বিরক্ত করলে তিনি বিশেষ রুষ্ট হতেন। সেরূপ তাঁর খাওয়া দাওয়ার সময়ও ছিল ঘড়ি বাঁধা। যখন বহুলোক এসে তাঁকে বিশেষ বিরক্ত করে তুলত, তখন অনেক সময় তাঁকে বলতে শুনেছি—"আমাকে সবাই মিলে দেখছি সাধারণের সম্পত্তি বা public property করে তুলেছে।"

সাধারণের মধ্যে তিনি নিজের স্বাতন্ত্র্যকে বিলীন করে দিয়েছিলেন

একথা আগেই বলেছি। সাধারণ বলতে গরীব দুঃখী অল্পবিত্ত লোক। কারণ এরাই হচ্ছে দেশের মধ্যে সংখ্যা প্রধান। তাই তিনি বরণ করে নিয়েছিলেন সাধারণ বাঙ্গালীর পোষাককে নিজের পোষাক রূপে। সে হচ্ছে দেশী ছিটের এবং পরবর্ত্তী কালে খদ্দরের কোট, খাট ধুতি এবং মোটা চাদর। খাটিয়ার উপর গদি বা তোষক পেতে হোত তাঁর শয্যার ব্যবস্থা। এই সরল সাধারণ পোষাক পরিচ্ছদে তিনি সর্ব্বত্র যাতায়াত করতেন। এতে অনেক সময় যে সব ছোট খাট ঘটনা ঘটত তার ইঙ্গিত পূর্ব্বে দিয়েছি। এরূপ দু'একটি ঘটনার কথা এখন বলব। এ সব ছোট ব্যাপারের মধ্যে তাঁর হৃদয়ের মহত্ত্বের পরিচয় আমরা পাই। এক সময়ে কোন এক সরকারী কমিশনের সদস্য হিসাবে Grand Hotel এ ঐ কমিশনের বৈঠকে তাঁর উপস্থিত হবার কথা। স্বর্গীয় ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ও ছিলেন ঐ কমিশনের সদস্য। দুই বন্ধুর মধ্যে স্থির হল যে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র গ্র্যাণ্ড হোটেলের দরজায় সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের জন্য অপেক্ষা করবেন; তারপর উভয়ে একযোগে বৈঠকে যাবেন। বহু উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী ও ছিল ঐ বৈঠকের সদস্য। প্রফুল্লচন্দ্র তার সনাতন সাধারণ বাঙ্গালীর পোষাকে যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে হোটেলের দরজায় সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের জন্য অপেক্ষা করে গাড়ীবারান্দায় পায়চারী করছেন। তাঁর ঐ পোষাক এবং হাতে একটা বিসদৃশ বাঁকা লাঠির প্রতি নজর করে হোটেলের দরোয়ান মনে করল এ কোন বড় সাহেবের বেয়ারা হবে; সাহেবের আগমন প্রতীক্ষা করছে। কৌতুহলবশতঃ সে প্রফুল্লচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করল, "আরে ভায়া, তোমরা সাহেব কব আয়েগা?" প্রফুল্লচন্দ্র ব্যাপার বুঝে মৃদুহাস্যে জবাব দিলেন, 'অভি আয় যায়ে গা। সে আবার প্রশ্ন করল, 'কেতনা তলব মিলতা'?' প্রফুল্লচন্দ্র উত্তর করলেন 'জাস্তি নেই।' এরূপে আলাপ যখন জমে উঠছিল, তখন সর্ব্বাধিকারী মহাশয় এসে তার রসভঙ্গ করলেন। এ কাহিনী আমি তাঁর নিজের মুখে শুনেছি।

আর একবার এরূপ কোন কমিশনের বৈঠকে নীচের তলা হতে উপরে উঠবার জন্য তিনি lift এর বাক্সে ঢুকে দাঁড়িয়েছিলেন। Lift এর boy টি Lift থেকে দিল বের করে; বলল, আরে—এ তোমরা ওয়াস্তে নেই; সাহেব লোগ কা ওয়াস্তে; তোম সিড়ি দেকে উপর চলা যাও। আচার্য্যদেব বিনা বাক্য ব্যয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলেন। কিন্তু এ নিয়ে কর্ত্তৃপক্ষকে বিষম বিব্রত করে তুলেছিলেন। নিজের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের জন্য নয়—জাতির জন্য এবং জাতীয় পোষাকের প্রতি অবজ্ঞার জন্য। তাঁর দুঃখ ছিল, আমাদের নৈতিক অধঃপতন এবং দাস-মনোবৃত্তি এতই বেড়ে উঠেছিল যে আমরা আমাদের নিজের জাতিকে এবং জাতীয় পোষাককে অবমাননা করতে গৌরব বোধ করতাম। আমরা আমাদের দেশীয় পোষাক ধুতি চাদর ছেড়ে হেট-কোট ধরেছি দেখেই যেন তাঁর খাট ধুতি চাদরের উপর অনুরাগ উঠেছিল বেড়ে।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের আহার ছিল খুব পরিমিত—কতকটা তাঁর ক্ষীণস্বাস্থ্যের দরুণ এবং কতকটা চারিদিকের দুঃখদৈন্যের মধ্যে তাঁর নিজের ভোগবিলাসে বিতৃষ্ণার দরুণ। প্রয়োজনাতিরিক্ত আহারে যাদের অনুরাগ তাদের উপর তাঁর বিরাগ ছিল প্রবল। আবার যারা অল্পাহারী বা অল্পাহারী বলে প্রচার করত তাদের তিনি খুব দেখতে পারতেন, বিশেষত যদি তারা পরিশ্রমী ও কাজের লোক হয়। অলস, বহুভাষী এবং কাজে ফাঁকি দেবার যাদের অভ্যাস তাদের তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। আমরা যখন প্রেসীডেন্সী কলেজে তাঁর ছাত্র ছিলাম, তখন আমাদের এক বন্ধু তাঁর সঙ্গে গবেষণা করতেন। কাজ করবার তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা এবং উৎসাহ ছিল। এ কারণে প্রফুল্লচন্দ্র তাঁকে খুব পছন্দ করতেন, তার উপর বন্ধুটি আবার আচার্য্যদেবের সামনে অল্পাহারী বলে পরিচয় দিতেন। আচার্য্যদেব আমাদের উপদেশ দিতেন সে বন্ধুর অনুকরণ করতে; অর্থাৎ কম করে খেতে এবং বেশী করে খাটতে; বামুনের গরুর মত খেতে হবে কম, কিন্তু দুধ দিতে হবে বেশী। বলা বাহুল্য, আসলে আমাদের বন্ধুবর আচার্য্যদেবের পরোক্ষে প্রচুর পরিমাণে মিঠাই মণ্ডা লুচি কচুরী দিয়ে উদর পূর্ত্তি করতে অবহেলা করতেন না। এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় বন্ধুটি আমাদের হারিয়ে দিতেন।

নিজের খাওয়া পরার বেলায় প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন অতিরিক্ত মাত্রায় কৃপণ, যদিও দীনদুঃখীদের সাহায্যকল্পে তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। এ প্রসঙ্গে একটি ছোট ঘটনার উল্লেখ করছি—যা হতে তাঁর নিজের বেলায় ব্যয়সঙ্কোচের একটি ধারণা আপনারা করতে পারবেন। প্রায়ই অনিদ্রা-রোগে কষ্ট পেতেন বলে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর ঘণ্টা দুই ময়দানে মুক্ত-বাতাসে বেড়ান ছিল তাঁর একটি নিয়মিত অভ্যাস। এর ব্যতিক্রম বড় দেখা যেতনা। আমরা কয়েকজনও তাঁর সহগামী হতাম। মাঠে রবার্টসের প্রতিমূর্ত্তির তলায় আমাদের বৈঠক বসত। একদিন ময়দান ফেরৎ তাঁরই সঙ্গে আসছি—তার একাখযানে। বৌবাজারের নিকট যখন এসেছি তখন রাস্তার ধারের দোকানে ঝুড়ি ঝুড়ি আঙ্গুর ঝোলান দেখে তিনি আমাকে কিছু আঙ্গুর নিয়ে আসতে বললেন। আমি নেমে মাত্র এক পোয়া আঙ্গুর নিয়ে ফিরলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কত আঙ্গুর নিয়ে আসলে? উত্তরে বললাম—এক পোয়া। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন—কত দাম নিলে? আমি বললাম—আট আনা। শুনেইত তিনি উঠলেন চটে। বললেন—করেছ কি? তুমিত দেখছি একটি ডাকাত। দু'-আনার আঙ্গুর হলে আমার বেশ চলে যেত; তুমি আট আনা পয়সা খরচ করে বসলে। আমি তাঁকে ঠাণ্ডা করবার জন্য বললাম—আঙ্গুর গুলো ভালো আছে; মাঝে মাঝে জল দিয়ে রেখে দিবেন, ৩.৪ দিন থাকবে। এ সত্ত্বেও আমাকে অমিতব্যয়িতার অপকারিতা সম্বন্ধে এক অনতিদীর্ঘ উপদেশ বাণী শুনতে হল।

প্রফুল্লচন্দ্রের দানের বিশেষত্ব ছিল; তিনি দীন দুঃখীকে ও দুঃস্থ ছাত্রগণকে অকাতরে সাহায্য করতেন। এ দানের অর্থ তাঁর রোজগারের বাহুল্য হতে আসে নি; কেননা তাঁর রোজগার তেমন বেশী ছিল না। অভাবের অল্পতাতেই ছিল তাঁর ঐশ্বর্য্য। নিজকে বঞ্চিত করে তিনি

ঐশ্বর্য্য সঞ্চিত করেছিলেন, দীন দুঃখী ও আর্ত্তের সেবার জন্য। তাঁর দান তাই ধনী লোকদের দয়ার বা নামের দান নয়। এতে মুরুব্বিয়ানার গন্ধ ছিল না। এ দানে ছিল প্রাণের প্রেরণা ও হৃদয়ের সমবেদনা।

প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনচরিত আলোচনা করলে দেখা যায় যে তাঁর সকল চিন্তা ও সকল কর্ম্মের প্রধান উৎস ছিল সাধারণ লোকের সুখদুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, হর্ষ বিষাদের সহিত আন্তরিক সমবেদনা ও সহানুভূতি। আপন খণ্ড-স্বার্থ ও স্বাতন্ত্র্যকে সর্ব্বসাধারণের এক অখণ্ড বা বিরাট স্বার্থের মধ্যে বিলীন করে তিনি পেয়েছিলেন পরমার্থের সন্ধান। এখানেই হচ্ছে তাঁর চরিত্রের মহিমা। পাশ্চাত্যের শিক্ষাদীক্ষায় সুপণ্ডিত হয়েও তিনি তাঁর জীবনকে গড়ে তুলেছিলেন প্রাচ্য মনুষ্যত্বের ত্যাগ ও সেবার আদর্শে। বাংলার সন্তানসন্ততিগণ যদি এই মহৎ আদর্শের অনুকরণ করে চলতে পারেন, তবে বাংলাদেশের বহু দুর্দ্দশা যে অচিরে অন্তর্হিত হবে, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। এতেই হবে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীর সার্থকতা। কারণ, এ কথা সবাই মানবেন যে উনবিংশ শতাব্দীতে যে সব মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করে বাংলাদেশকে শিক্ষা-দীক্ষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও চরিত্রের মহত্ত্বে গৌরবোজ্জ্বল করে আধুনিক বাংলার প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন তাঁদেরই একজন। আজ আমরা তাঁর মৃত্যু তিথিতে সম্মিলিত হয়ে তাঁর অমর আত্মাকে আমাদের নমস্কার জানাই। প্রার্থনা করি—তাঁর জীবনের মহান আদর্শ আজ বাংলার সকল পুত্রকন্যার বিভ্রান্ত জীবনকে প্রণোদিত ও সংযমিত করে তুলুক।

উনবিংশ শতাব্দীর মনীষী ভূদেবচন্দ্র

প্রশান্তকুমার রায়

উনবিংশ শতাব্দীতে, ইংলণ্ডের এলিজাবেথীয় যুগের মতই, বঙ্গদেশে জ্ঞানগরিমার এক বিস্ময়কর নব জাগৃতির ইতিহাস রচিত হইয়াছিল এবং বাঙ্গালীর মানস-পটে সেই যে নব-জাগরণের শুভ উদ্বোধন হইয়াছিল তাহার অমিত প্রভাব ভারতবর্ষের দূর দুরান্ত পর্য্যন্ত ক্রমশঃ প্রসারিত ও পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। দীপ যখন দীপ্ত তেজে জ্বলে তখন এমনই হয়—আপনার চতুর্দ্দিকে কেবল নয়, সুদূরের অন্ধকারকেও সে আলোকের প্রসাদ দিতে চায়। উনবিংশ শতাব্দীর গগনস্পর্শী প্রতিভা ভূদেব মুখোপাধ্যায় এমনই এক দীপ্ত-তেজে জ্বলা প্রদীপ!

যে প্রেম-প্রীতি, অধ্যবসায় ও আত্মজিজ্ঞাসা মানুষকে মহত্ত্বের সুউচ্চ শিখরে পৌঁছাইয়া দেয়, যে আত্মবিশ্বাস নিরলস কর্ম্মপ্রচেষ্টা মানুষকে মানবতার মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তোলে, এক ও বহুর কল্যাণে একদিকে সেই প্রেম-প্রীতি, অধ্যবসায় ও আত্মজিজ্ঞাসার মৌলিকগুণরাজি—অন্যদিকে আত্মবিশ্বাস ও কর্ম্মপ্রচেষ্টার পৌরুষ ভূদেবকে 'মহতো মহীয়ান' করিয়া তুলিয়াছিল। গীতোক্ত জ্ঞান ও কর্ম্মের মিলিত সাধনায় যে প্রাণপুরুষের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব ভূদেবের মধ্যে যেন তাহারই এক পরমাশ্চর্য্য অভিব্যক্তি আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম। ঐ জ্ঞান ও কর্ম্ম, বুদ্ধি ও হৃদয় যখন তিনি মানবের হিতার্থে নিবেদন করিতে চাহিয়াছেন তখনই একটা বিচার বোধ তাঁহার মনে সদাজাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে—একের চিন্তা দশের করিয়া তুলিতে গেলে যে সংস্কার ও সহজতা দরকার, ভূদেব তাহারই পরিকল্পনায় আপন চিন্তাগুলি পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি যাহা কিছু ভাবিয়াছেন, বৃহত্তর মানবসমাজের মঙ্গলের জন্য, যাহা কিছু করিয়াছেন এবং করিবার সাধুসংকল্প প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর জন্যই। শুধু বঙ্গদেশের মানুষকেই প্রতিভার আলোক আলোকিত করিয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই, প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষের এ-প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত অবধি ছুটিয়া বেড়াইয়া সুপ্ত-চেতন অশিক্ষিত মানুষগুলিকে অন্ধকার হইতে আলোকের মধ্যে আকর্ষণ করিয়াছেন। উপনিষদের সেই মন্ত্র বুঝি তাঁহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইত তমসো মা জ্যোতির্গময়; সেই চেতনা না জাগিলে মানুষের জন্য মানুষের প্রাণ এমন করিয়া বাজিয়া ওঠে না; কোন এক নব-জাগরণের ভৈরবী রাগিনীতে ভূদেব জাতির প্রাণকে জ্ঞানে ও কর্ম্মে বানাইয়া তুলিয়াছেন।

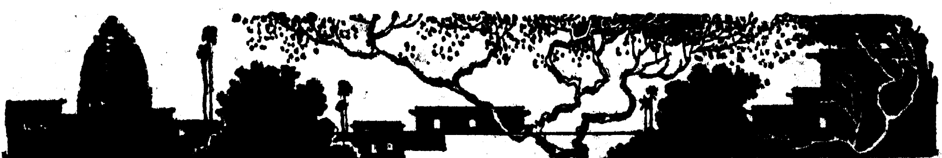
এই বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষের অক্লান্ত কর্ম্মময় ও জ্ঞানময় জীবন-কাহিনী বিস্ময়ের সৃষ্টি না করিয়া পারে না। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রচণ্ড ঢেউ যখন দুর্ব্বার বেগে এই প্রাচ্য ভূ-খণ্ডের তটপ্রান্তে বারংবার আঘাতে আঘাতে জাতীয় ধর্ম্ম, ঐতিহ্য ও সামাজিক বোধের ভিত্তিমূলে ফাটল ধরাইতে ছিল এবং যখন সেই বিদেশীয় জীবনাচরণের আদর্শ কিছু-গ্রহণ কিছু-বর্জ্জনের নীতি লইয়া রাজা রামমোহন ঐ খৃষ্টানী ভাবধারাকে পাশ কাটাইবার জন্য ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রচারকর্ম্মে বাহির হইয়াছিলেন তখন অনেকদিন পর্য্যন্ত সনাতনপন্থী হিন্দুরা কেবল মৃদু প্রতিবাদ করিয়া অসহায়তা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে উদ্বেগে দিন কাটাইতেছিলেন; ভূদেব সেই সংকটাবস্থায় হিন্দুর সনাতনী ঐতিহ্যের উপর আরোপিত সংশয়ের-আবরণখানি দৃঢ় হস্তে উন্মোচন করিয়া জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইবার জন্য বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীকে ডাক দিলেন। অবশ্য তিনি কোন ধর্ম্মান্দোলনে আপনার শক্তি ক্ষয় করিয়া ফেলেন নাই। তাঁর সতীর্থ মধুসূদনের মত তখনকার দিনের আত্মবিস্মৃত অনেক বাঙ্গালী যুবক বিদেশী ভাবধারার অন্ধ অনুকরণে যে ইয়ংবেঙ্গলী মনোভাবের পরিচয় দিতেছিলেন ভূদেব তাঁহাতে কোন মহত্ত্ব দেখিতে পান নাই। তিনিও ইংরেজী শাস্ত্রে পারঙ্গম এবং পাশ্চাত্যের যাহা কিছু ভাল ও অনুকরণীয় তাহা

বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিয়া তাহার জাতীয়করণ করিয়া লইয়াছেন। ইংরেজের ন্যায় কর্ত্তব্য বোধ, দায়িত্ব জ্ঞান ও সংস্কারমুক্তচিত্তে সমস্যার বিশ্লেষণ তাঁহাকে প্রগতি-চেতনায় উদ্বোধিত করিয়াছে। তিনি বুঝিয়াছিলেন, জাতিকে উন্নত করিতে হইলে শিক্ষার আলোক বর্ত্তিকা জ্বালাইতে হইবে। নিজে স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়া শিক্ষকতা করিয়াছেন এবং সরকারী শিক্ষা বিভাগের উচ্চতম শীর্ষে নিজ যোগ্যতা ও কর্ম্মক্ষমতার বলে আরোহণ করিয়া দেশে দেশে শিক্ষা প্রচারের কাজে মহা উৎসাহ দিয়া গিয়াছেন।

ভূদেবের মধ্যে প্রাদেশিকতার চিহ্নমাত্রও অনুপস্থিত ছিল। উদার দৃষ্টি লইয়া বিহারে হিন্দী ভাষার উৎকর্ষ সাধনে তাঁর দান ও শ্রম স্মরণীয়। সর্ব্ব ভারতীয় ঐক্যের জন্য তিনি হিন্দীভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদা দান সম্পর্কে প্রকাশ্যে মতপ্রচার করিতে অগ্রণী ছিলেন। বাংলা পুস্তক হিন্দীভাষায় অনুবাদ করাইয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে তাহা প্রচার করিয়াছেন ও তদ্দেশীয় সরকারী অফিস সমূহে হিন্দীভাষার প্রতিষ্ঠা করাইয়াছেন। শুধু বিহারের কেন, ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এবং পাঞ্জাব প্রদেশের শিক্ষা সংস্কার ও সম্প্রসারণের কাজে তাঁহার লিখিত ইংরেজী রিপোর্ট তাঁহার বৈদগ্ধ ও চিন্তার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। উড়িষ্যা ও মধ্যদেশেও তাঁহার শিক্ষা-প্রচার শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। ভূদেব কখনো জ্ঞান করেন নাই ; যাহা প্রচার করিতে চাহিতেন নিজেও তাহা যেন মন দিয়া পরীক্ষা করিয়া লইতেন, কদাপি উপদেশ দিয়া ক্ষান্ত হন নাই। শিক্ষা বিস্তারকল্পে তাঁহাকে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া পুস্তক প্রণয়ন করিতে হইয়াছে, সাহিত্য সাধনা করিতে হইয়াছে। সেই সাধনা ও প্রচেষ্টার ফলে তাঁর 'শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব' রচনা সম্ভব হইয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রদানের মহা উপকার সাধন করিয়াছে। তাঁর রচিত পুরাবৃত্তসার, ইংলণ্ড ও রোমের ইতিহাস (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ), প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও ইউক্লেডের অংশবিশেষ তখনকার দিনে বিদ্যালয়ের পঠন ও পাঠনে অত্যাবশ্যক ছিল—কেননা বাংলা ভাষায় ঐ জাতীয় গ্রন্থ তখনও রচিত হয় নাই। ভূদেবেরই পরামর্শে হজ্‌সন প্রাট্ সাহেব 'এডুকেশন গেজেট'নামে এদেশে একখানি সংবাদ-পত্র প্রকাশ করেন এবং পরে ভূদেবই সেই পত্রিকার সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী হইয়া সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন। ভূদেবের স্বদেশানুরাগের পরিচয় মিলিবে তাঁহার রচিত 'পুষ্পাঞ্জলী' গ্রন্থে। ইহা ব্যতীত নিছক সাহিত্য প্রীতিতে তাঁহার লেখনী হইতে যে বাঙ্ময় রূপ উৎসারিত হইয়াছে তাহা বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের আদি প্রেরণা হিসাবে আজিও মূল্যবান। সেই পুস্তকের নাম 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'। যদিও ইহা ইংরেজী 'রোমান্স অব হিষ্ট্রি'র অনুসারী, তথাপি এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশ 'অঙ্গুরী বিনিময়ের' অনেকাংশই ভূদেবের স্বকপোল-কল্পনাজাত এবং এই গ্রন্থই বঙ্কিমের প্রথম রোমান্স 'দুর্গেশ নন্দিনীর' আদর্শ স্থল।

জাতিগঠনের মস্তবড় একটা দিক চরিত্রের নির্ম্মলতা সাধন এবং এই ভাবনাই ভূদেবকে আরেক নবতম কর্ম্মের পথে টানিয়া আনিল। তাঁহার রচিত 'পারিবারিক প্রবন্ধ' ও 'আচার প্রবন্ধে' সেই চরিত্র-সৃজনের উপদেশগুলি তিনি উপস্থাপিত করিয়াছেন। রামায়ণ, মহাভারত ও বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে আদর্শ দৃষ্টান্ত বাছিয়া লইয়া জীবনাচরণের যে অমৃত উপদেশামৃত রচনা করিয়াছেন তাহা একদিকে যেমন নর ও নারীর সাংসারিক জীবনে শান্তি ফিরাইয়া আনিবার কথা শুনাইয়াছে অন্যদিকে সামাজিক মানুষকে সমাজনীতির সুস্থ পথ ও ন্যায়নীতির সত্য পথ বাৎলাইয়া দিয়া আদর্শ মানুষ গড়িবার সন্ধান দিয়াছে। তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের আরো নিদর্শন মিলিবে 'বিবিধ প্রবন্ধে'র প্রথম ভাগে—যেখানে তিনি সংস্কৃত নাটক মৃচ্ছ-কটিক, রত্নাবলী ইত্যাদির সম্যক আলোচনা করিয়া দক্ষতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বাংলা গ্রন্থ রচনায় তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রের মতই, ভাষায় পৌরুষ ও মাত্রা-বোধ তখনকার দিনেও বিশিষ্টতায় মণ্ডিত হইয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অপূর্বশ্রী সঞ্চার করিতে সক্ষম হইয়াছে। ভূদেবের মনীষার পরিচয় স্যার চার্লস ইলিয়টের বক্তৃতায়ও মিলিবে—"No single volume in India contains so much wisdom and none shows such extensive reading"—ইহা ভূদেবের সামাজিক প্রবন্ধ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছিল—

ভূদেব সমাজ ও জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য যাহা একহাতে করিয়া গিয়াছেন আজ তাহার পূর্ণমূল্য বুঝিবার অন্তরায় অনেক, কেননা ভূদেব নাম চাহেন নাই : লোকচক্ষুর অন্তরালে জ্ঞানের তপস্যা ও কর্ম্মের প্রচেষ্টা তাঁহাকে এমন করিয়া ধীরে ধীরে জাতির কল্যাণে অগ্রসর করিয়া দিতেছিল যাহাতে হঠাৎ চমকাইয়া দিয়া চক্ষু ঝলসান লোমহর্ষক কিছু করিবার চেষ্টা স্থান পায় নাই ; শনৈঃ শনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া দেশবাসীকে আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া ১৮৯৪ খৃঃ অব্দ ১৬ই মে তিনি জীবনের প্রদীপ নিভাইয়া দিয়া অনন্তধামে মহাপ্রয়াণ করেন। ভারতবর্ষের জ্ঞানাকাশ হইতে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল।





সোভিয়েট দেশে

শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কুচক্রী রাস্‌পুটিনের কুমন্ত্রণানুসারে পরিচালিত 'জার্' নিকোলাসের বিশৃঙ্খল-শাসন আর অপটু-ধনাধ্যক্ষতার ফলে জার্ম্মান-সেনাদের কাছে বারবার বিপর্য্যস্ত হয়ে শেষ পর্য্যন্ত রুশ-জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশা ঘটলো রীতিমত চরম। সুদীর্ঘ সংগ্রাম আর শোচনীয় অব্যবস্থার দরুণ সারা রাশিয়া জুড়ে দেখা দিল নিদারুণ অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব এবং বেকার-সমস্যা! বিক্ষুব্ধ প্রজাদের মনে জ্বলে উঠলো বিদ্রোহের দাবানল···'জারের' স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটলেই যে তাদের দুরবস্থা ঘুচবে আর মুক্তি মিলবে—এই বিশ্বাসই ক্রমে দৃঢ় হতে লাগলো রুশ-জনগণের মধ্যে!

রাজ্যের অভ্যন্তরে যখন এমনি বিদ্রোহ-অসন্তোষের আগুন ধুঁইয়ে উঠেছে, 'জার্' নিকোলাস্ তখন ছিলেন অষ্ট্রিয়ার সীমান্তে—জার্ম্মাণদের সঙ্গে যুদ্ধে মেতে। সেই সময় ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পেট্রোগ্রাড্ (আধুনিক লেনিন্‌গ্রাড্) সহরে ঘটলো দারুণ বিপর্য্যয়! অন্নের অভাবে দীন-দুঃখী রুশ-জনসাধারণ সহরের রুটির দোকানের সামনে ভিড় জমাতো নিত্য-নিয়ত। এমনি এক অন্নাতুর ক্ষুধার্ত্ত-প্রজাদের ভীড়ে সামান্য কি গোলমালের দরুণ পেট্রোগ্রাডের রাজ-শান্ত্রীর দল একদিন বেপরোয়াভাবে গুলি চালায়। ফলে সারা সহরের জন-সাধারণের মধ্যে তুমুল উত্তেজনা দেখা দেয় এবং রাজ-শান্ত্রীদের এই নির্ম্মম অনাচারের প্রতিবাদে তাঁরা পেট্রোগ্রাডের সমস্ত কল-কারখানা এবং স্কুল-কলেজে হরতাল বাধিয়ে বসেন। হরতাল বাধানো ছাড়াও বিক্ষুব্ধ-জনতা বিরাট 'ভুখা-মিছিল' করে সহরের পথে দাঁড়িয়ে রাজরক্ষীদের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিকারের দাবী জানায়—মুক্ত-নির্ভীক কণ্ঠে! এই ক্ষুব্ধ-জনতাকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে 'জারের' পুলিস আর সরকারী-ফৌজ আসে এগিয়ে, কিন্তু প্রজাদের অদম্য অটল-ভাব দেখে তাঁদের অনেকেই শেষ পর্য্যন্ত বিরোধী-দলের সঙ্গে মিশে যান। ফলে, ক্ষিপ্ত-জনতাকে হটানো নিতান্তই দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে রাজ-রক্ষীদের পক্ষে! সরকারী-ফৌজকে বিপর্য্যস্ত করে, বিক্ষুব্ধ-জনতা ওদিকে উত্তেজিত হয়ে যথেচ্ছ রাজ-অস্ত্রাগারের অস্ত্র লুঠে বন্দীশালা ভেঙ্গে বন্দীদের মুক্তি দিয়ে, গোয়েন্দা-পুলিশের দপ্তরে আগুন জ্বালিয়ে বজ্র-কঠোর কণ্ঠে রুশ-রাজ্যে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবী জানালো—সদীপ্ত ভঙ্গীতে!

অবস্থা সঙ্গীন দেখে রুশীয় রাজ্য-পরিষদ 'ডুমা'র (Duma) 'উদার-পন্থী ধনিক' সদস্যেরা অবিলম্বে 'মেন্‌শেভিক্' আর 'সমাজতন্ত্রী' বিপ্লবীদের সঙ্গে আপোষ করে Provisional Government' বা 'অস্থায়ী সরকার' গড়ে তুললেন—১৯১৭ সালের ১২ই মার্চ্চ তারিখে। নূতন এই 'অস্থায়ী-গভর্ণমেণ্টের সভাপতি নির্ব্বাচিত হলেন, জমিদার ও রাজতন্ত্রী-নেতা মাইকেল রোড্‌জিয়াঙ্কো (Michael Rodzyanko) এবং 'জার্'-শাসনের উচ্ছেদ-প্রয়াসী Social Revolutionary

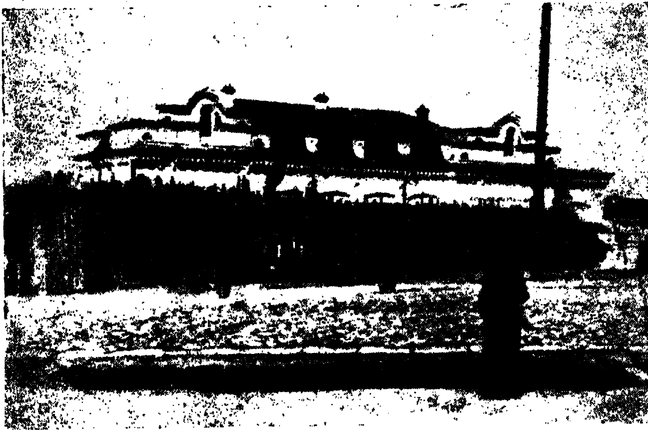


সোভিয়েট বিপ্লবীদের সর্বাধিনায়ক লেনিন্

Party অর্থাৎ 'সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী দলের' নেতা তরুণ-আইনজীবী আলেক-জাণ্ডার কেরেন্‌স্কী হলেন রুশ-রাজ্যের বিচার-ও শৃঙ্খলা বিভাগের মন্ত্রী। কেরেন্‌স্কী ছাড়া নব-গঠিত-মন্ত্রীসভায় সদস্য ছিলেন 'অক্টোব্রিষ্ট' দলের গুকোভ্, মেন্‌শেভিক দলের মিলিউকোভ্ প্রভৃতি ভূম্যাধিকারী-ধনীরা! ক্ষমতা লাভ করেই নব-গঠিত এই 'অস্থায়ী-গভর্ণমেণ্ট' অষ্ট্রিয়া-সীমান্তে যুদ্ধরত 'জার্' নিকোলাসের কাছে তাঁর পদত্যাগ দাবী করে পত্র পাঠালেন।

রুশ-রাজধানীতে নূতন এই 'অস্থায়ী-গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার খবর ইতিমধ্যেই 'জার্' নিকোলাসের কানে পৌঁচেছিল। খবর শুনেই তিনি অবিলম্বে অষ্ট্রিয়া-সীমান্তের রণাঙ্গন থেকে বিশ্বস্ত সেনাধ্যক্ষ ইভানোভ্-কে সসৈন্যে পাঠালেন রাজধানীতে বিদ্রোহ-দমনে—কিন্তু রাজদ্রোহী প্রজাদের অটল দাবীর কাছে শেষ পর্য্যন্ত নিতান্ত নিরুপায়ভাবেই 'জার্' নিকোলাস্কে বিনাবাধায় পদত্যাগ করতে হলো। এমনিভাবেই রাশিয়ায় তিনশো বছরের পুরোনো 'জার্' শাসন-ব্যবস্থা হলো বিলুপ্ত।

পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই নব-গঠিত 'অস্থায়ী-গভর্ণমেণ্টের' আদেশে 'জার্' নিকোলাস্কে সপরিবারে পেট্রোগ্রাড সহরের বাইরে 'জার্স্কাইয়া সেলো' (Tsarskaya Selo) অর্থাৎ 'সম্রাটের পল্লী-আবাস' প্রাসাদে অন্তরীণ-বন্দী করে রাখা হলো—সশস্ত্র-প্রহরীদের কড়া-পাহারায়! সুদীর্ঘ ছয়মাস এখানে বাস করার পর, তৎকালীন গভর্ণমেণ্টের' নির্দ্দেশেই 'জার্' নিকোলাস্কে সপরিবারে ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে টোবোল্স্ক (Tobolsk) সহরের শাসনকর্ত্তার আবাসে স্থানান্তরিত করে কড়া পাহারাধীনে বন্দী রাখা হয়। বন্দী অবস্থায় সেখানে সাত মাস অতিবাহিত করার পর, রুশ-সেনানায়ক কর্ণিলভের মত রাজানুরক্ত কেউ পাছে আবার 'জার্' নিকোলাস্কে রাজ-সিংহাসনে বসানোর জন্য বিপ্লব বাধায়—এই আশঙ্কায় ১৯১৮ সালের এপ্রিল মাসে কেরেনস্কীর আদেশে সুদূর সাইবেরিয়ার প্রান্তে, এক্যাটারিনবুর্গের (Ekaterinburg) নিভৃত অঞ্চলে সামান্য ছোট একটি বাড়ীতে ভূতপূর্ব্ব-সম্রাটকে সপরিবারে আবার স্থানান্তরিত করা হয়। পাহারার ব্যবস্থা এখানেও ছিল রীতিমত কড়া রকমের। বন্দীভাবে মাত্র মাস তিনেক এখানে বসবাসের সময় ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে বল্শেভিক আমলে নিশুতি এক রাত্রে 'জার্' নিকোলাস্কে সপরিবারে গুলি করে হত্যা করা হয়।



সুদূর সাইবেরিয়ার নিভৃত একটারিন্-বুর্গের এই সামান্য গৃহে বন্দীদশায় শেষ রুশ জার দ্বিতীয় নিকোলাস সপরিবারে শেষদিনগুলি যাপন করেন

এমনিভাবেই রাশিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যায় সুপ্রাচীন রুশ 'জার্-বংশ'!

নব-গঠিত 'প্রভিষ্ঠানাল বা অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের' চাপে 'জার্' নিকোলাস্ সিংহাসন-চ্যুত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রিন্স জর্জ্জ লভোভের (Prince Lvov) অধিনায়কতায় গঠিত হলো নূতন 'অস্থায়ী' শাসন-পরিষদ। এইভাবে রাশিয়ার ধনিকশ্রেণী আর ইতিমধ্যে ক্রমশঃ যে সব বড় বড় জমীদাররা ধনিক-শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের প্রতিনিধিদের নিয়ে 'অস্থায়ী-সরকার' গড়ে উঠলো বটে, তবে গোল বাধলো নূতন শাসন-পরিষদের সদস্যের মতামত নিয়ে। সদস্যেরা ব্যক্তি-স্বাধীনতা মানেন, কিন্তু তাঁরা চান যুদ্ধ শেষ হয়ে রাশিয়ায় ইংলণ্ডের মত নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Constitutional Monarchy), না হয় ফ্রান্সের মত গণতান্ত্রিক (Republican) শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হোক্। এঁদের মধ্যে একজন শুধু ছিলেন বিরুদ্ধ পক্ষে···তিনি হলেন সমাজ-তন্ত্রী বিপ্লবী (Social Revolutionary) দলের নেতা কেরেনস্কী! স্বার্থান্ধ-সদস্যদের এই মতদ্বৈততার ফলে সারা রাশিয়ার বুক জুড়ে গণ-বিপ্লবের জোয়ার বইতে সুরু করে দিল—রীতিমত ব্যাপক স্রোতে। রুশ সৈনিক আর শ্রমিকের দল নূতন এই শাসন-পরিষদ গঠনের সঙ্গে সঙ্গে আলাদা 'পঞ্চায়েৎ' বা 'সোভিয়েট' সমিতি গড়ে তুললো···১৯০৫ সালের গণ-বিপ্লবের পর যে-ধরণের প্রজা-সাধারণের 'সমিতি' বা 'সোভিয়েট' গড়ে উঠেছিল—ঠিক সেই ছাঁদে। এঁদের দাবী—দেশের সব কিছু ব্যবস্থার আমূল সংস্কার চাই···দেরী করলে চলবে না!

স্বার্থলোভী ধনিক এবং জমীদার শ্রেণী আর গণ-স্বাধীনতা-প্রয়াসী কৃষক-শ্রমিক-জন-সাধারণের এই নিদারুণ মত-বিরোধের ফলে রাশিয়ার রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেখা দিল বিচিত্র এক পরিস্থিতি। 'অস্থায়ী-গভর্ণমেণ্ট' হলো রুশীয় ধনিক-সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার যন্ত্র, আর শ্রমিক এবং সৈনিকদের সোভিয়েট' হলো মুক্তিকামী রুশ-জনগণের আশা-ভরসার কেন্দ্র···এই দুটি দলের মধ্যে ক্রমশঃ ঘনিয়ে উঠলো দ্বন্দ্ব-বিরোধের দুরন্ত ঝড়! অচিরেই গ্রামে গ্রামে, সহরে-সহরে সর্ব্বত্র রুশ চাষী-মজুর-প্রজারা মদমত্ত-মাতঙ্গের মত বিপ্লবের উত্তেজনায় মেতে উঠলো! মনের সুদীর্ঘ পুঞ্জীভূত আক্রোশে দেশের যেখানে যত ধনী, জমীদার এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকজন ছিলেন, তাঁদের সবাইকে নির্ম্মম নির্য্যাতনে জর্জ্জরিত করে, ঘর-বাড়ী লুঠ

করে, আগুন জ্বালিয়ে সবংশে নিহত করে বিক্ষুব্ধ বিপ্লবীর দল সে-সময় রাশিয়ার বুকে মহা-শ্মশানের এমন নিদারুণ তাণ্ডব হাহাকার জাগিয়ে তুলেছিল যে তা শুনলে আজও গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসে! ক্ষুব্ধ জনগণের এই উন্মত্ত অভ্যুত্থানের ফলে দু'মাস যেতে না যেতেই সদ্য-গঠিত 'অস্থায়ী-গভর্ণমেণ্টের' সদস্যদের বাধ্য হয়ে পরিষদ ত্যাগ করতে হলো। ল্ভোভ্ (Lvov) পদত্যাগ করলেন এবং তাঁর জায়গায় 'অস্থায়ী-গভর্ণমেণ্টের' প্রধান মন্ত্রী হয়ে বসলেন কেরেন্স্কী। তবে দেশের সেই দারুণ দুর্দ্দিনে যে বিপুল সাহস, শক্তি আর বিচক্ষণ শাসন-ক্ষমতার একান্ত প্রয়োজন ছিল, কেরেন্স্কী তার কোনো পরিচয় দিতে পারেন নি। শুধু মুখের ফাঁকা-বুলি, বড়-বড় স্তোক-বাক্য আওড়ানো, আর অসার-আশ্বাস দেওয়া ছাড়া যুদ্ধ বন্ধ করা কিম্বা রুশ চাষীদের মধ্যে জমি-বিলি আর প্রপীড়িত জনগণের অন্নবস্ত্রের সমস্যা ঘোচানোর ব্যাপারে কেরেন্স্কী এমন কোনো ব্যবস্থাই করতে পারেন নি যাতে বিক্ষুব্ধ প্রজাদের মনে এতটুকু আশার আলো জেগে ওঠে!

এমনি সঙ্গীণ মুহূর্তে ১৯১৭ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে বিপ্লবী বল্শেভিক্-দলের নির্ব্বাসিত-নেতা লেনিন সুইজারল্যাণ্ড থেকে এসে হাজির হলেন রাশিয়ার পেট্রোগ্রাড্ সহরে—মেন্শেভিক্ দলের বাগ্মী-বিপ্লবী নেতা ট্রট্স্কিও এলেন আমেরিকার নিউ ইয়র্ক থেকে! দেশে ফিরেই লেনিন রাশিয়ার বিক্ষুব্ধ-জনগণকে আহ্বান জানালেন যে, রাজ্যে স্বার্থান্ধ অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন না করে সমাজতান্ত্রিক (Socialist) শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা বিপ্লবের হলো উদ্দেশ্য! লেনিনের এই অভিনব সমাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা দিশাহারা-উদ্ভ্রান্ত রুশ জন-সাধারণের মনে রীতিমত আলোড়ন জাগিয়ে তুললো; তাছাড়া প্রাঞ্জল যুক্তি-তর্ক দিয়ে লেনিন রাশিয়ার বিক্ষুব্ধ জনগণকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিলেন 'সমাজ-তান্ত্রিক-বিপ্লব' (Socialist Revolution) সফল করে তোলবার জন্ত চাই—স্বার্থান্ধ 'অস্থায়ী শাসন-পরিষদের' অনাচারী অন্যায়-বিধানের সঙ্গে চরম বিরোধিতা এবং তার আমূল উচ্ছেদ-সাধন! অর্থাৎ রুশ-রাজ্যে নূতন আদর্শ সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট গণ-শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রথমে প্রয়োজন—দেশের দীন-দরিদ্র সর্ব্বহারা শ্রমিক-কৃষক আর সাধারণ প্রজাদের রাষ্ট্র-শাসন-পরিষদে সমস্ত-অধিকার…তারপর, পরিষদের বিধানে রাষ্ট্রের সম্পত্তি হিসাবে দেশের সমস্ত জমিদারী বাজেয়াপ্ত করা…এমন কি দেশের প্রত্যেকটি কল-কারখানা এবং যান্ত্রিক শিল্প-প্রতিষ্ঠান পর্য্যন্ত হাতে নেওয়া চাই। এক কথায় রাশিয়ার যা কিছু সম্পদ সব আসবে রাষ্ট্রের অধিকারে…ব্যক্তিগতভাবে কারো কোনো মালিকানা-সত্ত্ব থাকবে না এ-সব সম্পত্তির…রুশ-রাজ্যের প্রত্যেকটি প্রজার সমান দাবী অধিকার থাকবে দেশের প্রত্যেকটি ব্যাপারে। চাষবাস কিম্বা কল-কারখানায় যাবতীয় ফসল এবং সমস্ত জিনিষের উৎপাদন আর বিতরণের ব্যবস্থা আগাগোড়া নিয়ন্ত্রিত হবে সব-পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট রাষ্ট্র-পরিষদের নিরপেক্ষ নির্দ্দেশে। স্কুল, কলেজ, চিকিৎসাগার, কল-কারখানা, ক্ষেত-খামার, সরকারী দপ্তর, বিচারালয় এবং বিভিন্ন কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান—সর্ব্বত্রই সমস্ত রুশবাসীর থাকবে সমান অধিকার!



অক্টোবর বিদ্রোহের সময় পেট্রোগ্রাডে বলশেভিক বিপ্লবীদের 'উইণ্টার প্যালেস' আক্রমণ

লেনিনের এই সুচিন্তিত সাম্যবাদী শাসন-তন্ত্র রচনার আদর্শ-পরিকল্পনা শুধু যে রাশিয়ার জনগণের মনেই নূতন সাড়া জাগিয়ে তুললো, তা নয়, ট্রট্স্কির মত বিচক্ষণ-বিপ্লবীও এর মর্ম্ম উপলব্ধি করলেন! ফলে, মেন্শেভিক্ দলের নেতৃত্ব ত্যাগ করে ট্রট্স্কি এসে যোগদান করলেন বল্শেভিক বিপ্লবীদের সঙ্গে। বল্শেভিক দলের সপ্তম সম্মেলনের প্রথম প্রকাশ্য অধিবেশনে লেনিন তাঁর বিপ্লবী-সম্প্রদায়ের সাবেকী-নাম বদলে নূতন নাম রাখলেন—'কমিউনিষ্ট পার্টি' (Communist Party) বা 'সাম্যবাদী দল'! এই ভাবেই রাশিয়ার সাম্যবাদী-সমাজতন্ত্রী 'কমিউনিষ্ট দলের' সূচনা। পরবর্ত্তীকালে গণ-আন্দোলনের প্রবল হাওয়ার স্রোতে এই সব রুশ-বিপ্লবী ভাবধারা-আদর্শের টুকরো-টুকরো নানা রূপে গিয়ে দল হয়ে জমেছে আজ পৃথিবীর নানা দেশের আকাশে!

লেনিনের নিপুণ নেতৃত্বে, ট্রট্স্কির বাক্‌পটুতার গুণে বিপ্লবী রুশ জনগণ মেতে উঠলো ধনিক-স্বার্থ পরিপুষ্ট কেরেনস্কীর অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের-উচ্ছেদ-সাধনে। তবে গোল বাধলো একটি শেষ কারণে। রুশ-রাজ্যে সাম্যবাদী সমাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে একমত হলেও, লেনিনের চেয়ে ট্রট্স্কির বিপ্লববাদ ছিল আরো অনেক কঠোর এবং উগ্র! কাজেই এঁদের দুজনের মধ্যে অচিরে বাধলো বিরোধ এবং এ বিরোধের ফলে সুচতুর স্বার্থান্বেষী কেরেনস্কী যেন মস্ত সুযোগ পেলেন! কিন্তু সে-সুযোগ তিনি এতটুকু কাজে লাগাতে পারলেন না—কারণ, কেরেনস্কী ছিলেন নিতান্তই বক্তৃতাবাগীশ…রুশরাজ্যের নানা অঞ্চল ঘুরে অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেশের দুর্দ্দশাগ্রস্ত জনসাধারণের অবস্থার উন্নতির জন্য যে সব সংস্কার-সাধন করবেন বলে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার কোনোটাই শেষ পর্য্যন্ত কাজে প্রমাণ করতে না পারায় প্রজারা রীতিমত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল তাঁর উপর। ফলে ১৯১৭ সালের ১লা জুলাই 'অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের' উচ্ছেদ-সাধনে বদ্ধপরিকর হয়ে বিদ্রোহী প্রজারা দারুণ বিপ্লব-হাঙ্গামা বাধিয়ে বসলো পেট্রোগ্রাড্ সহরের বুকে। কেরেনস্কী অবিলম্বে অষ্ট্রিয়ার সীমান্ত থেকে সৈন্য পাঠালেন—এ বিপ্লব দমনের জন্য। প্রচুর রক্তপাত হলো। লেনিন তখন বলশেভিক দলের অধিনায়ক। তিনি এ বিপ্লব থামাবার চেষ্টা করলেন…বললেন—বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। আক্রোশে উন্মত্ত বিপ্লবীরা কিন্তু তাঁর কথায় নিরস্ত হলো না। কাজেই বল্‌শেভিক দল নিয়ে লেনিনকে অগত্যা কর্ম্মক্ষেত্রে নামতে হলো। শেষ পর্য্যন্ত লেনিনের কথাই সত্য হলো। কারণ দেশের জনমত ও সৈন্যবাহিনী তখনও বিপ্লবের জন্য সম্পূর্ণ ভাবে জেগে ওঠে নি। সুতরাং 'অস্থায়ী সরকারের' আপ্রাণ চেষ্টায় প্রজাদের বিদ্রোহ দমন হলো …প্রবল সংগ্রাম চালিয়ে প্রচুর রক্তপাত করা সত্ত্বেও শেষ পর্য্যন্ত বলশেভিক-বিপ্লবীদের পরাজয় ঘটলো কেরেনস্কীর সরকারী ফৌজের হাতে। এ পরাজয়ের ফলে বিদ্রোহীদের বহু নেতা আর কর্ম্মী বন্দী এবং নির্ব্বাসিত হলেন! অবস্থা সঙ্গীন দেখে লেনিনকে ফিন্‌ল্যাণ্ডে পালিয়ে আত্মগোপন করে থাকতে হলো। ট্রট্স্কী বন্দী হলেন 'অস্থায়ী সরকারের' বন্দীশালায়! এ-সব সত্ত্বেও বিপ্লবীদের কিন্তু দমানো গেল না কোনোমতে…গুপ্তভাবে আরো সক্রিয় হয়ে উঠলো তাঁদের বিপ্লবাত্মক কার্য্যকলাপ। গ্রামে সহরে, কল-কারখানায় সঙ্গোপনে গড়ে উঠলো বিপ্লবী-প্রজাদের ছোটখাটো বহু 'সোভিয়েট' বা পরিষৎ পঞ্চায়েৎ! এমন সময়ে গুজব রটলো যে রাশিয়ার রাজানুরক্ত অভিজাত-সম্প্রদায়ের সহায়তায় প্রধান রুশ-সেনাপতি জেনারেল কর্নিলভ্ (General Kornilov) মতলব ফেঁদেছেন মুখ্যমন্ত্রী কেরেনস্কীর কবল থেকে দেশ-শাসনের ক্ষমতা তাঁর কেড়ে নিয়ে রাশিয়াতে আবার 'জার্'-রাজত্বের প্রবর্ত্তন করবেন। ওদিকে স্বার্থাভিলাষী কেরেনস্কীও সুচতুর কৌশলে দেশের প্রজাদের প্রতারিত করে ফরাসী-বীর নেপোলিয়র মতই রুশ-রাজ্যের একচ্ছত্র বিধাতা হয়ে বসবার ফন্দী এঁটেছেন।

মারাত্মক এই গুজব রটনার ফলে রুশ-রাজ্যে দেখা দিল দারুণ বিশৃঙ্খলা। সে বিশৃঙ্খলার সুযোগে ১৯১৭ সালের ২৫শে অক্টোবর তারিখে গুপ্ত-ঘাঁটি থেকে লেনিন আবার সন্তর্পণে রাশিয়ার পেট্রোগ্রাডে এসে বিদ্রোহী প্রজাদের মনে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে তুললেন আরো তীব্র তেজে! কর্নিলভের চক্রান্ত চুরমার করে দেবার জন্য কেরেনস্কী উঠে পড়ে লাগলেন সে বিদ্রোহ-দমনে। পেট্রোগ্রাডের বিপ্লবী জনসাধারণও কর্নিলভকে বিধ্বস্ত করতে সাগ্রহে এগিয়ে এসে কেরেনস্কীর দলে যোগ দিলে! এঁদের সম্মিলিত চেষ্টায় কর্নিলভের পরাজয় ঘটলেও বিপ্লবী-দলে কেরেনস্কীর প্রভাব-প্রতিপত্তির অবসান হলো। বামপন্থী হলেও দূরদর্শিতার অভাবে আর স্বার্থান্ধ নীতি অনুসরণের দোষে কেরেনস্কী ক্রমে হয়ে উঠলেন বিপ্লবীদের বিরাগভাজন। ওদিকে লেনিনের নিপুণ নেতৃত্বে বলশেভিকরা ইতিমধ্যে দলে যেমন পুষ্ট হয়ে উঠলেন, তেমনি তাদের শক্তিও হলো রীতিমতই প্রবল। পরম উৎসাহে লেনিন, ট্রট্স্কী, ষ্টালিন প্রমুখ সুদক্ষ-বিচক্ষণ নেতাদের চেষ্টায় বল্‌শেভিক বিপ্লবীরা রাশিয়ার জনসাধারণ আর সৈন্যবাহিনীর মধ্যে মুক্তি-সংগ্রামের সাম্যবাদী-মতবাদ প্রচার কার্য্য চালালেন বেশ ব্যাপকভাবে। অষ্ট্রিয়ার সীমান্তে যে সব রুশ-সৈন্য জমায়েৎ ছিল, কর্নিলভের সঙ্গে কেরেনস্কীর বিরোধের অবসানে তাদের যখন দেশে ফেরবার সরকারী আদেশ জানানো হলো, তখন লেনিন এবং তাঁর বল্‌শেভিক দল স্বদেশ-প্রত্যাগামী সেনাদলকে পরামর্শ দিলেন,—বন্দুক রেখে দেশে ফিরো না…হাতিয়ার সঙ্গে এনো…আমাদের মুক্তি-সংগ্রামে সহায় হবে! কেরেনস্কীর 'অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের' অব্যবস্থায় মনে মনে উত্যক্ত হয়ে থাকবার দরুণ রুশ-সেনারাও বল্‌শেভিক নেতৃবৃন্দের নির্দ্দেশানুযায়ী কাজ করলে…এঁদের এবং দেশের বিক্ষুব্ধ জনগণের সহায়তায় সাম্যবাদী বিপ্লবী দল ক্রমে দুর্দ্দম শক্তিশালী হয়ে দাঁড়ালো।

ওদিকে পেট্রোগাডে লেনিনের নেতৃত্বে বল্‌শেভিক্ দলের কেন্দ্রীয় সভার এক গোপন-অধিবেশনে সিদ্ধান্ত হলো—কেরেনস্কী-শাসিত 'অস্থায়ী-সরকারের' বিরুদ্ধে সশস্ত্র-অভিযান চালিয়ে রাশিয়ায় এবার সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদী শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সক্রিয়-প্রচেষ্টা করতে হবে। বল্‌শেভিক্-দলের আর সব সভ্যের সম্মতি থাকলেও লেনিনের প্রস্তাবিত মুক্তি-সংগ্রামের এই নূতন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি জানালেন শুধু তিনজন—কামেনেভ্, জিনোভিয়েভ্ আর ট্রট্স্কী! তবে ট্রট্স্কী দ্বিধাভরে দলের সিদ্ধান্ত মেনে নিলেও কামেনেভ্ এবং জিনোভিয়েভ্ কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কাগজে প্রকাশ্য-বিবৃতি ছাপিয়ে লেনিনের বিরোধিতা করেন। এই বিশ্বাসঘাতকতার ফলে লেনিনের প্রস্তাবে কামেনেভ্ আর জিনোভিয়েভকে বল্‌শেভিক দল থেকে বিতাড়িত করা হয়। এই বিরোধিতা সত্ত্বেও বল্‌শেভিক দলের কেন্দ্রীয় সভার নির্দ্দেশে পেট্রোগ্রাডে ট্রট্স্কীর নেতৃত্বে 'রেড্ গার্ড' (লাল ফৌজ) নামে এক বৈপ্লবিক সামরিক-পরিষদ্ গঠিত হলো! এঁদের কাজ সশস্ত্র-সংগ্রাম চালানো!

ইতিমধ্যে কেরেনস্কী-পরিচালিত 'অস্থায়ী-গভর্ণমেণ্ট' বল্‌শেভিক্-

"যেমন সাদা – তেমন বিশুদ্ধ –
লাক্স টয়লেট সাবান –
কি সরের মতো, সুগন্ধি ফেনা এর।"

রমলা চৌধুরী
বলেন।



ভারতে
প্রস্তুত



এই সাদা ও বিশুদ্ধ সাবান রোজ ভালো করে মাখলে আপনার মুখে এক সুন্দর শ্রী ফুটে উঠবে। "গায়ের চামড়া রেশমের মতো কোমল ও সুন্দর রাখতে লাক্স টয়লেট সাবানের সুগন্ধি, সরের মতো ফেনার মত আর কিছু নেই।" রমলা চৌধুরী বলেন। "এতে আপনার স্বাভাবিক রূপলাবণ্য ফুটিয়ে তোলে আর আপনি এর বহুক্ষণ-স্থায়ী মিষ্টি সুগন্ধ নিশ্চয়ই পছন্দ করবেন।"

"...সেইজন্যেই ত আমি আমার মুখশ্রী সুন্দর রাখবার জন্য লাক্স টয়লেট সাবানের ওপর নির্ভর করি।"

সুখবর!

নতুন
বড় সাইজ
সারা শরীরের সৌন্দর্য্যের জন্য
এখন পাওয়া যাচ্ছে
আজই কিনে দেখুন!

চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান ★

LTS. 419-X52 BG

বিপ্লবীদের গুপ্ত-সিদ্ধান্ত জানতে পেরে তাঁদের দমনের উদ্দেশ্যে ১লা নভেম্বর তারিখে পেট্রোগ্রাড সহরে প্রচুর সমর-সরঞ্জাম, সাঁজোয়া গাড়ীও সশস্ত্র সরকারী-সৈন্য এনে জমা করলেন...'অস্থায়ী-পরিষদের' কড়া-হুকুমে বলশেভিক বিপ্লবী-দলের সংবাদ-পত্রের প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হলো সশস্ত্র সৈন্য আর সাঁজোয়া-গাড়ী পাঠিয়ে রীতিমত জুলুম করে! জ্বলন্ত আগুনে ঘৃতাহুতি পড়লে যেমন হয়—কেরেনস্কীর এই হঠকারিতার ফলে তাই ঘটলো! বলশেভিক বিপ্লব-প্রচেষ্টার আগুন তখন সবে ধুঁইয়ে উঠতে সুরু করেছে, এমন সময় 'অস্থায়ী-সরকারের' অচিন্তিত-আক্রমণের এই ইন্ধন পেয়ে তার তেজ বেড়ে গেল চতুর্গুণ... সঙ্গে সঙ্গে পেট্রোগ্রাড সহরের বুকে বেধে গেল বিক্ষুব্ধ বলশেভিক্ বিপ্লবীদের সশস্ত্র-অভ্যুত্থানের তাণ্ডব! এই সঙ্গীণ মুহূর্ত্তে ২৫শে অক্টোবর (রুশ দিনপঞ্জী মতে ৬ই নভেম্বর) বলশেভিক-দলের প্রধান-কার্য্যালয় স্মোল্নি' (Smolny) ভবনে হাজির হয়ে লেনিন স্বয়ং নিলেন এ-বিপ্লবের নেতৃত্ব-ভার এবং ট্রট্স্কী হলেন তাঁর সহায়। এঁদেরই নির্দ্দেশ অনুসারে 'লাল-ফৌজ' (Red Guards) আর বিপ্লবী সৈন্যদল রেল-ষ্টেশন, ডাকঘর, টেলিগ্রাফ অফিস, মন্ত্রীদের দপ্তরখানা, ব্যাঙ্ক, সরকারী-তোষাখানা, অস্ত্রাগার, গোয়েন্দা-পুলিশের ঘাঁটি এবং আরো অনেক সরকারী-ভবন দখল সারা করে সহর নিজেদের অধিকারে নিয়ে বসলো। উন্মত্ত এই গণ-বিদ্রোহের স্রোতের বিরুদ্ধে কেরেনস্কী পরিচালিত দুর্ব্বল 'অস্থায়ী-সরকারের' কোনো বাধাই টিকতে পারলো না...সব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। অবস্থা আয়ত্তাধীনে আনার উদ্দেশ্যে শেষ চেষ্টা হিসাবে কেরেনস্কী অবশেষে মরিয়া হয়ে 'অস্থায়ী-শাসন-পরিষদের' (Duma) সদস্যদের অনুমতি নিলেন—নিজের হাতে ক্ষমতা নিয়ে চূড়ান্ত-উপায়ে বিদ্রোহ-দমনের জন্য, কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য তাঁর যে সরকারী-ফৌজও তখন গিয়ে যোগদান করেছে বিপ্লবীদের সঙ্গে। পেট্রোগ্রাড সহরের কূলে 'নেভা' (Neva) নদীর বুকে রুশ রণ-পোত 'অরোরা'কে (Aurora) কেরেনস্কী পূর্ব্বাহ্নেই বন্দর-ত্যাগের আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু 'অরোরার' বিদ্রোহী নৌ-ফৌজ তাঁর সে-আদেশ অমান্য করে বলশেভিক্-বিপ্লবীদের সাহায্যে এসে নেভা-নদীর তীরে পেট্রোগ্রাড সহরে কেরেনস্কী-সরকারের দপ্তর-ভবন ভূতপূর্ব্ব 'জারের'-পুরী সুবিখ্যাত 'উইণ্টার্-প্যালেসের' (Winter Palace) উপর মুহুর্মুহুঃ কামান দাগতে লাগলো। 'অরোরার' কামান-গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই নেভা নদীর অপর তীরের 'পিটার ও পল্' দুর্গ (Peter and Paul fortress) থেকে অনর্গল গুলিবর্ষণ করে সেখানকার বিদ্রোহী সেনারা এসে বলশেভিক্-বিপ্লবীদের দলে যোগ দিলে। সঙ্গীণ বিপদে 'অস্থায়ী-সরকারের' সদস্যেরা তখন ভয়ে সদলে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন সুরক্ষিত 'উইণ্টার্-প্যালেসে'। বিপ্লবী জনসাধারণ এবং সৈন্যেরা দুরন্ত আক্রমণ চালিয়ে প্রাসাদ দখল করে তাঁদের সবাইকে বন্দী করলো...পরাজয়ের পর শুধু কেরেনস্কীই কোনোমতে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন। এমনি ভাবে পেট্রোগ্রাড এলো বলশেভিক্-বিপ্লবীদের হাতে...রাজ্যে তাঁরা ইস্তাহার জারী করলেন—'অস্থায়ী-সরকারের' পতনের সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ায় পুঁজিপতিদের ক্ষমতা-প্রতিপত্তির বিনাশ ঘটেছে...রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ভার এখন দেশের জনগণের হাতে।

সেই রাত্রেই স্মোল্নিভে সাড়ম্বরে বসলো 'নিখিল রুশ সোভিয়েট কংগ্রেসের' (All Russia Congress of Soviets) বিরাট সভা। সভার অধিবেশনে মেনশেভিক, বলশেভিক, এনার্কিষ্ট, সোশ্যাল-রেভলিসনিষ্ট, ক্যাডেট, প্রভৃতি বিভিন্ন বিপ্লবীদলের সভ্যেরা থাকলেও, বিপুল ভোটাধিক্যে শেষ পর্য্যন্ত বলশেভিকদেরই জয় হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে রাশিয়া তখন থেকে হলো 'Socialist Soviet Republic' অর্থাৎ সাম্যবাদী গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র! এছাড়া সভায় আরো সিদ্ধান্ত এলো যে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করা চাই এবং তিনমাসের মধ্যে রণমত্ত দেশগুলির গভর্ণমেণ্ট ও শ্রমিকদের কাছে সংগ্রাম বিরতির আবেদন-প্রস্তাব পাঠানো হবে। সোভিয়েট কংগ্রেসের বৈঠকে আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবে স্থির হলো যে, বিনা-ক্ষতিপূরণে সারা রাশিয়ার বুক থেকে জমিদারী-প্রথা চিরতরে লোপ পাবে। শুধু কৃষিজীবীর জমি সরকারে বাজেয়াপ্ত হবে না। (ক্রমশঃ)

সেই আর এই

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

কবেকার কোনো কুঞ্জ-কাননে ফুটেছিল মধু-মল্লিদল,
ভেসে আসে শুধু চঞ্চল বায়ে সে-দিনের সুধা-গন্ধ-ভার।
মনে পড়ে চারু-চন্দ্রিকারাতে উঠেছিল চাঁদ সু-নির্ম্মল,
মর্ম্মর গানে ভরেছিল ধরা, কাঁদে আজ প্রাণে ছন্দ তা'র।
স্বপ্নের বাঁশী বেজেছিল সাধা সুরগুলি আধা স্মরণ হয়,
কান পেতে শুনি সন্ধানি' ফের ভুলে চলি খুলে বন্ধ দ্বার;
চলিতে না চায় ক্লান্ত হৃদয় লাজ-বন্ধন চরণময়,
ক্রন্দন জাগে অন্তর মনে দূরে-কাছে দুলে অন্ধকার।
আজিকে সে-চাঁদ পৌর্ণমাসীর ডুবে গেছে সেই সুনীল নভে,
ফুলডোর টুটি' গিয়াছে দোলার, তবু মিছে মোর দুলিতে হবে!
কণ্ঠের ম্লান মন্দার-মালা ভিজাই এখন অশ্রু জলে,
শ্রান্তির ভার লুকাই বুকের পাণ্ডু মুখের হাসির ছলে।
মর্ম্মের কোণে ক্ষণে ক্ষণে শুধু বাজে অকারণ আগের গান,
হারানো দিনের অন্বেষণায় কাটে-অনুপল বর্ত্তমান॥

শ্রীবিধান বর্ধাপণে

নরেন্দ্র দেব

সাগর মেখলা এ ভারতে ছিল বাংলা মাথার মণি !
মানুষের মতো মানুষেরা এসে করেছিল তারে ধনী ।

নিভে গেছে তার দীপ একে একে, জমেছে অন্ধকার,
একটি মাত্র শিখা জলে আজও, তুমি সেই দীপাধার !



শ্রীবিধানচন্দ্র রায়

অখিল ভারতে দিয়েছে দীক্ষা মাতৃমন্ত্রে তারা
অবহেলি সেই আত্ম-সাধনা বাঙালী মহিমা হারা !

তোমারে আমরা রাখিবারে চাই প্রেমের বর্মে ঘিরে,
জানাই ধাতারে শতায়ু কামনা—আনন্দাশ্রু নীরে ।

হাতাশা ক্ষুব্ধ মূঢ় দেশবাসী বিপথে চলেছে যবে
তুমি একা ডেকে বলেছ বাংলা আবার মানুষ হবে।
যা-গিয়েছে যাক, যা-আছে আমরা তারেই করিব বড়ো
কে আছ কর্মী স্বদেশ সেবক মা'র কাজে হও জড়ো।
ব্যক্তি স্বার্থ ত্যজিয়া হেলায়, আপন বৃত্তি ভুলি,
নূতন বাংলা গড়িবার কাজ স্কন্ধে লয়েছ' তুলি।
তপোভ্রষ্ট গৌড়-প্রতিভা—তুমি তা জানিতে ভালো,
তাই তো লক্ষ আঁধার বক্ষে আবার জ্বেলেছ' আলো!

আসি নাই হেথা চাটুকার সম শুনাতে মিথ্যাস্তুতি,
তব অকপট স্বজাতি প্রীতির লভেছি যে অনুভূতি!
শালপ্রাংশুল মহাভুজ তুমি সুদীর্ঘ ঋজু দেহ
ব্যূঢ় স্কন্ধে দুঃসহ বোঝা বহিছ স্মরি যে স্নেহ
ত্রিসপ্ততির আয়ুভার ল'য়ে অমিত কর্মবীর
যে উৎসাহের দাও পরিচয় ন'জোয়ান নতশির!
তোমার ধৈর্য, সাহস তোমার, বিশ্বাস অবিচল
জাগায়েছে বহু নিরুৎসাহীর বাহুতে কর্মবল।

ক্ষতবিক্ষত বাঙলায় আজ নিবীর্যেরেই ভীড়
তোমার সবল কল্পনা সেথা রচিছে অভয় নীড়;
বাঙালী যেথায় আপনার পায়ে দাঁড়াবে সগৌরবে
হে দেশনায়ক কৃতজ্ঞ মোরা একথা জানাই সবে।
তিমির বিদারি' দিগন্তশেষে উষা ক্রমে স্ফুটতর;
ভবিষ্যতের বাংলার ছবি দেখিতেছি সুন্দর!
যারা দোষ ধ'রে শুধাই তাদের ভুলচুক নেই কার?
দোষে গুণে তুমি শ্রেষ্ঠ মানুষ, তোমারে নমস্কার।

কয়েকটি 'হরমোন' জাতীয় ঔষধের রাসায়নিক স্বরূপ

শ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস এম, এস-সি

শরীর বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে জীবদেহের মধ্যে নূতন নূতন শক্তিশালী জৈবরাসায়নিক পদার্থসমূহের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। দেহের জীবনীশক্তি রক্ষা করবার জন্য বিবিধ জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়াসমূহ সংঘটিত হয় এবং ঐসব প্রক্রিয়ার মূলে আছে 'এনজাইমের' সংযোগ। শ্বেতসার থেকে শর্করা তৈরী হয় 'ডায়েষ্টেস' নামক এনজাইম সহযোগে। প্রোটিন থেকে বিবিধ এমিনোএসিড তৈরী হয়—'পেপসিন' নামক এনজাইম দিয়ে। এইরূপ আরও কয়েকটি মূল্যবান এনজাইম জীবদেহের মধ্যে কার্য্যকরী অবস্থায় বিদ্যমান আছে। এনজাইম আবিষ্কারের পর পরিপাকযন্ত্র, শ্বাসযন্ত্র প্রভৃতি কয়েকটি শরীরযন্ত্রের জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়া সমূহ সহজবোধ্য হয়ে উঠল। শরীর বিজ্ঞানীর দৃষ্টি তখন গিয়ে পড়ল দেহের আরও কয়েকটি অংশের উপর—যেগুলিকে গ্রন্থি (gland) বলা হয়।

এই গ্রন্থিগুলি সাধারণতঃ কয়েকভাগে ভাগ করা হয়। বিভিন্ন অংশের নাম থায়রয়েড, প্যাংক্রিয়াস, গণাড, এড্রিন্যাল ও পিটুইটারি। এই সকল গ্রন্থি থেকে একপ্রকার রস নির্গত হয়, যার মধ্যে নানারূপ শক্তিশালী জৈবরাসায়নিক পদার্থসমূহ বিদ্যমান থাকে। জীবদেহস্থ ইন্দ্রিয়সকল এই সমস্ত গ্রন্থির রসের দ্বারা সক্রিয় থাকে এবং সাধারণতঃ কোন বিশেষ গ্রন্থির ক্রিয়া মন্দীভূত হইলে সঙ্গীয় ইন্দ্রিয়েরও বৈকল্য ঘটে। এই সকল গ্রন্থি থেকে নির্গত রসসমূহের মধ্যে সাধারণতঃ এক বা একাধিক শক্তিশালী তেজস্ক্রিয় জৈবরাসায়নিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়—তাহাকে 'হরমোন' বলে।

জীবদেহের অন্তস্থ আইয়োডাইড বিশ্লেষণের জন্য থাইরয়েড গ্রন্থির প্রয়োজন। এই আইয়োডাইড টাইরোসিন নামক এমিনোএসিড সহযোগে থাইরক্সিনে রূপান্তরিত হয় এবং গ্রন্থিতে প্রোটিনের সহিত যুক্তভাবে থাইরোগ্লোবুলিন হয়ে অবস্থান করে। এই থাইরোগ্লোবুলিন ভেঙ্গে থাইরক্সিন রক্তস্রোতে মিশে যায়। সুতরাং দেখা যায় এক দিক দিয়ে খাদ্য থেকে আইয়োডাইড এসে থাইরক্সিন তৈয়ারী হয়—পরে ঐ থাইরক্সিন আবার বাহির হয়ে এসে রক্তকে সঞ্জীবিত করে। যে দেহে থাইরক্সিনের অভাব এবং তজ্জন্য জীবকে বিকলাঙ্গ দেখা যায় তার উপর এই থাইরক্সিনের ক্রিয়া আশ্চর্য্যজনক। থাইরক্সিন সহযোগে খাদ্যমধ্যস্থ আইয়োডাইড ঐ বিকলাঙ্গ দেহ গ্রহণ করতে সক্ষম হবে এবং ক্রমে থাইরয়েড গ্রন্থিকে পরিপুষ্ট হতে দেখা যাবে। অধ্যাপক ড্রিল প্রমাণ করেছেন—থাইরয়েড হরমোনের সাহায্যে জীবদেহস্থ কেরোটিন ভিটামিন 'এ'তে রূপান্তরিত হয়।

১৯১৫ সালে কেণ্ডাল থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে একটি বিশুদ্ধ জৈব-রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কার করেন যার নাম দেওয়া হল থাইরক্সিন। ১৯২৭ সালে হ্যারিংটন ও বার্জার ল্যাবরেটরিতে থাইরক্সিন তৈয়ারী করতে হয়।

থাইরয়েড গ্রন্থির সহিত ঘন সন্নিবিষ্টভাবে আরও প্রায় চারটি গ্রন্থি আছে তাদের নাম প্যারাথাইরয়েডস্। ইহাদের কাজ রক্তের ক্যালসিয়ামের সমস্ত রক্ষা করা। এই গ্রন্থি থেকে নির্গত রসের (নির্য্যাস) মধ্যে একটি 'হরমোনের' সন্ধান পাওয়া যায়।

আমাদের খাদ্যের একটি প্রধান অংশ শর্করা। এ ছাড়া খাদ্যমধ্যস্থ ভাত, রুটি, তরকারি প্রভৃতি থেকে প্রচুর পরিমাণ কার্বহাইড্রেট পাকপ্রণালীতে গিয়ে ডায়াষ্টেস নামক এনজাইম সহযোগে শর্করায় রূপান্তরিত হয়। রক্তস্রোতে যে শর্করা আছে তার সমত্ব রক্ষা করা উচিত। শর্করা তৈয়ারী হয়ে পরে তার খানিকটা ব্যয়িত হয় শরীরের প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপন্ন করতে এবং বাকী অংশ গ্লাইকোজেন ও চর্বিতে রূপান্তরিত হয়। বহুমূত্র রোগীর দেহে শর্করা থেকে অন্যপদার্থ রূপান্তরকরণ যথাযথভাবে হয় না। সুতরাং শর্করার পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। রক্তের শর্করা বেড়ে যায় ও প্রস্রাবের সঙ্গে শর্করা ক্ষরণ হয়। দেহস্থ শর্করার রূপান্তর কার্য্যের সহিত প্যানক্রিয়াস নামক যন্ত্রের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। প্যানিক্রিয়াস থেকে ইনসুলিন নামক একপ্রকার হরমোন নিসৃত হয় এবং এই ইনসুলিনই রক্তের শর্করার সমত্ব রক্ষা করে। ইনসুলিন আবিষ্কারের পর ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং যখন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্যানক্রিয়াসজাত ইনসুলিন রক্তে আসে না তখন বাহির থেকে ইনসুলিন ইনজেকসন দেওয়া হয়। উহাতে রক্তস্থ শর্করার বৃদ্ধি প্রশমিত হয়। ডায়াবেটিস রোগে তাই ইনসুলিন ইনজেকসন দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশুদ্ধ ইনসুলিন একটি এলবুমিন শ্রেণীর প্রোটিন এবং পাকস্থলীতে গিয়ে নষ্ট হয়ে যায়। গরুর প্যানক্রিয়াস থেকে বিশুদ্ধ ইনসুলিন তৈরী করা হয়েছে এবং ল্যাবরেটরিতে ইহার সংশ্লেষণ এখনও সম্ভব হয় নাই।

জীবদেহস্থ যৌন প্রক্রিয়াসমূহ নিয়ন্ত্রণ করবার মূলে আছে কতকগুলি অতিমূল্যবান যৌন হরমোন। স্ত্রীপুরুষভেদে ঐ সমস্ত হরমোনের রাসায়নিক স্বরূপ বিভিন্ন। পুরুষদেহের যৌনহরমোনের নাম টেষ্টোষ্টিরোন এবং স্ত্রীদেহের যৌনহরমোনের নাম ইষ্ট্রোজেন ও প্রজিষ্টিরোন। টেষ্টোষ্টিরোন থেকে এণ্ড্রোষ্টিরোন, আইসোএণ্ড্রোষ্টিরোন ও ইটিওকোলানোলোন তৈরী হয়ে প্রস্রাবের সহিত নির্গত হয়। কোলেষ্টেরল থেকে এই হরমোন তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। ইষ্ট্রোজেনের মধ্যে L-এষ্ট্রাডিয়ল, ইষ্ট্রোন এবং ইষ্ট্রিয়ল প্রধানতঃ এই তিনটি হরমোন আছে। উপরোক্ত প্রকৃতিগত হরমোনসমূহের সংশ্লেষণ এখনও সম্ভব হয় নাই।

এড্রিন্যাল গ্রন্থির দুটি অংশ—একটি অন্তর্ভাগ বা এড্রিন্যাল মেডুলা এবং অপরটি বহির্ভাগ বা এড্রিন্যাল কর্টেক্স। এড্রিন্যাল মেডুলা থেকে এড্রিন্যালিন নামক হরমোন নিসৃত হয় এবং এড্রিন্যাল কর্টেক্স থেকে প্রায় ত্রিশটি জৈবরাসায়নিক পদার্থ পাওয়া গেছে। এই ত্রিশটির মধ্যে কর্টিসোন প্রভৃতি কয়েকটি শক্তিশালী হরমোন আছে। এই সমস্ত হরমোন জীবদেহস্থ রাসায়নিক ক্রিয়াসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করে। আমাদের মস্তিষ্কের নীচে একটি গ্রন্থি আছে তার নাম পিটুইটারী। এড্রিন্যাল গ্রন্থির ক্রিয়াসমূহ অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয় পিটুইটারীর দ্বারা। পিটুইটারীর মধ্য থেকে একটি অতি শক্তিশালী হরমোন নিসৃত হয় তার নাম এড্রিনোকর্টিকোট্রপিক হরমোন বা এ, সি, টি, এইচ। সুতরাং দেখা যায় এই পিটুইটারী গ্রন্থি থেকে যে হরমোন নিসৃত হয় তাহাই এড্রিন্যাল গ্রন্থির হরমোন নিঃসরণ কার্য্যকে সুনিয়ন্ত্রিত করে এবং এ, সি, টি, এইচকে তাই হরমোন শ্রেষ্ঠ বললে অত্যুক্তি করা হয় না। আগেই বলা হয়েছে এড্রিন্যাল কর্টেক্স থেকে দেহের অনেকগুলি প্রয়োজনীয় হরমোন যেমন যৌন হরমোন তৈরী হয়। সুতরাং পিটুইটারি বা তদীয় হরমোন (এ, সি, টি, এইচ) সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। এড্রিন্যাল কর্টেক্স এর কার্টিসোন একটি ষ্টিরয়েড শ্রেণীভুক্ত হরমোন এবং কশাইখানায় নিহত গরুর বাইল থেকে যে ডিসক্সিকোলিক এসিড পাওয়া যায় তার থেকে কর্টিসোন সংশ্লেষণ করা সম্ভব হয়েছে। এ, সি, টি, এইচ একটি প্রোটিন শ্রেণীর হরমোন এবং ইহার সংশ্লেষণ এখনও সম্ভব হয় নাই।

রিউমেটয়েড আর্থাইটিস, হাঁপানী, নিফ্রাইটিস প্রভৃতি বহু দুরারোগ্য রোগে এ, সি, টি, এইচ এবং কর্টিসোন ব্যবহারে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া গেছে। আবার এই দুইটি আশ্চর্য্যজনক ঔষধ বেশী মাত্রায় ব্যবহারে ক্ষতি হতে দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে বেশী মাত্রায় এ, সি, টি, এইচ প্রয়োগে বহুমূত্র রোগ ও ব্লাডপ্রেশার সৃষ্ট হয়েছে।

জীবদেহের শর্করার কিয়দংশ পুড়িয়া প্রয়োজনীয় উত্তাপ সৃষ্টি করে এবং বাকী অংশ গ্লাইকোজেন হয়ে যকৃতে ও পেশীসমূহে সঞ্চিত হয়। খানিকটা শর্করা চর্বিতে রূপান্তরিত হয় ও খানিকটা প্রস্রাবের সহিত নির্গত হয়ে যায়। বহুমূত্ররোগে প্যান্‌ক্রিয়াসের মধ্যস্থ হরমোন ইনসুলিনের অভাব হলে ঐ গ্লাইকোজেন তৈরী হওয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং শর্করার দহন কার্য্যও কমে আসে। এজন্য রক্তে এবং প্রস্রাবে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যায়। শর্করার পরিমাণ কমিয়ে উহার সমতা রক্ষার জন্য যেমন প্যান্‌ক্রিয়াসের হরমোন ইনসুলিন দরকার হয় তেমনি এই শর্করার পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় পিটুইটারী ও এড্রিন্যাল গ্রন্থি থেকে নির্গত হরমোন সমূহ। কর্টিসোন (এড্রিন্যাল হরমোন) ও এ, সি, টি- এইচ (পিটুইটারী হরমোন) শেষোক্ত শ্রেণীর প্রধান দুইটি হরমোন। এই কারণ অত্যধিক পরিমাণ কর্টিসোন ও এ, সি, টি, এইচ ব্যবহার করলে জীবদেহে শর্করার আধিক্য ঘটে এবং তখন আরও বেশী পরিমাণ ইনসুলিনের প্রয়োজন হয়।

কশাইখানায় নিহত গরুর এড্রিন্যাল কর্টেক্সের প্রায় ১০০০ পাউণ্ড থেকে ছয়টি হরমোনের মোট পরিমাণ পাওয়া যায় প্রায় ১২২১'৫ মিলিগ্রাম অর্থাৎ প্রায় ৪ লক্ষ ভাগের একভাগ। এত কম পরিমাণে উপস্থিত থেকেও ঐ সব হরমোনের কার্য্যকারিতা দেখলে বিস্মিত হতে হয়।

সালফনামাইড এবং এণ্টিবায়োটিক্‌স আবিষ্কারের পর বহুসংখ্যক প্রত্যক্ষফলদায়ী ঔষধ চিকিৎসাক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যক্ষ্মা, টাইফায়েড, রক্তদুষ্টি প্রভৃতি রোগে এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুফল পাওয়া যায়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে এড্রিন্যাল কর্টেক্স এবং পিটুইটারী থেকে আবিষ্কৃত হল দুইটি আশ্চর্য্যজনক ঔষধ (Wonder drug)—কর্টিসোন ও এ, সি, টি, এইচ। ইহাদের রোগ নিরাময়ক শক্তির বিষয় পূর্ব্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

সম্প্রতি ল্যাবরেটরিতে কর্টিসোনের সংশ্লেষণ এবং বিশুদ্ধ এ, সি, টি, এইচ প্রস্তুত করণ সম্ভব হয়েছে। কর্টিসোন অপেক্ষা একটি অধিক শক্তিসম্পন্ন ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে তাহার নাম হাইড্রোকর্টিসোন বা কম্পাউণ্ড এফ। এই সকল ঔষধের আবিষ্কার চিকিৎসা জগতে যুগান্তর আনিয়াছে সন্দেহ নাই।



— আঠারো —

"O ar esta Pezado"—

শান্তি নেই—কোথাও শান্তি নেই!

সিংহাসনে এখনো ফিরোজের রক্তমাথা—আবদুল বদর মামুদ-শার চোখের সামনে এখনো তার প্রেতচ্ছায়া ভেসে বেড়ায়। নিথর রাত্রে কখনো কখনো ঘুম ভেঙে যায় মামুদ-শার—খোলা জানলা দিয়ে পড়া এক ঝলক চাঁদের আলো যেন ফিরোজের মূর্তিতে পরিণত হয়। একটা তীক্ষ্ণধার ছোরা হাতে নিয়ে সে যেন এগোতে থাকে মামুদশার দিকে—তার দুটো চোখ নিষ্ঠুর হিংসায় দুখানা হীরের মতো ঝকঝক করে ওঠে!

একটা আর্ত চিৎকার বেরিয়ে আসে মামুদশার গলা থেকে: আল্লা—রহমান!—মূর্তিটা যেন জ্যোৎস্নার ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। দরজার বাইরে ঘুম-জড়ানো চোখ দুটো মেলে মাত্র মুহূর্তের জন্যে চমকে ওঠে প্রহরী—একবার ঝন্‌ঝনিয়ে ওঠে কোমরের তলোয়ার—তার পরেই আবার তন্দ্রার জড়তা। সে জানে ঘুমের ঘোরে ওই ভাবে চেঁচিয়ে ওঠার অভ্যাস আছে সুলতানের।

মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে একা প্রার্থনা করেন মামুদশা। কয়েক মুহূর্তের দুর্বলতায় আল্লার কাছে মিনতি জানান তিনি: ফিরিয়ে দাও—ফিরিয়ে দাও আবদুল বদরকে। আমি মামুদশা হতে চাই না।

কিন্তু রাত্রের বিভীষিকা দিনে থাকে না। তার জায়গায় থাকে আর এক জ্বালা! হাজিপুরের মখদুম ই আলেম—আর—আর সাসারামের শের খাঁ!

পূর্বভারত থেকে মোগলকে দূর করতে চেয়েছিলেন নসরৎ শা—প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন পাঠানের এক সম্মিলিত বিশাল রাজ্য। ভালোই করেছিলেন। কিন্তু একটা ভুল হয়েছিল তাঁর—দক্ষিণ বিহারের ওই সামান্য জায়গীরদার শের খাঁকে তিনি চিনতে পারেন নি। নসরৎ জানতেন না—আফগানের গৌরব ফিরিয়ে আনবার জন্যে এক বিন্দু মাথা ব্যথা নেই শের খাঁর। শের লোভী—শের স্বার্থপর। নিজের একার জন্যে সব গুছিয়ে নিতে চায় শের খাঁ—বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সম্রাট হয়ে বসতে চায় সে!

তুচ্ছ—নগণ্য ভৃত্য শের খাঁ। নসরৎ শা নিজের অজ্ঞাতে তার হাতে তুলে দিয়েছেন মৃত্যুবাণ। দিয়েছেন তারই হাতে আদিলশাহী বংশের সমাধিরচনার ভার!

বাবরের বিরুদ্ধে যে লক্ষ তলোয়ার এক সঙ্গে জড়ো হয়েছিল নসরৎ আর লোহানীদের নেতৃত্বে—আজ সেই সব তলোয়ারই রুখে দাঁড়িয়েছে গৌড়ের সর্বনাশ করতে। ওই শয়তান শেরের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে মখদুম-ই-আলম। গৌড়ের বুকে বিহারের ওই কাঁটাগুলো খচ্ খচ্ করে বিঁধছে সব সময়ে। যেমন করে হোক—উপড়ে ফেলতেই হবে ওদের।

তাই মুঙ্গেরের শাসনকর্তা বিশ্বস্ত কুতুব খাঁকে বিরাট সৈন্যবাহিনী দিয়ে পাঠিয়েছিলেন মখদুমকে দমন করতে—আগে আত্মীয়-শত্রু নিপাত করা দরকার। তারপরে আসবে শের খাঁর পালা। কিন্তু শয়তানের আশীর্বাদ পেয়েছে শের। যুদ্ধে লোহানী আর গৌড়ের সৈন্যেরা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে—শের হাতে প্রাণ দিয়েছে কুতুব খাঁ।

লজ্জা—অপমান! বাংলার প্রবল পরাক্রান্ত সুলতান—

হোসেন শা নসরতের উত্তরাধিকারী এমনি ভাবে হার মানবে বিহারের তুচ্ছ একটা জায়গীরদারের কাছে! আর—আর আত্মীয়-শত্রু মখদুম ওই রকম ভাবে গর্বে বুক ফুলিয়ে বেড়াবে! আবার নতুন উদ্যমে সৈন্য পাঠিয়েছেন মামুদশা। এবার আর শের খাঁ সময় মতো এসে মখদুমের সঙ্গে মিলতে পারে নি—মখদুমের বুকের রক্ত দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে।

কিন্তু শুধু মখদুমের রক্তস্নানেই তো গৌড়ের গৌরব উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না। এত সহজেই তো কুতুবের পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে পারা যায় না! যতদিন শের খাঁকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করা না যায়, যতদিন ভেঙে না দেওয়া যায় বিদ্রোহী বিহারের বিষদাঁত—ততদিন গৌড়-বঙ্গের শান্তি নেই কিছুতেই। ততদিন একটা হিংস্র জন্তুর মতো সারাদিন পায়চারী করবেন মামুদ শা—অসহ্য ক্রোধে নিজের হাত কামড়ে রক্তারক্তি করতে ইচ্ছে হবে—। আর—আর—নিথর রাত্রে যখন আচমকা ঘুম ভেঙে যাবে, তখন—

দু হাতে মাথা টিপে ধরলেন মামুদশা। শান্তি নেই—শান্তি নেই কোথাও। সুন্দরী বাইজীদের পেশোয়াজের ঘূর্ণি মাথা থেকে দুশ্চিন্তার পাহাড় উড়িয়ে নিতে পারে না—তাদের নেশাভরা চোখের তীক্ষ্ণ কটাক্ষ এতটুকু আলো ফেলতে পারে না মামুদশার অন্ধকার নিঃসঙ্গতায়। এর চেয়ে অনেক বেশি—অনেক বেশি সুখে ছিল সামান্য আবদুল বদর। খোদা—রহমান!

ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগলেন মামুদশা। মাথার ওপর হাজার ডালের বাতি জ্বলছে, আর তার আলোয় নিজের একটা দীর্ঘ ছায়া সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে তাঁর। ও যেন তাঁর দেহের প্রতিবিম্ব নয়—ও তাঁর অন্ধকার আত্মার প্রতিফলন! মামুদশা একবার তাকিয়ে দেখলেন। একটা বিকৃত বিকলাঙ্গ ছায়া—অদ্ভুত স্থূলকায়—অস্বাভাবিক তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। নিজের ভেতরে অমনি একটা বিকারকে বয়ে নিয়ে চলেছেন তিনি:. পেছনে পেছনে নিয়ে চলেছেন এক দুঃসহ ছায়া সহচরকে।

শান্তি? শান্তি কোথাও নেই।

আজ কিছুদিন ধরেই উৎকণ্ঠায় ভরে আছে মন। লোহানী জালাল খাঁ আর সেনাধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁর সঙ্গে আর একটি বিপুল বাহিনী মুঙ্গের থেকে তিনি পাঠিয়েছেন শেরের বিরুদ্ধে দুর্ধর্ষ এই সৈন্যবাহিনী—এমন প্রচণ্ড আয়োজন বাবরের বিরুদ্ধে নসরৎশাও করতে পারেন নি সেদিন। কামান আছে—ঘোড়সোয়ার আছে, আর—আর আছে বাঙালী পাইকের দল। রায়বাঁশ আর বল্লম নিয়ে এই বাঙালী পাইকেরা যখন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে—তখন এমন কোনো শক্তি নেই—যা তাদের মুখোমুখি দাঁড়ায়। যুদ্ধে তারা পিছন ফিরতে জানে না—শরীরে যতক্ষণ একবিন্দু রক্ত আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সংগ্রাম। এই হিন্দু পাইকদের ওপরেই মামুদশার ভরসা সব চাইতে বেশি।

কিন্তু কী আশ্চর্য—প্রায় এক মাস ধরে এই শক্তিধর বাহিনী শেরকে যুদ্ধে হারাতে পারে নি। বিচক্ষণ শের খাঁ যুদ্ধের সুযোগ দেয় নি বললেই হয়। সে জানে—ইব্রাহিম খাঁর সামনে একবার পড়লে হাওয়ার মুখে রাশি রাশি কাপাস তুলোর মতো উড়ে যাবে সে।

অদ্ভুত কৌশলে শের ইব্রাহিম খাঁকে আটকে রেখেছে সুরথগড়ের সংকীর্ণ প্রান্তরে। একদিকে খর বাহিনী গঙ্গা, অন্য দুধারে কিউল আর খড়্গপুরের পাহাড়। মাঝখানের ছোট পথটুকু আগলে আছে শের। ওখান দিয়ে অতবড় বাহিনীকে চালিয়ে বের করে নেওয়ার আগেই দু দিক থেকে আক্রমণ করে বসবে শের খাঁ। তার ফল কী হবে বলা যায় না। অতএব—

কিন্তু আর সহ্য হয় না। যেন আগুনের প্রকাণ্ড একটা চক্র ঘুরে চলেছে মাথার ভেতরে। মামুদ শা চিৎকার করে ডাকলেন, কে আছে বাইরে?

প্রহরী এসে অভিবাদন করে দাঁড়াল।

—উজীর সাহেব।—প্রয়োজন ছিলনা, তবু চিৎকার করে উঠলেন মামুদ শা।

প্রতীহারী চলে গেল। আবার সুলতান একা পায়চারী করতে লাগলেন ঘরের মধ্যে। আর ঝাড়-লণ্ঠনের আলোয় তাঁর নিজেরই ছায়া সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে লাগল। দেহের নয়—একটা অন্ধকার আত্মার প্রতিবিম্ব।

সিংহাসন! প্রতাপ! সুখ!

প্রতাপ থাকলে সিংহাসন পাওয়া যায় বই কি—তখ্‌তে বসে নির্ধারণ করা যায় কোটি কোটি মানুষের জীবন-মৃত্যু। বিলাস? তারও ত্রুটি থাকে না। আসে রাশি রাশি আশ্চর্য সূক্ষ্ম মসলিন—যেন চাঁদের আলোর সুতো দিয়ে

গড়া; হীরা-মাণিক-মোতি সবই আছে; ইরাণের সেরা সুন্দরীরা এসে জড়ো হয় রংমহলে—কত উন্মত্ত রাত কাটে উদ্দাম সম্ভোগের বন্যতায়! কিন্তু তারপর? কোনো নিঃসহতায়—নিজের কোনো একান্ত অবসরে—বুকের ভেতরে তাকিয়ে দেখো একবার। কেউ নেই—কিছুই নেই।

কখনো কখনো মামুদ শার মনে হয়—হঠাৎ এই গৌড় যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে; মসজেদের মিনার, মন্দিরের ত্রিশূল, আকাশ ছোঁয়া বুরুজ, লাল ইট আর শাদা-কালো পাথরে গড়া চারদিকের বড় বড় বাড়ি, গঙ্গায় পাল তোলা অসংখ্য নৌকো—এরা সব মুছে গেছে চক্ষের পলকে। জলের বুকে কয়েকটা বুদ্বুদের মতো ফুটে উঠেছিল এরা—এখন আর কোথাও নেই। কোন্ যাদুকরের ভেল্কী লেগে এই হাওয়াই শহর উড়ে গেছে আকাশে। আর মামুদ শা দাঁড়িয়ে আছেন একটা ফাঁকা মাঠের ভেতরে। মাঠ? তাও ঠিক বলা যায়না। পায়ের নিচে মাটি—ওপরে আশমান—সব কিছুই ধোঁয়া দিয়ে গড়া। তার মধ্যে একা দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। আর সেই ছায়া—ছায়া কুয়াশার ভেতরে—সেই শূন্যতার জগতে একে একে এগিয়ে আসছে নসরৎ শা—আসছে ফিরোজ, আসছে অসংখ্য মানুষের মিছিল। তাদের ছিন্ন-বিছিন্ন রক্তাক্ত শরীর—তাদের চোখে বীভৎস ঘৃণা। নিঃশব্দ সমস্বরে তারা যেন প্রশ্ন করতে চাইছে—তারপর মামুদ, তারপর?

তারপর?

—কে?—মামুদ শা প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন।

উজীর সামনে এসে দাঁড়ালেন।

—সুলতান আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

মামুদ শা চকিত হয়ে উঠলেন। যেন ঘুম ভাঙল তাঁর।

—ইব্রাহিম খাঁর কোনো খবর আছে?

—না।

—এখনো শের খাঁ চুরমার হয়ে যায় নি?

—সুলতানকে সুখবর দিতে পারলে আমিই সবচেয়ে খুশি হতাম—মাথা নিচু করে উজীর জবাব দিলেন। মামুদ শা আবার পায়চারী করতে লাগলেন। খাঁচায় বন্দী অসহায় একটা বাঘের মতো। বিকৃত পিণ্ডাকার ছায়াটা ঘুরতে লাগল সঙ্গে সঙ্গে।

—কী করছে ইব্রাহিম খাঁ? মখদুমের মতো শত্রু নিপাত হয়েছে আর শেরের মতো একটা সামান্য জায়গীরদার এখনো দাঁড়িয়ে আছে মাথা তুলে?

—শের অত্যন্ত ধূর্ত খোদাবন্দ্। বেয়াদবী মাপ করবেন —তাকে ঠিক সামান্য বলা যায়না।

—ধূর্ত!—হিংস্র গলায় সুলতান বললেন, এত সৈন্য, এত কামান, ইব্রাহিম খাঁ আর জালাল খাঁ লোহানীর মতো সেনানায়ক, তবু শেরকে পিষে মারা যায়না?

—হয়তো যায়। কিন্তু সুলতান তো জানেন শূরথগড়ের ওই সংকীর্ণ মুখটুকু শের খাঁ এমন কৌশলে আটকে রেখেছে যে তার সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ অসম্ভব। অথচ হঠাৎ একটা কিছু করতে গেলে তার ফলও হয়তো ভালো হবে না।

—উঃ—অসহ্য।—মামুদ শা ঘরে গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়ালেন। কেল্লার বাইরে গৌড়ের বুরুজ-মিনার আর বড় বড় বাড়ির চুড়োগুলো অন্ধকার আকাশে আরো কালো কালি দিয়ে আঁকা। দু একটা আলো বিদ্রূপ ভরা চোখের মতো মিট মিট করছে।

কিছুক্ষণ পরে উজীরই আবার স্তব্ধতা ভাঙলেন।

—তাছাড়া একথাও সুলতান জানেন যে মখদুম-ই-আলম মরবার সময়েও আমাদের শত্রুতা করে গেছেন। তীরবেগে ঘুরে দাঁড়ালেন মামুদ শা। জ্বলন্ত গলায় বললেন, মখদুম!

উজীর বলে চললেন, শেষবার যুদ্ধে যাওয়ার আগে মখদুম শের খাঁর হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর লক্ষ লক্ষ মোহর—বহু মূল্য হীরা-মাণিকের ভাণ্ডার। বলে গিয়েছিলেন, যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে তিনি এগুলো নেবেন—তাঁর কাছে থাকলে হয়তো গৌড়ের সৈন্য সব লুটে নেবে। যুদ্ধ থেকে মখদুম ফেরেননি—কিন্তু শেরের লাভই হয়েছে তাতে। মখদুমকে সে হারিয়েছে—পেয়েছে কোটি টাকার ঐশ্বর্য। এই টাকার জোরেই শের এমন করে লড়তে পারছে আমাদের সঙ্গে। সৈন্য সংগ্রহ করছে, কিনছে অস্ত্র-শস্ত্র। নইলে কোন্ কালে একটা তুচ্ছ পোকার মতো সে মাটিতে দলে যেত।

—কোনো কথা আমি শুনতে চাইনা—আবার একটা অধৈর্য আর্তনাদ এল মামুদের কাছ থেকে: আপনি দূত পাঠান শূরথগড়ে। ইব্রাহিম খাঁকে জানিয়ে দিন, সাত দিনের মধ্যে শের খাঁর মাথা পৌঁছোনো চাই আমার

বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে পত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহপূর্ব্বক 'ভারতবর্ষে'র উল্লেখ করিবেন।

কাছে—আর চাই বিহারের নিষ্কণ্টক অধিকার। যদি না পারে, ইব্রাহিম খাঁকে আমি বরখাস্ত করব।

—সুলতানের যা হুকুম, তাই হবে। কিন্তু: সংশয়ের মেঘ ঘনিয়ে এল উজীরের মুখে: শের খাঁ অত্যন্ত শয়তান। তাকে জব্দ করতে হলে কিছু ধৈর্য—

—ধৈর্য! ধৈর্যের সীমা আছে একটা। আর একটা কথাও আমি শুনতে চাইনা।

উজীর বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘরে ঢুকলেন আল্‌ফা হাসানী। চোখে-মুখে উৎকণ্ঠার ছায়া।

—সুলতানের কাছে একটা জরুরি সংবাদ পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিয়ে এসেছি আমি।

—জরুরি সংবাদ?—সুলতান উচ্চকিত হয়ে উঠলেন: শূরযগড়ে শের খাঁ হেরে গেছে? বিহার বশ্যতা স্বীকার করেছে গৌড়ের কাছে?

—সে আমি জানিনে খোদাবন্দ্‌। আমি এসেছি পর্তুগীজদের খবর নিয়ে।

—পর্তুগীজ!—ঘৃণায় মুখ বিকৃত করলেন মামুদ: সেই চোর, সেই লুটেরার দল। কী করেছে তারা? ঠাণ্ডা গরদ থেকে পালাতে চেষ্টা করেছে? তা হলে এখনি তাদের সবক'টার গর্দান নেওয়া হোক।

ধীর-বিচক্ষণ আল্‌ফা হাসানী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, অত অধৈর্য হলে চলবে না সুলতানের। কথাগুলো অত্যন্ত জরুরি—তাঁকে মন দিয়ে শুনতে হবে।

যেন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে থেমে দাঁড়ালেন সুলতান। একটা লাগাম-ছেঁড়া বুনো ঘোড়ার মতো তাঁর সমস্ত মন দাপাদাপি করতে চাইছে, অতি কষ্টে তিনি যেন তার রাস টেনে ধরলেন।

—বেশ, বলুন, কী বলতে এসেছেন।

—গোয়ার পর্তুগীজ শাসনকর্তার দূত জর্জ আল-কোকোরাদো এইমাত্র গৌড়ে এসে পৌঁচেছে।

—কী তার বক্তব্য?

—কামান আর ক্রীশ্চান সৈন্য নিয়ে ন'খানা পর্তুগীজ জাহাজ এসেছে চট্টগ্রামের বন্দরে।

—হুঁ, তারপর?

—তাদের সেনাপতি সিল্‌ভা মেনেজেস্‌ গৌড়ের সুলতানকে জানিয়েছে যে বাংলার সঙ্গে কোনো বিরোধ ঘটে এ তারা চায় না। ব্যবসা-বাণিজ্য আর বন্ধুত্বের সম্পর্কই তারা এ-দেশে আশা করে।

—বন্ধুত্বের সম্পর্ক!—মামুদশার মুখ আবার ঘৃণায় বিকৃত হয়ে উঠল: কতগুলো বিধর্মী ডাকাতের সঙ্গে!

—তা হলে কি গৌড়ের সুলতান ক্রীশ্চানদের শত্রু করতে চান?

—শত্রু! শত্রুতা করতে হয় উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে। কয়েকটা সামান্য জলদস্যুকে অতখানি মর্যাদা দিতে আমি প্রস্তুত নই।

—সেক্ষেত্রে—আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন আলফা-হাসানী: সে-ক্ষেত্রে মেনেজেস্‌ সুলতানকে জানাতে চায় যে যদি অবিলম্বে পর্তুগীজ ক্যাপিতান অ্যাফ্‌নসো ডি-মেলো আর তাঁর দলবলকে মুক্ত করা না হয়, তা হলে তিনি চট্টগ্রামে রক্ত আর আগুনের স্রোত বইয়ে দেবেন!

—কী—এতবড় কথা! এত বড় সাহস!—মামুদশা ক্ষিপ্তের মতো গর্জন করলেন: উজীর সাহেব, এখুনি। আমকতল্‌। এই দূত—ঠাণ্ডী-গারদে যারা আছে, তাদের সব শুদ্ধু এখনি কতল্‌ করা হোক। আর চট্টগ্রামে খবর দেওয়া হোক—ওদের একটি প্রাণীও যেন আর গোয়ায় ফিরে যেতে না পারে!

আল্‌ফা হাসানী বললেন, সুলতানকে আরো একটু ধৈর্য রাখতে অনুরোধ করব আমি। এর ফল যুদ্ধ।

—যুদ্ধ! এক ফুঁয়ে উড়ে যাবে। একবার ওদের মা মেরীর নাম করবার পর্যন্ত সময় পাবে না।

উজীর এতক্ষণ পরে মুখ খুললেন।

—সুলতান যা বলছেন সবই সত্যি। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের যুদ্ধ করতে হচ্ছে বিহারে। হয়তো দুদিন পরে দিল্লীর মোগলদের সঙ্গেও বোঝাপড়া করতে হবে। এই সময়ে আরো শত্রু বাড়লে আমাদের দুশ্চিন্তাও বেড়ে যাবে খোদাবন্দ্‌। শত্রু হয়তো তুচ্ছ—কিন্তু অনেকগুলো ক্ষুদ্র শত্রু একসঙ্গে মিললে তার শক্তিকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

—ঠিক কথা।—আল্‌ফা হাসানী মাথা নাড়লেন।

সুলতান চুপ করে রইলেন। একবার উজিরের মুখের

দিকে তাকালেন—একবার, আলফা হাসানীর দিকে। তারপর আবার ঘরময় পায়চারী করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ কাটল স্তব্ধতার মধ্যে। শেষে থেমে দাঁড়ালেন মামুদ শা। একটা বিচিত্র হাসি ফুটে উঠেছে তাঁর মুখে।

বললেন, বেশ, তাই হবে। ক্রীশ্চান দূতকে গৌড়ে কয়েকদিন অপেক্ষা করতে বলুন। আমি ভেবেচিন্তে এর জবাব দেব।

আল্‌ফা হাসানী আর উজীর বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ পেছন থেকে ডাকলেন মামুদশা।

—উজীর সাহেব!

—হুকুম করুন।

—কী বলেছি, মনে আছে আপনার?

উজীর দ্বিধা করতে লাগলেন। তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন না। ঠিক কোন্ জিনিসটি মামুদশা তাঁকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন—সেইটেই ভেবে নিতে চাইলেন।

মামুদশা বললেন, ইব্রাহিম খাঁকে খবর পাঠাতে হবে। সাতদিনের মধ্যে শেরের মাথা আমার চাই। বিহারের বিদ্রোহকে চিরদিনের মতো মুছে দেওয়া চাই। যদি তা না হয়, বন্দী করা হবে ইব্রাহিম খাঁকে। তাকে গৌড়ে এনে বেইমানীর বিচার করা হবে!

একটা কঠিন উত্তর আসতে চাইল উজিরের মুখে। বেইমান! বলতে ইচ্ছে করল, ভাইপোর রক্ত হাতে মেখে যে গৌড়ের তখ্‌তে বসেছে—বেইমান সেই-ই। যারা তার জন্যে দিনের পর দিন প্রাণপাত করছে, তার খাম-খেয়ালের তাগিদে যাদের জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছে, তারা কখনো বেইমান নয়।

কিন্তু একটা অর্ধ-উন্মাদ অস্থির মানুষকে সে-কথা বলা বৃথা। একবারের জন্যে দাঁতে দাঁত চাপলেন উজীর, তারপর অভ্যস্ত বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, তাই হবে।

আবার শূন্য ঘর। আবার একা মামুদশা। একটা ঝাপ্‌সা ধোঁয়াটে ছায়ার জগতে নিঃসঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সুলতান। কেউ নেই কোথাও—কিছুই নেই। এই প্রাসাদ—ওই মিনার: গৌড়ের এই বিশাল নগর—সব যেন বুদ্‌বুদের মতো মিলিয়ে গেছে। যেন কোন্ যাদুকরের ভেল্‌কী!

শের খাঁ! হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ করে মামুদশা। ভাবতে লাগলেন, এম্‌নি করে শেরের গলাটাও যদি তিনি দুহাতে টিপে ধরতে পারতেন!　　ক্রমশঃ

মাইকেল, দেশবন্ধু ও আচার্য্যদেব—

আমরা প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-পূজা করিয়া থাকি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রাজনীতিক নেতা ছিলেন, তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে—চিত্তরঞ্জন সেবাসদন, চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতাল, কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে মন্দির, মিহিজামে রেল কারখানার নাম 'চিত্তরঞ্জন' করণ প্রভৃতির কথা বলা যায়। মাইকেল মধুসূদন বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ কবি হওয়া সত্ত্বেও এখনও পর্য্যন্ত কলিকাতা সহরে তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা হয় নাই—যে স্থানে তাঁহার নশ্বর দেহ সমাহিত হইয়াছিল, সে স্থানটিও ভালভাবে রক্ষার ব্যবস্থা নাই। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র সম্বন্ধেও সেই কথাই বলা যায়। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তাঁহার জীবিতকালে 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার কথা আমরা স্মরণ করি। আচার্য্য রায়ের প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিকেলের কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে তাঁহার বার্ষিক স্মৃতি-সভা অনুষ্ঠিত হয় মাত্র। আমরা মাইকেলের স্মৃতি-রক্ষা বিষয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পরিচালকগণের এবং আচার্য্য রায়ের স্মৃতি-রক্ষা বিষয়ে তাঁহার অগণিত ছাত্র ও গুণমুগ্ধ বন্ধুগণের মনোযোগ আকর্ষণ করি। তাঁহাদের স্মৃতি-রক্ষা করিয়া আমরাই ধন্য হইব। যাঁহারা আমাদের জন্য বহু দান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি উপযুক্ত মর্য্যাদা দান স্বাধীন-রাষ্ট্রের পরিচালক ও অধিবাসীগণের কর্তব্য বলিয়াই মনে করা উচিত।

শ্যামাপ্রসাদ স্মরণে—

দেশবরেণ্য নেতা, পরহিতব্রতী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্বর্গারোহণের পর এক বৎসর কাল অতীত হইল। তাঁহার মৃত্যু-দিবস ও জন্ম-দিবস উপলক্ষ করিয়া কলিকাতা সহরে ও দেশের সর্বত্র তাঁহার অসাধারণ কর্ম-জীবন ও আত্মদানের কথা আলোচিত হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত অপরিণত বয়সে তিনি দেহত্যাগ করিলেও তাঁহার কর্মজীবন সুদীর্ঘ কালব্যাপী ছিল—বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়াই তিনি শিক্ষাব্রতীরূপে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতের একজন প্রধান নেতারূপে পরিণত হইয়াছিলেন। এখনও তাঁহার কর্মবহুল জীবন-কথা লিখিত ও প্রচারিত হয় নাই। তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার অন্য কোন ব্যবস্থা হওয়ার পূর্বে তাঁহার রচনা ও বক্তৃতাবলীর প্রকাশ ও তাঁহার জীবন কথা লেখা বিশেষ প্রয়োজন। তাঁহার ৩০ বৎসরের কর্মজীবন বাঙ্গালার একটি বিশিষ্ট যুগের ইতিহাস হইবে। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের অকাল প্রয়াণের কথা এখনও আমরা চিন্তা করিতে পারি না। তাঁহার অভাব এতই অসহনীয় পীড়াদায়ক যে, সে কথা মনে করিলেই মন স্তম্ভিত হইয়া যায়। তথাপি আমাদের রূঢ় সত্যের সম্মুখীন হইতে হয়। শ্যামাপ্রসাদের দানের কথা দেশবাসী কখনই যেন বিস্মৃত না হয়—তাঁহার ত্যাগ, তাঁহার কর্মনিষ্ঠা, তাঁহার সাহসিকতা, সর্বোপরি তাঁহার সহৃদয় ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার যেন তাঁহার দেশবাসী অনুকরণ করিয়া মনুষ্যত্ব লাভ করে—আমরা সর্বদাই ইহা কামনা করি। কর্মী শ্যামাপ্রসাদ, গুণী শ্যামাপ্রসাদ, দেশ-হিতব্রতী শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু নাই। তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া আমরা প্রার্থনা করিব—শতং জীবতু শ্যামাপ্রসাদ।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিপূজা—

গত ২৭শে জুন রবিবার সকাল ৮টায় ২৪পরগণা জেলার নৈহাটী কাঁঠালপাড়া গ্রামে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পিতৃভবনে সমারোহের সহিত তাঁহার জন্মোৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। সকলেই জানেন, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র যে বৈঠকখানা বাড়ীতে বসিয়া গ্রন্থ রচনা করিতেন, তাহা প্রধানতঃ—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চেষ্টায় এবং নৈহাটীবাসী শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্নের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অদম্য উৎসাহে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকার গ্রহণ



করিয়া 'পুরাতত্ত্ব রক্ষা আইন' অনুসারে রক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং তথায় 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা' প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য একটি কমিটী-গঠন করিয়াছেন। সে দিন বহু অর্থব্যয়ে উক্ত বৈঠকখানা গৃহের সংলগ্ন ময়দানে মণ্ডপ নির্মাণ করিয়া তথায় সভা হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি শ্রীসজনীকান্ত দাস উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-মন্ত্রী শ্রীপান্নালাল বসু সভার উদ্বোধন করেন। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদের পরিচালক ভূতপূর্ব বিচারপতি শ্রীগোপেন্দ্রনাথ দাস সভায় প্রধান অতিথিরূপে এবং লেডী রাণু মুখোপাধ্যায় বিশিষ্টা অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক বসতবাটী ভগ্ন হইয়া ইষ্টকস্তূপে পরিণত হইয়াছে—পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকারকে তাহা গ্রহণ করিয়া তথায় বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করার জন্য শ্রীঅতুল্য ঘোষ সভায় প্রস্তাব করেন। বর্তমান গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালাকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দান করিবার জন্যও সরকারকে এবং দেশবাসী সকলকে অনুরোধ করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র-সহোদর সঞ্জীবচন্দ্রের পৌত্র শ্রীশতঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় সভায় ঘোষণা করেন যে তাঁহার নিকট সংগৃহীত তাঁহাদের পরিবারের সকল স্মারক-দ্রব্য ও চিত্রাদি তিনি বঙ্কিম সংগ্রহশালায় দান করিবেন। সভায় কয়েক সহস্র লোক সমাগম হইয়াছিল এবং বহু দিন পরে বঙ্কিম-ভবনে এত লোক সমাগম ও আড়ম্বর দেখিয়া সকলকেই সন্তোষ প্রকাশ করেন। সভাপতি ও উদ্বোধক মহাশয় বঙ্কিম সংগ্রহশালাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার সকল প্রকার প্রতিশ্রুতি দান করেন। সংগ্রহশালা পরিচালক সমিতির পক্ষ হইতে সভাপতি শ্রীসত্যচরণ ভট্টাচার্য্য, সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্নের চেষ্টায় উৎসবের ব্যবস্থা সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল এবং সমবেত জনগণকে আদর আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সমিতির সদস্য-অধ্যাপক শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, পণ্ডিত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীসুরেশচন্দ্র পাল ও শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনও সে দিন সভায় উপস্থিত ছিলেন। এ বৎসর বাঙ্গালা দেশের বহুস্থানে এবং বাঙ্গালার বাহিরেও কতিপয় স্থানে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসব সম্পাদন করিয়া দেশবাসীরা জাতীয়তাবাদের প্রথম প্রচারক, বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের উদ্গাতা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত গ্রন্থাদি যাহাতে বর্তমানকালের যুবসমাজ কর্তৃক পঠিত ও আলোচিত হয়, সেজন্য সকলকে অবহিত হইতে সর্বত্রই অনুরোধ করা হইয়াছে।

বনমহোৎসব—

গত ৫ বৎসর ধরিয়া পশ্চিমবঙ্গে জুলাই মাসে বন-মহোৎসব সম্পাদন করা হইতেছে। এক মাস কাল সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সমূহ নানাস্থানে উৎসব করিয়া বৃক্ষরোপণ করিয়া থাকেন। সুন্দরবনের গাছ কাটিয়া সেখানে চাষাবাদের ব্যবস্থা করায় পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টিপাত কমিয়া গিয়াছে। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় লোক অর্থের লোভে পশ্চিম বাংলার আম, কাঁঠাল, জাম প্রভৃতি ফলের গাছ প্রায় একেবারে নির্মূল করিয়া দিয়াছে—তাহার স্থানে নানাকারণে নূতন ফলের বাগান করিবার আগ্রহ দেখা যায় না। সেজন্য দেশবাসীকে এ কাজে উৎসাহ ও প্রেরণা দান করাই বনমহোৎসব করার প্রধান উদ্দেশ্য। যে সকল স্থানে বন সৃষ্টি করা সম্ভব ও প্রয়োজন, এই উপলক্ষে সে সকল স্থানেও বন সৃষ্টি করার ব্যবস্থা হইতেছে। বাঙ্গালা দেশের রাজপথগুলির দুই ধারে এত অধিক গাছ ছিল যে কখনও পথিককে রৌদ্রের তাপ সহ্য করিতে হইত না। গত ১৫ বৎসর কেহ পথের ধারে বৃক্ষরোপণ করাও প্রয়োজন মনে করেন নাই। অথচ ঐ সকল গাছ হইতে দেশবাসী ফল ও কাঠ সংগ্রহ করিত। খাদ্যাভাবের সময় আমরা ফলের গাছের অভাব বিশেষ করিয়া অনুভব করিয়াছি। আম কাঁঠালের সময় দেশের লোকের বেশী পরিমাণ ভাত খাওয়ার প্রয়োজন হইত না। পেয়ারা, জাম, জামরুল, লিচু প্রভৃতি ফল গ্রামাঞ্চলে বালকবালিকাদের জলখাবারের অভাব দূর করিত। নিম্নবঙ্গে প্রচুর নারিকেল উৎপন্ন হইতে পারে, দেশবাসী সে বিষয়ে অবহিত হইলে খাদ্যের দিক দিয়া আমাদের অভাব অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে। এই প্রসঙ্গে ফুটি, তরমুজ, কলা, পেঁপে প্রভৃতি ফলের কথাও বলা যায়। সে যাহাই হউক, গত কয় বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা বলিতে পারি যে,

যে উৎসাহের সহিত বৃক্ষরোপণ উৎসব করা হয়, রোপিত বৃক্ষগুলির রক্ষায় আমাদের মধ্যে সে উৎসাহ দেখা যায় না। এ বৎসর বনমহোৎসব করার পূর্বে সর্বত্র এই কথাটি বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। বাংলার সর্বত্র জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও মহকুমা শাসকগণ জন-প্রতিনিধিদের সহিত মিলিত হইয়া সকলকে এ বিষয়ে উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। অতি দুঃখের কথা, সর্বত্রই পথের ধারে বৃক্ষরোপণ করা হইলে আজকাল স্থানীয় লোকজন গাছের বেড়া নষ্ট করিয়া দিয়া থাকেন—তাহার ফলে যে সরকারী অর্থের অপব্যয় হয় এবং নিজেদেরই অপকার করা হয়, এ কথা কেহ একবারও স্মরণ করিয়া দেখেন না। জন-সাধারণের মধ্যে এবার বিষয়টি আলোচিত হওয়ায়, আশা করা যায়, ভবিষ্যতে সরকারী কর্মীরা জন-সাধারণের সহযোগিতা লাভ করিয়া বনমহোৎসবকে সাফল্য-মণ্ডিত করিতে সমর্থ হইবেন। বনমহোৎসব শুধু সরকারী উৎসব নহে—ইহা প্রত্যেক গৃহস্থেরই উৎসব। যাঁহার বাড়ীর সঙ্গে গাছ পুতিবার জায়গা আছে, তাঁহারই বাড়ীতে আম, কাঁঠাল, লিচু, নিম, পেয়ারা, জামরুল, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতির চারা রোপণ করা উচিত। তাহার ফলে গৃহস্থও যেমন উপকৃত হইবেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীরা ও দেশবাসী সকলেই উপকৃত হইবেন।

কলিকাতায় সরকারী বাস—

আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৫৮-৫৯ সালের মধ্যে কলিকাতায় যাহাতে শুধু সরকারী বাস চলে, সেজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। সেজন্য মোট ১ কোটি ৯৮ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। প্রতি বৎসরই বেসরকারী বাসের সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হইবে। বর্তমানে কলিকাতায় ২৮৫খানা ষ্টেট বাস চলে—আরও ৩৫০খানা নূতন বড় ষ্টেট বাস আনা হইবে। বর্তমানে কলিকাতায় ৫৫২খানা প্রাইভেট বাস চলে—তাহার মালিকের সংখ্যা ৩২২জন। এ বৎসরই ২৭খানা প্রাইভেট বাসের লাইসেন্স বাতিল করা হইবে। ষ্টেট বাসে বর্তমানে ৩ হাজার ৩ শত লোক কাজ করে—তাহাদের সংখ্যাও বাড়িয়া যাইবে। সকল স্বাধীন ও সভ্য দেশেই ব্যবসা জাতীয়করণ করার ব্যবস্থা আছে। রেল, বিমান প্রভৃতির মত বাসও জাতীয়করণ করা হইলে মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের লোপ হইবে। তবে ষ্টেট বাস যাহাতে সুপরিচালিত হয় এবং যাত্রীদের প্রকৃত কল্যাণসাধনে সমর্থ হয়, সে ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে হওয়া দরকার। নচেৎ ষ্টেট বাসে যে অপব্যয় ও ক্ষতি হইতেছিল, তাহা চলিলে তদ্দারা দেশবাসী শুধু অপকৃতই হইবে—উপকৃত হইবে না।

স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ফল

বর্তমান বৎসরে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় কৃষ্ণনগর সেণ্ট জন বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীচঞ্চলকুমার মজুমদার ৬৮৯ নম্বর পাইয়া প্রথম হইয়াছেন—ইনি ভারতবর্ষের লেখক ও কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীনির্মলকান্তি মজুমদারের পুত্র। দ্বিতীয় হইয়াছেন—শ্যামবাজার (কলিকাতা) এ-



শ্রীচঞ্চলকুমার মজুমদার

ভি-স্কুলের শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি (নং ৬৬২), তৃতীয় হইয়াছেন—কলিকাতা হিন্দু স্কুলের শ্রীপ্রণবকুমার বর্দ্ধন (নং ৬৫৩) ও চতুর্থ হইয়াছেন—মেদিনীপুর কলিজিয়েট স্কুলের শ্রীমণিলাল চক্রবর্তী (নং ৬৪২)। ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম হইয়াছেন—কলিকাতা সেণ্ট জন ডায়োসেসন স্কুলের শ্রীকেতকী কুশারী (নং ৬১৯), দ্বিতীয় হইয়াছেন—নবাবগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের শ্রীইলা মিত্র (নং ৫৯৫), তৃতীয় হইয়াছেন—বহরমপুর মহাকালী পাঠশালার শ্রীসংযুক্তা সরকার (নং ৫৯৩) ও চতুর্থ হইয়াছেন—কলিকাতা কমলা স্কুলের শ্রীমণিকা ভট্টাচার্য্য (৫৮৬)। মোট ৫৫৭৭১ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩১৯২৪জন পাশ করিয়াছে (শতকরা

৫৭'২২৪)। প্রথম বিভাগে ১৬৮৫, দ্বিতীয় বিভাগে ৬৫৮৩ এবং বাকী তৃতীয় বিভাগে পাশ করিয়াছে।

শ্রীবিজলীভূষণ লাহিড়ী—

তিন বৎসরকাল ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষালাভের পর শ্রীবিজলীভূষণ লাহিড়ী বি-এস্‌-সি—বি-এম-ই গত ২৩শে জুন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি প্রথমে ম্যাঞ্চেষ্টারে মেসিন টুল প্রস্তুত কারখানায় ও পরে



ডাঃ বিজলীভূষণ লাহিড়ী

সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখে টার্বো-মেশিনারী কারখানায় শিক্ষালাভ করেন। তিনি টার্বো-মেশিনারী সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হইয়া আসিয়াছেন। আমরা তাঁহার জীবনে সাফল্য কামনা করি।

বোম্বায়ে বাঙ্গালী ছাত্রীর সাফল্য—

১৯৫৪ সালে বোম্বায়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কুমারী কৃষ্ণা চক্রবর্ত্তী উত্তীর্ণ ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। সে বিলাসপুর কোনীর সেণ্ট্রাল ট্রেণিং ইনিস্টিটিউটের অধ্যক্ষ শ্রীএন-সি-চক্রবর্ত্তীর কন্যা। বোম্বায়ে বাঙ্গালী ছাত্রীর এই সাফল্য বাঙ্গালী মাত্রেরই গৌরবের বিষয়।

পরলোকে বিভাবতী বসু—

স্বর্গত নেতা শরৎচন্দ্র বসুর পত্নী শ্রীমতী বিভাবতী বসু গত ২৩শে জুন বুধবার রাত্রিতে কলিকাতা উডবার্ণ পার্কে তাঁহার বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার ৫৯ বৎসর বয়স হইয়াছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁহার স্বামী শরৎচন্দ্রের এবং তাঁহার দেবর নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর দানের পিছনে বিভাবতী দেবীর প্রেরণা বিশেষ



বিভাবতী বসু

কাজ করিয়াছিল। তিনি কলিকাতা কলেজস্কোয়ারবাসী অক্ষয়কুমার দে'র কন্যা ছিলেন—১৪ বৎসর বয়সে বিবাহিতা হইয়া তিনি যেমন সংসার-ধর্ম পালন করিতেন, তেমনই নিষ্ঠা ও আগ্রহ লইয়া দেশের মুক্তি সংগ্রামে সাহায্য করিতেন। তাঁহার ৪ পুত্র ও ৪ কন্যা বর্ত্তমান।

ভাকরা নাঙ্গাল খালের উদ্বোধন—

গত ৮ই জুলাই পাঞ্জাবে শ্রীজহরলাল নেহরু ভাকরা-নাঙ্গাল খালের উদ্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—এই খাল ভারতবাসীর কল্যাণে উৎসর্গ করা হইল। পাঞ্জাব বিভাগের পর পূর্ব পাঞ্জাব (ভারতীয়) এলাকার পরিমাণ শতকরা ৩৪ ভাগ, লোকসংখ্যা শতকরা ৪২ ভাগ হইলেও খালের পরিমাণ ছিল শতকরা মাত্র ২০ ভাগ। সেজন্য পূর্ব পাঞ্জাবে কম খাদ্য উৎপন্ন হইত—নূতন খাল হওয়ায় সে অভাব দূর

হইবে। এই খাল হওয়ায় পশ্চিম পাঞ্জাবে জলের পরিমাণ কমিবে না। বিশ্ব ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ সে বিষয় বিবেচনা করিয়াছেন। পাকিস্তানে আত্মকলহের ফলে তাহাদের কোন নূতন পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হয় নাই—ভারত রাষ্ট্র সকল বিপদ ও বাধা অতিক্রম করিয়া এই বিরাট খাল-পরিকল্পনা সমাপ্ত করিয়াছেন। উৎসবে পূর্ব পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী শ্রীভীমসেন সাচার বলেন যে—শ্রীনেহরুর প্রেরণা ও উৎসাহ দানের ফলেই পূর্ব পাঞ্জাবে এই বিরাট কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। তিনি সেজন্য শ্রীনেহরুর কর্মশক্তির বিশেষ প্রশংসা করেন।

বর্ষা-উৎসব—

গত ১.ই জুলাই অপরাহ্ণে আলমবাজারে শ্রীহেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে সাহিত্য-বাসরের দ্বাদশ বর্ষা-উৎসব



আলমবাজারে সাহিত্যবাসরের বর্ষা উৎসব ফটো—সুনীল মাইতি

অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কবি শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। সভায় নৃত্য-গীত, আবৃত্তি প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল।

মানসিক স্বাস্থ্য প্রদর্শনী—

কলিকাতার নিকট দমদমে বঙ্গীয় উন্মাদ আশ্রমে গত ১১ই জুলাই রবিবার সকালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল অধ্যাপক শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মানসিক স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়াছেন। মানসিক রোগ ও তাহার সমস্যা দেশে দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে—সে সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করিবার উদ্দেশ্যেই এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টার ডাঃ বি-সি দাশগুপ্ত। প্রদর্শনী ৮টি ভাগে বিভক্ত। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক কবিরাজ শ্রীঅতুলবিহারী দত্ত এ বিষয়ে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দেশবাসীর উপকার করিয়াছেন। ১৯৩৫ সালে ঐ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রায় ২০ বৎসর কাজ করিতেছে। রাজ্যপাল মহোদয় সরকার ও জনসাধারণকে ঐ প্রতিষ্ঠানে সাহায্যদান করিতে আবেদন জানাইয়াছেন। সভাপতি ডাঃ দাশগুপ্ত বলেন—রোগ নিরাময়ের পর রোগীদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা করাও আশ্রমের অন্যতম কর্তব্য। আমরা সকলকে এই প্রদর্শনী দেখিয়া শিক্ষালাভ করিতে অনুরোধ করি।

পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন—

পশ্চিমবঙ্গে যে সকল উদ্বাস্তু রহিয়াছেন, তাঁহাদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনার পর মন্ত্রী কমিটী এই সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ জানাইয়াছেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, আগামী ৩ বৎসরে মোট ৩২ কোটি টাকা এ কার্য্যে ব্যয় করা হইবে—তন্মধ্যে ৯ কোটি টাকা সাহায্যরূপে এবং ২৩ কোটি টাকা দানরূপে ব্যয় করা হইবে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ঐ কমিটীর সদস্য ছিলেন। কেন্দ্রীয় অর্থ দপ্তরের জনৈক আণ্ডারসেক্রেটারীকে কলিকাতায় আনয়ন, পুনর্বাসন দপ্তরে পরিসংখ্যান শাখা প্রতিষ্ঠা, পুনর্বাসন সম্পর্কে জাতিগঠনমূলক বিভাগের সমন্বয় সাধন, রিলিফক্যাম্পের পরিবর্তে পুনর্বাসন স্থানে লোক প্রেরণ, পল্লী অঞ্চলে সমবায়ের ভিত্তিতে উদ্বাস্তুদের জন্য কুটীর শিল্প স্থাপন, শিক্ষার্থী পরিকল্পনার উন্নতি বিধান প্রভৃতি প্রস্তাব করা হইয়াছে। যে সকল কারণে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ব্যবস্থা সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই, সেগুলি সম্বন্ধেও তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছেন ও সেগুলি দূর করার ব্যবস্থায় মনোযোগী হইয়াছেন। ঐ কার্য্য উপলক্ষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন ১০ দিন পশ্চিমবঙ্গে বাস করিয়া গিয়াছেন। ফল কি হয়, তাহাই লক্ষ্য করিতে হইবে।

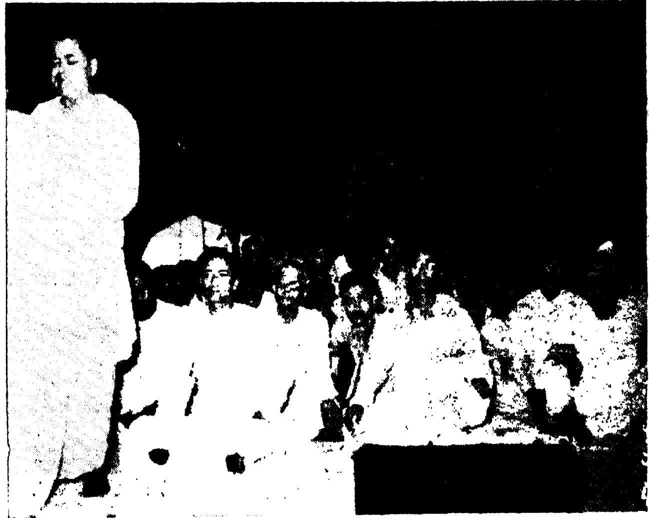
দেবীপ্রসাদের সম্মান—

মাদ্রাজ প্রবাসী খ্যাতনামা শিল্পী, ভাস্কর ও সাহিত্যিক শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী নয়া দিল্লীর নিখিল ভারত

ললিতকলা একাডেমীর প্রথম সভাপতি স্থির হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীরাজসাজা পূর্বেই নিখিল ভারত সঙ্গীত একাডেমীর প্রথম সভাপতি হইয়াছেন। আমরা দেবী-প্রসাদের এই সম্মান প্রাপ্তির সংবাদে তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী—

গত ১লা আষাঢ় শুভ স্নানযাত্রার দিন পুণ্যশ্লোকা রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সাধনপীঠ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে ৫ই আষাঢ় পর্যন্ত কয়দিনব্যাপী উৎসব হইয়াছিল। ১লা আষাঢ় প্রাতে উদ্বোধনী সভায় পৌরোহিত্য করেন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ত-তীর্থ এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন বিখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। ঐ দিন মন্দিরে রাণী রাসমণির যে প্রস্তর-মূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়, তাহার আবরণ উন্মোচন করেন ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী



দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী উৎসবে শেষ দিনের সভায় সমাগত সুধীবৃন্দ ফটো—সুনীল মাইতি

৪ঠা আষাঢ় শনিবার অপরাহ্নে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ গায়ক-গায়িকাদের সংগীত এবং বিশিষ্ট নৃত্যবিদ্‌দের নৃত্য প্রদর্শিত হয়। ৫ই তারিখের সভায় প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ও খ্যাতনামা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে বাঙ্গলার বিখ্যাত লেখক-লেখিকাদের রচনা লইয়া দক্ষিণেশ্বর দেবোত্তর এষ্টেটের পক্ষ হইতে "দক্ষিণেশ্বর মন্দির" (শতবার্ষিকী সংখ্যা) নামে একটি পুস্তকও প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকখানি সম্পাদনা করেন সাহিত্যিক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়।

খাদ্যশস্য বিনিয়ন্ত্রণ—

১০ই জুলাই শনিবার হইতে ভারতসরকার চাউল সম্পূর্ণ বিনিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। বর্তমানে সরকারের গুদামে ১২ লক্ষ ৭৫ হাজার টন চাউল মজুত আছে, তাহা ছাড়া ব্রহ্মদেশ হইতে আরও ৯ লক্ষ টন চাউল ভারতে আসিতেছে। তাহার উপর ব্যক্তিগতভাবে বহু ব্যবসায়ী ও উৎপাদক যে চাউল মজুত করিয়া রাখিয়াছেন—তাহার পরিমাণও বিরাট। প্রায় ১০ বৎসর ৯ মাস পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য রেশন চালু হইয়াছিল। চাউল নিয়ন্ত্রণ উঠিয়া গেলেও রাজ্যসরকার রেশন দোকান ও ন্যায্য মূল্যের দোকানের মাধ্যমে বর্তমানে প্রচলিত মূল্যে চাউল বিক্রয় ব্যবস্থা বহাল রাখিবেন। যতদিন সরকারী সরবরাহের চাউলের চাহিদা থাকিবে, ততদিন ঐ ব্যবস্থাও চালু থাকিবে। রেশন প্রথা উঠিয়া যাওয়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গের লোক আবার পেট ভরিয়া ভাত খাইতে পাইবে ও চাউলের দাম ক্রমশঃ কমিয়া যাইবে। বর্তমানে চাউলের মূল্য হ্রাস কৃষকদের পক্ষে ক্ষতিজনক হইলেও পরে সে অবস্থার

অবসান হইবে। বর্তমান বৎসরে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হইলে, আশা করা যায়, আগামী বৎসরে সাধারণ মোটা চাউল ১০ টাকা মণ দরে পাওয়া যাইবে। ময়ূরাক্ষী ও দামোদর পরিকল্পনা এবং অন্যান্য ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনা সাফল্য-মণ্ডিত হইয়া কার্য্যকরী হইলে দেশে আর খাদ্যাভাব থাকিবে না।

পুরীতে শ্রীচৈতন্যদেবের স্মৃতি—

ভারতের রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সভাপতি বিচারপতি শ্রীএন-চন্দ্রশেখর আয়ার গত ৭ই জুলাই পুরীতে যাইয়া পুরীতে শ্রীচৈতন্যদেবের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থার কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি এ বিষয়ে উড়িষ্যার রাজ্যপাল শ্রীকুমার-স্বামী রাজা ও ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ মহাতাবের সহিত আলোচনাও করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব পুরীর শ্রীরাধাকান্ত মঠে দীর্ঘ অষ্টাদশবর্ষ বাস করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট ও ভারতবাসীর পক্ষ হইতে তাহা একটি জাতীয় সম্পত্তিরূপে রক্ষার কথা চিন্তা করা হইতেছে। এ যুগের যুগগুরু শ্রীচৈতন্যদেবের কথা সর্বজনবিদিত হইলেও আজ তাঁহার জীবনী ও বাণী নূতন করিয়া প্রচারের প্রয়োজন হইয়াছে। শ্রীআয়ার এ বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দলাভ করিয়াছি।

নাগপুরে বাঙ্গালী ছাত্রীর সাফল্য—

নাগপুরে সরকারী বন বিভাগের প্রধান কর্মকর্তার অফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীএম-এন-চৌধুরীর কন্যা কুমারী নমিতা চৌধুরী বর্তমান বৎসরে নাগপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম-এস্ সি পরীক্ষায় বোটানীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। এম-এ ও এম-এস্ সি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারীদের মধ্যে তিনিই একমাত্র মহিলা।



সত্যিই কি আনন্দ যে হয়েছিল যখন দর্শকদের হাততালি আর হর্ষধ্বনির মধ্যে আমার নাচ শেষ হ'লো। উৎসাহ আর উত্তেজনায় মনে হচ্ছিল সারা রাত নাচতে পারি। তারপর যখন প্রথম পুরস্কার সোনার মেডেল নিতে গেলাম, তখন মনে হ'লো আমার মতো সুখী কেউ নেই। আর আমার নাচের গুরুর কি আনন্দ! মাকে বললেন: "কে বলবে এই মেয়েই দুবছর আগের সেই রুগ্ন নিস্তেজ মেয়ে?" মাও আনন্দে, উত্তেজনায় নির্বাক।

গুরু ঠিকই ব'লেছিলেন। দু বছর আগে পনেরো মিনিট এক সঙ্গে নাচতে পারতাম না, আর কি ক্লান্তই লাগত। মা তো ভেবেই অস্থির, ডাক্তারকেও দেখালেন। "ভাববার কিছুই নেই" ডাক্তার বললেন, "মেয়ের খাওয়াদাওয়ার দিকে নজর দিন। সমন্বয়যুক্ত খাবারের ব্যবস্থা করুন। দেখবেন যেন এর খাবারে আমিষজাতীয় খাবার, শর্করাজাতীয় খাবার, খনিজপদার্থ, ভিটামিন, আর সবের সঙ্গে স্নেহপদার্থ থাকে। খাঁটি, তাজা স্নেহপদার্থ প্রত্যহ আমাদের প্রত্যেকের খাবারে থাকা চাইই, কারণ এর থেকেই আমরা আমাদের দৈনিক শক্তি সামর্থ পাই।"

মা পরের দিন দোকানে গিয়ে দোকানদারের কাছে রান্নার জন্য খুব ভালো স্নেহপদার্থ চাইলেন। দোকানদার তক্ষুনি একটিন ডালডা বনস্পতি বার করে বললে "এর চেয়ে ভালো জিনিষ পাবেন না।"

ডালডায় রান্না খাবার খেয়েই আমার খিদে ফিরে এলো। ডালডা বনস্পতি সব রকম খাবারের নিজস্ব স্বাদ গন্ধ ফুটিয়ে তোলে। শীগ্গীরি সেই আগেকার ক্লান্ত, নিস্তেজ ভাব কেটে গেলো, আর অল্প দিন পরেই তিন ঘণ্টা ধরে নাচ শেখা, নাচের মহড়া চলতে লাগল। শক্তি দিতে ডালডা বনস্পতির চেয়ে ভালো আর কিছুই নেই। ডালডায় এখন ভিটামিন এ ও ডি দেওয়া হয়। ডালডা বনস্পতি বায়ুরোধক, শীলকরা টিনে সর্ব্বদা তাজা ও খাঁটি অবস্থায় পাওয়া যায়। ডালডায় খরচও কম। আজই একটিন ডালডা কিনে আপনার সংসারের সব রান্না এতেই করতে আরম্ভ ক'রে দিন।

শরীর গঠনকারী খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা

বিনামূল্যে উপদেশের জন্য আজই লিখুন:
দি ডালডা
এ্যাডভাইসারি সার্ভিস
পোঃ, আঃ, বক্স নং ৩৫৩, বোম্বাই ১



গাছ মার্কা টিন দেখে নেবেন

১০, ৫, ২ ও ১ পাউণ্ড টিনে পাবেন।

ডালডা বনস্পতি

রাঁধতে ভালো - খরচ কম

HVM. 216-X52 BG

রাঢ়ের সাহিত্য-সাধক

শ্রীপ্রশান্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

রাঢ়ের সাহিত্য বাংলার সংস্কৃতি সাধনার এক অনবদ্য অবদান! বাংলার অপর কোন অংশে সাহিত্য ও কাব্যের এত বিপুল চর্চ্চা হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রাঢ়ের সাহিত্য-সাধনার বহু বিস্তৃত আলোচনা হওয়া সত্ত্বেও নূতনের পোষাকে সাজাইবার প্রয়োজন আছে বলিয়াই অতীতকে পুনরপি লোকচক্ষে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাইয়াছি। বর্ত্তমানে রাঢ় বলিতে বিশেষ ভাবে বর্দ্ধমান জেলাকেই বোঝায়। ইংরেজ রাজত্বের প্রাক্‌কালে এবং ইংরেজ শাসনের প্রথম ভাগে রাঢ়ের সীমা আরও বিস্তৃত ছিল। বিদেশী শাসনের দ্বারা রাঢ়ের সীমা বহুক্ষেত্রে সঙ্কুচিত হইয়াছে। বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও হুগলীর অংশবিশেষও রাঢ় রূপে আখ্যাত ছিল। রাঢ়বঙ্গ—শিল্প সাহিত্য, কাব্য ও সংস্কৃতির কেবলমাত্র অগ্রদূতই ছিল না, বাংলার সভ্যতা-সাধনার কেন্দ্রমণি রূপে খ্যাত হইয়াছিল। তন্ত্র ও বৌদ্ধশাস্ত্র এবং বৈষ্ণব কাব্যের ভক্তিপ্লুত রসপ্লাবনে রাঢ়ের সংস্কৃতির পূর্ণ পরিণতি ঘটিয়াছিল। বৈষ্ণবকাব্য সাহিত্যের চর্চ্চা ও উৎস ভূমি এই রাঢ়দেশ। বৈষ্ণব-কাব্য-সাহিত্য ভক্তিধারার জাহ্নবীপ্রবাহ রূপে কেবলমাত্র মানুষকে ভাগবতীবোধে উদ্বোধিত করে নাই—পরন্তু ভারতীয় সাহিত্যে বৈষ্ণব-কাব্য-সাহিত্য এক অপূর্ব্ব প্রতিভার দ্যুতিতে দ্যুতিমান হইয়া উঠিয়াছিল। বৈষ্ণব সাহিত্য ব্রতীর যে সাধনা বাংলার দুকুলকে প্লাবিত করিয়াছিল তাহার প্রধান উৎস ছিল বর্দ্ধমানভুক্তি।

রাঢ়ের সাহিত্যসাধকদের ঐতিহাসিক নিরিখ দিয়া ধারাবাহিক আলোচনা বড় একটা হয় নাই। যে সকল বুধমণ্ডলী উক্ত আলোচনা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই। কুলগ্রন্থ বা কুলপঞ্জিকা যে রাঢ়ের জ্ঞান বৈভবের বিষয় তাহাও বিস্তৃত আলোচিত হয় নাই। রাঢ়ীয় সংস্কৃতি প্রাচীন বিহার, উৎকল ও আসামকেও পরিপ্লাবিত করিয়াছিল। নেপাল ও তিব্বত রাঢ়ের সভ্যতা সংস্কৃতির আলোক স্পর্শে আলোকিত হইয়াছিল।

রাঢ়ে সাহিত্য-আলোচনার একটা ঢেউ উঠিয়াছিল। এই সাধনার পরিপূর্ণ আলোচনা করিলে তাহা এক প্রকাণ্ড ইতিহাসে পরিণত হইবে। ভট্ট ভবদেব বা ভবদেব ভট্ট রাঢ়ের জ্ঞান-বোধির এক প্রদীপ্ত ভাস্কর। ইঁহার নিবাস সিদ্ধল বা সিধলে গ্রামে। শ্রীবলাই দেবশর্ম্মার মতে "মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ অনুমান করেন পশ্চিম রাঢ়ের গুস্করার সন্নিকটবর্ত্তী কোন গ্রাম সিদ্ধল বা সিধলে।" ভট্ট ভবদেবের ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রবিদ মীমাংসক বঙ্গাধিপ হরিবর্ম্মাদেবের রাজ্যকালে ছিলেন। ইনি বাঙ্গালী স্মার্ত্তরূপে খ্যাত। রাঢ়ের নানা স্থানে জলাশয় খনন করিয়া জনসমাজে আদৃত হইয়াছিলেন। ইঁহারই পদ্ধতি অনুযায়ী রাঢ়ের ব্রাহ্মণ সমাজ দশসংস্কার কার্য্য অনুষ্ঠিত করেন। ভুবনেশ্বরের অনন্ত বাসুদেবের মন্দির ও 'বিন্দু হ্রদ' ভবদেবের অবিনশ্বর কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। বাংলার বৌদ্ধপ্রভাব এঁরই চেষ্টায় বিদূরিত হইয়াছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ কীলহোর্ণ ভট্ট ভবদেবের প্রশস্তির লিপিকাল ১২০০ খৃষ্টাব্দের সমসাময়িক বলিয়া মনে করেন। ভট্ট ভবদেব হরিবর্ম্মা দেবের মন্ত্রসচিব ও তাঁহার পুত্রের দণ্ডনীতিদাতা ছিলেন। ভবদেব বার্ত্তা, ভবদেব প্রশস্তি, অনন্ত বাসুদেব প্রশস্তি, প্রায়শ্চিত্ত নিরূপণ, কুলপ্রশস্তি প্রভৃতি গ্রন্থ ভট্ট ভবদেবের রচিত বলিয়া অনুমিত হয়। ভুবনেশ্বরের অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরে ভবদেব ভট্টের কুলপ্রশস্তি উৎকীর্ণ আছে। ভবদেব খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর ব্যক্তি বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। (Bhatta Bhavadeva of Bengal by Monmohan Chakrabarty—Journal of the Asiatic society of Bengal (N. S.) Vol. VIII. P. 347.) আবার কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে, ভবদেব দশম শতকের উজ্জ্বল রত্ন। বাচস্পতি মিশ্র রচিত অনন্ত বাসুদেবের প্রশস্তিতে ভবদেবকে "বালবলভী ভুজঙ্গ ভট্ট ভবদেব" রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। কাজেই পূর্ব্ববর্ণিত 'অনন্ত বাসুদেব প্রশস্তি' ভবদেবের রচিত বলিয়া অনুমান টিকে না। "ছান্দোগ্য পরিশিষ্ট প্রকাশ" নারায়ণ ভট্ট লিখিত। নারায়ণ বর্দ্ধমানের অধিবাসী ছিলেন।

রাঢ়ের প্রাচীন ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক নিরিখ অনুযায়ী দ্বাদশ শতাব্দীর গীতিকাব্যের সুরকার জয়দেব ও চণ্ডীদাস রাঢ়ের কবি। কেন্দুবিল্ব ও নান্নুর কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে বর্দ্ধমান ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাংলার এই দুই শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন বর্দ্ধমানের কবি। নান্নুর এবং কেন্দুবিল্ব কয়েক শতাব্দীকাল পূর্ব্বেও বর্দ্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত ছিল। বাংলার এই দুই কাব্যের অগ্রসাধক ছিলেন বর্দ্ধমানের গৌরব।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতির আদিকাল যদি "অনির্দ্দিষ্ট উৎপত্তিকাল হইতে চৈতন্যদেবের প্রাদুর্ভাব পূর্ব্ব পর্য্যন্ত (১৪৮৫ খৃঃ) আদ্যকাল এবং বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসকে আদ্যকালের লেখক" রূপে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে চণ্ডীদাসকে রাঢ় অর্থাৎ বর্দ্ধমানের কবি বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। "ললিত বিস্তার" নামক বৌদ্ধ গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে বঙ্গলিপির উল্লেখ আছে। সুতরাং দশম শতাব্দীর বহু পূর্ব্বেও যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অস্তিত্ব ছিল তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

সন তারিখের চুলচেরা হিসাব-নিকাশ দিয়া বৃহত্তর রাঢ়ের সাহিত্য-সাধকদের স্মৃতি বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্বে 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের' শ্রেষ্ঠ রচনাকার এই বর্দ্ধমানের বা রাঢ়ের সম্পদ। বর্দ্ধমানের কুলীনগ্রামে কবির বাস ছিল। বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র ছিল এই কুলীনগ্রাম। ভক্তি-ধর্ম্মের অনুপমতার উৎসভূমি কুলীন গ্রাম। মালাধর বসু বা 'গুণরাজ খান' ইতিহাস-খ্যাত ব্যক্তি। মালাধর বসুকে

কেহ কেহ আন্তকালের বলিয়া বর্ণনা দিয়া থাকেন। 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' সন তারিখ যুক্ত বাংলা ভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থ। গ্রন্থের রচনাকাল ১৩৯৫-১৪০২ শকে অর্থাৎ ১৪৭৩-১৪৮১ খৃষ্টাব্দ। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মালাধর বসু কৃত ভাগবতের অনুবাদ 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের' উদ্ভব। ভক্তি রস-ধারার ইহা এক অমৃত নির্ঝরিণী। গৌড়েশ্বর মালাধরকে 'গুণরাজ খান' উপাধিতে অলঙ্কৃত করেন। নবদ্বীপ হইতে রাঢ়বঙ্গের মধ্যমণি বর্দ্ধমান ভক্তিধারায় অবগাহন করিয়াছিল।

যশোরাজ খান প্রাচীন ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেন। ১৪৯৩-১৫১৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যশোরাজের পদগুলি রচিত হইয়াছিল। শ্রীখণ্ডের বৈদ্যবংশের যশোসূর্য্য হইতেছেন—যশোরাজ খান।

—'অমিয়া মথিয়া কেবা   নবনী তুলিল গো
তাহাতে গড়িল গোরা দেহ।

ভক্তি-নির্ঝরিণীর ইহা এক অনবদ্য প্রবাহধারা! লোচনদাস ১৪৪৫ শকে (আনুমানিক) বর্দ্ধমানের কোগ্রামে আবির্ভূত হন। 'লোচনের পাট' আজও বৈষ্ণব সমাজকে ভক্তি নম্র করিয়া তোলে। লোচনদাসের অমরকীর্ত্তি "চৈতন্যমঙ্গল"। দুর্লভসার, রাগলহরী, বস্তুতত্ত্বসার, আনন্দ লতিকা, প্রার্থনা, শ্রীচৈতন্য প্রেমবিলাস ও দেহ নিরূপণ নামে আরও সাতটি রচনা করেন। ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে ৬৬ বৎসর বয়সে ইনি দেহরক্ষা করেন। যে প্রস্তর খণ্ডের উপর বসিয়া লোচনদাস 'চৈতন্যমঙ্গলের' হৃদয়-আকর্ষণী বীণা বাজাইয়াছিলেন আজও তাহা বিদ্যমান রহিয়াছে। 'চৈতন্যমঙ্গল' তিন খণ্ডে বিভক্ত। লোচন গার্হস্থ্যধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেও ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে লোচন প্রকট হইয়াছিলেন। বৈদ্যবংশের ইনি এক উজ্জ্বল রত্ন। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে গুরু নরহরি সরকারের আদেশে 'চৈতন্যমঙ্গলের' কবি উহা রচনা আরম্ভ করেন—তখন তিনি ৫৮ বৎসরের সীমায় পৌছিয়াছেন।

শ্রীখণ্ড বাংলার ভক্তি ও তন্ত্রসাধনার পীঠকেন্দ্র বলিয়া খ্যাত। বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত শ্রীখণ্ড। বৈষ্ণব ভক্তি ও প্রেমরসের মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল নবদ্বীপ হইতে শ্রীখণ্ডে। ভক্তের আর্ত্তি-নিবেদনে শ্রীখণ্ড একদা মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করিয়া ভারতীয় সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট অংশ যেমন বিপুলভাবে সৃষ্ট হইয়াছিল, তেমনি বর্দ্ধমানের শ্রীখণ্ডে বৈষ্ণবধর্ম্মের এক বিরাট প্রতিষ্ঠা ও ব্যাপকতার উদ্ভব হইয়াছিল। শ্রীখণ্ড যেন বাংলার ব্রজধামে রূপান্তরিত হইয়াছিল। শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার মহাপ্রভুর পারিষদ ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রধান প্রচারক ছিলেন। শ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তা রূপেও নরহরির খ্যাতি ছিল প্রচুর। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে শ্রীখণ্ড বাংলার সাহিত্য-সাধনার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। গ্রাম-কেন্দ্রিক বাংলায় ঠিক এমনটি বড় একটা হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নরহরি কতকগুলি কৃষ্ণলীলা ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ রচিয়াছিলেন। সাধনা বিষয়ক কয়েকটী প্রবন্ধও ইনি রচনা করিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদরচনায় নরহরি শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ। নরহরির ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দনও কবিখ্যাতি পাইয়াছিলেন। মুকুন্দদাস নামে আর একজন বৈষ্ণব কবির সন্ধান পাওয়া যায়। নরহরি, মুকুন্দদাস ও রঘুনন্দনের প্রচেষ্টায় শ্রীখণ্ডে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম বিস্তার লাভ করিয়াছিল। নরহরি সরকার (১৪৭৮-১৫৪০ খৃঃ অব্দ) শ্রীচৈতন্যের একজন অনুরাগী অনুচর ছিলেন। ইনিও কৌমার্য্য ব্রতচারী ছিলেন। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে নরহরি সরকারের তিরোভাব ঘটে।

বসু রামানন্দ বা রামানন্দ বসু মালাধর বসুর পৌত্র। মহাপ্রভু ইহাকে মিত্ররূপে সম্বোধন করিতেন। রামানন্দের কতকগুলি বাংলা ও ব্রজবুলি পদ আছে। কুলীনগ্রামের বসু বংশ বৈষ্ণব ভক্তিধর্ম্মের ধারক ও বাহক বলিয়া বৈষ্ণব পরিমণ্ডলীতে বিশেষ শ্রদ্ধা পাইয়া থাকে।

বর্দ্ধমানের প্রান্তস্থিত কাঞ্চননগরের শ্যামাদাস কর্ম্মকারের পুত্র গোবিন্দ কর্ম্মকার ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে গৃহত্যাগী হন। গোবিন্দের কড়চা ভক্তি রসের এক অনুপম ইতিহাস। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস পরিক্রমায় গোবিন্দ সহচর হইয়াছিলেন। চৌদ্দশ ত্রিশ-শকে গোবিন্দ গৃহত্যাগী হন। ইহার জননীর নাম মাধবী, স্ত্রী শশিমুখী। গোবিন্দ প্রেমাবতারের কিঙ্কর হইয়াছিলেন। স্ত্রী কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া গোবিন্দ গৃহপরিত্যাগ করেন। চৈতন্য-প্রভুর ভ্রমণ বৃত্তান্তই গোবিন্দের কড়চার প্রধান উপজীব্য।

গোবিন্দ ঘোষ নামে আর এক বৈষ্ণব পদকর্ত্তার নাম পাওয়া যায়। ইনি কুলীন গ্রামের অধিবাসী। নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য 'সঙ্গীত ও কারকে'র স্রষ্টা বলরাম দাস দোগাছিয়ার কবি। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। সম্ভবতঃ 'দাস' শব্দটি বিনয়সূচক বলিয়া বৈষ্ণবভক্তগণ প্রায়ই উহার ব্যবহার করিতেন। বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই বলরাম দাস শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন। 'প্রেমবিলাসের' কবি নিত্যানন্দ রূপেও খ্যাত, কিন্তু বলরাম দাস বলিয়াও ইনি বৈষ্ণব-বিদগ্ধ সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। বৈষ্ণব-সাহিত্যে বলরাম "কবি নৃপরাজ" উপাধিতে ভূষিত হন। পিতার নাম আত্মারাম দাস ও মাতা সৌদামিনী। নিত্যানন্দ প্রভুর পৌত্র গোপীজনবল্লভ বর্দ্ধমানের নোতা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার প্রপৌত্র রামেশ্বর গোস্বামী ইছাপুর গ্রামে বসবাস করিয়াছিলেন। রামেশ্বর গোস্বামীর পুত্র নৃসিংহ গোস্বামী মাড়ো গ্রামে বসবাস করিতেন। এই মাড়ো গ্রাম বাংলার সাহিত্যের তীর্থ ভূমি—এখানে "রাম-রসায়ন" প্রণেতা রঘুনন্দন গোস্বামীর জন্মভূমি। পরে রঘুনন্দন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিব। মাড়ো মানকরের নিকট। এই গ্রাম বর্দ্ধমানের গোপভূমি পরগণার অন্তর্গত। নৃসিংহদেবের পুত্র বলদেব। বলদেবের তিন পুত্র—লালমোহন, বংশীমোহন ও কিশোরীমোহন। যাঁহাদের নাম করিলাম তাঁহারা সকলেই কবি।

বর্দ্ধমান এক প্রাচীন জনপদ। ইহার ঐতিহ্য ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সাহিত্যে বর্দ্ধমানের অবদান অতুলনীয়। পুরাতনের জীর্ণ কঙ্কাল মালিকাকে গাঁথিবার প্রচেষ্টায় রহিলাম।

রবীন্দ্র-কাব্যের সর্ব্বশেষ পর্য্যায়

সুশীলকুমার গুপ্ত

॥ ১ ॥

রোগশয্যায় (জানুয়ারী, ১৯৪১), আরোগ্য (মার্চ্চ, ১৯৪১), জন্মদিনে (এপ্রিল, ১৯৪১) এবং শেষ লেখা (আগস্ট, ১৯৪১)—এই চারখানি কাব্যগ্রন্থ রবীন্দ্রকাব্যের শেষপর্য্যায়ের অন্তর্গত।

রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনায় এই শেষ পর্য্যায়ের কাব্যগ্রন্থগুলির একটি বিশেষ মূল্য আছে। রোগের আক্রমণ এবং রোগ-মুক্তির অভিজ্ঞতা তাঁর রচনাকে একটি আশ্চর্য্য রসে সিঞ্চিত করেছে। পৃথিবীর সাহিত্যে ঠিক এই শ্রেণীর কবিতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। রোগযন্ত্রণার ছায়া, ব্যাধিগ্রস্ত মনের হতাশ্বাস, কল্পনার আবিলতা অনেকগুলি রচনার মধ্যে প্রত্যক্ষ। কিন্তু কবি সমস্ত ব্যথা যন্ত্রণাকে অতিক্রম ক'রে মানুষের বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করেছেন।

মুক্ত-বন্ধ অমিল তানপ্রধান ছন্দেই অধিকাংশ কবিতা লেখা। মন্ত্রের সংহত দীপ্তিতে কবিতাগুলি ভাস্বর। অতিভাষণপ্রবণতা এখানে সমস্ত বাহুল্য বর্জ্জন করেছে। শিশিরসিক্ত মালতী যূথীর মালা নয়, অনেকগুলি কবিতা রুদ্রাক্ষ মালার মত। কোথাও খর মধ্যাহ্নের দীপ্তি না থাকলেও গোধূলির বর্ণরাগে কবিতাগুলি রঞ্জিত।

সহৃদয় পাঠকের কাছে তিনটি প্রধান ভাবধারা এই পর্য্যায়ের কবিতাগুলির মধ্যে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। প্রথম ধারাটির নাম দিয়েছি রবীন্দ্রকাব্যে গোধূলি। গোধূলির মধ্যে ধূসরতা, নিরাসক্তি, বৈরাগ্যের ব্যঞ্জনা। দ্বিতীয় ধারার নাম দিয়েছি মৃত্যুর প্রভাস্বরতায় রবীন্দ্রনাথ। আর তৃতীয় ধারার নাম দিয়েছি প্রকৃতি ও মানুষের কবি রবীন্দ্রনাথ।

আমরা এই তিনটি ধারার আলোচনা করবো।

॥ ২ ॥

রবীন্দ্রকাব্যে গোধূলি :—এই পর্য্যায়ের কবিতাগুলির মধ্যে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের খরদীপ্তি নেই। কবিতাগুলি গোধূলির গেরুয়া রাগে রঞ্জিত। জীবনের প্রদোষকালে মেঘমালার স্তবকে স্তবকে অস্তগামী সূর্য্যের রশ্মি-বিচ্ছুরণ অপূর্ব্ব ভাবলোকের সৃষ্টি করে। এই পর্য্যায়ের কবিতাগুলির মধ্যে ঋতু ও রীতি দুইয়েরই বদল হয়েছে।

রোগযন্ত্রণার ছায়া কয়েকটি কবিতায় সুপরিস্ফুট।

> গহন রজনী মাঝে
> রোগীর আবিল দৃষ্টিতলে
> যখন সহসা দেখি
> তোমার জাগ্রত আবির্ভাব
> মনে হয় যেন
> আকাশে অগণ্য গ্রহতারা
> অন্তহীন কালে
> আমারি প্রাণের দায় করিছে স্বীকার।

[রোগশয্যায়, ৭]

আবার

> দুঃসহ দুঃখের বেড়াজালে
> মানবেরে দেখি যবে নিরুপায়
> ভাবিয়া না পাই মনে
> সান্ত্বনা কোথায় আছে তার।

[রোগশয্যায়, ২৯]

নিজের দুঃখ যন্ত্রণায় কাতর হ'য়ে পড়লেও কবি সাহস হারান নি। দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করবার মধ্যে কবি দেহের যন্ত্রণা সহ্য করার অসীম শক্তির সন্ধান পেয়েছেন।

> এমন অপরাজিত বীর্যের সম্পদ,
> এমন নির্ভীক সহিষ্ণুতা,
> এমন উপেক্ষা মরণেরে
> হেন জয়যাত্রা—
> বহ্নি শয্যা মাড়াইয়া দলে দলে
> দুঃখের সীমান্ত খুঁজিবারে—

[রোগশয্যায়, ৫]

'এই মহাবিশ্বতলে যন্ত্রণার ঘূর্ণচক্র চলে'—এ কথা ঠিক। কিন্তু মানুষ যন্ত্রণার যন্ত্রশালাকে অতিক্রম ক'রে অজেয় সত্তার স্বাক্ষর রাখে। তাই তাঁর কাছে বেদনার বিভীষিকাময় রাত্রি আনন্দোজ্জ্বল প্রভাতের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এই প্রভাতের শুভ্র প্রেক্ষাপটে দুঃখজয়ী মানবের মূর্ত্তি ফোটে।

> সহসা দিগন্তে দেখা দেয়
> দিনের পতাকাখানি স্বর্ণকিরণের রেখা আঁকা
> আকাশের যেন কোন্ দূর কেন্দ্র হতে
> ওঠে ধ্বনি মিথ্যা মিথ্যা বলি'।
> প্রভাতের প্রসন্ন আলোকে
> দুঃখবিজয়ীর মূর্ত্তি দেখি আপনার
> জীর্ণদেহ—দুর্গের শিখরে॥

[আরোগ্য, ৭]

পীড়িত মনের রচনাপ্রয়াসকে কবি আদিম অন্ধকারে প্রথম সৃষ্টির অসম্পূর্ণ পিণ্ডের রূপের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

অসুস্থ দেহের মাঝে ক্লিষ্ট রচনার যে প্রয়াস
তাই হেরিলাম আমি
অনাদি আকাশে।

* * *

আদি মহার্ণব-গর্ভ হতে
অকস্মাৎ ফুলে' ফুলে' উঠিতেছে—
প্রকাণ্ড স্বপ্নের পিণ্ড
বিকলাঙ্গ অসম্পূর্ণ,......

[রোগশয্যায়, ৯]

রোগীর ঘরের বদ্ধ জীবনযাত্রাকে কবি মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন, শৈবালদল দিয়ে তৈরী দ্বীপের সঙ্গে তুলনা করেছেন। একদিন প্রবাহে এই দ্বীপ ভেসে যায়, কিন্তু দুঃখ-পাত্রের মধ্যে সুধাপূর্ণ দিনের স্মৃতি বেঁচে থাকে। সেবার স্নিগ্ধতা ও মধুর রস এই দিনগুলিকে অভিষিক্ত ক'রে রাখে।

একদিন বন্যা নামে শৈবালের দ্বীপ যায় ভেসে ;
পূর্ণজীবনের যবে নামিবে জোয়ার
সেই মতো ভেসে যাবে সেবার কক্ষটি
সেথাকার দুঃখপাত্রে সুধাভরা এই ক'টি দিন॥

[রোগশয্যায়, ১৪]

দেহের যন্ত্রণার মধ্যে কবির মনে হচ্ছে যে তাঁর কণ্ঠে পূর্ব্বেকার বাণীশক্তি নেই। তাঁর রচনাক্লিষ্ট হ'য়ে আসছে।

অসুস্থ শরীরখানা
কোন অবরুদ্ধ ভাষা করিছে বহন,
বাণীর ক্ষীণতা
মূহ্যমান আলোকেতে রচিতেছে অস্পষ্টের কারা।

[রোগশয্যায়, ১৫]

কিন্তু তবু না লিখে উপায় নেই। পূর্ব্বার্জ্জিত কীর্ত্তির কথা স্মরণ ক'রে মানুষ তাঁর স্খলন-পতন-ত্রুটিকে ক্ষমা করবে না—এ কথা কবি জানেন। এক মুহূর্ত্তের তালভঙ্গের জন্যে ইন্দ্রের রাজসভায় উর্ব্বশীর ক্ষমা নেই।

সুরলোকে নৃত্যের উৎসবে
যদি ক্ষণকাল তরে
ক্লান্ত উর্ব্বশীর
তালভঙ্গ হয়
দেবরাজ করে না মার্জ্জনা।

* * *

মানবের সভাঙ্গনে
সেথানেও আছে জেগে স্বর্গের বিচার।
তাই মোর কাব্যকলা রয়েছে কুণ্ঠিত
তাপতপ্ত দিনান্তের অবসাদে ;
কী জানি শৈথিল্য তার ঘটে যদি পদক্ষেপতালে।

[রোগশয্যায়, ২

সেইজন্যে খ্যাতির প্রতি কবির কোন আকর্ষণ নেই। তাঁর মন বৈরাগী সূর্য্যের গেরুয়া আলোয় রঞ্জিত। তাঁর নিরাসক্ত মন বলছে—

খ্যাতিমুক্ত বাণী মোর
মহেন্দ্রের পদতলে করি সমর্পণ
যেন চলে যেতে পারি নিরাসক্ত মনে
বৈরাগী সে সূর্য্যাস্তের গেরুয়া আলোয় ;

[রোগশয্যায়, ১]

কবি আবার বলেছেন—

অলস শয্যার পাশে জীবন মন্থর গতি চলে,
রচে শিল্প শৈবালের দলে।
মর্য্যাদা নাইকো তার তবু তাহে রয়
জীবনের স্বল্পমূল্য কিছু পরিচয়।

[আরোগ্য, ২৪]

কবির নব শিল্প-রচনা মোটেই স্বল্প মূল্যের নয়, তা দুর্ম্মূল্য। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে শেষ বয়সের রচনায় প্রত্যেক কবির অন্তরঙ্গ জগতের রূপটি স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। যৌবনের তরঙ্গ-চঞ্চল জীবনে কবির মানস-জগত ততটা প্রত্যক্ষ হয় না, যতটা হয় জীবন-সায়াহ্নে শান্ত, সমাহিত জীবনে। তখন কবির কাব্য কল্পনার লীলালাস্যই নয়, তা প্রত্যক্ষ সত্যের আভরণহীন বাণী মূর্ত্তি। তখন ছন্দের চটুল নৃত্য নয়, ধ্যানমগ্ন মন্ত্রের উচ্চারণ। এতোদিন যে রবীন্দ্রকাব্যের আকাশে মুহুর্ম্মুহু ইন্দ্রধনুর সৃষ্টি হয়েছে, এখন বৈরাগী সূর্য্যের গেরুয়া আলোয় বেদনার বিচিত্র গোধূলির সৃষ্টি হলো।

॥ ৩ ॥

মৃত্যুর প্রভাস্বরতায় রবীন্দ্রনাথ :—মৃত্যু সমীক্ষা এই পর্য্যায়ের রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কল্পলোকের মধুর স্বপ্ন আর বাস্তব জগতের রূঢ় সত্য—এই দুইয়ের মিলনে এক অপূর্ব্ব রামধনু সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয়েছে। যে কবি একদিন মৃত্যুকে মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান' বলেছিলেন, আজ জীবনের গোধূলি লগ্নে কনে-দেখা আলোতে মৃত্যু-বধূর মুখের রহস্যাবগুণ্ঠন উন্মোচন ক'রে সত্যিকার পরিচয় লাভ করলেন। মৃত্যু সম্বন্ধে আলোছায়াময় নীহারিকা-কল্পনা এখন বাস্তবতার গ্রহলোক সৃষ্টি করলে।

ধূসর গোধূলি লগ্নে সহসা দেখিনু একদিন
মৃত্যুর দক্ষিণবাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত
রক্ত সূত্রগাছি দিয়ে বাঁধা,
চিনিলাম তখনি দোঁহারে।
দেখিলাম নিতেছে যৌতুক
বরের চরম দান মরণের বধূ,
দক্ষিণ বাহুতে বহি চলিয়াছে যুগান্তের পানে।

[রোগশয্যায়, ৩৭

কবির অমৃতলোকের সন্ধান পেতে হ'লে মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁর এই অনুভূতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছেন যে বিশ্বজগতে এক চিরমানব আছে। তিনি সকল চৈতন্যজ্যোতির উৎস। প্রতি মানবের মধ্যে এই চৈতন্যজ্যোতির অংশ আছে। বিশ্ব-জগৎ এই চিরমানবের অমৃতরূপের বহিঃপ্রকাশ।

যে চৈতন্য জ্যোতি
প্রদীপ্ত রয়েছে মোর অন্তর গগনে
নহে আকস্মিক বন্দী প্রাণের সঙ্কীর্ণ সীমানায়
আদি যার শূন্যময় অন্তে যার মৃত্যু নিরর্থক,
মাঝখানে কিছুক্ষণ
যাহা কিছু আছে তার অর্থ যাহা করে উদ্ভাসিত।

[রোগশয্যায়, ২৮]

কবি অনুভব করছেন তাঁর মধ্যে যে চৈতন্যজ্যোতি আছে তার সঙ্গে সকল জ্যোতির উৎস সেই পরম মানবের মিলন হবে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে। তাই মৃত্যুকে তিনি ভয় করছেন না, মৃত্যু তাঁর কাছে নূতন আশ্বাস বহন করে আনছে।

এক আদি জ্যোতি উৎস হতে
চৈতন্যের পুণ্য স্রোতে
আমার হয়েছে অভিষেক,
ললাটে দিয়েছে জয়লেখ,
জানায়েছে অমৃতের আমি অধিকারী
পরম আমির সাথে যুক্ত হতে পারি
বিচিত্র জগতে
প্রবেশ লভিতে পারি আনন্দের পথে॥

[আরোগ্য, ৩২]

আবার কবি বলেছেন—

এ আমির আবরণ সহজে স্খলিত হ'য়ে যাক,
চৈতন্যের শুভ্র জ্যোতি
ভেদ করি' কুহেলিকা
সত্যের অমৃতরূপ করুক প্রকাশ।

[আরোগ্য, ৩৩]

তাই কবি ঘনায়মান মৃত্যু-অন্ধকারের মধ্যে নবজন্মের আকস্মিক আশ্বাসের আলোক দেখতে পাচ্ছেন। তাই মৃত্যু দিন জন্মদিনের ব্যঞ্জনায় ভরা।

জীবনের প্রান্তভাগে
অন্তিম রহস্য পথে দেয় মুক্ত করি
সৃষ্টির নূতন রহস্যেরে।
নব জন্মদিন তারে বলি
আঁধারের মন্ত্র পড়ি সন্ধ্যা যারে জাগায় আলোকে॥

[জন্মদিন, ২৭]

আবার

যেখানে অখণ্ড দিন
আলোহীন অন্ধকারহীন
আমার আমির ধারা মিলে যাবে ক্রমে ক্রমে
পরিপূর্ণ চেতনার সাগর সঙ্গমে।

[জন্মদিন, ১২]

রোগের তীব্রতা ও যন্ত্রণা কবিকে এক কেন্দ্রীভূত অন্তর্ভেদী দৃষ্টিশক্তি দিয়েছে। এই অন্তর্ভেদী দৃষ্টিশক্তির জন্যেই তিনি মৃত্যুর যথার্থ অমৃত-রূপ দেখতে সক্ষম হয়েছেন। মৃত্যুতীর্থপথযাত্রী কবি তাই বলতে পেরেছেন—

তোমরাও যোগ দিয়ো জীবনের পূর্ণ ঘট নিয়ে
সে অন্তিম অনুষ্ঠানে, হয়ত শুনিবে দূর হতে
দিগন্তের পরপারে শুভশঙ্খধ্বনি॥

[জন্মদিন, ২৯

রসিক চিত্তে এই শুভ শঙ্খধ্বনি বাজছে।

॥ ৪ ॥

প্রকৃতি ও মানুষের কবি রবীন্দ্রনাথ:—রোগের সমীকরণ শক্তির প্রভাবে কবি কতকগুলি নূতন শক্তি লাভ করেছেন। রোগমুক্ত কবির চোখে পৃথিবী এক নূতনরূপ লাভ ক'রে জেগে উঠেছে। তাঁর জীবনোন্মুখিতা এই পর্যায়ের রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ অংশের ওপর তাঁর গভীর আগ্রহের দৃষ্টি পড়েছে। তুচ্ছ চড়ুই পাখী তাঁর কাছে বেদনার রাত্রি শেষে নূতন প্রভাতের আগমন বার্তা বহন করছে।

অনিদ্রাতে যখন আমার কাটে দুখের রাত
আশা করি দ্বারে তোমার প্রথম চঞ্চুঘাত।

[রোগশয্যায়, ৬]

পৃথিবী তাঁর সামনে আনন্দ ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছে। আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে—এই সত্য কবি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন।

ভালবাসা যা পেয়েছি আমার জীবনে
তাহারি নিঃশব্দ ভাষা
শুনি এই আকাশে বাতাসে
তারি পুণ্য অভিষেকে করি আজ স্নান।
সমস্ত জন্মের সত্য একখানি রত্নহাররূপে
দেখি ঐ নীলিমার বুকে॥

[রোগশয্যায়, ২৭]

আজ কবি বলতে পারেন—

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি,
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি,

এই মহামন্ত্র খানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী।

[আরোগ্য, ১]

জীবনের প্রান্তে অনতিগোচর উপেক্ষিত ছবিগুলি চেতনার প্রত্যক্ষ প্রদেশে জেগে উঠছে। ছবির মালা কি অপূর্ব্ব বর্ণবৈচিত্র্যে ভরা।

হেথা হোথা চরে গোরু শস্যশেষ বজরার ক্ষেতে ;
তরমুজের লতা হতে
ছাগল খেদায়ে রাখে কাঠি হাতে কৃষাণ বালক।
কোথাও বা একা পল্লীনারী
শাকের সন্ধানে ফেরে ঝুড়ি নিয়ে কাঁখে।
কভু বহুদূরে চলে নদীর রেখার পাশে পাশে
নত পৃষ্ঠ ক্লিষ্টগতি গুণটানা মাল্লা একসারি।

জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃশ্যাবলী থেকে ইতিহাসের চলমান জীবনযাত্রা পর্য্যন্ত কবির দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে। এই ইতিহাস-চেতনা অভিনব। সাধারণ মানবের জয়যাত্রার বন্দনা করেছেন কবি।

ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল ;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।

*　　　*　　　*

শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ 'পরে
ওরা কাজ করে ॥

[আরোগ্য, ১০]

পলাতকা ও লিপিকার কোন কোন কথিকায় সাধারণ মানুষের কথা স্থান পেয়েছে। পুনশ্চে এই কথা আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছে। শেষ পর্য্যায়ের কবিতাগুলির মধ্যে এই সুরের এক আশ্চর্য্য পরিণতি। মানুষের দুঃখ দারিদ্র্য বেদনার প্রতি কবির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। পৃথিবী-জোড়া ধ্বংসের স্রোতকে কবি অনুভব করেছেন।

মহা ঐশ্বর্য্যের নিম্নতলে
অর্ধাশন অনশন দাহ করে নিত্য ক্ষুধানলে,
শুষ্ক প্রায় পিপাসার জল,
দেহে নাই শীতের সম্বল,
অবারিত মৃত্যুর দুয়ার,...

[জন্মদিন, ২২]

কিন্তু এই ধ্বংসলীলার শেষ হবে। প্রলয়ের চিতাভস্ম থেকে নূতন সৃষ্টির আবির্ভাব হবে। জন্ম নেবে এক নূতন পৃথিবী।

এ কুৎসিত-লীলা হবে অবসান,
বীভৎস তাণ্ডবে
এ পাপ যুগের অন্ত হবে,
মানব তপস্বীবেশে
চিতাভস্ম শয্যাতলে এসে
নব সৃষ্টি ধ্যানের আসনে
স্থান লবে নিরাসক্ত মনে—

[জন্মদিন, ২১]

কবি বুদ্ধকে স্মরণ করছেন—

ঐ মহামানব আসে ;
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্ত্য ধূলির ঘাসে ঘাসে।

[শেষ লেখা]

কবি অনুভব করেছেন যে সর্ব্বসাধারণের আনন্দ বেদনার কাব্য রচনা করতে তিনি পারেন নি। যে ভাবী কবি জনসাধারণের মর্ম্মলোকের বাণীরূপ রচনা করতে পারবে তিনি তার বন্দনা করে বলেছেন—

এসো কবি অখ্যাতজনের
নির্বাক মনের।
মর্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার
প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারিধার
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করে দাও তুমি।

[জন্মদিন, ১০]

এই বন্দনার মধ্যে কবি ভবিষ্যতের একটি উজ্জ্বল ইঙ্গিত রেখে গেছেন। এই উজ্জ্বল ইঙ্গিত আগামীর ললাটে জয়তিলকের মত জ্বল জ্বল করছে।

॥ ৫ ॥

উপরি উক্ত তিনটি ধারায় রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্য্যায়ের কবিতাগুলি অভিষিক্ত। রবীন্দ্র কবি-মানসের পূর্ণ পরিচয় পেতে হ'লে এই তিনটি ধারার অনুসরণ অপরিহার্য্য। এই তিনটি ধারার আবির্ভাব আকস্মিক নয়। জীবনের গোধূলি লগ্নে রোগের প্রভাব এই তিনটি ধারাকে স্বচ্ছতা দান করেছে এবং স্পষ্টতর হ'তে সাহায্য করেছে। সুযোগ হ'লে এই তিনটি ধারার উৎস আবিষ্কারের চেষ্টা করার ইচ্ছে রইলো। তৃতীয় ধারার মধ্যে অতি আধুনিক যুগ-মানবের উজ্জ্বল পরিচয় রয়েছে বলে এটি আমাদের কাছে একটি স্বতন্ত্র রসপূর্ণ আবেদন বহন করছে।









শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা ঃ

সুইজারল্যাণ্ডের বার্ণে অনুষ্ঠিত পঞ্চম বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে পশ্চিম জার্মাণ ৩—২ গোলে ১৯৫২ সালের বিশ্ব অলিম্পিক ফুটবল চ্যাম্পিয়ান হাঙ্গেরীকে হারিয়ে 'জুলেশ রিমেট ট্রফি' জয়ী হয়েছে। জার্মাণীর কাছে হাঙ্গেরীর পরাজয় এ এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। গত চার বছর ধরে আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় হাঙ্গেরী অপরাজেয় ছিল এবং আলোচ্য বিশ্বফুটবল প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় গ্রূপে হাঙ্গেরী ৮—৩ গোলে জার্মাণীকে শোচনীয়ভাবে হারিয়ে দিয়েছিল। এবার হাঙ্গেরীদলের 'জুলেশ রিমেট ট্রফি' জয় সম্বন্ধে কোন রকম সন্দেহ করার ছিলনা। ক্রীড়াজগতে অপ্রত্যাশিত ফলাফল ঘটেই থাকে, নতুন কিছুই নয়। কিন্তু জার্মাণীর কাছে হাঙ্গেরীর এ পরাজয়ের কথা খেলার আগে কেউ কল্পনা করতে পারেননি ; এমন কি স্বচক্ষে খেলা দেখেও এ ফলাফল অনেকে বিশ্বাস করতে পারেননি। সুতরাং ক্রীড়াজগতে অপ্রত্যাশিত ফলাফলের তালিকায় ১৯৫৪ সালের বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার ফলাফল শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত হিসাবে গণ্য হয়ে থাকবে। হাঙ্গেরীর ব্যর্থতার কারণ হিস'বে বলা যায়, কোয়ার্টার-ফাইনালে দুর্দ্ধর্ষ ব্রেজিল দলের সঙ্গে খেলায় তাদের একাধিক খেলোয়াড়ের জখম এবং ফাইনালের দিন প্রবল বারিপাতে মাঠ কর্দমাক্ত থাকায় হাঙ্গেরীর খেলোয়াড়রা তাদের স্বাভাবিক ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখাতে পারেনি। দলের অধিনায়ক পুস্কাস আহত থাকায় এদ্দিন তাঁর খেলবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তাঁকে দু'পায়ে মোটা পট্টি বেঁধে খেলায় নামতে দেখা যায়। খেলার প্রথমার্দ্ধের ৬ মিনিটে পুস্কাস প্রথম গোল করেন। এর কিছু পরই হাঙ্গেরী আর একটা গোল ক'রে ২—০ গোলে এগিয়ে যায়। ১৮ মিনিটের মধ্যে জার্মাণদল গোল দুটি শোধ করে দেয়। খেলা শেষ হওয়ার ছ' মিনিট আগে জার্মাণদলের রাইন জয়সূচক গোলটি করেন। রাইন দলের পক্ষে দু'টি গোলই দেন।

প্রথমার্দ্ধ শেষ হওয়ার আট মিনিট আগে হাঙ্গেরী একটি পেনাল্টি থেকে বঞ্চিত হয়। হাঙ্গেরীদল আবেদন করে কিন্তু ইংলিস রেফারী মিঃ বিলিং তা অগ্রাহ্য করেন।

দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলার প্রথম মিনিটে হাঙ্গেরীর অধিনায়ক পুস্কাস একটি অবধারিত গোলের সুযোগ নষ্ট করেন ; গোল দেওয়া বা না দেওয়া তাঁর দয়ার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করেছিলো ; বলটি গোলরক্ষকের হাতে তুলে দিলে জার্মাণ সমর্থকরা দারুণ দুঃশ্চিন্তা থেকে অব্যাহতি পায়। তৃতীয় গোল খাওয়ার পরও হাঙ্গেরীদল হাল না ছেড়ে, জোর বিক্রমে জার্মাণীকে চেপে ধরে। এই সময়ে পুস্কাস একটি গোল করেন কিন্তু তাঁর অফ্‌সাইড গণ্য হওয়ায় রেফারী তা বাতিল করেন।

হাঙ্গেরীদলকে প্রতিযোগিতায় শক্তিশালী দলের বিপক্ষে খেলতে হয়েছিলো। প্রারম্ভিক খেলায় হাঙ্গেরী ৯-০ গোলে কোরিয়াকে এবং ৮-৩ গোলে জার্মাণকে হারায়। এরপর দক্ষিণ আমেরিকার দুই শক্তিশালী ফুটবল দল, ব্রেজিল এবং উরুগুয়ের সঙ্গে তাদের খেলে জিততে হয়। ব্রেজিল গোঁয়ার-গোবিন্দর মত খেলেছিলো, ফলে হাঙ্গেরীর একাধিক খেলোয়াড় জখম হয় ; এইখানেই শেষ নয়, খেলার শেষে 'ড্রেসিং-রুমে'ও ব্রেজিলের খেলোয়াড়রা চড়াও করে হাঙ্গেরীর

খেলোয়াড়দের নির্দয়ভাবে মেরেছিল। এই সমস্ত ঘটনায় হাঙ্গেরীদলের খেলোয়াড়রা মনোবল হারিয়েছিল; যার ফলে ফাইনাল খেলায় সর্বত্রই বেশীর ভাগ সময় প্রাধান্য বিস্তার করেও তারা স্বাভাবিক ক্রীড়ানৈপুণ্য সহকারে খেলতে পারে নি।

খেলার মাঠের মধ্যে ৬৫ হাজার দর্শক উপস্থিত ছিলেন। তার মধ্যে জার্মাণ দর্শক ছিলেন ২৫ হাজার। রেডিও মারফৎ জার্মাণীর জয়লাভের সংবাদ পেয়ে পশ্চিম জার্মাণী বিজয় গৌরবে উল্লসিত হয়ে উঠে—রাস্তা, পার্ক এবং ভোজনালয়ে লোকের বিশেষ ভিড় দেখা যায়।

অষ্ট্রিয়া ৩-১ গোলে উরুগুয়েকে হারিয়ে তৃতীয় স্থান লাভ করেছে।

কোয়ার্টার-ফাইনাল

উরুগুয়ে ৪ : ইংলণ্ড ২ জার্মাণী ২ : যুগোশ্লাভিয়া ০

হাঙ্গেরী ৪ : ব্রেজিল ২ অষ্ট্রিয়া ৭ : সুইজারল্যাণ্ড ৫

সেমি-ফাইনাল

হাঙ্গেরী ৪ : উরুগুয়ে ২

জার্মাণী ৬ : অষ্ট্রিয়া ১

ফাইনাল

জার্মাণী ৩ : হাঙ্গেরী ২

ফাইনাল ফলাফল: ১ম জার্মাণী, ২য় হাঙ্গেরী, ৩য় অষ্ট্রিয়া এবং চতুর্থ উরুগুয়ে।

উইম্বলডন্ টেনিস—১৯৫৪

১৯৫৪ সালের উইম্বলডন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে ঈজিপ্টের জরোস্লাভ ড্রবনি ১৩-১১, ৪-৬, ৬-২, ৯-৭ সেটে অষ্ট্রেলিয়ার কেন্ রোজওয়ালকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছেন।

প্রতিযোগিতার ৭৭ বছরের ইতিহাসে চ্যাম্পিয়ান হিসাবে ড্রবনির মত জনপ্রিয়তা খুব কম খেলোয়াড়ই লাভ করেছেন। ড্রবনি বিগত এগার বছর ধরে লন টেনিস খেলায় এই বে-সরকারী বিশ্বচ্যাম্পিয়ানসীপ পাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে এসেছেন। ১৯৪৯ সালের ফাইনালে সজেডার এবং ১৯৫২ সালের ফাইনালে সেজম্যানের কাছে তিনি পরাজিত হ'ন। ড্রবনির জয়লাভে গত ৪০ বছরের খেলায় এই প্রথম একজন ন্যাটা খেলোয়াড় চ্যাম্পিয়ানসীপ পেলেন। খেলা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমুল আনন্দ ধ্বনির মধ্যে দর্শকমণ্ডলী বিজয়ী ড্রবনীকে অভ্যর্থনা জানান। এ বছরের প্রতিযোগিতায়, খেলার যোগ্যতা হিসাবে 'বাছাই' খেলোয়াড়দের যে নামের তালিকা প্রস্তুত করা হয়, ড্রবনির নাম সেই তালিকায় একাদশ স্থানে ছিল। প্রথম স্থান পেয়েছিলেন আমেরিকার টনি ট্রাবার্ট—যাঁর চ্যাম্পিয়ান হওয়া সম্পর্কে লোকের সুদৃঢ় ধারণা ছিল। কেন রোজওয়াল পেয়েছিলেন ৩য় স্থান। ১নং বাছাই খেলোয়াড় টনি ট্রাবার্ট সেমি-ফাইনালে ২-৩ সেটে ৩নং বাছাই খেলোয়াড় কেন রোজওয়ালের কাছে পরাজিত হ'ন।

২য় নং বাছাই খেলোয়াড় অষ্ট্রেলিয়ার লিউইস হোড (১৯ বছর বয়স) কোয়ার্টার ফাইনালে ষ্ট্রেট সেটে ড্রবনীর কাছে পরাজিত হ'ন।

বর্ত্তমান বিশ্বের টেনিস সম্রাজ্ঞী মিস মরেন কনোলী মহিলাদের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়ে উপর্যুপরি তিন বছর চ্যাম্পিয়ান হওয়ার কৃতিত্ব লাভ করেছেন। তাঁর পূর্বে অনুরূপ কৃতিত্ব লাভ করেছিলেন মাত্র চারজন মহিলা: আমেরিকার হেলেন উইলস (পরবর্ত্তীকালে মিসেস মুডী) ১৯২৭-৩০ সালে; মিস লুই ব্রাউ ১৯৪৮-৫০ সালে; মিস লোটি ডড (ইংলণ্ড) ১৮৯০-৯৩ সালে এবং সুজেন লেগলেন (ফ্রান্স) ১৯১৯-২৩ সালে।

ভারতীয় খেলোয়াড়দের খেলা

ভারতবর্ষের পক্ষে নরেন্দ্রনাথ, নরেশকুমার, রামনাথন, কৃষ্ণান এবং কুমারী রিতা দাভার যোগদান করেন। পুরুষদের সিঙ্গলসে কুমার, কৃষ্ণান এবং নাথ প্রথম রাউণ্ড থেকে খেলেছিলেন।

নরেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় রাউণ্ডে ৬নং 'সিডেড' খেলোয়াড় আর্ট লার্সেনের (আমেরিকা) কাছে ষ্ট্রেট সেটে পরাজিত হন।

রামনাথন কৃষ্ণান তৃতীয় রাউণ্ডে ৫নং 'সিডেড' খেলোয়াড় অষ্ট্রেলিয়ার ন্যাটা মেরীভেন রোজের কাছে ষ্ট্রেট সেটে পরাজিত হন।

নরেশকুমার তৃতীয় রাউণ্ডে পরাজিত হন বর্ত্তমান বছরের

৭নং 'সিডেড' খেলোয়াড় এবং ১৯৫০ সালের চ্যাম্পিয়ান বাজ পেট্টর (আমেরিকা) কাছে।

পুরুষদের ডবলস খেলার প্রথম রাউণ্ডেই নরেশকুমার ও নরেন্দ্রনাথের জুটি, এবং রামনাথন কৃষ্ণান ও এণ্ডারসনের (বৃটেন) জুটি বিদায় নেন।

মিক্সড ডবলসের দ্বিতীয় রাউণ্ডে কুমারী রিতা দাভার ও আর কৃষ্ণান ১-২ সেটে বৃটেনের জুড়ীর কাছে হার স্বীকার করেন। নরেন্দ্রনাথ প্রথম রাউণ্ডেই হেরে যায়। নরেশ-কুমার ২য় রাউণ্ড পর্য্যন্ত খেলেছিলেন।

জুনিয়ার উইম্বলডনের সিঙ্গলস ফাইনালে রামনাথন কৃষ্ণান (বয়স ১৭) অষ্ট্রেলিয়ার এ্যাসলি কুপারকে ৬-১, ৭-৫ সেটে হারিয়ে চ্যাম্পীয়ানসীপ পেয়েছেন। গত বছর এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে কৃষ্ণান পরাজিত হয়েছিলেন।

ফাইনাল ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস: জরোশ্লাভ ড্রবনি (ঈজিপ্ট) ১৩-১১, ৪-৬, ৬-২, ৯-৭ সেটে কেন্ রোজওয়ালকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস: মিস মরেন কনোলী (আমেরিকা) ৬-২, ৭-৫ সেটে মিস লুইসী ব্রাউকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।



জেরোশ্লাভ ড্রবনী

ফটো: রমেন চট্টোপাধ্যায়

পুরুষদের ডবলস: রেক্স হার্টউইগ এবং মেরভীন রোজ্ (অষ্ট্রেলিয়া) ৬-৪, ৬-৪, ৩-৬ ৬-৪ সেটে ভিক্ সিক্সাস এবং টনি ট্রাবার্টকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডবলস: মিস লুইস ব্রাউ এবং মিসেস মার্গারেট ডু পণ্ট (আমেরিকা) ৪-৬, ৯-৭, ৬-৩ সেটে মিস ডরিস হার্ট এবং মিস শার্লি ফ্রাইকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলস: ভিক্ সিক্সাস এবং ডরিস হার্ট (আমেরিকা—গত বছরের চ্যাম্পিয়ান) ৫-৭, ৬-৪, ৪৩-সেটে মিসেস মার্গারেট ডু পণ্ট (আমেরিকা) এবং কেন রোজওয়ালকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

ইংলণ্ড-পাকিস্তান টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

পাকিস্তান: ১৫৭ (এ্যাপলিয়ার্ড ৫১ রানে ৫ উইঃ) ও ২৭২ (মকসুদ আমেদ ৬৯, হানিফ মহম্মদ ৫১। ষ্টাথাম ৬৬ রানে ৩ এবং ওয়ার্ডলে ৪৪ রানে ৩ উইঃ)

ইংলণ্ড: ৫৫৮ (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ডেনিস কম্পটন ২৭৮, সিম্পসন ১০১, গ্রেভনী ৮৪। খাঁন মহম্মদ ১৫৫ রানে ৩ উইঃ)

নটিংহামের ট্রেন্ট ব্রিজ মাঠে অনুষ্ঠিত ২য় টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড ১ ইনিংস ও ১২৯ রানে পাকিস্তান দলকে হারিয়েছে। চতুর্থ দিনে বেলা ১-১৫ মিনিটে পাকিস্তানের ২য় ইনিংস শেষ হ'লে খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। ইংলণ্ডের পক্ষে দু'টি সেঞ্চুরী হয়েছে; ডেনিস কম্পটনের ডবল সেঞ্চুরী বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এ নিয়ে নটিংহামে ইংলণ্ড ১৫টি টেষ্ট ম্যাচ খেলেছে; ইংলণ্ডের জয় মাত্র ৩টি—পূর্ব্বজয় অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯০৫ ও ১৯৩০ সালে।

বিশ্ব জিমন্যাষ্টিকস চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

রোমে অনুষ্ঠিত বিশ্ব জিমন্যাষ্টিকস চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় রাশিয়া পুরুষ এবং মহিলা বিভাগের দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে।

মহিলা বিভাগ

১ম রাশিয়া—৫২৪.৩১ পয়েণ্ট; ২য় হাঙ্গেরী—৫১৮.২ পয়েণ্ট; ৩য় চেকোশ্লাভাকিয়া—৫১১.৭৫ পয়েণ্ট; ৪র্থ রুমানিয়া ৪৯৮.৫১ পয়েণ্ট; ৫ম ইটালী ৪৯৫.৭৭ পয়েণ্ট; ৬ষ্ঠ পোল্যাণ্ড ৪৯৫.৬৬ পয়েণ্ট এবং ৭ম বুলগেরিয়া ৪৯৩.৪৯ পয়েণ্ট।

পুরুষ বিভাগে জাপান ২য় স্থান নিয়ে অঘটন ঘটিয়েছে। বিশ্ব জিমন্যাষ্টিকস প্রতিযোগিতায় এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত কোন দেশ জাপানের মত কৃতিত্ব লাভ করতে পারেনি। ভারতবর্ষ প্রতিযোগিতায় নাম পাঠিয়েছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যোগদান করেনি।

পুরুষ বিভাগ

১ম রাশিয়া ৬৮৯.৯ পয়েণ্ট; ২য় জাপান ৬৭৩.৩ পয়েণ্ট; ৩য় সুইজারল্যাণ্ড ৬৭১.৫৫ পয়েণ্ট; ৪র্থ জার্মানী

৬৭০ ২৫ পয়েণ্ট ; ৫ম চেকোশ্লাভাকিয়া ৬৬১. ৪ পয়েণ্ট ; ৬ষ্ঠ ফিনল্যাণ্ড ৬৫৯.০৫ পয়েণ্ট ; ৭ম হাঙ্গেরী ৬৫০ পয়েণ্ট ; ৮ম ইটালী ৬৩০. ৪ পয়েণ্ট ; ৯ম বুলগেরিয়া ৬২৫. ৪৫ পয়েণ্ট ; ১০ম ফ্রান্স ৬২৩. ৫ পয়েণ্ট।

ক'লকাতায় প্রদর্শনী ফুটবল ঃ

অষ্ট্রিয়ার গ্রেজার এ্যাথলেটিক ক্লাব সুদূর প্রাচ্যে ফুটবল সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে ভারতবর্ষের মাটিতে তিনটি প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় যোগদান ক'রে গেল—ক'লকাতায় দুটি, মোহনবাগান এবং আই এফ এ দলের সঙ্গে এবং চন্দননগরে পি গুপ্ত একাদশ দলের সঙ্গে। গ্রেজার দলের খেলা ক্রীড়ামোদিদের সম্পূর্ণ নিরাশ করেছে। তিনটি খেলার মধ্যে তারা মোহনবাগানের কাছে ১-২ গোলে পরাজিত হয় ; বাকি দুটি ড্র যায়—আই এফ এ-র সঙ্গে খেলার ফলাফল দাঁড়ায় ১-১ এবং চন্দননগরের খেলায় কোন পক্ষেই গোল হয়নি। আই এফ এ দল মোটেই শক্তিশালী ছিল না ; মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল দলের কোন খেলোয়াড় খেলেনি। চন্দননগরের খেলায় গ্রেজার দলের বিপক্ষে যে দলটি খেলে তা আরও দুর্বল—কোন রকমে জোড়াতালি দিয়ে দল তৈরী হয়েছিলো। গ্রেজার দলের খেলায় উল্লেখযোগ্য কোন বিশেষত্ব ছিল না। ভারতীয় দলের তুলনায় তারা দৈহিক শক্তি এবং সৌষ্ঠবে অনেক উন্নত—এই বিশেষত্বটুকুই চোখে পড়েছিল। তাদের খেলার পদ্ধতি—লং-সট পাশ এবং হেড। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারে না। গোলে জোরালো সট চোখেই পড়লো না—গোলের মুখে বল পেয়েও সজোরে বল না মেরে বল পাশ করতে দেখা গেছে, উদ্দেশ্য আরও ভেতরে ঢুকে প্লেস ক'রে গোল করা।

ফুটবল লীগ ঃ

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলায় এখনও অনেক খেলা বাকি। খেলায় প্রত্যাশিত ফলাফলের জন্য লীগ চ্যাম্পিয়ান সম্পর্কে কোন দলের পক্ষে নিশ্চয় ক'রে কোন কিছু বলা শক্ত। পয়েণ্টের দিক থেকে বর্তমানে লীগের তালিকায় প্রথম স্থানে আছে মোহনবাগান—১৯টা খেলায় ২৯ পয়েণ্ট, হার ১টা—জর্জটেলিগ্রাফের কাছে। সমান খেলে ইস্টবেঙ্গল ২৬ পয়েণ্ট পেয়েছে, হার ৪টা—এরিয়ান্স, মোহনবাগান এবং ই আই আর দলের কাছে। ওয়াড়ী দলের সঙ্গে না খেলার দরুণ তাদের দু'টো পয়েণ্ট বৃথা নষ্ট হয়েছে। এরপর ওয়াড়ী ৩য় স্থানে—১৫টা খেলায় ২৩ পয়েণ্ট। ওয়াড়ীর হার একটায়—মহমেডান স্পোর্টিংয়ের কাছে। তারা মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গলের থেকে ৪টা ম্যাচ কম খেলেছে সুতরাং বর্তমানে তাদের কাছে লীগ চ্যাম্পিয়ান-সীপের পথ বেশী উন্মুক্ত। এবার প্রথম বিভাগ থেকে দুটি দল নামবে। ক্যালকাটা সার্ভিসেস ১৬টা খেলায় ৩ পয়েণ্ট পেয়ে তালিকায় শেষ স্থানে রয়েছে। সমান ১৬টা খেলায় খিদিরপুর ১১, জর্জটেলিগ্রাফ ১১ এবং ভবানীপুর ৯ পয়েণ্ট পেয়েছে। সুতরাং এই তিনদলের মধ্যে যে কোন একদলের নামবার সম্ভাবনা এখনও দূর হয়নি।

দ্বিতীয় বিভাগে কাষ্টমস, সালকিয়া ফ্রেণ্ডস, বেনিয়াটোলা এবং ক্যালকাটা এফ সি—এই চারদলের মধ্যে লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে। ১২।৭।৫৪

—

সাহিত্য সংবাদ

নব মঞ্জরী : বনফুল :

বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের আসরে বনফুল একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। ছোট গল্প কতো ছোট হতে পারে—এবং রসোত্তীর্ণ ছোট গল্প হ'তে পারে—তা একমাত্র বনফুলই আমাদের দেখিয়েছেন। মাত্র কয়েকটি লাইনে একটি পরিপূর্ণ এবং রসমণ্ডিত গল্প রচনায় বনফুল অদ্বিতীয়। আলোচ্য গ্রন্থখানিও গল্পগ্রন্থ। মোট তিরিশটি গল্প এই গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে। প্রত্যেকটি গল্পই আপনাপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল এবং প্রতিটি গল্পে এমন একটি সুমধুর সুর বর্তমান যা মনের গভীরে দোলা দেয়।

বনফুল-সাহিত্য সম্বন্ধে নতুন কিছু বলবার নেই। যাঁরা বনফুল-সাহিত্যের অনুরাগী নব-মঞ্জরী তাঁদের সাহিত্য-রস-পিপাসায় অমৃত প্রদান করবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

(প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ ; দাম—২॥০)

* * * *

অর্দ্ধেক মানবী তুমি : দেবেশচন্দ্র দাশ :

শ্রীযুক্ত দাশ একজন সুপরিচিত লেখক। আলোচ্য-গ্রন্থখানিতে তিনি ছোট গল্পের সীমাবদ্ধ পরিধির মধ্যে তাঁর ব্যঙ্গ ও শ্লেষকে অবরুদ্ধ না রেখে একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের মধ্যে তাকে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় জীবন্ত ভাবে ফুটিয়ে তুলে বাঙ্গালীর সমগ্র জাতীয় জীবনের দুর্বলতা, ব্যর্থতা ও সর্বনাশ-মুখীনতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

বাঙ্গালীর মেরুদণ্ডে যেখানে ঘুণ ধরতে আরম্ভ করেছে সেখানেই শ্রীযুক্ত দাশ তাঁর সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ব্যঙ্গ ও শ্লেষের আলোকপাত করেছেন এই গ্রন্থখানিতে। একটি রক্ষণশীল পরিবারের প্রবলপ্রতাপান্বিতা শাশুড়ীর সংসারে একটি নববধূ ও তাহার লাজুক নিরীহ স্বামী পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক প্রেমে অগ্রসর হয়ে আসতে আসতে ব্যক্তিত্ব বিকাশের এই রসমধুর কাহিনীটিতে বহু সংসারে বাঙ্গালী নববিবাহিত তরুণতরুণীরা তাহাদের নিজেদের ব্যাকুল অবস্থা সহানুভূতির সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত দেখবেন। কিন্তু সে কাহিনীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া আছে জীবন, বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে নিত্য যে জীবনের ব্যর্থ পুনরাবৃত্তি হইতেছে তাহা নিষ্ঠুর সত্য। তাই বাঙ্গালী বলে, "রোজ ভোরে উঠে সায়েবের নামে প্রার্থনা করি—দেখো বাবা, গুলি করে মেরো, কিন্তু চাকরী মেরো না।" এই বাঙ্গালীকে সেকালের উমার তপস্যার চেয়ে বড় তপস্যা আজকাল করিতে হয়। "চাকরীর উমেদারীই হচ্ছে এ যুগে উমার তপস্যা। মহাদেবের বদলে মহাবাবুর দরবারে। চাকরী চাইতে এসেছে বুঝলেই মহাবাবুর নেত্র দুটি ফাইলে আঁঠা মেরে যায়। ধ্যান ভঙ্গ আর হয় না।" যে আড্ডা আজ জাতীয় জীবনে নানাভাবে বিষময় ফল দিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া লেখক বলেছেন যে এই শাদা মাঠা জীবনে একটা 'ডিস্‌কভারী' নেই, একটা খোশ খবর নেই। শুধু সেই খোড় বড়ি খাড়া, আর খাড়া বড়ি খোড়। তাই বাঙ্গালী যায় আড্ডায়।

লেখকের অনবদ্য সৃষ্টি মেসের প্রেমাকাঙ্ক্ষী যুবকের হতাশাময় করুণ কথাগুলি প্রত্যেক মেসবিহারী প্রবাসীর আর তার গ্রামবাসিনী মায়ের মনে বিষাদময় প্রতিধ্বনি তুলিবে। এইখানে লেখক একটি ছোট্ট মন্তব্যে ব্যাপারটি উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। "ফুটবল খেলেছিল বটে এককালে মোহনবাগান। তার একমাত্র জুড়ী হচ্ছে উড়িয়া রাঁধুনী। যাদের রান্নাঘরের লেখা গোটা কলকাতাকে মাতিয়ে রেখেছে।"

এই ফুটবল খেলার উপর তীব্র শ্লেষ করিয়া শ্রীযুক্ত দাশ বাঙ্গালীর বর্তমান ব্যর্থতামূলক জীবন-ভঙ্গির উপর তীব্র আলোকপাত করিয়াছেন। বিবাহে অনিচ্ছুক অথচ তরুণী সঙ্গের প্রতি উদাসীন নহে এরূপ যুবক বলিতেছেন "আমরা করব বিয়ে? দেখেন নি আপনারা গড়ের মাঠে ফুটবল খেলা? আমরা মশায়, বল নিয়ে নেচে কুঁদে বাহবা পেলেই খুশী। গোল দিলেই ত ছাই ফুরিয়ে গেল। আই মিন, বিয়ে হয়ে গেল।...ফল আমরা চাই না। চাক বেঁধে কি হবে? গীতায় বলেছে, মা ফলেষু কদাচন।"

কাষ্ঠ-হিন্দুকে প্রাণহীন কাষ্ঠ-হিন্দু বলিয়া বর্ণনা করিবার দুঃসাহস লেখকের আছে, সঙ্গে সঙ্গে আছে তাহার প্রতি দরদে ভরা বিরাট অনুভব। মধ্যবিত্তের জীবনভরা বিপর্য্যয়ের কোন অংশই তাহার লেখনীর শ্লেষ ও সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হয় নাই। মধ্যবিত্ত যে নিজেকে "এ যুগে এ দেশের দধীচি" মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতেছে সে কথা বলিতে লেখক ইতস্তত করেন নাই। পরের দেওয়া অপমান পকেটস্থ করিতে তৎপর ব্যক্তিকে তিনি ব্যঙ্গ করিয়া সমর্থন করিতেছেন পরকীয়া প্রীতিতে এইরূপ আসক্তির জন্য।

প্রেমের বিভিন্ন পরিণতি অনুসারে প্রেমকে পরিমাপ করিয়া লওয়া সম্বন্ধে বর্ণনাটি অত্যন্ত কৌতুকজনক। "স্বামী স্ত্রী দুজনে কতখানি দূরে হেঁটে চলেছে তা দেখে তাদের কতদিন বিয়ে হয়েছে তা বোঝা যায়।" টেষ্টম্যাচ দেখিতে আসিয়া দর্শকগণ প্রজাপতির ক্রিকেট ম্যাচের মর্ম বুঝিতে পারেন। এই খেলাতে শাশুড়ী করেন উইকেট কিপিং, কর্তা করেন, বোলিং আর কনে দেখার বয় করেন ব্যাটিং। এইরূপ জীবন্ত

ব্যঙ্গ চিত্রের পর চিত্রের সার্থক রূপ ছাব্বিশটি অভিনব কার্টুন চিত্রে উদঘাটিত হইয়া পাঠকের মনে স্থায়ী রেখাপাত করে। বাংলা সাহিত্যের এই প্রথম শ্লেষ ও ব্যঙ্গাত্মক পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসটি সাহিত্যক্ষেত্রে একটি নব যুগের সূচনা করিতেছে।

(প্রকাশক—জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স : ১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—৩৲)

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

* * * *

কৃশানু : শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী :

বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরীর একটি বিশেষ স্থান আছে। তাঁর নতুন পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। সাহিত্য-ক্ষেত্র থেকে তিনি দীর্ঘদিন অন্তরালে ছিলেন। সম্প্রতি পুনরায় 'কৃশানু' উপন্যাস সহ দেখা দিয়েছেন।

কৃশানু তাঁর নতুন সৃষ্টি। ৩৬৬ পৃষ্ঠার সুবৃহৎ উপন্যাস কৃশানু। উনিশশো বিয়াল্লিশ সালের আগস্ট আন্দোলন থেকে শুরু ক'রে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী ইতিহাস পর্যন্ত এক বিরাট অধ্যায় উপন্যাসটির অঙ্গীভূত হ'য়ে আছে। লেখকের সার্থকতা কিন্তু কেবলমাত্র কাহিনীর বিস্তৃতির মধ্যেই আবদ্ধ নেই। সকল ঘটনা ও ঘটনা-সংঘাত ছাড়িয়ে এক কুশলী শিল্পীর আশ্চর্য নিরাসক্ত মনের স্পর্শ যে কোনো সংবেদনশীল পাঠককে মুগ্ধ ও বিস্মিত করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিত যেখানে যত বেশী সমসাময়িক, লেখকের মোহগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা ও অন্তর্দৃষ্টি আচ্ছন্ন হবার আশঙ্কা সেখানে তত বেশী। সেদিক থেকে বিশেষ কোনো মতবাদে পক্ষপাত দেখানোর যথেষ্ট অবকাশ ছিল এই উপন্যাসখানিতে। কিন্তু লেখক আগাগোড়া মোহমুক্ত থেকে আশ্চর্য সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। সমগ্র উপন্যাসের মধ্যে আমাদের রাজনীতি চেতনার বহুধা বিভক্ত মতবাদের স্বাক্ষর আছে কিন্তু কোথাও এমন কোনো সরব ঘোষণা নেই, যা থেকে পাঠকরা কোনো বিশেষ মতবাদের উপর অন্যায় পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করতে পারেন। চরিত্র সৃষ্টিই সার্থক উপন্যাসের মূলকথা। কৃশানু সেদিক দিয়ে পূর্ণ সার্থকতা অর্জন করেছে। ভুজঙ্গ, শ্রী, শুভেন্দু, ব্রততী, নৃপেন, বিপিন প্রভৃতি এই কাহিনীর প্রতিটি চরিত্রই প্রাণবন্ত এবং আপনাপন বৈশিষ্ট্যে প্রদীপ্ত।

সরোজবাবু এই উপন্যাসের গঠনশিল্পে অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন এবং ঘটনা সংস্থাপনে যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর 'সংলাপ' রচনাও অপূর্ব, সুন্দর ও প্রাণস্পর্শী। আমাদের বিশ্বাস পাঠক কৃশানু পাঠে এক নতুনতর আনন্দের আস্বাদ লাভ করবেন। গ্রন্থখানির ছাপা বাঁধাই সুন্দর এবং প্রচ্ছদপট মনোরম। কিন্তু মূল্য নির্ধারণ ব্যাপারে যদি প্রকাশক মহাশয় একটু উদারতার দৃষ্টি নিয়ে ক্রেতা সাধারণের কথা চিন্তা করতেন, ভালো হ'ত।

(প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স : ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২ : দাম—৬৲।)

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

* * * *

নির্ঝর সঙ্গীত : শ্রীপ্রোজ্জ্বল নীহার ভারতী :

কাব্যগ্রন্থখানিতে কবি স্বচ্ছ ভাষায় নিখুঁত ছন্দে আপনার অন্তরের গভীর অনুভূতিকে সরস রূপদান করিয়াছেন। এ নবীন কবির অনেক কবিতায় সার্থক কবিত্বের প্রত্যক্ষ পরিচয় বিদ্যমান। বাংলার ১৩৬০ মধ্যেই কাব্যগ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজনীয়তা ইহার জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য দেয়।

(প্রকাশক—শ্রীগৌরচন্দ্র চক্রবর্তী। ৩১ এস ছিদাম মুদি লেন, কলিকাতা—৬ : দাম—এগার আনা।)

* * * *



আচার্য্য বিনোবা

মিনতি দেবী

শতেক কল্পান্ত ধরি' পলে পলে প্রতিটি প্রহরে
নিঃশব্দ চরণে আসি' ধ্বংসকীট বেঁধেছিল বাসা
অতিকায় দানবের অস্থি-মাংস দেহ-কোষ ঘিরি'
নীরবে ঘুচাতে তার বাঁচিবার অসীম পিপাসা।

রহস্যের মায়াজালে আবরিয়া নিজ পরিচয়
নির্বাক্ মৃত্তিকা, জানি, সেইদিন এলো ধরণীতে,
চমকিয়া সরে যায় হতবাক্ যত প্রাণীদল ;
তাহার ব্যাকুল ভাষা কেহ তাই পারে নি বুঝিতে।

অলক্ষ্যে ঘুরিয়া চলে সময়ের জীর্ণ জপমালা—
মাটির মানুষ আসে ধরণীর আরো কাছাকাছি,
মনে মনে একদিন কহিল সে অসীম উল্লাসে—
"মৃত্তিকার মৌন ভাষা যেন আজ কিছু বুঝিয়াছি।"

ব্যথা-ভরা বক্ষে তার শতাব্দীর আকুল কামনা
মুক্তি চাহে বারে বারে আঁধারের নাগপাশ হ'তে ;
কাঁদিছে সে চীৎকারিয়া ঊর্ধ্বপানে দুই বাহু তুলি',
"আমারে ছড়ায়ে দাও পৃথিবীর নির্মেঘ আলোতে—।"

মৃত্তিকার মূক মুখে জাগে যেন অস্ফুট কাকলি—
বুঝিতে পারে নি কেহ, কিছু তার বুঝিল কেহ বা,
শুনি তার কণ্ঠমাঝে, ধমনীর অণুতে অণুতে
বাজে শুধু এক সুর—'জয় হোক্, আচার্য্য বিনোবা!'

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল প্রণীত উপন্যাস "মুণ্ডহীন দেহ"—৩৲

বনফুল প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "নবমঞ্জরী"—২॥০

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "বিজয়লক্ষ্মী" (২য় সং)—২॥০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "বিন্দুর ছেলে" (উপন্যাস—২২শ সং)—১৲, "রামের সুমতি" (উপন্যাস—২২শ সং)—১৲, "চন্দ্রনাথ" (২৫শ সং)—১॥০, "নিষ্কৃতি" (নাটক—২য় সং)—১॥০, "নিষ্কৃতি" (উপন্যাস—২৬শ সং)—১॥০

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত নাটক "পরপারে" (১১শ সং)—২॥০

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "আমি যারে চাই"—৩৲, "বিজয়িনী শিখা"—৸০

শ্রীস্বপনকুমার প্রণীত রহস্যোপন্যাস "পৃথিবী থেকে দূরে"—॥০

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুদিত গ্রন্থ "অ্যাড্ভেঞ্চার অব্ টার্জান"—১৲

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা কর্ত্তৃক অনুদিত গ্রন্থ "টার্জান দি এপ্ম্যান"—১।০

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুদিত গ্রন্থ "কিং সলোমনস্ মাইনস্"—১॥০

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার প্রণীত "জাতকের গল্প"—॥৵০, "উপনিষদের গল্প"—॥৵০

ডাঃ জে, এম, মিত্র প্রণীত "মডার্ণ কম্প্যারেটিভ মেটিরিয়া মেডিকা" (হোমিও—৪র্থ সং)—১২৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



শিল্পী

শিল্পী—শ্রী [illegible]

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস



ভাদ্র—১৩৬১

প্রথম খণ্ড | দ্বিচত্বারিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

গীতায় বিরোধ ও সমন্বয়

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-টি, ডি·এস্-ই

গীতার মত বহু-প্রচারিত ও বহু-প্রশংসিত গ্রন্থ পৃথিবীতে বেশী নাই। তাহা হইলেও ইহার সম্বন্ধে অভিযোগও খুবই শুনিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ গীতার মধ্যে বহু বিরোধ (Contradictions) দেখিতে পাইয়াছেন।

তাহারা বলেন গীতায় শ্রীকৃষ্ণকে একবার যোদ্ধা একবার যোগী একবার বা পরমেশ্বর বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে; কোনও জায়গায় ইহাতে যজ্ঞের নিন্দা করা হইয়াছে (২।৪৪-৪৬) আবার কোনও জায়গায় ইহাতে যজ্ঞের প্রশস্তি করা হইয়াছে (৩।৯-১৬, ৯।১৬); যোগ শব্দটি লইয়াও বিরোধের অন্ত নাই। যোগ শব্দটিকে কখনও বা পাতঞ্জলীয় যোগ বা "চিত্ত বৃত্তি নিরোধ" বলা হইয়াছে (৫।২৪-২৬, ৬।৭-১৯), কখনও বা ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত "সুকৌশল কর্ম্ম-পদ্ধতি" (২।৪৮, ৫০, ৪।১) বলা হইয়াছে, কখনও বা ভগবানের অব্যক্ত রূপ হইতে বক্ত রূপে প্রকাশকে 'যোগ' বলা হইয়াছে (৯।৫, ১০।১৮, ১১।৪, ৮), আবার কখনও বা ভগবৎপ্রাপ্তির সমস্ত প্রণালীগুলিকেই যোগ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে (৪।২৫-৩১), আবার "যোগক্ষেম" (৯।২১) প্রভৃতি শব্দের মধ্যে যোগের অন্য একটি অর্থ দ্যোতিত হয়।

দর্শন, ভগবৎ-তত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধেও ইহাতে বিরোধ কম নহে। ইহাতে theism আছে (৯।২৭, ৩০, ৩১-৩৪) pantheism আছে (৭।৭-১২) stoicism আছে (২।১৪, ৫৮, ৬১ ; ৫।২০, ২৩); ইহাতে চাতুর্ব্বর্ণ্য আছে (৪।১৩, ৩।৩৫, ১৮।৪১-৪৮) আবার বর্ত্তমান কম্যুনিজম্‌এর চেয়েও ব্যাপকতর সাম্যবাদ আছে (৫।১৮)।

শুধু তাই নয়, ইহাতে সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা আছে, নির্গুণ ঈশ্বরের উপাসনা আছে, Personal Godএর কথা আছে, বাইবেলের "জেহোভা"র মত jealous godএর কথা আছে (৯।২৭, ৩১, ৩৪, ১৮।৬৫, ৬৬), চণ্ডীর "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু" প্রভৃতির সুর আছে, ভাগবতের আত্ম-

নিবেদনের সুর আছে (১৮।৬৬), বৈধী ভক্তির কথা আছে, রাগানুগা ভক্তির কথা আছে।

শাস্ত্রাদির প্রতি আনুগত্যের দিক দিয়াও গীতায় বিরোধ আছে। ঈশ্বরে বিশ্বাস না করিলেও হিন্দু হইতে বাধা নাই। বস্তুতঃ হিন্দুর ষড়দর্শনের দুই একটি দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্বই অস্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দু হইতে হইলে বেদকে স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু গীতা হিন্দুদিগের সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও ইহাতে বেদের নিন্দা আছে (২।৪২-৪৬)। কিন্তু এই বেদ-নিন্দাই ইহার সম্বন্ধে চরম পরিচয়ের কথা নহে। ইহাতে বেদ-বিহিত যজ্ঞের প্রশস্তি আছে (৩।৯-১৬), শাস্ত্রাদির প্রতি আনুগত্যের নির্দ্দেশও আছে।

গীতায় এত বিরোধ কেন? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই সমস্ত আপাতঃ প্রতীয়মান বিরোধগুলির নানা ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, গীতা শাস্ত্রটা একটি সুচিন্তিত দর্শন শাস্ত্র নহে, ইহা হইতেছে একটা রূপক কাব্য-মাত্র, সুতরাং তাহার মধ্যে সুপরিচ্ছন্ন যুক্তি-শৃঙ্খলা আশা করা যাইতে পারে না। Franklin Edgerton সোজা-সুজিই বলিয়া দিয়াছেন গীতা হইতেছে "poetic mystical and devotional rather than philosophical" (ভক্তিমূলক রূপক কাব্যমাত্র, দর্শন শাস্ত্র নহে); W. Von Humboldt বলিয়াছেন, "গীতাকার একজন দার্শনিক পণ্ডিত নহেন, কাজেই যুক্তির মাল-মশলাগুলি সুচিন্তিত প্রণালীতে গ্রথিত করিয়া একটা সুপরিকল্পিত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবার শিক্ষা তাঁহার নাই, তিনি হইতেছেন একজন সাধু, যিনি শুধু হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে কতকগুলি ভাল ভাল কথা বলিয়াছেন"—কাজেই অনিবার্য্য ভাবে আসিয়া পড়িয়াছে নানাপ্রকারের অসঙ্গতি।

গীতার অসঙ্গতির অন্যপ্রকার ব্যাখ্যাও আছে। অধিকাংশ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত হইতেছে যে গীতা শাস্ত্রটি তাহার আদি ও অকৃত্রিমরূপে আমাদের মধ্যে আসে নাই। আমরা আজ যে গ্রন্থটিকে গীতা বলিয়া মনে করি, তাহার মধ্যে আসল গীতার কথার সঙ্গে—অনেক বাজে কথা মিশিয়া গিয়াছে। এই বইটিতে একযুগের লেখা-তত্ত্বের সহিত পরবর্ত্তী যুগের অন্যান্য মতবাদগুলি বেনামীতে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়াই গীতার মধ্যে অসঙ্গতি ও বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে। বিভিন্ন মতবাদের প্রক্ষিপ্ত রচনাগুলি একত্র গ্রথিত হইয়া এক দিক দিয়া যেমন গীতার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে, অপর দিক দিয়া তেমনই ইহার মধ্যে অসঙ্গতি ও বিরোধ বাড়িয়া গিয়া বইটিকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

তাহা হইলে এই গীতার মধ্যে কোনটি খাঁটী কথা, এবং কোনটিই বা মেকী? ইহার মধ্যে কোন অংশগুলি মূল গীতার বিষয়বস্তু এবং কোনটিই বা তাহার প্রক্ষিপ্ত অংশ? Winternitz সোজাসুজি রায় দিয়া দিয়াছেন যে যেখানেই শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন সেইটিই প্রক্ষিপ্ত, যেখানেই যজ্ঞের প্রশস্তি করা হইয়াছে সেইটিই প্রক্ষিপ্ত। Winternitz-এর মতে সমগ্র বিশ্বরূপ দর্শন অধ্যায়টি প্রক্ষিপ্ত, কারণ ঐ অধ্যায়ে যে pantheism-এর কথা আছে তাহা পুরাণাদির সগোত্রীয় জিনিষ। শুধু তাহাই নহে, গীতাতে যে আঠারো অধ্যায় আছে,—ইহাও অষ্টাদশ পুরাণের অনুকরণে একটা জোড়াতালি দেওয়া কৃত্রিম ব্যাপারের নিদর্শন মাত্র। নতুবা শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মধ্যে ধীরে-সুস্থে এই আঠারো অধ্যায়ের বিলম্বিত লয়ে অর্জ্জুনকে উপদেশ দিবার সময় পান নাই।

এই ত গেল অভারতীয় সমালোচকদের অভিমত। ভারতীয় সমালোচকগণ গীতার মধ্যে এই জাতীয় বিরোধের সন্ধান যে জানিতেন না তাহা নহে। তবে তাঁহারা গীতার অংশ বিশেষকে প্রামাণ্য এবং অবশিষ্ট অংশগুলি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া না দিয়া গীতার এমন ভাবে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, যাহার ফলে গীতার এক একটি ভাষ্য এক একটি ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সমর্থক হইয়া উঠে।

এই বিভিন্ন জাতীয় ভাষ্যের ফলেই গীতা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীদেরও প্রামাণ্য গ্রন্থ—আবার কর্ম্মযোগীরও প্রামাণ্য গ্রন্থ। শুধু তাই নয়, ইহা দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী, বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদী, কর্ম্মবাদী, পুরুষোত্তমবাদী, প্রত্যেকেরই ভক্তির গ্রন্থ।

ইহা কি ভাবে সম্ভব হইতে পারে? একই গ্রন্থের এত বিভিন্নমুখী ব্যাখ্যা কি ভাবে সম্ভব হইতে পারে? তাহা হইলে কি ইহাই বুঝিতে হইবে যে গীতাতে গ্রীক্ Oracle-গুলির মত দ্ব্যর্থ বা বহু-অর্থ-বোধক শব্দের গ্রন্থনে একটা হেঁয়ালি তত্ত্ব লেখা হইয়াছে। ফলে লোকে ইচ্ছা

ও সুবিধামত তাহার অর্থ তৈয়ারি করিয়া লইতেছে? নিশ্চয়ই তাহা নহে।

তাহা হইলে এই একখানি গ্রন্থে বিভিন্ন ধর্ম্মমতের সার কথাগুলি কি ভাবে স্থান পাইয়াছে? গীতা কি একটা electic ধর্ম্ম বা আকবরের "দীন ইলাহি" ধর্ম্মের মত একটা ভাল ভাল মতের জোড়াতালি দেওয়া একটা গ্রন্থ?

তাহাও নহে। কারণ কোনও electic ধর্ম্ম কখনও কোনও ব্যবহারিক পথ-নির্দ্দেশ করিতে পারে না। উহা হইতেছে ভিটামিন্ বিহীন refined foodএর মত একটা খাদ্য; তাহাতে প্রাণ বাঁচে না। কবি বলিয়াছেন—

"তুঁষাণাপি পরিত্যজ্য ন প্ররোহন্তি তণ্ডুলাঃ"

তুঁষকে বাদ দিয়া চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে চাউল হইতে অঙ্কুর উদ্গম হয় না। ধর্ম্ম জীবন সম্বন্ধেও এই জাতীয় কথা বলা চলে। ধর্ম্মের বহিরঙ্গ আচার অনুষ্ঠান tradition বিধি-নিষেধ কৃত্য প্রভৃতি জিনিষগুলিকে তুঁষের মত পরিত্যজ্য ভাবিয়া নিছক বুদ্ধি দিয়া ধর্ম্মের সার বাণীগুলি বাছিয়া লইলে ধর্ম্ম জিনিষটা—Utilitarianism বা theosophyর পর্য্যায়ে নামিয়া আসে, তাহার মধ্যে হৃদয়বৃত্তির প্রেরণা আর কিছু থাকে না। যে শাস্ত্র বিভিন্ন মতবাদের আচার-অনুষ্ঠানের কথা বাদ দিয়া শুধু সব মতবাদের সার কথা-গুলির সঙ্কলন করে, তাহা মানুষের বুদ্ধির খোরাক দিতে পারে, হৃদয়ের খোরাক দিতে পারে না। কিন্তু আমরা জানি, গীতা গ্রন্থটি শুধু তত্ত্বদর্শন হিসাবে মানুষের কাছে বুদ্ধির খোরাকই পরিবেশন করে না, ইহা যুগে যুগে মানুষকে হৃদয়ের খোরাক দিয়া তাহাকে ব্যবহারিক পথ-নির্দ্দেশ দিয়াছে। কোনও electic ধর্ম্ম-পুস্তক এই জাতীয় পথ-নির্দ্দেশ করিতে পারে না। তাহা শুধু উদ্ধৃতির অভিধান বা book of quotations হিসাবেই ব্যবহৃত হয়।

অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় এমন এক একজন লোক আছেন যাঁহারা সকল লোকেরই মন জুগাইয়া মিষ্ট-কথা বলেন, সকলকেই আশা দেন এবং সকলের নিকট হইতেই সুলভ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেন। কিন্তু এই সমস্ত লোকেরা শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের এই জনপ্রিয়তা বজায় রাখিতে পারেন না। কারণ ইহারা যাহাদিগকে উপকার করিবার প্রতিশ্রুতি দেন, তাহাদের সকলকার উপকার করিতে পারেন না।

গীতা কি এই জাতীয় লোকের মত শুধু সকলকে ফাঁকা মিষ্ট কথাই শুনাইয়া থাকে—তাহাদিগকে কোনও কার্য্যকরী পথ-নির্দ্দেশ দিতে পারে না? ইহার কি কোনও ব্যবহারিক উপযোগিতা নাই?

নিশ্চয়ই আছে—। জীবনের ব্যবহারিক কর্ম্ম-নির্দ্দেশ পাইবার জন্যই লোকে গীতা পাঠ করে। শুধু কতকগুলি ভাল ভাল উদ্ধৃতি (quotation) সংগ্রহ করিবার জন্য কেহ গীতা পাঠ করে না।

ইহা কি ভাবে সম্ভব হইতে পারে? ইহা প্রায় অসম্ভব জিনিষ বলিয়াই লোকে এই শাস্ত্রটিকে শ্রীভগবানের রচনা বলিয়া মনে করে। নতুবা সাধারণ মানুষের পক্ষে—সর্ব্ববিরোধের সমন্বয় করিয়া সকলের মন জুগাইয়া, সকলের অমীমাংসিত প্রশ্নের সমাধান করিয়া, সকলের আপেক্ষিক অসম্পূর্ণতাকে পরিপূর্ণ করিয়া, জাতি-নিরপেক্ষ ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ মতবাদ-নিরপেক্ষ সার্ব্বজনীন সর্ব্ব-হিতকর সর্ব্ব-মনোহারী তত্ত্বের সন্ধান দেওয়া সম্ভব নহে। ইহা যেন মানুষের খণ্ডিত জ্ঞানের ক্ষমতার অগম্য ব্যাপার। এই জন্যই মনে হয় যিনি গীতা রচনা করিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে সমস্ত খণ্ড জ্ঞানের সমন্বয় (synthesis) হইয়াছিল, কাজেই তাঁহাকে ভগবান মনে করা অসঙ্গত নহে।

গীতার সম্বন্ধে যে সমস্ত বিরোধের অভিযোগ আছে তাহার সবগুলিই হইতেছে ভাষা, ভাষা দৃষ্টির ফলে, অথবা ভ্রান্ত বিচারের ফলে, এবং গীতায় প্রক্ষিপ্ত-বাদ স্বীকার না করিয়াও সমস্ত গীতাটিকেই আমরা একটি অনন্যসাধারণ সমন্বয়মূলক গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করিতে পারি।

ঠিক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রারম্ভে ইহা গীত হইয়াছিল কিনা, তাহাই যদি হইয়া থাকে তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ কতটা বলিয়াছিলেন, কতখানি অংশই বা পরবর্ত্তী যুগে ব্রাহ্মণগণ জুড়িয়া দিয়াছিল,—এগুলি খুব প্রয়োজনীয় তত্ত্ব নহে। অষ্টাদশ অধ্যায়যুক্ত যে গীতা আজ প্রচলিত আছে এই গীতা যিনিই রচনা করুন না কেন, তাঁহার মত সমন্বয়ী প্রতিভা আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে কেহই দেখাইতে পারেন নাই।

এই সমন্বয়ের মূল সূত্রটি কোথায়? এই সমন্বয়ের মূল

সূত্রটি আছে কর্ম্মজ্ঞান ও ভক্তিমার্গের আপেক্ষিক ত্রুটিটিকে পূর্ণ করিয়া দেওয়ার মধ্যে।

কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তি ইহাদের কোনটিই তুচ্ছ নহে। ধর্ম্ম জীবনেও বটে, আর ব্যবহারিক জীবনেও বটে, সর্ব্বক্ষেত্রেই এই তিনটিই সমানভাবে প্রয়োজনীয়। কর্ম্মকে এড়াইয়া চলিলে জ্ঞান জিনিষটা অসম্পূর্ণ ভাব-বিলাসে পরিণত হয়। জ্ঞানকে বাদ দিলে কর্ম্ম জিনিষটা উদ্দেশ্য বিহীন আচার-অনুষ্ঠানে অথবা অসংযত অকল্যাণকর আস্ফালনে পর্য্যবসিত হয় এবং ভক্তিকে বাদ দিলে কর্ম্ম জিনিষটা জ্ঞানের সহিত জোট পাকাইয়া আত্ম-কেন্দ্রিক স্বার্থপরতার অশিবের উদ্বোধন করে। সেইজন্য কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ের প্রয়োজন। গীতা এই সমন্বয় সাধন করিয়াছে। জ্ঞানকে ভক্তি ও কর্ম্মের সহিত সংযুক্ত করিয়া, কর্ম্মকে অবশ্য-প্রতিপাল্য বিশ্ব-হিতৈষণায় পরিণত করিয়া, ভক্তিকে জ্ঞান কর্ম্ম যোগ প্রভৃতির সহিত যুক্ত করিয়া গীতা এই সমন্বয় করিয়াছে।

কর্ম্ম আমাদের করিতেই হইবে—তাহা ধর্ম্মের জন্যও বটে, জীবনধারণের জন্যও বটে। কর্ম্ম না করিলে জ্ঞানীর জ্ঞানও নিছক পুঁথিগত বিদ্যায় পরিণত হয়। কাজেই জ্ঞান-যোগীরও প্রাথমিক কর্ত্তব্য হইতেছে কর্ম্মের অনুশীলন।

কিন্তু কর্ম্মের পথেও কতকগুলি বিপদ আছে। বিধি-নিষেধের বন্ধন ও আনুষ্ঠানিকতা, ফলাকাঙ্ক্ষার জন্য লোলুপতা, প্রতিযোগিতার মত্ততা, বিজয়ের আস্ফালন, পরাজয়ের দীনতা, আশাভঙ্গের নৈরাশ্য ও কর্ম্মে অনাসক্তি, —এইগুলি হইতেছে কর্ম্মমার্গের ত্রুটি। গীতা কর্ম্মের এই ত্রুটিগুলি সংশোধিত করিয়া সাধারণের কর্ম্মকে (বা মীমাংসকের কর্ম্মকাণ্ডকে) "কর্ম্ম-যোগে" পরিণত করিয়াছে।

গীতার নিষ্কাম কর্ম্ম উদ্দেশ্যবিহীন কর্ম্ম নহে। ইহার মধ্যে একজাতীয় কামনা আছে। সে কামনা নিবাত-নিষ্কম্প দীপ-শিখার মতই স্থির অচঞ্চল থাকিয়া চিত্তলোককে আলোকিত করিয়া রাখে। তাহার মধ্যে সিদ্ধির ঐকান্তিকতা আছে, কিন্তু কৃপণের মত ফল-লোলুপতা নাই। সে কামনা সিদ্ধিতে উল্লসিত হয় না, ব্যর্থতায় ভাঙ্গিয়া পড়ে না। সে সাধনা সুখে দুঃখে, লাভে অলাভে, জয়ে পরাজয়ে সমান শক্তিশালী থাকে। এই নিষ্কাম কর্ম্মের মধ্যে এমনই একটু কৌশল আছে যাহার ফলে কামনার মাদকতা-দুষ্ট কর্ম্ম "কর্ম্ম-যোগে" পরিণত হয়। ইহাই হইতেছে kantএর Categorical imperativeএর আদর্শ, এই আদর্শের বলেই "সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়া জয়ৌ"(২।৩৮) মানুষ কাজ করিয়া যাইতে পারে। ফল-লোলুপ কৃপণ কর্ম্মী তাহা পারে না।

গীতা মীমাংসকদিগের কর্ম্মবাদের অসম্পূর্ণতাকে যেমন সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে, তেমনি পাতঞ্জলীয় যোগ ও সাংখ্যের জ্ঞানকেও পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে।

কর্ম্মকে অস্বীকার করিয়া যাহারা সোজাসুজি জ্ঞান-মার্গের পথিক হইতে চায়, গীতা তাহাদের ব্যর্থতা দেখাইয়াছে। গীতা বলিয়াছে কেহ কর্ম্ম না করিয়া জ্ঞানের অবস্থায় পৌছাইতে পারে না—

"ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে" ৩।৪

কাজেই জ্ঞানের খাতিরেই হউক অথবা সন্ন্যাসের খাতিরেই হউক—কর্ম্মকে ত্যাগ করিলে চলিবে না। জ্ঞানের পথের পথিককে ও—গোড়ার দিকে আনুষ্ঠানিক কর্ম্মগুলি করিয়া যাইতে হইবে। কি ভাবে তাঁহারা এই কাজ করিবেন? গীতা বলিতেছে "অবিদ্বান লোকেরা ফলাসক্ত হইয়া যে ভাবে কাজ করে, বিদ্বান লোকেরাও সেই ভাবেই কাজ করিয়া যাইবেন, শুধু অনাসক্ত হইয়া। তাহা না করিলে সমাজের শৃঙ্খলা নষ্ট হইয়া যাইবে, আনুষ্ঠানিক কর্ম্মের ব্যর্থতা বুঝিয়াও তাহার বিরুদ্ধে প্রচার করিয়া অজ্ঞ লোকদিগের "বুদ্ধি-বিচালন" করিয়া শুধু শুধু পাক ঘুলাইয়া তুলিবার প্রয়োজন নাই (৩-২৫-২৬)। অনধিকারীকে জ্ঞান দিয়া তাহাকে ইঁচড়পক্ক করিয়া তুলিলেই তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইবে না। কর্ম্মের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে তাহার স্বভাবকে উন্নত করিতে চেষ্টা কর, তাহা শ্রদ্ধার ভিতর দিয়াই সম্ভব, দম্ভ ও বুদ্ধির আস্ফালনের ভিতর দিয়া নহে।

সেক্সপিয়ারের Tempest নাটকের "ক্যালিকান্ প্রস্পেরো যে বলিয়াছিল তুমি আমাকে বিদ্যাদান করিয়াছ ইহার দ্বারা আমার এই লাভ হইয়াছে যে আমি মনের সাধে তোমাকে পণ্ডিতের ন্যায় গালি দিতে পারিব।" অনেক সময় অনধিকারীর নিকট জ্ঞান এইভাবেই কাজ করে। এই জন্যই কর্ম্মের মধ্য দিয়া, হয়ত সকাম কর্ম্মের ভিতর দিয়াও ধীরে ধীরে কর্ম্মের রহস্য বুঝিতে পারিয়া

কর্ম্মীর চিত্তশুদ্ধি হইবে এবং সে তখন জ্ঞানের অধিকারী হইবে। সুতরাং তাহাদিগকে কর্ম্ম করিতেই হইবে। আর এই অজ্ঞানী জন-সাধারণের মুখ চাহিয়া জ্ঞানী মহাপুরুষদেরও "লোক-সংগ্রহের" জন্য কর্ম্ম করিয়া যাইতে হইবে। শুধু বুদ্ধির শিং দিয়া সব কিছুকে গুঁতাইয়া যাইলেই চলিবে না। তাহা হইলে সমাজের নীতি-স্থিতি ব্যাহত হইবে। (৩।২০-২৪)

গীতায় আপাতদৃষ্টিতে যে সমস্ত বিরোধ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের চক্ষে ধরা পড়িয়াছে—তাহার অনেকগুলির সমাধান—এই তত্ত্বটির মধ্য হইতেই পাওয়া যায়। গীতায় যে যাগযজ্ঞের সুখ্যাতিও করা হইয়াছে, আবার নিন্দাও করা হইয়াছে তাহার একটি রহস্য এখানে পাওয়া গেল। যাহারা আনুষ্ঠানিক যাগযজ্ঞকেই ধর্ম্মের একমাত্র তত্ত্ব বলিয়া মনে করেন (২।৪২।৪৫) তাহারা ভুল করেন। কিন্তু এই যজ্ঞের ফলটি ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া আমাদের মর্ম্মপ্রবাহকে যদি আমরা নিষ্কাম সাধকের ভঙ্গীতে জগতের মঙ্গলের খাতে বহাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে ঐ কর্ম্মই আমাদের মুক্তির (নৈষ্কর্ম্মের) সোপান হইয়া উঠে। এই ভাবেই যজ্ঞ কর্ম্মের দ্বারা আমরা দেবতার সেবা করিতে পারি ও দেবতার করুণা পাই—(৩।১০-১১) এইজন্যই "মুক্তসঙ্গ" (৩।৯) ভাবে যজ্ঞ করিলে সে যজ্ঞ নিজের ও বিশ্বের মঙ্গলময় হয়। এই জাতীয় যজ্ঞের-ই সুখ্যাতি গীতায় করা হইয়াছে—

সাধারণ মানুষের সিদ্ধান্তগুলি ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত; তাহা একটা মতবাদের চরম প্রান্তে একটা ভুল দেখিতে পাইলেই একেবারে বিপরীত দিকে চরমপ্রান্তে ছুটিয়া গিয়া আর একটি নূতন ভুল করিয়া বসে। গীতা এই ভুল করে নাই। যজ্ঞ-সর্ব্বস্ব মনোভাবের সে নিন্দা করিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া যজ্ঞকে পরিত্যজ্য বলিয়া ঘোষণা করে নাই।

জ্ঞানের আলোকে গীতা বুঝাইয়াছে—সাধারণ যাগযজ্ঞের মধ্যে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি আছে, (২।৪৪) ভোগৈশ্বর্য্যের কামনা আছে, স্বর্গফলের জন্য লোলুপতা আছে। তাহা হইলেও গীতা যাগযজ্ঞকে অস্বীকার করে নাই এবং জ্ঞানের দম্ভে বৌদ্ধ দর্শনের মত যজ্ঞকে ত্যাজ্য বলিয়া প্রচার করিয়া মানুষকে ক্রিয়াহীন, নাস্তিক, শাস্ত্র-বিরোধী করিয়া তুলে নাই। গীতা আত্ম-কেন্দ্রিক যাগ-যজ্ঞকে বিশ্ব-কেন্দ্রিক বা ঈশ্বর কেন্দ্রিক করিয়া তুলিবার নির্দ্দেশ দিয়াছে। মহাজ্ঞানী শঙ্কর গীতার এই তত্ত্বটি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেই জন্যই যে স্থলে গীতা যজ্ঞকে সমর্থন করিয়াছে সেই স্থলে তিনি যজ্ঞের অর্থ করিয়াছেন "ঈশ্বর"। এই শঙ্কর-ভাষ্য হইতেই বুঝা যাইতেছে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ গীতার মধ্যে যেখানে দেখিয়াছেন বিরোধ (Contradiction), সেইখানে বাস্তবিক আছে সমন্বয়।

বস্তুতঃ গীতায় সমন্বয়ের অন্ত নাই। গীতা এক দিক দিয়া যেমন মীমাংসাকে কর্ম্মবাদের সহিত জ্ঞানের সমন্বয় করিয়াছে, অন্যদিক দিয়া তেমনই পাতঞ্জলীয় যোগের সহিত ভক্তি ও "ঈশ্বর বাদের" সমন্বয় করিয়াছে। গীতায় পাতঞ্জলীয় যোগের মতই আসন প্রাণায়ম বা কৈবল্য মুক্তির কথা আছে সত্য (৬।১১-২০), কিন্তু গীতায় যোগের চরম অবস্থা শুধু পাতঞ্জলীয় চিত্ত-বৃত্তি নিরোধ জনিত সুখ-দুঃখের অতীত একটা অবস্থা মাত্র নহে, ইহা হইতেছে একটা চরম আনন্দের অবস্থা (৬।২১), যে অবস্থায় মানুষ আর অন্য কোনও লাভকে বড় বলিয়া ভাবিতে পারে না (৬।২২), যে অবস্থায় মানুষ ব্রহ্ম-সংস্পর্শজনিত একটা অত্যন্ত সুখ লাভ করে এইরূপ একটা অবস্থা (৬।২৮)। ফলে গীতা যোগের বৌদ্ধ-নির্ব্বাণ জাতীয় একটা শূন্য অবস্থা-কে বৈষ্ণবীয় "রসোল্লাসে"র মত আনন্দ পরিপূর্ণ অবস্থায় উন্নীত করিয়া তুলিয়াছে। কৈবল্য সিদ্ধির নেতিমূলক অবস্থাকে ব্রহ্ম-সান্নিধ্যের আনন্দযুক্ত অস্তিমূলক অবস্থায় তুলিয়া দিয়াছে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি গীতা কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমন্বয় করিয়া এক দিক দিয়া যেমন জ্ঞানের বাচালতা ও ক্রিয়াহীন উচ্ছৃঙ্খলতাকে সংযত করিয়াছে, অপর দিক দিয়া তেমনই কর্ম্মের আনুষ্ঠানিকতা ফল-লোলুপ অধৈর্য্য প্রভৃতিকেও সংযত করিয়াছে। এখন দেখা গেল গীতা যোগীর যোগমার্গকেও অন্য একটা রূপ দিয়াছে। শুধু নাম টেপা টেপি অথবা "চিত্তবৃত্তির নিরোধ"ই গীতোক্ত যোগের শেষ কথা নয়, তাহার চরম অবস্থায় ব্রহ্ম সংস্পর্শের আনন্দ থাকা চাই, ভক্তির রসোল্লাস চাই। এই ভাবে গীতা যোগ জিনিষটাকেও নিছক শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম অথবা চিত্তের "জিম্‌নাষ্টিক্" এর অবস্থা হইতে ভক্তিরসপূত সত্যিকারের আধ্যাত্মিক জিনিষে উন্নীত করিয়া তুলিয়াছে।

গীতায় সমন্বয়ের কথা আলোচনা করিতে হইলে গীতায়

ভক্তিবাদের উল্লেখ না করিলে এই প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। আমরা জানি গীতায় জ্ঞানের প্রচুর প্রশংসা আছে। গীতার মতে সমুদয় কর্ম্ম জ্ঞানেই পরিসমাপ্তি লাভ করে (৪।৩৩), জ্ঞানরূপ নৌকা করিয়া পাপ-সমুদ্র পার হওয়া যায় (৪।৩৬), জ্ঞানের মত পবিত্র আর কিছুই নাই (৪।৩৮) ইত্যাদি। তাহা হইলেও গীতায় যে জ্ঞানের প্রশস্তি করা হইয়াছে তাহা সাংখ্যের ঈশ্বর—নিরপেক্ষ তত্ত্বজ্ঞান মাত্র নহে। গীতায় জ্ঞানীকে ভক্ত হইবারও নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জ্ঞানের যে ২০টি লক্ষণ দেওয়া আছে (১৩।৭-১১) তাহার মধ্যে "ময়ি চানন্য-যোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী" (১৩।১০) এই ভগবদ্ভক্তিটি জ্ঞানের অন্যতম লক্ষণ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। জ্ঞানের আস্ফালন হইতে যে নাস্তিকতার সৃষ্টি হয়, গীতায় কুত্রাপি সেই নাস্তিকতার সমর্থন নাই। সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের মত গীতাতেও "ভূমিরাপোনলোবায়ু" (৭।৪-৭) প্রভৃতি বিভিন্ন তত্ত্বের স্বীকৃতি আছে বটে; কিন্তু গীতা এই সব তত্ত্বের উপর আর একটি পরম তত্ত্বকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে; তাহা হইতেছে "ঈশ্বর তত্ত্ব"—এবং এই ঈশ্বর তত্ত্বের চারিদিকেই অন্যান্য তত্ত্বগুলি "ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব" (৭।৭) গ্রথিত হইয়া আছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা গীতার মধ্যে Pantheism ও Theism এর বিরোধ দেখিয়াছেন। বস্তুতঃ গীতায় এ বিরোধ নাই। কারণ গীতায় Theism থাকিলেও Heratheism নাই। গীতা জড় জগতের সঙ্গে পরমাত্মাকে ঠিক একাত্ম জিনিষ বলিয়া স্বীকার করে নাই। (৭।৪) গীতার দশম অধ্যায়ে আদিত্য শশী বাসব হিমালয় অশ্বত্থ উচ্চৈশ্রবা ঐরাবত প্রভৃতির মধ্যে যে দেবত্ব স্বীকৃত (১০।২১) হইয়াছে, তাহা হইতেছে একই ব্রহ্মের ব্যক্তরূপ বা "যোগবিভূতি" (১০।১৮) মাত্র। গ্রীক্ প্যান্থিস্‌ম্ এই জিনিষ নহে।

গীতার ভক্তি তত্ত্বও একটি অপূর্ব্ব জিনিষ এবং এই ভক্তি তত্ত্বের মধ্যেও গীতাকারের সমন্বয়ী প্রতিভার একটি আশ্চর্য্যজনক নিদর্শন পাওয়া যায়।

ভক্তির মধ্যে অনেক সময় একটা উচ্ছ্বাস, একটা মত্ততা, একটা অন্ধবিশ্বাস দৃষ্ট হয়। ইহা অনেক সময়েই জ্ঞান ও কর্ম্মের বিরোধী হইয়া উঠে। এই জাতীয় ভক্তিকেই উল্লেখ করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নৈবেদ্য কাব্যে বলিয়াছেন—

"যে ভক্তি তোমার লয়ে ধৈর্য্য নাহি মানে
মুহূর্ত্তে বিহ্বল হয় নৃত্য গীতগানে
ভাবোন্মাদ মত্ততায় সেই জ্ঞান হারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছল ফেন ভক্তি মদ ধারা
নাহি চাহি নাথ"

ইহা শুধু বৈষ্ণবীয় ভক্তির বিরুদ্ধে ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথের কটাক্ষপাত মাত্র নহে। জ্ঞানযোগী বা কর্ম্মযোগীদের অনেকেই ভক্তিপথের উচ্ছ্বাসটাকে সাধনার বিঘ্নকর জিনিষ বলিয়া মনে করেন এবং শান্ত অপ্রমত্ত মন লইয়া কাজ করিতে ভালবাসেন।

সাধারণ লোকের মধ্যেও একটা ধারণা আছে যে ভক্তির সঙ্গে জ্ঞানের কোনও সম্পর্ক নাই এবং ব্যবহারিক কর্ম্ম-জীবনেরও বিশেষ সম্পর্ক নাই। ফলে ভক্ত হইতেছে একটা অকর্ম্মা "হ্যালা খ্যাপা" জাতীয় লোক!

গীতা কিন্তু এই জাতীয় লোককে ভক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ দেয় না, অন্ধ ভক্তিকেও গীতা খুব বেশী উচ্চ স্থান দেয় নাই। আর্ত্ত জিজ্ঞাসু অর্থার্থী এবং জ্ঞানী ভক্ত (৭।১৬) দিগের মধ্যে গীতা জ্ঞানী ভক্তকেই (৭।১৭) শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে।

গীতার নির্দ্দেশ যে মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া অভ্রান্ত, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ আর্ত্ত ভক্তের আর্ত্তি কাটিয়া যাইলেই ভক্তির প্রয়োজন শেষ হইয়া যায়, জিজ্ঞাসু ভক্তের জিজ্ঞাসা শেষ না হইলে ভক্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না, অর্থী ভক্তের কাম্য বস্তু না মিলিলেই তাহার মধ্যে বিদ্রোহের ভাব থাকে। কিন্তু জ্ঞানী ভক্তের আর বুদ্ধি বিচালন হয় না। অন্ধ ভক্তির প্রাথমিক শক্তি যতই থাকুক না কেন, পরিণামে তাহা প্রায়ই নাস্তিকতায় বা গোঁড়ামিতে পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু জ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তিতে ভক্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা আর বিচলিত হয় না। জ্ঞানী ভক্তের প্রশস্তি করিয়া গীতা এই ভাবে জ্ঞান ও ভক্তির আপাতঃ বিরোধ বিদূরিত করিয়া উভয়ের মধ্যে অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করিয়াছে।

বস্তুতঃ গীতার ভক্ত অন্ধ বিশ্বাসের গোঁড়া লোকও নহে, উচ্ছ্বাসমত্ত ক্ষেপাটে লোকও নহে, আর সংসার-সম্পর্ক

বিহীন বেহিসাবী লোকও নহে। গীতায় যে ভক্তকে ভগবানের প্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে (১২।১৩-২০) তিনি একজন আদর্শ মহামানব। তাঁহার মধ্যে জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তির সমন্বয় হইয়াছে।

কোন জাতীয় ভক্ত ভগবানের প্রিয় এই প্রসঙ্গে গীতায় বলা হইয়াছে—"যিনি সর্ব্বভূতে দ্বেষশূন্য মৈত্র ও কৃপালু, যিনি মমত্বহীন নিরহঙ্কার সুখেদুঃখে সমদর্শী ক্ষমাশীল সন্তুষ্ট যোগী সংযতচিত্ত ঈশ্বরে মনোবুদ্ধি সমর্পণকারী তিনিই আমার প্রিয়; যাঁহার নিকট হইতে লোকরা কোনও উদ্বেগ পায় না এবং লোক হইতে যিনি উদ্বিগ্ন হন না, যিনি হর্ষ পরশ্রী-কাতরতা ভয় ও চিত্ত-ক্ষোভ হইতে মুক্ত, তিনিই আমায় প্রিয়; যিনি সকল বিষয়ে নিস্পৃহ, শুচি অনলস উদাসীন (পক্ষপাতশূন্য) সর্ব বিষয়ে চিন্তাশূন্য এবং সংকল্প-বিকল্প শূন্য, যিনি শত্রু-মিত্র মান অপমানে একরূপ, শীতোষ্ণ সুখে দুঃখে বিকার শূন্য, আসক্তি শূন্য নিন্দা ও প্রশংসায় সমভাবাপন্ন, মৌনী গৃহাদিতে অত্যাশক্তি শূন্য (অনিকেতঃ) স্থির, চিত্ত, এইরূপ ভক্ত-ই আমার প্রিয়"—(১২।১৩-২০)

এই যে ভক্তের লক্ষণ, ইহা শুধু রসক্ষেপা ভালমানুষ বা গোঁড়া অন্ধবিশ্বাসী ভক্তের সম্বন্ধে প্রযুজ্য নহে। গীতায় যে ভক্তকে ঈশ্বরের প্রিয় বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগ ও ভক্তি যোগের সমন্বয় হইয়াছে। বস্তুতঃ গীতায় যে যোগীর লক্ষণ (৬।৭-৩৯) অথবা জ্ঞানীর লক্ষণ (১৩।৭-১১) দেওয়া আছে, তাহার সহিত ভক্তের লক্ষণ প্রায় সগোত্রীয় জিনিষ।

গীতার ভক্তিবাদ অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইহার ফলে অনেকে এমন কথাও বলিয়াছেন যে গীতা বাইবেলের নিকট ঋণী। F. Lorinsir বলিয়াছেন গীতার যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ তাহার জন্য গীতা-কার New Testamentএর নিকট ঋণী। তিনি গীতা হইতে শতাধিক শ্লোক তুলিয়া গীতার সহিত বাইবেলের সাদৃশ্য দেখাইয়া এই তত্ত্বটি উপস্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই সাদৃশ্য হইতে বাইবেলের ঋণ বিশেষ কিছু প্রমাণিত হয় না। ঈশ্বরে ভক্তি কোনও একটি জাতির একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। কাজেই ভারতীয় শাস্ত্রে ঈশ্বর ভক্তির প্রসঙ্গ থাকিলেই তাহা অভারতীয়দিগের নিকট হইতে ধার করা জিনিষ হইবে, এ যুক্তি অশ্রদ্ধেয়। তা ছাড়া বাইবেল হইতে গীতার একটা বড় পার্থক্য আছে। গীতার Personal Godএর কথা আছে বটে, এমন কি হয়ত Jealous Godএরও কথা আছে (৯।৩১ ১৮।৬১, ইত্যাদি) কিন্তু গীতায় বাইবেলের মত Chosen peopleএর স্বীকৃতি নাই। গীতার ঈশ্বর সর্ব্বভূতে সমদর্শী; তাঁর দ্বেষও নাই প্রিয়ও নাই, যে তাঁহাকে ভক্তির সহিত ভজনা করে তিনি তাহাকেই কৃপা করেন (৯।২৯, ৩০); শুধু তাই নহে, অন্য কোনও দেবতাকেও যদি কেহ ভক্তি করে তাহা হইলেও গীতার ভগবান তাহাতে সন্তুষ্ট হন (৯।২৩); যে যে ভাবে তাঁহাকে ভজনা করে সে সেই ভাবেই তাঁহাকে পায়—(৪।১২)।

গীতার মধ্যে এই জাতীয় সর্ব্বমত ও সর্ব্বপথের স্বীকৃতি আছে বলিয়াই—হিন্দুরা জোর করিয়া কাহাকেও ধর্ম্মান্তরিত করিবার প্রয়োজন অনুভব করে না।

খৃষ্টান বা মুসলমান ধর্ম্মের সঙ্গে গীতোক্ত ধর্ম্মের এইখানেই একটা বিরাট পার্থক্য আছে। ঐ সব ধর্ম্ম বুঝিয়াছে যিশু ছাড়া গতি নাই, মহম্মদ ছাড়া গতি নাই। সুতরাং যাহারা ইহাদের আশ্রয় লইল না তাহাদের আর মঙ্গল নাই। সুতরাং মারিয়া ধরিয়া রক্তপাত হত্যা প্রভৃতি করিয়াও সকলকে ধর্ম্মান্তরিত করিবার জন্য ইহাদের মাথাব্যথা আছে। গীতার মধ্যে এই জাতীয় মাথাব্যথা নাই, গীতা তাহার উদার দৃষ্টি দিয়া সব মতকে মানিয়া লইয়াছে, সব পথ সে স্বীকার করিয়াছে এবং সব প্রণালীর অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণতা দিয়া সকলের মধ্যে সমন্বয় বিধান করিয়াছে।

কামাদি প্রবৃত্তি সম্বন্ধেও গীতার সমদর্শী প্রতিভা লক্ষণীয়। বৌদ্ধ অথবা মধ্যযুগীয় খৃষ্টান মঠধারীগণ কাম প্রভৃতিকে অপরাজেয় শত্রু মনে করিয়া ঘর সংসার ছাড়িয়া মানুষকে মঠ মন্দিরে আশ্রয় লইবার জন্য শিক্ষা দিয়াছে। রজোগুণোদ্ভব এই কামের শক্তিকে গীতা স্বীকার করিয়াছে এবং এই কাম প্রতিহত হইলে যে ক্রোধ উৎপন্ন হয় তাহাও স্বীকার করিয়াছে (৩।৩৭) কিন্তু তাহা হইলেও জোর করিয়া ইহাদিগের নিগ্রহ করিবার উপদেশ দেয় নাই; কারণ "প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ মিং করিষ্যতি„ (৩।৩১)

কিন্তু তাই বলিয়া প্রবৃত্তির স্রোতে গা ঢালিয়া দিবার উপদেশও গীতা দেয় নাই। গীতা স্বীকার করে যে ইহাদের

নিগ্রহ "বায়োরিব সুদুষ্করং" (৬।৩৪) তাহা হইলেও গীতার মতে অভ্যাসের দ্বারা বৈরাগ্যের দ্বারা ধীরে ধীরে এগুলিকে সংযত করা যায় (৬।৩৫)। এই ভাবে সংযম সাধনা করিতে পারিলে আত্মাই আত্মার বন্ধু হইয়া উঠে নতুবা আত্মাই আত্মার শত্রু (৫।৫ ; ৬)

এই সাধনার কঠোরতর কথা গীতা স্বীকার করে বটে কিন্তু তাই বলিয়া অসমাপ্ত সাধনার ব্যর্থতার কথা ভাবিয়া গীতা কাহাকেও মুখ নাড়া দেয় না, নিরুৎসাহ করে না। অর্জ্জুন এই অসমাপ্ত সাধনার ব্যর্থতার কথা স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "হে শ্রীকৃষ্ণ যদি কোনও লোক কিছুদিন যোগাভ্যাস করিয়া পরে তাহা হইতে বিরত হয়, তাহা হইলে তাহার অন্তিমে কি দশা হয়? সে কি ছিন্ন মেঘের ন্যায় বিনষ্ট হয়?" (৬।৩-৩৮)

ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"না তাহার ইহকাল বা পরকাল কিছুই বিনষ্ট হয় না, কারণ 'নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি (৬।৪০), এই আশাবাদ, এই ঔদার্য্য, পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ।

চণ্ডীপাঠ প্রভৃতিতে মন্ত্রাদির উচ্চারণে সামান্য ভুল হইলে আমরা ভয়ে শিহরিয়া উঠি, পূজাপার্ব্বণে আচার-অনুষ্ঠানে সামান্য ত্রুটি হইলে আমরা "হানির" ভয়ে আতঙ্কিত হই, কিন্তু যোগভ্রষ্ট হইলেও যে আমাদের শান্তি পাইতে হইবে না—বরং যতটুকু ভাল কাজ করিয়া জীবন ত্যাগ করিব, ততটুকু সুকৃতি লইয়া পরবর্ত্তী জন্মে অসমাপ্ত সাধনাকে সমাপ্ত করিবার ততটুকু সুযোগ সুবিধা পাইব, ভাল কাজের সামান্য মাত্র অনুষ্ঠানও কখনও ব্যর্থ হইবে না (২।৪০) এমন আশার কথা, এমন উৎসাহের বাণী, Browning, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির কাব্যের উচ্ছ্বাসের মধ্যে পাইয়াছি বটে,—দর্শন বা ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে খুব বেশী পাই নাই।

এইজন্যই গীতার এত গৌরব। এইজন্যই গীতাকে ধর্ম্মময়ী সর্ব্বজ্ঞান-প্রয়োজিকা সর্ব্বশাস্ত্র-সারভূতা গ্রন্থ বলা হয়। এত বড় সমন্বয়ের তত্ত্বগুলি সকলের বুদ্ধিগ্রাহ্য নয় বলিয়াই—সাধারণ লোকে গীতার মধ্যে বিরোধ আছে বলিয়া মনে করে। এইজন্যই গীতার নিগূঢ় তত্ত্ব শুধু শ্রীকৃষ্ণই পুরাপুরি জানেন—এবং "ব্যাসো বা ব্যাস-পুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোহথ মৈথিলঃ" কিছু কিছু জানেন বলিয়া মনে করা হয়। বস্তুতঃ গীতাকে যে নিষ্ঠার সহিত পাঠ করিবে এবং ইহার তত্ত্বটি কিছু কিছুও বুঝিতে পারিবে সে নিষ্কাম কর্ম্মী হইবে, কামনার পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না, গোঁড়ামির নীচতা তাহাকে স্পর্শ করিবে না, ভেদজ্ঞান অসহিষ্ণুতা অনুদারতা তাহাকে স্পর্শ করিবে না, নলিনী-দলে বারি-বিন্দুর মত কোনও পাপই তাহাকে লিপ্ত করিতে পারিবে না। তাহার মধ্যে কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তির সার্থক সমন্বয় হইবে।

মানসবধূ

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর

আজ বরষায় জলের ছিটে
লাগ্‌ল মানস বধূর গায়।
ভিজ্‌ল বসন, ভেদ করি তাই
রূপটি তাহার মধুর ভায়।
আজকে মনের ভাঙ্‌ল আগল
ও রূপ আমায় করল পাগল।
বার বারই তাই নয়ন যুগল
মুদি ও রূপ পিপাসায়।

বাইরে মেঘের সমারোহ
মনের মাঝেও তারি ঘটা।
খেলছে তাতে সিক্তবাসা
মানসবধূ তড়িচ্ছটা।
পাই না তারে বাহুর পাশে
স্বপ্নে তারে পাওয়ার আশে
শয্যা'পরে আজকে যাপি
বর্ষারাতি অনিদ্রায়॥



কানু কহে রাই

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটনাগপুরের একটি বড় সহর হইতে যে পাকা রাস্তাটি ষাট্ মাইল দূরের অন্য একটি বড় সহরে গিয়াছে সেই রাস্তা দিয়া একটি মোটর গাড়ী চলিয়াছে। শীতান্তের অপরাহ্ণ, বেলা আন্দাজ তিনটা। রাস্তার দুপাশে অসমতল জঙ্গল, কোথাও ঘন কোথাও বিরল, দূরে দূরে পাহাড়ের ন্যুব্জপৃষ্ঠ দেখা যায়। দৃশ্যটি নয়নাভিরাম, বাতাসের আতপ্ত শুষ্কতা স্পৃহণীয়।

মোটর মন্দগতিতে চলিয়াছে, ত্বরা নাই। স্টীয়ারিঙের উপর দুই অলস বাহু রাখিয়া মোটর চালাইতেছে একটি যুবতী। পরিণত-যৌবনা, বয়স অনুমান পঁচিশ। মুখের স্বাভাবিক সৌন্দর্যের উপর প্রসাধনের নৈপুণ্য মুখখানিকে আরও চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিয়াছে। চোখে হরিদাভ মোটর-গগ্‌ল্, পরিধানে কাশ্মীরী পশমের শাড়ী ও ব্লাউজ। সর্বোপরি সর্বাঙ্গ জড়াইয়া একটি আসক্ত আত্ম-প্রসন্নতা।

যুবতীর নাম মমতা। মোটর যে-শহরের দিকে চলিয়াছে সেই শহরের ম্যাজিস্ট্রেট্ মিস্টার ভৌমিক তাহার স্বামী। সে যে-শহর হইতে ফিরিতেছে সেখানে তাহার মামার বাড়ী, সে মামার বাড়ীতে কয়েক দিনের জন্য বেড়াইতে গিয়াছিল, এখন স্বামিগৃহে ফিরিতেছে।

তাহার পাশে বসিয়া আছে তাহার মামাতো বোন সতী। বয়সে তাহার চেয়ে বছর তিনেকের ছোট, দেখিতে তাহার মত সুন্দরী নয়, কিন্তু শ্রী আছে। চোখদুটি চপল, অধর চটুল; সহজেই হাসিতে পারে। বেশ-ভূষার বিশেষ পার্থক্য নাই, প্রসাধনের মধ্যে ভ্রূর মাঝখানে সিঁদুরের টিপ, গালে রুজের একটু আভাস। সতীর বাবা লণ্ডনে হাই কমিশনারের অফিসে বড় চাক্‌রে; সতী সেই সূত্রে দুই বছর বিলাতে ছিল, সম্প্রতি ফিরিয়াছে। বর্তমানে সে মমতার সঙ্গে ভগিনীপতির গৃহে বেড়াইতে যাইতেছে।

গাড়ীতে আর কেহ নাই। পিছনের আসনে দুজনের ফার্ কোট, হ্যাণ্ড ব্যাগ, দুটা বিলাতী কম্বল; গাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে খোলের মধ্যে দুটা স্যুট্‌কেস ইত্যাদি।

গাড়ী স্বচ্ছন্দ গমনে চলিয়াছে। দুই বোনে বিশ্রম্ভালাপ করিতেছে; সতীই বেশী কথা বলিতেছে, মমতা সায় উত্তর দিতেছে।

সতী একসময় বলিল—'আমিই কেবল বলে চলেছি, তুই চুপটি করে আছিস্। এবার তুই কথা বল, আমি শুনি।'

মমতা আলস্যভরে বলিল—'আমার বলার কিছু থাকলে তো বলব। তুই দু'বছর বিলেতে থেকে এলি, কত নতুন জিনিষ দেখলি, তা বিলেতের কথা তো কিছুই বলছিস না।'

সতী বলিল—'কি বলব? বিলেত দেশটা মাটির, মানুষগুলো আমাদেরই মত, কেবল রঙ্ কটা।'

'আর কিছু বলবার নেই?'

'বলবার অনেক আছে, কিন্তু সেগুলো প্রশংসার কথা নয়। বিচ্ছিরি দেশ ভাই, আমার একটুও ভাল লাগেনি। এত মানুষ চারিদিকে যে মনে হয় যেন গিজগিজ করছে, একটু নিরিবিলি নেই কোথাও।'

'তা সভ্য দেশে মানুষ থাকবে না তো কি বাঘ ভালুক থাকবে? আমি তো বাপু মানুষ না হলে একদণ্ড টিকতে পারিনা, প্রাণ পালাই পালাই করে।'

সতী হাসিল—'তোর কথা আলাদা, তুই হলি সভ্য মানুষ। আমি একটু জংলি আছি। মানুষের সঙ্গ যে একেবারে ভাল লাগেনা তা নয়, কিন্তু নিরিবিলিও চাই। এই স্তাখো দেখি কি সুন্দর দেশের ভেতর দিয়ে আমরা চলেছি। কোথাও মানুষের চিহ্ন নেই, মাথার ওপর সূর্য, মিঠেকড়া বাতাস, চারিদিকে জঙ্গল। এমন দৃশ্য বিলেতে কোথাও নেই।'

মমতা বলিল—'গরম পড়ুক তখন এ দৃশ্যের চেহারা বদ্‌লে যাবে।'

সতী বলিল—'তা বদলাক। মাগো, বিলেতে কি ঋতু বলে কিছু আছে? শুধু হাড়ভাঙা শীত আর পচা বর্ষা। ছাখো দেখি আমাদের দেশ! শীত গেলেন তো এলেন ঋতুরাজ বসন্ত। তারপর এলেন গ্রীষ্ম, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দশদিক শুদ্ধ করে নিলেন। গ্রীষ্মের পর বর্ষা এসে সব কালিঝুলি ধুয়ে দিয়ে গেলেন। অমনি এলেন সোনার শরৎ, তারপর হিমের আমেজ নিয়ে হেমন্ত। তারপর আবার শীত। কী সুন্দর বল দেখি, যেন ছটা ঋতু এস্রাজের তারের ওপর সারে গামা সাধছে।

মমতার ঠোঁটের কোণ একটু অবনত হইল—'তোর কবিত্ব রোগ এখনও সারেনি দেখছি।'

সতী হাসিয়া উঠিল—'ও সারবার নয়। কিন্তু সত্যি বলছি দিদি, বিলেতে দু'বছর ছিলুম, একটাও কবিতা লিখিনি। যখন বড্ড মন খারাপ হত তখন ঘরে দোর বন্ধ করে গান গাইতুম।'

'কি গান গাইতিস্?'

'গাইতুম—ধনধান্যপুষ্পভরা—, গাইতুম—কোন্ দেশেতে তরু লতা—গাইতুম—কানু কহে রাই—'

মমতা চকিত বিস্ফারিত চক্ষে চাহিল—'কানু কহে রাই—?'

সতী হাসি-ভরা মুখে খানিক মমতার পানে চাহিয়া রহিল, তরলকণ্ঠে বলিল—'হ্যাঁ।—কেন, ও গান কি বিলেতে গাইতে নেই?'

মমতা একটু গম্ভীর হইয়া রহিল, শেষে বলিল—'যা বলিস, গানটা কেমন যেন চাষাড়ে গোছের।'

সতী বলিল—'তা তো হবেই। চণ্ডীদাস যে চাষা ছিলেন। ধোপানীকে নিয়ে কি কাণ্ডটাই করেছিলেন। কিন্তু গানটি ভারি মিষ্টি ভাই।'

'আমার একটুও ভাল লাগেনা। ড্রয়িং রুমে ও গান চলে না।' একটু নীরব থাকিয়া বলিল—'ওই গান গেয়েছিল বলে একজনকে বিয়ে করিনি।'

সতীর চোখে উত্তেজনাপূর্ণ কৌতূহল নৃত্য করিয়া উঠিল—'ওমা, তাই নাকি! আমি তো কিছু জানিনা। বিলেত যাবার মাস কয়েক পরে খবর পেলুম তোর বিয়ে হয়েছে। কী হয়েছিল বলনা ভাই।'

মোটর একটানা গুঞ্জন করিতে করিতে চলিয়াছে। মমতা স্বরহীন কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিল—'দু'বছর আগেকার কথা, তুই তখন সবে বিলেত গিয়েছিস। কলকাতার বাড়ীতে রোজ সন্ধ্যেবেলা চার পাঁচটি যুবা পুরুষের আবির্ভাব হয়, কেউ মিলিটারি ক্যাপ্টেন, কেউ সিভিলিয়ান, কেউ শুধুই অভিজাত-বংশের ছেলে। আমার কিন্তু কাউকেই ঠিক পছন্দ হচ্ছে না। বাবার ইচ্ছে ক্যাপ্‌টেন্‌টিকে বিয়ে করি, মা'র ইচ্ছে চীফ্‌-সেক্রেটারীর অ্যাসিষ্টাণ্ট্‌কে। আমি কিছু ঠিক করতে পারছি না; এমন সময় একজন এলেন। নতুন লোক, কলকাতায় থাকেন না, মাঝে মাঝে আসেন। শিক্ষিত, চেহারা ভাল, দেখে মনে হয় সিভিলাইজ্‌ড্ মানুষ। নাম মৌলিনাথ।'

সতী বলিল—'তুই বুঝি প্রেমে পড়ে গেলি?'

মমতা বলিল—'একটু একটু।'

সতী বলিল—'প্রেমে আবার একটু একটু পড়া যায় নাকি?'

'যায়। মনের জোর থাকা চাই।—তারপর শোন্। বেশ ভাব হয়ে গেল। মা বাবারও পছন্দ। বিয়ে প্রায় ঠিক হয়ে গেল। একদিন বাড়ীতে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে, মা'র ইচ্ছে ডিনারের পর এন্‌-গেজমেণ্ট অ্যানাউন্স্ করবেন। ডিনারের আগে ড্রয়িংরুমে সবাই জড়ো হয়েছে। একজন অতিথি প্রশ্ন করলেন—মৌলিনাথবাবু, আপনি গান গাইতে জানেন? তিনি বললেন—জানি সামান্য। সবাই ছেঁকে ধরল, একটা গান করুন। তিনি বললেন—আমি পিয়ানো বাজাতে জানিনা, সাদা গলায় গাইছি। এই বলে মোটা সুরে গান ধরলেন—কানু কহে রাই!'

সতী-কৌতুক-বিহ্বল কণ্ঠে বলিল—'তারপর?'

'আমার মাথায় বজ্রাঘাত। অতিথিরা গা টেপাটেপি করে হাসছে। এ যেন একটা বোষ্টম ভিকিরি ড্রয়িংরুমে ঢুকে পড়েছে। আমি মা'কে গিয়ে বললুম, আজ এন্‌গেজমেণ্ট্ অ্যানাউন্স্ কোরো না।—মৌলিনাথবাবু বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন। ডিনারের পর আমাকে আড়ালে ডেকে বললেন, একটা কথা আপনাকে বলা হয়নি। আমার এখন যে রূপ দেখছেন এটা আমার ছদ্মবেশ, আসলে আমি অসভ্য মানুষ, বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই। শহরে লোকজনের মধ্যে বেশী দিন থাকতে পারি না।

আমাকে যিনি বিয়ে করবেন তাঁকে বনেজঙ্গলেই থাকতে হবে। আমি বললুম, তাহলে এক কাজ করুন, একটি সাঁওতালের মেয়ে বিয়ে করুন। তিনি বললেন—আপনি ঠিক বলেছেন, আচ্ছা নমস্কার।—বলে সোজা বেরিয়ে চলে গেলেন।'

সতী বলিল—ভারি আশ্চর্য মানুষ তো! তারপর আর ফিরে আসেন নি?'

মমতা বলিল—'না। এলেও আমি দেখা করতুম না। এই ঘটনার কয়েকদিন পরে ইনি এলেন।'

'ইনি কে? ম্যাজিস্ট্রেট সায়েব?'

'হ্যাঁ। এক মাসের মধ্যে বিয়ে হয়ে গেল।'

সতী একটি গভীর নিশ্বাস ফেলিল, বলিল—'নাটক বিয়োগান্ত কি মিলনান্ত বুঝতে পারছি না। দিদি, তোর মনে একটুও আপ্‌সোস নেই?'

মমতা দৃঢ় ওষ্ঠাধরে বলিল—'একটুও না। আমি যা চেয়েছি হাজারটার মধ্যে তাই বেছে নিয়েছি।'

সতী কিছুক্ষণ বিমনা থাকিয়া বলিল—'ম্যাজিস্ট্রেট্ সায়েবকে ভালবাসিস?'

মমতা বলিল—'স্বামীকে যতটা ভালবাসা উচিত ততটা ভালবাসি। আর কি চাই?'

কিছুক্ষণ আর কোনও কথা হইল না। গাড়ী চলিয়াছে। সূর্যের রঙ্ ঘোলা হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

হঠাৎ মোটরটা গোলমাল আরম্ভ করিল। এতক্ষণ বেশ অনাহতছন্দে চলিয়াছিল, এখন দু'চার বার হেঁচ্‌কা দিয়া চলিতে চলিতে শেষে ইঞ্জিন বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। দুই বোন শঙ্কিত দৃষ্টি বিনিময় করিল।

সতী বলিল—'এই মজিয়েছে।'

গাড়ীকে সচল করিবার চেষ্টা সফল হইল না। মমতা বলিল—'বোধহয় কারবুরেটারে ময়লা ঢুকেছে।'

সতী বলিল—'স্পার্কিং প্লাগ্‌ও হতে পারে।'

মমতা জিজ্ঞাসা করিল,—'তুই মেরামতের কিছু জানিস্?'

'কিছু না। তুই?'

'আমিও না। সব দোষ ওই হতভাগা ওস্‌মানের। ওকে বলে দিয়েছিলুম গাড়ীর কলকব্জা সব দেখেশুনে রাখতে, তা এই করেছে! দাঁড়াও না, আজ বাড়ী গিয়েই তাকে বিদেয় করব।'

'সে তো পরের কথা! এখন বাড়ী পৌঁছুবার উপায় কি?' সতী গাড়ী হইতে নামিল।

মমতা বলিল—'উপায় তো কিছু দেখছি না। এক যদি এ রাস্তা দিয়ে মোটর যায় তবে লিফ্‌ট্ পাওয়া যাবে। কিন্তু এ রাস্তায় যে ছাই মোটরও বেশী চলে না।'

মমতা গাড়ী হইতে নামিল, চশ্‌মা খুলিয়া অত্যন্ত বিরক্তভাবে চারিদিকে চাহিল।—

'জঙ্গলের মধ্যেই আজ রাত কাটাতে হবে দেখছি।'

সতী প্রশ্ন করিল—'শহর এখান থেকে কত দূর?'

মমতা কহিল—মিটার দেখিয়া হিসাব করিয়া বলিল—'দশ—এগারো মাইল।'

সতীর চোখে একটা নূতন আইডিয়ার ছায়া পড়িল, সে বলিল—'দশ-এগারো মাইল! তা আয় না এক কাজ করি। এখনও বেলা আছে, এখন থেকে হাঁটতে সুরু করলে সন্ধ্যে হতে হতে শহরে পৌঁছে যাব। কি বলিস?'

মমতা রাস্তার ধারে একটা পাথরের চ্যাঙড়ের উপর বসিয়া পড়িল—'আমাকে কেটে ফেললেও আমি এগারো মাইল হাঁটতে পারব না।'

সতী আর একটা চ্যাঙড়ের উপর বসিল—'তবে তো মুস্কিল। অন্য মোটর যদি না আসে এইখানেই রাত্রি বাস করতে হবে। জঙ্গলে নিশ্চয় বাঘ ভাল্লুক আছে, আমাদের গন্ধ পেয়ে বেরিয়ে আসবে। নাঃ, আজ বেঘোরে প্রাণটা গেল।'

মমতা দুহাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিল। সতী ছটফট করিয়া বেড়াইতে লাগিল; একবার উঠিয়া একবার বসিয়া মোটরের কলকব্জা নাড়া-চাড়া করিয়া অবশেষে আবার চাঙড়ে আসিয়া বসিল।—

'দিদি, তোর ক্ষিদে পায়নি?'

মমতা মুখ তুলিল—'তেষ্টা পেয়েছে।'

'আমার পেট চুঁই চুঁই করছে। সঙ্গে খাবার কিছু আছে নাকি?'

'উঁহু। মামীমা দিতে চেয়েছিলেন, নিলুম না। ভেবেছিলুম চারটের মধ্যে বাড়ী পৌঁছে চা খাব।'

'হুঁ।' সতী বনের পানে চাহিয়া রহিল।

দশ মিনিট এই ভাবে কাটিবার পর সতী হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—'ও দিদি, ত্থাখ্, ত্থাখ্—ধোঁয়া!'

মমতা চোখ তুলিল। বনের মধ্যে আন্দাজ সিকি মাইল দূরে তরুশ্রেণীর মাথায় ধোঁয়ার একটা স্তম্ভ ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বে উঠিতেছে।

সতী বলিল—'নিশ্চয় ওখানে সাঁওতালদের বস্তি আছে।—চল যাই। আর কিছু না হোক জল তো পাওয়া যাবে।'

মমতা বলিল—'যদি বস্তি না হয়! যদি জঙ্গলে আগুন লেগে থাকে?'

'দূর! আগুন লাগলে কি অমন তালগাছের মতন সোজা ধোঁয়া ওঠে। আয়—আয়—'

'কিন্তু—মোটর এখানে পড়ে থাকবে?'

'তোর ভাঙা মোটর কেউ চুরি করবে না। আয়।'

'এখনি কিন্তু ফিরে আসব। রাত্তিরে আমি বনের মধ্যে থাকছি না। মোটরের কাঁচ তুলে সারা রাত্তির বসে থাকব সেও ভাল।'

'ভাবিস্ নি একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই।'

দুজনে গাড়ীর ভিতর হইতে হ্যাণ্ডব্যাগ লইয়া গাড়ী লক করিয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। বন ক্রমশ ঘন হইয়াছে বটে কিন্তু অন্ধকার নয়। জমি উঁচু নীচু এবং শলামিশ্রিত, মাঝে মাঝে নালার মত খাজ পড়িয়াছে। দশ মিনিট হাঁটিবার পর তাহারা ধোঁয়ার উৎস মুখে উপস্থিত হইয়া হাঁ করিয়া দাঁড়াইল।

সাঁওতালদের বস্তি নয়। একটি মাত্র গৃহ। তাহাও এমন বিচিত্র যে মনে হয় ব্রহ্ম বা শ্যামদেশের জঙ্গলে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

বিঘাখানেক মুক্ত স্থান বড় বড় মহীরুহ দিয়া বেষ্টিত। মাঝখানে চত্বরের একটি প্রস্তরপট্ট। প্রস্তরপট্টের সম্মুখে কয়েকটি ঘনসন্নিবিষ্ট গাছের মাথা কাটিয়া কেবল স্তম্ভের মত কাণ্ডগুলিকে রাখা হইয়াছে, সেই স্তম্ভগুলির মাথায় কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো একটি ঘর। ঘরটি মাটি হইতে দশ-বারো হাত উচ্চে, মই দিয়া উঠিতে হয়। মইটি ঘরের দ্বারের সম্মুখে লাগানো আছে।

ঘরে জনমানব আছে বলিয়া মনে হইল না। কিন্তু প্রস্তরপট্টের উপর আগুন জ্বলিতেছে, তার উপর পাথরের ঝিঁকে বসানো একটি প্রকাণ্ড জলের কেট্‌লি।

সতী কিছুক্ষণ চক্ষু গোলাকার করিয়া দেখিল, তারপর করতালি দিয়া হাসিয়া উঠিল—'দিদি! হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস্ কি? জাপানী রূপকথা! আমরা এক দৈত্যের আস্তানায় এসে পড়েছি। দেখছিস না কত বড় কেট্‌লিতে চা গরম হচ্চে।'

মমতা বলিল—'হুঁ। কিন্তু দৈত্যটি কোথায়?'

সতী বলিল—'নিশ্চয় মানুষ শিকার করতে গেছে, চায়ের সঙ্গে খাবে। কিম্বা—হয়তো জাপানী দৈত্য নয়, আমাদের কুম্ভকর্ণ; ঘরে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে।—দেখব নাকি?'

সতী উৎসাহে মাতিয়া উঠিয়াছে, অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া মইয়ের সাহায্যে তর্ তর্ করিয়া উপরে উঠিয়া গেল; মইয়ের সর্বোচ্চ ধাপে উঠিয়া দ্বারের ভিতর উঁকি দিয়া সে কলকূজন করিয়া উঠিল—'ও দিদি, শিগ্‌গির আয়, দেখবি আয় কি সুন্দর সাজানো ঘর।'

মমতা মইয়ের নীচে হইতে উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিল,—'কেউ আছে নাকি?'

'কেউ না।' মমতা তবু ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া বলিল—'তোর কি মই বেয়ে উঠতে ভয় করছে নাকি?'

মমতা আর দ্বিধা করিল না, উপরে উঠিল। দুই বোন ঘরে প্রবেশ করিল।

টঙের উপর ঘরটি সমচতুষ্কোণ। তক্তার মেঝে, তক্তার দেয়াল। তিনটি দেয়ালে জানালা। মেঝের একপাশে বিছানা, বিছানার পাশে ভালুকের চামড়ার উপর কয়েকটি বই। ঘরের অন্য পাশে দেয়াল ঘেঁষিয়া সারি সারি গৃহস্থালীর দ্রব্য সাজানো; বড় বড় টিনে চাল ডাল, একটি জলের কলসী, থালা বাটি গেলাস, চায়ের প্যাকেট, বিস্কুটের টিন, প্রাইমাস্ স্টোভ্, হ্যারিকেন লণ্ঠন ইত্যাদি। দেয়ালের গায়ে সমতল ভাবে টাঙানো একটি রাইফেল ও একটি ছর্‌রা বন্দুক। পরিমিত আরাম ও নিরাপত্তার সহিত জঙ্গলে বাস করিতে হইলে সভ্য মানুষের যাহা যাহা প্রয়োজন সবই আছে।

চমৎকৃত চক্ষে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে সতী বলিল,—'কি সুন্দর ঘর দিদি! আমার যদি এমন একটা ঘর থাকত আমি রাতদিন এই ঘরেই থাকতুম, একটিবার নীচে নামতুম না।'

—মমতা কহিল—'জলের কলসী রয়েছে দেখছি, একটু খেলে হত।'

'খা না।—এই নে।' কলসী হইতে জল গড়াইয়া সতী মমতাকে দিল, তারপর বিস্কুটের টিন হইতে একমুঠি বিস্কুট লইয়া একটিতে কামড় দিল, অন্য বিস্কুটগুলি মমতার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল—'খাসা বিস্কুট—এই নে।'

মমতা বলিল—'পরের বিস্কুট না ব'লে খেতে নেই, রেখে দে।'

সতী বলিল—'তোর সব তাতেই আদব কায়দা। গৃহস্বামী যত বড় দৈত্যই হোন, দুটি অভুক্ত অতিথিকে নিশ্চয় খেতে দিতেন। নে—খা। (মমতা একটি বিস্কুট লইল) আয় বসি।'

'বসব কোথায়? চেয়ার কৈ?'

'ঐ তো বিছানা রয়েছে।'

'না।'

'কেন, পরপুরুষের বিছানায় বসলে ম্যাজিস্ট্রেট সায়েব রাগ করবেন? তবে আমিই বসি, আমার তো রাগ করবার লোক নেই।'

সতী বিছানার প্রান্তে হাটু তুলিয়া বসিল। মমতা দাঁড়াইয়া টিয়া পাখীর মত বিস্কুটের কোণ ঠুকরাইতে লাগিল।

দুখানা বই মাথার বালিসের পাশে পড়িয়াছিল, সতী একটা বইয়ের পাতা উল্টাইয়া বলিয়া উঠিল—'ও দিদি—সঞ্চয়িতা! দৈত্য কবিতা পড়ে!—এটা কি বই দেখি—ও বাবা, মহাভারতের সারানুবাদ! আমাদের দৈত্য দেখছি ভারি শিক্ষিত দৈত্য।'

মমতা বলিল—'এবার চল, গাড়ীতে ফিরে যেতে হবে। সন্ধ্যে হতে আর বেশী দেরী নেই।'

'আর একটু বসবি না। দৈত্য হয়তো এখনি ফিরে আসবে।'

'না—চল্।'

সতী অনিচ্ছাভরে উঠিল—আর একটু থেকে গেলে হত, হয়তো দৈত্য মোটর ইঞ্জিন মেরামত করতে জানে। সেকালে ময়-দানব কত বড় ইঞ্জিনীয়র ছিল জানিস তো।'

মমতা বলিল—জঙ্গলে টঙ্ বেঁধে থাকে, সে আবার মোটর মেরামৎ করছে। আয় নীচে যাই।'

মই দিয়া উপরে ওঠা যত সহজ নীচে নামা তত সহজ নয়। দুজনে অতি সন্তর্পণে নামিল। মমতা হাঁফ ছাড়িয়া বলিল—বাঁচলুম।'

সতী চারিদিকে লুব্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া ফিরিয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াছে এমন সময় বাধা পড়িল। জঙ্গলের ভিতর হইতে কে উচ্চৈঃস্বরে গাহিয়া উঠিল—

'কানু কহে রাই—'

আচম্‌কা গানের শব্দে দুই ভগিনী পরস্পর হাত চাপিয়া ধরিল। গান দ্রুত কাছে আসিতেছে—

—'কহিতে ডরাই
ধবলী চরাই মুই।'

সতী রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করিল—'দিদি—?'

মমতা ফ্যাকাসে মুখে বলিল—'মনে হচ্ছে—মৌলিনাথ-বাবুর গলা—'

এইবার দেখা গেল ঘন গাছপালার চক্র অতিক্রম করিয়া একটি লোক আসিতেছে। তাহার সঙ্গে একটি শ্বেতবর্ণ গাভী। গরুর দড়ি ধরিয়া লোকটি আসিতেছে; পরিধানে হাফ্-প্যাণ্ট্ ও গরম খাকি শার্ট, পায়ে হাঁটু পর্যন্ত মোজা ও বুটজুতা। সে মনের আনন্দে তারস্বরে গাহিতেছে—

'আমি রাখালিয়া মতি কি জানি পিরিতি
প্রেমের পসরা তুই।'

হঠাৎ লোকটির গান থামিল, সে দাঁড়াইয়া পড়িল; গরুর দড়ি তাহার হাত হইতে খসিয়া পড়িল। তারপর সে দ্রুত অগ্রসর হইয়া মমতা ও সতীর সম্মুখে দাঁড়াইল।

সতী দেখিল লোকটি সুপুরুষ, মুখের গঠন সুন্দর এবং দৃঢ়, বলিষ্ঠ আয়ত দেহ। মাথার চুলে কদম-ছাঁট, কিন্তু সেজন্য তাহার মুখ শ্রীহীন হয় নাই, বরং করোটির সুন্দর অস্থি-গঠন আরও পরিস্ফুট হইয়াছে। সতী মনের মধ্যে একটা শিহরণ অনুভব করিল। এই মৌলিনাথ, যাহাকে মমতা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল!

মৌলিনাথ বলিল—'আপনারা—'

সতী এক নিঃশ্বাসে বলিল—'আমরা মোটরে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলুম, মোটর খারাপ হয়ে গেছে। রাস্তার ধারে বসেছিলুম, আপনার ধোঁয়া দেখে এখানে এসেছি। আপনার ঘরে ঢুকেছিলুম—বিস্কুট খেয়েছি। আপনি

অ্যাত্তবড় কেট্‌লিতে চায়ের জল চড়িয়েছেন কেন? এত চা খাবেন?'

মৌলিনাথ গম্ভীর মুখে একবার কেট্‌লির দিকে তাকাইল, বলিল—'ওটা চায়ের জল নয়, স্নান করব বলে চড়িয়েছিলুম।

সতী একটু হাঁ করিয়া বলিল—'ও—আপনি গরম জলে স্নান করেন।'

মৌলিনাথ বলিল—'রোজ গরম জলে স্নান করিনা, কাছেই একটা ঝরণা আছে তাতে স্নান করি। আজ গরম জলে নাইবার ইচ্ছে হয়েছিল তাই জল চড়িয়ে ধবলীকে আনতে গিয়েছিলাম।'

সতী বলিল—'ও—আপনার গরুর নাম ধবলী। কোথায় ছিল?'

'ঝরণার ধারে চরছিল।'

'ও—ওর বাচ্ছা কোথায়?'

'বাছুরটা মারা গেছে।'

'আহা—কি হয়েছিল?'

'হয়নি কিছু। বাঘে নিয়ে গেছে।'

মমতা একটু অধীরভাবে ইহাদের বিশ্রব্ধ বাক্যালাপ শুনিতেছিল, বলিল—'এখানে বাঘ ভালুক আছে নাকি?'

মৌলিনাথ মমতাকে নিশ্চয় চিনিয়াছিল কিন্তু চেনার কোনও লক্ষণ প্রকাশ করে নাই; এখনও অচেনার মতই বলিল,—'বাঘ আছে কিন্তু মানুষখেকো বাঘ নয়; ছোট জাতের চিতা বাঘ, নেকড়ে বাঘ, এই সব। ভালুকও আছে কিন্তু তারা নিরামিষাশী। সে যাক, আপনারা দীনের কুটীরে পদার্পণ করেছেন আমার সৌভাগ্য। আপনাদের জন্যে কি করতে পারি?'

দুই বোন দৃষ্টি বিনিময় করিল। মমতা বলিল—'আপনি মোটর মেরামত করতে জানেন?'

মৌলিনাথ বলিল—'জানি সামান্য। যদি সর্দি কাশির মত মামুলি রোগ হয় তাহলে বোধহয় সারাতে পারব, কিন্তু যদি টাইফয়েড্ কি মেনিঞ্জাইটিস্ হয় তাহলে আমার বিদ্যেয় কুলোবে না। চলুন দেখি।'

তিনজনে মোটরের উদ্দেশ্যে চলিল। সতীর চোখে যেন বিদ্যুৎ খেলিতেছে, অধরের কূলে কূলে উত্তেজিত চাপা হাসি। মমতার মুখের ফ্যাকাসে ভাব এখনও কাটে নাই, পাৎলা ঠোঁট দৃঢ়বদ্ধ।

মোটরের কাছে যখন তাহারা পৌঁছিল তখন সূর্যাস্ত হইয়াছে। মৌলিনাথ বনেট খুলিয়া কলকব্জা নাড়াচাড়া করিল, কারবুরেটার দেখিল, স্পার্কিং প্লাগ খুলিল। তারপর বলিল,—'কি হয়েছে বুঝতে পেরেছি, কিন্তু আজ রাত্রে মেরামত করা যাবেনা। অন্ধকারে কিছু দেখতে পাবনা।'

এতক্ষণে প্রায় অন্ধকার হইয়া গিয়া ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। মমতা ও সতী ফার্ কোট পরিয়া লইল।

'তাহলে—'

'আজ রাত্রিটা যদি দীনের কুটীরে কাটাতে রাজি থাকেন, কাল সকালে গাড়ী মেরামত করে দিতে পারি।'

ক্ষণেক নীরবতার পর সতী থামিয়া থামিয়া বলিল,—'তাহলে—আজ রাত্তিরটা—দীনের কুটীরেই কাটানো যাক—কি বলিস দিদি?'

মমতা সিধা উত্তর দিলনা, বলিল—'স্যুট্‌কেস দুটো এখানে পড়ে থাকবে?'

মৌলিনাথ বলিল—'না, আমি নিচ্ছি।'

সে পিছনের খোলের ভিতর হইতে স্যুট্‌কেস দুটি বাহির করিয়া দু'হাতে লইল। বিলাতী কম্বল দুটি সতী ও মমতা লইল।

মৌলিনাথ বলিল—'চলুন।'

তিনজনে আবার জঙ্গলে প্রবেশ করিল। মাঝখানে মৌলিনাথ, দু'পাশে দুজন।

কিছুক্ষণ চলিবার পর মমতা বলিল—'কোন দিকে যাচ্ছি কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

মৌলিনাথ বলিল—'আমাকে দেখতে পাচ্ছেন তো? আমার ওপর নজর রাখুন, আর কিছু দেখবার দরকার হবেনা।'

আরও কিছুক্ষণ অন্ধকারে চলিবার পর মমতা যখন কথা কহিল তখন তাহার কণ্ঠস্বরে যেন একটু তীক্ষ্ণতা ধরা পড়িল—'আমাকে বোধহয় আপনি চিনতে পারেন নি?'

মৌলিনাথ সহজ সুরে বলিল—'চিনতে পেরেছি বৈকি! আপনার কাছে আমি লজ্জিত। আপনি যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা এখনও পালন করা হয়নি। সাঁওতাল মেয়ে জোগাড় করতে পারিনি।'

বাকি পথটা নীরবে কাটিল। গৃহের পদমূলে পৌঁছিয়া

মৌলিনাথ বলিল—'কম্বল দুটো আমায় দিন। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যান। এই নিন দেশলাই, ঘরে লণ্ঠন আছে জ্বেলে নেবেন।'

মমতা জিজ্ঞাসা করিল—'শোবার কি ব্যবস্থা হবে?'

মৌলিনাথ বলিল—'ঘরে বিছানা আছে, তাতে আপনাদের দুজনের কুলিয়ে যাবে। আমি নীচে শোব।'

সতী বলিল—'নীচে কোথায় শোবেন?'

'এই পাথরের চাতালের ওপর। গরমের রাত্রে বেশীর ভাগ এইখানেই শুই।'

দুই বোন ওপরে উঠিয়া গেল। সতী লণ্ঠন জ্বালিল। বাহিরে তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। দুইজনে বিছানায় বসিয়া ফিকা হাসিল।

'দিদি, ভয় করছে নাকি?'

'একটু একটু।—তোর?'

'উঁহু—হাসি পাচ্ছে।'

কিছুক্ষণ পরে দ্বারের বাহিরে মৌলিনাথের মুণ্ড দেখা গেল।

'আসতে পারি?'

'আসুন।'

মৌলিনাথ আসিয়া সুটকেস দুটি মেঝেয় রাখিল। বলিল—'চা খাবেন নিশ্চয়। আমার সব জোগাড় আছে, কেবল টাট্‌কা দুধ নেই। টিনের দুধ চলবে কি?'

সতী বলিল—'খুব চলবে।'

মৌলিনাথ স্টোভ জ্বালিল। দশ মিনিট পরে ধূমায়িত চায়ের বাটি ও বিস্কুট সামনে রাখিয়া বলিল—'ডিম ভেজে দেব কি? তাজা ডিম আছে, আজ সকালে জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে এক বন-মুরগীর বাসা থেকে কয়েকটি সংগ্রহ করেছি।'

মমতা সতীর মুখের পানে চাহিল, সতী বলিল—এখন থাক, রাত্তিরে হবে।'

মৌলিনাথ নিজের চা লইয়া তাহাদের অদূরে মেঝেয় বসিল।

রাত্তিরের খাওয়ার কথা আমিও ভাবছি। কী রান্না হবে এ সম্বন্ধে মহিলাদের কিছু বলতে যাওয়া ধৃষ্টতা। আমার ঘরে চাল ডাল তেল ঘি আলু পেঁয়াজ আছে। এখন আপনারা ব্যবস্থা করুন কি রান্না হবে।'

মমতা চায়ের বাটিতে একবার ঠোঁট ঠেকাইয়া বলিল—'রান্না করা আমাদের অভ্যাস নেই মৌলিনাথবাবু।'

মৌলিনাথ কিছুক্ষণ মমতার পানে চাহিয়া রহিল, তারপর নিজের চায়ে একটি চুমুক দিয়া সহজ সুরে বলিল—'তা বটে। বেশ, আমিই রাঁধব। শুধু ভয় হচ্ছে আমার রান্না আপনারা মুখে দিতে পারবেন না।'

সতী লজ্জিতভাবে একটু ইতস্তত করিয়া বলিল,—'আমি মোটামুটি রাঁধতে জানি। বিলেতে যখন দিশি রান্না খাবার ইচ্ছে হত তখন নিজেই রেঁধে খেতুম।'

মৌলিনাথ এবার সতীর পানে ভাল করিয়া চাহিল। প্রথম সাক্ষাতের পর হইতে মৌলিনাথ যখনই কথা বলিয়াছে সিধা মমতাকে লক্ষ্য করিয়া কথা বলিয়াছে; অপর পক্ষ হইতে সতী বেশী কথা বলিলেও মৌলিনাথ উত্তর দিয়াছে মমতাকেই। এতক্ষণে সে যেন সতীর স্বতন্ত্র সত্তা টের পাইল। সে কিছুক্ষণ নিবিষ্টভাবে সতীকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—'আপনি রাঁধবেন। তাহলে তো ভালই হয়। অনেক দিন মেয়েদের হাতের রান্না খাইনি। কিন্তু যে উপকরণ আছে তাতে বেশী কিছু রাঁধা চলবে না।'

সতী বলিল—'খিচুড়ি রাঁধা চলবে।'

মৌলিনাথ হৃষ্টমুখে বলিল—'খুব ভাল হবে। শাস্ত্রে লিখেছে—আপৎকালে খিচুড়ি।'

সতী বলিল—'আপনি খিচুড়ি ভালবাসেন তো? অনেকে ভালবাসে না।'

মৌলিনাথ বলিল—'খুব ভালবাসি। এ বিষয়ে আমি সম্রাট সাজাহানের সমকক্ষ।'

সতী হাসিল। মমতার মুখখানা কিন্তু কেমন যেন বিমর্ষ হইয়া রহিল। ভিতরের বাধা ঠেলিয়া তাহার ব্যবহার স্বাভাবিক হইতে পাইতেছে না।

চা শেষ হইলে মৌলিনাথ উঠিল, বলিল—'আমি এবার নীচে যাই, ধবলীকে বাঁধতে হবে।'

সতী জিজ্ঞাসা করিল—'কোথায় থাকে ধবলী?'

'এই ঘরের নীচে একটা খোঁয়াড় করেছি, রাত্রে সেখানেই বেঁধে রাখি। দিনের বেলা চরে বেড়ায়।'

মৌলিনাথ নামিয়া গেল। মমতা মুখ গম্ভীর করিয়া বসিয়া ছিল, পায়ের উপর একটা কম্বল টানিয়া লইয়া শুইয়া পড়িল। সতী তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া

বলিল,—'দিদি, তুই অমন মনমরা হয়ে আছিস কেন? আমার তো খুব মজা লাগছে।'

মমতা চোখ বুজিয়া বলিল—'বিপদে পড়লে তোর মজা লাগতে পারে, আমার লাগে না।'

সতী বলিল—'বিপদ কৈ? বিপদ তো কেটে গেছে। কাল সকালেই বাড়ী যাবি।'

মমতা মুদিতচক্ষে ক্ষণেক নীরব রহিল, তারপর বলিল—'মৌলিনাথবাবুর কাছে অনুগ্রহ নিতে আমার ভাল লাগে না।'

সতী বলিল—'অনুগ্রহ কিসের? বাড়ীতে অতিথি এলে সবাই যত্ন করে। তোর যে ওঁর সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল তা ভুলে যা না। উনি তো ভুলে গেছেন বলেই মনে হচ্ছে।'

মমতা একবার চোখ খুলিয়া সতীর পানে চাহিল, তারপর পাশ ফিরিয়া শুইল।

সতী তখন উঠিয়া ফার্ কোট খুলিয়া ফেলিল, কোমরে আঁচল জড়াইয়া রান্নার আয়োজনে লাগিয়া গেল।

নীচে নামিয়া মৌলিনাথ ধবলীকে খোঁয়াড়ে বন্ধ করিয়া আসিল। প্রস্তর-চত্বরের মাঝখানে আগুন প্রায় নিব-নিব হইয়াছিল, তাহাতে কয়েকটা শুকনা গাছের ডাল ফেলিয়া দিয়া সম্মুখে বসিল, দুই জানু বাহুবেষ্টিত করিয়া শান্ত মুখে বসিয়া রহিল। উপরে লণ্ঠনের আলোতে ঘরের দরজায় একটি চতুষ্কোণ রচিত হইয়াছে, একটি অস্পষ্ট মূর্তি চলিয়া বেড়াইতেছে—মনে হয় যেন মর্ত্তালোক হইতে স্বর্গের একটি আবছায়া দৃশ্য দেখা যাইতেছে।

ঘণ্টাখানেক পরে সতী দ্বারের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, ডাকিল—'এবার আপনি আসুন। খিচুড়ি তৈরি।'

মৌলিনাথ উপরে উঠিয়া গেল।

লণ্ঠন মাঝখানে রাখিয়া তিনজনে খাইতে বসিল। সতী ও মমতা বিছানার ধারে বসিল, মৌলিনাথ ভাল্লুকের চামড়ার উপর।

বাটিতে করিয়া গরম খিচুড়ি, সঙ্গে আলু-পেঁয়াজের চচ্চড়ি এবং ডিম ভাজা। মৌলিনাথ এক গ্রাস মুখে দিয়াই লাফাইয়া উঠিল—'আরে সর্বনাশ, একি!'

সতী শঙ্কিত কণ্ঠে বলিল—'খেতে ভাল হয়নি?'

মৌলিনাথ মাথা নাড়িয়া বলিল,—'এ তো খিচুড়ি নয়, এ যে পোলাও।'

সতীর মুখে হাসি ফুটিল। সে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—'তবু ভাল। আপনি এমন ভয় পাইয়ে দিতে পারেন। দিদি, সত্যি খিচুড়ি ভাল হয়েছে?'

মমতা বিরক্তি দমনের বিশেষ চেষ্টা না করিয়া বলিল—'হয়েছে রে বাপু হয়েছে। আমার মুখে এখন কিছুরই স্বাদ নেই। কোনও মতে রাতটা কাটাতে পারলে বাঁচি।'

সতী অপ্রতিভ হইল। মৌলিনাথ গম্ভীর চোখে মমতাকে নিরীক্ষণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল—'আপনার বিরক্তি স্বাভাবিক। কিন্তু উপায় তো নেই, কথায় বলে দুরবস্থায় পড়লে বাঘ ফড়িং খায়। আমারও এমন দুর্ভাগ্য অতিথিদের মনোরঞ্জন করতে পারলাম না।'

মমতা বোধহয় নিজের রূঢ়তায় একটু লজ্জিত হইয়াছিল, হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—'আপনাকে আমি দোষ দিচ্ছি না। আপনি যথাসাধ্য করেছেন, আপনাকে ধন্যবাদ।'

অতঃপর আহার প্রায় নীরবে সমাপ্ত হইল।

মৌলিনাথ নিজের কম্বলটা হাতের উপর ফেলিল, দেয়াল হইতে রাইফেল নামাইয়া বগলে লইল, কয়েকটা টোটা পকেটে পুরিল; হাসিমুখে বলিল—'এবার আপনারা শুয়ে পড়ুন।'

সতী বলিল—'আপনি রাইফেল নিয়ে যাচ্ছেন, তার মানে—'

মৌলিনাথ বলিল—'দরকার হবে বলে নিয়ে যাচ্ছি তা নয়। ওটা সঙ্গে থাকলে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোনো যায়।'

মৌলিনাথ সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল, সতী দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

'বাঘ কি মই বেয়ে উঠতে পারে?'

'না, ওদের ও বিদ্যে নেই। তবু দরজা বন্ধ করে দিন;

এই সময় সতী নিজের কব্জিতে ঘড়ি দেখিয়া বলিয়া উঠিল—'একি, এখন যে মোটে সাড়ে সাতটা। আমি ভেবেছিলুম কত রাত্তির হয়ে গেছে!'

মৌলিনাথ বলিল—'জঙ্গলে সাড়ে সাতটাই রাত দুপুর! শুয়ে পড়ুন।'

'এত শিগগির ঘুম আসবে কেন। তার চেয়ে—আপনি বলছিলেন অতিথিদের মনোরঞ্জন করতে পারেন নি—তাই না হয় করুন না।'

'কী করব? মহিলাদের মনোরঞ্জনের কোনও বিদ্যেই যে জানা নেই।'

'কেন, গান গাইতে তো জানেন।'

'গান!' হঠাৎ মৌলিনাথের কণ্ঠ হইতে স্বতস্ফূর্ত হাসির আওয়াজ উৎসারিত হইয়া উঠিল—'কি গান শুনবেন? কানু কহে রাই?'

'না, অন্য কিছু। গাইবেন?'

মৌলিনাথ উত্তর দিবার পূর্বেই মমতা বলিয়া উঠিল,—'সতী, বাড়াবাড়ি করিস নি। যা রয়-সয় তাই ভাল। দোর বন্ধ করে দে।'

সতী ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল মমতা শুইয়া পড়িয়াছে। সে ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ করিয়া দিল, আলো কমাইয়া মমতার পাশে গিয়া শুইল। কম্বলটা ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া লইয়া তৃপ্তির একটি নিশ্বাস ফেলিল। বলিল—'যাই বলিস। আমাদের ভাগ্যি ভাল যে এই জঙ্গলের মধ্যে একজন ভদ্রলোকের দেখা পেয়েছি। ভদ্রলোক না হয়ে ছোটলোকও হতে পারত।'

মমতা গলার মধ্যে কেবল একটা শব্দ করিল।

নীচে মৌলিনাথ প্রস্তর পট্টের উপর শয়ন করিয়াছিল; অর্ধেক কম্বলে বিছানা, বাকি অর্ধেক আবরণ। মাথায় রাইফেলের কুঁদা। সে উর্ধ্বমুখে আকাশের পানে চাহিয়া রহিল; তাহার অধরে বিচিত্র কৌতুকের হাসি খেলা করিতে লাগিল।

তারপর সে গান ধরিল; প্রথমে গুঞ্জরণ, তারপর স্পষ্ট স্বর—

কেউ ভোলে না কেউ ভোলে
অতীত দিনের স্মৃতি

* * *

কেউ জ্বালে না আর বাতি
তার চির-দুখের রাতে
কেউ দ্বার খুলি জাগে
চায় নব চাঁদের তিথি।

গান শেষ হইল। উপরের ঘর হইতে কোনও সাড়া পাওয়া গেলনা। মৌলিনাথ পাশ ফিরিয়া চোখ বুজিল।

ঘরে মমতা ও সতী পাশাপাশি শুইয়া আছে। মমতার চক্ষু মুদিত, হয়তো ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সতী নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া আছে।

আজ বোধহয় কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া কি চতুর্থী। জঙ্গলের মাথা ছাড়াইয়া চাঁদ উঠিতেছে। নব চাঁদের তিথি।...

চাঁদ যখন মধ্যগগনে তখন মৌলিনাথের ঘুম ভাঙিয়া গেল। কোথায় যেন খুট্ করিয়া শব্দ হইয়াছে। একেবারে রাইফেল হাতে লইয়া সে উঠিয়া বসিল।

বাঘ নয়। মই দিয়া একজন নামিয়া আসিতেছে, ফার্ কোট পরা চেহারা—পিছন দিক হইতে দেখিয়া মৌলিনাথ চিনিতে পারিল না, মমতা না সতী।

সতী আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। উর্ধ্বমুখী হইয়া চাঁদের পানে চাহিল, চারিদিকে ঘাড় ফিরাইয়া আলো-ঝিলমিল্ বনানী দেখিল, তারপর পাথরের উপর বসিয়া পড়িল। বিছানার বালিসের ঘর্ষণে তাহার খোঁপা খুলিয়া বেণী এলাইয়া পড়িয়াছে।

মৌলিনাথ রাইফেল রাখিয়া বলিল—'আপনি।'

সতী বলিল,—'ঘুম হলনা, তাই নেমে এলুম। দিদি ঘুমুচ্ছে।'

মৌলিনাথ বলিল,—'নতুন জায়গায় সকলের ঘুম আসেনা।'

সতী বলিল,—'সেজন্যে নয়। এত ভাল লাগছে যে ঘুমুতে পারছি না।'

মৌলিনাথের কণ্ঠস্বরে একটু সকৌতুক বিস্ময় প্রকাশ পাইল,—'এত ভাল লাগছে—!'

'বিশ্বাস করছেন না? সত্যি বলছি। যদি সারা জীবন এমনি জঙ্গলে কাটাতে পারতুম বোধ হয় আর কিছু চাইতুম না।'

'এখন তাই মনে হচ্ছে, দু'দিন থাকলে মন তখন পালাই পালাই করবে।'

'আপনার কি মন পালাই পালাই করে।'

'না। এ আমার নিজের জঙ্গল, এর প্রত্যেকটি গাছ আমার চেনা, প্রত্যেকটি পাখীর সঙ্গে আলাপ আছে। বাঘ ভাল্লুকেরাও অপরিচিত নয়, কে কোথায় থাকে তার ঠিকানা জানি।'

সতী চুপ করিয়া রহিল। অনেক দূর হইতে ঐক্যতানের

শব্দ ভাসিয়া আসিল; শৃগালেরা রাত্রির মধ্যযাম ঘোষণা করিতেছে।

'আপনার কি শহরে যেতে একেবারেই ভাল লাগেনা?'

'মাসে দু'মাসে একবার যাই। যখন ফিরে আসি তখন আরও মিষ্টি লাগে।'

'আপনি মানুষের সঙ্গ ভালবাসেন না?'

মৌলিনাথ স্মিতমুখে নীরব রহিল।

'চুপ করে রইলেন যে! বলুন না।'

'ও কথা যেতে দিন না।'

'না, বলুন।'

মৌলিনাথ আর একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—'কি বলব, মনের কথা কি স্পষ্ট করে বলা যায়। মোটামুটি এইটুকু বলা যায় যে মনের মানুষ যারা তাদের সঙ্গ ভাল লাগে, যারা তা নয় তাদের সঙ্গ ভাল লাগেনা। কিন্তু সমানধর্মা মানুষ পৃথিবীতে বেশী নেই। যেখানে যত বেশী মানুষ সেখানে তত বেশী বিরোধ, তত তীব্র স্বার্থপরতা। তার চেয়ে আমার জঙ্গল ভাল।'

সতী একটু চিন্তা করিয়া বলিল—'জঙ্গলে কি বিরোধ স্বার্থপরতা নেই?'

'আছে। কিন্তু অহেতুক বিরোধ নেই, দলবদ্ধ স্বার্থপরতা নেই। বাঘেরা দল বেঁধে বাঘের সঙ্গে লড়াই করেনা, হরিণেরা সংঘবদ্ধ হয়ে হরিণের সঙ্গে ঝগড়া করেনা। আর আমি তো জঙ্গলের মধ্যে একা, কার সঙ্গে ঝগড়া করব?'

'তাহলে মোট কথা এই যে, মনের মানুষ অর্থাৎ সমানধর্মা মানুষ পেলে আপনি ঝগড়া করবেন না।'

'ঝগড়া আমি কোনও অবস্থাতেই করব না, ঝগড়ার উপক্রম দেখলেই পালিয়ে যাব।'

'আপনি পুরুষ মানুষ, ঝগড়ার নামে পালাবেন? এ যে পলাতক মনোবৃত্তি।'

'হোক পলাতক মনোবৃত্তি। আমি পালাব।'

মৌলিনাথের বলিবার ভঙ্গী শুনিয়া সতী কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

'সতী!'

দু'জনে একসঙ্গে উপর দিকে তাকাইল। মমতা দ্বারের সামনে দাঁড়াইয়া। পশ্চিমে ঢলিয়া পড়া চাঁদের আলো তাহার মুখে পড়িয়াছে।

সতী বলিল—'দিদি, তোর ঘুম ভেঙেছে। নীচে আয়না।'

মমতা বলিল—'না, তুই ওপরে চলে আয়। এত রাত্রে ওখানে থাকতে হবেনা।'

'কটা বেজেছে?' সতীর হাতে ঘড়ি নাই, সে ঘড়ি খুলিয়া শয়ন করিয়াছিল।

'তিনটে বেজে গেছে।'

'তবে তো ভোর হয়ে এল। আর ঘুমিয়ে কি হবে।'

'সতী! চলে এস। বড় বাড়াবাড়ি করছ তুমি। আইবুড় মেয়ের অত ভাল নয়।' মমতার স্বর কঠিন।

সতী কিছুক্ষণ হতবাক হইয়া রহিল, তারপর ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল মৌলিনাথ নিঃশব্দে হাসিতেছে। সে আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না, উঠিয়া উপরে চলিয়া গেল।

রাত্রির যবনিকা উঠিয়া যাইতেছে; ভোর হইতে আর দেরা নাই। প্রথমে একটি বন-মোরগ তরুশীর্ষ হইতে ডাক দিল; তাহার ক্রোশন থামিতে না থামিতে দূরে আর একটি মোরগ ডাকিল; তারপর আরও দূরে আর একটি ডাকিল। এই শব্দে দোয়েল হাঁড়িচাঁচা টিয়া চড়ুই পায়রা ছাতারে সকলের ঘুম ভাঙিয়া গেল। বন মুখর হইয়া উঠিল।

সূর্যোদয় হইল।

মমতা ও সতী টঙ্ হইতে নামিয়া আসিল। তাহাদের কাঁধে বড় টার্কিশ্ তোয়ালে, হাতে টুথ্-ব্রাশ ও সাবানের কৌটা। মমতার মুখ গম্ভীর, সতীর মুখে গাম্ভীর্য ও হাসি লুকোচুরি খেলিতেছে।

মমতা মৌলিনাথকে বলিল—'ঝরণাটা কোন্ দিকে দেখিয়ে দিন তো।'

মৌলিনাথ তাহাদের ঝরণা পর্যন্ত পৌঁছিয়া দিল, ফিরিয়া আসিয়া চায়ের জল চড়াইল। ধবলী খোঁয়াড়ের মধ্যে হাম্বারব করিতেছিল, তাহাকে ছাড়িয়া দিল।

ঝর্ণার নির্জনতা হইতে ফিরিবার পথে মমতা কাঁটা-ঝোপের আকর্ষণ বাঁচাইয়া চলিতে চলিতে বলিল,—'বাবা, জঙ্গলে মানুষ থাকে? ভাগ্যিস ওকে বিয়ে করিনি।'

সতী বলিল,—'ভাগ্যিস।'

তাহারা ফিরিয়া আসিয়া দেখিল মৌলিনাথ পাটাতনের উপর চায়ের সরঞ্জাম সাজাইয়া অপেক্ষা করিতেছে।

ডিমসিদ্ধ ও বিস্কুট সহযোগে চা খাওয়া শেষ হইলে মৌলিনাথ বলিল—'এবার তাহলে মোটর মেরামতের চেষ্টায় যাওয়া যাক। আপনারা কি আমার সঙ্গে আসবেন ?'

তাহার বক্তব্য শেষ হইল না, জঙ্গলের মধ্যে বিলাতী ব্লাড-হাউণ্ড্ কুকুরের গভীর ডাক শোনা গেল। তারপর কয়েকজন লোক তরুচক্রের মধ্যে প্রবেশ করিল।

সর্বাগ্রে আসিতেছেন কুকুরের শিকল ধরিয়া মমতার স্বামী ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার ভৌমিক; তাঁহার পিছনে উর্দি-পরা কয়েকজন লোক। মিস্টার ভৌমিকের চেহারা ইঞ্জিনের মত, কাষ্ঠ-লোষ্ট্র-ইষ্টক-দৃঢ় ঘনপিনদ্ধ কায়া এবং তাহার অভ্যন্তরে যে লৌহ-গলন শৈল-দলন অচল-চলন মন্ত্র নিহিত আছে তাহাও নিঃসংশয়ে বলা যায়।

মমতা ত্বরিতপদে গিয়া স্বামীর বাহুর সহিত বাহু জড়াইয়া লইল, কুকুরের মাথায় হাত বুলাইয়া আদর করিল। সেইখানে দাঁড়াইয়া মিস্টার ভৌমিক স্ত্রীর জবানবন্দী শুনিলেন, নিজের হালও বয়ান করিলেন। কাল রাত্রি দশটা পর্যন্ত স্ত্রী ও শ্যালিকা পৌঁছিল না দেখিয়া তিনি টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন, তারপর আজ প্রাতঃকালে কুকুর লইয়া খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন।

এদিকে সতী ও মৌলিনাথ একক দাঁড়াইয়া আছে। সতী অনাবশ্যক সংবাদ দিল—'দিদির স্বামী মিস্টার ভৌমিক - ম্যাজিস্ট্রেট'

উত্তরে মৌলিনাথ শুধু ভ্রূ তুলিল।

মিস্টার ভৌমিক স্ত্রীকে বাহুলগ্ন করিয়া অগ্রসর হইলেন। সতীর সম্মুখে আসিয়া টুপী খুলিয়া বলিলেন—'এই যে সতী। কেমন আছ ?'

সতী বলিল—'আপনি কেমন আছেন ?'

শ্যালিকাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মৌলিনাথের দিকে ফিরিলেন, কড়া সুরে বলিলেন—'এই ঘর আপনার ?'

মৌলিনাথ বলিল—'হ্যাঁ।'

ম্যাজিস্ট্রেট বলিলেন—'আশা করি এ জমি আপনার, আপনি গভর্ণমেণ্টের খাস মহলে Trespass করেন নি।'

মৌলিনাথ বলিল—'এ জঙ্গল আমার, আমি গভর্ণমেণ্টের খাস মহলে Trespass করিনি। এবং গভর্ণমেণ্ট যদি আমার জঙ্গলে Trespass করে আমি গভর্ণমেণ্টের ঠ্যাং ভেঙে দেব।'

সতী অবাক হইয়া মৌলিনাথের পানে চাহিল; ঝগড়ার নামে যে-লোক পলায়ন করিতে বদ্ধপরিকর কথাগুলা তাহার মত নয়। সতী হঠাৎ সজোরে হাসিয়া উঠিল। ম্যাজিস্ট্রেট্ কিন্তু হাসিলেন না, রাগও করিলেন না। আপন শক্তিতে তিনি অটল। স্ত্রীকে বলিলেন—'চল, এবার যাওয়া যাক। ভাঙা গাড়ীটা টেনে নিয়ে যেতে হবে। তোমাদের জিনিষপত্র কোথায় ?'

মমতা আঙুল দেখাইয়া বলিল—ঐ ঘরে আছে। দুটো স্যুটকেস।'

ম্যাজিস্ট্রেট্ আদালিকে হুকুম দিলেন স্যুটকেশ দুটা নামাইয়া আনিতে। আর্দালি উপরে উঠিবার উপক্রম করিতে সতী বলিল—'আমার স্যুটকেস নামাবার দরকার নেই।'

সকলের সপ্রশ্ন চক্ষু সতীর দিকে ফিরিল। সতী সহজ সুরে বলিল—'আমি এখন যাব না, এখানেই থাকব।'

সকলের চোখের প্রশ্ন কণ্টকবৎ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল। মমতা আর্ত অবিশ্বাসের সুরে বলিল—'সতী !'

সতী বলিল—'এতে আশ্চর্য হবার কি আছে। জায়গাটা আমার ভাল লেগেছে তাই থাকব।'

'কিন্তু—একলা থাকবি কি করে ?'

'একলা কেন, উনিও তো থাকবেন,' বলিয়া সতী চিবুকের সঙ্কেতে মৌলিনাথকে দেখাইল।

মমতা জ্বলিয়া উঠিল—'তুই হলি কি! শিক্ষাদীক্ষা মান মর্যাদা সব জলাঞ্জলি দিলি।—ও সব হবে না, আমার সঙ্গে এসেছিস, আমার সঙ্গে ফিরে যেতে হবে। মামা-মামীমার কাছে আমার একটা দায়িত্ব আছে।'

'আমি যাব না।'

ম্যাজিস্ট্রেট্ এতক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চন করিয়া নীরব ছিলেন মৌলিনাথের দিকে ফিরিয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন,—'এর মানে কি ?'

মৌলিনাথ বলিল—'মানে আমিও জানি না। একটু অপেক্ষা করুন, দেখি যদি বুঝতে পারি।'

হাতের সংকেতে সতীকে ডাকিয়া মৌলিনাথ একটু দূরে লইয়া গেল, গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল,—'ব্যাপার কি ?'

সতীর চোখ ছলছল করিতেছে, স্ফুরিত অধরে সে বলিল—'আমি যাব না, কিছুতেই যাব না।'

'কিন্তু—না যাওয়ার মানে বুঝতে পারছ?'

'পারছি। ছেলেমানুষ নই, একুশ বছর বয়স হয়েছে।'

'তার মানে আমাকে বিয়ে করতে রাজি আছ?—কেমন?'

সতীর বাঁ চোখ হইতে একফোঁটা জল গড়াইয়া গালের উপর পড়িল। সে উত্তর দিল না।

মৌলিনাথ বলিল—'মৌনং সম্মতিলক্ষণম্।—কিন্তু যতক্ষণ বিয়ে না হচ্ছে ততক্ষণ এখানে থাকবে কোথায়?'

'কেন, আমি ঘরে শোব, তুমি নীচে শুয়ো।'

'চমৎকার ব্যবস্থা। আমাকে যদি বাঘে নিয়ে যায়?'

'বেশ, আমি নীচে শোব, তুমি ঘরে শুয়ো।'

'আরও চমৎকার। তোমাকে বাঘে খেতে পারে না?'

'সে আমি জানি না।'

স্ত্রীজাতির ইহাই শেষ যুক্তি। মৌলিনাথ কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া ঘাড় চুল্‌কাইল, তারপর সতীর হাত ধরিয়া বলিল—'এস দেখি, যদি কিছু ব্যবস্থা হয়।'

দু'জনে পাশাপাশি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। ম্যাজিস্ট্রেট ইতিমধ্যে একটা প্রকাণ্ড সিগার ধরাইয়া ইঞ্জিনের মত ধোঁয়া ছাড়িতেছিলেন। মৌলিনাথ বলিল—'সতী এখানেই থাকবে। এমন কি সেজন্যে আমাকে বিয়ে করতে পর্যন্ত তৈরি আছে। আমারও অমত নেই।'

ম্যাজিস্ট্রেট বলিলেন—'ড্যাম্।'

মমতা দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল—'এমন বেহায়া মেয়ে দেখিনি। ছি ছি!'

মৌলিনাথ বলিল—'ঠিক বলেছেন। কিন্তু উপায় নেই, ও সাবালিকা। মিস্টার ভৌমিক, এক্ষেত্রে আপনিই সব দিক রক্ষে করতে পারেন। সতী আপনার শালী একথাটা স্মরণ রাখবেন।'

ম্যাজিস্ট্রেট বলিলেন—'হোয়া 'জু' মীন্?'

মৌলিনাথ বলিল—'আপনি ম্যাজিস্ট্রেট, বিয়ে দেবার অধিকার আপনার আছে। সাক্ষি সাবুতও উপস্থিত। আপনি যদি বিয়ে না দিয়ে চলে যান একটা কেলেঙ্কারি হবে। সতী আপনার শালী, সুতরাং দুর্নাম হবে আপনারই বেশী।'

ম্যাজিস্ট্রেট ঘন ঘন ধূম উদগিরণ করিয়া মৌলিনাথ ও সতীকে দৃষ্টিপ্রসাদে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। তারপর তাঁহার ইঞ্জিনের মত মুখে অতি সামান্য একটু বাষ্পাচ্ছন্ন হাসির আভাস দেখা দিল। কখন পিছু হটিতে হয় ইঞ্জিন তাহা জানেন।

অতঃপর এক ঘণ্টা সময় কাটিয়া গিয়াছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া সস্ত্রীক সানুচর প্রস্থান করিয়াছেন। মমতা যাইবার সময় সতীর সঙ্গে কথা বলে নাই, মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গিয়াছে।

প্রস্তর-পট্টের কিনারায় সতী ও মৌলিনাথ পা ঝুলাইয়া বসিয়া ছিল। দুজনের মুখই চিন্তাগ্রস্ত।

মৌলিনাথ বলিল—'হিন্দুদের আট রকম বিয়ের ব্যবস্থা, তার মধ্যে গান্ধর্ব বিবাহ আছে, পৈশাচ বিবাহ আছে, রাক্ষস বিবাহ আছে। আমাদের বিয়েটা কোন্ বিবাহ বুঝতে পারছি না।'

সতী বলিল—'বোধহয় খোক্কস বিবাহ।'

মৌলিনাথ সতীর কাছে ঘেঁসিয়া বসিল। বলিল—'কি কাণ্ডটা করলে বল দেখি। এক রাত্তিরে এত হয়?'

সতী বলিল,—'যার হবার তার এক রাত্তিরেই হয়।—জামাইবাবু কিন্তু খুব ভাল লোক। দিদিটা ইয়ে। ভাগ্যিস তোমাকে বিয়ে করেনি।'

'ভাগ্যিস। কিন্তু ও কথা যাক। যে কাণ্ড করলে তার ফলাফল চিন্তা করেছ কি?'

'কী ফলাফল?'

'রোজ নিজের হাতে রাঁধতে হবে।'

'রাঁধতে আমি ভালবাসি।'

'বাসন মাজতে হবে।'

'মাজব।'

'বাথরুম নেই, জলের কল নেই। ঝরণায় গিয়ে নাইতে হবে।'

'নাইব। কেট্‌লিতে জল গরম করেও নাইব।'

'ধবলী চরাতে হবে।'

সতী ঘাড় তুলিয়া বলিল—'আমি ধবলী চরাব কেন? চণ্ডীদাস কী লিখেছেন? ধবলী চরাবে তুমি।'

'আচ্ছা আচ্ছা।'

'এবার তাহলে গানটা গেয়ে ফেল।'

'কোন্ গান?'

'কানু কহে রাই।'

দু'জনে আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া বসিল। জঙ্গলে পশুপক্ষী ছাড়া সাক্ষী নাই, তাহারাও পরের প্রণয়লীলা গ্রাহ্য করেনা। মৌলিনাথ সতীকে দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া লইয়া গান ধরিল। একটা কাঠঠোকরা অদৃশ্য থাকিয়া গানের সঙ্গে তাল দিতে লাগিল।

বাঙ্গালীর জীবনে রবীন্দ্রনাথ

অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১

রবীন্দ্র-জন্মোৎসব ক্রমশ যেরূপ দেশময় ব্যাপ্তি ও আয়তনে বিস্তৃতিলাভ করিতেছে তাহাতে ইহা বাংলার জাতীয় জীবনের সাংস্কৃতিক উৎসবের পর্যায়ে উন্নীত হইতে চলিয়াছে এইরূপ মনে হয়। মহাকবির জন্মদিনে বাঙ্গালী নিজ সৌভাগ্য ও গৌরবকে নূতন করিয়া অনুভব করিতে চেষ্টা করে—রবীন্দ্র-প্রতিভার নির্মল দর্পণে নিজের মানস জীবনকে প্রতিবিম্বিত করিতে প্রয়াসী হয়। রবীন্দ্র-সৃষ্টির উচ্ছ্বসিত স্তুতি করিয়া তাঁহার গীত-নির্ঝরে নিজ অবসন্ন, সংসার-যুদ্ধ-ক্লান্ত চিত্তকে ধারা-স্নান করাইয়া, তাঁহার কাব্যের আবৃত্তি ও নাটকের অভিনয়ে নিজ পারিপার্শ্বিক বাস্তবতাকে যথাসম্ভব রূপান্তরিত করিয়া, বাঙ্গালী কয়েক দিনের জন্য নিজেকে এক দিব্য-সম্পদের উত্তরাধিকারী মনে করে, তাহার ক্লেদকিন্ন অঙ্গকে রবিরশ্মির কনক-ভাতি-মণ্ডিত করিয়া এক স্বল্পস্থায়ী সুষমা-স্বর্গে স্বচ্ছন্দ-বিহারের আত্মবিস্মৃতি লাভ করে। বাঙ্গালার ভিতরে ও বাহিরে সমস্ত শিক্ষিত বাঙ্গালী এই উৎসবটির জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে—দেশের সুদূর প্রান্তস্থিত পল্লী হইতে সংস্কৃতি-অভিমানী মহানগরী পর্যন্ত আমন্ত্রিত-নিমন্ত্রণের ঢেউ বহিয়া যায়। প্রবন্ধ রচনায়, শ্রদ্ধানিবেদনে, গানের আসরে, সজ্জিত নর-নারীর সমাবেশ-সমারোহে, পার্কে পার্কে আলোক-দীপ্তিতে, পল্লীতে পল্লীতে উৎসারিত প্রাণপ্রাচুর্যে যেন সত্যই মনে হয় যে বাঙ্গালী আজ অপরিমিত প্রাণশক্তি ও সৌন্দর্যবোধের উৎসমুখ খুলিয়া দিয়াছে। তাহার শিল্পানুরাগী, সৌন্দর্যপিপাসু মন যেন রবীন্দ্র-প্রতিভাকে আশ্রয় করিয়া এক পরোক্ষ, অবাস্তব চরিতার্থতার নেশায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

যেখানে পূজার এত ঘটা, শ্রদ্ধা নিবেদনের এমন উচ্ছ্বাস-বিহ্বলতা, সেখানে আত্ম-সমীক্ষার প্রয়োগের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। জাতীয় মহাকবির জন্মোৎসব উপলক্ষে জাতির শ্রেষ্ঠ গুণগুলির বিকাশ হইবে ইহা মনে করাই সঙ্গত ও স্বাভাবিক। প্রতিভার পাদমূলে আমরা যে অর্ঘ্য বহন করিয়া লইয়া যাইব তাহা নির্মল ও নিষ্কলুষ হইবে, জাতির উন্নততম ও বিশুদ্ধতম অভীপ্সার নৈবেদ্য তাহাতে সজ্জিত থাকিবে—ইহাই জাতীয় জীবনের সুস্থতার নিদর্শন। এই উৎসব উপলক্ষে আমাদের তরুণ সম্প্রদায় যে প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার পরিচয় দেয় ও আয়োজন-পারিপাট্যের জন্য যেরূপ শ্রম স্বীকার করে তাহার উপযুক্ত ফল আমরা কতদূর লাভ করি ইহা বিশেষভাবে বিচার্য। আমরা কিরূপ মনোবৃত্তি লইয়া এই উৎসবে যোগদান করি, আত্ম-বিশুদ্ধি ও আত্মপরিচয় লাভের জন্য কিরূপ আন্তরিকতা দেখাই, কবির কোন্ আদর্শ ও তাঁহার সৃষ্টির কোন্ সৌন্দর্যের প্রতি সত্য সত্য আকৃষ্ট হই, তাঁহার নিকট আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার জন্য কোন বর মাগিয়া লই—এই সমস্ত প্রশ্ন আজ একান্ত প্রয়োজনীয় রূপেই আমাদের নিকট উপস্থিত হইতেছে। সত্যনিষ্ঠার সহিত এই প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতে পারিলে আমাদের রবীন্দ্র-পূজা হয়ত কিয়ৎ পরিমাণে সার্থক হইতে পারে।

২

প্রথমেই বলা ভাল যে এই উৎসবের প্রতি আমাদের আন্তরিক নিষ্ঠার অভাব নাই। আমাদের ভক্তির অকৃত্রিমতায় সংশয়ের কোন কারণ নাই। যদি আধুনিক যুগে বৈষ্ণবকবিদের ভাবতন্ময়তার ভাষা নিতান্ত বেমানান না শোনায়, তবে পদাবলী সাহিত্যের প্রেম-বিহ্বলা রাধিকার ভাষায় আমরা রবীন্দ্রনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিতে পারি—

> "তোমার গরবে গরবিণী হাম
> রূপসী তোমার রূপে।"

কিন্তু শুধু ভক্তি থাকিলেই ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় না। আমরা শত শত বৎসর ধরিয়া ভক্তি-গদ্‌গদ্-কণ্ঠে দেবীর নিকট 'ধনং দেহি, যশো দেহি' ইত্যাদি প্রার্থনা করিয়া আসিতেছি, কিন্তু সে প্রার্থনা যে পূর্ণ হইয়াছে এরূপ দাবী বোধ হয় কেহই করিবেন না। ভক্তির নামে যে অন্ধ

আবেগের বিমূঢ়তা আমাদের চিত্তকে অধিকার করে, তাহাতে এক আত্ম-প্রতারণা ছাড়া আর কোন ফলপ্রাপ্তি ঘটে বলিয়া মনে হয় না। ভক্তির সহিত নির্মলা ধীশক্তিও সুস্পষ্ট, দ্বিধাহীন কার্যক্রমের সংযোগ না হইলে উহা আমাদের অগ্রগতির পথনির্দেশ করে না। রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমাদের মনোভাব এই অন্ধ, আত্মতৃপ্ত আবেগের পর্যায়ভুক্ত কি না তাহাই আমাদের বিশেষভাবে প্রণিধান করিতে হইবে।

প্রত্যেক মহাকবির কাব্যে তাঁহার সৃষ্ট সৌন্দর্যের অবলম্বন স্বরূপ একটি বিশেষ যুগোপযোগী বাণী নিহিত থাকে। কবি কেবল যে সৌন্দর্য-স্রষ্টা তাহা নহেন, তিনি জীবনমন্ত্রের উদ্‌গাতা ঋষিও। সুতরাং তাঁহার কাব্যপাঠের পূর্ণ ফললাভ করিতে হইলে তাঁহার রচনার উভয়দিক সম্বন্ধেই তুল্যভাবে অবহিত হইতে হইবে। অবশ্য ইহা ঠিক যে বর্তমানের জটিল, নানা দ্বন্দ্ব-বিভক্ত মানস পরিস্থিতিতে কাব্য হইতে একটা নিশ্চিত জীবন-নীতি সংকলন পূর্বের ন্যায় সহজ নহে। ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে কাব্য প্রধানত সৌন্দর্যের ছায়াঘন-বীথিকা দিয়াই সত্যের মন্দিরে পৌঁছাইয়া দেয়। তথাপি কাব্যপাঠ হইতে যে জীবনপথ-নির্দেশ খানিকটা গ্রহণীয়, এই সত্য এখনও বাতিল হয় নাই। আর সৌন্দর্যপূজার ভিতর দিয়া সত্যানুসন্ধানকে সার্থক করিতে হইলে প্রয়োজন সৌন্দর্য-সুধার আকণ্ঠ পান; শুধু সৌন্দর্য-পেয়ালায় আত্মতৃপ্তির আবেগে নিমীলিত-নেত্র হইয়া মধ্যে মধ্যে চুমুক দিলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। কবিতাপাঠ কেবল মুহূর্তের চিত্ত-বিনোদন বা অবকাশ রঞ্জনের জন্য, ইহাতে প্রাণশক্তির গভীর মূলদেশে সঞ্জীবনী-রসসিঞ্চনের সম্ভাবনা নাই, এইরূপ মতবাদে প্রভাবিত হইলে উহা হইতে আমরা কোন মহৎ জীবন-সত্য লাভ করিতে পারিব না ইহা সুনিশ্চিত।

৩

রবীন্দ্রনাথের কাব্য হইতে আমরা এ পর্যন্ত কি পাইয়াছি বা পাইবার প্রত্যাশা করি উপরিউক্ত মন্তব্যের আলোকে তাহা যাচাই করিবার চেষ্টা করা যাউক। তাঁহার কাব্যের গভীর অধ্যাত্ম-তাৎপর্য না হয় বাদই দিলাম, কেননা ধর্মী অনুভূতি প্রধানত জীবন-সাধনা সাপেক্ষ, কাব্য এখানে জীবন-সাধনার সহায়ক শক্তিমাত্র। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনা যে অধ্যাত্ম চেতনার আভাসে-ইঙ্গিতে পূর্ণ, মানব মনের সহিত বিশ্ব-সত্তার যে লীলা-বিলাসের রহস্য-দ্যোতনায় ভাস্বর, আমাদের বস্তুবাদী মনের নিকট তাহা হয় অর্থহীন মুখরতা অথবা অস্পষ্ট মোহাবেশের উদ্রেক করে মাত্র। জাতীয় মনের যেরূপ প্রস্তুতি থাকিলে আমরা ইহার পূর্ণরস গ্রহণের অধিকারী হইতাম, সেরূপ প্রস্তুতির সম্পূর্ণ অভাবই ঘটিয়াছে। কাজেই ইহার জন্য খেদ করিয়া লাভ নাই। কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্যের অন্যান্য দিক আমাদের নিকট যে সুস্পষ্ট আবেদন বহন করে, আমাদের চিত্তের স্বাভাবিক নিম্নাভিমুখিতা ছাড়া তাহার অস্বীকৃতির কোন যুক্তিসঙ্গত কৈফিয়ৎ নাই। প্রথমত রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনা হইতে যে মানস-স্বচ্ছতা, সকল মোহাবেশমুক্ত সত্যনিষ্ঠার যে নির্মল দ্যুতি, যুক্তিবাদের যে সুশৃঙ্খল পরিচ্ছন্নতা ও সুরুচির যে প্রসন্ন শ্রী বিকীর্ণ হয় তাহার কতটুকু আমাদের চিত্তে প্রতিফলিত হইয়াছে? সংস্কারমুক্ত, স্বাধীনচিন্তার স্বচ্ছন্দগতিতে ছন্দায়িত, আদর্শনিষ্ঠার আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ় মনের পরিচয় রবীন্দ্রানুরাগী আমাদের কয়জনের মধ্যে পাওয়া যায়? দুঃখের বিষয় যে রবীন্দ্রোত্তর যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াও আমাদের চিত্তে বাঁধা-বুলির দাসত্ব শৃঙ্খল যেরূপ বদ্ধমূল হইয়াছে তাহা রামমোহন রায়ের পরবর্তী আর কোন অতীত যুগে ছিল কিনা সন্দেহ। আজ খোলা মন লইয়া আমরা কোন প্রকার আলোচনাতেই অবতীর্ণ হই না—দলগত সঙ্কীর্ণতা, নানারূপ মতবাদের শ্বাসরোধকারী ফাঁস, বহিরাগত চিন্তাধারায় গতানুগতিক অনুবর্তন, গোলে হরিবোল দিবার প্রবণতা আজ আমাদের মনকে এমন আবিষ্ট করিয়াছে যে আমরা ঝড়ে-উড়া ধূলা-বালিকেই জীবন-বায়ু-প্রবাহ বলিয়া ভুল করিতেছি। রবীন্দ্রনাথের মুক্ত বায়ুকে আমরা গোষ্ঠী-মনোভাবের কৃত্রিম-নিয়ন্ত্রিত নিঃশ্বাসের দ্বারা দূষিত করিয়া ফেলিতেছি। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ যে মননশীলতার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযুক্ত হইতে পারিত, সেইখানেই উহা বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে ইহা বাস্তবিকই ক্ষোভের বিষয়।

দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে বারে বারে সমন্বয়-স্থাপন ও মনুষ্যত্ব-উদ্বোধনের বাণী ধ্বনিত হইয়াছে। বর্তমানে নানা মতবাদ-বিচ্ছিন্ন একদেশদর্শিতার যুগে এই

উভয়বিধ আদর্শেরই যে গুরুতর প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা অনস্বীকার্য! আধুনিক যুগে জীবন-যাত্রা যত জটিল হইতেছে, ছোটখাট মত-বিভেদ যতই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে জাতীয় জীবনকে বিচ্ছিন্ন করিতেছে, বৃহত্তর সমন্বয়ের প্রয়োজন ততই তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে। গণতান্ত্রিক যুগে স্বাধীন মতবাদের অনিবার্যতা স্বীকার করিলেও দেশের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য ক্ষুদ্র বিভেদকে ঐক্যসূত্রে না গাঁথিতে পারিলে কর্মোদ্যম পদে পদে ব্যাহত হইবে। কি সামাজিক কি রাজনৈতিক জীবনে আমাদের সমন্বয়-সাধনের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে লক্ষ্যগোচর নহে। বরং আমাদের আচরণে বিপরীতমুখী প্রবণতাই অধিকতর প্রকট। ছোট পার্থক্যের উপর বেশী জোর দিয়া বৃহত্তর মিলনের পথকে কণ্টকাকীর্ণ করিয়া তোলা হইতেছে এবং জনসেবার বৃহত্তর আদর্শ হইতে জাতি বঞ্চিত হইতেছে। যে গাছের মূলে রসের অব্যাহত গতি, তাহার বিভিন্ন শাখাতে উদ্ভিন্ন পত্ররাজি মিশিয়া এক হইয়া গিয়া পথিকের উপর স্নিগ্ধচ্ছায়ার চন্দ্রাতপ রচনা করে। সেইরূপ যদি আমাদের চেতনা-মূলে রবীন্দ্র-সাহিত্যের রস সত্য সত্যই অভিসিঞ্চিত হইত, তবে আমরা মৃতপ্রায় বৃক্ষের বহুদূর-বিচ্ছিন্ন শাখার উপর রক্তবল্কল—বিরল-বিশীর্ণ পাতার ন্যায় আপন আপন স্বতন্ত্র মহিমার ধ্বজা উড়াইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতাম না।

৪

মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ব্যাপারেও যে আমরা উল্লেখযোগ্যভাবে রবীন্দ্রপ্রভাবের নিদর্শন তাহা বলা যায় না। সাত কোটি বাঙ্গালী আজ দেশ বিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গে আড়াই কোটিতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু দেশমাতৃকার মুগ্ধ, অন্ধ সন্তান-স্নেহ এখনও আমাদিগকে বাঙ্গালী করিয়াই রাখিয়াছে, মনুষ্যত্বের ছাড়পত্র দেয় নাই। দেশের সর্ববিধ কর্মক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই এই উক্তির সত্যতা প্রতিভাত হইবে। আজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশ-জোড়া আদর-আবদার, মান-অভিমান, ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও আত্মপ্রীতিসাধনের যে পালা চলিতেছে তাহাতে মনে হয় যে স্বাধীনতার পরে এই বাস্তব-অন্ধ, প্রশ্রয়-লোলুপ, মোহ-নিদ্রা আমাদের চেতনাকে আরও গভীরভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে। আজ যেন আমরা বিধাতার নিকট দাবী করিয়া বসিয়াছি যে যোগ্যতা ব্যতিরেকে যোগ্যতার পুরস্কার, সাধনা ছাড়া সিদ্ধি আমাদের বিধিদত্ত অধিকার। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনেক কবিতায় দুশ্চর তপঃসাধন, দুঃসাহসিক অভিযান ও অকপট আত্মবলিদানের বাণী শোনাইয়াছেন—আমরাও যথেষ্ট উৎসাহ ও ভাবুকতার সহিত সেগুলি সভা-সমিতিতে উৎসব-অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করিয়া থাকি। কিন্তু দেশের কর্মধারার মধ্যে এই কৃচ্ছ্রসাধনের পরিচয় কোথায়? বিশেষত আমাদের ভবিষ্যতের ভরসাস্থল, দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব-দায়িত্বের উত্তরাধিকারী ছাত্র-সমাজের মধ্যে এই দুর্গম পথ-যাত্রার প্রস্তুতি কতটা খুঁজিয়া পাওয়া যায়? আজ কথায় কথায় শৃঙ্খলা-ভঙ্গ, কর্তব্যের আহ্বান উপেক্ষা করিয়া আত্মাভিমানের উৎকট অভিব্যক্তি, অধ্যয়নের উন্নত মানরক্ষার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, প্রশ্নপত্রের যথার্থ বা কল্পিত দুরূহতার প্রতিবাদে সদলে পরীক্ষা-গৃহ ত্যাগ, নিজ অসহায়তার তারস্বরে ঘোষণা ও বিশেষ অনুগ্রহের জন্য উন্মুখলব্ধ প্রতীক্ষা ও উন্মুখর দাবী—এই চিত্রে কি কোন আদর্শনিষ্ঠ, দৃঢ়সংকল্প, জগতের শ্রেষ্ঠস্থান অধিকারে অভিলাষী জাতির সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করা যায়? রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'তে ভারতের বিভিন্ন বীর-যুগের যে উজ্জ্বল, উন্নত দেশপ্রেম ও আত্মদানতৎপরতা চিত্র-পরম্পরা উদ্ঘাটিত হইয়াছে, শান্তির যুগে ও সাধারণ কর্তব্য-সম্পাদনের মধ্যে সেই অকুতোভয় বীরত্বের দুই একটি বিচ্ছিন্ন অগ্নিস্ফুলিঙ্গও কি আমাদের ধূসর জীবন-যাত্রাকে আলোকিত করিবে না? অবশ্য এই নৈরাশ্যজনক গ্লানিকর অবস্থার জন্য শিক্ষক, অভিভাবক ও রাষ্ট্রনেতারাও তুল্যরূপ অথবা আরও অধিক দায়ী। ইহা নিশ্চিত যে রবীন্দ্রনাথের মনুষ্যত্ব লাভের জন্য জাতির প্রতি উদাত্ত আহ্বান জাতির চিত্ত হইতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে।

শ্রেষ্ঠ কবি জাতির চিত্তে সৌন্দর্য-সুষমার প্রতি প্রবণতা জাগাইয়া উহার রুচিবোধকে মার্জিত করেন ও উহার আচার ব্যবহারে শালীনতা, সৌজন্য ও শিষ্টাচারের একটি উন্নত আদর্শের সৃষ্টি করেন। পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মধ্যে ফরাসী ও ইটালীর অধিবাসীরা এই সৌজন্যবোধের জন্য বিখ্যাত এবং এই সুরুচি ও সামাজিক শিষ্টাচার তাহাদের সাহিত্য হইতে জীবনে সংক্রামিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনার মধ্যে একটি সহজ সম্ভ্রমবোধ ও মধুর শালীনতা

ও রুচি-জ্ঞানের পরিচয় দেদীপ্যমান। তাঁহার সমস্ত বাদবিতণ্ডামূলক রচনার মধ্যে আক্রমণের ঘাত-প্রতিঘাতের উত্তেজনার জন্ম কোথাও তিনি সংযম ও সুরুচির মাত্রা লঙ্ঘন করেন নাই। তাঁহার সত্যভাষণের নির্ভীকতার মধ্যে আক্রমণের তীব্রতা কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহার রাজনৈতিক প্রবন্ধসমূহের মধ্যে উদার, সমদর্শী আপাত-কারণের তুচ্ছতা অতিক্রম করিয়া মানবচিত্ত রহস্যের গভীর স্তরে বদ্ধদৃষ্টি একটি প্রশান্ত মনোভাবের স্নিগ্ধতা যেন প্রতি ছত্রে বিকীর্ণ হইয়াছে। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথের এই বহিরঙ্গমূলক আদর্শও যথাযথভাবে স্বীকৃত হয় নাই। যে কোন রাজনৈতিক বক্তৃতা ও সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই সত্যের সমর্থন পাওয়া যাইবে। এই সমস্ত বক্তৃতা, আলোচনা ও প্রবন্ধাদি পড়িলে মনে হয় যে আমাদের সত্য-প্রতিষ্ঠা করার অপেক্ষা বিরুদ্ধবাদীকে আঘাত করাই যেন মুখ্যতর প্রচেষ্টা। এমন কি আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনেও যখনই কোন মতানৈক্য ঘটে তখনই তাহা উদ্ধত, অবিনয় ও রূঢ়তার আকারে আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের নবতম সুরুচি গ্রহণ করা দূরে থাকুক, প্রাচীন উত্তরাধিকারসূত্রে মানবিক সম্পর্কের স্বচ্ছ স্নিগ্ধতাও আমরা হারাইতে বসিয়াছি।

৫

রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী রচনার একটা দিক মাত্র কিয়ৎ পরিমাণে আমাদের জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে—তাহা তাহার নৃত্যগীত, নাট্যাভিনয় প্রভৃতি চারুকলার দিকটা। রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উপলক্ষে তাঁহার প্রতিভার এই বিকাশ-গুলিই আমাদের সত্যকার আনন্দ দেয় ও আমাদের রুচিকে খানিকটা গঠিত করে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত আজ আমাদের গার্হস্থ্য জীবনে ও সামাজিক প্রীতি-সম্মেলনে বহুল পরিমাণে প্রচলিত। তাঁহার প্রবর্তিত নৃত্যকলা ও তাঁহার রচিত নাটকের অভিনয় আমাদের চিত্ত-রঞ্জনের একটা প্রধান উপায়রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। হয়ত এই দিক দিয়া আমাদের রুচি ধীরে ধীরে উন্নত ও মার্জিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু আমাদের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান এই নৃত্য-গীত-প্রিয়তার মধ্যে একটু ভাববিলাস প্রশ্রয়ের দিক যে না আছে তাহা নয়, সঙ্গীতের সহিত সাধারণ জীবন যাত্রার একটা সুস্থ, সহজ-নিরূপ্য সম্বন্ধ থাকিলে উহা জীবনকে পুষ্ট ও আদর্শে দৃঢ়ীভূত করে। জীবনে স্বতঃউদ্ভূত আকুতি, উহার বাস্তব অভাববোধ ও অপূর্ণ আকাংক্ষা হইতে জাত স্বপ্নরোমাঞ্চ সঙ্গীতে রূপ পায়। আমাদের বৈষ্ণব ও শাক্তপদাবলী জীবনব্যাপী সাধনার অর্দ্ধলব্ধ [illegible]কে পূর্ণরূপে পাইবার কল্পনাটি সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশ করিয়াছে। সুতরাং সঙ্গীত জাতির জীবনপথে বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত মধুর পরিণততম মাধুর্য ও সৌরভ। রামপ্রসাদ জীবনে যাহার অনুসরণে অর্দ্ধসফলতা লাভ করিয়াছেন, গীতে তাহারই পূর্ণতার আস্বাদন করিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবিওয়ালাদের প্রেম-সঙ্গীতে জীবনাকুতির সুর ক্ষীণতর হইয়া এক চটুল কৃত্রিম বাগভঙ্গীর রূপ ধারণ করিয়াছে। রাধাকৃষ্ণ প্রেমের বেনামীতে প্রাকৃত, অপকৃষ্ট প্রেমের বিলোল কটাক্ষ ও আবিল কামনাই যেন সেখানে আমাদের চিত্তকে মোহাবিষ্ট করে।

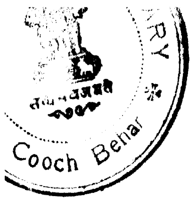
রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের ব্রহ্ম-সঙ্গীত ছাড়া অন্যান্য গীতাবলী সম্বন্ধে পাঠকের সহিত কবি-মনের একাত্মতা খুব সামান্য পরিমাণেই অনুভূতি হয়। এই গানগুলির বিষয় হইল অধ্যাত্ম তত্ত্ব ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, প্রকৃতির সহিত মানবিক ভাবের সূক্ষ্ম সাপেক্ষতা ও লৌকিক প্রণয়লীলা। প্রথম দুই জাতীয় কবিতায় কবির ব্যক্তি-মানসের নিগূঢ় অভিনব ভাবগ্রাহিতার মাধ্যমে উপলব্ধ আকুতি সাধারণ পাঠকের চিত্তকে কেবল ছুঁইয়া যায়, যে গভীর স্তরে চিত্তের উপাদান-সংশ্লেষ গঠিত হয় ততদূর পর্যন্ত পৌঁছে না। এগুলিতে আমরা মুখ্যত আস্বাদন করি সুর-বৈচিত্র্য ও ইহার সূক্ষ্ম শিল্প-কারুকার্য, ইহাদের অন্তর্নিহিত ভাবধারা আমাদের মানস তটে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে। যখন আমরা সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুরে' বা 'শ্রাবণ ঘন গহন মোহে' প্রভৃতি গানগুলি শুনি তখন আমরা সুরলহরীর লীলায়িত ছন্দেই মুগ্ধ হই, অসীমকে অনুভব করিবার আকুতি জীবনমধ্যে উহার স্পর্শ-লোলুপতা আমাদের জাগে না। সুরের ফাঁদে আমাদের মন বন্দী হইয়া পড়ে। সুর যে জীবন-দর্শনের বাহন তাহা জালের ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া যায়। অবশ্য সুর-সমুদ্রে অবগাহনের মধ্যেই চিত্তের প্রসার ও বিশুদ্ধি

ঘটিতে পারে। কিন্তু সুরের সঙ্গে যদি ভাবের আবেদন সম্মিলিত হয়, তবেই গানের প্রভাবের পূর্ণতা আসে।

রবীন্দ্রনাথের প্রেম-কবিতাগুলিই আমরা বিশেষভাবে আস্বাদন করিয়া থাকি। ইহাদের প্রধান আকর্ষণ গানের ভাবের সহিত আমাদের রুচি-সাম্য, উহার অনির্দ্দেশ্য, স্বপ্নমধুর ভাবাবেশের মধ্যে বাস্তব-বিস্মৃত আত্মনিমজ্জন। সুতরাং এই গীতিগুলি আমাদের স্বাভাবিক ভাববিলাস-প্রবণতাকেই পুষ্ট ও স্ফীত করে আমরা যেখানে স্বভাব-কোমল, স্বতই দুর্বল ও বাস্তব-পরাঙ্মুখ সেখানেই এই গানের প্রভাব আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ প্রবণতাকে স্ফুটতর করিয়া তোলে। এই কারণে ও সুরমাধুর্যের জন্যই গানগুলি বিশেষভাবে জনপ্রিয় হইয়াছে। জাতীয় জীবনে শক্তিমত্তার সহিত যদি প্রণয়ের সুকোমল আবেশের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়, তবে এই প্রণয় বাস্তবাশ্রয়ী না হইয়া স্বপ্নাশ্রয়ী হইয়া উঠে। আমরা ইংরেজী সাহিত্যে দেখি যে, যে যুগে বীরত্বের অধিক স্ফুরণ, সেই যুগেই প্রেম কবিতার সুকুমার-সৌন্দর্য আরও বিকশিত হইয়া উঠে। জীবনের দুঃসাহসিক কর্ম্ম-প্রেরণা হইতেই প্রেম নিজ ঊর্দ্ধাকাশ বিহারের শক্তিসঞ্চয় করে। কর্ম্মবিমুখ, স্বপ্নাবিষ্ট, আদর্শের স্থির-আশ্রয়-হীন জাতির প্রণয়-কবিতা আতিশয্য-বিড়ম্বিত ও খেয়ালী কল্পনার লক্ষ্যহীন ভ্রমণের পর্যায়ভুক্ত হইয়া দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া' ও তৎপরবর্ত্তী কাব্যসন্নিবিষ্ট প্রেম-কবিতার মধ্যে এই বলিষ্ঠ পৌরুষের সুর। এই দৃপ্ত আত্মপ্রত্যয় তাঁহার পূর্বতন কাব্যের রমণীসুলভ পেলবতার বিপরীতরূপে ধ্বনিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য আমি এখানে গানগুলির কাব্য-মূল্য বিচার করিতেছি না, আমাদের মনের উপর উহার ঘুম-পাড়ানো প্রভাবটি ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছি।

নূতন-স্বাধীনতা-প্রাপ্ত জাতির সাধনা-শক্তি উদ্বোধন ও জাতীয় স্বরূপের আবিষ্কার। পরাধীনতার যুগেও কাব্য-রচনা ও শিল্প-সৌন্দর্যের অনুশীলনের অবসর যথেষ্ট মিলে। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের সাহিত্য কেবল যে আমাদের সৌন্দর্যবোধকে তৃপ্তি দিয়াছে তাহা নয়, আমাদের স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষাকে প্রবলভাবে জাগ্রত করিয়াছে। ইহা মুখ্যত বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে আমাদের বিক্ষোভ জানাইয়াছে ও ইহার অপসারণের জন্য যে মনোভাব ও শক্তির অর্জন প্রয়োজনীয় সেইদিকে আমাদের চিত্তের উন্মেষ ঘটাইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পরে জাতীয় জীবনের উপর কাব্য সাহিত্যের প্রভাব আরও গভীর ও বহুমুখী হওয়া উচিত। জাতীয় জীবনের সম্পূর্ণ পুনর্গঠন, ইহার অগ্রগতির পথনির্দেশ, ইহার নূতন ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠা, ইহার চরম লক্ষ্যনির্ণয় ও বিবিধ সুপ্ত সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ—এই সমস্তই কাব্য-সাহিত্যের নিকট হইতে প্রেরণা পাইবে। আমাদের দেশের বিশেষ সমস্যা—প্রাচীন ঐতিহ্যের সহিত আধুনিক প্রগতিশীলতার সমন্বয় স্থাপন, পশুশক্তি ও অর্থনৈতিক উন্নতির উপর আধ্যাত্ম আদর্শের প্রাধান্য-বিস্তার ও পাশ্চাত্য মননশীলতাকে স্বীকার করিয়া মানস শক্তির নানা নূতন বিকাশ সাধন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে এই জাতীয় পুনর্গঠনের ইঙ্গিত প্রচুরভাবে বিদ্যমান—তাঁহার আবির্ভাব এই নবীন রাষ্ট্রের এক গৌরবোজ্জ্বল, অলিখিত অধ্যায়ের সূচনা করে। বঙ্কিম 'মা যা ছিলেন' ও 'মা যা হইয়াছেন' তাহার মর্ম্মস্পর্শী চিত্র আমাদের নিকট উদ্ঘাটন করিয়াছেন—রবীন্দ্রনাথ 'মা যা হইবেন' সেই অনন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছেন। যে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রারম্ভে সুভাষচন্দ্রের মত নেতা আবির্ভূত হন, তাহার ক্রমপরিণতিতে কি আমরা আরও সার্থক, আরও উন্নত সংগঠনপ্রতিভাশালী নেতৃত্বের প্রত্যাশা করিতে পারি না? রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শে যদি জাতি সত্যই অনুপ্রাণিত হয়, তবে তাহার ফল আমাদের রাষ্ট্রীয় মহিমা বৃদ্ধির মধ্যেও যে প্রতিবিম্বিত হইবে এরূপ আশা অযৌক্তিক নহে।





আর্য্য সঙ্গীতে শ্রুতি ও স্বর

শ্রীতুলসীচরণ ঘোষ বি-এল্

"আর্য্য সঙ্গীতে শ্রুতি" নামক প্রবন্ধে শ্রুতি কি ও কাহাকে বলে ও তাহাদের বণ্টন কি ভাবে হইবে এবং আর্য্যশাস্ত্রের সহিত কালচক্রের কি সম্বন্ধ তাহা বিশদ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। শ্রুতির সহিত স্বরের কি সম্বন্ধ ও স্বর কাহাকে বলে তাহাই এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। এই স্বর সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে স্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক, যদিও তাহা "সঙ্গীতের উৎপত্তি" নামক প্রবন্ধে সামান্যভাবে দর্শিত হইয়াছে তথাপি এসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা একান্ত প্রয়োজনীয়।

সঙ্গীতের এই সপ্ত স্বর প্রকৃতিতে অবস্থিত। মহাভারতে শান্তি-পর্ব্বে উল্লেখ আছে যে মহর্ষি ভরদ্বাজ প্রশ্ন করিলে ভৃগু কহিলেন—আকাশের একমাত্র গুণ শব্দ। শব্দ সাত প্রকার। ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। এই সপ্তবিধ শব্দ পটহাদিতে বিদ্যমান দেখা যায় বটে, কিন্তু উহারা আকাশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই নিমিত্ত শব্দ আকাশজ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। বায়ু লোকের শব্দ জ্ঞানের কারণ। লোকে বায়ুর অনুকুলতা বশতঃ শব্দ অবধারণে সমর্থ ও উহার প্রতিকূলতা নিবন্ধনই শব্দজ্ঞানে অসমর্থ হয়।

এই শব্দই ব্রহ্ম। এই শব্দ ব্রহ্ম হইতে সমস্ত জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। মহাভারতে শান্তি পর্ব্বে উপাখ্যানে উল্লেখিত আছে যে রাজা জনমেজয় কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া বৈশম্পায়ন কহিলেন—ব্রহ্মা সৃষ্টি মানসে বিষ্ণুর নাভি পদ্মে অধিষ্ঠিত হইয়া বেদ সৃজন করিতেছিলেন। সেই পদ্মাস্থিত দুই বিন্দু জল হইতে মধু ও কৈটভ দৈত্যদ্বয় উদিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট হইতে বেদ অপহরণ করিয়া পাতালে প্রবিষ্ট হইল। এবং নারায়ণ হয়গ্রীব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পাতালে প্রবিষ্ট হইয়া উদত্তাদি স্বর সমুদয় অবলম্বন করিয়া সামগান করিতে আরম্ভ করিলে রসাতল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। অসুরদ্বয় সেই শব্দ শ্রবণ মাত্র বেদ নিক্ষেপ পূর্ব্বক শব্দানুসারে ধাবমান হইল। নারায়ণ সেই বেদ লইয়া ব্রহ্মার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

এই শব্দ আবরণী ও বিক্ষেপণী অর্থাৎ সংকল্প ও বিকল্পময়ী মায়া প্রভাবে আবৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রাণ শক্তি প্রভাবে যখন এই মায়া অপসৃত হয় তখনই তাহার প্রকাশ হয় ধ্বনিতে। স্থূল ধ্বনিরূপ শব্দের অপেক্ষায় সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম শব্দও আছে এবং অবশেষে শব্দের এইরূপ আকার আছে যাহা প্রতীতিগম্য নহে। শব্দ যতই সূক্ষ্ম হয় ততই তাহার অনিত্যতা, অনেকরূপতা ও কার্য্যরূপতার খোলস পৃথক হইয়া যায় এবং পরিশেষে তাহা তাহার নিজস্ব একরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। শব্দের যাহা নিজস্বরূপ তাহাই স্ফোট নামে অভিহিত হয়। যাহা হইতে প্রত্যেক শব্দ স্ফুটিত অর্থাৎ বিকসিত হয় তাহাই স্ফোট। প্রত্যেক দ্রব্যের প্রতি সূক্ষ্ম অবয়ব পরমাণু যেমন আধার রূপে দ্রব্যেই অবস্থিত আছে কিন্তু দৃষ্টিগোচর হয় না সেইরূপ শব্দের সূক্ষ্মরূপ স্ফোটও প্রত্যেক বস্তুতে অবস্থিত থাকিলেও প্রতীতির বিষয় হয় না। এই সূক্ষ্ম শব্দ বা স্ফোট সমস্ত দৃশ্য বা অদৃশ্য প্রপঞ্চের উপাদান। প্রত্যেক উপাদানেরই স্বভাব এই যে তাহা কার্য্যের সহিত মিলিত থাকে। যেমন মৃত্তিকা ঘটের উপাদান, উহা ঘটের সহিত অন্বিত থাকে। মৃত্তিকা বাদ দিলে ঘটের অস্তিত্ব থাকে না। সেইরূপ সমস্ত প্রপঞ্চের উপাদান স্ফোটও সমস্ত বস্তুতে অন্বিত। এই স্ফোটই শব্দ ব্রহ্ম। এই স্ফোট অথবা শব্দব্রহ্মে নিখিল জগৎ বিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা সকলেরই জানা আছে যে এই তত্ত্ব অনুসরণে ব্রাহ্মী শক্তি সরস্বতীর পূজায় শব্দকে স্ফুট করিবার নিমিত্ত ফুটকড়াই অর্পণের বিধি আছে। বিবর্ত্ত অবস্থায় যে বস্তু যাহার বিবর্ত্ত তাহারও অস্তিত্ব অক্ষুন্ন থাকে। রজ্জুতে সর্পের অবাভাসকালেও রজ্জুর স্বরূপ অবস্থায় কোনরূপ বিকার ঘটে না। পরিণামে স্বরূপ হইতে প্রচ্যুতি ঘটে। কিন্তু বিবর্ত্তে স্বরূপ হইতে প্রচ্যুতি ঘটে না। শব্দ ব্রহ্ম হইতে সমস্ত জগৎ বিবর্ত্তিত হওয়া হেতু শব্দ ব্রহ্ম অথবা স্ফোট সমস্ত জগতের উপাদান। উপাদান অর্থে অধিষ্ঠান। জাগতিক বস্তুর কোন অস্তিত্ব নাই, কেবল অনাদিকাল হইতে যে সূক্ষ্ম বাসনা ব্রহ্মে লীয়মান থাকে সেই বাসনাই অবিদ্যা। সেই অবিদ্যার প্রভাবে স্ফোট বা শব্দব্রহ্মই নানারূপে ভাসমান হয়। আদি ও অন্তে এই ব্রহ্ম একইরূপে থাকে, কেবল মধ্যে অন্যরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

ব্রহ্ম যখন নিস্পন্দ থাকেন তখন সৃষ্টি নাই। সৃষ্টিকালে ব্রহ্মে স্বাভাবিক অতি সূক্ষ্ম যে স্পন্দন উঠে সেই স্পন্দনই ওঁকার আকারে প্রকাশ পায়। ব্রহ্মের সংকল্প বিকল্পময়ী এই স্পন্দন শক্তিই মায়া। এই মায়া ব্রহ্মকে যত রূপে বিবর্ত্তিত করে, ততপ্রকার শব্দ উৎপন্ন হয়। এই শব্দরাশি অনন্ত। পরব্যোমে ব্রহ্মের আদি ক্রীড়াই ওঁকার। এই ওঁকার হইল ব্রহ্ম সাগরে অতি সূক্ষ্ম তরঙ্গ মাত্র। নিস্পন্দ অবস্থায় উহা অব্যক্ত। শক্তির অভিব্যক্তিকালে প্রথমে যে প্রকার কুণ্ডলাকারে স্পন্দনের গতি হয় শক্তির পরবর্ত্তী গতিও ঠিক সেইরূপ। কুণ্ডলিনী একই ভাবে কার্য্য করে। অর্থাৎ পরব্রহ্মে যে ভাবে ক্রিয়া করে অতি-ক্ষুদ্র পরমাণুতেও সেই ভাবে ক্রিয়া করে। এই স্পন্দশক্তি অর্থাৎ কুণ্ডলিনী শক্তি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। এই কুণ্ডলিনী শক্তিই মূলাধারে অবস্থিত। এই শব্দ ব্রহ্মময়ী মহামায়ারই সমস্ত জগৎ বিবর্ত্ত। সারদা-তিলকে আছে—

"অথনন্দময়ীং দেবীং শব্দব্রহ্ম স্বরূপিণীং।
ঈড়ে সকল সম্পত্তৈ, জগৎ কারণমম্বিকাং॥"

গুহ্যদেশ হইতে দুই অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে, লিঙ্গমূল হইতে দুই অঙ্গুলি অধোদিকে চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত মূলাধার পদ্ম অবস্থিত। এই স্থানে ইড়া ও পিঙ্গলা নামক দুই সূক্ষ্ম নাড়ী সংযুক্ত অবস্থায় অবস্থিত। মূলাধার অবস্থিত এই কুণ্ডলিনী শক্তিকে কুম্ভকের দ্বারা সহস্রারে উপনীত করিতে হয়। ব্যক্ত স্পন্দশক্তি বা কুণ্ডলিনীই মা কালী। সহস্রারে উপনীত হইবার সময় তাহার যাহা গতি তাহাই মা কালীর নৃত্য। সাধক নীলকণ্ঠ ইহারই অনুভূতি করিয়া গাহিয়াছিলেন—

"শ্যামা মা নয় সামান্য মেয়ে
সে যে মূলাধারে সহস্রারে উঠছে ধেয়ে ধেয়ে।"

যেমন ব্যক্ত স্পন্দশক্তি মা কালীর রূপ সেইরূপ অব্যক্ত স্পন্দশক্তি দুর্গার রূপ। শক্তি যখন অব্যক্ত তখন তাহা অবধারণ করা কঠিন বলিয়াই তিনি দুর্গা—"দুঃখেন গম্যতে প্রাপ্যতে যস্যাং সা দুর্গা।"

অতএব দেখা যায় যে এই ওঙ্কারই স্ফোট, শব্দব্রহ্ম বা স্পন্দময়ী কুণ্ডলিনী শক্তি। সমস্ত বিশ্বই এই শব্দ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত।

সঙ্গীত বিলাস বলেন—

"আত্মা বিবক্ষমাণোয়ং মনঃ প্রেরয়তে মনঃ।
দেহস্থং বহ্নিমাহন্তি স প্রেরয়তি মারুতম্॥"
ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিতং সোহথ ক্রমাদূর্দ্ধ পথে চরণ।
নাভিহৃতকণ্ঠমূর্দ্ধাস্তেষ্বাবিভাবয়তি ধ্বনিম্।
নাদোতিসূক্ষ্মঃ সূক্ষ্মশ্চ পুষ্টোপুষ্টশ্চ কৃত্রিমঃ।
ইতি পঞ্চভিধা ধত্তে পঞ্চ স্থানস্থিতঃ ক্রমাত্।"

আত্মা নিজেকে ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে প্রকাশ করিবার মানসে চিত্তকে প্রেরণ করে। চিত্ত দেহস্থ বহ্নিকে জাগ্রত করিবার জন্য বায়ুকে প্রেরণ করে। ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিত সেই বায়ু ক্রমে ঊর্দ্ধদিকে উঠিতে থাকে। নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, মূর্দ্ধি ও শীর্ষস্থানে ধ্বনি আবির্ভূত হয়। সেই অতি সূক্ষ্ম-ধ্বনি ক্রমে পুষ্টিলাভ করিয়া কণ্ঠ দিয়া নাদরূপে প্রকাশ পায়। এই পঞ্চ স্থানে পঞ্চপ্রকার ক্রিয়া দ্বারা স্বর নির্গত হয়।

ইহা একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে দেহস্থ অনল দেহস্থ অনিলকে বিক্ষোভিত করা হেতু তাহা ঊর্দ্ধদিকে গমন করে। অর্থাৎ দেহস্থ অগ্নি মূলাধারাস্থ অপান বায়ুকে বিক্ষোভিত করা হেতু ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিত কুণ্ডলিনী শক্তি, যাহাতে সপ্তস্বর অবস্থিত, তাহা জাগরিত হইয়া ধীরে ধীরে ঊর্দ্ধ পথে আরোহণ করে। প্রশ্ন হইতে পারে ব্রহ্মগ্রন্থি কোথায় অবস্থিত।

সঙ্গীত দর্পণ বলেন—

"আধারাৎ দ্ব্যঙ্গুলাদূর্দ্ধং মেহনাত দ্ব্যঙ্গুলাদধঃ।
একাঙ্গুলং দেহমধ্যে তপ্তজাম্বু নদপ্রভম্॥
তত্রাস্তে অগ্নিশিখা তন্বী চক্রাৎ তস্মাৎ নবাঙ্গুলাত।
দেহস্ত কন্দ্রোৎ উৎখোধায়ামাভ্যাং চতুঃঙ্গুলং॥
ব্রহ্মগন্থিরিতি প্রোক্তা তস্য নাম পুরাতনৈঃ।

গুহ্যদেশ হইতে দুই অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে, লিঙ্গমূল হইতে দুই অঙ্গুল অধোদিকে এবং একাঙ্গুল দেহমধ্যে তপ্তজাম্বুর ন্যায় বর্ণ। সেখানে নবঅঙ্গুলি প্রমাণ চক্র অবস্থিত এবং সেই চক্রে অগ্নিশিখার ন্যায় সূক্ষ্ম নাড়ী অবস্থিত। দেহমূলে উচ্চতায় চতুরঙ্গুলি প্রমাণ ব্রহ্মগ্রন্থি অবস্থিত।

এই ব্রহ্মগ্রন্থিতে অবস্থিত নাদরূপী কুণ্ডলিনী শক্তি উত্তপ্ত অপান বায়ু কর্তৃক বিক্ষোভিত হইয়া চক্র হইতে চক্রে উঠিতে থাকে এবং অবশেষে কণ্ঠ দিয়া স্বররূপে প্রকাশ পায়। এই প্রকাশেরও একটা ক্রমিক রীতি আছে।

সঙ্গীত বিলাস বলেন—

"ব্যবহারে ত্রসৌ ত্রেধা হৃদিমন্দ্রোভিধীয়তে।
কণ্ঠেমধ্যো মূর্দ্ধি তার দ্বিগুণশ্চোত্তরোত্তর।"

ব্যবহারে তিন প্রকার—যথা হৃদয়ে মন্দ, কণ্ঠে মধ্য ও মূর্দ্ধি তার এবং তাহারা পরস্পরের দ্বিগুণ। মন্দ্রের দ্বিগুণ মধ্য ও মধ্যের দ্বিগুণ তার। আবার প্রত্যেক স্থানে সেই দ্বাবিংশ শ্রুতিও বর্ত্তমান। শাস্ত্র যথা—

"প্রত্যেকং তত পুনঃ স্থানং দ্বাবিংশতির্বিধং ভবেৎ।
তস্য দ্বাবিংশতির্ভেদা শ্রবণাৎ শ্রুতয়োমতাঃ॥"

অর্থাৎ প্রত্যেক স্থানেই তাহারা দ্বাবিংশ এবং তাহাদের দ্বাবিংশ ধ্বনি পার্থক্য উপলব্ধি শ্রবণযোগ্য বলিয়া তাহারা দ্বাবিংশ শ্রুতি। এই শ্রুতিসকল হৃদয়ের ঊর্দ্ধ দ্বাবিংশ নাড়ী সকলে অবস্থিত। শাস্ত্র যথা—

"হৃদ্যূর্দ্ধনাড়ীসংলগ্না নাড়য়ো দ্বাবিংশতির্মতাঃ।"

এই শ্রুতি সকলের বিভাগ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে স্বরসমূহ শ্রুতিতে বণ্টন কিরূপ ভাবে হইবে তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে স্বর কাহাকে বলে ও তাহাদের কি কি লক্ষণ সেই সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজন।

সঙ্গীত রত্নাকর বলেন—

"শ্রুত্যন্তরভাবী যঃ স্নিগ্ধ অনুরণনাত্মকঃ।
স্বতো রঞ্জয়তি শ্রোতৃচিত্তং স স্বরোউচ্যতে॥"

অর্থাৎ শ্রুতির অন্তে যাহা স্নিগ্ধ অনুরণনযুক্ত এবং আপনা হইতেই শ্রোতৃচিত্ত রঞ্জিত করে তাহাই স্বর।

সঙ্গীত পারিজাত বলেন—

"শ্রুত্যন্তরমুৎপন্নাস্নিগ্ধো অনুরণনাত্মকঃ।
রঞ্জয়তি স্বতঃ শান্তং শ্রোতৃণামিতি তে স্বরাঃ॥"

অর্থাৎ শ্রুতি সকলের অন্তে স্নিগ্ধ অনুরণনযুক্ত মধুর ধ্বনি যাহা শ্রোতৃ-যুগলকে আপনা হইতেই মোহিত করে তাহাই স্বর।

শৃঙ্গাহার বলেন—

"স্বয়ং যো রাজতে নাদ স স্বর পরিকীর্ত্তিতঃ।
সোহপি সপ্ত ষড়জাদি ভেদতঃ॥"

অর্থাৎ যাহা নিজে ধ্বনিকে রঞ্জিত করে তাহাই স্বর। তাহারা ষড়জাদি ভেদে সপ্ত।

অতএব দেখা যাইতেছে শ্রুত্যান্তর যে স্নিগ্ধ অনুরণনযুক্ত ধ্বনি তাহাই স্বর। আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে এইমাত্র বলা যায় যে

pure tone with all its harmonics is স্বর। এবং এই শ্রুত্যন্তর যে প্রথম অনুরণনাত্মক ধ্বনি কণ্ঠ দিয়া নির্গত হয় তাহাই সঙ্গীতের প্রথম স্বর ষড়্জ। এই ষড়্জাদি স্বরসমূহের লক্ষণ—যথা—

সঙ্গীত বিলাস বলেন—

ষড়্জ

"ষণ্ণাং স্বরাণাং জনকঃ ষড়্ভির্বাজন্যতে স্বরৈঃ।
যস্মিন্ ষড়্জাদয়ো জাতাস্তস্মাৎ ষড়্জ ইতিরিতঃ॥
কণ্ঠোদরন্তালুরসনা নাসিকা শীর্ষাভিধেষু চ।
ষটস্থ স্থানেষু জাতাত্বাৎ ষড়্জঃ স্যাৎ প্রথম স্বরঃ॥"

ছয়টী স্বরের জনক ও ছয়টি স্বর ইহা হইতে উৎপন্ন। অর্থাৎ জন্য ও জনক সম্বন্ধ বিশিষ্ট হওয়া হেতু ইহাকে ষড়্জ বলা হয়। ষড়্জাদি স্বরসমূহ ইহা হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহাকে ষড়্জ বলা হয়। পুনরায় ষড়াঙ্গ চালনা হেতু এই স্বর উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহাকে ষড়্জ বলা হয়। ষড়াঙ্গ যথা—কণ্ঠ, উদর, তালু, রসনা, নাসিকা ও মস্তক।

ইহার রূপ যথা—

"ষণ্মুখঃ স্যাৎ চতুর্হস্তঃ পাণিভ্যামুগুলে দধত।
বীণা শোভিকরমদ্বন্দ্বঃ স্ফুরত্তাম রস প্রভঃ॥
কুলং সুপর্ব্বজং জম্বুদ্বীপং ব্রহ্মা চ দৈবতং।
শৃঙ্গারকে রসে গেয়ো মুখ্যগাতা তু পাবকঃ॥
ময়ূরো বাহনং তস্য স্বরাণুকরণাতপুনঃ।"

ইনি ছয়মুখ বিশিষ্ট চতুর্হস্তযুক্ত। দুই হস্তে পুথি ধারণ করিয়া অবস্থিত এবং দুই হস্তে বীণা শোভিত। ইহার বদন হইতে তামসিক রস নির্গত হইতেছে। জম্বুদ্বীপ অর্থে মেরুদণ্ড, সুপর্ব্বজ অর্থে সুগ্রন্থি এবং কু অর্থে পৃথিবী ও লা অর্থে গ্রহণ। অর্থাৎ ষড়্জ স্বর মূলাধারে বিরাজিত কুণ্ডলিনী শক্তিতে শব্দব্রহ্মরূপে অবস্থিত। ইহার দেবতা ব্রহ্মা। ইহা শৃঙ্গার রসে গেয় এবং পাবক ইহার গায়ক। ময়ূর ইহার বাহন হইয়া ইহার স্বর অনুকরণ করে।

শ্রুতি বিচারে দেখান হইয়াছে যে এই ষড়্জ স্বর চতুঃশ্রুতিসম্পন্ন হইয়া ছন্দোবতী নামক চতুর্থ শ্রুতিতে অবস্থিত হেতু ইহা চতুর্থ নক্ষত্র রোহিণীর সহিত সম্বন্ধবদ্ধ। রোহিণী নক্ষত্রের দেবতা প্রজাপতি কমলজ। সুতরাং ষড়্জ হইল ব্রহ্মদৈবত।

ঋষভ

"প্রাপ্নোতি হৃদয়ং শীঘ্রমন্যস্মাদৃষভঃ স্মৃতঃ।
স্ত্রীগবীনু যথা তিষ্ঠন্বিভাতি ঋষভো মহান্॥
স্বরগ্রামে সমুত্পন্নঃ স্বরয়োঋষভস্তথা।
এক বক্ত্র চতুর্হস্তঃ পাণিভ্যাং কমলে দধৎ॥
বীণাং বিভ্রতকরাভ্যাং চ ঋষভো নীলবর্ণভূত।
অগ্নিস্তদৈবতং গাতা তু পদ্মভূঃ॥
রস হাস্যোস্য যানং গৌরীতি শৃঙ্গারহারকে।
নাভে সমুত্থিতো বায়ু স্তালু জিহ্বাগ্র সংহতঃ॥
ঋষভন্নদতে যৎ তস্মাদৃষভ উচ্যতে॥"

শীঘ্র অন্য স্বরের সহিত হৃদয়ে উপস্থিতি হেতু ইহাকে ঋষভ বলা হয়। স্ত্রী গবীর পার্শ্বে বৃষ যেরূপ শোভা পায় সেইরূপ ইহারও স্থিতি। স্বরগ্রামে উৎপন্ন হেতু ইহাকে ঋষভ আখ্যা দেওয়া হয়। ইহা একমুখবিশিষ্ট চতুর্হস্তযুক্ত। ইহার দুই হস্ত কমল শোভিত এবং দুই হস্তে বীণা ধৃত। ইহার বর্ণ নীল। ইহার গায়ক ব্রহ্মা এবং ইনি অগ্নিদৈবত। ইহার রস হাস্য এবং শৃঙ্গার রসেও গেয়। ইহার বাহন বৃষ। নাভি হইতে বায়ু উদিত হইয়া তালু ও জিহ্বাগ্রে সংহত হইয়া উচ্চারিত হয়। বৃষের ন্যায় শব্দ বলিয়া ঋষভ নামে অভিহিত করা হয়।

এই ঋষভ স্বর রতিকা নাম্নী সপ্তম শ্রুতি অবলম্বন করিয়া অবস্থিত। সপ্তম নক্ষত্র হইল অদিতি যাহা হইতে আদিত্য উৎপন্ন। আদিত্যই অগ্নিস্বরূপ। রবির দেবতা শিব ও অগ্নি। বেদে রুদ্রই অগ্নি। অতএব ঋষভ হইল অগ্নিদৈবত।

গান্ধার

"বাচং গানাত্মিকাংধত্ত ইতি গান্ধার সংজ্ঞকঃ।
গন্ধর্ব্বসুখহেতুত্বাদ্গান্ধারো ব্যভিধীয়তে॥
গান্ধারস্ত্বেক বদনো গৌরবর্ণঃ চতুষ্করঃ।
বীণাফলাব্জঘণ্টাভৃত করঃ স্যান্মেষবাহনঃ॥
শঙ্করোদৈবতং সুজর্ব্বজং কুলম্।
বিষ্ণুর্গাতা রসো বীরো জ্ঞেয়োঽথ মধ্যমঃ॥"

বাক্য গীতরূপ ধারণ হেতু গান্ধার সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। গন্ধর্ব্বদিগের সুখকারক হেতু গান্ধার নামে অভিহিত করা হয়। গান্ধার স্বরের একবদন, গৌরবর্ণ ও চারি হস্ত। হস্তসমূহ বীণা, ফল, পদ্ম ও ঘণ্টা দ্বারা শোভিত। মেষ ইহার বাহন। দেব কুলোদ্ভব হইয়া শঙ্কর দৈবতে অবস্থিত। ইহার মুখ্য রস বীর এবং ইহার গায়ক বিষ্ণু। ইহা হইতে মধ্যমকে জানা যায়।

গান্ধার ক্রোধানাম্নী নবম শ্রুতি আশ্রয় করিয়া বসতি করে। নবম নক্ষত্র হইল অশ্লেষা। উহা সন্ধি নির্দেশ করা হেতু কেতুর জন্মনক্ষত্র এবং মনরূপ চন্দ্রের গৃহে অবস্থিত। চন্দ্রকেতু হইল শঙ্করের নাম। সুতরাং গান্ধার হইল শঙ্কর দৈবত। এবং ক্রোধ হইল বীররসের পরিচায়ক।

মধ্যম

"স্বরাণাং মধ্যমত্বাচ্চ মধ্যম স্বরউচ্যতে।
যদ্বা মম প্রিয়ো রোগ ইতি মধ্যম শব্দতঃ॥
যদ্বা সমুত্থিতাদ্বায়োর্বক্ষচিত্তে সমহতাৎ।
মধ্যস্থানমবত্যস্মান্মধ্যমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
মধ্যমস্ত্বেকবক্ত্রঃ স্যাদ্ধেম বর্ণ চতুঃস্বরঃ।
সবীণাকলসৌহস্তো সপদ্মবরদৌ তথা॥
ভারতী দৈবতং বংশঃ সুপর্ব্বজঃ।
গাতাচন্দ্রো রসঃ শান্তঃ ক্রৌঞ্চযানমস্যতু॥"

স্বরসমূহের মধ্যস্থানে অবস্থান হেতু এই স্বরকে মধ্যম বলা হয়। পীড়া যেমন স্বীয় বোধকে বিকাশ করে সেইরূপ শব্দও মধ্যম স্বরকে প্রকাশ করে। অথবা বায়ু যখন উত্থিত হইয়া বক্ষচিত্তে অবস্থিত হয় এবং

মধ্যস্থানে বসিয়া স্বরসমূহের মধ্যতা করা হেতু মধ্যম আখ্যা দেওয়া হয়। মধ্যম এক মুখ বিশিষ্ট, হেমবর্ণ ও চারি হস্তযুক্ত। হস্তসমূহে বীণা, কলস ও পদ্ম শোভিত এবং বরমুদ্রাযুক্ত। ইনি দেবকুলজাত এবং ভারতী দৈবতে অবস্থিত। ইহার গায়ক চন্দ্র এবং ইহার রস শান্ত। ক্রৌঞ্চ ইহার বাহন।

"আর্য্যসঙ্গীতে শ্রুতি" নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে মধ্যম স্বরকে "অর্দ্ধ" স্বর বলা হয় কারণ ইহা সপ্তকটীকে দুইটী সমান অঙ্গের অংশে বিভাগ করে এবং ইহা প্রীতি নামক ত্রয়োদশ শ্রুতি অবলম্বন করিয়া স্বর সপ্তককে ধারণ করিয়া আছে।

ত্রয়োদশ নক্ষত্র হইল কন্যা রাশিস্থ ধারণক্ষম হস্তা নক্ষত্র যাহার দেবতা সবিতৃ। উহাই আর্য্যদিগের একাধারে গায়ত্রী, সাবিত্রী ও সরস্বতী। সুতরাং মধ্যম হইল ভারতী দৈবত।

পঞ্চম

"স্বরাস্তগণং বিস্তারং যোমিমীতে স পঞ্চমঃ।
পাঠক্রমেণ গণমে সংখ্যায়াং পঞ্চমোথবা॥
নাভিহৃৎকণ্ঠমূর্দ্ধোষ্ঠঘাতাত্তারিস্বনঃ।
পঞ্চস্থান সমুদ্ভূতঃ কথ্যতে পঞ্চমস্তদা॥
পঞ্চমোপ্যেকবদনো ভিন্নবর্ণশ্চদটকরঃ।
বীণাকরদ্বয়ে শঙ্খাবাপিচ বরাভয়ৌ॥
স্বয়ংভূদৈবতং পিতৃবংশজঃ।
কোকিল বাহনং গাতা নারদ প্রথমোরসঃ॥"

স্বরসমূহের যে বিস্তার করে তাহাকে পঞ্চম বলে। অথবা সংখ্যা পাঠে পঞ্চম স্থানে অবস্থিত বলিয়া পঞ্চম নামে অভিহিত হয়। পঞ্চাঙ্গ যথা নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, মূর্দ্ধি ও ওষ্ঠ চালনা হেতু ইহা উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহাকে পঞ্চম বলা হইয়াছে। ইহার এক বদন এবং বর্ণ ভিন্ন অর্থাৎ শ্যাম ও ছয় হস্ত বিশিষ্ট। দুই হস্তে বীণা ও দুই হস্তে শঙ্খ শোভিত এবং দুই হস্ত বর ও অভয় মুদ্রাযুক্ত। ইহা পিতৃগণ হইতে উদ্ভূত ও স্বয়ম্ভূ-দৈবতে অবস্থিত। কোকিল ইহার বাহন, নারদ গায়ক এবং রস আদি অর্থাৎ প্রথম।

ইহা আলাপিনী নামক সপ্তদশ শ্রুতি আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। বৃশ্চিক রাশিস্থ সপ্তদশ নক্ষত্র হইল অনুরাধা যাহার দেবতা মিত্র যাহা স্নেহকে ক্ষেপণ করে। ইহা রবির জন্ম নক্ষত্র এবং কিরণ ক্ষেপণ হেতু সূর্য্যের একটী নাম হইল মিত্র। ইহা সকলেরই জানা আছে যে রবি এইখানে আসিলে মিত্র পূজা (ইতু) আরম্ভ হয়। যে স্বরে আত্মার বিশেষ ক্ষেপন হইয়া উদ্ভূত হয় তাহাই স্বয়ম্ভুদৈবত অর্থাৎ স্বয়ং উদ্ভূত। সেই জন্য পঞ্চম হইল স্বয়ম্ভুদৈবত এবং আদিরসে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ধৈবত

"ধীর্ধাস্ত্যাস্তি স ধীবানন্তত:সম্বন্ধী ধৈবত স্মৃতঃ।
পৃষ্ঠস্থানে ধৃতো যস্মাৎ ততো বা ধৈবত স্মৃতঃ॥
ধৈবতো গৌরবর্ণস্যাদেকবক্রশ্চতুর্ভুজঃ।
বীণাম্বু কলস খট্টাঙ্গ ফলশোভিতস্তকরঃ॥
শম্ভুস্ত দৈবতং স্যাদৃষিজং কুলং।
রসো ভয়ানকশ্চাশ্বোযানং গাতা তু তম্বুরুঃ॥"

ধী অর্থে বোধ ও চিত্ত অর্থাৎ বোধ ও চিত্ত জন্য ও জনকের মত সম্বন্ধে আবদ্ধ বলিয়া ধৈবত বলা হয়। এবং যেহেতু পৃষ্ঠস্থানে ধৃত সেই হেতু ধৈবত বলা হয়। ইহার বর্ণ গৌর। ইহা এক মুখ বিশিষ্ট ও চারি হস্তযুক্ত। বীণা, কলস, মুদ্গর ও ফলসমূহের দ্বারা হস্ত সকল শোভিত। ইনি ঋষি কুলোদ্ভব ও শম্ভুদৈবতে অবস্থিত। ইহার রস ভয়ানক এবং ইহার গায়ক তম্বুরু। ইহার বাহন হয়। বিংশ নক্ষত্র হইল হয় নক্ষত্র।

রম্যা নামক বিংশ শ্রুতি অবলম্বন করিয়া ধৈবত অবস্থিত। ধনু রাশিস্থ বিংশ নক্ষত্রের দেবতা আপ্ যাহা আপ্যায়িত করে। ইহাই মঙ্গলের জন্ম নক্ষত্র। শম্ অর্থে মঙ্গল এবং ভূ অর্থে হওয়া। তাই ধৈবত স্বর শম্ভুদৈবত। যাহা জ্ঞানদেবতা রূপে ধীশক্তির সম্বন্ধ করে তাহাই শম্ভুদৈবত।

নিষাদ

"নিষীদন্তি স্বরাঃ সর্ব্বে নিষাদস্তেন কথ্যতে।
নিষাদোগজবক্ত্রঃ স্যাৎ চিত্রবর্ণশ্চতুর্ভুজঃ॥
ত্রিশূল পদ্ম পরশু বীজ পুরকস্তকরঃ।
গণেশো দৈবতঃ বংশঃ সুপর্ব্বজঃ॥
গাতা তু তম্বুরুঃ শান্তি রসঃ স্যদ্বাহন গজঃ।
নিষীদন্তি স্বরা সর্ব্বে নিষাদস্তে ন হেতুনা॥"

নিষাদ অর্থে ব্যাধ। ব্যাধ কথাটী বাধ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। ব্যাধ্—অর্থে হনন বা অন্ত করা। যে প্রাণীগণের রবের অন্ত করিয়া দিনান্তে অবস্থিত হয় সেই নিষাদ। স্বর সপ্তকের এই অন্ত স্বরটী স্বরসমূহের অন্তিমে অবস্থান করিয়া—স্বরসমূহকে অন্ত করা হেতু ইহাকে নিষাদ আখ্যা দেওয়া হয়। নিষাদের মুখ গজের ন্যায় এবং ইহার বর্ণ চিত্রিত ও ইনি চতুর্ভুজ। হস্ত সমূহে ত্রিশূল, পদ্ম, পরশু ও বীজ শোভিত। ইনি দেববংশ সমুদ্ভূত ও গণেশ দৈবতে অবস্থিত। তম্বরু ইহার গায়ক। ইনি শান্তরস জ্ঞাপক ও গজ ইহার বাহন।

নিষাদ দ্বাবিংশ শ্রুতি ক্ষোভিনীকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। শ্রুতি-সমূহ গণনায় দ্বাবিংশ সংখ্যা। যাহা গণন বা গণ বিভাগ করে তাহাই গণদেবতা গণেশ। সুতরাং নিষাদ স্বর গণেশ দৈবত।

মকর রাশিস্থ দ্বাবিংশ নক্ষত্র হইল শ্রবণা। ইহার দেবতা বিষ্ণু যাহার ত্রিপাদ হেতু গতি বুঝায়। দ্বাবিংশ্রুতি হইল ক্ষোভিনী। ক্ষোভিত অর্থে চালিত, আন্দোলিত, ধর্ষিত ইত্যাদি। ইহার শক্তিতেই ভাবের আন্দোলন ও আলোড়ন হইয়া থাকে।

এই স্বর সমূহ বিশুদ্ধ। ইহারা কেহ বিকৃত নহে। ইহা হইতে

যাহা বিকৃত তাহাই হইল বিকৃত স্বর। এই স্বর সমূহ কোন কোন শ্রুতিতে অবস্থিত হইবে তাহা যথা—

"আদি শ্রুতৌ চতুর্থ্যাং তু স্বরঃ ষড়্জোধিতিষ্ঠতি।
সপ্তম্যাং ঋষভস্তদ্বৎ গান্ধারস্য স্থিতি পুনঃ॥
নবম্যাং তু ত্রয়োদশ্যাং মধ্যম পঞ্চমস্ততঃ।
সপ্তদশ্যাং ধৈবতস্তু বিংশামথ নিষাদকঃ॥
দ্বাবিংশ্যামিতি মন্দ্রস্থাং স্বরাসপ্ত প্রকীর্তিতিঃ।
ইদৃশ্যেব স্থিতিমধ্যে তারে চৈবেদৃশী স্থিতিঃ॥"

সঙ্গীত বিলাস

অর্থাৎ আদি শ্রুতি হইতে চতুর্থ শ্রুতিতে ষড়জ, সপ্তম শ্রুতিতে ঋষভ, নবম শ্রুতিতে গান্ধার, ত্রয়োদশ শ্রুতিতে মধ্যম, সপ্তদশ শ্রুতিতে পঞ্চম, বিংশ শ্রুতিতে ধৈবত এবং দ্বাবিংশ শ্রুতিতে নিষাদ এই ভাবে স্বর সমূহকে শ্রুতি সকলে বসাইতে হইবে। এইরূপ ভাবে মন্দ্র, মধ্য ও তার স্থানে স্বর সপ্তক বসিবে।

এই যে স্বর স্থাপনা দেখান হইল ইহার সহিত আধুনিক স্বর স্থাপনার কোন সামঞ্জস্য নাই। আধুনিক স্বর স্থাপনা পাশ্চাত্য tempered scaleএর ওজনে হওয়া হেতু প্রাচীনদের সহিত এত পার্থক্য এবং সেই কারণবশতই সঙ্গীতের যাহা প্রকৃত উদ্দেশ্য তাহা হইতে বিচ্যুত। এই সমস্ত কারণ হেতু আর্য্যসঙ্গীতের এত অবনতি ও রসাভাব পরিলক্ষিত হয়।

সঙ্গীতের উৎপত্তি নামক প্রবন্ধে একটী রাগিনীর নাম অন-বধানতা-বশত বাদ পড়িয়া গিয়াছে। তাহা হইতেছে নটনারায়ণ রাগের একটী রাগিনী। সেটি হইতেছে "কম্পন হইতে—নাটিকা" রাগিনীর উদ্ভব। পাঠক পাঠিকারা ইহা সংশোধন করিয়া লইবেন।

—শিবম্—

জন্মাষ্টমী

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

আজি এ অধীর তিমির-গভীর রাতে
অষ্টমী-চাঁদ এখনো দেয়নি দেখা
তবু বিনিদ্র আমার আঁখির পাতে
ঝলকিয়া উঠে আঁধারের জ্যোতি রেখা।
আজি বরষার নিঝুম অর্ধ রাতে
অসাড় ভুবন গভীর নিদ্রাময়
তবু যেন কার কোমল চরণ পাতে
নুপুরের চারু অস্ফুট ধ্বনি হয়।
আকাশে বাতাসে ভাসে যেন আজি কার
মাধুরী-মাখান অঙ্গের পরিমল,
ভারি হয়ে উঠে নিশীথ অন্ধকার
শিশির-বিন্দু ঢালে চন্দন জল।
তারায় তারায় নীরবে বলিছে কথা
সাগরে সাগরে ঢেউএর নাচন জাগে
সহসা লুপ্ত পুঞ্জিত শত ব্যথা
জীবন জুড়ান পরশ হিয়ায় লাগে।

প্রকৃতি ও পুরুষ

শ্রীউমাপদ নাথ

সংযমের বালি-বাঁধ চুম্বনের কূলক্ষয়ী প্লাবনের বেগে
ভেঙ্গে পড়ে অকস্মাৎ: তন্দ্রা ভাঙ্গে মিলনের তড়িৎ-সম্বেগে।
বন্ধ্যা শীত-উপবনে বসন্তের মালঞ্চের প্রসূন-সম্ভার
ফিরে আসে আচম্বিতে, গ্রথিবারে মদনের পুষ্প-কণ্ঠহার।
মানস-সরসী-নীরে গুঞ্জমান ভ্রমরের কল-আমন্ত্রণে
বিনিদ্রিত শতদল খুলে ধরে, আপনার মধু-গুপ্তধনে:
সুপ্ত রত্নদীপ-মুখে জেগে ওঠে ঘুমোত্থিত উত্তেজিত শিখা,
স্রস্ত বাস আপনার ফেলে দেয় সর্বশেষ ব্যবধান-রেখা।

মহাশূন্য ব্যোমবক্ষে একখানি সীমাহীন চেতনার তনু
আপনার অঙ্গ হতে রচে দুই কামনার চিৎ-পরমাণু—
নিঃসঙ্গ বাসরে দু'টি মিলন-প্রলুব্ধ-প্রাণ প্রেমিক প্রেমিকা,
কামদগ্ধ তুমি আমি, জগতের নর নারী, শ্যাম ও রাধিকা।

চুম্বনের কারাগারে বন্দী হয় বিধাতার অন্তহীন লীলা:
মিলনের রাত্রি হ'তে শুরু হয় জ্যোতির্ময় সৃজনের খেলা।

প্রতিভা-পরিচিতি

জ্ঞানতপস্বী সক্রেটিস

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

যীশুখ্রীষ্ট জন্মাবার বহু পূর্ব্বেকার কথা। সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং সমৃদ্ধির সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠে রোমের এথেন্স নামক মহানগরী তখন স্বর্ণযুগের সোনার তরীতে ভেসে চলেছে। সেই সময় সেই নগরের জনবহুল প্রমোদ-উদ্যানে, হট্টশালায় আর ব্যবসাকেন্দ্রে একটি ব্যস্তসমস্ত উৎকেন্দ্রিক মানুষের গতিবিধি প্রায়ই নজরে পড়ত। বেঁটে-খাটো চেহারা, চেপ্টা নাক, গোল গোল দুই চোখ, দেখতে তিনি সুদর্শন ছিলেন না মোটেই। ব্যস্তভাবে চারিদিকে ঘোরাঘুরি করতেন, আর পথ-চলতি লোকের সঙ্গে কথা বলতেন অনর্গল। সারাদিন কাজ কিছুই করতেন না। কেবল কথা আর কথা। অহোরাত্র পরিচিত অপরিচিত নরনারীর কাছে তাঁর আদর্শের কথা, তাঁর দর্শনের কথা, নানা উদাহরণ আর ব্যাখ্যার সঙ্গে বুঝিয়ে বলাই ছিল তাঁর একমাত্র কাজ।

অলোকসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন, মহাদার্শনিক সক্রেটিসের লেখা বিশেষ কোন গ্রন্থ জগতের লোক পাঠ করেনি। কিন্তু তবুও তিনি যে নিখিল বিশ্বের মান্য এবং স্বীকৃতি লাভ করেছেন, তাঁর কথা যে জগতের লোক পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছে, তা সম্ভব হয়েছে তাঁর দুই প্রধান শিষ্যের প্রচেষ্টায়। বিখ্যাত দুই দার্শনিক প্লেটো এবং জেনোফোন সক্রেটিসের বাণীগুলি সংকলন করে জগতকে উপহার দিয়ে গেছেন। সেই বাণীর মধ্য দিয়ে বিশ্ববাসী তাঁর বিরাটত্ব উপলব্ধি করেছে।

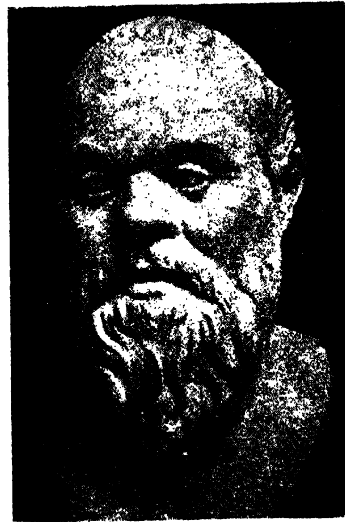
* * * *

খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৪৬৯ অব্দে এক ভাস্করের ঘরে সক্রেটিসের জন্ম হয়। ছেলেবেলায় তিনি অনেকদিন রাজমিস্ত্রির কাজ করেছিলেন। তাঁর মা ছিলেন ধাত্রী। সক্রেটিস বলতেন, এক হিসাবে জীবন ভোর তিনি মায়ের পেশাই অবলম্বন করেছিলেন, জীবের না হোক, চিন্তার ধাত্রীগিরি করাই তো ছিল তাঁর কাজ!

যৌবনকালে তাঁর সাহস আর তেজ ছিল অসিম। সত্তর পারেও সে দীপ্তি ম্লান হয়নি। প্রথম যৌবনে দেশের জন্যে যুদ্ধে গেছেন একাধিকবার। একবার এক সম্মুখ-যুদ্ধে অসমসাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করে নিজের দলের প্রধান সেনাপতি খ্যাতনামা যোদ্ধা অ্যাল্‌কিবিয়াই-ডিসের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। পরবর্তীকালে অ্যাল্‌কিবিয়াইডিস্ তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রধান শিষ্যরূপে পরিগণিত হয়েছিলেন।

শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, রোদ নেই, বর্ষা নেই, নগরীর পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন সক্রেটিস। পরণে জীর্ণবাস, পায়ে জুতো নেই, অত্যন্ত দরিদ্রের মত চেহারা। কিন্তু সম্মান পেতেন রাজার মত। তাঁর জীবদ্দশাতেই দেশের লোক তাঁকে তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকরূপে অভিনন্দিত করেছিল। আখ্যা পেয়েছিলেন—"প্রতীচীর বিজ্ঞতম সুধী।"

মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল অপরিসীম। তাঁর কাছে ছোট বড় উচ্চ নীচ ভেদাভেদ ছিল না। সকাল বেলা অল্প কিছু আহার করে



সক্রেটিসের ব্রোঞ্জমূর্ত্তি

তিনি পথে বার হতেন। আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হত তাঁর কাজ। কাজ মানে কথা। শোন বন্ধু, শোন! কি তোমার মনের ইচ্ছে? কি চাও তুমি? মন খুলে বল তো তোমার মনের কথা? সোজা সোজা কথা দিয়ে মানুষের সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করতেন। সৎ হতে চাও না? সততা ভিন্ন মানুষ যে মানুষই নয়, তা কি জান না? সততাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

ছোট ছোট কথা। ছোট ছোট প্রশ্ন। এমনি করে জনতার সঙ্গে

মনের মিতালি চলত তাঁর। তাদের ভাবিয়ে দিতেন তিনি। মাতিয়ে দিতেন নূতন প্রেরণায়, নূতন জিজ্ঞাসায়।

* * *

রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবার ইচ্ছা না থাকলেও শাসকমণ্ডলীর আদেশে যে-কোন কাজ করতে প্রস্তুত ছিলেন তিনি। রাষ্ট্র-সভার সভ্য হয়েছিলেন কিছুদিন। সেই সভার আলোচনায় এই সত্যাশ্রয়ী দার্শনিককে নিয়ে মাঝে মাঝে মহা অসুবিধা ঘটত। কারণ, তিনি তো আর লোকের মন রেখে কথা বলতে শেখেন নি! শেখেন নি কোন অন্যায় বা অসঙ্গত ব্যবস্থাকে স্বীকার করবার স্বার্থ-নীতি। নৈতিক বীর্যে তিনি ছিলেন অসামান্য বলীয়ান। তথাকথিত "জনমত" তাঁকে প্রভাবান্বিত করতে পারেনি কোনদিন।

বিচারের নামে অভিনয় করবে প্রহসনের? জনতাকে উদ্দেশ করে বললেন, প্রাণ দিয়ে প্রাণের মূল্য বুঝতে হবে, আজ যে অন্যায়রূপী জল্লাদকে তারা ডেকে আনছে, কাল সেই জল্লাদ রক্ত-পিপাসায় তাদের টুঁটি চেপে ধরবে। সুতরাং ও পথে নয়। এগিয়ে আসুক তারা ন্যায়ের পথে, সুবুদ্ধি আর সততার পথে।

কয়েকজন ঈর্ষাদগ্ধ প্রতিপক্ষের উপহাসের ধ্বনিকে দাবিয়ে দিয়ে জনতার জয়ধ্বনি শোনা গেল তাঁর পক্ষে। মৃত্যুপথযাত্রীরা বাঁচলো। জয় হল সক্রেটিসের।

আর-একবার কর্তৃপক্ষ কয়েকজন নাগরিককে কারারুদ্ধ করবার আদেশ প্রদান করেন। সঙ্গে সঙ্গে সক্রেটিস তাঁদের জানালেন যে, আইনের অনুমোদন না থাকলে কারুর স্বাধীনতা হরণ করা শুধু ঘোর বে-আইনী নয়, মহাপাপ। কর্তৃপক্ষ বললেন, তাঁদের কথাই আইন। সক্রেটিস উত্তর দিলেন, যে-কথার মধ্যে সত্য নেই, ন্যায় নেই, সততা নেই, সে-কথা শোনাও পাপ। তাঁদের কথা এবং আইন দুইই সমান অসৎ। সক্রেটিস জীবনে কোন অসৎ কাজকে প্রশ্রয় দেবেন না, এই তো তাঁর একমাত্র ব্রত। সুতরাং নির্দোষী নাগরিকদের কারারুদ্ধ করবার কাজকে তিনি অনুমোদন করতে পারেন না। প্রত্যাহার করতে হবে এই অন্যায় আদেশ।



আমোদ-প্রমোদ রত নাগরিকদের মধ্যে সক্রেটিস তাঁর বাণী প্রচার করছেন

এতবড় কথা? এত ঔদ্ধত্য? প্রাণের ভয় নেই সক্রেটিসের? না, তা নেই। প্রাণের ভয় কাকে বলে তা সত্যিই তাঁর জানা ছিল না। আত্মার অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে তাঁর মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। পুণ্যের প্রতি আস্থা ছিল প্রগাঢ়। বহুবিধ-মূর্তিবিশিষ্ট গ্রীক-পুরাণোক্ত দেবদেবীর পূজা ছিল না তাঁর ধর্ম। এথেন্স তখন ছিল ঘোর পৌত্তলিক। আর তিনি ছিলেন নিরাকারের পূজারী, অদ্বৈতবাদী। তাঁর নীতিশাস্ত্র আর জীবনদর্শনের সঙ্গে ভারতীয় ভাবধারার অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে।

একবার জনমতের খাতিরে কয়েকজন এথেনীয় সেনানীকে অন্যায়ভাবে বিচার ক'রে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। বিচার-পরিষদে সক্রেটিস ছিলেন। একমাত্র তিনিই সেই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে কঠোর অভিমত জ্ঞাপন করলেন। দণ্ডিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিক্ষোভ ছিল প্রবল। সেই বিক্ষোভের মুখে একাকী রুখে দাঁড়ালেন তিনি। কোনদিন কোন অন্যায়কে মুখ বুজে সহ্য করেন নি। অবিচারের কাছে মাথা নত করা তাঁর কোষ্ঠীতে লেখা ছিল না। প্রাণের ভয়ে অথবা মানের দায়ে বিচার-বুদ্ধিহীন জনতার কাছে আত্মসমর্পণ করবার মতো ভীরুতা ছিল না তাঁর মনে। তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে আসামীদের পক্ষে সওয়াল করলেন। ভুল করেছে জনতা, তাই বলে কি বিচারকরাও ভুল করবে? প্রশ্রয় দিয়ে অন্যায়ের?

* * *

কিন্তু এতখানি তেজ, সাহস আর আত্মস্বাতন্ত্র্য অনেকেরই সহ্য হল না। অনেকে তাঁকে আত্মম্ভরী, ধর্মদ্বেষী এবং দেশদ্রোহী বলে কটূক্তি করলে। সেই দলে অ্যারিস্টোফেনস্-এর মতো শিক্ষিত ও বিখ্যাত নাট্যকারও ছিলেন। তাঁর একটি নাটকে তিনি সক্রেটিসের এক বিকৃত চরিত্র অঙ্কিত করেছিলেন। সক্রেটিস দেশের যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে নিজের

উদ্ভট এবং প্রমাদপূর্ণ মতামত প্রচার ক'রে তাদের ভুল পথে নিয়ে চলেছেন, অধর্ম্ম আর পঙ্কিলতার মধ্যে দেশকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন, এই অভিযোগ উঠ্‌লো চারদিকে। একাধিক দল গড়ে উঠ্‌ল তাঁর বিপক্ষে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও ছাত্রের সংখ্যা, জিজ্ঞাসু এবং মুমুক্ষুর সংখ্যা বাড়তে লাগল দিন দিন। এলেন দুর্দ্ধর্ষ ক্রিটিয়াস, বীরশ্রেষ্ঠ অ্যালকিবিয়াইডিস, দার্শনিকত্রয় ক্রিটো, প্লেটো ও জেনোফোন। দূর দুরান্তর থেকে এলেন আরও অনেক মনীষী এবং সত্যসন্ধানী। এলিস পেরিক্লিস, থিবিস ও ইউরিপাইডিস। পৃথিবীর অনন্যতম জ্ঞানতপস্বীর পাদমূলে বসে তাঁরা এক নূতনতর জীবন-দর্শনের পাঠ নিলেন।

* * * *

সক্রেটিস বিবাহ করেছিলেন, একথা ভাবলে আশ্চর্য্য লাগে। সাধারণ গৃহস্থালীর পরিবেশের মধ্যে তাঁকে কল্পনা করা কষ্টসাধ্য। কিন্তু তিনি বিবাহ করেছিলেন এবং একবার নয়, দু'বার। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে জন্মেছিল দুটি পুত্র সন্তান। তারপর বিবাহ করেছিলেন জ্যানথিপি-কে, "দজ্জাল" স্ত্রীলোকরূপে যার অখ্যাতি চলে এসেছে প্রবাদের মত। কিন্তু সবটাই কি ছিল সেই নারীর দোষ? এক আধ-পাগলা, স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যব্রতী, সংসার সম্বন্ধে উদাসীন, আত্মভোলা, উৎকেন্দ্রিক দার্শনিককে নিয়ে ঘর করা যে কি বিড়ম্বনা তা ভুক্তভোগিনী ভিন্ন আর কে বুঝবে?

শত্রুরা লেগেছিল পিছনে। চেষ্টার অন্ত ছিল না তাদের। শেষ পর্য্যন্ত খ্রীষ্টপূর্ব ৩৯৯ অব্দে, সক্রেটিসের যখন সত্তর বছর বয়স, তখন তাদের উদ্দেশ্য সফল, প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ হল, রাষ্ট্র-কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে কারারুদ্ধ হলেন তিনি, বিচারাধীন আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হল তাঁকে! তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল দ্বিবিধ! রাষ্ট্র যে সকল দেবদেবীর পূজা অনুমোদন করেছে তাদের প্রতি তাঁর বিশ্বাস নেই, তিনি ধর্ম্মদ্বেষী এবং তিনি দেশের যুবসম্প্রদায়কে কু-আদর্শে অনুপ্রাণিত করে অধঃপতনের পথে নিয়ে যাবার প্রয়াসী।

সক্রেটিসের পক্ষে দাঁড়ালেন তখনকার-দিনের শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ এবং বাগ্মী লাইসিয়াস। জোরালো এক জবাব রচনা করে লাইসিয়াস সেই লেখাটি সক্রেটিসকে পড়তে দিলেন। হাজতে বসে সক্রেটিস সেটি পড়লেন। তারপর ধন্যবাদের সঙ্গে লেখাটি ফিরিয়ে দিলেন। তাঁর স্বপক্ষে এ-লেখা ব্যবহার করবার প্রয়োজন নেই। আত্মপক্ষ সমর্থনে পেশাদারী সাহায্য গ্রহণ করা বীর্য্যবত্তার পরিচায়ক নয়। দার্শনিক হবেন উদার অথচ অনমনীয়। লাইসিয়াসকে অশেষ ধন্যবাদ। নিজের কথা তিনি নিজেই বলবেন।

বললেন—"হে আমার দেশবাসী! হে আমার অতিপ্রিয় এথেন্সের নাগরিক! আমার অভিযোগকারীরা আমার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রয়োগে যে অসামান্য কৌশলের আর বাগ্মিতার পরিচয় দিয়েছেন তা শুনতে শুনতে বারংবার আমার মনে হয়েছে, বুঝি তাঁদের কথাই সত্যি। কিন্তু আসলে তা নয়। আমি জানি আমি দাঁড়িয়ে আছি সত্যের উপর। যে সত্য অখণ্ড এবং অনির্ব্বচনীয়। তাঁরা যে সব সাক্ষীসাবুদ উপস্থিত করেছেন তাদের খণ্ডন করবার প্রবৃত্তি আমার নেই। আমার যা কর্ত্তব্য তা থেকে বিচ্যুত হব না আমি কোনদিন কোন অবস্থায়। সে কর্ত্তব্য কি? সে কর্ত্তব্য তোমাদের সুখী করা, তোমাদের সত্য পথের সন্ধান দেওয়া। বিচারকদের রায় অপেক্ষা ভগবানের রায় আমার কাছে বড়। একমাত্র তাঁর আদেশ আমি স্বীকার করে নেব।"

রেগে আগুন হলেন বিচারকমণ্ডলী। আসামীর ঔদ্ধত্য অমার্জ্জনীয়। কঠিনতম শাস্তির যোগ্য।

বিচারকদের উদ্দেশ করে সক্রেটিস বললেন—"আপনারা আমায় এই সর্ত্তে মুক্তি দিতে চান যে আমি আমার প্রচারকার্য্য বন্ধ করব, আমার আদর্শের পথ পরিত্যাগ করব। কিন্তু তা আমার দ্বারা সম্ভব নয়,



সক্রেটিসের প্রিয়তম শিষ্য প্লেটো

জীবনে সম্ভব হবে না কোনদিন। যতদিন বাঁচবো, ততদিন পথের লোককে ডেকে বলব, স্থূল পার্থিব সম্পদের মোহে তুমি ভুলেছো নিজেকে, হে আত্মবিস্মৃত, তোমার মধ্যে যে বিরাট মনুষ্যত্ব আছে তাকে জাগ্রত কর, জ্ঞান এবং সত্যের পথে অগ্রসর হও, তোমার আত্মার কল্যাণ হবে। মৃত্যু কি তা আমি জানি না, কিন্তু তার ভয়ে আমার হৃদয় কম্পিত নয়।"

দণ্ডাদেশের বেলায় মতভেদ দেখা দিল। কয়েকজন বেশী হল মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে। সক্রেটিস মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। বিষপান করে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। তখনকার দিনের প্রচলিত প্রথা।

শান্তভাবে সক্রেটিস দণ্ডাদেশ গ্রহণ করলেন। মুখে মৃদু মধুর হাসি

দেখা দিল। বললেন—"এইবার আমাদের ভিন্ন পথে যাবার সময় হল। আমি চললাম মৃত্যুর পথে, তোমরা রইলে বাঁচার পথে। কিন্তু কোন্ পথ যে অধিকতর কল্যাণের তা জানেন একমাত্র ভগবান।"

সেই সময় দেশে একটি ধর্ম্মীয় উৎসব চলছিল। তাই তাঁর মৃত্যুর ব্যবস্থা তিন সপ্তাহের জন্যে স্থগিত রইল। জেলের মধ্যে রাখা হল তাঁকে, হাতে পায়ে শিকল বেঁধে। বন্ধু এবং শিষ্যদের দেখা করার বাধা ছিল না। তাই তাঁরা প্রত্যহ গুরুর কাছে সমবেত হতেন। প্রফুল্ল মুখে সরস কথায় তাঁদের সঙ্গে তিনি নানা দার্শনিক আলোচনা করতেন।

তাঁর এক বিশ্বস্ত শিষ্য ক্রিটো একদিন এসে গোপনে তাঁকে জানালেন যে সক্রেটিসের পলায়নের পাকা ব্যবস্থা করেছেন তিনি। ইচ্ছা করলেই তিনি কারাগার থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন। অসম্মত হলেন সক্রেটিস। বললেন, দেশের আইনসম্মত বিচারালয়ের আদেশ অমান্য করবেন না তিনি, রাষ্ট্রের অমর্য্যাদা করবেন না।

* * * *

শেষদিনের শেষ দৃশ্যটি মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বিবৃত করেছেন প্লেটো। বন্ধুরা এলেন তাঁর কাছে। সকলেরই মুখ বিষণ্ণ। চাপা কণ্ঠস্বরে সকলেরই মনের আবেগ ফুটে উঠ্‌ছে। পাশে বসে স্ত্রী কাঁদছেন।

সক্রেটিসের চোখে মুখে কিন্তু বিষাদের কোন চিহ্ন নেই। বন্ধু এবং শিষ্যদের প্রসন্ন হাস্যে অভ্যর্থনা করলেন। ক্রিটোকে ডেকে বললেন—"জ্যানথিপিকে নিয়ে যাও বন্ধু! আমি চলে যাবার পর তাকে দেখো, সান্ত্বনা দিও। আমার যা বলবার কথা তা আমি তোমাদের মধ্যেই তো রেখে গেলাম।"

পত্নী বিদায় নিলেন। উঠে বসলেন সক্রেটিস। সেদিন তাঁর পায়ের শিকল খুলে দেওয়া হয়েছে, লৌহ জিঞ্জিরের দাগ কেটে ব'সে গেছে হাতে পায়ের নানা স্থানে। সেই সব স্থানে হাত বুলোলেন খানিকক্ষণ। তারপর মৃদুনম্রকণ্ঠে সেদিনের শেষ আলোচনা আরম্ভ করলেন। আরাম কাকে বলে? বেদনাই বা কোন্ বস্তু? তাদের সম্পর্ক নিরূপণ করা যাবে কোন্ পথে? জীবন, মৃত্যু এবং আত্মা, তাদের স্বরূপ কি? কি বা তাদের সংজ্ঞা? এমনি নানা দার্শনিক বিষয়ের আলোচনা হল অপরাহ্ন পর্য্যন্ত।

সন্ধ্যা হল। স্নান করলেন সক্রেটিস। সূর্য্যাস্ত এবং রাত্রি আরম্ভের সন্ধিক্ষণে নির্দিষ্ট ছিল জীবনাবসানের চরম সময়। এলো সেই মহামুহূর্ত্ত। একজন রাজকর্ম্মচারী বিষপাত্র এনে তাঁর সামনে রাখলে। আর্ত্তকণ্ঠে বললে—"প্রভু! আমার অপরাধ নিও না। আমি হুকুমের চাকর।" সক্রেটিস পরম স্নেহে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। লোকটি কেঁদে আকুল হল।

বিষপাত্র হাতে নিলেন। কিছুটা নিবেদন করলেন ঈশ্বরকে। বাকী যা রইল, এক চুমুকে পান করলেন। নীলকণ্ঠের মতো পৃথিবীর সমস্ত কলুষ যেন নিজের মধ্যে গ্রহণ করলেন তিনি। বন্ধুরা বিহ্বল হয়েছিল। খেদোক্তিতে কারাগার অনুরণিত হল। সক্রেটিস তাদের মৃদু তিরস্কার করে বললেন—"স্ত্রীলোকের মত তোমরাও কাঁদতে শুরু করলে? এই কি তোমাদের আত্মার তেজ? এতদিন কি এই শিখলে আমার কাছে—এই চিত্তদৌর্ব্বল্য? শান্ত হও তোমরা।"

বিষের ক্রিয়া শুরু হল। নিস্তেজ হলেন সক্রেটিস। তার পর ধীরে ধীরে তাঁর দেহ নিস্পন্দ হল। মুখের উপর ভেসে রইল একটি অনির্ব্বচনীয় জ্যোতির্ম্ময় দীপ্তি—মৃত্যুকে জয় করার দীপ্তি।

তার পর হঠাৎ যেন আকাশ থেকে বজ্র আর বিদ্যুতের বর্ষণ হল। তাঁকে সমাধিস্থ করবার সঙ্গে সঙ্গে চেতনায় উদ্বুদ্ধ হল এথেন্সের নাগরিক। নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ক্ষেপে উঠল তারা। তাড়া করলে বিচারকদের। একঘরে করলে তাদের। বিচারকের আসনে ব'সে যারা সক্রেটিসের বিচার করেছিল, সমাজের আসন থেকে তারা বিচ্যুত হল। লোকালয়ে মুখ দেখাবার উপায় রইল না তাদের। ক্রোধে ক্ষোভে দিশাহারা হয়ে তাদের মধ্যে কয়েকজন শেষ পর্য্যন্ত আত্মহত্যা করলে।

দিকে দিকে সক্রেটিসের নামে জয়ধ্বনি শোনা যেতে লাগল। দেশের লোকের কাছে তাঁর নাম হল জপমালা। চারিদিকে সে কী তুমুল আলোড়ন! দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পী তাঁর এক ব্রোঞ্জের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করলেন। দেবতার বেদীতে বসলেন তিনি। দেশবাসীর অন্তরের আঙিনায় আসন গ্রহণ করলেন।

প্লেটো লিখলেন—"দর্শনশাস্ত্রকে আকাশ থেকে মাটিতে নামিয়ে আনলেন তিনিই প্রথম। বিমূর্ত্ত অধিবিদ্যাকে পরিহার ক'রে তিনিই প্রথম সহজ রাস্তায় মানুষকে নীতিগত দর্শনের কথা শোনালেন, মানুষকে শিব, সত্য ও সুন্দরের সন্ধান বলে দিলেন।"

প্লেটোর কথার মধ্যে আমাদের দেশের সেই শাশ্বত বাণী, সত্যম, শিবম, সুন্দরম-এর প্রতিধ্বনি শুনতে পাই।





দেশ-মাতৃকা—মৃন্ময়ী ও চিন্ময়ী

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

(১)

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী—এ নীতি জন্মভূমিকে জননীর মঙ্গল আসনে অভিষিক্ত করেছে। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নাই যে পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে এসে জন্মভূমি কথাটি আজ যে ব্যাপক ব্যুৎপত্তি লাভ করেছে, প্রাচীনকালে সে অর্থবোধ সূচনা করত না এ শব্দ। জননীর পর্য্যায়ে প্রাচীন ভারত কেন জন্মভূমিকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, সে শুভ অভিপ্রায় স্পষ্ট। জননী বক্ষে ও কক্ষে ধারণ ক'রে সন্তানকে প্রতিপালন করেন। জাতি ও ভুক্তি তাঁর কৃপায় মুক্তির উপায়। শিশুর মনে গাঁথা থাকে মায়ের রূপ এবং তার সঙ্গে স্নেহ, প্রীতি ও নিঃস্বার্থতা। মানুষের শিশুকাল হ'তে মাতৃ-জীবনের শেষদিন অবধি, দয়া, দাক্ষিণ্য ও কোমলতার শিক্ষা, জ্ঞানে-অজ্ঞানে, সচেতন করে মানব-চিত্ত যদি মানুষ জননীর দেবীত্ব বিস্মৃত না হয়। আর এই ভাব মনে গেঁথে দেবার জন্যই উপনিষদ শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন মন্ত্রে—

মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব।
আচার্য্য দেবো ভব। অতিথি দেবো ভব।
যান্যনবদ্যানি কর্ম্মানি তানি সেবিতব্যানি, নো ইতরাণি।
যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি। *

জননীকে জ্ঞান করিবে দেবতা। পিতাকে দেবতা মনে করিবে। আচার্য্যকে দেবতা মনে করিবে তথা অতিথিকে। আমাদের যে সব কর্ম্ম অনিন্দ্য তাহাই করিবে, অন্য কর্ম নহে। আমাদের যে সকল কর্ম সুচরিত, তাই করিবে তুমি আচরণ।

এই সংক্ষিপ্ত নীতি—বিবৃতি স্পষ্ট নিদেশ করত আর্য্য শিষ্যের জীবনের আদর্শ। কিন্তু সে উপদেশের প্রথম শিক্ষা—মাতা মূর্ত্তিময়ী দেবী।

সিংহাবলোকন ন্যায়ের দৃষ্টিতে—জননী জন্মভূমি স্বর্গ হতেও গরীয়সী—এ বাণীর মর্ম কথা স্পষ্ট। জননীর মতো জন্মভূমি আমাদের দেহ পালন করে—সহায়তা করে তার পুষ্টি ও নিরাময়তায়। দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, মহামানবের দৃষ্টান্ত এবং প্রচলিত নীতি ও বাণী জাগিয়ে তোলে আমাদের প্রাণ-শক্তি—স্নেহশীলা মাতৃ-দেবী যেমন ফুটিয়ে তোলেন মনুষ্যত্ব তাঁর অফুরন্ত দানে এবং স্বার্থ-হীন প্রাণের স্ফুরণে। তাই জন্মভূমি নিজ পালয়িত্রী জননীর উচ্চ-ভূমিতে অধিষ্ঠিত, কর্তব্য-বুদ্ধি-পুষ্ট চিত্তে।

আর্য্য-কৃষ্টি পুনর্জন্ম মানে। কোন্ পরিবেশে জীব জন্ম-গ্রহণ করবে, সে রহস্যের মূলে বিদ্যমান তার জন্ম-জন্মান্তরের কৃত-কর্মের পরিণাম। এ সত্যে মন প্রতিষ্ঠিত হলে আরও মাহাত্ম্য প্রতিভাত হয় জন্মভূমির। ভারতবাসী শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, পরেশনাথ, মহাবীর, গৌতম বুদ্ধ, কালিদাস, বেদব্যাস, শঙ্করাচার্য্য, মহাপ্রভু তুলসীদাস, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বঙ্কিম, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের দেশে জন্ম-লাভ করতে পারে মাত্র সুকৃতির ফলে। সে ভাগ্যের পূর্ণ আশীর্বাদ লাভ হয় দেশমাতৃকার মৃণ্ময় ও চিন্ময় রূপ-মাধুরীতে চিত্ত সন্নিবেশ করলে। জন্মভূমির বক্ষভেদ করে বৃক্ষ ওঠে। ফলে ফুলে, শস্যে ও তরুমূলে আমাদের দেহ হয় পুষ্ট ও বর্দ্ধিত—যেমন জননীর স্তন্যামৃত পানে মানুষ হয় লালিত ও পালিত।

চিন্ময়ী দেশ-জননী তাঁর সন্তানের যুগ-যুগান্তরের সমবেত দয়া, মায়া, স্নেহ, ভালবাসা এবং বিশিষ্ট কৃষ্টি ও সাধনার সার। দেশ-মাতৃকার মৃন্ময়ী মূর্তি যেমন আনন্দময়ী তেমনি আনন্দময়ী তাঁর চিন্ময়ী মূর্তি। বাহিরের দৃষ্টি পরের জন্মভূমির বিভিন্ন রূপ নিরীক্ষণ করে। কিন্তু কোনো দেশের সন্তান, একান্ত নির্লজ্জ বা বিদ্রোহী না হ'লে মাতৃ-দেহ ভাবে না কদাকার। শ্যামল শস্য পরিবৃত স্রোতস্বতী-বহুল স্বদেশকে এ দেশের মানুষ যেমন ভালবাসে, জলন্ত মরুভূমির বেদুইন সন্তান আরবের মৃন্ময় রূপকে তেমনি চক্ষে দেখে নিঃসন্দেহ।

অর্জুনের বিষাদের কারণ বিশ্লেষণ করলে আমরা

* তৈত্তিরিয়োপনিষৎ ১।১১।২

স্বদেশের চিন্ময় রূপের প্রতি শ্রদ্ধার একটি প্রধান কারণের সন্ধান পাই। দেশের প্রত্যেক লোক অবশিষ্ট সকল অধিবাসীর প্রতি ভ্রাতৃ-ভাব পোষণ করে, এ ভাবনা ধৃষ্টতা। মৈত্রী যেমন মানব-চেতনার সংস্কার, তেমনি সংস্কার দ্বেষ। অনুরাগ বা দ্বেষ কেহ পরিত্যজ্য নয় মানব-চিত্তে—এমনি মায়াময়ী বিশ্বজননীর সৃষ্টি লীলা। তাই প্রীতি ও বৈরিতার বিপরীতমুখ স্রোতের উৎপীড়ন সহ্য করতে পারেননি অর্জুনের মতো সাধক—অন্যে পরে কা কথাঃ।

যাদের জন্য রাজ্য ভোগ ও জীবনের আকাঙ্ক্ষা, তাদের বাদ দিয়ে জীবনধারণের সঙ্কল্প নিরর্থক। তেমন আত্মীয়ের তালিকা দিলেন অর্জুন সখা সারথিকে। আচার্য্য, পিতৃ-পুরুষ, পুত্র-স্থানীয় স্নেহের পাত্র, মাতুল, শ্বশুর, শ্যালক ও কুটুম্ব, বন্ধুত্বে ও বৈরিতায় জীবন স্রোতকে সচল রাখে। সেদিন তাদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল পাণ্ডবদের শত্রু। তাদের হত্যা চাহিলেন না পার্থ। সে শত্রু-ক্ষয়ে স্ত্রীলোক হবে দুষ্টা। এসব কথার অন্তর্নিহিত যুক্তি হৃদয়ঙ্গম করলে বোঝা সহজ—কেন ব্যক্তি-জীবনে সমাজের প্রভাব প্রচুর। মানুষ চায় মানুষের সঙ্গ—মানুষ বুঝতে। সে আকাঙ্ক্ষা তার পূরণ হয় দেশের-দশের সঙ্গ-সুখে। তাই দেশ বরেণ্য। তার চিন্ময়রূপ অবকাশ দেয় তৃপ্তির।

পূর্বে জন্মভূমি অর্থে ছিল না একত্র সংলগ্ন পৃথিবীর কতকটা অংশ এবং স্বজাতি পরিগণিত হ'ত তারা সবাই যারা সেই ভূ-খণ্ডে বসবাস করত। আর্য্য জাতি কৃষ্টির চরম পরিণতির দিনেও শূদ্রকে গণ্ডীর বাহিরে রাখত। আজিও তথা-কথিত সাম্যবাদী গণতন্ত্রে মানুষে মানুষে যথেষ্ট ভেদ আছে—কারণ ভেদবুদ্ধি মনোবৃত্তির একটা উপকরণ। কিন্তু স্বদেশ মৃন্ময় পৃথিবীর একটা টুকরা যে প্রকারই হ'ক তার অধিবাসীর সংগঠন—এ বোধ পাশ্চাত্যের জন্মভূমি শব্দে নিহিত।

প্রাচ্যে বিশেষ ভারতে তেমন ভূখণ্ডের টুকরার প্রতি প্রীতি ছিল না। জন্মভূমি নিজের নগর বা পল্লী ছিল। তার প্রতি শ্রদ্ধা ছিল অগাধ। রাষ্ট্র ছিল ভূপতিকে ঘিরে। সে রাষ্ট্রের প্রতি আস্থাবান থাকতো নাগরিক গর্বে ভয়ে বা রাজার প্রতি শ্রদ্ধাকে ধর্ম ভেবে। কিন্তু চিন্ময়রূপে সারা আর্য্যস্থানের গৌরবে হ'ত গৌরবান্বিত ভারতবাসী। বেদের শ্রুতি কোথায় শুনেছিলেন ঋষিরা, উপনিষদের ঋষি কোন্ প্রদেশের তপোবনে শ্লোক রচনা করেছিলেন, শ্রীশ্রীচণ্ডী লেখা হয়েছিল কোন্ ভূখণ্ডে—এ সব কূটতর্ক সাহিত্য বা পুরাণে পাওয়া যায় না, বা তার গৌরবে অন্য রাজ্যের লোককে অগৌরবের পঙ্কিল তড়াগে নিমজ্জিত হ'তে হ'য়েছিল, সে সমাচার প্রাচীন গ্রন্থে দুর্লভ। চিন্ময়রূপ ছিল সারা ভারতের। মাতৃভূমির মৃন্ময়ীরূপ নমস্য ছিল বাস্তব জন্মস্থল নগর বা পল্লীর রূপ। হিতোপদেশে শ্লোকে শুনি—চিরপ্রবাসী ব্যক্তি, রোগী, পরগৃহবাসী পরান্নভোজীর মত জীবন্মৃত। তবে সেই দেশ পরিত্যজ্য চাণক্যের মতে—যেথায় সম্মান, বৃত্তি, বান্ধব বা কোনো বিদ্যালয় নাই। *

রাষ্ট্রের প্রতি প্রীতি বৈদিক যুগেও ছিল প্রচুর। কিন্তু সে রাষ্ট্র রাজাকে ঘিরে। রাজনীতি ভারতের সকল রাজ্যে সমান করবার ব্যবস্থা ছিল শাস্ত্রের অনুশাসনে। আইন ছিল শাস্ত্র-গ্রন্থের নির্দেশ। রাজার যথেচ্ছাচারের প্রতিরোধ হত ব্রাহ্মণের প্রভাবে। সে প্রভাবের আয়ুধ ছিল শাস্ত্রানুশাসন। শাস্ত্রবিধি ছিল সার্বভৌম।

শুক্ল যজুর্বেদের রাষ্ট্র-বৃদ্ধি মন্ত্র অনুশীলন করলে বোঝা যায়, সমাজের শান্তি ও কৃষ্টি ছিল ঋষিদের লক্ষ্য এবং আদর্শ। এ শ্লোকে রাজ্যের মৃন্ময় ও চিন্ময় উভয় রূপই পূজিত হয়েছে।—

"হে ব্রহ্মন, আমাদের রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ এবং অধ্যয়ন রত হন। এই রাষ্ট্রের ক্ষত্রিয়েরা শত্রু-ভেদনশীল শরযুদ্ধ-নিপুণ, মহারথী হন। আমাদের রাষ্ট্রে ধেনু প্রচুর দুগ্ধ-দাত্রী, বৃষভ মহাভারবাহী, অশ্ব শীঘ্রগামী, নারী সর্বগুণ-সম্পন্না (এবং) যোদ্ধা জয়শীল হ'ক। এই যজ্ঞ দীক্ষিত যজমানের সুসভ্য সন্তান জন্মলাভ করুক।"

এর পর মৃন্ময়ী—

"আমাদের প্রার্থনানুসারে মেঘ বর্ষণ করুক, ওষধি সকল (প্রচুর) ফল প্রসব করিয়া পরিপক্ব হ'ক। আমাদের অলব্ধ দ্রব্য লাভ হ'ক এবং লব্ধ দ্রব্য সুরক্ষিত হ'ক।" †

---

* যস্মিন দেশে ন সম্মানো, ন বৃত্তির্ন চ বান্ধবঃ।
ন চ বিদ্যালয়ঃ কশ্চিৎ তং দেশং পরিবর্জয়েৎ ॥

† আব্রহ্মন ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবর্চসী জায়তাম। আরাষ্ট্রে রাজন্যঃ শূরইষব্যো ইতিব্যাধী মহারথো জায়তাম। দোগ্ধ্রী ধেনু র্বোঢানড্বান্ আশুঃ সপ্তিঃ পুরন্ধির্যোষা জিষ্ণুরথেষ্টাঃ, সভেয়ো যুবাস্য যজমনস্য বীরো জায়তাম। নিকামে নিকামে নঃ পর্জন্যো বর্ষতু। ফলবত্যো ন ওষধয়ঃ পচ্যন্তাম। যোগক্ষেমো নঃ কল্পতাম।

এ রাষ্ট্রের কেন্দ্র অবশ্য নরপতি। শেষে মৃন্ময় রাষ্ট্রের জন্য যে প্রার্থনা, তার মাঝে আধুনিক রাষ্ট্র-নীতির অনুরূপ নীতির সন্ধান পাইনা।

তাই মনে হয় হিন্দু ইতিহাসের সবদিনই জন্মভূমির সঙ্গে ভারতভূমির প্রতি প্রীতি জড়ানো ছিল। রাষ্ট্র ছিল শাসক ঘিরে। ঋক বেদের দেবী-সুক্তে—অহং রাষ্ট্রী—শুনলে মনে হয় প্রত্যেক মানুষকে নিজ নিজ রাষ্ট্রের প্রতি অনুরক্ত রাখবার আদর্শ ছিল মনোরম। কারণ সর্বশক্তি-ময়ী দেবীর একটা রূপ—রাষ্ট্র। রাষ্ট্রে ভক্তি দেবীর প্রতি ভক্তি। নিজ রাষ্ট্রের হিতকামনা বিস্তৃত হয়ে বিশ্ব-প্রাণতা উদ্বুদ্ধ করবার মানসে দেবী বলেছিলেন—"আমি বহুস্থান ব্যাপী। বহুকে আমি নিজের মধ্যে স্থাপন করি। দেবগণ আমাকে বহুস্থানে বিধান করেন"। * অবশ্য এই কস্‌মো-পলিটান সার্বভৌমিক প্রীতির নির্দেশ হ'তে বোঝা যায় যে হয়তো মানুষ তখন নিজ নিজ রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত ছিল না। তাই বিশ্ব-প্রীতি জাগাবার ব্যবস্থা। কিন্তু সে বিশ্ব ছিল আর্য্য-কৃষ্টি-সমুজ্জল বিশ্ব। আর এই বিশ্ব-প্রাণতা ভারতের সংস্কৃতির বিশিষ্ট সম্পদ।

বৌদ্ধনীতি যে সার্বভৌমিকতার আদর্শ প্রচার করেছিল, তাকে বিশ্ব ব্যাপী করবার চেষ্টা করেছিলেন সম্রাট অশোক। সেদিন জানা বিশ্ব হিমালয় ও সাগর বেষ্টনীর বাহিরে বিস্তার লাভ করেছিল। ভারতের খণ্ড রাষ্ট্রগুলির অধিবাসীরা দেশ ভক্ত ছিল—কিন্তু তাদের সে ভক্তি বর্তমান যুগের ন্যাসানালিজম ঘিরে ছিল—এ বিশ্বাস আমার নাই।

ভারতের কৃষ্টি সার্বভৌম উপলব্ধির সন্ধান। আস্তিকা-বুদ্ধি সে কৃষ্টির ছিল পট-ভূমি। শ্রদ্ধা ভক্তি চিত্তশুদ্ধির উপায়। বড় বিস্ময়ের কথা এ দেশে মানুষে মানুষে বিভেদ কলঙ্কের টীকায় রঞ্জিত করেছিল অধিবাসীকে। শান্তি, শ্রদ্ধা, চেতনা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্ষান্তি প্রভৃতি বিভিন্ন গুণের স্মৃতির পরে এদেশের দেবী মূর্ত্তির পরিকল্পনা। যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়া ইত্যাদি, তাঁকে নমস্কার করে হিন্দু নিত্য। কাজেই সর্বভূতের মাঝে এক রাষ্ট্রের লোক বেছে নিয়ে তাদের জোট বাঁধবার দিকে মনোনিবেশ করেনি প্রধানেরা। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হ'ত। রাজ্যের সীমানার পরিবর্তন ঘট্‌তো। কিন্তু সে সব যুদ্ধ-অভিযানের কেন্দ্র ছিল রাজার প্রসার, লোভ ও উচ্চাশা। শক হুনদল বা যবন যারা ভারতের ধর্মগ্রহণ করেছিল তাদের গর্ব ছিল দেশের চিন্ময় রূপে।

মুস্লিম-যুগেও দেশ-ভক্তি নিবিষ্ট ছিল কৃষ্টি-প্রেমে। মুস্লিম-ইমানে দীক্ষিত হবামাত্র নূতন ধর্ম-তত্ত্ব বোঝবার জন্য এদেশের সন্তানকে আরব-কৃষ্টির স্রোতে নিজের জীবন-স্রোত মিশিয়ে দেবার আয়োজন করতে হত। রাজার ধর্ম ইস্‌লাম—তার গৌরব দীক্ষার সঙ্গে তার বাড়াতো গর্ব। চেষ্টা হত পুরাতন সংস্কৃতি বিস্মৃতির। এমন কি নাম অবধি পরিবর্তন করতে হত ইসলাম ইমান গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে। আরব ও পারস্যের চিন্ময়রূপে শ্রদ্ধা জাগাবার আয়োজনে আর প্রয়োজন থাকত না ভারতের চিন্ময়রূপে আত্ম-প্রসাদ লাভ করবার। বাহির হতে রণ-ধারা বাহি যারা এসেছিল তারা এদেশের জীবনস্রোতে আত্ম-নিমজ্জন করেছিল নিঃসন্দেহ। কিন্তু মিশ্র ভারতীয় ও অ-ভারতীয় মুস্লিমধর্মীকে বাহির-চাওয়া হ'তে হ'ত—কারণ ধর্ম-গ্রন্থ ও পয়গম্বর ছিলেন আরব দেশের। সবাই দেশের মৃন্ময়রূপে উল্লসিত হত, এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নাই। যে যুগ-যুগান্তরের কৃষ্টি তাদের রক্তস্রোতে ধ্বনিত হত—তার প্রভাব উপেক্ষা করা ক্রমশঃ কঠিন হ'ল দেশের মুসলমান-ধর্মীর। বাঙ্‌লা সাহিত্যে এ সত্যের প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়।

এইরূপ ধর্মত্যাগের প্রতিক্রিয়া হিন্দুর পক্ষে উদ্বুদ্ধ করলে পূর্ব-পুরুষের সংস্কৃতি-গড়া ভারতবর্ষের চিন্ময় রূপ। কিন্তু পাশ্চাত্যের ন্যাসানালিজম্ এলো না আমাদের দেশে। অজ্ঞাতসারে পারস্য ও আরবের কতক কৃষ্টি এবং বহু শব্দ মিশে গেল আমাদের জীবন-স্রোতে। জাতি-বিভাগের কঠোরতা নিরাকরণ করবার চেষ্টা করলেন গুরু নানক, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষেরা। কিন্তু এসকল উদারতার ফলেও জাতীয়তা সার্বজনীন হতে পারেনি। বিদেশী ইংরাজ, ফরাসী প্রভৃতি এসে দেশ দখল করলে বিভেদের সুবিধায়। দেশ-মাতৃকার পূজার বেদীতে সকল সন্তানের পক্ষে একতাসূত্রে সংবদ্ধ থাকা কর্তব্য বিদেশীর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য, এ বোধ জাগলো না। হিন্দু দেশকে

* ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম।

ভালবাসতো যে কারণে, মুসলমানের দেশ-প্রীতির কারণ বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় তার কারণগুলা ছিল বিভিন্ন। ব্রাহ্মণ যে কারণে ভারত বা বাঙলাকে ভালবাসতো শূদ্রের দেশ ভক্তির মূলে বর্তমান ছিল না সে কারণ। প্রত্যেকে নিজ নিজ আদর্শে দেশ-ভক্ত হলে দেশের স্বার্থ বজায় থাকে না যদি সে আদর্শ না হয় এক-কেন্দ্র। সারা বিশ্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় নীতির সত্যতা— জোর যার মুলুক তার। আর তারই জোর যে পারে বাঁধতে জোট। লুটের লোভ দেখিয়ে পুরাতন সম্রাটেরা জোট বাঁধাতো যোদ্ধার। ধর্মের নামে স্বর্গের লোভ দেখিয়ে, ক্রমে সাম্রাজ্যবাদ, সভ্যতা প্রসার প্রভৃতি যুক্তিতে দল বেঁধে পুষ্টদল পরের দেশ জয় করত।

ইংরাজের অনাচার অত্যাচার ও শোষণের বেদনার চাপে এদেশের লোক ধীরে ধীরে বুঝতে পারলে তার বিজয়-রহস্যের মূল। ইংরাজের দেশের বিদ্যা সুলভ হ'ল এদেশে। সে বিদ্যা চোখ খুললে ভারতবাসীর। তার ন্যাসানালিজম্ একতার মন্ত্র। ওঁকার ধ্বনি একের মন্ত্রে যেমন একদিন ভারতের মহামানবের হৃদয়ে উঠেছিল রণরণি—তেমনি ব্রিটীশ শব্দ সূচনা করে ব্রিটেন-ভক্তি। এই মন্ত্র পাশ্চাত্যকে করেছিল শক্তিশালী। ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ, জার্মান প্রভৃতির মন্ত্র-শক্তি বিশ্লেষণ করলেন আমাদের দেশের প্রবীণেরা। বুঝিলেন মুক্তি সম্ভব তেমনি মন্ত্রের সাধনায়।

ন্যাসানালিজম্ যে জাতীয়তা সূচনা করে তার অর্থ মাত্র দেশ ও তার ঐতিহ্য নয়। ইংরাজের দেশে যে জন্মেছে এবং নাগরিক অধিকার লাভ করেছে, সে ব্রিটিশ; হ'ক সে ঋষি বা পামর, খৃষ্টান, ইহুদী বা নাস্তিক; ভূগোলের অর্থে ধরিত্রীর অঙ্গের একটুক্‌রা ব্রিটিশ। তার অধিবাসীর রক্ত-পরীক্ষায় যে কোনো জাতি উপজাতিরই সন্ধানই পাওয়া যাক না, প্রত্যেক অধিবাসী ব্রিটেনের ঐতিহ্য, গৌরব, স্পর্ধা ও সংযম নিজস্ব করেছে। এটা ব্রিটিশ চরিত্র। তখন আমেরিকা আজকের উন্নত স্থলে বসে নি। আজ আমেরিকা আমেরিকা—পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের লোক তার নাগরিক। সেদিন ঐ রকম জাতীয়তা নিয়ে এসেছিল এদেশে ফরাসী, জার্মান, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ, দিনেমার।

দেশের প্রবীণেরা ইংরাজি শিক্ষার আশীর্বাদে ব্যাপারটা বুঝলেন। সাধারণ ভারতীয় বুঝলো জাতির নামে, জাতীয় পতাকা প্রতীকের প্রতি অপার ভক্তিতে ঐ সব জাতির লোকের অপূর্ব কৃতিত্ব একজোটে কাজ করবার। তারা কৃষ্ণ, কালী, শিবের মূর্তি উপাসনাকে বললে ধর্মোন্মত্ততা কিন্তু পতাকা-দেবতার পূজায় তারা নিজেরা প্রতীয়মান হ'ল উন্মাদ ফ্যানাটিক। পতাকা পূজার বেদীতে তাদের আত্মোৎসর্গ এদেশে শুভানুধ্যায়ীর নয়ন করলে উন্মেষিত। ভারতবাসী বুঝলে তার দুর্দশার মূল হেতু। বীরত্ব সংহতি ঘিরে, ব্যক্তি-কেন্দ্রিক নয়। জীবনের সকল কর্মে সাফল্য লাভ হয় জোট বাঁধার ফলে। কারণ স্বাধীনতা হীনতায় পরম যোগীও স্ফূর্তি পান না মুক্তি-সাধনার সংগ্রামে। দ্বাদশ রাজপুতের ত্রয়োদশ রন্ধন পাত্রই দেশের সর্বনাশের মূল।

জীবনে নিজস্ব নিভৃত একটা স্তর আছে। সেথায় অবশ্য মানুষ আত্ম-ঘেরা। সব লোকের মানসিক বা আধ্যাত্মিক চেতনা এক নয়। কিন্তু সে নিজস্ব সম্পত্তি সংরক্ষণেও আবশ্যক জাতীয় স্বাধীনতার পরিবেশ। এবং জাতীয় স্বাধীনতা মাত্র সম্ভব দেশ-মাতৃকার সেবায়— পাশ্চাত্য জাতির দেশানুরক্তির আদর্শ। ফক দেশে যে বাস করে তাকেই করতে হবে আপনার। স্বার্থকে বিস্তৃত করতে হবে এক্ষেত্রে। আমার আমার নিজ যেমন হেয় কথা যখন ব্যক্তি ঘিরে উচ্চারিত হয়, তেমনি সে মহান যখন সারা দেশকে নিজস্ব করে নিয়ে মানুষ বলে—আমার দেশ, আমার জাতি, আমার কৃষ্টি, আমার ঐতিহ্য। এই জোট বাঁধার দরবারে হিংসা, দ্বেষ, তুচ্ছ স্বার্থ বা পরিজন-প্রীতিকে বিসর্জন না দিলে, দাম্ভিক বিদেশী শাসকের অনাচার বা শোষণ বন্ধ করার আশা দুরাশা। জাতীয় স্বার্থসিদ্ধির সাধনায় চক্ষু মেলে নিজের দেশ-মায়ের মৃন্ময় ও চিন্ময় রূপ পরিদর্শনেই আসে প্রেরণা।

তাই এদেশের মনীষা উপলব্ধি করলে যে ভূগোলের ও চিত্তের জন্মভূমি একত্র মিলে হয়েছে—স্বদেশ। ব্রাহ্মণ-চণ্ডালের মিথ্যা ভেদ-জ্ঞান কলুষিত করেছে এ পুণ্যভূমি ভারতকে যেথা জিমূত-মন্দ্রে ঋষি ঘোষণা করেছেন— সর্ব খল্বিদং ব্রহ্ম। তপস্বী ব্রাহ্মণের দেহও যেমন ব্রহ্মের মন্দির তেমনি মন্দির দরিদ্র অজ্ঞ দেশবাসীর দেহ কারণ

সবার অন্তরে বিরাজ করেন পরব্রহ্ম—তিনি মনিহারের সংযোজক সূত্রের মতো বাঁধন-শক্তি।

এই চেতনা নবীন রং মাখালো দেশের অঙ্গে! সমৃদ্ধ হ'ল দেশের কৃষ্টির মাহাত্ম্য-বোধ। ইংরাজও মানুষ, কাফ্রীও মানুষ। কিন্তু নিপীড়িত ভারতের লাঞ্ছিত, অবমানিত, শক্তিহীন মানুষের ভাণ্ডার-গৃহে অবহেলায় প্রায় অবলুপ্ত এমন মণি রত্ন আছে, মাত্র যার জ্যোতি উদ্ধার করতে পারবে মানব-জাতিকে। ভারতের মানুষ যদি জোট না বেঁধে তার সুমহান সত্যের প্রদীপকে জ্বালিয়ে রাখতে না পারে কোথায় যাবে মানুষ। পাশ্চাত্ত্য বলছে জীব-অভিব্যক্তির চরম বিকাশ মানুষ। আর্য্য সংস্কৃতি বলে দুর্লভ মনুষ্য জন্ম। কিন্তু এই সত্যের দু'মুখ দুদিকে। সামঞ্জস্য মাত্র সম্ভব ভারত থাকলে। ভারত থাকতে পারে জোট বাঁধলে পাশ্চাত্যের মতো—দেশকে বিলাতী ভঙ্গীতে মা বলে ডাকতে শিখলে।

ভারতের প্রকৃষ্ট সাধন-ফল সংরক্ষণ করবার প্রয়োজন বুঝলেন সেদিনের স্বদেশ-হিতৈষী, যার নিগ্রহ ছিল বিদেশী শাসকের নিত্য কর্তব্যের তালিকা-ভুক্ত। এই জাগরণে সাহিত্যের কর্তব্য হ'ল ঘুম-ভাঙ্গাবার সোনায়, কাঠির অনুসন্ধান। সে যে মন্ত্র উদ্ধার করলে তার সাধনা, বীরের পর বীর নির্ভীক সরলতায়, দুর্লভ মনুষ্য-দেহ মাতৃ-পূজার যূপ-কাষ্ঠে নিবেদন করলেন। প্রাণদান মাত্র কর্তব্য বুদ্ধিতে। অক্ষয় কীর্তির লোভ তার মহা-প্রাণে স্থান পায় নি। প্রাণ ছিল দেশ-জননীর মৃন্ময় ও চিন্ময় মলিন রূপে কাতর। জ্যোতিতে জাতীয় আকাঙ্ক্ষার মৌন অভিলাষকে ভাষা দেওয়া হ'ল জাতীয় সাহিত্যের এক দারুণ কর্তব্য। অনাচারে বিস্মরণে অজানা কোন্ ভয়ে সে ব্যথার অভিযোগ মৌন ছিল জাতীয় প্রাণের নিভৃত নিকুঞ্জে। সাহিত্য প্রকাশের অবকাশ লাভ করলে। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ভাষা দিলেন সেই বেদনাকে যেগু মরিয়া দহিতেছিল জাতির প্রাণে।

প্রাচীন সাহিত্যের মধুর সঞ্চয়ের ভাব-ধারা হতে নিজেকে মুক্ত করলেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। কানুর বাঁশী, শ্রীরাধিকার আত্ম-নিবেদন, শ্রীরামচন্দ্রের প্রজানুরঞ্জন তাঁকে পারলে না বেঁধে রাখতে। তিনি সাহিত্যের নবীন রূপ দিলেন। স্বজাতির রুদ্ধ চেতনা মুক্তি পেলে। তিনি মন্ত্র উদ্ধার করলেন—তাঁর জাতীয় তন্ত্রশাস্ত্রের প্রথায়। বন্দেমাতরম্।

সে মন্ত্রের সাথে যে চৈতন্যকে ভাষা দিলেন আচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্র তা বিদেশের অনুকরণে নয়। বঙ্কিমের মাহাত্ম্য হেথায়। সে মহানুভবতা সরস কবির দেশ-মাতৃকার পূজার অর্ঘে দেদীপ্যমান হ'ল। সে বৈশিষ্ট্য, মায়ের মৃন্ময় ও চিন্ময় রূপের ওতপ্রোত সংমিশ্রণ।

জাতীয় সাহিত্যে প্রকৃতির প্রভাব আবহমান বিদ্যমান। তাকে অস্বীকার করতে পারেন নি বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি মায়ের মৃন্ময় ও চিন্ময় সৌন্দর্যকে আরাধনা করতে অনুপ্রাণিত করলেন স্বদেশবাসীকে। কারণ ঋষি বঙ্কিম-চন্দ্রের প্রাণে দশ-প্রহরণ-ধারিণী চিন্ময়ী মূর্তির সাথে লুকানো ছিল মায়ের মৃন্ময়ী রূপের মাধুরী।

বঙ্কিমচন্দ্র মৃন্ময়ী ও চিন্ময়ী মাতৃ-অঙ্গে শক্তি-রূপিনী জননীর গৌরব-দীপ্তি দেখলেন। জননী জন্মভূমি স্বর্গ হতে গরীয়সী—নীতির অন্তর্নিহিত অর্থ বিস্তৃতিলাভ করলে। এ দেশের লোক সেদিন পাশ্চাত্যের রাজসিক প্রকৃতির বাহ্যিক চাকচিক্যে ছিল মোহ-গ্রস্ত। ইংরাজ দেশে খৃষ্ট-ধর্ম এনেছিল। কিন্তু দেশের আধ্যাত্মিক রূপের পরিচয়ের ব্যবস্থা করেনি! সৈন্য সজ্জা এবং শাসনের আড়ম্বরের তালে তাল রেখে করেছিল গির্জা-সজ্জা। সেথাও শৃঙ্খলিত সভ্যতার ছিল বিকাশ—সে ভাব মন্দিরে মসজিদে ছিল অজ্ঞাত। গির্জায় সুশৃঙ্খল বিধি-নিয়মে, উৎকৃষ্ট পোষাকে রবিবারে নির্দিষ্ট সময়ে প্রার্থনা করত বিদেশী। কালা-আদমী তার মর্ম-গ্রহণ বা ধর্ম-গ্রহণ করলেও সকলে প্রবেশাধিকার লাভ করত না ইংরাজের ধর্ম-শালায়।

দেশ জাগাবার মন্ত্র-ছন্দে বঙ্কিমচন্দ্র দেশবাসীর হৃদয়ের সুপ্ত আধ্যাত্মিকতা জাগাবার সূত্রটুকু অবহেলা করলেন না। তিনি দশভূজার শক্তিকে আবাহন করলেন মন্ত্রে। তাই বন্দেমাতরম গানে আমরা দেখি-জননীর ত্রি-মূর্তি—মৃন্ময়ী, চিন্ময়ী এবং শক্তি-রূপিনী।

মৃন্ময়ী মা—সুজলা সুফলা মলয়জ-শীতলা শস্য-শ্যামলা। তিনি ফুল্ল-কুসুমিত দ্রুমদল-শোভিনী, সুহাসিনী, সুমধুর ভাষিনী।

গানের শেষে তিনি আবার তাঁর মৃন্ময়-মূর্তি স্মরণ করলেন—

নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং সুজলাং সুফলাং
মাতরম।

শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং ধরণীং ভরণীং
মাতরম।

দেশ-মাতৃকার চিন্ময়ী রূপ বিশ্লেষণ করে দ্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র বল্লেন—

ত্রিংশ কোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদ করালে—বল্লেন—
তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম, তুমি হৃদি, তুমি মর্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

ভারতমাতার রূপ ছিল সেদিন মলিন—পরাধীনতার কালিমামাখা। মার চিন্ময় রূপে সে চিরদিনের বিশ্ব-প্রেম জীবে দয়া প্রভৃতি চরম সত্যের আবরণ লেপিত ছিল—সে রূপ বুঝলে না বিদেশী। অহিংসা, শান্তি-প্রিয়তা, আর্জ্জবকে না বুঝে শাসক ইংরাজ ভারত-বাসীর চিত্ত-বৃত্তি সংস্কৃতি ও আচরণকে কাপুরুষতা বলে প্রচার করেছিল জগতে। রাবণ বধ হ'য়েছিল তার নিজের অস্ত্রে। শ্রীরামচন্দ্রকেও সংগ্রহ করতে হ'য়েছিল রাণী মন্দোদরীর ভাণ্ডারে সংগোপনে রক্ষিত আয়ুধ—মাত্র যার তেজে সম্ভবপর ছিল দশ-মুণ্ডের নিপাত।

বঙ্কিমচন্দ্র বুঝলেন রাজসিক ইংরাজকে বুঝতে গেলে প্রয়োজন মহিষাসুর বিনাশের মাতৃ-রূপ। অথচ লক্ষীছাড়া হ'লে চলবে না। বিনাশের প্রধান উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠা। অশান্তির অন্তর হ'তে উদ্ধার করতে হবে শান্তি সুমহান। বিদ্যাকে বর্জ্জন করলে হবে না। প্রয়োজন সাহস তার পক্ষে যার কপালে ইংরাজ কাপুরুষতার কলঙ্ক টীকা অঙ্কিত করেছে। ইংরাজ সাহিত্যিক মেকলে বলেছিল—বাঙ্গালীর অস্ত্রাগারে মরণ-বাঁচনের প্রধান অস্ত্র, মিথ্যা সাক্ষ্য, জাল আর কথার তুচ্ছ প্যাচ।

তাই সাহস উদ্বুদ্ধ করবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র বল্লেন—

দ্বিত্রিংশ কোটি ভূজৈর্ধৃন খরকরবালে
কে বলে মা তুমি অবলে।
বহুবল ধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদল-নাশিনীং মাতরম।

আবার তিনি মায়ের রূপ দেখালেন আধ্যাত্মিক পরাশক্তিময়ী। সে রূপে দেশ তাঁকে পূজা করত অথচ বুঝতো না প্রতিমার মূর্তি।

ত্বং হি দুর্গা দশ-প্রহরণ-ধারিণী
কমলা কমল-দল বিহারিণী।

মূর্খের ধন-ভরা সাজানো সংসার মোহের কারাগার, দম্ভ, দর্প, অভিমানের যজ্ঞ-শালা। তাই বাণীকে আবাহন করেও দেখলেন তিনি দেশ-মাতৃকার শ্রীঅঙ্গে সন্নিবিষ্টা বল্লেন—

বাণী বিদ্যা-দায়িনী—
ত্রি-শক্তিকে সাধক কবি—বল্লেন—
নমামি ত্বং।

যদি বঙ্কিমসাহিত্য কোনো অসুরের অভিযানে হয় অবলুপ্ত, দেশবাসীর প্রাণে চিরদিন বিরাজ করবে বন্দে-মাতরম্ মন্ত্র। এই মন্ত্র উদ্ধার করেই তো বঙ্কিমচন্দ্রের ঋষিত্ব পরিস্ফুট। সাহিত্য-গুরু, দেশ-ভক্ত, সৎ-সাহসী বঙ্কিমচন্দ্র তাই দেশের প্রেরণা এবং মুক্তি-মন্ত্রের দীক্ষা-গুরু।



বিশ্বসাহিত্য

নরেন্দ্র দেব

মিশরীয় গল্প 'অম্বুবাতা'

অভিজ্ঞেরা বলেন কথা-সাহিত্যের ইতিহাসে বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন কাহিনী হচ্ছে মিশরদেশের পুরোনো পুঁথির মধ্যে পাওয়া 'অম্বুবাতা'র গল্প। মুখে মুখে অবশ্য বহু গল্পই সেকালে নানাদেশে প্রচলিত ছিল। কিন্তু পুঁথিতে লেখা গল্পের মধ্যে 'অম্বুবাতা'ই পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো একটি লিপিবদ্ধ কাহিনী। মানুষের কল্পনা-শক্তি যে হাজার বছর আগেও বেশ প্রখর ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় এই সবচেয়ে প্রাচীন গল্পটি থেকে। অনুমান সাড়ে তিন হাজার বছর আগে মিশরে 'পেপিরাস' কাগজ উদ্ভাবিত হয়েছিল, যেজন্য আজও পৃথিবীর লোক কাগজকে বলে 'পেপার'। মিশরের জলাভূমিতে প্রাচীনকালে 'পেপিরাস্' নামে একরকম দীর্ঘ তৃণ উদ্গত হ'ত। অনেকটা আমাদের দেশের হোগলার ম'তো। হোগলার ফুল হয় না। পেপিরাসের ডগায় কিন্তু রেশমের মতো এক এক থোপা ফুল হ'ত। মিশরীয়েরা এই তৃণের অগ্রভাগ থেকে কাগজ প্রস্তুত করতেন। এই কাগজের উপর তুলি দিয়ে তাঁরা তাঁদের সেই রহস্যময় প্রাচীন চিত্রাক্ষরের সাহায্যে পত্র লিখতেন। গ্রন্থাদিও রচনা করতেন।

মিশরের মমীর কথা আমরা জানি। মিশরের পিরামিডও আজ জগদ্বিখ্যাত। কিন্তু, প্রাচীন মিশরীয় নরনারীর মনের কথা, তাদের সুখ-দুঃখের অনুভূতি, তাদের প্রেমের আবেগ, তাদের দেবদেবীর উপর অবিচল ভক্তি, পাপ পুণ্য সম্বন্ধে ধারণা, তাদের ঘর সংসারের কথা এবং অলৌকিক ঘটনায় সুদৃঢ় বিশ্বাস প্রভৃতি ব্যাপারগুলির আমরা কতটুকু জানি?...সে আছে তাদের লেখা এই পুঁথির মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়ে। তাদের সেই অতীত জীবনের লুপ্ত স্মৃতি আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছে তাদের এই পুঁথিগুলি, যার পাঠোদ্ধার করেছেন উৎসাহী ভাষাতত্ত্ববিদেরা। এই 'অম্বুবাতা'র কাহিনীটি পৃথিবীর কথা-সাহিত্যের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাচীন হ'লেও এর রচনা-বৈশিষ্ট্য আমাদের বিস্মিত করে দেয়। অতি সহজ সরল অনাড়ম্বর রচনা, কিন্তু কি নিপুণভাবেই না লেখা। শুরু থেকেই গল্পটি চিত্তাকর্ষক। লেখকের ভাব ও কল্পনার সৌন্দর্য পাঠককে মুগ্ধ করে। বিশেষ করে প্রথমাংশটুকু একেবারে অনবদ্য। অবশ্য, গল্পের শেষের দিকে প্রচুর অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ আছে। প্রাচীন মিশরীয় সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁদের কাছে এগুলো অদ্ভুত বা অসম্ভব বলে মনে হবে না। কারণ, প্রাচীন মিশরীয় সাহিত্যের এ হ'ল উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। গল্পটি মস্ত বড়। গল্পের চেয়ে এটিকে 'রমোন্যাস' বললেই বোধ করি ঠিক হবে। আমি সংক্ষেপে কাহিনীটি শোনাচ্ছি।

একদা অম্বু আর বাতা নামে দুই সহোদর ভাই ছিল। অম্বু বড় আর বাতা ছোট। অম্বুর নিজের একখানি বাড়ী ছিল এবং তার বিবাহিতা স্ত্রী ছিল। বাতা দাদার চেয়ে বয়সে এত ছোট যে অম্বু ভাইকে আপন সন্তানের মতেই স্নেহ করতো। বাতাও দাদাকে এত ভালবাসতো যে দাদা বৌদিই ছিল তার জীবনের সবচেয়ে প্রিয়জন। বাতা তার দাদার গরু চরাতো। ক্ষেতে লাঙ্গল দিত। চাষের যা কিছু কাজ বাতা একলাই সব করতো। দাদাকে কিছুই করতে দিত না। অম্বু তাকে কোনও কাজে সাহায্য করতে গেলেই সে বলতো 'না দাদা, তোমায় কিছু করতে হবে না। আমি আছি কি করতে? ছোট ভাই থাকতে দাদা কেন কষ্ট করবে?

এইভাবে ছোটবেলা থেকে কাজ করতে করতে বাতা এমন কাজের লোক হ'য়ে উঠলো যে দেশে আর তার কেউ জুড়ি ছিল না। বাতার প্রশংসা সকলের মুখেই শোনা যেত। সবাই বলতো ভগবানের দয়া আছে ওর উপর। রোজ ভোরে উঠে সে দাদাবৌদিকে নিজের হাতে প্রতারাশ তৈরি করে খাইয়ে নিজের খাবার নিয়ে মাঠে চলে যেত। সন্ধ্যে নাগাদ বাড়ী ফিরত সংসারের যা কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সমস্ত সংগ্রহ করে নিয়ে। রাত্রে দাদা বৌদিকে নিজে রেঁধে খাইয়ে শুতে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে যেত—আহারের পর গোয়াল ঘরে গরু আগলে শুত।

একবার বর্ষার আগে অম্বু বললে, বাতা ভাই! আমাদের ক্ষেতের পাশের যে জমিটা এতদিন জলে ডুবেছিল; শুনলুম জল সরে গিয়ে জমিটা এখন চাষের উপযুক্ত হয়ে উঠেছে। তুমি একজোড়া বলদ আর হাল যোগাড় করে ফেল, কাল সকাল থেকে আমি যাবো তোমার সঙ্গে ওই নতুন জমীটা চাষ করতে। বাতা বললে, কেন দাদা আপনি কষ্ট করবেন? আমিই পারবো একলা ওখানেও চাষ করতে। অম্বু বললে, তুমি একলা আর কত খাটবে ভাই? তোমার পরিশ্রমের ফসল আমি অলসের মতো বসে বসে খাবো এটা ঠিক নয়। লোকে আমার নিন্দে করচে। আমাকেও একটু কাজ করতে দাও। তুমিতো কখনো আমার অবাধ্য হওনি। আশা করি আজও হবে না।

দাদার এ কথার পর বাতা আর কিছু বলতে পারলে না। দাদার হুকুম মতো সে একজোড়া বলদ আর হাল যোগাড় করে ফেললে। পরদিন সকালে দুই ভাই এক সঙ্গে গরু নিয়ে ক্ষেতে গেল। ভিজে জমী তৈরিই ছিল প্রায়। অল্পক্ষণের মধ্যেই হাল দেওয়া শেষ হয়ে গেল। বীজ বুনতে গিয়ে দেখা গেল ওইটেই ভুল হ'য়ে গেছে। সঙ্গে আনা হয়নি।

অম্বু বললে, তুই একবার ছুটে বাড়ী যা ভাই। তোর বৌদির কাছ থেকে যবের আর গমের বীজ নিয়ে চট করে ফিরে আয়।

লক্ষ্মণ ভাই বাতা তৎক্ষণাৎ ছুটলো। বাড়ী গিয়ে দেখে বৌদি স্নান করে উঠে ভিজে কাপড়েই দাঁড়িয়ে চুল শুকোচ্চে। বৌদির বয়স বাতারই সমান। দেখতে খুব রূপসী। বৌদির এই নির্লজ্জ বেহায়াপনা বাতার ভাল লাগল না। "বৌদি, শীগির যান। শুকনো কাপড় পরে আমাকে চারটি যবের ও গমের বীজ বার করে দিন। দাদা আমাদের নতুন ক্ষেতে বুনবেন বলে অপেক্ষা করছেন।"

বৌদি বললেন, তুমি ওই ভাঁড়ারের ঝুড়ি থেকে যতটা দরকার বুঝে বার করে নিয়ে যাও। আমি এখন যেতে পারবো না। এখনি হয়ত মেঘ করে আসবে, রোদ চলে যাবে; আমার এ একরাশ ভিজে চুল আর শুকোনো হবে না!

অগত্যা বাতা নিজেই গিয়ে ভাঁড়ার থেকে তিরিশ সের গম আর আধমণ যবের বীজ বস্তায় ভরে নিয়ে পিঠে ফেলে এগিয়ে এল। তার বৌদির চোখে এই প্রথম বাতার বলিষ্ঠ যৌবনপুষ্ট সুগঠিত দেহ একটা আশ্চর্য সৌন্দর্য নিয়ে ফুটে উঠলো। বাতা ভোরে উঠে বেরিয়ে যায়, সন্ধ্যের পর বাড়ী ফেরে। বাতা যে এমন সুন্দর সুপুরুষ—বাতার বৌদির এতদিন তা দেখবার সুযোগ হয় নি। আজ দিনের আলোয় দেবরের দিব্য রূপ দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। মধুর কণ্ঠে ডেকে বললে, ঠাকুরপো, শোনো, কাছে এস। কত বীজ নিয়ে যাচ্ছ আমায় দেখিয়ে নিয়ে যাও।

বাতা কাছে এসে দাঁড়ালো। বললে, এই দেখে নাও, তিরিশ সের গম আর আধমণ যবের বীজ নিয়ে যাচ্ছি।

জিনিসের ভারে তার সুপরিণত দেহের মাংসপেশীগুলো ঠেলে উঠেছে। বুকের ছাতি যেন ফুলে চওড়া হয়ে উঠেছে। বাতার বৌদির মুগ্ধ দৃষ্টিতে যেন আর পলক পড়ে না। হাত বাড়িয়ে বাতার কাঁধে হাত রেখে স্নিগ্ধ কমনীয় কণ্ঠে আদরের সুরে বললে, ঈস্! তুমি কি জোয়ান হয়ে উঠেছ? তুমি ভারি সুন্দর! কিন্তু, তুমি ভারি বোকা! না-ঠাকুরপো, এই ভূতের বোঝা পিঠে বয়ে তোমাকে আমি কিছুতেই আজ ক্ষেতে যেতে দেব না। চলো তুমি আমার ঘরে একটু বিশ্রাম করবে। আমি তোমার গা হাত পা টিপে ঘুম পাড়িয়ে দেব। বীজ নিয়ে কাল ক্ষেতে গেলেই হবে।

বাতা বললে, সে কি বৌদি। দাদা যে ক্ষেতে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। এখন বুঝি আমার বিশ্রাম করবার সময়? আমি চললুম। তুমি কিছু মনে কর না।

বৌদি এবার বাতার বাহুমূল আবেগে আকর্ষণ ক'রে বললে—তুমি ভারি বোকা! সত্যি! দাদার জন্যে খেটে খেটে সারা হয়ে গেলে! তার চেয়ে চলো তোমাতে আমাতে এই সুযোগে কোথাও পালিয়ে গিয়ে ঘর বাঁধিগে। তুমি খাটবে, আর আমি সেবা ক'রে তোমার শ্রান্তি দূর করবো। এখানে কি সুখে পড়ে আছো? কুলি মজুরেও তোমার চেয়ে আরামে থাকে। আমায় কি তোমার মনে ধরে না? ভাল ক'রে চেয়ে দেখ দেখি আমার দিকে—

মিহি পাতলা ভিজে কাপড় তখন তার সর্বাঙ্গে লেপটে তার যৌবনপুষ্ট সুগঠিত তনুটিকে মনোহর করে তুলেছিল।

বাতার দুই চোখ ক্রোধে ক্ষোভে অপমানে যেন আগুনের মত জ্বলছিল। তার ইচ্ছে হচ্ছিল এই দুশ্চরিত্রা নারীর গলা টিপে ধরে এই মুহূর্তে এর বাকরোধ করে দেয়। অতিকষ্টে নিজেকে সংযত করে নিয়ে বললে—শোনো বৌদি—তুমি আমার মায়ের তুল্য। দাদা আমার 'জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম পিতা?' দাদার স্নেহে আমি আশৈশব লালিত পালিত হ'য়ে আজ এত বড় হয়েছি। তুমি আমাকে একি কুৎসিত কথা বলছো? ছি ছি ছি? জীবনে আর কখনো তুমি আমাকে এরকম কথা বল না। অবশ্য, তোমার এ মুহূর্তের দুর্বলতার কথা আমি কাউকে বলবো না। তুমি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। দাদার সামনেও আমি এ সব কথা মুখে উচ্চারণই করতে পারব না। সুতরাং, তুমি ভয় পেয়ো না। আমি চল্লুম।

বাতা তার পিঠের সেই বিপুল ভারি বোঝা লঘু পালকের মতো বয়ে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল ক্ষেতের দিকে।

২

বাতা চলে যাবার পর তার বৌদি ভীষণ ভয় পেয়ে গেল! ভাবলে ও দাদাকে যে রকম ভালবাসে, নিশ্চয় আজকের ঘটনা ওর দাদাকে গিয়ে বলে দেবে। তাহলে ওর দাদা যে রকম রাগী, আমাকে আর আস্ত রাখবে না। মারতে মারতে হয়ত প্রাণটাই বার করে দেবে। কী উপায়ে আত্মরক্ষা করা যায়? তখন, অনেক ভেবে সে ঠিক করলে বাতার দাদা বাড়ী ফিরলেই তাকে সে বলবে যে বাতা দুপুরে বীজ নিতে এসে তাকে ভিজে কাপড়ে চুল ঝাড়তে দেখে উত্তেজিত হ'য়ে কুপ্রস্তাব করেছিল। সে অস্বীকার করায় তাকে এমন মার মেরেছে যে সে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছে না।

সন্ধ্যের পর অম্বু ক্ষেত থেকে বাড়ী ফিরে এল। বাতা তখনও ফেরেনি। ক্ষেতের সব কাজ সেরে গরু বাছুর ও হাল বলদ নিয়ে খড়, বিচালি, জ্বালানি কাঠ এবং তরি তরকারি সংগ্রহ করে তার ফিরতে দেরি হবে। অম্বু বাড়ী ফিরে দেখে বাড়ী অন্ধকার। ঘরে কেউ সন্ধ্যে দীপ জ্বালেনি। কেউ এগিয়ে এসে হাসি মুখে তাকে অভ্যর্থনা করলে না। তার পা ধুইয়ে মুছিয়ে দিলে না। সমস্ত বাড়ী যেন অন্ধকারে ঝিমিয়ে পড়েছে। অম্বু নিজেই আলো জ্বেলে এ ঘর ও ঘর খুঁজে দেখে তার স্ত্রী শোবার ঘরে বিছানায় পড়ে কাতরাচ্ছে।

ব্যস্ত হয়ে অম্বু জিজ্ঞাসা করলে—তোমার কি অসুখ করেছে? কী কষ্ট হচ্ছে? উঠতে পারছ না বুঝি?

অম্বুর স্ত্রী তখন ফুঁকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে, বাতা যে দুপুরে বীজ নিতে এসে কী ভীষণ কাণ্ড করে গেছে এবং তাকে মেরে আধমরা করে ফেলে রেখে গেছে এই কথাই অনেক বাড়িয়ে রঙ্‌ চঙ্‌ দিয়ে বললে।

অম্বু স্ত্রীর মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে ক্রুদ্ধ সিংহের মতো রাগে ফুলে উঠলো! এতদিন কি তবে দুধকলা দিয়ে কালসাপ পুষেছে সে বাড়ীতে? আসুক বাতা ফিরে। আজই তার ইহলীলা আমি ঘুচিয়ে দেব। এই

ব'লে একখানি শাণিত খড়্গ নিয়ে ছুটে গেল সে বাড়ীর দরজার কাছে। উদ্দেশ্য বাতা যেই বাড়ী ঢোকবার জন্য দরজায় মাথা গলাবে অমনি তার মাথাটি সে এক কোপে উড়িয়ে দেবে। এ রকম দুশ্চরিত্র যুবক শুধু পরিবারেরই কণ্টক নয়, সমগ্র সমাজের শত্রু সে! ও বেঁচে থাকলে সমগ্র জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ওকে মেরে ফেলাই কর্তব্য।

ক্ষণকাল পরেই বাতা ক্ষেত থেকে বাড়ী ফিরলো। গরু বাছুর ও বলদগুলোকে গোয়ালে রেখে, তাদের খাবার খেতে দিয়ে সে হাত মুখ ধুয়ে বিশ্রাম করবার জন্য যেই বাড়ীর ভিতর ঢুকতে যাবে, দরজার পাশে দেখলে পর্দার আড়ালে শাণিত খড়্গ হাতে নিয়ে তার দাদা হিংস্র বাঘের মতো তার উপর লাফিয়ে পড়বার জন্য উত্তেজিত ভাবে অপেক্ষা করছে।

বাতা গরুদের মুখের কথা বুঝতে পারতো। গাই বলদেরা তাকে খুবই ভাল বাসতো। তারা পথে আসতে আসতে বাতাকে বলেছিল—আজ তোমার ভয়ানক একটা বিপদ আসছে। তুমি আজ বাড়ী ঢুকোনা, প্রাণ যেতে পারে। তুমি এখনি এখান থেকে পালাও। বাতা জানোয়ারদের কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু বাড়ী ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ দাদাকে ওই অবস্থায় দেখতে পেয়ে সমস্ত ব্যাপারটা সে এক মুহূর্তে বুঝতে পারলে এবং আত্মরক্ষার জন্য বাড়ী না ঢুকে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে ছুটে পালালো। অনুও তাকে পালিয়ে যেতে দেখে বুঝলে যে, তার স্ত্রী সত্য কথাই বলেছে। ফেলোটা টের পেয়ে গেছে। অনু সেই খড়্গ নিয়ে তার পিছু পিছু ছুটলো।

২

দূর থেকে 'রা' দেবতার মন্দির চোখে পড়লো বাতার। সে হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে দেবতার উদ্দেশে প্রার্থনা জানালে, ঠাকুর! জীবনে যদি আমি কোনও পাপ না করে থাকি তবে আমার দাদাকে এই অন্যায় থেকে রক্ষা করো। নির্দোষীকে হত্যা করে ওঁকে যেন নরক ভোগ করতে না হয়।

দেবতার কানে এ প্রার্থনা গিয়ে পৌঁছলো। দেখতে দেখতে বাতা ও অনুর মাঝখানে এক দুস্তর নদী দেখা দিল। তরঙ্গসঙ্কুল ভীষণ স্রোতস্বতী, তাতে অসংখ্য হিংস্র কুম্ভীর ভেসে বেড়াচ্ছে। নদীর ওপার থেকে বাতাকে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে অনু বলে উঠলো—"যা নিমকহারাম; এবার বেঁচে গেলি বটে, কিন্তু, তোর মতো কুলাঙ্গারকে আমি মেরে তবে জলগ্রহণ করবো। এ তুই মনে রাখিস!"

বাতা নদীর এপার থেকে তার দাদাকে মিনতি করে বললে,—আজ রাতটুকুর মতো তুমি এই নদীর তীরে অপেক্ষা করো। কাল প্রভাতে সূর্য দেবতা 'রা' যখন পূর্বাকাশে উদয় হবেন, পৃথিবীর অন্ধকার দূর হয়ে চারিদিকে আলো ফুটে উঠবে তখন তোমারও মনের অন্ধকার কেটে যাবে। সূর্য দেবতা 'রা'র সামনে তোমার ও আমার অন্যায়ের বিচার হবে। কে ভাল, কে মন্দ, তিনিই তার নির্দেশ দেবেন। তবে এটা আমি তোমায় বলে রাখছি দাদা, আমি আর এ জীবনে তোমার বাড়ীতে এবং তোমাদের সঙ্গে বাস করবো না। আমি লোকালয় ছেড়ে বনে গিয়ে বাস করবো। মানুষের উপর আমার ঘৃণা হয়ে গেল।

অনু আজ রাত্রে নদী তীরে অবস্থান করবার প্রস্তাবে রাজী হল। সকালে দেবতার সামনে বিচার হওয়া ভাল বলেই সে মনে করে।

দেখতে দেখতে রাত্রি ভোর হয়ে গেল। উষার আকাশ রাঙা করে সূর্যদেবতা 'হরক্তি রা' উদয় হলেন। চারিদিকের অন্ধকার মিলিয়ে গিয়ে পৃথিবী আলোয় আলো হয়ে উঠলো। পাখীরা গান গাইছে। এপার থেকে ছোট ভাই ওপারে দাদাকে ডেকে বললে, "তুমি শাণিত খড়্গ হাতে আমাকে হত্যা করবার জন্য ছুটে এসেছ—কিন্তু তোমার কি উচিত ছিল না একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করা যে এ বিষয়ে আমার কি বলবার আছে? আমি তোমার মায়ের পেটের ভাই। আমাকে তুমি ছোটবেলা থেকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছ। আমার স্বভাব চরিত্র তোমার চেয়ে ভাল তো আর কেউ জানে না? তোমাকে আমি পিতার মত ভক্তি করি ও ভালবাসি। যেদিন তুমি বিবাহ ক'রে ঘরে স্ত্রী নিয়ে এলে আমি যেন আমার হারিয়ে-যাওয়া মা'কে খুঁজে পেলুম। বৌদিকে আমি বরাবর আমার জননীর মতোই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেছি। কিন্তু মানুষের উপর বিশ্বাস আমার চলে গেল, যখন কাল দুপুরে গম ও যবের বীজ নিতে বাড়ীতে ছুটে আসি। ভেবেছিলুম, এ লজ্জা—এ ঘৃণার কথা কাউকে বলব না। কিন্তু তোমার অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে বলতে বাধ্য হচ্ছি।

তার পর, বাতা সেদিনের সমস্ত ঘটনাই তার দাদাকে বললে এবং এও বললে যে, তুমি সেই দুশ্চরিত্রা নারীর মিথ্যাভাষণে প্রতারিত হয়ে ভ্রাতৃহত্যা করতে উদ্যত হয়েছো। বুঝতে পারছো না যে সমস্ত ঘটনাটাই সেই অপরাধিনী উল্টে নিয়ে এই নিরপরাধের স্কন্ধে চাপিয়েছে? মহান সূর্যদেবতা শ্রীশ্রী'হরক্তি রা'-আলোক-প্রভুর নামে শপথ নিয়ে বলছি—যদি কিছু মিথ্যা বলে থাকি তবে যেন জন্মের মতো আমি আমার বাকশক্তি হারাই। এই নাও—আমার রক্তমাংস দিয়ে আমি আজ তোমার ভুলের তর্পণ করছি"—এই বলে বাতা তার কোমরবন্ধ থেকে ছোরাখানা খুলে নিয়ে নিজের দেহের খানিকটা মাংস চক্ষের নিমেষে কেটে ফেলে সেই রক্তাক্ত মাংসখণ্ড নদীতে সূর্য দেবতা রা'য়ের উদ্দেশে অর্ঘ স্বরূপ অঞ্জলি দিয়ে বললে—জয় হোক তোমার হে দয়াল প্রভু—হরক্তি রা! নির্দোষী নিরপরাধীর তুমিই একমাত্র সহায়!

সেই আত্ম-আঘাতজনিত রক্তপাতে অবসন্ন হয়ে বাতা নদীর অপর পারে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লো দেখে অনুর দুই চোখ জলে ভরে উঠলো। তিনি নিজের হঠকারিতার জন্য নিজেকেই অভিশাপ দিতে লাগলেন। সমস্ত প্রাণ তার আকুল হ'য়ে নদীর অপর পারে আহত ও মূর্চ্ছিত ছোট ভাইটির কাছে ছুটে যেতে চায়! সে যে তার সন্তানেরও অধিক! কিন্তু, কেমন করে যাবে সে? উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল স্রোতস্বিনী খরবেগে প্রবাহিত। অসংখ্য যমদূতসদৃশ কুমীর ভাসছে সে জলে। অনু তখন কাতরভাবে সূর্যদেবতা 'রা'কে নিবেদন করলে—আমার অন্যায় হয়েছে

প্রভু। আমি অপরাধ করেছি। আমায় ক্ষমা করো। আমার সন্তানতুল্য ছোট ভাইকে আমার কাছে ফিরিয়ে দাও প্রভু!

এমন সময় অম্বু শুনতে পেলে আকাশবাণী হচ্ছে—তোমার নিরপরাধ নিষ্পাপ পুণ্যাত্মা ভাইটিকে আর ফিরে পাবে না। তার আত্মা চলে গেছে শিরীষবনের কুসুম কিঞ্জল্কের কোমল বুকে আশ্রয় নিতে। আজ থেকে সাত বছর পরে তোমার বাড়ীর বাগানের পূর্বদিকে একটি শিরীষ গাছ গজিয়ে উঠেছে দেখতে পাবে। সেই গাছের সব চেয়ে উঁচু ডালে যে ফুলটি ফুটবে তারই মধ্যে থাকবে বাতার পুণ্যাত্মা! সেই ফুল সযত্নে তুলে নিয়ে একটি পরিচ্ছন্ন পাত্রে নির্মল শীতল জলে ভিজিয়ে রেখ। অপেক্ষা করে থেকো—সেই ফুল থেকেই তোমার স্নেহের ছোট ভাই আবার সশরীরে জন্মগ্রহণ করে তোমার সন্তপ্ত হৃদয়কে শান্ত করবে। কিন্তু, সাবধান! প্রতীক্ষায় অধৈর্য হয়ে যেন আগেই ফুলটি জল থেকে তুলে ফেল না!

অম্বু বিষণ্ণমুখে অতি ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাড়ী ফিরে এল। তার হাতে যে একখানা শাণিত খড়্গা ঝকমক করছিল সে কথা তার খেয়ালই ছিল না। এমন সময় তার স্ত্রী ঘর থেকে ছুটে এসে একমুখ হেসে খুব উৎসাহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে—সে হতভাগা ছোঁড়াটাকে কেটে দু'খানা করে এসেছো ত? কাল সারারাত কি দুর্ভাবনাতেই না ভুগেছি। তুমি যখন ফিরলে না, তখনই আমি বুঝেছিলুম যে, তুমি কাজ হাঁসিল না করে আসবে না।

অম্বু গম্ভীরভাবে বললে, কাজ এখনও হাঁসিল হয় নি। একটু বাকি আছে। বলতে বলতে অম্বু তার হাতের শাণিত খড়্গা খানা বিদ্যুৎ বেগে তুলে এক কোপে তার পত্নীকে কেটে দু'টুকরো করে ফেললে। মৃতদেহ সমাধিস্থ না করে শেয়াল কুকুরকে দিয়ে খাওয়ালে। কিন্তু তবু কি রাগ যায়? তবুও কি তার শান্তি আছে? ছোট ভাইটির কথা ভেবে সে শোকাভিভূত হয়ে পড়লো।

৪

তারপর বহুদিন কেটে গেছে। দীর্ঘ সাত বছরের ব্যবধানে ছোট ভাই বাতার কথা অম্বু প্রায় ভুলে এসেছে। এমন সময় দেখলে তার বাগানের পূব কোণে একটি শিরীষ গাছে ফুল ফুটেছে। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো অম্বুর সাত বছর আগের কথা সমস্ত মনে পড়ে গেল। তবে ত' বাতা ফিরে এসেছে আমার কাছে। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সে শিরীষ গাছের সব চেয়ে উঁচু ডালের ফুলটি সযত্নে নিজের হাতে তুলে এনে একটি পরিচ্ছন্ন পাত্রে নির্মল শীতল জলে ভিজিয়ে রেখে দিলে।

পরদিন সকালে উঠে দেখে পাত্রের জল সব শুকিয়ে গেছে! সর্বনাশ! জলের অভাবে যদি ফুলটিও শুকিয়ে যায়! অম্বু তাড়াতাড়ি আবার নির্মল শীতল জল এনে সেই পরিচ্ছন্ন পাত্রটি ভরে রাখলে। পরদিন আবার দেখা গেল জল শুকিয়ে গেছে! অম্বু আবার জল ভরে দিলে পাত্রে! এমনিতর রোজই পাত্রের জল শুকিয়ে যেতে শুরু হল! দিন যায়। অম্বু ক্রমে ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগলো। সে আর রোজ পাত্রটি জলে ভরে রাখতে পারছে না। বাতা তো কই শিরীষ ফুলের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে না!

অম্বুর মনের যখন এই সংশয়পূর্ণ অবস্থা, তখন ফুলটি একদিন অকস্মাৎ কথা কয়ে উঠলো! দাদা! আমার আত্মা বড় তৃষিত! তাই, তুমি যে জল রেখে যাও পাত্রে সেই নির্মল শীতল জল আমি আকণ্ঠ পান করি রোজ। কত যে তৃপ্তি পাই কি বলবো। শীগগিরই তুমি আমাকে দেখতে পাবে, কিন্তু সাবধান! অধীর হয়ো না।

আবার কিছুদিন গেল। বাতা আর সশরীরে দেখা দেয় না। অম্বু ক্রমেই অধৈর্য হ'য়ে উঠছে। সে প্রতিদিন শূন্য পাত্রটীতে জল ভরে রাখবার সময় ফুলটিকে খুব নাড়া দেয়। ভাবে, নাড়া পেয়ে যদি ফুলের ভিতর থেকে বাতা বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু, বাতাও বেরোয় না এবং কোনও কথাও সে আর বলে না। অম্বু রীতিমতো অধীর হয়ে উঠলো। রোজই সে ফুলটিকে জিজ্ঞাসা করে—আমার বাতা ভাইটিকে দেখতে পাবো কবে?

ফুল কোনও কথাই বলে না. বোবার মতো চুপ করে থাকে।

হঠাৎ একদিন সকাল বেলা মিশরের রাজপ্রাসাদ থেকে একদল সশস্ত্র সৈনিক এসে তার বাড়ী চড়াও করলো। অম্বু তাদের দেখে আশ্চর্য হ'য়ে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করতে, সৈনিকেরা বললে—মহামান্য মিশরাধিপতি ফ্যারাওএর আদেশ—রাজ্যের যেখানে যত শিরীষ গাছ আছে সব নির্মূল করে কেটে ফেলতে হবে। রাজ সভায় খবর গিয়ে পৌঁছেচে আপনার বাড়ীর বাগানের পূব দিকে নাকি শিরীষ গাছ আছে। আমরা সে গাছ কেটে সমভূমি করে দিয়ে যাব। আমাদের উপর মিশর রাজের হুকুম আছে—যে-লোক এ কাজে আমাদের বাধা দেবে আমরা তৎক্ষণাৎ তার শিরচ্ছেদ করবো!

অম্বু বললে—ও গাছ আমি তোমাদের কিছুতেই কাটতে দেব না। তোমরা আমার শিরশ্ছেদ করো!

সৈন্যরা অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে—আপনার আপত্তি কেন জানতে পারি কি?

অম্বু বললে—ও গাছ তো সাধারণ গাছ নয়। আমারই দোষে আমার আপন সহোদর আজ গাছ হ'য়ে গেছে।

সৈন্যরা বললে—মাপ করবেন! আপনার বোধ করি মাথার কিছু গোলমাল হয়েছে। এক পাগলের কথা শুনে আমরা রাজকার্য থেকে বিরত হ'তে পারবো না। উন্মাদের শিরশ্ছেদ করাও যুক্তিযুক্ত নয় বলে মনে করি। আমরা চললুম আপনার বাগানের শিরীষ গাছটি কেটে ফেলতে। আপনার সাধ্য থাকে বাধা দিন।

সৈন্যরা সদলবলে হুড়মুড় করে বাগানের দিকে চলে গেল।

অম্বু ভীষণ রেগে উঠে তার সেই শাণিত খড়্গা নিয়ে সৈনিকদের বাধা দিতে ছুটছিল। এমন সময় শুনলে ফুলের ভিতর থেকে বাতা বলছে—বাধা দিও না দাদা। ওদের গাছ কাটতে দাও! তাতে তোমার ক্ষতি কি? আমি তো এই ফুলের মধ্যে রয়েছি। গাছ কাটলে আমার কোনও অঙ্গ হানি হবে না।

অম্বু এবার অবাক হয়ে জানতে চাইলে—ওরা কি তোমাকেই মারবার জন্য শিরীষ গাছ নির্মূল ক'রে বেড়াচ্ছে?

বাতা বললে, হ্যাঁ দাদা, ওরা আমাকেই মারবার জন্য দেশের সমস্ত শিরীষ গাছ নির্মূল করছে?

অম্বু উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কেন ভাই? এর কারণ কি?

বাতা বললে সে অনেক কথা। তোমাকে তাহলে আমার এই সাত বছরের জীবন-ইতিহাস সব শোনাতে হয়। একটু অপেক্ষা করো। রাজার সৈন্যরা সব গাছটা কেটে দিয়ে আগে চলে যাক। তারপর তোমাকে সব বলবো। (ক্রমশঃ)

সংস্কৃত ছায়ানাটকের ভূমিকা

গৌরীশ্বর ভট্টাচার্য

বিশ্বভারতী বিদ্যালয়ের পুঁথিবিভাগের রক্ষক নিযুক্ত হইবার পর সংস্কৃত এবং বাংলা পুঁথি সম্বন্ধে আমার কৌতূহল অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে। অবশ্য সংস্কৃতের ছাত্র বলিয়া সংস্কৃত পুঁথির প্রতি আগ্রহের মাত্রা কিঞ্চিৎ অধিক হয়। নূতন কোন সংস্কৃত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা তৎসম্বন্ধে আমি তৎপর—ইহা সৌভাগ্যক্রমে বহুসঞ্চিত ধূলিস্তর হইতে বহু অন্বেষণের পর একখানি নাতিদীর্ঘ কলের নাটকের সন্ধান পাই। নাটক এবং নাট্যকারের নামের বৈচিত্র্য দেখিয়া সেই মুহূর্তেই আমি চমৎকৃত হই এবং উহা যে এ যাবৎ অপ্রকাশিত, এই দৃঢ় ধারণাই বদ্ধমূল হয়। মাদ্রাজ, বরোদা, পুণা, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের সংস্কৃত পুঁথিশালায় এ সম্বন্ধে বিস্তৃত অনুসন্ধান করি। কিন্তু সকল স্থান হইতেই নাটকটি সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারি নাই। সকলেই জানাইয়াছেন যে নাটকটি তাঁহাদের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এবং সম্ভবতঃ অপ্রকাশিত। সমস্ত বিখ্যাত "ক্যাটালগ"এ ও নাটকটির নামের উল্লেখমাত্র নাই! অতএব নাটকটি সম্পূর্ণ নূতন এই ধারণায় তাহা লইয়া কিছু কাজ করিতে উদ্যোগী হইয়াছি।

নাটকটি সাধারণ লক্ষণাক্রান্ত নাটক অথবা রূপকের পর্যায়ভুক্ত নয়। উহা ছায়ানাটক। পুষ্পিকায় নাট্যকার লিখিয়াছেন—'ইতি শ্রীব্যাসলম্বু-বিরচিতং বৃত্তি বল্লভং নাম ছায়ানাটকং সমাপ্তম্।' নাটকের শেষে পরিষ্কারভাবে 'ছায়ানাটক' এই কথার উল্লেখ থাকায় 'ছায়ানাটকের' স্বরূপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হই। Krishnamachariar এর History of Sanskrit Literatureএ এবিষয়ে যে আলোচনা আছে অস্পষ্ট ও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। উক্ত গ্রন্থ হইতে নির্দেশ পাইয়া American Oriental Societyর Journalএ প্রকাশিত প্রবন্ধটি দেখি। কিন্তু উহাতেও এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য লাভ করিতে পারি নাই। বিশেষ বিব্রত হইয়া বিশ্বভারতীয় শ্রদ্ধেয় আয়াস্বামী শাস্ত্রীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি। তিনি দক্ষিণ ভারতীয়! দক্ষিণভারতে 'ছায়ানাটক সম্বন্ধে কোনো 'tradition' আছে কিনা তাহাই ছিল আমার জ্ঞাতব্য। অবশ্য অদ্যাপি দক্ষিণভারতে যে ছায়ানাটকের চল আছে (যাহাকে 'Shadow play' আখ্যা দেওয়া হয়) তাহা আমি জানি। আমার আলোচিত ছায়ানাটক সেই শ্রেণীর কিনা—সন্দেহ সেই স্থলে। আয়াস্বামীজী বলেন যে দক্ষিণভারতে একাঙ্ক নাটককে ছায়ানাটক বলা হয়। উহা 'Shadow play' নয়। উত্তর ভারতেও ইহার প্রচলন ছিল। কালের প্রভাবে তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং সেইজন্য বিখ্যাত আলংকারিকদের গ্রন্থে তাহার স্বীকৃতি নাই। ছায়ানাটক অর্থে, "নাটকীয় লক্ষণাক্রান্ত নাটক নয় কিন্তু নাটকের ছায়া" এই অর্থই তিনি করেন। ঐ সম্বন্ধে বিচার প্রয়োজন। কোনো আলংকারিকই এই ছায়ানাটক সম্বন্ধে কিছু না বলায় নানা প্রশ্ন মনে উদিত হয়। প্রথম প্রশ্ন—ছায়ানাটকের প্রচলন কবে হইয়াছিল? একটি বিশেষ বিষয় লক্ষণীয় এই যে ছায়া নাটক সাধারণতঃ একাঙ্ক। আমাদের আলোচ্য নাটকটিও একাঙ্ক এবং মাত্র তের পৃষ্ঠার। বোম্বাই কাব্যমালা সিরিজ হইতে দূতাংগদ নামে একটি ছায়ানাটক প্রকাশিত হইয়াছে। উহাও স্বল্প পরিসরের। Krishnamachariarএর গ্রন্থে 'ত্রৈবিক্রমম্' নামে একটি ছায়ানাটক appendix হিসাবে প্রদত্ত হইয়াছে। দক্ষিণভারতে চামড়ার পুত্তলিকার সাহায্যে যে ছায়ানাটকের অভিনয় হয় তাহার কাহিনী মূলতঃ রামায়ণ এবং মহাভারত অবলম্বন করিয়া। কাজেই সহজেই উপরিউক্ত দুইটি নাটককে এই shadow playর নিদর্শন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে এবং সেই-রূপ অনুমানও করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের নাটকটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। উহার কাহিনী রূপকাশ্রিত বা allegorical। নাটকের পাত্র পাত্রী সকলের নামই কতকগুলি বৃত্তি অনুযায়ী—বাস্তবতা তাহাতে নাই। অথচ নাটকখানি পাঠ করিলে উহা এতো প্রাণবান্ যে মনে হয় উহার অভিনয় সম্মুখে দেখিতেছি। বর্তমান নাটকখানি সেইজন্য 'ছায়া-নাটক সম্বন্ধে সকল সিদ্ধান্তে গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছে। Indian Historical Quarterlyতে শ্রদ্ধেয় ডাঃ সুশীলকুমার দে মহাশয়ের "মহানাটক" সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ একটি প্রবন্ধ আছে। সেই প্রবন্ধে মহানাটক যে ছায়ানাটক এই মতই তিনি পোষণ করিয়াছেন। এবং তদুপরি ছায়ানাটক সম্বন্ধে এক বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তবু সেই প্রবন্ধ হইতে ছায়ানাটক সম্বন্ধে চূড়ান্ত কিছু জানিবার অবকাশ নাই, এবং সেইজন্যই ছায়ানাটক সম্বন্ধে আরও আলোচনা এবং গবেষণা প্রয়োজন। মহানাটক যদি ছায়ানাটক হয় তাহা হইলে ছায়ানাটকের কলেবর সংক্ষিপ্ত এইরূপ সিদ্ধান্ত (যাহা আমি প্রবন্ধের গোড়ায় করিয়াছি) করিবার বোধ হয় বিশেষ কোনো কারণ নাই। 'দূতাংগদ' সম্বন্ধেও Krishnamachariar জানাইয়াছেন যে India Office Libraryতে উহার বৃহত্তর কলেবরের পুঁথি রক্ষিত আছে।

এক্ষণে দুইটি প্রশ্ন সহজেই মনে উদিত হইতে পারে—ছায়ানাটকের জন্ম কোন্ সময় এবং অলংকারিকেরা তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই কেন? প্রথম প্রশ্নের বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে কিছু বলা বর্তমানে কষ্টকর। যতগুলি ছায়া-নাটকের সন্ধান আমরা পাইয়াছি সবগুলিই প্রায় চতুর্দ্দশ শতকের পরে রচিত হইয়াছে। চতুর্দশ শতকে উত্তর ভারত মুসলমান শাসিত। স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগিতে পারে—এই ছায়ানাটকের উৎপত্তি মূলে মুসলমান নরপতিগণের অংশ কি পরিমাণ অথবা এই সময়েই ছায়া-নাটকের উৎপত্তি হইল কেন? মুসলমান শাসকগণকে আমরা বাল্য-কাল হইতেই হিন্দুসভ্যতা বিনাশকারী বলিয়াই জানিয়াছি। মুসলমান

বিজেতারা সংস্কৃত সাহিত্য রচনায় বা হিন্দুসংস্কৃতিতে কি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এ পর্যন্ত তাহা জানিবার বিশেষ চেষ্টা করা হয় নাই! সুখের বিষয় সম্প্রতি এ বিষয়ে সংস্কৃত শিক্ষাবিদ্‌গণের দৃষ্টি পড়িয়াছে। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে বিজিত জাতি স্বভাবতঃই আপনার সংস্কৃতি সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া পড়ে এবং সমসাময়িক সাহিত্যে তাহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। ছায়ানাটকের যুগে সংস্কৃত সাহিত্যের যুগ শেষ হইয়া আসিতেছে। উহা সংস্কৃত সাহিত্যের শেষ ধাপ। প্রাদেশিক সাহিত্য ধীরে ধীরে জন্ম পরিগ্রহ করিতেছে। সুতরাং নানা কারণে ছায়ানাটকে উচ্চাংগের শিল্পকলার পরিচয় পাওয়া যাইবে না। উহা যেন পুরাতনের পুনরাবৃত্তি। 'মহানাটক' সেই সাক্ষ্যই বহন করে। লক্ষণীয় বিষয় এই যে যে যুগে ছায়ানাটক লিখিত হইতেছিল, সেই যুগেই বহু একাঙ্ক নাটিকাও জন্মলাভ করে। বিশেষতঃ বাংলাদেশে যে সে সময় উহার বহুল প্রচলন ছিল তাহা "নাটক লক্ষণ রত্নকোষ" পাঠে অবগত হওয়া যায়। এই নাটিকাগুলির নাম এমনই বৈচিত্র্যপূর্ণ যে তাহারা রূপক ভিন্ন আর কিছুই নহে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়। দুঃখের বিষয় নাটকগুলির নামটুকুই আজ পড়িয়া আছে কোনো অস্তিত্ব নাই। আর নাম হইতে বিষয়বস্তু বুঝিবার বিশেষ উপায়ই নাই। এই একাঙ্ক নাটিকাগুলির সহিত ছায়ানাটকের নিশ্চয়ই একটা যোগ ছিল। কারণ উভয়ের উৎপত্তি কাল একই সময়ে। হয়তো ভারতের এক এক অংশে 'ছায়ানাটক' এক এক নামে প্রচলিত ছিল। বাংলাদেশে কোনো 'ছায়ানাটকের' সন্ধান মিলে নাই। দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি ছায়ানাটকের উল্লেখও Krishnamachariar এর গ্রন্থে পাওয়া যায়। তাহাদের অধিকাংশই রামায়ণ বা মহাভারতের কাহিনী লইয়া রচিত। দক্ষিণভারতের ছায়ানাটকগুলি তর্কের খাতিরে 'Shadow play' বলিয়া মানিয়া লইলেও আমাদের আলোচ্য নাটকটি (সম্ভবতঃ ইহার রচনাস্থল গুজরাট) যে 'Shadow play' নয় তাহা নাটকটি পাঠ করিলে বুঝা যায়। নাটকটির বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ অভিনব। এই প্রবন্ধটিকে ছায়ানাটকের ভূমিকা মাত্র বলিয়াছি। সুতরাং এ সম্বন্ধে আর দীর্ঘ আলোচনা করা হইল না। এক্ষণে আমাদের আলোচ্য নাটকটির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিব।

পূর্বেই বলিয়াছি নাটকটি ব্যাসলঘুকবি বিরচিত। নামটি পাঠ করিলেই উহা যে ছদ্ম নাম তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। কবি যে ভবভূতির সমগোত্রীয় ছিলেন তাহা নাটকটির পুষ্পিকা হইতে বুঝা যায়। বিরূপ সমালোচককে তিনি রূঢ় ভাষায় বিদ্রূপ করিয়াছেন এবং সান্ত্বনা লাভ করিয়াছেন এই আশায়--কঠিনকুঠারচ্ছেদং ঘর্ষণমপি নির্ভরং সহতে। কুচপরিরম্ভণনোভাচ্চন্দনমিন্দীবরাক্ষীণাম্।' অপিচ--চাতকস্য মুখচঞ্চুসম্পুটে নো পতন্তি যদি বারিবিন্দবঃ। সাগরীকৃত মহীতলস্য কিং দোষ এব জলদস্য দীয়তে।' নাট্যকার নিজ ক্ষমতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকিলেও নাটকটি রচনায় বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ পায় নাই। স্থানে স্থানে দুই চারিটি ভালো শ্লোক আছে মাত্র। অবশ্য নাটকটির গুরুত্ব অন্য কারণে। প্রথম তাহা ছায়ানাটক বলিয়া এবং দ্বিতীয় ইহাতে মূল্যবান্ ঐতিহাসিক উপাদান রহিয়াছে। নাটকটি কাগজে লিখিত--লিপি দেবনাগরী এবং প্রাচীন বহু লিপিকর প্রমাদ রহিয়াছে। ইহা হইতে লিপিকর নাট্যকার কিনা বলা শক্ত। নাটকের নান্দী শ্লোকটি ভিন্ন ধরণের। সাধারণ প্রথা অনুযায়ী দেবদেবীর স্তুতি না গাহিয়া নাট্যকার 'মহিমুদ শাহের প্রশস্তি গাহিয়াছেন। এই 'মহিমুদ শাহ' কে তাহা বিশেষ বিচারের বিষয়। নাট্যকার তাঁহাকে 'পাতশাহ শিরোমণি', 'গ্যাসদীনস্যাংগজ,' 'পৃথিবীপতি,' 'গুর্জরপতি', প্রভৃতি বিভিন্ন বিশেষণে বিভূষিত করিয়াছেন। নাটকটি প্রথম পাঠ করিলে এই 'মহিমুদশাহকে তোগলক্ বংশীয় মহম্মদ তোগলক্ বলিয়া ভ্রম হয়। তাহার উপযুক্ত কারণও রহিয়াছে--সূত্রধারের উক্তি--'প্রিয়ে পুনঃ কৌতুকমিদং মহীপতেঃ সমাকর্ণয়।' অথচ নাটকটির অভিনয় সম্রাটের সম্মুখেই হইতেছে।--সূত্রধার--'প্রিয়ে!--তদিদানীং মেতস্য মহীপতেঃ রূপসৌভাগ্যমালোকয়ন্তী নিজনেত্রযুগং কৃতার্থীকুরু।' যাহা হউক এ বিষয়ে এ প্রবন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। নাটকের নায়ক বৃত্তিবল্লভ এবং তাহার অনুচর অনঙ্গনিধি। নায়িকা বৃত্তি। তাহার সহচরী প্রতিষ্ঠা। বৃত্তি নায়ককে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাহা সম্রাটের রোষের কারণে। নায়ক তাই গুর্জর দেশ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে কাশীবাসে উদ্যত হইয়াছেন। তাহাকে সে উদ্যম হইতে প্রতিনিবৃত্ত করাই নাটকের মুখ্য বিষয়। ইহা কি নাট্যকারের জীবনালেখ্য? পুরুষ চরিত্র ঐ দুইটিই। নারীচরিত্র আরও আছে যথা--লজ্জা, আশা, রাজসেবা প্রভৃতি। এই বিচিত্র চরিত্রগুলি হইতেই নাটকটি সম্বন্ধে সহজেই কৌতূহল জাগিয়া উঠে। নাটকের শেষে সম্রাটের প্রশস্তি গাওয়া হইয়াছে এবং তিনি যে নির্দোষ তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। নাট্যকার নিজ রচনা সম্বন্ধে গর্বিত হইলেও আপন আত্মপরিচয় সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। লিপিকর ও তাঁহার নাম বা লিপির তারিখ লিপিবদ্ধ করেন নাই। আমাদের এই ছায়ানাটকটি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের বলিয়া ছায়ানাটক সম্বন্ধে নূতন আলোচনার সুযোগ ঘটিয়াছে এবং সেইখানে সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষতঃ নাটকে রূপকের ব্যবহার সম্বন্ধেও কৌতূহল জাগ্রত হইয়াছে। আশা করি, এই প্রবন্ধে জিজ্ঞাসু পাঠকের কিঞ্চিৎ উপকার হইবে।



সাংখ্যদর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

বুদ্ধির নিকট ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের বিষয় উপস্থিত করে; তাহার পর বুদ্ধি তাহাদিগকে পুরুষের সমক্ষে প্রদর্শন করে। পুরুষও প্রকৃতির মধ্যে যে ভেদ, তাহা বুদ্ধি দ্বারাই জানা যায়। বুদ্ধির ক্রিয়া সম্বন্ধে সাংখ্য কারিকায় উক্ত হইয়াছে—

সর্ব্বং প্রত্যুপভোগং যস্মাৎ পুরুষস্য সাধয়তি বুদ্ধিঃ।
সৈব চ বিশিনষ্টি পুনঃ প্রধান—পুরুষান্তরং সূক্ষ্মং॥

সাঃ কাঃ ৩৭।

পুরুষের সমস্ত উপভোগ—ইষ্ট ভোগ, অনিষ্ট ভোগ—উভয়ই বুদ্ধি সিদ্ধ করে। আবার বুদ্ধিই প্রধান ও পুরুষের মধ্যে সূক্ষ্ম ভেদও প্রকাশ করে। বুদ্ধি দ্বারা এইরূপ ভোগসাধনও যেমন হয়। তেমনি ভোগনিবৃত্তিও হইতে পারে। সমস্ত পুরুষার্থ অপবর্গ বুদ্ধি দ্বারাই সিদ্ধ হয়।

পুরুষকে সাক্ষী ও দ্রষ্টা উভয়ই বলা হইয়াছে। পুরুষ যদি সর্ব্বসাক্ষী হয়, তাহা হইলে তাহার একরূপতা থাকে কিরূপে? সাংখ্য সূত্রে (১।১৭১) আছে—

সাক্ষাৎ সম্বন্ধাৎ সাক্ষিত্বম্।

অর্থাৎ পুরুষের সাক্ষিত্ব "সাক্ষাৎ" সম্বন্ধ মাত্র। এই সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কেবল বুদ্ধির সহিত। যিনি সাক্ষাৎ দ্রষ্টা, তিনিই সাক্ষী। যে দৃষ্টিতে দ্রষ্টা ও দৃষ্টের মধ্যে ব্যবধান, থাকে না, তাহাই সাক্ষাৎ দৃষ্টি (বিজ্ঞান ভিক্ষু)। এইরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ পুরুষের কেবল বুদ্ধির সহিতই হইতে পারে। সুতরাং পুরুষ কেবল বুদ্ধিরই সাক্ষী। অন্য বস্তুদিগের দ্রষ্টা মাত্র।

বুদ্ধির মধ্যে সত্ত্বগুণের বিশেষ আধিক্য। এইজন্য বুদ্ধি অনেক পরিমাণে পুরুষের সদৃশ। এই জন্যই পুরুষের প্রতিবিম্বধারণে বুদ্ধি সমর্থ হয়। বুদ্ধি অচেতন হইলেও পুরুষের প্রতিবিম্ব যখন তাহার উপর পতিত হয়, তখন চেতনের মত হয়।

তস্মাচ্চ বিপর্য্যসাং সিদ্ধা সাক্ষিত্বং অস্য পুরুষস্য।
কৈবল্যং মাধ্যস্থং দ্রষ্টৃত্বং অকর্তৃভাবশ্চ।

সাং কাঃ ১৯।

প্রকৃতির স্বভাব হইতে পুরুষের স্বভাব ভিন্ন বলিয়া পুরুষের এইরূপ স্বভাবসিদ্ধ হয়: (১) সাক্ষিত্ব, (২) কৈবল্য, (৩) মাধ্যস্থ্য, (৪) দ্রষ্টৃত্ব, (৫) অকর্তৃত্ব। পুরুষ নিঃসঙ্গ, উদাসীন (সুখ ও দুঃখে), অকর্ম্মা (প্রবৃত্তিহীন, নিবৃত্তি হীনও বটে) এবং দ্রষ্টা ও সাক্ষী।

দ্রষ্টৃত্ব ও সাক্ষিত্বের ভেদ উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে। পুরুষ ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় পদার্থ। সুতরাং বুদ্ধির সহিত পুরুষের অব্যবধানে সংযোগ সম্ভবপর কিনা, তাহা বিবেচ্য।

সাংখ্যদর্শনের সহিত পাতঞ্জল দর্শনের তত্ত্ববিষয়ে বিশেষ পার্থক্য নাই। পাতঞ্জল দর্শনে আছে সমাধিকালে দ্রষ্টা স্বরূপে—শুদ্ধ চৈতন্যরূপে—অবস্থান করেন। বুদ্ধির সহিত তখন তাহার কোনও সংস্পর্শ থাকে না। অন্যান্য সময়ে "পুরুষের বৃত্তি—সারূপ্য হয়"। (বৃত্তি-সারূপ্যমিতরত্র (১।৪)। ইহার ব্যাস ভাষ্যে আছে "ব্যুত্থানে যাশ্চিত্ত-বৃত্তয়ঃ তদবিশিষ্টবৃত্তিঃ পুরুষঃ"—অর্থাৎ ব্যুত্থান (সমাধি হইতে উত্থিত অবস্থান) কালে চিত্তবৃত্তির সহিত পুরুষবৃত্তি অভিন্ন। ইহার পরে পঞ্চশিখের—"একমেব দর্শনং খ্যাতিরেব দর্শনম্" এই সূত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐ সূত্রের অর্থ "লৌকিক দৃষ্টিতে দর্শন (চৈতন্য) ও খ্যাতি (বুদ্ধি বৃত্তি) এক বলিয়া প্রতীতি হয়। ইহার পরে ভাষ্যে আছে "চিত্তং অয়স্কান্তমণিকল্পং সন্নিধিমাত্রোপকারি দৃশ্যত্বেন স্বং ভবতি পুরুষস্য স্বামিনঃ।" শান্ত, ঘোর ও মূঢ় এই তিনটি চিত্তের বৃত্তি। বিষয়ের সহিত সম্বন্ধবশতঃ চিত্তের যে পরিণাম হয়, তাহাই চিত্তবৃত্তি। স্ফটিকের নিকট জবাকুসুম স্থাপিত হইলে জবাকুসুমের রাগে স্ফটিক রঞ্জিত হয়। সেইরূপ বুদ্ধির সহিত পুরুষের সন্নিধান ঘটিলে বুদ্ধির বৃত্তিসকল পুরুষে সমারোপিত হয়, ইহার ফলে "আমি শান্ত", "আমি দুঃখিত", "আমি মূঢ়" বুদ্ধিতে এই সকল অধ্যবসায় হয়। যেমন মলিন দর্পণে প্রতিবিম্বিত মুখকে মলিন দেখিয়া "আমি মলিন" মনে করিয়া বুদ্ধি দুঃখিত হয়।

(বাচস্পতি)। পাতঞ্জল দর্শনের "চিতেঃ অপ্রতি সংক্রমায়াঃ তদাকারাপত্তৌ স্ববুদ্ধি সংবেদনং।" (৪।২২) এই সূত্রেও পুরুষের বৃত্তি-সারূপ্য বর্ণিত হইয়াছে। চিতি অর্থাৎ পুরুষের প্রতিসংক্রম অর্থাৎ অন্যত্র গমন নাই। চিৎরূপ বলিয়া পুরুষ অন্য কর্তৃক অসংকীর্ণ। চিত্ত পুরুষের প্রতিবিম্ব ধারণ করিয়া তাহার আকার প্রাপ্ত হয়। নির্মল চন্দ্র নিশ্চেষ্ট থাকিলেও তাহার প্রতিবিম্ব জলে পতিত হইয়া যেমন সমল ও সচল দৃষ্ট হয়, তেমনি চিতির প্রতিবিম্ব প্রাপ্ত চিত্ত (বুদ্ধি + মনঃ + অহঙ্কার) নিশ্চল পুরুষকে ক্রিয়াবান্ রূপে প্রকাশিত করে। এই প্রসঙ্গে বাচস্পতি লিখিয়াছেন "চিত্ত পুরুষের সহিত সংযুক্ত নহে, পুরুষের সন্নিহিত। এই সন্নিধান দৈশিক ও কালিক নহে, কেননা দেশ ও কালের সহিত পুরুষের কোনও যোগ নাই। এই সন্নিধি যোগ্যতা-লক্ষণ—অর্থাৎ যোগ্যতাই এই সন্নিধির লক্ষণ। এই যোগ্যতা কি? বাচস্পতি বলেন—"পুরুষের ভোক্তৃ-শক্তি আছে, চিত্তের আছে ভোগ্যশক্তি। শব্দাদি আকারে যাহাই পরিণত হয়, তাহাই ভোগ্য। ভোগ যদিও শব্দাদি-আকারা চিত্তবৃত্তি, চিত্তের ধর্ম্ম, তথাপি চৈতন্য ও চিত্তের অভেদ-সমারোপবশতঃ বৃত্তিসারূপ্যবশতঃ—এই ভোগ পুরুষের বলিয়া উক্ত হয়। সেইজন্য চিত্তের সহিত পুরুষের সংযোগ না হইলেও চিত্তকর্ত্তৃক কৃত উপকারের ভোগ (পুরুষ কর্ত্তৃক) যেমনি সিদ্ধ তেমনি তাহার অপরিণামিতাও সিদ্ধ। "প্রকৃত ভোগ" না হইলেও "ভোগ করিতেছি" এই বোধ উৎপাদন করিবার সামর্থ্যকেই বাচস্পতি "যোগ্যতা" বলিয়াছেন মনে হয়। কিন্তু ইহা দ্বারা পুরুষের ভোক্তৃত্বের ব্যাখ্যা হইয়াছে কিনা সন্দেহ। পুরুষের সহিত বুদ্ধির দৈশিক ও কালিক কোনও সম্বন্ধ নাই। উভয়ে ভিন্ন জাতীয় পদার্থ। পুরুষের প্রতিবিম্ব এ অবস্থায় বুদ্ধির উপর পতিত হওয়ার সম্ভাবনা কি? বুদ্ধিতে সত্ত্ব গুণের আধিক্য যতই হউক না কেন, তাহা কখনও চিৎ পদার্থে পরিণত হইতে পারে না। সুতরাং চিতির প্রতিবিম্ব বুদ্ধির উপর কিরূপে পতিত হইতে পারে, তাহা বুদ্ধিগম্য হয় না। এই প্রতিবিম্বের অস্তিত্ব যদি স্বীকারও করা যায়, তাহা হইলেও ইহার ফলে বুদ্ধি কিরূপে চেতনবৎ হয়, চৈতন্যের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়, তাহাও বোঝা যায় না। চন্দ্র ও জল উভয়ই জড়বস্তু। সুতরাং একের অন্যের ধর্ম্ম পাওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু চন্দ্রকিরণ জলের উপরে পতিত হইলে জল উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয় মাত্র, তাহার গুণের পরিবর্ত্তন হয় না। সুতরাং উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা বুদ্ধির চেতনত্ব-প্রাপ্তি বোধগম্য হয় না। সাংখ্য সূত্রে ইহার ব্যাখ্যার জন্য অন্য উপমার প্রয়োগ করা হইয়াছে।

"তৎসন্নিধানাৎ অধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ।"

(সাং সূত্র ১।৯৬)

অয়স্কান্ত মণির সন্নিধি মাত্রই যেমন শল্যাদির নিষ্কর্ষণ হয়, (অয়স্কান্ত = চুম্বক লৌহ। কোথাও লৌহ শলাকা বিদ্ধ হইলে চুম্বক লৌহ বিদ্ধ অঙ্গের সন্নিকটে স্থাপন করিলে লৌহ শলাকা বাহির হইয়া আসে) তেমনি পুরুষের সন্নিধি বশতঃ প্রকৃতি মহৎতত্ত্বাদিরূপে পরিণত হয়। পুরুষের সংকল্প দ্বারা হয় না। এই অর্থেই পুরুষ এই জগতের কারণ। এই অর্থে পুরুষের কর্ত্তৃত্ব ও অকর্ত্তৃত্ব উভয়ই বর্ত্তমান।

"বিশেষ কার্য্যেষু অপি জীবানাম্।"

(সাং সূ ১।৯৭) *

অর্থাৎ এই কর্ত্তৃত্ব যে কেবল আদি পুরুষেরই (হিরণ্য গর্ভের) আছে, তাহা নহে। সকল পুরুষেরই আছে।

"অন্তঃকরণস্য তদুজ্জ্বলিতত্বাৎ লোহবৎ অধিষ্ঠানম্"

(সাং সূ ১।৯৯)

অন্তঃকরণ পুরুষ-কর্ত্তৃক উজ্জ্বলিত হয় বলিয়া অন্তঃকরণকে পুরুষকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত বলা যায়। যেখানে অন্তঃকরণ সেখানেই পুরুষের অস্তিত্ব। অন্তঃকরণ কর্ত্তৃক উপলক্ষিত, অর্থাৎ অন্তঃকরণযুক্ত পুরুষই "জীব" শব্দ বাচ্য (বিজ্ঞান ভিক্ষু ১।৯৭ সূত্রের ভাষ্য)। তপ্ত লৌহ যেমন অগ্নিকর্ত্তৃক উজ্জ্বলিত, অন্তঃকরণও তেমনি পুরুষকর্ত্তৃক উজ্জ্বলিত। এই উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়া অন্তঃকরণ চেতনবৎ প্রতীত হয়। ইহাই অন্তঃকরণে পুরুষের অধিষ্ঠান। সুতরাং অন্তঃকরণকে ঘটাদির মতো অচেতন বলা যায় না। কিন্তু এই উজ্জ্বলতা হইতে পুরুষের সহিত অন্তঃকরণের সংযোগ অনুমান করাও যায় না। অন্তঃকরণে চৈতন্যের যে প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাহা দ্বারাই অন্তঃকরণের উজ্জ্বলতা সম্পাদিত হয়। পুরুষ-

---

* এই সূত্রদ্বারা ব্যষ্টি চৈতন্য (জীব) ও সমষ্টি চৈতন্যের মধ্যে ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। সমষ্টি চৈতন্যই মহৎ তত্ত্বের অধিষ্ঠাতা।

চৈতন্য অন্তঃকরণে সংক্রামিত হয় না।—যেমন অগ্নির প্রকাশাদি লৌহে-সংক্রামিত হয় না। অন্তঃকরণের সহিত পুরুষের যে এই বিশেষ প্রকারের সংযোগ, তাহা যেমন অন্তঃকরণে পুরুষের প্রতিবিম্ব-পতনের হেতু, তেমনি পুরুষেও অন্তঃকরণের প্রতিবিম্ব-পতনের হেতু। বুদ্ধিতে যে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাহা পুরুষের আপনাকে দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে (বুদ্ধৌ চৈতন্য প্রতিবিম্ব চৈতন্য-দর্শনার্থং, মুখপ্রতিবিম্ববৎ—বিজ্ঞান ভিক্ষু সাং সূ—১।৯৯) বুদ্ধিতে এই প্রতিবিম্ব চিৎ-ছায়াপত্তি, চৈতন্যাধ্যাস, চিদাভাস প্রভৃতি নামে উল্লিখিত হয়। চৈতন্যে বুদ্ধির যে প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাহা বুদ্ধিতে আরূঢ় বিষয়ের সহিত বুদ্ধির ভান বা প্রকাশ। বুদ্ধিতে যে সকল বস্তু গৃহীত হয়, বুদ্ধিতে তাহাদের আকার প্রতিবিম্বিত হয়, অথবা বুদ্ধি তদাকারে আকারিত হয়। তাহা হইলেও বুদ্ধি অচেতন বলিয়া তাহাদের জ্ঞান বুদ্ধিতে হয় না। জ্ঞানের জন্য চৈতন্যের প্রয়োজন। চৈতন্যরূপী পুরুষ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত এবং বিষয়াকার সমন্বিত বুদ্ধি পুরুষে প্রতিবিম্বিত না হইলে, এই জ্ঞান হয় না। কিন্তু এই জ্ঞান পুরুষের পরিণাম নহে। পুরুষ অপরিণামী, অপ্রতিসংক্রম। সেই জন্যই জ্ঞানের ব্যাখ্যার জন্য বুদ্ধি ও পুরুষ উভয়ত্রই প্রতিবিম্বপাত স্বীকৃত হইয়াছে। বাচস্পতি মিশ্র যে "যোগ্যতা"র কথা বলিয়াছেন, তাহা দ্বারা যদি পুরুষের ভোগের ব্যাখ্যা করিতে হয়, বুদ্ধির সহিত পুরুষের সংযোগ না হইলেও বুদ্ধিতে তাহার যে প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাহার ফলে বুদ্ধিতে প্রকাশিত সকল পদার্থের ভোগ করিবার যোগ্যতা যদি পুরুষের থাকে, তাহা হইলে মোক্ষ অবস্থাতেও সেই যোগ্যতার ফলে পুরুষের ভোগ হইতে পারে। এই যুক্তিতে বিজ্ঞান ভিক্ষু বাচস্পতির মত অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

পুরুষ কর্তৃত্বহীন। কর্ম্ম যাহা, তাহা বুদ্ধিতেই করে; কিন্তু পুরুষ তাহার ফল উপভোগ করে।

অকর্তুরপি ফলোপভোগঃ অন্নাদ্যবৎ।

সাং সূ—১।১০৫

রাজা যেমন অন্যকৃত অন্ন উপভোগ করেন, পুরুষও তেমনি বুদ্ধিকৃত কর্ম্মের ফল উপভোগ করে।

দেহ ও আত্মা সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় পদার্থ। এইরূপ বিসদৃশ পদার্থদ্বয়ের মধ্যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া কিরূপে সংঘটিত হইতে পারে, ইহা দর্শনের এক পুরাতন প্রশ্ন। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসী দার্শনিক জি'উলিংক্স বলিয়াছিলেন—ঈশ্বর সর্ব্ব শরীরে বর্ত্তমান থাকিয়া আত্মা ও দেহের মধ্যে সংযোগ-সাধন করেন। যখন কোনও বাহ্য দ্রব্য আমাদের ইন্দ্রিয়ে জ্ঞানোৎপাদন ক্রিয়া উৎপন্ন করে, ঈশ্বরই তখন আমাদের আত্মায় তাহার উপযোগী জ্ঞানের সৃষ্টি করেন। যখন আমাদের মধ্যে কোনও ইচ্ছা উদ্ভূত হয়, ঈশ্বর তখন আমাদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সেই ইচ্ছানুসারে চালিত করেন। সাংখ্য মতে দেহ একটি স্বতশ্চালিত যন্ত্র। ইহার মধ্যে যে সকল ক্রিয়া হয়, তাহার জন্য দেহের অধিষ্ঠাতা চিৎস্বরূপ কোনও পুরুষের প্রয়োজন নাই। কিন্তু যতক্ষণ পুরুষের সহিত বুদ্ধির পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত উপায়ে সংযোগ সাধিত না হয়, ততক্ষণ বুদ্ধির যাবতীয় প্রক্রিয়াই অচেতন ক্রিয়া মাত্র থাকে। পুরুষের সহিত সংযোগ হইলেই তাহারা অনুভূতি, জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি শব্দবাচ্য হয়।

বুদ্ধি যাহা পুরুষের নিকট উপস্থিত করে—বিষয়াকারে আকারিত বুদ্ধি-বৃত্তির প্রতিবিম্ব—পুরুষ তাহা ভোগ করে।

ভোক্তৃভাবাৎ। সাং সূ—১।১৪৩

কিন্তু সেই ভোগদ্বারা পুরুষের পরিণাম হয় না, তাহার শুদ্ধ-মুক্ত স্বভাবের কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। "আমি সুখী", "আমি ভোক্তা", "আমি দুঃখী" প্রভৃতি যে জ্ঞান হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে পুরুষকর্তৃক উজ্জ্বলিত বুদ্ধির জ্ঞান। তাহা অবিদ্যা। এই অবিদ্যা জন্মে জন্মে সঞ্চিত হয়। পুরুষ যদি এমন উপায় অবলম্বন করিতে পারে, যাহাতে বুদ্ধি তাহার সান্নিধ্যে আসিতে না পারে, তাহা হইলেই এই অবিদ্যা অথবা মিথ্যা জ্ঞানের বিনাশ হয় এবং তাহা হইতে যে দুঃখরূপ অমঙ্গলের সৃষ্টি হয়, (তাহা পুরুষকে প্রকৃতপক্ষে স্পর্শ করুক বা না করুক তাহা অমঙ্গলই) সেই অমঙ্গল বিনষ্ট হয়। সে উপায় হইতেছে জ্ঞান—পুরুষ শুদ্ধ চৈতন্যমাত্র ও মুক্ত, এই জ্ঞান। কিন্তু "আমি শুদ্ধ চৈতন্যমাত্র," এই জ্ঞান পুরুষের হওয়া সম্ভবপর কি? এ জ্ঞানও তো পুরুষের প্রতিবিম্বধারী বুদ্ধির। পুরুষের মধ্যে আমিত্ব নাই। সুতরাং দাঁড়াইতেছে এই, যে মহতের যে অংশ ব্যক্তিগত বুদ্ধি, যাহা বিশেষ বিশেষ পুরুষের সন্নিধানে স্থিত ও তাহার সূক্ষ্ম শরীরের অন্তর্গত, এবং সেই সেই

পুরুষ কর্তৃক উজ্জ্বলিত, তাহারই বন্ধন এবং তাহারই মুক্তি হয়। পুরুষ নিত্য অপরিণামী—তাহার বন্ধনও নাই, মুক্তিও নাই। যে দুঃখত্রয়াভিঘাতের কথা সাংখ্যকারিকা ও সাংখ্য সূত্রের প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা সত্য, কিন্তু তাহা প্রকৃতপক্ষে পুরুষের নহে। সে দুঃখবোধ সত্য, তাহা পুরুষেরই হউক, অথবা প্রকৃতিরই হউক। তাহা অমঙ্গল (Evil), সুতরাং তাহার উচ্ছেদের প্রয়োজন আছে। তাহার উচ্ছেদের জন্যই সাংখ্য শাস্ত্রের প্রয়োজন।

বুদ্ধি, অহংকার ও মনঃ—এই তিনটি অন্তঃকরণ। অন্তরিন্দ্রিয় মনঃ ও দশ বহিরিন্দ্রিয় এই উভয়বিধ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মনঃই প্রধান।

দ্বয়োঃ প্রধানং মনো, লোকবদ্ ভৃত্যবর্গেষু।

সাং সূ—২।৪১

ভৃত্যবর্গের মধ্যে যেমন একজন শ্রেষ্ঠ ভৃত্য থাকে, তদ্রূপ স্বয়ং করণ হইলেও মনঃ অপর ইন্দ্রিয়গণ হইতে শ্রেষ্ঠ। যেহেতু মনের সহিত যুক্ত না হইলে কোনও ইন্দ্রিয়ই পুরুষার্থ সাধন করিতে পারে না। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে এখানে মনঃ শব্দ বুদ্ধি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। মনঃকে অখিল সংস্কারের আধার বলা হইয়াছে। কিন্তু মনঃ যদি বুদ্ধির অতিরিক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতে অখিল সংস্কার থাকা সম্ভবপর হয় না। বুদ্ধিই সকল করণে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। সেইজন্য তাহার ক্রিয়া সর্ব্বত্রই দেখা যায়।

অব্যাভিচারাৎ—সাং সূ ২।৪১।

যাবতীয় সংস্কারের আধার বুদ্ধি, মনঃও নহে ইন্দ্রিয়গণও নহে।

তথাশেষসংস্কারাধারত্বাৎ—সাং সূ ২।৪২।

ইন্দ্রিয়গণ যে সংস্কারের আধার নহে, তাহার প্রমাণ এই যে লোকের দৃষ্টি অথবা শ্রবণাদি শক্তি নষ্ট হইয়া গেলেও পূর্ব্বদৃষ্ট পূর্ব্বশ্রুত প্রভৃতি বিষয়ের স্মৃতি থাকে। যদি ইন্দ্রিয়গণই সংস্কারের আধার হইত, তাহা হইলে তাহাদের নাশের সঙ্গে সংস্কারের নাশ হইত। মনঃ যে সংস্কারের আধার নহে, তাহার প্রমাণ এই যে তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে যখন অহংকার ও মনের লয় হয়, তখনও স্মৃতি থাকে। পরিশেষে

"স্মৃত্যানুমানাচচ"—সাং সূ ২।৪৩।

স্মৃতিরূপ বৃত্তি হইতেও বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা অনুমান করা যায়। "স্মৃতি"শব্দের অর্থ এখানে চিন্তনরূপা বৃত্তি। যাহাকে 'ধ্যান' বলে, তাহাই চিন্তা। সকল বৃত্তির মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ বৃত্তি। এই চিন্তাবৃত্তির আধার বলিয়াই বুদ্ধির এক নাম চিত্ত। শ্রেষ্ঠ বৃত্তির আধার বলিয়া বুদ্ধিই সকল করণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু চিৎ-স্বরূপ পুরুষকে চিন্তাবৃত্তির আশ্রয় না বলিয়া বুদ্ধিকে তাহার আশ্রয় বলিবার কারণ কি? ইহার উত্তর

"সম্ভবেৎ ন স্বতঃ"—সাং সূ ২।৪৪।

পুরুষ কূটস্থ—তাহার স্বতঃসিদ্ধ চিন্তাবৃত্তি নাই। আবার প্রশ্ন উঠিতে পারে চিন্তাবৃত্তি, সংস্কারাধারত্ব প্রভৃতি যদি বুদ্ধিরই হইল, তাহা হইলে অন্যান্য করণের অস্তিত্ব স্বীকারের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর এই যে বুদ্ধি এই সকল করণের সাহায্য ব্যতীত কার্য্য করিতে অক্ষম।

ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের বুদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন।

"তৎকর্ম্মার্জিতত্বাৎ তদর্থং অভিচেষ্টা লোকবৎ"

সাং সূ—২।৪৬

প্রত্যেক পুরুষের বুদ্ধি তাহার কর্ম্মের দ্বারাই অর্জিত। সেইজন্য তাহার বুদ্ধি তাহার অর্থসাধনের জন্যই চেষ্টা করে। সংসারে যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, যে যাহা অর্জ্জন করে, তাহা তাহারই কাজে লাগে। পুরুষ কূটস্থ; সুতরাং প্রকৃতপক্ষে পুরুষ নিজে কোনও কর্ম্ম করে না, ইহা সত্য। কিন্তু তাহার ভোগসাধক কর্ম্মের স্বামী পুরুষই গণ্য হয়। যেমন রাজা নিজে যুদ্ধ না করিলেও জয় পরাজয় তাহারই হয়। কেহ কেহ বলেন বুদ্ধিতে পুরুষের যে প্রতিবিম্ব পতিত হয়, কর্ম্ম তাহারই। তাহা ঠিক নহে। প্রতিবিম্বের তো বাস্তব অস্তিত্ব নাই; সুতরাং তাহা দ্বারা কর্ম্ম হইতে পারে না। কর্ম্ম ও ভোগ যদি প্রতিবিম্বেরই হয়, তাহা হইলে পুরুষ কল্পনার প্রয়োজন কি? ইহা বিজ্ঞান-ভিক্ষুর মত।

বুদ্ধি, অহংকার, মনঃ, বুদ্ধীন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণ ইহারা সকলেই করণ, অর্থাৎ ইহাদের দ্বারা পুরুষের অর্থ সিদ্ধ হয়। পুরুষার্থসাধক বলিয়া সকল করণই সমান হইলেও, সকলের মধ্যে বুদ্ধিরই প্রাধান্য, যেমন রাজকর্ম্ম-চারিগণ রাজভৃত্য বলিয়া সকলেই সমান হইলেও মন্ত্রীই সকলের মধ্যে প্রধান।

সমান কর্ম্মযোগে বুদ্ধেঃ প্রাধান্যং লোকবৎ।

সাং সূ—২।৪৭

বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেন এই জন্যই সর্ব্বশাস্ত্রে বুদ্ধিকে মহৎ বলা হইয়াছে। কিন্তু কঠোপনিষদে যাহাকে মহান্ আত্মা বলা হইয়াছে, তিনি বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র। (বুদ্ধে আত্মা মহান্ ততঃ)। এই মহান্ আত্মা সর্ব্বব্যষ্টিবুদ্ধির প্রতিষ্ঠা বলিয়া মহান্। তিনি মহনীয় অর্থাৎ বরণীয়। তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞানময়। তিনি শুধু মহান্ নহেন, মহান আত্মা। অত্ ধাতু হইতে আত্মা শব্দ নিষ্পন্ন। অত্ ধাতুর অর্থ জানা। জ্ঞান যাহার স্বরূপ তিনিই আত্মা। মহান্ আত্মা জ্ঞানস্বরূপ, তিনি বরণীয়, তিনি সর্ব্ব-বুদ্ধির প্রতিষ্ঠাতা। কূটস্থ পুরুষের—নির্গুণ ব্রহ্মের— প্রকাশিত রূপ।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের বুদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন। প্রত্যেক পুরুষ অনাদিকাল হইতে একটি স্বতন্ত্র লিঙ্গ শরীরের সহিত সংযুক্ত থাকে। প্রত্যেক লিঙ্গ শরীরের বিশেষত্ব আছে। তাহার বিশেষত্বই তাহার পুরুষের বিশেষত্ব, কিন্তু পুরুষ অসঙ্গ। লিঙ্গ শরীরের সহিত তাহার প্রকৃত সংযোগ থাকিতে পারে না। অসংখ্য পুরুষ সকলেই একরূপ, তাহাদের মধ্যে কোনও ভেদ নাই। সুতরাং যে কোনও পুরুষের সহিত যে কোনও লিঙ্গ শরীর যুক্ত হইবার বাধা নাই। বুদ্ধি যখন কর্ম্মাজিত (সাং সূ—২।১৬) এবং কর্ম্ম যখন পুরুষের নহে, পুরুষের বলিয়া কল্পিত হয় মাত্র, তখন কেন যে অনাদিকাল হইতে লিঙ্গ-শরীর-সমন্বিত এক এক বুদ্ধি এক এক পুরুষের বলিয়া গণ্য হইবে, তাহার সন্তোষজনক কোনও কারণ নাই। সাংখ্যের এই মত যুক্তিসহ বলিয়া বোধ হয় না। লিঙ্গ শরীরের সহিত পুরুষের সংযোগ প্রকৃত, কর্ম্মও পুরুষের, ইহা স্বীকার করিলে উপরি উক্ত আপত্তি উঠিতে পারে না। কিন্তু সাংখ্য তাহা স্বীকার করেন না।

যে প্রতিবিম্ববাদ দ্বারা বাচস্পতি মিশ্র ও বিজ্ঞান ভিক্ষু জ্ঞানোৎপত্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার সুস্পষ্ট ধারণা করা কঠিন। বুদ্ধি অচেতন। পুরুষে পতিত তাহার প্রতিবিম্বও নিশ্চয়ই অচেতন। সুতরাং পুরুষের সহিত বুদ্ধির সংস্পর্শ যদি অসম্ভব হয়, তাহা হইলে বুদ্ধির প্রতিবিম্বের সহিত পুরুষের সংস্পর্শ কিরূপ হইতে পারে, তাহা বোধগম্য হয় না। বিশেষতঃ পুরুষ যখন দেশকালের অতীত। আবার চিৎস্বরূপ পুরুষের প্রতিবিম্ব কিরূপ, তাহা বোঝাও সহজ নহে। ইহা কি পুরুষের Doube? যাহা হউক এই প্রতিবিম্ব হয় চেতন, নতুবা অচেতন। চেতন যদি হয়, এবং তাহা দ্বারা বুদ্ধিতে চৈতন্যের সঞ্চার যদি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে পুরুষ কর্তৃকই বা তাহা সম্ভবপর নহে কেন? এই প্রতিবিম্ব-কল্পনার প্রয়োজন তাহা হইলে নিরর্থক। আর পুরুষের প্রতিবিম্ব যদি অচেতন হয়, তাহা হইলে তাহা দ্বারা বুদ্ধির চৈতন্য-প্রাপ্তি অথবা চেতনের মত প্রতিভাত হওয়া অসম্ভব। কেন না প্রতিভাতি তো বুদ্ধির নিজের নিকটই। বুদ্ধি চেতনে পরিণত না হইলে, তাহাকে চেতন বলিয়া মনে করিবে কে? সাংখ্য তাঁহার পুরুষকে মনঃ বুদ্ধি ও অহংকার হইতে এত বিভিন্ন বলিয়াছেন, সে তাহাকে Transcendental self বলিয়া মনে করিলেও, বুদ্ধি মনঃ ও অহংকার দ্বারা তাহার বন্ধ কিরূপে হইতে পারে, তাহা বোধগম্য হয় না।

(ক্রমশঃ)

সব পেয়েছির খেলায়

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

আত্মারতি গভীরেতে নিবিড় হয়ে আরো
কলস্বনা নদীর মতো ছুটতে যদি পারো,
অন্ধকারের কারার মাঝে তারার প্রদীপ জেলে
বিচিত্রেরি চিত্রশালায় রেখার তুলি মেলে,
মিলতে পারে হয়তো দেখা তন্দ্রানিমীল, রাতে
স্বপন হরণ আসবে যখন অনল বরণ সাথে
উদয় তোরণে বাজবে মৃদঙ গুরু গুরু সুরু
ধ্যানলীন গিরির গর্ভে অগ্নি দুরু দুরু।

তীর্থপতির পথে পথে ঝঙ্কারিবে বীণ
রূপান্তরের রঙে রাঙা যুগান্তরের ঋণ
গুহাহিত জন্মান্তরে সর্পিলার সেই মেলায়
যোগ দেবে কে নেশায় মেতে সব পেয়েছির খেলায়
দেবতাত্মার কোলে বসে হিমাচলের মূলে
যে রূপটি জেগেছিলো গঙ্গার কুলেকুলে
ভাসিয়ে দিলাম ফুলের ভেলায় তারি সজল স্মৃতি
সাগরে গিয়ে মিশবে হেলায় উর্ম্মি চপল গীতি।

পল্লী-কাব্য পরিক্রমা

(মলয়ার বারমাসী)

নগেন দত্ত

আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয় মলয়ার বারমাসী, "কঙ্কের" প্রণীত মলয়ার বারমাসী অসম্পূর্ণ ভাবে সংগৃহীত হইয়াছে।......

বারমাসী বর্ণনায় কবির শক্তি বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে।* মলয়া সাধুর (সদাগরের) কন্যা। সাধু বাণিজ্যে গিয়াছে। হারা ডাকাত ডাকাতি করিয়া ধনরত্নসহ মলয়াকে হরণ করিয়া আনিয়াছে। মলয়ার বয়স তখন মাত্র নয় বছর। হারা ডাকাত, ডাকাত বটে, কিন্তু সে মানুষ এ কথা বলিতে দ্বিধা নাই। সে বনের ফলমূল খাওয়াইয়া মলয়াকে প্রতিপালন করিয়াছে। তাহার পিতৃস্নেহ যে মলয়ার উপর পড়ে নাই এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। তবু মলয়ার মন কাঁদে মায়ের জন্য, মুক্ত জীবনের জন্য। বনে মলয়ার মন অস্থির হইয়া ওঠে—যৌবন কড়া নাড়িতেছে মনের দুয়ারে। মলয়ার রূপের ব্যাখ্যা ইতিপূর্ব্বেই কবি করিয়াছেন। মলয়া সুন্দরী, তার রূপের বিন্যাস আছে, আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা আছে নতুবা রাজার কুমার বনে শিকার করিতে আসিয়া অমন করিয়া মলয়ার রূপে মজিবে কেন? অকস্মাৎ বনে সুন্দরী কন্যার সঙ্গে দেখা, রাজকুমার নিতান্তই একটা বিবাহের সম্মতি দিয়া নিজ রাজ্যে লইয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু তাহা ঘটে নাই। কবি কঙ্ক প্রেমের সাধারণ পরিণতি হিসাবে এইখানেই ছেদ টানিতে পারিতেন। কিন্তু জীবন দুঃখের পূর্ণ অনুভূতি না পাইয়া কোন দিন মহৎ হয় নাই। সে প্রেমেই হোক, জ্ঞানেই হোক, আর সাধনায়ই হোক—জীবনকে দুঃখদুর্দ্দশার নির্ম্মম সিঁড়ি পার হইতেই হইবে। কবি কঙ্ক মলয়াকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন,—

> "কঙ্ক কয় কন্যা তুমি না হও উতলা।
> দুঃখেরে করিয়া লহ আপন গলার মালা॥
> সুখ পাইতে চাও কর দুঃখের ভজনা।

ইহার শেষ অংশ পাওয়া যায় নাই। তাহা হইলেও ভাবের কোন অসঙ্গতি নাই। কেননা, মলয়া যখন রাজকুমারের প্রেমে মহীয়সী হইয়াও মিলন সুখ হইতে বঞ্চিত হইল তখন তাহার জীবনে দুঃখবাদই আকাঙ্ক্ষিত মনকে পাইবার পক্ষে প্রথম কণ্টকপথ রচনা করিল। ময়লার মন দুঃখের অন্তরালে থাকিয়া সেই প্রিয়ার আশায় প্রতি মাসেই এই কণ্টকাকীর্ণ পথে পা দিয়াছে, আর বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে সেই বিরহতপ্ত দুঃখের রূপ দেখিয়াছে। ইহাই দুঃখবাদের জীবন দর্শন, জীবনের অপরিহার্য্য অধ্যায়।

> "আইল আইল ফাগুন মাসরে গাছে নানা ফুল।
> গন্ধ তৈল দিয়া নারী বান্ধে মাথার চুল॥
> নবীন যৈবন ভারে হাল্যা পড়ে গাও।
> শরীল দহিয়া বয় পবনের বাও॥"

ফাল্গুন মাসে প্রকৃতি যে রূপে ধরা দিয়াছে বিরহিণীর মন সেই রূপেই প্রকট হইয়াছে। ফাল্গুনের বাতাস মৃদুমন্দ বটে, কিন্তু তাহাতে উত্তাপের স্পর্শ রহিয়াছে। সেই উত্তাপ বিরহী মনের আগুনের সঙ্গে মিশিয়া "দহিয়া বয় পবনের বাও।" মন তখন স্পর্শলোলুপ হইয়াছে।

> "গাছে গাছে সোনার কোইল রঙ্গে হুলা গায়।
> পঞ্জমা নাচিয়া পড়ে পঞ্জনীর গায়॥"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই মনে অতীতের ভয়াবহ মেঘ ভাসিয়া ওঠে। হারা ডাকাতের কথা মনে পড়ে সে তাহাকে তাহার মায়ের ভাণ্ডার হইতে হরণ করিয়া আনিয়াছে এবং আনিয়া দুঃখের অসীম কূলে ভাসাইয়া দিয়াছে। তখনই আবার প্রেমিক রাজপুত্রের কথা মনে পড়িল।

> "কোথার তলে আইলা পুরুস সোনার বরণ।
> বনের অতিথে—দিলাম জীবন যৌবন॥

বস্তুত মলয়ার জীবনে নির্ম্মম দুঃখের পালা এই জীবন যৌবন নিবেদন করিয়াই শুরু হইয়াছে। আপন দেহ-ধূপ দিয়া সে জীবনের আরতি করিয়াছে সেই ধূপের ধোঁয়ায় জীবন আচ্ছন্ন হইয়াছে—কেউ যেন মলয়ার মন চিনিতে পারে নাই—তার নিঃসঙ্গ জীবনযাত্রা অতি ধীরে ধীরে নিদারুণ দুঃখঘাতে যে জীবনের ভিৎ গড়িয়াছে তাহাতে দুঃখবাদেরই সৃষ্টি হইয়াছে। আর মনে আশা ও নিরাশার মেঘের ইতস্তত খেলা চলিতেছে।

মলয়ার বনবাসী জীবনে অনুভূতি তখনও প্রেমের স্তরে পৌঁছায় নাই। তখন কিশোরী মন শুধু পিতৃ-মাতৃ স্নেহরসে বঞ্চিত। মলয়ার এ বঞ্চনাও সহ্য হইত যদি না সে সোনার বরণ পুরুষকে জীবন যৌবন দান করিত। চৈত্রমাসে মলয়ার মান বিরহ তীব্রতর হইয়া ওঠে। সে আপন মনে বলিয়া বেড়ায়:

> "আইল আইল চৈত্র মাস রে বসন্ত দারুণ।
> যৌবনের বনে মোর লাগিল আগুন॥
> পুষ্প যেমুন পাগল হইয়া সম্ভাষে ভ্রমরে।
> যাচিয়া দিলাম মধু ভিন্ন (?)* দেশী কুমারে॥"

* * *

* পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা—ডাঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন—পত্র সংখ্যা ৫৫৩।

* অথবা 'ভিন্'?

মলয়ের হাওয়া বয় কোকিলা করে গান।
বন্ধুর মুখেতে তুল্যা দেই চুয়া পান॥
*　　*　　*
বেলা ত হইল ভারি নিদ নাহি টুটে।
এক দুই তিন করি চৈত্র মাস কাটে॥"

চৈত্র মাস কাটিল। বৈশাখের নিদারুণ গ্রীষ্ম আসিল, এমন নির্দ্দয় গ্রীষ্ম যেন 'আগুন অঙ্গে' মাখিয়া 'ভানুর উদয়' হইয়াছে। গ্রীষ্ম নিদারুণ হইলেও প্রাণ-বন্ধুর কথা মনের সবখানি জুড়িয়া বসিয়া আছে।

"শীতল চন্দন বন্ধু মাখে সর্ব্বগায়।
বন্ধুর উরেতে শুইয়া সুখে দিন যায়॥"

মনের মাধুরীপূর্ণ স্বপ্নালু আবেশের দিন আর ফিরিয়া আসে না। কাল কোন কিছুকেই বাঁধিয়া রাখে না। সে নিজে, যেমন মুক্ত, তেমনি কাহারও জন্য অপেক্ষাও করে না। বৈশাখও কাটিল। "জ্যৈষ্ঠ মাসেতে দেখ দুঃখের বিবরণ।" দারুণ দুঃখের দিন সামনে খাগাইয়া আসিল। এমন নির্ম্মম পরীক্ষার দিন বুঝি প্রেমের জীবনে আর কখনও আসে না।

"প্রাণপতি বন্দি মোর হইল বৈদেশে।
তরাসে কাঁপিল পরাণ জানিয়া হুতাশে॥
ধরিয়া অতিথের বেশ বন্ধুরে বাঁচাই (?)*
যত কষ্ট দিলা মোরে দুস্মন বলাই॥"

এই 'দুস্মন বলাই' মলয়ার জীবনে এক মহা অভিশাপ। হয়ত মানব জীবনে সব দুঃখেরই অথবা সব সুখেরই একটি সগরূপী কারণ বর্ত্তমান থাকে। সমাজ-জীবনে দেখা যায় যে, তাহা কোন ব্যক্তির মধ্য দিয়া প্রকট হইয়া থাকে। সেই ব্যক্তিকে কোন বিশেষ ব্যক্তির জীবনে এ ক্ষেত্রে মলয়াও শুভ বা অশুভ কর্ম্মের যন্ত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহার কোন কারণ নাই, অথচ সেই ব্যক্তিই আর একজনের জীবনে ঘোরতর দুঃখের কারণ হইল। ঘটনা এইরূপ ভাবে আবর্ত্তিত হইতে থাকে যে সেই বিশেষ ব্যক্তির প্রভাব হইতে রেহাই পাইবার কোন উপায় নাই; ইহাই হয়ত পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মফল ভোগ, কেহ কেহ মনে করেন এই কর্ম্মফল খণ্ডন করবার কোন উপায় নাই। তাই কেউ বা ইহা প্রশান্ত চিত্তে গ্রহণ করিয়া থাকে। আবার কেউ বা প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া এই পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মফলকে ভোগ করে। 'দুস্মন বলাই' কুপরামর্শ দিয়া মলয়ার সতীত্ব পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত মলয়াকে বনে পাঠাইয়া তবে 'দুস্মন বলাই' নিশ্চিন্ত। যাক সে কথা—

"কোথায় রইলা পরাণপতি কারে কহি কথা।
বারমাসী কাহিনী মোর শুন তরুলতা॥
*　　*　　*
গলায় তুলিয়া দিব ঘাহুনার* ফাঁস।
কঙ্ক কয় মা ছাড় কন্যা আপন পরাণ আশ॥"

আষাঢ়ের মেঘ সজল, বিরহিণীর মন বেদনাপ্লুত, দুঃখের বন্যায় মনের নৌকা কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে। স্মৃতি—সেই নিরালা বনের সুখ-মিলন স্মৃতি—বারে বারে মনে বিচিত্র রূপে ভাসিয়া ওঠে। মনে শাসনের বাঁধ আছে, তবু যেন চোখের জল মানে না, সে আপনার অজ্ঞাতে অঝরে ঝরে।

"কান্দে মলয়া নারী চক্ষে বহে পানি।
বনে বনে কাইন্দা কন্যা ফিরে উন্মাদিনী॥"

কবি কঙ্ক বার বার মলয়ার জীবনে আশার আলোক তুলিয়া ধরিয়াছেন, কন্যা আশা পরিত্যাগ করিও না। এই ত শাওন মাস আসিল, বন্ধুর দেখা হইবে।

"কঙ্ক কহে নাহি সে ছাড় কন্যা জীবনের আশ।
সুমুখে আসিল তোমার ওই না শাওন মাস॥"

শ্রাবণের ধারা অবিরল পড়িতেছে। মেঘের গর্জ্জন, দেওয়ার ডাক শুনিয়া নারীর মন কাঁপিয়া ওঠে। চঞ্চলা হয়, উথলা হয় অন্তর-নিবাসী প্রেম-নদী। নারী চমকিয়া আকাশের দিকে তাকায়—

"ঊলকিয়া ঝিনকি ঠাডা* আসমান ভাইঙ্গা পড়ে।
চমকাইয়া বেহুরা নারী আপন স্বামী ধরে॥
*　　*　　*

কবি আবার প্রবোধ দিতেছেন,—

"কঙ্ক কহে কন্যালো না ছাড় তার আশ।
সুমুখেতে ভাদ্র মাস চান্নিরা† পরকাশ॥

ভাদ্রের চাঁদ নির্ম্মল, রাত্রি ছোট, কিন্তু অভাগী মলয়ার চোখে ঘুম নাই। নিদ্রাহীন রাত্রি আসলে ছোট হইলেও বড় মনে হয়। মলয়া ভাবিতেছে—

"কেমুন জানি আছে বাপ কেমুন জানি মাও।
অঙ্গ শীতলিয়া বায়রে নদীর শীতল বাও॥
সেই বাওয়ে জ্বলে অঙ্গ দহেত পরাণী।
কি জন্য রাখ্যাছি পরাণ কিছু ত না জানি॥"

আশ্বিন মাসের নদী অনেকটা শান্ত হইয়াছে। জলের তরঙ্গ শান্ত বটে, কিন্তু যে নারী প্রেমের বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে—সে আর কিছুই ভাবিতে চায় না। ডুবিয়া মরিতে সে পাগলিনীর মত ছুটিয়া যায়। মলয়ার শৈশবের কথা মনে পড়িয়া যায়। বাপের বাড়ির দুর্গাপূজার কথা তখনও কিছু কিছু মনে পড়ে। আর মনে পড়ে সেই কথা—

"যত সুখ ছিল ভালে তত দুঃখ আইল।
সোনার না রাজ্যপাট কাড়ি খেদাইল॥
রাজার ছাওয়াল মোর হইল সোয়ামী।
বনেতে কান্দিয়া আজি পোহাই রজনী॥"

মলয়া ভাবে কার্ত্তিক মাসের আকাশ কেমন উজ্জ্বল, কিন্তু আমার আকাশে আলো নাই। বস্ত্র জীর্ণ হইয়াছে মলয়ার, বৃক্ষপত্র মলয়ার অঙ্গ জুড়িয়া রহিয়াছে। সে বিষণ্ণচিত্তে ভাবে—

---

* 'বাঁচাই' পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন অংশে চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ খুব সুস্পষ্ট নহে।

* ঘাহুনা—একরূপ লতা।

* ঠাডা—বজ্র। † চান্নির—চন্দ্রের।

"নদীতে ডুবিয়া মরি নদীত শুকায়।
বিষফল খাইতে গেলে পরাণ না যায়॥"

অগ্রহায়ণ মাস। চারিদিকে শিশির ছোঁয়া মাঠ। মলয়া বলে ওগো—

"শুন শুন তরুলতা আমার দুঃখের কথা।
দুঃখের লাগিয়া মোরে সৃজিলা বিধাতা॥"

এমন সময় কবি কহিতেছেন,—

"দুঃখিনী দুঃখের কপাল কাইন্দা কঙ্কে কয়।
সাওরে বিছায় শেয কন্যা নিয়ারে* কি ভয়॥
এই পথে চললো কন্যা পাবে বন্ধুর দেখা।
সুমুখেতে পৌষ আন্ধি অন্ধকারে ঢাকা॥"

পৌষ মাসে মলয়া উদ্‌ভ্রান্তের মত—

"দুই নয়ানে ধারা বহে কন্যা কান্দে বনে বনে।
কান্দিতে কান্দিতে গেল কাঠুরীর আনে॥"

এইবার মাঘ মাস। মলয়ার জীবনে আবার নূতন অধ্যায় শুরু হইল।

"মাঘ মাসেতে কন্যার দুঃখ হইল ভারি।
বন ছাইরা নগরেতে চলিলা কাঠুরী।
উদাস বনেতে কন্যা থাকে একেশ্বরী॥
দারুণ মাঘের শীতে অঙ্গে পড়ে ঢাকা।
এনকালে হারার সঙ্গে আরবার দেখা॥"

ইহার পরের কাহিনী খুব সংক্ষিপ্ত। কিন্তু রসিক পাঠকের মনে ইহার অন্তর্নিহিত রসটি জমিয়া উঠিতে বাধা নাই। সমগ্র কাহিনীটি অতি করুণ বিচ্ছেদের সুরে গাঁথা। ইহার প্রভাব পাঠকের মনকে অভিভূত করে ঘটনা বৈচিত্র্য সমস্ত কাহিনীতে যে ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা আরও রোমাঞ্চকর কেননা হার্যা ডাকতকে রাজকুমার নাগপাশে বাঁধিয়া আনিয়াছে। এবং রাজকুমার আর একবার মলয়াকে আনিতে বনের দিকে ঘোড়া ছুটাইয়াছে। বনে মলয়ার সাক্ষাৎ মিলিয়াছে কিনা—কে জানে? কবির ইঙ্গিতে যদি ভবিষ্যতের কথা বলিয়া থাকে তবে আমরা মলয়ার জীবনে বন্ধুমিলনের ছবি আঁকিতে পারি। কিন্তু সে অঙ্কিত ছবি কোন রঙে-রসে পূর্ণ হইয়া উঠিবে?

* নিয়ারে=নীহারে।

মহাদেশের সঞ্চারণ

শ্রীবিদ্যাধর রায়বর্মন বি-এস্-সি

মানুষকে 'ভবঘুরে' বল্‌লে বিস্ময়ের কিছু থাকে না, কিন্তু মাটী-পাথরে গড়া ভূপৃষ্ঠের সুবিশাল মহাদেশগুলিকেও 'ভবঘুরে' বল্‌লে প্রথমটা কিছু বিস্মিত হতে হয় বৈকি, তাই যখন ভূতাত্ত্বিক ওয়েজেনার (Wegenar) প্রথম বলেন, আজ যে-যে মহাদেশ ভূগোলকের উপর যে-যে স্থান দখল করে আছে, কোন সুদূর অতীতে তারা ঠিক সেই সেই স্থানেই ছিল না, পরন্তু স্থান পরিবর্ত্তন করেছে, তাতে বৈজ্ঞানিক মহলে এক বিস্ময়ের ঝড় সত্যি উঠেছিল। কিন্তু মহাদেশের সঞ্চারণ আজ আর কল্পনা মাত্র নয়। এ একদিন হয়েছিল এবং কোন সুদূর-ভবিষ্যতে আবারও হতে পারে।

অতীতকালের কতকগুলি জন্তু উদ্ভিজ্জীবনের জীবাশ্ম হতেই প্রথম বিতর্কের সৃষ্টি। যেমন, Marssupial জাতীয় প্রাণীর—যথা ক্যাঙ্গারুর —জীবন্ত নিদর্শন অষ্ট্রেলিয়ায় এবং দক্ষিণ-আমেরিকার চিলিতে এবং তাদের জীবাশ্ম আফ্রিকাতে দেখা যায়। কয়লার স্তরের মধ্যে glossopteris এবং gangamopteris জাতীয় উদ্ভিদের জীবাশ্মের সন্ধান ভারতবর্ষ, দক্ষিণ-আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ায় পাওয়া যায়। Lepidodendron নামক উদ্ভিদ জীবাশ্মের সন্ধান ইউরোপ এবং উত্তর-আমেরিকার উভয়ত্রই মিলে, এই উদ্ভিদ এবং জন্তুগুলি এমন যে স্থলভাগের দ্বারা যোগাযোগ না থাক্‌লে তাদের পক্ষে কখনই এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশে বিস্তার লাভ করা সম্ভব হত না। কাজেই প্রাণী-বৈজ্ঞানিকগণ স্থির ক'রলেন যে, অতীতে দক্ষিণ গোলার্দ্ধে দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, ভারতবর্ষ এবং অষ্ট্রেলিয়া সংযুক্ত ক'রে এক বিরাট স্থলভাগ বর্ত্তমান ছিল, যার নাম দেওয়া হ'ল "গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড।" উত্তর গোলার্দ্ধেও তেমনি উত্তর আমেরিকা এবং ইউরেশিয়ার ভূ-খণ্ডকে যোগ ক'রে কল্পনা করা হ'ল "আঙ্গারা ল্যাণ্ড"-এর। প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ফলে ঐ দুই মহাদেশের বিভিন্ন অংশ সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়, এবং বর্ত্তমান মহাদেশগুলি ঐ দুই মহাদেশেরই ভগ্নাংশমাত্র।

তা হলে ত আট্‌লাণ্টিক এবং ভারত মহাসাগরের গর্ভে খোঁজ ক'রলে প্রাচীন মহাদেশগুলির চিহ্ন পাওয়া যাবে। কিন্তু তা পাওয়া গেল না। কাজেই এই সিদ্ধান্ত টিকল না।

Isostasy-র সিদ্ধান্ত অনুযায়ীও এ অসম্ভব, Isostasy সিদ্ধান্তের এখানে কিছু ব্যাখ্যা দরকার। ভূ-গোলকের আভ্যন্তরীণ গঠন সম্বন্ধে জানা গেছে যে, যতই অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায়, ততই অধিকতর ঘনত্ব বিশিষ্ট উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়—সব যেন স্তরে স্তরে সাজানো। মহাদেশগুলি যে যে উপাদানে গঠিত, এক কথায় তার নাম সায়াল (Sial) —Silicon এবং aluminium-ই এর প্রধান উপাদান। ঠিক এর নীচেই যে স্তর বর্ত্তমান, তার নাম (Sima)—যার প্রধান উপাদান Silicon এবং magnesium-Sial হ'তে Sima বেশী ভারী এবং

মহাদেশগুলি এই Sima-র উপর ভাসমান। এই হ'ল Isostasy-র সিদ্ধান্ত। মহাদেশীয় অংশের সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হওয়ার অর্থ ই হচ্ছে sial-য়ের sima-র মধ্যে ডুবে যাওয়া। অর্থাৎ হাল্কা জিনিষ ভারী জিনিষের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে, যা অসম্ভব।

Wegenar এর এক অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি বল্লেন, ভারতবর্ষ এবং আফ্রিকার মধ্যে কোন অতিরিক্ত স্থলভাগের কল্পনা করা অর্থহীন। ভারতবর্ষ নিজেই—আফ্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। আফ্রিকাকে স্থির রেখে, ভারতবর্ষকে আরও দক্ষিণে টেনে এনে এবং একটুখানি বাঁদিকে মোচড় দিয়ে তাকে আফ্রিকার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হোক্। সেই রকমভাবেই অষ্ট্রেলিয়া, কুমেরু মহাদেশ এবং দক্ষিণ আমেরিকাকেও আপন আপন জায়গা থেকে টেনে এনে আফ্রিকার চারপাশে যথাস্থানে লাগিয়ে দেওয়া হোক্। এই হ'বে তথাকথিত গণ্ডোয়ানা ল্যাণ্ডের গঠন, আঙ্গারা ল্যাণ্ড-ও বাদ যাবে না। উত্তর আমেরিকাকে টেনে এনে আফ্রিকা এবং ইউরোপের উপকূলের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যেতে পারে। এইভাবে সমস্ত মহাদেশ মিলে যে এক বিশাল ভূমিখণ্ড কল্পনা করা হয়েছে এবং ওয়েজেনার এক কাল্পনিক ম্যাপে যা দেখিয়েছেনও তার নাম দেওয়া হয়েছে Pangea যতদিন এই প্যাঞ্জিয়া ভূমিভাগ বর্ত্তমান ছিল, ততদিন জন্তু এবং উদ্ভিদের পক্ষে এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশে ছড়িয়ে পড়া অসম্ভব হয় নি। পরে কোন কারণে মহাদেশগুলি পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং দূরে সরতে থাকে, যে পর্য্যন্ত না বর্ত্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছে। এই ধারণা isostasy সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে যাচ্ছে না।

মহাদেশগুলির অতীত গঠন সম্বন্ধে এইরূপ ধারণার বহু সঙ্গত কারণ আছে, কতকগুলি উল্লেখ করা হচ্ছে। যথা, প্রথম, ভূগোলকের ম্যাপে দেখা যায়, আটলাণ্টিক মহাসাগরের উভয় উপকূল—পশ্চিমে উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল, এবং পূর্ব্বে ইউরোপ ও আফ্রিকার উপকূল—প্রায় সমান্তরাল। এককালে তা'রা সংযুক্ত ছিল, এ কি তা'রই সাক্ষ্য?

দ্বিতীয়তঃ, ইউরোপে ক্যালিডোনিয়াল এবং হার্সেনিয়ান্ নামক দুই শৈলশ্রেণীর বিস্তার উভয় আমেরিকাতেও বর্ত্তমান, এবং শুধু তাই নয়, ইউরোপে তারা উপকূল পর্য্যন্ত পরস্পরের দিকে যেন ছেদ করবার মতলব নিয়ে এগিয়ে এসেছে, কিন্তু সেই ছেদটুকু ইউরোপে না ঘটে, ঘটেছে আমেরিকায়। ঠিক যেন এক টুকরো কাগজে দুটি পরস্পরচ্ছেদী রেখা টেনে কাগজটিকে এমনভাবে ছিঁড়ে বিচ্ছিন্ন করা হোল যে তার এক অংশে দেখা যাবে রেখা দুটি এগিয়ে আসছে পরস্পরের দিকে এবং আর এক অংশে দেখা যাবে তাদের ছেদ।

দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকার মধ্যেও অনুরূপ একটী দৃষ্টান্ত রয়েছে।

তৃতীয়তঃ, ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা এবং আমেরিকার কতকগুলি অংশে অতীত বরফযুগের অস্তিত্ব। হিমবাহের ঘর্ষণ ও ক্ষয়ক্রিয়ার ফলে এক ধরণের শিলাখণ্ডের সৃষ্টি হয় যারা অনির্দ্দিষ্ট আকার বিশিষ্ট, অমসৃণ এবং যাদের গায়ে ঘর্ষণের ফলে জাত বহুসংখ্যক আঁচড়ের মত দাগ দেখা যায়। এই ধরণের শিলাখণ্ডের অবস্থিতিই ভারত ও দক্ষিণ মহাদেশগুলিতে প্রাচীন হিমবাহের অস্তিত্বের প্রমাণ। এই অংশগুলি আজ উষ্ণতর মণ্ডলে অবস্থিত এবং কিছুতেই সেখানে বরফের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। কিন্তু Wegenar-এর Pangea-র ধারণা অনুযায়ী যদি ভারতবর্ষকে আফ্রিকার পাশে নিয়ে যাওয়া হয়, তবে তা অনেক দক্ষিণে দক্ষিণ মেরুর দিকে সরে আসবে। সেই যুগে স্বয়ং দক্ষিণ মেরুও বর্ত্তমান অবস্থান থেকে আর একটু উত্তরে আফ্রিকার দক্ষিণতম অংশে অবস্থিত বলে ধরে নেওয়া যায়। (মেরু বিন্দুর এই স্থান পরিবর্ত্তন অসম্ভব নয় বলে প্রমাণিত হয়েছে)। তা যদি হয়, তবে ভারত, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ার অংশ বিশেষ তৎকালীন দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের অন্তর্বর্ত্তী হয়ে পড়ে, আর, মেরু-অঞ্চলে যে বরফের রাজত্ব, সে ত সবাই জানেন।

ইউনাইটেড ষ্টেটসের উত্তরাংশ থেকে স্কটল্যাণ্ড, জার্ম্মানী, রুশিয়া এবং চীন পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক ল্যাটেরাইট ও বক্সাইট খনিজের অঞ্চল দেখ্তে পাওয়া যায়। ল্যাটেরাইট এবং বক্সাইট গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে ভূপৃষ্ঠের শিলার উপর তত্রত্য জলবায়ুর ক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়। বর্ত্তমানে ঐ অঞ্চলগুলি অবশ্য শীতপ্রধান। মোটামুটি ধরে নিতে পারি যে গণ্ডোয়ানা ল্যাণ্ডে যে-সময় বরফযুগ চলছিল, উপরোক্ত দেশগুলি সেই সময় বিষুবীয় অঞ্চলের অন্তর্গত ছিল।*

* পাটনা সায়েন্স কলেজের বঙ্গসাহিত্য সমিতির অধিবেশনে পঠিত।



ঋষি-তীর্থে

শ্রীঅনিলেন্দ্র চৌধুরী

রবিবারের প্রসন্ন সকাল। প্রচণ্ড আগ্রহ ও অদ্ভুত এক আবেগ নিয়ে ভোর না হ'তেই ছুটেছি তীর্থ দর্শনে,—যে পরম তীর্থে একদিন সূত্রপাত হয়েছে স্বাধীন ভারতের নবজাগরণের, যেখান থেকে উদ্গাত হ'য়েছে স্বাধীনতার মন্ত্র-বাণী, আর যে মাটীর বুকে সূচিত হ'য়েছে নবযুগের সাহিত্য-সাধনার প্রথম অঙ্কুর!

ভারত-তীর্থ কাঁঠালপাড়া! হিমালয় হ'তে সুদূর কন্যাকুমারিকা তীর্থ-পরিক্রমায় কত পুণ্য-ভূমির মাটি-স্পর্শ ক'রে ধন্য হ'য়েছি, অথচ এত কাছে এই মহা-তীর্থে যাওয়ার সুযোগ ঘটেনি, সাহিত্য-সেবক



বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (যৌবনে)

হিসাবে এ অত্যন্ত লজ্জার কথা বৈ কি! সহসা অপ্রত্যাশিত সে সুযোগ যখন এল, আনন্দের আতিশয্যে সত্যিই যেন দিশাহারা হয়ে গেলুম।

তেরশ' একষট্টির বারোই আষাঢ়। 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার' উদ্যোগে কাঁঠালপাড়ার বঙ্কিম-ভবনে বন্দেমাতরম মন্ত্রের উদ্গাতা-ঋষির জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান। এই উপলক্ষে সমাগম হয়েছে বাংলার বহু প্রখ্যাত সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, পণ্ডিত, সরকারী কর্ম্মচারী ও বিশিষ্ট জনসাধারণ—মৃত্যুঞ্জয়ী সেই অমর মনীষীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে!

নৈহাটী নিবাসী ও স্থানীয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-শাখার সম্পাদক শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্নের বহু বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে বঙ্কিম-ভবনের সম্মুখস্থ যে কক্ষটিতে আজ গ'ড়ে উঠেছে সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার, সরকারের সাহায্যে যেখানে রচিত হচ্ছে ভবিষ্যতের পট-ভূমিকায় অতীতের স্মারক-সৌধ, তারই উন্মুক্ত প্রশস্ত অঙ্গনে অনুষ্ঠানের আয়োজন। তিনি বঙ্কিমের নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ করেন। পরিচ্ছন্ন চন্দ্রাতপতলে অতি সুরুচিপূর্ণ অনাড়ম্বর পরিবেশে যেন পূজার উৎসব! সেখানে ভাষার চেয়ে ভাবের প্রকাশ বেশী, সৌজন্যের চেয়ে শ্রদ্ধার!

উদ্বোধনী ভাষণে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপান্নালাল বসু শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন ক'রে বললেন, বন্দেমাতরম মন্ত্রের উদ্গাতা ঋষির জন্যে তুচ্ছ স্মৃতি-ফলক নির্ম্মাণের প্রয়োজন নেই—তিনি জীবন্ত হ'য়ে আছেন সমস্ত মানুষের মনে মনে।

মাধ্যমিক শিক্ষা-বোর্ডের এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার শ্রীগোপেন্দ্রনাথ দাশের মতে বন্দেমাতরমের ঋষির আর কোন রচনা না থাকলেও তিনি স্বদেশ প্রেমিকদের মধ্যে অমর থাকতেন।

পশ্চিমবঙ্গ-কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ ঘোষণা করলেন, জনসাধারণের সাহায্য পেলে সরকার জাতীয় কর্ত্তব্য হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের ভদ্রাসনটি রক্ষা করতে প্রস্তুত আছেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীসজনীকান্ত দাস ভাষণ দিলেন যে, আমাদের দেশে মনীষীদের স্মৃতি রক্ষা করার নিয়ম হ'ল তাঁর নামে মেলার প্রবর্ত্তন করা। কিন্তু সে দিন আর নেই! সে নিয়মও বদলেছে। তাই এখন মেলার পরিবর্ত্তে বঙ্কিম-ভবনকে রক্ষা করিয়া সেখানে গবেষণাগার ও সংগ্রহশালা স্থাপনের উদ্যোগ হচ্ছে।

এর পর বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের পৌত্র শ্রীশতঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভায় ঘোষণা করলেন যে তাঁর কাছে বঙ্কিম-রচনার যত পাণ্ডুলিপি ও তাঁর ব্যবহৃত জিনিষপত্র এবং অন্যান্য যত স্মৃতি-চিহ্ন আছে সব তিনি এই সংগ্রহশালায় দান করবেন!

সর্ব্বশেষে সংগ্রহশালার পক্ষ থেকে সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ধন্যবাদ জানাতে দাঁড়িয়ে সভাস্থ সকলেরই মুখপাত্র হ'য়ে বিশেষ ক'রে শতঞ্জীববাবুকে এই বদান্যতার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললেন, শতঞ্জীব যেন সত্যিই 'শত'-জীব হ'ল।

অনুষ্ঠানের এখানেই শেষ। ছোট্ট, সুন্দর ও স্নিগ্ধ-মধুর আবেষ্টনী, সুষ্ঠু পরিচালনা—ঋষি-পূজার যোগ্য সন্দেহ নেই বটে। এই মাটি, এই বাড়ী, এই বৈঠকখানা—সমস্তই ঋষির স্মৃতি-বিজড়িত স্পর্শ-ধন্য! শৈশব ও বার্দ্ধক্যের অনেকগুলো বছর তাঁর কেটেছে এই মাটিতে, এই ঘরে।

প্রথম আলোর স্পর্শ পেয়েছেন তিনি এখানেই। তাঁর জন্মস্থানটি আজ ইটের স্তূপে-ঝোপে-জঙ্গলে পরিপূর্ণ! নৈহাটি-স্টেশন পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রায় আটমহলা কাঁঠালপাড়া-ভবনের অর্দ্ধেকের বেশী আজ আত্মবলি দিয়েছে রেলপথের প্রয়োজনে। সেই রেললাইনের ধারে বাড়ীর পেছনের যে অংশটি আজ ধ্বংসস্তূপে পরিপূর্ণ তারই জঙ্গলাকীর্ণ স্তূপের মত একটি জায়গার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের বংশধর চামেলীবাবু অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে দেখালেন ঋষির জন্মস্থান ব'লে। বিস্ময়-বিস্ফারিত-দৃষ্টিতে দেখ্‌লাম সেই পবিত্র পুণ্য-ভূমিতে গড়ে ওঠে নি কোন মন্দির বা স্মৃতি-সৌধ, দূর দূরান্তর থেকে যাঁরা এখানে সমবেত হয়েছেন জন্মোৎসবের অনুষ্ঠানে, তাঁরা ফিরেও দেখ্‌লেন না এই জন্মস্থানের পুণ্য-তীর্থের দুর্গতির পানে—কালের যাত্রায় আজ তার অস্তিত্বও অবলুপ্ত!

তখনকার দিনে প্রসূতি-আগার নির্ম্মিত হ'ত বাড়ীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থানে। তাই ঐ আটমহলা কাঁঠালপাড়া-ভবনের কোন ঘরে বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণের সুযোগ পান নি, তাঁর স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল বিস্তৃত উঠানের এক কোণে আটচালা বেঁধে। তখন তিনি ছিলেন শুধু বঙ্কিম, কিন্তু আজ তিনি 'ঋষি',—তবুও তাঁর জন্মস্থান রইল—তেম্‌নি অবহেলিত হ'য়ে। সে আটচালার কোন চিহ্ন আজ নেই, বিস্তৃত সে উঠানের ভগ্ন-স্তূপের মধ্যে তাঁর আসল জন্মস্থানটিও হয়ত কোথায় গেছে হারিয়ে! বছরের পর বছর জন্মোৎসবের অনুষ্ঠানে ভাল ভাল ভাষায় অনেক বক্তৃতা শুনব, কিন্তু আমাদের দায়িত্ব শুধু কি ঐটুকুই? তাঁর জন্মস্থান বাসস্থান যা' আজ জাতীয় তীর্থে পরিণত, তা রক্ষা করা কি আমাদের কর্ত্তব্য নয়? তবে কোথায় সে উদ্যোগ-আয়োজন?

বঙ্কিম-ভবনের সম্মুখভাগটা আজ বঙ্কিমানুজ পূর্ণচন্দ্রের পৌত্র চামেলীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের দখলে। তবু কিছুটা তিনি খাড়া রেখেছেন আপন প্রচেষ্টায়, কিন্তু সেটুকু ছাড়া অন্যান্য অনেক অংশই জীর্ণ ও ভগ্নপ্রায়। বিরাট পূজার দালান, আজ নিস্তব্ধ, নিঝুম হ'য়ে যেন মরণের প্রহর গুণ্‌ছে! কোন একজনের একক প্রচেষ্টায় অত বড় বাড়ীখানা সুসংস্কৃত ক'রে খাড়া রাখা সত্যিই দুঃসাধ্য। দেখ্‌লাম, বাড়ীতে ঢুক্‌তেই বাঁদিকে সুপ্রশস্ত বৈঠকখানা ঘরটা—সেখানে বঙ্কিম ও তাঁর সহোদরেরা সকলে মিলে একত্রে পড়াশুনো করতেন এবং ধূমপানেরও কোন বাধা ছিল না। ডান দিকের বৈঠকখানা ঘরে বিরাট কয়েকটি প্রতিকৃতি, ঐতিহ্যময় অতীতের বেশ একটু ছাপ আছে সেখানে।

এ বৈঠকখানা ঘরগুলি প্রথম আমলের। কর্ম্মক্ষেত্র থেকে অবসর নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যখন কাঁঠালপাড়ায় বসবাস সুরু করেন তখন বাড়ীর সামনে একটা বৈঠকখানা ঘর তৈরী করেন। সেইখানাই আজ বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার দখলে, সেখানেই রক্ষিত হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহৃত শিরস্ত্রাণ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি, কয়েকটি চিঠি ও দলিলের পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি। বেশ সুন্দর মাজা-ঘষা ঘরটায় আধুনিক কালের ছাপমারা। পুরাণো দিনের ঐতিহ্যময় ও বনেদীয়ানায় আভিজাত্যপূর্ণ বঙ্কিমভবনের সম্মুখে ঐ সাজানো ঝক্‌ঝকে বৈঠকখানা ঘরটি দেখে আনন্দমঠের দুটো কথা হঠাৎ মনে হ'ল—'মা কি ছিলেন' ও 'মা কি হইয়াছেন।'

বঙ্কিমচন্দ্র থাক্‌তেন বাঁহাতি বৈঠকখানার ওপরের ঘরটিতে, আর লেখাপড়া করতেন সামনের ঐ বৈঠকখানায়। খানাপিনার প্রতি কোন্ বাছবিচার ছিল না ব'লে সম্ভবতঃ তিনি নিজ বাটি পরিহার ক'রে বিচ্ছিন্ন অবস্থাতেই বেশী সময় কাটাতেন। বঙ্কিমজনক যাদববাবু আবার অত্যন্ত গোঁড়া লোক ছিলেন। এ সম্বন্ধে একটি ঘটনাও আছে।

তখন ভারতের বড়লাট ছিলেন লর্ড লিটন। বঙ্কিম প্রতিভায় আকৃষ্ট হ'য়ে তিনি কাঁঠালপাড়া ভবন পরিদর্শন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র পিতার কাছে এ সংবাদ জানাতে, পরমবৈষ্ণব যাদবচন্দ্র ত ক্ষেপে উঠলেন—'না, তা হবে না। আমার বাড়ীতে ম্লেচ্ছকে আনা হবে



বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহৃত চোগা

না। আমার নাম করে তুমি লাট সাহেবকে জানিয়ে দাও যে আমার বাড়ীতে তাঁর আসা আমার ইচ্ছা নয়। আমার ঝি-বউরা ম্লেচ্ছর সামনে বার হবে না।

মহা মুস্কিল! লাটসাহেব ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তাঁকে ত বাধা দেওয়া যায় না। আবার গোঁড়া পিতাকেও টলানো কঠিন। অবশেষে অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর যাদবচন্দ্র কিঞ্চিৎ নরম হ'লেন, ঠিক হ'ল বড়লাট আসবেন কিন্তু বাড়ীর ঝি-বউদের সঙ্গে আলাপ করতে পারবেন না। লাট-মহিষী বাড়ীর বউ-ঝিদের সঙ্গে আলাপ করবেন। যাদবচন্দ্র তাঁর শয়নকক্ষে বিশ্রাম করবেন, লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা করবেন না।

এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, যাদবচন্দ্র নিজে একজন গভর্ণমেণ্টের চাকুরীয়া ছিলেন। ডেপুটী কালেক্টরের পদ থেকে অবসর নিয়ে তখন পেন্‌সন ভোগ করছিলেন।

ঠিক স্পষ্ট ক'রে কোথাও উল্লেখ না থাকলেও শোনা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ম্লেচ্ছযানী অর্থাৎ মুসলমান বাবুর্চ্চির হাতে খানাপিনা করার জন্যে পিতৃস্নেহ থেকে অনেকটা বঞ্চিত ছিলেন এবং অনেকের ধারণা ঐ কারণেই বাড়ীর কোন অংশ তিনি পিতার কাছ হ'তে পাননি!—কিন্তু তা সত্যি নয়।

এতদ্‌সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র যে পিতৃভক্ত ছিলেন এর অনেক প্রমাণ আছে। একটা হ'ল—একদিন ছোটলাট বাহাদুর বঙ্কিমচন্দ্রকে ডেকে যখন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ দিতে চান্, পিতৃভক্ত বঙ্কিমচন্দ্র তৎক্ষণাৎ ছোট লাটকে বলেছিলেন, আমার পিতার বিনা-অনুমতিতে এপদ আমি গ্রহণ করতে পারি না। ছোটলাট বাহাদুর সে কথা শুনে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হ'য়েছিলেন।



বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক বাসভবন

কাঁঠালপাড়ার যে ভবনটিতে ১২৪৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ই আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার রাতে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম, সেটি তাঁর পিতৃপুরুষের আদি বাড়ী নয়। তাঁদের দেশ অর্থাৎ আদি বাড়ী হুগলী জেলার দেশমুখোতে। বঙ্কিমচন্দ্রের ঊর্দ্ধতন চতুর্থ পুরুষ হইতে এখানে বাস সুরু। রামহরি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মাতামহের সম্পত্তি পেয়ে এখানে কাঁটালপাড়ায় বসবাস করতে আসেন। তখন বাড়ীটি ছিল মাটির ও চালাঘর, আর তার অধিকারী ছিলেন ঘোষাল বংশ।

ঘোষাল বংশের কাছ থেকে চট্টোপাধ্যায়রা উত্তরাধিকার সূত্রে বাড়ীটি ছাড়া আরও যা পেলেন তা' হ'ল—রাধাবল্লভ বিগ্রহের সেবার ভার। এই রাধাবল্লভ বিগ্রহ প্রাপ্তি সম্বন্ধে নানা প্রবাদ আছে। তার মধ্যে যেটা প্রমাণ্য ব'লে মনে হয় সে সম্বন্ধে বঙ্গদর্শনের অন্যতম লেখক পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখে গেছেন :—

"প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে কাঁঠালপাড়া গ্রামে এক দরিদ্র ঘোষাল ব্রাহ্মণের গৃহে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হন্। ঘোষালের স্ত্রী ও দুইটি কন্যা। তিনি অতি দরিদ্র। তাঁহার দিনপাত হওয়া কঠিন ছিল, তথাপি তিনি সপরিবারে সন্ন্যাসীর যথেষ্ট পরিচর্য্যা করিলেন। দৈবক্রমে সন্ন্যাসী তাঁহার বাটিতেই পীড়িত হইয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসী আরোগ্যলাভ করিয়া বলিলেন, আমি তোমার সেবায় বড়ই সন্তুষ্টি লাভ করিলাম। আমার আর কিছুই নাই। এই রাধাবল্লভ বিগ্রহটি তোমায় দিয়া গেলাম, তুমি ইহার সেবা করিও।

'ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, 'ঠাকুর, আমারই দিন চলে না, আমি কি করিয়া বিগ্রহের সেবা করিব?

'সন্ন্যাসী কহিলেন,'আচ্ছা,আমি আসা পর্য্যন্ত, যেরূপে পার চালাও—আমি আসিয়া অন্যরূপ ব্যবস্থা করিব।'

'কিছুদিন পরে সন্ন্যাসী ফিরিয়া আসিয়া রাধাবল্লভের নামে একটি তালুক লিখিয়া দিলেন। ক্রমে ঘোষাল মহাশয় বেশ সম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। ফুলে ও বল্লভী মেলে দুইজন ভঙ্গ কুলিনের সঙ্গে দুইটি কন্যার বিবাহ দিলেন এবং জামাইদিগকে রাধাবল্লভ সেবার ভার দিয়া পরলোক-গমন করিলেন। এই ফুলে মেলে যে জামাই হইল, তাহারই বংশে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম।"

সেই তিনশত বৎসরের প্রাচীন রাধাবল্লভ বিগ্রহের আজও সেবা হয়, সে ঘোষাল বংশ আজও আছে মাদরালে। 'অপরাধ-বিজ্ঞান' প্রণেতা পঞ্চানন ঘোষাল সেই বংশেরই সন্তান।

বঙ্কিম-পরিবারের এই ইষ্টদেবতা শ্রীবিজয় রাধাবল্লভ জীউর রথযাত্রা একদিন বাংলাদেশের মধ্যে খুব প্রসিদ্ধ ছিল। অনেক উৎসব জাঁকজমক হ'ত, মেলা বসত, যাত্রা পুতুল নাচ কথকতা আরো কত কী হ'ত। আজ সে উৎসব অনেকটা ম্লান হ'য়ে গেলেও, আজও রথ চলে, সামনের আটচালায় মেলাও বসে। প্রমাণ স্বরূপ দেখে এলুম সেদিন রথযাত্রার মাত্র আর কয়েকদিন বাকী ছিল। রথটা পরিষ্কার হয়েছে, মেলার জন্যে অনেক মাটির পুতুলও তৈরী হয়েছে।

রাধাবল্লভ জীউর বিগ্রহটি নির্ম্মিত হয়েছে কাল পাথর কুঁদে, (শুনলাম বিগ্রহটি নাকি জয়পুরের), আর বলরাম নিমকাঠের। রাধাবল্লভ ও বলরামের স্ত্রী রাধারাণী ও রেবতী অষ্ট ধাতুতে প্রস্তুত।

রথটির কাঠামো লোহার ও পিতলের পাতে মোড়া। বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় তমলুকে ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট থাকা কালীন এই রথটি নির্ম্মাণ ক'রে নৌকাযোগে কাঁঠালপাড়ায় পাঠান এবং শ্যামাচরণ তাঁর পিতাকে দিয়ে রথটি প্রতিষ্ঠা করান্ ব'লে এর যাবতীয় খরচ তারই ছিল। অন্যান্য ভায়েরাও অবশ্য কিছু অর্থ সাহায্য করতেন। ন'দিনে তখন খরচ পড়ত ন'শো টাকার মত। কত সাহিত্যিক দার্শনিক, নৈয়ায়িক, পণ্ডিত এই উপলক্ষে সমবেত হতেন, কোন কোন বছর রবীন্দ্রনাথও থাকতেন সেই বৈঠকে। তাছাড়া দীনবন্ধু

মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতিও সমবেত হ'তেন। শতঞ্জীব বাবুর মুখে শুনলাম, আগে রথের সময় কদিন ধ'রে ঘষে মেজে রথ এমন ঝক্ঝকে ক'রে তোলা হ'ত যে দেখলে মনে হ'ত যেন সোনার তৈরী। তাতে খরচও পড়ত অনেক, এখন রঙ্ ক'রে সে খরচটুকু বাঁচানো হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা এই কাঁঠালপাড়ারই বাড়ীতে। পরে পিতার কর্ম্মক্ষেত্র চুঁচুড়া ও মেদিনীপুরে শিক্ষালাভ করেন। তিনিই বাঙালীর মধ্যে প্রথম গ্রাজুয়েট।

জন্মভূমির প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ আকর্ষণ ছিল। কলিকাতায় প্রতাপ চ্যাটার্জ্জী লেনে বাসকালে প্রতি সপ্তাহে তিনি কাঁঠালপাড়ায় আসতেন। সঞ্জীবচন্দ্রের স্ত্রীকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং পুত্র না থাকায় সেই স্নেহের সবটাই লাভ করেন সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র জ্যোতিষ-চন্দ্র। জ্যোতিষচন্দ্রের কর্ম্ম-বিমুখতার জন্যে যেমন তাঁকে তিরস্কারও করতেন, তেমনি সাহায্য করতেও কখনও কুণ্ঠিত হন্ নি। শাসন ও স্নেহ ছিল তাঁর চরিত্রে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

কিন্তু যেদিন তিনি শুনলেন যে কোন পুত্র না থাকায় তিনি ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামাচরণ পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, সেদিন থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষোভে ও দুঃখে কাঁঠালপাড়ায় আসা বন্ধ ক'রে দিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্রকে আনার জন্যে অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পিতার মতই ছিলেন অত্যন্ত জেদী পুরুষ। কোন মতে কৃতকার্য্য না হওয়ায় সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর নিজ অংশ থেকে কিছুটা বঙ্কিমচন্দ্রকে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু পিতা বর্ত্তমানে সঞ্জীব-চন্দ্রের দানপত্র সিদ্ধ হ'তে পারে না বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই পিতার স্বাক্ষরের জন্য একটি দানপত্র খসড়া করে অগ্রজকে পাঠান। সেই খসড়া দানপত্রটি আজিও আছে, কতকাংশ তার ছিন্ন ও লুপ্ত। সেই লুপ্ত অংশটুকু বাদে খসড়াটি অবিকল এইরূপ :—

পরম কল্যাণীয় শ্রীমান্ বঙ্কিমচন্দ্র ইত্যাদি লিখিতং শ্রীযাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাং কাঁঠালপাড়া, পং হাবিলি শহর, থানা নৈহাটি, সব্ ডিষ্ট্রিক্ট্ নৈহাটি, জেলা ২৪ পরগণা। উক্ত কাঁঠালপাড়া গ্রামে আমার যে ভদ্রাসন বাটি ছিল ও আছে তাহা বাংলা ১২৭২ সালে আমি আমার পুত্র সঞ্জীবচন্দ্র ও শ্রীমান্ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দান করিয়া-ছিলাম। তৎকালে উক্ত ভদ্রাসন বাটি চারি অংশে বিভক্ত করিয়া আমার চারি পুত্রকে দান করিবার আমার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামচন্দ্র ও তৃতীয় পুত্র তুমি তোমার............... ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া আমার কৃত ভদ্রাসন বাটির অংশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে তোমাদের দুইজনকে ভদ্রাসন বাটির কোন অংশ না দিয়া সমুদয় দ্বিতীয়পুত্র সঞ্জীবচন্দ্র ও কনিষ্ঠ পুত্র পূর্ণচন্দ্রকে বিভাগ করিয়া দিয়া-ছিলাম। তৎপরে শ্যামচন্দ্র পৃথক বাটি প্রস্তুত করিয়া বসবাস করিতেছেন, তুমিও পৃথক বাটি প্রস্তুত করতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে। কিন্তু তোমার ভ্রাতৃদ্বয় সঞ্জীবচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্রের ও আমার অনুরোধে তাহা বন্ধ করিয়া আমার প্রস্তুত করা ভদ্রাসন বাটির এক অংশ (যাহার চৌহদ্দী নীচে লেখা গেল তাহা) মেরামত করিয়া ও তাহাতে নূতন ঘর ও... প্রস্তুত করিয়া বসবাস করিতেন। ঐ অংশ......তিনি ঐ অংশ তোমাকে দান পত্রের......দান করিয়াছেন। এবং তৎসঙ্গে সদর বাটির তৃতীয়াংশ তিনি ও পূর্ণচন্দ্র তোমাকে দান করিয়াছেন। এক্ষণে ঐ ভদ্রাসন পিতৃদত্ত নহে বলিয়া তুমি তাহাতে বাস করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া স্থানান্তরে বাস করিবার ইচ্ছা করিয়াছ। এজন্য আমি তোমার লিখিয়া দিতেছি যে আমার ভদ্রাসনের যে অংশ তোমাকে তোমার ভ্রাতৃদ্বয় লিখিয়া দিয়াছেন তাহা তোমার হক্। বাংলা ১২৭২ সালের দানকালে তুমি উহা লইতে ইচ্ছুক... তোমাকে দান করিতাম।.........দান



বঙ্কিমচন্দ্রের মর্ম্মরমূর্ত্তি

করিয়াছেন সেও আমার অভিপ্রায়ানুসারে। ঐ দান সিদ্ধ ও আমার অনুজ্ঞাত। এবং আমার নিজকৃত জ্ঞান করিয়া উহাতে তুমি বসবাস করিতে থাকিবা। ইতি...

চৌহদ্দী......

চৌহদ্দীটা হয়ত অন্যকাগজে লেখা ছিল, কিন্তু তা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

ঋষিতীর্থ কাঁঠালপাড়ায় মাত্র কয়েক ঘণ্টার অবস্থিতি! সেইটুকু সময়েই ঐ প্রাচীন সৌধ-সমাধির মধ্যে যেন প্রত্যক্ষ করলুম একটা

পুরো শতাব্দীর ইতিহাস, বঙ্গ-সাহিত্যের নবজন্মের অঙ্কুর থেকে বনস্পতির স্বপ্ন-সম্ভাবনার যুগান্ত কাহিনী, আর সংগ্রাম সাধনার প্রথম মন্ত্র-বাণী হ'তে আজকের স্বাধীনতার বিস্তৃত অধ্যায়! কাঁঠালপাড়ার পুণ্যভূমি জাতীয় তীর্থ আজ!

যে মাটির প্রতিটি ধূলিকণা পবিত্র, যে গৃহের প্রতিটি ইঁটের মধ্যে মিশিয়ে আছে সেই মহর্ষির পুণ্য স্পর্শ, সে গৃহ, সে মাটি কালের কবল থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব শুধু সরকারেরই নয়, ভারতের আপামর জনসাধারণের। সাহিত্যে তাঁর বিরাট দান অস্বীকার কর্লেও আজকের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির কৃতজ্ঞতা হিসেবেও তাঁর স্পর্শ-স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখা কর্ত্তব্য। ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা তাঁর স্মৃতিকে অক্ষয় করার যে মহান উদ্দেশ্য-সাধনে ব্রতী হ'য়েছেন সমস্ত ভারত বাসীর তাতে সহযোগিতা করা উচিত। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহৃত জিনিষ-পত্র, দলিল ও রচনার পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি ছাড়াও তাঁর বাসগৃহ ও জন্মস্থান সংরক্ষণ করাও আমাদের জাতীয় কর্ত্তব্য! সেক্সপীয়র প্রভৃতি মনীষীদের বাসগৃহ যেমন জাতীয় তীর্থক্ষেত্র রূপে দর্শনীয়, কাঁঠালপাড়ার বঙ্কিম ভবনও তেমনি সরকারী সংরক্ষণের দ্বারা তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করার সময় এসেছে! এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত সম্পত্তি আজ জাতীয় সম্পদরূপে পরিগণিত হওয়া বাঞ্ছনীয়!*

* এ প্রবন্ধের তথ্যাবলী সঞ্জীবচন্দ্রের পৌত্র শ্রীশতঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হইতে সংগৃহীত।

'শরৎ'-বন্দনা

শ্রীসীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায়

ধূলাতলে নামি আসি ঐতিহ্যের উচ্চাসন হ'তে
অমর প্রতিভা কারো ইতিপূর্ব্বে করেনি সৃজন,
পীড়নের শতপাকে নিপীড়িত জীবনের ক্ষতে
আলেখ্য অঙ্কন পথ, উপেক্ষায় আছিল বিজন!

অভিজাত নরনারী সাহিত্যের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়,
এতকাল ভীড় করি পতিতেরে দেয় নাই স্থান,
দেশপ্রেম লয়ে কাব্য রচিয়াছে পরম নিষ্ঠায়
দেখায়েছে স্রষ্টা সেথা নিবেদিত অভিজাত প্রাণ।

সমাজের সত্যরূপ, মানবের পূর্ণ পরিচয়,
দেখালেন বিশ্বকবি— কবিধর্ম্মে দিয়া আবরণ,
দূর হ'তে দেখা বলে মনে হলো স্পষ্ট বুঝি নয়—
রহস্যে-আবৃত অতি-সাধারণ—জৈব আচরণ!

সার্থক সমাজ চিত্র আঁকিয়াছ বলিষ্ঠ রেখায়
অসঙ্কোচে উচ্চারিলে বিদ্রোহের অস্ফুট বচন।
মানবের বেদনারে মূর্ত্ত করি মধুর লেখায়
হে বাণী দুলাল, তুমি বাণী শোধ করিলে রচন!

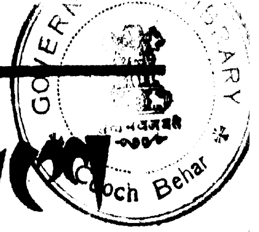
স্নেহ প্রেম, ঈর্ষাদ্বন্দ্ব, আবহকালের সংস্কার,
ভিন্ন খাতে প্রবাহিলে—উন্মেষিত হ'ল যুগ নব—
রক্ষণশীলদল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে করি তিরস্কার
নবীনের বন্যাস্রোতে মানিল পল্বল—পরাভব!

সমাজের সাথে তব সুনিবিড় যে একাত্ম যোগ
সর্ব্বস্তর মানবের সর্ব্ববৃত্তি করিল চিত্রণ,
বাণী পাদপীঠতলে নিবেদিলে যে নৈবেদ্য ভোগ
তাহারি মহিমা আজি জনে জনে করিছে কীর্ত্তন!

মানবের চিত্ততলে পাতা তব প্রেমের আসন
বিস্মৃতির সাধ্য নাই হরে সেই মৃত্যুজয়ী প্রাণ,
হেথা মৃত্যু পরাভূত, তুচ্ছ তার সকল শাসন
জয়টীকা দিয়া ভালে গাহিল কৌমারি জয়গান!!



সোভিয়েট দেশে



শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এ সব সত্ত্বেও কিন্তু দেশে শান্তি এলো না। নানা জায়গায় বল্‌শেভিক-বিপ্লবীদের সঙ্গে লেগেই ছিল ক্ষমতালোভী বিপক্ষ-দলের সঙ্ঘর্ষ! পেট্রোগ্রাডের বিপ্লবে যেমন অনায়াসে বল্‌শেভিকদের বিজয়লাভ ঘটেছিল, মস্কোতে কিন্তু তত সহজে হলো না। ক্রেমলিন দুর্গের সৈন্যদের সঙ্গে বল্‌শেভিক-বিপ্লবীদের সংগ্রাম বেশ কিছুদিন চলে। তবে শেষ পর্যন্ত বল্‌শেভিকদেরই জয়লাভ ঘটে এবং ক্রেমলিন দুর্গ, আসে তাঁদের দখলে। ক্রেমলিন প্রাসাদে ছিল তখন মস্কোর সরকারী দপ্তর…সুতরাং দুর্গ জয়ের সঙ্গে সঙ্গে বল্‌শেভিকদের হাতের মুঠোয় এসে গেল শাসন-যন্ত্রের চাবীকাঠি! মরিয়া হয়ে কেরেনস্কী এ-সময়ে একবার শেষ চেষ্টা করেন বল্‌শেভিকদের কবল থেকে তাঁর নষ্ট-প্রতিপত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য। কিন্তু ভাগ্য ছিল নিতান্ত বিরূপ! কাজেই প্রবল প্রতিপক্ষের কাছে হার মেনে, রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাতে হলো কেরেনস্কীকে—স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশ ধারণ করে। এছাড়া বল্‌শেভিকদের ক্ষমতা-প্রতিপত্তি-বৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে অন্যান্য প্রতিপক্ষ বিপ্লবীদের দলও রাশিয়ার শাসন-ক্ষমতা নিজেদের হাতে নেবার চেষ্টা করেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত লেনিনের বিচক্ষণ বুদ্ধি এবং সুতীক্ষ্ণ কূটনীতির চালে তাঁদের সকলকে হার মানতে হয়। এমনিভাবে লেনিন ক্রমশ হয়ে ওঠেন বল্‌শেভিক বিপ্লবীদের সর্ব্বাধিনায়ক!

বিপ্লবের পর বল্‌শেভিক্ দলের সহযোগিতায় প্রাণপাত-প্রচেষ্টায় লেনিন নূতন আদর্শে, নূতন ছাঁদে উন্নতভাবে অনাচার-জীর্ণ সুপ্রাচীন রাশিয়াকে আবার সুন্দর করে গড়ে তোলবার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। স্বার্থান্বেষী-বিলাসী-উদাসীন 'জার্'-শাসকদের আমলে রুশ-রাজ্যে যে সব পাপদুষ্ট অনাম্য, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আর্থিক অব্যবস্থার প্রাদুর্ভাব ছিল—লেনিন চাইলেন তার আমূল সংস্কার…চির-উচ্ছেদ! দেশের যা কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ—তেল, কয়লা প্রভৃতি খনিজ-পদার্থ, খাল-বিল-নদী, বন, জমি, কল-কারখানা, শিল্প-প্রতিষ্ঠান, স্কুল-কলেজ, দপ্তরখানা, চিকিৎসাগার, সবই হলো সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি এবং 'সোভিয়েট' বা 'পঞ্চায়েতী' ব্যবস্থায় রুশ জনগণের ভিতর থেকে সুদক্ষ প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে দেশ-শাসনের জন্য নূতন আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হলো Council of People's Commission' অর্থাৎ 'গণমন্ত্রী পরিষদ'! এ পরিষদের সভাপতি হলেন লেনিন; বৈদেশিক-ব্যাপারের মন্ত্রীত্বের ভার নিলেন ট্রট্স্কী; দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন রাইকভ্, ষ্টালিন হলেন জাতীয়তা-রক্ষা বিভাগের মন্ত্রী, শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রীত্বভার পেলেন লুনাচারস্কী! সুপ্রাচীন 'জারের' রাজ-প্রতীক-চিহ্ন অপসারিত হয়ে রুশ-রাজ-প্রাসাদের চূড়ায় উড়লো বল্‌শেভিক্-বিপ্লবীদের 'কাস্তে আর হাতুড়ীর' প্রতীক-চিহ্ন আঁকা



সোভিয়েট রাষ্ট্রনায়ক লেনিন ও তাঁর সুযোগ্য শিষ্য ষ্ট্যালিন
(ছবিটি তোলা হয়েছিল ১৯২২ সালে। সে সময় অসুস্থ অবস্থায় লেনিন মস্কোর অনতিদূরে গোর্কী রাজপথের পল্লী-আবাসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন)

রক্ত-রাঙা লাল-নিশান! বিপ্লবীদের নিশানের এই লাল-রঙ এবং কাস্তে-হাতুড়ী আঁকা প্রতীক-চিহ্নটির মূলে আছে এক বিচিত্র ইতিহাস।

১৭৯২ সালে ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ-সাধনের সময় ফরাসী গণতান্ত্রিক-বিপ্লবীর দল সশস্ত্র-অভিযানের সঙ্কেত হিসাবে সর্ব্বদাই রক্তের মত লাল-রঙের নিশান, রুমাল, হাত-পটি (Arm-band) কিম্বা অঙ্গরাখা-জামা ব্যবহার করতেন। তাঁদের সেই প্রথা-অনুসরণে রাশিয়ার রাজদ্রোহী সাম্যবাদী-বিপ্লবীরাও লাল-রঙটিকে বেছে নিয়েছিলেন নিজেদের

দলের প্রতীক হিসাবে। তখন থেকেই সোভিয়েট পতাকায় এই রঞ্জন-সূচনা। তাছাড়া রুশ-দেশে রাজা এবং অভিজাত-ধনী-জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে গণ-বিপ্লব বাধানোর দুঃসাহস এবং সাম্যবাদী-প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের তাগিদ প্রথম জাগিয়ে তোলে সুদীর্ঘ-প্রপীড়িত দীন-দুঃখী কৃষক আর শ্রমিকের দল—তাই তাদের সেই অপূর্ব্ব সংগ্রামের কথা স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে বল্‌শেভিক্ বিপ্লবী-দল কাস্তে আর হাতুড়ির প্রতীক-চিহ্নে সোভিয়েট-পতাকা শোভিত করেন! কাস্তে হলো কৃষিজীবী জনগণের প্রতীক এবং হাতুড়ি মেহনতী-শ্রমিকদের হাতিয়ারের চিহ্ন।

নব-গঠিত 'সোভিয়েট গণমন্ত্রী পরিষদের নূতন বিধানে রাশিয়ার বুক থেকে জাতি ও ধর্ম্মগত বিধি-নিষেধ সব লোপ পেলো... চার্চের সঙ্গে রাষ্ট্রের এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির আর কোনো রকম সম্পর্ক রইলো না...দেশের প্রত্যেক ব্যাপারে স্ত্রী-পুরুষের অধিকার-মর্য্যাদা হলো সমান...সাবেকী-প্রথায় গির্জ্জায় গিয়ে বিবাহের পরিবর্ত্তে সরকারী-দপ্তরে হাজির হয়ে 'রেজিষ্ট্রী-পরিণয়ের' প্রবর্ত্তন ঘটলো! দেশের যত অভিজাত-সৌখীন-সম্ভ্রান্তজন ধনী, মহাজন, জমিদার, ব্যবসায়ী এবং কারখানার মালিকদের অর্থ-সম্পদ, বাড়ী ঘর, জমি-জমা যা কিছু সম্পত্তি সমস্ত বাজেয়াপ্ত হলো সোভিয়েট-সরকারের তোষাখানায়...যেখানে যত ব্যাঙ্ক ছিল সব হয়ে গেল রুশ-রাজ্যের 'জাতীয় সম্পত্তি' (National Property)! সোভিয়েট সরকারের বিধান জারী হলো—রাশিয়ায় ধনী-নির্ধন, সবাই সমান! সবাইকেই খাটতে হবে...কাজ না করলে কারো অন্ন জুটবে না!

এমনিভাবে বল্‌শেভিকদের নূতন কার্য্যপদ্ধতিতে রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান হলেও যুদ্ধ আর পররাষ্ট্র-ব্যাপারে তেমন কোনো সুবিধা হলো না। সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট রণমত্ত দেশগুলিকে অনুরোধ জানালেন,—যুদ্ধ-শান্তি এবং সন্ধি সর্ত্ত আলোচনার জন্য! ইংলণ্ড আর ফ্রান্স সে-অনুরোধ উপেক্ষা করলেও, লেনিনের নির্দ্দেশে সোভিয়েট-সরকার কিন্তু জার্ম্মাণী এবং অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে আলোচনা চালালেন শান্তির আশায়!

ট্রট্‌স্কী এবং তাঁরই মত 'উগ্রপন্থী' বিপ্লবীরা দেশের সঙ্গীণ আর্থিক-কষ্টের মুহূর্ত্তেও নিতান্ত অবুঝের মত দলপতি লেনিনের নির্দ্দেশ অমান্য করে জার্ম্মাণীর সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি তুললেন। 'ব্রেষ্ট্-লিটোভ্‌স্কে'র যুদ্ধ-বিরতির আলোচনা ফেঁশে যাবার দাখিল, এমন সময় লেনিন এবং ষ্টালিন প্রাণপাত চেষ্টায় ট্রট্‌স্কী-পন্থীদের কূটনৈতিক-চালে পরাজিত করে বহুকষ্টে জার্ম্মাণীর সঙ্গে সন্ধি করেন!

পশ্চিম-ইউরোপে তখন পুরাদমে প্রথম মহা-সমরের (World War I—1914-1919) তাণ্ডব চলেছে। সে-সময় সদ্যজাত শিশু-রাষ্ট্র সোভিয়েট-রাশিয়ার সঙ্গে জার্ম্মাণীর সন্ধি হওয়ায় ইংলণ্ড, আমেরিকা, কানাডা প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক শক্তিপুঞ্জ রীতিমত বিচলিত হয়ে উঠলো! তাদের ফন্দী ছলে-বলে-কৌশলে যেন তেন প্রকারে রাশিয়ায় সোভিয়েট-সরকারের উচ্ছেদ-সাধন করা! ইতিমধ্যে সুযোগও জুটে গেল! সোভিয়েট-গভর্ণমেন্টের ক্ষমতা-বৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত রাশিয়ার অভিজাত আর ধনিক সম্প্রদায় জেনারেল কর্নিলভ্, ডেনিকিন্, ক্রাসনভ্ এবং রাঙ্গেল প্রমুখ ক'জন স্বার্থান্বেষী রুশ-সেনাধ্যক্ষের সঙ্গে গুপ্ত-চক্রান্ত করে 'White-Army' বা 'শ্বেত-সেনা বাহিনী গড়ে' দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবল আক্রোশে বিদ্রোহ বাধিয়ে তুললো—সাম্যবাদীদের বিরুদ্ধে! ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, কানাডা এবং অন্য সব ধনতান্ত্রিক শক্তিপুঞ্জ অবিলম্বে অস্ত্রশস্ত্র, সৈন্য আর অর্থ দিয়ে এই বিদ্রোহী রুশ-সেনাপতিদের রীতিমত সাহায্য করতে লাগলো। সারা রাশিয়ার বুক জুড়ে জ্বলে উঠলো সোভিয়েট-সরকারের 'লাল-ফৌজের' সঙ্গে বিদেশী-সহায়পুষ্ট শ্বেত সেনাবাহিনী'র প্রচণ্ড গৃহযুদ্ধের আগুন! 'ব্রেষ্ট্-লিটোভস্কের' সন্ধি-সর্ত্তের কথা ভুলে জার্ম্মাণীও সে-সময় সোভিয়েট-সরকারের বিরুদ্ধে এই গৃহযুদ্ধে ঘৃতাহুতি দিতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেনি! শুধু সাহায্যই নয়, সুযোগ বুঝে ইংরাজ ও ফরাসী বাহিনী যুদ্ধ ঘোষণা না করেই সসৈন্যে আক্রমণ চালিয়ে আর্ক-এঞ্জেল (Archangel) এবং মুরমান্স্ক (Murmanks) দখল করে বসলো। জাপানও সসৈন্য-অভিযান চালিয়ে ভ্লাডিভষ্টক্ (Vladi- vostok) দখল করে নিলে। ওদিকে উত্তর ককেসাশে জেনারেল কর্নিলভ্, ডেনিকিন, খারকোভ্, পোলটাভা সহর বিজয় এবং 'ডন্' (Don River) নদীর তীরে জেনারেল ক্রাস্‌নভ্ বহু বিস্তৃত অঞ্চল অধিকার করলেন। সশস্ত্র-বাহিনী নিয়ে রাশিয়ার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বিস্তৃত অংশ দখল করে জেনারেল জুডেনিচ্ অভিযান চালান পেট্রোগ্রাডের অভিমুখে কিন্তু ট্রট্‌স্কীর নিপুণ বিরোধিতায় তাঁর শোচনীয় পরাজয় ঘটে! জেনারেল রাঙ্গেল ক্রিমিয়া দখল করে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করলেও, কিছুদিন পরে 'লাল-ফৌজে'র আক্রমণে তাঁকে প্রাণ ভয়ে পালাতে হয় যুদ্ধে ইস্তফা দিয়ে! বিদেশী শক্তিপুঞ্জের সহায়তায় পরিপুষ্ট বিদ্রোহী রুশ নৌ-সেনাধ্যক্ষ আড্‌মিরাল্ কোলচাকেরও সাইবেরিয়া অঞ্চল দখল করে মস্কোর অভিমুখে সসৈন্য অভিযানের সময় বল্‌শেভিক্ সেনাদের হাতে পরাজিত হন! এই নিদারুণ গৃহযুদ্ধের ফলে রাশিয়ার দুরবস্থা দিন-দিন সঙ্গীণ হয়ে ওঠে! কিন্তু এত বিপদের মুখেও বল্‌শেভিক্ দলের সাহস ছিল অটুট, শক্তি ছিল অসীম এবং স্বদেশের স্বার্থ রক্ষার নিষ্ঠা ছিল তাঁদের অবিচল। এরই বলে ট্রট্‌স্কী, ষ্টালিন প্রমুখ নেতাদের নিপুণ নির্দ্দেশনায় পরিচালিত হয়ে তাঁরা প্রাণান্ত-চেষ্টায় বিদেশী শত্রু এবং বিশ্বাসঘাতক স্বদেশী সেনাধ্যক্ষদের স্বার্থান্ধ-অভিযানের দুরন্ত দাপট থেকে নিজেদের দেশকে বারবার রক্ষা করতে পেরেছিলেন! তাছাড়া বহিঃ-শত্রু বিতাড়নে সঙ্ঘবদ্ধ রুশ-জনসাধারণও, প্রত্যক্ষভাবে না হোক্ পরোক্ষ 'লাল-ফৌজ' এবং বল্‌শেভিক্ দলকে সর্ব্ব রকমে সাহায্য করেছিলেন সে-সময়। এঁদের সেই অপরূপ সহযোগিতার কথা সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে চিরদিন রাশিয়ার ইতিহাসের পাতায়। বল্‌শেভিকদের এবং রুশ জনগণের সম্মিলিত-প্রচেষ্টায় ১৯২০ সালের মধ্যেই সাম্যবাদী রাশিয়ার বিদেশী-হস্তক্ষেপের (Foreign Intervention) অবসান ঘটে।

সুদীর্ঘ চার বছর গৃহ-যুদ্ধের পর বল্‌শেভিক দলে আবার বাধলো

মতদ্বৈধতা। অনেকে প্রস্তাব জানালেন, দেশে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হোক্! কিন্তু দেশের শোচনীয় অভাব দুরবস্থা দেখে লেনিন কঠোর সিদ্ধান্ত করেন যে অতঃপর বল্‌শেভিক্ দলের অধীনে সামরিক-শাসনে শাসিত হবে সোভিয়েট রুশ-রাজ্য! সারা রাশিয়াকে লেনিন ভাগ করে দেন ক'টি প্রজাতান্ত্রিক (Republic) অঞ্চলে। এই সব নব-গঠিত অঞ্চলের প্রত্যেকটির আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থার ভার দেওয়া হলো সেখানকার অধিবাসীদের হাতে—স্বাধীনভাবে তাঁরা তাঁদের অঞ্চলের কাজ চালাবেন। এ ছাড়া মস্কো রাজধানী থেকে কমিউনিষ্ট দলের কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী সমিতি (Central Executive Committee) সারা রাশিয়ার অন্য সব ব্যবস্থা পরিচালনা করতে লাগলেন। এই কেন্দ্রীয় সমিতির সভাপতি হলেন লেনিন; সেনাবিভাগের ভার পড়লো ট্রট্‌স্কীর হাতে! বৈদেশিক বিভাগের দায়িত্ব নিলেন চিচেরিন এবং শিক্ষা বিভাগের ভার পড়লো লুনাচারস্কীর হাতে! এই সময় ট্রট্‌স্কীর নেতৃত্বে গঠিত রুশ সেনাবাহিনীর নাম হলো 'Red Army' বা 'লাল-ফৌজ'! শিক্ষা-দীক্ষা এবং দুর্দ্ধর্ষ ক্ষমতা-বলে গরিমায় রাশিয়ার 'লাল-ফৌজ' সৈন্যবাহিনী আজ ভুবন বিখ্যাত···অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি বলে পরিগণিত!

সুদক্ষ সৈন্যবাহিনী ছাড়াও সোভিয়েট সরকার সৃষ্টি করলেন 'চেকা' (Cheka) নামে দুর্দ্ধর্ষ এক গোয়েন্দা-বাহিনী। এঁদের কাজ হলো,—যে কেউ সোভিয়েট সরকারের বিরোধিতা করবে, তাকে নির্ম্মম সাজায় শায়েস্তা করা! 'চেকার' পরিচালনা-ভার নিলেন ফেলিক্স্ ঝার্‌ঝিন্‌স্কী! সাম্যবাদী-আদর্শের বিরোধী বহু 'বর্ণচোরা' স্বদেশী এবং বিদেশী শত্রু ছড়িয়ে ছিল তখন সারা রাশিয়ার বুকে—কাজেই বল্‌শেভিক্ দলের বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে এমন একটি সুনিপুণ গোয়েন্দা বাহিনীর! সোভিয়েট সরকার গঠিত হবার গোড়ার দিকে একবার সোশ্যাল-রেভলিউশ্যনিষ্ট্ দলের বিপ্লবীরা বিরোধী হিসাবে হত্যা করার উদ্দেশ্যে অতর্কিতে লেনিনের উপর পিস্তলের গুলি চালিয়ে তাঁকে গুরুতরভাবে আহত করে! সে-ঘটনার পর থেকেই সোভিয়েট সরকার গোয়েন্দা-বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেন এবং 'চেকার' ক্ষমতা-প্রতিপত্তিও বৃদ্ধি পায়। সে সময় সামান্য সন্দেহক্রমে কত সাম্যবাদী-বিরোধী বন্দী এবং নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করেছে 'চেকার' প্রকোপে···কত বিদ্রোহীর জীবনান্ত ঘটেছে এই নির্ম্মম রুশ গোয়েন্দা-বাহিনীর হাতে! ১৯১৮ সালের গৃহযুদ্ধের সময় 'চেকার' সক্রিয়-তৎপরতায় সারা রাশিয়া জুড়ে দুরন্ত আতঙ্ক বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছিল। সে কথা আজো 'Red Terror' বা 'লাল-আতঙ্ক' হিসাবে ইতিহাস-প্রখ্যাত হয়ে আছে! পরবর্ত্তীকালে কার্য্যপদ্ধতির কিছু অদল-বদল করে 'চেকা' নামের পরিবর্ত্তে এই রুশ গোয়েন্দা-বাহিনীর নূতন নাম রাখা হয় 'O.G.P.U.'

অধুনা রুশ গোয়েন্দা-বাহিনীর নাম দেওয়া হয়েছে N.K.V.D.

—বলা বাহুল্য, কর্ম্ম-পদ্ধতিরও প্রচুর পরিবর্ত্তন ঘটেছে এঁদের কালে-কালে এবং প্রয়োজনের তাগিদে!

এমনিভাবে ক্রমশঃ বহু দিক দিয়ে শক্তিশালী বল্‌শেভিক শাসনের ব্যবস্থায় রাশিয়ায় অন্নাভাব ঘুচলো না···দুর্দ্দশা বেড়ে চললো দিন দিন! সোভিয়েট সরকারের নির্দ্দেশে জনগণের প্রত্যেকের অন্নের মাত্রা হিসাব করে দেওয়া হলো—তবু হাহাকার চারিদিকে! দীর্ঘকাল ধরে গণ-বিপ্লব আর গৃহযুদ্ধের হাঙ্গামায় মেতে থাকার দরুণ দেশে দেখা দিল দারুণ অজন্মা, খাদ্যাভাব আর আর্থিক বিশৃঙ্খলা! ফলে, আবার জেগে উঠলো দেশ-জোড়া গণ-বিদ্রোহের কালো ছায়া! অবস্থা বুঝে সোভিয়েট সরকার সাম্যবাদের কড়া বিধান শিথিল করে দিলেন—সংস্কার সাধন করলেন ছোট-খাটো বহু দোষ-ত্রুটির! তাছাড়া রুশ জনসাধারণের সুবিধার্থে ১৯২১ সালে লেনিন প্রবর্ত্তন করলেন তাঁর সুপ্রসিদ্ধ New Economic Policy (N.E.P.) অর্থাৎ 'নূতন অর্থ নৈতিক নীতি'! এই নূতন নীতি অনুসরণের ফলে চাষ বাস এবং ছোট খাট ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প, কাজ-কর্ম্মে রুশ জনসাধারণ ব্যক্তিগত লাভের জন্য ব্যবসা চালানো বা খেটে যোগ্যতা অনুসারে অর্থ রোজগারের সুবিধা-অধিকার পেলো। শুধু কল-কারখানা, বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্য আর শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি চালানর ভার রইলো সোভিয়েট সরকারের অধীনে। এমন কি গোড়ার দিকে বিদেশী পুঁজিপতিদেরও সোভিয়েট দেশে কল-কারখানা বা শিল্প-প্রতিষ্ঠান খোলবার বেশ খানিকটা অধিকার দেওয়া হলো। কমিউনিজ্‌মের কড়া কানুন শিথিল করে মধ্যপন্থা অবলম্বন করলেন এবার সোভিয়েট সরকার! লেনিনের এ-ব্যবস্থার নাম—'State Capitalism' অর্থাৎ 'রাষ্ট্রীয় পুঁজি-প্রয়োগ ব্যবস্থা'!

দেশের আর্থিক-অবস্থার সংস্কার করে সোভিয়েট সরকার নজর দিলেন ধর্ম্মের অনাচার মোচনে! সমস্ত রুশধর্ম্ম মন্দিরের অর্থ-সম্পদ বাজেয়াপ্ত হলো সোভিয়েট সরকারে! অশিক্ষিত পশ্চাৎপদ রুশ-জনগণের অন্ধ ধর্ম্ম বিশ্বাস, আনুষ্ঠানিক গোঁড়ামী, অহেতুক কুসংস্কার আর স্বার্থান্ধ অনাচারী ধর্ম্মযাজকদের দৌরাত্ম্য ঘোচানর উদ্দেশ্যে বহু গির্জ্জা যাদুঘর ও সভাগৃহে রূপান্তরিত হলো। এমন কি 'জার' শাসকদের প্রাচীন উপাসনা-মন্দির মস্কোর 'লাল-চত্বরের' (Red Square) উপরকার প্রসিদ্ধ 'সেণ্ট বেসিল' গির্জ্জায় ধর্ম্মোপাসনার পরিবর্ত্তে প্রতিষ্ঠা করা হলো বিরাট এক ঐতিহাসিক-সামগ্রী রাখার সরকারী যাদুঘর আজো সেই সুসজ্জিত যাদুঘর বজায় রয়েছে 'সেণ্ট বেসিল গির্জ্জার অভ্যন্তরে।

এমনিভাবে সর্ব্বদিক দিয়ে লেনিনের নির্দ্দেশে পরিচালিত হয়ে সোভিয়েট শাসন-তন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হলো পশ্চাৎপদ রাশিয়ার বুকে। অবশেষে ১৯২৪ সালের ২১শে জানুয়ারী মস্কো সহরের উপকণ্ঠে গোর্কী (Gorky) জনপদের নিরালা পল্লী-ভবনের একান্তে সুদীর্ঘ-কাল রোগ-ভোগের পর লেনিন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন!

লেনিনের পর সোভিয়েত্ রাশিয়ার নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন তাঁর প্রিয় সহকর্মী ষ্টালিন। লেনিনের শোকসভায় পরলোকগত নেতার নামে শপথ করে ষ্টালিন প্রতিশ্রুতি দেন যে লেনিনের অসমাপ্ত কাজ বলশেভিক্ বিপ্লবীরা সকলে মিলে সুসম্পন্ন করবেন! সে কথা যে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হচ্ছে—তা স্পষ্ট বোঝা যায় সোভিয়েট রাজ্য পরিক্রমণে এসে! মোটর-বাসে চড়ে বিশাল মস্কো সহরের পথ মাড়িয়ে আশেপাশে বিচিত্র অভিনব দৃশ্য দেখতে দেখতে এগিয়ে চলার সময় এই কথাটাই মনে ভাবছিল বার-বার!

ক্রমশঃ



অনুবাদ সাহিত্য

কথার খেলাপ

(রুশ গল্প : আন্তন্ শেকভ)

অনুবাদ—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

নিকোলাশ ইলিচ বেলিয়েভ···সহরের মস্ত ধনী। সেন্ট-পিটার্সবুর্জে তাঁর অনেক বাড়ী-ঘর। তাছাড়া সহরের বাহিরে তালুক-মুলুক···রেশের নেশা তাঁর বেশ। বয়স বত্রিশ বছর···সৌখীন মানুষ···বেশ-ভূষার দিকে যেমন নজর, তেমনি নজর চেহারায় চটক রাখবার দিকে।

সেদিন বিকেলে তিনি এলেন মাদাম ইর্নিনার গৃহে। ইর্নিনার সঙ্গে তাঁর অনেকদিনের···অর্থাৎ নিকোলাশ বলেন—সম্পর্ক এখন এমন যেন সে অনেকদিনের পুরানো পড়া কেতাব! তার মধ্যে বৈচিত্র্য পাওয়া যায় না, তবু ছাড়া চলে না! তার সঙ্গে প্রথম পরিচয়—রোমান্সের রঙে সে-পরিচ্ছেদগুলো এমন রঙীন ছিল···মাঝে মাঝে মনে পড়ে—যেন স্বপ্ন! এখন স্বপ্নের সে-রঙ ঝরে গেছে···তবু কোথায় আবার নূতন রোমান্স রচনা করবেন? ···প্রাণে আর তেমন আবেগ নেই।

ইর্নিনা বাড়ী নেই···কোথায় বেরিয়েছে। ড্রয়িংরুমে একখানা সোফায় নিকোলাশ দেহ-ভার এলিয়ে দিলেন।

কোণ থেকে বালকের কণ্ঠে জাগলো অভ্যর্থনা—গুড্ ইভনিং···নিকোলাশ ইলিচ! মা বেরিয়েছে···সন্ধ্যার আগেই বাড়ী ফিরবে। সোনিয়াকে নিয়ে মা গেছে দর্জীর দোকানে।

ওলগা আইভানোভিনা বা মাদাম ইর্নিনার ছেলে এ-কথা বললে। ছেলের নাম আলোশা···বয়স আট বছর। এই বয়সেই ছেলে বেশ পাকা-পাকা কথা বলে···অনেক কিছু বোঝে···বুঝলেও সামলে চলতে শিখেছে। পরণে বেশ দামী ঝকঝকে ভেলভেট জ্যাকেট···পায়ে কালো রঙের সিল্কের ফুল মোজা···বগলশ-দেয়া জুতা। কোণে সাটিনের লম্বা কুশনে চিৎ হয়ে শুয়ে আলোশা সার্কাশের খেলোয়াড়ের খেলায় কশরৎ করছে। চিৎ হয়ে শুয়ে পা-দুটো জুড়ে উঁচু করে তুলে একটা বালিশ নিয়ে লাথি মেরে ছুড়চে উপরে—তার পর দু-পা এক করে' সেই বালিশ লুফে দু-পা এক করে পায়ের পাতায় রাখছে। মার সঙ্গে গিয়ে সার্কাশ দেখে এসেছে···এ খেলাটা তার সব চেয়ে ভালো লেগেছে; তাই মা বাড়ী না থাকলে সাটিনের কুশনখানা মেঝেয় বিছিয়ে সেই কুশনে চিৎ হয়ে শুয়ে এই খেলা প্রাকটিশ করে। মা বাড়ী থাকলে এ-খেলা হয় না! মা ধমক দেয়—হতভাগা ছেলে! দামী কুশনখানা মেঝেয় পেতে কি হচ্ছে ও!

মাকে আলোশা ভয় করে। মায়ের যা শাসন···উঠতে-বসতে সহবৎ শেখানোর দিকে মায়ের নজর।

আলোশা তাতে কেমন হাঁফিয়ে ওঠে!

আলোশার কণ্ঠ শুনে নিকোলাশ তাকালো তার দিকে, বললে—ও—আলোশা···তুমি! খেলা হচ্ছে!

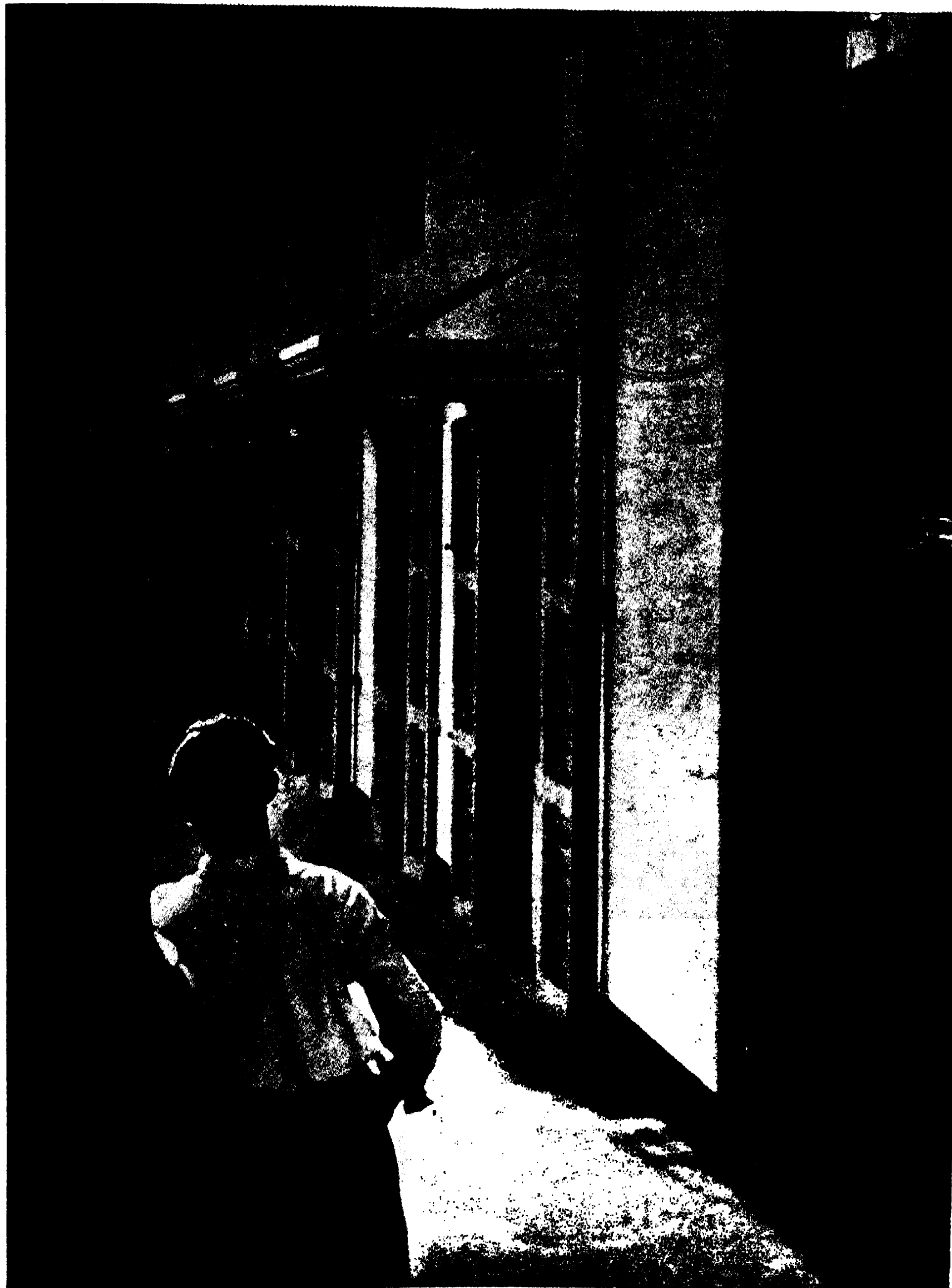
আলোশা বললে—সার্কাশ করছি।

নিকোলাশ বললে—মা ভালো আছে?

নিকোলাশ কাৎ হয়ে শুয়ে রইলেন সোফায় দৃষ্টি আলোশার উপর।

আলোশা ও-কথার জবাব দিলে না। সে চিৎ হয়ে শুয়ে ডান হাতে ধরলো বাঁ পায়ের বুড়ো-আঙুল—তার পর উল্টো-ডিগবাজি মেরে পড়লো একেবারে নিকোলাশের সোফার কাছে।

আলোশা বললে—মার কথা জিজ্ঞাসা করছেন? ও···! মা আবার কবে ভালো থাকে? মেয়েমানুষ তো···মেয়ে-মানুষরা কক্‌খনো ভালো থাকে না—সব সময়ে গজ্ গজ্ করে···



ফটো : অর্দ্ধেন্দুশেখর ভৌমিক

প্রতীক্ষা

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্



ফটো : অর্দ্ধেন্দুশেখর ভৌমিক

স্তম্ভ

•ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্•

একা···চুপ করে বসে থাকা যায় না···আলোশার সঙ্গেই নিকোলাশ কথা কইতে লাগলেন। ছেলেটাকে ভালো লাগে না, তবু···চুপ করেও থাকা যায় না! কাজেই···

আলোশা আবার কি খেলা সুরু করবে—নিকোলাশ তার পানে চেয়ে আছেন···একাগ্র দৃষ্টিতে তাকে দেখছেন। আলোশার মা ওলগার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে আলোশার পানে কোনোদিন ফিরে তাকান নি। ওলগার ছেলে তো ছেলে—সে কি করে···কি সে চায়···কিসে তার আনন্দ···কিসে সে মনে ব্যথা পায়··· সেদিকে নজর দেবার প্রয়োজন ছিল না নিকোলাশের —তার অবসরও ছিল না। আজ প্রথম আলোশাকে তিনি দেখলেন। ছেলেটার মুখ···ও-মুখে যেন মায়ের মুখ বসানো! ওলগার সঙ্গে নিকোলাশের রোমান্স যেদিন সুরু হয়, সেদিন ওলগার মুখে যে কমনীয়তা ছিল, শ্রী ছিল, ছেলের মুখে তেমনি শ্রী, তেমনি কমনীয়তা! ছেলেটাকে নিকোলাশের আজ ভালো লাগলো!

নিকোলাশ তাকে কাছে ডাকলেন; বললেন—এসো··· তোমার সঙ্গে ভাব করি।

এ-কথায় আলোশা ভারী আশ্চর্য্য হলো! সে এলো নিকোলাশের কাছে।

নিকোলাশের মনে হলো, ওলগা তাঁকে কি না দিয়েছে ···তাঁর জন্য ইর্নিনা···তার ছেলে! একে একেবারে ঠেলে সরিয়ে রাখা তাঁর উচিত হয়নি!

নিকোলাশ বললেন—মা ভালোবাসে?

এ-কথায় চোখ দুটো বড়-বড় করে আলোশা চেয়ে রইলো নিকোলাশের পানে—কোনো জবাব দিলে না।

তার পিঠে হাত দিয়ে, কণ্ঠে আদর ভরে নিকোলাশ বললেন—মাকে তুমি ভালোবাসো?···বাড়ীতে কেমন লাগে ···বেশ ভালো?

আলোশার ভ্রূ-কুঞ্চিত হলো। আলোশা বললে— আগেকার মতো নয়···আগে খুব ভালো লাগতো। মা'ও আগেকার মতো ভালোবাসে না···কেবল বকে। সব সময়ে মা যেন কেমন···

নিকোলাশ বললেন—কি করো সারাদিন?

আলোশা বললে—আমি আর সোনিয়া, খালি পড়া··· পড়া···পড়া! মা কখনো একটু কাছে ডাকে না, কেবলি এখানে যায়, ওখানে যায়···আপনি বুঝি আজ চুল কেটেচেন?

নিকোলাশ বললেন—হ্যাঁ···কেন বলো তো?

আলোশা বললে—দেখছি কি না। জুল্‌পী পরশু দেখেছিলুম—এতটা···আজ দেখছি···দাড়িও ছেঁটেচেন···না?

—হ্যাঁ।

আলোশা বললে—আপনার দাড়িতে হাত দেবো?

—কেন?

—আমার ভালো লাগে! এমনি সরু ছাঁটা দাড়ি··· ডগাটা ছুঁচোলোপানা···

বলতে বলতে নিকোলাশের দাড়িতে হাত দিয়ে আলোশা সুরু করলো—এখানটা আরো একটু ছোট করলেন না কেন? খুব ছোট ছোট···তার পর বড় বড়? এখানটা··· তাহলে খুব ভাল ভালো দেখাতো!

তার পর নিকোলাশের ঘড়িটা নিয়ে আলোশার কথা—এরকম চেন খুব ভালো নয়। ঘড়িটা সোনার! আচ্ছা, রূপোর ঘড়ি আর সোনার ঘড়ি···দুইই তো ভালো চলে, না, সোনার ঘড়ি আরো ভালো?

নিকোলাশ শুধু শুনছে কোনো জবাব দিচ্ছে না। মনে হচ্ছে, এই ছেলে কোনোদিন তাঁর কাছে আসতে ভরসা পায়নি! আজ একটু ডেকে কথা বলতেই একেবারে গায়ে পড়ে যেন কত আপন-জন···

তবু ওলগা! ওলগার ছেলে! আলোশা বললে—মা বলেছে, আমি যখন স্কুলে ভর্তি হবো—আমাকে মা একটা ঘড়ি কিনে দেবে। কি মজাই হবে! আমার নিজের ঘড়ি! মাকে বলবো শুধু ঘড়ি নয়···একটা চেনও দিতে হবে— আপনার চেনের মতো চেন। এটা? ও লকেট? আমার বাবার চেনেও এমনি লকেট আছে···আপনার লকেটের মতো···(বলেই আলোশা লকেট খুললো—লকেটের মধ্যে অক্ষর) আলোশা বলতে লাগলো—বাবার লকেটের মধ্যে অক্ষর নেই মার ছবি আছে। বাবার চেন অন্য রকম!

নিকোলাশ বললেন—তোমার বাবার লকেটে তোমার মার ছবি তুমি কি করে জানলে?

—বা রে, আছে, আমি দেখেছি যে।

বলেই আলোশা ভয়ে এতটুকু! তার মুখ কালো হয়ে গেল—সে একেবারে চুপ।

নিকোলাশ বললেন—তোমার বাবাকে তুমি দেখেছো?

—ন্-না!

নিকোলাশ বললেন—বলো···সত্য কথা বলো। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তোমার বাবার সঙ্গে তোমার কথা হয়, আমাকে বললে কোনো দোষ হবে না। বলো···

আলোশা তাকালো নিকোলাশের দিকে—বলুন, মাকে আপনি বলে দেবেন না?

—না।

—ঠিক বলছেন?

—ঠিক বলছি।

—তিন সত্য করুন!

—বলবো না···বলবো না···বলবো না···হলো?

আলোশা খানিকক্ষণ নির্বাক···তাকিয়ে রইলো নিকোলাশের দিকে; তার পর চারিদিকে তাকিয়ে খুব চাপা গলায় বললে—মাকে বলবেন না—কিন্তু মা তাহলে আমাকে আস্ত রাখবে না!

—না, মাকে বলবো না। তুমি বলো···

আলোশা বললে—সোনিয়া আর আমি···জানেন, বাবার সঙ্গে আমাদের দেখা হয় ফী মঙ্গলবার আর শুক্রবার···পোলাজিয়া দাসী আমাদের দুজনকে নিয়ে যায়। আমাদের বেড়াতে নিয়ে যায় তো বিকেলে··· সেই সময়ে পার্কের ধারে আছে আফেল কাফে···বাবা সেখানে আসে ঐ দুদিন।

নিকোলাশের ভ্রূ হলো কুঞ্চিত। নিকোলাশ বললেন—কি করে সব?

—কিচ্ছু না। আলোশা বললে—কাফের দরজার সামনে গিয়ে আমরা বলি—হ্যালো! বাবা এসে আমাদের ডেকে ভিতরে নিয়ে যায়। আমাদের কফি দেয়—পেষ্ট্রি দেয় খেতে। সোনিয়া কফি ছোঁয় না—কেবল পেষ্ট্রি খায় এই এত—! আমার ভালো লাগে না পেষ্ট্রি। তার চেয়ে ভালো লাগে ঐ বাঁধা কপি আর ডিম দিয়ে তৈরি পেষ্ট্রি···সে ঠিক পেষ্ট্রি নয়···ওঃ, এত খাই, পেট ভরে যায়। তার পর রাত্রে পেট ভরে থাকে তো—তবু বাড়ীতে খেতে হয়···মা না হলে বকবে, মারবে···।

নিকোলাশ বললেন—কি কথা হয় বাবার সঙ্গে?

—অনেক কথা···বাবা আমাদের আদর করে···দুজনকে চুমু খায়। বাবা বলে, আমরা আর একটু বড় হলেই বাবা আমাদের দুজনকে নিয়ে যাবে নিজের কাছে। বলে···এখন ছোট বলে মার কাছে আছি। বাবার কাছে গেলে কি মজাই হবে! বাবা বকে না, মারে না, খালি ভালবাসে। যা চাইবো, বাবা দেবে। সোনিয়া বলে, ও যাবে না বাবার কাছে, ও বলে, মার জন্য ওর মন কেমন করবে।··· আমারো মার জন্য মন কেমন করবে, জানি। তবু আমি যাবো। মন কেমন করে, মাকে চিঠি লিখবো·· মা চিঠি লিখবে!···

আলোশার মুখে কথার ঝড় বইছে যেন! আলোশা বললে—জানেন, বাবা বলেছে আমাকে একটা ঘোড়া কিনে দেবে, খেলার ঘোড়া নয়···সত্যিকারের জ্যান্ত ঘোড়া। সেই ঘোড়ায় চড়ে আমি যেখানে খুশী যাবো। সত্যি, মা কেন বাবাকে বাড়ীতে আসতে বলে না—জানি না। বাবা এলে কি মজায় থাকবো সকলে। জানেন, মাকে বাবা খুব ভালোবাসে—মার কথা কেবলি জিজ্ঞেস করে বাবা—মা কেমন আছে···আমরা যেন মাকে একটুও না জালাতন করি—মার কথা যেন দুজনে শুনি! মা যা ভালোবাসে না—কখনো যেন তা না করি। বাবা কেবলি কেবলি বলে।··একবার মার সেই অসুখ করেছিল না? শুনে বাবার চোখ দুটো এত বড় হলো। বাবা কত ভাবতে লাগলো। সেদিন বাবা আমাদের সঙ্গে আর কথা কইতে পারলে না। বাবা বললে—তোমরা বাড়ী যাও। তোমাদের মার অসুখ—তাঁর কাছে থাকবে, তাঁর সেবা করবে। বাবা বলে—আমাদের বরাত খুব খারাপ! কেন বলুন তো, বাবা ও-কথা বলে?

—বাবা বলে, তোমাদের বরাত খারাপ?

—হ্যাঁ···সত্যি বিশ্বাস করুন। আলোশা বললে—বাবা বলে, তোমাদের বরাত খারাপ, মারও বরাত খারাপ— নাহলে বাবা বলে, সংসারটা এমন করে নষ্ট হয়ে যেতো না!

নিকোলাশ বললেন—তোমার বাবা বলে, সংসার নষ্ট হয়ে যেতো না?

—হ্যাঁ বলে। আমরা বলি, বাবা বাড়ী এসো। বাবা হেসে বলে, না রে যাবো না।

নিকোলাশ একটা নিশ্বাস ফেললেন, বললেন—বাবার

সঙ্গে কী শুক্রবার-মঙ্গলবার দেখা হয় তোমাদের মা জানে ?

—না। কি করে জানবে ? আমরা বলি না তো !... পরশু...জানেন, বাবা আমাদের পাকা পাকা পীয়ারা দিয়েছে। কি মিষ্টি...কি বলবো ! আর কি রস !

—হুঁ। নিকোলাশ বললেন—তোমাদের বাবা আমার কথা বলে না ?

—আপনার কথা...হ্যাঁ।

এই পর্য্যন্ত বলে আলোশা থামলো।

নিকোলাশ বললেন—বলো, আমার কথা তোমার বাবা কি বলে ?

—শুনে আপনি রাগ করবেন না ?

—না। আমাকে গালাগাল দেয় তোমার বাবা—না ?

—না। গালাগাল নয় ঠিক। আপনার উপর বাবার ভয়ানক রাগ। বাবা বলে, বাবার আর মার এত দুঃখ, এত কষ্ট...শুধু আপনার জন্য ! বাবা বলে, আমাদের সংসার আপনি নষ্ট করে দেছেন। মা এমন শুধু আপনার জন্য ! আমি বাবাকে যত বলি, আপনি আমাকে আর সোনিয়াকে ভালোবাসেন...কত জিনিস কিনে দেন ! এই যে আমার ভেলভেটের পোষাক...আপনি কিনে দেছেন। বাবা কিছুতে সে কথা শুনবে না ! কেবলি মাথা নাড়ে—মাথা নেড়ে নেড়ে বলে—না, না, না—ছেলেমানুষ তোমরা বুঝবে না ! ও-লোকটা...ও-লোকটা...

আলোশা কথা শেষ করতে পারে না। নিকোলাশ বলেন—শয়তান ! এই তো ?

আলোশার হতাশ মলিন দু-চোখ ম্লান...শুধু চেয়ে থাকে নিকোলাশের পানে...কোনো জবাব দিতে পারে না।

নিকোলাশ একটা নিশ্বাস ফেললেন ; নিশ্বাস ফেলে বললেন—কিন্তু তা নয় আলোশা। তোমার বাবার দোষেই তোমার মা...তোমার বাবা তোমাদের বলে, আমিই তোমাদের মাকে...

নিকোলাশের কথায় ঝাঁজ...চোখের দৃষ্টিতেও তেমনি ঝাঁজ যেন !

কাতর করুণ কণ্ঠে আলোশা বললে—কিন্তু আপনি রাগ করবেন না, বললেন !

—না, না, আমি রাগ করিনি। নিকোলাশ বললেন—কিন্তু যাক, তুমি ছেলেমানুষ...এ সব বুঝবে না !...তোমাদের ঘর-সংসার আমার জন্যই...বটে !

নিকোলাশ নিশ্বাস ফেললেন।

বাহিরে বেল বাজলো। আলোশা লাফিয়ে উঠলো—মা এসেছে...

তখনি ঘরে ঢুকলো সজ্জিতবেশা এক তরুণী। তরুণীর সঙ্গে একটি ছোট মেয়ে...সোনিয়া। তরুণী...ওলগা আইভানোভনা...আলোশার মা।

ওলগার দিকে চকিতের জন্য চেয়ে নিকোলাশ কেমন উদাসভাবে ঘরে পায়চারি করতে লাগলেন...আপনা-আপনি বলতে লাগলেন—হুঁ...আমারি দোষ। আমিই এ সংসার ভেঙেছি। শনি আমি। স্ত্রীর পাশে স্বামীর যে আজ জায়গা নেই...আমার...আমার জন্য ! হুঁ...

ওলগা তাকালো নিকোলাশের পানে...আশ্চর্য্য হলো। বললে—কি বকছো আপন-মনে ! এ্যাঁ ?

—কি ?...শুনবে ?...নিকোলাশ তাকালেন ওলগার দিকে...তাঁর দু'চোখে আগুন। নিকোলাশ বললেন—তোমার স্বামী...জানো, তাঁর কীর্ত্তি ! আমি...আমি...আমি তোমাদের জীবনে অভিশাপ...তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দাঁড়িয়ে তোমাদের সর্ব্বনাশ করেছি ! আমি আমার জন্যই তুমি আজ...তুমি...তুমি...এমন ! আমি শয়তান...

ওলগার ভ্রূ-কুঞ্চিত...ওলগা বললে—কি বলছো ? এ-কথার মানে ?

—মানে জিজ্ঞাসা করো তোমার এই ছেলেকে...এঁচোড়ে-পাকা ছেলে !

আলোশা ভয়ে কাঁটা ! সে বললে—কিন্তু...কিন্তু...আপনি তিন সত্য করেছেন...

ওলগা তাকালো আলোশার পানে...

নিকোলাশ বললেন—তোমার ছেলেকে জিজ্ঞাসা করো। তোমার ঐ ঝী...পেলাজিয়া...জানো, ছেলেমেয়েকে বেড়াতে নিয়ে যায়...পার্কে ? না, পার্কে নয়। নিয়ে যায় ঐ আফেল কাফেতে। সেখানে তোমার পূজ্যপাদ স্বামী এসে বসে থাকেন ! ছেলেমেয়েদের পেষ্ট্রি দিয়ে তিনি বলেন ছেলেমেয়েকে...আমি শয়তান ! ছলায়-কলায় তোমাকে

ভুলিয়ে তাঁর ঘর-সংসার ভেঙেছি···তাঁর পুরী দখল করে বসেছি! আমি···আমি শয়তান!

বিস্ময়ে ওলগা নিথর নিস্পন্দ··বললে—এ সব কথা···

—হ্যাঁ, হ্যাঁ···নিকোলাশ বললেন—বেশ কঠিন স্বর·· কঠিন দৃষ্টি···নিকোলাশ বললেন—ছেলেমেয়েকে তিনি চমৎকার শিক্ষা দিচ্ছেন! তাদের কান ভাঙ্গানো! বলেন—আর একটু বড় হলেই ছেলেমেয়েকে তিনি নিয়ে যাবেন নিজের কাছে···

আলোশা একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়লো নিকোলাশের ঘাড়ে। নিকোলাশের মুখে হাত চাপা দিয়ে বললে—আর্ত্ত-স্বরে—কিন্তু··কিন্তু···আপনি তিন সত্য করেছিলেন! আপনি মিথ্যা কথা বলেন! আপনি বড় হয়েছেন—ভদ্রলোক···কথা বলে সে কথা রাখেন না!

ওলগা কিছু বুঝতে পারে না! তার বিস্ময় বাড়ে। ওলগা বলে—কিন্তু···আমি···মানে, আলোশা···

আলোশা তাকালো মায়ের দিকে···

মা বললে—আমার কথার জবাব দাও। তোমার বাবার কাছে তোমরা যাও! তার সঙ্গে দেখা করো তোমরা! আমি বারণ করে দিয়েছি! তবু···

মায়ের কথা আলোশার কানে গেল না। নিকোলাশকে ধরে তার নালিশ···অভিমানে স্বর কাঁপছে···আলোশা বলে—আপনি··আপনি তিন সত্য করলেন···করেও··· ছি···ছি···ছি···আপনার লজ্জা হলো না! মিথ্যা কথা বলেন আপনি!

আলোশার দু'চোখে জল··

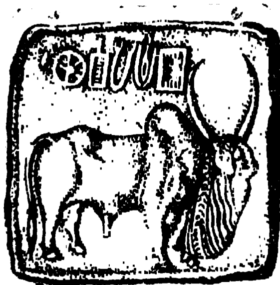
আলোশাকে ঠেলে সরিয়ে নিকোলাশ পায়চারি করেন, রাগে মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে। মনের মধ্যে আগুন জ্বলছে! সে-আগুনের আভায় দুটি কথা জ্বলজ্বল করে জ্বলছে যেন! প্রথম কথা—ওলগার সঙ্গে তাঁর সেই প্রথম পরিচয়। তার পর দামী উপহারে ওলগার চিত্ত-জয়···স্বামীর দিক থেকে ওলগার মনকে ফিরিয়ে নিজের করা···কুহকের ফাঁদ···স্বামীর সঙ্গে ওলগার সম্পর্ক কেটে গেল! এবং ওলগাকে নিয়ে নিকোলাশের···

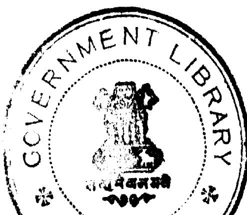
আর একটা কথা—ছেলেটাকে কথা দিয়ে তিন সত্য করে কথা···কথা দিয়ে সে কথার খেলাপ! মনে হচ্ছে, এতখানি কাপট্য! সত্য পণ করে···ওর মুখ থেকে সব কথা শুনে, জেনে নিয়ে তার পর এমন বিশ্বাসভঙ্গ···!

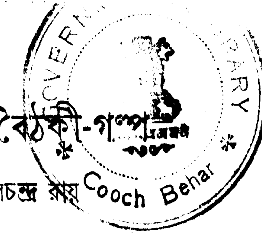
আজ প্রথম নিকোলাশের মনে হলো, সে চোর! চোরের মতো এ সংসারের সুখ শান্তি তিনি হরণ করেছেন! এই ছেলেটা···ঐ মেয়ে সোনিয়া···এদের বাপ···

তাঁর বুকে যেন আগুন জ্বলছে!

আর আলোশা?··সে কাঁপছে! তার মনে হচ্ছে, ···কথা দিয়ে মানুষ সে-কথা রাখে না! ছেলেমানুষ নয়—বড় হয়েছে· ভদ্রলোক···সেও! কেন? কেন? যে পৃথিবীকে সে জানে, শুধু পেষ্ট্রি আর পীয়ার, ঘড়ি আর ঘোড়া··কত রকমের খেলনা···এই সবই শুধু আছে। আজ মনে হচ্ছে, তা নয় পৃথিবীতে এত মিথ্যা কথা··· কথা দিয়ে সে কথার খেলাপ! বইয়ে লেখা আছে···আলোশা পড়ে, সদা সত্য কথা বলিবে···মিথ্যা বলিবে না···মিথ্যা কথা বলিলে পাপ হয়! এ সব কথা শুধু বইয়ের পাতায় লেখা থাকবার জন্য! সত্যকার পৃথিবীতে সত্য নেই? শুধু মিথ্যা কথা! কথা দিয়ে কথার খেলাপ শুধু!







শরৎচন্দ্রের বৈঠকী-গল্প

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

শরৎচন্দ্রের স্নেহভাজন-বন্ধু সাহিত্যিক শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী ১৩৬০-এর দৈনিক বসুমতী শারদীয়া সংখ্যায় এক প্রবন্ধে লিখেছেন—হয়তো অনেকেই জানেন না যে, শরৎচন্দ্র খুব ভাল গল্প বলিয়ে ছিলেন। এদিক দিয়েও তিনি ছিলেন একজন উঁচুদরের আর্টিষ্ট। তাঁর লেখার থেকে গল্প-বলার কায়দা ছিল আরো মনোহর।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় ছিল, তাঁরা সকলেই জানেন, এ কথা কত সত্য। গল্প করবার তাঁর একটা ক্ষমতাই ছিল অসাধারণ। গল্পের অভিনব বিষয়বস্তুর কথা ছেড়ে দিলেও তাঁর বলার ভঙ্গিতেই এমন একটা যাদু ছিল যে, শ্রোতারা অভিভূত হয়ে যেতেন। কবি ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারও তাই এক জায়গায় লিখেছেন—গল্প শুনিয়া আমি অভিভূত হইয়াছিলাম—শুধু গল্প নয়—গল্প বলিবার আশ্চর্য ভঙ্গিতেও।...শরৎচন্দ্রের গল্প সকলে পড়িয়াছেন ও মুগ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহার অনুপ্রেরণা আর এক ধরণের—তাহাতে ভাবের সংক্রামকতা আরো অব্যর্থ।

বাঙ্গলা, বিহার ও বর্মা এই তিনটি দেশে শরৎচন্দ্র ব্যাপকভাবে ঘুরেছিলেন এবং সর্বত্রই বহুলোকের সঙ্গে তিনি মিশেছিলেন। এই বিপুল ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার সব কাহিনী তিনি বন্ধুবান্ধবদের শোনাতেন। এর মধ্যে একদিকে যেমন থাকত নিছক হাসির গল্প, তেমনি কত রকমের করুণ কাহিনীও থাকত। এমন কি দেবদেবীর কাহিনী থেকে মায় ভূতের গল্প পর্যন্ত কিছুই বাদ যেত না।

শরৎচন্দ্রের এই বৈঠকী গল্পের এক শ্রোতা ১৩৪৪ সালের মাঘ সংখ্যা বিচিত্রায় এ সম্বন্ধে লিখেছিলেন—কতদিন তাঁহার বালিগঞ্জের বাড়িতে বৈকালে গিয়া রাত্রি পর্যন্ত তাঁহার মুখে গল্প শুনিয়াছি। রেঙ্গুন প্রবাসের গল্প, সাপ ধরার গল্প, কুমির ধরার গল্প, বামুনঠাকুরের গল্প, ঔপন্যাসিক নায়ককে আর চালাইতে না পারিয়া সর্প দংশনে কেমন করিয়া মৃত্যু ঘটাইলেন তাহার গল্প, রায় বাহাদুরের নূতন উপাধি লাভে, ব্যাণ্ড বাজাইয়া গ্রামে যাওয়ার গল্প, মূর্খ জমিদারের লাইব্রেরির গল্প—এইরূপ কত বিচিত্র কথা তিনি বলিয়া যাইতেন আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনিতাম।

মৃত্যুর তিন চার বছর আগে শরৎচন্দ্র একবার ভাগলপুরে গিয়েছিলেন। সেখানে গেলে ভাগলপুরপ্রবাসী সাহিত্যিক বনফুল (ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) একদিন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে যান। আলাপ-পরিচয়ের পর বনফুল শরৎচন্দ্রকে একটি গল্প বলতে অনুরোধ করলে শরৎচন্দ্র তাঁকে এক সাধুর জাহাজ গিলে খাওয়ার এক গল্প শুনিয়েছিলেন। বনফুল শরৎচন্দ্রের এই গল্পটি একদিন আমায় শোনান। শরৎচন্দ্রের মাতুল ও বাল্যবন্ধু শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মুখেও শরৎচন্দ্রের এই গল্পটি শুনেছি। শরৎচন্দ্রের বৈঠকী গল্পের নমুনা হিসাবে এখানে সেই গল্পটি পরিবেশন করা গেল।

শরৎচন্দ্র বলে চলেছেন—

আমরা তখন ছেলেমানুষ। স্কুলে পড়ি। সেই সময় একবার ভাগলপুরময় একটা খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, এই ভাগলপুরেরই আদমপুর ঘাটে এক অত্যাশ্চর্য সাধু এসেছে। গেরুয়া বা জটাজুটের দিক থেকে আর পাঁচজন সাধুর মতো হলেও, এর গুণ আর শক্তি নাকি অসাধারণ। ক'দিনের মধ্যেই নাকি সে ভাগলপুরের কত লোকের কত দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়ে দিয়েছে। আর শুধু কি তাই! কত কি অদ্ভুত তাজ্জব কাণ্ডও নাকি দেখাচ্ছে। সেটা তখন আমের সময় নয়, অথচ কেউ হয়তো বললে—সাধুজী আমার একটা পাকা আম খাওয়ার বাসনা। সাধুজী অমনি তার ঝোলার মধ্যে হাতটি পুরে দিব্যি পাকা আম তুলে আনলে। লোকে এই সব অলৌকিক কাণ্ড দেখে তো একেবারে তাজ্জব বনে যাচ্ছে। অল্প সময়ের মধ্যেই সাধুর কথা শহরময় রাষ্ট্র হয়ে গেল। ফলে হ'ল কি জানো—সাধুকে শুধু দেখবার জন্যই আদমপুর ঘাটে রোজই লোকে লোকারণ্য। অনেকে একান্ত ভক্তও হয়ে পড়ল সাধুবাবার। কী সব দীক্ষাটিক্ষা দিয়ে সাধু তাদের শিষ্যও করে ফেললে।

একদিন সাধু তার শিষ্যদের বললে—হাম গঙ্গামায়ীকে পূজা দেগা। ভক্তরা শুনে গদগদ। সে আর কথা কী গুরুদেব! পূজার যা কিছু নৈবেদ্য উপকরণ কালই আমরা সব এনে হাজির করব এখানে। আপনি পূজার ব্যবস্থা করুন।

পরদিন শিষ্যবৃন্দ গঙ্গামায়ের পূজার জন্যে প্রচুর উপকরণ এনে হাজির করল আদমপুর ঘাটে। গঙ্গাতীরে বালুর উপর একেবারে জলের কাছ ঘেঁসে থরে থরে সব কিছু সাজানো হল। পূজার সময় হয়ে এলে সাধু পূজায় বসবে—কি এমন সময় নিদারুণ এক ব্যাপার ঘটে গেল। "কার"-কোম্পানীর বড় ইষ্টিমারগুলো তখন রোজই ঐ রকম সময় আদমপুর ঘাট পার করে যেত। জাহাজের যেমন ছিল গর্জন, তেমনি ঢেউও তুলত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড। সেই ঢেউ এসে, করল কি জানো, গঙ্গামায়িকীর পূজার নৈবেদ্য ফলমূল সব তো নিয়ে গেল ভাসিয়ে। এই দেখে শিষ্যরা তো হায় হায় করে উঠল! সাধু কিন্তু গেল একেবারে ক্ষেপে। চিৎকার করে শাপশাপান্ত করতে লাগল—এতবড় স্পর্ধা জাহাজের! আমার গঙ্গামায়িকীর পূজা ভাসিয়ে দিয়ে যায়! আচ্ছা কাল আয় তুই বেটা জাহাজ! এসে ছাখ। কাল তোকে আমি গিলে খাব। কাল আর তোকে পালাতে দিচ্ছি নে! আয় একবার!

এদিকে শিষ্যরা তো সাধুর কথা শুনে হাঁ করে রইল। গুরুদেব বলেন কি! এতবড় একটা জাহাজ—তাকে আস্ত গিলে খাবেন!

একজন শিষ্য বলতে যাচ্ছিল—গুরুদেব…

গুরুদেব তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বললে,—হ্যাঁ, হ্যাঁ ও আমার এক কথা। কাল ঐ জাহাজকে আমি গিলে খাবই। ওর আর নিস্তার নেই। এতবড় স্পর্দ্ধা আমার পূজা ভাসিয়ে দিয়ে যায়!

শিষ্যরা তবুও যেন ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছিল না। মানুষে জাহাজ গিলে খাবে—একি কখনো সম্ভব! অবশেষে তাদের মধ্যেই একজন বললে—গুরুদেবের কাছে অসম্ভব কিছু নেই। সাধনার বলে কি না করতে পারেন তিনি। জাহাজ ভক্ষণ তো তুচ্ছ ব্যাপার। মহাপুরুষদের লীলাখেলাই আলাদারে ভাই!

এখন এই বার্ত্তা তো রটে গেল শহরময় যে, কাল বেলা বারটার সময় কার-কোম্পানীর বড় জাহাজখানা যখন আদমপুর ঘাটের কাছ দিয়ে যাবে, তখন সাধুজী সেই জাহাজখানাকে আস্ত গিলে খেয়ে নেবে।

শহর ছাড়িয়ে শহরের আশপাশেও অনেকদূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল কথাটা।

পরের দিন সকাল থেকেই আদমপুর ঘাটে লোক জমতে শুরু হয়ে গেল। দল বেঁধে আমরাও তো গেলাম। গিয়ে দেখি বেলা যত বাড়ে, লোকও ততই ঝাঁকে ঝাঁকে আসতে থাকে। ঘাট, ঘাটের আশপাশের সব জায়গা সমস্তই লোকে থৈ থৈ। দেখতে দেখতে বড় বড় গাছগুলো পর্য্যন্ত লোকে ভর্তি হয়ে গেল। কোথাও জায়গা না পেয়ে শেষে গঙ্গায় নেমে জলে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল অনেকে।

সাধুজীর জাহাজ গেলা দেখতে এটুকু কৃচ্ছ্রসাধন কে না করবে বল!

এগারটা বেজে গেল। বারোটাও প্রায় বাজে বাজে। তখনো কিন্তু সাধুজীর কোন সাড়া শব্দ নেই। সে তখন তীরে ধুনি জ্বালিয়ে গভীর ধ্যানে মগ্ন।

এদিকে লোকের ভক্তি ভয় উৎকণ্ঠা যেন ফেটে পড়ছে গঙ্গাতীরে।

এমনি সময়ে দূরে আসামীর টিকি দেখতে পাওয়া গেল। হৈ হৈ করে উঠল সব লোক—ঐ জাহাজ আসছে, জাহাজ আসছে!

লোকের চিৎকার শুনে সাধু তার ধ্যান ভঙ্গ করে চক্ষু মেলল। তারপর গম্ভীর মুখে ধীর পদক্ষেপে গঙ্গায় গিয়ে নামল। কোমর খানেক জল পর্য্যন্ত গিয়ে দাঁড়াল স্থির হয়ে। রবিবর্ম্মার গঙ্গাবতরণের ছবি দেখেছ? সেই ছবির শিবের মতো সাধুও ঠিক তেমনি ভাবেই দাঁড়াল। কোমরে হাত দুটো রেখে কম্বুকণ্ঠে সহসা চিৎকার করে উঠল—আয় তুই! আজ আর তোর নিস্তার নেই! তোকে আজ আস্ত গিলে খাবই!

সাধু বলে আর গলা চড়ে।

এদিকে টিপ্ টিপ্ করতে থাকে লোকের বুক। না জানি আজ কি অঘটনই বা ঘটে!

তীরের হৈ হল্লা কিন্তু এই সময়টায় একেবারে থেমে গিয়েছিল। বিস্ময়-বিমূঢ় গঙ্গাতীর নিঃশ্বাস রোধ করে ভাবছিল—তাইতো এতবড় জাহাজটাকে গিলে খাবে কি করে?

ভীমগর্জ্জনে এসে পড়ল জাহাজ। ঢেউ আছড়াতে লাগল আদমপুরের ঘাটে। সাধু এবার হুঙ্কার দিয়ে উঠল—এসেছিস্! আয়!—বলেই বিরাট এক হাঁ করে জাহাজটার দিকে এগিয়ে যাবে কি; ঠিক এমনি সময় হ'ল কি জানো, তীর থেকে দশ পনর জন লোক হঠাৎ হাউ মাউ করে কেঁদে হুড়মুড় করে জলের মধ্যে গিয়ে সাধুর পা দুটো জড়িয়ে ধরল। রক্ষা করুন গুরুদেব! রক্ষা করুন গুরুদেব! নির্জ্জীব অচেতন একটা তুচ্ছ পদার্থ এই জাহাজ, একটা অপরাধ করে ফেলেছে, তার কি মার্জ্জনা নেই গুরুদেব! তার উপর রাগ করা কি আপনার সাজে গুরুদেব! তাছাড়া জাহাজের মধ্যে নরনারী ঐ যে শত শত যাত্রী রয়েছে ওরা তো কোন অপরাধ করেনি গুরুদেব! তবে কোন অপরাধে ওদের খাবেন!

শুনে সাধুর ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে উঠল। মুখ গম্ভীর করে খানিকক্ষণ কি ভাবল, তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে—তা বটে, আচ্ছা ছোড় দেও। তুমহরা বাত রহা বেটা।

সাধু এবার জাহাজের দিকে চেয়ে হাত নেড়ে বললে—যা বেটা খুব বেঁচে গেলি আজ! তোর পুনর্জ্জন্ম হয়ে গেল!

জাহাজখানা ততক্ষণে সাধুর কাছ ছাড়িয়ে অনেকদূরে চলে গেছে।

শরৎচন্দ্রের এই মৌখিক গল্পটিকে একটি প্রথম শ্রেণীর রসোত্তীর্ণ গল্প বলা যেতে পারে। গল্প বলার মধ্যে এমন একটা নিপুণতা রয়েছে যে, তীরের সে দশ পনর জন লোক জলের মধ্যে গিয়ে সাধুর পায়ে ধরে কাঁদল, তারা যে সাধুর শেখানো লোক, এ কথার উল্লেখ না থাকলেও তা পরিষ্কার ভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাছাড়া সমস্ত গল্পটার মধ্যেও আগাগোড়া বেশ একটা সামঞ্জস্য রয়েছে।

শরৎচন্দ্রের এই ধরণের বহু গল্প তাঁর শ্রোতাদের মুখে মুখে আজও ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ কেউ অবশ্য যেমন ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি শরৎচন্দ্রের মুখে এই রকমের গল্প শুনে কোথাও কোথাও তা লিখেছেন।

কিছুদিন যাবৎ শরৎচন্দ্রের এই সব প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বৈঠকী গল্প সংগ্রহ করতে গিয়ে আমি বহু গল্প সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি। এই গল্প সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখেছি যে, শরৎচন্দ্র একই গল্পকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের কাছে বলে গেছেন। ফলে শরৎচন্দ্রের একই গল্প একাধিক লোকের মুখে শুনেছি। তাতে করে গল্পগুলি শরৎচন্দ্রের কিনা কোনদিনই মনে এ সন্দেহ জাগারও অবকাশ হয় নি। তাছাড়া শরৎচন্দ্রের এমন অনেক গল্প আছে যে, যাঁরা শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কোনদিন না মিশলেও, তাঁর রচনার সঙ্গে সামান্যমাত্র পরিচয়ের ফলেই বলে দিতে পারেন, এ একমাত্র শরৎচন্দ্রেরই গল্প, অন্য কারও নয়। গল্পের চেহারাই এমনি যে, দেখলেই বলা যায়, এ শরৎচন্দ্রের গল্প। এখানে এই রকম একটি গল্পের উদাহরণ দেওয়া গেল—

মেদিনীপুর শহরে বেলী হল পাবলিক লাইব্রেরিটির বর্ত্তমানে নতুন নাম হয়েছে "রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার।" আগে এই পাঠাগারের উদ্যোগে প্রতি বছর মেদিনীপুর জেলা পাঠাগার সম্মেলন হ'ত। তাতে জেলার প্রায় সকল পাঠাগারেরই প্রতিনিধি যোগ দিতেন।

এই পাঠাগার সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতি হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্র গিয়ে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নাড়াজোলের ছোটকুমার বিজয়কৃষ্ণ খানের বাড়ীতে ওঠেন। যথাসময়ে সভা হয়ে গেল। পরের দিন সকালে বিজয়কৃষ্ণবাবুর বাড়ীতে একটা ঘরোয়া সাহিত্য বৈঠক হয়। তাতে শহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত ভদ্রলোকদের মধ্যে অনেকে সাধারণভাবে সাহিত্য এবং শরৎচন্দ্রের রচনা বিষয়ে নানা প্রশ্ন করছিলেন। শরৎচন্দ্র একে একে তাঁদের উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ একজন প্রশ্ন করে বসলেন—আচ্ছা, শরৎবাবু, সতীত্বই তো নারীত্ব। আপনি আবার ও দুটোকে আলাদা করলেন কেন?

এই প্রশ্ন শুনে শরৎচন্দ্র বললেন—এর উত্তর তাহলে আপনাদের একটা গল্প বলি শুনুন। বলে শরৎচন্দ্র সুরু করলেন—

আমাদের পাড়ায় এক বাল বিধবা থাকতেন। গ্রাম সম্পর্কে তিনি আমার দিদি হতেন। খুব অল্প বয়সেই দিদির বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের কিছুদিন পরে দিদি বিধবা হয়ে বাপের বাড়ীতে ফিরে আসেন। দিদির শুধু বাপ-মা। ভাইবোন বা কাকা-জ্যাঠা কেউই ছিল না। তাও আবার দিদির বিধবা হবার কয়েক বছর পরে তাঁর বাবাও মারা যান। দিদি আর দিদির মা থাকেন। দিদির যখন তিরিশ-বত্রিশ বছর বয়েস তখন দিদিকে একা রেখে দিদির মা-ও মারা গেলেন। সেই থেকে বাড়ীতে দিদি একাই থাকতেন।

গ্রামের সকল পরিবারেই দিদির খুব খাতির ছিল। কেননা লোকের অসুখ বিসুখে প্রাণ দিয়ে দিদি সেবা করতেন, লোকের কাজ-কর্মের বাড়ীতে দিনরাত করে প্রচুর খাটতেন। গ্রামে এমন বাড়ী ছিল না যে, কোনো না কোনো বিষয়ে দিদির কাছ থেকে উপকার পায় নি।

আমি তখন ছেলে মানুষ। হঠাৎ আমার মাথায় একদিন খেয়াল চাপল, দিদি তো ওঁর বাড়ীতে একাই থাকেন, তা আজ রাত্রে ওঁকে ভয় দেখাতে হবে।

ঠিক করলাম, দিদির বাড়ীর প্রাচীরের লাগাও বাইরের দিকে যে বড় জাম গাছটা আছে, সন্ধ্যার পর সেই গাছে উঠে বিকৃত স্বরে শব্দ করে দিদিকে ভয় দেখাব।

সন্ধ্যার পর একটু রাত হলে লুকিয়ে জামগাছটায় গিয়ে উঠলাম।

দিদির একখানা মাত্র মাটির ঘর। বাড়ীর চারদিকেই প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। যাতায়াতের জন্যে উঠোনের একদিকে একটি মাত্র দরজা ছিল। সন্ধ্যা হলেই দিদির এই বাইরের দরজায় খিল পড়ে যেত।

জাম গাছ থেকে দিদির ঘরের সমস্তই দেখা যায়, অন্ধকারে গাছে উঠে সেখান থেকে খোনা গলায় যেমনি বলেছি—দি-দি, অমনি দেখি একটা লোক দিদির খাট থেকে তড়াক্ করে লাফিয়ে পড়ে খাটের তলায় গিয়ে লুকিয়ে পড়ল।

এই যে ব্যাপারটা দেখা গেল, এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, দিদির হয়তো সতীত্ব নেই, কিন্তু তাই বলে তাঁর নারীত্বও থাকবে না কেন? মানুষের রোগে শোকে সেবা করে, দীন-দুঃখীকে দান করে, যে মহত্ত্বের পরিচয় তিনি দিয়েছেন, তার কি স্বতন্ত্র কোন মূল্য নেই? নারীর দেহটাই কি সব, অন্তরটা কি কিছুই নয়? এই বাল-বিধবা দুঃসহ যৌবনের তাগিদে তার দেহটাকে যদি পবিত্র রাখতে নাই পেরে থাকে, তাই বলে তার আর সব গুণ মিথ্যে হয়ে যাবে? আমাদের কাছে কোন শ্রদ্ধাই সে পাবে না?

এই জন্যেই আমি সতীত্ব ও নারীত্ব—দুটোকে আলাদা করেই দেখেছি।

এই গল্পটি যে শরৎচন্দ্রের ছাড়া আর কারও নয়, তা গল্প দেখেই বলা যেতে পারে। নারীর প্রতি শরৎচন্দ্রের যে অসীম দরদ তা এই গল্পের সঙ্গে যেন মিশে রয়েছে।

শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন ধরণের এই সব বৈঠকী গল্পগুলির রসোত্তীর্ণ গল্প হিসাবে একটা পৃথক মূল্য তো আছেই, তাছাড়া এগুলি থেকে মানুষ শরৎচন্দ্রের একটা দিকের যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, সাহিত্যিক-শরৎচন্দ্রেরও তেমনি অনেক খবরাখবর মেলে।

লিফ্‌ট্‌ম্যান

(কথিকা)

সুকৃতি রায়চৌধুরী

লেডী টাইপিষ্ট রেণু। সকালবেলায় রেঁধেবেড়ে বুড়ী মাকে খাইয়ে নিজে কিছু নাকে মুখে গুঁজে অফিসে চলে আসে—আবার বিকেলে ফিরে রাঁধাবাড়া করে। বিলিতী মার্চেন্ট অফিস। বড়সাহেব খাঁটি ইংরেজের বাচ্চা—রেণু তার পি. এ.। পি. এ. অর্থাৎ পার্সোনাল এটেন্‌ডান্টের সংখ্যা অফিসের মধ্যে কম করে দু' ডজন।

ছোট সাহেবের গাড়ী আছে। বাড়ী ফেরবার মুখে রেণুকে প্রায়ই লিফ্‌ট্ দিতে চান নিজে থেকে। একে বয়েস অল্প, তায় শরীর চর্চ্চা করে থাকেন। বাঙালী হলেও মেজাজটা তাই বেশ কড়া। এইতো সেদিন মাঝপথে লিফ্‌টটা আটকে গেছে বলে লিফ্‌ট্‌ম্যানটাকে একেবারে এই মারেন কি এই মারেন। রেণুও ছিল সে লিফটে। হেঁসে বলেছিল, 'আহা ছেড়ে দিন। আপনার গায়ে অসুরের শক্তি,বাঘসিংহীও হার মানবে—ওতো ছেলেমানুষ।' শুনে তার ছত্রিশ ইঞ্চি বুক আটত্রিশ হ'য়েছিলো। হ'বারই কথা।

সেই দিনই বিকেলে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। রেণুকে বাধ্য হয়ে তাই ছোটসাহেবের গাড়ীতেই লিফ্‌ট নিতে হল। ময়দানের কাছে এসে হঠাৎ গাড়ীটা বিগড়ে গেল। গাড়ীর চালকও বোধ হয় সেই সঙ্গে। থিয়োরেমের পরেই করোলারী। আগে অনুকুল পরিবেশ পরে উচ্ছ্বাস। গোধুলী, সবুজ ঘাস, নীল আকাশ, দখিণ সমীরণ, বিশ্রাম—বাছা বাছা কথায় পরিবেশের সৃষ্টি, আর নির্জ্জনতায় ভাবের অভিব্যক্তি। বাহারে ফুলে মন ওঠে না—গন্ধও চাই যে। রেণই আমল দেয় নি।

রাত্রে খেতে খেতে রেণু বুড়ীমাকে বল্ল—আজ কালকার লোকজনগুলো মোটেই ভাল নয়। একটু প্রশংসা করেছ কি অমনি বেয়াড়াপানা সুরু করবে। আমাদের লিফ্‌ট্‌ম্যানটা যেমনি অসুর তেমনি জানোয়ার।'

মা বল্লেন, 'ঠিক বলেছিস।'

মেয়েদের কথা

পরিচালিকা—কল্যাণবাদিনী

নারীর প্রেম ও বিবাহ

শ্রীআশাবরী দেবী বি-এ

সবচেয়ে সুন্দর পবিত্র ও আনন্দময় বস্তুগুলিরই বিকৃতি হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী। পেলব পবিত্র জিনিষই একটু ম্লান স্পর্শেতেই মলিন হয়ে যায়—মন্দের সে ভয় নেই। নারীর প্রেম এমনিই একটি সুগোপন অমূল্য বস্তু, যা' সব সময়েই ব্যবহারিক জগতের রীতি-নীতির পরুষ-স্পর্শে বিকৃত, রূপান্তরিত বা এমন কি বিস্মৃতও হয়ে যেতে পারে নব-যৌবনা কিশোরীর স্পর্শভীরু মানসপট হ'তে। বুঝি বা কুমারীর সে প্রথম হৃদয়াবেগের অপরূপ পারিজাতমালা একমাত্র যোগীশ্বর মদন-দহনকারী মহাদেবের শুভ্র অবিচল চরণমূল ছাড়া আর কোথাও সমর্পিত হ'তে পারে না। নারীর প্রেম সার্থক হলেই ঘটবে অনন্ত আনন্দময় বিবাহের মাল্য-বন্ধন—প্রেমিকের দুই চোখের দৃষ্টি প্রদীপের মতো উজ্জ্বল হয়ে বলে উঠবে—

"তুমি মোরে করেছ সম্রাট।
তুমি মোরে পরায়েছ গৌরব মুকুট ;—"

নারী প্রেমের এই অপার্থিবতার সন্ধান যে ভাগ্যবান পান—এক মুহূর্তেই তাঁর কাছে এক সূত্রে বাঁধা পড়ে যায় জীবন ও মরণ।

তবে বাস্তব-জগতে অবহেলিতা দলিতা নারীর প্রেমের মাধুর্য গেছে হারিয়ে,—হৃদয়-রাজ্যের গোপন অন্তঃপুর হ'তে বাহিরে এসে তরুণীর কণ্ঠে প্রশ্ন জাগছে—

"নারীরে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার ?
হে বিধাতা—"

কিন্তু হায় বহির্বিশ্বে নারী বিজয়িনী অনেক সময়েই হতে পারে আপন যোগ্যতা বলে—কিন্তু তার অন্তর-লোকের জয়-পরাজয় সর্বদাই বেশীর ভাগ নির্ভর করে নারীর জীবন-সঙ্গীর প্রেম সম্বন্ধে ধারণার উপর। প্রেমকে অনেক সময়েই ইন্দ্রিয়বৃত্তির অন্যতম বলে ঘোষণা করা হয়ে থাকে। আবার এমনও অনেকে আছেন—যাঁরা এই দুইটিকে বেশ ভেবেচিন্তেই একীকরণ করেন এবং এদের পার্থক্যকে অলীক ভাবুকতামাত্র মনে করেন। ঠিক এই ব্যাপার সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল-সম্পর্কেও ঘটে। বাস্তব জগতে প্রায়ই সত্যকে নিছক তথ্য হতে—সুন্দরকে মনোহারিতা বা রমণীয়তা হ'তে এবং মঙ্গলকে স্বার্থসিদ্ধি হতে পৃথক করা হয় না। অর্থাৎ আমাদের সাধারণ জৈবিক বৃত্তিগুলির ভিত্তিতেই আমরা সত্য সুন্দর ও শিবের ধারণা কল্পনা করি। তার ওপরে যাবার সাধ্য বা ইচ্ছা আমাদের সাধারণতঃ হয় না। এই স্থুল অস্থি মজ্জা মাংসের দেহটিকে আশ্রয় করে যে একটি সূক্ষ্ম আত্মা আছে—তার সন্ধান আমরা রাখি না। আত্মা বলতে আমরা সাধারণতঃ কার্যকরীভাবে এই দেহসত্তাকেই বুঝি—মন, বুদ্ধি, অহংকারকেই বুঝি—যাহা দেহাপেক্ষী আর যাহা দেহেরই রক্ষণ ও চাকচিক্য-সাধনেই ব্যাপৃত। তাই মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের আত্মার বা আত্ম-সত্তার অবসানে আমরা বিশ্বাসী এবং ধর্ম বা কাব্য-বর্ণিত "মৃত্যুহীন আত্মা"কে কল্পনা-বিলাস বলেই মনে করি। ঈশোপনিষদে এই মনোভাবকে "আত্মঘাতী" বলা হয়েছে। এই আত্মঘাতী মনোভাব যেমন আমাদের এই জীবদেহের সহিত ঘনিষ্ঠতা হ'তে উৎপন্ন—তেমন আবার ইহার ফল এই জীবদেহকেই আরও আঁকড়ে থাকার বাসনা। মৃত্যু সুনিশ্চিত—মৃত্যুর সঙ্গেই আপনার সব কিছুর অবসান—সুতরাং এই জীবনটুকুই আছে এবং এইটিকেই চুটিয়ে ভোগ করে নিতে হবে—এই জীবন-দর্শন সর্বজনীন। ওমর খৈয়াম তাই এত জনপ্রিয়। চার্বাক-দর্শনই বস্তুতঃ সাধারণ মানুষের জীবন-দর্শন। কারণ সাধারণ মানুষ জৈবিক স্তরেই বাস করে।

কিন্তু সাধারণ মানুষ আজ যা—তাই তার শেষ পরিচয় নয়। তার সম্যক আত্মজ্ঞান এখনও হয়নি এবং নীতি-ধর্মের কথা যা কিছু মহাপুরুষেরা বলেছেন তা সবই মানুষের এই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিশ্বাস করেই। তা নাহলে তাঁরা যখন দেখলেন যে মানুষ স্বভাবতঃ হিংস্র, পরশ্রীকাতর, স্বার্থপর ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ—বা এক কথায় দেহসর্বস্ব—তখন মানুষকে এই সব রিপু জয় করতে বলতেন না। তাঁরা মানুষের এই স্বভাবকে—এই জৈবিক নিয়মকে মানুষের শেষ সত্য বলে মানতেন না। তাঁদের বিশ্বাস ছিল মানুষের আধ্যাত্মিকতায়—যার ভবিষ্যৎ-প্রকাশেই মানুষ নিজের স্বরূপকে ফিরে পাবে। সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে নিকটে আনবার ছিল তাঁদের প্রয়াস। তাঁরা নিজেদের মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছিলেন মানুষের দেহ-মন-বুদ্ধির ওপরের একটি সুপবিত্র অধ্যাত্ম-স্তরের এবং তাই প্রত্যেক মানুষকেই নিজেদের মতো স্বরূপতঃ আধ্যাত্মিক মনে করতেন। শুধু তারা স্পষ্ট জানে না তাদের এই স্বরূপকে—শুধু তারা তাদের প্রকৃত আত্মার স্থুল আশ্রয়টিকেই দেখেছে। তাই সব মহাপুরুষেরাই ক্ষমা করেছেন তাঁদের উৎপীড়নকারীদের

ধর্ম-আচরণের দ্বারা মহাপুরুষদের বাণী শ্রবণ ও মনন দ্বারা বা দার্শনিক চিন্তা দ্বারা আমরা আমাদের সত্য-স্বরূপকে উপলব্ধি করি। তখন দেহ-মন-বুদ্ধি-অহংকারকে আমাদের সর্বস্ব মনে করি না। তখন তাই সত্য সুন্দর ও মঙ্গলকে আমাদের প্রাণধারণ ও ব্যক্তিগত সুখ-ভোগের ব্যাপার মনে করি না। তখন সত্যের ও মঙ্গলের জন্য প্রাণ-বিসর্জন দেওয়াই স্বাভাবিক মনে হয়—সৌন্দর্য তখন আপাতরমণীয় না হয়ে তার বিপরীত মনে হয়। তখন কোনো ক্লেশকর বস্তুরও সাহিত্যে বা শিল্পেতে রূপায়ন সৌন্দর্যমণ্ডিত মনে হয়—কোনও ভীষণ রুক্ষ প্রাকৃতিক দৃশ্যও সুন্দর মনে হয়। সেই আত্মজ্ঞানের অবস্থায় প্রেমকেও চেনা যায়। তখন আর তাকে ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহের অন্যতম বলে ভুল হয় না—ভালোবাসাকে নিছক ভালোলাগা মনে করতে মন সরে না। কিন্তু এ সবই তো তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রত্যক্ষজ্ঞানের ব্যাপার—তর্কের নয়। অর্থাৎ প্রেম বলে কামনার ওপরে কিছু আছে কিনা তা তর্ক দিয়ে প্রমাণ করবার বিষয় নয়—তা শুধু উপলব্ধির বিষয়ই। আর এই উপলব্ধিও সাধনা-সাপেক্ষ। কারণ মানুষ তার প্রকৃত উন্নত স্বরূপের যা-কিছু উদ্ধার করেছে—তা সাধনা-দ্বারাই।

নারীর প্রেম কি বস্তু তা বুঝতে হলে আমাদের কেবল অতীন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি অর্থাৎ কামভাব ও যুক্তি তর্ককে আশ্রয় করলে চলবে না—কারণ এরা প্রেম অর্থে ইন্দ্রিয়-সুখই বলবে এবং ইন্দ্রিয় ধর্মের আচরণকেই প্রেমক্রিয়া বলে প্রমাণ করবে। অর্থাৎ মনশ্চাঞ্চল্য ও উত্তেজনাকে প্রেমধর্ম বলবে। ইন্দ্রিয় সকল উত্তেজনার সন্ধানে এবং অপর কাহারো হিতাহিত সুখ-সুবিধার কথা ভাবে না বা কোনও ন্যায় অন্যায় ও দায়-দায়িত্বের সম্পর্ক রাখে না এবং তারা সদাই বৈচিত্র্য চায়। সুতরাং কামধর্মপরায়ণতা যে পরিণামে সমাজসংহারী উচ্ছৃঙ্খলতায় পর্যবসিত হবেই তা সহজেই অনুমান করা যায়। এবং একে যদি প্রেম বা ভালোবাসা নাম দিয়ে এর ভিত্তিতে বিবাহ ব্যাপারকে স্থাপন করা হয় তহলে সে-বিবাহ যে ক্ষণভঙ্গুর হবে তাতে আর সন্দেহ কি? ভালো লাগে বলেই যাকে বিবাহ করলাম তাকে ভালো না লাগলেই ছেড়ে দেবো—এতো সহজ নয়। আর ভালো-লাগাটাও সব ইন্দ্রিয়ানুভূতি বা ভাবোচ্ছ্বাসের মতোই ক্ষণস্থায়ী—চঞ্চল। ইন্দ্রিয়-সর্বস্ব ভালো-লাগার বিষয় সম্পর্কে কোনও তারতম্য-জ্ঞান নেই—বিষয়ের অন্য কোনও গুণের জন্য তার প্রতি অনুরাগ বা নিষ্ঠা নেই। তার কাছে বিষয়ের মূল্য কেবল তার ইন্দ্রিয়-সুখকারকতায়—অন্য কিছুতেই নহে। সুতরাং যাকে আজ ভালো লেগেছে—তাকে কাল ভালো না লাগলে তাকে ছেড়ে আবার নতুন ভালো-লাগার পানে ছুটতে ইন্দ্রিয়ধর্মী তথাকথিত প্রেমিক-প্রেমিকার কোনও দ্বিধাই হবে না। এ অবস্থায় যে সমাজ ভেঙ্গে পড়বে—সেটা তো হলো এর গৌণ কুফল। এই মনোবৃত্তির মুখ্য বিপক্ষ যুক্তি বরং এইটাই যে এর দ্বারা পরিণামে মানুষই ছোট হয়ে নেমে যাবে মনুষ্যত্বের স্তর হতে জান্তব স্তরে এবং সে চিরতরে বঞ্চিত হবে জীবাত্মার সত্য আনন্দ হতে।

নারীর প্রেম যদি যথার্থ প্রেম হয় তাহলে তা হবে অতীন্দ্রিয় বস্তু এবং তার আনন্দ অলৌকিক—এবং এর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যে বিবাহ তাহা অবিচ্ছেদ্য। এ কথা খুব সেকেলে শোনালেও একেবারে সেকেলে পাহাড়-পর্বতের মতোই সত্য। জৈবিক ধর্মের দোহাই দিয়ে যে কাম-ধর্মের প্রচার ও গুণগান বিচিত্রভাবে সর্বত্রই চলছে তার মুখ্য কারণই হলো মানুষকে ছোট ও জান্তব ভাবে চিন্তা করা। মানুষ যে জীবদেহকে আশ্রয় করেও তাকে ছাড়িয়ে অনেক দূরের কিছুকে পেতে চায় এবং এই "চাওয়া ও পাওয়া"ই মানুষের সত্য পরিচয়—যেমন মাটির নীচে বীজের সত্য পরিচয় তার ফুলে—একথা আধুনিক তথাকথিত বস্তুতান্ত্রিকেরা অবজ্ঞা করলেও এ সত্য নক্ষত্রের মতো চিরপরিদৃশ্যমান। আজকের শিল্পে, সাহিত্যে, চলচ্চিত্রে ও আরও বিবিধ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যে বস্তুতান্ত্রিকতার ছড়াছড়ি—তাকে "আধুনিকতা" নামে অভিহিত না করে "আদিমতা" বললেই ঠিক বলা হয়। এই তথাকথিত আধুনিকেরা বস্তু বলতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকেই বোঝেন এবং ইন্দ্রিয়াতীত যা কিছুকে মানুষ এতদিন চেয়ে এসেছে—তা সবই নিছক কল্পনা মনে করেন। কিন্তু বস্তু যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যই হবে—এ তত্ত্বই বা তাঁরা কোথা হতে পেলেন? মানুষের জান্তব জীবনেও সেই অতীন্দ্রিয় বস্তুর আভাস আসে—তাকে অস্বীকার না করে আরও স্পষ্ট করাই তো মানুষের উচিত। সেইটাই তো হবে যথার্থ বিবর্তন। অতএব ইন্দ্রিয় ধর্মটা বাস্তবিকই প্রাকৃতিক নিয়ম হলেও তাকে অতিক্রম করা যায় না বা তার বিশেষ একটা পর্যায়ে বিরতি নেই—একথা কেবল উন্নতি-বিরোধী অচলায়তনের অন্ধ তার্কিকেরই শোভা পায়। করাল-ফণা বিষধর সাপ যদি শিশুকে বেড়ে ধরে—জননী পলকে আড়াল করে ধরবেন তার কিশলয় দেহ। ঘোর বস্তুতান্ত্রিকও লজ্জা পাবেন এ ঘটনার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিতে। কোনও বস্তুতান্ত্রিক প্রেমিক পারেন কি তাঁর প্রেয়সীকে এ রকম মৃত্যুকে তুচ্ছ করেও ঘিরে রাখতে? মানুষকে তো তার সকল অবনতি ও বিকৃতি স্বীকার করেও উন্নতির কল্পনা এবং তার জন্য সাধনা করতে হবে। বর্তমান জৈবিক অবস্থাকেই শাশ্বত সত্য বলে মেনে নেওয়া তার পক্ষে হবে মূঢ় কাপুরুষতা মাত্র।

সুতরাং দেখা যায় বিবাহ যদি সত্য প্রেমের ভিত্তিতে হয় তাহলে তা সমাজ-কল্যাণকরই হবে—কারণ তখন সে বিবাহ হৃদয়ের সংযোগের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। বিচ্ছেদ-আশংকা বা অশান্তির দুর্যোগ এ মিলন-কুটিরকে নাড়া দিতে পারবে না। কিন্তু এই প্রেম বিকশিত হবার অনুকূলে চাই তরুণ তরুণীর সুস্থ ও স্বাভাবিক মেলা-মেশা ও বন্ধুত্বের আবহাওয়া সমাজ-জীবনে। এই মেলা-মেশা আবার অতিরিক্ত সুযোগ বা সুবিধায় পর্যবসিত হলে অত্যন্ত ক্ষতিকর হইবে। সুতরাং এই সমস্যাটি কার্যতঃ কঠিনই বটে। এ সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান কোথাও—কি পূর্বে বা পশ্চিমে আজও হয়নি। তবে আদর্শের ধ্রুবতারাকে ভরসা করে দেশের তরুণ সমাজকে বলি প্রথমে, যে তোমরা এবার দাও নারীর ভালোবাসাকে পূর্ণ মর্যাদা ও নারী সম্বন্ধে তোমাদের ধারণার মাপকাঠি কারো অতি উন্নত—তোমাদের রুচি অনুসারেই তোমাদের জীবন সঙ্গিনীরা তৈরী হবে। তারপর তরুণী সমাজকে বলার আছে এইটুকুই

যে ঘটাও তোমাদের মনুষ্যত্বের পূর্ণ জাগরণ। তোমরাও যে মানুষ সে কথা যেন তোমাদের জীবন-সঙ্গীরা পারে প্রতি পলেই অনুভব করতে। শুধু নারী, অবসরসঙ্গিনী মাত্র নহ—বলো বীরাঙ্গনা রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার মতো—

"যদি পার্শ্বে রাখ মোরে সংকটে সম্পদে,
সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে সহায় হতে
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।"

গৃহ ও গৃহিণী

শ্রীউমা সান্যাল

(১)

গৃহকে সুখ শান্তি ও সম্পদের আগার করিতে হইলে তথায়—সুগৃহিণীর প্রয়োজন। কিন্তু আধুনিক নারী প্রগতির যুগে নারীরা আজকাল প্রায় গৃহকে বর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। উচ্চ শিক্ষা ও চাকরীর মোহে বেশীর ভাগ নারীই গৃহ জীবন হইতে বাহিরের জীবনকে বরণ করিয়া লইয়াছেন। অবশ্য এর মূলে রহিয়াছে অর্থনৈতিক সমস্যা। আজকাল আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এমন সঙ্কটজনক রূপ ধারণ করিয়াছে যে নারীকেও গৃহের বাহিরে আসিয়া উপার্জ্জন করিতে হইতেছে। যে—সংসারে প্রয়োজন সেখানে নারীরা গৃহের মোহ ত্যাগ করিয়া উপার্জ্জন করিতে বাহির হইবে ইহাতে অকল্যাণ নাই। দুর্দ্দশাগ্রস্ত স্বামী, ভ্রাতা বা পিতাকে সাহায্য করাও শিক্ষিতা নারীর কর্ত্তব্য। কিন্তু যেখানে প্রয়োজন নাই শুধু নারী প্রগতির স্বাধীনতার ধুয়ায় মেয়েরা ডিগ্রিলাভ করিয়া, গৃহজীবনকে বর্জ্জন করিয়া চাকরী করিতে ছুটে তাহা সমাজের পক্ষে শুভ নয়।

গৃহই নারীর প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র। মানুষ সামাজিক জীব, সমাজের নৈতিক উন্নতি ও দুর্নীতি নিবারণের জন্য চাই দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের সুস্থ ও সুন্দর গার্হস্থ্য জীবন। যাহার গৃহে কোন আকর্ষণ বা শান্তি নাই তাহার দ্বারা সমাজের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না, সে সমাজের অভিশাপ স্বরূপ। আজকাল আমাদের সমাজের দুর্নীতি বৃদ্ধির মূলেও রহিয়াছে এই নারীর গৃহবিমুখীনতাও সংসারে সুগৃহিণীর অভাব। নারী কল্যাণী, সংসার পালয়িত্রী ধাত্রী। সমাজকে বলিষ্ঠ সুসন্তান দান করা তাহার কর্ত্তব্য। তাই তাহার প্রধান কর্ত্তব্য সুমাতা ও সুগৃহিণী হওয়া। সংসারে সুগৃহিণী হইতে হইলে মেয়েদের সুশিক্ষার প্রয়োজন। এ শিক্ষা শুধু বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশের গণ্ডির মধ্যেই নাই। এ শিক্ষালাভ করিতে হইলে অভিজ্ঞা অভিভাবিকার নিকট সাংসারিক কার্য্যগুলি হাতে কলমে শিক্ষার প্রয়োজন। শুধু পুঁথিগত বিদ্যার দ্বারা সন্তান পালন বা সংসারকে সুনিয়ন্ত্রিত করা যায় না। আদর্শ সুগৃহিণী হইতে হইলে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রথমতঃ সংসারের পরিচ্ছন্নতা, দ্বিতীয়তঃ সংসারের অপচয় নিবারণ, তৃতীয়তঃ গৃহস্থ আত্মীয় পরিজনের স্বাস্থ্য রক্ষা, চতুর্থতঃ শিশুগণের নৈতিক চরিত্র গঠন ও তাহাদের মনে ধর্ম্মভাব জাগরণ।

ইংরাজীতে একটা কথা আছে Cleanliness is next to Godliness—পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাই স্বর্গীয়তা ও পবিত্রতার প্রধান সোপান। গৃহকে সব সময় পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয়। সুসজ্জিত ও সুপরিষ্কৃত গৃহই লক্ষ্মীর আবাস ভূমি, সেজন্য প্রতি গৃহিণীরই গৃহের পরিচ্ছন্নতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত। আবার শুধুই গৃহের পরিচ্ছন্নতার প্রতি লক্ষ্য রাখিলে চলে না; দেহের ও বেশভূষার পরিচ্ছন্নতারও প্রয়োজন। গৃহিণীকেও সুবেশা থাকিতে হয়। তাই মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন—"যিনি বাঁদী ও বিবি উভয়ই হইতে পারেন—হইতে পারেন তিনি লক্ষ্মী—তিনিই সম্পত্তি এবং শোভা উভয়েরই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।"

সাংসারিক অপচয় নিবারণ করাও গৃহিণীর কর্ত্তব্য। ইংরাজীতে বলে waste not want not, আমাদের দেশের আজ বড় দুর্দ্দিন, এদিনেও যদি সংসারের অপচয় নিবারণের চেষ্টা না করা হয় তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহ একেবারেই শ্মশান হইয়া যাইবে। কোন দ্রব্যই নষ্ট করিতে নাই, সকল দ্রব্য হইতেই কোন না কোন প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে, ছেঁড়া কাপড়, পুরাণ কাগজ, কুটনার খোসা ও ঘরের আবর্জ্জনা প্রভৃতি ও অকিঞ্চিৎকর পদার্থ নয়, তাহা হইতেও সুগৃহিণীরা অনেক লাভ করিয়া থাকেন। ছেঁড়া কাপড়ের বদলে নূতন বাসন, পুরাণ কাগজের বদলে নূতন কাগজ, কুটনার খোসায় গৃহ-পালিত পশুর পোষণ ও ঘরের আবর্জ্জনায় বৃক্ষের সার হইয়া থাকে।

তারপর স্বামী পুত্র ও অন্যান্য পরিজনের স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্বও গৃহিণীরই। সেজন্য গৃহিণীকে রান্নাঘরের প্রতিও দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যাহাতে সকল খাদ্য বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর হয়—তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। নিজে হাতে রান্না না করিলেও রাঁধুনী ও রান্নাঘরের পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি রাখা গৃহিণীরই কর্ত্তব্য।

গৃহিণীর সবচেয়ে বড় দায়িত্ব তাহার সন্তান পালনে। সন্তান পালনও তাহাকে সুশিক্ষা দান এক দুরূহ ব্যাপার। মাতার সুশিক্ষার উপরেই শিশুর শুভাশুভ নির্ভর করে, শিশুই ভবিষ্যত জাতির মেরুদণ্ড। সুতরাং জাতিকে সুস্থ সবল ও সুনীতি-পরায়ণ করিয়া তুলিতে হইলে সমগ্র নারীজাতিকে শিশুপালন ও শিশু শিক্ষার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বর্ত্তমানের শিশুটিই একদিন দেশের ভবিষ্যত নাগরিক—সেজন্য শিশুর মনে যাহাতে ধর্ম্মভাব প্রকাশ পায় এবং সে দুর্নীতিপরায়ণ না হইয়া উঠে সে বিষয়ে প্রতি জননীরই দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

আজকাল আমাদের দেশে এত দুর্নীতি বাড়িয়া গিয়াছে যে সমাজ জীবন বিপদগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। এর জন্য দায়ী কে? অনেকে বলিবেন বর্ত্তমান আর্থিক অবনতিই এর মূল কারণ,কারণ অভাবেই স্বভাব নষ্ট। কিন্তু আমার মনে হয় অর্থনৈতিক দুরবস্থা দুর্নীতির আংশিক কারণ হইলেও এর মূল কারণ দেশে সুগৃহিণী ও সুমাতার অভাব। তাই আজ সমগ্র শিক্ষিতা নারীজাতির প্রতি আমার একান্ত বিনীত অনুরোধ যে তাঁহারা যেন বাহিরের মোহে গৃহকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন না করেন। আবার যেন তাঁহারা সুগৃহিণী এবং সুমাতা হইয়া গৃহকে সুনিয়ন্ত্রিত এবং সমাজ-জীবনকে কল্যাণময় ও শান্তিপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারেন। তাহা হইলেই আমাদের শিক্ষার সার্থকতা সম্ভব হইবে।



সুমিতার সাধনা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তৃতীয় দৃশ্য

হাজারীবাগ গোপাল ভিলার ফটকের সম্মুখ। কাল রাত্রি।

সুমিতার ছোড়দা নরেন, পরণে খাঁকি সর্ট, হাফ হাতা সাদা কামিজ, হাতে একটা হকিষ্টিক। ছোট ছোট পাথরকে বল করিয়া ষ্টিক দিয়া লক্ষ্যহীন ভাবেই মারিতেছে। এবং কথা বলিতেছে একমনে বন্ধুর সঙ্গে। বন্ধুটি তাহারই সমবয়সী। ব্যারিষ্টার রণেন শর্মা। প্রকাণ্ড ধনীর সন্তান। পরণে ব্রীচেস। হাতে একটা কেইন জাতীয় ছড়ি। বাড়ীর ভিতর হইতে পিয়ানোর বাজনা শোনা যাইতেছে।

রণেন। কাল পূর্ণিমা। আমি সব বন্দোবস্ত করেছি। দুখানা গাড়ী। উইথ অল এ্যারেঞ্জমেণ্টস। ফুড ড্রিঙ্ক। এভরি থিং। তোমার রাইফেলটার চেয়ে সুরেনদার রাইফেলটা ভাল। সেটা যেন নেয়।

নরেন। দাদার কথা দাদা জানে। ইউ বেটার টেল হিম।

রণেন। মানে? হোয়াট ডু ইউ মিন?

নরেন। আই ডু মিন নাথিং। ইট ইজ সি হু মিনস। বোধ করি ভুল বললাম—ইট ইজ সি মানে বউদি। বউদি আসছেন না। কাজেই হার মোষ্ট বিলাভড্ এ্যাণ্ড ওবিডিয়েণ্ট হাজব্যাণ্ড ও আসছেন না।

রণেন। সে কি? এত পরামর্শ হল। প্রতিমা বউদি নিজে বললেন। কথা দিলেন। সেই জন্যে আমি কলকাতার সমস্ত কাজ ফেলে তোমাদের সঙ্গে ছুটে এলাম, বুইকখানাকে শুদ্ধু আনলুম। নইলে আমার ষ্টাণ্ডার্ড টুয়েলভই যথেষ্ট ছিল। ইজিলি সুমিতা জয়ন্তী তুমি আমি ড্রাইভার পাঁজজন কুলিয়ে যেত।

নরেন হাসিয়া উঠিল

তুমি হাসছ কেন?

নরেন। তোমার কল্পনা শক্তির দৈন্যতা—

রণেন। দৈন্যতা নয় দৈন্য কিম্বা দীনতা।

নরেন। আমি তোমাদের ব্যাকরণ মানি নে। আমি দৈন্যতাই বলব। পরীক্ষা দিচ্ছি না যে তুমি নম্বর কেটে নেবে।

রণেন। বেশ তবে তুমি দৈন্যতাই বল। কিন্তু কথাটা কি? আমার কল্পনা শক্তির দোষটা কোথায়?

নরেন। এ্যাবাউট সুমিতা।

রণেন। হোয়াট?

নরেন। সুমিতাই যাচ্ছে না।

রণেন। যাচ্ছে না?

নরেন। না।

রণেন। কিন্তু—

নরেন। আমার বাংলা ভাষার মত সুমিতা কোন ব্যাকরণে চলে না রণেন। এত দিনেও যদি তুমি তা না বুঝে থাক তবে ইউ আর এ ফুল। বলতে পার কোন্ ব্যাকরণ অনুসারে সে সকলকে ফেলে বাতিল ক'রে—সঞ্জীবকে পছন্দ করেছিল? তুমি ছিলে, শিশির ব্যানার্জ্জি ছিল, নেপেন ছিল, নিতু ভট্‌চার্জ্জি ওয়াজ দেয়ার, টেনিস চ্যাম্পিয়ন অশোক, আই সি এস ক্যাণ্ডিডেট; এ্যাণ্ড অশোক যে আই সি এস পরীক্ষায় ফার্ষ্ট ফাইভের ভেতর থাকবেই এ বিষয়ে কারুর কোন সন্দেহই ছিল না। কোন ব্যাকরণ অনুসারে সে সঞ্জীবকে পছন্দ করেছিল বল?

রণেন। কিন্তু সুমিতা সঞ্জীবকে ছেড়ে চলে এসেছে। তোমাদের বাড়ীতে সেদিন সে আমাকে বলেছে—আমি ভুল করি, মানুষ মাত্রেই করে। কিন্তু তাকে আমি শোধরাতে পারি। তাতে লজ্জা পাই নে। মিথ্যেও বলিনে। হঠাৎ আবার তার হ'ল কি? তার অনুরোধেই আমি হাজারিবাগ এসেছি।

নরেন। তুমি তাকেই জিজ্ঞাসা কর না। আমার সঙ্গে তার বনে না।

রণেন। চল, আই শ্যাল আস্ক হার স্ট্রেট। তার কথা-মতই আমি বন্দোবস্ত করেছি।

নরেন। তুমি চলে যাও ভিতরে। শুধু বি ওয়্যার অব দ্যাট ওল্ড ম্যান। কলকাতা থেকে এখান পর্য্যন্ত দ্যাট ওল্ড ম্যান ক্রমশ উগ্র থেকে উগ্রতর হয়ে উঠছে। এ্যাণ্ড আই অ্যাম সিওর—হি উইল কিল্ হিমসেলফ। ব্লাড প্রেসার টু হাণ্ড্রেড টেন। বাপ্ তার উপর এই রাগ। যাও তুমি ভিতরে যাও।

রণেন ভিতরে চলিয়া গেল

নরেন হকিষ্টিক দিয়া পাথর ছুঁড়িতে লাগিল

বাহির হইতে বিমল—সঞ্জীবের অনুগত ছেলেটি চীৎকার করিয়া বলিল—পাথর ঠ্যাঙাবেন না মশায় এমন ক'রে!

যেদিক হইতে কথা ভাসিয়া আসিল নরেন সেদিকে পিছন ফিরিয়া উন্টা দিকে পাথর ছুড়িতে লাগিল।

বিমল প্রবেশ করিল, সে সঞ্জীবের মাতৃশ্রাদ্ধের সংবাদ দিতে আসিয়াছে ও সুমিতাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছে।

বিমল। এইটিই কি ঘোষাল ভিলা? মিঃ এম এন ঘোষালের—।

নরেন মুখ ফিরাইয়া দেখিল

বিমল। নরেন? নরেন বাবু?

নরেন ঘুরিয়া দাঁড়াইল

নরেন। কে আপনি? হাউ ডেয়ার ইউ—আমাকে নরেন বলে ডাকেন কোন অধিকারে?

বিমল। আমাকে চিনতে পারছ—পারছেন না? আমি বিমল ঘোষাল—আপনাদের জ্ঞাতি। আমার বাড়ী শ্রীপুর। আপনাদের জ্ঞাতি।

নরেন। বুঝলাম—কি চান আপনি?

বিমল। আমি শ্রীপুর থেকে আসছি মানে সঞ্জীবদার কাছ থেকে।

নরেন। তারপর? কী হুকুম সঞ্জীববাবুর?

বিমল। না। মানে তিনি ঠিক পাঠান নি। সঞ্জীব দা'র মা হঠাৎ মারা গেছেন—

নরেন। হোয়াট? গত কাল রাত্রে সুমি সেখান থেকে এসেছে। ভোর রাত্রে আমরা কলকাতা থেকে বেরিয়ে এখানে এসেছি। এখন রাত্রি আটটা। আপনি এসেছেন—বলছেন সঞ্জীবের মা মারা গেছে?

বিমল। মানুষের জীবন—

নরেন। ওসব দার্শনিকতা রাখুন আপনি।

বিমল। সুমিতা বউদি চলে আসবার পরই বোধ হয় ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তিনি মারা গেছেন। বাড়ীতে কেউ ছিল না, তিনি সিঁড়ি থেকে পা হড়কে পড়ে যান। হার্ট দুর্ব্বল ছিল, আঘাত সহ্য করতে পারেন নি—তাতেই মারা যান।

নরেন। তাতেই মারা যান! গড নোজ। আই ডোণ্ট বিলিভ।

ঠিক এই সময়ে ভিতর হইতে সুমিতা রণেন ও জয়ন্তী বাহির হইয়া আসিল

সুমিতা। না—না—না। এক্সকিউজ মি; প্লিজ! বাবার শরীর অত্যন্ত খারাপ!

জয়ন্তী। সে তো বড়দি থাকছেন, দাদা থাকছেন—

সুমিতা। আমিও থাকব। আমার ওসব ভাল লাগবে না।

রণেন। কিন্তু কলকাতাতে—কাল রাত্রে যখন এ প্রোগ্রাম করা হয় তখন তুমিই সব চেয়ে উৎসাহ দেখিয়েছিলে সুমিতা। না হ'লে আমি এইভাবে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসতাম না।

সুমিতা। হ্যাঁ! পূর্ণিমা রাত্রে একদিন যাব বলেছিলাম। কিন্তু সেটা কাল-পূর্ণিমায় এমন কথা বলি নি!

এতক্ষণে তাহারা বাহির হইয়া আসিল

জয়ন্তী। মিষ্টার শর্ম্মা—অপেক্ষা করুন না কাল সকাল পর্য্যন্ত। দেখুন না সঞ্জীববাবু এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তাঁকে রাজী করার ভার আমি নিলাম।

নরেন। সে আসে নি এবং আসছে না, তার লোক এসেছে।

সুমিতা। বিমলদা!

বিমল। হ্যাঁ। আমি তোমাকে নিতে এসেছি বোন—

সুমিতা। কেন বিমলদা? আমি তো বলে এসেছি, তাঁকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়ে এসেছি—আমি আর সেখানে যাব না। তবু তিনি কেন—

বিমল। সঞ্জীবদা আমাকে পাঠায় নি। আমি নিজে এসেছি। তোমার শাশুড়ী মারা গেছেন—

সুমিত্রা। আমার শাশুড়ী—

বিমল। হ্যাঁ। তুমি চলে আসবার ঘণ্টাখানেক পরেই—

নরেন। এ ফেয়ারী টেল। তুমি চলে আসবার পরই দেবদূত এসে বুড়ীকে নিয়ে চলে গেছে।

সুমিত্রা। ছোড়দা—তুমি থাম।

বিমল। সিঁড়ির মাথা থেকে পা-পিছলে নিচের সিঁড়ি পর্য্যন্ত গড়িয়ে পড়ে যান। অপঘাত মৃত্যু—তিন দিনে থেউরী—চার দিনে শ্রাদ্ধ। কাল থেউরী। আমি নিজে থেকে ছুটে এসেছি সুমিতা; অমর বারবার ক'রে বলে দিয়েছে—সঞ্জীবদা পাঠাতে চান নি, তিনি বলেছিলেন—সে আসবে না। তুমি চল বোন—নইলে—।

সুমিতা। তিনি ঠিকই বলেছিলেন বিমলদা। ফিরেই যদি যাব-তো এসেছি কেন? আমি সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়ে এসেছি। আমি যাব না।

বিমল। সুমিতা—তোমাকে যেতেই হবে,—তুমি বুঝতে পারছ না—

সুমিতা। না—না—না। আমি যাব না।

সে দ্রুতবেগে ঘুরিয়া ভিতরে চলিয়া গেল—বলিতে বলিতে গেল

আমি যাব না। কাল পূর্ণিমা—কাল আমরা জয়রাইডে যাচ্ছি—কাল আমার—উঃ মা!

একটা পতন শব্দ শোনা গেল!

রণেন। সুমিতা! এ কি—পড়ে গেল সুমিতা!

জয়ন্তী। সুমিতা—সুমিতা। ঠাকুরঝি।

উভয়েই অনুসরণ করিল

বিমল। সুমিতা!

সেও ভিতরে ঢুকিতে গেল। বাধা দিল নরেন। হকি স্টিক দিয়া ফটক আটকাইয়া বলিল

নরেন। ভিতরে যাবেন না দয়া করে।

সে ভিতরে ঢুকিয়া ফটক বন্ধ করিয়া দিল

সুমিতা। (ভিতর হইতে সুমিতার চিৎকার ভাসিয়া আসিল) না—না—না। আমি যাব না! না।

চতুর্থ দৃশ্য

গ্রাম্য পথ। একজন বাউল গান গাহিয়া চলিয়া গেল

মন জানে না মনের কথা ভুলের ঘোরে কান্না হাসি।
মান ক'রে রাই ছিঁড়লো মালা কদমতলায় কাঁদল বাঁশী॥
কালো বরণ দেখবে না রাই—
নয়ন জলে ভাসে যে তাই—
কালো তারা ধুয়ে দেবে; কাটবে কালো কেশের রাশি।
বাঁশী ফেলে বনমালী—গৈরিকে হায় সাজ উদাসী॥

গান গাহিয়া বাউল চলিয়া গেল। প্রবেশ করিল সঞ্জীব ও অমর। সঞ্জীবের মাতৃ-শ্রাদ্ধ চলিয়া গিয়াছে। তাহার মাথা কামানো। কামানো মাথায় খদ্দরের টুপী পরিয়াছে।

অমর। না—না। তুমি এখন যাওয়ার মতলব করোনা সঞ্জীবদা। শ্রাদ্ধের পর যে জরটায় তুমি ভুগলে—সেই জ্বরের কথাটা মনে কর। এই দেহ নিয়ে তোমাকে আমি যেতে দেব না।

সঞ্জীব। আমার মন বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে অমর। বিমল হাজারিবাগ থেকে এসে বললে—সুমিতা মায়ের মৃত্যু-সংবাদ শুনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল। শুনে অবধি আমি মনে মনে যে কি কষ্ট ভোগ করেছি—তা তোমরা জান না।

অমর। জানি সঞ্জীবদা। একশো পাঁচ ডিগ্রী জ্বরে—ভুল বকেছ—সে ভুল বকুনীর মধ্যে—বউদির কথা। সুমিতা—সুমিতা! এলে, এস, বস। কোথায় লেগেছে তোমার?

সঞ্জীব। আমি তার উপর অবিচার করেছি অমর। অত্যন্ত অবিচার করেছি। ধনবান রূপবান অভিজাত প্রার্থী সুমিতাকে বিয়ে করবার জন্যে উৎসুক ছিল—তাদের সকলকে ছেড়ে সে আমাকে বরণ করেছিল। মায়ের মৃত্যু-সংবাদ শুনে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছে। মাতু বললে—মা নিজেই তাকে যাবার অনুমতি দিয়েছিলেন। আমি অবিচার করেছি। জান, আমার ভুল বিমলের আনা সংবাদেও ভাঙে নাই। কিন্তু সেই দিন রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখলাম—আমার মাকে স্বপ্নে দেখলাম। মা বললেন—বাবা—কোন দোষ নেই, তার কোন দোষ নেই। কাল আবার স্বপ্ন দেখলাম—সুমিতার খুব অসুখ! আমি

যাব, আমার মন বড় চঞ্চল হয়েছে। আমাকে বাধা দিয়ো না।

অমর। স্বপ্ন কি কখনও সত্যি হয় সঞ্জীবদা'—তুমিই বলো? বউদির খুব অসুখ স্বপ্ন দেখেছ—মনের উদ্বেগ থেকে। বউদি নিশ্চয় ভাল আছেন। বোধ হয়—শরীর দুর্ব্বল—তাই হয়তো পত্র দিতে পারেন নি।

সঞ্জীব। (স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইল) অমর!

অমর। সঞ্জীবদা!

সঞ্জীব। তুমি কি বলছ—আমাকে খুলে বল!

অমর। কি খুলে বলব সঞ্জীবদা?

সঞ্জীব। সে তুমি জান। আমি শুধু তোমার কথার মধ্যে কিছুর যেন ইঙ্গিত পাচ্ছি। ধরতে পারছি না।

অমর। তুমি সেখানে এখন যেয়ো না সঞ্জীবদা। তোমাকে আমি বারণ করছি। এর বেশী আর কিছু তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করো না।

সঞ্জীব। আমি চললাম অমর। (ঘড়ি দেখিয়া) বারোটা কুড়ির ট্রেণ এখনও ধরতে পারব।

প্রস্থান করিল

অমর। সঞ্জীবদা! সঞ্জীবদা! তাঁরা হাজারিবাগে নেই। কলকাতায় ফিরে এসেছেন। তুমি যেয়ো না শোন। (অনুসরণ করিল) কলকাতা পৌছুতে রাত্রি হবে। আজ পূর্ণিমা। আজ—

পঞ্চম দৃশ্য

কলিকাতায় এম, এন, ঘোষালের বাড়ী

প্রথম দৃশ্যের ঘরখানি। কাল—সন্ধ্যার পর। ঘরের মধ্যে বসিয়া আছে—জয়ন্তী নরেন প্রতিমা সুমিতা ও রণেন।

সুমিতা গান গাহিতেছে। প্রতিমা পিয়ানো বাজাইতেছে। নরেন সিগারেট টানিতেছে। রণেনের মুখে পাইপ। সুমিতা গান শেষ করিল।

রণেন। মধু মধু মধু। কি যে একটা শ্লোক আছে—মধু বাতা ঋতায়তে—। সব মধু ক'রে দিলে সুমিতা। আর একখানা সুমিতা। প্লিজ!

সুরেন প্রবেশ করিল

সুরেন। না। আর না। এবার আসর ভঙ্গ কর। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখ। আটটা বাজে। আজ পূর্ণিমা। তার উপর কৃস্মাস ইভ। আজ জাপানীরা ছাড়বে না। ফার্ষ্ট বমিং হয়েছে ২০শে। তারপর দিন বাদ দিয়ে বাইশে হাতীবাগান—তেইশে বাদ দিয়ে আজ চব্বিশে। বাবা বকছেন।

নরেন। বকলে শোভা পায়, বকছেন। বকলেই হ'ল। জাপানীরা এসে বোমাই যদি ফেলে—তবে কি—চুপচাপ বিছানায় লেপ মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকলেই রেহাই পাওয়া যাবে?

নেপথ্যে মণীন্দ্র। বউমা। সুমিতা!

প্রতিমা। আসছি বাবা।

সে উঠিতে উঠিতে সুমিতা উঠিয়া চলিয়া গেল, তাহার পিছনে পিছনে প্রতিমাও গেল। তাহাদের সঙ্গে সুরেনও চলিয়া গেল

জয়ন্তী। আমার কিন্তু অত্যন্ত ভয় করছে। এই বোমার মধ্যে। উঃ পরশু মনে হয়েছিল আমি হার্ট ফেল ক'রে মরে যাব। দিস ইজ টেরিবল। হাজারিবাগ থেকে কি আসবার দরকার ছিল—আমি জানি না।

রণেন। এত ভয় পাচ্ছ কেন জয়ন্তী? তোমরা যদি এমন ভয় পাও তবে সাধারণ লোকে কি করে?

জয়ন্তী। আপনি, আপনি যত অনর্থের মূল মিঃ শর্ম্মা। আপনিই সুমিতাকে ক্ষেপিয়ে নাচিয়ে এখানে নিয়ে এলেন। আপনি নিজে খাতায় নাম লিখিয়েছেন—সাইরেন বাজলে গাড়ী হাঁকিয়ে—কোমরে রিভলভার ঝুলিয়ে ছুটছেন। বেশ করছেন—। কিন্তু সুমিতাকে টানলেন কেন?

রণেন। সুমিতার টানে তোমরা না এলেই পারতে জয়ন্তী!

জয়ন্তী। না-এসে করব কি? উপায় কি?

নরেন। দ্যাট ওল্ড একসেন্ট্রিক জেণ্টেলম্যান—আমার পূজ্যপাদ পিতাঠাকুর—তিনি যে তাঁর আদরের মেয়েকে ছেড়ে একদণ্ড থাকবেন না। সুমিতা—সুমিতা—সুমিতা! বোমা পড়লে সুমিতা আহতদের সেবা করবে—সুতরাং এটা একটা মহৎ কর্ম্ম—সুমিতা মহিমাময়ী মেয়ে! যদি সুমিতা না-হয়ে জয়ন্তী হ'ত—তবে দেখতে কি ভীষণ এবং ভয়ানক ভাবে কনডেম্ করতেন তিনি।

জয়ন্তী। আস্তে কথা বল বাপু। বাবা শুনতে পাবেন।

রণেন। তোমাদের কাপুরুষতার অপরাধ তোমরা

চাপাচ্ছ সুমিতার উপর। তোমরা ভাবতে পারছ না—তার জীবনের শোচনীয় অবস্থার কথা। একটা ভুলে তার সারা জীবনটা মরুভূমি হয়ে গেছে।

জয়ন্তী। কিন্তু আপনি ফুটো কলসীতে জল ঢেলে ওয়েসিস্ সৃষ্টির চেষ্টা না-করলেই পারতেন। অন্তত আমরা সুখী হতাম। বাঁচতাম।

রণেন। আমাকে তুমি মিথ্যে দোষ দিচ্ছ। সুমিতা সঞ্জীবের ওখান থেকে চলে এল—তোমরা পরের দিনই হাজারিবাগ যাবার প্রোগ্রাম করলে—

নরেন। নো, উই ডিড নট। কিছু করি নি আমরা।

জয়ন্তী। বড়দি বাবা এঁরা করেছিলেন। মেয়ে এল শ্বশুরবাড়ী থেকে ঝগড়া করে—বাবা বললেন—কি শরীর হয়েছে সুমির। বড়দি বললেন—ওর মুখের দিকে চাইলে মনে হয় বুকের ভিতর আগুন জ্বলছে। সে কত কাব্য! চল—অমনি ঠিক হল চল হাজারিবাগ। হাজারিবাগ সুমির ফেভারিট জায়গা। কর সমীরকে টেলিগ্রাম। আমরা কি করেছি?

রণেন। তোমরা আমাকে ডেকেছিলে।

নরেন। সে সুমিতার জন্যে নয়। নিজেদের জন্যে। তুমি যে আজও সুমিতার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরও—প্লেটনিক প্রেমে ডগমগ—তা জানতাম না। জানলে ডাকতাম না।

জয়ন্তী। সুমিতা দুদিন হোক দশদিন হোক পর ফিরে যাবেই।

রণেন। না—সে যাবে না। সি ওন্ট।

জয়ন্তী। সে যাবে না- কিন্তু সে আসবে। আই মীন—হি—সঞ্জীববাবু। বাবা অলরেডি উইল করেছেন—সুমিতা ভাইদের সঙ্গে সমান ভাগ পাবে।

সুমিতার প্রবেশ

সুমিতা। তোমাদের কথার মধ্যে এসে পড়লাম। কিছু মনে করো না।

নরেন। তার জন্য আমরা এতটুকু বিব্রত হই নি। আমরা বলছিলাম বাবা উইল করেছেন—এবং তিন ভাগের একভাগ তোমাকে দিয়েছেন। জয়ন্তীর অনুমান এবার সঞ্জীব অনতিবিলম্বে এখানে এসে হাজির হবে।

সুমিতা। ছোট বউদি জ্যোতিষ বিদ্যায় খনাদেবী হয়ে উঠেছে তা জানতাম না। কিন্তু ওকথা যাক। আমি রণেনকে কয়েকটা কথা বলতে চাই।

জয়ন্তী। চললাম। উঠে এস।

শেষ কথাগুলি বলিল নরেনকে

নরেন। গুড নাইট ওল্ড বয়।

রণেন। গুড নাইট কেন? সুমিতার কথা শেষ হলেই তোমরা এস। এই তো সবে আটটা।

জয়ন্তী। আপনারা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জাপানী বম্বারের প্রতীক্ষায় থাকুন। আমাদের সইবে না।

প্রস্থান

সুমিতা। তুমি আমাকে দুটো চিতার দহন থেকে মুক্তি দিতে পার রণেন?

রণেন। সুমিতা তুমি কি বলছ?

সুমিতা। আমি আর পারছি না রণেন। আমি আর পারছি না। জীবনে ভুল করেছিলাম—কৈশোরের স্বপ্নের ছলনায় মতিভ্রান্ত হয়ে আমি তোমাকেও প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। তাকেই বিয়ে করেছিলাম। বুঝি নি! উঃ—রণেন—এই যে একটা বছর কি ভাবে কাটিয়েছি তা—জান না। বাবাকেও বলি নি। আমি আদর্শের মোহে ভালবাসার আকর্ষণে সেই পল্লীগ্রামেই গিয়েছিলাম। তোমরা আশ্চর্য্য হয়েছিলে। আমি কিন্তু হাসিমুখেই গিয়েছিলাম। প্রাণপণ চেষ্টা করেছি। কিন্তু পারি নি। মাটির ঘরে—আমার বড্ড সাপের ভয় লাগত। আমি তাই বলেছিলাম—আমাদের—আমার বাবার পাকাবাড়ীতে গিয়ে থাকতে। তাতে তার মর্য্যাদার হানি হল। রণেন, চরকা আমি কাটতে পারি না। মোটা কাপড়—কোন দিন পরি নি; খদ্দর পরব না বলি নি—সরু সুতোর খদ্দরের শাড়ী কিনে পরতে চেয়েছি, কিন্তু তাতে তার আদর্শে বেধেছে। নির্লজ্জের মত বলেছে—সে টাকা নেই আমার। টাকা দিতে চেয়েছি। নেয় নি! তাতে তার মর্য্যাদায় বেধেছে। শেষে বাবার জন্মদিনে আমায় বললে আসতে দেব না। বাড়ীতে তার মা অসুস্থ। তার নিজের কাজ আছে—পাশের গ্রামে ঘর পুড়েছে—সেখানে যাবে সে। আমি বললাম—একদিনে তাদের ঘর যেমন ছিল তেমনি হয়ে উঠবে না। সুতরাং পৃথিবী রসাতলে যাবে না।

উত্তর দিলে—বাবার একবারের জন্মদিনে না গেলেও পৃথিবী রসাতলে যায় না! আমি বিদ্রোহ করলাম। বললাম তোমাদের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ চুকে গেল আমার!

কলিং বেল বাজিয়া উঠিল—উভয়েই চমকিয়া উঠিল

সুমিতা। কে?

রণেন। বেয়ারা।

নেপথ্যে বেয়ারা। হুজুর।

রণেন। দেখ, বাইরে কে?

সুমিতা। আমি অন্যায় করেছি রণেন?

রণেন। না সুমিতা, অন্যায় তুমি কর নি।

সুমিতা। এখানে এলাম—এখানে এসে আর এক চিতার দহনে জ্বলছি। বাবা আমাকে সম্পত্তির ভাগ দিচ্ছেন দাদাদের সঙ্গে সমান ক'রে। আমি এদের বাক্য-বাণ আর সহ্য করতে পারছি না রণেন। তুমি আমাকে মুক্তির একটা পথ দেখিয়ে দিতে পার?

বেয়ারার প্রবেশ

তাহার পিছনে সঞ্জীব। সঞ্জীবকে প্রবেশ করাইয়াই বেয়ারা বাহিরে চলিয়া গেল

সঞ্জীব! সুমিতা! তোমার অসুখ করেছিল সুমিতা?

সুমিতা। (চমকিয়া উঠিল) তুমি?

সঞ্জীব। হ্যাঁ আমি। মায়ের মৃত্যু সংবাদ শুনে তুমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলে—

সুমিতা। (ভিতরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিতেছিল। চাপা গলায় বলিল) আস্তে কথা বল। বাবা ঘুমুচ্ছেন। (বন্ধ করা শেষ করিয়া ফিরিল) কিন্তু তুমি কেন এসেছ? কেন তুমি আমাকে জালাতে এলে? আমি তো তোমাকে জানিয়ে এসেছি—তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ রইল না!

সঞ্জীব। রণেনবাবু!

রণেন। নমস্কার সঞ্জীববাবু। আমি যাচ্ছি। সুমিতা আমি যাই।

সুমিতা। না। তুমি থাকবে। যদি যাও, তবে তোমার সঙ্গে আমার প্রীতির সম্পর্কও শেষ।

সঞ্জীব। (কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া) এটা আমি প্রত্যাশা করি নি।

সুমিতা। কি প্রত্যাশা করেছিলে? তুমি আসবামাত্র গলবস্ত্র হয়ে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করব আমি?

সঞ্জীব। তোমার আমার বোঝাপড়া নির্জ্জনে হবে প্রত্যাশা করেছিলাম। আমার দোষ আমি স্বীকার করছি। তোমার বাবার জন্মদিনে তোমাকে পাঠিয়ে দেওয়াই আমার উচিত ছিল। আমাকে বাড়ীতে থাকতে হ'ত তাহলে। তা হ'লে মায়ের আমার—

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল

রণেন। সত্যিই আপনার মাতৃবিয়োগ হয়েছে সঞ্জীববাবু?

সঞ্জীব। তার অর্থ? আমি মিথ্যা সংবাদ দিয়েছি।

সুমিতা। না। তুমি সত্য সংবাদই দিয়েছ। আমি জানি। তুমি দাও নি, বিমলদা তোমার অমতেই আমাকে সংবাদ দিতে গিয়েছিল হাজারিবাগ—

সঞ্জীব। সেও আমার ভুল। মাতুদি বলেছিল—মা নিজে তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তুমি অভিমান করে যে চিঠি লিখে এসেছিলে—সেই চিঠি পড়ে আমার ভুল হল—আমার অভিমান হল—

সুমিতা। ওটাও তোমার ভুল। মাতুরও ভুল। মাতু বুঝতে পারে নি—আমি চলে আসব—আমাকে আটকাতে পারবেন না জেনে তোমার মা আমাকে আসবার অনুমতি দিয়েছিলেন।

সঞ্জীব। সুমিতা!

সুমিতা। বিমল দা'ও তোমাকে ভুল খবর দিয়েছে। অথবা তুমি ইচ্ছে ক'রে ভুল শুনেছ। মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ি নি। বিমলদা আমাকে ফিরতে অনুরোধ করেছিল। আমি যাব না—জবাব দিয়ে অন্ধকারে বাড়ীর ভিতর যাবার পথে হুচোট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলাম।

সঞ্জীব। সুমিতা আমার সহ্যগুণের একটা সীমা আছে।

সুমিতা। আমার সহ্যসীমা অনেকদিন অতিক্রম করেছে। তোমার আদর্শবাদিতার অহঙ্কারের উত্তাপ আমার সহ্যশক্তিকে পুড়িয়ে ঝলসে দিয়েছে। তোমার দারিদ্র্য আমার সহ্যের অতীত। আমার বাবার ভাইদের প্রতি তোমার ঘৃণা—আমার প্রেম ভালবাসা ভক্তি সব কিছুকে ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দিয়েছে।

সঞ্জীব। আমার ভুল হয়েছে, সুমিতা আমি বুঝতে

পারি নি। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। তুমি—।
আমি হাত জোড় করছি—

সুমিতা। এর চেয়ে অনেক বেশী অসহ্য হয়েছে আমার—

সঞ্জীব। তুমি আমাকে মার্জ্জনা কর, আমি—আমি—

সুমিতা। তুমি—তুমি আমাকে মার্জ্জনা কর। আমাকে তুমি রেহাই দাও। মনে করো—

সঞ্জীব। হ্যাঁ—হ্যাঁ—মনে করো সুমিতা আমি মরেছি। তোমাকে আমি মুক্তি দিলাম। তোমার মুক্তি—তুমি মুক্ত।

ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল

রণেন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। সুমিতা হাঁপাইতেছিল

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর রণেন কথা বলিল

রণেন। এ তুমি কি করলে সুমিতা?

সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে সাইরেন বাজিয়া উঠিল

রণেন। এ কি? সাইরেন? সঞ্জীববাবু! সঞ্জীববাবু!

সে ছুটিয়া বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই সুমিতা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল।

রণেন। সুমিতা—সুমিতা!

যবনিকা নামিয়া আসিল (ক্রমশঃ)

বম্বের আশে পাশে

ভূপতি চৌধুরী

দুই বন্ধুতে তর্ক হচ্ছিল—কোন পথ দিয়ে বম্বে যাওয়া ভাল—নাগপুর হয়ে, না এলাহাবাদ হয়ে! তৃতীয় বন্ধু বললেন—রাতের হাওয়াই জাহাজ! সকলেরই যুক্তি প্রবল—সুতরাং তর্কে পরাজয় অসম্ভব। চতুর্থ বন্ধু চুপ করেছিলেন—তর্কের বেগ মন্দীভূত হয়ে এলে বল্লেন—এলাহাবাদ হয়ে যেতে হলে সময় এবং ভাড়া বেশী লাগবে এবং বেলা দশটায় সভায় যেতে হলে আগের দিন যেতে হবে। শীতকালে রাতের হাওয়াই জাহাজ অত্যন্ত অসুবিধাজনক। অতএব নাগপুর হয়ে যাওয়াই প্রশস্ত এবং রেলের মাশুলও কিছু কম।

সন্ধ্যা ১৯-৩৫ মিঃ বম্বে মেল। মাঘের সুরুতে কলকাতায় শীত মন্দ নয়। সন্ধ্যা ৭টাতেই রাত বেশ গভীর মনে হয়। রাতের আহার বাড়ীতে শেষ করে গাড়ী ছাড়ার আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে ষ্টেশনে এসে দেখা গেল—সহযাত্রী বন্ধুরাও সকলে উপস্থিত—সংখ্যায় ১০ জন—ডাঃ ত্রিগুণা-সেন, প্রতাপচন্দ্র বসু, সুবোধ ঘোষ, তারাপদ দত্ত, গোরাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালাচাঁদ ও উমা বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানচন্দ্র নিয়োগী, নীরেন রায়চৌধুরী এবং শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ। অনর্থক সময় নষ্ট না করে ট্রেণ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে যার শয্যা রচনা করে বিশ্রাম করতে উৎসুক হয়ে উঠল। ছুটির দিনের মতো নিশ্চিন্ত, কোনো কাজ নেই। কাল সকালে উঠে কাজের পিছনে ছোটার তাড়া নেই। আলস্যে গা ভাসিয়ে দিয়ে শুধু বিশ্রাম—কী আরাম!

গাড়ী বেগে ছুটে চলেছে—খড়্গপুর, টাটানগর, চক্রধরপুর প্রভৃতি বড় বড় ষ্টেশনে গাড়ী নিশ্চয়ই থেমেছে, যাত্রীরা ওঠানামা করেছে কিন্তু আমাদের কামরায় কোনো চাঞ্চল্য নেই। খুব ভোরে খানা কামরায় বেয়ারা এসে পালংচায়ের জন্য নিশানা দিয়েছিল কিন্তু ঘুম ভেঙে যাবার ভয়ে আমরা কেউ সাড়া দিইনি। শ্রীমতি উমা দেবী অবশ্য ভোরে উঠে আমাদের পালংচায়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু আমাদের দিক থেকে কোনো সাড়া না পাওয়ায় সে বেচারী আর উচ্চবাচ্য করেন নি।

যখন মনে হল যে এখন ওঠা যেতে পারে, তখন ঘড়িতে দেখা গেল বেলা ৮টা বেজে গেছে। গাড়ী মন্থর গতি থেকে মন্থরতর হয়ে অবশেষে স্থিতিলাভ করলে। সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ। শুধু একটী জানালায় কাচ লাগান। তারই মধ্য দিয়ে ষ্টেশনের নাম পড়া গেল—বিলাসপুর। অগত্যা আলস্য ত্যাগ করে উঠে পড়তে হ'ল—দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রভাত জানাল—শৈলেন্দ্রনাথ। উৎসাহ ভরে খানা কামরার বেয়ারাকে ডেকে প্রাতঃকালীন চায়ের সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করে ফেললে।

বিলাসপুর ষ্টেশনটি বেশ বড় একটী জংশন। স্বস্তিক মার্কা সিমেণ্টের জন্মভূমি কাটনি যেতে হলে এখানে গাড়ী বদল করতে হয়। রেলের একটী জেলা আপিস ও তৎসংক্রান্ত কর্ম্মচারীদের উপনিবেশ থাকায় ষ্টেশনটীর একটী গুরুত্ব আছে। বিলাসপুরী মজুর বলতে যা বোঝায়, সেই জাতীয় জনতায় সমস্ত প্লাটফরমটী পরিপূর্ণ ও কোলাহলমুখর। সারা রাত্রি বিশ্রামের পর যাত্রীরা নবোৎসাহে ওঠা নামা সুরু করে দিয়েছে। সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও গাড়ীতে যে পরিমাণ ধূলা ও কয়লা জমে উঠেছিল তা সাফ্ করার জন্য জমাদার ডেকে প্লাটফরমে নেমে পাদচারণ সুরু করে দেওয়া গেল। নির্ঘণ্ট হিসাবে এখানে গাড়ীর স্থিতি মাত্র দশ মিনিট, কিন্তু কার্য্যত গাড়ী ছাড়ল প্রায় পনের মিনিট পরে।

সমস্ত দিন কাটাতে হবে ট্রেণে—এমন অখণ্ড অবসর পাওয়া দুর্লভ। গাড়ী নাতি-মন্দ বেগে চলেছে—দেড় ঘণ্টা বাদে রায়পুর ষ্টেশন। বেশ বড় জংশন। এখান থেকে একটী মিটার মাপের লাইন ভিজিয়ানাগ্রামের উদ্দেশ্যে গিয়েছে—মধ্যভারতের খনিজদ্রব্য বিশাখাপত্তনম্ বন্দরের সাহায্যে বাইরে চালান দেবার জন্য। এছাড়া আড়াই ফুট মাপের একটী ছোট লাইন পঞ্চাশ মাইল দূরবর্ত্তী ধামতারী পর্য্যন্ত গিয়েছে। মধ্যভারতে রায়পুর সহরটীর একটী বিশিষ্ট স্থান ছিল—ব্রিটিশ যুগে। তখনকার দিনে রায়গড় ছিল—ছত্রিশ গড়ের রাজপুত্রদের শিক্ষাকেন্দ্র এবং রাজনৈতিক উপদেষ্টার প্রধান কর্ম্মস্থল। স্বাধীন ভারতে ছত্রিশগড়ের রাজাদের রাজত্বের অবসান ঘটায় রায়পুরের প্রাধান্য কিছুটা কমে গেছে বটে তবে মধ্যভারতে যোগাযোগের কেন্দ্র হিসাবে এখানে ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার অবশ্যম্ভাবী।

শীতের সকাল দশটা—বিশেষ শীত-বোধ ছিল না। মিনিট বারো পরে ট্রেণ যখন চলতে সুরু হল তখন যে যার আসন পরিগ্রহ করে, বাইরের চলমান দৃশ্য উপভোগ করায় মনসংযোগ করা গেল। লাইনের দু ধারে প্রচুর কৃষ্ণ জমি—দূরে নীলাভ পাহাড়ের রেখা। মধ্যে মধ্যে প্রশস্ত ও প্রস্তরবহুল শীর্ণ-তোয়া নদী—প্রকৃতির কেমন যেন একটী নীরস শুষ্ক ভাব। কর্ষিত ও কৃষিযোগ্য জমি অতি সামান্য। ভারতের মধ্যস্থলে অবস্থিত এই প্রদেশটী একান্ত বিরল বসতি। আয়তনের দিক থেকে বিচার করলে—মধ্যপ্রদেশ ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ—আমাদের পশ্চিম বাংলার চারগুণের চেয়েও বড়—কিন্তু মোট জনসংখ্যা পশ্চিমবাংলার চেয়ে প্রায় ৩০ লক্ষ কম। বিভিন্ন খনিজ পদার্থের আকর হিসাবে মধ্যপ্রদেশ বিশেষ সম্পদশালী। এখানকার খনিজদ্রব্য, রক্ষিত বনসম্পদ, পার্ব্বত্য নদীর প্রাকৃতিক শক্তি, এগুলিকে দেশের উন্নতিমূলক পরিকল্পনার কাজে নিয়োগ করার স্বপ্নে যখন বিভোর তখন ট্রেণ এসে থামল এমন একটী ষ্টেশনে যার অদূরে কয়েকটী ক্ষুদ্র অথচ সুদৃশ্য পাহাড়—দূরে ঘন জঙ্গল। ষ্টেশনের নাম ডোঙ্গরগড়। তখন বেলা বারোটা বেজে গেছে। ট্রেণভ্রমণে ক্ষুধাবৃদ্ধি একটা সাধারণ ঘটনা। সুতরাং কালবিলম্ব না করে মধ্যাহ্নভোজন সমাপ্ত করা হল। ট্রেণ অপেক্ষাকৃত মন্দগতিতে অগ্রসর হচ্ছে! দুই পাশে মনোরম গিরিশ্রেণী ও বনানী—সারি সারি সাজান শাল ও সেগুন গাছের জঙ্গল। এই গিরিবর্ত্মটী লম্বায় প্রায় সাতমাইল—একমুখের নাম দারকেশা ও অপরমুখের নাম শালকেশা। শালকেশা পার হতেই গাড়ী আবার দ্রুতবেগে চলতে সুরু করেছে। গাড়ীর নিয়মিত দোলানিতে চোখে কেমন যেন ঘুমের আমেজ লেগে গেল। ঘুমের নেশা যখন কাটল তখন বেলা ৪-৩০ মিঃ—গাড়ী এসে নাগপুর ষ্টেশনে থামল। এ লাইনে গাড়ী এত সময়ানুযায়ী চলা একটু আশ্চর্য্য ব্যাপার! ডাঃ সেন উপরের বার্থে শুয়ে ছিলেন। উৎসাহভরে নেমে বললেম—ট্রেণের জলে বড় কয়লা—নাগপুরের ওয়েটিংরুমের স্নানের ঘর থেকে স্নান করে আসি। হাতে ২৫ মিনিট সময়।



নাগপুর স্টেশনের প্লাটফরম সেতু

এতক্ষণ পর্য্যন্ত পূর্ব্বাঞ্চলীয় রেলপথের দৌড়। এইবার সুরু হবে মধ্যাঞ্চলীয় রেলপথের সীমানা। খাবার গাড়ী, এঞ্জিন প্রভৃতি বদল করা হল। এল নতুন বেয়ারার দল—রাত্রি ভোজনের ব্যবস্থা যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় সেই উদ্দেশ্যে তখনই বৈকালীন চায়ের হুকুম পেশ করা গেল। খানা কামরা এখান থেকে ব্রানডন কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে চালিত। চায়ের ব্যবস্থা থেকে আন্দাজ করা গেল—রাতের খানার ব্যবস্থা ভালই হবে।

নাগপুরের পর গাড়ী একঘণ্টা দশ মিনিট ছুটে বিখ্যাত ওয়ার্দ্ধা ষ্টেশনে থামে। সন্ধ্যা ছটা। রাত্রির অন্ধকারের ছায়া চারদিকে ঘনিয়ে এসেছে। সারাদিন ট্রেণের ঝাঁকুনিতে শরীরে কেমন যেন একটা অবসাদ আসে, প্লাটফরমে নেমে পাদচারণা করবার উৎসাহও নেই। ট্রেণ যখন ছাড়ে ছাড়ে তখন শৈলেন্দ্রনাথ আমাদের কামরায় তাড়াতাড়ি উঠে বললে—রায়সাহেব মানে দত্তমশাই একটা খুব ভাল প্রস্তাব করেছেন। বিখ্যাত তীর্থস্থান নাসিক পথেই পড়বে—কয়েকঘণ্টার জন্য সেখানে নামলে কী হয়? কালাচাঁদ সময়ের নির্ঘণ্ট নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল—শৈলেনের কথা শুনে চোখ তুলে বললে—তখনত রাত পৌনে পাঁচটা—অত সকালে ঘুম থেকে উঠবে কে? ইতিমধ্যে, ট্রেণ একটী ষ্টেশনে থামায় জ্ঞানচন্দ্র আমাদের কামরায় এসে বললেন—কালাচাঁদ তোমার "মারের" পথপঞ্জিকাটা বার করত—দেখি নাসিকে দ্রষ্টব্য কী আছে।

জ্ঞানচন্দ্রের কথা ও কাজের মধ্যে একটা সরাসরি ভাব আছে। নাসিকে এত কষ্ট করে নামা সার্থক হবে, যদি সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে দ্রষ্টব্য স্থান থাকে। বলা বাহুল্যমাত্র যে—তীর্থযাত্রীদের পক্ষে নাসিক এক মহাপুণ্যস্থান গোদাবরীতটবর্ত্তী পঞ্চবটী—দ্বাদশ বর্ষান্তে কুম্ভমেলার পীঠস্থান।

নাসিক সহরটী ষ্টেশন থেকে পাঁচমাইল দূরে—এখানকার ঘাট, সুন্দর নারায়ণের মন্দির, কপালেশ্বর শিবের মন্দির প্রভৃতি অনেক দ্রষ্টব্য স্থান আছে। কিন্তু দেখতে পাওয়া না গেলেও ভারতের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছাপাখানা হল নাসিকে—Security Printing অর্থাৎ

নোট ডাকটিকিট প্রভৃতির ছাপাখানা। এ স্থানে যে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ তা বলা বাহুল্যমাত্র।



নাসিক—স্নানের ঘাট

সন্ধ্যার অন্ধকার চারপাশে বেশ জমাট হয়ে বাসা বেঁধেছে। ট্রেণ ছুটে চলেছে সশব্দ গতিতে। জ্ঞানচন্দ্রের মুখে একটা প্রশান্তি ও সন্তুষ্ট—নাসিকের পুণ্যসঙ্কয়ে কষ্টের সার্থকতা একান্ত প্রতিভাত। শৈলেন্দ্রনাথের মন দ্বিধাসঙ্কুল। উমা দেবী নূতন স্থান ভ্রমণে উৎসুক, কিন্তু কালাচাঁদ ও তার কামরার সহবাসীরা ভোর রাত্রে যাত্রাভঙ্গ করতে একান্ত নারাজ। সুতরাং মুর্ত্তাজাপুর আসতে জ্ঞানচন্দ্র ও শৈলেন্দ্রনাথ অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ মনে নিজেদের কামরায় চলে গেল। অতএব আর কাল বিলম্ব না করে কোনো ক্রমে আহার সমাধান্তে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। মাঘের শীত, বিশেষ করে চলন্ত ট্রেণে বেশ প্রবল। লেপের আশ্রয়ে গভীর সুষুপ্তির মধ্যে একবার যেন বন্ধুদের কণ্ঠস্বর কাণে ভেসে এল—নাসিকে নামলাম. তোমরা আমাদের জিনিষ পত্র যথাস্থানে ব্যবস্থা কোর। কোনো প্রকারের সাড়া না দিয়ে বিছানা জড়িয়ে শুয়ে রইলাম। হাওয়া চলাচলের জন্য একটী জানালায় তারের জালফেলা এবং ষ্টেশন দেখবার জন্য একটী জানালায় কাঁচ ফেলা ছিল। ভোরের আলো কাচের জানালা ভেদ করে যখন চোখে লাগল তখন দেখি ট্রেণ এসে থেমেছে একটী ষ্টেশনে। দুপাশে পাহাড়, কুয়াশার মধ্য দিয়ে যে দৃশ্য চোখে পড়ল তাকে অপরূপ বললেও সম্পূর্ণ বলা হয় না। প্রকৃতি দেবী যে সুন্দরী তা যেন নিসংশয়ে উপলব্ধি হয়ে গেল। মুখ বাড়িয়ে দেখি ষ্টেশনটীর নাম—ইগাতপুরী।

ষ্টেশনের অদূরে কুয়াশায় আচ্ছন্ন কয়েকটী গিরিচূড়া, ভোরের আলোয় সেই গিরিচূড়ার নীলাভ ইঙ্গিত মনকে স্বপ্নরাজ্যে টেনে নিয়ে যায়। এখান থেকে সুরু হয় পরিবর্ত্তন। কয়লার এঞ্জিনের পরিবর্ত্তে বিদ্যুৎচালিত এঞ্জিন জুড়ে দেওয়া হয়—পশ্চিমঘাটের পর্ব্বতমালা ভেদ করে—গুটী দশেক সুড়ঙ্গ পার হয়ে ট্রেণ এসে থামে কাসারা ষ্টেশনে। সাড়ে ন মাইলের মধ্যে ট্রেণ ১০৫০ ফুট নেমে এল দ্রুত গতিতে। সমুদ্র থেকে কাসারা মাত্র ৯৩০ ফুট উঁচুতে। মেল ট্রেণ কাসারাতে থামবার কথা নয়, কিন্তু সিগনাল না পাওয়াতে তাকে কয়েক মিনিটের জন্য এখানে দাঁড়াতে হল। এর পর দৃষ্টিগোচর হ'ল থাল ঘাটের পার্ব্বত্য পথ—রেল লাইনের সঙ্গে এঁকে বেঁকে খেলা করতে করতে চলেছে। ট্রেণ থেকে পাহাড়ের তলার সমতল ভূমি পটে আঁকা ছবির মতো দেখা যাচ্ছে। ইগাতপুরী থেকে কল্যাণ মাত্র ৫৯ মাইল—সময় লাগে একঘণ্টা পঞ্চাশ মিনিট। পথের দৃশ্য মনোরম বলে গাড়ীর গতির মন্থরতা মনে বিরক্তির উদ্রেক করে না। কল্যাণ এলেই মনে হয় —আর কি বম্বে এসে পড়া গেল—মাত্র আর ৩৪ মাইল। আধঘণ্টা দাদার, তারপরই ভিকটোরিয়া টারমিনাস্ সংক্ষেপে ভি, টি। কল্যাণের একটু পরেই দৃষ্টিগোচর হল—সমুদ্রের খাড়ি তারপরেই থানা ষ্টেশন। এখান থেকেই বম্বে দ্বীপের আরম্ভ এবং সহরতলীর সুরু।

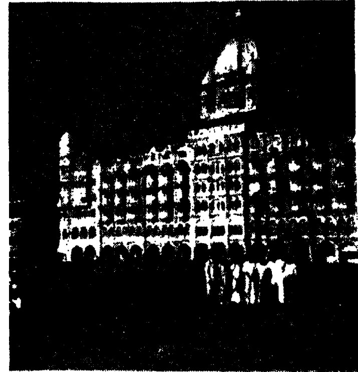
ইলেকট্রিকট্রেণ বিদ্যুৎ গতিতে মেল ট্রেণের সঙ্গে আড়াআড়িভাবে দৌড়ান সুরু করেছে। চার পাশেই জাগরণ ও কর্ম্মব্যস্ততার চিহ্ন সুপরিস্ফুট। ৩৬ ঘণ্টার ছড়ান জিনিষপত্র গুছিয়ে বাঁধাছাদা শেষ করে আমরাও প্রস্তুত অবতরণের জন্য—ভিটি এলেই হয়। ভিক্টোরিয়া টারমিনাস ষ্টেশনটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—বিশেষ করে বর্ত্তমান হাওড়া ষ্টেশনের অবস্থার তুলনায়। দুচাকা ও চার চাকার ট্রলিতে মালপত্র নিয়ে



ভিকটোরিয়া টারমিনাস

যাবার ব্যবস্থাটীও ভাল। পৌনে নটায় ষ্টেশনে নেমে পনের মিনিটের মধ্যে ট্যাক্সিতে জিনিষপত্র তুলে রওনা হওয়া, ষ্টেশনের মালবাহী ও যানবাহন ব্যবস্থার সুপরিচালনার পরিচায়ক।

আগে থেকেই চিঠি লেখা ছিল—সুতরাং কালবিলম্ব না করে—হোটেলে এসে ওঠা গেল। হোটেলটির অবস্থান ভাল—মিউজিয়াম ও কাউন্সিল হলের পাশেই এবং সমুদ্রের অতি নিকটে।



বম্বের তাজমহল হোটেলের সম্মুখভাগ

ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই ট্রেণের অবসাদ কাটিয়ে বার হবার জন্য প্রস্তুত হওয়া গেল। প্রথমেই সংগ্রহ করা হল বম্বে সহরের একটী নক্সা—যাতে ট্রাম এবং বাসের গন্তব্যস্থান প্রভৃতির নির্দ্দেশ দেওয়া আছে। বম্বেতে ট্রাম ও বাস একটী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের পরিচালনাধীন ছিল, এখন

এ দুটী সরকারী শাসনাধীন। বাসগুলি মন্দ নয় তবে ট্রাম আমাদের তুলনায় অনেক নীরেশ। কতকগুলি ট্রাম দোতলা—ধূমপায়ীরা ট্রামের দোতলায় ধূমপান করতে পারেন।

বম্বে কলকাতা থেকে সবরকমে শ্রেষ্ঠ—এই রকম একটা ধারণা অধিকাংশ লোকেরই আছে। দ্রুতগতিতে ওপর ওপর পরিভ্রমণ করলে এ জাতীয় ধারণা হওয়া খুবই সম্ভব।

বম্বের একটা স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আছে—তার তিনদিকে সমুদ্র, তার ওপর একদিক পাহাড়ের মতো উঁচু নীচু। বম্বেতে ভারতীয় ধনীর সংখ্যা কলকাতার তুলনায় অনেক বেশী। এখানকার আর একটী বিশিষ্ট ব্যবস্থা তার বিদ্যুৎচালিত রেলপথ—ধূমবিহীন ও তৎপর।

কলকাতার মতো বম্বেতেও দুটী ষ্টেশন—ভিটি, মধ্যাঞ্চলীয় রেলপথের প্রধান প্রবেশ দ্বার অপরটী বম্বে সেণ্ট্রাল—পশ্চিমাঞ্চলীয় রেলপথের প্রবেশ পথ। পশ্চিমাঞ্চলীয় রেলপথের বিদ্যুৎচালিত ট্রেণগুলি বম্বে সহরের পশ্চিম সীমানার সমুদ্রধার বরাবর চার্চ গেট ষ্টেশন পর্য্যন্ত যাওয়া আসা করে। চার্চ গেট ষ্টেশনের কাছেই—বিখ্যাত ব্রাবোর্ণ ষ্টেডিয়াম। সহরের অপর ধারে অর্থাৎ পূর্ব্ব সীমানায় ব্যালার্ড পিয়ার এবং ভারত তোরণ—তার সামনেই সুবিখ্যাত হোটেল—তাজমহল।

সহরের রাস্তাঘাট পরিষ্কার—আপিসের সময় কলকাতা সহরের মতো ফুটপাথে জিনিষ বিক্রেতা ভিড় করে দাঁড়ায়—একেবারে চৌরঙ্গী ও ধর্ম্মতলার মোড়ের দৃশ্য—কোনো তফাৎ নেই। (ক্রমশঃ)

সংঘাত ও সুর

(কথিকা)

লালমোহন পাঠক

আমাদের গ্রামের হাঁসপাতালের বড় হল্-ঘরখানায় একটা চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। পাণ্ডা আমাদের পাড়ার তরুণরা। ওতে বেশীর ভাগই আমার আঁকা ছবি।

আজ প্রদর্শনীর উদ্বোধন দিবস।

ঐ দিকে যাচ্ছিলাম।

আপন-ভোলা হয়ে পথ চলেছি। মনটা আর্টের নেশায় মস্‌গুল! চোখ দুটো যেন বুজে আসছে রূপ-স্বপ্নের মোহিনী মায়ায়। অমরাবতীর অমৃত প্রসাদে আজ আমরা আলেখ্য কলায় পরিবেশন করতে নেমেছি বিশ্বের দরবারে! বুকের ভিতর ক্ষীণ এস্‌রাজের সুরের মত কবিতা গুন্‌গুনিয়ে উঠলো—'যে স্বপন হারা হয়ে কাঁদিছে আজিকে ধরা

সে স্বপন
নয়ন-অঞ্জন
এঁকে দেবে পুনরায় কবে,—কারা ?
কারা ? 'অফকোর্শ'—মোরা !

গুন্‌গুন করতে করতে হাঁসপাতালের ফটক অব্‌ধি এসেছি বোধ হয়।

হঠাৎ এক ধাক্কা!

কে যেন হুমড়ি খেয়ে গায়ে এসে পড়লো। টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাচ্ছিলাম!

একটা বিশ্রী বোট্‌কা গন্ধ নাকে এল। মনে হল লোকটার হাতে ছিল একটা শিশি, পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

রাগে লোকটার কাঁধে একটা ঝাঁকানি দিয়ে মুখ ভেঙ্‌চে বললাম 'দেখ্‌তে পাও না ?—অন্ধ নাকি !!!' জবাব শুনে চম্‌কে গেলাম !—'হাঁ বাবু!' অস্ফুট কাতর কণ্ঠস্বর।

পরিহাস না সত্যি ? চেয়ে দেখি সত্যি চোখ দুটোয় তারা নেই!

আমার দুতিন জন তরুণ ভক্ত আমার লাঞ্ছনা দেখে ছুটে এল। অন্ধটাকে ধরে বেশ দু'চার ঘা কসিয়ে দিলে।

মন্দ লাগ্‌লো না।

ঘটা করে প্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটন হ'ল। সভা বস্‌লো। বক্তা আমি। সুদীর্ঘ বক্তৃতায় জ্বলন্ত ভাষায় বজ্রনির্ঘোষে প্রমাণ করে দিলাম —আর্টেই একমাত্র মানুষের মঙ্গল। চারিদিকে ধন্য ধন্য রব। সভাশেষে তরুণেরা পেট ভরে চপ্‌-কাটলেট খাওয়ালে।

মন্দ লাগ্‌লো না।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়।

এবার ফেরার পালা।

হাঁসপাতালের দরজা ছেড়ে ফটকের দিকে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম। কে যেন ফটকের ধারে উপু হয়ে বসে কি যেন হাতড়ে হাতড়ে খুঁজছে।

আওয়াজ দিলাম --'কেরে ?'

জবাব নেই।

কাছে গিয়ে হাতবাতীটা টিপে দেখি সেই অন্ধটা। তিক্ত কণ্ঠে বল্‌লাম—'আবার তুই এখানে কি করছিস্ ?'

লোকটা অপরাধীর মত জড় সড় হয়ে উঠে দাঁড়ালো, ভয়জড়িত কণ্ঠে বললে 'এজ্ঞে বাবু মনে হোলো ওষুধের শিশির ভাঙা টুকরোগুলো পড়ে রয়েছে এখানে, ওগুলো একটু সরিয়ে দি, কারো পায়ে ফোটে যদি! যাওয়া আসার রাস্তা!

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য

বর্ত্তমানের সমস্যাসঙ্কুল পৃথিবীতে গঠনমূলক পরিকল্পনা গ্রহণের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। ৩৫ কোটি জনগণের জন্মভূমি এই বিরাট ভারতবর্ষকে দারিদ্র্যমুক্ত না করিতে পারিলে জাতির জীবনীশক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া যাইবে। এই আশঙ্কায় দীর্ঘকাল যাবৎ ভারত সরকার দেশের বিপুল জনশক্তি ও বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদকে উপযুক্ত কার্য্যে বিনিয়োগ করিবার পরিকল্পনা করিয়া আসিতেছিলেন। ১৯৩৮ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস শ্রীজহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে একটী জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি (National Planning Committee) প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। এই সমিতি শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে অভিজ্ঞ দেশের বরেণ্য ব্যক্তিগণকে লইয়া গঠিত হয় এবং বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে জাতীয় জীবনে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আনয়নের প্রচেষ্টাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশের অভ্যন্তরে যে রাজনৈতিক অশান্তির আবহাওয়া ঘনীভূত হইয়া উঠে তাহাতেই উক্ত সমিতির কার্য্যাবলী ব্যাহত হইয়া যায়। ইতিমধ্যে কতিপয় বিশিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ দেশের আর্থিক উন্নতিবিধান কল্পে নানারূপ পরিকল্পনা গ্রহণে অগ্রসর হন এবং এই প্রচেষ্টাকে বোম্বাই পরিকল্পনা (Bombay Plan) নামে অভিহিত করা হয়।

ভারতসরকার নানারূপ পরিকল্পনার মাধ্যমে আর্থিক উন্নতি বিধায়ক একটী উন্নততর সর্ব্বব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা ও পুনর্গঠন বিভাগের (Deptt. of Planning & Reconstruction) সৃষ্টি করেন। পরিকল্পনা নির্ম্মাতাগণ প্রথমতঃ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য্যকে অবলম্বন করিয়া এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধোত্তর কালে দারিদ্র্যক্লিষ্ট দেশবাসীর উন্নতিবিধানকল্পে তাঁহারা এই গঠন-মূলক কার্য্যের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এই পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিবার জন্য যাবতীয় ক্ষমতা ভারতসরকারের হাতে সংরক্ষিত থাকে। এই পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত ১২টী বিষয় গৃহীত হইয়াছে :—

(১) কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন
(২) সেচ ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ সরবরাহ
(৩) পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা
(৪) শিল্প প্রতিষ্ঠান
(৫) সমাজসেবা (স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতি)
(৬) পুনর্বসতি—
(৭) কলকারখানা
(৮) অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনাসমূহ
(৯) উত্তর পূর্ব্ব সীমান্তের উন্নতিবিধান
(১০) আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের উন্নতি ব্যবস্থা
(১১) পৌরসভাসমূহকে ঋণদান
(১২) বিবিধ—

এই সমস্ত পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিবার জন্য ভারতসরকার ১৯৫১ সাল হইতে ১৯৫৬ সাল পর্য্যন্ত যে অর্থ ব্যয়িত হইবে তাহার পরিমাণ ধরিয়াছেন মোট ২০৬৯ কোটী টাকা; উহার মধ্যে প্রদেশসমূহের জন্য ধরা হইয়াছে ৮২৮'২১ কোটী টাকা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য ধরা হইয়াছে ১২৪০'৫৪ কোটী টাকা।

বর্ত্তমান ভারতবর্ষে এই পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল জাতীয় জীবনের মান উন্নত করা এবং দেশবাসীর সম্মুখে অধিকতর ধনসম্পদ-লাভের দ্বার উন্মুক্ত করা। অনুন্নত দেশের পক্ষে এইরূপ পরিকল্পনাকে রূপদান করিবার প্রধান উপায় হইল প্রাকৃতিক ও জাতীয় সম্পদকে সুপরিকল্পিত উপায়ে নিয়োগ করা। দেশের আর্থিক উন্নতিবিধানের উদ্দেশ্যে জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং দেশবাসীর মধ্যে সামাজিক-বোধ উদ্বুদ্ধ করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। সমাজে কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংস্থা সমূহের প্রতিষ্ঠাও সমধিক প্রয়োজন। ভারতবর্ষের জাতীয় বার্ষিক আয় ৯০০০ কোটী টাকা। আপাতদৃষ্টিতে ইহা একটা বিশিষ্ট পরিমাণ মনে হইলেও ৩৫ কোটী দেশবাসীর কথা বিবেচনা করিলে ইহা অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। দেশের জনসংখ্যার পক্ষে মাথাপিছু মাসিক ২১৲ টাকা আয় গ্রাসাচ্ছাদনের পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নহে।

ভারতবর্ষের যে স্বর্ণযুগের কাহিনী স্মরণ করিয়া আমরা আজিকার দিনেও গর্ব্ব অনুভব করি সেই যুগ আর নাই। সম্রাট অশোক ও সাজাহানের যুগ চলিয়া গিয়াছে। ভারতবাসিগণ এখন আর সম্পদের জন্য বিশ্ববাসীর নিকট পরিচিত নহে। দারিদ্র্যই তাহাদের একমাত্র পরিচায়ক হইয়া উঠিয়াছে। আজিকার দিনে যে ভারতবর্ষে ধনী ব্যক্তি নাই তাহা নহে। কিন্তু এই বিশাল জনসংখ্যার অনুপাতে তাহা অতি নগণ্য। অতএব জাতি হিসাবে সমগ্র দেশবাসীর শ্রীবৃদ্ধি করিতে হইলে জাতীয় বার্ষিক আয় কিরূপে ৯০০০ কোটী টাকার স্থলে ক্রমশঃ ১০,০০০, ১৫,০০০ কোটী অথবা ইহারও অধিক টাকা করা যাইতে পারে বর্ত্তমানে তাহাই আমাদের চিন্তার বিষয়। দেশের সম্পদ বৃদ্ধির দ্বারা দেশের আর্থিক স্বাতন্ত্র্য বিধানের ব্যবস্থাই এই ভারতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য।

ভারতবর্ষে বহুকাল যাবৎ খাদ্যশস্য, যন্ত্র ও নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু এতদিন যাবৎ তাহার সমগ্র জাতির আর্থিক উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রস্তুত হয় নাই। সমগ্র জাতির একই সময়ে আর্থিক উন্নতি বিধানের সঙ্কল্প লইয়া প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে এইরূপ আরও বহু পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে জনশক্তি ও যন্ত্রশক্তির যুগপৎ প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে; এবং দীর্ঘকালের দাসত্বক্লিষ্ট এই জনশক্তির জড়তা বিদূরিত করিয়া তাহাদের অন্তরে কর্ম্মসাধনার প্রেরণা জাগাইবার ক্ষণ আসিয়াছে। অপর দিকে এই কৃষিপ্রধান দেশে চাষের উন্নতির জন্য কৃষকের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও উপযুক্ত সার সরবরাহ করিতে হইবে এবং চীন, ইতালী ও জাপান প্রভৃতি দেশের ন্যায় কৃষকদিগকে কৃষিব্যাপারে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সুযোগ দান করিতে হইবে।

দেশের প্রতি উৎপাদন কেন্দ্র বৎসরান্তে যাহাতে কিছু সঞ্চয় করিতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং ঐ সঞ্চিত অর্থ ভবিষ্যতে বিনিয়োগের ব্যবস্থা না করিলে উৎপাদন কেন্দ্রগুলির প্রসারতা লাভ সম্ভব নহে। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতের জাতীয় ভাণ্ডারে শতকরা ৫ অংশ উদ্বৃত্ত হয়—এবং উক্ত অর্থ পরবর্ত্তী বৎসরে উৎপাদন বৃদ্ধি কল্পে নিয়োগ করা হয়। প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে বৃটেন জাতীয় আয়ের শতকরা ১০ হইতে ১৫ ভাগ পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর বিনিয়োগ করিয়া আসিয়াছে। আর আমেরিকা করিয়াছে বার্ষিক আয়ের শতকরা ১৩ হইতে ১৫ অংশ, জাপান শতকরা ১২ হইতে ১৫ অংশ, সোভিয়েট রাশিয়া জাতীয় আয়ের ½ অংশ, নরওয়ে শতকরা ১৫ অংশ এবং ফিনল্যাণ্ড শতকরা ১৮ ভাগ জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে নিয়োগ করিয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে জাতীয় আয় হইতে যত বেশী উদ্বৃত্ত হইবে ততই ভবিষ্যতে উৎপাদন ক্ষেত্রে তাহা অধিকতর পরিমাণে বিনিয়োগ সম্ভব হইবে।

যখন দেশবাসীর জীবনের মানকে উন্নতির পথে চালিত করিবার প্রচেষ্টা দেখা দেয় তখনই দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবহৃত যন্ত্রসমূহের সুষ্ঠু উন্নতি বিধানের দ্বারা দেশের কারিগরী শিল্প সাধনার পথ সুগম করিবার প্রয়োজন অনুভূত হয়। একটী অনুন্নত দেশকে তাহার ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যাসহ আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের পথে চালিত করিতে হইলে তাহার জাতীয় বার্ষিক আয় অন্ততঃ শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধি করিতে হইবে। ভারতবর্ষের বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ ১ হইতে ¼ অংশ, সুতরাং উৎপাদন ব্যাপারে বিনিয়োগের হার বাৎসরিক আয়ের শতকরা ৪ হইতে ৫ অংশ প্রতি বৎসর বৃদ্ধি করিতে হইবে। হাঙ্গেরী ১৯৪৭ সালে জাতীয় আয়ের শতকরা ১০ ভাগ এবং ১৯৪৯ সালে শতকরা ১৮ ভাগ নিয়োগ করিয়াছিল। আর পোল্যাণ্ড যুদ্ধোত্তরকালে বার্ষিক জাতীয় আয়ের শতকরা ২০ হইতে ২৫ ভাগ নিয়োগ করিয়াছে। নরওয়ে শতকরা ১৫ ভাগ এবং ইংল্যাণ্ড শতকরা ১৮ ভাগ দ্বিতীয় মহাসমরের পূর্ব্বে নিয়োগ করিয়াছিল।

দেশের জাতীয় অর্থ যে পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করা যায় সাধারণতঃ তাহা দুইটী বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। জাতীয় সরকারের উপার্জ্জনের হার এবং অনিয়োজিত জনশক্তি। কিন্তু সমস্যা এই যে, পরিকল্পনা—সমূহের রূপদান করিতে হইলে বিশেষ নিষ্ঠার সহিত কার্য্যের সম্মুখীন হইতে হইবে। একবার এই মহান্ কর্ম্মব্রতে আত্মনিয়োগ করিয়া দেশের কল্যাণকল্পে কিঞ্চিৎ পরিমাণেও উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারিলে স্বভাবতঃই দেশবাসীর অন্তরে নূতন কর্ম্মপ্রেরণা দেখা দিবে। ক্রমশঃ উৎপাদন ব্যাপারে অধিক পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ করা সম্ভব হইয়া উঠিলে ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সমূহ হইতেও আমাদের জাতীয় ভাণ্ডারে অর্থ আগমের পথ সহজ হইয়া উঠিবে। এইরূপে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব করিতে পারিলে কালে দারিদ্র্যের গোলক ধাঁধায় আচ্ছন্ন ভারতের জাতীয় জীবনে উন্নতির আলোকপাত সম্ভব হইবে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম যুগকে এক অতি সঙ্কটকাল বলা চলে। কারণ পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিবার জন্য প্রয়োজন অর্থের। অর্থ সংগ্রহের পক্ষে মাত্র দুইটী উপায় আমাদের সম্মুখে দেখা দেয়। প্রথমতঃ দেশবাসীর করভার বৃদ্ধি, ঋণ বণ্টন প্রভৃতি। দ্বিতীয়তঃ দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ও যে কোন উপায়ে জাতীয় মূলধন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা। কিন্তু উল্লিখিত উপায়দ্বয় অবলম্বন করিলে একদিকে যেমন দেশবাসীর আর্থিক কষ্ট সমধিক বৃদ্ধি পাইবে, অপর দিকে সেইরূপ মুদ্রা স্ফীতির সম্ভাবনা দেখা দিবে। অতএব দেশবাসীর কল্যাণ কামনার উদ্দেশ্য লইয়া নির্দ্ধারিত পথে প্রথমতঃ জাতীয় মূলধনের অল্প পরিমাণ অংশ লইয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে অর্থাৎ ঐ মূলধন বিভিন্ন উৎপাদনে বিনিয়োগ করিতে হইবে।

জাতীয় সম্পদের পরিমাণ যত বৃহৎ হইবে এবং তাহাকে যতই পুনরায় পরিকল্পনায় বিনিয়োগ করা সম্ভব হইবে, জাতীয় আর্থিক উন্নতির ক্ষেত্র ততই বিশাল হইয়া উঠিবে। দেশের আর্থিক উন্নয়নের সমস্যাকে ২৫।৩০ বৎসরের পরিপ্রেক্ষিতে সীমাবদ্ধ রাখিয়া প্রথম ৫ বৎসরের মধ্যে তাহার কিঞ্চিৎ ফললাভের সূচনা পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে হইবে। সুদীর্ঘ কালের দারিদ্র্যক্লিষ্ট ভারতবাসীকে সহসা ২।১ বৎসর কালের মধ্যে আর্থিক সম্পদের উপর প্রতিষ্ঠা করার দুরাশা বাতুলতা মাত্র। দেশের জনসংখ্যার হার একদিকে যেমন বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে, অপরদিকে সেইমত হারে উৎপাদন এখনও বৃদ্ধি পায় নাই। ইহারই ফলে দেশময় বেকার সমস্যা ক্রমশঃ প্রকটরূপে দেখা দিতেছে। অতএব এই সরকারী পরিকল্পনা একদিকে যে গুরু দায়িত্ব গ্রহণের ভার লইয়াছে অপরদিকে তাহার প্রতি দেশবাসীর একনিষ্ঠ সহযোগিতা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। রাষ্ট্র পরিচালনার কর্ণধারগণের উপর দেশ উন্নয়নের সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করিয়া দেশবাসী যদি অলস নিদ্রায় কালযাপন করেন তাহা হইলে দেশের কোনরূপ উন্নতিবিধান কখনই সম্ভব নহে।

ইহা অনুভূত হইয়াছে যে জাতীয় ভাণ্ডারের সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইলে এবং ব্যক্তিগত হিসাবে জাতির উপার্জ্জনের হার উন্নত করিতে হইলে রাষ্ট্রকে প্রথমতঃ কতকগুলি পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করিতে হয়; এবং দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বিষয়ে অবহিত হইতে হয়। সাধারণতঃ শিল্প ব্যাপারে ভারতবর্ষ লৌহ, ইস্পাত, বিদ্যুৎ,

রেল প্রভৃতি দ্বারা জাতীয় সম্পদ কথঞ্চিৎ পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে সক্ষম।

এই কৃষিপ্রধান দেশকে অধিকতর সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সেচ ব্যাপারে ভারত সরকার বিশেষ মনোযোগ দান করিয়াছেন। দেশের বিভিন্ন স্থানের অনুর্ব্বর ক্ষেত্রকে কৃষির উপযোগী করিবার জন্য বহু বাঁধ নির্ম্মাণ করা হইতেছে। এই সকল বাঁধের জলস্রোত হইতে একদিকে যেমন কৃষির উন্নতি সম্ভব হইবে, অপরদিকে তেমন ইহা হইতে উৎপন্ন বৈদ্যুতিক শক্তি দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহকে অভিনব কর্ম্মশক্তি প্রদান করিতে সক্ষম হইবে।

এই বিভিন্নমুখী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে দেশ যে কালে উন্নততর হইয়া উঠিবে সে বিষয়ে এখন আর সংশয়মাত্র নাই। পরিকল্পনার দুই বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে দেশে যেন একটা নূতন প্রেরণা সঞ্চারিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। জাতীয় বার্ষিক আয়ের পরিমাণ শতকরা অন্ততঃ পক্ষে ২০ ভাগ বৃদ্ধি হইবার অবস্থায় উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত দেশবাসী সর্ব্ববিষয়ে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু ইহা কাল সাপেক্ষ। ১৯৫০-৫১ সালের জাতীয় বার্ষিক বর্দ্ধিত আয়ের পরিমাণ শতকরা ৫ অংশ ছিল। ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫৫-৫৬ সালে শতকরা ৬½ অংশ এবং ১৯৬০-৬১ সালে শতকরা ১১ অংশ এবং ১৯৬৭-৬৮ সালে শতকরা ২০ অংশ বৃদ্ধি পাইতে পারে।

এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গণতান্ত্রিকতার মাধ্যমে দেশকে আর্থিক উন্নতিপথের সন্ধান দিয়াছে। ধূলার ধরণীতে স্বর্গ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা অথবা কল্পনা বিলাস ইহাতে নাই। এই পরিকল্পনা নিছক বাস্তববুদ্ধি সঞ্জাত। বর্ত্তমানের নিদারুণ অর্থ কৃচ্ছ্রতার যুগে এই পরিকল্পনাকে অবলম্বন করিয়া জাতীয় জীবনের মান উন্নততর করিবার জন্য সংযম, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত ভারতের প্রত্যেক অধিবাসীকে মহান্ কর্ম্মসাধনায় অগ্রসর হইতে হইবে। অন্যথায় পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইবার পরিবর্ত্তে উহা অলস স্বপ্নে পরিণত হইবে।

দুঃসাহস

দিবাকর সেনরায়

রবিবারে দুপুরের শূন্যতা অসীম,
অবসন্ন ছ'দিনের দম্ দেওয়া ঘড়ি,
দুই স্বাদ—মিষ্টি মধু আর তেতো নিম
একসাথে এ দুপুরে যেন পান করি।

অচেনারে বন্ধনের প্রয়াস সীমায়,
শূন্যতারে রূপ দিতে চাওয়া পূর্ণতায়;
রেশনের চাল খেয়ে চেতনা ঝিমায়,
পূর্ণতার স্বপ্ন রূপ লভে শূন্যতায়।

অব্যক্ত ঘুরে মরে অবচেতনায়—
হংস-মন ডানা মেলে আকাশের পথে,
মেঘ দেখে খোলা ডানা বন্ধ হলো হায়,
ভীরু মন বাঁধা পথে চলে কোনো মতে।

চেনা পথে ঘরে ফিরে নাগরিক-মন
নিশ্চিন্ত আলসে করে শয্যায় শয়ন।

পাথেয়

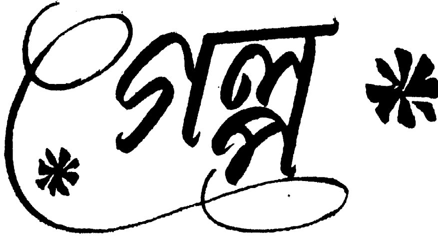
শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

বিচিত্র পথের প্রান্তে যাত্রা হ'ল শেষ।
হেরিলাম কত তীর্থ, কত লোকালয়।
মন্দির, মস্জিদ কত, বহু নদী, দেশ।
নয়ন সার্থক হেরি হিমাদ্রি বলয়।

দেখেছি তমাল বৃক্ষ যমুনা পুলিনে।
অশোকের লৌহ স্তম্ভ কুতবের পাশে।
পাহাড়ে মেঘের খেলা শরতের দিনে।
স্মরি রাম সীতা গোদাবরী কলভাষে।

কোন সে খাণ্ডব দাহে তুষি বৈশ্বানরে
সব্যসাচী লভিলেন অক্ষয় তূণীর!
কুরুক্ষেত্রে অস্ত্রমুখ চুমে পরস্পরে।
পিতামহ, গুরু জিনি শিষ্য হ'ল বীর।

পথের কল্যাণে হেরি কত পুরাকৃতি।
ভুলে যাই সবিশেষ, জেগে থাকে স্মৃতি।



মানুষ

শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

সন্ধ্যার মুখে ম্যাজিস্ট্রেট্‌ সাহেবের বাংলোর কম্পাউণ্ড পার হয়ে রাস্তায় পা দেওয়ার আগেই বৃষ্টি পড়া সুরু হল। রায়বাহাদুর সঙ্গে ছাতা আনেন নি, বাড়ী থেকে পরিষ্কার আকাশ দেখেই বেরিয়েছিলেন, ঝড়-বৃষ্টির কথা চিন্তাই করেন নি। ছোকরা ম্যাজিস্ট্রেট্‌ দশ বছর আগে এই জেলা থেকেই রিটায়ার-করা ম্যাজিস্ট্রেট্‌ রায়বাহাদুরকে মোটেই খাতির দেখান নি। যে বাংলোয় একদিন রায়-বাহাদুর প্রবল প্রতাপের সঙ্গে বাস করে গিয়েছিলেন সেই বাংলোর বর্তমান অধিকারীর কাছে আজ তিনি এসেছিলেন তাঁর ছোট ছেলের চাকরীর উমেদারী করতে। ক্ষুণ্ণ মনে রায়বাহাদুর দ্রুত হাটতে লাগলেন, আর ভাবতে লাগলেন কালের কি কুটিল গতি! দশ বছর আগে যে পথে আরদালী-পরিবেষ্টিত হয়ে সগৌরবে মোটর হাঁকিয়ে গেছেন সেই রাস্তা দিয়ে আজ বৃষ্টি মাথায় দিয়ে তিনি পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন। কিছুক্ষণ আগে এক অর্বাচীনের অপমানের জ্বালায় মনটাও জ্বলতে লাগল তাঁর। রায়বাহাদুরের এক জামাই এই সহরেই ওকালতী করেন, তাঁরই বাড়ীতে এসে উঠেছেন রায়বাহাদুর। ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠী শহরের একেবারে বাইরে, প্রায় আধ মাইলের মধ্যে কোন লোকালয় নেই। দেখতে দেখতে বৃষ্টি বেশ জোরেই নামল, অন্ধকারে পথ চলাও ক্ষীণ-দৃষ্টি রায়বাহাদুরের পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠল। কয়েক মিনিট জোরে পা চালিয়ে যাওয়ার পর রায়বাহাদুরের চোখে পড়ল মুসলমান বস্তির দিক থেকে একজন লোক ছাতা মাথায় দিয়ে আসছে—তার হাতে একটা লণ্ঠন। ম্যাজিস্টেটের কুঠী থেকে শহরে যাওয়ার রাস্তাটা পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব মুখে গিয়েছে, উত্তর দিক থেকে মুসলমান-পাড়ার রাস্তাটা এই রাস্তায় মিশে সোজা শহরের ভিতর চলে গিয়েছে।

রায়বাহাদুর রাস্তার মোড়ে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লোকটিও সেখানে এসে পড়ল। লণ্ঠনের আলোয় রায়-বাহাদুরকে আপাদ মস্তক দেখে নিয়ে লোকটী ছাতা নিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে এল—বৃষ্টি তখন খুব জোরে পড়ছে, আর অন্ধকারও ঘন হয়ে আসছে। রায়বাহাদুর অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করে ছাতার মধ্যে ঢুকে পড়লেন, বৃষ্টিতে ভেজা আর সহ্য করতে পারছিলেন না তিনি। কয়েক মিনিট ছাতার মালিকের সঙ্গে নীরবে হাঁটলেন, লোকটীর ভাব-ভঙ্গি দেখে তিনি আন্দাজ করে নিয়েছিলেন সে নিঃসন্দেহে তাঁকে চেনে। তাঁর ভূতপূর্ব চাপরাশী বাবুর্চিদের বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজন হওয়া অসম্ভব নয়, কারণ এরা সব ওই মুসলমান পাড়া অঞ্চলেরই বাসিন্দা। যাই হোক রায়বাহাদুর এবার তাঁর উপকারী সহচারীর পরিচয় নিতে উৎসুক হলেন। পরিচয় জিজ্ঞাসিত হয়ে লোকটী বললেন, "হুজুর আমায় চিনতে পারেন নি? আমার নাম আব্দুল, কর্ণেল নর্টনের ঘড়ি চুরির কেসে হুজুর আমায় ছ'মাসের সাজা দিয়েছিলেন।" রায়বাহাদুর জবাব শুনে চমকে উঠলেন, সিভিল সার্জন কর্ণেল নর্টনের ঘড়ি চুরির কেস প্রায় ১২।১৪ বছর পর তাঁর মনে পড়ল—মূল আসামীর নাম সত্যিই ছিল আব্দুল। প্রতিশোধ নেবে না ত আব্দুল? চারিদিকে বেশ ভাল করে তাকিয়ে রায়বাহাদুর নিশ্চিন্ত হলেন, তাঁরা শহরের ভেতরে এসে পড়েছেন, প্রতিশোধ নেবার হলে আব্দুল আগেই নিত, অন্ততঃ ৫।৭ মিনিট আগে যখন তাঁরা অন্ধকার জনবিরল পথে হাঁটছিলেন। রায়বাহাদুরকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই বলে চলল আব্দুল "জেল থেকে ফিরে এসে আর ওকাজ কখনও করি নি, একটা পাউরুটীর দোকান করেছি বাজারে, তাতেই দিন চলে যায়।" বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল, দুধারে দোকানগুলির আলোয় পথেও বেশ আলো, আব্দুলের সাহায্য আর প্রয়োজন ছিল না। রায়বাহাদুর মণিব্যাগ খুলতে যাচ্ছিলেন, আব্দুল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বললে "এবার আপনি বাড়ী চলে যান, ঐ আমার দোকান এসে গেছে, সেলাম," আব্দুল তার দোকানে ঢুকে পড়ল। রায়বাহাদুর বেশী কিছু বলার অবসরই পেলেন না, শুধু বল্লেন "সেলাম ভাই আব্দুল," তারপর বাড়ীর দিকে এগিয়ে চললেন—তিনি আজকার সন্ধ্যার এই অপ্রত্যাশিত বন্ধুর কথা ভাবতে ভাবতে।

দেশের কথা

কলিকাতায় বাসগৃহ সমস্যা—

কলিকাতায় বাসগৃহ সমস্যা সমাধানের জন্য কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট বহু নূতন কম-ভাড়ার বাড়ী নির্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছেন—ভারত গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে অর্থ সাহায্য করিতেছেন। ইটালী ক্রিষ্টোফর রোড এলাকায় যে বাড়ী নির্মিত হইয়াছে তাহাতে ১০৪টি পরিবার স্বতন্ত্রভাবে বাস করিবে। বেলিয়াঘাটা মেন রোডের পূর্ব প্রান্তে ৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে যে বাড়ী হইবে তাহাতে ৫৫৬টি পরিবার বাস করিবে। যেখানে সিংহীবাগান বস্তী ছিল, সেই স্থানে মদন চাটার্জী রোডে ১৩২টি পরিবারের জন্য গৃহ নির্মিত হইতেছে—প্রত্যেক পরিবার ২টি ঘর পাইবে—ব্যয় হইবে ১৫ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। হরিনাথ দে রোডেও ৯ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা ব্যয়ে বহু গৃহ নির্মিত হইতেছে। এই সকল গৃহ নির্মিত হইলে বহু লোক কম ভাড়ায় বাড়ী পাইবে বটে, কিন্তু গৃহগুলি সহরের বাহিরে নির্মিত হইলে আলো, বাতাস, জল প্রভৃতি লোক বেশী পাইত। কলিকাতায় এত অধিক লোক বাস করে যে পথে পদব্রজে যাওয়াই অনেক সময় কষ্টকর হয়। তাহার উপর অধিবাসীর সংখ্যা আরও বাড়িলে সমস্যা আরও সঙ্গীণ হইবে। পরিবাহন ব্যবস্থার দিন দিন উন্নতি সাধিত হইতেছে—লোক বাসে বা ট্রেণে বহু দূর হইতে কলিকাতায় আসিয়া কাজ করিয়া যাইতে পারে। তাহাদের পরিবারবর্গ সহরের বাহিরে থাকিলে সাংসারিক ব্যয় অনেক কমিয়া যায়। আমরা এ বিষয়ে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের কর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কলিকাতায় আরও বহুসংখ্যক পার্ক ও ছোট খেলার মাঠের প্রয়োজন। মদন চ্যাটার্জি লেন, হরিনাথ দে রোড, ক্রিষ্টোফর রোড প্রভৃতি অঞ্চলে নূতন পার্ক ও খেলার মাঠ করিলে বর্তমান অধিবাসীরা একটু বেশী আলো ও বাতাস পাইত। নূতন বড় বড় বাড়ী করিয়া লোককে হয় ত বাসের স্থান দেওয়া সম্ভব, কিন্তু ফ্ল্যাট বাড়ীতে লোক আলো ও বাতাস পায় না। দিনের বেলায় বিজলী আলো জ্বালিতে হয় ও সম্ভব হইলে লোক বিজলী পাখা ব্যবহার করে। তাহাতে স্বাস্থ্য ভাল না হইয়া আরও খারাপ হয়. ছোট ছেলেমেয়েদের খেলার স্থান সমস্যা, বিদ্যালয় সমস্যা প্রভৃতিও উত্তর কলিকাতার লোককে সর্বদা বিব্রত করিতেছে। এই সকল কারণে সহরের আয়তন বাড়াইয়া চারিদিকে ২৫ বর্গ মাইল পর্য্যন্ত স্থানে নূতন গৃহ নির্মিত হইলে লোকের বহু সমস্যার সমাধান হইবে। আমরা সেজন্য সহরে নূতন ফ্ল্যাটবাড়ী নির্মাণের প্রতিবাদ করিতেছি। সহর হইতে লোক সরাইবার ব্যবস্থা না হইলে জল-সমস্যা, ড্রেণ সমস্যা প্রভৃতির মত সত্বর আমাদের আরও বহু সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। সেজন্য পূর্ব হইতে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

কলিকাতায় ভেজাল নিবারণ—

গত প্রায় দুই-মাসকাল কলিকাতা কর্পোরেশনের খাদ্য-পরিদর্শকগণের সহযোগে কলিকাতা পুলিসের এনফোর্সমেণ্ট বিভাগ সহরে বহু ভেজাল খাদ্য ও ঔষধের দোকানে হানা দিয়া বহু লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে ও বহু জিনিষ আটক করিয়াছে। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আজ মানুষ এমন ভাবে পশুর পর্য্যায়ে নামিয়াছে যে তাহারা মানুষের সঙ্কটকালের নিদানস্বরূপ ঔষধসমূহও জাল করিতেছে। বড় ডাক্তার আসিয়া রোগী দেখিয়া ঔষধ নির্দেশ করিলেন, বাজার হইতে প্রচুর অর্থ ব্যয়ে ঔষধ সংগ্রহ করা হইল—কিন্তু ঔষধ প্রয়োগে রোগীর রোগ কমিল না। বহু ক্ষেত্রে এইরূপ অবস্থা হওয়ায় অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে বাজারে জাল ঔষধ বিক্রীত হওয়াই ইহার কারণ। জাল বা নকল ঔষধের বহু কারখানা ধরা পড়িয়াছে, বহু বড় বড় ঔষধের দোকানে নকল ঔষধ পাওয়া গিয়াছে—সেজন্য কলিকাতার এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের সুযোগ্য পুলিসকর্মী শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ডেপুটী কমিশনারের নেতৃত্বে এ বিভাগ কাজ করিয়া বহু জাল ঔষধ বাহির করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নকল ঔষধের প্রস্তুতকারকগণ বা বিক্রেতাগণকে কঠোর শাস্তিদানের এখনও কোন ব্যবস্থা হয় নাই। শুনা যায়, সেজন্য নূতন আইন তৈয়ারী না হইলে অপরাধীদের কঠোর শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা হইবে না। ঔষধ ছাড়াও খাদ্যে ভেজাল কলিকাতা সহরে কম নহে। চালের সহিত যেমন কাঁকর মিশানো হয়, তেমনই চিনির সহিত বালী মেশানো হইয়া থাকে। তেল, ঘি, দালদা প্রভৃতির সহিত নানাপ্রকার অখাদ্য মিশাইয়া বাজারে বিক্রয় করা হয় ও তাহা খাইয়া লোক পেটের অসুখে ভুগিয়া থাকে। এমন কি মসলার সহিত—যেমন গোলমরিচ, খয়ের প্রভৃতির মধ্যে নানাপ্রকার ভেজাল মেশানো হইতেছে। গুঁড়া দুধের সহিত বা গুঁড়া চায়ের সহিত অখাদ্য মিশানো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়াছে। নানাপ্রকার পেটেণ্ট ঔষধের ট্যাবলেট বা বড়ি লোক আজকাল সদাসর্বদা ব্যবহার করিয়া থাকে, সেগুলি যে নকল, ইহাও ধরা পড়িয়াছে। বহু নকল এম-বি ট্যাবলেট, এনাসিন ট্যাবলেট প্রভৃতির কারখানা আবিষ্কৃত হইয়াছে। মানুষ অর্থার্জনের জন্য প্রতিবেশীকে হত্যা করার এই যে উপায় অবলম্বন করিয়াছে, ইহা কঠোরতার সহিত দমন করা না হইলে জাতি হিসাবে আমরা মরিয়া যাইব। যাহারা এই সব কাজ করে, তাহারা বিদেশী নহে—এদেশের লোক—আমাদেরই আত্মীয় বা স্বজন। সমাজ যদি কঠোরতার সহিত এই সকল সমাজ-বিরোধী কার্য্যের নিন্দা না করে বা অপরাধীকে

ধরাইয়া না দেয়, তবে শুধু সরকারী ব্যবস্থায় বা চেষ্টায় ইহার প্রতীকার সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না।

কলিকাতায় কলেজ সমস্যা—

এ বৎসর স্কুল-ফাইনাল এবং আই-এ ও আই-এসসি পরীক্ষায় পাশের শতকরা হার বর্দ্ধিত হওয়ায় ও পশ্চিমবঙ্গে ছাত্রের সংখ্যা অধিক হওয়ায় কলিকাতার কলেজসমূহে প্রথম বা দ্বিতীয় বিভাগে পাশ-করা ছাত্রছাত্রী ছাড়া অন্য ছাত্রছাত্রীরা কলেজে ভর্তি হইবার সুযোগ লাভ করে নাই। গত কয় বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে হাই স্কুলের সংখ্যা যে হারে বাড়িয়াছে, সে হারে কলেজের সংখ্যা বাড়ে নাই। কৃষ্ণনগরে একটি মাত্র কলেজ—সেখানেও এত ছাত্র ভর্তির জন্য ভিড় করিয়াছিল যে তাহাদের মধ্যে অনেককে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছে। অথচ রাণাঘাট, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, বগুড়া প্রভৃতি স্থানে নূতন কলেজ স্থাপিত হইয়াছে—কিন্তু সে সব স্থানে উপযুক্তসংখ্যক ছাত্রছাত্রী পাওয়া যায় নাই। ছাত্রছাত্রী কলিকাতার বাহিরে কোন কলেজে যাইতে চাহে না—সেজন্য মফঃস্বলে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলেও কলিকাতায় ভিড় কমিতেছে না। ২৪পরগণায় বারাকপুর, নৈহাটী, বনগাঁ, বসিরহাট, টাকী, বারাসত, ডায়মণ্ডহারবার, দমদম প্রভৃতি স্থানে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলেও সে সব কলেজে উপযুক্ত সংখ্যায় ছাত্রছাত্রী পাওয়া যায় না। সুদূর মফঃস্বলের কথা না বলাই ভাল। তমলুক, কাঁথি, মহিষাদল, বিষ্ণুপুর, হেতমপুর, কালনা, কাটোয়া, আসানসোল প্রভৃতি বহু স্থানে নূতন কলেজ হইয়াছে—সেগুলির প্রতি এখনও ছাত্র আকৃষ্ট হয় না কেন, কর্ত্তৃপক্ষকে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। যে সংখ্যায় বালিকাদের হাইস্কুল বাড়িয়াছে, সে সংখ্যায় কলেজ (শুধু বালিকাদের জন্য) হয় নাই। সে জন্য এ বৎসর বহু বালিকা উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিতা থাকিবে। স্কুল ফাইনাল পাশ করার পর বহু ছাত্র কলেজে না পড়িয়া কোন টেকনিকাল স্কুলে ভর্ত্তি হইতে চায়—কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে টেকনিকাল স্কুলের সংখ্যা শুধু কম নহে—যে কয়টি স্কুল হইয়াছে, তাহাতে ছাত্র-সংখ্যাও নির্দ্দিষ্ট আছে—কাজেই অতি অল্পসংখ্যক ছাত্রই টেকনিকাল স্কুলে প্রবেশের সুযোগ লাভ করে। প্রতি জিলায় জেলাস্কুল বোর্ড প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা হইয়াছে, ফলে বহু-ছাত্রছাত্রী প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পাইতেছে—সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জন্য উচ্চ বিদ্যালয়ও খোলা হইতেছে। শুনা গিয়াছিল, সরকার বহু-সংখ্যক উচ্চ বিদ্যালয়ের সহিত টেকনিকাল বিভাগ খুলিবেন—কিন্তু মাত্র ৬টি হাই স্কুল নাকি সে সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। এ অবস্থায় দেশের শিক্ষার ক্ষেত্র প্রসারিত না হইলে দেশের যুবকগণের ভবিষ্যৎ কি হইবে, তাহা কল্পনাও করা যায় না। পশ্চিমবঙ্গে উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৫ শত হইয়াছে—তাহাদের অন্ততঃ ৫০টিতেও যাহাতে আগামী বৎসর হইতে টেকনিকাল শিক্ষা প্রদত্ত হয়, তাহার সত্বর ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। মফঃস্বলের মেডিকেল স্কুলগুলি তুলিয়া দেওয়ায় মধ্যবিত্ত জনগণের দুঃখের শেষ নাই। কলিকাতায় ৪টি মেডিকেল কলেজ চলে—কলিকাতায় থাকিয়া ডাক্তারী পড়া এত অধিক ব্যয়সাধ্য যে অনেকেই সে বিষয়ে অগ্রসর হইতে পারেন না। বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি মফঃস্বল সহরে মেডিকেল স্কুল থাকিলে ছাত্ররা কম খরচে ডাক্তারী-শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে। সভ্যতাকে সহর-কেন্দ্রিক না রাখিয়া যত অধিক গ্রামকেন্দ্রিক করা যায়, আমাদের সকলকে এখন সে বিষয়ে মনোযোগী হইতে হইবে। সে জন্য ইটাচুনার (হুগলী) মত গ্রামে যত অধিক সংখ্যায় টেকনিকাল শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়, ততই দেশবাসীর পক্ষে আনন্দের কথা। মফঃস্বলের কলেজগুলিতেও যাহাতে অধিক ছাত্র-ছাত্রী পড়িতে পারে, সে জন্য সুলভ শিক্ষার ব্যবস্থা দ্বারা ছাত্রাবাস নির্মাণ করিয়া তাহাদের আকৃষ্ট করা প্রয়োজন। অশিক্ষা ও কুশিক্ষা আমাদের পশুত্বে নামাইয়া দিতেছে—কাজেই শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে সকলেরই চেষ্টা করা কর্তব্য। যাহাতে আরও সত্বর সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা হয়, সে জন্য আমরা দেশবাসী সকলকে আন্দোলন করিতে অনুরোধ করি।

বেকার সমস্যার সমাধান-চেষ্টা—

শিক্ষিত বেকারদের সমস্যা সমাধানের জন্য ভারত সরকার বহু শিক্ষিত বেকারকে শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন। গত বৎসরে ঐভাবে কয়েক হাজার শিক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছে। এ বৎসর কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট ১৭ হাজার ৬ শত ৪০ জনকে নিযুক্ত করিয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রেরণ করিবেন। পশ্চিমবঙ্গে ৫০৩৫ জন নূতন শিক্ষক নিযুক্ত হইবেন। এই ভাবে একদল লোককে সুবিধা দান করা হইতেছে বটে, কিন্তু ব্যাপকভাবে বেকার সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে এই ব্যবস্থা অত্যন্ত কম। নূতনভাবে কুটীর-শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে না পারিলে বেকার সমস্যার সমাধান হইবে না। কুটীর শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে বিদেশী জিনিষ আমদানী বন্ধ করিতে হইবে ও আমদানী জিনিষের উপর অধিক শুল্ক বসাইয়া দেশীয় শিল্পগুলিকে রক্ষা করিতে হইবে। নচেৎ কুটীর শিল্প বাঁচাইয়া রাখা যাইবে না। আমরা এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

কৃষ্ণনগরে দ্বিজেন্দ্র স্মৃতি উৎসব—

গত ২৪শে জুলাই শনিবার সন্ধ্যায় কৃষ্ণনগরে রামগোপাল টাউন হলে কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বার্ষিক স্মৃতি উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। কৃষ্ণনগরে কবি দ্বিজেন্দ্রলালের পৈতৃক বাসভূমি। সে গৃহ আজ ভূমিসাৎ হইলেও প্রাতঃকালে কৃষ্ণনগরবাসীরা সেই স্থানে সমবেত হইয়া কবিবরের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বিকালে জনসভায় শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সুকবি শ্রীবাণী রায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এবং সুলেখিকা শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। কবিবরের বহু সঙ্গীত ও কয়েকখানি নাটকের কয়েকটি দৃশ্য লইয়া কৃষ্ণনগরবাসী সুকবি শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ যে 'দ্বিজেন্দ্র আলেখ্য' রচনা করিয়াছিলেন, সভাশেষে দুই ঘণ্টা কাল তাহা মঞ্চস্থ করা হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান সর্বজনপরিচিত—সেগুলি স্থানীয় শিল্পীরা

গান করেন ; মধ্যে মধ্যে কয়েকটি জাতীয় সঙ্গীত ও গীত হয়—স্থানীয় তরুণের দল নীহাররঞ্জনের প্রযোজনায় ও পরিচালনায় দ্বিজেন্দ্রলালের লেখাসমূহের নির্বাচিত অংশগুলি আবৃত্তি ও অভিনয় করেন—সঙ্গে বাদ্য ও নৃত্যাদির ব্যবস্থা ছিল। মোটের উপর কবির রচনা দিয়াই কবি-পরিচিতি বেশ মনোজ্ঞ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। শ্রীনির্মল দত্ত, শ্রীসমীরেন্দ্র সিংহরায় প্রভৃতির চেষ্টায় উৎসবটি সর্বাঙ্গসুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। উদ্বোধন ভাষণ, সভাপতির ভাষণ ও প্রধান অতিথির লিখিত প্রবন্ধের দ্বারাও দ্বিজেন্দ্রলালের কথাই আলোচিত হইয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের কথা আজ লোক প্রায় ভুলিতে বসিয়াছে—এ সময়ে কৃষ্ণনগরের অধিবাসীরা প্রতি বৎসর উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া দেশবাসীর উপকারই করিয়া থাকেন। কৃষ্ণনগর বাংলার অন্যতম সংস্কৃতি-কেন্দ্র ; কৃষ্ণনগরের অধিবাসীদের উদ্যোগে ও চেষ্টায় তথায় দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতি রক্ষার কোন স্থায়ী ব্যবস্থা হইলে তাহা শোভন হইবে।

ডাক্তার ঘোষের নূতন পরিকল্পনা—

খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাবিদ্ ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়া শিক্ষা ব্যবস্থা তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাকে নূতন ছাঁচে ঢালিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। তিনি—কলিকাতার আণ্ডার-গ্রাজুয়েট ছাত্র—তাহারা কি ভাবে বাস করে ও কাজ করে—এই বিষয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া সে সম্বন্ধে জনমত সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে তিনি যে সকল প্রস্তাব পাইয়াছিলেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়া ও নিজে চিন্তা করিয়া একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন। কল্যাণীতে ৬ শত বিঘা জমী লইয়া তথায় তিনি একটি নূতন শিক্ষা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন। ঐ পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে ২ কোটি টাকা ব্যয় হইবে—কল্যাণীতে এক হাজার অনার্স ছাত্রকে ৩ বৎসর কালের জন্য নির্দিষ্ট বি-এ ও বি-এস্-সি ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত করা হইবে। তাহার পর তাহারা ইচ্ছা করিলে তথায় আরও এক বৎসর থাকিয়া এম্-এ ও এম্-এস্-সি পরীক্ষা দিতে পারিবেন। মফঃস্বলের ছাত্ররা তথায় বাস করিয়া শিক্ষালাভ করিবেন। পরিকল্পনাটি ডক্টর ঘোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যদের মধ্যে প্রচার করিয়া সকলের অভিমত সংগ্রহ করিতেছেন। কলিকাতা সহরে ছাত্রগণকে যে পরিস্থিতি ও আবহাওয়ার মধ্যে বাস করিয়া শিক্ষালাভ করিতে হয় তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। 'ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ'—এই ঋষিবাক্য মানিয়া লইয়া যদি ছাত্রগণকে তপস্যার মত অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিতে হয়, তবে সহর হইতে দূরে কোন নির্জন স্থানে ছাত্র ও অধ্যাপকগণ যদি একত্র বাস করার সুযোগ লাভ করেন, তাহা হইলে ছাত্ররা প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হইবেন এবং যে শিক্ষা লাভ করিবেন, তাহা জীবনে প্রয়োগ করিয়া জীবনকে সুপরিচালিত করিতে পারিবেন। ডক্টর ঘোষের পরিকল্পনা হয়ত সর্বাঙ্গসুন্দর না হইয়া ত্রুটিপূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু তিনি সাহস করিয়া যে নূতন ব্যবস্থার কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, আমাদের বিশ্বাস, ছাত্রগণও উপকৃত হইবে, দেশও নূতন আদর্শের মানুষ পাইয়া লাভবান হইবে। আমরা ডক্টর ঘোষের পরিকল্পনা সমর্থন করি এবং সত্বর যাহাতে উহা কার্য্যে পরিণত হয়, সেজন্য সকলকে সচেষ্ট হইতে ও সাহায্য করিতে অনুরোধ করি। আজ শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন হইয়াছে—ডক্টর ঘোষ সে বিষয়ে নূতন কথা প্রকাশ করিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। আমরা মনে করি, তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার নিয়োগ করা নিষ্ফল হয় নাই !

পশ্চিমবঙ্গ—১৩৬১—

এতদিন পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহাদের কার্য্যের প্রচারের উপযুক্ত ব্যবস্থায় মনোযোগী হইয়াছেন দেখিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। পশ্চিমবঙ্গ ১৩৬১ নাম দিয়া তাঁহারা দেড় শতাধিক পৃষ্ঠার এক সচিত্র বিবরণ পুস্তক প্রকাশ করিয়া তাহা মাত্র ৪ আনায় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহাতে শুধু সরকারী কার্য্যের বিবরণ নাই—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের রচনা দিয়া তাহার আরম্ভ এবং অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'বাংলার সংস্কৃতি' প্রবন্ধই তাহার মূল ভিত্তি। বাঙ্গালীর কথা, কল্যাণের পথে, উন্নয়নের কাজে, সমস্যা ও সমাধান, গঙ্গাবাঁধ পরিকল্পনা প্রভৃতি সুলিখিত প্রবন্ধগুলি আজিকার বাংলার প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির পাঠ করা কর্ত্তব্য। আমরা সাধারণতঃ না জানিয়া সরকারী কার্য্যের সমালোচনা করিয়া থাকি। এই ৪ আনা মূল্যের পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে লোকের বহু ভ্রান্ত ধারণা চলিয়া যাইবে। যাহারা বইখানি সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহাদের ব্যবস্থাও অভিনন্দন যোগ্য। বইখানি সরস ও সুখপাঠ্য করিবার চেষ্টার ত্রুটি করা হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান—যেখানেই প্রয়োজন হইয়াছে, ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাহা ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীকালিদাস রায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত, নজরুল ইসলাম, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, গোপাল ভৌমিক প্রভৃতির কবিতা উদ্ধৃত করিয়া সকল রচনাকেই সরস করা হইয়াছে। বৃহত্তর কলিকাতার জলনিকাশ, পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, ময়ুরাক্ষী, শৃঙ্খলিত দামোদর, চিত্তরঞ্জন, সমাজ-উন্নয়ন, জন শিক্ষার অগ্রগতি, শ্রমিক কল্যাণ, কুটীর-শিল্প, পথ-উন্নয়ন প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে আমাদের স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রপরিচালকগণ কি ভাবে কাজ করিতেছেন, তাহার পূর্ণ বিবরণ এই গ্রন্থখানিতে পাওয়া যায়। পাতায় পাতায় ছবি দিয়া ইহাকে আরও হৃদয়গ্রাহী করার চেষ্টা করা হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গে এই গ্রন্থ কয়েক লক্ষ প্রচারিত হইবে এবং তাহার ফলে দেশবাসীর মন হইতে বহু ভ্রান্ত ধারণা চলিয়া যাইবে। ফলে লোকের মনে আশার সঞ্চার হইবে ও তাহা লোককে কর্মে প্রেরণা দান করিবে।

মহাকবি গিরিশচন্দ্র স্মৃতিপূজা—

গত ১লা আগষ্ট রবিবার বিকালে রামকৃষ্ণ মহামণ্ডলের উদ্যোগে দক্ষিণেশ্বরে আন্তর্জাতিক অতিথিশালা প্রাঙ্গণে এক বিরাট জনসভার

মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষের বার্ষিক স্মৃতিপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। নটসূর্য্য শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী সভাপতির ও শ্রীমতী নীরদাসুন্দরী (খ্যাতিমতী অভিনেত্রী) প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। মহামণ্ডলের সভাপতি শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এক লিখিত ভাষণে গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা বিশ্লেষণ করিয়া সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইলে শ্রীহেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত মহাশয় এক সুদীর্ঘ ভাষণে গিরিশচন্দ্রের কথা বিবৃত করেন। মহামণ্ডলের পক্ষ হইতে শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ১২জন খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রীকে মাল্যদান করিয়া সম্মানিত করেন—সে দলে ইন্দুবালা, রাণীবালা, শান্তি গুপ্তা, নন্দরাণী, রেখা দেবী, আশা দেবী, আভা দেবী, দীপ্তি, মলিনা, দুনিয়াবালা, ও ছোট রাণীবালা ছিলেন। সভাপতি অহীন্দ্রবাবু এক সুচিন্তিত ও মনোজ্ঞ ভাষণে গিরিশচন্দ্রের অপূর্ব জীবন-কথা, নাট্য প্রতিভা ও নাটকসমূহের কথা বিবৃত করিয়াছিলেন। অহীন্দ্রবাবুর পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের গভীরতা তাঁহার বক্তৃতায় প্রকাশ পাইয়াছিল। মহামণ্ডলের কর্মীরা গিরিশ-প্রতিভার এইরূপ আলোচনার ব্যবস্থা করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। বিশেষ করিয়া অনুষ্ঠানে বহুসংখ্যক অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সমাগম এবং তাঁহাদের আবৃত্তি ও সঙ্গীত বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

জনাব ফজলল হকের রাজনীতি ত্যাগ—

জনাব এ-কে-ফজলল হক পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচনে তাঁহার দলকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তথায় প্রধান মন্ত্রী হইয়া মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা কেন্দ্রীয় পাকিস্তানী মন্ত্রী সভার অনুমোদিত না হওয়ায় সে মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় ও বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানে গভর্ণরী শাসন চলিতেছে। সম্প্রতি পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী জনাব মহম্মদ আলি বলিয়াছেন—পূর্ব-পাকিস্তানে এখন ঐ গভর্ণরী শাসনই চলিবে। জনাব ফজলল হককে এতদিনে তাঁহার কৃত কার্য্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইয়াছে। ২৩শে জুলাই তিনি এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন—"অসতর্ক মুহূর্তে উচ্ছ্বাসবশে আমি যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহা আমি বলিতে চাই নাই। পাকিস্তানের প্রতি কোন অশুভ বা ক্ষতির মনোভাব আমি পোষণ করি না ইত্যাদি।" বৃদ্ধ ফজলল হককে গ্রেপ্তার ও আটক করা হইয়াছিল—তাহার পর কারাদণ্ডের ভয়ও দেখান হইয়াছে। কাজেই ৮২ বৎসরের বৃদ্ধের পক্ষে এই ভাবে ক্ষমা ভিক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তিনি রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা ফজলল হক সাহেবের এই অবস্থার জন্য দায়ী তাঁহারা যেন তাঁহাদের ভবিষ্যতের কথা স্মরণ করিয়া সতর্ক থাকেন!

পশ্চিমবঙ্গের নূতন পরিকল্পনা—

পশ্চিমবঙ্গের জন্য পরিকল্পনা কমিশন এমন কতকগুলি নূতন ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়াছেন, যাহার দরুণ বরাদ্দ অর্থের দ্বিগুণ পর্য্যন্ত ব্যয় করা চলিবে। সেজন্য কেন্দ্রীয় তহবিল হইতে পশ্চিমবঙ্গকে ৪ কোটি টাকা ঋণ সংগ্রহের কথা বলা হইয়াছে। বিষয়গুলি এইরূপ—(১) ময়ূরাক্ষী জলাধার নির্মাণ পরিকল্পনা—৩ কোটি টাকা (২) পল্লী অঞ্চলে চিকিৎসালয় স্থাপন—১ কোটি টাকা (৩) সরকারী পতিত জমীতে বৃক্ষরোপণ—১৫ লক্ষ টাকা (৪) পল্লী অঞ্চলে জল সরবরাহ—২০ লক্ষ টাকা (৫) পৌর এলাকায় জল সরবরাহ ও ময়লা জল নিষ্কাসন—১২ লক্ষ টাকা (৬) সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্তদের জন্য হাসপাতাল স্থাপন—১০ লক্ষ টাকা (৭) বর্তমান হাসপাতালগুলির উন্নয়ন—১৮ লক্ষ টাকা। স্বাধীন সরকার দেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করিবার জন্য এইরূপ বহুপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন—কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, কোন কাজই সাফল্যমণ্ডিত হইয়া দেশবাসীর কাজে লাগে না। সর্বত্রই সরকারী কার্য্যে এত অধিক অর্থ ব্যয় হয়, যে সাধারণ মানুষ তাহা কল্পনাই করিতে পারে না। এই সকল ব্যয় যদি নিয়ন্ত্রিত না হয়, তবে দেশবাসীর দুঃখ দিন দিন বাড়িয়াই যাইবে। অবশ্য এ বিষয়ে দায়িত্ব শুধু সরকারের নহে—দেশবাসীরও দায়িত্ব জ্ঞানের অভাব দেখা যায়। আমরা দেশবাসী সকলকে এ বিষয়ে অবহিত হইতে অনুরোধ করি।

দুর্নীতি দমনে বাধা—

ঘুস লইবার অভিযোগে আসামী ধরিবার সময় কলিকাতা কর্পোরেশনের দুর্নীতি দমন বিভাগের ২জন কর্মচারী সম্প্রতি জনৈক কর্পোরেশান কর্মচারী কর্তৃক গুরুতরভাবে প্রহৃত হন। প্রহারের ফলে একজনের হাত ভাঙ্গিয়া যায় ও একজনের মাথায় আঘাত লাগে। তাহাদের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিতে হয়। সংবাদটি দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এইরূপ ঘটনার সময় যদি জনসাধারণের সাহায্য পাওয়া না যায়, তবে দুর্নীতি দমন অসম্ভব হইয়া পড়িবে। আমরা সাধারণতঃ লোককে 'ঘুসখোর' বলি—কিন্তু প্রয়োজন হইলে নিজেরাই ঘুস দিতে চাই। যতদিন লোক ঘুস দেওয়া বন্ধ না করে—অর্থাৎ পরোক্ষভাবে ঘুস দেওয়ার প্রথা সমর্থন করিতে বিরক্ত না হয়, ততদিন যতই ঘুস দেওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন করা যাউক, ঘুস-দেওয়া বন্ধ হইবে না। কর্পোরেশন কর্মচারীটিকে দুর্নীতির জন্য যখন গ্রেপ্তার করিতে যাওয়া হয়, তখন নিশ্চয়ই পুলিস জনসাধারণের নিকট হইতে সাহায্য লাভ করে নাই—তাহা পাইলে কখনই পুলিসকে নিগ্রহ ভোগ করিতে হইত না। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই—পুলিস কোন দুর্নীতিপরায়ণ লোকের খোঁজ করিতে গেলে কেহ তাহার খবর বলে না। একদল দুর্নীতিপরায়ণ লোকদিগকে ভয় করে—আর একদল ঝামেলার মধ্যে যাইতে চাহে না বলিয়া সরিয়া দাঁড়ায়। কোন গ্রামে গিয়া কোন সরকারী কর্মচারীর দুর্নীতির কথা শুনিয়া যখন অভিযোগটি লিখিয়া দিতে বলা হয়, তখন একে একে সকল অভিযোগকারীই সরিয়া পড়ে। আমরা এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। একদিকে যেমন আমাদের ঘুস দেওয়া বন্ধ করিতে হইবে, অন্যদিকে তেমনই—যখন ঘুসের কথা জানা যাইবে, তখনই তাহা কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া দিতে হইবে। দেশ-শাসন কার্য্যে জনগণের সাহায্য ও সহানুভূতি না পাইলে দুর্নীতি

দমন সম্ভব হইবে না। দেশ স্বাধীন হইয়াছে—সরকারী কর্মচারীরা আমাদেরই নিজের লোক—আত্মীয় স্বজন। যদি তাহাদের আমরা দোষ দেখাইয়া না দিই বা গুণবর্ণনা না করি, তবে শাসন ব্যবস্থা অচল হইয়া যাইবে। আমরা বার বার সকলকে কথাটি চিন্তা করিয়া দেখিতে বলি। সকলের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত এই দারুণ অবস্থার পরিবর্তন সাধন সম্ভব হইবে না।

জনতা কর্তৃক পুলিস নিহত—

২০শে জুলাই আসাম নওগাঁ হইতে খবর আসিয়াছে—সহর হইতে ৪০ মাইল দূরে এক গ্রামে পুলিস হাজতে একটি বালকের মৃত্যু হইলে জনতা ফাঁড়ি আক্রমণ করে ও তরবারি দ্বারা এক পুলিস কনেষ্টবলকে হত্যা করে। এই ঘটনায় অবস্থা চরম সীমায় পৌছিয়াছে। আমরা সর্বদাই দেখিতে পাই—স্বাধীনতা লাভের পর মানুষের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা এত বাড়িয়াছে যে—কোথায় পুলিস কোন গোলমাল থামাইতে যাইলে জনতা পুলিসকেই আক্রমণ করিয়া থাকে। সকল স্থানে পুলিস যে নির্দোষ থাকে, এমন কথা যেমন বলিব না, তেমনই পুলিস শান্তিরক্ষক হিসাবে তাহার কর্তব্য সম্পাদন করিতে যাইলে—যদি সর্বদা তাহাকে সন্দেহ করা হয় এবং তাহার কার্য্যের বিচার করিয়া শাস্তি দিবার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে কখনই দেশে শান্তিরক্ষা করা সম্ভব হইবে না। পুলিসকে আমরা শান্তিরক্ষার জন্য নিযুক্ত করি ও তাহাকে কর্তব্য অর্পণ করি! অবশ্য পুলিসের মধ্যে হয়ত দুর্নীতি বাড়িয়াছে—সমাজের মধ্য হইতে যতদিন না দুর্নীতি দূর করা যাইবে, ততদিন শুধু পুলিসকে দোষ দিলে চলিবে না। নওগাঁর অধিবাসীরা যদি বিচারের ও শাস্তি প্রদানের ভার নিজেদের হাতে না লইয়া ঘটনাটি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানাইবার ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে হয়ত বিচারের ফলে হত্যার অভিযোগে ঐ পুলিস কনেষ্টবলেরই ফাঁসির হুকুম হইত। কিন্তু আমরা সকলে এত অধিক অসহিষ্ণু হইয়াছি যে সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত থাকি না। পথে ঘাটে লরী বা বাস লোক চাপা দিলে চালককে ধরিয়া প্রথমেই উত্তম মধ্যম দেওয়া হয়—কাহার দোষে লোক চাপা পড়িল, তাহা বিচার করিয়া দেখা হয় না। কলিকাতা সহরে বা সহরতলীতে আমরা পথ চলিবার সময় আইন মানি না—যথেচ্ছভাবে যাতায়াত করাই আমাদের স্বভাব—ভুলিয়া যাই, স্বাধীনতার অর্থ উচ্ছৃঙ্খলতা নহে—কাজেই উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য বহু লোক পথে বিপন্ন হয়। কিন্তু পথে কেহ বিপন্ন হইলে পথের অন্যান্য লোক পথচারীর দোষ দেখে না—গাড়ী চালকের উপর সকল দোষ চাপাইয়া তাহাকে প্রহার করিতে অগ্রসর হয়। এই মনোভাব ত্যাগ করা প্রয়োজন। আইন মানিয়া চলিলে—যেমন পথচারী বিপন্ন হইবে না—তেমনই জনগণ কর্তৃক যান-চালকগণও দণ্ডিত ও লাঞ্ছিত হইবে না। নওগাঁর ব্যাপারটি সত্যই মর্মন্তুদ। কনেষ্টবলটি অপরাধী সাব্যস্ত হইলে তাঁহার মৃত্যুদণ্ডে কেহই আপত্তি করিত না।

খেলাধূলা ও কংগ্রেস—

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর আজমীর অধিবেশনে খেলাধূলা সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া নেতারা দেশের তরুণগণের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। প্রস্তাবে বলা হইয়াছে—জাতির স্বাস্থ্য ও দৈহিক গঠনের জন্য খেলাধূলায় উৎসাহ দান গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য। খেলাধূলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া দরকার এবং খেলাধূলা সম্বন্ধে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা প্রয়োজন। কমিটী দুঃখের সহিত জানাইয়াছেন—ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানসমূহ যথোপযুক্ত পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় না এবং তাহার ফলে নানাপ্রকার বিরোধ উপস্থিত হয় ও সে বিরোধ আদালত পর্য্যন্ত গড়াইয়া থাকে। গভর্ণমেণ্ট যেন ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দেন, যদি সরকারের মতে সন্তোষজনক পদ্ধতিতে ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান পরিচালিত না হয়, তবে সরকার তাহাদের কোন প্রকার সাহায্য করিবেন না। এই প্রস্তাবটি খুবই সময়োপযোগী হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। বিদ্যালয়সমূহে যেমন খেলাধূলার ব্যবস্থা অধিক প্রয়োজন, তেমনই বিদ্যালয়ের বাহিরে যে সকল ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলি যাহাতে ভাল করিয়া চলে, তাহাও দেখা প্রয়োজন। গভর্ণমেণ্ট অবশ্য ক্রমে ক্রমে দেশের সকল স্তরের তরুণগণকে সামরিক বিদ্যা শিক্ষাদানের ব্যবস্থায় অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু তাহা করিবার পূর্বে প্রতিষ্ঠানগুলি সুনিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন। মফস্বলের সর্বত্র খেলার মাঠে বিবাদ ও মারামারি হইতে দেখিয়া আমরা সত্যই ব্যথিত হই। ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান মাত্রেরই সরকারী অনুমোদন থাকা প্রয়োজন এবং অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানে বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইলে সরকার পক্ষই তাহা সত্বর মিটাইয়া দিতে সমর্থন হইবেন। এখনও কর্পোরেশন বা মফঃস্বল মিউনিসিপালিটীগুলি ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য দান করিয়া থাকেন—ভবিষ্যতে ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান সরকারের অনুমোদন লাভ করিলে তাহাদের পক্ষেও সরকারী বা বেসরকারী সাহায্য লাভ করা কতকটা সহজ হইবে। ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ ভালভাবে শিক্ষালাভ করিলে তাহারাই দেশের মধ্যে শান্তিরক্ষার ভার গ্রহণ করিবে এবং ফলতঃ তাহারাই দেশকে সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিয়া সুপথে চালিত করিবে। আমাদের বিশ্বাস, কংগ্রেসের এই প্রস্তাব সরকারী মহলে প্রচার করিয়া সত্বর তদনুসারে কার্য্য করিবার ভার—উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়কগণ গ্রহণ করিবেন।

উত্তরবঙ্গ বন্যায় ক্ষতি—

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম মন্ত্রী, জলপাইগুড়ি হইতে নির্বাচিত প্রতিনিধি শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের বন্যাপ্লাবিত স্থানসমূহ দেখিয়া আসিয়া যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যেমন ভয়াবহ, তেমনই মর্মন্তুদ। তিনি জানাইয়াছেন—উত্তরবঙ্গে এইরূপ বন্যা কখনও হয় নাই। ব্যাপক অঞ্চল জুড়িয়া প্লাবনের ফলে অসংখ্য নরনারী ও গৃহপালিত পশু নিদারুণ দুর্গতির মধ্যে দিন কাটাইতেছে। জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের বিস্তৃত অঞ্চলে প্লাবনের ফলে প্রায় ৫০ হাজার নরনারী গৃহ-হারা হইয়াছে। প্রায় এক লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। শত শত গবাদি পশু বন্যার জলে ভাসিয়া গিয়াছে। উহাদের কোন খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না। প্রায় ২ লক্ষ মণ শস্য সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়াছে। এক শত বর্গ মাইল পরিমাণ ভূমির উপর বালি জমিয়া গিয়াছে। ফলে আগামী কয়েক

বৎসর এই জমীতে চাষ হইবার কোন আশা নাই। একমাত্র জলপাইগুড়ী জেলায় দুই শত বর্গ মাইল অঞ্চল প্লাবনে ডুবিয়া গিয়াছে। দুর্গত অঞ্চলের পথ-ঘাট ও রেললাইন এখনও ডুবিয়া আছে। যত শীঘ্র সম্ভব, দুর্গত অঞ্চলের রাস্তাঘাট ও রেল লাইন মেরামতের চেষ্টা হইতেছে। খাদ্য, সাহায্য ও ঔষধাদি প্রয়োজনীয় জিনিষ প্রেরণের ব্যবস্থাও হইয়াছে। পূর্বে দামোদরের বন্যায় পশ্চিমবঙ্গ প্রতি বৎসর দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইত—দামোদর নিয়ন্ত্রণের ফলে তাহা বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু তাহার স্থানে তিস্তা প্রভৃতি নদীর বন্যার ফলে উত্তরবঙ্গ বিপন্ন হইতেছে। ঐ সকল পার্বত্য নদী হঠাৎ অতিবৃষ্টির ফলে ভীষণ আকার ধারণ করে ও ফলে বহু স্থান বিপন্ন হইয়া পড়ে। ঐ অঞ্চলে যাহাতে সত্বর নদী নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হয়, সেজন্য কর্তৃপক্ষের সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। পূর্বে এ সকল দুর্গতি হইত না। পথ ও রেল নির্মাণের ফলে প্রাকৃতিক জলপথ ক্রমে বন্ধ হইয়া যাওয়াই এই সকল বন্যার কারণ কি, কর্তৃপক্ষের সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা উচিত। আমরা দুর্গত মানব সমাজের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করি এবং ধনী ব্যক্তিগণকে দুর্গতদের সাহায্য দানে অগ্রসর হইতে অনুরোধ জানাই। সঙ্গে সঙ্গে এমন ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন যেন ভবিষ্যতে আর ঐরূপ দুর্ঘটনা না ঘটে।

কাশ্মীর ভারতের অংশ—

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর আজমীর অধিবেশনে যোগদান করিয়া কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী বকসী গোলাম মহম্মদ গত ২৬শে জুলাই ঘোষণা করেন—কাশ্মীরের ভারত-চুক্তি চূড়ান্ত এবং অপরিবর্তনীয়। বিশ্বের কোন শক্তির সাধ্য নাই যে আমাদের পরস্পরকে যে বন্ধনসূত্র একত্র করিয়া রাখিয়াছে, তাহা ছিন্ন করে। কাশ্মীর গণপরিষদ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান এবং এই প্রতিষ্ঠান ভারতের অনুকূলে স্বীয় চূড়ান্ত রায় দিয়াছে—কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নের অধ্যায় শেষ হইয়া গিয়াছে। ১৯৪৭ সালে কাশ্মীরকে বলপূর্বক চাপিয়া ধরিবার জন্য পাকিস্তানের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে এবং পুনরায় যদি পাকিস্তান কাশ্মীর আক্রমণ করিতে সাহস করে, তাহাকে সেই একই ব্যর্থতার সম্মুখীন হইতে হইবে। কাশ্মীর সম্বন্ধে ইহার পর কোন সমস্যার কথাই নাই। পাকিস্তান যদি এখন কাশ্মীর লইয়া আবার বিরোধ উপস্থিত করে, তবে ভারতের পক্ষে তাহার কর্তব্য স্থির করা আদৌ কষ্টকর হইবে না। ভারত গভর্ণমেণ্ট এখন শক্তিশালী—অথচ এ অবস্থাতেও যখন পাকিস্তান ভারতের প্রতি দুর্ব্যবহার করে, তখন চুপ করিয়া না থাকিয়া ভারতের কঠোরতার সহিত কর্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য। আমাদের বিশ্বাস, ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইলে ভারত পাকিস্তানকে তাহার ঔদ্ধত্যের উত্তর দিতে দ্বিধা বোধ করিবে না।

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—

পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সভাপতি, খ্যাতনামা ভাষাতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় গত ২৪শে জুলাই শনিবার দিল্লী হইতে পশ্চিম আফ্রিকার দেশসমূহ পরিদর্শন করিতে গিয়াছেন। গোল্ড কোষ্ট, নাইজিরিয়া ও পৃথিবীর একমাত্র নিগ্রো প্রজাতান্ত্রিক দেশ লাইবেরিয়ায় অবস্থানকালে তিনি নেতৃবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং ছাত্র ও বিদ্বান ব্যক্তিদের সভায় বক্তৃতা করিবেন। তিনি পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলির ইতিহাস, ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিল্পকলা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করিবেন। ভারতে ফিরিয়া তিনি ভ্রমণ সম্বন্ধে বিবরণ শ্রীজহরলাল নেহরুকে জানাইবেন। ভারতে ফিরিবার পূর্বে তিনি প্যারিস ও কেম্ব্রিজ ঘুরিয়া আসিবেন। ভারতের সংস্কৃতি প্রচারক দূত হিসাবে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের মত উপযুক্ত ব্যক্তি আর নাই। তাঁহার এই ভ্রমণের ফলে, তিনি যে সকল দেশে যাইবেন, সেই সকল দেশের সহিত ভারতের সম্পর্ক মধুরতর হইবে ও নূতন সম্পর্কের ফলে উভয় দেশ উন্নত ও সমৃদ্ধ হইবে। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের এই সম্মান লাভে আমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

সাংবাদিক অধিকার রক্ষা দিবস—

গত বৎসর জুলাই মাসে ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিরোধ আন্দোলনের দুর্য্যোগপূর্ণ দিনে যে সকল সাংবাদিক ও প্রেস-ফটোগ্রাফার পুলিসের বাধাদান উপেক্ষা করিয়াও নিজ কর্তব্য পালন করিতে ময়দানে ও অন্যান্য সভাস্থলে পুলিসী নিপীড়নের সম্মুখীন হইয়াছিল—গত ২২শে জুলাই "সাংবাদিকগণের অধিকার রক্ষা দিবস" উদ্‌যাপনে কলিকাতা ভারত-সভা হলে এক সাংবাদিক সভায় একটি প্রস্তাবে—তাহাদের অভিনন্দিত করা হয়, ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সংঘের সভাপতি শ্রীমনীন্দ্রনারায়ণ রায় ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন। ঐ ঘটনা সম্পর্কিত মুখার্জি কমিশনের রিপোর্টের ফলে সাংবাদিকগণের অধিকার ও স্বার্থ-বিরোধী যে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে সে বিষয়ে আলোচনা করিয়া সভা কমিশনের ঐ রিপোর্ট বাতিল করিবার অনুরোধ রাজ্য সরকারকে জ্ঞাপন করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। সংবাদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার বাধা নিষেধ অপসারণ করিতে এবং সংবাদের উৎসস্থলে সাংবাদিকগণ কর্তৃক বিনা বাধায় সংবাদ সংগ্রহের অধিকার ও সুযোগ সুবিধা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিতে রাজ্য সরকারকে আর একটি অনুরোধ জানাইয়া সভায় প্রস্তাব গ্রহীত হয়। পুলিসী জুলুমের ফলে কলিকাতা সহরে সাংবাদিকগণের মধ্যে এক বিক্ষোভ দেখা যায়—রাজ্য সরকার সে বিষয়ে যে মুখার্জি কমিশন গঠন করেন, সেই মুখার্জি কমিশনের রিপোর্টে সাংবাদিকগণের ন্যায়সঙ্গত দাবী উপেক্ষা করিয়া পুলিসের কার্য্য সমর্থন করা হইয়াছে। সাংবাদিকগণের জীবনে ইহাতে যে দুরপনেয় কলঙ্ক অঙ্কিত হইয়াছে, ঐ রিপোর্ট সরকার বাতিল না করিলে তাহার কথা সাংবাদিকগণ কোন দিন ভুলিতে পারিবেন না। বিষয়টি সকল সাংবাদিকের পক্ষেই অসহনীয় ব্যাপার। এক বৎসরকাল অতীত হইলেও রাজ্য সরকার কলিকাতার সাংবাদিকগণের আইন সঙ্গত মর্য্যাদা ও সম্মান রক্ষার কোন ব্যবস্থা করেন নাই—ইহা সত্যই অতীব লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়। এরূপ অবস্থায় সাংবাদিকগণের পক্ষে সহজভাবে কার্য্য করা

সম্ভব নহে। তাহাদের এই দাবী যদি রক্ষিত না হয়, তাহা হইলে সাংবাদিকগণের এই কলঙ্কিত জীবন লইয়া কাজ করিয়া যাওয়া আমরা অসম্ভব বলিয়া মনে করি। এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

—

বৈদেশিকী

ইন্দোচীনে তত্ত্বাবধায়ক দল—

ভারত, ক্যানাডা ও পোলাণ্ড—এই তিনটি দেশের প্রতিনিধি লইয়া ইন্দোচীন যুদ্ধবিরতি তদারকী কমিশন গঠিত হইয়াছে। গত ১লা আগষ্ট হইতে দিল্লীতে ঐ কমিশনের বৈঠক বসিয়াছে। স্থির হইয়াছে যে তিনটি তদারকী দেশের ১২ জন প্রতিনিধি লইয়া গঠিত একটি কমিশন শীঘ্রই ইন্দোচীনের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে যাইবে—তাহারা ভিয়েৎনাম, কাম্বোডিয়া ও লাওসের অবস্থা দেখিয়া সত্বর নূতন ব্যবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট দাখিল করিবে। ভারত তদারকী কমিশনের সভাপতি বলিয়া একজন ভারতীয় অফিসার ঐ দলের সঙ্গে যাইবে। ক্যানাডার হাই কমিশনার মিঃ এসকট রীড ও ভারতস্থ পোলিস রাষ্ট্রদূত মিঃ জেরজি গুরুজিদসস্কি দিল্লীতে থাকিয়া ও শ্রীজহরলাল নেহরুর সহিত পরামর্শ করিয়া এ বিষয়ে কর্তব্য স্থির করিতেছেন। ইন্দোনেশিয়া ভারতের প্রায় অংশ বিশেষ—কাজেই ভারতের উপর তাহার সমস্যা সমাধানের ভার অর্পিত হওয়ায় বিষয়টি সহৃদয়তার সহিত আলোচিত ও মীমাংসিত হইবে বলিয়া সকলে আশা করেন। মীমাংসার ফলে ইন্দোচীনবাসী প্রবাসী ভারতীয়গণের ও অবস্থার উন্নতির আশা করা যায়। আমরা তদারকী কমিশনের কার্য্যের সাফল্য কামনা করি।

ফরাসীদের ভারত ত্যাগ—

ভারতে যে সকল ফরাসী উপনিবেশ আছে, সেগুলিকে ফরাসীদের হাত হইতে উদ্ধার করার জন্য গত কয়েক বৎসর ধরিয়া স্থানীয় ভারতীয়গণ বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। সে জন্য আন্দোলনকারীদের নানাস্থানে নানাভাবে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছে। সম্প্রতি ফরাসী উপনিবেশসমূহের শাসকগণ স্থির করিয়াছেন, তাঁহারা ১৪ই আগষ্ট ভারত ত্যাগ করিবেন। পণ্ডিচেরী ও কারিকলের ফরাসীরা ঐ সিদ্ধান্তে সম্মত হইয়াছেন। ভারত কর্তৃপক্ষের সহিত ফরাসী কর্তৃপক্ষের আলোচনার ফলেই এই ব্যবস্থা সম্ভব হইয়াছে। বৃটীশ ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর ভারতস্থ ছোট ছোট বিদেশী এলাকাগুলিকেও বিদেশী শাসন হইতে মুক্ত করার চেষ্টা চলিতেছিল। বর্তমানে সে চেষ্টা সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া সকলেই শান্তি অনুভব করিবেন।

সুয়েজ খাল হইতে সৈন্য অপসরণ—

বৃটেনের সহিত মিশরের নূতন চুক্তির ফলে স্থির হইয়াছে, আগামী সেপ্টেম্বর মাস হইতে বৃটেন সুয়েজ খাল অঞ্চল হইতে বৃটীশ সেনা ও তাহাদের পরিবারবর্গকে সরাইয়া লইয়া যাইবে। মোট ৪০ হাজার লোককে ইংলণ্ডে ব্লাকপুলে সরানো হইবে। প্রত্যেক মাসে ১০ হাজার করিয়া লোক লইয়া যাওয়া হইবে। বহুকাল সুয়েজ খালের রক্ষার ভার বৃটিশের উপর ছিল। মিশর স্বাধীনতা লাভ করায় ও ঐ এলাকা মিশরের বলিয়া সম্প্রতি এই নূতন ব্যবস্থা হইল। সমগ্র পৃথিবী হইতে সাম্রাজ্যবাদ ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতেছে। ইহা তাহারই অন্যতম লক্ষণ। আমাদের বিশ্বাস, নূতন ব্যবস্থায় মিশর ঐ অঞ্চল পাহারার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইবে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণ বিদ্বেষ—

দক্ষিণ আফ্রিকা জাতীয় কংগ্রেস ও দক্ষিণ আফ্রিকা ভারতীয় কংগ্রেস দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বৈষম্য ও কোনঠাসা নীতির চাপ দ্রুত নিশ্চিহ্ন করার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। উভয় প্রতিষ্ঠান হইতেই বলা হইয়াছে, দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণ-সমস্যা অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। রাষ্ট্রপুঞ্জ বর্ণ-বৈষম্য তদন্ত কমিশন গঠন করিয়াছেন বটে, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার কর্তৃপক্ষ কমিশনকে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাইবার অনুমতি দেন নাই। সে জন্য কমিশন জেনেভাতে অবস্থান করিতেছে। প্রকাশ, দক্ষিণ আফ্রিকা গভর্ণমেণ্ট অশ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদিগকে ক্রীতদাসের পর্য্যায়ে নামাইয়া আনিয়াছে। জনসাধারণকে তাহার বিরুদ্ধে আইনসঙ্গত আন্দোলনও করিতে দেওয়া হয় না। সেজন্য জনসাধারণ অত্যন্ত শঙ্কার সহিত তথায় বাস করিতেছে। সভ্য পৃথিবীর কোন দেশে যে এরূপ অবস্থা সম্ভব, আজ তাহা চিন্তাও করা যায় না। অথচ দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়গণকে এই দুর্দ্দশাই ভোগ করিতে হয়। কবে ইহার অবসান হইবে কে জানে?

২৫শে শ্রাবণ—১৩৬১



পাট ও পীঠ

চন্দন গুপ্ত

আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি একটি ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল ছয় সপ্তাহের জন্য রাশিয়া ভ্রমণে যাইবেন। কিছুদিন পূর্ব্বে অনুরূপ একটি সাংস্কৃতিক দল ভারতে আসিয়াছিলেন। এই দলে বিশেষ করিয়া নৃত্য-শিল্পী, গায়ক ও বাদকেরা অন্তর্ভুক্ত হইবেন। এই দলে যোগদান করার জন্য ভারত সরকার ইতিমধ্যে বিশিষ্ট শিল্পীদের অনুরোধ জানাইয়াছেন। ভারতীয় লোক-নৃত্য ও লোক-সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য ও দেশের জনগণকে সহজেই আকৃষ্ট করিবে বলিয়া আমরা আশা করি। আমরা এই সাংস্কৃতিক দলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইতেছি।

* * * *

সম্প্রতি লাহোরে ভারতীয় 'জাল' নামক হিন্দী কথা-চিত্রের শুভ-মুক্তির ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া যে অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং যাহার ফলে পাকিস্তানের কয়েকজন বিখ্যাত প্রযোজক, পরিচালক এবং তারকাবৃন্দসহ প্রায় শতাধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, জানা গেল, তাহাদের মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। পাকিস্থান চলচ্চিত্র শিল্পের এক প্রতিনিধি দল নাকি সরকারকে জানাইয়াছেন, ছবির বিরুদ্ধে অভিযোগ জ্ঞাপন করা ছাড়া ধৃত ব্যক্তিদের আর কোনরূপ উদ্দেশ্য ছিল না। এই আশ্বাসের ফলেই ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। হল্লা করা, চড়াও হওয়া যদি অভিযোগ জ্ঞাপনের অন্যতম উপায় বলিয়া পাকিস্তান সরকার মনে করেন, তাহা হইলে অবশ্য আমাদের কিছু বলিবার নাই।

* * * *

সম্প্রতি কলিকাতার মেট্রো সিনেমায় গত ২রা আগষ্ট হইতে মেট্রো উইমেন্স ক্লাব নামক একটি বিশেষ প্রমোদ-শাখার পত্তন করা হইয়াছে। মেয়েদের মধ্যে নাচ, গান, বাজনা, হাস্য-কৌতুক প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকিবে। ইচ্ছা করিলে মেয়েরা তাঁহাদের স্বীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করাইবার সুযোগ পাইবেন এবং কৃতিত্বের জন্য যথাযোগ্য পুরস্কারেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রতি সোম-বারের ম্যাটিনী শো-টি সম্পূর্ণ মেয়েদের জন্যই নির্দ্ধারিত থাকিবে। এই ক্লাবটি সম্পূর্ণ মেয়েদের দ্বারাই নাকি পরি-চালিত হইবে। উক্ত বিশেষ প্রদর্শনীতে প্রাপ্তবয়স্ক কোন পুরুষের প্রবেশাধিকার থাকিবে না। তবে নয় বৎসর বয়স্ক বালকেরা প্রবেশ করিতে পারিবে। বহুকাল পূর্ব্বে বাংলা দেশের কোন মঞ্চে 'নারীর রাজা' নামক একটি নাটক মঞ্চস্থ হইয়াছিল। মেট্রোর নবতম ব্যবস্থার ফলে আমাদের মনে একটি সন্দেহের উদ্রেক হইতেছে যে, কেবলমাত্র মেয়েদের দ্বারায় অভিনীত চিত্রই কি অতঃপর প্রদর্শিত হইবে?



দিল্লীতে নাট্য প্রতিযোগিতায় বিজয়ী প্রতিযোগীদের সঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু

* * * *

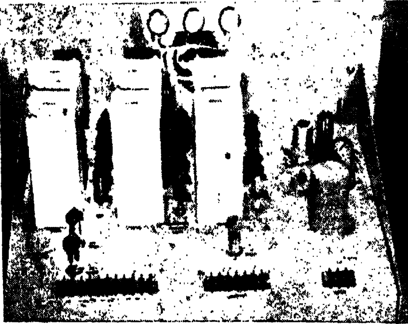
মেট্রো গোল্ডউইন মায়ারের উদ্যোগে মেট্রো সিনেমায় গত ২৭শে জুলাই পারসপেক্টা ষ্টেরিওফোনিক সাউণ্ড (Perspecta Stereophonic Sound) এর কার্য্য-

কারিতা দেখানর জন্য বিশিষ্ট টেক্‌নিসিয়ান শিল্পী ও সাংবাদিকদের আহ্বান করা হয়। কলিকাতার চিত্র-শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উক্ত প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। শব্দ-ধারণের নবতম কৌশলের



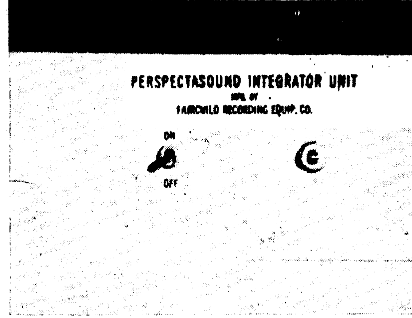
নবাবিষ্কৃত পার্স্‌পেক্টা শব্দ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র—১

দ্বারা নিকট ও দূরের শব্দের পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে। পারস্‌পেক্টা সাউণ্ডে গৃহীত ছবির জন্য পর্দ্দার পিছনে তিনটি স্পীকারের প্রয়োজন হয়। যখন যে দিক হইতে কথা বলা হয়, তখন ঠিক সেই দিকের স্পীকারটি কার্য্যকরী হয়। যদি কোন শিল্পী মধ্যস্থলে কথা কহিতে কহিতে ডান অথবা



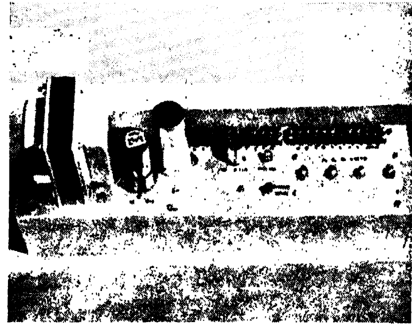
পার্স্‌পেক্টা শব্দ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র—২

বাঁ দিকে চলিয়া যান, তাহা হইলে শিল্পী যেদিকে কথা কহিতে কহিতে চলাফেরা করিবেন, সেইদিকের স্পীকারও সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যকরী হইয়া উঠিবে। দূরত্ব অনুসারে শব্দ-প্রক্ষেপণের ফলে ছবিগুলি অধিকতর সজীব বলিয়া বোধ হয়। সচরাচর ছবির ন্যায় ৩৫ মিলিমিটারের ছবির গা হইতেও একটি মাত্র শব্দ-রেখা ফুটিয়া ওঠে। যে কোন চিত্র-গৃহেই



পার্স্‌পেক্টা শব্দ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র—৩

এই নবতম শব্দ-নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বসান যাইতে পারে। সিনেমা



পার্স্‌পেক্টা শব্দ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র—৪

স্কোপ ছবি ছাড়াও যে কোন ছবি এই যন্ত্রের সাহায্যে দেখান যাইতে পারে।

* * * *

এ বছরে পশ্চিম বার্লিনে যে আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেষ্টিভ্যাল্ হয়, তাহাতে ডেভিড লীন পরিচালিত হবসন্ চয়েস্ নামক ব্রিটিশ চিত্রটিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। 'ব্রেলাভ্ এণ্ড ফ্যান্টাসি' নামক একটি ইতালীয় ছবি দ্বিতীয় এবং 'দি রেলিপেড্' নামক একটি ফরাসী ছবি তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। ডকুমেণ্টারী ছবি হিসাবে ওয়াল্ট ডিস্‌নের 'দি লিভিং ডেসার্ট' শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান লাভ করিয়াছে।

* * * *

ইন্দোনেশীয়ার গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান বৎসরের শেষাশেষি জাকার্তায় ফিল্ম-ফেষ্টিভ্যালের আয়োজন করিবেন বলিয়া এক সংবাদে জানা গিয়াছে। এশিয়ার বিভিন্ন রাজ্যে গৃহীত বিভিন্ন ভাষার ছবি প্রদর্শিত হইবে। এই উপলক্ষে এশিয়ার বিভিন্ন রাজ্যের কৃষ্টি-কলার সহিত পরস্পরের পরিচয় করানই মুখ্য উদ্দেশ্য। জানা গিয়াছে, ইন্দোনেশীয়ান গভর্ণমেণ্ট এতদুপলক্ষে, এশিয়ার বিভিন্ন দেশের চিত্র ও চিত্রতারকাদের আমন্ত্রণ করিবেন।

* * * *

বিভিন্ন রাজ্যে প্রযোজিত চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা হইয়াছে। এতদুপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রীর নামে যে পদক প্রদত্ত হইবে ইতিমধ্যে তাহার নক্সা স্থির করা হইয়াছে। পদকের একদিকে প্রতীক ছাড়া পদকের নাম থাকিবে, অপরদিকে ভারত ইউনিয়নের প্রতীক, চলচ্চিত্রের উৎপাদক, চলচ্চিত্রের নাম এবং পুরস্কার দানের সাল লিখিত থাকিবে। ভারত ইউনিয়নে প্রস্তুত সেরা-কাহিনীর জন্য রাষ্ট্রপতির স্বর্ণ পদক, বিভিন্ন ভাষা গ্রুপে শ্রেষ্ঠ চিত্র-কাহিনীর জন্য রাষ্ট্রপতির রৌপ্য-পদক এবং শ্রেষ্ঠ ডকুমেণ্টারী ছবির জন্য রাষ্ট্রপতির স্বর্ণ পদক দেওয়া হইবে। ইহা ছাড়া, শিশুদের জন্য নির্ম্মিত শ্রেষ্ঠ চিত্রের জন্য প্রধান মন্ত্রীর স্বর্ণপদক দেওয়া হইবে। প্রত্যেক বিভাগে দেয় পদকের জন্য পৃথক পৃথক নক্সা প্রস্তুত করা হইবে স্থির করা হইয়াছে। যে সকল নক্সা দাখিল করা হইবে তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করিবার জন্য একটি নির্ব্বাচনী কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছে। প্রত্যেক শ্রেণীর সর্ব্বোত্তম নক্সার জন্য ৫০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

* * * *

ষ্টার থিয়েটার সুসংস্কৃত হওয়ার পর বাংলার নাট-মঞ্চে এক নূতন প্রেরণা দেখা দিয়াছে। রঙ্‌মহল রঙ্গমঞ্চ দীর্ঘকাল বন্ধ থাকার পর সম্প্রতি নূতন পরিচালনাধীনে তাহার দ্বারোদ্ঘাটন হইয়াছে। প্রেক্ষাগৃহের আমূল সংস্কার করা হইয়াছে। রূপসজ্জা করিয়াছেন প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীসুধাংশু চৌধুরী। রঙ্‌মহলের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন প্রবীণ সংবাদিক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ এবং দ্বারোদ্ঘাটন করেন রাজারাও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং নাট্যকার উপস্থিত ছিলেন। রঙ্‌মহলের নূতন শিল্পী-গোষ্ঠির মধ্যে অধিকাংশ চিত্র-তারকা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের প্রথম নাটক কথা-শিল্পী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'দূরভাষিণী'। উপন্যাসকে নাটকাকারে রূপান্তরিত করিয়াছেন শ্রীসলিল সেন। রঙ্‌মহল রঙ্গমঞ্চের দ্বারোদ্ঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে মিনার্ভা থিয়েটারেরও গৃহ-সংস্কার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। আশা করা যায় শীঘ্রই মিনার্ভা থিয়েটার নবকলেবরে আত্মপ্রকাশ করিবে। কিছুদিন পূর্ব্বেও কলিকাতায় পাঁচটী রঙ্গমঞ্চের অস্তিত্ব ছিল না। সহসা পর পর রঙ্গমঞ্চগুলির দ্বার বন্ধ হওয়ায়, নাট-মঞ্চ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। নাট-মঞ্চগুলির পুনরাবির্ভাবে আশার সঞ্চার করিবে সন্দেহ নাই।

* * * *

দিল্লী-নাট্য-সঙ্ঘ, থিয়েটার সেণ্টারে-(ইণ্ডিয়া)র মাধ্যমে ইণ্টারন্যাশানাল থিয়েটার ইন্‌ষ্টিট্যুটের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গত তিন বৎসর যাবৎ নাট্য-প্রতিযোগিতার আয়োজন করিয়া আসিতেছেন। কেন্দ্রীয় সংবাদ ও বেতার মন্ত্রী ডাঃ বি, ভি, কেশকার এই সঙ্ঘের সভাপতি।

১৯৫৩-৫৪ সালের নাট্য-প্রতিযোগিতায় হিন্দী, পাঞ্জাবী, মারাঠী, তামিল, বাংলা, গুজরাটী এবং হিন্দুস্থানী ভাষায় ১৮টি নাটক বিভিন্ন নাট্য-সম্প্রদায় কর্তৃক অভিনীত হয়। দিল্লীর 'সংস্কৃতি পরিষদের' তরফ হইতে শ্রীঅজয়কুমার গুপ্ত শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসাবে বাংলা নাটক "নতুন ইহুদী"র পরিচালনা করেন। এই নাটকে শ্রীমতী বাণী রায় পরীর ভূমিকায় সকলকে মুগ্ধ করিয়া শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী হিসাবে সম্মানিতা হইয়াছেন। মারাঠী নাটক "কভডি চুম্বক" হইতে শ্রী এম, জি, যোশীকে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসাবে মনোনীত করা হয়।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ডাঃ কাটজু একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে সকলকে পুরস্কার বিতরণ করেন।



পরিচালক—উপানন্দ

অদম্য ইচ্ছাশক্তির অনুশীলন

ইচ্ছা শক্তির বিভিন্ন রূপ ও অবস্থা আছে, অদম্য অধ্যবসায়পূর্ণ ইচ্ছাশক্তি (Persistent will) তার মধ্যে সর্ব্বোত্তম। সহস্র বাধা বিপত্তি পর্ব্বতের মত হোলেও এর জোরে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। এর অপূর্ব্ব প্রভাবে এমন একটি সময়ের স্রোত জীবনে আসে, যে তা-ই অবলম্বন করলে, সুখ সৌভাগ্যলাভ হবেই। কিন্তু তাকে পেয়ে হারালে, উপেক্ষা করলে শেষে জীবনের অবশিষ্টাংশ কর্দ্দমাক্ত চড়ায় আবদ্ধ হয়ে দুঃখে কষ্টে অতিবাহিত করতে হয়। মনুষ্য জীবন ক্ষণস্থায়ী—পৃথিবী কর্ম্মক্ষেত্র। কখন কে পৃথিবী থেকে চির বিদায় নেবে তা কে বলতে পারে! যেন অজর ও অমর হয়ে থাকবে এই মনে করে ইচ্ছাশক্তির সাধনার সাহায্যে বিদ্যা ও অর্থ চিন্তা করবে, মানুষের মত মানুষ হবার জন্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হবে, আর উচ্চ আদর্শ সর্ব্বদা সামনে রাখবে। স্মরণ রেখো, সময় ও স্রোত কারও জন্যে অপেক্ষা করে না। যতক্ষণ রৌদ্র আছে খড় শুকিয়ে নেও, বৃষ্টি এলে তো তা করতে পারবে না—ব্যর্থ হোতে দিও না কোন শুভ সুযোগ। জেনে রেখো, যে কথা বলা হয়েছে, যে শর ছুড়ে দেওয়া হয়েছে, যে জীবন চলে গেছে, আর যে সুযোগ উপেক্ষা করা হয়েছে, তা আর ফেরে না।

এমন অনেক মানুষ আছে যারা ইচ্ছাশক্তির জোরে অসম্ভবকে সম্ভব করবে এই প্রতিজ্ঞা করে, অনুশীলন করতে করতে কিছু দূর এগিয়ে থেমে যায় আর বলে ওঠে—'ও অসম্ভব, হবে না, আমার দ্বারা হবে না—' এরা অদম্য ইচ্ছাশক্তির সাধক নয়, বরং এ শক্তির সাধকের প্রধান শত্রু। এদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। দো-মনাভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর। সাঁতার শিখতে হোলে সোজা জলে নেমে গা ভাসাতে হবে, তীরে দাঁড়িয়ে জল্পনা কল্পনা করলে তো হবে না। যে ভগবানের কোন রূপ নেই তাঁকেও ইচ্ছাশক্তির জোরে রূপে এনে প্রত্যক্ষভাবে তাঁর সঙ্গে দিন কাটিয়ে গেছেন ধ্রুব, প্রহ্লাদ থেকে সুরু করে এ যুগের রামকৃষ্ণ পরমহংস পর্য্যন্ত। এ শক্তির দ্বারা যা চাও তাই হবে।

উচ্চ আকাঙ্ক্ষা অদম্য ইচ্ছাশক্তির প্রধান সহায়ক। এমার্সন বলেছেন, আমাদের মালগাড়ীকেও উচ্চ আশা আকাঙ্ক্ষা তারার সঙ্গে লটকে দেবার ক্ষমতা রাখে। যাতে তোমাদের মালগাড়ী বেগে ছুটে গিয়ে খুব উজ্জ্বল বৃহৎ তারার সঙ্গে লটকে যায়, তারই চেষ্টা করবে—ছোট তারার দিকে কেন গাড়ীখানা ধাবিত করবে! তোমাদের মধ্যে জেগে উঠুক আশা, আকাঙ্ক্ষা আর বিশ্বাস, যাতে ভালো কিছু কাজ করতে পারো, বড় করে গড়তে পারো তোমাদের জীবন-শিল্পকে। তোমাদের সম্মুখীন হয়ে রয়েছে যে সব মহৎ কাজ—এসব কাজ হয়তো কখন করনি কিন্তু করা দরকার ও করতে হবেই—এই কর্ত্তব্যবোধ, দায়িত্বজ্ঞান, অনুরাগ, আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তি যাতে প্রগাঢ় হয় তার জন্যে চাই তীব্র প্রচেষ্টা!

আশা আকাঙ্ক্ষা কখন ছোট করবে না, কখন সঙ্কীর্ণ করবে না, কখন ক্ষণস্থায়ী করে দু'কুড়ি সাত বজায় করবার চেষ্টা করবে না। প্রত্যহ ইতিহাস, পুরাণ বা মহামানবদের জীবনী থেকে প্রেরণা অনুপ্রেরণা নিয়ে লক্ষ্য খুব উঁচু করবে, আর ইচ্ছাকে সুদৃঢ় করবে। জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্যে আগামীকালের পথ চেয়ে বসে থেকো না, কে জানে, তোমাদের পক্ষে আগামীকালে সূর্য্য উঠবে কি না! শ্রমশীল হয়ে অধ্যবসায়ের সঙ্গে পুরুষকার অবলম্বন করে সম্পদ লাভ করা যায়। দৈব ধন দান করবে, এ কথা কেবল কাপুরুষেরাই বলে।

অদম্য ইচ্ছাশক্তির বলে কোন্ লক্ষ্যে পৌঁছুতে চাও, প্রথমে সেইটে ঠিক করো, তার পর অনুশীলন সুরু করো—বিলম্ব চলবে না। ধরো, তোমরা পাঁচটা জিনিষ চাও—একটি কাগজে পাঁচটি পংক্তিতে ঘুম থেকে উঠেই সকালে লেখো—

(১) আমি চাই পরীক্ষায় খুব বেশী নম্বর রাখতে।

(২) আমি চাই মস্ত বড় আবিষ্কারক বা বৈজ্ঞানিক হ'তে।

(৩) আমি চাই মানুষের মত মানুষ হ'তে।

(৪) আমি চাই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হ'তে।

(৫) আমি চাই দৈহিক ও মানসিক শক্তিতে শ্রেষ্ঠ হ'তে।

উদাহরণ স্বরূপ উপরোক্ত পাঁচটি প্রতিজ্ঞা দেওয়া হোলো। তোমরা তোমাদের মনের মত বসাবে যা চাও, আর লিখবে—আমি চাই……এই পাঁচটী অভিপ্রায়ের বস্তু তোমাদের ধ্যান ধারণার মধ্যে সর্ব্বদাই রাখতে হবে। এদের পাবার জন্তে কাজে লেগে যাবে খুব উৎসাহ, একাগ্রতা আর অধ্যবসায়ের সঙ্গে,—দিন রাত কিভাবে চলে যাচ্ছে তাও খেয়াল রাখবে না। আশা আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত রাখতে কিছুমাত্র ত্রুটি রাখবে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না লক্ষ্যে পৌছিয়ে সাফল্য লাভ হয়। তোমাদের বিগত জীবনের দিনগুলির দিকে দৃষ্টি দেবে স্মৃতির সাহায্যে—দেখবে যে সব কাজে তোমরা সিদ্ধি লাভ করেছ, যে সব জিনিষ তোমরা পেয়েছ, যে সব পরীক্ষায় বিশেষ স্থান অধিকার করেছ বা যে সব ক্ষেত্রে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছ, তার প্রত্যেকটির মূলে আছে তোমাদের সজীব সুদৃঢ় অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও উদগ্র আশা আকাঙ্ক্ষা।

আজকের দিনে তোমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা ছোট করো না, কেরাণী হয়ে গোলামের জাতে পরিণত হয়ো না—কেরাণীগিরি করে আমরা যে ঘৃণ্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে গেলাম, তার পুনরাবৃত্তি যেন তোমাদের জীবনে না ফুটে ওঠে। মহৎ আদর্শের উপাসনা চাই।

তোমাদের অদম্য ইচ্ছাশক্তি জাগ্রত হয়ে উঠবে যদি তোমরা নিম্নোক্তভাবে রবিবার ব্যতীত এর প্রত্যহ অনুশীলন করো। যদি না করো, তা হোলে হবে না—তখন আমাকে দোষের ভাগী করো না। আজই মনকে সক্রিয় করে কাজে লেগে যাও—

প্রথমদিন: খুঁজে বের করো পাঁচটী মনের বৃত্তি যা ইচ্ছাশক্তির বৃদ্ধির পক্ষে শেষ সহায়ক হবে। সেগুলি তোমাদের খাতায় লিখে রাখো।

দ্বিতীয়দিন: নিজের ভাষায় লেখো এমন একটি মানুষের জীবনের কথা যিনি খুব সামান্য অবস্থা থেকে উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠে পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় ও চিরবরণীয় হয়ে রয়েছেন।

তৃতীয়দিন: লিখে রাখো যে তোমরা সত্তর আশী বছর পর্য্যন্ত বেঁচে থাকতে চাও—বাঁচার মত বাঁচতে চাও,—তোমাদের বৃত্তি বা পেশায় কতখানি তোমরা উচ্চে উঠবে আর কত টাকার মালিক হবে পরিষ্কার ভাবে একাধিক বার লিখবে।

চতুর্থদিন:—এদিন লেখো তোমাদের মানসিক সৎবৃত্তির কথা—যারা অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে লাভ করতে সাহায্য করবে—এরা তোমাদের সত্তর আশী বছর পর্য্যন্ত বেঁচে থাকার মধ্যে কতখানি কাজে লাগিয়ে তোমাদের সাহায্য করে বড় করে তুলতে পারে। এদিনে তোমাদের ভাব-ভাবনা চলবে মানসিক সৎবৃত্তিগুলোর পুষ্টিসাধনায়।

পঞ্চমদিন: ইংরাজী অভিধান খুলে 'Ambition' শব্দটীর সংজ্ঞা পড়ে নিয়ে, নিজের মনে ব্যাখ্যা করবে ও আলোচনা করবে। বাংলা অভিধানে আশা আকাঙ্ক্ষার অর্থ বারে বারে পড়ে উপলব্ধি করবে। তারপর ঐ মহামূল্য শব্দ, যা ইংরাজী আর বাংলায় বলা হয়েছে যেন তোমাদের কণ্ঠে বিরাজ করে, যেন তা তোমাদের মুখস্থ হয়ে যায়—মনে প্রাণে এটীকে গ্রহণ করবে।

ষষ্ঠদিন: নিজেকে আদেশ করে লেখো দুইটি বিষয়ে যা পরের দিন করতে হবে। এমন আদেশ করো যেন কার্য্য সুচারুভাবে সম্পাদিত হয়।

মানুষ অভ্যাসের সমষ্টি। তাই মানুষের পক্ষে কোন কাজ পুনঃ পুনঃ করলে সেটি তার এমি অভ্যস্ত হয়ে যায় যে, সহজে সে তা আর ত্যাগ করতে পারে না, আপনার অলক্ষিতে অভ্যাসের দাস হয়ে পড়ে। তোমরা মানুষ, তোমরাও উপরোক্তভাবে নিত্য অনুশীলন করতে করতে শেষে আর কোন কষ্টবোধ হবে না। আমাদের জীবিতকাল কতকগুলি মুহূর্ত্তের সমষ্টি। এই সমস্ত মুহূর্ত্ত একটির পর একটি দ্রুতগতিতে যাচ্ছে—যেটী যাচ্ছে, সেটী আর ফিরছে না। এই ভেবে প্রত্যেক মুহূর্ত্তকেই তোমাদের অদম্য ইচ্ছাশক্তির দ্বারা পরিচালিত কাজে নিয়োগ করবে—তোমাদের শৈথিল্যে, আলস্যে, দীর্ঘসূত্রতায় নিষ্ফল আমোদ-প্রমোদ অপচয় করে কর্ত্তব্যের প্রতি উপেক্ষা দেখিয়ে উন্নতির পথে কাঁটা দিও না। বিগত সন ১৩১৮ সালে কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> "ইচ্ছাশক্তি যাহার দুর্ব্বল ও সংকল্প যাহার অপরিস্ফুট তাহারই দুর্দ্দশা। যখন যেটুকু সুযোগ পাই তাহাকেই ইচ্ছার জোরে সম্পূর্ণ করিব, নিজের মন দিয়া নিজের মত করিয়া তুলিব।"

তোমরা কবিগুরুর কথাটী ভেবে দেখো।

খোকার স্বপ্ন

শ্রীলীলাময় দে

ফাগুন দিনের এক
সাঁঝের বেলা
ফিরলো ঘরেতে খোকা
সাংগ খেলা,
ক্লান্ত অবশ দেহে
মায়ের কোলে
নয়ন বুঁজলো ঘুমে
পড়লো ঢ'লে।
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে খোকা
স্বপন দেখে
নীল সাগরের ওই
ওপার থেকে,

রাজার কুমার নামে
　　ঘোড়ায় চ'ড়ে
ঝলমলে আবরণ
　　অংগে প'ড়ে।
　　মাথায় মুকুট তার
　　　　কণ্ঠে মালা
　　চরণে সোনালী জুতা
　　　　চোখ উজলা।
　　　　দীপ্ত নয়ন নত
　　　　　　বেদনা ভারে
　　　　ইতি উতি চাহি সদা
　　　　　　খুঁজিছে কারে।
　　খোকা জানে কা'রে খোঁজে
　　　　রাজার ছেলে
　　ঘুমানো অধরে তাই
　　　　হাসি যে খেলে।
সহসা স্বপন ঘুমে
　　ফুকারি ওঠে
"আমি না দেখালে পথ
　　পাবে না মোটে।"
　　রাজার কুমার শুনে
　　　　মুখ পানে চায়
　　বিস্ময় জাগে তার
　　　　চোখের কোণায়।
　　　　উৎসুক কণ্ঠে সে
　　　　　　জিজ্ঞাসে তারে
　　　　"বল দেখি এ পারেতে
　　　　　　খুঁজিতেছি কারে?"

খোকা তখন হেসে হেসে,
　　বললে—"আমি জানি,
কাহার লাগি এনেছ তুমি
　　গলার মালা খানি।"
　　"এ পারে ঐ দূর দিগন্তে
　　　　ধূসর ধূ ধূ বাটে
　　রাজকন্যা ঘুমিয়ে আছে
　　　　সোণায় মোড়া খাটে।"

"সাগর সেচা মুক্তা গাঁথা
　　যমপুরীতে একা
কত যে এলো রাজার ছেলে
　　পেল' না তার দেখা।"
　　"রাক্ষুসী এক দিবারাতি
　　　　আগলে থাকে তারে
　　রাজকন্যা আনতে গেলে
　　　　ভুলিয়ে সেথা মারে।"
"রূপোর কাঠি ছুঁইয়ে তারে
　　ঘুম পাড়িয়ে রাখে
সোণার কাঠির ছোঁয়ায় সে যে
　　চক্ষু মেলে জাগে।"
　　"ইচ্ছে ক'রে এমন পুরে
　　　　যেতে কি আছে কভু
　　শুনবে নাকো মিনতি মোর,
　　　　যাবেই তুমি তবু?"
　　　　"যেতে তোমায় দেব না আমি,
　　　　　　রাখবো বেঁধে কাছে
　　　　জেনে শুনেও জীবনটা কি
　　　　　　এমনি দিতে আছে?"

শুনে রাজার ছেলের ত্বরা
　　চক্ষু জ্বলে ওঠে
ঘোড়ায় চড়ে তক্ষুণি সে
　　টগবগিয়ে ছোটে।
　　"যেও না, ফেরো" ঘুমের মাঝে
　　　　বললে খোকা জোরে
　　মায়ের ডাকে উঠল বসে
　　　　পুছলো ঘুম ঘোরে,
　　　　"কোথায় গেল রাজার ছেলে
　　　　　　বড্ড সে যে বোকা;"
　　　　মা শুধালেন, আদর ক'রে
　　　　　　"কি হলরে খোকা?"

ঘুমের ঘোর কাটতে খোকা
　　লজ্জা পেলো ভারি
চক্ষু মুছে মিষ্টি হেসে
　　বললে তাড়াতাড়ি

"কিছুই না মা, স্বপ্নে শুধু
এসে আমার কাছে
আবার কোথা মিলিয়ে গেল
ধরবো ব'লে পাছে।"
"তোমার সে যে রূপ-কাহিনীর
রাজার ছেলে মাগো
সত্যি যদি আসতো তবে
কি হ'ত বলো না গো?"

লোভের পরিণাম

শ্রীছবি দেবী

(বিদেশী পুরাণ)

মানুষ যে, আশার অতিরিক্ত কতখানি আকাঙ্ক্ষা করতে পারে, এবং কতখানি লোভী হওয়া সম্ভব, আজ তোমাদের কাছে সেই বিষয় নিয়ে একটা ভারি মজার গল্প বলছি।

সেই তখনকার দিনে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় রাজা ছিল ফ্রিজিয়ার রাজা মিডাস্। কিন্তু এত যে তার ধনসম্পত্তি, তবু মিডাসের আকাঙ্ক্ষার অন্ত ছিল না। কেবলি যেন মনে হত' আরও হ'লে বুঝি ভাল হত' !!

যাই হোক্, দিন তার বেশ সুখেই চলেছে এবং হঠাৎ একবার এক দেবতার কিছু কাজ করার সে সুযোগ পেলে। মানে একদিন, তার বাগানে, মদের যে দেবতা ডাইওনাইসাস্ তারই এক অন্তরঙ্গ বন্ধু বৃদ্ধ সিলিনাস্ যখন ওদের দল থেকে পালিয়ে মিডাসের বাগানে একটু ঘুমিয়ে নিয়ে, মদের নেশাটাকে কাটাবার চেষ্টায় ছিল, ঠিক সেই সময় সিলিনাস্কে দেখতে পেলে রাজা মিডাস্। অতএব বুঝতেই পারছ, এই সুযোগটা পেয়ে কি আর বসে থাকতে পারে মিডাস্। সে তখন করলে কি, ভ্রাম্যমান আমোদপ্রিয় এই বৃদ্ধ সিলিনাস্কে খেলার ছলেই অনেক গোলাপ ফুল আর পেট পুরে মদ এবং মাংস খাইয়ে কিছুক্ষণের জন্য তাকে নিজের কাছে আটকে রাখলে। তারপর তাকে নিয়ে সে গেল, যেখান থেকে সিলিনাস্ পালিয়ে এসেছে, সেই মদের দেবতা ডাইওনাইসাস্—তার ওখানে। মদের দেবতা, তার এই ফুর্তিবাজ বন্ধুটিকে দেখে এতই খুসী হ'ল যে, রাজা মিডাস্কে বন্ধু হিসাবে বললে সে, পুরস্কার স্বরূপ তার যা ইচ্ছা, দেবতার কাছে সে বর প্রার্থনা করুক। অতঃপর এই কথা শোনা মাত্র, রাজা আর দ্বিতীয়বার কিছু ভাবার প্রয়োজন দেখলে না। সে উৎসুকভাবে বলে ফেললে "বরই যদি দেবে ত', আমায় এমন বর দাও যে, আমি যা কিছু স্পর্শ করব, সব সোনা হয়ে যাবে মুহূর্ত্তে!"

মিডাসের এই প্রার্থনায় হেসে দেবতা বললে, "বেশ তাই হবে। বলে ডাইওনাইসাস্ মদের পাত্র নিয়ে শপথ করলে।

এখন মিডাস্ ত' বর পেয়ে একেবারে আনন্দে আত্মহারা যাকে বলে! ধনরত্ন তার এখন থেকে একেবারে অফুরন্ত হবে ভেবে, উল্লসিত হৃদয়ে তক্ষুণি মিডাস্ সেখান থেকে ফিরে চল্ল নিজের রাজ্যে। খুসী মনে মিডাস্ চলেছে—চলেছে। এখন হঠাৎ, একটা বনের ভিতর দিয়ে সে যখন চলছিল, সেই সময়ে নতুন যে শক্তিটা তার হয়েছে সেটা পরীক্ষা করে দেখার আগ্রহে, সে একটা গাছের ডাল মট্ করে ভেঙ্গে ফেললে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! জীবন্ত একটা গাছের সবুজ শাখা, মিডাসের স্পর্শমাত্র যেন, মুহূর্ত্তে হল্‌দে সোনার মত একেবারে হয়ে গেল। সে পরীক্ষার জন্য, এবারে পথ থেকে পাথর তুললে কুড়িয়ে, কিন্তু তাও খাঁটি সোনাই হয়ে গেল তার ছোঁয়া লাগা মাত্র। এমন কি, মাটির ঢেলাটা পর্য্যন্ত তার ছোঁয়া লেগে, ঝক্‌ঝকে সোনা হয়ে যাচ্ছে। অতঃপর, এবারে মিডাস্ ধরলে শস্যের গোছা মুঠো করে, সেই শস্যগুলোও কিন্তু, সোনার মত শক্ত আর হল্‌দে হয়ে গেল মিডাসের স্পর্শ পেয়ে। তবু, লোভী রাজা মিডাস্ পরীক্ষা করে দেখে গাছ থেকে ফুল ছিঁড়ে, ফল পেড়ে। সেই হেস্‌পেরিডসের বাগানের আপেলের মত সব যেন সোনার মত ঝক্‌ঝক্ করছে চোখের সামনে। সুতরাং পথ চল্‌তি, এতই সোনা মিডাস্ জোগাড় করলে যে, মিডাসের চাকরগুলো সোনার ভারে একেবারে চলতেই কেউ পারছে না। তবু তারা গোঁঙ্গাতে গোঁঙ্গাতে, এগিয়ে চলেছে তাদের রাজার সঙ্গে। এদিকে আর এক ব্যাপার কি হ'ল, শোন! মিডসের গায়ে যে রাজপোষাকটি ছিল, সেটাত' আর সেই হাল্‌কা পোষাক নয় এখন, কেননা, মিডাসের ছোঁয়ায়, পোষাকটা একেবারে সম্পূর্ণই সোনার হয়ে গেছে। সুতরাং বুঝতেই পারছ, সোনার একটা ভারি পোষাক গায়ে চাপিয়ে মানুষ কতক্ষণ আর চলতে পারে! মিডাস্ তখন ঠিক করলে যে, খচ্চরে চেপে সে রাজপ্রাসাদে যাবে। কিন্তু, সে যখন খচ্চরে উঠতে গেল, তার ছোঁয়া লেগে জীবন্ত খচ্চরটা পর্য্যন্ত, একটা মূর্ত্তির মত নিশ্চল হয়ে মিডাসের সামনে দাঁড়িয়ে রইল। তখন আর কি করে, মিডাস্ পাল্‌কী চেপেই প্রাসাদে ফিরল যদিও, কিন্তু, তার চাকরগুলোর পক্ষে ঐ ভারী পাল্‌কীটা বয়ে আনা সত্যিই ভীষণ কষ্টকর হয়েছিল। তবু যাই হোক্—মোটের উপর খুব খুসী এবং গর্ব্বিত মনেই রাজা তার প্রাসাদে প্রবেশ করলে। সে যখন সিংহদরজাটা দিয়ে ঢুকলে তখন, মিডাস্ কি করলে জান, সে চট্ করে দরজার, সেই যে মোটা মোটা সব থাম থাকে—সেই থামে নিজের হাতটা দ্রুত বুলিয়ে দিলে। আর দেখতে দেখতে সেই থামগুলো সব একেবারে খাঁটি সোনা হয়ে গেল। তারপর পাল্‌কী থেকে নেমেই সামনে যে চেয়ারখানা সে দেখতে পেলে, সেটায় যেই না ধপ্ করে বসা, অমনি ঐ চেয়ারখানাও সোনার হয়ে গেল চোখের পলক ফেলার অনেক আগেই। আর সেই থেকে, ঐ চেয়ারখানা এতই মূল্যবান হ'ল যে, পৃথিবীর যে কোন রাজা ঐ অমূল্য সিংহাসনটিকে নিশ্চয়ই হিংসা করবে। ওকথা এখন থাক্, মিডাসের কি হ'ল তাই বলি।





লা ই ফ ব য় সা বা ন

প্রতিদিন ময়লার বীজাণু থেকে আপনাকে রক্ষা করে





ভারতে প্রস্তুত

হ্যাঁ, মিডাস্ ত' প্রাসাদে ফিরল। কিন্তু, এই পথশ্রম এবং উত্তেজনায় রাজা খুবই ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত্ত হয়ে পড়েছে। অতএব সে তক্ষুণি খাবার আনার জন্য চাকরদের হুকুম করলে। অত বড় একজন রাজা—তার হুকুম কি আর যে সে কথা! তক্ষুণি সব পরিচারকেরা চারিদিকে ছুটোছুটি সুরু করে দিলে। কেউ টেবিল পেতে দেয়, কেউ আনে রাজার হাত ধোবার জন্য গামলা ভরা জল, কেউ আনে থরে থরে সাজান খাবার। কিন্তু, আবার সেই সোনার খেলা এখানে পর্য্যন্ত! মানে—মিডাস্ যখন গামলার জলে হাত ডুবিয়ে ধুলে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দেখা গেল যে, তরল জলটা সোনার টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যেন জমে যাচ্ছে দেখতে না দেখতে। তারপর, খেতে বসে সেখানেও ঐ বিভ্রাট আর কি! অর্থাৎ, মিডাস্ যখন দেখলে যে, তার স্পর্শে থালা বাটি সবই সোনা হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, সে তখন মুচকে একটু হাসল। কিন্তু পরক্ষণেই তার সে হাসি, ভ্রূকুটিতে পরিণত হ'ল। কেননা, যেই না রাজা তার সামনে সুস্বাদু এবং সুগন্ধি সেই সব নানা রকম খাদ্য থেকে একগ্রাস মাত্র মুখে তুলেছে, অমনি সেগুলো যেন কোন ধাতু পদার্থের মতই বিস্বাদ হয়ে ঠোঁটে ঠেক্‌ল। যাই হোক্, মিডাস্ যে সহজে ছেড়ে দেবার লোক নয়, সে বোধ করি বুঝতেই পারছ সবাই। এখন, সে করলে কি, সেই মহামূল্য খাদ্যগুলোকে বৃথাই গিলবার চেষ্টা করলে, এবং দাঁত দিয়ে কড়মড় করে ভাঙ্গলেও। কিন্তু, ভাঙ্গলে কি হবে, সেই মহার্ঘ এবং মিষ্টি খাবারগুলো যেমন শক্ত, তেমনি স্বাদেও ছাইএর মত বিশ্রী! এই ত গেল খাবারের ব্যাপার। তারপর, সে যখন পিপাসা মিটিয়ে নিতে, একপাত্র মদ মুখের কাছে ধরছে, মুহূর্ত্তে সেই তরল পানীয়টাও দেখতে দেখতে জমাট বাঁধা একটা সোনার টুক্‌রো হয়ে গেল।

ক্ষুধা তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে, শেষ পর্য্যন্ত মিডাস্ এই কৃত্রিম খাদ্যগুলোর সামনে থেকে বিরক্ত ভাবে উঠেই পড়ল। কেননা খাদ্য নিয়ে এই ভাবে পরিহাস, ব্যাপারটাত' সত্যিই সহজ নয়! কিন্তু, কি করা যায়, দেবতার কাছে মিডাস ত' এই বরই চেয়েছিল, কেমন নয় কি? এখন পেটের জ্বালায় অস্থির হয়ে, অর্থলোভী রাজা, শেষ পর্য্যন্ত তারই প্রাসাদের রান্না ঘরে অতি দুস্থ গরীব যে ছোট্ট বাচ্চা চাকর, সেই চাকরটাকেও আজ সে হিংসা করলে জীবনে এই প্রথম, রাজার চেয়েও চাকরটা সুখী ভেবে। কেননা, এই যে দেখতে দেখতে রাজভাণ্ডারে ধন-সম্পত্তি ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে, এতে মিডাসের ক্ষুধা তৃষ্ণায় কিছুমাত্র সান্ত্বনা হচ্ছে না। উপরন্তু, সোনা দেখলেই যেন মিডাসের সারা গা ঘুলিয়ে উঠছে!

আরও এক সমস্যা হ'ল যে, মিডাস তার সন্তানদের যদি আদর করে জড়িয়ে ধরে, কিংবা যদি ক্রীতদাসদের সে মারে, সেই মুহূর্ত্তে তারা নিশ্চল প্রাণহীন সোনার মূর্ত্তি হয়ে ঐখানেই খাড়া হয়ে থাকে।

চারিদিকেই কেবল, সোনা আর সোনা! চোখের সামনে সোনার এই বিরক্তিজনক হল্‌দেটে প্রভায়, মিডাসের যেন পাগল হবার উপক্রম। যাই হোক্ যখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসে এই ঘৃণ্য বিরক্তিকর ধন-সম্পত্তিগুলোকে কিছুটা ঢেকে দিলে, তখন যেন মিডাস্ স্বস্তি পেলে। সে এইভাবে তার সোনা হয়ে যাওয়া সেই ভারী পোষাকটা গা থেকে খুলে, ছুঁড়ে ফেলে দিলে। তারপর, আরামের একটা শ্বাস মনে করে, নরম তক্‌তকে গদি আঁটা সোফাটায় হাত পা ছড়িয়ে. লম্বা টান হয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু সেখানেও আবার বিভ্রাট! মিডাসের ছোঁয়া লেগে, এই সোফাটাও সোনার মত শক্ত, আর ঠাণ্ডা হতে সুরু করলে অন্যান্য জিনিষগুলোর মতই। এখন সে যায় কোথায়? সুতরাং পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী হয়েও, অতি অভাগার মতই সারাটা রাত মিডাসকে ঐ সোফাতেই ছট্‌ফট্ করে কাটাতে হল। এখন, এইভাবে সারাটা রাত হতাশায় এবং নিদ্রাহীনভাবে কাটানর পর যেই না ভোরের অল্প অল্প আলো ফুটেছে, মিডাস্ সেই মুহূর্ত্তে বেরিয়ে পড়ল ডাইওনাইসাসের উদ্দেশ্যে। এবং সেখানে পৌঁছে সে শুধু দেবতার কাছে সকাতরে অনুরোধ করলে যে, তার উপর থেকে, অনুগ্রহ করে এই ক্লেশকর প্রসিদ্ধ বরটি তুলে নেওয়া হোক।

মিডাসের এই প্রার্থনা শুনে, দেবতা তখন ভৎ'সনা করে বলে উঠল—হুঁ মানুষ যা পাবার জন্য লোভাতুর হয়ে ওঠে, শেষ পর্য্যন্ত তার পক্ষে সেটা রীতি মত অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়!! যাক্, তবু আর একবার আমি তোমার ঈপ্সিত মতই বর দিচ্ছি। প্যাক্‌টোলাস্ নদীর উৎসটি খুঁজে বার কর এবং সেই পবিত্র জলে স্নান করলেই এই অভিশপ্ত বর থেকে তুমি মুক্ত হতে পারবে।

দেবতার কাছে পুনরায় অনুগ্রহ পেয়ে, মিডাস যে তাকে ধন্যবাদ দেবে, সেই সময়টুকু পর্য্যন্ত, রাজা অপেক্ষা করলে না। তক্ষুণি ঐ আরোগ্যকারী নদীর খোঁজে সে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে পড়ল।

রাজা মিডাস্ হেঁটে চলেছে। শেষ পর্য্যন্ত অসহ্য ক্ষুধা তৃষ্ণায় তাড়িত হয়ে লোভী মিডাস্ বহু পাহাড়-পর্ব্বত, উপত্যকার উপর দিয়ে, হাঁপাতে হাঁপাতে এক সময় ক্লান্ত পায়ে এসে উপস্থিত হ'ল সেই দেবতার বর্ণিত প্যাক্‌টোলাস্ নদীর উৎস মুখে।

অবশ্য এই নদীর বিষয়ে, এখন লোকে বলে যে, মিডাসের পায়ের ছোঁয়ায় নদীর পাড়ের বালিগুলো সোনালী ডোরাকাটা হয়ে গেছে, এবং মাটি খুঁড়লে বলে, মিডাসের পায়ের চিহ্ন এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যেতে পারে।

যাই হোক্, সে বিষয় নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাতে হবে না। মোট গল্পটা কি হ'ল, এখন তাই হ'চ্ছে কথা। হ্যাঁ, মিডাস্ শেষ পর্য্যন্ত হাঁপাতে হাঁপাতে এসেই পৌঁছুল নদীর কাছে। এখন, যেই না তার ঐ উত্তপ্ত শরীরটা নিয়ে সে স্রোতের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, অমনি দেখে কি, এমন যে সুন্দর কাঁচের মত স্বচ্ছ ঠাণ্ডা জল, কেমন যেন হাল্‌কা মত একটা সোনালী দাগ ঐ জলে পড়েছে। কিন্তু, অবাক কাণ্ড, মাথাটা জলে ডুবিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ মারাত্মক বরটি থেকে, মিডাস্ মুক্ত হ'ল। মিডাস তখন আনন্দে একেবারে বাক্ হারা হয়ে জল থেকে পাড়ে উঠে আসে, তারপর, সাধারণ মানুষের মতই আবার সে খেতে এবং পান করতে পারলে।

কিন্তু দুর্ভাগা রাজার তখন পর্য্যন্ত শাস্তির বাকী ছিল বলেই, আমাদের

গল্পটা এখানেই শেষ হয়ে গেল না। সুতরাং রাজা মিডাসের আরও কি হ'ল এখন তাই শোন।

এই রাজাটি দেবতাদের সঙ্গে সর্ব্বদাই যে আচার ব্যবহারে সে তাদের খুশী করতে পারত, তা নয়। অর্থাৎ সোনার লোভ থেকে এইভাবে মুক্তি পেয়েও, আর একটা জিনিষের প্রতি মিডাস্ আসক্ত ছিল। সেটা হ'ল নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান্ বলে ভাবা। অতএব জ্ঞানী রাজাটি তখন করলে কি জান, আনন্দিত মনে বনের চারিদিকে সে ঘুরতে লাগল। এইভাবে শ্যামল বন-ভূমিতে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এক সময় মিডাস্ উপস্থিত হ'ল যেখানে মহান্ দেবতা অ্যাপেলো, এবং প্যান্ উভয়ে খুব বিবাদ করছিল সেইখানে। অবশ্য, এদের বিবাদের যথার্থ কারণটা হ'ল এই যে, অসভ্য প্যানের ধারণা অ্যাপেলোর বীণা অপেক্ষা তার বাঁশের বাঁশীটিই হচ্ছে বেশী ভাল এবং মিষ্টি বাজনা। সুতরাং প্যান্ তার বাঁশের বাঁশী নিয়ে গর্ব্ব করতে করতে ব্যাপারটা যখন বিবাদে পরিণত হ'ল, তখন তারা মিডাস্কে দেখতে পেলে। অতএব বুঝতেই পারছ যে, মিডাসের মত, এমন একজন জ্ঞানী এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিকে পেয়ে সহজে কি তারা ছাড়ে! তক্ষুণি তারা, মিডাসকে বিচারক হিসাবে খাড়া করে দিলে যে, কার বাজনা সব চেয়ে বেশী মিষ্টি শুনতে, রাজাই সেটা বিচার করে দেবে।

অতঃপর কিছুক্ষণ বাজনা শোনার পর এই মূর্খ মানবশ্রোতাটি বিচার করে বললে যে, প্যানের বাঁশের বাঁশীই হ'ল বেশী মিষ্টি। এখন এই কথা শোনা মাত্র, অ্যাপেলো গেল ভীষণ চটে। তখন সে এই দাম্ভিক মূর্খ রাজাকে শাস্তি দিতে করলে কি, যে কান দুটিতে মিডাসের সুর সম্বন্ধে কিছুমাত্র জ্ঞান নেই, সেই কান দুটোকে তখনি সে গাধার কান করে দিলে। যেমন, হেল্ আই কন্ পাহাড়ে মানবী কুমারী হয়েও, সঙ্গীত দেবীদের সঙ্গে সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় নামার জন্য, পিরাসের মেয়েদের উপর, দেবীরা ঘৃণা ও বিদ্বেষবশতঃ, তাদের পাখীতে পরিণত করেছিল, ঠিক তেমনি করেই অ্যাপেলো অনভিজ্ঞ এই বিচারকটির, বেসুরো কানটিকে গাধার কান দিয়ে মিডাসকে চির দিনের জন্য সুসজ্জিত করলে।

এখন পথ চলতি প্রথমেই যে পুকুরটা, সেই জলে মিডাস তাকিয়ে দেখলে যে, কিরকম, লজ্জাজনক চেহারাটা এবার তার হয়েছে। কিন্তু কোন উপায়ই আর নেই! ক্রুদ্ধ দেবতার কাছে কিছুমাত্র যে দয়া সে পাবে, এ ভরসা মিডাসের নেই। অতএব কোন উপায়-অন্ত আর না পেয়ে শেষ পর্য্যন্ত রাজাকে চোরের মত, রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে প্রাসাদে ঢুকতে হ'ল। এবং তারপর, এই লম্বা লোমশ কান দুটো, যাতে করে কেউ দেখতে না পায়, সেইজন্য একটা ব্যবস্থা সে করলে। অর্থাৎ, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকেরা যেমন, সূর্য্য তাপ থেকে বাঁচতে মাথায় চাদর জড়িয়ে রাখে, ঠিক তেমনি করে মিডাস, পূর্ব্ব দেশীয় লোকেদের মত, একটা চাদর রাতদিন মাথায় জড়িয়ে রাখতে সুরু করলে।

রাজ্যসুদ্ধলোক রাজার এই বেশ দেখে ত' অবাক! তারা ভেবেই পায় না এবেশ কেন? কিন্তু, রাজ্যের একটি লোকমাত্র জানত' ব্যাপারটার যথার্থ কারণ, সে হ'ল রাজার নাপিত। কেননা, সকলের কাছে গোপন করে চলা সম্ভব হ'লেও, নাপিতকে ত' না বলে পারা যাবে না! সুতরাং, তার কাছে মিডাস্ ব্যাপারটা প্রকাশ করতে বাধ্য হলেও, যথেষ্ট ভাবেই নাপিতকে সে, শাসিয়ে এবং নানা প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল, যাতে কোনরকমে কথাটা নাপিতের মুখ থেকে প্রকাশ না হয়ে পড়ে। কিন্তু, এখন ঐ নাপিত বেচারীর অবস্থাটা বোধ করি তোমরা ধারণাই করতে পারছ না। কেননা, একে এমন একটা ব্যাপার, তার উপর রীতিমত গোপন করে রাখতে হবে কথাটাকে। কিন্তু, কথাটা পেটের মধ্যে যেন তার গুড়্ গুড়্ করে ডাকতে থাকে বেরিয়ে পড়ার আগ্রহে। উঃ, সে কি অসহ্য অবস্থা নাপিতের! গোপন কথার ভারে নাপিত হাঁস্ফাস্ করে, অথচ, মুখ ফুটে যে বলবে কাউকে, সে উপায়ও নেই। রাজার ক্রোধের ভয়টা ত' আছে তার! এদিকে, এত বড় গোপন কথাটা, পেটে রাখাও যে নাপিত বেচারীরপক্ষে অসম্ভব! সুতরাং, অনেক ভেবেচিন্তে, শেষে সে করলে কি জান,—একদিন চুপি চুপি চলে গেল নদীর পারে সেই একেবারে নির্জ্জন একটা স্থানে। তারপর সেখানে একটা গর্ত্ত খুঁড়ে, সেই গর্ত্তটাতে অতি গোপনে ফিস্ফিস্ করে বললে, "মিডাসের গাধা কান" কথার শেষে নাপিত ভাবলে যাক্ কথাটা বলাও হ'ল, এবং কেউ শুনলে না। অতএব বেশ নিশ্চিন্ত মনে হাল্কাভাবে নাপিত যে পেটের বোঝা নামিয়ে বাড়ী ফিরে গেল, সে কথা খুলে না বললেও তোমরা বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই। কিন্তু, এ যে কত বড় বিপদ করে গেল নাপিত, সেই আর বুঝতে পারলে না! মানে, ঐ নাপিতটা যে গর্ত্তটা করেছিল না, সেই গর্ত্তে ক'দিনাবাদে ধীরে ধীরে এক ঝাড় নল গাছ গজিয়ে উঠল। এবং সেই নল ঝাড়ে যখনই বাতাসের দোলা লাগে, তখনই সেগুলো ডানা দুলিয়ে ফিস্ফিসিয়ে বলতে থাকে—মিডাসের...গাধা কান, মিডাসের গাধা কান।'

এখন তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে, আশার অতিরিক্ত কোন জিনিষ আকাঙ্ক্ষা করতে নেই, এবং কখন জ্ঞানের অহঙ্কারও করতে নেই। সাবধান! রাজা মিডাসের মত কেউ আবার হয়ে বসনা যেন!

—

জাপান ও জাপানী শিক্ষা

অশোককুমার গুপ্ত

চেরী ফুলের দেশ জাপান। ঘন সবুজ পাইন শোভিত পর্ব্বতমালা আর নীল অম্বুঃ সমুদ্র পরিবেষ্টিত ছোট বড় দ্বীপ সম্বলিত এই জাপান দেশ সম্বন্ধে কিছু লিখতে হলে গোড়ার কথা খানিকটা জানান দরকার। জাপানের প্রাচীন নাম 'ওই আশিমা' অর্থাৎ বৃহৎ অষ্ট দ্বীপ। চীন দেশের পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত বলে পরবর্ত্তীকালে বর্ত্তমান জাপান 'নিপ্পন' বা সূর্য্যোদয়ের দেশ নামে পরিচিত হয়। নিপ্পন শব্দের চীনা ভাষায় উচ্চারণ হোলো 'জিপহেন', বিদেশীয়দের মুখে এই জিপহেনই জাপান নামে রূপান্তরিত হয়ে বিশ্বের দরবারে আজ পরিচিতি লাভ করেছে।

অন্যান্য পাঁচটা দেশের মত জাপানের প্রাচীন ইতিহাসও কিংবদন্তী-মূলক, জাপান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যে গল্প জাপানে প্রচলিত সেটা হচ্ছে স্বর্গের অধীশ্বরী সূর্য্যদেবী তাঁর পৈতৃক তিনটি রাজ চিহ্ন (তরবারি দর্পণ ও রত্ন) দান করে মর্ত্ত্যভূমি জাপানে অবতরণ করতে আদেশ করেন। সূর্য্যদেবীর পৌত্র যথারীতি দেবীর আদেশ ও আশীর্ব্বাদসহ যথাস্থান, জাপানে অবতরণ করেন। এর পর দেবীর অধস্তন পঞ্চম পুরুষ 'জিনমুটেন্নো' যখন ৬৬০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে জাপানের সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন থেকেই নাকি জাপান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। কিংবদন্তী অনুসারে জিনমুটেন্নোই জাপানের সর্ব্বপ্রথম সম্রাট।

জাপানী-সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দেখা যায়। মিশর, চীন অথবা ভারতবর্ষের মত জাপানী সভ্যতা অতটা প্রাচীন না হলেও তাকে যে একেবারে নবীন সভ্যতার আওতায় ফেলা যায় 'নারা যুগ', 'ফুজিআরা যুগ' ইত্যাদির ইতিহাস থাকতে সে কথা জোর করে বলা কঠিন। তবে এ কথা সত্য, জাপানের প্রকৃত সভ্যতার বিকাশ যে যুগেই হোক্ না কেন, বহির্বিশ্বে সেটা স্বীকৃতি লাভ করেছে, আজ থেকে বেশী দিন আগে নয়। 'মেইজি' যুগ থেকেই তার সূত্রপাত। মেইজি যুগ থেকেই জাপানে নবীন যুগের সৃষ্টি হয়। সম্রাট মেইজি' ১৮৬৮ খৃঃ থেকে ১৯১১খৃঃ পর্য্যন্ত জাপানের একচ্ছত্র সম্রাটরূপে রাজত্ব করেন, আর সেই সময়েই জাপান শিক্ষায়-দীক্ষায়, জ্ঞানে বিজ্ঞানে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতিলাভ করে এবং ১৯১৪ সালের বিশ্বযুদ্ধের পর পঞ্চ মহাশক্তির এক শক্তিরূপে পরিগণিত হয়। মোটামুটি এই হোলো জাপানের গোড়ার কথা।

এবারে জাপানের নব শিক্ষা ও তার প্রসার পদ্ধতি সম্বন্ধে খানিকটা আলোচনা করা যাক্। যে শিক্ষার কথা এখানে উল্লিখিত হচ্ছে সে শিক্ষার গোড়াপত্তন হয় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে। এই সময়ে প্রাচীন পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। পুরণো জাতির জীবনে আসে নব জীবনের জোয়ার, অজ্ঞতা এবং মূর্খতা দূরীকরণার্থে রাজকীয় ঘোষণার দ্বারা শ্রেণী নির্ব্বিশেষে বালক বালিকাদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। সম্রাট মেইজি ঘোষণা করেন যে "দেশে যেন কোন নিরক্ষর পরিবার না থাকে এবং কোন পরিবারে যেন নিরক্ষর লোক না থাকে"। ১৮৭২ সালের মেইজির এই ঘোষণাবাণী সত্যিই আজ স্বার্থকতা লাভ করেছে। সমগ্র জাপানে আজ নিরক্ষর লোক নেই বল্লেই চলে, আগেই বলেছি সম্রাটকে সূর্য্যদেবের প্রতীক বলে মনে করা হয়। জাপানের সর্ব্বত্র সূর্য্যদেব যেমন পূজিত, তাঁরও জীবন্ত-প্রতীক সম্রাট ও তেমনি পূজিত, জাপানীদের দেশ ভক্তি সম্রাটকেই কেন্দ্র করে। সম্রাটের জন্যই তারা বেঁচে থাকে, সম্রাটের জন্যই তারা হাসিমুখে প্রাণ দেয়। সম্রাট ছাড়া 'দেশের ভিন্ন কোন অস্তিত্ব তাদের কাছে নেই। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য বিবৃত করতে গিয়ে সম্রাট মেইজি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে পুর্ণরায় ঘোষণা করেন যে "পিতা মাতার প্রতি ভক্তি, ভাই বোনদের প্রতি স্নেহ ও প্রীতি, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একতার বন্ধন, বন্ধুর প্রতি বিশ্বাস এবং শিক্ষার মাধ্যমে নিজেকে বিনয়ী, নম্র ও ভদ্র করে তুলে সম্রাটের কাজে যোগ্য বলে বিবেচিত হতে হবে, আর তা হলেই, হবে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ।"

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত জাপানের শিক্ষা বিভাগও সরকার কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত। এই নিয়ন্ত্রণের ফলে গ্রামে এবং সহরে একই শ্রেণীর বিদ্যালয়ে একই রকম শিক্ষা-পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। জাপানে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা স্বয়ংপূর্ণ। আমাদের দেশের মত একটা আর একটার পরিপূরক নয়। জাপানের বেশীর ভাগ নরনারীই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেই কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করে।

প্রথমে প্রাথমিক শিক্ষার কথাই ধরা যাক্। জাপান দেশের প্রতিটি বালক বালিকাকে ৬ বৎসর বয়সের সময় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হতে হয় এবং সেখানে ৬ বৎসর কাল অধ্যয়ন করতে হয়। এই সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ মাতৃভাষা, নীতি, ইতিহাস, ভূগোল. গণিত, অঙ্কন, শারীরিক ব্যায়াম প্রভৃতি বিষয়ে যত্ন সহকারে শিক্ষা দেওয়া হয়। বালিকারা গার্হস্থ্য বিজ্ঞান এবং সূচী শিল্পে শিক্ষা লাভ করে। কোন কোন বিদ্যালয়ে হস্তশিল্প আর ব্যবসায়মূলক শিক্ষা দেবারও পদ্ধতি আছে। ক্লাস ঘরের দেওয়ালে টাঙানো বড় বড় মানচিত্র, তালিকা, ছবি প্রভৃতির মাধ্যমে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ে জগতে জাপানের স্থান কোথায়, সেটা দেখান হয়। জাপানে এই শ্রেণীর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ২৬০০০।২৭০০০ এবং প্রায় দেড় কোটি জাপানী বালক বালিকা এই সব বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করে।

আগেই বলেছি প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা স্বয়ংপূর্ণ। একটা আরেকটার পরিপূরক নয়। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করবার সময়েই ছেলেমেয়েদের এমন করে তৈরী করে দেওয়া হয় যে মাধ্যমিক অথবা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ না করলেও কার্য্যক্ষেত্রে তাদের বিশেষ কোন অসুবিধে ভোগ করতে হয় না। মাধ্যমিক বা উচ্চ শিক্ষা কেবলমাত্র বিশেষ বিষয়ে পারদর্শিতা লাভে ইচ্ছুক ছেলেমেয়েদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যে অগণিত ছেলেমেয়ে প্রতি বৎসর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করে বেরোয়, তাদের মধ্যে শতকরা ১০।১২ জন ছাত্র এবং ৬।৭জন ছাত্রী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছেলে এবং মেয়েদের পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো এই কারণে পৃথক পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত, যেমন—ছেলেদের জন্য আছে মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সাধারণ বিদ্যালয় প্রভৃতি আর মেয়েদের জন্য উচ্চ বিদ্যালয়, শিল্প শিক্ষা বিদ্যালয় ইত্যাদি। ছেলেদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঁচ বৎসর এবং মেয়েদের উচ্চ বিদ্যালয়ে চার থেকে ছয় বৎসর শিক্ষা লাভ করতে হয়। পাঠ্য পুস্তকের ভেতর তাদের পড়তে হয় নীতি বিজ্ঞান, জাপানী ভাষা ও সাহিত্য, চীনা সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, আইন ইত্যাদি। এগুলোর ভেতর কতকগুলো অবশ্যপাঠ্য. আর বাকিগুলো ছেলেমেয়েরা ইচ্ছানুসারে গ্রহণ করে থাকে। যারা আরও উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক, মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে তাদের তিন বৎসর উচ্চতর বিদ্যালয়ে পড়তে হয়। উচ্চতর বিদ্যালয়ের শিক্ষা দু-ভাগে বিভক্ত, যথা, কলা বিভাগ ও বিজ্ঞান বিভাগ। এই হোলো মোটামুটি জাপানের শিক্ষা-ব্যবস্থা-পদ্ধতি।

মেইজি যুগ (১৮৬৮-১৯১২) এর পর থেকে আজ পর্য্যন্ত মাত্র এই ৮৬ বছরের সভ্যতা নিয়ে শিক্ষায় দীক্ষায়, জ্ঞানে বিজ্ঞানে জাপান যে অদ্ভুত রকম এগিয়ে গেছে সেটা সত্যিই বিস্ময়কর। বর্ত্তমান উন্নত দেশগুলোর মধ্যে, জাপান সর্ব্বশেষে যান্ত্রিক সভ্যতা গ্রহণ করেছে একথা ঠিক—কিন্তু সকলের পেছনে পড়ে থাকা জাতটা এত দ্রুত যে আজ সকলের সামনে এসে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছে সামান্য ৮৬টা বছর সম্বল করে হাজার হাজার বছরের সভ্য দেশগুলোকে লজ্জা দিতে, সে কথা ভাবলে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। সামরিক রণ-কৌশল ও রাজনীতিতে জাপান যে কোন দেশ থেকে ছোটো নয়, গত বিশ্বযুদ্ধে সে কথা প্রমাণ হয়ে গেছে। এশিয়ার গৌরব জাপান আজ বিশ্বে অভিনন্দিত।



উনিশ

"Tenho mina—tenho mina !"

জোয়ার-ভাঁটায় রাজহাঁসের মতো ভাসতে ভাসতে রাজশেখর শ্রেষ্ঠীর বজরা এগিয়ে চলল। তীরের রেখা ক্রমেই ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে দুধারে। একদিক শুধুই ধূ-ধূ করছে—অন্যদিকে কালো কালো বিন্দুর মতো গাছপালার অস্পষ্ট স্বাক্ষর। মাঝখানে অতল জলন্ত জল। তার গেরুয়া রঙ ক্রমশ নীলিম হয়ে আসছে—তার স্বাদ এখন তীব্র লবণাক্ত।

শঙ্খদত্তের মনে পড়ল, সমুদ্র আর দূরে নয়। আবার সে সাগরের কাছাকাছি এসে পড়েছে। একদিন সমুদ্রের কালো অন্ধকারেই সে তার ভুলের মাশুল চুকিয়ে দিয়ে এসেছে। হারিয়ে গেছে তার দেবদাসী শম্পা—ডুবে গেছে তার বাণিজ্য-বহর। মৃত্যুর চাইতেও অসহ্য গ্লানি আর লজ্জা নিয়ে এখন সে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজ তার সপ্তগ্রামে ফিরে যাবার মুখ নেই, তার সাহস নেই যে শ্রেষ্ঠী ধনদত্তের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াবে।

পর্তুগীজ দস্যুরা তার বহর ডুবিয়ে দিয়েছে। তাতে লজ্জার কোনো কারণ নেই। কিছুদিন থেকেই এই শয়তান ক্রীশ্চানের দল সমুদ্রের বিভীষিকা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাদের কামানের মুখে শঙ্খদত্তের জাহাজ ডুবে গেছে—সেজন্য তার অপরাধ নেই, কেউ তাকে দোষও দেবে না। কিন্তু—

কিন্তু নিজের মনের কাছে কী বলে কৈফিয়ৎ দেবে শঙ্খদত্ত? সে জানে—সে বিশ্বাস করে, তার বহর ডুবির জন্যে দায়ী ক্রীশ্চানেরা নয়। সে অপরাধ করেছিল জগন্নাথের কাছে—দেববধূকে হরণ করে পালিয়ে যাচ্ছিল চোরের মতো। সে জানত না—শুধু মন্দিরের অন্ধকারেই দারুব্রহ্মের চোখ স্তব্ধ হয়ে থাকে না; তাঁর দৃষ্টির আগুন জ্বলে সূর্য-চন্দ্রে, তারায় তারায় তাকিয়ে থাকে তাঁর অসংখ্য চোখ—আকাশের বিদ্যুতে লক লক করে তাঁর ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটি।

তার পাপ। তারই পাপে ভরাডুবি হয়েছে! জগন্নাথ তাঁর বধূকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন, আর মাথার ওপর অভিশাপের বোঝা বয়ে প্রেতের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে শঙ্খদত্ত।

কী বলবে সে ধনদত্তকে? কী জবাব দেবে গুরু সোমদেবের কাছে?

নদীর জলন্ত জলে যেন নীল-সমুদ্রের সংকেত। গঙ্গা-সাগর তীর্থ আর বেশি দূরে নেই। আর একটা বাঁক ঘুরলেই সাগরদ্বীপের রেখা চোখে পড়বে—একটু আগেই মাল্লা-মাঝিদের সঙ্গে কথা কইছিলেন রাজশেখর। শঙ্খ-দত্তের ইচ্ছা হল, একবার চিৎকার করে বলে, কাকা, ফিরে চলুন। হিংস্র ক্রুদ্ধ সমুদ্রের কাছ থেকে একবার আমি পালিয়ে এসেছি—আর একবার মুঠোর মধ্যে পেলে আমাকে আর ছাড়বে না। হয়তো আমার পাপে এই বজরাও—

শঙ্খদত্তের হৃৎপিণ্ড হঠাৎ যেন থমকে গেল। কী হবে তা হলে? যেমন করে শম্পাকে সমুদ্র গ্রাস করেছে, তেমনি ভাবে গ্রাস করবে সুপর্ণাকেও?

আবার তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল সুপর্ণার দিকে। তেমনি উদাস লক্ষ্যহীন চোখে সে চেয়ে আছে জলের দিকে। মানুষ নয়—মোমের মূর্তি। নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা ভালো

করে বোঝাও যায় না। রাজশেখরকে কথা দিয়েছে এই মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে।

কেন করবে?

শুধুই সহানুভূতি? এমন একটি স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের তিলে তিলে এই অপমৃত্যুকে সে সইতে পারছে না? অথবা রাজশেখর শ্রেষ্ঠী তার দূর সম্পর্কের আত্মীয় বলে এটুকু নিছক কর্তব্য বোধ?

অথবা!

নিজের ঠোঁটটাকে প্রাণপণে কামড়ে ধরল শঙ্খদত্ত। কিছুদিন থেকেই তীব্র যন্ত্রণার একটা আত্মনিগ্রহ তার ভালো লাগে; সূচিকাভরণের জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে যেমন সৃষ্টি হয় বিষক্রিয়ার নেশা—ঠিক তেমনই অবস্থা হয়েছে তার। একটু পরেই ঠোঁটটা টনটন করতে লাগল, একটা মৃদু লোনা স্বাদে ভরে উঠল শঙ্খদত্তের মুখ।

সেই অবস্থায়, বড় বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে শঙ্খদত্ত বললে, না—না, দেবতার কাছে কোনো মতেই আমি হার স্বীকার করব না।

শম্পার মতো সুপর্ণাও তো দেবতার শিকার। শৈব রাজশেখর শক্তির কাছে হার মেনেছিলেন, তাঁর দেবতাকে মানুষের রক্ত দিয়ে শোধন করে নিতে চেয়েছিলেন তিনি। তাই রুদ্রের দণ্ড নেমেছে তাঁরও ওপরে। তাঁর একমাত্র সন্তান চিরদিনের মতো নীরব হয়ে গেছে। ডাকলে শুনতে পায় না, শুনলেও সাড়া দেয় না। মানুষের ভাষা সে ভুলে গেছে—সেই সঙ্গে ভুলে গেছে মানুষের পৃথিবীকেও।

কিন্তু বারে বারেই কি দেবতার চক্রান্তের কাছে শঙ্খদত্ত হার মানবে? একবার মাথা তুলে দাঁড়াবে না, একবারও প্রতিবাদ করবে না? শম্পাকে বাঁচাতে পারে নি, তাই বলে সুপর্ণাকেও দেবতার হাতেই সঁপে দেবে? —না। ওর মুখে আমি কথা ফিরিয়ে আনব। ওর অন্ধকার মনের মধ্যে জ্বালিয়ে তুলব চৈতন্যের মশাল।

পৃথিবীর আলোয় বাতাসে আবার আমি ফিরিয়ে আনব ওকে।

বজরার ছাতে বসে মাঝিদের সঙ্গে কথা বলছেন রাজশেখর। একটা দূরবীণ হাতে লক্ষ্য করছেন দূর-দূরান্তের তটরেখা। শঙ্খদত্তের স্বগতোক্তি তাঁর কানে গেল না।

শঙ্খদত্ত ডাকল, সুপর্ণা!

সুপর্ণা ফিরেও তাকালো না। বিরাট বিশাল নদীর ওপর সে তার চোখ দুটি ছড়িয়ে রেখে দিয়েছে। কী যেন অনবরত দেখে চলেছে, সেখান থেকে আর তার দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে পারছে না কিছুতেই।

শঙ্খদত্ত আবার ডাকল: সুপর্ণা—সুপর্ণা!

ও নামে কেউ কোথাও ছিল না—চিরদিনের মতোই ওই নামের অস্তিত্ব মুছে গেছে পৃথিবী থেকে। যেমন করে রোদ ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে মুছে যায় শিশিরবিন্দু; যেমন করে ঝড়ের হাওয়ায় মিলিয়ে যায় ফুলের গন্ধ; যেমন করে একটু পরেই রামধনুর চিহ্ন-মাত্র কোথাও থাকে না; আর যেমন করে চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে দেবদাসী শম্পাকে গ্রাস করে রাক্ষস সমুদ্রের জল।

—তাকাও এদিকে সুপর্ণা। সুপর্ণা, কথা বলো—

কে কথা বলবে? ফুলের গন্ধ যখন হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে যায়, তখন কে তাকে ফিরিয়ে আনতে পারে ফুলের বুকে? ইন্দ্রধনুর রঙকে আবার কে আলাদা করে বেছে নিতে পারে খরধার সূর্যের আলো থেকে? সুপর্ণার যে মন—যে বুদ্ধি তাকে ছাড়িয়ে আজ ছড়িয়ে পড়েছে অন্তহীন আকাশে, নদীর এই বিশাল বিস্তারের ভেতরে—সেখান থেকে মনের সেই কোটি কোটি বিন্দুকে কুড়িয়ে আনা যাবে কোন্ মন্ত্রে?

তবু সুপর্ণা ফিরে তাকালো এবার। কেন তাকালো সেই-ই জানে। হয়তো একভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শারীরিক যন্ত্রণা বোধ করছিল একটা, হয়তো শুধুই তার অর্থহীন খেয়াল, নয়তো নিছক একটা মস্তিষ্কহীন দৈহিক ক্রিয়া।

তবু সে ফিরে তাকালো। কী আশ্চর্য কালো তার বিষণ্ণ চোখ! শঙ্খদত্তের শম্পার চোখকে মনে পড়ল। সে চোখ কেমন তরল, যেন নদীর স্রোতের মতো বয়ে চলেছে, তার ওপরে ঝলমল করছে সূর্যের আলো। আর এ চোখ যেন গভীর, গম্ভীর—একটা দীঘির জলের মতো স্থির হয়ে আছে, এর নিবিড়পদ্ম যেন আমের জামের নিবিড় ছায়ার মতো তার ওপর বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে।

—কথা বলো সুপর্ণা, কথা বলো—

সুপর্ণা তবু কথা বললে না, শুধু একটুখানি শীর্ণ হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটের কোনায়। সে-হাসি ভোরের পাণ্ডুর নক্ষত্রের মতো। পৃথিবীর দিকে সে তাকিয়ে আছে—অথচ কোনোদিকেই তাকিয়ে নেই। তার দৃষ্টি ভেসে আসছে একটা শূন্য আকাশের মধ্য দিয়ে—তা দিয়ে সকলকে দেখা যায়, অথচ কাউকেই দেখা যায় না।

—তোমাকে আমি কথা বলাব সুপর্ণা, তোমাকে আমি বাঁচিয়ে তুলব দেবতার গ্রাস থেকে।—উন্মত্তভাবে ভাবল শঙ্খদত্ত। আকাশের তারা মাটির ফুল হয়ে ফুটে উঠবে।

শুধু শম্পা নয়—সুপর্ণাও সুন্দর। ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে বলেই সে আরো বেশি অপরূপ। দুর্লভের জন্যেই তো শঙ্খদত্তের চিরদিনের আকর্ষণ। তাই সপ্তগ্রামে যখন সঙ্গী আর বন্ধুর দল কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে মোহর নিয়ে জুয়ো খেলে—তখন শঙ্খদত্ত বেরিয়ে পড়ে দক্ষিণ পাটনের সুদূর সমুদ্রের আকর্ষণে। সরস্বতীর কূলে কোনো আলোককুঞ্জে তারা যখন বসন্ত-সঙ্গিনীর ঠোঁটে তপ্ত-কামনার মুখবন্ধ রচনা করে—তখন পূর্বঘাটের পাহাড়ের তলায় ফেনিল তরঙ্গ-মন্দ্রের সঙ্গে সিন্ধু-শকুনের কান্না শোনে শঙ্খদত্ত। বাতায়ন থেকে যৌবনমত্তা শ্রেষ্ঠী কন্যার কালো চোখের বাণ তার নিরুত্তাপ মনের বর্মে প্রতিহত হয়ে যায়, তাকে মৃত্যুর মোহে অবশ করে সাপের মাথার মণি দেবনর্তকী শম্পা।

শুধুই সুপর্ণা—শুধুই রাজশেখর শ্রেষ্ঠীর মেয়েকে সে কি কোনোদিন তাকিয়েও দেখত? এই মুহূর্তে তার কাছ থেকে মাত্র তিন হাত দূরে যে আত্মমগ্ন হয়ে বসে আছে—সে সেই সুদূরতমা। তাকে তার পেতেই হবে। কিন্তু কোন্ পথে? মনের ভেতরে একটা হিংস্র বর্বর রাঘবকে খুঁজে ফিরছে—খুঁজছে একটা প্রচণ্ড শক্তিকে—যা ভয়ঙ্কর আঘাত দিয়ে সুপর্ণাকে জীবনের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে পারে। কোথায় সে শক্তি? কোথায় আছে তা?

জীবনে আর একবার শঙ্খদত্তের রক্তে তীব্র একটা কলরোল বেজে উঠতে লাগল। সে কি তা হলে সুপর্ণাকে ভালোবাসল? আবার?

এইখানে মহর্ষি কপিল ধ্যান করছিলেন—কত হাজার হাজার বছর ধরে, কে জানে। পঞ্চ প্রাণবায়ুকে রুদ্ধ করে নিজের মধ্যে নিষ্কম্প দীপশিখার মতো মগ্ন হয়ে ছিলেন তিনি। তাঁরই আশ্রম প্রান্ত থেকে সগরের অশ্বমেধের ঘোড়া হরণ করলেন স্বর্গপতি ইন্দ্র।

সগরের ষাট হাজার হতভাগ্য পুত্র অকালে মুনির ধ্যান ভাঙিয়ে ভস্মস্তূপে পরিণত হল। আরো বহু দিন, বহু বছর কেটে গেল তারপরে। ভগীরথের শঙ্খরবে মর্ত্যে নামলেন জাহ্নবী। কিন্তু কোথায় সে ভস্মস্তূপ? কত বৈশাখী ঝড়, কত বর্ষা তাদের নিশ্চিহ্ন করে মুছে দিয়েছে পৃথিবী থেকে।

গঙ্গা বললেন, কোথায় গেল ভস্ম? কেমন করে তোমার পিতৃকুলকে আমি ত্রাণ করব?

মহাবিপদে পড়লেন ভগীরথ। অনেক চিন্তা করে বললেন, মা, যখন এত অনুগ্রহ করেছেন তখন আরো একটু করুন। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়েই আমার ষাট হাজার পিতৃপুরুষের দেহভস্ম ছড়িয়ে রয়েছে। আপনি এর সমস্তটাই একবার পরিক্রমা করুন।

গঙ্গা অনুরোধ রাখলেন। লক্ষ লক্ষ যোজন ধরে পরিক্রমা করলেন তিনি। সৃষ্টি হল সাগর। সগরের ষাট হাজার পুত্র—যারা আকাশে নিরালম্ব রূপে, বায়ুভূতে নিরাশ্রয় হয়ে প্রেতের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তারা মুক্তি লাভ করে স্বর্গে চলে গেল।

সৃষ্টি হল মহাতীর্থ গঙ্গা সাগর।

সেই গঙ্গা সাগরে কপিল মুনির আশ্রমে বাৎসরিক মহামেলা। দূর-দূরান্ত দেশ-বিদেশ থেকে এসেছে তীর্থযাত্রীর দল। সাগর দ্বীপের অরণ্যময় পঙ্কিল তীরে শত শত নৌকোর ভিড়। গঙ্গার মন্দির আর মহর্ষি কপিলের আশ্রম লোকে লোকারণ্য। ফুল, মিষ্টি, দুধ অবারিত ধারায় ঝরে পড়ছে। দলে দলে ভিক্ষুক এসেছে, এসেছে সন্ন্যাসী। এখানে ওখানে ধুনি জলছে, শোনা যাচ্ছে মন্ত্রপাঠ। চারদিকের নলবন আর এলোমেলো জঙ্গল পরিষ্কার করে সারি সারি কুঁড়ে ঘর উঠেছে।

রাজশেখর বজরাতেই থাকবেন স্থির করেছিলেন। ডাঙার মাটি জলে কাদায় একাকার—যেন বিরাট একটা পঙ্ককুণ্ডের ভেতরে একদল বুনো মোষের মতো চলা ফেরা করছে তীর্থযাত্রীর দল। তার ভেতরে বাস করার প্রবৃত্তি তাঁর



জীবনে এমন চমৎকার রান্না আগে কখনও করিনি
...কিন্তু কি ক'রে হোলো তা বুঝলাম না!



সবকিছুই অন্যদিনের মতো ছিল। স্বামীর ফিরতে দেরী, ছেলেরা হাত ধুতে গিয়ে মারামারি, ইতিমধ্যে ছোট বাচ্ছাটা আবার উঠে পড়লো। যাই হোক শেষ অবধি সবাই খেতে ব'সলো—খাবার পরিবেশন করলাম রোজকার মতই! হঠাৎ লক্ষ্য ক'রে দেখি কারো মুখে কথাটি নেই, সবাই খেতে ব্যস্ত—হাপুশ হুপুশ শব্দে সবাই খেয়ে যাচ্ছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছিল না—একি স্বপ্ন না সত্যি। কি এমন অসাধারণ কাজ করেছি যাতে এই পরিবর্ত্তন হোলো?

যে স্বামী, ছেলেমেয়েরা রান্না ভাল হয়নি ব'লে রোজ খুঁৎখুঁৎ করে, হঠাৎ তাদের আজ একি ব্যাপার? খাওয়া হ'য়ে গেলে ভাবতে বসলাম। বাজার নতুন কিছু কিনেছি ব'লে ত মনে প'ড়ছে না...তরিতরকারী, মাছ,...হ্যাঁ হ্যাঁ মনে প'ড়েছে, মনে প'ড়েছে একটা জিনিস শুধু নতুন কিনেছি বটে!

দোকানদারের পরামর্শে আজই সকালে বায়ুরোধক শীল-করা একটিন ডাল্‌ডা বনস্পতি কিনে তাতেই রান্না করেছি। দোকানদার বলেছিল বটে যে ভাজায়, রান্না করায়, মিষ্টি তৈরীর কাজে, এক কথায় সবরকম রান্নার পক্ষেই ডাল্‌ডা বনস্পতি আদর্শ। আরও বলেছিল ডাল্‌ডা সবরকম খাবারের স্বাদগন্ধ ফুটিয়ে তোলে।

এতদিনে স্বামী আর ছেলেমেয়েদের ডাল্‌ডা বনস্পতিতে আমার রাঁধা খাবার খাইয়ে যে খুসী করতে পেরিছি তা ভেবে আনন্দ হ'লো। ডাল্‌ডা বনস্পতি সবরকম রান্নার পক্ষেই উৎকৃষ্ট আর এতে



খাবারের স্বাভাবিক স্বাদ-গন্ধ ফুটে ওঠে! রান্নার জন্য খুচরো স্নেহপদার্থ কিনে বিপদ ডেকে আনবেন না। মনে রাখবেন খুচরো ও খোলা অবস্থায় দামী জিনিষেও ভেজাল থাকতে পারে ও তাতে মশামাছি, ধুলোবালি প'ড়তে পারে। আর সেইরকম স্নেহপদার্থে তৈরী রান্না খেয়ে আপনার অসুখ বিসুখ ক'রতে পারে। ডাল্‌ডা বনস্পতি সর্ব্বদা বায়ুরোধক, শীল-করা টিনে তাজা ও খাঁটি থাকে। ডাল্‌ডা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল আর এতে খরচও কম! ফের যখন বাজার করতে বেরোবেন ডাল্‌ডার কথা ভুলবেন না।

১০, ৫, ২, ১ ও ½ পাউণ্ড টিনে পাবেন।

ডাল্‌ডায় এখন ভিটামিন এ ও ডি দেওয়া হয়।

বিনামূল্যে উপদেশের জন্য আজই লিখুনঃ

দি ডাল্‌ডা
এ্যাডভাইসারি সার্ভিস
পোঃ, বক্স নং ৩৫৩, বোম্বাই ১

ডাল্‌ডা বনস্পতি
রাঁধতে ভালো - খরচ কম



গাছ মার্কা টিন
দেখে নেবেন

HVM. 218-X BG

ছিল না। সুপর্ণা, শঙ্খদত্ত আর জনকয়েক চাকর-মাল্লা নিয়ে তিনি কপিলের আশ্রমের দিকে পা বাড়াবেন—এমন সময় একটা বিচিত্র দৃশ্যে তাঁরা থমকে দাঁড়ালেন।

গঙ্গার লোনা জল যেখানে নীল-সমুদ্রের বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, ফেনায় ফেনায় যেখানে প্রকৃতির একটা হিংস্র উদ্দাম উল্লাস আর আধ-ডোবা একটা বালির ডাঙার ওপর যেখানে মানুষের এত কোলাহল সত্বেও একদল অচঞ্চল পাখি নিজেদের মনেই কী যেন ঠুকরে বেড়াচ্ছে, তিনখানা বড় বড় নৌকো সেই সাগর-সঙ্গমের দিকে এগিয়ে চলেছে। ডিঙ্গি-ধরণের খোলা নৌকো—সবই দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। প্রথম নৌকোতে একদল মেয়ে-পুরুষ—এতদূর থেকেও দেখা যায়, একটি অল্প বয়েসী বৌ দু হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে তাতে। মাঝখানের নৌকোটি সব চেয়ে বড়—তাতে ঢাক-ঢোল বাজছে, কয়েকজন মানুষ ধুনুচি হাতে ঘুরে ঘুরে নাচছে তার ওপরে। যে দাঁড় ধরে দাঁড়িয়ে আছে, সেও মাথার ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে দুলিয়ে তালে তালে পা ঠুকছে গলুইয়ের ওপর। সবচেয়ে পেছনের নৌকোয় প্রায় পঁচিশ ত্রিশজন মানুষ—ঢাক-ঢোলের আওয়াজ ছাপিয়েও তাদের চীৎকার শোনা যাচ্ছে : জয়—মা গঙ্গার জয়!

মেলার অর্ধেক লোক জড়ো হয়েছে জলের ধারে এসে। সকলের দৃষ্টি ওই নৌকোর দিকেই। একটা চাপা উত্তেজনার গুঞ্জন উঠছে চারদিকে—আগ্রহে জ্বলজ্বল করছে চোখ।

জিজ্ঞাসা করার দরকার ছিল না, তবু প্রশ্ন করলেন রাজশেখর : কী ব্যাপার?

একসঙ্গে অনেকেই জবাব দিলে। তাদের কথা থেকে আবিষ্কার করা গেল, শ্রীপুরের ছোট রাণী গঙ্গাসাগরে সন্তান দিতে এসেছেন।

গঙ্গাসাগরে সন্তান! সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল শঙ্খদত্তের। রাক্ষস—সমুদ্র রাক্ষস! দিনের পর দিন কত বলি সে নেয়, তবু তার পেট ভরে না। তাই শম্পাকেও সে গ্রাস করেছে!

একজন বললে, ছেলেটাকে আমি দেখেছি। কী সুন্দর—যেন মোমের পুতুল! মায়ের বুকের মধ্যে যেন হাসছিল, যেন পদ্মফুল ফুটে রয়েছে একটা।

অল্প বয়েসী একটি বিধবা আঁচলে চোখ মুছল। ধরা গলায় বললে, আহা—কোন্ প্রাণে অমন ছেলেকে মা হয়ে জলে ফেলে দিচ্ছে!

পাশের বুড়ো মতন মানুষটি—বাপ কিংবা শ্বশুর হবে, চাপা গলায় ধমক দিলে একটা। বললে, ছিঃ—ছিঃ, ও কথা বলতে নেই। দেবতার কাছে মানত রয়েছে, তাঁর জিনিস তাঁকে তো দিতেই হবে।

—ছাইয়ের দেবতা!—বিধবাটি হঠাৎ ডুকরে উঠল : আমিও তো আমার প্রথম সন্তানকে এম্‌নি করে গঙ্গায় দিয়েছিলাম। কী লাভ হল তাতে? আমার কোল তো আর ভরল না। বরং বছর ঘুরতে না ঘুরতেই কপালের সিঁদুর আমার চিরদিনের মতো মুছে গেল!

সঙ্গের বুড়ো লোকটি ভারী বিব্রত হয়ে উঠল। বিপন্ন-ভাবে চারদিকে তাকিয়ে দেখলে, কেউ তাদের লক্ষ্য করছে কিনা! এমন অধর্মের আর অশাস্ত্রের কথা শুনলে লোকে ভাববে কী!

বুড়ো বললে, থাক—থাক, ওসব কথা থাক। চলো, এখান থেকে আমরা যাই। এইবেলা পূজো দিয়ে আসি, মন্দিরের কাছে ভিড়টা নিশ্চয় অনেকখানি কমেছে এতক্ষণে।

অল্প-বয়েসী বিধবাটি তবু নড়ল না। সইতে পারছে না, চলেও যেতে পারছে না। সমস্ত দৃশ্যটার একটা বিষাক্ত আকর্ষণে সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তবুও। হয়তো আর একজনকে সন্তান ভাসিয়ে দিতে দেখে নিজের মনে মনেও জোর পাবে খানিকটা; হয়তো ভাবতে পারবে—অতল সমুদ্রের অসংখ্য ঢেউয়ে ঢেউয়ে তার খোকা এতদিন মাকে কেঁদে কেঁদে খুঁজে ফিরছে, এবার হয়তো একটি সঙ্গী জুটবে তার।

নদী আর সমুদ্রের নীল-গৈরিক রেখার ওপরে গিয়ে পৌঁচেছে নৌকো তিনটি। একরাশ পুঞ্জিত ফেনার ওপর দোলনার মতো দুলছে তারা। সমুদ্রের অশ্রান্ত ফোঁসানির সঙ্গে ঢাক-ঢোলের শব্দ চারদিকে একটা অমানুষিক ধ্বনি-তরঙ্গ সৃষ্টি করেছে।

তীর থেকে সমস্ত মানুষগুলি আকুল আগ্রহে তাকিয়ে রয়েছে। প্রতীক্ষায় যেন ঠিকরে বেরিয়ে যাচ্ছে তাদের চোখের তারা। মাঝের নৌকোর মানুষগুলি পাগলের মতো নাচতে শুরু করেছে।

হঠাৎ প্রথম নৌকোটি সকলের চাইতে আলাদা হয়ে খানিকটা পাশে সরে গেল। দু হাতে যে-মেয়েটি মুখ ঢেকে বসেছিল, নৌকোর একটা পাশের দিকে ঝুঁলে পড়ল সে। এত দূর থেকেও দেখা গেল, তার হাতে একটি শিশু।

আস্তে শিশুটিকে নীল-গৈরিক জলের পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনার ওপরে ছেড়ে দিলে সে। পরক্ষণেই দেখা গেল, সেও পাগলের মতো জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে চাইছে যেন। মাথার একরাশ রুক্ষ চুল তার উড়ছে সমুদ্রের হাওয়ায়—গায়ের থেকে কাপড় খসে পড়েছে।

তিন চারজন তাকে সঙ্গে সঙ্গে টেনে ধরল পেছন থেকে। নৌকোর ভেতরে যেন উপুড় হয়ে পড়ে গেল মেয়েটি—তাকে আর দেখা গেল না। ওদিকে তখন আকাশ ফাটানো চিৎকার উঠেছে: জয়—মা গঙ্গার জয়!—ঢাক-ঢোলের শব্দ এমনি উদ্দাম হয়ে উঠেছে, যে এতক্ষণের নিশ্চিন্ত পাখিগুলো পর্যন্ত এইবার আতঙ্কে ডানা মেলেছে আকাশে। ধূপ-ধুনোর ধোঁয়া এমনি পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে উড়ছে যে মনে হচ্ছে একটা চিতা জ্বলছে সাগর-সঙ্গমের অতল জলের ওপর।

ডাঙা থেকেও তখন তারস্বরে চিৎকার উঠছে: জয়—মা গঙ্গার জয়—

তার মাঝখানেই দেখা গেল, বোবা গলায় একটা আর্তনাদ তুলে মাটির ভেতরে মুখ গুঁজড়ে পড়েছে সেই বিধবা মেয়েটি। অজ্ঞান হয়ে গেছে।

—ও বৌমা—ও বৌমা! এ কী হল! এখন আমি কী করি!—সেই বুড়ো সঙ্গীটির ভয়ার্ত আকৃতি।

সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শঙ্খদত্ত দেখল, সাগর সঙ্গমের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন রাজশেখর। তাঁর সমস্ত মুখ বেদনায় বিকৃত। সুপর্ণাও তাঁরই মতো তাকিয়ে আছে সেদিকে—কিন্তু কোথাও কোনো অভিব্যক্তি নেই। সেও সব দেখেছে, সব শুনেছে—কিন্তু বাইরের জগতের যা কিছু ঘটনা, সবই কতগুলো উড়ন্ত ছায়ার মতো ভেঙ্গে গেছে তার মনের আকাশ দিয়ে—কোথাও এতটুকু ছায়া ফেলে নি।

রাজশেখরই কথা বললেন সকলের আগে।

—চলো, পুজো দিয়ে আসি। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে আর!

অন্ধকার থাকতেই শঙ্খদত্তের ঘুম ভাঙল।

ভোরের হাওয়ায় শীত করতে শুরু হয়েছিল, গায়ের ওপরে একটা আবরণ টেনে দিয়েও ভাঙা ঘুমটা আর তার জোড়া লাগল না। কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করতে লাগল সে। বজরার ভেতরে ঝাপসা অন্ধকার—তবুও আবছা আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছে সব। রাজশেখর শ্রেষ্ঠী অঘোরে ঘুমুচ্ছেন—সুপর্ণা যথানিয়মে কখন উঠে বসেছে জানলার কাছে। রাত্রে কখন ঘুমিয়েছিল কে জানে! অথবা আদৌ সে ঘুমোয় কিনা সে-কথাই বা কে বলবে!

বাইরে সাগর-দ্বীপ এখনো ভালো করে জাগে নি, তবুও মানুষের চলা ফেরা শুরু হয়েছে—শোনা যাচ্ছে কথার আওয়াজ। সমুদ্রের শোঁ শোঁ আর গঙ্গার কলতানের সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের প্রথম শঙ্খ-ঘণ্টার গম্ভীর শব্দ উঠছে। কোথায় যেন চীৎকার করে ভজন গান গাইছে একজন সন্ন্যাসী—কেন কে জানে, কেমন অলৌকিক মনে হচ্ছে তার গলার স্বর।

আরো কিছুক্ষণ চুপ করে পড়ে রইল শঙ্খদত্ত। আর একটি সকাল। কিন্তু কোনো আশা নিয়ে আসছে না, নিয়ে আসছে না কোনো নতুন আলো, আর নতুন সম্ভাবনার সংবাদ। আবার একটি দীর্ঘ ক্লান্তিকর দিন। নিজের হতাশাক্ষুব্ধ মনের ভেতরে আবার শূন্যতার মন্থন। শম্পা হারিয়ে গেছে, সুপর্ণাও আর কথা কইবে না। দেবতা তাকে গ্রাস করেছে, চিরদিনের মতোই ছিনিয়ে নিয়েছে মানুষের কাছ থেকে। বৃথা চেষ্টা। অভিশপ্ত, প্রেতগ্রস্ত শঙ্খদত্তের কোথাও না আছে আশ্রয়, না আছে সান্ত্বনা।

কোথায় যাবে শঙ্খদত্ত?

সপ্তগ্রামে? না। গুরু সোমদেবের কাছে? না।

জীবন। একটা কলঙ্কিত নাটকের ওপরে আশ্চর্য আর অসমাপ্ত পূর্ণচ্ছেদ।

শঙ্খদত্তের চোখ দুটো আবার জড়িয়ে আসতে লাগল। ঘুমে নয়—অবসাদে। শ্মশানে কোনো পরম প্রিয়জনের চিতাভস্ম ধুয়ে দেবার পরে যে অবসাদ সারা শরীরকে ভারাক্রান্ত করে, সেই ক্লান্তি—সেই মন্থরতা। অথবা: অথবা কোনো মৃত আত্মার মতো দাঁড়িয়ে থাকা নিজের নিঃসঙ্গ

চিতার পাশে। পৃথিবীর অবলম্বন নেই—শূন্যময় আকাশে পথ-রেখা নেই কোথাও। নিজের ভস্মশেষ দেহের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলা—তারপর হা-হা রবে আর্তস্বর তুলে মিলিয়ে যাওয়া কোনো রন্ধ্রহীন অন্ধকারে।

হঠাৎ শঙ্খদত্তের চমক ভাঙল। ভাঙল একটা আর্ত চিৎকারে।

রাজশেখর উঠে বসবার আগে, মাঝিদের বিহ্বল সুপ্তি সম্পূর্ণ কেটে যাওয়ার আগে—শঙ্খদত্ত এক লাফে বজরার বাইরে চলে এল। পালের খুঁটিটা ধরে মাতালের মতো টলছে সুপর্ণা। কিসের খেয়ালে যে বাইরের খোলা হাওয়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল, সে কথা একমাত্র সেই-ই জানে।

আবার একটা তীক্ষ্ণ গগনভেদী চিৎকার করল সুপর্ণা। চার বছর পরে এই প্রথম মানুষের স্বর বেরিয়ে এল তার গলা দিয়ে।

—কী ও! কী ওখানে?

ভোরের আলো স্পষ্টতর হয়ে উঠছে তখন। একটু একটু করে অরুণ-দীপ্ত হয়ে উঠছে নদীর জল। সেই রক্তাভায় চোখে পড়ল এক বীভৎস করুণ-দৃশ্য। জোয়ারের জল নেমে গেছে—বজরার আশে-পাশে ভেসে উঠেছে অনেকখানি পঙ্কতট। তারই ওপরে পড়ে আছে একটি শিশুর ছিন্নমুণ্ড। সুন্দর-শুভ্র মুখখানি একটুও মলিন হয় নি, শরীরের বাকী অংশ তার হাঙরে খেয়ে ফেলেছে, তবু মনে হচ্ছে বিশৃঙ্খল সোনালি চুলে ছাওয়া মাথাটি তুলিয়ে এখনি সে খিল খিল করে হেসে উঠবে!

দু হাতে চোখ ঢাকতে যাচ্ছিল শঙ্খদত্ত, তার আগেই দেখল, বজরা থেকে টলে জলের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে সুপর্ণা। শঙ্খদত্ত তাকে জড়িয়ে ধরল।

সুপর্ণার স্বর আবার যেন শত খান হয়ে ফেটে পড়ল: কী ও? কী ওখানে?

সঙ্গে সঙ্গেই একটা উন্মত্ত আনন্দধ্বনি শোনা গেল রাজশেখরের: কথা বলেছে—চার বছর পরে ও কথা বলেছে!

ক্রমশঃ

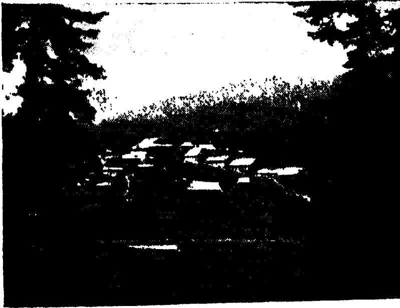
কাশ্মীর



শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

ইতিমধ্যে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত ও পাকিস্থান বিভক্ত হোয়েছে। উভয় রাষ্ট্রই চায় কাশ্মীর তার দিকে যোগ দিক—কাশ্মীর-মহারাজা ভেবেছিলেন এই সুযোগে তিনি নিরপেক্ষ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে কাশ্মীরকে প্রতিষ্ঠিত কোরবেন। শ্রীকাকের স্থলে মহারাজা পাঞ্জাবের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীমেহের চাঁদ মহাজনকে ইতিমধ্যে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিয়োগ করেন। এই পাঞ্জাবী হিন্দুর নিয়োগকে শেখ আব্দুল্লা তথা তাঁর ন্যাশান্যাল কনফারেন্স ভাল চোখে দেখেন নি। ভারত বিভাগের পর মহারাজা পাকিস্থানের সঙ্গে একটা স্থিতাবস্থা চুক্তি করেন। ইংরেজ আমলে কাশ্মীরের সঙ্গে ভারত সরকারের যে সকল সম্বন্ধ ও সর্ত্ত ছিল বোলে অভিহিত করেন এবং কাশ্মীর কোনদিকে যোগ দেবে তা স্থির কোরবেন মহারাজা, কাশ্মীরবাসী নয় এই মত প্রকাশ করেন। তিনি সম্ভবতঃ ভেবেছিলেন মহারাজাকে চাপ দিয়ে পাকিস্থানে যোগ দিতে রাজী করান সহজ হবে—কিন্তু মুসলীম লীগের বিরোধী দলের নেতা আবদুল্লা সাহেবকে দলে আনা কঠিন হবে। আদর্শের ঝগড়া ছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে জিন্না সাহেবের সঙ্গে আবদুল্লা সাহেবের ইতিপূর্ব্বে মনোমালিন্য ঘোটেছিল, আর এদিকে শ্রীনেহেরুর সঙ্গে আবদুল্লা সাহেবের সৌহার্দ্দ্যের বন্ধন ঘনিষ্ঠতর হোয়ে উঠছিল। তাই কাশ্মীরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধিয়ে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা পাকিস্থানের প্রয়োজন হোল। শ্রীনগর থেকে দূরে



প্রথম দৃষ্টিতে গুলমার্গ



শিকারার ব্যাপারী

তাকেই মেনে উভয়পক্ষ চোলবেন স্থির হয়। পাকিস্থানের জনক জনাব জিন্না প্রায়ই ধরেই নিয়েছিলেন যে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ মুসলমান-অধ্যুষিত জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য তাঁর পাকিস্থানের অন্তর্গত হবে, কিন্তু তার এ সাধে বাদ সাধলেন জাতীয়তাবাদী শ্রীনেহেরুর বন্ধু শেখ আবদুল্লা। তিনি খোলাখুলিভাবে মিঃ জিন্নার দ্বি-জাতি তত্বের নিন্দা কোরে ভারতীয় কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী আদর্শে আস্থা জানালেন। শেখ সাহেবের দেশ-প্রেম এবং নির্ভীকতায় অধিকাংশ কাশ্মীরবাসী তাঁকেই সমর্থন জানাল। মিঃ জিন্না "কাশ্মীর ছাড়" আন্দোলন সমর্থন করেন নাই—একে গুণ্ডামী আবদুল্লা সাহেবের সাক্ষাৎ প্রভাবের গণ্ডীর বাইরে পুঞ্চ এলাকার মুসল-মানদের ক্ষেপিয়ে হিন্দুনিধন যজ্ঞ আরম্ভ হোল। পাকিস্থান পেছন থেকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে নিজেদের সৈন্যদের ছুটি দিয়ে উপজাতিদের সাহায্য কোরতে পাঠিয়ে দিলে। নিরস্ত্র অসহায় সংখ্যালঘু হিন্দুদের হত্যা কোরে, তাদের সম্পত্তি লুণ্ঠন কোরে, নারীধর্ষণ কোরে, অগ্নিদাহের বিভীষিকা সৃষ্টি কোরে হিন্দু রাজার শাসন ব্যবস্থা অচল কোরে দেওয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য।

মহারাজের মুষ্টিমেয় সৈন্য উপজাতিদের এবং পাকিস্থানের সাহায্য

প্রাপ্ত সাম্প্রদায়িক উন্মাদনায় ক্ষিপ্ত প্রজাদের সহজে আয়ত্বে আনতে পারলো না—ক্রমে এই উন্মাদনা, লুঠের লোভ, নারীর মোহ, ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পোড়ল। মহারাজের অনেক মুসলমান সৈন্য ও বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিলে। শাসন ভাঙ্গার নেশা এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে পোড়ল—এমন কি শ্রীনগরেও সমস্ত পোষ্ট অফিস ও সরকারী অনেক অফিসে পাকিস্থানী পতাকা উড়তে লাগলো। এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্থান কাশ্মীরের সব ক'টী বাইরের রাস্তা অবরোধ কোরে দিলে। এর ফলে চিনি, নুন, কাপড়, পেট্রল প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ থেকেই শুধু কাশ্মীর বঞ্চিত হোল না, তার আমদানী শুল্ক বাবদ রাজস্ব দৈনিক ৩০ হাজার টাকা থেকে মাত্র কয়েক শত টাকায় নেমে এল। বলা বাহুল্য এই অবরোধ স্থিতাবস্থা-চুক্তি ভঙ্গ কোরেই করা হোয়েছিল। এর সঙ্গে ১৯৪৭ সালের ২২শে অক্টোবর দলবদ্ধভাবে সামরিক কায়দায় উপজাতি দস্যু আধুনিক অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হোয়ে হাজারে হাজারে মুজফরবাদে আক্রমণ সুরু করে এবং ২৪শে অক্টোবর দখল কোরে লুঠ, অগ্নিদাহ ও নারী-ধর্ষণের নারকীয়



পহলগামের একাংশ

তাণ্ডবের সৃষ্টি করে। সাফল্যের আস্ফালনে উন্মত্ত হোয়ে পঙ্গপালের মত এই নরপশুর দল চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে ও ২৬শে অক্টোবর বারামুল্লা সহর দখল করে নেয়। বারামুল্লা সহরের সমস্ত যুবতী নারীকে ক্যাম্পে আটকে রেখে এই বর্বরের দল তাদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করে। বলা বাহুল্য এই অত্যাচার বা লুঠনে তারা এত উন্মত্ত হয় যে হিন্দু মুসলমান বাছবার অবসরও তাদের ছিল না। মহারাজার সৈনাধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার রাজেন্দ্র সিংহ যথেষ্ট সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে এদের বাধা দেন, কিন্তু তাঁর মুষ্টিমেয় সৈন্য এই পঙ্গপাল দলকে বাধা দিতে পারে নাই। পশুর মত এই হানাদারের দল বারামুল্লা থেকে ক্রমে শোপুর, হান্দওয়ারা, গুলমার্গ এবং বেদগামের দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

এই আক্রমণ এমন অতর্কিত, দ্রুত ও সুপরিকল্পিত যে এতবড় নৃশংস আক্রমণের কাহিনী ভারতবর্ষের তথা পৃথিবীর লোক জানতে পারলো ২৬শে অক্টোবর অর্থাৎ ৪।৫ দিন পর। পাকিস্থানের পরিকল্পিত প্রচণ্ড এই আঘাতে মহারাজা, শেখ আবদুল্লা তথা কাশ্মীরবাসী বুঝতে পারলো যে আজকের জগতে কাশ্মীরের মত ছোট দুর্ব্বল রাজ্যের সার্ব্বভৌম স্বাধীনতার স্বপ্ন কত অলীক। প্রধান মন্ত্রী শ্রীমহাজন এবং শেখ আবদুল্লা ছুটে এলেন নূতন দিল্লীতে ২৬শে অক্টোবর। কাশ্মীরকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করে নিয়ে তাকে সৈন্য ও সামরিক সাহায্য দিয়ে রক্ষার জন্য আবেদন জানালেন। মহারাজা শাসনভার সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ কোরে শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে গঠিত একটি অন্তবর্ত্তীকালীন সরকার গঠন কোরবেন এবং পরে কাশ্মীরের জনসাধারণ নিজেদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন কোরে শাসন পরিষদ গঠন কোরবে এবং নিজেদের পছন্দমত ভবিষ্যতে ভারত বা পাকিস্থানে যোগ দেবে এই সর্ত্তে কাশ্মীরকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত কোরে ২৭শে অক্টোবর ভারত সরকার বিমানবাহিনী ও সামরিক বাহিনী কাশ্মীরের সাহায্যের জন্য প্রেরণ করেন। ৩০শে অক্টোবর ১৯৪৭ শেখ আবদুল্লা অন্তবর্ত্তী সরকারের প্রধান হিসেবে ঘোষিত হন। শ্রীনগর থেকে মাত্র ৩০।৩৫ মাইল দূরে তখন পাকিস্থানী পরিচালিত আফ্রিদি ও অন্যান্য উপজাতিরা যুদ্ধজয়ের আনন্দে উন্মত্ত। শেখ আবদুল্লার শাসন ক্ষমতা লাভে এবং ভারতীয় বিমানবাহিনীর সৈন্যদের আগমনে মুহ্যমান কাশ্মীরী জনতা নবপ্রেরণা লাভ কোরল। শ্রীনগরে তখন সমস্ত শাসন-ব্যবস্থা ভেঙ্গে পোড়েছিল—ন্যাশন্যাল কনফারেন্সের স্বেচ্ছাসেবক দল সহরের পুলিশ বিভাগের কাজের ভার নিলে। এদিকে মুষ্টিমেয় ভারতীয় সৈন্য যারা প্রথম বিমানে এসে পৌছিল, লেঃ কর্ণেল দেওয়ান রঞ্জিৎ রায়ের অধিনায়কত্বে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ শত্রু সৈন্যের সম্মুখীন হোয়ে—তারা অসীম শৌর্য্য ও কর্ত্তব্য পরায়ণতার পরিচয় দিয়ে প্রায় সকলেই নিজেদের প্রাণ বলি দিল, কিন্তু এতে হানাদারদের অগ্রগতি রুদ্ধ হোল। কাশ্মীরে এই যুদ্ধে ভারতীয় অধিনায়ক ও সেনানীদের অদ্ভুৎ আত্মত্যাগের এমনি বহু ঘটনা আছে যা ইতিহাসের অনেক মহান দেশপ্রেম ও বীরত্বের আদর্শকেও ম্লান কোরে দিতে পারে। সুযোগ হোলে এদের বীর্য্যগাথার কিছু কিছু পরে বোলব।

২৬শে অক্টোবর কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হোল, সেইদিনই মাত্র বিমানবাহিনীর মাধ্যমে সামরিক সাহায্য প্রেরিত হোল। স্থলপথে যোগাযোগের সব রাস্তাগুলিই তখন পাকিস্থানের কবলে; কাজেই পাঠানকোঠ থেকে নূতন রাস্তা বিদ্যুৎগতিতে নির্ম্মিত হোতে সুরু হোল। ৮ই নভেম্বর ভারতীয় বাহিনী বারামুল্লা পুনরুদ্ধার কোরে নেয়; শোপুর আগেই অধিকৃত হয়। ১১ই নভেম্বর দূরবর্ত্তী উরি থেকেও শত্রুসৈন্য বিতাড়িত হয়। ঐ তারিখেই প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু শ্রীনগরে উপস্থিত হন। কাশ্মীর করায়ত্ত হোয়েও হঠাৎ এই ভাবে হস্তচ্যুত হওয়ায় জিন্না সাহেব বিষম খাপ্পা হোয়ে উঠলেন। যেদিনই লাহোরে খবর পৌছল যে বারামুল্লা হাতের বাইরে চোলে গেছে, সেইদিনই মধ্যরাত্রে গভর্ণর জেনারেল জিন্না সাহেব পরামর্শ দাতাদের এক সভা আহ্বান করেন এবং পাকিস্তান বাহিনার সর্ব্বাধিনায়ক জেনারেল গ্র্যাসিকে অবিলম্বে সামরিক বাহিনী নিয়ে বারামুল্লা দখল করার হুকুম দেন। বারামুল্লা, শ্রীনগরের বিমাণ ঘাঁটী এবং বানিহাল গিরিবর্ত্ম দখল কোরতে পারলেই ভারতের পক্ষে কাশ্মীরকে কোন সাহায্য করা অসম্ভব। জেনারেল গ্র্যাসির,

জিন্না সাহেবের মত অত উত্তেজনার কারণ ছিল না, তিনি বলে পাঠান কাশ্মীর এখন ভারতের অন্তর্ভুক্ত, কাজেই সেখানে সামরিক বাহিনীর সরকারী আক্রমণের অর্থ ভারতের সঙ্গে প্রকাশ্য যুদ্ধ—সেটা কতদূর সমীচীন হবে জিন্না সাহেব যেন ভেবে দেখেন। এর ফলে সরকারী সামরিক বাহিনী আর পাঠান হোল না, কিন্তু সৈন্যদের ছুটী দিয়ে অস্ত্র-শস্ত্র সমেত ছেড়ে দেওয়া হোল উপজাতিদের সাহায্যের জন্যে এবং সংবাদ পত্রে, রেডিওতে অবিরাম কাশ্মীরের মুসলমানদিগকে উত্তেজিত করা হোতে লাগলো, দুখানা বিমানও আক্রমণকারীদের হাতে বেসরকারী ভাবে দেওয়া হয়। সমস্ত কাশ্মীর উপত্যকার সমতলভূমি শত্রুসৈন্য শূন্য হওয়ার পর ভারত সরকার পাকিস্থানের বিরুদ্ধে আক্রমণের অভিযোগ এনে রাষ্ট্রসঙ্ঘে নালিস জানালেন। সেখানে আজ ৬ বছরের ওপর এ নিয়ে নানা টালবাহানা চোলছে—তা সংবাদ পত্রের পাঠকমাত্রেই জানেন। ১৯৪৮ সালের ৫ই মার্চ্চ মহারাজা হরিসিংহ একটি ঘোষণায় শেখ আবদুল্লাকে প্রধান মন্ত্রীত্বে বরণ কোরে তাঁকেই রাষ্ট্রের প্রাপ্ত বয়স্কদের



আস্তাবলের একাংশ

ভোটাধিকার বলে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা একটি শাসনতন্ত্র রচনার ভার দেন। অতঃপর আবদুল্লা সরকারের এবং ভারত সরকারের চাপে মহারাজাকে ১৯৪৯ সালের ২০শে জুন তাঁর পুত্র যুবরাজ করণসিংকে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ কোরে রাজ্য থেকে সরে আসতে হয়। কাশ্মীরের অন্তবর্ত্তী সরকার কাশ্মীরের একটি পৃথক শাসনতন্ত্র রচনা কোরে, মহারাজার সমস্ত শক্তি লোপ কোরে, নিয়মতান্ত্রিক ভাবে যুবরাজ করণসিংহকে পাঁচ বছরের জন্য রাজ্যের প্রধান নিযুক্ত কোরলেন। তাঁর উপাধি হোল সর্দ্দার-ই-রিয়াসৎ। শেখ আবদুল্লা প্রধান মন্ত্রী হিসাবে সত্যকার শাসন ক্ষমতা হাতে পেলেন। সেদিনের রাজদ্রোহী আজ ভাগ্যচক্রে হোয়ে উঠলেন রাজ্যের অপ্রতিদ্বন্দী শাসক—শের-ই কাশ্মীর। কিন্তু ৮ই আগষ্টের রাত্রে (১৯৫৩) আবার কালের চক্র ঘটাল শেখ আব্দুল্লার ভাগ্যবিপর্য্যয়—বিশ্বাসঘাতকতা ও দেশদ্রোহিতার অপরাধে অতর্কিতে সে হলো বন্দী।

ইতিহাসের একটানা অনুসরণে আপনারা অনেকে হয়ত হাঁপিয়ে উঠেছেন। কাজেই এখন এখানেই ইতিহাসের ইতি করি।

এখানের ভিজিটার্স ব্যুরো মোটর বাসের ব্যবস্থা কোরেছে কাশ্মীরের বিভিন্ন স্থান দেখাবার জন্যে। কোনো কোনো জায়গায় রোজই বাস যায়। কোথাও বা সপ্তাহে দু' তিনবার। ভিজিটার্স ব্যুরোতে এই সব যাত্রার ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বহু বিষয়ের পুস্তিকা বিনামূল্যে পাওয়া যায়। আবার তারই কতকগুলি ট্রানস্পোর্ট কণ্ট্রোলারের অফিসে দাম নিয়ে বিক্রী করে। এই সব পুস্তিকা পূর্ব্বে সংগ্রহ কোরে নেওয়া ভাল। আমরা সরকারী বাস যে সব জায়গায় যায় তার জায়গাগুলিতেও গিয়েছিলাম।

এক এক দিনের যাত্রার কথা এবার বলি :—

উলার হ্রদ এলাকা :—সকাল বেলা ট্রান্সপোর্ট কণ্ট্রোলারের অফিস থেকে (নিডোজ হোটেলের কাছে, হোটেল রোডে) সকাল ৮টায় বাস ছাড়ার কথা ছিল, ছাড়লো ১০টায়; বাসের আড্ডায় প্রথমেই চোখে পোড়ল একটি পরিচিত মুখ—পণ্ডিত প্রবর ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সপরিবারে তিনিও এসেছেন এখানে বেড়াতে। বাসের আড্ডায় ও পরে বাসে কথাবার্ত্তার ফাঁকে ফাঁকে দেখা গেল কোট প্যাণ্টধারী যাত্রীদের অধিকাংশই বাঙ্গালী। বেশ লম্বা চওড়া জোয়ান; মাথায় কাশ্মীরী পশমের মুসলমানী টুপী, গলাবন্ধ লম্বা কোট আর পায়জামা পরণে—দেখে নিশ্চিত ধারণা কোরেছিলাম কোন পাঞ্জাবী মুসলমান, কিন্তু পরে দেখা গেল তিনি বিশুদ্ধ বাঙ্গালী-ব্রাহ্মণ সন্তান। বাঙ্গালী মেয়েদের শাড়ী পড়ার ধরণটা সহজেই তাঁদের চিনিয়ে দেয়; কিন্তু আধুনিক বাঙালীমেয়েদের বিভিন্ন ফ্যাসানের শাড়ী পরার কৌশল বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। তারা বাঙালী কি পার্শী, গুজরাটী, মারাঠী বা উত্তর প্রদেশীয় চেনা মুস্কিল। আরও অতি আধুনিকাদের গ্যারারা, শলোয়ার কামিজ ও ওড়না বাঙ্গালীর শালীনতাকে একেবারে উড়িয়ে দেয়। বাংলার বাইরে কথাবার্ত্তাও প্রায় সুরু হয় ইংরাজীতে, কাজেই কোথায় বাড়ী সোজা এই প্রশ্ন না কোরলে বেশ দেখে প্রদেশ ধরা বড় কঠিন।

শ্রীনগরে এবার (১৯৫২ সালে) এত বেশী বাঙ্গালীর ভীড় হয়েছিল যে, যে কোন বিদেশীকে প্রথমেই বাংলায় ভরসা কোরে কথা বলা চলে; শতকরা বিশ পঁচিশজন কষ্টে যেতে পারে, কিন্তু ৭৫জন ঠিকই বাঙ্গালী। এই সুদূর বিদেশে বাঙালীর বাহুল্য বিস্ময়কর বটে।

বাস ডালগেট হোয়ে বিতস্তার দক্ষিণ তীরে শহরের ভেতর দিয়ে এসে মাঠের মধ্যে পোড়ল। রাস্তা পাকা, কিন্তু পাঠানকোট থেকে শ্রীনগর পর্য্যন্ত যে পাকা রাস্তা তার মতো অত ভালো নয়। শহর থেকে ৩৪ মাইল এসে বাঁয়ে চোখে পোড়ল আনচার হ্রদের জল। এটা একটি ছোট অগভীর হ্রদ—নানা গাছপালা ও আবর্জ্জনায় আবদ্ধ। ডালের জলের সঙ্গেও এর যোগ আছে, কাজেই শীকারায় আসা যায়, এর পূর্ব্ব তীরে বিচারনাগ নামে একটা হিন্দু তীর্থ আছে। প্রায় ১৪ মাইল পর এলো গন্ধর্বল (হয়ত পূর্ব্বে ছিল গন্ধর্ব্ববল); গন্ধর্বল সিন্ধু নদীর তীরে একটি ছোট গ্রাম,—পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আফিস আছে ও ছোট একটি ডাক্তারখানা আছে।

গ্রীষ্মে এখানে হাজার হাজার স্বাস্থ্যান্বেষী এবং বিলাসীর ভীড় হয়। সিন্ধু নদীর বুকে বা তার নানা শাখা-প্রশাখায় তখন বহু নৌগৃহের নোঙ্গর পড়ে। সিন্ধুর তীরের সবুজ সমতলে শীতল চীনারের ঘন-ছায়ার তলে পড়ে বিভিন্ন তাঁবুর শ্রেণী, কেউ কেউ বা আশ্রয় নেন এখানের গ্রাম্য পর্ণকুটীরে। সিন্ধুর শীতল জল এবং এখানের নির্জ্জনতা অথচ শ্রীনগরের সান্নিধ্য একে বিদেশী বিলাসীদের কাছে বেশী প্রিয় কোরেছে। বলে রাখা ভালো সিন্ধুর জলে এখানে এত বেশীচূর্ণ, যে তা পানীয় হিসাবে অব্যবহার্য্য। তাই তীরের ঝরণা থেকে পানীয় জল আনতে হয়! সিন্ধুর শীতল জলে স্নান গ্রীষ্মে এখানের অন্যতম আকর্ষণ। শ্রীনগরের হোটেলে একজনের সঙ্গে পরে আলাপ হোয়েছিল—তিনি সপরিবারে শ্রীনগর থেকে বড় হাউস বোটে এখানে জল পথে এসেছিলেন, তিনি এখনকার অবস্থার প্রশংসা কোরলেন না, মানসবল ছাড়া উলার বা অন্য কোন জল-পথের তিনি সুখ্যাতি করেন নি—বোল্লেন আবর্জ্জনা ও পোকায় ভর্ত্তি, তাঁর মতে এ সময় জলপথে এসব জায়গা যাওয়া সময় ও অর্থের অপব্যয় মাত্র। ১৯৩০ সালে আমি শ্রীনগর থেকে জলপথে উলার আসি এবং বন্দীপুরা ও সোপুর হোয়ে স্থলপথে সারদাতীর্থে যাই—সেটা সম্ভব শ্রাবণ মাস, তখন কিন্তু এ পথ ভারী উপভোগ্য ছিল, শীতের দিকে হ্রদগুলি এবং জলপথ অনেকখানি শুকিয়ে যায়, কাজেই সৌন্দর্য্যও যায় ম্লান হোয়ে।

দেশবিদেশে

রাষ্ট্রগুরু, কবিগুরু ও বিদ্যাসাগর—

গত ৬ই ও ৭ই আগষ্ট যথাক্রমে রাষ্ট্রগুরু ও কবিগুরুর এবং গত ২৯শে জুলাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুদিবস সর্বত্র পালিত হইয়াছে। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম দেশবাসী প্রায় ভুলিতে বসিয়াছে—তাঁহার পরলোক গমনের পর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইলেও তাঁহার কোন জীবনী প্রকাশের চেষ্টা হয় নাই। ইহা দেশের পক্ষে কম দুর্ভাগ্যের কথা নহে। তাঁহার বারাকপুরস্থ বসতবাটীও ভগ্নপ্রায়—পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল উহা ক্রয় করিয়া তথায় একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবেন, সকলেই ইহা আশা করিতেছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার কাব্যের মধ্য দিয়া আমরা নিত্য স্মরণ করি। কাজেই অনুষ্ঠান করিয়া কবিগুরুকে স্মরণ করার প্রয়োজন হয় না। তথাপি তিনি যে দিন আমাদের ছাড়িয়া গিয়াছেন, সেই দিনে তাঁহার কথা যে আমরা বিশেষ ভাবে স্মরণের ব্যবস্থা করিব —ইহা স্বাভাবিক। যে স্থানে তাঁহার নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল, সেই স্থানটির উপযুক্ত মর্য্যাদা দান করা, বাঙ্গালী মাত্রেরই কর্তব্য। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুদিন পূর্বে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার আদর্শের কথা আজও আমাদের আলোচনার বস্তু। সেই তেজস্বী, কর্তব্যপরায়ণ, সহজ, সরল, পরদুঃখকাতর মানুষ বিদ্যাসাগরের আদর্শে কি বাঙ্গালার লোক আবার তাহাদের জীবন গঠন করিবে না?

স্বাধীনতা দিবসে সম্মান বিতরণ—

১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসে রাষ্ট্রপতি শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ নিম্নলিখিত রূপ সম্মান বিতরণ করিয়াছেন—(১) ভারতরত্ন —৩ জন (ক) শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী (খ) শ্রীসর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন (গ) শ্রীচন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমন। (২) পদ্মবিভূষণ — প্রথম বর্গ—৫ জন (ক)—শ্রীবালগঙ্গাধর খের (খ) শ্রীভি-কে-কৃষ্ণমেনন (গ) শ্রীনন্দলাল বসু (ঘ) অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও (ঙ) ডাঃ জাকির হোসেন—২ জন বাঙ্গালী নন্দলাল ও সত্যেন্দ্রনাথ। (৩) পদ্মবিভূষণ—২য় বর্গ—১৯ জন— তন্মধ্যে ২ জন বাঙ্গালী—(ক) ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ও (খ) প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযামিনী রায়। (৪) পদ্মবিভূষণ—৩য় বর্গ— ১৮ জন—তন্মধ্যে ৪ জন বাঙ্গালী—(ক) সিন্দ্রী সার কারখানার প্রধান টেকনোলজিষ্ট শ্রীক্ষিতীশরঞ্জন চক্রবর্ত্তী (খ) সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান পরিচালক শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দে (গ) উত্তরপ্রদেশ সেচ বিভাগের চিফ এঞ্জিনিয়ার শ্রীঅখিলচন্দ্র মিত্র ও (ঘ) কলিকাতা জিতেন্দ্রনারায়ণ রায় শিশু বিদ্যালয়ের শ্রীমতী মৃন্ময়ী রায়। আমরা তাঁহাদের এই সম্মান লাভে অভিনন্দন জানাইতেছি। জ্ঞানচন্দ্র ও সত্যেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং নন্দলাল ও যামিনী রায় শিল্পের ক্ষেত্রে বাঙ্গালীকে যাহা দিয়াছেন, বাঙ্গালার ইতিহাসে তাহা স্বর্ণক্ষেরে লিখিত রহিয়াছে।

পরলোকে সুরেশচন্দ্র মজুমদার—

আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং ডিরেকটার, প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ও ভারতীয় সংসদের সদস্য সুরেশচন্দ্র মজুমদার গত ১২ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার রাত্রি ১১টায় তাঁহার কলিকাতা বাগবাজার



পরলোকে সুরেশচন্দ্র মজুমদার

মদনমোহনতলাস্থ বাসভবনে ৬৬ বৎসর বয়সে সহসা পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। কলিকাতার সামাজিক জীবনে গত ৪০ বৎসরেরও অধিক কাল সুরেশচন্দ্র তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে নেতৃস্থানীয় ছিলেন। বহু বর্ষ ধরিয়া উত্তর কলিকাতার কংগ্রেস তাঁহার নেতৃত্বে পরিচালিত হইয়াছিল। মুদ্রণ যন্ত্র, মুদ্রণ-শিল্প ও মুদ্রাকর ব্যবসার সহিত তাঁহার ৫০ বৎসরের সম্পর্কের জন্য সকলে সর্ব্বদা তাঁহার উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করিত। সর্ব্বোপরি কলিকাতার ২ খানি শ্রেষ্ঠ দৈনিক সংবাদপত্রের পরিচালক হিসাবে বাঙ্গালা তথা ভারতের রাজনীতি, অর্থ-

নীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে সুরেশচন্দ্র নদীয়া কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করিয়া তথায় বাল্যশিক্ষা লাভ করেন। ১৯১০ সালে বিপ্লব আন্দোলন সম্পর্কে তিনি ধৃত হন—তখন ৮ ফুট লম্বা ও ৫ ফুট চওড়া সেলে তাঁহাকে দীর্ঘ ১৬ মাস কাটাইতে হইয়াছিল। ১৯১২ সাল হইতে তিনি প্রেসের কাজ আরম্ভ করেন ও ১৯১৪ সালে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। ৬ বৎসর কঠোর পরিশ্রমের পর তিনি বাংলা লাইনো টাইপ উদ্ভাবন করেন। পরে তিনি বাংলা টাইপ-রাইটারের কী-বোর্ডও উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। ১৯২২ সালে দোল পূর্ণিমার দিন তিনি আনন্দবাজার পত্রিকা (দৈনিক সংবাদপত্র) প্রতিষ্ঠা করেন—৩২ বৎসরের ইতিহাসে আনন্দবাজার পত্রিকার দান বাঙ্গালী কাহারও আজ অবিদিত নহে। স্বর্গত মৃণালকান্তি ঘোষ ও স্বর্গত প্রফুল্লকুমার সরকার এই কার্য্যে তাঁহার সহযোগী ছিলেন। প্রতিষ্ঠার ১০ বৎসর পর হইতে প্রচারাধিক্যের জন্য আনন্দবাজার পত্রিকা বর্ত্তমান ১নং বর্ম্মণ ষ্ট্রীটস্থ গৃহে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৩৭ সালে ঐ স্থান হইতে ইংরাজি দৈনিক হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড প্রকাশিত হয়। পুস্তক প্রকাশের দ্বারা জাতীয় সাহিত্য প্রচারে তাঁহার খুবই আগ্রহ ছিল—সেজন্য তিনি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তকও প্রচার করিয়াছিলেন। ১৯৪৭ সালে গণপরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হওয়ার পর হইতে তদবধি তিনি আইন পরিষদের কার্য্যের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত ছিলেন। তিনি প্রেস-মালিক সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া যেমন ছাপাখানার মালিকগণের স্বার্থ সংরক্ষণে চেষ্টা করিতেন, তেমনই প্রেস-কর্ম্মচারীদিগের দুঃখদুর্দ্দশা নিবারণেও সর্ব্বদা অবহিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে পশ্চিম বাংলার যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে।

কৃষি ও গো-পালন শিল্প শিক্ষালয়—

আমাদের দেশে কৃষি ও গো-পালনের প্রতি মানুষ বিমুখ হওয়ায় আজ আমাদের এত অধিক খাদ্যসমস্যা দেখা দিয়াছে। গো-পালনে কেহ আর মনোযোগী নহে বলিয়াই ভাল দুধ বা ঘি আমরা পাই না। এ বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য একজন স্বার্থত্যাগী কর্মী কলিকাতার নিকট দমদম ক্যান্টনমেণ্ট—কুমারপাড়া রোডে একটি কৃষি ও গোপালন শিল্প শিক্ষালয় স্থাপন করিয়াছেন। (১) ৬ মাসে ডেয়ারী ও গোপালন এবং (২) এক বৎসরে প্রাথমিক কৃষি বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। ট্রাকটার চালনা ও মেরামত শিক্ষাদানেরও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। কলিকাতার এত কাছে এই সকল বিষয় শিক্ষালাভ করিয়া দেশের তরুণগণ অতি সহজে স্বাধীনভাবে জীবিকার্জনের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। আজ সাধারণ মানুষের মন কৃষির প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। বহু ধনী ব্যক্তি ব্যবসা হিসাবে কৃষিক্ষেত্র ও গোপালন কার্য্যে আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। পূর্ববঙ্গাগত বহু গৃহস্থকে আমরা দুগ্ধের ব্যবসা দ্বারা সংসার প্রতিপালন করিতে দেখিতে পাই। তাহাদের কার্য্যপরিচালনায় সাহায্যের জন্য শিক্ষিত তরুণ কর্মীর অভাব। এই শিক্ষালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা সে অভাব অবশ্যই দূর করিতে পারিবেন। স্বাধীনভাবে ব্যবসা হিসাবে কৃষি ও গোপালন না করিলে আমাদের খাদ্য-সমস্যা বা দুগ্ধ-সমস্যা কিছুতেই দূর হইবে না। আমরা এ বিষয়ে দেশের চিন্তাশীল জন-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। যাঁহারা নূতন উদ্যম লইয়া এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করিয়াছেন, আমাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের ব্যবহারিক শিক্ষাদান প্রকৃত মানুষ তৈয়ার করিতে সমর্থ হইবে।

সংগীত বিদ্যায় উপাধি—

শ্রীমতী গৌরীরাণী দেবী (ইরা) বিষ্ণুপুর রামশরণ মিউজিক কলেজ হইতে এ বৎসর সংগীত পরীক্ষায় প্রথম



শ্রীমতী গৌরীরাণী দেবী

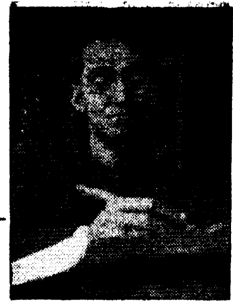
স্থান অধিকার করিয়া 'গীত সরস্বতী' উপাধি লাভ করিয়াছেন। আমরা শ্রীমতী গৌরীরাণী দেবীর সংগীত বিদ্যায় উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

খোশালপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য-কেন্দ্র—

গত ৮ই আগষ্ট তারিখে হাওড়া জেলায় আমতা থানার অন্তর্গত খোশালপুর ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর গ্রামে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের দ্বারোদ্‌ঘাটন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মাননীয় ডাঃ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় উক্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। সভায় পৌরোহিত্য করেন হাওড়ার জেলা শাসক শ্রীসুকুমার মল্লিক এবং বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আইন সভার অধ্যক্ষ শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় এবং সাধারণ স্বাস্থ্যসংসদের ডিরেক্টর ডাঃ ভূপেশচন্দ্র দাশগুপ্ত।







শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ক্যালকাটা ফুটবল লীগ ঃ

১৯৫৪ সালের ক্যালকাটা ফুটবল লীগের প্রথম বিভাগে মোহনবাগান ক্লাব লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে—২৬টা খেলায় ৪২ পয়েণ্ট পেয়ে। বাকি টো খেলায় পয়েণ্ট না পেলেও তাদের কোন যায় আসে না। এ পর্য্যন্ত মোহনবাগান ক্লাবের পক্ষে খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে—জয় ১৭, ড্র ৮ এবং হার ১—অপ্রত্যাশিতভাবে লীগের নিম্ন স্থান অধিকারী জর্জ্জ টেলিগ্রাফ দলের কাছে ০—১ গোলে। অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, সেম-সাইড গোল খেয়ে মোহনবাগানকে লীগের খেলায় এই প্রথম হার স্বীকার করতে হয়। জর্জ্জ টেলিগ্রাফ এই দুটি মূল্যবান পয়েণ্ট পেয়েও দ্বিতীয় বিভাগে নামার পাল্লা থেকে এখনও ছাড়ান পায়নি। দল হিসাবে মোহনবাগান শক্তিশালী হ'লেও লীগের খেলায় তাদের সূচনা আশাপ্রদ হয়নি। লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল দলের কাছে দুটি মূল্যবান পয়েণ্ট পেয়ে এবং প্রদর্শনী খেলায় অষ্ট্রিয়া আগত গ্রেজার দলকে হারিয়ে মোহনবাগান খেলায় যে প্রেরণা লাভ করে, তার ফলেই তাদের পরবর্ত্তী খেলায় প্রভূত উৎকর্ষতা লক্ষিত হয়। এই লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের জন্য দলের এই তিনজন খেলোয়াড় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রশংসার দাবী করতে পারেন—অধিনায়ক শৈলেন মান্না, রাইট-ব্যাক এস গুহ এবং সেণ্টার-হাফ সুভাষ সর্ব্বাধিকারী। এই নিয়ে মোহনবাগান পাঁচবার লীগ চ্যাম্পিয়ান হ'ল। ইতিপূর্ব্বে লীগ জয়ী হয়েছে—১৯৩৯, ১৯৪৩, ১৯৪৪ এবং ১৯৫১ সালে। প্রথম বিভাগের লীগের সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে মাত্র তিনটি ভারতীয় দল লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের গৌরব লাভ করেছে—মহমেডান স্পোর্টিং—(৮ বার – ১৯৩৪-৩৮, ১৯৪০-৪১ এবং ১৯৪৮), মোহনবাগান (৫ বার—১৯৩৯, ১৯৪৩-৪৪, ১৯৫১ এবং ১৯৫৪), ইস্টবেঙ্গল (৬ বার—১৯৪২, ১৯৪৫-৪৬, ১৯৪৯-৫০ এবং ১৯৫২)। প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয় মহমেডান স্পোর্টিং (১৯৩৪), ২য় হিসাবে মোহনবাগান (১৯৩৯) এবং ৩য় হিসাবে ইস্টবেঙ্গল (১৯৪২)।

এ বছরের খেলায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাদের সুনাম অনুযায়ী লীগে স্থান পায়নি। কারণ তাদের কয়েকজন নামকরা খেলোয়াড় দল পরিবর্ত্তন করায় তাদের আগের মত সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিশালী দল গঠন করতে যথেষ্ট অসুবিধায় পড়তে হয়। প্রবীণ খেলোয়াড় আপ্পারাও, প্রখ্যাত পাকিস্তানী খেলোয়াড় ফকরী এবং নতুন খেলোয়াড় নিয়াজ, তারাপদ রায় প্রভৃতির লীগের খেলায় যোগদান করা সত্ত্বেও দলের বিশেষ সুবিধা হয়নি। দলের অধিনায়ক আমেদ আপ্রাণ চেষ্টায় প্রশংসনীয়ভাবে খেলে এসেছেন।

বর্ত্তমানে লীগের রানার্স-আপের জন্য এরিয়ান্স এবং ওয়াড়ী দলের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে আশা করা যায়। লীগের তালিকায় সর্ব্বনিম্ন স্থান অধিকার ক'রে আছে ক্যালকাটা সার্ভিসেস দল। এবছর প্রথম বিভাগ থেকে দুটি দল দ্বিতীয় বিভাগে নামবে। সার্ভিসেস তার মধ্যে একটি। অপর কোন্ দল নামবে তারই লড়াই চলেছে এই তিনটি ক্লাবের মধ্যে—খিদিরপুর (২৪টা খেলায় ১৭ পয়েণ্ট), ভবানীপুর (২৩ খেলা, ১৬ পঃ) এবং জর্জ্জ টেলিগ্রাফ (২৫টা খেলা, ১৫ পঃ)।

লীগ তালিকায় প্রথম চারটি দল

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পয়েণ্ট
মোহনবাগান	২৬	১৭	৮	১	৩৪	৭	৪২
ইস্টবেঙ্গল	২৬	১৫	৬	৫	২৮	১৪	৩৬
উয়াড়ী	২২	১০	৯	৩	২২	১৩	২৯
এরিয়ান্স	২১	১১	৫	৫	২৪	১০	২৭

১০।৮।৫৪

ইংলণ্ড-পাকিস্তান টেষ্ট ক্রিকেটঃ

ম্যাঞ্চেষ্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে ইংলণ্ড বনাম পাকিস্তান দলের ৩য় টেষ্ট খেলা বৃষ্টির দরুণ পরিত্যক্ত হয়ে ড্র গেছে। পাকিস্তানের ভাগ্য ভাল, নচেৎ শোচনীয়ভাবে পরাজয় স্বীকার করতে হ'ত।

ইংলণ্ডঃ ৩৫৯ (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড; কম্পটন ৯৩, গ্রেভনী ৬৫, ওয়ার্ডলে ৫৪। ফজল মামুদ ১০৭ রানে ৪ এবং সুজাউদ্দিন ১২৭ রানে ৩ উইঃ)।

পাকিস্তানঃ ৯০ (হানিফ মহম্মদ ৩২। ওয়ার্ডলে ১৯ রানে ৪, বেডসার ৩৬ রানে ৩ এবং ম্যাক্‌কোনোন ১৯ রানে ৩ উইঃ) ও ২৫ (৪ উইকেটে। বেডসার ৯ রানে ৩ উইঃ)।

প্রথম দিনে ইংলণ্ডের ২৯৩ রান ওঠে ৬ উইকেটে। প্রবল বারিপাতের দরুণ ২য় দিন খেলা হয়নি। ৩য় দিন লাঞ্চের সময় ইংলণ্ডের ৩৫৯ রান দাঁড়ায়, ৮ উইকেট পড়ে। এই রানের মাথায় ইংলণ্ড প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস মাত্র ৯০ রানে শেষ হয়। ঐদিনই ২৬৯ রান পিছনে পড়ে পাকিস্তান ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে এবং নির্দ্ধারিত সময়ে তাদের ৪টে উইকেট পড়ে মাত্র ২৫ রান ওঠে। বৃষ্টির দরুণ ৪র্থ ও ৫ম দিনেও খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি ফলে খেলাটি পরিত্যক্ত হয় এবং ড্র যায়।

চারটি টেষ্ট খেলার মধ্যে ইংলণ্ড জয়ী হয়েছে ১টি, ২য় টেষ্ট খেলা। প্রথম ও তৃতীয় টেষ্ট খেলা একই কারণে ড্র গেছে। ৪র্থ বা শেষ টেষ্ট খেলা হবে ১২ই আগষ্ট, ওভালে। আলোচ্য সফরে পাকিস্তান দল নাকি দারুণ আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে পড়বে; পরবর্ত্তী খেলাগুলির সময়ে আবহাওয়া ভাল থাকলেও পাকিস্তান দলের আর্থিক লাভের বিশেষ সম্ভাবনা নেই, কোন রকমে সফরের খরচাটা তুলতে পারবে আশা করা যায়।

টমাস কাপঃ

ব্যাঙ্ককে অনুষ্ঠিত টমাস কাপ ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার 'এশিয়া জোনে'র প্রথম রাউণ্ডের খেলায় ভারতবর্ষ ৬-৩ খেলায় থাইল্যাণ্ডকে পরাজিত করেছে। মোট ৯টি খেলা হয়, ৬টি সিঙ্গলস এবং ৩টি ডবলস। ভারতবর্ষ ৫টি সিঙ্গলস এবং ১টি ডবলসের খেলায় জয়ী হয়। হার স্বীকার করে ২টি ডবলস এবং ১টি সিঙ্গলসের খেলায়। ভারতবর্ষের পক্ষে খেলেছিলেন নন্দু নাটেকার (বোম্বাই), ত্রিলোকনাথ শেঠ (ইউপি), অমৃতলাল দেওয়ান (দিল্লী), রবীন্দ্র ডোঙ্গরে (বোম্বাই) এবং পি এস চওলা (দিল্লী)।

পঞ্চম এম্পায়ার ও কমনওয়েলথ গেমসঃ

এক মাইল দৌড় প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ডের দৌড়বীর রোজার ব্যানিষ্টার পাঁচ গজের ব্যবধানে বিশ্বের সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী দৌড়বীর অষ্ট্রেলিয়ার জন্ ল্যাণ্ডিকে পরাজিত ক'রে প্রথম স্থান লাভ করেন। তাঁর সময় লাগে ৩ মিঃ ৫৮.৮ সেকেণ্ড। ল্যাণ্ডির সময় ৩ মিঃ ৫৯.৬ সেকেণ্ড।

প্রতিযোগিতায় এই দুইজন মহিলা তিনটি ক'রে স্বর্ণপদক লাভের গৌরব অর্জ্জন করেন—নিউজিল্যাণ্ডের মিস্ ইভেট উইলিয়ামস—লং জাম্প, ডিস্কাস এবং সর্ট-পুটে এবং অষ্ট্রেলিয়ার মার্জারী জ্যাকসন নেলসন—১০০ গজ, ২০০ গজ দৌড় এবং ৪৪০ গজ রীলে রেসে।

ইংলণ্ড সর্ব্বাধিক পয়েণ্ট পেয়ে বে-সরকারীভাবে চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। আলোচ্য ক্রীড়ানুষ্ঠানের ৯১টি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় মোট ৪৭টি ক্ষেত্রে নতুন রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে।

নিম্নে প্রথম ছয়টি দেশের পক্ষে স্বর্ণ, রৌপ্য এবং ব্রোঞ্জ পদক প্রাপ্তির হিসাব এবং সেই অনুসারে বে-সরকারীভাবে পয়েণ্ট পাওয়ার হিসাব দেওয়া হ'ল:

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	পয়েণ্ট
ইংলণ্ড	২৩	২৪	২০	৫১৪½
অষ্ট্রেলিয়া	২০	১১	১৮	৩৬৩¾
কানাডা	৯	২০	১৪	৩৩৯
দঃ আফ্রিকা	১৬	৭	১২	২৬০¾
নিউজিল্যাণ্ড	৭	৭	৫	১৬৪¾
স্কটল্যাণ্ড	৬	২	৫	১০৩½

প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ২৩টি দেশের মধ্যে এই চারটি দেশ কোন পদক লাভ করতে সক্ষম হয়নি—ভারতবর্ষ, ফিজি, বারমুণ্ডা এবং বাহমান দ্বীপপুঞ্জ।

ভ্যান্থুভারে অনুষ্ঠিত পঞ্চম "বৃটিশ এবং কমনওয়েলথ গেমস" প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল যোগদান করে। এই দলে ছিলেন চারজন প্রতিনিধি—পদ্মন সিংহ (ডিসকাস ও শট্ পুট), সরণ সিং (১১০ মিটার হার্ডল), অজিত সিং (হাই জাম্প) এবং যোগীন্দর সিং (৪০০ মিটার দৌড়)। দলের ম্যানেজার ছিলেন অশ্বিনী কুমার। প্রতিযোগিতায় ২৩টি দেশের প্রায় ৬৭১ জন প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। ভারতীয় দলের মধ্যে একমাত্র উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জ্জন করেন অজিত সিং—হাই জাম্পে ৬ ফিট উচ্চতা অতিক্রম ক'রে তিনি দশম স্থান পান। প্রতিযোগিতায় মোট ১১ রকমের অনুষ্ঠান ছিল, খেতাব সংখ্যা ছিল ৯১টি।



'ইণ্ডিয়ান লাইফ্ সেভিং সোসাইটী'র নবনির্মিত সুইমিং পুলে সন্তরণ শিক্ষা দান ফটো—ভারতবর্ষ

ডেভিস কাপ ঃ

১৯৫৪ সালের ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় ইউরোপীয় জোন ফাইনালে সুইডেন ৫-০ খেলায় ফ্রান্সকে পরাজিত করেছে। এরপর সুইডেন ইণ্টার-জোন ফাইনালে খেলবে আমেরিকান জোন বিজয়ী দেশের সঙ্গে। এই ইণ্টার-জোন ফাইনালে যে দেশ জয়ী হবে তারা ডেভিস কাপ লাভের জন্যে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলবে গতবারের ডেভিস কাপ জয়ী অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে। আমেরিকান জোনের ফাইনালে আমেরিকা খেলবে ক্যানাডা অথবা মেক্সিকোর সঙ্গে।

নবনির্ম্মিত সুইমিং পুল ঃ

জনহিতকর প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঢাকুরিয়া লেক অঞ্চলে অবস্থিত 'ইণ্ডিয়ান লাইফ্ সেভিং সোসাইটী'র যথেষ্ট সুনাম আছে। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠানের নব নির্ম্মিত 'সুইমিং পুল'-এর শুভ উদ্বোধন হয়ে গেল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের পৌরোহিত্যে। এই 'সুইমিং পুল'টির দৈর্ঘ্য ১০৪ ফিট এবং প্রস্থ ৩৩ ফিট। একদিকে একটি ২৫ মিটার ট্র্যাক আছে। এই সোসাইটির সভ্য এবং সভ্যা ছাড়াও স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা নামমাত্র চাঁদায় এই 'সুইমিং পুল' ব্যবহারের

সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে পারবে। বর্ত্তমানে এই সোসাইটির তত্ত্বাবধানে ৩৫০ জন শিক্ষানবিস আছেন,



'ইণ্ডিয়ান লাইফ্ সেভিং সোসাইটী'র নবনির্মিত সুইমিং পুল ফটো—ভারতবর্ষ

তার মধ্যে ১০০ জন মহিলা। সোসাইটির প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় এবং অনুকরণযোগ্য।

ফুটবল প্রসঙ্গ ঃ

এ বছর প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলা শেষ পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে শেষ হবে কিনা—এমন প্রশ্ন সাধারণের মনে জেগেছিল। গত কয়েক বছরে আই এফ এ কর্ত্তৃক পরিচালিত ফুটবল প্রতিযোগিতায় নানা ব্যাপারে এই সংস্থার অযোগ্যতা জনসাধারণকে হতাশ করেছে। ফলে এই সুপ্রাচীন ক্রীড়াসংস্থার সুনাম ঘরে-বাইরে যথেষ্ট পরিমাণে নষ্ট হয়েছে। পশ্চিমবাংলার ফুটবল খেলার নিয়ন্ত্রণ সংস্থা হিসাবে ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়সনের যে সব গুরু দায়িত্ব আছে, প্রাথমিক কর্ত্তব্য হিসাবে এই বিধিব্যবস্থা গুলির গুরুত্ব বেশী—(১) এই প্রদেশের ফুটবল খেলার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গঠনমূলক পরিকল্পনা (২) দর্শকদের খেলা দেখার সুখ-সুবিধার উদ্দেশ্যে ষ্টেডিয়াম নির্ম্মাণ (৩) খেলা পরিচালনার মান উন্নয়ন (৪) প্রতিযোগিতা পরিচালনায় কঠোরভাবে নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রয়োগ। দুঃখের কথা, এই সব ব্যাপারে আই এফ এ-র যথেষ্ট পরিমাণে অযোগ্যতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। জাতির 'বৃহত্তর স্বার্থের' কথা বিবেচনা ক'রে আই এফ এ-র বর্ত্তমান নীতির আমূল পরিবর্ত্তনের জন্য গঠনমূলক আন্দোলন হওয়া উচিত। আমরা এ ব্যাপারে জাতীয় সরকারের হস্তক্ষেপ আন্তরিকভাবে কামনা করি। প্রকৃতপক্ষে, বর্ত্তমানে আই এফ এ-র যেন একমাত্র করণীয় কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে 'চ্যারিটি ম্যাচ' খেলা থেকে অর্থ সংগ্রহ করা। জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের উদ্দেশ্যে এই ধরণের ব্যবস্থায় কোন দায়িত্বশীল নাগরিক আপত্তি করবেন না, যদি না ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করে। প্রতি বছর যে পরিমাণে চ্যারিটি ম্যাচের সংখ্যা বেড়ে চলেছে তাতে হায়রাণি এবং ব্যয়বাহুল্যের দিক থেকে ক্লাবের সভ্যদের এবং জনসাধারণের ওপর যে যথেষ্ট অবিচার করা হচ্ছে নিঃসন্দেহে একথা বলা চলে—এর উদ্দেশ্য যতই মহৎ হউক না কেন। 'চ্যারিটি ম্যাচ' আজ সাধারণের কাছে বিভীষিকা এবং আর্থিক অপচয়ের পর্য্যায়ে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থি।

সাহিত্য সংবাদ

গৌড়মল্লার ঃ শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ

বাংলার গৌরব মহারাজ শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্তের মৃত্যুর পরে বাঙালীর ইতিহাসে যে অন্ধকার অধ্যায় শুরু হয়েছিল, তারই পটভূমিকায় উপন্যাসটি রচিত। শশাঙ্কদেবের পৌত্র বজ্রদেবের বিচিত্র জীবন, তার প্রেম এবং শৌর্যের কাহিনীই উপন্যাসের বিষয়বস্তু।

অত্যন্ত সতর্কতা আর নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রায় তেরোশো বছর আগেকার বাংলা দেশকে লেখক এই উপন্যাসে জীবন্ত করে তুলেছেন। বেতসগ্রামের ছায়াস্নিগ্ধ আভীর-পল্লীর বনলক্ষ্মী গুঞ্জা এবং কর্ণসুবর্ণের বিশৃঙ্খল উদ্‌ভ্রান্ত জীবনের কামনাদর্পী রাণী শিখরিণী—এরা সবই লেখকের কল্পনায় সার্থক হয়ে ফুটে উঠেছে। কবি বিম্বাধর থেকে আরম্ভ করে শবর কচ্ছু, মহাস্থবির শীলভদ্র থেকে বেতসগ্রামের চাতক ঠাকুর—এদের প্রত্যেককেই সমান প্রাণবন্ত করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন লেখক।

আধুনিককালে বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক-রোমান্সের একমাত্র স্রষ্টা শরদিন্দুবাবু। তাঁর এই পর্যায়ের রচনাগুলি আমাদের চোখের সম্মুখে যেন এক আশ্চর্য মায়ালোক সৃষ্টি করে—ইতিহাসের সঙ্গে কল্পনার যথাযথ মিলনে তিনি এমন একটি রস-পরিবেশন করেন—যার আস্বাদন অন্যত্র দুর্লভ। 'গৌড়মল্লার'ও সেদিক থেকে পরিপূর্ণ সাফল্যলাভ করেছে।

'গৌড়মল্লার' শুধু এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলবার মতো বই-ই নয়—বারবার পড়বার মতো বই।

ছাপা, প্রচ্ছদপট এবং অন্যান্য অঙ্গসজ্জা সুন্দর।

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ঃ ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম - ৪৲ টাকা।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

* * * *

প্রথমা ঃ প্রেমেন্দ্র মিত্র ঃ

প্রথমা কবিতা সঞ্চয়ন। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী যুগে যে কয়েকজন কবি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে বাংলা সাহিত্যে স্থান করিয়া লইয়াছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁহাদেরই একজন। প্রথমায় তাঁহার প্রথম জীবনের লেখা কয়েকটী নির্বাচিত কবিতা স্থান পাইয়াছে। কবিতাগুলির মধ্যে সুদূরের আহ্বান, কবি, বেনামী বন্দর, নমস্কার, প্রার্থনা, আশীর্ব্বাদ, ফিরে আসি যদি, নটরাজ ও যৌবনবারতা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলা কাব্যের গতানুগতিক ধারাকে অতিক্রম করিয়া নূতন ভঙ্গীতে কাব্যসৃষ্টি করিবার প্রয়াস প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতাগুলিতে সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। তবে বিদ্রোহী কবি মনের বলিষ্ঠতা মাঝে মাঝে ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাসে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। লেখকের সৃজনী শক্তি উদ্দাম ও গতিশীল, তাই প্রত্যেকটী কবিতায় অব্যাহত গতিবেগ পরিলক্ষিত হয়। কবির বৈশিষ্ট্য ও নিজস্বতা প্রশংসনীয়।

প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ ঃ ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭। দাম—তিন টাকা।

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

* * * *

কনকপুরের কবি ঃ অমরেন্দ্র ঘোষ ঃ

আজ পৃথিবীর সর্বত্র যে শ্রেণীসংঘাত চলিয়াছে তাহারই সুন্দর আলেখ্য আলোচ্য পুস্তকখানি। ধনিক-দরিদ্র মৌলিক প্রভেদ, তাহাদের সংগ্রাম কোথা হইতে উদ্ভূত প্রভৃতি বিষয় লেখক অতি নিপুণতার সহিত চিত্রিত করিয়াছেন। কিরূপে একজন সামান্য মজুরী জীবনসংগ্রামের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সম্মুখীন হইয়া একটি বিরাট সম্ভাবনার উন্মেষ করিল, কিরূপে সামান্য একটি বিপ্লবের বীজ বিরাট মহীরূহে পরিণত হইল বঞ্চিত নরনারীর আদর্শ-গুণে, তাহাই পুস্তকখানির প্রতিপাদ্য বিষয়। কবি, কুসুম, জনার্দন চক্রবর্তী, ছোটদি, রঞ্জিত প্রভৃতি সকলেই জীবন্ত আমাদের সমাজে। সুচিন্তিত রচনায় বিদগ্ধজনের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন লেখক। লেখকের স্বতঃস্ফূর্ত অকৃত্রিম ভাবাবেগে কোন কোন স্থানে নাটকীয় পরিবেশের সৃষ্টি হইলেও তাহা পুস্তকখানির বিষয়বস্তুর উৎকর্ষে চাপা পড়িয়াছে।

প্রকাশক ঃ ডি. এম্. লাইব্রেরী ঃ ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—৪৲ টাকা।

সন্তোষ চক্রবর্তী

* * * *

দীপায়ন : শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য :

আজকাল কাব্যের নামে অনেক চতুর রচনাই আসর জমিয়ে বসছে—হয় আত্মকেন্দ্রিক ভাবভাবনা কিংবা রাজনৈতিক মতবাদকে আশ্রয় কোরে। যে কয়েকজন কবি এখনও কাব্যের ধ্রুব আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান—তাঁদের মধ্যে শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য অন্যতম।

রবীন্দ্রোত্তর কাব্যকে যে রবীন্দ্র কাব্যের 'বিষম' হতে হবে এ ধারণা কবির নেই। তাই তিনি সুস্থ সরল ও সবল কাব্য রচনাও পরিবেশন কোরতে কুণ্ঠিত হননি। ইহা পাঠকের সৌভাগ্য। যখন পড়ি—

"আশার অঙ্গনতলে নিত্য ডাকে বাসনার পাখী,
স্বপ্নঝরা ধরণীর তটপ্রান্তে মোর দুটি আঁখি
সংশয় বিস্ময়ভরা ক্ষণিকের বর্ণময় দিনে
সংসার ভবনদ্বারে পান্থ কত এলো পথ চিনে
অতিথির মত,— জীবন গল্পের পৃষ্ঠাগুলি খুলে
শুনায়েছে কতনা রহস্য! তারা মোরে গেছে ভুলে।"

(দীপায়ন—১১ পৃঃ)

তখন মনে হয় কবিতা এখনও জীবিত। অপূর্ববাবুর কাব্যে সেই বলিষ্ঠ গুরুগম্ভীর ছন্দ-মাত্রা পাই—ও সেই, ব্যাপক জীবন-দর্শনের পটভূমি—যা শ্রেষ্ঠ কাব্যের লক্ষণ। 'দীপায়ন' কাব্য গ্রন্থে মোট ছিয়ানব্বইটি কবিতা আছে। নানা ভাবভাবনা ও বিভিন্ন রসবস্তুতে সমৃদ্ধ এই কবিতাগুলি। ইহাদের আবেদন সর্বজনীন কারণ কবি নিজে সাধারণ মানুষ এবং মানুষের সনাতন সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, বিরহ-প্রেম ইত্যাদি ভাবগুলির সহিত পরিচিত। বিষয়বস্তু বা ভঙ্গীতে অসাধারণত্ব কবির লক্ষ্য নয়—লক্ষ্য মানুষের ঠিক মনের কথাটি প্রকাশ করা। অথচ বিষয়-নির্বাচনে ও ভাষাপ্রয়োগে কবির স্বকীয়তা যথেষ্ট। এই স্বকীয়তা বজায় রেখে কি কোরে বিশ্বমানব মনকে তারই যেন ভুলে যাওয়া অস্পষ্ট ভাবভাবনাগুলিকে কানে কানে বলে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় এইটাই যথার্থ যিনি কবি—তিনিই জানেন।

অপূর্ববাবু এই কৌশল আয়ত্ত কোরেছেন মনে হয়। পাঠককে চমকে দেবার স্পৃহা তাঁর নেই আর বিদ্যা-বুদ্ধির নানান্ কারিকুরি আর পাঁয়তাড়া দেয়া বা রাজনৈতিক মতবাদের তাল-ঠোকা তাঁর কাব্য-সাধনার অঙ্গ নয়। অথচ তাঁর বৈদগ্ধ্যের পরিচয় এই কাব্যগ্রন্থে পরিস্ফুট—আর একটি সুস্থ সরল দেশাত্মবোধ অনেকগুলি কবিতার প্রেরণা পাঠকের দেশাত্মবোধে অমৃত ঢালে—

"বঙ্কিম পন্থার রেখা পান্থজনে দীর্ঘতর হয়ে
এনে দেয় বক্র আশা আলস্য বিলাসে,
অন্ধ পঙ্গু বধিরের প্রাত্যহিক আর্তনাদ লয়ে
জীবন সাগর হোতে বিশ্বচিত্তাকাশে
বিষ বাষ্প ওঠে নব।
তুমি সুস্থ মননের শিল্প এঁকে রাখিবে কোথায়?
দুর্যোগ উৎসবে হেরবনবীথি শিহরে ব্যথায়।"

(দীপায়ন—পৃঃ ১৪৫)

দীপায়নের বহুল প্রচার কামনা করি।

(প্রকাশক—শ্রীমতী অম্বুজবালা দেবী : ১২৬, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৫। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগুরু লাইব্রেরী : ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম—৪৲)

শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী এম-এ, পি-এচ্-ডি

* * * *

শাল পিয়ালের বন : শক্তিপদ রাজগুরু :

সভ্য মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে যে ক্ষীয়মান বন্য আদিবাসীদের সমাজ বর্তমান এবং সভ্য মানুষের লোভের অগ্নিশিখায় যে সমাজ ধীরে ধীরে নিঃশেষ হ'য়ে পুড়ে যাচ্ছে, তাদেরই সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা ও জীবন সংগ্রামের আলেখ্য আঁকতে চেষ্টা করেছেন লেখক এই উপন্যাসখানিতে। অনেকগুলি সাঁওতাল নর-নারীর বিচিত্র চরিত্র ভিড় করে আছে কাহিনীটির মধ্যে। সেই সঙ্গে আছে কয়েকটি মিশনারি সাহেব, আছে কয়েকজন বিদেশী ব্যবসায়ী এবং দেশী ব্যবসায়ীর চরিত্র। যাদের কামনার কুটিল চক্রান্তে, লালসার বৈশ্বানরে অরণ্যের প্রশান্তি ব্যাহত হ'ল। সরল আদিবাসীদের শান্ত জীবনধারায় অশান্ত বিদ্রোহ উত্তাল উদ্দাম হ'য়ে উঠলো। কিন্তু সে বিদ্রোহে তারাই হ'ল নিষ্পেষিত—নিষ্ঠুর আর অত্যাচারী বণিক সম্প্রদায়ের হাতে।…

আজকাল সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসীদের জীবনযাত্রা প্রণালীকে কেন্দ্র ক'রে কেউ কেউ গল্প, উপন্যাস রচনা করে থাকেন। কিন্তু তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠ মেলামেশা না থাকলে কেবল মাত্র দূর থেকে দেখে কিংবা কল্পনা করে যেমন সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয় না, তেমনই তাদের সম্বন্ধে অজ্ঞ পাঠক সমাজও সে কাহিনী পাঠ ক'রে রস গ্রহণ করতে সমর্থ হন না। শক্তিপদবাবুর লেখার মধ্যে সাধারণতঃ আমরা যে রস পেয়ে থাকি আলোচ্য গ্রন্থখানি আমাদের সে রসে বঞ্চিত করেছে। অথচ তাঁর লেখার মধ্যে যে বিশিষ্ট ভঙ্গী ও দরদী মনের স্পর্শ থাকে এবং যা পাঠকের মন আকর্ষণ করে তা এ গ্রন্থখানিতেও বর্তমান।

ছাপা বাঁধাই এবং প্রচ্ছদপট মনোরম।

প্রকাশক—অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির : ৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—৩৲ টাকা।

*   *   *   *

কশ্চিৎ কান্তা : শ্রীঅনিলেন্দ্র চৌধুরী :

সাহিত্যক্ষেত্রে লেখক নবাগত। কিন্তু নতুন হলেও তাঁর দক্ষতা অনস্বীকার্য। আলোচ্য বইখানি একটি গল্পের সংকলন এবং প্রত্যেকটি গল্পই—বিশেষ ক'রে 'চোর', 'ক্ষেন্তিদি', প্রভৃতি কয়েকটি গল্প রসোত্তীর্ণ ও উৎকৃষ্ট হয়েছে। লেখক শিল্পী মন এবং সূক্ষ্ম রসানুভূতির অধিকারী। তাঁর ভাষা স্বচ্ছন্দ, গল্প বলার ভঙ্গী সুন্দর। বইখানি পাঠকদের ভালো লাগবে বলেই মনে করি।

বইটির অঙ্গ সৌষ্ঠব সুন্দর।

প্রকাশক—শ্রীকালীকৃষ্ণ বসু : ৪৭বি, তালপুকুর রোড, কলিকাতা—১০। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগুরু লাইব্রেরী : ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম—২৲ টাকা।

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

*   *   *   *

দিবাকরী (২য় সংস্করণ) : দিবাকর শর্মা :

স্বর্গত রবীন্দ্র মৈত্রের ছদ্মনাম ছিল দিবাকর শর্মা। এই ছদ্মনামে, বহু রচনা তাঁর আনন্দবাজার, শনিবারের চিঠি প্রভৃতিতে প্রকাশিত হ'য়েছিল। দিবাকরী তারই একটি মনোরম সংকলন। আলোচ্য বইখানিতে তাঁর লিপি বিবর্তনী, দিবাস্বপ্ন প্রভৃতি দশটি উৎকৃষ্ট রসরচনা মুদ্রিত হয়েছে। বইখানির ছাপা বাঁধাই সুন্দর।

প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ : ৯৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭। দাম—১৸৹ আনা।

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "ব্যোমকেশের গল্প" (৩য় সং)—২৷৹

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "নারীর মূল্য" (৪র্থ সং)—২৲, "চরিত্রহীন" (১৪শ সং)—৫৲, "রামের সুমতি" (উপন্যাস—২৩শ সং)—১৲, "গৃহদাহ" (৮ম সং)—৪৷৹

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "নীলকণ্ঠ" (৫ম সং)—২৷৹

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "এই তো জীবন"—২৲

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়-অনূদিত "টারজান এণ্ড হিজ মেট"—১৲

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত রহস্যোপন্যাস "শিখা ও সবিতা"—৸৹

শ্রীশিশিরকুমার নিয়োগী পরিবেশিত "বঙ্কিমচন্দ্রের মজার গল্প"—২৷৹

শ্রীস্বপনকুমার প্রণীত রহস্যোপন্যাস "বিকেল ছ'টার শো'তে"—৷৹

শশধর দত্ত প্রণীত উপন্যাস "মোহনের মৃত্যুবরণ"—২৲, "বিস্মিত মোহন" —২৲, "আবার দস্যু মোহন"—২৲, "তুমি দেবী—তুমি দানবী"—৩৲

শ্রীপূর্ণশশী দেবী প্রণীত উপন্যাস "মরু-নির্ঝর"—১৷৹

কুমারেশ ঘোষ-অনূদিত মেরি কেরেল্লির "থেলমা"—৩৷৹

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত "চিত্রে জয়দেব ও গীতগোবিন্দ"—৬৲

শ্রীসুজিতকুমার নাগ প্রণীত "মধ্যরাত্রির প্রার্থনা"—৸৹

বিশেষ দ্রষ্টব্য

পূজার ভারতবর্ষ—ভাদ্রের তৃতীয় সপ্তাহে আশ্বিন সংখ্যা এবং আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহে কার্তিক সংখ্যা ভারতবর্ষ প্রকাশিত হইবে। বিজ্ঞাপনদাতাগণ অনুগ্রহপূর্বক ১০ই ভাদ্রের মধ্যে আশ্বিন এবং কার্তিক সংখ্যার জন্য বিজ্ঞাপনের কপি পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে কপি না পাইলে বিজ্ঞাপন ছাপার বিশেষ অসুবিধা হইবে।

কর্মাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



শিল্পী—শ্রীবীরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী প্রণতি ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্



আশ্বিন—১৩৬১

প্রথম খণ্ড | দ্বিচত্বারিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

বিদ্যাপতি—চণ্ডীদাস—রামপ্রসাদ

শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত

পীন পয়োধর নখরেখসুন্দর
করে বাঁধহ কা গোরি
মেরু শিখর নব উগি গেল শশধর
গুপুতি ন রহলিএ চোরি ॥

"সুন্দরি! পীন পয়োধরে মনোহর নখরেখা হাত দিয়া ঢাকিতেছ কেন? মেরু শিখরে (স্তনে) নব শশধর (নখরেখা) উদিত হইলে, চুরি গোপন থাকে না।"*

বাঙ্গালীর প্রিয় কবি এই বিদ্যাপতি। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি কি রকমে বাঙ্গালীর আপন? প্রথমত, রসবোধের দিক থেকে। বিদ্যাপতির রসবোধের প্রকৃতি, তাঁর দৃষ্টি ও বর্ণনাভঙ্গি বাঙ্গালীর এত পরিচিত, এত নিকট, এত অভিন্ন ধরণের। দ্বিতীয়ত, ভাষা। অবশ্য বিংশ শতাব্দির চলিত বাংলার সঙ্গে বিদ্যাপতির ভাষার পার্থক্য আছে, কিন্তু তার মধ্যে বাংলা শব্দ এবং প্রকাশরীতি (ফরাসীরা যাকে বলে 'tournure') প্রকট ও প্রধান—বোধ হয় সংস্কৃতের কল্যাণে, কারণ সংস্কৃত ভাষার সঙ্গেও নিবিড় ঘনিষ্ঠতা ছিল বিদ্যাপতির—যে অভিরূপ ভূয়িষ্ঠ ছাড়া সাধারণ রসজ্ঞ বাঙ্গালীও তার মর্মগ্রহণ করতে পারে। অধ্যাপক বিমান বিহারী মজুমদার তাঁর সম্পাদিত পদাবলী সংগ্রহের এক সুদীর্ঘ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকায় লিখেছেন: (বিদ্যাপতি) "পূর্ব ভারতের কাব্য-রসিকেরা যেরূপ কবিতা শুনিতে উৎসুক হইবার সম্ভাবনা তাহা তদানীন্তন বাংলা, হিন্দি, ওড়িয়া ও অসমীয়া ভাষার সাহিত্য বিশেষ সাদৃশ্যযুক্ত মৈথিলী ভাষায় লিখিয়াছেন।" এই মন্তব্য থেকে এই একটা ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হতে পারে যে আমাদের কবি অনভিজ্ঞ পাঠক-সাধারণের মুখরোচক করে একটা কৃত্রিম পপুলার ভাষা তৈরী করেছিলেন। তাই বলতে চাই, মন্তব্যটির উদ্দেশ্য তবেই সার্থক—যদি মনে করি পঞ্চদশ শতাব্দীর মৈথিলীর সঙ্গে তৎকালীন বাংলার নৈকট্য ও স্বাভাবিক সাদৃশ্য প্রদর্শন করাই তার লক্ষ্য। যে-যুগে রাষ্ট্রীয় সীমানা ছিল অস্থির, বাংলার ভাব-তরঙ্গ বৃহত্তর-বঙ্গে

* অনুবাদগুলি মিত্র-মজুমদার সম্পাদিত গ্রন্থ হতে গৃহীত।

পড়ত ছড়িয়ে, সে-যুগে প্রান্তদেশীয় ভাষায় বাংলার রূপ রস রং ঢং লাগা স্বাভাবিক। এ-যুগে, প্রাদেশিক ভাষা-জাগরণের যুগেও, কি দেখি না ওড়িয়া ও অসমিয়াতে বাংলার একটা স্পষ্ট প্রতিচ্ছায়া? কিন্তু বলছিলাম—কাব্য-রসের, কাব্যের প্রকৃতির, কথা।

বিদ্যাপতি হলেন প্রাণের কবি, প্রেমের কবি। শুনুন তাঁর—

পিক মধুকর স্থর কহইত বোল।
অলপও অবসর দান অতোল॥

"এখন কোকিল ও ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে। এই সুযোগ স্বল্পকালস্থায়ী, ইহারই মধ্যে অতুলনীয় দান (রতিদান) করিতে হইবে।"

'কাননে কাননে কেসু ফুল' ফুটিয়ে, ভ্রমর ও কোকিলের আগমন ঘটিয়ে প্রকৃতিতে যেমন এসেছেন বসন্ত রাণী—তেমনি কবির নায়িকার মনেও সে-রঙের রেশ লেগেছে, সে মদিরার ঢেউ লেগেছে—তাই তো তার অন্তরে জেগেছে অমৃত-পিপাসা!

গগন গরজ ন সুনি মন সঙ্কিত
বারিস হরি করু রাবে।
দখিন পবন সৌরভে জদি সতরব
দুহু মন দুহু বিছুরাবে॥

"গগনে মেঘ গর্জ্জন করিতেছে শুনিয়া মন শঙ্কিত, বর্ষায় মেঘ ডাকিতেছে। দক্ষিণ পবন সৌরভে যদি সন্তরণ করিবে, (তাহা হইলে) দুই জন মনে মনে কেমন করিয়া ভুলিয়া থাকিবে?"

কিম্বা অন্যভাবে কবি যখন বলছেন আর এক রসের কথা—

গোর সরীর পয়োধর কোরী
পরসে অরুণ ভেল।
কনক বলরি জনি রতোপলে
মুকুলে উদয় দেল···

"আমার গৌরবর্ণ দেহ ও নূতন পয়োধর (নায়কের) স্পর্শে অরুণ বর্ণ হইল, যেন কনক লতায় রঙকমলের মুকুল উদিত হইল।"

তখন এর কবিত্ব বিষয়ে সংশয় থাকে না। কিন্তু তবু এইখানেই যদি কবির রসবোধ সীমাবদ্ধ হয়ে থাকত তাহলে তাঁর কাব্যের মহত্ব অনেকটা খর্ব হত। সৌভাগ্য-ক্রমে আলোচ্য কবির ক্ষেত্রে উপলব্ধি, আবেগ ও ভাবের সঙ্গে এসে মিশেছে একটা সুরুচি ও শালীনতা, মার্জিত রসবোধ, চেতনার একটা কৌলীন্য—যা তুচ্ছ আটপৌরে জিনিসের মধ্যেও আপন মাহাত্ম্য আপন উচ্চতা ধরে রাখে। এই তো কবিমনের রহস্য ও কবিত্বে রূপান্তরের কৌশল। চন্দ্র সূর্য প্রতিদিন ওঠে, সুখ-দুঃখ মানুষের নিত্য সহচর, প্রেম চিরন্তন বৃত্তি—ইতরজন তা নিয়ে কম বাক্য বিন্যাস করে না, অথচ একমাত্র কবির অন্তশ্চেতনার শক্তি, বিশেষ অনুভব ও বর্ণনায় বিশেষ সজ্জার গুণে তা-ই আবার হয়ে ওঠে রসমণ্ডিত কাব্যের উপাদান, সুন্দরের আলিম্পনা।

রক্তোপল জনি কমল বইসাওল
নীল নলিনি দল তবু।
তিলক কুসুম তহু মাঝ দেখিকহু
ভমর আবথি লহু লহু
পানি-পলব-গত অধর বিম্ব-রত
দসন দাড়িম বিজ তোরে।
কীর দূর ভেল পাস ন আবএ
ভৌঁহ ধনুহি কে ভোরে॥

"রক্তকমলে (হাতে) যেন কমল (মুখ) বসাইল, তাহাতে নীল কমল (চক্ষু) তাহার মধ্যে তিলক পুষ্প দেখিয়া ভ্রমর (নায়ক) ধীরে ধীরে আসিবে। করপল্লবে লগ্ন বিম্বফল-তুল্য অধর, দাড়িম্ববীজ তুল্য দশন দেখিয়া কীর অর্থাৎ শুকপাখীর লোভ হয়, কিন্তু ভ্রূকে ধনুক মনে করিয়া সে কাছে আসে না।"

Sensuous কবি হলেও মনে হয় না কি—বিদ্যাপতি এখানে একটা ক্লাসিকাল আভিজাত্য নিয়ে এসেছেন, অলংকার এবং সমৃদ্ধির দিক দিয়ে কালিদাসের সৌর-করোজ্জ্বল রাজত্বে চলে গিয়েছি? কালিদাস অবশ্য যে-ভাবায় লিখছিলেন তা আরো স্বচ্ছ, সংহত, তেজোময়, ব্যঞ্জনাময়—তার ভিতরে তিনি আবার ভরে দিয়েছিলেন বৃহৎ মানস চেতনার দিকপরিপ্লাবী আলো। কালিদাসের মতো বিদ্যাপতিও রূপের উপাসক। তিনি বলেছেন

নর নারীর প্রেমের গভীর কথা, তবে তা নিয়ে বীভৎসতা কিছু করেন নি, হীনবৃত্তির উপজীব্য বলে সে সবকে সাজিয়ে ধরেন নি। তাঁর কাব্যে রাজা-রাণীর আবির্ভাব যে অনিবার্য স্থূল ঐতিহাসিক কারণে হোক, তার এই হিসাবে রয়েছে অন্য এক অর্থ অন্য এক সার্থকতা—তিনি যে-ভালোবাসার কথা বলেছেন তা যেন পার্থিব অথচ পঙ্কিল নয়, যেন সর্বব্যাপী হয়েও সহজলভ্য নয়, একটা সংস্কৃতি ও সুকুমার রসবোধের দ্বারা বিশেষ-চিহ্নিত।

আরো কথা আছে, বিদ্যাপতি এই পার্থিব প্রেমকে শুধু একটা সংস্কৃতি সুরুচির মধ্যে তুলে ধরেই ক্ষান্ত হন নি, তাকে নিয়ে গিয়েছেন আরো দূরে। ভারতীয় বৈষ্ণব সাধনায় প্রেমের আদর্শ রাধা-কৃষ্ণের লীলা, বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতির অনেক পদ এই নিখিলচিত্তজয়ী কিশোর-কিশোরীর প্রেমকে আশ্রয় করে—সেগুলি আবেগ-প্রধান গীতিকাব্যলোকে সৌন্দর্য ও মাধুর্যের গুণে অতুলনীয়।

সজনি কি পুছসি মোহি।
অপদ পেম অপদহি পউ মোহি॥
জঞো অবধানিঞ পরজন্ম জান
কণ্টক সম ভেল রহএ পরান॥
বিরহানল কোইল কর জারি…

"সজনি! আমাকে কি জিজ্ঞাসা করিতেছ? অস্থানে প্রেম করিয়া আমি বিপদে পড়িলাম। যেমন জানিতেছি—অনুভব করিতেছি…তাহা যেন আর কাহাকেও না জানিতে বা বুঝিতে হয়। (প্রেম) কণ্টক-তুল্য হইল, তথাপি প্রাণ রহিয়াছে। কোকিল বিরহানল বৃদ্ধি করিতেছে।"…

কিম্বা আরো শুনুন শ্রীরাধার বিলাপ—

হিমকর কিরণে নলিনি যদি জারব
কি করব মাধবি মাসে॥
অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।

"চন্দ্রের কিরণে পদ্ম যদি দগ্ধ হয়, তাহা হইলে বৈশাখ মাস কি করিবে? রৌদ্রের তাপে অঙ্কুর যদি পুড়িয়া যায়, তাহা হইলে জলভরা মেঘে কি হইবে?"

কোথাও পাঠকের অন্তরে একটা সাড়া জাগে না, মনে হয় না এ তো আমার নিজেরই কথা, বিশ্বমানবের কথা? রাধা-কৃষ্ণের প্রেম কি শুধু অলৌকিক নর-নারীর অভিনব আখ্যান মাত্র? চিরন্তন রাধা আর চিরন্তন কৃষ্ণ তো মানুষের অন্তরেই; কৃষ্ণ তার অন্তরাত্মার মণিকোঠায়—তার জীবন-সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়ে—আবার রাধা হয়েছে তার প্রকৃতি, সে নিজেই, তার প্রতীক্ষা তার প্রয়াস তার লক্ষ্য সব এই প্রাণবল্লভের দিকে। আবার আর এক হিসাবে রাধা সমগ্র বিশ্বমানবের প্রতিনিধি—হতাশার মধ্যে দিয়ে, অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে, আর্তি ও বেদনার মধ্যে দিয়ে সে চলেছে পরম আনন্দময়ের সমীপে। এইভাবে দেখলে বিদ্যাপতির পদাবলী শুধু একটা সম্প্রদায়ের কাছে মুখরোচক হয়ে থাকবে না, দেখব তার আবেদন সার্বিক—সর্বদেশে সর্ব কালে সর্ব জনের অন্তরে তা বাজাবে অমরাপুরীর সুর।

বিদ্যাপতির সমসাময়িক এবং বিদ্যাপতির মতোই প্রথিতযশা চণ্ডীদাসের কথা বলব এবার। উভয়ে আধিপত্য করেছেন একই কালে, (উভয়ের সাক্ষাৎকারের কথা শোনা যায়—তার কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থাকলে ঐতিহাসিকদের মূল্যবান গবেষণার বস্তু হত) উভয়েই বৈষ্ণব ভাবে অনুপ্রাণিত। তবে মিথিলার কবি আর বাংলার পাঠকের মধ্যে কোথাও যদিও বা দুর্গ্রাহ্যতা বা অপরিচয়ের লেশমাত্র ব্যবধান থেকে থাকে—তাহলে নান্নুর বা ছাতনার কবির ক্ষেত্রে এসে সে বিভেদের রেখা সম্পূর্ণ অপসৃত হয়ে গিয়েছে। চণ্ডীদাস পুরাপুরি বাঙ্গালীর কবি।*

ছাড়িল গোকুল রহে বহুদূর
স্বপনে নাহিক জানি॥

বাঙ্গালীর শুধু মনের কথা নয়, মুখের কথাও। বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিদ্যাপতিতে পেয়েছিলাম অপূর্ব সব নিসর্গচিত্রের বর্ণনা, রসভাবের সুনিপুণ ও সুন্দর প্রকাশ—সেখানে উঠেছে যেন বহু যন্ত্রীর ঝংকার, উঠেছে একটা সমৃদ্ধ সুরসঙ্গত; তা যেন সমস্ত সত্তাকে মুগ্ধ করে জয় করে ফেলে। চণ্ডীদাস অন্য রকম। তাঁর

এ ভরা যৌবন বিফলো গোঁয়ানু
বঁধু ফিরে নাহি এল।

কিম্বা

* উদ্ধৃতিগুলি সব দীন চণ্ডীদাস থেকে গৃহীত।

আসিবার আশে লিখিনু দিবসে
খোয়ানু নখের ছন্দ।
উঠিতে বসিতে পথ নিরখিতে
দু আঁখি হইল অন্ধ।

যেন সহজ সরল নিরাভরণ সুন্দরের অর্ঘ্য রচনা ; এখানে হয়ত নেই বিদ্যাপতির প্রাণ-তরঙ্গ কিম্বা gorgeousness, কিন্তু আছে সেই নিঃশব্দচরণ আসা যা ইন্দ্রিয়দুয়ার পার হয়ে অন্তরের ইন্দ্রপুরীতে অনায়াসে গিয়ে পৌছায় ; এ যেন একতারার সুর—অথচ এই একটি তন্ত্রীর মূর্ছনা বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গিয়ে করুণকে আরো করুণ—

পিয়া গেল দূর দেশ হাম অভাগিনী···

কিম্বা মধুরকে আরো মধুর—

রসভরে দুহুঁ তনু থর থর কাঁপই
কাঁপই দুহুঁ দোঁহা আবেশে ভোর···

করে তুলেছে।

চণ্ডীদাসের কাব্যের মূল ভাবটি যেমন বলেছি মধুর মসৃণ মৃদু—তাঁর ভাষাও তেমনি নরম সুমিষ্ট ; তার হেতু স্বরূপ মনে হয় কবি যুক্তবর্ণের সংস্রব অনেকখানি বর্জন করে চলেছেন ; দ্বিতীয়ত, সুপ্রযুক্ত মিল ; তৃতীয়ত, শব্দবিন্যাসের নৈপুণ্যে একটা শ্রুতিসুখকর inner rhyme রেখে চলা।

যা সনে পীরিতি করি তারে না দেখিলে মরি
সে সকল দুখ বিসরিয়া।

বস্তুত চণ্ডীদাসের ছন্দশ্রী তাঁর কাব্যের লাবণ্য ও মাধুর্য অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে।

পদাবলী কাব্য ধর্মকাব্য—একটা বিশেষ ধর্ম তার প্রেরণা যুগিয়ে এসেছে, একটা বিশেষ ভাব তার রূপমূর্তি গড়ে দিয়েছে ; সে-ধর্ম বৈষ্ণবধর্ম। প্রাক্-চৈতন্য যুগে বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে এবং উত্তর-চৈতন্য যুগে দীন চণ্ডীদাসের কাব্যে আমরা তার প্রচুর পরিচয় পেয়েছি। আশ্চর্যের বিষয়, স্বদেশে ও বিদেশে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এবং পরমত-অসহিষ্ণুতার রেষারেষি এবং সংকীর্ণতার পরিচয় আমরা পেয়েছি—কিন্তু কি বিদ্যাপতি কি চণ্ডীদাসের কাব্যে এই ধরণের হীনতা বা পরশ্রীকাতরতা কোথাও প্রবেশ করে নি। পদাবলীকাব্য শুধু একটা ধর্মমতের মহিমা-প্রচার নয়, তা সত্যসত্যই উত্তম কাব্য—ধর্ম সেখানে অন্তঃসার হয়ে আছে বটে, তবে কাব্যের সর্বস্ব হয়ে নেই।

রামপ্রসাদের রচনাকেও এই ধর্মকাব্যের অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। তাঁর হল শাক্তধর্ম। তবে একটা ধর্মমতের বিস্তৃতশাখা দর্শন তাঁর চিন্তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জুড়ে নেই। কালীভক্ত কবি রামপ্রসাদ সাধক, তিনি পেয়েছেন—

ঘুম ঘুচেছে, আর কি ঘুমাই,
যুগে যুগে জেগে আছি ;
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে
ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি।

তাঁর কবিত্বের মধ্যে এই সাধকের মর্মবাণীই ফুটে উঠেছে :

তোমার কে মা বুঝবে লীলা।
তুমি কি নিলে কি ফিরিয়ে দিলে॥
তুমি দিয়ে নিচ্ছো তুমি
বাছ রাখ না সাঁঝ সকালে।

এই অন্তর্জীবনে তিনি একক যাত্রী—তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছে এক দিকে যেমন ভক্তির উৎসধারা, অন্যদিকে আবার তেমনি ফুটে উঠেছে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব, সুখ-দুঃখের আলো-ছায়া—

মন রে কৃষিকাজ জান না
এমন মানব-জমীন রইলো পতিত,
আবাদ করলে ফল্‌তো সোনা॥

সাধক কবি এক দিকে যেমন শরণ করেছেন মহামায়ার চরণ, তেমনি আবার দৃষ্টি দিয়েছেন নিজের মধ্যে যে অসামর্থ্য যে দৌর্বল্য আছে তার প্রতি : আত্মবিশ্লেষণ তাই রামপ্রসাদে যেমন বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসে তেমন পাই না। প্রকৃতপক্ষে এই ব্যক্তিগত সুরের আছে একটা বিশেষ আবেদন—রোমান্টিক কাব্যের তাই-ই হল এক প্রধান বিশেষত্ব ; আর এই আত্মমুখিতা এবং কবির আপনকার কথা লিরিক বা গীতিকাব্যের প্রাণস্বরূপ।

মহাকাব্যের মূল আকর্ষণের বিষয় তার ঘটনাবহুল মহান আখ্যায়িকা এবং বহু চরিত্রের সমাবেশ। গীতিকাব্যের অল্প পরিসরে আদ্যন্ত একটি মাত্র ভাবের প্রাধান্য, সুরকেই সেখানে পাঠকচিত্ত জয়ের মহৎ দায়িত্ব নিতে হয়—

কাব্যাংশের যা ধ্বনিমাধুর্য, পরিচ্ছন্ন শব্দ বিন্যাস এবং ভাষা-সৌকর্য, তা-ই তার প্রধান অবলম্বন। রামপ্রসাদের

মা আমায় ঘুরাবে কত?
কলুর চোক-ঢাকা বলদের মত॥

ভাবের দিক থেকে অতি-পরিচিত সহজ উপমার সাহায্যে হৃদয়গ্রাহী। বস্তুত রামপ্রসাদের জনপ্রিয়তার কারণ এই দুটি: তিনি যে-ভাষায় শিল্প-রচনা করেছেন তা সর্বসাধারণের ভাষা, যে উপমা ব্যবহার করেছেন তা-ও নিত্য-ব্যবহারের নিত্য-পরিচয়ের জগৎ হতে সংগৃহীত। একটু কৌতূহলের মনে হতে পারে, এই অষ্টাদশ শতাব্দীতে য়ুরোপে ইংলণ্ডের ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রমুখ কবিরা এমনি একটা আন্দোলন করছিলেন—প্রাচীনের, ক্লাসিকাল নিয়ম-বন্ধনের বিরুদ্ধে—তবে সে বিদ্রোহ ছিল সজ্ঞানকৃত সুচিন্তিত। এই নব্যপন্থীদের সরল হবার চেষ্টা একটা সজ্ঞান-প্রণোদিত প্রয়াস, তবে ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের কাব্যের মহত্ত্ব শুধু সেই জন্যই নয়। তিনি যথার্থ কবি সেখানেই—যেখানে নীতিপ্রচারকের ধর্ম ভুলে গিয়ে, প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়ে, প্রকৃতির মগ্ন হয়ে প্রকাশ করেছেন তার অন্তরের কথা—

The winds come to me from the fields
of sleep.

সমালোচক প্রশ্ন তুলতে পারেন, কবিত্বের দিক দিয়ে রামপ্রসাদের মধ্যেও তাঁর শিল্পের উপাদান আশ্রয় করে নেমেছে কি লোকোত্তর চেতনার একটা স্পন্দন, একটা বৃহত্তর ছন্দের প্রবেশ? ভানু সিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে রবীন্দ্রনাথ মনে হয় এই অঙ্গিকের দিকটা সুসম্পূর্ণ করে তুলতে চেয়েছিলেন—কোথাও অপূর্ণ অসুন্দর অক্ষম অবিন্যস্ত কিছু রাখতে চান নি—

যুগ যুগ সম কত দিবস বহয়ি গল,
শ্যাম তু আওলি না,
চন্দ্র-উজর মধু-মধুর কুঞ্জপর
মুরলি বজাওলি না!

কিন্তু এ-সৃষ্টি একান্তভাবেই রবীন্দ্রনাথের, এখানকার অভিজাতরুচি সুদক্ষ শিল্পীর polish এবং finish-ই সে-কথা জানিয়ে দেয়। প্রাচীন পদাবলীর কবির সৃষ্টিতে রবীন্দ্র-সুলভ মার্জিত নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা না থাকলেও সেখানে তার দোষ-গুণে মিশ্রিত আধারে রয়েছে প্রাণের স্পর্শ, সরস মাটির সঙ্গে যোগ ও একটা স্বাভাবিকতা, একটা যুগের একটা বাস্তব স্থান-কালের ছাপ—সে-সবকে নিয়েই তার যা কিছু মূল্য ও সার্থকতা।

ইংরাজী কাব্য-সাহিত্যেও অনুরূপ ভাবের কাছাকাছি যায় এমন দুটি কথা আছে—মেটাফিজিকাল কাব্য এবং রিলিজিয়স কাব্য। দর্শন শাস্ত্রে আমরা মেটাফিজিক্‌সের যে সংজ্ঞা পেয়েছি তার সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতি রেখে এই কবিরা চলছিলেন, এ কথা বলা যায় না। ডন-কে ((Donne) যে বলা হয় মেটাফিজিকাল কাব্যের একজন পাণ্ডা তাঁর কবিতার এই একটু নমুনা শুনুন—

O more than Moone,
Draw not up seas to drowne me in thy
spheare…

একেবারে নিছক প্রেমের কাব্য। তবে অন্য রকমও আছে—

Send home my long strayed eyes to me…

কিম্বা

Poor soule…
Thou neither know'st, how thou at first
Cam'st in,
Non how thou took'st the poyson of
mans sinne…
Why grasse is greene, or why our blood
is red.

এ বল ঐহিকের স্থূলের উর্ধ্বে বা অন্তরালে যে অলৌকিক রয়েছে তাকে ধরা-ছোঁবার চেষ্টা—ঠিক বুদ্ধি দিয়ে নয়, বুদ্ধির সঙ্গে যেন সজোজাগা অন্তরাত্মার একটা অনতিস্ফুট দৃষ্টি মিশিয়ে। এই জন্যই ডনের স্থান দিতে হয় ইনটেলেক-চুয়াল মিলটন এবং পুরোপুরি মিস্টিক ইয়েট্‌স এবং এ-ই'র মাঝখানে (কাল হিসাবে নয়, মানসিক গঠন হিসাবে)। ক্রশ, কেব, ভগহান প্রভৃতি কবিরা এই ধারারই অনুসরণ করেছেন। এলিজাবেথীয় যুগে ছিল ভাবকাব্য—কিম্বা বলতে পারি, আবেগ-প্রধান কাব্য—এ যাবৎ ছিল সৌন্দর্য, সুর (প্রধানত কি একান্তভাবে শেক্সপীয়রে), এই নূতন ধারার কবিরা তাকে একটা নূতন ভঙ্গি দিলেন, তার মধ্যে এনে ধরলেন এক বিচিত্র সূক্ষ্মচিন্তা, গূঢ়চারিতা এবং বোধ হয় খানিকটা অতীন্দ্রিয়মুখিতা, তাকে ঘুরিয়ে দিলেন নূতন আর এক পরিণতির দিকে। ধর্ম কাব্যগুলিতে তত্ত্বের প্রাবল্য নেই—মনের চেয়ে হৃদয় মুখর সেখানে বেশি। এগুলি সরল উপাসনার বা ভগবৎ প্রেমের রঙে রঞ্জিত। কিন্তু ইংরেজ কবি খৃষ্টধর্মী—কবি হলেও গীর্জার আবেষ্টনী সাধারণত তাকে ছাড়তে চায় না। বুনিয়ানে যে সুর উঠেছিল, রসেটির (ক্রিস্টিনা রসেটি) মধ্যেও তার রেশ এসে পৌছায়নি? ইংরেজ কবি যখন ভগবানের পূজা করে, তাঁর কথা বলে, তখন একটা নির্দিষ্ট রূপক, একটা নির্দিষ্ট পরিবেশ, একটা নির্দিষ্ট ভাব দিয়েই তাকে প্রকাশ করে—তার মূলরেখা সব এঁকে দিয়েছে বাইবেল। তবে যে কৃতী কবি তারই মধ্যে থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, উচ্চতা বা স্বকীয়তা দেখিয়েছেন—সে তাঁর অনুভবের নির্মলতা ও গাঢ়তা, আন্তরিকতা ও সত্যতার গুণে।



আদিষ্টা

শ্রীবিমল রায়

সে বছর বড়ো শীত পড়িয়াছিল। রাত্রি তখন সাড়ে দশটা, বেরিলী স্টেশনের ওয়েটিং রুমে আপাদ কাশ্মীরী কম্বল মুড়ি দিয়া বসিয়া লক্ষ্ণৌগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেন ধরিবার অপেক্ষায় ছিলাম। গাড়িটি ঘণ্টাখানেক লেট্ ছিল।

সন্ধ্যার পরই ধীরে ধীরে কুয়াশা করিয়া ত্রয়োদশীর শুক্লপক্ষ নিবিড় করিয়াছিল। গাড়ির কালি ঝুলিতে আবহাওয়া ভারী। স্টেশনের আশে পাশের ও ডিস্টান্ট্ সিগন্যালের লাল নীল আলোগুলি ভেজা তরল কুয়াশার আস্তরণের মধ্যে টিম টিম করিতেছিল। মরা মানুষের ফ্যাকাশে হলদে কোঁচকানো পায়ের তলার মত এক ফালি আকাশ ওয়েটিং রুমের জানালা দিয়া চোখে পড়িল। শীতের আলস্যে সিগারেটে মৃদু মৃদু টান দিয়া বিরক্তিকর অবকাশ কাটাইবার চেষ্টায় ছিলাম। প্রতীক্ষার মত বুঝি বিড়ম্বনা আর নাই। দুই চার টান দিয়া মাঝে একবার ঘুমাইয়াছিলামও, ঘোর কাটিলে দেখি রুমে এক স্থূলাকার ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। আগন্তুক অভদ্রভাবে আমার পাশের চেয়ারটা সশব্দে টানিয়া বসিলেন এবং টেবিলস্থিত আমার ব্র্যাডশ বইখানা ঠেলিয়া সরাইয়া তৎস্থলে নিজের চামড়ার গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগটা রাখিলেন। হাতে উত্তাপ লাগিতেছিল, দেখিলাম সিগারেটটার তিন চতুর্থাংশ ছাই হইয়া গেছে।

স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লোকটির সঙ্গে কথা বলিতে গা করিলাম না। ভদ্রলোক কিন্তু ক্ষুদে ক্ষুদে উজ্জ্বল চক্ষুতে আমাকে মনোযোগের সহিত দেখিতেছিলেন। অত বিরাট বপুর অমন খয়রা রঙের বিড়াল চক্ষুর ধারালো নজর ভালো লাগিল না। তাহার আবির্ভাব অবহিত হইয়াছি ভঙ্গীতে নড়িয়া চড়িয়া বসিলাম এবং দগ্ধপ্রায় সিগারেটটা লম্বা এক টান দিয়া ফেলিয়া দিলাম। স্থূলবপু চামড়ার ব্যাগটা টানিয়া বুকের কাছে আনিয়া বারবার সেটার মুখ-উন্মোচনীর কলকব্জাগুলি সরাৎ সরাৎ করিয়া খুলিলেন, বন্ধ করিলেন। লোকটির বয়স পঁয়তাল্লিশের মত। ব্রহ্মতালুর উপর কয়েক কাঠা জমিতে টাক, রেলওয়ের কৃপণ আলোতেও চক্ চক্ করিতেছিল। একবার ব্যাগটা খুলিয়া একগাদা কাগজের মধ্যে হাত চালাইয়া একখানা জীর্ণ মলিন ফটোগ্রাফ্ বাহির করিলেন এবং প্রশান্ত মুখে সেটা আমার দিকে প্রসারিত করিয়া বলিলেন, দয়া করে ফটোটা একবার দেখবেন ?

কাহার ফটো, কেনই বা দেখিব, কিছু বুঝিলাম না। ভদ্রতার খাতিরে হাত বাড়াইয়া ফটোখানা লইলাম। পুরাতন একখানা এনলার্জ করা ফটো। ফটোখানা কোন লম্বাটে গুম্ফমুখ যুবকের। অতিরিক্ত নাড়া চাড়ায় হাতের ময়লায় অনেকাংশই অস্পষ্ট হইয়া গেছে। লোকটার চুলগুলি প্রায় উল্টানো, নাকটা ক্ষুদে এবং ঠোঁট দুটি পুরু পুরু, মনে হয় দুই ঠোঁটে একটি কমলার রোয়া চুষিতেছে।

ভদ্রলোক বলিলেন, আচ্ছা ঐ ফটোর সঙ্গে আমার চেহারার কোন সাদৃশ্য চোখে পড়ে ?

তাহার গলায় ঔৎসুক্য ও ব্যাকুলতাও কম ছিল না। আমি তখনি ফটোখানা ফিরাইয়া দিয়া কহিলাম, একটুও নয়।

একটুও নয় তো ? বলিয়া তিনি যেন অত্যন্ত আশ্বস্ত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ খচ্ করিয়া ব্যাগটা খুলিয়া ফটোখানা বন্ধ করিলেন। অতঃপর পকেট হইতে সিগারেটের প্যাকেট বাহির করিয়া একটি সিগারেট আমার নাকের ডগার উপর সঙ্গীনের মত উঁচাইয়া ধরিয়া কহিলেন, সিগারেট প্লিজ—সিগারেট লইতেই স্থূলবপু বলিলেন, লোকের কি ভুল ধারণা দেখুন ! বলে ফটোর সঙ্গে আমার চেহারার মিল আছে।

বলিলাম, থাকলই বা, তাতে আপনার ক্ষতি কি ?

এ কথায় যেন তিনি বিমর্ষ হইলেন, বলিলেন—আছে আছে, আপনি তো এর কিছুই জানেন না। সে এক মহাভারত মশায়। শুনতে যদি চান দয়া করে, বলতেও পারি।

অপর কাহারও ফটোর সঙ্গে নিজের চেহারার মিল খুঁজিয়া মাথা কে-ই বা ঘামায়, আর অমিল না হইলেই বা কে এমন বিষণ্ণ হইয়া পড়ে। ইতিহাসটা জানিতে বড় কৌতূহল জন্মিল। তবে ভয়ও কম হইল না, কি জানি আমার সায় পাইয়া—না তিনি সত্য সত্যই একখানা মহাভারত ফাঁদিয়া না বসেন। বলিলাম, বিলক্ষণ শুনতে পারি তবে মহাভারত বাদ ছাদ দিয়ে বলবেন। আমার গাড়ির আর বেশি সময় নেই।

আলবৎ, সংক্ষেপেই বলচি, বলিয়া একটি সিগারেট ধরাইয়া ভদ্রলোক গল্প বলিতে শুরু করিলেন।

ফটোখানা আমার বন্ধু নীতিশ গুপ্তর। বছর পনের আগে কলকাতার নামজাদা এক বিলিতি ফার্মে দুজনে চাকরী করতাম। আমাদের মধ্যে খুব অন্তরঙ্গতা ছিল, এমন সচরাচর দু'বন্ধুর মধ্যে দেখা যায় না। নীতিশ তখন বিবাহিত। আমি বিয়ে করি নি, দক্ষিণ কলকাতায় একটি ঘরে একা একা থাকতাম। নীতিশের স্ত্রী শিক্ষিতা আধুনিকা হলেও, লজ্জা-সরমের বাড়াবাড়িটে খুব না থাকলেও, সহজভাবে কারো সঙ্গে মিশবার জন্যে উৎসাহ দেখাতেন না। আমার প্রয়োজন অপ্রয়োজন আসা-যাওয়া,চা খাওয়ার মধ্যে নীতিশের নির্দেশ ও সায় থাকলেও লক্ষ্য করতাম, এতে যেন বন্ধু-পত্নী বিব্রত ও বিরক্তই হন !

মাঝখানে ফার্মের কাজে আমাকে কলকাতার বাইরে যেতে হয়। মাস তিনেক থাকি সেখানকার কাজে। এ সময়টা ইচ্ছে করেই নীতিশের খবর নিই নি। কলকাতা ফিরে এসে দিন দশেক আফিসে যাই নি, নীতিশের সঙ্গে দেখাও হয় নি। তখন ফাল্গুন মাসই হবে, একদিন রাত্রি বারোটায় দরজায় করাঘাত হল। বিছানা ছেড়ে উঠে দোর খুলে দিতে দেখি, নীতিশের স্ত্রী। খালি পায়ে, এলোমেলো চুলে, অত্যন্ত ক্লান্ত, উদ্বিগ্ন এবং ভীত।

আমার বিস্ময় না কাটতেই বললেন, একবার আসুন না আমার সঙ্গে—

কেন, কি হয়েচে ? জিজ্ঞেস করলাম।

ওঁর অবস্থা খুব খারাপ। একা কিছু করতে না পেরে আপনার কাছে ছুটে এসেচি। চলুন···বোধ হয় বাঁচবেন না।

বাঁচবেন না ?

কিছু বুঝতে পারচি নে।

তখনি বেরিয়ে গেলাম তার সঙ্গে। গিয়ে দেখলাম নীতিশের শেষ অবস্থা। ডাক্তার ডাকা হল, চিকিৎসে হল, কিন্তু মিনিট-বিশেকের মধ্যে নীতিশ একেবারেই আমাদের ছেড়ে গেল। ডাক্তার বললেন, রক্তের চাপে মাথার শিরা ছিঁড়ে মারা গেচে।

মিনিট কয়েকের মধ্যে এমন যে অভাবনীয় কাণ্ড ঘটবে ধারণা করতে পারি নি। মৃত্যুর পরের ঘটনা ব্যাখ্যা করে লাভ নেই। তবে একথা সত্য, বন্ধু-পত্নী যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে এই অপূরণীয় ক্ষতি সইতে পেরেছিলেন।

শোকের ছায়া কাটলে কয়েক দিন পরে তিনি বললেন, যা হবার হল, এবার আমাকে একটা উপায় করে দিন। স্বাধীনভাবে নিজেকে চালাতে চাই।

চেষ্টা করে তাকে কয়েক দিনের মধ্যে মেয়ে-ইস্কুলের শিক্ষিকার কাজ জুটিয়ে দিলাম। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বললেন, বন্ধু নেই বলে যাতায়াতটা বন্ধ করবেন না। আমার দেখাশোনারও কিন্তু আপনারই প্রয়োজন হবে।

বললাম, তা দেখবো বইকি, নিশ্চয়ই যাবো আসবো।

নীতিশ মরে আমাদের দুজনকে মিশিয়ে দিয়ে গেল ভেবে মনে বড়ো দুঃখ পেলাম। পরক্ষণে মনের এক কোণে খচ্ করে উঠল এই সত্যটা—যে মানুষ মরে কেবল ক্ষতিই করে যায় না। ক্ষতিটেই আমাদের চোখে বড়ো হয়ে পড়ে বলে তার ভালর দিকটা দেখি নে। হতভাগ্য নীতিশ আমার উপকারই করে গেছে !

এই যা আমি সেদিন ভেবেচি—আজ সে যত জঘন্য কদর্য হোক না, সেদিন এমন করে ভাবি নি। নীতিশ মরবার সময় ওর অচৈতন্য দেহের ওপর আছড়ে পড়ে ওর স্ত্রীর সেই কান্না, ওকে ফিরে পাবার ব্যাকুলতা, সকাতর আকাঙ্ক্ষার ভেতর এই জিনিসটেই বুঝতে পেরেচি একজন মরে গিয়ে একজনের যে দশটা ক্ষতি করে যায়, স্বাভাবিক-ভাবে তার প্রায় সব পূরণ হলেও দু-একটি কিছুতে হয় না।

বন্ধু-পত্নীর সেই ক্ষতির প্রতি আমার সংবেদনশীল মনের মমত্বকে বনিয়াদ করে আমার এ নতুন সংকল্প বাসা বেঁধেছিল।

বন্ধু-স্ত্রীর দেখাশোনার ভারটা অতিরিক্ত করেই নিয়েছিলাম এবং সেটা প্রায়শই তীক্ষ্ণতর করে তাকে দেখাতেও চেষ্টা করেচি। একদিন বিকেলে গিয়ে বসে আলাপ করে করে রাত্রি দশটা করে ফেললাম। অবশেষে এক সময় তিনিই কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, রাত হয়েচে। তার ভেজা ঠাণ্ডা অস্বচ্ছ জ্যোৎস্নার মত শাদা ছুটি চোখে কেমন যেন ভীতিবিহ্বল করা চাউনি, অত্যন্ত দমে গিয়ে উঠে পড়লাম।

আর একদিন সন্ধ্যেবেলা হাজির হয়েই বললাম, আজ এখানে খাব।

বন্ধু-স্ত্রী অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, আমার এ সৌভাগ্যের জন্য অশেষ ধন্যবাদ।

রাত্রি সাড়ে দশটায় খাওয়ার পাট চুকল। বিদায় নেবার পূর্বক্ষণে মাথায় একটা অভিনব মতলব চাপল। অত্যধিক মাথার যন্ত্রণা হচ্চে ভান করে আশ্রয়শয্যা ভিক্ষা করলাম। বন্ধুপত্নী অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে আমাকে শুইয়ে দিলেন, ডাক্তার কল করবেন কিনা অভিমত চাইলেন। এ রকম মাঝে মাঝে হয়, ডাক্তারের প্রয়োজন নেই বলে তাকে আশ্বাস দিয়ে চুপচাপ পড়ে রইলাম। তিনি সযত্নে কোমল হস্তে কপাল মৃদু মৃদু টিপে দিতে লাগলেন।

কতক্ষণ কেটেচে, এক সময় কপালের ওপর ন্যস্ত বন্ধু-পত্নীর হাতখানা আস্তে আস্তে ধরে ফেললাম।

তিনি বললেন, এখন কেমন বোধ করচেন ?

হেসে বললাম, তামাসা করেচি, সত্যকার কিছুই হয় নি আমার।

তামাসা কেন ? ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন।

তার হাতখানা চেপে ধরে বললাম, কেন আমাদের ইন্দ্রিয় জয়ের ভান, মঞ্জু ?

সহসা তার মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠে পরক্ষণে ছাইয়ের মত পাংশু হল। বললেন, ছিঃ সত্যি আপনি অসুস্থ হয়েচেন, তামাসা করেন নি।

প্রত্যুত্তরে আমি তাকে সবলে বক্ষে চেপে ধরলাম। তিনি শারীরিক প্রতিবাদ করলেন না, দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, এ অন্যায়।

অতি কাছে তার সেই ভেজা ঠাণ্ডা অস্বচ্ছ জ্যোৎস্নার মত শাদা শাদা ছুটি চোখ দেখে আমার উষ্ণ রক্তস্রোতে ভাঁটা পড়ল। আপনা থেকেই আমার হাত ছুটি আলগা হয়ে গেল। অপরাধীর মত মাথা নিচু করে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম।

পরে সে রাত্রির কথা মনে করে বড়ো লজ্জিত হয়ে উঠেচি। সেদিনকার হঠকারিতা, মনে করেচি, বুঝি মঞ্জুকে দেখাশোনার দায় থেকে আমাকে মুক্তি দিয়েচে। কিন্তু তা হয় নি। আমার এক সপ্তাহ অনুপস্থিতির অনুযোগ করে তিনি আমাকে চায়ের এক নিমন্ত্রণ করলেন। মুখোমুখি হবার লজ্জায় সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম না। তারপর অনেকদিন তিনি সাড়া দেন নি।

তখনো গরম ফুরায়নি, বসন্তও চলে যায় নি, রাত্রি বারোটার মত হবে ইজিচেয়ারে একখানা বই হাতে করে পড়বার চেষ্টা করছিলাম। ডালহৌসি থেকে চিৎপুর হয়ে ফেরবার সময় সন্ধ্যার মুখে একরাশ সুগন্ধী রজনীগন্ধা কিনে এনেছিলাম। স্নিগ্ধ গন্ধফুলগুলি ঘরের বাতাস এত মাতাল মন্থর করেছিল যে পড়া ফেলে কতগুলো খাপছাড়া অবাঞ্ছনীয় চিন্তাধারার মধ্যে ডুবে পড়েছিলাম।

এমন সময় দরজায় করাঘাত হল।

দোর খুলে দিতে দেখি মঞ্জু। খালি পায়ে, এলোমেলো চুলে, অত্যন্ত ক্লান্ত, উদ্বিগ্ন এবং ভীত।

আমার বিস্ময় না কাটতেই বললেন, ভেতরে আসতে পারি ?

কেন, কি হয়েচে ? জিজ্ঞাসা করলাম।

আমার জিজ্ঞাসার জবাব না দিয়ে মঞ্জু ঘরে প্রবেশ করে দোর বন্ধ করলেন। আমার বিস্ময় আরো গভীরতর করে মঞ্জু পিরিচের ফুলের গোছা তুলে মুখে গালে সেগুলোর স্নেহস্পর্শ করিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়লেন।

তিনি রাত্রিতে আর ফিরে গেলেন না। পরেও কোনদিন গেলেন না। মঞ্জুর মনোপ্রকৃতির হঠাৎ এই ভাঙনের কারণ খুঁজতে আমি ব্যাকুল হয়ে পড়লাম। তার এই আকস্মিক বেপরোয়া স্বচ্ছন্দ আত্মসমর্পণের পশ্চাতের যুক্তি আমাকে বিহ্বল করে তুলল। একদিন জিজ্ঞাসা করলাম।

মঞ্জু বললেন, তুমি কি ভাবচো বল তো ?

কিছুই ভাবতে পারি নি, মঞ্জু।

কি রকম ?

মঞ্জু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, আমি নিজের ইচ্ছেয় করচি নে, আমার চরিত্রের স্খলনও বলতে পারি না। এ নীতিশের নির্দেশ।

নীতিশের নির্দেশ ? চমকে উঠলাম।

মঞ্জু তেমনি ভাবে বললেন, বলচি শোন। তুমি যেদিন শেষ আমার বাসায় গেছ, তার কদিন পরের এক সন্ধ্যায় এটা ঘটেচে। তুমি জান নীতিশ দক্ষিণের জানলাটার ধারে বসেই বরাবর বই-টই পড়ত। সেদিন সন্ধ্যা হয় হয় সময় ঘরে ঢুকে ওকে ওখানে বসে থাকতে দেখি। আমি ভয় পেয়ে উঠতে, মুখে আঙুল দিয়ে চীৎকার না করতে ইংগিত করল। আমি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। নীতিশ বলল, 'পুলকেশের সঙ্গে তোমার সেদিন ওমন করা উচিত হয় নি। ওর সঙ্গে মিলতে তোমার বাধা নেই, বরঞ্চ ওতে আমার আত্মা পরিতৃপ্ত হবে। আমার কায়াহীন তৃষিত আত্মা ওর দেহকে আশ্রয় করে তোমার থেকে মিলনে আনন্দ পাবে।' এই কথা বলার পর আর ওকে দেখা গেল না।

ঘরে বাতি ছিল না, হয়ত পূর্ণিমা নয়ত চতুর্দশীর জ্যোৎস্না ঘরে ঢুকে আবছা আবছা বিচিত্র আলো-আঁধারি রাজ্য করেছিল। এতক্ষণ চোখ বুজেই ছিলাম, এইবার চোখ মেললাম। আমার দেহ আশ্রয় করে নীতিশ ওর স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে কথায় শিউরে উঠলাম। মঞ্জুর দিকে চাইতেই ওর ফিকা ডাগর চোখ দুটি চোখে পড়ল। বড়ো কাছে তার স্রস্তবাসা দেহ, আলুলায়িতা মুখ আবছা চাঁদের আলোয় রহস্যময়। ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠে খচ্ করে বিজলীর বোতাম টিপলাম। আলো জ্বলল।

ঘরে ঝুলানো সামনের লম্বা আয়নাটায় নিজের ছায়া পড়ল। সে ছায়া দেখে যেন কণ্টকিত হয়ে উঠলাম, মনে হল, এ আমি নয়, আর কেউ। আর কেউ কোন রকমে এসে আমার দেহ জবর দখল করে বসেচে। দেখতে দেখতে ছায়াটা যেন কালো হতে হতে এক সময় সরাৎ করে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেই প্রথম চৈতন্য হারালাম।

জ্ঞান হলে দেখলাম—মঞ্জু আমার মাথা কোলে করে বসে। সেদিন আফিসে গেলাম না, নীতিশের ফটোখানা বার করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পরস্পরের সাদৃশ্য খুঁজতে লাগলাম। গভীর বিশ্লেষণ করে দেখতে পেলাম, আমি যেন অনেক জায়গাতেই নীতিশের মত হয়ে গেছি। কেমন ভয় ভয় লাগল।

বিকেলে আর একজন বন্ধুকে ব্যাপারটা খুলে বললাম। সেও ফটোখানা দেখে বলল—আমার সন্দেহ অনেকখানিই সত্য। আরো দুচারজনও এমনি বলল। আমি রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম। অহেতুক নানা প্রকার চিন্তা করে করে উন্মাদাবস্থা হতে আমার আর বাকি ছিল না। সন্ধ্যা হ'লে বাড়ী যেতে ভয় লাগল। মঞ্জুর মুখোমুখি হতে কে যেন আমায় টানতেও লাগল, কিন্তু বাড়ী ফিরলাম না। বাইরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। পরদিন সকালে মঞ্জুকে না বলে পঞ্জাব এক্সপ্রেসে কলকাতা ছেড়ে পালাই, আজ পর্যন্ত আট বছর আর ও-মুখো হই নি।

গল্প শেষ করিয়া স্থূল-বপু একটি সিগারেট ধরাইলেন।

গল্পটি অবৈজ্ঞানিক, অতি প্রাকৃত। অন্য সময় এত বড়ো ফাঁকি বিশ্বাস করিতাম না। সেদিনকার ঘোলাটে ফিকা কুয়াশাচ্ছন্ন রাত্রিতে অতীন্দ্রিয় বস্তু এত বিশ্লেষণ করিবার মত অবস্থা ছিল না। বিধবা মঞ্জুর পদস্খলনের যুক্তিটা সম্পূর্ণই মিথ্যা বোধ হইল না। জিজ্ঞাসা করিলাম, মঞ্জু এখন কোথায় জানেন ?

স্থূল-বপু জবাব দিলেন, এখন কোথায় ঠিক জানি নে। বছর পাঁচেক আগে মীরাট রেজিমেণ্টের উধম সিং নামে এক পাঞ্জাবী মেজরের কাছে শুনেচি—মঞ্জু পাগল হয়ে কোথায় উধাও হয়েচে। উধম সিংয়ের আশ্রয়ে কলকাতায় সে কিছুকাল ছিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, মঞ্জুর সহিত একত্র বাসে উধম সিংয়ের মানসিক গোলযোগ দেখা গেচে কিছু ?

স্থূলবপু মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না !

কি মনে হইল, ভাবিলাম তখন যেন খুব মনোযোগ করিয়া ফটোখানা পরীক্ষা করিয়া রায় দেই নাই। বলিলাম, আর একবার ফটোখানা দেখতে পারি ?

আলবাৎ পারেন, বলিয়া সরাৎ করিয়া ব্যাগ খুলিয়া ফটো বাহির করিয়া দিলেন। গভীর মনোযোগের সঙ্গে ফটোখানা আর লোকটির মুখ দেখিতে লাগিলাম। বার বার দেখিতে দেখিতে বোধ হইল, চুল, ঠোঁট বা নাক বাদ

দিয়া ফটোর চেহারার কপাল, চোয়ালের খানিকটা, কণ্ঠা আর ভ্রূদ্বয়ে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে সৌসাদৃশ্য আছে। সেটাই তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দেখিতেছি, স্থূলবপু বলিয়া উঠিলেন, কি মশায়, কিছু পেলেন না কি ?

কতকটা যেন মিল মিল দেখতে পাচ্চি···

বলিতেই সহসা চমকিয়া উঠিলাম, মোটা লোকটি বিদ্যুতবেগে আমার হাত থামচাইয়া ফটোখানা ছিনাইয়া লইয়া এক মুহূর্তে ব্যাগে বন্ধ করিলেন। অত্যন্ত চটিয়া উঠিয়া কহিলেন, তামাশা করচেন মশায় ? এই নেই এই আছে—আহা রাগ করচেন কেন ? যা সত্যি মনে হচ্চে তাই বলচি। আপনি নিজেই তো ফটো বিচার করতে অনুরোধ করেচেন ?

ভদ্রলোক ততক্ষণ ব্যাগ হাতে লইয়া উঠিয়াছেন।

অনুরোধ করেচি বলে আপনাকে একবার 'হাঁ' একবার 'না' করতে বলি নি। যতো সব পাগলের কারবার···বলিয়া গজগজ করিতে করিতে স্থূলবপু টান মারিয়া রুমের দরজাটা খুলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

একটু পরে ক্ষ্যাপা বন্যবরাহের মত উৎকট চীৎকার করিতে করিতে লক্ষ্ণৌগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি স্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল।

দুঃখ-স্বয়ম্বরা

আশা দেবী

অস্ত-আকাশ কান পেতে শোনে কার যেন একতারা—
পাণ্ডু-বরণ মলিন সন্ধ্যা তন্দ্রানিথর তারা !
হলো বিহ্বল আলোকের পাখী
নিশীথের সাথে বেঁধে নিলো রাখী
নীড়ের নিবিড়ে তিমিরের ধ্যানে হলো সে আপনহারা।
সরল শালের ছায়া বীথি তলে ঝিঁঝিঁরা ধরেছে সুর
পাহাড়িয়া রাগে নাচিছে ঝর্ণা বিভোর বাসনাতুর।

তুমি একা শুধু কী ভাবিছ মেয়ে ?
কাজলের ছায়া পড়ে মুখ ছেয়ে :
কারে মনে আসে—স্মৃতি চোখে আসে কোন্ দূর বন্ধুর ?
পাহাড়ের পারে এক ফালি চাঁদ বঙ্কিম ছাঁদে হাসে—
ওকি জানে তব মনের পথিক কোন পথ দিয়ে আসে !

পাহাড়ের খাদ পাশে হা-হা করে :
পাথর ঝরিছে উদ্দাম ঝড়ে
তারি মাঝে বুঝি ছোটে তার ঘোড়া দুর্বার উল্লাসে !
অথবা সে কোন্ খরবাহিনীতে এখন নেমেছে ঢল
আছাড় শিলায় ক্রোধ ডম্বরু বাজায় ক্ষিপ্রা জল।
সেই স্রোতে বুঝি পড়েছে ঝাঁপায়ে—
চাহেনিকো ফিরে দক্ষিণে-বাঁয়ে
মরণের সাথে সংগ্রামে সুখে স্নায়ু পেশী চঞ্চল।
শোনো মেয়ে শোনো—কেন মিছে এই দুখের স্বপ্নিলতা :
এই ঝাউবনে নেমেছে এখন সন্ধ্যার মদিরতা।

দুখের নেশায় কেন উন্মন
কারে দিতে চাও জীবন মরণ—
প্রলয়ের ঝড় কেন চাও বলো—হে মধুমল্লীলতা !
তার চেয়ে দেখ, বাতায়ন পাশে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বলে,
কাঁপে আলো ছায়া শান্ত কোমল তুলসী মঞ্চতলে।
রাখালিয়া বাঁশি বাজে দূর হতে
ঘনায় সুপ্তি আঁধারে—আলোতে
হে নীড় চারিণী, গুণ্ঠন টানো নিবিড় নীলাঞ্চলে।

তবু আনমনা ? তবু বুকে বাজে অশ্বপদধ্বনি ?
পাহাড়ী নদীর গর্জনে ওঠে সারা প্রাণ রণরণি ?
ওগো লীলাবধূ কেন এই ভুল
ভীরু স্রোত চাও প্লাবিতে দুকুল
মরণ—পিয়াসী কেন চাও তুমি ঝঞ্ঝার ঝনঝনি ?

বিশ্বসাহিত্য

বাংলা সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব

নরেন্দ্র দেব

রামায়ণকে প্রাচীন ভারতের আদি মহাকাব্য বলা চলে। রামায়ণের রচয়িতা মহর্ষি বাল্মীকিও ভারতের আদি কবি বলেই খ্যাত। রামায়ণের যুগে সংস্কৃতই ছিল অখিল ভারতীয় সাহিত্যের ভাষা। মহর্ষি বাল্মীকির অনুষ্টুভ্ ছন্দে রচিত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ কাব্যক্ষেত্রে এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। রামায়ণ রচনার মধ্যে যে সুমধুর কাব্য রস, যে অদ্ভুত কল্পনার বৈচিত্র্য ও মর্মস্পর্শী ভাবের ঐশ্বর্য আদি কবি আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে সন্নিবেশিত করেছিলেন তা ভারতবাসী প্রত্যেকটি মানুষেরই হৃদয় জয় করেছিল।

ভারতবর্ষ দার্শনিকের দেশ। শ্রদ্ধা প্রীতি ভক্তি প্রভৃতির সমন্বয়ে ধর্মপ্রাণ ভারতবাসী চিরদিন উচ্চ অধ্যাত্ম চিন্তার অনুশীলনে সর্বান্তঃকরণে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। এই বিরাট দেশে আমরা সেই বৈদিক যুগ থেকেই দেখতে পাই এখানে যে-কাব্য স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল তার মধ্যে ফল্গুধারার মতো অন্তর্নিহিত ছিল একটি প্রবল ভক্তি ও ভাবাবেগের রস নির্ঝর। এই রহস্যময় প্রাচ্য ভূখণ্ডের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিরা তাঁদের সাধনপথে যে পরম সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তাঁদের সেই মহাসত্য উপলব্ধির অভিজ্ঞতাটুকুও তাঁরা মনোহর কাব্যের সাহায্যে আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। এ যেমন প্রাচীন যুগের বেদ উপনিষদের মধ্যে দেখতে পাই, তেমনি পাই এ যুগের ঋষি রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'তে ও শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী' কাব্যে।

রামায়ণ ভারতের আদর্শ কাব্য। কি ভাবে, কখন, কেমন করে এই রামায়ণ রচিত হয়েছিল এ গল্পবিস্তর অনেকেরই জানা সুতরাং সে আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। রামায়ণ হয়ে উঠেছে ভারতের জাতীয় মহাকাব্য স্বরূপ। একান্তভাবে এ যেন ভারতবাসীরই নিজস্ব সম্পদ! এ কাব্য ভারতের কোনও অঞ্চল বিশেষের, কোনও সম্প্রদায় বিশেষের বা ভাষা গোষ্ঠীর আয়ত্তাধীন বা অধিকারভুক্ত সম্পত্তি নয়। রামায়ণের জনপ্রিয়তাজনিত প্রসার সমগ্র ভারতের এবং ভারতের বাহিরেও, যেমন, জাভা, বালি, সুমাত্রা, শ্যাম, কাম্বোজ প্রভৃতি বৃহত্তর ভারতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। আজও সেখানে রামায়ণ গান ও তার নৃত্যাভিনয় জনসাধারণের সবচেয়ে প্রিয়।

অযোধ্যায় আদর্শ নৃপতি ইক্ষ্বাকু বংশাবতংস শ্রীরামচন্দ্রের নানা ঘটনাবহুল অত্যাশ্চর্য জীবন কাহিনীই যে রামায়ণের মূল অবলম্বন বা বিষয়বস্তু এ আশা করি কাউকে বলে দিতে হবে না। অযোধ্যার রাজপ্রাসাদের একটা তদানিন্তন ঐতিহাসিক চিত্র ও রাজপরিবারের জীবনযাত্রারও অনেক চিত্তাকর্ষক ছবি আমরা দেখতে পাই এর মধ্যে।

বনের পথে ছেড়ে-দিয়ে-আসা নির্বাসিতা সীতার দুই ছেলে লব আর কুশই সর্বপ্রথম অযোধ্যায় এসে প্রকাশ্য রাজসভায় দাঁড়িয়ে রামায়ণ গান করেছিল। তারা জানতো না যে অযোধ্যার সর্বজনপ্রিয় প্রজানুরঞ্জক রাজা রামচন্দ্রই তাদের জনক। সীতার অনুরোধেই ঋষিকবি তাদের পিতৃ পরিচয় ছেলে দুটির কাছে প্রকাশ করেন নি। প্রিয়দর্শন যমজ বালক লব কুশের সুমধুর কণ্ঠে রামায়ণ গান শুনে সেদিন সভাস্থ সকল লোকের চক্ষু সজল হয়ে উঠেছিল। রামায়ণ সেদিন থেকেই শুধু অযোধ্যায় নয়, সর্ব ভারতের সর্বজনীন কাব্য হয়ে উঠেছিল।

অনুমান খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ থেকে চতুর্থ শতকের মধ্যে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে তদানিন্তন প্রচলিত পালি ও প্রাকৃত ভাষায় রামায়ণের অনুবাদ শুরু হয়েছিল। প্রচার হতে আরম্ভ হয়েছিল রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে সৃষ্ট নানা গল্প ও উপাখ্যান। সংস্কৃত পালি প্রাকৃত থেকে ক্রমশঃ বৌদ্ধ জাতকের গল্পের মধ্যেও রামায়ণের একাধিক গল্প ঢুকে পড়েছিল। গল্পগুলি প্রত্যেক প্রদেশের প্রচলিত নিজস্ব ভাষায়, স্থানীয় সাহিত্যের উপযোগী অলংকার ও বাগ্‌বিন্যাসাদি রচনা রীতি অবলম্বনে রচিত হওয়ায় এ যেন তাদেরই দেশের নিজস্ব কাব্য হ'য়ে গিয়েছিল। রামায়ণ গান সর্বত্র এত বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে প্রায় প্রত্যেক ছোটবড় শহরের মন্দিরে মন্দিরে, ঠাকুর বাড়ীতে, গ্রাম্য বারোয়ারী তলায় ও চণ্ডীমণ্ডপে এ প্রায়ই গীত ও অভিনীত হ'ত। রাম সীতা, লক্ষ্মণ ভরত, হনুমান এঁরা সবাই হ'য়ে উঠেছিলেন আমাদের কাছে দেবতা। 'রামলীলা' ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে বিশেষ করে উত্তর ভারতে, একটা বার্ষিক উৎসব বা পালাপার্বণে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। রামসীতার জন্মতিথি—রামনবমী ও সীতাষ্ঠমী আজও এদেশে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়।

মহর্ষি বাল্মীকি অযোধ্যাপতি প্রজানুরঞ্জক মহারাজ রামচন্দ্রকে আদর্শ নৃপতি বলেছেন, 'নরচন্দ্রমা' রূপ বিশেষণেও বিভূষিত করেছেন, কিন্তু তুলসীদাস, কৃত্তিবাস প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশের স্থানীয় যশস্বী সাধক কবিগণ শ্রীরামচন্দ্রকে বিষ্ণুর অবতার স্বয়ং গোলোকনাথ নারায়ণরূপে কল্পনা ও

বর্ণনা করে গেছেন। কালক্রমে রামসীতার পূজাও প্রচলিত হয়েছিল এদেশের নানা অঞ্চলে। দেখতে দেখতে রামায়ণ এদেশে প্রতি নগর থেকে সুদূর পল্লীর ঘরে ঘরে ধর্মের অঙ্গ স্বরূপ পূজ্য, পাঠ্য, গেয় ও অভিনেয় হ'য়ে উঠেছিল।

রামায়ণের কাহিনী আমাদের গ্রাম্য রূপ কথার মতো এত সরল সহজ ও ঘরোয়া ব্যাপার এবং সমগ্র উপাখ্যানটি এমন রোমাঞ্চকর ও চিত্তাকর্ষক যে এ গল্পের জনপ্রিয়তা অনিবার্য। এটা বিস্ময়কর বা আশ্চর্য ঘটনা একেবারেই নয়, নিতান্ত ঘরোয়া ও সম্ভাব্য ব্যাপার বলেই মনে হয় সকলের। অযোধ্যার সিংহাসনের জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত কুটিলা মন্থরা, নিষ্ঠুর প্রকৃতি কৈকেয়ী, পুত্র শোকে মহারাজা দশরথের আকস্মিক মৃত্যু, পিতৃ-সত্য পালনের জন্য রাজ্যাভিষেকের পূর্ব দিন যুবরাজ রামচন্দ্রের সেই মহান ত্যাগ স্বীকার, সেই স্বেচ্ছায় ও সানন্দে বন গমন, সাধ্বী পত্নী সীতার সেই স্বামীর ছন্দানুবর্তিনী হয়ে বনবাসে পতির অনুগমন, ভ্রাতৃস্নেহের সুনিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভরতের সৌভ্রাত্র্য মানব সমাজে সকল যুগের আদর্শ স্বরূপ। বীর হনুমানের প্রভুভক্তির তুলনা মেলে না। তারপর সেই মায়া মৃগ—মারীচ, জটায়ু, স্বর্ণলঙ্কা, পুষ্পক রথ, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ, ত্রিজটা, মন্দোদরী, সরমা, মেঘনাদ, তরণীসেন ভস্মলোচন, রক্তবীজ প্রভৃতি রাক্ষসদের অদ্ভুত কাহিনী রামায়ণকে সকল দিক দিয়ে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। বিশেষ করে এক সময় এদেশের শিশু ও নারীর মনোরঞ্জনের পক্ষে রামায়ণের আর কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না।

মহাকবি কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি প্রাচীন ভারতের একাধিক অমর প্রতিভাও বাল্মীকির রামায়ণের কাছে তাঁদের শ্রেষ্ঠ কাব্য ও নাটকের মাল মশলার জন্য প্রভূত পরিমাণে ঋণী। 'মেঘদূতম্' 'রঘুবংশম্' 'উত্তররাম চরিতম্' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি এর প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বাংলাভাষায় রামায়ণের প্রথম অনুবাদ করেন খৃষ্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ফুলিয়ার শক্তি-শালী ও প্রতিভাবান কবি কৃত্তিবাস ওঝা। ফুলিয়া নদীয়া জেলার শান্তিপুরের নিকটস্থ একটি গ্রাম। সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যে যেমন আদি কবি মহর্ষি বাল্মীকি, বাংলা কাব্য সাহিত্যে তেমনি আদি কবি কৃত্তিবাস। বাল্মীকি রামায়ণের যে অমৃত নিঃস্যন্দিনী ধারা এতকাল দুরূহ সংস্কৃত ভাষার উপলখণ্ডে আবদ্ধ ছিল, মহাকবি কৃত্তিবাস তাকে ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের মতো সংস্কৃতের নিগড় থেকে মুক্ত করে নিয়ে এসে বাংলা ছন্দের সহজ সুন্দর খাদে প্রবাহিত করেছিলেন।

কৃত্তিবাসের রামায়ণকে ঠিক বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণের অনুবাদ বলা চলে না, এমন কি অনুসরণও বলা যায় না। এ এক অভিনব নূতন সৃষ্টি। কৃত্তিবাসের উন্মেষশালিনী কাব্যপ্রতিভা তাঁর রামায়ণের মধ্যে এমন সব নূতন ঘটনার সৃষ্টি এবং বাংলাদেশের রুচি ও ভাবানুকূল এমন সব অবস্থার বর্ণনা করেছেন যে তার তুলনা হয় না। দু'একটি বিশেষ বিশেষ স্থানের উল্লেখ করলেই ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম হবে। যেমন, সীতার বিবাহ, অঙ্গদ রায়বার, তরণী সেন বধ, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ এবং অহিরাবণ ও মহীরাবণের কাহিনী, এসবই মহাকবি কৃত্তিবাসের নিজস্ব সৃষ্টি। বাল্মীকি রামায়ণে এসবের উল্লেখমাত্র নেই। কৃত্তিবাস কবি তাই সারা বাংলাদেশে বাল্মীকির তুল্যই সমান সমাদর ও মর্যাদা পেয়েছেন। সন্ত তুলসীদাসের ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত 'রামচরিত মানস'ও হিন্দি কাব্য সাহিত্যে ঠিক এই একই গৌরব ও যশোসৌরভের অধিকারী। তুলসীদাসের রামায়ণ, বাল্মীকির রামায়ণ নয়। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়ে তাঁর ভক্তকবি তুলসীদাস এক অভিনব সুন্দর রামগীতা রচনা করেছেন—যা হিন্দি ভাষাভাষী সকল ভারতবাসীর ঘরে সাদরে স্থান পেয়েছে, যেমন পেয়েছে মহাকবি কৃত্তিবাসের কীর্তিস্তম্ভ 'সপ্তকাণ্ড বাংলা রামায়ণ' বাংলাদেশের প্রত্যেক লোকের ঘরে ঘরে।

সুদীর্ঘ পাঁচ শতাব্দী ধরে কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙালীর জীবনে, তার সংসারে ও সমাজে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। গ্রামে গ্রামে এক এক দল রামায়ণ গায়ক এবং কথকও সৃষ্টি হয়েছিল—যাঁরা রামায়ণগান ও রামলীলাবিষয়ক কথকতা করাটাকেই তাঁদের উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা রামায়ণ সংক্রান্ত পালা-গান রচনা করে গাইতেন, ব্যাখ্যাসহ রামায়ণের শ্লোক আবৃত্তি করতেন এবং সুর করে রামায়ণের নানা অংশ পাঠের দ্বারা জনসাধারণের মনোরঞ্জন করতেন। পূজাপার্বণে, মেলায় ও উৎসবের দিনে রামায়ণ গান অনুষ্ঠানের একটা প্রধান অঙ্গ হয়ে উঠেছিল।

কৃত্তিবাসের রামায়ণের এই অপরিসীম জনপ্রিয়তা বাংলা দেশময় এমন ভাবে ব্যাপ্ত হ'য়েছিল যে কৃত্তিবাসের পরবর্তী বহু স্বল্পপ্রতিভাযুক্ত কবি তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে রামায়ণ রচনায় প্রলুব্ধ হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, অর্থাৎ নাম করা চলে একমাত্র কবিচন্দ্র এবং অদ্ভুতাচার্যের। কারণ, এঁরা তাঁদের সেই কঠিন প্রয়াসে কতকটা সাফল্যলাভ ক'রতে পেরেছিলেন। কিন্তু, দুঃখের ও পরিতাপের বিষয় যে, কৃত্তিবাসের অনুকরণ করতে গিয়ে অনেক অক্ষম কবি তাঁদের যে সকল ব্যর্থ রচনা দেশবাসীকে উপহার দিয়েছিলেন তার বেশ কিছু অংশ প্রকাশকদের অজ্ঞতাবশতঃ কৃত্তিবাসের মূল রামায়ণের মধ্যে প্রবেশ ক'রে তার বহুস্থান বিকৃত করে ফেলেছে। এই সব প্রক্ষিপ্ত শ্লোক-গুলিকে কৃত্তিবাসের রচনা বলে যাঁরা মূল গ্রন্থে মুদ্রিত করেছেন তাঁদের অপরাধের সীমা নেই।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে মোটামুটি তিনটি ধারায় বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা: প্রথম—পদাবলী' বা ছোট ছোট গীতিকবিতা অর্থাৎ গান যা সুর সংযোগে গেয়; দ্বিতীয় 'পাঁচালি' এও সুর সংযোগে গেয়, তবে পদাবলী জাতীয় সঙ্গীত শ্রেণীর ক্ষুদ্র রচনা নয়। পাঁচালির উপাখ্যানকে সমস্ত ঘটনা ও চরিত্র বর্ণনামূলক নাতিবৃহৎ গীতিকাব্য বলা যেতে পারে। তৃতীয় বা শেষ ধারা হল 'সন্দর্ভ', অর্থাৎ, যা কেবলমাত্র পাঠের জন্যই রচিত।

সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে প্রথম দুটি ধারার আবার একাধিক উপধারাও আছে। যেমন 'পদাবলী' বিভাগের চারটি উপধারা দৃষ্ট হয়। প্রথম—বৈষ্ণব গীতিকা, দ্বিতীয়—অবৈষ্ণব পদাবলী, কিম্বা—ধর্মবিষয়ক। তৃতীয়—লৌকিক বা সমাজগত প্রণয়গীতিকা, এবং চতুর্থ—গ্রাম্য ছড়া জাতীয় কবিতা। 'পাঁচালি' বিভাগেরও তিনটি

উপধারা লক্ষ্য করা যায়। যেমন, প্রথম—সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের অনুবাদমূলক রচনা—যথা, রামায়ণ, মহাভারত এবং শ্রীমদ্ভাগবত, দ্বিতীয়—বিভিন্ন দেবদেবীর মহিমাব্যঞ্জক মঙ্গল কাব্য, এবং তৃতীয়—লৌকিক ঘটনামূলক গাথা ও প্রণয় কাহিনী।

যদিও রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত পাঁচালি বিভাগের প্রথম উপশাখার অন্তর্গত, তাহলেও, মনে রাখতে হবে যে এই তিন কাব্যেরই প্রভাব, বিশেষ ক'রে, রামায়ণের প্রভাব—সমস্ত সমসাময়িক ও পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে প্রচুর পরিদৃষ্ট হয়। কারণ, রামায়ণই হ'ল সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনূদিত কাব্য সমূহের আদি ও প্রাচীনতম রচনা। এর অপরিসীম জনপ্রিয়তার কথা পূর্বেই বলেছি। গ্রামে গ্রামে সর্বত্র রামায়ণ গীত ও অভিনীত হওয়ায় এর প্রচার হয়েছিল অবাধ। এর মধ্যে যেমন ছিল সাহিত্যের সৌন্দর্য, তেমনি ছিল সঙ্গীতের মাধুর্য। এই সঙ্গীতের মর্মস্পর্শী প্রভাব বিস্তারলাভ করতে শুরু করেছিল বাংলা সাহিত্যের নানা শাখা উপশাখাগুলির উপর। রামায়ণের মধ্যে নানা স্থানে যে উৎকৃষ্ট স্বভাবের বর্ণনা, যে অনুপম কবিত্ব ও অলংকারের ঐশ্বর্য ছিল সেগুলিও পরবর্তী কবিদের উপর অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তারের মুখ্য কারণ বলা যেতে পারে। এমন কি পরবর্তীকালের রচিত মহাভারতাদি মহাকাব্যে, বিশেষতঃ, যুদ্ধ ইত্যাদির বর্ণনায় রামায়ণের প্রভাব অতি সুস্পষ্ট।

মধ্যযুগের অধিকাংশ বাংলা কাব্যের মধ্যে রামায়ণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন ত্যাগ করে মথুরায় চলে যাবার সময় গোপিনীদের কাতর বিলাপ রামচন্দ্রের বনবাসে যাবার প্রাক্কালে অযোধ্যাবাসীদের মর্মন্তুদ্ হাহাকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কাশীদাসের অনূদিত মহাভারতের বনপর্বের বহুঅংশ রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের প্রভাবে অনুপ্রাণিত দেখা যায়।

উত্তরবঙ্গের প্রসিদ্ধ রামায়ণ গায়ক সুকবি দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা কবি যশখ্যাতা চন্দ্রাবতী দেবীর লেখা রামায়ণের যে করুণরসাত্মক অংশ সীতার নিবিড় বেদনা ও দুঃখকে কেন্দ্র করে রচিত তার জন্য চন্দ্রাবতী কৃত্তিবাসের রামায়ণের কাছেই ঋণী। রায়মঙ্গল কাব্যে দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে পীর গাজি খাঁর যুদ্ধকে একেবারে রামরাবণের যুদ্ধের প্রতিচ্ছবি বলা চলে। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে ফুল্লরার যে অগ্নি-পরীক্ষার বিবরণ পাই তার মধ্যে সীতার অগ্নি-পরীক্ষার ছায়া দেখতে পাওয়া যায়। কালকেতুর রূপ বর্ণনার মধ্যে কিশোর রাজকুমার রামচন্দ্রের প্রতিবিম্ব পাঠক মাত্রেরই দৃষ্টিপথে ভেসে ওঠে। দ্বিজ রঘুনাথের অশ্বমেধ পাঁচালি যদিও মহাভারত অবলম্বনে লেখা, কিন্তু, অশ্বমেধের যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তার মধ্যে যুধিষ্ঠির ও শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধের সম্মিলিত রূপটিই ফুটে উঠেছে। লবকুশের সঙ্গে যুদ্ধে ভরত ও লক্ষ্মণের পরাজয়ই আমাদের স্মরণ পথে উদয় হয়—যখন পড়ি রঘুনাথের লেখা বভ্রুবাহনের সঙ্গে যুদ্ধে অর্জুনের পরাজয় কাহিনী।

এত গেল মধ্যযুগের সাহিত্যের কথা। সঙ্গীতের আসরেও দেখতে পাওয়া যায় 'রাধাকৃষ্ণের লীলা-সঙ্গীতের ন্যায় রামসীতার লীলা-সমগ্র রাঢ় অঞ্চলের অবসর বিনোদনের প্রধান অবলম্বন ছিল। লৌকিক গান, গ্রাম্য-ছড়া, রূপকথা, গল্প, গাথা সব কিছুর মধ্যেই রামায়ণের প্রভাব ওতোপ্রোত ভাবে বিদ্যমান। রাজারাণীর রূপকথা, রাক্ষস ও ভূতপ্রেতের গল্প, দৈত্যপুরে বন্দিনী রাজকন্যা ও তার উদ্ধারে রাজপুত্রের অসমসাহসিক অভিযানের কাহিনী—এসবের যে উৎপত্তি হয়েছিল কবে তা' সঠিক ভাবে বলা যায়না বটে, কিন্তু, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে বাংলা দেশে রামায়ণ কথা ও রামায়ণ গানের বহুল প্রসারের পর এই সব অদ্ভুত ও রোমাঞ্চকর গল্প ও রূপকথার প্রচলন হয়েছিল। রাজকুমার শ্বেতবসন্ত বা কাঞ্চনমালার কাহিনীর যে উৎস কোথায় তা পড়বামাত্র সহজেই বোঝা যায়।

সুতরাং, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব যে অল্প-বিস্তর সকল কাব্যের মধ্যেই পাওয়া যায় একথা অস্বীকার করা চলেনা। প্রত্যক্ষ প্রভাবের পরিচয় তো পাঠক মাত্রেরই কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে, কিন্তু, রামায়ণের পরোক্ষ প্রভাবও যে বাংলা সাহিত্যে প্রচুর—তা' অনুসন্ধান ও অনুশীলন সাপেক্ষ, কারণ সেটা প্রচ্ছন্নভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। অবশ্য এটা কবি ও কথাশিল্পীদের যে সজ্ঞানেই ঘটেছে এমন কথা বোধকরি জোর করে বলা চলেনা। সাহিত্যে যখন অসামান্য ও বড় কিছু আদর্শের সৃষ্টি হয় তার প্রভাব সমসাময়িক ও পরবর্তী কালের লেখকদের উপর না এসে উপায় নেই।

রামায়ণে আমরা দেখতে পাই রামচন্দ্র একজন আদর্শ মানব। তিনি একজন আদর্শ রাজাও ছিলেন। সীতার মতো সাধ্বী পত্নী সত্যই দুর্লভ। রামরাজ্যে প্রজারা যে পরম সুখে বাস করতো, এতো প্রায় প্রবাদ বাক্য হয়ে উঠেছে। কাব্যেও আমরা এই রকমটাই দেখতে পাই। রামায়ণের পরোক্ষ প্রভাব পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের প্রত্যেক বিভাগের উপরই সহজভাবে এসে পড়েছে। এই প্রভাবের পরিচয় মেলে মূলতঃ কাহিনী, চরিত্র চিত্রণ ও আদর্শ সৃষ্টির মধ্যে। সপত্নী-বিদ্বেষ, পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, অগ্রজের প্রতি শ্রদ্ধা, সৌভ্রাত্র্য সত্যরক্ষণ, জ্যেষ্ঠের আদেশ মেনে চলা, শৌর্য, বীর্য, সাহস ও সম্প্রীতির যে আদর্শ আমরা রামায়ণের মধ্যে পেয়েছি, পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের মধ্যে ঘুরে ফিরে ঐ সব আদর্শই আবার নব নব রূপে, নূতন নূতন ঘটনার ভিতর দিয়ে বিচিত্র-রূপে দেখা দিয়েছে। রামায়ণের অমোঘ প্রভাব থেকে কেউই অব্যাহতি পাননি। কারণ এ সকল আদর্শ তো আর কেবলমাত্র কবি কল্পনার বস্তু হ'য়ে নেই। এযে আজ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ-স্বরূপ আমাদের সংসার ও সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ স্বরূপ হয়ে উঠেছে!

বাংলাদেশের লোকসাহিত্য, লোকসঙ্গীত, কবিগান, তরজা, যাত্রা-গানের পালা বা গীতাভিনয় প্রভৃতির মধ্যেও রামায়ণের প্রভাব ছিল প্রচুর। এর মধ্যে অনেকগুলি আবার রামায়ণের কাহিনী ও চরিত্র নিয়েই রচিত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এদেশে যেমন 'কৃষ্ণযাত্রা' প্রভৃত জনপ্রিয় নাট্যাভিনয়

ও গীতিনাট্যের প্রচলন ছিল, তেমনি প্রচলিত ছিল রামসীতার কাহিনী অবলম্বনে রচিত গীতিনাট্য বা যাত্রার পালা। উত্তর ভারতের যে প্রসিদ্ধ 'রামলীলা' গীতাভিনয়—তাও এই রামায়ণকেই কেন্দ্র করে। বাংলাদেশে মেয়েদের মুখে মুখে প্রচলিত বহু ছড়া ও ব্রতকথার মধ্যে এই রামসীতার গল্প আশ্চর্য সহজভাবে ঢুকে পড়েছে।

কেবলমাত্র মধ্যযুগেরই বাংলা সাহিত্যের উপর যে রামায়ণের প্রভাব বিস্তৃত হ'য়েছিল, তাই নয়, রামায়ণের প্রভাব বাংলা সাহিত্যের উপর আজও রয়েছে। আধুনিক যুগেও বাংলা সাহিত্যের মধ্যে সে পরিচয় প্রচুর পাওয়া যায়। রামায়ণের আদর্শ চরিত্রগুলিকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশে এক বিরাট সাহিত্য গড়ে উঠেছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ' কাব্য এর জাজ্বল্যমান প্রমাণ! পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস' আর এক উল্লেখযোগ্য রচনা। এ দেশের রঙ্গালয়ের জনক-স্বরূপ মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষের একাধিক জনপ্রিয় নাটক এবং তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তীগণের নাটক সীতাহরণ, সীতার অগ্নি-পরীক্ষা, সীতার বনবাস, লক্ষ্মণ বর্জন, রামের রাজ্যাভিষেক, হরধনুভঙ্গ, বালিবধ, লংকাদহন প্রভৃতি যেমনি রঙ্গমঞ্চে একদা জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছিল, তেমনি কিছুদিন আগেও চলচ্চিত্রের পর্দাতেও দেখা গেছে।

কোনও কোনও নাটকে ও উপন্যাসে হয়ত রামায়ণের কাহিনী ঠিক যথাযথরূপে আসেনি, এসেছে সাজপোষাক বদলে আধুনিক বেশে। কিন্তু বাইরের রূপসজ্জা তো আর ভিতরের মানুষটিকে বদলে দিতে পারেনা। চরিত্রে ও আচরণে তারা ধরা দেয় রামায়ণের যুগের মানুষ বলে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এঁদের সকলের রচনার মধ্যেই রামায়ণের পাত্র-পাত্রীদের দেখা পাওয়া যায়। একটু গভীর দৃষ্টি নিয়ে তলিয়ে দেখলেই এটা তাঁদের চোখেও সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মিকী প্রতিভা' বা দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ধূপের ধোঁয়ায়' এসব হ'ল প্রত্যক্ষ উদাহরণ, কিন্তু পরোক্ষ প্রভাবেরও অজস্র পরিচয় পাওয়া যায় তাঁদের বহু রচনায়।

রবীন্দ্রনাথ বলতেন রামায়ণ গৃহাশ্রমের কাব্য। এর মধ্যে আছে ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। ভারতবর্ষ যা কিছু চেয়েছে সবই সে রামায়ণের কাছে পেয়েছে। পেয়েছে মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ এবং আত্মিক জীবনের পরিপূর্ণতা। কবিগুরুর মতে রামায়ণ ও ভারতবর্ষ এক ও অভিন্ন। রামায়ণের প্রভাব আমাদের সাহিত্যের ঋণ নয়, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া অমূল্য সম্পদ। রামায়ণের রসস্রোত কোনও দিনই শুষ্ক হবেনা। রাজার প্রাসাদ থেকে মুদির দোকান পর্যন্ত সর্বত্র এ অব্যাহত ভাবে তার রসস্রোত প্রবাহিত করে দেবে। রামায়ণের ভাবধারা তার আদর্শ ও শিক্ষা এ-দেশবাসীর জীবনে ও সাহিত্যে আজও সমভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ্

বিগত ৩১শে জুলাই কলিকাতা রাজভবনে পশ্চিম বঙ্গীয় সরকারের সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের সমাবর্তন উৎসব সুসম্পাদিত হইয়াছে। পরিষদের সচিব ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী সভার প্রারম্ভেই বিগত বৎসরের যে সকল লব্ধপ্রতিষ্ঠ সংস্কৃতবিদ্ মনীষী ও অন্যান্য পণ্ডিতের মহাপ্রয়াণে সংস্কৃত সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে, তন্মধ্যে পণ্ডিতা সুকবি ক্ষমা করাও, মহাঃ সকল নারায়ণ শাস্ত্রী, মহাঃ চণ্ডীদাস তর্কন্যায়তীর্থ, পণ্ডিত গৌরসুন্দর ভাগবতদর্শনাচার্য মহাশয়ের নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখ করেন। দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠের বালিকাশ্রম, প্রাচ্য বাণীমন্দির চতুষ্পাঠীর মহিলাবিভাগ, এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে পরিষদের বিভিন্ন কেন্দ্রে যে সকল পরীক্ষার্থিনী পরীক্ষা দিয়েছেন, তাদের ফলের বিষয়ে উল্লেখপূর্বক নারীদের সংস্কৃত বিষয়ে গভীরতর অনুরক্তি সমাজে সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তারের হর্ষোদ্দীপক মহৎ কারণ বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি আরো বলেন, বাংলাভাষার মাধ্যমে সংস্কৃতের প্রসার উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশ করে গেছেন; বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে "এক লিপি বিস্তার সমিতি" স্থাপন পূর্বক তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ মনীষী জষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও জষ্টিস্ সারদাচরণ মিত্র "দেবনাগর"কেই সর্বভারতীয় লিপি রূপে পরিগণিত করার মহাপ্রয়াস করেছিলেন। নিখিল ভারতে, বিশেষতঃ, নারী সমাজের লেখায় সংস্কৃত প্রধান ভাষাই এখন প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষার আদর্শ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিখিল ভারতীয় লিপিরূপে দেবনাগর কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃকই পরিগৃহীত হইয়াছে। বাঙ্গালীর স্বপ্ন সার্থকতায় সর্বদা আত্মপ্রকাশ করে এবং নিখিল ভারতকে কর্মপথে অগ্রসর করে দেয়। বাঙ্গালীর বর্তমান সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপন প্রচেষ্টাও সার্থকতায় আত্মপ্রকাশ করবে এবং নিখিল ভারতে সংস্কৃত শিক্ষা সংপ্রসারণের পথ সুনামতর করে তুলবে, এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত মত পোষণ করেন।

পরিষদের সভাপতি সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি ডক্টর শ্রীবিজন কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের কাজ যে খুব দ্রুতগতিতে সুচারুরূপে নির্বাহিত হইতেছে, তার প্রমাণ বিগত পাঁচ বৎসরে ছাত্রসংখ্যা তিন হাজার হইতে নয় হাজারে উন্নীত হইয়াছে, ১৫০০০ ব্যয়ভার হইতে তাহা এখন তিন লক্ষ টাকায় উন্নীত হইয়াছে। কিন্তু পরিষদের কর্মসাধনে যে বাধা গুরুতর আকার ধারণ করিয়া বিগত কয়েক বৎসর উন্নতির প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করিয়াছে, পশ্চিম-বঙ্গীয় সরকার সে বাধা দূরীকরণ সম্পর্কে কোনও ব্যবস্থাই অবলম্বন করেন নাই। গভীর ক্ষোভ ও দুঃখের সহিত মাননীয় বিচারপতি

মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন—"যে বাড়ীতে ৫ বৎসর যাবৎ পরিষদের কার্য নির্বাহ হচ্ছে, তার চেয়ে অপরিচ্ছন্ন ও আবর্জনাদুষ্ট স্থান এই কলিকাতার মত মহানগরীতেও খুব বেশী নাই। কোনও রকম সভার কার্য করা সেখানে অসম্ভব। যে পল্লীতে এই বাড়ি অবস্থিত সেটি একটি নিকৃষ্ট ও দুষিত পল্লী, তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা একেবারেই ভাল নয়। কোনও শিক্ষাপরিষদের সঙ্গে এরূপ পল্লীর সম্পর্কে চিন্তা করাও যায় না।" তিনি আরো দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, "প্রাক্তন হিন্দু স্কুলের পূর্ব অংশটি এখনও সম্পূর্ণ অব্যবহার্য অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে। কিন্তু আমাদের সম্বন্ধে কোনও চিন্তা কর্তৃপক্ষের মনে উদিত হয় না। আমি বিশ্বাস করি না যে অপ্রতিহত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিষদের এই বর্তমান কদর্য বাসস্থান অপেক্ষা যে কোনও উৎকৃষ্টতর বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন না।" সংস্কৃত শিক্ষা সংপ্রসারণের দিক থেকে ১৯৪৮ সালের সংস্কৃত শিক্ষা কমিটির আরো একটী নির্দেশ ছিল যে ছয় জন বৃদ্ধ বিশিষ্টতম পণ্ডিতকে আজীবন বার্ধক্য ভাতা প্রদান করা হইবে। কিন্তু বিগত ছয় বৎসরে এক ৺চণ্ডীদাস তর্কতীর্থ ব্যতীত আর কাকেও এই বৃত্তি সরকার প্রদান করেন নাই। এই বিষয়ে তিনি মন্ত্রী মহাশয়ের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। চতুর্থ সরকারী সংস্কৃত কলেজ স্থাপন সম্পর্কে তিনি বলেন কুচবিহারই সর্বদিক থেকে বর্তমানে যোগ্যতম স্থান, এবং সেখানেই এই কলেজ সংস্থাপিত হওয়া উচিত। বর্তমানে সংস্কৃত পুস্তকের পূর্ণ অভাব সম্পর্কে উল্লেখপূর্বক বিচারপতি মহাশয় বলেছেন—"এখন এ অভাবটি প্রকৃতপক্ষে এক আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি নিয়ে এসেছে এবং গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে দ্রুত সাহায্য প্রদান না করলে বাংলা দেশে সংস্কৃত পঠন পাঠনও বন্ধ হবার উপক্রম হবে। অন্ততঃ খুব প্রয়োজনীয় কতকগুলি পুস্তক মুদ্রণের ভার যদি গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেন, তবে ছাত্রদের অশেষ উপকার সাধিত হয়।

বঙ্গদেশের মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয় বলেন—সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার সময়ে যে ক্ষেত্রে বৎসরে হাজারখানেক পত্রের আদান-প্রদান হতো, এখন সেক্ষেত্রে পত্রসংখ্যা বৎসরে ত্রিশ হাজারে উন্নীত হয়েছে। ছাত্রসংখ্যাও তিনগুণ বর্ধিত হয়েছে। ভারতের সর্বত্র আমাদের পরীক্ষার্থী সংখ্যা বাড়ছে এবং নূতন নূতন কেন্দ্র সংস্থাপিত হচ্ছে—এ অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। বিগত কয়েক বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের রেজেষ্ট্রীকৃত পণ্ডিত সংখ্যাও আট শত থেকে ষোলশতে উন্নীত হয়েছে এবং পরিষদের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ শতভাবে বর্ধিত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত আসমুদ্রহিমাচল ভারতের সর্বত্র আমাদের পণ্ডিতমণ্ডলী আছেন এবং ৫৪টী পরীক্ষাকেন্দ্রে সহস্র সহস্র ছাত্র পরীক্ষা দেন বলে আমাদের পরিষদের সঙ্গে নিখিল ভারতের একটি অচ্ছেদ্য যোগসূত্র রয়েছে। ফলতঃ, আমাদের পরিষৎ নিখিল ভারতে একটী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ করছে। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। পরিষদের বাসভবনের অসুবিধা সর্বথা গুরুতম বলিয়া তিনিও উল্লেখ করেন। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী আশ্বাস দেন অচিরেই বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষৎ অভাবে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিগণিত করা হইবে।

শিকারে স্বীকার

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

রমেনের বয়স বছর ত্রিশ—ছ'ফুট দীর্ঘ—বলিষ্ঠ যুবা। ললাটে যৌবনের উজ্জ্বল রাজটীকা। কবিতা লেখে, গল্প লেখে, উপন্যাসেও হাত মন্দ নয়। আবার শিকারের বাতিকও যথেষ্ট। তার তীব্র দৃষ্টির সামনে কিছু এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। উচ্ছল প্রাণশক্তি নিয়ে সোজা পথে হাঁটে, সোজা কথা বলে; কিন্তু, পরন্তু, অর্থাৎ, "তবে কি না", এ সবের ধার কোনো দিনই সে ধারে না। তার অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ - শিকারের কথা শুনলেই তার সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে ওঠে—এক কথায়, সে শিকারে পাগল। আবার সে যখন গুন্ গুন্ করে সুর ভেজে নিয়ে কথা বসিয়ে গান রচনা করে, গল্প উপন্যাস কবিতায় হাত দেয়, তার কাছে পৃথিবীর অস্তিত্ব যেন লুপ্ত হয়ে যায়। পাখোয়াজেও রমেনের বেশ চমৎকার হাত—মেঘের গুরুগম্ভীর গর্জন যেন তার মৃদঙ্গে নেমে আসে!

বাপের একমাত্র পুত্র। তার সহপাঠীদের সব একে একে বিয়ে হয়ে গেল—সেই এখনও অবিবাহিত। বাপ মা তাকে অনেক অনুরোধ—উপরোধ করেছেন—ফল হয় নি। প্রত্যুত্তরে সে এইটুকুই জানিয়ে দেয়, তাঁদের আদেশ সে কোনও দিনই অমান্য করে নি—ক'রবেও না। তবে, এই বিয়ে-ব্যাপার নিয়ে যদি কেউ তাকে বেশী পীড়াপীড়ি করে, সে বাধ্য হয়ে গা ঢাকা দেবে। তার বন্ধুবর্গ অনেক যুক্তি-তর্ক দিয়ে তাকে বহুবার বহুরকমে বোঝাতে চেষ্টা করেছে—তার সেই একই উত্তর, ভারবাহী বলদের মত জাবর কেটে সে জীবনটাকে কোনো রকমেই ভারাক্রান্ত করতে চায় না—সে চায় শুধু, অবাধ, অগাধ, অনন্ত মুক্তি!

সেই রমেন হঠাৎ একদিন রোমাণ্টিক বিয়ে ক'রে ব'সল। সেই অনন্ত মুক্তিকামীর গলায় এখন শক্ত বাঁধন!

আজ রমেনের উৎসাহের অন্ত নেই! সে তার এক দূরাত্মীয়ের চিঠি পেয়েছে—মালদহে তাদের নাকি একটা গ্রামের কিছুটা দূরেই

বাঘের খুব অত্যাচার! সে যাবে শিকারে—সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে মেতে উঠ্‌লো। চোখে তার কী দীপ্তি—মনে কী অসীম উৎসাহ! যথা সময়ে সে তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে সেখানেই উপস্থিত হলো!

গৃহস্বামী প্রবীণ—নাম সুরেন্দ্রনাথ—। সাক্ষাৎ হতেই রমেন জানালে—

আপনার চিঠি পেয়ে তর সইলো না—চলে এলাম—দেখা যাক, কী হয়!

কেশবিরল মস্তিষ্কে হাত বুলিয়ে সুরেনবাবু অনুযোগ ক'রলেন—

—আগে একটা তার দিলেই ষ্টেশনে গাড়ী রাখ্‌তাম—তা' বেশ! ভালই হ'য়েছে। আমরা কালই যেতাম শিকারে। ঐ দেখ, সাত সাতটা হাতী আনিয়ে রেখেছি—অমিয়ার শিকারে খুব সখ—হাতও ভাল—সেও যাবে কি না!

—সেই অমিয়া? আপনার মেয়ে? কত বড় হয়েছে?—সেই ছোট বেলায় দেখেছিলাম—!

—এই ষোলো পেরিয়ে সতেরোয় পা দিলে। আর এরই মধ্যে কয়েকটা শূয়োর, হরিণ, কুমীরও মেরেছে—আমি নিজেই তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই কিনা—বুড়ো হ'লে কী হয়, শিকারে আমারও সখ কম নয়!

রমেন চিন্তা করে, ঐ একরত্তি মেয়ে, সে আবার বীরাঙ্গনা কবেই বা হোলো—!—যাক্ লক্ষ্য বস্তু সামনে এলেই, সুরেনবাবুর ফলাও বাক্যচ্ছটার সঙ্গে তাঁর কন্যার শিকার নৈপুণ্যের কতখানি যে সঙ্গতি—তখনই বোঝা যাবে!

রমেনের মুখে অবিশ্বাসের একটা ক্ষীণ রেখা বুঝি দেখা দিয়েছিল—সুরেনবাবু সেটা লক্ষ্য ক'রে বলেন—

—না না, আমি বাড়িয়ে ব'লছি না—তুমি নিজেও শিকারী—দেখ্‌লেই বুঝ্‌বে।

রমেন বিস্ময়াবিষ্ট! চক্ষু বিস্ফারিত!

—আশ্চর্য্য, এদেশে কোনো মেয়ে এত অল্প বয়সে শিকার করে কিনা—জানা নেই—বাংলায় বুঝি এই একটা প্রথম!

—একটা দুটো হ'য়ে লাভ কী? কিছুটা বেশী না হ'লে এদেশ বাঁচ্‌বে না—!

রমেনের বলার ভঙ্গীতে বেশ একটা আগ্রহের ভাব। হাত মুখ নেড়ে উত্তর দেয়—

—কিন্তু এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে কে? লোক কোথায়—?

আত্ম-প্রশংসায় পুলকিত সুরেন্দ্রনাথ খুব জোর গলায়, আবার মাথা দুলিয়ে সুরু করেন—

—ঘরে ঘরে সেই মানুষ তৈরী করতে হবে। যাদের ক্ষমতা আছে—তাদের এদিকে খেয়াল রাখা খুবই উচিত—অন্ততঃ আত্মরক্ষার জন্যেও লাঠি খেলা, ছোরা চালানো শেখাটা অত্যন্ত দরকার! খবরের কাগজ খুল্‌লেই দেখ্‌তে পাও না—মেয়েদের ওপর কী রকম অত্যাচারের মাত্রাটা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে! তাই অমিয়ার বন্দুক ছোঁড়ার দিকে ঝোঁক পড়্‌লো—এখন ত' নেশাই হয়ে দাঁড়িয়েছে!—ঐ দেখ, শিকারের কথা উঠ্‌লে আমিও সব ভুলে যাই! চল, হাত মুখ ধুয়ে, কিছু মুখে দাও—বিশ্রাম কর—কাল ভোরেই বেরুতে হ'বে।

সুরেনবাবু হাঁক ডাক দিয়ে তাঁর গেষ্ট হাউসে রমেনের থাকবার বেশ সুবন্দোবস্ত করে দিলেন। আর সে কী খাতির—কী আপ্যায়ন—সে কথা আজও রমেন বন্ধু মহলে গল্প করে থাকে!

ফাল্গুনের প্রথম প্রভাত। সুরেনবাবু সকালে রমেনকে ডেকে তুল্‌তেই সে বিছানা ছেড়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বস্‌লো। গৃহস্বামী তাকে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে চা-টা খেয়ে চটপট্ তৈরী হবার কথা বলে গেলেন। শিকার-পাগল রমেন্দ্রনাথও বিলম্ব করে নি। খাকী পোষাকে সজ্জিত হয়ে চা পান সুরু করেছে—অদূরে একটা বৌ কথা কও পাখী অশ্রান্ত ধারায় ডেকে চলেছে। চায়ের বাটীতে শেষ চুমুক দিয়ে রমেন নিজের মনেই হেসে উঠ্‌লো। ওদিকে, বাঘ শিকার—এদিকে বউ কথা কও—সামনে মৃত্যুর হাতছানি—পেছনে জীবনের আহ্বান! এই কী নিয়তির খেলা? দুত্তোর ছাই! এ সব গবেষণায় লাভ কী?

—কৈ হে, আর দেরী কত?—আমরা সব তৈরী যে!

সহাস্য মুখে দ্বারপ্রান্তে সুরেন্দ্রনাথের আবির্ভাব।

—আজ্ঞে, আমিও প্রস্তুত!

রাইফেল হাতে, কার্ট্রিজের থলি পিঠে ফেলে রমেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসেই থমকে দাঁড়ালো। কুমার সম্ভবের সেই "ন যযৌ ন তস্থৌ" ভাব আর কি!

রমেন চেয়ে দেখে, সারিবদ্ধ হাতীগুলোর উপর যে যার আপন স্থান করে নিয়েছে। কেবল সুরেনবাবু তার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে। ব্রিচেস্‌পরা কন্যাকুমারী অমিয়া একটা হাতীর উপর রাইফেল কোলে রেখে, দৃপ্ত-ভঙ্গীতে বসে। প্রভাত সূর্য্যের কনকরশ্মি অমিয়ার দুধে-আলতা রংএ পড়ে তার কমনীয়তা শ্রী আরও ফুটিয়ে তুলেছে। চোখ ফেরানো যায় না!

সুরেন্দ্রনাথ রমেনকে ঝাঁকি দিয়ে বলেন—নাও হে, এইটেতে উঠে পড়।

রমেনের চমক ভাঙ্গে। সেও উঠে বস্‌লো তার নির্দ্দিষ্ট স্থানে।

সুরেনবাবু তাঁর প্রিয় হাতীটির উপর চেপে বসেই—কান দুটি ঢেকে মাথায় একটা মোটা পাগ্‌ড়ী ঠেসে বেঁধে নিলেন।

জিজ্ঞাসু নেত্রে রমেন জানতে চায়—

—ওটার অর্থ কী?

সুরেনবাবু মোটা বর্ম্মাচুরুটে টান দিয়ে সহাস্যে উত্তর দেন—একে ত' মাথায় বেশী চুল নেই—সূর্য্যের তাপ থেকেও বাঁচ্‌বো—আর অন্য কোনও অবান্তর কথা—শিকারের গোলমাল—এ সবও কানে ঢুকবে না! জানোই ত'—বাঘের প্রথম লক্ষ্যই হল মাথা!

সুরেন্দ্রনাথ মাহুতদের আদেশ দিলেন—চালাও সব—নলের জঙ্গলে!

মাঝে মাঝে হস্তীর বৃংহতি—মট্ মটামট্ শব্দে তারা ডালপালা ভেঙ্গে মুখগহ্বরে ভরে নেয়—মাহুতের ধেৎ ধেৎ—মাল্ মাল্—হেই হেই—

সচীৎকার সতর্কবাণী বিভিন্ন জাতীয় শব্দ একসঙ্গে খিচুড়ী পাকিয়ে হাতীগুলোর গজেন্দ্র গমনের পথে একটা অভিনব উন্মাদনার সৃষ্টি করে চলেছে। একটা হাতীর উপর অনেক কিছু খাবারের সরঞ্জাম নিয়ে পুরাতন ভৃত্য রামনাথ সজাগ দৃষ্টিতে সমাসীন—কখন কী যে ফরমাস্ হয়—তার তো ঠিক নেই!

সুরেন্দ্রনাথ শিকারেও যেমন সিদ্ধহস্ত—আহারের পারিপাট্যের দিকেও তেমনি তীক্ষ্ণদৃষ্টি—অব্যবস্থার উপায় নেই!

রমেনের দৃষ্টি অমিয়ার প্রতি নিবদ্ধ। চোখাচোখি হতেই সে তখুনি চোখ নামিয়ে নেয়। অবশ্য অমিয়াও তার পদ্মপলাশ-চোখ দুটো তুলে ফাঁকে ফাঁকে এক একবার চকিতে রমেনকে দেখে নিতেও বাদ দেয় না। এই দৃষ্টির বিনিময়—এই লুকোচুরি দুজনের মধ্যেই চল্‌তে থাকে। রমেনের পাশের হাতীতেই সুরেন্দ্রনাথের এক বয়স্য উপেন্দ্রনাথ সুখাসীন।

কেউ এগিয়ে যায়, কেউ পিছিয়ে পড়ে!

বিরাট খড়ের জঙ্গল পেরিয়ে যাবার সময় পরস্পরকে আর দেখা যায় না। মানুষ সমেত হাতীগুলোও যেন ডুবে গিয়েছে। জঙ্গল একটু পাতলা হ'তেই, রমেন দেখে ঠিক পাশেই অমিয়া।

রমেন আপন মনে বলে উঠ্‌লো—

উঃ, কী ছুরির মত ঘাসগুলো—গা' যেন চড়ে যায়—!

—এ দিককার শিকারে এগুলো সইতেই হ'বে—উপায় নেই। আপনার কষ্ট হচ্ছে,—না?

অমিয়ার স্বচ্ছন্দ আচরণে রমেন মুগ্ধ—

—না, কষ্ট আর কী?—এ সব তো হয়েই থাকে! তোমার মনে পড়ে কী? সেই ছেলেবেলায় তুমি আমার একটা এয়ারগান্ ভেঙেছিলে? তখন তুমি কতোটুকু? এই ছ' সাত বছর!

স্মিতমুখ তুলে অমিয়া উত্তর দেয়—

—খুব মনে আছে—এর জন্যে আপনার কাছে বকুনীও খেয়েছিলাম। তাই তো এবার সত্যিকারের বন্দুক নিয়ে খেলা!

—তোমার বাবার কাছেও তাই শুন্‌লাম।

অমিয়া হাতীর পাশে পা' ঝুলিয়ে, রমেনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বস্‌ল।

—আপনার শিকারকাহিনীগুলো খুব ভাল লাগে। প্রাণ দিয়ে লেখেন, না?

—জঙ্গলের প্রাণ নিয়ে খেলা করি—কাজেই প্রাণটা বড় হয়ে ওঠে।

—ওঃ এতগুলো? প্রাণের ডিক্সনারী!

এইরূপ হাস্যকৌতুকে তারা পাশাপাশি দুজনে এগিয়ে যায়। পেছনে, একটু দূরে উপেনবাবু। ক্ষিপ্রগতির সঙ্গে তার হাতীটা চালিয়ে পাশে এসেই মুরুব্বীয়ানা চালে প্রশ্ন—

—হওর গান? হোয়াট্ মেক্? মাই হ্যাজ্ গাদা বন্দুক!

রমেনের উত্তর শোনার প্রতীক্ষায় উপেনবাবু কানে যন্ত্র লাগিয়ে তীর্য্যক্ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

ভাষার দখল দেখে চম্‌কে ওঠে রমেন—মৃচ্‌কি হেসে জবাব দেয়—

—কী বল্‌লেন? গাধা বন্দুক?

অমিয়ার হাসি আর থাম্‌তে চায় না!

—তোর আবার কী হ'ল রে বেটী? এ্যাংরেজী শুনে হাস্‌ছিস? তা' সবাই হাসে বটে! জানিস্, ম্যাজিষ্ট্র সায়েব্, এই বুলি শুনেই বন্দুকটা আমায় দিয়েছিল—তবে ছুঁড়তে পারি না—এই যা দুখ্‌খু!

—তা' বটে—এ তল্লাটে, তোমার ইংরেজী বুলির নাম আছে!

রমেনকে সম্বোধন করে অমিয়া বলে,

—কী চুপ্ করে গেলেন যে! লেখার উপাদান পেলেন বুঝি?

—হাঁ, কিছুটা পেয়েছি—গল্পেই প্রোডাকসনটা ভাল হবে।

সুরেন্দ্রনাথ পেছন ফিরে চাইলেন—ব্যাপারটা বুঝতে তাঁর বিলম্ব হোল না—নিশ্চয়ই উপেন্দ্রনাথ এতক্ষণ ওদের কাছে ইংরেজীর কাবাব বানিয়ে পরিবেশন চালিয়েছেন। হাঁক দিয়ে ডাক দিলেন—

—ওহে, এবার আমরা আসল জায়গায় এসে পড়্‌লাম। তোমরা সব আমার পাশাপাশি এসো—জঙ্গল বিট্ হবে।

নলের জঙ্গল—তার বুক চিরে একটা শীর্ণকায়া ছোট্ট নদী এঁকে বেঁকে বয়ে যায়। এখানে সেখানে বালুর চড়া—প্রাণের ক্ষীণ স্পন্দনটুকু এখনও ধুক্ ধুক্ করে—যেন থেমেও থাম্‌তে চায় না। এখন শেয়াল কুকুরগুলোও বুঝি ব্যঙ্গ করে হেঁটে পার হয়। অথচ এই নদীটাই নাকি ভরা ভাদ্রে দুকূল ছাপিয়ে, রুদ্ধ আক্রোশে গর্জ্জন করে ছুটে চলে —তখন সে কী উদ্দাম, উত্তাল, ভয়াল মূর্ত্তি—সে কী ভয়াবহ ছন্দ!

এখানে এসেই অমিয়া, সুরেনবাবু আর রমেনের হাতী তিনটে দাঁড়িয়ে গেল!

সুরেনবাবু অমিয়াকে শিকারের কতকগুলি উপদেশ দিয়ে রমেনকে বললেন—

—আমরা সবাই চেষ্টা করবো, তুমিই যেন প্রথম শিকারটা পাও—এখন তোমার হাত যশ আর কপাল! তবে নেহাৎ যদি আমাদের রেঞ্জে এসে পড়ে, তা'হলে ছাড়্‌বো না!

পূর্ব্বেই খবর ছিল—তাই বহু সাঁওতালের দল সেখানে জমায়েত হ'য়েছে। সুরেনবাবুর আদেশে জঙ্গল "বিট" সুরু হ'ল। মাঝে অমিয়া, এক প্রান্তে সুরেনবাবু, অপর প্রান্তে রমেন। অন্যান্য হাতীগুলো আর সাঁওতালের উল্টোদিক হ'তে হৈ হে করে জঙ্গল "বিট্" করে এগিয়ে আসে।

সুরেন্দ্রনাথের ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ল। রমেনের সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য কে জানে, বাঘটা তার কাছেই প্রায় পঁচিশ গজ দূরে, সেই ছোট্ট নদীটা পার হ'য়ে ছুটে যেতেই, রমেনের বন্দুক গর্জ্জন করে উঠ্‌ল। আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই সুরেন্দ্রনাথের ধ্বনি—

—সাবাস রমেন, সাবাস—

নৈরাশ্যের সুতীব্র অন্ধকার রমেনের মুখে—কণ্ঠে ব্যর্থতার সুর—না, বাঘ পড়ে নি—ফস্কে গেল! কৈ, এমনটা তো কখনও হয় নি—আজ এ কী হ'লো?

ডাক। দূরে বসে, প্রাণ-ধর্ম্মী রমেন অমিয়ার কানে মৃদু গুঞ্জন তোলে—

—পাখীটার দুষ্টুমি দেখ্‌ছো? সেও বলে কিনা—বউ কথা কও!

কী এক সুখ-স্বপ্নে অমিয়ার গালে রক্তের ছোপ লাগে!

*   *   *   *   *

ফুলশয্যার রাত্রি। তপশ্চারিণী গৌরীর মত অমিয়ার সমস্ত দেহে একটা প্রশান্ত দীপ্তি—চোখে অপূর্ব্ব তন্ময়তা বুকে যেন কী একটা অজানা আনন্দের ছোঁয়া! ফুলের মালা রমেনের গলায় পরিয়ে দিয়ে ফিক্ করে হেসে বল্লে—

—গুলীটা কিন্তু বাঘের ঠিক বুকেই লেগেছিল।—

রমেন অমিয়াকে জড়িয়ে ধরে—কণ্ঠে অস্ফুট আবেগ—

—ওঃ বুকে দারুণ চোট্—নইলে এতোদিনের অস্বীকারের পর কী এ বাঘের শিকার হয়!

রামকৃষ্ণ রায় কবিচন্দ্র

শ্রীপাঁচুগোপাল রায়

কবিচন্দ্র উপাধিবিশিষ্ট প্রাচীন কবিগণের মধ্যে রামকৃষ্ণ রায় অন্যতম। শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া তিনি "শিবায়ন" কাব্যে শিবের কীর্ত্তিগাথা গাহিয়া গিয়াছেন। 'রায়' উপাধিধারী হইলেও তিনি কাশ্যপ গোত্রীয় দেব বংশোদ্ভব। "শিবায়ন" কাব্যের ভণিতায় তিনি প্রায়শঃই নিজেকে দাস নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে অধিক কিছু জানিতে পারা যায় নাই। বাঙ্গলার উপর বর্গীর হাঙ্গামার যে বিপ্লব বহিয়া গিয়াছিল রসপুর গ্রামও তাহা হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। সেই অত্যাচারে যদি প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি নষ্ট না হইত তাহা হইলে আমরা হয়ত তাহার সম্বন্ধে অধিক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিতাম। তাঁহার শিবায়ন কাব্যে বংশলতা, প্রাচীন দলিল পত্রাদি, নানাবিধ গ্রন্থে এবং কিম্বদন্তী অবলম্বন করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে যে বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

রামকৃষ্ণ রায় তাঁহার কাব্যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার নিবাস হাওড়া জেলার অন্তর্গত উলুবেড়িয়া মহকুমার আমতা থানার রসপুর গ্রামে। ইহা হাওড়া আমতা লাইট রেলওয়ের আমতা ষ্টেশন হইতে প্রায় তিন মাইল উত্তরে দামোদর নদের বামতীরে অবস্থিত। কবির পিতামহের নাম যশশ্চন্দ্র রায় এবং পিতা শ্রীকৃষ্ণ রায়। শ্রীকৃষ্ণ রায় সর্ব্বশাস্ত্রেপণ্ডিত ছিলেন। কবির মাতার নাম রাধা দাসী এবং পিতামহীর নাম নারায়ণী। নারায়ণীর সরস্বতী নামে এক সতীন ছিলেন। কবির মাতামহ রায় সুধামিত্র।

কবি রসপুর গ্রামে রায় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রসপুরের রায় বংশের লোকেরা নিজেদের "কানসোনার দে" বলিয়া পরিচয় দেন। বর্ত্তমানে তাহারা রায়োপাধিক বলিয়া পরিচিত হইলেও রামকৃষ্ণের পরবর্ত্তীকালে বহুদিন পর্য্যন্ত তাহাদের কাহাকে কাহাকেও নিজ নামের সহিত দেবদাস পদবী ব্যবহার করিতে দেখা যায়।

প্রাচীনকালে দেব বংশ বঙ্গদেশে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। এই বংশ সুপ্রাচীনকালে রাজা কর্ণসেন ভাগীরথীর সন্ধিস্থলে নিজ নামানুসারে কর্ণপুর রাজধানী নির্ম্মাণ করেন। কর্ণসেনের পর তাঁহার সমাজস্থ নানা গোত্রে বিভক্ত যুদ্ধপ্রিয় (কায়স্থ) দেব বংশ চেষ্টা দ্বারা অঙ্গ ও বঙ্গে বহু রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এই কর্ণ স্বর্ণ সমাজের দেববংশ বঙ্গের সর্ব্বত্র 'কানসোনার দে' বলিয়া পরিচিত। (১)

রামকৃষ্ণ রায়ের পিতামহ যশ্চন্দ্র রায় রসপুর রায় বংশের আদি-পুরুষ। তিনি কবে কোথা হইতে আসিয়া রসপুরে বসতি স্থাপন করেন তাহা সঠিক জানা যায় নাই। দেববংশের কাশ্যপগোত্রীয় এক শাখা বৰ্দ্ধমানে বাস করিতেন। নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় দেব বংশের কুলস্থান নির্ণয় করিয়া লিখিয়াছেন, "ইদিলপুরের কারিকা অনুসারে রাঢ়ের বিভিন্ন ঘরের গোত্রও আদি সমাজস্থানের যে বিবরণ পাওয়া যায় তন্মধ্যে বটগ্রাম ও কর্ণস্বর্ণে শাণ্ডিল্য, মঙ্গলকোটে গৌতম ও বৰ্দ্ধমানে কাশ্যপগোত্রীয় দেবের কুলস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।" (২) মনে হয় যশশ্চন্দ্র এই বৰ্দ্ধমান জেলা হইতে রসপুরে আসিয়া বসবাস করেন। তখন দক্ষিণ রাঢ়ের ভুরিশ্রেষ্ঠী (হাওড়া জেলা) নগরের খ্যাতি সুদূরবিস্তৃত। শ্রীধর ও শ্রীকৃষ্ণ মিত্র এই নগরীর যশঃসৌরভ বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। অন্নদামঙ্গলের কবি ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ রাজগণও ভুরশুটের গড়-ভবানীপুরে রাজত্ব করিতেন। যে ভুরিশ্রেষ্ঠী নগরী গুণীগণের আশ্রয়স্থল হইয়াছিল তাহারই কয়েক মাইল দক্ষিণে রসপুর গ্রাম অবস্থিত। এই জেলার অদূরে সাগরসঙ্গম ছিল। দামোদর পূর্বপথ ত্যাগ করিয়া দক্ষিণগামী হইয়াছে। এই দক্ষিণবাহী দামোদরের পশ্চিমকূলে ভাগীরথীর পশ্চিমকূলের সদৃশ বলিয়া বর্ণিত। (৩) এই পুণ্য নদীর সন্নিকটে সাগরসঙ্গমে মুক্তবেণী ত্রিবেণী তীর্থক্ষেত্ররূপে খ্যাত হইতেছিল। রামকৃষ্ণ রায়ও তাঁহার কাব্যে ত্রিবেণীর প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন:—

প্রয়াগ সদৃশ কেহ করেত বিকল্প।
ত্রিবেণীর মাহাত্ম্য বিশেষ মাত্র অল্প॥
সংযোগ করিলে বিয়োগ এই করেন বিশেষ।

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজন্য-কাণ্ড পৃঃ ৬১-৭০

(২) নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-কাণ্ড ১ম, পৃঃ ৭১।৭২

(৩) প্রবাসী—১৩৩৮, পৃঃ—২৩৬, যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির "কি লিখি।"

এই সকল কারণে দক্ষিণ রাঢ়ে তথা হাওড়া জেলায় গুণীগণের বসবাস ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছিল। দেববংশের বাসও এই জেলায় বিস্তারলাভ করে। রাঢ়বঙ্গের সহিত নানাস্থানে অন্তর্বাণিজ্যের সুবিধার জন্য মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান ও হুগলী (হাওড়া সমেত) অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর সহিত সম্মিলিত "কানা সোনার খাল" নামে ইঁহাদের নির্ম্মিত কতকগুলি খালে বিদ্যমান ছিল।......সাঁওতাল ভাষায় দামোদর ও কানসোনা একার্থবাচী। হুগলী জেলার উলুবেড়িয়ার (এখন হাওড়ার) নিকট যে কানসোনার খাল আছে অনেকে তাহাকে দামোদরের প্রাচীন গর্ভ মনে করেন। (৪)

হাওড়া জেলায় উলুবেড়িয়া মহকুমায় দেববংশের বিস্তৃতির সঙ্গে যশশ্চন্দ্রও তাঁহার পূর্ব্ববাস ত্যাগ করিয়া সমৃদ্ধিশালী ভুরিশ্রেষ্ঠীর অদূরে দামোদরের তীরে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। দামোদর পুণ্য নদ। দামোদর পাইয়া ইহার তীরে তিনি বাসস্থাপন করেন। রসপুরের দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রান্তে দামোদর নদের ধারে তাঁহারা বাসভূমি নির্ম্মাণ করেন এবং দক্ষিণ পশ্চিমে দামোদর বেষ্টিত থাকায় উত্তর পূর্ব্বপ্রান্তে পরিখা খনন করিয়া বাসস্থান সুরক্ষিত করেন। অদ্যাপি এই বসতবাটীর পূর্ব্বাংশে এই গড়ের চিহ্ন দেখা যায়।

রামকৃষ্ণের জন্ম সন, তারিখ কিছুই জানা যায় নাই। পুরাতন দলিলাদি হইতে দেখাইয়াছি (৫) যে তাহার জন্ম ১৬১৮ খৃষ্টাব্দের পরে হওয়া সম্ভব নয়। শ্রীকৃষ্ণ রায় নিজে যেরূপ 'সর্ব্বশাস্ত্রে ধীর' ছিলেন, পুত্র রামকৃষ্ণকেও সেইরূপ সর্ব্বশাস্ত্রে বুৎপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ নিজেই লিখিয়াছেন :—

শুনিনু দর্শন ছয় বেদ শাস্ত্রে যত কয়
অষ্টাদশ পুরাণ ভারত।

তখনকার দিনে রাস্তাঘাট দুর্গম হইলেও রসপুরের দেববংশ তখনও তাঁহাদের পূর্ব্ববাসস্থান এবং তথাকার দেববংশের সহিত সংস্রব একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। শুনা যায়, রামকৃষ্ণ বর্দ্ধমান রাজ সরকারে কোন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র জগন্নাথ এবং জগন্নাথের মৃত্যুর পর পৌত্র মুকুন্দপ্রসাদ বর্দ্ধমান রাজার নিকট হইতে দেব সেবার কারণ এবং মহৎ ব্যক্তির সম্মান স্বরূপ ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন।

রসপুরে বসতি স্থাপনের সঙ্গে যশশ্চন্দ্র দুর্গাপূজার প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার বর্ত্তমান বংশধরেরা অদ্যাবধি তাঁহার প্রবর্ত্তিত পূজা পূর্ব্বপ্রথানুসারে পালন করিয়া আসিতেছেন। এই পূজার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, দেব বংশের প্রাচীন কালের বাণিজ্যের স্মারক চিহ্ন হিসাবে 'বুহিত তোলা' এই পূজার এক অঙ্গীভূত প্রথা হইয়া রহিয়াছে। নবমীর রাত্রে বাঁশের একটি কৃত্রিম নৌকা প্রস্তুত করিয়া বাদ্যসহকারে পূজামণ্ডপ হইতে কুলাঙ্গনারা গৃহে লইয়া যান।

রামকৃষ্ণের দুই বিবাহ। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে ছয় এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে একটিমাত্র পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে জগন্নাথ, বলরাম, পুরুষোত্তম, যাদব, মাধব, শ্রীকণ্ঠ ও গদাধর। শিবায়ন রচনাকালে জগন্নাথ ও বলরাম এই দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহাতে মনে হয় তিনি দীর্ঘায়ুঃ ছিলেন এবং শিবায়ন রচনা তাহার বয়সের প্রথমার্দ্ধে প্রায় ১৬৫০ খৃঃ অব্দের মধ্যে সমাপ্ত হয়। তিনি তাঁহার কাব্যে সর্ব্বত্রই কবিচন্দ্র উপাধি ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ প্রথম জীবনে শৈব অথবা শিবের অনুরাগী ছিলেন। শিবায়ন রচনাই এরূপ মনে করিবার অন্যতম হেতু। এতদ্ব্যতীত রসপুর গ্রামে বসতি স্থাপন করিয়া দেব তথা রায় বংশের লোকেরা সেস্থানে এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহেও শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন অথবা শিবলিঙ্গ স্থাপন করিবার সহায়ক হইয়াছিলেন। অদ্যাবধি তাঁহাদের উত্তর পুরুষগণ উক্ত শিবপূজাদির সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন।

কিন্তু নদীয়ায় মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের পর সারা বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম্মের যে আলোড়ন চলিতেছিল তাহার প্রভাব হইতে তিনি অব্যাহতি পান নাই। কিম্বদন্তী এইরূপ যে, একদা তাঁহার দুর্গাপূজার বলিদানের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে এক অদ্বিতীয় পণ্ডিত আসিয়া তাঁহাকে শাস্ত্রীয় তর্কে আহ্বান করেন এবং আলোচনা না হওয়া পর্য্যন্ত রামকৃষ্ণের গৃহে জলস্পর্শ করিতে অস্বীকার করেন। ব্রাহ্মণ বিমুখ হইবার ভয়ে দেব-দ্বিজ ভক্তিপরায়ণ রামকৃষ্ণ তাহাতে সম্মত হন কিন্তু আলোচনার পূর্ব্বে উক্ত ব্রাহ্মণ তাঁহাকে শপথ করাইয়া লন যে পরাজিত হইলে রামকৃষ্ণকে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। রামকৃষ্ণ উক্ত পণ্ডিতের নিকট পরাজিত হন এবং তাঁহার নিকট বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহার পর রামকৃষ্ণ "শ্রীশ্রীরাধাকান্ত" নামে বিষ্ণু বিগ্রহ স্থাপন করেন। সেই সময় হইতে তাঁহাদের দুর্গাপূজায় পশুবলি দূরের কথা, ইহার প্রতীক বলিও রহিত হইয়াছে। ইহার সমর্থনে "শিবায়ন" কাব্যে দুর্গা ও গঙ্গায় কন্দলে দুর্গার মুখে বলাইয়াছেন—

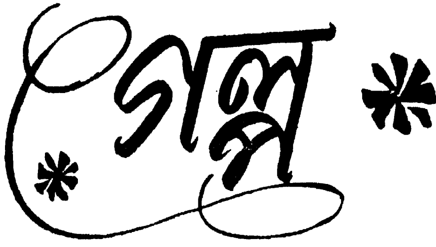
পশুবলি দিয়া পূজা লিখিয়াছে শাস্ত্রে।

নারিকেল জল কেহ দেয় কাংস্য পাত্রে॥
তাম্রপাত্রে মধু কিবা দেই দুগ্ধ দধি।
যুগে যুগে আছে এই অর্চ্চনার বিধি॥

শিবায়ন কাব্য রচনার পর রামকৃষ্ণ যে আর কোন গ্রন্থ রচনায় হস্তক্ষেপ করেন না এরূপ মনে করিবার কোন হেতু নাই। তাঁহার মত কবির পরবর্ত্তী জীবনে অপর কোন কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করাই সম্ভব। কিন্তু কবিচন্দ্র কুঞ্জের কিরণজাল হইতে রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের চন্দ্রিমা স্বতন্ত্র করা এক দুরূহ ব্যাপার।

শেষ জীবনে তিনি তাঁহার প্রাণপ্রতিম শ্রীশ্রীরাধাকান্তের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। এই রাধাকান্ত বিগ্রহের নানারূপ অলোকিক কাহিনী তখন চারিদিকে প্রচারিত হইতেছিল। শেষে কোন এক অভাবনীয় ঘটনায় প্রাণানন্দ রাধাকান্তের বিরহে তাঁহার জীবলীলা সাঙ্গ হয়। ইহা ১০৯১ বঙ্গাব্দে অথবা তৎপূর্ব্বাব্দে ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে।

(৪) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজন্যকাণ্ড পৃঃ ৭৩
(৫) সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ১৩৪৮ সাল "রামকৃষ্ণের শিবায়ন"



অসমাপ্ত গল্প

কানাই বসু

রাত্রে বৃষ্টি নেমেছিল। রাত শেষ হোলো, তখনও বৃষ্টি থামলো না, বরং বেড়ে উঠল। ছেলেমেয়েরা অনুমান করলো এই বৃষ্টি অন্ততঃ বেলা দশটা অবধি চলবে এবং বাদলদিনের অজুহাতে আজিকার মতো স্কুলে যাওয়া হ'তে মুক্তি পাবে। এই অনুমান এমনই চিত্তাকর্ষক যে অচিরে একে সিদ্ধান্তে দাঁড় করানো হোলো, সকলে স্থির করলো যে ইন্দ্রদেব যদি তাদের সঙ্গে শত্রুতা ক'রে দশটার পূর্বেই বৃষ্টি বন্ধ করে দেন, তথাপি তারা স্কুলে যাবে না।

কিন্তু কুড়িয়ে পাওয়া মাণিকের মতো এমন একটা অপ্রত্যাশিত স্বোপার্জিত ছুটীর যথাযোগ্য ব্যবহার করবার উপায় কী? যে বৃষ্টি ছুটী এনে দিল, সেই বৃষ্টিই ছুটী ভোগ করতে বাধা দিচ্ছে, বাহিরে যাবার জো নাই, ভোগের ক্ষেত্র ঘরের চারিটী দেয়ালের মধ্যে সংকীর্ণ করে বাঁধা। যা করে এ-ঘর হ'তে ও-ঘর।

সকলে ও-ঘরে গিয়া হানা দিল। বল্লে, "দাদাই, উঠেছ?"

মশারীর অন্তর্গত দাদাই বল্লেন—"শুলুম কখন ভাই যে উঠ্‌বো?"

"তবে গল্প বলো।"

"গল্প শুনবি? বেশ, বেশ। ভাবছিলুম কাকে শোনাই। রাত্তিরে ঘুম হচ্ছিল না, এইটে লিখেছি। পুরোনো গল্প কিন্তু, লিখেছি নতুন।"

"তাই শুনবো আমরা। তুমি বলো।"

"তবে জানলাটা খুলে সার্সি বন্ধ করে মশারীর মধ্যে আয় সব। বাইরে বড়ো ঠাণ্ডা। আজ আর স্কুলে গিয়ে কাজ নেই, বাড়ী থেকে বেরুসনি।"

এই জন্যই দাদাইকে এত ভালবাসে নাতি-নাতিনীরা। মনের কথা টেনে বলেন।

কনিষ্ঠটী এখনও ছেলেমানুষ, মনটা ভয়মুক্ত হয় নাই। বল্লে—"ইস্কুল না গেলে বাবা বকে যদি?"

দাদাই বল্লেন—"ঈস্। বকলেই হোলো! বাবারও বাবা আছে। আয় সব।"

অন্তরঙ্গগুলিকে অন্তরের কাছে সংগ্রহ করে নিয়ে দাদাই বল্লেন, "এ গল্পও বৃষ্টিতে সুরু। কিন্তু ভালো না লাগলে দোষ দিও না।"

জ্যেষ্ঠ বল্লে, "আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি পড়ো তো, আর ভূমিকা করতে হবে না।"

দাদাই খাতা খুল্লেন।

নিদারুণ পার্বত্য গরমের মধ্যে অকস্মাৎ সেদিন বৈকালে নিবিড় মেঘ করিয়া বৃষ্টি নামিল। ফলে অফিস হইতে ফিরিতে সেন মহাশয়ের দেরী হইতেছে। সন্ধ্যায় তিনি ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা দেখিতেন। আজ সুযোগ পাইয়া ছেলেরা পাঠ্য ছাড়িয়া অপাঠ্যে ও কার্য ছাড়িয়া অকার্যে নিশ্চিন্ত মনোনিবেশ করিয়া পরম সুখে বর্ষণ-মুখর সন্ধ্যা যাপন করিতেছিল। অকালের বর্ষা এমন সুলভ নয় যে ইহাকে পঞ্চদশ শতাব্দীর ইংরাজ-রাজ-বিবরণের ধাক্কা দিয়া অথবা বিংশ শতাব্দীর ত্রিকোণ-মিতির খোঁচা মারিয়া বিদায় করা যাইতে পারে।

ছেলেরা বৈঠকখানার দরজা ও জানালার সার্সিগুলি বন্ধ করিয়া বর্ষামঙ্গল গাহিতে সুরু করিল। সে-গান কেবলমাত্র বাহিরের প্রকৃতির সজলতায় ও গায়ক-গায়িকাদের অন্তর-প্রকৃতির নবীনতায় সরস হয় নাই, তাহার সঙ্গে সরিষার স্নেহসিক্ত চাল ও পাঁপর ভাজা যুক্ত হইয়া কণ্ঠ ও মুখবিবর, সুতরাং সঙ্গীতকে, অতিশয় রসাপ্লুত করিয়াছে। আনন্দ উৎসাহের আতিশয্যে কণ্ঠস্বরের মাত্রায় কিছু বাড়াবাড়ি ছিল, কিন্তু সঙ্গীতে তাল ছিল না এমন কথা বলা যায় না। কারণ গানের সঙ্গে অনেকগুলি হাত টেবিল

চেয়ার ও বাঁধানো অভিধানাদি বাক্যযন্ত্রের উপর নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গত করিতেছিল।

ঘড়ির দুই সূচি-তীক্ষ্ণ চরণ সময়ের গাত্রকে বিদ্ধ করিয়া অনলস গতিতে অগ্রসর হইয়া চলিল। কিন্তু নিষ্কণ্টক জলসা তখন জমিয়া উঠিয়াছে, ঘড়ির কাঁটার দিকে কে চাহিয়া দেখে। বাহিরে জল কখন কমিয়া আসিয়াছে, তাহাই বা কে লক্ষ্য করে।

রাত প্রায় ন'টা বাজে। এমন সময়ে থিয়েটারের নেপথ্যে— ভুঁইপটকার-আওয়াজের-সঙ্গে-সঙ্গে-চকিত-পট-পরিবর্ত্তনের-ন্যায়, দরজার বাহিরে সেন মহাশয়ের কণ্ঠস্বরে ঘরের মধ্যেকার দৃশ্য ও ভাবের ঝটিতি রূপান্তর ঘটিল। যে-জ্যেষ্ঠ শিল্পীটী বৃহৎ সেক্রেটেরিয়েট্ টেবিলের উপর চীৎ হইয়া শুইয়া উন্মুখ তারস্বরে গান গাহিতেছিল, সে চট্ করিয়া চেয়ারে নামিয়া আসিল ও পার্শ্ববর্ত্তী বাদকের হাত হইতে ভারি মোটা কেতাবটী টানিয়া লইয়া তাহারই পৃষ্ঠার গহনে মুণ্ড ডুবাইয়া দিল। যে-মধ্যমা শিল্পী টেবিলের ধারে বসিয়া বন্ধ সার্সীর কাঁচের উপরে ধারা-জল-তরঙ্গের সহিত আপন চুড়িপরা হাতের অঙ্গুলি-তরঙ্গ মিশাইতেছিল, সে টেবিল ও দেয়ালের অন্তর্বর্ত্তী স্থানে টুপ্ করিয়া এমন ডুবিয়া গেল যে তাহার মাথায় উদ্ধত টিকি থাকিলেও দেখা যাইত না। এবং মেজো ও ছোট শিল্পীদের নৃত্যচপল চরণগুলি মুহূর্ত্তে খসিয়া পড়িবার ফলে তাহারা যে যেখানে ছিল ঝুপ্‌ঝাপ্ বসিয়া নামতা আবৃত্তি সুরু করিল।

সকলেই একরকম আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিল, কেবল সেন মহাশয়ের বড়ো মেয়েটী তাহার অবস্থা ও অবস্থান পরিবর্ত্তনের সুযোগ বা সময়ের অভাবে দ্বিধাবিভক্ত টেবিলের নীচে, যেখানে সে ঝাঁকিয়া বসিয়া দুই হাতে দুই দিকের কাষ্ঠাঙ্গকে মৃদঙ্গ-জ্ঞানে নিজের গানের সঙ্গে অসঙ্গত সঙ্গত করিতে ব্যস্ত ছিল, সেইখানেই বন্দী হইয়া রহিল। সে আপন কণ্ঠ ও হাতের শব্দজালে আবৃত থাকায় পিতার কণ্ঠ শুনিতে পায় নাই, ঘরের মধ্যে হঠাৎ নিস্তব্ধতায় যখন ব্যাপারটা বুঝিল, তখন বাহির হইবার সময় নাই। অগত্যা সে বয়সোচিত ও শিল্পীজনোচিত, বিনয়-লজ্জাবশতঃ আপনাকে যথাসাধ্য অপ্রকাশ রাখিল।

কিন্তু অদৃষ্ট বিরূপ। সেন-মহাশয় বৈঠকখানার দ্বার-পথে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন "খুকি, খুকি কোথায় গেলি ?"

মেয়ে কালক্রমে বড়ো হইয়া উঠিয়াছে, কলেজে পড়িতেছে, কিন্তু তাহার নামটী বয়সোচিত বড়ো হয় নাই, সেই খুকিই আছে।

বাড়ীর ভিতর হইতে সেন-গৃহিণী আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেন-মহাশয় পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—"দিদি কোথায় রে ? শুয়ে পড়েছে নাকি ?"

দিদির ভাইবোনেরা পাঠে অতিশয় নিবিষ্টচিত্ত থাকায় পিতার প্রশ্ন শুনিতে পাইল না। সেন-গৃহিণী জবাব দিলেন—"শুয়ে পড়লে তো বাঁচতুম। বাড়ী মাথায় করে আছে সব।" বলিতে বলিতে তিনি ঘরের ভিতর আগাইয়া আসিয়া হাতের কাছে যাহাকে পাইলেন তাহার মাথায় একটা ঠেলা দিয়া বলিলেন—"এই হতভাগা, শুনতে পাচ্ছিস না ? দিদি কোথায় গেল ?"

"বা রে, আমাকে মারলে কেন ? আমি তো পড়ছি, মিছিমিছি আমাকে"—বলিতে বলিতে দিদি-ভক্ত ভাই উদ্যত কান্না অথবা হাসি, কিছু একটা চাপিতে চাপিতে ঘর হইতে পলাইল।

"নাঃ, কেউ কিচ্ছু জানো না, সব মুখ বুজে লঙ্কায় আগুন দিচ্ছিলে। সন্ধ্যে থেকে ঘরে যেন তাণ্ডব নেত্য করছে রাক্কোসগুলো। তোমার হাতে তো লাঠি রয়েছে, দাও না এক ধার থেকে পটাপট্। এই—এই রাক্কোসটা দলের সর্দার—বলিয়া সেন-গৃহিণী টেবিলের ধারে আসিয়া অভিধানপাঠরত ছেলেটীর কান ধরিয়া বলিলেন—"গলায় নেই সুর একফোঁটা, আর চীৎকার করে ষাঁড়ের মতন।"

এ-রকম সোজাসুজি কথায় ও স্পর্শে পড়ার কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত হয়, কিন্তু নিশ্চয় করিয়া জানা দরকার বইকি। পড়ুয়া ছেলেটী মাথা তুলিয়া মায়ের মুখের পানে চাহিয়া শান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"আমায় বলছো মা ?"

"হ্যাঁ গো, তোমার কানে ধরে বলছি, তোমায় নয় তো কি ও পাড়ার—, ও মাগো কী গো ?"

কান ছাড়িয়া, কথা ছাড়িয়া, প্রায় ভূপৃষ্ঠ ছাড়িয়া আতঙ্কিত সেন-গৃহিণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

"কী গো ? কী হোলো ?" সেন-মহাশয় দরজার ধারে চেয়ারে বসিয়া জুতা খুলিতেছিলেন, এক পাটী জুতা খুলিয়াছেন, সেই অবস্থায়, এক পায়ে জুতা পরা,

ছুটিয়া আসিলেন। গৃহিণী তখনও মেজেয় পা ঠুকিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু কামড়ালো নাকি ?"

গৃহিণী বলিলেন—"কী যেন, মাকড়সা না সাপ পায়ের ওপোর দিয়ে সুড়্ সুড়্ করে চলে গেল। দেখ তো টেবিলের তলায়।"

ছেলেমেয়েরা মুখে কাপড় দিয়াছে। সেন-মহাশয়কে টেবিলের নীচে কীট পতঙ্গ সরীসৃপ খুঁজিতে হইল না, পায়ে যে সুড়সুড়ি দিয়াছিল, সে নিজেই বাহির হইয়া আসিল। মা বলিলেন—"খুকি! তুই ছিলি টেবিলের তলায়? সর্বরক্ষে!"

অবশিষ্ট জুতাটী খুলিবার জন্য সেন-মহাশয় দরজার কাছে ফিরিয়া গেলেন। খুকি তাড়াতাড়ি গিয়া জুতার ফিতায় হাত লাগাইয়া বলিল—"বাবারে বাবা! মা-টা কী ভীতু! একটু পায়ে হাত দিয়েছি কি না দিয়েছি—"

অত্যধিক রাগ সত্ত্বেও হাসির ছোঁয়াচ লাগিলে সেন-গৃহিণী হাসি চাপিতে পারেন না, তাই আর কথাটা না কহিয়া সরিয়া পড়িলেন। মাকে ছেলেমেয়েরা চেনে এবং তাঁহার রাগকে কদাচিৎ ভয় করে।

জুতার পর মোজা খুলিতে খুলিতে পিতৃমুখী কন্যা বলিল—"আমাকে ডাকছিলে কেন বাবা?"

সেন মহাশয় বলিলেন—"দেখলে, ভুলে গেছি একেবারে। তোর মা যা কাণ্ড করলে। হ্যাঁ, তুই বাংলা গান শিখতে ভালবাসিস, শেখাবার লোকের অভাবে শেখা হয় না,— হবে কী করে, এমন পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশে এসে পড়েছি, বাঙ্গালীর ছেলেমেয়েরা বাঙ্গলা ভাষাই ভুলতে বসেছে তা বাঙ্গলা গান।"

এইখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। যে-দেশের নিন্দা করিতে সেন-মহাশয় আসল কথা ভুলিয়া যান, সে নিন্দার দেশ নয়। সে অপরূপ শোভা ও সৌন্দর্যের দেশ, শৈলশিখরবাসিনী নগরী। নামটা নাই বলিলাম, ভক্তদের মনে আঘাত লাগিতে পারে। অনেক বাঙ্গালী অনেক অর্থব্যয় করিয়া এখানে শৈত্য, শোভা ও স্বাস্থ্যের সন্ধানে আসেন। তাঁদের আসা ও আশা বিফল হয় না। অনেক বাঙ্গালী রাজকর্মে নিযুক্ত হইয়া এখানে বাস করেন এবং পরম সুখেই বাস করেন। কিন্তু সেন-মহাশয়ের মনে ষোলো আনা সুখ হয় না। বাঙ্গলা দেশ হইতে অতি দীর্ঘকাল অতি দূর দেশে থাকা সত্ত্বেও, অথবা থাকার কারণেই, তাঁহার মন সেই বাঙ্গলা দেশের জন্য কাঁদে। এখানে মন টেকে না। এখানে ছেলেমেয়েরা পাতলুন কোট, শালওয়ার সেরওয়ানি পরিয়া ইংরাজীতে গল্প করে, হিন্দীউর্দুতে গজল গাহে, এখানে ধুতি শাড়ী পরিয়া কেহ বাঙ্গলা শ্যামা-সঙ্গীত গাহে না; আশ্বিন মাসে এখানে চাঁদা করিয়া দুর্গাপূজা হয় বটে, কিন্তু দরজায় ভিখারী আসিয়া আগমনী গাহে না, তাই সেন-মহাশয় পুরাপুরি সুখী হইতে পারেন না। তিনি দিন গোণেন, কবে চাকরী হইতে অবসর পাইবেন, কবে দেশে গিয়া গ্রামের বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে খালি গায়ে বসিয়া ডাবের জল ও তামাকুর ধূম পান করিবেন, তাহার আশায় দিন গোণেন।

আর ছেলেরা সেইদিনের কথা মনে করিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠে। তাহারা কাগজে পড়িয়াছে—সে দেশে গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা একশত দশ ডিগ্রিরও উপরে উঠে। তথাপি সেখানকার লোকে দগ্ধ হইয়া মরিয়া যায় না! আর সেদেশে শীতকাল বলিয়া প্রকৃতপক্ষে কোনও কাল নাই, যাহাকে বাঙ্গালীরা শীতকাল বলিয়া চালায়, সে সময়েও নাকি বরফ দোকান হইতে কিনিলে তবে পাওয়া যায়। সেই আফ্রিকার মরুভূমি-সদৃশ উত্তপ্ত দেশে বাস করিবার সম্ভাবনা স্মরণ করিয়া ছেলেমেয়েরা এখন হইতে ম্রিয়মাণ হয়।

খুকি সাগ্রহে বলিল—"কে গান শেখাবেন বাবা? কবে থেকে শেখাবেন? রোজ আসবেন তো গান শেখাতে?"

দুই হাতে দুই কাপ চা লইয়া আসিলেন সেন-গৃহিণী, শেষের কথাগুলি শুনিতে পাইয়া বলিলেন—"রোজ এলে রোজ গান শিখবি নাকি?"

"কেন শিখবো না? দুবেলা এলে দুবেলা দুটো ক'রে শিখবো।"

"ও! তার বেলা পড়ার ক্ষতি হবে না, না? আর একবারটী আচারের হাঁড়ীগুলো রোদে দিতে বল্লে ফোর্থ ইয়ারের পড়া কামাই যায়, কেমন?"

কোট-টাই সার্ট খোলা হইলে সেগুলি লইয়া খুকু ভিতরে রাখিতে চলিল,—যাইতে যাইতে মায়ের কথার জবাব দিল,—"যায়ই তো। ফোর্থ ইয়ারের পড়া কি

চাট্টিখানি কথা নাকি ? আর সেটাও বিদ্যে, গানও বিদ্যে। তোমার আচারের হাঁড়ীতে তো আর বিদ্যে নেই।"

মা বলিলেন, "তা নেই, কিন্তু চোখ ফেরাতে না ফেরাতে হাঁড়ী ফাঁক হয়ে যেতে দেরী হয় না। সে বিদ্যেয় তো বেশ পাকা হয়েছ সবাই"—বলিয়া তিনি রান্নাঘরের দিকে চলিলেন জলখাবার আনিতে। ইত্যবসরে খুকু বাপের জন্য কাপড় আনিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কবে থেকে আসবেন বাবা ?"

এক কাপ নিঃশেষ করিয়া অপর কাপ তুলিয়া লইয়া সেন-মহাশয় বলিলেন—"কবে থেকে কী রে ? আজই, এখনই আসছেন ? আজ থেকেই শিখতে পারিস।"

গৃহিণী জলযোগের থালি আনিয়াছিলেন, বলিলেন—"সে কী গো ? কী রকম লোক তার খবরাখবর নিয়েছ সব ? কেমন মানুষ ?"

"কেমন আবার মানুষ ? যেমন মানুষ হয়, তেমনি। দুটো হাত, দুটো পা, একটা মুণ্ডু—"

"তুমি বোকো না। দুটো হাত দুটো পা না তো কি চারপেয়ে মানুষ বলছি ? স্বভাব চরিত্তির কেমন, কে চেনে, সব খবর নিয়েছ ?"

সেন-মহাশয় মাথা নাড়িলেন।

"তা জানি। তোমার তো কাজ। ও আমার দরকার নেই, গান মাথায় থাকুক। অত বড়ো মেয়েকে আমি যার তার কাছে গান শিখতে দেব না। যা সব কাণ্ড হচ্ছে চারদিকে। এই সেদিন কাগজে দেখলুম—"

সেন মহাশয় বলিলেন—"থাক সে কথা।" খুকু বাবার জন্য জল লইয়া আসিল। উৎসাহে তাহার দেরী সহিতেছে না। বলিল—"ঘরটা তাহলে একটু পরিষ্কার করে ফেলি। এখুনি আসবেন তো, হাঁ বাবা ?"

"হ্যাঁ, এই এলেন বলে। কালীবাড়ী হয়ে আসছেন বল্লেন।"

খুকু ঘরের পারিপাট্য সাধনের জন্য সাফ চাদর আনিতে গেলে, তাহার জননী বলিলেন,—"হ্যাঁ গা, কে লোকটী বল দেখি ? এ পোড়া দেশে আবার বাঙ্গলা গানের মাষ্টার কে আছে ? তোমার সঙ্গে আলাপ আছে ?"

"বাঃ, তা আর নেই ? বলে, আধ ঘণ্টার ওপোর গল্প করলুম, তিনখানা গান শুনলুম, আলাপ নেই ?"

ভ্রূ কপালে তুলিয়া ও চোখ বড়ো করিয়া সেন-গৃহিণী বলিলেন—"আধ ঘণ্টার আলাপ ! আগে চিনতে না ? কোথা যাব মা !"

এবার সেন-মহাশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"আহা, চিনবো না কেন ? এই তো পরশুদিন কালীবাড়ীতে আরতি দেখছিলেন, তারপর আজ কথাবার্ত্তাও হোলো, এবার থেকে বাড়ীতে আসবেন যাবেন, এই তো আলাপ। আবার আলাপ কি গাছ থেকে পড়বে। বাঙ্গালী, ভদ্রলোক—"

"দরকার নেই আমার আলাপে। তোমার কাছে বাঙ্গালী হলেই ভদ্দরলোক সবাই।"

"আহা, শোনই না। ভদ্রলোকের হাতে একটী পাত্র আছে। ছেলেটী ভালো, সম্প্রতি এখানে পোষ্টেড্ হয়ে এসেছে। চাকরী ভালো। মা নেই, বাপ আছে, বুঝলে ?"

গৃহিণীর সুর তবু নরম হয় না। তিনি বলিলেন—"তা বেশ, ছেলের খবরাখবর নাও ভালো করে। কিন্তু তা বলে যাকে তাকে গানের মাষ্টার করে বাড়ীতে ঢোকানো চলবে না। কোথাকার বিদেশী লোক, চোর কি জোচ্চোর তার ঠিক নেই—"

এই সময় সেন মহাশয় শশব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—"আসুন দাদা, আসুন। এই আপনার কথাই হচ্ছিল।"

সেন-গৃহিণী দরজার কাছেই দাঁড়াইয়াছিলেন। কখন পিছনে আগন্তুক আসিয়াছেন, দেখিতে পান নাই। কিন্তু তাঁহার শেষের কথাগুলি নিশ্চয় বাহির হইতে শোনা গিয়াছে। কাহাকে তিনি চোর জুয়াচোর বলিতেছেন, তাহা আগন্তুক যদি বা না বুঝিতে পারিতেন, তাঁহার কাণ্ডজ্ঞানহীন স্বামীটী আর সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ রাখিলেন না। স্বামীর পানে তীব্র এক ঝলক দৃষ্টি হানিয়া তিনি মাথায় কাপড় টানিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন। সে-দৃষ্টি সেন-মহাশয়ের কাছে ব্যর্থ। তিনি বলিলেন—"আসুন, দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে আসুন। আপনার জন্যেই বসে আছি, আপনার কথাই হচ্ছিল।"

ফরাসে চাদর পাতা স্থগিত রাখিয়া খুকু দেখিল—পাকা-চুলে-ভরা-মাথা ও জলকাদাভরা-পা, এক বৃদ্ধ দরজার উপর দাঁড়াইয়া হাসিমুখে তাহারই মুখের পানে চাহিয়া আছেন।

কেশে বেশে ও আকৃতিতে এ-সহরসুলভ চাকচিক্য বা পারিপাট্যের লেশমাত্র নাই। নিতান্তই বাঙ্গালী বেশ, বাঙ্গালী মূর্ত্তি।

কিন্তু এই অসংস্কৃত, অমার্জিত ও অপরিচিত বৃদ্ধকে দেখিয়া সেন মহাশয়ের আধুনিকা তরুণী কন্যার কী মনে হইল সে-ই জানে,—অথবা হয়তো সে-ও জানে না,—সে হঠাৎ আসিয়া বৃদ্ধের আজানু-অনাবৃত ভিজা পায়ের ধূলি লইয়া প্রণাম করিয়া বসিল। আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল বৃদ্ধের মুখ, তিনি খুকির ছোট মাথাটীর উপর হাত রাখিয়া বলিলেন—"এস মা, এস।"

সেন-মহাশয় বলিতে গেলেন—"এইটী আমার—", বৃদ্ধ বাধা দিয়া বলিলেন—"কিছু বলতে হবে না, আমি দেখেই চিনেছি আমার মাকে।"

তারপর গান হইল। শুনিতে খুব খারাপ হয়তো লাগিল না, কিন্তু নিতান্তই দেশী গান, সবই রামপ্রসাদ, দাশরথী, রাজকৃষ্ণ, বড় জোর রজনীকান্ত। আধুনিক তো নয়ই, রবীন্দ্রনাথও নয়, নজরুলও নয়, এমন কি অতুলপ্রসাদের নামও ভদ্রলোক শুনিয়াছেন কি না সন্দেহ। গান শুনিয়া খুকির শিখিবার উৎসাহ প্রায় নিবিয়া গেল। মনটা আশা-ভঙ্গে অতিশয় বিমর্ষ হইল।

"কখ্খনো নয়, কী যে বলেন।"

গল্পে বাধা পড়লো। গল্পকার বল্লেন—"কী কখ্খনো নয়, বৌমা?"

যিনি বাধা দিয়েছিলেন সেই বৌমা বল্লেন—"সে আপনি জানেন। ও রকম কেউ মনে করে নি। কী যে বানিয়ে বানিয়ে লিখেছেন সব!"

মশারী-মধ্যস্থ শ্রোতারা বল্লে—"তুমি এ গপ্প জানো বুঝি মা?"

মা বল্লেন—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি। এখন তোরা বেরিয়ে আয় দিকি। দাদাইকে উঠ্তে দে। একেবারে ঘাড়ের ওপোর গিয়ে বসেছিস যে সকলে। নেমে আয় বিছানা থেকে।"

কনিষ্ঠ বল্লে—"না, আমরা গপ্প শুনবো।"

জ্যেষ্ঠ বল্লে—"তারপর কী হল দাদাই?"

মা বল্লেন—"তারপর কিছু হোলো না, যাঃ। আপনার দুধ জুড়িয়ে যাচ্ছে বাবা। ওদের বার করে দিন। আমি দুধ আনছি।"

এবারে প্রায় সকল শ্রোতা সমস্বরে বল্লে—"আঃ, তুমি যাও না, মা। দাদাই এখন উঠবে না। তারপর দাদাই?"

দাদাই বল্লেন—"তারপর আর লেখা হয়নি ভাই।"

"ঐ তোমার দোষ। তুমি কিছু শেষ কর না। থাক্‌গে, তুমি তো জানো মনে মনে কী হোলো তারপর। সে বুড়ো কি করলে?"

"সে অনেক কথা ভাই। বলতে গেলে বেলা হয়ে যাবে। মা রাগ করবে।"

নাতি-নাতনিরা পর্বতের আড়ালে আছে, ভয় নাই। বল্লে—"ঈস্! মা'রও বাবা আছে। তুমি বল না কী হোলো?"

অগত্যা দাদাই বললেন—"আচ্ছা, একটুখানি বলি। ক'দিন পরে বুড়ো একটা চিঠি লিখেছিল সেন মশাইকে। তার থেকে একটু শুনিয়ে দিচ্ছি।"

"..... আপনার লক্ষ্মীস্বরূপা গৃহিণী না দেখিয়াই চোর-জুয়াচোর বলিয়া চিনিয়াছিলেন। যাহার নাই, সে যাহার আছে তাহার ধন চুরি করে। আপনার কন্যাটীকে চুরি করিতে ইচ্ছা হইয়াছে, তাহা জানাইতেছি। এবং নিজের পুত্রকে কেবলমাত্র পাত্র হিসাবে পরিচয় দিয়া তাহার সহিত প্রকৃত সম্বন্ধ গোপন রাখাকে যদি জুয়াচুরি বলা যায়, তবে সে নামও অর্জন করিয়াছি, অস্বীকার করিব না।

"উপযুক্ত জননীর উপযুক্ত কন্যাও অবশ্যই আমাকে চিনিয়া থাকিবেন, নতুবা প্রথম দেখাতেই তাঁহার হৃদয়স্বর্গ হইতে ভক্তির নির্মল ভাগীরথী নামিয়া এই দুইটা কদমাক্ত গোষ্পদে আসিয়া মিলিত না! সেই মুহূর্তে মনে মনে নাম রাখিলাম "নমিতা"। যদি চুরি করিতে দেন, আমার কাছে তিনি "নমিতা" হইয়াই থাকিবেন।"

"ওরে মা'র নাম রে! গপ্পর মধ্যে মা'র নামটা ঢুকিয়ে দিয়েছে দাদাই।"

"বলি তোরা আপনি বেরোবি, না আসবে ও-ঘর থেকে, কান ধরে টেনে বার করবে?"

আপনিই বার হোলো। একটী দুইটী করে অনেকগুলি ছোটো ছোটো পা বার হোলো মশারীর ভিতর হতে। তাদের পরে বার হোলো এক জোড়া দীর্ঘ শীর্ণ পা।

লালপাড় শাড়ীর আঁচল-বেষ্টিত সদ্যস্নাত শুভ্র ললাটটী সেই শীর্ণ পায়ের উপর নত করে বধূ তার নিত্য প্রণাম সারলো। শীর্ণতর হাত দিয়ে সেই নমিত মস্তক স্পর্শ করে বৃদ্ধ বললেন—"এস, মা, এস।"

ছেলে মেয়েরা বললে—"কী যে গপ্প লিখেছে দাদাই। শেষ নেই, কিছু নেই।"

দাদাই বললেন—"বুড়ো মানুষের গল্প ঐ রকম। শেষ যেন এর কোনদিন না হয় ভাই।"

শিবিরের মাধ্যমে শারীরিক শিক্ষা

শ্রীবিধুভূষণ জানা

পশ্চিমবঙ্গ শরীর শিক্ষক সমিতি ১৯৪৮ সাল হইতে ১৯৫৪ সাল পর্য্যন্ত নয় বার শিবিরের মাধ্যমে বহু শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে শারীরিক শিক্ষাদানে আশাতীত সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন।

বর্ত্তমান বৎসরে গত ২০শে মে হইতে ২০শে জুন পর্য্যন্ত আলীপুর হেষ্টিংস হাউসে পশ্চিমবঙ্গ শারীরিক শিক্ষক সমিতির শিক্ষিকা-শারীরিক-শিক্ষা শিবিরের কার্য্য পরিচালিত হয়। ২০শে জুন সমাপ্তি ও প্রশংসা-পত্র বিতরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যশিক্ষা বোর্ডের পরিচালক মাননীয় শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রনাথ দাশ মহাশয় সভাপতিত্ব করেন।

বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ শিক্ষাবিদ্ ও শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে, শিক্ষাকে সময়োপযোগী জীবনোপযোগী করার জন্য একটি ক্রমবর্দ্ধমান আন্দোলন দেখা যাইতেছে; কিন্তু শিক্ষাকে কি ভাবে পরিবর্ত্তিত করা প্রয়োজন, তাহার প্রকৃত প্রণালী বা রূপ সম্বন্ধে এখনও পর্য্যন্ত কোন সুস্পষ্ট অভিমত সৃষ্টি হয় নাই। গত দুই শতাব্দী অথবা তাহারও পূর্ব্ব হইতে আমাদের দেশে যে শিক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, সে শিক্ষায় শিক্ষিত জন সমাজ বর্ত্তমান জগতের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হইতে সমর্থ হয় নাই। এই অসামঞ্জস্য ক্রমেই অধিকতর সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, দীর্ঘ সমস্যা নূতন আকারে দেখা দিয়াছে। স্বাধীনতার গুরু দায়িত্ব বহনে যোগ্যতার তাগিদে জাতীয় জীবনে, সামাজিক জীবনে ও ব্যক্তিগত জীবনে যে সকল অভাব, অপটুতা ও অযোগ্যতা নগ্ন রূপে দেখা দিয়াছে, তাহা অবিলম্বে দূর করা একান্ত প্রয়োজন। এই প্রতিকারের বিরাট প্রচেষ্টা শিক্ষার মাধ্যমেই সাধন করিতে হইবে সন্দেহ নাই। শিক্ষা সম্বন্ধে যাঁহারা অবহিত তাঁহারা সকলেই জানেন যে, আমাদের বিগত দুই তিন শতাব্দীর শিক্ষায় চরিত্র-গঠন, দেহ গঠন ও মনুষ্যত্ব সৃষ্টির প্রয়াস অতি অল্পই পরিলক্ষিত হয়, আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতিও এ দোষে দুষ্ট। এই ত্রুটিগুলি আমাদের দূর করিতে হইবে এবং যত অল্প সময়ের মধ্যে করা যায় ততই মঙ্গল। এই অভাব অভিযোগগুলির কারণ অনুসন্ধান করিলে দুটি বিষয় সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যায়, একটি নৈতিক শিক্ষার অভাব—দ্বিতীয় স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষার অভাব। একটু বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, এতদিন শুধু বুদ্ধি-মূলক শিক্ষার ব্যবস্থাই করা হইয়াছে। একটি মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় নাই। বুদ্ধি ব্যবহার করা হইয়াছে, দেহকে অবজ্ঞা করা হইয়াছে, ফলে দৈহিক বিষয়ে ক্রমাবনতি ঘটিয়াছে, এই সকল দোষ ত্রুটি অবলম্বন করিয়াই ব্যক্তিগত জীবনে, সামাজিক জীবনে এবং জাতীয় জীবনে বিভিন্ন দোষ ও কুসংস্কার বিরাট আকারে দেখা দিয়াছে।



শারীর-শিক্ষা শিবিরের কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য ও শিক্ষক

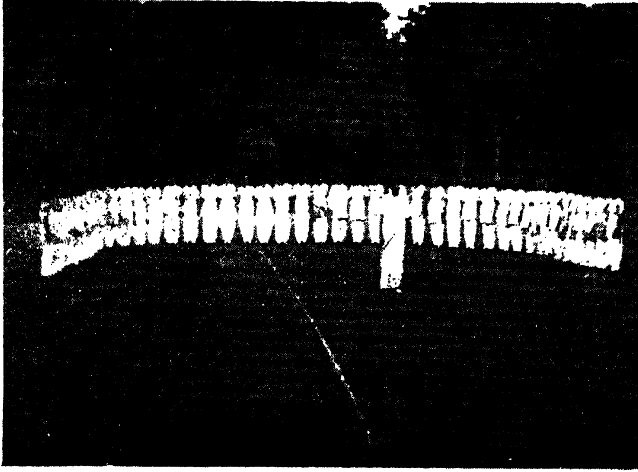


পশ্চিমবঙ্গ শারীর শিক্ষা শিবিরে শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রনাথ দাশ

বর্ত্তমানে কেবল বুদ্ধিমূলক শিক্ষার অসম্পূর্ণতার কুফল এত সুস্পষ্ট-ভাবে দেখা দিয়াছে যে শারীরিক শিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে দুই মত নাই। এই শিক্ষা যথাসঙ্গত ভাবে শিক্ষার প্রতি স্তরে বিশ্ববিদ্যালয়ে, মধ্যশিক্ষায়, প্রাথমিক শিক্ষায় অনুশীলন হওয়া প্রয়োজন। স্বাস্থ্য, শারীরিক শিক্ষা ও নীতি শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিলে শিক্ষার সংস্কার করা হইবেনা।

শারীরিক শিক্ষার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, বর্ত্তমানে আমাদের দেশে—বিশেষতঃ বাংলা দেশে স্বাধীনতা লাভের পর—বিশেষ করিয়া বঙ্গ বিভাগের পর হইতে যে সকল সমস্যা উৎকটরূপ ধারণ করিয়াছে, যথা বেকার সমস্যা (শিক্ষিতের), কর্ম্মে অক্ষমতা ও

অনিচ্ছা, স্বাস্থ্যহীনতা, দুর্ব্বলতা, ধৈর্য্যহীনতা প্রভৃতি ত্রুটি যদি কোন এক বিশিষ্ট উপায়ে দূর করা সম্ভব হয়—তাহা হইতেছে স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা। ইহাতে শারীরিক পুষ্টতা, কর্ম্মশক্তি, ধৈর্য্য ও পরমায়ু লাভ করা যায় ও বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে সাফল্য অর্জ্জনে সক্ষম হওয়া যায়, এই শিক্ষা ছেলে-মেয়ে সকলেরই প্রয়োজন। ছেলেদের মধ্যে এ শিক্ষার বিস্তার লাভ করিলে অল্প সময়ে সকল ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যাইবে। সুতরাং অবিলম্বে আমাদের দেশে এ শিক্ষার ব্যাপক প্রচার আরম্ভ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। স্থায়ীভাবে জাতীয় শিক্ষায় ইহার বিশিষ্ট স্থান আছে, মেয়েদের মধ্যে এ শিক্ষা প্রচারের গুরুত্ব আরও বেশী। কারণ মায়েরাই জাতির মধ্যে স্বাস্থ্য ও দেহ গঠনের ভিত্তি-স্থাপন করে থাকেন—শৈশবে লালনপালন ও পোষণ মেয়েদেরই হাতে—শিক্ষার প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র গৃহ বা পরিবার পরিচালনা মেয়েরাই করে থাকেন। এই প্রকার বহু পরিবারের সমষ্টিই একটি জাতি। সুতরাং জাতি গঠনে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা মেয়েরাই গ্রহণ করেন। জাতির বুনিয়াদ গঠনের দায়িত্ব যাহাদের হাতে —তাহাদেরই অগ্রাধিকার এ শিক্ষায়—



শিবির শিক্ষার্থীদের ব্যায়াম

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশের বিভিন্ন সংস্থান ও প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিবেশনের দিকে অধিক পরিমাণ মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে, আশা করি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশ ও জাতির শ্রেষ্ঠ উপাদান—মানুষের শিক্ষা ও দেহ মন গঠনের দিকে অধিক মনোযোগ দেওয়া হইবে। বর্ত্তমান পরিবর্ত্তিত জগতে বাঁচিবার ও সুষ্ঠুভাবে থাকিবার জন্য পরিবর্ত্তিত নূতন শিক্ষার প্রয়োজন এবং এই শিক্ষা শিক্ষকদেরই দিতে হইবে ; সুতরাং এই পরিবর্ত্তন শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষণের মাধ্যমেই সংসাধন হওয়া সম্ভব। এই বিপুল পরিবর্ত্তনের অধিকাংশই যে স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষার উপর অবিলম্বে অধিক মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা কেবলমাত্র কতিপয় শারীরিক-শিক্ষক ও স্বাস্থ্য-শিক্ষকের মাধ্যমে কার্য্যকরী হওয়া সম্ভব নয়। এ দায়িত্ব প্রতি বিষয়ের প্রতি শিক্ষকের, প্রতি অভিভাবকের ও পিতা মাতার এবং প্রতি দায়িত্বপূর্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত নাগরিকের।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে বয়ঃপ্রাপ্ত জনসাধারণ ও অভিভাবকগণ ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য ও শারীরিক পটুতা সম্বন্ধে সচেতন নহেন। সুতরাং এ গুরু দায়িত্ব অধিকাংশ ভাবে শিক্ষক ও শিক্ষিকাদেরই বহন করিতে হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষণ ব্যবস্থায় স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ব্যবস্থা নাই। সুতরাং এই শিক্ষণ ব্যবস্থায় আরও পরিবর্ত্তন একান্ত প্রয়োজন। তজ্জন্য একটা বিরাট পরিকল্পনা না করিয়াও বর্ত্তমানে শিক্ষিকা ও শিক্ষক—শিক্ষণের সকল স্তরেই স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষাকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করিলে সাধারণভাবে সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থী স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা সম্বন্ধে সচেতন হইবেন এবং এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গী স্বাস্থ্য ও শারীরিক সম্বন্ধে পরিবর্ত্তিত হইবে। ইহা ব্যতীতও শারীরিক শিক্ষায় যাহাদের পটুতা আছে তাহাদের শিক্ষণ পরীক্ষান্তে দুই কী তিন মাসব্যাপী একটি স্বল্পকালীন শিবিরের মাধ্যমে এ বিষয়ে বিশেষ পটুতা অর্জ্জনের ব্যবস্থা করা উচিত। যাঁহারা শিক্ষকতায় ব্রতী আছেন তাঁহাদের জন্যও স্বল্পকালীন শিবিরের মাধ্যমে (এক মাসব্যাপী) স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া এই নিতান্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষার প্রতি শিক্ষকদিগকে উদ্বুদ্ধ করা যাইতে পারে। এইরূপ শিবিরের মাধ্যমে পাশ্চাত্য দেশে নানা বিষয়ের শিক্ষার প্রচুর আয়োজন করা হইয়া থাকে। অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন যে, এক মাসের শিবিরে যথেষ্ট শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয় ; কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, গৃহ ও আপন পরিচিত-পরিবেশের প্রভাব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শিবিরে বাস কালে শিক্ষার আবহাওয়ায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে ব্যায়াম শিক্ষা ও বিশ্রাম, এবং সুনির্ব্বাচিত খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থায়—অতি আনন্দময় পরিবেশে শিক্ষার ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব্বরূপে দৈহিক, মানসিক ও শিক্ষণীয় বিষয়ে উন্নতি হইয়া থাকে। এই অদ্ভুত পরিবেশে দেহ ও মনের সহযোগিতার আতিশয্যেই বোধ হয়

এইরূপ উন্নতি সম্ভব হয়। বাস্তবক্ষেত্রে আবাসী শিক্ষা বা শিবির কেবলমাত্র সামরিক শিক্ষার জন্যই সীমাবদ্ধ নয়; সামাজিক ও জাতীয় জীবন দ্রুত পরিবর্তন বা বিপর্য্যয়ের সময়ে শুধু স্থায়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমেও যে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়, তাহা শিবিরের মাধ্যমে সম্ভব হয়। ইহাতে বিদ্যালয়—মহাবিদ্যালয়—বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্যও কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। কিন্তু উক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা সুসম্পূর্ণ হইয়া যায় একথা মনে করিলে ভুল হইবে। এই স্বল্পকালীন ব্যবস্থায় বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা ও ব্যবহারিক পটুতা অর্জ্জন হয়—যাহা সুদূর-প্রসারী শিক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক। আমাদের জাতীয় জীবনধারার সহিত সংহতি রাখিয়া, জাতীয় স্বাস্থ্য, পটুতা ও আয়ুর উপর দৃষ্টি রাখিয়া, আত্মরক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা ও রাষ্ট্ররক্ষার দিক বিচার করিয়া বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে শারীরিক শিক্ষার গভীর চর্চ্চা অনস্বীকার্য্য। এই উন্নততর স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রীদের স্কুল ফাইন্যালের পর অন্যান্য শিক্ষার সমপর্য্যায়ে সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা ও ডিগ্রীর স্তরে মহাবিদ্যালয়ের মাধ্যমে বিশেষ ব্যবস্থা করা একটি আদর্শ রাষ্ট্রের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

অনতিবিলম্বে প্রতি বিদ্যালয়ে ও প্রতি মহাবিদ্যালয়ে একজন করিয়া শারীরিক শিক্ষকের ব্যবস্থা না করিলে আদর্শ জাতিগঠনে অবহেলা করা হইবে। শিক্ষা ব্যবস্থায় এ বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিৎ। এই শিক্ষণের ব্যবস্থা দ্রুততর করিতে হইলে অবসর-প্রাপ্ত সমর্থ ও শিক্ষিত সৈনিকদের স্বল্পকালীন শিবিরের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের উপযোগী শারীরিক শিক্ষা দিয়া তাহাদের সাহায্যে অতি অল্প সময়ে দেশময় স্বাস্থ্য, শারীরিক পটুতা এবং শৃঙ্খলা সৃজন করা যাইতে পারে। সম্প্রতি মাদ্রাজে এ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। এই প্রকারে প্রতি বিদ্যালয়ে প্রতিটি ছেলে ও প্রতিটি মেয়ের জন্য অন্ততঃ কিছু পরিমাণ স্বাস্থ্য ও দৈহিক পটুতা অর্জ্জনের ব্যবস্থা করিলে জাতীয় স্বাস্থ্য, পটুতা ও কর্ম্মশক্তির উন্নয়ন হইবে সন্দেহ নাই।

শারীরিক-শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-চর্চ্চার দ্বারা রুগ্নকে রোগমুক্ত করিতে সহায়তা করে। সুস্থকে বলিষ্ঠ ও কর্ম্মক্ষম করে এবং স্বাস্থ্যবানের স্বাস্থ্যরক্ষার সহায়তা করে। আমাদের দেশে একটি ভুল ধারণা আছে যে, দুর্ব্বলের পক্ষে শারীরিক ব্যায়াম-চর্চ্চা অপকারক এবং শারীরিক ব্যায়াম-চর্চ্চা করিলেই অতিরিক্ত খাদ্যের প্রয়োজন হয়। এই দুইটি কথাই সম্পূর্ণ ভুল; উপরন্তু দুর্ব্বলের পক্ষে শারীরিক ব্যায়াম চর্চ্চা অত্যন্ত আবশ্যক। কিন্তু রোগীর পথ্য এবং বলিষ্ঠের খাদ্য যেমন সম্পূর্ণ বিভিন্ন হওয়া প্রয়োজন—দুর্ব্বল ও সবলের ব্যায়ামও তদনুরূপ বিভিন্ন হওয়া। অবশ্য এ ব্যবস্থা বিশেষজ্ঞগণেরই দেওয়া সম্ভব। দুর্ব্বলের দুর্ব্বলতা উপযুক্ত ব্যায়াম ও শারীরিক শিক্ষার দ্বারাই সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব।

খাদ্য ও ব্যায়াম সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, আমরা যে পরিমাণ আহার করিয়া থাকি তাহাকে সম্পূর্ণরূপে শরীরের মধ্যে গ্রহণ বা কার্য্যকরী করিবার জন্য সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে নিয়মিত ব্যায়াম করা একান্ত প্রয়োজন—"খায় দায়, খাওয়া গায়ে লাগে না" একথাটি আমাদের দেশে সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। যাহাদের যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য আছে তাহাদের মধ্যেও অনেকের দৈহিক পটুতার অভাব দেখা যায়, তাহার কারণ এই যে, ভোজন করিলেই বা হজম হইলেই খাদ্যের সারাংশ সর্ব্বাঙ্গের প্রতিকোষে পরিবেশিত হয় না, তজ্জন্যই দেহ অপুষ্ট থাকিয়া যায়। সাধারণতঃ আজকাল বেশীর ভাগ ব্যক্তির খাদ্য হজম না হওয়ার জন্য



ব্রতচারী নৃত্যরত শিক্ষার্থিনীরা

অথবা হজম হওয়া সত্ত্বেও সর্ব্বাঙ্গে খাদ্যসারের পরিবেশন বা সদ্ব্যবহার হয় না বলিয়াই শরীর ক্ষীণ হইতেছে। এ দোষ দূরীভূত করার জন্য অঙ্গ-সঞ্চালনের মাধ্যমে রক্ত-সঞ্চালন, আনন্দের সহায়তায় উজ্জীবনী ও বিশ্রামের দ্বারা ক্ষয় পূরণের সুযোগ গ্রহণ করা স্বাস্থ্য ও শক্তি-লাভের জন্য অপরিহার্য্য। ইহার প্রমাণ অপেক্ষাকৃত দরিদ্রের ঘরে অপেক্ষাকৃত খাদ্যাভাব সত্ত্বেও উন্নততর স্বাস্থ্য ও দৈহিক পটুতাসম্পন্ন ছেলে মেয়ে, নারী ও পুরুষ।

আর একটি কথার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, খাদ্যের যেমন অখাদ্য, কুখাদ্য ও সুখাদ্য আছে—ব্যায়ামেরও তদনুরূপ। খাদ্যের যেমন অতি ভোজন, সর্ব্ব-ভোজন ক্ষতিজনক—ব্যায়াম চর্চ্চাও তদনুরূপ, দেশ কাল পাত্র হিসাবে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয়—চাহিদার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে অভিজ্ঞ স্বাস্থ্যও শরীর শিক্ষকের সহায়তায় বর্ত্তমানের অসম্পূর্ণ শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার রূপ দেওয়ার জন্য প্রাথমিক শিক্ষায়, মধ্য শিক্ষায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অবশ্য পালনীয় সুষ্ঠু পরিকল্পনা সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই গ্রহণ করা সঙ্গত।



আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বাণী

ডাঃ অধরচন্দ্র বড়ুয়া

সঙ্কলন

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে 'ভারতবর্ষে' "ডিগ্রীর মোহ ও অভিশাপ" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়াছিলাম যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্‌মা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে কৃতিত্বলাভ এই যুক্তির মধ্যে অহি-নকুল সম্বন্ধ বিদ্যমান। আমার আত্ম-চরিতের দুই খণ্ডেও ভূরি ভূরি উদাহরণ দিয়াছি যে, তখনকার বড় বড় ব্যবসায়-বাণিজ্যের ধুরন্ধরদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন কি সেকেণ্ডারী স্কুলেরও তোয়াক্কা রাখেন নাই। উদাহরণ স্বরূপ যাঁহারা বিরাট ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং সর্ব্বজনবিদিত, তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ দিতেছি :—

১। লেভার ব্রাদার্স (সান-লাইট সাবানের প্রতিষ্ঠাতা)

২। হেনরী ফোর্ড ও ৩। উইলিয়ম মরিস (ইঁহারা বিখ্যাত মোটর গাড়ী নির্ম্মাতা)

পাঠকবর্গ বলিবেন যে, ইউরোপীয় জাতির পক্ষে সবই সাজে; কিন্তু আমাদের দেশে ঐ প্রকার কোথায়? পর পর তাহারও জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দিতেছি :—

১। স্যার আর এন, মুখার্জ্জি,—দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান, সাবেক কালে এণ্ট্রান্স পাশ করেন মাত্র। কিছুদিন অন্ন সংস্থানের জন্য বালিকা বিদ্যালয়ে মাষ্টারি করেন এবং কোনও রকমে সাবেক কালে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে প্রবেশ লাভ করেন; কিন্তু দারিদ্র্যবশতঃ দুই এক বৎসর পরেই ঐ কলেজ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। তারপর কিছুকাল 'হাবুডুবু' খান এবং ইহাতে তাঁহার স্বভাবজাত প্রতিভার স্ফুরণ হয়। তিনি কি প্রকারে কত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পরিশেষে সাফল্য লাভ করেন এবং পরে বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ারিং প্রতিষ্ঠান মার্টিন কোম্পানীর সিনিয়ার পার্টনার (প্রধান অংশীদার) হন, তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই।

২। স্যার হুকুমচাঁদ স্বরূপচাঁদ,—ইঁহার বাসভূমি ইন্দোরে (হোলকার রাজ্যে)। ইঁহাদের কয়েকটি কাপড়ের কল আছে। কলিকাতাতে ইঁহার বিরাট কয়েকটি কল-কারখানার অফিস আছে। হুকুমচাঁদ জুটমিলস্‌ ইহাদের অন্যতম। ইহা ভারতবর্ষের মধ্যে যত পাটের কল আছে—এমন কী ইউরোপীয় পরিচালিত কলের মধ্যেও সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই কলে ৭।৮ হাজার শ্রমিক কাজ করে। এতদ্ভিন্ন বালীগঞ্জ অঞ্চলে ইঁহার বিদ্যুৎ-চালিত একটি ইস্পাতের কারখানা আছে। ঐ কারখানায় লৌহ হইতে প্রথমতঃ ইস্পাত প্রস্তুত হয় এবং ঐ ইস্পাত গলাইয়া ছাঁচে ঢালাই করিয়া রেলওয়ে ও অন্যান্য বহু কল-কারখানায় ব্যবহৃত নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি তৈয়ারী হইয়া থাকে। শেঠ হুকুমচাঁদ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া আমি একবার ইন্দোরে একটি প্রদর্শনীর দ্বারা উদ্‌ঘাটন করিতে যাই। আমি আশ্চর্য্য হইলাম যে, শেঠজি আদৌ ইংরাজী জানেন না, সুতরাং ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা হইল।

৩। শেঠ ঘনশ্যাম দাস বিড়লা,—আমার সদ্য-প্রকাশিত "অন্ন সমস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয় ও তাহার প্রতিকার" পুস্তকে ইঁহার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি :—

—"বিড়লা পরিবার বহু বৎসর হইতেই ব্যবসায়-বাণিজ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট। প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে বোম্বাইতে শিউনারায়ন বলদেওদাস এই নামে ইঁহাদের সোনারূপার ও আফিঙের কারবার ছিল। ঐ ব্যবসায়ের উত্তরোত্তর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইঁহারা কিছুদিন পরে কলিকাতায় "বলদেওদাস যুগলকিশোর" নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ঘনশ্যাম দাস গৃহে সামান্য কিছু লেখাপড়া শিখিয়া ১৯০৭ সালে মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে নিজেদের ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। যখন তাঁহার বয়স ১৭ বৎসর, তখন কলিকাতায় আসিয়া তাঁহাদের ব্যবসায়ের একটি বিভাগের সমস্ত দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন। দিবাভাগে তিনি ব্যবসায়ের কাজ কর্ম্ম দেখিতেন এবং রাত্রিকালে ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিতেন। অতঃপর যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এই নূতনতর প্রতিযোগিতার যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যে পুরাতন পন্থী হইলে চলিবে না, তখন তিনি তাঁহার পৈতৃক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে ১৯১৮ সালে "বিড়লা ব্রাদার্স লিমিটেড" নামে একটি যৌথ কারবারে পরিণত করেন। যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই কারবার উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

১৯১৮ সাল হইতেই বিড়লা পরিবারের ব্যবসা জগতের বিভিন্ন দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই সময়ে তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে হেসিয়ান, তুলা, তৈলবীজ প্রভৃতি বিদেশে চালান দিতেন এবং বিদেশ হইতে বিক্রয়ার্থ স্বর্ণ, রৌপ্য আমদানী করিতেন। ১৯১৯ সাল হইতে ঘনশ্যামদাসবাবু শিল্প প্রতিষ্ঠার দিকে নজর দিতে আরম্ভ করেন। ঐ বৎসর তিনি কলিকাতার সন্নিকটে বিড়লা জুট মিলস্‌ এবং দিল্লীতে কটন স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিল স্থাপন করেন। ১৯২১ সালে গোয়ালিয়রের মহারাজার অনুরোধে তিনি সেখানে একটি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ১৯২৪ সালে তিনি কলিকাতার সন্নিকটস্থ কেশোরাম কটন মিলের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। মধ্যপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে তাঁহার তুলা পাঁজিবার কারখানা আছে এবং সম্প্রতি তিনি বিহার প্রদেশে চারিটি চিনির কল স্থাপন করিয়াছেন।

ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসার চেষ্টায় ঘনশ্যামদাসবাবুর কর্ম্মক্ষেত্র কেবলমাত্র ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রেই সীমাবদ্ধ নহে, তাঁহার বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভারতের বাহিরেও বহু রহিয়াছে, ইহা ভিন্ন বিড়লা পরিবারের অনেক জমিদারীও আছে।

ঘনশ্যাম দাস বাবু কেবল ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি করিয়াই তৃপ্ত হন নাই। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে কি উপায়ে দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব এবং কি করিলে দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে, তাহা সম্যকরূপে বুঝিবার জন্য অবসর সময়ে তিনি বিভিন্ন দেশের সামাজিক ও আর্থিক সমস্যা সম্বন্ধে লিখিত পুস্তকাদি নিয়মিত অধ্যয়ন করিতেন। এই একাগ্রতা ও অনুসন্ধিৎসা দ্বারা ঘনশ্যামদাসবাবু অর্থনীতি সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে যে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহারই ফলে দেখিতে পাই যে, মাত্র ২৭ বৎসর বয়সে, এমন কি কোনরূপ পাঠশালার শিক্ষা না থাকা সত্ত্বেও তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ১৯২১ সালে ভারতীয় শুল্ক অনুসন্ধান কমিশনের (Indian Fiscal Commission) সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। ইহার পাঁচ বৎসর পরে ইনি জেনেভার আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে ভারতীয় কলকারখানার মালিকগণের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন এবং ইহার দুই বৎসর পরে শ্রমিক কমিশন নিযুক্ত হইলে ঘনশ্যাম দাস বাবু গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ইহারও সদস্য মনোনীত হন। ১৯৩১ সালের দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে তিনি ভারতীয় ব্যবসায়ীদের অন্যতম প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে লণ্ডনে অবস্থানকালে ইংলণ্ড স্বর্ণ মান ত্যাগ করার জন্য ভারত-সচিব ভারতীয় মুদ্রানীতির কিছু পরিবর্ত্তন করিলে পর ইণ্ডিয়া অফিসের এক বৈঠকে ঘনশ্যামদাসবাবুর সহিত মুদ্রানীতির অন্যতম বিশেষজ্ঞ স্যার হেনরী-ষ্ট্রাকোসের যে তর্ক হয়, তাহাতে তিনি কারেন্সীর জটিল তত্ত্বসমূহ সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞানের পরিচয় দিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছিলেন।

যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর মোহগ্রস্ত বাঙ্গালী যুবক বুঝিতে পারে যে, বাণিজ্য জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর কোন প্রয়োজন হয় না এবং শ্রমবিমুখের প্রতি লক্ষ্মী কখনও তাঁহার কৃপা বর্ষণ করেন না, সেই উদ্দেশ্যেই দানবীর, কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদাস বিড়লার সম্বন্ধে এই দুই চারিটি কথা বলিলাম।

এ স্থলে ইংলণ্ডের রক্ষণশীল দলের নেতা বোনারলয়ের সহিত ঘনশ্যাম দাসবাবুর তুলনা করা যাইতে পারে। উভয়েই ব্যবসায়ের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আত্মচেষ্টার বলে অধ্যয়ন রত থাকেন এবং অর্থনীতিক্ষেত্রে প্রতিপত্তি লাভ করেন।

ইহা ছাড়া বোম্বে, পার্শী, গুজরাটী, ভাটিয়া প্রভৃতিরত কথাই নাই। তাঁহারা উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন নাই, অথচ অনেকেই বিরাট কল-কারখানার মালিক ও প্রতিষ্ঠাতা।

এস্থলে কয়েকজন মাড়োয়ারী ব্যবসাদারের কথা উল্লেখ করিতেছি—

সুরযমল—নাগরমল—ইঁহারা কয়েক বৎসরের মধ্যেই আমার চোখের উপরেই ব্যবসায় ও শিল্পে ফাঁপিয়া উঠিয়াছেন। ইঁহারা একক (যৌথ কারবার নয়) দুইটি বৃহৎ চিনির কল—একটি রাজসাহী জিলার গোপাল-পুরেও অপরটি দিনাজপুরের অন্তর্গত সিতাবগঞ্জে এবং জুট মিলস্ স্থাপন করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন আরও নানাবিধ ব্যবসায়ে ইঁহারা কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। আমাদের অর্থনীতিশাস্ত্রের (Political Economy) ছাত্রেরা এক বাঁধা বুলি শিখিয়াছেন,—তাঁহারা বলেন, ইঁহারা (উল্লিখিত ব্যবসায়ীরা) মিডলম্যান মাত্র। আমি বলি, মিডলম্যান হইলেও ইঁহারা কোটি কোটি টাকা উপার্জ্জন করেন—অর্থাৎ ব্যবসায়ে যত বহির্ব্বাণিজ্য ও অন্তর্ব্বাণিজ্য তাহা ইঁহারা প্রায় একচেটিয়া করিয়াছেন। পাট, ধান, চাউল, ভূষিমাল (কলাই, মুগ, ছোলা, মটর ইত্যাদি—নদীয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলার রবিশস্য) ইত্যাদি ইঁহাদের মারফতেই প্রধানতঃ রপ্তানি হয়; অন্তর্ব্বাণিজ্যেও ইঁহাদের একাধিপত্য। কাপড়, চিনি, লৌহ ও তজ্জাত দ্রব্যাদি, কেরোসিন তৈল, লবণ প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য ও এই সব ব্যবসায়ীর একচেটিয়া।

এক্ষণে আর এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীর উল্লেখ করিতেছি। ইঁহারা বোম্বাই ও গুজরাট অঞ্চলের মুসলমান সম্প্রদায়। যথা—বোরা, খোজা, কাচি মেমন ইত্যাদি।

বাঙ্গালা দেশে যত রেঙ্গুন চাউল ও নারিকেল তৈল আমদানী হয় এবং রংপুর ও কুচবিহারের যত উৎকৃষ্ট তামাক রপ্তানি হয়, সে সমস্তই ইঁহাদের করতলগত। এই কয়েকটা বিষয়ে কয়েক কোটি টাকার কারবার ইঁহারা চালাইয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সামান্য ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজী জানেন এবং অধিকাংশই ইংরাজী ভাষায় একেবারেই অনভিজ্ঞ। এই সব ব্যবসায়ী এবং অনেক মাড়োয়ারী বলিয়া থাকেন—"কাহে ইংরাজী শিখেঙ্গে—ত্রিশ-চল্লিশ রুপিয়া দেনেসে একটো বাঙ্গালী গ্রাজুয়েট মিলেগে।" এই সমস্ত উদাহরণ হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, ইংরাজী-শিক্ষার সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্পর্ক নিতান্তই অল্প।

অন্নসমস্যা সমাধান করিতে হইলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে নয়, কিন্তু সমগ্র বাঙ্গালার হাটে, বাজারে, ঘাটে, বাটে, মাঠে—বড়বাজারে, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও পোস্তার বাজারে উহা শিখিতে হইবে। এ বৎসর অনেক স্থানেই প্রচুর হৈমন্তিক ফসল (ধান্য) হইয়াছে; কিন্তু দেখিতেছি মাড়োয়ারী ও মেমন প্রভৃতি অজস্র ধান-চাউল গ্রামে গ্রামে ক্রয় করিয়া চালান দিতেছে। গত বৎসর দুর্ভিক্ষের সময় এই মেমনগণ রেঙ্গুন হইতে লক্ষ লক্ষ মন চাউল আমদানী করিয়াছে, আর মাড়োয়ারী সওদাগরগণ তাহা সমগ্র বাঙ্গালায় ছড়াইয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে। আর আমরা যাহা কিছু গহনাপত্তর বাঁধা দিয়া মহাজনের কাছে বেশী সুদে টাকা কর্জ্জ করিয়া ঐ চাউল ক্রয় করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিগণ কেবলমাত্র ষ্ট্যাটিসটিক্স গণনা করিয়াই নিশ্চিন্ত আছেন।

এই প্রবন্ধের প্রথমে লেভার ব্রাদার্স প্রভৃতি যে সমুদয় স্বাবলম্বী লোকের কথা বলিয়াছি তাঁহাদের বিষয় এখন আরম্ভ করিব। ভূতপূর্ব্ব ভারত সচিব লর্ড বার্কেনহেড উইলিয়ম লেভারের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

"প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ল্যাঙ্কাশায়ারের অন্তর্গত বোল্টন সহরের কোন মুদির দোকানে একটি ছোট হৃষ্টপুষ্ট বালক কাজ করিত। তাঁহার চোখ দুইটাই লোকের আগে নজরে পড়িত, কারণ চোখ দুইটী উজ্জ্বল এবং আকর্ষণী শক্তি বিশিষ্ট ছিল। এরূপ চোখ যাহার থাকে, সে

কখনও সাধারণ লোক হইতে পারে না। কোনও চিত্রকরও ঐ চোখের সম্পূর্ণ রহস্য ফুটাইয়া তুলিতে পারেন না। ঐ বালক কালে ভাইকাউণ্ট লেভারহুল্‌ম হইলেন। বোস্টনের একজন বৃদ্ধের নিকট আমি ২০ বৎসর আগে এই বিবরণ সংগ্রহ করি। ঐ বৃদ্ধের সহিত উইলিয়ম লেভার ও তাঁহার পিতার বিশেষ পরিচয় ছিল। ঐ বালক আজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাবানের বণিক এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে অন্যতম ধনী এবং সাহসী ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত। আমি সেই পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা যেন আজ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। বালক লেভার অল্পদিন মাত্র লেখাপড়া করিবার পরেই কর্ম্মময় জীবনে প্রবেশ করিলেন।"

আমেরিকার সুবিখ্যাত মহাজন (ব্যাঙ্কার) পিরপো মর্গ্যান এক সময় বলিয়াছিলেন,—"আমি যে কোন বিশেষজ্ঞকে আড়াই শত ডলার দিয়া খাটাইতে পারি এবং তাহাকে খাটাইয়া তদীয় বিশেষ জ্ঞানের সাহায্যে, আড়াই লক্ষ ডলার আয় করিতে পারি; কিন্তু সেই বিশেষজ্ঞ আমাকে এরূপে খাটাইতে পারিবে না।" এই কয়েকটী কথায় সাধারণ বিশেষজ্ঞের ব্যবসায় বুদ্ধির দৌড় কতদূর, তাহা সংক্ষেপে অথচ সঠিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বাটার জীবনী স্বাবলম্বনের আর একটী প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইনি ১০ বৎসরে এক কোটি পাউণ্ডের অধিপতি হইয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। মোরাভিয়ার অন্তঃপাতী জিল্‌ন সহরের টমাস বাটা আজ পৃথিবীর মধ্যে বুট এবং জুতা প্রস্তুতকারকদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন। প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে ইনি ব্যোমযানে প্রাচ্যদেশ পরিভ্রমণে আসিয়া কলিকাতায় নামিয়াছিলেন। বাটার ব্যবসা জগতে শীর্ষস্থান লাভ উপন্যাসের মতই রোমাঞ্চকর ব্যাপার। একজন দরিদ্র গ্রাম্য 'সেলাই জুতির' পুত্র বাটা বাল্যকালে দ্বারে দ্বারে বুট এবং জুতা ফেরি করিয়া বেড়াইতেন। ৫৫ বৎসর বয়সে তিনিই আজ জগতের সর্ব্বাপেক্ষা বড় জুতার কারখানার মালিক। তাঁহার কারখানায় এখন প্রত্যহ ১ লক্ষ ৬০ হাজারের উপর বুট এবং জুতা প্রস্তুত হইতেছে এবং ১৭ হাজার কর্ম্মী প্রত্যহ কাজ করিতেছে। (তিন বৎসর পূর্ব্বে লিখিত)।

প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উপলক্ষে বক্তৃতা দিবার সময় ঘটনাক্রমে টেলিগ্রাফের খবরের মধ্যে উইলিয়ম মরিসের (ইংলণ্ডের ফোর্ড) উল্লেখযোগ্য উক্তিটীর উপর আমার নজর পড়ে। তিনি বলিয়াছিলেন,—"ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সময়ের অপচয় মাত্র। কদাচিৎ ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। আমার প্রতিষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কখনও কোনও কাজে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ব্যবসায়ের জন্য যে সব গুণের প্রয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় তাহা পাওয়া যায় না। বরং মূলতঃ ঐ প্রকার গুণ বিদ্যমান থাকিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় উহা নষ্ট হইয়া থাকে। কর্ম্মীদের মনোভাব বুঝিবার মত ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় বিকাশ লাভ করে না; অথচ কোন বড় কারবারের সুপরিচালনের জন্য ইহা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। কলেজের ছাত্রগণ আণ্ডার গ্রাজুয়েট জীবনকে অতিশয় সহজ মনে করেন এবং তাঁহারা সচরাচর খেলাধূলাতেই বেশি মনোযোগ দিয়া থাকেন।" কর্ম্মীদের মনোভাব বিশেষভাবে বুঝিবার সুযোগ পাইবেন বলিয়া উইলিয়ম মরিস এখনও তাহাদের সহিত সাধারণ রেস্তোরাঁতে বসিয়া জলযোগ করিয়া থাকেন। আমার 'আত্মচরিতে' ১৯৩২ সালে শ্রীযুক্ত মরিস সম্বন্ধে এ-বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি উনি লর্ড নাফিল্ড নামে অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার বিরাট দানের কথা সকলেই জানেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন কোটি টাকা দান করিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার বিষয় কয়েকটী কথা বলিতেছি।

মরিসের পিতা, পিতামহ প্রভৃতি উচ্চ শিক্ষিত হইলেও উনি ১৪ বৎসর বয়সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষা ত্যাগ করিয়া একটী সাইকেল মেরামতের দোকানে কাজ লন। নয় মাস ঐ দোকানে কাজ করিবার পর ৫ পাউণ্ড মাত্র সম্বল লইয়া মরিস নিজেই সাইকেল প্রস্তুত এবং মেরামতের এক দোকান খোলেন। তাঁহার সাইকেলের খুব সুনাম হওয়ায় অসম্ভব কাটতি হইতে লাগিল এবং ৬ বৎসরে তিনি ২ হাজার পাউণ্ড সঞ্চয় করিলেন। ১৯১২ সালে তিনি 'মরিস মোটরকার' তৈয়ারী আরম্ভ করেন। ১৯২৯ সালে তিনি স্যার উইলিয়ম মরিস নামে খ্যাত হন এবং ২ বৎসর পূর্ব্বে তিনি লর্ড উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। লর্ড নাফিল্ড হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্যে মুক্ত হস্তে দান করিয়া 'ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং' এই মহাজন বাক্য অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতেছেন। এই স্বনামধন্য স্বাবলম্বী পুরুষ কিছুদিন পূর্ব্বেও বলিয়াছেন "ব্যবসায়ের উন্নতির সহিত অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজের শিক্ষার বিশেষ কোনও সম্বন্ধ নাই।"

উল্লিখিত উদাহরণগুলি হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, শিল্প ও ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠালাভ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উপর আদৌ নির্ভর করে না। আগামী প্রবন্ধে এ বিষয়ে আরও সবিস্তার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।



সঙ্গীতে

ভজন

মিশ্র বরওআ—কওআলী

গোবরধন গিরিধারী তুমকো পূজত সব নর-নারী।
মোর মকুট পীত-বসন-ধন ধন রাসবিহারী।
হো জগ বন্দন রাধিকারঞ্জন মাধব মুকুন্দ বনওআরী।
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর চরণ কমল বলিহারী॥ মীরা—

সুরশিক্ষক : ডাঃ শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বরলিপি : গীত-সরস্বতী শ্রীমতি গৌরীরাণী বন্দ্যোপাধ্যায়

অস্থায়ী—

```
 ১´              ০             .    ১´             ০
{রা জ্ঞপা মা জ্ঞা | র্রা সা রা ন্‌া | সা  ।  সা  । |(প্‌ন্‌া সা ন্‌রা রা)}
{গো  ০০  ব  র্‌  | ধ   ন  গি রী  | ধা  -  রী  - |( ০০   ০   ০০   ০)}

 ০        .
 ।  ।  ।  ।  |
 -  -  -  -

 ১´              ০             ১                   ০
 সা গা গা  ।  | মা  ।  মা মা | রা  মা পদা মপা | মজ্ঞা  ।  রা  ।  ||
 তু  ম কো  -  | পূ  •  জ  ত  | স   ব  ন০  র০  | না০   ০  রী  ০
```

অন্তরা—

১´ ০ ১´ ০
{ ন্‌া সা গা মা | পা পা । । | গা মা ধা পা | মজ্ঞা রজ্ঞা রা । } |
{ মো ০ র ম কু ট - - পী ০ ত ব স০ ০০ ন ০ }

১´ ০ ১´
{ গা গা গা গা | মা গা মা মা | রমা রমা পদা মপা | মজ্ঞা । রা । } ||
{ ধ ন ধ ন রা ০ স বি হা০ ০০ ০০ ০০ রী- - ০ - }

২য় অন্তরা—

১´ ০ ১´ ০
{ না সা গা মা | পা । পা পা | গা মা ধা পা | মজ্ঞা রজ্ঞা রা রা } |
{ গো ০ জ গ ব - ন্দ ন রা - ধি কা র০ ০০ ঞ্জ ন }

১´ ০ ১´
{ গা । গা গা | মা মা । মা | রা মা পদা মপা | মজ্ঞা । রা । } ||
{ মা - ধ ব মৃ কু - ন্দ ব ন ওআ ০০ রী০ - ০ - }

৩য় অন্তরা—

১´ ০ ১´ ০
{ ন্‌া সা গা মা | পা । পা পা | গা মা ধা পা | মজ্ঞা রজ্ঞা রা রা } |
{ মী ০ রা ০ কে - প্র ভু গি র ধ র না০ ০০ গ র }

১´ ০ ১´ ০
{ গা গা গা গা | মা গা মা মা | রমা রমা পদা মপা | মজ্ঞা । রা । } ||
{ চ র ণ ক ম ল ব লী হা০ ০০ ০০ ০০ রী০ - ০ - }

তান—

১´ ০ ১´ ০
১। নসা গমা পা । | । । । । | গমা পধা ণাঃ ধঃ | পঃ ধা পঃ মঃ পা মঃ |
আ০ ০০ ০ - - - - - আ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

১´ ০
গমা জ্ঞা রা । | জ্ঞপা মপা মজ্ঞা রসা |
০০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০০

১´ ০
২। নসা গমা পধা ণর্সা | ণধা পমা জ্ঞরা সরা |
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

১´ ০
৩। র্রর্রা র্সণা ধপা মপা | ণণা ধপা মজ্ঞা রা |
আ০ - ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০

১ ০ ১´ ০
৪। নসা গমা পগা মপা | গমা ধপা মজ্ঞা রসা | ন্সা গমা পধা পর্সা | ণধা পমা জ্ঞরা সরা |
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

১´ ০ ১´ ২
৫। র্মজ্ঞা র্রর্সা র্জ্ঞর্রা র্সণা | র্রর্সা ণধা র্সণা ধপা | ধণা র্সধা ণর্সা ধণা | র্রর্সা ণধা পমা জ্ঞরা |
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

অন্তরার তান—

১´ ০ ২´ ০ ১´ ০
৬। মমা পধা ণা া | া া া া | পা ধা র্সা া | া া া া | ধা র্সা ণা ধা | মা া জ্ঞা রা |
আ০ ০০ ০ ০ - - - - ০ ০ ০ - - - - - ০ ০ ০ ০ ০ - ০ ০

১ম অন্তরা "মোর মুকুট পীত-বসন" পর্য্যন্ত গাহিয়া তান ধরিতে হইবে।

সাংখ্যদর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

অহংকার

প্রকৃতের্মহাংস্ততোঽহংকারস্তস্মাৎ গণশ্চ ষোড়শকঃ।
তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চ ভূতানি॥

সাং কা—২২

প্রকৃতি হইতে মহৎ অভিব্যক্ত হয়; মহৎ হইতে অহংকার, অহংকার হইতে ষোড়শ-সংখ্যকগণ (পঞ্চ তন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়); সেই গণের অন্তর্গত পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ স্থূল ভূতের উদ্ভব হয়।

মহৎ সংবিদ্, কিন্তু আত্মসংবিদ্ (Self-Consciousness) নহে। ইতর জীব-জগতে অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্তরের জন্তুদিগের মধ্যে আত্মসংবিদ্ আছে কিনা অনিশ্চিত, নিম্ন-স্তরে যে নাই তাহা নিশ্চিত। আত্মসংবিদের সাক্ষাৎ পাই মানুষের মধ্যে। আত্মসংবিদ্‌হীন জ্ঞানের প্রথম অবস্থা মহৎ। ইহা জ্ঞানের প্রথম উন্মেষের অবস্থা। "আমার জ্ঞান" এই বোধ সেই জ্ঞানের মধ্যে নাই। এই রূপেই প্রকৃতির মধ্যে জ্ঞান প্রথম আবির্ভূত হয়। বিশ্ব মহতের (Cosmic Consciousness) আবির্ভাবের পরে, তাহার মধ্যে অহংকারের বিকাশ হয়। এই অহংকারও বিশ্ব অহংকার—সমষ্টি বুদ্ধির মধ্যে সমষ্টি অহংকার। উভয় হইতে বিশ্ব আত্মজ্ঞানের (Universal Self-Consciousness) আবির্ভাব হয়।

অভিমানোঽহংকার স্তস্মাৎ দ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ।
একাদশকশ্চ গণঃ তন্মাত্রপঞ্চকশ্চৈব॥ সাং সূ—২৪

অভিমানই অহংকার। অহংকার হইতে দ্বিবিধ সর্গ (সৃষ্টি) হয়—একাদশ গণ (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও উভয় সাধারণ মনঃ) ও পঞ্চ তন্মাত্র।

বিশ্ব বুদ্ধি ও বিশ্ব অহংকারের মধ্যে ব্যষ্টি বুদ্ধি ও ব্যষ্টি অহংকার বিকশিত হয়। অহংকার প্রত্যেক জীবের মধ্যেই আছে। অতি নিম্ন শ্রেণীর জীবের মধ্যে ব্যক্তভাবে না থাকিলেও বীজরূপে আছে।

সৎকার্য্যবাদ মতে কার্য্য কারণের মধ্যে সূক্ষ্ম ভাবে থাকে। সুতরাং মহত্তের মধ্যেই অহংকার সূক্ষ্ম ভাবে থাকে, পরে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। বিশ্ব অহংকার প্রকাশিত হইবার পরে তাহা ব্যষ্টি বুদ্ধির মধ্যে বিকশিত হয়। ইহাকে "অস্মিতা" বলে। ইহার দুই রূপ—অহন্তা ও মমতা। "ইহা আমি" এই বোধ "অহন্তা"; "ইহা আমার" এই বোধ "মমতা"। দেহে আত্মবোধ অহংকারেরই ফল। পুরুষ নিশ্চেষ্ট, কিছুই করে না, কিন্তু—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।

অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ গীতা—৩।২৭

প্রকৃতির গুণই সকল কর্ম্ম করে, কিন্তু অহংকারবিমূঢ় আত্মা আপনাকে তাহাদের কর্ত্তা বলিয়া মনে করে।

কার্য্যকারণ কর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতি রুচ্যতে।

পুরুষঃ সুখ দুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে।

গীতা—১৩।২০

কারণ হইতে কার্যের উৎপত্তির হেতু প্রকৃতি। কিন্তু সুখ ও দুঃখের যে ভোগ, তাহার ভোক্তৃত্ব পুরুষের। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু পুরুষ কর্ম্ম যেমন করে না, ভোগও তেমনি করে না। অহংকারই এই ভোক্তৃভাবের কারণ।

অহংকারের অস্তিত্বের প্রমাণ কি?

বাহ্যান্তরাভ্যাং তৈশ্চাহংকারস্য সাং সূ—১।৬৩

বাহ্য ইন্দ্রিয়, অন্তরিন্দ্রিয় ও তন্মাত্র হইতে তাহাদের কারণভূত অহংকারের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। এই সূত্রের ভাষ্যে বিজ্ঞান ভিক্ষু অহংকারের স্বরূপের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়গণ ও পঞ্চতন্মাত্র সকলেই দ্রব্য। সুতরাং অহংকারও দ্রব্য, দ্রব্যের গুণ নহে। "অহংকারশ্চ অভিমানবৃত্তিকং অন্তঃকরণ-দ্রব্যং, নতু অভিমান মাত্রং, দ্রব্যস্য এব লোকে দ্রব্যোপাদানত্ব দর্শনাং।" অর্থাৎ অভিমান অহংকারের বৃত্তি। অহংকার অন্তঃকরণ-দ্রব্য, কেবল অভিমান নহে। দ্রব্য হইতেই কেবল দ্রব্যের উৎপত্তি হইতে দেখা যায়।

পঞ্চতন্মাত্র যখন দ্রব্য, তখন তাহাদের কারণ অহংকারও দ্রব্য। আবার সুষুপ্তিকালে অহংকারের বৃত্তি অভিমানের নাশ হয়। অহংকার যদি অভিমান মাত্র হইত, তাহা হইলে তাহার নাশের সঙ্গে তাহা হইতে উদ্ভূত পঞ্চতন্মাত্র ইন্দ্রিয়াদি ও পঞ্চভূতেরও নাশ হইত।

বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে বুদ্ধি, অহংকার ও মনঃ, এই তিনটি অন্তঃকরণ। ইহারা জ্ঞানের করণ। প্রকৃতপক্ষে ইহারা এক হইলেও বৃত্তিভেদে ভিন্ন বলিয়া কথিত হয়। বাঁশ একটি, কিন্তু তাহার অনেক পর্ব্ব থাকে। পূর্ব্ববর্ত্তী পর্ব্বকে যেমন পরবর্ত্তী পর্ব্বের কারণ বলা হয়, তেমনি অহংকারকে মনের এবং বুদ্ধিকে অহংকারের কারণ বলা হয়।

এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞান ভিক্ষু বশিষ্ঠ-সংহিতা হইতে এক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে চিত্ত, চেতঃ ও মনঃ অন্তঃকরণ বৃক্ষের বিভিন্ন বৃত্তি মাত্র। অন্তঃকরণের অবস্থা ভেদ মাত্র। সাংখ্যশাস্ত্রে চিন্তবৃত্তিরূপী চিত্তবুদ্ধির অন্তর্ভুক্ত, অহংকারও বুদ্ধির অন্তর্গত।

পুরুষ অসংখ্য। তাহারা অনাদি। সাংখ্যদর্শনে এই সকল পুরুষের ধারক কোনও এক অসীম পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকৃত নহে, সকল পুরুষই সাংখ্য মতে বিভু। সুতরাং "ঈশ্বরাণাং পরমো মহেশ্বর" রূপ অনন্ত পুরুষের সহিত অন্য পুরুষদিগের সম্বন্ধ কি, সাংখ্যদর্শনে সে প্রশ্ন উঠে না। সাংখ্যের সকল পুরুষই অসঙ্গ; কাহারও সহিত কাহারও কোনও সম্বন্ধই নাই। সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রত্যেক পুরুষের সহিত প্রকৃতির সঙ্গ-প্রাপ্তি হয় এবং প্রত্যেক পুরুষের সহিত স্বতন্ত্র বুদ্ধি ও স্বতন্ত্র অহংকার সংযুক্ত হয়। এই সকল ব্যষ্টি বুদ্ধির সহিত সমষ্টি বুদ্ধি রূপ মহতের সম্বন্ধ কি, এই প্রশ্ন উঠিতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তির বুদ্ধি সমষ্টি বুদ্ধি হইতেই আগত হয়। "ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ"। যিনি বাহ্য জগতে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃরূপে প্রকাশিত, অন্তর্জ্জগতে আমাদের বুদ্ধি রূপেও তিনিই প্রকাশিত। আমাদের বুদ্ধি তাঁহার বুদ্ধিরই অন্তর্গত, তিনিই আমাদের বুদ্ধি প্রেরণ করেন। বিভিন্ন সংস্কারযুক্ত বিভিন্ন বুদ্ধির গতি বিভিন্ন দিকে। পরস্পর বিভিন্ন দিকগামী বুদ্ধিদিগের সেই অনন্ত বুদ্ধির মধ্যে কিরূপে সামঞ্জস্য হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু বহুত্ববাদী সাংখ্যের নিকট সে সমস্যা নাই।

অহংকার ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক।

সাত্ত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাৎ অহংকারাৎ।

ভূতাদেঃ তন্মাত্রঃ, স তামসঃ, তৈজসাৎ উভয়ম্॥

সাং কা—২৫

বৈকৃত অহংকার হইতে সাত্ত্বিক একাদশ (ইন্দ্রিয়) উদ্ভূত হয়। ভূতাদি নামক অহংকার হইতে পঞ্চতন্মাত্রের উদ্ভব হয়। ইহা তামস। তৈজস অহংকার হইতে (রাজসিক

অহংকার) উভয়ই উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ সত্ত্ব ও তমঃ নিষ্ক্রিয় বলিয়া রজঃদ্বারা চালিত হইয়া ইন্দ্রিয়বর্গ ও তন্মাত্রদিগের উৎপত্তি করিতে সমর্থ হয়। অহংকারের মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ তিন গুণই বর্ত্তমান। রজঃ ও তমঃকে অভিভূত করিয়া সত্ত্ব গুণ প্রবল হয়। সেই অবস্থাপন্ন অহংকারকে বৈকৃত বা সাত্ত্বিক অহংকার বলে। যখন সত্ত্ব ও তমঃকে অভিভূত করিয়া রজঃ গুণ প্রবল হয়, সেই অবস্থাপন্ন অহংকারকে রাজসিক অহংকার বলে। আবার তমঃ যখন সত্ত্ব ও রজঃকে অভিভূত করে, তখন সেই অবস্থার নাম তামস অহংকার। প্রকাশ-স্বভাব ইন্দ্রিয়গণ উদ্‌ভূত হয় বৈকৃত অহংকার হইতে; তমঃ-প্রধান তন্মাত্রগণ উদ্‌ভূত হয় তামস অহংকার হইতে। অহংকার হইতে অন্য কিছুই উদ্‌ভূত হয় না। তবে রাজসিক অহংকারের কার্য্য কি? সত্ত্ব ও তমঃ স্বতঃই নিষ্ক্রিয়, স্বকীয় কার্য্যসম্পাদনে অক্ষম। রজঃ চঞ্চল। রজঃকর্ত্তৃক চালিত হইয়াই সত্ত্ব ও তমঃ তাহাদের কার্য্য করে। উভয়ের কার্য্যের জন্যই রজঃর প্রয়োজন। (বাচস্পতি)।

জীবের সমস্ত কার্য্য অহংকার-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। পুরুষ কিছুই করে না।

অহংকারঃ কর্ত্তা, ন পুরুষঃ।
সাং সূ ৬।৫৪

কিন্তু ভোগ হয় পুরুষের। অহংকারের উদ্দেশ্যই পুরুষের ভোগসাধন করা। ভোগ উৎপন্ন হয় অহংকারের কার্য্য দ্বারা। যে অহংকার যে পুরুষকে আশ্রয় করিয়া আমিত্ব-জ্ঞান উৎপাদন করে, যে পুরুষের সহযোগে "অহন্তা" ও "মমতা" জ্ঞান উৎপন্ন করে, সেই অহংকারের কার্য্য দ্বারাই সেই পুরুষের ভোগ হয়।

জাগতিক সমস্ত কার্য্য বৈশ্বিক অহংকারদ্বারাই কৃত হয়; ঈশ্বর-কর্ত্তৃক নহে, কেননা এরূপ ঈশ্বরের কোনও প্রমাণ নাই।

অহংকার কর্ত্রধীনা কার্য্যসিদ্ধিঃ, নেশ্বরাধীনা, প্রমাণাভাবাৎ উপনিষদে আছে "অহং বহু স্যাম্ প্রজায়েয়"। এই যে সৃষ্টি, ইহা অহংকার-পূর্ব্বিকা সৃষ্টি। এই সৃষ্টির পূর্ব্বেই এক বিশ্ব অহংকার উদ্‌ভূত হইয়াছিল। তিনিই বহু হইবার সংকল্প করিয়াছিলেন। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা। এই আমিত্ব জ্ঞান না হইলে সৃষ্টি সম্ভবপর হয় না। এই সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর নহেন। কিন্তু এই অহংকারের উদ্‌ভব হয় কিরূপে? ইহার উত্তরে সাংখ্যকার বলেন—অদৃষ্টবশতঃই অহংকারের সৃষ্টি হয়। সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকৃতিতে যে বিক্ষোভ উৎপন্ন হয়, তাহার অন্য কোনও কারণ নাই। কর্ম্ম হইতে তাহার উদ্‌ভব কল্পনা করিতে গেলে অনবস্থা উপস্থিত হয়। (বি ভি)

অদৃষ্টোদ্‌ভূতিবৎ সমানত্বম্। ৬।৬৫

অহংকার দ্বারা জগৎ-সৃষ্টি হয়। কিন্তু জগতের পালন কার্য্য করে কে? ইহার উত্তর—"মহতো অন্যৎ"···সাং সূ ৬।৬৬

বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেন এই সূত্রের অর্থ অহংকারের কার্য্য সৃষ্টি ব্যতীত অন্য কার্য্য অর্থাৎ জগতের পালন কার্য্য মহত্তত্ত্ব দ্বারা হয়। মহত্তত্ত্ব উপাধিসমন্বিত হইয়া বিষ্ণু জগতের পালন কার্য্য করেন। মহত্তত্ত্ব উপাধিসমন্বিত বলিয়াই বিষ্ণুকে "মহান্, পরমেশ্বর বা ব্রহ্ম" বলে। শাস্ত্রে আছে "যদাহুর্বাসু দেবাখ্যং চিত্তং তৎ মহদাত্মকং" অর্থাৎ যাঁহাকে বাসুদেব বলা হয় তিনিই মহদাত্মক চিত্ত। সাংখ্য শাস্ত্রে কারণ ব্রহ্ম পুরুষসামান্য, নির্গুণ। সগুণ ব্রহ্ম অস্বীকৃত। সাংখ্যে "কারণ" শব্দে যিনি স্বশক্তি প্রকৃতিরূপ উপাধিযুক্ত পুরুষ, অথবা নিমিত্ত কারণ পুরুষ বুঝায়। পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য প্রকৃতির প্রবৃত্তি হয়, এইজন্য পুরুষ নিমিত্ত কারণ বলিয়া পরিগণিত হয়। "অত্র শাস্ত্রে কারণ ব্রহ্ম তু পুরুষ সামান্যং নির্গুণমেব ইষ্যতে, ঈশ্বরানভ্যুপগমাৎ। তত্র চ কারণ শব্দঃ স্বশক্তি প্রকৃত্যুপাধিকো বা নিমিত্ত কারণতা পরোবা, পুরুষার্থস্য প্রকৃতি-প্রবর্ত্তকত্বাৎ ইতি মন্তব্যং।

পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যে স্বস্বামিভাব (ভোক্তৃ-ভোগ্যভাব), তাহা বীজাঙ্কুরবৎ অনাদি ও কর্ম্ম হইতে উদ্‌ভূত। পঞ্চশিখ বলেন তাহার কারণ অবিবেক। সনন্দনাচার্য্য বলেন লিঙ্গ শরীরই ইহার কারণ। এই স্ব-স্বামিভাবের উচ্ছেদ সাধনই পরম পুরুষার্থ।

কর্ম্মনিমিত্তঃ প্রকৃতে স্ব-স্বামিভাবোঽপ্যনাদি বীজাঙ্কুরবৎ।
সাং সূ ৬।৬৭

অবিবেক নিমিত্তো বা পঞ্চশিখঃ। সাং সূ ৬।৬৮

লিঙ্গশরীরনিমিত্তক ইতি সনন্দনাচার্য্য। সাং সূ ৬।৬৯

যদ্বা তদ্বা তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থস্তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থং। ৬।৭০

কর্ম্ম, অবিবেক বা লিঙ্গশরীর যাহাই পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগের কারণ হউক না কেন, এই সংযোগ ও পুরুষ-প্রকৃতির ভোক্তৃ-ভোগ্যভাব অনাদি। এই ভোক্তৃ-ভোগ্য-ভাবের উচ্ছেদ না হইলে মুক্তি হইতে পারে না। অহংকার না থাকিলে ভোগ হয় না। সুতরাং মুক্তির জন্য অহংকারের বিনাশ করিতে হইবে। সোপেনহর স্ত্রী-পুরুষ-সংযোগ-পরিহার দ্বারা জীব-সৃষ্টিপ্রবাহ নিরুদ্ধ করিয়া দুঃখের বিনাশ-সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। সাংখ্য প্রকৃতি-পুরুষ সংযোগ বর্জ্জন দ্বারা সৃষ্টির বিনাশ সাধন করিতে চাহিয়াছেন।



লগ্ন

সরোজকুমার বটব্যাল

টঃফ্! রিণীর কপালটাতে খুব জোরে ধাক্কা লেগেছে। অমিত এগিয়ে গেল ঘরের দিকে। পেছনে রিণী এল।

কত চাই গো? অদ্ভুত করুণ রিণীর স্বর।

—পঁচাত্তোর টাকা আরও।

সত্তোর টাকা পাওয়া গেল বাক্স হাত্‌ড়ে। আর এক টাকা বের করলে রিণী সিন্দুর কৌটোর মধ্যে হ'তে।

হাঁস্‌লে অমিত, রিণীও হাঁস্‌লে আঘাত পাওয়ার যন্ত্রণা ভুলে।

বাইরে বেরিয়ে গেল রিণীই। দরজা পার হয়ে ভিড়ের মুখে পড়লো তাও জানে অমিত। তারপর—

হাত পা ছড়িয়ে বিছানার ওপর ধপ্ করে শুয়ে পড়লে সে। সব সাহসটুকু, নিজের মানটুকু রিণীর হাতে তুলে দিল দুর্ব্বলতার অজুহাতে।

'না, না, ব্যস্ত আমি হই নি মোটেই। বিপদে পড়লে সবাই ধার নেন্।' অমিত স্পষ্ট শুন্‌তে পেলো একজোড়া জুতোর শব্দ উঠোন বয়ে এগিয়ে আস্‌ছে। "কত দেশ মার্কিনী ডলারে মাথা বিকিয়েছে—আম্‌রা তো—"

নির্লজ্জ বিশ্রী একটা হাঁসি ধাক্কা খেলো দেওয়ালে।

'বসুন্'—নিজেই পা দু'টো গুটিয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠ্‌লো অমিত। বিছানার সাম্‌নে সোফাটাতে লোকটা বসে পড়লো চরম নিশ্চিন্তে।

"বসুন্—আমি চা নিয়ে আস্‌ছি।" রিণী বল্লে আত্মীয়তার সুরে।

"চা! আমি কিন্তু এখন ওভাল্টীন খাই।" একমুঠো অস্বস্তির ধুলো ছড়িয়ে লোকটি বল্লে নির্ল:জ্জর মতো।

বাঁচালেন। সত্যিই যেন হাঁপছেড়ে বাঁচ্‌লে রিণী। 'আমিও ঠিক এ সময় ওভালটিন্ খাই। যাক্ আপনার জন্তেও এক কাপ্ আনি, কি বলুন?"

লোকটা ইহুদি, জাতে নয় স্বভাবে। 'আচ্ছা আপনি বলুন্ না ম'শায় ন্যায্য কথা'—কৌশলে অপমান করতেও দক্ষ বুঝ্‌তে পারা যায়। "মশায় সুদ নিয়ে ছিলাম টাকায় দু'পয়সা—মাসে। বিপদের সময় এ্যাম্নি কে দেয় বলুন্?"

সত্যিই তো—ঘাড় নেড়ে সহানুভূতি জানায় আর একজন। এদিকে ভিড় জমে চলেছে পৌনঃপুনিক মাত্রায়। 'ব্যাপার কি?' ওদের ভিড়ে ওঠে গুঞ্জন।

"টাকা ধার নিয়েছে মশায় গত ফাল্গুনে"—বল্লে লোকটি ভিড়ের পানে চেয়ে, 'বল্লেন বে' করবো।'

এক ঝলক হাঁসির ফোয়ারা। কানদুটো কাল্‌চে হয়ে উঠ্‌লো অমিতের। সূক্ষ্ম শিরা উপশিরাগুলি বোধহয় ছিঁড়ে গিয়েছে। লাল রক্ত ছড়িয়ে পড়েছে সারা গালে। ওদের চাহনিতে সে রক্ত কালো হয়ে গিয়েছে।

ভিড়টা জমে উঠেছে অমিতের বাড়ির সাম্‌নেই।

স্পষ্ট বুঝ্‌লে অমিত যে, রিণী দাঁড়িয়ে আছে দরজার আড়ালে। চুড়ির রিণ্ রিণ্ শব্দ উঠ্‌লো। অমিত পা বাড়ালে ঘরে যাবার জন্তে।

"বলি' ও মশায় এ' অভাজনেরে বাইরে ফেলে—" লোকটা রসিকতা করলে।

'পরামর্শ নিয়ে আস্‌তে দিন্।' বল্লে কে একজন ভিড়ের মধ্যে হ'তে।

কা'র কাছে হ'তে মশায়?

'হোম মিনিষ্টারের কাছে হ'তে।' জুৎসই উত্তরটা চট্ করে জুগিয়ে দিল ভিড়েরই কে একজন ফাজিল ছোক্‌রা।

এগারো বারোটা মিহিমোটা হাঁসির ধমকে মাটির সাথে মিইয়ে যেতে লাগ্‌লো যেন অমিত। অসহ্য!! তবু সহ্য করতে হ'বে সব অপমান। কপাটটা খুল্‌লে অমিত সজোরেই। চাইলে না সে কোন দিকেও।

আমার সৌভাগ্য। আবার দাঁত বের করে হাঁসলে লোকটা।

এর পর অখণ্ড নিস্তব্ধতা। কি বলবে, কি করবে অমিত ভেবে পেলো না। চোখ বুঁজে বসে রইল অগত্যা।

চমৎকার, ফাইন্ আর্টস্।

চোখ খুললে অমিত। তা'র চোখে প্রশ্ন।

আপনার স্ত্রী এঁকেছেন বুঝি? প্রশ্ন করলে লোকটি।

ঘাড় নাড়লে অমিত। বল্লে, রিণী এঁকেছে।

হাউ সুইট্, বিউটিফুল্। এক চক্কর ঘরখানা ঘুরে নিলে লোকটি। থম্‌কে দাঁড়ালো, এখানে ওখানে। বুক সেল্‌ফের সাম্‌নেও।

আপনি প্রতিভাশালিনী।

স্তোত্র পড়ছে নাকি! চোখ খুললে অমিত। রিণীর পাত্‌লা ঠোঁট্ দু'টোতে হাসির ঝিলিক্। চোখের পাতায় ইশারা।

গুন্ গুন্ ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক কথা বলেছিল লোকটি। অজন্তা ইলোরা, নন্দলাল যামিনী, রেনোয়া গোগা এঞ্জেলো: সেখান হ'তে নেমে এল ওর নিজের নামে ফ্রেণ্ডস্ এ্যাণ্ড কোম্পানীর দরজায়। তা'র দোকানের শেয়ারের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা; মাসিক মুনাফা; টালায় একটা, টালীগঞ্জে ছোটখাটো দু'টো, আর সোনারপুরাতে ব্র্যাঞ্চ, একুনে—

চোখ দু'টো মিট্ মিট্ করে তাকিয়ে নিলে অমিত। জলখাবারের রেকাবীখানা এগিয়ে দিল রিণী। আর স্পষ্ট এবার দেখলে অমিত, রিণীর আঙ্গুল দু'টো সেই লোকটার মোটা থ্যাবড়া আঙ্গুলগুলোর ওপর মোলায়েম পরশ লাগিয়ে দিল।

এক টুকরো হাসি। গাঢ় আত্মীয়তার অভিনয়। অব্যর্থ শর সন্ধানে, অমিত জানে, রিণী ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে সেই ইহুদিটাকে।

*　　*　　*　　*

আর একদিন।

আস্‌বার সময়টাকে নিশ্চিত করে দিয়ে বড় ঘড়িটাতে বাজলো পাঁচটা। গুন্‌গুনিয়ে সারা ঘরটাতে একটা গুঞ্জনের আমেজ বুলিয়ে দিয়েছে রিণী।

আর একটু পর রান্নাঘর হ'তে লুচি ভাজার গন্ধ এল। অমিত হাঁসলে মনে মনে; এ আয়োজন তা'র জন্য নয় মোটেই।

দেরী হয়েছে আজ আপনার কিন্তু। রিণীর স্বরে অনুযোগ।

মোটেই না। এই দেখুন্ না।—

জানালার ফাঁক দিয়ে অমিত দেখ্‌লে সেই লোকটি বাঁ হাতটা তুলে ধরেছে রিণীর চোখের সাম্‌নে। ঘড়িটা দামী। আর সেইটা দেখিয়ে দেবার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলে সে।

চমৎকার ডিজাইন্‌টা কিন্তু। রিণীও সুচতুরা।

চলুন। লোকটা রিণীর ডান হাতটা টেনে নিল নিজের মুঠোর মধ্যে।

এই যে! থম্‌কে দাঁড়ালো লোকটি অমিতের সাম্‌নে। ভ্রূ দু'টো কুঁচ্‌কালো।

নমস্কার! অমিত জানালে।

ফিরে এল অপর পক্ষ হ'তেও। আর মনে মনে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারলো না অমিত রিণীকে। রিণীকে হাজার ধন্যবাদ জানালে।

'আপনার টাকাটা—' অমিত কি বোকা! চুলকে বর্ণ দেখাতে চায়!

সবে মাত্র এক টুক্‌রো লুচি মুখের ভেতর ঠেসে দিয়েছে লোক্‌টি। অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইলে তা'র দিকে। আর, আর কিছুক্ষণ পর এক প্রস্থ হেসে নিল লোক্‌টা। 'আপনার সময় কাট্‌ছে না বুঝি?'

'না, ...—অপ্রস্তুত অমিত চুপ করে গেল সদাশয় উত্তমর্ণের মত।

চায়ের পেয়ালাটা সুন্দর ভঙ্গীতে রিণী তুলে ধরলো ঠোঁটের ওপর। মুগ্ধ দর্শকের মতো লোকটি তাকিয়ে রইলো রিণীর পানে।

যদি সিনেমাতে একটা চান্স্ পাই...। রিণীর স্বরে আক্ষেপ।

—সত্যি বল্‌ছেন? আমার এক সিনেমা ডিরেকটার বন্ধু আছেন।

হাউ লাকি আই এ্যাম্! রিণী বেতের চেয়ারটা টেনে নিয়ে আর একটু ঘনিষ্ঠভাবে বস্‌লো।

অমিত উঠে এল আর বেরিয়ে গেল সেখান হ'তে।

চাঁদ্‌টা আট্‌কে পড়েছে সাতাশ নম্বর বাড়ীটার আড়ালে। একরাশ অন্ধকার পিছ্‌লে পড়েছে বাড়ির উঠানে, বারান্দায় আর ঘরটাতে।

অনেক দিন পর একটা সিগ্রেট্‌ ধরালে অমিত পরম নিশ্চিন্তে।

কড়া তামাকের গন্ধ ভেসে আস্‌ছে ঘরটার বদ্ধ বাতাসের মুঠো এড়িয়ে। অমিত ভাব্‌লে, কি করে রিণী সহ্য করতে পার্‌ছে চুরুটের কড়া বিশ্রী গন্ধটা !!

* * *

আরেক দিন। রাত ঘনিয়ে এসেছে ঘর পর্য্যন্ত। অমিত জানে, রিণী হয় তো চিঠি লিখ্‌ছে তা'র মাকে, টাকার বড্ড দরকার। মা পাঠাও, নয় তো—কি লিখ্‌ছেন ? লোকটা চলে এসেছে রিণীর কাছে। ছোট্ট মোম্‌বাতিটার আলো, অমিতকে জানিয়ে দিতে সক্ষম নয়।

রিণীর ঘাড়ের পাশ দিয়ে মাথা গলিয়ে আগ্রহ মেটাবার নিষ্ফল প্রয়াসে অস্থির হয়ে পড়ছিল লোকটা।

যাও : লক্ষীটি···এ'সময় বিরক্ত কোরো না ! রিণী হাতটা চালালে পেছন দিকে।

ও মা ! আপনি ? রিণী লজ্জিতা যেন। উঠে দাঁড়াল সে।

কি লিখ্‌ছেন ? লোকটার সুরে জেদী কৌতূহল।

'একটা গল্প।' লজ্জায় যেন লাল হয়ে উঠ্‌ল রিণী। তারপর চাপা দেবার জন্যেই বুঝি বলে উঠ্‌ল, 'এনেছেন ?'

'এনেছি।' কি মোলায়েম টানে ঘাড় বেঁকিয়ে জানালে লোকটি !

'কই দেখি ?' রিণী হাতটা বাড়িয়ে দিল।

চোখ বুঁজুন।

অমিত কিচ্ছুটি বল্লে না। রাগ্‌লে না একটুও। শুধু শুয়ে রইলে নিস্পন্দ।

কি সুন্দর মানাচ্ছে আপনাকে। রিণীর খোঁপাতে বেলিফুলের মালাটা জড়িয়ে দিয়েছে লোকটা। আর তা'রই গন্ধ শুঁকে নিচ্ছে, নিবিড় আবেশে।

কই, এ'বার দিন কাগজখানা। সত্যিই ঘুরে দাঁড়ালো রিণী এ'বার।

আবার কাগজ ? অনিচ্ছা সত্ত্বেও পকেট হ'তে বেরসিক-কাগজটা বের করে দিল লোকটা রিণীর হা'তে।

টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখ্‌লে রিণী কাগজটা।

'সত্যি, আপনি খুউব দুষ্টু।' রিণী ছোট্ট মেয়েটির মত অভিযোগ জানালে, খালি পায়ে, চুপি চুপি, পেছন হ'তে—। ও জান্‌লে কি বল্‌বে বলুন্‌ ?

এ'বার সত্যিই চুপ্‌ করে থাক্‌তে পারলে না অমিত। চেঁচিয়ে উঠ্‌লে, আগুন···রিণী···মোম্‌বাতিটা উল্টে গ্যাছে।

ও মাঃ—। রিণী ফ্যাকাশে মুখে টেবিলের দিকে ঘুরে দাঁড়ালে। জ্বলন্ত মোম্‌বাতিটা উঠিয়ে নিতে সময় লাগ্‌লো অনেক, অনেক বেশী।

ইস্‌···কাগজটা পুড়ে গেছে। লোকটা তুলে নিল কাগজখানা।

আব্‌ছা অ'লো। তবু অমিত বুঝলে যে, ওটা হ্যাণ্ড-নোট্‌। তা'র মনে ঘনিয়ে এলো একরাশ চিন্তা।

আমার গল্পটা···থাক্‌গে, আঙ্গুলটা যে জ্বলছে বড্ড। রিণী চোখ মুখ বিকৃত করে বল্লে, "কাইণ্ড্‌লি সাম্‌নের বাড়ির ডাক্তারবাবুকে ডাকুন্‌ না···।"

যাচ্ছি···। সত্যি ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল লোকটা ঘর হ'তে।

আর···আর রিণী সরে এল অমিতের অনেক কাছে। ফিস্‌ ফিস্‌ করে বল্লে, ওগো শুন্‌ছো, রাঁচী হ'তে ন' পিসীমা চিঠি দিয়েছে। চল কাল্‌কের ভোরের ট্রেণেই। বুঝ্‌লে ?

প্রায় অনেক দিন পর অমিত রিণীকে বুকের কাছে টেনে নিল।



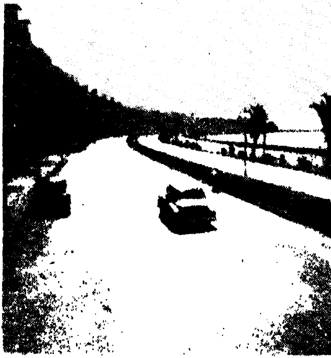
বম্বের আশে পাশে

ভূপতি চৌধুরী

পূর্বানুবৃত্তি

বম্বের পশ্চিম সীমায় সমুদ্র থেকে জমি উদ্ধার করে নতুন আবাস অঞ্চল তৈরী করা হয়েছে—মেরিন লাইনস্ ও মেরিন ড্রাইভ। সব সমান মাপের বাড়ী একই উচ্চতা ও ধরণ-ধারণ প্রায় এক রকমের। শোনা যায় স্থাপত্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমুদ্রের ধারের রাস্তাটী ভাল—বেশ জোরে গাড়ী চালিয়ে যাওয়া যায়। সন্ধ্যায় সমুদ্রের ধারে ভ্রমণবিলাসীদের সংখ্যা অগণ্য বলা চলে। বম্বে সহরের নতুন আকর্ষণ তারাপুরওয়ালা একোয়ারিয়াম; সমুদ্রের ধারে বাড়িটী বেশ আকর্ষণীয়—নানা প্রকার সামুদ্রিক মাছ, সাপ, মিঠা জলের মাছ এবং জলজ উদ্ভিদের এবং ঝিনুকের সংগ্রহ বেশ সুষ্ঠু ভাবে সাজান।

সত্য কথা বলতে কি এই সাজান গোজান ব্যাপারটাই বম্বের বিশেষত্ব। কলকাতার সঙ্গে বম্বের এই খানেই তফাৎ। কলকাতায় ভালো-মন্দ, সুশ্রী-বিশ্রী, প্রাসাদ-কুটীর, মোটর-রিকসা, ধনী-দরিদ্র সবই আলোছায়ার মতো পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকে। কলকাতার এই অত্যন্ত স্বাভাবিক অগোছাল ব্যবস্থার পাশে বম্বের এই সাজানগোজান ভাবটী বড় কৃত্রিম ও উন্নাসিক মনে হয়। তবুও একথা স্বীকার্য্য যে ভ্রমণকারীর পক্ষে বম্বের গঠন পরিপাট্য আকর্ষণীয় ও মনোহর।



মেরিন ড্রাইভ—বোম্বে

ট্রামে বম্বে সহরের অনেকটা অংশ পরিভ্রমণ করে রাত আটটায় হোটেলে ফেরা হল। পরদিন প্রাতে সকাল দশটায় আমাদের বাস্তুকার সভার বার্ষিক অধিবেশন।

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ থেকে বিশিষ্ট বাস্তুকারেরা এই সম্মেলনে যোগ দেন। সভায় এসে দেখা গেল—কলকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের বাস্তুকার-প্রধানেরা শ্রীঅমূল্য সেন, সুবোধ ঘোষ, হৈমজা রায় প্রভৃতিও এসে পৌঁচেছেন। প্রদেশের রাজ্যপাল সভার উদ্বোধন করলেন এবং বম্বে সহরের পুরশ্রেষ্ঠ (মেয়র) সমাগত সুধীবৃন্দের অভ্যর্থনা করলেন। সভার স্থান—বম্বের আইন সভা। ব্যাপারটী যে বিশেষ সমারোহপূর্ণ তা বলা বাহুল্য মাত্র। অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যকরী সমিতি ও অন্যান্য বিশেষ সমিতির সভা ও প্রবন্ধপাঠ একটী বিশিষ্ট অঙ্গ। এই সব সভার ফাঁকে ফাঁকে বৈকালীন চায়ের সভা, প্রমোদ অনুষ্ঠান, তাজমহল হোটেলে বার্ষিক নৈশ ভোজ এবং বম্বে ও তার নিকটবর্ত্তী স্থানে পূর্ত্তকার্য্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন।

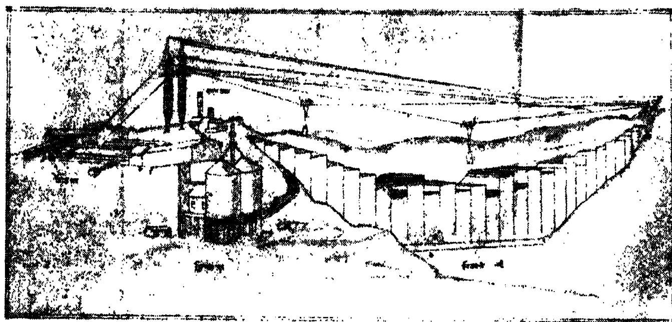
সত্য বলতে কি আমার মনে হয় এই সকল বার্ষিক সম্মেলন একটা বিরাট আন্তপ্রাদেশিক মেলামেশার উপলক্ষ মাত্র; সেই সঙ্গে দ্রষ্টব্যস্থান পরিদর্শন ব্যাপারটী কিছুটা শিক্ষণীয় পূর্ব্বেই বলেছি—কলকাতার লোক বম্বেতে এসে একটা তুলনামূলক মনোভাবে চালিত হয়। কলকাতায়



এলিফাণ্টা গুহার ত্রিমূর্ত্তি

শুনেছিলাম বম্বের উপকণ্ঠে "আরে"তে একটী দুগ্ধকেন্দ্র আছে—যা আমাদের হরিণঘাটার থেকে বহুগুণে বিস্তৃত ও উন্নত। আরে জায়গাটী বম্বে সহর থেকে মাত্র ২০ মাইল দূরে। পশ্চিমাঞ্চলীয় রেলপথের উপর। স্থানটী অপেক্ষাকৃত পার্ব্বত্য অঞ্চল—দুগ্ধকেন্দ্রের আয়তন বিরাট, ৩৫০০ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং বর্ত্তমানে এখানে ১৫০০ মহিষ সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। এই দুগ্ধ-কেন্দ্রটীর স্থাপতীয়পরিকল্পনাকার কুমার রামসিং পূর্ব্ব পরিচিত হওয়ায় তিনি আমাদের পরিদর্শনের সমস্ত ব্যবস্থা করে দেন। আমরা যখন আরেতে উপস্থিত হলাম তখন সকাল আটটা। দুধদোয়ার ব্যাপারটী সবে শেষ হয়ে গেছে। মহিষ রাখার খাটালগুলি পরিষ্কার ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করছে। প্রত্যেক খাটালে প্রায় ২০০ মহিষ রাখার ব্যবস্থা আছে।

বাচ্চাগুলি ভিন্ন খাটালে রাখা হয়। বম্বের লোক গরুর দুধ খায় না। তা রোগী ও দুর্ব্বলের খাদ্য। এই সকল মহিষগুলি গোয়ালাদের। পশুপরিপালন সরকারের। পশুগুলি চরাবার জন্য প্রচুর মাঠ আছে এবং সেই মাঠে এক বিশেষ ধরনের ঘাস চাষের ব্যবস্থা আছে যা



মহিষের পক্ষে সুখাদ্য। দুগ্ধকেন্দ্রের মধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট পাহাড় আছে এবং তারই একটা পাহাড়ের চূড়ায় একটি সুন্দর বাংলো আছে। বাংলোর চারধারে চমৎকার ফুলের বাগান। বনভোজনের পক্ষে স্থানটি অত্যন্ত মনোরম। এখান থেকে মহিষ রাখবার খাটাল—লরী থাকবার গ্যারেজ, গুদামঘর, ইতস্তত বিচরণশীল মহিষ প্রভৃতি বড় সুন্দর দেখায়। দুগ্ধকেন্দ্রের কারখানা ও আপিসবাড়ী একটি টিলার ওপর। সে এক বিরাট ব্যাপার। খাটাল থেকে সংগৃহীত দুধের বালতি লরী বোঝাই হয়ে কারখানায় এসে দাঁড়ায়। প্রত্যেকটি বালতি থেকে দুধের নমুনা সংগৃহীত হয়ে পরীক্ষিত হয় এবং তারপর দুধগুলি একটি বিশেষ ছাঁকনির ভিতরে পাম্প করে পাঠান হয়। প্রত্যেকটি বালতি সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে শোধন করে ফেরত পাঠান হয়। দুধ একবার সংগ্রহ



বরোদার অতিথিশালা

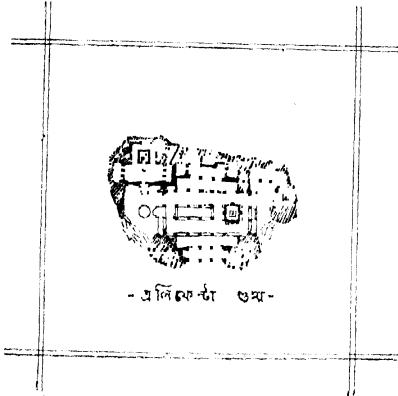
করবার পর সেগুলি জ্বাল দেওয়া, "পাস্তরাইজ" করা, বোতলে ভর্ত্তি করা প্রভৃতি কাজগুলি কলের সাহায্যে সম্পন্ন করা হয়। খালি বোতল ধুয়ে পরিষ্কার ও নির্গন্ধ করা কাজটি বড় কম নয়। চমৎকার কল আছে যার সাহায্যে ঘণ্টায় ১২০০০ বোতল সাফ করা হয়। শোনা গেল ভবিষ্যতে কলের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা হবে। দুধের বোতলগুলি তিনটি মাপের—এক পোয়া, আধ সের এবং এক সের। বোতলগুলি দুধ ভর্ত্তি হয়ে তারের ট্রেতে সাজান হয়ে ঠাণ্ডাঘরে গুদামজাত করে রাখা হয়, যতক্ষণ না পর্য্যন্ত এগুলিকে লরীর সাহায্যে সহরে পাঠান হয়।

এখানে দুধ দু'রকমের—খাঁটি দুধ ও টোন্‌ড্‌ বা হালকা দুধ। হালকা দুধের দর শস্তা—মহিষের দুধের সঙ্গে জল এবং গুড়ো দুধ মিশিয়ে এটি তৈরী করা হয়। বর্ত্তমানে এই ভাবে প্রত্যহ প্রায় ৬০০ মণ দুধ তৈরী করা হয়। এই দুধের কেন্দ্র থেকে বম্বে সহরে প্রত্যহ ২৮০০ মণ দুধ পাঠান হয়ে থাকে। এই পরিমাণ দুধ সহরের মাত্র চল্লিশভাগ চাহিদা পূরণ করতে পারে। কর্তৃপক্ষীয়েরা আশা করেন যে আর কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁরা পুরোপুরি ভাবে সহরের চাহিদা মেটাতে পারবেন। বোম্বাই সরকার আশা করেন যে সহরের গোয়ালারা অস্বাস্থ্যকর খাটাল পরিত্যাগ করে এই দুগ্ধকেন্দ্রে তাঁদের জন্তুগুলি রাখবার ব্যবস্থা করবেন। ঠিক কি সর্ত্তে গোয়ালারা এখানে গরু রাখতে পারেন তা অবশ্য জানতে পারি নি, তবে মনে হয় যে অনেক গোয়ালা যখন এরই মধ্যে তাঁদের মহিষ এই দুগ্ধকেন্দ্রে রেখেছেন তখন সে সর্ত্তগুলি যে গোয়ালাদের পক্ষে অসুবিধাজনক নয় এইটুকু মাত্র মনে হয়।

দুগ্ধকেন্দ্রের কারখানা এবং আপিস বাড়িটী আধুনিক স্থাপত্যরীতিতে পরিকল্পিত ও নির্ম্মিত। বেশ পরিষ্কার ও সুঠাম। শীতকাল হলেও পরিদর্শনের পর যখন একটু পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছিল তখন বন্ধুবর বললেন—মোরারজী দেশাইয়ের প্রতাপে বম্বে একেবারে শুকনো সহর, সুতরাং তৃষ্ণা নিবারণের জন্য এখানে দুধ ছাড়া অন্য পানীয় সম্ভব নয়। তথাস্তু—কাগজের নলের সাহায্যে বোতলের দুধ পান করা গেল। সকালটা এই-ভাবে কাটিয়ে বেলা তিনটায় প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা সভায় যোগদান করা গেল—সেখানে গিয়ে পেলাম একটী চিঠি—বম্বের সুবিখ্যাত হিন্দুস্থান কনস্ট্রাক্‌সন্ কোম্পানীর অধিকর্ত্তা শ্রীশিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লেডি উইলিংডন ক্লাবে নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রণ করেছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম সারা ভারতে—বিশেষ করে নির্ম্মাণকারকের মধ্যে—সুবিখ্যাতবড় বড় নদীর ওপর সেতু ও পর্ব্বতের দেহ ভেদ করে সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণের কাজে তাঁর পরিচালিত প্রতিষ্ঠান বিশেষজ্ঞ। যে বয়সে আমাদের দেশে

সাধারণ বাঙালী অবসর গ্রহণ করে—বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বহুদিন সে বয়স অতিক্রম করেও এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য শুধু ভারত নয়—সারা জগৎ পরিভ্রমণ করে বেড়ান। কর্ম্মবীর কথাটির বহুল প্রয়োগ আমরা করে থাকি। এ শব্দটি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্পর্কে প্রয়োগ করলে শব্দটির গৌরব বাড়বে বলে মনে হয়। নৈশ ভোজনের শেষে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব করলেন—বৈতরণা নদীর বাঁধ নির্ম্মাণ পরিদর্শনের কথা। এটী বাস্তুকার সংসদের পরিদ্রষ্টব্য তালিকার অন্তর্গত হলেও আমরা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্যবস্থাই গ্রহণ করলাম।

সকাল আটটায় যাত্রা করা হল। বম্বের পশ্চিম উপকূল ধরে গাড়ী চলল—পথটী বড় সুন্দর—সমুদ্র আর পাহাড়—রাস্তার অদূরে বম্বে সহরের জলবাহী লৌহনালিকা এক বিরাট সরীসৃপের মতো পড়ে আছে। কিছু পরে ঘাট পর্ব্বতমালা ভেদ করে মধ্যাঞ্চলীয় রেলপথের আড়াআড়ি পথে মোটর ছুটে চলল। মনে হল—দেশটী বড় রুক্ষ, গাছপালা পত্রবিরল—কেমন একটা রিক্ততা মনকে যেন পীড়া দেয়।



গাড়ী দ্রুত ছুটেছে—সত্তর মাইল পথ অতিক্রম করতে হবে। সহসা দৃষ্টিগোচর হল—খারডি রেল ষ্টেশনে সিমেণ্ট রাখবার দুটি প্রকাণ্ড সাইলো। এই রেল ষ্টেশনটি বৈতরণা বাঁধের সবচেয়ে কাছে—দূরত্ব মাত্র ১১ মাইল। পথে যেতে ষ্টেশন থেকে মালবাহী লরীর যাতায়াত ও কর্ম্মতৎপরতা নজরে পড়ল। অল্প পরেই বেলা সওয়া দশটায় বাঁধের নির্ম্মাণ কার্য্যালয়ের হাতায় উপস্থিত হওয়া গেল।

নির্ম্মাণ কার্য্যালয়টী ইংরাজী অক্ষরের U আকারে একটী প্রকাণ্ড চালা—কয়েকটী ঘরে বিভক্ত। কোনটী নক্সা করবার ঘর—কোনটী হিসাব করণিকের ঘর, কতকগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর সহকারী ও কর্ম্মাধ্যক্ষের ঘর। প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীলালচাঁদ তাঁর বসবার ঘরের জানালা থেকে সমস্ত কাজের জায়গাগুলি এক পলকে দেখিয়েদিলেন—মানুষটি যেন একটি জীবন্ত ডাইনামো। কর্ম্মের জন্য সতত উৎসুক। আমরা আসন গ্রহণ করতেই তিনি চায়ের হুকুম দিয়ে তাঁর কার্য্যক্রম বলা সুরু করলেন। সম্প্রতি শুনে অত্যন্ত ব্যথিত হলাম যে এই ধরণের জীবন্ত মানুষটি হঠাৎ পরলোক গমন করেছেন।

কয়েক বর্গ মাইল জুড়ে বিভিন্ন কাজ হচ্ছে। উঁচু নীচু পাহাড়ের পথ—জীপ একমাত্র বাহন। প্রথম গন্তব্য স্থান—যেখানে পাথর ফাটিয়ে মাপ মতো ঢেলা তৈরী হচ্ছে—পাথর সংগ্রহ থেকে তাঁকে গুঁড়িয়ে, ধুয়ে, মাপ মতো বাছাই করে চালান দেওয়া হচ্ছে যন্ত্র সাহায্যে। পথে যেতে দেখা গেল দুটি সুড়ঙ্গ—প্রত্যেকটির ব্যাস—দশফুট, মোট দৈর্ঘ্য ৪ মাইল। এই সুড়ঙ্গ পথে বাঁধের জল—তানসা হ্রদে চালান দেওয়া হবে। পাথরের খনিতে বারুদ দিয়ে পাথর ফাটানর কাজ পুরোদমে চলেছে। পাহাড়ের উঁচু নীচু পথে লরী চালান অসুবিধাজনক বলে রোপওয়ের সাহায্যে পাথর ও বালি চালান দেওয়া হচ্ছে একেবারে বাঁধের কাছে ৪ মাইল দূরে। রোপওয়ের টবগুলি ক্রমাগত সারবন্দীভাবে চলা-ফেরা করছে।

বিভিন্ন মাপের পাথরের টুকরা ও বালি পর্ব্বতাকারে সাজান হয়েছে; সেখান থেকে যন্ত্রের সাহায্যে সেগুলিকে ঠাণ্ডা করবার জন্য একটি বিশিষ্ট শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে পাঠান হচ্ছে। পাথর কুচিগুলিকে এইভাবে ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা এই প্রথম ভারতবর্ষে অনুসৃত হল। পাথর কুচির সঙ্গে সিমেণ্ট



এলেম্বিক কেমিক্যালের কার্য্যালয়, বরোদা

ও জল মেশানর ফলে কিছুটা তাপের সৃষ্টি হয়। সেই উত্তাপ প্রতিহত করার জন্য এই ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা। শীতল কক্ষ হতে পাথর কুচিগুলিকে যন্ত্র সাহায্যে "মিশান যন্ত্রে" পাঠান হয়। মিশান যন্ত্রে—বালি পাথরকুচি ও সিমেণ্ট একত্রিত মিশে গেলে—রেল ও বৈদ্যুতিক ক্রেনের সাহায্যে—এই কংক্রীট বাঁধের ছাঁচের ভিতর ফেলে দেওয়া হয়। প্রত্যহ এইভাবে ২০০০ ঘন গজ কংক্রীট ঢালা হচ্ছে। কাজের সঙ্গে পরীক্ষাগার আছে—সেখানে প্রত্যেক দিনের কংক্রীটের নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

বৈতরণা বাঁধের পরিকল্পনাকার—বোম্বাই সহরের বিশিষ্ট বাস্তুকার—শ্রী এন ভি মোদক। বিদেশ থেকে তথাকথিত বিশেষজ্ঞ না আনিয়ে বোম্বাই পৌর প্রতিষ্ঠান যে শ্রীমোদকের কর্ম্মকুশলতার ওপর নির্ভর করতে পেরেছেন তা দেখে আনন্দ অনুভব করলাম। আশা হচ্ছে এই দৃষ্টান্ত হয়ত আমাদের দেশেও অনুসৃত হবে।

বৈতরণা বাঁধটির নির্ম্মাণ খরচ—আনুমানিক আট কোটি টাকা—বাঁধটি লম্বায় ১৮২০ ফিট্, উচ্চতায় ২৭৮ ফিট্—বাঁধটির ওপর ৪০´×২৫´৬"

মাপের আটটি কপাট কল থাকবে। বাঁধটি সম্পূর্ণ হলে—দশ মাইল লম্বা এবং আয়তনে ৩·৮ বর্গ মাইল একটি হ্রদ নির্ম্মিত হবে। দশ ফুট ব্যাসের সুড়ঙ্গও লোহার নলের সাহায্যে এই জল বম্বে সহরে সরবরাহ করা হবে। কাজ যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে তাতে মনে হয় ১৯৫৪ সনের নভেম্বর মাস নাগাদ বাঁধের কাজ সমাপ্ত হবে।

বাঁধের কাজের সঙ্গে বেশ পাকাপাকিভাবে কংক্রীট পরীক্ষা করবার ব্যবস্থা আছে। পরীক্ষাগার গৃহটি এমনভাবে তৈরী হয়েছে যে বাঁধের কাজ শেষ হয়ে গেলে এ গৃহটি স্থানীয় কার্য্যালয় হিসাবে ব্যবহৃত হবে। কাজ ও তার ব্যবস্থা পরিদর্শন করে বেশ একটা তৃপ্তি পাওয়া গেল। আধুনিক যন্ত্রপাতির সুষ্ঠু ব্যবহার করে, কি ভাবে এই ধরণের বিরাট কাজ শৃঙ্খলাবদ্ধ-ভাবে পরিচালনা করা যায় বৈতরণা বাঁধ নির্ম্মাণ তার একটা খুব ভাল রকমের আদর্শ।

সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণে সহরে ফেরা হল। সেদিনকার মতো বিশ্রাম—কেননা পরদিন সকাল সাতটায় এলিফান্টা গুহা দেখতে যাবার কথা।



বরোদা, এলেমবিক কেমিক্যালের উদ্যানে চা সভা

বিখ্যাত বালার্ডপিয়ার থেকে ষ্টীমার ছাড়বে। শীতের সকাল সাতটায় জাহাজঘাটায় পৌছান মানে—রাত থাকতে ঘুম থেকে ওঠা। যতটা আশঙ্কা হয়েছিল কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল ব্যাপারটা সেরকম কিছু বিভীষিকাজনক নয়। প্রথম ট্রাম চলার আওয়াজ পেতেই বিছানা ছেড়ে উঠতে হল। পালং চা প্রস্তুত ছিল। পানান্তে প্রাতঃকালীন কর্ত্তব্য মায় স্নান পর্য্যন্ত শেষ করে যখন বালার্ড পিয়রে হাজির হওয়া গেল তখন দেখি আরও অনেকে আমাদের পূর্ব্বেই হাজির হয়েছেন।

বালার্ড পিয়র কথাটার সঙ্গে যেন বিলাত যাত্রা ব্যাপারটার একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে। পূর্ব্বতনকালে বিলাতগামী যাত্রীদের জন্য মেল-ট্রেণ এসে সোজা জাহাজঘাটায় দাঁড়াত। আসল ও নকল সাহেব মেমেরা কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সোজা জাহাজে চড়তেন। তেহি নো দিবসা গতা। সেদিন আর নেই—এখন ট্রেণের লাইনে মরচে ধরেছে বালার্ড পিয়রের পালিশ এখন ঔজ্জ্বল্যহীন—নিষ্প্রভ।

সমুদ্রের বুকে একটা পাতলা কুয়াসার আস্তরণ চাপা রয়েছে। চার পাশে কিছু স্পষ্ট দেখা যায় না। নাতিশীতোষ্ণ ভাব। তিনখানি ষ্টীমলঞ্চে এলিফান্টা দ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা হল। দূরত্ব মাত্র ছয় মাইল—সময় লাগল এক ঘণ্টা। ভাটার জন্য জেটীর পাশে লঞ্চ ভিড়তে পারল না—দেশী নৌকার সাহায্য নিতে হল। জেটী থেকে গুহার প্রবেশদ্বার প্রায় দেড় মাইল পথ, ধীরে ধীরে পাহাড়ের ওপর উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের ছোট ছোট ছেলেরা বিক্রী করবার জন্য নানা আকারের সুদৃশ্য সরু লাঠি আমাদের সামনে ধরল। দাম যৎসামান্য—সুতরাং তাদের বিক্রেয় দ্রব্য অতি সহজেই হস্তান্তরিত হয়ে গেল। গুহার কাছে একটী নামবার ঘাট আছে—দেশী নৌকা সেখানে সহজেই ভিড়তে পারে। গুহার তোরণ সমুদ্রতীর থেকে প্রায় আড়াইশো ফুট উঁচু। টিকিট কিনে গুহার অঙ্গনে প্রবেশ করতে হল—প্রবেশ মূল্য এক আনা। অঙ্গনটী প্রশস্ত, ছায়াসুনিবিড়।

গুহার প্রবেশপথ উত্তরমুখী—আকারে বিরাট, তোরণের স্তম্ভাদি ধ্বংস হয়ে গেছে—সরকারী চেষ্টায় যেটুকু দাঁড়িয়ে আছে তাকে টিকিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাত্রীদের বোঝাবার সুবিধার জন্য গুহার প্রথমেই তার একটী নক্সা রাখা আছে—গুহাটী দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় সমান। গুহাতে প্রবেশ করতেই প্রথমে সাক্ষাৎ পাওয়া গেল একটী বিরাট ত্রিমূর্ত্তির—উচ্চতায় প্রায় ১৯ ফুট। যে শিল্পী পাহাড়ের পাথর কেটে এমন বলিষ্ঠ অথচ সুষ্ঠু মূর্ত্তির রূপ দান করেছেন তাঁর নাম আমরা জানি না, কিন্তু তাঁর সৃষ্টিশক্তিকে আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। গুহার মধ্যে অর্দ্ধনারীশ্বর—হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তি এবং শিবের তাণ্ডব, রাবণের কৈলাস উত্তোলন—হরগৌরীর বিবাহ প্রভৃতি দৃশ্যের ভাস্কর্য্য সত্যই চমৎকার। গুহার পূর্ব্বে ও পশ্চিমে দুটী ছোট অঙ্গন—খুব সম্ভব গুহায় সকাল ও সন্ধ্যায় আলো প্রবেশের জন্য এ দুটীর প্রয়োজন ছিল। অঙ্গন দুটীর দক্ষিণেও দুটী ছোট গুহা আছে এবং তার মধ্যেও যথেষ্ট আকর্ষণের নমুনা পাওয়া যায়। কিন্তু সে গুলির দশা প্রায় শেষ অবস্থা।

প্রধান গুহা পরিদর্শন শেষ করে একটু বিশ্রামের সুযোগ সন্ধান করা হচ্ছিল এমন সময় শ্রীমতি উমাদেবী বল্লেন যে গুহার চার পাশ একবার দেখে এলে হয়। শৈলেন ভায়া এ প্রস্তাব সানন্দে সমর্থন করায় বিশ্রামের চেষ্টা পরিত্যাগ করে পরিক্রমণে বার হওয়া গেল। শুধু ডাঃ সেন ও শ্রী প্রতাপ বোস উৎসাহের অভাবে বিশ্রাম গ্রহণে মনোনিবেশ করলেন।

গুহার পূর্ব্বদিকের চূড়ার গায়ে বেশ একটু প্রশস্ত রাস্তা—অগ্রসর হয়ে দেখা গেল সেদিকেও অনেকগুলি অসমাপ্ত গুহা আছে। দেখলেই মনে হয় যে কোনো বিশেষ কারণে সে পরিকল্পনাগুলি সমাপ্ত করা হয় নি। তার পর যত্নের অভাবে সে গুহাগুলি ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে। শৈলেন্দ্রনাথ ও নীরেন আমাদের দলের আলোকচিত্রধর। অসমাপ্ত গুহার সম্মুখে আমাদের দাঁড় করিয়ে ছবি তুলে তবে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আর অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত নয় বলে ঘুরে দাঁড়ান হল। তারপর ঢালু পথ বেয়ে আবার ষ্টীমারে ওঠা হল।

তখন আকাশ বেশ পরিষ্কার—পশ্চিমধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট দ্বীপ চোখে পড়ল—এরই একটী দ্বীপের নাম ট্রম্বে—এখানে খনিজ তেল

থেকে পেট্রল ছেঁকে তৈরী করার যন্ত্রপাতি বসান হচ্ছে। ভারতে এই ধরণের তিনটী কারখানা নির্ম্মাণ করার কথা হয়েছে—দুটী বম্বেতে, একটী বিশাখাপত্তনমে—ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলে পেট্রলের ব্যবহার অধিক হলেও কলকাতা বা তার উপকণ্ঠে এই জাতীয় পরিষ্করণ কারখানার প্রয়োজন খুব বেশী। কিন্তু ভারতের পরিকল্পনার মধ্যে কলকাতায় চতুর্থ কারখানার স্থান আছে কিনা সে সম্বন্ধে ঠিক নিঃসন্দেহ নই। তবে একথা ঠিক যে এই তিনটী কারখানা যথাযথভাবে চালিত হলে দেশের অনেকটা উপকার হবে।

হোটেলে ফিরতে বেলা দুপুর গড়িয়ে গেল। দ্বিপ্রাহরিক ভোজনে বিশেষ উৎসাহ ছিল না, কেননা ষ্টীমারে টুকিটাকি খাবার প্রচুর পরিমাণে বিতরিত হয়েছিল। রাত্রে বাৎসরিক নৈশ ভোজন—তাজমহল হোটেলের খানাকামরায়।

তাজমহল হোটেলের এই খানাকামরাটী নাকি সারা ভারতের শ্রেষ্ঠ নৈশভোজনাগার, যদিও সত্য বলতে কি—এর বিশেষত্ব ঠিক কোনখানে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল না। যথারীতি ভোজনান্তিক বক্তৃতা হল—প্রধান অতিথি ছিলেন—ডাঃ জনমাথাই। তার বলার সুরটী বড় স্বাভাবিক। কাঁচের গ্লাসে সাদা জল ওষ্ঠে ঠেকিয়ে ভারতরাষ্ট্র ও রাষ্ট্রপতির শুভকামনা জানানর হাস্যকর প্রচেষ্টাও বাদ গেল না। অনেক সময়েই মনে হয়েছে যে এ ব্যবস্থার আশু পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। ভারত সরকারের কর্ণধারদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এ প্রহসন যে কেন ধরা পড়ে না তা সত্যই বিস্ময়কর। ভোজনপর্ব্বের আনুষ্ঠানিক অংশ শেষ হলে সুরু হল—শিরীনভাজিফদার সম্প্রদায়ের নৃত্য। খুব অপ্রশংসা করবার মতো কিছু নয়।

ক্রমশঃ

পূর্ব্ব বাঙ্গলার অতীত সম্পদ

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বাঙ্গালাদেশের নানাস্থানে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য কীর্ত্তি বিদ্যমান আছে। ইতিহাসে ও শিল্পকলার দিক্ দিয়াও তাহার গৌরব খুবই বেশী। পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তর বঙ্গের অধিকাংশ স্থান এখন পূর্ব্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। সেখানকার সব মন্দির, মঠ ও দেবায়তনের প্রতিষ্ঠাতারা এখন উদ্বাস্তুরূপে নানা স্থানে ঔপনিবেশিক হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের অধিকাংশের প্রাসাদোপম অট্টালিকা এখন জনশূন্য—বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং সর্পসঙ্কুল—মন্দিরে-মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টা আর বাজে না। আনন্দ-উৎসব আর হয় না। পল্লীবাসী নরনারীর দেবদর্শন করিবার সে উৎসাহ আর নাই—যাঁহারা আছেন তাঁহাদের সম্বন্ধেই একথা প্রযোজ্য। বাঙ্গলাদেশের এই সমুদয় বিভিন্ন পল্লীতে, তীর্থস্থানে আমি বহুবার ভ্রমণ করিয়াছি—আলোক-চিত্র সংগ্রহ করিয়াছি। আমার মনে হয় পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তর বঙ্গের প্রাচীন মন্দির, মঠ, দেবায়তনের কাহিনী পাঠকদের কাছে ভালই লাগিবে।

পূর্ব্ববঙ্গের এক ব্রাহ্মণ জমিদার পরিবারের কথা এবং তাঁহাদের কীর্ত্তি-কথা আজ বলিতেছি।

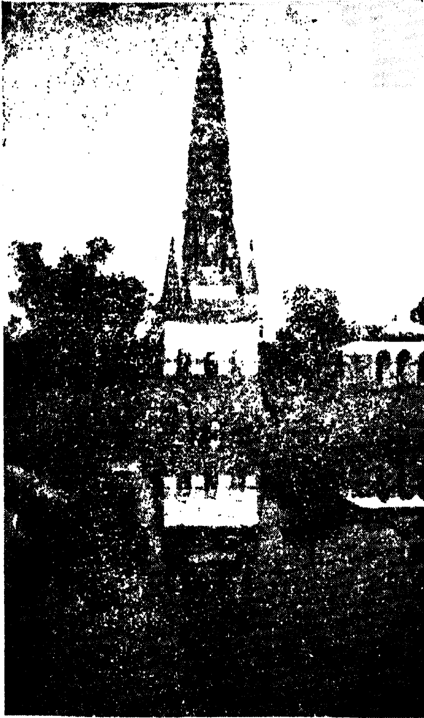
ফরিদপুর জেলার রুদ্রকর একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এ গ্রামের জমিদাররা বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন, এখনও আছেন। মাদারিপুর মহকুমা হইতে রুদ্রকরের দূরত্ব পনের মাইল মাত্র। গ্রামখানি দৈর্ঘ্যে পাঁচ মাইল এবং প্রস্থে তিন মাইল। গ্রামের উত্তর দিকে পণ্ডিতপ্রধান ধানুকা, আমতলি, কাগদী প্রভৃতি গ্রাম, পূর্ব্ব সীমা মাক্সহর, পশ্চিমে মধ্যপাড়া ও মনোহর রায়ের বাজার এবং দক্ষিণে কালীগঙ্গা নদীর খাত—এক সময়ে এই কালীগঙ্গা নদী ছিল রুদ্রকর পল্লীর প্রান্তবাহিনী। এখন ইহা বিলুপ্ত গিয়াছে। এ গ্রামে এক সময়ে লোকসংখ্যা ছিল পাঁচ হাজারের উপর।

রুদ্রকর গ্রামের বিশেষত্ব ছিল অনেক, তন্মধ্যে বহু বড় বড় দীঘি এবং মন্দির ও দেবায়তন ছিল। হাট-বাজারের মধ্যে আঙ্গারিয়ার বাজার এবং মনোহর রায়ের বাজার বেশ নাম-করা। রুদ্রকরেও প্রতিদিন বাজার বসে। গ্রাম-প্রধানেরা স্থানীয় জমিদার চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তীর নেতৃত্বে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি উহার প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

ব্রাহ্মণ-সমাজে রুদ্রকরের জমিদারবংশ বিখ্যাত। এ বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম ছিল বহুরূপ পণ্ডিত। কথিত আছে, রাজা বল্লালসেন তাঁহাকে চট্টোপাধ্যায় উপাধি দিয়াছিলেন। রুদ্রকরের জমিদার-বংশীয়েরা পূর্ব্ববঙ্গের ব্রাহ্মণ সমাজের নেতা এবং বিশেষ সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন। এ গ্রামের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ। বাঙ্গলার কুলীন সম্প্রদায়ের ইতিহাসের সহিত ইঁহাদের ইতিহাস বিজড়িত রহিয়াছে। বাঙ্গলার অন্যতম বার ভুঁইয়া চাঁদ রায় কেদার রায়ের সময় হইতেই ইঁহাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি চলিয়া আসিতেছে। কুলীন হইয়াও ইঁহারা বহু বিবাহের বিরোধী ছিলেন। শাস্ত্রবিহিত নীতি ও বিধান অনুসারে পরিচালিত হইলেও বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি বরাবরই শ্রদ্ধাবান্। রুদ্রকরের চক্রবর্ত্তীদের অতিথিসেবা, দেবসেবা এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান বরাবরই চলিয়া আসিতেছিল। তাঁহাদের বাড়ী বা অতিথিশালা হইতে কোনদিন কোন অতিথি ফিরিয়া যায় নাই।

এক সময়ে ঢাকা বিভাগে চক্রবর্ত্তী পরিবার একান্নবর্ত্তী পরিবার হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন—এক পরিবারভুক্ত ছিলেন ৮৫০ শত জন, পুরুষ ও নারী। সাতটি তরফে বিভক্ত এই পরিবারের প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর উপর বিভিন্ন বিভিন্ন রূপ কাজের ভার অর্পিত ছিল। সংস্কৃত

শিক্ষার জন্য তাঁহাদের বিশেষ উৎসাহ ছিল। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠাপিত চতুষ্পাঠীতে বাঙ্গালার নানাস্থান হইতে ছাত্রেরা অধ্যয়ন করিতে আসিত। পরিবারের প্রত্যেক মহিলা, গৃহিণী, বধূ ও কন্যাদের উপর সমুদয় সাংসারিক কার্য্যভার ন্যস্ত ছিল। এত বড় বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারের রন্ধন, পরিবেশন, অতিথি সেবা, ঠাকুর সেবার কার্য্য, রোগী ও আর্ত্তজনের সেবা-শুশ্রূষার দায়িত্ব—বয়স ও কর্ম্মক্ষমতার অনুযায়ী গৃহিণী, বধূ ও কন্যারা সমাপন করিতেন। একজনও পাচক ব্রাহ্মণ ছিল না। প্রত্যেক তরফে ১৫০ জন পুরুষ, নারী ও শিশু হিসাবে সাত তরফে প্রায় ৮৫০ জনের আহারাদির ছিল ব্যবস্থা। পারিবারিক সর্ব্ববিধ কার্য্য



রুদ্রকরের নবরত্ন মঠ ও মন্দির

যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় সেজন্য 'পরিবারের একজন কর্ম্মদক্ষ বুদ্ধিমান ব্যক্তি সাধারণ ম্যানেজার বা কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত হইতেন। তাঁহার উপর জমিদারি পরিচালনা, পারিবারিক সমুদয় কর্ত্তব্য, ভরণ-পোষণ, পূজা পার্ব্বণ, দান-দক্ষিণা সমুদয়ই নির্ব্বাহের দায়িত্ব থাকিত এবং তাঁহার পরিচালনাধীনে সম্পন্ন হইত।

প্রথমে যে বহুরূপ চট্টোপাধ্যায়ের কথা বলিয়াছি তিনি বল্লাল সেনের সভায় একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং কুলীন ছিলেন। বহুরূপ চট্টোপাধ্যায়ের অধস্তন দশম পুরুষ ছিলেন রবিকর চট্টোপাধ্যায়—রবিকর হইতে এই পরিবারের বংশধরেরা 'রবিকার' নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন বিখ্যাত দেবীবর ঘটকের সমসাময়িক। এই দেবীবর ঘটকই ব্রাহ্মণ কুলীন সম্প্রদায়ের মধ্যে মেল বন্ধন করেন। তিনি ৩৬টি মেল-বন্ধন করেন। রুদ্রকর পরিবার সর্ব্বানন্দী মেলের অন্তর্ভুক্ত। ইঁহারা সামবেদী এবং রাঢ়ের প্রাচীন অধিবাসী বলিয়া রাঢ়ি শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাজে পরিচিত।

রবিকর হইতে অধস্তন পঞ্চম পুরুষ গোবিন্দপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বার-ভূঁইয়ার শ্রেষ্ঠ বীর বিক্রমপুরের চাঁদ রায় কেদার রায়ের সভাপণ্ডিত ছিলেন। বৈদিক পণ্ডিতরূপে তাঁহার খুবই খ্যাতি ছিল। চাঁদ রায় ও কেদার রায় তাঁহার পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞানে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'কুলরাজ চক্রবর্ত্তী' উপাধি ভূষণে ভূষিত করেন। এই 'কুলরাজ চক্রবর্ত্তী' উপাধি তদবধি এই বংশে চলিয়া আসিতেছে। বার ভূঁইয়ার চাঁদ রায় ও কেদার রায় গোবিন্দপ্রসাদকে একটি পরগণা উৎসর্গ করেন। তাঁহার নাম অনুসারে সেই পরগণা, পরগণা গোবিন্দপুর নামে পরিচিত। এই গোবিন্দপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ই রুদ্রকর জমিদার পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি 'অগ্নিহোত্র' যজ্ঞ করিয়া সর্ব্বত্র খ্যাতিমান্ হইয়াছিলেন। পরগণা গোবিন্দপুরের কালেক্টরীতে কোন তৌজী নম্বর নাই। পরে গোবিন্দপুর পরগণা বহু অংশে বিভক্ত হয় এবং উহার একটী স্বতন্ত্র তৌজী নম্বর হইয়াছিল।

গোবিন্দপ্রসাদ বাঙ্গালা দেশে সংস্কৃত শিক্ষা প্রচলনের জন্য চতুষ্পাঠি প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য এত প্রসিদ্ধি লাভ করে যে নানা দেশ-বিদেশ হইতে সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, জ্যোতিষ প্রভৃতি অধ্যয়নানুরাগী ছাত্রেরা রুদ্রকর আসিতেন। সে সময়ে রুদ্রকর পূর্ব্ববঙ্গের বিখ্যাত সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। এই গোবিন্দপ্রসাদ কুলীন সন্তানের বহুবিবাহ নিবারণের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার সময়ে কুলীনদের মধ্যে বহুবিবাহ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১০১০ বাঙ্গলা সনে (ইংরাজী—১৬০৩ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার মৃত্যু হয়। গোবিন্দপ্রসাদ যে চাঁদ রায় কেদার রায়ের সমসাময়িক ছিলেন তাহা তাঁহার মৃত্যু তারিখ হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

এ বংশের পরবর্ত্তী খ্যাতিমান্ ব্যক্তিদের মধ্যে নীলমণি কুলরাজ চক্রবর্ত্তী,—বাংলা ১১২৫ সনে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব্ববঙ্গের জনসাধারণ তখন, দধিরাম পাল নামক একজন দুর্দ্দান্ত ডাকাতের অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়াছিলেন, সে সময়ে পর্ত্তুগীস্ দস্যু এবং আরাকানি মগদের লুণ্ঠন, নরহত্যায়, বিবিধ উৎপীড়নে পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল। সেই দুর্দ্দিনে নীলমণি কুলরাজ ডাকাত দধিরাম পাল, পর্ত্তুগীস্ ফিরিঙ্গি দস্যু, মগ ও চাটগাঁয়ের নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের দমন করিয়া অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। নিজে ও তিনি ডাকাত দধিরামের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন—কিন্তু একসপ্তাহ পরে একজন ভৃত্যের কৌশল ও চতুরতায় মুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন। সে এক রোমাঞ্চকর কাহিনী। মুক্তিপ্রাপ্তির পর নীলমণি কয়েকবার ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই করিয়া তাহাদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করেন। কালীগঙ্গা নদীর দশ মাইল দূরে ডাকাত দধিরাম ও তাহার সহচর ফিরিঙ্গি দস্যু,

মগ দস্যুর সঙ্গে যুদ্ধে নীলমণি বিজয়ী হইলেন এবং দেশের ডাকাতি নিবারণ করেন। ১২১৫ বাঙ্গালা সনে, নব্বুই বৎসর বয়সে নীলমণির মৃত্যু হয়, তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী গঙ্গামণি দেবী সহমরণে গিয়াছিলেন।

নীলমণির সমসাময়িক আত্মীয় ছিলেন—রাজদুর্লভ ও মুরহর চক্রবর্ত্তী। একটি বৃহৎ দীঘি এবং দুইটি প্রাচীন মন্দির এই পরিবারের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। রাজদুর্লভের পুত্র কৃষ্ণকান্তের তরুণ বয়সে মৃত্যু হইলে, তাঁহার পত্নী দীনময়ী দেবীও সহমরণে গিয়াছিলেন।

নীলমণি কুলরাজ চক্রবর্ত্তীর ছয় পুত্র, পিতার মৃত্যুতে দানসাগর শ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন করেন এবং প্রত্যেক পুত্রই নিজ নিজ নামে দীঘি খনন করাইয়াছিলেন। রাজচন্দ্র, তিলকচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, জয়চন্দ্র প্রভৃতি সকলেই কীর্ত্তিমান পুরুষ ছিলেন। শম্ভুচন্দ্র ও জয়চন্দ্র 'তুলাপঞ্চাগ্নি' নামক যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করেন। শম্ভুচন্দ্রের চারিপুত্রের মধ্যে কৃষ্ণকান্ত বরিশালের একজন প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন—উমাকান্ত একজন বিখ্যাত সংস্কৃত শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত ছিলেন। জয়চন্দ্রের পুত্রগণও তাঁহাদের মাতার স্বর্গারোহণের পর—১৩২০ সালে দানসাগর শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন।

তিলকচন্দ্রের তিনপুত্র গুরুচরণ, শশীভূষণ এবং বৈকুণ্ঠচন্দ্র এবং রাজচন্দ্রের একমাত্র পুত্র অভয়াচরণ সকলেই পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি ও গৌরব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। কেবল যে ধর্ম্মানুষ্ঠান পূজাপার্ব্বণে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন তাহা নহে—ইঁহারা জনসাধারণের কল্যাণের জন্য যাতায়াতের সুযোগ ও সুবিধার্থ পথঘাট নির্ম্মাণ, খাল কাটানো ও উহার সংস্কার, চিকিৎসালয়, ডাকঘর প্রভৃতি স্থাপন করিয়া জনকল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন।

মাতা রাসমণি দেবীর দানসাগর শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। তাঁহাদের নির্ম্মিত নবরত্ন মন্দির ঐ অঞ্চলের সর্ব্বোচ্চ মঠ ও মন্দির মাতার ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চিতাভস্মের উপর নির্ম্মিত হইয়াছে। ইঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ কাশীমণি দেবীর চিতার উপরও তাঁহারা একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বাঙ্গালা ১২১৭ সালে ঐ দুই মঠ ও মন্দির মধ্যে জয়কালী ও ভৈরব বহু অর্থ ব্যয়ে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রায় ত্রিশ হাজার লোককে ভুরিভোজন করান হইয়াছিল।

শশীবাবু এবং বৈকুণ্ঠবাবু তৎকালে পূর্ব্ব বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ সমাজের নেতৃস্থানীয় ছিলেন।

মাদারীপুর অঞ্চল ইংরাজ রাজত্বের সময়েও দুর্দ্দান্ত ডাকাতদের জন্য অতি ভয়াবহ স্থান ছিল—নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানদের ব্যবসাই ছিল ডাকাতি। ইহারা নির্ভয়ে সর্ব্বত্র ডাকাতি করিয়া বেড়াইত। নির্য্যাতিত পল্লীর অধিবাসীদের অনুরোধে শশীবাবু ডাকাতদের দমন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন—অনুরোধ উপরোধে কোন ফলই হইল না দেখিয়া অবশেষে তিনি বলপ্রয়োগে ডাকাতি দমন করেন। একবার বাসপল্লী রুদ্রকর হইতে মাদারীপুর যাইতেছেন—আরিয়ল খাঁ নদীতে প্রবেশ করিলে পর ডাকাতদল তাঁহার নৌকা আক্রমণ করিল। নিরুপায় শশীবাবু নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নদী সাঁতরাইয়া পার হইয়া কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য জিনাতুল্লার সাহায্যে ডাকাতদের ধরিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার অক্লান্ত শ্রম ও উদ্যোগে বহু ডাকাত ধৃত হইয়া রাজদ্বারে যথোপযুক্ত দণ্ড পাইয়াছিল। এই প্রচেষ্টার পর ঐ অঞ্চল হইতে দস্যুভীতি বিদূরিত হইয়াছিল।

কুলীন কুমারীগণের শোচনীয় দুরবস্থার কথা ছিল ব্রাহ্মণ সমাজের কলঙ্ক স্বরূপ। কৌলীন্য প্রথার কুৎসিত আচরণে বহু কুলীন কন্যা আজীবন অবিবাহিতা থাকিয়া 'যমবরণ' নামে অভিহিত হইত। যে বীভৎস পাশবিক অনুষ্ঠানে চল্লিশ পঞ্চাশ জন রমণী একটি বাস্তুভিটা-পরিশূন্য অশীতিপর বৃদ্ধের গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিতে বাধ্য হইত, সে সম্বন্ধে অধিক কথা বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। কবি হেমচন্দ্র গাহিয়াছিলেন :—

দেখরে নিষ্ঠুর হাতে লয়ে মালা
কুলীন সধবা অনূঢ়া অবলা
আছে পথ চেয়ে পতির উদ্দেশে,
অসংখ্য রমণী পাগলিনী বেশে
কেহবা করিছে বরমাল্য দান
মুমূর্ষুর গলে হয়ে ম্রিয়মাণ
নয়নে মুছিয়া গলিত বারি।

বিক্রমপুরের এক দীন ব্রাহ্মণ কুলীন-সন্তান রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় সমাজের এই জঘন্য প্রথা দূর করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি সহরে ও গ্রামে গ্রামে গাহিয়া এই প্রথা নিবারণের জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন। আমরা এখানে তাঁহার রচিত একটি সঙ্গীত উদ্ধৃত করিলাম, উহা পাঠ করিলেই সে কালের কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজের অবস্থা বুঝিতে পারিবেন :

বহুদিন পরে এসেছি চিনিনা শ্বশুরবাড়ী।
কোন্ পথে যাইব মাগো বিশ্বনাথ বাড়ুয্যের বাড়ী।
যারা ছিল ছেলে-পিলে, তাদের হ'ল ছেলে-পিলে,
বিয়ে ক'রে গেলাম ফেলে, বয়ে গেল বছর কুড়ি!
বাড়ী ঘর তার নাহি চিনি, কেবল শ্বশুরের নামটি জানি,
উত্তরেতে বাগানখানি, সুপারি সব সারি সারি॥
দ্বিজ রাসবিহারী বলে আরত হাসি রাখতে নারি।
তুমি যারে মা বলিলে সে বটে তোমারি নারি॥

বাঙ্গালা ১২৮৩ সনে শশীবাবু প্রভৃতি যখন মাতার দানসাগর শ্রাদ্ধ করেন, সে সময়ে কাশী, কাঞ্চি, দ্রাবিড় এবং ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে এবং বাঙ্গালার বিখ্যাত পণ্ডিতগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন—সে সময়ে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে কুলীন সন্তানগণের বহুবিবাহ-নিবারণ, বরপণ ও কন্যাপণ নিবারণ, মেল পর্য্যায় ভঙ্গ করিয়া বহু বিবাহ বিলোপ করিবার জন্য সভায় বহু প্রস্তাব গৃহীত এবং পণ্ডিতগণের অভিমত গ্রহণ করা হয়। শশীবাবু ঐ সভার নেতৃত্ব করেন। যদিও সেদিনকার সেই সভায় কোন মীমাংসা হয় নাই—তবে যুগধর্ম্মের প্রভাবে, সমাজ

হইতে যে সেই কুপ্রথা সেই সব আন্দোলনের ফলে দূর হইয়াছে, আজ আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি।

সেকালে বিলাত-ফেরতদের সমাজ চ্যুত হইতে হইত, শশীবাবু গোঁড়া হিন্দু হইলেও শিক্ষার উদ্দেশ্যে যাঁহারা বিলাত গমন করিয়াছে কিংবা ইউরোপের অন্যত্র গিয়াছে, তাহাদিগকে সমাজে সমাদরের সহিত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য,—এই মত পোষণ করিতেন। অবশ্য শাস্ত্রানুমোদিত প্রায়শ্চিত্ত বিধান দ্বারা। তিনি নমশূদ্রদের মধ্য হইতে অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য প্রয়াসী ছিলেন—হিন্দু সমাজ হইতে তাঁহারা বিচ্যুত হইয়া মুসলমান বা খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে সমাজের পক্ষে অকল্যাণজনক, একথা ভাবিয়া তিনি তাঁহাদিগকে সমাজে গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

পূর্ব্ববঙ্গে—মুমূর্ষু ব্যক্তিদের মৃত্যুকালে ঘর হইতে একরূপ টানিয়া হিঁচড়াইয়া বাহিরে আনার রীতি ছিল, এখনও আছে। একান্ত নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক, মুমূর্ষুর সেই ক্লেশদায়ক অবস্থা হইতে নিবৃত্ত করিতে তিনি অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

শশীবাবুর মৃত্যুর পর বৈকুণ্ঠবাবুও আর একবার—জয়কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আগত পণ্ডিত সভায় বহু বিবাহ প্রথা নিবারণ, বরপণ ও কন্যাপণ নিবারণ, বিলাত ফেরতদের সমাজে গ্রহণ প্রভৃতি বিবিধ সমাজ-সংস্কার কাজে তিনি নির্ভীক ও নিরপেক্ষভাবে ব্রতী হইয়াছিলেন,—কোন কোন স্থলে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, কোথাও হন নাই, তাহা পরবর্ত্তীকালে আপনা হইতেই হইতেছে।

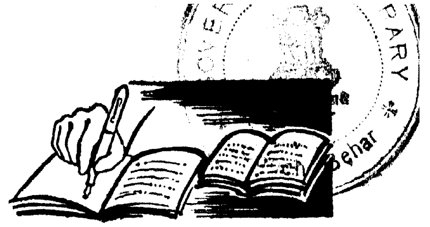
একবার হেমন্তের এক রাত্রিতে আমি রুদ্রকর চক্রবর্ত্তীর বাড়ী গিয়াছিলাম, তাঁহাদের নিকট হইতে—ঐ অঞ্চলের ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করিতে। আমি যে সহানুভূতি ও সাদর অভ্যর্থনা পাইয়াছিলাম, আজিও আমি তাহা ভুলিতে পারি নাই। এখন এই প্রতিপত্তিশালী রুদ্রকর জমিদার বংশের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা কে কোথায় আছেন তাহাও জানি না। পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের প্রাচীন ইতিকথা, লুপ্ত মঠ, মন্দির, ও মূর্ত্তির বিবরণ এখন সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা ঐতিহাসিকদের প্রধানতম কর্ত্তব্য হইতেছে।

কথার দোষ

শ্রীশিবচন্দ্র ন্যায়াচার্য্য

অধিকাংশক্ষেত্রেই কথা বলিলে তাহাতে কিছু না কিছু দোষ পাওয়া যাইয়া থাকে, সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বাক্যরচনা করা অতি কষ্টসাধ্য, আমরা যাহা বলি—বহুক্ষেত্রে উহা উকিল মোক্তারের জেরায় পড়িয়া বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়, বিশেষ দার্শনিক দৃষ্টি না থাকিলে কথার এই দোষগুলির অনুসন্ধান ও অপসারণ করা দুঃসাধ্য, এ স্থলে উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি স্থলের আলোচনা করিতেছি, সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে "সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর", ইহার খণ্ডনে একটি যুক্তি দেওয়া হয়; সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর এমন একটি পাথর প্রস্তুত করিতে সমর্থ কিনা? যে পাথরটি তিনি নিজেই তুলিতে পারেন না। এরূপ প্রস্তর-নির্ম্মাণ-সমর্থ পক্ষে নির্ম্মিত পাথর তুলিবার সামার্থ্য না থাকায় ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তা স্বীকার করা চলে না, প্রস্তর নির্ম্মাণ অসমর্থ পক্ষেও সেই কথা, উক্তরূপ প্রস্তর নির্ম্মাণে অসমর্থ ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলা চলে না। এইরূপ প্রশ্ন-মূলক যুক্তির দ্বারা একটি উভয়তঃ পাশারজ্জু অবস্থার সৃষ্টি করিয়া ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তার প্রতিবাদ করা হইয়া থাকে। এস্থলে যুক্তি বাক্যের দোষানুসন্ধান ও নিজ বাক্যে প্রদত্ত দোষের অপসারণ বিশেষ দার্শনিক দৃষ্টি ব্যতীত সম্ভব হয় না। যুক্তিটি আপাত দৃষ্টিতে অতিশয় মনোহর সন্দেহ নাই, কিন্তু এমন একটি বস্তুকে স্বীকারপূর্ব্বক প্রদর্শিত হইয়াছে, যাহা ঈশ্বরবাদিদিগের মতে সম্পূর্ণ অসম্ভব বস্তু; ঈশ্বরবাদিগণ এমন প্রস্তর স্বীকার করেন না, যাহা ঈশ্বর তুলিতে পারেন না, সুতরাং তাহাদের মতে অসম্ভব বস্তুকে ভিত্তি করিয়া যে যুক্তি বা প্রশ্ন পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ নিরর্থক। উদাহরণ যথা মদ্যপান করেন না, এমত ব্যক্তি সম্বন্ধে যদি প্রশ্ন করা যায় "আপনি মদ্যপান ছাড়িয়াছেন কিনা?" এ প্রশ্নটি যেরূপ নিরর্থক হইবে, ঈশ্বর সম্বন্ধেও উক্ত প্রশ্নটি অনুরূপ নিরর্থক। যাহা কখনও সম্ভব নহে, তাহার সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে না, কারণ অসম্ভব বস্তুকে শব্দের দ্বারা—উল্লেখ করা চলে না। মদ্যপান করেন না এমন ব্যক্তির মদ্যপান ছাড়া যেরূপ অসম্ভব বস্তু, ঈশ্বরবাদিদিগের মতে ঈশ্বর তুলিতে পারেন না এমন প্রস্তরও সেইরূপ অসম্ভব বস্তু, সুতরাং উভয়স্থলেই অসম্ভব বস্তুর নির্ম্মাণ এবং ত্যাগ সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করা হয় তাহা নিরর্থক হইয়া দাঁড়ায়। ঈশ্বর সম্বন্ধে আরও একটি সাধারণের মনে উদিত হয়—প্রশ্নটিও পূর্ব্ব প্রশ্নের মত অসম্ভব বস্তুমূলক, প্রশ্নটি এইরূপ, অবিনাশী পূর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর আত্মনাশ করিতে সমর্থ কিনা? সমর্থপক্ষে ঈশ্বরেরও বিনাশ সম্ভব; সুতরাং তাঁহাকে অবিনাশী বা নিত্য বলা চলে না। অসমর্থ পক্ষে আত্মনাশ সামর্থ্যবিহীন ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলা চলে না। এ প্রশ্নের হাঁ বা না উভয় প্রকার উত্তরেই ঈশ্বরবাদিদিগের মতে অনিষ্ট প্রসক্ত হয়। এজন্য জাতীয় প্রশ্নকে "উভয়ত পাশারজ্জু" অবস্থার সৃষ্টিকারক বলা হইয়াছে। ঈশ্বরের আত্মনাশ বস্তুটিই জগতে অসম্ভব, সুতরাং এ প্রশ্নও ঈশ্বরবাদিদিগের মতে অসম্ভব বস্তুকে ভিত্তি করিয়া উদ্ভূত হওয়ায় নিরর্থক, নিরর্থক প্রশ্নের উত্তর ও অনাবশ্যক। এইরূপে দার্শনিকগণ এ সকল প্রশ্নের পরিহার করিয়া থাকেন। এই সকল প্রশ্নের উদ্ভবের ফলে পরিশেষে একটি জিজ্ঞাস্য থাকিয়া যায় "ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তা বস্তুটি কি? উত্তরে বলিব যতগুলি শক্তি জগতে আছে সেই সমুদায় শক্তি ঈশ্বরের, ইহাই ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তা। যে শক্তি কোন স্থলে নাই, সে শক্তি ঈশ্বরের না থাকিলেও তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা ব্যাহত হয় না।

অনুবাদ সাহিত্য



গোলাপী মুক্তা

(স্পানিশ গল্প : লেখক : এমিলিয়া পার্দো বাজান)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

আমার এক বন্ধু···বেচারী···আমাকে এ কাহিনী বললেন—

তিনি বললেন, দুনিয়ায় কোনো-কিছুর দিকে না তাকিয়ে দিন-রাত পরিশ্রম করে শুধু টাকা রোজগার··· নিমেষের বিশ্রাম নয়! নিজের খাওয়া-পরার দিকে লক্ষ্য নেই! যে-টাকা রোজগার করি, তাতে স্ত্রীর সব কামনা চরিতার্থ করে যে আনন্দ···সে-আনন্দে দুঃখ-কষ্ট লাগে না দেহে-মনে! স্ত্রী চায় আকাশের চাঁদ···পাওয়া সম্ভব নয়, স্ত্রী জানে···তবু আমি সেই আকাশের চাঁদ পেড়ে দিতে উঁচু পাহাড়ে উঠতে চলেছি···জানো, স্ত্রীকে খুশী করতে এমনি ভাবেই আমি নিত্য কিছু না কিছু উপহার! এমন উপহার ···আমাদের মতো অবস্থার মানুষ যা কল্পনা করতে পারে না। উপহার পেয়ে স্ত্রীর চোখে বিমুগ্ধ বিবশ চাহনি···কণ্ঠে গদ্গদ ভাষা···তার দুখানি হাত ধরে তাকে বুকে টেনে নিয়ে···আমার মনে হতো দুনিয়ায় আমার মতো এমন ভাগ্য কার?

জুয়েলারির উপরই স্ত্রীর মায়া বেশী। লুশিলা বলতো— আমার এত ভালো লাগে! এই জুয়েলারি···সত্যি, কি করে তুমি আমার মনের কথা জানতে পারো! তার অধরে চুমুর পর চুমু দিয়ে আমি জবাব দিতুম—তোমার মন আমি বুঝবো না তো কে বুঝবে, লুশিলা? তোমার আমার মন যে এক!

জুয়েলার একদিন দেখালো দুটি গোলাপী মুক্তা··· বললে—এ জিনিষ দুনিয়ায় বড় পাওয়া যায় না! আপনার জন্য রেখেছি···স্যর।

সিন্দুক খুলে জুয়েলার দেখালো সেই গোলাপী মুক্তা। অপূর্ব! এক কাউন্টেশের জিনিষ··· তাঁর টাকার দরকার··· তিনি বেচতে দিয়ে গেছেন। মুক্তাজোড়া। দেখতে দেখতে ভেসে উঠলো স্ত্রীর কিশোর মুখ! এ মুক্তা পেলে তার যে আনন্দ হবে···আমাকে আদরে-সোহাগে লুশিলা···

জিজ্ঞাসা করলুম—অনেক দাম? আমার সামর্থ্যে কুলোবে কি?

জুয়েলার বললে—দাম বেশী···তবে কি জানেন, একটা সম্পত্তি। ধার করেও কেনেন যদি—মানে, যখনি বেচতে যান···রাজার ঐশ্বর্য্য পাবেন।

অনেক দাম···আমার সামর্থ্য নেই! অথচ এমন মুক্তা··· ছাড়তে পারি না!···দোকানে দাঁড়িয়ে ভাবছি···কি করে··· হঠাৎ দোকানের বড় কাঁচের সার্শির ভিতর দিয়ে দেখি, পথে চলেছে আমার বন্ধু গঞ্জালো লায়োরেন—আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু—যেমন ধনী, তেমনি সৌখীন। বেরিয়ে গিয়ে তাকে ডেকে আনলুম। মুক্তা দুটো দেখালুম। দেখে সুখ্যাতিতে সে একেবারে পঞ্চমুখ! বললে—এমন জিনিষ দেখা যায় না হে! এ মুক্তার ইয়ারিং···তোমার স্ত্রী যেমন রূপসী···খাশা মানাবে।

আমি বললুম—তা তো বুঝছি! কিন্তু ভয়ানক দাম। ছাপোষা মানুষ, এত দাম দেবো কোথা থেকে?

গঞ্জোলা বললে—তোমার যখন এত পছন্দ—নাও··· দাম আমি দিচ্ছি। ধীরে ধীরে শোধ করো।

জুয়েলার তাল বুঝে বললে—একটা সম্পত্তি! যখনই বেচতে যাবেন, এর ডবল দাম পাবেন নিশ্চয়।

গঞ্জোলা তার পকেট-বুক বার করলো—দিলে মুক্তার দাম। আমার কাছেও কিছু টাকা ছিল—গঞ্জোলাকে বললুম

—এটা তুমি রাখো···বাকি টাকা আমি মাসে মাসে কিছু কিছু করে দিয়ে শোধ করবো।

হেসে গঞ্জোলা বললে—বেশ, বেশ তার জন্য ব্যস্ত হবার দরকার নেই।

আনন্দ···কৃতজ্ঞতা—গঞ্জোলাকে নিমন্ত্রণ করলুম—বললুম কাল রবিবার এসো আমার ওখানে—খাওয়া-দাওয়া গল্প-স্বল্প করবো···কেমন?

হেসে গঞ্জোলা বললে—বেশ।

তারপর আমি বাড়ী ফিরলুম—যেন পাখীর মতো বাতাসে উড়ে! লুশিলা ড্রয়িংরুমের আসবাবপত্র ঝাড়া-মোছা করছিল—আমার দিকে তাকালো। আমি বললুম—আমি চোখ বুজে দাঁড়াচ্ছি···তুমি আমার পকেট তালাশ করো—কোনো জিনিষ পাও কি না,—ছাখো···

এ কথায় হাতের ঝাড়ন ফেলে লুশিলা ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার গায়ে···তারপর পকেট হাতড়ে বার করলো কেসে-ভরা সেই গোলাপী মুক্তার জুড়ি। কেস খুলে মুক্তা দেখে সে আমার গলা ধরে ঝুলে পড়লো—তারপর আমাকে সোফায় ফেলে জড়িয়ে ধরে চুমুতে-চুমুতে···

আমার নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে যাবে! তবু···এ সোহাগ আদর···কজন স্বামীর ভাগ্যে জোটে? লুশিলা বার-বার চুমু খায় আর বলে—তুমি···তুমি···সত্যি আমার কত ভাগ্য···এমন স্বামী কে পায়! তুমি···তুমি···তুমি···

চুমোর বর্ষণে তার মুখের কথা মিলিয়ে যায়। বললুম—এত টাকা কাছে ছিল না—বন্ধু গঞ্জালো পথে যাচ্ছিল—ভাগ্যে তাকে পেলুম! সে দিলে টাকা। অনেক টাকা। মাসে মাসে তাকে কিছু কিছু করে দিয়ে শোধ করবো। আর তাকে নিমন্ত্রণ করেছি···কাল রবিবার···এখানে এসে দুপুরবেলা লাঞ্চ খাবে।

সেদিনটা লুশিলা আমাকে ছাড়তে চায় না! উঠতে বসতে চলতে ফিরতে কী আদর···কী সোহাগ!

পরের দিন গঞ্জালো এলো। আমরা কি খুশী হলুম! লুশিলা সাজসজ্জা যা করেছিল! সবচেয়ে ভালো পোষাক পরে···গ্রে রঙের সিল্কের পোষাক···এ রঙে তাকে দেখায় অপরূপ! কানে সেই গোলাপী মুক্তার ইয়ারিং···পোষাকের রঙে, মুক্তার রঙে আর লুশিলার গায়ের রঙে এমন মানিয়ে ছিল তাকে, যে তার দিক থেকে চোখ ফেরানো যায় না! আমার নিত্য দেখা লুশিলা! আমার স্ত্রী—তবু তাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছিল!

খাওয়া-দাওয়া হাসি-গল্প হলো। তারপর গঞ্জালো এনেছিল থিয়েটারের টিকিট—ম্যাটিনী, তিনজনে থিয়েটারে গেলুম। সেদিনটা বেশ ভালোই কাটলো।

পরের দিন সোমবার···আমার চাকরি···ওভার-টাইম কাজ সুরু করলুম। মুক্তার জুড়ির দাম—সে দেনা শোধ করতে হবে।···কাজ করলুম রাত আটটা পর্য্যন্ত···একটানা ··বাড়ী ফিরলুম ডিনারের সময়। দেখি, লুশিলা বেশে-ভূষায় অপরূপ! কানে সেই লাল মুক্তার ইয়ারিং···আঙুলে আংটি···হঠাৎ দেখি, একটা ইয়ারিং কৈ? সে লাল মুক্তা কৈ?—নেই তো!

আমি বলে উঠলুম—একটা মুক্তা হারিয়েছো! এঁ্যা!

—না—না, একি তামাসা। বলে লুশিলা হাত দিলে তার ইয়ারিংয়ে—দেখলে তো তামাসা নয়! মুক্তা নেই, সত্য··তখন তার মুখ চকিতে সাদা। তারপর আর্ত্তনাদ। তার মূর্ত্তি যা হলো, দেখে···মুক্তার জন্য কোনো চিন্তা নয়···আমার চিন্তা—লুশিলা হার্টফেল হবে না তো?···উঠে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলুম···বললুম—কোথায় যাবে? কোনো ঘরেই হয় তো···এখনি খুঁজছি। খুঁজলেই পাবো। বাড়ী থেকে জিনিয উড়ে যেতে পারে না তো!

দুজনে কি খোঁজাই খুঁজলুম! মুক্তা পাওয়া গেল না। ঘরের মেঝে, কোণ, খাট-বিছানা, পর্দ্দার ভাঁজ খুলে সন্ধান ···কার্পেট তুললুম, র‍্যাগ··বাক্স আলমারি ড্রয়ার—যে সব বন্ধ আলমারি তিন-চার মাস লুশিলা খোলে নি—সেগুলো খুলে খোঁজ করলুম, মুক্তা পাওয়া গেল না। লুশিলা সোফায় লুটিয়ে পড়ে চোখে জলের ঝর্ণা খুলে দিলে! আমি বললুম—কোথাও বেরিয়েছিলে আজ?

—হাঁ, হাঁ, বেরিয়েছিলুম।

—কোথায় গিয়েছিলে?

—অনেক জায়গায়···কত কি কিনতে গিয়েছিলুম।

—কোন্ কোন্ দোকানে গিয়েছিলে?

—তা সব মনে পড়ছে না তো, ও—হাঁ, পোষ্ট-অফিসে গিয়েছিলুম।··তারপর ঐ রাস্তাতেই আরো ক-জায়গায়—

পর্দার কাপড় বেচে—সে দোকানে···তারপর প্যারেডে···হ্যাঁ···তারপর···

আমি বললুম—হেঁটে গিয়েছিলে? না, গাড়ীতে? না বাসে?

—প্রথমে হেঁটে। তারপর একখানা গাড়ী ভাড়া করেছিলুম।

—কোন্‌খানে গাড়ী ভাড়া করেছিলে? গাড়ীর নম্বর?

—নম্বর দেখি নি তো! কেন দেখবো? কখনো দেখি না। খালি-গাড়ী চলে যাচ্ছিল—ডেকে তাতে উঠি। হেঁটে তখন বড্ড ক্লান্ত হয়েছিলুম···

এই পর্য্যন্ত বলে কেঁদে লুশিলা লুটিয়ে পড়লো। কি সে কান্না! আমার ভয় হলো, এমন কান্না কাঁদলে বাঁচবে কি করে? বেচারী!

আমি বললুম—কেঁদো না। কাঁদলে জিনিষ পাওয়া যাবে না। ঠাণ্ডা হও···বেশ করে মনে করো, কোন কোন দোকানে গিয়েছিলে···আমি সব দোকানের নাম লিখে নিচ্ছি—তার প্রত্যেকটাতে গিয়ে সন্ধান নেবো। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেবো···যে খুঁজে এনে দেবে, তাকে পাঁচশো টাকা রিওয়ার্ড দেবো।

কাঁদতে কাঁদতে লুশিলা বললে—ওগো না, না, আমার কিছু মনে পড়ছে না! আমার কিছু মনে আসছে না! আমার মাথা যেন খালি হয়ে যাচ্ছে···চোখে···চোখে···আমি···আমি···

কান্নার বেগে লুশিলার কথা শেষ হলো না।

সে রাত্রি আমাদের যে কি করে কাটলো···আমার চোখে ঘুম এলো না···লুশিলা বিছানায় শুয়ে আছে···তার দু'চোখে যেন নায়েগ্রার জল ঝরছে! এক তিল বিরাম নেই! সেই সঙ্গে কান্নার অস্ফুট রোল···তার দিকে হতাশ নয়নে চেয়ে আমার রাত্রি কাটলো।

কাঁদতে কাঁদতে ভোরের দিকে লুশিলা একটু ঘুমিয়ে পড়লো! আমি তখনি উঠলুম···মুখ-হাত ধুয়ে পোষাক পরে তখনি ছুটলুম বন্ধু গঙ্গোলার কাছে! বড়মানুষ লোক—তার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করতে। পুলিশে গিয়ে জানালে পুলিশ সন্ধান করবে জানি, তবু গঙ্গোলার কাছে গেলুম তার কারণ, আমরা সাধারণ গৃহস্থ মানুষ···আমাদের কথায় পুলিশ তেমন গা করবে না হয়তো··গঙ্গোলা বড়-মানুষ লোক—তার প্রতিপত্তি আছে সহরে···সে বলে দিলে পুলিশ কোমর বেঁধে সন্ধানে লেগে যাবে!

গঙ্গোলার বাড়ীতে এলুম। তার খাশ ভৃত্য বললে—মনিব এখনো ঘুমোচ্ছেন···আপনি বসবার ঘরে এসে বসুন ·· আমি গিয়ে তাঁকে খবর দিই আপনি এসেছেন।

আমি এলুম বসবার ঘরে! সার্শি-খড়খড়ি-বন্ধ ঘরে সেন্টের সুরভি···সিগারেটের গন্ধ। চাকর সার্শি-খড়খড়ি খুলতে লাগলো—সার্শি খোলার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে আলোর প্রথম রশ্মি···সে আলোয় আমি দেখি কৌচে ভালুকের চামড়ার ব্যাগ, আর সেই ব্যাগে কি যেন ঝিক্‌ঝিক্‌ করছে! তুলে দেখি একটি গোলাপী মুক্তা! চাকরটা তখন সার্শি খড়খড়ি খুলছে···

মুক্তাটা আমি পকেটে ফেললুম। মনের মধ্যে যা হলো··· তুমি হলে তখনি তলোয়ার বাগিয়ে ঐ বন্ধুর শোবার ঘরে ঢুকে তখনি সে তলোয়ার তার বুকে ··যেন তার ও ঘুম আর না ভাঙ্গে!

কিন্তু আমি তা করলুম না। আমি কি করলুম—শুনবে? · মুক্তাটা পকেটে ফেলে চাকরকে বললুম—থাক আর এক সময়ে আসবো—তোমার মনিবকে বলো।

এ কথা বলে তখনি ফিরলুম গঙ্গোলার বাড়ী থেকে··· বেরিয়ে একেবারে নিজের বাড়ীতে।

স্ত্রী বিছানা থেকে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাজ-গোজ করছিল···কালকের সেই মলিন ম্লান মূর্ত্তি···নিঃশব্দে তার পিছনে দাঁড়ালুম। তাকে বললুম—এই তোমার গোলাপী মুক্তা···পেতে দেরী হয় নি। যেখানে তুমি ফেলে এসেছিলে, সেখানে যেতেই পেয়েছি!

মুক্তাটা দিলুম তার হাতে। স্ত্রীর দুচোখে বিস্ময়! তার কেমন হতভম্ব ভাব!

সঙ্গে সঙ্গে আমার সর্ব্বাঙ্গ জলে উঠলো! ঝাঁপিয়ে তার উপরে পড়লুম···পড়েই দু-কান থেকে ইয়ারিং দুটো টেনে ছিঁড়ে নিলুম! দু-কানে ঝরঝর করে রক্ত ঝরে পড়লো···ইয়ারিং দুটো মেঝেয় ফেলে দু-পায়ে পিষে গুঁড়ো করে ফেললুম! তার পর আর এক মিনিট বাড়ীতে নয়, বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম।···

এর পর লুশিলাকে আর কখনো দেখেছি কিনা, জিজ্ঞাসা করছো। দেখেছি একটিবার—একটা পুরুষের কাঁধ ধরে সে নাচছিল—না, গঙ্গোলা নয়···আর একটা লোক। আমি দেখলুম তার দু-কানের ডগা—দুটোতেই কাটা দাগ। বুঝলুম, আমার হাতের মার্কা···কান থেকে সেই ইয়ারিং দুটো···

প্রতিভা-পরিচিতি

চিত্রশিল্পী রাফেল

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ইতালীর জগদ্বিখ্যাত চিত্রশিল্পী রাফেল যখন খ্যাতির প্রথম সোপানে আরোহণ করছেন তখন তাঁর দেশে দুই অসাধারণ প্রতিভাধর শিল্পী যশ ও প্রতিপত্তির সর্ব্বোচ্চ শিখরে উপনীত হয়েছেন। এক দিকে অসামান্য শক্তিসম্পন্ন বহুমুখী প্রতিভাশালী শিল্পী ও বৈজ্ঞানিক লিওনার্দো দা ভিঞ্চি ; অপর দিকে অতুলনীয় ভাস্কর্য্য-শিল্পী মাইকেলএঞ্জেলো। এই দুই বিরাট শক্তিধর শিল্পীর মাঝখান দিয়ে নিজের পথ রচনা করা, সুনাম অর্জ্জন করা এবং তাঁদের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে নিজের স্বতন্ত্র প্রতিভার স্ফুরণের দ্বারা দেশবাসীর চিত্ত জয় করা বড় সহজ কথা ছিল না। সেদিন থেকে চিত্রশিল্পী রাফেল অসাধ্য সাধন করেছেন বললেও অতিশয়োক্তি হবে না।



শিল্পীর যৌবনের প্রতিকৃতি

রাফেল সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "The most ideal artist that God has ever created!" তাঁর ছবিগুলি শুধু যে জীবন্ত দেখাতো তাই নয়, তাদের মধ্যে দর্শক এমন একটি স্বর্গীয় সুষমা এবং ঐশীভাবের সন্ধান পেতো যার জন্যে তারা রাফেলের ছবির সামনে তন্ময়-চিত্তে দাঁড়িয়ে থাকতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা আহার নিদ্রা ভুলে।

তাঁর এক-একখানি ছবি এমনই প্রাণরসপুষ্ট ছিল যে, হঠাৎ দেখলে মনে হত যেন তারা চলাফেরা করছে, এখনি কথা বলবে! কথিত আছে, পোপ দশম লিওর একখানি পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন রাফেল। ছবিখানি পোপের খাসকামরার দেওয়ালে দাঁড় করানো ছিল। পোপের একজন সেক্রেটারী পরদা ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে সামনে ছবিখানি দেখে প্রথমে বুঝতেই পারেন নি যে সেখানি একটি ছবি মাত্র। তিনি মনে করলেন, তাঁর মনিব বুঝি সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাড়াতাড়ি মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানিয়ে সেক্রেটারী তাঁর



রাফেল অঙ্কিত ম্যাডোনা

হাতের কাগজ-পত্রগুলি এগিয়ে দিলেন। হাত যখন প্রসারিত হল না, মূর্ত্তি যখন নিশ্চল হয়ে রইল, তখন সেক্রেটারীর চমক ভাংলো।

*　　　*　　　*

১[illegible]লের ৬ই এপ্রিল মধ্য-ইতালীর আর্বিনো নামক পার্বত্য-নগরে [illegible]লের জন্ম। তাঁর পিতা জিওভ্যানি চিত্রকর ও শিল্পী হিসাবে বেশ নাম করেছিলেন। বহু গির্জ্জায় বেদী-চিত্র আঁকবার ফরমাস তিনি পেতেন। পিতার কাছেই রাফেলের প্রথম শিক্ষা।

অবস্থা স্বচ্ছল ছিল। কাজেই সুযোগ সুবিধার অভাব ঘটে নি, এবং সেই সুযোগ সুবিধার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন র‍্যাফেল।

যৌবনারম্ভেই অর্থ ও যশ পেয়েছিলেন প্রচুর। কিন্তু যশের মোহ বা অর্থের অহমিকা তাঁর স্বভাবকে কোনদিন বিকৃত করতে পারে নি। ভদ্রতা, নম্রতা, বিনয়, শালীনতা, বন্ধুবাৎসল্য—এই সব গুণের পরাকাষ্ঠা দেখা গেছে তাঁর জীবনে। যেমন সুন্দর শান্ত চেহারা তেমনি মধুর অমায়িক আচরণ, একবার যে তার সংস্পর্শে এসেছে সে-ই মোহিত হয়েছে। লোকের মুখে মুখে ফিরছে তাঁর নাম। "অমন মানুষ আর হয় না।"—বলেছে তাঁর দেশের লোক সবাই একবাক্যে।

* * *

আট বছর বয়সে র‍্যাফেল তাঁর মাকে হারালেন। পিতা দ্বিতীয়বার



আলেকজান্দ্রিয়ার সেন্ট ক্যাথারিণের চিত্র। ১৫০৭ সালে আঁকা

বিবাহ করলেন। বিমাতা ঘরে এসে সপত্নীপুত্রকে সুনজরে দেখলেন না। জিওভ্যানি অবশ্য পুত্রকে খুবই ভালবাসতেন। র‍্যাফেল দিনের বেশীর ভাগ সময় পিতার চিত্রশালায় অতিবাহিত করতেন। শিশুকাল থেকে ছবি আঁকবার প্রতি তাঁর অদম্য কৌতূহল আর ঝোঁক ছিল। পিতার চিত্রশালায় ব'সে দশ বারো বছরের ছেলে র‍্যাফেল যে-সব ছবি আঁকলেন তাদের দেখে তাঁর পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়েরা অবাক হ'য়ে গেলেন। জানা গেছে, কিশোর র‍্যাফেল তার পিতার কাজে অনেক সাহায্য করেছেন এবং অনেকগুলি ছবি পিতার নামে নিজেই অঙ্কিত করেছেন।

এগারো বছর বয়সে স্নেহময় পিতাও অকস্মাৎ ইহলোক ত্যাগ করলেন। অকূল পাথার। চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার। সমস্ত ভবিষ্যৎ বুঝি নষ্ট হল। পিতা উইল ক'রে তাঁর এক ভাইকে র‍্যাফেলের অভিভাবক নিযুক্ত ক'রে গিছলেন। কিন্তু র‍্যাফেল তাঁর সেই খুল্লতাত বা বিমাতা কারুর কাছেই স্নেহ বা সুবিচার পেলেন না। তাঁরা তাঁকে ফাঁকী দিয়ে তাঁর বিষয়-সম্পত্তির প্রতি লুব্ধ হলেন। সেই ঘোর দুর্দিনে র‍্যাফেলকে উদ্ধার করলেন তাঁর মামা। নিজের বাসায় নিয়ে গিয়ে তিনি র‍্যাফেলকে নিজের ছেলের মতো মানুষ করতে লাগলেন। স্নেহ দিয়ে মমতা দিয়ে তিনি তাঁর সমস্ত শোক অপনোদন করলেন। তারপর তাঁকে এক বিখ্যাত শিল্পীর কাছে শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। সেই শিল্পীর নাম পেরুজিনো। তখনকার দিনে তাঁর নামডাক বড় কম



জননী

ছিল না। তাঁর কয়েকখানা ছবি আজও বিদ্যমান আছে। পেরুজিনোর স্কুলে ভর্তি হয়ে র‍্যাফেল পরম উৎসাহে চিত্রাঙ্কন বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জ্জন করতে লাগলেন ঃ

মিষ্ট সুন্দর চেহারা, মিষ্ট নম্র ব্যবহার, মুখে হাসিটি লেগেই আছে। এ হেন তরুণের প্রতি সহজেই অন্যান্য সতীর্থরা আকৃষ্ট হল। তারপর তাঁর আঁকবার হাত! সে-হাত যেন যাদুবিদ্যা জানে। তুলির টানে মনের ভাবকে যে এমন করে ফুটিয়ে তোলা যায় তা আগে কে জানতো। শুধু সহপাঠীরা নয়, স্বয়ং শিক্ষক পর্য্যন্ত র‍্যাফেলের অনন্যসাধারণ ক্ষমতা দেখে বিস্মিত হলেন।

চারিদিকে প্রশংসার রব উঠ্‌ল। তরুণ শিল্পী অত্যন্ত লজ্জা এবং

বিনয়ের সঙ্গে সেই প্রশংসা গ্রহণ করলেন। বললেন, তাঁর যা-কিছু পারদর্শিতা তা শিক্ষকের গুণে আর সহপাঠীদের উৎসাহের ফলে ; তাঁর সতীর্থরা সকলেই খুব ভাল শিল্পী এবং তিনি তাদের মধ্যেই একজন।

এমনিই ছিল রাফেলের চরিত্র আর মন! কখনো কোন অবস্থাতেই লেশমাত্র আত্মগরিমার আভাস দেন নি তাঁর বাক্যে বা ব্যবহারে। সেই কারণে তাঁর লোকপ্রিয়তাও ছিল অসামান্য।

সতেরো বছর বয়সে রাফেল অনেকগুলি ছবি আঁকবার নিজস্ব অর্ডার পেলেন। ইতিমধ্যে তাঁর একাধিক পৃষ্ঠপোষক তাঁকে উৎসাহ দিয়ে অর্থ দিয়ে তাঁর কাছ থেকে ছবি আঁকিয়ে নিয়েছিলেন। সেই সব ছবি চিত্ররসিক সমাজে তুমুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল।

একুশ বছর বয়সে তিনি পেরুজিনোর ষ্টুডিও থেকে বেরিয়ে এসে নিজের পৃথক চিত্রশালা প্রতিষ্ঠিত করলেন। চারিদিকে তখন তাঁর নাম। ১৫০৪ সালে অঙ্কিত হয় তাঁর প্রথম বিখ্যাত ছবি—"মেরী মাতার বিবাহ।" সে-ছবি এখন মিলানের চিত্রশালায় আছে। রাফেলের সময়ে ধর্ম্মমন্দিরের বেদীর উপর, দেওয়ালের গায়ে এবং সিলিং এর ধারে ধারে নানা ধর্ম্মমূলক চিত্র আঁকবার বিশেষ রেওয়াজ ছিল। সন্ন্যাসীসম্প্রদায়, ধর্ম্মযাজক, ধর্ম্মনিষ্ঠ ধনী এবং ব্যবসায়ীরা তাঁদের ধর্ম্ম-মন্দিরগুলিকে অলঙ্কৃত করবার জন্যে অকাতরে অর্থব্যয় করতেন। সেই সব ছবির অনেক ফরমাস পেতে লাগলেন রাফেল।

কিছুদিন পরে তিনি বহুদূরবর্ত্তী নগরান্তরে গিয়ে তখনকার দিনের বিরাট প্রতিভাধর শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চির সঙ্গে দেখা করলেন। মাইকেলএঞ্জেলোর সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ হল। দা ভিঞ্চি ছিলেন উদার এবং উন্নতমনা। রাফেলের মধ্যে অসামান্য প্রতিভার সুস্পষ্ট পরিচয় লাভ করে তিনি মহা খুশী হোয়ে তাঁকে উৎসাহিত করলেন। মাইকেলএঞ্জেলো ছিলেন আত্মগর্ব্বী ও সংকীর্ণচিত্ত। মুখ বেঁকিয়ে বললেন—"পটুয়া ধরণের আঁকা ছবিগুলো মন্দ নয়। রাফেল ছোকরার তুলি মিষ্টি বটে।"

ফ্লোরেন্স শহরে ব'সে রাফেল যে-সব ম্যাডোনার ছবিগুলি আঁকলেন, মাতৃ-মুখের স্নেহ-করুণার অপরূপ অভিব্যঞ্জনায় সেগুলি আজো জগতের শ্রেষ্ঠ মাতৃবন্দনার চিত্ররূপে স্বীকৃত। সে-সব ছবিগুলি তাঁর দেশবাসীর কাছে এমনি জনপ্রিয় হোয়েছিল যে বহু ঘরে তাদের রীতিমতো পূজা-অর্চনা হোতে দেখা গিয়েছিল।

* * *

সেই সময় রোম নগরীতে ছিল এক বিচিত্র-চরিত্র বৃদ্ধ পণ্ডিত, তাঁর নাম ছিল ফেরিয়াস্। বিদ্বান হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল দেশ জোড়া। কিন্তু বড় অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ ছিলেন ফেরিয়াস্। কখনো কোন কাজে কারুর কাছে অর্থ গ্রহণ করেন নি। সারা জীবন অধ্যাপনা করেছিলেন বিনা পারিশ্রমিকে। ফলে শেষ বয়সে ভীষণ দারিদ্র্যদশায় পড়েছিলেন। পোপ তাঁকে মাসোহারা দিতেন। কিন্তু সে-টাকাও তিনি বন্ধুদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন। দু'বেলা আহার্য্য ছিল শাক-সব্জি আর লেটুস্-পাতা। এমনি করে আশী বৎসর বয়সের পর তিনি রীতিমতো অথর্ব্ব হ'য়ে পড়লেন। তাঁর সম্বন্ধে পোপের সেক্রেটারী তাঁর এক বন্ধুকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেই পত্রের মধ্যে কথাপ্রসঙ্গে রাফেলের মহান চরিত্রের একটি মনোমুগ্ধকর চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। পোপের সেক্রেটারী লিখেছেন—



মৃত্যুশয্যায় রাফেল

"আধপাগলা বুড়ো পণ্ডিত ফেরিয়াসের কথা শুনেছো নিশ্চয়ই। বর্ত্তমানে তাঁর আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। এক জীর্ণ গৃহে স্তূপাকার বইএর মাঝখানে শয্যাশায়ী হয়ে আছেন তিনি। শাক-পাতার রস খেয়ে কয়দিন আর জীবনধারণ করবেন তা বলা শক্ত। তাঁকে দেখাশোনা করছেন বিখ্যাত শিল্পী রাফেল। মাতৃহীন ছোট ছেলেকে বাপ যেমন স্নেহে করুণায় লালন করেন তেমনি যত্নে রাফেল এই বৃদ্ধের তদারক করেন, নিজের হাতে তাঁকে খাইয়ে দেন, স্নান করিয়ে দেন এবং তাঁর সর্ব্ববিধ কাজ করে দেন। রাফেল বলেন, ফেরিয়াসের মতো একজন পণ্ডিত দেশের গৌরব এবং তাঁর সেবা করায় পুণ্য আছে। রাফেল এখন সহরের একজন শ্রেষ্ঠ ধনী এবং গণ্যমান্য নাগরিক। স্বয়ং পোপ তাঁকে বিশেষ সম্মান করেন, বহু অনুষ্ঠানে তাঁর আহ্বান আসে। কিন্তু ফেরিয়াসের সর্ব্ব কাজ করবার পর যদি তিনি সময় পান তবেই সাধারণ সভা অনুষ্ঠানে যোগ দেন।...দেশবাসীর কাছে

রাফেল একজন পূজনীয় ব্যক্তি। তাঁর আশ্চর্য্য ক্ষমতা। তিনি ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারী। তাঁর এক-একখানা ছবি আঁকা শেষ হয়, আর দেশের লোক কাতারে কাতারে সেই ছবি দেখবার জন্যে তাঁর ষ্টুডিওর সামনে ভীড় জমায়। সেই ভীড়ের মধ্যে দেখা যায় সম্রাটের প্রতিনিধিকে, দেখা যায় স্বয়ং পোপকে, আর দেখা যায় সকল শ্রেণীর অগণিত নর-নারীকে। তারা নিয়ে আসে নৈবেদ্য, আনে পূজা-উপচার, ছবির পাদমূলে সেগুলি রেখে তারা প্রণাম জানিয়ে চলে যায়। তারা বলে, রাফেল হচ্ছেন ঈশ্বর-প্রেরিত ব্যক্তি, এই প্রাচীন নগরীর মহৎ মর্য্যাদাকে যিনি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যেই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন।

* * * * *

রাফেলের উপচীকীর্ষু অন্তরের যে-পরিচয় উপরি-উক্ত পত্রে ফুটে উঠেছে তার প্রকাশ বহুবার এবং বহু ক্ষেত্রে তাঁর জীবনে দেখা গেছে। তাঁর কাছে যারা ছবি আঁকা শিখতে আসতো তাদের ভবিষ্যত সম্বন্ধে তিনি নিরন্তর চিন্তা করতেন, সুযোগ পেলেই তাদের কাজে লাগিয়ে দিতেন, টাকা পাইয়ে দিতেন। অর্ডার সংগ্রহ করবার কাজে সহায়তা করতেন। বহুবার এমন দেখা গেছে যে নিজের জন্যে সংগৃহীত ফরমাস তিনি ছাত্রদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছেন—যাতে তারা ছবিগুলি এঁকে টাকা পেয়ে উৎসাহিত বোধ করে।

চিত্রশিল্পের মহাসাধক ছিলেন রাফেল। তপস্বী যেমন ক'রে সাধনায় উপবেশন করেন তেমনি অনন্যচিত্তে তিনি তুলি আর রং নিয়ে বসতেন। ছবি আঁকার কাজ যখন চল্‌ত তখন তাঁর বাহ্যজ্ঞান যেন লুপ্ত হ'ত। বাইরের শত কোলাহলেও তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হ'ত না। এ-সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী বলা যেতে পারে।

ফ্লোরেন্স নগরে নব-নির্ম্মিত ষ্টুডিওয় বসে একদা তিনি একটি ম্যাডোনার ছবি আঁকছিলেন। রেখায় রেখায় ফুটে উঠ্‌ছে মায়ের মুখের উপর করুণ কোমল অনৈসর্গিক লাবণ্যের ছায়া। ধ্যানমগ্ন চিত্তে তুলি টানছেন রাফেল, প্রতিমার গায়ে যেন চামর বীজন করছেন। ষ্টুডিওর মধ্যে সেদিন তিনি ছিলেন একাকী। চারিদিক নিঝুম নিস্তব্ধ।

এদিকে ষ্টুডিওর বাইরে এক উত্তেজিত জনতার সমাবেশ হয়েছে। রাফেলের এক শত্রু গুজব রটিয়ে দিয়েছিল যে রাফেল ফ্লোরেন্সবাসীদের ঘৃণা করেন, তিনি তাদের পরম শত্রু এবং তাদের সর্ব্বনাশ করবার জন্যে কৃতসংকল্প। সেই সঙ্গে টাকা দিয়ে দু'চারজন ভাড়াটে গুণ্ডাকেও লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। জনতাকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে ছোরা উঁচিয়ে গুণ্ডার দল সমবেত হয়েছিল রাফেলের শিল্পকলার সম্মুখে। তাদের চোখে খুন নাচছে।

শিল্পকলার দ্বার ছিল অবারিত। চুপি চুপি তারা ঢুকলো ভিতরে। নিঃশব্দে কাজ হাঁসিল ক'রে চুপিসাড়ে সরে পড়তে হবে, এই ছিল দুর্বৃত্তদের মতলব। রাফেল তাদের আগমন বার্ত্তা জানতে পারলেন না। অন্তরের সকল একাগ্রতা, সমস্ত নিষ্ঠা একত্রিত করে মায়ের মুখের উপর তুলির শেষ টান দিচ্ছেন তিনি। করুণায় ভরা দু'চোখ মেলে মা দেখছেন তাঁর কোলের শিশুকে, জননী জগদ্ধাত্রী যেন বিশ্বের সকল সন্তানের প্রতি তাঁর আশীর্ব্বাদ আর কল্যাণ-কামনা বর্ষণ করেছেন।

নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে দুর্বৃত্তের দল। একাধিক হাত উদ্যত হয়েছে শিল্পীর মাথার উপরে। এইবার বুঝি তারা তাঁকে টেনে নামাবে চেয়ার থেকে মাটিতে।.........এমনি সময়ে তাদের দৃষ্টি পড়ল সেই ছবির প্রতি! সঙ্গে সঙ্গে তারা অভিভূত নিস্পন্দ হল। অবশ হল তাদের হাত। নিমেষে নিস্তেজ হল তাদের ক্রোধান্ধ প্রবৃত্তি। এ কী দেখছে তারা চোখের সামনে! এ কী স্বর্গীয় দ্যুতি! পূত-পুণ্য পবিত্রতার এ কী পরম প্রকাশ!

ধ্যান ভাঙ্‌লো রাফেলের। ফিরে তাকালেন তিনি। ঘরের মধ্যে জনতার সমাবেশ দেখে খুসীতে ভরে উঠ্‌লো তাঁর দুই চোখ। ছবি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা এসেছে তাদের মাকে দেখতে! তাদের আগ্রহকে সাধুবাদ দিলেন তিনি। সমাদর ক'রে তাদের বসালেন।



আর একটি জননী মূর্ত্তি

বুঝিয়ে দিলেন, ছবির অর্থ, তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য। শেষ পর্য্যন্ত, যারা তাঁকে সংহার করতে এসেছিল তারা তাঁর জয়ধ্বনি করতে করতে ফিরে গেল!

* * * * *

১৫১৪ সালে রাফেল রোমের সেন্ট পিটার্স নামক বিখ্যাত গির্জ্জার স্থপতি নিযুক্ত হলেন। পুরাতন ধর্ম্মমন্দিরগুলির সংরক্ষণ ও সংস্কার-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করলেন তিনি। দেশের নষ্ট গৌরবকে পুনঃ সংস্থাপন ক'রে দেশবাসীকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে হবে, এই হল তাঁর নূতন ব্রত। স্নানাহার ভুলে নূতন কাজে ব্যাপৃত রইলেন। দূর দূরান্তর ভ্রমণ করতে লাগলেন! যেমনি সংবাদ পাচ্ছেন যে অমুক স্থানে একটি কারুশিল্পমণ্ডিত পুরাতন গির্জ্জা ভগ্নপ্রায় হ'য়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে অমনি রওনা হচ্ছেন সেই স্থান অভিমুখে, হোক না পথ দুর্গম, নাই বা থাক যানবাহনের কোন ব্যবস্থা। পায়ে হেঁটে বহু যোজন পথ পার হ'তেও ক্লান্তি ছিল না তাঁর।

এমনি এক পথ-পরিক্রমার শেষে জ্বরে শয্যাশায়ী হলেন। উঠ্‌লেন না আর। দিন দিন অবস্থার অবনতি ঘটতে লাগল। সেই সময় তিনি একখানি পরম সুন্দর বেদী-চিত্র আঁকছিলেন, যাকে চিত্র-সমালোচকরা আখ্যা দিয়েছিল—"অলৌকিক ছবি"। সে-ছবি সমাপ্ত হয় নি। ছবির নাম ছিল—"রূপান্তর"।

প্রত্যহ তাঁর শয্যার পাশে নগরের শ্রেষ্ঠ গুণী জ্ঞানী বিদ্বজ্জন ও

রাজপুরুষের সমাবেশ হ'তে লাগল। শেষ দিনে অন্তিম শয্যায় শুয়ে রাফেল তাঁর অসমাপ্ত ছবিখানি একবার দেখবার বাসনা প্রকাশ করলেন। পায়ের কাছে মস্ত বড় ইজেলের উপর পরদা-ঢাকা অবস্থায় ছবিখানি দাঁড় করানো ছিল। ঘরের মধ্যে তাঁর বন্ধু আর গুণগ্রাহীরা উপস্থিত। একজন সেই পরদাটি সরিয়ে ধরলেন। অতৃপ্ত নয়নে রাফেল কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন ছবির পানে। তার পর ধীরে ধীরে তাঁর দুই আয়ত চোখ চিরকালের মতো নিমীলিত হল।

অন্তিম শয্যায় রাফেলের একটী দুষ্প্রাপ্য সুন্দর ছবি এই প্রবন্ধের সঙ্গে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ১৫২০ সালের ৬ই এপ্রিল মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়সে এই মহান শিল্পী পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। তিনি অকৃতদার ছিলেন। শোনা যায় এক ধর্ম্ম-যাজকের কন্যার সঙ্গে একবার তাঁর বিবাহ স্থির হয়েছিল, এমন কি বাকদান পর্য্যন্ত হ'য়ে গিয়েছিল, কিন্তু কেন যে সে বিবাহ সংঘটিত হয় নি, তার সুস্পষ্ট কারণ আজও অজ্ঞাত।

বল্লভপুরের বল্লভজীর কাহিনী

শ্রীঅজিতকুমার ভট্টাচার্য

বাঙলার তীর্থক্ষেত্রে বল্লভপুর আজ একটি সর্বজনবিদিত গ্রাম। হুগলী জেলার শ্রীরামপুর শহরের পূর্ব দিকে অবস্থিত এই তীর্থক্ষেত্রটি আজ বৎসরের একটি বিশেষ সময়ে ধর্মপিপাসু নর-নারীর সমাগমে পূর্ণ হইয়া থাকে। ইহার পিছনে যে অলৌকিক দেবকাহিনী রহিয়াছে, তাহাই বর্তমানে এই স্থানকে তীর্থমাহাত্ম্য দান করিয়াছে। এই স্থানে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউর নামানুসারেই এই স্থানের নাম বল্লভপুর হইয়াছে।

প্রাচীন ঐতিহাসিক পুঁথিপত্রে বল্লভপুরের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না! শ্রীরামপুর ও মাহেশ গ্রামের মধ্যস্থলে আকনা গ্রামের নাম পাওয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে বল্লভজীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পর আকনা গ্রামের অংশবিশেষই বল্লভপুর নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। এই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতার সহিত শ্রীরামপুরের পশ্চিমে অবস্থিত প্রাচীন 'ছত্রপুরী' গ্রামের নাম বিশেষভাবে জড়িত। বর্তমানে এই গ্রাম চাতরা নামে পরিচিত।

প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্বে যশোহর জেলার প্রতাপকাঠি গ্রাম হইতে জনৈক যদুনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়া চাতরায় বসবাস করেন এবং এখানে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্যতম মন্ত্র শিষ্য শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর পণ্ডিতের ভগিনী যমুনা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহের ফলে তাঁহাদের রুদ্ররাম, রমাকান্ত ও লক্ষ্মণ নামে তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু অতি শৈশবেই তাঁহাদের পিতা পরলোকগমন করায়, যমুনা দেবী পুত্রদের লইয়া চাতরায় পিতৃ গৃহে আশ্রয় লন।

কাশীশ্বর পণ্ডিত নবাব সরকারে মজুমদারের কার্য করিয়া অগাধ সম্পত্তি করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতেও তাহার ধর্মপ্রাণতা কিছুমাত্র কমে নাই। বরং এই অর্থসম্পদ তিনি দেবতার কার্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। আপনার ভদ্রাসনে তিনি তাঁহার প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের বিগ্রহ এক বিরাট মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিয়া পরিপূর্ণ নিষ্ঠায় নিজেই তাঁহার নিত্যসেবার ভার গ্রহণ করেন। শান্ত, সংযতাচারী ও নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব ছাড়া আর কেহ যাহাতে তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্তি স্পর্শ করিতে না পারে, সেদিকে তাঁহার কঠোর নির্দেশ ছিল। ইহা উপেক্ষা করিবার শক্তি তাঁহার পরিবারবর্গের মধ্যে কাহারও ছিল না এবং এই নির্দেশই একদিন নির্মম নিয়তির মত রুদ্ররামের জীবনকে ছন্নছাড়া করিয়া দিল।

একদিন কাশীশ্বরকে বিশেষ কার্যে বহুদূরে যাইতে হইয়াছিল। বেলা বাড়িয়াই চলিল, তিনি ফিরিলেন না। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পূজা না-হওয়া পর্যন্ত কেহ জলগ্রহণও করিতে পারিতেছেন না। ক্রমেই সকলে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছেন। অবশেষে পূজার সময় চলিয়া যায় দেখিয়া যমুনা দেবী রুদ্ররামকে বিগ্রহ সেবার আদেশ দেন। কিন্তু রুদ্ররাম ছিলেন শক্তি-উপাসক। তাঁহার পূজায় কাশীশ্বর অত্যন্ত রুষ্ট হইবেন। তবুও মায়ের বার বার আদেশে তিনি ভয়ে ভয়েই পূজা শেষ করিলেন। ইহাই তাঁহার কাল হইল। শক্তি-উপাসকের বিষ্ণু পূজা কাশীশ্বর ক্ষমা করিলেন না,—তাঁহার নির্দেশ অমান্য করিবার অপরাধে তিনি রুদ্ররামকে খড়মের আঘাতে তিরস্কার করিলেন। মর্মাহত রুদ্ররাম সেই রাত্রেই গৃহত্যাগ করিয়া গঙ্গার তীরে তীরে পূর্ব দিকে চলিলেন। শক্তি-উপাসকের বৈষ্ণব-পূজায় অধিকার আছে কিনা---এই অন্তর্দ্বন্দের মীমাংসার সন্ধানে তিনি আকুল হইয়া উঠিলেন। অবশেষে কুসুমপুরের হোগলাবনের নির্জনতায় আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তিনি ধ্যানে ডুবিয়া গেলেন। তিন রাত্রি কাটিয়া গেলে জনৈক সন্ন্যাসীর ডাকে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। সন্ন্যাসী তাঁহাকে নূতন করিয়া দীক্ষা দিয়া 'অনন্তদেব-শিলা' দান করিলেন। আজো বল্লভজীর মন্দিরে ঐ শিলা সসম্মানে বিরাজিত ও পূজিত হইতেছেন।

রুদ্ররাম সত্যের সন্ধান পাইয়া যেন নব-জীবন লাভ করিলেন। কিন্তু তিনি তৃপ্ত হইলেন না। সত্যের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখিতে তিনি পুনরায় ধ্যাননিমগ্ন হইলেন। সেদিন তাঁহার জীবনের পরম ক্ষণ—শ্রেষ্ঠতম মুহূর্ত! দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার পর ইষ্টদেবের অপরূপ মূর্তি তাঁহার নয়ন

সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! মন্ত্রমুগ্ধের মত রুদ্ররাম সেখানে লুটাইয়া পড়িলেন। তাঁহার কর্ণে এক আকাশবাণী ভাসিয়া আসিল, সেই বাণী তাঁহাকে গৌড়ের নবাবের অন্দরমহলের তোরণশীর্ষের প্রস্তর খণ্ডটি সংগ্রহ করিয়া তাহার দ্বারা নিজ ইষ্ট-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিতে আদেশ করিল।

রুদ্ররাম তৎক্ষণাৎ গৌড়ে চলিলেন। অদ্ভুত এই প্রস্তর খণ্ড। মানব-শরীরের মত তাহা হইতে অনবরত ঘাম ঝরিতেছে! সন্ন্যাসীবেশী রুদ্ররাম তোরণদ্বারে ধ্যানে বসিলেন। সংবাদ পাইয়া নবাব স্বয়ং আসিয়া সাধুকে সসম্মানে তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রুদ্ররাম আকাশবাণীর নির্দেশমত বলিলেন যে, এই প্রস্তরখণ্ডটি সংসারের সমূহ বিপদের কারণ ও ইহাকে গঙ্গার জলে ফেলিয়া দেওয়া দরকার। নবাব ভয় পাইয়া পাথরটি গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিলেন। কয়েকদিন পরে এক ব্রাহ্মমুহূর্তে স্নান করিবার সময় সাধকপ্রবর রুদ্ররাম দেখিলেন—সেই পাথরটি তাঁহার আশ্রমের নিকট গঙ্গা তীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। পাথরটি তুলিতেই এক ভাস্কর আসিয়া তাহা হইতে মূর্তি খোদিত করিতে চাহিলে, রুদ্ররাম তাহাকে ইষ্টদেব-প্রেরিত ভাবিয়া সানন্দে স্বপ্নদৃষ্ট মূর্তি বর্ণনা করিলেন। এক একটি করিয়া তিনটি মূর্তি নির্মিত হইল। কিন্তু প্রথম দুইটি মূর্তির সহিত রুদ্ররামের স্বপ্নদৃষ্ট দেবতার কোনো মিল না-থাকায়, তাহাদের নাম দেন 'শ্যামসুন্দর' ও 'নন্দদুলাল'। তৃতীয়টি দেখিয়াই তাঁহার প্রাণে আনন্দের হিল্লোল বহিয়া গেল! তাঁহার পরম স্বপ্ন সকল মাধুরী বহিয়া এই মূর্তিটির মধ্যে বিকশিত হইয়া উঠিল। রুদ্ররাম 'রাধাবল্লভ' নামক বিগ্রহটিকে আশ্রম মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। যেটুকু প্রস্তর অবশিষ্ট ছিল, তাহা হইতে '[illegible]' মূর্তি নির্মিত হয়; শ্রীশ্রীরাধাবল্লভের পার্শ্বে আজো তিনি বিরাজিত। রুদ্ররাম অপর দুইটি বিগ্রহের একটি তাঁহার শিষ্য বীরভদ্র গোস্বামীকে দান করেন। গোস্বামী শ্রীধাম খড়দহে এই বিগ্রহটি 'শ্যামসুন্দর' নামে প্রতিষ্ঠিত করেন। অপরটি রুদ্ররাম কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ পণ্ডিতের দ্বারা সাঁইবনায় 'শ্রীশ্রীনন্দদুলাল' নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। রুদ্ররামের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা সার্থক হইয়াছে; তাঁহার সত্য সন্ধানও সফলতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। এইরূপ ব্রহ্ম ও শক্তির অভেদ যুগলমূর্তি ভারতে বিরল। এখানেই পণ্ডিত রুদ্ররাম সাধনার বলে কাশীশ্বরের ভুল দেখাইয়া দিলেন; প্রমাণিত হইল—ব্রহ্ম ও শক্তি অভিন্ন: শাক্ত ও বৈষ্ণবের মনের মন্দিরে একই দেবতা বিরাজিত রহিয়াছেন।

জীবনের শেষ প্রান্তে রুদ্ররাম বল্লভজীর সেবার ভার তাঁহার ভ্রাতা রমাকান্তের উপর দিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেম-পরিক্রমার সাথী হন। 'বৈষ্ণব-আচার-দর্পণে' আছে—

"বল্লভপ গোপাল যাঁর নাম বৃন্দাবনে,
শ্রীরুদ্রপণ্ডিত বলি চলে গৌর সনে।
নিত্যানন্দ প্রভুশালা বল্লভপুরে বাস,
শ্রীরাধাবল্লভ ঠাকুর যাঁহার প্রকাশ।"

রুদ্ররাম ১৪৩০ শকাব্দে কার্তিকা কৃষ্ণাষ্টমীতে আবির্ভূত হন এবং তিরোধানের পূর্বে তিনি বৃন্দাবনের রজোভূমিতে সমাধিস্থ হন। বৃন্দাবনে আজো তাঁহার 'শ্রীগোপাল' বিগ্রহ ও সমাধি সেবিত হইতেছে।

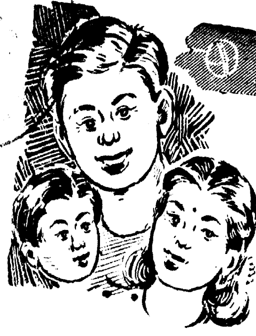
পণ্ডিত রুদ্ররামের প্রয়াণের বহুকাল পরে রমাকান্তের বংশধরগণের সময় কলিকাতায় মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের মাতার শ্রাদ্ধে বাঙলার বিভিন্ন শ্রীবিগ্রহের সহিত বল্লভজীর বিগ্রহও রাজসভায় আহূত হন। শ্রীশ্রীবল্লভজীর রূপমাধুরী অনির্বচনীয়; স্বয়ং মহাপ্রভু চৈতন্যদেব রূপময় বিগ্রহের পদতলে আবেশে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মহারাজও বিগ্রহ হইতে চোখ ফিরাইতে পারিলেন না। তিনি ঐ বিগ্রহ আপন বাটীতে প্রতিষ্ঠা করিবার মানসে আর ফেরৎ দিতে সম্মত হইলেন না। ইহাতে সেবাইতগণ অনশন করিবার উপক্রম করিলে, মহারাজ তাঁহাদিগকে এক লক্ষ টাকা জমা দিয়া বিগ্রহ লইয়া যাইবার নির্দেশ দেন। সেবাইতগণের অনুরোধে কলিকাতার ধনীশ্রেষ্ঠ ৺নয়নচাঁদ মল্লিক লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন। তখন মহারাজ বিচলিত হইয়া সেবাইতদের বলিলেন যে, অনেকগুলি বিগ্রহের মধ্য হইতে যদি তাঁহারা বল্লভজীকে চিনিয়া লইতে পারেন, তবে তাঁহার কোনো আপত্তি নাই।

সপ্তাহমধ্যে রাজা সুযোগ্য ভাস্করের সাহায্যে রাধাবল্লভজীর অনুকরণে কয়েকটি একই প্রকারের বিগ্রহ নির্মাণ করাইয়া এক সভাতে সেবাইতগণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ইতিমধ্যে ঠাকুর স্বয়ং এক স্বপ্নে তাঁহাদিগকে বিগ্রহ চিনিবার সাংকেতিক জানাইয়া দিয়াছেন। দেখিবামাত্র তাঁহারা নির্ভুলভাবে বল্লভজীর বিগ্রহটিকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন। মহারাজ ভক্তি-বিগলিতচিত্তে বহু অর্থসহ তাঁহাদিগকে শ্রীবিগ্রহ ফিরাইয়া দিলেন।

১৬৮৬ শকাব্দে বল্লভজীর বর্তমান মন্দির নির্মিত হয়। পুরাতন মন্দিরের ভিত্তি ভাগীরথী-তরংগের আঘাতে ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া যাইতেছিল। তখন ৺নয়নচাঁদ মল্লিক ভাগীরথীর তটরেখা হইতে কিছু পশ্চিমে আজিকার নূতন মন্দির ও বাসভবন নির্মাণ করিয়া দেন। সেই হইতে শ্রীবিগ্রহ এই মন্দিরেই সেবা পাইতেছেন। পুরাতন মন্দিরটি ১২৭১ সালের ঝড়ে ভূমিসাৎ হয়। অনেকে বলেন, ইংরেজদের কামানের গোলায় মন্দিরটি ধ্বসিয়া যায়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রাধাবল্লভজীর শ্রীমূর্তি দর্শন করিতে আসিয়া বারোজন ভক্তসহ মন্দিরের সম্মুখে রথযাত্রায় রবিবাসরে মহোৎসব করেন। আজো ঐ পুণ্য দিবসটি 'দ্বাদশ গোপালে'র উৎসব দিবস বলিয়া পরিচিত হইয়া আছে।





পরিচালক—উপানন্দ

বিভিন্ন শ্রেণীর ইচ্ছা শক্তির লক্ষণ

(১) অদম্য অধ্যবসায় বিশিষ্ট (Persistent) (২) স্থিতিশীল (Static) (৩) গতি শক্তিসম্পন্ন (Dynamic) (৪) সংযম-সম্পন্ন (Re-training) (৫) স্থির নিশ্চিত বা চূড়ান্ত (Decisive)—এই পাঁচপ্রকার ইচ্ছা শক্তি আছে।

কার্য্যসিদ্ধির জন্য 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন' এইটাই হচ্ছে অদম্য অধ্যবসায় বিশিষ্ট ইচ্ছা শক্তির লক্ষণ। প্রাণপণ চেষ্টা, অধ্যবসায় ও একাগ্রতা এর মূলমন্ত্র। শত বাধাবিঘ্ন-বিপত্তি তুচ্ছ ও প্রতিহত করে সাফল্যমণ্ডিত হওয়াই এর একমাত্র উদ্দেশ্য। তপস্বীর মত সাধনাই এর মূল সূত্র। সংসারের সকল দিকে যাঁরা এগিয়ে গিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন আর দুর্গম পথে দুর্ল্লভকে লাভ করেছেন তাঁরাই এরূপ ইচ্ছা শক্তির সাধক। ধরো, একটি অঙ্ক কষ্‌তে বা একটি জ্যামিতি প্রতিজ্ঞা বুঝ্‌তে পারছ না,—চেষ্টা করছ, হচ্ছে না, মন মেজাজও খারাপ হয়ে গেছে। সে সময়ে যদি এম্নিভাবে প্রতিজ্ঞা করে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করো যে, যতক্ষণ না সেই অঙ্কটা কষ্‌তে বা বুঝ্‌তে পার্‌বো ততক্ষণ কিছুতেই ছাড়্‌বো না, তাহোলে বুঝ্‌তে পারা যাবে যে, তোমাদের মনে অদম্য অধ্যবসায় বিশিষ্ট ইচ্ছা শক্তির উদ্ভব হয়েছে।

কার্য্যের দ্বারা বা শিক্ষার দ্বারা অর্জ্জন করে সংরক্ষিত করে রাখা যায় স্থিতিশীল ইচ্ছাশক্তি, সুযোগ ও সময়মত বা আবশ্যকমত তাকে ব্যবহার করে, সমাজ ও সংসারে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করাই এর উদ্দেশ্য। এ শক্তিকে বিপথে বা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত কর্‌লে অধঃপতনের চরম স্তরে নেমে যাওয়া যায়, আর সৎপথে বা উচ্চ আদর্শের দিকে অগ্রসর করাতে পার্‌লে গৌরবের উচ্চ শৈলশৃঙ্গেও আরোহণ করা যায়। ঠিক-মত ঠিক পথে চল্‌বার জন্যে সর্ব্বদাই সচেতন হবে। কেননা তোমাদের ভেতর ব্যক্তিত্বের বৈদ্যুতিক শক্তি সংরক্ষিত করে রাখা দরকার, যাতে দরকার হলেই এরূপ ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করতে পারো। মনের অবচেতন স্তরে এর স্থান। আত্ম-ইঙ্গিত বা আত্মসঙ্কেতের দ্বারা একে সক্রিয় করতে হয়। ধরো, তোমাদের বাড়ীতে বৈদ্যুতিক যন্ত্র আছে—এই যন্ত্র-শক্তির জোরেই তেতালা চার তলায় জল ওঠে। দরকার হোলো, মেসিন চালালে, না দরকার হোলো, চালালে না। যে সময়ে তোমাদের কার্য্যে ও চিন্তায় এম্নিভাবে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যাতে বল্‌তে পারো—'হ্যাঁ, দিলেই পার্‌বো—কেন, পার্‌বো না—যত বড় শক্ত অঙ্কই হোক্ না কেন—' যে সময়ে বুঝ্‌তে পারা যাবে যে, তোমাদের ভেতর স্থিতিশীল ইচ্ছাশক্তি সংরক্ষিত করে রেখেছে অটুট আত্মবিশ্বাস আর অসাধারণ মানসিকতা।

জেনে রেখো, অন্তরে মানুষ যা ভাবে, সে তাই-ই হয়—এই প্রবচন চিরন্তন সত্য। পরমহংসদেবের ভাষায় বল্‌তে গেলে—'তেলাপোকা কাঁচপোকা হব ভাব্‌তে ভাব্‌তে সত্যি একদিন কাঁচপোকা হয়ে যায়—' তোমাদের মনের ভেতর বিপথগামী হবার ইচ্ছাশক্তি সংরক্ষণের চেষ্টা করে নিজেদের সর্ব্বনাশ করো না।

গতিশক্তিসম্পন্ন ইচ্ছাশক্তির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আলস্য ও ঔদাস্য ত্যাগ করে আত্মসচেতন হয়ে কাজ করে যাওয়া। শুভসঙ্কল্প থাক্‌লে উচ্চ চিন্তাধারা গড়ে উঠ্‌বে, তার থেকে পাবে মহান্ আদর্শ, আর এই ইচ্ছাশক্তির জোরে দশজনের একজন হোতে পারবে। প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই রকম ইচ্ছাশক্তি ছিল। তিনি রাতদিন কাজের মধ্য দিয়ে নিজের আশা আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করেছিলেন। বাল্যজীবন থেকেই তিনি কখন আলস্যের দাস হননি। তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান ছিলেন। তাঁর পিতা অতি সামান্য বেতনে কল্‌কাতায় চাকুরি কর্‌তেন। বাসাতে অনেকগুলো প্রতিপাল্য পরিজন ছিল। বাসাতেও তাঁর কনিষ্ঠ ও দুটি সহোদর বিদ্যাশিক্ষার জন্যে এসে থাকতো। বাড়ীর ও বাসার বহু-জনের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করাই তাঁর পিতার পক্ষে খুব কষ্টকর ছিল। বিদ্যাসাগরকে নিজের হাতে ভৃত্য ও পাচকের সমুদয় কাজ করতে হোতো। সারাদিনই এই সব কাজে নিযুক্ত থেকে তিনি পাঠাভ্যাসের সময় পেতেন না। রাত্রি ৯।১০ টার সময় বাসায় সকলের আহার শেষ হোলে পর তিনি পাঠে প্রবৃত্ত হোতেন। প্রত্যহই তাঁকে রাত জেগে পাঠ শিক্ষা কর্‌তে হোতো। অর্থের অভাবে সব বই কিন্‌তে পার্‌তেন না, বিদ্যালয়ে

যাবার ও আস্‌বার সময়ে পথে কোন সহাধ্যায়ী বা শিক্ষকের বাসায় গিয়ে তাঁদের বই দেখে নিজের পাঠাভ্যাস করে নিতেন। তোমরা যদি তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রাতঃস্মরণীয় হোতে পারো তাহোলে বুঝা যাবে যে এরূপ ইচ্ছাশক্তির জন্যই তোমরা গৌরব লাভ করেছ।

বোধ হয় তোমরা জানো মানুষের মধ্যে ছয়টা রিপু আছে—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য—এই সব রিপুর যে কোন একটা যখন মানুষের জীবনে প্রবল হয়ে ওঠে—তখনই সাংঘাতিক রকমের অধঃপতন উপস্থিত হয়। ইচ্ছাশক্তি যদি এদের প্রাধান্যের সহায়ক হয় তাহোলেই সর্ব্বনাশ ঘটবে। কুসংসর্গে পড়্‌লে এই সব রিপুর দাস হয়ে পড়বার সম্ভাবনা আছে। এজন্যে যে ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে হীন মনোবৃত্তি ও অন্তরের রিপুগুলি সক্রিয় হয়ে উন্নতির পথে কণ্টক ছড়িয়ে দেয়, তাকে সংযত করা দরকার। সুতরাং সংযম-সম্পন্ন ইচ্ছাশক্তির সাধনা করবে, যাতে পরের ক্ষতি না হয় আর নিজের ভালো হয়। দরকার হোলে পশু-পক্ষী ইতর প্রাণীর সঙ্গে মিশে তাদের সদ্‌গুণ নেবে—যেমন ধরনা কেন, সিংহের কাছ থেকে নেবে তেজ, বীর্য্য ও উদারতা, কুকুরের কাছ থেকে প্রভু ভক্তি, অল্পে সুনিদ্রা, শীঘ্র চৈতন্য, গদ্দভের কাছ থেকে সহিষ্ণুতা, কাকের কাছ থেকে সঞ্চয়, অপ্রমাদ, অনালস্য, আর বকের কাছ থেকে শিখ্‌বে নীতি প্রয়োগ। জেনে রেখো ইচ্ছাশক্তি সংযম-সম্পন্ন না হোলে জীবনের বেশীর ভাগ সময়ে ফৌজদারী আদালতের কাঠ্‌গড়ায় আসামী হয়ে দাঁড়াতে হবে।

স্থির নিশ্চিত বা চূড়ান্ত ইচ্ছাশক্তিকে অর্জ্জন করতে হোলে তোমাদের ভাব অনুভাবে, প্রেরণা অনুপ্রেরণায় সৃষ্টি করতে হবে উদ্দেশ্য, আর উদ্দেশ্য থেকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও ক্রিয়ার উদ্ভব হয়। তোমাদের চিন্তাধারা ও আবেগের ওপর নির্ভরশীল হয়ে আছে তোমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের গতিবেগ। স্থিরমস্তিষ্ক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি কখন হুজুগপ্রিয় হয় না, তার কোন কাজের মধ্যে উত্তেজনা, বিভ্রম, উগ্রতা বা উন্মাদনা থাকে না। কোন কাজ করবার আগেই যে নিজের মধ্যে প্রশ্ন করে—'কি' 'কেমন' 'কেন' ও 'কখন', ধাপে ধাপে তার কাছে উত্তর আসে, তারপর বিবেকের সাহায্যে বিচার করে নিয়ে কাজ করতে থাকে। কি করা, কেমন করে করা এবং কখন করা অবশ্যই দরকার, তা তোমরা না জেনে কেনই বা উচ্ছ্বাসের বশবর্ত্তী হয়ে যে কোন কাজে ছুটবে ?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত পেস্‌কোভস্ক গ্রাম যে বালক বীরের নামে নামকরণ হয়েছে সেই সুরা চেকোলীনের জীবন পর্য্যালোচনা করলে দেখতে পাবে যে, সে স্থির নিশ্চিত বা চূড়ান্ত ইচ্ছাশক্তির বলে জার্ম্মাণদের অপ্রত্যাশিত রুশিয়া আক্রমণের প্রচণ্ডতাকে ব্যাহত করেছিল, তারপর একদিন জাতীয় সঙ্গীত গাইতে গাইতে জার্ম্মাণ ঘাতকের দেওয়া ফাঁসির রজ্জু গলায় পরে হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করলো, আর শহীদ হয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হয়ে রইলো। ও যে কোন দুঃসাহসিক অভিযানে এগিয়ে এসে শত্রু ধ্বংস করতো—ষোল বছরের ছেলে পড়াশুনায় সেরা ছিল, বাড়ীর যে কোন কাজও কৃতিত্বের সঙ্গে করতো। নিজের ও ছোট ভাই ভিট্যার দায়িত্ব ও নিজেই নিয়েছিল মা বাপকে দায়মুক্ত করে। তা ছাড়া ওর বাবাকে মৌমাছি পালনে সাহায্য করতো, যন্ত্রপাতির কাজ করতো আর ক্যামেরা নিয়ে ফটো তুলতো। মাছ ধরা, বন্দুক ছোঁড়া, শীকার প্রভৃতি ছিল ওর ছেলেবেলাকার খেলা। সুরার মা নাডেজাদা চেকোলীনা বলেছেন—'সুরা ছিল আমার জীবনের আনন্দ—' তোমরা এই রকম ইচ্ছাশক্তি অর্জ্জন করবে।

পৃথিবী ব্যতীত অন্য গ্রহে জীব আছে কি ?

গ্রহান্তরে জীব আছে কিনা এ নিয়ে বহু আলোচনা হয়ে গেছে। তোমরা বোধ হয় পড়ে থাকবে ১৫৪৩ সালে পোলাণ্ডের মহা-বৈজ্ঞানিক নিকোলাস কোপার্নিকাস সর্ব্বপ্রথম সৌরকেন্দ্রিক নতুন সৌরজগতের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। তিনিই বলেন—পৃথিবীও অন্যান্য গ্রহের মত সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। আমাদের কাছে অবশ্য এটা নতুন কথা নয়, আমাদের দেশের আর্য্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্কর, বরাহমিহির প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদগণ পূর্ব্বেই এ সত্য উদ্‌ঘাটিত করে গেছেন। গ্রহান্তরে জীবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রাচীন ঋষিরা বল্‌লেও এই প্রশ্নটি বৈজ্ঞানিক ভাবে নতুন করে তাঁর আবিষ্কারের পর উত্থিত করা হয়েছে। তার পর স্থির করা হোলো যে, আমাদের সূর্য্যের মত তারাগুলিও এক একটি অতিকায় জ্বলন্ত বাষ্পীয় গোলক, আর গ্রহরা বহু নক্ষত্রের চারিদিকে আবর্ত্তন করে থাকে।

এখন প্রশ্ন হোলো—অন্য কোন গ্রহে জীবের বাস আছে কিনা। বহু লোকেরই ধারণা পৃথিবী ভিন্ন অন্য কোথাও জীব নেই। জৈব পদার্থ মাত্রেরই অস্তিত্বের জন্যে কতকগুলো নির্দ্দিষ্ট পদার্থ ও রাসায়নিক অবস্থার প্রয়োজন আছে (মানুষ, পশু, গাছপালা ও জীবাণু)। সেগুলো হোলো—জল (জল ছাড়া প্রাণ থাকতে পারে না) বাতাস (শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে অম্লজান অপরিহার্য্য) অঙ্গারক বাষ্প (বাতাস থেকে উদ্ভিদগুলোকে খাদ্য যোগাবার জন্যে) আর পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উত্তাপ।

বিভিন্ন দূরত্বে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করছে সূর্য্যের তুলনায় কতকগুলো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গোলক বা শীতল গ্রহ। বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, উপগ্রহ-রাজি, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো। শেষোক্ত তিনটী গ্রহ দূরবীক্ষণ ছাড়া দেখ্‌বার উপায় নেই। পৃথিবী বাদে এদের কোনটিতে জীব আছে বা থাকা সম্ভব—এই হচ্ছে প্রশ্ন। জ্যোতির্ব্বিদরা গবেষণা করে বলছেন যে বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন গ্রহের আবহাওয়া মেথেন (জলাভূমির দূষিত বাষ্প) আর অ্যামোনিয়াম হাইড্রেট বাষ্পের দ্বারা গঠিত। মেথেন ও অ্যামোনিয়াম হাইড্রেট প্রাণীদের পক্ষে বিষাক্ত। তাই এই বিশাল গ্রহগুলির ভেতর (বৃহস্পতি

পৃথিবীর চেয়ে ১৩৩২ গুণ বড়) প্রাণীর অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব। বুধ গ্রহে বায়ুমণ্ডল বা জল নেই বল্লেই চলে। সুতরাং সূর্য্যের নিকটতম এই গ্রহেও (উহা সূর্য্য থেকে ৫ কোটি ৮০ লক্ষ কিলোমিটার—তোমরা বোধ হয় জানো এক কিলোমিটার ৫।৮ মাইল) জীব নেই।

বুধের পরেই সূর্য্যের নিকটে হচ্ছে শুক্র। আয়তন ও পদার্থের পরিমাণের দিক থেকে শুক্রকে আমরা পৃথিবীর যমজ ভাই বল্‌তে পারি। বিখ্যাত রুষ বৈজ্ঞানিক এম, ভি, লোমনোসফই ১৭৬১ সালে সর্ব্বপ্রথম এই গ্রহে বায়ুমণ্ডলের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। আমাদের এই প্রতিবেশী শুক্রর বায়ুমণ্ডল মেঘের দ্বারা পরিপূর্ণ। এর থেকে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, শুক্রের গড়ে বাৎসরিক উত্তাপ হোলো +৪৫° সেন্টিগ্রেড। ১৯৩৭ সালে জানা যায় যে শুক্রের বায়ুমণ্ডলে যথেষ্ট পরিমাণে অঙ্গারক বাষ্প আছে। কিন্তু অম্লজান বা জলীয় বাষ্পের অস্তিত্ব এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে ঐগুলির যদি অস্তিত্ব থাকে, তা হোলে মনে করা যেতে পারে যে শুক্রে জীব আছে।

জীবের অস্তিত্বের সম্ভাবনার দিক থেকে গ্রহগুলোর মধ্যে মঙ্গলই সর্ব্বাধিক কৌতূহলের উদ্রেক করে। লোহিতাভ বর্ণের জন্যে প্রাচীন রোমের রণদেবতার নামে ওর নামকরণ হয়।

পৃথিবী অপেক্ষা মঙ্গল সূর্য্য থেকে দেড় গুণ দূরে অবস্থিত। সূর্য্যকে পূর্ণ প্রদক্ষিণ করে আস্‌তে এর ৬৭৮ দিন লাগে অর্থাৎ প্রায় দু বছরের মত। মঙ্গলে দিনের দৈর্ঘ্য পৃথিবীর দিনের প্রায় সমান (২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট ২৩ সেকেণ্ড)। পৃথিবীর মতই সেখানে ঋতু পরিবর্ত্তন হয়, পার্থক্যের মধ্যে এই যে প্রতিটি ঋতু ছয় মাস কাল স্থায়ী হয়।

মঙ্গলের জলবায়ু অত্যন্ত শুষ্ক আর সুকঠোর। পৃথিবীর গড় বাৎসরিক উত্তাপ যে ক্ষেত্রে +১৫° সেন্টিগ্রেড, সে ক্ষেত্রে মঙ্গলে ওটা হোলো—২৩° সেন্টিগ্রেড। উত্তাপের অত্যধিক তারতম্যও সেখানে ঘটে থাকে। কোন কোন স্থলে দিনমানের +২০° হ'তে নেমে রাত্রি-কালে উত্তাপ দাঁড়ায়—৫০° (মঙ্গলে জল আছে যৎসামান্য)। মঙ্গলের উত্তর মেরু মণ্ডলে তুষারের শিরস্ত্রাণ স্পষ্টই দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে ওটা লঘু হয়ে আসে অর্থাৎ তুষার গল্‌তে আরম্ভ করে। মঙ্গলের লোহিতাভ রংএর কারণ হোলো এই যে, ওর স্বচ্ছ বিরলীভূত বায়ুমণ্ডল ভেদ করে আমাদের দৃষ্টি ওর ভূপৃষ্ঠের পীতাভ লোহিত বালুকারাশির, আবরণ পর্য্যন্ত পৌঁছায়। ঐ ধরণের বালু তোমরা তুর্কমেনিস্তানে গেলে দেখ্‌তে পাবে। মঙ্গল গ্রহের ওপর যে কতকগুলি সবুজ ও নীল দাগ দেখা যায় সেগুলি অবশ্যই আমাদের মনে কৌতূহল জাগিয়ে তোলে। দেখা গেছে, মঙ্গলে যখন সবুজের আবির্ভাব হয় তখন সেই দাগগুলিতে হলুদ ও পাটকিলে রং ধরতে থাকে। এইগুলোই কি উদ্ভিদ জন্মাবার জায়গা নয়? পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা বিশেষতঃ রুষিয়ার জি, এ, তিখফ প্রভৃতি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন যে মঙ্গল গ্রহে উদ্ভিদ-জগতের অস্তিত্ব আছে। তিখফ জ্যোতিষিক জীব-বিজ্ঞান নামে এক নূতন বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন করেছেন। মঙ্গল গ্রহে কোন পশু বা যুক্তিসম্পন্ন বুদ্ধিপ্রধান জীব আছে কিনা এ নিয়ে আলোচনা চলেছে। অনেকে বলেন মঙ্গল গ্রহে মানুষের চেয়েও বিশেষ বুদ্ধিসম্পন্ন জীব আছে, তবে পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে এখন নিঃসন্দেহ হতে পারেন নি। এই গ্রহে যে রেখাজাল অর্থাৎ তথাকথিত খালসমূহ দেখতে পাওয়া যায় সেগুলি সেখানকার অধিবাসীদের বুদ্ধিপ্রসূত কার্য্যকলাপের ফল—কিন্তু এই আকর্ষণীয় অনুমানের স্বপক্ষে কোনও প্রমাণ নেই। তবে একথা সত্য যে, সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে জ্যোতির্ব্বিদেরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, মঙ্গল গ্রহে গাছপালার অস্তিত্ব আছে, আর তা প্রমাণিতও হয়েছে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমাদের সৌরমণ্ডলের মত আরও অসংখ্য সৌরমণ্ডল আছে। জড় প্রকৃতি থেকে বস্তুর উদ্ভবের ফলে সর্ব্বস্থলে ও সর্ব্বকালে জীবনের অভ্যুদয়ের বলিষ্ঠ তাগিদ দেখা দেয় বলে জীবনের আবির্ভাব অবধারিত। যেখানেই অনুকূল অবস্থা দেখা দেবে, সেখানেই জীবনের আবির্ভাব হোতে বাধ্য। পৃথিবীতেও জীবনের অস্তিত্ব আগে ছিল না। ন্যূনাধিক দেড়শো কোটি বছরের পূর্ব্বে পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব হয়। আর মানুষের আবির্ভাব হয়েছে তার পূর্ব্বপুরুষ (পশুর মত দেখ্‌তে) থেকে প্রায় পনরো লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে। আজ যদি গ্রহ-বিশেষে জীবের অস্তিত্ব নাও থাকে, অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হোলে, যে কোন সময়ে জৈব জগতের আবির্ভাব হোতে পারে। ক্রমবিবর্ত্তনও সেখানে সুরু হয়ে একদিন বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীবেরও অভ্যুদয় হবে—এটা গাণিতিক সত্য। পৃথিবীর জীবের সঙ্গে অন্য গ্রহের জীবের যথেষ্ট পার্থক্য থাক্‌তে পারে—মানুষ থেকে অতিমানুষ হয়েও উঠ্‌তে পারে সে সব গ্রহে।

বট-বন্ধু

শ্রীকালিদাস রায়

এক যে আছে মোদের গাঁয়ে ক্ষীরপুকুরের পাড়ে
মস্ত বড় বুড়ো বট এক গয়লাপাড়ার ধারে।
শিশু-জীবন তাহার কোলে কাট্‌ল আমার সুখে,
আমার বুকের সকল স্মৃতি আঁকা তাহার বুকে।
ঐ তরুটির পাঠশালাতে আমার লেখা পড়া,
ঐখানেতেই ক্ষুদ্র আমার জীবনটুকু গড়া।
আজো যখন স্মরি তাহায় চক্ষে আসে জল,
বক্ষ আমার শীতল করে পল্লী বটের তল।
আজো যখন স্মরি তাহার উজান বহে প্রাণ,
চমকে উঠে বাল্যকালের দুঃখ অভিমান।

নামাল ধ'রে দোল খাওয়া আর শিকড় চড়ে খেলা
সঙ্গিগণের সঙ্গে হোথা সকাল সন্ধ্যাবেলা,
ধারাপাত আর বাড়াভাতের ভয়ে হেথায় এসে
দুপুরবেলা লুকিয়ে পড়া ঘুমিয়ে পড়া শেষে।
আরো কত জাগায় স্মৃতি মধুর অবিরল,
আমার শিশু স্বর্গভূমি পল্লী বটের তল!
আবার তেমন মধুর লাগে যেমন শিশুকালে
পল্লীবধূর কাপড় কাচা নাচের তালে তালে।
বাসনগুলির ঝনঝনানি গয়লা পাড়ার ঘাটে
হাঁসের দলের ঝটপটানি ঝাপ্‌টা জলের ছাটে,
লুব্ধ ক'রে বালক পরাণ ক্ষুব্ধ ক'রে তাকে,
রুই কাতলা পালায় কেমন ঢেউএর থাকে থাকে,
পাড়ার মেয়ে জল নিয়ে যায় মধুর বাজে মল।
কত কথাই জাগায় মনে পল্লী বটের তল।
দুপুর বেলায় গামছা পেতে ঘুমায় রাখাল যত
এ ডাল ও ডাল ঘুরে বেড়ায় কাঠবিড়ালী কত।
বাছুরগুলি চক্ষু মুদে হেথায় জাবর কাটে
ছাগল তাহার বাচ্চা দুটির নরম দেহ চাটে।
বেকার যুবক ছিপটি হাতে বসে থাকে ঠায়
অবিশ্রান্ত কাঠঠোকরা ঠুকছে গাছের গায়।
গুব্‌গাবিয়ে পড়ে জলে লোহিত বরণ ফল,
অনেক স্মৃতি জাগায় আমার পল্লী বটের তল।
সকল গাঁয়ের সকল পাখীর এই গাছে কি বাসা?
মধুর কারো গলার আওয়াজ পুচ্ছ কারো খাসা।
সমস্ত দিন কলর কলর নিত্যি ভোজের ধুম,
রাত্রি হলে আপন আপন তৈরি বাসায় ঘুম।
জমায় সাঁজে গল্প সভা কৃষাণ রাখালেরা
বাঁশের বাঁশী লয়ে কেহ তানটি ভাঁজে সেরা।
অন্ধকারে ফিরে ফিরে ডাকে ঝিঁঝিঁর দল,
আরো কত জাগায় স্মৃতি পল্লী বটের তল।
মাছরাঙাটি বেড়ায় চুপে কলমী শাকের বনে
এক পায়ে রয় বক যোগিবর মুদ্রিত নয়নে।
শাপলা বনে পানকৌড়ি খুঁজতেছে শিকার,
পানার সোঁদা গন্ধে ভরে সারা পুকুর ধার।
যে ঢোকে গাঁয় পা ধোয় তার বটতলাটির ঘাট
পড়লে বেলা বসে সেথায় পাড়ার ছোট হাট।
গাছের ছায়া দুলায় ধীরে ঢেউ নাচানো জল,
তেমনি ক'রে দুলায় এ প্রাণ পল্লী বটের তল।

জাতিচ্যুত

শ্রীজয়দেব রায় এম্‌-এ, বি-কম্‌

পুরাকালে বীতহব্য নামক এক রাজা রাজত্ব করিতেন, তাঁহার একশত জ্ঞানবান বীর যোদ্ধা পুত্র ছিল। তাহাদের লইয়া বীতহব্য দিগ্বিজয়ে বাহির হ'ন; কাশীরাজকে তাঁহারা বার বার পরাস্ত করিয়া শেষে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিলেন। কাশীরাজের পুত্র দিবোদাস অন্যত্র গিয়া রাজধানী স্থাপন করিলেন, কিন্তু বীতহব্যের পুত্রগণ সেখানেও তাঁহাকে আক্রমণ করিল।

দিবোদাস প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু শেষে পরাস্ত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া পলাইয়া ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বীতহব্যের পুত্রগণের অত্যাচারে দিবোদাসের বংশ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইল, তিনি তখন বংশধরের জন্য ভরদ্বাজ ঋষির সাহায্যে একটি যজ্ঞ করিলেন।

ঋষির বরে তাঁহার একটি বীরপুত্রের জন্ম হইল। পিতা-পিতামহের প্রতি অকথ্য অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্যই তাঁহার জন্ম হইল। ঋষি তাঁহার নাম রাখিলেন প্রতর্দন। তাঁহার শিক্ষায় ও চেষ্টায় প্রতর্দন অল্প দিনের মধ্যে পাণ্ডিত্যে এবং অস্ত্রবিদ্যায় সুনিপুণ হইয়া উঠিলেন। দিবোদাস যখন বুঝিলেন প্রতর্দন উপযুক্ত হইয়াছেন তখন তাঁহাকে ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যথাযোগ্য উপদেশ দিয়া যোগবলে সস্ত্রীক দেহত্যাগ করিলেন।

প্রতর্দন এইবার প্রতিশোধ লইতে প্রস্তুত হইলেন। একে একে বীতহব্যের একশত বীর পুত্রই সম্মুখ যুদ্ধে তাঁহার হাতে নিহত হইল। তিনি নিজ রাজ্য আবার উদ্ধার করিয়া রাজা হইলেন।

বীতহব্য এইবার রাজ্যচ্যুত হইয়া প্রাণভয়ে পলাইয়া মহর্ষি ভৃগুর আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

প্রতর্দনও তাঁহার অনুসরণ করিয়া ভৃগুর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ভৃগুমুনি তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়া বলিলেন—

"বৎস, আমার আশ্রমে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে হানা দিয়েছ কেন? এখানে তো তোমার কোনো শত্রু নেই।"

প্রতর্দন কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন—"গুরুদেব আপনার কাছে এ-কথা আশা করিনি। আপনি ভালো করেই জানেন,—আমি কেন এসেছি। বীতহব্যের পুত্রেরা আমার পিতৃকুল সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছে এবং আমার পিতৃরাজ্য হরণ করেছিল। আমার পিতা পথের ভিখারী হয়ে শেষে ভরদ্বাজের আশ্রমে আশ্রয় পেয়ে বাকী জীবন অতি কষ্টেই কাটান।

আমি অবশ্য তাদের প্রত্যেককে হত্যা ক'রে প্রতিশোধ নিয়েছি। কিন্তু বীতহব্য নিজে পালিয়ে আপনার আশ্রমে এসেছে, তাকে আমার হাতে প্রত্যর্পণ করুন।"

মহর্ষি ভৃগু শরণাগতকে বাঁচাইবার জন্য মিথ্যা-ভাষণ করিলেন—

"না, বৎস, এখানে বীতহব্য তো নেই ; যাঁদের দেখ্‌ছ তাঁরা সবাই ব্রাহ্মণ।"

প্রতর্দন তাঁহার কথার উত্তরে সবিনয়ে বলিলেন—"বেশ, আপনি যখন নিজ মুখে প্রত্যেককেই ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করে নিলেন, তখন আমিও সিদ্ধকাম হয়েই ফিরে যাচ্ছি। কারণ, ক্ষত্রিয় বীতহব্যকেই আমি হত্যা করতাম, কিন্তু তিনি যখন ভয়ে নিজের জাতি ত্যাগ করে ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত হতে চাইছেন—তখন তাঁকে আমি ক্ষমা করলাম।"

এই বলিয়া প্রতর্দন বীরদর্পে চলিয়া গেলেন। ভৃগুর অনুশাসনে বীতহব্যও তখন হইতে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইলে। এই ব্রাহ্মণ বীতহব্যের বংশেই রুরু প্রভৃতি বহু ঋষি জন্মগ্রহণ করেন।

শরতে

শ্রীকামাক্ষা সরকার

আজ ভুবনের দুয়ার খুলে
রূপের আলো ছড়িয়ে পড়ে,
আনন্দ আজ বাঁধন হারা
উথলে উঠে মাটীর ঘরে।

সবুজ ক্ষেতে ঢেউ খেলে যায়
নীল আকাশের কোন্ ইসারায় ;
ভাঙ্গা মেঘের ফাঁকে যে আজ
আলো আশার বন্যা ঝরে।
আনন্দ আজ পাপড়ি মেলে
গন্ধ ছড়ায় মাটীর ঘরে।

শরৎ রাণীর অঙ্গ ভরে
সোনার আলো ছড়িয়ে পড়ে,
সবুজ ধানের ক্ষেত বিছিয়ে
শ্যামল প্রাণের আশীষ ঝরে।
পথিক বাউল আপন মনে
সুরের রঙ্গীন আলিম্পনে
ভুবন জুড়ে তোমার আসন
ছড়ায় মাগো থরে থরে।
আনন্দময়ী আসছো তুমি
আনন্দ তাই মোদের ঘরে।

আমেরিকা ও তার প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতি

অশোককুমার গুপ্ত

নগর পত্তনের ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায় যে, অরণ্যের বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামের ধারাবাহিক কতগুলো কালো অধ্যায়ের দ্বারোদঘাটনের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টাপূর্ণ আলো আঁধারের আলপনা আঁকা আশা-নিরাশার কাহিনী। যুগ যুগ ধরে আরণ্যক পৃথিবীর বুকে চলেছে মানুষের অদম্য অভিযান—বন্য হিংস্র পশুর গুপ্ত গুহা থেকে সরিয়ে এনে নিজেকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসাবার মত ভূখণ্ডের সন্ধান থেকেই সৃষ্টি হয়েছে একটু একটু করে আজকের মানুষের পৃথিবী। মানুষ যে একদিন অরণ্যবাসী ছিল সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই, কিন্তু শিক্ষা ও সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সে হতে চেয়েছে অন্ধকারাচ্ছন্ন কালো অরণ্য থেকে বিচ্ছিন্ন, পশুর সমগোত্র থেকে মানুষের গোত্রে উন্নীত। আলো যেখানে পেয়েছে মুক্তি, বাতাস হয়েছে বাধাহীন, মানুষ যেখানে ঘর বাঁধবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, অরণ্যক সভ্যতার বেড়াজাল ভেঙে সে বেরিয়ে পড়েছে নতুনতর সভ্যতার সন্ধানে, তার সেই থেকেই সূচিত হ'য়েছে আরণ্যক সভ্যতার শেষ অধ্যায়। অরণ্যের বিরুদ্ধে এম্‌নি এক চেষ্টা থেকেই আমেরিকার গোড়াপত্তন।

বেশী দিনের কথা নয়। আজ থেকে সাড়ে তিনশ বছর আগেকার কথা। জেমস্ নদীর নিম্ন ভূভাগবর্ত্তী উপদ্বীপে ১৬০৭ সালের ২৪শে মে ছোট ছোট তিনটী জাহাজ এসে ভিড়ল ইংলণ্ড থেকে কতিপয় অভিযাত্রী নিয়ে। তারা নিয়ে এলো রেডইণ্ডিয়ান অধ্যুষিত অরণ্যাঞ্চলে মানুষের বীজ বহন করে। সম্পূর্ণ নতুন জায়গা, সম্পূর্ণ অপরিচিত, গাছপালা, পশুপাখী, ফুল ফল, এমন কি জলের স্বাদ পর্য্যন্তও তা'দের কাছে নতুন বলে মনে হোত। রোগে, অনশনে এবং রেডইণ্ডিয়ানদের অত্যাচারে তা'দের অনেকেই মারা গেল, যে ক'জন বেঁচে রইল তাদের অক্লান্ত চেষ্টায় ও পরিশ্রমে স্থাপিত হোল সর্ব্বপ্রথম জেমস্ টাউন উপনিবেশ। ধীরে ধীরে নারীরাও এলো, নতুন শিশু জন্ম গ্রহণ করল শহরে। এর পরের ইতিহাস হোলো আমেরিকার ক্রমবিকাশের ইতিহাস। ইউরোপের বিভিন্ন জাতি গিয়ে বসবাস সুরু কোরল নব আবিষ্কৃত আমেরিকায়। সর্ব জাতি ও ধর্মের সমন্বয় ঘটল আরণ্যক

অঞ্চলে। মহা মিলনের পুণ্যক্ষেত্র হয়ে উঠল আমেরিকা। একটার পর একটা করে নতুন নতুন উপনিবেশ স্থাপিত হতে লাগল। ধীরে ধীরে আসতে লাগল বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক শিক্ষক কৃষক মজুর ও ব্যবসায়ী। কালো আঁধারের যবনিকার ওপর পোড়ল এসে নবারুণ।

জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষা, শিক্ষার অভাব অনুভব করতে লাগল ঔপনিবেশিকেরা। শিক্ষা এবং তার ব্যপক প্রসার না হলে, দেশের প্রতিটি মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সম্ভব নয়। আমেরিকার 'প্লিমাউথ' উপনিবেশ সর্বপ্রথম সচেষ্ট হয়ে উঠল তাদের সন্তান সন্ততিদের শিক্ষার জন্য। কিন্তু প্লিমাউথ অঞ্চলের অধিবাসীদের দারিদ্র্য ও দুর্দশা থাকাতে অনেক দিন পর্য্যন্ত স্কুল প্রতিষ্ঠায় পর্বত প্রমাণ বাধা হয়েছিল। মানুষের সব চাইতে বড় সমস্যা হোলো খাদ্য-সমস্যা। জীবিকা উপার্জন করতে গিয়ে ঔপনিবেশিকেরা রেড ইণ্ডিয়ান-দের কাছ থেকে মৎস্য শীকার করতে শিখেছিল। সামুদ্রিক মাছ শীকার করাটাই তখন ছিল প্রথম ঔপনিবেশিকদের একমাত্র জীবিকা উপার্জনের পথ। ১৬৭০ সালে সাধারণ সভা যখন ঘোষণা করল যে মৎস শীকার থেকে বাৎসরিক যে পরিমাণ অর্থ লাভ হবে তার সবটুকুই প্লিমাউথ অঞ্চলের কল্যাণ ও একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় ব্যয়িত হবে তখন প্লিমাউথ সহর সঙ্গে সঙ্গে এই ঘোষণার সুযোগ গ্রহণ করে শহরে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে ফেল্ল।

সাধারণের রক্ষণাবেক্ষণে 'মেসাচুসেটস্' উপনিবেশেই সর্বপ্রথম বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সর্বপ্রথম ঔপনিবেশিক হিসেবে যারা এখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বিত্তশালী ও শিক্ষিত। ১৬৩৫ সালে 'বোষ্টন' শহরের এক সাধারণ সভায় শিক্ষার আশু প্রসারের জন্য বেতনভোগী শিক্ষক নিয়োগ করবার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সেই সূত্র ধরেই 'বোষ্টন' শহরে লাটিন স্কুলের প্রতিষ্ঠা। এর পরেই 'ডরচেষ্টার' অঞ্চলে সরাসরি জনসাধারণের দেয় শুল্কে পরিচালিত একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং ১৬৪২ সালের ঔপনিবেশিক ঘোষণা দ্বারা শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়।

এই ঘোষণা দ্বারা শহরের কর্তৃপক্ষস্থানীয়দের ওপর এমন ক্ষমতা প্রদান করা হয় যে সন্তানদের পড়বার ক্ষমতা অর্জন ও ধর্মের মূল কথা এবং পৌর নীতি বিষয়ক জ্ঞানলাভ সম্বন্ধে বিবরণ পেশ করতে অনিচ্ছুক অভিভাবকগণকে তাঁরা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারবেন।

শিক্ষার প্রসার কল্পে ১৬৪৭ সালে মেসাচুসেটস্ উপনিবেশ ঘোষণা করে যে পঞ্চাশ ঘর বসতি আছে এমন প্রতিটি শহরে একজন করে যোগ্য লোক নিয়োগ করে লিখতে এবং পড়তে শেখাবার পদ্ধতি বাধ্যতামূলক ভাবে গ্রহণ করতে হবে এবং এক শত ঘর বসতি আছে এমন প্রতিটি শহরে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে ছেলেদের অবশ্যই কলেজে পড়বার মত করে তৈরী করে দিতে হবে।

১৬২০ সাল থেকে ১৬৭৬ সালের মধ্যে আমেরিকায় মোট তেরটি উপনিবেশ স্থাপিত হয় এবং প্রথম বসতি স্থাপনের ক'এক বছরের মধ্যেই 'রোডস' দ্বীপ ব্যতীত অন্যান্য উপনিবেশগুলি সাধারণের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দিতে সমর্থ হয়। সাধারণ যে সব বিদ্যালয়-গুলোতে ছাত্রদের লিখতে এবং পড়তে শেখানো হোতো, সেগুলোর স্থলে প্রাথমিক বিদ্যাভ্যাস এর জন্য বালিকাবিদ্যালয় এবং বেসরকারী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ফলে গ্রামার স্কুলগুলো অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। বহিরাগত বৈদেশিক পরিকল্পনা ও আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লাটিন গ্রামার স্কুল। সম্মিলিত ঔপনিবেশিকেরা ভিন্নদেশীয় ধারকরা পদ্ধতিতে শিক্ষাগ্রহণ করতে অসম্মত হোলে বেসরকারী এবং বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; নিজ দেশীয় পদ্ধতির মারফতে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবার জন্যে। বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে একক একটি জাতির অভ্যুদয় ও তার স্বাধীন সত্তার বীজ এইভাবেই সর্বপ্রথম অঙ্কুরিত হতে দেখা যায় আমেরিকায়।

সাধারণ স্কুলগুলোর শিক্ষাপদ্ধতি চার ভাগে বিভক্ত ছিল। যেমন পড়া, লেখা, অঙ্ক এবং ধর্ম বিষয়ে শিক্ষা দান। সব চাইতে সহজ এবং সরল উপায়ে অক্ষর শিখবার পদ্ধতি 'হর্ণ বুক'এর মাধ্যমেই সর্বপ্রথম স্কুলগুলোতে অক্ষর পরিচয় চালু হয়। 'হর্ণ বুক' হোলো আমাদের দেশের বর্ণ পরিচয়ের মত। অধিকতর অগ্রসরপ্রাপ্ত ছেলে-মেয়েদের 'নিউ ইংলণ্ড প্রাইমার'এর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হোতো। এই নিউ ইংলণ্ড প্রাইমার ঔপনিবেশিক যুগের শেষ পর্য্যন্ত উপনিবেশগুলোতে চালু ছিল—কিন্তু বিপ্লবের পর থেকেই আস্তে আস্তে ভিন্ দেশীয় পদ্ধতি ও আদর্শে লেখা এই নিউ ইংলণ্ড প্রাইমার শিক্ষার বাজার থেকে অন্তর্হিত হয়ে যায় এবং তার স্থলে ওয়েবষ্টার প্রণীত অধিকতর আধুনিক পাঠ্যপুস্তক স্কুলগুলোতে স্থানলাভ করে।

যে দেশের লোক-বসতির গা ঘেঁষে বিরাট এক প্রতিদ্বন্দ্বীর মতো অরণ্য ও তার সূচীভেদ্য অন্ধকারের প্রতিবন্ধকতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যার সঙ্গে প্রতিদিন যুদ্ধ করে মানুষকে বাঁচতে হোতো, সেখানকার প্রধান শিক্ষা ও তার বিস্তারের এই হোলো মোটামুটি কথা।

এখন সেখানকার প্রাচীন স্কুলগুলো সম্বন্ধে দু চারটে কথা বোলব। তখনকার প্রায় সমস্ত স্কুলগুলোই ছিল কাঠের তৈরী এবং প্রায় জীর্ণ দশা-প্রাপ্ত। কেবল মাত্র একটি কাঠের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে ছাত্ররা রঙহীন বেঞ্চে এসে বোসত। সামনে তাদের ঘরের দেওয়াল এবং মাষ্টারের বসবার উঁচু একটুখানি তক্তপোষ ভিন্ন কিছুই থাকত না। বই হাতে করেই তাদের বসতে হোত। স্কুলগুলো শ্রেণী বিভক্ত ছিল না। যে সব ছোট ছোট ছেলেরা সবে মাত্র অক্ষর পরিচিতি লাভ করতে আসত, তারা অন্যান্য ছাত্রদের কাছ থেকে একটু তফাতে বোসত। ছাত্রদের অধিকাংশ সময়েই স্মরণ শক্তির ওপর নির্ভর করে আবৃত্তির ভঙ্গিতে পড়া বোলতে হোতো। আবৃত্তি মাস্টারের আশানুরূপ না হলে ছাত্রকে বেত্রাঘাত সহ্য করতে হোতো। অবাধ্য ছাত্রকে শাস্তি দেবার পদ্ধতি ছিল মাথায় নির্বুদ্ধিতার পরিচয়জ্ঞাপক টুপি পরিয়ে গরম চুল্লীর পাশে হাত সোজা করে তার ওপর ভারী ভারী বই চাপিয়ে, নাকে কাঠের ক্লীপ এঁটে দিয়ে ঘরের কোণে দাঁড় করিয়ে রাখা, নয়ত ঘরের যে অংশে মেয়েরা বোসত তাদের পাশে বসিয়ে দেওয়া। সে যুগে লেখা পড়াকে আকর্ষণীয় করে

তুলবার কোন চেষ্টাই ছিল না এবং বেশীর ভাগ ছাত্রকেই তিক্ত ও রূঢ় বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে লেখাপড়া শিখতে হোত।

মেয়েরা কখনও গ্রামার স্কুলে ভর্ত্তি হতে পারত না। ছোট ছোট সাধারণ স্কুলগুলোতে কিন্তু কখনও কখনও প্রয়োজনের কাছে সংস্কারকে হার মানতে হয়েছে এবং ছেলে-মেয়েরা এক সঙ্গে একই সময়ে একই ঘরে বসে লেখাপড়া শিখবার সুযোগ পেয়েছে। আইন অনুযায়ী যদিও মেয়েরা প্রাথমিক শিক্ষালাভের অধিকারিণী ছিল, তথাপি অষ্টাদশ শতাব্দীর পুরোভাগ পর্য্যন্ত দেখা গেছে শতকরা চল্লিশ জনেরও কম মেয়ে নিজেদের নাম সই করতে পারত।

বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হবার পর থেকেই মেয়েরা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পুরোপুরি সুযোগ লাভ করেছে। প্রথম অবস্থায় শিক্ষয়িত্রীরা নিজেদের বাড়িতে লেখাপড়া শেখাতেন। ছোট ছোট মেয়েদের শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করবার জন্যে তাদের রুটির তৈরী অক্ষর দেওয়া হোত এবং কোনটা কি অক্ষর বলতে পারলে পুরস্কার স্বরূপ সেগুলো তাদের খেতে দেওয়া হোতো।

সীমান্ত বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে শহরের ছেলে-মেয়েরা অধিকতর দূরত্বের জন্য সহরের কেবলমাত্র একটি স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া শিখতে যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করতে থাকে। এই সময়ে যাতে শহরের প্রতিটি অঞ্চলের ছেলে-মেয়েরা বিদ্যা শিক্ষা করতে পারে তার জন্যে ভ্রাম্যমাণ স্কুলের ব্যবস্থা করা হয়। ভ্রাম্যমাণ স্কুলটি শহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এক এক অঞ্চলে মাসাধিক কাল অবস্থান করে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিদ্যালয়সমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রতিটি শহরকে কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। এই ভাবেই শহরের প্রতিটি অঞ্চলের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেবার চেষ্টা থেকেই আঞ্চলিক বিদ্যালয় স্থাপন পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা হয়। এর পর আরও অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে শিক্ষার ক্ষেত্রে। নতুন পৃথিবীর বীজ এমনি করেই নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত হতে লাগল অঙ্কুরে। মহামহীরূহরূপে আজ দেখা দিয়েছে বিশ্বের দরবারে বিভিন্ন আটচল্লিশটি রাষ্ট্রের একক সত্ত্বা ও অবিচ্ছেদ্য যুক্ততা নিয়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র—আমেরিকা। শিক্ষার স্রোত বয়ে চলেছে সেখানে স্বতস্ফূর্ত্ত নির্ঝরিণী ধারার মত সকলকে প্লাবিত করে। আমেরিকাবাসীর শতকরা আজ আটানব্বই জন শিক্ষিত এবং সে দেশে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা প্রায় দু' হাজার।

একটি জীবন গান

শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

দুয়ারে সানাই বাজে দূর মেঘে সাজে রূপ দল
এ পারে তোমার তৃষ্ণা ওপারে চাতক যাচে জল।
শুরু হোলো জীবনের কলরব
মুছে দাও অতীতের যত সব
শুধু জেগে থাক দু'টি প্রতীক্ষিত স্বপ্নীল আঁখি
পাওয়ার লগন হয়ে এলো, নেই আর বাকী।

তোমার প্রাণের সুরে বেঁধে নিয়ে তার
আগামী প্রহর গোনা সুর থেকে সুরে আরবার
ভুলে ভরা জীবনের এ নূতন পথ পরিক্রমায়
তোমার পথিক মন খুঁজে নিক জীবনের ছায়ায়
আরো এক প্রাণ অন্ত তর গান
আরেকটি দরদী যদি পূর্ণতার সুষমায়
বাজাও প্রাণের বীণ সকল মায়ায়॥

জানতো মেঘের থরে জেগে থাকে অফুরন্ত সোনা
মৃত্তিকার বুকে তার ফসল জাগার স্বপ্ন বোনা
তোমার জীবনেও মূর্ত্ত হোক তার সৃষ্টির নিশানা
একটি প্রাণের সুরে বেঁধে নিয়ে তার হয়ে থাক মনে
মনেই জানা :

অতিক্রান্ত জীবনের মুছে দাও সব কিছু
মুছে দাও কুহেলী স্বপন
এ তুমি আরেক জন, বেঁচে থাক অন্য জন
অফুরন্ত জীবন—যৌবন :
তোমার প্রাণের কবি উঠুক জেগে
স্বপনের তৃষ্ণার কাছে
তোমার জানার পরে আরো কিছু
বহু কিছু জানিবার আছে।



(পূর্বানুবৃত্তি)

গন্ধর্বল থেকে ৩ মাইল এসে ক্ষীর-ভবানী তীর্থে বাস থামলো। কাশ্মীরে হিন্দুদের এটী একটি প্রধান তীর্থ। বিশেষ কোরে স্বামী বিবেকানন্দ এখানে কিছুদিন কাটানয় ও এখানের সঙ্গে তাঁর জীবনের কয়েকটি বিশিষ্ট ঘটনা জড়িত থাকায় বাঙ্গালীদের কাছে ক্ষীর-ভবানীর আকর্ষণ যেন অধিকতর। নৌকা পথেও ক্ষীরভবানী আসা যায়।

তুলামুল্লা গ্রামের একাংশে ক্ষীরভবানীর মন্দির—বেশ শান্ত পরিবেশ। চারিদিকে খালের মধ্যে প্রায় চতুষ্কোণ একটি দ্বীপ—তার মাঝে দেবীর কুণ্ড, মন্দির ও ভোগগৃহাদি। পাথর বাঁধান চত্বরের একদিকে একটী জলকুণ্ড—তার মাঝখানে ছোট মর্ম্মর মন্দির—তীরে মন্দিরে থেকে যাওয়া যায় না, তাই পূজার নৈবিদ্য বা অর্ঘ্য কুণ্ডের জলেই ফেলতে হয়। এখানে ঐ জলই দেবীর মূর্ত্তি, অন্য কোন মূর্ত্তি নাই, দেবীর অন্য নাম রাগনিয়া। এ জায়গাট বেশ প্রাচীন—সংস্কৃত রুদ্রমালা-তন্ত্রে এর উল্লেখ আছে। রাজতরঙ্গিনীতে পণ্ডিত কলহন ক্ষীর-ভবানী-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। অত্যাচারী রাজা জয়াপীড় (৭৫৬-৭৮৪ খৃঃ) অন্যান্য হিন্দুদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তর সঙ্গে যখন তুলামুলার পূজারী ইট্টিলার জায়গীর বাজেয়াপ্ত কোরলেন তখন একদিন তাঁর রাজছত্রের একটি স্বর্ণদণ্ড হঠাৎ পোড়ল তাঁর ওপর এবং সেই আঘাতেই তিনি মারা গেলেন। মুসলমান আমলে অবহেলিত হোয়ে এ তীর্থ প্রায় লুপ্ত হোয়ে যায়। সপ্তদশ শতাব্দীতে আবার কৃষ্ণ পণ্ডিত টাপলু নামে এক ভক্ত এ লুপ্ত তীর্থকে আবিষ্কার কোরে হিন্দু সমাজে প্রচার করেন।

মাঝের কুণ্ডটী থেকে অবিরাম জলধারা উৎসারিত হোয়ে বাইরের নালায় গিয়ে পড়েছে। ক্ষীর অর্থাৎ পায়স এখানের প্রধান নৈবেদ্য—তাই এই জলমূর্ত্তি শাক্ত-দেবীর নাম ক্ষীরভবানী।

কথিত আছে—যে ইনি লঙ্কার রাবণের পূজিতা দেবী ছিলেন। হনুমান এঁকে লঙ্কা থেকে এনে এখানে স্থাপন করেন। দীর্ঘ দিন ধোরে কুণ্ডের জলে পূজার ফুল, নৈবেদ্য জোমে জোমে কুণ্ডটির জলধারা বন্ধ হয়ে যায়। মহারাজা প্রতাপসিংহ কুণ্ডটীর সংস্কার করেন। সে সময়ে ময়লার নীচে আবিষ্কৃত হয়—একটী পুরাতন মন্দিরের ভিত্তি। নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি ও অন্যান্য কারুকার্য্যশোভিত বড় বড় কয়েকখানা পাথরও পাওয়া যায়। মহারাজা প্রতাপসিংহ সেই মন্দিরের ভিত্তির ওপর বর্ত্তমান মার্বেল পাথরের মন্দিরটি নির্ম্মাণ করান (১৮৮৫-১৯২৫ খৃঃ অঃ) এই মন্দিরে ক্রমে শাক্ত ও বৈষ্ণব কয়েকটী দেবদেবীর মূর্ত্তি এখন জায়গা কোরে নিয়েছেন।



কাশ্মীরি রূপসজ্জা

এই জল-তীর্থের বৈশিষ্ট্য এই কুণ্ডের জলের পরিবর্ত্তনশীল রং। কখনও জলের রং লাল হয়; কখনও বেগুনী, কখনও সবুজ, কখনো বা কালো। দেশে মড়ক বা হত্যাকাণ্ড ঘোটবে আশঙ্কা থাকলে এখানের জল ঘন লাল হোয়ে যায়; সবুজ শান্তির পরিচায়ক, কালো সাংঘাতিক জাতীয় বিপদের সূচনা করে, কাশ্মীরে 'কাবালী' অর্থাৎ 'কাবুলী' (আক্রমণকারীদের এরা

কাবুলী বলে) আক্রমণের সময় এখানের জলের রং সত্যিই পরিবর্ত্তিত হোয়েছিল কিনা—অনেককে জিজ্ঞাসা কোরলাম। সকলেই একবাক্যে বল্লেন—জল কালো হোয়ে গিয়েছিল এবং দীর্ঘ ছ'মাস ধোরে তা কালোই ছিল। এখন অবশ্য জলের রং ফিকে সবুজ বোধ হোল। তুলামুল্লা গ্রামের কয়েক মাইলের মধ্যে পাকীস্থানী হামলা যখন এগিয়ে এসেছিল, নারী ও শিশুদের প্রায় সকলেই শ্রীনগর পালিয়ে গিয়েছিল; কেউ কেউ সপরিবারে স্থান ত্যাগ করেন। সে সময় শ্রীনগর পর্য্যন্ত টাঙ্গা ভাড়া ৭৫ ১০০ টাকা উঠেছিল, জাপানের খেলনা বোমার চোটে কোলকাতার পালানর হিড়িক যাঁরা দেখেছেন তাঁরা সত্যিকার আক্রমণের মুখে প্রাণ ভয়ে পলায়নের চড়া মূল্য সহজেই বুঝতে পারবেন। তুল্লামুল্লার অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান—সামান্য কয়েক ঘর মন্দিরের পূজারী—পণ্ডিত।



মা ও মেয়ে

পাকিস্থানী আক্রমণের সময় মুসলমানদের অধিকাংশই তাদের আশু বাড়িয়ে নিমন্ত্রণ কোরেছে এবং হিন্দুদের যথেষ্ট অত্যাচারের ভয় দেখিয়েছে শুনলাম, একদিন পরই গ্রামটী পাকিস্থানের কবলে যাবে এমনি যখন অবস্থা, তখন ভারতীয় সামরিক বাহিনীর মোটর ও বিমানের গর্জ্জনে পাকিস্থানের পঙ্গপাল থমকালো; মুমূর্ষু হিন্দুর দল চমকালো। নিশ্চিন্ত ধ্বংস থেকে তারা কি সত্যই রেহাই পেলো? রেহাই তারা পেলো—কুণ্ডের যে জল ছ'মাস ধোরে—কালো ছিল, তা ধীরে ধীরে আবার সবুজ হোতে শুরু কোরেছে। কুণ্ডের তীরে একটী আচ্ছাদিত আশ্রয় আছে—তার ভেতর যাত্রীরা বোসে কুণ্ডে পূজা দেয়। মন্দির প্রাঙ্গণেই প্রায় কুড়িটী দোকান। পাঁচ আনা থেকে পাঁচ টাকা—দক্ষিণা উপযোগী পূজার ডালী এখানে পাওয়া যায়। পাণ্ডারা লোভী নয়, যার খুসী পূজা কোরবেন—এজন্য পীড়াপীড়ি নাই, পরকালের ভয় দেখান নাই। প্রায় সকল যাত্রীই পূজা কোরলেন, প্রাঙ্গণের একদিকে এক প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি জ্বালিয়ে হোম হচ্ছিল, কেউ হয়ত কোন মানসিক পুরণের জন্যে এ হোম কোরছিলেন, কঠিন পুরাতন রোগীরা এখানে এসে মায়ের স্মরণ নেন—দেবী মাহাত্ম্যে বা স্থানীয় আবহাওয়ার মাহাত্ম্যে এঁরা অধিকাংশই ফল পান শুনলাম। প্রতি অষ্টমী তিথি দেবী পূজার বিশেষ বার; কালীঘাটের কালী বাড়ীয় শনি মঙ্গলবারের মত। জ্যৈষ্ঠ অষ্টমী এবং শিব অষ্টমীতে এখানে বহু যাত্রীর সমাবেশ হয়, চারিদিকের জলের খালগুলি (সিন্ধুর জল থেকেই উৎপন্ন) তখন তীর্থযাত্রীদের ডোঙ্গা, হাউস বোটে পূর্ণ হোয়ে যায়, দান-ধ্যান, বেদমন্ত্র গান, পূজাপাটে চতুর্দ্দিক গম গম করে, পূজার মণ্ডপটীতে কয়েকটী ছবির সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দেরও একটি ছবি রোয়েছে দেখলাম—বোঝা গেল স্বামীজীর সঙ্গে এখানের যোগাযোগ এঁরাও জানেন, ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর পরমযোগী বিশ্ববরেণ্য বৈদান্তিক স্বামী বিবেকানন্দ ক্ষীর-ভবানীতে মায়ের মন্দিরে তপস্যা কোরতে আসেন, কাশ্মীরে আসার পর থেকেই ক্রমে তাঁর মন শুষ্ক জ্ঞানপথ ছেড়ে ভক্তি পথে আসতে আরম্ভ করে এবং নির্গুণ



ডালের একটি শাখায়

ব্রহ্মের বদলে শক্তিময়ী মায়ের পায়ে তিনি স্মরণ নেন, ১৮৯৮ সালের জুন মাসে তিনি কাশ্মীরে আসেন এবং অমরনাথ প্রভৃতি দর্শন কোরে কাউকে কিছু না বোলে অদৃশ্য হোয়ে যান। এই সময়েই স্বামীজী ক্ষীর-ভবানীতে ধ্যান-জপ-পূজা আরতি-ভোগ দ্বারা সাধারণ ভক্তের ন্যায় মায়ের উপাসনা করেন। শক্তি-মন্ত্রে সম্ভবতঃ এখানেই তাঁর পূর্ণসিদ্ধি লাভ ঘটে, কারণ এখান থেকে শ্রীনগর ফিরেই তিনি শিষ্যদের বলেন—"এখন আর হরিওঁ নয়—এখন শুধু মা।" ইতিপূর্ব্বে এই কর্ম্মযোগীর মনের ওপর যে কর্ম্মশক্তির একটা আবরণ পোড়েছিল—এখানে মাতৃমন্ত্রের সাধনায়—তা সরে যায়। এখানে সাধনার সময় "বীরবাণীর" লেখক এই তেজস্বী সন্ন্যাসীর মনে হোয়েছিল—দেবীর এই মন্দির বিধর্ম্মীর অত্যাচারে ধ্বংস হোয়েছিল, তখনকার হিন্দুরা নীরবে এই অত্যাচার সহ্য কোরেছে; প্রতিকারের কিছুমাত্র চেষ্টা করেনি। আমি যদি সে সময় থাকতুম, কখনও এরকম হোতে দিতুম? কখনও এরকম হোতে দিতুম না। প্রাণ দিয়েও মাকে রক্ষা কোরতুম। যখন তিনি এই কথা চিন্তা কোরেছিলেন তখন দৈববাণী

তিনি শুনতে পেলেন 'বিধর্ম্মী বা বিশ্বাসহীনেরা—যদি আমার মন্দিরে প্রবেশ করে, আমার মূর্ত্তি কলুষিত করে—তাতেই বা কি ? তোর তাতে কি ? তুই আমায় রক্ষা কোরেছিস, না আমি তোকে রক্ষা কোরেছি ?

কিন্তু এর পরও চিন্তার স্রোত তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে চোল্ল, তিনি ভাবতে লাগলেন এই জীর্ণ ভগ্ন মন্দিরের বদলে যদি একটা নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা কোরে দিতে পারি ত বেশ হয়। আবার সহসা দৈববাণী শুনে তিনি চমকিত হোলেন—স্পষ্ট শুনলেন মা বোলছেন—"ওরে আমি মনে কোরলে অসংখ্য মন্দির ও মঠ স্থাপন কোরতে পারি। এই মুহূর্ত্তেই এখানে সাত-তলা সোনার মন্দির হোতে পারে।"

এর পর থেকে স্বামীজীর কর্ম্ম স্পৃহা কোমে আসে ; এখান থেকে ফিরে তিনি বোলতেন—"আমার স্বদেশের ভাবনা ভাবার কি দরকার ? আমি ত ক্ষুদ্র ভৃত্য মাত্র।" এ ছাড়াও সাধনা-জগতের অনেক গুহ্য-তথ্য এখানে উপলব্ধি করেন।

পূজা পাঠ সেরে বাসে ফিরতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের চেয়ে একটু বেশী দেরী আমাদের সকলেরই হোয়েছিল। বাসে ৩।৪ জন ছোকরা, সম্ভবতঃ অহিন্দু, এজন্য আমাদের প্রতি—বিশেষ ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটূক্তি কোরল, এর ফলে উভয় পক্ষে বেশ একটু কথান্তর হোয়ে মনান্তর ঘোটল। শুনলাম ইতিপূর্ব্বে অন্য দিন এঁরা আমাদের সহযাত্রীদের অনেকের সঙ্গে অন্য জায়গায় অত্যন্ত অভদ্রতা কোরেছিল ; কিন্তু আজ আমাদের অর্থাৎ বাঙ্গালীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। গরিষ্ঠতার গুণে এই গণতন্ত্রের আবহাওয়ায় আমাদের দাবীই তাদের মানতে হবে—আমাদের ভাবটা ছিল এই রকম। গান্ধীজীর কৃপায় এই অহিন্দুরাও সংখ্যালঘিষ্ঠতার জন্যই তাদের দাবীর বিষয়ে সজাগ বেশী, কাজেই তারাও ঠিক কোরলেন পরবর্ত্তী দ্রষ্টব্য মানস-বলের প্রাকৃতিক দৃশ্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের দ্বিগুণ সময় ধোরে দেখবেন। বাসের মধ্যেই আবহাওয়াটা সেই শীতের মধ্যেও বেশ গরম হোয়ে উঠলো।

কিছুদূর এসে ছোট একটা পাহাড় চড়াই সুরু হোল। আগটেও পাহাড়ের মাথা পেরিয়ে চোখে পোড়ল "মানসবল হ্রদ" (শ্রীনগর থেকে ১৮ মাইল)। একটু নেমে গিয়ে হ্রদের তীরে বাস দাঁড়াল। চারিদিকে পাহাড়-ঘেরা এটি একটি প্রায় গোলাকার হ্রদ ; ব্যাস হবে প্রায় ৩।৪ মাইল। বর্ষায় ও বসন্তে এর শোভা না কি অতুলনীয়, গভীর নির্ম্মল জলে তখন ফোটে অজস্র পদ্ম। রাশি রাশি কমলের শোভা সৌন্দর্য্য-পিপাসুকে এখানে আকর্ষণ করে। জল এত স্বচ্ছ যে তল-দেশের পাথরের নুড়িগুলি পর্য্যন্ত দেখা যায়। জলের উৎস হোল হ্রদের অভ্যন্তরীণ বহু ঝরণা। উদ্বৃত্ত উৎসারিত জল "সম্বলে" গিয়ে বিতস্তার জলে নিজেকে উজাড় কোরে দিচ্ছে। এর তীরে মাটীর মধ্যে অর্দ্ধপ্রোথিত একটী হিন্দু-মন্দির এবং নুরজাহানের মনোরঞ্জনের জন্য জাহাঙ্গীরের তৈরী দারোগা-বাগ বাগানের ধ্বংসাবশেষ আছে। কিছুদূরে একটী মুসলমান ফকিরের গুহা আছে। এগুলি আমরা দেখতে যাই নাই। এখন শতদল নাই, আছে শুধু শান্ত স্বচ্ছ জলে তাদের পাতাগুলি ; পদ্মের সময় শেষ হোয়েছে। কাজেই আশানুরূপ শোভা আমরা দেখতে পাই নাই। বাসের বিরোধী দলও বিশেষ চেষ্টা কোরে এই শোভায় বেশীক্ষণ মন নিবিষ্ট কোরতে পারলেন না। অবশ্য এখানে ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় মিষ্টি কথায় এঁদের সঙ্গে আপোষ কোরলেন—একদিনের যাত্রাপথের সহযাত্রী আমরা—কি প্রয়োজন মনোমালিন্যে ? পরস্পরের সুখসুবিধা দেখতে হবে বৈকী, এবং আমাদের দেরীটা একটু বেশীই হোয়েছে। এর পর আর ঝগড়া থাকতে পারে না। আবার গল্প-গুজবে হাসি-ঠাট্টায় বাস গুঞ্জরিত হোয়ে উঠলো। বাস এরপর পাহাড়ের গায়ে গায়ে চল্‌লো।

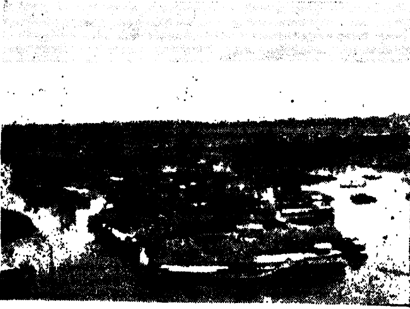
রাস্তার ধারে বহু বেদানার গাছ—আপনা-আপনি জন্মেছে, আমাদের গ্রাম্য রাস্তার ধারে বনকুলের গাছের মত। বেদানা বহু ধোরে আছে, এখন পাকছে। সেপ্টেম্বর অক্টোবরে কাশ্মীর উপত্যকা ফলে ফুলে ভোরে ওঠে। শরতের কাশ্মীর ভরা-যৌবনা, তার অন্তরের সমস্ত রস বিচিত্র রঙে রূপে বাইরে উছলে পড়ে। আপেল, নাসপাতি, বাগুগোসা, আলুবখরা, পিচ, আখরোট এ সময়ে অজস্র ফলে। বাদাম, পেস্তাও দুর্লভ নয়।



ডালের বুকে উইলোগাছের কোলে নৌ-গৃহের সারি

শ্যামল প্রান্তরে বিভিন্ন উদ্যানে বিচিত্র বর্ণের পুষ্পপল্লবের প্রাচুর্য্য সকল সময়ে না থাকলেও অভাব থাকে না। ক্রমে হরমুখ পর্ব্বতের গায়ে বেশ উঁচুতে বাস উঠল—অনেকখানি নীচে উলার হ্রদের জল দেখা গেল। কিন্তু হায় কোথায় উলারের কাজল জল, কোথায় বা পদ্মবনে ভ্রমরের গুঞ্জন ! তীরের কাছে উলুখাগড়ার মত বড় বড় ঘাস ; বহুদূর পর্য্যন্ত জল শুকিয়ে পাঁক বেরিয়ে গেছে—তার মাঝে মাঝে খাল কাটা, তার ভেতরই ছোট ছোট নৌকা চলাচল করে। এ ম্লান সৌন্দর্য্য দেখতে এতদূর পথশ্রম পণ্ডশ্রম বোলেই বোধ হোল। উলারকে অনেকখানি বেড়ে বাস থামলো বন্দীপুরা সহরে। রাস্তার দু'ধারে দোকানপাট, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস আছে, কাজেই ছোটখাট সহর। এখান থেকেই গেছে গিলগিট গিরিবর্ত্মের পথ। কাশ্মীরের উত্তরে কারাকোরাম পর্ব্বতমালার দুর্লঙ্ঘ্য বেষ্টনীর ভেতর এই একটী মাত্র দ্বার, সারা কাশ্মীর তথা ভারতকে উন্মুক্ত কোরে দিয়েছে মধ্য-এশিয়ার দিকে। এই পথেই অতীতে শক হুন ভারতে এসেছে। এই দরজাটী দখলে

রাখার জন্যই ইংরেজ চেয়েছিল কাশ্মীরকে করায়ত্তে রাখতে এবং আজও পাকিস্থানের পেছনে ইংরেজ-আমেরিকানদের যে উস্কানি—তাও এই পথটার ওপর ওদের আধিপত্য অটুট রাখার জন্যে; পাকিস্থানকে আমেরিকা সামরিক সাহায্য দেবে বলায় রাশিয়ার রাগও এই পথটার জন্য। বন্দীপুরা থেকে ট্রেগবল, গুরেজ, বুর্জিল গিরিসংকট, এ্যাসটর, বুনজী, হোয়ে গিলগিট যেতে হয় (বন্দীপুরা থেকে ১৯৩½ মাইল, শ্রীনগর থেকে ২২৮ মাইল)। এ পথে যেতে হোলে পূর্ব্বেও সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন ছিল, এখন ত এটী পাকিস্থানী এলাকায়। আজ যুদ্ধবিরতি সীমারেখা যেখানে টানা হোয়েছে তাতে জম্মুকাশ্মীর রাজ্যের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ পাকিস্থানের পকেটে গেছে, অবশ্য একথা ঠিক যে তার প্রায় অধিকাংশই পর্ব্বতসঙ্কুল। বন্দীপুরা থেকে প্রায় সমতল দিয়ে বাস অনেকখানি এসে ছোট একটী পাহাড় চড়াই কোরল, বাঁয়ে পাহাড়ের মাথায় শঙ্করাচারিয়া মন্দিরের ধরণের একটি মন্দির, তার নিচেই উলার



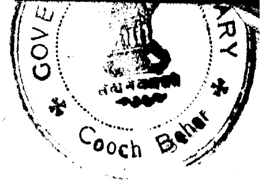
ডালের তীরের একাংশ

—হঠাৎ ভ্রম হয় জলের ধারে শঙ্করাচারিয়া পাহাড়ের কোলেই ফিরে এসেছি নাকি! এ পাহাড়টীর নাম স্কুর-উদ্দীন, উচ্চতা ৭০০ ফিট; পাহাড়ের মাথার মন্দিরটী স্কুর—উদ্দীনের জিয়ারাৎ। উলারের পশ্চিমে এই পাহাড়টীর মাথায় দাঁড়ালে উলারের অনেকখানি আয়তন চোখে পড়ে; এদিকের জল কিছু গভীর। ভারতের মধ্যে ত বটেই—সম্ভবতঃ এশিয়ার মধ্যে উলারই হোল সবচেয়ে বড় সুস্বাদু জলের হ্রদ। গ্রীষ্মের প্রথম দিকে লম্বায় এটী প্রায় ১৫ মাইল, অবশ্য পরে (শরৎকালে) জল অনেক কমে যায় এবং তখন ধারগুলি আগাছায় ভরে যায়; মশাও হয় প্রচুর। বিতস্তা নদী উলারের এক ধারে ঢুকে অন্যধার দিয়ে বেরিয়ে বারামুলা হোয়ে নীচে নেমে গেছে, কাজেই হ্রদের জল একেবারে আবদ্ধ নয়—বহমান।

উলারের কোলে তাঁবু ফেলে তার স-কমল শোভা দেখতে হোলে এপ্রিল-মে মাসই প্রকৃষ্ট সময়। ওয়াটলাব, টারমিমনা, কুনম, ডাচিগাম্ প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁবুতে বা হাউসবোটে এসময় বেশ লাগে। বন্দীপুরা থেকে গিলগিটের পথে ১০ মাইল দূরে ট্রেগবল গ্রামটী থেকে সমস্ত উলার দেখা যায়, এখানে একটী ডাকবাংলা আছে। শরৎকালে জল অনেকখানি কমে যায়, কাজেই কমল-শোভাও যায় শুকিয়ে। পদ্ম ছাড়া এর জলে পানিফল হয় প্রচুর, আর হয় মাছ। উলারের সুস্বাদু মাছ শ্রীনগরের বাজারেও বিক্রী হয়, এখানে খেয়া জাল দিয়ে সাধারণতঃ মাছ ধরে না। স্বচ্ছ জলে মাছগুলিকে বর্শা বিদ্ধ কোরে নৌকায় তোলা হয়, অথবা ছোট ছোট গোলাকার জাল বা ছিপ দিয়ে মাছ ধরে। কোর্স, মাহশীর ও ট্রাউট সাধারণতঃ এই তিন রকম মাছ এখানে পাওয়া যায়। শ্রীনগরের শীকার বিভাগ থেকে (Game Warden) দৈনিক সাত থেকে ১০৲ টাকা (বা সপ্তাহে ত্রিশ টাকা) দক্ষিণা দিয়ে মাছ ধরার লাইসেন্স নিয়ে মৎস্য-শীকারীরা এখানে মাছ ধোরতে পারেন। বলা বাহুল্য মাছ ধরার সব সরঞ্জামই ভাড়ায় সরবরাহ করার ব্যবস্থা শ্রীনগরে আছে। মাছধরার সরকারী সময় হোল এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর। আগষ্ট ও সেপ্টেম্বরেই সুস্বাদু মাহশীর মৎস্য মেলে। শ্রীনগরে আমরা কয়েকদিনই এই মাছ খেয়েছিলাম। উলার ও বন্দীপুরা ছাড়া সিন্ধু উপত্যকা, লীদার উপত্যকা, গুরেজ, কুলগাম্ প্রভৃতির নদীতেও মাছ প্রচুর পাওয়া যায়। মাছ-শীকারীদের বলে রাখা ভাল যে সিন্ধু, লীদার কিষণগঙ্গা প্রভৃতির খরস্রোতে ছিপ সূতা শক্তপোক্ত দরকার। কোকরনাগ, ভেরীনাগ, আচ্ছাবল প্রভৃতির ছোটখাটো নদীগুলিতে সাধারণ ছিপেই কাজ চলে। টাটকা ছাড়াও মাছ শুকিয়ে খাওয়ারও রেওয়াজ কাশ্মীরে আছে। শীতকালে চতুর্দ্দিক থেকে বহু জলচর পাখী উলারের জলে এসে বাসা বাঁধে। গ্রীষ্মে ও শরতে আসে শত শত বুনো হাঁস (duck), কাজেই নিরীহ পাখী শিকার কোরে যাঁরা আনন্দ পান তাঁরা সে সময় এখানে যথেষ্ট "গেমস্" পাবেন। এর সরকারী "সিজ্‌ন" সেপ্টেম্বর থেকে এপ্রিল। বাঘ ভালুক মারবার সখ ও সাহস যাঁদের আছে, তাঁদের "সিজ্‌ন" পনেরই সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ই মার্চ্চ। কাল ও লাল ভালুক, চিতাবাঘ, কস্তুরী মৃগ, হরিণ, নেকড়ে এবং ঐ জাতীয় নানা শীকার জম্মু ও কাশ্মীরে মেলে। ভারতের লাইসেন্স-ওয়ালা বন্দুকেই কাজ চলে। টোটাও এখান থেকে সঙ্গে নেওয়া ভাল। শীকারের জায়গায় সরকারী লাইসেন্সওয়ালা "গাইড" পাওয়া যায়। আর সরকারী দপ্তরকে লিখলে বা জিজ্ঞাসা কোরলে অন্যান্য সব খবর এমনকি প্রত্যেক জায়গায় থাকার জন্যে ডাকবাংলা অথবা তাঁবু ফেলার জায়গার ব্যবস্থা কোরে দেয়; অবশ্য মূল্য বিনিময়ে—কারণ কাশ্মীর রাজ্যের আয়ের একটা মোটা অঙ্ক আসে ভ্রমণকারীদের কাছ থেকে। অর্থবিদদের ভাষায় এরা হলেন—"পরোক্ষ রাজস্বসূত্র।"—

ক্রমশঃ





প্রতিবাদ *

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

গত আষাঢ় (১৩৬১) সংখ্যার ভারতবর্ষে "ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শরৎ-পরিচয়" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীগোপালচন্দ্র রায় ব্রজেন্দ্রবাবুর শরৎ-পরিচয় পুস্তকের কয়েকটি সিদ্ধান্ত খণ্ডিত করতে গিয়ে আমার বিরুদ্ধেও কয়েকটি উক্তি করেছেন, তৎসম্পর্কে আমার সামান্য প্রতিবাদ আছে।

আমার বিরুদ্ধে গোপালবাবুর প্রধান অভিযোগ এই যে, শরৎচন্দ্রের এফ্-এ পরীক্ষা না দিতে পারার আমি যে কাহিনী ব্রজেন্দ্রবাবুকে দিয়েছি সেটা বিশ্বাস্য নয়; পরন্তু শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট হ'তে তিনি যে কাহিনী শুনেছেন, সেইটেই বিশ্বাসযোগ্য।

আমার কাহিনী সম্বন্ধে তিনি এইরূপ লিখেছেন—

"এবার ব্রজেনবাবু যে বলেছেন—শরৎচন্দ্র টাকার অভাবে পরীক্ষা দিতে পারেন নি, একথা ভিত্তিহীন। আসলে ঐ 'অপ্রীতিকর ঘটনা' অর্থাৎ নকল করতে গিয়ে ধরা পড়ার ফলেই পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি পাননি—ব্রজেনবাবুর এই মত সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক্। শরৎচন্দ্র যে নকল করতে গিয়ে ধরা পড়েছিলেন, ব্রজেনবাবু কোথা হ'তে এ কথা জানলেন, তাঁকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছ থেকে তিনি এ কথা জেনেছেন।"

গোপালবাবুর উক্তি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, আমার সম্বন্ধে এই কথা প্রকাশ করবার পূর্বে তিনি যদি আমার দ্বারা এই উক্তিটি যাচাই ক'রে নিতেন—অর্থাৎ ঠিক কি বিবৃতি ব্রজেনবাবুকে আমি দিয়েছিলাম, আমি নিজ মুখে দিয়েছিলাম, অথবা অপর কাহারো দ্বারা আমার কাছ থেকে তিনি সে বিবৃতি পেয়েছিলেন ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করতেন,—তাহ'লে তাঁর কাজ অনেক সহজ এবং মজবুত হ'ত। আমরা উভয়ে একই সহরে বাস করি, আমার নিকট তিনি অনুগ্রহ ক'রে সর্বদাই যাতায়াত করেন, একবার যদি তিনি তদবসরে এ বিষয়ে আলোচনা করতেন, তাহ'লে হয়ত সুরেন্দ্রবাবুর মুখে শোনা কাহিনী এবং ব্রজেন্দ্রবাবুর মুখ হ'তে শোনা তথাকথিত আমার কাহিনীর মধ্যে একটা মোটামুটি সামঞ্জস্য খুঁজে পেতেন, এবং সে সামঞ্জস্যের সহিত শরৎচন্দ্র বিজ্ঞান বিষয়ে ভাল ছেলে ছিলেন, এ কথারও কোনও বিরোধই থাক্‌তনা; এবং তাহ'লে সম্ভবতঃ গোপালবাবু অনেক নিরর্থক গবেষণা হ'তে রক্ষা পেতেন।

বহুদিন হ'তে একটা কথা সময়ে সময়ে শোনা যায়, এমন কি পড়াও যায় যে, শরৎচন্দ্র অর্থাভাবের জন্য এফ্-এ পরীক্ষা দিতে পারেন নি; আর ভাগলপুর যখন শরৎচন্দ্রের মাতুলালয়—তখন তাঁর মামারা এফ্-এ পরীক্ষা দেওয়ার ফি সামান্য পনেরটা টাকা যখন দেননি, তখন তাঁরা লোক ভাল ছিলেন না। শরৎচন্দ্রের মাতুলদের বিরুদ্ধে এই অকারণ অপবাদ স্খালনের জন্য আমি একটি প্রবন্ধে লিখে দেখিয়েছিলাম যে, কুমার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শরৎচন্দ্রের ধনী ও সহৃদয় বন্ধুরা অনায়াসে ফি-এর সামান্য অর্থ, এমন কি মাস চারেকের সামান্য কলেজ-ফি পর্যন্ত দিতে পারতেন; এবং সেই সম্পর্কে আমি আমার প্রবন্ধে বলেছিলাম, অর্থের অভাবে শরৎচন্দ্র এফ্-এ পরীক্ষা দিতে পারেন নি সে কথা ঠিক নয়, কি কারণে দিতে পারেন নি সে কথা অবান্তর।

যে কথাকে আমি অবান্তর কথা ব'লে অনুক্ত রেখেছি, এবং ব্রজেন্দ্রবাবু 'অপ্রীতিকর ঘটনা' ব'লে ছেদ টেনেছেন, সেই পঙ্কিল প্রসঙ্গে গোপালবাবু খোলাখুলি অবতরণ করেছেন। পঙ্কে অবতরণ অবশ্য নিন্দনীয় নয়, যদি সে পঙ্ক থেকে সত্যসত্যই কোনো মূল্যবান পঙ্কজিনী আহরণ করা যায়। এবার দেখা যাক্ সুরেন্দ্রনাথের যে কাহিনীকে বিশ্বাসযোগ্য বিবেচনা ক'রে গোপালবাবু সন্তুষ্ট হয়েছেন, সে কাহিনী প্রথমতঃ গঠনতঃ (prima facie) বিশ্বাসযোগ্য কি-না, এবং দ্বিতীয়তঃ, বিশ্বাসযোগ্য ব'লে স্বীকার ক'রে নিলেও তা থেকে তিনি কোন্ মূল্যবান বস্তু লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছ থেকে গোপালবাবুর শোনা কাহিনীর যে টুকু অংশ বর্তমান আলোচনার জন্য প্রয়োজন তা এইরূপ—

"বিজ্ঞানের পরীক্ষার দিন শরৎচন্দ্র একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে বসলেন। শরৎচন্দ্র বিজ্ঞানের খুব ভাল ছাত্র ছিলেন। বিজ্ঞানের পরীক্ষার দিন শরৎচন্দ্র প্রায় অর্ধেক সময়ের মধ্যেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর লিখে দিয়ে বেরিয়ে এলেন। (অথবা পরীক্ষা দিতে দিতেই কোনো অজুহাতে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে এসেছিলেন।)

"পরীক্ষার হলে শরৎচন্দ্র দেখেছিলেন যে, তাঁর কটি বন্ধু ভাল লিখতে পারছেন না। তাই তিনি বেরিয়ে এসে কলেজ কম্পাউণ্ডেরই সংলগ্ন হোস্টেলে গিয়ে কাগজের স্লিপ ক'রে তাতে উত্তর লিখে দরোয়ানের হাত দিয়ে পরীক্ষার হলের মধ্যে পাঠিয়ে দিতে লাগলেন। দরোয়ান অবশ্য শরৎচন্দ্রের শেখানো মত গার্ডের চোখ এড়িয়েই, শরৎচন্দ্র যাকে যাকে দিতে বলেছিলেন, তাদের কাছেই স্লিপ পৌঁছে

---

* গত আষাঢ় সংখ্যা ভারতবর্ষে শ্রীগোপালচন্দ্র রায় লিখিত "ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শরৎ-পরিচয়" প্রবন্ধের প্রতিবাদ।

কোন লেখার প্রতিবাদ আসিলে আমরা মূল লেখককে সেই প্রতিবাদ দেখাইয়া থাকি। আমাদের এই প্রথা অনুযায়ী উপেনবাবুর প্রতিবাদটি গোপালবাবুকে দেখানো হইলে তিনি প্রতিবাদের একটি উত্তর দিয়াছেন। উত্তরটি সুদীর্ঘ। তাই প্রতিবাদ ও উত্তর একসঙ্গে প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। আগামী সংখ্যায় গোপালবাবুর উত্তর প্রকাশিত হইবে। [ভাঃ সঃ]

দিচ্ছিল। কিন্তু সে ঘন ঘন যাতায়াত করতেই গার্ডের সন্দেহ হয়। বিজ্ঞানের অধ্যাপক সারদা ভট্টাচার্য নিজেই গার্ড দিচ্ছিলেন। দরোয়ানের উপর তাঁর সন্দেহ হওয়ায়, দরোয়ান যখন বেরিয়ে যায়, তার অনুসরণ ক'রে তিনি হোস্টেলে গিয়ে দেখেন—শরৎচন্দ্র দিব্যি ব'সে ব'সে স্লিপে উত্তর লিখছেন।

"সারদাবাবু শরৎচন্দ্রকে হোষ্টেল থেকে কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কাছে ধরে নিয়ে এলেন। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন তখন শান্তিপুর-নিবাসী হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। তিনি অত্যন্ত নীতিবাগীশ লোক ছিলেন। শরৎচন্দ্রের এই অন্যায় কাজের জন্য তিনি শরৎচন্দ্রকে টেষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ঘোষণা করবেন না ব'লে স্থির করলেন। টেষ্ট পরীক্ষার ফল বেরুল। সব ছেলেই পরীক্ষা দেবার অনুমতি পেল। পেলেন না কেবল শরৎচন্দ্র।.........হরিপ্রসন্নবাবু জানতেন যে, শরৎচন্দ্র পড়াশুনায় ভাল ছেলে। পরীক্ষা দিলে পাস করবেনই। তাই তিনি কলেজের সম্মানের কথাটাও ভাবছিলেন। এইভাবে অনেক চিন্তা ক'রে পরীক্ষার ফি জমা দেবার আগের দিন, কি সেই দিন, হরিপ্রসন্নবাবু শরৎচন্দ্রকে ডাকালেন। শরৎচন্দ্র এলে হরিপ্রসন্নবাবু তাঁকে ফির টাকা এনে জমা দিয়ে যেতে বললেন।

"শরৎচন্দ্র বাড়ীতে ফিরে গিয়ে তাঁর পিতাকে টাকার কথা বললেন। শরৎচন্দ্রের পিতা অমনিই ত বেকার ও ঘোরতর অভাবী। হঠাৎ এক সঙ্গে পরীক্ষার ফি এবং ঐ সঙ্গে দেয় ক মাসের কলেজের মাইনের টাকা পান কোথায়? তিনি সমস্ত টাকা জোগাড় করতে পারলেন না। শ্বশুর বাড়ি থেকে চ'লে আসায় তিনি সেখানেও আর কারো কাছে টাকা চাইতে গেলেন না। ফলে শেষ পর্য্যন্ত টাকা জোগাড় না হওয়ায় শরৎচন্দ্র পরীক্ষার ফি আর জমা দিতে পারলেন না।

* * *

"যাই হোক, শরৎচন্দ্রের এফ-এ পরীক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারে সুরেনবাবু ও উপেনবাবুর কথার মধ্যে সুরেনবাবুর কথাই নির্ভরযোগ্য ব'লে আমি মনে করি। উপেনবাবুর কথার মধ্যে জায়গায় জায়গায় যে সামঞ্জস্য নেই, ইতিপূর্বে আমি তা আলোচনা করেছি।

"সুরেনবাবু এবং উপেনবাবু উভয়েই শরৎচন্দ্রের সম্পর্কীয় মাতুল। আর উভয়েই তখন অল্পবয়স্ক হলেও সুরেনবাবুই বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তা'ছাড়া সুরেনবাবু এই সময়ে ভাগলপুরেই থাকতেন, কিন্তু উপেনবাবু এই সময়ে ভাগলপুরে ছিলেন না। তিনি তখন অন্যত্র তাঁর অভিভাবকদের-কাছে থেকে লেখাপড়া করতেন।"

(ভারতবর্ষ—আষাঢ় ১৩৬১, পৃষ্ঠা ৪১-৪২)

প্রথমত: একে একে পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক, উল্লিখিত গল্পটির গঠন এমন যুক্তিপূর্ণ ও পরীক্ষাসহ কি-না যাতে গোপালবাবু সেটিকে "নির্ভর-যোগ্য" ব'লে গ্রহণ করতে পেরেছেন।

১। "পরীক্ষার হলে শরৎচন্দ্র দেখেছিলেন যে, তাঁর কটি বন্ধু ভাল লিখতে পারছেন না।" কটি অর্থে একটি নিশ্চয়ই নয়; দুটিও নয়, কারণ দুটি এত সহজে লক্ষ্যণীয় সংখ্যা যে দুটি হ'লে আমরা ক'টি না ব'লে দুটি বন্ধু লিখতে পারছে না বলি। ক'টি আরম্ভ হয় ন্যূনতম সংখ্যা তিনটি থেকে। সে যাই হোক, গোপালবাবুর গল্পটিকে আঠার আনা সুযোগ দেবার অভিপ্রায়ে ধরা গেল ক'টি বন্ধু অর্থে দুটি বন্ধু।

তা হ'লে দেখা যাচ্ছে শরৎচন্দ্র প্রশ্নের উত্তর লিখতে লিখতে ঘন-ঘন লক্ষ্য করছিলেন তাঁর দুটি "বন্ধু ভাল লিখতে পারছে না।" কে কোন কোন প্রশ্ন ভাল লিখতে পারছে না সেটা নিজের আসনে ব'সে দূর থেকে নিরূপিত করা যায় না। সুতরাং "প্রায় অর্ধেক সময়ের মধ্যেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর লিখে দিয়ে", অথবা "পরীক্ষা দিতে দিতেই কোনো অজুহাতে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে" আসবার পূর্বে নিশ্চয়ই তাঁকে দুই বন্ধুর সীটে একাদিক্রমে উপস্থিত হ'য়ে কে কোন প্রশ্ন "ভাল লিখতে পারছে না" তা লিখে নিতে, অথবা জেনে নিয়ে মনের মধ্যে মুদ্রিত ক'রে নিতে হয়েছিল।

এ কার্য করতে, ধরা যাক্, দুই আর দুয়ে চার মিনিট সময় লেগেছিল। এই সময়ে "বিজ্ঞানের অধ্যাপক সারদা ভট্টাচার্য নিজেই গার্ড দিচ্ছিলেন।" এই চার মিনিটটাক সময়ে শরৎচন্দ্র তা হ'লে সারদা ভট্টাচার্যের চক্ষুতে অদৃশ্য হয়ে রইলেন। ধরা যাক, নিশ্চয়ই রইলেন, নতুবা পরবর্তী ঘটনাবলি ঘটে কেমন করে? এবার পরবর্তী ঘটনাটি পরীক্ষা করে দেখা যাক্।

২। "তিনি (শরৎচন্দ্র) বেরিয়ে এসে কলেজ কম্পাউণ্ডেরই সংলগ্ন হোস্টেলে গিয়ে কাগজের স্লিপ ক'রে তাতে উত্তর লিখে দরোয়ানের হাত দিয়ে পরীক্ষার হলের মধ্যে পাঠিয়ে দিতে লাগলেন। দরোয়ান অবশ্য শরৎচন্দ্রের শেখানো মত গার্ডের চোখ এড়িয়েই, শরৎচন্দ্র যাকে যাকে দিতে বলেছিলেন, তাদের কাছেই স্লিপ পৌঁছে দিচ্ছিল। কিন্তু সে ঘন ঘন যাতায়াত করতেই গার্ডের সন্দেহ হয়।"

দরোয়ান গার্ডের চোখ এড়িয়েই স্লিপ পৌঁছে দিচ্ছিল, অথচ সে ঘন ঘন যাতায়াত করতেই গার্ডের সন্দেহ হয়। দরোয়ানের গার্ডের চোখ এড়ানো, আর তার ঘন ঘন যাতায়াত করাতে গার্ডের সন্দেহ হওয়া—এ দুই পরস্পরবিরোধী ব্যাপার কি ক'রে এক পাত্রের মধ্যে অবস্থান করে তা বোঝা শক্ত! এ তুচ্ছ ব্যাপার না-হয় উপেক্ষাই করলাম।

কিন্তু কলেজের দরোয়ানটি এক অদ্ভুতভাবে উদ্ভুটে মানুষ! সাজ্যাতিকভাবে উপচিকীর্ষু, অতি অনায়াসে নমনীয়, আর অবিশ্বাস্য-মাত্রায় নিজের ইষ্টানিষ্ট সম্বন্ধে উদাসীন। যে কাজে ধরা পড়লে শুধু অর্থদণ্ডই নয়, চাকরী থেকে বরখাস্ত হবার আশঙ্কাও আছে, সেই অতি-গর্হিত বিধিনিয়মলঙ্ঘিত অপকর্মে সে যাতায়াত করে একবার নয়, দুবার নয়,—ঘন ঘন! ক্রোধোন্মত্ত প্রিন্সিপালের রক্তনেত্রের আশঙ্কা উপেক্ষা ক'রে একটি পরীক্ষার্থীর "শেখান মত" নিজেকে অকারণে ঘোরতর বিপন্ন করে!

বিপুল এই পৃথিবী, বিচিত্র মনুষ্যচরিত্র,—কিন্তু তাই ব'লে এতখানি যা-নয়-তা?

৩। দরোয়ানের মত অতটা না হ'লেও, গার্ড সারদা ভট্টাচার্য মহাশয়কেও এই গল্পে কম অদ্ভুত করা হয় নি।

গল্পে বলা হয়েছে,—"কিন্তু সে (দরোয়ান) ঘন ঘন যাতায়াত করতেই গার্ডের সন্দেহ হয়।" প্রথম বারে কিম্বা দ্বিতীয় বারে সন্দেহ হয়নি, বোধকরি সারদাচরণ অন্যমনস্ক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন ব'লেই। ঘন ঘন যাতায়াত করতে তবে সন্দেহ হয়। কিন্তু সন্দেহ যখন হ'ল, তখন তিনি একশ' জনের মধ্যে একশ' জন যা করত, তা করলেন না; অর্থাৎ হাতে-নাতে (red-handed) ধ'রে পরীক্ষার্থীদ্বয়ের এবং দরোয়ানের বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন না। গল্পে একটা নাটকীয় পরিণতি সৃষ্টির সরস উদ্দেশ্যে "দরোয়ান যখন বেরিয়ে যায়, তার অনুসরণ ক'রে তিনি হোস্টেলে গিয়ে দেখেন, শরৎচন্দ্র দিবিা ব'সে ব'সে স্লিপে উত্তর লিখছেন।"

এইখানে গল্পের Climax গেল। কিন্তু সর্বশেষে একটা ছোটখাট anti-climaxও আছে।

৪। এই anti-climax-এর সৃষ্টি হয়েছে প্রিন্সিপাল হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের আচরণে। তিনি শরৎচন্দ্রকে ফি জমা দেবার অনুমতি দিলেন—একেবারে জমা দেবার শেষ দিনে কিম্বা আগের দিনে। কয়েক দিন আগে অনুমতি দিলে গল্পের পক্ষে অসুবিধার কারণ হোত। কারণ তা হ'লে টাকাটা জোগাড় করবার সময় পাওয়া যেত।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের পিতা "সমস্ত টাকা জোগাড় করতে পারলেন না। শ্বশুর বাড়ি থেকে চ'লে আসায় তিনি আর সেখানেও কারো কাছে টাকা চাইতে গেলেন না।"

এ বিষয়ে দুটি বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ সমস্ত টাকা যোগাড় করতে না পারলেও শরৎচন্দ্রের পিতা যদি শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি পনেরো টাকা জমা ক'রে দিতেন, আর কয়েক মাসের কলেজ ফি দিন দশ-পনেরো পরে দেবার প্রতিশ্রুতি দিতেন, তাহ'লে তেমন প্রস্তাবে সহৃদয় হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় নিশ্চয় সম্মত হতেন। দ্বিতীয়তঃ, এমন একটা প্রয়োজনীয় কারণে শরৎচন্দ্রের পিতা গাঙ্গুলী পরিবারে কারো কাছে টাকা চাইতে গেলেন না কেন? শরৎচন্দ্রের আপন মাতুল বিপ্রদাস, যিনি শরৎচন্দ্রের এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেবার ফি গুলজারিলালের কাছ থেকে দেনা ক'রে জুটিয়েছিলেন, তিনি স্বয়ং এবং সুরেন্দ্রনাথেরা সে সময়ে ভাগলপুরে ছিলেন। এমন জরুরি অর্থের জন্য তাঁদের কাছে না যাবার মত মনোমালিন্যের কোনও বাধা ছিল না। তাছাড়া এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন হচ্ছে,—যে ব্যক্তি, তা সে বিপ্রদাস, সুরেন্দ্রনাথেরা অথবা অপর যে কেহই হোন্‌না কেন, যিনি দু বৎসর শরৎচন্দ্রের কলেজের ফি এবং বই-খাতা-পত্রের মূল্য জুগিয়েছিলেন, শেষ রক্ষা না ক'রে তিনি হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়েছিলেন?

উপরে যে চারটি বৃহৎ ছিদ্র দেখালাম সে ছিদ্রগুলি অতিক্রম ক'রে গল্পের পাত্রে বিশেষ-কিছু সারবস্তু অবশিষ্ট থাকবে কি?

আচ্ছা, তর্কের খাতিরে মেনেই নেওয়া যাক্‌ "নির্ভরযোগ্য"—সঙ্গতির সিমেণ্টে সমস্ত কাহিনীটি একেবারে জমাট। এখন দেখা যাক্‌, এই জমাট দেহ হ'তে কোন্‌ সান্ত্বনার রস গোপালবাবু আহরণ করতে সমর্থ হয়েছেন।

পরীক্ষার দিন শরৎচন্দ্র যে স্লিপ লিখে লিখে তাঁর "ক'টি বন্ধুকে" পরীক্ষার হলে পাঠাচ্ছিলেন এমন ঘটনা নিশ্চয়ই অসাধারণ; অর্থাৎ এমন ঘটনা সাধারণতঃ ঘটে না। অন্ততঃ আমার ছাত্রজীবনে এবং পরবর্তী দীর্ঘজীবনে আমি ত' একটিও ঘটতে শুনিনি। এই অসাধারণ ঘটনা শরৎচন্দ্র না ঘটালেও পারতেন; আর, তাহ'লে যথাসময়ে তিনি টেষ্ট্‌ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেন এবং তাঁর পিতা প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য সময় পেতেন। সুতরাং গোপালবাবুর মনোনীত গল্প হ'তে দেখা যাচ্ছে শরৎচন্দ্র যে এফ-এ পরীক্ষা দিতে পারেননি তার কারণ, অন্ততঃ মুখ্য কারণ, তিনিই উক্ত অসাধারণ ঘটনার দ্বারা সৃষ্টি করেছিলেন।

এবার শরৎচন্দ্রের পিতার অর্থাভাবের কথাটা বিবেচনা ক'রে দেখা যাক্‌।

তিন পুত্র ও এক কন্যা সহ শরৎচন্দ্রের পিতা তৎকালে খঞ্জরপুর পল্লীতে স্বাধীনভাবে বাস করছিলেন। দিনরাতের জন্য একটি পরিচারিকাও ছিল। সুতরাং কিছু সঙ্গতি তাঁর ছিল, সে কথা ধরা যেতে পারে। গোপালবাবু লিখ্‌ছেন, "শরৎচন্দ্রের পিতা অমনিই ত বেকার ও ঘোরতর অভাবী। হঠাৎ এক সঙ্গে পরীক্ষার ফি এবং ঐ সঙ্গে দেড় ক'মাসের কলেজের মাইনের টাকা পান কোথায়? তিনি সমস্ত টাকা জোগাড় করতে পারলেন না।"

একথা অতি সমীচীন। তবুও শরতের পিতা কিছু টাকা জোগাড় করতে পেরেছিলেন; হঠাৎ টাকা বার করতে হ'লে অনেক সময়ে অর্থবান ব্যক্তিও বিপদে পড়ে যায়। শনিবার বৈকালে হঠাৎ টাকার দরকার হ'লে সোমবার পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতেই হয়। আর মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা ত' সর্বদাই "অভাবী" (অভাবগ্রস্ত)। একটা কোনো অনিয়মিত উট্‌কো খরচ সম্মুখবর্তী হলে সময় থাকতে তাদের তার জোগাড়ের জন্য সচেষ্ট হতেই হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফি দিতে না পারার জন্য দায়ী শরতের পিতার অর্থাভাব ততটা নয়, যতটা শরৎচন্দ্রের স্লিপ পাঠাবার ঘটনা। আর, এই ঘটনাকে ব্রজেন্দ্রবাবু যদি অপ্রীতিকর ঘটনা ব'লে থাকেন, তবে গোপালবাবুর বোধ হয় আপত্তি করা উচিত নয়। ব্রজেন্দ্রবাবু তাঁর উল্লিখিত অপ্রীতিকর ঘটনাকে প্রকাশ করেননি; কিন্তু গোপালবাবু উভয় অপ্রীতিকর ঘটনাকেই প্রকট করেছেন এবং এর ফলে তিনি কোনো প্রয়োজনীয় মূল্যবান সামগ্রী পাননি।

আমার বিরুদ্ধে সরাসরি রায় প্রকাশের পূর্বে গোপালবাবুর উচিত ছিল স্লিপ পাঠাবার কাহিনীটি আমাকে শুনিয়ে ব্রজেন্দ্রবাবুর মুখে শোনা আমার কাহিনী সম্বন্ধে আমার বক্তব্য শুনতে চাওয়া। এই একান্ত করণীয়টি যদি তিনি করতেন, তাহ'লে আমার মুখের কাহিনী শোনার পর, ব্রজেন্দ্র-বাবুর মুখের শোনা কাহিনী ও আমার মুখে শোনা কাহিনী—উভয় কাহিনীর মধ্যে তিনি একটা সামঞ্জস্য খুঁজে পেতেন। শরৎচন্দ্র বিজ্ঞানে যে কাঁচা ছেলে ছিলেন না তার গৌণ (negative) প্রমাণ,—আর যে

কার্য ক'রে তিনি নিজেকে বিপন্ন করেছিলেন তা নিজ স্বার্থের জন্য করেন নি সে-কথার মুখ্য (positive) প্রমাণ আমার শোনা কাহিনীর মধ্যে পেতে পারতেন।

গোপালবাবু প্রকাশ করেছেন,—"টেষ্ট পরীক্ষার ফল বেরুল। সব ছেলেই পরীক্ষা দেবার অনুমতি পেল। পেলেন না কেবল শরৎচন্দ্র।"

একথা সত্য নয়। আমার জানা অন্ততঃ আর একজন ছাত্র অনুমতি পাননি। তাঁরই সঙ্গে জড়িত হ'য়ে শরৎচন্দ্র পরীক্ষা হলে বিপন্ন হয়েছিলেন।

গোপালবাবু বলেছেন, "যাই হোক, শরৎচন্দ্রের এফ-এ পরীক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারে সুরেনবাবু ও উপেনবাবুর কথার মধ্যে সুরেনবাবুর কথাই নির্ভরযোগ্য ব'লে আমি মনে করি। উপেনবাবুর কথার মধ্যে জায়গায় জায়গায় যে সামঞ্জস্য নেই ইতিপূর্বে আমি তা আলোচনা করেছি।"

এ বিষয়ে আমার সংক্ষেপে তিনটি বক্তব্য আছে।

(১) উপেনবাবুর সঙ্গে গোপালবাবুর যখন কোনো কথাই হয়নি, তখন উপেনবাবুর কথার সামঞ্জস্য অসামঞ্জস্য সম্বন্ধে কোনো তর্কই উঠে না। মাথা না থাকলে মাথা ব্যথার তর্ক অপ্রাসঙ্গিক।

(২ ও ৩) সুরেনবাবুর কাহিনী নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করার ফলে গোপালবাবু তা থেকে দুটি অবিসংবাদনীয় সত্য করতলগত করেছেন,—যথা (ক) স্লিপ লিখে লিখে পাঠানো—ঘটনার ফলে শরৎচন্দ্র ফি জমা দেবার অনুমতি সকল ছাত্রের সহিত প্রথম দিনেই পাননি ; আর (খ) তার দ্বারা শরৎচন্দ্র তাঁর পিতাকে টাকা জোগাড় করবার উপযুক্ত সময় থেকে বঞ্চিত করেছিলেন।

তাহ'লে আর বাকি রইল কতটুকু? যে ঘটনাকে ব্রজেনবাবু অপ্রীতিকর ব'লে নিরস্ত হয়েছিলেন তার একটু রকম-ফের অপ্রীতিকর ঘটনাকে লোকচক্ষুর সম্মুখে টেনে এনে দুরমুষ ক'রে গোপালবাবু প্রমাণ্য ক'রে ছেড়েছেন।

সর্বশেষে, যে যুক্তিপদ্ধতির দ্বারা তিনি আমার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন তৎসম্বন্ধে আমার কিছু নিবেদন আছে। তিনি লিখেছেন,—"সুরেনবাবু এবং উপেনবাবু উভয়েই শরৎচন্দ্রের সম্পর্কীয় মাতুল, আর উভয়েই তখন অল্পবয়স্ক হলেও সুরেনবাবুই বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তা ছাড়া সুরেনবাবু এই সময়ে ভাগলপুরেই থাকতেন, কিন্তু উপেনবাবু ভাগলপুরে ছিলেন না। তিনি তখন অন্যত্র তাঁর অভিভাবকদের কাছ থেকে লেখাপড়া করতেন।"

উপেনবাবু ভাগলপুরে ছিলেন না,—এ কথা তাঁকে কে বললে? ভাগলপুর আমার নিবাস, আর পিতামাতা সেখানে থাকতে ভালবাসতেন ব'লে বৎসরে অন্ততঃ তিনবার গ্রীষ্ম, পূজা ও বড়দিনের ছুটিতে আমি ভাগলপুরে থাকতাম। একটু কষ্ট ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার খুলে দেখলে গোপালবাবু দেখতে পাবেন ১৮৯৯ সালে আমি ভাগলপুর জিলা স্কুল থেকেই এণ্ট্রান্স পাস করি। ১৯০০ সালে আমার পিতা দীর্ঘস্থায়ী পীড়ার পর ভাগলপুরে পরলোকগমন করেন। ১৮৯৫ সালে যখন শরৎচন্দ্রের মাতা ভুবনমোহিনী আমাদের ভাগলপুরের বাড়িতে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, তখন আমি সেই বাড়িরই দ্বিতলের কক্ষে দুর্দান্ত টাইফয়েড রোগে ৪২ দিন শয্যাগত। আমার কাছে এসে গোপালবাবু যদি এ সকল কথা জেনে যেতেন তাহলে তিনি কখনই অত জোরের সহিত বলতেন না, উপেনবাবু ভাগলপুরে থাকতেন না।

হ'তে পারে শরৎচন্দ্রের টেষ্ট পরীক্ষার গোলযোগের সময়ে আমি ভাগলপুরে ছিলাম না ; কিন্তু ভাগলপুরে না থেকেও যদি গোপালবাবু শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে "নির্ভরযোগ্য" তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন, তাহ'লে ভাগলপুরের সহিত অত ঘনিষ্টসম্পর্কিত হয়েও এবং ঘটনার পরবর্তীকালে ভাগলপুরে অতবার এবং অতদিন অবস্থান ক'রেও আমার পক্ষে নির্ভরযোগ্য সংবাদ সংগ্রহ করবার বাধা কোথায় ছিল?

তারপর বয়সের কথা। সুরেনদাদার চেয়ে আমি দু বৎসরের নয়, এক বৎসরের নয়, মাত্র দশ মাসের ছোট। প্রসিদ্ধ আইনবিদ্ শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত মহাশয়ের সহিত এবার সাক্ষাৎ হ'লে জেনে নেব, এক ব্যক্তির চেয়ে অপর এক ব্যক্তি যদি দশ মাসের ছোট হয়, তাহ'লে শুধু সেই অপরাধেই প্রথমোক্ত ব্যক্তির সম্পর্কে তার সকল কথা অবিশ্বাস্য ব'লে গণ্য হবে,—এই কি আইন?

শুনছি শরৎচন্দ্রের একটি সম্পূর্ণ জীবনী রচনার জন্য গোপালবাবু প্রস্তুত হচ্ছেন। খুবই আনন্দের কথা। শরৎচন্দ্রের একটি বৃহৎ প্রামাণিক জীবনী একান্তই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যত-না বাঞ্ছনীয় হোক, সে বস্তু রচিত করতে পারা তার চৌষট্টি গুণ কঠিন। তার জন্য চাই দুর্মদ ধৈর্য এবং বিরতিহীন পরিশ্রম ; চাই অদম্য উৎসাহ ও উদগ্র অনুসন্ধিৎসার দ্বারা সর্বাঙ্গন হ'তে উপকরণ সংগ্রহ ; তারপর চাই ব্যক্তিগত ঝোঁককে সম্পূর্ণভাবে দমিত রেখে ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং প্রখর বিচারশীল দৃষ্টির সাহায্যে সংগৃহীত উপকরণরাশি হ'তে ঝুঠা মাল ও সাচ্চা মাল পৃথক্‌কীকরণ ; তারপর চাই নির্বাচিত উপকরণগুলির দ্বারা সঙ্গতি এবং সুষমার সূত্রে মাল্যরচনা। সর্বোপরি চাই উপরি-উক্ত কার্যগুলি যথাযথভাবে সুসম্পন্ন করতে পারার জন্য কিছু প্রতিভা এবং মেধা।

গোপালবাবুকে একটি অনুরোধ করি। ভবিষ্যতে যদি তাঁকে অপরের মুখে কোন কথা শুনে আমার বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ করতে হয় তা হ'লে শুধু পরের মুখে ঝাল না খেয়ে তিনি যেন প্রয়োগ করবার পূর্বে অনুগ্রহ ক'রে আমার মুখেও ঝাল খেয়ে যান্। আর, আমার মুখে ঝাল খেয়ে সে ঝাল শুধু মনের মধ্যে না রেখে কাগজে যেন লিখে, এবং সম্ভব হ'লে আমাকে দিয়ে সই করিয়ে নেন।

গোপালবাবু তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন, "শরৎচন্দ্র যে নকল করতে গিয়ে ধরা পড়েছিলেন ব্রজেনবাবু কোথা থেকে এ কথা জানালেন তাঁকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম। উত্তরে তিনি বলেছিলেন—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছ থেকে তিনি একথা জেনেছেন।

এত গুরুতর এবং বিতর্ক প্রসঙ্গ মাত্র প্রশ্নোত্তরের মধ্যে স্থাপিত না রেখে গোপালবাবুর উচিত ছিল, ব্রজেনবাবুর নিকট হ'তে একথা লিখিয়ে সই করিয়ে নেওয়া, অথবা চিঠিপত্রের দ্বারা পাকা ক'রে ফেলা। সাত নকলে যদি আসল খাস্তা হয়, তাহ'লে কয় কথনে আসল খাস্তা,—এ অতি সহজ ত্রৈরাশিকের অঙ্ক।

এ বিষয়ে Hermann Hesse একটি সারগর্ভ কথা বলেছেন, Words do not express thoughts very well. They always become a little different immediately they are expressed, a little distorted, a little foolish. ব্রজেনবাবুর মুখ থেকে গোপালবাবু যে কথা শুনেছিলেন তা এতদিনে a little different হয়ে যায়নি—তা কে বলতে পারে?

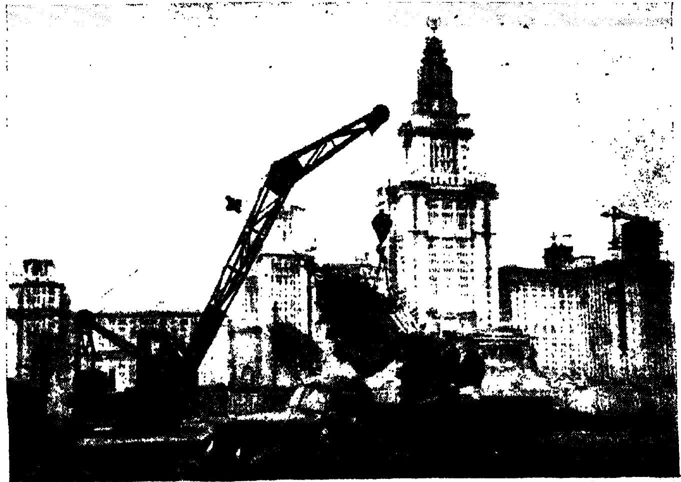


সোভিয়েট দেশে

শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সোভিয়েট রাজধানী মস্কো-সহরের কথা বলতে গিয়ে কেন যে রুশ-দেশের প্রাচীন ইতিহাসের সুদীর্ঘ অবতারণা করে বসেছি, সে সম্বন্ধে অনেকের মনেই হয় তো খটকা জেগেছে। কিন্তু সে-ইতিহাস আলোচনার প্রয়োজন আছে। আধুনিক মস্কো-সহরের সঙ্গে রাশিয়ার পুরোনো ইতিহাসের স্মৃতি এমন নিবিড়ভাবে জড়িয়ে রয়েছে যে তার কিছু হদিশ না জানলে সোভিয়েট-রাজধানীর আসল রূপটির পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকবে। তা ছাড়া যে-সব বিদেশী পর্য্যটক ইতিপূর্ব্বেই এদেশে এসেছেন তাঁদের অনেকেই বলেন—মস্কো-সহর শুধু সোভিয়েট-রাজ্যের রাজধানী নয়···রাশিয়ার প্রাচীন ইতিহাস···সুদীর্ঘ আটশো বছরের রাজনীতি, সমাজ আর সংস্কৃতির অপরূপ 'মিউজিয়াম্' বা 'যাদুঘর'! তাই মস্কো-সহরের পথে বেরুলেই চোখে পড়ে প্রাচীন আর আধুনিক-কালের বিচিত্র সমন্বয়···সেকালের বাড়ী-ঘর-বাগিচা এবং সহস্র স্মৃতি জড়ানো নানান্ সব পুরোনো কীর্ত্তি-নিদর্শনের পাশাপাশি গড়ে উঠেছে একালের বড় বড় পথ-ঘাট ইমারত-উদ্যান কল-কারখানা আর বিভিন্ন 'জাতীয়-প্রতিষ্ঠান'গুলি!

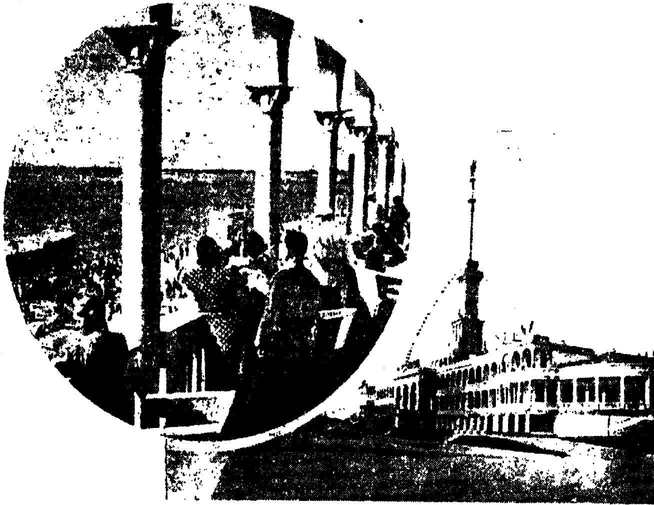


সোভিয়েট পূর্ত্তকর্মীদের অভিনব পদ্ধতিতে নব নির্মীয়মান মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের (অধুনা সমাপ্ত) প্রাঙ্গণ-পথে দুরান্ত-অঞ্চল থেকে আমদানী করা বৃক্ষ-রোপণের কার্যকলাপ চলেছে

'ইন্তুরিস্ত্' প্রতিষ্ঠানের মোটর-বাসে চড়ে মস্কোর পথে-পথে ঘুরে বেড়ানোর সময় এদেশের যে বিশেষত্বটি বিশেষভাবে আমাদের নজরে পড়লো সেটি হচ্ছে—এঁদের সব কিছু সুন্দর, শ্রীমণ্ডিত এবং উন্নততর আধুনিক বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতিতে কালোপযোগী করে গড়ে তোলার অভিনব প্রচেষ্টা···যাতে সকলেরই সকল দিকে সুখ-সুবিধা আর স্বাচ্ছন্দ্যবিধান হয়। এদেশী বাসিন্দাদের এই প্রগতিশীল-ঐকান্তিক গঠন-প্রয়াসের ফলেই মস্কো-রাজধানীর সীমানা আজ সুদূর-বিস্তৃত···বৈশিষ্ট্য-গরিমায় এর আসন আজ সারা জগতের শ্রেষ্ঠ সহরগুলির পুরোভাগে! অথচ, মাত্র বছর পঁয়ত্রিশ আগে অর্থাৎ 'জার্'-সম্রাটদের আমলে মস্কো-রাজধানীর অবস্থা ছিল রীতিমতই পশ্চাদপদ এবং অনুন্নত-ধরণের। রাজা, রাজ-অমাত্যবর্গ, আর সম্রান্ত-ধনীদের অল্প কয়েকটি সুদৃশ্য-সুসজ্জিত সৌধ-প্রাসাদ বড় বড় গুটিকতক মঠ-গীর্জ্জা-সরকারী-ভবন ছাড়া ইট-পাথরের তৈরী পাকা-বাড়ী বড় বিশেষ একটা চোখে পড়তো না তখন মস্কো-সহরের বুকে···দেশের সাধারণ প্রজাদের বাড়ী-ঘর-দোরের দুরবস্থা ছিল নিদারুণ!

সেকালে মস্কোর বেশীর ভাগ বাড়ীই ছিল কাঠের তৈরী···তবে তারই মধ্যে দু'চারজন সঙ্গতী-মধ্যবিত্ত-প্রজার ইট-বালি-চুণ-সুরকী দিয়ে গড়া ছোট-খাট খানকয়েক সাধাসিধে-ছাঁদের পাকা বাড়ী-ঘরের চেহারাও যে চোখে না পড়তো এমন নয়! কিন্তু সে সব পাকা-বাড়ীর সংখ্যা ছিল তখন নিতান্তই নগণ্য এবং দেখতেও তেমন সুদৃশ্য নয়—অতি সাধারণ গোছের!···দোতলা বড় জোর তিনতলা বাড়ী! তাছাড়া তখনকার

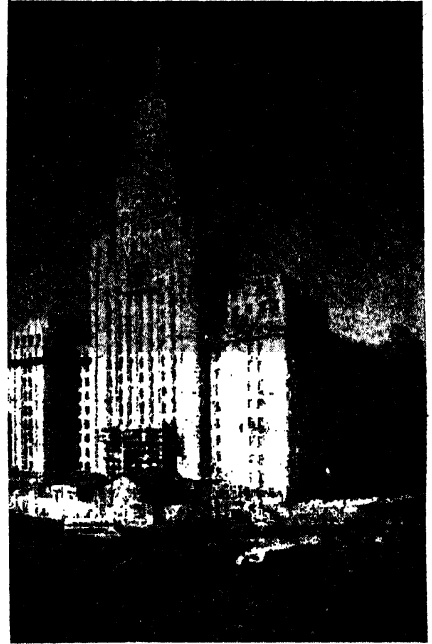
দিনে অশিক্ষা এবং অজ্ঞতার দরুণ এদেশী বাসিন্দাদের দৃষ্টিভঙ্গীও ছিল দারুণ পশ্চাদপদ-ধরণের! আর্থিক-অসচ্ছলতার দরুণ একে তো বাড়ীগুলি তৈরী হতো সে-সময়ে ছোট-খাট খাপ্‌রার ছাঁদে, তার ওপর ওদেশের দুরন্ত শীতের প্রকোপ থেকে পরিত্রাণ পাবার উদ্দেশ্যে সে-সব বাড়ীতে জানলা-দরজা বা বাইরের খোলা-বাতাস চলাচলের জন্য ঝিল্‌মিলি-ফোকরের বন্দোবস্তও থাকতো না তেমন বিশেষ। উপরন্ত, প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত বাসস্থানের অভাবে সেকালে মস্কো-অধিবাসীদের অধিকাংশকেই কোনোমতে এই সব ঘিঞ্জি-অপরিসর বসতি-আশ্রয়ের আলো-বাতাসহীন কন্দরে ঘেঁষাঘেঁষি ভীড় করে মাথা গুঁজে থেকে দিন কাটাতে হতো। এই নিদারুণ বাস্তু-সমস্যার ফলে, সে-আমলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বাপ-মা, স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-পুলে অর্থাৎ পরিবারের সকলকেই একই কামরায় একত্রে চির-জীবন বসবাস করতে হতো নিতান্ত নিরুপায় অবস্থায়…আব্রু বা শালীনতা বজায় রাখারও তেমন কোনো সুবিধা জুটতো না তাদের বরাতে! এমন কি, কোনো পরিবারে কারো সংক্রামক-ব্যাধি হলে তার ছোঁয়াচ এড়ানোর উদ্দেশ্যে অন্যদের দূরে সরিয়ে রাখার ব্যবস্থাও ছিল তখন রীতিমতই দুঃসাধ্য এবং কল্পনাতীত ব্যাপার! কাজেই, মস্কো-সহরের সাধারণ-প্রজাদের বাড়ী-ঘর-বসতিগুলি সেকালে ক্রমেই হয়ে দাঁড়িয়েছিল অস্বাস্থ্য আর রোগের ডিপো…অশান্তির আড্ডা…নরকের সামিল! এ ছাড়া তখনকার দিনে মস্কো-সহরের পথ-ঘাটের দুরবস্থাও ছিল মর্ম্মান্তিক শোচনীয়! রাজ-প্রাসাদ আর বড় বড় সরকারী-ভবন এবং সম্ভ্রান্ত-ধনীদের সৌধ-অট্টালিকাগুলির আশে-পাশে অল্প দু'চারটি নাতি-বৃহৎ পাকা-সড়ক ছাড়া, সহরের অধিকাংশ রাস্তাই ছিল জীর্ণ-সঙ্কীর্ণ, এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো খানা-খন্দলে ভরা…ধুলো-কাদা-পাঁক আর পূতিগন্ধময়-আবর্জনায় জর্জর—কতকটা ঠিক আমাদের কোলকাতার চীৎপুর-বড়বাজার অঞ্চলের, কিম্বা কাশী-বৃন্দাবনের সেকেলে-ছাঁদের গলি-ঘুঁজির মত নোংরা-অপরিসর আর পশ্চাদপদ-ধরণের! একালে সোভিয়েট আমলে কিন্তু দেখলুম মস্কো-সহরের সেকালের সে অনুন্নত চেহারার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে…ওদেশের প্রগতিশীল অধিবাসীদের ঐকান্তিক-প্রচেষ্টায় এবং উন্নততর আধুনিক বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতির অনুসরণে সুদীর্ঘ আটশো বছরের পুরোনো রাজধানী আজ বিচিত্র নব-রূপ ধারণ করেছে…যেন 'কায়-কল্প' কবিরাজীর পর জরাজীর্ণ বৃদ্ধের দেহে-মনে নূতন জীবন, নবীন-যৌবন আর সজীব-আনন্দের কর্ম্ম-চঞ্চল স্বতস্ফূর্ত্ত-বিকাশ দেখা দিয়েছে অফুরন্ত-ধারায়! সোভিয়েট-সরকারের সুব্যবস্থার গুণে, বিরাট মস্কো-সহরের অগণ্য পথ-ঘাট সবই আজ সুদৃশ্য-সুন্দর, সুপ্রসারিত এবং আগাগোড়া পাথর-কংক্রীট দিয়ে পাকা করে বাঁধানো…চারিদিক ঝকঝকে-তক্‌তকে পরিচ্ছন্ন…কোথাও এতটুকু ধুলো-কাদা বা নোংরা-আবর্জ্জনার চিহ্ন চোখে পড়ে না! পুরোনো-আমলের অস্বাস্থ্যকর-ঘিঞ্জি বসত-বাড়িগুলির বিলোপ ঘটিয়ে এদেশী বাসিন্দারা এখন কুশলী সোভিয়েট স্থপতি-শিল্পীদের উন্নত বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতিতে গড়া দশ-বিশ তলা উঁচু সুদৃশ্য-বিরাট প্রাসাদোপম সৌধ-ইমারতে অবাধ-উন্মুক্ত আলো-বাতাস আর বিজলী-বাতি রান্নার গ্যাস, বাথ্‌-টব, কলের জল, লিফ্‌ট্‌, টেলিফোন এবং তাপ-নিয়ন্ত্রণের যান্ত্রিক-ব্যবস্থা প্রভৃতি আধুনিক-যুগের যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-সুবিধার প্রাচুর্য্য উপভোগ করে পরম আরামে নিশ্চিন্তে দিন কাটিয়ে চলেছে। সেকালের মত একালের মস্কো-সহরবাসীদের মত আর আলো-বাতাস-আব্রুহীন ছোট্ট একটি খুপরি-কোঠরে ভেড়ার পালের ঘেঁষাঘেঁষি ভীড় করে থেকে জীবন কাটাতে হয় না…সোভিয়েট সরকারের সুবন্দোবস্তের ফলে, স্বাচ্ছন্দ্য-শান্তিতে বসবাসের জন্য প্রত্যেক পরিবারেরই বরাতে জোটে আজকাল নূতন-ছাঁদে গড়া এই সব প্রাসাদোপম অট্টালিকার দু'তিন বা চার কামরাওয়ালা আধুনিক-ব্যবস্থায় সুসজ্জিত বড় বড় সুন্দর সব 'ফ্ল্যাট' বা 'সৌধাংশ'! তা ছাড়া এ-সব বাড়ীর সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লাগোয়া রয়েছে ফুলে-ঘাসে রঙীণ, ফোয়ারা আর বিচিত্র মর্ম্মর-মূর্ত্তি দিয়ে সাজানো ছবির মত সুন্দর বাগিচা…ছোট ছেলেমেয়েদের খেলবার আঙ্গিনা এবং বাসিন্দাদের আরো নানান্ সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা! সেকেলে-ছাঁদের ছোট-খাট বাড়ী-ঘর কিম্বা ঘিঞ্জি-গলি যদিও বড় বিশেষ একটা নজরে পড়ে না আজকাল উন্নত-আধুনিক



মস্কোর সীমান্তে ভলগা-মস্কো কেনালের বুকে খিমিকী বন্দর

মস্কো-সহরের বুকে, তবু প্রয়োজনের খাতিরে এবং অতীতের ঐতিহ্য-স্মৃতির প্রতীক-হিসাবে পুরোনো আমলের কিছু ঘর-বাড়ী এখনও বজায় রাখা হয়েছে ওদেশী লোকজনের আগ্রহ এবং সোভিয়েট-সরকারের নির্দ্দেশ অনুসারে। সোভিয়েট-স্থপতিশিল্পীদের প্রচেষ্টায় ১৯৪০ সালের মধ্যেই সহরের চারিদিকে বিপুল সংখ্যায় নূতন নূতন বিরাট সৌধ-অট্টালিকা গড়ে ওঠা স্বত্ত্বেও, শুনলুম, মস্কোর অধিবাসীদের গৃহ-সমস্যার নাকি এখনও সম্পূর্ণ সমাধান হয়নি! তাছাড়া বিগত মহাযুদ্ধে (world war II) হিট্‌লারের দুর্দ্ধর্ষ নাৎসী-বাহিনীর দাপটে মস্কোর বহু বাড়ী-ঘর ধ্বংস হওয়ার দরুণ ওদেশের গৃহ-সমস্যা রীতিমতই প্রবল। কাজেই যুদ্ধান্তে বিরাট মস্কো সহরের বিপুল বাসিন্দাদের স্বাচ্ছন্দ্য-বসবাসের জন্য অবিলম্বে এই ধরণের আরো অনেক সৌধ-ভবন গড়ে তোলার জরুরী-প্রয়োজন। তাই আজও মস্কোর পথে-পথে ঘুরে বেড়ানোর সময় প্রায়ই চোখে পড়ে—রাস্তার দু'পাশে নব-পরিকল্পনায় নির্ম্মীয়মান নানান্ বড়-বড় ইমারৎ—অট্টালিকা কাঠামো…কোথাও সবেমাত্র ভিত্তি-স্থাপনার কাজ সুরু হয়েছে…কোথাও বা সর্ব্বাঙ্গে ভারা-বাঁধা অর্দ্ধ সমাপ্ত বাড়ীর লোহার ফ্রেমে ওদেশী স্থপতি-কর্ম্মীদের কংক্রীট-ঢালাইয়ের সমারোহ…আবার কোথাও বা সদ্য-সম্পূর্ণ আবাস-গৃহে বাস্তু-রচনার প্রাথমিক আয়োজন নিয়ে মেতে রয়েছে সেখানকার বাসিন্দার দল। প্রবল চাহিদা অনুযায়ী মস্কো-অধিবাসীদের গৃহ-সমস্যা ঘোচানোর জন্য অল্প সময়ের মধ্যেই বড় বড় বসত বাড়ী গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সুদক্ষ সোভিয়েট স্থপতি-বিশারদের দল আজকাল যে-সব অভিনব-পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকেন, সেগুলি অপরূপ বিচিত্র! ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর আমাদের দেশে এক সময় নব-উদ্ভাসিত 'Pre-fabricated' পদ্ধতিতে বাড়ী-ঘর গড়ে তোলার হিড়িক জেগেছিল প্রবল, তবে কার্য্যতঃ সফল হয়ে উঠতে পারেনি নানান্ কারণে! সোভিয়েট দেশে কিন্তু চূড়ান্ত-সফলতা লাভ করেছে এ-পদ্ধতি অনুসরণে বড়-বড় সৌধ-ভবনাদি নির্ম্মাণের কাজ! শুধু মস্কো-সহরেই নয়, সোভিয়েট-দেশের সর্ব্বত্রই আজকাল এই 'Pre-febricated' পদ্ধতি-অনুসারে ওখানকার কুশলী স্থপতি-শিল্পীরা সরকারী-কারখানায় 'Mass-Scale' বা ব্যাপকভাবে তৈরী নানান্ ছাঁদের থাম, খিলান, দরজা-জানলা, সিঁড়ি, রেলিং, বারান্দা, ছাদ, দেয়াল প্রভৃতি বাড়ীর যাবতীয় টুকরো-টুকরো অংশ একত্র চূণ-বালি-সিমেণ্ট-কংক্রীটের সাহায্যে পাকা করে গেঁথে-মিলিয়ে মাত্র দু'তিন সপ্তাহ বা দু' চার মাসের মধ্যেই নিত্য-নূতন বিরাট আকারের বহু সুদৃশ্য-আধুনিক সৌধ-অট্টালিকা গড়ে তুলছেন উন্নত যান্ত্রিক এবং বৈজ্ঞানিক-কৌশলের সাহায্যে! মহাভারতে অপরূপ-অলৌকিক ময়দানবের সৃজনী-প্রতিভার কাহিনী শুনেছি, কিন্তু সোভিয়েট দেশে এসে দেখলুম—এখানকার আধুনিক স্থপতি-কর্ম্মীর দল তাঁকেও হার মানিয়েছেন, এঁদের অপূর্ব্ব কলা কৌশল দক্ষতায়! অতি অল্প সময়ের মধ্যে আকাশচুম্বী বড়-বড় ইমারৎ গড়ে তোলা ছাড়াও সোভিয়েট-স্থপতিবিদ্‌দের আরো যে একটি বিচিত্র সৃজনী-প্রতিভার পরিচয় পেলুম মস্কো-সহরের পথে বেরিয়ে সেটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য!

আমাদের বুকে নিয়ে 'ইন্‌তুরিস্তের' মোটর-বাস তখন ছুটে চলেছে মস্কো-সহরের অন্যতম প্রধান সড়ক জনাকীর্ণ 'গোর্কী ষ্ট্রীট' মাড়িয়ে—আগাগোড়া কনক্রীটে-বাঁধানো ঝরঝরে-পরিষ্কার সুপ্রশস্ত রাস্তা—আমাদের কোলকাতার চৌরঙ্গী রোডের চেয়ে চার-পাঁচগুণ চওড়া…পথে মোটর গাড়ী, ট্রলী-বাস্ ও অন্যান্য যান-বাহনের স্রোত বয়ে চলেছে অবিরাম! রাস্তার দু'পাশে সুপ্রসারিত 'ফুটপাত'…পথ-চারীদের ভীড়ে ভরপুর! সোজা যতদূর দৃষ্টি যায়—চোখে পড়ে, ফুটপাতের কিনারে উঁচু-উঁচু গাছের সারি—সজীব-শ্যামল-শোভায় সুদীর্ঘ পথ যেন আলো করে আছে। তারই কোলে আকাশের বুকে মাথা তুলে সদীপ্ত-ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওদেশের আধুনিক-আমলের আট-দশ-বারো-তলা সুদৃশ্য-অতিকায় সৌধ-ইমারতগুলি। মুগ্ধ-চিত্তে মস্কো-সহরের এই নব-রূপান্তরের তারিফ সুরু করেছি, এমন সময় সহযাত্রী ওদেশী বন্ধুদের মুখে শুনলুম সোভিয়েট-



মস্কোর 'রেড গেটস্' রাজপথের বুকে আধুনিক আমলের অতিকায় ভবন

স্থপতি-শিল্পীদের বিচিত্র-বিস্ময়কর কীর্ত্তি-কলাপের বিবরণ! 'গোর্কী ষ্ট্রীট' রাস্তাটি প্রাচীন-আমলের…'জার'-সম্রাটদের সময়ে এ-সড়কের নাম ছিল 'ত্‌ভেরস্কায়া' (Tverskaya)। তবে সে-যুগে এ রাস্তার চেহারা ছিল এ-যুগের সম্পূর্ণ বিপরীত…যেমন বিশ্রী নোংরা-ঘিঞ্জি, তেমনি সংকীর্ণ এবং বেয়াড়া-ছাঁদের…এবড়ো-খেবড়ো নুড়ি-পাথরের তৈরী…দুরতিক্রম্য খানা-খোন্দলে ভরা…বর্ষা-বাদলা কিম্বা ওদেশী-শীতের দিনে প্রচণ্ড তুষার পাতের সময় পথ-চলাচল করা ছিল রীতিমতই দুঃসাধ্য ব্যাপার! এ রাস্তায় সেকালে পাকা বাড়ী ছিল মাত্র চৌদ্দখানি…বাকী সব দীন-দরিদ্রের বস্তী। ধনীদের পাকা-বাড়ীগুলি ছাড়া পথের পাশের খুপ্‌টি খোঁয়াড়ের মত

সেকেলে বাড়ী-ঘরের অবস্থাও ছিল জঘন্য অস্বাস্থ্যকর এবং কুশ্রী-জরাজীর্ণ-গোছের! লেনিনের মৃত্যুর পর ১৯৩৫ সালে সোভিয়েট রাষ্ট্রনায়ক ষ্টালিন যখন দেশের ও দশের উন্নতিকল্পে অভিনব 'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা'র (Five-years Plans) প্রবর্ত্তন করেন তখন থেকেই সুরু হয় মস্কো-সহরের সংস্কার-উন্নতি সাধন। সোভিয়েট-সরকারের সাদর-আহ্বানে ওদেশের কৃত-বিদ্য স্থপতি-বিশারদ এবং যান্ত্রিক-বৈজ্ঞানিকের দল ঐকান্তিক-আগ্রহে এগিয়ে এলেন নগরোন্নতির কাজে সহায়তার উদ্দেশ্যে... তাঁদেরই সম্মেলনে গঠিত হলো—'মস্কো পুনর্গঠন সংসদ' (Moscow Re-construction Committee)...আটশো বছরের পুরোনো সহরকে উন্নত-আধুনিক নূতন ছাদে গড়ে তুলতে লাগলেন তাঁরা একনিষ্ঠ-সঙ্ঘবদ্ধ-প্রচেষ্টায়! এঁদের অসামান্য সৃজনী-প্রতিভার গুণেই আজ সুপ্রাচীন মস্কো-সহরের এতখানি শ্রীবৃদ্ধিলাভ ঘটেছে বিপ্লবোত্তর-কালে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে। সহরের বুকের উপরেই 'মস্কো-পুনর্গঠন সংসদের' কার্য্যালয়—দেশের জন-সাধারণের কাছে এঁদের যাবতীয় পরিকল্পনা এবং কার্য্য-কলাপের তথ্য-বিবরণ বিশদভাবে বুঝিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এক অপরূপ যাদুঘর (Museum)! সে-যাদুঘরে নানান্ সব ছবি, নক্সা, মানচিত্র, গড়া-নমুনা এবং মডেলের সাহায্যে প্রাঞ্জল-ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে—মস্কো-সহরের ক্রম-বিবর্ত্তনের ইতিহাস। নগর-সংস্কারের কাজে হাত দিয়েই 'পুনর্গঠন সংসদের' বিশেষজ্ঞেরা স্থির করলেন—মস্কোর পথ-ঘাট সুন্দর-সুঠাম ও সুপ্রসারিত করতে হবে আর সেই সঙ্গে প্রাচীন-আমলের ছোট-ছোট বাড়ী-ঘরগুলিকে সরিয়ে দিয়ে অচিরেই তার বদলে গড়ে তুলবেন বড়-বড় গগন-স্পর্শী সৌধ-অট্টালিকা-রাজি। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী সেকালের জীর্ণ-সঙ্কীর্ণ 'ভেরস্কায়া' (আধুনিক গোর্কী ষ্ট্রীট) রাস্তাটির সংস্কার-সাধনের কাজে তাঁরা দেখলেন যে এটিকে সুপ্রসারিত করতে গেলে পথিপার্শ্বস্থ পুরোনো বাড়ীগুলিকে ভেঙ্গে ফেলা দরকার। অথচ যে-সব পুরোণো-আমলের বাড়ীর অনেকগুলিই ঐতিহাসিক-স্মৃতি মণ্ডিত। কাজেই সোভিয়েট-স্থপতিবিদের দল তখন সিদ্ধান্ত করলেন যে প্রাচীন ঐতিহ্য-স্মৃতির প্রতীক সে-সব বাড়ীগুলি ভেঙ্গে নষ্ট না করে বরং তাদের আদিম-ভিত্তি থেকে অক্ষত-অটুট অবিকল অবস্থায় সমূলে উঠিয়ে এনে আগেকার জায়গায় বিশ-ত্রিশ গজ পিছনে দূরে সরিয়ে নূতন-ভিত্তির উপর বসিয়ে দেবেন আবার বেমালুম। অবশ্য ব্যাপারটি বলতে যত সোজা, কাজে ততটা সহজ নয়! কিন্তু ওদেশের সুদক্ষ-কুশলী স্থপতিবিদেরা আধুনিক বিজ্ঞান আর উন্নত যান্ত্রিক কলা-কৌশলের সাহায্যে অনায়াসে শুধু যে এই অসম্ভব দুরূহ-ব্যাপার সম্ভব করে তুলেছেন তাই নয়, শুনলুম এ-পদ্ধতিতে তাঁরা নাকি আজকাল হামেশা দশ-বিশ-তলা বিরাট-প্রাসাদোপম সৌধ-অট্টালিকাগুলিকে ইলেকট্রিক, গ্যাস, টেলিফোন ও জলের পাইপের ব্যবস্থা অবিচ্ছিন্ন রেখে, বাড়ীর আসবাবপত্রাদি না নড়িয়ে, সম্পূর্ণ অক্ষত-অটুট-অবস্থায় এক জায়গা থেকে দূরে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই। কেবল বাড়ী-সরানোই নয়, সহরের শোভা-বর্দ্ধনের উদ্দেশ্যে এই অভিনব-পদ্ধতি অনুসরণে রাজ্যের দূর-দূরান্ত অঞ্চল থেকে শিকড়-মাটি সমেত একই মাপের দশ-বিশ ত্রিশ-চল্লিশ বছর বয়সের বহু দুর্লভ এবং সুন্দর-সুন্দর নানান্ সব বড়-বড় গাছপালা-মহীরুহ প্রভৃতি আমদানী করে এনে পথের দু'পাশে সারি দিয়ে রোপনের ব্যবস্থাও ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছে আজকাল সোভিয়েট-রাজ্যের সর্ব্বত্র। গত পাঁচ বছরের মধ্যে এ-প্রথানুযায়ী কার্য্যের ফলে মস্কোর বিভিন্ন অঞ্চলে পথের ধারে-ধারে তেরো লক্ষ বড়-বড় গাছপালা এবং আটান্ন লক্ষ ষাট হাজার ছোট-ছোট চারা-তলাদি রোপন করে সহরকে আগাগোড়া সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলেছেন ওদেশী স্থপতি-শিল্পীর দল!

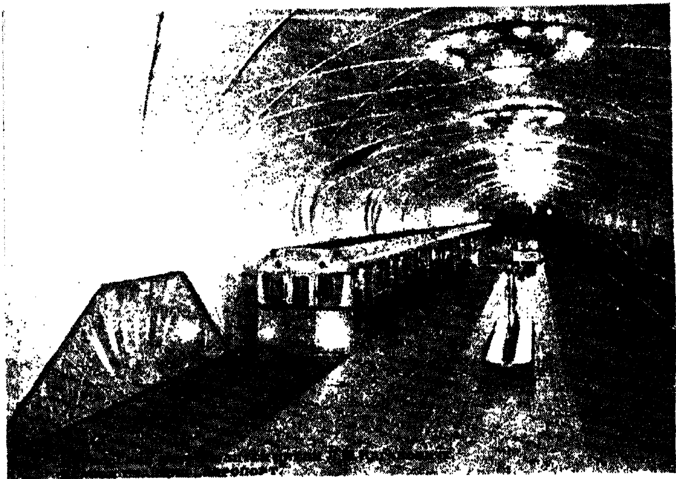
এ-প্রসঙ্গে 'নগর-পুনর্গঠনের' আরো একটি বিচিত্র ব্যবস্থার উল্লেখ করা প্রয়োজন। সোভিয়েট-ব্যবস্থার আগে, সেকালের সহরে-বাসিন্দাদের মধ্যে ঘরকন্নার কাজে কয়লা আর কাঠের সাহায্যে আগুন-জ্বালানোর রীতি প্রচলিত থাকার দরুণ প্রাচীন মস্কো-সহরের আকাশ-বাতাস ধোঁয়া-কালি-ঝুলের বিষাক্ত-বাষ্পে ছেয়ে থাকতো সারাক্ষণ... শীতকালে দুর্দ্দশা হয়ে দাঁড়াতো আরো মর্ম্মান্তিক...রীতিমত অস্বাস্থ্যকর... লোকজনের দমবন্ধ হবার দাখিল! একালের সুদক্ষ সোভিয়েট-ইঞ্জিনীয়ারদের প্রগতিশীল-প্রচেষ্টায় কিন্তু মস্কো-সহরে সে-অসুবিধার অবসান ঘটেছে ইদানীং। সুদীর্ঘ নলের সাহায্যে সুদূর সারাটোভ্ (Saratov) সহরের 'গ্যাসের' কারখানা থেকে চব্বিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মস্কো-অধিবাসীর ঘরে-ঘরে আগুন জ্বালানোর জন্য 'গ্যাস্' সরবরাহ করে ওদেশের কুশলী-ইঞ্জিনীয়ারের দল শুধু যে কাঠ ও কয়লার বিপুল অপচয় বাঁচিয়েছেন তাই নয়, অস্বাচ্ছন্দ্যকর ধোঁয়া আর ঝুল-কালির দূষিত আব্‌হাওয়া থেকে রাজধানীর আকাশ-বাতাস চির-নির্ম্মল, নিষ্কলুষ করে তুলেছেন অসামান্য প্রতিভা-বলে!

সুদক্ষ সোভিয়েট-ইঞ্জিনীয়ারদের বিচিত্র সৃজনী-প্রতিভার আর একটি অপরূপ কীর্ত্তি-নিদর্শন হলো—মস্কো-সহরের 'Metro' বা ভূ-গর্ভস্থ রেলপথ (Underground Railway)! জনাকীর্ণ রাজধানীর পথে এবং ট্রামে-বাসে লোকজনের ভীড় কমানো আর স্বাচ্ছন্দ্যে স্বল্প-কালের মধ্যে দূর-দূরান্ত অঞ্চলে যাতায়াতের সুবিধার জন্য সারা মস্কো-সহরটিকে ঘিরে মাটির তলায় সুড়ঙ্গ রচনা করে অভিনব কলা-কৌশল-নৈপুণ্যে পাতা হয়েছে এই বৈদ্যুতিক-রেলপথ। মস্কোর বিভিন্ন অঞ্চলে পথের মাঝে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে 'মেট্রো' রেলপথের নানা সুদৃশ্য-বিরাট সব ঘাঁটি...প্রত্যেকটিই লোকের ভীড়ে ভরপুর, অথচ কোথাও এতটুকু বিশৃঙ্খলার চিহ্নমাত্র নেই! শুধু সুবিধা-স্বাচ্ছন্দ্য এবং কার্য্য-কারিতার দিক দিয়েই নয়, গঠন-সৌষ্ঠবেও 'মেট্রো'-রেলপথের প্রত্যেকটি ঘাঁটিই অনবদ্য সুন্দর!

এ ছাড়া রাজধানীর জল-কষ্ট দূরীকরণ এবং যাত্রী ও মালবাহী নৌ-যান চলাচলের সুবিধার্থে আধুনিক-আমলে 'ভল্‌গা-মস্কো কেনাল' (Volga-Moscow Canal) নামে 'ভল্‌গা' নদী থেকে 'মস্কো' নদী পর্য্যন্ত যে বিশাল সুগভীর খাল কাটা হয়েছে—সেটিও সোভিয়েট পূর্ত্তশিল্পীদের অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। ১৯৩৭ সালে এ-খালের সৃষ্টি...খালটি দৈর্ঘ্যে প্রায় আশী মাইল, প্রস্থে আঠারো ফুট এবং

গভীরতায় ছুশো আশী ফুট। সুদক্ষ-কৌশলে সুদীর্ঘ এই খালের মধ্যে দিয়ে 'ভল্‌গা'র বারি-স্রোত 'মস্কো'-নদীতে আনা হয়েছে প্রায় আশী মাইল ব্যাপী গিরি-বন, জলা-প্রান্তরের ব্যবধান ঘুচিয়ে এ অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার উদ্দেশ্যে ওদেশের পূর্ত্ত-শিল্পীরা প্রকাণ্ড বাঁধ আর বহু কৃত্রিম-হ্রদ (Artificial Lakes) রচে তুলেছেন খালের নানান্ অঞ্চলে। হ্রদগুলি রচিত হয় ধাপে-ধাপে…'ভল্‌গা'র জল সেই সব ধাপ অতিক্রম করে আজ 'জার'-সম্রাটদের আমলের অযত্ন-অবহেলায় মজে-যাওয়া 'মস্কো' নদীর বুক আজ ভরে তুলেছে অফুরন্ত জলস্রোতে। এ-জলের ধারা বিচ্ছেদ-বিরামবিহীন রাখবার জন্য মস্কো-সহরের সীমান্তে সোভিয়েট আমলে 'মস্কো-সাগর' বা (Sea of Moscow) নামে বিশাল এক 'জল-ভাণ্ডার' (Storage-Lake) নির্ম্মাণ করা হয়েছে। এই অভিনব জল-ভাণ্ডারটি ঠিক ভল্‌গা ও মস্কো নদীর সঙ্গমস্থলে! এই দুই নদীর মলিন-মোহনার উপকূল-প্রান্তে আকাশের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে সোভিয়েট-পূর্ত্ত শিল্পীদের গড়া মস্কোর সুদৃশ্য-বিরাট 'খিমিকী-বন্দর' (Khimiki Port)! এই সুদীর্ঘ খাল এবং অপরূপ বন্দরটির রচনায় সময় লেগেছে চার বছর আট মাস। এই 'ভল্‌গা-মস্কো কেনালের' দৌলতে জল-পথে যাতায়াতের সুবিধা ঘটার দরুণ মস্কোর সঙ্গে বল্‌টিক্ কাস্পিয়ান্ আর শ্বেত-সাগরের (White Sea) শুধু যে সংযোগ সংসাধিত হয়েছে তাই নয়, দূর দূরান্তের বহু সহরের ব্যবধানও কমেছে অনেকখানি এবং তারই ফলে মস্কো সহর আজ ক্রমশঃ ওদেশের বিরাট এক বন্দরে পরিণত হয়েছে!…সোভিয়েট-সরকারের সুব্যবস্থায় নব-রচিত এই জল-পথে নিত্য-নিয়মিত বড়-বড় জাহাজ-ষ্টীমার মোটর-বোট প্রভৃতি জল-যান চলাচলের সুবিধা ঘটায় দেশ-বিদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে মস্কোর ব্যবসা-বাণিজ্য এবং লোকজন আনাগোনারও প্রসারতা বৃদ্ধি পেয়েছে আজকাল রীতিমতই ব্যাপক ভাবে! তবে 'ভল্‌গা-মস্কো কেনালের' বুকে জল-যান চলাচলের সুযোগ মেলে সারা বছরের মধ্যে মাত্র সাত-আট মাস—কারণ শীতের সময় ওদেশের দুরন্ত ঠাণ্ডায় স্রোতস্বিনী-ধারার জল যখন আগাগোড়া জমে শক্ত বরফ হয়ে যায়, তখন এ-পথে জাহাজ-ষ্টীমার বা নৌকা চালানো শুধু রীতিমত দুঃসাধ্যই নয় একান্ত অসম্ভব ব্যাপার। সে-সময় মস্কোর 'খিমিকী বন্দরের' সামনে এই খালের জল-জমে-বরফ হয়ে যাওয়া শুভ্র-কঠিন তুষারাচ্ছন্ন সুপ্রসারিত আঙিনায় ওদেশী বাসিন্দাদের শীতকালীন ক্রীড়া-উৎসব-প্রতিযোগিতার ধুম পড়ে যায়…'ভল্‌গা-মস্কো কেনালটি' তখন হয়ে দাঁড়ায় সোভিয়েট-রাজধানীর বিশেষ জনপ্রিয় 'স্কেটিং-রিং' (Skating Ring)! দারুণ শীতের দিনেও এখানকার আমন্দোৎসবে যোগ দিতে রাজ্যের দূর-দূরান্ত অঞ্চল থেকে অগণ্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ক্রীড়া-রসিক নর-নারীর দল অসীম-আগ্রহে নিত্য এসে ভীড় জমায় 'ভল্‌গা-মস্কো কেনালের' উপকূল-প্রান্তে সুবিখ্যাত 'খিমিকী বন্দরের' এই অভিনব 'স্কেটিং রিঙের' আসরে!

এমনিভাবে মস্কো-সহরের নানান্ দ্রষ্টব্য এবং জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রত্যক্ষ-পরিচয় লাভ করতে করতে এগিয়ে চলেছিলুম আমরা 'ইন্‌তুরিস্তের' মোটর-বাসে চড়ে! সহর-পরিক্রমণকালে চোখে পড়লো মস্কো-নদীর কূলে 'কোটেল্‌নিচেশ্‌কায়া বাঁধের' (Kotelnicheskaya Embankment) কিনারায় নব-নির্ম্মীয়মান ৩৫০টি ফ্ল্যাট-বিশিষ্ট অতিকায় ভবন, 'দোরোগোমিলভ্‌স্কায়া বাঁধের' (Dorogomilovskaya Embankment) ধারে ত্রিশতলা উঁচু এবং ২৫০টি ফ্ল্যাট ও এক হাজার কামরাওয়ালা সুবিশাল ইমারত 'প্লোশাদ্ ভোস্তানিয়া' বা 'বিদ্রোহ-চত্বরের' (Ploshad Vostania বা Square of the Revolt) ৪২০টি ফ্ল্যাট-সমন্বিত আধুনিক-আমলের সুদৃশ্য-বিরাট অট্টালিকাটির চেহারা! সহযাত্রী ওদেশী-সঙ্গীদের মুখে শুনলুম,—যে নির্ম্মাণ-কার্য্য চুকে গেলে এ-সব অতিকায় নূতন-বাড়ীগুলিতে সোভিয়েট-দেশের সাধারণ-কর্ম্মীদের বসবাসের এবং হোটেল-রচনার ব্যবস্থা হবে। এ-ছাড়াও মস্কো-সহরের 'জারিয়াদী' (Zariadye), 'স্মোলেন্‌স্কায়া প্লোশাদ্' (Smolenskaya Ploshad বা Smsleusk Square) অর্থাৎ 'স্মোলেনস্ক্ চত্বরে', 'ক্রাশ্‌নিয়ে ভোরোতা' (Krasniye Vorota বা Red Gates) ওরফে 'লাল-ফটকের' ধারে এবং



মস্কোর ভূ-গর্ভস্থ মেট্রো রেল ও কাগানোভিচ্ ষ্টেশন

সোভিয়েট-রাজধানীর 'বোল্শায়া কালুজ্স্কায়া' ষ্ট্রীট (Bolshaya Kaluzskaya Street) 'মোঝাইস্ক্ হাইওয়ে' (Mozhaisk Highway) 'খোরোশেভ্স্ক হাইওয়ে' (Khoroshevsk High way) 'পেশ্চানায়া ষ্ট্রীট' (Peschanaya Street) প্রভৃতি আরো নানান্ অঞ্চলে বহু বিরাট-আধুনিক সৌধ-অট্টালিকা গড়ে তোলার দৃশ্য নজরে পড়লো !

পথে চক্কর দিয়ে বেড়ানোর সময় আরো দেখলুম মস্কোর সুদৃশ্য-বিরাট 'চাইকোভ্স্কী মিউজিউক্ হল' (সঙ্গীত-ভবন), 'পলিটেক্নিক্ মিউজিয়াম'-ভবন, 'সহর-পুনর্গঠন সমিতির' কার্য্যালয় ও যাদুঘর, 'Paln of Soviet' বা সোভিয়েট-দপ্তরখানা, কমিউনিষ্ট-পার্টির কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়' 'লেনিন মিউজিয়াম,' বেতার-কেন্দ্রের ভবন, 'লেনিন লাইব্রেরী', রেড-আর্ম্মি,' জীপ্সী' এবং 'মস্কো আর্ট,' থিয়েটার, 'উদারনিক্' সিনেমা-গৃহ, 'গোর্কী পার্ক' প্রমোদোদ্যান, 'ডাইনামো ষ্টেডিয়াম,' প্রাচীন রুশ-কবি পুশ্কিনের মর্ম্মর-মূর্ত্তি শোভিত সজ্জিত বাগিচা, সরকারী হাসপাতাল, সোভিয়েট রাজ্যের নৌ-বিভাগ এবং ডাক-পরিবহন বিভাগের প্রধান কার্য্যালয়, 'voks'' বা দেশের 'সংস্কৃতি-পরিষদের' প্রধান-কেন্দ্র-ভবন, 'তেত্রিয়াকভ্' চিত্রশালা প্রভৃতি বহু বিচিত্র সব দ্রষ্টব্য-স্থান ! এ সব দেখতে দেখতে সব এগিয়ে চলে আমরা শেষে হাজির হলুম গিয়ে মস্কো-সহরের সীমান্তে 'Spariow Hill' বা 'চড়ুই-পাহাড়ের' উঁচু টিলার চুড়োয় ! এ-টিলাটি হলো মস্কো-সহরের চেয়ে উঁচু জায়গা—সুউচ্চ এই টিলার উপর থেকে নীচে সারা মস্কো-সহরের যে সুবিস্তৃত-শোভা দেখতে পাওয়া যায়, সেটি অপরূপ সুন্দর··· শ্যামল গাছপালার মাঝে-মাঝে দূরে আকাশের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে মস্কো-সহরের সুদৃশ্য বাড়ীঘর···আধুনিক-যুগের অভিনব-বিরাট অট্টালিকারাজি···এগুলির ফাঁকে-ফাঁকে চোখে পড়ে প্রাচীন 'ডুমা'-পরিষদ-গৃহ, 'সেন্ট বেসিল' গীর্জ্জা আর ক্রেমলিন দুর্গ-প্রাসাদের চেহারা···রাজধানীর বুক চিরে আঁকা-বাঁকা সর্পিল-ভঙ্গীতে 'চড়ুই পাহাড়ের' পাদদেশ চুম্বিত করে প্রবাহিত হয়ে চলেছে রৌদ্রের আভায় ঝলমলে মস্কো-নদী ! এ-টিলার সঙ্গে রুশদেশের প্রাচীন ইতিহাসের স্মৃতি মিশে আছে সবিশেষ ! ১৮১২ খৃষ্টাব্দে দুর্দ্ধর্ষ ফরাসী-বীর নেপোলিয়ান যখন বিপুল সৈন্য-সহকারে রুশ-অভিযানে আসেন, তখন এই টিলার উপর দাঁড়িয়েই তিনি লুব্ধ-নেত্রে সর্ব্বপ্রথম মস্কো-রাজধানীর রূপ নিরীক্ষণ করেন।···বহু কষ্টে সুদীর্ঘ দুর্গম-পথ অতিক্রম করে সহায়-আতিথ্যহীন অচেনা-বিদেশে পৌঁছে, দুরভিলাষী নেপোলিয়ান আর তাঁর ক্লান্ত পরিশ্রান্ত সৈন্যরা মনে-মনে আকুল হয়ে উঠেছিলেন যে অনায়াসে মস্কো-বিজয়ের পর তাঁদের বরাতে হয় তো এতদিন জুটবে এবার নিশ্চিন্ত-আরামে বিশ্রামের অবসর ! কিন্তু তাঁদের সে-বাসনা স্বপ্নই রয়ে গেল···সত্যে পরিণত হবার আর সুযোগ পেলো না কোনো-দিন ! আজকাল সোভিয়েট সরকারের ব্যবস্থায় 'Sparrow-Hill' টিলাটি হয়ে উঠেছে মনোরম একটি বেড়ানোর জায়গা···চারিদিকে অপরূপ প্রাকৃতিক-সৌন্দর্য্যের শোভা···ওদেশের বিশেষ জনপ্রিয় 'পার্ক' !

এখান থেকে বেরিয়ে সোজা গেলুম আমরা মস্কো-রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে—'মুসিয়ী ইজোরাজিজেল্নিখ্' বা 'Museum of Art' নামে বিচিত্র কলা-শিল্পের যাদুঘর দেখতে। সুবিখ্যাত 'লেনিন লাইব্রেরীর' কিছু দূরে বিরাট সুদৃশ্য আধুনিক ভবন। মস্কোর অন্যতম কলাশিল্পাগার হিসাবে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সোভিয়েট-আমলে—বিগত মহা-সমরের (World war II) পর। লোকান্তরিত সোভিয়েট-রাষ্ট্রনেতা মার্শাল ষ্টালিনের ৭১ তম জন্মদিবস-উপলক্ষে দেশের ও বিদেশের অনুরাগী-জনের কাছ থেকে বিচিত্র-বহুমূল্য যে-সব উপহার-উপঢৌকন পেয়েছিলেন—সেগুলি তিনি এই নবনির্ম্মিত মিউজিয়ামে দান করেন। তাঁরই দানে বিবিধ শিল্প সম্পদে এ-যাদুঘর আজ রীতিমত সুসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। সোভিয়েট-রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের নানা অপরূপ শিল্প-সৃষ্টির কলা-নিদর্শন ছাড়া, ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম, চীন, ইতালী, হাঙ্গেরী, ফ্রান্স, মেক্সিকো, প্রভৃতি সকল বিদেশী রাজ্যেরই বহু বিচিত্র শিল্প-কারু-সম্ভারে মিউজিয়ামের বিভিন্ন কক্ষ ভরপুর ! আমাদের দেশের চন্দন কাঠ ও হাতীর দাঁতে গড়া কারুমূর্ত্তি, জরীদার নক্সা-বসানো বেনারসী কাপড়ের নমুনা প্রভৃতি এ-সব সংগ্রহ তো আছেই, উপরন্তু ভারতের এক অনুরাগী-কারুশিল্পীর পাঠানো এক টুকরো চালের দানার উপর ষ্টালিনের প্রশস্তি-রচনার অভিনব শিল্প-সৃষ্টির সূক্ষ্ম নিদর্শনটুকুও পরম-সমাদরে-সযত্নে রাখা রয়েছে দেখলুম ওদেশের এই অপরূপ যাদুঘরে ! ছোট্ট চালের দানাটির গায়ে-আলপিন দিয়ে সূক্ষ্ম-হরফ খোদাই করা প্রশস্তি-বচনের কথাগুলি কৌতূহলী দর্শকদের কাছে সুস্পষ্টভাবে দেখানোর উদ্দেশ্যে দ্রষ্টব্য-বস্তুটির সামনেই সাজানো, আধুনিক-ছাঁদের সুন্দর একটি 'মাইক্রোস্কোপ'···সেটির সাহায্যে রসিক-জনেরা ভীড় করে দেখতে আসেন ভারতের বিচিত্র কারু-কৌশলের প্রতীক এই অপরূপ চালের দানাটিকে ! সেদিন সোমবার···সোভিয়েট-রাজ্যে ছুটির দিন···তাই ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ দর্শকের ভীড়ে ভরে ছিল যাদুঘরের বিভিন্ন কক্ষ ! শুধু ছুটির দিনেই নয়, শুনলুম প্রত্যহই দলে-দলে কলা-রসিক দর্শকের এমনি ভীড় জমে মিউজিয়ামে-সাজানো দেশ-বিদেশের এই সব বিচিত্র শিল্প-সম্ভার দেখতে··· সে-ভীড়ে বিদেশী-জনের সংখ্যাও বড় অল্প হয় না ! যাদুঘরে প্রদর্শনী-কক্ষ অনেকগুলি···প্রত্যেকটি কক্ষে আলাদা-আলাদা করে সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে এক-একটি দেশের শিল্প-সম্ভার ! বিভিন্ন কক্ষে ঘুরে পুরো যাদুঘরটি দেখে বেড়াতে আমাদের সময় লাগলো প্রায় ঘণ্টা তিনেক। তবে ওখানকার সব জিনিষ খুঁটিয়া দেখতে গেলে সময় লাগে ঢের বেশী ! অথচ বেলা ওদিকে গড়িয়ে চলেছে···অপরাহ্নে যাবো মস্কোর 'লাল-চত্বরে' (Red Square) সোভিয়েট-মন্ত্রগুরু লেনিনের 'সমাধি-মন্দির' দর্শনে। কাজেই সেদিনের মত 'ম্যুসিয়ী' ইজোরাজিজেল্নিখের' বন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে 'ইনতুরিস্ত'-প্রতিষ্ঠানের মোটর-বাসে চড়ে সদলে আবার ফিরে এলুম আমরা 'স্তাভয় হোটেলের' আশ্রয়ে !

(ক্রমশঃ)

রামগোপাল ঘোষ ও মালো-বন্দর

সুরেন্দ্রনাথ কর

"ভারতবর্ষ" ও "নারায়ণ" মাসিক পত্রিকায় ও অধুনাতন হাইকোর্টের জজ মাননীয় রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "বঙ্গবাণী"তে আমার পিতা সময়ে সময়ে রামগোপাল ঘোষের সে জীবনী প্রকাশিত করেন সেই সূত্রে জীবনী লেখককে সাহায্য করিতে "বেঙ্গল হরকরা" প্রভৃতি সংবাদপত্রে বিভিন্ন সভা-সমিতির বিবরণী ইত্যাদি আমাকে দেখিতে হইয়াছিল। কেন না আমার পিতার ইচ্ছা ছিল না "ডুবাল নামে একটি বালক ছিল" লিখিয়া বাকীটুকু সমসাময়িক অভিমত ত্যাগ করিয়া অপূর্ব অনুমানে রামগোপালের জীবন পূর্ণ করিয়া দেন। রামগোপাল গরীবের ঘরে বাংলার মাটিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিংশ বৎসর পূর্ণ হইবার কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁহাকে পিতার সংসারে আয় সংকুলানের চেষ্টা করিতে হয়। কিন্তু উপার্জন করিয়াই দেশের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে ছাত্রদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য প্রভূত উপহার দিতেন। পুস্তক ব্যতীত কখন নগদ মুদ্রা কখন স্বর্ণ ও রৌপ্য পদকও দিতেন। বিভিন্ন ছাত্রদের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় রামগোপালের এরূপ পদক লাভ করেন! দেশবাসীর ও দেশের পারিপার্শ্বিকের যাহাতে উন্নতি হয় এই ছিল তাঁহার ব্রত। তিনি চাকুরী করেন নাই, কোম্পানীর নুন কখন খান নাই। তিনি শিক্ষিত ছাত্রদের দেশের সেবায় উৎসাহিত করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন যে মুষ্টিমেয় যে কয়জন দেশভক্ত ছিলেন, রামগোপাল ছিলেন তন্মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। শিক্ষা বিস্তারে দেশীয় ও ইউরোপীয়দিগের মধ্যে সমান অধিকারের দাবীও রক্ষায়, বাণিজ্য-বিস্তারে, শিল্প-উন্নতিতে, রেলপথ-বিস্তারে, খাল-খনন প্রভৃতির সম্যক প্রচলনে তিনি অগ্রণী ছিলেন। শতবর্ষ পূর্বে মালোবন্দর যখন প্রস্তাবিত হয় সে সময়ে বন্দরটিকে সংযুক্ত করিবার যে আলোচনা হয় তাহার সহিত রামগোপাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আর সে সময়কার আলোচনায় ভাগীরথীর তলদেশের কতক অংশ আজকের আলোকে আনিতেছি।

অধুনা ভাগীরথী হুগলীর ক্রমিক অবনতি বিষয়ে ভারত সরকার যে ব্যবস্থার আলোচনা করিতেছেন কলিকাতা ও ডায়মণ্ডহারবারের মধ্যে সংযোজনার জন্য যে গভীর খাল খনন বা বিদ্যাধরী পিয়ালীর মজা নদীগুলিকে ঝালাইয়া বা ভিন্ন খাতে চালনা করিবার আলোচনা পুণার গবেষণাগারে স্পষ্ট আদর্শ অনুযায়ী বিবেচিত হইতেছে। প্রায় শত বর্ষ পূর্বে এক আধুনিক উচ্চ বৈজ্ঞানিক প্রথায় না হইলেও কিছু কিছু আনুষঙ্গিক অবস্থার সমান্তরাল বিষয়ে সে কালের হুগলী নদীতে নৌবহনের বাধা সৃষ্টির নিমিত্তই ঘটিয়াছিল। তখন এই কারণেই প্রশ্ন উঠিয়াছিল মালো নদীর মোহনায় মাৎলা নামে কলিকাতা বন্দরের অনুপূরক বা উপবন্দর সৃষ্টি করা হয় বিধেয়। তখন হুগলী নদী-বক্ষে অধিকাংশ পণ্যবাহী জাহাজ ছিল পাল ও মাস্তুলবাহী। আজ বাংলাদেশে সে পরিবহন প্রথার উন্নয়ন হইয়াছে বটে, কিন্তু হুগলীর পয়বাহিকার তলদেশ ক্রমশঃ জাহাজ চলাচলের বাধা-সংকুল হইয়া উঠিতেছে। এখন প্রতি বৎসর বহু লক্ষ মণ বালি ও মাটি বহু শাখা ও উপনদী হইতে হুগলী নদীতে আসিয়া পড়ে। তা ছাড়া দৈনন্দিন জোয়ার ভাটায় স্থানে স্থানে তলদেশের গভীরতা এরূ পরিবর্তিত হয় যে বহু পণ্যবাহী জাহাজের কতক পণ্যাংশ মাদ্রাজ বা বিশাখাপাটানাম বন্দরে খালাস করিয়া হাল্কা হইয়া তবে কলিকাতা বন্দরে প্রবেশ করা সম্ভব হয়। তাছাড়া কলিকাতা বন্দরে পৌঁছাইতে সমুদ্র হইতে শত মাইলেরও অধিক উজান ঠেলিতে হয়।

মালোবন্দরের পরিকল্পনা ঠিক একই কারণে ঘটিয়াছিল। ১৮৫৩ সালে চেম্বার অফ কমার্স গভর্ণমেণ্টকে জানায় যে হুগলী নদীর তলদেশ ক্রমশঃ বুজিয়া আসিতেছে, লয়েড চ্যানেল, জেমস মেরি এবং গ্যাসপার স্যানডসে সে বৎসর জলের গভীরতা সর্বাপেক্ষা হ্রাস পাইয়াছে, সেইজন্য পাঁচ শত টনের অধিক ভারী জাহাজ পাইলটরা বিনা বাষ্পীয় শক্তিতে চালাইতে সাহসী হয় নাই। তদ্ব্যতীত নাবিক ও নদী সম্বন্ধীয় বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে হুগলী নদীতে জোয়ারজনিত এবং নদীর অববাহিকায় বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী হইতে যে পরিমাণ কাদা ও বালি উপকূল ও উপরিস্থিত সান্নিধ্যভূমি ধুইয়া আসিয়া পড়িতেছে, তাহাতে নদীর নিম্নস্থ মৃত্তিকা রাশীর চাপে ও আধিক্যে যে অবস্থার উৎপত্তি হইয়াছে তাহাতে জাহাজাদির গমনাগমনের অধিকতর বাধার সৃষ্টি হইতেছে। আজ সেই একই কথা— তবে এই প্রতিবন্ধক তদনীন্তন কোন ইন্‌জিনীয়ারিং কৌশলে পরিস্কৃত ও অপসারিত হওয়া সম্ভব ছিল না। সে সময়ে কয়েকখানি জাহাজ অকর্মণ্য হইয়া গিয়াছিল, কয়েকখানি ভগ্ন হইয়াছিল, এই কারণে জাহাজের অধিকারী ও মেরিণ ইনসিওরারদের শঙ্কিত করিয়াছিল—সংগে সংগে বিলাতী ব্যবসায়ী-মহল শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল বুঝি বা কলিকাতার মত এরূপ একটি বৃহৎ বন্দর বন্ধ হইয়া যায়। কতকটা সে শঙ্কামুক্ত হইবার জন্য মালো নদীর মোহনায় কলিকাতার অনুপূরক একটি বন্দর স্থাপনের প্রস্তাব হয়।

রামগোপাল তখন বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের প্রতিপত্তিশালী সভ্য। তিনি মালোবন্দরটিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সহায়তা করেন। এই সংগে তাঁহার কয়েকটি ব্যক্তিগত ঘটনা সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে! তা ছাড়া দেশবাসীর মংগল হিসাবে তিনি আশা করিয়াছিলেন যে বন্দরটি প্রতিষ্ঠিত হইলে পরিবেশের নিদ্রিত গ্রামগুলি বাণিজ্যাদি কর্মব্যগ্রতায় সাড়া দিয়া নূতন সক্রিয় জীবন গ্রহণ করিবে। তিনি তখন সুপ্রতিষ্ঠিত আর জি ঘোষ এণ্ড কোং নামক কুঠির—সত্বাধিকারী। তাঁহার একটি শাখা আফিশ তখন বর্মা একায়েবে ও অন্যটি রেংগুনে স্থাপিত ছিল। এই শাখা আফিশ হইতে তিনি চাউল সরবরাহ করিতেন! এই সূত্রে "কুলউড" নামক জাহাজের কমানডার W. S. Fitzsimmonsএর সহিত মালো নদীর জাহাজ চলাচল সম্বন্ধে আলোচনার পর তাহার নিকট রামগোপাল একখানি লিখিত রিপোর্ট চান! কমানডার এই আলোচনার উল্লেখ করিয়া রাজগোপালকে যে দীর্ঘ চিঠিখানি লেখেন তাহাতে হুগলী নদীর সহিত বিশেষভাবে তুলনায় মালোর নৌচালনার সুবিধা প্রমাণিত করেন।

১৮৫৬ সালে তদানীন্তন ছোটলাট একটি ছোট কমিটি গঠন করিয়া তাহাদের কয়েকজনকে একখানি ষ্টিমার নদীটি পরিদর্শন করিতে পাঠাইয়াছিলেন। তখন পিয়ালী নদীর আবর্জনার চাপে বিদ্যাধরীর উপরদিক মজিয়া যায় নাই, তখন কতকটা আবর্জনা পরিষ্কার করিয়া বাকীটা বর্ষার বা যাদবপুরী বৃষ্টির বেগে ধসাইয়া গড়াইয়া যাইবার আশা হয় নাই। সে সময় বিদ্যাধরীর ধারে ও দূরে পরিদর্শকেরা বিস্তর গ্রাম ও বসতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। নদীয়ার নদীগুলি মজিয়া যাওয়ায় উত্তর ও পূর্বদিকের প্রচুর পণ্য বিদ্যাধরীর বক্ষে বাহিত দেখিয়াছিলেন। এই কমিটির সভ্যেরা ফিরিয়া আসিয়া বিচার-বিবেচনা করিয়া মত দেন যে মালো কলিকাতার দ্বিতীয় বা উপবন্দর হইবার বিশেষ উপযোগী।

ইহার পর ইউরোপীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অনেকে মালোকে নূতন বন্দর উপলক্ষ্য করিয়া সেই বৎসর ও পরে কয়েকখানি জাহাজ ঐ বন্দরে

উপস্থিত করেন। গভর্ণমেণ্ট পাইলট ও বন্দরের প্রাপ্য যথেষ্ট উদারতার সহিত নির্দিষ্ট করেন। প্রথমে লবণ আসিয়াছিল সেজন্য অনেক ছোট বড় গোলা সৃষ্ট হয়, চাউলের গোলাও ক্রমে গড়িয়া উঠিতে থাকে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানে তেরখানি জাহাজ পণ্য লইয়া আসে, তন্মধ্যে "ক্লুলউড" রামগোপালের বাণিজ্য শাখা একায়েব হইতে চাউল লইয়া আসে। এই স্থানের অপর দিকে কাষ্টম আদায়ের নিমিত্ত এবং কলেকটারের ও তাঁহার আফিসের জন্য জাহাজের নংগর পড়ে। মালা বন্দরের জন্য লাট নং ৫৪ গভর্ণমেণ্ট ক্রয় করিয়া বিলি করেন। প্রথম শ্রেণীর বণিকেরা মালো নদীর মুখেই পাঁচ হাজার ফুট ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বণিকেরা মালিখালের তীরে স্থান সংগ্রহ করেন।

চিঠিপত্রাদি লেখালেখিতে ও জংগলাদি পরিষ্কার করিতে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে অন্যান্য ব্যবসায়ীরা মালোর উপকূলে একটি নূতন সহর গড়িয়া তুলিবার অদম্য উৎসাহে নদীর অপর উপকূলে জমিদারের নিকট হইতে জমি গ্রহণ করিয়া ইলেনগঞ্জ নামক স্থানটিতে গোলা খুলিতে লাগিলেন। একজন পরম উৎসাহী ব্যবসায়ী বাষ্পীয় শক্তি পরিচালিত চাউল পরিষ্কারের কল গড়িয়া তুলিলেন। লোনা জায়গা সেখানে পানীয় জলের বিশেষ অভাব ছিল। পুষ্করিণীতে জল ছিল কিন্তু সুমিষ্ট পানীয় নহে। কয়েকটি জলাশয় খনন করিয়াও সুফল পাওয়া যায় নাই। সেখানে যাহারা গিয়াছিল জলাভাবে বিশেষ কষ্ট হইতে লাগিল। রামগোপাল বহু অর্থ ব্যয়ে একটি পুষ্করিণী খনন করিবার উদ্যোগ করিলেন। রামগোপাল জানিতেন সুপেয় পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব কিন্তু অসম্ভব বলিয়া তিনি বিনা উদ্যমে ছাড়িতে প্রস্তুত ছিলেন না। স্থানীয় লোকের উপদেশ লইয়া তিনি যে জলাশয়টি খনন করেন তাহা তাহার জননীর নামে প্রতিষ্ঠা করেন। জননীকে তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার জন্য কলিকাতা হইতে পুরোহিত ব্রাহ্মণ আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব লইয়া কয়েকখানি নৌকাতে মাটির জালা পূর্ণ পানীয় জল নির্মাল্য দ্বারা শোধিত করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। যাত্রাবাহী নৌকায় কয়েকখানিতে পুরুষ অন্য কয়েকখানিতে স্ত্রীলোকেরা আনন্দ উৎসব ও হর্ষধ্বনি করিতে করিতে যান। আমার পিতাও ইহার মধ্যে একজন যাত্রী ছিলেন। রামগোপালের জননীর একান্ত ইচ্ছায় পার্শ্বেই পঞ্চবটী স্থাপনা করেন। তিনটি পুষ্করিণীর জল পানীয় বলিয়া ব্যবহারে আসিয়াছিল, এই নূতন পুষ্করিণীটি উহাদের মধ্যে অন্যতম।

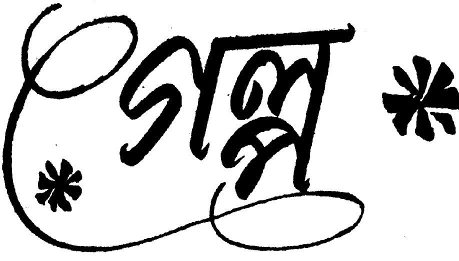
কিন্তু কলিকাতার ২৫ মাইলের মধ্যে জাহাজ চলাচল সুগম হইলেও আরও দ্রুততর পরিবহনের জন্য একটি রেলপথ ও সোজাসুজি একটি খাল কাটাইবার প্রস্তাবটি ওঠে, দ্বিতীয় প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হয়। রেল-পথটি ২৪টির মধ্যে চারিটি পরগণার ভিতর দিয়া যাইবার প্রস্তাব হয়। পরগণাগুলিতে সহর ব্যতিরিক্ত কলিকাতার প্রতি বর্গমাইলে জন সংখ্যার ক্ষমতা ছিল ৫৬৮, কাশপুর ৬৬৫ মেদনমল্ল ৩৪৩ এবং মাগুরায় ৫৭২। রামগোপাল এ রেলপথের সমর্থন করেন। ই আই রেলের কল্পনার সমর্থনে তিনি দ্বিজেন সেনকে লিখিয়াছিলেন যে দেশের পরিবহনের দ্রুত উন্নতি দেশের খনিজ ও ভূমিজ অর্দ্ধলুক্কায়িত ও গুপ্ত সম্পত্তির উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় প্রদেশে বিতরণে দেশবাসীর সুবিধা হইবে। নূতন রেলপথের অবতারণা এই অভিমতের পোষকতা করে।

মালো নদীতে অনায়াসে জাহাজ চলা-চলের রিপোর্ট বন্দর ও রেলপথ প্রবর্তনের সংস্রবে দেশের মূলধন নিয়োগের বিষয় আলোচিত হয়। ধনিসম্প্রদায়ের পরদানসীন মূলধন তখন লোহার সিন্দুকের চতুঃসীমার ভিতর লজ্জায় মরিত। আজও সে মূলধন লজ্জা ছাড়ে নাই, তাই দেশের কাজে বিদেশী মূলধন আমন্ত্রিত হইতেছে। ২১শে জুলাই ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মালো অ্যাসোসিয়েসনের যে সভা সমাহুত হয় তাহা রামগোপাল ঘোষের ১নং মিশন রোর আফিসে অধিষ্ঠিত হয়। অনেক সময়ে ইহাদের সভা এইখানেই বসিত। সেদিনকার সভায় অ্যাসোসিয়েসনের সভাপতি ব্যতীত উপস্থিত ছিলেন ক্যাপটেন ডাইসি ও নিসবেট, শিলার, সুন্দরবনের কমিশনার রাইলি, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিং, আগাবেগ, প্যারীচরণ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি বিশ জন ভদ্রলোক। এই সভায় রামগোপাল বলেন যে যে-পরিমাণ পণ্য মালো নদী দিয়া বাহিত হয় তাহার হিসাব গ্রহণ করিয়া তদুপরি ন্যায্য আস্থা স্থাপন করিলে সভ্যেরা অনুমান করেন মালো বন্দর অচীরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। সুতরাং এ কার্যে মূলধন নিয়োগ করা যাইতে পারে। অতঃপর সেই সভায় একজন বলেন যে মালো পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের প্রস্তাব সাধারণের নিকট করা হউক এবং শিলার বলেন যে কলিকাতা-মালো ও ইষ্টারণ রেল-কোম্পানীর পরিচালনাভার দেশীয় ও ইউরোপীয় শেয়ার হোলডার দিগের মধ্যে একটি কমিটি গঠন করিয়া তাহাদের হস্তে দেওয়া হয়। রামগোপাল এ মতের সমর্থন করেন কিন্তু সেই সভাতেই যখন ডাইসির প্রস্তাবে ও নিসবেটের সমর্থনে প্রস্তাবিত হয় যে মালো অ্যাসোসিয়েসনের সমস্ত কাগজ পত্রাদি পরীক্ষা করিয়া নিশ্চিত ভাবে মূলধন নিয়োগের উপযোগী বলিয়া প্রচার করা হউক তখন রামগোপাল সাধারণকে এতটা নিশ্চয়তা দিয়া প্রলোভিত করিতে স্বীকৃত হন নাই। রামগোপাল তখন দেশের নেতা, তাঁহার সততার উপর দেশবাসীর বিশেষ আস্থা ছিল সে জন্য তাঁহার অভিমতের মূল্য ইউরোপীয় সভ্যেরা বুঝিতেন আর নেতারও দেশবাসীর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল যাহাতে তাহারা হুজুগে মাতিয়া বিফলে অর্থ নিয়োগ না-করেন। রামগোপাল ঐ প্রস্তাব পরিবর্তিত করিয়া বলেন যে কলিকাতা ও সাউথ ইষ্টারণ রেল কোং কলিকাতা হইতে মালো নদীর মুখ পর্যন্ত রেল লাইন দ্বারা সংযুক্ত করার কার্যে মূলধনের নিয়োগ দেশের মধ্যেই আয়জনক হওয়া সম্ভব অবশ্য সরকারি সংবাদাদি ও দলিল পত্রাদি হইতে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। তাঁহার এ প্রস্তাব ডাইসির সমর্থনে একবাক্যে গৃহীত হয়।

তবে বন্দর ও রেল প্রতিষ্ঠার কার্য নানা প্রতিবন্ধকের মধ্যে দিয়া অগ্রসর হয়। পানীয় জলের ও শ্রমিকের অভাব এবং গভর্ণমেণ্টের অনুৎসাহ উহা অসম্ভব করিয়া তুলে। ইহার মধ্যে পলাশীর প্রতিশোধের ভয়ে গভর্ণমেণ্ট উদ্বিগ্ন থাকেন। সে সময়ে নিত্য পরামর্শাদির জন্য ছোটলাট সাহেবকে বড়লাটের বাড়ির নিকট ঘর ভাড়া করিয়া থাকিতে বাধ্য করে। আজ মটরকার, টেলিফোন, বিমানপোত সে সময়ের দূরত্ব সংক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছে।

যাহা হউক ভারত-সচীব লর্ড ষ্ট্যানলী প্রতিশ্রুতি দেন যে মূলধনের চার আনা রকম অংশ উঠিলেই গভর্ণমেণ্ট তাহার উপর গ্যারাণ্টী দিবেন। এ টাকাও অতি সত্বর উঠিয়াছিল। ইহার মধ্যে রামগোপাল চল্লিশ হাজার টাকার শেয়ার ক্রয় করেন। ১৮৫৯ সালের জানুয়ারী মাসে উহা গভর্ণমেণ্টকে দেওয়া হয়। ক্যানিং পোর্টের প্রতিষ্ঠার ঘটনাবলী এই মালো বন্দর স্থাপনের প্রস্তাবের সহিত জড়িত। সে পরের ইতিহাস।





ন জানন্তি দেবাঃ

শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

আকাশটা কেমন মেঘলা ছিল। বেলা অনেকটা হয়েছিল, কিন্তু হোটেলের কর্মচারীদের মধ্যে তেমন কর্মচাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছিল না। নয় নম্বর ঘরের দ্বার খোলাই ছিল। পত্রিকাওয়ালা একটুখানি খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে পত্রিকাটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেল। চাকর জগন্নাথ টেবিলের উপর থেকে গত রাত্রের চায়ের ট্রে, কাপ-পট সব নিয়ে গেল। কিন্তু কেউ লক্ষ্য করে দেখল না— সুখময় বাবু উঠছেন না কেন?

তার কিছুক্ষণ পরে মুচি আগের দিনে দেওয়া জুতো রঙ করে ফিরিয়ে দিয়ে গেল, ধোপা বিছানার এক পাশে ধোয়া কাপড় রেখে গেল; কিন্তু কেউ ডাকল না সুখময়-বাবুকে। বেলা প্রায় সাড়ে আটটা, জগন্নাথ অন্য বাবুদের কাজকর্ম শেষ করে, সুখময়ের জন্য চা' নিয়ে এসে হাজির হ'ল। তখনও সুখময়ের সাড়া নেই। ডাকলো জগন্নাথ— "ও বাবু, বাবু, চা এনেছি, চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।"

অন্যদিন এমন দেরী হ'লে জগন্নাথের কপালে গঞ্জনার অন্ত থাকত না। আজও সে ভয়ে-ভয়ে বাবুর ঘরে ঢুকেছিল। কিন্তু—আজ যে বাবুর ভর্ৎসনা নেই, গঞ্জনা নেই—কোন কথা নেই?

সুখময়ের কাছে গিয়ে জগন্নাথ তাঁর গায়ে ধাক্কা দিল। একি তাঁর শরীরটা যে সাপের গায়ের মত ঠাণ্ডা! জগন্নাথ স্পর্শ করেই আঁৎকে উঠল। চীৎকার করে ডাকল—'বাবু! বাবু!'

জগন্নাথ ঘাবড়ে গেল। ঘরের দরজায় গিয়ে চীৎকার করল—"ম্যানেজারবাবু! সুখময় বাবুর কি হয়েছে দেখুন? তাঁর ঘুম ভাঙছে না!"

ম্যানেজার এলেন। আর তাঁর সঙ্গে এলেন অন্যান্য নূতন পুরাতন অধিবাসীরা। সুখময় তখন চিরনিদ্রায় আচ্ছন্ন। কাহার ডাকেও তিনি সাড়া দিলেন না।

ম্যানেজার জগন্নাথকে বল্লেন, "যা, ডাক্তারকে নিয়ে আয়।"

ডাক্তার এলেন, পরীক্ষা করে দেখলেন সুখময়কে আপাদ-মস্তক। শরীরটা সাপের গায়ের মত শীতল, বিবর্ণ মুখখানাতে অসহ্য যন্ত্রণার ছায়া-মাখানো। ভাল ভাবে পরীক্ষা করে দেখলেন, বললেন, "বিষের ক্রিয়ায় যেন মৃত্যু হয়েছে, এ মৃত্যু সন্দেহজনক।"

সারা হোটেলের লোকেরা এসে ভেঙে পড়েছিল। ডাক্তারের কথা শুনে, কেউ আত্মহত্যা, কেউ বিষ খাইয়ে মারার ব্যাপার ইত্যাদি বলাবলি করতে করতে ভেগে যেতে লাগল। ডাক্তার ম্যানেজারকে বললেন, "পুলিশকে খবর দিন। এ মৃত্যু সন্দেহজনক।"

পুলিশও সত্বর এসে হাজির হ'ল। কানন ঘোষ এই এলাকার ইন্সপেকটার। এককালে তিনি ডিটেকটিভের কাজে বড় আনন্দ পেতেন। এখনও সন্দেহজনক মৃত্যু অথবা রহস্যজনক কিছুর খবর পেলে বড় উৎসাহ সহকারে ছুটে আসেন। সঙ্গে জন চারেক কনষ্টেব্‌ল্ নিয়ে তিনি এলেন। এসেই হোটেলের দরজায় দুইজনকে মোতায়েন করলেন—হোটেল থেকে কোন লোক যেন পালিয়ে না যেতে পারে তা' দেখবার জন্যে। বাকী দুইজনকে নিয়ে তিনি সুখময়ের ঘরে গেলেন। ডাক্তার ও ম্যানেজার তাঁরই জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

ম্যানেজার—দেখুন ইন্‌স্‌পেকটার সাহেব, কি বিপদ দেখুন!

ইন্‌স্‌পেকটার—হ্যাঁ, তা তো দেখছি, এখন দেখুন কোন বোর্ডার যেন পালিয়ে না যায়। আর যে-সব ঠাকুর-চাকর এঁর ঘরে আসে তাদের সবাইকে এখানে নিয়ে আসুন; আর ডাক্তারবাবু!

ডাক্তার—আমার মনে হচ্ছে, ওর বিষ-ক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে। আপনি একটু ভাল ভাবে দেখুন।

কানন ঘোষ সুখময়কে পরীক্ষা করে দেখলেন—হাত পা, কান-চোখ-মুখ। হঠাৎ মুখের কাছে এসে ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে তিনি ডাক্তারকে বললেন—"দেখুন তো ডাক্তার-বাবু, ঠোঁটটা ফোলা-ফোলা মনে হচ্ছে না? এই জায়গাটা কালো হয়ে আছে?"

ডাক্তার আস্তে আস্তে নীচের ঠোঁটটি টানলেন— "তাইত, কিসে যেন কামড়িয়েছে! দুটো দাঁতের দাগ! সাপের কামড় নয় তো?"

ইন্‌স্‌পেকটার—সাপ কামড়াবে এমন জায়গায়?

ডাক্তার—বড় অদ্ভুত ঠেকছে।

ইন্‌স্‌পেকটার—একে শব-ব্যবচ্ছেদ-আগারে পাঠাতে হবে। এর আগে ওর একটা ছবি তুলে নিতে হবে।

ছবি তোলা হ'ল। তারপর হোটেলের ঠাকুর-চাকর

সকলকে ডেকে ইন্‌স্‌পেকটার তাদের পরীক্ষা করতে আরম্ভ করলেন। একটি কনষ্টেব্‌ল্‌ এসে ঢুকল—"স্যার, একটা আহত লোককে হোটেলের বাইরে নিয়ে যেতে চাইছে কয়জন। যেতে দেব ?"

ইন্‌স্‌পেকটার—"আহত লোক ? কে সে ? ম্যানেজার কোথায় ? কোথায় গেলেন তিনি ?

দারোয়ান—তিনিও সেখানে গিয়েছেন।

ইন্‌স্‌পেকটার—ডাক, তাঁকে ডাকো।

ম্যানেজার এলেই ইন্‌স্‌পেকটার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন "আহত ব্যক্তি আবার কোথাকার ? বোর্ডার বুঝি ? তিনি কি করে আঘাত পেলেন ?"

ম্যানেজার—না বোর্ডার নয়। একটি মাদ্রাজী কি মারাঠী যুবক হবে। কাল রাত্রে আমাদের হোটেলের ধারে ঐ নীচে রাস্তার পাশে ঘাসের উপর পা ভাঙা অবস্থায় পড়ে ছিল। দারোয়ান কি করে দেখতে পেয়ে হোটেলে এনে রেখেছিল। গাড়ী ঘোড়া যান চলাচল তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তাই হস্পিটালে নিয়ে যেতে পারা যায় নি। প্রাথমিক চিকিৎসা করে হোটেলের সিকরুমে রেখে দেওয়া হয়েছিল।

আজ কয়জন সদয় বোর্ডার ওকে হস্পিটালে নিয়ে যেতে চাইছে।

ইন্‌স্‌পেকটার—ও আঘাত পেল কি করে জানেন ?

ম্যানেজার—ও বলছে মোটর গাড়ীর ধাক্কা লেগে, গড়িয়ে গড়িয়ে রাস্তার ধারে ঘাসের ওপরে এসে পড়েছিল।

ইন্‌স্‌পেকটার—চলুন ওকে দেখে আসি। চলুন ডাক্তারবাবু, চলুন।

তিনজনেই সিকরুমে হাজির হলেন। দেখলেন, ফুল-প্যাণ্ট, হাফ-সার্টপরা একটি মারাঠী যুবক—বয়স তাঁর ৩০।৩৫ হবে। ডাক্তার ভাঙা পাটা পরীক্ষা করে দেখলেন, ইন্‌স্‌পেকটারকে বললেন; "এ তো মোটর-ধাক্কার আঘাতের মত মনে হচ্ছে না ?"

ইন্‌স্‌পেকটার—কি মনে হচ্ছে ?

ডাক্তার—মনে হচ্ছে, যেন পড়ে গিয়ে আঘাত লেগেছে, উপর থেকে পড়ে গিয়ে।

যুবক—না, না পড়ে গিয়ে নয়, মোটরের ধাক্কা খেয়ে।

ইন্‌স্‌পেকটার—আপনার নাম ?

যুবক—হনুমন্ত রাও।

ইন্‌স্‌পেকটার একটা কনষ্টেবলকে ইঙ্গিত করে বললেন, একে সার্চ করতে হবে। তারপর যুবকটিকে লক্ষ্য করে বললেন—"মিঃ রাঃ, কিছু মনে করবেন না, আপনাকে সার্চ না করে তো পারব না।"

হনুমন্ত রাও—সার্চ ?

কনষ্টেবল্‌ হনুমন্ত রাওএর বুক পকেট থেকে কতকগুলি কাগজ, চিঠিপত্র তুলে নিল। তার মুখখানা কেমন কালো হয়ে গেল। তারপর ডানদিকের পকেট থেকে একখানা রিভলভার খুঁজে পেল সে।

ডাক্তার—ম্যানেজার কেমন চকিত হয়ে উঠলেন। ইন্‌স্‌পেকটার ভাবলেন, একটা আসামী বুঝি ধরা পড়ল।

ইন্‌স্‌পেকটার—এটা নিয়ে ঘুরছিলেন কেন ? একেবারে যে গুলিভরা দেখছি !

হনুমন্ত রাও—এ আমার লাইসেন্স করা রিভলভার। গঙ্গার ধারের পোর্টকমিশনার আফিস থেকে রাতে একা ফিরতে হয় ; খিদিরপুরের রাস্তা ভাল নয় ; তাই এই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা।

ইন্‌স্‌পেকটার। ও তাই ? আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে হস্পিটালে নিয়ে যাক। তবে এ হস্পিটালে নয়—আলিপুর জেল হস্পিটালে। ভালভাবে পরীক্ষা না করে একে ছাড়া যাবে না।

তারপর ইন্‌স্‌পেকটার হোটেলের যাকে যাকে সন্দেহ হ'ল, তাদের সবাইকার জবানবন্দী নিলেন। কোন সূত্র খুঁজে পেলেন না। শেষ পর্যন্ত ঠাকুর-চাকর ও দরোয়ানের কাছ থেকে জানলেন—গতকল্য রাত্রে সুখময়বাবুর ঘরে দু'টি মেয়ে এসেছিল। এদের একটিকে ভাল ভাবে কেউ চেনে না, অপর আর একজন রমলা দেবী নামে একটি ধনবতী মহিলা।

ইন্‌স্‌পেকটার—আচ্ছা ম্যানেজার বাবু, বলতে পারেন মহিলা দু'টি কে ?

ম্যানেজার—একটিকে ভাল ভাবে জানি না। কিন্তু রমলা দেবীকে জানি। তাঁর বাপ-মা কেউ নেই। পিতার বিরাট সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিণী। দূর সম্পর্কীয় নিরাশ্রয় আত্মীয়দের আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন। লেখাপড়া খুব করেছেন। সুখময় বাবুর সঙ্গে পড়তেন। তাঁর সঙ্গে খুই শীঘ্রই বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে তাঁদের বাড়ী।

ইন্‌স্‌পেকটার—তাকে আমার খুব দরকার। আচ্ছা সুখময় বাবুর কেউ আছেন ?

ম্যানেজার—নিশ্চয়ই কেউ আছেন ? কিন্তু কোথায় কে আছেন সে-সব আমাদের জানা নেই।

ইন্‌স্‌পেকটার—তা' হলে একটা কাজ করুন, রমলা দেবীকেই খবর দিয়ে পাঠান।

ম্যানেজার—আহা ! বেচারী বড় শক্‌ড্‌ হবেন।

ইন্‌স্‌পেকটার—কিন্তু উপায় নেই ?

ম্যানেজার—জগাইকে পাঠাচ্ছি। ও-ই ঠিকানা জানে। ও-ই সুখময় বাবুর দূত ছিল কিনা !

(২)

কাননবাবু আপনার বৈঠকখানায় বসে চুরুট টান-ছিলেন। চুরুটের ধূম মুখের ভিতর জমিয়ে মাঝে মাঝে

ফু-দিয়ে ছাড়ছিলেন আর তার কুণ্ডলীপাকানো দেখছিলেন; কত কিছু ভাবছিলেন,—সম্মুখের দরজা খোলা ছিল। তার পর্দা ঠেলে প্রবেশ করল একটি সুস্থ সুশ্রী যুবক।

কানন—এসো এসো রঞ্জিত, তোমার অপেক্ষাতেই বসেছিলুম। কাল সকালে একটি রহস্য-জনক কেস পেয়েছি। তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য লোক পাঠিয়েছিলুম,—কিন্তু কোন পাত্তাই তোমার পাওয়া গেল না।

রঞ্জিত—বাড়ী ছিলুম না। টাকার ধান্ধায় বেরিয়েছিলুম। কিন্তু লাভ হ'ল না। একটা পয়সাও পাওয়া গেল না। যে-ছাত্তরকে পড়াতাম তার বড় অসুখ; ওর মা-বাবার কাতরতা দেখে টাকা চাওয়ার ভরসা হল না।

কানন—টাকা? তোমার পুরস্কারের টাকা তো এসে গিয়েছে। তোমাকে দেওয়ার জন্যে আমি খুঁজে মরছি! তোমার মত বিদ্বান বুদ্ধিমান যুবককে শুধু ইনফরমার হিসাবে যৎকিঞ্চিৎ দিচ্চি, তার জন্য আমি খুব লজ্জিত। বলব কি, একটাও ভেকেন্সি হচ্চে না। হ'লে কবে রেগুলার ডিটেক্টিভ ইন্‌স্‌পেকটারের পদে বড় সাহেবকে ধরে এপয়েন্ট করিয়ে নিতুম। যাক্, তুমিও কাজ করতে থাক, আমিও সুযোগ খুঁজছি।

রঞ্জিত—কোথায় কি কেস পেয়েছেন?

কানন—সে বলব বলেই তো বসে রয়েছি। চল বেড়াতে বেড়াতে যাই, আজকেই তোমাকে নিয়ে মিস্ রমলার বাড়ীতে যাবার জন্য এন্‌গেজমেন্ট করে এসেছি।

রঞ্জিত—সে আবার কে?

কানন—সবই বলব, আমি আসছি তোমার টাকাটা নিয়ে, বোস। রঞ্জিত বসু কানন বাবুর স্বর্গত বন্ধুর ছেলে। বি-এ পাশ করার পর পিতার বন্ধুর কাছে চাকুরীর জন্যে এসেছিল। ছেলেটি চালাক, বুদ্ধিমান ও চটপটে দেখে তাকে ইনফরমারের কাজে লাগিয়েছেন। তারপর থেকে নানা রকম জটিল ডিটেকটিভের কাজে কাননবাবু রঞ্জিতকে লাগিয়েছেন—তার অপরাধ বিশ্লেষণের ক্ষমতা দেখে অবাক হয়েছেন, তাকে তেমন পুরস্কার আদায় করে দিতে পারেন নি বলে দুঃখিত হয়েছেন।

কিন্তু এইবার? কিন্তু এইবার যদি রঞ্জিত সন্তোষজনক ভাবে সুখময়ের মৃত্যুরহস্য উদ্‌ঘাটিত করতে পারে তবে সরকারী পুরস্কার পাওয়া যাক বা না যাক, রমলা নিজেই এক হাজার টাকা পুরস্কার দেবে কথা দিয়েছে।

● ঘটনাটা বলে পথ চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন কানন বাবু, "এই যে এই এসে পড়েছি, এই বড় বাড়ীটাই রমলা দেবীর," বলেই দাঁড়ালেন তিনি। বাইরের দরজায় টিপলেন ইলেকট্রিক বেলের বোতাম। তারপর দু'জন ঘট্‌ঘট্ করে উপরে উঠে গেলেন।

রমলা তার বাইরের হল ঘরে বসে অপেক্ষা করছিল। তাদের দেখেই, "আসুন, আসুন,—এদিকে বসুন" বলে উঠে এল সে।

প্রচুর খাবার আয়োজন করে রেখেছিল রমলা। ওদের বসিয়েই ভিতরে চলে গেল সে। একটি মেয়ে থালায় খাবার সাজিয়ে তাঁদের সামনে এনে রাখল।

রঞ্জিত—এত সব কি?

কানন—খেয়ে নাও; বুদ্ধি খুলবে।

রমলা—হ্যাঁ, বুদ্ধি আপনাদের ভাল ভাবে খোলা দরকার। দিন রাত আমার অন্য কোন চিন্তা নেই। কেবল এক ভাবনা, কি করে সুখময় বাবুর মৃত্যুটা হ'ল।

কানন—সত্যি রমলা দেবী খুব মর্ম্মাহত হয়েছেন। বিয়ের সব ঠিকঠাক, এমন সময় এ দুর্ঘটনা।

রমলা—বিয়ের জন্য মর্মাহত হই নি। বিচলিত হয়েছি ওর অদ্ভুত মৃত্যুটা দেখে। কেমন করে কি হলো, কিছুই বুঝতে পারছি না।

কানন—সে-জন্য আমরা রয়েছি। কিন্তু একটা কথা,—আপনাকে সব কথা খুলে বল্‌তে হবে, যা-জিজ্ঞেস করব,—সব।

রমলা—তবে চলুন, আমার পড়ার ঘরে, সে-টা খুব নিরিবিলি।

ততক্ষণে দুজনেরই খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। মুখ মুছে উঠে ধীরে ধীরে রমলার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তার পড়ার ঘরে গেলেন।

রঞ্জিত—বাঃ, চমৎকার পাঠাগার তো। এত সব বই? আপনি বুঝি খুব পড়তে ভালবাসেন?

রমলা—হ্যাঁ, বসুন।

কানন—এবার সুখময় বাবুর হিষ্ট্রিটা ভাল করে জেনে নিতে হবে।

রমলা—শুনুন আমি বলছি, কিন্তু গুছিয়ে বলতে পারবো না। সঠিক ভাবতেই পারছি না।

রঞ্জিত—হওয়ারই কথা!

কানন—আচ্ছা, আমি জিজ্ঞেস করছি, আপনি জবাব দিন।

রমলা—বলুন।

কানন—সুখময় বাবুর আত্মীয় আছেন কেউ?

রমলা—দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় হয়ত নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু আমরা তাদের জানি না। মা-বাপ তাঁর কেউ নেই। এক বিধবা মাসীর ঘরে মানুষ হয়েছিলেন। সে-মাসীও মারা গিয়েছেন। তাই কলেজ ছেড়ে চাকুরীতে যখন ঢুকেছিলেন তখন ঐ হোটেলে বাসা বাঁধেন। আর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত একই ঘরে কাটিয়ে গেলেন।

রঞ্জিত—আচ্ছা, আত্মীয় তো গেল? এখন বন্ধু-বান্ধবী, এদের পরিচয় দিতে পারেন?

রমলা—তাঁর আপিসের বন্ধুদের খবর বলতে পারবো

না, কিন্তু কলেজে তাঁর অনেক বন্ধু-বান্ধবী ছিল। আমরা স্কটিশে পড়তুম। আমার যাদের সঙ্গে আলাপ ছিল, তাঁরও তাদের সঙ্গে ভাব ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কলেজ ছেড়েও ওর সঙ্গে যোগ রক্ষা হয়েছিল শুধু তিন জনের, আমার, হীরেন বলে একটি ছেলের—সে এখন অ্যামেরিকায়; আর বিজলী বলে একটি মেয়ের।

রঞ্জিত—বিজলী আবার কে?

রমলা—বিজলী? একটি ভারতীয় ক্রিশচিয়ান মেয়ে। —এক পাদ্রীর পালিতা কন্যা। দেখতে খুব স্মার্ট, চোখ দিয়ে যেন বিজলী জ্বলছে। ও মেট্রিকে আমাদের সঙ্গে ইংরেজিতে প্রথম হয়েছিল।

কানন—একটা কথা জিজ্ঞেস করব,—মনে কিছু করবেন না।

রমলা—বলুন।

কানন—আচ্ছা, বিজলী আর রমলার মধ্যে সুখময়বাবু কার প্রতি বেশী অনুরক্ত ছিলেন?

রমলার মুখখানা কেমন লাল হয়ে উঠল।

রঞ্জিত—লজ্জা করবেন না।

রমলা—বিজলীর সঙ্গে হয়েছিল ওর লেখাপড়ার প্রতিযোগিতা। বিজলী সুখময়কে কোনদিনই পরাজিত করতে পারেনি। তারপর কখন আরম্ভ হ'ল তাদের প্রেম করার পালা। বিজলী তাঁকে বিয়ে পর্যন্ত করতে চাইলো। কিন্তু কেন জানি না, তাতে ওর মন রাজি হ'ল না।

কানন—শেষে আপনারই জয় হয়েছিল?

রমলা—(লজ্জিত মুখে) জয় কোথায়? পিসীমার বহুদিন ইচ্ছে, তার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়; সুখময়বাবু আমাদের বাড়ী এসে তাঁর কাছে থাকতেন, খেতেন, কতবার কলেজের ছুটিতে পিসীমার কাছে কাটিয়ে গিয়েছেন। আমিও দেখতুম বিয়ে একটা করতেই হবে, নইলে সংসার চালাতে বড় অসুবিধে। পিসীমারও যখন এত ইচ্ছে তখন সুখময়বাবুর সঙ্গেই বা বিয়ে হ'তে আপত্তি কি?

কানন—বিজলীর সঙ্গে আপনার কেমন ভাব ছিল?

রমলা—অন্য মেয়েদের সঙ্গে যেমন প্রায় তেমনি, হয়ত একটু বেশী।

রঞ্জিত—বিজলী আপনাকে হিংসে করতো?

রমলা—প্রথম তেমন কিছু লক্ষ্য করিনি; কিন্তু এই কয়েক মাস ধরে তার হিংসার জ্বালা দেখে অবাক হয়েছি।

রঞ্জিত—আমি সূত্র পেয়েছি।

কানন—কোথায়?

রঞ্জিত—সে কথা পরে বলব। আচ্ছা, রমলা দেবী, যে মারাঠী যুবকটি ধরা পড়েছে, তাকে দেখেছেন কি?

রমলা—হ্যাঁ, দেখেছি, আমি সংবাদ পেয়েই যখন ছুটে গেলুম পিসীমাকে নিয়ে তখন লোকটাকে পুলিশ আর হোটেলের দারোয়ান ধরে কালো-গাড়ীতে তুলছে।

রঞ্জিত—ওকে চেনেন কি?

রমলা—দেখা মাত্রেই চিনি বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু তখন তো আর ওর দিকে মনোযোগ দিতে পারি নি। বিজলীর পাণি প্রার্থী হনুমন্ত রাও যেন?

কানন—হ্যাঁ, হনুমন্ত রাও-ই বটে।

রঞ্জিত—আপনি ওকে কি করে জানলেন?

রমলা—জানি বলতে পারি না। বিজলী যখন আমাদের বাড়ী আসত তার পিছু পিছু আসত ঐ রাও। বাড়ী পর্যন্ত আসত না, পথ থেকে ফিরে যেত। বিজলী এই প্রেমপাগলার গল্প বলে হেসে গড়াগড়ি খেত।

রঞ্জিত—ইউরেকা,—আমি পেয়েছি।

কানন—রাখো,—ধীর হয়ে পরে ভেবো। আচ্ছা রমলা দেবী আপনি ঐ দিন রাত্রে যখন গিয়েছিলেন, তখন, আর কেউ এসেছিল কি?

রমলা—তখন আর কেউ ছিল না। তবে সুখময় বলেছিল বিজলীর সন্ধ্যার পরে আসার কথা ছিল।

রঞ্জিত—সে এসেছিল কি?

কানন—খুব সম্ভব এসেছিল। হোটেলের লোকেরা বলেছিল, আরও একটি মহিলা এসেছিলেন; তাঁর নাম—ঠিকানা কেউ বলতে পারে নি।

রঞ্জিত—তাঁর ঠিকানা জানেন?

রমলা—হ্যাঁ, আমি জানি,—পার্ক সার্কাসে।

রঞ্জিত—আজ রাত্রেই ওকে য়্যারেষ্ট করুন।

কানন—তা না হয় করা যাবে।

রঞ্জিত—করোণারের রিপোর্ট এসেছে?

কানন—হ্যাঁ, তাতো এসেছে। রক্তে সাপের বিষ দেখা গিয়েছে। রক্ত জমে কালো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঠোঁটের যে ক্ষত চিহ্নটা সেটা সাপের দাঁতের চিহ্ন বলে তাঁরা মনে করেন না।

রমলা—সেটাই অদ্ভুত!

(৩)

সাপুড়ে বস্তীর অন্ধকার কোঠায় হাত পা বাঁধা অবস্থায় রঞ্জিত বসুর শ্বাসরোধ হয়ে আসছিল। প্রতিক্ষণে অপেক্ষা করছিল মৃত্যুর জন্য—সর্পদংশনে মৃত্যু! সাপুড়েদের সর্দার এই হুকুমই করে গিয়েছে—ওকে ছাড়া হবে না। ওকে ছাড়লে আমাদের দলকে দল পুলিশ ধরে নিয়ে জেলে দেবে—ছেলে-পুলে বৌ সব না খেয়ে মরবে। আর একটা লোক বলছিল—"কি করে মারবে?" সর্দারের ফিস্ ফিস্ করা গলায় স্পষ্ট শুনেছিল রঞ্জিত—বড় গুখরোটার বিষ কাল পূর্ণ ত্রিশ দিন হলেই পুরো হবে। সেটাকে দিয়ে কামড়ে নোব। সাপের কামড়ে মরবে কেউ কোন সন্দেহ করবে না।" কানের মধ্যে শুধু বার বার ঐ কয়টি কথাই যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল,—'বড় গোখরো দিয়ে কামড়ে

নোব।' মৃত্যুর সম্মুখে বন্দী অবস্থায় পড়ে থেকে রঞ্জিতের বাড়ীর সকলের কথা মনে পড়ছিল—মনে পড়ছিল রমলার কথাও। কারো কাছে বিদায় নিয়ে যেতে পারলো না সে।

সহসা তরুণী কণ্ঠের ধ্বনি শুনল, "কিরে বাবু, বড় ভয় হচ্ছে না?"

চক্ষু মেলে রঞ্জিত দেখল একটি সুন্দরী বেদেনী। বয়স তার আঠার-উনিশ হবে। মুখে যেন তার করুণা ঝরে পড়ছে।

বেদেনী—ভয় হওয়ারই কথা! আর কারো সঙ্গে দেখা হবে না! আচ্ছা রে বাবু তোর পিয়ারী ছিল রে?

রঞ্জিত—আছে, ঠিক তোমারই মত একটি মেয়ে। তার কথা ভাবতে পার?

বেদেনী—ঠিক পারছি রে বাবু, ঠিক পারছি, তাই এসেছি ছুটে। আমি তোর বাঁধন খুলে দেব। তুই শিঘ্‌গিরি পালিয়ে যা! কিন্তু একটা কথা তুই পিতিজ্ঞা কর, তোর পিয়ারীর নাম নিয়ে পিতিজ্ঞা কর,—এই সাপুড়েদের পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে না!—এ-কাজের জন্য কেউ কিছু বলবে না!

বেদেনী ধীরে ধীরে রঞ্জিতের হাত-পায়ের বাঁধা খুলে দিল। মুক্ত হয়ে বসল রঞ্জিত। বলল—তোমাকে কি পুরস্কার দেব? তোমার কি নাম বল? সারা-জীবন তোমার নাম মনে রাখব।

বেদেনী—আমার নাম মনে রাখবি? সেই আমার বড় পুরস্কার। আমার নাম বেহুলা।

রঞ্জিত—আমায় আর একটা কথা বলবে?

বেদেনী—কি কথা রে?

রঞ্জিত—বিজলী বলে যে পাদ্রী সাহেবের মেয়ে, ও এখানে কেন আসতো?

বেদেনী—পাদ্রী সাহেবের মেয়ে নয় সে—পাদ্রী সাহেব ওকে লালন পালন করে মানুষ করেছে। ও আমার বড় চাচীর মেয়ে। চাচী যখন চাচাকে ইস্তফা দিয়ে চলে গেল, তখন ওকে পাদ্রী সাহেবের কুঠীতে দিয়ে এলেন চাচা। সেই থেকে সাহেব ওকে লেখাপড়া শিখিয়েছে, কত কি করেছে? মাঝে একবার ওকে এনে শাদী দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সায়েব দেয় নি—বিজলীও আসতে চায় নি।

রঞ্জিত—তোমাদের এ-বাড়ীতে সে আসতো?

বেহুলা—আসতো। বড় হয়ে যখন সে মেম-সায়েবদের মত হ'ল তখন যীশুর কথা বলতে আসতো।

কিছুদিন আগেও এসেছিল। যে লোকটা তোকে খবর দিয়েছিল সে লোকটার কাছে এসে সে সাপের বিষ নিয়ে গিয়েছিল।

রঞ্জিত—সে লোক বলেছিল আমায় সব বলবে।

বেহুলা—সেই লোভেই তো এসে মৃত্যুর মুখে পা দিয়েছিস, এখন যা, পালিয়ে যা!

রঞ্জিত—কিন্তু আমি যে যাব, তোমার কি শাস্তি হবে।

বেহুলা—আমাকেই হয়ত মারবে।

রঞ্জিত—ত' হলে আমি যাব না। আমায় মেরে ফেলুক।

বেদিনী—আমিও পালিয়ে যাব।

রঞ্জিত—আমাকে রক্ষা করে তোমাকে ঘর-ছাড়া হতে হবে?

বেদেনী—না! আজই আমার প্রীতমের সঙ্গে পালিয়ে যাব, নইলে তার সঙ্গে যে শাদী হবে না। তুই অত কথা বুঝবি নি।

রঞ্জিত—পথে যদি আমায় ধরে ফেলে?

বেদেনী—চল, তা' হলে সাপুড়েদের আলখাল্লাটা পরে চল। আমি যাব, আমার সাপুড়ে যাবে, ঝাঁপিতে আমাদের সাপ যাবে, বড় সাপ সব বাছাই করে নিয়েছি, যে সাপটা তোকে কামড়াতো, তার বিষ দাঁত ভেঙে দিয়েছি। সাপই তো আমাদের ঘরের লক্ষ্মী। দূরে চলে যাব, বহুদূরে।

রঞ্জিত। দূর দেশে?

বেদেনী। হ্যাঁ গো বাবু হ্যাঁ, দূর দেশে গিয়ে নূতন সংসার পাতব। এরা আমাদের কোন খবর পাবে না।

(৪)

রমলা এই অপরিচিত যুবক রঞ্জিতের দিকে এই সামান্য কয়দিনের পরিচয়েই কেমন আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। সে নিজেই তা বুঝতে পারে নি। আগেকার দিন বিকালে এসে দশটা টাকা চেয়ে নিয়ে গিয়েছিল সে, বলেছিল, "রমলা দেবী আমায় দশটা টাকা দিন, ঐ টাকাতে ভাল একটা সাক্ষী জোগাড় করে নিয়ে আসব, যে সুখময় বাবুর মৃত্যু কে ঘটিয়েছে তার আভাস দিতে পারবে।"

রমলা হেসে বলেছিল, "টাকা দিয়ে মিথ্যা সাক্ষী জোগাড় করবেন?" রঞ্জিত একটু চমকে বলেছিল, "না! আমি যা অনুমান করেছিলুম সে যে সত্য, এ সাক্ষ্য একটা লোক দেবে। আমি তার খোঁজ পেয়েছি।"

রমলা। কি করে?

রঞ্জিত—সে প্রায় অন্ধকারে ঢিল মেরেই। কিছুদিন ধরে সেই পার্ক সার্কাসে পাদ্রী সাহেবের কুটীর থেকে তিল-জলা পর্যন্ত যত সন্দেহ-জনক চরিত্রের লোক দেখেছি, তার কাছেই বিজলীর খোঁজ নিয়েছি। নিতে নিতে একটা লোক পেয়েছি, সে প্রায় সব কথা জানে। টাকা দিলেই সাক্ষ্য দেবে। আমি তাকে সরকারী উকীলের বাড়ী নিয়ে যাব।

রমলা—নিয়ে যান টাকা ; দরকার হলে আরও দিতে প্রস্তুত আছি। আপনি কখনো চাইতে সংকোচ করবেন না। আর লোকটা কি বলে আজই কিন্তু উকিলের বাড়ী থেকে ফিরে এসে বলবেন। আমি আপনার অপেক্ষায় রইলাম।

সেই থেকে রমলা অপেক্ষা করছে। সাক্ষীর খবর জানবার জন্যে ততটা নয়, যতটা রঞ্জিতের নিরাপদে ফিরে আসা দেখবার জন্যে। কিন্তু রঞ্জিতের কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না। রমলা গভীর রাত্রে একবার কানন বাবু, আর সরকারী উকীলের বাড়ী ফোন করেছিল। কিন্তু কেহই কোন হদিশ দিতে পারল না। পরদিন সকালে সে রঞ্জিতের বাড়ীতে লোক পাঠিয়ে খবর নিল, তার বাড়ীর লোকেরাও তার জন্য ছটফট করে মরছে। সে কোথায় গিয়েছে, সে খবর কাউকেও বলে যায় নি।

পরদিন বিকালে রঞ্জিতকে দেখেই রমলা আনন্দে লাফিয়ে উঠল, বলল, "আপনি তো চমৎকার লোক, সেই আসি বলে কোথায় গেলেন, আর এলেন এই !

রঞ্জিত—মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলুম।

আরো আতংকিত হলো রমলা।

রঞ্জিত—সাক্ষাৎ মৃত্যু।

রমলা—তাই তো দেখছি, চোখ মুখ সব শুকিয়ে গিয়েছে। হাতে-পায়ে ওসব কিসের দাগ ? নাওয়া-খাওয়া হয় নি নিশ্চয়ই। আগে আসুন তো, স্নান করে আগে খান তো দেখি।

রঞ্জিত—সে বাড়ীতে গিয়ে হবে।

রমলা—আপনি যখন এখানে এসেছেন, আপনাকে স্নান করতেই হবে। হাত ধরেই টেনে নিয়ে গেল সে রঞ্জিতকে।

রঞ্জিত—আপনাকে কাহিনীটা না বলে পারছিলাম না, তাই আগেই আপনার বাড়ী এসে হাজির হয়েছি।

রঞ্জিত নাওয়া-খাওয়া সেরে রমলার পড়ার ঘরে একটা আরাম কেদারায় শুয়ে শুয়ে যেন স্বর্গ-সুখ অনুভব করছিল। রমলা ঘরে ঢুকামাত্রই বলল, "এখন আসছি, বাড়ীর লোকেদের একটা খবর দেওয়া দরকার।"

রমলা—সে খবর আমি অনেকক্ষণ পাঠিয়েছি, আপনি এখন কি হয়েছিল বলুন।

রঞ্জিত—সে কথা ভাবতেও ভয় লাগছে। যে সাপুড়েকে সাক্ষী করব ঠিক করেছিলাম, তাকে খুঁজে খুঁজে বের করলাম পার্ক সার্কাস ছাড়িয়ে বস্তীর পরে বস্তীর মধ্যে। লোকটা রাজী ছিল, টাকাটা আমার কাছ থেকে নিয়ে সে সর্দারের কাছে গেল। সে পরামর্শ নিতে গিয়েই আমার বিপদ ঘটাল। দলের সর্দার বলেছে—এই সাক্ষ্য দিতে গিয়ে, ও সাপুড়েদের দলটাকে জেলে পাঠাবে। তারপর আমি যে জেনেছি ওরা সাপের বিষ বিক্রী করে নরহত্যায় সাহায্য করে, এ ব্যাপারটাই তাদের পক্ষে মারাত্মক। ও লোকটা সাক্ষ্য না দিলেও, আমি সাপুড়েদের সর্বনাশ করতে পারি। তাই সর্দার স্থির করলেন, আমাকে গুম করে ফেলবে। গোখরো সাপ দিয়ে কামড়িয়ে আমাকে হত্যা করবে। তারপর নির্জন রাস্তায় ফেলে দেবে।

সন্ধ্যায় আমি উঠবার চেষ্টা করছি, ওরা আমাকে উঠতে দিল না। একটা জোয়ান সাপুড়ে আমার হাতে পায়ে বেঁধে একটা ঘরে রেখে দিল, সারা রাত মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করলাম। মৃত্যু এল না, পরদিন দুপুরবেলা জীয়ন-কাঠি হাতে নিয়ে এল এক তরুণী—বেদেনী। সেই দিল আমাকে মুক্তি। এই মেয়েটিকে আর একটি ছেলেকে রেখে সাপুড়ের দল সাপের খেলা দেখাতে বেরিয়েছিল। এই সুযোগে সেই মেয়েটি আমায় জীবন দিল। মেয়েটিকে বললুম, তোমার তো বিপদ হবে, আমায় মুক্তি দিয়ে। ও সেই দিনই তার প্রণয়ীকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল, বলল, "আমরা পালিয়ে যাচ্ছি, আমাদের জন্য তোর ভাবনা করতে হবে না—অদ্ভুত মেয়ে।

রমলা—কি সাংঘাতিক।

রঞ্জিত—কি দয়ার প্রাণ। সাপ নিয়ে খেলা করেও তার প্রাণ করুণায় ভরা। আর আপনার শিক্ষিতা নারী বিজলী ?

রমলা—এ ত শুধু আপনার অনুমান।

রঞ্জিত—আমার এ অনুমান যে সত্যি তার অনেক প্রমাণ পেয়েছিলুম সাপুড়েটির কাছে।

রমলা—সাপুড়েদের এবার পুলিশে ধরিয়ে দিন সব কটাকে।

রঞ্জিত—সে হতে পারে না। কাননবাবুও একথা বলবেন জানি। সে কোন-মতেই হতে পারে না। আমি আমার জীবনদাত্রীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি—সাপুড়েদের পুলিশে দিতে পারব না।

৫

বিজলীকে জেলে বন্দী করা হয়েছে। কানন বাবু তার জবানবন্দী নিয়েছেন। কিন্তু অপরাধের সঙ্গে কোন ভাবেই সে জড়িত আছে এমন কথা সে স্বীকার করল না।

কানন বাবু চালাকি করে বললেন, "বিজলী, এমন তোমার সুন্দর চেহারা, এমন বুদ্ধি—সব ফাঁসীর মঞ্চে নষ্ট হয়ে যাবে, এ আমি চাই না। তুমি অপরাধ স্বীকার কর, তোমাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করব।"

বিজলী গর্জন করে উঠল—আমি কিছু জানি না।

কানন—জান না ? তুমি তাকে হত্যা করেছ, আমি তার প্রমাণ পেয়েছি। গর্জন মুখরা বিজলী সহসা স্তব্ধ হয়ে গেল।

কানন—এখনো সময় আছে, ভেবে দেখো অপরাধ স্বীকার করলে মৃত্যু থেকে রক্ষা পাবে।

বিজলী আর কোন কথাই বলল না। কি একটা গভীর দুশ্চিন্তায় যেন তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

বিজলীকে ছেড়ে দিয়ে কানন বাবু হনুমন্ত রাওকে ডাকলেন। রঞ্জিত বলেছিল, 'হনুমন্ত প্রেম-পাগলা, বিজলী ধরা পড়েছে শুনলেই ওর জবানবন্দী পাল্টাবে। কানন বাবু প্রত্যক্ষ করলেন, সত্যি তার মধ্যে পরিবর্তন এসেছে।

কানন—মিঃ রাও, আমার সত্যি মনে হচ্ছে, আপনি নির্দোষ। কিন্তু সত্যি ব্যাপারটা একবার খুলে বলবেন। আমি আপনার মুক্তির চেষ্টা করছি।

হনুমন্ত—আমি কিছু জানি না।

কানন—জানেন না? শুনেছেন বিজলী ধরা পড়েছে? ওর সব অপরাধ প্রমাণ হয়ে গেছে। ওর ফাঁসী হতে পারে।

হনুমন্তের মুখখানা কেমন দুশ্চিন্তায় ভরে গেল।

কানন—ভাবছেন কি?

হনুমন্ত—আমি দোষ স্বীকার করলে, ওর মুক্তি হবে?

কানন—সে এক গোলমালের ব্যাপার, সত্যি কথাটা আমায় বলুন আমি আপনার মুক্তির উপায় দেখছি।

হনুমন্ত—আমিই সুখময়কে হত্যা করেছি।

কানন—কেন হত্যা করলেন, কি করে হত্যা করলেন?

হনুমন্ত—সে বলতে পারব না, আমি অপরাধ স্বীকার করব।

কানন—শুধু শুধু আপনি কেন মরবেন? যা ঘটেছে বলুন, আমি আপনার মুক্তির পথ দেখছি।

হনুমন্ত—বিজলীর ফাঁসী হবে—আর আমি মুক্তি পাব!—সে হবে না।

কানন—যান, ভাল করে চিন্তা করে দেখুন। আপনার হাতে এখনো তিন দিন সময় আছে।

কানন বাবু মফঃস্বল থেকে ঘুরে বাড়ী ফিরে দেখলেন, রঞ্জিত অপেক্ষা করছে।

কানন—ঠিক ধরেছ তো, হনুমন্ত একেবারে বদলিয়ে গিয়েছে।

রঞ্জিত—ও প্রেম-পাগলা! আমার মনে হচ্ছে ওর কোন দোষ নেই। কেবল তার প্রণয়িনীকে অনুসরণ করতে গিয়ে এ বিপদে পড়েছে। ওই এই কেসের একমাত্র সাক্ষী।

কানন—তোমার অনুমান সত্যি বলে মনে হচ্ছে।

রঞ্জিত—মনে হবে কেন? এই সত্যি। হনুমন্তের জীবনের একমাত্র ধ্যান বিজলী। আমি খবর পেয়েছি ও আফিসের কাজ ফেলে বিজলীর পেছনে ছুটেছে। আর বিজলী ছুটেছিল সুখময়ের পেছনে।

কানন—আর সুখময়?

রঞ্জিত—সুখময়ের চিত্তের টান ছিল নানা দিকে। বিজলীর ঝলক ওকে যেমন আচ্ছন্ন করেছিল, ঠিক তেমনি রমলার ঐশ্বর্যও কম আকৃষ্ট করে নি।

কানন—বেচারা সত্যি হিসেবী ছিল। ভেবেছিল দুকুলই রক্ষা করবে।

রঞ্জিত—ভাবতে পারে নি সাপুড়ে মেয়ের কাছে এ-চালাকি চলবে না।

কানন—রঞ্জিত তুমি যা বলছ তাতে মনে হয় রমলা দেবী বেঁচে গেলেন। নইলে ওর জীবনটা বড় দুঃখের হোত।

রঞ্জিত—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই হোত।

কানন—এক্ষণে হনুমন্তের সাক্ষ্যটা আদায় করতে পারলেও বিজলীর শাস্তিটা হোতে পারত। তোমার সাপুড়েকে এনে খাড়া করতে পারলেও কোন রকমে বিজলীর অপরাধ কিছুটা হয়ত প্রমাণিত হত।

রঞ্জিত—আমি প্রতিজ্ঞা করেছি। ওদের নিয়ে টানাটানি করবেন না।

কানন—তোমার এ আদর্শ কিন্তু আমার ভাল লাগছে না।

ক্রিং ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠল কাননবাবুর ফোন, তিনি ছুটে গিয়ে তুলে ধরলেন যন্ত্রটি।

টেলিফোন—কানন বাবু নাকি?

কানন—আজ্ঞে হ্যাঁ।

টেলিফোন—আর এক ঝঞ্ঝাট সৃষ্টি হয়েছে। আপনার বিজলী জেলের কোঠায় মরে পড়ে আছে। তার ডান হাতে দুটি দাঁতের কামড়!

কানন—সব পরীক্ষা হয়েছে?

টেলিফোন—হ্যাঁ, রক্তে বিষের ক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে। সুখময়ের রিপোর্ট যেমনি ছিল ঠিক তেমনি। একটা ছোট শিশি পাওয়া গিয়েছে, তার ঘরে। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে তাতে সাপের বিষ। আরও পাওয়া গিয়েছে একখানা পত্র—হনুমন্ত রাওকে লেখা! বিজলী লিখেছে—শুনলুম, তুমি আমাকে রক্ষা করার জন্য নিজে দোষ স্বীকার করছ। কিন্তু কেন? অপরাধ করেছি আমি আর শাস্তি পাবে তুমি? আমার অপরাধ সম্বন্ধে যদি কিছু জান কোর্টে গিয়ে খুলাখুলি বলো? আমার জন্য তুমি মরবে কেন? পাগল? জীবনে তোমার ভালবাসার কোন প্রতিদান দিতে পারি নি। ক্ষমা করো। আর অভাগীকে ভুলে যেও। বিদায় বন্ধু! বিদায়!

কানন—ও! হৃদয় বিদারক!

যন্ত্রটি রেখে দিলেন কাননবাবু। উৎকণ্ঠ হয়ে এগিয়ে এল রঞ্জিত।—কানন বাবু সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলেন।

রঞ্জিত—ফোন করলেন কে?

কানন—ডেপুটি জেলার।

রঞ্জিত—আশ্চর্য! বিজলী আত্মহত্যা করেছে! একই প্রক্রিয়ায় নর হত্যা—তারপর আত্মহত্যা।

কানন—তোমার সব অনুমান সত্য। এখন চল, হনুমন্ত রাওকে নিয়ে গিয়ে বিজলীর মৃত দেহ আর তার চিঠিটা দেখাতে হবে। তাহলেই বুঝতে পারা যাবে রাওএর উপর এ ঘটনার প্রতিক্রিয়া কতখানি। এখন বোধ হয় রাও যা জানে তা বলতে রাজী হবে, এবং তা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যাবে বিজলী কি ভাবে সুখময়ের মৃত্যু ঘটিয়েছে।

রঞ্জিত—চলুন।

জেলখানায় গিয়ে কাননবাবু আর রঞ্জিত জানলেন হনুমন্ত রাওকে বিজলীর মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হয় নি।

রঞ্জিত—ও যেমন প্রেমপাগলা, ওকে খবরটা দিলে কি হবে কে জানে?

কানন—চল, আমি কায়দা করে বলছি।

উভয়ে হনুমন্ত রাওএর ঘরের দ্বারে এসে পৌছলেন।

রাও—ইন্‌স্‌পেকটার সাহেব। আর আমাকে কতদিন এভাবে ঝুলিয়ে রাখবেন। ফাঁসী দ্বীপান্তর যা হয় একটার ব্যবস্থা করে ফেলুন।

কানন—সে তো আর আমাদের হাতে নয়—কোর্টের হাতে। তার উপর আপনি কেসটিকে বড় জটিল করে তুলেছেন। যাই হোক বিজলী ব্যাপারটাকে সহজ করে দিয়েছে।

রাও—কি করে?

কানন—সে সকল দোষ স্বীকার করে, আত্মহত্যা করেছে।

রাও। আত্মহত্যা করেছে! বলেই বসে পড়ল হনুমন্ত রাও।

রঞ্জিত—আপনার জন্যে একখানা চিঠিও লিখে রেখে গেছে।

রাও—আমাকে চিঠি? দেখাবেন আমায়?

কানন—নিশ্চয়ই দেখাব, চলুন।

রাওকে নিয়ে তারা গেলেন যেখানে বিজলীর শব কাপড়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। বিজলীর চিঠিখানা ডেপুটি জেলারের কাছে ছিল, কানন বাবু তাও আনিয়ে দেখালেন রাওকে।

কানন—এবার কি ঘটেছিল, বলতে আপনার আপত্তি নেই হয়ত?

রাও—আর বেঁচেই বা কি লাভ বলুন?

কানন—এখনও আর পাগলামি করার মানে হয় না মিঃ রাও। বিজলী মরেছে। এখন আপনি যা জানেন তা প্রকাশ করে পুলিশকে সাহায্য করুন।

রাও—জীবনটাই তো পাগলামি। তা' না হ'লে বলুন, কে অপরের প্রতি আসক্তার পেছনে ঘুরে মরে? আপনি বুঝবেন না কিসের টানে আমি, বিজলী যখন সুখময়ের হোটেলে যেত-তার পেছনে পেছনে ছুটে যেতাম। ঐদিন কি হলো বলতে পারি না, আমার মাথায় ঢুকল সুখময়ের ঘরে গিয়ে বিজলী কি করে দেখতে হবে। রাত্রির অন্ধকারে পাইপ বেয়ে সুখময়ের ঘরের জানালার ধারে গিয়ে ঝুলে রইলুম। সুখময়ের সোহাগটা দেখে পিত্ত জলে গেল। এক মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে—অন্য মেয়েকে এমন সোহাগ করা কেন। হঠাৎ দেখলুম সুখময় বিজলীকে চুম্বন করছে। কি চুম্বনের পালা। বুকটা ফেটে যাচ্ছিল। তারপর হঠাৎ দেখলুম, সুখময়ের ঠোঁট থেকে দরদর করে রক্ত পড়ছে। বিজলী তার রুমাল দিয়ে রক্ত মুছে নিলে। তার পর একটা ছোট শিশি বের করে সুখময়ের ঠোঁটের ক্ষত স্থানে লাগিয়ে দিলে কি একটা ওষুধ সেই শিশি থেকে। লাগানো মাত্রেই সুখময়ের যন্ত্রণা বেড়ে গেল মনে হল! বিজলী নানাভাবে সুখময়ের পরিচর্যা করতে লাগল। ক্রমে মনে হল সুখময় যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। সে যেন হাত পা নেড়ে, মাথা দুলিয়ে যন্ত্রণা প্রকাশ করতে পারছে না। তারপর সুখময়কে ঘুম পাড়িয়ে যেন বিজলী তার ঘর থেকে চোরের মত পালিয়ে যাচ্ছিল। বিজলীকে ধরব বলে তাড়াতাড়ি নামতে যাচ্ছিলুম—হাত-পা পিছলে পড়ে গেলুম। আর নড়তে পারি নি। পরের দিন সকালে শুনলুম, সুখময়ের মৃত্যু ঘটেছে!

কানন—এবারে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। ঐ শিশির ভিতর ছিল সাপের তীব্র বিষ। সেই বিষ সুখময়ের ক্ষত স্থানে লাগিয়ে দিতেই তা রক্তের সঙ্গে মিশে যায় এবং বিষের ক্রিয়াও আরম্ভ হয়, আর অল্পক্ষণের মধ্যেই সুখময়ের মৃত্যু ঘটে। দিন এখন বিজলীর পত্রখানা দিন।

রাও—এ বিজলীর প্রেমের একমাত্র প্রতিদান। এটা আমি রাখতে চাই।

কানন—তা' পরে হবে'খন। এটা কোর্টে দরকার হবে। বিজলীরই লেখা কি না পরীক্ষা করতে হবে।

রাও—এ বিজলীরই লেখা, ইন্‌স্‌পেকটারবাবু—সে এই রকম অক্ষরে—তুমি একটা গাধা—কতবার আমাকে লিখে পাঠিয়েছে।

হনুমন্ত রাও চিঠিখানা ফেরৎ দিল।

কানন বাবু তাকে তার ঘরে পাঠিয়ে দিলেন।

রঞ্জিত—এবার হয় ত হনুমন্ত রাও রেহাই পেতে পারে।

কানন—কোর্টে গিয়ে কিসে কি দাঁড়াবে কিছু বলা যায় না। তবে তুমি যা অনুমান করেছিলে তা' সম্পূর্ণ সত্য। এবার তোমার পুরস্কারটা রমলা দেবীর কাছ থেকে আদায় করে দিতে হবে।

রঞ্জিত একটু হাসল।

কানন—হাসলে যে? পুরস্কার চাও না বুঝি? না এরি মধ্যে পেয়ে গিয়েছ?

রঞ্জিত মাথা নিচু করে রইল।

কানন—কিছু পুরস্কার পেয়েছ তা' বুঝেছি। এখন আমি পুরো পুরস্কারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। রমলার পিসী বলছিলেন—তোমার পরে নাকি মেয়েটার খুব টান! এমন টান কারো জন্যেই নাকি কখনও দেখেন নি। প্রস্তাব করেছেন, রমলাকে তিনি তোমার হাতে দিয়ে কাশী গিয়ে শান্তিতে মরতে চান। তোমার ঘরে কেউ নেই। পাত্রকর্তা আমিই। তোমার মনটা জানলেই আমি ওর পিসীমার সঙ্গে কথা কয়ে সব ব্যবস্থা পাকা করতে পারি।

রঞ্জিত—রমলার পড়ার ঘরে ডিটেকটিভ উপন্যাসের অন্ত নেই।

কানন—এখন বুঝি সেখানে গিয়ে ওই সব খুব পড়ছ? ওর পিসীমাও তা বলছিলেন।

রঞ্জিত আর সেদিন বেশী কথা বলতে পারে নি।

দেশ-মাতৃকা—মৃন্ময়ী ও চিন্ময়ী

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

(২)

রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য স্বদেশ-প্রীতি বিশ্লেষণ করলে আমরা সন্ধান পাই ঐ এক বারতার—তাঁর কাছে পবিত্র ছিল দেশ-মাতৃকার রূপের উভয় দিক—মৃন্ময় ও চিন্ময়। সদাই বিশ্বের বাণী মধুর সুরে ঝঙ্কার দিত তাঁর প্রাণে কারণ তিনি ছিলেন বিশ্বের সাথে এক-প্রাণ। তিনি বিশ্বকবি। বিশ্বের যে পরিবেশের উদাত্ত সুরে হতেন আত্মহারা, সে সুরছন্দ তরঙ্গিত হত স্বদেশে। অথচ আর্য্যাবর্ত্ত ছিল তাঁর কাছে মূর্ত্তিময় সত্য কারণ উপনিষদ ও পুরাণের ঋষিরা করেছিলেন এই মৃন্ময়ী দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা। তাই দেশ-জননীর চিন্ময়রূপে তিনি দেখতেন সার সত্য।

স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশের গানে প্রাণ মাতাতেন তিনি দেশ-ভক্তের। কিন্তু জানতেন তিনি যে ভারতবাসীর প্রাণ ভারত মাতার মৃন্ময়রূপের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। তাই মার রূপের প্রতিফলন দেখতেন দেশবাসীর প্রাণে। যখন আমাদের প্রাণের তিনি সাড়া পেতেন না, তখনও শুদ্ধ কর্ম্মীকে উৎসাহ দিতে বিরত হতেন না। বিরক্তিকাতর করত তাঁকে দেশবাসীর অলস উদাসীনতা। কিন্তু নিরাশা-পঙ্গু ছিলেন না কোনোদিন রবীন্দ্রনাথ। শেষ জীবনের সে কথা বলব পরে।

মাতৃ-মন্দিরে তাঁর যৌবনের অর্ঘ্য ছিল প্রাণ-মাতানো উত্তেজনা। তাঁর উপর প্রকৃতির প্রভাব ছিল প্রচুর। তাই দেশ-মাতৃকার মৃন্ময়রূপের মাধুরীতে উল্লসিত হতেন কবি।

মানুষের প্রয়োজনই মাটির সার্থকতার মান। তাই মাটির ডাক শুনে তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন—

আজকে খবর পেলাম খাঁটি মা আমার এই শ্যামল মাটি
অন্নে ভরা শোভার নিকেতন।
অভ্রভেদী মন্দিরে তার বেদী আছে প্রাণ দেবতার
ফুল দিয়ে তার নিত্য আরাধন
এইখানে তার অঙ্কমাঝে প্রভাত রবির শঙ্খবাজে
আলোর ধারায় গানের ধারা মেশে।
এইখানে-সে পূজার কালে সন্ধ্যারতি প্রদীপ জ্বালে
শান্ত মনে শান্ত দিনের শেষে।

সুতরাং প্রাণ-দেবতার বেদী মাটি। দেশ-মাতৃকার আরতিতে তিনি বাংলা বা ভারতের মাটির রূপ বিস্মৃত হবেন কেমন করে। তিনি মায়ের মৃন্ময়রূপ, যে সাধনায় মিলিয়েছেন প্রাণ-দেবতার সাথে সত্যই তা অপূর্ব্ব। আমাদের দেশ-জননী নির্মল-সূর্য-করোজ্জ্বল ধারিণী।

নীল সিন্ধুজল ধৌত চরণ-তল
অনিল-বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল
অম্বর-চুম্বিত-ভাল-হিমাচল
শুভ্র তুষার কিরীটিনী।

মায়ের মৃন্ময়রূপ দেশের চিত্তকে কী উদাত্ত সুরে মহীয়ান করেছিল সে বারতা কবি পরিবেশন করলেন সুমহান আবাহন সঙ্গীতে।

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে
প্রথম সামরব তব তপোবনে
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে
জ্ঞান ধর্ম কত কাব্য-কাহিনী।

সামরব, জ্ঞান, ধর্ম, কাব্য-কাহিনী ভারতের অতুলনীয় দান বিশ্ব-সংসারকে; কিন্তু এ প্রসঙ্গে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সম্পদের উল্লেখ কেন? আমার মনে হয় ঋষিদের উপর দেশ-জননীর প্রকৃতি-মাধুরীর প্রভাবের সঙ্কেত সূচিত হয়েছে গানে। আমরা জানি বাঙলার বিশ্বকবি অরূপের বিশ্বরূপ দেখতেন এই বাঙলা মায়ের রূপের ললিত ছন্দে। মায়ের দেহ ও চিত্তের মেশানো রূপ বঙ্কিম হতে কোনো কবি উপেক্ষা করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে একদিন বলেছিলেন—

আমি ভালবাসি দেব এই বাঙ্গালার
দিগন্ত-প্রসার ক্ষেত্রে যে শান্তি উদার
বিরাজ করিছে নিত্য—মুক্ত নীলাম্বরে
অচ্ছায় আলোক গাহে বৈরাগ্যের স্বরে
যে ভৈরবী গান। যে মাধুরী একাকিনী
নদীর নির্জ্জন তটে বাজায় কিঙ্কিনী
তরল কল্লোল রোলে। যে সরল স্নেহ

তরুচ্ছায়া সাথে মিশি স্নিগ্ধ পল্লীগেহ
অঞ্চলে আবরি আছে, যে মোর ভবন
আকাশে বাতাসে আর আলোকে মগন
সন্তোষ, কল্যাণে, প্রেমে—

কবি সত্যের সন্ধানী। কাব্য সত্যের প্রকাশ। কবির মন রসের আগার। সেথায় প্রেমের সাথে জড়িয়ে থাকে অভিমান। উদাসীন দেশবাসীর শৈথিল্য অভিমানী দেশ-প্রাণ কবিকে করত ব্যথিত। কিন্তু সে বেদনা তাঁকে সাধনার পথ হ'তে অপসরণ করতে সক্ষম হ'ত না। তাই তিনি মুক্ত কণ্ঠে, হাতে দণ্ড নিয়ে গাইলেন—

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,
তবে একেলা চলো রে!
একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে।
যদি কেউ কথা না কয় (ওরে ওরে ও অভাগা)
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরিয়ে, সবাই করে ভয়
তবে পরাণ খুলে
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে।

উপেক্ষাকে তিনি মানতে চান না। তিনি বল্লেন—

পথের কাঁটা
ও তুই রক্ত মাখা চরণতলে একলা দলো রে।

পথ হোক না আঁধার-ঘেরা অন্যের উদাসীনতায়—

যদি ঝড় বাদলে আঁধার ঘরে দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলো রে।

এ অভিমানীর ব্যথার গান। তাঁর দেশ-প্রাণতা যে ছিল মধুর—তাই দেশের মাধুরী বিরাজ করত কবির হৃদয় জুড়ে। তিনি মায়ের ছবি এঁকে হৃদয় বেদীতে অভিষিক্ত করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন ছেলের মতো সরল ভাষায়।

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।

শিশুর মতো উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ প্রাণের কথা নিবেদন করেছেন—

ও মা ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে
(মরি হায় হায়রে)—
ওমা অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি
মধুর হাসি।

কবি মুগ্ধ হ'য়েছিলেন দেখে—

কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে নদীর কূলে কূলে।

স্মৃতি-বিজড়িত মাতৃ-ভূমি। শৈশবের স্মৃতির আয়ু সুদীর্ঘ। কবি শৈশবের কথার উল্লেখ করেছেন—

তোমার এই খেলা-ঘরে শিশুকাল কাটিল রে
তোমারি ধুলামাটি অঙ্গে মাখি ধন্য জীবন মানি।

মার চিন্ময় রূপে ফুটে উঠেছিল এ সঙ্গীতে রাখাল ও চাষী ভাইদের শ্রম যার ফলে বাঙ্গালার ধানে ভরা আঙ্গিনাতে জীবনের দিন কাটে।

কবি ছিলেন সঙ্গীত-প্রিয়। তাঁর অপূর্ব্ব জীবনটা ছিল এক মধুর ছন্দ। তিনি আকাশে বাতাসে আলোকের বিচ্ছুরণে দেখতেন লীলায়িত ছন্দ তরঙ্গ। কিন্তু দেশের দুর্দ্দশায় তিনি তিরস্কারের স্বরে একদিন গানের লহর বন্ধ করবার নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন—

আমায় বলো না গাহিতে বলো না।
এ-কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা, শুধু মিছে
কথা ছলনা।
এ-যে নয়নের জল, হতাশের শ্বাস
কলঙ্কের কথা, দরিদ্রের আশ
এ-যে বুক-ফাটা দুখে গুমরিছে বুকে গভীর মরম বেদনা।

দেশবাসীর মাতৃ-সেবার উদাসীনতায় ব্যথিত হয়ে কবি বল্লেন—

কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ—
কাতরে কাঁদিবে, মায়ের পায়ে দিবে
সকল প্রাণের কামনা।

কবির মনে নিরাশার কুহেলিকা যখন হয় অবলুপ্ত, তিনি প্রাণ খুলে গান ভারত-মাতার মহিমা। সে মহিমার মাঝে তিনি যেমন ভারতের বিরাট কীর্ত্তি দেখেন কৃষ্টির ঐতিহ্যে তেমনি তৃপ্ত হন জননীর অঙ্গের শোভায়। তাঁর নিজের চিত্ত-মাঝে বাহিরের ও অন্তরের শোভা মিশে চিত্র আঁকতো সকল বস্তুর সকল প্রকৃতির। তাঁর দেশ-পূজার অর্ঘ্যের ডালি তাই অন্তর ও বাহির প্রকৃতির প্রতিফলন। মাতার চিন্ময় রূপকে দেশবাসী আজ ম্লান করছে, এ নির্ম্মমতা অভিমানে ব্যথিত করত তাঁর ভাবপ্রবণ চিত্তকে।

একদিন নব বর্ষে তিনি গাহিলেন—

হে ভারত, আজি নবীন বর্ষে, শুন এ কবির গান
তোমার চরণে নবীন হরষে এনেছি পূজার দান।
এনেছি মোদের দেহের শকতি এনেছি মোদের
মনের ভকতি।
এনেছি মোদের ধর্ম্মের মতি এনেছি মোদের প্রাণ
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য তোমারে করিতে দান।

এ উল্লাস প্রশমিত করলে না বাস্তব। সত্যে কবির পূর্ণ বিশ্বাস। উদ্যমহীনতা দোষ। কিন্তু দরিদ্রের পূজা প্রাণ-হীন মলিন হয় না। তাই কবি গাহিলেন—

কাঞ্চন থালি নাহি আমাদের অন্ন নাহিক জুটে
যা আছে মোদের এনেছি সাজায়ে নবীন পর্ণপুটে।
সমারোহে আজি নাহি প্রয়োজন
দীনের এ পূজা, দীন আয়োজন
চির-দারিদ্র্য করিব মোচন চরণের ধূলা লুটে।

এদেশ ধনের গৌরবে কোনদিন উৎফুল্ল ছিল না। এদেশের সাধনা তপস্যা। ভারত রাজা নন, মহাতাপস। কিন্তু—

দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন
তোমার মন্ত্র অগ্নি-বরণ তাই আমাদের দিয়ো।
পরের সজ্জা ফেলিয়া পরিব তোমার উত্তরীয়।

এবার ভারতের শ্রেষ্ঠ দানের কথা কহিলেন কবি—অভয়-মন্ত্র, অশোক-মন্ত্র, অমৃত-মন্ত্র।

কবির উপনিষদ অমৃত পুষ্ট মন, বর্ত্তমান পরিত্যাগ করে ছুটলো অতীতে।

যে জীবন ছিল তব তপোবনে
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে
মুক্ত দীপ্ত সে-মহাজীবনে চিত্ত ভরিয়া লবো।
মৃত্যু-তরণ শঙ্কা-হরণ দাও সে মন্ত্র তব।

কবির প্রাণ নিরাশা-ব্যথিত হয়, তবু তিনি ছাড়েন না আশা। তিনি ধিক্কারের পটভূমিতে উৎসাহ দেন দেশবাসীকে। ভগবানকে ডাকেন কাতর প্রাণহীন ছন্দে নয় দাবীর ভঙ্গিতে।

দিন আগত ঐ ভারত তবু কই?
সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব-জন পশ্চাতে।

ভগবানের কাছে জোর কণ্ঠে চাহিলেন—

প্রেরণ কর, ভৈরব তব দুর্জ্জয় আহ্বান হে—
জাগ্রত ভগবান হে!
নিশ্চল নিবীর্য্য-বাহু কর্ম্ম-কীর্ত্তি হীনে
ব্যর্থ শক্তি নিরানন্দ জীবন-ধন-দীনে।

বর্ত্তমান দিনের ভারত সন্তানের এ বর্ণনা দিয়ে কিন্তু কবি ভগবানকে ছাড়লেন না। স্নেহময় পিতাকে ডেকে বল্লেন—

প্রাণ দাও, প্রাণ দাও, দাও দাও প্রাণ হে
জাগ্রত ভগবান হে!

আবার আত্ম-গ্লানি স্বীকার ক'রে তিনি প্রার্থনা করলেন।

গত-গৌরব, হৃত-আসন, নত-মস্তক লাজে
গ্লানি তার মোচন কর নর-সমাজ মাঝে
স্থান দাও, স্থান দাও, দাও দাও স্থান হে
জাগ্রত ভগবান হে!

কবি সত্যানুরাগী। স্পষ্ট কথায় দেশের দুর্দ্দশা বিবৃতি বন্ধ করেনি ভণ্ডামীর চক্ষু লজ্জা। ভারতের দশা আবার বর্ণনা করলেন কবি—

দৈন্য-জীর্ণ-কক্ষ তার, মলিন শীর্ণ আশা
ত্রাস-রুদ্ধ চিত্ত তার, নাহি নাহি ভাষা—
কোটি-মৌন-কণ্ঠ-পূর্ণ-বাণী কর দান হে—
জাগ্রত ভগবান হে!
আত্ম-অবিশ্বাস তার নাশ কঠিন-ঘাতে
পুঞ্জিত অবসাদ-ভার হান অশনি-পাতে
ছায়া-ভয় চকিত মূঢ় করহ পরিত্রাণ হে
জাগ্রত ভগবান হে!

বলা বাহুল্য কবির তিরস্কার আত্ম-দোষানুদর্শন। তাঁর বর্ণনায় নিজেকে দূরে রেখে পরের প্রতি ভর্ৎসনার তীব্রতা নাই। কিন্তু তিনি তাদেরও উদ্দীপিত করতেন যাদের ছেড়ে অন্যে নিজের স্বার্থানুসন্ধানে আত্ম-নিয়োগ করত।

তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে তা' বলে
ভাবনা করা চলবে না।
তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে হয়তো ফল ফলবে না,
হয়তো বাতি জ্বলবে না, পাষাণ হিয়া গলবে না
হয়তো বারে বারে ঠেললেও দুয়ার টলবে না।
তা' বলে ভাবনা করা চলবে না॥

দেশের ভাবধারা পূর্ব্ব দিনের সঞ্চয়। সে সঞ্চয়ের অপব্যয় হ'লে দেশ হয় বিচার বিমূঢ়। নবীন প্রাণের সঞ্চারের ফলে যে ইতিহাসের প্রাণ সে জীবন চাহেন নাই আমাদের দেশের সু-সন্তানেরা। এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁদের মাতৃ মূর্ত্তির চিত্র হতে।

অতীতকে সম্বোধন করে কবি বলেছিলেন—

হে অতীত
শান্ত তুমি নির্ব্বাণ বাতির অন্ধকারে
সুখ দুঃখ নিষ্কৃতির পারে।
শিল্পী তুমি আঁধারের ভূমিকায়
নিভৃতে রচিছ সৃষ্টি নিরাসক্ত নির্ম্মম-কলায়
স্মরণে ও বিস্মরণে বিগলিত বর্ণ দিয়ে লিখা
বর্ণিতেছ আখ্যায়িকা।

রবীন্দ্রনাথ আশাবাদী এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নাই। তিনি বর্ত্তমানের কালো মেঘের অন্তরালে নবারুণরাগের প্রভা দেখতেন সদাই।

কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথ ভারতের মহা-মানবের সাগর তীরে চিত্তের উদ্বোধনে আত্মহারা হয়ে, অতীত চিত্রের বর্ণ-মাধুরীর বিলোপ স্মরণ করে ভগ্নোদ্যম হননি। বর্ত্তমান দুরবস্থার পিছনেও ভবিষ্যতের উজ্জল মূর্ত্তি দেখেছিলেন। এই একটি কবিতার মাঝে তাঁর দেশের মৃন্ময়, চিন্ময় ও বর্ত্তমানের কালিমা-মলিন মুখ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। হেথা রাজে হর্ষ-বিষাদ নিরাশা ও আশা। প্রকৃতির প্রভাব ছিল—রবীন্দ্রনাথের প্রাণে প্রচুর। তাঁর পবিত্র কৃষ্টির মূলে ছিল বৈদিক সত্যের উপলব্ধি। ভারতের ভাবী কালের দীপ্ত রূপ ছিল তাঁর আশা-দীপ্ত অন্তরের নিভৃত গভীরে।

তিনি প্রথমে পরমানন্দে উদার ছন্দে নর দেবতার বন্দনা করেই দেখলেন—

ধ্যান-গম্ভীর ঐ যে ভূধর
নদী-জপ-মালা-ধৃত প্রান্তর
হেথায় নিত্য হের পবিত্র ধরিত্রীরে।

ভারতের মহা-মানবের মধ্যে যে সম্মিলিত মানব-গোষ্ঠী আছে তাদের কথা ভাবলেন কবি—

হেথায় আর্য্য হেথা অনার্য্য হেথায় দ্রাবিড় চীন
শক্ হুনদল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।

তার পর তিনি ভাবলেন মার অতীতের চিন্ময়রূপ।

হেথা একদিন বিরাম-বিহীন মহাওঙ্কার ধ্বনি
হৃদয় তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণি
তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল গড়িয়া তুলিল একটি বিরাট হিয়া।

কবি দ্রষ্টা। মিথ্যার স্তোকবাক্য দুর্ব্বলের শরণ ভূমি। কিন্তু কবির সত্তা ছিল বীর-হৃদয়। শোক-সুখ অবশ্য তাঁর মানব-প্রাণকে অভিভূত করতেন। তাই দেখলেন—

সেই হোমানলে হের আজি জ্বলে দুখের
রক্তশিখা।

হবে তা সহিতে মর্ম্মে দহিতে
আছে সে ভাগ্যে লিখা।

এ-দুঃখ বহন করো মোর মন, শোনরে একের ডাক
যত লাজ ভয়-করো করো জয় অপমান দূরে যাক্।

এ কথায় বল পেলেন কবি। আমাদের সবল করলেন গানের ছন্দে। তার পর আশার বাণী—

দুঃসহ ব্যথা হবে অবসান
জন্ম লভিবে কী বিশাল প্রাণ
পোহায় রজনী, জাগিছে জননী বিপুল নীড়ে,
এই ভারতের মহা মানবের সাগর তীরে।

এই বহু ভাবকে মেনে নেওয়া ছিল রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব। বাস্তবকে তিনি কোনো দিন অবহেলা করেন নি। আকাশের অনন্তরূপ দেখেছেন তিনি ভূমি হতে। তারপর আহ্বান। কিন্তু তার" মাঝেও অতীতের বাস্তবতার আছে ইঙ্গিত। যে ব্রাহ্মণ উদাত্ত স্বরে শুনিয়েছিলেন—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—সে ব্রাহ্মণের পক্ষে মানুষকে পতিত ভাবা অশুচি। আর বেচারা পতিত বহু দিনের অপমান-জর্জ্জরিত। তার সহায় পরশ না পেলে মঙ্গল ঘট হতে পারে না তীর্থ-নীরে পূর্ণ। পাশ্চাত্যের ন্যাসানালিজম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ না করলে আধুনিক কোনো রাষ্ট্র তিষ্টতে পারে না। অবশ্য সে দিন ইংরাজ ভারত ছাড়ে নি বা ছাড়বার ব্যগ্রতা দেখায় নি। জাতি-গঠনে ইংরাজ যদি আসে শুদ্ধ মনে মন্দ কি? তার নিকট শেখবার তো অনেক কিছু ছিল। তাই কবি গাহিলেন—

এসো হে আর্য্য, এসো অনার্য্য, হিন্দু, মুসলমান
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃষ্টান
এসো ব্রাহ্মণ শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমান ভার।

ভারতের মহামানব গঠিত বহু উপাদানে, তাদের কোনোটিকে বাদ দিলে রাজনৈতিক জাতি গড়া যেতে পারে না। এ সত্য কি উপেক্ষা করতে পারে কবির অন্তর্দৃষ্টি?

আজ যে গান জাতীয় সঙ্গীত রূপে গ্রহণ করেছে ভারত, সে উচ্ছ্বাসে এ ভাব স্পষ্ট। মার মৃণ্ময়রূপে গঠিত—

পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি তরঙ্গ।

মায়ের চিন্ময় রূপে অংশ নেবে—

হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃষ্টানী। জন-গণ ঐক্য বিধায়ক ভারত-ভাগ্য বিধাতার বেদীতে তিনি সঙ্কট দুঃখ ত্রাতার শঙ্খ-ধ্বনি শুনলেন। জয় গান করলেন—

জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে
ভারত ভাগ্যবিধাতা।

আশাবাদের পটভূমি প্রকৃতির শোভা—

রাতি প্রভাতিল উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব্ব উদয়গিরি ভালে
গাহে বিহঙ্গম পুণ্য সমীরণ নব জীবন-রস ঢালে।
তব অরুণারুণ রাগে নিদ্রিত ভারত জাগে
তব চরণে নত মাথা।

আশাবাদী রবীন্দ্রনাথকে কিন্তু শেষ জীবনে নিরাশ করেছিল দেশের শিথিল উদাসীনতা এবং নির্মম স্বার্থপরতা। তিনি ইংরাজ-পরিত্যক্ত ভারত দেখে যান নি। তাঁর দুরদৃষ্টি দেখেছিল তাদের বিদায়-যাত্রা। কিন্তু সে কল্যাণে অকল্যাণের যে চিত্র তাঁর মনের পটে প্রতিফলিত হয়েছিল, তার সত্যতা আমরা অনুভব করেছি চোখের জলে, তপ্ত নিশ্বাসে। ধৈর্য্য সম্ভব তাঁর আশার বাণীতে। আমি এ প্রসঙ্গে তাঁর সে বাণী উদ্ধৃত করছি বড় লজ্জায় গভীর মরম বেদনায়।

"ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরাজকে ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জ্জনাকে! একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্ক-শয্যা দুর্বিষহ নিস্ফলতাকে বহন করতে থাকবে!"

এ দুর্দ্দশার জন্য অবশ্য কবি কতকটা দায়িত্ব আরোপ করেছেন ইউরোপের স্বার্থান্ধ সভ্যতার দানের কার্পণ্যকে। তিনি বিশ্বাস হারান নি কোনোদিন জীবনের পরিপূর্ণতা সম্বন্ধে। তাই তিনি বল্লেন—"মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ অবধি রক্ষা করব। আশা করব মহা-প্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্ম্মল আত্ম-প্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্ব্বাচলের সূর্য্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল ব্যথা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্য্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতীকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।"

কবি দ্রষ্টা। তিনি যে লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জ্জনা দেখেছিলেন ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে, সে দৃশ্য আমাদের ব্যথিত করেছে। কাজেই তাঁর ভবিষ্যতের স্বপ্নকে সার্থক করবার জন্য আমাদের প্রথম প্রয়োজন উপলব্ধি

করা—"পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিতকর সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ !"

তিনি বিশ্লেষণের পর ভাবীকালের যে ভবিষ্যদ্বাণীতে আমাদের সমৃদ্ধ করেছেন সে বাণী সফল করবার ভার আজ তথাকথিত স্বাধীন ভারত-বাসীর। কবির কথায় যেন আমরা আশা ও উৎসাহের উৎসের সন্ধান পাই। ইংরাজের অধঃপতনে যেন উপলব্ধি করি—"প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে।"

কবির সাথে আমরাও যেন উপলব্ধি করি এ সত্য। তা হ'লে নিশ্চয় সফল হবে, তাঁর বাণী—

ঐ মহামানব আসে,
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্তধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ
নরলোকে বাজে জয়-ডঙ্ক
এল মহা জন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলি তলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয় শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নবজীবনের আশ্বাসে।
"জয়-জয়-জয়-রে মানব-অভ্যুদয়"
মন্দ্র উঠিল মহাকাশে।

এই পুণ্য তীর্থে নব-জন্মের জীবন-স্পন্দন অনুভব করে, আমাদের বলতে হবে—

হেথায় দাঁড়ায়ে দু বাহু বাড়ায়ে নমি নর দেবতারে
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দনা করি তারে।

শেষ বয়সে আমাদের নিষ্ঠুর উদাসীনতা তাঁকে ব্যথিত করেছিল। তাঁর উক্তিতে তিরস্কারের আমেজ আছে। হয়তো তিরস্কৃতদের মধ্যে তিনিও একজন। সত্যই বেদনা-প্রসূত এ উচ্ছ্বাস।

"দেশ মানুষের সৃষ্টি। দেশ মৃন্ময় নয় সে চিন্ময়। মানুষ যদি প্রকাশমান হয় তবে দেশ প্রকাশিত। সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা ভূমির কথা যতই উচ্চকণ্ঠে রটাব ততই জবাবদিহির দায় বাড়বে। প্রশ্ন উঠবে প্রাকৃতিক দান তো উপাদান মাত্র, তা নিয়ে মানবিক সম্পদ কতটা গড়ে তোলা হ'ল। মানুষের হাতে জল যদি যায় শুকিয়ে, ফল যদি যায় মরে, মলয়জ যদি বিষিয়ে ওঠে মারীবীজে, শস্যের জমি যদি হয় বন্ধ্যা তবে কাব্য-কথায় দেশের লজ্জা চাপা পড়বে না। দেশ মাটিতে তৈরী নয়। দেশ মানুষের তৈরি।

তাই দেশ নিজের সত্য প্রমাণেরই খাতিরে অহরহ তাকিয়ে আছে তাদেরই জন্যে যারা কোনো সাধনায় সার্থক। তারা না থাকলেও গাছ-পালা জীবজন্তু জন্মায়, বৃষ্টি পড়ে, নদী চলে কিন্তু দেশ আচ্ছন্ন থাকে মরুবালুতলে ভূমির মতো।"

অবশ্য কবির প্রবীণ দৃষ্টি ক্ষুণ্ণ হয়েছিল সেদিন যেদিন তিনি অধঃপতনের পিচ্ছিল পন্থায় আমাদের গড়িয়ে নিম্ন হতে নিম্ন স্তরে পৌছবার ঐকান্তিকতায় বিরক্ত হ'লেন! অভিমানের সুর স্পষ্ট এ উক্তিতে। সেদিন তিনি মাত্র কবিগুরু নন, দেশের গুরু। সে হিসাবে আমাদের শাসন ভার তাঁর হাতে আমরাই সমর্পণ করেছিলাম।

কবির জীবনে প্রকৃতির প্রভাব ছিল অফুরন্ত। তিনি চিরদিন দেশের শ্রীমুখ দেখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো তিনিও সকল দিনই মায়ের মৃন্ময়ী ও চিন্ময়ী মূর্ত্তিকে আরতি করেছেন। তাঁর এ অভিমানের অভিযোগেও তিনি ভূমির সন্ধান পেয়েছেন মরুবালুতলে। আমরা জানি কবি ভূমিতে ভূমার সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন—তিনি বিশ্ব-কবি।

তাঁর শেষ জীবনের এ ধারণা প্রতিভাত নয় তাঁর যৌবনের অর্ঘ্যে। বলেছি প্রকৃতির প্রভাব ছিল রবীন্দ্রনাথের উপর প্রচুর। তাই তিনি দেশ-জননীর মৃণ্ময় মূর্ত্তির বেদীতে অসামান্য অর্ঘ্য দিয়েছেন।

হাস্য-রসিক দ্বিজেন্দ্রলাল মনোরম কবিতার কষাঘাতে সেদিনের বিলাত-ফেরতা ক'ভাই, নন্দলাল প্রভৃতির প্রাণে উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করেছিলেন সরল ঐকান্তিকতা। দেশ-মাতৃকার বন্দনায় দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন নিষ্ঠাচার পূজারী। সকল বাঙালী কবির মত তিনি হৃদয় ভরপুর করে রেখেছিলেন বাঙলা মায়ের লীলা-মধুর রূপে। প্রকৃতি রাণীর রূপ-মাধুরী মাখা ছিল জননী বঙ্গভূমির গায়ে। এ মৃণ্ময় রূপে তিনি আবাহন করলেন দেশ-মাতৃকাকে—

ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা—
তাহার মাঝে আছে দেশ এক—সকল দেশের সেরা;
ও যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।

তাই সকল দেশের রাণী কবির জন্মভূমি। বিশেষ চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা কোথায় উজল এমন ধারা—

কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে
তার পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠি পাখির ডাকে জেগে।
এত স্নিগ্ধ নদী কাহার কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়
কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশতলে মিশে—
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।

শেষে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কবি চাহিলেন—

আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি।

বঙ্গ আমার জননী আমার সঙ্গীতে মায়ের অতীত দিনের কথায় জাগালেন দেশবাসীকে—

কবি। সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠের সুরকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য স্বাজাতিকে স্মরণ করালেন—

উদিল যেথানে বুদ্ধ-আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষ-দ্বার
আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ জগৎ ভক্তি প্রণত চরণে যাঁর
অশোক যাঁহার কীর্ত্তি ছাইল গান্ধার হতে জলধি শেষ
তুই কিনা মাগো তাদের জননী তুই কি না মাগো
তাদের দেশ।

কি জানি এদিনে অধ্যাত্মিকভাব লুপ্ত গরিমা উদ্ধারের মন্ত্র হবে কিনা ভাবলেন কবি। এখন শক্তির যুগ—মনের নয় দেহের। তাই কবি স্মরণ পথে আনলেন রাজসিক রাজ্যে সাফল্য অতীত দিনের। তিনি বল্লেন—

একদা যাঁহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়
একদা যাঁহার অর্ণব-পোত ভ্রমিল ভারত সাগরময়
সন্তান যাঁর তিব্বত চীন জাপানে করিল উপনিবেশ
তার কি না এ ধূলায় শয়ান, তার কিনা এ-মলিন বেশ।

আবার শরণ নিলেন কবি আধ্যাত্মিক ভাবের স্মৃতিতে—

উদিল যেখানে মুরজ মন্দ্রে নিমাই কণ্ঠে মধুর তান
ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি চণ্ডীদাস গাহিল গান।

শেষে নতশিরে গদগদ কণ্ঠে দেবীকে বল্লেন—

দেবী আমার। সাধনা আমার! স্বর্গ আমার! আমার দেশ।
এ পূজা, এ প্রণতি অনবদ্য।

যে কবি ইংরাজের পীড়ন-ভয়ে ভীত স্বদেশবাসীকে বলে ছিলেন—সাধে কি যাবা বলি গুঁতোর চোটে বাবা বলায়—তাঁর মুখে যখন নির্ম্মল ভাষায় পবিত্র ভাবের দেশ বন্দনা শুনি সত্যই প্রাণ নেচে ওঠে আনন্দে। সত্যই তো সবার দেশ তার নিজের কাছে ভূস্বর্গ। কিন্তু তাঁর বন্দনার ভঙ্গিমায় উপলব্ধি করা যায়, জাতীয় ভাব-ধারার প্রবাহ-মুখ। যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিল জননী ভারতবর্ষ সেদিন কি মঙ্গল সূচিত হ'য়েছিল, সে বরতা দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের শুনিয়েছেন ললিত ছন্দে একান্ত আনন্দ-সঙ্গীতে। যেদিন ইংলণ্ড জন্মেছিল সেদিনেরও কোষ্ঠিফল শুনিয়েছেন প্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি টনসন।

When Britain first at Heavens, command
Arose from out of the azure main
This was the charter of the land
And Guardian Argels Sung the strain
"Rule Britannia rule ! Britannia rules the waves
Britons never shall be slaves."

কবি টমসন কল্পনা করেছিলেন সেদিনের যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠেছিল তাঁর স্বদেশ—ব্রিটেন। স্বাধীনতা তাঁর সন্তানের বিশিষ্ট সম্পদ। কিন্তু সে চেতনার মাঝে ছিল অপরের স্বাধীনতার লোপ। সেদিন সাম্রাজ্যবাদের মদোন্মত্ততা ইংরাজের স্পর্দ্ধাকে স্থান দিয়েছিল উচ্চ ভূমিতে। কবি প্রকাশ করে স্বজাতির রুদ্ধ ভাব। সুতরাং টমসন দেখেছিলেন সাগরোত্থিতা দেশ-জননীর জন্মের উদ্দেশ্য—তরঙ্গ শাসন। সত্যই সেদিন উর্ম্মি-রাশি সগর্ব্বে ভাসিয়ে নিয়ে বেড়াতো ব্রিটেনের অর্ণবপোত—মাত্র ভারত-সাগরময় নয়—বিশ্বের সপ্ত-সমুদ্রে।

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর দেশের সংস্কৃতির ফলে উপলব্ধি করলেন ভারত-মায়ের মৃন্ময় ও চিন্ময় রূপ। তিনি দেখলেন—

যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি! ভারতবর্ষ সেদিন—

ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ কমল করিয়া স্পর্শ
গাইল জয় মা জগন্মোহিনী। জগজ্জননী ভারতবর্ষ।

একেবারে খাঁটি ভারতীয় ভাব। তার পর বর্ণনা করলেন কবি মার রূপ—

উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য করিছে তপন তারকা-চন্দ্র
মন্ত্রমুগ্ধ চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদমন্দ্র।

রবীন্দ্রনাথ ভারতকে বন্দনা করে ব'লেছিলেন, শুভ্র তুষার কিরীটিনী! হিমালয়ের দৃশ্য মুগ্ধ করে সকলকে। দ্বিজেন্দ্রলালও বললেন—

শীর্ষে শুভ্র তুষার কিরীট, সাগর উর্ম্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার—পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গা।

বিশাল ভারতভূমি সারা বিশ্বের চিত্র। তাই তিনি বিশ্ব-রূপিনী। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল সকল মূর্ত্তিতেই দেখলেন মায়ের মাধুরীর বিকাশ।

কখনো মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর উষর দৃশ্যে
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে।
উপরে পবন প্রবল-স্বননে শূন্যে গরজি অবিশ্রান্ত
লুটায়ে পড়িছে পিক-কলরবে চুম্বি তোমার চরণ-প্রান্ত।
উপরে জলদ হানিয়া বজ্র করিয়া প্রলয় সলিল-বৃষ্টি
চরণে তোমার কুঞ্জ-কানন কুসুম-গন্ধ করিছে সৃষ্টি।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল অপর একটি দরদী কবিতায় মায়ের চিন্ময় রূপ বর্ণনা করেছেন প্রকৃষ্ট রূপে। দরদী কারণ তিনি আরম্ভ করেছেন—

ভারত আমার, ভারত আমার, যেখানে মানব মেলিল নেত্র।
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা, এসিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।

কবি কর্ম্ম-জ্ঞানের জননী, ধর্ম্ম-জ্ঞানের ধাত্রীর মহিমা বর্ণনায় গেয়েছেন—

ভগবদ্গীতা গাহিল স্বয়ং ভগবান যেই জাতির সঙ্গে
ভগবৎ-প্রেমে নাচিল গৌর সে-দেশের ধূলি মাখিয়া অঙ্গে।
সন্ন্যাসী সেই রাজার পুত্র প্রচার করিল নীতির মর্ম্ম।
যাদের মধ্যে তরুণ তাপস প্রচার করিল—সোঽহং ধর্ম্ম।
আর্য্য-ঋষির অনাদি গভীর উঠিল যেখানে বেদের স্তোত্র
নহ কি মা তুমি সে ভারতবর্ষ, নই কি আমরা তাদের গোত্র।

শেষে কবির আশার বাণী—

চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া অতীতের সেই মহা-আদর্শ।
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে, রচির প্রেমের ভারতবর্ষ।
এ দেবভূমির প্রতি তৃণ পরে আছে বিধাতার করুণ দৃষ্টি
এ মহাজাতির মাথার উপরে করে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি।

দেশের রূপ ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের চেতনা জুড়ে। নাট্য-কাব্যে তিনি বিরাট খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন। নাটকে পাত্র-পাত্রীর মুখে বিসদৃশ কথা ফোটালে কাব্যের সমীচীনতা ক্ষুন্ন হয়। কবি সেকন্দরের মুখে প্রথম ভারত দর্শনে যে উচ্ছ্বাস প্রকটিত করেছেন তা' জিঘাংসা-পরায়ণ সাম্রাজ্য-লোভী যবন ভূপতির না মাট্য কারের?

সেকন্দর—সত্য সেলুকস। কি বিচিত্র এই দেশ। দিনে প্রচণ্ড সূর্য্য এর গাঢ় নীল আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায় আর রাত্রিকালে শুভ্র

চন্দ্রমা এসে তাকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়ে দেয়। তামসী রাতে অরণ্য উজ্জ্বল জ্যোতি-পুঞ্জে যখন এ আকাশ টলমল করে, আমি বিস্মিত আতঙ্কে চেয়ে থাকি। প্রাবৃটে ঘন কৃষ্ণ মেঘ রাজি গুরু-গম্ভীর গর্জ্জনে প্রকাণ্ড দৈত্য সৈন্যের মত এর আকাশ ছেয়ে আসে। আমি নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখি এর অভ্রভেদী ধবল-তুষার-মৌলি নীল হিমাদ্রী স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এর বিশাল নদনদী ফেনিল উচ্ছ্বাসে বেগে ছুটেছে। এর মরুভূমি বিরাট স্বেচ্ছাচারের মত তপ্ত বালুরাশি নিয়ে খেলা করছে।"

এই সব উক্তি হ'তে মনে হয় যে কবির প্রাণে বদ্ধমূল ছিল প্রকৃতির শোভা। হাঁসির গান নিরাশার সঙ্গীত দেশ-ভক্তি প্রণোদিত।

আর একটা উদাহরণ দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের দেশ-প্রাণতার কথা শেষ করব।

যবন সৈনিক এসেছিল জয়ের শেষে লুটের আশায়। অবশ্য সে হৃদয়ে যে বিরহ ব্যথা জাগাতে পারে না এ নিষ্ঠুর কথা আমি বলছি না। কিন্তু তার স্মৃতি জাগাবার কারণগুলো বিচিত্র গ্রীক সৈন্যের পক্ষে। তারা গেয়েছিল—

যখন সঘন গগন গরজে বরিষে করকাধারা
সভয়ে অবনী আবরে নয়ন লুপ্ত চন্দ্র তারা

তখন বিজয় লুণ্ঠনবাজ গ্রীক সৈন্যের চিত্তে কী কাণ্ড হয় কবি তা বর্ণনা করেছেন—

দীপ্ত করি সে তিমির জাগে কাহার আননখানি
আমার কুটীর রাণী সে যে গো আমার কুটীর রাণী।

পুনশ্চ

জ্যোৎস্না-হসিত নীল আকাশে যখন বিহগ গাহে
স্নিগ্ধ-সমীরে শিহরি ধরণী মুগ্ধ নয়নে চাহে—

তখনও ঐ কুটীর রাণীর স্মৃতি জাগে যবনের প্রাণে। এ ব্যাপারে কবি গ্রীসকে সুন্দর রঙে রাঙিয়েছেন উদার ভাবে। বর্ণনা তাঁর আদরের স্বদেশের। কিন্তু এর মাধুরী যখন যবনের প্রাণে নিজের দেশের স্মৃতি জাগায়, কবির উদার মতে, গ্রীসেরও তেমনি মধুর রূপ।

আমি এ প্রবন্ধে ইঙ্গিত দিলাম মাত্র তিনটি মহাকবির রচনার উল্লেখ করে। এ যুগের সকল কবির দেশের কথা আলোচনা করলে ঠিক ঐ ভাবের স্ফুরণ দেখা যায়। পাশ্চাত্যের ন্যাসানালিজম মূলক দেশপ্রাণতা দেশের মৃন্ময় রূপের প্রতি ভালবাসার উৎস রুদ্ধ করতে পারেনি। সত্যেন্দ্রনাথের গর্ব্বের কথা কানে বাজে। একদিকে মনে হয়—

কোন্ দেশেতে চল্‌তে গেলেই দলতে হয় রে দূর্ব্বাকোমল

আবার অন্যদিকে—

কোন্ দেশের গৌরবের কথায় বেড়ে ওঠে মোদের বুক।
সাধনার আদর্শ আমাদের দেশ-মায়ের মৃন্ময় ও চিন্ময়রূপ।

কালের গতি

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

ঘোমটা পুরিয়া বালিকা-বধূটি কবে এসেছেন ঘরে—
জমা খরচের খাতা খুলে আজ সেই দিন মনে পড়ে।
পতি যে পরমগুরু—
এই বিশ্বাসে যাত্রা করিয়া সুরু,
প্রণমি আমারে পাদোদক পান করিতেন মহাসতী
পাকা চুলে আজো সিঁদুর পরিয়া কেন তিনি ধূমাবতী ?

পতির নিন্দা শুনিলেই কানে আঙুল দিতেন যিনি—
আজি তিনি মোর নিন্দামুখরা ভীষণা কল্লোলিনী !
ভীমা—ভৈরবী রূপ !
মোর কথা যেন আগুনে যোগায় ধূপ।

নত শিরে করি পদসেবা তার, তবু তিনি কেন এত দুর্ব্বার ?
ঘরে ও বাহিরে শুধু মার মার—এই কি কালের গতি ?
আমিও তাঁহার বৃদ্ধ ভর্ত্তা—তিনিও বৃদ্ধা সতী !

সাবধান নব-দম্পতি দল !
কুসুম-শয়নে বিবাহের ছল—
মধুময় জানি, তবুও তাহার আছে বাস্তব দিক্—
অর্থ-রুধিরে তর্পণ বিনা মেজাজ থাকে না ঠিক্।

কাল বলবান্—মনে রেখো ভাই যৌবন-মদ-মত্ত !
শেষের হিসাবে বোঝাপড়া হয় প্রেমের যন্ত্র-পত্র।

দেশের কথা

পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সম্মেলন—

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছাত্রসমাজের মধ্যে যে অধীরতা দেখা গিয়াছে, তাহা প্রত্যেক স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তিকেই বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। ছাত্রদের মধ্যে কি ভাবে শান্ত অবস্থা ফিরাইয়া আনা যায়, সেজন্য বহুপ্রকার চেষ্টা হইতেছিল। সম্প্রতি গত ২৮শে ও ২৯শে আগষ্ট কলিকাতায় যে পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সম্মেলন হইয়া গেল, তাহাতে আশান্বিত না হইয়া থাকা যায় না। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় ৬ শত ছাত্র প্রতিনিধি ঐ সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন এবং পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ, প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বহু সুধী সম্মেলনে উপস্থিত হইয়া ছাত্রগণকে উপদেশ দান করিয়াছেন। বিধান সভার সভাপতি শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অভিভাষণের শেষে তিনি ছাত্রগণকে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, আমরা তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম—(১) সমস্ত শিক্ষা বহির্ভূত উত্তেজনাপূর্ণ আন্দোলন ১০ বৎসরের জন্য বন্ধ করা (২) সময় ও কার্য্যকরী শক্তি অধ্যয়নে নিযুক্ত করা (৩) অবসর মুহূর্তে স্বাস্থ্য সঞ্চয়ে মনোনিবেশ করা (৪) ভবিষ্যতে রাষ্ট্র-পরিচালনের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য শক্তি সঞ্চয় করা (৫) সাধারণ জ্ঞান অর্জন করা—কারণ জ্ঞানই শক্তি (৬) জ্ঞানার্জনের জন্য শ্রদ্ধার সঙ্গে অগ্রসর হওয়া—কারণ শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্ (৭) ভারতীয় প্রণালীতে ধ্যান ও যোগবলে জীবনকে ঘড়ির কাঁটার মত নিয়ন্ত্রিত করা (৮) অধ্যয়ন, কাজ ও সেবার মধ্যে সময় বিভাগ করিয়া সেই নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করা (৯) উদ্দেশ্যবিহীন বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া ছাত্রসমাজকে শ্রেষ্ঠ সেবার অধিকারী হইতে হইবে—জাতীয় জীবনের কয়েকটি মাত্র ক্ষেত্রে তাঁহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে। তাহাতে যাহারা সেবা করিবে ও যাহারা সেবা লইবে উভয়েই উপকৃত হইবে। এই সেবার অবসরে যদি অধ্যয়নের সঙ্গে সামান্যমাত্রও উপার্জন সম্ভব হয় তাহা সর্বতোভাবে গ্রহণীয়। উপার্জন তিন প্রকারে হয়—সরকারী নিয়োগ, বেসরকারী নিয়োগ ও আত্ম-নিয়োগ। ছাত্ররা আত্ম-নিয়োগ করার পথ আবিষ্কার করিতে পারে। গান্ধীজি যে পথ চরকার প্রতীক দ্বারা দেখাইয়াছেন, দেশের নূতন পরিস্থিতিতে এইরূপ বহু উপায় অবলম্বন করিলে বেকার সমস্যার সমাধান হইবে। (১০) বর্তমান অবস্থায় ছাত্র সমাজ কর্ত্তৃক শ্রেষ্ঠ সেবার ক্ষেত্র—অবসর সময়ে জনসাধারণের মধ্যে দেশের অবস্থা ও ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান সঞ্চয় করা ও দেশে দ্রুত অশিক্ষা নিবারণের দায়িত্ব গ্রহণ করা। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে বহু প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ ঘোষের তত্ত্বাবধানে কলিকাতার ছাত্রদের আর্থিক দুর্গতি সম্বন্ধে তথ্যমূলক অনুসন্ধানের ফলে ছাত্রদের জীবনধারণের যে ভয়াবহ অবস্থা প্রকাশ পাইয়াছে, সে সম্বন্ধে অনতিবিলম্বে ছাত্রদের স্বাস্থ্য ও জীবনধারণের মান উন্নয়ন বিষয়ে সরকার তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যকরী উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন, বিভিন্ন উপায়ে সরকারী ও বেসরকারী সাহায্যে ছাত্রদের বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব। (ক) অসুস্থ ছাত্রদের চিকিৎসা (খ) অক্ষম ছাত্রদের পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা (গ) ছাত্রদের খেলাধুলা ও ব্যায়াম চর্চার অধিকতর সুযোগ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি বিশেষ অর্থ ভাণ্ডারের ব্যবস্থা করাও উচিত! অবসর সময়ে ও ছুটীর অবকাশে ছাত্রদের আর্থিক রোজগারের ব্যবস্থা, ছাত্রদের ব্যক্তিগত পরীক্ষা সম্বন্ধে ভারত সরকার প্রকাশিত নীতি অনুসরণের ব্যবস্থা এবং ছাত্রদের উপযোগী অবৈতনিক পাঠাগার স্থাপনের ব্যবস্থা করারও অনুরোধ করিয়া সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কারিগরী শিক্ষার বহুল প্রচার, বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার প্রচলন দ্বারা ছাত্রসমাজের মধ্যে দেশরক্ষা ও আত্মরক্ষার মনোভাব গঠন এবং ছাত্রদের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের অধিকতর সুযোগ দানের জন্য সরকারের নিকট আবেদন করা হইয়াছে। মোটের উপর এই ছাত্র-সম্মেলন একদিকে যেমন সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল, অন্যদিকে তেমনই সুফলপ্রদ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। বর্তমান অবস্থায় ছাত্ররা যে নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবহিত হইয়া এই সম্মেলনে মিলিত হইয়াছিলেন, ইহাও কম আশার কথা নহে।

জাল ঔষধ—

গত মাসে আমরা ভেজালের কথা প্রসঙ্গে জাল ঔষধের কথাও উল্লেখ করিয়াছিলাম। তাহার পর কলিকাতা পুলিসের ডেপুটী কমিশনার শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় জাল ঔষধ সম্বন্ধে অনেক কথা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—জাল ঔষধে আজ বাজার ছেয়ে গেছে। এমন কৌশলে জাল ঔষধ তৈয়ার হচ্ছে যে সাধারণের বোঝা অত্যন্ত শক্ত—কোনটি জাল আর কোনটি আসল। ডাক্তাররাও চোখে দেখে সহজে তা বুঝতে পারেন না। অসাধু ব্যবসায়ীরা নিম্নলিখিত উপায়ে জাল ঔষধের ব্যবসা করে—(১) তাদের ভাড়া করা লোক বাড়ী বাড়ী ঘুরে চড়া দামে লেবেল লাগানো ঔষধের শিশি বোতল কিনে আনে। লেবেল ভালো থাকলে তারা চড়া দামে শিশিগুলি কিনে নেয়। গৃহস্থরা বেশী দাম পেয়ে ভাবেন—খুব লাভ করিলাম। এই সব

শিশি বোতলে জাল ঔষধ ভরে আসল বলে বাজারে চালানো হয়। (২) অসাধু কম্পাউণ্ডার আর হাতুড়ে কেমিষ্টদের তারা তাদের পরীক্ষাগারে জাল ঔষধ তৈয়ারীর কাজে নিযুক্ত করে। এরা লেবেল সমেত খালি শিশিতে যা তা জিনিষ এমন ভরে দেয়, যাতে কেউ বুঝতে না পারে। তা ছাড়া লেবেল চুরি করে এনেও জাল ঔষধ তৈয়ারীর কাজে লাগায়। (৩) এই সব ঔষধ বাজারে চালানোর জন্য উচ্চ হারে কমিশন দেওয়া হয়। দুর্ভাগ্যের কথা, বেশী কমিশনের লোভে নিকৃষ্ট কাজে যোগ দিতে ঔষধ-ব্যবসায়ীর অভাব হয় না। (৪) অসাধু প্রতিনিধিরা ঔষধের বাজারে ঘুরে সস্তা দরের লোভ দেখিয়ে খুচরা ব্যবসায়ীদের হাত করে। এ ব্যাপারে মফঃস্বলের ব্যবসায়ীরাই বেশীর ভাগ তাদের প্রলোভনে ভুলে যায়। নিম্নলিখিত ঔষধগুলিই বেশী জাল হইতেছে—(ক) পেনিসিলিন (খ) ষ্ট্রেপটোমাইসিন (গ) ক্লোরোমাইসেটিন, ক্লোরোমাইসেটিনের ক্যাপসুলে অন্য সস্তা ঔষধ ভরে দেওয়া হয় (ঘ) কুইনোহেমোজেন—পাইরেক্স ইত্যাদি—কুইনাইনঘটিত ঔষধগুলির বদলে চালানো হচ্ছে সাধারণ রং করা চিরতার জল। (ঙ) টিটেনাস এণ্টি-টকসিন। ইনজেকসানের লেবেলে লেখা থাকে ২০০০০ ইউনিট—ভেতরে ঔষধ থাকে মাত্র ১৫০০ ইউনিট। এর প্রতিকারের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন—(১) সব রকম ঔষধের লেবেল, কার্টুন এবং সম্ভব হলে শিশি বোতলগুলিও নষ্ট করে ফেলা উচিত। (২) প্রসিদ্ধ ও বিশ্বস্ত দোকান হইতে রসিদ লইয়া ঔষধ কিনিতে হইবে (৩) দালালের কাছ হইতে কম দামে ঔষধ কেনা বন্ধ করিতে হইবে (৪) পরিবারের সকলকে সাবধান করিয়া দিতে হইবে—কেহ যেন লেবেল ও কার্টুন সমেত কোন শিশি বোতল বিক্রয় না করে। (৫) সন্দেহ হইলেই পুলিসের এনফোর্সমেন্ট বিভাগকে খবর দিতে হইবে। এক দিকে পুলিস যেমন দুর্ব্বৃত্তদের ধরার চেষ্টা করিবে, অন্য দিকে জনসাধারণকে এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। নচেৎ এই পাপ দূর করা সম্ভব হইবে না।

কলিকাতায় সরকারী বাস—

কলিকাতার যানবাহন সমস্যা সমাধানের বহু চেষ্টা হইতেছে বটে, কিন্তু সে সমস্যার সমাধান এখনও হয় নাই। ট্রাম ও বাস সাধারণ মানুষের যাতায়াতের উপায়। সহরে গত কয় বৎসরে কয়টি নূতন রাস্তায় ট্রাম চলিলেও চাহিদার তুলনায় তাহা কিছুই নহে। বহু নূতন পথে ট্রাম চালানো প্রয়োজন হইয়াছে। এ বিষয়ে জনগণের মধ্যে প্রবল আন্দোলন হইলে সরকার ট্রাম কোম্পানীকে সে বিষয়ে বাধ্য করিতে পারেন। তাহার পর বাসের কথা। কলিকাতার লোকসংখ্যা ১৯৫১ সালের আদম সুমারীর হিসাবে ২৫ লক্ষ ৪৯ হাজার। তা ছাড়া প্রত্যহ সহরতলী হইতে ২ লক্ষ ২৫ হাজার লোক কলিকাতায় আসিয়া থাকে। তাহার মধ্যে ১০ লক্ষ লোক প্রত্যহ ট্রামে ও ৮ লক্ষ লোক বাসে যাতায়াত করে। সহরে ২৮৫টি সরকারী বাস ও ৫৫২টি বেসরকারী বাস চলিয়া থাকে। সরকারী বাস চলার ফলে বহু নূতন রাস্তায় বাস চলিতেছে ও তাহার ফলে বহু লোক বাড়ীর কাছে বাসে চড়িবার সুযোগ পাইয়া থাকে। সরকারী বাস জনগণের সুবিধাবিধানের বহু রকম নূতন পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা করিয়াছে—সেজন্য হয়ত উপযুক্তরূপ লাভ করা সম্ভব হয় নাই। তাহা ছাড়া পরিচালন ব্যবস্থার যে ত্রুটি ছিল না, এমন কথাও বলা যায় না। বেসরকারী বাসের মালিকগণ তাহাদের কর্ম্মীদের সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা করেন, সরকারী ব্যবস্থায় কর্ম্মীদের সম্বন্ধে সেরূপ ব্যবস্থা সম্ভব হয় না—ইহাও সরকারী বাসে অধিক লাভ না হওয়ার অন্যতম কারণ। যাহা হউক, এখন সরকারী বাস-পরিচালন ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি হইতেছে এবং আশা করা যায়, শীঘ্রই সরকারী বাস হইতেও লাভ হইবে। ২৮৫টি সরকারী বাসে ৩৩০০ লোক কাজ করে—অধিকাংশই মধ্যবিত্ত পরিবারের ও উদ্বাস্তু পরিবারের যুবক। আগামী ৫ বৎসরে সহরে যাহাতে শুধু সরকারী বাস চলে তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। বেসরকারী বাসসমূহকে সহরতলীতে ও গ্রামাঞ্চলে তাহাদের গাড়ী চালাইতে দেওয়া হইবে। বাস-তৈয়ারী বা মেরামতের জন্য সরকারকে এখন আর পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না। সরকারী কারখানায় বহু যুবককে বাস নির্মাণ ও মেরামতের কাজ শিক্ষা দিয়া তৈয়ারী করা হইয়াছে, তাহারা এখন বাসের নূতন বডি-নির্মাণ ও মেরামতের কাজ করিতেছে। মধ্যবিত্ত পরিবারের বেকার সমস্যা দূরীকরণে সরকারী বাস ব্যবসা বহু পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে। ইহার পূর্বে অন্য রাষ্ট্রের লোকই অধিক সংখ্যায় বাসে কাজ করিত—ক্রমে সে ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে দেশ উপকৃত হইতেছে। তবে এখনও বাস-পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতির বহু পথ অবলম্বন করা হয় নাই। আমাদের বিশ্বাস, নূতন ব্যবস্থার ফলে যাত্রী সাধারণের অভিযোগও যেমন দূরীভূত হইবে, তেমনই বেকার সমস্যা সমাধানেও সাহায্য করা সম্ভব হইবে।

ভারত ও ইন্দোচীন কমিশন—

সকলেই জানেন, ইন্দোচীনে ভিয়েৎনাম, লাওস ও কাম্বোডিয়ার যুদ্ধ-বিরতি তত্ত্বাবধায়ক কমিশনগুলির সভাপতির পদ ভারত বিনা সর্ত্তে গ্রহণ করিয়াছে। ভারতের শক্তি বা সামরিক বলের জন্য ভারতকে এই সভাপতি পদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করা হয় নাই—ভারতের ন্যায়পরায়ণতা ও স্বাধীনচিত্ততার উপর বিশ্ববাসীর ক্রমবর্দ্ধমান নির্ভরতাই ইহার কারণ। এর ফলে ভারতের উপর এক বিরাট দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে—জাতির সম্মিলিত শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা দ্বারাই এই দায়িত্ব-পূর্ণ কাজ সফল করা সম্ভব হবে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু বহু স্থানে বহু বক্তৃতায় ভারতবাসীকে এই দায়িত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। জেনেভায় যে ইন্দোচীন যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে, তাহার ফলে গত মহাযুদ্ধের পর এই প্রথম পৃথিবী সম্পূর্ণরূপে সংগ্রামমুক্ত হইয়াছে। কানাডা, পোলাণ্ড ও ভারতের প্রতিনিধি লইয়া কমিশন গঠিত হইয়াছে ও ভারতকে কমিশনের সভাপতি করা হইয়াছে। প্রায় ২ বৎসর ইন্দোচীনের তিনটি রাজ্য সম্পর্কে

কমিশনের কাজ চলিবে। এই জেনেভা-চুক্তির ফলে আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতিতে নূতন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। পৃথিবীতে এই প্রথম বৃহৎ দেশগুলির রাষ্ট্রনায়করা যুদ্ধ ও শান্তি সমস্যা আয়ত্তের মধ্যে আনিতে সমর্থ হইয়াছেন। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ার এই সমস্যার সমাধান না হইলে বিষম বিপদ উপস্থিত হইত। যুদ্ধবিরতি চুক্তি না হইলে যুদ্ধ আরও ব্যাপক ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়তে পারতো ও নূতন নূতন আণবিক অস্ত্রের ব্যবহার হইত। এক পক্ষ আণবিক অস্ত্র ব্যবহার করলে অপর পক্ষও আণবিক অস্ত্র ব্যবহার করিত। তার ফলে সমগ্র পৃথিবীতে আবার ধ্বংসের লীলা আরম্ভ হইত। শুধু ইন্দোচীনেরই যুদ্ধের প্রশ্ন নহে। বর্ত্তমানে প্রত্যেকটি ঘটনাই আন্তর্জ্জাতিক। পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভয়, আশঙ্কা ও ঘৃণার ভাব ছড়িয়ে পড়েছে। এ অবস্থা অতিক্রম করা বড়ই কঠিন। সুখের কথা জেনেভা সম্মিলনে সমবেত সকলে ইহা বুঝিয়াছিলেন এবং সেজন্য সকলের সম্পূর্ণ অভিমত না থাকা সত্ত্বেও তত্ত্বাবধায়ক-কমিশন গঠিত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, ভারতের নেতৃত্বে এই কমিশন তাহার কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত করিবে এবং দেশ হইতে যুদ্ধের আশঙ্কা স্থায়ীভাবে দূরীভূত হইবে।

রাঁচী যক্ষ্মা হাসপাতাল—

রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মীরা ভারতের বিভিন্ন স্থানে আর্তদের সেবার জন্য কত ভাবে কত বড় বড় প্রতিষ্ঠান পরিচালন করিতেছেন, তাহার সংখ্যা নাই। তাঁহাদের অন্যতম সেবাক্ষেত্র রাঁচী যক্ষ্মা হাসপাতাল। সম্প্রতি ঐ হাসপাতালের তৃতীয় বার্ষিক কার্য্য বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। রাঁচী রেল ষ্টেশন হইতে ১০ মাইল দূরে রাঁচী চাইবাসা পথের উপর সমুদ্র হইতে ২১০০ ফিট উচ্চে পর্বত-পরিবেষ্টিত শাল জঙ্গলের মধ্যে ২৫০ একর জমীর উপর এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত। স্থানটি চমৎকার ও স্বাস্থ্যকর হইলেও তথায় দারুণ জলাভাব। সম্প্রতি সরকারী সাহায্যে ডুংরী বাঁধ সংস্কার করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণ হয় নাই। ইন্দারার জলও পর্য্যাপ্ত নহে। হাসপাতাল এলাকায় ৩৫টি বাড়ী হইয়াছে ও তথায় রোগী, কর্মী প্রভৃতি লইয়া মোট ১৫০ জন বাস করে। ৯৩টি যক্ষ্মা রোগী রাখিয়া চিকিৎসা করা হয়। ২০ হাজার টাকা জমা রাখিলে একটি দরিদ্র রোগীকে বিনা ব্যয়ে রাখার ব্যবস্থা করা যায়। ১৯৫২ সালে ৫৮ জন রোগী রাখার ব্যবস্থা ছিল—১৯৫৩ সালে নূতন ৩৫ জন রোগী রাখার উপযুক্ত গৃহাদি নির্মিত হইয়াছে। আরও ১২টি রোগী রাখার গৃহাদি নির্মিত হইতেছে। এই হাসপাতালে প্রতিষ্ঠাবধি মোট ১২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা সংগৃহীত ও ১২ লক্ষ ২২ হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। আয়ের মধ্যে ৫০ হাজার টাকা ঋণও ধরা হইয়াছে। স্বামী বেদান্তানন্দের সম্পাদকতায় এই হাসপাতাল দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। সুখের কথা, তথায় বহু বাঙ্গালী চিকিৎসার সুযোগ লাভ করিতেছে। ঐ স্থান বিহার প্রদেশে অবস্থিত হইলেও রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনায় তথায় কোন প্রাদেশিকতা নাই। বিহার সরকার তথায় ৫টি রোগী রাখার জন্য বার্ষিক ৮৫০০ টাকা দিয়া থাকেন—১৯৫৩ সালে জল সরবরাহ ব্যবস্থায় ২৩৫২ টাকা দিয়া তাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে (১৯৫৩) চাঁদা তোলা হইয়াছে ২৭ হাজার টাকা ও রোগীদের নিকট হইতে ৬০ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতার এক ব্যারিষ্টার প্রদত্ত সম্পত্তির আয় হইতে ৪০ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে। গৃহাদি নির্মাণ বাবদে ৯২ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। বিরাট জমীটিকে সংস্কার করিয়া তথায় শাক-শব্জী ও অন্যান্য ফসল উৎপাদনের জন্য বহু অর্থ প্রাথমিকভাবে ব্যয় করিতে হইবে। ভারতবর্ষে আজও দাতার অভাব হয় নাই। মিশনের কর্মীদের চেষ্টায় এই যে বিরাট প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়া বহু আর্তের সেবা করিতেছে, তাহাতে সাহায্য করা প্রত্যেক হৃদয়বান ব্যক্তির কর্তব্য। রামকৃষ্ণ মিশনের বহুমুখী সেবা প্রচেষ্টা আজ প্রত্যেক ভারতবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া থাকে। আমাদের বিশ্বাস, জনগণের সাহায্যে এই হাসপাতালও ক্রমে সর্বাঙ্গ সুন্দর হইয়া গড়িয়া উঠিবে।

পূর্ব-বঙ্গ হইতে উদ্বাস্তু সমাগম—

সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্থান হইতে কলিকাতা শিয়ালদহ ষ্টেশনে যে বহুল-সংখ্যায় উদ্বাস্তু সমাগম হইতেছে, তন্মধ্যে বরিশাল, খুলনা ও ফরিদপুর—বিশেষতঃ শেষোক্ত জেলার উদ্বাস্তু নরনারীই অধিক আসিয়াছে। অধিক সংখ্যায় উদ্বাস্তু সমাগম চলিতে পারে, এই আশঙ্কায় এখন শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে উদ্বাস্তুগণকে বিভিন্ন জেলায় উদ্বাস্তু শিবিরে পাঠাইয়া দেওয়া হইতেছে। ষ্টেশনে অবস্থিত পুনর্বসতি ইউনিটেও সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ষ্টেশনে তিন সিফটে সর্বদাই লোক কাজ করিতেছে। পূর্ববঙ্গে গভর্ণরের শাসন প্রবর্তনের পর হইতে গ্রামাঞ্চলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর পীড়নের ফলে এত লোক চলিয়া আসিতেছে। অবশ্য সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও কিছু লোক চলিয়া আসিতেছে। এই ব্যবস্থা আরও কিছুদিন চলিলে পূর্ব-বঙ্গে আর হিন্দু থাকিবে না। দেশ-বিভাগের ফলে এই যে বিরাট সমস্যা দেখা দিয়াছিল, তাহা কোন দিন শেষ হইবে না। এ অবস্থায় ভারতের রাষ্ট্রীয় সরকারের কি দায়িত্ব আছে, তাহাও চিন্তার বিষয়। এখন হইতে যদি ইহার প্রতীকারের ব্যবস্থা করা না হয়, তাহা হইলে ভারতের অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা একদিন ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

বন্যা সাহায্য ও কেন্দ্রীয় সরকার—

১লা সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকার স্থির করিয়াছেন যে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও আসাম—তিনটি রাষ্ট্রে ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকদিগকে সাহায্য প্রদানের জন্য প্রাদেশিক সরকার সমূহ যে অর্থ ব্যয় করিবেন, তাহার শতকরা ৫০ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার প্রদান করিবেন। বাকী অর্দ্ধেক ব্যয় প্রাদেশিক সরকার সমূহকেই বহন করিতে হইবে। এ অর্থ অবশ্য দুঃস্থদের সাহায্য দানে ব্যয়িত হইবে। যদি কোন প্রদেশে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ২ কোটি টাকার অধিক হয়, তবে অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থের শতকরা ৭৫ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার বহন করিবেন—বাকী

মাত্র শতকরা ২৫ টাকা প্রাদেশিক সরকারকে বহন করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনাব রফি আমেদ কিদোয়াই এ ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনটি প্রদেশ—কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত জানাইয়াছেন। এবারের বন্যার ক্ষতির পরিমাণ এখনও স্থির হয় নাই—সত্বর স্থির করা সম্ভব ও হইবে না। এই বন্যা নিরোধের জন্য যে সকল স্থায়ী ব্যবস্থার প্রয়োজন, আমাদের বিশ্বাস, সে সকল ব্যবস্থা ও অবলম্বন করা হইবে। এইরূপ ভয়াবহ বন্যা ভারতে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই। এ বৎসর মানুষ যে আশা লইয়া বৎসরের আরম্ভে কাজ সুরু করিয়াছিল বন্যার ফলে সে আশা প্রায় নির্মূল হইল—তবে ভরসা এই যে, কেন্দ্রীয় সরকার যথা সময়েই—এই দুর্দ্দশার প্রতীকারে অগ্রসর হইয়াছেন।

ইন্দোচীন অভিমুখে ভারতীয় বাহিনী—

ইন্দোচীনে আন্তর্জ্জাতিক শান্তি পর্য্যবেক্ষক কমিশনের কাজে সাহায্য করিবার জন্য দিল্লী হইতে একটি দল ব্যারাকপুরে আসিয়াছে—তাহারা উড়োজাহাজে ক্রমে ইন্দোচীনে প্রেরিত হইবে। ঐ দলের মোট ৪৭৮ জনের মধ্যে আছেন—৪৭ জন সামরিক অফিসার, ৫ জন নৌবিভাগের অফিসার, ২ জন বিমান অফিসার ও ১৮ জন অন্যান্য অফিসার। লেঃ কর্ণেল আই-এস-কানান দলের পরিচালক। দ্বিতীয় দলে ২৫ জন কানাডার সামরিক অফিসার ও ইন্দোচীনে যাইয়া ভারতীয় দলের সহিত মিলিত হইবে। কোরিয়ায় শান্তি স্থাপনের জন্য যে সকল ভারতীয় সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল, এবার তাহাদের কাহাকেও লওয়া হয় নাই—সবই নূতন লোক পাঠান হইতেছে। কোরিয়ার কাজ ও ইন্দোচীনের কাজ একরূপ হইবে না। ৭ বৎসর যুদ্ধের পর ইন্দোচীনে যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা হইবে, সেজন্য তথায় বহু নূতন ব্যবস্থার প্রয়োজন এবং সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা না হইলে ইন্দোচীনে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে না। রাষ্ট্রসংঘ হইতে ভারতের উপর যে গুরুদায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার প্রদত্ত হইয়াছে, আমাদের বিশ্বাস ভারতীয় প্রতিনিধি দল তাহা সুসম্পন্ন করিয়া ভারতের গৌরব ও মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন।

কলিকাতা সহরের উন্নতি—

কলিকাতা সহরের সাধারণ উন্নতিমূলক পরিকল্পনা, পথ-পরিকল্পনা, বস্তি পরিষ্কার পরিকল্পনা, পুনর্ব্বাসন পরিকল্পনা, গৃহ সংস্থান পরিকল্পনা প্রভৃতি ব্যবস্থার জন্য কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট আইনের সংশোধন করিয়া বিধান সভার গত অধিবেশনে একটি নূতন আইন করা হইয়াছে। তাহার ফলে ঐ কার্য্যব্যবস্থার জন্য ১১ জন সদস্য লইয়া একটি কলিকাতা উন্নতিসাধন ট্রাষ্ট বোর্ড গঠন করা হইবে—তাহাতে থাকিবেন —রাজ্য সরকার নিযুক্ত সভাপতি, কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার, কর্পোরেশন কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ৩ জন সদস্য, ৪টি বণিক সংঘের প্রতিনিধি ২ জন ও রাজ্যসরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত ৪ জন সদস্য। যে অঞ্চলের জন্য পরিকল্পনা করা হইবে, সেখানে পথ ঘাট, নর্দ্দমা ও পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী, ডোবা ও নালা ভরাট, কুটীর বা অট্টালিকার আংশিক বা সমগ্র ধ্বংস বা পুনর্গঠন, অধিবাসীদের পরিশ্রুত জল সরবরাহ প্রভৃতি করা হইবে। কলিকাতা সহরের উন্নতির জন্য এখনও বহু কার্য্য বাকী আছে। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের আইনে সে সকল কাজ করা সম্ভব হয় না —সে জন্য এই নূতন আইনের প্রয়োজন হইয়াছে। ইহার ফলে, আশা করা যায়, কলিকাতার মত বিরাট সহর তাহার উপযুক্ত মর্য্যাদা লাভ করিবে ও সহরের মধ্যে যে সকল বিসদৃশ স্থান আছে, সেগুলি আর থাকিবে না।

স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস—

নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস রচনার কাজ চলিতেছে তাহা ১৯৫৬ সালে সমাপ্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। স্বাধীনতা আন্দোলনের বহু অজ্ঞাত ও চিত্তাকর্ষক তথ্য এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইবে। কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক কার্য্যালয়সমূহে এ বিষয়ে গবেষণা কার্য্য চলিতেছে ও রাজ্যসরকারসমূহ গবেষকগণকে প্রয়োজনীয় মালমসলা সরবরাহ করিতেছেন। ইতিহাস-খানি তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে ও প্রথম খণ্ডের কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে ১৮৫৭ সালের সিপাই-যুদ্ধ পর্য্যন্ত ইংরাজদের বিরুদ্ধে যে সকল প্রতিরোধ আন্দোলন হইয়াছে তাহার বিবরণ থাকিবে। দ্বিতীয় খণ্ডে জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যুত্থানের পূর্ব্ব-ইতিহাস হইতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এবং তৃতীয় খণ্ডে গান্ধীজীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা লাভের বিবরণ থাকিবে। কংগ্রেসের ইতিহাসে ও স্বাধীনতা আন্দোলনে বাঙ্গালীর দান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আমরা আশা করি, বাঙ্গালার কথা এই ইতিহাসে উপেক্ষিত বা অবহেলিত হইবে না।

ভারতের ফরাসী উপনিবেশ—

খবর আসিয়াছে যে ফরাসী সরকার ফরাসী-ভারতীয় উপনিবেশ ত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। ফরাসী প্রধান মন্ত্রী স্যাঁদে ফ্রাস স্বীকার করিয়াছেন—ফরাসী উপনিবেশবাসী ভারতীয়গণ সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় এবং তাহাদের জীবন ধারণের জন্য সম্পূর্ণভাবেই ভারতের উপর নির্ভর করিতে হয়। এ অবস্থায় তাঁহাদের ফরাসী—ভারতীয় উপনিবেশ-গুলি ত্যাগ করা ছাড়া অন্য উপায় নাই। ঐ সকল উপনিবেশে ভবিষ্যতে কিরূপ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহা ভারত সরকারই স্থির করিবেন। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ফরাসী সরকার সকল উপনিবেশের হস্তান্তর ব্যবস্থা শেষ করিবেন স্থির হইয়াছে। ভারতের মধ্যস্থিত ছিট-মহলগুলির নানা সমস্যা সম্পর্কে ভারত সরকারকে চিন্তা করিতে হয় ও তাহাদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিতে হয়—এ অবস্থায় ছিটমহলগুলি ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইলে আর ঐ সমস্যা থাকিবে না। ফরাসী উপনিবেশ-গুলি সম্বন্ধে ব্যবস্থা হইল—কিন্তু পর্ত্তুগীজ ছিটমহলগুলির সমস্যা-সমাধান হইলেই মঙ্গলের কথা।

কম্যুনিষ্ট দল বেআইনি ঘোষণা—

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি আইসেন-হাওয়ার গত ২৪শে আগষ্ট আইন করিয়া কম্যুনিষ্ট দলকে আমেরিকায় বেআইনি দল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কম্যুনিষ্টরা আমেরিকায় বিভিন্ন শ্রমিক সংঘের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শিল্প পরিচালনায় বাধা সৃষ্টি করিতেছিল। ঐ ঘোষণায় বলা হইয়াছে—(১) যাহারা কম্যুনিজম প্রচার করিবে তাহাদের নাগরিকের অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইবে (২) শান্তির সময়ে যাহারা অন্য দেশের গুপ্তচরের কাজ করিবে তাহাদের মৃত্যু দণ্ড দেওয়া হইবে (৩) যে সকল ভূতপূর্ব সরকারী কর্মচারী কম্যুনিষ্ট হইবে তাহাদের পেন্সন প্রভৃতি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। ভারতবর্ষেও আজ অনুরূপ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন প্রয়োজন হইয়াছে। সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানেই একদল কম্যুনিষ্ট যাইয়া শিল্প ধ্বংস করার চেষ্টা করিতেছে। দেশের অগ্রগতিতে বাধা দানের জন্য তাহাদের চেষ্টার অন্ত নাই। এ অবস্থায় গোড়া হইতে কঠোর সাবধানতা অবলম্বিত না হইলে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্ভব হইবে না।

সুমিতার সাধনা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় অঙ্ক

১৯৪৭ সাল। কলিকাতা

কোন বরেণ্য নেতার বাসভবন

খদ্দর-পরিহিত পরিচ্ছন্ন শুদ্ধ মানুষটি স্বল্প আয়োজনের মধ্যে বসিয়া আছেন। পাশে একটি চরকা। সামনে বসিয়া আছে অমর; সঞ্জীবের সঙ্গী ও শিষ্য।

নেতা। এসব উৎসব-সমারোহের ব্যাপারে মন্ত্রী-টন্ত্রীদের নিয়ে যান। এ সবে আমাদের কেন? তা ছাড়া দেশ এখন স্বাধীন দেশ, স্বাধীন দেশের মন্ত্রী আমাদের নিজেদের জন; তাঁদের পর ভাবছেন কেন? আমি বরং বলে দিচ্ছি—মন্ত্রীদের কাউকে। ডাঃ ঘোষ হয় তো পারবেন না যেতে, তবে—চারুবাবু আছেন, অন্নদাবাবু আছেন; বলুন না—কাকে চাই আপনাদের। দেশের ভাল কাজ—বললে তাঁরা নিশ্চয় যাবেন।

অমর। আমাদের ইচ্ছে আপনি যান। আপনি সঞ্জীবদা'কে চিনতেন, ভালবাসতেন!

নেতা। সঞ্জীব? কোন সঞ্জীব? সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়?

অমর। আজ্ঞে হ্যাঁ। তাঁরই নামেই আমাদের প্রতিষ্ঠান। সঞ্জীব সেবায়তন।

নেতা। সঞ্জীব সেবায়তন? সঞ্জীবের নামে কেন? সঞ্জীব—তা হলে—? কি বলছ তুমি?—তুমি বলে ফেললাম—কিছু মনে করো না। তুমি তাকে দাদা বলছ সঞ্জীব আমার ছাত্র—আমার প্রিয় ছাত্র ছিল, সে; শুধু কলেজেরই ছাত্র ছিল না সে—বাইরে সে ছিল আমার শিষ্য। কলেজের পড়া শেষ ক'রে সে বিয়ে করলে; সেই থেকে আমার সঙ্গে দেখা করে নি। [illegible] হয়েছিল তার। কারণ ছিল। কতদিন আমি তাকে বলেছি—দেশ স্বাধীন না-হওয়া পর্য্যন্ত বিয়ে করো না। সেও বলত'—বিয়ে করব না। সে ১৯৪১ সালের কথা; উঁহু—১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাসে বোধ হয়!

অমর। আজ্ঞে হ্যাঁ। ১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাসেই সঞ্জীবদা বিয়ে করেছিলেন।

নেতা। সেই অবধি আর আমার সঙ্গে দেখা হয় নি। ৪২ সালের আগষ্ট মাসেই আমি এ্যারেষ্টেড হলাম। কিন্তু—কি বলছ তুমি—সঞ্জীব—? সঞ্জীব নেই? কতদিন হল? কি হয়েছিল?

অমর। ১৯৪২ সালের ২৪শে ডিসেম্বর কলকাতায় সবচেয়ে বড় জাপানী-বমিংয়ের রাত্রি থেকে তাঁর সন্ধান কেউ বলতে পারে না। বমিংয়ের কিছুক্ষণ আগেই তিনি শ্বশুরবাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন; (একটু ইতস্তত করিয়া) বোধ হয় হাওড়ায় ট্রেন ধরবার জন্যে বেরিয়েছিলেন। আজ পাঁচ বৎসর হয়ে গেল।

নেতা। সঞ্জীব নেই? তার নামে তোমরা সেবায়তন করেছ—তার উদ্বোধনে আমাকে ডাকতে এসেছ?

অমর। এ সেবায়তন প্রতিষ্ঠা আমরা করি নি। করেছিলেন সঞ্জীবদা নিজে। ছেলেবেলা থেকেই এ কাজ তিনি করতেন। কিন্তু বিয়ে করে গ্রামে এসে নবগ্রাম-সেবায়তন নাম দিয়ে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। ৪২ সালে ডিসেম্বর মাসে এই ঘটনা ঘটার পর সঞ্জীবদার স্ত্রী সেবায়তনের কাজে প্রাণ ঢেলে দিয়েছেন। তাঁর গহনাগাঁটি পৈত্রিক টাকাকড়ি কিছু পেয়েছিলেন, সে সব ওই সেবায়তনের কাজে খরচ করছেন। দেশ স্বাধীন হল—এখন তাঁর একান্ত ইচ্ছে—সঞ্জীবদার নামে সেবায়তনের নাম দিয়ে—ওটিকে স্থায়ী পাকা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন।

নেতা। সঞ্জীবের স্ত্রী তো অ্যাডভোকেট ঘোষালের মেয়ে? খুব আদরের মেয়ে। কোন ছেলেপুলেও তো নেই?

অমর। সে থাকলেও তো একটা অবলম্বন থাকত—সান্ত্বনা থাকত।

নেতা। ঘোষাল তো বেশ ধনী লোক। সায়েব মানুষ। ভদ্রলোকের ছোট ছেলে অসবর্ণ বিয়ে করেছে। ছেলেটিকেও আমি জানতাম—সঞ্জীবদের সময়—ছাত্রমহলে খুব প্রগতিবাদী বলে খ্যাতি ছিল। সঞ্জীবের স্ত্রীকেও বোধ হয় এক আধবার দেখেছি। সেও তো আলট্রা মডার্ণ মেয়ে। না—।

অমর। আজ্ঞে?

নেতা। এমন ক্ষেত্রে ভদ্রলোক মেয়ের আবার বিয়ে দিলেন না?

অমর। তিনি তো আর বেঁচে নেই!

নেতা। এম-এন-ঘোষাল মারা গেছেন?

অমর। যে রাত্রিতে সঞ্জীবদা' বর্মিংয়ের মধ্যে হারিয়ে গেলেন—সেই রাত্রিতেই ওঁর শ্বশুরও মাথার শিরা ছিঁড়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তারপর মাস তিনেকের মধ্যেই তিনি মারা যান। বাপের মৃত্যুর পর সঞ্জীবদা'র স্ত্রী নবগ্রামে ফিরে এসেছেন। ওঁর বাবা এককালে সায়েব ছিলেন—কিন্তু শেষের দিকে পাল্টে গিয়েছিলেন। বেঁচে থাকলেও মেয়েকে আর বিয়ের কথা বলতেন না। সুমিতা-বউদিও ঠিক সে ধরণের মেয়ে নন। আপনি বোধ হয় জানেন না, সঞ্জীবদাকে তিনি ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন—অনেক বড়লোকের ছেলে—বিলেত ফেরৎ ছেলে সুমিতা বউদিকে বিয়ে করতে চেয়েছিল—কিন্তু সকলকে প্রত্যাখ্যান করে তিনি সঞ্জীবদাকে বিয়ে করেছিলেন। তিনি এখন প্রায় তপস্বিনী। সব ছেড়েছেন। ভোগ বিলাস—সব। তিনিই পাঠিয়েছেন আমাকে আপনার কাছে।

নেতা। Truth is stranger than fiction! দেখ গোড়াতে কথাটা তোমাকে বলি নি। সঞ্জীব শুধু বিয়ে করার জন্যেই লজ্জিত হয়ে আমার সঙ্গে আর দেখা করে নি—তা নয়—ওই বাড়ীতে বিয়ে করার জন্যে বেশী লজ্জিত হয়েছিল। অন্য ঘরে সাধারণ মেয়েকে বিয়ে করলে—সে অন্তত দেখা-না করার মত লজ্জা পেত' না। সঞ্জীব যখন এ্যাডভোকেট ঘোষালের বাড়ী যাতায়াত করত—তখন আমি বারবার বারণ করেছি। তখন সে ব'লত—আমাদের স্বগ্রামবাসী তাই যাই।

অমর। আজ্ঞে হ্যাঁ, ওঁরা আমাদের গ্রামের লোক। বাড়ী রয়েছে। আজকাল ঘোষাল মশায়ের ছেলেরা গ্রামের বাড়ীতেই বাস করছেন। কলকাতার বাড়ী ওঁদের বিক্রী হয়ে গেছে। ব্যবসা করতে গিয়ে সবই নষ্ট করেছেন প্রায়। গ্রামের বাড়ী সম্পত্তি ঘোষাল মশায় দিয়ে গিয়েছিলেন মেয়েকে—সুমিতা বউদিকেই। বউদি সে সব ভাইদের ছেড়ে দিয়েছেন। শুধু যে নগদ টাকাটা দিয়ে গিয়েছিলেন—সেইটে তিনি এই সেবায়তনে দিয়েছেন। সুমিতা বউদি অদ্ভুত মেয়ে।

নেতা। সেই কথাই বলছি—Truth is stranger than fiction; অথচ সে সময়—অর্থাৎ সঞ্জীব যখন বিয়ের আগে ওখানে যেত—তখন নানা রকম কথা শুনেছি। সেই কারণেই সঞ্জীবকে বারণ করেছিলাম। এম-এন ঘোষালের বাড়ীর আবহাওয়ায় যে মেয়ে মানুষ হয়েছে—সে স্বামীর জন্যে সন্ন্যাসিনী সাজতে পারে এ আমার বিশ্বাসের বাইরে।

অমর। আপনি চলুন স্বচক্ষে দেখে আসবেন।

নেতা। যাব। এর পর না গিয়ে পারি না। যাব, নিশ্চয় যাব। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন) নেতা হয়েছি দেশের—এ দুঃখ সইতে হবে—এ সব দেখতে হবে বই কি! এই সেদিন শচীন—শচীন মিত্তির—আমার পরম প্রিয় ছিল সে—হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা থামাতে গিয়ে জীবন দিলে—তার স্ত্রী সন্ন্যাসিনী সাজলে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। শচীনের শোকসভায় বক্তৃতা ক'রে এলাম। যাব, সঞ্জীবের স্মৃতি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা সভাতেও বক্তৃতা করে আসব। তার স্ত্রীকে দেখে আসব। কবে? তারিখ কবে?

অমর। চব্বিশে ডিসেম্বর। ওই তারিখেই তো—

নেতা। যাব, আমি যাব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

নবগ্রামে সঞ্জীবের বাড়ীতে শয়ন কক্ষ। ঘরখানির দেওয়ালে সঞ্জীবের একখানি বড় ছবি টাঙানো। একপাশে একখানি তক্তাপোষে সামান্য অথচ পরিচ্ছন্ন একটি বিছানা। একপাশে একটি দেরাজ। দেরাজের উপরে একটি চরখা। এ ছাড়া কিছু বই ও সামান্য কিছু আসবাব। সুমিতা বসিয়া মালা গাঁথিতেছে। মালাটি প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। তাহার বেশবাসে বৈরাগ্যের চিহ্ন পরিস্ফুট। সাদা খদ্দরের শাড়ী—সাদা ব্লাউস।

সুমিতা। (আবৃত্তি করিতে করিতে মালা খানির সুতায় গ্রন্থি দিয়া মালা সম্পূর্ণ করিল)

সে যেন ওই ছবিখানির সঙ্গেই কথা বলিতেছিল

"নাই যদি বা এলে তুমি, এড়িয়ে যাবে তাই ব'লে ?
অন্তরেতে নাই কি তুমি সামনে আমার নাই ব'লে ?
মন যে আছে তোমায় মিশে—আমায় তবে ছাড়বে কিসে
প্রেম কি আমার হারায় দিশে অভিমানে যাই ব'লে ?"

ছবির গলায় মালাখানি পরাইয়া দিয়া প্রণাম করিল। তার-পর চরখা নামাইয়া চরখা কাটিতে বসিল। এই সময় বাহির হইতে বৃদ্ধ পরমেশ্বর ডাকিলেন।

নেপথ্যে পরমেশ্বর। কালী কালী ব'লে নাত-বউ রয়েছিস নাকি ভাই ?

সুমিতা। (খুসী হইয়া সাড়া দিল) পরম দাদু! আসুন আসুন।

পরমেশ্বরের প্রবেশ

পরম। কালী বলে এলাম দিদি। হচ্ছে কি? চরখা! কালী কালী বল মন। কালী কালী বল। বেড়ে কারখানা—দিলাম তুলো—হলেন সুতো। বলিহারি বলিহারি! চরখার পাকে পাকে—একদিকে বেরুলো সুতো—অন্যদিকে ইংরেজের লাগল ঘুরপাক! চরখা সামান্য নয়। কালী বলে কেটে যা চরখা, সুতোতে লাগুক পাক—মনের পাক ঘুরে যাক।

সুমিতা। (আসন দিয়া) বসুন!

পরম। জয় কালী! কিন্তু কালী সুতো পাকাচ্ছিস পাকা—কিন্তু সেই পাকে আমাকে জড়িয়ে বিপাকে ফেলছিস কেন দিদি ?

সুমিতা। কেন দাদু? আপনাকে সেবায়তনের সভাপতি করেছি বলে বলছেন ?

পরম। হ্যাঁরে! সর্ব্বনাশ—এই বয়সে সভার পতি! কালী কালী বল মন—আমি কালী মায়ের মায়ে-খেদানো বুড়ো খোকা। ও আমার দ্বারা হবে না ভাই। তোরা আর কাউকে ডাক।

সুমিতা। না দাদু, সে হয় না।

পরম। বিপদে ফেললি ভাই। তাই বলছিলাম—বিপাক।

সুমিতা। আপনি ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই দাদু!

পরম। এই দেখ, এই দেখ, এ মেয়েটা কি বলে দেখ! কালী কালী—কালী—কালী! কালী আছেন—কালী আছেন। চোখ খুলে দিনের আলোয় দাপাদাপি—লাফালাফি করে মানুষ এলিয়ে পড়ে, মারামারি কাটাকাটি করে আর পারে না, চোখ বুজে গা ঢেলে দেয়, চোখ বুজলে অন্ধকার—ঘুমোলে—আরও অন্ধকার। সেই আমার মা কালীর কোল। জুড়িয়ে যায়—মানুষ। বলে দেখতো। আর আমার কেউ নেই ? কি কাণ্ড? কালী কালী, কালী কালী!

সুমিতা। আপনি কালীকে চেনেন—কালী আপনার। আমি আপনাকে চিনেছি—আমার আপনিই আছেন। অহঙ্কারের মূল্য আদায় করতে গিয়ে আমার স্বামীকে হারালাম—

পরম। কালী বলে অহঙ্কার নয় সুমিতা ভাই—অভিমান।

সুমিতা। না আমার অহঙ্কার। আমি তাকে যে নিষ্ঠুর কথা বলেছিলাম—তা মনে পড়লে আজও নিজেকে আমি মার্জ্জনা করতে পারি নে।

পরম। কালী কালী বলে—ও কথাটা তুই ভুলে যা।

সুমিতা। ভুলব বললেই তো ভোলা যায় না দাদু, ভুলিয়ে দেবার লোক চাই। সে মানুষ আপনি। সে দিন রাত্রে তিনি চলে গেলেন টলতে টলতেও ছুটে চলে গেলেন। সাইরেন বাজল; আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম; ওঘর থেকে বাবা উঠে এসে দেখে শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। নিষ্ঠুর আঘাত তাঁর সইল না। মাথার শিরা ছিঁড়ে গেল। অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তখনও বুঝতে পারিনি। তিন মাস পর বাবা গেলেন। তখন বুঝলাম পৃথিবীতে আমি একা। কেউ নেই আমার। বুঝতে পারলাম—অহঙ্কারের বশে সে দিন যাকে নিষ্ঠুর আঘাত দিয়ে বের করে দিয়েছি—সে আমার কতখানি জুড়ে ছিল। পৃথিবী তেতো হয়ে গেল। দাদারা চাইলেন আমি আবার বিয়ে করি। সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে এলাম এখানে।

পরম। তাই তো তোকে এত ভালবাসি কালী বলে।

সুমিতা। সেই তো বলছি দাদু। সেদিন তুমি না ভালবেসে আমার পাশে দাঁড়ালে—এখান থেকেও আমাকে পালাতে হ'ত। গাঁয়ের লোকের তো দোষ ছিল না।

তাদের প্রাণের দুলালকে আমি নিষ্ঠুর অপঘাত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছি। বের করে দিয়েছি বাড়ী থেকে বোমার মুখে। কি ক'রে আমাকে তারা গ্রহণ করবে—কথা বলবে? আমার মুখ দেখবে! বিমলদা জ্ঞাতি ভাই, সে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল—অমর ঠাকুরপো বললে—এখানে তুমি কেন এলে? গাঁয়ের লোক কেউ ফিরে তাকালে না। দাদু তোমাকে আজ খুলে বলি—সেদিন ভেবেছিলাম—আমি মরব। এমন সময় তুমি এলে। মাথায় হাত দিয়ে বললে—ভয় কি সুমিতা! আমি আছি!

পরম। (প্রায় চমকিয়া উঠিলেন) তাই বলেছি? কালী কালী! পরম তাই বলেছে? না-না-না—তা যদি বলে থাকে পরম, তবে তার মতিচ্ছন্ন হয়েছে! পরমের পাখা উঠেছে—আগুনে পুড়ে মরবে। পরমের নাক বেঁকেছে—পরম মরে নরকে যাবে!

সুমিতা। না দাদু, ভুল একটু বলেছি আমি। আমি আছি বলেন নি আপনি—বলেছিলেন—মা কালী আছেন। মা কালী আপনার মা—তার ভরসা আপনি করেন—আমি করেছিলাম আপনার ভরসা।

পরম। বাঁচালি ভাই, বাঁচালি।

সুমিতা। ভুল বললেন দাদু। আপনি ভুল বললেন? আমি বাঁচালাম?

পরম। জয় কালী বলে ঠিক বলেছিস ভাই—পরম ভুল বলেছে—মা কালী বাঁচালেন। কিন্তু চুপি চুপি একটা কথা বলি। জানিস তো—মা আমার ক্ষ্যাপা বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে বাপের বাড়ী যাবার জন্যে কালী মূর্ত্তি ধ'রে ছিলেন—শিবকে শব ক'রে বুকে চেপেছিলেন। আবার বাপের বাড়ী গিয়ে—ক্ষ্যাপার নিন্দে শুনে অভিমানেই—দেহত্যাগ করেছিলেন। তাই তো আমি তোর মধ্যে তার মিল দেখতে পাই। তাই তো সেদিন ছোঁড়াদের বললাম—ওরে ছোঁড়ারা—অমরা—বেমলা—তোরা কাকে ফেরাচ্ছিস্? পায়ে ধর—পায়ে ধর। ফিরিয়ে আন। শিবাকে শব করে যে সে কালী—শবকে সেই আবার বাঁচিয়ে তুলে মৃত্যুঞ্জয় করে। কালী বলে তাই তো করেছিস ভাই তুই। সঞ্জীব যদি নেই তবে তার কাজ হচ্ছে কি করে? তার কর্ম্মগঙ্গা শতধারা হয়ে দেশটাকে ছেয়ে দিলে কি ক'রে? সে যদি মৃত্যুঞ্জয় না হয়ে থাকে—তবে যে নেই তার নাম দিনান্তে শতমুখে সহস্রবার হয় কেন? জয় কালী! তুই ভাই কালীর খেলা খেলছিস?

সুমিতা। আপনি না থাকলে—সে-খেলায় আমি জোর পাব না দাদু, সান্ত্বনা পাব না—সুখ পাব না। দিনের শেষে কাজের হিসেবের সময়—যখন হাজার ভুলের কথা মনে পড়ে তখন আপনি না থাকলে বলবে কে—

পরম। আমি নয় ভাই—সে আমার কালী!

সুমিতা। হ্যাঁ দাদু, আপনার কালী আমাকে তো কথা বলে না, বলে আপনাকে। আপনি বলেন আমাকে।

পরম। কালী বল এই ঠিক বলেছিস—পরম হল মা কালীর ঢেকো। কালী বলে ফিস্ ফিসিয়ে পরম সে কথা নিয়ে ঢাক বাজায়। জয় কালী ঠিক বলেছিস।

সুমিতা। তাই হ'ল দাদু। আপনার কালীর কথা আপনি জানেন—আমি বুঝি না—জানি না; মানি না বললেও রাগ করেন না। কিন্তু ভুল করা গ্লানিতে অশান্তি যখন হয়—তখন আপনি এসে যখন বলেন—কালী বলে কুচ্ পরোয়া নাই—ভুলের বোঝা দে ফেলে কালীর পায়ে। ভুলগুলো কাল বিল্‌কুল ঠিক ক'রে নে। তাতে দুঃখ পেলে কষ্ট পেলে ভয় করিস্ নে লজ্জা করিস্ নে। তখন অশান্তি সত্যিই দূরে যায়। মনে বল পাই। আবার দ্বিগুণ জোরে পথ চলি।

পরম। বলব না? তাই যে হয়। তুই গল্প শুনিস নি? মহাকালী সাধক ছোট গোপালের? এই তো কোতল ঘোষার রে! পাঁচ ভাই গোপালের ছোট ভাই নন্দ গোপাল মাকালী ছাড়া কিছু বুঝত না জানত না। রাজসভায় মায়ের প্রসাদী কারণের নেশায় বুঁদ হয়ে বসে ঢুলছিল। হঠাৎ রাজা জিজ্ঞাসা করলে—পণ্ডিত আজ তিথিটা কি বলতো? চতুর্দ্দশী কতক্ষণ? পণ্ডিত বললে চতুর্দ্দশী ছেড়ে গেছে মহারাজ—এখন ভর্ত্তি পূর্ণিমে। সকলে চমকে উঠল। বললে—পূর্ণিমে কি? কৃষ্ণপক্ষে পূর্ণিমে? অমাবস্তে বল? এমন ক'রে আর মদ খেয়ো না পণ্ডিত। পণ্ডিত চমকে উঠল। অমাবস্তে? না—পূর্ণিমে? পূর্ণিমে বলেছি? তা মা কালী জানেন। তাঁর ইচ্ছে। পূর্ণিমে যদি বলে থাকি তো তিনিই জানেন। হবে পূর্ণিমে। উঠবে পূর্ণিমের চাঁদ। নিশ্চয় উঠবে। কালী বলে। কালী কালী বলে—তাই নাকি উঠেছিল দিদি! মা নাকি

হাতে কঙ্কন তুলে ধরেছিলেন। লোকে দেখল অপরূপ পূর্ণিমার চাঁদ—এক চাঁদে একশ চাঁদের উদয়। তোরা মান্‌বি নে, আমিও পারব না দেখাতে। তবে আমি তো মানি—তাই বলি।

নরেন—সুমিতার ছোড়দার প্রবেশ

নরেনের পোষাকে পরিচ্ছদে অভাবের চিহ্ন পরিস্ফুট। মুখে চোখেও প্রচ্ছন্ন কষ্টের ছাপ

সে ডাকিতে ডাকিতেই প্রবেশ করিল।

নরেন। সুমি! সুমি! (ঘরে ঢুকিয়া পরমেশ্বরকে দেখিয়া)—আরে মিষ্টার ওল্ড-ফসিল কালীর ছেলে-শিবের পোলা-পরম ঠাকুর-ইউ আর হিয়ার?

সুমি। ছোড় দা-এ সব তুমি কি বলছ?

পরম। (কথাগুলি শুনিয়াই হাসিতে শুরু করিয়াছিলেন) ওয়াণ্ডারফুল—মারভেলাস্‌। কালী কালী কালী—একেবারে ফাষ্টো কেলাস। সুমিতা ভাই রাগ করিস নে। নরেন ভায়া সাক্ষাৎ রসরাজ হয়ে উঠেছে! কি—কি? ওল্ড ফসিল কালীর ছেলে শিবের পোলা। বলিহারি বলিহারি!

নরেন। আপনি এখন থস্থন তো পরমঠাকুর! সুমির সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে কটা।

সুমি। না। তোমার সঙ্গে আমার কোন কথা নেই ছোড়দা। তুমি যার জন্যে এসেছ সে আমি জানি। তোমার লজ্জা করে না ছোড়দা? তুমি আমার মার পেটের বড় ভাই। রণেনের কাছে টাকা খেয়ে—আমার কাছে এসে বিধবা বিবাহই সব চেয়ে প্রগতিশীলতা প্রমাণ করতে বসতে তোমার এতটুকু লজ্জা করে না ছোড়-দা? ছি! ছি! তোমাকে ছি!

পরম। কালী কালী বল মন। কালী কালী, কালী কালী। কালী বলে আমি এখন আসি ভাই সুমিতা!

সুমি। আসুন দাদু, এ সব কথা আপনার শুনে কাজ নেই। আমার উপায় নেই—আমাকে শুনতে হয়!

নরেন। আমি রণেনের কথা বলতে আসি নি। আমার কিছু টাকা চাই। তারই জন্যে এসেছি আমি।

সুমি। টাকা আমার নেই।

নরেন। টাকা আমার চাইই। বাবা তোকে আমাদের সঙ্গে সমান ভাগ দিয়ে গেছে that old Tyrant autocrat, দেড় লাখ টাকার পঞ্চাশহাজার; আইন বল্‌ ধর্ম্ম বল্‌—কোন কিছু অনুসারেই সে তোর প্রাপ্য নয়। পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে তুই ছিনি মিনি খেলছিস—সেবায়তন—করেছিস; যত সব হ্যাগাবণ্ড নিয়ে কাণ্ড-কারখানা! আর ওই টাকার অর্দ্ধেকের আমি অধিকারী—আমি টাকার অভাবে কষ্ট পাব, এ হতে পারে না।

সুমি। তা পারবে কেন? তুমি তোমার অংশের টাকা উড়িয়ে দিলে—ভুল ব্যবসা করাতে, আমোদ ক'রে, বউ নিয়ে ইউরোপ গিয়ে হৈ—হৈ ক'রে। তা হ'তে পেরেছে। কলকাতার বাড়ী জমি সব বিকিয়ে গেল তোমাদের দুই ভাইয়ের বুদ্ধির দোষে। তা হ'তে পেরেছে। আমি সেবাধর্ম্মে বাবার দেওয়া টাকা খরচ করছি—তা হতে পারবে না। চমৎকার যুক্তি তোমার। শোন ছোড়-দা—এ মূর্ত্তি ধরলে—এ গ্রামের বাড়ী—জমি যা বাবা আমাকে দিয়ে গিয়েছেন—যা ভাই বলে আমি তোমাকে থাকতে দিয়েছি ছেড়ে দিয়েছি—তা—সব কেড়ে নেব।

নরেন। No, No, No, আড়াই শো টাকা আজ আমার চাই, আই মাষ্ট হ্যাভ ইট। আমি তোকে শোধ দেব। আমি বলছি—শোধ দেব।

সুমি। আমি দেব না।

নরেন। দিতে হবে। (সুমিতার হাত চাপিয়া ধরিল) আমি শুধু হাতে ফিরে যাব না।

সুমি। ছোড় দা—হাত ছাড়।

নরেন। টাকা দে আগে।

সুমি। ছোড় দা! উঃ—উঃ—ছোড় দা!

নরেন। আমাদের টাকায় তুই—সেবায়তনের নামে—ওই ছোঁড়াগুলোকে নিয়ে মাতামাতি করবি—কেলেঙ্কারি করবি—আর আমি—

পরমানন্দ পুনরায় প্রবেশ করিল

পরম। কালী বলে হাত ছেড়ে দাও হে ছোকরা! বলি শুনছ?

গলার পিছন দিকে জামা চাপিয়া ধরিল

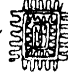
নরেন। গেট আউট—ইউ—ওল্ড রাস্কেল—

পরম সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া নরেনের মাথার লম্বা চুল চাপিয়া ধরিল। ডান হাতের লাঠি উঠাইল।

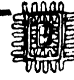
পরম। কালী বলে আমাকে আর দক্ষযজ্ঞ নাশ করাসনে নরেন। এ লাঠি ত্রিশূলের চেয়ে সাংঘাতিক। ত্রিশূলে গলা থেকে মুণ্ডুটা কেটে গিয়েছিল—এতে ডিম ফাটা হয়ে যাবে। গাধার মুণ্ডুও আর বসানো যাবে না। ওরে এ বুড়ো হাড়ে এখনও তোর চেয়ে অনেক বেশী জোর আছেরে প্যাঁকাটি ছোঁড়া। আয়—আয়? কালী বলে আয়!

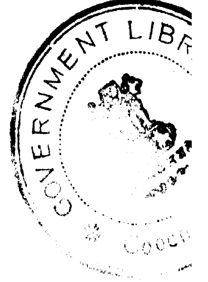
টানিয়া লইয়া গেল

ক্রমশঃ



মেয়েদের কথা





পরিচালিকা—কল্যাণবাদিনী

নারী ও সমাজ

শ্রীমতী অম্বুজবালা দেবী

প্রাচীন ভারতে আর্য্যরা রমণীদের সম্মান করতেন। তাঁদের মতে, রমণী ছিল পুরুষের সমকক্ষ। আদিম অধিবাসীদের প্রভাব যখন আর্য্য-সমাজের ওপর প্রভাবান্বিত হোলো, তখনই স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করার দিকেই সমাজপতিদের নজর পড়্‌লো। ফলে সুরু হোলো অল্প বয়সেই মেয়ের বিয়ে দেওয়া। মনু তাঁর সংহিতায় নির্দ্দেশ দিলেন—'ছেলেবেলায় মেয়েরা পিতার বশে, যৌবনে স্বামীর বশে, স্বামীর দেহ-ত্যাগের পর পুত্রের বশে থাক্‌বে—কিন্তু কখনও স্বাধীন ভাবে অবস্থান করবে না। স্বামীর অনুমতি ভিন্ন ব্রত ও উপবাস নেই। কেবল পতি-সেবার দ্বারাই স্ত্রীলোক স্বর্গে গমন করতে পারে।' মনুসংহিতাকে সমর্থন করলেন পরবর্ত্তী স্মার্ত্তকারেরা, ব্রাহ্মণেরাও এই মত প্রকাশ করলেন। বৈদিকযুগে মেয়েরা যে সম্মান পেয়েছিলেন ক্রমেই তা নীচে নেমে এলো, পৌরাণিকযুগেই অসম্মান ও অবজ্ঞার স্তরে নারীদের স্থান দেখা গেল, আর বৌদ্ধ যুগে মেয়েদের সম্মান ও অধিকার বহুলাংশে হীন করা হোলো। স্ত্রীলোকদের ওপর বৌদ্ধদের ব্যবহার অতি কঠোর। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে বৌদ্ধ ধর্ম্মে বলা হয়েছে—'নারী অপবিত্রতার আধার। জঘন্য মাংসাবৃত অস্থিপুঞ্জের মধ্যে প্রচ্ছন্ন সাক্ষাৎ পাপ, মিথ্যাবাদিতা, অহঙ্কার, ব্যাধি ও মৃত্যুর প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি—' জাতক-গ্রন্থ এই নীতিধর্ম্ম লোক সমাজে প্রচার করে ভারতবর্ষের যথেষ্ট ক্ষতি করেছে,—আর বৌদ্ধবাদ অনুসরণ করেই ভারতবর্ষ উত্তরোত্তর হীনবীর্য্য হয়ে শেষে বিদেশীর পদানত ছিল প্রায় হাজার বছর ধরে। প্রাচীন বৈদিক সভ্যতাকে শেষ করে দিয়ে গেছে পৌরাণিক যুগ আর বৌদ্ধ যুগ। বুদ্ধদেব অনিচ্ছাসত্ত্বেই স্ত্রীলোকদের ভিক্ষুণীশ্রেণীভুক্ত করেছিলেন, আর এই সব ভিক্ষুণীর নৈতিক চরিত্র নষ্ট হয়েছিল ভিক্ষুদের দ্বারা—এটাই সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয়। বৌদ্ধধর্ম্ম সমস্ত ভারতে প্রচারিত হওয়ামাত্র, বৌদ্ধ ধর্ম্মের অধোগতি হোলো। বৌদ্ধ ধর্ম্মকে পরাজিত করে যিনি নব্য হিন্দুধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করলেন সেই শঙ্করাচার্য্যও বৌদ্ধ প্রভাব থেকে মুক্ত হোতে পার্‌লেন না। তিনিও গার্হস্থ্য জীবন বিধ্বস্ত করবার পক্ষে ছিলেন। বল্‌লেন—'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—' কলি যুগে সন্ন্যাস বর্জ্জনীয়, শাস্ত্রের এই নির্দ্দেশ লঙ্ঘন করে তিনি বিভিন্ন সন্ন্যাসী সম্প্রদায় সৃষ্টি করে গেলেন, মেয়েরাও গার্হস্থ্য জীবন অবলম্বন করে সুখী হোতে পার্‌লো না। তন্ত্রশাস্ত্রে নারীকে উচ্চ আসন দেওয়া হয়েছে। গুরুপ্রকরণে বলা হয়েছে স্ত্রীলোকের কাছে দীক্ষা নিলে অচিরে সিদ্ধি লাভ হয়, আর মায়ের কাছে নিলে বহু গুণ উচ্চ ফল লাভ হয়ে অধ্যাত্মক্ষেত্রে বিশিষ্টস্থান অধিকার করা যায়। পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় তন্ত্র সাধনা সুরু করে স্ত্রীলোককে শক্তির প্রতীকরূপে অর্চ্চনা আরম্ভ করলে। আমাদের দেশে ভৈরবী-সাধনা ও কুমারী-পুজা তন্ত্রোক্ত সাধনার অঙ্গ। বেদে ও তন্ত্রে নারীদেবতাকে অর্চ্চনা করা ও নারীকে সাধনার পুরোভাগে স্থান দেওয়ার নির্দ্দেশ দেখা যায়। অধম-মাতৃজা, অক্ষমালা ও শারঙ্গী ক্রমান্বয়ে ঋষি বশিষ্ঠ ও মন্দপালের সঙ্গে বিবাহসূত্রে মিলিত হয়ে পরম মান্যা হয়েছিলেন। তন্ত্রোক্ত শৈব বিবাহে জাতি কুলের প্রয়োজন হয় না। এ বিবাহে স্ত্রীরূপে যাঁকে গ্রহণ করা হয় তাঁর স্থান বৈদিক বিবাহের স্ত্রীর ন্যায়। শৈব বিবাহে বয়স ও জাতির বিচার দরকার হয় না। কেবল সপিণ্ডা না হয় এবং সভর্ত্তৃকা না হয়, তাঁকেই শিবের আজ্ঞা বলে শক্তিরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে—মহানির্ব্বাণতন্ত্রে এই কথাই বলা হয়েছে।

তন্ত্র ধর্ম্মের প্রচলন বর্ত্তমানে হ্রাস পাওয়ায় শৈব বিবাহ অপ্রচুর হয়ে পড়েছে। এক সময়ে এর বিশেষ প্রাচুর্য্য ছিল। এই মত অনুসারে হিন্দুর পক্ষে সর্ব্ব বর্ণের স্ত্রী, এমন কি অহিন্দু নারীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করার নির্দ্দেশ আছে। বৈষ্ণবদের কণ্ঠী বদলের বিবাহে বর্ণের বিচার নেই। প্রথম বাজীরাও পেশোয়া নিজামকন্যা মস্তানীকে বিবাহ করেন, আর তিনি তাঁর গর্ভজাতপুত্র ওসমান বাহাদুরের উপনয়ন সংস্কারের চেষ্টা করেছিলেন। কালাপাহাড় দুলারীকে বিবাহ করবার সময়ে মুসলমান হননি। জাতিগঠনে রক্ত-সংমিশ্রণ বিশেষ প্রয়োজনীয়। রক্তের মিশ্রণের পথ এখন অনেকটা ব্যাহত হয়েছে কিন্তু প্রাচীনকালে তা ছিল না। স্মৃতি পুরাণাদি পাঠে জানা যায় যে, অতীতকালে বিস্তর মিশ্রণ হয়ে গেছে, আর তখন মিশ্রণের পথ অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ছিল। মহা-ভারতের অনুশাসন পর্ব্বে আমরা পাই মাতৃ দোষে শূদ্রার পুত্র অব্রাহ্মণ বা শূদ্র হবে, কিন্তু অপর তিন বর্ণে জাত ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ হবে। ব্রাহ্মণীতে জাত ব্রাহ্মণের পুত্র যে ব্রাহ্মণ তাতে সন্দেহ নেই, ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাতে জাত পুত্রও সেইরূপ ব্রাহ্মণ। যে বল্লাল-রচিত কৌলিন্য-নাগপাশে বাঙ্গালীর সমাজ এখনও জড়জরত হয়ে রয়েছে, তার ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, তাও অবিমিশ্র নয়। ওঝধিনাথ নামে

জনৈক দক্ষিণী বৈদিক ব্রাহ্মণ তাঁর ক্ষত্রিয়াজাতীয়া পত্নী নিয়ে ত্রিবেণীতে গঙ্গাবাস করতেন। তাঁদের সন্তান সামন্ত সেন ব্রহ্ম-ক্ষত্র। ক্ষত্রিয় ও বৈদ্যেরা ব্রহ্ম-ক্ষত্রকে কুলীন জ্ঞান করতেন। সামন্ত সেন এক বৈদ্য সামন্তের মেয়েকে বিয়ে করে বৈদ্য জাতিতে মিলিত হয়ে যান। তাঁর পুত্র হেমন্ত সেনও বৈদ্য কন্যা বিবাহ করেন। হেমন্তের পুত্র বিজয় সেন গৌড়াধিপতি চন্দ্র সেনের কন্যা প্রভাবতীকে বিয়ে করেন। তাঁরই পুত্র রাজাধিরাজ বল্লাল সেন। এখনও অনেকে বল্লালকে ব্রহ্মক্ষত্র বলেন। বাংলার নারীর দুর্দ্দশা সুরু হোলো যেদিন কুলীনরা বহু নারীকে বিবাহ করে কোন দায়িত্ব না নিয়ে পিত্রালয়ে ফেলে রাখ্‌তে আরম্ভ করলেন। ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলার মেয়েরাই সবচেয়ে নির্য্যাতন ভোগ করে আসছে। এখানেই পণপ্রথার দুঃশাসন সমাজের রক্ত শোষণ করে। অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ের ফলে বর্ত্তমানে যে সব মেয়ে চাকুরী করতে যায় বা পথে ঘাটে চলে ও স্কুল কলেজে পড়ে, তাদের ওপর পুরুষের পশুবৃত্তিসম্পন্ন মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকের প্রতি কুমন্তব্য করা হয় ও শ্লীলতাহানিরও চেষ্টা করতে দেখা যায়—এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। আমাদের দেশে যেমন অল্প বয়সে বিবাহ দেবার রীতি আছে, রাশিয়াতেও এই রকম নীতি আজও অনুসৃত হয়ে থাকে। অনেক রুশীয় মেয়ের সতেরো বছরের মধ্যেই বিয়ে হয়ে যায়। অনেক পুরুষ কুড়ির পরে অবিবাহিত থাকতে ঘৃণা বোধ করে। সেখানে বিপ্লব বা যন্ত্রযুগ এইভাবে বাল্য বিবাহের প্রেরণা রোধ বা ব্যাহত করতে পারেনি। পঁচিশ বছর বয়সের অবিবাহিত পুরুষ বা রমণী রুশীয় সমাজেও কানাকানি সৃষ্টি করে। গত যুদ্ধে রাশিয়ায় বহু মেয়ে বিধবা হয়েছে। ওদের দেশের মেয়েরা যেমন অশিক্ষিতাদের শিক্ষিতা করে তুল্‌বার চেষ্টা করে, আমাদের দেশে সে রকম কিছু নেই। যে পরিণত মননশীলতা ও নিষ্ঠায় নারী-জীবন গঠিত তাদের যদি স্বাভাবিক কর্ম্মধারায় বঞ্চিত না করা হয় তা হোলে মানুষের সভ্যতার ইতিহাস দশ গুণ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হোতে পারে; এদিক দিয়ে রাশিয়া অনেকখানি এগিয়ে গেছে। ওখানে আমাদের দেশের মত শুচিবাদের বিভীষিকার বালাই নেই, কারণ মেয়ে পুরুষ ছেলেবেলা থেকেই এমন ভাবে মানুষ হয় যে তাদের যৌনপ্রবৃত্তি সংযমের পথেই থাকে, চারিত্রিক উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ পায় না। ওরা অনেকেই বিধবা হয়েছে বটে, কিন্তু স্বামী বিয়োগের পর দ্বিতীয়বার বিবাহ করেনি এরূপ সংখ্যাই বেশী। বহু যুবতী বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করে আজও শুচিস্মিতা। জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশে গত যুদ্ধের সময়ে কয়েকটি সিগারেটের জন্যে যেমন বহু নারী দৈহিক শুচিতাকে ক্ষুণ্ণ করেছে, রাশিয়ায় সে রকম দেখা যায়নি। ইংলণ্ড এখনও সংরক্ষণশীল মনোবৃত্তিকে পরিত্যাগ করেনি, মার্কিন প্রভৃতি দেশে ব্যভিচার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। চৈনিক মন সংস্কারধর্ম্মী হোলেও এখনও সে প্রাচ্য ভাবধারাকে বর্জ্জন করেউঠ্‌তে পারেনি। বিশ্বের বিভিন্ন নারী সমাজের জীবনযাত্রা পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায়, আমাদের দেশের নারীদের মত অসহায়া পৃথিবীতে বিরল বললেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের দেশে নারীকে এখনও পূর্ণভাবে সম্মান বা অধিকার দেওয়া অনুসৃত হচ্ছে না, ফলে সমাজধর্ম্মপঙ্গু হয়ে পড়েছে। অবরোধ প্রথার উচ্ছেদ সাধন হয়েছে বটে, কিন্তু মাংস ক্রয়বিক্রয়রূপ পণ-প্রথা, তত্ত্ব ও সামাজিকতার বৈবাহিকসূত্রে গঠিত বাহুল্যতা কিছুমাত্র দূর হয়নি। সমাজের ওপর এই সব কুপ্রথা জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে আছে। অর্থনৈতিক সঙ্কটও বিপর্য্যয়ের ফলে বহু নারী স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে জীবনযাত্রার পথ অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখ্‌ছে। বহু সরকারী অফিস আছে যেখানে এখনও মেয়েদের কোন স্থানই নেই, আরও একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে স্বামী স্ত্রী উভয়েই চাকুরী করতে চলে গেলে ছোট ছোট মেয়েরা কার কাছে থাক্‌বে—এমন অনেক ছেলে বা মেয়ে আছে যারা একক, পিতামাতা উভয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে গেলে তার পক্ষে একা বাসায় থাকা অসম্ভব—তার অবস্থানের বিষয় চিন্তা করবার মত। অন্যান্য স্বাধীন দেশে নানা প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে পিতামাতা কর্ম্মক্ষেত্রে যাবার সময়ে ছেলেমেয়েদের রেখে যান, বাড়ী ফেরবার পথে নিয়ে আসেন, এখানে সেরূপ ব্যবস্থা নেই। এ বিষয়ে রাষ্ট্র চেতনার আবশ্যক। চাকুরীর ক্ষেত্রে কত মেয়েকে উপরওয়ালার মনস্তুষ্টির জন্যে দৈহিক শুচিতাকে পর্য্যন্ত নষ্ট করতে হয়, তার সংখ্যা ক'জন করে, তার প্রতীকারের জন্যেই বা ক'জন চিন্তা ক'রে! এমন বহু স্বামী আছে যাদের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়ে এবং বাধ্যতামূলক ইঙ্গিতে বহু নারীকে স্বামীর সুলভ অর্থোপার্জ্জন ও সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করবার জন্যে যন্ত্রী হয়ে থাকতে হয়। স্বেচ্ছায় নারী ব্যভিচারিণী হয়, এই মতবাদ অত্যন্ত ভ্রমাত্মক। স্ত্রী স্ত্রীও শালীনতার দিকে নারীর সজাগ দৃষ্টি আছে, কিন্তু ঘটনাচক্রে তার নৈতিক অধঃপতন হোলে বুঝ্‌তে হবে সেটা তার স্বেচ্ছাকৃত নয়—দায়ে ঠেকে। তন্ত্রশাস্ত্র বলে নারী কখন অশুচি হয় না, কেননা সে শক্তি স্বরূপিনী। কিন্তু ভারতবর্ষ যখন অধঃপতনের পথে চল্‌তে সুরু করলো তখন থেকেই নারীর ওপর যে লাঞ্ছনা সুরু হোলো আজও তা সমাপ্তির মধ্যে এলো না। মোটর বিহারীদের মধ্যে অনেকে বহু নারীকে কি অদ্ভুত ভাবেই না রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দিয়ে যাবার আশ্বাস দিয়ে প্রলুব্ধ করেন ও প্রবৃত্তি চরিতার্থ করেন—এ সম্বন্ধে ক'জনই বা সন্ধান রাখে? ক'জনই বা দেখেছে সিনেমা হল থেকে পথ হেঁটে বাড়ী ফেরা ভদ্রমহিলার পশ্চাদ্ অনুসরণ করে তার বাড়ী পর্য্যন্ত আস্‌তে যুবক, প্রৌঢ় এমন কি বৃদ্ধ লম্পটকে—মহিলাটীও বাসায় প্রবেশ করলেন, লম্পটও দরজার গোড়ায় একটু ঘোরাঘুরি করে উপরের বারান্দার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌তে ফেল্‌তে চলে গেল, এরূপ দৃষ্টান্ত কলিকাতা সহরে দিন দুপুরে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিধবাবিবাহ প্রচলন বর্ত্তমানে দেখা যায় না, কারণ বিধবাকে গ্রহণ করতে স্ত্রী বিয়োগ হবার পরও কোন বিপত্নীক পুরুষ সম্মত হয় না। প্রেম বা ভালোবাসা শব্দটা প্রয়োগ করা হয় দৈহিক সম্ভোগ লালসায়, আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির পর পরিণাম ভয়াবহ হয়ে ওঠে। তখন প্রেমিকার দুর্গতির সীমা থাকে না। এদেশের লোক শুধু বর্ণচোরা নয়, বর্ণপাগলও বটে—তাই সুন্দরীদের ওপর থাকে অসংখ্য ক্ষুধিত লম্পটের লোলুপ দৃষ্টি, আর কুৎসিত রমনীর ওপর থাকে তার স্বামী, স্বজন ও পরিবারবর্গের বিষ-

দৃষ্টি। যেখানে শিক্ষিতা কুৎসিতা মেয়ে স্বামীর সংসারে বা স্বামীর কাছে সমাদর পেয়েছে সেখানে বুঝতে হবে স্বার্থের জন্যে—কেননা শিক্ষিতার অর্থোপার্জ্জনের অংশে স্বামীর মেদস্ফীতি হোতে পারবে, আর সংসার চলবে ভালো। মেয়েরাই মেয়েদের শত্রু, বিশেষতঃ আমাদের দেশে। এই ভাবটা না হয়ে যদি মহিলা সমাজের পারস্পরিক সঙ্ঘবদ্ধতা ও সম্প্রীতি হয়, তা হোলে এদেশের মেয়েদের অবস্থা খুব উন্নত ও ভাবী-বংশধররাও মানুষের মত মানুষ হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—এ বিষয়ে রাষ্ট্রচালকদের অবহিত হওয়া আবশ্যক।

—

বয়ন শিল্প

শ্রীমতী কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় বি-এ

ঘোড়ার মুখ প্যাটার্ন

(দু' রঙা উল দরকার)

(১৯ ঘরে)

১। সোজা—১ সাদা, ১ কালো, ১৭ সাদা।
২। উল্টা—১৬ সাদা, ২ কালো, ১ সাদা।
৩। সোজা—১ সা, ৩ কা, ৮ সা, ২ কা, ৫ সা।
৪। উল্টা—৪ সা, ৩ কা, ৮ সা, ৩ কা, ১ সা।
৫। সোজা—১ সা, ৩ কা, ৭ সা, ৩ কা, ১ সা, ২ কা, ২ সা।
৬। উল্টা—২ সা, ৩ কা, ১ সা, ১ কা, ১ সা, ৩ কা, ৪ সা, ৩ কা, ১ সা।
৭। সোজা—১ সা, ৪ কা, ২ সা, ৫ কা, ১ সা, ৩ কা, ৩ সা।
৮। উল্টা—৩ সা, ২ কা, ১ সা, ১ কা, ১ সা, ৫ কা, ১ সা, ৪ কা, ১ সা।
৯। সোজা—১ সা, ৫ কা, ১ সা, ৩ কা, ১ সা, ৩ কা, ১ সা, ১ কা, ৩ সা।
১০। উল্টা—৪ সা, ৫ কা, ১ সা, ১ কা, ১ সা, ৬ কা, ১ সা।
১১। সোজা—১ সা, ৭ কা, ১ সা, ৫ কা, ৫ সা।
১২। উল্টা—৫ সা, ৬ কা, ১ সা, ৬ কা, ১ সা।
১৩। সোজা—১ সা, ৫ কা, ১ সা, ২ কা, ২ সা, ২ কা, ৬ সা।
১৪। উল্টা—৬ সা, ৫ কা, ১ সা, ১ কা, ১ সা, ৪ কা, ১ সা।
১৫। সোজা—১ সা, ৪ কা, ১ সা, ২ কা, ১ সা, ৩ কা, ৭ সা।
১৬। উল্টা—৮ সা, ১ কা, ১ সা, ৩ কা, ১ সা, ৩ কা, ২ সা।
১৭। সোজা—৫ সা, ২ কা, ১ সা, ২ কা, ৯ সা।
১৮। উল্টা—৮ সা, ২ কা, ২ সা, ২ কা, ৫ সা।
১৯। সোজা—৬ সা, ১ কা, ৩ সা, ১ কা, ৮ সা।

উট্ প্যাটার্ন

(দু' রঙা উল দরকার)

(৪২ ঘরে)

১। সোজা—৫ ঘর সাদা, ৮ কালো, ১৬ সাদা, ৮ কালো, ৫ সাদা।
২। উল্টা—৫ সা, ১ কা, ১ সা, ১ কা, ১ সা, ১ কা, ১ সা, ১ কা, ১৮ সা, ১ কা, ১ সা, ১ কা, ১ সা, ১ কা, ১ সা, ১ কা, ৫ সা।
৩। সোজা—৫ সা, ১ কা, ১ সা, ১ কা, ১ সা, ১ কা, ১ সা, ১ কা, ১০ সা, ১ কা, ১ সা, ১ কা, ১ সা, ১ কা, ১ সা, ১ কা, ৫ সা।
৪। ২য় লাইনের মত।
৫। ৩য় লাইনের মত।
৬। উল্টা—৫ সা, ৯ কা, ১২ সা, ৯ কা, ৫ সা।
৭। সোজা—৬ষ্ঠ লাইনের মত তবে কিন্তু উল বদলাবেন।
৮। উল্টা—৫ সা, ১০ কা, ১২ সা, ১০ কা, ৫ সা।
৯। সোজা—তবে উল বদলানর নিয়ম ৮ম লাইনের মত।
১০। উল্টা—৪ সা, ৮ কা, ১ সা, ২ কা, ১২ সা, ২ কা, ১ সা, ৮ কা, ৪ সা।
১১। সোজা—৫ সা, ৭ কা, ১ সা, ৩ কা, ১০ সা, ৩ কা, ১ সা, ৭ কা, ৫ সা।
১২। উল্টা—৬ সা, ৫ কা, ২ সা, ৪ কা, ৮ সা, ৪ কা, ২ সা, ৫ কা, ৬ সা।
১৩। সোজা—৭ সা, ৩ কা, ৩ সা, ১ কা, ১ সা, ২ কা, ৮ সা, ২ কা, ১ সা, ১ কা, ৩ সা, ৩ কা, ৭ সা।
১৪। উল্টা—১৩ সা, ২ কা, ১২ সা, ২ কা, ১৩ সা।

এই প্যাটার্ন দুটি সোয়েটারের বর্ডারে দিলে চমৎকার দেখাবে।



পাট ও পীঠ

চন্দন গুপ্ত

অপ্রাপ্তবয়স্ক চিত্রাভিনেতাদের দ্বারা চিত্রে ধূমপান দেখান আইন করিয়া নিষিদ্ধ করার চেষ্টা চলিতেছে। সম্প্রতি কোন একটি হিন্দী চিত্র হইতে অপ্রাপ্তবয়স্ক চিত্রাভিনেতার ধূমপানের দৃশ্যটি বাদ দেওয়া হইয়াছে। কুঅভ্যাস বর্জ্জন করিয়া সুরুচিসম্পন্ন চিত্র নির্ম্মাণ করিতে পারিলে সত্যই দেশ, জাতি ও সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। সেন্সর বোর্ড এদিকে দৃষ্টিপাত করায় আমরা অভিনন্দিত করিতেছি।

*　　*　　*



শরৎচন্দ্রের অমর সৃষ্টি ষোড়শীর একটি আবেগময় দৃশ্যে জীবানন্দ ও ষোড়শীরূপে ছবি বিশ্বাস ও দীপ্তি রায়

কিছুদিন পূর্ব্বে দিল্লীর তের হাজার মহিলার স্বাক্ষরিত এক স্মারকলিপি প্রধান-মন্ত্রীর নিকট পাঠান হয়। উক্ত লিপিতে চলচ্চিত্রে দুর্নীতি রোধ করার জন্য প্রধান মন্ত্রীকে অনুরোধ করা হইয়াছিল। সম্প্রতি দিল্লীর লোকসভায় শ্রী এস, এন, দাস এতৎসম্পর্কে এক প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তথ্য ও বেতার বিভাগের মন্ত্রী উত্তরদান প্রসঙ্গে বলেন—মহিলাদের আবেদন যুক্তিমূলক সন্দেহ নাই। কিন্তু সংবিধানের ধারা অনুযায়ী গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সহসা কিছু করা সম্ভব নয়। আবেদনকারিণীদের বক্তব্য অনুসারে কার্য্য করিতে গেলে আরো অধিক ক্ষমতার প্রয়োজন। লোকসভার সভ্যেরা সমাজের কল্যাণের জন্য সে ক্ষমতা গভর্ণমেণ্টকে অর্পণ করিতে পারেন।

*　　*　　*

বঙ্গের চিত্র-প্রযোজক, পরিবেশক ও প্রদর্শকসংস্থা একযোগে স্থির করিয়াছেন যে, অতঃপর তাঁহারা আর কোন ভারতীয় ছবি পাকিস্থানে পাঠাইবেন না এবং পাকিস্থান হইতে আগত কোন চিত্রের প্রদর্শনও করিবেন না। পাকিস্থান সরকারের যুক্তিহীন বাণিজ্যনীতির ফলেই বঙ্গের চিত্র-ব্যবসায়ীরা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

*　　*　　*

গত জানুয়ারী হইতে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসে যে সকল ছবি মুক্তিলাভ করিয়াছে তাহার মধ্যে বাঙ্গালা ছবির সংখ্যাই অধিক। ইতিপূর্ব্বে ১৯৪৮ সালে প্রথম ছয় মাসে বাংলা মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির সংখ্যা ছিল—১৬, ১৯৪৯ সালে ছিল—১৯, ১৯৫০ সালে ছিল—২৩, ১৯৫১ সালে ছিল—২৫, ১৯৫২ সালে ছিল—২৬, ১৯৫৩ সালে ছিল—২৪ এবং বর্ত্তমান বর্ষে হইয়াছে—২৭। আশার কথা এই যে, অধিকাংশ ছবিই এ বছর দর্শকদের চিত্তজয়ে সমর্থ হইয়াছে। বর্ত্তমানে কলিকাতার ১২টী ষ্টুডিওতে ৫৩খানি ছবি তোলার কাজ চলিয়াছে।

*　　*　　*

খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী শ্রীবিভু বর্দ্ধন সম্প্রতি বোম্বাই-এ পরলোকগমন করিয়াছেন। শ্রীবর্দ্ধন নৃত্যশিল্পে বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি বোম্বাই-এ নৃত্যশিল্পের স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বোম্বাই-এ চিত্রশিল্পী-সমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন।

*　　*　　*

গত ২৫শে আগষ্ট বুধবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত



দ্রুত-ফেনিল সানলাইট
না আছড়ে কাচলেও সাদা ও ঝকঝকে ক'রে দেয়



"শিক্ষয়িত্রী বলেন আমি বেশ ফিটফাট থাকি। তার কারণ মা সানলাইট সাবান দিয়ে আমার ফ্রক ধপধপে সাদা ক'রে কেচে দেন। সানলাইটের স্তূপাকার সরের মত ফেনা শীঘ্র ও সহজেই কাপড়-চোপড় থেকে ময়লা বার করে দেয়—আছড়াতেও হয় না।"



"আমার ক্লাসের মধ্যে আমাকেই সব চেয়ে চমৎকার দেখায়। সানলাইট দিয়ে কাচার জন্য আমার রঙিন ফ্রক কেমন ঝকঝকে থাকে দেখুন। মা বলেন সানলাইট দিয়ে কাচলে কাপড়-চোপড় নষ্ট হয় না আর তা টেঁকেও বেশী দিন। এতে খুব খুসী হবার কথা—নয় কি?"



'শ্যামলী' নাটকের দ্বিশততম অভিনয়ের স্মারক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক



স্টার থিয়েটারে অভিনীত শ্যামলী নাটকের দ্বিশততম অভিনয় রজনীর স্মারক উৎসবের সভাপতি পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ভাষণ দিতেছেন। পার্শ্বে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রী ধী রে ন্দ্র না রা য় ণ রায়, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ হে মে ন্দ্র নাথ দা শ গু প্ত, শ্রীযোগীন্দ্রনাথ গুপ্ত, প্র সি দ্ধ নাট্যকার শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি এবং পশ্চাতে অভিনেত্রী শ্রীমতী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অভিনেতা শ্রীজহর গাঙ্গুলী প্রভৃতি দৃশ্যমান

শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। বহু খ্যাতনামা কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, নাট্যকার ও নাট্যামোদীগণের বিপুল সমাবেশে অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হয়। এতদুপলক্ষে ষ্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সলিলকুমার মিত্র পরিচালক, নাট্যকার, গীতিকার, মঞ্চ-শিল্প-নির্দ্দেশক, সুরকার ও মঞ্চের শিল্পীদের এবং সমস্ত নেপথ্য কর্ম্মিদের পুরস্কৃত করেন। এই সকল উপহার ডাঃ রায় স্বহস্তে বিতরণ করেন। 'শ্যামলী'র প্রযোজক শ্রীসলিলকুমার মিত্রের পক্ষে পরিচালক শ্রীযামিনী মিত্র ডাঃ রায়ের পরিকল্পিত পলিও-ক্লিনিকের সাহায্যার্থে ১০০১৲ ডাঃ রায়ের হস্তে ও ৫০১৲ প্লাবন-পীড়িত দুস্থগণের সাহায্যার্থে 'পত্রিকা সাহায্য ভাণ্ডারে' শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষের হস্তে অর্পণ করেন। অবিচ্ছিন্ন দুইশত রজনীব্যাপী অভিনয়ের গৌরব অর্জ্জন করায় ডাঃ রায় 'শ্যামলী'র অভিনেতৃবর্গকে অভিনন্দন জানাইয়া বলেন—"এই শিল্পীরা বিভিন্ন ভূমিকার অন্তর্নিহিত মর্ম্মবাণী অনুভব করিতে পারিয়াছেন। প্রত্যেকটি চরিত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন। এই কারণেই তাঁহাদের অভিনয় দর্শকজনের কাছে চিত্তজয়ী হইয়াছে। সমাজের সকল মানুষকেও ঠিক এই ভাবেই আত্মীয়-পরিজন ও প্রতিবেশীদের দুঃখ-বেদনাকে ভালভাবে বুঝিতে হইবে। তবেই দেশ, জাতি ও সমাজের কল্যাণ সম্ভব। নাট্যাভিনয়ের দ্বারা দেশের অজ্ঞ নিরক্ষর মানুষের চিত্ত সহজেই আকর্ষণ করা যায়। দেশ গঠনে তাহাদের উদ্বুদ্ধ করা যায়। দেশের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য কেমন সুন্দরভাবে প্রকাশ করা যায় তাহা বাঙ্গালার অভিনেতা সমাজের উচিত অন্যান্য দেশকে নাট্যাভিনয়ের দ্বারা দেখান। প্রধান অতিথি শ্রীযুক্ত



জেমিনীর 'বহুৎদিন হুয়ে' চিত্রে রতনকুমার

তুষারকান্তি ঘোষ তাঁহার ভাষণে বলেন—অবিচ্ছিন্ন ভাবে 'শ্যামলী'র দুইশত রজনীর অভিনয় এক অভিনব ব্যাপার এবং ইহা দ্বারা প্রযোজক, পরিচালক, নাট্যকার ও অভিনেতৃবর্গের কৃতিত্বের কথাই বিশেষ ভাবে কীর্ত্তিত হইতেছে।" অনুষ্ঠানে রাজারাও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বক্তৃতা করেন।

* * *

রাজশ্রী পিক্‌চার্স-এর পরিবেশনায় জেমিনীর বহু প্রতীক্ষিত চিত্র 'বহুৎ দিন হুয়ে' সম্প্রতি কলিকাতা বিশিষ্টচিত্র-গৃহে মুক্তিলাভ করিয়াছে। জেমিনীর অন্যান্য ছবির ন্যায় আলোচ্য চিত্রটিও দর্শকদের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইয়াছে।



জেমিনীর—'বহুৎদিন হুয়ে' চিত্রে আগা

ছায়াচিত্রে সুরারোপ

অনিল বাক্‌চী

(সঙ্গীত পরিচালক)

যখন ছায়াছবির গান বা আবহ সঙ্গীত তার নাট্য-পরিস্থিতিকে নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনায় রূপায়িত ক'রে সেই পরিস্থিতিকে সক্রিয় সাহায্য করতে পারে তখনই হয় তার সুর সৃষ্টির সার্থকতা। যখন গীতিকার, সুরকার ও নাট্য পরিস্থিতির সম্পূর্ণ সমন্বয় হয় অর্থাৎ যখন সবকিছুই একই তন্ত্রীতে বেজে ওঠে—তখনই ছায়াছবির কল্পিতরূপ বাস্তবে পরিণত হয়—আর তার রূপ হয়ে ওঠে মর্ম্মস্পর্শী। যখন চিত্রনাট্যকার তার নাটকীয় পরিস্থিতির সম্যক উপলব্ধি বোধে গীতিকার ও সুরকারের সহায়তায় অপূর্ব্ব যোগাযোগ ঘটান তখনই সঙ্গীত হয়ে ওঠে সক্রিয় ও প্রাণবন্ত। নাটকের বিভিন্ন রূপরস পরিবেশনে ও বিভিন্নরূপ প্রকাশ করার প্রয়োজনে। আবহ সঙ্গীত ও কণ্ঠসঙ্গীতের প্রয়োজন হয় কিন্তু যখন সঙ্গীতকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ সঙ্গীত প্রধান নাটকের রূপ ও প্রকাশভঙ্গী হয়ে পড়ে অন্যরূপ—সেখানে নাটককে সঙ্গীতের আশ্রয় নিতে হয় বেশী পরিমাণে—তাই তার রূপ সৃষ্টির ধারাও হয়ে পড়ে অন্যরূপ।

বাংলা গানের বিশেষ একটী নিজস্ব স্বকীয়তা আছে; কারণ কাব্য প্রধান ভাষাকে বাঁচিয়ে তার কথার মাধুর্য্য, ভাবালুতা ও ছান্দিকগতি প্রভৃতিকে ব্যহত না ক'রে সুরসংযোজনা করা অর্থাৎ শুধু কথাও নয় ভাবও নয় কিম্বা সুরও নয়—কথা ও সুরের প্রকৃষ্ট মিলন ঘটানই হবে—সুরকারের প্রকৃত দায়িত্ব। তাই সুরকারকে সব সময়ই সজাগ থাকতে হবে—কারণ তাঁর সুর সৃষ্টির রস বোধের মাত্রার উপর নাটকের পরিস্থিতির প্রাণ ও গতি নির্ভর করে। যদিও যখনই নাটকীয় গানের প্রয়োজন হিসাবে সুর সৃষ্টি করতে হয় তখনই তার একটা সীমারেখা টেনে দেওয়া হয়, সঙ্গীতের পরিধিও হয়ে ওঠে সীমাবদ্ধ অর্থাৎ গান আনন্দে বা দুঃখে ফুটতে চায় এক নূতন সুষমায়, জাতিহীন, বর্ণহীন ও গোত্রহীন ভাবে বিশেষ কোন শ্রেণী বিভাগকে অস্বীকার করে—কিন্তু নাটকীয় পরিস্থিতি চায় সব কিছুরই সীমারেখা টেনে দিতে—তাই অনেক ক্ষেত্রে রংবাহারের দীপ্তি ঝিলিক দিয়েই মিলিয়ে যায়—অশোভনতা ও মাধুর্য্য-হীনতাকে এড়িয়ে যাবার জন্য সঙ্গীতকে সঙ্কুচিত হতে হয়—তাই ছায়াছবির বিশেষ পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে হলে পরিচালক মহাশয়ের এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত হবে না কি? উপরন্তু

চিত্রনাট্যকার, পরিচালক ও সঙ্গীত পরিচালকের সমন্বয় চেষ্টাই হবে ছায়াছবির পরিবেশ সৃষ্টির ও সুষ্ঠরস পরিবেশনের দায়িত্ব। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায়—তাই ছবির আকর্ষণও হয়ে পড়ে দুর্ব্বল।

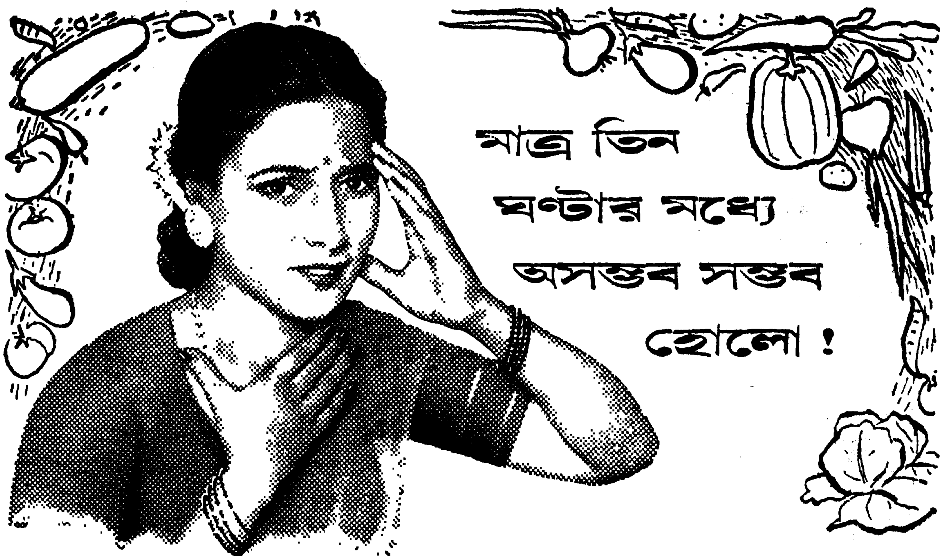
ভাষার যে রূপ দেওয়া সম্ভবপর হয়—তার হুবহু অনুকরণ সর্ব্বস্ব মনবৃত্তি নিয়ে মৌলিকত্বকে বর্জ্জন করে ভাবধারাকে নিয়ন্ত্রিত করার অপচেষ্টা চল্‌ছে দেখছি, হয়ত সাময়িক উত্তেজনা প্রসূত রস সৃষ্টির রূপ জনসাধারণকে চমক দিচ্ছে কিন্তু তা ক্ষণস্থায়ী বলেই মনে করি—ইতিহাসের পাতায় সব সময়ই ধারাবাহিকতার রূপকেই স্থান দিয়ে এসেছে—তাই এই সব অনুকরণ প্রবৃত্তি শুধু নিন্দনীয় নয় দণ্ডনীয়ও বটে—এই ভারতীয় সঙ্গীত বহু পুরাতন বৈদিক যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যেও তার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই চলেছে—আজও তার ধারা সেই মহান আদর্শে সঞ্জীবিত হয়ে আছে—এই সাধনার বস্তুকে এখনও এই আকস্মিক রস স্পর্শও করতে পারেনি—তাই উৎকর্ষ ও অনুশীলন চলেছে পুরামাত্রায়—তাই আমরাও এই ভারতীয় সঙ্গীতকে ভিত্তি করে নানাভাবে ও নানারূপে এই ছায়াছবির ব্যাপারে কাজে লাগাতে পারি কিনা এ বিষয়ে সঙ্গীত পরিচালক মহাশয়দের একটু গবেষণা করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে—কারণ তখনকার ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের—এই সঙ্গীতকে সাধন মার্গের প্রশস্ত উপায় হিসাবে ব্যবহার করা ছাড়া অন্যভাবে চিন্তা করা সম্ভবপর হয়নি। আজ আমাদের প্রয়োজন বোধে স্থান, কাল, পাত্র ও পরিস্থিতির বিভিন্ন স্পর্শে ও



নভেলটি ফিল্মস্ লিঃ-এর মুক্তি প্রতীক্ষিত চিত্র ষোড়শীর ভূমিকায় দীপ্তি রায়

রসে—আমাদের এই নিজস্ব সম্পদকে কাজে লাগাতে পারি কিনা—সেবিষয়ে চিন্তা করার সময় এসেছে—তার বাণিজ্যের পণ্য হিসাবে নয়—উপযুক্ত মর্য্যাদা দিয়ে অর্থাৎ রাগসঙ্গীতকে ভিত্তি করে যে গান গড়ে উঠবে তার গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি করে ছায়াছবির পরিস্থিতি তৈয়ারী

আজকাল দেখতে পাওয়া যায় যে, স্বল্পপ্রাণ বাংলা ভাষাকে ভিত্তি করে দীর্ঘস্বর হিন্দিগানের অনুকরণে সুর যোজনা করতে—কিন্তু সেটা সত্যই কি প্রগতি না দুর্গতি তা ভাববার বিষয়—কারণ যে ভাষার যে রকম রসসৃষ্টি হয় সেই ভাবেই তাকে চালিত করা উচিত নয় কি? দীর্ঘস্বর





বিকেল বেলাটা একটু আরামে কাটাবো ভাবছি এমন সময় আপিসের পিওন এক চিঠি নিয়ে এসে হাজির। এক অসম্ভব ব্যাপারকে সম্ভব ক'রতে হবে—মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যে। আমার স্বামী তাঁর আপিসের সাহেবকে আজ রাত্রে খাবার নিমন্ত্রন করেছেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে মনের মতো ক'রে খাওয়ানো মুস্কিলের কথা অথচ ভাল কিছু খাওয়াতেই হবে—স্বামীর মান বাঁচাতে। বড় ভাবনায় পড়লাম। ঠিক এমন সময় ডাক পিওন দিয়ে গেল একটা বড় মোড়ক। তাতে ছিল আমারই অর্ডার দেওয়া চকচকে নূতন একটি ডালডা রন্ধন পুস্তক।



তাড়াতাড়ি কিছু ভালো খাবার রান্না করতেই হবে। আর যা খুঁজছিলাম তা পেয়ে গেলাম বইখানাতে। তখনই কোমর বেঁধে রাঁধতে লেগে গেলাম—রান্না অবশ্য ডালডা বনস্পতি দিয়েই করলাম।

তাড়াহুড়োতে হিমশিম খেয়ে গেলাম, কিন্তু তা সার্থক হ'য়েছিল। খাবার পরিবেশনের সময় আমার স্বামীর গর্বোজ্জ্বল মুখ দেখেই তা বুঝতে পেরেছিলাম। আর খাওয়া শেষ ক'রে ওঠবার সময় সাহেবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা যদি শুনতেন! ডালডা বনস্পতি দিয়ে রান্না ক'রলে খাবারের নিজস্ব স্বাদগন্ধ ফুটে ওঠে ও সাধারণ খাবারও সুস্বাদু হয়। ভাজাভুজি, ঝোলঝাল থেকে আরম্ভ ক'রে কালিয়া-পোলাও ও মিষ্টান্ন পর্যন্ত—সবই ডালডা বনস্পতি দিয়ে চমৎকার রাঁধা চলে। আজকাল ডালডা বনস্পতিতে ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' দেওয়া হয়।

বাজারের খোলা টিন থেকে খুচরো স্নেহপদার্থ কেনা মানে বিপদ ডেকে আনা—খোলা অবস্থায় খুব দামী স্নেহপদার্থেও ভেজাল দেওয়া ও তাতে ধূলোবালি ও মাছি পড়া সম্ভব। আর তা খেয়ে আপনি অসুখে পড়তে পারেন।



স্বাস্থ্য বজায় রাখবার জন্য আমাদের যে বিশুদ্ধ স্নেহপদার্থের দরকার—ডালডা বনস্পতি তা আমাদের যোগায়। সব সময়ই বায়ুরোধক শীলকরা টিনে ডালডা বনস্পতি কিনবেন। সকলের সুবিধার জন্য ডালডা বনস্পতি ১০, ৫, ২ ও ১ পাউণ্ড টিনে পাওয়া যায়। আজই একটিন কিনে ফেলুন।

সচিত্র ডালডা রন্ধন পুস্তক বাংলা, হিন্দি, তামিল ও ইংরাজীতে পাওয়া যাচ্ছে। ৩০০ রকম পাকপ্রণালী, রান্নাঘরের খুঁটিনাটি বিষয় ও পুষ্টি সম্বন্ধীয় তথ্য ইত্যাদি এতে পাবেন।

দাম মাত্র ২ টাকা আর ডাক খরচ ১২ আনা।

আজই এই ঠিকানায় লিখে আনিয়ে নিন:

দি ডালডা
এ্যাডভাইসারি সার্ভিস
পোঃ, বক্স ৩৫৩, বোম্বাই ১



গাছ মার্কা টিন দেখে কিনবেন

ডালডা বনস্পতি

রাঁধতে ভালো—খরচ কম

HVM. 210-X52 BG

করতে হবে, যাহাতে ন্যায়সঙ্গত স্থানে ও উপযুক্ত পাত্রেই পড়ে। দেখা গেছে যে অনেক ভাল ভাল গান সুষ্ঠু পরিবেশনের অভাবে একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে—আবহ সঙ্গীতের রূপ বদলে গেছে ঠিক সময় উপযোগী স্থানে বিচার না করে দেওয়ার জন্য। আবহ সঙ্গীত যে কতখানি ছায়াছবিকে সাহায্য করে তা বলাই নিষ্প্রয়োজন। তার পরিস্থিতির রূপ ফলপ্রদ করতে যে আবহ সঙ্গীতের প্রয়োজন হয়—তার সক্রিয়তা সম্বন্ধে উদাসীন হলে ছায়াছবির অঙ্গহীনতা প্রকাশ পাবে। তাই অনেক সময় দেখা যায়, যে ধার করা আবহ সঙ্গীতের ব্যবহারে ছবির রূপ বিকৃত হয়েছে, যদিও সবকিছুই নির্ভর করে সঙ্গীত পরিচালকের ব্যুৎপত্তির উপর কিন্তু সঙ্গীতকে সুসমৃদ্ধ করতে যাঁরা ব্যক্তিগত ভাবে সংশ্লিষ্ট ও যাঁদের সাহায্যের প্রয়োজন হয় তাঁদের যান্ত্রিক অথবা আন্তরিক ক্রিয়া-কুশলতা ব্যতিরেকে সঙ্গীত পরিচালক নিতান্তই অসহায়।

কোন গ্রামের শিক্ষিকাকে

শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

হেথায় তুমি সবুজ ঘাস ধূলোয় রোদে বিবর্ণ,
তাম্বুলেতো ঠোঁটের কালি মুছছে না,
পিচ বাঁধানো পথের ধারে কৃষ্ণচূড়া কি জীর্ণ,
সদাব্রতে দৈন্যতো হায় ঘুচছে না।
হারিয়ে যাওয়া হায়রে সেই কুমুদ ফোটা সন্ধ্যা রাত,
হারিয়ে যাওয়া হায় দুখানি উষ্ণ হাত!

কবিগুরুর জন্মদিনে সভাপতির নেইকো সাড়,
অপরাধের থাকবে নাকো সীমা যে,
পথের দিশা হারায় যদি বলার আছে কিই বা আর,
ম্লান হ'লো আজ রবির অরুণিমা যে।
গাঁয়ের ছায়ে পাতার ঘরে একটি কোণে ব্যাগ্র চোখ,
ঘণ্টাতিনেক আমায় ঘিরে নতুন জগৎ সৃষ্টি হোক।



— কুড়ি —

"Vicmos buscar !"

ইরাণী সুরার পাত্র শূন্য হয়ে চলেছে একটির পর একটি। সামনে বাইজীর উন্মত্ত নাচের ঘূর্ণি চলেছে—সে নাচে মানুষের আদিম-আকাঙ্ক্ষা গর্জন করে ওঠে। দিলরুবা, সারেঙ্গী, বাঁশির সুরে সুরেও যেন আগুন ঝরছে। নেশায় জর্জরিত চোখ মেলে তাকিয়ে আছেন মামুদ শা। নিশি-রাত্রের নিঃসঙ্গ আবদুল বদর যেন মামুদ শা হয়ে ভুলতে চাইছেন নিজেকে।

কিন্তু এই-ই বা কতক্ষণ চলবে ? তৃষ্ণারও একটা শেষ আছে। দেহের চূড়ান্ত উত্তেজনার পরে আছে তার ভয়াবহ অবসাদ। দুশ্চিন্তার পুঞ্জ পুঞ্জ সঞ্চয় মাথার ভেতরে জমে আছে পাথরের পিণ্ডের মতো। সুলতান আবার মদের পাত্রে চুমুক দিলেন।

ওড়না উড়ছে—পেশোয়াজ উড়ছে নর্তকীর। দেহের প্রত্যেকটি রেখা ফুটে উঠছে ফণা তোলা সাপের মতো। কিন্তু খানিকক্ষণ পরে ও-ও নাচতে নাচতে ক্লান্ত হয়ে থেমে যাবে, সুলতানের উচ্ছলিত রক্তে শুরু হয়ে যাবে ভাঁটার টান। তখন ? সেই মুহূর্তে ?

পরের কথা পরে। একজন থামলে আর একজন আসবে। তারপরে আর একজন। তিনশো নর্তকী এনেছেন মামুদ শা। তারা আসতে থাকবে একের পর এক—যতক্ষণ তিনি না অচেতন হয়ে লুটিয়ে পড়েন।

—খোদবন্দ, উজীর সাহেব সেলাম দিয়েছেন।

সুলতান চমকে উঠলেন। রাত দুই প্রহর! এই সময় উজীর! এমন পরিপূর্ণ নাচের আসরে এমন রসভঙ্গ! সুলতানের প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করল : গর্দান নাও! —তার পরক্ষণেই মনে হল, এমন অসময়ে কেন উজীর? নিশ্চয়ই সুসংবাদ আছে কোনো। হয়তো সুরযগড়ের যুদ্ধ জয় হয়ে গেছে—হয়তো ইব্রাহিম খাঁ ভেট পাঠিয়েছে পাঠান শের খাঁ সুরীর ছিন্নমুণ্ড—

সুলতান বললেন, ডেকে আনো—

নাচ চলতে লাগল। মনের তীব্র উত্তেজনা ভোলবার জন্যে আবার মদের পাত্রের দিকে হাত বাড়ালেন সুলতান, কিন্তু হাত কাঁপতে লাগল তাঁর।

একটু পরেই উজীর এসে ঢুকলেন। নিষ্ঠাবান মুসলমান, সুরা স্পর্শ করেন না, নারী ঘটিত ব্যাপারে কোনো আশক্তি নেই। অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে প্রায় বিবর্ণ মুখে এসে দাঁড়ালেন সুলতানের পাশে। নটীর সংক্ষিপ্ত এবং উদ্দাম বেশ-বাসের দিকে তাকিয়েই তাঁর মাথা নিচু হয়ে গেল।

তীক্ষ্ণ উদগ্র দৃষ্টিতে তাকালেন সুলতান। উজীরের মুখে সুসংবাদের লেখা তো কোথাও দেখা যাচ্ছে না! পেছনে পেছনে শেরখাঁর ছিন্নমুণ্ড নিয়ে আসছেনা ইব্রাহিম খাঁর দূত! তা হলে—

হঠাৎ গর্জন করে উঠলেন মামুদ শা : খবর?

উজীর চমকে উঠলেন। নর্তকীর পা থমকে গেল মুহূর্তের জন্যে, একবারের জন্যে কেটে গেল সারেঙ্গীর সুর। তেমনি মাথা নিচু করে উজীর শীর্ণ স্বরে বললেন, খবর ভালো নয় সুলতান। আমার বেয়াদবী মাপ করবেন।

—সুরযগড় যুদ্ধের খবর?—সুলতান আর্তনাদ করলেন।

—না। পর্তুগীজ ক্যাপিতান মেনেজেস্ চট্টগ্রামের বন্দরে আগুন লাগিয়েছে। আমাদের বহু সৈনিক নিহত হয়েছে। যুদ্ধ চলছে চট্টগ্রামে!

—কুত্তা—কুত্তা!—মামুদ শা চিৎকার করে উঠলেন : এত সাহস কতগুলো ক্রীশ্চানের!—সুলতানের গলা চিরে যেন একটা পৈশাচিক আওয়াজ উঠল : নাচ বন্দ্ করো!

পরের ঘটনা ঘটল যেন যাদুমন্ত্রে। অভিশপ্ত আবদুল বদরের চোখের সামনে থেকে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল কল্পলোক। নর্তকী চকিতের মধ্যে ভয়ার্ত হরিণীর মতো

মিলিয়ে গেল, শুধু একটা ঘুঙুর মাটিতে পড়ে রইল স্মৃতি-চিহ্নের মতো। সারেঙ্গী আর সঙ্গতীর দল তাদের বাজনা কুড়িয়ে নিয়ে চলে গেল উর্ধ্বশ্বাসে।

সুলতান বললেন, আজই ফৌজ পাঠাও—এখনি! পর্তুগীজেরা যেন কর্ণফুলীর মুখ থেকে বেরুতে না পারে, যেন একটি জাহাজও ফিরে যেতে না পারে বার-দরিয়ায়। একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া চাই ওদের। আর সেই মেনেজেসকে হাতে-পায়ে জিঞ্জীর পরিয়ে আনা চাই এখানে—আমি তাকে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াব।

উজীর বললেন, ফৌজ পাঠাবার ব্যবস্থা আমি করছি। কিন্তু আরো খবর আছে খোদাবন্দ্। আর একজন ক্রীশ্চান ক্যাপিতান ডিয়োগো রেবেলো সপ্তগ্রাম বন্দরের পথ আটকে বসে আছে। একটি জাহাজ আসতে পারছে না, একটি জাহাজও যেতে পারছে না।

—সপ্তগ্রাম পর্যন্ত এসেছে!—ক্রোধে মামুদ শা থমকে গেলেন।

—এর পরে হয়তো গৌড়েও আসবে!

—ইয়া আল্লা! এও আমায় সইতে হ'ল! মশা আজ হাতীকে ঘায়েল করতে চায়! বড় বড় কামান পাঠান উজীর সাহেব, তোপের মুখে উড়িয়ে দিয়ে পথ পরিষ্কার করে ফেলুন। আর—মুহূর্তের জন্য সুলতান থামলেন—উজীর অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সুলতান বললেন, যে-সব ক্রীশ্চান গারদে আছে, এক্ষুনি তাদের সকলকে কতলের ব্যবস্থা করতে বলুন।

উজীর অস্বস্তিতে ছট্‌ফট্ করে উঠলেন।

সুলতান আবার বললেন, রাত শেষ হওয়ার আগেই তাদের মাথাগুলো যেন শহরের পথে-বাজারে টাঙিয়ে দেওয়া হয়।

উজীর একটা ঢোক গিললেন।

—এটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না সুলতান। এখন সময়টা ভালো নয়—

—চুপ করুন!—সুলতান চেঁচিয়ে উঠলেন: আপনাদের পরামর্শ শুনেই আমি ভুল করেছি। তখনি যদি এদের ঝাড়শুদ্ধ নিকাশ করতাম, তা হলে এদের বুকের পাটা এত বাড়ত না—এরা ল্যাজ গুটিয়ে অনেক আগেই পালিয়ে যেত। তা করিনি দেখে ভেবেছে আমি ভয় পেয়েছি। যান—একটা কথাও আর আমি শুনতে চাই না।

—কিন্তু সুরযগড়ের যুদ্ধ—

—কোনো খবর আছে তার?

—এখনো কিছু পাকা খবর আসেনি, তবে যতদূর জানি, অবস্থা খুব ভালো নয়—

অসহ্য অন্তর্জ্বালায় সুলতান হঠাৎ হাতের মদের গ্লাসটা সামনের দেওয়ালের গায়ে ছুড়ে মারলেন। বিকট শব্দ তুলে ঝন্ ঝন্ করে ভেঙে পড়ল কাচপাত্র, যেন দেওয়ালের বুক ফেটে একরাশ টকটকে লাল রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল।

উজীর স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, আমি বলছিলাম—কিন্তু এবারেও উজীরের কথা শেষ হতে পেল না। ঘরে ঢুকলেন আল্‌ফা হাসানী। তাঁর সঙ্গে সুরযগড়ের দূত।

আল্‌ফা হাসানী শান্ত গম্ভীর গলায় বললেন, সুলতান, আমাদের দুর্ভাগ্য। সুরযগড়ের যুদ্ধে ইব্রাহিম খাঁ আর জামাল খাঁর সম্পূর্ণ পরাজয় হয়েছে। একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে বাংলার সৈন্য। দুর্দান্ত বেগে শের খাঁ সুরী গৌড় আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছেন।

কিছুক্ষণের জন্যে মৃত্যুর মতো স্তব্ধতা। যেন অনন্ত কাল ধরে হাসানীর কণ্ঠস্বর রং-মহলের দেওয়ালে দেওয়ালে গম্ গম্ করে বেড়াতে লাগল।

তারপর, আশ্চর্য শান্ত গলায় সুলতান বললেন, তামাম শোধ!

উজীর তটস্থ হয়ে উঠলেন: এখনো হাল ছাড়বার সময় হয়নি সুলতান।

—হয়নি?—অদ্ভুত অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকালেন সুলতান! তারপর সীমাহীন অবসাদে নিজেকে তাকিয়ায় এলিয়ে দিয়ে বললেন, এখনো কোনো আশা আছে?

আল্‌ফা হাসানী বললেন, খোদাবন্দ্, এ উত্তেজনার সময় নয়। চারদিক থেকেই সঙ্কট এসেছে এখন। এ অবস্থায় ভেবে-চিন্তে কাজ না করলে শের খাঁর হাত থেকে বাংলা দেশ রক্ষা করা যাবে না। সুরযগড়ের যুদ্ধে যে লোকক্ষয় হয়েছে, তার চাইতেও বড় ক্ষতি সামনে এগিয়ে আসছে। শেরকে রোখা এখন অসম্ভব। সে অসাধারণ বীর, অদ্ভুত কৌশলী। এই যুদ্ধ জয়ের ফলে আমাদের বহু অস্ত্রশস্ত্র তার হাতে গিয়ে পড়েছে। তার ওপরে তার রয়েছে মখদুম্-ই-আলমের বিরাট ধনভাণ্ডার। এখন ঘর সামলে তার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে!

সুলতান জবাব দিলেন না। ফিরোজের রক্ত মাখা সিংহাসন। হোসেন শাহের সমাধির পাশে লুটিয়ে পড়ে আছে নসরৎ শার মৃতদেহ। রক্ত আর মৃত্যুর অভিশাপ চারদিকে। একটা বায়বীয় শূন্যতার মধ্যে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন—তাঁর সম্মুখে যেন প্রেতলোকের হাতছানি। আবদুল বদর—কী প্রয়োজন ছিল তোমার মামুদ শা হয়ে? আবার কি তুমি আবদুল বদর হয়ে সহজে নিশ্বাস ফেলতে পারো না, খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে নিঃসংশয় চোখে দেখতে পারো না খোদাতালার পৃথিবীকে? উজীর আস্তে আস্তে বললেন, এখন এই ক্রীশ্চানেরাই আমাদের ভরসা!

—ক্রীশ্চানেরা?—সুলতান একবার নড়ে উঠলেন।

উজীর সন্তর্পণে বললেন, ওরা দুঃসাহসী সৈনিক। তা ছাড়া ওদের যুদ্ধ-কৌশলও সম্পূর্ণ আলাদা। ওদের কামান

আমাদের চেয়ে জোরালো। আজ যদি ওরা আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায়, তা হলে হয়তো শেরের আক্রমণ থেকে গৌড়-বাংলাকে বাঁচানো সম্ভব।

মিতালি! কতগুলো লুটেরার সঙ্গে। যারা অসীম দুঃসাহসে গৌড়ের রাজমর্যাদাকে বার বার অপমান করছে, সেই কয়েকটা বিদেশীর সঙ্গে!

কিন্তু—এ হবেই। শুধু সিংহাসনে নয়—চারদিকেই ফিরোজের রক্ত। বাতাসে বাতাসে ক্রুদ্ধ অভিসম্পাত। অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মিছিল। সেই অপঘাতের শোভা-যাত্রায় নিজের প্রতিচ্ছবিও কি দেখতে পাচ্ছ না মামুদ শা? ফকির সাহেব! কোথায় গেলেন তিনি? এ সময়ে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী শুনতে পেলে ভরসা পাওয়া যেত।

উজীর বললেন, তা হলে ওদের সঙ্গে সন্ধির ব্যবস্থাই করি।

সুলতান বললেন, করুন।

—ডিয়োগো রেবেলোকে ডেকে পাঠাই।

—পাঠান।

—আর—উজীর একবার গলা পরিষ্কার করলেন, ওদের নেতা ক্যাপিতান অ্যাফ্‌নশো ডি মেলোকে এখনি সসম্মানে সদলে মুক্তি দেওয়া দরকার। তাঁর জন্যেই যা কিছু গণ্ডগোল। ডি-মেলো যদি আমাদের সহযোগিতা করতে রাজী হন, তা হলে আর কোনো ভাবনাই থাকবে না।

পরাজয়ের পালা পড়েছে—ইলিয়াস শাহী বংশের ওপর আল্লার ক্রোধ নেমে আসছে। কিছুই করা যাবে না—কিছুই করবার উপায় নেই! মামুদ শা শুধুই নিমিত্তমাত্র।

—বেশ, তাই হোক—একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে কথাটা ছেড়ে দিলেন মামুদ শা। তারপর আবার হাত বাড়ালেন সুরাপাত্রের সন্ধানে। কিন্তু সব শূন্য হয়ে গেছে।

সুলতান টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালেন। চোখের সামনে একরাশ ধোঁয়া পাক খাচ্ছে যেন। উত্তেজনায় টানে টানে বাঁধা স্নায়ুগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। এবার শুধু লুটিয়ে পড়বার পালা।

সুলতান বললেন, বেশ, তাই করুন।

নিজের বিশ্রাম ঘরের দিকে ফিরে চললেন সুলতান। কিন্তু কোথায় ঘর? কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না। চারদিকে শুধু কবরের পর কবর দাঁড়িয়ে। আর মামুদ শার নিঃসঙ্গ নিরাশ্রয় প্রেতাত্মা যেন তার নিজের কবরটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কোথাও তা দেখতে পাচ্ছে না।

* * *

গৌড়ের সুলতানের দরবারে পর্তুগীজেরা আবার এসে দাঁড়ালেন সার দিয়ে। ডি-মেলো, আন্তোন্যো, ডিয়োগো রেবেলো। এর মধ্যে অনেক শীর্ণ হয়ে গেছে ডি-মেলোর চেহারা। মাথায় বন্য বিশৃঙ্খল চুল—তামাটে দাড়িতে অস্বাভাবিক রুক্ষতায় পাক ধরেছে, চোখের কোটরে কালো অন্ধকার, তার মধ্য থেকে দুটো উজ্জ্বল অঙ্গারকে যেন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কপালের ডান দিকে ক্ষত-চিহ্নের একটা কলঙ্ক রেখা—গুরাজিলের শেষ মহ্‌ফিলের স্মারক!

সুলতান দু হাতে কপাল টিপে ধরে বসে আছেন। সভায় একটা শোকাচ্ছন্ন নীরবতা।

উজীর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। গম্ভীর গলায় বলতে শুরু করলেন তারপর।

—গৌড়ের সুলতান অনেক চিন্তা করে দেখেছেন যে বিদেশী ক্রীশ্চানদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করাই তাঁর রাজ-মর্যাদার উপযুক্ত। তাই এতদিন ধরে ক্রীশ্চানদের যে তিনি কারারুদ্ধ করে রেখেছিলেন, সে জন্যে তিনি আন্তরিক দুঃখিত।

ডিয়োগো রেবেলোর ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের একটা চাপা হাসি খেলে গেল। হঠাৎ একটা অসহ্য হিংস্র ক্রোধে সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল ডি-মেলোর। গঞ্জালো—পেড্রো—চাকারিয়া—ওয়াজিলের নিমন্ত্রণ! ডি-মেলো তলোয়ারের বাঁট মুঠো করে চেপে ধরলো।

উজীর বলে চললেন, তাই সুলতান মনে করেন, তিনি গোয়ার মহামান্য ডি-কুন্হার সঙ্গে সন্ধি এবং শান্তি রচনা করবেন। গৌড়-বাংলার সঙ্গে তিনি বাণিজ্যের সনদ দেবেন পর্তুগীজদের। আর এই উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম এবং সপ্তগ্রামে তিনি ক্রীশ্চানদের কুঠি রচনারও অনুমতি দেবেন।

সুলতান একবার মাথা তুললেন। কিছু দেখতে পাচ্ছেন না চোখের সামনে। এই প্রাসাদ নয়—এই সভা নয়—কিছুই নয়। মাথার ওপরে একটা আশ্চর্য উদার আকাশ। তার রঙ্ ঘন নীল। সবুজ অরণ্য সূর্য স্নান করছে। মস্‌জিদ থেকে শোনা যাচ্ছে আজানের গম্ভীর সুর। কী পবিত্র—কী উদার! কোথাও কোনো সমস্যা নেই—কোথাও কোনো সংকট নেই—মাথার ভেতরে অশান্ত উন্মত্ততার চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। এবার নামাজের সময় হয়েছে আবদুল বদর! খোদার কাছে মোনা জাত করো: আমাকে সাচ্চা মুসলমান করো রহমান—একটি টুকরো রুটি, একখানা কোরাণ—আর কিছুই নয়!

পর্তুগীজেরা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এতদিনের এত দুঃখ—এত তিক্ততার পরে। বেঙ্গালা! মাটিতে সোনা, আকাশে সোনা। ভোরের কুয়াশায় মস্‌লিন উড়ে বেড়ায়। ডা-গামার স্বপ্ন—আলবুকার্কের অসমাপ্ত কল্প কামনা।

উজীর প্রশ্ন করলেন: এ বিষয়ে পর্তুগীজ ক্যাপিতানের আশা করি কোনো আপত্তি নেই।

—না।—ডি-মেলো জবাব দিলেন। যেন কয়েক শতাব্দী পরে কথা কইলেন তিনি, তাঁর নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কানেই যেন অপরিচিত ঠেকল।

—কিন্তু একটি সর্ত আছে।—উজীর বলে চললেন, বিহারের শের খাঁ গৌড় আক্রমণ করতে আসছে। এই আক্রমণ রোধ করবার জন্যে সুলতান পর্তুগীজ সৈনিকদের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেন। পর্তুগীজ ক্যাপিতান কি রাজী আছেন?

—রাজী।—আবার সেই অপরিচিত গম্ভীর গলায় ডি-মেলো জবাব দিলেন।

—তা হলে এই সর্ত-পত্রে পর্তুগীজ ক্যাপিতান স্বাক্ষর করুন।

ডি-মেলো এগিয়ে গেলেন আস্তে আস্তে। বেঙ্গালা! স্বর্গের দরজা খুলে গেল এতদিন পরে।

লেখনী তুলে নিলেন ডি-মেলো—ধীরে ধীরে কাঁপা হাতে সই করে দিলেন কালো কালো অক্ষরে। আর সেই স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গেই মহাকাল তাঁর পাণ্ডুলিপিতে নতুন একটি অধ্যায়ের পাতা খুলে দিলেন। পাশ্চাত্য বাণিজ্য-লক্ষ্মীকে সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে প্রাচ্যের বাণিজ্য-লক্ষ্মী ভাগীরথীর জলে বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে গেলেন!

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন সুলতান।

—আপনারা ক্ষমা করবেন, আমি বড় অসুস্থ।

মামুদ শা সভা থেকে বেরিয়ে গেলেন। ভঙ্গ হল সভা। একা এগিয়ে চলতে চলতে সুলতানের মনে হল, তাঁর নিজের ছায়াটা যেন তাঁকে ছাড়িয়ে সামনের দিকে প্রলম্বিত হয়ে চলেছে!

* * * *

তারপর ইতিহাস।

আশ্চর্য কৌশলের সঙ্গে কী করে শের খাঁ গৌড়ের দিকে এগিয়ে এলেন—যুদ্ধনীতির নিদর্শন হিসেবে তা স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। পর্তুগীজ অধ্যক্ষদের নেতৃত্বে তেলিয়াগঢ়ীর দুর্গে যে বিরাট নৌবাহিনী গঙ্গার পথ আটক করে রেখেছিল, তার মুখোমুখি দাঁড়ালে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতেন শের খাঁ। অথবা গৌড়েও যদি তিনি পৌঁছুতেন, তা হলে দশ বছরেও তার দুর্ভেদ্য প্রাকার তিনি ভাঙতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

কিন্তু আবদুল বদর যুদ্ধ চায় না। সে যেন দেওয়ালের গায়ে নিয়তির লেখন দেখতে পেয়েছে।

কিছু না করে শুধু বাধা দিয়ে রাখলেই হয়তো শের খাঁর পরাজয় ঘটত। ইতিহাসে যেমন আগেও ঘটেছে, এবারেও তেম্‌নি তারই পুনরাবৃত্তি হত। বাংলা দেশের অসংখ্য নদী-নালা দুর্লংঘ্য বাধা হয়ে দাঁড়াত শেরের সাম্‌নে—প্রতি পদে পদে থমকে দাঁড়াতে হত আফগান সৈন্যকে। তারপরে আসত বর্ষা—বাংলা দেশের মেঘপুঞ্জিত নিবিড় ঘন ধারা বর্ষণ। সেই প্রচণ্ড জলধারায় গঙ্গা গর্জন করে উঠত—মহানন্দা ধরত মৃত্যুরাক্ষসীর রূপ। সাড়া দিয়ে উঠত জল-জঙ্গলের হিংস্র বিষধরের দল, পলি-মাটির পঙ্কবন্ধনে থমকে যেত শের খাঁর কামান। আসাম অভিযানে যে তিক্ত-অভিজ্ঞতার চরম মূল্য দিয়েছিলেন মীর-জুম্‌লা—ঠিক তেম্‌নি ভাবেই হত-লাঞ্ছিত শের খাঁকে বাংলা জয়ের স্বপ্ন চিরদিনের মতো ত্যাগ করতে হত।

অ্যাফন্‌সো ডি-মেলো সেই পরামর্শই দিয়েছিলেন মামুদ শাকে।

কিন্তু মনের মধ্যে যার পরাজয়ের তিক্ত গ্লানি, চোখের সামনে যার শূন্যতার অন্ধকার, নিশি রাত্রে ফিরোজের রক্তাক্ত দেহ যাকে পরিক্রমা করে বেড়ায়—সেই মামুদশার আর যুদ্ধ করবার শক্তি ছিল না।

পর্তুগীজদের পরামর্শ কানে তুললেন না মামুদ শা। ডি-মেলো যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন—কিন্তু কে যুদ্ধ করবে? নত-মস্তকে মামুদ শা সন্ধি করলেন সেরের সঙ্গে। তেরো লক্ষ টাকার সোনা উপঢৌকন নিয়ে শের খাঁ এবারের মতো ফিরে গেলেন।

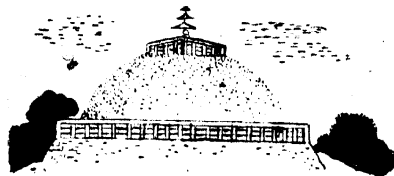
অ্যাফন্‌সো ডি-মেলো বলেছিলেন, শয়তানকে লোভ দেখালেন সুলতান—নিজের দুর্বলতাকে মেলে ধরলেন তার সাম্‌নে। এবার সে ফিরে গেল, কিন্তু আবার আসবে। সেদিন তার ক্ষুধা আপনি নিবৃত্তি করতে পারবেন না—গৌড়-বাংলাকে সে গ্রাস করে নেবেই।

সুরার পাত্র নিঃশব্দে নিঃশেষ করে মামুদ শা নর্তকীদের আহ্বান করতে বলেছিলেন। ডি-মেলোর কথার কোনো জবাব তিনি দেন নি।

কিন্তু সে ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে হয় নি। ঐতিহাসিকের ভাষায় "মামুদ শা নিজের সর্বনাশের জন্যে মাটিতে রোপণ করলেন ড্রাগনের দাঁত; আর তাঁরই দেওয়া প্রত্যেকটি স্বর্ণমুদ্রা থেকে জন্ম নিল এক একটি দুর্ধর্ষ আফগান সৈনিক—যারা পরের বৎসরেই তাঁর ওপর দ্বিগুণ উৎসাহে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে।"

আর সমস্ত ইতিহাসের এই তরঙ্গ-মন্থনের পর দুটি পদ্মের মতো নতুন সূর্যের আলোয় ভেসে উঠল পর্তুগীজদের দুটি বাণিজ্য-কুঠি।

একটি চট্টগ্রামে, একটি সপ্তগ্রামে। (ক্রমশঃ)





উত্তরবঙ্গে বন্যা—

এ বৎসর উত্তরবঙ্গের বন্যা কি ভাবে বিস্তৃতি লাভ করিল, তাহার বিবরণ এইরূপ। ১৯৫৪ সালের মে মাসের প্রথম ভাগে জল ঢাকা নদীর জল কুচবিহার জেলায় গিরিয়া নামক ছোট নদীর মধ্য দিয়া বেগে প্রবেশ করায় সেচবিভাগ মাথাভাঙ্গা সহর রক্ষার জন্য নদীর ধারে ৭ শত ফিট বাঁধ নির্ম্মাণ করে। জুন মাসের প্রথম ভাগে দেখা যায় তিস্তার জলস্রোত জলপাইগুড়ী জেলার দোমহনী ও বার্ণেস ঘাটের মধ্যবর্ত্তী রেলের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেয়। সেচবিভাগ বাঁধ বাঁধার পূর্ব্বেই লাইন ভাঙ্গিয়া যায় ও ১৬ই জুন তিস্তায় বন্যা দেখা যায়। তিস্তার জল দক্ষিণে যাইয়া দোমহনী ইউনিয়নের কতকাংশ এবং বার্ণেস, পদামতী ও ধরমপুর ইউনিয়নের সকল অংশ ভাসাইয়া দেয়। ঐ অঞ্চলে একটি নূতন জলস্রোত যাইয়া প্রথমে কয়া নদী ও পরে বেকলার সহিত মিলিত হয়। ১৭ই জুন দোমহনী ও ময়নাগুড়ি রোড ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী রেলবাঁধ তিন স্থানে নষ্ট হয় ও বন্যার জল মাধবডাঙ্গা ইউনিয়ন ভাসাইয়া ধরলা নদীতে গিয়া পড়ে। ১৫ হাজার লোক গৃহহীন হয় ও তিন হাজার বাসগৃহ ব্যবহারের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। ঐ সময়ে জলপাইগুড়ি সহরের ও সহরতলীর বহু নিম্নভূমি জলপ্লাবিত হয় এবং বহু পরিবার সহরের উচ্চস্থানে যাইয়া বাস করিতে বাধ্য হয়। এই ভাবে বন্যা সুরু হইলে ৫ শত মণ চাউল বিতরণ করা হয় —১ লক্ষ ২১ হাজার টাকা বন্যাপীড়িত লোকদের দেওয়া হয় ও গৃহনির্ম্মাণের জন্য দেড় লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। উড়ো জাহাজে করিয়া ৩ শত জোড়া ধুতি, ৩ শত জোড়া সাড়ী ও বহু শিশুর পোষাক বিতরণের জন্য প্রেরিত হয়। ঐ সময়ে আলিপুর ডুয়ার্সে কালজানি নদীর বন্যায় ৪০টি পরিবার বিপন্ন হয়। সেখানেও ৫ হাজার টাকা দানের ব্যবস্থা হয়। দোমহনী ও ময়নাগুড়ি রোড ষ্টেশনের মধ্যে রেল চলাচল কিছুদিন বন্ধ থাকে। ইতিমধ্যে চেল নদীর জল বাড়িয়া উদলাবাড়ীর নিকট বন্যা হয় ও জলপ্রবাহ জামপই পর্য্যন্ত যাইয়া ময়নাবাড়ী চা-বাগান ও উদলাবাড়ী বাজার বিপন্ন করে। কুচবিহারে সারা জুন মাস ধরিয়া খুব বৃষ্টি হয় —জুনের তৃতীয় সপ্তাহে মেকলীগঞ্জে বন্যা হয় এবং ২৮শে জুন ও ২রা জুলাই তারিখের মধ্যে সমগ্র কুচবিহার জেলা ভাসিয়া যায়। জলপাইগুড়ী হইতে তর্সা নদীর জল আসিয়া মেকলীগঞ্জ থানার সালিয়াজান ও ধর্লা নদীতে প্রবেশ করে। কুচবিহার জেলার সকল নদীর জলই বাড়িতে থাকে, ফলে দিনহাটা, সদর ও তুফানগঞ্জ—তিনটি মহকুমাই জলমগ্ন হয়। আউস, পাট ও আমন ধান্য সমেত ৭১৮ হাজার একর জমী ডুবিয়া যায়। যাহা হউক—অধিকাংশ আউস ধান রক্ষা পায় ও নূতন করিয়া আমন ধান চাষ সম্ভব হয়। কুচবিহারে ২২টি বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়। বহু লোক রাস্তার উপর আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। টর্সা নদীর জল চারিদিকে নূতন পথে ছড়াইয়া পড়ে ও বহু বাড়ী ভাসিয়া যায়। ২৮শে জুলাই নূতনভাবে বন্যা আরম্ভ হইল—তিস্তার জল বাড়িয়া জলপাইগুড়ি সহরের আদালত গৃহ ও পুলিস লাইন ভাসাইয়া দিল—৫শত লোককে স্থানান্তরিত করিতে হইল। ময়নাগুড়ি সার্কেলে পূর্বে যে স্থানগুলি প্লাবিত হয় নাই—তাহাও জলমগ্ন হইল। জলঢাকা নদীর বন্যায় ৫ হাজার লোক বিপন্ন হয়। ডুয়ার্সে যাতায়াতের প্রায় সব পথ ভাঙ্গিয়া যায়। রেলপথ বা সাধারণ রাস্তা দিয়া জেলার একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাতায়াত বন্ধ হইয়া যায়। ঘীস, চেল, মালনদী ও নেওরা নদীতেও বন্যা হয়। উদলাবাড়ী ও তাহার সন্নিহিত ১০ বর্গ মাইল স্থান জলমগ্ন হইয়া ২৫ শত লোক বিপন্ন হয়। ৪জন মানুষ ও ২শত পশু ভাসিয়া যায়—রামসই-এর নিকট জলঢাকার বাঁধ ভাঙ্গিয়া জর্দার জল নামে ও ময়নাগুলির সমস্ত স্থান ভাসিয়া যায়। আলিপুর ডুয়ার্সে হোলং নদীর জলে মাদারীহাট থানার বহু গ্রাম ভাসিয়া যায়। হামিলটনগঞ্জ ও কালচিনির মধ্যবর্তী পথ নষ্ট হইয়া যায় ও রাডাক ও কুলকুলি নদীর বন্যায় কুমারগ্রাম থানার বহু গ্রাম জলমগ্ন হয়। আলিপুর ডুয়ার্স সহরে ও কালজানি নদীর জলে স্থানীয় লোক বিপন্ন হয়। পশ্চিম দিনাজপুরেও আত্রাই ও পুনর্ভবা নদীর বন্যায় সমস্ত ফসল নষ্ট হইয়া যায়। সেখানে দানের জন্য ১০ হাজার টাকা ও গৃহ নির্মাণের জন্য ৫ হাজার টাকা প্রেরিত হয়। সেখানে প্রায় ২৫শত পরিবার বিপন্ন হইয়াছে। দার্জিলিং জেলায় মহানন্দা, বালাসন, তিস্তা ও পানচানাই নদীর বন্যা হয়। পানচানাই নদীর বন্যায় আসাম লিঙ্ক রেল লাইন ভাঙ্গিয়া যায়। শিলিগুড়ী মহকুমার ফাঁসি-দেওয়া ও খড়িবাড়ী থানা বিপন্ন হইয়াছে। ২৮শে জুলাইএর পর মালদহ জেলাও বন্যা প্লাবিত হইয়াছে। মোট ১১৪০৭ বর্গ মাইল স্থানের মধ্যে ৬ হাজার বর্গ মাইল বিধ্বস্ত হইয়াছে। ৯৩টি ইউনিয়নের মধ্যে ৭৪টি ইউনিয়ন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ২৪শে আগষ্ট বন্যার তৃতীয় দফা আরম্ভ হয়। জলপাইগুড়ি সহরের ২।৩ ভাগ ডুবিয়া যায়—ফায়ার ব্রিগেডের লোক দিয়া ৫ হাজার লোককে স্থানান্তরিত করা হয়। তিস্তার

জলে খরিজাবাড়ী-বেরুবাড়ীর অধিকাংশ এবং দক্ষিণ বেরুবাড়ী ইউনিয়ন ভাসিয়া যায়। হাতিনালা পুল হইতে একখানা রেল এঞ্জিন জলঢাকা নদীতে পড়িয়া যায়। আলিপুর ডুয়ার্সে ও কালজানীর জলে ৫০খানা বাড়ী ভাঙ্গিয়া যায়। ২৩শে আগষ্টের পর কুচবিহারেও ভীষণ বন্যা হয়। সমগ্র কুচবিহার সহরে গভীর জল জমিয়া যায়। সমগ্র জেলা ক্রমে ডুবিয়া যায়। ২৮শে আগষ্টের পর জল ক্রমে কমিতে থাকে। উত্তরবঙ্গের বহু স্থানই এখনও পর্য্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে। যে সকল স্থানে বিমান হইতে যাওয়া সম্ভব নহে, সে সকল স্থানে ডাক চলাচল ও প্রায় বন্ধ। ৫ই সেপ্টেম্বর শ্রীজহরলাল নেহরু ২২ জন এম-পি'কে লইয়া কুচবিহারে কয়েকঘণ্টা থাকিয়া ও উড়ো জাহাজে উপর হইতে চারিদিক দেখিয়া আসিয়াছেন। এখনও ঐ অঞ্চলের ক্ষতির পরিমাণ স্থির করা সম্ভব নহে। এখন পর্য্যন্ত যে হিসাব করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় ৭৭৯০০০ একর জমীর ফসল নষ্ট হইয়াছে। ৬,৬২,২০,০০ টাকা মূল্যের ৪৭৩০,০০০ মণ চাল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যে সকল জমীতে বালী জমিয়া আছে, সে সকল জমীতে আগামী কয়েক বৎসর চাষ করা যাইবে না। ১ কোটি টাকা মূল্যের পাট নষ্ট হইয়াছে। ৩৭৪০০০ টাকা মূল্যের ১৫ শত গবাদি পশু মারা গিয়াছে। ৫ কোটি টাকা মূল্যের ৫০ হাজার গ্রাম্য বাসগৃহ ধ্বংস হইয়াছে। বর্তমান সংবাদ অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলের লোকের ক্ষতির পরিমাণ ১২ কোটি ৬৫ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা। সব খবর পাওয়া গেলে দেখা যাইবে যে মোট ক্ষতির পরিমাণ ২০ কোটি টাকা। জলপাইগুড়ী ও কুচবিহার জেলার রাস্তা তৈয়ার ও মেরামত করিতে কত টাকা লাগিবে, তাহা এখনও হিসাব করা সম্ভব নহে। বিহারকে আসামের সহিত যুক্ত করিয়া যে নূতন বড় রাস্তা গত আগষ্ট মাসের মধ্যভাগে প্রথম খোলা হইয়াছিল, তাহা প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। সরকারী ২৩টি পথ ধ্বংস হইয়াছে। সিলিগুড়ী-গ্যাংটক রাস্তা, বার্ণেস-ময়নাগুড়ী পথ, আলিপুর ডুয়ার্স-পাতলা খাওয়া পথ প্রভৃতি মেরামত করিতে ১ কোটি টাকার প্রয়োজন হইবে। শিলিগুড়ী হইতে সাংকোষ পর্য্যন্ত আসাম লিঙ্ক রেলের সমস্ত অংশ অচল হইয়াছে। বহু সরকারী জঙ্গল নষ্ট হইয়াছে! এখন সরকারী ও বেসরকারী সমবেত সাহায্য ভিন্ন এই সকল নষ্টপ্রায় অঞ্চল পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হইবে না। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারও কেন্দ্রীয় সরকার তাঁহাদের সাধ্যমত সকল ব্যবস্থাতেই মনোযোগী হইয়াছেন। দেশের সদাশয় ও মহাপ্রাণ জনসাধারণও যেন এ সময় কর্ত্তব্যে উদাসীন না থাকেন, তাঁহাদের নিকট ইহাই আমাদের নিবেদন। উপরে বন্যার কিয়দংশের বিবরণ প্রদত্ত হইল। ক্রমে ক্রমে মানুষ ক্ষতির সম্পূর্ণ ইতিহাস জানিতে পারিবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

সমুদ্রগর্ভে যীশুর মূর্তি স্থাপন—

গত ২৯শে আগষ্ট ইতালী দেশের সান ফ্রতোসাতে যীশুখৃষ্টের একটি ব্রঞ্জ নির্মিত মূর্তি সমুদ্র জলে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। মূর্তিটি সাড়ে ৮ ফিট উচ্চ ও তাহার ওজন ৮০ টন! ইতালীয় শিল্পী গানেত্তি ঐ মূর্তি নির্মাণ করিয়াছেন। উপসাগরের অগভীর স্বচ্ছ জলে নিমজ্জিত ঐ মূর্তি পুণ্যার্থীরা অনায়াসে দেখিতে পাইবে। উহা জলপৃষ্ঠ হইতে ৩৫ ফিট নিয়ে দণ্ডায়মান ; মার্কিণ নৌবহর ঐ তীর্থস্থানে আলোর ব্যবস্থা করিয়া দিবেন—আলোকমালা যীশুর মূর্তিটিকে উদ্ভাসিত করিয়া রাখিবে। জড়বাদ-জর্জরিত এই যুগে যাহারা ইউরোপে ঐ মূর্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মনোভাব বিচারের দিন আসিয়াছে। ধর্মহীন পৃথিবীর লোক আর এ ভাবে ধ্বংসের সম্মুখে বাস করিতে চাহে না। সমগ্র পৃথিবীর লোক ধীরে ধীরে আস্তিক্যবাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। বিংশ শতাব্দীতে যীশুর এই মূর্তি প্রতিষ্ঠায় তাহারই সূচনা দেখা যায়।







শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা ঃ

মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বোম্বাই প্রদেশ ২-১ গোলে সার্ভিসেস দলকে হারিয়ে এই প্রথম 'সন্তোষট্রফি' জয়ী হ'ল। বোম্বাই এর আগে তিনবার—১৯৪৫, ১৯৪৭ এবং ১৯৫১ সালে 'সন্তোষট্রফি'র ফাইনালে খেলেছে এবং প্রতিবারই বাংলা দলের কাছে হার স্বীকার করেছে। সার্ভিসেস দলের পক্ষে এই প্রথম ফাইনাল খেলা।

ভারতীয় ফুটবল খেলার ইতিহাসে ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েসনের সুযোগ্য সভাপতি সন্তোষের স্বর্গীয় মহারাজা মন্মথনাথ রায়চৌধুরীর দান অনস্বীকার্য্য। তাঁর স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে, জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় আই এফ এ কর্তৃক এই 'সন্তোষট্রফি' প্রদত্ত হয়। বাৎসরিক অনুষ্ঠান হিসাবে জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয় ১৯৪১ সালে, ক'লকাতায়। হিসাব মত ধরলে, এ-বছর নিয়ে ১৪ বার প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে হয়েছে ১১ বার। তিনবছর, ১৯৪২-৪৩ এবং ১৯৪৮ সালে প্রতিযোগিতা স্থগিত ছিল। এ পর্য্যন্ত পাঁচটি স্থানে সন্তোষ ট্রফির খেলা হয়েছে—ক'লকাতায় ৫ বার, বোম্বাইয়ে ২'বার, বাঙ্গালোরে ২ বার দিল্লী এবং মাদ্রাজে একবার হিসাবে। জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ইতিহাসে বাংলা-দলের প্রাধান্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ বছর বাদ, বাংলা-দল প্রতিবারই ফাইনাল খেলেছে অর্থাৎ ১১ বারের প্রতি-যোগিতায় বাংলাদল একটানা ১০ বার ফাইনালে উঠেছে; সন্তোষ ট্রফি পেয়েছে ৭ বার। এ পর্য্যন্ত সন্তোষ ট্রফি পেয়েছে ৪টি প্রদেশ—বাংলা ৭ বার, মহীশূর ২ বার, দিল্লী এবং বোম্বাই ১ বার হিসাবে। বাংলা উপর্য্যুপরি সন্তোষ ট্রফি জয়ী হয়েছে ৪ বার, ১৯৪৭-১৯৫১ সাল পর্য্যন্ত। এ বছরে ১৭টি দল যোগদান করে। প্রতিযোগিতায় অপ্রত্যাশিত ঘটনা—সেমি-ফাইনালে সার্ভিসেসদলের কাছে বাংলাদলের ০—২ গোলে, তৃতীয় রাউণ্ডে সার্ভিসেসদলের কাছে হায়দ্রাবাদদলের ০—২ গোলে, এবং বিহারের কাছে মহীশূরের ১—২ গোলে পরাজয়। সার্ভিসেস এবং বিহারদল এ বছর প্রতিযোগিতায় ক্রীড়ামহলের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করে। সেমি-ফাইনালে বিহার দুদিন বোম্বাইয়ের সঙ্গে খেলা ড্র রেখে ৩য় দিনে ০—২ গোলে হেরে যায়। বোম্বাইদল ফাইনালে যায়—ইউপিকে ৬—০, মাদ্রাজকে



সন্তোষ ট্রফি

১—১ ও ১—০, বিহারকে ০—০, ১—১ ও ২—০ গোলে হারিয়ে।

সার্ভিসেসদল ফাইনালে ওঠে,—আসামকে ০—০ ও ৩—০, হায়দ্রাবাদকে ২—০ এবং বাংলাকে ২—০ গোলে হারিয়ে।

বাংলা বনাম সার্ভিসেসদলের সেমি-ফাইনাল খেলায়

বাংলাদল একমাত্র গোল দেওয়া ছাড়া বাকি সবই করেছে। গোলের মুখে বল পেয়েও আক্রমণভাগের খেলোয়াড়রা গালে বল সট করেন নি; বল নিয়ে আরও গোলের মুখে যাওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে বিপক্ষ দলের কাছে বাংলাদলের খেলোয়াড়দের আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ধরা পড়ে যায়। এরকম ক্রীড়াপদ্ধতি দলের পক্ষে আত্মঘাতি ছাড়া আর কিছুই নয়। আশা করি বাংলাদল সমুচিত শিক্ষালাভ করেছে।

ফাইনাল খেলায় সার্ভিসেসদল তাদের সমর্থকদের হতাশ করেছে। ৩য় রাউণ্ড এবং সেমি-ফাইনালে হায়দ্রাবাদ এবং বাংলাদলের বিপক্ষে তারা যেমন খেলেছিলো সে রকম ফাইনালে খেলতে পারে নি। ফাইনাল খেলার প্রথম দশ মিনিটই যা খেলেছে। এ সময়ে কয়েকবার তারা গোল দেওয়ার সুযোগও পায় কিন্তু গোল দিতে পারে নি। বোম্বাইদলের গুলাব সিং প্রথম গোল করেন, প্রথমার্দ্ধের খেলার ১৬ মিনিটে। বিরতির সময় বোম্বাই ১—০ গোলে এগিয়ে থাকে। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ৪র্থ মিনিটে সার্ভিসেস দলের রাইট আউট মুখার্জি পেনাল্টি থেকে গোলটি শোধ দেন। খেলার ১২ মিনিটে বোম্বাইয়ের ডি' সুজা প্রায় ৩০ গজ দূর থেকে জোরালো সট ক'রে বোম্বাইয়ের জয়সূচক গোলটি দেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী ফাইনাল খেলার ফলাফল

	বিজয়ী	বিজেতা	গোল	স্থান
১৯৪১	বাংলা	দিল্লী	৫-১	ক'লকাতা
১৯৪৪	দিল্লী	বাংলা	২-০	দিল্লী
১৯৪৫	বাংলা	বোম্বাই	২-০	বোম্বাই
১৯৪৬	মহীশূর	বাংলা	০-০, ২-১	বাঙ্গালোর
১৯৪৭	বাংলা	বোম্বাই	০-০, ১-০	ক'লকাতা
১৯৪৯	বাংলা	হায়দ্রাবাদ	৫-০	ক'লকাতা
১৯৫০	বাংলা	হায়দ্রাবাদ	১-০	ক'লকাতা
১৯৫১	বাংলা	বোম্বাই	১-০	বোম্বাই
১৯৫২	মহীশূর	বাংলা	১-০	বাঙ্গালোর
১৯৫৩	বাংলা	মহীশূর	০-০, ৩-১	ক'লকাতা



১৯৫৪ সালের প্রথম বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান ক্লাব ফটো : ডি রতন



সাহিত্য সংবাদ

দেবানন্দ ঃ শ্রীননীমাধব চৌধুরী ঃ

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ-প্রতিরোধ আন্দোলনের পর বাঙলার জাতীয় জীবনে যে রাজনীতিক চেতনা ও স্বাধীনতা-আন্দোলন ধীরে ধীরে আত্মবিস্তার করিয়াছিল তাহারই পটভূমিকায় উপন্যাসখানি রচিত। এই উপন্যাসের নায়ক ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মচারী জীবানন্দের পুত্র দেবানন্দ। উপন্যাসের দিক হইতে কাহিনীটির গতি ও পরিণতির সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা না থাকিলেও, ইহাতে যে সকল চরিত্র ও তদানীন্তন ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের যে ছবি লেখক আঁকিয়াছেন, তাহা তথ্যপূর্ণ। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই কাহিনীর ব্যাপ্তিকাল। তৎকালে বাঙলার সমাজ জীবন ও রাজনৈতিক আন্দোলন কোন পথে অগ্রসর হইয়াছিল, জাতীয় নেতারা কখন কি রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন ও স্বাধীনতা আন্দোলনে যুগান্তর দল ও বাঙলার ছাত্রসম্প্রদায় কতখানি ত্যাগ ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার বিশদ বর্ণনা বইখানিতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর উপন্যাস শুধু অবসরের অবলম্বন নয়, জাতীয় আন্দোলনের বিশেষ একটা অধ্যায়ের সহিত পাঠকদের পরিচিত হইবার সুযোগ দেয়। বইখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

[প্রকাশক ঃ—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ঃ ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম—৮৲ টাকা।]

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

উপন্যাসের উপকরণ ঃ শ্রীভোলা সেন ঃ

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে গতানুগতিকতা হইতে মুক্তির এক ব্যাপক সাধনা দেখা যাইতেছে। ইহার ফলে সার্থক সৃষ্টি হিসাবে ততটা সাফল্য এখনও প্রত্যক্ষ না হইলেও প্রতিভার স্পর্শদগ্ধাত আশাপ্রদ বহু রচনা ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে। রসিক চিত্তের ইহাতে পুলকিত হইবারই কথা।

আলোচ্য গ্রন্থটির রচনাশৈলীও অভিনব। উপন্যাসের উপকরণ খুঁজিবার প্রয়াস ইহাতে বর্ত্তমান, কিন্তু এখানি স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি উপন্যাস। ইহা এক পরিজনহীন হৃদয়বান বৃদ্ধের শেষ জীবনে খেয়ালী পথে চলিবার কাহিনী, মানুষের মনে একটুখানি ঠাঁই করিয়া লইবার একান্ত কামনায় মানুষের মন যে দুয়ারে দুয়ারে মাথা খুঁড়িয়া মরে, এই উপন্যাসে দরদের সহিত তাহারই ছবি রূপায়িত হইয়াছে। গল্প শেষ পর্য্যন্ত মিলনান্তক, গ্রন্থশেষে বৃদ্ধ তাহার বহুকালের হারাণো কন্যাকে অপ্রত্যাশিতভাবে ফিরিয়া পাইলেন, নাতনী নাতজামাইকে লইয়া জীবনসায়াহ্নে তাঁহার সুখনীড় গড়িয়া উঠিল।

বইখানিতে পাকা হাতের ছাপ আছে, নানা বহিরঙ্গ ও বিচিত্র চরিত্রের সমাগমেও ইহার মূল চরিত্রের কেন্দ্রিকতা নষ্ট হয় নাই। তবে এই শ্রেণীর গ্রন্থে যে ত্রুটি প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায়, আলোচ্য উপন্যাসখানিও তাহা হইতে মুক্ত নহে। কাহিনীর একমুখিতা বা মূলচরিত্রের অন্তর্মুখিতার জন্য পড়িতে পড়িতে একাধিক জায়গায় বেশ কিছুটা একঘেয়ে লাগে। তা ছাড়া রোমাণ্টিকতার প্রাবল্যে কোন কোন স্থলে গল্পের বুনানি কাঁপিয়া গিয়াছে।

মোটের উপর, নূতন ধরণের লেখা হিসাবে বইখানি পাঠকসমাজে সমাদৃত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। গ্রন্থের রূপসজ্জাও আকর্ষণীয়।

[প্রকাশক ঃ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ঃ ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম—২॥০ আনা।]

শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

মেঘলা আকাশ ঃ রামপদ মুখোপাধ্যায় ঃ

আদর্শবাদী ইস্কুল মাষ্টার হরিশ। হরিপুর নামক এক গণ্ডগ্রামের একটি ইস্কুলে শিক্ষকতা করেন তিনি। এই শিক্ষকতাই তাঁর জীবনের মহৎ ব্রত। সকল কর্ম এবং আচরণের মধ্যে শিক্ষকের কর্তব্যবোধ তাঁর অন্তরে সজাগ হ'য়ে থাকে। এর জন্যে জীবনব্যাপী কৃচ্ছ্রতা বরণ ক'রে নিয়েছেন তিনি, পরিবারবর্গকেও এই কৃচ্ছ্রতা বরণে বাধ্য ক'রেছেন। এমন সময় হ'ল যুদ্ধের আবির্ভাব। সেই সঙ্গে এলো অন্নকষ্ট, এলো চোরাবাজার, এলো দুর্নীতি। পারিপার্শ্বিক দুনিয়ার এই বীভৎস ব্যভিচারের সঙ্গে আদর্শবাদী হরিশ মাস্টারের মনের দ্বন্দ্ব, সকল প্রকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ইস্কুল মাস্টারের অনাড়ম্বর মহৎ জীবন—প্রভৃতি অপূর্ব ভাষায় রচনা করেছেন লেখক এই ছোট উপন্যাসখানিতে। ভাষা ও কাহিনীবিন্যাস সব কিছু মিলে গ্রন্থখানিকে অতি মাত্রায় আকর্ষণীয় করেছে। একবার পড়তে আরম্ভ করলে বইখানি শেষ না করে ওঠা যায় না।

[প্রকাশক ঃ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড্ পাব্লিশিং কোং লিঃ ঃ ৯৩, হ্যারিশন রোড, কলিকাতা—৭। দাম—২॥০ আনা।]

সাগরিক ঃ—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ

বইখানির প্রারম্ভেই লেখক এর বিষয়বস্তু সম্বন্ধে এক কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। বলেছেন—'সমুদ্রতীরের কয়েকটি দিনের সঞ্চয় এই সাগরিক।···প্রবাসের দিনলিপির আরম্ভ যেমন আকস্মিক, তার সমাপ্তিও তেমনি অর্ধ পথে। সাগরিক পড়তে গিয়ে লেখককে কেউ অপরাধী না করেন, সেইজন্যেই গোড়াতে এই কৈফিয়ৎ।' সুতরাং এ কাহিনী সম্পর্কে এর পর আর কিছু বড় একটা বলার থাকে না। তবুও যদি বলতে হয় তা হলে এই কথাই বলবো যে, অতি সামান্য ঘটনাকে ভাষা ও বর্ণনার মাধুর্যে অসামান্য করে তুলেছেন নারায়ণবাবু। যে কয়টি চরিত্রের আবির্ভাব ঘটেছে এই কাহিনীর মধ্যে প্রত্যেকটিই মনে রাখার মতো। বিশেষ ক'রে হার্ডওয়ার মার্চেণ্ট নিঃসন্তান চাটুয্যে দম্পতি। প্রথম জীবনে যাঁরা নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাপনের স্বপ্নানন্দে রুদ্ধ করেছিলেন সন্তানের জন্ম, পরে সেই সন্তানেরই আকাঙ্ক্ষায় অতৃপ্ত জীবনের নিদারুণ পরিসমাপ্তি সত্যই মর্মান্তিক।

[প্রকাশক ঃ—সাহিত্য জগৎ ঃ ২০৩।৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম—২॥০ আনা।]

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

গ্রামছাড়া ছেলেরা ঃ (কিশোর কাহিনী) শ্রীমণীন্দ্র দত্ত। আলোচ্য গ্রন্থখানির লিখন-শৈলী ও চিত্র-অঙ্কণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ভাষা প্রাঞ্জল, ব্যঞ্জনার কাব্য-সৌন্দর্য্য। এই গ্রন্থে প্রখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্র দত্ত কিশোর কিশোরীদের আসরে অশ্রু ও আশ্বাসের কথাই শুনিয়েছেন। বাস্তুহারা পরিবারের অসহায় দুঃখের অংশীদার হয়ে যারা পথে নেমে এলো, সেই সব অগণিত কিশোরের জীবন-আলেখ্য মর্ম্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। প্রথমেই ছেড়ে আসা গ্রামের ছবিটী এঁকে বলা হয়েছে—'তাকে দূর থেকে ভালোবাসা যায়, কিন্তু তার কোলে বাস করা যায় না—বিদ্যাব্যথি স্কুলের ছাত্র দীপঙ্কর কল্‌কাতা সহরে এসে বিদ্যালয়ের ছাত্র হয়েও ভুলতে পারেনি গ্রামের কথা। তার হারানো দিনগুলির কথা মনে প'ড়ে—'সে দেশে কি আর ফিরে যাওয়া যায় না ?' এর উত্তর বেরিয়ে এলো—'তা যদি যাওয়া যেতো, তা হোলে কিশোর নচিকেতা কখনো বাঙ্‌লা দেশের মাটি ছেড়ে ভারত মহাসাগরের বুকে পাড়ি জমাতো না।'

নচিকেতা চরিত্রটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনুতোষের জীবন কথা অত্যন্ত করুণ—'অকস্মাৎ রাহুগ্রস্ত হোলো চাঁদ। আকাশে আঁকা রইলো শুধু তার ছিন্ন দেহের রক্তের স্বাক্ষর।...' পল্লবের কথাও শুনবার মত হয়েছে। স্মৃতিতে জড়িয়ে আছে যে সুকোমল শিউলি গাছের সঙ্গে এক হয়ে তার ইতিহাস মনে গভীর রেখাপাত করে। পূজার ছুটিতে ছেড়ে আসা গ্রামে গিয়ে, ঝরা শিউলির মত যারা স্মরণের আঙিনা ভরেছিল, পাঠক সমাজের সামনে তাদের তুলে ধরে গ্রন্থকার বলছেন—'ওমনি করেই তো দেশে দেশান্তরে ছড়িয়ে আছে দীপংকর, নচিকেতা, অনুতোষ, পল্লব, সুকোমল ও নাম-না-জানা কত গ্রাম ছাড়া কিশোর ছেলে।'

আন্দামানের অরণ্য মাটিতে অতুল সমিতির আপ্রাণ চেষ্টায় ঘর ছাড়া মানুষরা বাঁধতে লেগেছে নতুন ঘর, জাহাজে চড়ে আসছে আরও বাস্তুহারার দল, আর তারই মধ্যে দাঁড়িয়েছে ওদের পণ্ডিত মশাই নচিকেতা। শ্যামা বাঙ্‌লার প্রাণপ্রবাহ বিস্তারের প্রচেষ্টা আর নতুনের জয় ঘোষণার পৃষ্ঠা-ভাষ আন্দামানের ভেতর কেন্দ্রীভূত হয়ে গ্রন্থের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। আলোচ্য গ্রন্থের বিভিন্ন চরিত্র কিশোর সমাজের হৃদয়গ্রাহী হবে, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিশোর সাহিত্যে গ্রন্থকারের দক্ষতার পরিচয় বিশেষভাবেই পাওয়া গেছে। গ্রন্থখানির প্রচার কামনা করি। ছাপা কাগজ ও প্রচ্ছদপট যুগোপযোগী হয়েছে।

[প্রকাশক : 'তুলেকলম'এর পক্ষে শ্রীকল্যাণব্রত দত্ত : ৪নং মধুপাল লেন, কলিকাতা—৫। দাম—১৲ টাকা।]

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

জোটের মহল ঃ অমরেন্দ্র ঘোষ ঃ

এই উপন্যাসখানা, স্বয়ংসম্পূর্ণ হইলেও কণকপুরের কবির পরিপূরক। এ যাবৎ কৃষক-বিপ্লব সম্বন্ধে বাংলা সাহিত্যে অনেকগুলি রসোত্তীর্ণ বই লেখা হয় নাই। কিন্তু এখানা সে সার্থকতা দাবী করিতে পারে। নায়ক দিবাকরের বলিষ্ঠতা অনেকদিন পর্য্যন্ত পাঠকের চিত্তে ছাপ রাখিয়া যাইবার যোগ্য! ইংরেজ আমলে তদানীন্তন প্রগতিশীল আন্দোলন যে কী ভাবে কৃষকজীবনে পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহা লেখক অত্যন্ত দরদ ও মুন্সীয়ানার সঙ্গে দেখাইয়াছেন। নায়িকা মুক্তা এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। কিন্তু পার্শ্ব চরিত্র কুন্তলাও এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য—তথাকথিত জনদরদীদের প্রতি এক তীব্র কশাঘাত! পূর্ব্ব-বাংলার পটভূমি ও সংলাপ রচনায় দক্ষিণের বিল ও চরকাশেমে লেখক যে দক্ষতা দেখাইয়াছেন এ বইতেও তাঁহার কৃতিত্ব অক্ষুণ্ণ আছে। প্রচ্ছদপটটী মনোরম ও প্রতিভূমূলক।

[প্রকাশক ঃ ডি, এম লাইব্রেরী ঃ দাম—৩৷৹ টাকা]

ভানু রায়

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

নগেন্দ্রনাথ সোম প্রণীত জীবনী-গ্রন্থ "মধু-স্মৃতি" (২য় সং)—১০৲
শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "নিরুদ্দেশ"—৪৲
শ্রীবীরেন দাস প্রণীত "নরখাদক"—১৲
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত রহস্যোপন্যাস "অফিস মার্ডার"—১৷৹
শ্রীনরেন্দ্র দেব প্রণীত "অনেক দিনের অনেক কথা"—২৲
রাধারমণ প্রামাণিক প্রণীত উপন্যাস 'উত্তর ফাল্গুনী'—২৲
রেণুকা দেবী প্রণীত উপন্যাস 'মেঘমালা'—২৷৹
শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত নাটক "নর-নারায়ণ" (৭ম সং)—২৷৹
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত রহস্যোপন্যাস "বনে জঙ্গলে কৃষ্ণা"—১৷৹, "রহস্যময়ী শিখা"—৸৹
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত "বঙ্গ বিজেতা"—১৲
শ্রীপ্রবুদ্ধকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "স্বরলিপি-কৌমুদী"—২৷৹
কুমারেশ ঘোষ প্রণীত উপন্যাস 'পণ্যা'—৩৲ অনুবাদ গ্রন্থ 'বেনহুর'—১৷৹
বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত কাব্যগ্রন্থ 'সম্ভবা'—২।০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩৷১৷১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



শিল্পী—শ্রীবীরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী অকাল বোধন ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস



কার্ত্তিক—১৩৬১

প্রথম খণ্ড | দ্বিচত্বারিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

জ্ঞান ও কর্ম

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

হিন্দুদর্শনের একটি বিশেষত্ব এই যে ইহাতে কেবল তত্ত্বকথা বলা হয় নাই, সেই তত্ত্ব কিরূপে অনুভব করিতে পারা যায় তাহার উপায়ও বলা হইয়াছে। সাধারণ ভাবে তত্ত্ব জানাকে 'জ্ঞান' বলা হইয়াছে, সেই তত্ত্বের অনুভব বা সাক্ষাৎকারকে 'বিজ্ঞান'(১) বলা হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য 'ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিবার সময় বলিয়াছেন 'অবগতি পর্য্যন্তং জ্ঞানং' অর্থাৎ এরূপ জ্ঞান হইবে যাহাতে ঈশ্বর লাভ হয়। ব্রহ্ম কিরূপ বস্তু উপনিষদে তাহা বলা হইয়াছে, কিরূপে ব্রহ্মকে লাভ করা যায় তাহাও বলা হইয়াছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদ বলিয়াছেন, যাগ যজ্ঞ শ্রাদ্ধ তর্পণ এই সকল কর্মে কখনও অবহেলা করিবে না(২)। বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছায় অনাসক্তভাবে যজ্ঞ, দান ও তপস্যার অনুষ্ঠান করেন(৩)। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য যজ্ঞ একটি উপায়। যজ্ঞে নানা দেবতার উপাসনা করা হয়, মন্ত্র পড়িয়া অগ্নিতে ঘৃত প্রভৃতি আহুতি দিতে হয়। সুতরাং উপনিষদের মতে এই সকল দেবতার কল্পনা মিথ্যা নহে, দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যপ্রদান ব্যর্থ নহে। অনেকে মনে করেন উপনিষদে যখন এক ব্রহ্মের কথা আছে, তখন বুঝি বেদে যে সকল ইন্দ্র বায়ু অগ্নি প্রভৃতি দেবতার কথা আছে উপনিষদের ঋষিগণ সে সকল দেবতায় বিশ্বাস করিতেন না। ইহা কিন্তু যথার্থ নহে। এক সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ ব্রহ্মের কল্পনার সহিত ইন্দ্রাদি দেবতার কল্পনার কোনও বিরোধ নাই। ইন্দ্রাদি দেবতা মনুষ্যের তুলনায় অধিক জ্ঞানসম্পন্ন এবং শক্তিশালী হইলেও ব্রহ্মের তুলনায় তাঁহাদের জ্ঞান ও শক্তি অল্প। উপনিষদে বহু স্থলে এই সকল দেবতার

১। জ্ঞানং তে ইহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ। গীতা ৭।২

২। "দেব পিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যং,"—দেবকার্য্য অর্থাৎ যাগযজ্ঞ, পিতৃকার্য্য অর্থাৎ শ্রাদ্ধ তর্পণে।

৩। "তমেতং ব্রাহ্মণাঃ বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা ইনাশকেন।"

উল্লেখ আছে(৪)। অপর পক্ষে বেদের মন্ত্র বা সংহিতা অংশে বহু স্থলে ব্রহ্ম বা সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উল্লেখ আছে(৫)। এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এবং তাঁহার অধীনে ইন্দ্রাদি বহু দেবতা, এই কথা বেদেও আছে উপনিষদেও আছে—এ বিষয়ে বেদ ও উপনিষদের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। দুঃখের বিষয় কয়েকটি পাশ্চাত্য শিক্ষিত আধুনিক ভারতীয় পণ্ডিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন যে এ বিষয়ে বেদ ও উপনিষদের মধ্যে বিরোধ আছে। উপনিষদের উৎপত্তি সম্বন্ধে Sir Sarvapalli Radhakisen লিখিয়াছেন, "উপনিষদের ঋষিগণের সন্দেহ হইল যে সকল দেবতাকে এতদিন অজ্ঞভাবে উপাসনা করা হইতেছিল, তাঁহারা বাস্তবিক আছেন কি না। বেদে আদিম মনুষ্যোচিত বহু দেবতার কথা আছে, তাহার অনেক পরে উপনিষদের দার্শনিক বিচার হইয়াছিল"(৬)। অধ্যাপক ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখিয়াছেন, "বেদের অপর অংশ হইতে উপনিষদ একান্ত বিভিন্ন, উপনিষদে জ্ঞানমার্গের কথা আছে, তাহা কর্মমার্গের বিরোধী"(৭)। আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি যে উপনিষদের মতে কর্মের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়, অর্থাৎ কর্ম ও জ্ঞানের মধ্যে বিরোধ নাই। অধ্যাপক ডাঃ শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে উপনিষদে বেদ হইতে ভিন্ন ধর্ম প্রতিপাদন করা হইয়াছে, সে ধর্ম বৈদিক কর্মকাণ্ডের বিরোধী(৮)। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীরাণাডে লিখিয়াছেন, বেদের ব্রাহ্মণ অংশে যে যজ্ঞের কথা আছে উপনিষদ কয়েকস্থল ব্যতীত তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী(৯)। শ্রীযুক্ত রাণাডের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে উপনিষদের কোনও কোনও স্থলে যজ্ঞের সমর্থন আছে, আবার কোথাও যজ্ঞের বিরোধ আছে। অর্থাৎ উপনিষদ পরস্পর বিরোধী। বলা বাহুল্য এই উক্তি ভ্রান্ত। উপনিষদের কোনও কোনও স্থলে আপাততঃ বিরোধ আছে মনে হয় বটে, কিন্তু উত্তর মীমাংসা দর্শনে সে সকল বাক্যের সামঞ্জস্য করা হইয়াছে। উপনিষদে যদি পরস্পর বিরোধ থাকিত তাহা হইলে শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব, সারণ প্রভৃতি বৈদিক পণ্ডিত উপনিষদ ও বেদকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেন না। বাস্তবিক উপনিষদে কোথাও যজ্ঞের বিরোধ নাই। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হিরিয়ান্না লিখিয়াছেন যে উপনিষদের ভাব বেদের কর্মকাণ্ড হইতে ভিন্ন—কেবল ভিন্ন নহে বিরোধী(১০)। এই উক্তির সমর্থনে অধ্যাপক হিরিয়ান্না একটিমাত্র উপনিষদ্ বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, "প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ" (মুণ্ডক ১।২।৭)। এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে সকাম যজ্ঞের দ্বারা মোক্ষ লাভ করা যায় না, তাহাতে স্বর্গলাভ করা যায়, কিন্তু স্বর্গভোগের পরে পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু নিষ্কাম ভাবে যজ্ঞ করিবার ফলে চিত্তশুদ্ধি হয়, তাহাতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়—এ কথাও উপনিষদ অন্যত্র বলিয়াছেন। সুতরাং উপনিষদ যজ্ঞের বিরোধী নহেন। অধ্যাপক হিরিয়ান্না যে উপনিষদের বাক্য হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে উপনিষদ যজ্ঞের বিরোধী সেই মুণ্ডক উপনিষদের ১২ খণ্ডের প্রথমেই বলা হইয়াছে যে যজ্ঞ

৪। অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্—ঈশোপনিষদ্ তস্মাদ্বা এতে দেবা অতি তরামিব অন্যান্ দেবান্ যদগ্নির্বায়ুরিন্দ্রঃ—কেনোপনিষদ্
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ—কঠোপনিষদ
দেবানামসি বহ্নিতমঃ—প্রশ্নোপনিষদ
তস্মাদ দেবা বহুধাঃ সম্প্রসূতাঃ—মুণ্ডক উপনিষদ ইত্যাদি।

৫। একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি ঋগ্বেদ সংহিতা ২।৩।৩২
উপাসতে প্রশিষং যস্তদেবাঃ ঐ ১০।১২১
মহিত্বা এক ইদ্ রাজা জগতো বভুব ঐ ঐ
পাদোইস্য সর্বাভূতানি ঐ ১০।৯০

৬। "Man sat down to doubt the gods they ignorantly worshipped, * * From primitive polytheism to systematic philosophy pp 71, 72

৭। The upanishads are an entirely different type from the rest of the Vedic literature as indicating the path of knowledge (jnana marga) as opposed of the path of works (Kama marga)—**History of Indian Philosophy.**

৮। "Indeed the upanishads really expound a new religion ceremonial" Hindu Civilization p.118

৯। "The spirit of the upanishads is on the other hand oassing a few exceptions entirely antaganistic to the sacrificial doctrine of the Brahmanas. "A constructive survey of upanishadic Philosophy (pp 6, 7)

১০। "The upanishads primarily represent a spirit different from and even hostile to ritual" **p. 48.**

সকল সত্য এবং সে সকল অনুষ্ঠান করা উচিত। "তদেতৎ সত্যং মন্ত্রেষু কর্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যন্। * * তান্যাচরথ-নিয়তং সত্যকামাঃ"। অতএব অধ্যাপক হিরিয়ান্না কর্ম-কাণ্ডের সহিত উপনিষদের যে বিরোধ কল্পনা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অলীক। ব্রহ্মজ্ঞান ও দেবতত্ত্বে বিরোধ আছে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের প্রচারিত এই ভ্রান্ত মত রবীন্দ্রনাথকেও প্রভাবিত করিয়াছে। এজন্য তিনি রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী সভায় বৈদিক যজ্ঞকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, Primitive races believe that their ceremonials have a magic influence upon their deities. যজ্ঞের ফলদায়কতা কেবল যে প্রাচীন বৈদিক যুগের লোকে বিশ্বাস করিতেন তাহা নহে, উপনিষদের ঋষিগণ বিশ্বাস করিতেন। পৌরাণিক যুগে শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, ব্যাস, বাল্মীকি বিশ্বাস করিতেন, ঐতিহাসিক যুগে শঙ্করাচার্য্য রামানুজ, মধ্ব প্রভৃতি বৈদান্তিক পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করিতেন।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে উপনিষদের আদেশ—দেব-পিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যং অর্থাৎ দেবকার্য্য এবং পিতৃকার্য্যে অবহেলা করিবে না। যজ্ঞ, সন্ধ্যা, তর্পণ,—এ সকল কর্মই এই বাক্যের দ্বারা সমর্থিত হইতেছে। এই প্রসঙ্গে উপনিষদ আরও বলিয়াছেন, "ধর্মং চর" অর্থাৎ ধর্ম আচরণ করিবে। যা বেদবিহিত তাহাই মুখ্যতঃ ধর্ম। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থও বেদমূলক—বৈদিক ধর্ম প্রচার করিবার জন্যই এই সকল গ্রন্থ ঋষিগণ কর্তৃক লিখিত হইয়াছে। মনু সম্বন্ধে বেদ বলিয়াছেন, "যদ্ বৈ কিঞ্চ মনুঃ অবদৎ তৎ ভেষজং" (তৈত্তিরীয় সংহিতা ২।২।১০।২) অর্থাৎ মনু যাহা বলিয়াছেন তাহা ঔষধের ন্যায় হিতকারী। মনুসংহিতায় দেখা যায় যে মনু যাহার জন্য যাহা ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন তাহা ধর্ম বলিয়া বেদেই উক্ত হইয়াছে :

যঃ কশ্চিৎ কস্যচিৎ ধর্মো মনুনা পরিকীর্তিতঃ
স সর্বোভিহিতো বেদে—(মনুসংহিতা ২।১৭)

মনু বলিয়াছেন যে শ্রুতি ও স্মৃতিই ধর্মের প্রকাশক। (মনু ২।১০)

সুতরাং উপনিষদ যে বলিয়াছেন "ধর্মং চর" তাহার অর্থে বুঝিতে হইবে শ্রুতি ও স্মৃতিবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করা উচিত। শঙ্করাচার্য্য তৈত্তিরীয় উপনিষদের এই অংশের ব্যাখ্যা করিবার সময় বলিয়াছেন, "প্রাগ্ ব্রহ্মাত্ম বিজ্ঞানাৎ নিয়মেন কর্তব্যানি শ্রৌতস্মার্তানি কর্মাণি" অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পূর্বে নিয়মপূর্বক শ্রুতি ও স্মৃতিবিহিত কর্ম করা উচিত। মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থে দেখা যায় যে প্রত্যেক ব্যক্তির কোন্ কর্ম কর্তব্য তাহা তাহার বর্ণ এবং আশ্রমের উপর নির্ভর করে। ইহাকেই বর্ণাশ্রম ধর্ম বলা হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পূর্বে এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করা কর্তব্য। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এ কথা স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন—তিনি বলিয়াছেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার বর্ণবিহিত কর্ম অনুষ্ঠান করিবার সময় চিন্তা করিবে, "ঈশ্বর সর্বব্যাপী, আমার বর্ণবিহিত কর্মের দ্বারা আমি সর্বব্যাপী ঈশ্বরকে আরাধনা করিতেছি,"—এইভাবে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করিলে সিদ্ধি লাভ করা যায়—অর্থাৎ মোক্ষলাভের অধিকারী হওয়া যায়।

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততং।
স্বকর্মণা তমভ্যচ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥

গীতা ১৮।৪৬

"যে ঈশ্বর হইতে সকল প্রাণীর উৎপত্তি, যিনি নিখিল জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, নিজ বর্ণবিহিত কর্মের দ্বারা তাঁহাকে উপাসনা করিলে মানব সিদ্ধি লাভ করিতে পারে।" বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন নিজ বর্ণাশ্রমবিহিত কর্মানুষ্ঠান দ্বারা ঈশ্বরকে আরাধনা করা উচিত।

বর্ণাশ্রমাচারবতো পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তোষকারণং॥

"বর্ণাশ্রমবিহিত আচারের দ্বারা পরমপুরুষ বিষ্ণু পূজিত হয়েন। তাঁহাকে তুষ্ট করিবার অন্য উপায় নাই।" ব্রহ্ম-সূত্রের ভাষ্য রচনা সমাপ্ত করিয়া রামানুজাচার্য্য লিখিয়াছেন, "এবং অহরহরনুষ্ঠীয়মান বর্ণাশ্রমধর্মানুগৃহীত তদুপাসনরূপ তৎসমারাধনপ্রীত উপাসনাদ্ অনাদিকালপ্রবৃত্ত-অনন্তদুস্তর-কর্মসঞ্চয়রূপবিদ্যাং বিনিবর্ত্য স্বযাথাত্ম্যানুভবরূপ অনবধিকা-তিলম্ আনন্দং প্রাপর্য্য পুনর্ননিবর্তয়তি।

(ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।২২ শ্রীভাষ্য)

অর্থাৎ প্রত্যহ বর্ণাশ্রমধর্ম অনুষ্ঠান করিলে তদ্দারা ঈশ্বরকে উপাসনা করা হয়, তাহাতে তিনি প্রীত হন এবং অনাদিকাল হইতে আমরা যে সকল অন্যায় কর্ম করিয়াছি

সেই কর্মরাশিরূপ অবিদ্যা দূর করেন, তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন, তাহাতে নিরতিশয় আনন্দ লাভ হয় এবং পুনরায় সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য বর্ণাশ্রমধর্মের উপযোগিতা ব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্র ৩।৪।২৬ সূত্রে (সর্বাপেক্ষাতু যজ্ঞাদি শ্রুতেরশ্ববৎ) তিনি বলিয়াছেন যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য সকল রূপ কর্মের প্রয়োজনীয়তা আছে। এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য উপনিষদ বাক্য তুলিয়া দেখাইয়াছেন যে আশ্রমবিহিত কর্মসকল ব্রহ্মজ্ঞানের সাধক। কঠোপনিষদ বলিয়াছেন—সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্বাণি চ যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেন ব্রবীমি (১।২।১৫) অর্থাৎ সকল বেদ যে ব্রহ্মের প্রাপ্তির উপায় নির্দেশ করে, সকল তপস্যা যাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া করা হয়, যাঁহাকে পাইবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করা হয়,—তোমাকে সেই ব্রহ্মের কথা বলিব। এখানে দেখা যাইতেছে যে বেদপাঠ, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা প্রভৃতি আশ্রমবিহিত কর্ম ব্রহ্মলাভের উপায়। রামানুজ-ই সূত্রের ভাষ্যে গীতা ১৮।৪৬ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম পালনের কথা বলিয়াছেন। পরবর্তী সূত্রে (৩।৪।২৮) ব্যাসদেব বলিয়াছেন, যে বর্ণাশ্রমধর্ম পালন করিবার সময় শম, দম প্রভৃতি অভ্যাস করা প্রয়োজন। শম অর্থাৎ কামনা ত্যাগ; দম অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযম। পরবর্তী সূত্রে (৩।৪।২৮) ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথম অধ্যায় দশম খণ্ডের উষস্তি ঋষির উপাখ্যানের উল্লেখ পাওয়া যায়। দুর্ভিক্ষের সময় প্রাণ সংশয় হওয়াতে ইনি মাহুতের নিকট মাসকলাই লইয়া খাইয়াছিলেন, পরে যখন মাহুত জল দিতে চাহিয়াছিল তখন তাহার জল খান নাই, মাহুত জিজ্ঞাসা করিল "কলাই খাইলেন, জল খাইতে আপত্তি কেন?" উষস্তি বলিলেন, "কলাই না খাইলে প্রাণ ধারণ করিতে পারিতাম না, জল আমি অন্যত্রও পাইব।" ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিষয়ে শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধিনিষেধ সাধারণতঃ অনুসরণ করা উচিত, তবে প্রাণসংশয় হইলে সেই সকল নিয়ম অতিক্রম করিতে পারা যায়। পরবর্তী সূত্রেই (৩।৪।২৯) উপনিষদের এই বাক্যটি লক্ষ্য করা হইয়াছে "আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ" (ছান্দোগ্য ৭।২৬।২) আহার শুদ্ধি হইলে বুদ্ধি শুদ্ধ হয়, বুদ্ধি শুদ্ধ হইলে ধ্রুব স্মৃতি হয়, অতএব ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য আহার শুদ্ধি প্রয়োজন—যাহা খুসী তাহা খাইলে হইবে না। ৩।৪।৩১ সূত্রে এ বিষয়ে একটি বেদবাক্যকে লক্ষ্য করা হইয়াছে—তস্মাৎ ব্রাহ্মণো সুরাং নপিবেৎ (যজুর্বেদ সংহিতা) অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সুরা পান করিবে না। ৩।৪।৩৬ সূত্রে বলা হইয়াছে যে যাঁহারা কোনও আশ্রমের অন্তর্বর্ত্তী নহেন তাঁহারাও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন (এ বিষয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদে রৈক্কের উপাখ্যান আছে,—তিনি শকট-চালক ছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন—বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখা যায় বাচক্নবী রমণী হইয়াও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন)। আশ্রমধর্মে অধিকার না থাকিলেও জপ উপবাস দান নামসঙ্কীর্তন প্রভৃতিতে সকলের অধিকার আছে, সেই সকল কর্মের সাহায্যে সকলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন, বেদে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতেও এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যথা ভীষ্ম, সংবর্ত। মনু-সংহিতাতেও বলা হইয়াছে যে ব্রাহ্মণ অন্য আশ্রমধর্ম পালন করুক বা না করুক কেবল জপের দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিতে পারে * (মনু ২।৮৭)। জপ, উপবাস, দান প্রভৃতি ধর্ম কর্মের দ্বারাও ঈশ্বরকে প্রীত করিয়া তাঁহার অনুগ্রহে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়, সকল বর্ণের লোকের এই ধর্ম কর্মে অধিকার আছে। প্রশ্নোপনিষদ বলিয়াছেন "তপস্যা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়া আত্মানম্ অন্বিষ্যেৎ" অর্থাৎ তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য শ্রদ্ধা ও বিদ্যার দ্বারা আত্মাকে অন্বেষণ করিবে। এই সকল কর্মের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব,—কিন্তু আশ্রম ধর্ম পালনই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকতর উপযোগী (ব্রহ্মসূত্র ৩।৪।৩৬-৩৯)।

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় সম্বন্ধে উপনিষদ বলিয়াছেন "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ" (বৃহদারণ্যক ২।৪।৫) অর্থাৎ আত্মাকে

* জপের দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিতে হইলেও সদাচার পালন করা প্রয়োজন। নিষিদ্ধ আচার পালন করিলে জপ নিষ্ফল হয়। বৈষ্ণব গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে নাম অপরাধ হইলে নাম জপ করিয়াও সিদ্ধি লাভ করা যায় না। নিষিদ্ধ আচার নাম-অপরাধের অন্তর্গত। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, মধ্য লীলা, ১৯ পরিচ্ছেদ।

দর্শন করিতে হইবে,—দর্শন করিবার উপায়, প্রথমতঃ শ্রোতব্যঃ শ্রবণ করিতে হইবে, শাস্ত্র ব্রহ্ম বিষয়ে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা শ্রবণ করিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ মন্তব্যঃ চিন্তা করিতে হইবে, তৃতীয়তঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ অর্থাৎ ধ্যান করিতে হইবে। যতক্ষণ ব্রহ্ম দর্শন না হয় ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে হইবে। চিন্তা প্রবাহকেই ধ্যান বলা হয়। এই শ্রুতিবাক্যকে লক্ষ্য করিয়া বেদব্যাস বলিয়াছেন "আবৃত্তিঃ অসকৃৎ উপদেশাৎ" (ব্রহ্মসূত্র ৪।১।১) অর্থাৎ ব্রহ্মকে বার বার চিন্তা করিতে হইবে,—একবার চিন্তা করিলে হইবে না। এই বার বার চিন্তা বা ধ্যানের সহায়রূপে মালা জপ করিবার ব্যবস্থা আছে। ধ্যান করিবার সময় মন একান্ত রাখিতে চেষ্টা করিতে হইবে—যেন বিজাতীয় চিন্তাপ্রবাহ বাধা না দেয়। ধ্যানের প্রধান অন্তরায়, কামনা প্রভৃতি মলিনতা। আমাদের মনে নানারূপ বাসনা থাকে বলিয়া ধ্যান করিতে বসিলেও আমাদের চিত্ত বিষয়-চিন্তা করে। ধ্যানের বাধা দূর করিবার জন্য আমাদের হৃদয়ের কামনা-বাসনা অপসারিত করা প্রয়োজন—চিত্ত নির্মল করিতে হইবে। চিত্ত নির্মল করিবার জন্য বর্ণাশ্রম-বিহিত কর্ম বিশেষ উপযোগী—জপ দান উপবাস প্রভৃতি কর্মও কথঞ্চিৎ উপযোগী।

ভক্তি বা জ্ঞান আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু সেই ভক্তি বা জ্ঞান লাভ করিবার জন্য কর্ম প্রয়োজন। নিম্নতর সোপান-রূপ কর্মকে বাদ দিয়া একেবারে ভক্তি বা জ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর নহে। ঈশোপনিষদে বিদ্যা ও অবিদ্যা তত্ত্ব বিচার দ্বারা এই কথাটি প্রকাশ করা হইয়াছে। বিদ্যা অর্থাৎ ভক্তি বা জ্ঞান; অবিদ্যা অর্থাৎ কর্ম। ঈশোপনিষদ বলিয়াছেন যিনি ভক্তি ও জ্ঞান বাদ দিয়া কেবল কর্মের অনুষ্ঠান করেন তিনি গভীর অন্ধকারে নিমগ্ন হন। কারণ কর্ম দ্বারা স্বর্গলাভ হইলেও, যেহেতু স্বর্গ চিরস্থায়ী নহে, অতএব স্বর্গবাসের পর পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে এবং পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলেই অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন হইতে হইবে। তাহার পর শ্রুতি বলিয়াছেন যে যিনি কর্ম বাদ দিয়া একেবারে ভক্তি বা জ্ঞান লাভের চিন্তা করেন তিনি আরও গভীর অন্ধকারে পতিত হন,—আরও গভীর অন্ধকার বলিবার তাৎপর্য্য এই যে যিনি কেবল কর্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁহার চিত্ত ক্রমশঃ শুদ্ধ হইতে থাকে, চিত্ত শুদ্ধ হইলে কোনও সদ্‌গুরুর উপদেশ পাইলে তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যিনি কর্ম বাদ দিয়া কেবল জ্ঞানের চর্চা করেন, তাঁহার চিত্ত কখনই শুদ্ধ হয় না, অতএব তাঁহার কখনও ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা থাকে না। তিনি একটা বড় জিনিষের ওজর দেখাইয়া তাঁহার কর্তব্য অবহেলা করিতেছেন মাত্র। তাহার পর শ্রুতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—যে ব্যক্তি কর্ম ও ভক্তি উভয়ের অনুষ্ঠান করেন, তিনি কর্ম দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া ভক্তির দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া সোমের অধিকারী হন। আমাদের পূর্বকৃত পাপরাশিই মৃত্যু, ইহাই আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অন্তরায়। পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা এই পাপ দূর করা সম্ভব। বেদ বলিয়াছেন "পুণ্যেন পাপমপনুদতি।" গীতায় ভগবান বলিয়াছেন

> যেষামন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাং।
> তে দ্বন্দ্বমোহ নির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥
>
> গীতা ৭।২৮

অর্থাৎ পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা যাহাদের পাপ বিনষ্ট হয়, তাহারা সুখ দুঃখ প্রভৃতির দ্বন্দ্ব রূপ অজ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আমার ভজনা করেন। বিদ্যা ও অবিদ্যা সম্বন্ধে শ্রুতির শ্লোকগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

> অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে ঽবিদ্যামুপাসতে।
> ততো ভূয়ইব তে তমঃ য উবিদ্যায়াং রতাঃ॥
> বিদ্যাং চ অবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদো ভয়ং স হ।
> অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে॥
>
> ঈশোপনিষদ ৯ ও ১১

এই শ্লোকগুলির যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইল তাহা আচার্য্য রামানুজের মতানুযায়ী। আচার্য্য শঙ্কর এই শ্লোকগুলির কিছু ভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু রামানুজের মধ্যে যে তত্ত্ব আছে তাহা শঙ্কর অন্যত্র স্বীকার করিয়াছেন, যথা তৈত্তিরীয় উপনিষদ ১।১১র ভাষ্য। বস্তুতঃ তৈত্তিরীয় ভাষ্যে শঙ্কর যে ভাবে ঈশোপনিষদের ১১ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে রামানুজের ব্যাখ্যাই সমর্থন করে।



অপদার্থ

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘটনাটি ঘটিয়াছিল অল্পাধিক চল্লিশ বছর আগে। তাহাও আবার বিহার প্রদেশের অজ পাড়াগাঁয়ে। সুতরাং ইহাকে আদিম কালের কাহিনী বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

গঙ্গার তীরে চরের উপর গ্রাম—দিয়ারা মনপথল। সহর হইতে চৌদ্দ পনরো মাইল দূরে। সভ্যতার আলো এখানে মৃৎপ্রদীপের শিখা হইতে বিকীর্ণ হয়, কদাচিৎ হ্যারিকেন লণ্ঠনের ধোঁয়াটে কাচের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু তবু গ্রামটি সমৃদ্ধ। প্রায় তিন শত ঘর ভুঁইয়া রাজপুত এখানে বাস করে।

সম্পৎ সিং এই গ্রামের বর্ধিষ্ণু জোতদার, দেড়শত বিঘা জমি চাষ করেন। গৃহে লক্ষ্মীর কৃপা উছলিয়া পড়িতেছে। পঞ্চাশ বছর বয়সে গ্রামের সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিয়া চলে, বিপদে আপদে তাঁহার পরামর্শ ও সহায়তা অন্বেষণ করে। কিন্তু তাঁহার মনে সুখ নাই, একমাত্র পুত্র ভূপৎ সিং মানুষ হইল না।

ছেলেবেলা হইতেই ভূপতের স্বভাব কেমন এক রকম; কিছুতেই যেন আঁট নাই। তাহার স্বাস্থ্য ভাল, কিন্তু খেলাধূলায় তাহার মন নাই; লেখাপড়া ও না মা সি ধং পর্যন্ত করিয়া গুরুজির পাঠশালা ছাড়িয়া দিয়াছে। গ্রাম্য বড় মানুষের ছেলে অল্পবয়সে বখিয়া গেলে ভাঙ্ এবং গাঁজা ধরে, নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের সহিত অবৈধ ইয়ার্কির সম্বন্ধ পাতে। কিন্তু ভূপতের সে সব দোষ নাই, সে শুধু কাজ করিতে নারাজ।

অথচ গৃহস্থের সংসারে কত না কাজ। ক্ষেতে গিয়া চাষবাস তদারক করিতে হয়, ঘরে বসিয়া হিসাব নিকাশ করিতে হয়। যাহার দু'চার বিঘা জমিজমা আছে তাহারই মামলা মোকদ্দমা আছে, সহরে গিয়া উকিল মোক্তারের সহিত দেখা করিয়া মোকদ্দমার তদ্বির করা প্রয়োজন। কিন্তু এই সব কাজ সম্পৎ সিংকে নিজেই করিতে হয়, উপযুক্ত পুত্র থাকিয়াও নাই।

পুত্রের চৌদ্দ বছর বয়স হইতেই সম্পৎ সিং তাহাকে সংসারের ছোট খাটো কাজে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু বিশেষ ফল হয় নাই। পিতার আজ্ঞায় ভূপৎ যথাসাধ্য উৎসাহ সংগ্রহ করিয়া কাজ করিবার চেষ্টা করিত; কিন্তু অল্পকাল পরেই তাহার উৎসাহ ফুরাইয়া যাইত, মন উদাস হইয়া পড়িত। একবার সম্পৎ সিং তাহাকে লইয়া মামলার তদ্বির করিতে সহরে গিয়াছিলেন। টাট্টু ঘোড়ায় চড়িয়া সহরে যাইতে মন্দ লাগে নাই; কিন্তু তারপর সারা দিন আদালতে উকিলের পিছু পিছু ঘুরিয়া এবং মামলা মোকদ্দমার অবোধ্য কচ্‌কচি শুনিয়া সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অতঃপর আবার সহরে যাইবার প্রস্তাব হইলে সে লুকাইয়া বসিয়া থাকিত। সম্পৎ সিং হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

পুত্রের সতরো বছর বয়সে সম্পৎ সিং তাহার বিবাহ দিলেন। বধূটির নাম লছমী, যেমন সুন্দরী, তেমনি মিষ্ট-স্বভাব, বয়স চৌদ্দ বছর, সেয়ানা হইয়াছে। সম্পৎ সিং ভাবিলেন, নিজের সংসার হইলে ভূপতের সংসারে মন বসিবে। কিন্তু হায় রাম! ভূপতের কর্মজীবনে তিলমাত্র পরিবর্তন দেখা গেল না। বরং আগে যদি বা নৈষ্কর্ম্যের পীড়নে উত্যক্ত হইয়া সে ক্ষেত খামারের দিকে পা বাড়াইত, এখন নিরবচ্ছিন্ন ঘরের কোণে আড্ডা গাড়িল।

লছমী মেয়েটি বড় বুদ্ধিমতী। সে দু'চার মাসের মধ্যেই শ্বশুর-বাড়ীর হালচাল বুঝিয়া লইল। শ্বশুরের দুঃখ অনুভব করিল, স্বামীও যে সুখী নয় তাহা অনুমান করিল। কিন্তু কেন যে স্বামীর মন কর্মবিমুখ তাহা বুঝিতে পারিল না। নির্জনে সে চোখের জল ফেলিয়া ভাবিত পাড়াপড়্শী মেয়েরা বলে, তাহার স্বামী অলস অপদার্থ অকর্মণ্য, তাহা

সত্য নয়, তাহার স্বামী মানুষের মত মানুষ। কেবল নিয়তির দোষে এমন হইয়াছে। হে ভগবান, তুমি আমার স্বামীর নিয়তির দোষ কাটাইয়া দাও, আমি বুকের রক্ত দিয়া পূজা দিব।

ভূপতের নিয়তির দোষ কিন্তু কাটিল না। বছরের পর বছর কাটিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু ভূপৎ গ্রামের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কোনও কাজই করিল না।

ভূপতের বিবাহের আট বছর পরে একটি ঘটনা ঘটিল। ভূপতের বয়স তখন পঁচিশ, সে চারিটি সন্তানের পিতা। সম্পৎ সিংয়ের বয়স ষাটের কাছাকাছি, কিন্তু তিনি এখনও সমস্ত সংসারের কর্মভার একাই বহন করিতেছেন।

গ্রামে একটি যাযাবর বায়স্কোপ কোম্পানী আসিল। তখন নির্বাক চলচ্চিত্র দেশে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। লাইম্‌-লাইটের পরিবর্তে বিদ্যুৎ বাতির সাহায্যে চলচ্চিত্র প্রদর্শন প্রচলিত হইয়াছে। একদল ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন উৎসাহী লোক গরুর গাড়ীতে যন্ত্রপাতি লইয়া গ্রামে গ্রামে বায়স্কোপ দেখাইয়া ফিরিতেছে এবং প্রচুর পয়সা পিটিতেছে। এক আনা দু'আনার টিকিট, বাইশ-কোপ দেখিবার জন্য প্রত্যেক গ্রামে ছেলেবুড়ো ভাঙিয়া পড়ে।

গ্রামের মাঠে তাঁবু পড়িয়াছে। সন্ধ্যার পর ডায়নামো চালাইয়া বিদ্যুৎ বাতি জ্বালা হইল। বিদ্যুৎ বাতি গ্রামের কেহ পূর্বে দেখে নাই, আলো দেখিয়াই সকলের চক্ষু স্থির। তারপর যখন ছবি দেখিল তখন আর কাহারও মুখে বাক্য রহিল না।

ভূপৎ ও ছবি দেখিতে গিয়াছিল। কিন্তু তাহার চক্ষে ছবির চেয়ে বিদ্যুতের আলোই বেশী সম্মোহন বিস্তার করিয়াছিল। একী অপূর্ব আলো! এমন আলো মানুষ জ্বালিতে পারে! কেমন করিয়া জ্বালে? তেল নাই, দেশলাই নাই; ফুঁ দিলে নেভে না, দেয়াল টিপিলেই জ্বলিয়া ওঠে!

রাত্রে ভূপৎ ভাল ঘুমাইতে পারিল না। যখন ঘুমাইল তখন দেখিল শত শত হুরীপরী বিজ্‌লি-বাতির মত তাণ্ডব মূর্তিতে তাহাকে ঘিরিয়া নাচিতেছে। জাগিয়া দেখিল ঘরের কোণে রেড়ির তেলের মিটিমিটি আলো। কনুইয়ে ভর দিয়া উঠিয়া সে লছমীর ঘুমন্ত মুখ দেখিল। না, এ আলোতে লছমীর মুখ ভাল দেখায় না, ওই আলো জ্বালিয়া লছমীর মুখ দেখিতে হয়। গাঢ় আবেগ ভরে সে লছমীর শিথিল অধরে চুম্বন করিল, লছমী আধ-জাগ্রত হইয়া তাহার গলা জড়াইয়া লইল।

সকালে ভূপৎ গিয়া বাইশ-কোপের মিস্ত্রির সহিত ভাব করিয়া ফেলিল, তাহাকে পেঁড়া গুলাবজামুন খাওয়াইল। মিস্ত্রি যত্ন করিয়া তাহাকে বিদ্যুজ্জনন যন্ত্র দেখাইল এবং প্রক্রিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিল। ভূপৎ কিছুই বুঝিল না কিন্তু চমৎকৃত হইয়া রহিল।

ব্যবসা এখানে ভাল চলিতেছে দেখিয়া বাইশ-কোপের দল দুই তিন দিন থাকিয়া গেল। তারপর একদিন সকাল-বেলা মালপত্র যন্ত্রপাতি গরুর গাড়ীতে বোঝাই করিয়া প্রস্থান করিল। সেই দিন সন্ধ্যাবেলা দেখা গেল ভূপৎ গ্রামে নাই। বাইশ-কোপ দলের সঙ্গে সঙ্গে সেও অন্তর্ধান করিয়াছে।

সে রাত্রে বেশী খোঁজ খবর লওয়া চলিল না। পর দিন প্রাতে সম্পৎ সিং চারিদিকে লোক পাঠাইলেন। কয়েক মাইল দূরের একটি গ্রামে বাইশকোপ দলের সন্ধান মিলিল, কিন্তু ভূপৎকে পাওয়া গেল না। সে তাহাদের সঙ্গে আসে নাই।

সম্পৎ সিং অতিশয় কাতর হইলেন, নাতি নাতিনীদের কোলে লইয়া 'বাবুয়া রে বাবুয়া রে' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। একে পুত্রস্নেহে তাঁহার হৃদয় বিকল, উপরন্তু তাঁহারই কোন অনীপ্সিত অবহেলার ফলে ভূপৎ অভিমানে গৃহত্যাগ করিয়াছে এই কথা ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

লছমী কিন্তু কাঁদিল না, সে শক্ত রহিল। ভূপৎ তাহাকে কিছু বলিয়া যায় নাই, কিন্তু সে মনে মনে বুঝিয়াছিল। শ্বশুরের কান্নাকাটি দেখিয়া সে দ্বারের আড়াল হইতে নিম্নস্বরে বলিল,—'বাবুজি হয়রাণ হবেন না, কোনও ভয় নেই।'

সম্পৎ সিং চক্ষু মুছিয়া ভগ্নস্বরে বলিলেন,—'বেটি, তুমি কিছু জানো? কেন সে চলে গেল? কোথায় চলে গেল?'

লছমী বলিল,—'জানি না। কিন্তু আপনি ভয় পাবেন না, উনি শিগ্‌গির ফিরে আসবেন।'

পুত্রবধূর দৃঢ়তায় সম্পৎ সিং আশ্বাস পাইলেন

'কিন্তু ছয় মাস কাটিয়া গেল, ভূপতের দেখা নাই। সম্পৎ সিং আবার ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিলেন। লছমীর মনেও অজানিত আশঙ্কার স্পর্শ লাগিল।

তারপর হঠাৎ একদিন ভূপৎ ফিরিয়া আসিল। ছোট বড় করিয়া চুল ছাঁটা, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, একমুখ হাসি। ভূপৎ যেন আর সে ভূপৎ নয়, তাহার আকৃতি-প্রকৃতি সমস্ত বদলাইয়া গিয়াছে।

ভূপৎ পিতার পদধূলি লইল। সম্পৎ সিং 'বাবুয়ারে—' বলিয়া পুত্রকে জড়াইয়া ধরিলেন।

অতঃপর তিনি একটু শান্ত হইলে ভূপৎ গত ছয় মাসের কাহিনী বলিল।—বাইশকোপ দলের মিস্ত্রির নিকট ঠিকানা জানিয়া লইয়া সে কলিকাতায় গিয়াছিল। কলিকাতায় একটি ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানীর কারখানায় চাকরি লইয়া বিদ্যুৎ বিদ্যা শিখিয়াছে। কোম্পানীর বড় সাহেব বিদ্যুৎ সম্বন্ধে তাহার সহজাত বুদ্ধি দেখিয়া তাহাকে চাকরি দিয়াছেন। শীঘ্রই পাটনায় বিদ্যুৎ বাতি আসিবে, ভূপৎ কোম্পানীর পক্ষ হইতে পাটনায় বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও মেরামতির দোকান খুলিবে। পঞ্চাশ টাকা মাহিনা ও কমিশন।

সম্পৎ সিং বলিলেন,—'বেটা, তুমি পরের নৌকরি করবে কেন? তোমার কি পয়সার অভাব?'

ভূপৎ বলিল,—'পয়সার জন্যে নয় পিতাজি, আমি বিজ্‌লির কাজ করব। বিজ্‌লির কাজ করতে আমি ভালবাসি। পাটনায় বাসা ঠিক করে আমি আপনার আশীর্বাদ নিতে এসেছি। বুতরুদেরও নিয়ে যাব।'

সম্পৎ সিং তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—'তোমার-যে-কাজ ভাল লাগে তাই কর বেটা। আমিও তোমার সঙ্গে পাটনা যাব, তোমার ঘর-বসত করে দিয়ে আসব।'

পরদিন ভূপৎ পিতা ও স্ত্রীপুত্র লইয়া পাটনা চলিয়া গেল। ভূপতের অপদার্থ নাম ঘুচিয়াছে, সে তাহার স্বধর্ম খুঁজিয়া পাইয়াছে।

ভাবিতেছি, ভূপৎ যদি শতবর্ষ পূর্বে, এমন কি পঞ্চাশ বছর পূর্বেও জন্ম গ্রহণ করিত তাহা হইলে কী হইত? তখন বিদ্যুৎ-যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নাই, ভূপৎ সম্ভবত নিষ্কর্মা অপদার্থ বদনাম লইয়াই জীবন কাটাইয়া দিত। বর্তমানেও এমনি কত অপদার্থ মানুষ অজ্ঞাত ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া নিষ্ক্রিয় নিরর্থক জীবন কাটাইয়া দিতেছে কে তাহার হিসাব রাখে?

কীর্ত্তন-প্রেমী বৈদেশিক

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

আর্ণণ্ড বাকে ইউরোপের অন্তর্গত নেদারল্যাণ্ডসের অধিবাসী। কিছুদিন পূর্ব্বেও তিনি কলিকাতায় বেশ সুপরিচিত ছিলেন। গত কয়েক বৎসর হইতে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরী পাইয়া কলিকাতার মমতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি নেদারল্যাণ্ডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন-কালে ভারতবর্ষের সঙ্গীতের দিকে আকৃষ্ট হ'ন। তিনি নাকি ভরতের নাট্যশাস্ত্রের দু'টি অধ্যায় অনুবাদ করিয়া সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে Ph. D লাভ করেন। সেই সময় বোধ হয় বৃত্তিও পান। ভারতে আসিয়া ডক্টর বাকে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে যান। এই হইতেই তিনি অনেকগুলি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষালাভ করেন। তিনি চারি বৎসর শান্তিনিকেতনে ছিলেন।

একদিন হঠাৎ তাঁহার নিকট হইতে আমি চিঠি পাইলাম। তাহাতে লিখিয়াছেন যে, বিশ্বভারতীতে থাকাকালে তিনি অনেক কীর্ত্তন গান শুনিয়াছেন। এমন কি, ইলমবাজারে তিনি ভাল কীর্ত্তনও শুনিয়াছেন। তিনি এই সম্বন্ধে অধিক জ্ঞান লাভের জন্য আমার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে একটি সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া পত্র দিলাম। তিনি ত' শান্তিনিকেতন থেকে আসিতে-ছেন, সুতরাং তাঁহাকে কিছুদিন সময় দিয়া দেখা করিতে লিখিলাম।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে তিনি ও তাঁহার স্ত্রী আমার বাড়ীতে আসিলেন। দেখিলাম, ছয়ফুট দীর্ঘ, সুন্দর চেহারার অভিমান-বর্জ্জিত একজন লোক আসিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নিতান্ত সাদাসিদা বেশ। উভয়েই যেন আনন্দের মূর্ত্তিস্বরূপ। আমাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময় নবদ্বীপ ব্রজবাসী মহারাজকে খবর দিয়াছিলাম—তিনিও উপস্থিত ছিলেন। আমাদের গান কিছু শুনিলেন এবং স্ত্রীকে বলিলেন, এইখানেই ভাল

জিনিষ পাওয়া যাইবে। "Here we have come at last and he can deliver the goods."

দুঃখের বিষয় আমি তাহার পরের দিনই ছুটিতে অন্যত্র যাইতেছি। এক মাস ও তদপেক্ষা দীর্ঘকালও লাগিতে পারে। সেইজন্য, আমি তাঁহাকে ব্রজবাসীর জিম্মা করিয়া দিলাম। তিনি তারপর আরও কিছুদিন কলিকাতায় থাকিয়া ব্রজবাসী মহাশয়ের সঙ্গলাভ করিয়া সুখী হ'ন। সে আজ ২৫ বৎসর পূর্ব্বের কথা। তিনি এখানে সামান্য কিছু কীর্ত্তন শিখিয়া বোধ হয় ১৯৩৬ সালে বিলাত গমন করেন। সে সময় লণ্ডনে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। সুযোগ এই, সে সময় ডরচেষ্টার হোটেলে মহারাজা গাইকোয়াড় অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব পূর্ণ হওয়ায় বন্ধুবান্ধব মিলিয়া তাঁহার জন্য এক সান্ধ্য-সম্মেলনের আয়োজন করেন। সেখানে অনেক বড় বড় লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। লর্ড ল্যামিংটন, স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাসব্যাণ্ড প্রভৃতি এবং আমাদের মত কয়েকজন ভারতীয় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। উদ্বোধন সঙ্গীত গান করেন শ্রীমতী শকুন্তলা রাও। ভারতীয় সঙ্গীতের নমুনা হিসাবে বাকে সাহেব কয়েকটি গুজরাটী ও নেপালী লোকসঙ্গীত দলবলসহ গান করিতে আহুত হইয়াছিলেন। আমাকে ঐখানে দেখিয়া বাকে দম্পতি যে আশাতীত সুখী হইলেন তাহা তাঁহাদের ব্যবহারে বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

ইহার কিছুকাল পরে বাকে সাহেব শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন। সেই সময় তিনি আমাকে লেখেন, "আপনাদের ওখানে কি বাড়ী পাওয়া যায়? আমি ও আমার স্ত্রীর জন্য দুইখানি ঘর হইলেই চলিবে। আমি আপনার খুব কাছেই থাকিতে চাই। কারণ যখন আপনার আসর হয় তখনই আমাকে ডাকিয়া পাঠাইতে পারেন। কীর্ত্তনের সুরগুলি অত্যন্ত দুর্লভ এবং আপনার কাছে অনেকদিন না থাকিলে শিখিবার প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া যাইবে।" এইরূপ আগ্রহ দেখিলেই বোঝা যায় যে ইঁহারই কীর্ত্তন শেখা হইবে; এতকাল কীর্ত্তন শিখিলাম বা শেখার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু গুটিকয়েক ছাড়া আর কোনও শিক্ষার্থী পাই নাই।

অবশ্য বাকে সাহেবের জন্য আমার এ পাড়ায় কোনও বাসা পাইলাম না। ইহার পরে পৃথিবীতে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়াতে বাকে সাহেবের বৃত্তি বন্ধ হইয়া গেল। তাহার পরে অর্থের চেষ্টায় তাঁহাকে সিংহল প্রভৃতি স্থানে ঘুরিতে হইল। ছয় মাস পরে তিনি আমাকে লিখিলেন যে বিদেশভ্রমণের ফলে তাঁহার কিছু অর্থসঞ্চয় হইয়াছে এবং ইতিমধ্যে বৃত্তির টাকাও তাঁহাকে দিবার আদেশ হইয়াছে। ঠিক কবে মনে নাই, ইহার পর হইতে তিনি কলিকাতায় বসবাস করিতে লাগিলেন। আমি দেখিলাম, তাঁহার কীর্ত্তনের প্রতি অনুরাগ অত্যন্ত বেশী। সেই জন্য একদিকে যেরূপ কীর্ত্তন শিখিতে লাগিলেন, অন্যদিকে তেমনি তাঁহার বাংলা ভাষা শিখিবার ব্যবস্থাও করিয়া দিলাম। এই উভয় বিষয়ে তিনি অধ্যবসায়গুণে প্রভূত কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। কীর্ত্তন শিখিবার সুবিধা হইল এই যে, তিনি আগে হইতেই স্বরলিপি বা notation আয়ত্ত করিয়া ছিলেন। এই সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে কীর্ত্তনের তালগুলি আয়ত্ত করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল।

সকলেরই জানা আছে, উচ্চাঙ্গ কীর্ত্তন সঙ্গীত শিখিতে অসাধারণ পরিশ্রমের দরকার। ছোট দশকুশী, বড় দশকুশী, তেওট, দুঠুকী, দাসপাহিড়া প্রভৃতি তাল বৈঠকী সঙ্গীতে অল্পাধিক অপরিচিত। সেইজন্য কেহ কীর্ত্তন গান শিখিতে অগ্রসর হয়েন না। একজন বৈদেশিক যে এই গানে কৃতিত্ব লাভ করিবেন, ইহা আমরা কল্পনা করিতে পারি নাই। তিনি এই ব্যপদেশে বাংলা ভাল করিয়া শিখিলেন এবং বাংলায় কথাবার্ত্তা কহিতেন। কীর্ত্তন সঙ্গীতও কতক অধিকার করিলেন।

বালিগঞ্জে সে সময় একজন সাধুর আবির্ভাব হয়। সেই বৈষ্ণব সাধুর নাম সাঁইবাবা। তিনি এখনও জীবিত আছেন। অনেকের নিকটই তিনি সুপরিচিত। অনেকের রোগপীড়া তিনি ভাল করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার ওখানে প্রায়ই হরিনাম কীর্ত্তন হইত। সাধুবাবার একটি গুণ ছিল। তিনি তুলসীপত্র দিয়া অনেককে আকৃষ্ট করিতে পারিতেন। এই বাকে সাহেব তাঁহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারই সঙ্গে নামগান করিতেন। এইরূপে অনেকদিন সন্ধ্যায় তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া নামগানেও ইনি যথেষ্ট দক্ষতা লাভ করিলেন। সাধুবাবা যে নামগান করিতেন, তাহা তাঁহার নিজের কল্পিত সুরে, এবং সেই গানে কঠিন কঠিন সুর সন্নিবেশ করিয়া শ্রোতাদিগের মনোরঞ্জন করিতে পারিতেন। বস্তুতঃ, "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম,"—এই গানে যে এইরূপ বিভিন্ন সুর দেওয়া যায়, তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি নাই। সাধুবাবার গানের সুর দখল করিলেন বাকে সাহেব এবং তাঁহার রচিত কয়েকটি গান শিক্ষা করিয়া তিনি অনুরূপ তালমাত্রার সহিত গান করিতে শিখিয়াছিলেন। একবার তিনি ব্রজবাসীর সঙ্গে বৃন্দাবনে গমন করিলেন এবং ধুতি চাদর মণ্ডিত হইয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্মুখে বিশুদ্ধ তাললয়ে রূপাভিসার গান করেন। আমি সে সময় বৃন্দাবনে উপস্থিত ছিলাম না। কিন্তু শুনিয়াছি, যাহারা শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি আমার সঙ্গেও অনেকবার দোহারকি করিয়াছিলেন। পাইকপাড়ায় রাজার বাড়ীতে, সুরেন ঠাকুরের বাড়ীতে ও অন্যান্য স্থানে তিনি গলা খুলিয়া আমার সঙ্গে গান করিয়াছেন, পরে যে সময়ে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা হয়, তাহার ঠিক পূর্ব্বে মহিষাদলের রাজবাড়ীতে মূলগান করেন।

ইউরোপীয় কোনও ভদ্রলোক বা মহিলা যদি বাংলায় কথাবার্ত্তা বলেন বা কদাচিৎ বাংলায় সঙ্গীতচর্চ্চা করেন, তাহা হইলে অনেক সময়ে তাঁহাদের প্রাপ্যের অধিক সুখ্যাতি করিতেই আমরা অভ্যস্ত। এক্ষেত্রে, আমি সেইরূপ উদারতার বা উচ্চপ্রশংসার কোনও কারণ দেখি না। এই প্রসঙ্গে আমার একটি গল্প মনে পড়িতেছে। আমি কিছুদিন পূর্ব্বে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় বাংলার প্রধান পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলাম। পরীক্ষকদের মধ্যে একজন ছিলেন বিদেশীয় মহিলা। বাংলায় বাঙ্গালীর ছেলেদের পরাজিত করিয়া বাংলার এম. এ. পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। অবশ্য তাঁহার বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে আমার

কোনও সংশয় নাই। কিন্তু, পরীক্ষক হিসাবে তাঁহাকে প্রথম যে পঁচিশখানা কাগজ পরীক্ষা করিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিতে বলিলাম ; দেখিলাম একটি ছেলে লিখিয়াছে, "ভীম গদাঘাতে যুধিষ্ঠিরের উরুভঙ্গ করিলেন।" তিনি সেই প্রশ্নে দশের মধ্যে সাত দিয়াছেন। আমি তাঁহার এ কয়খানি কাগজ সংশোধন করিয়া দিলাম এবং বলিলাম যে ভবিষ্যতে সমস্ত প্রশ্নোত্তরের মধ্যে যে বানান ভুল, ব্যাকরণ ভুল ও সঙ্গতির ভুল আছে সেগুলি চিহ্নিত করিয়া রাখিবেন। তাহা না হইলে কে কত নম্বর পাইবার অধিকারী তাহা বুঝিতে অসুবিধা হইবে। তিনি ফেরৎ ডাকে সমস্ত কাগজ আমাকে ফেরৎ পাঠাইয়া দিলেন। বলিলেন, ডাক্তার তাঁহাকে চক্ষুর পক্ষে কাগজ দেখা অনিষ্টকর হইবে বলিয়াছেন। ইহার পরও বিশ বৎসর আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম, কিন্তু তাহার মধ্যে সে মহিলার চক্ষু ভাল হয় নাই এবং পরীক্ষক পদের জন্য আবেদনও করেন নাই।

মহিষাদলের রাজবাড়ীতে রাজা স্বয়ং এবং তাঁহার সহযোগীরা সকলেই সঙ্গীতজ্ঞ এবং তাল মাত্রায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন। রাজা বাহাদুর এখনও রেডিওতে গান করেন। উপরন্তু ব্রজবাসী মহাশয়ের খোল বাজনার দাপটে অনেকে অভ্যস্ত জিনিষও ভুলিয়া যান। কিন্তু দেখিলাম, বাকে সাহেব বিশুদ্ধ তাল মাত্রায় কীর্ত্তন গান করিলেন ; আমরা সকলেই শুনিয়া সুখী হইলাম। অবশ্য ধুতি পাঞ্জাবী পরিয়াই গান হইয়াছিল এবং কীর্ত্তনান্তে বাকে সাহেব ব্রজবাসী মহাশয়ের পদধূলি লইতে এবং আমাদের নমস্কার করিতে ভোলেন নাই। শুনিলাম মহিষাদলের রাজা তাঁহাকে এক শত টাকা পারিশ্রমিক পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং বাকে সাহেব তাহা ফেরৎ দেন।

এখন তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন। মাঝে মাঝে লণ্ডন বি. বি. সি. হইতে তাঁহার কীর্ত্তন শোনা যায়।

রাধা হিয়া

শ্রীদিলীপকুমার রায়

শুধাস নে সখী—কেন প্রেমে তার মজিল পলকে আমার প্রাণ,
তারি তরে কেন অধীর হৃদয়—দেখে নাই কভু যারে নয়ান ?—
মেলে নি তো আজো দিশা আমার,
এইটুকু শুধু জেনেছি সার :
ধরণীর প্রতি রং লীলায়
কত ছলে চিতচোর লুকায়,
প্রতি বাসনার মাঝে হিয়ায়
আশার প্রতিটি ঢেউ দোলায়
অঙ্গে অঙ্গে আমার ছায় লো তারি মধুনাম সাঁঝবিহান।
শুধাস নে সখী—কেন প্রেমে তার মজিল পলকে আমার প্রাণ ?

শুধাস নে সখী—কেন তারি তরে শুধু রহি পথ চেয়ে আমি,
বারেকো যাহারে দেখি নি—কেন এ-মন তারে শুধু
জানে স্বামী ?—
মেলে নি তো আজো দিশা আমার,
এইটুকু শুধু জেনেছি সার :
মুগ্ধ মারুত-হিল্লোলে
ফুলভার নত শাখা দোলে
নদীর ললিত কল্লোলে
কলিকার রাঙা সুকপোলে
আমার সাধের প্রতি বোলে—তারি স্মৃতি ওঠে রণি' দিনযামী।
শুধাস নে সখী—কেন তারি তরে শুধু রহি পথ চেয়ে আমি ?

শুধাস নে সখী—কেন বা এমন সুরে করি নিতি তারে স্মরণ,
ছবিও যাহার দেখি নি কথনো—কেমনে সে চুরি
করে এ-মন ?—
মেলে নি তো আজো দিশা আমার,
এইটুকু শুধু জেনেছি সার :
অচিন এ-বঁধু নয় লো নয়,
যুগ যুগের যে এ-পরিচয়,
এ-জীবন দিল ছলনাময়
হারানিধি ফিরে করিতে জয়,
মীরা শুধু গায় তারি প্রণয়—যে-সুরে গায় গান মরি, মোহন !
শুধাস নে সখী—কেন বা এমন সুরে করি নিতি তারে স্মরণ ?*

---

* (ইন্দিরা দেবীর সমাধি-শ্রুত মীরাভজনের অনুবাদ)

বাঙ্গালী বিয়েতে বার্ণার্ড শ

দেবেশ দাস

বিয়ের নেমন্তন্নে ট্রেণে কলকাতায় যাচ্ছিলাম। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। এয়ার কণ্ডিশন কোচের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। আলো বড়ই কমে গেছে। বোধ হয় ট্রেণটা খুব আস্তে আস্তে চলছে বলে। একটু বিরক্তই হলাম।

বিড় বিড় করতে লাগলাম মনে মনে। যেমন আস্তে তেমন আঁধার। যেমন আঁধার তেমন আস্তে। যেমন দেশ তার তেমন বন্দোবস্ত।

ঠিকই বলেছ তুমি। ঘাড়ের উপর কে যেন এই কথাগুলো ফিস ফিস করে বলে উঠল। চমকিয়ে ফিরে দেখি মুখখানা চেনা চেনা। অথচ এই লম্বা দাড়িওলা বুড়ো ইংরেজকে আগে কখনো দেখিনি। বললাম—মাপ করবেন, আপনাকে আগে কোথাও দেখেছি কি?

কেন বল ত, বাছা?—সস্নেহে তিনি প্রশ্ন করলেন। এত স্নেহভরে যে ওর ইংরেজী কথাটা বাংলায় বলতে গেলে বলতে হয় বাছা।

একটু ভরসা পেলাম। বললাম—মনে হচ্ছে আপনি বার্ণার্ড শ। আপনাকে এখানে দেখে আমার এত ভাল লাগছে। তা এমন চুপি চুপি এদেশে এসেছেন কেন? আত্মগোপন করে?

উনি হাসলেন। বললেন—আমার কাজই ত হচ্ছে নিজেকে ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে ফেলে আর সবাইকে দেখা। অবশ্য আমার নিজের চোখ দিয়ে।

দুঃসাহসী ভাবে একটা প্রস্তাব করে বসলাম। বললাম—আসুন না একবার আমার সঙ্গে। আপনার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আমাদের দেখে যান। আমি চলেছি একটা খুব বড় বিয়ের উৎসবে। অনেক সাহেব সুবোও আসবে। আমি বিয়ে বাড়ীর হয়ে আপনাকে নেমন্তন্ন করছি।

বার্ণার্ড শ হাসলেন—তা মন্দ নয়। চল তোমাদের সঙ্গে একটু দহরম মহরম করা যাবে। অবশ্য আমার নাটকের ভূমিকাতেই আমি জানিয়ে দিয়েছি যে যখন আমার মনের ধারাগুলো দেখতে দেখতে তোমাদের সয়ে যাবে তখন আমাকে আর এত খারাপ সঙ্গী বলে মনে হবে না।

না, না। বাধা দিয়ে বললাম—আপনাকে কোন দিনই খারাপ সঙ্গী বলে মনে হয় নি। আপনি ত সমাজের আঁট-সাট নিয়ম-কানুনের কাঠামোর বিরুদ্ধে সব সময়ই লড়াই করেছেন। তা বলে কেউ ত আপনাকে আজকাল দোষ দেয় না।

শ বললেন—লড়াই না করেই বা কি করি বল। এই কাঠামোটাই ত বাপে-ছেলেতে মায়ে-মেয়েতে সম্বন্ধটাকে এত গোলমেলে, এত 'কনভেনশনাল' করে তুলেছে। তোমাদের দেশেও তাই। সেজন্যেই তোমাদের ঘরে ঘরে এমন মেয়ে দরকার যে নিজের মনকে নিজে যাচাই করে দেখবে। সে তার মাকে বলতে পারবে—খোলাখুলি বলছি মা, তোমার কোনরকম ননসেন্স আমি একটুও সইতে পারব না। আর তা যখন তুমি ছেড়ে দেবে তখন আমারো কোন ননসেন্স তুমি সয়ে যাবে এটাও আশা করব না। তোমার নিজের স্বাধীন ইচ্ছা, নিজের জীবনের ধারা এগুলিকে আমি সব সময়ই তাদের ন্যায্য দাম দেব।

সায় দিলাম। তবে এ কথাও বললাম—আমাদের তেমন ব্যক্তিত্বই যে ফুটে ওঠে না সহজে। এঁচড়ে পাকার মুখে কি আর গাছপাকা কাঁঠালের মিষ্টি থাকবে?

শ মাথা নাড়লেন। বললেন—কিন্তু যে এঁচড়ে পাকতে চাইছে তাকে ত কথামৃতের রসে ডুবিয়ে রাখলেই সে মিষ্টি হবে না। তাকে ঠাট্টা করে, বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দাও। এই দেখ না দাঁতের ব্যথায় কি হয়। বোকামীগুলো হচ্ছে পোকা-খাওয়া দাঁতের ব্যথার মত। খুব কষে লাফিং গ্যাস দিয়ে ব্যথা মেরে দাও; তারপর তুলে ফেল খারাপ দাঁত চটাপট। ব্যস।

পৌছালাম বিয়ে বাড়ীতে। খুব শানাই বাজছে; বাগানের গাছে গাছে লাল নীল আলো। মেয়েরা সেজে-গুজে প্রজাপতির মত এগিয়ে আসছে, মিষ্টি হেসে নমস্কার

করে ফুলের ছোট ছোট তোড়া হাতে তুলে দিচ্ছে। শ যেরকম মুচকী হেসে একটু তেরছা ভাবে নুয়ে নিজের হাতে একটা তোড়া বেছে নিলেন তাতে আমি ঘাবড়িয়ে গেলাম। হয়ত এখনি এমন কিছু কুটুশ করে মন্তব্য

মেয়ে তো নয়, একখানা তুবড়ী

ঝাড়বেন যে সবাই জেনে ফেলবে—কে আমাদের মধ্যে এসেছে।

শ'র কনুই ধরে একটু আলতো টান দিলাম।

উনি তৈরীই ছিলেন। সরে এলেন আমার সঙ্গে। একটা গাছের আড়ালে আবছা আঁধারে একটি মেয়েকে নজরে পড়ল। তার এক পাশে গুটি দুয়েক তরুণ। আর এক পাশে তরুণের কোঠা পার হয়ে এসেছে তবু শিঙ ভেঙে দলে ভিড়তে চায় এমন একজন রসিকও আছে।

আবার ঘাবড়ে গেলাম। পাছে অসুবিধা হবার মত কিছু বলে বসেন। উনি কানের কাছে মুখ এনে বললেন—দেখেছ, একেবারে আগুনের ফিনকি। মেয়ে ত নয়, একখানা তুবড়ী। বারুদে ঠাসা।

হাসলাম। বললাম—যা বলেছেন একেবারে নিয্যস সত্যি। বাংলা দেশে বোধ হয় আপনি এতটা আশা করেন নি।

নিশ্চয়ই করি। খুব আবেগ দিয়ে তিনি বললেন—নিশ্চয়ই করি। দেখ, ডন জুয়ানের মত পাড় নচ্ছারও শিল্পীর প্রভাবে পড়ে নারীকে পূজো করেছে। সেও নারীর কণ্ঠে গানের মাধুর্য, মুখে ছবির রূপ, আর মনে কবিতার উচ্ছ্বাস দেখতে পেয়েছে। তোমাদের দেশের দড়িছেঁড়া তরুণরাই বা কেন পাবে না? ওদের মনে কি কবিতার, সাহিত্যের কোন ছাপ পড়ে না?

মাথা নেড়ে বললাম—কই আর তেমন পড়ে? যদি পড়ত তাহলে যাদের ঘর-সংসার বাঁধবার যোগ্যতা হয়েছে তারাও বিয়ে করে না কেন?

সহানুভূতিতে ছল ছল করে উঠল তাঁর চোখ—বোধ হয় তারা একেবারে কচি কুঁড়ির মত অনাঘ্রাত কুসুম খোঁজে ফোটা ফুলের মধ্যে। কাঁচের কৌটোয় রাখা হরলিক্সের মত—হাত দিয়ে পর্য্যন্ত ছোঁয়া নয়। মনে আছে তোমার অ্যানা আর ডন জুয়ানের কথা?

মনে নেই? মুখস্থ আছে। অ্যানা বলেছিল—ডন জুয়ান, সতীত্বের বিরুদ্ধে একটা কথা বললেও আমার অপমান হবে।

ডন জুয়ান—ভদ্রে, তোমার সতীত্ব একটি স্বামী আর

বারটি ছেলেমেয়ের রূপ নিয়েছে। কাজেই আমি তার বিরুদ্ধে কিছুই বলি না। তুমি যদি সবচেয়ে বেশী ছেড়ে-যাওয়া মেয়ে হতে তাহলেই বা এর চেয়ে বেশী কি করতে পারতে?

অ্যানা—বার জন স্বামী আর একটিও সন্তান নয়।

শ শুনে খুব হাসলেন—বাঃ বাঃ, বেশ ত মনে রেখেছ। কিন্তু জান, এই যে অগ্নিশিখাটি এতগুলি পতঙ্গকে নাচাচ্ছে, এরই বা শেষ পর্য্যন্ত কি গতি হবে? হয়ত এত কৃত্রিম, মানে সফিসটিকেটেড, হয়ে উঠবে যে শেষ পর্য্যন্ত যাকে পাকড়াবে তাকে বলবে,—আমার ভয়ানক মনে হচ্ছে যে আমি বিবাহিতা হয়ে যাব, কারণ দুনিয়াটাই চায় যে তোমার একটি বৌ হোক। আর সে-বেচারাও এমন একটা ভাব করবে যেন বিয়ে করে সে নিজে বিক্রী হয়ে গেল, স্ত্রীর সম্পত্তি হয়ে গেল।

স্বীকার করলাম যে আমাদের দেশেও আজকাল এ ধরণের মতিগতি হচ্ছে তরুণতরুণীদের।

কি রকম, খুলে বল ত?—জিজ্ঞেস করলেন শ।

এই বিয়ে-বাড়ীর বর কনের ইতিহাসই ধরুন না কেন। ছেলে আর মেয়েতে মেলামেশাতে দু পক্ষেরই কত ভয়। কত পা টিপে টিপে ওজন করে চলা। যেন কোন সহজ ভাবই নেই। সত্যের ছোঁয়া নেই। নভেলে-পড়া নকল-করা প্রেমের অভিনয়। কুমারীসুলভ লজ্জা আর যুবকের যোগ্য শিভ্যালরী দুই-ই ছিল মেকী। মনে মনে মেয়েটি বলছে হ্যাঁ, আর মুখে দেখাচ্ছে না, না। আমাদের সমবয়সী সবাই জানত সে কথা। আবার বাপ মারাও গোত্র পর্য্যায় ঠিকুজী এ সবের হিসাব কষছে।

শ খুসী হলেন না শুনে। প্রতিবাদ করে বললেন—সবই যদি সত্যি হয় তবু বলব এমন বিয়েতে যতই দেরী হয় ততই ভাল। নিজেদের যাচাই করে নেওয়ার সময় মেলে। তোমরা বিশ্বের সব সেরা বই পড়লে বাইরের ঘরে বসে বসে। ডিবেটিং ক্লাবে, সাহিত্য বৈঠকে হালের পশ্চিমে হাওয়ার ঝড় বইয়ে দিলে। কিন্তু বিয়ের বেলা ঠিক যে কে সেই। এই ধর না, এই যে আজকের বর-কনে। ওরা কি সহজ ভাবে নিজেরা নতুন স্বামী-স্ত্রী হিসাবে থাকবার কোন সুবিধা পাবে? ইষ্টি কুটুম আছে, পাড়া সমাজ সবাই আছে শুধু ট্যারা ভাবে নজর দিতে। ওদের চরকায় তেলের বদলে গাঁদ মেশাতে।



বিয়ে নয়। যেন সার্কাসে তারের উপর···

স্বীকার করলাম। বাঙ্গালী বিয়ে ত বিয়ে নয়। যেন সার্কাসে তারের উপর রোপ ওয়াকিং করে হাঁটতে হাঁটতে পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসা। সব দর্শক উপরের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে দেখছে।

আমরা আর নিরিবিলি কথা কইতে সময় পেলাম না। সবাই উঠে পড়েছে বিয়ে দেখার জন্য। ছানলাতলার পাশে এসে দাঁড়ালাম।

দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে শ বললেন—আহা, কি সুন্দর মেয়েটি।

একটু থেমে আবার বললেন—কিন্তু রূপেই বা কি হবে? ও দূর থেকেই বেশ ভাল। ঘরে এসে তিন দিন থাকবার পর কে আর রূপের জন্য মরে?

মনে পড়ল ম্যান য়্যাণ্ড সুপারম্যানে তিনি এ রকম একটা কথা লিখেছেন। আরো লিখেছেন যে ঠিক শিল্পী যে রকম তার বেহালা বা সিপাই যে রকম তার বন্দুক

ভালবাসে, সে রকম ভাব তার নায়ক নারীকে ভালবাসে। চুপ করে রইলাম।

একটি মেয়ে খুব হাসিখুসী ভাব দেখাচ্ছে। গালে ঠোঁটে রঙ ফেটে পড়ছে, কিন্তু সারা মুখের ক্লান্তি, চোখের অসহায় ভাব তাতেও ঢাকা পড়ে নি। শ ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করলেন,—ব্যাপার কি? অনেকে আশা দিয়ে ঠকিয়েছিল বুঝি? না, চাকরীর দুয়োরে ধর্ণা দিয়ে মাথা ঠুকছে?

একটু কুণ্ঠিত হয়ে উত্তর দিলাম,—সম্ভবত দু-ই।

খুব চোখা প্রশ্ন করলেন শ,—তোমাদের এক পুরোনো কবি একজন দেবী মহাদেবকে বিয়ে করবার জন্য তপস্যা করেছিল বলে কাব্য লিখেছিলেন। তোমরা সে কাব্য মাথায় তুলে ধেই ধেই করে নাচ। তারই ফল দেখছি।

কাচু মাচু হয়ে উত্তর দিলাম,—তা কালিদাস ত শুধু উমার একরকমের তপস্যার কথাই লিখেছিলেন। আজকাল যে আবার উমার নতুন তপস্যাও সুরু হয়েছে। এটা আপনাদের পশ্চিমের আমদানী।

তেড়ে ফুড়ে উঠলেন বার্ণার্ড শ। পশ্চিমের কাঁটাটা ত খুবই ফুটেছে দেখছি। বলি, মধুও কিছু পেয়েছ ত? কই, স্বাধীন ভাবে ছেলে-মেয়েদের বেশ মিশতে দেখছি। কিন্তু স্বাধীন ভাবে তাদের নিজেদের সাথী খুঁজে নিতে, জীবন গড়ে নিতে দিচ্ছ কি?

স্বীকার করতেই হল যে এখনো তা দিই নি। এই বিয়েতেই কি আর কুল, গোত্র এ সব নিয়ে কম মারামারি হয়েছে? সে কথাও কবুল করলাম। সায়েব সুবো নিমন্ত্রিত আর পাগড়ী পরা বেয়ারার দল জাতের দাবীকে ঢেকে রাখতে পারেনি।

হো হো করে হেসে গড়িয়ে গেলেন শ। চারদিকে সবাই তাকিয়ে দেখল যে একজন বুড়ো ইয়োরোপীয়ান প্রাণ খুলে হাসছেন আর বলছেন,—সত্যি কথা বলাই হচ্ছে আমার ঠাট্টার ধরণ। সত্যি কথাই পৃথিবীতে সবচেয়ে মজার ঠাট্টা। হাঃ হাঃ।



উমার নতুন তপস্যা

ছানলাতলার সবগুলি আলো ওর দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ রগড়াতে রগড়াতে দেখলাম, না ও গুলি ছানলাতলার নয়, হাওড়া পোলের আলো। আমার কামরায় বিছানার উপর খোলা রয়েছে বার্ণার্ড শর বইগুলি। সারাদিন ও গুলো পড়ার পরে গাড়ীর দোলানীতে তন্দ্রা এসেছিল।—

রবীন্দ্রনাথের কবিতা

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

রবীন্দ্রনাথের কবিতা ভারতের বহুমূল্য সম্পদ। "এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে" দাঁড়াইয়া কবি যেমন লক্ষ্য করিয়াছেন—কত দেশ হইতে কত মানুষের ধারা দুর্ব্বার স্রোতে আসিয়া ভারত মহা সমুদ্রে হারাইয়া গিয়াছে, এবং তাহাদের মিলিত রূপ এক অভিনব রূপে যুগ হইতে যুগান্তরের পথে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। আমরাও তেমনই দেখিতেছি—পূর্ব্ব ও পশ্চিমের ভাবপ্রবাহ কবি-হৃদয়ে আশ্রয় খুঁজিয়াছে এবং তাহাদের সম্মিলিতরূপ তাঁহার লেখনীমুখে—কত বিচিত্র বাণী মূর্ত্তিতে ছন্দায়িত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা যেমন বিশাল তেমনই গভীর, যেমন সুন্দর, তেমনই মধুর। পৃথিবীর সমস্ত সুন্দর বস্তুর মত রবীন্দ্রনাথের কবিতাও সহজেই হৃদয় আকর্ষণ করে, অনুভূতির আনন্দে হৃদয়কে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করিয়া দেয়।

রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমের ভাবধারা আত্মসাৎ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রকাশ ভঙ্গীতে ভারত-ভারতীর ব্যত্যয় ঘটে নাই। বরং তাঁহার মধ্যে ভারতীয় সাধনার, সভ্যতার ও সংস্কৃতির, ঐতিহ্য পরম্পরা অতি সুষ্ঠুরূপেই সুবিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথকে ভারতের বাণীমূর্ত্তি বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। ভারতের উপনিষদ, দর্শন, রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাস-ভবভূতি প্রভৃতির কাব্য নাটক, বাঙ্গালার বৈষ্ণব পদাবলী, উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথের সাধু সন্তগণের রচনা, পুরাণ, ইতিহাস, কথা, গাথা ও লোকশ্রুতি এ সমস্তই রবীন্দ্র মানস-সরোবরকে তরঙ্গায়িত করিয়াছে। ভারতবর্ষ আর একজন ব্যক্তির মধ্যেও স্বয়ম্ প্রকাশিত হইয়াছিল, তিনি মহামানব মহাত্মা গান্ধী। রবীন্দ্রনাথ ভাব, গান্ধীজী রূপ, রবীন্দ্রনাথ কল্পনা, গান্ধীজী কর্ম্ম। বর্ত্তমান ভারতবর্ষের ইতিহাস রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর সাহিত্য ও জীবনেতিহাস।

যে গ্রন্থখানির মাধ্যমে আমি রবীন্দ্র কবিতার সঙ্গে প্রথম পরিচিত হইয়াছিলাম—সে গ্রন্থখানি চয়নিকা—অজিত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সঙ্কলন। স্মরণ হইতেছে—বেশ সুন্দর বাঁধাই, প্রথমেই একটি চিত্র ছিল, আর তাহারই নীচে "ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে" কবিতাংশ মুদ্রিত ছিল, কিম্বা পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় চিত্র, আর তাহারই সম্মুখের পৃষ্ঠায় সমগ্র কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছিল। গ্রন্থখানি চুরী গিয়াছে। পরবর্ত্তী আর একখানি চয়নিকা বোধ হয় কবির নিজের সঙ্কলিত, সেখানি কোন বন্ধু পত্নীকে উপহার দিয়াছিলাম। সম্প্রতি কবির সঙ্কলিত-"সঞ্চয়িতা" আমার অন্যতম অবলম্বন।

অপরাধ অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, বাঙ্গালা সংবাদপত্র পাঠে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার কবিতার প্রতি আমার একটা বিরূপ ধারণাই ছিল। অজিত চক্রবর্ত্তীর চয়নিকাখানি আমার একজন বন্ধুর বিবাহ উপলক্ষে নববধূ উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পত্নীর কবিতা প্রীতির কোন লক্ষণ না দেখিয়া বন্ধু গ্রন্থখানি আমাকেই দান করেন। কারণ রবীন্দ্র কবিতা লইয়া আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট তাঁহার এবং তাঁহার সহোদরের সঙ্গেই বেশী বিরুদ্ধ বিতর্ক করিতাম। চয়নিকা পাঠে অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। এই রবীন্দ্রনাথের কবিতা, এমন চমৎকার? আর এই মধুর হইতে মধুরতম—এমন সুন্দর হইতে সুন্দরতম কবিতার রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ। সাম্রাজ্য জয়ের আনন্দ কেমন জানি না, নব আবিষ্কারের উন্মাদনা কি বস্তু বুঝাইতে পারিব না। সে দিনের সে আনন্দ,—আজ কতদিনের কথা কিন্তু "আজো মনে হয় যেন সেদিন সকাল" চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। কবির কবিতা সাজাইবার একটী পদ্ধতি দেখিতেছি রচনার কালানুক্রমের অনুসরণ। অজিতকুমার কেমন ভাবে কবিতা সাজাইয়াছিলেন, স্মরণ করিতে পারিতেছি না। তবে এ কথাটী বেশ স্মরণ আছে যে তিনি দুই একটী কবিতার কোন কোন গুচ্ছ বর্জ্জন করিয়াছিলেন, কবি স্বীয় সঙ্কলিত চয়নিকায় সেগুলি পুনর্যোজনা করেন। উদাহরণ স্বরূপ "পুরস্কার", পরশ পাথর" ও "উর্ব্বশী"র কথা স্মরণ হইতেছে। আবার এমনও দেখিতেছি, অজিত কুমারের সঙ্কলিত চয়নিকায় ছিল এরূপ দু একটা ছত্র যাহা কবি বর্জ্জন করিয়াছেন। উদাহরণ, মনে হয় "পতিতায়" এই ছত্র দুটী ছিল—

মন্ত্রি, আবার সেই বাঁকাহাসি না হয় দেবতা আমাতে নেই।
ছেড়েছি ধরম তা বলে ধরম ছেড়েছে কি মোরে একেবারেই॥

পরবর্ত্তী সঙ্কলনে এই দুই ছত্র আর দেখিতে পাই নাই। গুপ্তপ্রেম কবিতায়—

আমি আপন অপমান সহিতে পারি—
প্রেমের সহেনাতো অপমান,
অমরাবতী তেজে মরতে এসেছে সে
তোমার চেয়ে সে যে মহীয়ান।

সঞ্চয়িতায় এই গুচ্ছটীও বর্জ্জিত হইয়াছে।

ইদানীংকার কবিতার মধ্যে "সাগরিকা"র শেষের গুচ্ছের আগেকার "পরের দিনে তরুণ ঊষা-বেণু বনের আগে" গুচ্ছটী কবি বাদ দিয়াছেন। ইহার মধ্যে হয়তো স্বয়ং কবির সংশোধন স্পৃহা অথবা সমালোচক বা সঙ্কলয়িতার অথবা পাঠকের সঙ্গে কবির রুচিভেদের কথা থাকিতে পারে।

আমার মনে হয় কবিতার কালানুক্রমিক আলোচনায়—পাঠকের রসোপভোগের বিশেষ সহায়তা হয় না। কবিতা যতদিন কবিতা হয় নাই, ঐতিহাসিকের পক্ষে সেই দিনগুলির একটা প্রয়োজন থাকিতে পারে। কিন্তু কবিতা যখন সত্যই কবিতা হইয়া উঠিল, তখন হইতে কালের হিসাব নিকাশের প্রয়োজন ফুরাইয়াছে বলিয়াই মনে করি। কবিতা এমন বস্তু নয় যে কালের অঙ্কেকে তাহার রস নিরূপিত হইবে। রসের গণ্ডী দিয়া তাহার পরিমাপ করিব কিরূপে? কবির স্থায়ী ভাব নিশ্চয়ই একটা

আছে। সময় সময় সঞ্চারী ও ব্যভিচারী ভাব আসিয়া তাহাকে পরিপুষ্ট করিয়াছে। তাহার রূপান্তর ঘটাইয়াছে। কে সেই ক্ষণঘটী পলকে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে? কবিতা যেদিন কবিতা হইয়া উঠিয়াছে, সেই দিনই এই স্থায়ী ভাব উদিত হইয়াছে। সেই রসোত্তীর্ণ কবিতার রসের বিষয় ও আশ্রয়, অবলম্বন ও উদ্দীপন-আদি হইতেই পাঠকের রসানুভূতি ঘটিবে। অবশ্য কোন বিশেষ ঘটনা বা ব্যক্তি অথবা কাল লইয়া লিখিত কবিতার কথা স্বতন্ত্র।

রবীন্দ্র কবিতার আলোচনায় অনেকে কবির মনস্তত্ব লইয়া আলোচনা করিতে বসেন। আমার মনে হয় কাব্যালোচনায় কবি মনের বিচার, আর রসতত্বের সঙ্গে মনস্তত্বের মিলন সাধনের চেষ্টা প্রায় সমান। এ যেন স্রষ্টার তত্বানুসন্ধানের পথে সৃষ্টির পরিচয় গ্রহণ। আমরা কিন্তু সৃষ্টির মধ্য দিয়াই স্রষ্টার সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করিতে চাই। কবির সৃষ্টির বিষয়ে বরং এই কথাই বলিতে হয়—যে আমাদের পক্ষে সৃষ্টির পরিচয়ই যথেষ্ট, স্রষ্টার পরিচয় গৌণ। সৃষ্টির মধ্য দিয়া যদি কিছু পাওয়া যায়—যথা লাভ।

অনেকে রবীন্দ্র কবিতার আলোচনার প্রমাণ-পঞ্জীরূপে কবির ছিন্নপত্র ও জীবন স্মৃতি উল্লেখ করেন। অতীত দিনে কবে কখন কোন ভাবের বন্যা আসিয়াছিল, কিসের প্রেরণায় কবি কোন্ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, কবি কি সেই বিশেষ ক্ষণ বা প্রেরণাটীকে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছিলেন? তাঁহার দিনলিপিতে কি তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায়? যৌবনে লেখা কবিতা, আজ পরিণত বয়সের অধিষ্ঠান ভূমি হইতে কবি যে দৃষ্টি ভঙ্গীতে নিরীক্ষণ করিতেছেন, তাহাকে কবিতার রসোপলব্ধির মানদণ্ড বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে! কিন্তু তাই বলিয়া সহৃদয় সামাজিকের নিজস্ব অনুভূতির অমর্য্যাদা করা চলিবে না। এ বিষয়ে কবির সঙ্গে পাঠকের রসবোধের পার্থক্য ঘটিতে পারে। কালিদাসের কাব্য-রসাস্বাদের সময় আমরা কি কবিমনের কোন পরিচয় গ্রহণের জন্য ব্যগ্র হই, না প্রত্নতাত্বিকগণের নিকট তাঁহার দিনলিপির কোন অনুসন্ধান করি। এই সমস্তের অভাবে কি আমাদের আনন্দ উপভোগের কোন ব্যাঘাত ঘটে?

রবীন্দ্রনাথের প্রতিটী কবিতা যেন এক একটী খণ্ড কাব্য। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে কবির একটী কবিতা অন্য একটী কবিতার অনুপূরক, কিম্বা পরিপূরক, অথবা কবি কোন একটী বিশেষ রস ও ভাবকে নানা ভাষায় নানা ছন্দে ভিন্ন, ভিন্ন, কয়েকটী কবিতার মধ্যেও রূপান্তরিত করিয়াছেন; তথাপি এই কথা বলাই সঙ্গত যে, কবির অধিকাংশ কবিতাই স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং তাহার সমগ্রতাই আমাদিগকে আনন্দদান করে। কাব্য আলোচনা সম্বন্ধে কবির সংক্ষিপ্ত অভিমত এইরূপ—

"কাব্যের একটা গুণ এই যে কবির রচনাশিক্ষা পাঠকের রচনা শক্তির উদ্রেক করিয়া দেয়; তখন স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কেহবা সৌন্দর্য্য, কেহবা জাতি, কেহবা তত্ব সৃজন করিতে থাকেন। এ যেন আতস বাজীতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া—কাব্য সেই অগ্নি শিখা, পাঠকদের মন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আতসবাজি। আগুন ধরিবামাত্র কেহবা হাউয়ের মত একেবারে আকাশে উড়িয়া যায়, কেহ বা তুবড়ির মত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, কেহ বা বোমার মত আওয়াজ করিতে থাকে। * * অনেকে বলেন—আঁঠি ফলের প্রধান অংশ এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা তাহার প্রমাণ করাও যায়। কিন্তু তথাপি অনেক রসজ্ঞ ব্যক্তি ফলের শাঁসটি খাইয়া তাহার আঁঠি ফেলিয়া দেন। তেমনি কোনো কাব্যের মধ্যে যদিবা কোনো বিশেষ শিক্ষা থাকে, তথাপি কাব্য রসজ্ঞ ব্যক্তি তাহার সম্পূর্ণ কাব্যাংশটুকু লইয়া শিক্ষাংশটুকু ফেলিয়া দিলে কেহ তাঁহাকে দোষ দিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা আগ্রহ সহকারে কেবল ঐ শিক্ষাংশটুকুই বাহির করিতে চাহেন, আশীর্ব্বাদ করি তাঁহারাও সফল হউন এবং সুখে থাকুন। আনন্দ কাহাকেও বলপূর্ব্বক দেওয়া যায় না। কুসুম ফুল হইতে কেহবা তাহার রঙ বাহির করে, কেহবা তৈলের জন্য তাহার বীজ বাহির করে, কেহবা মুগ্ধনেত্রে তাহার শোভা দেখে। কাব্য হইতে কেহবা ইতিহাস আকর্ষণ করেন। কেহবা দর্শন উৎপাটন করেন, কেহবা নীতি, কেহবা বিষয় জ্ঞান উদ্‌ঘাটন করিয়া থাকেন,—আবার কেহবা কাব্য হইতে কাব্য ছাড়া আর কিছুই বাহির করিতে পারেন না—যিনি যাহা পাইলেন তাহাই লইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে ঘরে ফিরিতে পারেন—কাহারও সহিত বিরোধের আবশ্যক দেখি না—বিরোধে ফলও নাই! (পঞ্চভূত)

কবি নিজের কথায় বলিয়াছেন—

"আমার তো মনে হয় আমার কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে—সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা।" (জীবনস্মৃতি)

সঞ্চয়িতার ভূমিকায় কবি বলিয়াছেন—"সন্ধ্যা-সঙ্গীত, প্রভাত সঙ্গীত ও ছবি ও গান এখনো যে বই আকারে চলছে, একে বলা যেতে পারে কালাতিক্রমণ দোষ। * * * ঐ তিনটি কবিতা গ্রন্থের আর কোনো অপরাধ নেই কেবল একটি অপরাধ লেখাগুলি কবিতার রূপ পায়নি। * * * ইতিহাস রক্ষার খাতিরে এই সঙ্কলনে ঐ তিনটি বইয়ের যে কয়টি লেখা সঞ্চয়িতায় প্রকাশ করা গেল তা ছাড়া ওদের থেকে আর কোনো লেখাই আমি স্বীকার করতে পারব না। ভানু সিংহের পদাবলী সম্বন্ধেও সেই একই কথা। * * * তার পর মানসী থেকে আরম্ভ করে বাকী বইগুলির কবিতায় ভালমন্দ মাঝারি ভেদ আছে কিন্তু আমার আদর্শ অনুসারে ওরা প্রবেশিকা অতিক্রম করে কবিতার শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।"

সঞ্চয়িতায় ভানু সিংহের ভনিতাযুক্ত যে দুইটি কবিতা কবি উদ্ধৃত করিয়াছেন—যতদূর স্মরণ হয় অজিত চক্রবর্ত্তীর সঙ্কলনেও এই কবিতা দুইটি ছিল—আমার মতে এই দুইটি রচনা সত্যই কবিতা হইয়াছে এবং কবির নিজের মাথায় তাঁহার কাব্যরচনার যে একটিমাত্র পালা, সে পালা ঐ ভানুসিংহের পদ হইতেই সুরু হইয়াছে। কাব্যালোচনা প্রসঙ্গে কবি যে বলিয়াছেন "কবির রচনাশক্তি পাঠকের রচনা শক্তি উদ্রেক করিয়া দেয়" কথাটি অতি সত্য কথা, কবির নিজ জীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূতির কথা। কিশোর বয়সে কবি বৈষ্ণব কবিতা পাঠে যে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে ঐ অনবদ্য কবিতা রচিত হইয়াছিল।

অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় কিশোর-কবি সেই যে সম্বোধন করিয়াছিলেন—"মরণ রে তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান" অতি পরিণত বয়সেও বহু কবিতায় নানাভাবে নানারূপে তিনি ঐ একই কথা পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিয়াছেন। মৃত্যুভয় তিনি অতিক্রম করিয়াছিলেন, মরণকে প্রিয়রূপে, বররূপে, বঁধুরূপে, অতিথিরূপে কতরূপে যে তিনি দেখিয়াছিলেন! প্রথম কৈশোরে শ্যামরূপে, আবার পরিণত বয়সে শঙ্কররূপে—"যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন"—(মরণ মিলন) কবি এই মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। মরণ তাঁহার নিকট নবজীবনের সঙ্গে পরিণয়। সীমার সঙ্গে অসীমের মিলন। কবি আজীবন নানাছলে এই কথাই বলিয়াছেন—

* * * নব নব মৃত্যুপথে,
তোমারে পূজিতে যাব জগতে জগতে॥ (জন্ম ও মরণ)

মানব-জীবনের যে চিরন্তন জিজ্ঞাসা—কিশোর-কবি-হৃদয়ে সেই জিজ্ঞাসাই জাগ্রত হইয়াছিল। যাঁহার জন্য যুগ যুগ ধরিয়া মানব হৃদয়ের অসীম আকুতি ধরণীর আকাশ বাতাসকে আকুল করিয়া তুলিতেছে—কৈশোরেই কবি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, কিন্তু তখনো চিনিতে পারেন নাই। তাই, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—কো তুঁহুঁ বোলবি মোয়? ইহা কথার কথা নহে, অলস কল্পনাবিলাস নহে; ভারতের ঋষি তপোবনে শুশ্রুষু সমিধপাণি ঋষি তনয়ের শাশ্বত প্রশ্ন যেমন—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"—তেমনই ভারতীর আনন্দনন্দনে প্রথম প্রবিষ্ট কবির বিস্মিত জিজ্ঞাসা—

কো তুঁহুঁ বোলবি মোয়।
হৃদয় মাহ মঝু জাগসি অনুক্ষণ
আঁখ উপর তুঁহু রচলহি আসন
অরুণ নয়ন তব মরণ সঙ্গে মম
নিমিখ না অন্তর হোয়॥
হৃদয় কমলু তব চরণে টলমল
নয়ন যুগল মম উছলে ছলছল
প্রেম পূর্ণ তনু পুলকে ঢলঢল
চাহে মিলাইতে তোয়॥
বাঁশরী ধ্বনি তুই অমিয় গরল রে
হৃদয় বিদারয়ি হৃদয় হরল রে
আকুল কাকলি ভুবন ভরল রে
উতল প্রাণ উতরোয়॥

এই একটিমাত্র কবিতা লিখিয়াই 'কবি বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠীর মধ্যে আসনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান" কবিতাটীর কথা সকলেই জানেন। কবি কৈশোরেই অনুভব করিয়াছিলেন—"জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করার নামই ভালবাসা। প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্য্য-সম্ভোগ। সমস্ত বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত রহিয়াছে।"

"বৈষ্ণব ধর্ম্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটীকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে—প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জ্জন করে, প্রিয়তম এবং প্রিয়তমা পরস্পরের নিকট আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন এই সমস্ত প্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়াছেন।" (পঞ্চভূত)

মানসীর "অনন্ত প্রেম"এর মধ্যেই কবির এই অনুভূতির পরিচয় আছে। ভানুসিংহের পদাবলীতে যে জীবন-দেবতাকে কবি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"কো তুঁহুঁ বোলবি মোয়" অনন্ত প্রেম কবিতায় তাঁহাকেই উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন—

"অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে দেখা দেয় অবশেষে
কালের তিমির রজনী ভেদিয়া তোমারই মুরতি এসে
চির স্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকার বেশে"॥

* * * * *

"আজি সেই চির দিবসের প্রেম অবসান লভিয়াছে
রাশি রাশি হ'য়ে তোমার পায়ের কাছে।
নিখিলের সুখ নিখিলের দুখ নিখিল প্রাণের প্রীতি
একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে সকল প্রেমের স্মৃতি,
সকল কালের সকল কবির গীতি"॥

ভারতীয় সাধনায় জীবন-দেবতাকে, আপন অভীষ্টকে প্রিয়ারূপে পরিচিন্তনের কোনো সাধন নাই। তন্ত্রে নায়িকা-সাধনার পদ্ধতি আছে, কিন্তু এই নায়িকা দেবী নহেন, দেবীর সহচরী। সুফী ধর্ম্মে ভগবানকে প্রিয়তমারূপে ভাবনার কথাই প্রধান। হয়তো কবি কৈশোরেই এই সাধন পথের পরিচয় পাইয়াছিলেন, এবং তাঁহার জীবনে বৈষ্ণব সাধনা ও সুফী সাধনার সমন্বয় ঘটিয়াছিল। অথবা কবি ভারতীয় উপনিষদ হইতেই ব্রহ্মকে পুরুষ ও নারীরূপে দর্শনের রহস্য অবগত হইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে কবির রমণী কবিতাটী স্মরণীয়।

যেভাবে রমণীরূপে আপন মাধুরী
আপনি বিশ্বেরনাথ করিছেন চুরী।
যেভাবে সুন্দর তিনি সর্ব্ব চরাচরে,
যেভাবে আনন্দ তাঁর প্রেমে খেলা করে,
যেভাবে লতায় ফুল নদীতে লহরী,
যেভাবে বিরাজে লক্ষ্মী বিশ্বের ঈশ্বরী।
যেভাবে নবীন মেঘ বৃষ্টি করে দান
তটিনী ধরারে স্তন্য করাইছে পান
যেভাবে পরম এক আনন্দে উৎসুক
আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ

দুয়ের মিলনাঘাতে বিচিত্র বেদনা
নিত্য বর্ণ গন্ধ গীত করিছে রচনা
হে রমণী ক্ষণকাল আসি মোর পাশে,
চিত্তভরি দিলে সেই রহস্য আভাসে ॥ (স্মরণ)

সুতরাং কবি যে জীবন-দেবতাকে কখনো বঁধুরূপে বরণ করিয়াছেন, আবার কখনো বধূরূপে লাভ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য নাই। আমার মনে হয় এই মানসীতেই কবি মেঘদূতের পূর্ব্বমেঘরূপ সীমা হইতে যাত্রা করিয়া অসীমের উত্তর মেঘের অলকায় উপনীত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার মানস-সঙ্গিনী বা লীলাসঙ্গিনীর সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটিয়াছিল।

সোনার-তরীতে জীবন-দেবতার ছায়া দেখিয়াছি। "নিদ্রিতায়" স্বপ্নলোকে গিয়া তিনি আপন অভীষ্ট দেবীর গলে মাল্যদান করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার জীবন দেবতাও যে তাহার জন্য ব্যাকুল, কবিতায় তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় আছে "সুপ্তোত্থিতায়"। সোনার তরীর "মানস-সুন্দরী" এই জীবন দেবতারই আবাহন। জগৎ ও জীবন কবি পরিচিত হইয়াছেন, দুইকেই অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। "বসুন্ধরা" কবিতা কবি-জীবনের জগৎ পরিক্রমারই পরিচয়। "কবি" জীবন-দেবতাকে আহ্বান করিয়াছিলেন, এইবার জীবন দেবতার ইঙ্গিতে "নিরুদ্দেশ যাত্রা" করিয়াছেন!

চিত্রায় জীবনদেবতার সাক্ষাৎ দর্শনের পরিচয় আছে। "সাধনা" ও "আবেদন" কবিতা দুইটি "জীবনদেবতার" নিকটেই প্রার্থনা। চিত্রার অপর দুইটী কবিতা "জীবনদেবতা" ও "সিন্ধুপারে"। কবি দুইরূপে জীবনদেবতার সাক্ষাৎলাভ করিয়াছেন। "জীবনদেবতা" কবিতায় কবি বধূরূপে তাঁহার নিকট আত্মনিবেদন করিতেছেন। আর "সিন্ধুরূপে" কবিতায় জীবন-দেবতাই বধূরূপে তাঁহার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে মিলিত হইয়াছেন।

উপনিষদ বলিয়াছেন—"য মে বৈধং বৃণুতে"। কবি জীবন-দেবতাকে বলিতেছেন—

আপনি বরিয়া লয়েছিলে মোরে না জানি কিসের আশে।
লেগেছে কি ভালো হে জীবন নাথ
আমার রজনী আমার প্রভাত
আমার ধর্ম্ম আমার কর্ম্ম আমার বিজন বাসে ॥

* * * *

এখন কি শেষ হয়েছে প্রাণেশ যা কিছু আছিল মোর।
যত শোভা যত গান যত প্রাণ জাগরণ ঘুম ঘোর ॥
শিথিল হয়েছে বাহু বন্ধন,
মদিরা বিহীন মম চুম্বন,
জীবনকুঞ্জে অভিসার নিশা আজি কি হয়েছে ভোর ॥
ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা
আনো নবরূপ আনো নব শোভা
নূতন করিয়া লহ আরবার চির পুরাতন মোর।
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায় নূতন জীবন ডোর ॥

এই নূতন বিবাহের কথাই কবি "সিন্ধুপারে" কবিতায় বলিয়াছেন—

* * * * *

শরণ ছাড়িয়া উঠিল রমণী বদন করিয়া নত
আমিও উঠিয়া দাঁড়াইনু পাশে যন্ত্রচালিত মতো।
নারীগণ সবে ঘেরিয়া দাঁড়াল একটি কথা না বলি,
দোঁহাকার সাথে ফুলদল সাথে বরষি লাজাঞ্জলী।
পুরোহিত শুধু মন্ত্র পড়িল আশীষ করিয়া দোঁহে,
কী ভাষা কী কথা কিছু না বুঝিনু দাঁড়ায়ে রহিনু মোহে
অজানিত বধূ নীরবে সঁপিল শিহরিয়া কলেবর,
হিমের মতন মোর করে তার তপ্ত কোমলকর ॥

* * * *

পাদপীঠ পরে চরণ প্রসারি শয়নে বসিল বধূ
আমি কহিলাম সব দেখিলাম তোমারে দেখিনু শুধু ॥
চারিদিক হতে কাঁদিয়া উঠিল শত কৌতুক হাসি।
শত ফোয়ারায় উঠেছিল যেন পরিহাস রাশি রাশি ॥
সুধীরে রমণী দুবাহু তুলিয়া অবগুণ্ঠন খানি
উঠায়ে ধরিয়া মধুর হাসিল মুখে না কহিয়া বাণী।
চকিত নয়নে হেরি মুখ পানে পড়িনু চরণ তল
এখানে ও তুমি "জীবন দেবতা" কহিনু নয়ন জল।
সেই মধু মুখ সেই মৃদুহাসি সেই সুধাভরা আঁখি
চিরদিন মোরে হাসাল কাঁদাল চিরদিন দিল ফাঁকি।
খেলা করিয়াছে নিশিদিন মোর সব সুখে সব দুখে
এ অজানাপুরে দেখা দিল পুন সেই পরিচিত মুখে।
অমল কোমল চরণ কমলে চুমিনু-বেদনাভরে
বাধা না মানিয়া ব্যাকুল অশ্রু পড়িতে লাগিল ঝরে ॥

সেই চিরসুন্দর যে কতরূপে কত ছলে কত বিভিন্ন ক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে কবির সহিত মিলিত হইয়াছেন, কবিও তাহা বলিতে পারেন নাই। কবি সুন্দরকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—"এই জীবনে ঘটালে মম জন্ম জন্মান্তর"। সুতরাং কোনো একটি সূত্র ধরিয়া কবিকে অনুসরণ অসম্ভব। কোনো একটি ব্যাখ্যার কাঠামোতে—রবীন্দ্র-কবিতাকে আবদ্ধ করিবার প্রয়াস সমালোচনা নহে। কবি জগৎ এবং জীবনকে ভালবাসিয়াছিলেন? ভালবাসিয়াছিলেন জগৎরূপে প্রকাশিত জগতে বিলসিত জগদতীত জীবন দেবতাকে? তাই তো বলিতে পারিয়াছিলেন—"দেবতাকে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা"।

সোনার তরী, চিত্রা প্রভৃতি গ্রন্থে এমন কতকগুলি উৎকৃষ্ট প্রথম। কবিতা আছে; যে সমস্ত কবিতার রসোপলব্ধির জন্য কবির বয়স, চিন্তাধারা, রচনার সাল তারিখ কোন কিছুরই প্রয়োজন হয় না। কারণ তাহার মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধহীন স্বয়ংসম্পূর্ণ অনেক কবিতাই পাওয়া যাইতেছে।

দুই চারিটি কবিতা পড়িয়া যেমন কবির বিষয়ে কোন একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা চলে না, তেমনই কোন একটি কবিতার বিষয়বস্তু বিচার করিয়া কিম্বা কোন কবিতার প্রতিপাদ্য ধরিয়া তাহাই কবির অভিমত, এমন কথাও বলা চলে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ "অমত্ত" কবিতাটি উদ্ধৃত করিতেছি।

যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য্য নাহি মানে,
মুহূর্ত্তে বিহ্বল হয় নৃত্য গীত গানে
ভাবোন্মাদ মত্ততায়, সেই জ্ঞান হারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছ্বল-ফেণ ভক্তি মদধারা
নাহি চাহি নাথ।
দাও ভক্তি শান্তিরস,
স্নিগ্ধ সুধা পূর্ণ করি মঙ্গল কলস
সংসার ভবন-দ্বারে। যে ভক্তি অমৃত
সমস্ত জীবনে মোর হইবে বিস্তৃত
নিগূঢ় গভীর, সর্ব্ব কর্ম্মে দিবে বল,
ব্যর্থ শুভ চেষ্টারেও করিবে সফল
আনন্দে কল্যাণে। সর্ব্ব প্রেমে দিবে তৃপ্তি
সর্ব্ব দুঃখে দিবে ক্ষেম, সর্ব্ব সুখে দীপ্তি
দাহ-হীন। সম্বরিয়া ভাব-অশ্রু-নীর
চিত্ত রবে পরিপূর্ণ অমত্ত গম্ভীর॥ (নৈবেদ্য)

কবির জীবনে হয় তো এমন একদিন আসিয়াছিল, যেদিন শান্ত ভক্তি-রসের প্রয়োজনীয়তা ছিল। অথবা তিনি কোন কারণে ঐ ভাবোন্মাদ-মত্ততা হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন। যে জন্যই হউক এক সময় ঐ কবিতা তিনি লিখিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে এবং পরে তিনি এমন অনেক কবিতা লিখিয়াছেন যাহা শান্ত ভক্তিরসের পর্য্যায়ে পড়ে না। দুই একটি উদাহরণ দিতেছি।

(১) হে রুদ্র, তব সঙ্গীত আমি,
কেমনে গাহিব কহি দাও স্বামী
মরণ নৃত্যে ছন্দ মিলায়ে
হৃদয় ডমরু বাজাব। (সুপ্রভাত)

(২) আজি আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া গগনে ছড়ায়ে এলোচুল
চরণে জড়ায়ে বনফুল।
ঢেকেছ আমারে তোমার ছায়ায়
সঘন সজল বিশাল মায়ায়
আকুল করেছ শ্যাম সমারোহে হৃদয় সাগর উপকূল,
চরণে জড়ায়ে বনফুল॥
(আবির্ভাব)

(৩) মহাবিশ্ব জীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা
মৃত্যুরে না করি শঙ্কা। (এবার ফিরাও মোরে)

(৪) বাজা তোরা বাজা বাঁশী মৃদঙ্গ উঠুক তালে মেতে
দুরন্ত নাচের নেশা পাওয়া।
নদীপ্রান্তে তরীগুলি ঐ দেখ আছে কান পেতে
ঐ সূর্য্য চাহে শেষ চাওয়া॥
নিবি তোরা তীর্থ বারি যে অনাদি উৎসের প্রবাহে
অনন্তকালের বক্ষ নিমগ্ন করিতে যাহা চাহে
বর্ণে গন্ধে রূপে রসে তরঙ্গিত সঙ্গীত উৎসাহে
জাগায়ে প্রাণের মত হাওয়া॥
(মিলন॥ মহুয়া॥)

এমন অনেক আছে। এই সমস্ত কবিতা শান্ত ভক্তিরসের উদাহরণ বলিয়া গ্রহণ করা চলে না।

কবির এমন অনেক কবিতা আছে, যেগুলি নানাভাবে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। অনেক কবিতা বুঝিতে পারি, বুঝাইতে পারি না। অনেক কবিতার অর্থ ধরি ধরি করিয়াও ধরা যায় না। বুঝিতে পারি না, বুঝাইতে পারি না, তথাপি মনে হয়—এ-তো আমারই অন্তরের কথা, এই কথাই তো আমি বলিতে চাহিতে ছিলাম। আমি বুঝি বা না বুঝি—পৃথিবীর সহৃদয় সামাজিকগণ তো আমাদের কবিকে বুঝিয়াছেন। কবির প্রতিজ্ঞা তো পূর্ণ হইয়াছে।

না পারে বুঝাতে আপনি না বুঝে
মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে
কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে
মাগিছে তেমনই সুর।
কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা
কিছু ঘুচাইব প্রকাশের ব্যথা
বিদায়ের আগে দু'চারিটী কথা
রেখে যাব সুমধুর॥

কবির এই উক্তি তো সার্থক হইয়াছে।

যে কথাটি বলিবার জন্য আমার এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের অবতারণা, রবীন্দ্র রসজ্ঞগণের নিকট সেই কথা এইবার নিবেদন করিতেছি। সেও আজ বহুদিনের কথা,—কবি অক্ষয় বড়ালের "শংখ" পড়িয়া সর্ব্বপ্রথম এই কথাটিই মনে হইয়াছিল যে মানুষের জীবন এবং এই কাব্য যেন এক সূত্রে গাঁথা, অর্থাৎ শঙ্খ যেন একটি জীবন কাব্য। কবিতার এমন বিন্যাস নৈপুণ্য আমি বাঙ্গালার অন্য কোন কবিতাগ্রন্থে দেখি নাই। জগতের উদ্ভব স্থিতি এবং পরিণতি, মানবের জন্ম জীবন এবং বিলয়—যেন প্রকৃতির এক অমোঘ নিয়মে শৃঙ্খলিত হইয়া আছে, এবং শঙ্খের কবিতার পর কবিতায় তাহার প্রকাশ বিকাশ ও পরিণাম প্রত্যক্ষ করিতেছি। রবীন্দ্রনাথের কবিতাবলী লইয়া তেমনই একখানি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা চলে না? আমার মত অল্পবুদ্ধি যাহারা রবীন্দ্র কবিতা পাঠ করিতে চায়, তাহাদের জন্য এইরূপ গ্রন্থের প্রয়োজন আছে।

কবির বয়স ও মনের অবস্থা, রচনার সন তারিখ, কোন্ গ্রন্থের কবিতা, এই সমস্ত উল্লেখের কোন প্রয়োজন নাই। ভাব ও রসের অঙ্কুর, বিকাশ এবং পরিণতি বিশ্লেষণ করিয়া,—ভাব ও রসের পারম্পর্য্য সূত্রে গাঁথিয়া কবিতাগুলিকে সাজাইতে হইবে। একাজ হয়তো একার দ্বারা সম্ভব নহে। যত সহজে এই কথা কয়টি লিখিলাম একাজ তত সহজসাধ্যও নহে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে—যেখানে মণিরত্নের সংখ্যা নাই—উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতম মণিরত্নের নির্ব্বাচন বাজারের তথাকথিত স্বয়ংসিদ্ধ জহুরীর দ্বারা ঘটিয়া উঠিবে না। বিশ্বভারতী এই ভার গ্রহণ করিলে, তবেই আমাদের আশা পূর্ণ হইতে পারে।

কবিতাগুলির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাও দিতে হইবে। সোনার তরীর নাবিক শস্যগুলি গ্রহণ করিলেন, কিন্তু শস্যের যিনি অধিকারী তাঁহাকে তরীতে স্থান দিলেন না। আবার ক্ষণিকার যাত্রী কবিতায় নাবিক ধানশুদ্ধ অধিকারীকে তরীতে স্থান দানের জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া-ছেন। ভ্রষ্টলগ্ন (কল্পনা) কবিতার সঙ্গে খেয়ার শুভক্ষণ কবিতার, চিত্রার আবেদন, কল্পনার অশেষ, ও কল্পনার শঙ্খ—কবিতার, ক্ষণিকার আবির্ভাব, উৎসর্গের নব বেশ ও খেয়ার আগমন কবিতার ঐক্য বা পার্থক্য বিশ্লেষণ প্রয়োজন। উৎসর্গে একটী কবিতা আছে প্রচ্ছন্ন, আবার খেয়াতেও আছে প্রচ্ছন্ন। অতি সামান্য দুই একটি উদাহরণ মাত্র দিলাম।

তত্ত্ব-কথা

শ্রীনরেন্দ্র দেব

একথা স্বীকার কেহ করি বা না-করি—
অন্তরে আছে এ সত্য ভরি,
বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—নারী ;
দেবতা মানব দৈত্য সর্ব চিত্তহারী।
ললিত পেলব তনু, চম্পকবরণা
শ্রোণীভারে সুমন্থর অলস চরণা
কটাক্ষে বিদ্যুৎ দীপ্তিভরা ;
পাদনখকণা যার চুম্বনে সার্থক মানে ধরা !
অধরে অমৃত লিপ্ত, সুদশনে ঝরে স্নিগ্ধ হাসি,
সুমধুর কণ্ঠে বাজে বাঁশী !
অতুলন মনে হয় তাই।
হেরিলে বড় আনন্দ পাই,
সুন্দরে আমি যে ভালবাসি।
লীলায়িত তনুতটে নৃত্য করে নবীন যৌবন,
মাধুরী পড়িছে গলে,
চঞ্চল করিয়া তোলে
বৃদ্ধ, যুবা, কিশোরের মন !

*　　*　　*　　*

যারা বলে মানুষের দেহের ভিতর
আছে শুধু ক্লেদ ক্লিন্ন পঙ্ক অসুন্দর,
কঙ্কালের ক্রূর বীভৎসতা—
শুনো না তাদের কোনো কথা।
বৈরাগ্যের উপদেশ ছলে
যদি তারা বলে—
দু'দিনের এ নব যৌবন,
ঝরিয়া মরিয়া যায়,—
ধীরে ধীরে যেমনি শুকায়
বসন্ত শেষের যৌবন।
যদি বলে ডেকে—
তোমার শরীর আছে ঢেকে
মেদ মজ্জা অস্থি আর স্নায়ু !

রমণীর মোহে পড়ে বেসোনাক ভালো,
রূপ তার আলেয়ার আলো !
হে মানুষ, তুমি যে গো নিতান্ত স্বল্পায়ু,
রোগ শোক জরা মৃত্যু ভরা
দুদিনের বিনশ্বর ধরা,
এ জগৎ মায়াময়,
হেথা কিছু সত্য নয়,
শুনিয়া এ সব তত্ত্ব হয়ো না চঞ্চল,
যারা বলে জেনো তারা দুর্ভাগার দল
এসেছে মক্ষিকাবৃত্তি লয়ে !
তাদের দায়িত্বহীন এসব কথায়
জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ ছেড় না বৃথায়।
এ সংসার বিষকুম্ভ শুধু পয়োমুখ,
যারা বলে, স্নেহে প্রেমে নাহি কোনো সুখ,
সুন্দরের আবরণে রয়েছে কুৎসিত—
তাহারা পারেনা কভু আস্বাদিতে আনন্দ সৎচিৎ !

*　　*　　*　　*

হেন দিব্যদৃষ্টি নাহি চাই,
তৃতীয় নয়নে মোর প্রয়োজন নাই ,
যদি কিছু মন্দ থাকে মাটির ভিতরে—
কি লাভ কবর খুঁড়ে তারে বার করে ?
সুন্দরের আমরা পূজারী,
মাটির পুতুল নহে বিধাতার সৃষ্ট নরনারী ;
আমরা তাদের মাঝে পেয়েছি যে সুন্দরের দেখা,
বহু রূপে লীলা যিনি করিছেন একা !
ভালবাসি রূপ তাঁর, ভালবাসি তাঁহার রচনা,
নাহি চাহি বিশ্লেষণ, কুসুমে কীটের আলোচনা !
মাটির প্রতিমা হেরি মাতৃজ্ঞানে পূজা করি যাঁর
ভক্তিভরে শ্রদ্ধাভরে বারংবার করি নমস্কার,
জানিতে চাহি না উহা শুধুমাত্র খড় বাঁশ দড়ি !
পড়িতে চাহি না মোরা অজ্ঞেয়'রে শূন্যে পাতি খড়ি।

সুখ নাই শান্তি নাই হেন জ্ঞান লাভে ;
যে মানুষ ভাবে—
স্বপ্নের জগৎ এটা, মায়ার সংসার !
তোমার আমার
'দু'দিনের শুধু ছেলেখেলা' ;
ফুরায়ে আসিছে ক্রমে বেলা,
জীবন নহে রে চিরন্তন,
খোঁজো সেই শাশ্বত রতন,
ত্যাগের সাধনা করো
গৈরিক বসন ধরো,
দীক্ষা ল'য়ে বৈরাগ্যের ব্রতে
চলো সেই অজানার পথে
সীমাহীন অলক্ষ্য সন্ধানে
লেগে যাও কায় মন প্রাণে,
সেথা পাবে মুক্তির নিদান—
আত্মালভে সুচির নির্বাণ
পরমাত্মা মাঝে,
নির্গুণ ও নিরাকার ব্রহ্ম সেথা রাজে।

*   *   *   *

শুনো না তাদের সেই ভ্রান্ত উপদেশ,
তোমার সে যাত্রা হবে চির-নিরুদ্দেশ !
এ সংসার নহে মিথ্যা মায়া,
নহে ইহা মরুবক্ষে মরীচিকা ছায়া !
বৃথাই জ্ঞানীরা ঘোরে আলেয়ার পাছে,
পায় না দেখিতে হায় রহিয়াছে স্বর্গ কত কাছে !
এ নিখিল বিশ্ব চরাচরে—
অণু পরমাণুভরা প্রতি ক্ষুদ্র ধূলিকণা 'পরে,
সারা সৃষ্টি মাঝে,
যত বস্তু পুঞ্জ; আর—
সুপ্ত ও চেতনাধার
প্রতি জীবে যে-শিব বিরাজে—
ভুলে গিয়ে তাঁর কথা তারা,
ব্রহ্মাণ্ড খুঁজিয়া হয় সারা !
কৃচ্ছ্র সাধনায় বসে, বীজমন্ত্র করে নিত্য জপ,
ষড়রিপু বিনাশিয়া হতে চায় তারা পরন্তপ !

অভাগা তাহারা জেনো ভাই
তাদের জীবনে শান্তি নাই !

*   *

সুন্দর এ পৃথিবীরে বলে যারা অবিদ্যার পুর,
বলে, মিথ্যা ! বলে, মায়া ! জানে না তো—
কত যে মধুর
এ সংসারে মাত্র এই দু'দিনের খেলা !
সুখে দুঃখে ভরা এই ক্ষণিকের আনন্দের মেলা—
অশ্রু ও বেদনা হেথা জানি জানি আছে,
ফুল কলি ফুটে পুনঃ পড়ে যায় ঝ'রে,
মানুষ মধুপ তাই আজীবন ঘোরে
সংসারের মধুচক্র পাছে।
চিরস্থায়ী হ'লে কিছু সারা সৃষ্টি হ'ত যে জঞ্জাল !
ফুল ফুটে উঠে আজ, না-যদি পড়িত ঝরি কাল
ব্যর্থ হত ফুল !
অমৃতের প্রলোভন জেনো মহাভুল !
মৃত্যু হেথা আছে বলে তা'ই
জীবনের স্বাদ মোরা পাই !
চিরদিন রব না বলেই ভালবাসি ধরণীর মাটি,
যে কদিন বাঁচি মোরা—মুগ্ধ হ'য়ে এর কোলে হাঁটি,
আকাশের রং দেখে নির্নিমেষ আঁখি,
আনন্দ-বিহ্বল চোখে অবাক হইয়া চেয়ে থাকি,
মেঘে মেঘে কী বিচিত্র বর্ণাঢ্যের মহিমা অদ্ভুত !
সে কেবল ধূমজ্যোতি সলিল মরুৎ
বিশ্লেষণ কে চাহে মেঘের ?
হৃদয়াবেগের
গেয়ে যাব জয় ;
সূর্যকর শুভাশিস্,চাঁদের কিরণ মানুষের লাগে মধুময় !

*   *

চাহি না সে পরা-জ্ঞান যার লাগি লুব্ধ যোগীজন,
মুছে দেয় আঁখি হ'তে যাহা, কল্পনার রম্য মোহাঞ্জন !
বলো দেখি—মিথ্যা সে কি, যেদিন এ সংসারের
আনন্দ নন্দনে—
যৌবনের অভিষেক মিলনের চুম্বন-চন্দনে,
বিধাতার সৃষ্টি কার্যে যোগ দিই তুমি আমি এসে,
তৃপ্ত হই পরস্পর নিবিড় আশ্লেষে—

সে মুহূর্ত ভুলিবার নয়,
সৃজনের ইতিহাসে স্মৃতি তার রেখে যায় অপূর্ব বিস্ময় !
প্রাণতীর্থে যৌবনের সম্ভোগের প্রথম শর্বরী
জীবনের পানপাত্রে দিয়ে যায় যে আনন্দ ভরি
কোথায় তুলনা মেলে তার ?
ব্রহ্মানন্দ সুখ সাধে সমাধি সে-জেনো কল্পনার !
মৃত্তিকার এই মর্ত্যে ক্ষণিকের সুখ-স্বর্গবাস—
ক্ষণস্থায়ী জীবনের সেই ত পরম আর চরম বিলাস !
হোক না ক্ষণিক তাহা তবু সে যে মহেন্দ্রের ক্ষণ ;
অনন্ত মাধুর্য ভরা প্রাণ-পদ্মে পুলকের অমৃত ক্ষরণ !
মানুষের পৃথিবীতে
জীবনের চারিভিতে
সেই ক্ষণই—সীমাহীন শাশ্বত মধুর !
আনন্দের সুধা সিন্ধু ;
তারই মাঝে নাদবিন্দু
ওঙ্কারে ঝঙ্কারি তোলে—চিত্ত করি প্রমত্ত বিধুর
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের একই সাথে শান্ত রুদ্র সুর !

* *

প্রথম সন্তান ল'য়ে কোলে
যে অপূর্ব গর্ব সুখে নারী-চিত্ত ত্রিভুবন ভোলে,
জননীর স্নেহাস্বাদ-দিব্য-অনুভূতি—সেই তার
জীবনে প্রথম !
নারী জীবনের তার পূর্ণ সার্থকতা বিধাতার
বিশ্বে অনুপম,
'নরকের দ্বার নারী' যে বলেছে যাও তারে ভুলে,
জ্ঞানীদের উপদেশ গ্রন্থাগারে রেখে দাও তুলে।
ভীরু ওরা—কাপুরুষ ভাই,
নানা মিথ্যা ছলনায় এড়াইতে চাহে সবে তাই
সংসারের দুঃখ তাপ বেদনার ক্লেশ ;
ওদের সে বিমূঢ় নির্দেশ
মেনে যদি চলো তবে হবে তুমি বিদ্রোহী স্রষ্টার
বিধির বিধান যদি তুচ্ছ করো, সে মহা দ্রষ্টার
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে হ'য়ে অপরাধী।
ব্রহ্মচর্য শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে যারা—তারা মিথ্যাবাদী !
সন্ন্যাস-জীবন এক নিরালম্ব নিরানন্দ মরু,
ফুল ফল হীন বৃক্ষ—অনাদৃত নিষ্ফলা সে তরু !

কাম ক্রোধ লোভ মোহ মানুষের সহজ স্বভাব,
পূর্ণ নহে সে মানুষ আছে যার রিপুর অভাব !
নির্বিকল্প সমাধির অবিচ্ছিন্ন আনন্দ ও সুখ—
হেন প্রলোভন হ'তে ফিরাইয়া লহ তব মুখ,
দুঃখ যদি নাহি থাকে, সুখ কিবা ? আনন্দ কেমন ?
স্থির চিত্তে ভেবে তুমি দেখ কিছুক্ষণ,
শুধু সুখ—শুধু শান্তি—
সেই ত' মোহের ভ্রান্তি,
বুদ্ধির বিভ্রম আর চিত্তের বিকার !
আলোর মহিমা কোথা—নাহি যদি থাকে অন্ধকার ?
জরা মৃত্যু রোগ শোক দুঃখ তাপ নাই,
যারা ভাবে সুখী হবো পেলে হেন ঠাঁই,
তাদের নিকটে শুধু জানাই বিনীত নিবেদন
অবিরাম সুখস্বাদে অবসাদ আসিবে যখন
কোথা পাবে মুক্তি তুমি ভাই ?
অধিক মিষ্টতা আনে শুধু তিক্ততাই !
নিত্যানন্দ মনে হবে ঘোর অভিশাপ।

* *

অকৃতজ্ঞ জেনো তারা
বলে যারা
নারী হেথা মূর্তিমতী পাপ !
সৃষ্টির যা প্রাণবীজ, ত্রিলোকের যাহা মূলাধার
তারই ছন্দে গড়া তারা, পূর্ণ করে বসুধার
সাধ বিধাতার !
কোথায় রহিত জ্ঞানী—তত্ত্ববেত্তা—মহামানবক—
হ'ত যদি বিশ্ববাসী ব্রহ্মচারী নিষ্কাম সাধক ?
রেণু ও পরাগে যদি না-ঘটিত ঈপ্সিত মলিন
চঞ্চল সমীরে অনুক্ষণ,
ফুটিত কি ফুল !
ফলভারে নত হয়ে তরুশাখা হ'ত কি আকুল ?
না পেলে মাটি সে স্নেহ—প্রাবৃটের সুধা সুমধুর
কোথা পেত শস্যকণা জীবনের নবীন অঙ্কুর ?
সঘন বর্ষণ রাতে
দুর্যোগের ঝঞ্চাবাতে
না-যদি খসিত এই ধরণীর নীবি
মরুভূমি হ'ত এ পৃথিবী !

* *

থাক থাক তত্ত্বকথা, ক্ষান্ত হও জ্ঞানী,
আমরা এসেছি হেথা দু'দিনের অনিশ্চিত প্রাণী
সুখে-দুখে হেসে কেঁদে যাব ভালবেসে,
জানিতে চাহি না মোরা কি ঘটিবে মরণের শেষে।
পরপার আছে কিনা সে হিসাব যে রাখে রাখুক,
অজানার আশঙ্কায় ম্লান ক'রে রবো কেন মুখ ?
যাহা পাও লহ তাহা শিরোধার্য করি,
বিধাতার দান সে যে—যেয়ো না পাসরি'।
যে কদিন বেঁচে আছো আনন্দে কাটাও
বাজিলে যাবার ঘণ্টা হাসি মুখে ছেড়ে চলে যাও !
অকালে গিয়েছে বলে আক্ষেপ কোর না কারো তরে ;
যে যায় সে যায় জেনো বিধাতার বরে।

ভয় নাই, আমরাই ভগবানে গড়িয়াছি ভাই,
দূর করে দাও যত সন্ন্যাসের বৈরাগ্য বালাই,
সমাজের জেনো ওরা বোঝা,
ওদের জীবন নহে সহজ সুন্দর কিংবা সোজা।
ভুলনা ওদের বাক্যজালে,
অনুতপ্ত হয় তারা জেনো দূর কালে।
সত্য ও নিঃস্বার্থ চিতে স্নেহে প্রেমে
মায়া মমতায়—
ভালবেসে সুখ-স্বর্গ রচো এ ধরায় ;
দুঃখেরে কোর না ডর, বিপদের রেখ না হে ত্রাস,
মানুষেরই দেহের মন্দিরে জেনো সদা
ঈশ্বরের বাস !

বোম্বের আশে পাশে

শ্রীভূপতি চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রাত্রি এগারোটায় তাজের ভোজনশালা থেকে বার হয়ে সমুদ্রতীরে ভারত তোরণের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া গেল। বিশাল সমুদ্র—একেবারে নিশ্চল—দূরে দু' একটী ষ্টীমারের আলো তখনও জ্বলছে—সমুদ্রতীরে তখনও নর-নারীর সংখ্যা অগণ্য না হলেও নগণ্য নয়।

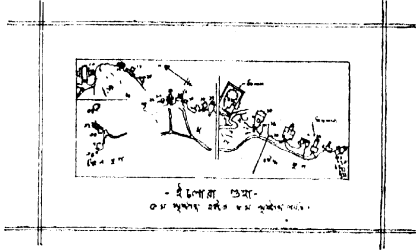
অনর্থক রাত্রি বাড়িয়ে লাভ নেই। পরের দিন বরোদায় যেতে হবে। সকালে আনুষ্ঠানিক লিপি অনুসারে বৈতরণা পরিদর্শন। সেটী আগে হতেই সমাধা করে রাখায় সকাল বেলাটা সহরের বিভিন্ন বাজারে কাটান গেল। টাই, মোজা প্রভৃতি থেকে সুরু করে ষ্টেনলেশষ্টীলের ট্রে, সিল্কের কাপড়, সুটিং কিছুই বাদ গেল না। একটা জ্ঞান সঞ্চয় করা গেল—বম্বের বাজারের বৈচিত্র্য কলকাতা থেকে অনেক বেশী। প্রথমে ভাবা গিয়েছিল—যে শ্রীউমা দেবী ও শৈলেন ভায়ার উৎসাহই সবচেয়ে বেশী। কিন্তু বাজারে বার হয়ে দেখা গেল—কারো উৎসাহই কম নয়—এবং সকল প্রদেশের বন্ধুরাই এ-বিষয়ে সমান উৎসাহী।

ডাঃ সেন ও শ্রীপ্রতাপচন্দ্র বসু দুজনেই বরোদা যাবার ইচ্ছা ত্যাগ করলেন—প্রতাপচন্দ্র বসুকে পরদিনই কলকাতা ফিরতে হবে সরকারী কাজের আহ্বানে এবং ডাঃ সেনকে হাজিরা দিতে হবে হায়দ্রাবাদে শিল্প-শিক্ষা সংসদের অধিবেশনে। অগত্যা তাঁদের ফেলে রেখেই সন্ধ্যায় বম্বে সেণ্ট্রাল ষ্টেশনে উপস্থিত হওয়া গেল। ষ্টেশনটী বেশ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন এবং যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে পরিকল্পিত। এই ষ্টেশনটী এখন পশ্চিমাঞ্চলীয় রেলপথের প্রধান আস্তানা। এই লাইনের প্রধান গাড়ী ফ্রণ্টিয়ার মেল—দিল্লী হয়ে অমৃতসর পর্য্যন্ত যায়। এছাড়া দেরাদূন এক্সপ্রেস—গুজরাত মেল, সৌরাষ্ট্র মেল প্রভৃতি এ অঞ্চলের প্রধান গাড়ী—আমাদের দৌড় বরোদা পর্য্যন্ত—মাত্র ২৪১ মাইল—প্রায় দেড়শ' যাত্রী। সকলকে একই ট্রেণে স্থান দেওয়া সম্ভব না হওয়ায়—তিনটী গাড়ীতে বিশেষ কামরা যোগ করে দেওয়া হয়েছিল। গাড়ীগুলি বরোদায় কেটে রাখা হবে এবং ফিরে আসার সময় অন্য গাড়ীতে জুড়ে দেওয়া হবে। ব্যবস্থাটী ভাল। আমাদের দলটীর স্থান হয়েছিল—দেরাদূন এক্সপ্রেসে—রাত্রি ৯-৩০ মিনিটে যাত্রার-ক্ষণ। যথাসময়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হয়ে দেখা গেল কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট বাস্তুকারেরা সস্ত্রীক আমাদের দলের অন্তর্গত হয়ে পড়লেন।

বম্বের পশ্চিম দিকবর্ত্তী সমুদ্রতীর ধরে লাইনটী চলেছে। বেশিন রোড ষ্টেশন পর্য্যন্ত বেশ পরিষ্কার একটা আঁশটে গন্ধ পাওয়া গেল। বেশিন রোড ষ্টেশন থেকে মাছের চালান যায়, সুতরাং মাছের ঝুড়ি বোঝাই করার জন্য ষ্টেশনে বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। রাত গভীর হওয়ায় যে যার শয্যা আশ্রয় করলে—নিদ্রাভঙ্গে দেখি গাড়ী বরোদা ষ্টেশনের সাইডিংয়ে—ঘড়িতে তখন সাড়ে ছ'টা বেজে গিয়েছে।

তাড়াতাড়ি নামবার উদ্যোগ করা গেল। দেখি আমাদের মতো বিলম্বকারীর দল নিতান্ত হাল্কা নয়। ৪টী বাস বোঝাই হয়ে গেল। গাড়ীর কামরায় বিছানাপত্র রেখে শুধু ছোট হাতব্যাগ সঙ্গে নিয়ে অবতরণ করা হল। বরোদা ষ্টেশনটীর নতুন রূপ আধুনিক স্থাপত্য রীতি অনুসারে গঠিত হয়েছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাদের

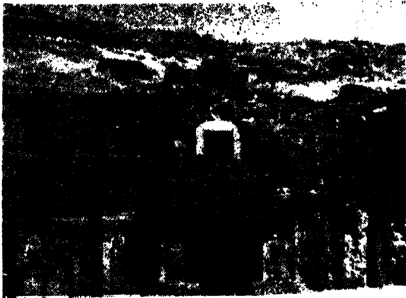
বিশ্রাম আবাসে উপস্থিত হওয়া গেল। এটী পূর্ব্বে ষ্টেট গেষ্ট হাউস ছিল। এখন এটীকে হোটেলে রূপান্তরিত করা হয়েছে। বরোদার



বিখ্যাত শিল্প-প্রতিষ্ঠান জ্যোতি-লিমিটেডের অতিথিরূপে আমরা এই হোটেলে অবস্থান করলাম।

অতিথিশালাটী প্রকাণ্ড—তাতে নানা ধরণের ও বিভিন্ন পদাধিকারী অতিথিদের জন্য বিভিন্ন রকমের বাড়ী ও ঘরের ব্যবস্থা। বাড়ীগুলি একতলা। সামনে বারান্দা—ঘরের সংলগ্ন ড্রেসিংরুম ও বাথরুম। দেরী হওয়া সত্ত্বেও একটী ঘর পাওয়া গেল যেখানে কোনোক্রমে একটু বসবার ও স্নানাদির ব্যবস্থা হতে পারে। মাত্র ত একটী দিনের মামলা। এক ঘণ্টার মধ্যেই স্নানাদি শেষ করে প্রাতর্ভোজনে বসা গেল। তার পরই পরিদর্শন—বাস রথ দ্বারে প্রস্তুত, অতএব কালবিলম্ব না করে রথারূঢ় হয়ে প্রথম উপস্থিত হওয়া গেল—কাঁচের কারখানায়।

কাঁচের কারখানাটী বিখ্যাত ঔষধ নির্ম্মাতা এলেমবিক্ কেমিক্যালের পরিচালনাধীন। তাঁদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় শিশি বোতল এখানেই তৈরী হয়। তাছাড়া বাইরের ফরমাইস মাফিক শিশি বোতলও তৈরী করার ব্যবস্থা আছে। কারখানাটী আধুনিক যন্ত্রপাতি সাহায্যে গঠিত। অধিকাংশ কাজই যন্ত্র সাহায্যে সম্পাদিত হচ্ছে। কাঁচের চুল্লী থেকে বোতল তৈরী হওয়া ও তার ভালমন্দ বিচার ব্যাপারটী একেবারে ছবির

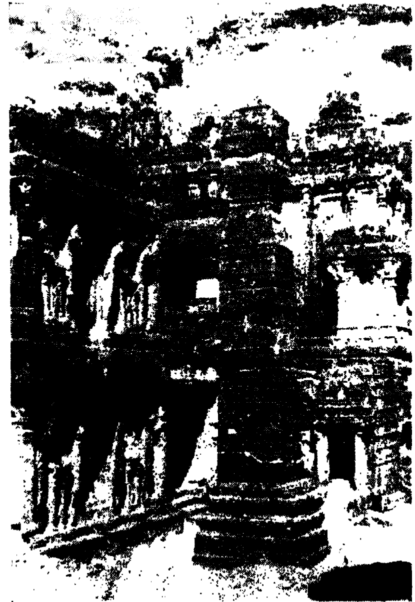


ইলোরা—গুহা সম্মুখে

মতো দেখা গেল। প্রত্যহ প্রায় ত্রিশ হাজার বোতল তৈরী হতে পারে এই রকম ব্যবস্থা।

কারখানার বাড়ীটী পাকা—সুরুচিসম্পন্ন ও বিশিষ্ট পরিকল্পনা-মণ্ডিত—আমাদের দেশে কারখানা বলতে কতকগুলি টিনের চালাঘর ও বিশ্রী পরিবেশের কথা মনে পড়ে। এ কারখানাটী তার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। কারখানার সামনে কিছুটা ফুলের বাগান ও ঘাসের লন থাকায় পাকা কারখানা বাড়িটির সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

কাচের কারখানার পর জ্যোতি লিমিটেডের পাম্প তৈরীর কারখানা। কারখানাটী বিরাট—প্রত্যেক অংশটী অতি সুন্দরভাবে সাজান। লোহার ঢালাইয়ের ব্যবস্থা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরিচালিত—কারখানার সংলগ্ন পরীক্ষাগারে এখানকার প্রত্যেকটী মালমশলা পরীক্ষিত হয়ে তবে ব্যবহৃত হয়। ঢালাই কারখানার পাশে ইলেকট্রিক মোটর নির্ম্মাণের কারখানা। ইলেকট্রিক মোটরের প্রত্যেকটী অংশ অতি যত্নসহকারে গ্রথিত হচ্ছে। ব্যবস্থা



ইলোরা—কৈলাস

বিরাট এবং সুচারু। প্রতিষ্ঠানের পরিচালকেরা কয়েকটী ভারতীয় ছাত্রকে বৈদেশিক এই জাতীয় কারখানায় শিক্ষনবিশী করিয়ে নিয়ে এসে এখানে নিয়োগ করেছেন। বিদেশী বিশেষজ্ঞ নিয়োগের পরিবর্ত্তে এই জাতীয় ব্যবস্থা যে আমাদের জাতীয় শিল্প উন্নতি ও বাণিজ্যের বিশেষ সহায়ক একথা বলা বাহুল্যমাত্র।

কাচের কারখানা, পাম্পের কারখানা এবং আর সকল কারখানা রেলের সাইডিংয়ের পাশে, ফলে এখানে মাল গ্রহণ ও প্রেরণ ব্যাপারটী অনেকাংশে সহজ ও সরল। নগর বিধান পদ্ধতির দিক থেকে এই ধরণের ব্যবস্থা খুবই সন্তোষজনক।

সকালে ছুটী কারখানা পরিদর্শন করতেই বেলা একটা বেজে গেল। এর পর দু' ঘণ্টার জন্য অতিথি-ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করে দ্বিপ্রাহরিক আহার ও বিশ্রাম সমাপনান্তে আবার বেলা তিনটায় পরিদর্শন—এলেমবিক কেমিক্যাল কোম্পানির বিভিন্ন বিভাগ। সকাল বেলা কারখানার পাকা বাড়ীগুলি ও তাদের গঠন পারিপাট্য দেখে খুশী হওয়া গিয়েছিল, কিন্তু বিকালে এলেমবিক কেমিক্যালের কারখানা ও আপিস বাড়ী দেখে তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করা গেল—বিরাট চারতলা বাড়ী—আগাগোড়া শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত।

মাটীরতলার বেসমেণ্টে ছাপাখানা, ওপরে আপিস, পরীক্ষাগার ও বিভিন্ন বিভাগের যন্ত্রপাতিসমন্বিত প্রস্তুতশালা। বাড়ীটির এক অংশে একটী সুন্দর পুস্তকাগার এবং সুঠাম পাঠ কক্ষ। অতিথিদের বিশ্রাম ও অপেক্ষা-গৃহটীও সুসজ্জিত ও প্রশস্ত। পরিদর্শনের পর কারখানার সুদৃশ্য লনে চা ও জলযোগের বিরাট ব্যবস্থা ছিল। এই কারখানার ইতিহাস এটীর মালিকের ঐকান্তিক শ্রমনিষ্ঠতা ও সততার উজ্জ্বল



ইলোরা—হরপার্বতী

দৃষ্টান্ত। বর্ত্তমানে এর প্রতিষ্ঠাতার তিন পুত্র এই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের পরিচালনা করেন। তিন ভ্রাতাই কৃতবিদ্য; এক ভাই ভারতীয় গণপরিষদের সভ্য। চা-পানের সময় এঁদের সঙ্গে আলাপ ও আলোচনা করে আনন্দ লাভ করা গেল। সর্ব্বভারতীয় বাস্তুকার সংসদের সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহকারী সভাপতি হিসাবে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বরোদার বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত পূর্ত্ত-বিভাগ পরিদর্শন করতে হল। পূর্ত্ত-বিভাগের প্রধান আচার্য্যের অনুরোধক্রমে সমবেত ছাত্রদের সিভিল ইন্‌জিনিয়ারিংএর ক্রমোন্নতি বিষয়ে একটী অভিভাষণ দিতে হল। বক্তৃতা ও ধন্যবাদ পর্ব্ব শেষ করে বরোদা সহর পরিভ্রমণে বার হওয়া গেল। রাজপ্রাসাদ থেকে সুরু করে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়, আদালত, হাঁসপাতালের বাড়ী, বাজার, চক প্রভৃতি স্থানে একটা মার্কিণি-ভাবে চক্র দেওয়া গেল। রাজকীয় বদান্যতায় পুষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির গৃহ ও পরিবেশ সুষ্ঠু ও মনোজ্ঞ; জনসাধারণের গৃহ ও পরিবেশ ভারতের আর পাঁচটা সহরের মতো। সঙ্গে ক্যামেরা থাকলেও সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় ছবি তোলার সুবিধা হল না; অগত্যা স্থানীয় ষ্টুডিও থেকে সহরের কিছু দৃশ্য সংগ্রহ করে অতিথিশালায় ফিরে আসতে হল। রাত্রের আহার সেরে ৯টার মধ্যেই ষ্টেশনে যেতে হবে। আমাদের নিমন্ত্রণকর্ত্তা জ্যোতি লিমিটেডের কর্তৃবৃন্দ যা ব্যবস্থা করেছিলেন তা সত্যই অনিন্দ্যনীয়—তাঁদের কর্ম্মচারীবৃন্দ আমাদের গাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে তবে বিদায় নিলেন। যথাসময়ে আমাদের কামরাগুলি একস্‌প্রেস ট্রেণে সংযোজিত হল। ভোর না হতেই দেখি গাড়ী "বম্বে সেণ্ট্রালে" পৌঁছে গেছে। সমস্ত শহর তখনও সুষুপ্ত—দোকানপাট বন্ধ—রাস্তার আলো-গুলি কেমন যেন নিষ্প্রভ।

সময় নষ্ট না করে সেই দিনই বিখ্যাত অজন্তা ইলোরা গুহা দেখতে



ইলোরা—বুদ্ধমূর্তি

যাবার ব্যবস্থা। প্রথমে যেতে হবে ভিটি ষ্টেশনে। বম্বে সেণ্ট্রাল থেকে ভিটি মাইল চারেক পথ। হাতে প্রচুর সময়, সুতরাং গড়িমসি করে গাড়ী যোগাড় করে যখন ভিটিতে পৌঁছান গেল তখন সকাল হয়ে গেছে কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের বাস্তুকারেরা কিন্তু বিশ্রাম না করে বম্বে ত্যাগ করতে রাজী হলেন না। দোতলার বিশ্রামাগারে জিনিষপত্র রেখে পালা করে স্নানাদি সমাপন করা হল। তিনতলায় রেস্তোরাঁ—চা-পান ও প্রাতর্ভোজন সেখানে। দেখতে দেখতে বেলা দশটা বেজে গেল। অজন্তা ও ইলোরা দেখতে হলে আওরঙ্গাবাদে যেতে হবে মানমাদে ট্রেণ পরিবর্ত্তন করে। বেলা এগারোটার প্যাসেন্‌জার ট্রেণে যাওয়া স্থির করা হয়েছিল। মানমাদ বম্বে থেকে ১৬২ মাইল। দ্রুত মেল বা

একস্‌প্রেস গাড়ীতে ৪ থেকে ৫ ঘণ্টায় পৌঁছান যায়, কিন্তু গাড়ী বদলের সময় কম থাকার দরুণ প্যাসেঞ্জার ট্রেণটীকেই আমরা পছন্দ করলাম। রাত আটটায় মানমাদ পৌঁছে ৯-২০ মিঃ আওরঙ্গাবাদের ট্রেণ গোদাবরী ভ্যালি একস্‌প্রেস। এই ১ ঘণ্টা ২০ মিনিটে মানমাদে নৈশ ভোজন সমাধা করা গেল। মানমাদ থেকে আওরঙ্গাবাদ ৭১ মাইল—সময় লাগে ২ ঘণ্টা ২২ মিঃ। একস্‌প্রেস গাড়ীতে ভীড় বড় বেশী। কোনো রকমে স্থান সংগ্রহ করে রাত বারোটায় গন্তব্যস্থানে পৌঁছান গেল। এত রাত্রে আওরঙ্গাবাদে যাতে অসুবিধায় না পড়ি সেজন্য নিজাম সরকারের প্রাক্তন প্রধান বাস্তুকার শ্রীদিলদার হোসেনকে পূর্ব্বেই লিখে-ছিলাম। ফলে তিনি আমাদের অভ্যর্থনা ও আবাসস্থানের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করেছিলেন আওরঙ্গাবাদের ষ্টেট হোটেলে।

ষ্টেট হোটেলটী বর্ত্তমানে রেলওয়ে হোটেলে রূপান্তরিত হয়েছে। হোটেলটীর পরিচালনার ভার একজন মার্কিনী মহিলার ওপর। হোটেলটী ষ্টেশন থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে। মার্কিনী মহিলাটী আমাদের জন্য



দৌলতাবাদ দুর্গের ধ্বংসাবশেষ—অদূরে চাঁদমিনার

অপেক্ষা করছিলেন—আমরা উপস্থিত হবার দশ মিনিটের মধ্যেই আমাদের ঘরের ব্যবস্থা করে দিলেন। পরদিন কি ভাবে পরিদর্শন করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে সব ব্যবস্থা করে রাখবেন এ প্রতিশ্রুতিও দিলেন।

সারা দিনের ট্রেণভ্রমণে শরীর অবসাদগ্রস্ত, সুতরাং নিদ্রাগত হতে বিলম্ব হল না। প্রভাতে ঘুম থেকে উঠে একবার চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করা গেল।

হোটেলটী সত্যই মনোহর। ঘর বারেন্দা আসবাবপত্র সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, চার পাশে ফুলের বাগান। দূরে নাতিউচ্চ পাহাড়ের অস্পষ্ট আভাস। মনটা খুশী হয়ে উঠল। বাগানে পায়চারী করছি এমন সময় সুপ্রভাত জানিয়ে হোটেলের পরিচালিকা শ্রীমতী মিচেল স্মরণ করিয়ে দিলেন—সেদিনের কার্য্যক্রম—প্রথম গন্তব্য স্থান ইলোরা। কিভাবে এখানকার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি পরিভ্রমণ করা হবে তার একটি সুনির্দ্দিষ্ট নির্ঘণ্ট পাওয়া গেল। আমরা যখন আওরঙ্গাবাদে পৌঁছাই তখন শান্তি পুরস্কারপ্রাপ্ত বিখ্যাত রালফ বুঁচে অজন্তা ও ইলোরা পরিভ্রমণ সবে শেষ করেছেন—সরকার থেকে তাঁর জন্য যে সব বন্দোবস্ত ও তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন—আমরা সেই তালিকা ও নির্ঘণ্ট থেকে অনেক সাহায্য পেলাম। ইলোরা পরিদর্শন ব্যাপারটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য স্থানীয় মিউজিয়মের একজন কর্ম্মচারী আমাদের সাথী হলেন। বেলা ঠিক ৮॥০ টায় ইলোরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা হল, দূরত্ব মাত্র ২০ মাইল কিন্তু পথ অত্যন্ত ধূলিময়। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গুহার সম্মুখে উপস্থিত হওয়া গেল। পথের দৃশ্য ঠিক সুন্দর বলা যায় না, তবে পর্ব্বতমালার চড়াইয়ের সময় ঘাট-পথ থেকে নীচের সমতল ভূমির দৃশ্য ভাল দেখায়। পথে পড়ে দৌলতাবাদ দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। ফেরবার পথে দেখা যাবে এই ভেবে অগ্রসর হওয়া গেল ইলোরার সম্মুখে। গুহার সম্মুখে এক প্রশস্ত অঙ্গন—দূরে সমতল ভূমিতে এক সুন্দর সুউচ্চ মন্দির—শোনা যায় সেটি রাণী অহল্যাবাঈয়ের নির্ম্মিত। মন্দিরটির কাছে যাওয়ার মতো সময় ছিল না। সমতল ভূমি—চারপাশে বিশেষ কিছু নেই—তার মধ্যে নিঃসঙ্গ মন্দিরের বলিষ্ঠ গাম্ভীর্য্য সহজেই মনকে অভিভূত করে। ইলোরার খ্যাতির আকর্ষণে অহল্যাবাঈয়ের মন্দিরের নিঃশব্দ আহ্বান উপেক্ষা করে আমরা গুহা পরিদর্শনে প্রবৃত্ত হলাম। গুহাগুলি সংখ্যায় ৩৪টি—১২টি বৌদ্ধ-যুগের, ৫টি জৈন যুগের এবং ১৭টি ব্রাহ্মণ্য যুগের। অনেকগুলি গুহা একরকমের—এদের মধ্যে ১০ নং এবং ১২ নং বৌদ্ধযুগের, ১৪ এবং ১৫ নং ব্রাহ্মণ্য যুগের এবং ৩৩ নং জৈন যুগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

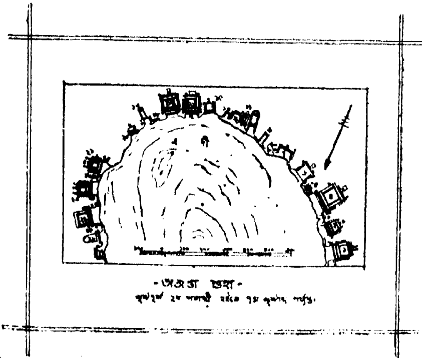
দক্ষিণ থেকে বামে পরিক্রমা সুরু করা গেল। প্রথম গুহা একটি বিহার—মাপে প্রায় চতুষ্কোণ—৪১ ফুট চওড়া। ছাদ সমতল। ভিতরে ১১ ফুট উঁচু একটি বুদ্ধ মূর্ত্তি। বিহারের দুই পাশে আটটি কক্ষ। ১০নং এবং ১২ নং গুহা দুটি আকারে বিরাট। ১০ নং গুহাটির নাম—বিশ্বকর্ম্মা—মাপে ৮৬ ফুট লম্বা ৪৩ ফুট চওড়া। দু'পাশে স্থূলকায় স্তম্ভ-শ্রেণী—গুহার ছাদ সমতল। ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে যে এই কঠিন আগ্নেয়শীলা কী ভাবে কেটে এই রকমের সমতল ছাদ নির্ম্মিত হয়েছে। আজকের দিনের সাধারণ লোহার ছেনির প্রায় অসাধ্য এ কাজ।

এর পরই প্রবেশ করা হল তিনতলা গুহায় (১১নং এবং ১২নং); গুহা দুটিই প্রকাণ্ড—বৌদ্ধ পদ্ধতির গুহানির্ম্মাণের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। প্রত্যেকটির ভিতরে ভগবান বুদ্ধের ধ্যানগম্ভীর উপবিষ্ট মূর্ত্তি বিরাজমান। কিছু কিছু ভাস্কর্য্যের নমুনাও এ দুটি গুহায় পাওয়া যায় তবে সেগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। গুহাগুলির নির্ম্মাণকাল বিষয়ে নানা মত প্রচলিত আছে। ঐতিহাসিক সূক্ষ্ম বিচার ছেড়ে দিয়ে একথা নির্ভয়ে বলা যায় যে এগুলি নির্ম্মিত হয়েছে ছয় শত বা সাত শত বৎসর ধরে এবং এগুলির নির্ম্মাণ সুরু হয়েছে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দী থেকে।

বারো নম্বর গুহার পর সুরু হয়েছে ব্রাহ্মণ্য পদ্ধতির গুহাগুলি। এ পদ্ধতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন কৈলাস। সাধারণত গুহা বলতে যা বোঝায়—কৈলাস তা থেকে একেবারে স্বতন্ত্র। একটি একশ ফুট উঁচু চূড়ার মধ্যভাগে মন্দির, গোটা পাহাড় কেটে তৈরী—এবং তার চার পাশে প্রশস্ত অঙ্গন। অঙ্গন ঘিরে বারান্দার মতো গুহা। তাতে রামায়ণের বিভিন্ন ঘটনা: ভাস্কর্য্য, শিবের বিবাহ, এবং হরপার্ব্বতীর বিভিন্ন অবস্থার

বিচিত্র মূর্ত্তি। রাবণের কৈলাস পর্ব্বত উত্তোলনের খোদাই শিল্পটি অদ্ভুত বলিষ্ঠ, অঙ্গনের দুদিকে দুটি প্রকাণ্ড ধ্বজস্তম্ভ ও গজরাজের মূর্ত্তি। গজরাজের শুণ্ডটি ভগ্ন বটে, কিন্তু এখন তার যে ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান, তা থেকে করিবরের বিরাটত্ব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকে না। মধ্যস্থ মন্দিরের উপর তলা পর্য্যন্ত ওঠবার সিঁড়ি অদ্ভুত কৌশলে নির্ম্মিত। ওপর তলার ছাদে ও দেয়ালে কিছু ছবির চিহ্ন আছে। কিন্তু অযত্নে ও আগুনের ধোঁয়ায় ও কালিতে সে ছবির স্বরূপ বোঝার আর কোনো উপায় নেই।

কৈলাসের প্রবেশদ্বারে নিজাম সরকারের প্রকাশিত অজন্তা ও ইলোরা সম্বন্ধে পুস্তকাবলি ও চিত্রাবলী পাওয়া যায়। এগুলি বেশ জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ এবং এগুলির ছাপা ও বাঁধাই মনোজ্ঞ। কিছু কিছু ছবি ও বই সংগ্রহ করে জৈনপদ্ধতির গুহাগুলি পরিদর্শন করা হ'ল। সত্য বলতে কি কৈলাস দেখবার পর সেগুলির কথা স্মরণযোগ্য বলেই মনে হয় না। শিল্পের দিক থেকে জৈনপদ্ধতির গুহাগুলির বৈশিষ্ট্য নেই বলেই মনে হয়।



গুহাগুলি দেখা শেষ হতে বেলা ১১টা বেজে গেল। আমাদের সাথী মিউজিয়ামের কর্ম্মচারীটির সাহায্যে—একটু পরিষ্কার ভাবে চা পান করার চেষ্টা করা হল। চা পান করতে করতে মনে হল—এইসকল স্থানে বেশ সুন্দর ও সুচারু ভাবে বিশ্রাম ও আহারের ব্যবস্থা সরকার থেকে করা সম্ভব কিনা? আজকের দিনে বিদেশ থেকে প্রচুর ভ্রমণকারীর দল এইসব বিখ্যাত স্থান, বিশেষ করে শীতকালে দেখতে আসেন—সেই সময়টা অন্তত ভালরকম ব্যবস্থা করে রাখলে, গুহাপরিদর্শন যে আরও মনোজ্ঞ হত তা বলা বাহুল্য মাত্র। প্রত্যাবর্ত্তনের পথে দৌলতাবাদ দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এবং মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সমাধি বিশেষ দ্রষ্টব্য।

দৌলতাবাদ দুর্গটি পাহাড়ের ওপর—সমুদ্রতীরের হিসাবে ২২৫০ ফুট ওপরে। চতুর্দ্দিকে পাহাড়ের প্রাচীর, তার মধ্যে এই দুর্গ হিন্দু আমলে যাদব-রাজাদের রাজধানী ছিল এই স্থানটিতে, তখন এর নাম ছিল দেবগিরি। তের খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দিন খিলজি এটি চালুক্য রাজাদের কাছ থেকে জয় করে নেন। ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে ইতিহাস বিখ্যাত মহম্মদ তোগলক্ দিল্লী থেকে এখানে তাঁর রাজধানী উঠিয়ে নিয়ে আসেন। তাঁর সে চেষ্টা যে বিফল হয়েছিল তা সকলেই জানেন। দৌলতাবাদের চারদিক দেখলে তার চেষ্টা যে কেন সফল হয়নি তা স্থির করতে বিশেষ চিন্তা করার প্রয়োজন হয় না। মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় জলের এখানে একান্ত অভাব, অথচ আশ্চর্য্যের কথা এই যে মানুষে এখনও এধরণের ভুল আজকের দিনেও করছে।

চার পাশের রুক্ষ দৃশ্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করা হল। এটী যে এক সময়ে হিন্দু রাজাদের দুর্গ ছিল—তার প্রচুর প্রমাণ এখনও বর্ত্তমান। তোরণ অতিক্রম করলেই প্রথমে দৃষ্টিগোচর হয় একটী ছোট মন্দির ও তার সম্মুখস্থ একটী ১২।১৩ ফুট উঁচু দীপস্তম্ভ। ছোট কিন্তু সুদৃশ্য। আর কিছু অগ্রসর হলেই এক অঙ্গন



দৌলতাবাদ দুর্গের তোরণ

—সেখানে আছে এক সুউচ্চ জয়স্তম্ভ—বর্ত্তমানে চাঁদমিনার নামে খ্যাত—উচ্চতায় ১০০ ফুট, নির্ম্মাণকাল ১৪৩৫ খৃষ্টাব্দ। চাঁদমিনার নামকরণের ঐতিহাসিক কারণ সম্বন্ধে কোনো প্রকারের ঔৎসুক্য প্রকাশ না করে অগ্রসর হওয়া গেল। প্রচুর সিঁড়ি অতিক্রম করে ও নানা আকারের তোরণ ভেদ করে আমরা দুর্গের অন্তস্থলে প্রবেশ করলাম। মধ্যস্থলে বিরাট হর্ম্ম্য—এক সময়ে দেবগিরির রাণীর বাসস্থান ছিল। এটীর নাম "বারদোরী"—এখান থেকে আওরঙ্গাবাদ সহরের একটা সুন্দর দৃশ্য চোখে পড়ে। বরদোরী থেকে একশ ধাপ ওপরে উঠলে একটা প্রকাণ্ড ছাদে এসে পৌছান যায়—ছাদটী ১৬০ ফুট লম্বা এবং ১২০ ফুট চওড়া—এই ছাদের এক ধারে প্রায় দশ ফুট ওপরে ৭ ইঞ্চি ব্যাসের কুড়ি ফুট লম্বা একটা কামান আছে। কামানটীর নাম ঝঞ্ঝারাজ বা ব্যাঘ্যা-

সম্রাট। কামানটী অত্যন্ত ভারী, এত ভারী জিনিষটীকে যে কি করে ওপরে নিয়ে আনা হল তা সত্যই বিস্ময়কর। কিন্তু সে সব যুগে এই ধরণের অনেক কিছু বিস্ময়কর ঘটনা ঘটত, তার প্রচুর নিদর্শন আমরা প্রায়ই পেয়ে থাকি। অতএব এ বিষয়ে অনর্থক মাথা না ঘামিয়ে আমরা ধীরে ধীরে দুর্গের ওপর থেকে নীচে নেমে এলাম। পথে পড়ল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সমাধি। বেলা দুপুর গড়িয়ে গেলেও অত বড় দুর্দান্ত সম্রাটের শেষ পরিণতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন না করাটা অন্যায় ভেবে গাড়ী থেকে নামা গেল।

রাস্তা থেকে অনেকগুলি সিঁড়ি অতিক্রম করলে তবে সমাধি প্রাঙ্গণে ওঠা যায়। প্রাঙ্গণের চারপাশে কতকগুলি একতলা থাকবার কামরা—মুসলমান পথিকদের আস্তানা বা মুশাফিরখানা। কতকগুলি কামরা মুসলমান বালকদের পাঠশালা বা মাদ্রাশা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সৈয়দ জৈনুদ্দিনের দরগার সামনে সম্রাটের সমাধি। খুব সাদাসিধা ধরণের এই একই চত্বরের মধ্যে আওরঙ্গজেবের দ্বিতীয় পুত্র আজমসাহ ও তাঁর স্ত্রীর সমাধি রয়েছে। নিজাম সরকার থেকে এগুলি তত্ত্বাবধান করবার ব্যবস্থা আছে। অন্য সব মোগল সম্রাটের ঐশ্বর্য্যময় সমাধি মন্দিরের কথা স্মরণ করে সম্রাট আওরঙ্গজেবের সমাধির এই অত্যন্ত সরল অনাড়ম্বর ব্যবস্থা মনকে সহজেই নাড়া দেয়। মোগল সম্রাটের আদর্শ নিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ধীরে ধীরে প্রাঙ্গণ থেকে পথে নেমে এলাম।

পথ অত্যন্ত ধূলিময়। দু পাশে ছোট ছোট নিম্নশ্রেণীর বসতি। এক সময়ে যে এটী জনপদ পর্য্যায়ভুক্ত ছিল তা এর ভগ্নাবশেষ থেকে বেশ বোঝা যায়। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করে হোটেলে প্রত্যাবর্ত্তন করা হল। নির্ঘণ্ট মতো বিকালের প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান বিবি-কা মকবারা। আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য-বিজয় সহচরী অন্যতম প্রিয় মহিষী রাবেয়াদুরাণীর সমাধি। সমাধির পরিকল্পনা আগ্রার তাজমহলের অনুকরণ। তবে তাজমহলের মতো মার্ব্বেল পাথর বা সূক্ষ্ম কারুকার্য্য এখানে নেই। সাদা মার্ব্বেলের পরিবর্ত্তে সাদা শঙ্খের কাজ করে একটা শুভ্রতার আবহাওয়া সৃষ্টি করা হয়েছে। সমাধির পাশে মোগল উদ্যান ও তার রচনা সত্যই মনোরম। সমাধির সম্মুখস্থ কৃত্রিম জলাধারে অসংখ্য ফোয়ারার ব্যবস্থা আছে কিন্তু জলের অভাবে সেগুলি সাধারণতঃ বন্ধ করাই থাকে। আমাদের অনুরোধে ফোয়ারাগুলি কিছুক্ষণ চালান হল। সূক্ষ্ম জলধারার জালের মধ্য দিয়ে সমাধি মন্দিরের দৃশ্যটী বড় করুণ মনে হয়।

সাংখ্যদর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

ইন্দ্রিয়দিগের অভিব্যক্তি

"ইন্দ্রিয়" শব্দ "ইন্দ্র" শব্দ হইতে উৎপন্ন। বেদে আছে "ইন্দ্রঃ মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।" এখানে ইন্দ্র শব্দের অর্থ আত্মা। আত্মার চিহ্ন বলিয়া ইন্দ্রিয়দিগকে ইন্দ্রিয় বলে। বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে "ইন্দ্রস্য সংঘাতেশ্বরস্য করণং ইন্দ্রিয়ম্"। দেহরূপ সংঘাতের কর্ত্তা যিনি, তাঁহার করণই ইন্দ্রিয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় বা বুদ্ধীন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ভেদে বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বিবিধ। ইহা ভিন্ন আন্তর ইন্দ্রিয় মনঃ। মোট একাদশ ইন্দ্রিয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা, ত্বক্, ইহারা জ্ঞানেন্দ্রিয়, আর বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ইহারা কর্ম্মেন্দ্রিয়। এই সকল ইন্দ্রির দৃশ্যমান স্থূল ইন্দ্রিয় নহে।

অতীন্দ্রিয়ং ইন্দ্রিয়ং, ভ্রান্তানাম্ অধিষ্ঠানে। সাং সূ ২।২৩ ইন্দ্রিয়গণ অতীন্দ্রিয়, ভ্রান্তলোকেই তাহাদের অধিষ্ঠানকে ইন্দ্রিয় বলিয়া মনে করে। এই সকল ইন্দ্রিয়শক্তিদিগের মধ্যে ভেদ আছে, তাহারা একই শক্তির বিভিন্ন কার্য্য নহে।

"শক্তিভেদেঽপিভেদ সিদ্ধৌ ন একত্বম্।" ২।১৪ সাং-সূ মনঃ উভয় ইন্দ্রিয়াত্মক। "উভয়াত্মকং মনঃ।" (সাং-সূ ২।২৬) মনঃ ভিন্ন কোনও জ্ঞানেন্দ্রিয় বা কর্ম্মেন্দ্রিয় কোন কার্য্য করিতে পারে না। মনঃরূপ ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন শক্তিকে বাহ্য জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় বলা যায়।

ইন্দ্রিয়দিগের উৎপত্তি যে অহংকার হইতে তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সাংখ্যসূত্রের বিজ্ঞানভিক্ষুর ব্যাখ্যানুসারে ইন্দ্রিয়দিগের উৎপত্তির বিবরণ এই—

"সাত্ত্বিকং একাদশকম্ প্রবর্ত্ততে
বৈকৃতাৎ অহংকারাৎ" সাং-সূ ২।১৮

এই সূত্রের ব্যাখ্যায় ভিক্ষু লিখিয়াছেন, "একাদশকের অর্থ একাদশের পূরণ। মনঃই একাদশক ইন্দ্রিয়। বৈকৃত অহংকার হইতে মনঃ উদ্ভূত। অন্যান্য দশ ইন্দ্রিয় রাজস অহংকার হইতে উদ্ভূত।

ইন্দ্রিয়দিগের দ্রষ্টৃত্বাদিশক্তি নাই। তাহাদের সাহায্যে দৃষ্টি, শ্রবণ প্রভৃতি হয়। দ্রষ্টা শ্রোতা প্রভৃতি আত্মা।

"দ্রষ্টৃত্বাদিরাত্মনঃ করণত্বমিন্দ্রিয়াণাম্" সাং সূ—২।২৯

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লৌহের ও অয়স্কান্ত মণির সান্নিধ্যের মতোই এই দ্রষ্টৃত্ব ও শ্রোতৃত্ব। পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

মনঃ, বুদ্ধি ও অহংকার, এই তিনটি অন্তঃকরণ। ইহাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র বৃত্তি আছে। কিন্তু পঞ্চপ্রাণ অন্তঃকরণদিগের সাধারণ বৃত্তি।

স্বালক্ষণ্যং বৃত্তিত্রয়স্য সৈষা ভবত্যসামান্যা।

সামান্য করণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ। সাং কা ২৯

ত্রয়ানাং স্বালক্ষণ্যং। সাং সূ—২।৩০

সামান্যকরণ বৃত্তিঃ প্রাণাদ্যাঃ বায়বঃ পঞ্চ সাং সূ ২।৩১

তিন অন্তঃকরণের বৃত্তি স্ব স্ব লক্ষণযুক্ত। এই তিন বৃত্তির প্রত্যেকেই অসামান্য, অর্থাৎ ইহারা সকলেই প্রত্যেক অন্তঃকরণের বৃত্তি নহে। কিন্তু প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান নামক পঞ্চ বায়ু প্রত্যেক অন্তঃকরণেরই বৃত্তি—অন্তঃকরণদিগের সাধারণ বৃত্তি। বায়ুর মতো সঞ্চরণশীল বলিয়া পঞ্চপ্রাণকে বায়ু বলে। তাহারা স্বতন্ত্রতত্ত্ব নহে; চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের মধ্যে তাহাদের নাম নাই। তাহারা মনঃ, অহংকার ও বুদ্ধির সাধারণ বৃত্তি। তাহাদের পরিণাম দ্বারা শরীরের রক্ষা হয়।

পঞ্চপ্রাণও একপ্রকার করণ বলিয়া গণ্য। দেহধারণই তাহাদের কার্য্য। দেহধারণের অর্থ দেহগঠন, বর্দ্ধন ও পোষণ। শ্বাস-প্রশ্বাস, খাদ্যদ্রব্যের সমীকরণ, মল বহিষ্করণ প্রভৃতি যে সকল কর্ম্ম দেহরক্ষার জন্য প্রয়োজন, তাহা প্রাণ দ্বারাই সম্পন্ন হয়।

সকল করণ বা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মনঃই শ্রেষ্ঠ—

দ্বয়োঃ প্রধানং মনঃ লোকবৎ ভৃত্যবর্গেষু (সাং সূ ২।৪০)

তথাশেষ সংস্কারাধারত্বাৎ (সাং সূ ২।৪২)

পঞ্চ বাহ্য ইন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়দিগের মধ্যে মনঃই শ্রেষ্ঠ। ভৃত্যগণ যেমন একজন প্রধান ভৃত্যের অধীন, অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণও তেমনি মনের অধীন। মনের শ্রেষ্ঠত্বের অন্য এক কারণ এই, যে তাহা অশেষ সংস্কারের আধার। আমরা যাহা কিছু জানি, ভাবি, করি, অনুভব করি, তাহারা সকলেই মনের উপর একটা দাগ ফেলিয়া যায়। সেই দাগই সংস্কার। এই সংস্কারধারণ ব্যতীত মনের অন্য কার্য্যও আছে। জ্ঞানোৎপাদনে মনের কার্য্য অসাধারণ।

উভয়াত্মকং অত্র মনঃ সংকল্পকম্ ইন্দ্রিয়ঞ্চ সাধর্ম্যাৎ।

গুণপরিণামবিশেষাৎ নানাত্বং বাহ্যভেদাশ্চ সাং কা-২৭

চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্ আদি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ যে স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, তাহার কারণ তাহারা মনঃকর্তৃক অধিষ্ঠিত। এই জন্যই মনকে উভয়াত্মক বলা হয়। মনের যে রূপ অন্য কোনও ইন্দ্রিয়ের নাই, তাহা হইতেছে "সংকল্প"। বিজ্ঞানভিক্ষু সংকল্প শব্দের অর্থ বলেন চিকীর্ষা। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্রের মতে ইহার অর্থ "আলোচিতং ইন্দ্রিয়েণ বস্তু ইদম্ ইতি সম্মুগ্ধং, ইদং এবং, ন এবং ইতি সম্যক্ কল্পয়তি, নিয়ম্য দর্শয়তি, বিশেষণ-বিশেষ্য ভাবেন বিবেচয়ন্তি ইতি যাবৎ।" বাহ্যবস্তুর সহিত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের স্পর্শের ফলে প্রথমে বস্তুমাত্রের জ্ঞান হয়, অর্থাৎ ইহা একটা কিছু, এই জ্ঞান হয়। এই জ্ঞানকে আলোচন বলে। এইরূপ জ্ঞাত বস্তুকে "সম্মুগ্ধ" বলে। কিন্তু তাহার পরেই সেই ইন্দ্রিয়-গৃহীত বিষয়ের মধ্যে বিশেষত্ব প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। তখন তাহাকে একটি বিশিষ্ট বস্তু বলিয়া মনে হয়; তাহা "ইহা", "উহা" নয়, এইরূপ বোধ হয়। এইরূপ মনের ক্রিয়াই সংকল্প। কিন্তু এই অসাধারণ লক্ষণযুক্ত মনঃও অন্য ইন্দ্রিয়দিগের সমধর্ম্মী বলিয়া 'ইন্দ্রিয়' নামে খ্যাত। রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ স্পর্শরূপে আকারিত হইয়া মনঃ যে নানাত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহার কারণ তাহার মধ্যস্থ সত্ত্ব-রজঃ ও তমঃ গুণ ভিন্ন ভিন্নরূপে পরিণত হয়। রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ স্পর্শ রূপ পঞ্চ তন্মাত্রও একই অহংকার হইতে উৎপন্ন হয় এবং গুণের বিভিন্ন পরিণামের জন্য বিভিন্ন হয়।

ইন্দ্রিয়গণ অহংকার হইতে উদ্ভূত, তাহারা ভৌতিক বস্তু নহে।

"আহংকারিকত্বশ্রুতের্ন ভৌতিকানি", সাং সূ—২।২০

জ্ঞানেন্দ্রিয়দিগের বৃত্তি "আলোচন মাত্র"।

শব্দাদিষু পঞ্চানাম্ আলোচনমাত্রং ইষ্যতে বৃত্তিঃ।

বচনাদান বিহরণোৎসর্গানন্দাশ্চ পঞ্চানাং। সাং কা—২৮

উপরে যাহাকে "সম্মুগ্ধ" বলা হইয়াছে তাহার দর্শনই "আলোচন"। কোনও একটি বস্তু এই মাত্র জ্ঞান প্রথমে ইন্দ্রিয় হইতে হয়। তাহার পরে মনঃ সেই সম্মুগ্ধ বস্তুর উপর

প্রযুক্ত হইয়া সেই বস্তুর স্বরূপ নির্দ্ধারণে নিযুক্ত হয় এবং বুদ্ধি তাহার নিশ্চিত জ্ঞানলাভ করে।

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বৃত্তি হইতেছে বচন, আদান, বিহরণ, মল পরিত্যাগ, আনন্দ।

বুদ্ধি, অহংকার ও মনঃ এই তিন অন্তঃকরণ ও জ্ঞানেন্দ্রিয়দিগের কার্য্য কখনও কখনও একসঙ্গেই হয়, কখনও বা ক্রমানুসারে হয়।

যুগপৎ চতুষ্টয়স্যতু বৃত্তিঃ, ক্রমশশ্চ, তস্য নির্দিষ্টা।

দৃষ্টে তথাপি অদৃষ্টে ত্রয়স্য তৎপূর্ব্বিকাবৃত্তিঃ। সাং কা ৩০। নিবিড় অন্ধকারে বিদ্যুৎ-সম্পাতমাত্র যদি নিকটে কোনও ব্যাঘ্র দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ যেমন ইন্দ্রিয়ের আলোচন বৃত্তি হয়, তেমনি মনের সংকল্প, অহংকারের অভিমান এবং বুদ্ধির অধ্যবসায় সকলই যুগপৎ সংঘটিত হয়। দেখিবামাত্রই দ্রষ্টা লম্ফ দিয়া পলায়ন করে। আবার স্তিমিত আলোকে কোনও বস্তু দৃষ্টিপথে পড়িলে প্রথমে তাহা সম্মুগ্ধ রূপে গৃহীত হয়। পরে তাহার উপর ক্রমে ক্রমে মনের, অহংকারের ও বুদ্ধির ক্রিয়া হয়। পরোক্ষে অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে অন্তঃ-করণের বৃত্তি হয়। তাহার সঙ্গে কোনও বাহেন্দ্রিয়ের বৃত্তি থাকে না, কিন্তু অন্তঃকরণের বৃত্তি তখন প্রত্যক্ষপূর্ব্বিকা, কেন না তখন দৃষ্ট বিষয়ের স্মৃতি হয়, এবং তাহা হইতেই অনুমান সম্ভবপর হয়।

ইন্দ্রিয়গণ অন্য কোনও শক্তি কর্ত্তৃক স্ব স্ব কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয় না। কিন্তু তাহাদের সমস্ত চেষ্টা পুরুষার্থসাধনের অভিমুখী।

স্বাং স্বাং প্রতিপদ্যন্তে পরস্পরাকূত-হেতুকাং বৃত্তিং
পুরুষার্থ এব হেতু র্ন কেনচিৎ কার্য্যতে করণম্।

সাং কা—৩১

ইন্দ্রিয়দিগের বৃত্তি পরস্পরের আকূত-হেতুকা। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের আকূত (= অভিপ্রায়) যেন অবগত হইয়াই তাহাদের কার্য্য করিতে চেষ্টা না করিয়া নিজের কার্য্য করে। কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানহীন, তাহাদের প্রকৃতি-বশেই এইরূপ কার্য্য হয়।

সকল করণের উদ্দেশ্যই পুরুষার্থসাধন।

এতে প্রদীপকল্পাঃ পরস্পর বিলক্ষণাঃ গুণ বিশেষাঃ
কৃৎস্নং পুরুষস্যার্থং প্রকাশ্য বুদ্ধৌ প্রযচ্ছন্তি। সাং কা—৩৬

বুদ্ধির নিম্নস্থ করণগণ পরস্পর হইতে পৃথক, তাহাদের কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন। তাহারা গুণের (সত্ত্বঃ রজঃ তমঃ) বিশেষ বিশেষ বিকার। তৈল, বর্ত্তিও অগ্নি এই তিনের মিলন দ্বারা প্রদীপ যেমন আলোক দান করে, করণগণও তদ্রূপ। তাহারা পুরুষের জন্য সমস্ত অর্থ প্রকাশিত করিয়া বুদ্ধিতে অর্পণও উপস্থিত করে।

তন্মাত্র ও পঞ্চভূত

রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ এই পাঁচটি তন্মাত্র। তন্মাত্র শব্দের অর্থ তৎমাত্র, তাহা মাত্র, তাহার অধিক কিছু নহে। রূপমাত্র, রসমাত্র, গন্ধমাত্র, শব্দমাত্র, স্পর্শমাত্র। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের নানা ভেদ আছে। তন্মাত্রগণ তাহাদের ভেদবিহীন অবিশেষ অবস্থা। প্রত্যেক দ্রব্য হয় শান্ত (সুখকর), নতুবা ঘোর (দুঃখকর), না হয় মূঢ় (মোহকর)। তন্মাত্রগণের এই সকল বিশেষত্ব নাই। তাহারা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ গুণের অতি সূক্ষ্ম অবস্থার আশ্রয় দ্রব্য। "গুণস্য অতি সূক্ষ্মরূপেণ অবস্থানং তন্মাত্র শব্দেন উচ্যতে" (গুণদিগের অতি সূক্ষ্ম রূপে অবস্থানই তন্মাত্র।) সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ যে বৈশেষিক গুণ নহে, দ্রব্য—তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তন্মাত্রগণ ও দ্রব্য, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য দ্রব্যদিগের অতি সূক্ষ্ম অবস্থা। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ হইতে তাহারা স্থূলতর হইলেও, তাহারাও সূক্ষ্ম। অহংকার হইতে একদিকে যেমন ইন্দ্রিয়দিগের উদ্‌ভব হয়, তেমনি তন্মাত্রগণও উদ্‌ভূত হয়। রূপ, রস গন্ধাদির নানা ভেদ আছে। তাহাদের কোনও রূপটি সুখকর, কোনটি দুঃখকর, কোনটি বা সুখকরও নহে দুঃখকরও নহে। বিশেষত্ব প্রাপ্ত হইলেই তাহারা সুখ দুঃখাদি উৎপাদন করে। বিশেষত্ব-বর্জিত রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শই তন্মাত্র।

তন্মাত্র হইতে পঞ্চভূতের—ক্ষিতি, অপ্‌ তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোমের অভিব্যক্তি হয়।

তন্মাত্রাণ্যবিশেষাঃ, তেভ্যো ভূতানি পঞ্চ পঞ্চভ্যঃ।
এতে স্মৃতা বিশেষাঃ শান্তাঃ ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ॥

সাং কা—৩৮

পঞ্চতন্মাত্রকে অবিশেষ বলে, এই পঞ্চ হইতে পঞ্চস্থূলভূত উৎপন্ন হয়। পঞ্চস্থূলভূতকেই বিশেষ বলে। ইহারা শান্ত, ঘোর এবং মূঢ়।

দেশ ও কাল

দেশ ও কাল দর্শনের এক অতি প্রাচীন সমস্যা। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়, কিন্তু দেশ ও কালের বোধের জন্য আমাদের কোন ইন্দ্রিয় নাই। এইজন্য তাহাদের বাস্তবতা কোনও কোনও দার্শনিক অস্বীকার করিয়াছেন। দেশ ও কালকে অনন্ত বলা হয়, কিন্তু সীমাহীন কোনও বস্তুর ধারণা করা অসম্ভব। ঈশ্বরকে বিভু বা সর্ব্বব্যাপী ও শাশ্বত বলা হয়, তিনি সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বকাল ব্যাপিয়া আছেন মনে করা হয়। দেশের সমস্ত অংশই আমাদের সম্মুখে বিস্তৃত; তাহার মধ্যে পারম্পর্য্য নাই—দেশের সকল অংশই পরস্পরের পাশাপাশি অবস্থিত। সুতরাং সর্ব্বদেশব্যাপী অনন্ত ঈশ্বরের সম্পূর্ণ ধারণা সম্ভবপর না হইলেও একটা অস্পষ্ট ধারণা সম্ভবপর। কিন্তু সর্ব্বকাল-ব্যাপিত্বের অর্থ কি? কালকে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। অতীত কাল তো গত ও বিনাশপ্রাপ্ত। তাহার অস্তিত্ব এক সময়ে ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে নাই। ভবিষ্যৎ অনাগত। যত ক্ষণ তাহা বর্ত্তমানে পরিণত না হয়, ততক্ষণ তাহারও অস্তিত্ব নাই। আছে শুধু বর্ত্তমান, কিন্তু তাহার অস্তিত্বও সন্দেহ সংকুল। অলক্ষ্যে প্রতিক্ষণে তাহা অতীতে পরিণত হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইতেছে। কোনও ক্ষণকে বর্ত্তমান বলিবার উপায় নাই। যখনই তাহার বোধ মনে উদিত হয়, তাহার পূর্ব্বেই তাহা অতীত হইয়া যায়। অতীতের অস্তিত্ব নাই, ভবিষ্যতের অস্তিত্ব নাই, বর্ত্তমান বলিয়াও কোনও ক্ষণকে ধরিবার উপায় নাই। এই অবস্থায় কালের বাস্তব অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া স্বাভাবিক। তাই কালের অস্তিত্ব অনেকে অস্বীকার করিয়াছেন। ঈশ্বরকে সর্ব্বকালব্যাপী না বলিয়া কালাতীত বলা হইয়াছে। তিনি ত্রিকালাতীত—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সকলই তাঁহার নিকট এক সঙ্গে বর্ত্তমান। তিনি মহাকাল—বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪।৪।১৬) ব্রহ্মের নিম্নে সংবৎসর দিন-রাত্রির সহিত পরিবর্ত্তিত হইতেছে বলা হইয়াছে। (যস্মাৎ অর্ব্বাক সংবৎসরঃ অহোভিঃ পরিবর্ত্ততে)। ইংরাজ কবি ভনের (Vaughan) নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি কবিতায় উপনিষদের এই ভাবই সুন্দর রূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

I saw Eternity the other night
Like a great ring of pure and
endless light.
All calm, as it was bright :
And round beneath it
Time in hours, days, years.
Driven by the spheres.
Like a vast shadow moued :
in which the world
And all her train were hurbed.

"সেদিন রাত্রিকালে আমি মহাকালকে দেখিয়াছি। শুদ্ধ, অনন্ত, অচঞ্চল, উজ্জল সেই আলোক বৃহত্তর অধোদেশে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া কাল—ঘণ্টা, দিন ও বৎসরের রূপ ধরিয়া বিরাট ছায়ার মত চক্রাকারে ঘূর্ণিত হইতেছে। সেই ছায়ার মধ্যে সংসার সাঙ্গোপাঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইয়া বর্ত্তমান আছে।"

বৈদান্তিকের মতে দেশ ও কালের জগৎ প্রাতিভাসিক জগৎ। ব্রহ্ম দেশ ও কাল কর্ত্তৃক অস্পৃষ্ট। পাশ্চাত্য দার্শনিক ইমান্নুয়েল ক্যাণ্ট দেশ ও কালের বাস্তবতা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে আমাদের মনঃই বাহ্য জগতে দেশ ও কালের আরোপ করে। মনের বাহিরে তাহাদের অস্তিত্ব নাই। প্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক বার্গস্ঁ কালপ্রবাহ ও প্রাণকে (Elan Vital) অভিন্ন বলিয়াছেন। স্যামুএল আলেকজাণ্ডার কালকে বিশ্বের চালক শক্তি বলিয়াছেন। তিনি দেশ ও কাল উভয়েরই মনোবাহ্য বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে দেশ ও কাল উভয়ে মিলিত হইয়া এক বস্তুতে পরিণত হইয়াছে, এবং এই বস্তু দ্বারাই যাবতীয় বস্তু নির্ম্মিত।

সাংখ্যমতে আকাশ ও তাহার উপাধিদিগের হইতে দেশ ও কালের উদ্ভব হইয়াছে।

দিক্‌কালৌ আকাশাদিভ্যঃ সাং কা—২।১২

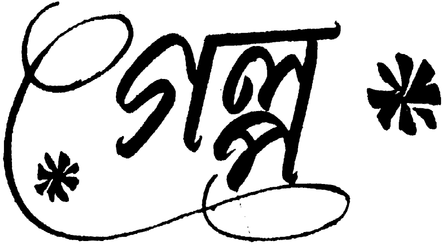
এই সূত্রের ভাষ্যে বিজ্ঞান ভিক্ষু লিখিয়াছেন নিত্যৌ যৌ দিক্‌কালৌ, তৌ আকাশ প্রকৃতিভূতৌ প্রকৃতেঃ গুণ বিশেষৌ এব। অতঃ দিক্ কালয়োঃ বিভুত্বোপপতিঃ। "আকাশবৎ সর্ব্ব গতশ্চ নিত্যঃ" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্তং বিভুত্বং চ আকাশস্য উপপন্নং। যৌ তু খণ্ডদিক্‌কালৌ, তৌ তু তত্তপাধিসংযোগাৎ আকাশাৎ উৎপদ্যেতে

ইত্যর্থঃ। আদি শব্দেন উপাধিগ্রহণাৎ ইতি। যদ্যপি তত্তৎ উপাধিবিশিষ্টাকাশমেব খণ্ড দিক্‌কালৌ, তথাপি বিশিষ্টস্য অতিরিক্ততাভ্যুপগমবাদেন বৈশেষিক নয়ে শ্রোত্রস্য কার্য্যতাবৎ তৎকার্য্যত্বং অত্র উক্তম্।" ইহার অর্থ যে দিক্ ও কাল নিত্য, তাহারা আকাশ-প্রকৃতিভূত,প্রকৃতির গুণ বিশেষ। ইহা হইতেই দিক ও কালের বিভুত্বপ্রাপ্তি। "আকাশবৎ সর্ব্বগত ও নিত্য।" এই শ্রুতিবাক্য হইতে আকাশের বিভুত্ব উপপন্ন হয়। যে দিক্ ও কাল খণ্ড দিক্—কাল, তাহারা উপাধি-সংযোগবশতঃ আকাশ হইতে উৎপন্ন হয়। সূত্রেতে আদি শব্দ দ্বারা উপাধির কথাই বলা হইয়াছে। যদিও উপাধি-বিশিষ্ট আকাশই খণ্ড দিক্ ও কাল, তথাপি বিশিষ্ট আকাশ বলিয়া তাহাদিগকে আকাশের কার্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়ছে।" বিজ্ঞানভিক্ষু এখানে নিত্য ও খণ্ড দিক্‌কালের মধ্যে যে পার্থক্য করিয়াছেন, সূত্রে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। এই সূত্রের অনিরুদ্ধকৃত ভাষ্যে আছে "তৎ তৎ উপাধিভেদাৎ আকাশমেব দিক্ কাল শব্দবাচ্যং। তস্মাৎ আকাশে অন্তর্ভূর্তৌ।" অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ উপাধিভেদে আকাশই দিক্ ও কালের শব্দবাচ্য। ইহারা আকাশের অন্তর্ভূর্ত। দেশ ও কাল মধ্যে নিত্য ও খণ্ডরূপ দ্বিবিধ ভেদ থাকুক অথবা না থাকুক, আকাশ যখন প্রকৃতির বিকার, তখন দেশ ও কাল ও প্রকৃতিরই বিকার। সুতরাং তাহারা দ্রব্য। তাহাদের মনোবাহ্য অস্তিত্ব আছে। কিন্তু অন্যত্র বিজ্ঞানভিক্ষু দিক্ কালকে বুদ্ধি-নির্ম্মাণ (construction of the mind) বলিয়াছেন। "প্রকৃতির অভিব্যক্তির ক্রমানুসারে উদ্‌ভূত যাবতীয় ঘটনার মধ্যগত সম্বন্ধই দেশ ও কাল। প্রত্যক্ষ জগতের যাবতীয় বিষয় দেশ ও কালের সম্বন্ধে আবদ্ধ। অনন্ত কাল ও অসীম দেশের প্রত্যক্ষ প্রতীতি আমাদের হয় না। এইজন্য অনন্ত কাল ও অসীম দেশকে বুদ্ধি-নির্ম্মাণ বলে।"

সাংখ্যমতে প্রত্যেক ব্যক্ত বস্তু সক্রিয় ও পরিস্পন্দবৎ অর্থাৎ স্পন্দন বা গতিযুক্ত। প্রত্যেক বস্তু নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন হয় অতি মন্থর গতিতে,অতি ধীরে—এত ধীরে যে পরিবর্ত্তনের পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। কালের ক্ষুদ্রতম অংশে—অর্থাৎ প্রতিক্ষণে সমগ্র জগৎ পরিবর্ত্তিত হয়—পরিবর্ত্তিত হইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা হইতে ভিন্ন হইয়া পড়ে। প্রত্যক্ষ জগতে দেশ ও কাল সসীম রূপেই প্রতীত হয়। পূর্ব্বাপর সম্বন্ধে বদ্ধ প্রত্যক্ষ বিষয়দিগের জ্ঞান হইতে আমরা প্রকৃতির অভিব্যক্তির ক্রম বুঝিবার জন্য এক অন্তহীন কালের কল্পনা করি।

পাতঞ্জলদর্শনের ব্যাসভাষ্যে আছে "জড়ের ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য অংশ যেমন পরমাণু, তেমনি কালের ক্ষুদ্রতম অংশ "ক্ষণ"। একটি চলন্ত পরমাণুর এক বিন্দু হইতে পরবিন্দুতে যাইতে যেটুকু সময়ের প্রয়োজন, তাহাই ক্ষণ। এই ক্ষণের অবিচ্ছেদ্য প্রবাহ পূর্ব্বাপর ক্রমানুসারে হয়। ক্ষণ এবং তাহাদের পারম্পর্য্যের (sequener) সমবায় হইতে কোনও বস্তু উদ্‌ভূত হয় না। সুতরাং কালের বাস্তবতা নাই। তাহা মনঃকর্ত্তৃক সৃষ্ট, "বুদ্ধি-নির্ম্মাণ।" বস্তুর প্রত্যক্ষ প্রতীতি অথবা শব্দের জ্ঞান হইতে কালের জ্ঞান হয়। (বুদ্ধি-নির্ম্মাণঃ শব্দজ্ঞানানুপাতী)। কিন্তু ক্ষণ ক্রমাবলম্বী অর্থাৎ পূর্ব্বাপর ক্রমে ব্যবস্থিত, এবং তাহার বাস্তবতা আছে (বস্তুপতিত)। দুইটি ক্ষণের যুগপৎ আবির্ভূত হওয়া অসম্ভব। যখন এক ক্ষণ অন্য ক্ষণের পরে আবির্ভূত হয়, তখন পূর্ব্বাপর ক্রমের উদ্‌ভব হয়। বর্ত্তমান ক্ষণের মধ্যে একটিমাত্র ক্ষণ বর্ত্তমান, তাহার মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী কোনও ক্ষণের অস্তিত্ব নাই। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ক্ষণের কোনও সমবায়ও নাই। কিন্তু অতীত ও ভবিষ্যৎ ক্ষণ পরিণামেরই অন্তর্গত—সুতরাং প্রত্যেক ক্ষণে সমগ্র জগৎ পরিণামপ্রাপ্ত হয়। "একেন ক্ষণেন কৃৎস্নো জগৎ পরিণামং অনুভবতি।" এই পরিণামের প্রবাহই কাল নামে অভিহিত হয়। সাংখ্য মতে কাল জন্য বস্তু। বিজ্ঞানভিক্ষু যে নিত্য কালের কথা বলিয়াছেন, তাহার অস্তিত্ব নাই। প্রকৃতি হইতে যাহা যাহা উদ্‌ভূত হয় সকলই অনিত্য, কালও সেই জন্য অনিত্য। (ক্রমশঃ)





অন্তর্নিহিত

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য

সন্ধ্যে হ'তে না হ'তেই সাজগোজের পালা সুরু হ'য়েছে শ্রীলেখার। দামী বেনারসী, টিস্যু, জর্জেট, মাদ্রাজী, ব্যাঙ্গালোর—স্তূপীকৃত শাড়ি আর ব্লাউজ, সোনা, মণি-মুক্তোর জড়োয়া গয়না। ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যকে এমনি এক একটি অনুষ্ঠানেই জাহির করা দরকার। গয়নার ভার একালে অচল—ডিজাইন নিয়েই আধুনিকতা। সেদিক থেকে শ্রীলেখার কোন হাঙ্গাম পোওয়াতে হয় না। টুকিটাকি গয়না পরলেই চলবে। হীরের দুল আর সোনার কয়েক গাছি চুড়ি—তার সঙ্গে কিছু জড়োয়ার সেট্। হাতে একটা দামী রিস্ট ওয়াচ। অভ্যাগত মহলে এইতেই চাঞ্চল্য এবং মর্যাদার সৃষ্টি হবে। আসল হীরেটার মূল্য নির্ণয়ে অনেক ঈর্ষাকাতরার চক্ষে রাতের ঘুম আসবে না। কিন্তু শাড়ির রঙ নিয়েই মুস্কিল বেধেছে শ্রীলেখার। গায়ের রঙে ম্যাচ ক'রে প'রতে গেলে ফিকে রঙই ভালো। আকাশের নীলাভ রঙ কিংবা কচি কলাপাতার সবুজ আভা। কিন্তু তাতে যেন মন ওঠে না শ্রীলেখার। বার বার শাড়িগুলির পাট খুলে পরা আর পাট ক'রে সাজিয়ে তুলে রাখা! প্রচণ্ড গরমে ক্লান্তিতে শরীর যেন নুইয়ে পড়ে। কম পরিশ্রমের কাজ নয় শাড়ির পাট ভাঙা আর পাট ক'রে সাজানো! ইলেকট্রিক পাখাটার গতিকে শেষ বিন্দু পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েও বিন্দু বিন্দু ঘামের সঞ্চার হয় শ্রীলেখার কপালে, মুখে চোখে।

সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হ'য়ে এল। অনেক বিচার-বিবেচনার পর শ্রীলেখার পছন্দমত শাড়ির রঙ বাছাই করা হ'ল। কিন্তু সুধীরের এখনও দেখা নেই কেন? রাত আটটা বাজে—সুধীর এখনও এসে পৌছাল না। শ্রীলেখা তাকে তাড়াতাড়ি ফিরবার কথা ব'লে দিয়েছিল।

অরুণের বৌভাতে যেতে হবে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সচকিতা হ'য়ে উঠল শ্রীলেখা। এখনও সুধীর ফেরে নি। সাজগোজ প্রায় শেষই হ'য়ে গেছে তার। বেরুবার সময় একটু কেবল রিটাচ ক'রে নিলেই চলবে।

ড্রেসিং টেবিলটার সামনে দাঁড়িয়ে বার বার সে তার অঙ্গসজ্জার দিকে তাকাচ্ছিল। সমস্ত সজ্জার মাঝখানে আয়নায় প্রতিভাত হ'য়ে উঠল তার ঝল্‌মলে শাড়িখানি। কমলালেবু রঙের বেনারসী টিস্যু—সোনালী রঙের নক্ষত্রের বুটি তাতে। একটু সেকেলে; কিন্তু ভারি উজ্জ্বল রঙ। ধবধবে ফরসা গায়ের রঙ হ'লে কী সুন্দরই না তাকে মানাত। মনটা একটু খুঁৎ খুঁৎ করে বই কি! কিন্তু তা ক্ষণিকের। এই রঙের শাড়িই পছন্দ করে অরুণদা। কতদিন, কত সন্ধ্যায় এই রঙের শাড়ির স্তুতিগানই না শুনেছে অরুণের কণ্ঠে। বেশ মনে আছে শ্রীলেখার—একবার তার জন্মদিনে এই রঙের একখানি জর্জেট অরুণ তাকে উপহার দিয়েছিল। ভারি পছন্দ হয়েছিল শ্রীলেখার শাড়িখানি। টুকটুকে ঘোর বর্ণশোভা। মুখে বেহিসাবী খরচের জন্যে অভিযোগ প্রকাশ ক'রলেও মনে মনে সে খুসিই হয়েছিল অরুণের দেওয়া শাড়িখানি পেয়ে। কতদিন সে ওই শাড়িখানিকে প'রেছে—মন তার খুসির আমেজে ভ'রে উঠেছে।

বড় লোকের মেয়ে সে। চিরকালই বেশভূষার আতিশয্যে মানুষ। রকম রকম শাড়ির বাহার—রকম রকম ডিজাইন। আর রঙের কত বিচিত্র সমারোহ! অরুণ কিন্তু গাঢ় কমলালেবু রঙটিই পছন্দ করে সবচেয়ে বেশি। এই নিয়ে কত ঠাট্টাই না ক'রেছে শ্রীলেখা তাকে। বিয়ের পরও অনেকবার সে এই রঙের নানা শাড়ি প'রেছে। বড়লোকের স্ত্রী সে! স্বামীর কিন্তু ওদিকে কোন টেস্ট নেই। শাড়ির জমি এবং মূল্য দিয়েই শাড়ির আভিজাত্য রঙ তার কাছে মুখ্য নয়।

এই নিয়ে অনেক মন কষাকষি হ'য়েছে সুধীরের সঙ্গে শ্রীলেখার। অনেক রমণীয় সন্ধ্যার সজ্জা ব্যর্থ হ'য়ে গেছে শ্রীলেখার। কিন্তু সে কথা যাক্!

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আর একবার দেখলে শ্রীলেখা তার পরণের শাড়ির বর্ণ ঔজ্জ্বল্যকে। খুসির আমেজে মন তার ভ'রে উঠল। গাঢ় কমলালেবুর রঙের বেনারসী টিস্যু—হোক্ না কেন একটু সেকেলে প্যাটার্ণের, কিন্তু ভারি সুন্দর ম্যাচ ক'রেছে। আর তার উজ্জ্বল টানাটানা চোখদুটি আজ যেন আরও বেশি জ্বল্‌জ্বলে—আরও বেশি ভাসা-ভাসা। সুর্মার সূক্ষ্ম রেখার টানে মনোমুগ্ধকর। আর কর্ণমূলে হীরকের দীপ্তি—আভিজাত্যের রঙ যেন ঠিক্‌রে প'ড়ছে।

একটু দেরিই হ'য়ে গিয়েছিল। অফিস থেকে আর একটা এন্‌গেজমেণ্ট সেরে সুধীরের ফিরতে সন্ধ্যা পার হ'য়ে গিয়ে রাত প্রায় নটা বেজে গেল।

শ্রীলেখা তেলে-বেগুনে চ'টে উঠল—তোমার আক্কেলটা কী শুনি?

—একটা বিশেষ জরুরী এন্‌গেজমেণ্টে আটকে প'ড়ে গিয়েছিলাম।

—সে কাজটাই তোমার কাছে বড় হ'য়ে উঠল? আর এদিকে আজ যে অরুণদার বৌভাত—সে কথাটা বেশি খেয়ালই কর নি?

—বারে, তা কেন? সেই জন্যেই ত তাড়াতাড়ি ফিরলাম।

—তাড়াতাড়ি ফিরলে? ক'টা বেজেছে শুনি?

হাতের রিস্ট ওয়াচটির দিকে তাকিয়ে সুধীর বললে—কী আর এমন রাত হ'য়েছে?

স্বামীর বেহায়াপণা কথায় শ্রীলেখা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—তা ত' বটেই! আমার দরকারের মূল্যটা তোমার কাছে এমন কীই বা আর বেশি?

সুধীর আশ্বাস দিয়ে বললে—মোটে ত রাত নটা। গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যেই বলতে পার। গাড়িতে যাবে আর আসবে।

—তার মানে শুধু নিমন্ত্রণ খাওয়া আর চ'লে আসা? তুমি বোধ হয় জানো না অরুণদার সঙ্গে আমার সে সম্পর্ক নয়।

কথায় কথা বাড়ে। আর সেই বাড়াবাড়ি থেকে রীতিমত গৃহ-যুদ্ধের সৃষ্টি হয়। পরিণাম তার ভয়ঙ্কর। সুধীরকে নাস্তানাবুদ হতে হয় তাতে। সুতরাং শ্রীলেখার কথায় সুধীর অপরাধীর মতন ত্রুটি স্বীকার ক'রে নেয়।

শ্রীলেখা স্বামীকে আরও একটু মৃদু ভর্ৎসনা ক'রে বলে—নাও, তুমি পাঁচ মিনিটে রেডি হ'য়ে এসো।

যত গোল বাধালে সর্বাণী। বেরুবার মুখেই সর্বাণী এসে হাজির।

—কী রে, সবাই গেল অরুণের বৌভাতে—তোরই কেবল পাত্তা নেই!

—এই ত' বেরুচ্ছি। আর বলিস কেন, সংসারের ঝঞ্ঝাট কী কম?

শ্রীলেখার কথায় সর্বাণী হেসে উঠল, তোর আবার সংসার? কপোত কপোতী মিলে দিনরাতই ত' কূজন ক'রে বেড়াস। পাঁচ বছর বিয়ে ক'রেছিস, তোদের প্রেমে ভাঁটা পড়ে নি। আমরা ত' তিন বছরেই হাঁপিয়ে উঠেছি। সংসার যদি দেখিস তবে বলবি সং-এর সার। কুড়ি পার হ'তে না হ'তেই বুড়িয়ে গেলাম।

এতক্ষণে সুধীর প্রস্তুত হ'য়েই বেরিয়ে এল। শান্তিপুরে ধুতির 'পর ফিন্‌ফিনে আদ্দির পাঞ্জাবী—পুরুষদের বেশ-ভূষায় এর চেয়ে বেশি জাঁকজমকের প্রয়োজন হয় না। আর সুধীর সুপুরুষ—ফরসা দোহারা চেহারায় আভিজাত্যের জৌলুষ; তাই অল্প সাজ-সজ্জাতেই তাকে মানায় ভালো।

স্বামীর বেশ-ভূষায় খুসিই হ'য়ে উঠল শ্রীলেখা। শুধু ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটা হীরের আঙটি সুধীরের অনামিকায় সে পরিয়ে দিলে।

গাড়িতে ওঠবার সময় সর্বাণী বললে—কী চমৎকার বৌ হ'য়েছে অরুণের। সত্যিই রূপসী—প্যারাগণ অফ বিউটি যাকে বলে ঠিক তাই!

শ্রীলেখা উৎকর্ণ হ'য়ে শুনলে সর্বাণীর কথা। বললে—তুই তা হ'লে বিয়ে বাড়ি থেকেই ফিরছিস্?

সর্বাণী ব'ললে—হাঁ, তা তুই এতক্ষণে বুঝলি বুঝি?

—কী ক'রে বুঝব বল? তোদের মতন অত হ্যাংলাটে স্বভাব নয়। নিমন্ত্রণ হ'য়েছে ব'লে সাত সকালে গিয়ে লোকের বাড়ি পাত পাড়ব।

কিল খেয়ে কিল চুরি করবার মতন মেয়ে সর্বাণী নয়। কিল খেয়ে কিল ফিরিয়ে দিতেও সে জানে। কলেজে পড়বার সময় থেকেই অরুণকে কেন্দ্র ক'রে তার সঙ্গে শ্রীলেখার আড়াআড়ি সম্পর্ক। অরুণ কলেজ ইউনিয়নের সেক্রেটারি। শ্রীলেখা এবং সর্বাণী দু'জনেই কলেজে নামকরা গায়িকা; কিন্তু অরুণের পক্ষপাতিত্ব ছিল শ্রীলেখার প্রতি। আর অরুণ তাদের সিনিয়র হ'লেও শ্রীলেখাদের বাড়িতে তার যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল। শ্রীলেখার ভাই তার সহপাঠী বন্ধু।

সর্বাণী তাই শ্রীলেখার কথার প্রত্যুত্তরে ঠেস মেরে বলে—অরুণের বাড়ি তা ব'লে লোকের বাড়ি নয়। এখনকার কথা ঠিক ব'লতে পারি নে, এক কালে অন্তত: তোর কাছেও তা ছিল না।

খোঁচাটাকে হজম ক'রে নিতে হয় আপাতত: শ্রীলেখার। তা হ'লে তুই আর অরুণদার বাড়ি এখন যাবি নে। তা হ'লে চল—তোকে পৌঁছে দিয়ে যাই তোদের বাড়িতে।

সর্বাণী ব'ললে—না, আমি বাসেই যাবোখন। একেই তোদের দেরী হ'য়ে গেছে। সত্যিই তুই না যাওয়াতে অরুণ অনুযোগ করছিল আমার কাছে।

কিন্তু শ্রীলেখা কিছুতেই ছাড়লে না সর্বাণীকে। তাদের সঙ্গে তাকেও গাড়িতে তুলে নিলে।

গাড়িতে আরও কিছু কিছু টুকিটাকি কথাবার্তা চলতে লাগল। বেশির ভাগ কথা শ্রীলেখাই বলে নিজেদের দাম্পত্য-জীবনের ঘটনাকে উল্লেখ করে। স্বামী তার কত বেহিসাবী আর কত ছেলেমানুষ। তাদের জীবনের দাম্পত্য-কলহ কত মধুর ইত্যাদি ইত্যাদি!

কথাপ্রসঙ্গে সুধীরও যোগদান করে। আত্ম-প্রশংসার কথা স্ত্রীর মুখে শুনে আনন্দে গদগদও হ'য়ে ওঠে।

সর্বাণীর এসব প্রসঙ্গে কোন আগ্রহ নেই। তার মনে পূর্বেকার ঈর্ষ্যার আগুন জ্বলতে থাকে। বলে—সত্যিই লেখা, তোর আজ সন্ধ্যের আগেই অরুণের বাড়ি যাওয়া উচিত ছিল। বার বার সে তোর কথা বলছিল।

অগত্যা শ্রীলেখাকে এ প্রসঙ্গে আসতেই হয়। জিজ্ঞেস করে—কী রকম খেলি অরুণদার বৌভাতে?

সর্বাণী বললে,—গরীব হ'লেও বিয়েতে আর বৌভাতে খুব খরচ ক'রেছে অরুণ! বৌকে দিয়েছে থুয়েছেও বেশ! অবস্থার অতিরিক্ত ক'রেছে অরুণ।

শ্রীলেখা জানে অরুণের পারিবারিক অবস্থা। নিতান্ত সাধারণ গৃহস্থ ঘর। আর চাকরিও অরুণ যা করে তা ঘটা ক'রে বলবার মতন নয়। কোন রকমে দিন গুজরাণ করা। আগ্রহের সুর তুলে শ্রীলেখা তাই প্রশ্ন ক'রলে—এত খরচ ক'রেছে যখন তখন বিয়েতে পেয়েছে খুব। অরুণদা তা হ'লে বেশ বড়লোকের জামাই হ'য়েছে বল্।

—দূর, তা কেন? বরঞ্চ ঠিক তার বিপরীত। অত্যন্ত গরীবের মেয়ে বিয়ে ক'রেছে অরুণ। বিয়ের সমস্ত খরচ ঘর থেকে ক'রতে হ'য়েছে তাকে। একটি কপর্দকও যৌতুক নেয় নি।

শ্রীলেখা প্রশ্ন ক'রলে—এত টাকা পেল কোথায়? ওই ত অবস্থা অরুণদার!

সর্বাণী বললে—তাইত' ভাবছি। সোনা-দানা অবিশ্যি তেমন দিতে পারে নি, কিন্তু গায়ে-হলুদের তত্ত্বে যা শাড়ি দিয়েছে—কী ব'লব তোকে। কত রকম ডিজাইনের আর নতুন বৌএর গায়ের রংএর সঙ্গে প্রত্যেকটি যেন ম্যাচ্ করা।

শ্রীলেখা জিজ্ঞেস করে—তুই এসব জানলি কেমন ক'রে?

সর্বাণী উত্তর দেয়—বারে, আমি ত ক'দিনই যাতায়াত ক'রছি অরুণের বাড়ি। অনেক ক'রে ব'লে গিয়েছিল। দেখা-শুনো করে এমন কোন আত্মীয়-স্বজন মেয়েছেলে ওর পরিবারে ত' নেই।

শ্রীলেখা পরিহাসের সঙ্গে বলে—তাইত'হ্যাংলাটে স্বভাব' বলছিলাম তোকে। তুই ত' চ'টেই অস্থির। যাই বলিস্ না কেন তুই, আমাকেও ত কত ক'রে অরুণদা অনুরোধ জানিয়ে গিয়েছিল; কিন্তু নিজের ঘর-সংসার ফেলে রাত দিন যাতায়াত করা সংসারী লোকের পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর নয়। এই দেখনা, আজকে বৌভাতে যেতেই কত দেরি ক'রে ফেললাম!

শ্রীলেখার এ কথার প্রত্যুত্তরে সর্বাণী ঠেস দিয়ে বলে—তোর মতন অতটা নিজেরটিকে এখনও চিনে উঠতে পারি নি কিনা তাই। বন্ধু-বান্ধবদের উপকারে তাই এখনও একটু-আধটু এগিয়ে যাই।

গাড়ির গতিটা এইবার কিছুটা মন্থর হ'য়ে এলো। একটা বড় রাস্তার শেষ পর্যায়ে আসতে সর্বাণী বললে—এইখানেই থামাতে বল, এটুকু পথ পায়ে হেঁটেই চ'লে যাব।

সুধীর বাধা দিয়ে বললে—তা কেন? আপনার বাড়ির দরজাতেই পৌছে দিয়ে আসছি। কীইবা আর এমন দেরি হবে?

সর্বাণী শ্রীলেখার বেশ-ভূষার দিকে তাকিয়ে এতক্ষণে হঠাৎ একটা মন্তব্য প্রকাশ ক'রে বলল—ভারি সুন্দর তোকে দেখাচ্ছে—শুধু একটুখানি ত্রুটি থেকে গেছে।

—কী?

—এই শাড়িতে তোকে কিন্তু মানাচ্ছে না! তা ছাড়া আর সব ভালো।

শ্রীলেখা বলে—কেন বল দেখি? বড্ড 'ড্যাজলিং'—এইত?

—হ্যাঁ, এ যেন বিয়ের কনের শাড়ি। আর ঠিক এই শাড়িই প'রেছে আজ অরুণের বৌ। একে ফরসা ধবধবে রঙ, তায় সুন্দর মুখশ্রী। আর কী সুন্দর চোখ দুটি—সুর্মা টানার দরকারই নেই।

সর্বাণীর কথায় জ্বলে ওঠে শ্রীলেখা!—কীইবা এমন বয়েস হ'য়েছে আমাদের যে এ রঙ্ মানায় না। তুই বড্ড বুড়িয়ে গেছিস দেখছি! আমার কিন্তু খুব ভালো লাগে শাড়িখানিকে—বিশেষ ক'রে এর রঙ্‌টা!

সর্বাণী জ্বলন্ত আগুনে আরও ইন্ধন জোগায়—তা কে অস্বীকার ক'রছে? কিন্তু যাই বল বাপু, খুব ফরসা না হ'লে এ রঙ্ কিছুতেই মানায় না। তোকে লাইট্ কলারই দেখায় ভালো। যার যা অঙ্গ আর যার যা বর্ণ!

মোটর এসে পৌছাল সর্বাণীর বাড়ির দরজায়। রাত্রি তখন প্রায় নটা বেজে গেছে। সর্বাণীকে নামিয়ে দিয়ে সুধীর সোফারকে নির্দেশ দিলে—অরুণের বাড়ির পথে নিয়ে যেতে।

শ্রীলেখা বললে—না, আগে একটু বাড়ি চল।

বিস্মিত সুধীরের চোখে প্রশ্ন—শ্রীলেখার সেদিকে গ্রাহ্য নেই।

তবুও মোলায়েম কণ্ঠে সুধীর বলে—বড্ড দেরি হ'য়ে যাবে না?

শ্রীলেখা উত্তর দেয়—আমি ত' আর সর্বাণী নই—নিমন্ত্রণ হ'য়েছে ব'লেই যে সাত সকালে গিয়ে লোকের বাড়ি পাত পাড়ব!

গাড়ি আবার ফিরে চ'লল শ্রীলেখাদেরই বাড়িতে। রাত্রি একটু বেশিই হ'য়ে গেছে। তা হোক্—তবুও চট্ ক'রে শাড়িটাকে পাল্‌টে নিতে কতই বা আর এমন দেরি হবে শ্রীলেখার?

শারদ শর্ব্বরী

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

শান্ত, স্নিগ্ধ, দধিশুভ্র শারদ শর্ব্বরী!
ক্লান্ত কলহংসীসম বেলাবালুকায়—
রজনীগন্ধার বনে নিদ্রায় নিলীন
বল্লীবেণীরম্যা যেন কোন্ বিরহিনী
[illegible] সম্বৃত যৌবন
লোভনীয়! নিরজন স্তব্ধ পল্লীবাটে
কারা ওরা এসেছিল ছায়াপথ বাহি'
দুলায়ে নক্ষত্রহার চারু কণ্ঠতটে,
করি' কেলি কলোচ্ছল মন্দাকিনী-নীরে
সুদূর নন্দন হ'তে! কেদার—কান্তারে,
মন্দগন্ধবহস্রোতে মন্দার-সুরভি
ছড়ায়ে গেল কি ওরা? স্মিত বিম্বাধর
দেখিল কি সকৌতুকে সরসী-সলিলে?
ওদেরি অঞ্চল হ'তে স্খলিত কি কাশপুষ্পরাশি?

বঙ্কিম ও শরৎ সাহিত্যে বাংলার কয়েকটি সমাজচিত্র

শ্রীমহাদেব ঘোষ

বঙ্কিমচন্দ্র এবং শরৎচন্দ্র বাংলা কথা-সাহিত্যের সোনার-তরীর দুজন বিশিষ্ট কর্ণধার। সোনার-তরীর গঠন ও পরিচালনায় তাঁরা বিশিষ্ট আসনই গ্রহণ করেছেন, সে কারণে তাঁদের সার্থক ও বিচিত্র কথা-সাহিত্যে বাংলা সমাজের সুম্ভাব্য বা যথাযথ চিত্র যে থাকবে তা আশা করা অসঙ্গত হবে না।

অনেক সময়ে অনেক সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক মহৎসাহিত্যের বিশ্বজনীন আবেদনের কথা স্মরণ করে—বলে থাকেন যে কোথাও যদি বিশেষ দেশ বা সমাজের বিষয় চিত্রিত হয়, সে সাহিত্য অসার্থক। কিন্তু বনস্পতির মত সাহিত্যেরও সীমা ও অসীমের দুটো দিক আছে। গাছ মাটির তলায় শিকড় পাঠিয়ে কঠিন মাটীর বুক থেকে রস সংগ্রহ করে সারা গাছে তা সঞ্চারিত করে থাকে, এই শিকড়ের দিক হল গাছের সীমার দিক। আবার মাটীর উপরে সেই বনস্পতি দিকে দিকে শাখা প্রসারিত করে সূর্যকে যেন তপস্যারত গৌরীর মত বন্দনা জানায়—সেখানেই তার অসীমতা, তেমনি স্রষ্টা সাহিত্যসৃষ্টির জন্য দেশীয় ও জাতীয় প্রভৃতি খণ্ড সম্পদকে স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসা ও মানবতার রসে জরিয়ে তাকে বিশ্ব-উপযোগী এক নূতন উপাদানের সৃষ্টি করে থাকেন। যাঁর সৃজন ক্ষমতা আছে, যাঁর রসবোধ আছে তিনিই তো সামান্য উপাদান সূতো আর ফুল দিয়ে সুন্দর মালা গাঁথতে পারেন, কিন্তু যে ব্যক্তির রসবোধ নেই তিনি কি করে তত্ত্ব ও রসের হর-গৌরীর মিলনের কথা চিত্তপটে আঁকবেন? তাই সার্থক সৃষ্টির মধ্যে সীমিত উপাদানের অনুসন্ধান অনেকাংশে বিশ্লেষণের কাজ হলেও এবং তাতে রসহানির সম্ভাবনা থাকলেও সমালোচনার জন্য তার যে কোন প্রয়োজন নেই একথা অশ্রদ্ধেয়। বিশেষ করে সার্থক সমালোচক তো ভক্ত পূজারীর মত স্রষ্টার মূলভাবের অনুসন্ধান করেই তা পাঠক-হৃদয়ে সঞ্চারিত করে থাকেন।

বঙ্কিম ও শরৎচন্দ্রের কথা-সাহিত্যে বাংলা সমাজচিত্রের রস-সন্ধান করলে তাঁদের সৃষ্টির প্রতি অবিচার তো করা হবেই না, বরং এই সামান্য বিষয়কে তাঁরা কি ভাবে অসামান্য রসরূপ দিয়েছেন তার একটা পরিচয় পাওয়া যাবে, উপরন্তু তাঁদের আন্তর সত্যের গভীরতাও উপলব্ধি করা যাবে বলে আশা করা যায়।

এর পরে স্বভাবতই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে বাঙ্গালীত্ব কি? বাঙালীর জাতীয় জীবনে কোন্ উপাদান অন্য প্রদেশ ও দেশবাসীর জীবন থেকে পার্থক্য ঘটিয়েছে? অনাদি অতীত থেকে, চলমান বর্তমান ও অনাগত ভবিষ্যতে কোন বিশিষ্ট বাঙালীর পরিচয় বহন করে যাবে এবং সে বৈশিষ্ট্যের সার্থক প্রতিফলন কতখানি বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের কথা-সাহিত্যে ঘটেছে।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক—এর জলে স্থলে, বাতাসে একটা কোমলতা ও পেলবতার ভাব বর্তমান। এহেন পল্লবিত দেশে ও সরস পরিবেশের মধ্যে যে জাতির বসবাস, তার স্বভাব যে অলস ও কর্মকুণ্ঠ হবে তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে? "এ জাতি চরিত্রে যেমন দুর্বল, ভাবুকতায় ও মেধায় তেমনি শক্তিমান; যেমন কর্মকুণ্ঠ তেমনি কল্পনাকুশল, ইহার ফলে সে যেমন স্বপ্নসুখবিলাসী, তেমনি আত্ম-পরায়ণ Egoist. বাস্তবের আরাধনায় সে যেমন ক্ষুদ্রচেতা, অবাস্তবের সাধনায় সে তেমনি ভাবের আবেগে আত্মহারা। এই দুই বিপরীত প্রবৃত্তি তাহার স্বভাবে প্রবল হইয়া আছে; ইহার কারণ সেই মজ্জাগত আলস্য।"

[মোহিত লাল]

সেকালের বিদ্যাপতি থেকে আরম্ভ করে মহাপ্রভু, রামপ্রসাদ রামকৃষ্ণ—এমন কি একালের রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিভিন্ন সাধক ও কবি রসের পথেই সিদ্ধি লাভ করেছেন। ভারতবাসীর কাছে যে রামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গের দেবতা, বাঙালীর কাছে তাঁরা ঘরের ঠাকুর। কালীকে ভারতের অন্য প্রদেশের অধিবাসী যেখানে ভয়মিশ্রিত ভক্তি জানিয়েছে, বাঙালী সেখানে আবেগমিশ্রিত সন্তানের আকুতি জানায়; এবং এই আবেগমিশ্রিত মাতৃত্বভাবেই বাঙালী নারীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য, তাই বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের প্রেম উপজীব্য বিষয় হইলেও, তাঁদের সৃষ্ট বিভিন্ন বিভিন্ন নারী চরিত্রে সেবাপরায়ণতা, দাস্যভাব ও বাৎসল্য-ভাবের বিকাশ যেন অনিবার্য কারণেই ঘটেছে। সেক্সপীয়ার বা পৃথিবীর অন্য সাহিত্যিকদের সঙ্গে বাঙলার বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের প্রেম-বোধের এইখানেই পার্থক্য।

বঙ্কিম-সাহিত্যে নারীর মাতৃত্বের ভাবটা সমুজ্জ্বল চিত্রে স্ফুটতর হয়ে উঠেনি সত্য, কিন্তু তারা পুরুষের প্রিয়া হলেও তাদের প্রেম উদগ্র কামনায় কলুষিত নয়, শ্রী, রমা, নন্দা, কল্যাণী, শান্তি, ললিতলবঙ্গলতা, সূর্যমুখী, ইন্দিরা প্রভৃতি নারীচরিত্র ত্যাগপূর্ণ, সেবাপূর্ণ প্রেমের মহিমায় গৌরবান্বিত।

শ্রীর বিয়ের পরই তাকে স্বামী ত্যাগ করে, কিন্তু সন্ন্যাসিনী জয়ন্তীর প্রশ্নের সে যে উত্তর দেয় তা বিশেষ লক্ষণীয়...

জয়ন্তী—এত ভালবাসিলে কিসে?

শ্রী—যেদিন হইতে বালিকা বয়সে তিনি আমাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন সেইদিন হইতে আজিও তাহাকে রাত্রিদিন ভাবিয়াছিলাম।...চন্দন ঘষিয়া, দেওয়ালে লেপন করিয়া মনে করিয়াছি, তাহার অঙ্গে মাখাইলাম...। ঠাকুর প্রণাম করিতে গিয়া কখনও ভাবি নাই যে ঠাকুর প্রণাম করিতেছি, মাথার কাছে তাঁরই পাদপদ্ম দেখিয়াছি...

শ্রীর এই একনিষ্ঠ স্বামীপ্রেম কি আমাদের একান্ত অপরিচিত। শ্রীকে তো আমাদের বাঙালীর ঘরের মেয়ে বলেই মনে হয়।

শ্রীর সপত্নী সীতারামের অন্য স্ত্রী নন্দাও বাঙালী ঘরের গৃহিণী। "নন্দা বিবেচনা করিত—ভালমন্দের বিচারক আমার স্বামী, তিনি যদি ভাল বুঝেন সে ভাবনায় আমার কাজ কি? তাই নন্দা প্রাণপাত করিয়া পতি সেবায় নিযুক্তা, মাতার মত স্নেহ, দাসীর মত সেবা, সীতারাম সবই নন্দার কাছ হইতে পাইয়াছিল"

বিষবৃক্ষের সূর্যমুখী স্বামীর সুখের জন্য, সমস্ত সম্পদ, দত্তবাড়ীর লোভনীয় গৃহিণীপদ ত্যাগ করে বিধবা ও রূপসী কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে স্বামী নগেন্দ্রনাথের বিয়ে দিয়েছে। ননদ কমলমণি তাকে জিজ্ঞাসা করে —"তুমি কি সুখী হইয়াছ?"

সূর্যমুখী—আবার আমার কথা কেন জিজ্ঞাসা কর। আমি কে? যদি কখনও স্বামীর পায়ে কাঁকর ফুটিয়াছে দেখিয়াছি, তখনই মনে হইয়াছে যে, আমি ঐখানে বুক পাতিয়া দিই নাই কেন? স্বামী আমার বুকের উপর দিয়া পা রাখিয়া যাইতেন?"

স্বামী-পরিত্যক্তা ভ্রমর ও কুন্দনন্দিনীর জীবন স্বামী গোবিন্দলাল ও নগেন্দ্রনাথের অবহেলায় বিষময় হয়ে উঠে। কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রী এই দুই নারীর স্বামী দর্শনের ব্যাকুলতা আমাদের বিশেষ ব্যথিত করে তোলে।

সাত বছর পর গোবিন্দলাল "ভ্রমরের বিছানায় বসিল। তখন ভ্রমর আপনার করতলের নিকট স্বামীর চরণ পাইয়া, সেই চরণযুগল স্পর্শ করিয়া পদরেণু মাথায় লইয়া দিল; বলিল—আজ আমার সকল অপরাধ মার্জনা করিও; জন্মান্তরে যেন সুখী হই..."

নগেন্দ্রনাথের অবহেলায় পুঞ্জীভূত আত্ম অভিমান নিয়ে কুন্দ আত্ম-হত্যা করে। কিন্তু মৃত্যুর কিছু পূর্বে "নগেন্দ্র নিকটে দাঁড়াইলে কুন্দ ছিন্নবল্লীবৎ তাহার পদপ্রান্তে মাথা লুটাইয়া পড়িল—কহিতে লাগিল—আমি তোমায় দেবতা বলিয়া জানিতাম...। কুন্দ স্বামীর পদ-যুগলের মধ্যে মুখ লুকাইল...কুন্দ আর কথা কহিল না।"

শৈবলিনী, মতিবিবি ও জেবউন্নিসা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের আদর্শ গৃহিণী না হলেও তাদের প্রেম ও কামনার দোষে দুষ্ট নয়।

চন্দ্রশেখর উপন্যাসের শৈবলিনী প্রেমাস্পদ প্রতাপকে পাবার জন্যই ফষ্টারের সঙ্গে স্বামী চন্দ্রশেখরের গৃহত্যাগ করে; সে যোগবলে সেই উত্তর দেয়।

চন্দ্রশেখর—তুমি ফষ্টারের সঙ্গে গেলে কেন?

শৈবলিনী—প্রতাপের আশায়...যদি পুরন্দরপুর গেলে প্রতাপকে পাই এই আশায়...।

পরে প্রতাপের জিজ্ঞাসা—প্রতাপ কি তোমার জার?

শৈবলিনী—ছি! ছি!

চন্দ্রশেখর—তবে কি?

—একবোঁটায় আমরা দুটি ফুল—এক বনমধ্যে আমরা ফুটিয়াছিলাম, ছিঁড়িয়া পৃথক করিলে কেন?

আবার আগ্রার নৃত্যপটিয়সী, বিদুষী, ধনবতী মতিবিবি পঞ্চশরের বেদনায় ব্যাকুল হয়ে সম্রাজ্ঞীর লোভনীয় পদত্যাগ করে বাল্যের গণ্ডগ্রাম ও সপ্তগ্রামের নবকুমারের কাছে প্রণয় ভিক্ষা করেছে—"কেবল তোমার দাসী হইতে চাহি। তোমার যে পত্নী হইব, এ গৌরব চাহি না, কেবল দাসী..."

রাজসিংহ উপন্যাসের বাদশাহজাদী জেবউন্নিসা আচরণে ছিল স্বেচ্ছা-বিহারিণী, বিলাসিনী ও কামুকা। কিন্তু তারও অন্তরের অন্তঃস্থলে যে বাঙালী নারীর স্নেহের ফল্গুধারা সঞ্চারিত হয়, তা বোধ হয় সে নিজেই জানত না। তা যদি জানত সে কখনই প্রণয়াস্পদ মবারককে ভালবেসেও মবারক শাহাজাদা নয় এই অজুহাতে তার বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখান করত না। কিন্তু উদয়পুরে "শাহাজাদী ভস্ম হইল"।

মবারকের জিজ্ঞাসা—তুমি এখন এ গরীবকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত?

জেবউন্নিসা সজল নয়নে বলিল—এত ভাগ্য কি আমার হইবে?

এই ভাবে আলোচনা করলে দেখা যায় বঙ্কিম সাহিত্যের বিভিন্ন নারী দাস্যভাব থেকে মাধুর্যের জগতে উপনীত হতে চেয়েছে, বাঙলার বৈষ্ণব সাধকরা পরম পুরুষের রসঘন ও রহস্যঘন লীলা উপলব্ধি করতে দাস্যভাব থেকে মাধুর্যের জগতে উপনীত হবার নির্দেশ দিয়েছেন, আজকের দিনেও আমরা মেয়েদের আশীর্বাদ করতে বলে থাকি—"সীতা-সাবিত্রীর মত ত্যাগপরায়ণা ও পতিপরায়ণা স্ত্রী হও।" কই বলা হয় না তো—"ডেস্‌ডেমোনার মত আদর্শ স্ত্রী হও।"

আবার শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট বিভিন্ন নারীর কাজে এই সেবা ও ত্যাগের পরাকাষ্ঠা যে ঘটেছে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবসর নেই বোধহয়। তিনি রাজলক্ষ্মী, অন্নদাদিদি ও অভয়া প্রভৃতি সমাজ-চিহ্নিত তথাকথিত পতিতাদের চরিত্র-চিত্রণ করেছেন কিন্তু তারা কেউ সমাজ-পরিত্যক্তদের মত দেহের ব্যবসা করেনি,—তাদের অন্তরের সংস্কার ও সংযম তাদের চরিত্রকে মহৎ করে তুলেছে এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার মূলে ত্যাগ ও সেবার চির-উজ্জ্বল মহত্ত্বের ভাবটাই অধিকতর ব্যক্ত হয়েছে।

উত্তর জীবনে রাজলক্ষ্মীর পিয়ারী বাইজীরূপে রূপান্তর ঘটে সত্য, কিন্তু তার অন্তরের সেই কিশোরী রাজলক্ষ্মীর অপমৃত্যু ঘটেনি। শৈশবে এক-দিন বঁইচির মালা দিয়ে শ্রীকান্তকে সে বরণ করেছিল—ধনশালিনী বাইজী সেই কথা কমলমণিকে বলেছে—"আজও চোখ বুঁজলে ওর সেই কিশোর গলায় মালা দুলছে দেখতে পাই"

কি ভাবে সে সুখী হতে পারে, রাজলক্ষ্মী আবার শ্রীকান্তের এই প্রশ্নের উত্তর দেয় "আমার সমস্ত টাকা কড়ি যদি কোনরকমে চলে যায় তাহলেই।"

মুরারীপুর আখড়ায় শ্রীকান্তর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উক্তি—"আপনার দেখি মস্ত ফাঁড়া—

শ্রীকান্ত—ফাঁড়া? কবে?

—খুব শীঘ্র! মরণ বাঁচনের কথা।

"চাহিয়া দেখিলাম রাজলক্ষ্মীর মুখে আর রক্ত নাই, ভয়ে শাদা হইয়া গিয়াছে।"

ভালবাসার পাত্রের জন্য রাজলক্ষ্মীর এই উৎকণ্ঠা কি বাঙালী নারীর কোন পরিচয়ই বহন করে না?

ইন্দ্রনাথের একান্ত ভক্তির পাত্রী অন্নদাদিদি সত্যই "ভস্মাচ্ছাদিত

বঙ্কি," সমাজের দৃষ্টিতে সে কুলত্যাগিনী, কিন্তু স্বামীর ধর্মকে সে আপন ধর্ম ভেবেই স্বামীর মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছে, স্বামীর জন্যই সে নিজে ধনীর কন্যা হওয়া সত্ত্বেও কঠোর দারিদ্র্য বহন করেছে। তার সতীত্বের আগুন সমাজের দেওয়া কালিমারূপ ভস্মও চাপা দিয়ে রাখতে পারে নি।

চরিত্রহীনের সাবিত্রীর কোন সামাজিক মর্যাদা ছিল না। সে প্রেমাস্পদ সতীশের সম্ভ্রমের কথা স্মরণ করে "ধরিত্রীর বুকে বুক দিয়া বার বার বলিয়াছে, কেন তুমি আমায় ঘৃণা কর না, আমি তোমার ঘৃণা পেতে পারি না।" কিন্তু সতীশের বিপদের দিনে সে তার সমস্ত ভাল মন্দ উপেক্ষা করে সতীশের পাশে গেছে।

শরৎ-সাহিত্যে সমাজ উপেক্ষিত নারী ছাড়া, বিজয়া, রমা, বিন্দুবাসিনী, নারায়ণী, বড়দিদি ও জ্যাঠাইমা প্রভৃতি সতী ও সামাজিক নারীও মাতৃত্বের মহিমায়, ত্যাগের গৌরবে সাহিত্যে অমর হয়ে আছে। নারায়ণীর দেবর রামকে সন্তানরূপে পালন, মেজদিদির কেষ্টর প্রতি অকারণে অকৃপণ স্নেহ-বর্ষণ, বিন্দুবাসিনীর অমূল্যর প্রতি উৎকট পুত্র-স্নেহ, জ্যাঠাইমার গান্ধারীর মত অপক্ষপাত সূক্ষ্ম বিচার—এ সকলই বাংলা দেশ ছাড়া অন্য কোথাও দেখা যাবে বলে মনে হয় না। এ ছাড়া বিজয়া ও রমার প্রেমাস্পদ নরেন্দ্র ও রমেশের প্রতি প্রেমও সেবা এবং অন্ন পরিবেশনকে কেন্দ্র করে ঘনীভূত হয়েছে। রমেশ তারকেশ্বরে রমার খাওয়ানয় বিশেষ তৃপ্ত হয় এবং তারপর থেকেই তার শূন্য অন্তরাত্মা রমার সেবা পাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছে।

সহরবাসিনী শিক্ষিতা ব্রাহ্মকন্যা বিজয়ার যে অভাবিতপূর্ব মানস পরিবর্তন ঘটেছিল, তাও দেখি আত্মীয়-পরিচয় বিহীন নরেন্দ্রকে বার বার পাওয়ানয়। তাই বলা যেতে পারে যে শরৎ-সাহিত্যের বিভিন্ন নারী বাঙালীর বৈশিষ্ট্যবর্জিত নয়।

চরিত্র-চিত্রণ ছাড়াও এই কথা শিল্পীর আবির্ভাবকালে দেশের রাষ্ট্রিক যে পরিবর্তন ঘটেছে তারও আভাস কথা-সাহিত্যে পাওয়া যায়।

উনবিংশ শতাব্দী বাংলা তথা ভারতের পক্ষে যুগ-সন্ধিক্ষণ, এই সময়েই বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব। পাশ্চাত্য ভাবের প্রবল বন্যা এদেশের শিক্ষা-দীক্ষায় আমূল পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছিল, কিন্তু কয়েকজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকই এ শিক্ষায় দীক্ষা নেয়,—এর ফলে সে যুগে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়, আবার দেশের জনসাধারণের কুসংস্কার প্রভৃতি কারণে এই সব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষদের জীবন হয়েছে ট্র্যাজিক। রামমোহন, মাইকেল, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি সকলেই এ যুগের মানুষ, তাঁদের চরিত্র বলিষ্ঠ, কিন্তু সাধনার ক্ষেত্রে তাঁরা একক এবং এঁদের সকলকেই দেশের জন্যই হয় সমাজ ত্যাগ করতে হয়েছে, না হয় কেউ ধর্ম ত্যাগ করেছেন।

গভীর ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রীতি; তাই তিনি ব্যাকুল হয়ে বলেছেন "বাঙ্গলার ইতিহাস চাই। নইলে বাঙ্গালী মানুষ হইবে না।" কিন্তু তাঁর সমাজচেতনা ছিল প্রাণবন্ত—তাই আদর্শ যুগনায়ক ও দেশনায়ক গড়তে নগেন্দ্রনাথ, প্রতাপ, গোবিন্দলাল ও সীতারামের মত বলিষ্ঠ দেশ-প্রেমিকের চরিত্রসৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তাঁরা সকলেই সাধনার ক্ষেত্রে জীবনে একক এবং তাদের জীবন ট্র্যাজিক।

আবার বাঙ্গালীর মজ্জাগত সংস্কার ও আলস্যের জন্য সে আনন্দমঠের মত বৃহৎ আয়তন মঠ গড়তে পারে না, তাই বোধ হয় আনন্দমঠের সন্তান-দের জয়লাভের শেষ মুহূর্তে পরাজয় ঘটল, এবং সত্যানন্দ, ভবানন্দ ও জীবনান্দর জীবনও মহাভারতের যুধিষ্ঠিরের মত ট্র্যাজিক হয়ে উঠেছে।

অপর পক্ষে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে, শরৎচন্দ্রের সময়ে, দেশের সকলই অর্থকরী ইংরাজী বিদ্যা শিখে চাকরী পাবার জন্য ব্যগ্র হয়েছে, পল্লীপ্রাণ বাংলার দেশবাসী গ্রাম ছেড়ে নগরের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এর ফলে দেশের সকলই এক বিশেষ ধরণের শিক্ষা পাওয়ায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ক্রমেই দেশ থেকে লোপ পেল; প্রয়োজনাতিরিক্ত শিক্ষিত ব্যক্তির আবির্ভাবে সহরে বেকার-সমস্যা উৎকট রূপ নেয়, আবার অব-হেলিত বাংলার পল্লীতে বেণী ঘোষাল প্রমুখ অশিক্ষিত ও ক্ষমতা-লোলুপ নিষ্কর্মা ব্যক্তিদের প্রতাপ বৃদ্ধি পেল, একাধারে দেখি বিংশ শতাব্দীর জাতির মেরুদণ্ডের প্রতীক মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ব্যক্তি শ্রীকান্ত প্রাণ ধারণের জন্যই বাংলাদেশ ত্যাগ করে বর্মা যাচ্ছে; অপর ধারে গফুরের মত দরিদ্র কৃষককে জমিদার শিবনাথের অত্যাচারে চাষ ছেড়ে চাকরীর জন্য সহরের চটকলে যেতে হচ্ছে; রূপহীনা বালিকা জ্ঞানদা রক্ষণশীল বাংলা পল্লীসমাজের কর্তাদের চক্রান্তে অরক্ষণীয়া থাকে।

বাঙালী পল্লীবাসীর এই আত্মপরায়ণ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভাবটা, যার চিত্র শরৎচন্দ্রের রচনায় সুপ্রচুর পাওয়া যায়, তা বর্তমান শতকের একান্ত বাস্তবযুগচিত্র, ইংরাজ শাসন ও শোষণের ফলে দেশের যে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক পতন ঘটেছিল তার কুফলে আজও বাংলার গণ্ডগ্রামে হেমাঙ্গিনী অপেক্ষা কাদম্বিনীর মত পরচর্চালোলুপ, স্বার্থপর নারীর সংখ্যা বেশী বলেই মনে হয়।

যুগের চরিত্র-চিত্রণে বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে নানাকারণে পার্থক্য যে ঘটেছে তা একান্ত স্বাভাবিক, কিন্তু সাদৃশ্য যে তাঁদের চিত্রে নেই তা নয়। উভয় শিল্পীই আমাদের বাঙালীর একান্নবর্তী পরিবারের সুমধুর চিত্র অংকিত করেছেন। বিষবৃক্ষের দত্ত পরিবার, সীতারাম ও গোবিন্দ লালের জমিদার বংশ শুধু পরিবারের আত্মীয় স্বজন ও দাস-দাসী লালন করেছে তা নয়, সমস্ত গ্রামের উত্থান-পতনও যেন ঐ সব পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত।

শরৎচন্দ্রের বড়দিদি, নিষ্কৃতি, বিন্দুর ছেলে প্রভৃতি কথা-সাহিত্যে গ্রাম-বাসী পালনের কথা বলা হলেও দূরসম্পর্কীয়দের মধ্যে যে একটা প্রীতিমূলক সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে তা বাঙালীর একান্নবর্তী পরিবারের পরিচয় বহন করে।

তবে বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে পার্থক্য এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্রের মত মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের চিত্র অঙ্কন করেন নি। তাঁর সৃষ্ট সমস্ত চরিত্রই প্রায় অভিজাত ও ধনী, কিংবা প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চরিত্র কিন্তু তারাও বাঙালী। এইখানেই উভয় শিল্পীর সার্থকতা; তাঁদের সৃষ্টি যে বাঙালীর সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সাক্ষ্য দিয়ে থাকে, তাই অনাগত কালে বাঙালীর আশা ও আনন্দের কারণ হবে এবং তাঁরা কথা-সাহিত্য জগতে অমর হয়ে থাকবেন। অবশ্য বাঙলা সমাজের আরো নিদর্শন যে উভয় কথা-শিল্পীর রচনায় পাওয়া যায় না তা নয়, তথ্যান্বেষী আগ্রহশীল সমালোচক তাদের সন্ধান করবেন আশা রইল।

শালিভদ্র

শ্রীপূরণচাঁদ শ্যামসুখা

[শালিভদ্র-কথা পুরাতন জৈন সাহিত্যের একটী অতি বিখ্যাত কথা। কিন্তু একাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত জিনেশ্বর সূরি এই কথাটী এক বিশেষ ভঙ্গীর সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনায় তৎকালের বণিক্‌গণের অতুল সম্পত্তির কথা এবং তাহাদের আবাসস্থানের ও আহারের বিবরণ বর্তমান কালের ইউরোপীয় ধনী অভিজাত সম্প্রদায়ের আবাস ও আহারের প্রথার সহিত সাদৃশ্য বিশেষ কৌতূহলের উদ্রেক করে। উক্ত বর্ণনা অবলম্বনে এই কথাটী রচিত।]

সেকালে, সেসময়ে রাজগৃহ নামক এক অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। ইহা মগধ সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল এবং সে সময়ে মহারাজ শ্রেণিক সেখানে রাজত্ব করিতেন। মহারাজ শ্রেণিকের সুশাসনে সমগ্র দেশে শান্তি বিরাজ করিত। বণিকগণ নির্ভয়ে দেশ-বিদেশে বাণিজ্য করিয়া প্রভুত অর্থ সঞ্চয় করিতেন।

একদা দূরদেশ হইতে রত্নকম্বল বিক্রেতা বণিকগণ রাজগৃহে আগমন করিয়া নগরের ধনশালী শ্রেষ্ঠিগণকে তাঁহাদের কম্বলগুলি দেখাইলেন এবং প্রত্যেকটীর মূল্য এক লক্ষ মুদ্রা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু অত্যন্ত মহার্ঘ বলিয়া কেহই তাহা ক্রয় করিতে সম্মত হইলেন না। তখন রত্নকম্বল-বিক্রেতা বণিকগণ মহারাজ শ্রেণিকের নিকট গমন করিয়া কম্বলগুলি দেখাইলেন। শ্রেণিক তাঁহার পট্টমহিষী চেল্লনাকে দেখাইলে তিনি খুবই পছন্দ করিলেন ও ক্রয় করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু মূল্যাধিক্য বলিয়া রাজা লইতে সম্মত হইলেন না।

বণিকগণ রাজবাটী হইতে নির্গত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে শালিভদ্র শ্রেষ্ঠীর গৃহে গমন করিয়া শালিভদ্রের মাতা ভদ্রাকে কম্বলগুলি দেখাইলেন এবং রাজগৃহের ন্যায় বিখ্যাত নগরে কম্বলগুলি ক্রয় করিতে সমর্থ কোন ধনবান্ ব্যক্তি নাই—এমন কি এখানকার রাজারও সামর্থ্য নাই বলিয়া নিন্দাও করিতে লাগিলেন। ভদ্রা সমস্ত কম্বলগুলি ক্রয় করিয়া তাঁহাদের প্রার্থিত মূল্য প্রদান করিলেন।

রাজগৃহ নগরে গোভদ্র নামক এক প্রভুত ধন-সম্পত্তিশালী বণিক ছিলেন। গোভদ্র শ্রেষ্ঠী বহু বৃহৎ বৃহৎ পোতে পণ্যদ্রব্য পূর্ণ করিয়া দেশ দেশান্তরে বাণিজ্য করিবার জন্য সমুদ্রপথে গমন করেন। সমুদ্রে ভীষণ ঝড় উত্থিত হওয়ায় শ্রেষ্ঠীর সমস্ত পোত নিমজ্জিত হইল এবং শ্রেষ্ঠীও নিমগ্ন হইয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে শ্রেষ্ঠীর স্ত্রী ভদ্রা বাড়ীতে পুত্র-সন্তান প্রসব করিলেন। এই সন্তানের নাম শালিভদ্র রাখা হইল। ভদ্রা তাঁহার মৃত স্বামীর ব্যবসায় এরূপ দক্ষতার সহিত পরিচালিত করিতে লাগিলেন যে প্রভুত উপার্জন হইতে লাগিল এবং শীঘ্রই তিনি নগরের একজন প্রধান বণিকরূপে বিখ্যাত হইয়া পড়িলেন। শালিভদ্রকে শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য গৃহে কলাচার্যকে রাখিয়া তাঁহাকে সর্বপ্রকার বিদ্যায় পারদর্শী করা হইল এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার মাতা ধনাঢ্য বণিকগণের বত্রিশ জন সুন্দরী কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ প্রদান করিলেন। ভদ্রা শালিভদ্রের জন্য একটী অত্যন্ত মনোহর প্রাসাদ প্রস্তুত করাইলেন, তাহার সর্বোপরিস্থিত ষষ্ঠতলে শালিভদ্র স্ত্রীগণসহ ভোগ-বিলাসে মগ্ন থাকিতেন; সূর্য চন্দ্রের উদয়াস্ত কখন হয় তাহাও তিনি বুঝিতে পারিতেন না। ব্যবসায়ের সমস্ত কার্য তাঁহার মাতা ভদ্রা নির্বাহ করিতেন।

এদিকে রাজ্ঞী চেল্লনা রত্নকম্বল না পাওয়ায় মহারাজ শ্রেণিকের উপর রুষ্ট হইলেন। রাজা অগত্যা একটী কম্বল ক্রয় করিবার ইচ্ছায় বহিরাগত বণিকগণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বণিকগণ আসিয়া নিবেদন করিলেন যে সব কম্বলই গোভদ্র শ্রেষ্ঠীর স্ত্রী ভদ্রা ক্রয় করিয়াছেন। রাজা বিস্মিত হইলেন এবং একজন রাজপুরুষকে ভদ্রার নিকট হইতে একটী কম্বল মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া আনিতে পাঠাইলেন। ভদ্রা উত্তর করিলেন;—"দেবপাদের সহিত আমাদের ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবহার কেন? মূল্য না লইয়াই কম্বল দেবপাদকে ভেট প্রদান করা হইত, কিন্তু ষোলটী কম্বলকেই দ্বিখণ্ড করিয়া আমার ৩২জন পুত্রবধূর প্রত্যেকটী এক একটী টুকরা পর্যঙ্কের নিম্নে পাদ-প্রোঞ্ছনের জন্য দেওয়া হইয়াছে। কম্বলগুলি বহুদিনের প্রস্তুত বলিয়া স্থানে স্থানে কীটদষ্ট হইয়াছে ও তজ্জন্য বধূগণের পায়ে আঘাত লাগিতে পারে মনে করিয়া পাপোশরূপেও সেগুলি ব্যবহার করা হয় নাই। যদি ঐগুলির দ্বারা দেবপাদের কার্য সমাধা হইতে পারে তবে আজ্ঞা হইলে সমর্পণ করিব।" রাজপুরুষ প্রত্যাগমন করিয়া রাজার নিকট সমস্ত নিবেদন করিলে রাজা তাঁহার রাজ্য মধ্যে এতাদৃশ ধনশালী শ্রেষ্ঠী আছেন জানিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং শালিভদ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে রাজসভায় ডাকিবার জন্য রাজপুরুষকে পুনরায় প্রেরণ করিলেন। রাজপুরুষ ভদ্রার নিকট রাজাদেশ বলিলে ভদ্রা বলিয়া পাঠাইলেন যে:—"শালিভদ্রের কখনও চন্দ্র সূর্যের দর্শন হয় না, অতএব দেব এরূপ আদেশ করিবেন না। দেব স্বয়ং মহারাজ্ঞী ও পরিজনসহ আমাদের গৃহে আগমন করিয়া আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করুন।" ভদ্রার প্রস্তাবে. মহারাজ সম্মত হইলে ভদ্রা বলিয়া পাঠাইলেন যে তিনি সংবাদ দিলে যেন দেব আগমন করেন।

এবার ভদ্রা মহারাজকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিনি রাজবাটীর সিংহদ্বার হইতে নিজ গৃহদ্বার পর্যন্ত রাজমার্গ সজ্জিত করিলেন। রাজমার্গের উভয় পার্শ্বে বংশদণ্ডের উপর শনবর্তিকার (দড়ি) দ্বারা আবদ্ধ করিয়া উর্ধ্বমুখী দীর্ঘ দীর্ঘ বল্লরীসমূহ স্থাপন করা হইল, তাহার উপরে খসখসের টাটি দিয়া আচ্ছাদিত করা হইল। দ্রবিড়াদি দেশে প্রস্তুত উত্তম বস্ত্রের চন্দ্রাতপ বিস্তীর্ণ করা হইল। স্থানে স্থানে বৈদূর্যমণি ও স্বর্ণ নির্মিত ঝুমকা প্রলম্বিত করা হইল, পঞ্চবর্ণের

নানাপ্রকার পুষ্প দ্বারা পুষ্পগৃহ ও মধ্যে মধ্যে তোরণ প্রস্তুত করা হইল। সুগন্ধ জলের দ্বারা রাজমার্গ সিক্ত করা হইল, স্থানে স্থানে অগুরু প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্য পোড়াইয়া চতুর্দিক সুগন্ধিত করা হইল। স্থানে স্থানে শস্ত্রধারী প্রহরী সমূহকে নিযুক্ত করা হইল, বিলাসিনী স্ত্রীগণের দ্বারা মঙ্গলোপচারের জন্য স্থানে স্থানে গীতবাদ্যের সহিত নৃত্যের ব্যবস্থা করা হইল। এইরূপে সমস্ত সজ্জা সম্পন্ন করিয়া ভদ্রা মহারাজকে মহারাণী ও পরিজনগণসহ আগমন করিতে প্রধান পুরুষের দ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন।

মহারাজ শ্রেণিক মহারাজ্ঞী চেল্লনা সহ শিবিকায় আরোহণ করিয়া শালিভদ্রের গৃহে যাইবার জন্য নির্গত হইলেন। পথ মধ্যে দেবলোকের ন্যায় নয়ন-মন-সুখকর সুসজ্জিত ও সুগন্ধ পরিপূরিত রাজমার্গ স্বয়ং দেখিতে দেখিতে ও রাজ্ঞীকে দেখাইতে দেখাইতে ক্রমে তিনি ভদ্রার গৃহ-দ্বারে সমাগত হইলেন। সেখানে তাঁহাকে মঙ্গলোপচারের দ্বারা স্বাগত করা হইল।

এইবার রাজদম্পতি শ্রেষ্ঠীর গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রথমে দুই পার্শ্বে নির্মিত অশ্বশালা ও হস্তিশালা ও তাহাতে নানাস্থানের শঙ্খ-চামর শোভিত সুন্দর সুন্দর অশ্ব ও হস্তী দেখিতে পাইলেন। তৎপরে গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রথম তলে নানাপ্রকারের দ্রব্য সমূহের ভাণ্ডাগার দেখিতে পাইলেন, দ্বিতীয় তলে দাস দাসীগণের বাস ও আহার করিবার ব্যবস্থা. তৃতীয় তলে এক পার্শ্বে পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিহিত সূপকারগণকে রন্ধন করিতে ও অন্য পার্শ্বে তাম্বুল প্রস্তুতকারীগণকে সুপারী কর্তন ও কুঙ্কুম, ঘনসার ও কস্তুরীর দ্বারা সুবাসিত করিয়া তাম্বুল প্রস্তুত করিতে দেখিতে পাইলেন। চতুর্থ তলে শয়ন করিবার (Bed room), উপবেশন করিবার (Drawing room) ও ভোজন করিবার (Dining room) পৃথক্ পৃথক্ গৃহগুলি এবং মূল্যবান দ্রব্যের ভাণ্ডাগার সমূহ দৃষ্ট হইল। এই তলে রাজা ও রাজ্ঞীর জন্য সুখাসন বিস্তৃত করা ছিল তাহাতে তাঁহাদের উপবেশন করান হইল। রাজা শালিভদ্র কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে ভদ্রা উত্তর করিলেন যে মহারাজের স্নানাহার সম্পন্ন হইলেই শালিভদ্র আসিবে। আপনারা কৃপা করিয়া স্নানাহার সম্পন্ন করুন।

এই প্রস্তাবে মহারাজ সম্মত হইলে রাজা ও রাজ্ঞীকে পৃথক্ পৃথক্ চিত্র বিচিত্র মণ্ডপে উপবেশন করাইয়া সুগন্ধিত অভ্যঙ্গ ও উদ্বর্তনের দ্বারা তাঁহাদের শরীর মর্দন করা হইল। তৎপরে তাঁহারা পঞ্চম তলে গমন করিলেন। সেখানে সর্বঋতুতে উৎপন্ন হয় এরূপ পুষ্প ও ফলের দ্বারা পরিপূর্ণ, পুন্নাগ নাগ চম্পকাদি নানাপ্রকারের পুষ্পবৃক্ষ ও লতাসমূহের দ্বারা সুশোভিত, নন্দনবনের ন্যায় সুন্দর ও মনোহর উদ্যান দেখিতে পাইলেন। উদ্যানের উপরিভাগ আচ্ছাদিত থাকায় ইহাতে চন্দ্র সূর্যের কিরণ প্রবেশ করিতে পারিত না কিন্তু ইহার মধ্যস্থিত স্তম্ভ ও অলিন্দগুলিতে পঞ্চবর্ণের রত্নসমূহ জড়িত থাকায় তাহার প্রভার দ্বারা অন্ধকার বিদূরিত হইয়া স্নিগ্ধ আলোকে সমস্ত উদ্যানটী উদ্ভাসিত হইয়া থাকিত। এই উদ্যানের মধ্যভাগে একটী ক্রীড়া পুষ্করিণী (Swimming Pool) ছিল। ইহার চতুর্দিকে স্থিত উপবেশন করিবার বেদীসমূহ চন্দ্রমণির দ্বারা নির্মিত। পুষ্করিণীর জল নিষ্কাশন ও পূরণ করিবার জন্য কীলকের ব্যবস্থা ছিল। ইহার চতুর্দিকে সুসজ্জিত তোরণ ছিল। সংক্ষেপে বলিলে পুষ্করিণীটির অসাধারণ সৌন্দর্য দেবতাগণেরও মনোহরণ করিত।

এই পুষ্করিণীতে মহারাজ শ্রেণিক ও রাজ্ঞী চেল্লনা জলক্রীড়া ও স্নান করিবার জন্য অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। কখনও রাজার প্রেরিত জল তরঙ্গের হিল্লোলে রাণী আকৃষ্ট হইয়া রাজার নিকট আসিতে লাগিলেন, কখনও বা রাণীর প্রেরিত তরঙ্গ হিল্লোলে রাজা আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। এইরূপে নানাপ্রকার জলক্রীড়া ও স্নান করিয়া তাঁহারা পুষ্করিণী হইতে উত্থিত হইতে যাইতেছিলেন ইতিমধ্যে রাজার অঙ্গুলি হইতে একটী বহুমূল্য অঙ্গুরীয় জলাশয়ে পড়িয়া গেল। রাজা ইতস্ততঃ দেখিতে লাগিলেন কিন্তু কোথাও দেখিতে না পাইয়া কিরূপে পাওয়া যাইতে পারে ভদ্রাকে জিজ্ঞাসা করিলে ভদ্রা পুষ্করিণীর জল নিষ্কাশন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। জল নিষ্কাশিত হইলে দেখা গেল যে এক কোণে অঙ্গুরীয়টী মলাবৃত হইয়া পড়িয়া আছে। রাজা তাহা উঠাইতে উদ্যত হইলে ভদ্রা তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন যে তাঁহার পুত্রবধূগণের গাত্রমলের দ্বারা উহা আচ্ছাদিত হইয়া আছে দেব, স্পর্শ করিবেন না। ভদ্রা দাসীর দ্বারা অঙ্গুরীয়টী আনাইয়া পরিষ্কার করাইয়া রাজাকে সমর্পণ করিলেন। তৎপরে রাজ-দম্পতির শরীরে বিলেপণ করিবার জন্য গোশীর্ষ চন্দনাদি সুগন্ধ দ্রব্য এবং পরিধান করিবার জন্য বহুমূল্য বস্ত্র আনীত হইল।

স্নানান্তে রাজ-দম্পতি পুনরায় চতুর্থ তলে অবতরণ করিলে চৈত্যভবন উদ্‌ঘাটিত করা হইল। সেখানে মণি, রত্ন ও সুবর্ণাদি নির্মিত জিন প্রতিমার দর্শন ও নানা উপকরণের দ্বারা পূজা করিয়া তাঁহারা আনন্দিত হইলেন। তাঁহারা চৈত্যভবনের অপূর্ব শোভা দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন।

এইবার মহারাজকে ভোজন গৃহে লইয়া যাওয়া হইল। প্রথমে দাড়িম্ব, দ্রাক্ষা, কুল প্রভৃতি চর্বনীয় পদার্থ পরিবেশন করা হইল। রাজা যথাযোগ্য গ্রহণ করিলে ইক্ষু, খর্জুর, আম্রাদি চুষ্য দ্রব্য আনীত হইল, তৎপরে নানাপ্রকারের অবলেহাদি (চাটনি) লেহ্য পদার্থ এবং তাহার পরে অশোক, মোদক, ফেণী, ঘেবর, ঘৃতপূর্ণাদি ভোজ্য-পদার্থ (মিষ্টান্ন) পরিবেশিত হইল। তৎপরে সুগন্ধযুক্ত নানাপ্রকারের চাউল (ভাত) ও অনেক দ্রব্যের সংযোগে প্রস্তুত কড়ি আনা হইল। এই সমস্ত দ্রব্য ভক্ষিত হইলে ভোজন পাত্র সমূহ উঠাইয়া লইয়া রাজার হস্ত ধৌত করান হইল। তৎপরে নানাপ্রকারের দধি নির্মিত খাদ্য দ্রব্য উপস্থাপিত করা হইল ও তাহা ভুক্ত হইলে পাত্র উঠাইয়া লইয়া আবার হস্ত ধৌত করান হইল। তৎপরে শর্করা, মধু, কঙ্কুমাদি মিশ্রিত ঘন দুগ্ধ প্রদত্ত হইল। আহার সমাপনান্তে মহারাজকে আচমন করান হইল, দন্ত পরিষ্কার করিবার দন্তশলাকা ও হস্তপ্রক্ষালন করিবার জন্য সুগন্ধিত উদ্বর্তন ও ঈষদুষ্ণ জল প্রদত্ত হইল যাহাতে অন্নের গন্ধ চলিয়া যায়।

রাজা হস্তপ্রক্ষালন করিয়া উঠিলে তাঁহাকে অন্য গৃহে উপবেশন করাইয়া বিলেপন, পুষ্প, গন্ধ, মাল্য, তাম্বুলাদি প্রদান করা হইল।

তাঁহার মনোরঞ্জনার্থে কুশল শিল্পীর দ্বারা গীত বাদ্যাদি আরম্ভ করান হইল। রাজা শালিভদ্রকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ভদ্রা তাহাকে আনিবার জন্য ষষ্ঠতলে গমন করিয়া শালিভদ্রকে চতুর্থতলে নামিয়া আসিতে আসিতে বলিলেন যে—"শ্রেণিককে দেখিবে, চল।" শালিভদ্র কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন যে—"মা ইহা মহার্ঘ কি সুলভ তাহা তুমিই জান, যাহা ভাল হয় কর।" ভদ্রা তখন তাহাকে বলিলেন—"বৎস, শ্রেণিক কোন পণ্যদ্রব্য নহেন, তিনি আমাদের দেশের রাজা, আমাদের স্বামী, আমাদের প্রভু। তিনি তোমাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া আমাদের গৃহে আসিয়াছেন, চল, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কর"। শালিভদ্র বিস্মিত হইয়া বলিল—"আমারও কেহ স্বামী, প্রভু আছে? আমি এরূপ কথা কখনও শ্রবণ করি নাই।" যাহা হউক মাতার আগ্রহে শালিভদ্র চতুর্থ তলে নামিয়া আসিলেন। রাজা তাঁহার দেবকুমারের ন্যায় সুন্দর রূপ দেখিয়া তাহাকে সাগ্রহে ক্রোড়ে বসাইয়া আদর করিতে লাগিলেন। শালিভদ্র অস্বস্তি অনুভব করিতেছেন দেখিয়া অল্পক্ষণ পরেই তাহাকে যাইতে দিতে ভদ্রা অনুরোধ করিলেন। রাজা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে—শালিভদ্র মনুষ্যের গন্ধ, এমন কি এখানকার পুষ্প মাল্যাদির গন্ধও সহ্য করিতে পারে না। প্রতিদিন দেবতা ইহাকে দেবলোক সুলভ পুষ্প, গন্ধ, বিলোপনাদি প্রদান করেন। আহারের জন্য দিব্য ফলাদি, পানের জন্য দিব্য জল ও পরিধানের জন্য দিব্য বস্ত্রালঙ্কারও দেবতা প্রদান করেন। একবার ব্যবহৃত বস্ত্রাদি সে দ্বিতীয়বার ব্যবহার করে না। অতএব এখানে এ অস্বস্তি অনুভব করিতেছে, ইহাকে যাইবার অনুমতি প্রদান করুন। নৃপতি চেল্লনাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন যে—"তুমি বল যে বণিকের স্ত্রীগণ যাহা পাপোশ রূপে ব্যবহার করে রাজার অগ্রমহিষী তাহা গাত্রাবরণরূপে ব্যবহার করিতে লালায়িত হইয়াও পায় না। কিন্তু এখন দেখিলে এরূপ বৈভব কোনও রাজার নাই। সমস্তই পূর্বজন্ম কৃত পুণ্য কর্মের ফল।" রাজা শালিভদ্রকে গমন করিতে আদেশ দিলেন। শালিভদ্র গমন করিলে রাজাও প্রত্যাবর্তনের জন্য উত্থিত হইলেন ও শিবিকায় আরোহণ করিলেন। ভদ্রা উত্তম জাতির অশ্ব ও হস্তি-শাবক রাজাকে উপঢৌকন প্রদান করিলেন। রাজা উপঢৌকন গ্রহণে প্রথমে অস্বীকৃত হইলেন, কিন্তু ভদ্রার বিশেষ উপরোধে গ্রহণ করিয়া রাণী ও পরিজনগণ সহ প্রস্থান করিলেন।

এদিকে শালিভদ্রের মনে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন—আমারও স্বামী, প্রভু আছে। আমি স্বাধীন নই! আমার এই অতুল বৈভব, দেবলোকের ন্যায় প্রাসাদ, অনুপম সুখভোগ, সমস্তই বৃথা! বৃথা এ জীবন, ধিক্ এ সুখভোগ! তিনি তীব্র বৈরাগ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলেন। নরেন্দ্র, সুরেন্দ্র প্রভৃতি যাঁহার পাদবন্দনা করেন সেই সংসারত্যাগী সাধুই শ্রেষ্ঠ—এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি সংসার ত্যাগ পূর্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে স্থির সংকল্প করিলেন। ভদ্রার নিকট এই সংবাদ প্রদান করা হইল। একমাত্র পুত্রের বৈরাগ্যে তিনি মর্মাহত হইলেন। পুত্রকে নানাপ্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন কিন্তু শালিভদ্র নিজের সংকল্পে অবিচলিত থাকিয়া ভগবান মহাবীরের আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

শালিভদ্রের সুন্দরী নাম্নী জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। ধন্য নামক এক অতি সমৃদ্ধিশালী বণিকের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ভগবান্ মহাবীরের রাজগৃহে আগমন বার্তা শ্রবণ করিয়া ধন্য তাঁহাকে বন্দনা করিতে যাইবার অভিপ্রায়ে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। স্নান করিবার জন্য স্নানপীঠে তিনি উপবেশন করিলেন ও তাঁহার স্ত্রী সুন্দরী তাঁহার পায়ে অভ্যঙ্গ মর্দন করিতে লাগিলেন। হঠাৎ একটী অশ্রুবিন্দু ধন্যের পায়ে পতিত হইল। তিনি সুন্দরীকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সুন্দরী উত্তর করিলেন যে তাঁহার একমাত্র ভ্রাতা শালিভদ্র প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া তাহার ৩২ জন পত্নীর মধ্যে প্রতিদিন এক এক জনকে পরিত্যাগ করিতেছে। পূর্ণ-যৌবনে অতুলনীয় সম্পত্তি অসাধারণ সুন্দরী স্ত্রীগণকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে সংবাদ পাইয়া দুঃখে অশ্রুপাত হইতেছে।—সুন্দরীর কথা শ্রবণ করিয়া ধন্য বলিলেন—"সে কাপুরুষ, বৈরাগ্য হইলে সমস্ত একদিনেই পরিত্যাগ করিত।" সুন্দরী কিছু উত্তেজিত হইয়া উত্তর করিলেন—"ত্যাগ করা মুখে বলা সহজ কিন্তু কার্যে পরিণত করা অত্যন্ত কঠিন। মহাশয় উদাহরণ দেখান না।" ধন্য বলিয়া উঠিলেন—"স্নান করিয়াই ভগবান্ মহাবীরের নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করিতে যাইতেছি।" ধন্যের কথায় সুন্দরী অত্যন্ত ভীত ও বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং নানাপ্রকারে ক্ষমা প্রার্থনা ও অনুনয় করিতে লাগিলেন কিন্তু ধন্য দৃঢ়সংকল্প হইয়া স্নানের পরই মহাড়ম্বরের সহিত দীক্ষা গ্রহণ করিতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পথিমধ্যে শালিভদ্রের গৃহে আসিয়া শালিভদ্রকে সত্বর আসিতে বলিয়া পাঠাইলেন। শালিভদ্রও তৎক্ষণাৎ আগমন করিয়া মহাড়ম্বরের সহিত নির্গত হইয়া উভয়ে ভগবান্ মহাবীরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন ও নানা স্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন।



প্রতিভা-পরিচিতি

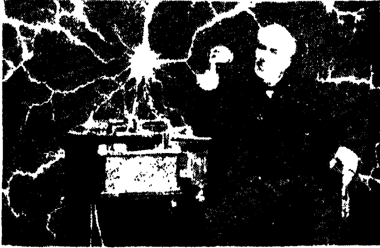
বিজ্ঞানী এডিসন

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

যাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে "The greatest inventor of all time" সেই বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞান-সাধক টমাস আলভা এডিসন বাল্যকালে তাঁর বাবা-মা-আত্মীয়-স্বজন এবং শিক্ষকদের কাছে আখ্যা পেয়েছিলেন—"নিরেট-বুদ্ধি গণ্ডমূর্খ কেব্‌লা-কেষ্ট।"

এই অদ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক ও আবিষ্কারকের বাল্যজীবনের যে ইতিবৃত্ত আমরা পড়েছি তার মধ্যে বহু কৌতুকাবহ চিত্র আছে। দু'একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

একদিন দুপুরবেলা। বালক এডিসন তার ছোট ভগ্নীকে নিয়ে বাড়ীর পিছন দিকে এক গোয়াল ঘরে গিয়ে আসনপিঁড়ি হয়ে বসেছেন। পায়ের তলায় একটি হাঁসের ডিম। বোন্ বললে—"কি করছ দাদা এমন ক'রে ব'সে?" গম্ভীর মুখে বালক বললে—"ডিমে তা দিচ্ছি। হাঁসেরা যদি



পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারকরূপে অভিনন্দিত টমাস আলভা এডিসন

এমনি ক'রে ব'সে ডিমে তা দিয়ে বাচ্ছা ফোটাতে পারে, তাহলে আমরাই বা পারবো না কেন?" সারা দুপুর গড়িয়ে গেল। বাচ্ছা ফুটলো না। বালক বললে—"একদিনে হবে না। দু' চারদিন লাগবে।"

এই সংবাদ যখন বাড়ীর মধ্যে রাষ্ট্র হল তখন মহা হাসির রোল উঠল। আত্মীয়-স্বজনরা বহু টিকাটিপ্পনী কাটলেন এবং ব্যঙ্গোক্তি করলেন। এমনি ধরণের ছোটোখাটো নানা ব্যাপারে বালকের "নির্বুদ্ধিতার" নিশ্চিত প্রমাণ পেয়ে তার পিতা এমনি নিরুৎসাহ হয়েছিলেন যে তিনি এডিসনের শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই করেন নি। এ-হেন "গবেট" ছেলের জন্যে শিক্ষক নিযুক্ত করা বা স্কুলের মাহিনা গোনা একেবারে বাজে খরচ ব'লে মনে করেছিলেন তিনি।

কাছাকাছি এক নীচু শ্রেণীর পাঠশালা ছিল। সেইখানে পাঠানো হল শিশু এডিসনকে। যাই হোক, অক্ষর পরিচয়টা তো হওয়া দরকার। মাস দুই বাদে একদিন কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলেন এডিসন। মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে বললেন—"আমি আর ও পাঠশালায় যাব না মা। মা প্রশ্ন করলেন—"কি হয়েছে বল্।" ছেলে জানালে যে পড়া বলতে পারেনি



নিজের বৃহৎ রসায়নাগারে পরীক্ষারত এডিসন

বলে গুরুমশায় তার মাথায় গাঁট্টা মেরেছে আর গাধা বোকা ক্যাবলা গবেট এই সব ব'লে গাল দিয়েছে।

ছেলের কথা শুনে মা একেবারে জ্বলন্ত চুল্লীর আকার ধারণ করলেন। তৎক্ষণাৎ পাঠশালায় গিয়ে হাজির হলেন। তাঁর সেই রণচণ্ডী মূর্তি দেখে গুরুমশায় আর অন্য শিক্ষকের দল ভয়ে একেবারে কেঁচো। যে-সব

কথা মা তাঁদের শোনালেন তা তাঁরা জীবনে কোনদিন শুনেছেন কি না সন্দেহ। পাঠশালা খুলে বসেছো ? কসাইএর দল কোথাকার ! পাঠশালা না ছাই। বেঞ্চিগুলো যেমন সরু, মাস্টারগুলো তেমনি গরু ! মনের ঝাল মিটিয়ে মা ফিরে এলেন বাড়ীতে। ঘোষণা করে দিলেন, তাঁর ছেলে আর পাঠশালায় যাবে না, ঘরে বসে তাঁর কাছে পড়বে। বাপ বললেন, "অক্ষর পরিচয়টাও তা হলে বোধ হয় আর হল না।" মা তাঁকে ধমক দিয়ে বললেন—"তুমি আর তোমার ভায়েরা আমার ছেলেকে যতখানি বোকা মূর্খ ভাবছ, দেখে নিও, সে তা হবে না। আমার ছেলে তোমাদের ছেঁদো বংশের গৌরব বাড়াবে। আমার ছেলে মানুষের মত মানুষ হবে।

মিথ্যা হয় নি মায়ের কথা। ধন্য মা পেয়েছিলেন এডিসন। পরম যত্নে আর স্নেহে ছেলেকে তিনি লেখাপড়া শেখাতে লাগলেন। বিবাহের

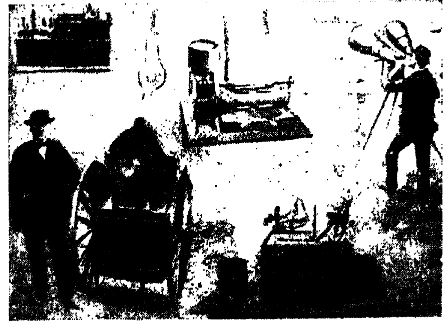


লোকাল ট্রেণের মালগাড়ীর মধ্যে যে ছাপাখানা ও রসায়নাগার স্থাপন করেছিলেন বালক এডিসন, ট্রেনের গার্ড তার জিনিষ-পত্রগুলি প্লাটফর্মে ফেলে দিচ্ছেন। এডিসন নিরাশা-কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন

আগে তিনি কানাডায় শিক্ষয়িত্রীর কাজ করেছিলেন। সুতরাং তাঁর হাতে ছেলে ভালমতই মানুষ হতে লাগল। বালক এডিসন কঠিন নির্ম্মম আর বিদ্রূপভরা পরিবেশ থেকে মুক্তি লাভ ক'রে নূতন চেতনা এবং প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হলেন। মায়ের বিশ্বাস আছে, তিনি বড় হবেন, নামজাদা লোক হবেন। মায়ের সেই বিশ্বাস আর স্নেহের মর্য্যাদা রাখতেই হবে তাকে। সমস্ত মন প্রাণ ঢেলে এডিসন লেখাপড়া শিখতে লাগলেন। বুদ্ধি আর মেধা ছিল অফুরন্ত। শক্ত শক্ত বিজ্ঞানের বই প'ড়ে রপ্ত করলেন। পড়লেন ইতিহাস আর ভূগোলের বহু মোটা মোটা গ্রন্থ। সেই সঙ্গে নানারকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ব্যাপৃত হলেন। এক নূতন জগতের প্রবেশপথ তাঁর সামনে উন্মুক্ত হ'ল।

* * *

এডিসনের প্রথম অর্থোপার্জ্জনের কাজ হল, লোকাল ট্রেনে খবরের কাগজ ফেরি করা। ট্রেনগুলির গার্ড থেকে আরম্ভ ক'রে সবাই তাঁকে চিনতো। বারো বছরের সেই সুকুমার কিশোরকে সবাই ভালবাসতো। উৎসাহ পেয়ে একটি ট্রেনের একটা বড় মাল-কামরায় এডিসন একটি ছোটখাটো রসায়নাগার বসালেন। নানারকম রাসায়নিক পদার্থ, শিশি বোতল, স্পিরিট ল্যাম্প, কাগজ, টেষ্ট টিউব একধারে জড়ো করা, অন্য



এডিসন কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত কয়েকটি জিনিষ (১) গ্রামোফোন। (২) আধুনিক ইলেকট্রিক বাল্‌ব। (৩) বৈদ্যুতিক ভোট গণনা-যন্ত্র। (৪) মেগাফোন। (৫) চলমান সন্ধানী আলো। (৬) চলচ্চিত্র প্রক্ষেপন যন্ত্র

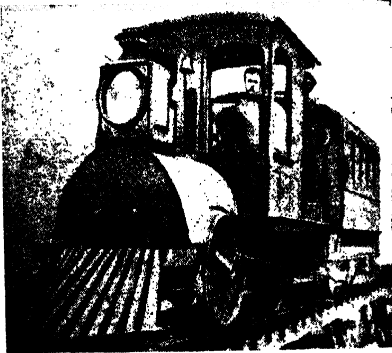
ধারে একটি ক্ষুদ্রকায় ছাপাখানা। কিছু টাইপ, মুদ্রণের একটি হাত-যন্ত্র আর দু'চারটে গ্যালি। নিজেই তিনি একপাতা দু'পাতার খবরের কাগজ বার করতেন। নাম দিয়েছিলেন—Weekly Herald ! চলন্ত ট্রেনের মধ্যেই ছাপার কাজ চলত। ফুলস্ক্যাপ সাইজের দু' পৃষ্ঠার সংবাদ-পত্র। তার মধ্যে নানা খবর। সব নিজেই রচনা করতেন। বানান ভুল থাকতো বটে, কিন্তু তারই মধ্যে নিঃসংশয়ে পরিচয় পাওয়া যেত তাঁর বুদ্ধির আর জ্ঞানের। রেলের কর্ম্মচারীরা তাঁর কাগজ কিনে তাঁকে উৎসাহিত করত।

শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক হ'তে পারতেন তিনি। কিন্তু সেদিকে তাঁর সবখানি মন ছিল না। বিজ্ঞানের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল তাঁর। কিন্তু সেই সাধনাতে অকস্মাৎ বিষম বাধা পড়ল। একদিন ট্রেনের সেই কামরায় মধ্যে একটা বোতলের ভিতরকার তরল দাহ্য পদার্থ কাঠের মেঝেয় গড়িয়ে প'ড়ে জ্বলে উঠল। চারিদিকে আগুন ধ'রে গেল। ধোঁয়া দেখে লোকজন ছুটে এলো এবং বিশেষ কোন ক্ষতি হবার আগেই আগুন নির্ব্বাপিত হল। কিন্তু ট্রেনের গার্ড মহা ক্রুদ্ধ হলেন।

শেষে কি সকলকার চাকরি যাবে একসঙ্গে! পরের ষ্টেশনে ট্রেন থামতেই তিনি এডিসনের মালপত্র, শিশি বোতল, ছাপাখানা, সমস্ত কিছু ট্রেন থেকে প্লাটফরমের উপর টেনে ফেলে দিলেন।

ট্রেন থেকে নির্ব্বাসিত হলেন বটে, কিন্তু এডিসন কাগজ ফেরি করবার কাজ থেকে বঞ্চিত হলেন না। কর্তৃপক্ষ দয়াপরবশ হ'য়ে তাঁকে ট্রেনের মধ্যে দৈনিক কাগজ বিক্রয় করবার যে অনুমতি দিয়েছিলেন তা বহাল রাখলেন। নিজের পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেল। বিজ্ঞানের নানা পরীক্ষাগুলোও মাঠে মারা গেল। প্রথমটা ভারী মুষড়ে পড়লেন এডিসন। তারপর নিজের বাড়ীর চিলকোঠায় নূতন ক'রে একটি গবেষণাগার প্রস্তুত করলেন। ট্রেণের কীর্ত্তির কথা বাবা শুনেছিলেন। বাড়ীর মধ্যে রসায়নাগার-স্থাপনের সংবাদ পেয়ে তিনি মহা চীৎকার শুরু ক'রে দিলেন। এইবার বাড়ীশুদ্ধ লোককে একগাড়ে পুড়িয়ে মারবে ছেলেটা। যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত মায়ের চেষ্টায় বাড়ীর গবেষণাগারটি মারা পড়ল না।

নানা পরীক্ষায় নানা পুস্তকের সাহায্য দরকার। কয়েকখানা বই



এডিসন কর্তৃক আবিষ্কৃত বিদ্যুৎ চালিত ট্রেণ

চাই। কিন্তু বড্ড চড়া দাম বইগুলির। টাকার সংস্থান নেই এডিসনের। হঠাৎ একদিন অভাবিতরূপে সেই টাকা তিনি পেলেন। সেদিন যথারীতি ট্রেনে কাগজ ফেরি করতে বেরিয়েছেন। লম্বা বারান্দা-যুক্ত ট্রেনের বারান্দা দিয়ে হাঁকতে হাঁকতে এদিক থেকে ওদিক পর্য্যন্ত যাতায়াত করছেন—"কাগজ চাই, খবরের কাগজ, ভাল ভাল কাগজ, টাট্‌কা খবর।" ট্রেনের মধ্যে একটিমাত্র প্রথম শ্রেণীর কামরা। তার মধ্যে আধ-শোয়া অবস্থায় এক ব্যক্তি ঝিমোচ্ছিলেন। তাঁর চার পাশে স্যুটকেশ, বাস্কেট, বেডিং। বড়লোক, সন্দেহ নেই। এডিসনের চীৎকারে চোখ মেলে তাকালেন, তারপর তাঁকে ডেকে বললেন—"কতগুলো কাগজ আছে তোমার বগলে?" গুণে দেখে এডিসন জবাব দিলেন—"চল্লিশখানা আছে, স্যর।" ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন—"চল্লিশখানার দাম কত?" হিসাব ক'ষে এডিসন দাম বললেন। ভদ্রলোক বললেন—"আচ্ছা, এক কাজ কর, ওই চল্লিশখানা কাগজকে বারান্দা দিয়ে ফেলে দাও। ভয় নেই, চল্লিশখানার দাম দিয়ে দিচ্ছি। এই নাও দাম। দাও কাগজগুলো উড়িয়ে।" প্রথমটা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়েছিলেন এডিসন। তারপর দিলেন কাগজের বাণ্ডিলটা ফেলে। টাকাগুলো পকেটস্থ ক'রে চ'লে এলেন সেদিক থেকে। পরবর্তী ষ্টেশন থেকে আবার তাঁর হাঁক শোনা যেতে লাগল—"ভাল ভাল মাসিকপত্র। আজকের সাপ্তাহিক। চাই ভাল মাসিকপত্র, ভাল ভাল সাপ্তাহিক।" আবার সেই ফাষ্ট´ ক্লাশের কামরার কাছে এলেন। আবার উঠে বসলেন ভদ্রলোক। বললেন—"আবার চীৎকার শুরু করেছো? কতগুলো পত্রিকা আছে? দাম কত? আচ্ছা, এই নাও টাকা। ওগুলোকেও ফেলে দাও। আর এদিকে এসো না। তোমার গলার স্বরটা ভারী কর্কশ।"

সাহস পেয়ে এডিসন বললেন—"ভাল ভাল ডিটেকটিভ বই আছে, স্যার। খুব সস্তা দাম। তিনখানা কিনলে একখানা ফাউ।" মাথা নেড়ে ভদ্রলোক বললেন—"বটে। ফাউ সমেত দাম কত সবগুলোর?" এবার চড়া দাম হাঁকলেন এডিসন। সঙ্গে সঙ্গে এক গোছা নোট



পরীক্ষাগারে কাজ করতে করতে এডিসন যখন নিদ্রাতুর হতেন তখন সেই ঘরেই বেঞ্চের উপর খবরের কাগজের বালিশ তৈরী করে তার উপর মাথা দিয়ে বিশ্রাম করতেন

এগিয়ে দিলেন ভদ্রলোক। বললেন—"ব্যস! আর হাঁক পাড়বে না তো?" মাথা হেলিয়ে এডিসন বললেন—"আজকের মতো আর হাঁক পাড়বো না স্যর।"

একসঙ্গে অনেকগুলি টাকা পেয়ে তাঁর অনেকদিনের সাধ পূর্ণ হ'ল। বহু-ঈপ্সিত বইগুলি কিনলেন। লাখ টাকার চেয়েও দামী ছিল সেই বইগুলি তাঁর কাছে এবং উত্তরকালে সেই বইগুলির সাহায্যে তিনি বহু লক্ষ টাকার কাজ করেছিলেন, অনেক অমূল্য জিনিষ উপহার দিয়ে গিয়েছিলেন জগৎকে।

*   *   *

একুশ বছর বয়স থেকে আরম্ভ হল এডিসনের অনন্যসাধারণ উদ্ভাবনী-শক্তির নিত্য নূতন প্রকাশ। ইতিমধ্যে টেলিগ্রাফ-অপারেটারের কাজ

শিখেছিলেন। সেই কাজে তিনি এমন কয়েকটি বিস্ময়কর উন্নতি সাধন ক'রে দেখালেন যার জন্যে তাঁর নাম চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। নিউ ইয়র্ক থেকে তাঁর ডাক এলো। সেখানকার একটি যন্ত্রশালায় তার মালিকের অনুরোধে কাজে লেগে যন্ত্রগুলির মধ্যে নূতন নূতন অংশ সংযোজিত ক'রে তাদের কার্য্যকারিতা চতুর্গুণ বাড়িয়ে দিলেন। ফলে যন্ত্রশালার মালিক খুশী হ'য়ে তাঁকে ৮ হাজার পাউণ্ডের এক চেক বকশিস দিলেন।

একসঙ্গে এত টাকা, হাতে পাওয়া তো দূরের কথা, জীবনে চোখেও দেখেন নি এডিসন। চেকখানা হাতে নিয়ে হতভম্ব হলেন। তারপর ব্যাঙ্ক থেকে চেকখানা ভাঙিয়ে যেন দিশাহারা বোধ করতে লাগলেন। কি করবেন, কোথায় রাখবেন টাকাগুলো? দু' তিন দিন সমস্ত টাকাটা তাঁর পকেটে পকেটে ঘুরতে লাগল। তারপর স্থির হ'য়ে বসলেন। এক বিরাট পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করলেন। কিছুদিনের মধ্যে স্থাপন করলেন সর্ব্ব রকমের যন্ত্রপাতি-সমন্বিত এক বৃহৎ গবেষণাগার। পরীক্ষা চলতে লাগল নানা বিষয়ে। তিন চারজন সহকারী নিযুক্ত করলেন। ভুলে গেলেন স্নানাহার, ভুলে গেলেন পোষাক-পরিচ্ছদের পারিপাট্য, ভুলে গেলেন জগৎ-সংসার। বিজ্ঞানের মহাসাধনায় সিদ্ধিলাভের যে-পথ নয়নগোচর হয়েছে সেই পথের শেষে তাঁকে পৌঁছোতেই হবে।

এডিসনের সব চেয়ে স্মরণীয় কীর্ত্তি কোন্‌টি তা নিয়ে নানা বৈজ্ঞানিকের নানা মত আছে। তবে তাঁর সময়কালে তিনি ইলেকট্রিক বাল্‌ব্‌ তৈরী ক'রে দেশময় যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন তার আর তুলনা নেই। ১৮৭৮ সালে সর্ব্বপ্রথম ইলেকট্রিক আর্ক্‌-ল্যাম্পের প্রচলন হয়। অত্যধিক উজ্জ্বল চোখ ধাঁধানো আলো ঘরের কাজে লাগানো সুবিধাজনক নয়, তাই এডিসন ছোট আলো কেমন করে তৈরী করা যায় সে-বিষয়ে নানা পরীক্ষা করতে লাগলেন। শুধু জ্বাললেই হবে না, তাকে ইচ্ছামতো সহজেই নেভানো যাবে আবার জ্বালা যাবে—এ-ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে থাকা চাই। ১৮০২ সালে বেরুলো তাঁর প্রথম ফিলামেন্ট্‌ বাল্‌ব্‌। লোকে তার নাম দিল—"বোতলের মধ্যে মাথার কাঁটা।" ছোট ছোট হাজারখানেক বাল্‌ব্‌ তৈরী হ'য়ে যেদিন সেগুলি তাঁর পরীক্ষাগারের চারিদিকে ঝুলিয়ে দিয়ে রাত্রিবেলা জ্বালিয়ে দেওয়া হল সেদিন সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব আলোকমালার সজ্জা দেখবার জন্যে সহরের লোক ভেঙে পড়েছিল। আকাশের তারার দল মাটিতে নেমে এসেছে। দেবদূতরা ছোট ছোট স্বর্গীয় মশাল নিয়ে এডিসনের অট্টালিকার চারধারে ঘুরছে। এমনি প্রবাদ ছুটলো চারিদিকে। দূর দূরান্তর থেকে হাজার হাজার লোক আসতে লাগল প্রতি দিন। রেল-কর্ত্তৃপক্ষকে স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। সাত দিন ধরে সে এক হুলুস্থূল ব্যাপার!

* * *

টেলিগ্রাফী, বিজলী-বাতি, টাইপ-রাইটার, গ্রামোফোন, চলন্ত ছবি এবং আরও-বহু প্রকারের আবিষ্কারের জনক ছিলেন এডিসন। আবিষ্কার সম্পূর্ণ হবার পর তিনি সেগুলির পেটেণ্ট, অর্থাৎ আইনগত প্রবর্তনস্বত্ত গ্রহণ করতেন। ১৮৬৯ সালে প্রথম পেটেণ্ট গ্রহণ করেন। ১৯১০ সালে তাঁর পেটেণ্টের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১৩০০। ভাবলে অবাক লাগে। ক্ষণস্থায়ী একটি জীবনের কী অপরিমেয় কার্য্য-কুশলতা! লোকে তাঁকে আখ্যা দিয়েছিল—"বিজ্ঞানের যাদুকর"। পরীক্ষাগারে যখন কাজে মগ্ন হতেন তখন যেন তাঁর আর বাহ্যজ্ঞান থাকতো না। একদিকে যেমন আত্ম-সমাহিত চিত্ত, অন্যদিকে তেমনি অদ্ভুত খেয়ালী আর উৎকেন্দ্রিক ছিলেন তিনি। বিবাহ স্থির হবার পর, বিবাহের দিন তিনি সে-কথা বেবাক ভুলে এক পরীক্ষায় নিমজ্জিত হ'য়ে ছিলেন। কথায় যেমন আছে, "যার বিয়ে তার হুঁস নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই," এও ঠিক তেমনি অবস্থা! অবশেষে, বন্ধুরা পরীক্ষাগারের দরজায় দমাদম ধাক্কা মেরে দরজা খুলিয়ে তাঁকে টেনে বার করলেন। এবং সেই অবস্থায় প্রায় চ্যাংদোলা ক'রে নিয়ে গেলেন গির্জ্জায় বিবাহ-বাসরে। সেখানে অপেক্ষা করছিলেন ধর্ম্মযাজক আর তাঁর হবু পত্নী এবং বহু অতিথি অভ্যাগত। এডিসনের পোষাকের, চুলের আর চেহারার বাহার দেখে তাঁরা তো থ। এ কী রকম বর! শেষ কালে একটা পাগলের সঙ্গে বিয়ে হল নাকি মেয়েটার! রাম, রাম!

তাঁদের মুখের পানে তাকিয়ে এডিসন বললেন—"মহাশয়গণ, আপনাদের মুখ-চোখের অবস্থা দেখে বুঝতে পারছি, আমার আচরণে আপনারা কিছু বিভ্রান্ত হয়েছেন। হবারই কথা! কিন্তু বেশ-ভূষার চাকচিক্য সাধন করা শক্ত ব্যাপার নয়। অপর পক্ষে আমি যে পরীক্ষায় নিযুক্ত ছিলাম, তা সহজ নয়। বলতে আনন্দ বোধ করছি আমার সে-পরীক্ষা সফল হয়েছে। কাল আপনারা ঘরে ব'সে একটি ছোট বাক্স-যন্ত্র চালিয়ে আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পাবেন।"

এডিসন সেদিন তাঁর গ্রামোফোন ও গ্রামোফোন-রেকর্ডের আবিষ্কার-কার্য্য সম্পূর্ণ করেছিলেন।

১৮৪৭ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী আমেরিকার ওহিও নগরে যে-জীবনের আরম্ভ, তার নির্ব্বাণ ঘটে ১৯৩১ সালের ১৮ই অক্টোবর। সুদীর্ঘ দিনের এমন সার্থক সাফল্যমণ্ডিত এবং কর্ম্মময় জীবন সচরাচর দেখা যায় না। সে-জীবনে ছিল না ফাঁকী। ছিল না আলস্য। কাজ-পাগল মানুষ ছিলেন এডিসন। নিজের পরীক্ষাগারে কাজে পরিশ্রান্ত হয়ে যখন ঘুম পেতো তাঁর, তখন কোন নরম শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করতেন না তিনি। কাঠ-কাঠ্‌রা বোঝাই টেবিলের উপরেই খবরের কাগজের বাণ্ডিল বালিশ ক'রে বিশ্রাম ক'রে নিতেন পনেরো মিনিট বা আধঘণ্টা! তারপরেই আবার চলত কাজ!





আঠারো বছর আগে

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

আঠারো বছর পরে বাপের বাড়ীতে ফিরেছে মুকুলিকা আজই সন্ধ্যায়। মস্তো বড় বাড়ীটা অক্টোপাসের মত তাকে যেন জড়িয়ে ধরতে চাইচে, একটা প্রাগৈতিহাসিক জীবের কঙ্কালের মত বাড়ীটা অদ্ভুত প্রহেলিকাময়। কেন যে সে ফিরলো তাও সঠিক জানে না সে এখনও। মনকে মন্থন করে অনেক স্মৃতিই উথলে উঠছে। সে শ্রীমতী মুকুলিকা, রূপে গুণে শিক্ষায় সম্পদে কলিকাতার কালচার্ড সমাজের মধ্যমণি, আঠারো বছর আগে এই ছোট্ট পল্লীগ্রাম ছেড়ে চলে গিছলো, আজ সেই নির্ব্বাসিতার আত্মকাহিনী সে কী নিজেই শুনবে।

আস্তে আস্তে জানালাটা খুলে দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো সে। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে অঝোরে। মহাতামসের নগ্ন নিষ্পেষণে ধরা দেওয়া কালোর অতলে হারিয়ে যাওয়া রাত্রির বুঝি কান্নার আর শেষ নেই। তবু যতো দীর্ঘই হোক রাত্রির একটা সমাপ্তি আছে, আগে হোক্ পরে হোক্ আলোর সমুদ্রের ঢেউ এসে কালোর অঙ্গরাগকে মুছিয়ে দেবে, সীমন্তে নতুন করে অরুণ বিন্দুর সিন্দুর এঁকে দেবে, কিন্তু মুকুলিকার কৃষ্ণীকৃত রেখা যে মোছবার নয়। পার্টিতে পিকচারে পিক্‌নিকে স্মার্ট শিক্ষিতা সুন্দরীকে দেখে কেউ কি বুঝতো যে এর বুকের ভেতর জমে আছে হিমালয়ের বরফের মত গুমরে গুমরে জমে যাওয়া ঠাণ্ডা কান্না। গরবিনী সেও হয়েছিল, তারও জীবনে এসেছিল পরম লগ্ন, সেই চরমকে হেলা করতে পারেনি বলেই কি আজ তার এতো দুঃখ, এতো কষ্ট, এতো অপবাদ। সন্ধ্যা দীপের ক্লান্ত শিখা, অপমানের রাজটীকা পরিয়ে দিয়েছিল তার ললাটে। শ্রীকণ্ঠ দেবতা তারই কপাল দোষে নীলকণ্ঠ হয়ে রইলেন—সে বিষ আর গলা দিয়ে নামলো না।

হ্যাঁ, আঠারো বছর আগে এমনি এক ঝোড়ো রাতে সৌভাগ্যবতীর ভাগ্যদেবতা তার সঙ্গে খেলার এক অঙ্ক সাঙ্গ করেছিলেন, ভেঙে গিয়েছিলো মধুর আশ্বাস, বিধুর আবেশ···দেউলে হয়েছিল শুধু তার দেহ আর মন নয়, তার স্বপ্নও। যৌবনে স্বপ্ন ভেঙে যাওয়া জীবনের যে কতো বড়ো ট্রাজেডি আজ সে তার কিছুটা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে পারে, মন দিয়ে অনুভব করতে পারে।

তার খাস্ ঝি সারদা এসে জিজ্ঞাসা করে—মা, অনেক রাত হলো যে,

মা,—হঠাৎ যেন তার মনের সমস্ত তারগুলো এক সঙ্গে বেজে উঠলো ঝনঝনিয়ে—মা, মা!

এ কী মহামন্ত্র জপ করছে সে। মা—মা বলতে আজও তার সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে, বুকের একটা দিক্ যেন ভেঙে পড়ে চূর্ণ মানবতায়। মা হওয়া কি সোজা কোথা! নিজের মাকে মনে পড়ে—মায়ের একমাত্র মেয়ে ছিলো সে, কতো কামনার, কতো আদরের কতো যত্নের। মায়ের কথা মনে হলেই মনে পড়তো আর একজনকে—সে তার বাপ। সে বাপের হুঙ্কারে কেঁপেছে তার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের কথা জেনেছে, মাইকেল মজলিসের গল্প শুনেছে কিন্তু কোন দিন মনের নিভৃতে পায়নি তাঁকে মায়ের পাশে, যেখানে শিবশিবানী এক সঙ্গে দোলে। জ্ঞান হতেই দেখেছে এই শান্ত মহিলাটিকে একা একা দূরে ভয়ে সিঁটকে থাকতে', অথচ কি অমেয় মমতাই না ঝরতো তাঁর চোখে, কি নিষ্ঠা নিয়েই না কাজ করতেন তিনি। স্বামী ব্যক্তিটি তাঁর কাছে ব্রাত্য হলেও স্বামী আদর্শটির উপর ছিল তাঁর অসীম শ্রদ্ধা। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বংশের মেয়ে তার মা, হয়ত তার শান্ত সৌম্য প্রভাব কিছুটা ছিল। বড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে অনুভব করেছে মায়ের অতলান্ত দুঃখ, অংশ নিয়েছে তার বেদনার। মাঝে মাঝে মুকুলিকা জ্বলে উঠতো—আচ্ছা মেয়ে আর পুরুষের ন্যায় অন্যায়ের বিচারের কোন্ আলাদা মানদণ্ড আছে না কি?

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সয় দুজনেই যে সমান দোষী।

মা ভীত দৃষ্টিতে তার দিকে চাইতেন, বলতেন—মুকুলিকা, থাম্ বাড়াবাড়ি করিসনি, ওরে মেয়ে হওয়া বড় জ্বালা—

হঠাৎ মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে সে বলতো—আর মা হওয়াটা কম জ্বালা, না ?

বুঝ্‌বি, বড়ো হ'—

বারে অভিশাপ দিচ্ছো নাকি ?

মার মুখ হাসিতে ভরে যেতো, চোখে নামতো অশ্রু, সেই আলোছায়ার মাঝখানে মনে মনে লুকোচুরির খেলা চলতো মায়ের ও মেয়ের।

বিবাহিত জীবনের প্রথম দুবছর কোন রকমে স্বামীকে সহ্য করেছিলেন ত্রিনয়নী। তার পর দুরন্ত ভোগের সংসার থেকে চুপ করে এক পাশে সরে গেলেন তিনি মেয়েকে নিয়ে যৌবনকে পিষ্ট করে আশাকে বলি দিয়ে। আস্তে আস্তে দেশের সঙ্গে তাঁর যুবক স্বামীও সম্পর্ক কমিয়ে আনছিলেন দিন দিন। শেষ পর্য্যন্ত এমন হলো যে কলকাতাতেই স্থায়ী আড্ডা গাড়লেন তিনি। কচিৎ কদাচিৎ টাকা আদায় করতে পাঁচ আনি জমিদারীর পাঁচ ইজারী মালিক সপারিষদ শুভাগমন করতেন, বিলাসব্যসনের সব কিছু সামিষ ও নিরামিষ উপকরণ তাঁর সঙ্গেই থাকতো। স্ত্রীর মহলে তিনি ভুলেও পদার্পণ করবেন এমন স্ত্রৈণ তিনি ছিলেন না, খবরও নিতেন না মা আর মেয়ে কি করছে না করছে। অবশ্য অন্নবস্ত্রের অভাব ছিলনা, নায়েব গোমস্তারাই তার ব্যবস্থা করতো।

পূজাপার্ব্বণ, লেখাপড়া, ঠাকুরদেবতা গুরু পুরুত নিয়েই ত্রিনয়নী দিন কাটাতেন, আর ছিলেন কুলদেবতা মদন মোহন —অত্যন্ত অসহ্য হলে তিনি ধন্না দিতেন সেইখানে, বলতেন—ঠাকুর তোমার মদনমোহন নামটা কে রেখেছিলো বলো দিকিন, সুখের দিনেও তোমার খোঁজ পেলাম না আর দুঃখের রাতেও তোমায় সংশয় হচ্চে। বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মশাই ছিলেন তাদের সান্ত্বনার স্থল, মাকে শোনাতেন যোগবাশিষ্ঠ, মেয়েকে শোনাতেন মেঘদূত। একদিন ত্রিনয়নীকে বল্লেন্—মেয়েকে লেখাপড়া শেখাও, যে যুগের যা, পাশটাশ করুক, নিজের পায়ে দাঁড়াক্—

সে কী—ওর বাপ ত ইস্কুল কলেজে পড়া সমর্থন করবেন না, বরং জানতে পারলে অনর্থই বাঁধাবেন—

ঘরেই পড়ুক্—প্রাইভেটেই দিক্—সুনীত ওকে মাঝে মাঝে পড়াশুনো দেখিয়ে দেবে। সুনীত ওঁরই ছেলে—কলেজে পড়ছে।

অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলো মা আর মেয়ে। ভট্টাচার্য্য মশায় সাধারণ গায়ের মানুষ তর্কে তীর্থ ছিলেন না, ভায্যেও ছিলেন না নীলকণ্ঠ বা মল্লিনাথ কিন্তু ছিল তার রসোজ্জ্বল শুচিশুভ্র মন যা তাকে বুদ্ধির বাইরেও ঋদ্ধিমান করেছিলো। উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলো মা আর মেয়ে, বাপের অজান্তেই বাড়ীতে বসে প্রাইভেটে ম্যাট্রিক্ আই এ. বি এ দিয়ে ফেল্লে সে। সাহায্য করেছিল সুনীত। ভাগ্যিস্ সেই সময় বাপ কয়েক বছর বিলাসের চূড়ান্ত করতে বিলেতেই ছিলেন।

ভারী ভালো লাগতো সুনীতকে ত্রিনয়নীর, মনের গোপনে এক প্রত্যাশা জেগে উঠতো—কি মানায় দুটিতে—কিন্তু সে তো হবার নয়, তবু হাজার হোক্ মায়ের মন্ নিজের জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা যাই হোক্, তাঁর অমন্ সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে, তার সাধ আহ্লাদ নেই। ভাবতে ভাবতেই একদিন শেষ শয্যা নিলেন ত্রিনয়নী, ডুকরে কেঁদে পড়েছিলো মুকুলিকা—বাবাকে খবর দি—এই একদিনই সে স্পষ্ট কঠিন উত্তর শুনেছিল—'না' যে 'না' কোনদিন 'হাঁ' হয় না।

ফাগুনী পূর্ণিমায় যাবার দিন গভীর রাতে তিনি ডেকে বললেন—জানালাটা খুলে দেতো মা, আলো আসুক্ ঘরে, সুনীত কোথায় রে—

কাছে এসেছিল তারা দুজনে। ভরা জোছনার আলোয় যখন বিছানা ভর্ত্তি, তখন হঠাৎ তাঁর অর্দ্ধ অচৈতন্য সত্তা মগ্ন-সাগর থেকে উঠে তাদের হাত দুটি ধরে কি বলতে চেয়েছিলো, কিন্তু বলা হয়নি, শুধু তারই মধ্য দিয়ে আশীর্ব্বাদ ঝরে পড়েছিলো মৃত্যুপথ যাত্রিনীর।

সংবাদ পেয়ে বাপ এসেছিলেন, তম্বীতাম্বাও করেছিলেন কেন সময় মত খবর দেওয়া হয় নি তাঁকে। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে মহাসমারোহে শ্রাদ্ধ শান্তিও চুকেছিল—আকাশস্থ নিরালম্ব বিদেহীর কাছে সে শ্রদ্ধার তর্পণ পৌঁছেছিল কিনা জানা নেই কিন্তু মাথুর কীর্ত্তন হয়েছিল সারা রাত্রি ধরে—সমস্ত নাট মন্দিরটা ঘিরে নাচওয়ালীদের নৃত্যোল্লাসে তৃপ্ত হয়েছিলেন পত্নীবিয়োগবিধুর বাবুমশায়। মুকুলিকা মাথা

নীচু করে বসেছিলো আর মদনমোহন হয়ত নেপথ্যে হেসেছিলেন।

মেয়ের দিকে তাকিয়ে কিন্তু অবাক্ হয়ে গিছলেন বাবু মশায়। এ কী, এ যে লকলকে তেজী লতা, গনগনে আগুনের পরশ পাওয়া প্রদীপ্ত-শিখা। শীঘ্রই একটা বিয়ে দিয়ে এর একটা সামাজিক হেস্তনেস্ত করা উচিত, এই স্পষ্ট কর্ত্তব্য বোধটাও জেগে উঠেছিল। মারমুখী হয়েছিলেন যখন শুনলেন তাদের অসূর্য্যম্পশ্য ঘরে লেখাপড়া করেছে তাঁর মেয়ে, আর সুনীত তার গুরু। হাওয়ায় শনশন্ শোনা গিয়েছিল হাণ্টারের বাঁশী। আর পরের দিন শোনা গেল সুনীত বুড়ো বাপের চিকিৎসার জন্য তাঁকে নিয়ে কলকাতা যাচ্ছে। গোপনে চোখ মুচেছিলো মুকুলিকা, সরির মাকে ডেকে কি যেন বলেও ছিল। সে ফিরে এসে খবর দিলে—ভট্টাচার্য্য মশাইরা ভোর রাতেই বেরিয়ে পড়েছেন দিদিমণি, ত্র্যহস্পর্শ পড়বে কিনা তাই ভোর লগ্নেই যাত্রা—অন্ধ মানুষ, চোখ কাটাতে যাচ্ছেন। চুপ করে শুনেছিলো মুকুলিকা—দেখেছিল তারও জীবনে রাহুর প্রেমের ত্র্যহস্পর্শ। তারও অন্ধত্ব বুঝি কাটাতে হবে অনেক দাম দিয়ে।

সরির মা সবই বুঝতো, মানতো, বল্লে—ভাবছো, কেন দিদিমণি, সুনীত দাদাবাবু শীঘ্রই ফিরবে—

একটা শঙ্কাতুর মন নিয়ে, মুকুলিকার অস্পষ্ট প্রত্যাশা দিনে দিনে ডুবে গেছলো।

কয়েক মাসের মধ্যেই জানাজানি হয়ে গেলো যে মুকুলিকার জীবনের রথ সাবলীল সহজ গতি ছেড়ে মোড় নিয়েছে প্রেমের কণ্টকাকীর্ণ পথে। পুষ্পধনুর শরসন্ধান ব্যর্থ হয় নি। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া রক্তের চাঞ্চল্যে কামনার রসোচ্ছ্বাসে আর প্রকৃতির দুর্দ্দমনীয় নিয়মে সদ্য-যৌবনবতী আবেগবতী হয়েছিল এবং তারই ফলে দেহের সানুতে অনুতে মিলন তৃষাতুর রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন নতুন সত্তা নিয়ে বীজরূপী অনির্ব্বাণ দেবতা, জীব হয়ে জন্ম নেবার জন্য।

দুর্ম্মুখ আর মন্থরাদের অভাব কোন যুগেই হয় না। যথা সময়ে বাপের কাছে খবর পৌছে দিয়েছিল আত্মীয় অনাত্মীয় দরদীরা। হাণ্টার হাতে ছুটে এসেছিলেন উন্মত্ত বাবুমশায়। এতো বড়ো অনাচার তাঁদের খানদানী বংশে—আলমগীরের কড়চায় যাদের উৎপত্তি, সাতপুরুষ ধরে ভোগের রক্তে যাঁদের ত্যাগের মহিমা সুকীর্ত্তিত। চাবী দিয়ে আটকে রেখেছিলেন তাকে, পিঠে পড়েছিল ঘা এর পর ঘা। সুনীত সেই যে হারিয়ে গিছলো, তার আর খবরই পায় নি মুকুলিকা।

যাক্ সে সব কথা—আঠারো বছরের ওপার হতে সে সব কথা মনে করে লাভ কি—বাপ ত মিলিয়ে গেছে বুদ্বুদ হয়ে, আর সুনীতের—বুকটা টন্‌টন্ করে উঠলো—আর—কিন্তু এতো রাত্রে ষ্টেশনে নামলো কে—হারিকেন লণ্ঠন বাহিত একটি আলোর বিন্দু এগিয়ে আসছে ঘন কালোর পর্দ্দা ঠেলে, কে এলো। আকাশে দেখা যাচ্ছে না ম্যুরিলোর আঁকা ইমম্যাকুলেট কনসেপশনের ছবিখানা।

২

বাগ্দী পাড়া থেকেও এই ক্ষণভঙ্গুর আলোটা দেখতে পেয়েছিল কাজল। অজ পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিতা হাড়ী-বাগ্দীর মেয়ে সে, যাদের হাওয়া গায়ে লাগলে, ছায়া মাড়ালে শুচিবায়ুগ্রস্ত সমাজধ্বজীদের গঙ্গাস্নানে যেতে হতো বিষ্ণু বিষ্ণু বলে। অবশ্য আতুরে নিয়মোনাস্তির মত উচ্ছলযৌবনা চটকচটুলাদের বেলায় ঐ নিয়ম খাটতো না। স্ত্রীরত্ন একুল ওকুল দুকুল হতেও গ্রহণীয়—শাস্ত্রেই বলে। পাঁচখানা গাঁয়ে তার মায়ের ধাত্রী হিসাবে নাম ডাক পশার খুবই প্রচুর ছিল। জোর তুফানে বানচাল হওয়া কেসেও সে শক্ত করে হাল ধরতে পারতো, নানা কায়দা কসরৎ দ্রব্যগুণ মুষ্টিযোগও তার জানা ছিল। মেয়েদের অগতির গতি ছিল সে, অনেক আপদে বিপদে পার করিয়েছে সে, নানা সুড়ঙ্গপথ অতিক্রম করিয়ে দিয়েছে। অবশ্য যে সমাজ বা যে আবহাওয়ায় সে বা তার মা ঘুরতো ফিরতো, তাতে নীতিজ্ঞান নিয়ে বালাই বিশেষ ছিল না। মনে পড়লো এমনি এক বাদলধোওয়া রাতে তাদের কুঁড়ে ঘরে মৃদু করাঘাত পড়েছিলো—নিস্তার—আছিস্।

তার মায়ের সেদিন জ্বর।

দোর খুলে দিয়েছিল কাজল। তার আন্দোলিত দেহবল্লরীর উপর নজর পড়তেই নতুন নায়েবমশাই শুধু তড়িতাহত হয়ে চমকেই ওঠেননি, লুব্ধতায় মর্ম্মে মর্ম্মে আহতও হয়েছিলেন। তন্বী শ্যামাঙ্গীর প্রতিটি কোটিতে, তনুতটের প্রত্যেকটি সীমায় অবরুদ্ধ যৌবনের ভঙ্গী যেন অগ্নি সাক্ষী করে স্বাক্ষর রেখে গেছে বন্য লাবণ্যের।

সঙ্গে ছিল, অনেকদিনের অভিজ্ঞা শ্যামা, তার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাতেই সে বলেছিল—নিস্তারের মেয়ে গো, দুবছর ধাইগিরির ট্রেনিং নিতে-গেছলো, কেমন বেশ চালাক চতুর চটপটে না।

বিয়ে হয়েছে?

পোড়াকপাল, কড়ে বিধবা যে।

তার পর চুপি চুপি কানে কানে বলে—বেশী নজর দিয়ো না, ভাল হবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়ছে বটে। যাই হোক্, আজ আর নায়েব মশায়ের অন্য দিকে মন দেবার মত সময় ছিল না। বাবুমশায়ের জরুরী কাজটা হাতে নিয়ে হাসিল না করলে সব দিকেই মুস্কিল। মেজবাবুর সঙ্গে কাজ করা মানে সসর্প গৃহে বাস। তা ছাড়া কাঞ্চনের নির্গলিত নির্য্যাসেই কামিনীর বিগলিত সাধনা জমে ভাল। আজকের কাজটা ভালোয় ভালোয় মিটলে বেশ কিছু প্রাপ্তিযোগও আছে। আর শ্যামাও লোক সুবিধের নয়। বয়স পঁয়ত্রিশ পেরুলে কি হয়, এখনও আঁটসাঁট মসৃণ গড়ন—পুত্রহীনার উঠন্ত দিনের গর্ব্বোদ্ধত যৌবনের বেশ পালাই পালাই করেও মুখরা মেয়ের আঁচল খুলে পালাতে সাহস করে নি। যেটুকু আটকে আছে সেটুকুকেই ঘষে মেজে চকচকে করে তুলতে জানে সে, চোখের ক্ষণিক বিভ্রমও জাগায়। আজ বিশ বছরের উপর অনেক পুরুষের মাথা চিবিয়ে খেয়ে পরম পরিতৃপ্তির মৃদু উদ্গার তুলেছে সে। নিজেও জীর্ণ যে হয় নি তা নয়।

অনেকক্ষণ কথা হলো নিস্তারের সঙ্গে। সে বল্লে—বাবুদের বাড়ীর কাজ, না বলি কি করে, কিন্তু জ্বরে ধুঁকছি, তা ছাড়া বড্ডো এগিয়ে গেছে, এখন কি করে কি যে করি। বড় ভাবনায় পড়লুম! তা ছাড়া আমি অধর্ম্ম করতে পারবো না বলে দিচ্চি। শ্যামা মুখ ঘুরিয়ে দাঁত চেপে বলে—ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠিরের কন্যে এলেন, সাত কাল পুড়িয়ে মাথা মুড়িয়ে বৈরিগী।

শেষ পর্য্যন্ত নিস্তার বল্লে—নিজের মেয়ে বলে বলছি না, কাজল অনেক শিখে পড়ে এসেছে—

শ্যামার ইচ্ছে ছিল না কাজলকে নিয়ে যাবার। অবচেতনে একটা প্রতিযোগিতার ভাব ছিল—না বাপু তোমার লেখাপড়া শেখা ধিঙ্গী মেয়ে, কি করতে কি করবে, করিতকর্ম্মা ত নয় তোমার মতন, কতো দেখেছো, শুনেছো, আর তা ছাড়া তোমার আগুন-পারা মেয়ে; কানে কানে কি বললে শ্যামা।

মুখে আগুন্—বলেছিল নিস্তার।

শেষ পর্য্যন্ত মায়ের বদলে মেয়েই গিয়েছিলো অনেক কুণ্ঠার সহিত। দুপুর রাতে তার মত মেয়ের একা যাওয়ার যা ভয়, তা বিশেষ করেই জানতো তার মা। তবে ভরসা করেছিল যে নিজেকে রক্ষা করবার মত জোর কাজলের আছে—আর কজীর জোরও ছিল কাজলের।

রোদনসিক্তা অচৈতন্যা রোগিণীকে দেখে এবং চাপা কথাবার্ত্তার দুএক ছত্র শুনেই ব্যাপারটা বুঝে নিতে বুদ্ধিমতীর দেরী হয়নি। সে স্পষ্ট জবাব দিলে—না, আমার দ্বারা এ সব হবে না।

শ্যামা, নায়েব এমন কি স্বয়ং বাবুমশায় অনেক আবেদন নিবেদন অনুনয় বিনয় করলেন।

হাত গুটিয়ে সে বসে রইলো—না।

মদিরাক্ষ বাবুমশায় তখন সবে কয়েকটা পেগ্ চড়িয়েছেন, রক্তিম নয়নে হুঙ্কার দিলেন—নায়েব, ঐ ছোটলোকের মেয়েটাকে বলে দাও যে বাবুদের এলাকা থেকে মান ইজ্জত নিয়ে কোন মেয়েই আজ পর্য্যন্ত স্বেচ্ছায় বেরিয়ে যেতে পারে নি, বেশী চালাকি করলে কাছারী বাড়ীর হাজতে দরোয়ান দিয়ে বেইজ্জত্ করে ছেড়ে দেবো, আর ভালো মানুষের মত কথা শুনলে মায়ে ঝিয়ে নগদ পাঁচশো পাবে—

সেই এক জবাব—না।

অগত্যা পাইক্ গিয়ে ধরে নিয়ে এসেছিলো মাকে। গুঁতোর চোটে জ্বর ছেড়ে পালিয়েছিল। যে কাজের জন্য তাকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছিল সে কাজ তাকে করতে হয়েছিল, আর তাকে বলা হয়েছিল যে তার মেয়ে ততক্ষণ ফাটকে আটক্ থাকবে। নায়েববাবুই হৃষ্ট চিত্তে সে ব্যবস্থা করেছিলেন, সারা রাত্রি কাজল কারারুদ্ধ ছিল তাঁরই হেফাজতে।

ভোর বেলায় পাণ্ডুর নয়নে ক্ষত দেহে বিক্ষত মনে যখন সে ছাড়া পেলো—তখন তার একমাত্র কামনা ছিল ভরতি গঙ্গায় ডুব দিলে ঐ ক্লেদাক্ত দেহটাকে চিরকালের মত ভাসিয়ে দিতে পারাটাই বুঝি সবচেয়ে বড় কাজ।

জলে নামতেই সামনে পড়েছিল এক অপরূপ ছবি

যাতে তলিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাটা স্থগিত হয়ে গেলো। দিন ও রাতের মোহানায় দাঁড়িয়ে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে স্নানস্নিগ্ধ বদন ঠাকুর জোড়হাতে আকাশের অস্পষ্ট আলোর রেখার দিকে চেয়ে মন্ত্র পড়ছেন—আর চোখ দিয়ে ঝরছে ঝর ঝর করে জল—হে মহাপাবনের দেবতা মহাদ্যুতি, নিয়ে এসো তোমার আলোর কৃপাণ, টুকরো টুকরো করে দাও সব অশুচি অন্ধকার, নিয়ে এসো তোমার প্লাবনের ধারা, সব পাপ মুছে যাক্, সব ক্লেদ ধুয়ে যাক্, প্রেম শুদ্ধ করে নাও এই তিক্ত ধরাকে হে মধুমান্।

সিঁড়িতে উঠতেই শেষ ধাপে পায়ের কাছে কি ঠেকলো তাঁর—ছেঁড়া নেকড়ায় জড়ানো একটা ছোট্ট পুঁটলি। হাত দিয়ে বুঝতে পারলেন সদ্যোজাত একটি অসম্পূর্ণ মাংসপিণ্ড, এখনও বিগতপ্রাণ নয়, হয়ত সেবায় শুশ্রূষায় বেঁচে যেতে পারে।

ততক্ষণে উঠে এসেছে বিদ্যুৎগতিতে কাজল, অবাক্ হয়ে দেখছে তাঁকে। এই সেই বদন ঠাকুর, যার কত কথা সে শুনেছে। অশুচি ছেলে কোলে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি অভিভূত শুদ্ধ হয়ে—বহুযুগের ওপার হতে কোন অনাগত তাকে যেন ডাকছে, আকাশের কোণে কোণে নব জীবনের বারতা নামছে, জন্ম নিচ্ছে নূতন দিন, তিমির-হরণ আসছেন।

হঠাৎ তার নজর পড়লো কাজলের দিকে, কি ভেবে তিনি পুঁটলীটিকে কাজলের কোলে দিয়ে বল্লেন—কে তুমি তা জানি না, কিন্তু এইটুকু জানি তুমি মা, মৃত্যুর কোল থেকে অমৃতকে ছিনিয়ে নিয়ে আসতে পারে একমাত্র মায়েরাই, মেয়েরাই, তারা যে সাবিত্রী, ধরেও রাখতে পারে তারাই। এই নাও, এ আমার কাজ নয়। কেঁদে ফেলেছিল কাজল।

•

আঠারো বছর পরে এই স্মৃতির ধারা বেয়েই আনমনা পাইচারী করছিলেন বদন ঠাকুর। দূরে অতিদূরে আলোর অস্পষ্ট রেখাটি কালো মাঠ পেরিয়ে এগিয়ে আসছে। এই এক টুকরো আলোর অপেক্ষাতেই তিনি বসে আছেন সারাজীবন সারারাত্রি। যৌবনের তীক্ষ্ণতা কেটে গেছে, কর্ম্মকোলাহলে মত্ততা নেই, চোখে তিনি ঝাপ্সা দেখেন, চুল গেছে পেকে, কিন্তু মাথা নুইয়ে পড়ে নি, শির দাঁড়া আজও খাড়া। স্থিতধী আজও শান্ত অচঞ্চল, ভূমাময়ী আজও তাঁর উপাস্যা। তিনি ছিলেন সেকালের স্বদেশী যুগের প্রাণ-উদ্দীপ্ত জীবন্ত মানুষ, ঘোড়া খুলে সুরেন বাঁড়ুয্যের গাড়ী হয়ত টানেননি তিনি, কিন্তু সদলে বন্দেমাতরম্ বলে রাখী বন্ধনের দিনে কত বাড়ীতে ঢুকে উনুনে জল ঢেলে দিয়ে জোড় হাতে বলেছেন—মায়েরা, আজ অরন্ধন, বাংলার মাটি বাংলার জল পূর্ণ হোক্ ধন্য হোক্ পুণ্য হোক্। হঠাৎ একদিন তিনি হলেন উধাও—কেউ বললে তিনি গেছেন হিমালয়ে কুথমী বাবার ডাকে, কেউ বললে নর্ম্মদার তীরে তিনি তপস্যায় মগ্ন। নিন্দুকে রটালে পুলিশের পেয়াদা পিছনে ঘুরছে উদ্যত রাজরোষের বজ্র নিয়ে—তাই তিনি দিয়েছেন গা ঢাকা—দুএকজন তাকে দেখেছিলো জাভায় সাংহাইএ, আবার কালিফোর্নিয়ায়, কলোরাডোর তীরে। বারো বছর তিনি কোথায় ছিলেন, কি করছিলেন, কেউ জানে না, তিনিও বলেননি।

গান্ধী যুগের প্রথম উল্লাসে তাঁকে দেখা গেলো মদের দোকানে পিকেটিং করে ছয় মাস জেল খাটছেন, তারপর কতোবার তিনি ধরা পড়লেন, ফিরে এলেন, তারপর একদিন হঠাৎ এই গাঁয়ে এসে গাঁট্ হয়ে বসে বললেন—যতক্ষণ মানুষ তৈয়ারী না হয় ততক্ষণ পলিটিক্স ইকনমিকসের কাঠামো নিয়ে ঝগড়া করে লাভ নেই—শক্ত ইমারতের জন্য চাই ইস্পাতওয়ালা ইট্, খাঁটি মানুষ। নেমে পড়লেন তিনি আকণ্ঠ পাঁকের মধ্যে। কত বাধা কত বিপত্তি কত ভুল ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে গড়ে উঠলো এই আয়তন—প্রেম দিয়ে, কাজ দিয়ে, ধ্যান দিয়ে। দু একজন করে দু একটা স্বপ্ন-বিলাসী বাপমায়ের ছেলে আসতে লাগলো, আর আসতে লাগলো বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানোর দল—সব জায়গা থেকে হতাশ হয়ে যারা ফিরেছে। তাদেরই তিনি চাইতেন বেশী করে। ছেলেদের নিয়ে তিনি ক্লাশ খুলে পাঠ দিতেই বসলেন না, খুললেন ব্যায়ামাগার, শেখালেন লাঠি, চললো কুস্তীগিজোধাপসার কম্পিটিশন্, চললো তাঁত চরকা, নদীতে জল তোলপাড় করে সাঁতার, বিকেলে দাঁড় বেয়ে বাচ। আবার সন্ধ্যের পর বসতো গানের বৈঠক—নিজেই বসতেন তানপুরো নিয়ে, গুণী হাতে সুরেন্দ্র সভায় সুর বর্ষণের মত বেজে উঠতো তারগুলো ঝঙ্কার দিয়ে। তা ছাড়া ছিল একটি ল্যাবোরেটরি, একটা টেলিস্কোপ, একটা মাইক্রসস্কোপ, কিছু সাজসরঞ্জাম যন্ত্রপাতি—গরীব দেশে

একার চেষ্টায় যতটুকু হয়। বাউরী পাড়ায় কলেরা লেগেছে ছেলেরা ছুটতো ওষুধ নিয়ে, কত গরীব কত আতুর পেয়েছে তাদের সেবা-নিপুণ অনলস হাতের অযাচিত শুশ্রূষা।

কিন্তু একদিনের বিপাকেই ভেঙে গেলো তার এত বছর ধরে নিজের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান্, তার প্রতিষ্ঠা গেলো লুটিয়ে মাটিতে।

আশ্রমে নিয়ে এসেছিলেন তিনি কাজলকে শিশু সমেত। ছেলেরা একটু চমকে উঠলো—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী তিনি। অন্য পাঁচজনে বললে একি অনাচার। শুধু শিশু হলেও বা কথা ছিল, সঙ্গে এলো মুকুলিত-যৌবনা ছোটজাতের মেয়ে, যাদের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক্। তা ছাড়া ঐ লাঙ্গুলহীন মর্কট সদ্যোজাত মহাবীরটির পরিচয় কি। গাঁয়ের বাইরে থাকলেও গাঁয়ের লোকেদের মাথা-ধ্যথার সীমা ছিল না। কাজল ও তার মাকে সবাই চিনতো, তাদের পেশার কথাও জানতো।

কানাঘুষোয় দুএকজনে দু এক কথা বলতে আরম্ভ করলে। নিন্দেয় কান পাতা যায় না।

কেউ বললে—ডুবে ডুবে জল খাওয়া, বাবা,—

আবার কেউ বললে—মুনিদেরও মতিভ্রম হয়, শাস্ত্রে বলেছে ঘি আর আগুন্।

তারই প্রিয় শিষ্য নিখিলেশ একদিন তাঁকে কি বললে—

তিনি হেসে জবাব দিলেন—নীড় যদি ভাঙে ভাঙুক্, আমার দিগন্তকে ত কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

আর একদিন বললেন—নিখিলেশ, জীবনটা অনন্ত সম্ভাবনাময়, তাকে কি ধরে রাখা যায় ছোট্ট গণ্ডীতে, না নীতির পুঁটলিতে।

বাবুমশায়ের কাছেও খবরটা পৌচেছিল। ততদিনে তিনি মুকুলিকাকে সরিয়ে ফেলেছেন কলকাতাতে, কিছুই জানতে দেননি। কাজলের মাকেও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন নবদ্বীপে মোটা টাকা দিয়ে। কিন্তু অন্যদিকেও তিনি মতলব আঁটছিলেন। নায়েবকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সদরে। এই নিরীহ মাষ্টারমশাইটিকে নিয়ে কুলিশপাণি পুলিশ প্রভুদের বেশ একটু দুশ্চিন্তা ছিল। তাঁর আশ্রমটিও হয়েছিল তাদের চক্ষুশূল। ছলে বলে কৌশলে এটাকে ভণ্ডুল করবার অনেক প্ল্যানই ভেস্তে গিয়েছিল! তাই পরের মুখে ঝাল খেয়ে এমন সুযোগটা কাজে লাগাতে তৎপর হতে দেরী করলেন না তাঁরা। কয়েকদিনের মধ্যেই সদলবলে পরোয়ানা সমেত হাজির হলেন ন্যায় ও শৃঙ্খলার চর ও অনুচরেরা।

ধমক্ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—এই নবজাতকটি কার, কিসের জন্য, কোথা থেকে এবং কি মতলবে একে আনা হয়েছে? কাজলকে নিয়ে টানাটানি হলো প্রচুর।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি, আপনি মগ্ন ধ্যানস্তিমিত মানুষটি। তারপর ভেতরে গিয়ে নিজে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন ছেলে-কোলে কাজলকে নিজে হাত-ধরে। অপ্রত্যাশিত পাণিগ্রহণে সে থর থর করে কাঁপছিল। কেউ কিছু বলবার আগেই অকুণ্ঠিত চিত্তে দৃপ্ত স্বরে তিনি বললেন—এই ছেলে আমাদের দুজনের—

বজ্রপাত হলেও লোকে এর বেশী চমকাতো না। কাজলও হয়ে গেলো হতভম্ব। আকুমার ব্রহ্মচারী প্রৌঢ় দাঠাকুরের এ কী কাণ্ড, মাথা খারাপ হলো নাকি?

মেজবাবুর চক্রান্তে ও পুলিশের দাপটে ছাড়া পেলেন না কিন্তু বদন ঠাকুর। তাঁর স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করেই বিচার হলো যে অসঙ্গত প্রণয়ের সাক্ষাৎ ফলকে তিনি অঙ্কুরেই বিনাশ করতে চেয়েছিলেন। বেফাঁস বলে তাঁকে নিয়ে বেশী টানাটানি মেজবাবু বা পুলিশ সঙ্গত মনে করলেন না। অনেক কথা কাজল বলতে চেয়েছিল, সে বিদ্রোহ করেছিল, বলতে দেননি তিনি—এক কথায় থামিয়ে দিয়েছিলেন—তুমি মা, ছেলের সব দায়িত্ব তোমার, আমাকে ওরা জেলে পুরবেই, কিন্তু তার সঙ্গে তুমি গেলেও ছেলেকে দেখবে কে—ও যে বাঁচবে না।

মাথা নত না করে তিন বছরের কারাবাস সানন্দে বরণ করে নিয়েছিলেন। যেদিন তিনি বেরিয়ে এলেন সেদিন অর্ঘ্য চন্দন ফুলের মালা নিয়ে অন্যবারের মত তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য কেউ দাঁড়িয়ে নেই, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনরা ত নয়ই, ভক্ত শিষ্য অনুরাগীরাও নয়। শুধু গাছতলায় ছেলে নিয়ে ক্লান্ত চরণে শীর্ণদেহা কাজল দাঁড়িয়েছিল ম্লান মুখে—যেন মেরী মায়ের কোলে কাঁটার মুকুট পরা যীশু [illegible] অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করেছিল সে মাথা লুটিয়ে। অত্যন্ত দরদের সঙ্গে হাত ধরে তাকে তুলেছিলেন তিনি, ঠাট্টা করে বলেছিলেন—আর কি, গণেশ-জননী হলে

এবার। দেখি বাবাজীটি কি বলেন—মায়ের কোল ছেড়ে সে এলোই না তাঁর কাছে।

যেতে যেতে বল্লেন—একটা কথা বলি, এবার ত ছেলেকে ছেড়ে দিতে হবে—

বুকের শিশুকে সজোরে জড়িয়ে ধরে কাজল চেঁচিয়ে উঠেছিল—না, না, আপনি পাষাণ, আপনি নিষ্ঠুর—এমন কথা বলবেন না, আপনি চলে যান্।

৪

আলোর রেখাটি এসে থামলো ঘরের দুয়ারের সামনে। সৌম্য সহাস উচ্ছল প্রাণ এক কিশোর এসে প্রণাম করলে। বুকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি তাকে অনেকক্ষণ ধরে। তার পর ধীরে ধীরে বল্লেন—তোমার বয়স আজ আঠারো বছর পূর্ণ হলো, চলো তোমায় মায়েদের কাছে পৌঁছে দি—তাহলেই আমার ছুটি—

মায়েদের কাছে,—

হ্যাঁ।

অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলো সে। সন্তজাগরিত সকালের এক ফালি তির্য্যক আলো যেন লাগলো তার কপালে।

স্বাধীন ভারতবর্ষ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

নূতন প্রভাতে নূতন রূপে মা,
দিলে আজি তুমি দেখা,
যে প্রভাত লাগি রহিয়াছি জাগি
দীর্ঘ-রাত্রি একা।
যে দীপ্তি চোখে লাগিয়াছে ভালো
সে ত নহে শুধু সূর্য্যের আলো,
শারদ উষার সোনার রৌদ্র
সে ত নয়, সে ত নয়,
নূতন দিবসে পেয়েছি জননী,
তব নব পরিচয়।

সেদিন দেখেছি আশার স্বপ্ন,
ভেবেছি অতীত কথা,
গুমরি গুমরি উঠেছে হৃদয়ে
বর্ত্তমানের ব্যথা।
সেদিন নিবিড় তিমিরের মাঝে
সুপ্ত আলোর কি বেদনা বাজে!
কল্পলোকের কল্পনা ছিলে,
ছিলে ধ্যানে ধারণায়,
স্বপ্নের গান গেয়েছি সেদিন
তোমারি বন্দনায়।

ভুলিনি ভুলিনি প্রাচীন কাহিনী
তব গৌরব-গীতা,
জানি জানি তুমি একদা ছিলে মা,
বিশ্বের বন্দিতা।
জগতের বর-অভয়দাত্রী
এশিয়ার তুমি অধিষ্ঠাত্রী,
নয়নে করুণা,—চরণে তোমার
প্রণতি জানাতো তারা,
সেই সুদূরের স্মৃতির মাঝারে
হয়েছি আত্মহারা।

তমসার পারে নব মহিমায়
উদিলে জ্যোতির্ম্ময়ী,
স্বাধীন ভারতবর্ষ, তোমারে
চিনেছি চিনেছি অয়ি!
আননে তেমনি প্রসন্ন হাসি,
হৃদয়ে তেমনি করুণার রাশি,
তোমার পূজার মন্ত্রে তেমনি
বাজে শান্তির বাণী,
চির-আরাধ্যা, সবার উর্দ্ধে
তোমার আসনখানি।

বাংলার গোষ্ঠী-সঙ্গীত

শ্রীজয়দেব রায় এম-এ, বি-কম্

পল্লীপ্রধান বাংলা দেশে যে পল্লী সঙ্গীতের প্রতিপত্তি হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ! কীর্ত্তনকেও যদি পল্লী সংগীতের গণ্ডীতে ধরা যায়, তবে বলা চলে এ দেশের সমস্ত গানই পল্লী সঙ্গীতেরই প্রকার ভেদ।

রাজধানীতে গ্রাম্য গানের প্রথম প্রচলন হয় ইংরাজ আমলের প্রথম যুগে ধনী জমিদারদের বৈঠকখানায়—সে গানের নাম ছিল 'কবির গান।' রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিলে—"তখন নূতন রাজধানীর নূতন সমৃদ্ধিশালী কর্ম-ক্লান্ত বণিক সম্প্রদায় সন্ধ্যা বেলায় বৈঠকে বসিয়া দুই দণ্ড আমাদের উত্তেজনা চাহিত।......কেবল গান শুনিবার এবং ভাবরস সম্ভোগ করিবার যে সুখ তাহাতেই তখনকার সভ্যগণ সন্তুষ্ট ছিলেন না, তাহার মধ্যে লড়াই এবং হারজিতের উত্তেজনা থাকা আবশ্যক ছিল।

কবির গানে লড়াই-ই মুখ্য। কবিত্ব অথবা সুর-রস গৌণ ; একটা রঙ্গরসের প্রতিযোগিতাই ছিল সে সঙ্গীতের আসল উদ্দীপনা।

কবির গানেরও একটা গ্রাম্য আসরের রূপ প্রচলিত ছিল 'তর্জা' নামে। তর্জা গানের মধ্যে নাগরিক ভব্যতার শাসন গণ্ডীও ছিল না— সরাসরি গালিগালাজের লড়াই ছিল তর্জার উদ্দেশ্য। সহুরে অন্যান্য সান্ধ্য আসর বসিত যাত্রাগানের এবং পাঁচালী গানের। কিন্তু এ অঙ্গের সমস্ত গানের মধ্যে কাব্যকলার কৃত্রিমতা স্থান পাইয়াছিল, সুরের স্বতঃস্ফূর্ত্তিতাও ছিল না। বাংলার স্বাভাবিক লৌকিক জীবনের সঙ্গে এ সব গানের কোন ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল না।

একটি কোন বিশেষ উপলক্ষে বা কোন বিশেষ অনুষ্ঠানে গ্রামের ইতর-ভদ্র সবাই একত্র মিলিত হইয়া এসব গান শুনিত, কিন্তু হৃদয়ের গভীর সংস্পর্শ এ সব গানে পাইত না।

সেদিক দিয়া বাউল, ভাটিয়ালী, মুর্শিদ্যা প্রভৃতি গানের সুরে কলা-কৌশলের সঙ্গে সংগীতের গভীর রস এবং দর্শনের গহন তত্ত্ব অনুস্যূত ছিল বলিয়াই বোধ হয় ঐ সকল গান সর্বসাধারণের আনন্দ-উৎসবের অঙ্গীভূত হইয়া উঠে নাই।

কিন্তু আর এক শ্রেণীর গান বাংলার গ্রামে গ্রামে প্রচলিত ছিল, তাহার সঙ্গে সমগ্র গ্রামবাসীদের জীবনের সংযোগ আছে। এ সকল গান গ্রামের ইতর-ভদ্র, ধনী-দরিদ্র, শিশু-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ সকলেরই সুপরিচিত 'গোষ্ঠী সঙ্গীত' !

এই শ্রেণীর গানের সাহিত্যিক মূল্য হয়ত বিশেষ নাই, কাব্যরীতির নির্দিষ্ট প্রথা-পদ্ধতি এ গুলিতে পালন করাও হয় নাই, তাহা সত্ত্বেও এ সকল গান বাঙ্গালীর জাতীয় সম্পত্তি। গৃহস্থ ঘরের কন্যা-বধূদের এবং বালক-বালিকাদের সম্মিলিত কণ্ঠে এ গানগুলি পূর্বে প্রতি বৎসরই নব নব রূপ ধারণ করিত।

বাংলার গ্রামগুলিতে আজ নাগরিক সভ্যতা দ্রুত বিস্তার লাভ করিয়াছে। গ্রামে গ্রামে যান্ত্রিক সঙ্গীতের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। বাংলার বাহির হইতে আগত নব নব সুর গ্রামবাসীদের এখন মুগ্ধ করে।

তাই আজ আর সে সব গানের জনপ্রিয়তা কমিয়া গিয়াছে, ক্রমেই সে সকল গোষ্ঠী-সঙ্গীত অনাদরে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

ভাদুর গান, ঘেঁটুর গান, কুলের মাগনের গান, হোরীর গান, বন-বিবির গান, পৌষ পার্বণ গান প্রভৃতি বাঙ্গালীর এককালের অতিপ্রিয় অনুষ্ঠানিক সংগীত আজ সে সকল অনুষ্ঠানের ক্রমবিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বিদায় লইতেছে।

এ সকল গানের মধ্য দিয়া যে সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের পরিবেষ্টনী রচিত হইত বাংলার গার্হস্থ্য জীবনের উপর তাহার প্রভাব কম ছিল না !

এই প্রবন্ধে এই প্রকৃতির কয়েকটি গোষ্ঠী-সঙ্গীত লইয়া আলোচনা করা হইতেছে—

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এবং মানভূমে ভাদুর গান নামে একটি বিশিষ্ট লোক-সংগীত প্রচলিত আছে। বর্ষাবসানের পরেই বর্ষণক্লান্ত ও কর্ষণক্লান্ত গ্রামবাসীদের শরীর মনে একটা বিশ্রাম পিপাসা জন্মে। বর্ষায় এতদিন পথ ঘাট ভাসিয়া গিয়াছিল, খাল বিল ভরিয়া ছিল, মাঠে মাঠে কাজের চাপে লোকের মাথা তুলিবার অবসর ছিল না। ভাদ্র মাসে তাহারা অনেক বিশ্রামের সময় পায়। আবার আশ্বিন হইতে নূতন কাজের পালা আসে, নানা উৎসব আসিয়া পড়ে, ধান কাটা সুরু হয়। ভাদ্র মাসে তাই ভাদ্রেশ্বরী বা ভাদুরাণীকে ঘরে আনিবার গান ঘরে ঘরে উদ্গীত হয়।

পুরুষের ক্লান্ত কণ্ঠ এ গানের অংশ লইতে পারে না—তাই ভাদু পূজা ও ভাদুর গান স্ত্রীলোকদেরই, বিশেষতঃ বালিকাদের একচেটিয়া। এ পূজায় সাজ-সরঞ্জাম নাই, একটি গৃহ-লক্ষ্মীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রতিদিন সন্ধ্যায় ছড়া গাহিয়া তাঁহার পূজা করা হয়, এ পূজার মন্ত্র—উপচার, প্রধানতঃ ছড়া গান।

কুমারীরা ছড়া গাহিয়া ঘরে ঘরে নাচিয়া বেড়ায়, তাহাতেই ভাদুরাণীর তৃপ্তি, প্রকৃতি দেবীর নিকটে কৃতজ্ঞতা এবং হৃদয়াকুতির নিবেদন।

গান শুনিলেই বোঝা যাইবে এ সমস্ত গানের রচয়িত্রী মেয়েদেরই —তাহাদেরই বিশিষ্ট বুলি এবং মেয়েলি আচার অনুষ্ঠানের কথা এ সব ছড়ার গঠন-উপাদান। ভাদুর পূজার আয়োজন করিবার জন্য তাহারা ভাদুকে আহ্বান করিয়া বলে—

ভাদু নিজ গুণে
দয়া করে এসেছে গো এখানে ॥
কেহ বারি আন্‌তে চল গো, কেহ যাও ফুল বাগানে।
(আবার) কেহ বা নিযুক্ত থাকো নৈবেদ্যের আয়োজনে ॥

কলাপাকা আম্র টাবা গো, বাজারে আন কিনে ;
আরো কেহ বা মিষ্টান্ন আনো, ভুবন ময়রার দোকানে।
জিলাপী খাজা লেডীকেনী গো, কিন্‌বে যে দেখে শুনে ;
ভালো করে পরখিবি, বাসী যেন আনিস্ নে॥

এই আধুনিক ছড়াটির মধ্যে খাবারের তালিকাই ইহার গায়িকাদের শিশুসুলভ মনোভাবের প্রকাশ করিয়াছে।

ভাদুরাণী তো তাহাদের কাছে দেবী নয়, তাহাদের গুরুস্থানীয়াও নয়, সে যে তাহাদেরই একজন, সুখদুঃখের সাথী—তাই তাহার সঙ্গে মান, অভিমান, হাসি-ঠাট্টাও অবাধে চলে। যেমন—

ভাদু বিধুমুখি।
বদন তুলে হেসে কথা কও দেখি॥
বিরস বদন কেন লো, আজকে তোমার নিরখি॥
ধনি, কিবা অভিমান হয়েছে, আমারে বলো দেখি,
সুখনিশি জাগরণে লো, সকলি যে হয় ফাঁকি।
তুমি বহুদিন পরে এলে নিরানন্দ করো ছিঃ॥

—ছড়াগুলির রচনার ভাষা অতি কাঁচা। অবশ্য গ্রাম্য স্ত্রীলোকদের কাছে তাহার অপেক্ষা আর কিছু আশা করাও অন্যায়!

আগমনী গানে যেমন সভ্য কবিরা দেবীর বৎসরান্তে আগমনে আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করিয়াছেন, এ সব গ্রাম্য মেয়েরাও সে ভাবেই বৎসরান্তে তাহাদের গৃহে ভাদুরাণীর আতিথ্য গ্রহণে মাতৃমমতা এবং বাৎসল্য রস প্রকাশ করিয়াছে—

ওলো ভাদুমণি,
কেমন করে ছিলে বলো তাই শুনি॥
সম্বৎসর যে গত হ'ল খবর কিছু না জানি।
(তুমি) ভালোয়-ভালোয় এলে ঘরে সুখেতে থাক তুমি॥
(আমি) কি করে যে ছিলাম ঘরে গো জানেন চিন্তামণি।
(ওগো) আমার দিব্য থাকে ভাদু শুনিস্ না কারো বাণী॥
পিতার তোমার কঠিন হৃদয় গো কথা না শুনেন তিনি।
ওগো সত্য করে বলছি ভাদু ফি বৎসর আন্‌ব আমি॥

আগমনী গানের মতনই এ সব গানেও আন্তরিকতার উষ্ণ স্পর্শ রহিয়াছে।

ভাদুর একটি লৌকিক আখ্যান রহিয়াছে। এক সময়ে মানভূমের কোন রাজার ভাদ্রেশ্বরী নামে একটি অপরূপ সুন্দরী কন্যা ছিল। তাহার বয়স হইলে বীরভূমের রাজকুমারের সঙ্গে তাহার বিবাহের আয়োজন হইল। বীরভূম হইতে মানভূমে বর যখন সদলে বিবাহ করিতে আসিতেছিল, পথে এক বিজাতীয় শত্রুর আক্রমণে বর নিহত হইল।

ভগ্নদূত যখন এ দুঃসংবাদ বহন করিয়া মানভূম রাজবাটিতে উপস্থিত হইল—তখন রাঙাচেলীপরা কুঙ্কুমচন্দনেভূষিতা সুরভিতপুষ্পমাল্যে-শোভিতা একটি সুন্দরী কিশোরী কম্পিত বক্ষে নব জীবনের যাত্রাপথে তরী ভাসাইবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল।

রাজা এ সংবাদ তাহাকে জানাইতে নিষেধ করিয়া সেই লগ্নেই ভিন্ন পাত্রের সঙ্গে বিবাহের মনস্থ করিলেন। কিন্তু ভাদ্রেশ্বরী সংবাদ পাইয়া তাহাতে রাজী হইল না, সেই অদেখা পাত্রের মৃতদেহের পাশে তাহারই চিতায় আরোহণ করিল।

রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ কবিতার ভাষায় এখানে বলা যায়—

'বাজাও বাঁশি ওরে বাজাও বাঁশি'
চতুর্দ্দোলা হতে বধূ বলে।
'এবার লগ্ন নাহি হবে পার,
আঁচলের গাঁট খুল্‌বে নাক আর ;
শেষ মন্ত্র পড়িব এইবার
শ্মশান-সভায় দীপ্ত চিতানলে!'

সখী ভাদ্রেশ্বরীর সঙ্গে সারা মাস নানা আনন্দে কাটাইয়া ভাদ্র সংক্রান্তির দিনে মেয়েরা গায় ছড়া—

ভাদুর বিজয়ার গান—

বিদায় দিতে মন সরে না ভাদু তোমারে।
নিশ্চয় যদি যাবি গো ভুলিস্ না গো আমারে॥
যাচ্ছ যদি ভাদুমণি কেঁদো না গো মনোমোহিনী।
আর বৎসর থাকি যদি আন্‌ব গো তোরে॥
আর কেঁদ না ধৈর্য্য ধরো মাসী তোমায় প্রণাম করে।
কি করিবি যেতেই হবে বিধাতার নিয়ম রে॥

রাত্রিশেষে আশ্বিনের প্রথম সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে বৎসরের মতন ভাদুর বিসর্জন হয়। মেয়েরা চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে ঘাট হইতে গান গাহিয়া ফেরে—

যেও না যেও না ভাদু গো ধরি তব চরণে।
চলে গেলে আমরা বলো গৃহে রবো কেমনে॥

পল্লীতে আবার নূতন করিয়া গানের পালা বসে পৌষপার্বণে। সারা পৌষ মাস ধরিয়া ফসল কাটার পালা চলে, গৃহস্থের ঘরে ঘরে নূতন ধানের নূতন মরাই বাঁধা হয়। আঙ্গিনায় আঙ্গিনায় ধান ঝাড়ান চলিতে থাকে, রান্নাঘরে চলে পিঠে পুলির আয়োজন। বালক বালিকাদের এখন পূর্ণ অবসর, তাহারা দল বাঁধিয়া মাঠের ধারে বনভোজনে মাতে।

সন্ধ্যার পর বালকদল গৃহস্থদের ঘরে ঘরে নূতন চাল, শাকসব্জী, মিঠাই সংগ্রহ করিতে বাহির হয় গান গাহিয়া। এ দিনে গৃহস্থদের সকলের ঘরেই পর্য্যাপ্ত শস্য, বাগানে প্রচুর তরি-তরকারি, সবাই মুক্ত হস্তে তাহাদের থলি ঝুলি ভরিয়া দেয়। অনেকে আবার তাহাদের উৎসাহ দিতে স্নেহভরে নব বস্ত্র, পয়সা, খেলনা প্রভৃতিও দান করে। পূর্ববঙ্গে এই চাঁদা ভিক্ষাকে বলে 'কুলের মাগন', আর বালকদল যে গান গাহিয়া তাহা সংগ্রহ করে তাহাকে 'কুলের মাগনের গান' বলে।

এ সকল গানের রচয়িতা অখ্যাত অজ্ঞাত গ্রাম্য কবিরা, সুরও তাহাদেরই দেওয়া ; এগুলিও অনেকটা ছড়া কাটার মতনই শুনিতে লাগে। বালকদলের উপযোগী। সহজ সরল কথাই সাধারণতঃ এ গানগুলিতে থাকে। গ্রাম্যবালকদের প্রধান ক্রিয়াকর্ম তো গরু চরানো—তাই আপনা হইতেই গানের মধ্যে গোকুল, যশোদা, আর গোপাল বা রাখালরাজের কথা আসিয়া পড়িয়াছে—

সাজ সাজ গো সব রাখাল।
কুলের মাগনে যাবে নন্দের গোপাল॥
সাজিয়া কাজিয়া গোপাল নুপুর দিল পায়।
ঘর থেকে বাহির হতে নিষেধ করে মায়॥
সাজ সাজ বলিয়ারে নগরে পড়ল ধ্বনি।
আজিকের মাগনে যাবে আমাদের নীলমণি॥
সাজিয়া কাজিয়া গোপাল মুখে দিল পান।
ঘর থেকে বা'র হল যেন পূর্ণিমার চাণ॥
সাজ সাজ বলিয়ারে নগরে পড়ল সাড়া।
আজিকে মাগনে মোরা যাব সকল পাড়া॥

সাজিয়া কাজিয়ার অর্থ সাজিয়া গুঁজিয়া এবং চাণ ও চাঁদ একই। বাংলাদেশে 'কানুছাড়া গতী নেই'—তাই বৃন্দাবন লীলাই এ গানেরও প্রধান উপজীব্য। নৌকাখণ্ডের গল্পটি বালিকাদের বেশ উপভোগ্য বলিয়া মনে হওয়াতে অনেক গানে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন—

পার করিয়াছে, আমরা যাব মথুরা নগরে।
পার কর্‌রে ওরে কানাই, ডাকি কূলে রয়ে
মথুরাতে বেচা কিনার সময় গেল বয়ে॥

(দ্বিতীয় জন) সব সখি পার করিতে লব আনা আনা,
রাধিকারে পার করিতে লব কানের সোনা॥

দিনমানের গোচারণের স্মৃতি অকস্মাৎ গায়কদের মনে আসিয়া যায়। তাহাদের জীবন তো সেই ধেনু গুলিকেই কেন্দ্র করিয়া আবর্তমান, তাই অতি স্বাভাবিক ভাবেই এ গানে তাহাদের কথা আসিয়া পড়ে—

কানাই বলেরে শ্রীদাম
বেলা গেল বিলম্বে আর কার্য্য নাই॥
বেলা গেল, সন্ধ্যা হ'ল, রবি গেল তল,
বিলম্বের আর কার্য্য নাই ধেনু লয়ে চল॥
ধবলী, শ্যামলী গাই পালের প্রধান
হারায়ে ধবলীর বাছুর উড়িল পরাণ॥
গাছে থাক পাখীগণ নজর বহু দূর,
এই পথে কি যাইতে দেখেছ ধবলীর বাছুর।
দেখেছি দেখেছি বাছুর কালিন্দীর তীরে,
গলায় ঘণ্টা পায়ে ঘুমুর চলেছে ধীরে ধীরে॥

অনেক 'মাগন গানে' সমাজ-চেতনামূলক গভীর ইঙ্গিত রহিয়াছে, পল্লী সংস্কারের আহ্বান আছে, বৈজ্ঞানিক যুক্তিও রহিয়াছে। কচুরি-পানা এবং বিলিতি পানাকে পূর্ববঙ্গের অনেক স্থানে 'টাগই' বলে—এগুলি যেভাবে আমাদের ক্ষতি করে, অন্য কোন আগাছাই তাহার সিকিও করিতে পারে না! পানা ধ্বংস করিয়া গ্রামের জলাশয়গুলিকে পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য মাগনগানে উদাত্ত আহ্বান আছে—

আচম্বিতে টাগই দেশে এল, দেশ লুটে খেল।
যত ছিল ছেলে-চাষা মাঠে চলে গেল,
ক্ষেতের মধ্যে টাগই দেখে বাড়ী ফিরে এল॥

* * *

সবে মিলি সেইগুলিকে গরুরে খাওয়াইল।
আঘন মাসে ক্ষেতের টাগই উল্টা করা হল;
মাঘ ফাগুনে সবে তাতে আগুন লাগাইল॥
আগুনে পুড়িয়া টাগই ছাই হইয়া গেল।
চাষের মাটির সঙ্গে তাহা সকলই মিলিল॥
এরূপে সকলে টাগই মারিতে লাগিল।
তবু বছর বছর টাগই বাড়িয়া চলিল॥
শস্য জল সবই টাগই নাশিতে লাগিল।
এ শত্রুকে তাড়াইতে সবে হার মানিল॥

ঘেঁটুর গান দক্ষিণ বঙ্গের অন্যতম বিশিষ্ট গোষ্ঠীসংগীত। ২৪ পরগণা, হুগলী এবং হাওড়ার গ্রামে গ্রামে এ গান এখনও শোনা যায়। ঘণ্টাকর্ণের অপভ্রংশ 'ঘেঁটু'। গল্প আছে যে, ঘণ্টাকর্ণ নামে একজন অসুর শ্রীকৃষ্ণের নাম শুনিবে না বলিয়া কানে ঘণ্টা বাঁধিয়া রাখিত। ঘণ্টাকর্ণকে ব্যঙ্গ করার ছলে যুগ যুগ ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণভক্ত বাঙ্গালী তাহাকে লইয়া গানের মাধ্যমে উল্লাসে মাতে।

ফাল্গুন সংক্রান্তিতে ঘেঁটুর পূজা হয়। হাটের মাঝে 'কেলে হাঁড়ী' রাখিয়া সর্বজনসমক্ষে তাহা পদাঘাতে ভাঙ্গাই ঘেঁটু পূজা অর্থাৎ ভগবদ্-বিদ্বেষী ঘণ্টাকর্ণের দর্পচূর্ণ করাই এ পূজার মূল উদ্দেশ্য। তাহার পূর্বে সারা ফাল্গুন মাস ধরিয়া বালকদল সাজগোজ করিয়া প্রতি সন্ধ্যায় গৃহস্থদের ঘরে ঘরে গান গাহিয়া বেড়ায়। তাহাদের মধ্যে একজন সাজে ঘেঁটু, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া অন্য সকলে নানা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে, সেও সাধ্যমত গান গাহিয়া জবাব দেয়।

কালের পরিবর্ত্তন হইতেছে—সঙ্গীতের মধ্যেও সমাজ-চেতনার ঢেউ আসিয়াছে, আজ তাই ঘেঁটুর মারফতে অন্য নানা বিষয়ের সমাবেশ হইয়াছে। নূতন করিয়া ঘেঁটু গানের মারফতে দেশের সাম্প্রতিক দুঃখ-কষ্টের নানা ফিরিস্তি যোগ করিয়াছে। রাজনৈতিক চেতনার দিনে, এ গানের সুযোগে জাতীয় আন্দোলনের নব রূপ দেখা দিয়াছিল।

বালকদের মুখে পাকামি মনে হইলেও এসব গানে নানা উপদেশ, নানা ঘরোয়া নীতিকথা প্রভৃতিও রহিয়াছে। পল্লীর লোকের এখনও বিশ্বাস—ঘেঁটু পূজা করিলে দাদ, খোস প্রভৃতি চর্মরোগ হয় না, তাই চর্মরোগাক্রান্ত বালকরাই এ গানের পুরোভাগে অংশ গ্রহণ করে—

আজ আনন্দে ঘেঁটু লয়ে সঙ্গে
নাচিয়া নাচিয়া চল সবে যাই।
মনের আনন্দে দাও গো পূজা
এমন দিন ত আর হবে নাই॥
খোস চুলকুনা ঘেঁটু দিছিল গায়
সতী নারীর বীর পতির পায়।

বামে দাঁড়ায়ে সতী নারী
পতি বিনা সতীর গতি নাই ॥

সংক্রান্তির দিনে ঘেঁটুর পূজার আয়োজনে কিশোরী-বেশী কিশোরদল চাল ডাল, বাগানের ফুল, দুর্বাঘাস, হলুদ লইয়া নৈবেদ্য সাজায়। ঘেঁটুর পূজা মানেই কিন্তু ঘেঁটুর বিবাহ—তাহার জন্য সীতাপুরের বাসনা নামিকা এক পাত্রীকে ঠিক করা হইল, তাহার গায়ে হলুদের আয়োজন হইল, জল সইবার ব্যবস্থা হইল—

ঘেঁটু রাজার জন্যে কনে দেখতে যাই কজন,
সীতাপুরে আছে মেয়ে, নামটি বাসনা ॥
মেয়ের বয়সের নেই গাছ পাথর
আশীর কম হবে না।
হবে যেটি ঘেঁটুর কনে, কুলোয় শুয়ে দুধ খায় দু বেলা ॥

জল সইতে গিয়া সবাই ঘেঁটুর রূপগুণ লইয়া নানাপ্রকার ঠাট্টা, বিদ্রূপ, হাসাহাসি করিতে লাগিল—

সাধের মালা রইল গাঁথা বরণ ডালাতে
ঘেঁটুর রূপ দেখে আজ বিরূপ হলাম আমরা সবেতে ॥
আ মরি কি রূপের গঠন দেখে গা'টা করছে কেমন
গলা সরু মাজা মোটা টাক ধরেছে মাথাতে ॥
কম হয়েছে চোখের জ্যোতি, ঝোল হয়েছে বুকের ছাতি,
দাঁতগুলো সব নড়্‌তেছে, চুল নাই চোখের ভুরুতে ॥

ক্রমে ক্রমে বাংলার চিরপরিচিত তর্জার লড়াই সুরু হইল। একদল বালক ঠাট্টা করিয়া নানা প্রশ্ন করিলে ঘেঁটুও তাহার জবাবে গান গাহিয়া উত্তর দিতে লাগিল। হরিবিদ্বেষী অশুদ্ধ ঘেঁটুকে তাহারা জল শুদ্ধ করিয়া লইতে বলিল—

জল শুদ্ধ করিয়া লও, হাত পা তোমার ধোও।

ঘেঁটু পবিত্র হইবার জন্য হরিগুণ গান করিয়া বলিল—

ভাগ্যমানে কাটায় পুকুর চণ্ডালে কাটে মাটি।
কুমোরের কলসী, কাঁসারির ঘটি।
জল শুদ্ধ, স্থল শুদ্ধ, শুদ্ধ মহামায়া
হরিনাম করিলে পরে শুদ্ধ হয় আপন কায়া ॥
(বল হরি হরি, হরি হরি বল রে)

বাংলাদেশের কৃষিজীবী সমাজের বালকদলের নির্দিষ্ট কাজ গোচারণ। তাহাদের জীবন ধেনুরদল আর গোষ্ঠ ভূমিকে কেন্দ্র করিয়াই আবর্ত্তিত। কেবলমাত্র বাংলাদেশ কেন সমগ্র ভারতবর্ষের Pastoral Lifeকে অবলম্বন করিয়াই তো গোষ্ঠী সংগীতের সৃষ্টি হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণ আর গোকুলের রাখাল বালকের দল, ধেনুগণ আর যমুনার কালোজলই তো ভারতবর্ষের সংগীতের একটা প্রধান বিষয়বস্তু।

গো-চারণের নিত্য নৈমিত্তিক কাজকে লৌকিক জীবনে সহজ স্বাভাবিক করিয়া লওয়া হইয়াছে। রাখাল বালকেরা ঐ সব গান গাহিয়াই তপ্ত দিনের সারা বেলা মাঠে মাঠে কাটাইয়া দেয়। তাহাদের এ 'গোঠের গান' কিন্তু কেবলমাত্র গোষ্ঠকে কেন্দ্র করিয়াই রচিত নয়, সাংসারিক তুচ্ছ কথাকে অবলম্বন করিয়াও তাহাদের গানে মাঝে মাঝে অনেক পারমার্থিক ইঙ্গিতও আসিয়া গিয়াছে।

বৈষ্ণব কবিরা—গোকুলে শ্রীকৃষ্ণ বলরামের ধেনুচারণের লীলাকে আশ্রয় করিয়া ভগবানের লীলারই বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এ গানগুলিতে রাখালদের সারল্যমণ্ডিত আন্তরিকতার মধ্যে আধ্যাত্মিকতাকে অতিক্রম করিয়া লৌকিক জীবনের ভাবই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। বাৎসল্যের সুমধুরায়িত রসে এ গানগুলি ভরপুর—সেই সকালবেলায় কখন ছেলে গরু লইয়া কোন দূর মাঠে বাহির হইয়াছে, তাহার পর বৈশাখের প্রখর রৌদ্রে, শ্রাবণের অবিশ্রাম বর্ষণে, মাঘের দুরন্ত শীতে সারাদিন কি করিয়া কাটাইতেছে, তাহার জন্য মায়ের প্রাণ উদ্বেগে আকুল হইয়া থাকে। রাখালরাও সারা বেলা মাঠে সমবয়সী সখাদের সঙ্গে কলরবে, ধেনুদের তদ্বিরে ক্লান্ত হইয়া পড়ে ; কখন ঘরে গিয়া মায়ের কোলে আশ্রয় পাইবে তাহার চিন্তায় অস্থির হইয়া উঠে। মা হয়ত এতক্ষণে বার বার ঘর বাহির করিতেছে, হয়ত দীঘির পাড়ে গিয়া তাহার জন্য পথচারীদের প্রশ্ন করিতেছে। ঘরে বেগুন পোড়া দিয়া তপ্ত ভাত রান্না করা আছে। রাখাল ছেলের তাই জল খাইতে বিষম লাগে—

মনটা কেমন করে আমার বাড়ীত ফিইর‍্যা যাইতে চায়।
বন্দরে পাই চাইয়া রইছে।
আমার কাঙ্গালিনী মায় গো আমার দুখিনী মায় ॥
ক্ষেণে বার মা রান্নাঘরে
ক্ষেণে যায় মা দীঘির পাড়ে
উঁকি মাইর‍্যা চাইয়া দেখে
দেখা যায় কি নাইও যায়।
আমারে দেখা যায় কিনা যায় গো ॥
বাইগুন পোড়া ভাত থাইয়া মায়
ঘরের মাইঝে শুইতে যায়।
ক্ষেণে আইস্যা পীড়ার ওপর উঁকি মাইর‍্যা চায়।
এরই লাইগ্যা পানি খাইতে
আইজ আমার বিষম খায় ॥

সাঁঝবেলায় গোয়াল ঘরে আবার আগুন জ্বালাইতে হইবে—না হইলে মশার কামড়ে গাই বাছুর সারা রাত ছট্‌ফট্ করিয়া মরিবে। তারপর মায়ের কোলে শুইয়া পূর্ণবিশ্রাম—

গাই বাছুরের পেট ভইরাছে বেলাও ত আর নাই।
মায়ে জ্বালাইছে বাতি চল গৃহে যাই ॥
গোয়াইল ঘরে ধোঁয়া দিয়া তপ্তা ভাত গিয়া খাই।
মায়ের বুকে মাথা রাইখ্যা শুইয়া নিদ্রা যাই রে ॥

'মৈমনসিং গীতিকা'র মধ্যে যেমন সংসার জীবনের লৌকিক প্রেমের সুস্পষ্ট চিত্র পরিস্ফুট—এক শ্রেণীর গোষ্ঠ গানেও ঠিক্ সে রকম মানব হৃদয়ের উষ্ণ স্পর্শ অনুভূত হয়। আবার মাঠে চাষ করিতে গিয়া কৃষক রৌদ্র বৃষ্টিতে কষ্ট পাইতেছে, তাহার বিলম্বজনিত বিচ্ছেদে কৃষাণ বধূ ভাবিয়া অস্থির—

ঘরের কোণায় থাকিরে আমি, তুমি থাকরে মাঠে,
কাঠ ফাঠা রইদে রে তোমার মাথা ফাটে।
তোমার লাগিয়া বন্ধুরে আমি ছেঁওয়ায় পাইবে তাপ।
কি জানি, কোন্ জন্মে রে বন্ধু কইরাছিলাম পাপ ॥
শাওনের রৈদরে বন্ধু নিমের পাতার তিতা ;
বিচ্ছেদ হৈতে অনেক ভাল তৈতে কাঠের চিতা ॥

কাশ্মীর



শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

উলারের জলের মাঝে (বন্দীপুরা নালা যেখানে মিশেছে) একটী পরিত্যক্ত দ্বীপ ও তার ওপর কিছু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আছে। এ দ্বীপটির নাম লঙ্কা বা জৈন লঙ্কা। জৈন-উল-আবদীন এই দ্বীপটির সংস্কার কোরে এখানে বারদোয়ারী ও কয়েকটী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করান ; সেইজন্য তাঁর স্মরণে এর বর্ত্তমান নাম জৈন-লঙ্কা। এই লঙ্কার অস্তিত্ব কিন্তু আরও প্রাচীন। কথিত আছে এই দ্বীপটি পূর্ব্বে আরও অনেক বড় এবং ঘন বসতিপূর্ণ ছিল। এ লঙ্কার রাবণ, রাজা সুন্দরসেন—যেমন অত্যাচারী তেমনি দুশ্চরিত্র ছিল। রাজার অনুকরণে প্রজারাও ক্রমে তেমনি চরিত্রহীন ও নিষ্ঠুর হোয়ে উঠল। এর ফলে ভগবানের অভিশাপে একদিন এই নগরীটি হ্রদের জলের নীচে নিমজ্জিত হোয়ে নিশ্চিহ্ন হোয়ে গেল। অতীত ইতিহাসের এই সূত্র ধরে বোধহয় জৈন-উল-আবদীন আবিষ্কার করেন এই জলমগ্ন সহরটাকে। ডুবুরী দিয়ে তিনি জলের ভেতরের বহু মন্দির ও প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পান এবং নূতন কোরে মাটী ফেলে আবার এই দ্বীপটিকে সৃষ্টি করেন। সেই নূতন দ্বীপে আবার গোড়ে উঠল মন্দির, মসজিদ অট্টালিকা—এবং তার নূতন নামকরণ হোল জৈন লঙ্কা। কিন্তু কালের করাল কবলে আবার তা ধীরে ধীরে ধ্বংস হোল, লঙ্কা আজ হতশ্রী, বাইরে থেকে চোখে পড়ে তার ওপরের আগাছা, তারই ভেতরে এখানে ওখানে পড়ে আছে বড় বড় পাথরের থাম-ভাঙ্গা খিলান, একটী বড় হিন্দু মন্দিরের নীচের কিছু অংশ। বর্দ্ধমান বনানী এগুলিকেও অবিলম্বে বিলুপ্ত কোরবে বোলেই মনে হয়।

সুকুর-উদ্দিন পাহাড়ের মাথায় বাস দাঁড়াল, উলারের দৃশ্য দেখা ও ফটো তোলার জন্য। প্রায় সকল কাশ্মীরযাত্রীই সঙ্গে একটা ক্যামেরা নেন, কিনেই হোক বা চেয়েই হোক। এটা একটা ফ্যাশন—অথবা কাশ্মীরের বহুশ্রুত দৃশ্যাবলীর ছবি নিজের হাতে তোলার আনন্দের জন্যও হয়ত। এখান থেকে উৎরাই কোরে সমতল ভূমিতে খানিকটা এসে বেলা প্রায় ২টোয় বাস থামলো ওয়াটলাবের ডাকবাংলার সামনে।



নিশাতের নির্ঝরিণী



শালিমারের একাংশ

উলারের পশ্চিমতীরে ওয়াটলাব, সেখানে জলের ধারে কমলবনের মাঝে মধ্যাহ্ন ভোজন হবে, তার একটা মানসিক সুন্দর চিত্র সকলের মনে ছিল, কিন্তু কোথায় উলারের কালোচিকণ জল? ড্রাইভার বোল্লে এপ্রিল মে মাসে এখানে জল থাকে ; এখন জল প্রায় তিন মাইল দূরে সরে গেছে। সকলেই ক্ষুণ্ণ হোলেন, কেউ কেউ খাপ্পা। তাঁরা যাবেনই উলারের জলে। ড্রাইভার বল্লে—এক দেড় ঘণ্টা সময় এখানে আপনারা পাবেন, যা খুসী কোরতে পারেন। যাত্রীরা সব ছড়িয়ে পোড়লেন। ডাকবাংলার মাঠে বোসে অনেকেই খাওয়া দাওয়া কোরলেন। বলা-

বাহুল্য খাবার সকলেই শ্রীনগর থেকে সঙ্গে এনেছিলেন। ডাকবাংলার কাছেই আছে একটি ছোট ঝরণা, মালীটাও যথেষ্ট সাহায্য কোরলে। পাহাড়ের কোলে নির্জ্জন সমতলভূমি হিসাবে ওয়াটলাব ভাল লাগলো—এছাড়া এর অন্য কোন আকর্ষণ নাই। ওয়াটলাব ছেড়ে কয়েক মাইল এসে গাড়ী থামলো সোপুর সহরে। পূর্ব্বেই বোলেছি অবন্তি বর্ম্মণের ইঞ্জিনিয়ার সূর্য্য এখানে বিতস্তার খাল কেটে উদ্বৃত্ত জল বের করার ব্যবস্থা করেন। তাঁরই নামে এর নাম হয় সূর্য্যপুর, ক্রমে তা রূপান্তরিত হোয়েছে সোপুরে। এটী বন্দীপুরার চেয়ে বড় সহর। এখান থেকেই যেতে হয় সারদা মহাপীঠ। এখানকার বাজারে আপেল আখরোট শ্রীনগরের চেয়ে সস্তা। ১৮।২০ সের ওজনের একটি আপেলের বাক্সের দাম ১০।১১৲ টাকা। সোপুর সহরটীও পাকীস্থানী হানাদাররা দখল করে, কিন্তু এটী তারা পুড়িয়ে ধ্বংস করেনি। লুঠ, নারীধর্ষণ, হিন্দু-নিধন, এসব যথারীতিই হোয়েছিল; কিন্তু সহরটীর কোন ক্ষতি করেনি, কারণ বোধ হয় তখন পাকীস্থান ধোরেই নিয়েছিল যে কাশ্মীর তাদের দখলে এসেই গেছে; কাজেই ব্যবসা বাণিজ্যের বন্দরটীকে নষ্ট না করাই উচিত। অবশ্য ৩।৪ দিন পরেই তাদের এ সহরটী ছেড়ে



ডাল দরজার কাছে

পালাতে হয়। কাশ্মীর উপত্যকার অন্যতম পার্শ্ব অধিত্যকা "লোলাব অধিত্যকা" যাবার প্রধান পথও সোপুর। বন্দীপুরা, আলুসা, দোবগা এবং বারামুল্লা থেকেও লোলাব অধিত্যকায় যাওয়া যায়, কিন্তু সোপুরের রাস্তায় গেলে মোটর বা টাঙ্গা অধিত্যকার দরজা পর্য্যন্ত যায়; সোপুর থেকে ২১ মাইল পর দ্রুগমুল্লা এবং তার তিন মাইল পর কুপওয়ারা। এখান থেকেও সারদা মহাপীঠে যাবার একটি রাস্তা আছে। কুপওয়ারা থেকে ৪ মাইল পথ পাহাড়ের কোলে কোলে থুমব্রিয়াল গ্রামে গেছে, এখান থেকে একটী রাস্তা সেতু পেরিয়ে গেছে লোলাব, অন্যটী গেছে কোট্রাস্। এই অধিত্যকার প্রাকৃতিক দৃশ্যও বেশ মনোরম এবং লোলাব থেকে আরও আগে অনেকগুলি ছোট-বড় পাহাড়ী গ্রামে এগিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু এ অঞ্চলটা আজ আমাদের অধিকারের বাইরে, পাকীস্থানের আওতায়।

সোপুর থেকে অনেকখানি সমতল পথ দিয়ে বিকেলের দিকে বাস এল 'বারামুল্লা' সহরে। কাশ্মীর উপত্যকার এই অঞ্চলের এটী বৃহত্তম সহর ছিল। 'কাবালী' অর্থাৎ কাবুলী হানাদারদের হত্যায় ও লুণ্ঠনে সহরটী শুধু সর্ব্বস্বান্তই হয় নাই, প্রায় নিশ্চিহ্ন হোয়েছিল—সহরের সামান্য কয়েকখানা বাড়ী-মাত্র এদের অগ্নিদাহের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিল। সে ক্ষতের চিহ্ন আজও সহরের প্রায় সর্ব্বত্রই চোখে পড়ে, তবে খুব দ্রুত তা মিলিয়ে গিয়ে, নূতন সহর গড়ে উঠেছে। সে দুর্য্যোগ রাত্রির দুঃস্বপ্ন কাটিয়ে এখানের লোক এখন যেন নূতন প্রভাতে নূতন আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জেগে উঠেছে। আবার বাজার হাট জমে উঠেছে, মন্দির মাথা তুলেছে, কাঠ ও ইটের ইমারৎ গড়ে উঠেছে। এখানে একটী সিনেমা আছে ও সৈন্যদের বিরাট এক ছাউনি আছে।

বারামুল্লায় ঢুকতেই একটী ছোট বাড়ীর দেওয়ালের গায়ে উর্দ্দুতে লেখা মর্ম্মর ফলকের কাছে বাস দাঁড়ায়। এটী হোল শহীদ শেরওয়ানীর স্মৃতি ফলক। শেরওয়ানী আবদুল্লা সাহেবের সমর্থক এবং মুসলীম-লীগ-বিরোধী। তিনি এ অঞ্চলের প্রতিপত্তিশালী নেতা ছিলেন। পাকীস্থানীরা যখন বারামুল্লা দখল কোরলে তখন তারা শেরওয়ানী সাহেবকে ধোরল শ্রীনগর দখল করবার সোজা পাহাড়ী



পানিয়া ভরণে সেঁইয়া

পথ দেখিয়ে দেবার জন্যে। শেরওয়ানী সাহেব তাদিকে খানাপিনা ও ভোজে আপ্যায়িত কোরে বারামুল্লায় ৩।৪ দিন কাটিয়ে দেন এবং পরে এই সব হানাদার সৈন্যকে গুলমার্গের ঘুর পথে নিয়ে যান। গুলমার্গ ধ্বংস কোরে যখন তারা বুঝতে পারলো যে প্রায় বিশ মাইলের ঘুর পথে তারা এসেছে তখন শেরওয়ানী সাহেবকে তারা সঙ্গে নিয়ে বারামুল্লায় ফিরে এল এবং তার এই বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি স্বরূপ একটী দেওয়ালের ধারে কাঠের থামে তাকে বেঁধে গ্রামের সকলকে সেখানে জোর করে জড় কোরলে এবং শেরওয়ানীর সর্ব্বাঙ্গ প্রথমে বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত কোরলে, তারপর ১৪টী গুলী কোরে তাকে হত্যা কোরল। এতেও ক্ষান্ত না হোয়ে তার নাক কেটে কপালে লিখে দিল "লোকটী বিশ্বাসঘাতক, মৃত্যুই এর শাস্তি।" মৃত দেহ প্রকাশ্য স্থানে একটী গাছে ঝুলিয়ে রেখে দিল। পাকীস্থানীদের কাছে সেরওয়ানী ছিলেন বিশ্বাসঘাতক, কিন্তু কাশ্মীরের তিনি রক্ষাকর্ত্তা। কাশ্মীর সরকারের সমস্ত সামরিক বাহিনী পাকিস্থানী

পঙ্গপালের কাছে পঙ্গু হোয়ে গিয়েছিল। বাইরে থেকে সাহায্য এসে না পৌছান পর্য্যন্ত হানাদারদের ঠেকিয়ে রাখতেই হবে। বিজয়োন্মত্ত কাবালীরা যদি এইভাবে ভুল পথে না গিয়ে পোড়ত, তাহ'লে ভারতের সামরিক সাহায্য কোন কাজেই লাগত না, কারণ শ্রীনগর ও বিমান ঘাঁটি দখল হোয়ে গেলে সাহায্য নেবার কেউ থাকতো না। কাজেই শত্রুকে বিপথে বিভ্রান্ত কোরে যে সময়টা শেরওয়ানী সাহেব ভারতীয় বাহিনীকে দিয়েছিলেন তার ফলেই কাশ্মীরের ইতিহাস পরিবর্ত্তিত হোয়ে গেল। সেই সময়টুকু না পেলে আজ সমস্ত কাশ্মীর পাকিস্থানের কবলিত হোত। উপরোক্ত কাহিনী বারামুল্লায় শুনেছিলাম, কিন্তু পরে অন্যত্র পড়েছি যে শেরওয়ানী সাহেব ভারতীয় সৈন্যদের দুর্গম অচেনা পথ দেখাবার জন্য স্কাউটের কাজের ভার নিয়েছিলেন। সম্বল এলাকায় তার মোটর বাইক খারাপ হওয়ায় তিনি যখন সেটা মেরামত কোরছিলেন তখন শত্রুসৈন্য তাকে ধোরে ফেলে ও তার প্রতি উক্ত ব্যবহার করে। মকবুল শেরওয়ানী সাহেবের দেশপ্রেম, সাহস ও আত্মত্যাগ অবলম্বনে ইতি-



সানামার্গের পথে

মধ্যেই কাশ্মীরে নাটক ও লোক-সঙ্গীত রচিত হোয়েছে এবং বারামুল্লার নূতন নামকরণ হোয়েছে মকবুলাবাদ।

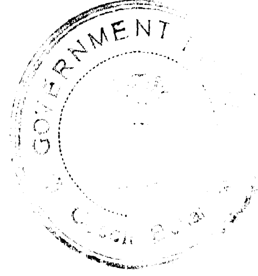
কিন্তু বারামুল্লার আর একজন আত্মত্যাগী কর্ত্তব্যপরায়ণ দেশপ্রেমিক সৈনিকের স্মৃতিসৌধ থাকা উচিত ছিল—যিনি নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের কোন হিসাব না কোরে অগণিত শত্রু-সৈন্যের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পোড়ে তাদের গতিরোধ করেন—নিজের প্রাণের বিনিময়ে। এঁর নাম লেঃ কর্ণেল দেওয়ান রঞ্জিত রায়। সেরওয়ানীকে শত্রুপক্ষ বধ কোরে সহীদ নাম দিয়েছে, কিন্তু শ্রীরঞ্জিত রায় সামান্য সৈন্য নিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুকে নিজে বরণ কোরে নেন কর্ত্তব্যের আহ্বানে। কাশ্মীরের ভারত সরকার প্রথম যে সৈন্যদল বিমানে পাঠালেন লেঃ কর্ণেল রঞ্জিৎ রায় ছিলেন তার অধ্যক্ষ। বিমান ঘাঁটাটি শত্রুদের কবলে কিনা তাও তখন জানা নাই। দেশে কোন শাসন শৃঙ্খলা নাই; রাজার মুসলমান সৈন্যের অধিকাংশ শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছে; রাজা জম্মুতে পলাতক, প্রধান মন্ত্রী দিল্লীতে—এমন অবস্থায় লেঃ কর্ণেল রায় মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে শ্রীনগরে পৌছলেন। রাস্তা ঘাট জানা নাই, পার্ব্বত্য পথের কোন অজানা ঘাঁটি থেকে শত্রুসৈন্য ঝাঁপিয়ে পোড়বে তার ঠিকানা নাই, অধিকাংশ উপত্যকাই শত্রুদের হাতে, স্থানীয় মুসলমানদের কে শত্রু কে মিত্র চেনা মুস্কিল—এমনি এক আবহাওয়ায় শ্রীরায়কে শত্রু সৈন্যের সম্মুখীন হোতে হোল। পরবর্ত্তী সাহায্য কখন আসবে জানা নাই; এদিকে বিরাট শত্রুবাহিনী ক্রমে শ্রীনগরের দিকে এগিয়ে আসছে; বারামুল্লায় তাদের প্রধান ঘাঁটী। এ অবস্থায় এই সৈন্যাধ্যক্ষ অপেক্ষা কোরতে পারলেন না; তাঁকে ভার দেওয়া হোয়েছে শত্রু সৈন্যের গতি-রোধের জন্য। শেষে তিনি মাত্র এক কোম্পানী সৈন্য নিয়ে বারামুল্লার দিকে এগিয়ে গেলেন। হানাদাররা এই প্রধান রাজপথটী ধরে অগ্রসর হয় নাই, বাধাও দেয় নাই; বরং তারা চেয়েছিল এই পথ দিয়ে ভারতীয় সৈন্য এলে পেছনের পাহাড়ী পথ থেকে তাদের ঘেরাও কোরে পিষে ফেলবে, তাছাড়া তাদের একাংশ ভিন্ন পথ দিয়ে শ্রীনগরের দিকে এগিয়ে চলেছিল। কাজেই প্রায় বিনা বাধায় লেঃ কর্ণেল রায় বারামুল্লায় এসে পৌছলেন। বারমুল্লার উন্মুক্ত প্রান্তরে যুদ্ধ আরম্ভ হোল। আট দশ হাজার সশস্ত্র শত্রুসৈন্য একদিকে, আর লেঃ কর্ণেল রায়ের এক কোম্পানী মাত্র হিন্দু সৈন্য অন্যদিকে—কিন্তু এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেশপ্রেমিক মুষ্টিমেয় সৈন্যদলের কেউ এক পা পিছু হোটলো না'—বরং অভিমন্যুর অমিত তেজে এগিয়ে গিয়ে শত্রুসৈন্যকে ত্রস্ত চকিত কোরে তুললো। শত্রুসৈন্যরা তখন সঠিক জানতো না পেছনে এদের কত শক্তি আছে—তাই এদের দুর্ব্বার বিক্রমে বিভ্রান্ত হোয়ে পিছু হোটল। এ যুদ্ধে লেঃ কর্ণেল রঞ্জিৎ রায় এবং তার সাহসী সেনানীর অধিকাংশই প্রাণ দিলেন, কিন্তু তার ফলে শত্রুসৈন্যের অপ্রতিহত প্রভঞ্জন-গতি রোধ হোল। এর পর অবশ্য অন্যান্য ভারতীয় সৈনিকেরা ৮ই নভেম্বর বিকালে বারামুল্লা থেকে শত্রুসৈন্য বিতাড়িত করেন। কিন্তু বারমুল্লার প্রান্তরে এই বীর সেনাপতির সাহস ও শৌর্য্য মহারাণা প্রতাপসিংহ বা গ্রীসের থার্ম্মোপলিস যুদ্ধের বীরদের কীর্ত্তির চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তাঁর এই স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণের দুর্জ্জয় সাহস অনেক পরে ১৯৫২ সালের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ কর্ত্তৃক মহাবীরচক্র পদক দান দ্বারা স্বীকৃত ও সম্মানিত হোয়েছে। এই পদক দেওয়া হোয়েছে তাঁর বিধবা পত্নী শ্রীমতী শীলা রায়কে। সেই সঙ্গে ঝানগরে এমনি সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ কোরে প্রাণ দেওয়ার জন্য ব্রিগেডিয়ার ওসমানকেও মহাবীরচক্র দেওয়া হয়েছে (তাঁর ছোট ভাই মহম্মদ সোভনের হাতে)। ব্রিগেডিয়ার ওসমানের নামে শ্রীনগরে গান্ধীপার্কের পাশেই ওসমান পার্ক হোয়েছে। কিন্তু লেঃ কর্ণেল রায়ের স্মৃতির জন্যে অথবা অন্যতম মহাবীরচক্র সম্মানভোগী স্বর্গতঃ সেনাপতি লেঃ কর্ণেল ইন্দ্রজিৎ সিংএর স্মৃতির জন্যে কাশ্মীর সরকার কোন কিছু করেন নাই—এটা বেদনাদায়ক। কংগ্রেসী রাজনীতিতে এ ঘটনাটা সাম্প্রদায়িক নয়, কিন্তু এর উল্লেখ হয় ত সাম্প্রদায়িক বলে গণ্য হবে।

১৮৯৮ খৃঃ অব্দের ১১ই অক্টোবর স্বামী বিবেকানন্দ বারামুল্লা আসেন। এখানে তাঁর জীবনে একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। একটী মুসলমান ফকিরের এক চেলা মাঝে মাঝে তাঁর কাছে আসত। একদিন তার ভয়ানক জ্বর ও মাথাধরা হোয়েছে-শুনে স্বামিজী দয়াপরবশ হোয়ে

তার মাথায় আঙ্গুল দিয়ে কয়েক মিনিট টিপে ধোরতেই লোকটীর সব ভাল হোয়ে যায়—এতে লোকটী স্বামিজীর বিশেষ ভক্ত হোয়ে ওঠে। ফলে তার গুরু মুসলমান ফকির চেলা অবাধ্য ও হাতছাড়া হয় দেখে বিশেষ চটে যান। স্বামিজীকে ছেলেটীর সঙ্গে মিশতে নিষেধ করেন। তিনি একথা না শোনায় শেষে চোটে তাঁকে শাপ দেন—মাথা ধরা ও বমিতে তিনি এমন আক্রান্ত হবেন যে তাতেই তাঁকে কাশ্মীর ছাড়তে হবে। আশ্চর্য্যের বিষয় ফকিরের এই অভিশাপ অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল।

বারামুল্লা থেকে সংগ্রাম ও পট্টন হোয়ে (শ্রীনগর থেকে ১৯ মাইল) পূর্ব্বের রাওলপিণ্ডি—শ্রীনগর রাস্তা দিয়ে সোজা শ্রীনগরে ফিরলাম—একশো মাইলেরও বেশী বেড়িয়ে সন্ধ্যা সাতটায়। (পট্টনের প্রতিষ্ঠাতা শঙ্কর বর্ম্মণের আমলের (৮৮৩—৯০১) কয়েকটা ভাঙ্গা মন্দির আজও পট্টনে অতীত ঐশ্বর্য্যের সাক্ষ্য দেয়)। এই যাত্রাটীর মাথা পিছু ভাড়া ৮৲ টাকা।

(ক্রমশঃ)



জন্মাষ্টমী স্মরণে

শ্রীচাঁদমোহন চক্রবর্তী

আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে—দ্বাপর যুগের শেষ ভাগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্ম পরিগ্রহ করেছিলেন মানব রূপে। সেদিন ছিল ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা অষ্টমী তিথি—রোহিণী নক্ষত্র। সেই মহাপুণ্য স্মরণের দিন—শ্রীকৃষ্ণের অবতার তিথির দিনকে বলা হয় জন্মাষ্টমী।

শ্রীভগবান মানব রূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন তখনি—যখন জগৎ অধর্মে অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়—অসহায় হয় জনসাধারণ কোন অত্যাচারী রাজা বা কোন শক্তিশালী ব্যক্তির হাতে! তখন ধরিত্রী জননী দেবী কাঁদেন নীরবে তাঁর কোলের সন্তানদের ক্লেশ দেখে—অধর্মের অভ্যুত্থান দেখে। ধরিত্রী যখন কাঁদেন অসহনীয় পাপের ভারে ভগবান তখনই নেমে আসেন মর্ত্তলোকে মানব রূপে। দ্বাপর যুগে একবার কেঁদেছিলেন ধরিত্রী তাঁর ক্রোড়ের সন্তানদের যাতনা দেখে—তখন এই আর্য্যভূমিতে শয়তানের রূপ পরিগ্রহ করে জন্মগ্রহণ করেছিল কয়েকজন নরপতি—তাদের বিনাশের জন্য ও ধর্ম সংস্থাপনের জন্য শ্রীভগবান জন্মগ্রহণ করলেন মানবীর গর্ভে—সেই ভাগ্যবতী নারী দেবকী দেবী—মথুরাপতি কংসের ভগিনী।

রাজা কংস ছিলেন এক ভীষণ অত্যাচারী লোক—সমাজের সকল অনাচার, অবিচার মূর্ত্ত হয়েছিল তার মধ্যে। মথুরা রাজ্যের প্রজাকুল হল জর্জরিত তার অমানুষিক অত্যাচারে। দেশের সকল ধর্ম কার্য হল বন্ধ—ভগবানের নাম করলে শাস্তি পেত প্রজাবৃন্দ। ধার্মিক লোকেরা সর্বদা থাকত ভীত-ত্রস্ত। কারো পরিত্রাণ ছিল না তার হাতে—আপন পর জ্ঞান ছিল না। স্নেহের ভগিনী দেবকীর বিবাহ হল সাত্বিক বাসুদেবের সংগে সমারোহে—পিতা হল হৃষ্ট কিন্তু মহাপাপী কংস তার পিতাকে পূর্বেই করেছিল বন্দী। যখন টের পেল বাসুদেব একজন ধার্মিক ব্যক্তি—বাসুদেব ও দেবকীকে নিক্ষেপ করল অন্ধকার কারাগৃহে। দৈববাণী হল এই ভগিনীর গর্ভজাত পুত্র হবে তার হন্তা—রাক্ষস পরিণত হল মহা রাক্ষসে। লৌহ শৃংখলে বদ্ধ করল দেবকী বসুদেবে। স্বামী-স্ত্রী ডাকেন কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবানকে মুক্ত করতে। পরম পিতার নিকট পৌঁছিল তাদের করুণ আবেদন! একে একে সাতটি সন্তান প্রসব করলেন দেবকী, কিন্তু একটিও জীবিত রইল না। নরপশু কংস স্বহস্তে আছাড় মেরে হত্যা করল সেই পুষ্পের ন্যায় পবিত্র শিশুদের। এবার অষ্টম সন্তান এসেছে তাঁর গর্ভে। দেবকী স্বপ্ন দেখেন তাঁর গর্ভে এসেছেন গোলকপতি—শংখ চক্র গদাপদ্মধারী। বসুদেব ধ্যান করতে চক্ষু মুদ্রিত করেন, তিনি দেখেন দেবকীর গর্ভে এসেছেন তার আরাধ্য ঠাকুর। কি আশ্চর্য! এ কি কখন সম্ভব?

আজ রোহিণী নক্ষত্রযুক্তা অষ্টমী তিথি—ভাদ্র মাস। দেবকী অনুভব করছেন তার প্রসব আসন্ন—গভীর রজনীতে—বাইরে ভীষণ বজ্রধ্বনি ও বৃষ্টিপাত হচ্ছিল। সেই শুভক্ষণে কংসের কারাগারে আবির্ভূত হলেন স্বয়ং বিষ্ণু—শ্রীকৃষ্ণ রূপে। দেবকী বসুদেব বিস্ময়াবিষ্ট ভাবে দেখলেন তিনি এসেছেন—তাদের সেই স্বপ্নের ঠাকুর—ঠিক সেই চতুর্ভুজ মূর্তি কিন্তু সেই নবদূর্বাদলশ্যাম পরিণত হল অপূর্ব শিশুমূর্তিতে—সর্বাংগে বিচ্ছুরিত হচ্ছে দিব্য জ্যোতিঃ—অন্ধ কারাগার হল উদ্ভাসিত সেই দিব্য আলোকে। আ! হা! হা! কি সুন্দর মুরতি!

এদিকে কংস জানে ভগিনী তার পূর্ণগর্ভা—চারিদিকে রেখেছে সশস্ত্র প্রহরী—না পারে পালাতে কেহ নবজাত শিশুসহ। প্রতি দণ্ডে খবর দিচ্ছে দৌবারিক দেবকীর কারাকক্ষের সংবাদ। কিন্তু এ কি! কাহার মোহন স্পর্শে তমসাচ্ছন্ন হল সমস্ত রাজপুরী! রাজা কংস ও তার সশস্ত্র প্রহরীর দল হল সুপ্ত—গভীর নিদ্রামগ্ন। মহামায়ার মায়া!

দেবকী-বসুদেবের ভাবাবিষ্ট ভাব কেটে গেল—এখনই তো আসবে কংস—বধ করবে তাদের স্নেহের পুত্তলীকে। দেবকী দাদার নৃশংস প্রবৃত্তির কথা স্মরণ করে হল শঙ্কিতা—কোলে তুলে নিল নবজাত শিশুকে—দুই চোখের অশ্রুরাশিতে সিক্ত করল শিশুকে। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে স্বামীকে জানাল—দেবে না এবার শিশুকে নিষ্ঠুর কংসকে—সেইক্ষণে দৈববাণী হল কারাকক্ষে—রেখে আসবে এই

নবজাত শিশুকে গোকুলে গোপরাজ নন্দগৃহে সন্তপ্রসবা যশোদার ক্রোড়ে, আর নিয়ে আসবে যশোদার ক্রোড় হতে তার নবজাত কন্যাকে দেবকীর সূতিকাগৃহে। স্বামী-স্ত্রীর দুই গণ্ডে গড়িয়ে পড়ল আনন্দাশ্রু। কিন্তু বসুদেবের পায়ে যে শৃঙ্খল, কি করে যাবে এই শিশু নিয়ে! কিন্তু এ কি! বসুদেবের পায়ের শৃঙ্খল কোথায় গেল—সে যে মুক্ত! জয় ভগবান!—বলে বসুদেব নবজাত শিশুকে ক্রোড়ে নিয়ে অগ্রসর হলেন রুদ্ধ দ্বারদেশে—কি আশ্চর্য কাহার মোহন দণ্ড স্পর্শে কারাগারের রুদ্ধদ্বার গেল খুলে—প্রহরী হল গভীর নিদ্রামগ্ন। কংস-ভয়ে ভীত বসুদেব ভীতচকিত ভাবে চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখলেন, ঘোর তমিস্র রজনী—আকাশে ঘন ঘটা—নিস্তব্ধতা ভংগ করছে বৃষ্টির টুপ্‌টাপ শব্দ ও মেঘ-গর্জন। সমস্ত প্রাসাদপুরী নিঃশব্দ—প্রহরীরা তমসাচ্ছন্ন। বসুদেবের হৃদয়ে আজ এসেছে দুর্বার সাহস কিন্তু কংস ভয়ে ভীত—কখন এসে কংসের সৈনিক কেড়ে নেবে তার শিশু-পুত্র। নবজাত শিশুর দেহের দিব্য আলোকে আলোকিত হচ্ছে পথ। রাজপ্রাসাদের বাইরে এসে দেখলেন এক শৃগাল চলেছে সামনে পথ-প্রদর্শক রূপে। বসুদেব যমুনাতীরে এসে দাঁড়ালেন চিন্তিত মনে—কি করে তিনি যাবেন ওপারে। পথপ্রদর্শক শৃগাল কিন্তু নিঃশব্দে নামল যমুনার জলে—কি আশ্চর্য! পুণ্যতোয়া যমুনা যেন স্বেচ্ছায় পথরেখা করে দিলেন তার গর্ভে। হৃষ্ট মনে যন্ত্রচালিতের ন্যায় বসুদেব চললেন নদী পথে—পশ্চাতে তাকিয়ে দেখলেন সহস্র ফণা বিস্তার করে বাসুকী রক্ষা করেছেন তার শিশু পুত্রকে প্রবল বারীধারা হতে। বসুদেব তিমির রজনীর দুর্গম পথ অতিক্রম করে এলেন নন্দালয়ে। যোগমায়া প্রভাবে সুপ্তা যশোদার কোলে তার শিশুপুত্রকে রেখে ক্রোড়ে তুলে নিলেন যশোদার নবজাত কন্যাকে। আবার তেমনি ভাবে নিঃশব্দে ফিরে এলেন মথুরা রাজপ্রাসাদের অন্ধকার কারাকক্ষে—দেবকী অশ্রুসিক্ত নয়নে বুকে চেপে ধরলেন সেই অপূর্ব সৌন্দর্যময়ী যশোদা তনয়াকে।

কংস জানলো না মঙ্গলময়ের আবির্ভাব ও নন্দ গৃহের অভিযান। দুরাচার কংস জানে না অমৃত লোকের অমৃতের আস্বাদন। সে যে বহির্মুখী। যারা অন্তর্মুখী তাদের কাছে মঙ্গলময় শ্রীভগবান লীলা পুরুষোত্তম—ব্রজের কানু, সদা হাস্যময় অমৃতের উৎস। দেবকী বসুদেব, নন্দ-যশোদা সমস্ত ব্রজবাসী পেল সেই অমৃতের আস্বাদন কানায় কানায়। আর কংস ও তার অনুচরেরা পেল মহাকালের শীতল কর-স্পর্শ মৃত্যু।

তিনি এসেছেন আবার আসবেন এমনি আনন্দময় মূর্তি পরিগ্রহ করে আসবেন। যিনি তাঁকে চিনবেন তিনিই পাবেন অমৃতের আস্বাদন। তাকে আমরা দেখব সকলেই। কেহ মৃত্যু রূপে, কেহ বা অমৃত রূপ। হে অমৃতময়, আমাদের হৃদয়ের সব কলুষতা নষ্ট করো, অমৃতময় কর আমাদের কৃষ্ণ প্রেমে। প্রেম ধর্মে। তার জন্য প্রার্থনা করছি তোমার মঙ্গলময় পুনরাবির্ভাব—যাতে মুছে যায়, বিলুপ্ত হয় বিশ্বব্যাপী অনাচার, অবিচার! হে প্রভো; ধর্ম সংস্থাপন কর ভারতে দ্বিখণ্ডিত ভারত জননীকে এক করে।

তুমিই বলেছ—

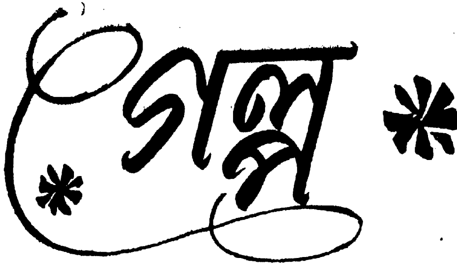
"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

নিগূঢ় রহস্য

শ্রীসুধীর গুপ্ত

প্রতিদিন হেরি মোর বাতায়নে বসি'—
প্রভাতের পৃথিবীর ঘুম হ'তে জাগা,
আশার আবেশে কাঁপা বিটপীর আগা,
আকাশের কূলে কূলে অরুণিমা লাগা;
আঁধারের আবরণ কোথা যায় খসি'
আলোর সহস্র-দল উঠে যে বিকশি';
সৌরভে সৌন্দর্য্যে বিশ্বে করে মাতোয়ারা,
বাধা-মুক্ত ক'রে দেয় জীবন-ফোয়ারা।

প্রতি রাতে আরবার শুব্ধ অন্ধকারে
জীবন-জোয়ারে আসে ভাঁটার বিরতি;
নীলাকাশে নিভে আসে নীলকান্ত-জ্যোতি
থেমে আসে ফোয়ারার অফুরন্ত গতি।
বিশ্ব যেন গুটাইয়া আনে আপনারে
ধ্যান-শান্ত বিশ্বাতীত কোন্ সিন্ধু পারে;
এই থামা—চলা, এই গুটানো—ছড়ানো
জানি না নিগূঢ় কোন্ রহস্যে জড়ানো।



প্রশ্ন

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বৈশাখ মাস। বারো বছরের নাতিটিকে নিয়ে প্রাতঃস্নান সেরে ফিরছিলাম।

হঠাৎ নাতি আমার ডান হাতে টান দিয়ে বলল, দেখুন ছোড়দা, সবাই গঙ্গা নেয়ে যাবার সময় অশথ গাছে জল দিচ্ছে, কিন্তু গাছতলায় যে ভিখিরী বসে আছে তাকে কেউ একটা পয়সাও দিচ্ছে না। গাছে জল দিলে বুঝি বেশী পুণ্যি হয়?

ওর প্রশ্নটা যেন চাবুক মারল আমায়। সংসারে এইটাই তো সহজ ব্যবস্থা। সহজ বলে কারও মনে দ্বিধা জাগায় না—কারও মনকে নাড়া দেয় না। ঠিক তেমনি একটি ঘটনা—চল্লিশ বছর আগেকার ঘটনা আমার স্মৃতি-পটে ভেসে এল। সেইটাই বলি।

আমাদের পাড়ায় এক ঘর গরীব গৃহস্থ ছিল। জাত্যাংশে তারা খুব নিচু নয়, কিন্তু গরীব বলে সামাজিক মর্য্যাদা ছিল না তাদের। তারা চাকরি করত না, ব্যবসাও নয়। 'পাড়া' করে অর্থ-উপার্জ্জন করত, সংসার চালাত, ওদের বাড়ীর ন'দশ বছরের ছেলেরা ছিল আমার খেলার সাথী। এই 'পাড়া' করা জিনিসটার স্বরূপ বুঝাতে হলে—সেকালের জীবন-যাত্রার সঙ্গে কিছু পরিচয় থাকা আবশ্যক। জীবন-যাত্রা মানে শহরের জীবন কিংবা শহর-ঘেঁষা পাড়াগাঁর জীবন নয়। এসব জীবনের শাখা-প্রশাখা উর্দ্ধে প্রসারিত—আকাশের আলো আর বাতাসে তার শোভা সৌন্দর্য্য। কিন্তু মাটির নিচেকার অলক্ষ্য-প্রসারিত যে শিকড়ে জীবনের রস-সঞ্চয় ক্রিয়া বিদ্যমান—সে এই অজ পাড়াগাঁয়েরই জিনিস। সেকালের সেই অজ পাড়াগাঁয়ে শহরের বিলাস-উপকরণ তো দূরের কথা, শহরের সাদাসিধা কয়েক রকমের খাবারও ছিল দুষ্প্রাপ্য। সেখানে খাবারের মধ্যে ঘরে ভাজা মুড়ি আর আখের গুড়। খুব যদি বিলাসী হল গৃহস্থ তো—দু'একখানি করে বড় বাতাসা যোগ করে দিল অতিথির জলযোগপর্ব্বে। এ ছাড়া আর কিছু পাওয়া যেত না। অন্ততঃ সেই চল্লিশ বছর আগে পাওয়া যেত না।

আমাদের প্রতিবেশী প্রৌঢ় গণেশের স্ত্রী সারা রাত ধরে নানান খাবার জিনিস তৈরী করত। গণেশ সেগুলি চাঙারি ভর্ত্তি করে—হাতে একটি লণ্ঠন আর ডুগ্‌ডুগি নিয়ে বেরিয়ে পড়ত এই সব গ্রামের উদ্দেশে। সিঙাড়া, কচুরি, ফুলুরি, বেগুনি, নিমকি, জিবেগজা, রসমুণ্ডি আর গুড়ের খাজা, মোটামুটি এই ক'টি বস্তু তার চাঙারিতে থাকত। মেটো পথে পা দিয়েই ডান হাতের ডুগডুগিতে শব্দ তুলত সে। দেখতে দেখতে মাঠের প্রান্তের গ্রাম থেকে কুকুর ডেকে উঠত ঘেউ ঘেউ করে, অর্দ্ধ-উলঙ্গ ছেলেমেয়ের দল ছুটে এসে জমত তার চারিধারে। তাদের কারও হাতে একটি আধলা—কারও হাতে বা একটি পয়সা। গণেশ ডালা তুলে ধরতেই লোভাতুর ছেলেমেয়ের দল ডালার উপর ঝুঁকে পড়ে কলরব তুলত; দোকানী, আমায় জিবে-গজা দাও না এক পয়সার, আমায় ফুরুলি (ফুলুরি) আধ পয়সার, আমায় সিকি পয়সার খাজা আর সিকি পয়সার রসমুণ্ডি। সিঙাড়া, নিমকি, কচুরির খরিদ্দারও থাকত। বেশীর ভাগ জিনিসই পাওয়া যেত আধ পয়সা বা সিকি পয়সায়। যেমন পয়সায় চারটে করে রসমুণ্ডি আর জিবে গজা, পাঁচগণ্ডা ছোট ফুলুরি, দু'খানা করে সিঙ্গাড়া, কচুরি বা নিম্‌কি। খুব ভোরবেলায় বাড়ী থেকে বার হয়ে সন্ধ্যে উতরে গেলে বাড়ী ফিরত গণেশ—কোন কোন দিন কিছু রাত হত। হাতে থাকত একটি লণ্ঠন—চার চৌকো কাঁচ ঘেরা—তার মধ্যে জলন্ত কেরোসিনের একটি ছোট্ট কুপি। ধোঁয়ায় কালো হয়ে উঠত কাঁচ। যেটুকু ম্যাড়মেড়ে আলো তা থেকে ছড়িয়ে পড়ত পথে—তাতে পথ চেনা দুষ্করই, কিন্তু প্রতিদিনকার জানা পথ বলে কোন অসুবিধা হত না গণেশের। সারাদিন যা উপার্জ্জন হত—তারই কিছু অংশ দিয়ে চাষা গাঁ থেকে কিছু চাল ডাল কিছু আনাজ পাতি

নিয়ে আসত সে, কোন রকমে চলত সেকালের সস্তাগণ্ডা দিনের সংসার। কোন রকমে চলত বলেই বসনে কৃচ্ছ্রতা ঘোচেনি গণেশদের। গণেশের পোষাকের মধ্যে ছেঁড়া হাতকাটা একটি ফতুয়া—কখনও কামিজ, আর রিপুকরা আধ ময়লা ধুতি; একটা তেলচিটে গামছা অবশ্য কাঁধে থাকত। গণেশের পুরাতন অ-মেরামতি ঘর দিয়ে বর্ষাকালে জল ঝরত, খোয়াহীন মেঝে ভর্ত্তি হয়ে থাকত কাদায়। তারই উপর ইঁট আর তক্তা বিছিয়ে চট পেতে সপরিবারে নিদ্রা দিত গণেশ। এক ঘুমে রাত হত শেষ। এই জীবনে কষ্ট ছিল হয় তো, হয় তো বা গ্লানিও, কিন্তু গণেশের দিনানু-দিন জীবনযাত্রার পথে এসব কিছুই জমত না।

দু'টি মেয়ে আর তিনটি ছেলে, নিজে আর স্ত্রী এই নিয়ে গণেশের সংসার। স্ত্রী ও সংসার চলায় সাহায্য করত। অর্থাৎ কারও ডাল ভেঙ্গে দিয়ে, কারও বা বড়ির ডাল বেটে দিয়ে, কারও ছাতু কিংবা বেসম তৈরী করে। শহরের লোকে মুড়ি কেনে। গণেশ পাড়াগাঁ থেকে শস্তায় কিনে আনত মুড়ির চাল, কিনে আনত ধান। বালির খোলা চাপিয়ে ওর বউ বসে বসে খই ভাজত—মুড়ি ভাজত। আর ভর্ত্তি করে রাখত মাটির হাঁড়ায়। এসব অবশ্য রোজ করতে হত না,—একদিন ভাজলে তিন দিন ধরে বিক্রীত হত। এ ছাড়া অন্য উপায়েও কিছু উপার্জ্জন হত—তাতেও কিছুদিন এক বেলাকার আহার চলে যেত।

ওদের একতলা কোঠাঘরের পাশেই ছিল আমাদের বাগান। দু'বিঘে জমির উপর আমবাগান। জমির সবটাতেই অবশ্য আম গাছ ছিল না। দু'টো বেল গাছ, একটা বড় কাঁঠাল গাছ, কিছু নিম, নোনা আতা আর দেশী আতার গাছও ছিল। আর ছিল কিছু সজনে গাছ। বাগানের রক্ষণাবেক্ষণের ভারটা ওদের উপরেই দিয়েছিলেন ঠাকুমা। না দিয়ে উপায় ছিল না বলেই দিয়েছিলেন। খোলা বাগানে গরীব মুসলমানরা আসত আম পাড়তে, আসত ভিন্ পাড়া থেকে দুষ্টু ছেলের দল। গ্রীষ্মের দুপুর-বেলা রোদ যখন ঝাঁ ঝাঁ করত—পথে লোক চলাচল কমে যেত এবং তন্দ্রায় আলস্যে মানুষ পড়ত ঝিমিয়ে—সেই সময়ে সুযোগ-সন্ধানীরা চুপিসারে হানা দিত বাগানে। ঢিল-পড়ার শব্দ হলেই গণেশের ছেলেরা চেঁচিয়ে উঠত!

হাম বোলাবোল, মা ঠাকুরুণ, আপনাদের বাগানের আম পেড়ে নিয়ে গেল।

কে পেড়ে নিল—নাম করবার জো নাই, কারণ উপদ্রবকারীরা আগে ভাগেই শাসিয়ে রাখত, খবরদার, যদি নাম করেছ তো—

ওতেই কিন্তু কাজ হতো। ঠাকুরমা চেঁচিয়ে উঠতেন এধার থেকে, কে রে? অমনি দুড় দুড় করে ছুটে পালাত সবাই।

লোক দিয়ে আম পাড়ানো হলে ঠাকুরমা ওদের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ দিতেন—পারিশ্রমিক হিসাবে মাত্র চেঁচানোর পারিশ্রমিক—অতি সামান্যই। তাতে ওদের পেটের ক্ষুধা মিটত না—মনও প্রসন্ন হত না। তবে বাগানের গা ঘেঁষে থাকাতে পারিশ্রমিক ওরা অন্য উপায়ে পুষিয়ে নিত। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের সামান্য বাতাসে পাকা আম পড়ত টুপটাপ করে, ওরা কুড়িয়ে কোঁচড় ভর্ত্তি করত। সেই সংগ্রহে ওদের এক বেলাকার ক্ষুন্নিবৃত্তি হত। পাকা কাঁঠালও পড়ত। শব্দটা হত প্রচণ্ড। কিন্তু আমরা বাড়ী থেকে ছুটে যেতে না-যেতে সে কাঁঠাল অদৃশ্য হয়ে যেত মন্ত্রবলে। বেলের বেলাতেও তাই। নোনা আতা আমরা অবশ্য খেতাম না, কিন্তু ভাদ্র মাসে যে ভাল আতা পাকত —তার কিছু অংশ আমরা পেতাম। সেগুলি ছিল লোভের সামগ্রী। কিন্তু বহু আতার মধ্যে কয়েকটিমাত্র পেলে কে না অভিযোগ করে? আমাদের অভিযোগের উত্তরে ওরা বলত, নিচু গাছ, রাতবিরেতে চোরে নিয়ে যায়, আর কাঠ-বিড়ালে ইঁদুরে বাঁদরে কম নষ্ট করে। এর আদ্ধেক পেলে আপনাদের ভাঁড়ার ঘর ভর্ত্তি হয়ে যেত ঠাকুরমশাই।

এদের এই মিথ্যা কৈফিয়ৎ একদিন ধরা পড়ে গেল। সেদিন দুপুর বেলায় খেতে বসেছি—এমন সময় দু'জন অচেনা লোক বাইরে এসে হাঁকাহাঁকি সুরু করে দিল।

মা-ঠাকরোণ, বাড়ী আছেন? একবার ইদিকে আসুন। সেই সঙ্গে কান্না ও ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ কানে গেল।

আমরা সবাই উঠে গেলাম—ব্যাপার কি দেখতে।

ব্যাপার দেখে তো আমাদের চক্ষু স্থির! গণেশের দুই ছেলে—হরি আর তিনু—কোঁচড় ভর্ত্তি আতা নিয়ে কাঁদ-কাঁদ গলায় কি বলছে—আর ওদের দু'হাত ধরে জয়নাল আর রহিম আছে দাঁড়িয়ে। ওরা দু'ভাই হাত

ছাড়াবার জন্য ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে, কিন্তু সাধ্য কি বালকের সে বলিষ্ঠ বাঁধন ছাড়িয়ে নেয়।

আমাদের দেখে জয়নাল আর রহিম এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, এই দেখুন বাবু—আপনাদের বাগান সাবাড় করে হাটে নিয়ে আতা বেচছিলেন দুই ওস্তাদ। চিনতে পারেন এগুলো? বলে ওদের কোঁচড়ের বাঁধন খুলে আতাগুলো ছড়িয়ে দিল মাটিতে।

হরি আর তিনু কাঁদ-কাঁদ গলায় প্রতিবাদ করল, হাঁ—ওনাদের বাগানের আতা বইকি!—আমরা তো হরিপুরের মাঠ থেকে পেড়ে এনেছি।

তা আর নয়! গাল টিপলে দুধ বার হয়—তোরা গিয়েছিলি হরিপুরের মাঠে—এক কোশ দূরে? শুনুন আপনারা—কেমন ডাহা মিথ্যে বলছে!

ঠাকুরমা বললেন—হাঁরে হরে, তোদের এই কাজ? যে রক্ষক—সেই যদি—ভক্ষক হয়—তা হলে মানুষ সংসারে বাস করবে কি করে! ওপরে যে ধর্ম্ম রয়েছেন—

ওরা কাঁদতে কাঁদতে হেঁট হয়ে বলল, সত্যি বলছি মা ঠাকরোণ—আপনার পা ছুঁয়ে দিব্যি করে বলছি—আমরা হরিপুরের মাঠ থেকে—

বড়-দাদা এগিয়ে গিয়ে ওদের গালে পটাপট্ গোটা কয়েক চড় কসিয়ে দিয়ে ধমকে উঠলেন, মিথ্যুক কোথাকার। এই বয়সে—এই—বড় হলে যে মস্ত ডাকাত হবি!

ওরা চীৎকার করে কেঁদে উঠল। ঠাকুরমা বললেন, আর—ভরদুপুর বেলায় ভিটেয় বসে এমন কাঁদিস কেন? ছেড়ে দে বীরু, গাছের এঁটো ফল—নিকগে—মরুকগে।

জয়নাল বলল—না মা ঠাকরোণ, আতাগুলো ধুয়ে ঘরে তুলুন—

ঠাকুরমা বললেন, না বাপু, শত্যিক জাত ছোঁয়া জিনিষ ঘরে তুলব না। ওদের আশার জিনিস—নিকগে।—তবে একটা কথা শুনে রাখ—বাগান তোদের জিম্মায় আর রাখব না।—খবরদার—তোরা আর ঢুকবি নে বাগানে।—

'পাড়া' করে গণেশ ফিরল সন্ধ্যেবেলায়। সম্ভবতঃ বাড়ী এসে ঘটনাটা আদ্যোপান্ত শুনলে—তারপর তার চীৎকার ও ছেলে দুটোর কান্না শুনে বুঝলাম—শাসন সুরু হয়েছে।

শুয়োরের বাচ্চা—কেন গিয়েছিলি বামুনদের বাগানে? কেন হাত দিয়েছিলি—বামুনের জিনিসে! এই কালের ভয় না করিস—পরকাল মানিস নে? সেখানে যে—

অপর জগতের অপরাধের ভয়াবহ শাস্তির কতখানি ওরা হৃদয়ঙ্গম করল—জানি না, বহুক্ষণ ধরে চীৎকার করে ওরা নিরস্ত হল।

গ্রীষ্মের ছুটিতে লেখাপড়া বিসর্জ্জন দিয়ে আমরা ক'ভাই আমবাগান আগলাবার ভার নিলাম। টুপ্‌টাপ করে পাকা আম পড়ে—আমরা ছুটে গিয়ে কুড়িয়ে আনি, জড়ো করি গাছতলায়। কতক বা খাই, ডাঁসাগুলি আধ-খাওয়া করে ফেলে দিই। চেয়ে দেখি—ওদের এক-তলা ঘরের রোয়াকে দাঁড়িয়ে ওরা ক'ভাই জুল্ জুল্ করে তাকিয়ে আছে এদিকে। ছেলেদের মনে মায়ার অংশ কম, কেমন একটু নিষ্ঠুর আনন্দে ওদের দেখিয়ে দেখিয়ে পাকা আম লোফালুফি করি। আঁটি আর খোলা ছুড়ে ছুড়ে ফেলি ওদেরই রোয়াকের কোলে, অকারণে হাসি আর ছুটোছুটি করে খেলি।—দিনকয়েক আগেও ওরা ছিল আম খাওয়া ও খেলার সাথী।

এর পর আমবাগানের পালা শেষ হল, বর্ষা এল।—আমরাও ভুলে গেলাম ওদের কথা।

কিন্তু আশ্বিনের শেষে আর একটা ঘটনা ঘটল—যা আজও দাগ কেটে বসে আছে আমার মনের মধ্যে।

বাগানে যে বড় কাঁঠাল গাছটা ছিল—ওটাতে প্রায় বারো মাসই ফল হতো। আশ্বিন কার্ত্তিকে এঁচোড় ও কাঁঠাল দুই পাওয়া যেত এক সঙ্গে। ফল অবশ্য সবই আমরা পেতাম না। কিছু চুরি হত, কিছু বা পৌঁছত আমাদের ঘরে। প্রায়ই প্রতিবেশীদের কেউ—না—কেউ এসে বলত, ওগো মা, কাল বাজারে দেখি এঁচোড় বিক্রী হচ্ছে। ফড়েরা কিনেছে কার কাছ থেকে কে জানে—বেশ ছোট ছোট এঁচোড়—এ দিগড়ে তোমাদেরই গাছে ফল হয় বারো মাস, তোমাদের এঁচোড় না হলে কোত্থেকে আসবে বল! এ নিশ্চয়—ওদের কাজ। বলে আঙুল দিয়ে গণেশদের বাড়ী দেখিয়ে দিত। বর্ষাকালে 'পাড়া'য় বেরুতে পারে না তো—তাই যে করে হোক—

ঠাকুরমা বললেন, কি করব—বল—হাতে-নাতে ধরতে পারি তো এর বিহিত হয়।

সত্যিই বর্ষাকালটা বিশ্রী কাল—বিশেষ করে পাড়া-

গাঁয়ের বর্ষা। পূজো পর্য্যন্ত এর জের চলে। তখন পথ ঘাট জলে জলময়—কাদায়—কাদায় মেঠো পথ একাকার। পুরো কার্ত্তিক মাস লাগে এই জল কাদার জের মরতে। এই জলে-কাদায় পিছল পথে খালি হাতে যে চলে—সেই জানে এ কত দুর্গম; যার মাথায় বোঝা—সে তো পাঁচ মিনিটের পথ পা টিপে টিপে যাবে আধ ঘণ্টায়। এ ছাড়া—এ সময়ে খরিদ্দারও কম। পুরো তিনটি মাস গণেশের নামেই কাটে। এক বেলা অনাহার, কখনও বা দু'বেলাই। ওরা যদি হাতের কাছে কোন বস্তু পায়ই সদসৎ জ্ঞান ওদের থাকবে কেন? শাস্ত্রের পাতায় পরকালের বিধি-বিধানে পরদ্রব্য অপহরণের পাপটাকে যত ভয়ঙ্কর উজ্জ্বল করেই আঁকা হোক না কেন, ওরা কেন বুঝবে সে লেখা? আজ বুঝি সে কথা।—তখন কিন্তু সুযোগ সন্ধান করছিলাম—হাতেনাতে চুরি কর্ম্মটি ধরতে পারি যদি।

সে সুযোগ অবশ্য পরে এল।

বর্ষাকালে পাড়াগাঁ—আর মানুষ দুয়েরই চেহারা সকরুণ হয়ে ওঠে। জলে কাদায় থৈ থৈ করা পথঘাট, সূর্য্যহীন আকাশ আর বিশ্রী বুক চাপা আবহাওয়া, আর ম্যালেরিয়া অতিসারে জর্জ্জর ক্ষুণ্ণ শ্রীহীন মানুষ। গণেশের পরিবারবর্গ অমনি বিশ্রী হয়ে উঠল। হাড় জিরজিরে ছেলেগুলোকে দেখলে আমাদের দয়ালেশহীন প্রাণেতেও কেমন মায়া হত। ভাবতাম, আহা, এরা বুঝি এবার মরে যাবে। তবু সারা বর্ষার প্রতাপ সহ্য করে ওরা বেঁচে রইল এবং যে ঘটনার কথা বলছি—সেটা শরতের প্রসন্ন আকাশের তলাতেই একদিন ঘটল।

একদিন কে একজন এসে খবর দিয়ে গেল, মা-ঠাকরোণ,—আপনাদের গাছে ওপরের ডালে বেশ একটা বড় কাঁঠাল হয়েছে, পাড়িয়ে নেবেন।

উপর ডালের কাঁঠাল—শক্ত লোক না হলে তো পাড়তে পারবে না। আমরা চোদ্দ পনেরো বছরের কিশোররা যদিও আস্ফালন করলাম—পেড়ে দিচ্ছি বলে, ঠাকুরমা বাধা দিয়ে বললেন, হাঁ—ওই উঁচু ডাল থেকে পড়ে গিয়ে তারপর একটা কাণ্ড বাধাও! পরশু রবিবার আছে—অবস্তী বাড়ী আসুক—সেই ব্যবস্থা করবে কাঁঠাল পাড়বার, অসময়ের কাঁঠাল—ভাবছি মা সিদ্ধেশ্বরীকে—আর বুড়ো বারোয়ারি মাকে দিয়ে আসব।

আমরা সকাল বিকাল ছুটে ছুটে যাই বাগানে, দেখে আসি শাখার উচ্চ মঞ্চে সুবৃহৎ পনস ফলটি দেবতার ভোগের অপেক্ষায় কেমন করে পরম লোভনীয় হয়ে উঠছে প্রতি বেলায়। শনিবার বিকালে পক্ব পনস-সৌরভে সারা বাগান সুরভিত হয়ে উঠল। লাফাতে লাফাতে বাড়ী এসে বললাম, ঠাকুমা, কাঁঠাল পেকে গেছে।

ঠাকুরমা বললেন, সন্ধ্যেবেলায় তোর কাকা বাড়ী আসবে—কাল সকালে পাড়িয়ে দেবে'খন। পরশু পূজো—মাকে নিবেদন করে দিয়ে প্রসাদ পাব সবাই।

সন্ধ্যেবেলায় কাকা এলে যুক্তি পরামর্শ ঠিক হয়ে গেল। শচীনদের বাড়ী থেকে বড় মইখানা আমরা তিন ভায়ে ধরাধরি করে নিয়ে আসব। যে মোটা গুঁড়ি কাঁঠাল গাছের—না হলে কেউ উঠতে পারবে না গাছে। ঐ সঙ্গে জোগাড় করতে হবে একটা বিশ বাইশ হাত লম্বা দড়া, একটা ঝুড়ি, একখানা দা। এসব অবশ্য বাড়ীতেই মিলবে। পাতকুয়ার জল তোলার দড়া—আর ঘুঁটে রাখার ঝুড়িটা নিলেই হবে। দা, শাবল, খন্তা, কোদাল এ সব তো প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়ীতেই থাকে। ঝুড়ির তিন দিকে দড়ি বেঁধে সেটা শিকের মত করা হবে—সেই শিকের দড়িতে বাঁধা থাকবে দড়া। সেটা কাঁঠালের নিকটবর্ত্তী শাখায় আটকে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে—যেমন কপি কলে দড়া বেঁধে পাতকুয়ো থেকে জল তোলা হয়। কাঁঠাল কাটবার আগে আশ্রয় পাবে ঝুড়িতে—এবং কাটা হলে দড়া আল্‌গা দিয়ে ঝুড়িটা নামিয়ে আনা হবে। তাহলে আছাড় খেয়ে পড়ে কাঁঠাল ছত্রকার হয়ে নষ্ট হবে না।

কাঁঠাল পাড়ার এই পরিকল্পনাই চিত্ত-উত্তেজক বলেই আমরা অনেকক্ষণ ধরে এই নিয়ে আলোচনা করলাম। এবং আশ্চর্য্যের বিষয়, অন্যদিন সূর্য্য উঠবার বহু পরে ঘুম ভাঙ্গলেও—সেদিন ভোর বেলাতেই চোখ মেলে চাইলাম। আমরা তিন ভাইই বিছানায় উঠে বসেছি, না জানি কি কঠিন কাজ করব আজ—সেই উৎসাহে চঞ্চল হয়ে উঠেছি।

সাজ সরঞ্জাম জোগাড় করে ডাকলাম কাকাকে। উনি বললেন,—দাঁড়া—ভাল করে ফরসা হোক আগে। তোরা বুঝি ঘুমুস নি রাত্তিরে?

সে কথা বলাই বাহুল্য।

সত্যিই আমাদের সবুর সইছিল না। মই ঘাড়ে করে আমরা তিন জন বাগানে ছুটলাম।

সকালবেলার হাওয়াটি চমৎকার। কোথায় শিউলি ফুল ফুটেছে—তার গন্ধ ভেসে আসছে। এই গন্ধ শারদীয়া পূজার বার্ত্তা নিয়ে আসে। কিন্তু এর মন-উতল-করা নরম মিষ্ট গন্ধ—কাঁঠালের উগ্র মিষ্ট গন্ধটা কি চাপা পড়ে গেল! এই সুন্দর সকালে বাগানটা শিউলি-গন্ধেই ভরে উঠেছে।

মধু ছুটতে ছুটতে কাঁঠালতলায় আগেই পৌচেছিল। উপর পানে উঁকি মেরে চেঁচিয়ে উঠল, বড়দা, কাঁঠাল তো দেখতে পাচ্ছি না।

আমি দূর থেকে বললাম, দূর বোকা, পূব দিকের তে-ফ্যাকড়া-ডালটায় ঝুলছে—ভাল করে চেয়ে দেখ। মস্ত বড় কাঁঠাল।

ছাই কাঁঠাল। মধু মুখভঙ্গী করে উঠল।

আমরা নিকটে এসে দেখি—সত্যিই তো, কাঁঠাল কোথায়? তে-ফ্যাকড়া মসৃণ ডালটা স্থির শাদা চোখে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে—আমরা অথচ লক্ষ্যচ্যুত দৃষ্টিকে এদিক ওদিক নিক্ষেপ করছি। তাজ্জব ব্যাপার তো! কাল বিকেলে দেখে গিয়েছি—ফল-শোভায়-শাখার অপূর্ব্ব শ্রী, আজ সে শাখা সর্ব্বহারার বোবা-বেদনা-মাখা দৃষ্টি দিয়ে আমাদের সর্ব্বাঙ্গ লেহন করছে। আশা-ভঙ্গে আমরা হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম, চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল।

ছুটে বাড়ীর মধ্যে এসে বললাম, ঠাকমা, কাঁঠাল নেই।

অ্যাঁ! ঠাকুরমা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। ভাল করে দেখেছিস তো? তখনও ভোরের ঘোর কাটেনি, গাছপালার ফল নজর হবে কেন!

আমরা তিনজনে এক সঙ্গে বললাম, আমরা খুব ভাল করে দেখেছি—কাঁঠাল নেই।

বলিস কিরে, এ যে ঠাকুর দেবতার মানতের ফল। কার এত বড় বুকের পাটা হল যে ঠাকুরের জিনিসে হাত দিলে!

মুহূর্ত্ত মাত্র চুপ করে তিনি কি যেন ভাবলেন, তারপর ক্রোধে ফেটে পড়লেন, বুঝেছি—বুঝেছি কার কাজ এ। ওই সব্বনেশে গণ্শার কাজ। না হলে কার এমন বুকের পাটা ভরসন্ধ্যেবেলায় কাঁঠাল চুরি করবে। ডাক তোর কাকাকে। চ তো দেখি কেমন করে ও ঠাকুরের জিনিস হজম করে।

গণেশ পাড়ায় বেরুবে বলে সবেমাত্র চাঙাড়ি গুছিয়ে ছেঁড়া কামিজটা গায়ে দিচ্ছিল—আমরা সদলবলে এসে দাঁড়ালাম ওর এক তলা ঘরের সামনে।

ও হাত তুলে হয় তো প্রণামের ভঙ্গী করছিল, ঠাকুরমা ফেটে পড়লেন, ওরে অপ্পেয়ে ড্যাকরা—আমার ঠাকুরের কাঁঠাল চুরি করে আবার পাড়া বেরুনো হচ্ছে। বার কর বলছি জিনিস—নৈলে ঝাড়েমূলে নিব্বংশ হবি।

গণেশের ছেলেরাও ততক্ষণে বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে, গণেশের বউ এসে দাঁড়িয়েছে দোর গোড়ায়। গণেশ ওদের পানে চেয়ে আমতা আমতা করে কি বলল। আমি আর মধু এক লাফে ওদের ইঁট-ঘসা রোয়াকে উঠে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলাম। মধু চীৎকার করে উঠল, ঠাকুমা, এই ঘরেই কাঁঠাল আছে, গন্ধ বেরুচ্ছে। সত্যি, যে-গন্ধ খোলা-মেলা বাগানটাকে ভরিয়ে দিয়েছিল—সে এই ছোট ঘরখানাতে আরও ঘন—আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। আমরা খুঁজতে লাগলাম কোথায় কাঁঠাল।

গণেশের বউ ঘরের মধ্যে এল। আমাদের পানে চেয়ে বলল, ওই কোণে চট ঢাকা দেয়া আছে। ভোর বেলাতে গাছ থেকে পড়ল, ছেলেরা কুড়িয়ে নিয়ে এল। ভাবলাম, বেলা হোক—দিয়ে আসব মা-ঠাকরুণকে।

চট খুলে ফাটা চৌচির কাঁঠাল আমরা বাইরে নিয়ে এলাম। দেখে ঠাকুরমা আরও ক্ষেপে গেলেন—তাঁর গালি-গালাজে পাড়ার লোক এসে জমল।

কাকা ঠাকুরমার হাত ধরে বললেন, আর গাল দিয়ে কি হবে মা—জিনিস তো পাওয়া গেছে।

ও জিনিস ঠাকুরকে দেব কি করে?

কেন, হাট থেকে যে জিনিস কিনে আনি আমরা—তাকে কি সৎ আচারে রাখে জমারীরা!

সে মূল্য দিয়ে কেনে—

এ-ও না হয় গঙ্গা জল দিয়ে ধুয়ে শুদ্ধ করে নেবে।

ঠাকুরমা বললেন, ঠাকুরের জিনিসে হাত দিয়েছে—এরা যদি না নিব্বংশ হয় তো দিন-রাত্তির মিথ্যে হয়ে যাবে। ভগবান আছেন মাথার ওপরে, তিনি সাজা দেবেন।

গণেশ বিনীত কণ্ঠে বললে—আমাদের অপরাধ কি মা-ঠাকরোণ। সামনে পড়ল ফল—ছেলেরা কুড়িয়ে আনল। না আনলে গরুতে খেয়ে যেত, নষ্ট হত।

—হত নষ্ট আমার জিনিস, তোদের কি। তোরা দেবতাকে বঞ্চিত করে যেমন নেবার ফিকির করেছিলি—তেমনি সাজা পাবি। প্রাতঃকালে—বামুনের মেয়ে বলে যাচ্ছি—এর প্রিতিফল পাবি—পাবি—পাবি।

কাঁঠাল নিয়ে আমরা বিজয় গর্ব্বে চলে এলাম। গণেশের ছেলেগুলো শুকনো মুখে চেয়ে রইল আমাদের দিকে—বেশ বুঝলাম—ওদের মুখের গ্রাস কেড়ে আনা হল। দুঃখ তো হবেই।

এর পর দীর্ঘ বছর কেটে গেছে, মা-ঠাকুরমা সকলে গত হয়েছেন, আমরা চাকরিতে ঢুকেছি—সংসার-ধর্ম্ম করছি। চাকরীর দায়ে শহরে বাস করছি—পাড়াগাঁ প্রায় মুছে যেতে বসেছে স্মৃতি থেকে। বাগানে যে-ক'টি পুরাণো গাছ ছিল ঝড়ে ভূমিসাৎ হয়েছে। কাঁঠাল গাছটাকে কেটে ফেলা হয়েছে দুয়োর জানালার তক্তা হবে বলে। শুধু নিম গাছগুলো আয়তনে বেড়েছে, বেল গাছটা আরো ঝাঁকড়া হয়েছে। আতার জঙ্গলও জমিটাকে গ্রাস করেছে। আর বাগানের ও-পাশে গণেশরা! তারাও এই ঝড়ে-পড়া আম গাছগুলোর মত কালের স্রোতে কোথায় ভেসে গেছে। এক তলা বাড়ীটা এখন ইটের স্তূপ মাত্র। সে স্তূপও ধীরে ধীরে পাতলা হচ্ছে, যে যার প্রয়োজনে ইট সংগ্রহ করছে।

ঠিক মনে আছে—সেই বারই গণেশের দু'টি ছেলে মারা যায়। ডাক্তার বলেছিলেন, ম্যাল নিউট্রিশন। ভাল করে খেতে না পেলে রোগ ঠেকাবার শক্তি পাবে কোথায়! সামান্য রোগেই মানুষ জেরবার হয়ে পড়বে এবং মরবেও সামান্য কারণে। দেশ জুড়ে রয়েছে এমনি কত গণেশ, কে জানে। এমনি জেরবার হয়ে তারাও ভেসে যাচ্ছে কালের স্রোতে। যেখানে জল ঢালা উচিত—সেখানে জল ঢালছি কি আমরা? আমাদের দরদী মন দেব-মহিমার উজ্জ্বল দেউল পার হয়ে লোকযাত্রার মর্ম্ম-কেন্দ্রটিতে পৌছবে আর কতকাল বাদে?

নাতির প্রশ্নের জের রয়েই গেল মনের মধ্যে। পরের দিন স্নান করতে এসে চাইলাম অশ্বত্থ গাছটার দিকে। কিছুদিন আগে দেখেছি—গাছটা শুকিয়ে যাচ্ছিল। বহু পুণ্যার্থীর অবিরত জল সিঞ্চনে আজ ওর গা থেকে বেরিয়েছে এক নূতন শাখা, মাটির স্তন্যরস ও আলোর দাক্ষিণ্য ওকে ফিরিয়ে আনছে নব-জীবনের রাজ্যে। ও বাঁচবে।

গাছের তলায় বসে যে ভিখারীটি ক্ষীণ কণ্ঠে মানুষের দয়া প্রার্থনা করছে—তার জীবনের মূল্য কি ওই গাছটার চেয়েও অকিঞ্চিৎকর। পুণ্য সঞ্চয়ের আলোকে একে যাচাই করে নিতে এখনও আমাদের ভুল হচ্ছে কেন?

নাতির প্রশ্নের জবাব দেওয়া আর হয়নি। গণেশের কাহিনীটা—সারা মন জুড়ে রয়েছে। যা পিছনে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল এতকাল, তা যেন গতকাল থেকে প্রশ্নের তর্জ্জনী আন্দোলন করে আমাকে কেবলই শাসন করছে।

পূর্ব্বাশা

শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত

এই পৃথিবীর রণপ্রমত্ত প্রলাপ মাঝে
'মাভৈ' মন্ত্র পূর্ব্বগগনে আজো যে বাজে।
বিশ্বাকাশের পশ্চিমে জাগে কুটিল মেঘ,
শতফণা তুলে জাগে ঝঞ্চার প্রবল বেগ,
ধ্বংস যজ্ঞে হয়েছে আহুতি লক্ষ প্রাণী,
তবু তারি মাঝে বাজে পূরবের শান্তিবাণী।

নিকষ কালোয় ঢাকে চারিধার কোথায় পথ!
ভ্রান্তির তলে রুদ্ধ প্রাণের স্বর্ণরথ।
গভীর আঁধারে স্বার্থে, স্বার্থে কি হানাহানি!
শুধু তারি মাঝে জ্বলে পূরবের আলোকখানি।
হীন সন্দেহে মিত্রেরা হল শত্রু আজ,
সংঘাত হানে প্রতিবেশী-শিরে মৃত্যু-বাজ,

মানবতা কত পাপপদতলে ধুলায় লোটে,
মৈত্রী মন্ত্র তবুও পূরবে ধ্বনিয়া ওঠে!



পরিচালক—উপানন্দ

সংযমের মাধ্যমে ইচ্ছাশক্তি

যাঁরা জগতে কর্ম্মক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেছেন তাঁরা সকলেই বলেন সংযমশক্তি একান্ত প্রয়োজন। বিশেষ ইচ্ছাশক্তি সম্পন্নমাত্রেই সুদৃঢ়ভাবে চিত্তসংযম করে নিজের কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করেন। ধর, পরীক্ষা দেবার সময় প্রশ্নপত্র দেওয়া হোলো, উত্তর লিখ্‌বার আগে মন স্থির করে বারে বারে পড়ে আর বুঝে উত্তর দেবে—আর উত্তর লিখ্‌বার সময়ে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করবে যাতে উত্তর সুন্দর ভাবে লেখা যায়। চিত্ত স্থির করে ইচ্ছাশক্তি অর্জ্জনের পক্ষে ত্রাটকযোগ বিশেষ অনুকূল। যে পর্য্যন্ত চোখ থেকে জল না পড়ে, সে পর্য্যন্ত চোখের পলক না ফেলে কোন সূক্ষ্ম বস্তুর দিকে লক্ষ্যপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করবে,—এরই নাম ত্রাটকযোগ। এ-যোগ অভ্যাস কর্‌লে চোখের অসুখ হয় না, আর উত্তম দৃষ্টি লাভ হয়। সকালবেলা উঠেই এই যোগ অভ্যাস করবে, আর চেষ্টা করবে মনটাকে সকলপ্রকার ভাব-ভাবনা থেকে সরিয়ে এনে শূন্য করে ফেল্‌তে। তোমরা জানো, যার যে কাজ কর্ত্তব্য বলে নির্দ্দিষ্ট হয়েছে, তা তার যথাযথভাবে পালন করা উচিত। কর্ত্তব্যপরায়ণতা একটি শ্রেষ্ঠ বৃত্তি। কর্ত্তব্য সম্পাদনে অদম্য উৎসাহে সংযমের মাধ্যমে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করবে তা'তে সুন্দর ভাবে সাফল্য লাভ হবে। সংসারে বিদ্যা, জ্ঞান, অর্থ, মান-সম্ভ্রম প্রভৃতি সুখ-সৌভাগ্যলাভ কর্‌তে হোলে বিবেক বুদ্ধি হারিয়ে অসংযমী হওয়া চল্‌বে না। মানুষের মানসিক গঠন এরূপ যে, সে কোন কাজ বার বার কর্‌লে সেটি তার এমনি অভ্যস্ত হয়ে যায় যে, সহজে সে তা আর ত্যাগ কর্‌তে পারে না। অতএব সংযম অভ্যাস কর্‌লে সহজে ইচ্ছাশক্তি অর্জ্জন করা যাবে। সংযম ও অদম্য ইচ্ছাশক্তির মধ্যে পারস্পরিক নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। আমাদের মধ্যে অনেকেই অর্দ্ধপথে জিনিষ ফেলে রেখে যাই। তার কারণ আমরা বহন করে নিয়ে যাবার শক্তি অর্জ্জন কর্‌তে শিক্ষা করি নি।

সংযম বৃদ্ধি করার পক্ষে যদি অসুবিধা বোধ করো, তা হোলে প্রথমে পাঁচ মিনিট ধরে কোন বিষয়-বস্তুর ওপর মনঃসংযোগ করবে, আর পরিশ্রমের সঙ্গে তা সম্পাদন কর্‌বার চেষ্টা করবে, তারপর পাঁচ মিনিট চুপচাপ বসে থাক্‌বে। তারপর আবার সাত মিনিট ধরে মন-প্রাণ দিয়ে কাজ করে তিন মিনিট বিশ্রাম নেবে। সংযম অভ্যাসে সুদক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন বিষয়-বস্তুর ওপর নিবিষ্টচিত্ত হবে না, তা'তে ফল সুবিধা হয় না। যে কোন শুভ সাধনা প্রকৃতির সঙ্গে খাপ না খাইয়ে কর্‌তে যাওয়া অনুচিত। প্রত্যহ মনঃসংযোগের অভ্যাস রাখ্‌বে যাতে সংযম সুদৃঢ় হয়। প্রত্যহই কিছু না কিছু কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর্‌তে দৃঢ়সঙ্কল্প হবে। নিত্যনৈমিত্তিক অভ্যাসের দ্বারাই শেষে ঐ সব কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুসম্পন্ন করে জয়মাল্য নিশ্চয়ই লাভ কর্‌তে পার্‌বে। মন যেমনি ঘুরে বেড়াতে চলেছে পড়ার বইয়ের পাতা ছেড়ে, অমনি তাকে ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে টেনে এনে ধরে রাখ্‌বে।

তোমরা বোধ হয় দেখেছ অনেকে জপের মালা নিয়ে ভগবানের নাম জপ্‌ছেন আর গল্প কর্‌ছেন, এতে ভগবানের দয়া পাওয়া যায় না, গল্প করে সময় নষ্ট করে জীবনী শক্তিকে হ্রাস করা হয় মাত্র। শুধু চিত্ত-সংযম নয়, বাক্‌-সংযমও দরকার। কথা বেশী বলা উচিত নয়, তা'তে তোমাদের ভেতর যে ঐশীশক্তি আছে তা দুর্ব্বল হয়ে যায়। ভেতরটা দুর্ব্বল হলে বাইরেটাও দুর্ব্বল হবে, ফলে শরীর দিয়ে মন দিয়ে পূর্ণভাবে কোন কাজ করে সফল হোতে পারবে না। যারা বেশী কথা বলে তাদের আয়ু ক্ষয় হয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা যাতে তোমাদের মুখ থেকে না বেরোয় তার জন্যে বাক্‌ সংযম করবে। হিসেব করে কথা বল্‌বে, আবোল-তাবোল কথা বলে নিজেকে জাহির কর্‌বার চেষ্টা কর্‌বে না।

মন উড়ু উড়ু হোলে আর কাজে না বস্‌লে, কয়েক মিনিট বিশ্রাম নেবে, তা হোলে এ-রোগ সেরে যাবে। মনঃসংযমের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অনুশীলন যদি কর্‌তে চাও, তা হোলে এমন একটা কথা বেছে নেও

যার মানে তুমি জানো না। ঐ কথার যত রকম মানে হ'তে পারে অভিধান থেকে নিয়ে একত্র করে লেখো আর মুখস্থ করো, চেঁচিয়ে বারে বারে বলো—এরূপ নিত্য অভ্যাসের ফলে সংযম আয়ত্ত হবে।

ইচ্ছাশক্তি অর্জ্জন কর্তে বাধা পাচ্ছ কিনা, আর মনে কোন রোগ জন্মে ইচ্ছাশক্তিকে পঙ্গু ও নষ্ট করছে কিনা—তার পরীক্ষা প্রায়ই কর্বে। পরীক্ষা কর্বার প্রণালীটা নিম্নের মত হবে।

একটি জায়গায় নিম্নোক্তভাবে প্রশ্ন লিখে, নিজেকে নিজেই নিরপেক্ষভাবে বিচার করে 'হাঁ' কিম্বা 'না' তার পাশে রাখ্বে। নিজের সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করলে বুঝ্তে পার্বে কোথায় তোমাদের গলদ প্রকাশ পাচ্ছে।

১। আমি কি হিতাহিত বিবেচনা না করে ঝোঁকের মাথায় কাজ করি?......

২। সহজে কি রেগে যাই?......

৩। আমি কি ভেবে দেখি, যে সব কাজ কর্ছি তাদের পরিণাম কি রকম হবে?......

৪। আমি কি মতলব করি?......

৫। আমার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে কোন সুদৃঢ় আশা-আকাঙ্ক্ষা আমার মধ্যে আছে কি?......

৬। আমি আমার ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত কর্বার জন্মে চেষ্টা করি কি?......

৭। সরল জীবন-যাপন ও ছাত্র-জীবনে নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য পালনের ব্রত ঠিক মত পালন করি কি?......

৮। মহাপুরুষের জীবনী পাঠ ও সৎপ্রসঙ্গ দ্বারা কিছু লাভ করেছি কি?......

৯। মানুষের মত মানুষ হয়ে পিতা-মাতার মুখ উজ্জ্বল কর্বার জন্মে কি কি প্রতিজ্ঞা অবলম্বন করেছি?......

১০। আমার মনে যে কোন ভাবাবেগ হোলে ভালো-মন্দ বিচার না করে তা করে থাকি কি?......

এই সব প্রশ্নের উত্তরগুলি পড়ে যে সব কাজে ক্রটি ঘটছে বা যে সব সৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে না, সেগুলির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবে', যাতে নিয়মানুবর্ত্তিতার মধ্য দিয়ে সুসম্পাদিত হয়। রুশো বলেছেন—"ইচ্ছাশক্তি নিজস্ব জিনিষ; কিন্তু তদনুযায়ী কর্ম্ম কর্বার ক্ষমতা সকল সময়ে নিজের করায়ত্ত নয়। যখন প্রলোভনে পড়ে কর্ম্ম করি, তখন বাইরের দ্বারা অভিভূত হই, যখন তার জন্মে অনুতপ্ত হই, তখন আমার হৃদয়গত ইচ্ছার স্বরূপ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। যখন আমি অপগুণের অধীন, তখন আমি গেলাম; যখন অনুতপ্ত, তখন নির্ম্মুক্ত।" মানুষ কর্ম্মের দাস নয়, মানুষের জন্যই কর্ম্মের অনুষ্ঠান—তোমাদের সময় ও অর্থ অনর্থক অপব্যয় করো না। কর্ত্তব্য সম্পাদনে চাই সৎসাহস ও নির্ভীকতা। শেখভ বলেছেন—'মুখ, পরিধেয়, চিন্তা ও আত্মা—মানুষের সব কিছু সুন্দর হওয়া চাই—' এতদ্ব্যতীত কোনপ্রকারে উন্নতিশীল হওয়া যায় না। নৈতিক নিষ্ঠাও একান্ত প্রয়োজন। আঠারো বৎসরের মেয়ে রাশিয়ার বীরাঙ্গনা জয়া কস্মোডে মিনস্কোয়া, যাকে জার্ম্মাণরা ফাঁসি দিয়েছিল গত মহাযুদ্ধের সময়ে, লিখে গেছে তার 'ডায়েরীতে'—নিজেকে সম্মান করো; নিজেকে খুব বাড়িয়ে ভেবো না, নিজের গণ্ডীতে আবদ্ধ থেকো না; একপেশে হয়ো না; লোকে আমায় শ্রদ্ধা করে না, চিন্লে না, এ কথা বলে কখনো চেঁচিয়ো না; নিজেকে তৈরী করার জন্মে চেষ্টা করো, তা হলেই নিজের মধ্যে অধিকতর বিশ্বাস সঞ্চয় করতে পার্বে—"

যেদিন এই বিশ্বাস তোমাদের মধ্যে জন্মাবে, সেদিন সংযমের মাধ্যমে ইচ্ছাশক্তির অপরাজেয় ক্রিয়া উপলব্ধি করতে পারবে। তোমাদের ইচ্ছাশক্তি অর্জ্জনের উদ্দেশ্যে যেন সৎ দৃষ্টি, মহৎ সঙ্কল্প, সদ্‌বাক্য, সদ্ব্যবহার, সদুপায়ে বিদ্যা ও জীবিকাহরণ, সৎচেষ্টা, সদসঙ্গ ও সৎস্মৃতি অন্তরে বাহিরে ফুটে ওঠে, তা হোলেই আমার বক্তব্য সার্থক হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'বৈশাখী ঝড় যেমন দেখ্তে দেখ্তে সমস্ত দিক ছেয়ে ধরণীর তাপ ও শুষ্কতা বর্ষণে মোচন করে, তেমনি নিজের পরিপূর্ণতাও পুরুষকারের অপেক্ষা না করে এক মুহূর্ত্তে মন ছেয়ে সমস্ত কর্ম্মক্ষোভ ও অপবিত্রতা দূর করে দেয়। সে মৌচাকের মধুভরা নয়, সে বসন্তের এক নিশ্বাসে বনে বনে লক্ষকোটি ফুলের নিগূঢ় মর্ম্ম-কোষে মধু সঞ্চারিত করে দেওয়া—'

নিজের পরিপূর্ণতা একমাত্র সংযমের মাধ্যমে অদম্য ইচ্ছাশক্তির সাহায্যেই সম্ভব। এই পরিপূর্ণতা লাভ হলে মানুষ মানুষের মত হয়ে উঠতে পারে, এ কথাটী তোমরা ভেবে দেখো।

'নলিনীকুঠি'

কামালপুর, চাকদহ। নদীয়া।

আশ্বিন ১৩৬১, মহাসপ্তমী

পরম কল্যাণীয় আমার ভাই বোনেরা,

আজ জাতির দিব্য মুহূর্ত্তে, তোমাদের আশীর্ব্বাদ করিতেছি। তোমরাই দেশের প্রাণ। তোমাদের কণ্ঠেই নব জীবনের গান শুনিয়া দেশবাসী আনন্দিত হউন। পরমা মহামায়ার শক্তিতে আমরা শক্তিমান। এ দিন, আমাদের বড় আনন্দের দিন। জীবনের অপরাহ্ণে, তোমাদের হাসিমুখ আমাকে শান্তি দিক। প্রার্থনা করি, তোমরা ধনে-ধান্যে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, সাহিত্যে, মহত্ত্বে, ঔদার্য্যে শ্রেষ্ঠ হও। মহীয়ান হও। তোমরা শক্তি সঞ্চয় কর। দেশ ও জাতির ঐতিহ্য উজ্জ্বল কর।

তোমাদের মনুষ্যত্ব যেন দেবত্বে পরিণত হয়। তোমাদের যশ দেদীপ্যমান থাকুক। বাণী-বিজয়িনী হউন্। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

তোমাদের দাদু,

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

"ফুল-ফোটার ছন্দ"

[নাটিকা]

স্বপনবুড়ো

(সন্ধ্যেবেলা। একটি ছোট্ট মেয়ে টবের পাশে চুপচাপ বসে আছে। ঝিরঝিরে হাওয়ায় একটি ফুলের কুঁড়ি হেলছে, দুল্‌ছে। মেয়েটি এক দৃষ্টে ফুলের কুঁড়িটির দিকে তাকিয়ে আছে। এমন সময় আস্তে আস্তে মেয়ের মা এসে কাছে দাঁড়ালেন। মেয়েটির কিন্তু এতটুকু হুঁস নেই। সে একই দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।)

মা॥ কিরে কণা, সেই বিকেল থেকে চুপচাপ টবের পাশেই বসে আছিস? জলখাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল! তারপর পড়তে বস্‌বি নে? এক্ষুনি মাষ্টারমশাই আসবেন যে!

কণা॥ দেখ্‌বে এসো মা, কি মজার ব্যাপার! আমার টবে একটি কুঁড়ি ফুটেছে। কাল সকালে ফুল ফুট্‌বে।

মা॥ তা ত' ফুট্‌বেই। সেটা আর এত হাঁ করে দেখ্‌বার কি আছে? তাড়াতাড়ি জলখাবার খেয়ে পড়তে বোস্। একটা কুঁড়ির মধ্যে এত কি লুকিয়ে রয়েছে বুঝিনে বাপু!

কণা॥ দেখ্‌বার নেই? তুমি বল্‌ছ কি মা? এই আজ সন্ধ্যেবেলায় কুঁড়ি রয়েছে, কাল সকালে একটা পুরো ফুল আমাদের চোখের সামনে বাতাসে দুল্‌তে থাকবে, ছড়িয়ে দেবে তার সুবাস। কিন্তু রাত্তিরের অন্ধকারে কি ভাবে কখন ফুল ফুট্‌বে আমি দেখ্‌বো। তাই ত চুপচাপ বসে আছি টবের ধারে। আজ আমি চোখের পাতা কিছুতেই বন্ধ করছিনে। যেই ফুলটি ফুট্‌বে আমি দেখে নেবো।

মা॥ কি যে আবোল-তাবোল পাগলের মতো কথা বলিস্ তার কিছু ঠিক নেই! ফুল ফোটার মধ্যে কি আছে তা ত' কোনো দিন শুনি নি বাপু! তোর যত আজে বাজে খেয়াল!

কণা॥ বা রে! কার খেয়ালে অন্ধকার রাত্রে সবার অজান্তে ফুল ফোটে তা দেখ্‌বো না? তখন তোমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়বে। আকাশে চাঁদ জাগবে, আর নীচে জাগ্‌বো আমি। কিন্তু ফুল কি করে ফোটে আমি দু'চোখ মেলে দেখ্‌বো।

মা॥ (রেগে) যা খুশী করো, আমি কিচ্ছু জানি নে। তারপর যদি ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করে—ভুগ্‌তে হবে ত' আমাকেই! (প্রস্থান)

কণা॥ মা রাগ করে চলে গেল...এ হল ভালো। আমি চুপিচুপি আর একা-একা! কেউ কোথাও নেই। বেশী লোক কাছাকাছি থাকলে ফুল হয়ত লজ্জা পাবে... ফুট্‌তে চাইবে না! (একটু ভেবে) আমাকে ফুল ভালো-বাস্‌বে। একটুও পর ভাববে না। চোখ পিট্‌ পিট্‌ করে মেলে দেবে ওর দল। তাই ত' দু'চোখ ভরে আমি দেখ্‌বো।

(নেপথ্যে সেতারের ঝঙ্কার)

(পা টিপে টিপে চাঁদের আলোর প্রবেশ)

চাঁদের আলো॥ এ কি! খুকু এখনো ঘুমোয় নি! ফুল ফোটার যে সময় হয়ে গেল! এখন উপায়?

দখিণ হাওয়া॥ তাই ত' আমিও ভাবছি। কিন্তু খুকুর চোখে ঘুম নেই। ঘুম পাড়ানি মাসি-পিসির আজ হল কি?

চাঁদের আলো॥ হবে আবার কি? হয় ত বাপের বাড়ী চলেছে দুজনে।

দখিণ হাওয়া॥ তা হলে এখন উপায়? খুকু না ঘুমুলে ত' আমরা ফুল ফোটাতে পারবো না।

চাঁদের আলো॥ আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? তুমি ত' খুব তাড়াতাড়ি ছুট্‌তে পারো, ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসিকে ডেকে আন্‌তে পারো না?

দখিণ হাওয়া॥ সে হয়ত পারি। তা হলে তুমি ততক্ষণ খুকুকে যতটা পারো ভুলিয়ে রাখো।

দখিণ হাওয়ার গান

যতদূর চোখ যায়—চলি ফুর্ ফুর্ !
মাসি পিসি আছে যেথা পাহাড়ের পুর।
বাটা ভরা পান নিয়ে
মাসি পিসি মিশি দিয়ে
মেঘের ভেলায় চড়ে আসে তুর্ তুর্ ॥
মাসি-পিসি নিজে আজ ঘুম-কাতুরে
বাপের বাড়ীতে দেখি বড় আদুরে।
নিয়ে আয় খিলি পান,
মিঠে সুরে শোনা গান
না যদি আসিস্ তবে চলে যা দূরে ॥

(দখিণ হাওয়া দূরে চলে গেল)

চাঁদের আলো ॥ যতক্ষণ দখিণ হাওয়া ফিরে না আসে আমাকেই ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু কণা যে ভাবে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে—ও দস্যি মেয়ে যে ঘুমুবে তা ত' বোঝা যাচ্ছে না! আমার মিঠে রূপোলী আলোতে ওর কোঁকড়া চুলগুলি চমৎকার দেখাচ্ছে। আচ্ছা, কি করলে ওর ঘুম আস্‌বে? ঘুম-পাড়ানি মাসি-পিসি যদি না আসে তা হলে ত' মহা মুস্কিল! আচ্ছা, আস্তে আস্তে ওর হাল্‌কা চুলে জ্যোৎস্না দিয়ে সুড়সুড়ি দেবো?

(একটু একটু সুড়সুড়ি দিতে লাগলো)

কণা ॥ (হাই তুলে) এ কি! আমার ঘুম পাচ্ছে যে! না—না! আমি কিছুতেই ঘুমুবো না। উঠে দাঁড়িয়ে একটুখানি পাইচারী করি।

(উঠে ছাদে ঘুরতে লাগ্‌লো)

(মায়ের প্রবেশ)

মা ॥ এ কি রে কণা, এখনো ছাদে ঘুরে বেড়াচ্ছিস? চল, খাবি চল।

কণা ॥ না মা, আমি ছাদ থেকে কিছুতেই ভেতরে ঢুক্‌বো না। যদি এর মধ্যে ফুল ফুটে যায়!

মা ॥ পাগ্‌লি মেয়ে! আচ্ছা, প্লেটে করে তোর খাবার দিচ্ছি! ছাদেই না হয় খা! তাই বলে রাত উপোসি থাক্‌তে আছে? কথায় বলে, রাত উপোসি থাক্‌লে হাতিও কাহিল হয়ে পড়ে!

কণা ॥ ওই ত' ঝি খাবার নিয়ে এসেছে। দে, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খেয়ে নি—

(খেতে লাগ্‌লো)

মা ॥ চল্ লো ক্ষেমীর মা, আমার এ এক অবুঝ মেয়ে হয়েছে। ফুল ফোটা দেখবি কি করে বাপু! লোকে শুন্‌লে যে হাস্‌বে।

(মা ও ঝিয়ের প্রস্থান)

(ঘুম পাড়ানি মাসি-পিসির প্রবেশ।
সঙ্গে রয়েছে দখিণ হাওয়া)

দখিণ হাওয়া ॥ এই মেয়েটির নাম হচ্ছে কণা! মাসি-পিসি, তোমরা যখন এসে পড়েছ—তখন আর কোনো ভাবনা নেই। সুন্দর একটি ছড়া গাইতে সুরু করে দাও। তক্ষুণি চোখের পাতায় ঘুম নেমে আস্‌বে।

ঘুম পাড়ানি মাসি-পিসির গান

আয়রে ঘুম আয়রে আয়!
কণার চোখে ঘুম যে ছায়!
সাত সাগরের হাওয়া দিয়ে পাড়াই ঘুম!
রাতের তারা দুই নয়নে লাগায় চুম!
দিনের আলোর রদ্দুরেতে আপদ-বালাই যায়!
আয়রে ঘুম আয়!
মাটির মেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো শয্যাতে
ফুল যে তোমার ফুট্‌ছে নাকো লজ্জাতে!
নিশীথ রাতে ঘুমের পাখী পাখ বিছায়
নিঝুম পুরী শীতল পাটি কই বিলায়?
আয়রে ঘুম আয়
কণার চোখে আয়!

মাসি ॥ কিন্তু কি আশ্চর্য্য! মেয়েটা এখনো ছাদে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পিশি ॥ আমাদের ঘুম-পাড়ানি গান শুনে দানব ঘুমিয়ে পড়ে, আর ওই একরত্তি মেয়ের চোখের পাতায় ঘুম নেই?

মাসি ॥ তাইত! ছেলে হারিয়েছে মা, চোখে একফোঁটা ঘুম নেই···আমরা ঘুম-পাড়ানি মাসি-পিসি ছড়া গেয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়েছি।

পিসি ॥ টাকার গরমে মাথা হয়েছে তপ্ত! বরফ,

চাপিয়েও একটুখানি ঠাণ্ডা হয় নি। আমরা গান গেয়ে সেই তপ্ত মাথা ঠাণ্ডা করেছি। টাকায়-গরম-মানুষের চোখেও এনে দিয়েছি কাল-ঘুম!

মাসি॥ কিন্তু এই পুঁট্কে মেয়ে যে আমাদের জব্দ করল। ত্রিভুবনের লোককে আমরা ঘুম পাড়াই, আর এই কণার চোখে ঘুম আন্‌তে পারবো না! এ হল কি আমাদের?

পিসি॥ আর একটি গান ধরবো নাকি দুজনে?

মাসি॥ না-গো-না, তাহলে আরো লোক হাসাবো। এই বেলা মানে-মানে পালাই চল্—

[মাসিপিসির প্রস্থান]

দখিণ হাওয়া॥ মাসি-পিসি ত' পালিয়ে প্রাণ বাঁচালো, এখন আমি কি করি?

চাঁদের আলো॥ আমিও ত' অনেকক্ষণ ধরে ওর কোঁকড়া চুলে হাত বুলিয়ে দিলাম। কিন্তু ভারী দুষ্টু মেয়ে! কিছুতেই ঘুমুবে না। হার মেনেছি ওর কাছে।

দখিণ হাওয়া॥ যা বলেছিস ভাই। আমার মিষ্টি হাওয়ায় কে না ঘুমিয়ে পড়ে বল! কিন্তু একেবারে ধানি লঙ্কা। আমাকে শুদ্ধু কাঁদিয়ে ছেড়েছে!

চাঁদের আলো॥ ও ভাই রাতের তারা! অনেক দূরে ত' রয়েছ! আমাদের একটু সাহায্য করতে পারো?

[রাতের তারার প্রবেশ]

রাতের তারা॥ কি করতে হবে বলো! আমি আকার ছোট-খাটো ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাই নে! অনেক উঁচুতে থাকি কিনা! নোংরা পৃথিবীর কথা ভাব্‌বার সময় কৈ? তা কি বল্‌বে চটপট্ বলে ফেল!

দখিণ হাওয়া॥ ওই যে ছোট্ট মেয়েটিকে দেখ্‌ছ… টবের ধারে চুপচাপ বসে আছে। ওর চোখে ঘুম আনাতে পারো? আমরা দু'জনে ত' হিম্‌সিম্ খেয়ে গেলাম!

রাতের তারা॥ ওই ক্ষুদে মেয়েটাকে ঘুম পাড়াবার জন্যে আবার আমাকে ডাকতে হল? লজ্জার কথা! এতে আমার অপমান হয় তোমরা জানো?

চাঁদের আলো॥ তা আমাদের জন্যে একটু অপমান না হয় তোমার হলই! দোহাই তোমার রাতের তারা, আমরা প্রাণে বেঁচে যাবো। খুকু না ঘুমুলে ফুল ফুটতে পারছে না! আমাদেরও ছুটি নেই তা হলে!

রাতের তারা॥ ও! এই কথা! আচ্ছা, একটি গান গেয়ে এক্ষুণি তোমাদের পুঁচ্‌কে মেয়েটাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি। তখন আবার আমাকে যেন পিছু ডেকো না।

রাতের তারার গান

নীল গগনে আলো জ্বালাই আমি রাতের তারা,
বিশ্ব মাঝে দিই ছড়িয়ে নতুন গানের ধারা॥
অনেক দূরে জ্বালাই প্রদীপ
তোরা ভাবিস্ কপালে টিপ্
সে গান শুনে তিনটি ভুবন হল পাগল পারা
সবাই ঘুমায় গানের সুরে—নিদ্রা-বিহীন যারা॥

রাতের তারা॥ এ কী! আমার গান শুনেও পুঁচ্‌কে মেয়েটা চুপ চাপ বসে রইল, ঘুমে ঢুলে পড়ল না ছাদের ওপর?

চাঁদের আলো॥ হা—হা—হা!

দখিণ হাওয়া॥ হো—হো—হো!

রাতের তারা॥ কি? আমায় অপমান! চল্লাম আমি আড়ালে, এ নোংরা পৃথিবীতে এক মুহূর্ত্তও থাক্‌তে চাইনে। তোদের কথা শোনাই আমার ভুল হয়েছে।

[রাতের তারা রেগে চলে গেল!]

দখিণ হাওয়া॥ রাতের তারা ত' পালালো, এখন উপায়?

চাঁদের আলো॥ ওই যে ভোরের শিশির যাচ্ছে। ওগো ভোরের শিশির, এই কণা মেয়েটাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারো?

ভোরের শিশির॥ আমি কি পারবো! আমি যে অতি ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছ, কারো নজরেই পড়ি না!

দখিণ হাওয়া॥ না, না, তুমিই পারবে। আর দেরী না, ওদিকে ভোর হয়ে এলো। তোমার মনের কথা গানে গানে শোনাও ত!

ভোরের শিশিরের গান

ভোরের শিশির আমি টুল্ টুল্ টুল্!
সমীরণে দোল খাই পরীদের দুল!

অতি ছোট, থাকি আমি সব আড়ালে—
পদতলে মিশে যাই হাত বাড়ালে!
নয়নের বারিপাতে ফোটাই যে ফুল ॥

চাঁদের আলো ॥ কি আশ্চর্য্য! ভোরের শিশিরের গান শুনে দুষ্টু খুকু ঘুমিয়ে পড়েছে…

দখিন হাওয়া ॥ আরো মজা…সঙ্গে সঙ্গে ফুলও ফুটেছে…সবার চোখের আড়ালে সঙ্গোপনে!

চাঁদের আলো ॥ তাই ত বলি, ফুল ফোটার ছন্দ লুকিয়ে রয়েছে ভোরের শিশিরের কণ্ঠে। আমরা মিছেই আকাশপাতাল খুঁজে মরছি!

—যবনিকা—

ঝগ্‌ড়াতে যার হয় না উপায়

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

বিশাল খালের উপর ছিল
বাঁশের সরু সাঁকো—
একের বেশী তার উপরে
পার হওয়া যায় নাকো।
রামু দামু দুদিক থেকে
এলো সাঁকোর মাঝে,—
সাম্‌নে এসে এগিয়ে কেউ
যেতেই পারে না-যে।
রামু তখন বল্লে তারে'—
পথটি দিতে ছেড়ে'—
"তা হবে না, তা হবে না—"
বল্লে দামু তেড়ে।
রামু জানায় "পথ ছেড়ে দাও,—
পিছনে যাও হটে,—"
দামু তখন দাঁড়ায় রুখে,
বল্লে তারে চ'টে—
"কে হে তুমি সাম্‌নে এলে,—
সাঁকোর উপর আজি,—
পালাও তুমি, আমি হেথায়
সরতে নাহি রাজি।
যেতেই হবে আগেই আমায়,—
বড়ই তাড়াতাড়ি,—
নড়্‌ব নাকো, দেখছি তুমি
বে-আক্কেলে ভারি।"
রামু বলে "আমারও যে—
বেজায় তাড়া আছে,—
আগে যাবার আর্জ্জিটা তাই—
জানাই তোমার কাছে।"
কে আগে পথ ছাড়বে সেটা
স্থির হোলো না কিছু,—
সাঁকোর আগে দাঁড়ায় দুজন,—
হট্‌বে না কেউ পিছু।
হঠাৎ তারে বল্লে রামু—
স্বরটি নরম করে',
"ঠেলাঠেলি করলে হেথা—
জলেই যাব পড়ে।"
গভীর জলে পড়লে পরে
বাঁচাই কঠিন হবে,
তার চেয়ে ভাই ঝগ্‌ড়া ছাড়ো—
বুদ্ধি বলি তবে,—
উবু হয়ে বসছি আমি—
ডিঙিয়ে যাও চলে—
ঝগড়াতে যার হয় না উপায়—
হয় সেটা কৌশলে।"
এই না বলে উবু হয়ে
বস্‌লো সেথায় রামু—
টপ্‌কিয়ে তায় খালটি এবার
পার হয়ে যায় দামু।

ছোট-বড়

শ্রীমণীন্দ্র দত্ত

দুর্ভাগ্যক্রমে এমন একটি জীবিকা আমাকে গ্রহণ করতে হয়েছে যে, ঘুষ না নিলে—ঘুষ না দিলে আমার জান-মান বাঁচানো দায়। প্রথম প্রথম খুবই খারাপ

লাগতো। বিবেক বিদ্রোহ করতো। অনেক সময়ই ভাবতাম, চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দেব।

সুকুমারের কথা ভাবতেই আমার আরো খারাপ লাগতো। সুকুমার এখন বড় হচ্ছে। স্কুলে পড়ে। আমার এই ঘুষখোর জীবিকার জঘন্যতা যখন তার বুদ্ধিতে ধরা পড়বে, আমাকে তখন সে কী মনে করবে? বাবা বলে আমাকে শ্রদ্ধা করা তার পক্ষে সম্ভব হবে কি? যদি না হয়? ছেলে যদি আমাকে ঘৃণা করে মনে মনে?

এই সব ভেবেই চাকরিতে ইস্তফা দেবার কথা ভেবেছি অনেক দিন। কিন্তু ক্রমে সবই সয়ে গেছে। জীবনের চাকার তেল জোগাতে একাকার হয়ে গেছে বুঝি ভাল-মন্দের ভেদাভেদ। মন খারাপ লাগে। বিবেক দংশন করে। কিন্তু অভাবের সংসারের উদ্যত তর্জনীর সামনে সবাই চুপ করে থাকে। দিন গড়িয়ে যায়।

একদিন বিকালে।

এমনি এক মক্কেলের সংগে আদান-প্রদানের কথা হচ্ছিলো। কথায় কথাই বাড়ছে, কিন্তু মীমাংসা হচ্ছে না কাজের। কথা বাড়তে বাড়তে ক্রমে বাড়ছে মেজাজ। স্বভাবতঃ ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ আমি, কখন যে রুক্ষ মেজাজে চড়া গলায় কথা বলতে সুরু করেছি, নিজেই বুঝতে পারি নি।

বুঝতে পারলাম যখন ঘরে ঢুকলো সুকুমার। চমকে কথা থামিয়ে ওর দিকে চাইলাম। ওর চোখে মুখে কেমন যেন একটা বিরক্ত বিস্ময়। একটা যেন প্রশ্ন ওর চোখে। ওর বাবা এমন করে কড়া মেজাজে চড়া গলায় কথা বলতে পারে, এ যেন ওর কাছে বিস্ময়কর, অনভিপ্রেত।

নিজের কাছে বড়ই লজ্জিত বোধ করলাম। মৃদু গলায় সুকুমারকে বললাম—বাড়ির ভিতরে যেতে। সুকুমার মাথা নিচু করে চলে গেলো।

মক্কেলকে বললাম: আপনি আজ চলে যান। আজ আর এ বিষয়ে কোন কথা হবে না।

মক্কেল সবিস্ময়ে বললেন: সে কি? এমন লাভের ব্যাপারটা আজই সেরে না ফেললে হয়তো হাত ছাড়া হয়ে যাবে?

বললাম: তা যায় যাক। মোট কথা আজ আর কোন আলোচনা আমি করতে পারব না। আপনি আসুন।

অগত্যা মক্কেল চলে গেলেন। বারান্দায় ইজি-চেয়ার পেতে চুপ করে বসে রইলাম। অনেক দিন আগেকার একটি ছোট ঘটনা মনে পড়লো।

অনেক দিন আগেকার কথা।

তখন জীবিকা ছিলো অন্য। বাসস্থান ছিলো অন্যত্র।

আসামের এক চা-বাগানে তখন চাকরি করতাম। মোটামুটি মন্দ ছিলাম না।

সুকুমার তখন ছোট। বছর পাঁচ ছয় বয়স।

বাগানের ইংরেজ ম্যানেজারের জন্যে একটি নতুন বাড়ী তৈরির প্ল্যান মঞ্জুর হয়ে এলো উপর থেকে। শুধু কাঠ দিয়ে তৈরি একখানি খুব 'ফ্যাশানেব্‌ল্' বাংলো বাড়ি।

ম্যানেজার সাহেবের সুনজর ছিলো আমার উপর। আমার সততায় ছিলো তাঁর বিশ্বাস। তাই আমার উপরেই তিনি ছেড়ে দিলেন বাড়ি তৈরির সমস্ত ভার।

মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করলাম। এতগুলো টাকার কাজ সাহেব আমার হাতেই সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলেন।

কিন্তু সেই আত্মপ্রসাদের রন্ধ্র পথেই বুঝি শনি প্রবেশ করলো আমার জীবনে।

আমার পিছনে ফেউ জুটলো এক দালাল। দিনরাত সে আমার পিছনে ঘুরতে লাগলো, এক কন্সট্রাক্সন কোম্পানীর হয়ে ওই বাড়ি তৈরির কণ্ট্রাক্ট নেবার জন্যে। প্রথমে অনুরোধ-উপরোধ, অনুনয়-বিনয়, তারপর ঘুষের লোভ। বেশ মোটা টাকা ঘুষ।

এমন সময় একদিন সকালে এসে হাজির হলো একদল চীনা মিস্ত্রি। কোথা থেকে শুনেছে সাহেবের বাড়ি তৈরির খবর, তাই এসেছে। গিয়েছিলো সাহেবের কাছেই। তিনি আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কি করি? শুনেছি, চীনারা খুব ভালো কাঠের মিস্ত্রি। তা ছাড়া, খুব ভালো ভালো এক তাড়া প্রশংসাপত্র তারা দেখালো অনেক রাজা-মহারাজা, সাহেব-সুবোর। ওদের হাতে ছেড়ে দিলে বাড়িটা হয়তো মনোমতই হবে। কিন্তু সেই দালাল? তার মোটা টাকা?

হঠাৎ মন স্থির করতে পারলাম না। ওদের কদিন অপেক্ষা করতে বললাম, চা-বাগানের ক্লাব-ঘরে।

ওরা সানন্দে রাজি হলো। শুধু বুড়ো মিস্ত্রি বললে: বাবুজি, শুধু হাতে বসে থাকব এ কদিন? তার চেয়ে তোমার জন্যে একটা নক্সা-কাটা টেবিল তৈরি করি! তুমি শুধু কাঠটা আনিয়ে দাও। তারপর কাজ দেখে যা তোমার ইচ্ছে হয় মজুরি দিও।

রাজি হলাম।

কয়েকদিন পরেই দেখা গেলো, নাওয়া, খাওয়া আর ঘুমের সময় ছাড়া এক দণ্ডও সুকুমারকে বাড়িতে পাওয়া যায় না। সারা দিন ও ক্লাব-ঘরে কাটায় চীনা মিস্ত্রিদের কাছে।

ব্যাপার কি?

একদিন বিকেলে গেলাম ক্লাব-ঘরে। দেখি বুড়ো চীনার কোলে বসে শ্রীমান সুকুমার মহানন্দে কেক ভক্ষণ করছে।

আমায় দেখে হেঁ হেঁ করে বুড়ো চীনা বললে: আপনার এ ছেলেটি বড়ই লক্ষ্মী। কেমন চুপটি করে বসে বসে আমাদের কাজ দেখে। বড় হয়ে এ ছেলে খুব বড় 'মিস্ত্রি' হবে।

আমি মৃদু হাসলাম। তারপর সুকুমারকে সংগে করে বাড়ি ফিরে এলাম।

কয়েকদিন পরে ম্যানেজার-সাহেব নিজে একদিন ক্লাব-ঘরে যেয়ে আমার জন্যে তৈরি টেবিলটা দেখে খুব খুসি হয়ে গেলেন। সংগে সংগে নিজের জন্য ছোট ছোট কয়েকটি জিনিষ বানাবার হুকুম দিয়ে দিলেন!

চীনা-মিস্ত্রিরা বেশ জাঁকিয়ে বসলো এবার। আর সেই সংগে সেখানে পাকা আসন বসালো সুকুমার। মায়ের কাছ থেকে চেয়ে আমচুর আর কাসুন্দি নিয়ে দেয় বুড়ো মিস্ত্রিকে। আর তার কোলে বসে খায় কেক, বিস্কুট ও অন্য সব খাবার।

বুড়ো চীনা ওকে নানা রকম গল্প শোনায়। কাঠ কেটে ছোট ছোট খেলনা বানিয়ে দেয়। একদিন কাঠ খোদাই করে তৈরি করে দিলো সুন্দর একটি ড্রাগনের মূর্তি।

নিজের টুকিটাকি জিনিষগুলো দেখে ম্যানেজার সাহেব তো মহাখুসি। বাংলো-বাড়ি তৈরির কাজটা যে চীনা মিস্ত্রিরাই পাবে, এ এক রকম ঠিকঠাক।

এমন সময় আবার এলো সেই দালাল। সংগে কন্‌স্ট্রাকশন্ কোম্পানীর বড়বাবু। বড়বাবু সোজাসুজি জানালেন, সাহেবের বাংলো বাড়ি তৈরির কাজটা তাদের দিলে একটা মোটা টাকা তারা আমাকে দেবেন। এখন আমি রাজি কিনা।

মাথা চুল্‌কালাম, নখ খুঁটলাম, অনেক ভাবলাম। অবশেষে রাজি হলাম।

সাহেবকে বুঝালাম, এই সব টুকিটাকি নক্সার কাজেই চীনারা ওস্তাদ। এত বড় একটা বাড়ি তৈরির কাজ কোন সুপ্রতিষ্ঠিত ফার্ম ছাড়া যাকে তাকে দেওয়া সংগত নয়।

সাহেব দুচার কথাতেই রাজি হলেন। রাতারাতি কণ্ট্রাক্ট স্বাক্ষরিত হলো।

পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিয়ে কদিন পরেই চীনা মিস্ত্রিরা তল্পি-তল্পা বেঁধে রওনা হলো।

তখনি ঘটলো এক আশ্চর্য ব্যাপার। বুড়ো চীনাকে কিছুতেই যেতে দেবে না সুকুমার। ওকে জড়িয়ে ধরে ওর সে কী কান্না!

বুড়ো যতো বলে: আমি আবার আসবো খোকাবাবু, তুমি কেঁদো না, সুকুমার তত জোরে ওকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে: না, না, তুমি যাবে না, কিছুতেই যাবে না।

বুড়ো মিস্ত্রির দুই চোখ বেয়ে টস্ টস্ করে জল পড়তে লাগলো। সুকুমারের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে 'বাবা সোনা' বলে অনেক কষ্টে সে পথে নামলো।

সুকুমারের কান্না কিন্তু থামলো না।

দিন-রাত ও গুম্ হয়ে থাকে। মাঝে মাঝেই ক্লাব-ঘরে যায়। আর থেকে থেকে অকারণেই কেঁদে ওঠে।

আমি কিছুতেই ওর কাছে যেতে পারি না। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই ওর কাছ থেকে। নিজেকে বড়ই ছোট মনে হয় ওর পাশে।

* * *

অকারণেই একটা দীর্ঘ শ্বাস পড়লো।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। একটি দুটি করে অনেকগুলো তারা ফুটেছে আকাশে। একটু পরেই উঠবে চাঁদ।

সুকুমারের চাঁদমুখখানি মনে পড়লো।

হঠাৎ, আজ আবার নিজেকে বড়ই ছোট মনে হলো ওর পাশে।

পরদিনই চাকরিতে ইস্তফা দিলাম।

এ কাজ আর নয়। আর নয় এখানে। এবার অন্য কোথা—অন্য কোন খানে,—সুকুমারের চাঁদ-মুখ যেখানে বাবার দিকে চেয়ে কালো হয় না।

চীনদেশীয় ম্যাজিক

যাদুকর এ-সি-সরকার

প্রাচীন সুসভ্য দেশগুলির মধ্যে চীনের একটা বিশেষ স্থান আছে। চীনের সভ্যতা আজকের নয়, বহু শতাব্দী পূর্ব্বেই সভ্যতার আলোক প্রবেশ করেছিলো এই দেশে। বিজ্ঞানে, দর্শনে ও কারীগরী বিদ্যায় যেমন এদেশ উন্নত হয়ে উঠেছিল তেমনি হয়েছিল চারুকলার উন্নতি। অভিনয় নৃত্য-গীত ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে যাদুবিদ্যারও বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল প্রাচীন চীনে। তখনকার দিনে কোন্ কোন্ যাদুকর কিরূপ ছিলেন সে সব কথা আমরা জানি না বটে, কিন্তু তখনকার দিনে চীনদেশে প্রচলিত অনেক খেলাই আজকের দিনে যাদু-জগতে বিশেষ সমাদর লাভ করেছে।

প্রাচ্যের যাদুবিদ্যা চিরকালই পাশ্চাত্যের বিস্ময় উৎপাদন করে এসেছে। ভারতীয় যাদুবিদ্যায় সামান্যতম খেলার কৌশলও অদ্যাবধি খুঁজে বের করতে পারেন নি পাশ্চাত্যের যাদু বিশেষজ্ঞবৃন্দ। এই কারণেই ভারতীয় যাদুবিদ্যা আজও রয়ে গেছে রহস্যের অন্তরালে। এ রহস্যের সমাধান স্থূল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সম্ভব নয়—অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম তথ্যে মিলবে এর সমাধান।

ভারতীয় এবং চীনদেশীয় যাদুবিদ্যায় ইউরোপ ও আমেরিকাবাসী জনসাধারণের আছে প্রবল আকর্ষণ। এই কারণেই বিভিন্নকালে বিভিন্ন যাদুকর নিজেদের নাম পরিবর্ত্তন করে ভারতীয় ও চীনদেশীয় নাম গ্রহণ করে সেই প্রকার বেশভূষা পরে ও ছদ্মবেশ ধারণ করে কেবলমাত্র রঙ্গমঞ্চেই অবতীর্ণ হন নি, স্বাভাবিক জীবন যাত্রার ক্ষেত্রেও তেমন ভাবেই থেকেছেন। প্রসঙ্গ ক্রমে আর্থার রুড ডার্বির নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ও তাঁর ছেলে ভারতীয় বেদের বেশভূষা প'রে 'করাচী' ও 'কাদের' এই ভারতীয় ছদ্ম নামে যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করাতেন। বর্ত্তমানেও একজন মার্কিন যাদুকর মহম্মদ বক্‌স দি হিন্দু (Mohammod Box the Hindu) এই ছদ্ম নামে যাদুবিদ্যা দেখিয়ে থাকেন। এই যাদুকরটির নাম John Mulholland. William Elseworth Robinson নামক একজন যাদুকর 'চাং লিং সু' নাম গ্রহণ করে বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি বেশভূষা, হাব-ভাব—এমন কি চেহারার ও এমন পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছিলেন যে তাকে খাঁটী চাইনিজ ছাড়া আর কোন কিছু বলে ধরাই যেত না। তিনি নিজের ছদ্মবেশ ধারণ সম্বন্ধে এত নিশ্চিন্ত ছিলেন যে চাং লিং ফু (Chung ling Foo) নামক এক খাঁটি চাইনিজ যাদুকরকে নকল চীনে এবং নিজেকে আসল চীনে বলে প্রচার করতেও সাহসী হয়েছিলেন। এই ভাবে অনেক যাদুকরই চীনেও



চোখ বাঁধা অবস্থায় রাজপথে মোটর বাইক চালনায় রত
যাদুকর শ্রী এ-সি সরকার

ভারতীয় ছদ্মনাম ও ছদ্ম পরিচয় গ্রহণ করে যাদুজগতে সুপরিচিত হয়েছেন।

চীনদেশীয় যাদুর খেলার সঙ্গে ভারতীয় যাদুর পার্থক্য অনেক। ভারতীয় যাদুর খেলার মূলতথ্য ক্ষিপ্র-হস্ত-কৌশল ও ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ। কিন্তু চীনদেশীয় যাদুবিদ্যার ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির কলাকৌশলই সব কিছুর মূল। মূলগত পার্থক্য বর্ত্তমান থাকলেও উভয় দেশীয় খেলার প্রদর্শন করানো ভঙ্গী প্রায় একই প্রকার। যেমন বিখ্যাত ভারতীয় আমগাছ তৈরীর খেলাটি। চারদিকে দর্শকেরা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যাদুকর একটা সাধারণ খালি টব নিয়ে তার মধ্যে মাটি ভরে নিল, আর দর্শকদের দেখিয়ে শুকনো আমের আঁটি ঐ টবের মাটিতে পুঁতে দিল। এইবার একটী

কাপড় দিয়ে তৈরী ছোট্ট তাঁবু দিয়ে টবটাকে ঢাকা দিয়ে পর মুহূর্ত্তে ঢাকনা তুলে নিতেই দেখা গেল টবের ভেতরে আমের চারা গজিয়েছে। আবার ঢাকা দেবার ফলে পত্রপল্লবশোভিত ছোট একটি গাছের জন্ম হল। সর্ব্বশেষে ঐ গাছের আমের ফলনও দেখানো হল ও পাকা আম কেটে দর্শকদের খাওয়ানো হল। এই খেলাটির সঙ্গে চীনদেশীয় একটি খেলার তুলনা করা যেতে পারে। চারিদিকে দর্শক-পরিবেষ্টিত অবস্থায় যাদুকর একটি বড় চাদর দিয়ে ঝাঁকুনি দেবার সঙ্গে সঙ্গে একটা টবের উপরে ফুল গাছের আবির্ভাব হ'ল। এই খেলাটি এবং পূর্ব্ববর্ণিত ভারতীয় আমগাছ তৈরীর খেলাটি উভয়ের মূল কৌশল বিভিন্ন হলেও দেখতে প্রায় একই প্রকার—তবে ভারতীয় আমগাছের খেলা যে বেশী বিস্ময়কর তা বলাই বাহুল্য।

চীনদেশীয় লিংকিং রিং (Linking Ring) ও ভারতীয় 'বলবাটীর খেলা' (Cups & balls) যাদু জগতে বিশেষ পরিচিত। লিংকিং রিং খেলাটি দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে এবং অনেক যাদুকরই বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে দেখিয়ে থাকেন। যাদুকর রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন ৫।৬টি



চীনা সজ্জায় ক্রীড়াপ্রদর্শন রত শ্রী এ-সি-সরকার

রিং নিয়ে। এই রিং দর্শকদের দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নেবার পরে যাদুকর একটা রিংয়ের সঙ্গে অন্য রিং জুড়ে দিতে থাকেন এবং অবশেষে রিংগুলো জুড়ে জুড়ে একটা মালা তৈরী করেন। এক রিং এর সঙ্গে অন্য রিং এমন সুন্দরভাবে জুড়ে যায় যে টেনেও তা বিচ্ছিন্ন করতে পারেন না দর্শকবৃন্দ। সম্প্রতি হংকং অবস্থানকালে এক চীনে যাদুকরকে এই খেলাটা এক বিশেষ ভঙ্গীতে দেখাতে দেখলুম, দুটো রিং নিয়ে উপর দিকে ছুঁড়ে দিলেন তিনি, একটার সঙ্গে অন্যটা গাঁথা হয়ে রিং দুটো পড়ল মাটিতে, কী অপূর্ব্ব নৈপুণ্য!

এবারে আসা যাক ভারতীয় বলবাটীর খেলা প্রসঙ্গে। এই বিশেষ খেলাটি অনেকেই দেখেছেন পথে ঘাটে নিরক্ষর বেদেদের হাতে। কী অভাবনীয় নৈপুণ্যের সঙ্গে এই খেলাটি যে তারা দেখায় তা অবর্ণনীয়। দুটো ছোট কাঠের বাটী আর কয়েকটা ছোট ছোট কাপড়ের বল—এই তো হচ্ছে খেলার সরঞ্জাম। কিন্তু এই অকিঞ্চিৎকর সরঞ্জাম নিয়ে যে বিস্ময়ের সৃষ্টি তারা করে থাকে, তা আজকের দিনের তথাকথিত বড় বড় প্রফেসারেরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। কেবলমাত্র হস্তকৌশল, দর্শক মনের উপরে প্রভাব বিস্তার করা ও দৃষ্টি বিভ্রম ঘটানোই এই খেলার মূল কৌশল। দুটো বাটীকেই খালি দেখিয়ে উপুড় করে রাখে যাদুকর। এর পরে একটা বাটীকে চিৎ করতেই তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে একটা বল। এই বলকে বাটী দিয়ে ঢাকা দিয়ে দ্বিতীয় বাটীটাকে চিৎ করে এর মধ্যেও দেখা যায় একটা বল—এই বলটাকেও আবার চাপ দেওয়া হয় দ্বিতীয় বাটী দিয়ে। প্রথম বাটীটাকে চিৎ করলে দেখা যায় তার মধ্যে দুটো বল রয়েছে দ্বিতীয় বাটীটা চিৎ করলে দেখা যায় তার মধ্যে বল নেই। এর পরে এই বাটী দুটোর মধ্যে বলের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এই হচ্ছে 'বলবাটির খেলা'। দু'একজন বেদেকে আমি এর চেয়েও উন্নত পর্য্যায়ে এই খেলাটাকে দেখাতে দেখেছি। সম্প্রতি উত্তর প্রদেশে সফরকালে আগ্রা সহরে এক বেদেকে এক অদ্ভুত ভঙ্গীর বলবাটীর খেলা দেখাতে দেখলাম। সে বাটীর নীচে বলের আবির্ভাব ও সংখ্যাবৃদ্ধি তো প্রদর্শন করালোই, অধিকন্তু শেষকালে বাটির নীচে থেকে দুটো ছোট ছোট মুরগীর বাচ্চা বের করে দর্শকদের বিস্ময় উৎপাদন করল। কতটুকু নৈপুণ্যের অধিকারী হলে যে এই জাতীয় খেলা দেখানো সম্ভবপর তা পাঠকমাত্রেই বুঝতে পারবেন।

চীন দেশীয় যাদুবিদ্যার অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলা হচ্ছে শূন্য স্টেজে বহু দ্রব্যের আবির্ভাব ঘটানো। কেবলমাত্র ছোট একটি চাদরের সাহায্য নিয়ে স্টেজের উপরে জলপূর্ণ কাঁচপাত্র ইত্যাদির আবির্ভাব ঘটানোর যে সুন্দর কৌশল অতি প্রাচীন কালেই চীনদেশে উদ্ভাবিত হয়েছিল, তা বর্ত্তমান কালের যাদুকরদের নিকটেও বিস্ময়ের বস্তু। এই কৌশল অবলম্বন করেই ল্যাকায়েত নামক এক ইউরোপীয় যাদুকর স্টেজের উপরে দুইটি বালকের আবির্ভাব ঘটিয়ে বিলাতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন। বর্ত্তমান শতাব্দীতে যারা এই জাতীয় খেলায় সিদ্ধহস্ত তাদের মধ্যে চীনা যাদুকর লংতাক্ সামের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই সমস্ত খেলা ছাড়াও এমন অনেক খেলা চীনদেশে অতি প্রাচীন কালে আবিষ্কৃত হয়েছিল যা তুলনায় পাশ্চাত্যের যাদুর খেলার চেয়ে কোন অংশে হেয় নয়।

মণ্টুর মা

ডাঃ শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী এম-এ, পি-আর-এস্, পি-এচ্-ডি

আজমীরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। পুষ্কর হ্রদ থেকে ফেরবার পথে পাহাড়ের ধারে একটি ছোট সুন্দর বাংলো ধরণের বাড়ী দেখে বিস্ময় ও কৌতূহল দুই খুব হলো। বাড়ীখানির সম্মুখে গোল কম্পাউণ্ড। সবুজ রংকরা বাহারে বেড়ায়-ঘেরা অজস্র ফুলে ফুলময় বাগান। ছোট সবুজ গেটটির

ওপরে সোনালী ফলকে বাংলায় ক্ষোদা আছে "মনোরমা-স্মৃতি-মন্দির"। ফুলের বাগান চিরে লাল কাঁকরের সরু ঢালা পথ দিয়ে সামনের ঘোরানো বারান্দার ওপরের লাল টালির ছাতে সন্ধ্যা-মালতীর ফুলন্ত লতায় ছেয়ে গেছে। তারার মতো লাল সাদা ফুল ভরে রয়েছে। আর থাকতে না পেরে ট্যাক্সী-চালককেই প্রশ্ন করলাম—"এটা কার বাড়ী ?" ট্যাক্সী-চালক বললে—"বাবুসাব, এটি একটি বাঙালী ভদ্রলোকের বাড়ী। কিন্তু এখানে কেউ থাকে না, একমালী আছে, সে-ই বাগান ও বাড়ী দেখা-শোনা করে।" আমি গাড়ী থামাতে বললাম। গেটের সম্মুখে এসে শ্রদ্ধা-দৃষ্টিতে এই ক্ষুদ্র স্মৃতি-মন্দিরের দিকে চেয়ে রইলাম। এমন সময় বাড়ীর ভিতর হতে শুভ্রকেশ এক বৃদ্ধ বেরিয়ে এলো। তার হাতে নিড়েনী দেখে বুঝতে পারলাম এই সেই মালী। মালী হাত যোড় করে অত্যন্ত বিনীতভাবে আমায় জিজ্ঞাসা করলে—"বাবুসাব আপনি কি বাঙালী—আপনাকে দেখে আমার—" "হ্যাঁ মালী, আমি বাঙালী—তাইতো এই অপূর্ব নিভৃত ফুলের মন্দির আমায় অভিভূত কোরে গাড়ী হ'তে নাবিয়েছে।" বাংলাতেই বলে উঠলাম। মালী এবার বড় অনুনয় করে আমায় ভাঙা ভাঙা বাংলায় বল্লে "বাবু আপনি দয়া কোরে ঘরে এসে বসুন।" সে সমুখের বড় ঘরখানি খুলে দিলে আমি ফুলবাগানের দিকের জানালা ঘেঁষে একখানি বড়ো গদী-আঁটা চেয়ারে বসলাম। পড়ন্ত বেলায় সোনালী রোদে সমস্ত ঘরখানি উজ্জল হয়ে উঠেছে, বাইরে মৃদু হাওয়ার ঢেউয়ে একসঙ্গে দুলছে ফুলের ঝাঁক। একা কিছুক্ষণ বসে রইলাম—মালী বাইরে গিয়েছিল—বিচিত্র সব ভাবনার সঙ্গে একটা শূন্যতার ভাব মনটাকে কেমন উদাস করে ফেলেছিলো। মালী এই সময় ফিরে এলো। আমার মুখপানে চেয়ে সে যেন আমার মনের অবস্থাটাই অনুমান করলে। একটু ম্লান হেসে সে আমার সমুখে মেঝেয় বসে পড়লে। ভাঙা ভাঙা বাংলায় বললে, "বাবু একটু আশ্চর্য হয়েচেন বোধ হয়। এই বাড়ীর মালিক এখানে খুব কমই থেকেছেন—নানান জায়গায় গিয়ে চাকরী উপলক্ষে ঘুরে বেড়াতে হতো। চাকরী হ'তে অবসর নিয়ে বছর দুই মাত্র তিনি এখানে ছিলেন। আর সেই সময়ই এ বাড়ীর সকল ব্যবস্থা তিনি কোরে দিয়েছেন। সহরে সারদাউকীলবাবুর কাছে সব দলিল-পত্র জমা আছে। বাবু বাপের একমাত্র সন্তান—বিয়েও কোরলেন না। এ বাড়ী রামকৃষ্ণ-আশ্রমকে দিয়েছেন—কোনও সাধু যদি একা থাকতে চান তো এখানে থাকতে পারেন। আর আমি যতোদিন বাঁচবো—আমারও একটা মাসোহারার বন্দোবস্ত কোরে গেছেন। তা ছাড়া ফুল-ফল বেচেও আমার কিছু হয়।···আমারও কেউ নেই।—একটি নাতনী ছিলো···তা বছর তিন হলো সে···ও···।"—এখানে মালীর কণ্ঠস্বর প্রিয়-হারানোর বেদনায় ডুবে গেলো। একটু পরে আস্তে আস্তে সে আবার বলতে লাগলো—"হ্যাঁ—তারপর এ বাড়ীতে থাকার একটি সর্ত হচ্ছে যে বাড়ীর কোনও জিনিষ অদল-বদল কোরতে পারবে না। বাবুর বাবা এই বাড়ী তৈরী কোরেছিলেন—তাঁরই এই হুকুম ছিলো। আমার বাবা তাঁর চাকর ছিলেন। বাবু এখন বুড়ো হয়েচেন—চিরজীবন কাটালেন বই পড়ে আর বেড়িয়ে। এখনও তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। উকীলবাবু তো আর তার ফিরে আসার আশা ছেড়েই দিয়েচেন।—তা আপনি বাঙালী বাবু—কিছুদিন এখানে থেকে যান না—আমি সব ব্যবস্থা কোরে দেবো।" সত্যিই, পাহাড়ের কোলে এই ছোট্ট বাড়ীটি এতো মনোরম লাগছিলো যে এখানে দু' একদিন থাকতে ভারী ইচ্ছে হলো। ট্যাক্সীকে বলে দিলাম যে হোটেলে গিয়ে যেন বলে দেয় যে দু'একদিন আমি এখন এখানেই থাকবো।

তিনটি পাশাপাশি সুদৃশ্য ঘর। পিছনে এক ধারে রান্নাঘর, স্নানের ঘর ইত্যাদি। মাঝে একটু উঠোন। এক কোণে একটি কুঁয়া। সব জায়গায় যেন একটি শূন্যতাভরা পবিত্র শান্তিতে ভরা রয়েছে।

মালী আমার খাবার-দাবারের জোগাড়ে সহরে চলে গেলো সেই ট্যাক্সীতেই। সহর প্রায় তিন মাইল দূর হবে। আমি ততক্ষণ বাড়ীখানি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম।

ঘরগুলি সবই ঝক্‌ঝকে, পরিষ্কার আর চমৎকার দামী আসবাব-পত্রে সাজানো। প্রত্যেক ঘরের দেওয়ালেই খুব ভালো ভালো হাতে আঁকা ছবি—বেশীর ভাগই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের। কতকগুলি ফটোগ্রাফও দেখলাম। তিনটি ঘরেই তিনখানি একই অয়েল-পেন্টিং—বেশ বড়ো কোরে আঁকা—অপূর্ব মাতৃমূর্তি! একটি দু'বছরের ফুটফুটে ছেলে-কোলে হাস্যময়ী এক তরুণী মা! গণেশ-জননীর মতো

অসীম স্নেহরাশি যেন মায়ের ছুই চোখে টলমল করছে। চিত্রশিল্পীর হাতের দক্ষতা আমায় মুগ্ধ করলো, কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম মায়ের মুখপানে। তিনটি ছবিতেই সদ্যফোটা ফুলের মালার গন্ধে ঘর সুরভিত হয়ে উঠেছিলো। ঘুরতে ঘুরতে আরও কিছু ছোট বড়ো ফটোগ্রাফ দেখতে পেলাম। ঐ মাতৃমূর্তিরই আরও নানা রকম ভাবে তোলা ফটো আর কিছু ঐ খোকার। খোকার মা ও আর একজন সৌম্যদর্শন ভদ্রলোকের একসঙ্গে একখানি ফটোও এক পাশে দেখলাম। খোকা হবার আগেকার ছবি খুব সম্ভব তার বাবা মার। দক্ষিণের ঘরখানিই সবচেয়ে সাজানো ও তার জানলাগুলির বাইরেই ফুলের ঢেউ ছুলছে। আকাশের নীলপটে পাহাড়ের ঢেউগুলি যেন তার সাথে তাল দিচ্ছে। অপরূপ মনে হলো। পালঙ্ক, সোফা, আলমারী, আয়না ছাড়া ঘরের এক কোণে একটি সুন্দর হাতের কাজকরা চাদর দিয়ে ঢাকা একটি পায়ে চালানোর সেলাই-কল রাখা আছে। সেই সেলাই কলের বোর্ডের ওপরেই একটি মীনে করা জয়পুরী ফুলদানীতে রাখা আছে অপর্যাপ্ত সদ্য ফোটা ফুলের একখানি নিপুণ তোড়া—ঘরে আর কোথাও ফুল নেই—শুধু দেয়ালে কাচের ছবিতে আর এই শেলাই-কলের ওপর। কেমন অবাক হয়ে গেলাম। শেলাই-কলের টেব্‌লটার ওপর হাত রেখে শেলাই-কলের সম্মুখে রাখা শেলাই করার কালো ভেলভেটের কুশন ঢাকা মোড়াটায় বসে জানলা দিয়ে চেয়ে রইলাম। দূরে পাহাড়ের গায়ে বেলা পড়ে আসছিলো। বাগান হ'তে বাসা-ফেরা পাখীদের কিচিরমিচির কানে ভেসে আসছিলো। হঠাৎ মনে হলো এ বাড়ীর একটা মস্ত রহস্য আছে। ড্রয়ারটা ধরে হঠাৎ অন্যমনস্ক-ভাবে টান দিতেই খুলে গেলো—চোখে পড়ে গেলো কতকগুলি বই খাতা। বইখাতাগুলি উল্টে পাল্টে একটি সুন্দর বাঁধানো খাতা টেনে নিয়েই দেখি প্রথম পাতাতেই লেখা রয়েছে "মনটুর মা"। পড়তে লাগলাম।

"আমার সমস্ত জীবনটিই আছে আমার অদেখা মাকে কেন্দ্র কোরে। যাঁকে জ্ঞানে কোনোদিন পাই নি—সমস্ত জীবন ধরেই তাঁর কথা ভেবেচি আর তাঁর স্নেহস্পর্শ যেন আমার সকল অনুভূতিতে ছড়িয়ে পড়েচে। আমার এই গল্পটি আজ লিখে রাখি। কাউকে বলি নি কোনোদিন এই গল্প—নিরালা এই বাড়ীর একটি নিভৃত সম্পত্তি হয়ে থাক এই কাহিনী।

জ্ঞান হ'তেই আমি জানি যে আমার মা নেই, আর বাবা অনেক দূরে কোথায় আছেন—আবার বিয়ে টিয়ে কোরে। কোলকাতাতে দিদিমার কাছে মানুষ হচ্ছিলাম। পাশের বাড়ীর সন্তুর মা আমায় ভালোবাসতেন। কিন্তু কেন যেন সে-ভালোবাসা আমার ভালো লাগতো না। ও তো আমার মা নয়। ও আমায় কেন ভালোবাসবে? আমার নিজের মার অধিকার যেন অন্য কেউ না চুরি করে—এই ছিলো আমার ভাবখানা। তবু আমি সন্তুর মার কাছেই যেতাম—বিশেষ কোরে যখন তিনি শেলাই-কল চালাতেন—তখন আমি পাশে দাঁড়িয়ে দেখতাম। পায়ে-চালানো বড়ো শেলাই-কল—তার ঘড় ঘড় আওয়াজে আমার খুব উৎসাহ হতো—আশ্চর্যও হতাম কম না। আমি শেলাই-কলের বোর্ডটা ধরে দাঁড়াতাম আর তার কাঁপুনি আমার হাত বেয়ে সমস্ত ছোট শরীরটায় ছড়িয়ে পড়তো। মাকুতে সুতো পরাবার সময় আমি অনেক সময় রীলটা একটা কাঠিতে পরিয়ে ধরে থাকতাম। রীলটা বন্‌বন্‌ কোরে ঘুরতো আর আমার খুব মজা লাগতো। একদিন কিন্তু আমার সন্তুর মার কাছে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেলো, উনি কি একটা কাজে শেলাই ফেলে উঠে গিয়েছিলেন আর আমি অমনি চাকাটা ঘুরিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি ফিরে এসে আমায় বকেছিলেন। আমি দিদিমার কাছে এসে সে কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেললাম। দিদিমা আমায় বুকে টেনে, চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে ধরা গলায় বললেন "তুই আর ওদের বাড়ী যাবি না মণ্টু।" আমিও আর গেলাম না। সন্তু কতোবার ডাকতে এসেছিলো। রাতে সেদিন যখন শুতে গেলাম দিদিমা পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন—"মণ্টু তোর মারই ওই রকম মস্ত শেলাই-কল ছিলো—আমি দিয়েছিলুম বিয়ের সময়। জানিস্‌ দাদা, সেই কলে তোর মা তোর কতো জামা শেলাই করতো। আমার জন্যও সে কতো জামা সেমিজ শেলাই কোরে কোরে বিদেশ হ'তে পাঠাতো।" এই কথা শুনে আমার ভীষণ বিস্ময় আর দুঃখ হলো। আমি যখন তখন সেই শেলাই-কলের কথা ভাবতাম। দিদিমা আজকাল প্রায় রোজই রাতে আমায়

ঘুম পাড়াবার সময়ে মার গল্পই করতেন, চোখের কোণের গড়িয়ে-আসা জলবিন্দু আমার অলক্ষ্যে মুছে ফেলে। তাঁর নিরুদ্ধ বেদনার গোপন উৎসের সন্ধান আমার মা-হারা-শিশুমনের অজানা ঐশ্বর্য হারানোর ব্যথার সঙ্গে মিশতে লাগলো। একদিন দিদিমা বললেন—"তখন তুই দু'বছরের। কোলকাতায় মিনির (আমার পিসীমার) বিয়েতে আসবার আগে তোর জন্যে, নিজের জন্যে আর তোর পিসীর জন্যে সব জামা শেলাই কোরছিলো তোর মা। এমন সময় তোকে ওর কোলে দিয়ে গেলো ঝী কি একটা কারণে। তুই অমনি একটা হাত দিয়ে দিলি স্ঁচের তলে। রক্তাক্ত কাণ্ড একেবারে। মাঝের আঙুলের এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে স্ঁচ ভেঙ্গে গেলো। ব্যস্! সেই হলো তোর মার শেষ শেলাই। সেই তোকে নিয়ে চলে এলো ওরা—ট্রেন থেকে নেমেই তার জর হলো। তোর পিসির বিয়ের দিন তো সে বেহুঁশ।—ঐ লাল বাড়ীটা ভাড়া নিয়ে তোর পিসির বিয়ে হয়েছিলো—তোর মা একবার যেতেও পারে নি—কী সব সময়ই গেছে।" আমার উত্তেজনায় ঘুম হয় না। কিছুতেই মনে করতে পারি না এই সব শৈশব-স্মৃতি—তবু মনে হয় মাঝের আঙুলের নোখ্টা কেমন ট্যারা ব্যাঁকা—অন্যগুলোর মতো নয় যেন। আমি ঐ নোখ্টা দেখি, আর ভাবতে থাকি। কত কি ভাবি। কার একটা ছবি ছিলো দিদিমার কাছে আমায় কোলে নিয়ে। কি সুন্দর যে মাকে দেখতে ঐ ছোট্ট ছবিটিতে! এমন মা যার ছিলো—সে কেন সন্তুর মার কাছে যাবে? আর আমার মারও তো শেলাই-কল ছিলো। এখন মা থাকলে——আমিও মার সঙ্গে সেই বিদেশে বাবার কাছে থাকতুম, আর শেলাই-কল চালাতে শিখে নিজেই শেলাই কোরতুম। মা কি আমায় বকতেন? কখনোই না। বরং তাঁর কাজের এতে কতো সুবিধাই হতো। এই সব আকাশ-পাতাল ভাবতাম।

একদিন বাবা এলেন। আমার জীবনের সে এক পরমাশ্চর্য স্মরণীয় দিন। ভোরে ঘুম ভাঙলো বাবার স্নেহ-স্নিগ্ধ হাতের স্পর্শে। আমি চোখ মেলতেই আমায় তুলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর কি সৌম্য প্রশান্ত মুখখানি। আমি যে আনন্দে দুঃখে লজ্জায় কেমন হয়ে গেলাম—আমায় বাবা কতো কথা জিজ্ঞাসা করলেন—একটিরও উত্তর দিতে পারলাম না। দুপুরের দিকে আমি একটু সহজ হতে পারলাম। বাবা বললেন, "তুই এখন এখানেই মন দিয়ে পড়াশুনা করবি—আর একটু বড় হলে আমার কাছে নিয়ে যাবো।" আমি বাবাকে এক মিনিট ছাড়তাম না। এক সময় তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "বাবা সেখানে আমার মার শেলাই-কলটা আছে?" বাবা হেসে বললেন, "আছে রে আছে—তুই বড়ো হ'লে, সবই তো তোর জন্যেই রাখা আছে—" একটু থেমে আবার স্মিত-মুখে বললেন—"তোর বউ চালাবে।" দুতিন দিন পরে বাবা চলে গেলেন। আমার দিদিমাদের যেন তেমন ভালো ধারণা ছিলনা বাবার উপরে। আমার মা দিদিমার একমাত্র মেয়ে ছিলেন—আমার একমাত্র মামা অনেক ছোট ছিলেন তাঁর চেয়ে বয়সে। আমার বাবারও ছিলেন একটি ভাই বাড়ীতে। ঠাকুরদাদা ঠাকুরমা নাকি বাবার অল্প বয়সেই মারা যান। আমার দুই পিসীমা ছিলেন—দুজনেই বিদেশে—মাঝে মাঝে আমার খবর নিতেন, জিনিষপত্র হাতে দেখতে আসতেন কোলকাতায় এলে। বাবা চিরদিন অত্যন্ত স্বল্পভাষী ও নির্জনতাপ্রিয়—তাই বোধ হয় সংসারে তাঁকে খানিকটা বিদেশী আগন্তুকের মতোই সকলে ভাবতেন। সকলেরই ধারণা ছিল, বাবা আবার বিয়ে কোরেছেন নাকি পশ্চিমেই কারুকে। কিন্তু ওসব ভাবতেও আমার কষ্ট হতো। বাবাকে দেখে আমার খুব ভক্তি-সম্ভ্রম হলো—বড্ড ভালো লাগলো আমার বাবাকে। তিনি যে কোনো লুকোচুরী কোরতে পারেন এ কথা আমার অসম্ভব মনে হতো। তিনি জীবনে কখনও যেন আমার মাকে ভুলতে পারেন নি—এত বড় একটা বিশ্বাস আমার শিশুমনও বিনা দ্বিধায় রাখতে পেরেছিলো। তাঁর প্রকৃতি যেন অন্য সকলের হ'তে পৃথক—তিনি যেন সকল দুর্বলতার উর্দ্ধে—এই ধারণাই আমার মনে গেঁথে গেলো। বরং দিদিমাদের ওপরেই রাগ হতো তাঁদের বাবার ওপরে বিরূপ ধারণার জন্য। বাবা চলে যাবার পর একদিন ঘুমোবার সময়ে দিদিমাকে শেলাই-কলের কথাটা বলে ফেলতেই দিদিমা বললেন, "সে এখন কোথায় কার কাছে আছে তার কি আর ঠিক আছে রে?" দিদিমার কথার ভাবে আমি রাগে অভিমানে বালিশে মুখ গুঁজলুম—

আমি ঠিকই জানতুম যে শেলাই কল বাবার কাছেই আছে, আর আমি বড়ো হলেই সেটা পাবো। বাবার কথা অবিশ্বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিলো।

বাবা চাকরী-উপলক্ষে নানা জায়গায় থাকতেন। কয়েক বছর বাবা আর এলেন না। আমি প্রাণপণে মন দিয়ে পড়াশোনা করতাম—বাবা খুশী হবেন বলে। বাবার আসার আশায় থেকে থেকে হতাশ হয়ে পড়েচি এমন সময় আজমীর হতে 'তার' এলো। বাবার খুব অসুখ—আমায় দেখতে চাইছেন। আমার তখন বয়স ১৪ বৎসর। আমায় নিয়ে মামা সেই রাতেই রওনা হলেন। আজমীরে পৌছে, সহর ছাড়িয়ে এই বাড়ীতে এলাম। বাবা দক্ষিণের ঘরে (আমার মার ঘর) মৃত্যুশয্যায় শুয়েছিলেন —আমায় দেখার জন্যে তখনও প্রাণটুকু যায় নি। ক্ষীণ হাতে আমায় বুকে টেনে আস্তে আস্তে বললেন, "খোকা, ঐ যে তোর মার শেলাই-কল। এ বাড়ী তোর মার—তাঁর নিজ হাতে সাজানো তাঁর সব জিনিষপত্র ঠিক সেই রকম আছে—" একটু থেমে আবার ক্ষীণ কণ্ঠে বলতে লাগলেন, "এই এগারো বছর ধরে তার জিনিষ-পত্র আগলে ছিলাম—এতদিনে সে ছুটির ডাক দিয়েচে···হ্যাঁ তার সব দামী জিনিষপত্র আলমারীতে পাবি—খোকা! এই তোর মার ঘর—ঐ জানলার ধারে তোকে কোলে নিয়ে সে আমার আসা যাওয়ার সময়ে দাঁড়িয়ে থাকতো! ···খোকা—বাবা আমার! তার সব কিছু যত্ন কোরে রাখবি···!" দুই চোখে জল এসে বাবার গলার স্বর ডুবে গেলো। তিনি আমার মাথায় একবার আস্তে হাত বুলিয়ে, দুটি হাত বুকের ওপর যুক্ত কোরে হঠাৎ যেন ঘুমিয়ে পড়লেন পরম শান্তিতে। বাবা ঘুমিয়েছেন দেখে আমার বালক মনের সকল কৌতূহল অদম্য হয়ে উঠলো সেই কোণে-রাখা হাতের-কাজ-করা চাদর-ঢাকা মস্ত শেলাই-কলের দিকে। আমি ছুটে গিয়ে চাদর তুলে দেখি সুন্দর ঝকঝকে শেলাই-কল। অনেকক্ষণ ধরে একাগ্র বিস্ময়ে সব দেখতে লাগলাম খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। হঠাৎ চোখ পড়লো সুঁচের জায়গায়—একটি ভাঙা সুঁচ লাগানো আছে—আর একটি টুকরো পাশে পড়ে—কেমন কাল্‌চে রঙের। বুঝলাম সমস্তই—একটা ছোটো জামা পাশেই আধ-শেলাই অবস্থায় রয়েছে। আমি হঠাৎ শেলাই-কলের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ঝর ঝর কোরে কেঁদে ফেললাম।

বাবার আর জ্ঞান ফিরলো না। সেই রকম ঘুমিয়ে-পড়া অবস্থাতেই দু'দিন থাকবার পর তাঁর হৃৎস্পন্দন আস্তে আস্তে থেমে গেলো। বাবাকে হারিয়েই যেন আমি মাকে পেলাম।

আমি তারপর হ'তে এখানেই থাকি। প্রথমে বাবার এক বন্ধুর বাড়ীতে ছিলাম, তারপর দু' এক বছর পরেই বুড়ো চাকর ও আমি বাড়ীতেই বাস কোরতে লাগলাম। বাবা আমার জন্যে যথেষ্ট টাকাকড়ি রেখে গিয়েছিলেন। দিদিমা বেঁচে থাকতে আমায় সংসারী করবার অনেক চেষ্টা কোরেছিলেন—আমার চির মা-কাঙাল মন কিন্তু তাতে কেমন আতংকিত হতো—তাই বই পড়া আর ছবি আঁকাই হলো আমার সেই নির্জন নিভৃত মাতৃ-মন্দিরের সঙ্গী। আর কিছুরই প্রয়োজন বোধও করি নি। প্রায় বছর দশ পরে লাগলো ভ্রমণের নেশা। মাঝে মাঝে এসে দক্ষিণের মায়ের ঘরখানিতে শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম নিতাম।

এখন আমি বৃদ্ধ। ভাবচি তীর্থে তীর্থে শেষ জীবনটা কাটাবো। এ বাড়ীও ভুলতে চেষ্টা করতে হবে। আমার পিতামাতার আশীর্ব্বাদ আমার সাথে সর্বক্ষণ আছে। এখন তাঁদের পার্থিব মায়াও ত্যাগ কোরে যেতে হবে সেই লোকে—যেখানে একমাত্র ঈশ্বরই আমাদের একাধারে পিতা আর মাতা।"

সন্ধ্যা হয়ে এলো। মালী এতোক্ষণে ফিরলো। চা কোরে নিয়ে এলো। আলো জ্বালিয়ে দিলো। আমি আস্তে আস্তে উঠে শেলাই-কলের সমুখে দাঁড়ালাম—তারপর ছবিতে সেই মাতৃমূর্তির দিকে চেয়ে রইলাম। মালী আমার জন্যে রান্নার আয়োজন করছিলো। বললাম, "আমি কিছু খাবো না মালী—তুমি কেন এতো ব্যস্ত হচ্ছো?" সে বললো—"বাবু সে কি কথা। আমার বাবু বলে গেছেন যে কেউ এলে যেন ভালো কোরে তাঁর সেবা করি। তাইতে বাবুর মা-বাপের আত্মার তৃপ্তি হবে।"

নেক্‌লেশ

নরেন চক্রবর্ত্তী

পথ চল্‌তে চল্‌তে রাজকুমারী তার বাবাকে বল্‌লে—আমাকে ওই রকম একটা নেক্‌লেশ কিনে দেবে বাবা? সনাতন মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করে বল্‌লে—দেবরে মা দেব, ভগবান দিন দেন তো নিশ্চয় দেব।

রাজকুমারী কোল থেকে নেমে পড়ে বল্‌লে—ছাই দেবে। তুমি তো কখনো-না বলো না; যখনই যা চাই তোমার এক কথা—দেবোরে, যদি ভগবান দিন দেন তো দেব। ভগবান আর তোমাকে দিন দিয়েছেন! একটা ভাল জামা কিনে দিতেই পারো না—তা আবার সোনার অমন ভাল নেক্‌লেশ। আমি অম্‌নি বল্‌ছিলুম—হার আমার চাই না। আবার একটু পরেই বল্‌লে—দেখ বাবা, কেমন চক্ চক্ করচে হারটা।

সনাতন সাম্‌নের দিকে চেয়ে দেখলে—একটি মেয়ে তাদের আগে আগে চলেছে, রোদের আলো লেগে তার গলার হারগাছটি ঝক্ ঝক্ করছে। সনাতন ভাবলে—সত্যিই হারটি চমৎকার, মেয়েটির কি-ই বা এমন রূপ! ফর্সা মোটেই বলা চলে না—স্বাস্থ্যও এমনই বা কি? রোগাই বলা চলে, অথচ এই হারছড়াটি তার শরীরের সকল বেমানান ঘুচিয়ে দিয়ে তাকে মনোহর করে তুলেছে। রাজকুমারী যদি এই রকম একটা হার পরে বেড়ায় তবে তাকে খুবই ভালো দেখাবে। স্বাস্থ্য তার তো ভালই; সাত আট বছরের মেয়ে, তাদের মতো গরীবের ঘরে, এমন হৃষ্টপুষ্ট কটাই বা আছে। রঙও যদি যত্ন পায় তবে ভালই ফুটে উঠতে পারে।

মেয়েটি মন্থরগতিতে বই হাতে নিয়ে চলেছে, সনাতন চেয়ে আছে তার কণ্ঠের দিকে। বেলতলা থেকে রসারোডে পড়ে মেয়েটি বাঁ দিকে বেঁক্‌লো, সনাতনও একটু তাড়াতাড়ি পা ফেলে প্রায় তার পিছনে এসে পৌছল। হারটি তখন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—হ্যাঁ, সত্যই গড়নটি সুন্দর, ওজন কতোই বা হবে—বড়জোর দেড় কি দু' ভরি।

সনাতনের তখনি মনে হ'লো—কিন্তু সেই দেড় ভরির দামই বা সে কোথা থেকে দিতে পারবে। সে যে সামান্য রাজমিস্ত্রীর কাজ করে কোন রকমে সংসার চালায়। সে যাবে তার সাধের মেয়ের জন্যে দেড়ভরি দু'ভরি দামের একছড়া সোনার নেক্‌লেশ কিনতে—হায়রে, এ যে চ্যাটাইএ শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা! সে পাগল—সে পাগল।

তবু সনাতন চেয়ে রইলো মেয়েটির চলে-যাওয়া পথের দিকে—নিশ্চল পাথরের মূর্ত্তির মতো।

রাজকুমারী বাবার হাতে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে বল্‌লে—অমন করে কি দেখছো বাবা, মুড়িটুড়ি কিন্‌বে না—দেরি হয়ে যাচ্ছে যে।

সনাতন চম্‌কে উঠলো। রাজকুমারীর হাত ধরে বল্‌লে—হ্যাঁ মা, তাড়াতাড়ি চল্। দেরি হ'লে তোর মা আবার রাগ করবে—রোগে ভুগে বড্ড খেঁকি হ'য়ে উঠেছে তোর মা।

সনাতন মুড়ি, এক প্যাকেট গুঁড়ো চা, কিছু চিনি—এই সব কিনে মেয়েকে নিয়ে বাড়ী ফিরলো।

এরমধ্যে রাজকুমারী কিন্তু হারের কথা ভুলে গেছে। এমনই তার হয়। কোন লোভনীয় জিনিষ দেখলেই তার নেবার সাধ হয়, বাবার কাছে আবদার করে চায়। পায় না—আবার ভুলে যায়।

কিন্তু ভোলে নি সনাতন। রাজকুমারীর কোন আবদারই সে ভোলে না, কোন আবদার সে পূরণ করতেও পারে না। একটিমাত্র মেয়ে—একটু বেশি বয়সেরই মেয়ে। যেন তাদের আঁধার ঘরে প্রদীপ শিখা। সখ করে নাম দিয়েছিল রাজকুমারী। স্ত্রী ঠাট্টা করে বলেছিল—ও হরি, তোমার মেয়ে রাজকুমারী! তুমি যে মহারাজ তা তো জানতুম না, ছদ্মবেশে মিস্ত্রীর কাজ করচো বুঝি? তা' এ ছদ্মবেশ কবে তোমার ঘুচবে রাজা?

সনাতন একগাল হেসে উত্তর দিয়েছিল—ভুল করলি তুই। মহারাজ না হ'লেও রাজমিস্ত্রী তো বটে। তবে সে ভেবে আমি এ নাম রাখতে যাই নি। তোর মেয়ের দিকে একবার চেয়ে দেখ্ তো ভাল করে—রাজকুমারী হ'লেই একে মানাতো কি না!

রাজকুমারীর মা স্বামীর কথার কোন উত্তর না দিয়ে মুগ্ধনেত্রে চেয়ে রইলো মেয়ের দিকে। ধীরে ধীরে তার বুক থেকে একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। ভাবলে—সত্যি

স্বামী কিছু মিছে বলে নি। এ মেয়ে যেন এদের ঘরে মানায় না—কি খাইয়ে, কি পরিয়ে তারা এর রূপের মর্য্যাদা দেবে—এ স্বাস্থ্য গরীবের ঘরে কতদিনই বা অটুট্ থাকবে।

কিন্তু অটুটই ছিল। বাপ মার আন্তরিক যত্ন রাজকুমারীর স্বাস্থ্যকে ম্লান হতে দেয় নি।

* * *

সনাতনের মাথায় পোকা ঢুক্‌লো। যতোই ভুলতে চায় ততই তার মনে পড়ে মেয়ের অভিমান-ভরা কথা—একটা ভালো জামা কিনে দিতেই পারো না, তা আবার অমন সোনার ভাল নেকলেস্! সনাতনের বুকে যেন ছুঁচ ফুট্‌তে লাগ্‌লো। সে যেন দেখ্‌তে পেল কলেজের সেই মেয়েটি গলায় হার ঢুলিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে চলেছে। তার গলার হার ছড়াটীর ওপর এক ঝলক রোদ এসে পড়েছে—হারটি ঝিক্ ঝিক্ করছে।

সনাতন স্থির থাক্‌তে পারে না। ভোর হতেই সে এসে দাঁড়িয়ে থাকে বেলতলার মোড়ে, এই পথ দিয়েই মেয়েটি যাবে কলেজে। একটু পরেই মেয়েটি বইখাতা হাতে এই পথে আসে কলেজে যাবার জন্মে—রোদ পড়ে তার কণ্ঠহারটি চক্ চক্ করে ওঠে! মেয়েটির পিছু পিছু সনাতনও চল্‌তে থাকে। মেয়েটি কলেজে ঢুকে পড়ে—সনাতন গেটের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে ভাবে—এ হার এ মেয়েটাকে মোটেই মানায় না—এ হার যদি উঠ্‌তো রাজকুমারীর গলায়!

* * *

রাজকুমারী অগাধে ঘুমোচ্ছে, তখনও ভালো করে ফরসা হয় নি। সনাতন তার গায়ে আস্তে আস্তে নাড়া দিল। রাজকুমারী চম্‌কে জেগে উঠ্‌তে সনাতন তাকে ইসারায় ঘরের বাইরে ডেকে নিয়ে গেল। চারিধার চেয়ে দেখে মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে সনাতন চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে—রাণী মা, হার চাই তোর? নিবি মা হার?

রাজকুমারী অবাক্। বাবা বলে কি? একটা সামান্য জিনিষ যে এনে দিতে পারে না, সে কিনা ভোর হ'তে না হ'তেই ঘুম ভাঙিয়ে সোনার হার দিতে ব্যস্ত! বাবার আজ হোলো কি?

হতভম্বের মতো জিজ্ঞাসা করলে—কি বল্‌চো বাবা তুমি? হার কোথায় পাবে?

সনাতন তাড়াতাড়ি রাজকুমারীর মুখে হাত চাপা দিয়ে বল্‌লে—চুপ্, অত জোরে কথা বলিস্ নি। তোর মা যেন কিছু শোনে না, তার শরীর খারাপ। হার আমি তোকে দেব রে—আজই। তোকে ওই রকম একটা হার পরলে খুব ভালো মানাবে রে। তুই যে সত্যিই রাজকুমারী। বলে বুকে জড়িয়ে ধরে সনাতন তার মেয়েকে একটি চুমু খেলে। রাজকুমারী তার এই আট বছর বয়সে বাবাকে এমন উদ্‌ভ্রান্ত হ'তে আর কখনো দেখে নি।

রাজকুমারীর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে সনাতন বল্‌লে—একটু বেলা হ'লে তুই আমার সঙ্গে যাবি, আমি তোকে নেক্‌লেস্ দেব। তুই শুধু একটি কাজ করবি মা, যেমনি হারটি আমি তোর কাছে ফেলে দেব তুই নিয়েই হাঁসপাতালের ভেতর ঢুকে পড়বি, তারপর পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাড়ী চলে যাবি—খবরদার, দৌড়বি না, আস্‌তে আস্‌তে যাবি! তুই কিছু ভাবিস্ নি মা, আমি খানিক পরেই বাড়ী ফিরবো। খুব সাবধান—তোর মাকে যেন ঘুণাক্ষরেও কিছু বলিস নি—হারটাও দেখাবি না। তাকে যা বলবার আমিই বল্‌বো।

রাজকুমারীর মনে ব্যাপারটা এখন স্পষ্টভাবে ফুটে উঠ্‌লো। বাবার গলা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে সে বল্‌লে—সে কি বাবা, এ সব তুমি কি বল্‌ছো? চুরি করবে তুমি—তুমি চোর?···না—না বাবা—কাজ নেই আমার হারে।

সনাতন খানিক তার মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলো—তারপর বল্‌লে—কিছু তুই ভাবিস না মা, হার আমি তোকে দেবই—হার পরে বেড়ালে এমন সুন্দর তোকে দেখাবে মা! হার পরে তুই ছুটে আস্‌বি আমার কাছে, মার কাছে যাবি, পড়্‌শিদের কাছে ঘুরে ঘুরে বেড়াবি—কি চমৎকার দেখাবে—যেন কোন দেশের রাজার মেয়ে আমাদের মাঝে এসেছে বেড়াতে।···হার তোকে দেবই। কি ছাই দেখতে ওই মেয়েটা—ওর গলায় কি ওই হার মানায়! ও হার ওর জন্মে নয়।

রাজকুমারী যেন স্বপ্ন দেখ্‌লে তার গলায় ঝুল্‌ছে সেই নেক্‌লেশ। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই নেক্‌লেশ

পরে। তার যতো খেলার সাথী আছে তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে—সকলেই তাকে দেখে বল্‌ছে—কি সুন্দর তোকে দেখাচ্ছে রে ভাই রাজী, যেন সত্যিই তুই রাজকুমারী।

রাজকুমারীর অন্তর ক্ষেপে উঠ্‌লো সেই হারটি পরবার জন্যে। রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করলে—কখন যাবে বাবা?

সনাতন বল্‌লে—একটু পরেই আমি তোকে ইসারা করে ডাক্‌বো, তুই আমার সঙ্গে চলে আস্‌বি।

*　　*　　*

একটু বেলা হ'তেই সনাতন রাজকুমারীকে নিয়ে বেল-তলার মোড়ের একটু পিছনে এসে দাঁড়াল, তখনও সে অঞ্চলে লোক যাওয়া আসা তত বেশি সুরু হয় নি। সেই মেয়েটি প্রত্যহ এই পথ দিয়েই কলেজে যায় সনাতন জেনেছে। কিছু পরেই দেখা গেল মেয়েটী আস্‌ছে, গলায় ঝুলে আছে সেই নেক্‌লেসটি, প্রভাতী আলোতে হারটি চক্‌ চক্‌ করছে। সনাতন মেয়েটির পিছনে এসে দাঁড়ালো, অতি সন্তর্পণে হারটী গলা থেকে কেটে বার করে নিয়ে পাশেই ফেলে দিলে, রাজকুমারী হারটি কুড়িয়ে নিয়ে পাশে হাঁসপাতালের ভেতর ঢুকে পড়লো।

কিন্তু সনাতন চলে যেতে পারলে না। হারটি কেটে নেবার সময় হয়তো একটু খোঁচা লেগে থাক্‌বে মেয়েটির গলায়। সে চম্‌কে গলায় হাত দিয়ে দেখে সেখানে হার নেই, পেছনে চেয়ে দেখ্‌লে একটি লোক তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে যাচ্ছে। সে 'চোর-চোর' বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, তখনই একটি ভদ্রলোক ধরে ফেল্‌লেন সনাতনকে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভীড় জমে উঠ্‌লো।

রাজকুমারী বাড়ী যায় নি। সে ভেবেছিল একটু অপেক্ষা করে একেবারে বাবার সঙ্গেই বাড়ী ফিরবে। তাই সে হারটিকে ভাল ভাবে কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে রেখে সেইখানে এসে হাজির হোলো। দেখ্‌লে ভীড়ের মাঝে পড়ে আছে সনাতন—মাথা ফেটে রক্ত ঝরছে, মুখে ফুটে উঠেছে নিদারুণ যন্ত্রণা। রাজকুমারী ভীড় ঠেলে একেবারে সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। একজন লোক তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বল্‌লেন—তুই ছেলেমানুষ এই ভীড়ের মধ্যে কোথায় ঢুক্‌ছিস, এখানে তামাসা দেখান হ'চ্ছে নাকি? দেখ্‌ছিস্‌ না একটা চোর ধরা পড়েছে। চোর দেখিস্‌ নি এখনো?

রাজকুমারীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল একটা জড়ান শব্দ—আমি দেখ্‌বো। সনাতন চেয়ে দেখ্‌লে রাজকুমারীর দিকে, চেয়েই মাথাটা নিচু করে রইলো। রাজকুমারীর একবার ইচ্ছে হলো—বাবার ক্ষত বিক্ষত দেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, ছুড়ে ফেলে দেয় হারটা ওই মেয়েটার গায়ে। কিন্তু সনাতনের সেই একটিবারের দৃষ্টিতে সে যেন কিসের ইঙ্গিত পেল—সে কিছুই করতে পারলে না, শুধুই দাঁড়িয়ে রইলো চুপ করে প্রাণহীন পুতুলের মতো। তখন পুলিস এসে গেছে। সনাতনকে নিয়ে গেল থানায়। রাজকুমারী বাড়ী ফিরে গেল।

*　　*　　*

মা জিজ্ঞাসা করলে—তোর বাবা কোথায় গেলরে, তুই যে একা বাড়ী ফিরলি?

রাজকুমারী কোন রকমে জবাব দেয়—তাতো জানি না, বোধহয় কাজে গেল। আমাকে বাবা বল্‌লে 'তুই বাড়ী যা, আমার যেতে দেরি হবে

মা ভাব্‌লে তাই হবে হয়তো, বোধহয় কোন কাজের সন্ধানেই গেছে, ক'দিন কাজ নেই। মনে মনে প্রার্থনা করলে—ভগবান একটু মুখ তুলে চাও—কাজ যেন একটা হয়।

বেলা হলো। মা ডাক্‌লে 'রাজী, খাবি আয়।' রাজকুমারী খেতে আসে না। সে হারটা বিছানার তলায় গুঁজে রেখে সেই যে তার ওপর বসে আছে, সেখান থেকে যেন আর নড়তে চায় না। মা আবার ডাক্‌লে—কইরে রাজী, এলি?

রাজকুমারী কোন রকমে জবাব দিল—আমি এখন যাবো না মা, অসুখ করছে।

মা মেয়ের গলার আওয়াজে চম্‌কে ওঠে। কাছে এসে দেখে মেয়ের বুক চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে। রাজকুম[illegible] কাছে টেনে নিয়ে বল্‌লে—কিরে মা, কি অসুখ করছে?

রাজকুমারীর চোখে আবার জল ছাপিয়ে উঠ্‌লো। সে কোন রকমে বল্‌লে—বড্ড পেটের যন্ত্রণা হচ্ছে মা—বড্ড।

রাজকুমারীর মা তার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বল্‌লে—তবে[illegible]খেয়ে কাজ নেই, শুয়ে থাক্‌ চুপ করে। আমিও তো এখন খাবো না। তোর বাবা বাড়ী আসুক, তিনজনে এক সঙ্গে খাবো।

রাজকুমারীর পাশে তার মা শুয়ে পড়লো। রাজকুমারী দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো মাকে, তার চোখে আবার জল ঝরতে আরম্ভ করেছে।

*　　*　　*

ক্রমে বেলা পড়ে এল। রাজকুমারী একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ চম্‌কে উঠে ধড়মড় করে উঠে বস্‌লো। মা জিজ্ঞাসা করলে—কিরে অমন করে চম্‌কে উঠ্‌লি কেন—স্বপ্ন দেখ্‌ছিলি বুঝি? শরীর কেমন আছে রে? এক বেলাতেই মুখটা এমন শুকিয়ে গেছে! খাবি কিছু?

রাজকুমারী উত্তর দেয়—যন্ত্রণা যে আরো বেড়েছে মা। আমি কিচ্ছু খাবো না, খেতে বোলো না। বাবা আসুক—তারপর তিনজনে একসঙ্গে খাবো। মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাজকুমারী ভাব্‌ছে—বাবা তো এখনো এল না। তাকে কি তবে পুলিশে ধরে রেখেছে, তবে কি আরো মারছে! হয় তো সারাদিন বাবা কিছুই খাই নি—শুধু পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে—উঃ সে কি মার! মাথা ফেটে রক্ত পড়ছে, জামা কাপড় রক্তে ভেসে গেছে। থানায় কি আরো বেশি মারছে? কিন্তু বাবা তো এতো মার সহ্য করতে পারবে না—যা রোগা, যদি মার খেতে খেতে মরেই যায়! খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলো, চেয়ে দেখ্‌লে কাছে কোথাও মা নেই। বিছানার তলা থেকে নেক্‌লেশটা বার করে ভাল করে কাপড়ের ভেতর জড়িয়ে নিয়ে নিঃশব্দে রাজকুমারী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

থানার মধ্যে ঢুকতে তার সাহস হোল না। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখ্‌লে ইন্‌স্‌পেকটরের পায়ের কাছে বসে আছে তার বাবা, পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটা চৌকিদার! প্রহারে সনাতনের মুখ ফুলে উঠেছে, সকালের ঝরা রক্তধারাগুলি শুক্‌নো হয়ে গায়ে লেগে রয়েছে।

চৌকিদার বল্‌ছে—হুজুর, এতো মারেও যখন কিছুতেই কান কবুল করলে না—আর মালেরও যখন কোন পাত্তা ওয়া গেল না তখন মনে হচ্ছে ভুল লোককে ধরা হয়েছে। আসল লোক মাল নিয়ে ঠিক কেটে পড়েছে—এ বেচারা মাঝখান থেকে ধরা পড়ে শুধু মার খেয়েই মোলো।

ইন্‌স্‌পেকটর বল্‌লেন—ঠিকই বলেছ হে। এ বেচারা শুধু মার খেয়েই মোলো। পুলিশের রেকর্ড তো ঘেঁটে দেখ্‌লুম, এর কোন নাম গন্ধ নেই, বোঝা যাচ্ছে লোকটা দাগীও নয়। ছেড়েই দেওয়া যাক্‌।

সনাতন হাতজোড় করে বল্‌লে—হুজুর গরীব আমি রাজ-মজুরি করে খাই, চুরি চামারি জীবনে কখনো করি নি, মা কালির দিব্যি করে বল্‌ছি। আমি কাজের চেষ্টায় সকালে বেরিয়েছিলুম***তার পরেই সে কেঁদে ফেল্‌লে। বল্‌তে লাগ্‌লো—হুজুর আমার মেয়ে রাজকুমারী আমাকে এতক্ষণ দেখ্‌তে না পেয়ে না জানি কতোই কাঁদছে, সে হুজুর, আমাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারে না। হুজুর, আমাকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিন।

রাজকুমারী সব কথা শুনতে পাই নি। শুধু তার কানে গেল—হুজুর আমার মেয়ে রাজকুমারী আমাকে এতক্ষণ দেখ্‌তে না পেয়ে না জানি কতোই কাঁদ্‌চে—সে হুজুর, আমাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারে না।

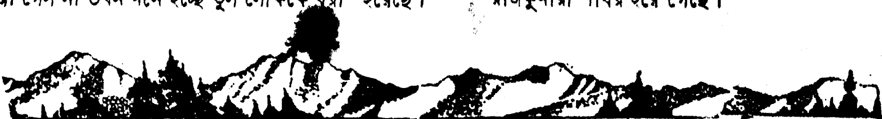
রাজকুমারী সত্যই কেঁদে ফেল্‌লে। ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকে ইন্‌স্‌পেকটরকে বল্‌লে—বাবু, আমার বাবাকে ছেড়ে দিন, আর মারবেন না বাবু, তা হোলে বাবা আমার বাঁচ্‌বে না। এই নিন্‌ বাবু আপনাদের হার। আমি হার ফিরিয়ে দিচ্ছি—আপনি বাবাকে ছেড়ে দিন।

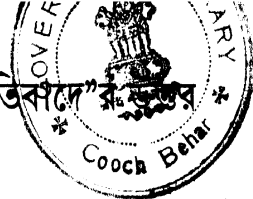
আঁচল খুলে রাজকুমারী নেক্‌লেশটা টেবিলের ওপর রেখে দিলে। অবাক্‌ হয়ে তার দিকে ফিরে তাকালো ইন্‌স্‌পেকটর, চৌকিদার, ফিরে চেয়ে রইলো সনাতন।

ইন্‌স্‌পেকটর হো হো করে হেসে উঠ্‌লেন। বল্‌লেন—উঃ বেটা কি সয়তান হে, মেয়ের হাতে মাল পাচার করেছিল। যাক্‌ প্রমাণ এখন হাতে এসে গেছে, বেটাকে হাজতে পুরে দাও।

বলেই বুট শুদ্ধ লাথিটা সনাতনের মুখের ওপর বসিয়ে দিলেন। সনাতন তখনও চেয়ে আছে মেয়ের দিকে।

রাজকুমারী পাথর হয়ে গেছে।





উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "প্রতিবাদে"র উত্তর

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

গত আষাঢ়ের ভারতবর্ষে প্রকাশিত আমার লেখা "ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শরৎ-পরিচয়" প্রবন্ধের প্রতিবাদ করেছেন শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। উপেনবাবুর এই প্রতিবাদ গত আশ্বিন সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়েছে। এখানে আমি উপেনবাবুর ঐ প্রতিবাদের উত্তর দিলাম—

শরৎচন্দ্রের এফ. এ. পরীক্ষা দিতে না পারার কারণ সম্বন্ধে আমি আমার প্রবন্ধে দু'টি কথা নিয়ে আলোচনা করেছি—(১) ব্রজেনবাবুর বর্ণিত "অপ্রীতিকর ঘটনা", (২) সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথিত-কাহিনী। এই দু'টি কাহিনীর মধ্যে সুরেনবাবুর কথাকেই আমি বিশ্বাসযোগ্য বলেছি।

উপেনবাবু তাঁর 'প্রতিবাদে' উক্ত দু'টি কাহিনীর মধ্যে কোনটিকে যে সমর্থন করেন, তা স্পষ্ট করে বলেন নি। কিংবা শরৎচন্দ্র কেন যে পরীক্ষা দিতে পারলেন না, সে সম্বন্ধে কোন নতুন কথাও শোনান নি। বরং তিনি সুরেনবাবুর কাহিনীটিকে উড়িয়ে দেবার জন্য লেগেও শেষ পর্যন্ত ঐটিকেই আবার প্রকারান্তরে সমর্থন করে বসেছেন।

উপেনবাবু সুরেনবাবুর বর্ণিত শরৎচন্দ্রের শ্লিপ পাঠাবার কাহিনীটিকে "পরস্পর-বিরোধী মশলার অতি-অসম্ভাব্য গল্প" বলেও পরেই আবার লিখছেন—"সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার ফি দিতে না পারার জন্য দায়ী শরতের পিতার অর্থাভাব ততটা নয়, যতটা শরতের শ্লিপ পাঠাবার ঘটনা। আর এই ঘটনাকে ব্রজেনবাবু যদি অপ্রীতিকর ঘটনা বলে থাকেন, তবে গোপালবাবুর বোধ হয় আপত্তি করা উচিত নয়। ব্রজেনবাবু তাঁর উল্লেখিত অপ্রীতিকর ঘটনাকে প্রকাশ করেন নি।"

উপেনবাবু নিজের প্রয়োজনে শরৎচন্দ্রের শ্লিপ পাঠাবার ঘটনাটাকেই এখন ব্রজেনবাবুর বর্ণিত অপ্রীতিকর ঘটনা বললেও, ব্রজেনবাবু কিন্তু আসলে তা স্বীকার করে যান নি। এই অপ্রীতিকর ঘটনাটি সম্বন্ধে ব্রজেনবাবুর একটি লিখিত প্রমাণই তাহলে এখানে উদ্ধৃত করা যাক্।

ব্রজেনবাবুর 'শরৎ-পরিচয়' গ্রন্থের এক জায়গায়—"টেস্ট-পরীক্ষা দানকালে এমন একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিল যাহার ফলে কলেজের কর্তৃপক্ষ শরৎচন্দ্রকে এফ. এ. পরীক্ষা দিতে অনুমতি দেন নাই; ১৫৲ টাকা ফি সংগ্রহে অসমর্থ হইয়া তিনি পরীক্ষা দিতে পারেন নাই—এ কাহিনী ভিত্তিহীন।" আবার অপর এক জায়গায়—লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত শরৎচন্দ্রের এক পত্রে "বড় দরিদ্র ছিলাম, ২০টি টাকার জন্যে একজামিন দিতে পাইনি। এমন দিন গেছে যখন ভগবানকে জানাতাম, হে ভগবান আমার কিছু দিনের জন্যে জ্বর করে দাও, তাহলে দুবেলা খাবার ভাবনা ভাবতে হবে না, উপোস করেই দিন কাটবে।"—থাকায়, একই গ্রন্থের মধ্যে এই পরস্পর-বিরোধী কথার জন্য আমি যেমন একদিন ব্রজেনবাবুকে এ-সম্বন্ধে মুখে প্রশ্ন করেছিলাম; আমার ন্যায় শ্রীরামপুর-নিবাসী শ্রীগৌরসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায় বি. এ. সাহিত্যরত্ন মহাশয়ও ব্রজেনবাবুকে এক পত্রযোগে তেমনি প্রশ্ন করেছিলেন। ব্রজেনবাবু গৌরবাবুর পত্রের উত্তরে তাঁকে লিখেছিলেন*—

৫৫, ইন্দ্রবিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া
কলিকাতা—৩৭, ২৫-৬-৫২

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র পাইয়া আপনি যে বিশেষ যত্ন করিয়া আমার পুস্তকখানি পড়িয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম। আপনার মনে যে সন্দেহ জাগিয়াছে, তাহার মূল শরৎচন্দ্র নিজে। আমার অনুসন্ধানের ফল আমার ভাষায় জানাইয়াছি এবং ইহাও জানিয়াছি যে শরৎচন্দ্র অতিশয় গালগল্পপ্রিয় ছিলেন। লোকের সহানুভূতি ও বিস্ময় উৎপাদনের জন্য তিনি একই ঘটনা বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে তাঁহার দারিদ্র্যের বিষয়ে উক্তি সেই পর্যায়ের। তাঁহার মাতুল-গোষ্ঠীর সাক্ষ্য ও অন্যান্য প্রমাণে জানিয়াছি যে অর্থাভাবে পরীক্ষা না দেওয়ার কাহিনী নিতান্ত কাহিনীমাত্র। পরীক্ষায় দুই বন্ধুতে টোকাটুকি করিয়াছিলেন এইরূপই অবগত হওয়া যায়। ইতি—

নিবেদক
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এখানে ব্রজেনবাবু পরিষ্কার স্বীকার করেছেন, পরীক্ষায় দুই বন্ধুতে টোকাটুকি করে ধরা পড়েছিলেন এবং তারই জন্য তাঁকে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হয়নি। আর এখানে 'পরার্থে'রও প্রশ্ন নেই। উপেনবাবু যতই বলুন—'যে কার্য করে তিনি নিজেকে বিপন্ন করেছিলেন, তা নিজ স্বার্থের জন্য করেন নি' এ কথাও আর টেকে না। কারণ ব্রজেনবাবু নিজেই তাঁর "শরৎ-পরিচয়" গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, শরৎচন্দ্র এই সময় পড়াশুনা করতেন না। লেখাপড়া অপেক্ষা আমোদ-প্রমোদ, অভিনয় ও গান-বাজনায় তিনি মেতে উঠেছিলেন।

একটা কথা—ব্রজেনবাবুর এই চিঠিটির মধ্যে অবশ্য উপেনবাবুর নাম উল্লেখ নেই। ব্রজেনবাবু শুধু 'মাতুল-গোষ্ঠীর' কথা বলেছেন। এখন দেখা যাক্ এই 'গোষ্ঠীর' মধ্যে উপেনবাবু পড়েন কিনা।

শরৎচন্দ্রের মাতুল-গোষ্ঠীর মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং

* ব্রজেনবাবুর লেখা এই চিঠিটি গৌরবাবুর কাছে আজও রয়েছে।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ই (সুরেনবাবুর ভ্রাতা গিরীনবাবু অনেককাল আগেই মৃত বলে তাঁর আর নাম করলাম না) সাহিত্যসেবী এবং এই সূত্রেই বিশেষ করে এঁরা শরৎচন্দ্রের অনেক খবরাখবর রাখতেন। ব্রজেনবাবুর লিখিত ঐ 'মাতুল-গোষ্ঠীর' মধ্যে সুরেনবাবুর সঙ্গে ব্রজেনবাবুর সদ্ভাব ছিল না। তার প্রমাণ—বিভিন্ন পুস্তক ও পত্রিকাদিতে পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধ উক্তি এবং আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ। আর তাছাড়া সুরেনবাবু তো শরৎচন্দ্রের পরীক্ষা দিতে না পারার ব্যাপার সম্বন্ধে অন্য কথাই বলেন। তাহলে উক্ত সাহিত্যিক মাতুল-গোষ্ঠীর মধ্যে এখন বাকি থাকছেন উপেনবাবুই। ব্রজেনবাবুর সঙ্গে উপেনবাবুর বিশেষ হৃদ্যতাও ছিল। অতএব ব্রজেনবাবু তাঁর চিঠিতে উপেনবাবুর নাম উল্লেখ না করলেও এবং বহুবচনে গোষ্ঠী শব্দের ব্যবহার করলেও উপেনবাবুই যে ব্রজেনবাবুকে 'টোকাটুকির' কথা বলেছিলেন, এ কথা বলা যেতে পারে।

তাছাড়া উপেনবাবু নিজেই তো আমার কাছেও এ-কথা বলেছিলেন। উপেনবাবু আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন, আমরা একই শহরে বাস করেও এবং আমি তাঁর কাছে প্রায়ই যাতায়াত করেও একদিনও কেন তাঁকে এ সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই।

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, আমার "ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শরৎ-পরিচয়" প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার পূর্বেই আমি একদিন উপেনবাবুর বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম—শরৎচন্দ্র অর্থাভাবে পরীক্ষা দিতে পারেন নি, না টেস্ট পরীক্ষার সময় হলের মধ্যে নকল করতে গিয়ে ধরা পড়ার ফলে পরীক্ষা দেবার অনুমতি পান নি—এর কোনটি ঠিক ?

উত্তরে উপেনবাবু বলেছিলেন—নকল করার কথাটাই ঠিক। এই প্রসঙ্গে আমি সুরেনবাবুর বর্ণিত কাহিনীটি শোনালে, উত্তরে উপেনবাবু আমাকে বলেছিলেন—দেখ, সুরেনদার কাহিনীর মধ্যে অবৈধ উপায় অবলম্বন, আর অর্থাভাব দুটোই রেখে একটা গোঁজামিল দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। কেমন জান, তবে একটা গল্প বলি শোন—একজন লোক আর একজনকে টাকা ধার দেয়। যে টাকা নিয়েছিল, সে শোধ না দেওয়ায় পাওনাদার তার নামে তো নালিশ করল। পাওনাদারের সাক্ষীকে বিপক্ষ-দলের উকিল জেরা করলেন—আচ্ছা বাপু, বলতো টাকা যে দিয়েছিল সব কি রূপোর টাকা না কাগজের নোট ?

সাক্ষীটি কিন্তু খুব চালাক এবং তুখড় ছিল। সে বললে—বাবু, কিছু নোট, আর কিছু রূপোর টাকা।

উকিল আবার প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা, টাকাটা যে দিয়েছিল দিনে না রাতে ?

সাক্ষী বললে—বাবু, টাকা ধার নিতে দিনই বিকালে এসেছিল। তবে টাকাটা যখন নেয়, তখন আর দিন ছিল না রাত হয়ে গিয়েছিল।

উপেনবাবু সেদিন উকিল এবং সাক্ষীর এই ধরণের কথোপকথনের গল্পটি আমায় শুনিয়েছিলেন।

অতএব প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্বে তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করিনি বলে, তিনি আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছেন, তা সত্য নয়।

শরৎচন্দ্রের নকল করার কাহিনী উপেনবাবু অন্য লোকের কাছেও গল্প করেছেন। দুজন সাহিত্যিক তাঁরা উপেনবাবুর বিশেষ বন্ধু এবং অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তাঁরা আমারও পরিচিত, তাঁরা আমায় বললেন—শরৎচন্দ্র নকল করতে গিয়ে ধরা পড়ায় পরীক্ষা দেবার অনুমতি পাননি, এ গল্প উপেনবাবু আমাদেরও বলেছেন।

বন্ধু-বিচ্ছেদের ভয়ে উপেনবাবুর এই বন্ধুদের নাম এখানে আর করলাম না। তবে একান্ত প্রয়োজন হলে, তাঁদের নামও উল্লেখ করতে পারি।

উপেনবাবু লিখেছেন—"বহুদিন হতে একটা কথা সময়ে সময়ে শোনা যায়, এমন কি পড়াও যায় যে, শরৎচন্দ্র অর্থাভাবের জন্য এফ. এ. পরীক্ষা দিতে পারেন নি, আর ভাগলপুরে যখন শরৎচন্দ্রের মাতুলালয় তখন তাঁর মামারা এফ.এ. পরীক্ষা দেওয়ার ফি সামান্য পনেরটা টাকা দেননি, তখন তাঁরা লোক ভাল ছিলেন না।"

'লোক ভাল ছিলেন না' একথা আমি তো কোথাও বলিই নি, তাছাড়া কই অপর কাকেও বলতেও শুনি নি। অর্থাভাবের জন্য দায়ী তো শরৎচন্দ্রের অলস ও বেকার পিতা নিজেই। তাছাড়া শরৎচন্দ্র ঐ সময় তাঁর মামার বাড়ীতেও থাকতেন না।

উপেনবাবু বলেছেন—শরৎচন্দ্র অর্থাভাবে পরীক্ষা দিতে পারেন নি এ কথা ঠিক নয়। অর্থাভাবের কারণ হলে কুমার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শরৎচন্দ্রের ধনী ও সহৃদয় বন্ধুরাই অনায়াসেই ফি-এর এবং মাস চারেকের সামান্য কলেজের ফি দিয়ে দিতেন।

শরৎচন্দ্র বহুবার বহু জায়গায় বলেছেন যে, টাকার অভাবেই তিনি পরীক্ষা দিতে পারেন নি। শরৎচন্দ্রের জীবিতকালে উপেনবাবু কখনো এর বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন নি। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর এখন উপেনবাবু এই কথা বলছেন। শরৎচন্দ্রের প্রবেশিকা পরীক্ষার সময় সামান্য ক'টা টাকার জন্য বিপ্রদাসকে যখন গুলজারীলালের কাছে হ্যাণ্ডনোট লিখে দিয়ে টাকা ধার করতে হয়েছিল, কই তখন তো কেউই (এমন কি শরৎচন্দ্রের মামার বাড়ীর অন্য কেউও) সাহায্য করতে আগিয়ে আসেন নি।

কুমার সতীশচন্দ্রের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা কোন্ সময়ে হয়েছিল বলতে পারি না, তবে ব্রজেনবাবুর শরৎ-পরিচয় গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের তদানীন্তন প্রতিবেশি যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের রচনায় দেখেছি—শরৎচন্দ্র ছাত্রজীবনের পরেই সম্পূর্ণ বেকার অবস্থায় সতীশবাবুর বাড়ীতে প্রায়ই কাটাতেন। যাই হোক্, এমনো তো হতে পারে যে, আত্ম-সম্মানের জন্যই হয়তো শরৎচন্দ্র অনাত্মীয় অপর কারো কাছে হাত পাতেন নি।

উপেনবাবু সুরেনবাবু বর্ণিত কাহিনীটির মধ্যে "চারটি বৃহৎ ছিদ্র" দেখিয়েছেন। সেই 'বৃহৎ ছিদ্র'গুলি নিয়ে এখন আলোচনা করা যাক।

(১) উপেনবাবুর চোখে যেটি প্রথম বৃহৎ ছিদ্র, সেটি হচ্ছে

শরৎচন্দ্রের বন্ধু দুটি কোন্ কোন্ প্রশ্ন লিখতে পারছে না, শরৎচন্দ্র তাঁর আসনে বসে জানতে পারলেন কি করে?

আমার বক্তব্য—কলেজের টেষ্ট পরীক্ষা এমন কিছু একটা কড়াকড়ির ব্যাপার নয়। টেষ্ট পরীক্ষার বাঁধন যেখানে এমন আলগা, সেখানে শরৎচন্দ্রের দুটি বন্ধু শরৎচন্দ্রের অদূরেই বসে, অনুচ্চ কথায়, ইসারায় বা কাগজে লিখে গুলি পাকিয়ে ছুঁড়ে দিয়ে, তাদের অলিখিত প্রশ্নগুলির কথা অতি সহজেই তাঁকে জানিয়ে দিতে পারে। আর পরীক্ষার হলে গার্ডের আসন থেকে সকলেই দূরে সুবিধা মত জায়গায় বসলে, এ কাজ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব বলে মনে হয় না। কলেজের টেস্ট পরীক্ষা তো দূরের কথা, ইউনিভারসিটির পরীক্ষাতেও কত ছাত্র যে কথা-বলাবলি, টোকাটুকি করে প্রতি বছরই ধরা পড়ে এতো সকলেই জানেন।

আর তাছাড়া এমনো তো হতে পারে—শরৎচন্দ্রের ঐ অন্তরঙ্গ বন্ধু দুটি পরীক্ষার আগের দিন শরৎচন্দ্রকে বললে—দেখ, বিজ্ঞান তো কিছুই পড়িনি। মাত্র এই এই প্রশ্নগুলো পড়েছি। এ থেকে যদি আসে তবেই লিখতে পারব, না হলে নয়। এই এই অধ্যায় একেবারে বাদ দিয়েছি। এইগুলো থেকে যদি কোন প্রশ্ন আসে তাহলে তুই এক কাজ করবি। বিজ্ঞানে তুই ভাল ছেলে, তুই তো অনেক আগেই খাতা দিয়ে বেরিয়ে আসবি। বেরিয়ে এসে তুই হোস্টেলে গিয়ে ঐ প্রশ্নগুলোর উত্তর শ্লিপে লিখে দরোয়ানের হাতে পাঠিয়ে দিবি। তাতে যা যতটা লিখতে পারি, আর যা দুচার নম্বর পাই।

এই যুক্তি করে তারা কলেজের দরোয়ান (বা চাকরকে) কিছু টাকা দিয়ে হাত করল এবং দরোয়ান পরীক্ষার সময় জল, কালি, ব্লটিং (কাগজ) প্রভৃতি দেওয়ার নাম করে হলের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে তাদের হাতে শ্লিপ পৌঁছে দেওয়া একেবারে অসম্ভব বলে তো মনে হয় না।

উপেনবাবুর চোখে পড়া দ্বিতীয় বৃহৎ ছিদ্রটির সম্বন্ধে উপেনবাবু বলেছেন—"কলেজের দরোয়ানটি এক অদ্ভুতভাবে উদ্ভুটে মানুষ। সাঙ্ঘাতিকভাবে উপচিকীর্ষু, অতি অনায়াসে নমনীয়, আর অবিশ্বাস্য মাত্রায় নিজের ইষ্টানিষ্ট সম্বন্ধে উদাসীন। যে কাজে ধরা পড়লে শুধু অর্থদণ্ডই নয়, চাকরী থেকে বরখাস্ত হবার আশঙ্কাও আছে, সেই অতি গর্হিত বিধিনিয়মলঙ্ঘিত অপকর্মে সে যাতায়াত করে একবার নয়, দুবার নয়—ঘন ঘন। ক্রোধোন্মত্ত প্রিন্সিপালের রক্তনেত্রের আশঙ্কা উপেক্ষা করে একটি পরীক্ষার্থীর 'শেখানো মতো' নিজেকে অকারণে ঘোরতর বিপন্ন করে। বিপুল এই পৃথিবী, বিচিত্র মনুষ্যচরিত্র—কিন্তু তাই বলে এতখানি যা-নয়-তা?"

উপেনবাবুর এ কথার উত্তরে আমার বক্তব্য—অল্প বেতনের দরোয়ানকে কিছু অর্থ দিয়ে বশ করাটা এমন কিছু অসম্ভব নয়। উপেনবাবু বলছেন—যেখানে ধরা পড়লে তার চাকরী যাবার সম্ভাবনা সেখানে সে কি এমন অপকর্ম করতে পারে? আচ্ছা, এমন কি প্রায়ই দেখা যায় না বা শোনা যায় না যে, ভৃত্য অর্থের লোভে অন্যের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে প্রভুর ঘরে চুরি ডাকাতি করাচ্ছে, নানা অপকর্ম করাচ্ছে, এমন কি খুন পর্যন্তও করাচ্ছে। এখানেও তো ধরা পড়লে তার চাকরী যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবুও সে কি দূরে থাকে!

আর তাছাড়া এমনো তো হতে পারে যে, শরৎচন্দ্রের ঐ দুঃসাহসী বন্ধুদের কথা অগ্রাহ্য করলে, তাদের হাতে দরোয়ানের জীবন বা মানসম্ভ্রম বিপন্ন হতে পারে, এই ভেবে অনিচ্ছা সত্ত্বেই সে তাদের কথা শুনেছিল। মানুষ নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও দায়ে পড়ে যে কখনো কখনো ইচ্ছাবিরুদ্ধ কাজ করে থাকে, তারও নজির তো প্রায়ই দেখা যায়। অতএব উপেনবাবুর বিস্মিত হয়ে 'যা-নয়-তা' কথা স্বীকার করা চলে না।

উপেনবাবুর দৃষ্ট তৃতীয় ছিদ্রটি সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য—সন্দেহ যখন হ'ল তখন তিনি একশ জনের মধ্যে একশ জন যা করত, তা করলেন না কেন অর্থাৎ হাতে-নাতে (red-handed) ধরে পরীক্ষার্থী দ্বয়ের এবং দরোয়ানের বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন না কেন?

আচ্ছা, এমন কি হতে পারে না—দরোয়ানের উপর সারদাবাবুর সন্দেহ হয়েছে। সারদাবাবু দেখছেন, দরোয়ান বারে বারে যাতায়াত করছে। এই দেখে সারদাবাবু ভাবলেন, দরোয়ান বারে বারে যাতায়াত করায় যখন ইচ্ছা হলের মধ্যেই হাতে-নাতে ধরা যেতে পারে। এখানে দরোয়ান যাদের এনে দিচ্ছে এ তো দেখাই গেল, কিন্তু কোথা থেকে ও আমদানি করছে এবং সেখানে কে সরবরাহ করছে সেটাও দেখা দরকার। এই ভেবে সন্দেহ হবার পরই সারদাবাবু দরোয়ানের অজ্ঞাতে তাকে অনুসরণ করলেন, ফলে সরবরাহকারীকেও হাতে-নাতে ধরতে সক্ষম হলেন।

সারদাবাবু এরূপ করায় 'অদ্ভুত' না হয়ে বুদ্ধিমানের কাজই করেছেন বলে তো আমার মনে হয়। সারদাবাবুর অবস্থায় পড়লে ১০০ জনের মধ্যে ১০০ জনই হলের মধ্যে হাতে-নাতে না ধরে অনেকে সারদাবাবুর পন্থাও অবলম্বন করতেন বলে তো আমি মনে করি।

উপেনবাবু তাঁর আবিষ্কৃত চতুর্থ ছিদ্রটিতে দেখিয়েছেন—শরৎচন্দ্রের পিতা পরীক্ষার ফি জমা দেবার দিন শুধু ফির টাকাটা জমা দিয়ে, দিন দশ পনেরো পরে পুত্রের কলেজের কয়েক মাসের মাহিনা দেবার প্রতিশ্রুতি প্রিন্সিপালের কাছে দিলেন না কেন? আর সুরেন্দ্রনাথরা বা বিপ্রদাসই বা তখন কোথায় ছিলেন? তাঁদের কাছ থেকেই বা টাকা চাওয়া হয়নি কেন?

এর উত্তরে আমার বক্তব্য—এক কিস্তিতে পরীক্ষার ফির টাকা, পরে আর এক কিস্তিতে কলেজের মাইনের টাকা দেওয়া যেত কিনা হয়তো মতিলালের জানা ছিল না। কিংবা দরিদ্র মতিলাল এমনো তো ভাবতে পারেন, এখন কোনরকমে ফির টাকা দিলে, কদিন পরেই আবার মাইনের টাকাই বা পাব কোথা থেকে? আর উপেনবাবুর কথা মতই মতিলাল যদি প্রিন্সিপালের কাছে গিয়ে দু'বারে টাকা দেবার কথা বলেই থাকেন, তাহলে এমনো হয়তো হতে পারে যে, নীতিবাগিশ প্রিন্সিপাল আইনবিরুদ্ধ কাজ করতে চান নি।

এবার সুরেন্দ্রনাথরা ও বিপ্রদাসের কথা—সুরেনবাবু ও তাঁর ভাইরা

তখন ছেলেমানুষ। এঁরা তখনু ভাগলপুরে থেকে পড়াশুনা করলেও, সুরেনবাবুর বাবা তখন মালদহ জেলায় চাঁচরে কাজ করতেন।

শরৎচন্দ্রের টেস্ট পরীক্ষার ক'বছর আগেই বিপ্রদাসের বাবা ও মা মারা যান। তাঁর বাবার মৃত্যুর পরই তাঁর কাকাদের সঙ্গে তাঁদের একান্নবর্তী পরিবার ভেঙ্গে যায়। বিপ্রদাসের দাদা ঠাকুরদাস অফিসে টাকা ঘাটতির অভিযোগে অভিযুক্ত হলে, তার জন্য মামলায় বিপ্রদাসদের নিঃস্ব হতে হয়। ঠাকুরদাস দায়মুক্তও হলেন না, অথচ তাঁরা সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন। এই সময় বিপ্রদাসকে তাঁর দাদার, তাঁর নিজের এবং তাঁর ভগ্নীপতি মতিলালের সকলেরই সংসার চালাতে হ'ত। অথচ সেইমাত্র তিনি নতুন চাকরীতে ঢুকেছেন আর আয়ও অত্যন্ত অল্প।

নিজের আলস্য এবং চাকরীহীনতার জন্যই মতিলাল সপরিবারে বিপ্রদাসদের বাড়ীতে বসে বসে খাচ্ছিলেন। তারপর স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি পুত্র কন্যাদের সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকে খঞ্জরপুরে চলে আসেন। বিপ্রদাসদের বাড়ী থেকে চলে আসার সময় বিপ্রদাসের সঙ্গে মতিলালের কিছু মনোমালিন্য হওয়া স্বাভাবিক। তা না হলে এত বৎসর সপরিবারে ঐ বাড়ীতে থেকে বেকার মতিলাল অভাব-অনটনের ঝুঁকি নিয়ে চলেই বা আসেন কেন? মতিলাল বিপ্রদাসের সহিত এই মনোমালিন্যের জন্যই হয়তো শরৎচন্দ্রের পরীক্ষার ফির টাকা নেন নি। কেননা সামান্য মনোমালিন্য বা অভিমানের বশে মানুষ এই ক্ষতি কেন এর চেয়ে অনেক গুরুতর ক্ষতি এমন কি আত্মহত্যা পর্যন্তও তো করে থাকে!

আর এ না হয়ে হয়তো এমনও হতে পারে যে, মতিলাল দরিদ্র ও বিপন্ন বিপ্রদাসকে আবার টাকার কথা বলে. আরও বিপন্ন করতে চাননি। শরৎচন্দ্রের প্রবেশিকা পরীক্ষার সময় সামান্য ক'টা টাকার জন্যও বিপ্রদাসকে ভাগলপুরের সাইলক গুলজারিলালের কাছে হ্যাণ্ডনোট লিখে দিয়ে টাকা ধার করতে হয়েছিল।

যাক্, উপেনবাবুর আবিষ্কৃত বৃহৎ ছিদ্র ৪টির কথা তো গেল, কিন্তু এখন আশ্চর্যের কথা হচ্ছে এই যে, যে উপেনবাবু শরৎচন্দ্রের স্লিপ পাঠাবার কাহিনীটিকে উড়িয়ে দেবার জন্য এতক্ষণ ধরে লড়ছিলেন, তিনিই পরে আবার বলছেন—"সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার ফি দিতে না পারার জন্য দায়ী শরতের পিতার অর্থাভাব ততটা নয়, যতটা শরৎচন্দ্রের স্লিপ পাঠাবার ঘটনা। আর এই ঘটনাকে ব্রজেনবাবু যদি অপ্রীতিকর ঘটনা বলে থাকেন, তবে গোপালবাবুর বোধ হয় আপত্তি করা উচিত নয়।"

পরের জন্য স্লিপ পাঠাবার ঘটনাটিকে ব্রজেনবাবু অপ্রীতিকর ঘটনা বললে আমি কখনো আপত্তি করতাম না। কিন্তু ব্রজেনবাবু তো তা বলেন নি। উপেনবাবুর এ কথার উত্তর ইতিপূর্বে আমি শ্রীগৌরসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়ের চিঠি উদ্ধৃত করে দেখিয়েছি।

আমি লিখেছিলাম—শরৎচন্দ্রের এফ. এ. পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে সুরেনবাবু ও উপেনবাবুর কথার মধ্যে—সুরেনবাবুর কথাই নির্ভরযোগ্য বলে আমি মনে করি। উপেনবাবুর কথার মধ্যে জায়গায় যে সামঞ্জস্য নেই, ইতিপূর্বে আমি তা আলোচনা করেছি।

এর প্রতিবাদে উপেনবাবু লিখেছেন—"এ বিষয়ে আমার সংক্ষেপে তিনটি বক্তব্য আছে। (১) উপেনবাবুর সঙ্গে গোপালবাবুর যখন কোনো কথাই হয়নি, তখন উপেনবাবুর কথার সামঞ্জস্য অসমাঞ্জস্য সম্বন্ধে কোনো তর্কই উঠতে পারে না। মাথা না থাকলে মাথা ব্যথার তর্ক অপ্রাসঙ্গিক। (২ ও ৩) সুরেনবাবুর কাহিনী নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করার ফলে গোপাল-বাবু তা থেকে দুটি অবিসংবাদনীয় সত্য করতলগত করেছেন, যথা—(ক) স্লিপ লিখে লিখে পাঠানো—ঘটনার ফলে শরৎচন্দ্র ফি জমা দেবার অনুমতি সকল ছাত্রের সহিত প্রথম দিনেই পাননি, আর (খ) তার দ্বারা শরৎচন্দ্র তাঁর পিতাকে টাকা জোগাড় করবার উপযুক্ত সময় থেকে বঞ্চিত করেছিলেন।

তা'হলে আর বাকি রইল কতটুকু? যে ঘটনাকে ব্রজেনবাবু অপ্রীতিকর বলে নিরস্ত হয়েছিলেন, তার একটু রকম ফের অপ্রীতিকর ঘটনাকে লোকচক্ষুর সম্মুখে টেনে এনে দুরমুষ করে—গোপালবাবু প্রামাণ্য করে ছেড়েছেন।"

উপেনবাবুর তিনটি বক্তব্যের মধ্যে প্রথম বক্তব্যটি সম্বন্ধে আমার কথা হচ্ছে এই যে, উপেনবাবু "শরৎ-স্মরণিকায়" লিখেছিলেন—শরৎচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষার আগে দুবছর এবং পরে দুবছর (এফ. এ. পড়ার সময়) এই চার বছর তাঁর ছোট মামা বিপ্রদাসের অভিভাবকত্বের "দুর্মোচ্য কীলকে" আটকে ছিলেন। এ সম্পর্কেই আমি বিস্তৃত আলোচনা করে দেখিয়ে ছিলাম যে, না তা নয়। শরৎচন্দ্র ঐ সময় বড় জোর বছর দেড়েক তাঁর ছোট মামার অভিভাবকত্বে ছিলেন। এই প্রসঙ্গেই উপেনবাবুর কথার মধ্যে সামঞ্জস্য নেই বলেছিলাম। এতে মাথা থাকা না থাকার তো কথা ওঠে না। আর উপেনবাবু যদি বলেন, এ সম্বন্ধে গোপালবাবুর সঙ্গে কোন কথা হয়নি, তা'হলে আমি জোর করেই বলব, আমি আগে যা বলেছি—আমার প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্বে আমি এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে সমস্তই আলোচনা করেছি।

উপেনবাবু তাঁর অপর দুইটি বক্তব্যে শরৎচন্দ্রের স্লিপ পাঠাবার ঘটনা ও তাঁর পিতাকে টাকা যোগাড় করবার উপযুক্ত সময় না দেওয়ার কথা উল্লেখ করে, "তাহলে আর বাকি রইল কতটুকু" বলে আমার ঘাড়ে একটা দোষ চাপিয়ে দিয়েছেন। উপেনবাবুর মতে ব্রজেনবাবু যেখানে শুধু "অপ্রীতিকর ঘটনা" বলে নিরস্ত হয়েছেন, সেখানে এই অপ্রীতিকর ঘটনাকে" আমি লোকচক্ষুর সম্মুখে টেনে এনে ঠিক করি নি।

ব্রজেনবাবু শরৎচন্দ্রকে ঘোরতর মদ্যপ, উচ্ছৃঙ্খল ইত্যাদি রূপে চিত্রিত করেছেন। সে তো গেল। কিন্তু ব্রজেনবাবুর—পড়াশুনা না করার ফলে টোকাটুকি করে ধরা-পড়া-রূপ অপ্রীতিকর ঘটনা অপেক্ষা আমার লেখা পড়াশুনায় অত্যন্ত ভাল ছেলে হয়ে নিজের পরীক্ষান্তে পরার্থে স্লিপ পাঠানোর—কাহিনীটিতে (অবশ্য যদিও দুটি কাজই অন্যায়) যে শরৎ-চন্দ্রকে ব্রজেনবাবুর অপেক্ষা খেলো করা হয়নি, একথা আশাকরি উপেন-বাবুও স্বীকার করবেন।

উপেনবাবু লিখেছেন—"সর্বশেষে যে যুক্তি পদ্ধতির দ্বারা তিনি আমার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন, তৎসম্বন্ধে আমার কিছু নিবেদন আছে। তিনি

লিখেছেন—'সুরেনবাবু এবং উপেনবাবু উভয়েই শরৎচন্দ্রের সম্পর্কীয় মাতুল, আর উভয়েই তখন অল্প-বয়স্ক হলেও সুরেনবাবুই বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাছাড়া সুরেনবাবু এই সময় ভাগলপুরেই থাকতেন, কিন্তু উপেনবাবু ভাগলপুরে ছিলেন না। তিনি তখন অন্যত্র তাঁর অভিভাবকদের কাছে থেকে লেখাপড়া করতেন।

উপেনবাবু ভাগলপুরে ছিলেন না,—এ কথা কে বললে? ভাগলপুর আমার নিবাস, আর আমার পিতামাতা সেখানে থাকতে ভালবাসতেন বলে বৎসরে অন্ততঃ তিনবার গ্রীষ্ম, পূজা ও বড়দিনের ছুটিতে আমি ভাগলপুরে থাকতাম।......

তারপর বয়সের কথা। সুরেনদাদার চেয়ে আমি দু বৎসরের নয় এক বৎসরের নয়, মাত্র দশ মাসের ছোট। প্রসিদ্ধ আইনবিদ্ শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের সহিত এবার সাক্ষাৎ হলে জেনে নেব, এক ব্যক্তির চেয়ে অপর এক ব্যক্তি যদি দশ মাসের ছোট হয়, তাহলে শুধু সেই অপরাধেই প্রথমোক্ত ব্যক্তির সম্পর্কে তার সকল কথা অবিশ্বাস্য বলে গণ্য হবে—এই কি আইন?"

আমার বক্তব্য—সুরেনবাবু ভাগলপুরে ছিলেন, উপেনবাবু ছিলেন না, আর যেহেতু সুরেনবাবু বয়োজ্যেষ্ঠ অতএব তাঁর কথাই বিশ্বাস্য—এই যুক্তির বলে আমি আদৌ রায় দিই নি। আমি বহু আলোচনা ও বহু যুক্তি দেখিয়েই তবে রায় দিয়েছি এবং আমার সিদ্ধান্ত প্রকাশের পরে সুরেনবাবু যে বয়োজ্যেষ্ঠ এ কথাটা অমনি সাধারণভাবে মাত্র উল্লেখ করেছি, এ থেকে মোটেই কোন উপসংহার টানি নি। আমি কোন্ যুক্তির বলে যে রায় দিয়েছি, সমস্ত পড়েও উপেনবাবুর একথা বলার কোন অর্থ দেখি না।

উপেনবাবু বলেছেন—প্রসিদ্ধ আইনবিদ্ অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হলে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করবেন—শুধু দশ মাসের ছোট হওয়ার অপরাধেই কি তাঁর সকল কথা অবিশ্বাস্য হবে? উপেনবাবুকে অনুরোধ করছি, ঐ সঙ্গে তিনি যেন দয়া করে অতুলবাবুর কাছ থেকে এ কথাটাও জেনে নেন, দশ মাসের বড় হওয়ার অপরাধের জন্য সুরেনবাবুর কথাটাই বা অবিশ্বাস্য হবে কেন?

উপেনবাবু বলেছেন—"কে বললে আমি ভাগলপুরে ছিলাম না?"

আচ্ছা, কারও বাড়ি যদি ঢাকায় হয় এবং সে যদি ঢাকায় না থেকে কলকাতায় থেকে পড়াশুনা করে; তাহলে তার সম্বন্ধে যদি বলা যায়, সে ঢাকায় না থেকে অন্যত্র থেকে লেখাপড়া করছে, তার উত্তরে সে কি বলবে—কে বললে আমি ঢাকায় নেই? আমি তো বড় বড় ছুটিতে ঢাকায় আসি!

উপেনবাবুর এটা যে কি যুক্তি তা তিনিই জানেন।

উপেনবাবু বলেছেন—"ভাগলপুরে না থেকেও যদি গোপালবাবু শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে 'নির্ভরযোগ্য' তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন, তাহলে ভাগলপুরের সহিত অত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত হয়েও এবং ঘটনার পরবর্তীকালে ভাগলপুরে অতবার এবং অতদিন অবস্থান করেও আমার পক্ষে নির্ভরযোগ্য সংবাদ সংগ্রহ করবার বাধা কোথায় ছিল?"

উপেনবাবু ভাগলপুরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত হয়ে শরৎচন্দ্রের পরীক্ষা দিতে না পারার ব্যাপার সম্বন্ধে কি যে নির্ভরযোগ্য সংবাদ সংগ্রহ করলেন, তাঁর এত বড় দীর্ঘ প্রতিবাদের মধ্যে কোথাও তা আর উল্লেখই করলেন না। আর আমার সম্বন্ধে উপেনবাবুর মন্তব্যের উত্তর হচ্ছে এই যে, কই কোথাও তো আমি বলি নি যে, আমি ভাগলপুরে না থেকেও নির্ভরযোগ্য সংবাদ বলছি। আমি যা বলেছি, সে তো ভাগলপুরে অবস্থানকারী সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়েরই কথা!

উপেনবাবু ভাগলপুরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত হয়েও শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তখন কিরূপ সম্পর্ক রেখেছিলেন, সে সম্বন্ধে তাহলে শরৎচন্দ্রের ভাগলপুরের আর এক বাল্যবন্ধু শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের লেখা এখানে কিছুটা উদ্ধৃত করা যাক্।

সৌরীনবাবুর মেসোমশায় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় (ইনি লেখিকা অনুরূপা দেবীর পিতা) এই সময় ভাগলপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। সৌরীনবাবু তখন স্বাস্থ্যের জন্য ভাগলপুরে মেসোমশায়ের বাড়ীতে থেকে এফ.এ. পড়তেন। খঞ্জরপুরে শরৎচন্দ্রের প্রতিবেশি ও বন্ধু বিভূতিভূষণ ভট্ট ছিলেন আবার সৌরীনবাবুরও সতীর্থ এবং বন্ধু। তাছাড়া বিভূতিবাবুর ছোট বোন নিরুপমা দেবী ছিলেন আবার অনুরূপা দেবীর গঙ্গাজল। এই সব সূত্রে সৌরীনবাবু বিভূতিবাবুদের বাড়ীতে প্রায়ই যেতেন। এদিকে শরৎচন্দ্রও বন্ধু এবং প্রতিবেশি বিভূতিবাবুদের বাড়ীতেও খুবই আসতেন। তার ফলেই বিভূতিবাবুদের বাড়ীতে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সৌরীনবাবুর প্রথম আলাপ হয় এবং এই আলাপ ক্রমে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। সৌরীনবাবু এফ.এ. পরীক্ষা দিয়ে কলকাতায় তাঁদের বাড়ীতে চলে আসবার সময় শরৎচন্দ্রের বড়দিদি গল্পটি তাঁর একটি খাতা থেকে আগাগোড়া কপি করে নিয়ে আসেন।

এই বড়দিদি গল্পটি এনে সৌরীনবাবু একদিন তাঁদের ভবানীপুরের 'ছাত্রসমিতি'র বন্ধুদের পড়ে শোনান। সেখানে সৌরীনবাবুদের ছাত্রসমিতির অন্যতম সদস্য এই উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও উপস্থিত ছিলেন। সেদিন উপেনবাবু শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছিলেন, সে সম্বন্ধে সৌরীনবাবু লিখেছেন—"বড়দিদি গল্পটি এনে আমি তাঁদের শোনাই। সকলে বিমুগ্ধ হলেন। উপেন্দ্রনাথকে বলেছিলুম—তোমার ভাগ্নে হয় শুনেছি। তাতে উপেন্দ্রনাথ জবাব দিয়েছিলেন—দূর সম্পর্কের, ভারিবদ্, বাড়ীছাড়া।" (শরৎ-স্মরণিকা, ১৩৫৮)।

পিতার মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্র অসহায় অবস্থায় চাকরীর আশায় কলকাতায় উপেনবাবুদের বাসায় কয়েকমাস যখন থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন, তখন তিনি এঁদের বাড়ী থেকে কিরূপ ব্যবহার পেতেন, সে সম্বন্ধে উপেনবাবুদের কলকাতার তৎকালীন প্রতিবেশি শরৎচন্দ্রের বাল্যবন্ধু এই সৌরীনবাবু যা বলেন সে কথা আর এখানে উল্লেখ না করাই ভাল। তবে কারও জানবার ইচ্ছা হ'লে, সৌরীনবাবুর কাছ থেকেই জেনে নিতে পারেন।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পরে উপেনবাবু নিজেকে তাঁর সঙ্গে জড়িত করে যেভাবে প্রচার করেছেন, কেউ কেউ প্রকাশ্যে তার প্রতিবাদও করেছেন।

যেমন—'রবি বাসরের' বৈঠকে উপেনবাবু একবার নিজেকে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে জড়িত করে একটি কাহিনী পাঠ করলে, সেদিন সভায় শরৎচন্দ্রের আর এক বিশিষ্ট বন্ধু কবি শ্রীনরেন্দ্র দেব ঐ কাহিনী সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলে তখনি প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলেন।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে উপেনবাবুর যে তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না, তার আর একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ উপেনবাবুর সম্পাদিত 'বিচিত্রা' কাগজে প্রথম দিকে বেশ কিছুদিন শরৎচন্দ্রের কোনও লেখা আদৌ প্রকাশিত না হওয়া। বহু টাকা ব্যয় করে এবং বেশ আড়ম্বর করেই তখন এই বিচিত্রা কাগজ প্রকাশিত হয়েছিল। অথচ বিচিত্রার প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বহু নাম করা লেখকের রচনা প্রকাশিত হলেও তাতে শরৎচন্দ্রের কিন্তু কোনও স্থান তো কই তখন দেখছি না! এমন কি বিচিত্রায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য ধর্মে'র প্রতিবাদে শরৎচন্দ্র 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' নামে যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, সেটিও বিচিত্রায় প্রকাশিত না হয়ে, তখন 'বঙ্গবাণী'তেই প্রকাশিত হয়েছিল। এ থেকেও বেশ বোঝা যায় যে এঁদের পরস্পরের মধ্যে তেমন কোন ঘনিষ্ঠতা ছিল না।

যাক্, এবার এইখানেই শেষ করা গেল। উপেনবাবু আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছিলেন এবং নিজে যে সব পরস্পর-বিরোধী উক্তি করেছিলেন, তা সবই একে একে আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি। তবে আমার সব চেয়ে বড় কথা এই যে, শরৎচন্দ্রের স্লিপ পাঠাবার কাহিনীটিকেই উপেনবাবু নিজের লিখিত "অবান্তর" এবং ব্রজেনবাবুর "অপ্রীতিকর ঘটনা" বলে এখন আবার প্রচার করবার যে চেষ্টা করেছিলেন, তা যে সত্য নয় শ্রীগৌরসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট ব্রজেনবাবুর নিজের লেখা চিঠিটি উদ্ধৃত করে আমি তা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি। *

* এরপর এ সম্পর্কে আর কোন বাদানুবাদ প্রকাশিত হইবে না। ভাঃ সঃ

রুদ্রশিশু

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

চির নন্দলালা বন্দী ওরে বক্ষে সবার বৃন্দাবনে
করি স্বর্গেরি সুখ তুচ্ছ তারা নাচ্‌ছে প্রেমানন্দ মনে।
কেহ ধার ধারে না দৈবশাসন অভয় দেছে বন্ধু হরি,
তারা ইন্দ্র যমে তুচ্ছ করি রইল শ্যামচন্দ্রে ধরি'।
হল দেবের পূজা বন্ধ সেথায় ইন্দ্র রোষে আত্মহারা,
হানে গর্জি রোষে সৃষ্টি নাশের বজ্র শিলাবৃষ্টি ধারা।
সদা দৈবে করে তুচ্ছ তারা বন্দী যাদের বক্ষে হরি,
হেসে মাভৈঃ দিল নন্দলালা গোবর্দ্ধনের ছত্র ধরি'।
ওরে বন্দীদীনবন্ধু সদা ভক্ত বুকে সঙ্গোপনে,
সদা ক্ষুদ্র বেশী রুদ্রশিশু করছে লীলা বৃন্দাবনে।
সদা চঞ্চল অতি নন্দলালা ছন্দে নাচায় নন্দরাণী,
পদে মঞ্জুতালে গুঞ্জরণে উঠ্‌ছে বেজে ছন্দবাণী।
হঠাৎ এম্‌নি দিনে ছদ্মবেশী পুৎনা এল পুণ্যপ্রাতে,
তার রূপের মায়া উথ্‌লে ওঠে স্নেহের সুধা ভাণ্ড হাতে।
পাপ রাক্ষসীর ওই রূপের মায়ায় উঠ্‌লো কেঁপে মাতৃমন,
মা'র গুপ্তব্যথা নিলেন জেনে ভাবগ্রাহী জনার্দন।
ছলে ক্ষুদ্র শিশুর রুদ্র চুমা এম্‌নি করেই মারলো টান্!
হেসে ধ্বংস করি কংস চরে সত্য হলেন মূর্ত্তিমান।
ওরে অরির কাছে মূর্ত্ত সে যে, ভক্তবুকে সঙ্গোপনে,
সদা ক্ষুদ্র বেশী রুদ্র শিশু করছে লীলা বৃন্দাবনে।

কালো হ্রদের গর্জে ওঠে কাল্‌কালীয়ের রুদ্রফণা,
আজ সুধার বারি ভরলো বিষে শঙ্কিত যে সর্ব্বজনা।
সবে রৌদ্রে দহি তৃষ্ণাতে আজ জলের লাগি প্রাণ বিকল্,
হায় কালীর দহে জ্বল্‌ছে গরল পান করে তাই ভক্তদল।
নেচে রুদ্র শিশু কৃষ্ণ হেসে বল্লে—মাভৈঃ শঙ্কা নাই,
সে যে লাফিয়ে পড়ে' হ্রদের জলে মুছ্‌লো সকল যন্ত্রণায়।
মধু অঙ্গেরিতার গন্ধ লেগে ভরল সুধা বিষের জলে,
সে যে কালকালীয়ের দর্পদমন করল শ্রীপাদপদ্মতলে।
ওরে সর্পরাজের দর্পীফণা খর্ব করি সঙ্গোপনে,
সদা ক্ষুদ্র বেশী রুদ্র শিশু করছে লীলা বৃন্দাবনে।
ওরে এম্‌নি করে' ব্রজের বুকে আসুক যতই বিঘ্ন ঘোর,
সদা নন্দপ্রাণচন্দ্র কৃপায় হবেই দুঃখরাত্রি ভোর?
যেথা আনন্দেরে ধ্বংসিবারে দুঃখ-মেলার হট্টগোল,
সেথা সঙ্গী শ্যামচন্দ্রসাথে ভক্ত করে নৃত্যে দোল্।
ওই অব্‌বকেরি তৃণের দাপট্ ফিরুক ব্রজকুঞ্জে নিতি,
সেথা ডর কিরে ভাই নন্দলাল গাচ্ছে মাভৈঃ বংশীগীতি।
ওরে আসুক্‌নারে দৈত্য অসুর গোকুলবাসীর নেইকো ভয়,
যারা দৈবজয়ী ভাগবত্ ওরে কর্বে তারা সর্ব্বজয়।
জেনো বিঘ্ন সাথে সঙ্গী দীনবন্ধু সদা সঙ্গোপনে,
সদা ক্ষুদ্র বেশী রুদ্রশিশু করছে লীলা বৃন্দাবনে।



ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়াকস্

গগনচুম্বী

ফটো :—জোন্ বোস



ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ শিকার ফটো :—রমেন চট্টোপাধ্যায়

কানাই-বলাই

[একাঙ্কিকা]

মন্মথ রায়

চরিত্র

কানাই চৌধুরী বলাই অধিকারী	সওদাগরী অফিসের কেরাণী।
চণ্ডী দেবী	বলাই অধিকারীর স্ত্রী।
দুর্গা দেবী	কানাই চৌধুরীর স্ত্রী, চণ্ডী দেবীর ছোট বোন।
গণেশ	কানাই চৌধুরীর ভৃত্য।

কানাই চৌধুরীর বাসভবন। বেলা তিনটা। কানাই চৌধুরীর স্ত্রী দুর্গা এবং বলাই অধিকারীর স্ত্রী চণ্ডী—দুই সহোদরা বোনে রুদ্ধ দ্বারকক্ষে গোপন আলোচনা করিতেছে।

দুর্গা ॥ কি হ'বে দিদি?

চণ্ডী ॥ হ'বে আর কি! কপাল তোর পুড়েছে।

দুর্গা ॥ (ছল ছল চক্ষে) দিদি!

চণ্ডী ॥ বিয়ের আগেও তোকে বলেছি, বিয়ের পরেও তোকে বলেছি দুর্গা,—শত্রুকে বিশ্বাস করবি; তবু স্বামীকে বিশ্বাস করবি না। সে কথা শুনে তুই তখন হাসতিস্। এখন কাঁদতে হবে।

দুর্গা ॥ কিন্তু দিদি, উনি তো এমন ছিলেন না। আমাকে ছাড়া আর যে কাউকে জানতেন, এতো কখনো মনে হয় নি।

চণ্ডী ॥ বিয়ের পর থেকেই সঙ্গে সঙ্গে ছিলি। সঙ্গে থাকলে এক মূর্ত্তি, সঙ্গে না থাকলে আর এক মূর্ত্তি—এও তো তোকে আমি বলেছি। পুরীতে যদি তুই সঙ্গে যেতিস্—সাহস পেতো না, এ সব কেলেঙ্কারী ঘটতোও না।

দুর্গা ॥ তুমি জামাইবাবুকে একলা যেতে দিলে,—সঙ্গে গেলে না। তাই দেখেই তো আমি সাহস পেলাম দিদি। তার ওপর জামাইবাবুর সঙ্গে যাচ্ছে দেখে—ভাবলাম, নাই বা গেলাম আমি সঙ্গে। পুজোর সময়ে দেনা করে বাপের বাড়ী গিয়েছিলাম, সেই দেনাই এখনও শুধতে পারি নি। জানো তো, আমাদের খরচার সংসার। যাবো বললেই তো আর হয় না।

চণ্ডী ॥ তা' না হয় না গেলি। কিন্তু কড়া শাসন রাখতে তোকে কে মানা করেছিল? কড়া শাসনে রেখেছি বলেই আজ আমি নিশ্চিন্ত। বলেতো,—"চণ্ডী, কী অভ্যাস করে দিয়েছো। বরং তুমি সঙ্গে থাকলে এদিক ওদিক চাই। কিন্তু যখন সঙ্গে থাকো না, তখন স্রেফ্ মাটীর দিকে চেয়ে পথ চলি। তোমার শাসনে ও কেমন অভ্যাস হয়ে গেছে।"

দুর্গা ॥ তুমি ঠিকই বলেছো দিদি। তোমার কথা না শুনে কী ভুলই করেছি। ভুল যে শুধরোবো, সে আশাও আর নেই দিদি। মনে হয়, শাসনের বাইরে চলে গেছে। ঐ নীল চিঠি—যেদিন ওর নামে ডাকে এসেছে, সেদিনই আমার কপাল পুড়েছে। পড়েছো তো চিঠিখানা।

চণ্ডী ॥ পড়বো না—কী তার রং, কী ঢং। মুখপুড়ী চিঠিতে আবার একতোলা আতর মাখিয়ে ডাক-বাক্সে ছেড়েছে।

দুর্গা ॥ কী জানি দিদি! এসব কথা মনে হলেই মাথা ঘোরে, চোখে অন্ধকার দেখি। জামাইবাবুকে কি চিঠিটা দেখিয়েছো? বের করতে পারলে কিছু? মেয়েটা কে?

চণ্ডী ॥ অ্যাদ্দিন জেরা করেও পারিস্‌নি তো কানাইয়ের পেট থেকে কোন কথা বের করতে?

দুর্গা ॥ না দিদি। কই আর পারলাম? এ কথা তুললেই বলেন,—"তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, আমি এর কিছুই জানি না দুর্গা।"

চণ্ডী ॥ ও বললে, আর তুই বিশ্বাস করলি! কতোবার তোকে বলবো—শত্রুকে বিশ্বাস করবি, কিন্তু নিজের সোয়ামীকে বিশ্বাস করবি নে কখনো। আমি তো তোর জামাইবাবুকে বললাম,—"ভাল চাও তো, সব খুলে বল। পুরীতে গিয়ে দুই ভায়রায় মিলে কী সব কাণ্ড করে এসেছো

বল। না বলো তো আজ আর রক্ষে নেই। সাঁড়াশী দিয়ে তোমার জিভ টেনে বের করে কথা আদায় করবো।”

দুর্গা॥ ওরে বাবা! জামাইবাবু তবে বলেছেন?

চণ্ডী॥ বলবে না? বাবা সাধে আমার নাম রেখে-ছিলেন ‘চণ্ডী’। কিন্তু তোর নাম কেন যে তিনি ‘দুর্গা’ রেখেছিলেন, আজও আমি তা’ বুঝলাম না। দুর্গা! একটা গোবেচারা স্বামীকে যে শায়েস্তা করতে পারলো না, সে হলো গিয়ে দুর্গা!

দুর্গা॥ জামাইবাবু কী বললেন দিদি? মুখপুড়ীটা কে?

চণ্ডী॥ একটা হাতী।

দুর্গা॥ হাতী!

চণ্ডী॥ আমি মিথ্যা বলছি নে রে দুর্গা। সত্যিই একটা হাতীর মতো মেয়ে—আড়াই মণ ওজন—যেমন কালো, তেমনি মোটা। কোথাকার খুব বড় জমিদারের একমাত্র মেয়ে। মা নেই, কিছুদিন হলো বাপও গেছে মারা। অগাধ সম্পত্তির মালিক। চিঠিতে নাম দিয়েছে না—“তোমারই নগেন।” আর কেউ দেখলে মনে করবে কোন ব্যাটা ছেলে। কিন্তু নামটা হলো গিয়ে ওর নগেন্দ্র নন্দিনী। তিনিই হলেন গিয়ে নগেন—পেটে পেটে এতো শয়তানী।

দুর্গা। তা’ এতো বড়ো জমিদারের মেয়ে—এতো টাকার মালিক—বিয়ে হয় নি?

চণ্ডী॥ কে বিয়ে করবে ঐ কেলে হাতীকে? বললে তো তোর জামাইবাবু, যতো দিন যাচ্ছে, ততো ফুলছে—চর্ব্বির একটা পাহাড়। হ্যাঁ, ঐটেই হলো গিয়ে ওর ব্যাধি। ঐ ব্যাধি সারাতেই গেছে পুরী—লোণা জল-হাওয়ায় যদি কয়েক সের কমে। পুরীতে এবার যতো লোক বেড়াতে গেছে, সবার মুখেই এই কেলো হাতীর কথা। এষ্টেটের ম্যানেজার নাকি দু হাতে টাকা ঢালছে—যদি কেউ সারাতে পারে। এলোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ, কবেরজ, ঝাড়ফুঁক, অবধূত—সবাই বেশ কিছু কামিয়ে নিচ্ছে। দিনের পর দিন এই না দেখে দুই ভায়রায় হলো যুক্তি—তোর জামাইবাবু বললে বেশ,—“হরির কৃপায় দশ জনে খায়, আমরাই কেন খাবো না হে?”

দুর্গা॥ তার মানে?

চণ্ডী॥ তার মানে আমার বলাই অধিকারী পুরীতে রটিয়ে দিলেন—তোমার কানাই চৌধুরী কী যেন এক ভৌতিক চিকিৎসা জানেন—ভূতের যদি কৃপা হয়, হেন ব্যাধি নেই সারে না। জমিদার বাড়ী থেকে তলব এলো। আসতেই হবে।

দুর্গা॥ তা’ সে গেল?

চণ্ডী॥ যাবে না? প্রথম দিনেই একশো টাকা ফি—আর সে কী খাতির-যত্ন!

দুর্গা॥ হায়, হায়, সেই খাতির-যত্নই আমার কাল হলো।…ঐ পায়ের শব্দ পাচ্ছি। আপিস থেকে আসছেন। যা করতে হয়, তুমিই কর। আমার মাথা ঘুরছে, বুকটা কেমন করছে।

অফিস হইতে সদ্য প্রত্যাগত কানাই চৌধুরীর প্রবেশ

কানাই॥ ও বাবা! এ যে একেবারে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম—প্রয়াগ-তীর্থ!

চণ্ডী॥ কানাই, ও সব ছেঁদো কথায় ভবি ভুলবে না। বোসো।

কানাই॥ বসছি দিদি। কিন্তু অফিসের এই জামা-কাপড়গুলো—

চণ্ডী॥ ওগুলো গায়েই থাকবে। এটাও আদালত।

কানাই॥ ওরে বাবা! আচ্ছা থাক। কিন্তু এক পেয়ালা চা—পাবো তো?

চণ্ডী॥ পাবে—যখন গলা শুকিয়ে যাবে—প্রাণ-পাখী ত্রাহি-ত্রাহি করবে।

কানাই॥ ব্যাপার কি চণ্ডীদিদি? সেই নীল চিঠিটা তো? সে তো আমি দুর্গার গা ছুঁয়ে বলেছি—কে আমাকে কেন লিখলো, আমি জানি না। বিশ্বাস না হয়, তোমার পা ছুঁয়ে বলছি চণ্ডীদিদি।

চণ্ডী॥ দুর্গা! এক কেটলী জল গরম কর্।

দুর্গা॥ কেন দিদি?

চণ্ডী॥ থামো। গরম জলের কেটলীটা সাঁড়াশী দিয়ে ধরে আনবি—হ্যাঁ, সাড়াশী।

কানাই॥ ওরে বাবা! বলাইদা’ আমাকে বলেছেন, তুমি নাকি একদিন—

চণ্ডী॥ নাকি! নাকি কেন? বলাইদা’ কখনো মিছে কথা বলে না।…কই, তুই গেলি না দুর্গা?

দুর্গা। যাই দিদি।

চণ্ডী॥ আচ্ছা দাঁড়া। কথাগুলো তোরও শোনা দরকার।

কানাই॥ তা দরকার। ওরই সব চেয়ে বেশী শোনা দরকার। (একটি চেয়ার আগাইয়া দিয়া) তুমি বোসো দুর্গা, বোসো।

চণ্ডী॥ খবরদার! কিছু লুকোবার চেষ্টা করো না। জেনো, আমি সব কিছু শুনেছি। কোনও বাইরের লোকের কাছ থেকে নয়—শত্রু-টত্রুও নয়! শুনেছি তোমারই পেয়ারের বলাইদার কাছে। মিথ্যে বলবার লোক সে নয়—বিশেষ আমার কাছে। স্বামীকে বিশ্বাস করতে নেই আমি জানি। কিন্তু তাকে আমি এমন গড়ে-পিটে মানুষ করেছি যে, হ্যাঁ, ওকে বিশ্বাস করা চলে। আমি শুধু একটা কথা জানতে চাই,—কোনও বাজে কথা নয়—মোক্ষম একটা কথা। তোমার প্রাণের নগেন্দ্র সুন্দরী তোমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল।…যাক্। কিন্তু তুমি—তুমি তাতে রাজী হয়েছিলে কিনা?

কানাই॥ বিশ্বাস কর দিদি, আমি তাকে দেখিই নি। দুর্গার গা ছুঁয়ে বলেছি। তোমার পা ছুঁয়ে বলছি।

দুর্গা॥ বটে।

কানাই॥ হ্যাঁ। তাকে ঝাড়-ফুঁক চিকিৎসা করতে গিয়েছিল বলাইদা'—আমি না! মা কালীর দিব্বি করে বলছি—আমি নই।

চণ্ডী॥ দুর্গা, এক কেটলী গরম জল। না—আচ্ছা, দাঁড়া।

কানাই॥ নিজে সব কিছু করে বলাইদা' যে এমন করে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাবে, এ আমি কখনো ভাবি নি—ভাবতে পারি নি।

দুর্গা॥ জামাইবাবু যদি উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়েই চাপাবেন, তবে মেয়েটা, কেন লেখে—(চিঠি বাহির করিয়া) "প্রাণের কানাই!"

দুর্গার হাত হইতে চিঠিটি কাড়িয়া লইয়া চণ্ডী বাকী অংশ ঢং করিয়া পড়িতে লাগিল

চণ্ডী॥ "ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখী উড়ে গেলে—আর এলে না।"

ছিঃ ছিঃ—পড়তেও ঘেন্না হয়।

দুর্গা॥ (চণ্ডীর হাত হইতে চিঠিটি কাড়িয়া লইয়া) না পড়লে তো চলবে না দিদি। বর-সাজে সাজিয়ে ১লা ফাল্গুন পুরী পাঠিয়ে দিতে হবে যে! এই যে লিখেছে—(পত্রপাঠ)

"তোমার আসার আশায় আর কতোদিন সমুদ্রের ঢেউ গুণিব? তুমি বলিয়া গিয়াছিলে, ফাল্গুন মাসের প্রথমেই শুভকার্য্য ঘটিতে পারিবে। তোমার সেই কথায় ম্যানেজারবাবু পাঁজী দেখাইয়া ৩রা ফাল্গুন বিবাহের দিন ঠিক করিয়াছেন। কবে আসিতেছ তার করিয়া জানাও। তার না পাইলে আমার হার্টের অসুখ আরো বাড়িয়া যাইবে। কোন্ দিন এ অভাগীর প্রাণ-পাখী খাঁচা ছাড়া হইবে—"

আহা-হা! তাই হোক্ না। হলে তো বাঁচি।…দিদি, আসল কথার জবাবটা এখনও আমরা পাই নি কিন্তু। কোন্ সাহসে মানুষটা সেই কেলো হাতীকে বিয়ে করতে চেয়েছিল? সাহসটা কোত্থেকে এলো শুনি। আমি কি মরে গেছি?

চণ্ডী॥ মরে গেছিস্ কি বেঁচে আছিস্ দেখাচ্ছি। (কানাইকে) কী বলবে বল।

কানাই॥ কী আর বলবো দিদি! এতো করেতো বললাম, তাওতো বিশ্বাস করছো না।

চণ্ডী॥ বিশ্বাস করবার মতো কথা হলেই বিশ্বাস করা যায়। বিয়ে করতে না চাইলে কি করে তার সাহস হয় ঐ চিঠি লিখতে?

দুর্গা॥ তা' নয়তো কি? দুনিয়ায় এতো লোক থাকতে এই মানুষটার কাছে চিঠি লেখে কেন? আর তার ঠিকনাই বা পেলো কি করে?

চণ্ডী॥ মানুষ—মানুষ করিস্‌নে দুর্গা। এরা আবার মানুষ! আঁস্তাকুড়ের সব জঞ্জাল। (হঠাৎ চীৎকার করিয়া) ঝাঁটা গাছটা আন্। সব জঞ্জাল আজ ঝেঁটিয়ে সাফ করবো।

ভৃত্য গণেশ খান দুই ডাকের চিঠি লইয়া আসিল

গণেশ॥ বাবু, চিঠি।

দুর্গা॥ এই গণ্শা, আমার হাতে দে।

গণেশ চিঠিগুলি দুর্গার হাতে দিয়া চলিয়া গেল

কানাই॥ যাক্। নীল খাম-টাম নেই। আতরের গন্ধও পাচ্ছি না।

চণ্ডী ॥ ও—সেজন্যে বুঝি খুব আফসোস হচ্ছে? হ্যাঁরে দুর্গা, তোর মাছ-কাটা বঁটিটা অতো ছোট কেনরে?

দুর্গা ॥ ছাখোতো দিদি এই চিঠিটা—পুরী থেকেই এসেছে। নাম লিখেছে—তারানাথ রায়—ম্যানেজার। কী জানি বাপু, এতো পাকা লেখা আমি পড়তে পারি না।

চণ্ডী ॥ দে না - পাকা হাতেই দে। (কানাইকে) পড়। ঠিক ঠিক পড়ো কিন্তু—বাদ-সাধ দিও না।

কানাই উক্ত চিঠিটি লইয়া পড়িতে লাগিল

কানাই ॥ মান্যবরেষু!

মাননীয় কানাইবাবু, আমার দুর্ভাগ্য—এক নিদারুণ দুঃসংবাদ আপনাকে জানাইতে হইতেছে। আমাদের এষ্টেটের মালিক শ্রীমতী নগেন্দ্রনন্দিনী দেবী গত ২৩শে মাঘ বৃহস্পতিবার রাত্রি আট ঘটিকায় হঠাৎ স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন।”

চণ্ডী ॥ জয় মা কালী। খুব বিচার করেছো মা।

দুর্গা ॥ খুব বাঁচিয়েছো। কালীঘাটে গিয়ে জোড়াপাঠা দিয়ে আমি তোমার পুজো দেবো মা।

কানাই ॥ কিন্তু একি! আমি স্বপ্ন দেখছি না তো? আমার মাথা ঠিক আছে তো?

দুর্গা ॥ কেন? কি হলো?

চণ্ডী ॥ মরেও বুঝি তবে আবার বেঁচে উঠেছে।

কানাই ॥ ওগো, তোমরা আমাকে ধর। আমার হাত-পা কাঁপছে—আমার মাথা ঘুরছে আমি চোখে অন্ধকার দেখছি।...এক লাখ নয়, দু লাখ নয়, দশ লাখ টাকা—দশ লাখ টাকার সম্পত্তি—

দুর্গা ॥ ওগো, অমন করছো কেন? বল না কি হলো?

চণ্ডী ॥ আ মর্! লোকটা পাগল হলো না কি?

কানাই ॥ পাগল হবারই কথা। দশ লাখ টাকার সম্পত্তি—মরবার কিছু আগে উইল করেছে আমার নামে।

চণ্ডী ॥ হতেই পারে না।

দুর্গা ॥ না, না, তা' হতে পারে। কই দেখি কি লিখেছে।

কানাইয়ের হাত হইতে চিঠি লইয়া পাঠ

“......আপনি কথা দিয়াও না আসায় তিনি সর্বস্ব ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। আহার-নিদ্রা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। দিন দিন ওজন কমিতে থাকে। আড়াই মণ হইতে এক মাসেই দেড় মণে দাঁড়ায়। উহা আপনার ভৌতিক চিকিৎসার ফল মনে করিয়া আমরা আনন্দেই ছিলাম। কিন্তু তিনি ধরিয়া লইয়াছিলেন—আপনাকে না পাইলে আর বাঁচিবেন না। কি মনে করিয়া দশ লক্ষ টাকা মূল্যের সমুদয় সম্পত্তি আপনার নামে গোপনে উইল করেন। অন্তিমকালে ইহা প্রকাশ করিয়া যান। আপনিই এখন আমাদের মালিক। শীঘ্র আসিয়া এই বিশাল সম্পত্তি বুঝিয়া লউন।”

দুর্গা ॥ ওগো, তা হ'লে তো তোমাকে এখনই পুরী রওনা হ'তে হয়।

চণ্ডী ॥ না, না, সে কি করে হয় দুর্গা? চিকিৎসা করলেন তোর জামাইবাবু—বিয়ের কথাও হলো তোর জামাইবাবুরই সঙ্গে—ঐ কানাই-ই তো সে কথা একশো বার বলেছে—পুরী তবে ও যাবে কেন? যাক্ তোর জামাইবাবু। আমি যাচ্ছি—আজ রাতের গাড়ীতেই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দুর্গা ॥ জামাইবাবু গেলেই তো হবে না। উইলটা হয়েছে আমার কর্তার নামে। কিগো বল না। ঘটনাটাতো তোমার সঙ্গেই ঘটেছিল। সত্যি কথা বলতে ভয় কি?

কানাই ॥ না, না, ভয় আবার কি! বিশেষ এখন। তবে শুনবে সত্যি কথা।

চণ্ডী ॥ সত্যি কথাটাইতো শুনতে চাইছি।

কানাই ॥ তবে শোনো। আমি মিথ্যে বলি নি। নাটের গুরুটি হচ্ছেন ঐ বলাইদা। যাতায়াত, ঝাড়ফুঁক—তা ছাড়া আর যা যা সব ঘটনা—

চণ্ডী ॥ তাই যদি হবে, সম্পত্তিটাও তবে তোমার বলাইদাই পাবে। কি বল ভাই?

কানাই ॥ উহুঁ। পাবো আমি।

চণ্ডী ॥ কেন?

কানাই ॥ তোমার জন্য দিদি—তোমার জন্য—। তোমার জিভকে ধন্যবাদ—তোমার কেটলীভরা গরমজলকে ধন্যবাদ—তোমার সাড়াশী···ঝাঁটা-বঁটি—সব কিছুকে ধন্যবাদ।

চণ্ডী ॥ মস্করা রাখো। ব্যাপার কি বল?

কানাই ॥ ব্যাপারটা অতি সোজা কথা। প্রেম করলেন বটে বলাইদা। কিন্তু তোমার কাছে কোনদিন ধরা পড়বেন ভয়ে তার কাছে নাম-ঠিকানা দিলেন আমার।

আমি জানলাম—বলাই অধিকারী। তিনি জানলেন—কানাই চৌধুরী।...হ্যাঁ, আমাকে সব বলে-কয়েই দাদা আমার এই অঘটনটি পুরীতে ঘটিয়ে এসেছেন।.. ঐ যে দাদাও আমার এসে গেছেন। এসো দাদা—এসো—

বলাই অধিকারীর প্রবেশ

এই নাও—পুরীতে গিয়ে যা সব কাণ্ডকারখানা করে এসেছো, এখন তার ঠ্যালা বোঝো।

বলাই॥ আমি আবার কী কাণ্ড করেছি। আমি ও সবে নেই। (চণ্ডীকে) ওগো, সেই কখন এ বাড়ীতে এসেছো। লোকটা যে আপিস থেকে ফিরে একলা ঘরে বসে আছে—এক পেয়ালা চা না পেয়ে গলা শুকিয়ে মরছে—সে ভাবনা বুঝি নেই ?

দুর্গা॥ বসুন-জামাইবাবু। আমি চা-জলখাবার আনছি।

কানাই॥ খালি চা-জলখাবারে আজ আর চলবে না। সের দশেক সন্দেশ আনাও।

দুর্গা॥ তা আনাবো বৈকি।

বলাই॥ ব্যাপার কি ?

চণ্ডী॥ ব্যাপার তোমার মাথা আর মুণ্ডু। চিঠিখানা পড়।

চিঠিখানি দুর্গার হাত হইতে ছোঁ মারিয়া লইয়া বলাইয়ের হাতে গুঁজিয়া দিল। বলাই রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চিঠিখানি পড়িতে লাগিল।

বলাই॥ ওরে বাবা! (পুনরায় পাঠ) এরে বাবা!! (পুনরায় পাঠ) ওরে বাবা!!!

পাঠ শেষ হইলে চিঠিখানা হাত হইতে পড়িয়া গেল

(পাছা চাপড়াইতে চাপড়াইতে) এ আমি কি করেছি রে—কি ভুলই আমি করেছি রে—হায় হায় হায়—

চণ্ডী॥ কি করেছো এখনো টের পাও নি। চল আগে বাড়ী—তারপর বুঝবে। ডুবে ডুবে জল খাওয়া! জাতও গেল, পেটও ভরলো না। আজ তোমারই একদিন, কি আমারই একদিন।

দুর্গা। আহা—হা—দিদি, ছাড়ো—ছাড়ো। জামাই-বাবু একবার না হয় ভুল করেছেন,—আর ভুল করবেন না। বুঝলেন জামাইবাবু, এবার থেকে যা করবেন, নিজের নামেই করবেন। দিদির শিক্ষা হয়েছে—আর কিছু বলবে না।

কানাই ও বলাই উভয়ে হাসিয়া উঠিল

কানাই ও বলাই } (একযোগে) তা বটে! তা বটে!!

যবনিকা

মানসীর প্রতি

আনন্দ বাগ্‌চী

তোমাকেই ভুলে যাবার সাধনা আমার মনে,
আমার সৃষ্টি দু'হাতে জড়ায় প্রতিক্ষণে
তোমার স্মৃতিকে। হোক না কীর্ত্তি অবিনশ্বর
কিন্তু তোমাকে ভুলতেই হবে তার কি করি ?
কেমন করে বা পাড়ি দেব এই কাল-প্রহর
এই দুর্দ্দিনে তোমাকেই তাই স্মরণ করি।

ওগো দয়াময়ী, চরম আঘাতে আহত কর,
অহর্নিশির চিন্তা রাশিকে ব্যাহত কর।
তবু জানি আমি ভুলতে পারিনে তোমার কথা,
কাছেই এসো বা দূরে স'রে যাও কথা সে এক,
ভুলেই যাও বা ভালবাস তুমি, দুটোই ব্যথা,
তাই অগত্যা এই তপস্যা ক'রব ত্যাগ!

তোমাকেই আমি ভুলতে চেয়েও পারিনি ত
তোমার কথাই বেশী ক'রে মনে এনে দিত!
তোমার দেহ ত বধির-বাক্য অহল্যা
নব যৌবনে জলতরঙ্গ মূর্চ্ছিত,
তোমার কেশ ত ঘন অরণ্য, অনন্যা,
সবে ভোর-হওয়া-বক্ষ তোমার উচ্ছ্রিত।

মর্মিল ব্যথা তোমার মনকে স্বপ্নারতি
করে, আজো করে, ওগো, দেহাতীত অরুন্ধতী!

গোন্দ-পুরাণ-কথা

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

(১)

ভারতের সমস্ত আদিম জাতির মধ্যে গোন্দরাই সর্ব্বাপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ। ১৯৪১ সনের আদমশুমারি অনুসারে এদের জন-সংখ্যা ৩১,০১০০৪। তন্মধ্যে কেবলমাত্র মধ্যপ্রদেশেই ২৪ লক্ষের উপর গোন্দের বাস, তা' ছাড়া বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যভারত এবং হায়দরাবাদ রাজ্যেও গোন্দদের দেখতে পাওয়া যায়।

প্রাচীনকালে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোন্দ রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল এবং আজকের দিনেও মধ্যপ্রদেশের কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্য গোন্দ সর্দ্দারদের দ্বারা শাসিত হয়। পুরাকালের ন্যায় এখনো গোন্দদের দেশ গোন্দোয়ানা নামে পরিচিত। বাদশাহ্ আকবরের সঙ্গে সংগ্রামে গোন্দরাণী দুর্গাবতী অতুলনীয় বীরত্বের পরিচয় দিয়ে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। হায়দরাবাদ রাজ্য, নব গঠিত অন্ধ্র রাজ্য এবং উড়িষ্যার সীমারেখার মধ্যস্থলে



কিংড়ি নামক বাদ্যযন্ত্র বাদনরত একজন প্রধান

অবস্থিত, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত বাস্তার ষ্টেটের মারিয়া, মারিয়া গোন্দ এবং হাল্বা প্রভৃতি গোন্দ-উপজাতীয় লোকেরাই নাকি পৃথিবীর আদিমতম মানবগোষ্ঠীর ধারাবাহী।

গোন্দজাতীয় লোকেরা যে ভাষায় কথা বলে তার নাম গোন্দী উপভাষা। স্মরণাতীত কালে লোকের মুখে মুখে গোন্দী ভাষায় যে সকল লোকগীতি এবং পুরাণ-কথা রচিত হয়েছিল, 'প্রধান' নামে গোন্দীগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এক সম্প্রদায়ের লোকেরা গোন্দদের সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে কিরকি নামক বাদ্যযন্ত্র সংযোগে সেগুলো গেয়ে থাকে। গোন্দদের সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ পি. সেতুমাধবরাও অনুমান করেন যে, প্রধানরা মূলতঃ ছিল রাজপুত রাজা এবং মধ্যপ্রদেশের সামন্ত রাজাদের পেশাদার চারণ। এই সমস্ত রাজার পতনের পর এই চারণদের জীবিকা অর্জ্জনের পথ রুদ্ধ হয়ে যায় এবং তারা গোন্দ সর্দ্দারদের শরণাপন্ন হয়, গো-খাদক গোন্দদের সঙ্গে মেলামেশার দরুন, তাদের জাতিচ্যুতি ঘটে এবং কালক্রমে প্রধানরা গোন্দসমাজের অঙ্গীভূত হয়ে যায় এবং গোন্দ সামন্ত নৃপতিদের আশ্রয়ে পেশাদার চারণবৃত্তি অবলম্বন করে।

গোন্দজাতির লোকসাহিত্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে এই প্রধান চারণ সম্প্রদায়, মধ্যপ্রদেশ এবং হায়দরাবাদের অন্তর্গত আদিলবাদের পার্ব্বত্য ভূমিতে তাদের মুখেই শোনা যায় মাণিকগড়ের গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা, গোপীচাঁদ এবং তারামতীর চিত্তাকর্ষক কাহিনী। প্রধানরা এক দিকে যেমন গোন্দ লোক-সাহিত্যের ধারাবাহী, অন্যদিকে তেমনি এদের কল্যাণে গোন্দ-সংস্কৃতিরও ঘটেছে রূপান্তর। গোন্দ পুরাণ-কথা ও কাহিনীতে এরা দিয়েছে নূতন রূপ, প্রবর্ত্তন করেছে হিন্দু সংস্কৃতির ভাবধারা। ফলে রামায়ণ মহাভারত এবং হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী, হিন্দুশাস্ত্র প্রভৃতির সঙ্গে গোন্দদের মোটামুটি পরিচয় ঘটেছে, জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাদের রস-চেতনায় হিন্দুপুরাণের দেবদেবীর চরিত্র এবং লীলা-কাহিনী। প্রধানদের মাধ্যমে গোন্দ পুরাণগাথায় আর্য্য এবং অনার্য্য কথা ও কাহিনীর এমন গভীর সংশ্লেষ ঘটেছে যে, এর মধ্যে কতটুকু গোন্দদের নিজস্ব এবং কতটুকু হিন্দুশাস্ত্র ও সংস্কৃতি ভাণ্ডার থেকে আহৃত, তা নির্ণয় করা নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার। হিন্দু পুরাণের বহু দেবদেবী যে আজ গোন্দপুরাণ গাথায় কায়েম হয়ে বসেছেন তা মুখ্যতঃ প্রধানদেরই দৌলতে। বস্তুতঃ, প্রধানদের নিঃসংশয়ে বলা চলে গোন্দ-সমাজে হিন্দু সংস্কৃতির বাহক।

পৃথিবীর জন্মকথা সম্পর্কিত যে পুরাণ-গাথা প্রধানদের দ্বারা গীত হয়ে থাকে, গোন্দরা তাকে বলে মূলগণ্ড। এই গাথাটির সঙ্গে হিন্দু সংস্কৃতির ভাবধারা ও হিন্দুজাতির অধ্যাত্মচিন্তা ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। এতে হিন্দুশাস্ত্র এবং পুরাণাদিতে বর্ণিত বহু ঘটনা এবং দেবদেবীর লীলা-কাহিনী সন্নিবিষ্ট হওয়াতে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে, এগুলি প্রক্ষিপ্ত এবং পরবর্ত্তীকালে প্রধানদের সংযোজনা। মূলগণ্ডের বর্ত্তমান রূপ থেকে এর মৌলিক চেহারা কেমন ছিল তা আঁচ করা দুষ্কর। হায়দরাবাদের অন্তর্গত আদিলবাদ জেলার উত্তর তালুক প্রভৃতি অঞ্চলে প্রধানদের কণ্ঠে গীত এই পুরাণগাথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ নিম্নে দেওয়া যাচ্ছে, অবশ্য মধ্যভারতে এটি যে আকারে প্রচলিত তার সঙ্গে এর যৎসামান্য পার্থক্য বিদ্যমান।

(২)

আদিতে ছিল এক সর্ব্বব্যাপী মহা শূন্য। সেই অনন্ত শূন্যে 'সানমাম দীপে' (দ্বীপ) জন্ম নিলেন সূর্য্য গুরু। তারপর আবির্ভূত হলেন স্বয়ম্ভু

প্রভু নিরঞ্জন, সৌর 'দীপে' ছিল তাঁর স্বর্ণ সিংহাসন, সেখানে অবস্থান করতেন তিনি।

অতঃপর ঝাড়া গুরু এবং মাতা কঙ্কনীর মিলনে জন্ম হল সপ্ত বারির। আসি জল, মাসি জল, মাহী জল, আহী জল, পানিয়া জল, ভাঙ্গাল জল এই সব বারি প্রসারিত হতে লাগল—অন্ধকার গুরু, অন্ধকার গুরু (কুহেলিকা) এবং ওয়াভি চক্কর গুরু (বায়ু) এই তিন জনের দাপটে। ওয়াভি চক্কর বিদীর্ণ করলেন তাঁর গণ্ডীরেখা, সঙ্গে সঙ্গেই উঠল ঝড়, চমকাল বিদ্যুৎ, স্ফীত হয়ে উঠল বারিরাশি। তারা এই বলে গর্ব্ব করতে লাগল যে, তাদের চেয়ে বড় আর কেউ নেই। দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর চলল এমনি ভাবে। তারপর এই বারিরাশির উপরে জন্মালেন বাপাঁদেব (শৈবাল)। দেহ বিস্তার করে তিনি আচ্ছাদিত করলেন বিপুল জলরাশিকে। এমনি যখন অবস্থা তখন আর কে জন্মাতে পারেন পভুন গুরু (পত্রযুক্ত শৈবাল) ছাড়া। জলরাশিতে ইতিমধ্যে এসেছে যৌবন-জোয়ার। পভুন গুরু এবং জলরাশির মিলনে সৃষ্ট হল চারিটি ফুল, যথাসময়ে সেই চারিটি ফুল পরিণত হল চারিটি ফলে। তার মধ্যে প্রথম ফাটল জলজাপি ফল, আর তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল রাজা শেকা (স্বর্গের সাপ—শেষ নাগ), তারপর বিদীর্ণ হল জলকাপালি ফল, তার থেকে জাত হল কামধেনু (স্বর্গের গাভী), যা নাকি পরিচিত কামধাম কস্তুরী নামে।

অনতিকাল পরে জল প্রভুন ফলও ফাটল, আর জন্ম হল ধুন্ধ মুন্দ গুরুর। ধুন্ধ মুন্দ বলতে তাঁকে বুঝায় যিনি নিরাকার। তাঁর জন্মের পর গড়ে উঠল এক স্বর্ণপ্রাসাদ—ধুন্ধ মুন্দ গুরু বাস করতে লাগলেন সেই প্রাসাদপুরীতে।

সর্ব্বশেষে বিদীর্ণ হল জল জাকাট ফল, আর পরিপূর্ণ মহিমায় আবির্ভূতা হলেন মেহোশক্তি (মহা শক্তি)। মুখ তাঁর মুক্তো দিয়ে তৈরি, পক্ষদ্বয় হীরের, আর পা দু'খানি সোনায় গড়া। তাঁর জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই উত্থিত হল তুমুল ঝটিকা, দশ দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল—ডাইনে বামে সুমুখে পেছনে খালি জল আর জল। পক্ষ সঞ্চালন-পূর্ব্বক মহাশক্তি চতুষ্পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করলেন। কোথাও যে দাঁড়াবার জায়গা নেই! জলরাশি থেকে উঠে তিনি উড্ডীয়মান হলেন মহাশূন্যে। পুরো ছয়টি মাস তিনি উড়ে চললেন ঊর্দ্ধ থেকে ঊর্দ্ধতর লোকে। অবশেষে তাঁর দৃষ্টিপথে পতিত হল সেই স্বর্ণপ্রাসাদ, কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য তিনি সেটির শীর্ষদেশে উপবেশন করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই প্রকম্পিত হয়ে উঠল প্রাসাদ-প্রাচীর সমূহ। প্রাসাদাভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে এসে ধুন্ধ মুন্দ গুরু তারস্বরে বলে উঠলেন—"আমার চেয়েও শক্তিশালী কে ওখানে বসে?" তাঁকে দেখে তো মেহো-শক্তি ভান করলেন যেন তিনি রীতিমত ভড়কে গেছেন। ধন্দ মুন্দ গুরু তাঁকে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যেতে আদেশ করলেন। মোহো শক্তি তখন প্রাসাদশিখর থেকে নেমে এসে এক নিভৃত স্থানে গিয়ে প্রসব করলেন একটি প্রকাণ্ড অণ্ড, নয় মাস, নয় দিন নয় ঘণ্টা পরে সেই অণ্ড বিদীর্ণ হল, আর এক নিমেষে গড়ে উঠল একুশটি স্বর্গ।

এই ঘটনার অনতিকাল পরে সৃষ্ট হল নভকোট ধারাগিরি নামক স্বর্ণ-সিংহাসন সমন্বিত উত্তুঙ্গ সোনার পর্ব্বত। সেই স্বর্ণসিংহাসনোপরি জন্মালেন ইয়াধান গুরু। তাঁর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে দ্বাদশ সূর্য্য, দ্বাদশ চন্দ্র এবং সপ্ত নক্ষত্রের দ্যুতিতে আলোকিত হয়ে উঠল মহাশূন্য।

এবার সুরু হল দেবদেবীদের জন্মলীলা। জন্মগ্রহণ করলেন দেবী যাতী, আর পরম দেবতা ব্রহ্মা—জন্ম হল নব্বই লক্ষ দেবতার। ক্রমে ক্রমে জন্মালেন শ্রীইষ্ট (বিষ্ণু) শ্রীকৃষ্ট (কৃষ্ণ), আপদেব, গোপদেব, নভরদেব, গোভরদেব, প্রমুখ দেবগণ। নভরদেব আর গোভরদেব বাস করতে লাগলেন ভাণ্ডারা দীপে (দ্বীপ)।

ইয়াবধান গুরু অবস্থান করছিলেন ধারাগিরি পর্ব্বতের শীর্ষদেশে। হঠাৎ একদিন বিপুল উদ্দাম জলরাশি সেই অভ্রভেদী পর্ব্বতকে ভাসিয়ে নিতে উদ্যত হল—স্থানচ্যুত হয়ে বিপুলকায় ধারাগিরি থর থর করে কাঁপতে লাগল।

এদিকে দেবলোকে দেখা দিলে নিদারুণ খাদ্যাভাব। ঊর্দ্ধে সপ্ত-স্বর্গ



পেপরি নামক বংশী-বাদন রত জনৈক প্রধান

এবং অধঃ সপ্তস্বর্গের অধিবাসী দেবতারা দিন যাপন করতে লাগলেন অনশনে অর্দ্ধাশনে। তখন ইষ্ট, বিষ্ট, আপদেব, গোপদেব এবং মাহাদু (মহাদেব) এই কয়জন দেবতা সল্লাপরামর্শ করে ধারাগিরিতে যাওয়া সাব্যস্ত করলেন, কেননা সেখানে আছে ধান্যের প্রাচুর্য্য।

ধারাগিরিতে প্রথম গেলেন ইষ্টু। ইয়াধান গুরুকে তিনি জানালেন যে, তিনি সেখানে এসেছেন খাদ্যান্বেষণে এবং নিবেদন করলেন, তিনি যথারীতি তাঁর সেবা করতে প্রস্তুত। বিষ্ট, আপদেব, গোপদেব প্রমুখ দেবগণ একে একে ইয়াধান গুরুর নিকটে গিয়ে হাজির হলেন। সকলের শেষে গেলেন মাহাদু। মাহাদুর করুণ ক্রন্দনে বিচলিত হয়ে ইয়াবধান গুরু তাঁকে নিজের আহার্য্যের ভাগ দিলেন এবং তাঁকে নিযুক্ত করলেন পরিচারকরূপে।

একটা বাজী রাখলেন ইয়াধান গুরু। তাঁর ইচ্ছা যে পাতালের ভিত্তি কোথায় সেইটে আবিষ্কৃত হয়। তিনি ঘোষণা করলেন—যে পাতালের ভিত্তি আবিষ্কার করতে সমর্থ হবে তাকে দেবেন তিনি ধারাগিরি রাজ্য। দেবতারা সকলেই এই বলে অস্বীকৃতি জানালেন যে, এ কাজ নিতান্তই

অসম্ভব, নব্বই লক্ষ দেবতা জ্ঞাপন করলেন তাঁদের অক্ষমতা। আগ ঋষি, বাগ ঋষি, অন্ত ঋষি, দন্ত ঋষি কেউই রাজী হলেন না। অবশেষে পরমদেব ব্রহ্মা সম্মতি প্রদান করে জলরাশির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

ভাসতে ভাসতে, তিনি এসে পৌঁছলেন কামসাম দীপে। সেখানে স্বর্গের গাভী কামধেনুর সঙ্গে হল তাঁর দেখা। তিনি তাকে বললেন যে, পাতালের ভিত্তি আবিষ্কার করবার জন্যেই তার এ অভিযান। কামধেনু বললেন—"দেবতা, এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করুন, কেননা পাতালের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এর সাতটি বহিঃপ্রাচীরের প্রত্যেকটিতে প্রহরায় রত আছেন এক এক জন গুরু, তাঁরা এরূপ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী যে, দৃষ্টিপাত মাত্রেই যে-কোনো প্রাণীকে ভস্ম করে ফেলতে পারেন। এই সাতটি বহিঃপ্রাচীরের পর আছে আরো সাতটি অন্তঃপ্রাচীর। কাজেই আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া যে সম্পূর্ণ অসম্ভব সে তো বুঝতেই পারছেন।



একটি বেড়াঘেরা স্থানে পুরাণকথা-কীর্তনরত একদল কানাকা প্রধান

ব্রহ্মা কিন্তু কামধেনুর বারণ শুনলেন না। এগিয়ে চললেন তিনি পাতালপুরীর সন্ধানে।

ইতিমধ্যে বিপুল উদ্দাম জল রাশি অধিকতর পরিস্ফীত হয়ে প্রচণ্ড গর্জ্জনে এগিয়ে আসতে লাগল ধারাগিরি শিখরদেশের অভিমুখে, মনে হল এবার বুঝি সত্য সত্যই বিপুল পর্ব্বত তলিয়ে যাবে অতল জলতলে। ইয়াধান গুরু তো রীতিমত ভড়কে গেলেন। তখন দেবতাদের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ মাহাদু স্বরূপ প্রকাশ করলেন। ইয়াধান গুরুকে আশ্বাস দিয়ে তিনি বললেন—"মা ভৈঃ! এই পর্ব্বত ক্রমশঃ উচ্চ থেকে উচ্চতর হতে থাকবে, ক্রমবর্দ্ধমান জলরাশি কিছুতেই পারবে না একে গ্রাস করতে। ইয়াধান গুরু অবাক হয়ে দেখেন স্বর্ণসিংহাসনসমন্বিত পর্ব্বতশৃঙ্গ উর্দ্ধমুখী হয়ে যেন এক জ্যোতির্লোকের অভিমুখে এগিয়ে চলেছে। মাহাদু তখন ইয়াধান গুরুকে আদেশ করলেন সিংহাসন থেকে নেমে আসতে। ইয়াধান গুরু তাঁর কথামত কাজ করলে পর তিনি স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করলেন। দেবতারা তখন তাঁকে অভিনন্দিত করলেন ধারাগিরির অধীশ্বর বলে, আর দেবগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত তাঁর নূতন অভিধা হল শম্ভু মহাদেব। ধারাগিরিতে তাঁর অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হলে পর তিনি সিংহাসন থেকে নেমে এসে সবাইকে অভিবাদন করে—পাতালের উদ্দেশে রওনা হলেন।

গর্জ্জমান জলরাশি যেন কোন্ যাদু-মন্ত্রবলে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করে দু'ভাগ হয়ে তাঁর জন্যে পথ করে দিলে। প্রথমে তিনি এসে উপনীত হলেন কামধেনুর আবাসস্থল কাসাম দীপে। সেখান থেকে সরাসরি পাতালে গিয়ে তিনি একে একে বিশ্বনাথ গুরু, জগন্নাথ গুরু, অগ্নি গুরু, গোতা মুনি প্রমুখ তেরো জন বহিঃপ্রাচীর-রক্ষী ঋষিকে অভিবাদন জানালেন। ঋষিরা প্রত্যেকেই তাকে ভস্ম করবার জন্যে রোষকষায়িত লোচনে দৃষ্টিপাত করলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থকাম হয়ে তাঁরা তাঁকে শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ এবং সত্যযুগীয় ক্ষমতাসম্পন্ন বলে স্বীকার করলেন এবং তাঁকে অভীষ্টের সন্ধানে আরও এগিয়ে যাবার অনুমতি প্রদান করলেন। মাহাদু অবশেষে এসে উপনীত হলেন নভখণ্ড পাতাল দীপে। এসে দেখেন, স্বর্ণসিংহাসনে অঘোরে ঘুমুচ্ছেন নিরঞ্জন গুরু। তিনি পর্য্যায়ক্রমে গভীর নিদ্রায় অচেতন থাকতেন ছয় মাস, আর জেগে থাকতেন ছয় মাস। মাহাদু তাঁর পদতলে পতিত হলেন এবং তাঁর পদসেবা করতে লাগলেন। জেগে উঠে গুরু মাহাদুর পরিচয় এবং পাতালে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য কি তিনি তা জানতে চাইলেন। মাহাদু যখন তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন তখন ইয়াধান গুরু তাকে এ অসাধ্য-সাধনের ব্যর্থ প্রয়াস না করে স্ব-স্থানে প্রস্থানের পরামর্শ দিলেন, মাহাদু কিন্তু সেই পরামর্শ করলেন প্রত্যাখ্যান।

গুরু তখন মাহাদুকে পরীক্ষা করবার জন্যে তাকে ভূপাতিত করে তার উপর ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হলেন। এমনিভাবে কাটল পুরো ছয় মাস, তারপরে গুরু তাকে উপাধানস্বরূপ ব্যবহার করে ঘুমিয়ে কাটালেন আরো ছয়টি মাস। তারপরেও যখন দেখলেন মাহাদু তার সঙ্কল্পে অবিচলিত তখন প্রথমে তাঁকে ফুটন্ত তৈলকটাহে এবং পরে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করলেন—মাহাদু কিন্তু অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন অবলীলাক্রমে, অক্ষত শরীরে। অগ্নিশিখা তাঁর কেশস্পর্শ করতেও সমর্থ হল না।

অগ্নিকুণ্ড থেকে বেরিয়ে এসে মাহাদু দেখেন, সুমুখে দাঁড়িয়ে সাতটি সুন্দরী কন্যা। এরা গিরধাজান গুরুর মেয়ে—এখানে এসেছিল খেলা

করতে। অবাক হয়ে তারা, আগুনে যাকে পোড়াতে পারে না সেই মাহাদুকে দেখতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে তারা অরণ্যের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

মাহাদুর নিষ্ঠা আর কষ্টসহিষ্ণুতা দেখে গুরু তার উপর খুব প্রীত হয়েছিলেন। তিনি তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন,—"শোন মাহাদু, তোমাকে চুপি চুপি একটা কথা বলছি। ঐ মেয়েগুলো ভৃত্য কাকেস্থরের জিম্মায় তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ রেখে জঙ্গলের ভেতর হুটোপাটি সুরু করে দিয়েছে। এই অবসরে তুমি এক কাজ কর—পেটুক কাকেস্থরের সামনে প্রচুর ভাত আর দই রেখে দাও। খেতে খেতে যখন তার এমন অবস্থা হবে, যে সে আর নড়তে চড়তে পারছে না তখন মেয়েদের অজান্তে তুমি তাদের মধ্যে একজনের একটি পোশাক চুরি করে নিয়ে চলে এসো। মেয়েরা হয়তো তোমাকে পেছন ফিরে তাকাবার জন্যে অনুরোধ করতে পারে, কিন্তু তাদের কথায় তুমি কান দিয়ো না।

মাহাদ নিরঞ্জন গুরুর কথামত কাজ করলেন। কনিষ্ঠাত মাটির পোষাক চুরি করে সরাসরি চলে এলেন গুরুর কাছে। কাকেস্থর যখন তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, মেয়েরা তখন কোনো একটা অবাঞ্ছিত ব্যাপার ঘটেছে আঁচ করে ত্বরিতপদে ছুটে এসে দেখে এই ব্যাপার, এ-যে মাহাদুর কীর্ত্তি তা বুঝতে তাদের বাকী রইল না। একান্ত নিরুপায় হয়ে সর্ব্বকনিষ্ঠা গিরিজা (পার্ব্বতী) তখন নিরাবরণা অবস্থায়ই নিরঞ্জন গুরুর 'স্থানে' এসে পোষাক ফিরিয়ে দেবার জন্যে অনুনয়বিনয় করতে লাগলেন। মাহাদু তখন সাহস করে এগিয়ে এসে পপ করে গিরিজার হাত দু'খানি চেপে ধরলেন। নিরঞ্জন গুরু তখন মাহাদু এবং পার্ব্বতীর পরিণয়ের আয়োজনে ব্যাপৃত হলেন। দেবতারা সকলে এসে তাঁকে সাধ্যমত সাহায্য করতে লাগলেন। দেবলোকের সর্প সেকা তার বিরাট ফণা বিস্তার করে রচনা করলে বিবাহ-মণ্ডপ। ভগবন্ত দিলেন পোষাক-পরিচ্ছদ, মাল্য, কর্ণভূষণ, মুকুট, শঙ্খ, ঘণ্টা, সপ্ত অমৃত-পাত্র, সপ্ত অগ্নি-আধার। আরেক দফায় দিলেন তিনি সোনালী পালক, রূপালি দণ্ড,—পবিত্র শ্বেতবর্ণ বৃষভ নন্দীকেও (হিন্দু পুরাণোক্ত শিবের বাহন নন্দী) মাহাদু পেলেন বিয়ের যৌতুকস্বরূপ। সদ্যবিবাহিত দেব-দম্পতি তখন বৃষভপৃষ্ঠে আরোহণ করে ইয়াধান গুরুর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করলেন। ইয়াধান গুরু মস্তকে তণ্ডুল বর্ষণ করে তাঁদের কল্যাণকামনা করলেন।

এই কৃত্যের পর ইয়াধান গুরু মাহাদুকে বললেন—"বৎস, এত দিন তুমি ছিলে সাদামাটা মাহাদু, কিন্তু অতঃপর তুমি অভিহিত হবে শ্রীশম্ভু বলে, আর তোমার সহধর্ম্মিণী পরিচিতা হবে গিরিজা পার্ব্বতী নামে।

গিরিজা তখন ইয়াধান গুরুর নিকট একটি সোনার সিঁড়ি, এবং সোনার দড়ির জন্য প্রার্থনা জানালেন—তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ হল। তিনি তাঁর পিতার নিকট থেকে কাকেস্থরকেও চেয়ে নিলেন।

এই সকল বিচিত্র এবং মহার্ঘ্য দ্রব্যসম্ভারসহ দেব-দম্পতি রওনা হলেন ধাওড়াগিরির অভিমুখে। ব্যোমপথ মুখরিত হয়ে উঠল নন্দীর গলার ঘণ্টা-ধ্বনিতে। যখন তাঁরা গিয়ে পৌঁছলেন নভকোট ধাওড়াগিরিতে, তখন নব্বই লক্ষ দেবতা দণ্ডায়মান হয়ে তাঁদের অভিবাদন করলেন। ইয়াধান গুরু নেমে এলেন সিংহাসন থেকে—আর পার্ব্বতীকে পাশে নিয়ে তথায় উপবিষ্ট হলেন মহাদেব।

জলরাশির উচ্ছ্বাস কিন্তু শান্ত হয় নি তখনো, জলের তোড়ে ধাওড়াগিরি তখনো ইতস্ততঃ আন্দোলিত হচ্ছিল। এর প্রতিকারের জন্যে মাটি দিয়ে পৃথিবী গড়বার পরিকল্পনা এল মাহাদুর মনে। কিন্তু সমস্যা দাঁড়াল মাটি পাওয়া যায় কোথায়? একটি বাজপাখী সৃষ্টি করে তিনি তাকে পাঠালেন মাটির সন্ধানে। পুরো ছয়টি মাস খোঁজাখুঁজির পর বিফলমনোরথ হয়ে সে প্রত্যাবর্ত্তন করল ধাওড়াগিরিতে। শম্ভু তখন কাকেস্থরকে পাঠালেন মাটির সন্ধানে। দীর্ঘ বারো বৎসর কাল সে অভীষ্ট বস্তু লাভের জন্যে সে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় উড়ে বেড়াতে লাগল। কিন্তু তারও সকল প্রয়াস পর্য্যবসিত হল ব্যর্থতায়। ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে অবশেষে সে সমুদ্রবক্ষে বিচরণশীল বালেশুর নামে কর্কটের পিঠের উপর গিয়ে চড়ে বসল। বালেশুর সমুদ্রের অতলে ডুব মারতে উদ্যত হয়েছে, এমন সময় কাকেস্থরের কাকুতি-মিনতি তার কানে এসে প্রবেশ করল। শম্ভু তাকে পাঠিয়েছেন মাটির অন্বেষণে একথা শুনে বালেশুর তাকে সাগরের সেই অতলে নিয়ে যেতে রাজী হল যেখানে পড়ে রয়েছে সাতটি মাটির ডেলা—বালেস্থর সেখান থেকে একটি মাটির ডেলা চুরি করে নিয়ে এল—তার ওজন সাত তোলা। সেই মাটির ডেলা নিয়ে কাকেস্থর ফিরে চলল ধাওড়াগিরির পানে। শম্ভু মহাদেবের কাছে যখন সে এসে পৌঁছল তখন ক্ষুধা তৃষ্ণা আর পথশ্রমে সে মৃতপ্রায়।

যাই হোক্, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে মাটি তো পাওয়া গেল। এখন শম্ভুর নিকট সমস্যা দাঁড়াল কি করে এই মাটিকে সম্প্রসারিত এবং দৃঢ় করা যায়। তখন পার্ব্বতী এসে স্বর্ণদণ্ড এবং স্বর্ণরজ্জুর সাহায্যে সুরু করলেন মৃত্তিকা-মন্থন। এই মন্থনের দরুন নরম মাটির তাল তিল তিল করে প্রসারিত হতে লাগল।

নভরদেব এবং গোভরদেব নামক দেবতাদ্বয় তখন জলরাশির গতিকে নিম্নাভিমুখী করে দিলেন। সেই জলরাশির চাপে প্রসার্য্যমান মৃত্তিকা শূন্য থেকে নীচের দিকে নামতে লাগল।

শম্ভু মহাদেব তখন স্মরণ করলেন ব্যাস গুরুকে। সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাস গুরু এসে হাজির হলেন সাঁড়াশি, হাতুড়ি প্রভৃতি যন্ত্রপাতিসহ এবং অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জলিত করে মাটির পৃথিবী গড়ার কার্য্যে প্রবৃত্ত হলেন। নভরদেব এবং গোভরদেবকে জ্বলন্ত অনলে আহুতি স্বরূপ অর্পণ করা হল। শম্ভু প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, ভাবীকালে বিবাহের পূর্ব্বে লোকে যাতে তাঁদের পুজো করে সেই ব্যবস্থা তিনি করবেন।

গিরিজার মৃত্তিকা-মন্থন-ক্রিয়া তখনো কিন্তু চলছে অবিশ্রান্ত। ওদিকে ধাওড়াগিরির অবলম্বন-স্বরূপ ব্যাস নির্ম্মাণ করলেন এক অভ্রভেদী বিরাট স্তম্ভ। পৃথিবী গড়া হল বটে, কিন্তু তখনো তা প্রতিষ্ঠিত হয় নি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর, ঘন ঘন আন্দোলিত হচ্ছিল

প্রবল বেগে। শম্ভু তখন কামধেনুর নিকট গিয়ে তার সাহায্য প্রার্থনা করলেন। তার পর স্বর্গের সাপ সেকার নিকট গমন করে অনুনয়-বিনয় করে বললেন—"কামধেনু পৃথিবীকে তার শৃঙ্গদ্বয়ের উপর ধারণ করতে রাজী হয়েছে। তুমি তাকে তোমার দেহের উপর পা রেখে দাঁড়াতে দিয়ো।" চতুর্দ্দশ ফণা-বিশিষ্ট সেকা শম্ভুর আদেশ প্রতিপালন করবে বলে প্রতিশ্রুত হল। অত্যন্ত খুশী হয়ে শম্ভু মহাদেব তাকে এই বলে আশীর্ব্বাদ করলেন যে, অনাগত কালে নাগপঞ্চমী তিথিতে মর্ত্ত্যলোকে তার পূজা অনুষ্ঠিত হবে।

এখন কামধেনু নিজের জন্যে একটি বর প্রার্থনা করলে শম্ভু তাকে এই বর দিলেন যে, ভবিষ্যতে দেওয়ালীর অন্ধকার নিশীথে ধন-সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে গোন্দদের সমাজে কামধেনুর পূজো প্রচলিত হবে।

শম্ভুর নির্দ্দেশমত কামধেনু তখন ধরিত্রীকে ধারণ করলে আপন শৃঙ্গদ্বয়ের উপরে। শম্ভুকে সে জিজ্ঞাসা করলে, এমনি ভাবে কতকাল থাকতে হবে তাকে। শম্ভু বললেন—"পৃথিবীর সকল কলরব যখন সম্পূর্ণরূপে থেমে যাবে, তখন বিরত হবে তুমি ভূ-ভার বহনে, তখন থেকেই তোমার ছুটি।" এই বলে তিনি সৃষ্টি করেন—অগণিত পক্ষী এবং মক্ষিকাকুল, তাদের কূজন গুঞ্জন চলতে থাকে সারা রাত ধরে। কাজেই কামধেনুর ছুটি আর মেলে না। এমনি ভাবে সেকার ফণায় পা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে তাকে অনন্তকাল ধরে—কেননা দিনে কিংবা রাত্রে কোনো সময়েই পৃথিবীর কলরব একেবারে ক্ষান্ত হয় না।

দোদুল্যমান পৃথিবী তখন স্থির হল, আর একে একে সৃষ্ট হতে লাগল ইয়েরু গিরি, মেরু গিরি, কৈলাস, দ্রোণ গিরি, মহাদেব পর্ব্বত প্রভৃতি শৈলমালা। ব্যাস গুরু তৈরি করলেন শম্ভুর রমণীয় উদ্যান, অমৃত-তরু, সোনার অশ্বত্থ বৃক্ষ।

এমনি ভাবে গড়ে উঠল বিচিত্র বিশ্ব। কিন্তু পৃথিবী যে বন্ধ্যা! শম্ভু তখন চারদিকে ছড়াতে লাগলেন গাছপালা আর ঘাসের বীজ—তার পর দেখতে দেখতে তাজা সবুজে ছেয়ে গেল পৃথিবীপৃষ্ঠ।

এখন সমস্যা দাঁড়াল, কে হবেন স্বর্গের অধিপতি। তৈরি হল চব্বিশটি প্রাসাদ—দ্বাদশ সূর্য্যের জন্যে বারোটি, আর দ্বাদশ চন্দ্রের জন্যে বারোটি। তাঁরাই স্বর্গের উপর পালাক্রমে কর্তৃত্ব করতে আদিষ্ট হলেন।

এবার মনুষ্যসৃষ্টির পালা। শম্ভু প্রথমে গড়লেন কাদার মূর্ত্তি, শুকোবার জন্যে তাদের রাখা হল একটা ফাঁকা জায়গায়। কিন্তু রাত্রে ইন্দ্রের ঘোড়া এসে তাদের মধ্যে কতকগুলোকে ভেঙে-চুরে তছনছ করে দিয়ে গেল। শম্ভু তখন তাদের স্থাপন করলেন এক সুদৃঢ় লৌহ-যবনিকার অন্তরালে।

শম্ভু মহাদেব তখন এই সকল মৃন্ময় মূর্ত্তির উপর করলেন অমৃতবর্ষণ, কিন্তু তা সত্ত্বেও মূর্ত্তিগুলোতে হল না প্রাণসঞ্চার। ব্যাসগুরুর পরামর্শে শম্ভু তখন নিয়ে এলেন সিরমাগুরুর দুহিতাকে। তাঁর দেহ থেকে তৈরি হল রক্তবাহী ধমনী। তখন শক্তি দেবী আদিষ্ট হলেন ধমনীসমূহে প্রবেশ করে নির্জ্জীব দেহে প্রাণচেতনার সঞ্চার করতে! মূর্ত্তিগুলো তখন হয়ে উঠল জীবন্ত!

প্রাণচৈতন্য লাভ করে প্রথম সৃষ্ট পুরুষ এবং নারী পরস্পরের পাশাপাশি দাঁড়াল! শম্ভু তখন পুরুষকে জিজ্ঞেস করলেন—"বল ত, তোমার পাশে দাঁড়িয়ে ও কে?" সে জবাব দিলে যে, ওটি তার বোন্। শম্ভু তখন পুরুষের চোখের সামনে মায়াজাল বিস্তার করে আবার সেই একই প্রশ্ন করলেন। পুরুষ এবার নারীকে দেখলে নূতন চোখে, জবাব দিলে এটি তার জীবনসঙ্গিনী। নারী পুরুষ এক সঙ্গে তখন শম্ভু মহাদেবকে জিজ্ঞেস করলে, কেন তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। শম্ভু জবাব দিলেন—"অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে আমি সৃষ্টি করেছি এই পৃথিবী। তোমরাও পরিশ্রম করে বেঁচে থাকো এই পৃথিবীতে!" তারা আবার শুধোলে—" "খাটতে আমরা রাজী আছি, কিন্তু কে আমাদের সাহায্য করবে?"

শম্ভু তখন তাকে একটি ষাঁড়, কুকুর ও শকুনি দিয়ে বললেন…"এরাই হবে তোমাদের সাহায্যকারী।" শম্ভুর নির্দ্দেশমত এই তিনটি প্রাণী তখন পুরুষ এবং নারীর অনুগমন করলে, তখন তারা সকলে মিলে এক সঙ্গে পৃথিবীতে বাস করতে লাগল। খাটুনির মেয়াদ ফুরোলে পর শম্ভু তাদের ডেকে নিতেন নিজ নিকেতনে…সেই আদিকালে তো আর মৃত্যু বলে কিছু ছিল না।

এমনিভাবে দিনের পর দিন চলে যায়—বড় সুখের জায়গা মর্ত্ত্যলোক! সেখানে আধিব্যাধি নেই, মৃত্যু নেই। কিন্তু একদিন ঘটল বিপর্য্যয়।

পৃথিবীতে ছিল দু'জন নিপুণ ছুতোর। বিশেষ কোনো জরুরি কাজে শম্ভু একদিন তাদের স্বর্গে নিয়ে আসবার জন্যে পাঠালেন দু'জন অনুচর। তারা এসে হাজির হলে পর ছুতোর দুটির মাথায় গজাল দুষ্ট বুদ্ধি। একটা বড় গাছের গুঁড়ি কেটে তারা একটা গর্ত্ত তৈরি করলে আর শম্ভুর অনুচরদ্বয়ের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করিয়ে দিলে যে, এইটেই হচ্ছে স্বর্গে যাবার সংক্ষিপ্ততম রাস্তা। অনুচর দুটি তরুকোটরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই সূত্রধরদ্বয় গর্ত্তটির মুখ বুজিয়ে দিলে।

এদিকে অনুচরদ্বয়ের প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব হওয়াতে শম্ভু অধীর হয়ে উঠলেন এবং ব্যাপারখানা কি দেখবার জন্যে পৃথিবীর অভিমুখে রওনা হলেন। মদ্যবিক্রেতার ছদ্মবেশে নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে তিনি উপনীত হলেন সূত্রধরদ্বয়ের আবাসে। আসল ব্যাপারখানা কি তা বুঝতে তার আর বাকী রইল না। ছুতোর দুজনকে সমুচিত শাস্তি দেবার জন্যে তিনি হলেন কৃতসঙ্কল্প। স্বর্গে ফিরে গিয়ে যম রাজাকে তিনি দিলেন একটি ইস্পাতের অঙ্গাবরণ এবং একটি তীক্ষ্ণধার বর্শা। তারপর তিনশো ষাট রকমের ব্যাধি সৃষ্টি করে তিনি তাদের পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিলেন। ছুতোর দু'জন আক্রান্ত হল নিদারুণ ব্যাধিতে। শম্ভুর হুকুমে যম তখন কালো পোশাকে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করে অদৃশ্যভাবে ছুতোর দু'জনের অন্তিম শয্যাপার্শ্বে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাদের আত্মাকে তিনি টেনে নিয়ে এলেন শম্ভু মহাদেবের সকাশে, মাটির দেহ পড়ে রইল মাটিতেই। সূত্রধরদ্বয় যখন বললে যে, নিজেদের জীবনের এবং ছেলে-পুলেদের মায়াবশতঃ সংসার ছেড়ে আসতে চায় নি বলেই তারা অপকৌশল অবলম্বন করে শম্ভুর অনুচরদের জীবনাবসান ঘটিয়েছিল

তখন শম্ভুর মন গলে গেল। তিনি করুণাপরবশ হয়ে এই বিধান দিলেন যে, নিজ নিজ পরিবারের আবার হবে তাদের নব জন্ম। তখন থেকেই সুরু হল জন্ম এবং মৃত্যুর চক্রাবর্ত্তন।

(৩)

এই হল পৃথিবীর জন্ম-সম্পর্কিত গোন্দ-পুরাণ কথা। আর একটি গোন্দী পুরাণ কথায় আছে শম্ভুর পৃথিবী পরিক্রমণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ। বিভিন্ন স্থান পর্য্যটন করে অবশেষে তিনি গিয়ে উপস্থিত হলেন গান্ধারী ও কটুমার (কুন্তী) কাছে এবং তাদের আশীর্ব্বাদ করলেন পাঁচটি শস্যকণা দিয়ে। তাঁরা দু'জনে ভাগাভাগি করলেন। এর দরুন যথাসময়ে গান্ধারীর গর্ভে জন্ম নিল একুশটি দুর্য্যোধন, আর কটুমা জন্মদান করলেন পঞ্চপাণ্ডবের।

এখন শম্ভুর মনে জাগল যোগ্যতর ব্যক্তির হাতে সমগ্র পৃথিবীর শাসন-ভার অর্পণের বাসনা। তিনি ঘোষণা করলেন, বিপুল আয়তনের এক যষ্টি এবং বিরাট ওজনের একটি গদা যে ঘোরাতে পারবে তাকে দেওয়া হবে সমগ্র পৃথিবীর রাজ্যভার। প্রতিযোগিতায় অন্যান্য রাজাদের পরাস্ত করে ভীম শম্ভুর প্রসাদে সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর হলেন, ফলে দুর্য্যোধনদের ক্রোধানল হল প্রজ্জ্বলিত।

অনেক গোন্দী-পুরাণ কথায় গোন্দদের জাতীয় মহাবীর লিঙ্গোর মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হয়। শম্ভু কর্ত্তৃক গুহায় নিক্ষিপ্ত গোন্দ দেবতাদের তিনিই উদ্ধার করেন। শম্ভুর প্রসাদ লাভের জন্য কঠোর তপস্যায় রত হলেন লিঙ্গো—দীর্ঘকাল চলল কঠোর তপস্যা। তারপর—

"পরম দেবতা মহাদেব করলেন অনুভব
থর থর করে কেঁপে উঠছে তাঁর আসন।
অবাক বিস্ময়ে ভাবেন দেবতা
অনশনে কোন মহাতাপস
রত আছেন তপশ্চর্য্যায়
মাটির পৃথিবীতে।"

শেষ পর্য্যন্ত নির্ব্বিকার থাকতে পারলেন না মহাদেব—গোন্দদের মঙ্গলবিধানের জন্যে অনুষ্ঠিত লিঙ্গোর সকল কার্য্যে সহায়ক হতে হ'ল তাঁকে।

গোন্দ পুরাণ-কথায় মহাভারতের কাহিনীর যে কি প্রকার রূপান্তর ঘটেছে তার একটু আভাস নিয়ে দেওয়া যাচ্ছে।

শাহ জ্যোতি ধর্ম্মরাজ আর তার পত্নী দ্রৌপদীর এক কন্যা ছিল তার নাম জমকামা। নকুল বিয়ে করেন বাবুর দেবীকে, তাদের ছেলের নাম রাজা রাম বালুকর। পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে ভীমই হচ্ছেন সর্ব্বকনিষ্ঠ ইত্যাদি। গোন্দপুরাণে রামায়ণে বর্ণিত অযোধ্যার নামান্তর হয়েছে অভধপুরী আর সেখানকার রাজা দাশেরওয়াল (দশরথ)।

অর্জ্জুনের পাতাল-গমন-সম্পর্কিত একটি পুরাণ-কথাও গোন্দদের সমাজে প্রচলিত আছে। তুলজাপুরের অম্বা ভবানীর কন্যা তুলজা ভবানীর সখ হল কেশগুচ্ছে পরবেন দেগদা ফুল। কিন্তু বাঞ্ছিত বস্তুটি না পেয়ে তিনি জ্বলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছেন এমন সময় অকুস্থলে এসে উপস্থিত হলেন বানা হার্জ্জুন (অর্জ্জুন)। তুলজা ভবানীর অনুরোধে বানা হার্জ্জুন গেলেন পাতালে। সেখানে দেগদা পুষ্প আহরণ ত তিনি করলেনই, উপরন্তু সেকা নাগের কন্যা করিয়ালকে পরিণয়-পাশেও আবদ্ধ করলেন।

এই সমস্ত কাহিনী থেকে গোন্দ পুরাণ-কথার সঙ্গে হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে তা সহজেই বুঝতে পারা যায়।

হিন্দু পৌরাণিক রূপকথা গুলিকে নিজেদের জাতীয় স্বতন্ত্র বেশভূষা পরিয়ে গোন্দরা যে-রূপ দিয়েছে তাতে তাদের কল্পনাশক্তি, সমাজ-জীবনের বৈশিষ্ট্য এবং মানস-সংস্কৃতির পরিচয় সুপরিস্ফুট। এই দেশেরই খাঁটি ভূমিজ সন্তান হলেও অধিকাংশ আদিবাসী সমাজ ভারতের অন্যতম গৌরবময় রিকথ পৌরাণিক কাহিনী, রামায়ণ মহাভারতের চরিত্র এবং ঘটনাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কিন্তু গোন্দ জাতি যে এর ব্যতিক্রম তা তাদের-পুরাণ-কথা আলোচনা করলে নিঃসংশয়ে উপলব্ধি হয়। বহু পৌরাণিক চরিত্রকে এরা নিজস্ব ছাঁচে ঢালাই করে নিয়েছে, এঁদের নূতন নামকরণও করেছে—গোন্দ সংস্কৃতির সংস্পর্শে হিন্দু পুরাণ-কথা-সমূহের ঘটেছে রূপান্তর।

রক্তের নেশা তব ছুটবে

শ্রীনীলাপদ ভট্টাচার্য্য

কখন রাতের শেষে পৃথিবীরে দেখেছ কি আবছা আলোয় ?
অনেক কান্না-ভেজা ভিজে ঘাসে তুমি কিছু বুঝেছ ?
ঘন ঘোমটায় ঘেরা কুয়াসার পাশ দিয়ে তাকিয়ে,
কী যে ওর মূক ব্যথা,—কখন কি আগ্রহে খুঁজেছ ?
শ্যামলা জননী হায়, আমরা ছিলাম যবে ঘুমিয়ে—
বোবা কান্নায় তুমি কি ব্যথায় হায় এত কাঁদলে ?
আমারও চোখের জলে ভিজাতাম বুক তোর জননী,
হায় হায় বেদনায় তুই এত কাঁদবি তা জানলে !

কখন রাতের শেষে ঘুমভাঙা চোখ নিয়ে—
ব্যথাভরা ধরণীরে দেখেছ !
অনেক কান্না ভেজা ভিজে ভিজে ম্লান মুখ
সে মুখ কি বুকে এঁকে রেখেছ ?
হিংসার তাণ্ডবে রক্তের নেশা তবে ছুটবে
তোমার জানি ছুটবে।
এখানে ফসল ক্ষেতে আনন্দ উৎসবে
জুটবে আবার তুমি জুটবে।



মিশ্র রাগেশ্রী—ত্রিতাল

ছেয়েছিল বন বীথি বকুলের ফুলে ফুলে
কদম কেশর বিছায়েছে তরু মূলে
কে আবার আজি দিল ঢালি
উজাড়ি পূজার ডালি
ঝরা শেফালিকা রাণী কি জানি কি মন ভুলে।

বিকশিত শতদল কার রাঙ্গা পদলোভে
কাহারে দুলাবে বলে কাশের চামর শোভে
আগমনী গান গেয়ে
তরী বেয়ে চলে নেয়ে
মুখরিত গীত রবে ভরা নদী কুলে কুলে।

কথা—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী ঃ স্থর ও স্বরলিপি—শ্রীরবীন্দ্রমোহন বস্থ

II পা ধা ণর্র র্সা | ণা া ধা পা | পধা পা মগা রগা | মা া া া |
ছে ০ য়ে ছি ল ০ ০ ০ ব ন বী ০ থি ০ ০ ০

সা া সা া | গা রা গা মা | পা ধপা মগা রগা | মা া া া |
ব ০ কু ০ লে ০ র ০ ফু লে ফু ০ লে ০ ০ ০

{ মা পা পা া | পা া পা ধা | ণা র্সা র্সা ণর্রর্সা | ণা ধা পা |
ক ০ দ ম কে ০ শ র বি ০ ছা য়ে ছে ০ ০

র্সা ণা ধা পা | ধা পা মা গরা | গমা া া া | া া া া } II
বি ছা য়ে ছে ত রু র মূ লে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II মা মা ণা ধা | া ধা ধা না | না র্সা র্রর্সা না | র্সা া া া |
কে আ বা ০ ০ র আ জি দি ০ ল ঢা লি ০ ০ ০ ০

র্সা র্সা নর্সা র্রর্গর্মা | র্রা র্সা না র্সা | র্রা র্সণা া া | ধা পা া া |
উ জা রি ০ পূ জা ০ র ডা লি ০ ০ ০ ০ ০ ০

{ র্সা ণা ধা পা | ণা ধপা মগা রগা | মা া া া | া া া া }|
ঝ রা শে ফা লি কা রা ০ শি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

সা া সা া | গা রা গা মা | পা ধা মগা রগা | মা া া া II
ভ ০ রা ০ ন ০ দী ০ কু লে কু ০ লে ০ ০ ০

II র্সা ণা ধা পা | ধা পা মগা মা | পা া া পা | মা গা া া |
বি ক শি ত শ ত দ ল কা ০ ০ র ০ ০ ০ ০

গা গা মা পা | ধা পধা ণা র্সণা | ধা া া া | া া া া |
০ রা ঙা প দ লো ০ ০ ভে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

ণা ণা ণা ণা | ণা ণা ণধা া | র্সা া া া | া ণা ধা পা |
কা হা রে ঢু লা বে বো ০ লে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

সা া রা রা | গা মা পা ধপা | মগা রগা মপা ধপা | মা া া া |
কা ০ শে র চা ০ ম র শো ০ ০ ০ ভে ০ ০ ০

মা মা মা মা | ণা ধা ধা না | র্সা া র্গা র্রর্গা | র্রর্সা া া া |
০ আ গ ম নী ০ গা ন গে ০ ০ ০ য়ে ০ ০ ০

না া না না | র্সা নর্সা র্সা র্রা | ধা র্সা ণা া | ণধা পা া া |
ত ০ রী বে য়ে ০ চ লে নে ০ য়ে ০ ০ ০ ০ ০

ণা ণা ধা পা | ধা পা মগা রগা | মা া া া | া া া া |
মু খ রি ত গী ত র ০ বে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

সা া সা া | গা রা গমা া | পা ধপা মগা রগা | মা া া া II II
ভ ০ রা ০ ন ০ দী ০ কু লে কু ০ লে ০ ০ ০

উত্তরবঙ্গে বন্যা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ শিকদার

বিচিত্র এই দেশ—বিচিত্র এর প্রকৃতি। পৃথিবীর সকল বৈচিত্র্যের এক আশ্চর্য্য সমাবেশ এই বাংলাদেশে। ঠিক এমনটি আর অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। এই বাংলাদেশের প্রকৃতির যথাযথ বিবরণ দিতে গেলে পুরোপুরি কাব্য করতে হয়। শত-শতাব্দীর কাব্য-কাহিনী, শিল্পকলা, স্থাপত্য-ভাস্কর্য্য ও লোকগাথায় এর প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের বিভিন্ন দিকগুলির সুন্দর ছবি আঁকা রয়েছে। নগাধিরাজ হিমালয়ের পদলাঞ্ছিত এ দেশের উত্তরাঞ্চল—দক্ষিণাঞ্চল সাগর-সংগমে। এদেশ মাঝখানে আস্তৃত রয়েছে গাংগেয় সমভূমি প্রদেশে। উত্তরাঞ্চল একে পৃথিবীর শীতপ্রধান দেশগুলির বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। দক্ষিণাঞ্চল ও নিম্ন-দক্ষিণাঞ্চল দিয়েছে উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশের বৈশিষ্ট্য। সমস্ত বাংলাদেশ পরিভ্রমণ করে এলে পৃথিবীভ্রমণের সুখ-স্মৃতি রোমন্থন করা যায়—একথা যদি বলি, তা হলে হয়ত আমার্জ্জনীয় অপরাধ হবে না।

আমরণ অভিজ্ঞতাকে সযত্নে কুশাগ্র করে তোলে—প্রকৃতি ও মানুষ। প্রকৃতির যে রহস্যময় কার্য্যকলাপে আমার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র অনেকখানি প্রশস্ত হয়ে গেছে—সে কাহিনী শোনাব বলেই এই কথার ধূম্রজাল রচনা করে চলেছি। দক্ষিণাঞ্চল যখন প্রকৃতি-দেবীর দক্ষিণ নয়নের রুদ্র কটাক্ষে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যায়—উত্তরাঞ্চল সেইখানে তার বাম নয়নের অশ্রুধারায় সিক্ত হয়ে শীতবস্ত্রের জন্মে হাহাকার করে। দক্ষিণাঞ্চলে প্রাকৃতিক জীবেরা যখন ছায়া খোঁজে আর আঁঠাল জিভ দিয়ে শুক্‌নো ঘাসের স্বাদ গ্রহণ করে, উত্তরাঞ্চলের জীবেরা তখন সূর্য্যোকরোজ্জ্বল প্রদেশ আর শুকনো জমি খুঁজে বেড়ায়। কি বিচিত্র লীলা।

দেবতাত্মা হিমালয়ের দুর্গম ও দুর্নিরীক্ষ বক্ষঃস্থল থেকে ক্ষীণকায়া তুষারধবল নির্ঝরিণী সমভূমিতে নেমে এসে পাহাড়ী নদীতে নামান্তর ঘটিয়েছে। এরা ঋতুতে ঋতুতে বিধাতার শান্ত ও রুদ্ররূপ গ্রহণের বার্ত্তা মানুষের কাছে পাঠিয়ে দেয়।

প্রকৃতি রাণীর এই রুদ্ররূপ সাধারণ মানুষের জীবনে কি নিদারুণ হাহাকার এনে দিয়েছে তার ছবি যদি কথা ও কাহিনীর তুলিকা ও রঙে এঁকে যাই—যদি তাদের জীবনের দু-চারটী সুখ-দুঃখের কাহিনীতে সে রুদ্ররূপের অংশ বিশেষও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, তা হলেই মানুষ হিসেবে মানুষের প্রতি কর্ত্তব্য করা হবে এবং মানবতা বোধের গর্ব্বে অন্তরে অন্তরে পুলকিত হওয়া যাবে। মানুষই মানুষের জীবনের বিচারক। দেবতার রুদ্ররূপ তার বিচারবোধকে জাগ্রত করে—শান্তরূপ করে রসবোধকে জাগ্রত। কাব্য করা ছেড়ে এবার কয়েকটা আধুনিক তথ্য-সমৃদ্ধ বিবরণ দেওয়া যাক।

ক্ষীণাঙ্গী হিমকন্যাদের এই প্রচণ্ড উদরস্ফীতির প্রথম এবং প্রধান কারণ হিমালয় পর্বতের সানুদেশে তুমুল বর্ষণ এবং সেই তুমুল বর্ষণও কারণ ব্যতিরেকে ঘটে নি। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুস্রোত সমুদ্র থেকে সমগ্র বাংলাদেশ, বিহার ও আসামের জন্ম মোট যতটুকু আর্দ্র বায়ুকণা তাড়িত করে এনেছিলো তার অদৃশ্য পাখার ঝাপ্‌টা দিয়ে—তার নগণ্য অংশও বাংলার গাংগেয় সমভূমিতে ঝরে পড়েনি। সমস্তটুকু সোজা উড়ে চলে গেছে শুষ্ক ও অরণ্যবর্জিত অংশ ছেড়ে উত্তরে এবং সেখানে পৌঁছে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছে হিমালয়ের গগনচুম্বী প্রাচীরে—তারপর ক্লান্ত হয়ে ঝরেছে সেইখানে। তাই উত্তর প্রান্তে অতিবর্ষণ—দক্ষিণ প্রান্তে অনাবৃষ্টি। স্পষ্টই এর প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী।

বর্তমান উত্তর বাংলার একটি প্রধান জেলাসহর জলপাইগুড়ি। এটি প্রধানতঃ চা-শিল্পাঞ্চল। আধুনিক জগতে চা একটি অন্যতম শিল্পপণ্য। সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসী চা-শিল্পের মাধ্যমে জীবিকানির্ব্বাহ করে। জেলার অভ্যন্তরের গ্রামগুলোতে বাস করে অসহায় কৃষিজীবী মানুষেরা। সমস্ত জেলার মধ্য দিয়ে কতগুলি ক্ষীণকায়া পাহাড়ী নদী সর্পিল গতিতে এঁকে বেঁকে বয়ে চলেছে। অন্য দিকে জলপাইগুড়ির পাশ দিয়েই ভয়ংকর-সুন্দর তিস্তা প্রবহমান। এখানে তিস্তার বিস্তার প্রায় তিন মাইল। প্রমত্তা বর্ষণ ছাড়া অন্য কোন ঋতুতে যদি কোন দর্শক সেখানে যায় তবে তার দৃষ্টি-সীমায় দেখা দেবে নিষ্ঠুর তিস্তা-রাক্ষসীর কঙ্কালখানা। ধু-ধু করে উষর প্রান্তর—উত্তপ্ত নরম বালুকারাশি পরিব্যাপ্ত সে প্রান্তর—শীর্ণ, পিংগল, কাশবনের আগামী বর্ষা পর্য্যন্ত টিকে থাকার করুণ প্রয়াস—আর ক্ষীণধারা কাকচক্ষু জলে রাক্ষসীর বহু দিবসের সঞ্চিত বুভুক্ষাও পড়বে তার চোখে।

এই তিস্তাই সহসা একদিন (১৫ই জুন, ১৯৫৪) জেগে উঠল তার প্রচণ্ড ক্ষুৎপিপাসা নিয়ে এবং অস্বাভাবিক ভাবে সম্পূর্ণ এক নূতন পথে চালাল তার উদর-পূর্ত্তির নারকীয় অভিযান। মধ্য রাত্রে সে তার পুরোনো শাখা ছেড়ে প্রায় তিন মাইল বেঁকে দোমোহানী-ময়নাগুড়ি রেলওয়ে বাঁধ নিশ্চিহ্ন করে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র ও চাষীদের জনপদগুলোতে ঘোলা জলের হিমশীতল স্পর্শ ছড়িয়ে দিল।

অভিশাপগ্রস্ত মানুষ বছর বছর তাদের স্বর্ণময় আকাংখা প্রকৃতির প্রশান্তির জন্য বিসর্জ্জন করে অভ্যস্ত—তারা আর একবার সকরুণ নেত্রে আকাশ ও মাটীর দেবতার কাছে প্রার্থনা জানালে।

মানুষের দুর্বল সে প্রার্থনা—বুদ্ধিজীবী মানুষের আত্মরক্ষার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল মুহূর্ত্তে। ভীত ও বিহ্বল মানুষ নারী ও শিশুদের নিয়ে ছুটে চল্‌ল উঁচু জমির সন্ধানে। কিন্তু চারিদিকে তখন কল-কল—ছল-ছল ঘোলা জলের অবিশ্রান্ত উল্লাসধ্বনি।

অন্ধকারের আত্মগোপনে কালরাত শেষ হয়ে গেলে মানুষের কাছে প্রকটিত হোল প্রকৃতির নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলা। মানুষের মনে জেগে উঠল



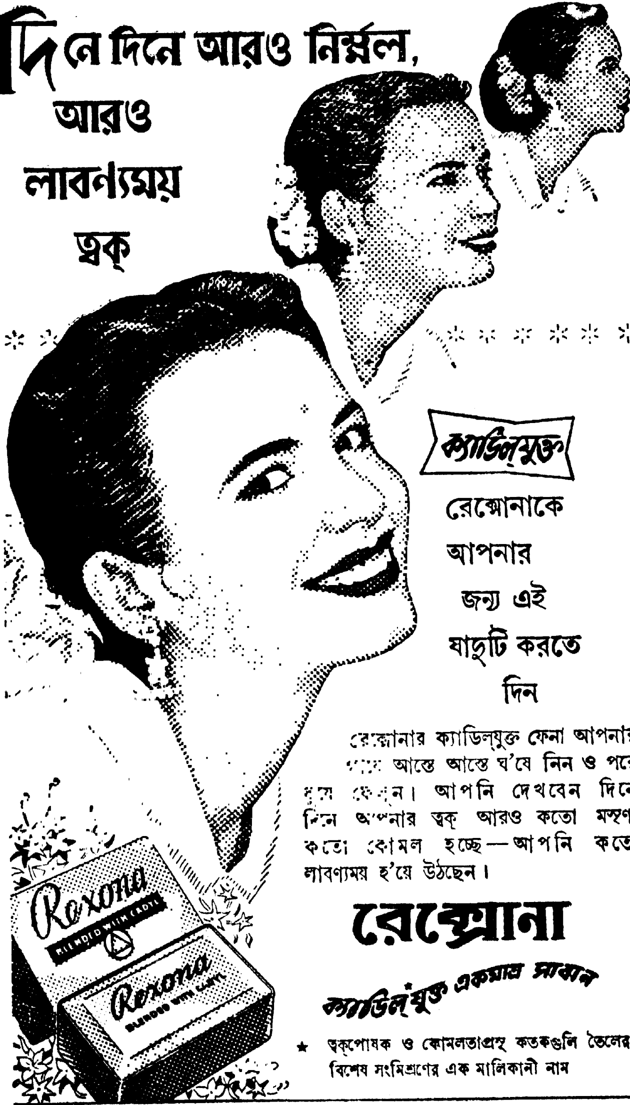
বিরাট বিভীষিকা—কিন্তু বিভীষিকার থেকে জনম নিলো মানুষের দুঃখ মোচনের দৃঢ় সংকল্প। যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে—যেন এক নূতন পৃথিবী জনম নিয়েছে মহাপ্লাবনের পর। একদল পুরাতন পৃথিবীর মানুষ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে—সে দৃষ্টিতে লক্ষ্য করা যায় সদ্যবিলুপ্ত পুরোনো জগতের প্রীতিভরা স্মৃতিছায়া।

দেখা গেল কতগুলো ছোট ছোট শাখানদী—যাদের শুভ্ররসে জমিগুলিতে সোনালী ফসলের গুঞ্জন ধ্বনি শোনা যেত, তাদেরকেই আশ্রয় করে চলেছে তিস্তার এই বিধ্বংসী অভিযান! এতে করে তিস্তা গ্রাস করে ৩৩০০০ একর জমি, ১৫০০০ মানুষ দাঁড়ায় পথে, আর ৩০০০ গৃহ তিস্তার বিশাল উদরে নিশ্চিন্ত স্থান লাভ করে। জলপাইগুড়ি সহরের অপেক্ষাকৃত নীচু জায়গাগুলি এ সময় জলনিমগ্ন হয়। এই জেলার অন্য প্রান্তের কালজানিতে বাণ ডাকে প্রায় এই সময়েই এবং ৫০খানা বাড়ী যায় ভেসে সে জলের তোড়ে। কিন্তু মানুষকে চিন্তার কোন অবকাশ না দিয়ে জেলার উত্তর প্রান্তের চেল নদী তার বিপুল জলশক্তি নিয়ে ওদালাবাড়ী শিল্পাঞ্চলকে ভয় দেখিয়ে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করলো সে সপ্তাহে। মানিয়াবাড়ী চা বাগান পড়লো তার কবলে। জুনের তৃতীয় সপ্তাহে জলপাইগুড়ির প্রতিবেশী জেলা কুচবিহারও বন্যার কবলিত হয়ে পড়ে। ক্রমাগত বর্ষণে তোরসা স্ফীতকায় হয় এবং একমাত্র লক্ষ্যস্থল স্বরূপ সমস্ত মেখলীগঞ্জ থানা গ্রাস করে। ক্রমে ক্রমে ২রা জুলাই কুচবিহারের একাংশ, দিনহাটা, তুফানগঞ্জ মহাকুমাগুলিও একান্ত অসহায় ভাবে বনহরিণীর ন্যায় অজগরের জঠরস্থ হয়ে পড়ে। এখানে তোরসা তার পঙ্কিল প্রবাহে ডুবিয়ে দেয় ৬০০০ একর আউস ও আমন ধানের জমি। মানুষের আত্মরক্ষার ক্ষীণ প্রচেষ্টাগুলি অমুক্ত থেকে যাতনাই বোধ করে চলে। তোরসা নদী এখানে গতিধারা পরিবর্ত্তন করে এবং মানুষের অনেক বাসগৃহ ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বন্যার প্রথম পর্য্যায় এভাবে বিরতি লাভ করে।

মানুষ ভেবেছিলো স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সে এবার একবার ঘর গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করবে, কিন্তু বিধাতা সেদিন অলক্ষ্যে হেসেছিলো কিনা জানা যায় নি। মানুষ নষ্টসম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য গ্রহণ করেছিলো এক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। কিন্তু সে চেষ্টার অনুপ্রাণিত হওয়ার পূর্বেই জুলাই শেষ সপ্তাহে তিস্তা কালিংপং সহরের কাছে তার বিপজ্জনক সীমাকে অতিক্রম করে বিপুল জলশক্তি সহকারে সমস্ত জেলাকে গ্রাস করার নিদারুণ সংকল্পে অস্থির হয়ে উত্তাল তরংগমালায় গ্রাম-নগর-জনপদ মথিত করে বয়ে যেতে থাকে। স্ফীতকায় নদীগুলির পর পর নাম উচ্চারণ করা যাক—তিস্তা, ধীস, চেল, মূলান্দি, নেওরা, জলঢাকা, কালজানি, হলং এবং অগণন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখানদী—যেগুলি গ্রামাঞ্চলের শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। সম্পূর্ণ ময়নাগুড়ি থানা প্লাবিত হয় এবং জেলা-সহরের আধখানা যায় ডুবে। সরকারী যোগাযোগ ব্যবস্থা যায় ভেংগে এবং জাতীয় রাজপথ, রেলওয়ে লাইনেই নানাস্থানে গভীর ও বিপদ-সংকুল খাদের সৃষ্টি হয়। সেই পথে জলস্রোত আকুল আগ্রহে শস্যক্ষেত্র ও জনপদ গ্রাস করতে ছুটে চলে। দেখা যায় সমস্ত জেলায় সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের। মানুষ ফিরে গে সেই ইতিহাসের আদিম যুগে—আশ্রয় করেছে বৃক্ষশাখা। মর্ম্মন্তুদ দৃ দেখা যায় গৃহপালিত পশুদের বেলায়—সহস্র সহস্র ভেসে চলেছে অ কোন জনম গ্রহণের জন্য। কুচবিহারও পুনরায় বিপন্ন হয়ে পড়ে তোরসা কুটিল হয়ে ক্রমশ অক্টোপাশের বেষ্টনীতে সমগ্র সহরটাকে চক্রাকারে ঘিরে ধরে এবং প্লাবিত হয় প্রায় ৬০০ বর্গমাইল স্থান।

দার্জ্জিলিং জেলায় এ সময় মহানন্দা, বালাসোন, তিস্তা এবং পঞ্চনাই নদী স্ফীত হয়ে দু-কূল প্লাবিত ক'রে এবং শিলিগুড়িতে আসাম লিংক রেলওয়েকে উৎপাটন করে সহরের কয়েকটি এলাকা ভাসিয়ে দেয় এবং প্রায় ২০০ গৃহস্থের আবাসস্থল পঙ্কিল করে তোলে। সমসাময়িককালে মহানন্দার পঙ্কিল জলস্রোত মালদহ জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর-কে প্লাবিত করে এবং ৪০০০ বর্গমাইল স্থান দিয়ে সে প্রবাহিত হয়। আমনধানের জমি ডুবে যায় ৯২,৫৮৮ একর। বন্যার দ্বিতীয় পর্য্যায় এখানে বিশ্রাম পায়।

দ্বিতীয় পর্য্যায়ের বন্যার ক্ষয়ক্ষতির হিসেবের অবকাশ জলপাইগুড়ি-বাসীর জীবনে এখনো আসে নি। বিড়ম্বিত অদৃষ্টের জন্য তাদের দীর্ঘ-নিঃশ্বাসটুকু ত্যাগের অবসর না দিয়ে সর্বগ্রাসী তিস্তার তৃতীয় এবং ভয়ংকর প্রচেষ্টা দেখা দিল—যখন সে তার করাল বদন বিস্তার করে জেলার সর্বাংগ লেহন করতে চাইল ২০শে আগষ্ট তারিখে। তিস্তার এই সর্বনাশারূপ জেলার অতিপ্রাচীন ব্যক্তিরও বিস্মরণের তালিকায় চলে—সবাই মন্তব্য করেছিলো। মন্দিরে মন্দিরে মানুষের ক্রন্দন ধ্বনিতে শব্দতরংগ উঠে বিংশ-শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে। সে শব্দতরংগ রাজধানীতে পৌঁছে—সংবাদপত্রে সে বার্ত্তা পেয়ে মানুষ চঞ্চল হয়ে ওঠে। এ সময় সহরের দুই-তৃতীয়াংশ ডুবে যায় এবং অবশিষ্ট ডুয়ার্সের সমস্তগুলো নদী একযোগে স্ফীত হয়ে বাইরের জগত থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। আশ্চর্য্য যে কুচবিহারের ভাগ্যও এ সময় জলপাইগুড়ির সাথে এক হয়ে ওঠে তোরসার বদনবিস্তারে। ক্ষতির পরিমাণ হিসেব করে জানা গেছে সমস্ত জেলা কতকগুলি বিচ্ছিন্ন অংশে ভাগ হয়ে গেছে। মোট ৭০০ বর্গমাইলের ওপর দিয়ে এই প্রচণ্ড জলস্রোত বয়ে গেছে। বনজ সম্পদ নষ্ট হয়েছে কয়েক লক্ষ টাকার। যেখানে নিবিড় বনরাজিনীলা বিরাজমান ছিল—এখন সেখানে ধূ ধূ করে উষর প্রান্তর।' ১৬০০ একর জমির চা-বাগানের কল্পনাতীত রকম ক্ষতি হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে নাগ্রাকাটা অঞ্চলের বিস্তৃত বনজ সম্পদ;—'রামসাহী ও যাদবপুর চা-শিল্পাঞ্চল। গৃহপালিত পশু মরেছে ২৫০০। ৭ কোটি টাকার ধান ও ১ কোটি টাকার পাট সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়েছে। বহু অর্থব্যয়ে নির্মিত রেলওয়ে ও রাজপথের সেতুগুলো ধ্বংস হয়েছে অবর্ণনীয় ভাবে। ৪০০০০ আশ্রয়স্থল ভেসে চলে গেছে, তার ফলে ক্ষতি-গ্রস্ত হয়েছে ২০০০০০ অসহায় মানুষ। মৃত মানুষের খোঁজ জানা গেছে ২৫০ জন। প্রায় সমস্ত নদীগুলোই অবলম্বন করেছে নূতন গতি পথ। জলপাইগুড়ির ভৌগোলিক আকৃতির ঘটেছে বিরাট পরিবর্তন।


দিনে দিনে আরও নির্ম্মল,
আরও
লাবণ্যময়
ত্বক্
ক্যাডিল্‌যুক্ত
রেক্সোনাকে
আপনার
জন্য এই
যাদুটি করতে
দিন
রেক্সোনার ক্যাডিল্‌যুক্ত ফেনা আপনার
আস্তে আস্তে ঘ'ষে নিন ও পরে
আপনি দেখবেন দিনে
দিনে আপনার ত্বক্ আরও কতো মসৃণ,
কতো কোমল হচ্ছে—আপনি কতো
লাবণ্যময় হ'য়ে উঠছেন।
রেক্সোনা
ক্যাডিল্*যুক্ত একমাত্র সাবান
★ ত্বক্‌পোষক ও কোমলতাপ্রসূ কতকগুলি তৈলের
বিশেষ সংমিশ্রণের এক মালিকানী নাম
Rexona
BLENDED WITH CADYL
RP. 123-50 BG
রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারী লিঃএর তরফ থেকে ভারতে প্রস্তুত

চিরকাল যারা তিলে তিলে নিজেদের শ্রম দিয়ে প্রাণ দিয়ে মানুষের সভ্যতার বনিয়াদ গড়ে তুলেছে সেই সব অখ্যাত, অবজ্ঞাত, মূর্খ ও একান্ত অসহায় কৃষক ও শ্রমিককুলই বিধাতার রুদ্ররোষের বহ্নিজ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরছে। জন্মের এ এক আদিম ও মৌলিক রহস্য—এই রহস্যই আমার জীবনের অভিজ্ঞতাকে সূক্ষ্মতর করে তুলেছে। পরিবর্ত্তন ঘটেছে আশ্চর্য্যরকম। ধান-জমিগুলোকে বালুতে আর কাঁকরের আস্তরণে করেছে পতিত, আর পতিত জমিকে করে তুলেছে উর্ব্বরা—অবশ্য সমানুপাতিক হারে তো নয়ই। এ সবই যেন মানুষের সেখানকার জীবনের মৌলিক পরিবর্ত্তন ঘোষণা করছে। মোট ধ্বংসকে অর্থ দিয়ে সীমায়িত করলে বলা যায় ২০ কোটি টাকা এবার ভয়ংকর রকম মার খেয়েছে। আপন ঘরের সিন্দুকের খবর যারা রাখেন—তাদের জন্য বলছি না যে বছরে সেখানে জমা হয় ৩৫ কোটি টাকা। সমস্যা-বিফল পশ্চিমবংগকে পর্য্যুদস্ত করার এ এক দুরন্ত প্রয়াস নয় কি?

মানুষ পরাজিত হয় না। এই অনমনীয় মনোভাব জীবনে এক বিষণ্ণ মধুর রসের সৃষ্টি করে। সেই ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে কোন আকাংখার তাড়নায় জানি না—পুরোনো জীবনের অমৃতধারাকে উদ্ধার করবার চেষ্টায় সেখানকার মানুষ উঠে পড়ে লেগে গেছে। জাতীয় সরকার তার দেহেতে জোগাচ্ছে শক্তি। কয়েক লক্ষ অর্থ-সাহায্য দেওয়া হচ্ছে বিড়ম্বিত মানুষের কর্ম্মশক্তি পুনরুজ্জীবনের জন্য। কিন্তু এ সমস্তই শান্ত, সুস্থ ও সুশৃংখল জীবনসৃষ্টির পক্ষে একেবারেই অনুল্লেখ্য। শত বৎসরের দুরীভূত জীবনের ভিত্তিমূলকে নাড়া দিয়ে, উৎপাটন করে দিয়ে গেছে একেবারে বন্যা। এর জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করে অগ্রসর হওয়া প্রাথমিক প্রয়োজন। অন্যথায় ভবিষ্যতে সেখানে জীবন অসহ হ'য়ে উঠবে, এর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। আমাদের প্রিয় নেতা জহরলাল বলেছেন—বন্যায় পরোক্ষ সম্ভাবনার ইংগিত থাকে—সে জমিকে নূতন উর্ব্বরা শক্তিতে সঞ্জীবিত করে। দৃষ্টান্ত দিয়েছেন মিশরের নীল নদের। তার কথা অস্বীকার না করলেও একথা দৃঢ় ভাবে বলতে পারি, বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক মানুষ একান্ত অসহায় ভাবে কেন মেনে নেবে জীবন-বিধ্বংসী বন্যার এই উৎশৃংখল আচরণকে। সে তাকে কঠোর শাসনে সংযত করে ব্যবহার করছে ইচ্ছামত'। সে বন্যাকে বইয়ে দেবে পতিত অনাবাদী জমির ওপর দিয়ে—মানুষের শান্তির নীড়গুলোকে রক্ষা করবে সযতনে। বৈজ্ঞানিক শক্তিকে ব্যবহার করবে জীবন গঠনে, জীবন ধ্বংসে নয়।

হিমালয়ের অন্তঃস্থলে এখনও জল জমে আছে। সে জল নেমে না যাওয়া পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত জীবনের স্বস্তি নেই। এ সমস্ত ব্যাপক ধ্বংসের অভ্যন্তরে সম্ভাবনার যদি কোন ইংগিত থেকে থাকে, আগামী কাল তার বিচার করবে। আমার বক্তব্য এখানে সমাপ্ত হলো।

চপলা

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

সুদূরের মেঘলোকে কে গো তুমি রূপসী,
চঞ্চল গতি তব বায়ু-পথ বিলসি ;
চিকিমিকি হাসিয়া
দিশি দিশি ছুটিয়া
চলে যাও যেন তুমি সচকিতা হরিণী,
নন্দন-কাননের কে গো প্রিয়া কামিনী।

এই আছ, এই নেই, দূর হ'তে সুদূরে,
শিঞ্জন শুনি তব ঝংকৃত নূপুরে।
চঞ্চলা চপলা,
প্রিয়-সুখ-উতলা,
আকাশের নিধু বনে কে গো তুমি শ্রীমতী
দিকে দিকে অভিসারে নাই কোন বিরতি।

তম্বী কে গো তুমি চম্পক-বরণী,
রূপলেখা হেরি তব সচকিতা ধরণী ;
আকুলিত কেশপাশ,
শিথিলিত বেশবাস,
সর্পিল গতিপথে সুস্মিত বয়না
শাশ্বত-যৌবনা অয়ি মৃগনয়না।

জীবনের পথে মোর এসো তুমি নামিয়া,
অসীমের পথে তুমি লও মোরে টানিয়া।
তব কর-পরশে,
তব প্রীতি-হরষে,
জীবনের গ্লানিমা যায় যেন ঘুচিয়া,
আর বার ওঠে যেন তোমা সম হাসিয়া।



নীড়ের পাখি

কানাই বসু

আই-এ পরীক্ষা হয়ে গেলে অনসূয়া তার বাবার সঙ্গে দেশ ভ্রমণে বেরোলো। এ তার বহু দিনের সাধ-পূরণ এবং তার বাবার প্রতিশ্রুতি রক্ষা।

যাত্রা করবার পূর্বে অনসূয়ার মা বল্লেন—"আদুরে মেয়েকে নিয়ে তো চল্লে হিল্লী দিল্লী ঘুরতে, একটু চোখ কান খুলে ঘুরো। মিথ্যে মিথ্যে টাকার শ্রাদ্ধ না করে ভালো পাত্তর একটা দেখতে চেষ্টা কোরো। শুনেছি দিল্লী সিমলেতে অনেক ভালো ছেলে আছে, বুঝলে?"

কৃষ্ণনাথ বল্লেন—"তা হোলে কী বলিস অনু, খবর টবর নেব নাকি?"

অনসূয়া বল্লে—"তাই বই কি! আমি বলে বি-এ পড়বো, বি-এ পাশ করে এম-এ পড়বো। খবরদার বলছি বাবা, তুমি যদি ঐ সব নিয়ে একটা কথা কারও সঙ্গে কও, কি একটু চিন্তাও কর এ নিয়ে, তা হলে আমি আর বাড়ীই ফিরবো না।"

মা বল্লেন—"বাড়ীই ফিরবো না! আহা, বড়ো আদিখ্যেতা! বাড়ী ফিরবে না তো কোথায় যাবে শুনি?"

"যাবার ভাবনা? সিমলে সহরে তো কেবল পাহাড় কেটে রাস্তা, এক পা অসাবধান হলে, ব্যস্ একেবারে অতল খাদ। ইচ্ছে থাকলে অসাবধান হতে কতক্ষণ?"

মা বকতে বকতে চলে গেলেন—"বি-এ এম-এ পাশ করে কী চারটে হাত বেরুবে? বুড়ো বুড়ো মেয়ে ধিঙ্গী হয়ে নেচে বেড়ানো আমি দু চক্ষে দেখতে পারি না।"

কৃষ্ণনাথের নিজেরও মত মেয়েরা উচ্চ শিক্ষা লাভ করে। সুতরাং পিতাপুত্রীতে আশু-বিবাহের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ এক মত।

প্রথম যাত্রা শেষ হোলো একেবারে সিমলায়। দিল্লী আগ্রা মথুরা বৃন্দাবন হরিদ্বার ইত্যাদি ফিরবার পথে সারবেন। উঠলেন এক বিলাতী হোটেলে। সিমলার বাঙালী সমাজে কৃষ্ণনাথের বন্ধু ও পরিচিত কয়েকজন আছেন। তিনি মিশুক লোক, অচিরে সর্বত্র আলাপ জমে উঠলো। অনসূয়ার সুশ্রী চেহারা ও সুকণ্ঠ সঙ্গীত তাকেও জনপ্রিয় করে তুলেছে। হোটেলের বিচিত্র সমাজ তো আছেই, তা ছাড়া মেজর চৌধুরীর বাড়ীতে হাই-টি (High Tea), কর্ণেল বসুর বাড়ীতে লাঞ্চ, মিস্টার সেনের বাড়ীতে লীলা কীর্তন, জাস্টিস রাওয়ের বাড়ীতে ডিনার, গভর্ণরের য়্যাট্ হোম (At Home), সিসিল হোটেলের ফ্যান্সি বল্ (Fancy Ball), ক্যারিগণানোতে পিক্‌নিক্, কালীবাড়ীতে পূর্ণিমার সিন্নি, রবিচক্রের জয়ন্তী—সকালে, বিকালে, সন্ধ্যায়, রাত্রিতে, দিনের পর দিন, হৈ হৈ করে কেটে যেতে লাগলো।

দিন দশেক কেটে গেছে। সন্ধ্যায় ওয়েস্টার্ণ কম্যাণ্ডের ট্যাটু (Tattoo) দেখে ফিরে কৃষ্ণনাথ আরাম কেদারায় শুয়ে চুরুট ধরিয়েছেন। অনসূয়া পাশের ঘরে বস্ত্র পরিবর্তন করছে। কৃষ্ণনাথ বল্লেন—"কাল খুব ভোরে উঠতে হবে অনু। মেজর চৌধুরীর গাড়ী আসবে ছ'টার সময়। গাড়ী তো থাকবে সেই কার্টরোডে, এতখানি নেমে যাওয়া, সাড়ে পাঁচটার মধ্যে রেডি না হলে সকলের দেরী হয়ে যাবে আমাদের জন্যে। ও-ঘর থেকে অনসূয়া বল্লে—"যাবো না বাবা।"

"যাবি না? কেন, কী হয়েছে? শরীর কি—"

"শরীর খুব ভালো আছে। এমনিই যাবো না।"

"উঁহুঃ, এমনি হতেই পারে না। কারণ আছে কিছু। শাড়ীগুলো সবই বুঝি সকলে দেখে ফেলেছে? ইয়ারিং, ব্যাঙ্গল্ সবগুলোই বুঝি পুরোনো হয়ে গেছে, না?"

মহার্ঘ্য বেশভূষা ছেড়ে সাদা শান্তিপুরে শাড়ী ও হাতঢাকা জামা পরে অনসূয়া এসে আরাম-কেদারার পিছনে দাঁড়ালো। বাপের সাদা মাথার পাতলা চুলের মধ্য দিয়ে আঙুল চালাতে চালাতে বল্লে—"তুমি যতই ক্ষেপাতে চেষ্টা কর বাবা, আমি

ক্ষেপবো না। আই ডোণ্ট্ কেয়ার ফর নতুন শাড়ী, কিন্তু আমি কাল যাব না।"

"শাড়ীর অভাব যদি না হয়ে থাকে, তবে যাবি না কেন? অত করে বলেছে, সারাদিনের আউটিং, মোটর ট্রিপ্—খুব ভালো লাগবে।"

"না, আমার ভালো লাগছে না আর।"

এর পরের কথার জন্য কৃষ্ণনাথ অপেক্ষা করতে লাগলেন। অনসূয়া মুহূর্তকাল নীরব থেকে বল্লে—"ভালো লাগে না হৈ হৈ করে বেড়াতে—"

"ধিঙ্গীর মতো নেচে বেড়াতে বল্! তোর মা যা বলে—"

"সত্যি বাবা, মা'র মতন দেখতে পাই না কাকেও। এত নেমন্তন্ন খাচ্ছি, নিন্দে করছি না, কিন্তু বাবা, মা কেমন হাতায় কোরে পরিবেশন করে, আর সকড়ি বাঁ হাতের মুঠি উল্টে মাথায় কাপড় টানতে চেষ্টা করে, কপালের উপর গুঁড়ি গুঁড়ি ঘাম হয়ে চুলের গুচ্ছ আটকে থাকে, কী সুন্দর দেখতে লাগে বল?"

কৃষ্ণনাথের মুদিত চোখের পাতায় গৃহলক্ষ্মী পত্নীর সেই সেবা-রতা মধুর মূর্ত্তিটি ফুটে উঠ্‌লো। বল্লেন—"তা সত্যি।"

অনসূয়া বল্লে—"মা কেমন বলে—ওটুকু খেয়ে নাও, খুব পারবে। আমার মাথা খা, উঠিস নি।"

কৃষ্ণনাথ চুরুটে লম্বা টান দিয়ে বল্লেন—"কিন্তু তোর মা তো রবীন্দ্রনাথের গান গায় না, গীটার বাজায় না, তাই রাতদিন রান্না করে আর—

মাতৃনিন্দা সইলো না মেয়ের। বল্লে—"কক্ষনো নয়, মাকে তোমরা গান বাজনা শেখাও নি কেন? সেতো তোমাদের দোষ। কিন্তু গান বাজনা নাচ থিয়েটার সব করলেও মা নিশ্চয় রান্না কোরে মাথার দিব্যি দিয়ে খাওয়াতো সকলকে। এ যদি তুমি না জানো, তবে মা'কে তুমি কিছুই চেনো না।"

"তা হয়তো করতো। তা ব'লে সিমলে সহর এমন ফুলের রাজ্য, প্রাকৃতিক দৃশ্য, পর্বতমালা, সাহেবরা পর্যন্ত এর রূপে মুগ্ধ, তোর ভালো লাগলো না?"

"ভালো লাগবে না কেন? খুব ভালো সহর, স্বাস্থ্যকর জায়গা। চমৎকার দৃশ্য, কিন্তু কী জানি বাবা যত বিরাট মহান্ সুন্দর হোক পর্বতমালা, এ দৃশ্য বেশী দিন আমার ভালো লাগে না। ধূ ধূ করবে মাঠ, মাঠের বুক চিরে নদী, সেই নদীর তীরে ছোট্ট একটা বাড়ী, সেই বাড়ীতে আমার মনে হয় সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারি আমি?"

চোখ বুজে শুনছেন কৃষ্ণনাথ। অনসূয়া থামতে বল্লেন—"একলা?"

"একলা কেন? তুমি থাকবে।"

"তারপর? বলে যাও।"

"ভোরবেলা উঠে আমি উনুনে আগুন দেব, কাঠের উনুন ফুঁ দিয়ে দিয়ে ধরাবো, তারপর নদীতে চান কোরে এসে তোমার জন্যে ওভালটিন্ কোরে দেব। দিয়ে রান্না চড়াবো।"

"খালি আমার জন্যে ওভ্যালটিন্! আর তোর চা?"

"না, চা আমি খাবো না তখন। তুমি চা খাও না। মা বলে কেবল নিজের খাবার জন্যে কিছু রান্না করতে নেই মেয়েদের। আমিও ওভ্যালটিন্ খাবো। তারপর রান্না চড়াবো।"

"আর আমি কী করবো? সারাদিন শুয়ে থাকবো পক্ষাঘাতের রোগীর মতো?"

বাপের মাথার চুলে ঈষৎ টান দিয়ে অনসূয়া বল্লে—"অমন কথা বলবে না বোলে দিচ্ছি বাবা। তুমি শুয়ে থাকবে কেন? তুমি চলে যাবে ক্ষেতে চাষবাস দেখতে। মস্ত বড়ো ক্ষেত-খামার তোমার। দুপুর বেলায় ক্ষেত-খামার থেকে ফিরবে, বেলা করে এলে আমি কিন্তু বকবো এসে খবরের কাগজ নিয়ে চুরুট ধরিয়ে বসলে আর তো উঠবে না, আমার হবে জ্বালা! তাড়া দিয়ে দিয়ে তোমাকে চান করতে পাঠাবো। নদীতে যেতে পাবে না, বাড়ীতে তোলা জলে চান করবে বুঝলে?"

"হুঁ, বুঝেছি বই কি। চাষা বলে কি আর অতটুকু বুদ্ধি থাকবে না? কিন্তু চান করার জন্যে তো ভাবনা নেই, খাওয়া-দাওয়াটা কী রকম হবে তাই ভাবছি। মাঠে মাঠে ঘুরে ক্ষিদে যা পেয়েছে—"

"আচ্ছা, আচ্ছা, খেয়ে দেখো না। তোমার সিসিল হোটেলের চেয়ে ঢের ঢের ভালো হবে। অনেক রকম তরকারি রাঁধবো, আদা দিয়ে পলতার সুক্তো, হিং দিয়ে কড়াইয়ের ডাল, লাউয়ের ঘণ্ট বড়ী দিয়ে, তারপর মাছের

ঝোল, পোস্তর অম্বল—কী সুন্দর যে রাঁধবো তখন দেখো, ঠিক মা'র মতন চমৎকার হবে।"

"বেশ। কিন্তু তুমি দু বেলা ঘরের কাজ হাঁড়ী-ঠেলা বাসন-মাজা—"

"না বাবা, বাসন মাজতে পারবো না। বাসন মাজা আর জল তোলা আর বাটনা-বাটার জন্যে একটা ঝি-টি থাকবে, কিন্তু ঘরের কোনও জিনিস তাকে ছুঁতে দেব না। তোমার বিছানা, বইপত্তর, কাপড়জামা, টাকাকড়ি—সব আমার হাতে থাকবে। তুমি কথাটি কইতে পারবে না, বলে দিচ্ছি কিন্তু।"

"তা কইব না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকো। কিন্তু সারাদিন যদি রান্না-বান্না ঘরের কাজেই কেটে গেল, তা হলে লেখাপড়া গানবাজনা সব বৃথা গেল দেখছি। সারাদিনে একটা গানও শুনতে পাবো না, এই হচ্ছে আমার ভাবনা।"

"কী যে বলে বাবা! বৃথা কেন যাবে? রাঁধতে রাঁধতে গান করবো, রুটী বেলতে বেলতে গান করবো, ঘর ঝাঁট দিতে দিতে গান করবো। তা ছাড়া ভোরে গীটার বাজিয়ে একটা গান, সন্ধ্যেয় দুটো, আর রাত্তিরে তোমার শোবার আগে একটা—অন্ততঃ এই চারটে গান তোমাকে প্রত্যহ শোনাবই। আর পড়াশুনো তোমার কাছে দুপুরে করবো, সন্ধ্যের পর ভাত চাপিয়ে এসে করবো, আর তুমি ঘুমোলে আমি বসে বসে—"

হোটেলের ভৃত্য এসে জানালো খানা প্রস্তুত। অনসূয়ার নীড়ের ছবি সম্পূর্ণ হোলো না।

দেশ ভ্রমণ থেকে ফিরে কৃষ্ণনাথ কন্যার জন্যে পাত্র সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন।...

অতি পণ্ডিতদের সকাশে নিবেদন তাঁরা যেন এই গল্পের মধ্যে বায়োলজি না দেখেন। মানুষ পাখি নয়, কেবল ডিমে তা দেবার জন্যেই বাসা বাঁধে না! পিতা হোক, স্বামী হোক, পুত্রকন্যা হোক, সকলেই নীড় বাঁধবার উপলক্ষ মাত্র। লক্ষ্য একমাত্র নীড়।

মেয়েদের কথা

পরিচালিকা—কল্যাণবাদিনী

লোক-সঙ্গীতে নারী-নৃত্যের গান

বেলা দে

সনাতন-হিন্দুপ্রথা অথবা ভারতীয় সভ্যতার বিরুদ্ধ বলে অনেকে হয় তো আমার প্রবন্ধের নামকরণটীকে আশ্চর্য্য বলে মনে করবেন। অর্থাৎ লোকসঙ্গীতে পল্লীর মেয়েরা আবার নৃত্যের সন্ধান পেলেন কোথা থেকে? কিন্তু অনেকেই হয় তো জানেন যে, বাংলা দেশে একসময়ে নৃত্যের প্রথা—কি পুরুষ কি নারী উভয়ের মধ্যে সামাজিক ও ধর্মজীবনে অতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এমন কি প্রাচীনকালে মেয়েদের নৃত্য বা নাচ ছিল কতকটা দৈনন্দিন কাজের মতই। তখন পূজা-পার্বণে, সন্ধ্যা-আরতিতেও ছিল নাচ। পুষ্পচয়নে, প্রতি উৎসবে, ঋতু বন্দনায়, বিবাহে যে কোনো আনন্দ-অনুষ্ঠানে নৃত্য ছিল অপরিহার্য্য অঙ্গ।

প্রাচীন সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে নারীদের নৃত্য-গীতের অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রাচীন চিত্র, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি শিল্পকলার নিদর্শনগুলিতেও নারীর নৃত্যপরা-ভঙ্গী অতীতের সাক্ষ্য হয়ে আছে। অজন্তার গুহা-গাত্রের চিত্রাবলীতে নারীর মনোরম নৃত্য-ভঙ্গীমার আনন্দোচ্ছল ছন্দ কি রূপরেখায় অনবদ্য হয়ে ফুটে ওঠেনি?

ব্রতনৃত্য, বরণনৃত্য, বিবাহের নৃত্য তো ছিল তরুণী, এমন কি বর্ষীয়সী মহিলাদেরই ব্যাপার। মনের আনন্দ-ঘনরূপকে তাঁরা সুঠাম দেহভঙ্গীর ভিতর দিয়ে ছন্দায়িত করে তুলতেন। এই সুললিত দেহ-ছন্দে মূর্ত্ত হয়ে উঠত উৎসব। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, ইংরাজি শিক্ষার পূর্ব্বে এবং ইংরাজি শিক্ষা প্রচলনের পরেও যাঁরা ইংরাজি শিক্ষা পাননি, তাঁরাই এই সব উৎসব-নৃত্য প্রাণময় করে তুলতেন। কিন্তু তাঁরা ইংরেজি শিক্ষিতা আধুনিকা ছিলেন না। কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে ইংরাজি শিক্ষার ফলে যখন সমাজ প্রগতিশীল হয়েছে বলা হয়ে থাকে, নৃত্য সম্বন্ধে বিরূপতা তখনই উঠেছে উগ্র হয়ে।

যে মেয়েটী তুলসীতলায় বা দেবালয়ে ফুলের ডালা বা সন্ধ্যাদীপ নিয়ে প্রবেশ করে, সে যদি নৃত্যের ছন্দে আরতি করে বা প্রণতি নিবেদন করে, তা কি অশোভন অথবা সৌন্দর্য্য ও শুচিতার পরিপন্থী? বকুল, অশোক, আমের মুকুল যখন তাদের শাখা প্রশাখা এবং সৌরভ ও সৌন্দর্য্য নিয়ে প্রকৃতির কোলে দেখা দেয়, তখন বিশ্বে বসন্ত প্রকৃতিকে নৃত্যে আবাহন বা অভিনন্দিত করা কি সুশোভন ও মধুর বলে হয় না? তাই তো পৌরাণিক কাহিনী সুললিত নৃত্যের ছন্দে, লীলায়িত মাধুর্য্যে আজো আমাদের মনে কি অনির্ব্বচনীয় ঝঙ্কারই না তোলে! লক্ষ্য করে থাকবেন আমাদের দেশে বিবাহের রাত্রে যে সাতপাকের নিয়ম আছে, বিবাহ রাত্রে সেই সময় স্ত্রী-আচারে সাত জন এয়োস্ত্রী শ্রী, বরণডালা, মঙ্গলহাঁড়ি, চিতের কাঠি প্রভৃতি সাত রকম জিনিষ নিয়ে উলুধ্বনি সহকারে সাত বার বর ও কনেকে প্রদক্ষিণ করে থাকেন। আগেকার দিনে এই সময় মেয়েরা নানা রকম ছড়া গান করতেন—আবার "জলসহার" গান ও নৃত্য ছিল সেদিনের বড় উৎসব—

"সই লো সই মকর গঙ্গাজল
আজ হবে কামিনীর বিয়ে
সইতে যাব জল।
উলু দিয়ে শাঁখ বাজায়ে
বরণডালা মাথায় লয়ে
জলের ঝাঁঝরি হাতে করে
জল সইতে চল।"

আবার বিয়ের দিন আরো গান আছে—

"সবে মিলি যাব মোরা, যমুনা পুলিনে ত্বরা
কাঁখে নেব হীরার কলসী
শাড়ী পরব কিরণশশী, জল ভরিয়া গৃহে আসি
স্নান করাব রামধনে।"

পূর্ব্ববঙ্গে বিবাহের দিন 'সোহাগ মাগা' অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়, অবশ্য পশ্চিমবঙ্গেও বিবাহের দিন অতি প্রত্যুষে এই ধরণের সামান্য অনুষ্ঠানও অনেক জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়। এই অনুষ্ঠানে মেয়েরা শাড়ীর আঁচল সামনে বা পিছনের দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে জা বা ননদ এই ধরণের সম্পর্কীয়াদের কোমরে একটী কলসী বা কুলো বহন করে, আঁচল লুটাতে লুটাতে প্রতিবেশিদের বাড়ীতে গিয়ে 'সোহাগ' মেগে নিয়ে কন্যার মা কুলাটী মাথায় নিয়ে নীরবে আপনার বাড়ী চলে এসে কন্যার মাথায় এটা স্পর্শ করেন এবং সঙ্গী সাথীরা এই সময় নৃত্যের তালে নাচ ও গান করে যেমন—

"শচী লক্ষ্মী সরস্বতী মেনকা সুন্দরী।
রতি তিলোত্তমা রম্ভা রামা বিদ্যাধরী॥
সোহন বেশেতে সাজে নারীগণ যত।
সোহাগ মাগিতে চলে গাইয়া নানা গীত।
সাবিত্রীর কাঁখে কলসী মেনকার মাথায় কুলা।
সোহাগ মাগিতে রাণী দেবপুরে গেলা।
এই মতে চইল্যা যায় প্রতি ঘর ঘর
তারপর চইল্যা যায় আপনার বাসর
মেনকার মুখের পাণ গৌরীরে দিয়া
গ্রন্থি মোচন করলো কুলা নামাইয়া।"

কাজেই এই সব থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে অতি প্রাচীনকালেও বাংলার নিজস্ব এই সুন্দর স্বাস্থ্যপ্রদ ও আনন্দপ্রদ নৃত্যের প্রথা ছিল। এমন কি মেয়েরা যখন কলসী কাঁখে করে পুকুরের জল তুলতে যেতেন, তখন সেই আসা যাওয়ার পথে সিক্তবসনা পল্লীর মেয়েরা নৃত্যের ভঙ্গীতে গান গাইতে গাইতে বাড়ী আসতেন। অধিকাংশ জায়গায় আজো নানারকম ব্রত উপলক্ষে মেয়েরা প্রকাশ্য-ভাবে অতি সুরুচিপূর্ণ প্রণালীতে নৃত্য করে থাকেন। বিশেষ করে এই সবের সঙ্গে তারা যে গান গেয়ে থাকেন সেগুলি সহজ, সরল কথা, ছন্দ ও সুরের লালিত্যে অতি মূল্যবান লোকসঙ্গীত। ব্রত অথবা পূজা উপলক্ষে যে সব লোকনৃত্য হয়, তার সঙ্গে ঢাক বাজে, আর বিবাহ ইত্যাদি উৎসবে যে সব নৃত্য হয় তার সঙ্গে বাজে ঢোল। পশ্চিম বাংলায় কোনো কোনো গ্রামে এখনো অবিবাহিতা মেয়েদের মধ্যে ইন্দ্রপূজার সময় ভীর্জো-নৃত্য নামে একটী নাচের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। এ ছাড়া বাংলাদেশে নৃত্য-কলার একদিন বিশেষ চর্চ্চা ছিল। দেবদাসীদের নৃত্যভঙ্গী দেখে এক সময় দূরদেশাগত রাজারা পর্য্যন্ত বিমোহিত হতেন। রামচরিতে রমণীদের মনোহর ভূষণে সজ্জিতা হয়ে নৃত্য করার উল্লেখও আছে। নর্ত্তকীদের নূপুরধ্বনি সকলেরই চিত্তবিনোদন করতো। মনসামঙ্গল কাব্যে বেহুলার গল্পে আমরা দেখেছি বেহুলা নাচুনী দেবসভায় গিয়ে নৃত্য করেছিলেন লোক-কবির গান ও এখানে নৃত্যের তালে তাল রাখা ছিল যেমন—

"নৃত্য করে বেউলা রমা ঘন নাড়ে হাত
নৃত্যেরে মোহিত হইল ত্রৈলক্যের নাথ;
কোন গাইনে গান করে তারে ডাক দিয়ে আন
বহিঃদ্বারে করে গান শুনিতে না পারি আমি তান।
লক্ষ কোটি স্বর্গ নর্ত্তকী বস্তু না লাগে ভালো শিবের
বৈকালী দেখিতে নৃত্য এখন শিবের এমনিতর তানে।
বেউলার মন হয় আনন্দিত
নৃত্যেতে মোহিত হলেন মহাদেব।
শিব বলে নর্ত্তকী নৃত্য বন্ধ কর
মানা গুনে যা চাবি তাই দিব বর।"

তা হলেই এই ছড়া গানটী থেকে বুঝা যায় বেহুলা এমন অপূর্ব্ব নৃত্যে মহাদেবকে তুষ্ট করেছিলেন যার জন্য তিনি তাঁকে বর দিয়ে তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন। কাজেই এই সব বিবরণ থেকে অনুমান করা যায় প্রাচীন বাংলায় একদিন প্রকাশ্যেও মেয়েদের নাচতে তখন বাধা ছিল না।

কাব্যে নারী-প্রতিভা

শ্রীমতি নীলিমারাণী চক্রবর্ত্তী বি-এ

আজকালকার সমানাধিকারের যুগে অনেক বিষয়েই নারীজাতির কৃতিত্বে আমরা চমকিত হচ্ছি। কিন্তু এই কৃতিত্বে আমরা বিস্মিত হই কেন? কি কারণে নারী এ ভাবে পিছিয়ে পড়েছিল পুরুষের থেকে? সর্ব্ব-বিষয়েই—বিজ্ঞানে, জ্ঞানে, শিল্পে, সাধনায় সেই প্রাচীন যুগ হতে পুরুষ দেদীপ্যমান, নারী শুধু মাঝে মাঝে এক আধটু আলোর শিখা ছড়িয়েছে,

এবং তা নিয়ে আমরা গর্ব্ব বোধ করি। কাব্যালোচনা—অবসর-বিনোদন ও মনের স্বতস্ফূর্ত্ত আবেগের প্রকাশ। তাতে নারী-শিল্পীর সংখ্যা অতীব অল্প। তাইতেই মনে হয় অবসর ক্ষণে ক্ষণিক বসিয়া কাব্যালোচনা করার মত সময়ের কি অভাব ছিল নারীর? একটানা গৃহকর্ম্ম, সন্তানধারণ ও সন্তানপালন এইতেই কি যেত নিঃশেষ হয়ে তার সব দৈহিক ও মননশক্তি?

বৈদিক সূক্ত হতে মহিলা-ঋষির লিখিত সূক্তের উল্লেখ পাই, তবে তা তুলনায় কম। ঋষি অপালা, গোধা, শশ্বতী, লোপামুদ্রা, বাক্, ঘোষা, বিশ্ববারা, অগস্ত্যভগিনী প্রভৃতি যে সকল ঋক্ রচনা করে গিয়েছেন, তা সুন্দর ও স্বাভাবিক নারীমনের পরিচায়ক। কোথাও পাই সেই মহানের স্তুতি। কোথাও নিজেদের সাধারণ সুখ-দুঃখের কাহিনী জড়িয়ে দেবতার কাছে শুভ যাচ্ঞা, কোথাও বা নর-নারীর চিরন্তন মিলনাকাঙ্ক্ষার কামনা। তবে অম্ভৃ ঋষিকন্যা বাক্ দেবী রচিত সূক্তে পাই এক অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি। শক্তিরূপিনী দেবী আত্মপ্রকাশ করেছেন এই সূক্তে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সব ব্যাপিয়া তিনি সর্ব্বনিয়ন্তা, দ্যুলোকভূলোকব্যাপিনী মহামায়ার আত্মপ্রকাশ যেন—স্বতঃই বিস্ময় জাগে মনে কে এই নারী যিনি নিজেকে বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে একান্তরূপে মিলিয়ে দিয়েছেন? এই নারী ঋষিদের মধ্যে বিশ্ববারা, অপালা ও ঘোষা ছিলেন রোগাক্রান্তা। দেবতার আশীর্ব্বাদে স্বাস্থ্য ফিরে পেয়ে বিশ্ববারা ও ঘোষা পেয়েছেন মনোমত স্বামী ও অপালা পেয়েছিলেন ফিরে স্বামীগৃহ—মনোলিপ্সা পূর্ণ হওয়ায় গেয়েছেন তাঁরা স্তুতি গান। পিতৃগৃহে কাটত দিন তাই ছিল স্বামীপুত্র নিয়ে একটী পূর্ণ সংসারের আকাঙ্ক্ষা, আর তারি পূরণ মানসে স্তোত্রাকারে দেবতার স্তুতি। অগস্ত্য-পত্নী লোপামুদ্রা যে স্বামীর সান্নিধ্য কামনা করে স্তবক রচেছেন, তাতেও দেখতে পাই একটি অনুরক্ত স্বামী ও পুত্র সহিত গৃহাশ্রমের কামনা। শাশ্বতী নারীর রূপ ফুটে উঠেছে তাঁদের রচিত কাব্যধারায়। আত্রেয়ী, পার্শী, মদালসা এইরূপ দু একটি ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছু নারী ব্যতিরেকে অধিক সংখ্যাই করেছেন দেবতার স্তুতি অভিলাষ পূরণ মানসে। ব্রহ্মজ্ঞানী মদালসা গৃহস্থাশ্রমে বাস করেও সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। আপন পুত্রদের দিয়েছেন তিনি ব্রহ্মজ্ঞান ও দিয়েছেন সন্ন্যাসে দীক্ষা, আবার স্বামীর অনুরোধে চতুর্থ পুত্রকে আদর্শ রাজা ও গৃহস্থ—এ অপরূপ স্বাতন্ত্র্য সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না। যে যুগে পুরুষের বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল, আর তাই ছিল সপত্নীদের মধ্যে প্রাধান্য লাভের ইচ্ছা। তাই ইন্দ্রাণী সূক্তে, স্বামীর প্রেমে একাধিপত্য লাভের আকাঙ্ক্ষা, সপত্নীভীতি ও বিদ্বেষ কিছু পরিমাণে প্রকট হয়ে উঠেছে। এতে দেখি এর তীব্র ওষধি প্রশস্তি, যা দিয়ে নারী তার প্রেমাস্পদকে একমাত্র তারই প্রতি আকর্ষণ করে রাখতে পারবে। "গাভী যেমন বৎসের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণে, জল যেমন, দুর্নিবার আকর্ষণে সাগরাভিমুখেই ধাবিত হয় সেইরূপ স্বামীর মন যেন শুধু তাঁর প্রতিই স্নেহে প্রেমে আপ্লুত হয়ে থাকে। দেবী শচী সঙ্কলিত সূক্তের ঐ একই মনোবৃত্তির পরিচয়। সব সপত্নীদের পরাস্ত করে, বীর স্বামীর প্রেমিকারূপে ও পরিবারবর্গের কর্ত্রীরূপে সৌভাগ্যলাভে গর্ব্বিতা নারীর তৃপ্ত উক্তি। অপ্সরা উর্ব্বশীকৃত সাতটি ঋক্-এ বর্ণিত হয়েছে, পুরুরবা ও উর্ব্বশীর অপূর্ব্ব প্রেম-গীতি। আর যমীলিখিত সূক্তে অপূর্ব্ব জ্ঞানের 'আলো'—মৃত্যুর পরবর্তী যদি কিছু থাকে তারই সম্বন্ধে গভীর তথ্যালোচনা।

পরবর্ত্তীকালে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় মহিলা-কবিদের কবিতায় নর-নারীর প্রেমকাহিনী মধুর রসে পরিপূর্ণ। ইঁহাদের মধ্যে শীলা, ভট্টারিকা, মদালসা, ইন্দুলেখা, পদ্মাবতী, অনুলক্ষ্মী, বিজ্জকা, মারুলা ইত্যাদির লিখিত কবিতা হতে নারীমনের ভাবরস বেশ উপভোগ্য। বিজ্জকা লিখিত একটি কবিতাতে রবীন্দ্রনাথের 'অভিমান' কবিতার ভাব পাই। আর পাই ভাবক দেবী লিখিত আর এক স্তবক হতে—"যৌবনের সে প্রেমলীলা এখন মুছে গেছে মন হতে। এখন যে নারী শুধুই গৃহিণী। সন্তানের জননী। আঁখিতে আর নাই সে অনুরাগভাব—আছে পরিণত বয়সের সংসারধর্ম্ম শুধু"। বয়স যেন নিঃশেষ করে দিয়েছে সেই চঞ্চলতা চপলতা, খেদ আছে তাই মনে।

বৌদ্ধ যুগে সুজাতা কাশীরাজকন্যা মালিনী ও পটাচারা কৃত বৌদ্ধগাথা মনোরম। বিদুষী পতিতা নারী বুদ্ধ কৃপাভাগিনী অম্বপালী কৃত অনেক সুন্দর সুন্দর গান বৌদ্ধ সাহিত্য অলঙ্কৃত করেছে। যৌবনে অপরূপ রূপবতী অম্বপালী মানবদেহে অবশ্যম্ভাবী জরার-প্রভাব কি চমৎকার উদার দৃষ্টি দিয়ে তাঁর কাব্যে প্রকাশ করেছেন।

মধ্যযুগে দক্ষিণী মহিলা কবি মাথুলক্ষ্মী, রাজস্থানের পুণ্যবতী নারী দয়াবাঈ ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে, মুঞ্জকেশী, রাণী রূপ-কুমারী ও রামপ্রিয়ার ভক্তিরসাশ্রিত সঙ্গীতাবলী মধুর ও উচ্চ ভাবসম্পন্ন। তারপরে আসেন সাধিকাশ্রেষ্ঠা মীরাবাঈ—যিনি ভাব ও প্রেমধারায় নদের নিমাই এর মতই—ভগবৎপ্রেমে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন দেশ, জগৎ হয়েছিল মুগ্ধ। মানুষের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য অজানাকে সে জানতে চায়, অনুভব করতে চায় তার প্রাণ মন দিয়ে—এতে নেই কোন স্বার্থসিদ্ধি। এ শুধু পরম প্রকৃতিকে জানাবে আনন্দেই মেতে বেড়ান। ভগবৎ প্রেমে পাগলিনী রাজরাণী মীরা তাই সব কিছু ভুলে পথে বেরিয়ে পড়েছেন আপন মনের মাধুরী মিশায়ে স্বরচিত কৃষ্ণসঙ্গীতের ঢেউ তুলে। কাব্য ও অধ্যাত্ম জগতে মীরার দান অতুলনীয়।

'পরবর্ত্তী যুগে বাংলার মেয়ে সরোজিনী, মানকুমারী বসু,' কামিনী রায় ইত্যাদি তাঁদের সহজ কবিতায় মুগ্ধ করেছেন সুধী-চিত্ত।

'গ্র্যাজুয়েট মেয়ে'

(প্রতিবাদ)

শ্রীমতী রুবি ঘোষ, এম, এ, সরস্বতী

গত চৈত্র-সংখ্যায় 'মেয়েদের কথা' বিভাগে কুমারী অনামিকা রায়, সাহিত্যভারতী গ্র্যাজুয়েট মেয়েদের বিবাহে বিড়ম্বনা সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।—ব্যক্তিগত

অনুভূতি প্রকাশের স্বাধীনতা প্রত্যেকের আছে—এবং অপরের ব্যক্তিগত অনুভূতি বা মতামতে হস্তক্ষেপ করাও সমীচীন নয়—তবে অপরের মতামতের সঙ্গে নিজের মতামত মিলিয়ে মতান্তর কোথায় দেখ্‌তে ক্ষতি কি?

লেখিকা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারের কন্যাদায়-সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। বর্তমান যুগের অর্থনৈতিক সংকটে বাস্তবিকই বহু পরিবারে অনূঢ়া কন্যার বিবাহ-দান সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে। বহু ক্ষেত্রে সর্বগুণান্বিতা সুশ্রী কন্যাকেও সঙ্গতিহীন পিতা অর্থাভাবে সৎ-পাত্রস্থ করতে সমর্থ হন না। এই যে সমস্যা—এ তো শুধু বি-এ, এম্‌-এ ডিগ্রীধারিণীদের ভাগ্যাকাশের রাহু নয়—এ তো শিক্ষিতা অশিক্ষিতা নির্বিচারে সমস্ত সঙ্গতিহীনাদেরই মিলিত সমস্যা—অর্থগৃধ্নু পাত্রপক্ষের দাবীর কাছে অর্থহীন কন্যা-পক্ষের হৃদয়বিদারক ব্যর্থতা। এই অর্থপিপাসুর কাছে ডিগ্রীর মূল্য নেই—নিরক্ষরতার গ্লানি নেই—সৌন্দর্যের প্রশংসা নেই—আছে শুধু বিশ্বগ্রাসী লোলুপ ক্ষুধা। সুতরাং এই রূপের মোহের কাছে কুশ্রী, সুশ্রী, শিক্ষিতা, অশিক্ষিতার প্রশ্ন অবান্তর।

লেখিকা প্রথমেই ব'লেছেন, "সময়ে যাঁরা মেয়ের বিয়ে দিতে পারেন নি—তাঁরা সাধ্যে সঙ্কুলান হলে মেয়েকে পড়িয়ে যাচ্ছেন।"—বর্তমান যুগে শিক্ষার প্রসারে ধনীদরিদ্র সব ঘরের মেয়েরাই সামর্থ্য অনুযায়ী লেখাপড়া শিখ্‌ছেন। শিক্ষা মানুষের জীবনে অন্ধকার আনে না—আলোই এনে দেয়।—ডিগ্রী গ্রহণের' পর মেয়েদের শ্রী থাকে না—এ কি সত্যি? নিষ্ক্রীয় দেহ মন নিয়ে ঘরে বসে বিবাহের চিন্তাতেই কি রূপ লাবণ্য বজায় থাকে? নারী জীবনের রূপ-যৌবন, শ্রী স্বাস্থ্য না দিলে কি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বাক্ষর-নামা দেন না?—প্রকৃত শিক্ষা নারীর শ্রীকে আরও প্রদীপ্ত ক'রে তোলে ব'লেই আমার ধারণা।

শিক্ষিতা মেয়েদের অবিবাহিতা অবস্থায় করণীয় বহু কাজ থাকে। কিন্তু যাঁরা অশিক্ষিতা, অথচ অর্থাভাবে বিয়ে হয় নি—তাঁদের অবস্থা তো আরও সহানুভূতির উদ্রেক করে।

লেখিকা ব'লেছেন, যাঁরা এম্‌-এ, পাশ তাঁরা গ্র্যাজুয়েট মেয়ের মত শিক্ষয়িত্রী হ'তে অমর্য্যাদা বোধ করেন,—"একেবারে ট্রাজিক অবস্থা।—' কিন্তু লেখিকার সঙ্গে আমি এ ক্ষেত্রে একমত হ'তে পারছি না। আজ-কাল বি-এ, ও এম্‌-এ ছাত্রীর সংখ্যাধিক্যে উভয়ের মানদণ্ডে এমন কিছু পার্থক্য থাকে না যা'তে এম্‌-এ, ডিগ্রীধারিণীরা শিক্ষয়িত্রী পদ গ্রহণে অসম্মান বোধ করবেন।—যদিই বা এই আত্মসচেতন মনোবৃত্তি কারও থাকে—তা' থাকা বাঞ্ছনীয় ব'লে আমি মনে করি না।

লেখিকা নিজের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা তুলে ধ'রেছেন। তাঁর তো অভাব কিছুরই ছিল না। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বরপুত্রী হ'য়েও নিজেকে তিনি নিঃস্ব বোধ করছেন। বাঙ্গলা দেশে ক'জন মেয়ের ভাগ্যে এ সংযোগ হয়? তিনি যদি এমন রিক্ত বোধ করেন, তা হলে যাঁরা অর্থে ও শিক্ষায় বঞ্চিত তাঁদের অবস্থা কি হবে? যা পাই নি তার জন্যে সারা জীবন হা হুতাশ করার চেয়ে যা পেয়েছি তাকে সার্থক ক'রে তোলার চেষ্টাতেই জীবনে কিছুটা তৃপ্তি পাওয়া যায় না কি?

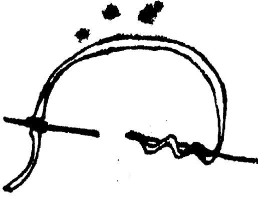
একটি সংসার গড়ে তুলে নীড় বাঁধার আকাঙ্ক্ষা নারীর চিরন্তনের কামনা। কিন্তু এ কথা [illegible] ভুলে চলবে না যে ভারতবর্ষে—বিশেষ ক'রে বাঙ্গলা দেশে—প্রায় অধিকাংশ মেয়েরা বিয়ে করে না—তাদের বিয়ে হয়। কন্যার পিতামাতা বা অভিভাবক অভিভাবিকা সাধ্যমত খোঁজ-খবর করেই কন্যাদান করেন।—লেখিকা ধ'রে নিয়েছেন যে বিবাহিত জীবন নিরবিচ্ছিন্ন সুখ তৃপ্তিতে ভরা হয়।—কিন্তু বিবাহ নারীর জীবনে ভাগ্যের খেলা।—এ অমৃত মন্থনে যদি অমৃত ওঠে তাহলে তা'র চেয়ে আকাঙ্ক্ষণীয় নারীর কাছে কিছু নেই—কিন্তু যদি গরল ওঠে?—তার চেয়ে 'ওল্ড মেইড' হয়ে থাকা ভালো নয় কি?—

তাই বলি যে বিয়ে হয় নি বলে বা মেয়েদের কাজের উপযুক্ত ক্ষেত্র রচিত হয় নি বলে—নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকলে চলবে না। বিশেষ দায় তাদেরই যাঁরা শিক্ষিতা। শিক্ষিতা লেখিকা নৈরাশ্যবাদে নিমজ্জিতা না হয়ে নিজের কৃষ্টি ও শিক্ষার উপযুক্ত ক্ষেত্র রচনা করে নিজেকে প্রসারিত করুন। যাতে অন্য বহু ভাগ্যবিড়ম্বিতা (যাঁদের বিয়ের আশা ক্ষীণ, বা হবেও না কোন দিন) আশায় বুক বাঁধতে পারে ও নিজ নিজ পথ খুঁজে নিতে পারে। আজকের দিনে মেয়েদের নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতেই হবে সমাজের পরিবর্ত্তনের সাথে। কারণ পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে যে মেয়েদের শীঘ্র ও ভাল বিবাহের আশা মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারে ক্রমেই বিলীয়মান হয়ে যাচ্ছে সমাজের বুক থেকে!

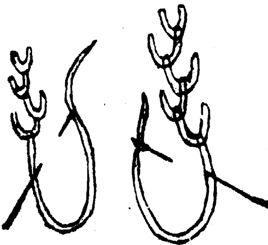
শিশুদের কাপড়ের টুপি তৈরীর প্রণালী

শ্রীমতী কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় বি-এ

এই টুপিটি তৈরী করতে হলে যে কোনো রঙের কাপড় (গরম বা সুতি) ও কিছু রঙিন সুতার প্রয়োজন হবে। প্রথমে ১নং ও ২নং আঁকা নক্সার



ফ্রেঞ্চ নট্ সেলাই

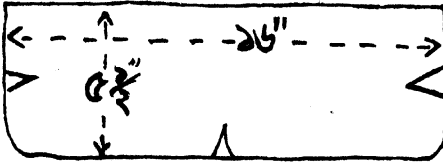


ফেদার সেলাই

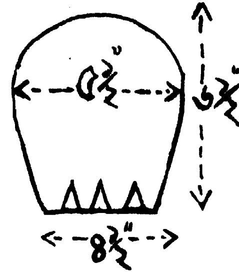
আকৃতি ও আকার অনুযায়ী রঙিন কাপড় কেটে নিন। তার পর প্যাটার্ণগুলি

এই প্যাটার্ণটি টুপির উপর ভাগে হবে। এখানে প্যাটার্ণের একটি দিক দেখা যাচ্ছে

বাকি অর্দ্ধেক অংশের জন্য যখন প্যাটার্ণটির পুনরাবৃত্তি করবেন তখন ৩নং ছবিটি ভাল করে দেখে করবেন।



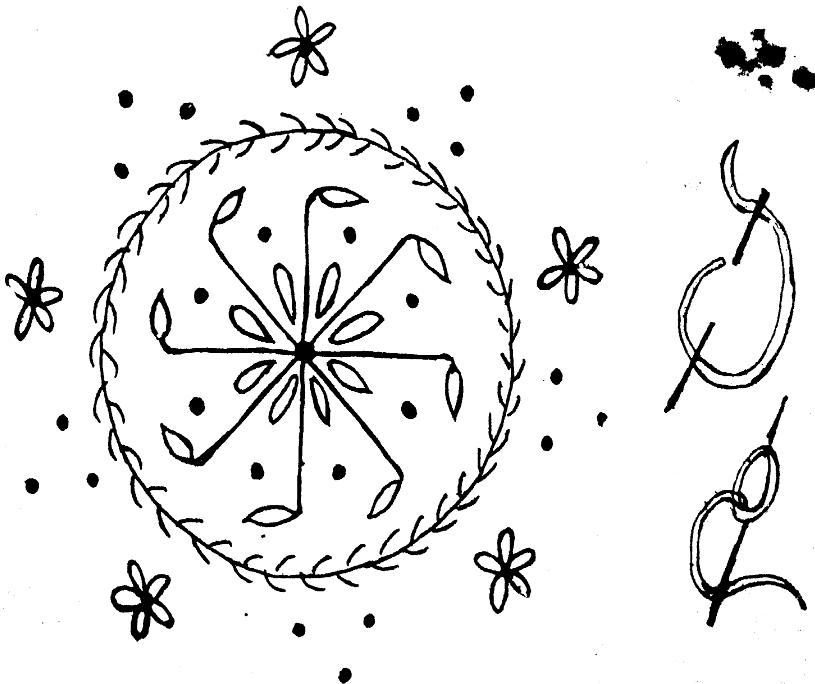
নং১



নং২

কাপড়ের উপর এঁকে নিয়ে রঙিন সুতা দিয়ে এম্ব্রয়ডারী করুন। চেন্, ডাল, ফেদার সেলাই ও ফ্রেঞ্চ নট্ দেবেন। নক্সার নির্দ্দেশ অনুযায়ী আধ ইঞ্চি করে কাপড় ভেতর থেকে

Λ এই রকম চিহ্ন যেখানে যেখানে দেওয়া আছে সেইখানে ভিতর থেকে ½ ইঞ্চি করে কাপড় মুড়বেন



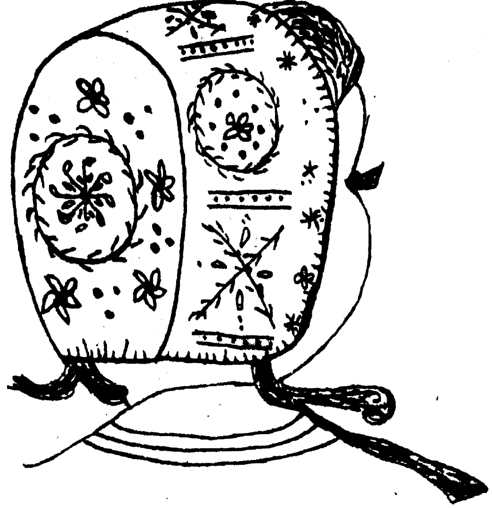
চেন্ সেলাই

এইটি টুপির পিছন দিকের প্যাটার্ণ

মুড়বেন। তার পর উল্টো দিক করে টুপির উপরের দিকটি পিছনের দিকের সহিত আগে পিন দিয়ে আটকে নিয়ে, ওই উল্টো দিকেই সেলাই করে দুটি অংশকে জুড়ে নিন। রঙিন সুতার ডাল সেলাই জোড়ের উপর দিয়ে করুন। টুপির সামনের ও পিছনের দিকের ধারগুলি একটু মুড়ে নিয়ে বোতাম ঘরের সেলাই দিন। ভেতরে সাদা কাপড়ের

লাইনিং দিলে ভাল হয়। টুপির রঙের ছুটি সার্টিনের ফিতে তলার দিকে জুড়ে দিন। টুপিটি তৈরী করবার সময় ছবিগুলি ভাল করে পরীক্ষা করে করলে তৈরী করা খুবই সহজ হবে।

নং৩



টুপিটি তৈরী করবার সময় এই ছবিটি ভাল করে পরীক্ষা করবেন

ভ্যানিটী ব্যাগ

শান্তিরাণী মজুমদার

খানিকটা 'চট' বা 'ছালা' নিয়ে তাকে অর্দ্ধ গোলাকৃতি করে দুটো খণ্ড কেটে নিন। এই ছালার উপর নীচ থেকে উপর পর্য্যন্ত লম্বা লম্বা বরফীর মত এঁকে নিন্। উল দিয়ে এই আঁকার উপর চেনষ্টীচ্ করে দিন। রং মিলিয়ে প্রতি লাইন এক এক রং দিয়ে চেনষ্টীচ করে দিন। এমন গায়ে গায়ে করবেন যেন ছালা না দেখা যায় ও বরফীগুলি ভরে যায়, বরফীর নীচের দিকটাও যে ভাবে খালি যাবে চেনষ্টীচ্ ঘুরিয়ে ভরে দেবেন ও উপরের খালি জায়গাগুলিও ঐ ভাবে হবে। দুটো খণ্ডই এই ভাবে উল দিয়ে সেলাইর পর রঙ্গিন কাপড় দিয়ে উল্টো পিঠে সেলাই করে দিন। এখন ঐ খণ্ড দুটো সেলাই করে জুড়ে দিন, হ্যাণ্ডাল তৈরীর জন্য নানা রংএর উল নিয়ে বিনুনীর মত লম্বা খানিকটা তৈরী করে দুই কোণে জুড়ে দিন, মুখে টিপ-বোতাম লাগিয়ে দিলে আর কোন জিনিষ পড়ে যাবে না।

ব্যাগের যে নমুনাটী দিলাম সহজের মধ্যে বেশ সুন্দর হয়। সোয়েটার ইত্যাদি উলের কাজের পর অনেক নানা রংএর উল জমা হয়ে যায়, তা দিয়ে রং মিলিয়ে করলে একটা কাজের জিনিষ তৈরী হয় এবং সূচীশিল্পীদের পছন্দ হলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

মেয়েদের যৌগিক ব্যায়াম

শ্রীলাবণ্য পালিত

ঘরে বসে মেয়েরা যে ভাবে শরীর চর্চ্চা করতে পারেন যোগব্যায়াম তার মধ্যে একটি। অবশ্য যোগব্যায়াম বলতে শুধু সাধারণ ব্যায়াম বুঝলেই হবে না, যোগ ব্যায়ামের নির্দ্দেশ অনুসারে যদি আপনারা ব্যায়াম চর্চ্চা আরম্ভ করেন তা হলে দৈহিক বহু শক্ত রোগের হাতে থেকে রেহাই পেতে পারেন।

এর আগেও আমি আপনাদের কাছে 'যোগাসন' সম্বন্ধে জানিয়েছি, (গত অগ্রহায়ণের ভারতবর্ষ দেখুন) কাজেই আজ আর বেশী কিছু বলতে চাই না। এখন যোগ ব্যায়ামের বহুল প্রচার হওয়ায় বহু ছেলে মেয়েরা যোগ ব্যায়াম অভ্যেস করছেন।

আমাদের মধ্যে অনেকেরই পেটের ব্যামো বেশী; তার মধ্যে বায়ু রোগও আছে, তবে আমি উদগকাশি বায়ুর কথা বলছি না……।

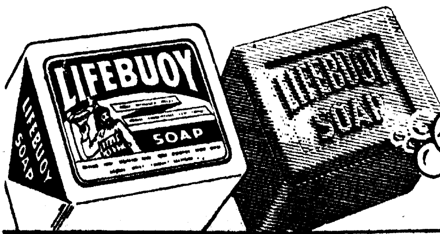




লাইফবয় সাবান

প্রতিদিন ময়লার বীজাণু থেকে আপনাকে রক্ষা করে





ভারতে প্রস্তুত　　L. [illegible] BG

অনেকে সকাল বেলা উঠে অনুভব করেন যে, পেটে বেশ বায়ু আছে এবং তার জন্যে কষ্টও হয় খুব—তা ছাড়া পায়খানা হবে হবে করে হয় না……। এগুলি খুব সহজ রোগ নয়, কারণ এই লক্ষণগুলি কিছুদিন যাবৎ প্রকাশ পাওয়ার পর যে কোন একটা শক্ত ব্যামো এসে পড়ে।

তবে রোগ কথনো নোটিশ না দিয়ে আসে না, যে কোন শক্ত অসুখ হবার আগে কতকগুলি লক্ষণ শরীরে দেখা দেয়……, তখন যদি আমরা না বুঝি বা ইচ্ছে করে অবহেলা করি, অর্থাৎ সময় থাকতে সাবধান না হই তা হ'লে সে রোগ আমাদের পেয়ে বসে, আর সারা জীবন ধরে চলে তার জের……!

পেটে বায়ু হ'লে তা সারাবার উপায় যোগ ব্যায়ামের দ্বারা সম্ভব হয়। পারেন প্রথম অবস্থায়, ততক্ষণ থাকুন। তারপর ঐ পাটি ছড়িয়ে লম্বা করে দিয়ে বাঁ পাকে ঐভাবে মুড়ে দিন, আবার বাঁ পায়ের উরুটি বাঁ দিকের পেটের উপর চেপে ধরুন ; এখন ঐভাবে থাকুন যতক্ষণ পারেন।

তারপর বাঁ পা ছেড়ে দিয়ে লম্বা করে দিন, এইবার শেষকালে দু'টি পা একসঙ্গে মুড়ে উরু দুটি চেপে ধরুন পেটের ওপর। ভাল করে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস চলবে ; এইভাবে যতক্ষণ পারেন থাকুন।

তারপর আগের মত দু'টি পা ছেড়ে দিয়ে লম্বা করে দিন। হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে পূর্ণ বিশ্রাম নিন্।

এই যে বিশ্রামটুকু নেওয়া হয় আসন করার পর, একে বলে—'শবাসন।' অর্থাৎ শব—আসন=শবাসন। শবদেহ যে রকম এলিয়ে পড়ে থাকে



পবন মুক্তাসন

খানিকটা সেই ভাবে পড়ে থাকার মত আর কি, তবে আগেই যা যা বলেছি,—নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ভালভাবে নিতে হবে। মোট কথা শরীরকে বিশ্রাম দিতে হয়। আসনের পর এই বিশ্রাম নেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

'পবন মুক্তাসন' নামে একটি আসন আছে, নিয়মিত এই আসনটি অভ্যেস করলে পেটের মল বেরিয়ে যাবার সুযোগ হয় আর বায়ু, অজীর্ণ প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে সেরে যায়।

পবনমুক্তাসন :—

নিয়ম—

পা দু'টি মাটিতে ছড়িয়ে চীৎ হ'য় শুয়ে পড়ুন।

শবদেহ যে ভাবে পড়ে থাকে সেইভাবে থাকুন ; কেবল নিশ্বাস প্রশ্বাস বইবে, দেহের কোন অংশই শক্ত করে রাখবেন না।

এখন প্রথমে ডান পাকে হাঁটু থেকে মুড়ে এনে তার উরুটি ডানদিকের পেটের ওপর চেপে ধরুন। অপর পা তখন সাধারণ ভাবে লম্বা করা থাকবে। এই অবস্থায় ১৫ সেকেণ্ড গুণে নিন্ মনে মনে, অথবা যতক্ষণ

বায়ু নিষ্কাসন ছাড়াও প্লীহা, লিভার—এ ছাড়া পাকস্থলীর দুর্ব্বলতা-জনিত যে কোন রোগ এই আসনের দ্বারা সারাবার সাহায্য পাওয়া যায়। এ ছাড়া অন্যান্য কতকগুলি ব্যায়ামের সঙ্গে এই আসনটি অভ্যেস করলে মেয়েদের অস্বাভাবিক পেটের চর্ব্বি কমাতেও কিছু কিছু সাহায্য করে।

ভোরবেলা ঘুম থেকে জেগেই বিছানায় শুয়ে শুয়ে পবনমুক্তাসনটি করা চলে। ৩ বার এই আসনটি করতে হয়, কোন কোন বিশেষ রুগীর ক্ষেত্রে আবার ৪ বারও অভ্যেস করতে পারা যায়। অন্য দিকে মন দিয়ে আসন অভ্যেস করবেন না। যতবারই আসন করবেন ততবারই বিশ্রাম নিতে ভুলবেন না।

সুপ্রভা মুখার্জ্জি, অনুপকুমার সুঅভিনয় করিয়াছেন। প্রথমাংশে ভিখারাণী ও মাঃ বিভু জনচিত্তজয়ে সমর্থ হইয়াছে।

*　*　*　*

সম্প্রতি একটি ভারতীয় চলচ্চিত্র-প্রতিনিধিদল রাশিয়া পরিভ্রমণে যাইবেন। উক্ত দলে প্রযোজকদের তরফ হইতে বিমল রায়, বিজয় ভাট, চেতন আনন্দ, এ, কে, আব্বাস ও রাজকাপুর যাইবেন বলিয়া জানা গিয়াছে এবং শিল্পীদের তরফ হইতে দেবানন্দ, নার্গিস, নিম্মি, নলিনীজয়ন্ত ও বনরাজ সাহনীকে প্রতিনিধিদলে মনোনীত করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ক্যামেরাম্যান রাধু কর্ম্মকার ও সঙ্গীত পরিচালক শ্রীসলিলচৌধুরীও যাইবেন বলিয়াশোনা যাইতেছে। নৌশাদের নাম মনোনীত হইয়াছিল কিন্তু তিনি যাইতে পারিবেন না। মীণাকুমারীও উক্ত দলে মনোনীত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার স্বামী তাঁহার সহিত যাইতে পারিবেন না বলিয়া মীণাকুমারীর যাওয়া সম্ভব হইবে না।

*　*　*

ইণ্ডিয়ান মোশান পিকচার্স এ্যাসোসিয়েশন স্থির করিয়াছেন, সিংহল ও গোয়া রেডিও ষ্টেশন হইতে ভারতীয় ফিল্ম সঙ্গীতের কোন রেকর্ড বাজাইতে পারিবেন না। ইতিপূর্ব্বে উক্ত দুইটি রেডিও-ষ্টেশনের সহিত ভারতীয় ফিল্ম প্রযোজকদের সঙ্গীতের রেকর্ড পরিবেশনের যে সর্ত্ত ছিল তাহা বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সম্ভবতঃ গোয়া-প্রবাসী ভারতীয়দের উপর ফরাসী সরকারের সাম্প্রতিক দুর্ব্যবহারের ফলেই ইণ্ডিয়ান মোশান পিকচার্স এসোসিয়েশন এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

*　*　*

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় চলচ্চিত্র বিল গৃহীত হইয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী বিলের বিতর্কের উত্তরে বলেন—গত তিন চার বৎসর ধরিয়া গভর্ণমেন্ট কলিকাতায় নূতন চিত্রগৃহ নির্ম্মাণের অনুমতি দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। চিত্রগৃহের সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয় তজ্জন্য গভর্ণমেণ্টকে আরও অধিক ক্ষমতা গ্রহণের প্রয়োজন হইতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় স্কুলের ছাত্রদের চিত্রপ্রদর্শন সম্পর্কে বলেন—গভর্ণমেণ্টের এইরূপ নির্দ্দেশ আছে যে, অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার পূর্ব্বে কোন চিত্রপ্রদর্শনী হইতে পারিবে না। ইহা ছাড়াও কেন্দ্রীয় আইন অনুসারে কোন ফিল্ম মঞ্জুর করার সময় উহা 'সর্ব্বসাধারণের জন্য' এবং প্রাপ্ত-বয়স্কদের জন্য লিখিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। সিনেমা জ্ঞানের বাহন এবং এই জ্ঞান আরও অধিক পরিমাণে আমাদের মধ্যে আসুক। ইহা উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম যেদিক হইতেই আসুক না কেন, কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। একটি দেশের জনসাধারণ যে ধরণের জ্ঞান আত্মস্থ করিয়া লইতে পারে, তাহাই সেই দেশের জাতীয়তার ভিত্তি।'

*　*　*　*　*



বসুমিত্রের আগতপ্রায় অমৃতলাল বসুর 'চাটুয্যে বাঁড়ুয্যে' কথা-চিত্রের নায়িকা
শ্রীমতী সবিতা চট্টোপাধ্যায়　ফটো—কালীশ মুখোপাধ্যায়

নৃত্যকলায় সঙ্গীতের স্থান

কনকলতা

"গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং, ত্রিভিঃ সঙ্গীতমুচ্যতে"—সংজ্ঞার অর্থ এই যে, "পূর্ণ" সঙ্গীতে, কণ্ঠ, যন্ত্র ও নৃত্য তিন "সঙ্গীতে"র যুগপৎ মিলন অবশ্যম্ভাবী। যে যুগে দেবতারা তাঁদের স্বর্গীয় আবাস অনায়াসেই পরিত্যাগ করতে পারতেন, যে যুগে তাঁরা মর্তধামের নশ্বর মনুষ্যজাতির মধ্যে অবাধে বিচরণ করতেন, যে যুগে তাঁদের লীলা-খেলার ক্ষেত্রই ছিল আমাদের এই সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা মাতৃভূমি, সে যুগে সঙ্গীতের কি নিগূঢ় অর্থ ছিল জানিনে। তবে এটা স্বীকার্য যে, তিনের সমবেত শক্তিতেই সঙ্গীতের সৃষ্টি। যন্ত্র সঙ্গীতকে এবং অনেক স্থলে কণ্ঠ-সঙ্গীতকে লঙ্ঘন করে—আমরা নৃত্য-সঙ্গীতের কল্পনাও করতে পারিনে। ত্রিমূর্তির যেমন ত্রি- মূর্তি অবিচ্ছিন্ন, নৃত্য-সঙ্গীত তেমনই অপর দুই সঙ্গীতের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত।

কথিত আছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রণের আদিদেবতা—দেবাদিদেব ব্রহ্মাই নাট্য বেদের রচয়িতা। দেবরাজ ইন্দ্রের করুণ প্রার্থনায় বিগলিত হয়ে তিনি এই রচনার কার্য করেন। রাজকার্যের গুরুভারে নিষ্পেষিত, শাসন-যন্ত্র পরিচালনার অমানুষিক পরিশ্রমে প্রপীড়িত দেবরাজের দেবদুর্লভ, অনবদ্য কোন এক আনন্দের প্রয়োজন ছিল, যে আনন্দ উপভোগ কালে সমস্ত মানসিক শ্রান্তির অপনোদন হয়। নাট্যবেদের যে খণ্ডে কেবল সঙ্গীত সম্বন্ধেই সংবাদ আছে তাকে গন্ধর্ববেদ বলা হয়। শাস্ত্রকার বলেন যে এই বেদ-জ্ঞান ব্রহ্মা নটরাজের নিকট থেকেই প্রাপ্ত হন। গন্ধর্ববেদ একটী সংকলন বিশেষ। এর শাব্দিক অংশ ঋগ্বেদ, সুরের অংশ সামবেদ, আঙ্গিক অংশ যজুর্বেদ এবং ভাবরসাংশ অথর্ববেদ থেকেই সঙ্কলিত। উত্তরকালে এই অপার্থিব, ললিতকলা মহর্ষি ভরতের প্রচেষ্টায় পৃথিবীতে প্রচারিত হয়। এজন্যই কালিদাস তাঁর বিক্রমোর্বশীতে ভরতের নামকরণ করেছেন—"ঐশ্বরিক নাট্যকার।"

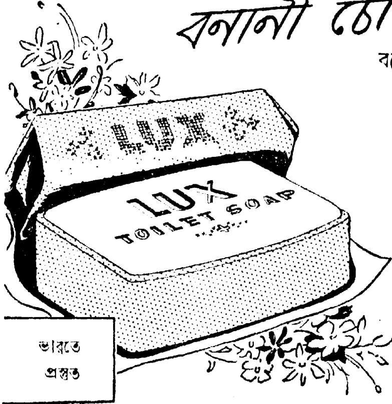


নিউ-থিয়েটার্সের আগতপ্রায় কথা-চিত্র তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাই কমল'-এর নায়িকা নবাগত শ্রীমতী কাবেরী বসু ফটো—কালীশ মুখোপাধ্যায়

দেবরাজ ইন্দ্রের দরবারে যে সব নাটক রূপায়িত হত, তাতে কেবল প্রাকৃতিক দৃশ্যপটের প্রদর্শন থাকত। কিন্তু দক্ষযজ্ঞে, যখন সতী—নিজ পতির মান রক্ষায় দেহত্যাগ করেন এবং যখন কৈলাসপতি শঙ্কর পত্নীর মৃতদেহ স্কন্ধে করে মর্মান্তিক দুঃখ ও দুর্বিসহ ক্রোধের উত্তেজনায় উন্মাদ হয়ে সৃষ্টির সংহার-লীলায় ভৈরবরূপে তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করেন, তখন থেকেই নৃত্য কলাও দৃশ্যকাব্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই সংযোগের ফলে নাট্যকলায় প্রকৃতিগত কোন পরিবর্তন সাধিত না হলেও, এ কলা যে অধিকতর শ্রুতি ও দৃশ্য সুখকর হয়ে ওঠে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নাট্যকলায় সঙ্গীতের স্থান এতদিন ছিল অবিসংবাদিত। এ ঘটনার পর, নৃত্য-কলারও সে স্থানে সমান অধিকার জন্মে গেল। সম্মোহক শক্তিতে সঙ্গীত অপরাজেয় তো ছিলই, রস-পরিবেশক নৃত্যকলার সংহতিতে সে শক্তি সীমাহীন হয়ে উঠল। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ, অপ্সরা মেনকার অপরূপ নৃত্যকুশলতা, যার উন্মাদনায় মোহে রাজর্ষি বিশ্বামিত্রেরও তপোভঙ্গ হয়।

"যেমন সাদা—তেমন বিশুদ্ধ—
লাক্স টয়লেট সাবান—
কি সরের মতো সুগন্ধি ফেনা এর।"

বনানী চৌধুরী বলেন।



ভারতে প্রস্তুত



লাক্স টয়লেট সাবান এত সাদা হবার কারণ কি? কার
ইহা তৈরী ক'রতে কেবল সবচেয়ে বিশুদ্ধ তেল ব্যবহার করা হয়। "এক লাক্স টয়লেট সাবানেই আমার সৌন্দর্য প্রসাধন সম্পূর্ণ হয়" বনানী চৌধুরী বলেন। "এর সরের মতো সক্রিয় ফেনা লোমকূপের ভেতর পর্য্যন্ত গিয়ে পরি-ষ্কার ক'রে আমার ত্বককে রেশমের মতো কোমল, ও নির্ম্মল করে দে'য়। রোজ লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করে আপনার মুখশ্রী সুন্দর রাখুন। এর সুগন্ধও আপনার খুব ভালো লাগবে।"

"...সেইজন্যই ত আমি আরও পরিষ্কার ও ঝরঝরে মুখশ্রীর জন্য লাক্স টয়লেট সাবানের ওপর নির্ভর করি!"

সুখবর!
নতুন
বড় সাইজ
সারা শরীরের সৌন্দর্য্যের জন্য
এখন পাওয়া যাচ্ছে
আজই কিনে দেখুন।

 চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য সাবান 

LTS. 427-X52 BG

নৃত্যকলার দৃষ্টিতে ব্যক্তিগত বা সমাজগত কারণ থাকলেও, নাট্য ও সঙ্গীতকলায় ধর্মগত কারণই অন্তর্নিহিত। আমরা জানি যে, সুসভ্য গ্রীকরা দেবতাদের পূজায় গীত, বাদ্য ও নৃত্যের সম্যক ব্যবহার করতেন। গ্রীকদের ন্যায় হিন্দুদের শিল্পকলাতেও ধর্মগত অভিব্যক্তির প্রাধান্য উপলব্ধি হয়। তবুও বলা চলে যে, হিন্দুরা গ্রীকদের সহিত তুলনায় অধিকতর অন্তর্মুখী। হিন্দুদের চারুকলা কেবল ভাব-ব্যঞ্জনার শুষ্ক অনুকরণ নয়, বা কামচরিতার্থতা নয়, বা ধর্মে অন্ধবিশ্বাসও নয়। হিন্দুদের আদর্শ, পরমানন্দের সাত্ত্বিক উপভোগ—আত্মসংযম ও ভক্তির ভিতর দিয়ে, ধ্যান-মগ্নতার মধ্য দিয়ে, ব্রহ্মানন্দের বিকাশ ও পরমার্থ মোক্ষ প্রাপ্তি। যুগের পরিবর্তনে এই উচ্চ আদর্শ ক্ষুণ্ণ হলেও, এখনও হিন্দু শিল্পকলা এই রসেই পরিপুষ্ট। সাধে কি আর শ্রীরবীন্দ্রনাথ "সত্যং শিবং সুন্দরম্"-এর জয়গান করেছেন!



বাংলা চিত্র জগতের অন্যতম কর্মবীর নিউ থিয়েটার্স লিঃ-এর সর্বপ্রধান শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকার—গোধূলী—সাহেব বিবি গোলাম—রাইকমল—বকুল প্রভৃতি কাহিনীর নব উদ্দীপনায় চিত্ররূপ দিতেছেন

ফটো—কালীশ মুখোপাধ্যায়

নাট্য ও নৃত্যকলায় অভিনয়ই অবলম্বন। এখানে অভিনয়ের অর্থ বিভঙ্গ, অর্থাৎ মুদ্রাদি সহকারে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুষমিত, তরঙ্গায়িত বিন্যাস। কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতের ভাবনা লহরীর, নৃত্যকলার মাধ্যমে, রূপদান। এই রূপদক্ষতায়, নাট্য, নৃত্য ও সঙ্গীত সম্মিলিত। কালিদাসীয় ও তৎপূর্ববর্তী যুগের ইহাই ছিল শিল্পকলার মাপকাঠি। পরবর্তী যুগে, নাট্যকলায় কথোপকথন, গীতিকাব্য, বেশভূষ প্রভৃতির অবতরণের ফলে, নৃত্য ও সঙ্গীতকলার প্রভাবের হ্রাস হতে লাগল। নৃত্য ও সঙ্গীত প্রাচীন ও প্রত্যক্ষ সহযোগ থেকে বঞ্চিত হোল। এতে লাভ হোল যে, এদের দুজনের মধ্যে এক যোগসূত্র স্থাপিত হয়ে, এরা অপ্রত্যাশিত মিলনের সুযোগ পেয়ে গেল।

অভিনয়-দর্পণ বলছেন—পূর্বরঙ্গ অর্থাৎ অবতরণিকার কার্য সম্পন্ন হলে, নর্তকী তার নৃত্য-কৌশল দেখাতে আরম্ভ করবে। তার নৃত্য ও গীত নাটকীয় ঢঙ্গে এবং অঙ্গসঞ্চালন তালের সঙ্গে চলবে। কণ্ঠ-সঙ্গীতের ভাব ও অর্থ—হস্তমুদ্রা, চোখ মুখের ভাব ও রস এবং পদদ্বয়ের ছন্দে প্রকাশ করবে। নর্তকীর দক্ষিণে থাকবে খঞ্জনী, দক্ষিণে ও বামে দুটী মৃদঙ্গ, মধ্যে শ্রুতিকার (আধুনিক তম্বুরা)। দর্পণ আরো বলছেন যে, নর্তকীর শ্রবণেন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়। নাট্যশাস্ত্র, বৌদ্ধজাতক ও অন্যান্য শাস্ত্র, সকলেই এই এক বাণীই শুনিয়েছেন। সে যুগের নর্তকীরা যে সঙ্গীতপটু ছিলেন এর প্রমাণ, যোগিমারা গুহার নাট্যশালার ফ্রেস্কো চিত্র।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, নৃত্যশিল্পের সহিত সঙ্গীতকলার যোগাযোগ আবহমান কাল চলে আসছে এবং নর্তকীরাই এই কালবর্তিকার বাহক হয়ে এ কলাবিদ্যাকে এখনও সঞ্জীবিত রেখেছে। কেবল নিছক আনন্দদানই এর আদর্শ নয়, এর উদ্দেশ্য শিক্ষাদানও। অন্য কোন শারীরবিদ্যায় এরূপ ছন্দোবদ্ধ সুন্দর শরীরের নির্মাণ হয় না। নৃত্যকলায়, কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতের স্থান গৌণ সন্দেহ নেই, কিন্তু সঙ্গীত বিনা অন্য কোন চারুকলা নৃত্যশিল্পকে এরূপ অপরূপ মহিমামণ্ডিত করে দর্শকগণের ধমনীতে উষ্ণ রক্তস্রোত প্রবাহিত করতে পারে না। এক পণ্ডিত লেখক বলেছেন "সঙ্গীতকলা নৃত্যশিল্পের জিয়নকাঠী, তার স্তনদাত্রী জননী। জননী সঙ্গীতকলার স্তনদুগ্ধে প্রতিপালিত নৃত্যরূপী সন্তানের উপর জননীর কতদূর আধিপত্য, অনেকেই সেটা বিচার করে দেখেন না।"



—একুশ—

"Rue outro valor mais alto se alevanta."

ঝড় উঠেছে দূরের সমুদ্রে। ইতিহাসের ঢেউ আছড়ে আছড়ে ভেঙে পড়েছে পশ্চিম সাগরের কূলে কূলে, সিংহলের শৈলতটে, মালদ্বীপের নারিকেল বনে। তারই একটুখানি দোলা এসে লেগেছিল চট্টগ্রামে। কোয়েলহো, সিল্‌ভিরা, অ্যাফন্‌সো, ডি-মেলো। কিন্তু গৌড়বঙ্গ তখনো বহুদূরে—তখনো নিশ্চিন্ত সুপ্তিতে ঘুমিয়ে আছে বাংলার সপ্তগ্রাম—তার পুণ্যভূমিকে প্রদক্ষিণ করে "তিনদিকে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বহে জল।" দুটি-চারটি করে বৈষ্ণবের আনাগোণা শুরু হয়েছে সেখানে, কিন্তু আজো দেশের মানুষ ভক্তিভরে জড়ো হয় বিশালাক্ষীর মন্দিরে—কান পেতে শোনে "যোগীপাল-ভোগীপাল-মহীপালের গীত।" গুরু গোরক্ষনাথের মহিমা-কাহিনীতে তারা এখনো তন্ময়। তার শঙ্খবণিক গন্ধবণিকের ঘরে এখনো লক্ষ্মীর সোনার পদ্মের পাপড়ি ছড়ানো—আজো কোজাগরী রাতে হাতীর দাঁতের পাশা নিয়ে তারা দ্যূতক্রীড়া করে।

কিন্তু সমুদ্রের ঝড় এগিয়ে এল গৌড়-বাংলার বুকের ভেতরে। সপ্তগ্রামে এসে ঘাঁটি আগলালেন ডিয়েগো রেবেলো। বাংলার মাটিতে খ্রীস্টান-শক্তির প্রথম অনুপ্রবেশ। সমুদ্র থেকে কাল-বৈশাখী মেঘ বাংলার আকাশে ঘনিয়ে এল এই প্রথম। বিশালাক্ষীর মন্দিরে যারা গান শুনছিল, তারা একবারও জানল না—যুগান্তের এক সন্ধিলগ্নে পদক্ষেপ করল তারা; যে বণিকের দল গৌড়ী আর পৈষ্টীর নেশায় বিভোর হয়ে নটীর গৃহে সান্ধ্য-অভিসারে চলেছিল, তারা জানল না—শুধু বাংলা দেশ নয়—শুধু ভারতবর্ষ নয়—সমস্ত পূর্ব-পৃথিবীর বাণিজ্যে প্রবেশ করল প্রথম মৃত্যুবীজ!

ক্যাম্বে থেকে আসা দু'খানা আরব-জাহাজ তখন প্রবেশ করতে যাচ্ছিল সপ্তগ্রামের বন্দরে। রেবেলো প্রথমেই কামানের ভয় দেখিয়ে বন্দর ছাড়তে বাধ্য করলেন তাদের। পূর্ব-পৃথিবী থেকে আরব-বাণিজ্য একেবারে মুছে যাওয়ার সেই বুঝি ইতিহাসের ইঙ্গিত!

জাহাজের মাথায় দাঁড়িয়ে রেবেলো দেখতে লাগলেন—ত্রস্ত গতিতে সরস্বতীর জল কেটে আরব জাহাজ দুটো পালিয়ে যাচ্ছে সম্মুখ থেকে। মাথার ওপর তাকিয়ে দেখলেন নদীর স্নিগ্ধ সজল হাওয়ায় ক্রুশ-চিহ্নিত পতাকা বিজয়-গর্বে ফর্ ফর্ করে উড়ছে। দেউল-মন্দির-প্রাসাদে ছাওয়া সপ্তগ্রামের ঘাটে ঘাটে কতগুলো খর্বাকার মানুষের বিহ্বল দৃষ্টি! মুহূর্তে রেবেলোর মনে হল যেন এই পতাকাকে অভিনন্দন জানানোর জন্যেই তারা ভক্তিভরে সমবেত হয়েছে এখানে।

সৈনিক কবি ক্যামোয়েনস্-এর 'লুসিয়াদাদ' তাঁর মনে পড়ল।

"Cesse tude o que Musa antigue Canta,
Rue outro valor mais alto se alevanta!"

'হে স্বর্গের গীতকণ্ঠ, থামাও তোমার অতীতের গান; সৃষ্টি-সাগরের তীরে এবার উজ্জ্বলতর এক নক্ষত্রের আবির্ভাব ঘটেছে।' আর সেই নক্ষত্র?

মাতা মেরীর জয় হোক!

লিসবোঁয়ার জয় হোক!

সেই মুহূর্তেই রেবেলোর কাছে সংবাদ এল—গৌড়ের সুলতান মামুদ শা তাঁকে সসম্মানে আহ্বান জানিয়েছেন।

* * *

জর্জ আলফোকোরাদোকে গৌড়ে পাঠিয়ে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করছিলেন মেনেজেস। কিন্তু ধৈর্য্য তাঁর শেষ সীমায় পৌচেছে। আলফোকোরাদোর কী হয়েছে কে জানে। বিশ্বাস নেই এই মুরদের—এই হেঁদুরদের মতলব বোঝবার উপায় নেই। কে জানে গৌড়ের সুলতান তাকেও বন্দী করে রেখেছে কিনা!

কর্ণফুলীর জলে অবিশ্রাম জোয়ার-ভাঁটার তরঙ্গলীলা। যেন কোথাও কিছু হয় নি—এমনি স্বাভাবিক নিয়মেই বয়ে

যায় দিনের পর দিন—রাতের পর রাত। নিস্পৃহ নির্বিকার ভাবেই বন্দরের মানুষগুলো সুখ-দুঃখ জন্ম-মৃত্যুর প্রহর গোণে! নবাবের কর্মচারী—বন্দরের গুয়াজিল চোখের সামনেই ঘুরে বেড়ায়—ঠোঁটে তাদের চাপা ব্যঙ্গের হাসিই যেন দেখতে পান মেনেজেস্!

আর সহ্য হয় না। মাথার মধ্যে রক্তের হিংস্র তরঙ্গ দুলে ওঠে মেনেজেসের। গৌড়ে চরমপত্র পাঠিয়েছেন তিনি। কতদিন দেরী লাগে তার জবাব আসতে? কী করতে চায়—সুলতান, কী তার উদ্দেশ্য?

এইবার যা হওয়ার হয়ে যাবে। জাহাজের ভারী ভারী কামানগুলো রাক্ষসের মতো ক্ষুধা নিয়ে যেন বন্দরের দিকে গলা বাড়িয়ে আছে। আর সেই সঙ্গে আছে নুনো-ডি-কুন্হার আদেশ: দরকার হলে রক্ত আর আগুন দিয়ে ভাসিয়ে দিতে হবে পোর্টো গ্র্যাণ্ডি। যে ইতিহাস কালিকটে একদিন আল্মীতাকে রচনা করতে হয়েছিল, হয়তো তারই পুনরাবৃত্তি করতে হবে আবার!

কিন্তু কতদিন? আর কতদিন এই ভাবে অপেক্ষা করতে হবে?

রাত অনেক হয়েছে। সামনে মদের পাত্র নিয়ে একা বসেছিলেন মেনেজেস্। নদীর অবিশ্রান্ত কলধ্বনি কানে আসছে। বন্দরের আলোগুলো প্রায় সব নিভে গেছে—শুধু একটি বাতি এখনো মিট্‌মিট্ করছে গুয়াজিলের কাছারীতে। আসে-পাশে মুর আর বাঙালী বণিকদের বহরগুলো একরাশ জমাট ছায়ার মতো কর্ণফুলীর জলের ওপরে দুলছে।

মদের পাত্র শূন্য করতে করতে একটা তিক্ত বিদ্বেষে জর্জরিত হচ্ছিলেন মেনেজেস্। বন্দরের ঘরে ঘরে এখন মানুষের নিশীথ বিশ্রাম—সঙ্গিনীদের দেহের উত্তাপ তাদের শরীরে মাদকতা ঘনিয়ে আনছে। আর সেই সময় শুধু মদের পাত্রেই খুশি থাকতে হচ্ছে মেনেজেস্‌কে! উঃ—অসহ্য!

জাহাজে একটা কলরব শোনা গেল।

তৎক্ষণাৎ কাচপাত্রটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মেনেজেস্। তীরবেগে টেনে নিলেন তলোয়ার। সুলতানের লোকেরা রাত্রির অন্ধকারে জাহাজ আক্রমণ করেনি তো? বিশ্বাস নেই—কিছুই জোর করে বলা যায় না।

খোলা তলোয়ার হাতে বেরিয়ে এলেন মেনেজেস্। জাহাজের নাবিকেরা একটি লোককে ঘিরে কলরব করছে। সে মুরদের কেউ নয়। সবিস্ময়ে মেনেজেস্ দেখলেন—সে আল্‌ফোকোরাদো!

—জর্জ!—

আল্‌ফোকোরাদো সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানালো।

—এ সময় তুমি কোথা থেকে এলে জর্জ?

—পালিয়ে এসেছি ক্যাপিতান!—আল্‌ফোকোরাদো তখনো যেন একটু একটু হাঁপাচ্ছে—যেন দাঁড়াতে পারছে না ভালো করে। কয়েকটা মশালের উজ্জ্বল আলোয় মেনেজেস দেখতে পেলেন শীর্ণ-পীড়িত তার চেহারা। কতদিন যেন সে খেতে পায় নি—যেন অসংখ্য দুর্ভোগ পার হয়ে আসতে হয়েছে তাকে।

—পালিয়ে? কেন?—বজ্রের মতো গম্ভীর হয়ে বেজে উঠল মেনেজেসের গলা।

—গিয়ে পৌছোনোর পরেই গৌড়ের সুলতান বিশ্বাস-ঘাতকের মতো আমাকে বন্দী করে। আমার অবস্থাও হয় ক্যাপিতান ডি-মেলো আর তাঁর দলবলের মতো। প্রহরীদের মুখে শুনছিলাম, সুলতানের হুকুমে শিগ্‌গীরই আমাদের হত্যা করা হবে। ঠিক এই সময় একদিন সুযোগ পেয়ে আমি কারাগার থেকে পালাই। সুলতানের সৈন্যেরা অনেকদূর পর্যন্ত আমাকে তাড়া করে এসেছিল – মাতা মেরীর দয়ায় আমি রক্ষা পেয়েছি। বন-জঙ্গলের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে—রাত্রির অন্ধকারে নদী-নালা পার হয়ে আমাকে আসতে হয়েছে। একবার একটু হলেই কুমীরে ধরত, আর একবার বাঘের মুখে পড়তে পড়তে বেঁচে গেছি।

আল্‌ফোকোরাদো থামল। মশালের আলোয় আদিম-জিঘাংসা জ্বলতে লাগল মেনেজেসের চোখে।

মেনেজেস্ বললেন, আর আমাদের কিছু করবার নেই। মূর্খ মামুদশা নিজেই রক্ত আর আগুনকে ডেকে আনল!

চট্টগ্রাম বন্দর থেকে প্রায় এক যোজন দূরে সেই রাত্রেই আশ্রয় নিয়েছিলেন সোমদেব।

প্রায় দু'বছর পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। ঘুরেছেন পাগলের মতো। কোথাও তিনি একটা মানুষকে খুঁজে পাননি—একটা লোক সাড়া দেয়নি তার ডাকে।

—দেশ থেকে দূর করে দাও পাঠানকে। আবার ফিরিয়ে আনো ব্রাহ্মণের যুগ।

দেশের মানুষ বিহ্বল হয়ে তাকিয়েছে তার দিকে। যেন একটা কথাও তারা বুঝতে পারেনি।

সোমদেবের উদ্‌ভ্রান্ত চোখ থেকে যেন রক্ত ছিটকে পড়েছে।

—শুনছ তোমরা সবাই! কান পেতে শোনো। এমন সুযোগ আর আসবে না। বাংলা আর বিহারে পাঠানের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি শুরু হয়েছে। মোগল এখনো অনেকদূরে। গৌড়ের সুলতান একটা বদ্ধ উন্মাদ—তার হয়ে এসেছে। এই সময়েই যে-যা পারো অস্ত্রশস্ত্র তুলে নিয়ে বিদ্রোহ করো।

—বিদ্রোহ!

আশ্চর্য হয়ে শুনেছে মানুষগুলো। বিদ্রোহ? কিসের জন্যে? কার বিরুদ্ধে? গৌড়ের সিংহাসনে হিন্দু কিংবা পাঠান যেই-ই যাক, কী আসে যায় তাদের? ডিহিদারের

লোকের কাছে খাজনা দিয়েই তারা নিশ্চিন্ত। সুলতানের সঙ্গে তাদের চোখের দেখারও সম্বন্ধ নেই। বিদ্রোহ ?

—হাঁ—হাঁ—বিদ্রোহ!—প্রায় গর্জন করে উঠেছেন সোমদেব—মাথার জটাবাঁধা চুলগুলো একদল ক্রুদ্ধ সাপের মতো ফণা তুলে উঠেছে: দেখতে পাচ্ছনা, আজ মহাশক্তির জাগবার পালা? দেখছ না শিব আজ শব হয়েছেন? দেখছ না চণ্ডীর জিহ্বা রক্তের তৃষ্ণায় লক লক করছে? আগুন জ্বালাও বিদ্রোহ করো—পাঠানের গ্রামগুলোকে মুছে দাও দেশের ওপর থেকে।

—পাঠান আমাদের শত্রু নয়।—একজন বুড়ো মতন মানুষ এগিয়ে এল সামনে।

—শত্রু নয়?—বিকৃত কণ্ঠে সোমদেব বললেন, শত্রু নয়?

—না।—শান্ত স্থির গলায় বুড়ো বললে, আমাদের দেশে ঘর বেঁধেছে তারা, আমাদের প্রতিবেশী। তারা আমাদের ভাষা শিখছে—আমাদের ভাষায় কথা বলছে। আমাদের রামায়ণ আর মহাভারতের গান শুনতে তারা আসে। মিথ্যে কেন তাদের সঙ্গে শত্রুতা করব আমরা? তা ছাড়া তারা বীর। গায়ে যেমন শক্তি—মনেরও তেম্নি জোর। তাদের হাতে লাঠি আর তরোয়াল দুইই সমান চলে। আগে আমাদের গ্রামে প্রায়ই ডাকাত পড়ত—সর্বস্ব লুটপাট করে নিয়ে যেত—আমরা রুখতে পারতাম না। কিন্তু যে সব জায়গায় বীর পাঠানের দল এসে ঘর বেঁধেছে, সে-সব জায়গায় আর দস্যুর ভয় নেই—ঠ্যাঙাড়ের উৎপাত থেমে গেছে—

—চুপ! চুপ করো!

বুড়ো বললে, কেন পাগলামি করছ ঠাকুর? কে হিন্দু, কে পাঠান কিংবা কে বৌদ্ধ—তা নিয়ে কী আসে যায়! এক সঙ্গে আমরা থাকি, এক সঙ্গেই আমাদের মরা-বাঁচা। যদি লড়তে হয় সবাই মিলে লড়ব খুনে আর ডাকাতের সঙ্গে। গ্রামে বাঘ এলে জঙ্গল ঘেরাও করব সবাই মিলে, নদীতে কুমীর এলে ফুঁড়ে তুলব বল্লম দিয়ে। নতুন ধান উঠলে এক সঙ্গেই গানের আসর বসবে আমাদের। ওরা ওদের গান গাইবে—আমরা গাইব আমাদের গান—

এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অসহ্য ক্রোধে কাঁপছিলেন সোমদেব। এইবার দাঁতে দাঁতে ঘষে বললেন, নিপাত যাও।

বুড়ো হাসল: কেন শাপমন্যি দিচ্ছ ঠাকুর? বামুন মানুষ, পূজো-অর্চনা করতে চাও, করো। আমাদের গাঁয়ে পায়ের ধুলো দিয়েছ—দুটো দিন থাকো, আমাদের সেবা নাও—

—তোদের দিয়ে মহাকালীর সেবার ব্যবস্থা করতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার! সেবা! মূর্খ—বর্বরের দল!

একজন আর একজনকে বললে, বোধহয় পাগল।

দ্বিতীয় লোকটি শঙ্কিত মুখে বললে, না, পাগল নয়। বোধহয় তান্ত্রিক।

—অ্যাঁ—তান্ত্রিক!

—দেখছ না, সেই লাল লাল চোখ—সেই জটা-বাঁধা চুল—সব অবিকল সেই রকম। মানুষটার রকম-সকম দেখে আমার ভালো লাগছে না। হয়তো রাত-বিরেতে আমাদের ছেলে-পুলে চুরি করে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে বলি দেবে! শেষ কথাটা সোমদেবের কানে গিয়েছিল। বীভৎসভাবে চিৎকার করে উঠলেন তিনি।

—হ্যাঁ—দিয়েছিই তো নরবলি। নিজের হাতেই দিয়েছে—ফিন্‌কি দিয়ে বেরিয়েছে রক্ত—ধড়টা একটুখানি দাপাদাপি করেছে, তারপরেই সব স্থির। হা—হা—হা!—সোমদেব হেসে উঠলেন: এবার তোদের সব কটাকে নির্বংশ করব—কারুর একটা ছেলেও আমি ঘরে রাখব না—

এক মুহূর্তে চারদিকের মানুষগুলোর মুখ জমে যেন পাথর হয়ে গেল। একজন চিৎকার করে উঠল—মার্! আর একজনের হাতের প্রকাণ্ড একটা মোটা লাঠি সবেগে নেমে আসবার উপক্রম করল সোমদেবের মাথার ওপর।

সেই বুড়োই বাঁচালো। নইলে গ্রামের লোক গুঁড়িয়ে ফেলত সোমদেবকে।

সোমদেবকে আড়াল করে বুড়ো বললে—ছিঃ—ছিঃ—কী হচ্ছে! ব্রাহ্মণ—অতিথি।

—অতিথি নয়—তান্ত্রিক! আমাদের ছেলেপুলে চুরি করে নিয়ে বলি দেবে।

ভীড়ের মধ্য থেকে উতরোল কান্না শোনা গেল একটা। বুক চাপড়ে কাঁদছে একটি মেয়ে।

—আমার ছেলেকে বলি দিয়েছে তান্ত্রিকেরা—আমার একমাত্র ছেলেকে বলি দিয়েছে!

—মার্···মার্—

অনেক কষ্টে সে-যাত্রা বুড়ো সোমদেবের প্রাণ বাঁচালো। সোমদেব তখন একটা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছেন নিথর ভাবে। করুক—করুক, ওরা তাঁকে হত্যাই করুক। এই ক্লীব-কাপুরুষদের দেশে বেঁচে থেকে তাঁর কোনো লাভ নেই—এর চেয়ে মৃত্যুই তাঁর ভালো। নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইলেন সোমদেব। দুঃখ, ভয়, ক্ষোভ—তাঁর মুখে কোনো কিছুর চিহ্নই নেই! শুধু ঘৃণা—পুঞ্জ পুঞ্জ শুষ্ক ঘৃণা সেখানে!

খুড়োই অবশ্য তাঁকে গ্রামের চৌহদ্দির বাইরে রেখে এলো। বললে, ঠাকুর, বুঝে-সুঝে চোলো। দিনকাল বড় খারাপ। তান্ত্রিকদের অত্যাচারে ঘরে ঘরে কোথাও শান্তি নেই। ঘরে ঘরে অল্প-বয়েসী ছেলে চুরি যাচ্ছে, দিন-দুপুরে ঘাট থেকে বৌ-ঝিদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এ সময় সাবধানে কথাবার্তা না বললে বেঘোরে প্রাণ হারাবে!

সোমদেব অনেকবার ভেবেছেন আত্মহত্যা করবেন। ভেবেছেন এই বিড়ম্বিত লজ্জিত জীবনের বোঝা আর তিনি বয়ে বেড়াবেন না। কিন্তু তারপরেই তাঁর মনে হয়েছে—কেন মরবেন তিনি এত সহজেই, কিসের জন্যে হাল ছেড়ে দেবেন? যদি কেউ না থাকে—তবে তিনি একা। একাই তিনি যুদ্ধ করবেন সমুদ্রের সঙ্গে।

একা ছাড়া কীই বা বলা যায় আর?

কোথাও দেখেছেন বৌদ্ধদের গ্রাম—আকাশের অনেকখানি পর্যন্ত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ওদের বিহার। দেখে ঘৃণায় মাটিতে থুথু ফেলেছেন তিনি। এই আর একদল! নাস্তিক—বেদের শত্রু!

দূর থেকে দেখেছেন খড়ের চালার মধ্যে বুদ্ধের মাটির মূর্তি। সার দিয়ে প্রদীপ জ্বলছে সেখানে। মাথা নীচু করে ধ্যানমগ্ন হয়ে আছে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। কখনো সে প্রণাম করছে 'গোতম-চন্দিমা'কে—কখনো বা প্রার্থনা করে বলছে—দাও আমাকে 'সম্মা বাচা', 'সম্মা সংকপ্পো'—'সম্মা আজীবো'।

'সম্মা আজীবো!' সত্য জীবন! বিধর্মী—নাস্তিকদের দল! পাঠানদের আগে ওদের মুণ্ডপাত করলে তবেই তাঁর ক্ষোভ মেটে। এরাই তো সর্বনাশের ফাটল ধরিয়েছে সকলের আগে। দু হাতে নিজের কান চেপে ধরে—অন্ধের মতো প্রায় চোখ বুজেই বৌদ্ধদের গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেছেন সোমদেব।

কিন্তু কোথায় যাবেন? চারদিকেই অগ্নিবলয় জ্বলছে তাঁর।

নবদ্বীপের ওই চৈতন্য-পণ্ডিত! কৃষ্ণনাম ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। শুধু কেশব নয়—আরো কত জন! হরে কৃষ্ণ। অহিংসা পরমো ধর্ম! দেশের সর্বনাশ কে আর ঠেকাতে পারবে!

হয়তো গ্রামের প্রান্তে কোথাও আশ্রয় নিয়েছেন। ভেবেছেন রাতটা কাটিয়ে দেবেন সেখানেই। এমন সময় দূর থেকে বুকের মধ্যে এসে বেঁধে কতগুলো বিষের তীর! যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়ে সোমদেব শুনতে পান:

'তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
সুত-মিত-রমণী সমাজে,
তোহে বিসরি' মন তাহে সমর্পিলুঁ
অব মঝু হব কোন্ কাজে!
মাধব—মঝু পরিণাম নিরালা—'

যেমন বৌদ্ধদের গ্রাম, তেমনি বৈষ্ণবদের গ্রাম থেকেও একটা অভিশপ্ত আত্মার মতো ছুটে পালাতে হয় সোমদেবকে। নিস্তার নেই—কোথাও নিস্তার নেই! শুধু ওই একটি পংক্তি কানের কাছে তীব্র একটা আর্তনাদের মতোই একটানা বাজতে থাকে: 'মাধব, মঝু পরিণাম নিরালা—'

কার পরিণাম? সোমদেবের?

তা ছাড়া আর কার? দেশের মানুষ আজ বিধর্মী পাঠানকে প্রতিবেশী বলে কাছে টেনে নিয়েছে। গ্রামে গ্রামে আজও মুখর হয়ে উঠছে বেদ-বিদ্বেষী—ধর্ম-বিদ্বেষী গৌতমের বন্দনা! বীর্যহীন কাপুরুষদের দল অহিংসা পরম ধর্মকেই সত্য বলে জেনেছে, খোলে-করতালে চাঁটি দিয়ে 'গৌর হে—গৌর হে—' বলে তারস্বরে আর্তনাদ করছে!

চুলোয় যাক—চুলোয় যাক সমস্ত।

আবার চন্দ্রনাথ পাহাড়েই ফিরে যাবেন তিনি। ফিরে যাবেন তাঁর অরণ্য বাসে। কী তাঁর দায়? নিজেরা যারা আত্মহত্যা করতে চলেছে—তাদের বিচারের ভার বরং মহাকালই তুলে নিচ্ছেন হাতে।

একটা প্রকাণ্ড বটগাছের অন্ধকার ছায়ায় পড়েছিলেন সোমদেব। চারদিক থেকে ভিজে ভিজে মাটির কেমন একটা বিষাক্ত গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। মাথার ওপরে প্যাঁচার কর্কশ চিৎকার। দূরে কোথায় একটা কুকুর হাহাকার করে উঠল।

রাত আর বেশি নেই। আকাশের ওই কোথায় কী দেখা যাচ্ছে ওটা? অত বড়—অত উজ্জ্বল? ভোরের তারা? ওটাকে তো অনেকবার দেখেছেন সোমদেব। কিন্তু এমন বিরাট—এমন আশ্চর্য তো কখনো মনে হয়নি! ও যেন কিসের একটা নিশ্চিত সূচনা: একটা নতুন ইঙ্গিত!

কী যেন আসছে। কে যেন আসছে।

কী সে? কে সে?

ক্রীশ্চান? বিদেশী? তাই সম্ভব! তারাই আসছে। বাংলা দেশে তাদের আবির্ভাবের ওই বুঝি নিশ্চিত পূর্ব-সংকেত! তাই হবে—তা ছাড়া কী আর হতে পারে? হয়তো দেরী হবে, হয়তো আরও কিছুদিন সময় লাগবে। কিন্তু ওরা আসবেই। সংকল্পে কঠিন মুখ ওই দীর্ঘদেহ মানুষগুলোকে দেখেই সে-কথা বুঝতে পেরেছেন সোমদেব!

শুকতারা নয়—ওটা নতুন তারা!

সোমদেব নির্নিমেষ চোখে তারাটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। নক্ষত্র নয়—একটা অগ্নিকুণ্ড যেন! তাকিয়ে তাকিয়ে সোমদেবের মনে হতে লাগল, ওর তীব্র নির্মম আলোয় গলে যাচ্ছে তাঁর চোখ দুটো—পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে তাঁর চোখের পাতা! একটা দুঃসহ যন্ত্রণায় তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন।

আর তৎক্ষণাৎ—

তৎক্ষণাৎ দূর-দুরান্তের ওপার থেকে যেন মেঘের ডাক শুনতে পেলেন তিনি।

মেঘের ডাক! কিন্তু এ কেমন মেঘ গর্জন!

আকাশ নির্মল কালো—শেষ রাত্রির তারাগুলো ঝকঝক করছে সেখানে। এক টুকরো মেঘের চিহ্ন নেই সেখানে।

তবে ? তবে এ কেমন মেঘের ডাক ?

আবার সেই শব্দটা উঠল। রাত্রির শেষে শান্ত আকাশের তলা দিয়ে আবার তার তরঙ্গিত গুরু গুরু ধ্বনি হাওয়ায় হাওয়ায় আশ্চর্য আতঙ্কের রেশ ছড়িয়ে দিলে একটা !

না—এ তো মেঘের ডাক নয় !

ত্রস্ত হয়ে সোমদেব উঠে বসলেন। লহরে লহরে সেই গর্জন আসছে—একের পর একটা। মাথার ওপর নক্ষত্র-ছাওয়া আকাশটা যেন থর থর করে দুলে উঠল। অজানা ভয়ে তড়িৎ গতিতে উঠে বসলেন সোমদেব।

আর সেই মুহূর্তে তিনি দেখতে পেলেন পুব দিকে কালো আকাশটা লাল হয়ে উঠছে একটু একটু করে। উষার বর্ণচ্ছটা নয়—আগুনের রক্তরাগ !

ওই দিকেই তো চট্টগ্রামের বন্দর !

আগুনের আকর্ষণে অন্ধ পতঙ্গের মতো সোমদেব ছুটে চললেন সেদিকে। বুঝেছেন—নিশ্চিত করে কিছু একটা বুঝতে পেরেছেন। আকাশের নতুন নক্ষত্রের সঙ্গে ওই গুরু গুরু বজ্রনাদের সম্পর্ক আছে কোথাও। সোমদেবের অনুমান করতে বিলম্ব হয় নি – ওটা কামানের ডাক !

রক্তাভ দিগন্তের দিকে রুদ্ধশ্বাসে ছুটে চললেন সোমদেব।

*　　*　　*

মেনেজেসের মত্ত প্রতিহিংসায় তখন চট্টগ্রামের বন্দরে আগুন জ্বলছে। ধ্বসে পড়ছে বাড়ীর পর বাড়ী—উড়ে যাচ্ছে মসজিদের মিনার, দেউলের চূড়ো। আগুনের আভায় সূর্যোদয়ের রক্তরাগ মুছে গেছে !

বন্দরের দিক থেকে নবাবের কামানে জবাব এসেছিল কয়েকবার। কিন্তু অনেক গুণে শক্তিশালী পর্তুগীজ কামানের মুখে কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা থেমে গেছে। চারদিকে ভয়ার্ত মানুষের আকাশ-ফাটানো কোলাহল !

এই প্রচণ্ড অগ্নিবর্ষণকে বাধা দেবার কেউ নেই। নবাবের সৈন্য ইতস্তত পালিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টায় ব্যস্ত। মেনেজেসের আদেশে সেই সুযোগে তিনশো পর্তুগীজ খোলা তলোয়ার হাতে বন্দরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

নবাব সৈন্যের কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না কোথাও। পর্তুগীজের ধারালো তলোয়ারের মুখে শিশু-বৃদ্ধ-নারীর ছিন্ন মুণ্ড লুটিয়ে পড়তে লাগল মাটিতে। হত্যার নেশায় মাতাল পর্তুগীজেরা রক্তের বন্যা বইয়ে দিলে চারদিকে।

বন্দরে আগুন আর মৃত্যু—নদীর জলেও তাই। বাঙালী আর মুর বণিকদের বহরগুলো ধূ-ধূ করে জ্বলছে। নদীর জলে ভেসে চলেছে কবন্ধ শবদেহ, আর হাঙর লাফিয়ে উঠছে নরমাংসের সন্ধানে।

ঠিক সেই সময়ে চট্টগ্রামে এসে পৌছুলেন সোমদেব।

চারদিনের এই নরকের মাঝখানে বজ্রগর্ভ মেঘের মতো তিনি থমকে দাঁড়ালেন। হুঙ্কার করে বললেন, পালাচ্ছ কেন সব—কেন পালাচ্ছ ভীরুর মতো ?—দু চোখ দিয়ে তাঁর রক্ত ছুটে বেরুতে লাগল : ফিরে দাঁড়াও—ফিরে দাঁড়াও। এই সুযোগ ! পাঠান পালাচ্ছে—রুখে দাঁড়াও ক্রীশ্চানকে। তারপর—

সোমদেব আর কথা শেষ করতে পারলেন না।

বজ্রমন্দ্রিত আকাশ থেকে আর একটা কামানের গোলা ঠিক তাঁর পায়ের কাছে এসে পড়ল—বিদীর্ণ হয়ে গেল প্রবলবেগে। ছিন্ন-ছিন্ন দেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন সোমদেব।

মহাকালীর পায়ে শেষ পর্যন্ত নিজেকেই বলি দিতে হল তাঁর। নিজের রক্তেই তাঁর যজ্ঞে পড়ল শেষ আহুতি।

— আগামী সংখ্যায় সমাপ্য —

শ্রীশ্রীদুর্গামাতা

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

মহিষাসুর নির্ণাশী ভক্তানাং সুখদে নমঃ।
রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

এ প্রার্থনা যখন কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে তখন মরম জানতে চায় কে সে মহিষাসুর-নাশ-কারিণী দেবী—যাঁর কাছে যাচিঞা করছি—রূপ, জয়, যশঃ এবং শত্রুর বিনাশ?

সাধক জানেন তাঁর স্বরূপ কি। তিনি সাধারণ মানুষকে ভাবেন অনধিকারী, তাই যবনিকার কুহেলিকায় আচ্ছন্ন রাখেন মায়ের আসল মূর্ত্তি। রহস্যের আবরণ অতৃপ্ত করে পিপাসুকে। ভক্তি মানব-মনের জন্মগত সংস্কার—সে জাগে পূজার দিনে মাত্র এই প্রত্যয়ে যে মাথা হেঁট করছি মহাশক্তির বেদীতে—যাঁর ইচ্ছায় ঘটে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। কিন্তু সাথে এসে জোটে লাভের আশা, প্রতিষ্ঠা, যশ, মান, শত্রুক্ষয়ের লোভ। হৃদয়ের শুভ অনুষ্ঠান বলে এতো প্রকৃত ভাব নয়।

ভক্ত জ্ঞানের পথ বন্ধ দেখে অভিমানের মনোবেদনা পান তাঁদের ব্যবহারে—যাঁরা মায়ের মূর্ত্তি রহস্যে ঢেকে রাখেন নিজের মোক্ষের আয়োজনে। কাজেই মনের পটভূমিতে এক বিন্দু ভক্তি রেখে শারদোৎসবকে খেলার মেলায় পরিণত করি আমোদে ও উৎসবে, বহু অর্থ ব্যয়ে। কোথাও প্রতিযোগী সর্ব্বজনীন পূজার কর্ম্মকর্ত্তাদের সঙ্গে বাদ বিসম্বাদের সৃষ্টি করি। এমন প্রমোদ উৎসবে দুর্গামাতার গৌরব কতটুকু পুষ্ট করি ধীরভাবে সে কথার বিচার প্রয়োজন। মিলনে মানুষের মনের বিস্তৃতি। মিলনমাত্র সমাজের কল্যাণকর নয়—সৌজন্যের প্রসারেই তো আমরা স্বর্গ সুখ পাই। কারণ হিন্দু-কৃষ্টির সিদ্ধান্ত—ভিন্ন দেহে বিরাজ করেন একই ভগবান।

পূজার দিনে তাই চিরকাল শিক্ষিতের মন চায় জ্ঞানলাভ করতে মার স্বরূপ সম্বন্ধে। বাস্তবিক কি আমরা প্রার্থনা করি রূপ—অস্থি রক্ত বসা মাংসের সুদৃশ্য কমনীয় সৌন্দর্য্য? জয় চাই কিসের? যশই বা কি? আর দ্বিষো জহি। আমার আতঙ্ক হত শুনে যে চণ্ডীপাঠের পূর্ব্বে প্রার্থনা করে মানুষ তার শত্রুর বিনাশ। শত্রুও যদি চণ্ডী-ভক্ত হয় তাহ'লে মৃত্যু হ'বে কি দুজনার? কী ভীষণ ভাবনা। উত্তর দেবে কে? জ্ঞানী বলে, অধিকারী নও জানবার। দুষ্ট বলে—এই তন্ত্র? মন বলে—তবে কি আর্য্য-কৃষ্টির অহিংসা তন্ত্র নেহাত ভণ্ডামী! নিখিলের সর্ব্বভূতে যে সে আমাকে পায়—শ্রীকৃষ্ণের এ বাণী কি নিরর্থক?

পূজার বেদীতে লোকের ভিড় হয়। ব্রাহ্মণ নিষ্ঠার সাথে সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করেন, চণ্ডীপাঠ করেন, ভোগের ব্যবস্থা করেন। বলি হয়, ছেলেরা নাচে, বৃদ্ধেরা দেখে, যুবক সহায়তা করে। আরতি হয় ধূপ ধুনার গন্ধে প্রাণে আনন্দ আসে, ভক্তি আসে, কিন্তু রহস্য-ঘেরা মা আত্মপ্রকাশ করেন না আমাদের চিত্তাকাশে। মা জননী, শক্তি-রূপিণী এ-ধারণা আসে পূজার মণ্ডপে। কিন্তু উৎসবের শেষে থাকে না সে উপলব্ধি। কারণ সে স্পষ্ট নয়। সামাজিকতা কতক আনন্দ দেয়। কিন্তু মনের সুপ্ত অসুর আবার জাগে—আমরা পড়ি তার শাসনের চাপে। দম্ভ, দর্প, অভিমান, ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতা দামামা-দুন্দুভি বাজিয়ে ঘোষণা করে মনের মাঝে অসুর-রাজের সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্যবাদ। শাস্ত্র স্বয়ং বলেছেন—

—পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র এবং অসুররাজ মহিষের আধিপত্যের সংগ্রাম হ'য়েছিল শতবর্ষ। সুতরাং তিনদিনের পূজার তিন ঘণ্টায় আমরা কতটুকু আধ্যাত্মিক শক্তিলাভ করতে পারি, যদি মনের রণক্ষেত্রে দুর্বৃত্ত অসুরকে পরাভব করতে চেষ্টা না করি সদা-সর্ব্বদা। সকল পদার্থের মতো চিত্তবৃত্তিও গড়ানো ভূমি পেয়ে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে অধোগমন করে পিচ্ছিল পথে। আত্মদোষানুদর্শন মানুষের চমক ভাঙ্গে। তাই আজ আমি অভিযোগের সুরে মাতৃ-চরণে ভিক্ষা করছি জ্যোতি। যেন আজ আমরা তাঁর সিংহাসনের সন্ধান পাই মনের মাঝে জাতীয় উৎসবের দিনে।

আমার দোষ-স্বীকার করি। চণ্ডী পড়তাম, অনুবাদ দেখতাম, বুঝতাম না কিছু, কিসের কাটাকাটি যুদ্ধ-সংগ্রাম। মন চাইত জানতে—সত্যিই কি আকাশের উপর কোথাও অসুর যুঝেছিল দেবীর সাথে? না বল্‌তে পারতাম না পাপের ভয়ে, হাঁ বলতে পারতাম না বিচার যুক্তির ফলে। আমার বিভ্রান্ত মনে শান্তি দেবার জন্য আমার সহধর্ম্মিণী সংগ্রহ করলেন —শ্রীশ্রীসত্যদেব কর্ত্তৃক সাধন সমর গ্রন্থ। আমরা দুজনে শিলঙে গেলাম। সেথায় কামাখ্যা দেবীরই নিকটের পাহাড়ে উত্তর পেলাম বহু প্রশ্নের। বুঝলাম মা দুর্গার মূর্ত্তি পুতুল নয়, কোনো ঋষি-কবির খাম-খেয়ালী নক্সা নয় বাঙলার মৃৎ-শিল্পীর শিল্পাগারের জন্য। রূপ কল্পনা ঋষি-বাক্য বোঝাবার আয়োজন।

সত্যই তো মানুষের মন অখণ্ড, অনন্তের জায়া। তাই সে চিদম্বর। মনের মাঝে দেবতার বাস, আর বাস অসুরের। আমরা সত্যের সন্ধান পাই, সুষ্ঠু-কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করি। শুদ্ধ জ্ঞানলাভ করি চিদাকাশের দেবশক্তির দীপ্তির আলোয়। কিন্তু মনের মাঝে যে অসুর শক্তি বিদ্যমান সে দুর্ব্বৃত্তির সংস্কার। শ্রীশ্রীচণ্ডীপুরাণ বলেছেন—রূপকের মাধ্যমে মনের কুবৃত্তি ও সুবৃত্তির সংগ্রামের কথা। মহিষাসুরের সেনাপতি চক্ষুর। মা দুর্গা প্রথমে তাকে হত্যা করলেন। আমাদের মনের দুর্গা পুণ্য-বুদ্ধি প্রথমে চিক্ষুরকে বধ করতে না পারলে নীতির পথে, ধর্ম্মের পথে সুবুদ্ধি এক-পা অগ্রসর হতে পারে না। চিক্ষুর—বিক্ষেপ। মন সদাই বিক্ষিপ্ত, দানের কথা ভাবতে ভাবতে আমরা চুরির কথা ভাবি, আকাশ ভাবতে পাতাল ভাবি। জ্ঞানের বাতিকে নিভিয়ে দেয় বিক্ষিপ্ত মনের মোহের বাতাস। দুর্গা আমাদের সুমতি। তাঁকে লাভ করতে গেলে প্রথম মারতে হয়—মনের চিক্ষুর বা বিক্ষেপ অসুরকে, একাগ্রতা চিত্তবৃত্তি-নিরোধের উপায়।

দ্বিতীয় অসুর চামর—কেশের রাশি। তারা ঝাপসা করে দৃষ্টিকে। চামরের ফাঁকে ফাঁকে আলো দেখা দেয়—কিন্তু দৃষ্টি হয় ঝাপসা। তাই মহিষাসুরনির্ণাশী নাশ করলেন চামরের অস্তিত্ব। জ্ঞান-চক্ষু উন্মিলিত হলেই কি মনের অসুরী উপদ্রবের নিবারণ হয়? বরং জ্ঞানের আলোয় দেখি অন্য অসুর। তখন আসে উদগ্র অসুর। এর মুণ্ডটা উপর দিকে—অর্থাৎ ভীষণ দাম্ভিক ভাব যার ফলে মনে হয়, আমি পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ, আমি সুপুরুষ, সুকণ্ঠ, বীর্য্যবান। অহঙ্কারে মাথাটা উপরদিকে ঘোরা। তাকে বিনাশ করে মনের দুর্গা-মা। মহিষাসুরের আর এক সেনাপতি—অসিলোম। প্রত্যেক লোম যেন তরবারি—আমাদের সেই দুর্বুদ্ধি—যার ভয়ে মানুষ কাছে ঘেঁষতে পারেনা। নাক্-তোলা অপ্রিয়ভাষী করে এই অসুর বুদ্ধি। শাস্ত্রের খোচা-লাগবার ভয়ে লোকে দুর্জন ভেবে এমন লোককে দূরে পরিহার করে। তার বিনাশ সম্ভব দুর্গা-শক্তি উদ্বুদ্ধ করলে মনের মাঝে। অন্য সব অসুরদের মধ্যে আমাদের চিত্তে উপলব্ধি করি বিড়ালাক্ষ অসুরের অস্তিত্ব। সে সদাই সন্দেহের চোখে চায়। আঁধারেও শীকার খোঁজে—কোন্ ছিদ্র হতে মুষিক নির্গত হয় তার সন্ধানী। পরের দোষ দেখা না ছাড়লে তো আমরা প্রকৃত গুণী হতে পারি না। পর যে আপন।

এইসব অসুর বিনাশ ক'রে দুর্গা মহিষাসুর বধ করেছিলেন। আমাদের মনের মহিষ যত বা প্রবল, তত বা এক মন, তেমনি এক গুঁয়ে। তাকে বিনাশ করতে মনের সু-প্রবৃত্তির নায়কতার আবশ্যক সিংহ-বিক্রম। তাই মহিসুর নির্ণাশীর বাহন সিংহ।

হয়তো চণ্ডী পুরাণকে রূপক ভাবা মহা-পণ্ডিতেরা অনুমোদন করবেন না। সাধন সমর জ্ঞানী ও দ্রষ্টার রচনা। আমি সকলকে অনুরোধ করি এ মহা গ্রন্থ পাঠ করতে। মূর্ত্তির সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম হলে পরে আরও গভীরে সাধকের দৃষ্টি যায়। রূপক ভাবলে তো সমস্যার সমাধান হয়। ফুটে ওঠে মাতৃমূর্ত্তি।

মা বিরাজেন সর্ব্বঘটে—বলেছিলেন সাধক রামপ্রসাদ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন—আমি অবস্থিতি করি সবার হৃদ্দেশে। দুর্গা যে বিষ্ণুমায়া আদ্যা-শক্তি। তাই তাঁকে অন্তরের অন্তরতম শক্তি ব'লে চেনা তো অধর্ম্ম নয়। কাজেই অধিকারীর ভেদ-বুদ্ধি সুবুদ্ধি নয়। তাই আমরা পূজা-মণ্ডপে শুভদিনে শ্রীশ্রীচণ্ডীপুরাণের রূপকের সাহায্যে মাতৃপরিচয় লাভ করলে পাপ করব না। না বোঝা বা মূর্ত্তিকে পুতুল বোঝা পুণ্য নয়।

অসুর যখন প্রাণমন জয় করে, ব্যক্তিত্ব পূর্ণ হয় আসুর সম্পদে। শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা তাদের নির্দ্দেশ দিয়েছেন। দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, পারুষ্য, অজ্ঞান—এরাই অভিজাতের অসুরী সম্পদ। আসুর সম্পদই বন্ধনের কারণ।

কিন্তু জীবের মাঝে যে বিদ্যমান শিব। দ্যোতন-শক্তি মানুষের তেমনি সম্পদ যেমন অসুরী-শক্তি। মনতো দানব চরিত্রে শান্তি পায় না। তার স্পর্দ্ধার দিনেও চিত্তের পটভূমিতে চিত্র দেখে সরলতার। অত্যাচারের চরম কর্ম্মে মনের পটে ভেসে ওঠে বিশ্ব-প্রেমের বিমল স্নিগ্ধ প্রাণারাম চিত্র। হিংসার দিনে অহিংসা বলে—না না মনের পরিবর্ত্তন আবশ্যক। মনের রাজা ইন্দ্র চায় বল, শিব চায় শান্তি। এসব শক্তি তো মনের মাঝে বিরাজ করে।

কিন্তু অসুর শক্তি প্রবল। মন তাকে বশে আনতে পারে দৈবী-শক্তির মাত্র উদ্বোধনে নয়—একত্রী করণে। শুভের মাঝে একটু ফাঁক পেলে অশুভ ছিদ্রকে বাড়ায়, প্রবল স্রোতস্বতী যেমন ফাটলের ভিতর দিয়ে দেশকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

তাই আমরা ঋষি মেধসের মুখে শুনি মার্কণ্ডেয় পুরাণে শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মহা-শক্তির উৎপত্তি ও গঠনের কথা। দেবতাদের পরাজয়ে মহিষকে বধ করবার জন্য নির্গত হ'ল তেজ দেবগণের দেহ হ'তে। মানুষের মনের শক্তি যে মন দল বাঁধে—সুপ্রবৃত্তির দ্বারা কু-প্রবৃত্তিকে বিনাশ করতে। মানুষ মাত্র তো সে পথ অনুসরণ করে। তাই শুনি—চক্রধারী বিষ্ণু, ব্রহ্মা, মহাদেবের মুখ হতে মহৎ তেজ নির্গত হ'ল। ইন্দ্র প্রভৃতি অন্য দেবগণের শরীর হ'তেও সুমহৎ তেজ-নির্গত হ'ল। এবং সেই সমস্ত তেজরাশি একত্র মিলিত হ'ল। সেই দিগন্তব্যাপী তেজ একত্র মিলিত হয়ে এক নারী-শক্তি সৃষ্টি হ'ল। সেই কেন্দ্রীভূত শক্তি—শ্রীদুর্গা।

সত্যই তো অনেক আলো একত্র করে একমুখ করলে তবে গাঢ় অন্ধকার বিনষ্ট হয়। গীতায় বর্ণিত সকল দৈবী সম্পদের সারাংশ একত্র না করলে কি আমরা মনের মহিষাসুরকে হত্যা করতে পারি? অভয়, সত্ত্বসংশুদ্ধি, জ্ঞানযোগ, অহিংসা, সত্য, অপৈশুন প্রভৃতির সার যে আলো আলে তার কেন্দ্রীভূত রশ্মিতে পুড়িয়ে না মারলে কি দম্ভ, দর্প, একগুঁয়ে নিষ্ঠুরতা প্রভৃতিকে ভস্ম করা সম্ভব। তাই শক্তির সার একত্র ক'রে অসুর নিধনের কথা আছে চণ্ডী পুরাণে। পরের অসুর আচরণও আমরা প্রতিহত করতে পারি দৈবী-সম্পদে।

চণ্ডীপুরাণে আছে দেবীকে অস্ত্র দিলেন—ভূষণ দিলেন দেবতারা। সকলগুলির তাৎপর্য্য বোঝাবার স্থান নাই এ প্রবন্ধে। কিন্তু একটা প্রশ্ন নিশ্চয়ই সবার মনে জাগে, মা কেন দশভুজা। আমার মনের মাঝে সে শক্তি লুকানো আছে, তার প্রভাব দশদিকব্যাপী। এক দিকে শক্তির অভাব হ'লে মহিষ—শয়তান সেইদিকে পাঠাবে সেনা তাই শক্তি—দশভুজা, দশ-প্রহরণ-ধারিণী। কিন্তু হিন্দু-ধর্ম্ম চিরদিনের অহিংসা-বাদী মত। তাই জননীর মুখে হাসি—সমর নিষ্ঠুরতায় চিত্তে কৃপা।

আমি আবার বলি চণ্ডীপাঠের সময় অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে মনকে জ্ঞানের আলোয় জাগিয়ে মাতৃমূর্ত্তি ধ্যানে মনের মাঝে নিজের সুপ্তদেব-শক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। পূজার আমোদ উৎসবকে করতে পারে প্রকৃত মহোৎসব।

চণ্ডী ও গীতা সাধন পথ দেখায় গৃহীকে। বিবেক বৈরাগ্য না হলে, ভেকে বা গৈরিক বস্ত্রে বৈরাগ্য জন্মে না। তাই জীবনে সিদ্ধি আবশ্যক। মা দুর্গার সহচর সিদ্ধিদাতা গণেশ। গণেশের বাহন ইঁদুর। সে গোলায় ঢুকে সঞ্চিত ধান খায়। আমাদের সঞ্চিত কর্ম্মের বীজ গণেশের ইঁদুর কেটে তচনচ করলে আমরা কামনাহীন হতে পারি?

শ্রীশ্রীদুর্গা মাতা মহালক্ষ্মী। সংসারের শ্রী কাম্য। চণ্ডীপুরাণেই স্তবে শুনি—মা আমার সুকৃতির ঘরে শ্রী—পাপাত্মার ঘরে অলক্ষ্মী, সজ্জনব্যক্তির হৃদয়ে শ্রদ্ধা, নির্ম্মলবুদ্ধি ব্যক্তির বুদ্ধি। তাই আমাদের কাম্য লক্ষ্মীশ্রী। লক্ষ্মীর পূজা হয় দুর্গা পূজায়, মহালক্ষ্মীর সাথে।

আর কাম্য বীর্য্য। কার্ত্তিক তাই মার সাথী শারদোৎসবে। মাটির নিচে অলক্ষ্যে কত সাপ থাকে, কুটিল বিষধারী। তাদের ধ্বংস করে বাহন ময়ূর। অথচ বীরতা তো সৌন্দর্য্যের পরিপন্থী নয়। শিখীবাহন কার্ত্তিকের শক্তির প্রয়োজন বাংলাদেশে চিরদিন। বল, সৌষ্ঠব, সৌন্দর্য্য বিনা জাতি তিষ্ঠতে পারে না।

এই সুরাসুরের যুদ্ধ ছান্দোগ্যোপনিষদে আমরা পাঠ করি। শঙ্করাচার্য্য ব্যাখ্যা করেছেন—শাস্ত্রার্থ বিষয় বিবেক-জ্যোতি দ্যোতন শক্তি দেব-শক্তি। আর তার বিপরীত শক্তি তমোরূপ অসুর। সর্ব্বপ্রাণীর মধ্যে প্রতিদেহে দেবাসুর সংগ্রাম অনাদিকাল চলছে।

মৃন্ময় মূর্ত্তির বিষয় দুটো কথা বলবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। ভক্ত বলেছেন—আপনি রূপ বর্জ্জিত ধ্যানে রূপ কল্পনা করেছি। আপনি অনির্ব্বচনীয় অখিল গুরু আপনার বচনে স্তুতি করে অপরাধ করেছি। আর তীর্থযাত্রার দ্বারা নিরাকৃত করেছি যে আপনি সর্ব্বব্যাপী। হে জগদীশ সেই তিনটি বিফলতা দোষ আমার ক্ষমা করুন।

তিনি যা বলেছিলেন আমাদের তো সে উপলব্ধি নাই! তাই মনস্থির করবার জন্য, জ্ঞান-মন্দিরে প্রবেশের পক্ষে এ তিনটি সোপান আমরা ছাড়ি কেমন করে।

বিষ্ণুপুরাণ সত্যই বলেছেন অপ্রমেয়, চিন্ময়, নির্গুণ ব্রহ্মের রূপ কল্পনা সাধকের হিতের জন্য।

শ্রীমদ্ভাগবদ্ বুঝিয়েছেন—কাষ্ঠে পাষাণে বা মৃন্ময়ে দেবতা থাকে না, তিনি থাকেন ভাবে, সেইজন্য ভাবই কারণ।

কিন্তু মনকে স্থির করতে গেলে প্রতীক আবশ্যক সাধনার সোপান হিসাবে। এ প্রথা মানুষের সমাজে চিরন্তন। ক্রুশ, বাইবেল, কোরাণ ঘট, পট, মূর্ত্তি মনকে দৃঢ় করে। তার পর আসে ভাব—সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি, লয়।

তাই শাস্ত্র বলেছেন—সহজ অবস্থাই প্রথম, দ্বিতীয় ধ্যানধারণা, তৃতীয় প্রতিমাপূজা চতুর্থ হোমযাত্রা।

আজ যেন পূজার বেদীতে আমরা মনস্থির করে, প্রতিমার কল্পিতরূপ নিরীক্ষণ করে শক্তি জননীর আসল রূপ বুঝতে পারি; তাহ'লে আমাদের মনের দেবশক্তি আবার রাজ্যলাভ করবে—অসুর শক্তি হবে নিধন। সাত্ত্বিক মনোবৃত্তির হবে জয়, দ্বেষ হবে দূর।

এখন আমরা স্তবের অর্থ কতকটা বুঝতে পারব। অসুর নির্ণাশী সুখদা। কারণ আনন্দ সচ্চিদানন্দের উপাধি। আনন্দকে ঢেকে রাখে কু-প্রবৃত্তি। কু-প্রবৃত্তিরূপ অবিদ্যার অপসরণে জাগে সুখ—আনন্দ। তাই অসুর বধ করে মা সুখদা হন। মা আমাদেরই মধ্যে বিরাজিত

ঐশ শক্তি। আমরা রূপ চাই তেমন মার কাছে—সে রূপ যে স্বরূপ—জীবাত্মার জ্ঞান আত্ম-দর্শন। চাই জয়—অসুর বধের জয়, আত্মীয় স্বজন, পাড়াপড়শী মারার জয় নয়। প্রার্থনা করছি অসুর বিনাশ শরণ করে। যশ চাই যশস্বী প্রবৃত্তির—পৃথিবীর সাফল্যের দুষ্ট যশ নয়। আর চাই যে দ্বেষ করে তার বিনাশ। সে দ্বিষতা করেছিল অসুর নির্ণাশীর মহিষাসুর। সে অসুর-বৃত্তির নাশ চাই—অন্য জীবের নয়। সমগ্র শ্লোকটি একত্র নিলে প্রকৃত অর্থ বোধগম্য হবে—রূপ, জয়, যশ ও দ্বিষতার।

তাই অসুর বিনাশ স্মরণ করে আমাদের হিতার্থে বলব পূজার দিনে—

শূলেন পাহি নো দেবি
পাহি খড়্গেন চাম্বিকে
ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাহি
চাপজ্যানিস্বনেন চ।

প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাং চ
দক্ষিণে রক্ষ চণ্ডিকে
ভ্রামণেনাত্মশূলেন উত্তরস্যাং তর্থেশ্বরী।
সৌম্যানি যানি রূপানি ত্রৈলোক্যে বিচরন্তিতে
যানি চাত্যর্থঘোরানি তৈ রক্ষ স্মাং স্তথাভূবম্।

শূল ভেদ করে। তেমনি মনের জমাটি পাশব বৃত্তিকে ভেদ কর মা মহাশক্তি। হে অম্বিকে সুবুদ্ধিরূপ খড়্গ দ্বারা মা আমাদের রক্ষা কর। আমাদের ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা রক্ষা কর। যেমন ওঙ্কার ধ্বনি রক্ষা করে স্বাত্ত্বিকবৃত্তি। মন্দ বিনাশের জন্য ধনুকের জ্যা শব্দ দ্বারা আমাদের রক্ষা কর মা। মায়ের যে মনোহর সৃষ্টি স্থিতি ও অতিশয় ভীষণ সংহার রূপ ত্রিলোকে বিচরণ করছে, তদ্দ্বারা আমাদের ও পৃথিবীকে রক্ষা কর মা অম্বিকা।

প্রার্থনা জীবাত্মার সন্ধান বিশ্ব প্রাণের। তাই সর্ব্বমঙ্গলার কাছে সবার মঙ্গল কামনা করলে প্রসারিত হয় ক্ষুদ্র চিত্ত।

দেখেছ কি তার স্বপন চক্রবালে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

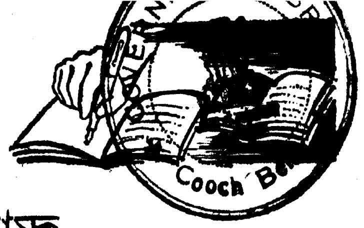
মন্দিরে কার মনোমন্দিরা বাজে
প্রেম কেন তব অভিমানে মন্থর ?
আলো ছায়া খেলা জীবন মৃত্যু মাঝে
দেহের ভিতরে তুমি যেন অন্তর।
তোমার নয়নে শরতের মনলোভা
ঊষার কোলেতে, যেন শুকতারা সম :
তনু লাবণ্যে অপরূপ তব শোভা
প্রণামের মত এসেছ পরাণে মম।
নিভৃত নিমেষে হের গো চিত্তহরা
সূর্য্যের মত সাগরের উপকূলে।
নিশার অশ্রু ঊষার আঁচল ভরা
অলি বিহঙ্গ স্তব গুঞ্জন তুলে।

পাখী জাগা প্রাতে মেঘ-হারা মদিরতা
সুনীল আকাশ শ্বেত চন্দন মাখা।
বনে বনে আর মনে মনে অধীরতা
অঙ্গনে কার রহে আলিপনা আঁকা।
প্রতি দিবসের হাসি কান্নারে লয়ে
বহু দূর গেছে জীবনের পথগুলি :
সেই পথে কত কথা ওঠে ফুল হয়ে
কত স্মৃতি কাঁদে অবগুণ্ঠন খুলি !

নব হৃদয়ের শোনো উৎসব বাণী
রাত্রি শেষের বাতাসে কে যেন কয় !
সেথা কি শেফালী ঝরে ঝরে পড়ে রাশি !
রজনীগন্ধা যেথায় ঘুমায়ে রয়।
বিদায়ের দিনে মিলনের দিন কেউ
পেয়েছে কি ক্ষণ-উৎসব অবসরে !
বিরহ মিলনে ভেঙে ভেঙে পড়ে ঢেউ
প্রেম সিন্ধুর উর্ম্মি বক্ষ পরে।
সব তটিনীর জীবনের জলধারা
বিলীন কেন গো মহাসাগরের বুকে ?

শত ঝরণার স্রোত কেন পথহারা
আর্ত্ত তৃষিত তপ্ত মরুর মুখে !
প্রাণ কুরঙ্গ চপল মায়ার জালে
জড়ায়েছে কেন ভীরু দুর্ব্বল মন ?
দেখেছ কি তার স্বপন চক্রবালে
রাঙা সন্ধ্যার আলোকের স্পন্দন ?
স্মরণে তোমার শ্রাবণের ধারা জলে
যে বীজ রোপণ করেছিলে একদিন,
আজি কি তাহার শ্যামল ফসল তলে
তোমার প্রমজ বেদনা হয়েছে লীন ?

অনুবাদ সাহিত্য



জোড়-বিজোড়

শ্রীমতী সুমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়

[আফ্রিকানের লেখা গল্প ও উপন্যাস ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হ'চ্ছে। লাইবেরিয়ানের লেখা একমাত্র উপন্যাস ১৯৩২ সালে ইংল্যাণ্ডে প্রকাশিত হয়, নাম "Love in Ebony : A west African Romance" (ঘন কৃষ্ণের প্রেম : পশ্চিম আফ্রিকার আখ্যান) লেখক Varfelli Karlee (আসল নাম চার্লস্ কুপার) ; বইটি দুষ্প্রাপ্য। এর অংশ-বিশেষ স্বর্গত গ্রন্থকারের স্ত্রীর অনুমতিক্রমে অনূদিত।]

অভিসার

(১)

সবুজ ভেলভেটের নতুন পোষাকে সেজে, মাথায় সেই রংয়ের রুমাল বেঁধে, পায়ে সবুজ চটি, চুলে সোনার-ছোরা গোঁজা, গলায় হার, আর দুই বাহুতে প্রেমাস্পদের উপহার হাতীর-চামড়ার-অনন্ত প'রে, গরবিণী বেশে ফারমাটা তার মার ঘর থেকে বেরুল, মমলু বে-র সঙ্গে গত রাতের ব্যবস্থামত নিভৃতে দেখা করতে।

কুমার বাহাদুর পিউ আসার পর থেকে যে অবস্থার সৃষ্টি হ'য়েছিল তা থেকে পালিয়ে কাল সে বেঁচেছে। মমলু যে কাহিনী গত কাল বিকেলে শুনিয়েছে তাতে ফারমাটা শুধু আতঙ্কিত হয়নি কুমার বাহাদুরের প্রতি যদি সামান্য কোন আকর্ষণ মনের কোণে উঁকি দিয়ে থাকে কোন সময়ে, তা অন্তর্হিত হয়ে তার বদলে একটা বীতরাগ সৃষ্টি হ'য়েছে। (মমলুর প্রেমাসক্ত এক কুমারী পীউ-এর কামনা চরিতার্থ ক'রতে বাধ্য হয় ও পরে আত্মহত্যা করে; সেই থেকে পীউ-এর উপর মমলুর জাতক্রোধ)। অবশ্য পীউকে স্বামীত্বে বরণে এই অস্বীকৃতি কতদূর টিঁকতো যদি মা ইয়াদানা মমলুর কাহিনী শোনার পরও বিবাহ প্রস্তাবে রাজি হ'তেন বলা শক্ত। ইয়াদানা মেয়েকে তাদের আলোচনার কোন ইঙ্গিত দেননি। ফারমাটার পক্ষে কাজেই মার মন-জানার সুযোগ হয়নি; এমন কি মমলুর এই আকস্মিক আবির্ভাব সম্বন্ধেও, মা ফারমাটার প্রচ্ছন্ন প্রশ্নের কোন উত্তর দেননি। এ সব ব্যাপারে মায়েদের অসীম ক্ষমতার কথা তার জানা ছিল; আর এ-প্রসঙ্গ নিজে তোলা নির্লজ্জতা।

সারা রাত এই দুশ্চিন্তার বোঝা তাকে পীড়িত করেছে। তার মনে আর সন্দেহ নেই যে দিনের আলোয় সে নিজের মতো ভাবতে পারলেও, রাতের অন্ধকারে তার একমাত্র চিন্তা মমলু। মমলুর কথার সম্মোহনী শক্তি, জলজলে চোখ, মিষ্ট কণ্ঠস্বর তাকে ঘিরে ছিলো,—এ যেন আবার সেই বাজারে প্রথম দেখার সময় যে অতর্কিত প্লাবন তাকে প্রায় ভাসিয়ে নিয়েছিল সেই অবস্থা। কখনো কখনো সে ভাবতে চাইলো যে তার হৃদয়ের দরজায় এই যে বিরামহীন ডাক এ ক্ষণিকের, বোঝাতে চেষ্টা ক'রলো নিজেকে যে সব পুরুষই এক ধাঁচে ঢালা—প্রেম তাদের কাছে বাসনার তেজী মন্দার ঢেউয়ে বেচা-কেনার সামগ্রী মাত্র।

কিন্তু মমলুর সাহস, তাকে পাবার জন্য উদগ্র প্রয়াস, তার নানা দুর্ভোগ স্মরণ করে তো তা মনে হয় না। কুমার বাহাদুর পীউ-এর তুলনায় অবশ্য সে ক্ষমতায় ছোট, কিন্তু দুজনে দু-জগতের; মমলুর প্রেমের স্রোতের নিচতলায় যে বেগবতী ধারা তা ফারমাটাকে না টেনে নিয়ে ছাড়বে না। সে তাকে ভালবাসতে না চাইলেও তার প্রেমের জালে সে জড়িয়ে প'ড়বেই।

নতুন সবুজ পোষাকে চ'লতে চ'লতে ফারমাটার কানে পৌছালো রমজানের উৎসবের ঢোল-আর-সানাই-এর মোহিনী সুর;—দুরন্ত বাসনা তাকে চেপে ধরছিল' নাচের দলে ছুটে যেতে। আধ-অনিচ্ছায়, এই ইচ্ছা চেপে সে ভীড় ঠেলে এগুতে লাগলো। ক্রমে শিমূল গাছের তলায় মমলুকে দেখা গেল।

মমলু সেদিন জরীর কাজ করা লাল জমকালো ঢোলা-কোর্তা, আর নিচে সাদা ড্রিলের সরু পাজামায় সুসজ্জিত। তার লাল ফেজ টুপিতে সোনালী ঝুমকো,—খুবই সম্ভ্রান্ত বেশে ফারমাটার সম্মুখে সে উপস্থিত।

মমলু সেদিন তার বিবেচক ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি বন্ধু ঈয়ফীকে ব'লেছিল যে প্রেম হ'লো ফুলের কেশরের মতো, তার শিকড় মাটীর ধূলোর মধ্যে পোঁতা। ঈয়ফী উত্তরে ব'লেছিলেন, "ফুল শুকিয়ে যায়, বন্ধু সূর্য্যের উত্তাপ প্রখর হ'লে।" মমলু প্রত্যুত্তরে ব'লেছিল, "কিন্তু আমার প্রেম যে জীবন-বৃক্ষের শাখায়ই ফুটেছে।" আজ তার মুখে দীপ্তি, আজ

সে সমস্ত বাধা দূর ক'রে তার জীবনের পরম আকাঙ্ক্ষা পূরণ ক'রবে,—সেই সঙ্গে হয়তো চরম স্বার্থত্যাগেরও প্রয়োজন হ'তে পারে।

ফারমাটার রূপে ও সান্নিধ্যে মমলুর দেহ মন কেঁপে উঠলো। কাছের গাছতলায় একটা বিশ্রাম-কুটীর দেখিয়ে মমলু ব'ললো, "চলনা ভিতরে যাই" ?

ফারমাটার মুখে ক্ষণিকের জন্য ছায়া পড়লো, "না ওখানে নয়"—কেননা আগের দিন মূর্চ্ছার পর তাকে ঐ কুঁড়েতে নিয়ে শুইয়ে রেখেছিল।

মমলু হাসলো। "আচ্ছা আর একটা ঘরে যাই। কিন্তু ঐ কুঁড়ে আমার কাছে আল্লার গৃহের সামিল—ওখানেই তোমায় ফিরে পেয়েছি"।—ব'লতে ব'লতে ফারমাটার হাত ধরে কাছের আর এক কুঁড়েতে ঢুকলো; ঝাঁপ বন্ধ হ'য়ে গেল।

ভিতরটা কেমন যেন ঠাণ্ডা আর অন্ধকার। উত্তেজনা ও ভয়ের রেশে ফারমাটা কিছু দেখতেও পাচ্ছিল না। জানলার জন্য হাত বাড়িয়ে মমলুর হাতে হাত ঠেকলো, মমলুর হাত তার বাহু, কাঁধ, গলা বেয়ে মুখখানাকে জড়িয়ে ধরলো—এই প্রথম একজনের ওষ্ঠ অন্যের ওষ্ঠদ্বয় স্পর্শ করলো। মমলু নিঃশব্দে তারপর স'রে গিয়ে জানলার ঝাঁপ খুলে দিল। সূর্য্যালোক ঝাঁপিয়ে পড়লো ঘরে। সে ব'লে উঠলো "দেখো, আল্লার আলো চারিদিকে"।

তারার মত চোখ দুটি নিয়ে ফারমাটা এগিয়ে এলো মমলুর কাছে। বাইরে শিমুল গাছের নিচে আর একজোড়া প্রেমিক। ঘরের ভিতরকার যুগল বা বাইরের যুগল কেউ-ই কথা কইছিল না, না ছিল তাদের খেয়ালে জনারণ্য, যা তাদের পাশ দিয়ে গতায়াত করছিল—এত আত্মহারা।

মমলু একটু বাদে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে ফারমাটার দিকে তাকিয়ে তার বাহু স্পর্শ ক'রে ব'ললো—"আমি যে তোমায় ভালবাসি সে কথা জানো না কি ?"

"জানি বৈকি মমলু, কিন্তু, আমাদের পরিবারকে সে কথা জানাও নি কেন ?"

"কারণ তোমার মন আমি জানতাম না।"

চক্‌চকে চোখ দুটি তুলে ফারমাটা জবাব দিলো "আমার মনের কথা তুমি জানতে না ? এখন জানো তো "মাহ্‌জা" (মহাশয়) ?"

মমলু এই প্রথম ফারমাটার কণ্ঠে প্রেমের স্বীকৃতি শুনলো, তাকে আবার সে জড়িয়ে ধরলো। ফারমাটা হঠাৎ কেঁপে উঠলো।

"ফারমাটা কি হ'য়েছে ? কাঁপছো কেনো ?"

"আমার ভয় করছে"—আস্তে আস্তে এই কথা কয়টি ব'লেই সে মমলুর বাহুতে মুখ ঢাকলো।

"কোন পুরুষ যদি কোন মেয়ের অনিচ্ছায় তাকে স্ত্রীত্বে বরণ করে সে 'পালাভা' (Palava) (হাঙ্গামা) আনে, আর মেয়েদের নিয়ে 'পালাভা' হ'চ্ছে সব চেয়ে মুস্কিলের ব্যাপার।"

ফারমাটা মাথা নাড়লো; কিন্তু, মমলুর চোখে না তাকিয়ে বলতে লাগলো—"বিনা অনুমতিতে অন্যের রাজত্বে প্রবেশ করা যুক্তিযুক্ত নয়। একদিন তুমি হয়তো আর আমায় ভালবাসবে না। সত্য জানলে, সেদিন তুমি আমায় ছোট ক'রে দেখবে।"

ফারমাটার চোখ ফেটে জল এলো, সে কাছের একটা টুলের ওপর ব'সে প'ড়লো। মমলু রুমাল বার ক'রে চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা ক'রলো "আমি কাছে ব'সে আছি, তবু কান্না কেন ?"

হঠাৎ ফারমাটা সোজা হ'য়ে ব'সলো, মমলুর বাহু-বেষ্টনের মধ্যেই। কণ্ঠস্বরে একটা দৃঢ়তা এনে সে ব'লতে লাগলো, "মমলু, জানো, আমি তোমায় ভালবাসি। আশা করি আমি এখন যা ব'লছি তা তুমি বুঝবে। 'পোরো'র (গুপ্ত উপজাতীয় শিক্ষা শিবিরে বালক-বালিকাদের কয়েক মাস থেকে কয়েক বৎসর প্রত্যেক প্রাচীনপন্থী আফ্রিকান পাঠাতে বাধ্য) শিক্ষা তুমি জানো প্রেম ও সততা সম্পর্কে; 'পোরো'র দীক্ষার পর তার অনুশাসন না মানার সাধ্য কার ?—মমলু, আমার যখন দশ বৎসর বয়েস তখন আমি বাগদত্তা হই।"

মমলু প্রস্তর মূর্ত্তির মত হাঁটু গেড়ে ব'সে রইলো ফারমাটার দিকে তাকিয়ে। তার স্বর্গ ধসে পড়ছে যে চার পাশে। এই প্রতিশ্রুতি যে মৃত্যুর মতই অলঙ্ঘনীয়। আল্লার হস্তক্ষেপ ভিন্ন কোন পথ নেই ফারমাটাকে পাবার।

এই শোক ও আঘাতের মধ্যেও একটা আশার ক্ষীণ রেখা দেখা দিল মমলুর মনে। "সেই লোকটি এখন কোথায়।" সে জিজ্ঞাসা ক'রে ব'সলো।

ফারমাটা মাথা নেড়ে জবাব দিল "আমি জানি না। আমরা ছেলে বয়সে একত্র বেড়ে উঠেছি, খেলায় দিন কাটিয়েছি। যুদ্ধ যখন তাদের গ্রামে পৌছালো, তাকে বন্দী ক'রে দাস হিসাবে বিক্রি ক'রে দেয়। তারপর সে বেঁচে আছে কিনা তাও জানা নেই। কিন্তু তার বাবা-মা ও আমার বাবা-মার মধ্যে প্রতিশ্রুতি ঠিকই আছে।"

সে মমলুর কাঁধে হাত রাখলো। এতদিনের গোপন কথা, বাল্যের সখার স্মৃতি যার সঙ্গে লুকোচুরি, হাসাহাসি, গাছ থেকে গাছে, সবুজ বনানীর মধ্যে, নদী আর নালায় যার সঙ্গে মাছ ধরে বেড়িয়েছে, ঢোল-সানাই-এর সুরে যার সঙ্গে নেচেছে—আজ তার স্মৃতি দুঃখের মাঝেও মধুমাখা, নৈরাশ্যের মধ্যেও চিরপবিত্র। সে স্মৃতি-রাগ বা ভর্ৎসনায় মোছা যায় না—যদিও সে জানে এ শুধু একটা স্বপ্ন যা ভাগ্যচক্রের বিবর্তনে টুকরো হ'য়ে গেছে হয়তো, যার একমাত্র অবলম্বন অলঙ্ঘনীয় এক প্রতিশ্রুতির রেশ।

মমলু ধীরে ধীরে বললো "তাহ'লে বুঝলাম আমার নিয়তির ফের। যদি নিয়তি সদয় হন্…।"

"তাহ'লে তোমার কপাল খুলবে।" ফারমাটা মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ব'ললো। "কিন্তু, যদি আমার হারানো জন ফিরে আসে তুমি প্রত্যাখ্যাত হবে। আল্লার এই বিধান। আবদুল্লা ফিরলে, আমার প্রতিশ্রুতি ও আমার সম্প্রদায়ের প্রতিশ্রুতি রক্ষা আমি ক'রবই।"

অতর্কিতে নিস্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে বাজনা শোনা গেল, তাদের কুঁড়ের পাশ দিয়ে নৃত্যরত একদল গাইতে গাইতে, সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'রে হাততালি দিতে দিতে ঝড়ের মত চ'লে গেল।

ফারমাটা হেসে মমলুর হাত ধরে ব'লে উঠলো—"চলো নাচি গে।"

মমলু হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ভারি গলায় জবাব দিলো "আমায় ভাবতে দাও। অনেক কিছুর ব্যবস্থা ক'রতে হ'বে। সূর্য্যাস্তের পর আমি আবার আসবো।"

ফারমাটার মন হাল্কা হ'য়ে গিয়েছে। চারধারের বাজনা তার রক্তে দোলা এনে দিচ্ছিল। সে আধ-হাসি হেঁসে, রুমাল উড়িয়ে, নাচের দোলায়, ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল।

(২)

প্রত্যাবর্ত্তন

লাইঙ্গা গ্রামে এসে সহযাত্রী ও পথ-প্রদর্শক যেযের কথা মত মমলু "বুজি" উপজাতীয় বেশ নিল, যাতে দুই জনে ভাই ব'লে পরিচয় দিতে পারে। চাঁদ মিলিয়ে যেতে যেতেই তারা বারকাদু সহরের মাইল পাঁচেকের মধ্যে এসে পৌছালো। সেখানে রাস্তা দুদিকে বেরিয়ে গেছে।

যেযে হটাৎ থেমে পথের দিকে তাকালো। একটা পথ গেছে পূবে, খানিকটা খোলা মাঠের ওপর দিয়ে। অন্য পথ উত্তরের দিকে, গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। পূবের পথের গোড়ায়, পাশের ঝোপ-ঝাপ থেকে সংগৃহীত তাজা পাতা উপ্পুড় ক'রে রাখা হ'য়েছে। অন্য পথটিতে ঐ পাতারই সবুজ দিক দেখিয়ে ফেলে রাখা হ'য়েছে। মমলু-ও ভাল ক'রে পাতাগুলি দেখলো না ছুঁয়ে। সে সোজা হ'য়ে দাঁড়াতেই যেযে-র সঙ্গে চোখাচোখি হ'ল।

মমলুর মুখ গম্ভীর। "বুঝলাম পূবের রাস্তায় এক 'পোরো' সমিতির জমায়েত চ'লছে। উত্তরের রাস্তা ধ'রে যেতে হবে।"

যেযে-ও ব'ললো—"নিঃসন্দেহ। কপাল ভাল যে আলো ছিল এই চিহ্ন স্পষ্টভাবে চোখে পড়বার মতো। বাবার এক বন্ধু একবার এসব গ্রাহ্য না ক'রে নিষিদ্ধ রাস্তায় গিয়েছিলেন। তিনি কখনো দীক্ষিত হননি এবং বন্ধুদের সাবধান-বাণী শুন্‌লেন না। গানের কলি গুণ্ গুণ্ ক'রতে ক'রতে, ওল্টানো পাতা মাড়িয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন। তাঁর আর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।"

মমলুও সম্মতি জানালো। যেযে ঠিকই ব'লেছে এই ব্যাপারে। 'পোরো' আফ্রিকার গভীরতম গুপ্ত-সাম্প্রদায়িক-রীতি-নীতির-ধারক; বিচিত্র, ক্ষমাহীন, আশ্চর্য্য ও ভয়াবহ। বাইরের কোন লোকের পক্ষে এর ব্যাখ্যার চেষ্টা বা একে বুঝবার চেষ্টা করাও মূর্খতা, এর আচার-অনুষ্ঠান সুকঠোর। নৈতিক-ব্যবস্থা থেকে নিষ্ঠুরতম বর্ব্বরতার সমস্ত ক্রিয়া-কলাপের মধ্য দিয়ে এর সাধনার পথ।

বেলা প'ড়তে প'ড়তেই বরকাদু দেখা গেল। দূরে যেযে দেখালো পাহাড়ের উপর সূর্য্যালোকে ঝক্‌ঝকে বড়-মসজিদের গম্বুজ। প্রায় দশ ক্রোশ দূরে তিসাইবু পর্ব্বত-মালার শ্রেণী, সবুজ বনানীর পিছনে,—সেখান থেকে নেমে আসছে লোফা নদী তার জল সোনালী—আর যেখানে ছায়া—সেখানে বেগুনির রেশ; সামনে ত্রিকোণ ছাদ গ্রামের কুঁড়ে-গুলির।—মমলুর নিঃশ্বাস যেন ক্ষণেকের জন্য থেমে গেল তার আশার লক্ষ্য দৃষ্টিগোচর হওয়ায়!

দুজনে সহরে যে ঢুকলো তাতে দোর-গোড়ায় ক্রীড়ারত ছেলেমেয়েরাও ফিরে তাকালো না। কারণ দুজন বুজি-চাষার প্রবেশ কোন লক্ষ্যণীয় বিষয় নয় এ সহরে—কত বিদেশী যাচ্ছে আর আস্‌ছে।

বরকাদুতে থাকতে হ'লে কতকগুলি অবশ্য-কর্ত্তব্য আছে পরদেশীর পক্ষে। পরদিন প্রাতে বুজি পোষাকে যেযের সঙ্গে 'ফাবে-বেল্লে'য় (সভাস্থলে) গিয়ে হাজির হ'ল মমলু, স্থানীয় গোষ্টিপতি যেখানে সপার্ষদ সভাস্থ ছিলেন। যেযের সম্পর্কে কোন অনুমতির হাঙ্গামা উঠ্‌লো না, কারণ গোষ্টিপতি তাকে জানতেন ও খাতির করতেন। যেযে তখন মমলুকে তার বুজি নামে পরিচিত করিয়ে, তার হ'য়ে প্রচলিত সেলামী দাখিল ক'রলো—সাদা কাপড় কয়েক গজ, "জিন্"-মদ এবং কয়েক প্রস্থ তামাক পাতা।—

—অনুমতি পাওয়া গেল ব্যবসা করবার ও বাসের তাঁদের আশ্রয়ে।

* * * *

যেযের পুরানো বন্ধুদের সতর্ক ভাবে প্রশ্ন করে বা হাটে বাজারে অপরিচিতদের সঙ্গে কথা ব'লে আবদুল্লার কোন সন্ধানই মিললো না। সহরের ভিতরে ও বাইরে দাসের সংখ্যা তো অনেক, কিন্তু বেগার-খাটানো ছাড়া কেউ তাদের সন্ধানে ব্যস্ত নয়। তাদের খোঁজ খবর নিলে অন্তরা হয় হাসে নয় কোন গা-ই করে না।

একদিন প্রাতে বাজারের পথে মমলু দেখলো এক বৃদ্ধা 'জো' (পোরো সমিতির অধিনায়িকা)-কে একটা লাঠিতে ভর দিয়ে অতি কষ্টে হাঁটতে। বৃদ্ধার একাকিত্বের কথা লক্ষ্য ক'রে এবং প'ড়ে যেতে পারেন মনে ক'রে, মমলু

তাঁকে হাত ধরে নিজের দোকানে নিয়ে এলো। সূর্য্যালোক থেকে দূরে একটা টুলে বসিয়ে, নিজের বুদ্ধি-পরিচয় দিয়ে, হাঁটু গেড়ে ডান হাত দিয়ে মমলু তাঁর পা স্পর্শ করলো।

উপজাতিদের মধ্যে যুদ্ধে ছেলেরা মারা গেছে, বৃদ্ধার সঙ্গহীন মন, বৃদ্ধের ও শিশুর সহজাত দৃষ্টি দিয়ে মমলুকে দেখলেন এবং আপন সন্তান-জ্ঞানে তাকে দেখবেন ব'ললেন।

*   *   *

একদিন অপরাহ্ণের দিকে যখন সূর্য্য ঢলে প'ড়েছেন এবং দক্ষিণ পুব দিকের হাওয়া এসে গরমটা একটু নরম করেছে, হঠাৎ বাজারের মাঝে পরদেশী একদল উপজাতীয় লোকের সঙ্গে স্থানীয় কয়েকজনের ভীষণ বাগবিতণ্ডা সুরু হ'লো। প্রথমে কান না দিলেও ও কোন উৎসাহ না দেখালেও, কয়েকটা কথা কানে যেতেই মমলু উঠে দোকানের সামনে দাঁড়ালো। মুসুবুদুর এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির এক ছাগ চুরি নিয়ে হাঙ্গামা। পরদেশীরা এই ছাগের খোঁজে এসে রূঢ় ভাবে ব'লছে যে ফরাসী অঞ্চলের সীমান্ত অতিক্রম ক'রে এই ছাগ এখানে এসেছে এবং বরকাদুর কোন অসৎ লোক তাকে লুকিয়ে রেখেছে।

এই লুকিয়ে-রাখা ছাগের নাম আবদুল্লা শুনেই কাল বিলম্ব না করে মমলু যেযেকে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে সংবাদের জন্য অপেক্ষা করলো বিকেল পাঁচটা পর্য্যন্ত, যখন জেলার কমিশনারের হুকুম মত সমস্ত দোকান বন্ধ করতে হয়। হঠাৎ তার মনে পড়লো 'জে' বৃদ্ধার কথা। সে সোজা তাঁর কুঁড়েতে গিয়ে হাজির হ'লো,—যেযেকে মিছে কথা বলে যে দোকানে একটা—কিছু ফেলে এসেছে। বৃদ্ধা তার টোকা বুঝতে পেরেই তাকে ঘরে ঢুকতে বললেন।

মমলুর আচম্বিত আগমনে বৃদ্ধা আশ্চর্য্য হন্‌নি। পরে যখন সে তাঁর আসনের পাশে ব'সে তার নিজের সত্য নাম-ধাম এবং বয়কাদুতে আসার কারণ ব'ললো তখনও তিনি কোন ভাবান্তর দেখাননি। কিন্তু যখন সে বাজারের হাঙ্গামার কথা বিবৃত করলো, তাঁর ক্ষীণ দেহ কাঁপতে লাগলো ও গাল বেয়ে চোখের জল গড়াতে সুরু করলো।

মমলুর আর সন্দেহ রইল না যে এই বৃদ্ধাই আবদুল্লার সন্ধান জানেন। মমলু প্রতিশ্রুত হ'লো যে বৃদ্ধার কাহিনী কখনও কাউকে বলবে না। তারপর জানতে পারলো যে একদিন জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহের সময় কি ক'রে তিনি আবদুল্লাকে দেখতে পান, এবং সে এখন সহরের কয়েক মাইল দূরে এক কুঁড়েতে; তাকে যারা চুরি ক'রে এনেছে তার প্রাক্তন প্রভুর কাছ থেকে, তাদেরই জনকয় অনুচরের প্রহরায় আছে। অতি সঙ্গোপনে এবং বার্দ্ধক্যের দারুণ কষ্টে, বৃদ্ধা তাকে মাঝে মাঝে আপন সামান্য আহার্য্য থেকে অংশ পৌঁছে দিয়েছেন। (সেই রাতেই আবদুল্লার কুটিরের সন্ধান ক'রে, লুকিয়ে ঢুকে ক্ষীণপ্রাণ আবদুল্লাকে ফারমাটার বন্ধু হিসাবে পরিচয় দিয়ে মমলু ভোরের আলোয় ফিরে এলো সঙ্গী যেযের সহায়তার জন্য।

*   *   *

যেযে কাজের লোক। সে বুঝলো এ ব্যাপারে আরও লোক চাই। মমলুকে তাড়াতাড়ি খাওয়াবার ব্যবস্থা ক'রে দুজন বিশ্বাসী লোকের সন্ধানে সে বেরুলো। সহরের এক প্রান্তে তাদের নিয়ে, বার শিলিং (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আমেরিকান ডলার বিশেষ ক'রে চালু হ'য়েছে, তার আগে ইংল্যাণ্ডের মুদ্রা এখানে চলতো) তামাক খানিকটা এবং বস্ত্রখণ্ড দিয়ে, গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি আদায় করলো। ইতোমধ্যে মমলু বৃদ্ধা 'জে'র কাছে গেল এক থলে ভর্ত্তি রৌপ্য মুদ্রা উপহার দিতে,—তাঁর সহায়তা ভিন্ন আবদুল্লা-উদ্ধার সম্ভব হ'ত না।

কিন্তু, এদিনের অভাবিত ঘটনার এখনও শেষ হয়নি। ফিরে মমলুর নজরে পড়লো যেযের মুখে আতঙ্কের ছায়া এবং সে ঘরের সামনে ঘন ঘন পায়চারি করছে। "ব্যাপার কি?"—মমলু জিজ্ঞাসা করলো, ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে।

"আল্লা মহিমময়।" যেযে ব'লে উঠলো, "তোমার ঋণ শোধ হ'য়েছে। কুমার পীউ পরলোকে। আমি বাহক-দুজনের সঙ্গে ব্যবস্থা ক'রে ফিরছি, পথে ভনজামো-ফেরৎ এক ব্যাপারীর সঙ্গে দেখা। তার কাছেই শুনলাম যে শুন্দেদুর কাছে লোফা নদী পার হ'তে গিয়ে কুমার ডুবে মারা গেছে। এখনও বোধ হয় তার দেহ ভনজামার মৃতের কুঁড়ে ঘরে পুণ্য-অগ্নি ধূমের মধ্যে ঝুলছে! আর তার পার্শ্বচর মূসার দেহ-ও ঝুলছে,—সে মৃত্যু বরণ ক'রেছে প্রভুর সঙ্গে পরলোকেও থাকবার জন্য।"

ক্ষণেকের জন্য মমলুর চোখের সামনে একটা কালো ধোঁয়া যেন ঘূর্ণিপাক খেল। সে টেবিলের উপর ভর দিল। তারপর আর কোন কথা না ব'লে দুজনে হাঁটু গেড়ে, মাথা নুইয়ে তিনবার ভূমিস্পর্শ ক'রলো।···

তারাহীন রাতের আঁধারে তারা বেরুলো। পাহাড়ে জঙ্গলে পথ হাঁতড়ে-হাঁতড়ে মমলুর নির্দ্দেশমত, তারা ত্বরায় ও নিঃশব্দে কুঁড়েতে পৌছালো। প্রহরীরা এবার জেগে ছিল, তাদের তাঁবুতে আগুনের কাছে কুণ্ডলী ক'রে। কাজেই যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তারা শোবার ব্যবস্থা ক'রলো, ততক্ষণ এই দলকে অপেক্ষা ক'রতে হ'লো।

মমলু আর যেযে একত্র কুঁড়েতে ঢুকলো। মাদুরের উপর সেই অসাড় অবস্থাতেই শুয়ে ছিল আবদুল্লা। মমলুর স্পর্শে সে একটু নড়বার চেষ্টা ক'রে ব্যথায় ক্ষীণ আর্ত্তনাদ ক'রলো; চোখ দুটো খুলবার সময় একটা চকিত-ভয়ের রেখা দেখা দিল। মমলু আস্তে আস্তে ব'ললো "চলুন এখন যেতে হবে।"

আবদুল্লা গা-তুলবার একটা বৃথা চেষ্টা ক'রতেই, মমলু যেযের সাহায্যে তাকে আলগোছে তুলে নিল, তার দেহটা

দেশী বোনা কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে। সন্তর্পণে তারা বেরিয়ে প'ড়লো।

খানিকটা দূরে লম্বা একটা লাঠিতে একটা দোলা ঝুলিয়ে বাহকরা দুজন অপেক্ষা-রত ছিল। এমনও আশঙ্কা হ'চ্ছিল যে দোলার ঝাঁকুনিতেও প্রাণবায়ু বেরিয়ে যেতে পারে! মমলু আবদুল্লার বুকে হাত দিয়ে যেযেকে যখন ব'ললো, "এখনও জীবন ধুক্ ধুক্ ক'রছে," আকাশে চাঁদও যেন সেই সময় দেখা দিল। তাদের সামনের সরু বাঁকা পথ প্রেমের ভরসার জ্যোতিতে ঝল্মল্ ক'রছে তখন।

মিলিতা

(৩)

অতি প্রত্যুষ। জিগিদার বৃক্ষচূড়ায় ও গৃহছাদে আলোর কণিকা মাত্র ছুঁয়ে ভোরের মুক্তা-বিন্দুর সৃষ্টি ক'রছে, পাখীরা স্তব্ধ আকাশে সবে তাদের ঘুমভাঙা কাকলি সুরু ক'রেছে। ছোট এক পাহাড়ের উপরের গৃহদ্বারে ফারমাটা নিশ্চল অবস্থায় পথের দিকে স্থির-দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

সে সম্পূর্ণ একাকী, কেউ তখনও জাগেনি। পাখীর ডাক, বা কোন শব্দ তাকে তার স্বপ্নহীন নিদ্রা থেকে জাগায় নি। যেন হঠাৎ মনে হ'ল এক অদৃশ্য মূর্ত্তি তার শয্যাপার্শ্বে, তার নয়ন-পল্লব খুলে গেল আসন্ন আলোকের অভ্যর্থনায়। অতি দ্রুত বেশবাস প'রে অজানিতের ডাক তাকে দরজায় হাজির ক'রেছে। দরজা খুলতেই ঠাণ্ডা হাওয়ার এক ঝলক তাকে সিক্তিত করলো।···

দূরে, অস্পষ্টভাবে সহরের দিকের প্রশস্ত পথ তার চোখের সামনে। সেদিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ, মাথা দেওয়ালে ছুঁইয়ে দুগাত দুপাশে ঝুলিয়ে, এক পা একটু পেছনে তুলে দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণাঙ্গী ক্ষীণ-কটি যুবতী—অজানা, না-বোঝা এক আশা-আশঙ্কায়।

ক্রমে আলো দেখা দিল। হঠাৎ যেন আকাশময় শিঙ্গা-ফুঁকে সূর্য্য বিদ্যুৎবেগে ও অপূর্ব্ব তেজে দিগ্বলয়ে দেখা দিলেন—ষতামু রাতের যবনিকা ছিন্ন হ'ল। আচম্বিতে ফারমাটার ঝুঁকে-পড়া দেহ সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো, সূর্য্যালোকিত পথে কি যেন নড়ছে! দুরন্ত হৃদস্পন্দন তার নিজের কাণেই দাপাতে লাগলো!—অত ধীরে আসছে কেন? বিন্দুবৎ এখনো মনে হয়। সময় যেন কাটছে না। ছুটে সে যেতে পারতো, কিন্তু পা যেন মাটীতে পোঁতা।···ক্রমে দেখা গেল জনচার লোক, তার দুজন কাঁধে কিছু বইছে।

অতি মন্থর-গতিতে তারা আসছে যেন। ফারমাটার দু-চোখ ফেটে জল গড়াতে লাগলো, মুখ ঢাকতে গিয়ে তার দু-হাত জলে ভিজে গেল।—চাপা গলার শব্দে সে চোখ খুলে তাকাতেই দেখলো মমলুকে, আর তার কাছে অতি সন্তর্পণে দুজন লোক তাদের কাঁধ থেকে বোঝা মাটিতে নামালো।

ফারমাটা আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলো। মমলু তাকে ধরে ফেলে জানালো "ফারমাটা, আবদুল্লাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে এনেছি। অন্য লোকেরা সরে গেল। অল্পক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ফারমাটা দোলার পাশে হাঁটু গেড়ে ব'সে মমতাময় কণ্ঠে "আবদুল্লা, ও আবদুল্লা।" ব'লে, তার দেহের নিচে হাত দিতে যেতেই, আবদুল্লা এই প্রথম নড়ে হাত তুললো। "ফারমাটা, আমায় ছুঁয়ো না। সর্ব্ব দেহ আমার দুষ্ট-ক্ষতে ভরা।" এক কনুইয়ে ভর-ক'রে গলার কাছটা অন্য হাত দিয়ে খুলে বুকে দেখালো পশ্চিম আফ্রিকার 'ক্র-ক্র' ক্ষতের ভয়ঙ্কর দগ্‌দগে ঘা। ফারমাটার চোখের জলে তার ঘায়ে ভর্ত্তি হাত ধুয়ে যেতে লাগলো।

"বছরের পর বছর ফারমাটা তোমার জন্য কেঁদেছি। আল্লা দয়ালু। মরণের আগে তিনি তোমার মুখ আমায় দেখালেন।" ব'লতে ব'লতে কথা গলায় আটকে গেল। একটা হাত মমলুর দিকে অন্যটা ফারমাটার দিকে সে এগিয়ে দিল। দোলার দুপাশ থেকে মরণ-পথ-যাত্রীর দেহের উপর মমলু আর ফারমাটার হাত মিলিত হ'ল, আবদুল্লার বরফের ঠাণ্ডা হাত তাদের গরম হাত ছুঁল।

সুস্পষ্ট স্বরে সে ব'ললো "মমলু, ফারমাটাকে তোমার হাতে দিয়ে গেলাম, তাকে সুখী ক'রো, তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসো। নইলে আল্লা যে অনুগ্রহ তোমায় ক'রলেন, সেই রকম শাস্তি তোমায় দেবেন।"—একটু থেমে, ফারমাটার চোখে চোখ রেখে, আবার ব'লতে লাগলো—"সৎ ও সাধু লোকের হাতে তোমায় দিচ্ছি। তার প্রেমের উপযুক্ত হ'য়ো, তাকে সেবা-যত্ন ক'রো। তোমার আর আমার পরিবারের প্রতিশ্রুতি আজ শেষ হ'লো। আল্লার আশীর্ব্বাদ"—মমলু চট্ ক'রে আবদুল্লার দেহ জড়িয়ে ধ'রলো; তারপর তাকে দোলায় ভাল ক'রে আবার শুইয়ে দিল।

সূর্য্যালোকিত নিস্তব্ধের ছায়ায় দুজনেই জানলো আবদুল্লা মহম্মদের চিরশান্তির রাজ্যে প্রয়াণ ক'রেছে।

হতভাগ্য

সুনীল বসু

হে হৃদয় তুমি যেন অস্থির কাগজের টুক্‌রো—
কেবল যেন উড়ে উড়ে ঘুরছ ধুলোভরা রাস্তায়,
দুষ্ট হাওয়ার ঝাপটে!
বলছ কত যে তার প্রজ্ঞা, কত যে তার ধৈর্য্য,
কত যে তার করুণা।

তার কোলের উপর রাখা ছোটো ছ'টি হাতের ফাঁকে
সরমে নোয়ানো তার মাথা, নিশিতে আসবে আরও নুয়ে ;—
যেখানে ওষ্ঠবৃন্তের পাশে, যেখানে ঝিকিমিকি খেলছে ছায়া—
সেখানে দেখবে অপার ক্ষমা, আর দেখবে তার দার্ঢ্যের গুণ,
আর তার শান্তি রয়েছে নিবিড় শান্তিতে,
এসো তুমি এসো তার কাছে, এসো তার সান্নিধ্যে !'

কিন্তু এসব সে গ্রাহ্যই করবে না। আমাকে আসতে দেখে
সে মুচকি হাসতেই থাকবে শুধু—
তাই আমি স্বপ্নে স্বর্গই ভাবি সমস্তকে।
দেবে, দেবে সে আমি যা চাই, দেবে সে চুম্বন ছোঁয়া—
বক্ষের আশ্লেষ :
পবিত্র হাওয়ার বুকে খুলবে বিস্তৃত শান্তির তোরণ দুয়ার,
অপার ক্লান্তিকে উধাও করে নেবে সে আমায় আলয়ে,—
ঈশ্বর থেকেও শুভ্র মমতায়।
কিন্তু হৃদয়, হায়রে হৃদয়,—
এসবে তার কিছুই যায় আসে না !

রুপার্ট ব্রুকের কবিতার ভাবানুবাদ

সুস্থ জীবন

শ্রীদীনেশচন্দ্র ঘটক (ষ্টীলমান)

আপনাকে যদি কেউ প্রশ্ন করে যে আপনি ব্যায়াম করে কি করবেন, আপনি উত্তরে কি বলবেন? আপনি হয়ত বলবেন, "কিছু নাহয় ত অন্ততঃ উত্তর-কলিকাতা-শ্রী হ'তে পারব ত !" কিন্তু তা নয়। আপনার উত্তর হওয়া উচিত, "সুস্থ জীবন যাপন করব, সবল হ'ব।" ও সব "শ্রী" খেতাব রেখে দিন তাঁদের জন্যে, যাঁরা ব্যায়ামকে নিজেদের পেশা করে নিয়েছেন বা করে নিতে চান। কিন্তু আপনার ত পেশা ব্যায়াম নয়। ব্যায়াম ছাড়াও ত' অনেক কিছুই করবার আছে আপনার। কিন্তু তাই বলে এ কথা বলছি না যে ব্যায়াম করবেন না। ব্যায়াম নিশ্চয়ই করবেন —ব্যায়াম না করলে স্বাস্থ্য ভালো রাখতে পারবেন না ; আর স্বাস্থ্য ভাল না হ'লে কোনও কাজই সুষ্ঠু ভাবে করতে পারবেন না। অর্থাৎ ব্যায়ামকে আপনার অবশ্য করণীয় জিনিষের মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ে রাখবেন কিন্তু শরীর কর্মঠ রাখতে আপনি যা যা করবেন, তাতে প্রথম ও প্রধান স্থান দেবেন ব্যায়ামকে। তাই বলছিলাম যে শরীর সুস্থ ও সবল রাখতে, কর্ম্মক্ষম রাখতে, ব্যায়াম করবেন। ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ হ'বেন বলেই যে গান শিখতে হ'বে তাত' নয়। তবে এ কথাটা অবশ্য স্বীকার করতেই হ'বে যে বড় হ'বার জন্য একটা লক্ষ্য চাই, যা' প্রেরণা দেবে।

ব্যায়ামের, শুধু ব্যায়ামের নয়—সব কিছুরই, প্রধান কথা হচ্ছে মনঃসংযোগ। মনঃসংযোগ না করে আপনি যত কঠিন ব্যায়ামই করুন না কেন, কিছুই হ'বে না। যে মাংস-পেশীর ব্যায়াম করছেন, সে মাংস পেশীর উপর সম্পূর্ণ মনঃসংযোগ করতে হ'বে, যাতে পূর্ণ আকুঞ্চন হয়। সকলেই জানেন, এমন একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ছুতোর মিস্ত্রী সারাদিন খাটছে, খাটছেও অনেকদিন ধরে, এবং তাতে তার মাংসপেশীর যথেষ্ট সঞ্চালনও হচ্ছে কিন্তু তার চেহারা ও বছরখানেক মন দিয়ে ব্যায়াম করছেন এমন একজনের চেহারা পাশাপাশি রেখে তুলনা করুন। তফাৎটা আমাকে বলে দিতে হ'বে না, আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন।

দ্বিতীয় কথা হ'চ্ছে সংযম। সংযম না জানলে পৃথিবীতে স্থান নেই। মনের ওপর আধিপত্য বিস্তার করলে বচনে ও কর্ম্মে সংযম নিজে থেকেই আসবে। আমাদের মনটা এমন একটা জিনিষ, যা আমাদের হাতে ছাড়া আছে, অথচ আমাদের দ্বারা সে এক মুহূর্তে খুব ভাল কাজও করিয়ে নিতে পারে কিম্বা পৃথিবীর জঘন্যতম কাজও করিয়ে নিতে পারে। ঠিক ঘোড়ার মত। বল্গা আমাদের হাতে—একটু অন্যমনস্ক হ'লেই খানা ডোবায় পড়তে পারে, আবার ঠিক মত চালাতে জানলে স্বচ্ছন্দগতিতে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারে। ঠিকমত চালাতে জানা চাই। মনের ওপর সংযম রাখতে হ'লে চাই মনের জোর। সেই মনের জোরটা আনতে হ'বে। ব্যায়াম করলে বেশ মনের জোর পাওয়া যায়।

খাদ্যের ব্যাপার নিয়ে অনেককে মাথা ঘামাতে দেখি। অনেকেও স্পষ্টই বলেন, "আরে মশাই, মাগ্‌গিগণ্ডার বাজারে খেতে পাই না ভালো, ব্যায়াম করব কি করে?" কথাটা ভুল। আমরা প্রত্যহ যা খাই, আমাদের সুস্থ ও সবল রাখতে তাই যথেষ্ট।

খাদ্যের কাজ কি? আমাদের শরীরে প্রতিনিয়তই ক্ষয় হচ্ছে। খাদ্যের কাজ হ'চ্ছে দেহের ক্ষয়পূরণ করা, শরীরের বৃদ্ধি সাধন করা, উত্তাপ রক্ষা করা আর বল দান করা। দেখা গিয়েছে যে খাদ্যের মধ্যে মোটামুটি চার রকম জিনিষ আছে—

(১) আমিষ, যাকে ইংরাজীতে বলে Protein.
(২) শ্বেতসার, ইংরাজী নাম হল Carbohydrate.
(৩) স্নেহ পদার্থ, ইংরাজীতে Fat ও
(৪) লবণ বা Salt.

বেশীর ভাগ খাদ্যেই এই চার জাতীয় জিনিষ কম বেশী মেলে।

(১) আমিষ জাতীয়—দুধ, মাছ, মাংস, ডিম, ছানা, ছোলা ও নানা রকমের ডাল। আমিষ জাতীয় খাদ্যের কাজ হ'ল, শরীরের ক্ষয় পূরণ করা ও নতুন বোধ গঠন করা।

(২) শ্বেতসার—চাল, আলু, ময়দা, চিনি, গুড় ইত্যাদি। এর কাজ হ'ল শরীরে তাপ উৎপন্ন করা। এরা পেশী গঠন করতে পারে না। শ্বেতসার মুখে লালার সঙ্গে মিশে চিনিতে পরিণত হয়। খুবই সহজে হজম হয় ও যেটা উদ্বৃত্ত, সেটা যকৃতে গ্লাইকোজনরূপে ভবিষ্যতের জন্যে জমা থাকে। কিন্তু মনে রাখবেন, এ জাতীয় খাদ্য অত্যধিক গ্রহণ করলে বহুমূত্রের কারণ হ'তে পারে।

(৩) স্নেহ পদার্থ—মাখন, চর্ব্বি, ঘি, তেল ইত্যাদি। শরীরে তাপ উৎপন্ন করে; দেহকে খাটবার শক্তি জোগায়। আমিষ ও স্নেহ পদার্থে পার্থক্য হ'ল এই যে আমিষের উদ্বৃত্ত অংশ শরীরে থাকে না; মলাকারে তাকে আমরা ত্যাগ করি; কিন্তু স্নেহপদার্থ উদ্বৃত্ত হলে শরীরে জমা হয় ভবিষ্যতে কাজে আসবে বলে। একই ওজনের স্নেহ পদার্থ ও শ্বেতসারের মধ্যে বেশী তাপ দান করে স্নেহ পদার্থ। বেশী পরিমাণে স্নেহ পদার্থ গ্রহণ করলে মোটা হবেন কিন্তু।

(৪) লবণ—হৃৎপিণ্ডকে কর্ম্মক্ষম রাখতে সাহায্য করে, অস্থি গঠন করে ও জলীয় অংশের সমতা (Balance) রক্ষা করে। শাকসব্জিতে লবণ পাওয়া যায়।

প্রাত্যহিক আহার্য্যের মধ্যে শাকসব্জি প্রচুর পরিমাণে খাবেন। প্রচুর জল খাবেন; শরীরের ময়লা বার করতে, খাদ্যবস্তুকে তরল করে রক্তে সঞ্চালন করতে—জলের মত ওস্তাদ বোধ করি আর কেউ নেই।

বাঙালীর চিরদিনের খাদ্য হ'চ্ছে ভাত, ডাল, মাছ, শাকসব্জি আর দুধ। এই কটার একত্র সমাবেশ আমাদের খাদ্যে পূর্ণতা দেয়। চাল সম্বন্ধে একটা কথা বলি। ঢেঁকিছাঁটা মোটা চালের ফ্যানে ফ্যানে ভাত খাওয়া অভ্যাস করুন। সবটুকু খাদ্যপ্রাণ—যা ভাত আপনাকে দিতে পারে, ঢেঁকিছাঁটা চালের বেলায় তা ফ্যানের সংগে বেরিয়ে যায়। কলছাঁটা চালে ত' ওসবের বালাই নেই; কাজেই ফ্যান থাকলো বা গেলো। দু'বেলা ভাত না খেয়ে একবেলা ময়দা খাওয়া অভ্যাস করুন। লাল আটা হ'লে ভালো হয়। এতে ভিটামিন অনেক বেশি আছে ও খুবই পুষ্টিকর।

সব খাদ্যের মধ্যে দুধ শ্রেষ্ঠ···কারণ এতে সব জিনিষ বর্ত্তমান। তাই সম্ভব হ'লে দুধ খাবেন। অবশ্য আপনি বলতে পারেন যে কলকাতার দুধে ভিটামিন ছাড়া আর সবই আছে। তবু তার মধ্যে থেকেই যথাসম্ভব ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ নিতে হ'বে। ডিম খাওয়া ভালো, তবে প্রত্যহ ডিম খেলে শরীরে তাপ বেশী হয়। এতে হজমের গোলমাল হ'বার সম্ভাবনা আছে। অনেকের ধারণা মুরগীর ডিম হাঁসের ডিমের চেয়ে উপকারী। এই ধারণাটা যদি আপনার থাকে তাহ'লে ভুল সংশোধন করে নিন। মুরগীর ডিমে ও হাঁসের ডিমে খাদ্যপ্রাণ সম্বন্ধে কোনও প্রভেদ নেই। বরং হাঁসের ডিম আকারে বড় হওয়ায় খাদ্যপ্রাণ একটু বেশিই পাওয়া যায়। তবে হাঁসের ডিমের গন্ধটা একটু আঁসটে ধরণের। আমিষ পদার্থ, বিশেষ করে মাংস বেশি খাওয়া অনুচিত। এতে বাত ও ব্লাডপ্রেসারের সম্ভাবনা আছে।

খাদ্যের অধিকার মধ্যে প্রচুর শাকসব্জি ও ফলমূলের স্থান দিন। তরীতরকারী কেটে খোসা বাদ দেবেন না, খোসা শুদ্ধই খাবেন? অবশ্য এটা "বাবুয়ানী" বিরুদ্ধ। কিন্তু বাবুয়ানী আগে, না স্বাস্থ্য আগে? বেশীর ভাগ "বাবুর" দেখবেন আদ্দির পাঞ্জাবির নীচে মেঘের আড়ালে তারার মত জ্বল জ্বল করছে ৩০´´ বুক ও প্যাকাটির মত হাত পা। বঙ্কিমচন্দ্রের "বাবু" প্রবন্ধ পড়েছেন ত? তার কটা লাইন উদ্ধৃত করলাম:—

"যাঁহাদের চরণ মাংসাস্থিবিহীন শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় হইলেও পলায়নে সক্ষম; হস্ত দুর্ব্বল হইলেও লেখনী ধারণে এবং বেতন গ্রহণে সুপটু; চর্ম্ম কোমল * * * * তাঁহারাই বাবু।"

আপনিই বিচার করুন, কথাটা কি মিথ্যা? কিন্তু কেন এমন হ'বে? এই বদনামটা কি ইচ্ছে করলেই দূর করা যায় না?

আর একটা কথা বলি খাদ্য সম্বন্ধে। ক্ষুধা না থাকলে খাবেন না। একটা সময় ঠিক করে নিন, ঠিক যে সময়টিতে আপনি খাবেন। দেখবেন ক্ষুধা আপনিই পাবে। কিন্তু বাঙালীর একটা মস্ত বড় দোষ হ'ল অসময়ে খাওয়া। ফলও ভোগ কচ্ছেন। অজীর্ণ, আমাশয় প্রভৃতি রোগ ত আজকাল ঘরে ঘরে লেগেই আছে। অতিভোজন যেমন নিষিদ্ধ, তেমন অনবরত খাওয়াও নিষিদ্ধ। এতে পাকযন্ত্র বিশ্রাম পায় না বলে অকেজো হ'য়ে যায়। ধনুকের ছিলা না খুলে যদি সারাক্ষণ লাগিয়ে রাখা যায় তাহলে খুব ভাল ধনুকও এক সময় অকেজো হয়ে পড়ে। একথা সকলেই জানেন নিশ্চয়ই।

প্রত্যহ সকালে অঙ্কুরিত ছোলা ও আদা খাবেন। যদি পারেন কিছু ফলমূলও খাবেন।

চা দিনে দু'তিন বারের বেশি খাবেন না। এতে ট্যানিন আছে, যা পাকস্থলীকে দুর্ব্বল করে দেয়। সকল প্রকার অসুস্থতার মূল হ'ল পেট, অতএব পাকস্থলীর যত্ন নিন। তাই বলে যেন মনে করবেন না যে আমি খেতে মানা করছি। বিপরীত অর্থ টাই তাড়াতাড়ি চোখে পড়ে কিনা, তাই বলছি।

দাঁতের যত্ন নেবার কথা ত' ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছেন, কিন্তু দাঁতের যত্ন ক'জনে নেন? দাঁত ভালোভাবে পরিষ্কার করবেন। দাঁত অপরিষ্কার থাকলে খাদ্য-কণা পচে অম্লরসের সৃষ্টি করে। এতে দাঁতের এনামেল নষ্ট হয় ও পোকা-পড়া দাঁতের উদ্ভব হয়। তা ছাড়া এতে টার্টার (Tartar) সৃষ্টি হয়। এ থেকে পাইওরিয়া হয়। একবার পাইওরিয়া হ'লে আর সারে না। বাংলায় একটী প্রবাদ আছে, "দাঁত থাকতে দাঁতের মর্য্যাদা বোঝে না।" কথাটা অতিমাত্রায় সত্যি। দাঁত যতক্ষণ আছে,



দীনেশচন্দ্র ঘটক (ষ্টীলম্যান)

ততক্ষণ অবহেলার অন্ত নেই, কিন্তু দাঁত একবার গেলে কি আর পাবেন? কৃত্রিম দাঁত ত দন্তহীনতাকে চাপা দেবার জন্যে; ওর কোনও কাজ করার (যা প্রকৃত দাঁত করতে পারে) ক্ষমতা নেই। মাঝে মাঝে ডেন্টিষ্টকে দিয়ে দাঁত পরীক্ষা করাবেন।

দাঁতন ব্যবহার করা ভাল। কিন্তু "Old order changeth yeilding places to new"—আজকাল দাঁতন উঠে গিয়েছে, শূন্য-স্থান পূরণ করেছে টুথ্ব্রাশ। টুথ্ব্রাশ ব্যবহার করা খারাপ নয়, বরং কয়েক জায়গায় অতিমাত্রায় Scientific; কিন্তু যেন ভালো হয়, আর তার মানেই দামী ব্রাশ ব্যবহার করতে হবে। তা আর কটা লোক পারে!

সস্তার ব্রাশ যে একেবারেই পরিত্যাজ্য, তা নয়। ব্যবহার আরম্ভ

করার আগে ভালো করে স্পিরিটে ডুবিয়ে নেবেন। নিয়মিত পরিষ্কার করবেন ব্রাশ—অপরের ব্রাশ ভুলেও ব্যবহার করবেন না। "ডেণ্টিফ্রাইস (Dentifice) নিজের জন্যে সম্পূর্ণ আলাদা করে কিনে রাখবেন একটা—কাউকে নিজেরটা ব্যবহার করতে দেবেন না, নিজেও কারুরটা ব্যবহার করবেন না। এটা প্রায় অনেকেই করেন না অবশ্য, কিন্তু এমন অনেকে আছেন যাঁরা অপরের উচ্ছিষ্ট সম্বন্ধে কোনও বিচারই করেন না। অভ্যাসটা খুবই খারাপ। এতে করে অন্য লোকের রোগ নিজের শরীরে খাল কেটে কুমীর আনার মত করে আনা হয়। এ জিনিষটা নিজে বিচার করার জিনিষ, কারুর শিক্ষায় এ অভ্যাস সংশোধন হয় না।

দাঁত মাজার পর অনেকে জিবছোলা দিয়ে জিব পরিষ্কার করে থাকেন। অনেকের মতে এই অভ্যাসটা খারাপ। তাঁরা বলেন আঙুল দিয়ে জিব পরিষ্কার করা উচিত। আমার মনে হয় কথাটা খুবই যুক্তি-যুক্ত। জিবের ওপরকার ময়লা আঙুল দিয়ে পরিষ্কার হয়। যে ময়লার পর্দাটা পরিষ্কার হয় না, গোটা পেটের গণ্ডগোলের জন্যে জিবে জমা হয়। কাজেই অযথা জিবকে কষ্ট না দিয়ে পেটের দিকে নজর দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

প্রত্যহ স্নানের সময় সরষের তেল মাখবেন। এতে মাংসপেশী দলাই মলাই হ'বে—মাংসপেশীর বৃদ্ধির জন্য যেটা অপরিহার্য্য। তেল মাখার উপকারিতা অনেক। আমাদের শাস্ত্রানুযায়ী শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা-শাস্ত্র "চরক সংহিতায়" আছে যে, প্রত্যহ তেল মাখলে যে উপকার পাওয়া যায়, প্রত্যহ ঘি খেলে, তার ১/৮ ভাগ উপকারও পাওয়া যায় না। অর্থাৎ ঘি খাওয়ার থেকে তেল মাখার উপকার ৮ গুণ বেশি হয়। তেল মেখে ভালো করে স্নান করলে দেখবেন, শরীরের ময়লা খুব তাড়াতাড়ি ছেড়ে যাচ্ছে।

এবার ব্যায়ামের সময় সম্বন্ধে একটু আলোচনা করি। এ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। কেউ বলেন, সকালবেলা ব্যায়াম করার শ্রেষ্ঠ সময়, কেউ কেউ বলেন, বিকালবেলা। আবার অনেকে এও বলেন যে ব্যায়াম করার শ্রেষ্ঠ সময় হোলো রাত্রি ৮টা।৮।৩০। তাঁদের মত হ'ল এই যে সেই সময় থেকে ব্যায়াম আরম্ভ করে পুরো ব্যায়াম করার পর খেয়েদেয়ে বিছানায় আশ্রয় গ্রহণ করলে বিশ্রাম পাওয়া যায়; ফলে মাংসপেশী বৃদ্ধি পায় বেশী। আমার মতে এই তিন সময়ের মধ্যে সব কটাই শ্রেষ্ঠ সময়, কিন্তু একটু বিচার করা যাক।

আমার প্রবন্ধ আমি তাঁদের জন্য লিখছি যাঁরা স্কুল কলেজের ছাত্র বা সাধারণ চাকুরে গৃহস্থ। লক্ষ্মীর কৃপা যাঁদের ওপর একটু বেশি পরিমাণে আছে তাঁরা রাত ৮টা।৮-৩০টা সময় ব্যায়াম করতে পারেন।

কিন্তু আমার ছাত্র ও তরুণ বন্ধুদের আমি তা করতে বলি না, কারণ ব্যায়াম ছাড়া আরও অনেক কিছু করতে হ'বে তাঁদের। রাতের সময়টা তাঁদের বাদই গেল, ও সময় ব্যায়াম করা তাঁদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। থাকলো সকাল ও বিকাল। সকালবেলা ব্যায়াম করা উপযুক্ত সময়—একথা অনেকে বলেন। তাঁদের মত হ'ল এই যে সারা রাত ঘুমের পর শরীরের কোষগুলির ক্ষতিপূরণ হয় ও এরা উন্মুখ হ'য়ে থাকে ব্যায়াম করার জন্য, এতে বৃদ্ধি বেশী হয়। আবার অনেকের মতে সকালবেলা ভারী ভারী লোহালক্কড় নাড়াচাড়া করা উচিত নয়। তাঁরা বলেন, ব্যায়াম করার শ্রেষ্ঠ সময় হোলো বিকালবেলা। আমার মনে হয় যে লোহালক্কড় সকালে নাড়াচাড়া উচিত নয় এমন কোনও কথা নেই। বরং সকালবেলাকার ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস ও পুরো ঘুমের পর তাজা মন নিয়ে ব্যায়াম করলে ভালো হয়। কিন্তু যখন মতভেদ আছে, তখন সকালটাকে বাদ দিয়ে দিন। তাছাড়া নানা দিক থেকে বিবেচনা করে দেখলে বিকালটাই শ্রেষ্ঠ সময়। ধরুন আপনার সকালে ঘুম ভাঙে না। ঘুম থেকে উঠলেন, চা জলখাবার খেলেন, তারপরই দৌড়লেন বাজার, বাজার থেকে এসে তাড়াতাড়ি স্নান করে অর্দ্ধসিদ্ধ চারটি নাকে মুখে গুঁজে চাপলেন বাসে। বাস্, পাঁচটা পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত। যাঁরা ছাত্র, তাঁদের জন্যে সকালবেলা লেখাপড়ার শ্রেষ্ঠ সময়। মন তাজা ও প্রফুল্ল থাকে বলে এই সময়কার পড়াটা মনে থাকে। এই সময় ব্যায়াম করলে লেখাপড়ার ক্ষতি হ'বে। তাছাড়া এই সময় যদি ব্যায়ামের মাত্রা একটু বেশি হয়ে যায়, তাহ'লে সারা দিন ধরে অবসাদে ভরে থাকে শরীর ও মন, কোনও কাজই ভালো লাগে না। ব্যায়ামের পরে খানিকটা বিশ্রাম দরকার, যা সকালবেলা পারেন না। তাছাড়া কাজের মধ্যে থেকে ব্যায়াম করার জন্যে সময় বার করা মুস্কিল। কিন্তু বিকেল বেলাটা ত' সকলেরই ছুটি। অতএব তখন ব্যায়াম করলে কোনও কাজের ক্ষতিও হ'বে না, অতটা সময়ের সদ্ব্যবহারও হ'বে। এই রকম ভাবে বিচার করলে বিকাল বেলাটাই ব্যায়াম করার শ্রেষ্ঠ সময় বলে মনে হয়। তাছাড়া এ সময়ে ব্যায়াম করা সম্বন্ধে যখন কোনও মতভেদই নেই, তখন সর্ব্বসম্মতিক্রমে বিকাল বেলাটাই ব্যায়াম করার শ্রেষ্ঠ সময়। আপনি বিকালেই ব্যায়াম করুন এবং স্বাস্থ্যবান হয়ে সুস্থ জীবন যাপন করুন।

সুমিত্রার সাধনা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তৃতীয় দৃশ্য

দিল্লীর অভিজাত অঞ্চলে একটি সুদৃশ্য বাড়ীর সুসজ্জিত কক্ষ। সেই কক্ষে পায়চারী করিতেছে—সঞ্জীব। তাহার জীবনে বহুবিচিত্র পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। সেই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া সে তাহার আকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটাইতে চেষ্টা করিয়াছে। পোষাকে পরিচ্ছদে সে নিখুঁত সাহেব। মুখে ফ্রেঞ্চ ছাঁট দাড়ী রাখিয়াছে। চোখে একটা নীল চশমা অহরহ পরিয়া থাকে। নিজের পূর্ব্বনাম পরিহার করিয়াছে। তাহার নাম এখন রঞ্জিত মুখার্জ্জী। ঘরের মধ্যস্থলে টেবিলের উপর দামী বিলিতী মদের বোতল ও গ্লাস, সোডার বোতল। পায়চারি করিতে করিতে সে থমকিয়া দাঁড়াইল। গ্লাসে পানীয় ঢালা ছিল সে গ্লাস তুলিয়া লইয়া—উপরে তুলিয়া ধরিয়া—বলিল—

সঞ্জীব। ভাগ্যবান রঞ্জিত মুখার্জ্জীর স্বাস্থ্যপান করছি। নূতন জীবন! নূতন প্রভাত! নূতন সূর্য্যোদয়! সঞ্জীব মুখার্জ্জী was a fool! a fool।

বেয়ারা প্রবেশ করিল

বেয়ারা। শেঠজী, হুজুর!

সঞ্জীব। শেঠজী? কাঁহা? বাহার খাড়া হ্যায়? তুম একঠো বুদ্ধু হ্যায়! কই শেঠজী? কোথায়? আরে, ভিতরে আসুন। বাইরে কেন?

গ্লাস রাখিয়া দিল

বাহিরে চলিয়া গিয়া তাহার ব্যবসায়ের অংশীদার শেঠ মনোহরলালকে লইয়া প্রবেশ করিল।

সঞ্জীব। আমি অত্যন্ত দুঃখিত, তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

মনোহর। বাইরে থেকেই হুইস্কির গন্ধ পেলাম মুকুরজী সাব। থেমে গেলাম। এ চিজ তুমি কেনো খাও মুকুরজী? তুমি ভাই এমন আদমী—যখুন হুইস্কি খাও—তখুনি কি যে হয় তোমার—আরে বাপ রে—। ভাই—উ সময়মে এ্যায়সা ইচ্ছা হোয় কি—তুমার সাথ কারবার উঠাবার একদম খতম করে দি।' হাঁ। জিন্দিগীমে কভি বাত বি ন করি। উ তুম মত্ পিয়ো। উঃ—উস্ রোজ—উঃ—

সঞ্জীব। ও, যেদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গুলি ক'রে আয়না ভেঙেছিলাম সেই দিনকার কথা বলছ?

মনোহর। হাঁ ভাই। তুমার মনে আছে?

সঞ্জীব। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) আবছা—আবছা মনে আছে। থাকে, আবছা আবছা মনে থাকে।

মনোহর। আজ ভাই বাতচিজ থাক। কাল হোবে। আজ তো তুমার—মৌজকে টাইম আ গেয়া।

সঞ্জীব। না। বস। (অগ্রসর হইয়া গ্লাসের পানীয়টা জানালার গরাদের পার করিয়া ফেলিয়া দিল) ভয় নেই। কথা শেষ না-করে খাব না।

মনোহর। নেহি—নেহি। থোড়া থোড়া পিয়ো ভাই। উসমে হরজা নেহি। ই চিজ থোড়ে পিনেসে তো আচ্ছা হ্যায়। তাকদ দেতা। হিসাব করকে পিয়ো।

সঞ্জীব। তা হলে তো তোমাকে শুদ্ধ খেতে হয়। হিসেবে তো তুমি সাক্ষাৎ শুভঙ্কর। খাবে?

মনোহর। নেহি ভাই।

সঞ্জীব। ভাল। তা হলে কথাটা শেষ কর তাড়াতাড়ি।

মনোহর। গোস্সা মত্ কর না মুকুরজী সাব। কসুর হোগা তো পহেলে সে মাফি মাঙকে রাখতা হুঁ!

সঞ্জীব। ঠিক আছে। নির্ভয়ে বল তুমি কথা। অভয় দিলাম।

মনোহর। ই কেয়া বাত ভাই মুকুরজী, হম তুমার পার্টনার, তুমহি ভাই কারবারকে তুমারু হিস্সা—বেচোগে—হামারা সাথ বাতচিজ ভি হোতা হ্যায়—কিন তুম ভাই দুসরা আদমীকে সাথ বাতচিজ কাহে করতা হ্যায়!

সঞ্জীব। কি করব? তুমি মুখে বলছ কিনব, কিন্তু কিনছ না। আমি জানি—তুমি কিনতে ঠিক রাজী নও। বল ঠিক কি না?

মনোহর। হ্যাঁ ভাই। ইয়ে বাত ঠিক হ্যায়। তুমহারা কারবারকে হিস্সা—বেচনা হম নেহি চাহাতা হ্যায়। মুকুরজী—এ হামি চাহে না ভাই। ইয়ে কারবার তুমহারা কারবার।

সঞ্জীব। হাঁ। কারবার আমার। কত বড় দাম দিয়ে যে এ কারবার আমি করেছি—সে তুমি জান না মনোহরলাল। জীবন দিয়ে কারবার করেছি। একটা জীবন এ কারবারের দাম। তবু আমি এ কারবারের অংশ বেচে দেব।

মনোহর। শুনো ভাই মুকুরজী। উয়ো করণেল সাহাবকে পাশ হামি ভগোয়ানকে নাম লিয়ে বলিয়েছিলাম—কি মুকুরজীকে লোকসান হম কভি নেহি করেগা—গোনে ভি নেহি দেগা। তুমি জানো না মুকুরজী। উ করলেন্ সাব কভি বিনা টাকাসে কথা করত না ভাই। পহেলে

টাকা পিছে বাত। ওহি করণেল সাহাব আমাকে তলব করলো, বললো—মনোহরলাল—ইয়ে মুকুরজী হামারা জান বাঁচায়া। বিলকুল কণ্ট্রাক্ট হম্ মুকুরজীকে দেগা—তুম ধরমকে নাম লেও, ভগোবানকে নাম লেও—বলো—মুকুরজীকে তুম লোকসান নেহি করেগা ; তব হম মুকুরজীকে সাথ আধা পার্টনার কর দেগা। মুকুরজী, ভগোবানকে নাম লেকে হম বাত দিয়া সাহাবকো। কণ্ট্রাক্ট সাহাব দিয়া—হম দিয়া রূপেয়া—তুম কিয়া কাম্।

সঞ্জীব। মনে আছে মনোহর ভাই সব মনে আছে।

মনোহর। তুম ভাই, খায়া নেহি, পিয়া নেহি—পাগল মানুষকে মাফিক—সকালসে রাত বারা বাজে এক বাজে তক কাম কিয়া। এক মাহিনাকে কাম—বিশ রোজমে হাসিল কর দিয়া।

সঞ্জীব। করেছি। তুমি তো জানো না ভাই মনোহরলাল—সে দিনের মনের জ্বালার কথা। মনোহরলাল—আমি মরতে চেয়েছিলাম। জীবনের সব বন্ধন—সেদিন ছিঁড়ে গিয়েছিল। একজন মাত্র আপনজন, সে বললে—তোমার সঙ্গে চুকে গেল সম্বন্ধ। পাগলের মত বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। হঠাৎ বেজে উঠল সাইরেন। চব্বিশে ডিসেম্বর বিয়াল্লিশ সাল। কলকাতা শহরের রাস্তায় আমি একা। মনে হল ভগবানের নির্দ্দেশেই এসেছে ওই জাপানী বম্বারগুলো ; ভগবান আমার প্রার্থনা শুনেছেন। মৃত্যুদূত আমার জন্যেই পাঠিয়েছেন। বোমার শব্দ উঠল। আমি ছুটলাম শব্দ লক্ষ্য ক'রে। (থামিল) দাঁড়াও মনোহরলাল, বুকটা হু-হু করছে। একটু মদ না খেয়ে পারছি না। (সে উঠিয়া গিয়া বোতল হইতে গ্লাসে মদ ঢালিয়া লইয়া খাইল।) আঃ। (হাসিল) জান মনোহরলাল—একদিন আমি মদ খাওয়াকে পাপ মনে করতাম। শুধু কি মদ খাওয়াকে? বড়লোক হওয়াও—পাপ মনে করতাম! (সিগারেট ধরাইল) তখন সিগারেটও খেতাম না আমি!

মনোহর। ই সব তুমি ছেড়ে দাও ভাই। মুকুরজী—তুমি হামাকে ঘেন্না করো ভাই, লেকেন হামি তুমাকে ভালবাসে। তুমার দুখ হামি বুঝতে পারি। কি দুখ উ হামি জানে না। লেকেন বহুৎ দুখ—বড়া ভারী দুখ, ই হমি বুঝতে পারে।

সঞ্জীব। হ্যাঁ। অনেক দুঃখ। তবে আর দুঃখ নেই। দুঃখ অনেক দুঃখ—না হলে কি কেউ মরতে বের হয় মনোহর লাল? (সিগারেটটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল, উঠিয়া গিয়া জুতার চাপে নিভাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিল) বললাম তো দুনিয়ার সঙ্গে বাঁধনটাই কেটে গেল ছিঁড়ে গেল। ছুটলাম কোথায় বোমা পড়ছে সেই দিক লক্ষ্য ক'রে। ময়দানে—গড়ের মাঠে এলাম। দেখলাম ডালহৌসি স্কোয়ারের মাথার উপর আকাশে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ ঝলকে উঠছে যেন। আবার ছুটলাম। হঠাৎ দেখলাম রাস্তা ধ'রে একখানা জীপ গাড়ী ছুটে চলেছে। প্রচণ্ড বেগে। মোড় নিতে গিয়ে উল্টে গেল গাড়ীখানা। থমকে দাঁড়ালাম। একবার মনে হল ছুটে যাই—কেউ বেঁচে আছে কিনা দেখি। আবার মনে হল—যাক গে—মরুক। আমি যাই—আমার মরণের লগ্ন চলে যাচ্ছে। চলেই যাচ্ছিলাম। কিন্তু একটা মর্ম্মান্তিক কাতরাণি শুনে ফিরলাম। দেখলাম ছিটকে মাঠের উপর পড়ে আছে—একটা মানুষ। একজন ষ্টিয়ারিংয়ের সঙ্গে গেঁথে মরে গেছে। মাঠের উপর যে পড়েছিল সেই কাতরাচ্ছিল। লোকটার তখনও জ্ঞান ছিল। আমাকে দেখে কাতরভাবে হাত বাড়ালে, জল চাইলে। হল এ্যাণ্ডারসনের বাড়ীর সামনের পুকুর থেকে কাপড় ভিজিয়ে জল নিয়ে এলাম। সে ওই কর্ণেল সায়েব। দাঁড়াও আর এক গ্লাস খাই।

উঠিয়া গেল। পিছন পিছন গেল মনোহরলাল

মনোহর। না। না। আর খাবে না মুকুরজী। আর খাবে না।

সঞ্জীব। খাবো না?

মনোহর। না। তুমি এবার পাগলা হয়ে যাবে! না।

সঞ্জীব। (হাসিয়া) আমাকে মদ খেতে শিখিয়েছে কর্ণেল সাহেব। একদিনের কথা বলি। পুরো এক বোতল মদ খেয়ে শেষ ক'রে—হঠাৎ আস্তে আস্তে বললে—মুখার্জ্জী আজ খবর এসেছে—আমার বড় ছেলে এ্যাফ্রিকার ফ্রণ্টে মারা গেছে। মদ না-খেলে মনে আমি জোর পাই নে—মনোহরলাল।

গ্লাসে মদ ঢালিয়া পান করিল

উঃ। বড় ঝাঁঝালো জিনিষ হে! (সিগারেট ধরাইল) বুকের আগুন নেভাতেও এমন জিনিষ নেই মনোহরলাল, আগুন জ্বালিয়ে রাখতেও এমন জিনিষ নেই। এ জল বল—জল, ঘি বল—ঘি। যেদিন প্রথম মদ খাই, ওই কর্ণেলই খেতে ধরিয়েছিল। ওকে হাসপাতালে আমিই পৌঁছে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম—পৌঁছে দিয়ে চলে যাব। কর্ণেল তখন অজ্ঞান হয়ে গেছে। আমাকে মিলিটারী পুলিশ এ্যারেষ্ট করলে। কর্ণেল হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে খালাস করে বললে—তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ। তুমি আমার ছেলের বয়সী। আমার ছেলের মত। বল তোমার কি করতে পারি আমি! আমি হেসে বললাম—সাহেব কি করবে আমার? আমি মরতে যাচ্ছিলাম। তোমাকে বাঁচাতে গিয়ে মরা হয় নি। এখন ছেড়ে দাও—অসমাপ্ত কাজটা শেষ ক'রে ফেলি। সাহেব চমকে উঠল। বললে—মরবে কেন? বললাম—পৃথিবীতে কোন আকর্ষণ আমার নেই বলে মরব! সাহেব একগ্লাস মদ আমাকে দিয়ে বললে—খাও—পৃথিবী আবার তোমাকে আকর্ষণ করবে। আমার কথা বিশ্বাস কর। কি হয়েছে আমাকে বল!

মনোহর। সো তো মুকুরজী তুমহি—দুনিয়ামে কোইকে বলবে না ভাই। ওহি তো পুছি ; মুকুরজী ভাই—দোস্ত কি দুখ তুমার কহো। তুমি ভাই কভি হাসতা—হা-হা-হা। কভি গুম্ হো যাতা!

সঞ্জীব। সাহেবকে বলেছিলাম। সাহেব আমাকে বলেছিল—মদ খাও। আর দিয়েছিল—কণ্ট্রাক্ট! কাজ! আজ ছ বছর তাতেই ডুবে আছি। আর না। আর পারছি না। বাকী কাজ যেটা আছে—সেটা শেষ করব। কারবার সেই জন্যেই বিক্রী করব।

মনোহর। নেহি ভাই। ই কাম তুম মৎ করো। কামমে মন তুমার না লাগে—তুমহি ভাই কুছ দিন ইধর উধর ঘুমে আও। চলে যাও—বিলায়েত—ইউরোপ—আমেরিকা—ঘুমকে আও। নেহি তো সাদী করো। বিনা সাদীমে আদমীকে দিল এইসা হোতা হ্যায়।

সঞ্জীব। তোমার তো তিনটে বউ মনোহরলাল?

মনোহর। হা। তিন সাদী কিয়া ভাই।

সঞ্জীব। ফিন্ এক সাদী তুম করো!

মনোহর। তুমহি ভাই বাত দেও—কারবার নেহি ছোড়েগা—তো হমি ফিন্ এক কেঁও দো তিন সাদী করে। হাঁ!

বেয়ারার প্রবেশ

বেয়ারা। সিকিটারি সাহাব কলকাত্তাসে ঘুমকে আয়ে হেঁ।

সঞ্জীব। গুপ্ত এসেছে? ডাকো তাকে। তুমি মনোহরলাল—পাঁচ মিনিট—পাঁচ মিনিট ও-ঘরে বস! পাঁচ মিনিট।

বেয়ারা বাহিরে গেল। সঞ্জীব মনোহরকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। ওদিক হইতে প্রবেশ করিল সেক্রেটারী গুপ্ত—এদিক হইতে সঞ্জীব।

সঞ্জীব। কি খবর? কি জেনে এলে?

গুপ্ত। সবই সত্যি। এম-এন ঘোষাল মারা গেছেন অনেকদিন। ১৯৪২ সালের ২৪শে ডিসেম্বর—কলকাতায় বম্বিংয়ের সময় মাথার শিরা ছিঁড়ে অজ্ঞান হয়ে যান। মাস কয়েক পরে মারা যান। তাঁরা ছেলেরা বেঁচে আছে। তবে ব্যবসাতে ফেল হয়ে তাঁদের এখন অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। বাড়ী বিক্রী করেছেন।

সঞ্জীব। হাঁ—হাঁ। আর কি খবর বল? আর কি?

গুপ্ত। বাড়ী কিনেছেন একজন মাড়োয়ারী। তিনি দাম চাইছেন দুলাখ। তাই আমি বায়না ক'রে এসেছি।

সঞ্জীব। গুড। মণি ভবন—মণি ভবন! আচ্ছা! ঠিক করেছ। (হঠাৎ মৃদু হাস্যের সঙ্গে পায়চারী করিতে করিতে হঠাৎ অধীর হইয়া বলিল) তারপর—বল। আর খবর বল!

গুপ্ত। বড় ছেলে সুরেনবাবু কলকাতাতেই আছেন। অল্পস্বল্প ব্যবসা করেন।

সঞ্জীব। আঃ। আর কি খবর?

গুপ্ত। ছোটছেলে সর্ব্বস্বান্ত—সে তাদের দেশে থাকে। গ্রামে। তার এখন—

সঞ্জীব। আঃ—আঃ আঃ। আর কি খবর বল?

গুপ্ত। আজ্ঞে আর কি খবর—

সঞ্জীব। এম এন ঘোষালের এক—এক মেয়ে ছিলেন—

গুপ্ত। তিনি বিধবা হয়েছেন। তাঁর স্বামী—কলকাতায় ওই ২৪শে ডিসেম্বরের বম্বিংয়ের সময়—রাস্তায় ছিলেন—তারপর থেকে আর কোন খোঁজ নেই।

সঞ্জীব। হাঁ—হ্যাঁ—হাঁ। That I know. I know. সে মেয়ে কোথায়? তার আর বিয়ে হয় নি?

গুপ্ত। আজ্ঞে, তাতো শুনি নি!

সঞ্জীব। ব্যারিষ্টার রণেন শর্ম্মার সঙ্গে?

গুপ্ত। আজ্ঞে না—।

সঞ্জীব। সে মেয়ে কোথায়?

গুপ্ত। তিনি শুনলাম—ওই দেশের বাড়ীতেই থাকেন। ওঁর শ্বশুরবাড়ীও ওই গ্রামে।

সঞ্জীব। হাঁ—হ্যাঁ! সেই গ্রামে।

গুপ্ত। তিনি সেই গ্রামেই থাকেন। তাঁর খবরটা খুব বেশী নিই নি আমি। মানে—

সঞ্জীব। You are a—; থাক—। তুমি যাও। তুমি যাও। কাল সকালেই কলকাতায় সলিসিটারদের চিঠি লেখ—'মণি ভবন' এক সপ্তাহের মধ্যে কিনে দখল নিতে হবে। যাও। যাও।

গুপ্ত চলিয়া গেল

সঞ্জীব। মনোহরলাল! মনোহর।

গ্লাসে মদ ঢালিল ও পান করিল

মনোহরের প্রবেশ

মনোহর। মুকুরজী!

সঞ্জীব। কারবার তুমি কিনবে? বল? এক সপ্তাহ আমার সময়। এক সপ্তাহ! বল—হাঁ কি না। না—হলে কালই আমি অন্য লোকের সঙ্গে কথা পাকা করব।

মনোহর। দুসরা আদমীকে বেচবে তো হামাকে লিতে হোবে ভাই।

সঞ্জীব! দেখ, পাক্কা?

মনোহর। পাক্কা।

সঞ্জীব। যে দাম তুমি দেবে আমি তাই নেব।

গ্লাসে মদ ঢালিল

মনোহর। মুকুরজী। নেহি! মত পিয়ো।

সঞ্জীব। ছাড়ো—হাত ছাড়ো।

পান করিল

মনোহর। মুকুরজী—এ তুমি কি করছ? রঞ্জিত ভাই!

সঞ্জীব। রঞ্জিত মুকুরজী মরবে মনোহর। রঞ্জিত মরবে।

মনোহর। মুকুরজী!

সঞ্জীব। যাও, যাও, মনোহরলাল যাও ভাই। চলে যাও। আমার ভিতরটা ফেটে যাচ্ছে—আগুন বের হবে। আগুন। যাও। চলে যাও!

মনোহর। (ভীত হইয়া বলিল) রঞ্জিতভাই, মুকুরজী-বাবু—

বলিতে বলিতে প্রস্থান করিল

সঞ্জীব। কোথায় গেল ক্ষুর?—

টেবিল হইতে ক্ষুর লইয়া—দাড়ী কামাইতে উদ্যত হইল

(আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বকে প্রশ্ন করিল) সঞ্জীব! সঞ্জীব! সঞ্জীব! সাড়া দাও। তুমি সাড়া দাও।

ক্রমশঃ

হে মোর যৌবনলক্ষ্মী

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

হে মোর যৌবনলক্ষ্মী, আরবার এসো এ জীবনে!
ছুটী বাহু-লতা দিয়ে কণ্ঠ মোর জড়াইয়া ধরো।
মর্ম্মের শোণিতে জ্বালো অগ্নিশিখা উত্তপ্ত চুম্বনে!
মুক্ত পথে আরবার মোরে তব সহচর করো।
তখন ঝড়ের রাত; বজ্রনাদে ভয়ার্ত্ত আকাশ।
ঝরঝর বৃষ্টিধারা; বিদ্যুতের সে কী ঝল্‌কানি!
ফেনিল সমুদ্র-বক্ষে তরঙ্গের ভয়াল উচ্ছ্বাস!
অম্বরে ডম্বরু বাজে, মৃত্যু-নাচ নাচে শূলপাণি।
বাতায়ন-পথে এসে সেই রাতে দাঁড়ালে সুন্দরী!
ইঙ্গিতে ডাকিলে মোরে। মুহূর্ত্তে ভুলিয়া গেনু সব।
আসিনু বাহির বিশ্বে। থরোথরো উঠিনু শিহরি।
মেঘের গর্জ্জনমাঝে মরণের সে কী মহোৎসব!
বিপ্লবের দক্ষযজ্ঞে সঙ্গী হনু ক্ষ্যাপা ধূর্জ্জটীর।
মাতিনু প্রলয়নৃত্যে! ভাঙনের সে কী মহোল্লাস!
দিকে দিকে ধূলিসাৎ অতি-দর্প স্পর্দ্ধিত শক্তির।
ধূল্যবলুণ্ঠিত জাতি ফিরে পায় আত্মায় বিশ্বাস।
কণ্টকে আকীর্ণ পথ, বাধা-বিঘ্ন পর্ব্বত-সমান,
সম্মুখে ফাঁসির রজ্জু, বন্দীশালা, উদ্যত বন্দুক,
মৃত্যুরে কে করে ভয়? সর্ব্বোপরি জাতির সম্মান।
সম্মান বিলুপ্ত হ'লে বেঁচে থেকে বলো কিবা সুখ?
ফিরে দাও পৌরুষের অনির্ব্বচনীয় সে গরিমা।
হে মোর যৌবনলক্ষ্মী, ফিরে দাও সেই নির্ভীকতা;
উন্নত মস্তকে চলি, অকুণ্ঠ সে চলার ভঙ্গিমা।
প্রাণের আগুন চক্ষে, বক্ষে জমা নিখিলের ব্যথা।
দাও ফিরে আরবার বাগ্মীর সে আনন্দ অপার!
রক্তাক্ত মর্ম্মের জ্বালা উৎসারিত আগ্নেয় গিরির
অগ্নিস্রাবী বাক্য-স্রোতে। ভাবাবেগে মত্ত জনতার
নয়নে কখনো অশ্রু, কভু শিখা বিদ্যুত-বহ্নির।
সহচর-বৃন্দ লয়ে 'জলঙ্গী'তে সেই জল-কেলি;
উচ্ছ্বসিত সে কি হাস্য! চন্দ্রালোকে চলিছে 'কোরাস';
কখনো রবীন্দ্রনাথ, কভু সঙ্গী ব্রাউনিং, শেলী,
স্বপনের পাখা মেলে মেঘলোকে ওড়ার উল্লাস।
মেহগিনী-বন-বীথী কানন-লক্ষ্মীর নিকেতন!
দিগন্তে আঁধার হ'তে প্রভাত জাগিছে ধীরে ধীরে!
শিশিরে সজল ঘাসে নগ্ন-পদে করি পর্য্যটন!
স্বপ্নের অতীত—সে কি আর কভু আসিবেনা ফিরে?
নামিছে সন্ধ্যার ছায়া। ক্লান্ত দেহ; থাক্ ধনুঃশর!
মন চায় অন্ধকারে একখানি আরাম-কেদারা!
ঘুমন্ত বিরাট বিশ্ব; চারিদিক নিস্তব্ধ নিথর!
শেফালির মৃদুগন্ধ, ছায়াপথে সংখ্যাহীন তারা!
প্রস্ফুটিত পুষ্পবনে ভ্রমরের অশ্রান্ত গুঞ্জন,
পাখীর কাকলি, আর বনে বনে বাতাসের খেলা;
ভেসে যায় শুভ্রমেঘ; ঊর্দ্ধে নীল নির্ম্মল গগন;
একান্তে নিজেরে নিয়ে কর্ম্মহীন কাটে সারা বেলা।
থাক্, থাক্—স্বপ্ন নয়। নয়, নয় একান্তে আরাম।
হে যৌবনলক্ষ্মী, তুমি এ জীবনে এসো আরবার।
এখনো যে বাকী আছে কত কাজ, কত যে সংগ্রাম!
ফুলে ফুলে কাঁদিতেছে চারিদিকে অশ্রু-পারাবার।
ডাকিলে ভাঙার রাতে। ফুকারিছে তখন বিষাণ।
নাচে ক্ষ্যাপা নটরাজ; পদাঘাতে রেণু রেণু সব!
সে দিন থাকিনি দূরে! আজি এলো সৃষ্টির আহ্বান!
বিষ্ণুর বাঁশরি বাজে। তুমি কেন এখনও নীরব?
ডাক দাও, ডাক দাও, হে যৌবনলক্ষ্মী ডাক দাও!
এ নবসৃষ্টির প্রাতে তুমি মোরে ভুলিয়া থেকো না!
সর্ব্বোদয় আজও স্বপ্ন! উদ্দীপনা অন্তরে জাগাও।
ধূলায় গড়িব স্বর্গ। রামরাজ্য রবে না কল্পনা।
স্বপ্নেরে করিতে সত্য নিঃশেষে করিব আত্মদান।
শান্তি যদি চেয়ে থাকি—অপগত হোক সেই মোহ।
কালবৈশাখীর ঝড় রক্তে মোর জাগাক তুফান।
হে যৌবন-লক্ষ্মী, মোরে শেষবার করো অনুগ্রহ!

দেশ-বিদেশে

জনগণের শ্রমদান ও শ্রীনেহরু—

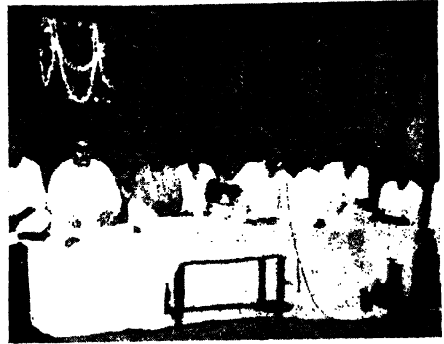
গত ১৯শে সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু রেলমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ও পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীঅজিত-প্রসাদ জৈনকে সঙ্গে লইয়া সাহারাণপুরে ৪০ মাইল দীর্ঘ পূর্ব যমুনা খাল সংস্কার কার্য্য দেখিতে গিয়াছিলেন। তাহার ২ দিন পূর্বে জনসাধারণ কর্তৃক শ্রমদান দ্বারা খাল প্রশস্ত করার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে ও এক সপ্তাহ কাল সে কাজ চলিবে। ২০ হাজার ছাত্র, অধ্যাপক, গ্রামবাসী, কংগ্রেসকর্মী প্রভৃতি খাল খনন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। শ্রীনেহরু বলিয়াছেন—শ্রমদান প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। সকল বৃহৎ কার্য্য শ্রমদান দ্বারা করা সম্ভব নয়, তবে ইহাতে জনকল্যাণমূলক কার্য্যে হাজার হাজার লোক আকৃষ্ট হয় এবং স্বেচ্ছাশ্রম দ্বারা গ্রামবাসীদের অবস্থার উন্নতি হইতে পারে। শ্রমদান বিদ্যালয়সমূহের কার্য্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত—তাহাতে ছাত্রদের স্বাস্থ্যরক্ষা হইবে। ভারতে আর বাবুর প্রয়োজন নাই—কঠোর শ্রমসহিষ্ণু লোকের প্রয়োজন। এই শ্রমদান আন্দোলন ভারতের প্রতি গ্রামে আরম্ভ হইলে গ্রামবাসীরাই উপকৃত হইবে। উত্তর প্রদেশ যে দৃষ্টান্ত দেখাইল, আশা করি, সমগ্র ভারতে তাহা অনুকৃত হইবে।

নিখিলবঙ্গ শিশু-সাহিত্য সম্মেলন—

গত ৪ঠা ও ৫ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা ষ্টুডেণ্টস হলে নিখিলবঙ্গ শিশু-সাহিত্য সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এবং শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত সভাপতিত্ব করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন ডাঃ যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সম্মিলনে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক, শ্রীমতী রেণু মিত্র, শ্রীমতী উষা বিশ্বাস প্রভৃতি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সাউথ সুবার্বান স্কুলের (ব্রাঞ্চ) ছাত্রগণের 'কবির লড়াই' বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। বহু বৎসর ধরিয়া এদেশে প্রাদেশিক ভাষায় শিশু-সাহিত্য রচনা ও প্রচারের চেষ্টা চলিলেও তাহা সাফল্যলাভ করে নাই। সম্মেলন হইতে স্থায়ীভাবে সে ব্যবস্থা করা হইলে দেশ অবশ্যই উপকৃত হইবে।

দেবানন্দপুরে শরৎ-স্মৃতি উৎসব—

গত ২রা আশ্বিন রবিবার অপরাহ্নে অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ৭৭তম জন্ম স্মৃতি-বার্ষিকী তাঁহার জন্মস্থান দেবানন্দপুর গ্রামে মহা-আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই উৎসব অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শ্রীগোপাল ভৌমিক এবং শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীগোপালচন্দ্র রায় যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সাহিত্যিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র এই উৎসবে পৌরোহিত্য করিবেন কথা ছিল। কিন্তু তিনি অনিবার্য কারণবশতঃ যোগদান করিতে না পারায় সভার জন্য একটি লিখিত বাণী প্রেরণ করেন। সভার উদ্বোধক শ্রীগোপাল ভৌমিক এবং সভাপতি শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়



দেবানন্দপুরে—শরৎস্মৃতি সভায় সমাগত সুধীবৃন্দ
ফটো—রমেন মুখার্জ্জী

শরৎ-সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করেন। প্রধান-অতিথি শ্রীগোপালচন্দ্র রায় শরৎচন্দ্র যে কিরূপ পরিহাসপ্রিয় মানুষ ছিলেন তাহার উল্লেখ করিয়া শরৎচন্দ্রের হাস্য-পরিহাসের বহু কাহিনী ও গল্প শোনান। হুগলী জেলা শরৎ-স্মৃতি সমিতির সম্পাদক শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দত্তমুন্সী, উত্তরপাড়ার জমিদার শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিও সভায় বক্তৃতা করেন।

কলিকাতায় নূতন সরকারী দপ্তরখানা—

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর শনিবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় কলিকাতা ১নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নূতন দপ্তরখানার উদ্বোধন করিয়াছেন। ১৩ তলা এই বাড়ী এশিয়ার উচ্চতম ভবন। উহার উচ্চতা ১৯৫ ফিট। উহা কলিকাতা মনুমেণ্ট অপেক্ষা ২৩ ফিট ছোট। মনুমেণ্টের উচ্চতা ২১৮ ফিট। বাড়ীর নির্মাণ শেষ করিতে ৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। দক্ষিণ দিকে ২৭২ ফিট লম্বা ও ৬০ ফিট চওড়া একটি অংশের কাজ শেষ হইয়াছে—পূর্ব

দিকে অংশ ৬ তলা, ৭৫ ফিট উচ্চ, ১০৮ ফিট লম্বা ও ৬০ ফিট চওড়া। মধ্যের অসমাপ্ত গৃহ ২৭ ফিট উচ্চ, ২৫০ ফিট লম্বা ও ২৮ ফিট চওড়া হইবে। এই গৃহে বহু সরকারী অফিসের স্থান হইবে—ঐ অফিসগুলি এখন কলিকাতার নানাস্থানে ভাড়াটিয়া বাড়ীতে আছে। এই ভাবে অফিসগুলি একত্র করার ফলে জনসাধারণের ও কর্মীদের বহু অসুবিধা দূর হইবে।

শ্রীবিমলকুমার দত্ত—

বিশ্বভারতীর প্রবীণ গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করায় শ্রীবিমলকুমার দত্ত গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হইয়াছেন। বিমলবাবু ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে



শ্রীবিমলকুমার দত্ত

বিশ্বভারতীতে যোগদান করেন। ইনি নিউইয়র্ক কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। বিমলবাবু "গ্রন্থাগার" ও "ভারতশিক্ষা" নামে দুখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। বিমলবাবু বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হওয়ায় আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

রহড়া বালকাশ্রমে নূতন গৃহের উদ্বোধন—

গত ৯ই সেপ্টেম্বর সকালে ২৪ পরগণা জেলার খড়দহের নিকটস্থ রহড়া গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বালকাশ্রমে জুনিয়ার বেসিক বিদ্যালয়ের নূতন গৃহের উদ্বোধন হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের চিফ সেক্রেটারী শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় উৎসবে সভাপতিত্ব করেন এবং শিক্ষা-সেক্রেটারী শ্রীধীরেন্দ্রমোহন সেন উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। বালকাশ্রমে উচ্চ বিদ্যালয়, টেকনিকাল স্কুল ও ভোকেসনাল স্কুল ছিল, বর্তমানে সম্পাদক স্বামী পুণ্যানন্দের চেষ্টায় তথায় একটি বুনিয়াদি বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইল। দেশে যে আজ বুনিয়াদি শিক্ষা প্রবর্তনের সর্বাগ্রে প্রয়োজন, স্বামীজির মত লোকও সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন ও যাহাতে বুনিয়াদি শিক্ষা-ব্যবস্থার একটি আদর্শ বিদ্যালয় তথায় পরিচালিত হয়, সে জন্য কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, মিশন-প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত বুনিয়াদি বিদ্যালয়ও পশ্চিমবঙ্গে নূতন আদর্শ প্রচার করিবে।

শ্রীমান্ প্রণবকুমার বসু—

বিগত জুলাই মাসে কলিকাতা হাইকোর্টের ফাইন্যাল এটর্ণী-সিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার বসু মহোদয়ের কনিষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ প্রণবকুমার বসু প্রথম স্থান অধিকার করেন। গত ১২ই



শ্রীপ্রণবকুমার বসু

আগষ্ট তারিখে অন্যতম বিচারপতি শ্রীযুক্ত প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সম্মুখে ইঁহাকে মহাধর্ম্মাধিকরণের এটর্ণী-শ্রেণী ভুক্ত করিয়া ব্যবহারজীবীর সনদ দেওয়া হয়। শ্রীমান্ প্রণবকুমার আইনের উপাধি পরীক্ষায় শীর্ষস্থান লাভ করায় বেলচেম্বার সুবর্ণপদকে ভূষিত হইবেন এবং অন্যান্য আইনের পরীক্ষায় ইঁহার প্রতিভার জন্য হীরেন্দ্র দত্ত পুরস্কার ইঁহাকে প্রদত্ত হইবে জানা গিয়াছে। শ্রীমান্ প্রণবকুমার আইনের ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করুন এবং দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া দেশের জনসাধারণের উপকার করুন শ্রীভগবানের কাছে ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

পূর্ববঙ্গ হইতে হিন্দু আগমন—

১৯৫৪ সালের প্রথম ৭ মাসের প্রতি মাসে ৫ হাজার লোক পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিয়াছে। বাস্তুত্যাগের প্রধান কারণ হইল—ঐ প্রদেশের অধিবাসীগণ

—বিশেষ করিয়া হিন্দুগণ অর্থনীতিক দুরবস্থার সম্মুখীন হইয়াছেন। মুসলমানদের বিভিন্ন রকমের হায়রাণি ও উপর প্রতীকায়ে পূর্ববঙ্গ গভর্ণমেণ্টের ব্যর্থতাও বাস্তত্যাগের অন্যতম কারণ। গত কয়েকমাসে বহু লোক গ্রেপ্তার হওয়ায় হিন্দুদের মনে নিরাপত্তার অভাব দেখা দিয়াছে। এই সংবাদে পশ্চিমবঙ্গবাসীমাত্রই বিচলিত হইবেন। লিয়কৎ-নেহরু চুক্তির পর লোক মনে করিয়াছিল—পূর্ববঙ্গে হিন্দুরা শান্তিতে বাস করিতে পারিবেন। পশ্চিমবঙ্গেও স্থানাভাব এবং নানা সমস্যায় পূর্ববঙ্গাগত হিন্দুরা বিব্রত। এ অবস্থায় ভবিষ্যত কর্ত্তব্যের কথা আমাদের ধীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।

দামোদরের উপর সেতু—

হাওড়া জেলার মধ্যে বাগনানে কলিকাতা-বোম্বাই পথের জন্য দামোদর নদের উপর ১২ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা ব্যয়ে ৫ শত ফিট দীর্ঘ পুল নির্মাণ করা হইবে। কলিকাতা ও সম্বলপুরের মধ্যে ৪টি পুল হইবে—এটি চতুর্থ—তাহার ফলে কলিকাতা হইতে মোটরে সরাসরি বোম্বাই যাওয়া যাইবে। দ্বারং নদীর উপর একটি পুল নির্মিত হইতেছে—রূপনারায়ণ ও কুশী নদীর উপরও ২টি পুল নির্মাণ সম্পর্কে অনুসন্ধান কার্য্য চলিতেছে। ঐ পুলগুলি নির্মিত হইলে কলিকাতা হইতে মাদ্রাজও সরাসরি মোটরে যাওয়া যাইবে। কলিকাতা হইতে খড়্গপুর পার হইয়া কিছুদুর পর্য্যন্ত মাদ্রাজ ও বোম্বাই যাওয়ার পর এক থাকিবে—তাহার পর ২ দিকে ২টি পথ যাইবে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ২ শত পুল নির্মিত হইবে—তন্মধ্যে ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৫টি পুল হইয়াছে ও ৮০টি পুলের কাজ চলিতেছে। পথই মানুষের সভ্যতার মাপ কাঠি—দেশে বহু পথ নির্মিত হইলে দেশবাসীর সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব হইবে।

বিনা টিকিটের ১৩ লক্ষ টাকা—

গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত তিন মাসে ইষ্টার্ণ রেলপথে ৫৭৮০৫১ জন বিনা টিকিটে যাত্রীর নিকট হইতে মোট ১৩ লক্ষ ৩২ হাজার ৮০ টাকা আদায় হইয়াছে। মোট অর্থের মধ্যে বুক-না-করা লগেজের জন্য ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ৭ শত ৯ টাকা আছে। আমাদের দেশ স্বাধীন হইয়াছে, রেল-পথের আয়ে দেশের বহু জনহিতকর কাজ হইয়া থাকে। তাহা জানিয়াও যাহারা টিকিট না করিয়া রেলে যাতায়াত করে, তাহাদের কাছে শুধু ভাড়া আদায় না করিয়া তাহাদের কঠোর দণ্ডদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আমরা এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ফাঁকি দেওয়া একদল লোকের স্বভাবে পরিণত হইয়াছে—সে স্বভাব যাহাতে পরিবর্ত্তিত হয়, সেজন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থাই বাঞ্ছনীয়।

পরলোকে কবি যতীন্দ্রনাথ—

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার রাত্রি ৮ ঘটিকায় খড়্গপুরের নিকটবর্ত্তী হিজলীতে বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁহার পুত্র অধ্যাপক শ্রীমান সুনীলকান্তির বাসভবনে ৬৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার ৩ পুত্র, ৪ কন্যা ও স্ত্রী বর্ত্তমান। তাঁহার শেষ কাব্যগ্রন্থ অনুপূর্বা। তাহা ছাড়া মরীচিকা, মরুশিখা, মরুমায়া ও সায়ম্—আরও ৪ খানি কাব্য তিনি রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৮৬ সালে বর্দ্ধমান জেলার পাতিলপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে তাঁহার জন্ম—তিনি নদীয়া



কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

শান্তিপুরের সন্নিহিত হরিপুরের অধিবাসী। এফ-এ পাশ করিয়া তিনি শিবপুর কলেজ হইতে ১৯১১ সালে এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন। কৃষ্ণনগরে জেলা বোর্ডে কাজ করার সময় তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়—তাহার নাম মরীচিকা। এঞ্জিনিয়ার-কবি বাঙ্গালা দেশে সংখ্যায় কম। যতীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল কাসিমবাজারেও কাজ করিয়াছিলেন। কয়েক মাস পূর্বে অবসর গ্রহণ করিয়া পুত্রদের নিকট বাস করিতেন। তিনি কখনও আত্মপ্রচারের চেষ্টা করেন নাই—তথাপি তাঁহার কবিপ্রতিভা সর্বত্র স্বীকৃত ও প্রশংসিত হইয়াছে। বাঙ্গালার কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার নাম স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

কৃষ্ণনগরে গোপাল ভাঁড় উৎসব—

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর রবিবার বিকালে নদীয়া কৃষ্ণ-নগরের রাজবাটীর ঐতিহাসিক বিষ্ণুমহলে 'হোমশিখা'

নামক মাসিক পত্রের কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে সাড়ম্বরে 'গোপাল ভাঁড়' দিবস পালন করা হইয়াছে। শ্রীপ্রমথনাথ বিশি, উৎসবে পৌরোহিত্য করেন এবং খ্যাতনামা সাংবাদিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। খ্যাতনামা হাস্যরসিক দাদাঠাকুর (শ্রীশরৎ পণ্ডিত) কয়েকটি গল্প ও গানের সাহায্যে সভাস্থ সকলকে হাস্যরসে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। নদীয়ার মহারাজকুমার শ্রীসৌরীশচন্দ্র রায় 'হোমশিখা' পত্রিকার পক্ষ হইতে দাদাঠাকুরকে একটি রৌপ্যপদক প্রদান করেন ও সভায় উপস্থিত থাকিয়া সকলকে আদর আপ্যায়ন করেন। সভার শেষে গোপাল ভাঁড় নামক একখানি একাঙ্ক নাটিকা অভিনীত হইয়াছিল। বাঙ্গালা দেশে যে যুগে হাস্যরস পরিবেশনের কথা লোক ভুলিতে বসিয়াছে, সে যুগে গোপাল ভাঁড়ের কথা আলোচনার প্রয়োজন আছে। কৃষ্ণনগরবাসী সাহিত্যিকবৃন্দ, বিশেষ করিয়া 'হোমশিখা'র কর্তৃপক্ষ এই উৎসব করিয়া দেশবাসী সকলের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। মহারাজকুমার সৌরীশচন্দ্র এই অনুষ্ঠানে সর্বপ্রকার সাহায্য করিয়া কৃষ্ণনগরের রাজবংশের খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

বিনোবা ভাবের জন্মতিথি উৎসব—

আচার্য্য বিনোবা ভাবে সমগ্র ভারতবর্ষে যে ভূদান যজ্ঞ আন্দোলন প্রবর্তিত করিয়া পরিচালন করিতেছেন, তাহার ফলে দেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা—ভূমি-সমস্যার সমাধান হইবে। তিনি মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নিজের জীবন এই আন্দোলনে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করিয়াছেন। তাহার ফলে দেশের একদল মহাপ্রাণ লোক তাঁহার এই আন্দোলনের সহায়ক হইয়া গ্রামে গ্রামে ভূদানযজ্ঞের বার্তা প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। গত ৫ই সেপ্টেম্বর শনিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে কলিকাতা ভূদান যজ্ঞ প্রচার সমিতির উদ্যোগে আচার্য্য ভাবের ৬০তম জন্মতিথি পালিত হইয়াছে। কবি শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিজয় সিং নাহার, শ্রীসুধীর লাহা প্রভৃতি সভায় বিনোবাজীর আদর্শ ও জীবন কথা প্রচার করেন। বিনোবাজীর আদর্শ আজ বর্তমান ভারতের গ্রহণের সময় আসিয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব হইতে নিজেদের মুক্ত করিয়া ভারতীয় আদর্শ গ্রহণ করাই বিনোবাজীর জীবনের প্রধান কাম্য। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার স্বার্থশূন্য প্রচেষ্টা নিষ্ফল হইবে না।





শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়



সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ইংলণ্ড—পাকিস্তান টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

পাকিস্তান ঃ ১৩৩ (কারদার ৩৬। টাইসন ৩৫ রানে ৪ এবং লোডার ৩৫ রানে ৩ উইকেট) ও ১৬৪ (ওয়াজির মহম্মদ ৫২, জুলফিকার আমেদ ৩৪। ওয়ার্ডলে ৫৬ রানে ৭ উইঃ)।

ইংলণ্ড ঃ ১৩০ (কম্পটন ৫০। ফজল মামুদ ৫৩ রানে ৬, মামুদ হোসেন ৫৮ রানে ৪ উইঃ) ও ১৪৩ (মে ৫৩। ফজল মামুদ ৪৬ রানে ৬ উইঃ)।

ওভালে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড—পাকিস্তানের চতুর্থ অর্থাৎ শেষ টেষ্টে পাকিস্তান ২৪ রানে জয়ী হওয়ায় আলোচ্য ইংলণ্ড বনাম পাকিস্তানের টেষ্ট সিরিজ ড্র গেল। পাকিস্তানের পক্ষে এই জয়লাভ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইতিপূর্ব্বে ইংলণ্ডে প্রথম ক্রিকেট সফরে গিয়ে ইংলণ্ডকে কোন দল সরকারী টেষ্টে হারাতে পারে নি অথবা টেষ্ট সিরিজ অমীমাংসিত রাখতে পারে নি। আন্তর্জ্জাতিক ক্রিকেট খেলায় নবাগত দেশ পাকিস্তানের পক্ষে এ কৃতিত্ব বিশেষ গৌরবের বস্তু হয়ে রইলো। অষ্ট্রেলিয়া সফরের প্রাক্কালে পাকিস্তানের কাছে ইংলণ্ডের পরাজয়, ইংলণ্ডের ক্রিকেট মহলে দুশ্চিন্তা এবং ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

গত বছর ১৯৫৩ সালে ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট সিরিজে ইংলণ্ড স্বদেশের মাটিতে অষ্ট্রেলিয়াকে ১—০ টেষ্ট খেলায় হারিয়ে একটানা সাতবারের চেষ্টায় 'এসেজ' লাভ করেছিল। সুতরাং এ বছরের অষ্ট্রেলিয়া সফরের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে পাকিস্তানের কাছে ইংলণ্ডের পরাজয় এবং টেষ্ট সিরিজ ড্র—ইংলণ্ডের পক্ষে শুভ লক্ষণ নয়। টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়া তার পুরাতন এবং প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী।

ইংলণ্ড-পাকিস্তানের চতুর্থ টেষ্টে ব্যক্তিগত কৃতিত্বের একমাত্র অধিকারী হ'লেন পাকিস্তানের ফজল মামুদ। তিনিই এই খেলার নায়ক এবং তাঁর নামেই চতুর্থ টেষ্ট খেলা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। দুই ইনিংস মিলিয়ে তিনি ১২টা উইকেট পান ৯৯ রানে—৫৩ রানে ৬টা এবং ৪৬ রানে ৬টা। তাঁর পরই উল্লেখযোগ্য, উইকেট-কিপার ইমতিয়াজ আমেদের খেলা। তিনি ইংলণ্ডের সাতজন



ফজল মামুদ

খেলোয়াড়কে আউট করেন। পাকিস্তানের ২য় ইনিংসের ভাঙ্গনের মুখে ৯ম উইকেটের জুটি ওয়াজির এবং জুলফিকার মামুদের খেলা দলের জয়লাভের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিলো। তাঁদের জুটিতে ৫৮ রান হয়।

১২ই আগষ্ট প্রথম দিনের খেলায় পাকিস্তানের ১ম ইনিংস ১৩৩ রানে শেষ হয়। ইংলণ্ড কোন উইকেট না

হারিয়ে একরান করে। বৃষ্টির দরুণ ২য় দিন খেলা আরম্ভই হয়নি। ৩য় দিন মাঠের অবস্থা ভাল না থাকায় খেলা দেরীতে আরম্ভ হয়। চা-পানের সময় ইংলণ্ডের ১ম ইনিংস ১৩০ রানে শেষ হ'লে পাকিস্তান ৩ রানে এগিয়ে যায়। ঐ দিন পাকিস্তানের ২য় ইনিংসের খেলায় ৪ উইকেট পড়ে ৩৩ রান ওঠে। ৪র্থ দিনে পাকিস্তানের ২য় ইনিংস শেষ হয় ১৬৪ রানে। ইংলণ্ডের ২য় ইনিংসে ৬ উইকেটে ১২৫ রান ওঠে। এ অবস্থায় ইংলণ্ডের পক্ষে জয়লাভের প্রয়োজন ছিল ৪৩ রান। হাতে একদিন সময় এবং উইকেট ৪টে, কিন্তু সবই ল্যাজের দিকের, বিশেষ ভরসার কথা নয়। শেষ দিনের খেলায় মাত্র ১৮ রান যোগ হয়ে ইংলণ্ডের ২য় ইনিংস ১৪৩ রানে শেষ হয়ে যায়। ফলে পাকিস্তান ২৪ রানে জয়ী হয়।

ইংলণ্ড-পাকিস্তানের টেষ্ট সিরিজের এভারেজ তালিকায় ব্যাটিংয়ে ইংলণ্ডের পক্ষে প্রথম স্থান পেয়েছেন ডেনিস কম্পটন (মোট রান ৪৫৩, সর্ব্বোচ্চ রান ২৭৮, এভারেজ ৯০.৬০) এবং পাকিস্তানের পক্ষে হানিফ মহম্মদ (মোট রান ১৮১, সর্ব্বোচ্চ রান ৮১, এভারেজ ২২.৬২)।

বোলিংয়ে ইংলণ্ডের পক্ষে শীর্ষ স্থান লাভ করেছেন ওয়ার্ডলে (১৭৬ রানে ২০ উইকেট, এভারেজ ৮.৮) এবং পাকিস্তানের পক্ষে ফজল মামুদ (৪০৮ রানে ২০টা, এভারেজ ২০·৪)। আলোচ্য টেষ্ট সিরিজে মাত্র ২টি সেঞ্চুরী হয়েছে; এবং দুইটিই ইংলণ্ডের পক্ষে—কম্পটন ২৭৮ এবং সিম্পসন ১০১ (২য় টেষ্ট)।

ইউরোপীয়ান এ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

সুইজারল্যাণ্ডের অন্তর্গত বার্ণের সুফিল্ড ষ্টেডিয়ামে পাচদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত 'ইউরোপীয়ান এ্যাথ্‌লেটিকস্‌ চ্যাম্পিয়ানসীপ' প্রতিযোগিতায় ২৮টি দেশের ১,০০০ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। গতবার এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ব্রাসালসে, ১৯৫০ সালে। আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় মোট ৩৫টি স্বর্ণপদকের মধ্যে রাশিয়া ১৬টি স্বর্ণপদক লাভ করে সর্ব্বাধিক স্বর্ণপদক লাভের কৃতিত্ব অর্জন করে। এ ছাড়া রাশিয়া ২৬৯ পয়েণ্ট পেয়ে বে-সরকারীভাবে প্রতিযোগিতায় ফলাফলের তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করেছে। ২য় স্থান পেয়েছে বৃটেন, ১০০½ পয়েণ্ট। পয়েণ্টের ব্যবধান থেকেই রাশিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব কতখানি মাপা যায়। প্রতিযোগিতায় তিনটি অনুষ্ঠানে নতুন বিশ্ব রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে—এবং তারও কৃতিত্ব রাশিয়ার।

নতুন বিশ্ব-রেকর্ড

হ্যামার থ্রো : ক্রিভোনোসোভ (রাশিয়া); দূরত্ব ২০৭ ফিঃ ৯½ইঃ। পূর্ব্ব রেকর্ড : এস ষ্ট্রাণ্ডলি (নরওয়ে); দূরত্ব ·০০ ফিঃ ১১⅞, ওসলো, তারিখ ১৪. ৯. ৫২।

৫,০০০ মিটার দৌড় : ভলডিমির কুটজ (রাশিয়া); সময় ১৩ মিঃ ৫৬.৪ সেঃ। পূর্ব্ব রেকর্ড : এমিল জেটাপেক (চেকোশ্লোভাকিয়া); সময় ১৩ মিঃ ৫৭.২ সেঃ।

৩ মাইল দৌড় : ভলডিমির কুটজ (রাশিয়া); সময় ১৩ মিঃ ২৭.৪ সেঃ। পূর্ব্ব রেকর্ড : চাটাওয়ে এবং ফ্রেড গ্রীণ (ইংলণ্ড)।

স্বর্ণপদক লাভের সংখ্যা ঃ রাশিয়া ১৬; চেকোশ্লোভাকিয়া ৪; হাঙ্গারী ৪; বৃটেন ৩; ফিনল্যাণ্ড ২; জার্মানী ২; ফ্রান্স, ইটালী, পোল্যাণ্ড এবং সুইডেন প্রত্যেকে ১টি হিসাবে।

বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্ত্তৃক অর্জিত পয়েণ্ট এবং স্থান ঃ

১ম—রাশিয়া ২৬৯ পয়েণ্ট; ২য়—বৃটেন ১০০½; ৩য়—চেকোশ্লোভাকিয়া ৮৩; ৪র্থ হাঙ্গেরী ৮১; ৫ম জার্মানী ৭৮; ৬ষ্ঠ ফিনল্যাণ্ড ৫৯½; ৭ম সুইডেন ৫৩; ৮ম পোল্যাণ্ড ৩৯; ৯ম ফ্রান্স ২৫; ১০ম ইটালী ২৫; ১১শ নরওয়ে ১৩; ১২শ বেলজিয়াম ও যুগোশ্লাভিয়া ১০; ১৩শ হল্যাণ্ড, রুমানিয়া ও সুইজারল্যাণ্ড ৬; ১৪শ ডেনমার্ক; ১৫শ আয়ার্ল্যাণ্ড ২; ১৬শ বুলগেরিয়া গ্রীস ও ল্যাক্সমবার্গ ১।

ইংলিশ কাউণ্টি চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

১৯৫৪ সালের ইলিংশ কাউণ্টি ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় সারে চ্যাম্পিয়ানসীশ লাভ করেছে। এই নিয়ে সারে উপর্য্যপরি তিন বছর লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করলো।

বিশ্ব সাইকেল প্রতিযোগিতা ঃ

স্প্রিণ্ট চ্যাম্পিয়ানসীপ (পেশাদার)—রেগ হ্যারিস (বৃটেন)।

পারস্যুইট চ্যাম্পিয়ানসীপ (পেশাদার)—গুইডো মেসিনা (ইটালী); সময় ৬ মিঃ ১৮.৮ সেঃ।

স্প্রিণ্ট চ্যাম্পিয়ানসীপ (এ্যামেচার)—সিরিল পিকক (বৃটেন)।

পারস্যুইট চ্যাম্পিয়ানসীপ (এ্যামেচার)—জান্দ্রো ফ্যাগ্‌গিন (ইটালী); সময় ৫ মিঃ ৫.১ সেঃ।

আই এফ এ শীল্ড ঃ

১৯৫৪ সালের আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতায় ৪০টি দল নিয়ে শীল্ড খেলার তালিকা প্রস্তুত হয়। আলোচ্য বছরের শীল্ড খেলায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অনুপস্থিতি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গত বছরের আই এফ এ শীল্ড জয়ী বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়া কালচার লীগদলও যোগদান করেনি।

এ পর্য্যন্ত শীল্ডের খেলায় অপ্রত্যাশিত ফলাফল—২য় রাউণ্ডে গত বছরের সেমি-ফাইনালিষ্ট জামসেদপুরদলের কাছে ০—২ গোলে এরিয়ান্সের পরাজয়, দ্বিতীয় বিভাগের টিম ডালহৌসীর কাছে ০—১ গোলে ওয়াড়ীর পরাজয়, ৩য় রাউণ্ডে উড়িষ্যার কাছে ২—৩ গোলে রাজস্থানের পরাজয়, জামসেদপুরদলের কাছে ০—২ গোলে মাদ্রাজের নামকরা ক্লাব উইম্‌কো (ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ম্যাচ কোম্পানী) দলের পরাজয়; ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে বনাম বার্ণপুর ইউনাইটেড দলের তৃতীয় রাউণ্ডের খেলা চারদিন ড্র যায় (০—০, ১—১, ০—০, ০—০)। পঞ্চম দিনের খেলায় ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে ১—০ গোলে জয়ী হয়। বিজয়ীদলে ১৯৫৪ সালের সন্তোষ ট্রফি জয়ী বোম্বাই জাতীয়দলের পাঁচজন খেলোয়াড় আছেন।

সেমি-ফাইনাল খেলা এইভাবে হয়—মোহনবাগান —২ ; ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে (বোম্বাই)—০ ; হায়দ্রাবাদ—৩ ; বিন্নিমিলস্ (বাঙ্গালোর)—০।

বিশ্ব মুষ্টিযুদ্ধ ঃ

ফ্রান্সের রবার্ট কোহেন ১৫ রাউণ্ডের লড়াইয়ে থাইল্যাণ্ডের সঙ্গকিট্রাটকে পয়েণ্টে পরাজিত ক'রে বিশ্ব মুষ্টিযুদ্ধের ব্যাণ্টমওয়েট বিভাগে নতুন বিশ্বখেতাব লাভ করেছেন।

আমেরিকান লন্ টেনিস ঃ

ফরেস্ট হিলস-এ অনুষ্ঠিত ১৯৫৪ সালের আমেরিকান লন্ টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতার ফাইনাল ফলাফল—

পুরুষদের সিঙ্গলসে : ভিক্ সিক্সাস (আমেরিকা) ৩-৬, ৬-২, ৬-১, ৬-৪ গেমে রেক্স হার্টউইগকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : মিস ডরিস হার্ট (আমেরিকা) ৬-৮, ৬-১, ৮-৬ গেমে মিস লুইস ব্রাউকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলস : মিস ডরিস হার্ট এবং ভিক্ সিক্সাস ৪-৬, ৬-১, ৬-১ গেমে মিসেস মার্গারেট ওস্‌বোর্ণ ডু পণ্ট (আমেরিকা) এবং কেন্ রোজওয়ালকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

ইউরোপীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা ঃ

১৯৫৪ সালের ইউরোপীয়ান সুইমিং চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে হাঙ্গারী এবং রাশিয়া। সতেরটি অনুষ্ঠানে হাঙ্গারী পেয়েছে ৮টি স্বর্ণপদক, ৫টি রৌপ্যপদক এবং ৬টি ব্রোঞ্জ পদক। রাশিয়া পেয়েছে ৪টি স্বর্ণপদক, ৫টি রৌপ্যপদক এবং ৩টি ব্রোঞ্জপদক।

আন্তঃ নৌবাহিনী ফুটবল ঃ

সিংহলের ত্রিনকোমালিতে অনুষ্ঠিত ইণ্টার-নেভী কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবল চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় ভারতীয় নৌবাহিনী চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। প্রতিযোগিতায় যোগদান করে ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, সিংহল এবং রয়েল নেভী।

ফাইনাল টেবল

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পয়েণ্ট
ভারতবর্ষ	৩	২	১	০	৫
রয়েল নেভী	৩	২	০	১	৪
পাকিস্তান	৩	০	২	১	২
সিংহল	৩	০	১	২	১

২৫।৯।৫৪

সাহিত্য সংবাদ

বিজয়লক্ষ্মী ঃ শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজয়লক্ষ্মী উপন্যাস। উপন্যাস হলেও গতানুগতিক আঙ্গিকে লেখা কাহিনীস্তূপ নয় ঃ চিত্রনাট্যের আঙ্গিকে রচিত একটি সহজ ও চিত্তাকর্ষক বড় গল্প। শরৎ চন্দ্রের পরবর্ত্তী যুগে যে কয়েকজন শক্তিশালী কথাশিল্পী আপন আপন বৈশিষ্ট্যে স্বনামধন্য হয়েছেন, শরদিন্দুবাবু তাঁহাদের মধ্যে একজন। শরদিন্দুবাবুর রচনায় লক্ষণীয় বস্তু দুটি। একটি তাঁর অনবদ্য ভাষা ও প্রাঞ্জল প্রকাশভঙ্গী, অপরটী কাহিনীর চিত্তাকর্ষক বিন্যাস, যা চলচ্চিত্র জগতে তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। আলোচ্য উপন্যাসখানি সাহিত্যধর্মী নয় ব'লে, গল্পাংশ, সংলাপ ও চরিত্র-চিত্রণে লেখক এমন নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন যে, বইখানি পড়তে আরম্ভ করলে শেষ না ক'রে ছাড়া যায় না। ধনেশ, নীলাম্বর, লক্ষ্মী ও বিজয় প্রভৃতির চরিত্র যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে কাহিনীর আগাগোড়া। কার্তিকের মার্বেল খেলা ও তার 'চিকা চিকা বুম' পাঠকের মনে থাকে।

[প্রকাশক ঃ—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। কলিকাতা—৬ দাম—দু টাকা আট আনা।]

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

প্রাচীন কবির কাহিনী ঃ শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু

শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসুর 'প্রাচীন কবির কাহিনী' পড়লাম। বাল্মীকি থেকে আরম্ভ ক'রে কালিদাস ও জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, লোচনদাস, জ্ঞানদাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবি এবং কাশীরাম ও কৃত্তিবাস এবং বিজয় গুপ্ত, মুকুন্দরাম, ষষ্ঠীবর দত্ত, কৃষ্ণরাম প্রভৃতি মঙ্গল-কাব্যের কবি, তাছাড়া ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের জীবনী ও কাব্যের মোটামুটি কথা এই বইখানিতে চমৎকার ভাষায় অত্যন্ত সরস ক'রে বর্ণনা করা হয়েছে। বাংলার ছেলেমেয়েদের এই সমস্ত প্রাচীন কবির সঙ্গে পরিচয়-সাধনের প্রয়োজন আছে। নইলে বাংলা-সাহিত্যের ধারাটিকে তারা খুঁজেই পাবে না। কিন্তু সে কাজ সহজ নয়। রবীন্দ্রকুমার সেই দুরূহ কাজটিই অত্যন্ত সহজে সুন্দর ক'রে সম্পন্ন করেছেন। শুধু যে তাঁর ভাষা গল্পের মতো সরস তাই নয়, প্রাচীন কবিদের সম্বন্ধে কতটুকু কেমন ক'রে জানলে তাদের মনে ওঁদের সম্বন্ধে আরও জানবার আগ্রহ জাগবে তাও তিনি বুঝেছেন। তাই ছেলেমেয়েরা এই বইখানি পড়তে ক্লান্ত তো হবেই না, বরং আরও জানবার জন্যে অন্য বড় বই সন্ধান করবে। স্বাধীন ভারতের ছেলেমেয়েদের পক্ষে জ্ঞানোন্মেষের আগেই পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে পরিচয় করতে না গিয়ে নিজেদের ঐতিহ্যকে জানাবার এবং বোঝাবার চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়।

[প্রকাশক ঃ শ্রীগুরু লাইব্রেরী ঃ ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ দাম—১৷৷০ আনা।]

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

রাসিয়ার রূপকথা ঃ শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বাংলাদেশ হইতে ছোটদের রূপকথার পাঠ একরকম উঠিয়া গিয়াছে। এখন থ্রিলার আর ছোকরা ও কিশোরী ডিটেকটিভের গল্প পড়ার যুগ। এমন দিনে প্রবীণ কথাশিল্পী সৌরীন্দ্রমোহন রাশিয়ার রূপকথা লিখিয়া ছোটদের আসরে যে সুস্থ আবহাওয়ার সৃষ্টি করিলেন সেজন্য তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতেছি। এ গ্রন্থে রাশিয়ার প্রায় হাজার বছর আগেকার আটটী বিভিন্ন রসের রূপকথা মা-দিদিমাদের সহজ সরল রূপকথার ছন্দের সুরে লিখিয়াছেন। লেখার গুণে রাশিয়ায় বৈশিষ্ট্য যেমন কোন গল্পে এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নাই, রূপকথার রাজ্যের আলোয় সুরে গল্পগুলিকে সম্পূর্ণ এদেশী বলেই মনে হয়। গ্রন্থে অনেকগুলি ছবি আছে। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই প্রভৃতি রূপসজ্জাও বেশ উপভোগ্য হইয়াছে।

[প্রকাশক ঃ শ্রীমদনমোহন দত্ত ঃ ২০ সি রামমোহন লেন, কলিকাতা-৭। দাম—২৷৷০ আনা।]

হাসির গান ঃ ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

স্বদেশী-গানের সুবিখ্যাত কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রচিত হাসির গান বাঙলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এককালে গানের আসরে আসরে ডি. এল. রায়ের হাসির গান শোনা যাইত। শোনা যাইত—

"পার তো জন্মো না কেউ, বিষ্যুৎবারের বারবেলা ;"

"আমার প্রিয়ার হাতের সবই মিঠে ;"—

আরও শোনা যাইত—

"হ'ল কি ! এ হ'ল কি ! এত ভারি আশ্চর্য্যি !"

বিলেত ফের্তা টানছে হুক্কা, সিগারেট খাচ্ছে ভশ্চায্যি।"

কিন্তু আজকাল সে-সব গান তেমন বড় একটা শোনা যায় না। কান্নার রাগিণীতে উদ্‌গীত 'আধুনিক'-গান নামে পরিচিত এক শ্রেণীর সঙ্গীত আজকাল আমাদের আসর মাতাইয়া রাখিয়াছে।—জীবন সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত বাঙালীর জীবনে সত্যই আজ হাসির অবকাশ বড়ই অল্প। কিন্তু হাসি ছাড়া যে মানুষ বাঁচিতে পারে না। শত লাঞ্ছনা-দৈন্যে উৎপীড়িত মানুষের অন্তরে একটুখানি হাসির রেখা, স্ফূর্তির আমেজ নব-জীবন সঞ্চারিত করে। তাই হাসির গানের প্রয়োজনীয়তা আমাদের জাতীয় জীবনে একান্ত প্রয়োজনীয়। আর সেই কারণেই 'হাসির গান' পুনর্মুদ্রণের জন্য প্রকাশক বাঙালীজাতির ধন্যবাদার্হ।

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান নিছক হাসির গানই নয়। এ গানের সুরের আড়ালে একটি সংবেদনশীল, সমালোচনা-প্রখর অন্তর সর্বদা জাগ্রত। আমরা ও-গানে হাসি বটে, কিন্তু আমাদের দৈন্য-নীচতা-ভাবালুতা ও বোকামির দিকে যখন কবি দুষ্ট হাসিয়া অঙ্গুলি নির্দেশ করেন, তখন আমাদের আত্ম-চেতনা ফিরিয়া আসে, নিজেদের কতকটা চিনিতে পারি। "কৃষ্ণরাধিকার সংবাদ", "রিফরমড হিন্দুজ্‌", "বিলাত ফের্তা", "চম্পটির দল—নতুন কিছু করো", "নব কুলকামিনী", "বদলে গেল মতটা", "নন্দলাল", "হিন্দু", "স্ত্রীর উমেদার", "যেমনটি চাই তেমন হয় না", "প্রেমতত্ত্ব", "প্রণয়ের ইতিহাস", "নূতন চাই", "বিরহতত্ত্ব", "বিরহ-যাপন", "বিলেত", "সালসা খাও", "চাকরি করা হায়রাণি" প্রভৃতি গানে যতখানি মধু আছে হুলও তেমনি সমানভাবে অনুভূতি-গম্য। 'আমরা ও তোমরা' এবং 'তোমরা ও আমরা' এই দুটি গান আমাদের সমাজের নারী ও পুরুষের সমবেদনা-মিশ্রিত সমালোচনায় অতীব মধুর। পুরুষ যখন বলে,—

আমরা দু'টাকা জোড়ার কাপড় পরি,—
তোমাদের চাই সোনা দশ বিশ ভরি,
বোম্বাই বারাণসী বছর বছরই,
তবু মন উঠে না'ত।

নারী জবাব দেয়—

প্রেমের সুখটি তোমরা লুফিতে চাও,
(তার) যাতনা আমরা সহি ;
পুত্র সাধটি তোমরা করিতে আগে
(তার) দুঃখ আমরা বহি ;
কোলে কর তারে যখন বেড়ায় খেলিয়া,
কাঁদিলেই দাও আমাদের কোলে ফেলিয়া,
ভাঙ্গিলে ঘুমটি রাত্রে কাঁদিয়া ছেলিয়া—
(তার) বকুনী আমরা সহি।

কি রকম স্ত্রী চাই এ-সম্বন্ধে কবি যখন গাহেন—

বসন কম ছেঁড়ে ও বাসন কম ভাঙ্গে
গয়না সে কদাচিৎ দুই একখান চায়,
খরচ-পত্র একটু গুছিয়ে করে,
অল্পই ঘুমায় ও অল্পই খায়,
তার উপর হয় একটু চলনসই গড়ন,
আর যদি হয় একটু বোকাটে ধরণ,
তার উপর ডাকে আমায় সোহাগে
পোড়ার মুখো মিন্সে ও হতভাগা,
তা'হলে হাঃ হাঃ সেত সোণায় সোহাগা।

তখন শুধু আমাদের হাসিই পায় না, আমাদের অন্তরের স্বার্থপরতার দিকেও দৃষ্টি পড়ে।

এই রকম অজস্র হাসির উপাদানে 'হাসির গান' পরিপূর্ণ। উদ্ধৃতির স্থান এখানে নিতান্তই অল্প, নইলে ভুলে যাওয়া অনেক হাসির গান পাঠককে স্মরণ করাইয়া দিতে পারা যাইত।

অধুনা প্রকাশিত একাদশ মুদ্রণটির প্রচ্ছদপট ছাপা, রঙীন কাগজ সকলই চমৎকার। উপহারের বই হিসাবে এই সংস্করণটির মূল্য অনেকখানি, ইহা পাঠকমাত্রেই অনুভব করিবেন। বাঙলাদেশের গায়ক ও গায়িকারা যদি এই গানগুলি আবার স্মরণ করেন, তাহা হইলে বাঙালীর মরাগাঙে আবার হাসি ও আনন্দের বান ডাকিবে আশা করা যায়।

[প্রকাশক : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স : ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—২॥০ আনা।]

পরের ছেলে : শ্রীনিরুপমা দেবী

জনপ্রিয় লেখিকা নিরুপমা দেবী রচিত কাহিনী পরের ছেলে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। লেখিকা একটি অতি পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থার জটিলতা সংশ্লিষ্ট নরনারীর মনোজগতে যে আলোড়ন সৃষ্টি হইতে পারে, তাহার মনোজ্ঞ চিত্র আঁকিয়াছেন।

দত্তক গ্রহণ আমাদের সমাজের একটি অতি প্রাচীন ব্যবস্থা। জমিদার নন্দকিশোর রায় নিঃসন্তান। একমাত্র ভাগিনেয় বিনয় তাঁহার বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। বিনয়ের একমাত্র ছেলে মাণিককে লইয়া জমিদার-পত্নী রাজেশ্বরীর বাৎসল্যবৃত্তি চরিতার্থ হওয়ার পথে চলিয়াছিল। হঠাৎ বিনয়ের স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ার পর বিনয়ের মনে রাজেশ্বরীর সর্বগ্রাসী বাৎসল্য ক্ষুধা থেকে মাণিককে মুক্ত করার দুর্দম দুশ্চেষ্টা আরম্ভ হইল। এই গানেই কাহিনী তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিয়াছে। কেমন করিয়া বিনয় একমাত্র পুত্র মাণিককে মাসীর কোলে তুলিয়া দিতে বাধ্য হইল তাহার উপর সকল অধিকার হারাইল ; রাজেশ্বরী পরের ছেলেকে নিজের করিতে গিয়া কি সমস্যায় পড়িলেন। নিজের ছেলেকে পরের হাতে তুলিয়া দিয়া বিনয় কি ভাবে পথে পথে ঘুরিয়া মরিল, শৈশবে মাতৃহীন বালক পরের শত স্নেহ মমতা ও ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত হইয়াও মানসিক দৈন্যে লাঞ্ছিত হইল, সমগ্র কাহিনীটি তাহারই তরঙ্গ সংঘাতে রসঘন হইয়া উঠিয়াছে। পাঠক মাত্রেই সে রসে আবিষ্ট হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

[প্রকাশক : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স : ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা। দাম—৩৲ টাকা।]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

দেশে দেশে মোর ঘর আছে : স্বপনবুড়ো প্রণীত

ছেলেমেয়েদের মনের মত করে কাব্য-সাহিত্য সৃষ্টি করা খুব সহজ-সাধ্য নয়, সে হিসেবে বিচার করলে সহজেই অনুমেয় যে, গল্পের মত করে এদের উপযোগী ভ্রমণ কাহিনী লেখা কত কঠিন। ভ্রমণের কথা গল্পচ্ছলে বলতে পারলে শুধু ছেলেমেয়েরাই আনন্দিত ও উৎসাহিত হয় না, তাদের পিতামাতা অভিভাবকেরাও তাদের দলে যোগদান করে রসাস্বাদন করেন।

গত বৎসরে নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের জয়পুর অধিবেশনে যোগদান করবার জন্যে গ্রন্থকার আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এই সুযোগটী পূর্ণভাবে গ্রহণ করবার উদ্দেশ্যে ইনি বেরিয়ে পড়েছিলেন যুগান্তরের ছেলেদের পাততাড়ি ফেলে ভারতের পূর্ব্ব তোরণ থেকে পশ্চিম তোরণের দিকে। ইতিপূর্ব্বে ইনি ইউরোপ ভ্রমণ করে 'সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে' লিখে ছেলেমেয়েদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছিলেন। এ সময়ে ওদের মধ্যে একজন বলেছিল—আচ্ছা স্বপন বুড়ো, তুমি তো বিদেশের কথা লিখছ, কিন্তু আমাদের এই ভারতবর্ষে কত জায়গা আছে, তার বিবরণ লিখবে না ?—সেই কথা এঁর মনে ছিল। তাই জয়পুর অধিবেশনে যাবার সময়ে এঁর মনে যে ঘর ছাড়া পথ ভোলা পথিক রয়েছে, সেই প্রেরণা জুগিয়েছিল ভ্রমণ কাহিনী লিখতে, তারই ফলে আলোচ্য গ্রন্থের সৃষ্টি হয়েছে। আমরাও ছিলাম এঁর যাত্রাপথের সাথী। গ্রন্থখানি পড়ে মনে হলো, দেশে দেশে, পথে পথে, ট্রেনে, টঙ্গায়, বাসে, মোটরে যেতে যেতে ইনি যে সব বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে মিশতে পেরেছিলেন, তাদের আচার ব্যবহার, সমাজ-সংসার ও সুখ-দুঃখের কথা লিখেছেন বেশ রসালো করে। তা ছাড়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, ঐতিহাসিক ঘটনার বিবৃতি ও ঐতিহ্যের আলেখ্য তো আছেই। আমরা যেখানে ধুলো মেখে বাউল সেজেই বিভোর হ'য়েছিলাম, উনি সেখানে ধুলো ঝেড়ে তার ভেতর থেকে সোনা সংগ্রহ করছেন। উত্তর পশ্চিম ভারত আক্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর রেখেই গ্রন্থকার নীরব হন নি, বর্ণনা ভঙ্গীর মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য ফুটিয়েছেন যা সাহিত্য সমাজের মানস ভোজের উপাদেয় সামগ্রী বলে সমাদৃত হবার সম্ভাবনা আছে, যেমন—চিতোরে একদিন যে ফুলটি বিকশিত হয়ে উঠেছিল, দিল্লীর তপ্ত নিঃশ্বাসে তা অকালেই অগ্নিশিখায় পুড়ে ছাই হয়ে গেল, দিলওয়ারার চারু-শিল্পকলায় বিমুগ্ধ হয়ে শিল্পী গ্রন্থকার লিখেছেন——'সেই সাহিত্যই হচ্ছে প্রকৃত সাহিত্য—যা নাকি পড়্‌বার পরেও ফুরিয়ে যায় না, আর সেই শিল্পকলাই সার্থক সৃষ্টি যা দেখ্‌বার পর মনে নতুন করে কল্পনার জাল বোনা সুরু হয়—' দিল্লীর পটভূমিকার ওপর দাঁড়িয়ে লেখক বলেছেন—'ফসিলের বুকে ফুটে উঠবে নতুন রক্তকমল—' আর গ্রন্থের উপসংহার করেছেন এই বলে—'দেশ দেশ থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে এলাম যে তীর্থ সলিল, তা একদিন গঙ্গার জলে মিশিয়ে দিতে হবে—কথাটার মধ্যে অন্তরের নানা নিগূঢ় ভাবের নিবিড় দ্যোতনা আছে—হয়তো নৈরাশ্যজনক, হয়তো বা আশাপ্রদ।

গ্রন্থের ভাষা খুব ঝর্‌ঝরে, তর্‌তরে, সহজ সরল। নানা স্থানের চিত্র ও পৃষ্ঠাগুলিতে পরিপূর্ণ।

[প্রকাশক: শ্রীপরিতোষ কুমার। সোয়ান্‌ বুক্‌স: ১১।১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—দুই টাকা।]

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

দিব্য জীবনবার্ত্তা: শ্রীঅরবিন্দের "The life Divine" পুস্তকের বঙ্গানুবাদ ১ম খণ্ড। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু

Life Divineএর মত যুগপ্রবর্ত্তক গ্রন্থের একাধিক অনুবাদের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে—কেন না এ গ্রন্থের ব্যঞ্জনা অসীম, সুতরাং বিভিন্ন অনুবাদ শিল্পকর্ম্ম হিসাবে অনুবাদকের নাম সংস্কৃতির সাধনরূপে গণ্য হবার দাবী রাখে।

শ্রীঅরবিন্দকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্ত্তি," মাত্র দুটী কথায় তাঁর এ গভীর পরিচিতির তুলনা নাই, বিদেশী ভাষার আবরণ উন্মোচন করে এই বাণীমূর্ত্তি আবিষ্কার করবার ভার যখন পড়লো তখন হাজার হাজার বছরের অধ্যাত্ম সাধনায় যে সার্ব্বভৌম্য দর্শনের ভাষা এদেশে গড়ে উঠেছে, তার শরণ নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না, শ্রীঅরবিন্দ যে বিরাট ঐতিহ্যের নবতম ও সমৃদ্ধতম অভিব্যক্তি, তার ধারাবাহিকতাকে অনুবাদে রক্ষা করাই ছিল অনুবাদকের উদ্দেশ্য। কিন্তু তার মনে অনুবাদ পরিভাষাসঙ্কুল এবং দুরূহ হয়েছে, সর্ব্বসাধারণের সহজবোধ্য হয় নি।

দিব্য-জীবনকে সহজবোধ্য করবার একটা দায় ছিল, শ্রীঅরবিন্দ সে সঙ্কল্পের অনুমোদনও করেছিলেন, কিন্তু এতদিন তাকে কার্য্যে পরিণত করবার সুযোগ হয় নি। আজ বসু মহাশয় নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে এ কাজটি সমাধা করেছেন। তাঁর অনুবাদ সম্বন্ধে বেশী কিছু বলবার প্রয়োজন দেখছি না। এমন করে তিনি দূরের জিনিসকে আমাদের কাছে এনে দিয়েছেন—এ তার শ্লাঘনীয় কৃতিত্ব। তাঁর সার্থক প্রচেষ্টায় দিব্য-জীবনের বার্ত্তা সাধারণের কাছে এমন সরল ভাষায় যে পরিবেশিত হল, তার জন্য তিনি আমাদের সকলের কাছে ধন্যবাদার্হ হয়ে রইলেন।

[প্রকাশক: শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির: ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা—১২। দাম—৫ টাকা।]

শ্রীঅনির্বাণ

নীড়হারা

শ্রীগৌরমোহন দাশ (প্রামাণিক)

কালবৈশাখীর প্রলয় ঝটিকা, যেদিন বহিল হায়;
নীড়হারা পাখী, সাথী খুঁজে সারা দুরন্ত দুরাশায়।
অতি আদরের প্রিয় বাসাখানি, কতই না শ্রমে রচেছিনু জানি,
জীবনের যত, ব্যথা ও স্মৃতির পরশ আছিল তায়।

তবু সে যে মোর, স্বপ্নের সেরা, হৃদয়ের ফুলরাণী;
কত জনমের, কল্পনা ঘেরা, "প্রিয় সে কুটীরখানি"।
মেদুর বাতাসে শেফালির দল, আঙ্গিনায় ঝরে ব্যথা বিহ্বল,
কেঁদে কেঁদে ফিরে, আশা আকাঙ্ক্ষা, ভগ্ন হিয়ার গ্লানি।

চলে গেছে আজি তারি সাথে সব, যত কিছু আশা মোর
মধুর স্বপন ভেঙ্গে গেছে হায় যামিনী না হ'তে ভোর।
ছিঁড়ে গেছে তার, ভগ্ন বীণার, দরদী প্রাণের সুর ঝঙ্কার,
নিভে গেছে দীপ রুক্ষ হাওয়ায়, ঝরে শুধু আঁখিলোর॥

আজো মনে পড়ে সবই ছিল না স্মৃতিভরা গৃহ মাঝে;
আলো করা চাঁদ, বনানী শিখরে, তেমনি আজি গো রাজে।
জীবনের সেরা তীর্থ আমার, প্রণিপাত করি চরণে তোমার,
কালের চক্রে, বিদায় দিয়াছি, বেদনা বিধুর সাজে।

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত রহস্যোপন্যাস "শত্রু-সমরে নারী (২য় সং)—২৲
ডাঃ নরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রণীত "টি, বি—সহজবোধ্য ও সহজসাধ্য"—৫৲
বিধায়ক ভট্টাচার্য্য প্রণীত পুরুষ ভূমিকা বর্জ্জিত নাটক "মাটির ঘর"—৷৷৶৹
দেব সাহিত্য কুটীর-প্রকাশিত ছোটদের পূজা-বার্ষিকী "ইন্দ্রধনু"—৪৲
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "শুভদা" (৮ম সং)—২৷৷৹
নিশিকান্ত বসুরায় প্রণীত নাটক "পথের শেষে" (১৬শ সং)—২৲
শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "ঝিন্দের বন্দী" (৯ম সং)—৩৲,
"দুর্গরহস্য" (২য় সং)—৩৷৹

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



শিল্পী—শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস



অগ্রহায়ণ—১৩৬১

প্রথম খণ্ড | দ্বিচত্বারিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

অর্দ্ধনারীশ্বর

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

মানুষ ইন্দ্রিয়গত রসানুভূতির দাস ;—তার বহিরঙ্গনে যে কী ঐশী লীলা চলচে তা' তার দেখার সাধ্য নেই। তাই সে মননে, ধ্যানে ও অনুভূতিতেও কেবল নিজের ইন্দ্রিয়গত রসরূপেরই ইঙ্গিত পায় তুরীয়লোকে ইন্দ্রিয়বোধকে ক্ষণতরে অবহত রেখেও। একেশ্বরবাদী বিভিন্নধর্মী 'সেন্ট' বা 'সুফি'রাও এই প্রকার এক অভূতপূর্ব অনুভূতির পরিচয় পেয়েচেন, যাকে 'মিসটিক' বা 'ছায়াবাদ' বলা যেতে পারে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেহই রহস্যময়ের রহস্যরূপের দ্বার উদ্‌ঘাটনে সমর্থ হন নি। আমাদের পৌরাণিক তেত্রিশ কোটী দেবতার রূপ-কল্পনা তাই বিশ্বরূপের ব্যক্তিগত অনুভূতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। কেহ শৈব যদি হন ত শক্তির পূজারীকে ঘৃণা করার কোনোই কারণ নেই। নিজের বোধ ও উপলব্ধিতে উপাসক উপাসনা করেন, কিন্তু আত্ম-সুখের জন্য নয়—সর্বজীবের মঙ্গলের জন্য। ব্রাহ্মণ্য-ধর্মে গীতায় উপনিষদে—এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে এই অহমের বিস্তারের কথা বহু ভাবে বলা হয়েচে। এই অহমের বিস্তার যখন সর্বজীবে চরাচরের মধ্যে হয় তখন আর নিজের সুখ, সুবিধা বা নিজের আত্মীয়-গোষ্ঠীর প্রতিপালনেরই মধ্যে জীবনের সকল তথ্য নিহিত থাকে না। তখন গরীব ও ধনীর দুই তারতম্য তাঁদের মনে পীড়া দেয়—তাঁরা সবাইকে সমান সুখী ও সমান জ্ঞানী দেখতে চান। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়ে, এই সংসারে প্রতিপদে আমরা তার বিপরীত আচরণ করচি হিন্দু হয়েও। প্রকৃত হিন্দু সেই ব্যক্তি যিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ সেই ব্যক্তি যিনি ত্যাগী নির্লোভ—যিনি সকলের সেবার জন্য জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেন। প্রকৃত ব্রাহ্মণ বিষয় বুদ্ধদেবও এই কথাই বহু ভাবে বলেচেন প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে আমাদের দেশেই। কিন্তু আজও আদিযুগের আত্মরক্ষার্থে অর্থসংগ্রহ, আত্মগোষ্ঠী প্রতিপালনের মমতা নিয়েই আমরা আছি। আমাদের বৃহৎ মানবলোকের প্রতি প্রসারিত পরিমার্জিত দৃষ্টি পড়চে

না এবং আদি সংস্কার আজও দূর হয়ে যাচ্ছে না। তাই আমাদের বার বার জানা প্রয়োজন—প্রকৃতরূপে বিশ্বপ্রকৃতি কে এবং তার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কী। আমরা যখন মূলগত বিষয়ের সন্ধান করব, তখন আমাদের মনের সঙ্কীর্ণতা ঘুচে যাবে। এই মূলের দিকে তাকিয়েই ঋষি মুনিরা সত্য বিচার করতে পেরেচেন এবং নৈতিক বা পারমার্থিক সকল তত্ত্বের কথা আমাদের নিকট প্রকট করে গেছেন। এর মধ্যে মূলগত প্রকৃতি ও পুরুষের বা অর্দ্ধনারীশ্বর রূপে অপাপবিদ্ধ—সত্যসত্তা-বোধকে যে তাঁরা কি ভাবে অনুভব করেচেন তার কথাই গোড়ায় বলা প্রয়োজন মনে করি।

মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায় ৩২ শ্লোকে আছে—প্রজাপতি দ্বিধা বিভক্ত হয়ে এক অর্দ্ধে পুরুষ এবং অপরার্দ্ধে নারী হয়েছিলেন এবং সেই নারীতে বিরাট পুরুষকে সৃষ্টি করেছিলেন;—সেই বিরাট পুরুষ আবার মানবমণ্ডলীর জনক মনুকে সৃষ্টি করেছিলেন। দ্বিধা বিভক্ত প্রজাপতিকে চর্মচক্ষে আমরা দেখচি পুরুষরূপে আকাশে—অর্থাৎ অনন্ত-লোকে এবং নারীরূপে তার বিপরীতে দেখচি সৃষ্টিতে—অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য আর অগণিত নক্ষত্ররাজির বিভূতির মধ্যে। এই ব্যাপার থেকেই দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের সৃষ্টি হল। কঠোর তপশ্চর্যার দ্বারা বেদজ্ঞ ঋষি মুনিরা সৃষ্টি ও স্রষ্টার বিষয় জানবার জন্য বহু গবেষণা করেচেন আমাদের দেশে। তবে এটা ঠিক যে, কোনো সৃষ্টিই একক বা স্বয়ম্ভু নয়। সৃষ্টিকর্তাকেই একমাত্র স্বয়ম্ভু বলা যায়, নইলে তাঁকে নিয়ে আমাদের বিপদে পড়তে হবে। কোনো ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তি দিয়ে তাঁকে বাঁধা যাবে না বা প্রকাশ করা যাবে না—সকল সংজ্ঞা বা বুদ্ধির অতীত তিনি। আমরা চর্মচক্ষে ইন্দ্রিয়গত জ্ঞানে বীজের মধ্যেই বৃক্ষের আদি পরিচয় পাই; কিন্তু সেটা স্থূল বিচারেই পাওয়া সম্ভব। সূক্ষ্ম বিচারে বীজের ও জন্মের আদি অনুসন্ধান যদি করি তবে তার অস্তিত্ব আমাদের নিকট কোথায় থাকে? কেবল একটা অনুভূতির বিষয় মাত্র হয়। কিন্তু যে বীজ এখনো জন্মায়নি সেটার বিষয় আমাদের অনুভূতিই বা কোথায়? বৈজ্ঞানিক বিচারেও আমরা দেখি, অণুলোম প্রতিলোম ঘটিত ব্যাপারে সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্ম বিচারে অণু, বিদ্যুতাণু থেকে নিয়ে আরো সূক্ষ্ম বস্তুতান্ত্রিক গবেষণায় দিশাহারা হতে হয়েছে। বিজ্ঞান ধ্বংস-শক্তির চাবিটি উদ্ধার করতে পেরেচে—কিন্তু সৃষ্টি রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটিত করতে পারেনি। বিশ্বযোনি যেখানে বিরাট, সদাব্যাপক—ইন্দ্রিয়াতীত লোকে চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র-রাজিতে ক্রমবর্দ্ধমান, সেখানকার কথা ভাবতে গেলে আমাদের শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যায়—বাক্ নিস্তব্ধ থাকে—চৈতন্য লোপ পায়। মানসিক পরিকল্পনায় সাধু মহাত্মারা যে বিরাট আলোক বা সূক্ষ্ম তেজকণার অনুভূতি লাভ করেন হৃদয়ের গভীর অন্তঃস্থলে তূরীয় অবস্থায় তাতেও তার রসরূপ গড়া হয় মাত্র—সত্যরূপ নির্দ্ধারিত হয় না। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ শিক্ষা ও সংস্কারগত বিশ্বাসে বৰ্দ্ধিত হয়ে যে অনুভূতি উপার্জন করেন তার মধ্যে সেই বিরাট-সত্তার অনুভূতি সম্পূর্ণভাবে থাকতে পারে না।

সিদ্ধিযোগে আছে: (১) "অণিমা" অণুকণায় আত্ম-সত্তা বিলোপ (অহম-বিলোপ); (২) "মহিমা" সৃষ্টি-বিভূতি ও অনন্তের মধ্যে অহমের বিস্তার (অর্থাৎ সৃষ্টির সকল বস্তুর মধ্যে জড়, জীব,স্থাবর, জঙ্গম, বায়ুকণা, ধূলিকণার মধ্যে নিজেকে দেখা); (৩) "লঘিমা লঘুত্ব আনা (অর্থাৎ শরীরের অস্তিত্ববোধ দূর ক'রে বায়ুর মত নিজেকে বোধ করা), (৪) "গরিমা" নিজের ওজন বৃদ্ধি (অর্থাৎ সকল বাস্তব দেহধারী জীব ও বস্তুর সমষ্টিগত ওজন নিজের মধ্যে অনুভব করা। (৫) "প্রাপ্তি" সকল বস্তুকে অহমের মধ্যে প্রাপ্তি। এই প্রকার বহু অনুভূতির যজ্ঞ যোগাচারীরা করেন। কঠোপনিষদে (ষষ্ঠী বল্লী—৯ম শ্লোকে) আছে—

> "ন সন্দশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
> ন চক্ষুষা-পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
> হৃদা-মনীষা-মনসাভিকৢপ্তো
> য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

অর্থাৎ—ইঁহারা (এই বিরাটের) রূপ, দর্শনের বিষয় নয়। কেহ তাঁহাকে চক্ষুর দ্বারা দেখতে পান না। হৃদয়—সংশয়-রহিত বুদ্ধি এবং মনন দ্বারা তিনি প্রকাশিত হন। যিনি ইঁহাকে জানেন, তিনি অমর হন। মূলতঃ তাঁকে জানা যায় না এই কথা মননে বিচার দ্বারা জানলেই তাঁকে জানা হয়। উপনিষদে তাই আরো বলা হয়েছে—"অব্যক্ত হইতে ব্যাপক এবং অশরীর পুরুষই শ্রেষ্ঠ।" যাঁহাকে জানিয়া জীব মুক্ত হয় এবং অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি সঙ্গীতে সেই অজানারই গান গেয়েছেন:—

"দু-দিন দিয়ে ঘেরা ঘরে
তাতেই কি তোর এতই ধরে—
চিরদিনের বাসাখানি—
সেই কি শূন্যময় ?
জয় অজানার জয় !"

এই অজানার রূপেতেই জানা হবার জন্যই যেন প্রকৃতি-মাতা (পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গিনী) লাবণ্য-সম্ভৃতা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবে আমাদের সম্মুখে একইকালে প্রকাশমানা আছেন। দ্বৈতরূপ এইভাবে প্রতিনিয়তই ত আমরা দেখচি প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে চোখের সামনে, কিন্তু কবির ভাষায় পুনরায় বলা প্রয়োজন,—"চোখে দেখিস প্রাণে কানা, হিয়ার মাঝে দেখনা ধরে ভুবনখানা।" আমরা আমাদের এই বিশ্ব-মাতার কোলে থেকেও তাঁকে দেখচি না—কাঁদচি অহরহঃ অভাব-অভিযোগের মধ্যে ক্ষণস্থায়ী শরীরীরূপে অবস্থান করে এই সংসারে। বিশ্বপিতা এবং বিশ্বমাতা একাধারে দুই কোলে আমাদের যে রেখেচেন তার কথা ভুলে যাই আমরা—দেহগত ইন্দ্রিয়ের ক্ষণিক সুখে অভিভূত হ'য়ে। বৈষ্ণবসাধুরা তাই আরো নিকটতর করার জন্য এই অর্দ্ধ নারীশ্বরকে (দ্বৈত ও অদ্বৈতকে) দেখেচেন শ্রীকৃষ্ণমুরারী রাধিকারমণরূপে। স্রষ্টা শ্যাম, বারিদঘন নীলাকাশ অঙ্গ নিয়ে বাঁশরী বাজাচ্চেন অনন্ত রন্ধ্রে—বসন তাঁর পীত (বিভূতিযুক্ত)। সেই মধুক্ষরিত বংশীধ্বনিতে উতলা নীলবসনা (অনন্ত রূপব্যঞ্জক) রাধা সৃষ্টির সকল বিভূতিরূপে ছুটে চলেচেন তাঁর নিকটে। ওতপ্রোতভাবে—চক্রহারে এই চলার খেলা চলেচে গগনে ভুবনে ত্রিলোকের মধ্যে এবং তার বহিরঙ্গনে। পুরুষ "শিবরূপ শান্ত; প্রকৃতি" মহাকালীরূপে চঞ্চল, ক্ষণভঙ্গুর অশান্ত। শিবেরই বুকে মহাকালীর তাণ্ডব নৃত্য চলচে। ধ্বংস ও সৃজন-রহস্যের এই লীলা বিজ্ঞানে যা' ধরতে পারেনি, আমাদের ঋষিরা এইভাবে ভাবগ্রাহ্য করেচেন; অশরীর সৃষ্টি ও লয়ের কারণ, মঙ্গলস্বরূপ এবং প্রাণাদি দেহভাগের কর্তাকে এই ভাবে তাঁরা উপলব্ধি করেচেন।

এই প্রকৃতিতে নারীভাব এবং অনন্তে পুরুষভাব উপলব্ধি করা থেকেই নারী আর আমাদের নিকট কেবল সংসারের আসবাবপত্রের মত একটা অচল কিছু রইল না। মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি আজও তার সাক্ষ্য দিচ্চেন। নারীতেই দুর্গারূপ দিয়েচেন পৌরাণিক ঋষিরা। দুর্গা "দুর্ + গম + ড" এই ধাতু প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন শব্দ 'দুর্গা'—অর্থাৎ যিনি মৃত্যু থেকে (সকলকে) দূরে গমন করাতে পারেন। তিনি দশপ্রহরণধারিণী ইন্দ্রিয়-অসুর নিধনে লিপ্ত। কল্যাণের জন্যই শস্ত্র ধারণ করেচেন! অন্যদিকে যশোদা মাতা কৃষ্ণকে কোলে ক'রে আছেন। অনন্ত ("নীলমণি" আকাশ) নেবে এসেছে ধরণী মাতার কোলে। যশোদা কৃষ্ণের এই রূপ আমরা দেখতে পাচ্চি। আবার যোগেশ্বরীকে দেখচি: দেবীর হস্তে খড়্গা ("শাসন" অন্যায় কর্মে আঘাতদানের জন্য); মুসল ও লাঙ্গল অন্য হস্তে (অর্থাৎ জন্ম ও উৎপন্নের সহায়ক শস্ত্রধারিণী)। এইভাবে রক্তচামুণ্ডার রুধিরের মধ্যে সকল জীবের প্রাণ-শক্তির বীজ আমরা দেখচি—জীর্ণকংকালে নবকিশলয়ের মত। বলি দিচ্চি তাঁর নিকট বাসনার আত্ম-বলি—সকল ইন্দ্রিয়গ্রামকে বশীভূত করে—মহানুভূতিকে জাগিয়ে। স্থাবর, জঙ্গম, জগৎ যাঁহার দ্বারা পরিব্যাপ্ত, তাঁকে এই দ্বিত্ববোধে আমরা অহরহঃ উপলব্ধি করতে পারি। একদিকে যেমন তিনি অজ্ঞাত, অন্যদিকে মাতার মতন পিতার মতন আমাদের সম্মুখেই সদা বিরাজমান তিনি। নারীর মধ্যেই ঐশীশক্তি আমাদের ঋষিরা এইভাবে দেখেচেন। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী-ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রহ্মাত্মিকা শক্তিই এই নারী। এই শক্তিই সৃষ্টি সংহারের—জন্ম-মৃত্যুর লীলারহস্য। ঝড় ঝঞ্ঝা, মহামারী, মৃত্যু, প্রলয়, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রকৃতির দুর্যোগ এই শক্তির রূপ, ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ করে। আবার নবকিশলয়ে পল্লবিত তরুলতা—সদ্যজাত শিশুর মধ্যেও সেই নারীশক্তির মহামায়া রূপ প্রকাশিত থাকে।

দেবীপুরাণে আছে:—মাতৃগর্ভ মধ্যে অবস্থিত শিশু প্রসূতিবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া ভূমিষ্ঠ হবার মাত্র যিনি তাঁকে নিরন্তর জ্ঞান-রহিত করেন, যিনি পূর্বজন্মের সংস্কার-সমূহ দ্বারা জীবনের প্রথম দিনেই মানুষকে আবদ্ধ করিয়া জ্ঞাননাশক মোহ ও মমত্ব দ্বারা আচ্ছন্ন করেন—যিনি জীবকে ক্রোধ, উপরোধ ও লোভে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপপূর্বক পশ্চাৎ কামাসক্ত করিয়া অহর্নিশ চিন্তাযুক্ত, আমোদনিরত ও ব্যসনাসক্ত করেন, সেই জগদীশ্বরই এই কারণে 'মহামায়া' নামে অভিহিতা হন। এই মহামায়া সংসারের মোহে আবদ্ধ না করলে মানব সৃষ্টি বা জীব-প্রজনন সম্ভব হতো

না। সকল নারীতেই তাই এই মোহিনী শক্তি বিরাজ করে। এই রজগুণাত্মিকা শক্তি এই মহামায়ারই সৃষ্টির মধ্যে স্থিতি-রাগ জন্মাবার কৌশল মাত্র। তন্মাত্র যোগে যোগী ঋষিরা এই তত্ত্ব অনুভব করেন এবং সাবধান হন। নিত্য বস্তুর নিত্যত্ব জ্ঞান এবং অনিত্য বস্তুর অনিত্যত্ব জ্ঞান—বা বিবেকই এই ধর্মাত্মাদের সহায় হয়। প্রজ্ঞারূপা সরস্বতীকে এই মনীষীরা প্রত্যক্ষগোচর করেন এবং সত্ত্বজ্ঞানযুক্ত বিচারে প্রকৃত সত্তাকে অনুভব করেন। সরস্বতী ব্রহ্মাকন্যারূপে বিদিতা ;—তাঁর কাজ সকল শুদ্ধ শান্ত সৃষ্টি কার্যের মধ্যে। তাই বীণাপাণি শ্বেতা। নীর থেকে ক্ষির গ্রহণ করচে নিয়ত তাঁর বাহন হংস। পরমহংস যাঁরা তাঁরাও তাই কার্যতঃ তাঁরই উপাসক। সহজভাবে আমরা ধর্মাত্মা না হয়েও দেখতে পাই নারীর মাতৃমূর্তি ঘরে ঘরে। আমাদের মা-ই আমাদের গতি। মাকে পাওয়া যায় প্রত্যেকের ঘরে যদি সত্য অনুভূতি জাগে। প্রকৃতিকে যদি চিনি তবে নারীকে মায়ের মতই দেখ্‌তে পাব। মাতৃজাতি সর্বদা আত্মত্যাগে রতা—দেশ, কাল,—পশুপক্ষী জীবজন্তুর মধ্যেও এই মায়ের কোনো পরিবর্তন নেই—সর্বত্রই তিনি আছেন। 'নেগেটিভ' ও 'পজেটিভ' মিলে যেমন বিদ্যুৎ তেমনি প্রকৃতি (মা) এবং পুরুষ (পিতা) অর্থাৎ অনন্ত মিলে বিশ্বসৃষ্টি সম্ভব হয়েচে। সেই কথাই একদিন মনে উদয় হওয়ায় আমার কণ্ঠে গান এল :—

(ওমা) এসেছি ত বিবসনা
ব্যসনে কি কাজ
যাব চ'লে তব কোলে
ঘুচিবে গো লাজ।
(ওমা) চাঁচর চিকুর দিয়ে
দিলি চূড়া যা' বাঁধিয়ে
বুকে নিলে দিগম্বরী
যাব ফেলে সাজ।
একি মোহ একি মায়া
দিলি ওমা মহামায়া
কাল্‌কে যেথা ছিনু আমি
ভুলেছি সে আজ।

জীবনবাদ

শান্তশীল দাশ

হিসাব নিকাশ অনেক হয়েছে, এবার বন্ধু শোন ;
জমা খরচের জাব্‌দা খাতাটা ফেলে দাও এক ধারে ;
এতদিন ধরে হিসাব করে কি লাভ হ'লো ভাই কোন ;
ওতে প্রতিদিন অশান্তি আর অভিযোগ শুধু বাড়ে।

দিন রাত্রির বেড়া-দিয়ে-ঘেরা ছোট এ জীবনখানি,
কবে এর সুরু—কেউ তো জানে না, হিসেব রাখে না তার ;
ছোট এ-ঘরের নিভে গেলে দীপ, শেষ হয়ে যাবে জানি ;
তার পর কিছু আছে কি না আছে—সবই তো অন্ধকার।

এই জীবনের মাঝে আছে আলো, আছে হাসি, আছে গান ;
আছে তার মাঝে দুঃখ-দৈন্য, বেদনার আঁখি ছল।
সীমা টেনে টেনে ছোট ছোট ঘর বেঁধে মান অভিমান—
হিংসা-দ্বেষের বিকৃত জীবনে মিছে শুধু কোলাহল।

চোখের সমুখে দেখি প্রতিদিন সীমাহীন নীলাকাশ,
পায়ের তলায় দিগন্ত-জোড়া প্রসারিত ভূমিতল ;
আদি ও অনন্ত কোথাও এদের মেলে না কোন আভাস,
তারই মাঝে ছোট বিন্দুর মত এ-জীবন চঞ্চল।

এত ছোট এই জীবনের মাঝে অকারণ চপলতা,
সে-চপলতার হিসাব-নিকাশ নহে কি অর্থহীন !
মৌনী তাপস বিরাট বিশ্ব, ভাঙে নাকো নীরবতা,
ক্ষণিকের এই কলকোলাহল থেমে যাবে এক দিন।

হাসিমুখে নাও যখন যা আসে ; আনন্দ বেদনায়
ওরে তোল এই ছোট জীবনের ছোট এ পত্রখানি ;
যাবার বেলায় সে তো পড়ে রবে ধূলায়, অবহেলায়,
পথের প্রান্তে ;—এই কথাটুকু কেন নাও নাকো মানি।



সিবনালয়

শ্রীসুধীররঞ্জন গুহ

১

সব ভিড়কে হার মানিয়েছে অক্‌ল্যাণ্ড রোডের ভিড়। এ-ভিড়ের মুখে হাসির এতটুকু ছোঁয়া নেই। একমাত্র ছুটীর দিন ছাড়া অন্য সব দিনেই সমান। দশটা থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত দূর থেকে মনে হয় যেন একটা থম্‌কে দাঁড়ান জনসমুদ্র!

অক্‌ল্যাণ্ড রোড। উদ্বাস্তু পুনর্ব্বসতি আফিস। কে কি পায় কে জানে! তবুও নামের মোহে মাথা গুঁজতে এক টুক্‌রা জমি বা ঋণের জন্য ওখানে ছুটাছুটী করে উদ্বাস্তুরা। অসীম ধৈর্য্য ওদের। কবে থেকে যে ওখানে যেতে সুরু করেছে, আর কবে যে যাওয়া শেষ হবে—তা' তা'রা জানে না। জানে—যাদের উপায় নেই তাদের ধৈর্য্য হারাতে নেই।

এক টুক্‌রা জমির জন্য অনেকদিন যাবৎ ঘোরাঘুরি করছিল প্রতীপ। দরখাস্ত ক'রেছে ১৯৫০ সালের প্রথম দিকে—তখনও পায় নি। জমি পায় নি কিন্তু পেল মহুয়াকে।

আগের দিন প্রতীপ মহুয়াকে দেখেছিল, মহুয়াও দেখেছিল প্রতীপকে। অনেক দিন পর এই প্রথম দেখার আনন্দ ওদেরকে এক জায়গায় এনে দেবার কথা। কিন্তু তা' আনল না। সে পরিবেশ কোথায়? মনে সে-মাধুরী নেই মহুয়ার। মহুয়া তাই ডুব দিয়েছিল জনসমুদ্রে।

প্রতীপ মনে করল, মহুয়া হ'লে নিশ্চয়ই এগিয়ে আসত। এত দিন পরে দেখা—নিশ্চয়ই কথা বলে যেত তা'র সঙ্গে। সুতরাং ও মহুয়া নয়—তবে চেহারায় অনেকটা মিল রয়েছে মহুয়ার সঙ্গে।

ফেরার পথে সারা পথ প্রতীপের তাই ভাবনা, কেন সে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল না মেয়েটীর কাছে। কাছে গিয়ে দেখ্‌লেই সন্দেহ দূর হ'য়ে যেত। ভুল করেছে সে খুব। সে-ভুলের জন্যই অনুতাপে প্রতীপের মন আনমনা।

আগের দিন প্রতীপকে এড়াতে গিয়ে কাজ না করেই মহুয়া চলে এসেছিল। পরের দিন তাই আবার তাকে যেতে হ'ল অক্‌ল্যাণ্ড রোডে। মনে ভাবল মহুয়া, সেদিন আবার প্রতীপের সঙ্গে সাম্‌নাসাম্‌নি দেখা হ'য়ে না যায়। কিন্তু প্রতীপ যে সেদিনও সন্দেহ দূর করবার জন্যই গেছে।

নিজের চোখ দু'টীতে দূরবীণের শক্তি নিয়ে মহুয়াকে খুঁজছিল প্রতীপ। পরিশ্রমের ফল পেল হাতে হাতে। দূর থেকে দেখ্‌ল, গত দিনের শাড়ীখানা পরা সেই মেয়েটী। প্রতীপের নিজের মনের যত শক্তি তখন কেন্দ্রীভূত তা'র চোখ দুটীতে। চোখ দিয়েই আট্‌কে রাখল তা'কে।

হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছে। মহুয়াই। চেহারা অনেক খারাপ হ'য়েছে। চেনাই যেত না যদি মর্ম্মভেদ করা চোখের চাওয়া, আর কাঁধের উপর সারা কাঁধ জুড়ে ওর চুলের খোপাটী আগের মত না থাকত।

সেদিনও ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে একবার চেষ্টা করেছিল মহুয়া, কিন্তু চেয়ে দেখে প্রতীপের চোখে সে বন্দিনী। পালাবার আর পথ কোথায়! শেষ পর্য্যন্ত পথ ক'রে আসতে হ'ল একটা ফাঁকা জায়গায়।

জিজ্ঞেস করার মতো কত কথা প্রতীপের জিবের ডগায় এলো। ঢোক্ গিলে সেগুলোকে নীচে নামিয়ে দিয়ে প্রতীপ জিজ্ঞেস করল, তুমি এখানে কেন মহুয়া?

মনে হ'ল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস জোর ক'রে চেপে রাখল মহুয়া। পরে বল্ল, এখানে না এসে উপায় কি! বাবা, ঠাকুর্দ্দা বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে প্রার্থনা জানাতেন। আর আজ শুধু আমাদের একার নয়, গোটা পূব-বাংলার

জন্য উদ্বাস্তুদের এই তো সেই বিরাট চণ্ডীমণ্ডপ! যা'র যা প্রার্থনা সে তো এখানেই—রিলিফ-কমিশনার সিদ্ধিদাতা! কিন্তু আপনিই বা এখানে কেন প্রতীপ বাবু?

—দেব মন্দিরে কি আমার কোন প্রার্থনা থাকতে পারে না?

—পারবে না কেন···তবু?

—জমির জন্য। ১৯৫০-এ দরখাস্ত ক'রেছি। অফিসার বলেছিল, দরখাস্তের ক্রমিক নম্বর অনুসারে পর পর জমি দেওয়া হচ্ছে। সে-কথাতেই বিশ্বাস করে' এত দিন ছিলাম। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, আমার পরে যা'রা দরখাস্ত ক'রেছে তা'রা একটু ঘুর-পথে গিয়ে জমি পেয়ে দিব্যি বাড়ী ঘর তুলেছে। ঘুরপথে যাওয়ার পাথেয় আমার নেই তাই সোজাপথে একটু হাটাহাটি করে যদি জমিটা পেয়ে যাই···

আমিও আপনার চেয়ে কম ভুক্তভোগী নই,—বল্ল মহুয়া।—তবে জমির জন্য নয়, সোয়িং মেসিন।

—পেয়েছ? জিজ্ঞেস করল প্রতীপ।

—পেয়েছি। তারই কিস্তির টাকার জন্য মাথার উপর নোটিশ ঝুলছে।

—কি করতে চাও তুমি?

—শ্লিপ্‌ দিয়েছি—অফিসারের সঙ্গে দেখা করব। দেখুন তো ক'টা বাজে?

—তিনটা দশ।

—সর্ব্বনাশ! তিনটা থেকে চারটা পর্য্যন্ত দেখা করার সময়। আমাকে তবে ওখানেই গিয়ে এখন দাঁড়াতে হয়।

নিশ্চয়। কিন্তু কোথায় থাক তা' তো বল্লে না! তোমার বাবা মা কেমন আছেন?

—থাকি পূর্ণনগর উদ্বাস্তু কলোনীতে। দয়া করে একদিন যাবেন—দেখে আসবেন বাবা মাকে।

—যাব কি করে? ঠিকানা না দিয়ে গেলে, 'কলকাতায় থাকি'—কোথায় গিয়ে উঠ্‌ব?

একটু হেসে মহুয়া বল্ল, ভুল হ'য়ে গেছে। টালীগঞ্জ ট্রাম ডিপো থেকে আশী নম্বর বাসে উঠবেন। নামবেন রাণীকুঠীতে। নেমে জিজ্ঞেস্ করবেন কাউকে, ঠিক বলে দেবে। বাড়ীর নম্বরটী হচ্ছে কা১৮, সিবনালয়।

পরের রবিবার। সকাল থেকেই মনে মনে প্রস্তুতিটা চলছিল প্রতীপের। বিকালের দিকে গিয়ে উপস্থিত হ'ল মহুয়াদের বাড়ী। জোর-দখল কলোনীতে ছোট ছোট টালির ঘর। চারকাঠা করে প্লট্। বাঁশ দিয়ে বাড়ীর সীমানা দেওয়া। তারই মাঝে—সব হারিয়েও শখ যায় নি যাদের—তাদের আবার কুঞ্জলতায় লতান সদর দরজা—ইটের কোণা উঁচু ক'রে রাস্তা তৈরী করা। ভেতরে লাউ কুমড়া তরিতরকারীর গাছ। সব বাড়ীতেই কলাগাছ বেশী। চোখের খোরাকীর জন্যও আছে লাল, নীল এবং বেগ্‌নী রংয়ের ফোটা, আধ-ফোটা ফুল। কিন্তু মহুয়াদের বাড়ীতে ওসব কিছুই নেই। শুধু শরৎ কালকে নিজের বাড়ীতে বেশী করে পাওয়ার এবং দেখবার জন্য মহুয়া লাগিয়েছে দু'টী শিউলি ফুলের গাছ।

ঘরের বারেন্দায় মহুয়ার স্কুল বসেছে। অনেকগুলো মেয়ে। যা'দের হাতে খড়ি, তা'রা কাঁচি দিয়ে খবরের কাগজ কেটে কেটে ব্লাউজের ছাট্ শিখ্‌ছে। যা'দের হাত পেকেছে তা'রা কাট্‌ছিল সত্যি সত্যি কাপড়। ঐ কাগজ এবং নানা রংয়ের ছিট্‌কাপড়ের ছাট্-কাটের টুক্‌রা অংশ বাড়ীময় ছড়িয়ে রয়েছে পাতাবাহারের পাতার মত।

প্রতীপ প্রথমেই গেল মহুয়ার বাবার কাছে। মহুয়ার বাবা অসুস্থ, শয্যাশায়ী। বিছানার পাশে শিশিতে লাল রংয়ের মিক্‌চার। একটা কাটা ডাবের মুখ ঢাকা, আর কাগজের একটা ঠোঙার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল আধখানা বেদানার লাল রোয়াগুলো।

প্রথমটাতে জীবনবাবু চিনতেই পারল না প্রতীপকে। জিজ্ঞেস্ করল, কে এসেছেরে মহুয়া?

প্রতীপবাবু তোমাকে দেখতে এসেছেন।

একটু সময় লাগল যেন মনে করতে। পরে জীবনবাবু বল্ল, তুমি প্রতীপ মাষ্টার!

—হ্যাঁ—আমি প্রতীপ।

বেশী কথা বলার শক্তি ছিল না জীবনবাবুর। মুখে যা' বল্ল, হাত ঘুরিয়ে বল্ল তার চেয়ে অনেক বেশী। উপরের দিকে আঙুল দিয়ে কি দেখাল কয়েকবার—আবার নিজের কপালেও হাত ছোঁয়াল বার দুই।

জীবনবাবুর এই ইঙ্গিত অনেকটা বুঝতে পারল প্রতীপ! দুঃখ পেল মনে। জীবনবাবুর সে-জাঁকজমকের সাক্ষী তো

সে নিজেও। দেশের দোতলা বাড়ীতে ঐ হাতে কত টাকা-পয়সা আয়-ব্যয় ক'রেছে সে নিজে। আর আজ পড়ে রয়েছে মরার অধম হ'য়ে। এমন বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াও অনেক ভালো। আজ তার মেয়ের উপর নির্ভর।

সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে তখন। শরতের নীল নভে দেখা দিয়েছে উতলা চাঁদ। চাঁদের যত জ্যোছ্‌না সবটুকু বান ডেকে এসে পড়েছে এই ধরণীতে। আর আকাশে ছেঁড়াছেঁড়া সাদা সাদা মেঘ ভেসে চলেছে কোন অজানা দেশে।

সহরের মধ্যে হ'লেও এ-অঞ্চলটা বৈমাত্রেয় সন্তানের মত। রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলোর ছড়াছড়ি নেই—দূরে দূরে জ্বলে গ্যাসের আলো। চাঁদের আলোতেই পায়ে-চলা-পথ বেশ চলা যায়। প্রতীপ আর মহুয়া দু'জনে চলছিল সে-পথেই। আর একটু গেলেই বাস্‌। একেবারে চুপ্‌ করে চলাটা ভালো লাগল না প্রতীপের। অথচ বলবেই বা কি? বলার চেয়ে সে ভেতরে ভেতরে অনুভব করছিল বেশী। তবুও কেন যেন প্রতীপ বলে ফেল্ল, তোমার শরীরটা কিন্তু খুবই খারাপ হ'য়েছে মহুয়া!

নিজেও তা' বুঝি---বল্ল মহুয়া। কিন্তু উপায় কি? সেদিন আপনি আমার কাঁধের উপর চুলের খোঁপাটা দেখে চিনেছিলেন—আর আজ তো দেখলেন খোঁপার সঙ্গে অলক্ষ্যে এই সংসারটাও আমার কাঁধে চাপান।—বইতে পারি না আর! বড় কষ্ট হয়!!

—তোমাদের তো অনেক বড় বড় আত্মীয়-স্বজন রয়েছে, তা'দের কাছে···

—তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌ল মহুয়া—না পছন্দ করি না! তা'ছাড়া জীবনে কা'রোর কাছে আর কিছু চাইবার প্রবৃত্তি আমার নেই। নিজে সেলাই করে যা' পাই তাতেই যা' চলে চলবে।

কথায় কথায় বাস্‌ রাস্তা পর্য্যন্ত এসে পড়ল ওরা। মনে করল প্রতীপ, মহুয়ার শুধু মেসিন দিয়ে জামা-ব্লাউজ সেলাই করেই চলছে না সেই সঙ্গে মানুষের চোখের আড়ালে দুঃখ আর অভাব দিয়ে দিনগুলোকে সেলাই করেও সে চলছে। মাসের প্রথম সপ্তাহ। পকেটে টাকা ছিল। একবার ইচ্ছা হ'ল দশটা টাকা দিয়ে যায় রোগীর ফল খাওয়ার নাম ক'রে, কিন্তু মহুয়াকে ভয় হ'ল তা'র। প্রত্যাখ্যানের অপমান নিশ্চয়ই ভুলতে পারে নি মহুয়া।

বাসায় ফিরে এসে সংসারের ঝামেলা থেকে নিজের মনটাকে তুলে এনে একা বসে আছে প্রতীপ। সে তখন সংসারের কেউ নয়, নয় রুবীর স্বামী বা লিলির বাবা। মনের ঘোড়া ছুটিয়ে চল্ল ফেলে-আসা-জীবনের এক ধূ ধূ করা অধ্যায়ে। দক্ষিণ দিক খোলা। বাতাস আসছিল ঝিরঝির ক'রে। সেই মৃদু বাতাসে জীবন-ইতিহাসের এক একখানা পাতা উল্টে যাচ্ছিল। হঠাৎ যে অধ্যায়ে এলে পর বাতাস গেল থেমে, প্রতীপের জীবন-নাট্যের সে-অধ্যায়টা বড় করুণ!

বি. টি. পাশ করার পর প্রতীপ মহুয়াদের গ্রামের নূতন হাইস্কুলে মাষ্টার হ'য়ে যায়। গ্রাম দেশের স্কুল—মেস্‌ বোর্ডিং হাউস নেই। বিদেশী মাষ্টার এবং ছাত্রেরা থাকত লোকের বাড়ীতে বাড়ীতে। প্রতীপ ছিল মহুয়াদের বাড়ী।

মহুয়ার বাবা জীবনবাবুর অবস্থা ছিল ভালো। টাকা-পয়সা নগদ তেমন ছিল না—যা' ছিল তা' ছড়ান ছিল জমাজমিতে। দোতলা পাকা বাড়ী। পুকুরে মাছ, গোয়ালে গরু আর গোলাঘরে ধান থাকত প্রচুর। কাজেই আদর-আপ্যায়ন আর আন্তরিক আতিথেয়তায় প্রতীপ বিদেশে থেকেও নিজের বাড়ীর মতই একটা স্বাচ্ছন্দ্য নিয়েই দিন কাটাত। তাই একদিন কথায় কথায় প্রতীপ মহুয়াকে বলেছিল, জানো মহুয়া! আমি যে অপরের বাড়ীতে আছি এ-কথা কোন সময়েই ভাবতে পারি না।

প্রতীপের এই কথায় মহুয়ার মনের কোন্‌ এক কোনে যেন আঘাত লাগল। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস নিজের বুকের মধ্যে জোর ক'রে চেপে রেখে মহুয়া বল্ল, আপনি তা' হ'লে আমাদেরকে পর মনে করেন?

মহুয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে প্রতীপ বুঝতে পারল তা'র কথাটা মহুয়াকে কতখানি আঘাত দিয়েছে। নিজেকে তাড়াতাড়ি শুধ্‌রে নেবার জন্য বল্ল, তুমি অন্য অর্থ নিও না মহুয়া! আমার ভাষার দৈন্য রয়ে গেছে বলে' আমি যা' বলতে চেয়েছিলাম তা' প্রকাশ করতে পারি নি। তোমরা সত্যি—সত্যি বলছি মহুয়া আমাকে আপনের আপন ক'রে ফেলেছ।

—বাবা কিন্তু তা' বলেন না।

—কি বলেন তিনি ?

—তিনি বলেন, আপনাকে আমরা এখনও আপন করতে পারি নি। আপনার আদর যত্নের নাকি অনেক ক্রটী হচ্ছে। আপনি অত্যন্ত লাজুক তাই কিছু বলেন না; অসুবিধাকে হজম ক'রেই চলেছেন। আমাকে বাবা তাই রোজ মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, প্রতীপ কিন্তু বড় লাজুক। ওর যা' দরকার তা' যেন না-চাইতেই সব প্রস্তুত পায়।

আনন্দের স্বচ্ছ হাসিতে তখন সারা মুখখানি ছেয়ে গেল প্রতীপের। বল্ল, না না সে কি কথা! এ ধারণা তিনি যেন তাঁর মন থেকে মুছে ফেলেন। আমি এখানে বেশ আছি। ছোট কাল থেকেই তো বিদেশে-বিভূঁয়ে। বাবা মায়ের আদর ভাগ্যে জোটে নি। তোমাদের এখানে এসে আমি সে আদর পেলাম। তোমার বাবা মায়ের স্নেহের কাছে আমি ঋণী আর······

—থামলেন কেন ? বলুন না আর কি ?

—না, থাক সে-কথা।

—থাকবে কেন—বলতে যাচ্ছিলেন যা' বলেই ফেলুন। তৃষ্ণার্ত্ত ক'রে রাখবেন না।

মহুয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা বলতে যেন সাহস পেল প্রতীপ। পরে বল্ল, না শুনলেই কি নয় ?

—এতো কার্পণ্যই বা কেন ?

—তোমার ভালোবাসায় আমি মুগ্ধ মহুয়া!

অগুণতি টাকা যেন হঠাৎ ব্যাঙ্কে জমা হ'ল মহুয়ার নামে। আনন্দের আতিশয্যে মহুয়া নিশ্চল! নির্ব্বাক!! ফল্গুধারার মতো খুশীর ধারা বইতে লাগল তার মনে—বাইরে প্রকাশ পেল না কিছুই।—প্রকাশ পাবেই বা কি ক'রে? মহুয়ার তখন মনের যে ভাব তা' প্রকাশ করার মত ভাষা মহুয়ার কেন, কারোরই নেই। তা'ছাড়া ভাষা দিয়ে সে-ভাব প্রকাশ করা যায় না, শুধু বোঝা যায় সে-ভাব-বন্যায় যে হাবিডুবি খায় তা'কে দেখে।

একখানি ছবির মত দাঁড়িয়েছিল মহুয়া। প্রতীপ জিজ্ঞেস করল, চুপ করেই রইলে তুমি! বলার মত তোমার কি কিছুই নেই মহুয়া ?

তবুও প্রত্যুত্তরে কোন কথা নয় শুধু নিজের চোখ দুটী মহুয়া একবার তুলে ধরেছিল প্রতীপের দিকে। বিনি কথায় চোখের সে-ভাষা আজও প্রতীপের চোখের সাম্‌নেই লেখা!

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই দুর্য্যোগ ঘনিয়ে এলো মহুয়ার জীবনে। সে-দুর্য্যোগের ঘনঘটায় আজও মহুয়ার জীবন-আকাশ আচ্ছন্ন। অন্য স্কুল থেকে বেশী টাকায় ডাক এলো প্রতীপের। পদেরও উন্নতি—সহকারী প্রধান শিক্ষক।

বুকের ব্যথায় তখন মুখের বাঁধ খুলে গেল মহুয়ার। প্রতীপের কাছে গিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে বল্ল, আপনার উন্নতি হ'ক; আপনার জীবন কৃতকার্য্যতায় ভরে উঠুক এটা আমি খুব চাই। কিন্তু আপনার সেই প্রস্ফুটিত জীবনের পাশে কি আমার স্থান হ'তে পারে না ?

লোকদেখান সামাজিক সম্বন্ধটাই কি এ-জগতে বড় মহুয়া? আমি যেখানেই যাই তুমি আমার পাশে কেন—আমার মনের মণি কোঠায় চিরদিনের জন্যই থাকবে। আমি মনে করি, মনের এই পবিত্র সম্পর্কটাই তো অনেক বড়।

প্রতীপের এই কথায় আর কোন কথা বেরোয় নি মহুয়ার মুখ দিয়ে। শুধু নিশ্চল মহুয়ার চোখ দু'টী হ'য়ে উঠল চঞ্চল—অন্তর-বেদনার আঘাতে চোখের জল নয়, যেন পোখরাজ পাথরের ধারা চোখ থেকে ঝরতে লাগল অজস্র ধারায়!

মহুয়ার এই চোখের জলে ভিজা-পথেই সেদিন বিদায় নিয়ে এলো প্রতীপ। পা বাড়াল সে জীবনের উন্নতির আর একটা ধাপে। আর ওদিকে দুঃখে, প্রত্যাখ্যানের অপমানে নিজের দিনগুলোকে বিষাদময় ক'রে কালের রথে এগিয়ে চলছে মহুয়া। প্রতীপকে তাই অনেকদিন পরে অক্‌ল্যাণ্ড রোডে দেখে সে পালিয়ে গিয়েছিল—ইচ্ছা ছিল না পরের দিনও দেখা করার।

কিন্তু এই উন্নত পদ প্রতীপের ভাগ্যে বেশীদিন টিকল না। পাকিস্থান হ'ল কয়েক মাস পরেই। ওল্‌ট পাল্‌ট হ'ল রাষ্ট্র-জীবনে। প্রতীপ মনে করে, তবে কি মহুয়ার দীর্ঘ নিশ্বাসে? স্কুল মাষ্টার প্রতীপ তখন বাধ্য হ'য়ে এলো কলকাতা। হ'ল কেরাণী। তারপর বিয়ে করল রুবীকে, মেয়ে হ'য়েছে লিলি। মাগ্‌গীভাতা নিয়ে দেড়শ টাকা পায় তা'তে সংসার যেভাবে চলে তাকে ঠিক চলা বলে না।

রুবী তাই মাঝে মাঝে দুঃখ করে বলে, কেরাণীর স্ত্রী শুনতে বড় বিশ্রী লাগে। তার উপরে আবার অভাব। এর চেয়ে দরিদ্র স্কুল-মাষ্টারের স্ত্রী হওয়াও অনেক ভালো—মনে একটা সান্ত্বনা থাকে। তুমি বরং আগে যা নাকি ছিলে সেই মাষ্টারী পাও কি-না দেখ।

কথাটা অস্বীকার করতে পারে না প্রতীপ। অভাবী সংসার তা'র। মেয়েটাকে ইচ্ছামত কিছু দেওয়ার ক্ষমতা নেই তা'র। মার্চেন্ট আফিসে চাকরী। গত বছর ব্যবসায় লাভ না হওয়ায় বোনাস পায়নি বলে ৺পূজার সময় পর্য্যন্ত রুবীর হাতে একখানা নূতন শাড়ী তুলে দিতে পারে নি সে। লিলিকে জামা দিয়েছিল, জুতো কিনে দিতে পারে নি। লিলির সে কি কান্না! সে কান্নায় প্রতীপকেও অন্তরে অন্তরে কম কাঁদায় নি।

এ-বছরে তাই আগে থেকে রুবীর জন্য ব্লাউজ, সেমিজের কাপড়, আর লিলির জামার কাপড় প্রতীপ কিনে রেখেছিল। কোন রকমে মজুরী দিতে পারলেই চলবে। তারপরে আর যা' ক্রমে ক্রমে সে কিনে রাখবে।

সেদিন প্রতীপ আফিস থেকে বাসায় ফিরতেই চোখে মুখে আনন্দ ফুটিয়ে লিলি বল্ল, বাবু! মা আমার জামা বানাতে দিয়েছে।

হ্যাঁ—তোর সব তোর মাই তো দেয়।

রান্না করছিল রুবী। কাথাটা কানে যেতেই বল্ল, থাক ওর সঙ্গে আর লাগতে হবে না। ওর জন্য যা' কিছু কর নিজের ইচ্ছায় কর কোনদিন? আমি তোমাকে বলে বলে বিরক্ত করি—তখন হয় তো একটা ফ্রক করে দিলে। লিলি তাই দেখে—শোনে, তাই অমন কথা ব'লেছে।

—থাক্ বক্তৃতা বন্ধ কর। কোথায় বানাতে দিয়েছ বল তো?

—একজন রেফিউজি মেয়ের কাছে।

—রেফিউজি মেয়ে! তবেই হ'য়েছে!!

—ভয় নেই তোমার—হবে না। কথায়-বার্ত্তায় আর চেহারা দেখে মনে হ'ল বেশ ভদ্রঘরের মেয়ে।

—একটু ঠাট্টার সুরে প্রতীপ জিজ্ঞেস করল, কোথায় থাকেন তিনি?

—ঠিকানা জিজ্ঞেস করি নি।

—চমৎকার!—সে যদি ফিরে আর না আসে!

—আমি একাই দিইনি। চৌধুরী গিন্নী, দত্তদিদি, আরও অনেকে দিয়েছে। তা'দেরটা যদি যায় তবে আমাদেরটাও নয় যাবে কিন্তু আমি ভাবি, তোমার মন এত ছোট কেন? মানুষকে বিশ্বাস করতে শেখ। বাইরে বাইরে ঘোর—মনটা তোমার প্রশস্ত হয় না কেন?

তোমার কাছে এখন নীতি কথা শিখতে হবে আমার,—প্রতীপের সুরে একটু গরম ছোঁয়া থাকে।

রুবী ভয় পেল না তা'তে—বল্ল, দেখ! আমরাও তো রেফিউজি। রেফিউজি হ'য়ে যদি রেফিউজিকে একটু সহানুভূতি না দেখাই তবে তার চেয়ে দুঃখের আর কি থাকতে পারে? নিজের কথা ভেবে দেখ, তোমার মালিক তোমাকে সহানুভূতি না দেখিয়ে যদি চাকরী না দিত তবে আমাদের অবস্থাটা আজ কি হ'ত? সহানুভূতি যেমন অপরের কাছ থেকে তুমি পাবে, তেমন তুমিও আবার অপরকে দেখাবে—এই হচ্ছে নিয়ম।

নিয়মের ব্যতিক্রম আছে—অন্ততঃ রেফিউজির বেলায় ওদেরকে বিশ্বাস ক'রে খুব ঠকেছে এমন অনেক লোক আমার জানা আছে।

তা' যা'ই বলো লেখা-পড়া-জানা মেয়ে। সেলাই স্কুল থেকে ডিপ্লোমা পেয়েছে। সেলাই করে যা' পায়, তা' দিয়েই সংসার চালায়। আমাদের দু'গজ কাপড় মেরে নিজের সংসারটাকে মেরে ফেলতে পারে না নিশ্চয়ই। দেখ তুমি! ঠিক তারিখ মত সাত দিনের দিন মেয়েটী জামা নিয়ে আসবেই।

আর আমিও বলে রাখছি—বল্ল প্রতীপ—মেয়েটী কিছুতেই আর এ-মুখো হবে না।

* * * *

প্রতীপের ইচ্ছা ছিল একদিন সময় করে জামার কাপড়টা মহুয়াকে দিয়ে আসবে। মজুরী তো দেবেই, সেই সঙ্গে তা'র বাবার অসুখে ফল খাওয়ার নাম করে যদি আর কয়েকটী টাকা দিয়ে দিতে পারে। এমনিতে তো কিছুতেই কিছু নেবে না মহুয়া। কিন্তু রুবী সে-পথও বন্ধ ক'রে দিল। কোনদিক থেকে মহুয়াকে এতটুকু সাহায্য করার পথ না দেখে নিজের মনে রুবীর বিরুদ্ধে একটা চাপা অসন্তোষ ক্রমেই দানা বেঁধে উঠছিল। দিন গুণতে

লাগল প্রতীপ—সাত কোন রকমে পার হ'য়ে গেলেই ধরবে রুবীকে।

দিনের পর দিন গিয়ে সাতদিন পার হ'য়ে গেল, জামা নিয়ে এলো না মেয়েটা। সুরে একটু ঠাট্টা, একটু রাগ মিশিয়ে প্রতীপ বল্ল, কই রুবী! তোমার সেই ভদ্রঘরের রেফিউজি মেয়েটী তো জামা নিয়ে এলো না দেখছি। এখন তোমার শিক্ষাটা হ'ল তো?

এলো না বলি কি করে! সময় গেছে নাকি? এই তো সবে সাতদিন হ'ল। আমি মানুষকে অত অবিশ্বাস করি না। দেখবে—দু'একদিনের মধ্যেই মেয়েটী আসবে।

দু'একদিন তো দূরের কথা—মোট দিন কুড়ি চলে গেল—মেয়েটীর নামে দেখা নেই। রাগে গজ গজ করতে লাগল প্রতীপ। নিজের হাতের মধ্যে যা' ছিল তা' দিয়েও মনুষ্যকে একটু উপকার করতে পারল না সে। রুবী হাত ছাড়া করে' দিয়েছে, তা' এখন সে-জামার কাপড়ও বুঝি যায়!

কিন্তু কথায় প্রতীপ রুবীর সঙ্গে পারে না। রুবী মানবতার প্রশ্ন আনে, প্রশ্ন আনে ন্যায়নীতির। আবার এই রুবীকেও হার মানতে হয় এক জায়গায়—মেয়ে লিলির কাছে। লিলি দিনের মধ্যে আর না হ'ক দশবার এসে ঘুরে ফিরে জিজ্ঞেস করে, মা! আমার জামা আন্‌ছে না কেন? কখনও বা লিলি একটু চুপ করে থাকে, প্রতীপ উস্কে দেয় তক্ষুণি, লজেন্স খাবি তো মাকে বলগে' সেই কথা!

লজেন্সের লোভ সামলানো লিলির পক্ষে হ'য়ে ওঠে অসম্ভব। যেই আবার বলতে সুরু করে—মা! আমার জামা···অম্‌নি ধমক দিয়ে ওঠে রুবী—বিরক্ত করিস না লিলি।—বিরক্ত করলে জামা আসবে না—কিছুতেই আসবে না। একসঙ্গে তিনদিন যদি চুপ ক'রে থাকতে পারিস, তবে দেখবি, চারদিনের দিন জামা এসে উপস্থিত হবে।

রুবীর কথাটা যেন ক্ষণে পড়েছিল। সত্যিসত্যি দু'দিন পরেই জামা ব্লাউজ নিয়ে এলো মেয়েটী।

তখন কিন্তু রুবী চটে আগুন—ছিঃ ছিঃ আপনার কথার এতটুকু মূল্য নেই। এ-জন্যই তো রেফিউজিদের কেউ বিশ্বাস করে না। উনি তো এ-জামার আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন।

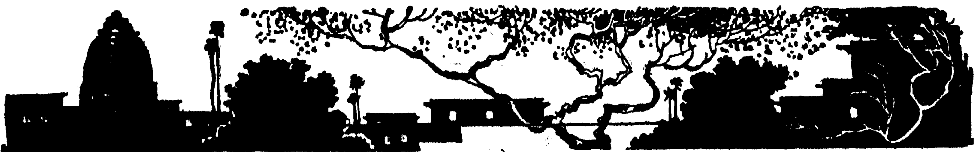
আমাকে শুধু একটা কথা বলতে দিন দিদিমণি।

এতে আপনার বলার মত কি থাকতে পারে? দু'একদিনের দেরী হ'লে না হয় কোন কৈফিয়ৎ থাকতে পারত।

দয়া ক'রে শুনুন—মেয়েটীর করুণ সুর, বিনয়ে অবনতা। অনেকদিন যাবৎ বাবা অসুখে ভুগছিলেন। আপনার কাছ থেকে অর্ডার যেদিন নিয়েছি তার তিন দিন পরেই বাবা মারা যান। আমিই তাঁর ছেলে—তাঁর মেয়ে। বাবার যা' কিছু শেষ কাজ তা' সবই আমাকে করতে হ'য়েছে—সেলাইতে আর হাত দিতে পারি নি।

পাশের ঘরে শুয়ে ছুটীর দিন উপভোগ করছিল প্রতীপ। ইচ্ছা হচ্ছিল, কথা খেলাপের জন্য বেশ ক'রে দু'টো কড়া কথা মেয়েটীকে শুনিয়ে দেয়। কিন্তু মেয়েটীর গলাটা যেন চেনা চেনা বলে মনে হ'ল তা'র। তার উপরে তা'র বাবা মারা গেছে শুনে কোথায় কোন্ হিসাবে যেন মিল হ'য়ে গেল প্রতীপের। তবুও সন্দেহে দুলছে মন। সন্দেহ দূর করবার জন্য ধীরে ধীরে বিছানা থেকে উঠল প্রতীপ। দাঁড়াল গিয়ে দরজার আড়ালে—আড়াল থেকেই দেখল পরিষ্কার ভাবে।

শুধু একটা পলকের এই দেখায় কি জানি কি হ'ল প্রতীপের। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না সে—আবার গিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানাতেই।



হঠাৎ-মৃত্যু বা—"মৈত্র-ব্যাধি?"

ডাঃ শ্রী জে, এন, মৈত্র

বৈজ্ঞানিক আজ পৃথিবীর সব তথ্য জেনে ভাব্‌ছে—পৃথিবীর সব জানি!

এই সব-জান্তা ভাবটিই বড় সর্ব্বনাশা হয়েছে। সব কি জানা যায়? তাই বিদ্রূপ ক'রে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু বিবেকানন্দবাবু যুগান্তরে টিপ্পনী ক'রে কতই না হাস্যরসের—কাফী খাঁ-র ব্যঙ্গ চিত্র ছাপান!

শেক্সপীয়রও হোরেসিওকে লক্ষ্য ক'রে বলেছেন—পৃথিবী ও তাহার বাহিরে কত অজানা আছে।

এই অজানাকে জানাই বিজ্ঞান। আমার উপপাদ্য ও সম্পাদ্য অঙ্কের মত যোগ ক'রে মিলে যায়। সুতরাং এ জীবন নাট্য, যাহা আমার গবেষণার বিষয়—সেটী "যোগান্ত নাটক", বিয়োগান্ত নহে।

আমার বন্ধু আগরওয়াল রামকুমারবাবু পৃথিবীর মধ্যে বড় বড় গর্ত্ত খুঁড়িয়া তৈল, মায়কা, তেজোক্রিয় ইউরেনিয়াম বাহির করলেন, ইনকমট্যাক্স বহু দিলেন—রাজ্যের একজন বড় বন্ধু। সত্যেন বসু মহাশয় বিজ্ঞান কলেজে বড় গোল হয়, প্যারী বাঁ জেনেভায় ব'সে আইনষ্টাইনের সঙ্গে ব'সে আঁক কসে দেখিয়ে দিলেন, "যাহা সরল দেখ্‌ছো, সব বাঁকা।" বহু বছর আগে কংগ্রেসকে তাহার আদর্শচ্যুতি দেখে রাজশেখরবাবুও প্যাঁড়াতলা ও তাহার পাশে বড়বাজার কংগ্রেস কমিটি উভয়ের "আপেক্ষিক গুরুত্ব" দেখিয়েছিলেন।

তাই আমার উপপাদ্য হইতে সম্পাদ্যে পৌঁছিতে কিছু আপেক্ষিক দূরত্ব আছে ব'লে অনেকে ভাব্‌তে পারেন। "বনে ষাঁড় খুঁজিয়া না পাইলে ষাঁড় ও বনের উভয়েরই দোষ।" খোঁজাক নির্দোষ! ব্যস্‌।

আমি চিকিৎসক। রোগী না দেখিয়াই ব্যবস্থা দিই, পৈত্রিক "গরু হারানোর" ঔষধ দিলে বনে যাওয়ার কারণ উদ্ভূত হইলেই গরু না খুঁজে পাই, হাত চালিয়ে এমন ব্যবস্থাপত্র লিখি আমার খাস কম্পাউণ্ডার ছাড়া আর কেহ ঔষধ জানে না, ইত্যাদি উপায়ে ও আধুনিক অরো, টেরা, সিন্‌কো, মাইসোর বড়ি, মলম, লোশন, মাথার ঘা হইতে পায়ের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি-প্রদাহ পর্য্যন্ত ১০ হাজার মাইল দূর হইতে ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ আর করিতে দেওয়া যায় না। মহামান্য মন্ত্রীমহোদয়ের পত্রিকায় ডাঃ ডি, সিলভার প্রশ্নের জবাব তাঁহারই লিখিত বা সম্পাদনায় নিষ্ক্রান্ত "চিকিৎসা জগতে" প্রকাশিত হয়েছে আমার প্রবন্ধ। সেই প্রবন্ধে স্যার নীলরতন, ৺প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, ৺ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺কুমুদশংকর রায় ও জীবিত বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসক মহামান্য ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত ও আমার সহপাঠী, জ্ঞানী, কর্ম্মী ডাঃ জিতেন্‌ দত্ত ও বড়-ছোট যে সব বন্ধুদের ও ১৯২৬ সাল হইতে অতৃপ্ত-বিজ্ঞান-চর্চ্চায় পথে-অতিক্রান্ত চিকিৎসক-হাসপাতাল যাহাকে যাহাকে অনবধানতায় ভ্রূকুটি-কুঞ্চিত মুখ-মণ্ডলে বর্ষাকাল-সুলভ অন্ধকারময় মুখ দেখাইয়া মনে ব্যথা দিয়াছি আশা করি আমার ময়না তদন্তের অপমানের ও অত্যাচারের ইতিহাস বলিলে তাঁরা ক্ষমা ও তিতীক্ষার কার্পণ্য আমার প্রতি করবেন না।

হাতে নাড়ী না পাইয়া এক, দুই, তিন চামচ ডিজিটেলিস্‌ দিয়া রোগিণী ভাল হইল। লাভের মধ্যে একজন এলোপাথারী ডাক্তার হোমিও হোম খুলে বল্‌লেন, "ডাকাত—ডাকাত, ৫ হইতে ১৫ ফোঁটা ডোজ্‌, একেবারে ১৮০ ফোঁটা"—রোগী ভাল হইল, আমাকে ১৫০৲ জরিমানা দিয়া আর এক মাস খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া ফোর্ড গাড়ীতে চড়িতে ও নামিতে হ'ল। তার অব্যবহিত পরেই ডাঃ...কে ৩ চামচ ডিজিটেলিস্‌ দেওয়ায় আমার পরম শ্রদ্ধেয় গুরু রায় বাহাদুর ডাঃ অখিল মজুমদার মহাশয় ক্যাম্বেল হাসপাতাল হইতে সস্নেহ আশীর্ব্বচনে অভিনন্দন জানান।

"হঠাৎ মৃত্যু", "শ্রোডার সাহেবের ম্যানেজারের ব্যাধি", 'লেডী সাহেবের বনে ষাঁড় খোঁজা", "করোনারী ধমনীর শেষ সংকোচন", কি কারণে হয়?

এই আমার উপপাদ্য। যোগের আঁক। সম্পাদ্য কি? একস্‌রে, ইলেকট্রো কার্ডি ও গ্রাম, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ও বৎসরের পর বৎসর রোগীর রেকর্ড রাখা ও তারপরও আকস্মিক মৃত্যুর প্রত্যেক রোগীর ময়না তদন্ত করা। এক কথায় জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সবিজ্ঞান-জ্ঞান-সহ-পর্য্যবেক্ষণ।

পর্য্যবেক্ষণটী "পরিপ্রশ্নেন, প্রণিধানেন, সেবয়া" হওয়া চাই। "পল্লব-গ্রহণ বা "পেটেণ্টো ব্যবহার" নহে। কি কারণে ব্যাধির সূত্রপাত হয়?

নিজে কারখানার মালিক বা লাভ লোকসান খতাইয়া সস্তায় লোক খাটানোর পর সস্তায় কাঁচা মাল খরিদ ও আক্রার বাজার প্রস্তুত করা। রাজনীতিতে বা সমাজনীতিতে বা রাজনীতির সহিত সমাজনীতি মিশাইয়া দায়িত্ব গ্রহণ, প্রয়োজন হইলে একাধিক সংঘ প্রস্তুতি, অযথা ধর্ম্মান্ধতা বা বহু অর্থের রক্ষার দায়িত্ব বা ধনক্ষয়ে ভীতি; দাঁত, দাঁতের গোড়ার ব্যাধি, পেটের ভিতরের পাথুরী গঠন ও নানাবিধ অজীর্ণ, অম্ল বা যে কোনও প্রকার সঙ্কোচন-প্রসারণের সৃষ্টি ব্যাধির গোড়ার ইতিহাসে ধরা পড়ে।

পূর্ব্ব ও পশ্চিম জার্ম্মাণীর হঠাৎ মৃত্যুসংখ্যা তুলনা করে শ্রোডার সাহেব অদ্ভুত তথ্য বার করেছেন। ফার্ম্মের কর্ম্মী পূর্ব্ব-জার্ম্মাণীতে হঠাৎ মৃত্যুতে মরেই না, অথচ বস্‌ (Boss) মালিক বা মালিক-ম্যানেজার অত্যধিক সংখ্যায় মরিতেছে। কত ছুটি নেবে? কত ছুটি দেবে? কে দেবে? যৌথ-মালিকান বা কোঅপারেটিভ্‌ ফার্ম্মিংই কি আদর্শ? নীতিগত আচরণই রাজনীতিতে পর্য্যবসিত হবে?

তাই ভয় হয়, ক্ষয় রোগের কথা—বলতে গেলে ক্ষয়-রোগ বিষয়ে

বিশেষজ্ঞতা সমাজ-বিজ্ঞান চর্চ্চায় পর্য্যবসিত হ'য়ে দাঁড়ায়! হঠাৎ মৃত্যু নাকি রুষদেশে নাই-ই। তাদের আছে অত্যধিক রক্তের চাপ ব্যাধিমাত্র, অপরাপর হৃদ্‌রোগ বাতরোগে হৃদপিণ্ড দখল সে দেশে অজানা।

হৃদ্‌পিণ্ডে কি প্রকার ঘটনা হয়? নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যে, লোক নিয়োগ, কার্য্যের হিসাব দৃষ্টে উচাটন, ভয়, অযথা ত্রাস ও প্রতি মুহূর্ত্তেই নূতন নূতন ঘটনা পরম্পরা, যেমন ডাক্তার ও মালিকানার ম্যানেজারকে করতে হয়। চিকিৎসকেরা আমেরিকায় ছয়গুণ বেশী মরেন করোণারী সংকোচন ব্যাধিতে—৪৮ বৎসর বয়সে গড়পড়তা হিসাবে। তার ষষ্ঠ পরিমাণ ম্যানেজারেরা মরেন। করোণারী শাখার সংকোচন হইলেই, পাশ দিয়া নূতন ধমনী গজায় আর হৃদ্‌পিণ্ড আকারে বাড়ে। এই ভাবে বাড়িয়া হৃদপিণ্ড ও পঞ্জর খাঁচার আয়তন হৃদ্-বলে (Cardiotheracic ratio) অসমতা ও বড় একটি ধমনীর অসময়ে সংকোচনই মৃত্যু ঘটাইয়া থাকে। এই রকম অজানা ভাবেই লোকচক্ষুর অগোচরেই কত না হৃদ্‌পিণ্ডের কার্য্য বন্ধ হইয়া যাইতেছে!

তাই ময়না তদন্তে নিত্য নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছে। আমার কয়েকজন-চিকিৎসক বন্ধু খুব আপত্য তুলিয়াছেন যে ময়না তদন্তে ডাক্তারদের ভুলই বেশী ধরা পড়িবে; গবেষণা হইবেই না। তাহার জবাবে আমি ৩ বার পুলিশে কি ভাবে পুয়োর ব্যাঙ্কে টাকা দিয়া রেহাই পাইয়াছি গল্প বলি। বছরে একটা না একটা ফৌজদারী আমার বিরুদ্ধে আছেই। কুষ্টিতে অর্থদণ্ড আছে, কিন্তু কারাবাস নাই।

করোণারী ব্যাধির প্রবন্ধ চিকিৎসা জগতে জানুয়ারী সংখ্যায় বিস্তৃত দিয়াছি। এ সংখ্যায় কারণ ও সংটন ও চিত্রে করোণারী সঙ্কোচন (রক্ত স্পন্দন হেতু নহে) Non-Thronibotic Coronary Occlesion দুই ভাগে ভাগ করা যায়। হৃদপিণ্ড স্ফীতি সহজসাধ্য ও স্ফীতি দুঃসাধ্য (Reversible & Irreversible) Caroiae Eularcinent প্রথমটিকে Syndrome ও শেষটী Symptoms বলায় ভুল হইবে না। যতক্ষণ সহজসাধ্যও Reversible থাকে ততক্ষণ চিকিৎসনীয় থাকে। যখনই Irreversible ও স্ফীতি দুঃসাধ্য হয়, তখনই ডাক্তার, বৈদ্য, চিকিৎসক ভীত হন। প্রথম টের পাওয়া (detection) ও মৃত্যু (terssinal occlusion) ৩ বৎসরের মধ্যেই শেষ হয়। এই অরিষ্ট-লক্ষণ বোঝা বড় কঠিন, তাই দুঃখ করে লেডি সাহেব "ষাঁড় ও জঙ্গল" উভয়কে দোষারোপ করে বলেছেন, It is a unique power to diognose Conenery artery disease early. প্রোডার সাহেব লক্ষণ বুঝেই ৩ মাস ছুটির ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তিনি এখনও জঙ্গলে ষাঁড় খুজিয়া ডাক্তারকে ছাড়িয়া ম্যানেজার লইয়াই ব্যস্ত হইয়া ঘুরিতেছেন।

এখন এ অবস্থা কি তর্কের "কাকতালিও" সমস্যা কি না। ইহার বিচার হওয়া সব দিক থেকেই প্রয়োজনীয়। বিচার ও বিবেচনা ন্যায়-সঙ্গত হওয়া চাই।

সম্প্রতি মহামান্য হাইকোর্টের বিচারপতি মহোদয়রা ও করোনার সাহেব উভয়ের তরফের নির্দ্দেশ মত কতকগুলি নিম্ন কোর্টের সাজা পাওয়া দোষী নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইয়া খালাস পাইয়াছেন। বিচার্য্য বিষয় তা হ'লে দাঁড়াচ্ছে, (১) মৃত্যুর কারণ কি? (২) মৃত্যু-ঘটানোর কার্য্য কারণ, স্থান কাল, পাত্র কি বা কে বা কাহারা, (৩) এ মৃত্যু কি ভগবান প্রেরিত? (৪) এ মৃত্যু কি জ্ঞান-বিজ্ঞান মত পূর্ব্বাহ্নে জানা যায়? এবং (৫) এ মৃত্যু কি পূর্ব্বাহ্নে জানা গেলে প্রতিরোধ করিয়া সেই মহাপুরুষের প্ল্যান-প্রোগ্রাম কার্য্যে পর্য্যবসিত করাইয়া শত বর্ষ নরগজা করিয়া তাঁহাকে জীবনপ্রদীপ শতবর্ষব্যাপী জ্বালাইয়া রাখা যায় কি না?

ডাক্তার প্রোডার পশ্চিম জার্ম্মাণ ডাক্তার। তিনি পূর্ব্ব জার্ম্মানী ও রুশদেশে সাধারণ রক্তের চাপে মৃত্যু ছাড়া এই ম্যানেজার ব্যাধি হেতু মৃত্যু দেখিতে পান না।

১৯২৭ সালের পর গবেষণার ফল ১৯৩৯ সালে মহামতি উপরাষ্ট্রপতি স্যর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ সকাশে ১৯শে ডিসেম্বর যে গবেষণায় প্রতিপাদ্য উপস্থাপিত করি তাহা জীবনবীমা গবেষক এস্, সি, রায় তাঁহার ইন্‌সিওরেন্স ওয়ার্ল্ডে অনবদ্য ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। হৃদ্‌যন্ত্রের স্ফীতি (Hypertrophy & dilation) এবং একস্ রে ও ই, সি, জি পরীক্ষায় ক্রম-বিকাশ ও শেষ পরিণতি ও জীবন্ত অবস্থায় পর্য্যবেক্ষণ এবং মৃতের ময়না তদন্ত এই সমস্ত ধাপে ধাপে দেখাইয়া প্রমাণ করা যায় কিনা যাঁহারা হাইড্রোসায়ানিক এসিড সেবন, রীতিমত এ্যানোকসিমিয়া ব্যায়াম করা, দায়িত্ব ত্যাগ করিয়া দীর্ঘজীবী হইয়াছেন কিনা, তাঁহারা এ ব্যাধি মুক্ত কিনা।

ইহারই বা প্রমাণের কষ্টসাধ্য ভার কে লইবে?

আকাদামী অফ সায়েন্স্ (Academy of Sciences) স্থাপন করিয়া মস্কোর মত কে বা কাহারা এ দুরূহ কার্য্যের ভার লইবে? মহা-সর্ব্বাধিকরণের বিচারপতিরা দিল্লীর এবং বিভিন্ন রাজ্যে বিধান সভায় পাশ করিয়া মহামান্য প্রধান মন্ত্রী যদি যুদ্ধ এড়াইয়া নিজের জীবনটা কাটাইয়া প্রতি রাজ্যে ও কেন্দ্রে এ্যাকাদেমী অফ সায়েন্স প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাদের বিশিষ্ট পৌরোহিত্য ধর্ম্ম (এলোপ্যাথি ডাক্তারী ও পেটেন্ট ব্যবহার) বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন এবং (Queen) কিউ দেওয়া ডাক্তারী আইনতঃ বন্ধ করিয়া আপামর সাধারণের জন্য সামাজিক চিকিৎসায় প্রবর্ত্তন করিয়া গবেষক ও কম-ঔষধে সারানোর জন্য পর্য্যাপ্ত পারিতোষিকের ব্যবস্থা করিতে পারেন তবেই এই সমস্যায় উপযুক্ত সমাধান হয়।

শিশুর মাতৃজঠরে ও মাতার স্বাস্থ্য শিশুর ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে, পিতার ইতিহাস ও তাঁহার বংশে কোন বংশপরম্পরায় ব্যাধি ছিল কিনা —এক কথায় মাতা-পিতার দিক দিয়া বংশগত ব্যাধির ইতিহাস চাই।

জন্মের পর, বাল-সুলভ ব্যাধি হাম, হুপিং কাশি, রিকেটস্, ডিপথিরিয়া টাইফয়েড, কলেরা—কখন কি ব্যাধি ছিল, এক কথায় পূর্ব্বের ইতিহাস লওয়ার পর বর্ত্তমান ব্যাধির কি ইতিহাস লওয়া প্রয়োজন।

ইতিহাস সঠিক লইয়া—আপাদ মস্তক পরীক্ষা করা। তারপর প্রতি ৩ বা ৬ মাস অন্তর তাবৎ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করা ও নিরীক্ষণ করা (Observation) প্রয়োজন। বায়ু, জল, সূর্য্যালোক, তাপ, শৈত্য প্রভৃতি নৈসর্গিক ও মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করায় কী ফল হইয়াছে তাহার সঠিক বিচার বিবেচনা করা। রক্ত, মূত্র, এক্স্ রে, ইসিজি ই, ই, জি (Blood urine, X ray', Electio cerdiograph, Electioencaph-baslograph) প্রভৃতি পরীক্ষার ফল ঐ এ্যাকাডেমির সভ্যদিগের সমবায়ে গঠিত কমিটিতে পেষ করিতে হইবে। প্রয়োজন বোধ করিলে ঐ আকাদোমসিয়েনেরা মহাধিকরণের বিচারপতিগণকে লইয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের ফল ব্যাধির প্রয়োগের নির্দ্দেশ দিতে পারিবেন। এটি যেমন বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার বেলায় আটিবে অনুরূপ তেজোষ্ক্রিয় ধাতব দ্রব্য ব্যবহারে ও বেলাতেও চালাইতে হইবে। অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইউনিফায়েড ফিল্ড থিয়রীর মত (Unified Field Theory) জৈব-অজৈব-রশ্মি-বা-ঢেউ (wave) প্রভৃতির অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে মানবদেহের ব্যাধির নিরাকরণের আসিয়াছে। আর বিলম্ব চলে না।

বৈজ্ঞানিককে রাজনীতিজ্ঞ ও সমাজ-সেবকের মত তাবৎ প্রশ্নের সমাধানে মাথা ঘামাইয়া খাটাইতে হইবে। উদ্দেশ্য সত্য-সন্ধান।



বম্বের আশে পাশে

শ্রীভূপতি চৌধুরী

(পূর্বানুবৃত্তি)

এখান থেকে আওরঙ্গবাদ পাহাড়ের গুহাবলী খুবই কাছে, কিন্তু সেগুলি এখন আর ঠিক দ্রষ্টব্য নয়। অযত্নে ও মেরামতের অভাবে অধিকাংশই ভেঙে পড়েছে। পথে হিংস্র জন্তুরও নাকি আর্বিভাব হওয়া সম্ভব। সন্ধ্যার মুখে এরকম স্থানে যাওয়া সমীচিন নয় ভেবে আমরা সহরের দিকে ফিরলাম। পথে দ্রষ্টব্য—পানি চাক্কি বা জলচালিত কল। পাহাড় থেকে বদ্ধ-নালিকায় জল এনে তারই সাহায্যে একটা চাকা ঘোরান হয়। জলের স্রোত এখন এত অল্প যে সব সময়ে তার সাহায্যে চাকা ঘোরান সম্ভব হয় না। জলের সাহায্যে চাকা ঘুরিয়ে তার থেকে কাজ আদায় করার ফন্দী মানুষের বহুদিনের আবিষ্কার। আজকের দিনে পাহাড়ী নদীতে বাঁধ তৈরী করে তার জলস্রোতের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন—এ ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এখন এই পানিচাক্কি কিন্তু মানুষের কৌতূহল নিবারণের যন্ত্র হিসাবে আছে মাত্র। পানিচাক্কির সামনে একটী সুন্দর জলাধার আছে—সেখান থেকে জল উপচে পড়ে আবার বদ্ধ-নালিকায় চলে যাচ্ছে। এই সঙ্গে একটী মাদ্রাশা ও তার সংলগ্ন গ্রন্থাগার আছে। শোনা গেল—এই গ্রন্থাগারটীতে নাকি অনেক পুরানো বই আছে।

সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় আর সহর প্রদক্ষিণ করা হল না। বিশ্রামেরও প্রয়োজন—সকাল সকাল ওঠে অজন্তা গুহা দেখতে বার হতে হবে। সকাল আটটার মধ্যে প্রাতরাশ সেরে বার হওয়া গেল। দূরত্ব ৭০ মাইল—পথ ধূলিময়। সওয়া ২ ঘণ্টায় পথ অতিক্রম করে অজন্তাগুহা পর্ব্বতের পাদদেশে এসে যখন উপস্থিত হওয়া গেল তখন বেলা দশটা।

স্থানটী অত্যন্ত রুক্ষ ও শুষ্ক—একটী পাকাঘর ও দুটী খুঁটীসার চালা অত্যন্ত বিসদৃশ ভাবে বর্ত্তমান। কিন্তু স্থানটীর সৌন্দর্য্য বিচারে সময় নষ্ট না করে গুহার অভিমুখে অগ্রসর হওয়া গেল। কিছুটা চড়াই উঠতে হবে—দুটী উপায় আছে ; গড়ানে ঢালু পথে অগ্রসর হওয়া অথবা বাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে ওঠা। বাঁধানো সিঁড়ি-পথে শীঘ্র ওঠা যাবে মনে করে সেই পথই অবলম্বন করা হল। সিঁড়ির সংখ্যা মনে নেই তবে প্রায় শ' খানেক ফুট উঠে ঢালু পথ ধরা গেল। কয়েক পা অগ্রসর হতেই সমগ্র গুহাবলীর দৃশ্য চোখের সামনে এগিয়ে এল। একদিকে ইন্ধারী পর্ব্বতমালার গাত্রে বিভিন্ন গুহামুখ সম্মুখে ওয়াঘোরা নদীর শুষ্ক গতিপথ অর্দ্ধচন্দ্রাকারে পর্ব্বতমালা প্রসারিত—পাদদেশে জলধারার পথচিহ্ন—শীতের প্রকোপে জলের অস্তিত্ব অদৃশ্যপ্রায়। গুহার সম্মুখে মাত্র চার ফুট চওড়া পায়ে চলার পথ—কখনও ঢালু কখনও সিঁড়ির ধাপ সমন্বিত।

প্রথমেই স্থানীয় গুহারক্ষকের কার্য্যালয়ে প্রবেশ করে ৫৲ টাকা জমা দিয়ে পরিদর্শনের সময় ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা করা গেল। সঙ্গে একজন পরিদর্শকেরও সাহায্য পাওয়া গেল।

মোট গুহার সংখ্যা ২৯টী। তবে এর মধ্যে কয়েকটী গুহার অবস্থা বিপদজনক মনে হওয়ায় সেখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। ঐতিহাসিকদের মতে গুহাগুলির নির্ম্মাণকাল খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতক থেকে পঞ্চম খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। গুহাগুলিকে দুটী ভাগে বিচার করা চলে—প্রথম যেগুলি খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বে নির্ম্মিত এবং অপরগুলি খৃষ্ট জন্মের পরে নির্ম্মিত। সব গুহাগুলিই অবশ্য বৌদ্ধযুগের, তবে পুরাতন গুহা বলতে



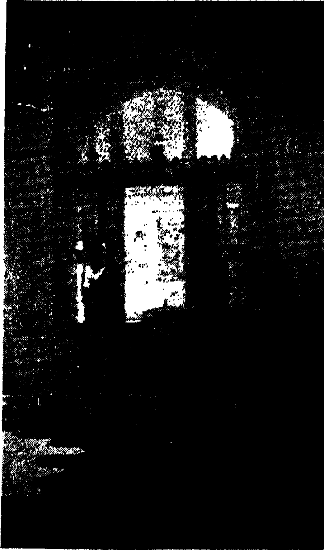
অজন্তার সৌর বাতায়ন

যেমন ৮নং ৯নং ১০নং ১১নং ১২নং এবং ১৩নং। এগুলি শুধু পুরাতন নয়, এগুলি হীনযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের—অপরগুলি মহাযান সম্প্রদায়ের।

হাতে সময় কম থাকলে গুটী চারেক গুহা যেমন ১, ১০, ১৭ এবং ২৬ নম্বরের গুহা দেখলেই অজন্তা সম্বন্ধে বেশ স্পষ্ট ধারণা করা যেতে পারে। তবে আমাদের সে রকম কোনো তাড়া ছিল না সুতরাং বেশ ধীরে সুস্থে ভাল করে গুহাগুলি দেখা সুরু করা গেল।

প্রথম গুহাটী মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের, খৃষ্টীয় পাঁচ শতাব্দীতে নির্ম্মিত। সামনের তোরণ কিছুটা ভাঙা কিন্তু গুহার ভিতর অক্ষুন্ন ;

প্রকাণ্ড চতুষ্কোণ দালান, কুড়িটী বেশ স্থূলকায় স্তম্ভের ওপর গুহার ছাদ অবস্থিত। ছাদটী বিচিত্র বর্ণে অলঙ্কৃত। অনেক স্থানে ছাদের পলস্তারা খসে পড়েছে, ছবির রঙ মলিন হয়ে গেছে, কিন্তু যেগুলি এখনও বর্ত্তমান আছে সেগুলি থেকে এদের বিগত দিনের ঐশ্বর্য্য, বর্ণ-বিন্যাস ও কলা-কুশলতার উৎকর্ষ কল্পনা করা মোটেই কষ্টকর নয়। বিহারটীর তোরণের অপর দিকে একটী কক্ষে বুদ্ধদেবের এক বিরাট মূর্ত্তি আছে—সে মূর্ত্তির মুখের প্রশান্তি ও মৃদুহাস্য অপূর্ব্ব। একটী স্তম্ভের গায়ে চারটী হরিণ ও তাদের একটী মুখ এমন অদ্ভুত কৌশলে আঁকা যে দেখলে শিল্পীর তারিফ না করে থাকা যায় না। প্রাচীর গাত্রে ও ছাদের ছবিগুলি ক্রমশ মলিন ও অস্পষ্ট হয়ে আসছে। আর কতদিন এগুলি থাকবে তা বলা খুবই শক্ত। অজন্তার এই প্রাচীর চিত্রগুলি প্রাচীন ভারতের অপূর্ব্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতির আলেখ্য। দেওয়ালে ও



কুলাবাদ আওরঙ্গজেবের সমাধি

ছাদে আঁকা এই ছবিগুলি যে পদ্ধতিতে নির্ম্মিত হয়েছে তা ইটালিয়ান ফ্রেস্কো পদ্ধতি থেকে কিছুটা ভিন্ন। কর্কশ পর্ব্বত গাত্রে গোময় খড় পশুলোম মিশ্রিত মাটির প্রলেপ দিয়ে তার ওপর সাদা খড়িমাটী বা জিপসামের একটী আস্তরণ দেওয়া হত। এই আস্তরণের ওপর আসল ছবি আঁকা হত। অনেক জায়গায় এই আস্তরণ খসে গেছে, কোনো কোনো স্থানে ছবির রঙ উঠে গেছে। ইটালি থেকে বিশেষজ্ঞ আনিয়ে অজন্তার দেওয়াল-চিত্রের মেরামতি কাজ করার চেষ্টা করা হয়েছে। চেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু তা সুফলপ্রদ হয়েছে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে।

এই প্রথম গুহাতেই অনেকগুলি ছবি আছে যার প্রতিলিপি আচার্য্য নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার প্রভৃতি বাঙালী শিল্পীরা সাধারণ্যে প্রচার করেছেন। যতদূর মনে আছে বুদ্ধ ও মারের প্রলোভন, রাজসভায় নৃত্য, কৃষ্ণাকুমারী প্রভৃতি ছবিগুলি প্রথম গুহাতে দেখতে পাওয়া গেল। এইসব ছবির রঙিণ প্রতিলিপি নিজাম সরকার বহুব্যয়ে প্রকাশ করেছেন সেই প্রতিলিপিগুলি সত্যই সুন্দর।

প্রথম গুহার তুলনায় দ্বিতীয় গুহা আয়তনে অনেক ছোট। এটীও একটী বিহার শ্রেণীর গুহা—মধ্যে চতুষ্কোণ দালান—আয়তন ৪৮ ফুট, ধারে বারোটী স্তম্ভ। ছাদের ছবি সম্পূর্ণ খসে গিয়েছে। দেওয়ালের ছবিগুলি অস্পষ্ট হলেও কিছুটা বোধগম্য। একটী বিরাট রাজকীয় শোভাযাত্রার ছবি আছে—যা দেখলেই সে যুগের লোকের হাবভাব ও বিলাস বৈচিত্র্যের প্রকৃতি মনের ওপর অতি সহজেই রেখাপাত করে। শিল্পীর আঁকবার কায়দায় শোভাযাত্রার ঐশ্বর্য্য বড় চমৎকার ফুটে উঠেছে। প্রথম গুহার তুলনায় দ্বিতীয় গুহার পরিদর্শন অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে সারা হল। তৃতীয় গুহা একটী বারান্দামাত্র, সুতরাং সেটীকে বাদ দিয়ে চতুর্থ গুহায় প্রবেশ করা হল। বিহার হিসাবে এটী সবচেয়ে



আওরঙ্গাবাদ-বিবিকা মকবারা

বড়, চতুষ্কোণ, মাপে ৮৯ ফুট; আটাশটী স্তম্ভের ওপর ছাদ। সামান্য কিছু ভাস্কর্যের কাজ আছে কিন্তু সেগুলি খুব উল্লেখযোগ্য বলে মনে হল না। পরের গুহাটী পরিদর্শনযোগ্য নয়, সুতরাং সেটীকে বাদ দিয়ে ৬ নম্বরে হাজির হওয়া গেল। গুহার সামনের অংশ দু'তলা তবে তার কিছুটা ভাঙা। ভিতরে ষোল স্তম্ভের দালান কিন্তু স্তম্ভগুলি অধিকাংশই জীর্ণ, তাতে মেরামতির চিহ্ন সুপরিস্ফুট। গুহার ভিতরে আর একটী কক্ষ—সেখানে পদ্মাসন বুদ্ধ! দেওয়ালের গায়ে কিছু ছবি আছে কিন্তু সেগুলি বড় অস্পষ্ট। এখানে সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি বার হয়ে সাত নম্বর গুহায় অগ্রসর হওয়া গেল। সাত নম্বর গুহাটী—অন্য গুহা থেকে কিছু স্বতন্ত্র। এটীকে ঠিক বিহার শ্রেণীতে ফেলা যায় না অনেকটা বারান্দার মতো, তার মধ্যে একটী কক্ষ—সে কক্ষে অভয়পাণি বুদ্ধ মূর্ত্তি।

এইবার সুরু হল—হীনযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কীর্ত্তি আট নম্বর গুহা থেকে। এ গুহাগুলির নির্মাণ রীতি মহাযান সম্প্রদায়ের গুহারচনা হতে

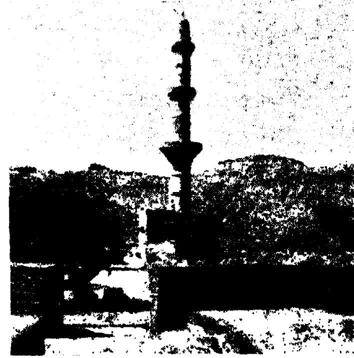
বিভিন্ন। ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে হীনযান সম্প্রদায়ের গুহাগুলি বেশী পুরাতন। এ গুলির নির্ম্মাণকাল খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫০ থেকে ১০০ বৎসর। গুহাগুলি দেখলেই এর সত্যতা অতি সহজে বোঝা যায়। গুহাগুলির গঠনে কাষ্ঠযুগের চিহ্ন সুপরিস্ফুট। গুহাগুলির ছাদে কড়ি বরগার অনুকরণ ও সেই মতো বক্র। এ থেকেই মনে হয় যে এই গুহা যাঁরা নির্ম্মাণ করেছেন তাঁরা তখনও কাঠের সঙ্গে পাথরের প্রভেদ স্পষ্ট করে বুঝতে পারেন নি। কিন্তু সে যাইহোক, এত শক্ত পাথরে যাঁরা খোদাই কাঠের কাজ নিখুঁতভাবে তুলতে পারেন তাঁদের ক্ষমতা ও শ্রমশিল্পের উৎকর্ষ সম্বন্ধে কোনো রকমের সন্দেহ থাকতে পারে না। আজকের দিনে পাথর কাটার জন্য বিশেষভাবে তৈরি লোহার ছেনি কত সহজে এসব পাথরের কাছে ভোঁতা হয়ে যায় তা ভেবে অবাক মনে হয়—যে সব শিল্পীরা এত প্রকাণ্ড গুহা ও এত ভাস্কর্য্যের কাজ এই সব কড়া পাথরে রূপায়িত করেছেন—সে সব কী ধরণের যন্ত্রের সাহায্যে ও কত সময় ব্যয় করে?

প্রথম অংশ ভাঙা হলেও ভিতরটা এখনও সুঠাম আছে। দেওয়ালের ছবিগুলি বেশ স্পষ্ট ও বোধগম্য। রাজারাণী পরিচারিকা সমভিব্যাহারে বোধি বৃক্ষ পূজা দেখছেন। অশ্বত্থতলে ষড়দন্তযুক্ত হস্তীযূথ, নৃত্যসভা প্রভৃতি অনেকগুলি ছবি এই গুহাতেই আছে। এ ছবিগুলি থেকে তখনকার দিনের পোষাক পরিচ্ছদের বেশ একটা সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।

এর পর চারটী গুহা ১১ থেকে ১৪ নং ছোট বলে এবং আমাদের গাইডের পরামর্শ মতো বাদ দিয়ে একেবারে ১৬ নম্বর গুহায় প্রবেশ করা হল। গুহাটী বেশ বড়—বিহার জাতীয়—সামনে চওড়া বারান্দা, ভিতরে চতুষ্কোণ দালান, কুড়িটী স্তম্ভ ঘেরা আয়তনে ৬৬ ফুট—দুধারে ছয়টী কক্ষ, পিছনে গর্ভ গৃহে বিরাট বুদ্ধ মূর্ত্তি। দেওয়ালে অনেকগুলি ছবি আছে—তার মধ্যে ভিক্ষাপাত্র হাতে বুদ্ধের ছবিটী সুপরিচিত। এর পাশে ১৭ নম্বরের গুহাটীও ১৬ নম্বরের অনুরূপ—আকারে এবং আয়তনে—দেওয়ালে প্রচুর ছবি আঁকা, কিন্তু ধোঁয়া লেগে সেগুলির অবস্থা বড়ই শোচনীয়।



দৌলতাবাদ দুর্গের কামান



চাঁদমিনার-দৌলতাবাদ

আট নম্বর গুহাটী হীনযান সম্প্রদায়ের গুহার প্রথম নিদর্শন হলেও এটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। সুতরাং এটীতে একবার উঁকি দিয়েই তার পাশে নয় নম্বরে প্রবেশ করা হল।

এই গুহাটী চৈত্য জাতীয়—গুহার শেষ অংশ অর্দ্ধ বৃত্তাকার, ছাদটি গিলানের মতো; গুহার প্রবেশ দ্বারে অজন্তার বিখ্যাত সৌর বাতায়ন। দুই পাশে চতুর্দ্দশ স্তম্ভ। চৈত্যের শেষ প্রান্তে একটী দাগোবা অর্থাৎ ক্ষুদ্র স্তূপ—উচ্চতায় এগারো ফুট মাত্র। দেওয়ালে এখনও কিছু কিছু ছবির অস্পষ্ট চিহ্ন পাওয়া যায়; কিন্তু সেগুলির স্বরূপ অনুমান সাপেক্ষ। সুতরাং অনুমানের ভার অপরের জন্য রেখে অগ্রসর হওয়াই যুক্তিযুক্ত। পাশেই ১০ নম্বর গুহা—আয়তনে বেশ বড়, লম্বায় ৯৫ ফুট চওড়ায় ৪১ ফুট এবং উচ্চতায় ৩৬ ফুট—এটীর নির্ম্মাণকাল খৃষ্ট পূর্ব্ব প্রায় ১৫০ বৎসর আগে। গুহার সামনের অংশ ভেঙে গেছে। গঠনের ভগ্ন অংশ থেকে মনে হয় এটীরও সামনে একটী প্রকাণ্ড সৌর বাতায়ন ছিল। গুহার

ছবিগুলির মধ্যে দুটী কিছু বোঝা গেল—একটী বিজয় সিংহের সিংহল অবতরণ অপরটী বুদ্ধের সম্মুখে মাতা ও পুত্র।

এতগুলি গুহা ঘুরে ও ছবি দেখে বড় ক্লান্তি আসছিল। সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ সুবোধবাবু একটা পাথর বেছে বসে পড়েছিলেন। অপর সকলেই ইতস্তত করছিলেন—শুধু উমাদেবী ও শৈলেন ভায়া অচঞ্চল নয় উৎসাহময় ও বটে। সত্য বলতে কি আমার এই ভগ্নিটীর কষ্টসহিষ্ণুতা ও সদাপ্রফুল্লভাব এবং শৈলেন ভায়ার সপ্রতিভ নিষ্ঠা—এ দুয়ের গুণে ভ্রমণের কোনো অসুবিধাই মনে রাখবার উপায় ছিল না। কি করা যায়—বিশ্রাম না অগ্রসর। সুবোধবাবু নিস্প্রভভাবে চেয়ে রইলেন। আমাদের প্রদর্শক উৎফুল্লভাবে আমাদের উৎসাহ দিয়ে বল্লে—১৯ থেকে ২৫ নম্বরের গুহা না দেখলে ও চলে, কিন্তু ২৬ নং হল সবচেয়ে সেরা—না দেখলে এখানে আসাই বৃথা। উমা দেবী হেসে বললেন—ও; মোটে আর একটা—তবে আর অনর্থক দেরী করে লাভ কি? শৈলেন উৎসাহভরে বলে উঠল—

তবে আর বসে দরকার কি, এগুনো যাক্‌। ঘোষ মশাই আর কোনো কথা না বলে অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন—তাই হোক্‌।

প্রদর্শকের কথা সত্য—২৬ নং গুহাটী সত্যই অপূর্ব্ব—অন্য সকল গুহা হতে এটী বিভিন্ন। গুহাটী চৈত্য জাতীয়, আয়তনে ৬৮টী ফুট দীর্ঘ, ৩৬ফুট প্রশস্ত ও ৩১ ফুট উচ্চ—সামনে প্রকাণ্ড সৌর বাতায়ন। গুহার ভিতরে দুধারে ৪৬টী স্তম্ভ—অন্তস্থলে দাগোবা স্তূপ—২০ ফুট উচ্চ। চতুর্দ্দিকে বুদ্ধের বিভিন্ন অবস্থার ভাস্কর্য্য। গুহার অভ্যন্তরে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত বুদ্ধের প্রকাণ্ড মূর্ত্তি, দেওয়ালের গায়ে বুদ্ধ ও মারের প্রলোভনের তক্ষণ চিত্র।

স্তম্ভশীর্ষের উপরিভাগে দেওয়ালে আগাগোড়া ভাস্কর্য্যের নিপুণ নিদর্শন। বলিষ্ঠ অথচ সূক্ষ্ম। দেখে সত্যই মনে হল এ গুহা না দেখে যাওয়াটা অপরাধ হত।

এর পরে আরও গুটী তিনেক গুহা ছিল কিন্তু সেগুলি অনধিগম্য। এই গুহার সামনে থেকে সমস্ত পথ ও নীচে শুষ্ক নদীবক্ষের দৃশ্যটী বড় ভাল লাগল। অল্প একটু বিশ্রাম করে—মধ্য পথে এক গুহার ঝরণা থেকে জল পান করে পর্ব্বতের পাদদেশে ধীর পদক্ষেপে প্রত্যাবর্ত্তন করা হল। ঘড়ির হিসাবে গুহাগুলি দেখতে সময় লাগল সাড়ে তিন ঘণ্টা। বেলা তখন দেড়টা—সকলেই বেশ পরিশ্রান্ত। সুতরাং আর কাল বিলম্ব না করে পর্ব্বতের পাদদেশস্থিত পাকা ঘরটীর ভিতর সতরঞ্চি বিস্তার করে বিশ্রাম ও ভোজনের আয়োজন করা গেল। গাড়ীতেই আহারের সমস্ত উপকরণ অতি সুনিপুণভাবে হোটেল পরিচালিকা গুছিয়ে দিয়েছিলেন। এ কাজ তাঁকে প্রতি নিয়তই করে থাকতে হয়। ঘরের পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক দৃশ্য যে খুব মনোজ্ঞ এমন কথা হলফ করে বলতে পারি না, তবে তার মধ্যেই যথাসম্ভব সুসংস্কৃতভাবে আহার পর্ব্ব সমাধা করা গেল। স্থানীয় একটী লোকের সাহায্যে কয়েক বালতি জলও সংগ্রহ করা গেল। তার-পরই হোটেলে প্রত্যাবর্ত্তন। গাড়ী থেকে নেমে নিজেদের কাপড়জামার বিবর্ণ অবস্থা দেখে হোটেলের ঘরে ঢুকতেই লজ্জা মনে হয়। গায়ে ধুলার একটা সূক্ষ্ম আস্তরণ পড়ে গিয়েছে। মাথার চুলের রঙ বদলে গেছে। অথচ সিডানবডি গাড়ীতে যাওয়া আসা করা হয়েছে। ধুলার কি সূক্ষ্ম অবাধ গতি।

আর কালবিলম্ব না করে স্নানাগারে প্রবেশ করা হল। গরম জল ও সাবানের সাহায্যে যথাসম্ভব পরিষ্কৃত হয়ে ফরসা কাপড় ও জামা পরে তবে খানিকটা সুস্থবোধ করা গেল। চা খেয়ে দেখা গেল তখনও হাতে প্রচুর সময়। মানমাদে ফেরার ট্রেণ রাত নটায়। অতএব সহরের শিল্পদ্রব্যাদির কিছু সন্ধান করা অন্যায় হবে না ভেবে আবার বার হওয়া গেল! এখানকার জরি ও সলমাচুমকির কাজ এবং বিদ্রির কাজ খুব বিখ্যাত। স্থানীয় সিল্কের কারখানা, তাঁতশালা প্রভৃতি দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে এল। শিল্প নিদর্শনও কিছু সংগ্রহ হল।

আর দেরী করা উচিত নয় ভেবে হোটেলে আটটার মধ্যেই নৈশ আহার সমাপন করে ষ্টেশনে উপস্থিত হওয়া গেল। যদিও হোটেল থেকে গাড়ীতে শোবার জায়গা সংকুলান করবার কথা পূর্ব্বাহ্নে জানান হয়েছিল তবুও মনে একটা উদ্বেগ ছিল। রাত পৌনে একটায় মানমাদ থেকে বম্বের গাড়ী—গাড়ীটী একটী গাধাবোট বিশেষ, কিন্তু তবুও এটীকে পছন্দ করার একমাত্র কারণ যে এ গাড়ী মানমাদ থেকে ছাড়ে সুতরাং এখানে শোবার জায়গা মেলা অপেক্ষাকৃত সহজ। রাত্রি সাড়ে বারোটায় আওরঙ্গাবাদ থেকে মানমাদে পৌঁছে দেখা গেল—আমাদের অনুমান সত্য—স্থান সংরক্ষিত।

কালবিলম্ব না করে নিদ্রাগত হওয়া গেল। রাত্রের কথা বলতে পারি না, গাড়ী কি ভাবে অগ্রসর হয়েছে—কিন্তু সকালে যখন দেখা গেল যে আমাদের গাড়ীটিকে সহরের পাশে ফেলে অপর সব ট্রেণ বিদ্যুতবেগে এগিয়ে যাচ্ছে তখন এক একবার ইচ্ছা হচ্ছিল যে ট্রেণ বদল করি। কিন্তু সঙ্গের জিনিষপত্র ওঠানামানর হাঙ্গামার কথা ভেবে সে সদিচ্ছা সংবরণ করা হল।

ভিটি ষ্টেশনে পৌঁছে আর এক সমস্যা—আজ সন্ধ্যাতেই যখন বম্বে ত্যাগ করতে হবে তখন রিটায়ারিং রুমেই দিন কাটান যাক—কিন্তু সেখানে যখন দেখা গেল যে স্থানাভাব তখন কেউ বল্লেন হোটেল কিন্তু নতুন হোটেল—আর কেউ বল্লেন মাত্র কয়েক ঘণ্টা ত—ওয়েটিং রুমেই কাটিয়ে দেওয়া যাক্‌। উমা দেবী আওরঙ্গাবাদের ধুলার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বল্লেন—আবার কিন্তু আর এক দফা ভাল করে স্নান না করলে আওরঙ্গাবাদের ধুলা গা থেকে উঠবে না। সুতরাং হোটেলেই ফেরা হল—নতুন হোটেলে স্থানাভাব। পুরাতন হোটেলই সন্ত পুরাতন খরিদ্দার বলে—স্থানাভাব সত্ত্বেও আমাদের একটা ব্যবস্থা করে দিলেন।

সারা দিন বম্বে সহর ঘুরে বেড়ান হল। আপিস যাত্রীদের ভিড়ে ফুটপাতে চলা দুষ্কর, তার ওপর মনোহারী জিনিষপত্র নিয়ে বসে আছে অসংখ্য ফেরীওয়ালা। রুমাল, পেন্সিল, গেঞ্জী, খেলানা, ছুরি, কাঁচি নানাবিধ প্রসাধনদ্রব্য। চোখ ফেরান মুস্কিল। কলকাতার ডালহাউসি স্কোয়ারে বা গোলদিঘীর ধারে পায়ে চলা যাঁদের অভ্যাস আছে তাঁরা জানেন এ সব জিনিষের কী আকর্ষণ। টুকিটাকি জিনিষপত্র যোগাড় হল মন্দ নয়। ষ্টেশনারী দোকানের বাংলা নাম মনোহারী দোকান যে কেন বলা হয় তা যেন এতদিনে বেশ বোঝা গেল।

ট্রেণে ওঠবার আগে একবার ক্রফোর্ড মার্কেট ঘুরে আসা হল।

বিকাল ৫-৫৫ মিনিটে কলকাতার গাড়ী। প্লাটফরমের অপর ধারে দাঁড়িয়ে দেখি একটী পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে গাড়ী—জানা গেল ওইটাই বিখ্যাত "ডেকান কুইন"। শুধু প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী—বসবার চেয়ারের সামনে টেবিল। কেজো লোকের পক্ষে খুব সুবিধাজনক। কয়েক মিনিটের মধ্যে গাড়ী ভর্ত্তি হয়ে গেল—এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইলেকট্রিক ট্রেণের এঞ্জিন হর্ণ বাজিয়ে দ্রুতবেগে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আর সময় বড় ছিল না। আমাদের গাড়ীতে আগেই জিনিষপত্র গুছিয়ে রাখা ছিল—দক্ষিণের রাণী চলে যেতেই আমরা যে যার আসন পরিগ্রহ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাদেরও যাত্রা সুরু হল। তখন বম্বে সহরের ওপর সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে।

ছত্রিশ ঘণ্টা পরে আবার কলকাতা—হাওড়ার ব্রীজ, কলকাতার ট্রাম ও বাস, তার জনকোলাহল। সবই মধুর মনে হল।

সাংখ্যদর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

সাংখ্য-মনোবিজ্ঞান (Psychology) ও জ্ঞান-বিজ্ঞান (Epistemology)

প্রকৃতির অভিব্যক্তির দুইটি ধারা—ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এক ধারায় জ্ঞানের করণদিগের—অন্তঃকরণ ও বাহ্য-করণদিগের—অভিব্যক্তি; অন্যধারায় জ্ঞানের বিষয়দিগের অভিব্যক্তি। জ্ঞানের বিষয়দিগের সহিত—গ্রাহ্য বা জ্ঞেয় বিষয়দিগের সহিত—জ্ঞানের করণদিগের সংযোগ হইতে জ্ঞানের উদ্ভব হয়। এই সংযোগকেই ভগবদ্গীতায় "মাত্রা-স্পর্শ" বলা হইয়াছে। এই মাত্রাস্পর্শ হইতে জ্ঞান ও সুখ-দুঃখের অনুভূতি উৎপন্ন হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগই জ্ঞানোৎপাদনের জন্য যথেষ্ট নহে। এই সংযোগের পশ্চাতে চিৎস্বরূপ পুরুষের অবস্থান না হইলে জ্ঞান হয় না। সুতরাং জ্ঞানের উৎপত্তির জন্য তিন বস্তুর প্রয়োজন—(১) জ্ঞাতা পুরুষ, (২) জ্ঞানের করণ ও (৩) জ্ঞেয় বিষয়। ইহাদের মধ্যে করণগণ ও জ্ঞেয় বস্তু প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত, এবং ত্রিগুণাত্মক বলিয়া ইহারা স্বজাতীয়। বুদ্ধি হইতে উদ্ভূত অহংকার হইতে যেমন বাহ্যকরণ ও মনঃ তেমনি পঞ্চতন্মাত্রও উদ্ভূত হয়, আর পঞ্চতন্মাত্র হইতেই স্থূলভূত ও স্থূল জগতের যাবতীয় বস্তুর উদ্ভব। সুতরাং মনোজগৎ ও বাহ্যজগতের মধ্যে আত্যন্তিক ভেদ নাই। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে মনঃ ও জড়বস্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয়। তাহাদের মধ্যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া কিরূপে হয়, পাশ্চাত্ত্য দর্শনে তাহা একটি কঠিন সমস্যা। সাংখ্যদর্শনে বুদ্ধি ও মনঃ এবং বাহ্যজগৎ উভয়েই ত্রিগুণাত্মক ও সমজাতীয় বস্তু বলিয়া উক্ত সমস্যা তাহার নাই। অচেতন বুদ্ধি বাহ্যজগতের প্রতিবিম্ব লাভ করিয়া কিরূপ পুরুষের সান্নিধ্যে চৈতন্য ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, ইহাই সাংখ্যদর্শনের সমস্যা।

মনের ধর্ম্ম সংকল্প (সাং কা ২৭)। সংকল্প দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, কর্ম্মের মানসের নাম সংকল্প (সংকল্পঃ কর্ম্মণো মানসম্)। দ্বিতীয়তঃ ইন্দ্রিয় দ্বারা বস্তুমাত্ররূপ যে জ্ঞান হয়, তাহাকে বিশিষ্ট জ্ঞানে পরিণত করাই সংকল্প।

সম্মুগ্ধং বস্তুমাত্রন্তু প্রাক্‌গৃহ্নন্ত্যবিকল্পিতং
তৎ সামান্য বিশেষাভ্যাং কল্পয়ন্তি মনীষিণঃ

(তত্ত্ব-কৌমুদী)।

ইন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান হয় তাহা বস্তুমাত্রের জ্ঞান—অর্থাৎ ইহা একটা বস্তু, এই মাত্র জ্ঞান। কোন্ বস্তু? তাহার ধর্ম্ম কি? প্রভৃতির জ্ঞান এই জ্ঞানের মধ্যে নাই। এতাদৃশ জ্ঞানে যাহা প্রতিভাত হয়, তাহাকে "সম্মুগ্ধ বস্তু" বলে। ইহার জ্ঞানকে বলে "আলোচন"। ইন্দ্রিয়গণ প্রথমতঃ সম্মুগ্ধ-রূপেই বস্তু গ্রহণ করে। ইন্দ্রিয় কর্তৃক আলোচিত, বস্তুমাত্র-রূপে গৃহীত সম্মুগ্ধ বস্তুর উপর মনের সংকল্পক্রিয়া প্রযুক্ত হয়। পূর্ব্বের অবিকল্পিত জ্ঞান তখন বিশেষ জ্ঞানে পরিণত হয়। তখন যে জ্ঞান ছিল "ইহা একটা বস্তু" এই মাত্র, তাহা বিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞানে পরিণত হয়। তখন সেই বস্তুতে বিশেষণ-যুক্ত হয়; ইহা চতুষ্পদ, লাঙ্গুল-বিশিষ্ট, শ্বেতবর্ণ প্রভৃতি বিশেষণ-প্রযুক্ত হইয়া তাহা একটি বিশিষ্ট গোরুর জ্ঞানে পরিণত হয়।

অস্তি হ্যালোচনজ্ঞানং প্রথমং নির্ব্বিকল্পকং।
বালমূকাদি বিজ্ঞান সদৃশং মুগ্ধবস্তুজং॥
অতঃ পরং পুনর্ব্বস্তুধর্ম্মৈর্জাত্যাদিভি র্যয়া।
বুদ্ধ্যাবসীয়তে সাহি প্রত্যক্ষত্বেন সম্মতা।

তত্ত্ব-কৌমুদী (২৭)

প্রথম নির্ব্বিকল্প জ্ঞানকে আলোচন জ্ঞান বলে। শিশু ও মূকবধিরদিগের জ্ঞানের সদৃশ এই জ্ঞান। তাহা "মুগ্ধবস্তু" জাত জ্ঞান। তাহার পরে বস্তুর ধর্ম্ম, তাহার জাতি প্রভৃতির জ্ঞানসহ যে নিশ্চিত জ্ঞান হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ জ্ঞান। কোনও বস্তুর সহিত অন্য বস্তুর সাদৃশ্য ও ভেদ লক্ষ্য-করণই সংকল্প।

বুদ্ধি, অহংকার ও মনঃ এই তিন অন্তঃকরণ ও তাহাদের সহিত কোনও এক বাহ্যেন্দ্রিয় কোনও প্রত্যক্ষ বিষয়ে যুগপৎ অথবা ক্রমশঃ প্রযুক্ত পারে।

যুগপৎ চতুষ্টয়স্যতু বৃত্তিঃ, ক্রমশশ্চ, তস্য নির্দ্দিষ্টা,
দৃষ্টে তথাপ্যদৃষ্টে ত্রয়স্য তৎপূর্ব্বিকা বৃত্তিঃ। সাং কা—৩০

বাচস্পতি নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত দ্বারা এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন; সর্ব্বতোব্যাপী নিবিড় অন্ধকারে সহসা বিদ্যুৎ প্রকাশ হইলে যদি অতি নিকটে ব্যাঘ্র দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের আলোচন, মনের সংকল্প, অহংকারের অভিমান এবং বুদ্ধির অধ্যবসায় (অর্থাৎ ইহা হিংস্র ব্যাঘ্র এই নিশ্চিত জ্ঞান) যুগপৎ হইয়া থাকে। দ্রষ্টা তৎক্ষণাৎ লম্ফ দিয়া সে স্থান ত্যাগ করে। আবার মন্দালোকে কিয়ৎ দূরে দণ্ডায়মান পুরুষ প্রথমে সম্মুগ্ধ বস্তুরূপে আলোচিত হয়। তাহার পরে কোদণ্ডহস্ত লোকরূপে পরিদৃষ্ট হইলে, তাহাকে দস্যু বলিয়া জ্ঞান হয়। তাহার পরে "আমার দিকে আসিতেছে", এই নিশ্চিত জ্ঞান হইলে দ্রষ্টা পলায়ন করে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানে অন্তঃকরণ ও বাহ্যকরণদিগের বৃত্তি এইরূপ। পরোক্ষজ্ঞানে বাহ্যকরণদিগের কোনও ক্রিয়া নাই। না থাকিলেও অন্তঃকরণদিগের বৃত্তি প্রত্যক্ষপূর্ব্বিকা, অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে পরোক্ষ জ্ঞানে তাহারই জ্ঞান হয়। অনুমান, আগম এবং স্মৃতি দ্বারাই পরোক্ষ জ্ঞান হয়। পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া তথায় বহ্নির অস্তিত্ব অনুমিত হয়। বহ্নি এখানে প্রত্যক্ষ নহে। কিন্তু পূর্ব্বে ধূমের সহিত দৃষ্ট হইয়াছে বলিয়াই সে সময়ে প্রত্যক্ষ না হইলেও তাহার জ্ঞান হয়। অভ্যস্ত মন্ত্রের উচ্চারণ সময়ে পূর্ব্বে প্রত্যক্ষীভূত এবং পঠিত মন্ত্রেরই স্মরণ হয়। এইরূপ আগম হইতে যে জ্ঞান হয়, তাহা পূর্ব্বপ্রত্যক্ষীভূত বিষয়েরই জ্ঞান। প্রত্যক্ষ জ্ঞানেও অন্তঃকরণের বৃত্তি যুগপৎ অথবা ক্রমশঃ হয়।

অন্তঃকরণ তিনটির যাহা বিষয়, তাহা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালেরই ব্যাপার হইতে পারে, কিন্তু বাহ্যকরণদিগের বিষয় কেবল বর্ত্তমানকালে অবস্থিত।

বাহ্য ইন্দ্রিয়গণ যে সকল বিষয় মনঃ, অহংকার ও বুদ্ধির নিকট উপস্থিত করে, তাহারা তাহাদের মধ্যে অবগাহন করে (এবং তাহাদের—জ্ঞান লাভ করে)। এই জন্য ইন্দ্রিয়গণ দ্বার এবং অন্তঃকরণ দ্বারবান। ইন্দ্রিয়দ্বার পথে সমস্ত বিষয় অন্তঃকরণের নিকট উপস্থিত হয়।

সান্তঃকরণা বুদ্ধিঃ সর্ব্বং বিষয়মবগাহতে যস্মাৎ।
তস্মাৎ ত্রিবিধং করণং দ্বারি,দ্বারানি শেষানি॥

সাংকা—৩৫।

গ্রামাধ্যক্ষ যেমন গৃহস্থদিগের নিকট কর সংগ্রহ করিয়া তাহার উপরিস্থ বিষয়াধ্যক্ষকে প্রদান করে, বিষয়াধ্যক্ষ সর্ব্বাধ্যক্ষকে প্রদান করে এবং সর্ব্বাধ্যক্ষ রাজাকে প্রদান করে, তেমনি বাহ্য ইন্দ্রিয়গণ আলোচনা করিয়া "আলোচন" মনকে দান করে, মনঃ সংকল্প করিয়া সংকল্পিত বিষয় অহংকারকে দান করে, অহংকার অভিমান করিয়া অর্থাৎ ইহা আমার মনে করিয়া আলোচিত, সংকল্পিত ও অভিমত বিষয় বুদ্ধিকে দান করে। বুদ্ধি হইতে অধ্যবসায় বা নিশ্চিত জ্ঞান হয়। (তত্ত্ব কৌমুদী ৩৬)

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ে বাচস্পতি ও বিজ্ঞানভিক্ষুর মতের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। বাচস্পতির মতে মনের মাধ্যমেই বাহ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব বুদ্ধির উপর পতিত হয়। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে ইন্দ্রিয় সাহায্যে বুদ্ধি আপনিই বিষয়ের সংস্পর্শে আসে। কিন্তু সাংখ্যকারিকায় মনঃকে সংকল্পক বলা হইয়াছে। মনের এই ক্রিয়া ব্যতীত জ্ঞান সম্ভবপর নহে।

পাতঞ্জল দর্শনে অহংকার-এবং-ইন্দ্রিয়-সমন্বিত বুদ্ধি চিত্ত নামে অভিহিত। দীপ শিখার মতো বুদ্ধি অনবরত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বুদ্ধিতে সত্ত্বগুণের আধিক্য। তাহার আধেয় "প্রত্যয়" একটির পর একটি আবির্ভূত এবং বিলীন হইতেছে এবং পুরুষে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। পুরুষও বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। এই প্রতিবিম্বন হইতেই পুরুষের ভোক্তৃত্বের উদ্ভব। বুদ্ধি দর্পণ সদৃশ।

তস্মিংশ্চ দর্পণে স্ফারে সমস্তাঃ বস্তু দৃষ্টয়ঃ
ইমাস্তাঃ প্রতিবিম্বন্তি সরসীব তটদ্রুমাঃ

(যোগবার্ত্তিক—১।৪)

সরোবরে তটস্থিত বৃক্ষগণ যেরূপ প্রতিবিম্বিত হয়, বুদ্ধিরূপ দর্পণেও তেমনি সকল বিষয় প্রতিবিম্বিত হয়। বুদ্ধি এই প্রতিবিম্বনের ফলে বিষয়াকারে আকারিত হয়। যোগবার্ত্তিকের অন্যত্র উক্ত হইয়াছে যে ইন্দ্রিয়গণ সঞ্চরণ মার্গ। ইন্দ্রিয়পথে বহির্গত হইয়া চিত্ত বিষয়াকারে পরিণাম-প্রাপ্ত হয়। (যোগবার্ত্তিক ১।৬।৭) ইন্দ্রিয় মার্গদ্বারা দেহের বাহিরে গিয়া বিষয়ের সংস্পর্শে চিত্ত বিষয়াকার প্রাপ্ত হউক, অথবা বিষয় বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হউক, তাহার জ্ঞান পুরুষের সাহিত্য ব্যতিরিকে সম্ভবপর হয় না। বিষয়াকার প্রাপ্ত অথবা বিষয়-প্রতিবিম্ব-সমন্বিত বুদ্ধি যখন পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয় তখনই জ্ঞান হয়। প্রতিবিম্ববাদ

পাশ্চাত্য দর্শনের প্রতিরূপ প্রত্যক্ষবাদের (Representative perception) সদৃশ। কিন্তু শেষোক্ত মতে জ্ঞান পুরুষেরই —মনঃ ও বুদ্ধি পুরুষেরই অন্তর্গত। সাংখ্য মতে এ সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ আছে। "ভোক্তৃভাবাৎ" এই সূত্র হইতে অনুমান করা যায় যে এই জ্ঞান পুরুষের। বুদ্ধি জ্ঞান-লাভে পুরুষের করণ মাত্র। (সাং সূ ১।১৪৩)। কিন্তু পুরুষ অসঙ্গ, নিত্য, শুদ্ধ (অধিকারী) ও মুক্ত (সাং সূ ১।১৫, ১৯) ইহাও বলা হইয়াছে। তাহা হইলে তাহার প্রকৃতির সহিত সান্নিধ্য সম্পর্ক সম্ভবপর হইলেও প্রকৃতির, ভোগ সম্ভবপর হয় না। কিন্তু প্রকৃতির যাবতীয় ক্রিয়াই যখন পুরুষের ভোগ ও পরে কৈবল্যের জন্য, তখন এই ভোগকে কল্পিত মাত্র বলিলে (এই ভোগ বস্তুতঃ প্রকৃতির, পুরুষের নহে বলিলে) কৈবল্যার্থ সাধনের কোনও প্রয়োজনই থাকে না। সাংখ্যসূত্রে (৩।৮) কিন্তু তাহাই বলা হইয়াছে।

"সম্প্রতি পরিমুক্তো দ্বাত্যাম।"

স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ—এই দুইটির কোনওটিই পুরুষের নাই। কারণ, পুরুষ নিঃসঙ্গ। বিবেকের উদয় হইলে আত্মা যেরূপ দেহসঙ্গ-রহিত, অধিরেক কালেও তদ্রূপ। বিজ্ঞান ভিক্ষু "দ্বাভ্যাং" শব্দে শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদি বুঝায় বলিয়াছেন। তাহাতেও বিশেষ অর্থভেদ হয় না। কিন্তু অনিরুদ্ধ কৃত ভাষ্যে এই সূত্রের পাঠ আছে "সম্প্রতি পরিম্বক্তো দ্বাভ্যাং।" ইহার অর্থ সংসারে জীব স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর যুক্ত হইয়া অবস্থান করে। কিন্তু অন্যত্র পুরুষকে যে অসঙ্গ ও অপরিণামী বলা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

যে জ্ঞানের উৎপত্তি প্রক্রিয়া বর্ণিত হইল, তাহার স্বরূপ কি? "জ্ঞান" একটি পদ। ইহার অর্থ আছে, সুতরাং ইহা একটি পদার্থ; সেই পদার্থের স্বরূপ কি? বৈশেষিক ও ন্যায়দর্শনে যে সকল পদার্থের উল্লেখ আছে, তাহাদের মধ্যে জ্ঞানের উল্লেখ নাই। তবে জ্ঞান কি "ক্রিয়া" পদার্থের অন্তর্ভুক্ত? ব্রহ্ম জ্ঞান-স্বরূপ বলিয়া তৈত্তিরীয় উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছেন। (সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম)। জ্ঞান যদি ক্রিয়া হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের মধ্যে তাহা ক্রিয়ারূপে বর্ত্তমান। কিন্তু ক্রিয়া তো কাল সাপেক্ষ। কালাতীত ব্রহ্মে ক্রিয়ার সম্ভব হয় কিরূপে? ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সকলই তো তাঁহার নিকট একসঙ্গে বর্ত্তমান। ব্রহ্ম সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু চিৎ ও জ্ঞান সমার্থক নহে। সদ্যোজাত শিশু চিৎ পদার্থ, কিন্তু তাহাতে জ্ঞান নাই, জ্ঞানের শক্যতা আছে। জ্ঞান বলিতে জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের অস্তিত্ব সূচিত হয়। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে সম্বন্ধকে জ্ঞান বলা যায়। জ্ঞেয়ের অনুভবই জ্ঞান। এই অনুভবই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে সম্বন্ধ। ইহা এক অনন্য-সাধারণ বিশেষ সম্বন্ধ। ব্রহ্মের বাহিরে কিছুই নাই। সুতরাং ব্রহ্মের জ্ঞান ব্রহ্মের স্ব-সম্বন্ধী জ্ঞান। ব্রহ্ম আপনাকে আপনি জানেন (আত্মানং আত্মনা বেত্তি)। ব্রহ্ম নিজের জ্ঞানের বিষয়। কিন্তু এই জ্ঞান নিত্য বলিয়া তাহার উৎপত্তি নাই, তাহা সদা বর্ত্তমান। ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া তাহা সৎ বস্তু। তাহা নিত্য আবির্ভূত। কিন্তু মানুষের জ্ঞান কালে আবির্ভূত হয়। এই আবির্ভাবকে উৎপত্তি বলা যায়। ইহা অন্য ঘটনার উপর নির্ভরশীল। সাংখ্যের পুরুষ চিৎ পদার্থ হইলেও তাহাতে বাহ্য পদার্থের জ্ঞান নাই—বাহ্য পদার্থের সহিত তাহার সত্য সংযোগও কখনও হয় না। পুরুষ চৈতন্য পদার্থ সন্দেহ নাই; তাহাতে সংবিদ্ (Consciousness) আছে। কিন্তু যখন অহংকার নাই, তখন আত্ম-সংবিদ্ (Selfconsciousness) আছে বলা যায় না। জীবের চৈতন্য পুরুষের সহিত প্রকৃতির তথাকথিত সংযোগের ফল। এই সংযোগের ফলে অচেতন প্রকৃতিতে বুদ্ধি, অহংকারও মনের উদ্ভবের ফলে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়।

মানুষের জ্ঞানের যখন উৎপত্তি আছে, তখন তাহার সহিত কালের সম্বন্ধ আছে। তাহা নিত্য নহে। জ্ঞান বুদ্ধির এক রূপ (অধ্যবসায়ো বুদ্ধিঃ)। বুদ্ধি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বিকার। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ দ্রব্য। সুতরাং বুদ্ধি ও দ্রব্য। সুতরাং তাহার এক রূপ যে জ্ঞান, তাহাকেও দ্রব্য বলিতে হয়। এই দ্রব্যের উদ্ভব হইতে পারিত না, যদি প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ না হইত। পুরুষের আলোকে আলোকিত প্রকৃতিতেই বুদ্ধির আবির্ভাব হয়। পুরুষ যখন প্রকৃতির সান্নিধ্য হইতে সরিয়া যায়, তখন সে আলোকও নির্ব্বাপিত হয়, জ্ঞানেরও বিনাশ হয়। এই বিনাশশীল বুদ্ধিকে সাংখ্য চেতন বলেন নাই। পুরুষের সংযোগে তাহা চেতনের ন্যায় প্রকাশিত হয় বলিয়াছেন। (সাংকা ২০)। সুতরাং বুদ্ধিকে ও জ্ঞানকে অচেতনই বলিতে হইবে।

চেতনের মতো হইলেও তাহা অচেতন। কিন্তু "আমি জানিতেছি" এই বোধ অচেতন হইলেও, যিনি জানেন, সেই "আমি" চেতন অথবা চেতনরূপে প্রতীয়মান পদার্থ।

দ্বয়োরেকতরস্য বাপ্যসন্নিকৃষ্টার্থ-
পরিচ্ছিত্তিঃ প্রমা, তৎ সাধক-
তমং যৎ, তৎ ত্রিবিধং প্রমাণম্
সাং সূ—১।৮৭

অসন্নিকৃষ্ট অর্থের পরিচ্ছিত্তি প্রমা অর্থাৎ যে অর্থ বা বস্তু অবধারিত হয় নাই তাহার পরিচ্ছিত্তি অর্থাৎ অবধারণই প্রমা। এই প্রমার আশ্রয় কে, অর্থাৎ এই জ্ঞান কাহার? কোন মতে পুরুষ ও বুদ্ধি উভয়েরই এই জ্ঞান। আবার কেহ কেহ বলেন, এই জ্ঞান শুধু বুদ্ধির। প্রমা যাহা দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহার নাম প্রমাণ। প্রমাণ ত্রিবিধ। ইহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রমাতা বা জ্ঞাতা যে পুরুষ, তাহা সাংখ্য সূত্রের "ভোক্তৃভাবাৎ" (১।১৪৩) সূত্রে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু পুরুষের এই ভোক্তৃত্ব যে প্রকৃত নহে, তাহাও সাংখ্যকাধিকার ৬২ কারিকায় উক্ত হইয়াছে। সে যাহা হউক, বুদ্ধি অহংকার এবং একাদশ ইন্দ্রিয় এই ত্রয়োদশ করণ দ্বারা বাহ্য বস্তুর জ্ঞান লাভ হয়।

আমি আর কেহ নই…

শ্রীসুবোধচন্দ্র ঝা

এখন ক্লান্তির শেষে
শান্তির নিস্তব্ধ সমাবেশ,
এখন রাত্রির বেশে
কল্পনার রঙীন আবেশ,
এখন এ বিশ্ব হ'তে উর্দ্ধলোকে মোর নিমন্ত্রণ,
স্বপ্নের পেখম মেলে যাত্রিকের এই শুভক্ষণ,
এখন অনেক দূরে, আরও দূরে যাত্রার প্রস্তুতি,
এখন সবার কাছে বিদায়ের শুভ অনুমতি
কামনা আমার; সকল বাঁধন টুটে
ছুটে যেতে দাও,
পথের সকল গ্রন্থি শুধু খুলে নাও
মর্ত্তোর বিধাতা,
ভুল ক'রে শূন্য রাখো পুণ্যার্থীর হিসাবের পাতা
শুধু একবার,
আজ তুমি মুক্ত করো বদ্ধময় হৃদয়-ভাণ্ডার।

* * *

তখন আমারে কে গো ব'লে গেলে মোর কানে কানে,
আছে মোর নিমন্ত্রণ নামগোত্রহীন কোনখানে;
তাইতো এসেছি আমি, কোথায় তোমার বাসস্থান
বলো শুধু একবার; গাও শুনি একখানি গান
তোমার সে সুরে,
যে সুরে ডাকিয়াছিলে, ব'লেছিলে: "দূরে বহুদূরে
নিমন্ত্রণ আছে তব।"
সেই সুরে কথা কও আর একবার, অভিনব
মুক্ত পথ বিহঙ্গের যাত্রাপথে ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস
পাও যদি শুনিবারে—

* * *

হে বিহঙ্গ, ডেকেছি তোমারে,
অন্য কোথা হ'তে নয়,
হৃদয়ের কক্ষে বসি' অলক্ষ্যে পেয়েছি পরিচয়;
'জীবনের সকল সঞ্চয়'
'পথপ্রান্তে ফেলে' দাও, শুধু একবার,
অকারণে ল'য়ে চল'—ছিল এই কামনা আমার—

কে আসি শুনিতে চাও?…
এস' তবে কানে কানে কই:
আমি আর কেহ নই,
আমি অশরীরী,
বসুধার বক্ষ মাঝে ব্যথার সামগ্রী ল'য়ে ফিরি;
আমি অপলাপ,
আমি মরজীবনের ক্ষুব্ধ মনস্তাপ!



রূপ-ত্রিতয়

(কারণ-সূক্ষ্ম-স্থূল)

অনাদি, অসীম, অগাধ আলোকে
হে পুরুষোত্তম পরম পুলকে
পরা প্রকৃতির সুধা সহবাসে
বিরাজিছ তুমি সোনার দ্যুলোকে ;
প্রকৃতি বিশ্বের আদ্যা প্রসূতি ; তুমি বিশ্বের কারণ স্বামী
নমামি প্রকৃতি নমামি পুরুষ, নমামি যুগলে নমামি আমি ॥
দিঠীতে ফুটে ওঠে যতেক চরাচর
সকলি সকলের প্রাণেরি সহোদর
সূক্ষ্মে রাজিছ সবার হৃদি মাঝে
তোমারই প্রসূন প্রকৃতি মরামর,

শক্তিরূপে আছ তুমি মা প্রকৃতি,
আত্মরূপে প্রভু হৃদয়ে আছ তুমি
নমামি শক্তি, নমামি আত্মন, নমামি যুগলে নমামি আমি ॥
স্থূল তনু ধরি তোমরা দুজনে
এসেছ এ যুগে এ মর ভুবনে
বিশ্বে দানিতে বিজ্ঞান মহাবাণী
প্রকাশ করিলে যা দিব্য জীবনে ;
তুমি যে শ্রীমীরা মোদেরি শ্রীমাতা,
তুমি শ্রীঅরবিন্দ হৃদিস্থিত স্বামী
নমামি শ্রীমাতা, নমামি শ্রীগুরু, নমামি যুগলে নমামি আমি ॥

কথা—শ্রীঅনন্তকুমার সরকার ঃ সুর ও স্বরলিপি—শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

II সা মা মা | রা -া | সা সা I সা মা গা | পা -া | পা পা I
অ না দি অ . ০ সী ম, অ গা ধ আ ০ লো কে

I ধা ধা ধা | র্সা -া | ধা ধা I ধা ণধা মা | পা -া | পা পা I
হে পু রু ষো ০ ত্ত ম প র০ ম পু ০ ল কে

I ধা ধা -র্রা | র্র্সা র্সা | ধা ধা I ধা ণধা মা | পা -া | পা পা I
প রা ০ প্র কি তি র সু ধা০ স হ ০ বা সে

I রা পা পা | মপা -ধ্রা | ধপা পা I মা রা সা | রা -া | সা সা I
বি রা জি ছ০ ০ তু মি সো না র ত্ন্য ০ লো কে

I সা রা রা | রা -া | রা গা I রা -গা মা | মা -া | মা মা I
(১) প্র কৃ তি - বি ০ - শ্বে র - আ ০ দ্যা - প্র ০ - সূ তি
(২) শ ক্ তি - রূ পে - আ ছ - তু মি মা - প্র ০ - কৃ তি
(৩) তু মি যে - শ্রী ০ - মী রা - মো দে রি - শ্রী ০ - মা তা

I গা পা -া | পা -া | পা পা I হ্মা -পা ধা | ধা -া | পা পা I
(১) তু মি ০ - বি ০ - শ্বে র - কা ০ র - ণ ০ - স্বা মী
(২) আ ত্ ম - রূ পে - প্র ভু - হৃ দ য়ে - আ ছ - তু মি
(৩) তু মি শ্রী - অ র - বি ন্দ - হৃ দি ০ - স্থি ত - স্বা মী

I পা র্গা র্গা | র্রা -া | র্সা র্সা I না র্রা র্সা | ধা -া | পা পা I
(১) ন মা মি - প্র ০ - কৃ তি - ন মা মি - পু ০ - রু ষ
(২) ন মা মি - শ ক্ - তি ০ - ন মা মি - আ ত্ - ম ন্
(৩) ন মা মি - শ্রী ০ - মা তা - ন মা মি - শ্রী ০ - গু রু

I ধা ধা মা | পা -র্সা | ধা ধা I গা মগা সা | রা -া | সা -া II
(১)(২)(৩) ন মা মি যু ০ গ লে ন মা০ মি আ ০ মি ০

II মা মা মা | পা পা | ধা না I না র্সা ধা | ধা মা | পা পা I
দি ঠী তে ফু টে ও ঠে য তে ক চ রা চ র

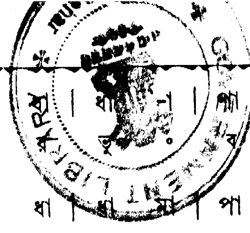
I ধা না র্সা | র্রা র্সা | র্গা র্রা I র্সা না র্রা | র্রা র্রা | র্সা র্সা I
স ক লি স ক লে র প্রা ণে রি স হো দ র

I র্গা -া র্গা | র্রা -া | র্সা র্সা I না র্রা র্সা | ধা ধা | পা পা I
সূ ০ ক্ষ্মে রা ০ জি ছ স বা র হৃ দি মা ঝে

I ধা ধা মা | পা -র্সা | ধা ধা I গা মগা সা | রা রা | সা সা I
তো মা রি প্র ০ সূ ন প্র কৃ০ তি ম রা ম রা

শক্তিরূপে আছ……………………………নমামি আমি II

II গা -মগা সা | রা রা | সা রা I ণ্া রা রা | সা -া | সা সা I
সু ০০ ল ত সু ধ রি তো ম রা দু ০ জ নে



I সা গা মা | ধা -া | পা পা I ধা মা ... | ধা -া | পা পা I
এ সে ছো এ ০ যু গে এ ম ... ভু ০ ... নে

I ধা -া না | র্সা -া | র্রা র্রা I না র্সা ধা | ... | পা পা I
বি ০ শ্বে জ্ঞা ০ ন তে বি জ্ঞা নি ম হা বা ণী

I ধা ধা মা | পা র্সা | ধা ধা I গা -মগা সা | রা -া | সা সা I
প্র কা শ ক রি লে যা দি ০০ ব্য জী ০ ব নে

তুমি যে শ্রীমীরা·································নমামি আমি II II

বৈদিক সভ্যতা

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রচলিত ধারণা এই যে বৈদিক সভ্যতা ব্যর্থ হইয়াছে, কারণ আমরা অনেকদিন পরাধীন হইয়াছিলাম, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা সার্থক হইয়াছে কারণ পাশ্চাত্ত্য জাতিরা নানাদেশ জয় করিয়াছে ও প্রভূত ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়াছে। কিন্তু বিচার করিলে দেখা যাইবে যে এই ধারণা ভ্রান্ত। বৈদিক সভ্যতা সার্থক হইয়াছে, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাই ব্যর্থ হইয়াছে।

প্রথমে রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনা করা যাক। যে ইংরাজ জাতি এতদিন আমাদের উপর রাজত্ব করিল তাহারা কতদিন স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে? ইংলণ্ডের আদিম অধিবাসী ব্রিটনগণ প্রথমে রোমানদের দ্বারা বিজিত হয়, পরে রোমানরা চলিয়া গেলে স্যাক্সনদের দ্বারা বিজিত হয়। কিছুকাল পরে নরমানরা ইংলণ্ড জয় করে। তখন ইংলণ্ডে বিজেতা জাতি ছিল নরম্যান এবং বিজিত জাতি ছিল—স্যাক্সন ও ব্রিটন। কালক্রমে এই তিনজাতি মিশ্রিত হইয়া এক জাতিতে পরিণত হইল। তাহার পর হইতে ইহা বলা যায় যে ইংলণ্ড স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে। সুতরাং ইংলণ্ডের স্বাধীনতা মাত্র কয়েক শত বৎসরের। ইহার পূর্ব্বে কয়েক শত বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ড তিনবার পরাধীন হইয়াছিল—একবার রোমানদের নিকট, একবার স্যাক্সনদের নিকট, একবার নরম্যানদের নিকট এবং দুইটি জাতির বিনাশ হইল—ব্রিটন জাতি ও স্যাক্সন জাতি। ইহার সহিত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনা করুন। ভারতবর্ষে হিন্দুর স্বাধীন রাজত্ব স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বৈদেশিক ঐতিহাসিকেরা বলেন যে আর্য্যরা ভারতের বাহির হইতে আসিয়া ভারত জয় করে, পরে আর্য্য ও অনার্য্য জাতি মিশ্রিত হইয়া হিন্দু জাতির উৎপত্তি হয়—যেমন ইংলণ্ডে হইয়াছে। কিন্তু আর্য্যরা যে ভারতবর্ষের বাহির হইতে আসিয়াছে তাহার কোনও নিঃসন্দেহ প্রমাণ নাই। এই পর্য্যন্ত পাওয়া যায় যে সংস্কৃত ভাষা, গ্রীক ভাষা, ল্যাটিন ভাষা প্রভৃতি এক ভাষা হইতে উৎপন্ন এবং ইহা হইতে অনুমান হয় যে গ্রীক ও রোমানদের পূর্বপুরুষ এবং আর্য্যগণ এক জাতি ছিল। কিন্তু সেই একজাতির বাসস্থান যে ভারতের বাহিরে ছিল তাহার কোনও প্রমাণ নাই। বেদে এরূপ উদ্ভিদ ও প্রাণীর উল্লেখ আছে যাহাদের ভারতে এখন দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এখন দেখিতে পাওয়া না গেলেও পূর্বে ছিল না ইহা বলা যায় না। পৃথিবীর নানাস্থানে এরূপ প্রাণীর কঙ্কাল এবং উদ্ভিদের চিহ্ন পাওয়া যায় এক্ষণে যাহাদের অস্তিত্ব নাই। কতকগুলি প্রাণী ও উদ্ভিদ সুদূর অতীতে ভারতে ছিল, কিন্তু জল-হাওয়া এবং ঋতুর পরিবর্ত্তনের ফলে এখন ভারতে দেখা যায় না এরূপ কল্পনা করা অযৌক্তিক হয় না। বেদের ঋষিগণ ভারতের বাহিরে গিয়া ঐ সকল দেশের উদ্ভিদ প্রাণীও প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়াছিলেন এবং বেদে তাহার উল্লেখ আছে ইহাও কল্পনা করা যায়। অনেক আধুনিক হিন্দুর গ্রন্থে ইংলণ্ড আমেরিকার কথা আছে। ঐ গ্রন্থ পাঠ করিয়া কেহ যদি সিদ্ধান্ত করেন যে গ্রন্থকার ভারতের লোক নহেন, তাঁহার যেরূপ ভুল হইবে সেইরূপ বেদে ভারতের বাহিরের কথা আছে বলিয়া বেদের লেখক ভারতের বাহিরের লোক এরূপ সিদ্ধান্ত করাও ভুল হইবে। লোকমান্য তিলক এবং Prof. Jacobi দেখাইয়াছেন যে বেদে তারকার যে সন্নিবেশ উল্লেখ আছে তাহা খৃঃ পূঃ ৬০০০ এর পরে হয় নাই। সুতরাং বেদ যে অন্ততঃ আট হাজার বৎসরের প্রাচীন এ বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না। সেই সময় হইতে পৃথ্বীরাজের সময় পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রায় সাত হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষ স্বাধীন ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শক ও হুনরা ভারত আক্রমণ করিয়া ভারতের কিয়দংশ কিছুকাল অধিকার করিলেও পরে হিন্দুগণ তাহাদের পরাভূত করিয়া হিন্দু স্বাধীনতা পুনঃস্থাপিত করেন। কয়েক শত বৎসর মুসলমান শাসনের পর মুসলমান শক্তির অবনতি হয় এবং শিখ ও মারাঠা এই দুই হিন্দু জাতি মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া ফেলে। আবার দুই শত বৎসর ইংরাজ রাজত্বের পরে হিন্দুগণ রাজনৈতিক আন্দোলন করিয়া মুসলমান-দের বাধা সত্ত্বেও পুনরায় ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করিতে সক্ষম

হইয়াছে। সুতরাং যে স্থলে ইংলণ্ড দেড় হাজার বৎসরের মধ্যে দুই তিন বার পরাজিত হইয়াছিল, যে জাতি একবার পরাজিত হইয়াছিল সে জাতি আর উত্থান করিতে পারে নাই, পরন্তু বিলুপ্ত হইয়াছিল। কোনও জাতি এ পর্য্যন্ত সহস্র বৎসরও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে নাই,—সে স্থলে হিন্দু জাতি অন্ততঃ সাত হাজার বৎসর স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল এবং দুই তিনবার পরাজিত হইলেও বিনষ্ট ত হয় নাই-ই, প্রত্যুত শক্তি সঞ্চয় করিয়া প্রত্যেকবার বিজেতা জাতিকে পরাস্ত করিয়া দিল। সুতরাং ইংরাজদের রাজনৈতিক ইতিহাস অপেক্ষা হিন্দুর রাজনৈতিক ইতিহাস অধিকতর গৌরবপূর্ণ। বস্তুতঃ হিন্দুর রাজনৈতিক ইতিহাস অপর যে কোনও জাতির রাজনৈতিক ইতিহাস অপেক্ষা গৌরবপূর্ণ, কারণ পৃথিবীতে কোনও জাতি এক সহস্র বৎসরের অধিককাল স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল এরূপ দেখা যায় না।

সাধারণতঃ ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে এইরূপ ধারণা আছে যে হিন্দুর রাজনৈতিক ইতিহাস অত্যন্ত লজ্জাজনক এবং তাহার জন্য হিন্দুর ধর্ম ও সমাজব্যবস্থাই দায়ী। এই প্রচলিত ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত তাহা দেখান হইল। বস্তুতঃ হিন্দুর ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থা অতি উৎকৃষ্ট বলিয়াই হিন্দু-জাতির জীবনীশক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। অনেকের ধারণা যে হিন্দুধর্ম কেবল পরলোকের চিন্তাই করিতে বলে, ইহলোককে অবহেলা করিয়াছে, তাই ইহলোকে অবনতি হইয়াছে, বিজ্ঞানে উন্নতি করিতে পারে নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্ম ইহলোক এবং পরলোক উভয়ের প্রতি উপযুক্ত দৃষ্টি রাখিয়াছে। হিন্দুধর্ম পাশ্চাত্য সভ্যতার ন্যায় কেবল ইহলোকের প্রতি লক্ষ্য রাখে নাই, খৃষ্টানধর্মের ন্যায় কেবল পরলোকের চিন্তা করে নাই। ঋষিগণ ধর্মের লক্ষণ দিয়াছেন—যাহা ইহলোকে উন্নতি লাভের সহায়ক এবং পরলোকে মোক্ষলাভের সহায়ক তাহাই ধর্ম। হিন্দু সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ রামায়ণ মহাভারতে দেখা যায়,—যে হিন্দুগণ যেমন ধর্ম ও দর্শনে উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল, সেইরূপ ঐশ্বর্যশালী শক্তিমান এবং বহুবিধ যুদ্ধোপকরণ এবং অস্ত্রশস্ত্র-সমন্বিত ছিল। ইহলোকের প্রতি লক্ষ্য ছিল বলিয়াই প্রাচীন ভারত শিল্পে এত উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল,—যাহার নিদর্শন ভারতবর্ষের সর্বত্র বিরাজিত উৎকৃষ্ট দেব-মন্দিরে দেখিতে পাওয়া যায় এবং যাহার ফলে ভারতের মসলিন প্রভৃতি শিল্পদ্রব্য পৃথিবীর সর্বত্র সমাদৃত হইত এবং পৃথিবীর সকল দেশ হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্য ভারতে প্রবাহিত হইয়া ভারতের ঐশ্বর্য পৃথিবীর মধ্যে প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছিল (১) এবং বহু লুণ্ঠনশীল জাতিকে ভারত আকৃষ্ট করিয়াছিল।

যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ স ধর্মঃ। (মহর্ষি কণাদ)

বিজ্ঞান-চর্চা বহু ব্যয়সাধ্য। রাজকীয় সাহায্য ব্যতীত তাহা উৎকর্ষলাভ করিতে পারে না। যতদিন ভারত স্বাধীন ছিল ততদিন ভারত সকল বিজ্ঞানে জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। ভারত পরাধীন হইবার পর রাজকীয় সাহায্যের অভাবে ভারতে বিজ্ঞান চর্চা উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই এবং পাশ্চাত্য স্বাধীন জাতিসকল বিজ্ঞানে উন্নতিলাভ করিয়াছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য জাতিসমূহ বিজ্ঞানচর্চা করিবার সময় এক মারাত্মক ভুল করিয়াছে। বিজ্ঞানের ফল হাতে হাতে পাওয়া যায় দেখিয়া এবং ধর্মের ফল অনেক দেরীতে—অনেক সময় মৃত্যুর পর—পাওয়া যায় বলিয়া তাহারা ধর্মকে অবহেলা করিয়াছে—ঈশ্বরের উপাসনা ত্যাগ করিয়া বিজ্ঞানের উপাসনা করিয়াছে। তাহার ফলে সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ ভোগসুখাসক্ত এবং ইহলোকসর্বস্ব হইয়াছে,—তাহার পরিণাম যাহা হইবার তাহা হইয়াছে—ঈর্ষা দ্বেষ ও দুর্নীতিতে পাশ্চাত্য জগৎ ছাইয়া গিয়াছে—যে বিজ্ঞানের উপাসনা করিয়া তাহারা সকল কামনা পূর্ণ করিবে ভাবিয়াছিল সেই বিজ্ঞানের ফলেই তাহাদের ধ্বংস আসন্ন হইয়া পড়িয়াছে—এত ভীষণ লোকসংহারক অস্ত্রের উদ্ভাবনা হইয়াছে যে পাশ্চাত্য সভ্যতা ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছে। বিখ্যাত সাহিত্যিক রোমাঁ রোলাঁ বলিয়াছেন, "পাশ্চাত্য সভ্যতা একটি আগ্নেয়গিরির গহ্বরের পার্শ্বে উপস্থিত হইয়াছে, যে কোনও মুহূর্তে ইহা ধ্বংস হইতে পারে।" এবং বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন বলিয়াছেন "মনুষ্য জগত নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে এইরূপ আশঙ্কা প্রবল হইয়াছে।"(২) পাশ্চাত্য জগতের চিন্তাশীল মনীষীরা ভাবিতেছেন, প্রাচীন যুগে যেমন ইজিপ্ট, এসিরিয়া, ব্যাবিলনিয়া, ক্যার্থেজ, গ্রীস ও রোমে ঐশ্বর্য্য ও প্রতাপশালী বহু সভ্যতার উদয় হইয়াছিল, এখন তাহাদের চিহ্নমাত্রও নাই,—পাশ্চাত্য সভ্যতারও সেই দশা হইবে। অলডাস হাক্সলি প্রভৃতি কোনও কোনও মনীষী বলিতেছেন, যে সকল নিয়ম চিরকালের জন্য সত্য সেই সকল নিয়ম আশ্রয় করিয়াই ভারতীয় সভ্যতা কালের প্রভাব অতিক্রম করিয়া বাঁচিয়া আছে, আমাদিগকেও সেই সকল নিয়ম অনুসন্ধান করিতে হইবে, তাহা হইলে যদি আমাদের সভ্যতাও বাঁচিতে পারে।

তাই বলিতেছিলাম যে আপাতদৃষ্টিতে পাশ্চাত্য সভ্যতা সার্থক হইয়াছে ইহা মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা ব্যর্থ হইয়াছে এবং আপাতদৃষ্টিতে বৈদিক সভ্যতা ব্যর্থ হইয়াছে মনে হইলেও ইহাই সার্থক হইয়াছে।

(১) The wealth of ormny or of Ind—(Milton's Paradise Lost.)

(২) The threat of extinction hangs over humanity.



প্রতিভা-পরিচিতি

কবি বায়রণ

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শুধু অসামান্য কবিত্ব-প্রতিভাই নয়, চরিত্রের অমিত তেজ আর নিপীড়িত মানুষের পক্ষ নিয়ে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার দুর্জ্জয় সাহস বায়রণের অদ্ভুত বিচিত্র বিপথগামী এবং পথভ্রষ্ট জীবনকে এক বিশিষ্ট মহিমায় আজো আমাদের কাছে স্মরণীয় ক'রে রেখেছে।

বায়রণকে জানতে হলে তাঁর পিতৃপুরুষদের কিছু পরিচয়ও জানা দরকার। তাঁর দু'পুরুষ আগে যিনি বংশগরিমার উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁর নাম উইলিয়ম পঞ্চম লর্ড বায়রণ। প্রজাদের কাছে তিনি আখ্যা পেয়েছিলেন—"বদমাস লর্ড।" সারাদিন মদ খেতেন, খেল্না-



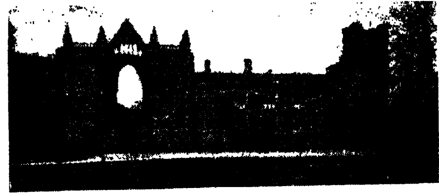
যৌবনে বায়রণ

জাহাজ পুকুরে ভাসাতেন, আরসোলার দৌড় দেখে আনন্দ পেতেন, শিকার করতেন নেংটি ইঁদুর। তাঁর ছেলেপুলে ছিল না। ছিল ভাইপো, জন বায়রণ। ভাইপো আবার খুড়োর চেয়ে এক কাঠি সরেস। পর পর দু'বার বিবাহ করেছিলেন। দ্বিতীয়া পত্নী ক্যাথারিণ-এর গর্ভে কবি বায়রণের জন্ম হয় ১৭৮৮ সালের ২২শে জানুয়ারী।

উইলিয়মের বিষয় আর খেতাবের উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁর ভাইপো জন। কিন্তু ভাইপোর কাণ্ডকারখানায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে খুড়ো তাঁকে বাড়ী থেকে দূর ক'রে দিয়েছিলেন। চতুর্দ্দিকে ধার-কর্জ্জ ক'রে আর অশেষ বদনাম কিনে জন বায়রণ ফ্রান্সে চলে গেলেন এবং পাঁয়ত্রিশ বছর বয়সেই নানা রোগে ভুগে পরলোকগমন করলেন। তাঁর শিশুপুত্র বায়রণ হলেন বংশের ও পদবীর উত্তরাধিকারী।

উইলিয়মের মৃত্যুর পর অ্যাবারডিনের এক ছোট্ট বাড়ী থেকে তাঁর মা যেদিন বায়রণকে নিয়ে তাঁদের পূর্ব্বপুরুষের ভিটা "নিউস্টেড্ অ্যাবি-তে" গিয়ে উঠলেন সেদিন বায়রণ দশ বছরে পা দিয়েছেন। ছ'শো বছরের পুরানো প্রকাণ্ড প্রাসাদ সংস্কারের অভাবে জীর্ণ হোয়ে পড়েছে। বড় বড় হলঘরে চামচিকের বাসা। বাগানে আর পুকুর পাড়ে আগাছার সমারোহ।

দেউড়িতে গাড়ী দাঁড়ালো। পাঁচশো হাত লম্বা বার-বাড়ী পেরিয়ে



বায়রণদের পৈতৃক বাসভবন "নিউস্টেড অ্যাবি"

অন্দর মহলে প্রবেশ ক'রে পায়ের যন্ত্রণায় বায়রণ ব'সে পড়লেন। তাঁর একটি পা ছিল জন্মাবধি খোঁড়া। অঙ্গের এই বিকৃতি তাঁকে শারীরিক যন্ত্রণা যত না দিয়েছে, তার চেয়ে বেশী দিয়েছে মানসিক ক্লেশ। তাঁর পায়ের যে কোন দোষ নেই এবং পায়ের জন্যে তিনি যে কোন কাজে অপটু নন, তা প্রমাণ করবার জন্যে তিনি দৌড়-প্রতিযোগিতায় যোগ দিতেন, সাঁতার কাটতেন, ক্রিকেট খেলতেন। সাঁতারে আর ক্রিকেট খেলায় স্কুলে তাঁর সুনাম ছিল প্রচুর। অভিজাত শিক্ষায়তন হ্যারোর বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হোয়ে তিনি লেখাপড়া শেখার চেয়ে বড়লোকের ছেলেরা যেমন বেপরোয়া জীবন যাপন করে তেমনি জীবন যাপনে মত্ত হলেন। কিন্তু সেই সময়েই তাঁর চরিত্রের আর একটি দিকের একটি মনোরম চিত্র আমরা পাই। স্কুলে দু'চারজন ষণ্ডামার্কা ছেলে থাকে—যাদের কাজ হল নিরীহ ছেলেদের উপর উৎপীড়ন করা এবং তাদের লাঞ্ছিত ক'রে আনন্দ পাওয়া। এমনি একটা গুণ্ডা একদিন বায়রণের সহপাঠী রবার্ট

পীল-কে ধ'রে নির্য্যাতন করছিল। পীল ছিলেন দুর্ব্বল ভালমানুষ। অত্যাচারীর শাস্তি নীরবে সহ্য করছিলেন। এমন সময় বায়রণ সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর দু'চোখে আগুন। কিন্তু ষণ্ডার সঙ্গে তো পারা যাবে না। তাই বললেন—"ওকে আর কতগুলো ঘুসি তুমি মারতে চাও?" ষণ্ডা বললে—কেন! তাতে তোর কি দরকার? বায়রণ জবাব দিলেন—"আমি ওর শাস্তির ভাগ নিতে চাই। ওকে না মেরে তুমি আমায় মারো।" ষণ্ডা-ছেলেটা কিছুক্ষণ বায়রণের দিকে তাকিয়ে থেকে সেখান থেকে চলে গেল।

*   *   *

ষোলো বছর বয়সে বায়রণ প্রেমে পড়লেন। তাঁর প্রথম প্রেম। তাঁদের জমিদারীর কাছেই থাকতো অ্যানা চাওয়ার্থ নামে আঠারো বছরের রূপসী এবং বিত্তশালিনী এক মেয়ে। উভয় পরিবারের মধ্যে বহু বছর আগে প্রবল শত্রুতা ছিল। অ্যানার এক পূর্ব্বপুরুষকে বায়রণের এক পূর্ব্বপুরুষ দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত করেছিলেন। তাহলেও এই বিবাহে কোন



বিলাস-উপকরণে সজ্জিত বায়রণের পোষাক-কামরা

বাধা ছিল না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অ্যানা বায়রণকে প্রতারণা করলে। বায়রণ শুনতে পেলেন, অ্যানা তার এক সঙ্গিনীকে বলেছে, "খোঁড়া কবির জন্যে আমার কোন মাথাব্যথা নেই, ওকে বিয়ে করতে আমার দায় প'ড়ে গেছে! ভালবাসি না ছাই।"

কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন বায়রণ। কবিতার খাতাগুলো পুড়িয়ে ফেললেন। পাগলের মত ঘুরলেন রাস্তায় রাস্তায়। অ্যানার প্রবঞ্চনা তাঁর অন্তরে এক প্রচণ্ড দাবদাহের সৃষ্টি করল। গভীর নৈরাশ্য আর অপরিসীম তিক্ততায় মন বিষিয়ে উঠল। তিনি খঞ্জ, নারীর প্রণয়লাভের যোগ্য নন তিনি, এই হতাশা আর বেদনা তাঁর চরিত্রকে অস্বাভাবিক পথে নিয়ন্ত্রিত করতে যে অনেকখানি সহায়তা করেছিল তাতে আর সংশয় নেই। তাঁর আজীবন বন্ধু ও সমালোচক হব্‌হাউস স্পষ্টই লিখে গেছেন যে বায়রণের প্রথম প্রেম যদি চরিতার্থ হোত তাহলে তাঁর জীবনের গতি হয়ত কোনদিনই উন্মার্গগামী হোতনা।

কিশোর বয়সেই কবিখ্যাতি অর্জ্জন করবার দৃঢ় সংকল্প ছিল বায়রণের মনে। ১৮০৭ সালে "আলস্যের দিন" নামে যে কাব্যগ্রন্থ তিনি প্রকাশ করেছিলেন—তার মধ্যে উন্মেষ-উন্মুখ প্রতিভার সুস্পষ্ট আভাস ছিল। সমালোচকরা কিন্তু সে-সময় সেই গ্রন্থকে সমালোচনা আর কটূক্তির কষাঘাতে জর্জ্জরিত করেছিলেন। আহত ক্রুদ্ধ বায়রণ তাঁর পরবর্ত্তী গ্রন্থে জ্বালাময়ী শ্লেষের দ্বারা তাঁদের উত্তর প্রদান করলেন, সে-বইএর নাম দিয়েছিলেন, "ইংরাজ কবি ও স্কচ সমালোচক।" এক মাসের মধ্যেই এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন হয়েছিল। বায়রণের কবি-খ্যাতি শুধু আর তাঁর বন্ধুদের মধ্যে আবদ্ধ রইল না। বড় বড় পত্রিকা এবং কাব্যরসিকগণ তাঁর লেখার প্রতি আকৃষ্ট হলেন।

একুশ বছর বয়সে সাবালক হ'য়ে তিনি তাঁর সম্পত্তির পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হলেন। চলল খানাপিনা, আমোদ প্রমোদ আর বিলাস-ব্যসনের



মহার্ঘ্য আসবাবে সজ্জিত বায়রণের শয্যা

অব্যাহত স্রোত। সংযম অথবা চিত্তবৃত্তিকে বশে রাখবার সাধনা কোনদিনই ছিল না তাঁর। ফলে যে-জীবনের আবর্ত্তে তিনি ঝাঁপ দিলেন তাকে সুস্থ বা স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বলা চলে না। শুরু হল জীবনের অপচয় আর প্রতিভার তিলে তিলে অপমৃত্যু।

অশান্ত মনে শান্তি খুঁজে পেলেন না কোথাও, দেশ ছেড়ে বেরুলেন দীর্ঘ সফরে। সমুদ্রযাত্রা। সঙ্গী হলেন বন্ধু হবহাউস এবং বিশ্বস্ত ভৃত্য ফ্লেচার। সেই সুদীর্ঘ দিনের ভ্রমণে নানা স্থানে তিনি এমন সব কাণ্ড করতে লাগলেন, এমন সব দুঃসাহসিক কার্য্যকলাপে নিজেকে জড়িত করতে লাগলেন যে, এই দু'জন পরম সুহৃদ যদি সঙ্গে না থাকতো তাহলে তাঁকে বোধ করি জীবন নিয়ে স্বদেশে ফিরে আসতে হত না।

তুরস্কে গিয়ে বায়রণের খেয়াল হল বাদশা সাজতে হবে। অদ্ভুত

বিচিত্র পোষাক তৈরী হল। সেই পোষাক প'রে সঙ্গে একশত ভাড়া-করা ক্রীতদাস নিয়ে তিনি সহরের পথে পথে ঘুরতে লাগলেন। জলুস, আড়ম্বর আর বিলাসিতার পিছনে অর্থব্যয় করতে লাগলেন অকাতরে। আলবেনিয়ার বন্য সৌন্দর্য্য দেখে মুগ্ধ হ'য়ে কবিতার পর কবিতা লিখলেন। পার্ব্বত্য রমণীদের সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে অহরহ তাদের পিছনে পিছনে ঘুরতে লাগলেন। শেষ পর্য্যন্ত সেখানকার এক দুর্দ্ধর্ষ ডাকাতের সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে তার গুপ্ত-প্রাসাদে গিয়ে তার আতিথ্য গ্রহণ করলেন। সেই ভয়ঙ্কর অত্যাচারী আর লুণ্ঠক আলি পাশা সম্বন্ধে বায়রণ লিখছেন—"আমাকে তার প্রথম প্রশ্ন হল, এত অল্প বয়সে আমি দেশ ছেড়ে বেরিয়েছি কেন এবং যদিই বা বেরিয়েছি, আমার সঙ্গে ধাত্রী নেই কেন? আমাকে দেখে নিয়ে বললে যে আমার গলা টিপলে নাকি দুধ বেরুবে আমি এতই কচি। আলি পাশা অতিশয় মহৎ ব্যক্তি। সে বললে যে তার এলাকায় যতদিন আমি থাকবো ততদিন সে আমাকে তার ছেলের মতোই মনে করবে। সত্যিই সে আমাকে ছোট ছেলের সামিল মনে করত। আমাকে দিনে কুড়িবার ক'রে বাদাম, ফল আর মেঠাই পাঠাতো।"

* * *

রাজ্যের পর রাজ্য অতিক্রম ক'রে চলেছেন আর সেই সঙ্গে লেখা হচ্ছে তাঁর বিখ্যাত বই "চাইল্ড হ্যারল্ড্স্ পিলগ্রিমেজ।" এদিকে দেশে তাঁর উত্তমর্ণের দল তাঁকে ফেরবার জন্যে তাগিদ দিচ্ছিল অবিরাম। এটর্নীর চিঠিও যেতে লাগল ঘন ঘন। দু'বছর পরে তিনি দেশে ফিরলেন। সঙ্গে নিয়ে এলেন, বহুসংখ্যক ক্রীতদাস, মড়ার মাথা, দামী পাথর এবং জীবন্ত জন্তুজানোয়ার।

সম্পত্তির কিয়দংশ বিক্রি ক'রে দেনা শোধ ক'রে দিলেন। তারপর লণ্ডনের এক অভিজাত-পল্লীতে একটি বাড়ী নিয়ে তাকে মনের মতো ক'রে সাজালেন। শুরু হল এক নতুন অধ্যায়। লণ্ডনের রসিক ও বিলাসী সমাজকে জয় করবার সাধনায় ব্যাপৃত হলেন বায়রণ। দু'হাত বাড়িয়ে সেই সমাজ তাঁকে গ্রহণ করল। সকল বড়ঘরের দরজা তাঁর জন্যে উন্মুক্ত হল। অসামান্য রূপবান পুরুষ এবং শক্তিমান কবিরূপে লর্ড বায়রণ লণ্ডনের চিত্ত জয় করলেন। কিন্তু রক্তের মধ্যে ছিল বংশাবলীর ধারা। তাকে রোধ করবার সাধ্য ছিল না তাঁর। অল্পদিনের মধ্যেই একাধিক প্রণয়কাণ্ডের নায়করূপে চারিদিকে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলেন তিনি। প্রথম ঘটনার নায়িকা ছিলেন লেডী ক্যারোলাইন ল্যাম্ব্, দ্বিতীয় কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন লেডী অক্স্ফোর্ড।

উঠুক চারিদিকে কুখ্যাতির তুফান, কবি বায়রণ তাকে গ্রাহ্য করেন না। নিত্য নব নব কাব্যের ঝরণা নামতে লাগল তাঁর কলম দিয়ে। পর পর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হোতে লাগল, "ওয়ালজ্", "গীওর", "অ্যাবিডসের বধু", "করসেয়ার", "লারা" ও "হীব্রু সঙ্গীত"।

পার্লামেন্টের অধিবেশন শুরু হল। সদম্ভে গিয়ে হাউস অফ লর্ডস-এ তাঁর নির্দ্দিষ্ট আসনে বসলেন। এবং শুধু তাই নয়, প্রথম সুযোগেই তীব্র জোরালো এক বক্তৃতা দিলেন। নটিংহাম শহরে এক আইনঅমান্যকারী জনতার বিরুদ্ধে গভর্ণমেন্ট অতি কঠিন ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন, কয়েকজনকে গ্রেপ্তার ক'রে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। বায়রণ গভর্ণমেন্টের সেই চণ্ডনীতির তীব্র সমালোচনা এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের পক্ষ নিয়ে দীর্ঘ সওয়াল করলেন। দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, এমনধারা সরকারী-নীতি জনগণের বিক্ষোভ



গ্রীকদেশের প্রথা অনুসারে জলমগ্ন কবি শেলীর মৃতদেহ সমুদ্রসৈকতে দাহ করা হয়। চিতার পাশে মুহ্যমান বিষণ্ণ বায়রণকে দেখা যাচ্ছে

কোনদিনই শান্ত করতে পারবে না। তাঁর বক্তৃতায় চমৎকৃত হল সবাই। বিলাসী ও বিপথগামী এক কবির মুখে এমনধারা কথা শোনা যাবে তা বোধ করি কেউ প্রত্যাশা করেনি। ১৮১২ সালের ২৭শে ফেবরুয়ারী ছিল সেই বক্তৃতার তারিখ। বায়রণের জীবনে এই তারিখটি স্মরণযোগ্য।

তার দু'দিন পরে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "চাইল্‌ড্‌ হ্যারল্‌ড্‌"-এর প্রথম ও দ্বিতীয় ক্যান্টো প্রকাশিত হল। ইংলণ্ডের সাহিত্য-জগতের সে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। সেই কাব্য যেন প্রবল ঝড়ের মতো সারা দেশকে আলোড়িত করল। এক মাসে সাত সাতটি সংস্করণ নিঃশেষ হল। বায়রণের নামে জয়ধ্বনি উঠল চারিদিকে। লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল তাঁর নাম। তাঁর কাব্য পড়বার রেওয়াজ, তাঁর লিখন-ভঙ্গী, চলনভঙ্গী, পোষাক-পরিধান-ভঙ্গী, তাঁর আহার-বিহারের অনুকরণ চলল যুবকদের মধ্যে সারা দেশব্যেপে। সাহিত্যে নতুন সুর যোজনা করেছেন তিনি, এনেছেন নতুন এক প্রাণ-বন্যা, নতুনতর এবং বিচিত্রতর এক জীবনবেদ!



গ্রীকদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগ দিয়ে বায়রণ প্রত্যহ অশ্বপৃষ্ঠে নগর পরিভ্রমণ ক'রে জনগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করতেন।

বায়রণ লিখলেন—"একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম, আমি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি।"

বায়রণের চব্বিশ বছর বয়সে "চাইল্‌ড্‌ হ্যারল্‌ড্‌" প্রকাশিত হয়েছিল, তারপর পাঁচ বছর ধরে লণ্ডনের সমাজে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে আলোচ্য ব্যক্তি।

শুধুমাত্র ফ্যাশন সৃষ্টি ক'রে দেশের নরনারীদের মোহমুগ্ধ করা বা লেখার মধ্যে রঙচঙা কারদানি দেখিয়ে পাঠকদের চিত্তে চমক লাগিয়ে তাদের আকৃষ্ট করা—বায়রণের কাব্যে এইসব বাহ্যিক চাকচিক্যের অন্তরালে ছিল এমন কোন শাশ্বত গুণ যার জোরে তিনি কালের সীমানা পেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন। তাঁর আত্মম্ভরিতা, অমিতাচার আর হাজারো চরিত্রদোষ সত্ত্বেও তাঁর কাব্যের মধ্যে পাঠক শুনেছিল স্বাধীনতার জয়গান, শুনেছিল অত্যাচারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার বাণী, শুনেছিল সেই গান, যুগে যুগে সকল কবির মর্ম্মে যার সুর অনুরণিত হয়েছে—"তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি অন্ধ বন্ধ কোর না পাখা।"

* * *

১৮১৫ সালের জানুয়ারী মাসে বায়রণ বিবাহ করলেন। সেই বিবাহই বোধ করি তাঁর জীবনের সবচেয়ে শোচনীয় দুর্ঘটনা। অ্যানাবেলা মিলব্যাঙ্ক নামে যে মেয়েটি তাঁর ঘরণী হোয়ে এলেন, তাঁর সঙ্গে কোনদিক দিয়েই বায়রণের মিল ছিল না, না মনের মিল, না বা আদর্শের মিল। বিবাহের আগে কোনরূপ পূর্ব্বরাগের ব্যাপার ছিল বলেও জানা যায় না। তবুও কেন যে বায়রণ এই বিবাহে সম্মত হলেন, সে এক রহস্য। অ্যানাবেলা বায়রণের জটিল চরিত্রকে সহানুভূতি দিয়ে কোনদিনই বোঝবার চেষ্টা করেন নি। এক বৎসর পরেই তিনি বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা করলেন, বললেন, তাঁর স্বামীর মাথার গোল আছে। স্ত্রীর স্বপক্ষে এবং স্বামীর বিপক্ষে যেসব সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করা হল তাতে দেখা গেল এই বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারে বায়রণের দায়িত্ব কম নয়। বিক্ষুব্ধ জনমত প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত হল তাঁর বিরুদ্ধে। দেশে আর টিঁকে থাকা গেল না। বায়রণ আবার তাঁর নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরুলেন।

জেনেভায় দেখা হল এবং আলাপ হল শেলীর সঙ্গে। সঙ্গে ছিলেন কাপ্তেন ট্রিলনি, এক পোড়-খাওয়া নৌযোদ্ধা। তিনজনের মধ্যে গভীর সখ্যতা স্থাপিত হল। বায়রণ আর শেলী তাঁদের লেখা কবিতা পাঠ করতেন। অদূরে বসে ট্রিলনি হাই তুলতেন। মাঝে মাঝে ঘাড় নেড়ে বলতেন—বেশ, বেশ! এই সফরেই বায়রণ তাঁর অপূর্ব্ব শ্লেষাত্মক কাব্য-গ্রন্থ "ডনজুয়ান" রচনা করেন।

১৮১৯ সালের বসন্তকালে বায়রণ কাউন্টেস গুইচিওলির সঙ্গে পরিচিত হন এবং উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। মহিলাটি ছিলেন এক ষাট বছরের বৃদ্ধ ভূম্যধিকারীর রূপসী তরুণী ভার্য্যা। ভেনিসে উভয়ে কিছুকাল একত্রে অতিবাহিত করলেন। তারপর কুৎসার ঝড় উঠল। বায়রণকে ছেড়ে কাউন্ট-ঘরণী স্বামীর সঙ্গে চলে গেলেন।

তারপর সহসা বায়রণের জীবনে এক বিরাট পরিবর্ত্তন এলো। ১৮২২ সালের ৮ই জুলাই পিসার সমুদ্রে শেলীর জলে ডুবে মারা পড়ার খবর পেয়ে তিনি স্তম্ভিত এবং মর্ম্মাহত হলেন। জীবনের একটা দিক হঠাৎ যেন ফাঁকা হোয়ে গেল। সেখানকার প্রথা অনুসারে শেলীর মৃতদেহ সমুদ্র সৈকতে দাহ করা হল। সেই জ্বলন্ত চিতার পাশে দাঁড়িয়ে বায়রণ নীরবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অশ্রুপাত করলেন।

ঘরে ফিরে অত্যন্ত অস্থির বোধ করতে লাগলেন বায়রণ। এই দুর্ব্বিষহ জীবন নিয়ে কি করবেন তিনি? এক বন্ধুকে পত্র লিখলেন, জীবনের সব অর্থ হারিয়ে গেছে তাঁর, কাব্যের প্রতি সকল আসক্তি মন থেকে তিরোহিত হয়েছে। কাজ চাই। এমন কোন কাজ করতে চান তিনি যাতে উদ্দীপনা আসে মনে, চেতনায় উদ্বোধন হয়।

খুঁজে পেলেন কাজ। শেষ মহৎ কাজ। এক পরপদানত বিপন্ন

দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগ দিলেন বায়রণ। গ্রীসের প্রতি আকর্ষণ আর মমতা ছিল বহুদিনের। যখন শুনলেন যে গ্রীকরা তুরস্কের আধিপত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবার আয়োজন করেছে তখন তিনি লণ্ডনের গ্রীক কমিটির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ক'রে বহু অর্থ দিয়ে তাঁদের সাহায্য করলেন, তারপর ১৮২৩ সালের জুলাই মাসে গ্রীস অভিমুখে রওনা হলেন।

মিসলংঘি শহরে উপনীত হোয়ে তিনি সেখানকার জনগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সঞ্চার করলেন। নাটকীয় আর আড়ম্বর ছিল চিরকালের সঙ্গী। প্রত্যহ সকাল বিকাল গ্রীক পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে, সোনালী সাজে সজ্জিত শাদা ঘোড়ার পিঠে চেপে, সঙ্গে জমকালো পোষাক-পরা সশস্ত্র নিগ্রো দেহরক্ষীদের নিয়ে তিনি যখন শহরের পথে বেরুতেন তখন কাতারে কাতারে নরনারী তাঁকে দেখবার জন্যে পথের পাশে সমবেত হত, তাঁর নামে জয়ধ্বনি উঠ্‌তো চারিদিকে।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ তিনি দেখে যেতে পারলেন না। মিসলংঘির জলা-জঙ্গলের আবহাওয়ায় তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। কঠিন বিষাক্ত জ্বরে শয্যাশায়ী হলেন তিনি এবং অল্প কয়েকদিনের অসুখের পর ১৮২৪ সালের ১৯শে এপ্রিল ভোর ছটায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর শয্যার পাশে উপস্থিত ছিল তাঁর আজীবনের বিশ্বস্ত অনুচর ফ্লেচার। শেষ সময়ে বায়রণ বারবার স্ত্রী এবং কন্যার নাম ক'রে তাঁদের খুঁজেছিলেন।

মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে মারা গেলেন বায়রণ। বিদেশে এবং বিচিত্র পরিবেশে তাঁর মৃত্যু দেশের লোকের মনে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। তাঁর হৃদপিণ্ড মিসলংঘির সমাধিক্ষেত্রে প্রোথিত হয়েছিল। দেহ নীত হয়েছিল স্বদেশে এবং তাঁর পিতৃপিতামহের বাসভূমির কাছে পূর্ব্বপুরুষদের সমাধির পাশে তাঁর সমাধি রচিত হয়েছিল।

কাব্যের লক্ষণ

শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী এম্‌-এ

ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের পীঠভূমি হইতেছে কাশ্মীর। কাশ্মীরীয় অলঙ্কার-শাস্ত্র রচয়িতা মম্মটাচার্য্য কাব্যের স্বরূপ নির্ণয় করিলেন তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে কাব্যপ্রকাশের প্রথম উল্লাসে। তাঁহার মতটি এইরূপ—তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণাবনলঙ্কৃতী পুনঃ ক্বপি। কাব্যে দোষবর্জ্জিত শব্দার্থ থাকিবে, এবং উহা অলঙ্কারযুক্ত হইবে। 'ক্বাপি' এই শব্দের দ্বারা তিনি প্রকাশ করিলেন যে সর্ব্বত্রই কাব্য অলঙ্কারযুক্ত হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। (C. F. "স্ফুটালঙ্কারবিরহেঽপি ন কাব্যত্বহানি"।)। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে তিনি অলঙ্কারের ক্ষেত্রে বিকল্পত্বের ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। ইহার কারণ গ্রন্থকার নিজেই অষ্টমোল্লাসে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার বিস্তৃত বিচারের সারমর্ম্ম উল্লেখ করা যাইতেছে। অলঙ্কারগুলি অনুপ্রাস প্রভৃতি, নারীদেহের কুণ্ডলের ন্যায়। নারীদেহের লাবণ্যই আসল। অলঙ্কার তাহার শোভাবর্দ্ধক মাত্র। গুণ কিন্তু রসের ধর্ম্ম, রস হইতে গুণকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। শৌর্য্যাদি যেমন দেহের ধর্ম্ম নয়; আত্মারই ধর্ম্ম, সেইরূপ গুণের ক্ষেত্রে অলঙ্কার দেহের শোভাবর্দ্ধক মাত্র। মম্মটের মতটি ৬৬ নং কারিকায় ব্যক্ত হইয়াছে। তাহা এই—"যে রসস্যাঙ্গিনো ধর্ম্মাঃ শৌর্য্যাদয় ইবাত্মনঃ। উৎকর্ষহেতবস্তে স্যুরচলস্থিতয়ো গুণাঃ"। আবার তিনি তৎপশ্চাৎ বৃত্তিতে বলিতেছেন—অতএব মাধুর্য্যাদয়ো রসধর্ম্মা সমুচিতৈর্বর্ণৈর্ব্যজ্যন্তে, ন তু বর্ণমাত্রাশ্রয়াঃ।" শৌর্য্যাদি সমবায় বৃত্তির দ্বারা এবং অলঙ্কারাদি সংযোগবৃত্তির দ্বারা বর্ত্তমান। অতএব গুণ এবং অলঙ্কারের প্রবিভাগ সুস্পষ্ট হইল। উপচারের দ্বারা গুণ এবং অলঙ্কারের শব্দার্থবৃত্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। আসলে কিন্তু উহা উপচার। (গুণবৃত্ত্যা পুনস্তেষাং বৃত্তিঃ শব্দার্থয়োর্মতা।" ৭১নং কারিকা)।

যে গ্রন্থকার গ্রন্থাগ্রে দোষবর্জ্জিত গুণালঙ্কারযুক্ত শব্দার্থই কাব্যের লক্ষণ নির্ণয় করিলেন, তিনি কিরূপে অষ্টমোল্লাসে তাঁহার স্বীয়মতেরই বিরুদ্ধ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন—ইহাই জিজ্ঞাস্য। আলঙ্কারিক সুধী সমাজের মধ্যে রুয্যকের ক্ষমতা ছিল সত্য কথা বলিবার। তিনি বলিয়াছিলেন মম্মটের তদদোষৌ শব্দার্থৌ ইত্যাদি কাব্যের লক্ষণ ঠিক নয়। উহা কাব্যের স্বরূপ বর্ণন। সত্যই ইহা কাব্যের স্বরূপ বর্ণন। গ্রন্থকার নিজেই বলিতেছেন—"এবমস্য কারণমুক্ত্বা স্বরূপমাহ"—এই উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। গ্রন্থকার যাহা বলেন নাই; তাহা যদি তাঁহাকে দিয়া বলাইয়া লওয়া হয় তাহা হইলে তাঁহার প্রতি কি ন্যায়বিচার করা হইবে না।

গ্রন্থকার যে রস মানেন না তাহা নহে। চতুর্থোল্লাসে তিনি রসের লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন। উপরন্তু চতুর্থোল্লাসের প্রথমেই তিনি বলিতেছেন—যদ্যপি শব্দার্থয়োর্নির্ণয়ে কৃতে দোষগুণালঙ্কারাণাং স্বরূপমভিধানীয়ম্ তথাপি ধর্ম্মিণী প্রদর্শিতে ধর্ম্মাণাং হেয়োপাদেয়তা জ্ঞায়ত ইতি প্রথমং কাব্যভেদানাহ"—ইহার পর আর কিছু বলিবার থাকে? প্রশ্ন হইতেছে 'ধর্ম্মিণি প্রদর্শিতে' কথাটির তাৎপর্য্য কি? ধর্ম্ম হইতেছে তাঁহার মতে ধ্বনি। কারণ উক্তিটির পরেই তিনি 'অবিবক্ষিত বাচ্য' ইত্যাদির প্রবিভাগ আরম্ভ করিলেন। উপরন্তু তিনি পঞ্চমোল্লাসে ধ্বনির তিনটি বিভাগ করিয়াছেন '(ব্যঙ্গস্য ত্রিরূপত্বাৎ)।' একটি বাচ্যতাসহ, অপরটি

তদ্বিপরীত। বাচ্যতাসহ আবার দুইপ্রকার—অবিচিত্র এবং বিচিত্র। অবিচিত্র হইতেছে বস্তুধ্বনি, বিচিত্র হইতেছে, অলঙ্কারধ্বনি। যাহা বাচ্যতাসহ নয় তাহা রসধ্বনি। বর্ত্তমানে ধ্বনির এই ত্রিরূপত্ব কি প্রসিদ্ধ ধ্বন্যালোক রচয়িতার ধ্বনির বিভাগের সহিত মিলিতেছে না? আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য কি জ্ঞানে হউক, অজ্ঞানে হউক মম্মটের উক্তিটি গ্রহণ করেন নাই? আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য তাঁহার বৃত্তিতে বলিতেছেন—"স হ্যর্থো বাচ্যসামর্থ্যাক্ষিপ্তং বস্তুমাত্রমলঙ্কার-রসাদয়শ্চ……বাচ্যাদন্যত্বম্।" বৃত্তি বলিলাম কারণ—আমার মতে গ্রন্থকার নিজেই বৃত্তি ও কারিকাপ্রণেতা। (কৌতূহলী) পাঠক এই স্থলে Bhandarkar's B. C. Law 2nd volumeএ Dr. Satkari Mookherjee'র প্রবন্ধটি দেখিতে পারেন)।

মম্মট সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে ধ্বনি লক্ষণার দ্বারা প্রকাশ্য নয়। অভিধার দ্বারাতো নয়ই। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখিত হইতে হয় যখন বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণের প্রথম পরিচ্ছেদখানি পড়িতে হয়। সেই স্থলে বিশ্বনাথ মম্মটের বিরুদ্ধে অযথা নিন্দাবাদ আরম্ভ করিয়াছেন। যেহেতু মম্মটাচার্য্য বলিয়াছেন 'তদদোষৌ'। সেই হেতু বিশ্বনাথ বলিতেছেন দোষহীন কাব্য সম্ভব নয় এবং কাব্যের লক্ষণ করিতে গিয়া দোষ শব্দের উল্লেখ নিন্দাই। আসলে কিন্তু বিশ্বনাথ এই স্থলে ভুল বুঝিয়াছেন। মম্মটাচার্য্য 'তথাভূতাং দৃষ্টা নৃপ সদসি পাঞ্চালতনয়াম্'—ইত্যাদি স্থলে দোষসত্ত্বেও ধ্বনির অঙ্গীকার করিয়া ইহার কাব্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ধ্বনি কিংবা রস রক্ষিত হইলে দোষ সত্ত্বেও কাব্যত্বহানি হইবে না। আবার বিশ্বনাথ 'সগুণৌ'—এই কথাটির উপর দোষ তুলিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহা 'রসবন্তৌ' অথবা 'সরসৌ' হওয়া উচিত। যে গ্রন্থকার ৭১নং কারিকায় সুস্পষ্টভাবে 'গুণবৃত্ত্যা পুনস্তেষাং বৃত্তিঃ বলিলেন—তিনি কি গুণের শব্দার্থবৃত্তিত্ব স্বীকার করিলেন 'শব্দার্থৌ' শব্দার্থয়োর্মতা' 'সগুণৌ' এই উক্তিটির দ্বারা? ইহাই আলঙ্কারিক বুদ্ধিজনোচিত উক্তি? অতএব বিশ্বনাথ এস্থলেও প্রমাদবশতঃ এইরূপ উক্তি করিয়াছেন।

বিশ্বনাথের লক্ষণই দেখা যাউক। তিনি বলিতেছেন—'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।' রসাত্মক বাক্যই যদি কাব্য হয়, তাহা হইলে সর্ব্বত্রই কি রসপ্রাপ্তির সুযোগ ঘটিবে? মেঘদূতের খণ্ড খণ্ড প্রত্যেকটি শ্লোকেই কি রস আছে? 'তাঁস্ত্বাবশ্যং দিবস-গণনা তৎপরামেকপত্নীম্' ইত্যাদি-স্থলে কি রস? অথচ এস্থলে ধ্বনি আছে বলিয়া ইহার কাব্যের হানি ঘটে নাই। উপরন্তু পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের উক্তিটি এস্থলে প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাঁহার 'রসগঙ্গাধর' নামক অলঙ্কারগ্রন্থে বলিয়াছেন—"যত্তু রসবদেব কাব্যম্ ইতি সাহিত্যদর্পণে নির্ণীতম্ তন্ন। বস্ত্বলঙ্কার প্রধানানাং কাব্যানাম্ কাব্যত্বাপত্তেঃ"। (রসগঙ্গাধর—প্রথমানন) পণ্ডিতরাজ জগন্নাথও মম্মটের প্রতি অবিচার করিয়াছেন। জগন্নাথের কাব্যের লক্ষণ হইতেছে—রমণীয়ার্থ প্রতিপাদক শব্দই কাব্য। তাঁহার মতে শব্দই কাব্য। তবে তিনি রমণীয়ার্থকে শব্দের বিশেষণ করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। তিনি যে ধ্বনি ও রস মানেন না তাহা নয়, স্পষ্টই ধ্বনি ও রসের উল্লেখ করিয়াছেন। ("প্রতীয়মানঃ প্রপঞ্চেঽস্মিনং রসো রমণীয়তামাবহতীতি নির্ব্বিবাদম্।" ১ম আনন—রসগঙ্গাধর) কিন্তু তাঁহার বিচারপদ্ধতিতে একটু অসঙ্গতি রহিয়া গিয়াছে। তিনি বলিতেছেন—কাব্যশব্দের ব্যবহার শব্দবিশেষেই। অর্থে নয়। অতএব মম্মটের 'শব্দার্থৌ' বলা অনুচিত। ইহা কিন্তু যুক্তিযুক্ত নয়। ব্যবহার উভয়ত্রই দেখা যায়। "তদধীতে তদ্বেদ"। ইহা নাগেশের উদাহরণ। এস্থলে উভয়ত্রই কাব্য শব্দের ব্যবহারও শব্দে এবং অর্থে। অতএব জগন্নাথ যে বলিলেন—'তদেবং শব্দবিশেষস্যৈব কাব্যপদার্থত্বে সিদ্ধে তস্যৈব লক্ষণং বক্তুং যুক্তং ন তু স্বকল্পিতস্য কাব্যপদার্থস্য' ইহা যুক্তিযুক্ত নয়। আর তাহা ছাড়া তিনি যে বলিলেন 'দুষ্টং কাব্যম্' এই বাক্য হইতে পারে না, কারণ, 'বাধকং বিনা লাক্ষণিকত্বাযোগাৎ'। ইহাও যুক্তিযুক্ত নয়। অপ্রতীত দোষে একজনের নিকট দুষ্টবাক্য হইতে পারে, অপরজনের নিকট নাও হইতে পারে!

অতএব দেখা যাইতেছে যে কাব্যের লক্ষণ কেহই সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। মম্মট পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন। বিশ্বনাথ বলিয়াছেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগও আসিয়াছে। ধ্বনিকার লক্ষণের ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। জগন্নাথ অবশ্য সুস্পষ্টরূপেই বলিয়াছেন। তিনিই যে একেবারে অভিযোগশূন্য তাহা বলিতেছি না—তবে রমণীয়ার্থ প্রতিপাদক শব্দই কাব্য এইরূপে কাব্যের লক্ষণ করিলে মোটামুটি সাধারণভাবে বিপদ অতিক্রম করা যায়। একেবারে অভিযোগ-বিরহিত কাব্যের লক্ষণ করা অসম্ভব ব্যাপার।





—বাইশ—

"Aguas do Gange, e a terra de Bengala ;
Fertil de sorte que outra não the iguala—"

সরস্বতীর ঢুধবরণ জলের ওপর বিশাল ছায়া মেলে দিয়ে পর্তুগীজ জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে তিনখানা। হাওয়ায় হাওয়ায় শব্দ করে উড়ছে ক্রুশ-চিহ্নিত পতাকা—এই সপ্তগ্রামের সমস্ত মন্দির-মসজিদের চূড়ো ছাড়িয়ে যেন আকাশের মেঘের সঙ্গে গিয়ে মিলতে চাইছে। ইতিহাসের একটা অঙ্ক শেষ হয়ে গেল—শুরু হল আর এক নতুন পালা।

ঝড়ের গতিতে বয়ে গেছে সময়। অপদার্থ অসংযত মামুদ শা নিজের হাতেই রচনা করেছেন নিজের ভাগ্যলিপি। —শয়তানকে পথ দেখিয়ে দিলেন সুলতান! আবার আসবে—বারে বারে ফিরে ফিরে আসবে সে।

অ্যাফন্‌সো ডি-মেলোর সে ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে হয় নি। শেরখাঁ আবার ফিরে এসেছিলেন কালবৈশাখীর বেগে। সে প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে মামুদ শা উড়ে গিয়েছিলেন কুটোর মতো—'দিল্লীশ্বরো জগদীশ্বরো বা' হুমায়ুনও তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পান নি।

সে পরের কথা। কিন্তু এই দুর্যোগের দুর্লগ্নে হোসেনশাহী বংশের ওপর যখন সর্বনাশ ঘনিয়ে এল, তখন নতুন উষার স্বর্ণদ্বার খুলল ক্রীশ্চানদের। মহাসঙ্কটে আত্মরক্ষা করার জন্যে মামুদ শার সেদিন নুনো-ডি-কুন্‌হার সঙ্গে চুক্তি না করে আর উপায় ছিল না! সমুদ্রের ঝড়ে ভরাডুবি হয়ে একদিন ডি-মেলো 'বেঙ্গালার' তটে এসে পৌচেছিলেন, সেদিন দুর্ভাগ্য ছিল তাঁর ছায়াসহচর। আর আজ অতলে ডুবে যাওয়ার আগে তাঁকেই তৃণখণ্ডের মতো আশ্রয় করেছেন মামুদ শা।

মামুদ শার নিস্তার নেই—তাঁর পরিণাম নিশ্চিত। কিন্তু ডি-মেলো যা চেয়েছেন সবই পেয়েছেন। এতদিন পরে বাংলা বাহু বাড়িয়ে বরণ করে নিয়েছে ক্রীশ্চান শক্তিকে। পোর্টো গ্র্যাণ্ডি আর পোর্টো পেকেনোতে কুঠি গড়বার অনুমতি মিলেছে পর্তুগীজদের।

সরস্বতীর শুভ্র জলধারার ওপর তিনখানা পর্তুগীজ জাহাজের বিশাল ছায়া। ক্রুশ-চিহ্নিত পতাকা উড়ছে হাওয়ায়। কিছু দূরে নদীর ধারে গড়ে উঠছে বিরাট বাণিজ্য-কুঠি। সেখানে খাটছে কালো কালো ক্রীতদাসের দল—তাদের পিঠে চাবুকের শুভ্র ক্ষতচিহ্ন জলজল করে জলছে। আফ্রিকার উপকূল থেকে এরা শাদা-সভ্যতার শিকার। বন্দরের মানুষ নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে সেদিকে।

শুধুই বিস্ময়—তার বেশি আর কিছুই নয়। এমন কত আসে—কত যায়। বাংলার ঘরে লক্ষ্মীর নিত্য কোজাগরী। বাঙালীর অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার অফুরন্ত। কোনো ভিক্ষার্থী এখান থেকে বিমুখ হয়ে ফেরে না। আজ এরা এসেছে—এরাও নিয়ে যাক।

সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণীর বণিকেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

—আসুক না, ভালোই তো। দেব—বুঝে নেব। আমাদের কাছে সবাই সমান।

আর একজন বলে, সমান কেন হবে? আরবী সদাগরদের চাইতে এরা অনেক ভালো। আরবরা চালাক

হয়ে গেছে আজকাল—বড্ড যাচাই করে, বড় বেশি দরদাম করে। ওদের সঙ্গে ব্যবসা করে আর সুখ নেই। এরা নতুন এসেছে—এ দেশের হালচাল জেনে নিতে এদের দেরী হবে।

—ঠিক কথা।—তৃতীয় জন বলে, পাটের শাড়ী দেখলে এদের ভিমি লাগে—রেশমের সঙ্গে তার ফারাক্ এখনো বুঝতে পারে না। দলে দলে আসুক, যত খুশি ব্যবসা করুক, আমাদের তাতে লাভ বই ক্ষতি নেই। নেবে মসলিন, পাটের কাপড়, রেশম, লাক্ষা, আফিং, যোন—দেবে শঙ্খ, গোলমরিচ, দারচিনি আর মুক্তো। দেওয়া-নেওয়া ছাড়া আর কী সম্বন্ধ ওদের সঙ্গে।

তা নেই। তবু কেমন অদ্ভুত ধরণ যেন লোকগুলোর। উগ্র-পিঙ্গল চোখের দৃষ্টি—শিকারী বাজের চোখের মতো তীক্ষ্ণতায় ঝকঝক করে। ভ্রূ পর্যন্ত ঢাকা টুপিতে যেন কপালের ওপর মেঘ ঘনিয়ে থাকে একরাশ। গায়ের ডোরা-কাটা আঙিয়া দেখে মনে পড়ে যায় বাঘের কথা। যখন হাঁটে পায়ের তলায় মাটি কাঁপতে থাকে—ঝন্‌ঝনিয়ে বাজতে থাকে কোমরের তলোয়ার।

কোথায় একটা কী যেন আছে ওদের মধ্যে। অতিরিক্ত উগ্রতা—অতিরিক্ত লোলুপতা। যেন সব নিতে চায়—কোথাও কিছু বাকী রাখবে না। সপ্তগ্রামের বণিকেরা কী একটা বুঝতে চায়, অথচ সম্পূর্ণ করে বুঝতে পারে না যেন।

সার-বাঁধা তিনখানা জাহাজের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলেছে রাজশেখর শ্রেষ্ঠীর বজরা। বজরার ভেতরে ক্লান্ত ঘুমে এলিয়ে আছে সুপর্ণা। চার বছর ধরে অনেক বিনিদ্র রাত কাটাবার পরে এখন তার দুচোখ ভরে পৃথিবীর সমস্ত ঘুম নেমে এসেছে যেন। কথা এখনো সে বেশি বলে না—শুধু কখনো কখনো আশ্চর্য চোখ মেলে অনেকক্ষণ ধরে শঙ্খদত্তের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সে। যেন সে-মুখে কাকে সে খুঁজছে, অথচ এখনো সম্পূর্ণ করে চিনতে পারছে না।

বজরার বাইরে শ্রেষ্ঠী রাজশেখর আর শঙ্খদত্ত দাঁড়িয়ে ছিলেন পাশাপাশি। গম্ভীর বিষণ্ণ কৌতূহলে দুজনে দেখা দিলেন সমুদ্রজয়ী এই বিরাট আগন্তুকদের। একখানা জাহাজের ভেতর থেকে আট দশটি গলার সমবেত সঙ্গীত শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। তার ভাষা বোঝা যায় না—অর্থও না, তবু একসঙ্গেই কেমন গা ছম ছম করে উঠল দু-জনের। নতুন গান—নতুন মন্ত্র—নতুন আবাহন।

রাজশেখর বললেন, ওরা তবে এল!

শঙ্খদত্ত শীর্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা: হাঁ এল।

রাজশেখর বললেন, ওরা আসবে সে আগেই জানা গিয়েছিল। এত নদী-সাগর যারা পাড়ি দিয়ে এসেছে, বাংলা দেশের দোর গোড়া থেকেই তারা ফিরে যাবে না। নিজেদের পথ ওরা ঠিকই তৈরী করে নেবে। শুধু মাঝখান থেকে অনর্থক গুরুদেব—

বলেই মাঝপথে রাজশেখর থেমে গেলেন। গুরুদেব—গুরু সোমদেব। একটা জ্বলন্ত উল্কার মতো তিনি দিকে দিকে ছুটে চলেছেন। তাঁর শান্তি কোথাও নেই। শুধু নিজের জ্বালাতেই তিনি জ্বলে মরছেন, আর বিরাট একটা শুকনো ক্ষত-চিহ্ন রেখে গেছেন রাজশেখরের জীবনে। শুধু সুপর্ণা নয়—সেই কিশোর পর্তুগীজ ছেলেটির রক্তাক্ত ছিন্ন মুণ্ডের কথা কোনোদিনই কি ভুলতে পারবেন রাজশেখর?

গুরু—সোমদেব। তাঁর কথা শঙ্খদত্তও ভাবছিল। গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে সে বাণিজ্যে গিয়েছিল, গুরুকে কথা দিয়েছিল তাঁর ব্রতে সে সাধ্যমতো সাহায্য করবে। কিন্তু কী করেছে সে? দেবদাসীর ওপরে লোভের দৃষ্টি দিয়ে দারুব্রহ্মের ক্রোধে সে সব হারিয়েছে—নিঃস্ব রিক্ত অবস্থায় প্রায় পাঁচ বছর পরে ফিরে এসেছে সপ্তগ্রামে। কী বলবে সে বাপ ধনদত্তের কাছে—কেমন করে তাঁর কাছে গিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবে সে?

—শ্রেষ্ঠী, নৌকো কোথায় ভিড়বে?

মাঝি প্রশ্ন করছে। শঙ্খদত্ত চমকে উঠল।

—সামনের ওই বড় কদম গাছটা পার হলে যে বাঁধা ঘাট—সেখানে।

এসে পড়েছে, আর দূর নেই। আর একটু এগিয়ে গেলেই শ্রেষ্ঠী ধনদত্তের বাড়ীর উঁচু চূড়োটা চোখে পড়বে। তার পরে বাঁধানো ঘাট, সেখান থেকে পাথর বাঁধা পথ ধরে দু পা হাঁটলেই বাড়ীর সিংহ দরজা। কিন্তু অত বড় সিংহ দরজা সত্ত্বেও ঘাড়টাকে যথাসম্ভব নুইয়ে বাড়ীতে পা দিতে হবে শঙ্খদত্তকে। ভাবতেই বুকের ভেতরটা শুকিয়ে আসতে লাগল।

সুপর্ণা নয়—শম্পা নয়—শঙ্খদত্তের ইচ্ছে করতে লাগল এখনি সে সরস্বতীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। কিন্তু এতখানি মনের জোর কোথায় তার—কোথায় তার আত্মহত্যা করবার শক্তি?

নিষ্ঠুর নিয়তির মতো বজরা এসে বাড়ীর ঘাটে ভিড়ল।

আরো শাদা হয়েছে মাথার চুল—আরো শুভ্র হয়েছে ভ্রূজোড়া। গালে-মুখে-কপালে রেখার জটিল অরণ্য। কালো কোটরের ভেতরে প্রায় অদৃশ্য হয়ে আছে ধনদত্তের চোখ।

অন্ধকার দৃষ্টি তুলে ধনদত্ত বললেন—ও কিছু না। যিনি দিয়েছিলেন, তিনিই নিয়েছেন।

মাথা নীচু করে বসে রইল শঙ্খদত্ত।

ধনদত্ত বললেন, তুমি এতদিন পরে এসেছ রাজশেখর, আমি বড়ো খুশি হয়েছি। তোমার মেয়েটিও ভারী লক্ষ্মীমতী। ও সুখী হবে।

রাজশেখর বললেন—মেয়েটির জন্যেই আরো এলাম আপনার কাছে। ওকে আমি শঙ্খের হাতেই তুলে দিতে চাই। আমার একমাত্র মেয়ে—আপনারও ওই একটিই ছেলে। যদি অনুমতি করেন—

ধনদত্ত শীর্ণ হাসি হাসলেন: লক্ষ্মী নিজে ঘরে এসেছেন, তাঁকে বরণ করে নেওয়াই দরকার। অনুমতির কোনো কথাই ওঠে না রাজশেখর।

শঙ্খদত্ত উঠে গেল সম্মুখ থেকে। এসে দাঁড়ালো বারান্দায়। সামনে সরস্বতীর জল। নৌকোর সারি। কিছু দূরে ক্রীশ্চান জাহাজের উদ্ধত মাস্তল। ওপারে আটটি শিবের মন্দির দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি। সোনার কলস আর ত্রিশূল রোদে ঝকমক করে জ্বলছে।

সুপর্ণা তার জীবনে আসবে। শঙ্খদত্তর খুশি হওয়া উচিত বই কি। একথাও ঠিক যে রাজশেখরের বজরায় বসে তার অপূর্ব মনে হয়েছিল সুপর্ণাকে। দুটি আশ্চর্য নিবিড় চোখ মেলে তাকিয়ে আছে—অথচ সে চোখ দিয়ে কাউকে দেখতে পাচ্ছে না; একটা গভীর সমুদ্রের অতলে তলিয়ে আছে তার মন, কিন্তু চৈতন্যের একটি ঢেউ সেখানে গিয়ে দোলা দেয় না তাকে। এত কাছে সে শুদ্ধ হয়ে বসে আছে, তার রুক্ষ চুল এলোমেলো হাওয়ায় শঙ্খদত্তের মুখের ওপরে এসে ছড়িয়ে পড়ছে—অথচ দূর আকাশের নক্ষত্রের মতো সমস্ত স্পর্শসীমার সে বাইরে। সেদিন শঙ্খদত্তের মনে হয়েছিল এই ঘুমন্ত কন্যাকে সে জাগিয়ে তুলবে, মাটির মূর্তির মতো এই প্রতিমার মধ্যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করবে সে। পাথরের ফুলকে সে ভরে তুলবে প্রাণের গন্ধে-পরাগে।

সুপর্ণা জেগেছে—প্রাণ পেয়েছে পাষাণ। কিন্তু এই বার? একটা আকস্মিক প্রশ্ন জেগেছে; পূজারী কি প্রতিমাকে ভালোবাসতে পারে? অথবা তাও নয়। যে করুণা—যে অনুকম্পার ছোঁয়া দিয়ে সুপর্ণাকে সে জাগাতে চেয়েছিল, তার পালা তো শেষ হয়ে গেছে! এর পরে আর তো কিছু নেই সুপর্ণার মধ্যে। শঙ্খদত্ত আর কোনো নতুন বিস্ময়কে খুঁজে পাবে না তার ভেতরে, আর কোনো অসামান্যতা আকর্ষণ করবেনা তাকে। সপ্তগ্রামের শ্রেষ্ঠীদের ঘরে ঘরে যে অসংখ্য সুন্দরী মেয়ে সন্ধ্যায় শঙ্খ বাজায়, লক্ষ্মীর পায়ের আল্পনা আঁকে, হাসি-কান্না দুঃখ বেদনা দিয়ে সংসার গড়ে—তাদের সঙ্গে কোথায় পার্থক্য সুপর্ণার? শুধু এইটুকু পাওয়ার জন্যেই এমন করে সমুদ্র পাড়ি দিতে হয়েছিল শঙ্খদত্তকে? এ তো তার ঘরেই ছিল—এর জন্যে তো এতখানি মূল্য দেবার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

আজ তার আর সুপর্ণার মধ্যে করুণা ছাড়া কোনো বন্ধনই তো সে খুঁজে পাচ্ছে না। কিন্তু এই করুণার পাথেয় নিয়ে কি চিরদিন চলবে? সাধারণ আরো দশজন বণিকের মতো তো ঘরে বসে দিন কাটাতে পারবে না শঙ্খদত্ত। একবার সমুদ্র তার সব কেড়ে নিয়েছে, তাই বলে সে হার মানবে না সাগরের কাছে। আবার বহর সাজাবে—আবার পাড়ি দিতে চাইবে কালফণা তোলা কালীদহ, আবার তার রক্তে রক্তে এসে দোলা দেবে দক্ষিণের ডাক। সেদিন কী হবে কে জানে! আর একবার হয়তো কোনো নতুন দেবদাসী শম্পা তাকে পথ ভোলাবে—আবার সে বাহু বাড়াবে আকাশের দিকে—কেড়ে নিতে চাইবে দেবতার নৈবেদ্য। সেই দিন?

আর—আর সুপর্ণাই কি তাকে ভালোবাসতে পারবে?

দু একটা কথা আভাসে বলেছেন রাজশেখর—অস্পষ্ট-ভাবে আরো কী যেন বলেছে সুপর্ণা। শঙ্খদত্ত কিছু একটা

বুঝেছে বইকি। সুপর্ণার ঘুম ভেঙেছে, কিন্তু আজো সে সম্পূর্ণ করে জেগে ওঠেনি। তার অস্বচ্ছ মনের সামনে কী যেন—কে যেন ঘুরে বেড়ায়। সোনালি তার চুল, নীল তার চোখ, অপরিচিত তার ভাষা—

সে কি কখনো মুছে যাবে সুপর্ণার মন থেকে? যেমন করে শম্পাকে কোনোদিন সে ভুলতে পারবে না? সুপর্ণা চিরদিন একটি রক্তজবার স্বপ্ন দেখবে, আর শঙ্খদত্ত চোখ বুজলেই দেখতে পাবে সুরের সমুদ্রে অম্লান-সুন্দর একটি শ্বেতপদ্ম ভেসে চলেছে। দুজনে পাশাপাশি বসে থাকবে—অথচ কেউ কারো সঙ্গে থাকবে না; দুজনের হাত মিলে থাকবে এক সঙ্গে—অথচ এক সময়ে শিউরে উঠে দুজনেরই মনে হবে যেন অপরিচিত কাউকে স্পর্শ করে আছে তারা। সেই দিন?

শঙ্খদত্তের ভাবনায় ছেদ পড়ল।

বাইরে থেকে সংকীর্তনের সুর। খোল-করতালের আওয়াজ।

শঙ্খ উচ্চকিত হল। এখানেও কীর্তন?

বাইরে বেরিয়ে আসতেই সে চমকে উঠল।

এখানেও ভুল করেছেন শুরু সোমদেব। সব ক'টি স্রোতের উলটো মুখেই তিনি দাঁড়াতে চেয়েছিলেন—কিন্তু কোনোটিকেই তাঁর রুখবার ক্ষমতা ছিল না। যে বৈষ্ণবেরা তাঁর কাছে ছিল নিছক কৌতুক আর ঘৃণার উপাদান, আজ তারাই সারা দেশকে ছেয়ে ফেলেছে। মহাকালীর হাতে খড়্গ তুলে দিতে চেয়েছিলেন সোমদেব—কিন্তু বাঁশী হাতে দেখা দিয়েছেন ব্রজগোপাল। সেই চৈতন্যেরই জয় হয়েছে শেষ পর্যন্ত!

তা না হলে এ কী করে সম্ভব হয়?

তাদের বাড়ীর উঠোনেই চলেছে সংকীর্তন। জরাগ্রস্ত ধনদত্ত সে কীর্তনে যোগ দিতে পারেন নি—তিনি শুয়ে পড়েছেন ধূলোয়—অঝোরে ঝরছে তাঁর চোখের জল। আর কীর্তনের মাঝখানে গলায় তুলসীর মালা পরে যে মুণ্ডিতমস্তক মানুষটি ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নাচছেন—তিনি আর কেউ নন—বণিককুলের চূড়ামণি ত্রিবেণীর উদ্ধারণ দত্ত!

সুবর্ণ বণিক উদ্ধারণ দত্ত—ঐশ্বর্যের অন্ত নেই তাঁর, ঘরে তাঁর সুবর্ণের অক্ষয় ভাণ্ডার। দেশ-জোড়া তাঁর খ্যাতি। সেই উদ্ধারণ দত্ত ভাবের আবেগে নাচছেন উন্মত্ত হয়ে!

"এসো হে গৌরাঙ্গ এসো
এসো এসো শচীর দুলাল—
এসো নদীয়ার চাঁদ
এসো এসো দীন-দয়াল—"

এসেছেন বইকি নদীয়ার দুলাল। ভক্তদের ওপরে আবির্ভূত হয়েছেন তিনি। নাচতে নাচতে প্রায়ই দু একজন মাটিতে লুটিয়ে পড়ছেন দশাগ্রস্ত হয়ে। শঙ্খদত্তের সেই ব্যঙ্গাত্মক সংস্কৃত শ্লোকটা মনে পড়ল: 'কীর্তনে-পতনে মল্ল শরীর।' কিন্তু এই মুহূর্তে—ভাবের এই বন্যার সামনে সে তো পরিহাস করবার শক্তি খুঁজে পাচ্ছে না। বরং তার নিজের বুকই ছলছলিয়ে উঠছে এখন।

মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল শঙ্খদত্ত।

ঘরে-বাইরে দু দিক থেকেই পরিবর্তনের পালা। সরস্বতীর জলে ক্রীশ্চান বণিকদের জাহাজগুলোর বিশাল-গম্ভীর ছায়া। সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণীতে ভক্তের কণ্ঠে চৈতন্য-দেবের বন্দনা। সোমদেব একটা অতীত ইতিহাস।

কতক্ষণ একভাবে শঙ্খদত্ত দাঁড়িয়েছিল জানে না। ধনদত্তের ডাকে তার ধ্যান ভাঙল।

ভাঙা কাঁপা কাঁপা গলায় ধনদত্ত ডাকলেন, শঙ্খ, এসো এখানে।

শঙ্খদত্ত এগিয়ে এল। তখন কীর্তন থেমে গেছে। সমাধিস্থের মতো প্রাঙ্গণে বসে আছেন উদ্ধারণ দত্ত। দু চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে তাঁর। পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছে সপ্তগ্রামের বণিকের দল—এতদিন যাদের কেউ কেউ একশো ছাগ-মেষ-মহিষ বলিদান দিয়ে শক্তিপুজো করত, বলির রক্তের মধ্যে যারা মাতামাতি করত অমানুষিক উল্লাসে!

তেম্‌নি কাঁপা কাঁপা সিক্ত গলায় ধনদত্ত বললেন, আমাদের পরম সৌভাগ্য যে ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধারণ দত্ত আজ আমার এখানে পায়ের ধুলো দিয়েছেন। নিতাইয়ের তিনি দাস—তিনি গৌরাঙ্গের পদাশ্রিত। নীলাচলে মহাপ্রভুর সেবা করে তিনি ধন্য হয়েছেন। শঙ্খ, প্রণাম করো—

একবার সোমদেবের মুখ মনে পড়ল, মনে পড়ল তাঁর

রক্ত-রাঙানো দুটো জ্বলন্ত চোখ, মনে পড়ল তাঁর মাথায় ফণা তোলা কেউটের মতো পিঙ্গল জটার রাশি—বাঘের গর্জনের মতো তাঁর উগ্র কণ্ঠস্বর। কিন্তু কোথায় এখন সোমদেব—কত দূরে! কী পরিণাম তাঁর হয়েছে কে জানে! মহাকালী আর জাগবেন না—তাঁর হাতের খড়্গ আজ ব্রজগোপালের বাঁশীতে পরিণত হয়ে গেছে। এখন শুধু অসহ্য অন্তর্জ্বালায় জ্বলে মরতে হবে তাঁকে—যেমন করে কক্ষচ্যুত একটা উল্কা জ্বলে যায়।

সব অন্যরকম হয়ে গেছে। সোমদেব যা চেয়েছিলেন—তার একটিও তিনি পেলেন না। কী পেলো শঙ্খদত্ত?

ধনদত্ত আবার বললেন, শঙ্খ, কী দেখছ দাঁড়িয়ে? তোমার সামনে মহাপুরুষ। রাজার মতো ঐশ্বর্য ছেড়ে দিয়ে যিনি মাধুকরী বেছে নিয়েছেন, গৌর-নিতাইয়ের আশীর্বাদ যাঁর মাথায়, নিত্যানন্দ যাঁর প্রভু, সেই বণিক-কুল-গৌরব উদ্ধারণ দত্ত বসে আছেন তোমার সামনে। প্রণাম করো, প্রণাম করো তাঁকে—

অন্তঃপুরে মেয়েদের কান্নার স্বর শোনা যাচ্ছে—হয়তো সুপর্ণাও আছে ওদের মধ্যে। রাজশেখর ভেসে গেছেন এই ভাবের বন্যায়, মাথা খুঁড়ছেন উদ্ধারণের পায়ের সামনে। মোহগ্রস্তের মতো শঙ্খদত্তও এগিয়ে গেল, তার পর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল সেই নিশ্চল ধ্যানস্থ মূর্তিকে।

কে একজন আকুল হয়ে গেয়ে উঠল:

"যাবৎ জনম হাম তুয়া পদ না সেবলু
কুসঙ্গে রহিলুঁ সদা মেলি,
অমৃত ত্যেজি কিয়ে হলাহল পিয়লুঁ
সম্পদে বিপদহি ভেলি—"

নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রইল শঙ্খদত্ত—মাটিতেই। ভক্তি নয়—আবেগ নয়—বহুদিন, বহু বৎসরের সঞ্চিত অবসাদ এসে যেন তাকে ঘিরে ধরেছে—মাটি থেকে মাথা তুলে উঠে বসবার মতো শক্তিও যেন সে খুঁজে পাচ্ছে না আর। এইখানে—এই মুহূর্তে একটা গভীর নিশ্ছিদ্র মুখের মধ্যে তলিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে তার।

* * *

আরো ছ'মাস কেটে গেছে তার পর।

ইতিহাসের ঢেউ উঠেছে, ইতিহাসের ঢেউ ভেঙেছে। চট্টগ্রাম—গৌড়। হুমায়ুন, শের শা, মামুদ শা, সাম্পায়ো শক্তি আর কূটতার পাশা খেলা। দিল্লীর মসনদের ওপর ঝুঁকে পড়েছে বিহারের বাঘের উদ্যত থাবা। প্রাণভয়ে প্রহর গণছেন হুমায়ুন। চূড়ান্ত লজ্জায় আর অপমানে নিজের রক্ত দিয়ে ফিরোজ শার রক্তের ঋণ শোধ করেছেন অভিশপ্ত আবদুল বদর।

আর তার মধ্যে একটু একটু করে ভিত পাকা হয়েছে পশ্চিমের বাণিজ্য লক্ষ্মীর। মালদ্বীপ থেকে সিংহল, সিংহল থেকে কালিকট-গোয়া, তারপরে বঙ্গোপসাগর। 'বেঙ্গালা' ভারতের স্বর্গ। পোর্টো গ্র্যাণ্ডি—পোর্টো পেকেনো।

ভাস্কো-ডা-গামার স্বপ্ন মিথ্যে হয়নি। আল্‌বুকার্কের আশা মেলে দিয়েছে দুটি নবাঙ্কুরের পল্লব। সার্থক হয়েছে নুনো-ডি-কুনহা আর অ্যাফন্‌সো ডি-মেলোর সাধনা। পর্তুগীজ নাবিকেরা মুগ্ধ চোখ মেলে তাকায় 'বেঙ্গালার' সোনা-ঝরানো আকাশের দিকে, তার শ্যাম-শস্যের বিস্তারের দিকে, তার মস্‌লিন, তার সোনা রূপো, তার মশলার দিকে। তারা জানে, এই সোনার দেশ এবারে ধন্য হবে মা মেরীর পুণ্যনামে—জেণ্টুরদের মন্দির ছাড়িয়ে আকাশে উঠবে 'ইগ্রেঝার' চূড়ো—ক্রীশ্চান ধর্মের আশ্রয়ে এসে তারা লাভ করবে মুক্তির পরমার্থ। খ্রীস্টের করুণায় অভিষিক্ত হয়ে যাবে পৌত্তলিকতার দাবদাহ।

মুগ্ধ চিত্তে এক আধজন আবৃত্তি করে সৈনিক কবি 'লুসিয়াদাসের পংক্তি:

Aguas do Gange e a terra Bengala;
Fertil de sorte que outra nãao the iguala"—

'পবিত্র গঙ্গার মোহানার মুখে এই তো বাংলা দেশ যেন স্বর্গের উদ্যান বিস্তীর্ণ হয়ে আছে দিকে দিকে।'

—মাতা মেরীর জয় হোক—

—লিসবোয়ার জয় হোক—

শুধু একটুখানি বিস্ময় অবশিষ্ট ছিল শঙ্খদত্তের জন্য।

সুপর্ণার সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেছে। জীবনের সঙ্গে রফা করে নিয়েছে শঙ্খদত্ত। সুপর্ণা তার নিঃসঙ্গ মুহূর্তে এখনো সেই সোনালি চুল আর নীল চোখের কথা ভাবে কিনা কে জানে! কিন্তু শঙ্খদত্ত আর ভাবতে চায় না। যতদিন রক্তে রক্তে আবার দক্ষিণ সমুদ্রের ডাক না আসে—

যতদিন সেই দুঃসাহসের আহ্বান আবার তাকে বিভ্রান্ত না করে—ততদিন এমনিই চলতে থাকুক। ততদিন সরস্বতীর শান্ত স্রোতের মতো বয়ে চলুক জীবন তার তীরে তীরে ছায়া বিছিয়ে দিক আম-জাম-জারুলের বন, ততদিন ঘরের কোনে সন্ধ্যা-প্রদীপ জেলে দিক সুপর্ণা।

বিকেলের রক্তিম আলোয় সরস্বতীর ওপর দিয়ে ডিঙি ভাসিয়ে চলেছিল শঙ্খদত্ত। একটা নিশ্চেষ্ট অবসাদে হাল ধরে বসে ছিল সে—ডিঙি আপনি এগিয়ে চলেছিল স্রোতের টানে।

নদীর ধারে ক্রীশ্চানদের বিরাট কুঠি গড়ে উঠেছে। তার সামনেই গীর্জা। ব্যবসা আর ধর্মপ্রচার। এক সঙ্গে দুটি উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছে ওরা। christaos e speciarias!

কুঠির ঘাটে একখানা জাহাজ নোঙর করে আছে। আর সেই জাহাজ থেকে নামছে একদল ক্রীশ্চান সন্ন্যাসী আর সন্ন্যাসিনী।

শঙ্খদত্ত পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ যেন বুকের ভেতরে একটা ঝড়ের ঘা লাগল এসে! হাত থেকে খসে পড়ল দাঁড়।

নিকষ কালো নিগ্রো আর দফিনী সন্ন্যাসিনীদের মধ্যে একজনের রঙে চাঁপার বর্ণ মেশানো; সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে একবার সে মুখ ফিরিয়ে তাকালো। তার শান্ত মুখের ওপর জ্বলে উঠল বিকেলের আলো।

মাত্র মুহূর্তের জন্যেই তার মুখ দেখতে পেলো শঙ্খদত্ত। তারপরেই তা হারিয়ে গেল কালো অবগুণ্ঠনের আড়ালে।

কিন্তু শঙ্খদত্ত চিনেছে তাকে। সে শম্পা।

এবার আর সে দাঁড় বাইবারও চেষ্টা করল না। স্রোতের টানে নৌকো ভেসে চলল এলোমেলো ভাবে। দেবদাসী—দেবতার বধূ। চিরকালই সে মানুষের স্পর্শ-সীমার বাইরে। তাই দেবতাই তাকে ফিরে নিয়েছেন। নতুন রূপে—নতুন বেশে আবার দেবতার সঙ্গে পুনর্মিলন হয়েছে তার।

জেন্টুর মন্দিরের 'বাল্‌হিডেরাস' (দেবদাসী) সে নয়—সে সন্ন্যাসিনী। আজ সে খ্রীস্টের সেবিকা, নতুন বিগ্রহের সে দেবদাসী। এ দেবতা তাকে হরণ করে গ্রহণ করেছিলেন, এবারেও সে হৃতা! আশ্চর্য যোগাযোগ!

শম্পাকে আর দেখা যাচ্ছে না—সন্ন্যাসিনীদের মধ্যে তাকে আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না আর। শঙ্খদত্ত একবার তাকালো আকাশের দিকে। কত দূরে আকাশ। তার মেঘ, তার নক্ষত্র, তার ইন্দ্রধনু! সে আকাশকে নিয়ে স্বপ্ন গড়া যায়, কিন্তু তাকে স্পর্শও করা যায় না।

সেই মুহূর্তে মেঘের ডাকের মতো গুরু গুরু ধ্বনিতে কেঁপে উঠল আকাশ।

একবার—দুবার—তিনবার! পর্তুগীজদের কুঠি থেকে কামানের শব্দ।

আর বহুকাল আগে কালিকট বন্দরে ডা-গামার অট্ট-হাসির মতো সেই কামানের আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল পূব থেকে পশ্চিমে, উত্তর থেকে দক্ষিণে। বাংলার পথ-মাঠ-পাহাড়-নদী-বন-বনান্তর পার হয়ে সেই শব্দ ভেসে চলল ইতিহাসের দিগন্তে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়াবহ জাগ্রত স্বপ্নে বুঝি চমকে উঠল বাংলা দেশের তাঁতীরা। একটা অস্পষ্ট অস্ফুট যন্ত্রণার মতো বুঝি তাদের মনে হল—কারা যেন তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দিয়ে নিষ্ঠুর হিংসায় এক একটি করে তাদের হাতের আঙুলগুলো কেটে চলেছে!

সমাপ্ত



শরৎচন্দ্রের বিবাহ-প্রসঙ্গ

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

রেঙ্গুনের কনট্রাক্টর ও ভূপর্যটক গিরীন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত "ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র" নামে একখানা বই আছে। এই বইয়ে গিরিনবাবু লিখেছেন, শরৎচন্দ্রের দুই বিবাহ ছিল। প্রথম বিবাহ কবে, কোথায় এবং কিভাবে হয়েছিল গিরিনবাবু সে সম্বন্ধে কিছুই লেখেন নি। তবে তিনি বলেছেন যে, শরৎচন্দ্রের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর নাম ছিল শান্তি দেবী এবং শরৎচন্দ্র তাঁর এই স্ত্রীর খুব অনুরাগী ছিলেন। গিরিনবাবু এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—তিনি স্ত্রীর বড় অনুরক্ত ছিলেন। স্ত্রীকে ছাড়িয়া এক মুহূর্তও থাকিতে কষ্টবোধ করিতেন বলিয়া আমি তাঁহাকে মহা-স্ত্রৈণ বলিয়া উপহাস করিতাম।

স্বপ্নবিলাসী শরৎচন্দ্রের প্রাণে ছিল অপূর্ব প্রেমের ভাণ্ডার, তিনি তাহার সমস্ত খুলিয়া দান করিয়াছিলেন তাঁহার স্ত্রী শান্তি দেবীকে, কিন্তু ভবিতব্যের বিধান অন্যপ্রকার থাকায় ঘটনা অন্যপ্রকার হইল। বিধির বিপাকে বিবাহের দুই বৎসর পরেই তাঁহার প্রথম পক্ষের স্ত্রী প্লেগ রোগাক্রান্ত হইয়া দেহ ত্যাগ করেন।

এরপর গিরিনবাবু শরৎচন্দ্রের প্রথম পক্ষের স্ত্রী শান্তি দেবীর মৃত্যু ও তাঁর শবদাহের এক বিস্তৃত কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

গিরিনবাবু শরৎচন্দ্রের দ্বিতীয়বারের বিবাহ সম্বন্ধে লিখেছেন—"দুই বৎসর পরে শরৎচন্দ্র ছুটি লইয়া কলিকাতা যান এবং দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া সস্ত্রীক রেঙ্গুনে আসিয়া আমার বাড়ীর সন্নিকটে ৩৬নং গলিতে বাড়ী ভাড়া করিয়া কয়েক বৎসর ছিলেন। তাঁহার সন্তানাদি হয় নাই।"

কবি শ্রীনরেন্দ্র দেব শরৎচন্দ্রের একটি জীবনী লিখছেন। সে গ্রন্থের নাম "শরৎচন্দ্র।" সেই "শরৎচন্দ্র" গ্রন্থে নরেনবাবু লিখেছেন—

"...পরদুঃখকাতর কোমল হৃদয়ের অনুপ্রেরণায় এই সময় শরৎচন্দ্রকে অত্যন্ত বিপন্ন অবস্থায় ব্রহ্মদেশে একটি স্বজাতীয় কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে হয়েছিল। সে কাহিনী গল্প কথার ন্যায় রোমান্টিক।

তিনি তখন রেঙ্গুনের যে বাড়ীতে বাস করতেন তার নীচের তলায় একজন মেকানিক বা কলকব্জার মিস্ত্রী ছিল। জাতিতে সে বাঙালী—চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ, বিপত্নীক। সংসারে একটিমাত্র বিবাহ-যোগ্যা অনূঢ়া কন্যা ছাড়া আর কেউ ছিল না। চক্রবর্তীর চরিত্রে ছিল অনেক দোষ। সন্ধ্যার পর কারখানা থেকে ফিরে এসে বাড়িতে সে এক আড্ডা বসাতো। সেখানে জুটতো যত নেশাখোর মাতাল গেঁজেল কারিকর ও বদমাইসের দল। এরাই ছিল তার বন্ধু ও সঙ্গী। অনেক রাত্রি পর্যন্ত চলতো তাদের হুল্লোড়। মেয়েটিকে খাটতে হ'ত এই সব পাষণ্ডদের নানারকম ফাইফরমাস। চক্রবর্তীকে রেঁধে খাওয়ানো, বাসন মাজা প্রভৃতি সংসারের যা কিছু কাজ সবই করতো এই মেয়েটি। কোনো বিষয়ে একটু কিছু ত্রুটি হ'লেই চক্রবর্তী দিত মেয়েকে ধরে নির্মম প্রহার।

শরৎচন্দ্র সন্ধ্যার পর প্রায়ই বাসায় থাকতেন না। অনেক রাত্রে ফিরে এসে ঘরে শুতেন, আবার সকালে উঠে বেরিয়ে যেতেন। একদিন রাত্রে শুতে এসে দেখেন ঘর ভিতর থেকে বন্ধ। কে তার ঘরে ঢুকে খিল দিয়েছে—চোর নয় ত?—তিনি দরজায় জোরে ধাক্কা দিয়ে খুলে দেবার জন্য ডাকতে লাগলেন। একটু পরে দরজা খুলে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল চক্রবর্তীর মেয়ে! থর থর করে সর্বশরীর কাঁপছে তার তখনও—দুচোখ ভেসে যাচ্ছে অশ্রুজলে। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন যে চক্রবর্তী তার বন্ধু পাকা বদমায়েস ও মাতাল ঘোষাল-বুড়োর সঙ্গে মেয়েটির বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছে। ঘোষাল-বুড়ো সেজন্য চক্রবর্তীকে কিছু টাকাও নাকি দিয়েছে। আজ নেশার ঝোঁকে চক্রবর্তীর মেয়েকে সে নিজের পত্নী বলে দাবী করে অন্দরের মধ্যে তেড়ে এসেছিল। মেয়েটি ভয়ে পালিয়ে এসে দাদাঠাকুরের ঘরে খিল দিয়ে আত্মরক্ষা করেছে। কিন্তু এমন করে আর কদিন চলবে! মেয়েটি শরৎচন্দ্রের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল—আপনি আমাকে রক্ষা করুন—আপনি আমাকে বাঁচান।

শরৎচন্দ্র মেয়েটিকে সে রাত্রের মত সেই ঘরেই নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাতে বলে নীচে নেমে চলে গেলেন। বলে গেলেন, ভয় নেই; কাল সকালে আমি ফিরে এসে এর বিহিত করবো।

পরের দিন চক্রবর্তীকে মেয়ের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শরৎচন্দ্র পড়লেন বিপদে। চক্রবর্তী বলে—'মেয়ে বিয়ের যোগ্যা হয়েছে—বিয়ে দেব না? আমি গরীব মানুষ, এই বিদেশে ওর চেয়ে ভাল পাত্র আর কোথা পাবো? ঘোষালের টাকা আছে, ছুঁড়টা ভাত কাপড়ের দুঃখ পাবে না, একটু নেশা ভাঙ করে—তা হোক্। সে তো আমিও করি। আর যদি বয়সের কথা বল বাবু—বেটা ছেলের আবার বয়স কি?

শরৎচন্দ্র অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু চক্রবর্তী সে পাত্রই নয়। ঘোষালের দেনা শরৎচন্দ্র মিটিয়ে দেবেন বললেন, তবুও বলে—না, মেয়ের আমার বিয়ে দিতে হবে ত? শেষকালে চক্রবর্তী ধরে বসলো—এতই যদি তোমার প্রাণে দয়ামায়া বাবু, তুমিই কেন এই গরীব বামুনের মেয়েটাকে নিয়ে আমার জাত কুল রক্ষা কর না।

অগত্যা শরৎচন্দ্রকেই নিতে হয়েছিল সেই মেয়েটির ভার। তাকে নিয়ে শরৎচন্দ্রের দিন সুখেই কাটছিল। একটি পুত্র সন্তানও হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য তখনও ফিরছিল তাঁর পাছে পাছে। রেঙ্গুনে আবার একবার প্লেগের দারুণ মহামারী দেখা দিল—শরৎচন্দ্রের পত্নী-পুত্র সেই প্লেগের আক্রমণে আট চল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে যেন স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেল।

কোমলহৃদয় শরৎচন্দ্র সেদিন বালকের ন্যায় অধীরভাবে কেঁদেছিলেন। তাঁর সেই সকাতর অশ্রু-বিসর্জন দেখে রেঙ্গুনের তাঁর পরিচিত বন্ধু-বান্ধবরা চোখের জল রোধ করতে পারেন নি। রেঙ্গুনের তদানীন্তন প্রসিদ্ধ কণ্ট্রাক্টর মিঃ জি, এন, সরকার বা গিরীন্দ্রবাবু—এই বিপদে শরৎচন্দ্রকে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন।

মধ্যে মধ্যে অল্প কয়েকদিনের জন্য বাঙলাদেশে এসে ভাইবোনদের খবর নিয়ে, আত্মীয়বন্ধুদের সঙ্গে দেখাশুনা করে শরৎচন্দ্র আবার ফিরে যেতেন রেঙ্গুনে। এমনি এক আসা-যাওয়ার মাঝে হিরণ্ময়ী দেবী নামে একটি অসহায়া দরিদ্রা-ব্রাহ্মণ-রমণীকে তিনি দ্বিতীয়বার সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। ইনি মেদিনীপুরনিবাসী ৺কৃষ্ণদাস অধিকারী মহাশয়ের কন্যা।"

শ্রীকানাইলাল ঘোষের লেখা 'শরৎচন্দ্র' নামে আর একখানা বই আছে। কানাইবাবু তাঁর বইয়ে বলেছেন যে, শরৎচন্দ্র একটি বিয়ে করেছিলেন এবং সেই বিয়ে হয়েছিল শৈব মতে। কানাইবাবু শরৎচন্দ্রের সেই বিয়ের কাহিনীটি বিস্তৃতভাবে লিখেছেন। এখানে কানাইবাবুর লিখিত কাহিনীটিও উদ্ধৃত করা গেল—

"...এই ঘটনার (শরৎচন্দ্র যে বাড়ীতে থাকতেন, সেই বাড়ীটি পুড়ে গেলে) পর শরৎচন্দ্র তাঁর প্রিয় সেই কুলিবস্তীর মায়া কাটিয়ে উঠে এলেন রেঙ্গুন শহরে। অভিরাম পতির হোটেলে (কারও কারও মতে চটরাজের হোটেলে) দু'বেলা খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

সেদিন আবহাওয়াটা ভাল ছিল না। শরৎচন্দ্র হোটেল থেকে নেমে রাস্তায় পা দিয়েছেন, একটি বছর পনেরো কি ষোল বছরের মেয়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো। হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—তুমি? তুমি এখানে বামুনদা?

শরৎচন্দ্র তখনও মেয়েটিকে চিনতে পারেন নি।

মেয়েটি তেমনি ব্যাকুল কণ্ঠে বললে, ভুলে গেছ বামুনদা? কলকাতায়—

মুখটা চেনা চেনা মনে হচ্ছিল এতক্ষণ। কলকাতা কথাটায় তাঁর সমস্ত স্মৃতিটা জাগরূক হয়ে উঠলো। মনে পড়ে গেল সৌরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের আখড়ার কথা। চকিতে চোখের তারা দুটো তার জ্বলে উঠলো। চিনতে পারলেন মেয়েটিকে। তখন সে ছিল প্রায় শিশু, এখন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারার অনেক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। তাইত সহসা তাকে চিনে উঠতে পারেন নি। বললেন—হ্যাঁ—হ্যাঁ—তা খবর কি বলত? থাকো কোথায়?

মেয়েটি ব্যাকুলতা প্রকাশ করলো—আমায় তুমি বাঁচাও বামুনদা!

শরৎচন্দ্র তাঁর এই ব্যাকুলতার কারণ খুঁজে পান না। বললেন, কি হয়েছে তোমার, খুলে বলতে পারো স্বচ্ছন্দে।

মেয়েটি চঞ্চল হয়ে উঠলো। চার পাশ একবার ভাল করে তাকিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলো—তোমার বাসা কোথায় বামুনদা? দয়া করে একটু আশ্রয় দাও, তারপর সব কথা তোমায় খুলে বলছি!

বাসাটা ছিল কাছেই। অফিসে যাওয়ার সময়ও হয়ে এসেছিল মেয়েটিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এসে ঢুকলো।

শরৎচন্দ্র বললেন, এখন অফিস যাচ্ছি, পরে বরং দেখা ক'রো আমার যতদূর সাধ্য তোমায় সাহায্য করবো।

মেয়েটি কিন্তু নিঃশব্দে তক্তপোষের নীচে আশ্রয় নিয়ে বললে, তার চেয়ে বরং ঘরে চাবি দিয়ে যাও—আমি কোন মতেই আর বার হচ্ছি নে।

শরৎচন্দ্র বিব্রত হয়ে পড়লেন। বললেন, তা কি হয়?

মেয়েটি উত্তর দিলে, নইলে বাবার হাত থেকে আমার আর মুক্তি হবে না। বিশ্বাস কর, তিনি আমায় বিক্রী করে দিতে চান—দোহাই দা'ঠাকুর আমায় বাঁচাও।

সময় অত্যন্ত সংক্ষেপ। বাধ্য হয়ে তারই কথামত ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন অফিসে।

* * * * *

শুভ অশুভ চিন্তায় মনটা তাঁর ভারাক্রান্ত ছিল। তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফিরে এলেন। কাছে এসে দেখলেন, পুলিশ তাঁর বাসাটা ঘিরে রয়েছে। নিরুপায়ে তিনি ফিরে গেলেন মণিবাবুর (মিত্রের) কাছে। তিনিই শরৎচন্দ্রকে তাঁর অফিসে চাকরী করে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে শুধু আন্তরিক স্নেহ করতেন না—একজন যথার্থ গুণী বলে সমাদরও করতেন যথেষ্ট।—তাঁর রেঙ্গুনের সমস্ত অফিসার ও সম্ভ্রান্ত লোকের সঙ্গে শুধু আলাপ ছিল না, সকলেই তাঁকে মান্য করে চলতেন। তিনিই এসে পুলিশ সাহেবকে ডেকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন; এবং বার বার জোর দিয়ে বলতে লাগলেন—আমরা মেয়েটিকে রক্ষা করতেই চেয়েছি, তার বাপের অত্যাচারের হাত থেকে।

পুলিশ সাহেব চলে গেল। নিবারণ চক্রবর্তী তখন মণিবাবুকে ধরে বসলেন—আপনারা আমার মেয়েকে নিয়ে যা খুশী করুন কোন আপত্তি নেই। শুধু নিবেদন—আমায় নগদ দু'শো টাকা, আর যাতায়াতের খরচাটা দিন।

শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, কারণটা কি?

নিবারণ চক্রবর্তী বললেন, নইলে আমার বাঁচার উপায় থাকবে না। আকিয়াবে ওকে দু'শো টাকায় বিক্রী করেছিলাম, কিন্তু ও পালিয়ে এলো। টাকা ফেরৎ দেবো কথা দিয়েছি,—তাদের লোকও সঙ্গে আছে,—হয় আমায় বাঁচান, নইলে হৈ-চৈ করে বেড়াবো—যাতে এখানে আপনাদের বাস করার উপায় থাকবে না কোনদিন!

অগত্যা শরৎচন্দ্র রাজী হলেন দু'শো টাকা দিতে। মণিবাবুও বাকী টাকা দিতে স্বীকৃত হলেন।

নিবারণ চক্রবর্তী পেয়ে বসলেন, একটা ধুতি ও চাদর দিতে হবে।

মণিবাবু আশ্বাস দিয়ে বললেন, তার জন্যে আপনি ভাববেন না নিবারণবাবু, এখন একটু চুপ করে দাঁড়ান—আপনার মেয়ের কাছ থেকে আমরা ফিরে আসছি এখুনি।

ঘর খোলা হল। নিবারণ চক্রবর্তীও তাঁদের পিছু পিছু ভেতরে ঢুকলেন। তাঁকে দেখেই মেয়েটির মুখ ভয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

চোখের জলে ভাসতে ভাসতে বললে—না—না—দোহাই আপনাদের, ওঁর হাতে আর আমায় ফিরিয়ে দেবেন না।

মণিবাবু তার সামনে যেয়ে দাঁড়ালেন। বললেন—ভয় কি মা? আমরা ত সব রয়েছি।

মেয়েটির চোখের জল তবুও থামতে চায় না। বললে—ভাগ্যে আমার আরও কত দুঃখ আছে কে জানে! আট বছর বয়সে হ'লাম বিধবা। শাশুড়ী বিক্রী করে দিলে—আর একজনের কাছে। সে নিয়ে এলো কলকাতায় ঠাকুর-বাড়ীতে। সেখান থেকে মুক্তি পেলাম। পুনরায় ফিরে এলাম বাবার কাছে, সেখানেও পেলাম না শান্তি। তিনি আবার বিক্রী করলেন আকিয়াবে মুসলমানের কাছে। তারা বন্ধ করে রাখলো সাতদিন। তারপর হাঁটাপথে এসেছি রেঙ্গুন,—এর পরও কি একটুকু আশ্রয় পাবো না?

* * * * *

মণিবাবু অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন! বললেন—না, না, তোমায় আমরা সম্পূর্ণ আশ্বাস দিতে পারি—এখানে তোমার উপর আর কেউ নির্যাতন করবে না। নিবারণবাবুর সমস্ত প্রাপ্য এখুনি আমরা মিটিয়ে দিচ্ছি। বলেই বেরিয়ে এলেন বাইরে।

শরৎচন্দ্রকে কাছে ডেকে বললেন—আপাততঃ তোমার কাছেই থাক—তারপর দেখে শুনে বিয়ের একটা ব্যবস্থা করে দিলেই চলবে।

শরৎচন্দ্রও রাজী হয়ে পড়লেন। বললেন, সেই ভাল। টাকাটা বরং এখনই চুকিয়ে বুড়োকে বিদায় করে দেওয়া যাক। আবার কি ঝামেলা বাধবে, কে জানে!

মণিবাবু ও শরৎচন্দ্র নিবারণবাবুকে ডেকে তাঁর সমস্ত দাবী মিটিয়ে দিলেন। খুশীতে বুড়োর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললেন, সত্যই আপনারা বাবুর মত বাবু আছেন বটে। আমি আবার সে শালাদের ঋণটা শোধ করে দিয়ে আসি। ফিরে কিন্তু এখানেই আজ দুমুঠো খাবো।

নিবারণবাবু চলে গেলেন। মণিবাবু অতি দুঃখেও হেসে ফেললেন। বললেন—দুনিয়াটা সত্যই বিচিত্র হে শরৎ! এমন বাপও দুনিয়ায় থাকে!

নিবারণবাবু লোক যে খুব খারাপ ছিলেন তা নয়। অভাবের তাড়নায়—শোকে দুঃখে এমন একটা স্বার্থান্বেষী জড় প্রকৃতির মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। হাসিমুখে তিনি মেয়েকে বিক্রী করেছিলেন কিন্তু তার সুখ-স্বচ্ছন্দতার কথা ভোলেন নি একটুও। যাওয়ার সময় তিনি মেয়েকে কাছে ডেকে, পাশে বসিয়ে, দুচার ফোঁটা চোখের জল ফেলে বললেন—যে বাবুর হাতে তোমায় তুলে দিয়ে গেলাম—তিনিই তোমায় সুখী করবে মা! দেখো, বুড়ো বাপের আশীর্বাদ কখনও মিথ্যে হবে না।

নিবারণবাবুর আরও দুচার দিন থাকার ইচ্ছা থাকলেও, শরৎচন্দ্রের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে সে ভরসা আর তাঁর হল না। পরদিন তিনি রওনা হয়ে পড়লেন দেশের দিকে।

* * * *

কিছুদিন পরে শরৎচন্দ্র ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মেয়েটি আপ্রাণ সেবা ও যত্নে তাঁকে সুস্থ করে তুললেন। শরৎচন্দ্রও তাঁর এই ঐকান্তিক সেবা ও যত্নে মুগ্ধ হয়ে পড়লেন। মণিবাবু বিয়ের কথা মুখে বলে গেলেও আজ পর্যন্তও কোন চেষ্টাই তিনি করেন নি। শরৎচন্দ্র তাকে বিয়ে করা স্থির করলেন। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলে তিনি তাকে শৈবমতে বিয়ে করলেন। নাম দিলেন হিরণ্ময়ী দেবী।"

শৈলেশ বিশী তাঁর "বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবন প্রশ্ন" গ্রন্থে বলেছেন, শরৎচন্দ্র রাজলক্ষ্মীকে শৈবমতে বিয়ে করেছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—"তিনি তাঁকে বিয়ে করেছিলেন শৈবমতে। যেদিন সেই কথা তাঁর মুখে শুনলুম, আমার সব অমৃতের সন্ধান বিষিয়ে গেল, নিজের অলক্ষ্যে চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে ক' ফোঁটা জল ঝরে পড়লো। আমি স্পষ্টই বললুম, এত বড় ভালবাসাকে আপনি বিয়ে করে অমর্যাদা করলেন? যেটা ছিল স্রোতের জল, স্বচ্ছ পুণ্যতোয়া—ভাগীরথী, আজ সেটাকে বাঁধ দিয়ে করলেন একটা পুকুর, খানা, ডোবা! তিনি কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন—এ ছাড়া উপায় ছিল না, তাছাড়া ও ছাড়ল না।

এতদিনে আমার সম্বিৎ ফিরে এলো, তখন বুঝিনি, না জেনে দাদার মনে আমি কী আঘাতই না দিয়েছি, এখন বুঝেছি—রাজলক্ষ্মী স্বামী চেয়েছিল—সে প্রেমিক চায় নি। গৌরীর মত তপস্যা করেই সে এই ভবঘুরে স্বামী লাভ করেছিল। রাজলক্ষ্মীর জীবনে পূর্ণতা—স্বামী-স্ত্রীর প্রেম। এ অমৃত সকলের ভাগ্যে জোটে না।"

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় "ইংগিত" নামক একটি মাসিকপত্রের ১৩৫৮ ও ১৩৫৯ সালের কয়েক সংখ্যায় "শরৎ-প্রসঙ্গ" নামে একটি লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। তাতে তিনি লেখেন—

"ভারতবর্ষের স্বত্বাধিকারীর ভরসা পেয়ে শরৎচন্দ্র এক বছরের ছুটি নিয়ে কলকাতা এলেন ১৯১৬ সালের এপ্রিল মাসে।…কলকাতায় এসে তিনি তাঁর দিদি অণিমা দেবীর বাসার কাছে বাজে শিবপুরে নীলকমল কুণ্ডুর লেনে বাসা করলেন। দেবানন্দপুরের বাড়ী ও ভিটে দেনায় বিক্রী হয়ে গিয়েছিল—এসে সেটা উদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন, চেষ্টা সফল হয়নি।

বাজে শিবপুরে বাসা বাঁধলে তাঁর ছোট ভাই প্রকাশ তাঁর কাছে এসে বাস করতে এল। আর একজন এলেন—তাঁর কথা আমরা আগে শুনিনি, আত্মীয়রাও বোধ হয় শোনেনি। তিনি শরৎচন্দ্রের স্ত্রী। শরৎচন্দ্র যে বিবাহ করেছিলেন তা আমরা জানতাম না। শুনেছি ভবঘুরে অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে একস্থানে তিনি বিবাহ করেন। কিন্তু

তখন তাঁর চালচুলো কিছু ছিল না, কাজেই তাঁর সঙ্গে এতদিন সংসার করা হয়নি। রেঙ্গুনেও তাঁর চালচুলো হয়নি। সেখানে হোটেলে থেতেন ও ১টি ঘর ভাড়া করে—দরিদ্রভাবে দিনযাপন করতেন। শরৎচন্দ্রের বর্মা-প্রবাসের সঙ্গী সতীশচন্দ্র দাস লিখেছেন—'যেদিন শরৎচন্দ্র মায়ের গঙ্গাজলের চিঠি পাইয়া—তাঁহার বাড়িতে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলেন,—মাসীমা কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন, সেদিন মাসীমার ক্রন্দনে শরৎদা অনন্যোপায় হইয়া কি ভাবে মাসীমাকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর পাঠক-পাঠিকাগণ তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন।' সতীশবাবুর কথা বেশ স্পষ্ট নয়। তবে অবিশ্বাস্য হইবারও কোন কারণ নাই। আমার কোনদিন এ বিষয়ে প্রশ্ন করিবার সাহস হয় নাই। শরৎদাদা 'আমার স্ত্রী' না বলিয়া তোমার বৌদিদি কথাটাই ব্যবহার করিতেন। আমরা বৌদিদি বলিয়াই জানিতাম।

প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লেখা শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত নিম্নলিখিত পত্রাংশ হ'তে জানা যায়—শরৎচন্দ্র যখন ব্রহ্মদেশে ছিলেন—তখনও শরৎচন্দ্রের স্ত্রী তাঁর কাছে শেষের দিকে ছিলেন। 'চাকরটার অসুখ, আমায় নিজেই বাজার যেতে হয়। না গেলে যিনি আছেন তিনি বলেন—'খেতে পাবে না। ইনি ত দিনরাত পূজো আচ্চা নিয়েই থাকেন।'

আর একখানা পত্র হতে জানা যায়—তিনি প্রমথবাবুকে লিখেছেন—চোরবাগানে তাঁর স্ত্রীকে টাকা দেওয়ার জন্য। সেই সঙ্গে প্রমথবাবুকে অনুরোধ করা হয়েছে—একটি ভদ্র পরিবারের সঙ্গে তাঁকে রেঙ্গুন পাঠানোর জন্য। শরৎচন্দ্র লিখেছেন—'এঁরা না এলে লিখতে পারছি না।'

এতদিনে শিবপুরে তিনি বাসা বেঁধে দিদির অনুরোধে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে এলেন। এখন শরৎচন্দ্র পুরাদস্তুর সংসারী। ভাইএরও বিবাহ হ'লো। এতদিন বাদে শরৎচন্দ্র নারীহস্তের সেবাযত্ন পেয়ে শুধু গৃহস্থ নয়, প্রকৃতিস্থ হলেন। (কার্তিক—১৩৫৮)

* * * * *

কৈশোরকাল হ'তে প্রৌঢ়কালের আরম্ভ পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল শরৎচন্দ্র নারীহস্তের সেবাযত্ন পাননি—তিনি এই সেবাযত্নের ভিখারী ছিলেন।... বাজে শিবপুরের বাড়ীতে তিনি প্রথম সেবাযত্ন লাভ করতে লাগলেন। (অগ্রহায়ণ—১৩৫৮)"

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, গিরীন্দ্রনাথ সরকারের "ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র", নরেন্দ্র দেবের "শরৎচন্দ্র", কানাইলাল ঘোষের "শরৎচন্দ্র", শৈলেশ বিশীর "বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবনপ্রশ্ন", কালিদাস রায়ের প্রবন্ধ—এই সমস্তগুলিতেই শরৎচন্দ্রের বিবাহ সম্পর্কে এক একজনে প্রায় এক এক রকম কথা বলেছেন। এঁরা তবুও তো বিয়ের কথা বলেছেন, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আবার ঠিক বিয়ের কথা বলেন নি। তিনি তাঁর "শরৎ-পরিচয়" ও "শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়" নামক গ্রন্থ দু'খানিতে "শরৎচন্দ্রের স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবী" না বলে "শরৎচন্দ্রের জীবনসঙ্গিনী হিরণ্ময়ী দেবী" বলে গেছেন। হিরণ্ময়ী দেবীকে শরৎচন্দ্রের স্ত্রী বোঝাতে 'জীবনসঙ্গিনী' শব্দের ব্যবহার করেছেন কিনা, এ সম্পর্কে আমি একদিন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করেছিলাম। উত্তরে তিনি বলেছিলেন—সাধারণ সামাজিক অর্থে আমরা যাকে বিয়ে বলে থাকি, শরৎচন্দ্র সেরূপভাবে হিরণ্ময়ী দেবীকে বিয়ে করেননি বলে আমি স্ত্রী না লিখে জীবনসঙ্গিনী লিখেছি।*

এখন গিরিনবাবু, নরেনবাবু, কানাইবাবু, শৈলেশবাবু, কালিদাসবাবু ও ব্রজেনবাবু এঁদের কার কথা যে মিথ্যে, আর কার কথা যে সত্য, তাও আবার কতখানি সত্য, তা বোঝা বেশ কঠিন।

শৈলেশবাবু বলেছেন—রাজলক্ষ্মীকে শৈবমতে বিয়ে করার কথা তিনি নিজে শরৎচন্দ্রের মুখে শুনেছেন। এদিকে গিরিনবাবু, নরেনবাবু ও কানাইবাবু এঁরা তো প্রত্যেকেই এঁদের বর্ণিত কাহিনীসমূহকে সত্য বলে প্রচার করবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টাও করেছেন। যেমন—গিরিনবাবু লিখেছেন—"রেঙ্গুনপ্রবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে আমিই তাঁহার প্রথম বন্ধু।" এছাড়া গিরিনবাবু তাঁর গ্রন্থের ভূমিকাতেও বলেছেন যে, ব্রহ্মদেশে সুদীর্ঘ ১৪ বৎসর কাল শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব ও প্রীতির সম্বন্ধ ছিল। তিনি শরৎচন্দ্রের জীবনের বহু ছোট বড় ঘটনা ও চিত্তাকর্ষক কাহিনী জানতেন। সেই সব ঘটনা ও কাহিনী তিনি তাঁর ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র গ্রন্থে লিখে গেছেন।

নরেনবাবুও তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন..."তাঁর বিস্তৃত ও বিচিত্র জীবনের শুধু একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছি মাত্র।...

সে আশ্চর্য পুরুষটির সুসম্পূর্ণ জীবনী কোনদিন কেউই রচনা করতে পারবেন কিনা সন্দেহ।"

নরেনবাবু তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় এই কথা লিখলেও তিনি তাঁর গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনীগুলি যে সমস্তই সত্য, তা প্রমাণ করবার জন্য শরৎচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দিয়ে তাঁর গ্রন্থ সম্বন্ধে একটি অভিমত লিখিয়ে নিয়েছেন এবং সেই অভিমতটি তিনি তাঁর গ্রন্থের প্রথমেই জুড়ে দিয়েছেন। প্রকাশবাবু লিখেছেন—"নরেনবাবু আমাদের পরিবারের বহুদিনের বন্ধু, দাদার যে সংক্ষিপ্ত জীবনী তিনি লিখেছেন, আমরা তা দেখেছি। এর মধ্যে কোথাও অসত্য বা অতিরঞ্জন নেই।"

এদিকে কানাইবাবু তাঁর লেখাকে সত্য বলে প্রমাণিত করবার জন্যে তিনিও তাঁর গ্রন্থের প্রথমেই একটি বিস্তৃত 'নিবেদন' লিখেছেন। কানাইবাবু তাতে বলেছেন—"অমর বা অপরাজেয় কথাশিল্পী স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ম'শায়ের পরিপূর্ণ জীবনী সংগ্রহ করা সত্যই দুরূহ ব্যাপার। যতটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছি, ততটুকুই এই ক্ষুদ্র রচনায় প্রকাশ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি।......

* নরেন্দ্র দেবও হিরণ্ময়ী দেবীর কথায় বলেছেন—শরৎচন্দ্র হিরণ্ময়ী দেবী নামে একটি অসহায় দরিদ্রা ব্রাহ্মণ রমণীকে দ্বিতীয়বার সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের প্রিয়শিষ্য ও সঙ্গী, সুসাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়…প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহায়তায় ও আন্তরিকতায় তাঁর জীবনের বহু গোপন তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়েছে।

শুধু এইটুকু বললে—তাঁদের ব্যক্তিগত সাহায্যদানকে ক্ষুণ্ণ করা হবে। তাঁরা কাহিনী দিয়েছেন এবং পাণ্ডুলিপিখানি আন্তরিকতার সঙ্গে পড়েও দেখেছেন।"

কানাইবাবু শুধু এই নিবেদন লিখেই ক্ষান্ত হন নি। তিনি "শরৎচন্দ্রের প্রিয়শিষ্য ও সঙ্গী" শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে দিয়ে তাঁর গ্রন্থ সম্বন্ধে একটি অভিমত লিখিয়ে, সেই অভিমতটি তাঁর গ্রন্থের ললাটে এঁটে দিয়েছেন।

সুরেনবাবুর অভিমতটি অবশ্য তেমন কিছুই নয়। এতে কানাইবাবুর বই সম্বন্ধে কিছু না লিখে তিনি বরং তাঁর নিজের কথাই লিখে গেছেন। তবে তাঁর লেখার শেষের ক'লাইন কানাইবাবুর বই সম্বন্ধে কাজে লাগানো যেতে পারে। সুরেনবাবু লিখেছেন—"তাঁর সঙ্গে বহুতরভাবে মেলামেশার জন্য তাঁর জীবনের কাহিনী এবং রহস্য জানার অবসর এবং সৌভাগ্য ঘটেছিল আমার। তিনি কোন কথাই প্রায় গোপন করতেন না আমার কাছে। শরৎচন্দ্রের জীবনী বিবৃতির সময় এই কথা মনে রেখেই কাজ করেছি। স্বকপোল-কল্পনার স্থান হয়নি বোলেই আমার দৃঢ়-বিশ্বাস।"

গিরীন্দ্রনাথ সরকার, নরেন্দ্র দেব, কানাইলাল ঘোষ প্রভৃতি প্রত্যেকেই নিজ নিজ বর্ণিত বিষয়কে সত্য বলে প্রমাণিত করবার চেষ্টা করলেও, এঁদের বর্ণনা যখন পরস্পর-বিরোধী তখন নিশ্চয়ই এই সব কাহিনীর মধ্যে কোথাও কিছু না কিছু অসত্য আছেই। কেন না সত্য এক, তার কখনো দ্বিরূপ হতে পারে না।

এখন এঁদের কার কথা সত্য, বা আদৌ কারো কথার মধ্যে কোন সত্য আছে কিনা সে সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছবার জন্য এঁদের কাহিনীগুলি নিয়ে একে একে আলোচনা করা দরকার। শ্রীকানাইলাল ঘোষের বর্ণিত কাহিনীটিই সব চেয়ে চাঞ্চল্যকর। তাই প্রথমে কানাই-বাবুর কাহিনীটি নিয়েই আলোচনা সুরু করা গেল —

কানাইবাবুর বর্ণিত কাহিনীটির প্রথমেই আছে, শরৎচন্দ্র যে-বাড়ীতে থাকতেন, সেই বাড়ীটি পুড়ে গেলে তিনি "তাঁর প্রিয় কুলী-বস্তীর মায়া কাটিয়ে রেঙ্গুন শহরে উঠে এলেন।"

কানাইবাবুর এই কথাটি সত্য নয় বলে আমি মনে করি। কেননা শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ হ'লে তিনি তখন সেই "কুলী-বস্তী" ত্যাগ করে রেঙ্গুন শহরে না এসে সেই "কুলী-বস্তীতেই" ছিলেন। এ সম্বন্ধে আমার যুক্তি ও বক্তব্য এই—

রেঙ্গুন শহরে ধানের কল, কাঠের কল, ডক্‌ইয়ার্ড, ঢালাই কারখানা প্রভৃতির ফিটার, বাইশম্যান ও ঢালাই মিস্ত্রীর কাজ বাঙ্গালী মিস্ত্রীদের একরূপ একচেটিয়া ছিল। তারা দলবদ্ধ হয়ে শহর থেকে মাইল দুই দূরে বোটাটং ও পোজনডং অঞ্চলে বাস করত। এখানে এদের জন্য সারি সারি কাঠের ব্যারাকবাড়ী ছিল। শরৎচন্দ্র এদের মধ্যেই বোটাটং অঞ্চলে একখানা কাঠের বাড়ী ভাড়া করে থাকতেন।

শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুন প্রবাসকালে সতীশচন্দ্র দাস নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর ছ'সাত বৎসর কাল বন্ধুত্বভাব ছিল। এঁরা বোটাটং ষ্ট্রীটের একটি মেসে একত্র কিছুদিন ছিলেন। ঐ মেস বাড়ীর তিন তলায় থাকতেন সতীশবাবু, আর চার তলায় থাকতেন শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্রের উক্ত গৃহদাহের প্রসঙ্গে তাঁর রেঙ্গুনের এই বন্ধু সতীশবাবু তাঁর "শরৎ-প্রতিভা" গ্রন্থে লিখেছেন—

"বোটাটং লান্সডাউন ষ্ট্রীটে একটা দোতলা কাঠের বাড়ীতে শরৎদা বাস করিতেছিলেন, সেই লাইনে সবই কাঠের বাড়ী ছিল। সামনে প্রকাণ্ড মাঠ। মাঠের অনতিদূরেই ঐরাবতী নদী। শহরের উপরে থাকা শরৎদা মোটেই পছন্দ করিতেন না।……

হঠাৎ একদিন ষ্ট্রীটের শেষভাগে একটা কাঠের বাড়ীতে আগুন ধরিয়া যায়। আমরা তখন শরৎদার বাড়ীর সামনের মাঠে বসিয়া গল্প-গুজব করিতে করিতে সান্ধ্য সমীরণের সুশীতল বায়ু সেবন করিতেছিলাম। হঠাৎ আগুন দেখিয়া—সকলেই চীৎকার করিয়া উঠিলাম, কিন্তু দেখে কে, অগ্নিদেব লক্ লক্ জিহ্বা বিস্তার করিয়া দরিদ্রের পর্ণকুটীরগুলি একে একে গ্রাস করিতে লাগিল।……তিনি (শরৎচন্দ্র) তখনি অনতি-দূরে আলিমুল্লার বাজারের পাশে একখানা বাড়ী ভাড়া করিয়া ঘরের বারান্দা হইতে দেখিতে লাগিলেন, তাঁর অতি সাধের তৈলচিত্র, ঘরের সাজ-সরঞ্জাম, বই পুস্তক ইত্যাদি অগ্নিদেব কিভাবে গ্রাস করিতেছিল।"

শরৎচন্দ্র এই সময় মাঠ ও নদীর ধারে যে থাকতেন, এ কথা সত্য। কেননা শরৎচন্দ্র এই সময় তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে রেঙ্গুন থেকে ২২-৩-১২ তারিখের এক পত্রে লিখেছিলেন—"আমার সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহিয়াছ—তাহা সংক্ষেপে কতকটা এইরূপ—

(১) সহরের বাহিরে একখানা ছোট বাড়ীতে মাঠের মধ্যে এবং নদীর ধারে থাকি।

(৪) আগুনে পুড়িয়াছে আমার সমস্তই। লাইব্রেরী এবং চরিত্রহীন উপন্যাসের manuscript—"নারীর ইতিহাস" প্রায় ৪০০।৫০০ পাতা লিখিয়াছিলাম তাও গেছে।……"

এখানে সতীশবাবুর লেখা এবং শরৎচন্দ্রের চিঠি উভয় থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, গৃহদাহের পরে শরৎচন্দ্র শহরে উঠে না এসে শহরের বাইরে তাঁর সেই প্রিয় মিস্ত্রী-বস্তীতেই ছিলেন।

রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ যে একবার মাত্রই হয়েছিল, সে বিষয়ে কারও দ্বিমত নাই। অতএব কানাইবাবু তাঁর কাহিনীর অবাধ পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শরৎচন্দ্রকে তাঁর সেই প্রিয় মিস্ত্রী-বস্তী থেকে শহরের অচেনা জায়গায় আনার যে কথা বলেছেন, তা সত্য নয়।

আর একটা কথা—কানাইবাবু তাঁর বর্ণিত কাহিনীর মধ্যে লিখেছেন, শরৎচন্দ্র অফিস থেকে ফিরে এসে দেখলেন, পুলিশ তাঁর বাসাটি ঘিরে রয়েছে।

কানাইবাবুর বর্ণনা থেকে কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যায় যে, শরৎচন্দ্র

যখন মেয়েটিকে তার ঘরে চাবি দিয়ে আফিসে চলে গেলেন, তখন কেউই এ ব্যাপার আদৌ কিছু টের পেল না। আচ্ছা যাক্। এদিকে পুলিশের সঙ্গে মেয়েটির বাবা—নিবারণ চক্রবর্তীকে যখন দেখা যাচ্ছে, তখন মনে হয় চক্রবর্তীই পুলিশকে ডেকে এনেছে। কানাইবাবু বলেছেন—পুলিশ-সাহেব মণিবাবুর কথা শুনে চলে গেল। অথচ আশ্চর্য ঠেকে এই যে, যে নিবারণ চক্রবর্তী পুলিশ সাহেবকে ডেকে আনল, পুলিশ সাহেব চলে যাবার সময় তাকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করল না? আর যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সেই মেয়েটিকেও কি কোন কথা জিজ্ঞাসা করা পুলিশ আদৌ কর্তব্য বলে মনে করল না?

কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, এই নিবারণ চক্রবর্তী হঠাৎ এখানে এসে জুটল কোথা থেকে? কানাইবাবুর লেখা থেকে তো মনে হয়—সে রেঙ্গুনে থাকত না! কেন না মেয়েটি যখন বলছে—"আট বছর বয়সে হলাম বিধবা। শাশুড়ী বিক্রী করে দিলে আর একজনের কাছে। সে নিয়ে এলো কলকাতায়—ঠাকুর বাড়ীতে। সেখান থেকে মুক্তি পেলাম। পুনরায় ফিরে এলাম বাবার কাছে। সেখানেও পেলাম না শান্তি। তিনি আবার বিক্রী করলেন আকিয়াবে মুসলমানের কাছে। তারা বন্ধ করে রাখলো সাত দিন। তারপর হাঁটা পথে এসেছি রেঙ্গুন—এরপরও কি এতটুকু আশ্রয় পাব না?"

মেয়েটি রেঙ্গুনে কার কাছে যে আশ্রয় পাবে বলে এল, তার কোন উল্লেখ নেই। তবে তার বাপের কাছে নয় বলেই মনে হয়, কারণ যে বাপ তাকে ব্রাহ্মণ হয়েও মুসলমানের কাছে বিক্রী করতে পারে, আবার কি তার কাছেই ফিরে গিয়েছিল?

এছাড়া কানাইবাবু আরও লিখেছেন—"নিবারণ চক্রবর্তী তখন মণিবাবুকে ধরে বসলেন……আমায়—নগদ দুশো টাকা আর যাতায়াতের খরচটা দিন।……

অগত্যা শরৎচন্দ্র রাজী হলেন দুশো টাকা দিতে। মণিবাবুও বাকি টাকা দিতে স্বীকৃত হলেন।"

এখানে মণিবাবু—যে বাকি টাকাটা অর্থাৎ যাতায়াতের টাকাটা নিবারণ চক্রবর্তীকে দিলেন, তা নিশ্চয়ই দু'এক টাকা নয়, কিছু বেশি টাকা বলেই মনে হয়। দু'এক টাকা হ'লে শরৎচন্দ্র ঐ দুশো টাকার সঙ্গেই দিয়ে দিতে পারতেন।

নিবারণ চক্রবর্তী কি করত, কোথায় থাকত সে সম্বন্ধে কানাইবাবু কিছুই বলেন নি। তবে মণিবাবুর বাকি টাকা দেওয়া—অর্থাৎ চক্রবর্তীর যাতায়াতের খরচা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, রেঙ্গুন থেকে বেশ কিছুটা দূরেই সে থাকত।

কানাইবাবু তাঁর কাহিনীর উপসংহারেও লিখেছেন—"পরদিন তিনি (নিবারণ চক্রবর্তী) রওনা হয়ে পড়লেন দেশের দিকে।" এই কথা থেকেও বেশ বোঝা যায় যে, চক্রবর্তী রেঙ্গুনে থাকত না। চক্রবর্তী শরৎচন্দ্রের বাড়ী থেকেই যখন একেবারে দেশের দিকে রওনা হচ্ছে, তখন এটাও অনুমান করা যেতে পারে যে, রেঙ্গুনের কোথাও তার কর্মস্থল বা সাময়িক বাসস্থলও ছিল না।

এ ত গেল চক্রবর্তীর রেঙ্গুনে না থাকার পক্ষে যুক্তি। এদিকে কিন্তু আবার কানাইবাবু লিখছেন—"আকিয়াবে ওকে দুশো টাকায় বিক্রী করেছিলাম, কিন্তু ও পালিয়ে এলো। টাকা ফেরৎ দেবো কথা দিয়েছি—তাদের লোকও সঙ্গে আছে। আমি আবার সে শালাদের ঋণটা শোধ করে দিয়ে আসি। ফিরে কিন্তু এখানেই আজ দুমুঠো খাব।"

এখানে আবার, ঋণটা শোধ করে ফিরে এসে এখানেই আজ দুমুঠো খাব বলায়, মনে হয় যেন শরৎচন্দ্রের বাড়ীর অদূরেই কোথাও চক্রবর্তীর একটা আস্থানা ছিল এবং সেই আস্থানাতেই "তাদের লোক" অর্থাৎ যাকে সে তার মেয়েকে বিক্রি করেছিল, সে বা তার কেউ অপেক্ষা করছিল।

কানাইবাবুর কাহিনীর মধ্যেকার এই এলোমেলো উক্তি ছাড়াও তিনি আরও যেসব অর্থহীন কথা বলেছেন, এবার সে সবের আলোচনা করা যাক্।

কানাইবাবু তাঁর গ্রন্থের নিবেদনে লিখেছেন, সুরেনবাবু তাঁকে শরৎচন্দ্রের জীবনের বহু গোপন তথ্য দিয়েছেন এবং তিনি কানাইবাবুর বইয়ের পাণ্ডুলিপি খানি পড়েও দেখেছেন। এদিকে সুরেনবাবুও তাঁর 'অভিমতে' বলেছেন, শরৎচন্দ্র কোন কথাই প্রায় তাঁর কাছে গোপন করতেন না। তাই স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে, কানাইবাবুর বর্ণিত শরৎচন্দ্রের এই অপরূপ বিয়ের কাহিনীটি কি সুরেনবাবুই বলেছেন? না কানাইবাবু অন্য কোথা থেকে সংগ্রহ করলেও সুরেনবাবুও জানতেন। তা না হ'লে তিনি পাণ্ডুলিপি পড়ে কোন আপত্তি করলেন না কেন? না সুরেনবাবু কানাইবাবুর বর্ণিত কাহিনীটি দেখেও সমর্থন করে গেলেন?

আমি একদিন সুরেনবাবুর বাড়ীতে গিয়েছিলাম। ঐদিন সুরেনবাবুকে প্রশ্ন করেছিলাম—কানাইবাবুর লেখা শরৎচন্দ্রের বিবাহ কাহিনীটি কি সত্য?

তিনি কাহিনীটি শুনতে চাইলে, আমি কাহিনীটি তাঁকে শোনালাম শুনে তিনি মহাবিস্মিত হয়ে বললেন—আঁা, তাই আছে নাকি?

বললাম—আপনি কি তবে পাণ্ডুলিপি পড়েন নি?

—না, না, আমি তো পড়িনি!

—তবে না পড়েই অভিমত লিখে দিলেন?

—কানাই এসে ধরলে, তাই সাধারণভাবে অমনি একটা লিখে দিয়েছি। কিন্তু এ রকম কথা যে আছে, তাতো জানতাম না! যদি থাকে তাহলে তো সত্যিই বড় অন্যায় কথা!

এইতো গেল সুরেনবাবুর কথা। সেদিন আবার কানাইবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হল। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম—শরৎচন্দ্রের এই অপরূপ বিবাহ কাহিনীটি কোথায় পেলেন বলুন তো?

উত্তরে তিনি বললেন যে, কাহিনীটি তিনি সুরেন গাঙ্গুলী মশায়ের কাছ থেকে শুনেছেন।

শুনে আমি বিস্মিত হয়ে বললাম—এ কি বলেন মশায়? আপনার বইয়ে এই কাহিনী আছে—না জেনে ভূমিকা লিখেছেন বলে সুরেনবা

সেদিন কত অনুতাপ করেছিলেন, আর আপনি বলছেন কিনা তিনিই এই কাহিনী আপনাকে শুনিয়েছেন !

কানাইবাবু তবুও বললেন, এ কাহিনী তাঁকে সুরেনবাবুই বলেছেন। এখন মুস্কিল এই যে, সুরেনবাবু ও কানাইবাবু এঁদের কার কথা যে সত্য তা বোঝা কঠিন। তবে সুরেনবাবুর কথাই সত্য বলে অনুমান হয়। তিনি কানাইবাবুকে শরৎচন্দ্রের বিবাহ কাহিনীটি বলা তো দূরের কথা, কানাইবাবুর পাণ্ডুলিপিটি পড়েন নি বলেই মনে হয়। সুরেনবাবু অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়েছেন এবং চোখেও খুব কম দেখেন। তিনি যে পাণ্ডুলিপি-খানি পড়েন নি, একথাই বিশ্বাস্য। সুরেনবাবু শরৎচন্দ্রের বয়োকনিষ্ঠ মাতুল এবং বাল্যবন্ধু। শরৎচন্দ্রের উপর তাঁর যে গভীর শ্রদ্ধা তা আজও তাঁর মধ্যে বর্তমান রয়েছে। তিনি যদি কানাইবাবুর পাণ্ডুলিপিটি পড়তেন তাহলে শুধু শরৎচন্দ্রের বিবাহ কাহিনীটিই নয়, কানাইবাবুর বর্ণিত আরও বহু কাহিনীতেই তিনি আপত্তি করতেন।

কানাইবাবু তাঁর গ্রন্থের নিবেদনে লিখেছেন—"কিন্তু তাঁর বিবাহ সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভবপর হয়নি।"

অথচ অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, কানাইবাবু একথা লেখা সত্ত্বেও তিনি কি করে স্থির সিদ্ধান্ত করে শরৎচন্দ্রের বিবাহ নিয়ে এরূপ একটা অদ্ভুত ও আপত্তিকর মনগড়া কাহিনী লিখে গেলেন ?

এ সম্বন্ধে কারণ দেখিয়ে কানাইবাবুই বলেছেন,—"কারণ, স্বর্গীয় শ্রদ্ধেয় গিরীন সরকার মহাশয় রচিত "ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র" নামক গ্রন্থে তিনি যে সব কাহিনী বর্ণনা করে গেছেন,—তার সকল বিষয়বস্তুর সঙ্গে অনেকেই একমত হতে পারেন নি। বরং অনেকের মতে সেই নির্যাতিত পতিত সমাজে, বহু নারীর পরিত্যক্ত মৃত দেহ, তিনি স্বেচ্ছায় নিজ স্ত্রীর পরিচয়ে, সৎকারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সুতরাং শ্রদ্ধেয় নরেন দেব ও গিরীন সরকার ম'শায় বর্ণিত শান্তি দেবী যে, তাঁর বিবাহিত প্রথমা স্ত্রী তার কোন স্থির-সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভবপর হল না। তাই যে যে কাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্য দেখা গিয়েছে, সেগুলি শ্রদ্ধার সঙ্গে এই রচনায় সংগৃহীত হয়েছে, বিশেষ ক'রে তাঁর রচনায় প্রকাশিত কয়েকটি গান। সেগুলি যে সত্য—তা প্রমাণ করা শুধু দুঃসাধ্য নয়, আমার শক্তির অতীত বস্তুও বটে।"

কানাইবাবুর এই যে লেখাটি এখানে উদ্ধৃত করলাম, লেখাটি যেমন অর্থহীন, তেমনি সঙ্গতিশূন্য। প্রথমতঃ তিনি গিরিনবাবু ও নরেনবাবুর লেখার সমালোচনা করতে গেছেন বটে, কিন্তু এঁদের লেখা মন দিয়ে পড়েন নি। পড়লে তিনি দেখতে পেতেন যে, নরেনবাবু তাঁর লেখার মধ্যে কোথাও শরৎচন্দ্রের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর নাম যে শান্তি দেবী এ কথা লেখেন নি। দ্বিতীয়তঃ গিরিনবাবু যেখানে বলেছেন—শরৎ-চন্দ্রের স্ত্রী শান্তি দেবীকে তিনি নিজে দেখেছেন, এমন কি শরৎচন্দ্রকে তিনি "মহা স্ত্রৈণ" বলেও উপহাস করতেন, সেখানে স্ত্রীর কথা ছেড়ে পতিতা সমাজের নারীর কথা উত্থাপন করার প্রয়োজন কি ? এখানে গিরিনবাবুর কথাকে অন্যভাবে খণ্ডন করা কানাইবাবুর উচিত ছিল। আর শুধু মৃতদেহ সৎকারের জন্য শরৎচন্দ্র অহেতুক মৃত পতিতা নারীদের নিজের স্ত্রীই বা বলতে যাবেন কেন ! তাই একবার নয়, দুবার নয়, বহুনারীর পরিত্যক্ত মৃতদেহ এই বলে সৎকার করেছেন ?

কানাইবাবু—নরেনবাবু ও গিরিনবাবুর বর্ণিত শরৎচন্দ্রের প্রথম বিবাহ সম্বন্ধে "কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভবপর হ'ল না," বলে তিনি যে বললেন—"তাই যে কাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্য দেখা গিয়েছে, সেগুলি শ্রদ্ধার সঙ্গে এই রচনায় সংগৃহীত হয়েছে।" কিন্তু কানাইবাবু তাঁর বর্ণিত শরৎচন্দ্রের বিবাহের এই অদ্ভুত কাহিনীটির সঙ্গে, কোথায় কোন্ কাহিনীর তিনি যে সামঞ্জস্য পেলেন, তার কোনও হদিস্ দিলেন না। বরং তিনি বিয়ের কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ আবার গানের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখতে গেছেন।

এখন কানাইবাবুর বর্ণিত কাহিনীটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলো-চনা করে দেখা গেল যে, কাহিনীটি যেমন সঙ্গতিশূন্য ও ভিত্তিহীন, তেমনি সম্পূর্ণ ই অসত্য। আর শুধু এই কাহিনীটিই নয়, কানাইবাবুর গ্রন্থের অধিকাংশ কাহিনীই যে আজগুবি, * তা যে কেউ পড়লেই অতি সহজেই দেখতে পাবেন।

(ক্রমশঃ)

* কানাইবাবুর গ্রন্থের এই আজগুবি গল্পগুলি নিয়ে পরে আলোচনা করবার ইচ্ছা আছে।



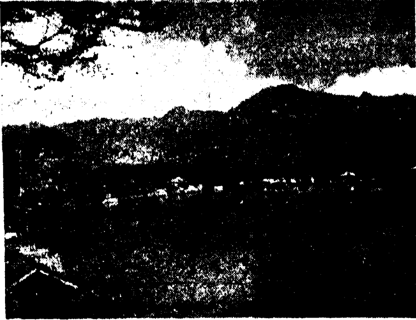


কাশ্মীর

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

যে সব রসলিপ্সু, মানসবল ও উলারের ভরা যৌবনের রস উপভোগ কোরতে চান তারা ডোঙ্গা অথবা বড় হাউসবোটে জলপথে এখানে বেড়াতে পারেন। এতে অর্থ ও সময় অবশ্য অনেক বেশী লাগে, তবে অবসর আনন্দে কাটাবার এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করবার এ একটী প্রকৃষ্ট পথ। ছোট ডোঙ্গায় এ যাত্রাটীর জন্য ব্যয় হয় ৫০।৬০ টাকা; সময় লাগে প্রায় ৫।৬ দিন। হাউসবোটে প্রায় ৩৫০।৪০০ টাকা পড়ে, সময় লাগে প্রায় ১০ দিন। বিতস্তা থেকে সাদিপুর হোয়ে সুরু খাল দিয়ে এলে সোজা পথে উলার আসা যায়। সুরু খাল দিয়ে না গিয়ে সোজা নদীপথে এলে সম্বল ও পরে মানসবল আসা যায়। মানসবল থেকে আবার



দূর থেকে নাগিন-বাগ

সম্বল হোয়ে আর একটী সোজা খাল দিয়ে উলার ও বন্দীপুরা যাওয়া যায়। সাদিপুরে সিন্ধু ও বিতস্তার সঙ্গম ঘোটেছে, কাজেই এখান থেকে সিন্ধু নদী দিয়ে গন্ধর্বল ও ক্ষীরভবানী যাওয়া যায়। এর পূর্ব্বে যখন কাশ্মীর গিয়েছিলাম জলপথেই আমরা এগুলি দেখেছিলাম। শ্রীনগর থেকে সাদিপুর সম্বল হোয়ে বন্দীপুরা ও মানসবল যাবার গাড়ীর পাকা রাস্তাও আছে। এই সাদিপুর হোল সম্রাট ললিতাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত (৭০১-৭৩৪ খৃঃ অঃ) পরিহাসপুর। আজও তার আশে পাশে ললিতাদিত্যের সময়কার মন্দির, প্রাসাদ ও বৌদ্ধ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ আছে। অতীত স্মৃতির অতলতলে এই সব মৌন ম্লান সাক্ষ্যের সন্ধানে ডুবে যেতে যাঁরা আনন্দ পান, তাঁরা এখানের একমানপুরের কাছে ভৈন স্বামীর মন্দিরের, মালিকপুরের ও দিতারগ্রামের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধযুগের অনেক অকথিত কাহিনীর গুঞ্জন শুনতে পাবেন।

ললিতাদিত্যের পরিহাসপুরের পরিহাস-কেশব মন্দিরের সঙ্গে বাঙ্গালী জাতির বীরত্বের এক উজ্জ্বল কাহিনী রাজতরঙ্গিনীতে কথিত আছে। ললিতাদিত্য কান্যকুব্জ পর্য্যন্ত জয় করেন, কিন্তু বীর বাঙ্গালাকে জয় কোরতে না পেরে বাঙ্গালার রাজার সঙ্গে সৌখ্য স্থাপন করেন এবং কাশ্মীরে ফিরে তাঁকে নিমন্ত্রণ করেন। বাংলার রাজা সরল বিশ্বাসে বন্ধুর দেশে গেলে কৌশলে তাঁকে হত্যা করা হয়। এই হীনতার প্রতিশোধ নেবার জন্যে মাত্র ৭০০জন বাঙ্গালী যোদ্ধা ছদ্মবেশে বাংলা থেকে সুদূর কাশ্মীরে যায়।

তখন প্রবাদ ছিল যে, পরিহাসকেশব ললিতাদিত্যের রক্ষাকর্ত্তা, যতদিন পরিহাসকেশব আসনচ্যুত না হন ততদিন ললিতাদিত্যকে পরাজিত করা অসম্ভব। তাই এই বাঙ্গালী বীরের দল দীর্ঘ পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম কোরে শত্রুর দেশের মধ্যে ঢুকে খুঁজে খুঁজে গেল পরিহাসকেশবের মন্দিরে। এই দেবতার মন্দির সর্ব্বদা সুরক্ষিত থাকতো। তাছাড়া রাজধানীর হৃৎপিণ্ডে এই মন্দির। এই মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী মন্দিরে পৌঁছে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ ছুঁড়ে ফেলে বাঙ্গালীর জয়ধ্বনি তুললে—জানিয়ে দিলে তাদের রাজাকে হীন হত্যার প্রতিশোধ নিতে তারা এসেছে এই দুর্গম পথ লঙ্ঘন কোরে শত্রুর গুহায়। জীবন পণ কোরেই এরা এসেছিল—জীবন এরা দিলে বাংলার গৌরবের জন্যে। এদের অমানুষিক বীরত্ব দেখে কাশ্মীরবাসী স্তম্ভিত হোয়ে গেল। বাঙ্গালীর বীরত্ব কাশ্মীরীদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি কোরলে। রাজতরঙ্গিনীর লেখক তাই একে লিপিবদ্ধ কোরতে বাধ্য হোয়েছেন।

গুলমার্গ

সকাল ৮টার বদলে দশটায় বাস ছাড়ল। শ্রীনগরের আশে পাশে পাহাড়ের মাথায় মাথায় তখন শীতের সঞ্চারের সমারোহ চোলেছে। দক্ষিণের পীরপঞ্জল পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় তুষারের চুম্বন সুরু হোয়েছে—

এসময় গুলমার্গ যাওয়ার ঠিক সময় নয়। নীচে অর্থাৎ শ্রীনগরে যখন বিশ্রী গরম পড়ে তখনই গুলমার্গের গরিমা। সেদিন মাত্র আমরা ৬।৭জন যাত্রী ছিলাম, সকলেই বাঙ্গালী এবং পূর্ব্বপরিচিত ; কাজেই বেশ ঘরোয়া ভাবেই সেদিন সারা পথটা কেটেছিলো। শুনলাম সরকারী বাস সেবছরের মত সেই শেষদিন গুলমার্গ গেল, এবছর আর যাবে না। বারামুল্লার পিচ-বাঁধানো পথে পপলার শ্রেণীর মাঝ দিয়ে বেশ জোরেই বাস চোললো। খানিকটা পথ এসে বাঁদিকে বাস বেঁকলো ; সামনের সোজা পথ গেছে পট্টন হোয়ে বারামুল্লা। গুলমার্গের দিকের পথটাও বাঁধান, কিন্তু তত মসৃণ নয়। ১৪ মাইল এসে মাগাম নামে একটী ছোট গ্রাম পোড়ল, এর পরই ধীরে ধীরে চড়াই সুরু হোল। শীতের স্পর্শে পপলারের সবুজ পাতা বিবর্ণ হোয়েছে প্রায় সর্ব্বত্রই। এদিকে পথের ধারে নূতন কোরে পপলার চারা বসান হোয়েছে—পুরাতনীদের কোথাও কোথাও মূলোচ্ছেদ চোলছে। এটি রাজ্য সরকারের একটী বড় ব্যবসা। দেশলাইয়ের কাঠি তৈরীর জন্যে পপলারের প্রয়োজন খুব—কারণ এগুলি হালকা ও সহজদাহ্য। কাশ্মীরের যাবতীয় তুঁত গাছও রাজ্য সরকারের এবং



চশমাশাহী উদ্যানে উঠবার সিঁড়ি

রেশমের কারবারও প্রায় সরকারের একচেটে। এ পথের পাশে পাশে তুঁত গাছও চোখে পড়ল। রাস্তার ধারের পাহাড়ী ঝরণাগুলি উপলবহুল বেগবতী ও বিশীর্ণ হোয়ে উঠতে লাগলো। তাদের স্রোত ধারাকে পাথরের নুড়ির বাঁধ দিয়ে কৃষকেরা জাঁতা চালাবার ব্যবস্থা কোরেছে। পাহাড়ী স্রোতস্বিনীর স্রোতধারাকে এইভাবে নিজেদের কাজে লাগানোর বুদ্ধি ও ব্যবস্থা সমস্ত হিমালয়ের পাহাড়ীদের মধ্যে দেখা যায়। বর্ত্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক হাইড্রলিক প্রথায় বিরাট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্রের ব্যবস্থা হোয়েছে—কিন্তু বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন এই সব নিরক্ষর পাহাড়ী নিজেদের প্রয়োজনেই আবিষ্কার কোরেছে প্রকৃতির অপচয়িত শক্তিকে কাজে লাগাবার পন্থা। কেদার-বদরীর পথে, মানস-কৈলাসের পথে, নেপালের পশুপতিনাথের পথে কাশ্মীরের বিভিন্ন পাহাড়ী অঞ্চলে এই রকমের জলচালিত জাঁতা অনেক দেখা যায়।

মাগাম থেকে ১১ মাইল এসে টাংমার্গে গাড়ী থামলো। এখানে খাড়া পাহাড় পথরোধ কোরেছে। এখান থেকে পদব্রজে কিংবা অশ্বপৃষ্ঠে বা মানবপৃষ্ঠে ওপরে উঠতে হবে। এখানে ভাল ডাকবাংলো আছে এবং নিজেদের মোটর রেখে ওপরে যাবার জন্যে অনেকগুলি গ্যারেজ আছে (ভাড়ায় দেয়)। এখানেই টাঙ্গা-পথের শেষ—তাই নাকি এর নাম টাঙ্গমার্গ বা টাংমার্গ। মোটর যুগের পূর্ব্বে টাঙ্গাই ছিল এ অঞ্চলের দ্রুত যান। এখানে বহু পাহাড়ী ঘোড়া, কয়েকটা ডাণ্ডিও কাণ্ডী যাত্রীদের জন্যে অপেক্ষা করে। সমস্ত ঘোড়ার গুলমার্গ বা তারও উঁচুতে খিলানমার্গ যাওয়ার ভাড়া বাঁধা। টাংমার্গ থেকে গুলমার্গ ১।•, গুলমার্গ থেকে খিলানমার্গ ১।• ; (যাতায়াত দ্বিগুণ) কোন ঠিকাদার সরকার থেকে এ রাস্তার যাত্রীবহনের ঠিকা নিয়েছে। এতে যাত্রীদের একটা সুবিধা এই যে দরে ঠকতে হয় না এবং অসাধু ঘোড়াওয়ালাদের হাতে পড়ার ভয় থাকে না। তবু খদ্দের ধরবার জন্যে সহিসদের মহামারামারি—এর কারণ বখশিস—যা অবশ্য বে-আইনী। কিন্তু যাত্রীরা সাধারণতঃই খুসী হোয়ে ২।১৲ টাকা বখশিস দেয়, এটাই তাদের সত্যিকারের উপার্জ্জন।

সহিসরা মাসিক মাত্র ৮।১• টাকা বেতনে অথবা দৈনিক ৸• দিন মজুরীতে ঠিকাদারের কাজ করে। বড় গরীব এরা। পূর্ব্বে এখানে



ফতে-কদল—পেছনে সা-হামেদান ও হরিপর্ব্বত

আসতো ইংরেজ আমীররা, কাজেই তাদের সংস্পর্শে—সহিসরা একেবারে নিরক্ষর হোয়েও—বহু ইংরাজী শব্দ বেশ রপ্ত কোরেছে এবং লাগসই কোরে তা কথাবার্ত্তায় ব্যবহারও করে—অবশ্য তার বিকৃতিও বিস্তর। গুলমার্গের আর একতলা ওপর খিলানমার্গ পর্য্যন্তই ঘোড়া ভাড়া করা হোল। কোন ঘোড়া বেছে নেওয়া যায়। এই পাহাড়ী পথটি ১৫•• ফিট উঠেছে ৪ মাইল ঘুরে। টাংমার্গের উচ্চতা ৭২•• ফিট, গুলমার্গ ৮৭•• ফিট ; শ্রীনগর থেকে ২৯ মাইল। প্রায় দেড় ঘণ্টা লাগলো এই ৪ মাইল চড়াই পথ "সার্কুলার রোড" শেষ কোরতে। রাস্তাটী বেশ চওড়া, প্রয়োজন হোলে জীপ যেতে পারে এখন ; রাস্তাটী কখনও ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, কখনও সবুজ ঘাসের ছোট মাঠের উপর দিয়ে, কখনও ঝরণার ধার দিয়ে উঠে গেছে। রাস্তাটী থেকে অদূরের পাহাড়গুলির মাথায় নূতন পড়া তুষারগুলি বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। পাশের একটী পাহাড়ের মাথায় বেশ খানিকটা—সমতলভূমি

তার নাম তোসময় দান; এখন তা তুষারে ঢাকা। গ্রীষ্মে অনেক ভ্রমণ-বিলাসী এখানে যান—দুর্গম পথ চলার নেশায় এবং এখানের কয়েকটা ভাঙ্গা পুরাতন মন্দির দেখতে; গুলমার্গ থেকে এটা ১২ মাইল দূর। বিশ্বস্ত কুলী ও সমস্ত আহার্য্য নিয়ে এই দুর্গম স্থানটীতে যেতে হয়; এখানের হিন্দু-মন্দিরগুলি ভেঙ্গেছিলেন বিগ্রহ-বিদ্বেষী সুলতান সিকান্দার-সাহা। গ্রীষ্মে এখানে মেষ পালকের দল তাদের মেষের পাল নিয়ে থাকে, এখানে নাকি শাদা পাথর (white stone) পাওয়া যায়। ফিরোজপুরের নালা হোয়ে কয়েকটা মার্গ এবং জঙ্গল পেরিয়ে তিন ধাপে এখানে পৌছন যায়। খাড়া চড়াই ঠেলে উঠতে হয় বোলে প্রায় তিন দিন লাগে এই কয়েক মাইল পথ উঠতে। প্রথম দিন দানওয়াদা, দ্বিতীয় দিন তেজ্জাল এবং তৃতীয় দিনে তোষময়দানে পৌছন যায়। গুলমার্গের আসেপাশের ফিরোজ-পুরের উপত্যকা এবং নালাও প্রাকৃতিক দৃশ্য হিসেবে অন্যতম দ্রষ্টব্য।

একে শীত, তাতে সেদিন মেঘলা ছিল, পীরপঞ্চলের উত্তর গায়ে গুলমার্গের অধিত্যকায় যখন পৌছলাম তখন বরফান ঠাণ্ডা হাওয়ায় হাড়ের মধ্যে কাঁপুনী ধরাল; ক্ষিদেও পেয়েছিল খুব, এখানে ছোট বড় অনেক



গাঁয়ের মেয়ে চাল কুটছে

হোটেল আছে। খুব বড়দের মধ্যে নিডোজ কয়েকদিন আগে এদিকে তুষার পাতের জন্য তল্পীতল্পা গুটিয়ে নীচে নেমে গেছে শ্রীনগরে, আবার আসছে বছর আসবে। বাকী ক'টী তখনও টিম টিম কোরছে—তাদের চীমনীর ধোঁয়াতেই তা ধরা গেল। খালসা হোটেলে কিছু খেয়ে নিয়ে গরম কাপড় জামা যা ছিল সব শরীরে চাপিয়ে খিলান মার্গের দিকে যাত্রা কোরলাম।

গুলমার্গের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা কাশ্মীরের কবি-মহিষী হাবা-খাতুন। কোন সময় হয়ত এখানে 'গুল' (গোলাপ) হোত প্রচুর—তাই এর নাম ছিল গুলমার্গ, কিন্তু গোলাপের বদলে ক্রমে এখানে এলো গোলাপী সাহেব, মেম; তারা এখানে বানালো খেলার মাঠ, হকির মাঠ, গল্ফ্ খেলার ময়দান; আর শীতের সময় স্কী (Ski) খেলার সরঞ্জাম সাজান। ভারতীয় স্কীক্লাবের প্রধান দপ্তর হোল গুলমার্গ। কিন্তু ক্রমে সাহেব-বিবি ভারত ছাড়লো, আর ছড়ালো সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষ। সেই বিষের জ্বালায় আর পাকিস্থানের পৃষ্ঠপোষকতায় এলো হানাদারের দল বারামূল্লা ধ্বংস কোরে গুলমার্গে—এখানের বাড়ী ঘর যা ছিল তার সব কিছু তারা পুড়িয়ে দিলে। শীতের জন্যে আর হয়ত সুলভ বোলে এখানের সব বাড়ীই ছিল কাঠের, কাজেই লঙ্কাকাণ্ড অতি সহজেই সম্পন্ন হোল। লুঠ, ধর্ষণ, হত্যা কিছুই বাদ গেল না, ফলে আজ গুলমার্গের গোলাপী আমেজের কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই। কয়েকখানা বাড়ী ঘর নূতন কোরে গোড়ে উঠেছে, আর কয়েকটী দৈবাৎ বেঁচে গেছে। তবে আজও রোয়েছে এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য; মাঝখানে অনেকখানি সমতল পোলোর মাঠ, তিন-দিকে উঁচু নিচু রাস্তা এঁকে বেঁকে চোলেছে, মাঝে মাঝে পাইন বা ঐ জাতীয় গাছের শ্রেণী, এক ধারে-তুষার-মৌলী গিরিমালা, মাঝে মাঝে চোলেছে ছোট ছোট নির্ঝরিণী শান্ত মেয়েটীর মত। পূর্ব্বের সযত্নরক্ষিত পোলো মাঠ এখন অবারিত গোচারণ ভূমি—বঙ্কিমবাবুর ভাষায় বোলতে ইচ্ছা কোরে "হায় গুলমার্গ তোমার দিন গিয়াছে। শীতের শিশু ইংরাজ নাই, তোমার শৈত্যের কদর বুঝিবে কে?" বছরে সাত মাস সমস্ত গুলমার্গ বরফে ঢাকা থাকে; জুন থেকে সুরু হয় জনসমাগম।

গুলমার্গের মাঠটি পার হোয়ে ইংরেজ ছেলেমেয়েদের স্কুলের এবং



শঙ্করাচারিয়া থেকে সর্পিণী বিতস্তা

নিডোজ হোটেলের পাশ দিয়ে রাস্তা আবার পাহাড়ে উঠেছে। এ পথটা গুলমার্গের পথের মত অত ভাল নয়, তবে শেষের কিছু অংশ ছাড়া দুর্গম বা বিপজ্জনক নয়। যাত্রী কম; নির্জনতা একটু বেশী; বিদেশীর একটু ভয় ভয় করে। এটী ছাড়াও খিলানমার্গের আরও কয়েকটী কঠিন পথ আছে; দুর্গমের মায়া যাদের হাতছানি দেয়, তাঁরা সেগুলো ব্যবহার করতে পারেন। কিছুক্ষণ পর ঘনায়মান মেঘ বর্ষণ সুরু কোরলে। শীতকালে ছাতা সঙ্গে নেওয়ার রেওয়াজ নাই—তাই বিনা ছাতায় ভিজতে ভিজতেই চোল্লাম। ফেরার কথাও মনে উঠেছিল, কিন্তু তখন মাঝ পথে, কাজেই ভিজতে হবেই। ভিজে ফিরে আসার চেয়ে ভিজে এগিয়ে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত বোধ হোল। এ পথটায় নাকি বৃষ্টি প্রায়ই হয়—তাই পিচ্ছিল, একটু সাবধান হোয়ে চোলতে হয়—তবে অগম্য নয়। আরও ৪ মাইল চড়াই কোরে একটী ক্ষুদ্রতর সমতল অধিত্যকায় এলাম। এর গায়ে এক ধারে এক টানা আকারওয়াৎ পাহাড়—এখন ধবধবে তুষার ঢাকা, অন্যদিকে অনেক নীচে দিগন্তবিস্তৃত কাশ্মীর উপত্যকার

শায় সমতল, আর উলারের নিথর নীলাম্বু। খিলানমার্গ অধিত্যকায় একধারে পাইন গাছের পাতলা জঙ্গল, মাঝে গোটা দুই ঝরণা, একটীমাত্র কাঠের কুটীর। হিম-শীতল হাওয়ায় বাইরের দৃশ্য বেশীক্ষণ উপভোগ করা সম্ভব হোল না, নীচের দৃশ্যগুলিও মেঘের জন্য সব সময় খুব স্পষ্ট ছিল না। এখান থেকে নাঙ্গা পর্ব্বত পর্ব্বত (২৬৭৯২ ফিট), হরমুখ পর্ব্বত (১৬৯০০) এবং অমরনাথের পার্শ্ববর্ত্তী কোলাহাই পর্ব্বত (১৭৭৯২ ফিট) দেখা যায়; কিন্তু সেদিন জলদের জালে সবই আড়াল পোড়েছিল।

এখানের ঠাণ্ডা পাতলা হাওয়া কয়েক মিনিটেই পথের ক্লান্তিকে হরণ কোরে নিলে। কাঠের কুঠুরীটি থেকে এক বৃদ্ধ বেরিয়ে এসে চা বা কফি খাবার অনুরোধ জানালো। কিছু আগেই গুলমার্গে খেয়েছি কাজেই আর প্রয়োজন নাই বলায়-বোল্লে "আপনাদের জন্যেই ত এত শীতেও এই ব্যবস্থা কোরে এখানে বোসে আছি; আপনারা 'না' বোললে" এখানের এই একটিমাত্র দোকান ও আশ্রয় বন্ধ হোয়ে যাবে, তখন যাদের প্রয়োজন হবে কোথায় তারা আশ্রয় পাবে? সরস পানীয় পাবে? অতএব আপনার প্রয়োজনে না হোক—অন্যান্য যাত্রীদের স্বার্থের খাতিরে ভেতরে আসুন।" যুক্তিটা গরজের হলেও উপেক্ষণীয় নয়। কাজেই ভিতরে গেলাম। চা, কফি, ডিম প্রভৃতি হালকা খাবার আর তার সঙ্গে আছে জ্বলন্ত আগুনের মিষ্টি আমন্ত্রণ। যাত্রী ও কুলীদের সকলেই ভেতরে এসে আগুনের আনাচেয় আঁচ পোয়াতে বোসলেন।

এখানে একটী মজার ঘটনা ঘোটেছিল। যাত্রীদের মধ্যে একজন বাঙ্গালী মহিলা শীতের জন্যে পুরুষালীঢঙ্গে পুরো প্যান্ট পোরে, অনেক গরম কাপড় জামা চড়িয়ে সবশেষে একটা ওভারকোট দিয়ে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে-ছিলেন, মাথায় ছিল কান ঢাকা টুপী কাজেই তিনি নারী কি পুরুষ বোঝা সত্যিই কঠিন ছিল। দোকানী তাঁকে পুরুষ ভেবেই কথাবার্ত্তা বোলছিল, হঠাৎ তিনি আগুনের কাছে এসে টুপীটা খুলতেই মাথার মস্ত খোঁপাটী বেরিয়ে পোড়ল, কানের দুলগুলি ঝক্ ঝক্ কোরে উঠলো, ব্যাপারটা হাসির হোত না—যদি বেচারী দোকানদার এই আকস্মিক অভাবনীয় পরিবর্ত্তনে তার অসীম বিস্ময় ও অপ্রতিভতা বেসামাল হোয়ে সবার সামনে ব্যক্ত না কোরত। এর ফলে উল্টো কাণ্ড ঘোটল একটু পরে বাইরে। আমাদের জনৈক পুরুষ সঙ্গী একটু বেঁটে খাটো, মুখখানি তাঁর বেশ মিষ্টি. মেয়েদের মতই মনে হয়। তাঁরও শরীর শীতের জন্যে অমনি আপাদ-মস্তক মোড়া; একটী ঘোড়াওয়ালা তাঁকে 'মাইজী' বোলে সম্বোধন কোরে জানতে চাইল তার সাহেব ভেতরে আছে কিনা; হাসির হুল্লোড়ে বেচারী বিব্রত হোয়ে পোড়লেন; আংশিক বিবস্ত্র হোয়ে প্রমাণ কোরলেন নিজের স্বাজাত্য।

নভেম্বরের প্রথমেই এখানে তুষারে সব আচ্ছন্ন হোয়ে যাবে; ডিসেম্বর জানুয়ারী থেকে মার্চ্চ এপ্রিল পর্য্যন্ত এখানের ও গুলমার্গে—শীতের খেলায় সময়। একজন সহযাত্রী আমার সহিসকে জিজ্ঞাসা কোরলেন— "সাহেব লোক স্কী খেলত কোথায়; এবং স্কী খেলাটী কি?" সহিস ছোকরা ধাঁ কোরে জবাব দিলে—"ওপরের ঐ আলপাথর পাহাড় থেকে খিলেনমার্গ সব তখন বরফে এক হোয়ে যায়। সাহেবরা ওপরের আলপাথরে গিয়ে দু'পায়ে লম্বা কাঠ বেঁধে পিছল বরফের ওপর দৌড়ত আর খিলেনমার্গ হোয়ে একবারে নীচে গুলমার্গের ময়দানে গিয়ে থামতো," সঙ্গী হেসে বোল্লেন "গুলমার্গের নামের সার্থকতা বুঝলাম: এই দেশেই তোমার বাড়ী ত?" বেচারী আধুনিক বাংলা 'গুল' শব্দের অর্থ না বুঝেই হেসে ঘাড় নাড়লে, হয়ত ভাবলে বাঙ্গালীটাকে খুব ধাপ্পা দিয়েছি। গ্রীষ্মে খিলানমার্গকে নাকি বিচিত্র ফুলের সজ্জায় সাজিয়ে দেন প্রকৃতি দেবী, তখন এর হাওয়া থাকে মিষ্টি, চারিদিকের দৃশ্য স্পষ্টতর। সে শোভা দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই এখান থেকে উত্তর পশ্চিমে একটী নালার দক্ষিণ তীর ধোরে প্রায় এক ঘণ্টা গেলে আলপাথর পৌছান যায়। গ্রীষ্মকালে যাদের চিরতুষার দেখার সখ তারা আফারওয়ার্ট পাহাড়ের কোলে এই চিরতুষারাবৃত হ্রদটী দেখতে যান। এখানে এখন যাবার উপায় ছিল না; ইচ্ছাও ছিল না এবং হাতে সময়ও ছিল না। মে থেকে অক্টোবর এই সব তুষার শৃঙ্গ সফরের প্রকৃষ্ট সময়; এর মধ্যে বাঙ্গালীদের বোধ হয় মে অক্টোবর বাদ দেওয়াই ভাল। কারণ তখনকার শীতের দাপট তাঁদের পক্ষে প্রায় অসহ্য। এই সব চির তুষারের ভূমিতে যেতে হোলে—পর্য্যাপ্ত গরম জামা কাপড়, বেশ ভাল নীল চশমা, কাঁটাওয়ালা বুট জুতো এবং লাঠি সঙ্গে থাকা উচিত। এছাড়া অকস্মাৎ অনাসৃষ্টি বৃষ্টি এসে যাতে সব বরবাদ না কোরতে পারে এজন্য বিছানাপত্র ওয়াটারপ্রুফ দিয়ে ঢেকে নেওয়া উচিত; পথে মশারিও মাঝে মাঝে দরকার হয়। এ ছাড়া, নিজেদের তাঁবু, ভাঁজ করা খাট, চেয়ার, রান্নার বাসনপত্র ত নিতেই হবে। এ সবই শ্রীনগরে ভাড়া পাওয়া যায়। কাশ্মীরের এমনি চিরতুষারের দেশে যাবার প্রধান কেন্দ্র হোল গুলমার্গ, পহলগাম, সোনমার্গ।

গত বৎসর খিলানমার্গেই ওপরের পাহাড় থেকে তুষারের বিরাট স্তূপ পিছলে এসে এখানের এক চৌকিদারের বাড়ীঘর পরিবারবর্গ নিশ্চিহ্ন কোরে নেমে যায় নীচে। চৌকিদার অন্যত্র গিয়াছিল; ফিরে এসে দেখলে কঠিন তুষারের চলন্ত স্তূপ নির্ম্মম কালচক্রের মত তার মায়ার সব বাঁধন নিশ্চিহ্ন কোরে দিয়েছে। লোকটী কিন্তু পাগল হয় নাই— নিয়তির নির্ম্মম বিধান মেনে নিয়েছে। চায়ের কুটীরের ধারে দাঁড়িয়ে থাকে যাত্রীদের কাছে সাহায্যের জন্যে—দোকানী তার দুঃখের কাহিনী শুনিয়ে যাত্রীদের কিছু দান কোরতে অনুরোধ করে।

মাথার ওপর মেঘ ক্রমশঃ ঘোরাল হোয়ে উঠছিল, তাই ফেরার পালা সুরু হোল; বাঙ্গালী মেয়েদের অনেকেই এই প্রথম ঘোড়ায় চোড়লেন। পাহাড়ে চড়ার আনন্দের মাত্রাকে তা আরও চড়িয়ে দিয়েছিল। পুরুষরা কেউ কেউ গুলমার্গের ময়দানে ঘোড়া ছোটাবার চেষ্টা কোরলেন; কিন্তু ঘোড়ার গতিচ্ছন্দের সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে বেসামাল হোয়ে পোড়লেন। বেগতিক দেখে দলের সঙ্গ না ছাড়ার অজুহাতে ক্ষান্ত দিলেন। যাত্রা শেষে টাংমার্গে এসে ঘোড়ার ভাড়া ঠিকাদারের লোকের হাতে দিতে হোল—এতক্ষণ ধারে কারবার চোলছিল। শ্রীনগর ফিরলাম সন্ধ্যায়; রাস্তার দোকানে দোকানে তখন লালচে বিজলি বাতি টিম্ টিম্ কোরছে।

(ক্রমশঃ)

যুদ্ধ ও শান্তি

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

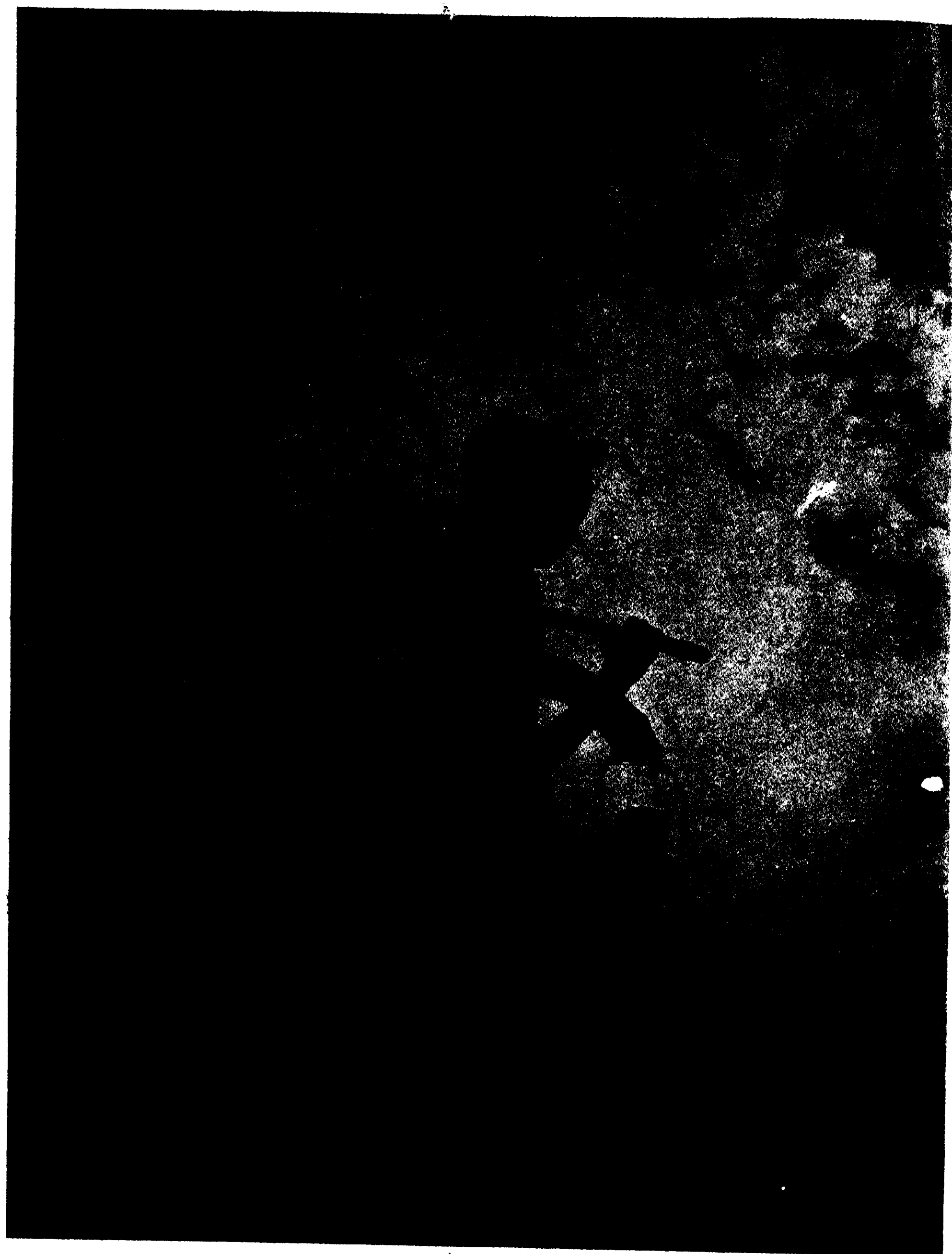
অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধ বাধিবে কি বাধিবে না, সে বিষয়ে যথেষ্ট আলোড়ন সংবাদপত্র খুলিলে চোখে পড়ে। সম্প্রতি দেখা গেল কোরিয়া, ইন্দোচায়না ও গুয়াটে মালায় বেশ ঘোরালো ভাবে যুদ্ধ বাধিয়াছিল। কিন্তু আমাদের ভাগ্যক্রমে সেই যুদ্ধ পৃথিবীতে ছড়াইয়া না পড়িয়া অর্থাৎ "Global War"-এ পরিণত না হইয়া থামিয়া গিয়াছে। এখন আবার দেখা যাইতেছে চিয়াং তাহার পুরাতন চীন সাম্রাজ্য ফিরিয়া পাইবার তাগিদে চীনের মূল ভূভাগে বোমা বর্ষণ সুরু করিয়া দিয়াছেন। যাই হউক আজকের দিনে যুদ্ধ বস্তুটী কি তার সম্যক্ ধারণা স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে আমাদের থাকা বাঞ্ছনীয়। এ ধারণা আমাদের থাকা উচিত যে চোখ বুজিয়া থাকিলেই বিপদ এড়ান যায় না ; এবং গায়ে ময়লা মাখিলেই 'যমের' হাত হইতে রেহাই পাওয়া সম্ভব নয়। যুদ্ধ বলতেই আমরা প্রচণ্ড বিভীষিকা, হত্যা, লুণ্ঠন প্রভৃতি বুঝিয়া থাকি। যুদ্ধের পরিপূরক হিসাবে শান্তি আসে কিনা এবং শান্তির পরিপূরক হিসাবে যুদ্ধ বাধে কিনা ; কূটনৈতিক আলোচনার শেষ স্বাভাবিক পরিণতি যুদ্ধ কিনা,—এ অতীব কূট তর্কের বিষয়। জার্ম্মাণীর বিখ্যাত যোজা লুন্‌ডেনডোর্ণ এ মতবাদ প্রচার করিতে গিয়া, শান্তিকামী জনসাধারণের নিকট পাগল বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। তবুও এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে সেই সব শান্তিপ্রিয় নাগরিকের দল যুদ্ধ ঠেকাইয়া রাখিতে পারেন নাই। যুদ্ধের রূপ ও নীতি বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, যুদ্ধের রূপ ও নীতি কিছুই বদলায় নাই, কেবলমাত্র তার ব্যাপকতা ও প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পুরাকালে অসভ্য বর্ব্বরেরা যেমন যুদ্ধের ব্যাপারে কাহাকেও রেহাই দিত না, আজকের যুদ্ধ ততোধিক বর্ব্বোচিত পর্যায়ে নামিয়া গিয়াছে। আজকের যুদ্ধে কেহই,—শিশু, বৃদ্ধ, বা স্ত্রীলোক—রেহাই পায় না, কেহ নিজেকে নিরাপদ বিবেচনা করিতে পারে না। ভবিষ্যত দিনের যুদ্ধে সেনাবর্গ হইতে হাজার হাজার মাইল দূরের সহর, নগরী ও গ্রাম্য জীবন নিরাপদ নহে, একথা স্বীকার করিতে আজকের যুদ্ধ বিশারদেরা দ্বিধা বোধ করেন না। দূরপাল্লা কামান অপেক্ষা প্রচণ্ডতম দূরপাল্লা এয়ারোপ্লেন নিচু এয়ারডোম্ হইতে উড়িয়া গিয়া আপাতত দৃষ্টিতে নিরাপদ ও নিভৃত স্থান ধ্বংস করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারে। আজকের দিনের যুদ্ধের মারণ-অস্ত্রগুলিকে এরূপ নিখুঁতভাবে বৈজ্ঞানিকের দল সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে যে একথা নিশ্চিন্তচিত্তে বলা চলে বৈজ্ঞানিকের দল "খোদার উপর খোদকারি" কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। আজকের যুদ্ধ শুধু স্থলে নিবদ্ধ নয়, জলেও নিবদ্ধ নয়, জলে, স্থলে অন্তরিক্ষে চড়াইয়া পড়িয়াছে।

যুদ্ধের মূল সূত্র আমরা সকলেই জানি, সেটা হচ্ছে স্বার্থ। মানুষের আদিম যুগেও যেমন আজকের দিনেও তেমনি মানুষ যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে জমির জন্য। অবশ্য পুরাকালে দেখা গিয়াছে যে রমণীও যুদ্ধের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যেমন আমরা দেখিতে পাই রামায়ণে সীতা, মহাভারতের দ্রৌপদী বা গ্রীকদেশের হেলেন যুদ্ধের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। আগেকার দিনে ব্যক্তির বা দেশের রাজার স্বার্থবুদ্ধি হইতে যুদ্ধ উদ্বোধিত হইত, আজকের বিংশ শতাব্দীতে তাহা সম্ভব নয়। আজকের দিনে যুদ্ধ যাহারা বাধায় তাদের মুখে দেশের কল্যাণের জন্য, রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য, বুলি ধ্বনিত হইতে থাকে। এর পর কোনদিন হয়ত শোনা যাইবে যে বিশ্বের কল্যাণের জন্য যুদ্ধ অনিবার্য্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কার্য্যের জন্য কারণের কোন দিন অভাব হয় নাই, যেমন হয় নাই সেদিন নিচে পানরত মেষ-শিশুর প্রাণ হরণ করিতে ব্যাঘ্রের। গতিশীলতার কাছে পৃথিবী ক্রমশই ছোট হইয়া পড়িতেছে এবং এই পৃথিবীকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া একদিকে আমেরিকা ও অপরদিকে রুশিয়া নিজ নিজ নীতির ছকের ঘরে দাঁড়াইয়া তাল ঠুকিতেছে ; সুতরাং ভবিষ্যতে যে যুদ্ধ বাধিবে তাহাতে নীতির দোহাই দেওয়া হইবে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।—আসলে কিন্তু সেই পুরাতন স্বার্থের দ্বন্দ্ব ; কেবলমাত্র পুরাতন জীর্ণ লৌহ শিরস্ত্রানের স্থলে নূতন ষ্টীলের শিরস্ত্রান। যুদ্ধকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র সালিসীর দ্বারা বিশ্বের সমস্ত বিবাদ বিসংবাদ মিটাইয়া ফেলা যায় কিনা, তার একটী প্রচেষ্টা চলিতেছে বটে। কিন্তু এ চেষ্টা মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ একবার করিয়াছিলেন, মাত্র পাঁচখানি গ্রাম পঞ্চপাণ্ডবের জন্য কৌরবদের কাছে প্রার্থনা করিয়া, কিন্তু দুর্য্যোধন তাহাতে রাজী হয় নাই। সুতরাং সেদিন যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। ভবিষ্যতে ঐ রকম ২।১টী দুষ্টলোক যুদ্ধকে অনিবার্য্য করিয়া তুলিবে। ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করে এই তথ্যের উপর যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাহাদের পক্ষে এই সত্যকে অস্বীকার করার উপায় নাই। কিন্তু যুদ্ধকে এড়াইবার জন্য আরও একটী নীতি নির্দ্ধারিত হইতে চলিয়াছে। সোজা কথায় বলিতে গেলে এই কথা বলা চলে যে যুদ্ধকে এড়াইতে হইলে সর্ব্বদাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আধুনিককালে হয়ত ভারতবর্ষকে আক্রমনাত্মক্ যুদ্ধে লিপ্ত হইবার প্রয়োজন নাই। কেননা জমি ও সম্পদ তার প্রচুর পরিমাণে আছে। কিন্তু তাই বলিয়া ভারতবর্ষকে কেহ কোনদিন আক্রমণ করিবে না, এ কথা ভাবিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া থাকিতে পারে—এ মাত্র পাগলের দল। স্বাধীন ভারতবর্ষ তাহাকে স্বাধীনভাবে বাঁচিতে হইলে যুদ্ধের প্রস্তুতি তাহাকে রাখিতেই হইবে। যাহারা মনে করেন যে গান্ধীজির অহিংসা নীতির দ্বারা যদি আমরা প্রবল প্রতাপশালী ইংরাজকে তাড়াইয়া স্বাধীনতা লাভে সক্ষম হইয়া থাকিত,—অহিংস নীতির দ্বারা আমরা সেই স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিব—আমি তাহাদের স্মরণ করাইয়া দিতে চাই—যে তাহা হইলে মহাত্মাজীর প্রিয়তম শিষ্য জহরলালজী ভারতবর্ষের অর্দ্ধেকের উপর রাজস্ব কেবল সেনাবিভাগের জন্য খরচ করিতেন না। এবং একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে—অহিংসা ও অনশন—এই দুই নিদারুণ অস্ত্র গান্ধীজি যেমন নিপুণভাবে প্রায়োগ করিতে পারিতেন—বর্ত্তমান যুগে আর কাহারও পক্ষে তেমন ভাবে প্রয়োগ করা সম্ভবপর নয়। একথা স্বীকার করিয়া লইলে নিজেদের অক্ষমতা বা দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায় না—প্রকাশ পায় নিজেদের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী। আর লজ্জা তখনই প্রকাশ পাইবে, যদি আমরা আমাদের এই কষ্টার্জ্জিত স্বাধীনতা নিজেদের দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতার জন্য রক্ষা করিতে অক্ষম হই। বিগত যুগের জার্ম্মাণীর জন্মদাতা বিসমার্ক বলিয়াছিলেন যে জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া শ্রীবৃদ্ধি করিতে হইলে, চাই লৌহ, আর রক্ত। আর এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে জাতি ইহার ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছে, সেই জাতির পক্ষে না হয় স্বাধীনতা রক্ষা না হয় তার শ্রীবৃদ্ধি লাভ। ভারতবর্ষের স্বাধীন নাগরিকদের পক্ষে একথা স্মরণ রাখা আজকের দিনে বিশেষ প্রয়োজন আছে।

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

নৌকায়

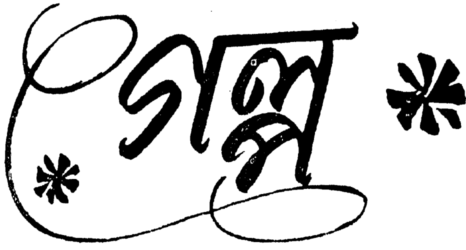
ফটো—সৌরেন মুন্সী



ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

যাত্রী

ফটো—বজলে হোসেন



চন্দ্রগ্রহণ

স্বরুচি সেনগুপ্তা

এক পাত্র বিষাক্ত বাষ্প যেন ফেনিল হ'য়ে উপ্‌চে প'ড়ছে। দূষিত ক'রে তুল্‌ছে নিশ্বাসের বাতাস।

এতদিন ছোটো ছিল, ভালো ক'রে বুঝ্‌তে পারে নি, বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে অস্পষ্ট ব্যাপারটা স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে ওর সম্মুখে। ক্রমে নবনীর অসহ্য হ'য়ে ওঠে, অসহায় একটা বোবা বেদনা ওর বুক থেকে গলা পর্য্যন্ত ঠেলে উঠ্‌তে চায়।

সচ্ছলতা যেন আঁচল বিছিয়ে ঘুমিয়ে আছে ওদের বাড়ীতে। বাড়ী-গাড়ী-দাস-দাসী মূল্যবান গৃহসজ্জা কিছুরই অভাব নেই ওদের। কিন্তু নবনীর মনে হয় এই প্রকাণ্ড বাড়ীখানার রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন অনাচার আর অশুচিতা ঘর বেঁধে আছে। গৃহসজ্জা আর দেহসজ্জা সবই যেন পাপের ক্লেদে পঙ্কিল। কোন্ পথ দিয়ে এত ঐশ্বর্য্য ওদের হাতে এসে পৌছায়, এ প্রশ্ন অহরহ তার বুকের মধ্যে মাথা কুটলেও সে প্রশ্নের মীমাংসা করবার সাহস তার নেই।

মীমাংসা ক'র্‌তে গিয়ে কোথা দিয়ে কি ভাবে কি তীব্র হলাহলের উদ্ভব হবে ভেবে এ বিষয়ে বেশী চিন্তা কর্‌তেও সে ভয় পায়। মনকে সান্ত্বনা দেয় যে, এখনো সে ছেলেমানুষ, বোঝেই বা কতটুকু, যা' বোঝে তা-ও হয় তো সব ভুল। এমনি ক'রে অন্তরের অত্যন্ত আহত স্থানের বেদনাকে সে চাপা দিয়ে রাখে।

লরেটো স্কুলে পড়ে সে। মাঝে মাঝে সহপাঠিনীদের বাড়ীতে সে বেড়াতে যায়। সকলেই তারা ধনী নয়, তাদের ঘরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিলাস-সামগ্রীর ভীড় নেই, সারাদিন বাইরের কতকগুলো লোকের অহেতুক আনা-গোনা নেই, গান-বাজনার উচ্ছৃঙ্খলতা নেই। কী পরিচ্ছন্ন প্রশান্ত সমাবেশ।

ওদের কারো কারো বিধবা মাকে বড় ভালো লাগে নবনীর। মাথার চুলগুলি খাটো ক'রে কাটা, আধ-ময়লা সেমিজ আর থান ধুতিতে তাঁদের নিরাভরণ দেহ যেন শুচিশুদ্ধতায় সমুজ্জ্বল। তাঁদের শান্তসহিষ্ণু মুখের দিকে চাইলেই 'মা' ব'লে পায়ের ধুলো মাথায় তুলে দিতে সাধ হয়। এঁদের সঙ্গে আহারে পরিচ্ছদে, রীতিতে নীতিতে নবনীর বিধবা মায়ের কী বিরাট পার্থক্য! তার মা-ও যদি ওঁদের মতই খাঁটি বিধবার নিষ্ঠা পালন ক'রে চল্‌তেন! কিন্তু সে যা চায় তা পায় না, আর যা' চায় না, তাই প্রতিদিন ঘটে চলেছে।

ক্রমে যৌবনের আবির্ভাব ঘটে ওর জীবনে। যৌবন ওর সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণ তূলিকা বুলিয়ে দিয়ে ওকে কোন্ এক সময় কূলে কূলে ভরিয়ে তোলে। সঙ্গে সঙ্গে ওর ইচ্ছাকৃত অজ্ঞতার সূক্ষ্ম আচ্ছাদন ছিন্ন ভিন্ন ক'রে সমস্ত ঘটনাকেই নগ্ন মূর্ত্তিতে তুলে ধরে ওর সম্মুখে।

ব্যাধ অনুসৃত হরিণীর মত সে পালাবার পথ খোঁজে, কিন্তু কোথায় পথ?

বাইরের কতকগুলো লোক, যাদের সঙ্গে নবনীর এক ফোঁটা রক্তের সম্পর্ক নেই, তারা কেন সব সময় এসে ওর সুখস্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে এত মৌখিক দরদ প্রকাশ ক'র্‌বে? মুঠো মুঠো টাকা খরচ ক'রে ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার জন্য ওদের এত ব্যাকুলতা কিসের? মায়ের মনের কথা নবনী জানে, তবু মায়ের কাছেই সে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, তাদের ব্যবহার সম্বন্ধে প্রবল আপত্তি জানায়। কিছুদিন হয় নিজের মত ও পথের বিরুদ্ধ-ভাব লক্ষ্য ক'রে মায়ের মনও মেয়ের প্রতি উষ্ণ হ'য়ে উঠেছিল। আজ মেয়ের প্রকাশ্য প্রতিবাদের ধৃষ্টতায় তিনি কঠিন হ'য়ে ওঠেন। কঠোর স্বরে বলেন, 'অনাথা দেখে দশ জন আসে, দয়া ক'রে টাকাকড়ি দেয়; তাই তো রাজার হালে চলে! এতে তোমার এত মান খোয়া যায় কেন শুনি? ওরা দয়া ক'রে না দিলে চ'ল্‌বে কিসে ভেবে দেখেছ? বাপ তো তোমার কাণাকড়িও রেখে যান নি।'

'না-ই বা কাটল রাজার হালে। গরীবের মেয়ে আমি গরীবের মতই থাকতে চাই।'

মায়ের কণ্ঠ প্রখর হ'য়ে ওঠে। দু'পাতা ইংরিজি প'ড়ে খুব বড় বড় বুলি ঝাড়তে শিখেছ। সংসারের অভিজ্ঞতা তোমার কতটুকু আছে? ওসব বড় বড় কথা বলতে ভালো, শুনতেও ভালো। কিন্তু কাজে ভালো নয়। বিধবা হ'য়ে সে অভিজ্ঞতা ঢের হ'য়েছে আমার। ভাসুর দেওরের সংসারে হেঁসেলে পড়ে গুষ্টীর পিণ্ডি সেদ্ধ ক'রেছি সারা দিন ধরে। আহা বলে নি কেউ কোনো দিন। না একটু ভালো খাবার, না একখানা ভালো কাপড়। হাড়ির হাল হ'য়েছিল মা মেয়ের।

এ জীবনের চেয়ে সে-ও যে ভালো ছিল মা! চল না, আবার আমরা কাকাদের কাছে ফিরে যাই।

অশ্রুসজল কণ্ঠে মাকে মিনতি করে নবনী। কিন্তু সে মিনতি মায়ের মন স্পর্শ করে না। যাও না—গেলে তারা কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় ক'রে দেবে। হাতে কেউ এক গেলাস জলও খাবে না।

নবনীর অন্তরের নিভৃতে যে একটি আশার নীড় গ'ড়ে উঠেছিল, মায়ের কথার ইঙ্গিতে সে আশার নীড় ধূলিসাৎ হ'য়ে যায়। তার একান্ত আশ্রয় স্থল, পিতার সহোদরদের গৃহের দ্বার তার কাছে চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হ'য়ে গেছে। তবে সে কোথায় যাবে? নির্বিঘ্ন একটু আশ্রয় সে পাবে কোথায়?

তাদের বাড়ীর পাশেই ছেলেদের একটা মেস। সেখানকার খানিকটে হৈ হুল্লোড়ও ওদের বাড়ীতে এসে পৌঁছায়। নবনীর ঘরের জানালা খোলা থাকলে ওদের ঘর স্পষ্ট দেখা যায়। কতদিন কত ছেলের বহু প্রতীক্ষার ক্ষুধিত দৃষ্টির সঙ্গে ওর দৃষ্টির মিলন হয়। অধিকাংশ দৃষ্টিতেই যৌবনের বর্ব্বরতা ফুটে ওঠে। লুব্ধ শিকারীর মত সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টির উপর একবার দৃকপাত করেই নবনী সশব্দে জানালা বন্ধ ক'রে দেয়। কতদিন ঘরের মধ্যে কত প্রণয়-লিপি কুড়িয়ে পায় সে। অসংযত অন্তরের সেই অভদ্র প্রলাপোক্তি হাত দিয়ে স্পর্শ ক'রতেও তার ঘৃণা বোধ হয়।

মেসের ছাদের উপরকার ছোটো ঘরখানায় নিরিবিলি থাকে একটি ছেলে। নবনী জানে তার নাম মৈনাক। ছেলেটি বোধ হয় ডাক্তারী পড়ে, কারণ খোলা দরোজা জানালা দিয়ে দেখা যায়, তার ঘরের দেয়ালে ঝোলানো আছে একটা নর-কঙ্কাল। আর মানুষের কতকগুলি হাড় গোড়ের দিকে অখণ্ড মনোযোগ নিবদ্ধ ক'রে সে চুপ ক'রে বসে থাকে, তা-ও দেখা যায়।

এই তরুণটি যেন জগতের ব্যতিক্রম। অন্য ছেলেদের মত একটি সুন্দরী তরুণীর দৃষ্টির সঙ্গে নিজের একটু দৃষ্টি বিনিময়ের আগ্রহ তো তার নাই-ই, ক্বচিৎ কখনো দৃষ্টি বিনিময়ের সুযোগ ঘটলেও তার দৃষ্টিতে আনন্দের রাঙা-শিখা জ্বলে ওঠে না, বরং তাড়াতাড়ি সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সেই এক ঝলক দৃষ্টিতে আর যা-ই থাকুক না কেন, একটা উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা আর বর্ব্বর বুভুক্ষা যে নেই, সে কথা নবনী বোঝে। হয় তো সে দৃষ্টিতে থাকে খানিকটে বিরক্তি আর উপেক্ষা। কিন্তু সে উপেক্ষা নবনীকে আহত করে না, বরং গৌরবান্বিত করে। কলুষ দৃষ্টি দ্বারাও, যে পুরুষ নারীকে অপমানিত করতে কুণ্ঠিত হয়, নারীকে প্রকৃত শ্রদ্ধা করে সেই-ই। সমস্ত তরুণ সমাজ থেকে সে পৃথক, সে অনন্য, অসাধারণ, একমাত্র। সে যেন এ জগতের নয়, তার জগৎ আলাদা, সে জগতে কোনো নারী কোনোদিন প্রবেশের অধিকার পেয়েছে কিনা, অথবা ভবিষ্যতে পাবে কিনা সে কথা নবনী জানে না।

সন্ধ্যা সকালে খোলা গায়ে মৈনাক ছাদে ডন-বৈঠক করে। তার সুডৌল বলিষ্ঠ দেহের সৌন্দর্য্য নবনীর দৃষ্টিকে কানায় কানায় ভরিয়ে তোলে। শুধু অন্তরে নয়, দেহেও সে বলিষ্ঠ। নবনীর ভীরু নিরুপায় অন্তর কিসের ভরসায় যেন আশ্বস্ত হয়।

অন্তরের কি এক সূক্ষ্ম আকর্ষণে হয় তো বা নিজের অজ্ঞাতেই নবনী মাঝে মাঝে ছাদে গিয়ে দাঁড়ায়। মৃতের একরাশ অস্থি সম্মুখে রেখে ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূর্ত্তির মত যে স্থির হ'য়ে বসে থাকে, তার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে নবনীও যেন কি এক মহাধ্যানে মগ্ন হ'য়ে পড়ে। সে মুখ যেন মঙ্গলারতির ধূপের ধোঁয়ায় ধোয়া কোনো দেবতার মুখ। ধ্যানভঙ্গ হ'লে সে যদি একবার নবনীর চোখের উপর চোখ রাখে, অন্য কারো দৃষ্টিতে সে কখনো যা পায় নি, হয়তো সে দৃষ্টিতে সেই অভয় আর শুদ্ধতা কুড়িয়ে পাবে!

কিন্তু যে তরুণীর এক পলক দৃষ্টির আশায় কত তরুণ-

হৃদয় চঞ্চল ও অধীর হ'য়ে প্রতীক্ষা করে সেই একজোড়া কালো চোখের ব্যাকুল প্রতীক্ষারত দৃষ্টিও তার ধ্যানভঙ্গ ক'রতে পারে না। মড়া ঘেঁটে ঘেঁটে তার মনটাও যেন মৃতের মত স্পন্দনহীন নির্ব্বিকার হ'য়ে গেছে। এই ভাবে কতক্ষণ কেটে যায়, সে হিসাব নবনী রাখে না, সহসা কোন্ এক সময়ে মৈনাকের রূঢ় দৃষ্টির আঘাতে তার বিহ্বলতা কেটে যায়। সে যা' কিছু চেয়েছিল সবই কুড়িয়ে পায় সেই শাসন-কঠোর দৃষ্টির মধ্যে। অসীম শ্রদ্ধায় দূর থেকে মনে মনে তাকে প্রণাম জানিয়ে সে ঘরে চ'লে আসে। সেদিন পূর্ণিমা। পূর্ণচন্দ্রের অঙ্গ থেকে মুঠো মুঠো জ্যোৎস্না ঝ'রে ঝ'রে যেন জ্যোৎস্নার প্লাবন ডেকে এনেছে। সেই ধ্যানভগ্ন আপন-ভোলা ছেলেটার নিগূঢ় মনের মধ্যেও যেন এই জ্যোস্নাধারা আজ কুহক বিস্তার করতে সক্ষম হ'য়েছে। পূর্ণিমা রজনীর এই দাক্ষিণ্যকে মৈনাক উপেক্ষা ক'রতে পারে না, ধীরে ধীরে ছাদে এসে দাঁড়ায়। তার উন্মুক্ত দেহের গৌরকান্তির সঙ্গে যেন পূর্ণচন্দ্রের রজতধারার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। মায়াবিনী নিশীথিনী মায়াবলে সমস্ত পৃথিবীকে ঘুম পাড়িয়ে ফেলেছে, জেগে আছে শুধু এই একটি তরুণ, একক—নিঃসঙ্গ।

সেই আত্মভোলা ছেলেটির মন ভোলাবার জন্য নাম-না-জানা কোন্ ফুলের আবছা একটু গন্ধ ভেসে আসে, হয়তো বা নবনীদের ছাদের টবের ফোটা ফুল থেকেই। ভুলে যাওয়া একটা গানের হারাণো একটা সুর খুঁজে গুন্ গুন্ করে সে। বেশ লাগে তার, এইবার বুঝি তার চোখে রাজ্যের ঘুম নেমে আসবে! কিন্তু এমন রাত ফেলে সে ঘুমোবে কেমন ক'রে?

সহসা লঘু একটু পদধ্বনি! চুড়ি বালার একটু রিনিঝিনি শব্দ শুনে চমকে তাকায় মৈনাক।

একখণ্ড জ্যোৎস্নার মত তার পায়ের কাছে এসে বসে প'ড়েছে নবনী। অমাবস্যার রাত্রির মত ঘন কালো খোলা চুলের রাশি তার গৌরবর্ণ মুখখানাকে বেষ্টন ক'রে অপরূপ ক'রে তুলেছে। নিটোল মুক্তার মত পরিপূর্ণ তনুলতা ভয়ে না লজ্জায় কিসে যেন থর্ থর্ ক'রে কাঁপছে।

বায়ু-কম্পিত অসহায় জুঁই ফুলের মত তার করুণ মুখের দিকে চেয়ে এক মুহূর্ত্তে মৈনাকের দৃষ্টিতে মমতা ঘনিয়ে আসে, তার সংযম-কঠোর বুকেও কোথা থেকে একটু দুর্ব্বলতার সঞ্চার হয়। এই মোহময়ী রজনীতে মুখোমুখী হ'য়ে দাঁড়ায় দুটি জ্যোৎস্নাস্নাত তরুণ-তরুণী। সমস্ত জগতের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য ঘনীভূত হ'য়ে এখনই বুঝি এখানে একটি নূতন জগৎ গড়ে উঠবে একমাত্র এই দুটি তরুণ তরুণীর জন্যই।

কিন্তু এই পূর্ণিমা রজনীর সমস্ত কুহক, অস্পষ্ট পুষ্প-সুরভির সমস্ত যড়যন্ত্র, সুন্দরী নারীর সৌন্দর্য্যের মায়াজাল সমস্তই ব্যর্থ হ'য়ে যায়। মনের ক্ষণিক দুর্ব্বলতাকে সংযত ক'রে দু'পা পিছিয়ে যায় মৈনাক, দু'খণ্ড হীরের মত তার চোখ দুটো ঝক্ ঝক্ ক'রে ওঠে।

রূঢ় স্বরে সে বলে, এ কি? কে আপনি? এত রাতে এখানে এসেছেন কেন?

দু'চোখ জোড়া অশ্রুঅর্ঘকে হাত তুলে মুছে ফেলতেও ভুলে যায় নবনী। সজল দৃষ্টি তুলে তাকায় মৈনাকের মুখের দিকে।

'আপনি আমাকে রক্ষা করুন—'

নিতান্ত লৌকিকতা রক্ষার জন্যই যেন মৈনাক বলে 'কেন, কি হ'য়েছে আপনার?'

'আপনি কি আমাকে চেনেন না? আমি ঐ পাশের বাড়ীতে থাকি। আমার নাম নবনী।'

'ও—ও'

এতক্ষণে মনে পড়েছে মৈনাকের। ইচ্ছায় হোক্, অনিচ্ছায় হোক্, এ মুখ আর এ দৃষ্টির সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেছে, সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

'তা' এত রাতে এখানে এসেছেন কেন? জানেন না এটা ছেলেদের মেস? যান—বাড়ী যান।'

অশ্রুকম্পিত স্বরে নবনী বলে, 'এত কাছে থেকেও কি আপনি আমার অবস্থা কিছুই বুঝতে পারেন নি? ও বাড়ীর বিষাক্ত আবহাওয়ায় আমি আর এক মুহূর্ত্তও থাকতে পারছি নে। আপনি আমাকে বাঁচান।'

'আমি? আমি তো আপনার কেউ নই, আমি আপনাকে কেমন ক'রে বাঁচাব?'

তপ্ত মরুভূমির বুকে ক্ষীণ জলধারা যেন নিমেষে শুষ্ক হ'য়ে গেল, কোথাও একটু আর্দ্রতাও বুঝি রেখে গেল না।

কত কথা নবনীর কণ্ঠ পর্য্যন্ত ভীড় ক'রে এসেছিল, কিন্তু অধর স্পর্শ ক'রবার আগেই অশ্রুর প্লাবনে সে সব শুদ্ধ হ'য়ে গেল।

আদেশের সুরে মৈনাক বলে, 'আর দেরী ক'রবেন না, যান, বাড়ী চ'লে যান—।

এক মুঠো জ্যোৎস্নার মত একটি তরুণীর ললাটের ললিত রক্তাভা ও মুক্তাবিন্দুর মত অশ্রুজল যেন অপমানের কালিতে কালো হ'য়ে ওঠে। অপমানাহত অন্তরকে সংযত ক'রে কথা ব'লতে গিয়ে তার বিবর্ণ ওষ্ঠাধর থর্ থর্ ক'রে কাঁপে।

'তিল্ তিল্ ক'রে নিজেকে এমন ক'রে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে পারি নে আমি। আমি জানি আপনি নারী-জাতিকে শ্রদ্ধা করেন, আপনিই পারবেন আমাকে রক্ষা ক'রতে। আপনি আমাকে বাঁচান—রক্ষা করুন।'

তার মিনতি-গদগদ কণ্ঠকে উপেক্ষা ক'রে মৈনাক বলে—'আপনাকে আমি রক্ষা ক'রব কেমন ক'রে, সে অধিকার তো আমার নেই—'

'সমস্ত অধিকারই আমি আজ আপনার হাতে তুলে দিতে এসেছি। আপনি আমাকে গ্রহণ করুন।'

স্তব্ধ চাঁদনি রাতে এক মুগ্ধ ভক্ত এসেছে নিজেকে অর্ঘ দিতে এক পাষাণ দেবতার পাদমূলে। সাক্ষী আছে শুধু আকাশের পূর্ণচন্দ্র, আর অগণিত মূক-তারা।

মৈনাক প্রথমে নিজের শ্রবণকে অবিশ্বাস করে, কিন্তু সম্মুখে এক নারীর আত্মনিবেদনের ভঙ্গিটিকে অবিশ্বাস ক'রতে পারে না। এই অসম্ভব প্রস্তাবের নির্জ্জলতা ও ধৃষ্টতায় তার কণ্ঠ অধিকতর কঠিন হ'য়ে ওঠে। · আপনাকে গ্রহণ করব 'স্ত্রী রূপে'—সে আমি পারব না।

মৌন চরাচর যেন শত কণ্ঠে ধিক্ ধিক্ ক'রে ওঠে। যাত্রা বন্ধ ক'রে এক টুকরো কালো মেঘ এই অভিসারিণী নারীর লাঞ্ছিত মুখের দিকে তাকায়। কি ব'লতে যেয়ে কোন্ একটা পাখী একবার একটু ডেকে উঠেই চুপ্ ক'রে যায়।

'তবে কে আমাকে রক্ষা ক'রবে'--আপনি ছাড়া আর আমি ভরসা ক'রব কাকে?'

গভীর প্রত্যাশায় যে নারী মুখের দিকে চেয়ে আছে, তার মুখের দিকে চেয়ে মৈনাক বলে—আমি গ্রহণ ক'রলেও আমাদের সমাজ আপনাকে গ্রহণ ক'রবে না।

নবনীর অন্তরের সমস্ত আশা সমস্ত আদর্শ ঝড়ের মুখে শুষ্ক পত্রের মত দিক্‌ভ্রান্ত হ'য়ে পড়ে। একটি নিষ্কলুষ মেয়েকে রক্ষা করাও কি সমাজের কর্ত্তব্য নয়?

আমি সমাজ-সংগঠক বা সংস্কারক নই, কাজেই সে কথা জানিনে। শুধু এইটুকু জানি যে আপনাকে গ্রহণ করলে শুধু সমাজই নয়, আমার আত্মীয় স্বজন সকলেই আমাকে ত্যাগ ক'রবেন। আমার জীবন থেকে পূর্ব্ব জীবনকে একেবারে ছেঁটে ফেলে দিতে হবে।

'কিন্তু নারীর জন্য সর্ব্বত্যাগী হ'য়েও পুরুষ সুখী হয়, এ দৃষ্টান্তও তো জগতে বিরল নয়। সে ত্যাগেও কি আনন্দ নেই?'

'হয়তো আছে। ভালোবাসার জন্য সর্ব্বত্যাগী হওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু আমি তো আপনাকে—'

'ভালোবাসেন না, এই তো ব'লতে চান?'

'হ্যাঁ—বরং—'

তার অসম্পূর্ণ বাক্যকে সম্পূর্ণ ক'রে দেয় নবনী, 'বরং ঘৃণা করেন সে কথা ব'লতে এত কুণ্ঠা কিসের? সে আমি জানি।

অপমান আর অভিমানে নবনী যেন পাথর হ'য়ে যায়। কিন্তু নিজেকে সে অসংযত হ'তে দেয় না। স্থির দৃষ্টিতে মৈনাকের চোখের উপর চোখ রেখে শান্ত কণ্ঠে বলে—কেন ঘৃণা করেন, সে কথা আর তুলব না। কিন্তু আপনার ঠুন্‌কো ভালোবাসার পরিচয় পেলে আজ এত অনায়াসে হয়তো আপনার কাছে আত্মসমর্পণ ক'রতে আসতে পারতাম না। দূর থেকে আপনার চরিত্রের দৃঢ়তা দেখে আপনার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা জন্মেছিল। ভেবেছিলাম অসংযমী, আত্মসুখসর্ব্বস্ব, মেরুদণ্ডহীন পুরুষদের চেয়ে হয় তো আপনি স্বতন্ত্র। নারীকে হয় তো আপনি শুধু ভোগের বস্তু ব'লেই মনে করেন না। একটি অসহায় মেয়েকে রক্ষা করবার মত কর্ত্তব্য-বুদ্ধি আর সাহস হয় তো আপনার আছে। আপনি সাধারণ নন্—

বাধা দিয়ে মৈনাক বলে 'আপনি ভুল ক'রেছেন—'

'হ্যাঁ—আমার ভুল হ'য়েছিল। আমিও আপনাকে ভালোবেসে আত্মসমর্পণ ক'রতে আসি নি, ভুল করেই এসেছিলাম। আজ আমিও আপনাকে ঘৃণা করি। নির্ব্বিচারে আপনি নারীকে ঘৃণা ক'রতে পারেন, কিন্তু রক্ষা ক'রবার সাহস আপনার নেই। আপনি অসাধারণ নন্—এমন কি সাধারণের চেয়েও আপনি হীন্—'

স্খলিত অঞ্চল অঙ্গে জড়িয়ে এগিয়ে যায় নবনী। ধীরে ধীরে ফুরিয়ে যায় পায়ের শব্দ। এক ঝলক বাতাস চুরি ক'রে রেখেছিল নবনীর চুলের এক আঁজলা গন্ধ, স্তব্ধ মৈনাকের চারদিকে সেইটুকু ছড়িয়ে দেয়।

কোন সময় চাঁদ নেমে গেছে পশ্চিমে।

আত্মবাদ ও আত্মরাজ্য*

শ্রীশিশিরকুমার সেন

কালপ্রবাহের মোড় ঘোরাবার আন্দোলন

ভূদান আন্দোলন দ্বারা ভারতে যে আর্থিক ও সামাজিক ক্রান্তির কাজ আরম্ভ হয়েছে, তার প্রতিধ্বনি হিন্দুস্থানের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে কোটি কিষাণ ও মজুরের মধ্যে গুঞ্জরিত হচ্ছে। আমেরিকা ও রুশদেশ পর্য্যন্ত এই ধ্বনি পৌঁছে গেছে। ভারতে এ এক অভূতপূর্ব্ব আন্দোলন চলেছে। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বিচারকেরা এখন বলছেন কি, য়ুরোপ, রুশ ও চীন প্রভৃতি বড় বড় দেশে খুনখারাপী ও বর্গ সংঘর্ষের দ্বারা সামাজিক ও আর্থিক ক্রান্তি করবার যে প্রযত্ন চলেছে, সেই ক্রান্তি আজ ভারতে অহিংসা দ্বারা হতে যাচ্ছে।

তেলেঙ্গানার সাক্ষাৎকার

বিনোবাজী সাধারণ রচনাত্মক কার্য্যক্রমকে সরিয়ে রেখে ভূদান আন্দোলন দ্বারা জমি ও সম্পত্তির ব্যক্তিগত স্বামিত্বকে নষ্ট করার আন্দোলন আরম্ভ করলেন ও সমাজের স্বামিত্ব স্থাপিত করবার ক্রান্তির শুভারম্ভ করলেন। ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই এই মহান ক্রান্তির ধ্বনি সর্ব্বপ্রথম জয়প্রকাশজীর মতো বৈপ্লবিক-স্বভাবের নেতা শুনতে পেলেন। সাধারণ সুশিক্ষিত জনগণের মন যখন ভারপ্রাপ্ত কংগ্রেস পক্ষের নেতারা তাদের দিকে টান দিল, আর যখন সাধারণ গান্ধীবাদীও এই বিচার-প্রবাহেই বাহিত হচ্ছিল, তখন তেলেঙ্গানায় বিনোবাজী ভূদান যজ্ঞের আদেশ শুনতে পেলেন ও তার ব্যাপক অভিব্যক্তি সেখানেই প্রকট করলেন। কেবল তেলেঙ্গানায় নয়, সমস্ত এশিয়া মহাদেশের জনতার ভূমি-ক্ষুধা তীব্র। এই ক্ষুধার উপশম না হলে দুনিয়ার কোন রাষ্ট্র বা সমাজ স্থির হতে পারবে না। তেলেঙ্গানার পরিস্থিতিতেই তাঁর এই সমস্যার সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়।

রুশের ক্রান্তি

কিষাণের জমির ক্ষুধা, কারখানার মজুরের অন্নের ক্ষুধা, আর সর্ব্ব-সাধারণ নাগরিকের শান্তি ও যুদ্ধবিরতির আকাঙ্ক্ষা—এই তিন চিরন্তন ক্ষুধা থেকেই রুশদেশের সাম্যবাদী ক্রান্তির উদ্ভব হয়। চাষীকে জমি ও ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দেবার এবং যুদ্ধে শ্রান্ত সৈনিককে যুদ্ধ বন্ধ ও শান্তি লাভ করবার ত্রিবিধ প্রতিশ্রুতি দিয়ে লেনিন জারশাহী কেল্লা ভূমিস্যাৎ করেন। এরপর দেশে যে অরাজকতা উপস্থিত হল তাকে আটকাবার জন্য রাজদণ্ড ধারণ করে নিজদলের তানাশাহী (এক নায়কত্ব) স্থাপন করলেন। এই রাজদণ্ডের সাহায্যে একনায়কত্ব দ্বারা দেশের জমি ও সম্পত্তির বণ্টন তিনি করলেন। বর্গসংস্থা ও রাজ্যসংস্থার লোপ সাধন করে শান্তি স্থাপিত করবার এ এক প্রয়োগ।

অহিংসক ক্রান্তির অপরিহার্য্য প্রক্রিয়া

যে বৎসর রুশদেশে লেনিন এই প্রয়োগ আরম্ভ করলেন, সেই বৎসরই অর্থাৎ ১৯১৭ সনে ভারতে গান্ধীজী বিহারের চম্পারণ জেলায় সত্যাগ্রহ ক্রান্তির যজ্ঞ সুরু করলেন। ক্রান্তিকারী অহিংসবাদের আদি-প্রণেতা গৌতম বুদ্ধের দেশ হিসাবে বিহার ভারতের ইতিহাসে প্রাচীন-কালে নাম অর্জ্জন করেছে। আজ এই দেশ রাজেন্দ্রবাবু ও জয়প্রকাশের দেশরূপে প্রসিদ্ধ। বিনোবাজী সেই বিহারের বুদ্ধ-গয়ায় সর্বোদয় সম্মেলনে ঘোষণা করলেন যে ভূদান আন্দোলনের অন্তিম লক্ষ্য শাসনমুক্ত সমাজ ও সম্পত্তির সমাজীকরণ, আর এর আধার হবে গ্রামোদ্যোগ ও স্বাবলম্বী স্বয়ংপূর্ণ গ্রামসংস্থা। তিনি নিজের এই ধ্যেয়কে সম্মেলনে বিশদ করলেন। এই সর্বাঙ্গীণ সামাজিক ক্রান্তির যজ্ঞে সমগ্র জীবন অর্পণকারী অহিংসক ক্রান্তিকারীর এক সংগঠনও শ্রীজয়প্রকাশের নেতৃত্বে এই সময় জন্মলাভ করে।

শুদ্ধ বুদ্ধিবাদী নরম দলের অসফল প্রচেষ্টা

রুশ বিপ্লবের পর ১৯১৭ সনে য়ুরোপে প্রাগতিক (Liberal—নরমদল) বুদ্ধিবাদী তত্ত্বজ্ঞান অস্তমিত হতে লাগল ও সাম্যবাদের ক্রান্তিকারী তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হল। প্রাগতিক (লিবারেল)দের বিশ্বাস ছিল যে শুদ্ধ বুদ্ধিবাদ দিয়েই সমাজের সমস্ত সমস্যার সমাধান হতে পারে ও সশস্ত্র বিপ্লবের আশ্রয় না নিয়েই সমাজে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী ক্রমে ক্রমে স্থাপনা করে জনতন্ত্র, রাষ্ট্রীয় আত্মনির্ণয় তথা শান্তির সাম্রাজ্য সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। জন মর্লের মতো নিষ্ঠাবান ও খাঁটি লিবারেলও প্রথম মহাযুদ্ধ সুরু হতেই বুঝে নিলেন যে দুনিয়াতে প্রাগতিক (liberal) তত্ত্বজ্ঞান এখন অন্তিম দিন গুণছে। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। মর্লেই প্রথম বুঝতে পারলেন যে মহাযুদ্ধের সময় ও তারপর যে সব সমস্যা মানব-সংস্কৃতির সামনে উপস্থিত হবে তা সমাধান করবার সামর্থ্য প্রাগতিকদের কেবল বুদ্ধিনিষ্ঠ সুধারবাদ অথবা প্রাগতিক তত্ত্বজ্ঞানে আর অবশিষ্ট নাই। যে তত্ত্বজ্ঞান এক সময় চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল তা শেষ হয়ে এসেছে।

---

* সর্বোদয়ে প্রকাশিত অধ্যাপক জাবড়েকরের প্রবন্ধ হইতে।

সমাজবাদকে আটকাবার প্রযত্ন

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রুশে বিপ্লব হল এবং পুঁজিবাদী সংস্কৃতিকে ধ্বংসকারী সাম্যবাদ বা বিপ্লবী সমাজবাদ মূর্তরূপে অবতীর্ণ হল। যে বিপ্লবী সমাজবাদী তত্ত্বজ্ঞানকে প্রায় পঁচাত্তর বৎসর ধরে পুঁজিবাদী জনতন্ত্র দাবিয়ে রেখেছিল, তাই আজ সশস্ত্র ক্রান্তির রূপে ও বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের নামে সমস্ত জগতে উৎপাত সৃষ্টি করতে লাগল। পরন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ দিকে প্রেসিডেন্ট উইলসন, লয়েড জর্জ ও ক্লেমেন্সো, সমাজবাদ পুঁজিবাদকে যে চ্যালেঞ্জ করল তাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে, পুঁজিবাদী জনতন্ত্রকে স্থায়ী করবার জন্য রাষ্ট্রসংঘ ও তার সংরক্ষণের নীচে য়ুরোপে নবনির্মিত ছোট ছোট লোকতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এক অদ্ভুত মায়াসৃষ্টি কিছুকালের জন্য করলেন। কিন্তু অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই মায়াসৃষ্টি নষ্ট হয়ে গেল। সমস্ত য়ুরোপ থেকে প্রাগতিক তত্ত্বজ্ঞানকে সমূলে উৎপাটিত করে হিটলার ও মুসোলিনীর উদ্ভব হল ও দুনিয়ার রাজনীতি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দিকে সজোরে এগিয়ে যেতে লাগল। জনতন্ত্রকে চারিদিক থেকেই বিপদ ঘিরে ধরল। তাকে বাঁচাবার জন্য সমস্ত পৃথিবীকে বিধ্বস্ত করবার মতো দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ জ্বলে উঠল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্রাগতিক জনতন্ত্র ও প্রাগতিক তত্ত্বজ্ঞানকে স্থায়ী করতে শুদ্ধমাত্র বুদ্ধিবাদের বল ও তা অপূর্ণ সাধিত হলে সেখানে শস্ত্রবলের প্রয়োগ নিরর্থক এবং মানব সংস্কৃতির সামনে উপস্থিত সমস্যার সমাধানের এই প্রযত্ন সম্পূর্ণভাবে অসফল, ইহা সিদ্ধ হয়ে গেল।

আত্মবাদী সত্যাগ্রহ তত্ত্বজ্ঞানের উদয়

এই সময় অর্থাৎ ১৯১৭ সনে যখন রুশ রাজ্যবিপ্লব হয়, সেই সময় থেকে ১৯৩৭ সন পর্যন্ত, অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত ২০ বৎসরে হিন্দুস্থানে আত্মবাদী সত্যাগ্রহ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় ও তার প্রভাব ভারতীয় রাজনীতির উপর পূর্ণরূপে পড়ে। আধুনিক য়ুরোপ বুদ্ধিবাদী প্রাগতিক রাজনীতির অপূর্ণতা দেখেই সাম্যবাদ (কম্যুনিজম) ও নাশবাদ (নাজিজিম) এর শস্ত্রগ্রহী রাজনীতিকে স্বীকার করেছিল ও এভাবে প্রাগতিক লোকতন্ত্রকে কবর দিয়েছিল। ভারত সে সময় সত্যাগ্রহের আশ্রয় নিল এবং গান্ধীজী ও নেহরুর নেতৃত্বে লোকতন্ত্র ও সমাজবাদের ধ্যেয়কে আত্মসাৎ করে আত্মবলের প্রভাব প্রকটকারী সত্যাগ্রহী ক্রান্তি-শাস্ত্রের নির্মাণ তারা করলেন। মানব সমাজের সামনে উপস্থিত সমস্যা ক্রান্তিকারী অহিংসবাদের দ্বারা সমাধানের ইহা নিষ্ঠাপূর্ণ সিদ্ধান্ত। এ সময় বুদ্ধিবাদী প্রাগতিকেরা ভারতীয় রাজনীতি থেকে সরে গেল এবং আত্মবাদী সত্যাগ্রহীরা ভারতীয় রাজনীতি ও ভারতীয় সংস্কৃতির উপর আপন প্রভাব বিস্তার করতে লাগল।

শ্রেষ্ঠ ও অভিন্ন তত্ত্বজ্ঞান

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভারত রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্রতা ও আত্মনির্ণয়ের অধিকার লাভ করল ও এখানে জনতান্ত্রিক রাজ্যপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হল। তথাপি ভারতীয় সংবিধান-পরিষদ যে সংবিধান এদেশে প্রচলন করলেন, তা সত্যাগ্রহী আত্মবাদী তত্ত্বজ্ঞানের উপর আধারিত নয়। তার স্থাপনা হয় ব্যক্তিবাদী প্রাগতিক তত্ত্বজ্ঞানের উপরই। এজন্য সমাজবাদীরা আজকার এই রাজ্য পদ্ধতিকে 'পুঁজিবাদী জনতন্ত্র' আখ্যাই দেয়। সত্যাগ্রহী গান্ধীবাদীরাও মনে করেন না যে—প্রচলিত সংবিধান গান্ধীজীর তত্ত্বপ্রণালীর উপর আধারিত, বা এই সংবিধান অনুসারে চালিত রাজকাজ সত্যাগ্রহী সিদ্ধান্ত অনুসারে চলেছে বা চলতে পারে। এজন্য ভারতীয় সমাজবাদী ও সত্যাগ্রহী গান্ধীবাদী উভয়েই অহিংসক প্রতিষ্ঠানে একত্র হয়ে ভারতে এক সর্বাঙ্গীণ সামাজিক ও আর্থিক ক্রান্তি করবার জন্য মিলিত হয়েছেন। বিনোবাজী ও জয়প্রকাশজী ভূদান, সম্পত্তিদান, শ্রমদান, বুদ্ধিদান ও জীবনদান দ্বারা এই সর্বাঙ্গীণ ভারতীয় ক্রান্তির আবাহন করছেন। এই ক্রান্তির মূলে যে আত্মবাদী সত্যাগ্রহী তত্ত্বজ্ঞান আছে, তা শস্ত্রগ্রহী সাম্যবাদের তত্ত্বজ্ঞান থেকে ভিন্ন। তেমনি বুদ্ধিবাদী ও ব্যক্তিবাদী প্রাগতিক তত্ত্বজ্ঞান থেকেও এ ভিন্ন। এ দুইটি অপেক্ষাই এ তত্ত্বজ্ঞান শ্রেষ্ঠ।

আধুনিক ভারতে ব্যক্তিবাদ, রাষ্ট্রবাদ ও সমাজবাদ এ তিন তত্ত্বজ্ঞানই আধুনিক য়ুরোপ থেকে এসেছে। এই তিন তত্ত্বজ্ঞানের সৎ অংশ আত্মসাৎ করে ও আধ্যাত্মের সাথে তার সমন্বয় সাধন করে এই চতুর্থ তত্ত্বজ্ঞানের উদ্ভব। ইহা থেকে অথবা এর প্রেরণা থেকে নির্মিত ভারতীয় লোকতন্ত্র ও ভারতীয় সমাজবাদ উহা হতে ভিন্ন ও শ্রেষ্ঠই হবে এই ধারণা ভারতের ও জগতেরও হচ্ছে। এ ধারণা ক্রমে বাড়ছে।

নরমদলীয় লোকতন্ত্র ও সত্যাগ্রহী লোকতন্ত্র

প্রাগতিক লোকশাহী (Liberal Democracy) ও সত্যাগ্রহী লোকশাহী (Democracy based on Non-Violence) এ দুয়ের মধ্যে যে তাত্ত্বিক ভেদ আছে তা ধ্যানে না এলে ও তার বিশদ ব্যাখ্যা না করে এদেশে পুঁজিবাদী লোকতন্ত্রের পরিবর্তন করা তথা সত্যাগ্রহী লোকতন্ত্রের দিকে বা আত্মরাজ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া ভারতের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য প্রাগতিক জনতন্ত্রে ও সত্যাগ্রহী জনতন্ত্রে যে প্রভেদ আছে তার বিচার প্রথম করা যাক্।

সত্যাগ্রহীর দৃষ্টিভঙ্গী এই যে প্রাগতিকেরা যে বুদ্ধি-স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উপর জোর দিয়েছেন, সে তত্ত্বের সঙ্গে সমাজবাদীদের দ্বারা প্রশংসিত সামাজিক স্বামিত্ব ও আর্থিক সাম্যের তত্ত্বের সমন্বয় করতে হবে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের শুদ্ধিকরণও করতে হবে।

আপন বুদ্ধিকে বিকার ও বাসনা থেকে মুক্ত করে শুদ্ধ ও পবিত্র করা অত্যন্ত প্রয়োজন, আর এ জন্য ব্যক্তিকে নিরহঙ্কার ও নির্মম হয়ে সত্যের শোধন ও সংস্থাপন করতে হবে। জীবনের সাফল্য এতেই—এ কথা তাকে মানতে হবে। এর উদ্দেশ্য এই যে সত্যশোধনের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির আচার ও বিচারের স্বতন্ত্র লাভে বিন্দুমাত্র বাধা থাকলে চলবে না। "স্থিতপ্রজ্ঞের" ব্যবহারিক অর্থও এই যে, অব্যভিচারী সত্যনিষ্ঠার বৃত্তি আমাদের বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত হউক, কিন্তু যাতে আমার বুদ্ধিতে অব্যভিচারী সত্যনিষ্ঠা আসতে পারে তার জন্য প্রয়োজন বুদ্ধির

স্বহিত-কামী না হয়ে সর্বহিতনিষ্ঠ হওয়া। স্বার্থ ও অহঙ্কার, বৈরী ও দ্বেষ, পক্ষপাত ও মমত্ব থেকে মুক্ত বুদ্ধিই অব্যভিচারী ও সত্যনিষ্ঠ থাকতে পারে। এরূপ নিঃস্বার্থ, নিরহঙ্কার, নির্বৈর ও নির্মম অদ্বেষ-ভাবনা থেকেই নিজ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করবার জন্য প্রত্যেকেরই বুদ্ধি-স্বাতন্ত্র্য লাভ করা প্রয়োজন। প্রত্যেকে এই স্বাতন্ত্র্য পেতে পারে, এমন সমাজ-গঠন ও রাজ্যব্যবস্থার অস্তিত্ব সে জন্যই প্রয়োজন। এ প্রকার সমাজ-গঠন ও রাজ্যব্যবস্থা স্থাপনের জন্য অন্যান্য ধর্মাচার, বাধক সামাজিক সংস্কার ও রাজকীয় বন্ধনের শান্তিপূর্ণ উল্লঙ্ঘন করে নিজের ও সমাজের উন্নতি করবার নৈতিক অধিকার প্রত্যেকের থাকা চাই। এ মানতে হবে যে প্রত্যেক সত্যাগ্রহীর কর্ত্তব্য এই অধিকারকে অনত্যাচারী ও অদ্বেষ-ভাবনার সঙ্গে প্রয়োগ করা। পরম্পরাগত ধর্মাচার, সামাজিক সংস্কার ও রাজনৈতিক কানুন অন্ধভাবে পালন করা এবং ধার্মিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অত্যাচারের সাথে সাহচর্য্যকারী তো গোলামী মনোবৃত্তি মাত্র। সমাজে বৈষম্য ও দ্বেষ প্রচারকারী ধার্মিক আচারের বিরুদ্ধে, আত্মিক ও সামাজিক উন্নতিসাধনে অভিলাষী সত্যাগ্রহীকে নির্বৈর ও অদ্বেষ বৃত্তি নিয়ে সতত সংঘর্ষ করতে হবে। সাম্য ও মৈত্রীর বিরুদ্ধে যে সব সামাজিক সংস্কার আছে, তা লংঘন করে সমাজে সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অন্যায় কানুনের সঙ্গে অসহযোগ ও ন্যায্য কানুন স্থাপিত করবার জন্য যে দুঃখকষ্ট আসে তা নির্বৈর ও অদ্বেষ বৃত্তির সাথে সানন্দে সহ্য করতে হবে।

উপরোক্ত সত্যাগ্রহ বৃত্তিতে চালিত নাগরিকের লোকতান্ত্রিক রাজ্যেও সবিনয় আইন ভঙ্গের অধিকার থাকা চাই। যে রাজকীয় তত্ত্বজ্ঞ প্রাগতিক দৃষ্টি দিয়ে বিচার করেন তিনি এই তত্ত্বকে স্বীকার করেন না। একবার প্রতিনিধিমূলক জনসভা স্থাপিত হয়ে গেলে কানুন তৈরীর অধিকার লোকনিযুক্ত প্রতিনিধিরাই প্রাপ্ত হয়, তখন আর প্রজার "সবিনয় কানুন ভঙ্গের" অধিকার থাকে না, ইহাই প্রাগতিকদের রাজনৈতিক ফিলজফি বা দার্শনিক সিদ্ধান্ত।

সত্যাগ্রহী নিষ্ঠা

এদিকে সত্যাগ্রহী তত্ত্বজ্ঞান বর্ত্তমান পরিস্থিতি ও মানবসংস্কৃতির বর্ত্তমান অবস্থায় যদিও প্রতিনিধিমূলক লোকতন্ত্রকে স্বীকার করে নেন, তবু তার মধ্যে বাস করেও, সত্যাগ্রহের ও সবিনয় কানুন ভঙ্গের অধিকার থাকা চাই, এ কথাও জানেন। আইনের রাজ্য (Rule of Law) ও প্রতিনিধি সভার সত্তা (Sovereignty of Parliament) এ দুইটিকে বৃটিশ জনতন্ত্রের আধারভূততত্ত্ব বলে মানা হয়। কিন্তু সত্যাগ্রহী তত্ত্বজ্ঞানে এ তত্ত্বকে অন্তিম নিষ্ঠারূপে মানা যায় না। আরও একটু এগিয়ে গিয়ে, "প্রজার অন্তরাত্মার প্রভুত্ব" ও ন্যায়ের রাজত্ব এই দুই শব্দ দিয়েই সত্যাগ্রহী লোকতন্ত্রের অন্তিম নিষ্ঠা ব্যক্ত করা যেতে পারে।

প্রাগতিক জনতন্ত্র ও সত্যাগ্রহী জনতন্ত্রের মধ্যে আরো একটি প্রভেদ আছে। প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন স্বার্থ সাধনে রত থেকে সেরূপ স্বাধীনতা অন্য ব্যক্তিকেও দিলে, সমাজের হিত সহজেই সাধিত হয়, এই ভ্রমপূর্ণ যুক্তিবাদ সত্যাগ্রহী তত্ত্বজ্ঞান বিন্দুমাত্রও স্বীকার করে না। এই ভ্রমপূর্ণ যুক্তির উপরই পুঁজিবাদী সংস্কৃতি স্থাপিত হয়েছে। বেন্থাম, এডাম স্মিথ প্রভৃতি প্রাগতিক তত্ত্বজ্ঞানের আদি-প্রণেতারা এই ভ্রমপূর্ণ যুক্তির স্তুতি করেছেন ও একেই অর্থশাস্ত্রের আধারভূত গৃহীত তত্ত্বরূপে মেনে নিয়েছেন। এই ভ্রমপূর্ণ তত্ত্বের উপরকার চাকচিক্য ছুটে গেছে ও আত্মিক ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ ও নিয়োজনের আবশ্যকতা সকল অর্থশাস্ত্রীরাই স্বীকার করেছেন।

আর্থিক ও সামাজিক গঠনের বুনিয়াদ

এই যথেষ্ট নয়। স্বার্থ ও প্রতিযোগিতার তত্ত্বের উপর অবধারিত পুঁজিবাদী সমাজ গঠনের মূল বুনিয়াদই আমাদের বদলাতে হবে। স্বার্থের বদলে সেবা ও প্রতিযোগিতার বদলে সহযোগিতার তত্ত্বের উপর নূতন আর্থিক ও সামাজিক গঠনের বুনিয়াদ স্থাপন করতে হবে। প্রাগতিক অর্থশাস্ত্রী ও সমাজশাস্ত্রীদের এ বিষয়ে পূর্ণচেতনা এখনও আসে নাই। সত্যাগ্রহী তত্ত্বজ্ঞান এ বিষয়ে সমাজবাদের সঙ্গে একমত। তারা মানে যে সম্পত্তির সামাজিক স্বামিত্ব, বর্ণহীন সমাজ, আর্থিক সমতা, সহযোগিতা ও সেবার তত্ত্বের উপরই নবসমাজ নির্মিত হবে। আজকার মানব-সংস্কৃতিতে ইহা মূলভূত ক্রান্তি। এই ক্রান্তি, অহিংসক পদ্ধতিতে ও লোকতন্ত্র দ্বারাই হওয়া চাই, তবেই ইহা সফল হতে পারে। লোকতন্ত্র ও সমাজবাদের মূলে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর যে ধ্যেয় আছে, তা তখনই মূর্ত্ত হতে পারে ও মানব সংস্কৃতি সুখ ও শান্তিতে থাকতে পারে। ইহাই সত্যাগ্রহী নিষ্ঠা। কিন্তু প্রাগতিক তত্ত্বজ্ঞানের বিশ্বাস এই যে ব্যক্তির ধনসংগ্রহ ও ধনবৃদ্ধির অধিকার থাকা চাই এবং আর্থিক বর্গভেদ ও পুঁজিবাদী সংস্কৃতির মূল আধাররূপে কায়েম থাকা চাই। "আমাদের সংস্কৃতির পক্ষে এই বিশ্বাস মৌলিক" এই নিষ্ঠার ভিত্তিতেই আমেরিকার কাজকর্ম চলেছে। এ ছাড়া জনতন্ত্র টিকতে পারে না, এই তাদের ধারণা। ইসা মসিহ দ্বারা উপদিষ্ট জীবনমূল্যের আধারও তারা এতে পান। এজন্য এই মনোবৃত্তি ক্রমে বাড়ছে যে সম্পত্তির সামাজিক স্বামিত্ব ও বর্গহীন সমাজকে স্বীকারকারী সমাজবাদকে সমূলে উৎখাত করাই "সংস্কৃতি সংরক্ষক" হিসাবে তাদের কর্ত্তব্য। সত্যাগ্রহীর দৃষ্টি ঠিক এর বিপরীত। এ মনে করে সমাজবাদী আর্থিক সংগঠনের তত্ত্বকে স্বীকার করা ছাড়া ও সেই তত্ত্বের উপর নবসমাজের স্থাপনা ছাড়া লোকতন্ত্র সার্থক ও সফল হতে পারে না। এজন্য সত্যাগ্রহী তত্ত্বজ্ঞান সুধীরবাদ থেকে ভিন্ন হয়ে গেছে। আর এ অহিংসক হলেও ক্রান্তিবাদী। বস্তুতঃ অহিংসক ক্রান্তিবাদই খাঁটি বৈজ্ঞানিক ক্রান্তিবাদ ও সাম্যবাদীদের শস্ত্রগ্রহী ক্রান্তিবাদ অবৈজ্ঞানিক। সত্যাগ্রহী তত্ত্বজ্ঞানের এই দৃঢ়বিশ্বাস যে এই অবৈজ্ঞানিক ক্রান্তিবাদের আশ্রয় নিয়ে লোকতন্ত্র ও সমাজবাদের মূলভূত ধ্যেয় কখনও লাভ করা যাবে না।

এই সামাজিক ক্রান্তি কেবলমাত্র বুদ্ধির জোরে অর্থাৎ মত পরিবর্ত্তনের যুক্তিযুক্ত পদ্ধতিতেই হতে পারে না। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, প্রাগতিকদের কেবলমাত্র বুদ্ধিবল ও যুক্তিবাদ সমাজের মূলভূত বিশ্বাস

অথবা নিষ্ঠার পরিবর্ত্তন আনতে অসমর্থ প্রমাণিত হয়েছে। গান্ধীজী ইহা অনুভব করেছিলেন তাই তিনি আত্মিক শক্তির পথ খুঁজে বার করলেন।

ত্রিবিধ পরিবর্ত্তন

এ আত্মিক শক্তির পথে তিন প্রকারের পরিবর্ত্তন অভিপ্রেত। এই ত্রিবিধ পরিবর্ত্তনকে বিনোবাজী 'ক্রান্তির ত্রিকোণ' এই সুন্দর নাম দিয়েছেন (১) মত পরিবর্ত্তন (২) হৃদয় পরিবর্ত্তন (৩) পরিস্থিতি পরিবর্ত্তন। সত্যাগ্রহীর বিশ্বাস, সমাজে এই ত্রিবিধ পরিবর্ত্তন এনে সমাজহিতের জন্য আবশ্যক ক্রান্তি অহিংসা দ্বারা হতে পারে। যিনি স্বভাবেই সজ্জন এবং সমাজের ন্যায় স্থাপনা হওয়া চাই এই যার সহজ বৃত্তি, তার মত পরিবর্ত্তন সত্যাগ্রহী লোকসেবকের সতত বিচার, প্রচার ও সক্রিয় নৈতিক সাহচর্য্যে তাড়াতাড়িই হতে পারে। কিন্তু যার ন্যায়বুদ্ধি স্থিতিশীল আচারের দরুণ মন্দ ও মলিন হয়ে গেছে, তার মত পরিবর্ত্তন করবার পূর্ব্বে হৃদয় পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়। এজন্য সত্যাগ্রহের অনত্যাচারী অসহযোগ ও আত্মক্লেশের সার্থ গ্রহণ ক'রে সমাজের হৃদয় পরিবর্ত্তন ও সামাজিক মূল্যের নিদর্শন করাতে হয়। আসপাশের সমাজে এপ্রকার হৃদয় পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব হ'লেও বদ্ধমুল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সহযোগ ও সত্যাগ্রহের পথ অন্যায়পীড়িত জনতা গ্রহণ করতে আরম্ভ করলে, পরিস্থিতি পরিবর্ত্তন সহজ হয়ে যায়। পরিস্থিতি পরিবর্ত্তন হওয়া পর্য্যন্ত যাদের মত পরিবর্ত্তন হয় না, তাদের মত পরিবর্ত্তন এই নূতন পরিস্থিতি দর্শনে হতে পারে ও এরাও ক্রান্তির বিরোধ করা ছেড়ে দেয়। এদের মধ্যে কয়েকজন ক্রান্তিকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। এই পরিস্থিতি তৈরী হয়ে গেলে, ক্রান্তির পথ কানুন বা রাজদণ্ড কিছুতেই অবরোধ করতে পারে না। পরন্তু কানুন ও রাজদণ্ড এই কান্তির পিছনে পিছনে এসে তার সহায়তাই করে। এই ভাবে মত-পরিবর্ত্তন হৃদয়-পরিবর্ত্তন ও পরিস্থিতি পরিবর্ত্তন রূপে "ক্রান্তির ত্রিকোণ" পূর্ণ হয়। সত্যাগ্রহী সাধক দ্বারা যে ক্রান্তি করা যাবে, তাই খাঁটি ক্রান্তি হবে। এই ক্রান্তি শাস্ত্রকেই "বৈজ্ঞানিক ক্রান্তিশাস্ত্র" এই আখ্যা দেওয়া যায়। এইভাবে সত্যাগ্রহী-দৃষ্টি-যুক্ত বিচারকের কাছে, মার্কসবাদ দ্বারা নির্মিত একনায়ক ক্রান্তি কোন রকমেই বৈজ্ঞানিক মনে হতে পারে না।

পুঁজিপতির মত পরিবর্ত্তন

"মত পরিবর্ত্তন, হৃদয় পরিবর্ত্তন পরিস্থিতি পরিবর্ত্তনের আধারে সত্যাগ্রহ দ্বারা সামাজিক ক্রান্তি করা যায়" এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মার্কসবাদ এই যুক্তি দেখায় যে, পুঁজিপতির মত পরিবর্ত্তন কখনও হতে পারে না। মার্কস বর্গসংঘর্ষের তত্ত্বের আবিষ্কারক ও এই তত্ত্বের গুণগান করেছেন। এজন্য উপযুক্ত যুক্তি সমাজবাদী, কমপক্ষে মার্কসবাদী দৃষ্টিতে অখণ্ডনীয়। মনুষ্যস্বভাব ও মানবীয় অন্তঃকরণের যে দর্শন মার্কস লাভ করেছিলেন, তাই অন্তিম সত্য ও এই তত্ত্বের মধ্যে আর অনুসন্ধান করবার আবশ্যকতা নাই, এ মত ও অবৈজ্ঞানিক। এরূপ জগত দিয়ে এইযুক্তিকে খণ্ডন করা যায়। গান্ধীজী সত্যাগ্রহী ক্রান্তি শাস্ত্র খুঁজে বের করেছেন ও তার প্রভাবকে প্রকট করেছেন। এ প্রভাব কাল্পনিক নয় বাস্তব। জয়প্রকাশজী সমাজবাদীদের বলেন যে, বস্তুনিষ্ঠ ক্রান্তিশাস্ত্রের জনকরূপে প্রসিদ্ধ মার্কস যদি এ প্রভাব দেখতেন তো নিজ সিদ্ধান্তের আরও গভীর বিচার করতেন। আমি আরো একটু বাড়িয়ে বলতে চাই যে পুঁজিবাদী আর্থিক সংগঠনের জন্য যে বর্গসংঘর্ষ সমাজে ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে, সেই বর্গসংঘর্ষের পরিস্থিতি যখন উৎকট ভাবে তীব্র হতে থাকে, তখন পুঁজিপতিবর্গের লোকেদেরও মত পরিবর্ত্তন হতে পারে, ও তাদের মধ্যে অনেকে ক্রান্তির বিরোধ করাই ছেড়ে দেয়। কেউ কেউ এতে যোগ দেয়, কিছুতো তাতে নেতৃত্ব পর্য্যন্ত করতে লেগে যায়। মার্কসেরও এ ধারণা স্পষ্ট ছিল। কম্যুনিষ্ট ঘোষণাপত্রের নিম্ন উদ্ধৃতি এই দিক দিয়ে বিচারযোগ্য ও বোধপ্রদ :—

Finally, in times when the class struggle nears the decisive hour, the process of dissolution going on within the ruling class—in fact, within the whole range of an old society—assumes such a violent, glaring character that a small section of the ruling class cuts itself adrift and joins the revolutionery class, the class that holds the future in its hands. Just as, therefore, at an earlier period a section of the nobility went over to the bourgeosie, goes over to the proleteriat, and in particular, a portion of the bourgeosie ideologists who have raised themselves to the level of comprehending theoretically the historical movements as a whole.

অবশেষে, বর্গসংঘর্ষ যখন অন্তিম মুহূর্ত্তের দিকে এগিয়ে আসে, তখন শাসকশ্রেণীর মধ্যে কেন পুরাতন সমাজের সমস্ত পরিধি জুড়ে, যে ভাঙ্গন চলতে থাকে তা এমন উগ্র সুস্পষ্ট আকার ধারণ করবে যে, শাসকশ্রেণীর একটি ক্ষুদ্র অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে, ভবিষ্যতের নিয়ামক বৈপ্লবিক শ্রেণীতে যোগ দেয়। যেমন পুরাতন কালে অভিজাত শ্রেণীর একটি অংশ বুর্জুয়া (মধ্যম) দলে চলে এসেছিল; তেমনি এখন প্রলেটিরিয়েট (সর্ব্বহারা ইতর শ্রেণী) এ সামিল হয়। বিশেষ করে আসে সেই সব বুর্জুয়া আদর্শবাদীরা, যারা তত্ত্বের দিক দিয়ে ঐতিহাসিক প্রগতিকে সমগ্রভাবে বুঝবার মতো নিজেদের উন্নত করতে পেরেছে।

তর্কসংগত জীবনদান

কম্যুনিষ্ট ঘোষণাপত্রের উপরোক্ত উদ্ধৃতিটি মনোযোগ দিয়ে পড়লে বুঝা যাবে যে মার্কস মনে করতেন, পুঁজিবাদী সমাজে যখন বর্গসংঘর্ষ বাড়তে বাড়তে তা সমাজ-গঠনকে দহন করতে আরম্ভ করে, তখন পুঁজিপতিবর্গের অনেকে, বিশেষ করে তার মধ্যে দূরদৃষ্টিশালী বিচারক, যার সমস্ত সমাজের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা আছে, তিনি ক্রান্তির

বিরোধ ক'রে ক্রান্তিকারী দলে যোগ দেন। মার্কস তার এই মতের সমর্থন হিসাবে এক ঐতিহাসিক প্রসঙ্গও উপস্থিত করেছেন যে, সামন্ত শাহীর বিরুদ্ধে যখন ক্রান্তি হয়, তখন সেই বর্গের লোকেরাও অবশেষে এই ক্রান্তিতে যোগ দেন। সত্যাগ্রহী তত্ত্বজ্ঞানের মত পরিবর্ত্তন ও হৃদয় পরিবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত ও মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণে অভেদ প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি উপরোক্ত উদ্ধৃতি এই জন্যই দিয়েছি যে, যখন সমাজের হৃদয় পরিবর্ত্তন ও সামাজিক পরিস্থিতিতে পরিবর্ত্তন হয়, তখনও পুঁজিপতিদের মত পরিবর্ত্তন হতে পারে না, এরূপ দুরাগ্রহ মার্কসবাদও স্বীকার করে না। যাহোক, যিনি সত্যাগ্রহের প্রভাব দেখেছেন তিনি যদি বিনোবাজীর ত্রিকোণাত্মক ক্রান্তির সিদ্ধান্ত অনুধাবন করেন তো এ প্রকার দুরাগ্রহের শিকার হবেন না ও ক্রান্তির জন্য প্রয়োজন ত্রিবিধ পরিবর্ত্তন আনায় নিজের জীবনদানের সংকল্প করবেন।

মার্কসবাদী বিচারে ইতিহাসের বস্তুস্থিতির বিশ্লেষণে আরো একটি অপপ্রয়াস দেখতে পাওয়া যায়। তাদের কথায় লোকের এই ধারণা হয় যে ক্রান্তি সব সময়ই একটি মাত্র বর্গ করে, ও অন্যান্য বর্গ সংগঠিত ভাবে তার বিরোধ করতে থাকে। কিন্তু রুশদেশ ও ফ্রান্সে যে ক্রান্তি হল, তার ইতিহাস বাস্তবিক তা নয়। ক্রান্তির সময় সমস্ত বর্গই ভিন্ন ভিন্ন কারণে, প্রতিষ্ঠিত রাজ্যসত্তার বিরুদ্ধে অসন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছিল ও তাকে উপড়ে ফেলবার জন্য তৎপরও হয়ে উঠেছিল। সে সময় পুরানো রাজসত্তা সকলের অত্যাচারী বা অত্যাচারী অসহযোগে ভেঙ্গে পড়ে ও সমাজে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ে। এই অরাজক অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন পক্ষ চেষ্টা করে সত্তা নিজ হাতে নিয়ে নিজের দলের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে। এই প্রচেষ্টায় লোকতন্ত্র খতম হয়ে যায় ও তানাশাহী (একনায়কত্ব) কায়েম হয়। ইতিহাসের এই পাঠ শিখে নিয়ে যাতে তার পুনরাবৃত্তি না হয়, সেজন্য সত্যাগ্রহী ক্রান্তি শাস্ত্রের জন্ম। এই ক্রান্তিশাস্ত্র এই সিদ্ধান্ত মানে যে, কেবলমাত্র যুক্তিবাদ ও বিচার প্রচার দ্বারাই নয়, পরন্তু আত্মক্লেশ, অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ দ্বারা সমাজের সমস্ত লোকের হৃদয় পরিবর্ত্তন ও মত পরিবর্ত্তন করা সম্ভব। ইহাই আত্মবাদী সিদ্ধান্ত। এর অর্থ এই যে, সকলের হৃদয়েই ন্যায়নিষ্ঠার অন্তরাত্মা বাস করে, আর তাকে জাগান যায়। সমাজের এই ন্যায়বুদ্ধি জাগ্রত হয়ে, প্রতিষ্ঠিত ও রূঢ় ন্যায় অন্যায় ধারণায় ক্রান্তি যখন হয়, তখন এক নূতন ক্রান্তিকারী পরিস্থিতির উদ্ভব হয় ও তার সামনে সকলকেই নতিস্বীকার করতে হয়। নূতন পরিস্থিতির ধারণা সত্তাধারী ও সম্পত্তিবানবর্গেরও হয়। কাজেই ক্রান্তি কেবল একটী বর্গই করে, এ কথনও ঐতিহাসিক সত্য হতে পারে না! ক্রান্তিকারী অবস্থার সৃষ্টি হলে তার জ্ঞান ধনবান ও সত্তাধিকারীর হয় না এ কথা বলাও ভুল। এর মধ্যে সত্য এইটুকুই যে, প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় সত্তা ও সম্পত্তির পূর্ণ উপভোগ যারা লাভ করে, তাদের মত পরিবর্ত্তন করতে কেবল বুদ্ধিবল অপর্য্যাপ্ত। তার সঙ্গে এ কথাও সত্য যে ক্রান্তির অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা দলিত বর্গের অনুভূত হলেও, তার স্বরূপ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানও তাদের হওয়া দরকার। আবার সেজন্য যে দুঃখ আসবে তা সইবার ও আবশ্যক ত্যাগ করবার জন্য এই বর্গ কেবল যুক্তিবাদ দ্বারাই প্রবুদ্ধ হতে পারে না। তাদের পরিবর্ত্তন করবার জন্যও ক্রান্তির ত্রিকোণ অবলম্বন করা দরকার। ভূদান আন্দোলন দিয়ে যে ক্রান্তি করা হবে; তাতেও এই ত্রিকোণ গ্রাহ্য। এ কথা মনে রাখলে মতভেদের কোন কারণ থাকবে না।

লোকরাজ্য হতে আত্মরাজ্যের দিকে

সমাজে প্রকৃত শান্তি ততদিন আনতে পারে না ও টিঁকতে পারে না, যতদিন প্রতিনিধিমূলক জনতন্ত্র ও পুঁজিবাদী আর্থিক গঠন থেকে আমরা এগিয়ে না যাই। ততদিন সকলের রোজগারের প্রশ্নের সমাধান হয়ে ন্যায়ের স্থাপনা হতে পারে না। এ অনুভব আজ হচ্ছে। এদিকে ভূদান আন্দোলন এ কথা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে প্রতিনিধিমূলক লোকতন্ত্র থেকে আজ আত্মরাজ্যের দিকেই এগিয়ে যেতে হবে ও আমাদের ধ্যেয় শাসনমুক্ত সমাজ অথবা দণ্ডহীন সামাজিক সংগঠন এবং বর্গহীন সমাজ। বুদ্ধগয়া সম্মেলন এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে আত্মরাজ্য লাভ করবার পথ সম্পত্তির সমাজীকরণ ও বর্গহীন সমাজ স্থাপনার ভিতর দিয়ে গিয়েছে। এজন্য ভারতীয় ক্রান্তির হালও সেই দিকে ঘোরাতে হবে। বর্গসংস্থা ও সম্পত্তির ব্যক্তিগত স্বামীত্ব ও আত্মরাজ্য প্রাপ্তিতে সবচেয়ে বড় বাধা। এজন্য যিনি শাসনমুক্ত সমাজএর প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন, তাঁকে আর্থিক ক্রান্তিকেই আপনার সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য বলে মানতে হবে। এ বিষয়ে আজ কোন মতভেদ নাই। মার্কসবাদ ও গান্ধীবাদে আর্থিক ক্রান্তির সাধন ভিন্ন। মার্কসবাদ একদলীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে আর্থিক ক্রান্তি করতে চায়। গান্ধীবাদ বা সত্যাগ্রহী ক্রান্তিশাস্ত্র এই ক্রান্তির কাজ পক্ষাতীত ভাবে ও লোকশক্তির দ্বারা করতে চায়।

পক্ষ বিসর্জনের প্রক্রিয়া

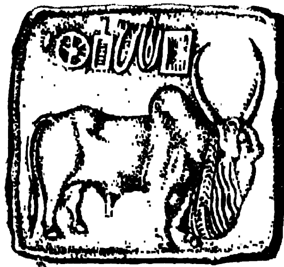
প্রতিনিধিমূলক জনতন্ত্রে যে রাজনৈতিক পার্টি পদ্ধতির উদয় হয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে, সামাজিক ক্রান্তির পক্ষে এই পার্টি পদ্ধতি কেবল যে অপর্য্যাপ্ত প্রমাণিত হয় তা নয়, ইহা দলীয় একনায়কত্বের বিকৃতিতে পরিণত হয়। এতে জনতন্ত্রই শেষ হল মনে করা যায়। এই অনুভূতির জন্যই সত্যাগ্রহী দৃষ্টি মনে করে কি, সামাজিক ক্রান্তির কাজ কেবলমাত্র একটি দলের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে, তা পক্ষাতিত ভাবে চলা উচিত, আর এই কাজের পেছনে যে শক্তি থাকবে তা জনতার হাতেই থাকা উচিত। সত্যাগ্রহ জনতার প্রত্যক্ষ প্রতিকার (Direct action) এর এক পথরূপে ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করে। ইহা সম্পূর্ণরূপে অহিংস পথ। এজন্য তার অন্তিম ধ্যেয় দণ্ডহীন সমাজ বা শাসনমুক্ত সমাজই হতে পারে। তা পেতে হলে সম্পত্তির সমাজীকরণ ক'রে বর্গসংস্থার শেষ করতে হবে, একথা অনেক দেরীতে স্পষ্টই হয়ে উঠেছে।

রাজ্যসংস্থা নষ্ট করবার আদর্শ স্বীকার করে নেবার পর রাজ্যসংস্থার সাহায্যেই সামাজিক ক্রান্তি করবার এই মার্কসবাদী অসংগতির কথা যখন চিন্তা করব, তখন আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে যে, সামাজিক ক্রান্তি

সত্যাগ্রহ দ্বারা করতে হলে, ইহা পক্ষাতীত বৃত্তিতেই করা চাই আর প্রতিনিধিমূলক জনতন্ত্রে যে পক্ষসংস্থা প্রবল হয়ে রয়েছে তা ধীরে ধীরে নষ্ট করে দিতে হবে। বিনোবাজীর এই দৃষ্টিকোণ সত্যাগ্রহ অনুসারেই হয়েছে। পক্ষ পদ্ধতির দোষ আজ সকল পক্ষের নেতাই স্বীকার করলেন। কিন্তু নেহরু ও জয়প্রকাশজীর মতো নেতা এর বাস্তববাদী কল্পনা এখনও করতে পারেন নাই যে, পক্ষ পদ্ধতি নষ্ট করে লোকশাহী রাজত্ব কিভাবে চালান যেতে পারে। এজন্য যদিও প্রতিনিধিমূলক জনতন্ত্র দোষযুক্ত ও পক্ষ পদ্ধতিও দোষযুক্ত, তবু বাস্তববাদী রাজনৈতিক দৃষ্টিতে আজকার পরিস্থিতিতে ইহা অনিবার্য্য হয়ে গেছে। একথা স্পষ্ট যে রাজনৈতিক ক্রান্তি সত্যাগ্রহ দিয়েই করতে হবে। তবু এ কাজ যে করবে সে কোন পক্ষভুক্তই হবে না একথা মানা হয় না। সবপক্ষের সহযোগে এই কাজ হোক, কিন্তু সে কাজে সকলেই পক্ষাতীত মনোবৃত্তি নিয়েই যোগ দিক, এই নীতি মানা হয়। এদেশে আজ বহু পক্ষ আছে। এজন্য সব পক্ষের জন্য সমান কার্য্যক্রম যত হয় খুঁজে বার করা ও সব পক্ষের সহকারীতার ক্ষেত্র বাড়াতে যাওয়া দরকার। পক্ষ পদ্ধতির দোষ নষ্ট করা ও অবশেষে দল-সংস্থাকে বিলীন করে দেওয়ার ইহাই ব্যবহারিক মার্গ। সবপক্ষের জন্য এ প্রকার সমান ও স্বীকৃত কার্য্যক্রমে, জমি তথা উৎপাদনের অন্যান্য সাধনের সমাজীকরণ, বর্গহীন সংস্থাপনার ধ্যেয়ের প্রসার ও এর জন্য আবশ্যক জনশক্তি আবাহন এর কার্য্যক্রমকে সমাবিষ্ট করার প্রয়োজন বিনোবাজী বুঝেছেন। ভারতের সামাজিক ও আর্থিক ক্রান্তির কাজ আজ সব পক্ষের জন্য সমান কার্য্যক্রম হয়ে গেছে। এই ক্রান্তিকারী কাজের পেছনে সত্যাগ্রহী শক্তিকে খাড়া করবার কাজ আজ বিনোবাজী ও জয়প্রকাশজী করছেন। বিনোবাজী সামাজিক ও আর্থিক ক্রান্তির ধ্যেয়ের প্রসার সাধন করেছেন ও জনতার অহিংসক শক্তিদ্বারা এই ধ্যেয় লাভ করবার জন্য এগিয়ে গিয়েছেন। এ দিয়ে বিনোবাজী ভারতীয় ইতিহাস ও মানব সংস্কৃতিকে আত্মরাজ্যের দিকে নিয়ে যাবার পথ দেখিয়েছেন।

আত্মরাজ্যের ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্বরূপ

সত্যযুগ, পরমাত্মার রাজ্য, রামরাজ্য অথবা আত্মরাজ্য প্রভৃতি ধ্যানের দীপশিক্ষা কমপক্ষে রামরাজ্যের সময় হতে মানুষের অন্তঃকরণে অনির্বাণ জ্বলছে। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যিশু ও মহম্মদ—এ সবারই অন্তিম ধ্যেয় ছিল এই আত্মরাজ্য। এই আত্মরাজ্যের পূর্ণ ও শুদ্ধ স্বরূপ অব্যক্ত ও অনির্দিষ্ট। এই সনাতন, অব্যক্ত ও অনির্দিষ্ট ধ্যেয়কে ব্যক্ত, নির্দিষ্ট অথবা কোন মূর্ত স্বরূপ আপন আপন সময়ের জন্য করে নিতে হবে, আর তার আরাধনার সাধন মানবমাত্রকে উপলব্ধ করাতে হবে। এ ছাড়া এই আত্মরাজ্যের দিকে নিয়ে যাবার ধ্যান মানুষের ব্যবহারে মূর্তরূপ পরিগ্রহ করতে পারবে না। ভারতীয় সংস্কৃতি নিজ অন্তঃকরণে রামরাজ্যের যে অমূর্ত ধ্যেয় প্রতিষ্ঠিত করেছে, তাকে মূর্তরূপ দেবার জন্য প্রাচীনকালে বর্ণাশ্রম ধর্মের সামাজিক সংগঠন ভারতীয় সংস্কৃতি তৈরী করেছিল। আত্মরাজ্য স্থাপিত হউক মানব অন্তঃকরণের এই সনাতন প্রেরণা এই সংগঠনের পেছনে ছিল। আত্মরাজ্যের এই অব্যক্ত প্রেরণা যদিও সনাতন, তবু তাকে বর্ণাশ্রমের যে বিশিষ্ট আকার দেওয়া হয়েছিল অথবা প্রাপ্ত হয়েছিল, তা সনাতন ছিল না ও সনাতন নয়। বর্ণাশ্রম ধর্মে যে আত্মরাজ্যের অব্যক্ত প্রেরণা ছিল, গান্ধীজী সেই প্রেরণাকেই জাগ্রত করলেন, ও সত্যাগ্রহ দ্বারা তাকে ক্রান্তিকারী রূপ দান করলেন। এই সত্যাগ্রহী ক্রান্তিকারী আত্মপ্রেরণা থেকেই ভারতে আত্মরাজ্যের নূতন স্পষ্টিকরণ, নূতন আবিষ্করণ হচ্ছে। এই আবিষ্কারের মূর্তরূপ আজ বিকেন্দ্রিত লোকশাহী সমাজবাদ (Decentralised Demo-Cratic Socialism) হবে। আমার মনে হয়, আত্মরাজ্যের অব্যক্ত ও শুদ্ধ স্বরূপ তো দণ্ডহীন সমাজ, কিন্তু তার আজকার ব্যক্ত ও নির্দিষ্ট স্বরূপ বিকেন্দ্রিত লোকশাহী সমাজবাদই হবে। এই বিকেন্দ্রিত লোকশাহী সমাজবাদের অন্তঃপ্রেরণা সত্যাগ্রহ। এর প্রবৃত্তি হবে, রাজনৈতিক পক্ষ ও রাজ্যসংস্থা উভয়েরই উত্তরোত্তর বিলুপ্তির দিকে অগ্রসর হওয়া। সত্যাগ্রহী জনশক্তি যতদূর পর্য্যন্ত স্বয়ংপূর্ণ ও স্বাবলম্বী গ্রামরাজ্য নির্মাণে সক্ষম হবে, ততদূরই রাজনৈতিক পক্ষ ও রাজদণ্ডের লোপ ও অস্ত হবে। আত্মবাদী তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা নির্মিত "লোককারণ"এর অর্থাৎ সত্যাগ্রহী প্রজাধর্মের তত্ত্বজ্ঞান ও তাহার ব্যবহারের বিকাশের এই কাজই আমার কাছে একমাত্র করণীয় বলে প্রতিভাত হয়। এই ক্রান্তিকারী প্রেরণা থেকে যে নবসমাজ উদ্ভূত হবে, তাকে আকার দেবার কাজে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক পক্ষ কমবেশী প্রমাণে যোগ দেবেই। তবু এই কাজ কোন বিশেষ দলের কাজ হবে না। আর ইহা সবদলের সমান ধ্যেয় হলেই তাতে ভারতীয় জনতন্ত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিহিত আছে।





উপানন্দ

ইচ্ছাশক্তি ও ব্যক্তিত্ব

পৃথিবীতে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন কৃতীপুরুষের সমাদর আছেই। যার ব্যক্তিত্ব নেই, তার সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ হয় না। তোমরা ইচ্ছাশক্তি অনুশীলনের দ্বারা ব্যক্তিত্বগঠন করবে, নতুবা সংসারে হেয় প্রতিপন্ন হবে। বোধহয় দেখেছ দুই ভাইয়ের মধ্যে একজন বিশেষ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হয়ে দেশের ও দশের কাছে বরমাল্য লাভ করছে, অপর একজন ব্যক্তিত্ব হীন হয়ে জনসমাজে অবজ্ঞার স্তরে বা উপেক্ষার মধ্যে পড়ে রয়েছে। প্রশ্ন উঠতে পারে—এর কারণ কি? এর উত্তরে বলা যেতে পারে, যে ভাইটী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন কৃতীপুরুষ হয়েছে, সে ছেলেবেলা থেকেই সঙ্কল্প করেছিল মানুষের মত মানুষ হবো, আর সকল অবস্থায়ও সকল বয়সের লোকের সঙ্গে মানুষের মত ব্যবহার করবো। এর অন্তরে বাইরে এমন সব সৎপ্রবৃত্তি, আচরণ ও আশা আকাঙ্ক্ষা বাল্যকাল থেকে রূপ নিয়েছে, যা তার ইচ্ছাশক্তির জোরে ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে। উন্নতিশীল মানুষের মধ্যে এই সব সদ্‌গুণ সহজাত বলেও অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন। শৈথিল্য, আলস্য, দীর্ঘসূত্রতা, নিষ্ফল আমোদ-প্রমোদ আর লক্ষ্যহীন দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ফলে অপর ভাইটী উন্নতির স্তরে উঠতে না পেরে মনুষ্যপদবাচ্য হওয়া তার পক্ষে সম্ভব হোলো না। তার জীবন পর্য্যালোচনা করলে দেখতে পাবে, তার আশা আকাঙ্ক্ষা বা উচ্চ বাসনা নেই। নিষ্কর্ম্মা লক্ষ্যহীন মানুষ সমাজের শত্রু। অল্পবয়স্কেরা অবিবেচকের মত আমোদের অনুসরণ করে শেষে অনুতপ্ত হয় ও অবশিষ্ট জীবন দুঃখে যাপন করে। তাই কৈশোর অবস্থা থেকেই সতর্ক হবে। কৈশোরেই তোমাদের প্রথম অনুসন্ধান করতে হবে সেই সব মহামানবের জীবনী, যাঁরা সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব দ্বারা পৃথিবীতে বরেণ্য হয়েছেন ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উর্দ্ধস্তরে অবস্থান করছেন। তোমাদের মনে এঁদের আদর্শ যদি স্থিতিলাভ করে, তাহোলে তোমরা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কৃতীপুরুষ হোতে পারবে। জেনে রেখো, পরিশ্রমীর অন্ন শ্রম-বিমুখ অলস ব্যক্তির জন্যে নয়। অপরের চরিত্রগত দুর্ব্বলতা স্মরণ করে নিজের মনটাকে নির্ম্মম হোতে দেওয়া কোনমতেই যুক্তিসঙ্গত নয়। উচ্চলক্ষ্য, উন্নত আশা, আর সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি না থাকলে মানুষ পশুতে পরিণত হয়। জেনে রেখো অভাব ক্রমশঃ বাড়িয়ে তোলা, ক্রমাগত অপরের সঙ্গে নিজের তুলনা করা, বাইরের লোকের মতামতের ওপর একান্ত নির্ভর রাখা—মোটামুটি, এই সবই মানুষকে বিগড়ে দেয়। যেখানে নিজের গুণ প্রকাশ হোলে, সঙ্গে সঙ্গে অপরের দোষ ও প্রকাশ হবার সম্ভাবনা, সেরূপ সঙ্কট স্থল যথাসাধ্য পরিবর্জ্জন করবে। শক্তি যার প্রয়োজন-সাধনের অতিরিক্ত, সে ক্ষুদ্র কীট হোলেও শক্তিমান ও সুখী। যদি বড় হোতে চাও, তা হোলে অবজ্ঞার সুর একেবারে বন্ধ করে দাও, আর মানুষ হয়ে, মানুষের অমর্য্যাদা করো না। পরছিদ্র অন্বেষণকারী জীবনে কখন বড় হয় না বা সুখী হয় না। পরকে কাঁদালে নিজেকে কাঁদতে হয়। পরের সঙ্গে নিজের তুলনা করতে গিয়ে, লোকের কাছে নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করবার আকাঙ্ক্ষা জন্মে,—অপরের দিকে উন্নাসিক হয়ে তার প্রতিভার অবমাননা করে যারা মিথ্যার আশ্রয়ে নিজেকে জাহির করতে চায়, তারা পরে ধরা পড়ে,—তাদের মিথ্যার আশ্রয়ে বড় হয়ে উঠ্‌বার কুঅভিসন্ধিগুলো তাদের উন্নতির অপমৃত্যু আনে আর তারা ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র হয়। ক্ষুদ্রচিত্তে শূন্যগর্ভ গর্ব্ব শরতের মেঘের গর্জ্জনের মত নিষ্ফল। মদমাৎসর্য্য ও দুরাকাঙ্ক্ষা থেকে অজস্র ক্ষুদ্রতা আর নানা বিবাদ বিসম্বাদের উৎপত্তি হয়। কোন প্রতিভাকে হনন করবার জন্যে দুরভিসন্ধির আশ্রয় নিওনা, তাহোলে নিজের প্রতিভাই শুধু নয়, আরও অনেক সদ্‌গুণ যা অর্জ্জন করেছ, এক নিমেষে হৃত হয়ে যাবে! ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন কৃতী পুরুষেরা কখন এরূপ অবগুণের মধ্যে থাকেন না। তাঁরা উদার, তাঁরা সকল মানুষকে ভালোবাসেন আর কোন সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে রাখেন না। আত্মানুরাগ, বিকৃত হোলে, তা আত্মাভিমানে পরিণত হয়। এরূপ পরিণতি উন্নতির পথে অন্তরায়। মনের ভেতর দুটী স্তর আছে—(১) সজ্ঞান (২) নির্জ্ঞান। মনের নির্জ্ঞান বা অবচেতন স্তর হচ্ছে ঠিক যেন গুদাম বা ভাণ্ডার। এর ভেতর যা কিছু প্রবৃত্তি, আকাঙ্ক্ষা, ধারণা,

অভ্যাস বা শিক্ষার ফলাফল, বাইরের ছাপ প্রবেশ করে। মনের অবেচতন স্তরে প্রত্যেক চিন্তা বা কার্য্যের সূতিকাগৃহ রয়েছে। এখান থেকেই যে সব ভাব বা বাসনার উৎপত্তি, সেগুলি একে একে বাইরে সক্রিয় হয়ে ওঠে, তা ভালোই হোক্ আর মন্দই হোক্। মেয়েপুরুষ নিজেরাই নিজেদের শত্রু। এমন অসম্ভব চিন্তা করে বসে যার থেকে তাদের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা বা প্রবৃত্তি সরে যেতে বাধ্য হয় তাদের মনের দুর্ব্বলতার ফলে। পরীক্ষা দেবার সময়ে ভাবে, কিইবা হবে পরীক্ষা দিয়ে, কৃতকার্য্য হোতে পার্‌বোনা,—হয়তো সে অনেকখানি পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে, মনের এই দুর্ব্বলতার জন্যে সে পিছিয়ে এসে নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই করে। লোকে হয়তো বল্‌লো কিই বা হবে লেখাপড়া করে, এই তো দেশের অবস্থা আর চাকুরীর বাজার। অবচেতন মনে এই কথাটা যেমনি ছাপ দিল, অম্নি পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে বোম্বেটে হয়ে পড়ার রোগ জন্মালো। তোমরা জানো এই মারাত্মক মানসিক ব্যাধি দুরারোগ্য—এ ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে ভবিষ্যতে পশুর অধম হয়ে দুঃখে কষ্টে জীবন যাপন করার সম্ভাবনা খুব বেশী, ফলে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হওয়ার সব সাধ দূরে চলে যায়, আর সংসার ক্ষেত্রে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে পড়ে জীবনটা একেবারে নষ্ট হয়। যারা পরের কুপরামর্শ শোনে আর বিবেকের আশ্রয় নেয় না, তাদের মানসিক দুর্ব্বলতা তাদেরই মৃত্যুরচনা করে। এজন্যেই সৎশিক্ষা ও জ্ঞানলাভ, শক্তি সঞ্চয় ও অদম্য ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের কৌশল অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন। সাফল্য লাভের শক্তি তোমাদের অন্তর্নিহিত, তোমাদের বাইরে নয়। অবচেতন মনে জাত অজ্ঞানাচ্ছন্ন কাজ করা মানেই আপনার সর্ব্বনাশ করা। বিদ্যাকে যে ভয় করে, অবিদ্যা তাকে পেয়ে বসে। অবিদ্যাই মানুষকে ক্রমাগত দুঃখ দেয় আর অকাল মৃত্যু আনে। অজ্ঞানই অবিদ্যা। বিদ্যার্জ্জনের দ্বারা জ্ঞানলাভ হোলে অবিদ্যা পলায়ন করে আর আত্মমর্য্যাদা লাভ হয়। আত্মমর্য্যাদা লাভ হোলে ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হয়। ব্যাপক অর্থে কর্ত্তব্য মাত্রকেই ধর্ম্ম বলা হয়। এ সংসারে বড় হোতে হোলে, ছেলেবেলা থেকেই ধর্ম্মপরায়ণ ও সত্যব্রতী হোতে হবে আর সময়ের সদ্ব্যবহার করে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে যেতে হবে। বাল্যে যে অভ্যাস বদ্ধমূল হয়, তা উত্তরকালে কোনক্রমেই পরিহার করা যায় না। নিজেকে বা পরকে ফাঁকি দেওয়ার পরিণাম ভয়াবহ। এরূপ কর্‌লে নিজেই ফাঁকিতে পড়বে। চিন্তা কর্‌তে না শিখ্‌লে কখনই যথার্থ জ্ঞানলাভ করতে বা ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন কৃতীপুরুষ হোতে পারবে না। চিন্তা ভিন্ন কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন কর্‌তে পারা যায় না। প্রকৃত শিক্ষিত ও জ্ঞানবান যাঁরা হয়েছেন, তাঁরা বাল্যকাল থেকেই অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা অদম্য ইচ্ছাশক্তির বলে বহু তত্ত্ব ও তথ্যকে নব নব রূপ দিয়েছেন—তোমরা পার্‌বে না! তোমরা হবে না বিরাট ব্যক্তি সম্পন্ন কৃতী পুরুষ!

জান্‌বার বিষয়

বৈজ্ঞানিকদের মতে কীটপতঙ্গদের ঘ্রাণশক্তি মানুষের চেয়ে অনেক বেশী।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা এক ইঞ্চির ১৫০০০০০ ভাগ দেখা যায়।

কোন কোন বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে, সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটার সঙ্গে মাটির নীচের জলের জোয়ার ভাঁটার সম্বন্ধ আছে।

দুগ্ধকে বিশ্লেষণ করে ১০৮টী বিভিন্ন পদার্থ পাওয়া গিয়েছে। জানা যায় শশকের দুগ্ধই নাকি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চর্ব্বিপূর্ণ, এর পরেই নাকি কুকুরের দুধ। শশকের দুধে মানুষের দুধের চেয়ে দশগুণ অধিক প্রোটিন থাকে আর গো-দুগ্ধের চেয়ে পাঁচগুণ অধিক। গো-দুগ্ধের শতকরা ৮৭·৩ ভাগ জল।

কেহ কেহ বলেন জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গ্রীষ্মপ্রধান স্থান নাকি কাশ্মীর প্রদেশস্থ লাডাক, যদিও এটা হিমালয়ের মধ্যেই অবস্থিত। এই স্থানে গ্রীষ্মকালে উত্তাপ হয় দিনের বেলা ১৬০ ডিগ্রী কিন্তু রাত্রে ৪৫ ডিগ্রী মাত্র। মনে রাখা কর্ত্তব্য যে কলিকাতার সর্ব্বোচ্চ তাপ ১১৭ ডিগ্রীর উর্দ্ধে বড় যায় না, তাও সব সময় হয় না।

সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী নীহারিকা ৩০ কোটী 'আলোক বর্ষ' দূরে। ১৮৬০০০ মাইল পথ যদি এক সেকেণ্ড সময়ে যাওয়া যায়, এটাই আলোর ক্ষিপ্রগতির পরিমাণ, তা হোলে এই ৩০ কোটী বৎসর অতিক্রম কর্‌তে আলোর কত মাইল ভ্রমণ কর্‌তে হবে, তা তোমরা অনুমান করে দেখ।

মধ্যভারতে একরকম গাছ আছে। এই গাছের পাতাগুলি বিদ্যুৎশক্তিসম্পন্ন। কেউ সেই পাতা ছুঁলে, অমনি ভীষণভাবে 'সক্' লাগ্‌বে। কিন্তু বৃষ্টি হোলে এই পাতার ক্ষমতা চলে যায়। 'সক্' লাগার ভয়ে কোনো পাখী এই গাছের ধার ঘেঁষেও আসে না।

আজ্‌কে তোমরা উড়ো জাহাজ দেখ্‌ছ কল কব্জায় তৈরী কিন্তু উড়ো জাহাজের স্বপ্ন মানুষ দেখেছে অনেক আগে, এ জাহাজ চালাবার সখও পুরাতন। ১৮৮১ সালে আমেরিকায় হাল্কা উড়ো জাহাজ তৈরী করে ঈগল আর শকুন বেঁধে দেওয়া হোতো। এই পাখীরাই ছিল তখন উড়ো-জাহাজের চালক। কেমন, মজা নয় কি? আমাদের দেশে প্রাচীনকালে উড়ো জাহাজ চল্‌তো, কথাসরিৎসাগরে উড়ো জাহাজের বর্ণনাও উল্লেখ আছে। তোমরা পড়লে জান্‌তে পার্‌বে, ভারতে এটা উচ্চ অঙ্গের একটি শিল্প ছিল। এতে রীতিমত শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে পারদর্শী লোকেরা 'যন্ত্রতক্ষ' অর্থাৎ যন্ত্রশিল্পী নামে কথিত হোতো।

মাছদের কখনো জল তৃষ্ণা পায় না।

শামুকের কোনো শব্দ কর্‌বার শক্তি নেই।

শকুনি ঘণ্টায় ১০০ মাইল উড়্‌তে পারে।

উট দিনে ১০০ মাইল পর্য্যন্ত হাঁট্‌তে পারে।

দু'জন মানুষের বুড়ো আঙুলের ছাপ কখনো একরকমের হয় না।

১৪২০ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম এলার্ম ঘড়ির সৃষ্টি হয়।

খোকন-সোনা

শ্রীরণেশ মুখোপাধ্যায়

সবাই বলে ভালবাসে খোকন-সোনাকে,
আসল ফেলে চিন্‌বে নকল—এমন বোকা কে!
শিশির যেন কমল দলে,
খোকন-সোনার চোখের জলে;
সবারই মন অমনি গলে
সবাই বুকে টানে:
লক্ষ্মী-যাদু, এমন কে আর দেখেছে কোনখানে!

কিন্তু খোকন এমনি-আদর নেয়না কারো কাছে,
দেবার মতো দামী জিনিষ তার কাছে আছে।
চাঁদ-ঝরাণো মিষ্টি হাসি,
আধো-বোলের মুক্তা রাশি;
কচি হাতের স্নেহের ফাঁসি
সেই তো প্রতিদান:
আদর নেওয়ায় তাইতো তাহার নাইক অপমান॥

বিধাতার পরিহাস

(রূপকথা)

শ্রীহরিপদ গুহ

কাল-বৈশাখী। বাইরে ঝড়ের তাণ্ডব-নৃত্যের সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল। বাড়ীর সামনের গলিতে এক কোমর জল জমে গেছে। সেদিন মাষ্টারমশায়ের আসবার সময় পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। ছুটির আনন্দে আমাদের মন চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। তখন ঘরের মধ্যে হৈ-হৈ সুরু হয়ে গেছে। এমন সময় সদ্য বি-এ পাশ করা নতুন বৌদি ঘরে ঢুক্‌লেন। তাঁকে দেখেই আমরা ক'টী ছোট ছেলে তাঁকে গল্প শোনাবার জন্য ধরে বস্‌লুম। তিনি প্রথমে কিছুতেই আমল দিলেন না, পরে আমাদের একান্ত নাছোড়বান্দা দেখে বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন—

সে অনেক দিনের কথা। এক ছিল দরিদ্র গৃহস্থ। বহুদিন পরে তাদের একটী পুত্র-সন্তান হল। ছেলেটী জন্মে ছিল কতকগুলি শুভ-গ্রহের লগ্নে। দৈবজ্ঞ বলেছিলেন যে, চোদ্দ বৎসর বয়সের সময় এই বালকের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হবে।

বিধাতার লীলা বোঝা ভার। তিনি তাঁর কলমের একটী খোঁচায় জাতকের ললাটে যা লিখে দেন, তাতে কেউ হয় সম্রাট, আর কেউ হয় ফকির। যুগ যুগান্তর ধরে এম্‌নি করেই তাঁর লীলা খেলা চলে আস্‌ছে।

সেদিন রাজামশাই ছদ্মবেশে নগর পরিদর্শনে বেরিয়ে-ছিলেন। তিনি চরমুখে শিশুর জন্মবৃত্তান্ত এবং জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎবাণী শুনে কিন্তু মোটেই খুসী হতে পারেন নি। একটা অজানিত আশঙ্কায় তাঁর বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠেছিল।

তিনি আর স্থির থাকতে না পেরে, সেই দরিদ্র গৃহস্থের কাছে গিয়ে ছেলেটীকে বিক্রী করবার জন্যে অনুরোধ করলেন।

তারা নিজ সন্তানকে বেচ্‌তে প্রথমে কিছুতেই রাজী হয় নি। কিন্তু রাজামশাই যখন বার বার অনুরোধ করতে লাগলেন এবং অধিক মূল্য দিতে চাইলেন, তখন তারা পুত্রের ভবিষ্যৎ বিবেচনা করে রাজী না হয়ে পারলো না। মাতা সজল চোখে পুত্রের মুখ-চুম্বন করে ভগ্নহৃদয়ে তাকে বিদায় দিল।

শিশুটীকে নিয়ে রাজামশাই একটি কাঠের বাক্সে বন্ধ নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তিনি মনে মনে বল্‌লেন—দেখা যাক্ কেমন করে সে রাজকুমারীকে বিয়ে করে।

ঈশ্বর যাকে রক্ষা করেন, তাকে মারে কে? শিশুর ভাগ্য এমনই সুপ্রসন্ন যে বাক্সের মধ্যে এক ফোঁটা জলও প্রবেশ করল না। সেটা নদীর স্রোতে ভাস্‌তে ভাস্‌তে প্রায় দু' মাইল দূরে নদীর বাঁকের মুখে এসে ঠেক্‌ল।

যেখানে এসে বাক্সটী আট্‌কালো, সেখানে ছিল একটী ময়দার কল। কলের মালিক বাক্সটী দেখ্‌তে পেয়ে সযত্নে সেটা উপরে নিয়ে এল। ঢাক্‌নাটা খুলে সে যখন একটী শিশুকে তার দিকে চেয়ে হাসতে দেখ্‌ল, আনন্দে তার বুকটা কেঁপে উঠ্‌ল। তার কোন সন্তান ছিল না। সে মনে মনে ভাব্‌লে ভগবানই পাঠিয়ে দিয়েছেন তাদের এই দেব-শিশুকে।

সে সযত্নে শিশুটীকে তুলে নিয়ে তার স্ত্রীর কোলে দিলে। হঠাৎ এমন সুন্দর একটী শিশু পেয়ে তার মনে আনন্দ আর ধরে না। তার অতৃপ্ত-আত্মা এই শিশুর অমৃত-স্পর্শে পুলকিত হয়ে উঠ্‌ল।

তাদের পরম যত্ন ও আদরে শিশু দিন দিন বাড়তে লাগল। তাদের আঁধার ঘরে আলোর বান ডাক্‌ল। যেদিন থেকে এই শিশু তাদের ঘরে এলো, সেদিন থেকে তাদের প্রচুর অর্থ আসতে লাগল। ধনে-ধান্যে তাদের ঘর ভরে উঠ্‌ল।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেই শিশুর তের বৎসর বয়স হয়ে গেল। দৈবক্রমে রাজামশাই একদিন সেই ময়দার কলে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি কলের মালিককে জিজ্ঞাসা করলেন—বালকটী কে?

মালিক উত্তর দিল—আমার ছেলে?

মহারাজ বল্‌লেন—কৈ, তোমার কোন ছেলে আছে বলে তো শুনিনি এতদিন!

মালিক তখন রাজামশাইকে ছেলে প্রাপ্তি সম্বন্ধে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সব প্রকাশ করে বল্‌লে। রাজামশাই মনে মনে হিসেব করে বুঝলেন—তিনি যাকে একদিন জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, এ বালক সেই; তার মৃত্যু হয় নি!

মহারাজ হেসে বল্‌লেন—ভারি চমৎকার ছেলে তো! তারপর মালিককে বল্‌লেন—ওকে আমার বড় প্রয়োজন, রাণীর কাছে এখনই একখানি পত্র দিয়ে আস্‌তে হবে। অবশ্য আমি পারিশ্রমিক দেব।

মালিক বিনীত-কণ্ঠে বল্‌ল—আপনি যা আদেশ করবেন, তাই করবে ও।

রাজামশাই তাড়াতাড়ি একখানি পত্র লিখে খামে ভরে বালকের হাতে দিয়ে বল্‌লেন—যাও, তুমি এখনি রাণীর হাতে দিয়ে আসবে এটা। সঙ্গে সঙ্গে তার হাতে একখানি মোহর দিলেন পুরস্কার স্বরূপ।

বালকের মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌ল। সে তখনই পত্র নিয়ে যাত্রা কর্‌ল।

চল্‌তে চল্‌তে সে বহুদূরে এসে পড়্‌ল। ক্রমে সে একটা গভীর বনের মধ্যে ঢুকে পথ হারিয়ে ফেল্‌লে। ধীরে ধীরে আঁধার ঘন হয়ে এলো, আর চলা যায় না। সে বেশ একটু ভীত হয়ে পড়্‌ল। হঠাৎ একটা আলোর রেখা দেখ্‌তে পেয়ে সে পুলকিত হয়ে সেই দিকে এগিয়ে চল্‌ল। খানিকটা গিয়ে সে দেখ্‌তে পেলো—একটী ছোট কুঁড়ে ঘরে প্রদীপ জ্বল্‌ছে। এই আলোই সে দূর থেকে দেখ্‌তে পেয়েছিল। ঘরের মধ্যে এক বৃদ্ধা ছাড়া আর কেউ ছিল না।

বৃদ্ধা বালকটীকে দেখে চমকিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—তুমি এখানে কেন এসেছ? কোথায় যাবে বাবা?

বালক উত্তর দিল—মা, আমি রাণীমার কাছে একখানি পত্র নিয়ে যাচ্ছি। পথ হারিয়ে এই বনে এসে পড়েছি। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত। আজ রাত্রে আমায় যদি আশ্রয় দাও, তবে বড় উপকার হয় মা!

বৃদ্ধা করুণকণ্ঠে বল্‌লে—তুমি বড়ই ভাগ্যহীন বাবা! এখানে ডাকাতেরা থাকে। ফিরে এসে তারা যদি তোমায় দেখ্‌তে পায় তবে হয় তো তোমার অমঙ্গল হতে পারে।

'আমি বড়ই ক্লান্ত, আর চল্‌তে পার্‌ছি না। যা অদৃষ্টে থাকে হবে।' বলে সে তাকের উপর পত্রখানি রেখে একখানি বেঞ্চের উপর শুয়ে পড়্‌ল এবং একটু পরেই গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়্‌ল।

অনেক রাত্রে ডাকাতরা বাড়ী এসে ঘুমন্ত বালকটাকে দেখে বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—এই ছেলেটা কে, ও এখানে কেন?

বৃদ্ধা বল্‌লে—ও একখানি চিঠি নিয়ে রাণীর কাছে যাচ্ছিল, পথ হারিয়ে এই বনে এসে পড়েছে। বাছা অত্যন্ত ক্লান্ত, মুখ শুকিয়ে গেছে দেখে, আমার প্রাণটা কেমন করে উঠল, তাই আমি একে এখানে আশ্রয় দিয়েছি।

সর্দ্দার তাক থেকে পত্রখানি তুলে নিয়ে পাঠ কর্‌তে লাগ্‌ল। তাতে লেখা ছিল—

এই পত্রবাহক যাবামাত্র হত্যা করে মাটিতে পুঁতে ফেল্‌বে।

দস্যুসর্দ্দার চিঠিখানি টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলে দিলে এবং আর একখানি কাগজে লিখলে—এই পত্রবাহক যাবামাত্র এর সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে দেবে। আমার ফিরতে দেরী হবে, আমি গিয়ে যেন দেখি—বিয়ে হয়ে গেছে। তারপর পত্রখানি খামে ভরে তাকের উপর যেমন ছিল, তেমনি রেখে দিল।

পরদিন প্রভাতে বালকের ঘুম ভাঙতেই, ডাকাতেরা তাকে একটু জলযোগ করিয়ে রাণীর কাছে যাবার পথ দেখিয়ে দিল। পত্রের কথা তারা কিছু বল্‌লে না। পত্রখানি হাতে নিয়ে সে তাদের নির্দ্দেশিত পথে এগিয়ে চল্‌ল।

পত্র পাঠান্তে রাণী তখনই বিয়ের সব ব্যবস্থা করে ফেল্‌লেন। বালকের রূপ ও বলিষ্ঠ চেহারা দেখে রাজকুমারী খুসী হয়ে সম্মতি দিলেন।

বিয়ে হয়ে যাবার পর রাজামশাই প্রাসাদে ফিরে এলেন। সব কথা শুনে তিনি একেবারেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কেমন করে এ অঘটন সম্ভব হলো! দৈবজ্ঞের ভবিষ্যৎবাণী সত্য হলো! ভাগ্যবান বালকই শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হলো।

রাজামশাই গম্ভীর কণ্ঠে রাণীকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—তুমি কার হুকুমে বিয়ে দিলে? আমি বিয়ের কথা তো কিছু লিখিনি, একে হত্যা করতেই বলেছি।

রাণী তাড়াতাড়ি চিঠিখানি বের করে রাজামশাইএর হাতে দিয়ে বল্‌লেন—পড়ে দেখুন মহারাজ, আপনার হুকুম না থাকলে কি এ কাজ আমি কর্‌তে পারি?

রাজামশাই পত্র পাঠ করে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলেন। তিনি তো এ সব কথা কিছুই লেখেন নি।

তখনই তিনি জামাতাকে তলব কর্‌লেন। সে বললে—আমি কিছুই জানি না, চিঠিখানি তাকের উপর রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। পরদিন পত্র নিয়ে চলে আসি। হয় তো রাত্রে কেউ পত্র বদল করে থাক্‌বে।

রাজামশাই গম্ভীর ভাবে বল্‌লেন—হতে পারে, তোমার কথা অবিশ্বাস করছি না। পর্ব্বতের গুহায় যে দৈত্য বাস করে, তার মাথার তিনটি সোনার চুল নিয়ে এসো, তবেই তোমায় জামাই বলে স্বীকার কর্‌ব।

'বেশ তাই হবে' বলে সে রাজকুমারীর নিকট বিদায় নিয়ে তখনই সোনার চুলের সন্ধানে বেরিয়ে পড়্‌ল।

চল্‌তে চল্‌তে সে খুব বড় একটা সহরের ফটকের নিকট এসে উপস্থিত হলো। সে যখন ভিতরে প্রবেশ করবে, দ্বারী তাকে প্রশ্ন কর্‌ল—তোমার ব্যবসা কি? কি কাজ জান তুমি?

সে হেসে জবাব দিল—আমি সব কাজই জানি।

দ্বার-রক্ষী তাকে বল্‌লে—তাই যদি হয়, আমরা তোমার মত একজন লোকেরই খোঁজ করছি। আচ্ছা ভাই, বল তো আমাদের বাজারের কাছে যে ঝরণা ছিল, সেটা শুকিয়ে গেল কেন? আর জল পাওয়া যায় না। এর কারণ বলে দাও, আমরা তোমাকে অনেক সোনা দেব।

সে বল্‌লে—ফেরবার সময় এর জবাব দিয়ে যাব আমি। তারপর সে পথ চল্‌তে আরম্ভ করে দিলে। সে যখন সহরের দ্বিতীয় ফটকের সাম্‌নে এলো দ্বারী তাকে প্রশ্ন কর্‌ল—সে কি কাজ জানে?

হেসে জবাব দিলে সে—সব কাজই তার জানা আছে।

তখন দ্বাররক্ষী তাকে ধরে বস্‌ল—এখানে একটা গাছে সোনার আপেল ফলত, এখন গাছে একটা পাতা পর্য্যন্ত জন্মায় না; এর কারণ কি বলে যাও ভাই।

সে বল্‌লে—ফিরে এসে এর জবাব দেব। এখন বড় ব্যস্ত আছি।

তখন চল্‌তে চল্‌তে সে একটা বড় হ্রদের কাছে এসে উপস্থিত হলো। এটা পার হয়ে তাকে ওপারে যেতে হবে, তবেই সে দৈত্যের গুহার দেখা পাবে।

খেয়া নৌকোর মাঝিও তাকে প্রশ্ন কর্‌লো—তুমি কি কাজ জান?

সে পূর্ব্বের মতই জবাব দিল তাকে।

তখন সেই মাঝি তাকে জিজ্ঞেস কর্‌লে—দিনের পর দিন আমি খেয়া পারাপার করে আস্‌ছি। একটুও অবসর নেই। বলো দেখি ভাই, কি কর্‌লে আমি এখান থেকে মুক্তি পাব?

সে বল্‌লে—কিছু ভেবো না বন্ধু, ফিরে এসে তোমায় বলে যাবো।

সেই হ্রদ পার হয়ে তীরে নাম্‌তেই খুব সুন্দর একটী গুহা দেখা গেল। এখানেই সোনার চুলওয়ালা সেই ভীষণ দৈত্যরাজ থাকে। সে তখন গুহায় ছিল না। তার মাতামহী একখানি টুল গুহার মুখে পেতে বসে ছিলেন।

তিনি বালককে ওখানে ঘুর্‌তে দেখে জিজ্ঞেস কর্‌লেন—তুমি কি খুঁজ্‌ছ এখানে?

সে উত্তর দিল—দৈত্যের মাথার তিনগাছি চুল চাই আমার।

তিনি বল্‌লেন—সে বড় বিপদের কথা। সে বাড়ী ফিরে এলে, তোমার জন্যে আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি। তারপর তিনি যাদুমন্ত্র বলে তাকে একটী পিঁপ্‌ড়েয় পরিণত করে, নিজের বস্ত্রের ভাঁজের মধ্যে তাকে রেখে দিলেন। বালক তাঁকে বল্‌লে—আমার আরো তিনটী প্রশ্ন আছে। তার জবাব চাই।

১। ঝর্‌ণা কেন শুকিয়ে গেছে?

২। গাছে কেন সোনার আপেল আর হয় না?

৩। খেয়ার মাঝি কেন তার কাজ থেকে মুক্তি পায় না?

বৃদ্ধা বল্‌লেন—তোমার প্রশ্নগুলো বড় গোলমেলে। চুল ছেঁড়ার সময় আমি এর উত্তর তার কাছ থেকে আদায় করব, তুমি মন দিয়ে শুনে রেখো।

রাত্রির অন্ধকার নেমে আস্‌তেই দৈত্যরাজ তার গুহায় ফিরে এলো। সে বাতাসটা একবার শুঁকে নিয়ে বল্‌লে—মানুষের গন্ধ কেন পাই? সঙ্গে সঙ্গে গুহাটা সে একবার ভাল করে খুঁজে দেখ্‌ল। কিন্তু কিছুই সে দেখ্‌তে পেল না।

তখন সে বুড়ির কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়্‌ল। শীঘ্রই সে ঘুমিয়ে পড়্‌ল। যখন তার নাক ডাক্‌তে সুরু কর্‌ল—তখন সেই বৃদ্ধা তার একটী সোনার চুল ধরে এক টান দিল।

দৈত্য জেগে উঠে বুড়ির দিকে কট্‌মট্ করে চেয়ে বল্‌লে—ওকি হচ্ছে?

বুড়ি বল্‌লে—আমি একটা স্বপ্ন দেখ্‌ছিলুম। একটা বাজারের কাছে একটা ঝর্‌ণা ছিল, এখন তার জল শুকিয়ে গেছে। তার কারণ কি বলো দেখি?

দৈত্য বল্‌লে—ঝর্‌ণার নীচে একটা পাথরের তলায় একটা কোলাব্যাঙ্‌ বাসা করেছে, সেটাকে মেরে ফেল্‌লেই আবার জল পড়্‌বে। তারপর সে আবার ঘুমতে লাগ্‌ল।

কিছুক্ষণ পর বৃদ্ধা আবার তার একগাছি চুল ধরে এক টান দিল। দৈত্য আবার রেগে উঠ্‌ল।

বৃদ্ধা বল্‌লে—আমি আর একটা স্বপ্ন দেখ্‌ছিলুম। একটা আপেল গাছে আগে সোনার আপেল হত এখন কিছু হয় না কেন?

দৈত্য বল্‌লে—গাছের নীচে মাটিতে ইঁদুরে বাসা করেছে, সেই ইঁদুর মেরে ফেললেই আবার আপেল হবে। একটু পরেই তার নাক্ ডাক্‌তে আরম্ভ কর্‌ল।

বৃদ্ধা আবার তার একগাছি চুল ধরে মারল এক টান।

এবার দৈত্য বেজায় রেগে গেল। বল্‌লে—আজ তোমার হয়েছে কি? আমাকে বার বার বিরক্ত করছ কেন? আবার যদি আমায় বিরক্ত কর তোমার ভাল হবে না কিন্তু।

বৃদ্ধা বল্‌লে—এবার আর একটা স্বপ্ন দেখলুম। ব্যাপারটা কি বলে তুমি ঘুমোও, আমি আর বিরক্ত কর্‌ব না।

দৈত্য বল্‌লে—কি দেখ্‌লে ?

সে বলতে লাগ্‌ল—একটা খেয়া নৌকার মাঝি বহুদিন ধরে পারাপার কর্‌ছে, তার ছুটি হয় না, সে মুক্তি পাবে কিসে ?

দৈত্য বল্‌লে—কোন পথিকের হাতে তার বৈঠা তুলে দিলেই তার মুক্তি হবে এবং সেই পথিক এই কাজ আরম্ভ করে দেবে। এই বার আমাকে ঘুমুতে দাও !

পরদিন সকালে দৈত্য চলে গেলে বৃদ্ধা সেই পিঁপড়েকে মন্ত্র বলে আবার মানুষ করে দিয়ে তার হাতে সোনার চুল তিনটী দিলে এবং বল্‌লে—তোমার প্রশ্ন তিনটীর উত্তর শুনেছ তো ?

সে বল্‌লে—হ্যাঁ, শুনেছি। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

তারপর সে ফিরে চল্‌ল রাজামশাইএর কাছে সোনার চুল নিয়ে।

খেয়া নৌকোয় উঠ্‌তেই মাঝি তাকে চিন্‌তে পেরে বল্‌লে—কই, আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাও !

সে বল্‌লে—আগে ওপারে নিয়ে চল বল্‌ছি।

মাঝি তাকে ওপারে নামিয়ে দিতেই সে তাকে বল্‌লে—এর পর কোন আরোহী এলেই তার হাতে তোমার বৈঠা-খানি দিয়ে তুমি চলে যেও, তবেই তুমি পাবে মুক্তি, আর সে বেচারা তোমার কাজ কর্‌তে থাক্‌বে।

চল্‌তে চল্‌তে সে সেই সহরে এলো, যেখানে শুক্‌নো আপেল গাছ ছিল। দ্বার-রক্ষীরা তাকে চিন্‌তে পেরে বল্‌লে—এবার আমাদের প্রশ্নের জবাব দাও !

সে বল্‌লে—সেই গাছের নীচে ইঁদুরে বাসা করে শিকড় কেটে দিচ্ছে, সেই ইঁদুর মারলেই গাছ আবার ফল দিতে আরম্ভ কর্‌বে। তারা খুসী হয়ে তাকে অনেক ধনরত্ন উপহার দিলে।

সে সাম্‌নের দিকে এগিয়ে চল্‌ল। যেতে যেতে সে সেই সহরে এসে উপস্থিত হল, যেখানে ঝর্‌ণা শুকিয়ে গেছে।

ফটক-রক্ষীরা তাকে চিন্‌তে পেরে তাদের প্রশ্নের জবাব চাইল। সে হেসে বললে—ঝরণার নীচে একখানি পাথর পড়ে আছে, তার তলায় একটা মস্ত কোলা ব্যাঙ বাসা করে আছে, সেই পাথর তুলে ব্যাঙটাকে মেরে ফেল্‌লেই আবার ঝর্‌ণা বইতে সুরু কর্‌বে। তারা খুসী হয়ে তাকে দুটো গাধা বোঝাই করে মোহর দিয়ে বিদায় কর্‌লে।

তারপর সেই ভাগ্যবান যুবক রাজপ্রাসাদে এসে উপস্থিত হলো। তাকে ফিরে পেয়ে রাজকন্যার মনে আনন্দ আর ধরে না। সে তো তার আশা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিল।

তারপর সে রাজামশাইর হাতে দৈত্যের মাথার তিন গাছি সোনার চুল দিলে। রাজামশাই আর কোন আপত্তি তুল্‌লেন না।

তার অত ঐশ্বর্য্য দেখে খুসীতে রাজামশাইএর মন ভরে উঠ্‌ল। তিনি তাকে প্রশ্ন কর্‌লেন—অত সোনা কোথায় পেলে ?

সে হেসে বল্‌লে—একটা হ্রদের পারে স্তূপাকার হয়ে সোনার মোহর পড়ে আছে, যত ইচ্ছে তুলে আনলেই হয়। তারপর সে রাজামশাইকে সেই পথের নির্দ্দেশ দিল।

সেই লোভী রাজা তখনই বেরিয়ে পড়্‌ল সোনার লোভে। তিনি সেই হ্রদের তীরে উপস্থিত হতেই, সেই মাঝি তার হাতে বৈঠাখানি তুলে দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল।

আজো রাজামশাই সেখানে খেয়া পারাপার কর্‌ছেন।

আর এই ভাগ্যবান যুবক রাজা হয়ে সুখে রাজত্ব কর্‌ছে।

ভগবান যাকে রক্ষা করেন, তার অমঙ্গল কেউ কর্‌তে পারে না।

আমার কথাটি ফুরুলো।

একদা যারা কিশোর ছিল

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

কিশোরটি খুব বেশী লেখাপড়া করিতে পারে নাই। কিন্তু অন্তরে তাহার অদম্য অধ্যয়নস্পৃহা ছিল। অর্থাভাবে সে আকাঙ্ক্ষা ফলবতী হইতে পারে নাই। তাহার মাতা ছিলেন বিত্তহীন এক বিধবা। জীবিকার জন্য তিনি কোন এক ভদ্র-লোকের গৃহরক্ষার কাজ করিতেন। ছেলেকেও তিনি লণ্ডনের একটি কাপড়ের দোকানের কাজে ভর্তি করিয়া দেন।

বালকটির উৎসাহের অন্ত ছিল না। চাকুরী পাইয়া

ভাবিল, দিনের বেলায় কাজ করিবে—আর মাইনের টাকায় বই কিনিয়া রাত্রিবেলায় পড়িবে। কিন্তু ভাগ্যে তাহার বিশ্রাম লেখা ছিল না। সকাল পাঁচটায় উঠিয়া তাহাকে কাজে লাগিতে হইত। দোকানে ঘর পরিষ্কার করিতে হইত। তারপর সারাদিন কাজ—১৫ ঘণ্টা কাজ করিতে হইত। এর পর? এর পর ক্লান্তিতে আর তাহার লেখাপড়া সম্ভব হইত না। তবু রাত্রি জাগিয়া পড়ার জন্য চেষ্টার অন্ত ছিল না। এই ভাবে তাহার দুই বৎসর কাটিয়া গেল, কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। শেষে একদিন সকালে অধৈর্য হইয়া ১৫ মাইল হাঁটিয়া সে তাহার মায়ের কাছে চলিয়া গেল।

মা ছেলের দুঃখ বুঝিয়াও বুঝিলেন না। ছেলে প্রতিজ্ঞা করিল, সে আত্মহত্যা করিবে, ঐ দোকানে আর কাজ করিতে যাইবে না। শেষে অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া সে তাহার বৃদ্ধ মাষ্টার মহাশয়ের কাছে নিজের দুঃখের কথা, আশা-ভংগের কথা জানাইয়া পত্র লিখিল। মাষ্টার মহাশয়ের চিত্ত সমবেদনায় ভরিয়া গেল। তিনি বালকটিকে নিজের স্কুলে একটা সহকারী মাষ্টারির কাজ দিলেন, আর তাহাকে উৎসাহ দিলেন, তাহার দ্বারা খুব বড় কাজ হইবে ভবিষ্যতে। এই উৎসাহটুকু কিশোরটির প্রাণে একটা আশ্চর্য রকমের প্রেরণা আনিয়া দিল। স্কুলের কাজে সে যেন আনন্দের প্রস্রবণ খুঁজিয়া পাইল। সারাদিন পড়া আর পড়ানো। জ্ঞানের পরিধি তাহার বাড়িয়া চলিল। সেখানে সে সরকারী বৃত্তি লাভ করিয়া রয়েল-কলেজ-অব-সায়েন্সএ ভর্তি হইল, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এসসি ডিগ্রী লাভ করিল। তারপর ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে সে সাংবাদিকের জীবন বরণ করিয়া লইল। ১৮৯৫ অব্দে তাহার প্রথম পুস্তক "সিলেক্ট কনভারসেশন উইথ এন আনকল্" প্রকাশিত হইল। তাহার বয়স তখন মাত্র উনত্রিশ বৎসর। ইংরেজি সাহিত্যের আসরে ধীরে ধীরে তাহার আসন পাতা হইয়া গেল। তাহার দানে ইংরেজি সাহিত্য আজ সমৃদ্ধ। তাহার বিখ্যাত বইএর সংখ্যা ৭৭। লক্ষ লক্ষ টাকা তাহার সাহিত্য-রচনায় উপার্জন হইল। পৃথিবীজোড়া তাহার খ্যাতি। ইনিই হচ্ছেন বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক ও চিন্তানায়ক এইচ্, জি, ওয়েলস্।

আমেরিকার আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা

অশোককুমার গুপ্ত

পূর্ব প্রবন্ধে আমেরিকার প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে দু'চার কথা লিখেছি। সংগ্রামশীল মানুষের একক একটি শিক্ষিত জাতিরূপে পরিণত হবার মূলে লক্ষ বাধা বিপত্তির মধ্যে যে শিক্ষা একটু একটু করে সর্বপ্রথম দানা বেঁধে উঠেছিল অন্ধকার কালো অরণ্যের বুকে, তারই কথায় ভরা সেই কাহিনী। কিন্তু এখন যে কথা লিখছি সে কথা অরণ্যের বুকে বসে আশার স্বপ্ন দেখা নয়, সুস্থ, প্রকৃতিস্থ, আত্মপ্রতিষ্ঠ একটি জাতির ক্রমবিকাশমান আধুনিক শিক্ষার কথা। মাত্র তিন'শ বছর আগে যে জাতটা সৃষ্টি হোল পৃথিবীর এক অজানা প্রান্তে নানা দেশীয় রক্তের সংমিশ্রণে, তিন'শ বছর পরে আজ সে জাতটা কোথায় এসে দাঁড়াল, আর কেমন করেই বা তা সম্ভব হোল, সে কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। জাতির ইতিহাস খুঁজলে হয়ত দেখা যাবে বয়সের দিক থেকে আমেরিকান জাতটাই সর্বকনিষ্ঠ। সর্বকনিষ্ঠ এই জাতটা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শিল্প-কলায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে আর শিক্ষায় দীক্ষায় এতো বেশী এগিয়ে গেছে যে, পৃথিবীর অন্যান্য বয়োঃজ্যেষ্ঠ জাতিরা হাঁ করে তাকিয়ে আছে তার সেই দ্রুত অগ্রগমনের পথে আশ্চর্য্য হয়ে। ফুলকে কেন্দ্র করে যেমন তার চারপাশে ঘুরে বেড়ায় মধু-লোভী মক্ষিকাগণ, তেমনি করে আজ পৃথিবীর সমস্ত দেশগুলো জাতিধর্মনির্বিশেষে ঘুরছে আমেরিকার চারপাশে, তার আভ্যন্তরীণ উন্নতির একটুখানি ছোঁয়াচ পেতে একথা বল্লে হয়ত অত্যুক্তি হবে না।

আমেরিকার বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি ও তার বিস্তারের কথা লিখতে হলে প্রথমেই লিখতে হয় যে যুক্তরাষ্ট্রে অবলম্বিত গণ-প্রচেষ্টাগুলোর মধ্যে শিক্ষা অন্যতম। এই শিক্ষা-ব্যবস্থা ও তার উন্নতির পেছনে অন্যান্য যে কোন গণ-প্রচেষ্টা থেকে অনেক বেশী পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয়। বিদ্যালয়গুলোর দশা আর আগের মত নেই, ছাত্রদের সুবিধার্থে এবং শিক্ষাকে অধিকতর সহজভাবে ব্যাপক আকারে সারা দেশময় ছড়িয়ে দিয়ে সকলকে সমানভাবে তা গ্রহণ করবার সুযোগ করে দিতে কোটি কোটি টাকা প্রতি বছর বিদ্যালয় গৃহের উন্নতিসাধন ও নতুন বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের পেছনে ব্যয় করা হয়। ১৯৪৮ সালে শিক্ষা খাদে ৪½ বিলিয়ন* মুদ্রা বরাদ্দ করা হয়েছিল। আমেরিকার নানা জাতীয় বিদ্যালয়ে বছরে যে সংখ্যক শিক্ষক ও ছাত্র তালিকাভুক্ত হয় তার সংখ্যা যথাক্রমে এক মিলিয়ন* এবং তিরিশ মিলিয়ন! এই সংখ্যার সঙ্গে

---

* দশ লক্ষে এক মিলিয়ন। * দশ কোটিতে এক বিলিয়ন।

যদি হাজার হাজার বিদ্যালয় সদস্য, দ্বাররক্ষী এবং অন্যান্য কর্মচারী এবং যারা বিদ্যালয়ের পুস্তক প্রণয়নে, বিদ্যালয়ের আসবাব ও যন্ত্রপাতি তৈরীর কাজে, বিদ্যালয়ের নক্সা এবং বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের কাজে নিয়োজিত করে তাদের মোট সংখ্যা যোগ করা হয়, তাহলে দেখা যায় সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি সাতজনের মধ্যে দু'জন শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে সর্বাক্ষণ ব্যাপৃত। এই হিসেব থেকেই বেশ পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে কি ব্যাপক আকারেই না ছোঁয়াচে রোগের মত এই শিক্ষা নামক বস্তুটি সে দেশে তড়িৎগতিতে মানুষের মধ্যে সংক্রামিত হয়ে চলেছে।

এই যে বিশাল গণ-প্রচেষ্টা মানুষের কল্যাণ এবং সুখের জন্য সুষ্ঠুভাবে গঠিত ও পরিচালিত হচ্ছে তার মূল ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে গণতান্ত্রিক মতবাদের ওপর। যাতে দেশের প্রতিটি নাগরিক শিক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রের অবশ্য-করণীয় কর্তব্যগুলো সঠিকভাবে বুঝতে পেরে দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে সে সব কর্তব্যগুলো সম্পাদন করতে পারে, তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখেই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে সে দেশে।

আমেরিকার প্রধান আদর্শ হোল শিক্ষাকে সার্বজনীন রূপ প্রদান করা। যেহেতু বিদ্যালয়গুলো রাষ্ট্রের দায়িত্বাধীন, রাষ্ট্রের কর্তব্য সকলের জন্যে শিক্ষা গ্রহণের সমান সুযোগ করে দেওয়া, এই নীতি সে দেশে রাষ্ট্র কর্তৃক কঠোরভাবে প্রতিপালিত হয়। শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় বন্দোবস্তের জন্য জনসাধারণের ওপর রাষ্ট্র কর্তৃক কর আরোপ নীতি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। সে দেশে ধনীদরিদ্রনির্বিশেষে সকলকেই গণশিক্ষার প্রসারে ও উন্নতিকল্পে শুল্ক দিতে হয়। শুল্কের পরিমাণ নির্ভর করে ব্যক্তিগত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির নির্ধারিত মূল্যের ওপর। এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ নেই সে দেশে, কেননা দেশের প্রতিটি নাগরিক চায় সমানভাবে শিক্ষার সুযোগ পেয়ে প্রকৃত শিক্ষিত হয়ে উঠবে। আমেরিকার আর একটি মূল্যবান আদর্শ হোল শিক্ষাকে গণ-নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা। সুদূর গ্রামাঞ্চলের ক্ষুদ্র বিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রের বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে গণ-নিয়ন্ত্রণাধীন।

আমেরিকার শাসন প্রণালীর কোথাও শিক্ষার উল্লেখ নেই, শিক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা ও পরিচালনার ভার সরকার বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলোর ওপর ছেড়ে দিয়েছে। প্রতিটি রাষ্ট্র স্বস্ব নাগরিকদের শিক্ষাপ্রদান ব্যাপারে অতিমাত্রায় সচেতন ও দায়িত্বশীল। সমস্ত রাষ্ট্রগুলোর শিক্ষাপদ্ধতি কিন্তু এক রকম নয়। প্রতিটি রাষ্ট্র নিজস্ব রীতি অনুযায়ী বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতির উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত ও যত্নবান। সাধারণতঃ আমেরিকার বিদ্যালয়গুলো সহশিক্ষামূলক। ছেলে এবং মেয়েদের ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয় সেখানে বড় একটা দেখা যায় না। সম্প্রতি ১৯৫০ সালে আমেরিকার ষোলোটি রাষ্ট্রে ছেলে এবং মেয়েদের জন্য পৃথক পৃথক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমেরিকার বিদ্যাশিক্ষাপদ্ধতি সাধারণতঃ চার ভাগে বিভক্ত। যেমন প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, নরম্যাল বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ছাত্র-সংখ্যা অন্যান্য বিদ্যাশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ঢের বেশী, এবং অনেক বেশী পরিমাণ অর্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পেছনে প্রতি বছর ব্যয়িত হয়। বেশীর ভাগ রাষ্ট্রেই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো অষ্টম শ্রেণী বিশিষ্ট। কেবলমাত্র আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো সপ্তম শ্রেণী বিশিষ্ট। এই সকল শ্রেণীতে পড়া, অঙ্ক, বানান, অঙ্কন শিল্প এবং হাতের লেখার প্রাথমিক নিয়ম ও প্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। রাষ্ট্রের শিক্ষা-দপ্তর থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপযোগী বিশেষ কতকগুলো পাঠ্য ও শিক্ষণীয় বিষয়ক পুস্তক প্রকাশিত হয়। অবশ্য সেগুলো বিদ্যালয়-আইন অনুযায়ী হওয়া চাই। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে দিনে দু'বার করে পড়ান হয়। একবার সকালে আর একবার বিকেলে। এই গেল মোটামুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর কথা। এবার সেখানকার উচ্চ বিদ্যালয় সম্বন্ধে দু'চারটে কথা বলা যাক্।

আমেরিকার সাধারণ উচ্চ বিদ্যালয়গুলো ক'এক বৎসরের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নতিলাভ করেছে। ১৮৯০ সাল থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে যে সকল নতুন সাধারণ উচ্চ বিদ্যালয়গুলো তালিকাভুক্ত হয়েছে, বর্ধিত হারে জনসংখ্যার চাইতে তার সংখ্যা কুড়ি গুণ বেশী। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কেবলমাত্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভাগ থেকেই প্রতি বছর প্রায় সত্তর লক্ষ ছাত্র উচ্চবিদ্যাশিক্ষার্থে উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র তালিকাভুক্ত হয়। উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি হোলো, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করে ছাত্রকে আরও চার বৎসর উচ্চ বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ। কোন কোন উচ্চ বিদ্যালয়ে বিশেষ কোন বিষয়ে কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের ওপর ছাত্রকে ডিগ্রী দেবার পদ্ধতি আছে, আবার কোন কোন উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্রের মনোমত পছন্দসই বিষয়ের সাফল্যের ওপরেও ডিগ্রী দেওয়া হয়। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই ইংরেজী, অঙ্ক, বিদেশী ভাষা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং সমাজ বিজ্ঞান অবশ্যই পাঠ্যরূপে পরিগণিত।

এবার দেখা যাক্ আমেরিকার প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলোর কোন্ শ্রেণীতে শতকরা কতজন ছাত্র পড়াশুনা করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণীগুলিতে মোট তালিকাভুক্ত ছাত্রসংখ্যার শতকরা ২১জন প্রথম শ্রেণীতে, ১৪জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে, ১৩জন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে, প্রায় ১২জন পঞ্চম শ্রেণীতে, ১১জন ষষ্ঠ শ্রেণীতে, ৯জন সপ্তম এবং ৭জন অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত। উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ থেকে চতুর্থ বর্ষ পর্যন্ত যথাক্রমে শতকরা ৩৮জন, ২৭জন, ২০জন এবং ১৫জন ছাত্রকে অধ্যয়নরত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়াও আমেরিকায় ১৮০০ শতেরও বেশী কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে। উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারে আমেরিকা এত দ্রুত উন্নতিলাভ করেছে যে বর্তমানে দেশের প্রতি ২০০জনের মধ্যে ১জন বিশ্ববিদ্যালয়এ অথবা কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে এবং ১৯৪৮-৫০ সালের ভেতর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রসার লাভ করে এবং সেই সময় দেড় শতেরও অধিক নতুন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ আমেরিকার শিক্ষা দপ্তরের তালিকাভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়। কেবলমাত্র ১৯৪৯ সালেই যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাষ্ট্রে ৮০টি কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এর থেকেই বোঝা যায় আমেরিকাবাসী কতটা আন্তরিকতার সঙ্গে শিক্ষাকে গ্রহণ করেছে।

আমেরিকায় শিক্ষার এই ব্যাপক প্রসার ও আজকের ক্রমবর্দ্ধমান প্রসারতার মূলে যে সকল মনীষী নিজেদের আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন এবং যাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও পরিশ্রমে আজকের আমেরিকার বিদ্যালয়গুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবার পথ খুঁজে পেয়েছে, তাঁদের মধ্যে আলবার্ট পিক, বার্ণার্ড, আরকি, ভিক্টর কাজিন, কালভিন্ ষ্টো প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এঁদের ভেতর আলবার্ট পিকই সর্বপ্রথম শিক্ষামূলক সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করবার জন্যে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন এবং 'এ্যাকাডেমিকান' নাম দিয়ে ১৮১৮ সালে নিউইয়র্ক থেকে একখানি ১৬ পাতা সম্বলিত শিক্ষামূলক সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

শিক্ষার প্রসার ও উন্নতিকল্পে পত্রিকা যে কত বড় সহায়ক সে কথা আজ বোধহয় আর বলে অথবা লিখে বুঝাবার দরকার হয়না।



বিশ্বসাহিত্য

মিশরীয় গল্প—'অম্বুবাতা'

নরেন্দ্র দেব

(পূর্বানুবৃত্তি—ভারতবর্ষ—ভাদ্র ১৩৬১—৩১৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

রাজার সৈন্যেরা শিরীষ গাছটি কেটে নিয়ে চলে গেল। অম্বু কাতর হয়ে ফুলটিকে জিজ্ঞাসা করলে, বাতা ভাই! তোমার লাগেনি ত? এবার ফুলের ভিতর থেকে বাতা নিজেই সশরীরে বেরিয়ে এল। অম্বু আনন্দে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলে।

বাতা তার দাদার ক্ষমা-সুন্দর আশীর্বাদ এবং স্নেহ ও প্রীতিভরা আলিঙ্গন পেয়ে খুশী হয়ে তার সাত বছরের অজ্ঞাতবাসের ইতিহাস বলতে শুরু করলে।

শিরীষ বনে ঘুরে বেড়াই আপন মনে একা। সারাদিন মরুভূমিতে গিয়ে মৃগয়া করে কাটাই। রাত্রে শিরীষ বনে ফিরে এসে ফুলের মাঝে ঘুমিয়ে পড়ি। শেষে বিরক্ত হয়ে নিজের হাতে বনের গাছ কেটে এনে তৈরি করলুম অরণ্যের মধ্যে এক অট্টালিকা। কত যে সুন্দর সুন্দর প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভারে পূর্ণ করে ফেললুম সে প্রাসাদ তার সংখ্যা হল না। কিন্তু, তবুও মনে হত শূন্য এ প্রাসাদ! কি যেন নেই এ অট্টালিকায়! কি যেন চাই!

এমনিতর উদাস মনে ঘুরে বেড়াচ্ছি একদিন বনের পথে, দেখি স্বর্গ হতে নবগ্রহ ও দেবগণ নেমে এসে চলেছেন সেই পথে। আমাকে দেখেই তাঁরা বললেন—এই যে নবগ্রহের বৃষবাহন! আমরা তোমাকেই খুঁজছি। জানো কি তোমার দাদা অম্বু তার স্ত্রীকে বধ করেছেন? মিথ্যাবাদিনী দুশ্চরিত্রা নারী তার উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে।

সেই নবগ্রহ দেবতাদের মধ্যে সূর্যদেব শ্রী'হরক্তি-রা'ও ছিলেন। রা-হরক্তি-দিবাকর চন্দ্রদেব 'ক্নুম্‌'কে বললেন—ওহে, তুমি বাতার জন্য একটি রূপসী নারী সৃষ্টি করো, যাতে বাতাকে আর এ বনে এমন একলাটি না থাকতে হয়।

সূর্যের আদেশে ক্নুম্‌ এমন একটি অপরূপ সুন্দরী কন্যা সৃজন করলেন যে পৃথিবীতে তার সমতুল্য রূপসী আর কেউ ছিল না। কিন্তু, সেই কন্যার রূপই করলে আমার সর্বনাশ! নবগ্রহের দেবতারা প্রসন্ন হয়ে যে দুর্লভ দান আমাকে দিলেন, সৌন্দর্য প্রেম ও আনন্দের সপ্ত দেবীরা সে রূপসী মেয়েকে দেখে বললেন—এ মেয়ের অতি শোচনীয়ভাবে ভীষণ মৃত্যু হবে।

আমি সে কথা কানেই তুললুম না। সুন্দরী পত্নীর রূপে মুগ্ধ হয়ে আমি তাকে এত বেশি ভালবেসে ফেলেছিলুম যে তাকে একদণ্ড চোখের আড়াল করতে পারতুম না। আমার সেই নিজের হাতে তৈরি প্রাসাদে তাকে রাণী করে এনে রাখলুম। আমার জীবনের ইতিহাস সমস্ত তাকে বিশ্বাস করে খুলে বললুম। বললুম, ঐ শিরীষ ফুলের মধ্যেই আমার প্রাণ আছে। তুমি ও ফুল কখনো ছিঁড়ো না। শিকারে যাবার সময় বলে যেতুম, তুমি যেন প্রাসাদের বাইরে যেও না। সাগরদেবতা তোমাকে দেখতে পেলে হরণ করে নিয়ে যাবেন। সমুদ্রের হাত থেকে আমি তোমাকে রক্ষা করতে পারব না।

একদিন সে আমার উপদেশ ভুলে গিয়ে বেড়াতে বেড়াতে শিরীষ বন পার হয়ে সমুদ্রতীরে গিয়ে পড়েছে। আমি তখন শিকারে বেরিয়েছি। সাগর তার রূপ দেখে পাগল হ'য়ে উত্তাল ঢেউ তুলে তাকে জড়িয়ে ধরতে এল। সে ভয় পেয়ে ছুটতে ছুটতে পালিয়ে এসে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লো।

উন্মত্ত সাগর তখন ক্রুদ্ধ হয়ে শিরীষ বনকে বললে—ওকে না পেলে আমি এ বন ভাসিয়ে দেব! শিরীষ বন স্তব-স্তুতিতে সমুদ্রকে শান্ত করে আমার স্ত্রীর মাথার সুরভিসম্পৃক্ত এক গুচ্ছ ভ্রমর কৃষ্ণ কেশ তাকে উপহার দিলে। সমুদ্র সেই চারুচিক্কণ কেশ নিয়ে মিশরের রাজবাড়ীর ধোপারা যে ঘাটে মিশরপতি ফ্যারাওয়ের রাজবেশ কাচতো সেখানে নিয়ে গিয়ে রাখলে। ফলে মিশরপতির রাজবেশে সেই কেশসুরভি সঞ্চারিত হয়ে গেল। ফ্যারাও যখন সেই রাজবেশ পরিধান করলেন সমস্ত প্রাসাদ এক অপূর্ব সৌরভে আমোদিত হয়ে উঠলো। ফ্যারাও বিস্মিত হয়ে ধোপাকে ডাকিয়ে এনে প্রশ্ন করলেন—এ সৌরভ তুমি কোথায় পেলে? ধোপা হাত জোড় করে বললে—প্রভু আমি তো ঠিক বলতে পারছিনি কেমন করে এ সৌরভ আপনার রাজবেশে এসে লাগলো। আমি সন্ধান করে দেখে কাল আপনাকে জানাবো।

পরদিন ধোপা যে ঘাটে কাপড় কাচে সেখানে সন্ধান করতে গিয়ে দেখলে সুদীর্ঘ একগুচ্ছ কালো কেশ সেখানে ভাসছে। কেশগুচ্ছ তুলে এনে দেখে সে সুগন্ধ এই চুলে লেগে রয়েছে। ধোপা সেই কেশগুচ্ছ এনে ফ্যারাওর সম্মুখে উপস্থিত করলে। ফ্যারাও সে সুগন্ধ চুল দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন। মন্ত্রীদের ডেকে আদেশ করলেন—সন্ধান করো এ সুরভিত চুল কোন মেয়ের মাথার মুকুট?

মন্ত্রীরা তখন দেশের বড় বড় পণ্ডিত ও জ্যোতিষীদের ডেকে এনে এ চুলের রহস্য ভেদ করতে বসলেন। জ্যোতিষী ও পণ্ডিতেরা মিলে বহু গবেষণার পর আবিষ্কার করলেন—এ চুল সূর্যদেবতা রা হরক্তি প্রভৃতি নবগ্রহের মানস কন্যার।

ফ্যারাও জানতে চাইলেন এ কন্যাকে কোথায় পাওয়া যাবে। তাঁরা আবার গণনায় মনোনিবেশ করে বললেন—উত্তর প্রদেশের এক শিরীষ কুঞ্জে এ মেয়েকে পাওয়া যাবে। ফ্যারাও সে মেয়ের সন্ধানে উত্তর প্রদেশের চারিদিকে লোক পাঠালেন।

কিছুদিন পরে রাজ-অনুচরেরা হতাশ হয়ে ফিরে এল। কোথাও তারা সে মেয়ের সন্ধান পায় নি। কেবল উত্তরপ্রদেশের শিরীষ কুঞ্জ সন্ধান করতে যারা গিয়েছিল তারা আর কেউ ফিরল না। কারণ, আমি তাদের হত্যা করেছিলুম। কেবল একজন পালাতে পেরেছিল। সে ফিরে গিয়ে ফ্যারাওকে সংবাদ দিলে। ফ্যারাও তখন বহু সৈন্য সামন্ত নিয়ে শিরীষ বন আক্রমণ করলে। একা আমি আর কি করতে পারি। ফ্যারাও আমার স্ত্রীকে হরণ করে নিয়ে গেল। তার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে মিশরের মহারাণী করলে। কিন্তু আমার জন্যে ফ্যারাওর মনে একটা উদ্বেগ ছিল। তিনি আমার স্ত্রীকে তাঁর অগাধ ঐশ্বর্য ও ভালবাসায় মুগ্ধ করে, আমাকে কেমন করে এ পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পারবেন জানতে চাইলেন। রাজ-ঐশ্বর্যে ও ফ্যারাওর প্রেমে ভুলে আমার স্ত্রী বলে দিলে যে শিরীষ ফুলের মধ্যে আমার প্রাণ আছে।

ফ্যারাও তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলেন মিশরের যেখানে যত শিরীষ ফুলের গাছ আছে সমস্ত কেটে নির্মূল করে ফেল। মিশরের সমস্ত শিরীষ ফুলের গাছ নির্মূল হয়ে গেল, কিন্তু, আমি তখন শিরীষ কুসুম কিঞ্জল্কের সঙ্গে বাতাসে উড়ে তোমার বাগানের কোণে গিয়ে পড়েছি। তারপর যা ঘটেছে সবই তো তুমি জানো। আমি চাই এখন আমার স্ত্রীকে উদ্ধার করতে। কিন্তু, প্রবল পরাক্রান্ত ফ্যারাওর সঙ্গে যুদ্ধ করে কোনও ফল হবে না। তবে, আমি যা বলি তুমি যদি তা করো তাহলে আমাদের দুজনেরই ভাল হবে। তুমি বহু ধনরত্নের মালিক হয়ে সুখে থাকবে এবং আমিও আমার স্ত্রীকে ফিরে পেয়ে সুখী হব।

অম্বু জিজ্ঞাসা করলে কি করতে হবে বলো ভাই, আমি এখনি তা করতে প্রস্তুত। বাতা বললে—আমি নবগ্রহের বাহন বিরাটকায় বৃষরাজের মূর্তি ধারণ করবো। তুমি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করে আমাকে ফ্যারাওর কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁকে উপহার দেবে। পৃথিবীর কোনও রাজার প্রাসাদে এত বড় বৃষ নেই। রাজা খুশী হয়ে তোমাকে প্রচুর ধনরত্ন উপহার দেবেন। আমি যে কে তা তিনি কিছুই জানতে পারবেন না।

পরদিন প্রভাতে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাতা বৃহৎ এক বৃষরূপ ধারণ করলে। অম্বু তার পিঠে চড়ে তাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেল। ফ্যারাও এই সর্বসুলক্ষণযুক্ত আশ্চর্য সুবৃহৎ বৃষটি উপহার পেয়ে অত্যন্ত খুশী হলেন এবং অম্বুকে প্রচুর ধনরত্ন পুরস্কার দিলেন।

বৃষটিকে ফ্যারাওর এত ভাল লেগেছিল যে তিনি তাকে রোজ নিজের হাতে খাওয়াতেন। তাকে বেঁধে রাখতে নিষেধ করেছিলেন। বৃষটি রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণে যদৃচ্ছা বিচরণ করে বেড়াতো। একদা সুযোগ বুঝে বৃষরূপী বাতা রাজঅন্তঃপুরের উদ্যানে প্রবেশ করলে। নূতন রাজমহিষী, অর্থাৎ বাতার পত্নী তখন সেই উদ্যানেই ছিলেন। বৃষরূপী বাতা রাণীকে সম্বোধন ক'রে বললেন—নবগ্রহ দেবতারা তোমাকে আমার পত্নীরূপে সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু, তুমি রাজৈশ্বর্যের লোভে আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে আমার মৃত্যুর সন্ধান বলে দিয়েছিলে ফ্যারাওকে। শিরীষ বন নির্মূল হয়েছে বটে, কিন্তু আমি মরিনি। দেবতারা আমাকে রক্ষা করেছেন। আমি বৃষরূপ ধারণ করে এখানে এসেছি তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। তুমি কি আমার সঙ্গে ফিরে যেতে প্রস্তুত আছ?

রাজমহিষী বৃষের বচন শুনে ভয় পেয়ে ছুটে রাজ অন্তঃপুরের মধ্যে পলায়ন করলেন।

রাত্রে নূতন রাণী ফ্যারাওকে নানাভাবে তুষ্ট করে বললেন—আমার একটি অনুরোধ আপনাকে রাখতে হবে। বলুন রাখবেন? আমার গা ছুঁয়ে শপথ করুন। সে অনুরোধ যত কঠিন হোক আপনি তা পূর্ণ করবেন।

সুন্দরী নারীর ছলাকলায় ভুলে ফ্যারাও তার অনুরোধ রাখবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। তখন এই অনামান্যা রূপসী মহিষী বললেন—আপনার ঐ প্রিয় বৃষটির মাংস খাবার আমার অত্যন্ত লোভ হয়েছে। রাজা শুনে খুব দুঃখিত হলেন বটে, কিন্তু প্রতিশ্রুত হয়েছেন অনুরোধ রাখবেন। তাই বললেন—বেশ, তাই হবে।

ফ্যারাওর আদেশে তার পরদিন মহাসমারোহে বৃষোৎসর্গ পর্ব অনুষ্ঠিত হল। রাজ্যের সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোক আমন্ত্রিত হ'য়ে এলেন এই বৃষমেধ যজ্ঞে যোগ দিতে। বৃষটিকে যখন বধ করা হল তখন তার কণ্ঠ থেকে তীর বেগে রক্ত ছিটকে এসে পড়লো রাণীর মহলের প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে। রাণী এ ঘটনা লক্ষ্য করে শিউরে উঠলেন। কিন্তু, আর কেউ তা জানতে পারলে না। কিছুদিন পরে সবাই দেখে বিস্মিত হল যে সেখানে একটি নীলপারিজাতের গাছ উঠেছে। ফ্যারাও শুনে ভাবলেন ও নিশ্চয় কোনও দৈব ব্যাপার! নীলপারিজাত তো মর্ত্তে কোন ছার, স্বর্গেও দুর্লভ! তিনি আদেশ দিলেন একটি শুভদিন দেখে এই দৈব বৃক্ষের পূজা করা হবে।

ফ্যারাওর আদেশ মতো বৃক্ষপূজার বিরাট আয়োজন হল। পূজার দিন দেখা গেল সুবৃহৎ গাছটি নীলপারিজাত ফুলে একেবারে ভরে গেছে। দেখতে এত সুন্দর লাগছে যে ফ্যারাও অত্যন্ত খুশী হ'য়ে হুকুম দিলেন, তার তলায় সুবর্ণ বেদী নির্মাণ করতে। বৃক্ষপূজার শেষে একে একে সকলে এসে বৃক্ষমূলে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। প্রথমে দিলেন ফ্যারাও নিজে। তারপর নূতন মহিষী। তিনি যখন অঞ্জলি দিচ্ছেন তখন গাছটি তাঁর কানে কানে বলছে—বৃষবধ করে তার মাংস খেয়েছ বটে, কিন্তু বাতাকে মারতে পারোনি। আমি এই তোমার মহলের দ্বারে জাগ্রত প্রহরী রূপে দাঁড়িয়ে আছি নীলপারিজাতের গাছ হ'য়ে। তোমার বিশ্বাসঘাতকতা ও অন্যায়ের শাস্তি না দিয়ে আমি মরছিনি!"

রাণী শুনে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

দিন যায়। একদিন সুযোগ বুঝে রাণী ফ্যারাওকে ধরলেন তাঁকে একটি প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। ফ্যারাও জানতে চাইলেন কি সে প্রতিশ্রুতি? রাণী বললেন—আগে কথা দিন যে আপনি আমার অনুরোধ রাখবেন তবেই বলবো। ফ্যারাও সে কুহকিনীর রূপের মায়ায় ভুলে আবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তখন রাণী বললেন, আমার একান্ত সাধ ঐ নীলপারিজাত গাছের গুঁড়ির পালঙ্ক বানিয়ে শোবো। মিশরপতি অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বললেন—রাণী, তোমার ইচ্ছা আমি পূর্ণ করবই যখন বাক্যদান করেছি কিন্তু, ভেবে দেখ, দৈবে পাওয়া মিশরের দুটি শ্রেষ্ঠ গৌরব থেকে তাকে তুমি বঞ্চিত করলে। অতিকায় বৃষ গেল। এবার দুর্লভ নীলপারিজাতও আমরা হারাবো। আমাদের ভাগ্যদেবতা কি এতে অপ্রসন্ন হবেন না?

রাণী ফ্যারাওকে আদরে মুগ্ধ ক'রে বুঝিয়ে দিলে যে, দুঃখ করবেন না! আমি যদি প্রসন্ন হই তবে মিশরে আবার সব হবে।

ফ্যারাও আদেশ দিলেন—নীলপারিজাত গাছ কালই কেটে টুকরো টুকরো ক'রে পালঙ্ক তৈরি করতে হবে।

পরদিন গাছ কাটা শুরু হ'ল। রাণী স্বয়ং নিকটে দাঁড়িয়ে তা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। সহসা কুড়ুলের ঘায়ে গাছের একটা চোক্‌লা ঠিকরে গিয়ে রাণীর গলায় ঢুকে আটকে গেল। কাঠুরেরা তা' দেখতে পায়নি। যেমনি আর এক কোপ মেরেছে আবার এক চোক্‌লা ঠিকরে গিয়ে রাণীর চোখ কানা ক'রে দিলে। রাণী চিৎকার করতে গিয়ে পারলেন না। গলায় চোক্‌লা আটকে তিনি দম বন্ধ হয়ে মারা গেলেন।

বাতার ক্ষুব্ধ আত্মা তখন তৃপ্ত হ'য়ে অগ্রজ অম্বুর কাছে ফিরে গেল।

সমাপ্ত

ভক্ত-কবি তুলসীদাস ও আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী

শ্রীননীগোপাল গোস্বামী এম্‌-এ

প্রেম ও ভক্তির অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে তুলসীদাস রচিত রামচরিতমানস বা হিন্দী রামায়ণ ভারতীয় সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ রত্ন। কাব্য জগতের অপূর্ব্ব সৃষ্টি এই রামায়ণ হিন্দুস্থানের গৃহে গৃহে প্রত্যহ গীতা, ভাগবতের ন্যায় পঠিত হয়ে থাকে। ডক্টর গ্রীফিথ্ বলেন :—

"The Ramayana of Tulsi Das is more popular and more honoured by the people of the North-Western Provinces than the Bible is by the corresponding classes in England."

আজ থেকে প্রায় চারশ' বছর আগে এই রামায়ণ রচিত হয়। সাধক তুলসীদাস দেশ পর্য্যটনে বহির্গত হয়ে অযোধ্যায় উপনীত হ'ন। কথিত আছে, এই সময় তাঁর ওপর স্বপ্নাদেশ হ'ল—তুলসীদাস, তুমি মাতৃভাষায় রামায়ণ রচনা কর।'

তুলসীদাসের চোখের সামনে ভেসে উঠলো এক নতুন উদ্দীপনা—সীতা-রামের অমৃতময় কাহিনী তাঁকে লেখনীর মুখে প্রকাশ করতে হবে। সে কি আনন্দ! সীতারামের একনিষ্ঠ সেবক তুলসীদাসের হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বেজে উঠলো সুর—যা' যুগ যুগান্তের নর-নারীকে চিরদিনের জন্য ভক্তির ডোরে বেঁধে রাখতে পারে।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে সীতারামের পদারবিন্দ স্মরণ করতে করতে তুলসীদাস রামায়ণ রচনায় প্রবৃত্ত হলেন,—

সংবত সোরহসৈ একতীশা কহৌ
কথা হরিপদ ধরি শীশা।
নৌমী ভৌমবার মধুমাসা অয়ধপুরী রহ
চরিত প্রকাশা॥

অরণ্যকাণ্ডের রচনা চলেছে। এই সময় তাঁকে কাশী চলে আসতে হ'ল।

কাশী এসে কিছুদিন পরে আবার তিনি তাঁর অসমাপ্ত রচনা সমাপ্ত করার জন্য ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উঠলেন।

কিন্তু এ কি! রচনা তো হয় না। কাশীর পাণ্ডা ও মোড়লেরা সব সময়ই তাঁকে ঘিরে রেখেছে। রামায়ণ রচনার সময় কই? কাজেই কাশী না ছাড়লে আর উপায় নাই। কাশী তাঁকে ছাড়তেই হবে!

তুলসীদাসের মনের যখন এই রকম অবস্থা তখন আর এক ঘটনা ঘটলো—যার ফলে তুলসীদাসের জীবনস্রোত আবার অপ্রতিহতগতিতে সম্মুখের পথে ছুটে চললো।

কাশীতে তখন এক বিশ্ববরেণ্য পণ্ডিত অবস্থান করতেন। বিশ বৎসর বয়সে তিনি কাশী যান এবং তথায় বিশ্বেশ্বর সরস্বতী নামক এক দণ্ডীর নিকট থেকে দণ্ড গ্রহণ করেন এবং বিশ্বেশ্বর সরস্বতী, শ্রীধর সরস্বতী প্রভৃতির কাছে সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তারপর শ্রীক্ষেত্রের নিকট এক বনে ১৭ বৎসর তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেন। ইনি ছিলেন একাধারে সাধক এবং পণ্ডিত। ভারতীয় সর্ব্ব দর্শনের তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ বিগ্রহ। তিনি জ্ঞানের যে অপরিমেয় ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিয়ে গেছেন, তাতে নিখিল বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে গেছে, তবু অবশেষে বাংলার মানবীয় ভাবের জয় তাঁর জীবনেও ফুটে ওঠে, আর তিনি গোপবধূপ্রণয়রসিক প্রেমলীলাময় চতুরের প্রেমে বাঁধা পড়ে যান।

তুলসীদাস কাশী ছেড়ে চলে যাবার জন্য যখন সঙ্কল্প করছেন, তখন কি করে এই পণ্ডিতপ্রবর তা' জানতে পারলেন। ব্যথা ও বেদনায় তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠলো! রামচরিত রচনার যে মহান দায়িত্ব তুলসীদাস গ্রহণ করেছেন, তা' কি কাশী ছেড়ে চলে গেলে ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে কখনও সম্পাদন করা সম্ভবপর হবে! কালবিলম্ব না করে তিনি তুলসীদাসের নিকট একটি শ্লোক লিখে পাঠালেন,—

আনন্দ কাননে কাশ্যাং তুলসী জঙ্গমস্তরুঃ।
কবিতা মঞ্জরী যস্য রামভ্রমর ভূষিতা॥

'কাশীর নাম আনন্দ কানন। সেই কাননে একমাত্র জঙ্গমতরু তুমি তুলসী। তোমার কবিতা মঞ্জরীই তো রাম ভ্রমরে ভূষিতা। তুমি কাশী ছাড়বে কেমন করে?' (রাম নরেশ ত্রিপাঠী, রামচরিত মানস, তুলসী জীবনী, ৯৮ পৃষ্ঠা)

সুধীজনের উৎসাহ বাক্যে তুলসীদাসের প্রাণমন ভরে গেল। তিনি কাশীতেই রয়ে গেলেন। রামায়ণ রচনাও সমাপ্ত হ'ল।

হিন্দী ভাষায় অপূর্ব্ব তুলসী রামায়ণ আজ ভারতের ঘরে ঘরে বিরাজিত, কিন্তু এই মহাকাব্য রচনার মূলে কাশীনিবাসী এই পণ্ডিতের উৎসাহ যে কতখানি কাজ করেছে তার সংবাদ হয়তো অনেকে জানেন না।

এই বিশ্ববরেণ্য পণ্ডিত এক বাঙ্গালী, বাড়ী ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার অধীন কোটালীপাড়া গ্রামে, নাম—মধুসূদন সরস্বতী, আজ যাঁর নামে সুধীসমাজে এখনও সম্ভ্রমের সঙ্গে বলে থাকেন—

মধুসূদন সরস্বত্যাঃ পারং বেত্তি সরস্বতী।
পারং বেত্তি সরস্বত্যাঃ মধুসূদন সরস্বতী॥



ভারতীয় নৃত্যকলা

শ্রীমতী প্রীতি চক্রবর্ত্তী

শাস্ত্রে যে চৌষট্টি কলার কথা বর্ণিত আছে নৃত্য-গীত-বাদ্য তার মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। সংস্কৃত ভাষায় রচিত সঙ্গীত শাস্ত্রে গীত-বাদ্য নৃত্য এই তিনটিকে এক কথায় সঙ্গীত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতে নৃত্য গীত বাদ্য এই তিনটি কলা বিদ্যারই বিশেষ চর্চ্চা হয়েছিল। তখনকার দিনে উৎসবানুষ্ঠানে নৃত্য গীতাদি প্রদর্শনে মেয়েরা যে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করতেন, প্রাচীন ভাস্কর্য্যে এবং অজন্তা গুহা চিত্রাদিতে বিবৃত হয়ে আছে তার বহু নিদর্শন।

ভরত নাটাম্ হচ্ছে প্রাচীনতম শাস্ত্রসম্মত নৃত্য। অনেক অনেককাল আগে এই ভারতবর্ষে সুপরিকল্পিত নৃত্য প্রচলিত হয়েছিল। লেখা হয়েছিলো নৃত্যের ব্যাকরণ পর্য্যন্ত। নৃত্যরসিক ও নৃত্যশিল্পী মাত্রেই ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। এই ভরত নাট্যশাস্ত্রকে বলা হয় পঞ্চমবেদ। এই নাট্যশাস্ত্রের উপরে নির্ভর করে যে নৃত্য পুরাকালে ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত হোতো। অনেকের মতে সেই নৃত্যকে বলা হয় ভরত নাটাম্। এর রচনাকাল সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব্ব ২০০ বর্ষ থেকে ২০০ খৃষ্টাব্দের কোন এক সময়। কথিত হয়, যাঁর সর্ব শরীরের ছান্দিক হিন্দোলই হচ্ছে এ পৃথিবী, শব্দ তরঙ্গ যাঁর বাণী, চন্দ্র ও গ্রহ তারকা যাঁর ভূষণ, সেই সৌম পবিত্র সর্বশক্তিমানই শিব। ব্রহ্মদেব সেই শিবকে প্রণাম জানিয়ে চার বেদ থেকে বাক্য, বিন্যাস, সঙ্গীত এবং আবেগ আহরণ করে তাকে নাট্যশাস্ত্রে রূপ দান করলেন। ব্রহ্মদেব এই পঞ্চমবেদ অর্থাৎ নাট্যবেদ ভরতমুনিকে শেখান। ব্রহ্মার কাছ থেকে ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্র আয়ত্ত্ব করে তাঁর সন্তানদেরকে এর সঠিক প্রয়োগ কৌশলসহ সুশিক্ষিত করে গেলেন। সেই থেকে যুগ যুগান্তর ধরে গুরু থেকে শিষ্যে ভরতনাট্যম্ লালিতপালিত হয়ে আসছে। ওদিকে ভাবপ্রধান মণিপুরী নৃত্য প্রধানতঃ মেয়েদেরই নৃত্য। মণিপুরী মেয়েদের লাস্য নৃত্যে রাসলীলা প্রভৃতি উৎসব যে কি অপরূপ শ্রীমণ্ডিত হয়ে ওঠে তা প্রত্যক্ষদর্শী মাত্রেরই জানা আছে।

প্রাচীন বাংলাদেশেও যে মেয়েদের মধ্যে নৃত্য গীত বাদ্যের বহুল প্রচলন ছিল তার বিবিধ প্রমাণ ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায় লিখিত "প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন" নামক পুস্তকে পাওয়া যায়। বাংলা দেশের মন্দিরের দেবদাসীদেরও নৃত্যগীতনিপুণা হতে হত। পুণ্ড্রবর্দ্ধনের কার্ত্তিকেয় মন্দিরে যে নৃত্য হত তা ভারতের নাট্যশাস্ত্রসম্মত। ডক্টর নীহাররঞ্জন লিখছেন—"জয়দেব গৃহিনী পদ্মাবতী কুশলী নটী ছিলেন এবং সংগীতে তাহার খুব প্রসিদ্ধি ছিল।"

পঞ্চাশ ষাট বৎসর আগেও ভদ্র বাঙ্গালী গৃহস্থ পরিবারে বিবাহাদি উপলক্ষে পুরমহিলাদের নৃত্যের রেওয়াজ ছিল, তার প্রমাণ শ্রী অজিতকুমার



শ্রীমতী প্রীতি চক্রবর্ত্তী

মুখোপাধ্যায় প্রবাসীতে প্রকাশিত "জাতিয় জীবনে ঠাকুরমার দান" নামক প্রবন্ধে দিয়েছেন। যে নৃত্যকলা ছিল মেয়েদের আনন্দলাভ এবং আনন্দ পরিবেশনের অন্যতম প্রধান উপায়, কালক্রমে তার প্রতি দেশবাসীর

মনে একটা অবজ্ঞামূলক মনোভাবের সৃষ্টি হল এবং ধীরে ধীরে ভদ্রসমাজে তার চর্চ্চাও লুপ্ত হয়ে গেল। অবশেষে বিংশ শতাব্দীতে নৃত্যকলার পুনরুজ্জীবন হল রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায়, আর সমগ্র পৃথিবীতে ভারতীয় নৃত্যকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন উদয়শঙ্কর।

মণিপুরী নৃত্যকলার অন্তর্নিহিত অফুরন্ত রসসম্পদ সর্ব্বপ্রথম ধরা পড়ে বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কলারসিক রবীন্দ্রনাথেরই চোখে! আগরতলা (ত্রিপুরা রাজ্যে) গিয়ে প্রথম বড়ঠাকুরের পরিবারে তাঁর কন্যাদের নৃত্যকলা দেখে মুগ্ধ হন। তিনি নাকি ১৩২৩ সনে যখন শ্রীহট্টে যান, তখন উক্ত শহরের উপকণ্ঠস্থ একটি পল্লীর (মাদিমপুর) মণিপুরী মেয়েদের রাস-নৃত্য দেখবার পর থেকেই শান্তিনিকেতনে মণিপুরী নৃত্য-শিক্ষা প্রবর্ত্তনের সঙ্কল্প তাঁর মনে জাগে। শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের মণিপুরী নাচ শেখাবার উদ্দেশ্যে কবিগুরু স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য থেকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নবকুমার ঠাকুরকে এবং মণিপুর রাজ-পরিবারের বুদ্ধিমন্ত সিংহকে শান্তিনিকেতনে আনিয়েছিলেন। তাছাড়া শিলচর থেকে ১৩৪১ সনে রাজকুমার সেনারিক, মহিম সিং, এবং সিলেট থেকে নীলেশ্বর নামে একজন মণিপুরী নৃত্যশিক্ষক শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন।

ভারতীয় নৃত্যকলার ইতিহাসে মণিপুরী তথা ১৯২৭ ইংরাজীর ২৭শে জানুয়ারী তারিখটি বিশেষভাবে বরণীয়। ঐ দিন নটীর পূজা অভিনীত হয়। নৃত্যকলা যে দর্শকের মনে কি অপূর্ব্ব অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সঞ্চার করেছিলো তা বই'এ উল্লেখ আছে। মণিপুরী নৃত্যকেই ভিত্তি করে নটীর পূজার নৃত্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কবিগুরুর পরবর্ত্তীকালের ঋতুরঙ্গ, শাপমোচন, চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা প্রভৃতি নৃত্য-নাট্যে ও মণিপুরী নৃত্য বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। শান্তিনিকেতনের ছাত্রীরা রবীন্দ্রনাথের নৃত্য-নাট্যে অংশ গ্রহণ করে অপূর্ব্ব কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করলেন। এর পর নৃত্যশিক্ষাদানের দিকে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে লাগল। গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশে শিক্ষিত ভদ্রসম্প্রদায়ের মধ্যে নৃত্যকলা অপ্রত্যাশিত সমাদর লাভ করেছে এবং ভদ্রঘরের মেয়েদের মধ্যে ব্যাপকভাবে এর প্রচলন হয়েছে। যে নৃত্যকলা মধ্যযুগে ছিল অবহেলিত ও উপেক্ষিত, আজ তা হয়ে দাঁড়িয়েছে নির্দ্দোষ এবং নির্ম্মল আনন্দ পরিবেশনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

অন্যান্য কলাবিদ্যার ন্যায় নৃত্যকলায় নৈপুণ্য লাভ ও কঠোর সাধনাসাপেক্ষ। নাচের মুদ্রা, অভিনয় ইত্যাদি আয়ত্ত করতে হলে প্রচুর যত্ন এবং অভ্যাসের প্রয়োজন। তাই যারা নৃত্যশিক্ষা লাভ করতে চায় তাদের প্রত্যেকেরই উচিত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে শিক্ষা গ্রহণে প্রবৃত্ত হওয়া। যেমন দক্ষিণীভারতে নৃত্য গুরুদের কাছে ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা গ্রহণ করে থাকেন। এই কারণেই দক্ষিণীভারতে বালা সরস্বতী, ভানুমতী, বীরলক্ষ্মী, গৌরবাই-এর মত শিল্পীদের দর্শন মেলে। (অবশ্য ওদের মধ্যেও ফাঁকি দিয়ে নৃত্যশিল্পীর নাম কেনার মনোবৃত্তি অনেকেরই আছে) যেমন আমাদের বাংলা দেশে প্রকৃত গুণী ও অপ্রকৃত শিল্পী আছে। ফাঁকি দিয়ে বাজে নাম কেনার মোহে আমরা আমাদের এই সাংস্কৃতিক সমাজের কথা ভুলে যাই, কিন্তু তা ভুলে গেলে চলবে না, যে নৃত্যকলার মূল লক্ষ্য মানুষের মনকে উর্দ্ধমুখী করা, আমাদের প্রত্যেক শিল্পীর উচিত তার যেন অধোগতি না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া।

ক্ষণিকা

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

দোলা লাগে সর্বদেহে হাস্যমুখে হঠাৎ যখন
কাছে এসে বস তুমি ; মনে হয় আছ বহুদূরে,
শিরায় শিরায় মোর উষ্ণ রক্ত চঞ্চল তখন,
অসংখ্য উন্মত্ত ঢেউ যেন ওঠে স্থির সমুদ্দুরে।

সে কী তৃষ্ণা ওঠে মোর, সে কী জ্বালা নখরে নখরে
সর্বাঙ্গে সে কী আশ্চর্য মদালস মধু শিহরণ,
আজি কি নূতন করে' প্রসাধন করেছ অধরে
এত কাছে, তবু কেন নহে অকুণ্ঠিত বিহরণ।

সেদিন ভীড়ের মাঝে দেহে দেহে ছোঁয়া লেগেছিল
হয়ত লুকান ইচ্ছা ছিল মোর অবচেতনায়,
কে যেন বিদ্যুৎ-বহ্নি সারা দেহে ছড়াইয়া দিল,
তারই তরে এতদিন কামনা কি করেছি তোমায় ?

স্পর্শ-লোভাতুর দেহ, সে দেহের প্রতি রন্ধ্র ব্যাপি'
অসহ্য উদ্বেগে ত্রস্ত প্রলুব্ধ অনলশিখা সম
শেষ আহুতির লাগি' অতৃপ্তিতে উঠিতেছে কাঁপি,
হে ক্ষণিকা, বহ্নিশিখা, উদ্‌ভ্রান্ত পতঙ্গে আজি ক্ষম।

মেয়েদের কথা

পরিচালিকা—কল্যাণবাদিনী

নব্য-আইন ও নারী-সমাজ

শ্রীমতী অম্বুজবালা দেবী

বর্ত্তমান ভারতের রাষ্ট্রনায়কগণ যে ভাবে মহিলাদের জন্য নানাপ্রকার আইনকানুন করে সমাজ সংসার-জীবনে তাদের স্থান দিয়ে, তাদের অধিকার সংরক্ষণের চেষ্টা কর্‌ছেন, তা লক্ষ্য কর্‌বার বিষয়। প্রত্যেক পুত্র পিতার সম্পত্তির যে অংশ পাবে, প্রত্যেক কন্যা তার অর্দ্ধেক অংশ পাবে। হিন্দু নারীর অবস্থার উন্নতি হবে, এরূপ ধারণা কতকগুলি লোকের মধ্যে এসেছে। কিন্তু অনেকে মনে করেন, তা হবে না, বরং অনিষ্টই হবে। তাঁরা বলেন, কোন রমণী একদিকে যেমন তাঁর পিতার সম্পত্তির অংশ পাবেন, অপর দিকে তাঁর ননদেরা তাঁর শ্বশুরের সম্পত্তি থেকে তাঁকে বঞ্চিত কর্‌বেন। পরিণামে লাভ অপেক্ষা, ক্ষতিই হবে বেশী। ভ্রাতা-ভগ্নীদের মধ্যে শান্তি অপেক্ষা কলহই হোতে থাক্‌বে, পরিণাম ও ভয়াবহ হয়ে উঠ্‌বে।

এটা অনেকেই জানেন যে, সম্পত্তি যত বেশী অংশে বিভক্ত হয়, তার মূল্যও তত হ্রাস পায়। হিন্দুর বিবাহ ও উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে আইন পরিবর্ত্তন করে, যে নূতন পদ্ধতি অবলম্বনের উদ্যোগ পর্ব্ব চল্‌ছে, তা'তে নানা দিকে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মুসলমান আইন অনুসারে যে ভাবে মেয়েরা সম্পত্তি পায়, হিন্দু আইনে সেই ভাবেই মেয়েদের ভাগ বাঁটোয়ারা করে সম্পত্তি দেওয়ার নির্দ্দেশ রয়েছে। মুসলমান সমাজ এই প্রথায় ক্ষতিগ্রস্ত, তাদের সম্পত্তিও শীঘ্র নষ্ট হয়ে যায়। মুসলমানদের মধ্যে ঘরোয়া বিবাহ প্রচলিত থাকার একমাত্র কারণ হচ্ছে সম্পত্তি না পরহস্তগত হয়। এ জন্যই ঐ সমাজে খুড়তুত জেঠতুত ভাই বোনের মধ্যে বিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ আছে, আর এ জন্যই বিধবা ভাই-বউকে নিকা করা হয়। হিন্দু সমাজে এরকম প্রথা প্রচলিত নেই, এ জন্য আশঙ্কা হয় হিন্দু সমাজের বিশেষ ক্ষতি হবে। মুসলমানরা ওয়াকফ আইন করে সম্পত্তি সম্প্রতি রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। হিন্দু সমাজে সে রকম রীতি বা পদ্ধতি নেই। ওতে হিন্দু, বিশেষতঃ হিন্দু মেয়েরা, নানা ভাবে প্রতারণা প্রবঞ্চনায় ও অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়ে ধ্বংসোন্মুখ হচ্ছে, তার ওপর এরূপ ব্যবস্থা গেলে, সমাজ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা ভাব্‌বার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। হিন্দুর মধ্যবিত্ত সমাজ ধ্বংসোন্মুখ,—তাকে দারিদ্র্যের কবলে নিক্ষেপ করাই হয়েছে আধুনিক রাষ্ট্রপদ্ধতির ধর্ম্ম। মেয়ের বিয়ের জন্য অনেকে ধার করে, সম্পত্তি বন্ধক দেয়, বিক্রয়ও করে—এই সামাজিক নির্য্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে পুত্ররা আপত্তি করে না। তারা লক্ষ্য করে, আর ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে দেখে বোনের বিয়ের জন্যে পরিবারের সর্ব্বনাশ কেমন করে হচ্ছে। নতুন আইনের প্রচলন হোলে সম্পত্তি বিক্রয় করে বিয়ে দিতে পুত্ররাও আপত্তি কর্‌বে। পিতার মৃত্যুর পর মেয়েরা এসে ছেলেদের মত সম্পত্তির ভাগ নেবার জন্য দাবী কর্‌বে। আজ্‌কের দিনে সকলেই এই কথা ভাব্‌ছে। প্রশ্ন উঠেছে—হিন্দু ভারত আজ কোন্ পথে? কোথায় এ পথের শেষ?

মেয়েরা যে আজ প্রচলিত ধারা অনুসরণ করে নানা-ভাবে বিপন্ন, একথা অস্বীকার করা যায় না। যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করে মেয়েকে বিয়ে দেবার পরও নিশ্চিন্ত মনে থাকা এক রকম অসম্ভব হয়ে উঠেছে। বহু শিক্ষিত ছেলে বিশ্বাসঘাতকতা করে বহু মেয়ের সর্ব্বনাশ কর্‌ছে, আর বহু মেয়েকে সর্ব্বহারা করে দিচ্ছে, তার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। নানাপ্রকার ষড়যন্ত্রের ফলে অত্যাচারে জর্জ্জরিতা মেয়ে বাপের বাড়ী চলে আসে, আর স্বামীর সংসার কর্‌বার অধিকার পায় না। চোখের জলে দিনের পর দিন সে জীবন অতিবাহিত করে, তার সব সাধ সুখ আশা চলে যায়, শেষে বাপ মা, ভাই-বউদের গলগ্রহ হয়ে থাকে, আর তাদের

বিরক্তির পাত্রী হয়ে সংসারে পড়ে থাকে পরিত্যক্ত বস্তুর মত—এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। কাজেই তাকে শেষ পর্য্যন্ত নীতি পথ থেকে দূরে চলে যেতে হয়—ঘটনাচক্রে পরপুরুষের প্রলোভন ও চক্রান্তে ভোগস্পৃহা ও ভোগ-কামনার তাড়নায় সে পতিতা হয়ে যায়। এর জন্য কে দায়ী —সে, না তার আত্মপরিজন? চলতি কথায় বলে—'ভাত দেবার কেউ নয়, কিল মারবার গোঁসাই'—নির্লজ্জভাবে বাংলার হিন্দু সমাজের পুরুষ-পুঙ্গবগণের একাধিক বিবাহ কলঙ্কের বিষয় নয় কি?

হতভাগিনী বাল-বিধবাদের সংখ্যা বড় কম নয়। হিন্দু শাস্ত্রে বিধবার জীবনযাপনের জন্য কঠোর বিধি বিধান দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশের লোকের অজ্ঞতা বা ঔদাস্যবশতঃ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনের নিয়ম শিথিল হয়ে গেছে, অপর পক্ষে আদর্শমূলক শিক্ষার অভাবে বিধবারা তাদের জীবনের কাজের দায়িত্ব বুঝ্‌তে অক্ষম হয়েছে। হতভাগিনী বালবিধবাদের কথা যখন ভাবা যায়, তখন মনে হয় এই সব অবলা কোমলা নিষ্কলঙ্কা মেয়েরা কি এমন অপরাধ করেছে, যে সাগর থেকে তুলে এনে, মরুভূমিতে তাদের নির্ব্বাসনদণ্ড দেওয়া হচ্ছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত বিধবাবিবাহ প্রচলনে হিন্দু সমাজ উপেক্ষাই করে এসেছে, ফলে মেয়েরা পেয়েছে দারুণ আঘাত। শরীর ও মনের সংযম, ইন্দ্রিয়-দমন, পরের সেবা ও সাধারণের কাজে জীবন উৎসর্গ করে অবশ্য ইহজগতে প্রচুর আনন্দ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু প্রাকৃতিক ধারাকে বর্জ্জন করে, অপ্রাকৃতিক অবস্থায় জীবনকে টেনে নিয়ে যাওয়া অনেকের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে হিন্দু আইনের পরিবর্ত্তন একেবারে মূল্যহীন বলা যায় কি?

ব্রহ্মচর্য্য কথাটী যত সহজ, কাজটী তত নয়। বাহ্যিক অপেক্ষা আন্তরিক বৈরাগ্য ভিন্ন একে আয়ত্ত করা যায় না। শারীরিক ত্যাগ স্বীকারের সঙ্গে মনের বাসনা, কামনা ও সুখাশা বিসর্জ্জন দেওয়াই প্রকৃত বৈরাগ্য। এরূপ বৈরাগ্য দুর্ব্বল ও অসংযত মনে কখন স্থান পায় না। তা ছাড়া বর্ত্তমান যুগসভ্যতার পরিবেশ ও বিলাসভোগপ্রিয়তা মানুষকে প্রলুব্ধ করে। তবে একথাও সত্য, প্রথম থেকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে কোমল নারীমনগুলোকে সবল ও সংযত করে ওদের নিষ্কামভাবে পরের জন্য কাজ কর্‌তে শিখালে, ওদের দ্বারা জগতের অনেক মহৎ কাজ সাধিত হ'তে পারে। ইউরোপের নানাস্থানে কুমারী ও বিধবা দ্বারা সাধারণের বহু উপকার সাধিত হয়, সেদিকে আমাদের লক্ষ্য করা উচিত। মেয়েদের চরিত্রগঠন একান্ত প্রয়োজনীয়। চরিত্র গঠনের প্রথম সোপান—স্বার্থত্যাগ। দ্বিতীয়—আত্মশাসন; তৃতীয়—আত্মবিসর্জ্জন। এগুলি বিশেষ শিক্ষা-সাপেক্ষ। সুখদুঃখজর্জ্জরিত জীবনের কোলাহলের মাঝে, আমাদের দেশের মেয়েরাই সবচেয়ে বিড়ম্বনা ভোগ কর্‌ছে; পরিবর্ত্তন ও সংস্কারের কথা উঠ্‌লে, প্রাচীন বুলি কতকগুলি বলে ভাঁওতা দেওয়ারই চেষ্টা হয়, নারীর মর্য্যাদা সংরক্ষণের দিকে অধিকাংশ ব্যক্তিকেই দেখা যায় অনগ্রসর।

মেয়েকে মা বাপ যখন যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট করে বিয়ে দিলেন তখন দেখা গেল না সেই মেয়ের স্বামীর কোন দোষ ত্রুটি। মেয়ে স্বামীর ঘর কর্‌তে গিয়ে শুন্‌লো স্বামী ব্যভিচারী, পরস্ত্রী বা পতিতাসক্ত, মদ্যপ ইত্যাদি। মেয়ে পায় না দাম্পত্য প্রণয়ের অধিকার। যাদের ভিতর তাকে থাক্‌তে হয়, তারাও তাকে অনাদর করে, আর গঞ্জনা ও লাঞ্ছনায় তার মন বিষাক্ত করে তোলে—প্রতীকারের কোন পথ সে পায় না, প্রতিবাদ তার কণ্ঠরোধ করে দেয় মেরে ফেল্‌বার জন্য। রিক্তা হয়ে যখন সে বাপের বাড়ীতে চলে আসে পরণের কাপড়খানি সম্বল করে আর নিরাভরণা হয়ে, তখন তার কথা ক'জন ভাবে! বাপের বাড়ীতে চলে আসার পরই শ্বশুর বাড়ীর তরফ থেকে তার চরিত্রের ওপর কলঙ্ক আরোপ করা হয় যাতে সে সকলের কাছে ঘৃণ্যা হতে পারে। তাঁদের পুত্ররত্নটী পূর্ব্ব থেকে যে কলঙ্ক কালিমা মেখে আছেন, তার সম্বন্ধে ক'জন ভাব্‌ছে বা বল্‌ছে! এমন অনেক উচ্চশিক্ষিত যুবক আছেন যাঁরা নীরবে সরকারী তহবিল ভেঙে শেষে পণের টাকায় নিজেকে বাঁচানোর জন্য নানাপ্রকার মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বিয়ে করে মামলা চালান ও জেল খাট্‌তে চলে যান, সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীকে পথে বসিয়ে দিয়ে—স্ত্রী স্বামীর ঘরে থাক্‌তে গেলেও শ্বশুরবাড়ীর কেউই জায়গা দেয় না—শিয়াল কুকুরের মত তাকে তাড়িয়ে দিয়ে, তার চরিত্রের ওপর অপবাদ দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। মেয়ের বাপ পণের টাকা দিয়ে রেহাই পায় না, জামাইয়ের মামলার খরচ বহন করেও

শেষে অশ্রু ভারাক্রান্ত ও সর্ব্বস্বান্ত হয়। এই তো সমাজ! এর প্রতীকার কোথায়? সমাজে বড় বড় বুলি আওড়াবার লোকের অভাব হয় না—প্রগতিবিরোধী প্রাচীনপন্থীরা সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী থেকে সুরু করে পদ্মিনী করুণাবতী পর্য্যন্ত অনেকের মহিমা কীর্ত্তন করে সমাজের রঙ্গমঞ্চ মুখর করে তুল্‌বেন কিন্তু এর সম্বন্ধে তাঁরা কি ভাবেন? যিনি বিবাহের যোজকতা কর্‌বার জন্য আত্মীয় সেজে বন্ধুর মেয়ের এম্নি সর্ব্বনাশ করেন, তিনিও পর্য্যন্ত অন্তরালে থেকে যান। এমন পুরুষও বাংলাদেশে অভাব নেই, যাঁর খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আর স্ত্রীকে পথে বসিয়ে অন্য কুমারীর পাণিগ্রহণ করেন, পতিতালয়ে থাকেন বা কোন পরস্ত্রী বা বিধবাকে নিয়ে স্বামী স্ত্রীর ন্যায় বসবাস করেন। এদিকে পুরাতন-পন্থীদের কি বল্‌বার আছে? এই সব অবস্থায় নারীকে রক্ষার জন্য রাষ্ট্র সংবিধানের পক্ষে যদি হিন্দু কোডের পরিবর্ত্তন করা যুক্তিযুক্ত মনে হয়ে থাকে, তাহোলে অন্যায়টা কি হয়েছে?

আধুনিক যুগ নারীর জীবিকা অর্জ্জনের অনেক পথ খুলে দিয়ে অনেকটা উপকারই করেছে। যাঁরা বলে থাকেন, সত্যকারের সংস্কৃতি বলে যাঁদের বংশে কিছু আছে, তাঁরা শত অভাব সত্ত্বেও, মেয়েদের রোজগারে হওয়া ভালো চক্ষে দেখেন না—কিন্তু সংস্কৃতি তো সভ্যতার ভগ্ন সৌধকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌ছে না—একে একে তার ভিৎ ধ্বসে যাচ্ছে। সেদিকে লক্ষ্য আছে কি? মধ্যযুগে বাঙ্‌লার মেয়েরা যে ভাবে অত্যাচারে জর্জ্জরিতা হয়েছে, আর যে ভাবে তাদের ভ্রষ্টা করা হয়েছে, তা পড়্‌লে চোখে জল আসে। ইতিহাস তার জ্বলন্ত প্রমাণ। হিন্দু তার নারীকে কোন দিনই মর্য্যাদা দিয়ে তার আত্মরক্ষার চেষ্টা করেনি—শুধু স্তোক বাক্য আর ধামাচাপা দিয়ে এতকাল চণ্ডীমণ্ডপে বসে মেয়েদের সম্বন্ধে কুৎসিত আলোচনাই করে এসেছে। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে তা চিরদিন চলে না। এতকাল মেয়েরা সমাজ সংসারে নিজেদের উজাড় করে দিয়ে এসেছে, বিনিময়ে পেয়েছে কি? আজ যদি মেয়েরা নিজেদের জীবনধারণ ও স্বাবলম্বনের জন্য নার্সিং, ডাক্তারী, শিক্ষকতা, অধ্যাপনা, কেরাণীগিরি এসব কাজ নিয়ে থাকে, তা হোলে এমন কিছু অপরাধ করছে না। পুরুষের বিশ্বাসঘাতকতা, শঠতা ও প্রবঞ্চনার কবল থেকে রক্ষা পাবার জন্য এদের এরূপ আচরণ নিন্দনীয় নয়। নারীহরণ, নারীধর্ষণ ও নারীকে বিধর্ম্মীকরণের মূলে হিন্দু সমাজের শৈথিল্য ও কুসংস্কারই দায়ী। বৈদিক যুগে মেয়েরা পেয়েছে সম্মান, অধিকার, শক্তি ও মর্য্যাদা—সেই আরণ্যক সভ্যতার ভস্মস্তূপে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, তারই বিকৃত রূপ নিয়ে এতকাল হিন্দুসমাজ আত্মঘাতী হয়ে এসেছে। আজ যদি আমূল পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয়ে থাকে, তা হোলে তা'তে বাধা দেবার পূর্ব্বে ভেবে দেখা উচিত—আমরা কোথায় ছিলাম, আর কোথায় এসেছি? এখন আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য মেয়েদের মধ্য থেকে সম্পূর্ণভাবে নিরক্ষরতা দূর করে দেওয়া, এজন্য প্রত্যেক শিক্ষিতা মহিলাকে এগিয়ে এসে নারী সমাজের উন্নয়নের জন্যে এদিকে লক্ষ্য দেওয়া—তা হোলে আজও যে হাহাকার ও আর্ত্তনাদ নারীকণ্ঠে শোনা যাচ্ছে তাও অচিরে দূর হয়ে যাবে। যাঁরা বলেন, দুঃখই নারীর গৌরব, তাঁরা স্বপন-পসারী মাত্র! তাঁদের দ্বারা সমাজের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় চলে, সমাজের কল্যাণ হয় না। যাঁরা বলেন—মেয়েরা কর্ম্মক্ষেত্রে এসে জীবিকা উপার্জ্জনের পথে দাঁড়ালে ব্যভিচারের স্রোতে ভেসে যাবে, তাঁদের জেনে রাখা উচিত পর্দ্দার অন্তরালেও ব্যভিচার বড় কম হয় না। অতীতেও ব্যভিচার ছিল খুব বেশী, তা না হোলে বাঙালীর মধ্যে আজ বিশুদ্ধ আর্য্যরক্ত থাক্‌তো—দ্রাবিড়ীয় মঙ্গোলীয় শক হূণ প্রভৃতি রক্তের মিশ্রণ ঘট্‌তো না। প্রগতিকে যাঁরা দুর্গতির নামান্তর বলেন, তাঁরা যে সমাজকল্যাণকামী নন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভারতীয় নারীকে আজ নূতন ভাবে জীবন গড়ে তুল্‌তে হবে, রন্ধনশালায় চিত্তকে আবদ্ধ রাখ্‌লে চল্‌বে না—নারী যখন তার নারীত্বের ভিত্তিতে, নারীত্বকে বিসর্জ্জন না দিয়ে কোনও অধিকারের ন্যায়সঙ্গত দাবী নিয়ে দাঁড়ায়, তখন তাকে অগ্রাহ্য কর্‌বার শক্তি যারা দেখাতে চায় তারা কি ক্ষমার যোগ্য?—তারা কি সামাজিক জীব? এই কথাই আজ আমি সমগ্র বাঙ্গালী সমাজের সম্মুখে তুলে ধর্‌ছি।

—

সমাজে নারীর ক্রমবিকাশ

অমিয়া পাল

আদিম সভ্যতার যুগের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, সে সময়ে মেয়েরাই ছিল পুরুষদের উঁচুতে। স্ত্রী জাতি ছিল সমাজের অগ্রণী ও শীর্ষস্থানীয়। তাহাদের মধ্যে অনেকেই খুব উচ্চশিক্ষিতা ছিল এবং বেদ পুরাণ রচনা করিয়া গিয়াছে। গৃহের কাজকর্ম্ম সেরে তারা অবসর সময়ে শাস্ত্র আলোচনা করত। সেকালে পুরুষেরা শিকার করত এবং শিকারই ছিল প্রধান উপজীবিকা। শিকারেই সংসার চলত না, তাই সমাজের উৎপাদন বিষয়ে মেয়েরাই ছিল অগ্রণী; এবং উৎপাদন ক্ষেত্রের মালিকানা ছিল তাহাদেরই উপরে। আদিম সভ্যতার যুগের ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে Pastoral সভ্যতার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা অনেকটা সঙ্কুচিত হ'য়ে এলো। এই Pastoral সভ্যতার যুগে পুরুষেরা পশুপালন এবং পশুচারণ করত এবং গো-সম্পদের মালিকানা থেকে উৎপাদন কার্য্য ও তাহাদের হাতে এসে গেল। সেদিন থেকে সমাজে মেয়েদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আরও সঙ্কুচিত হ'য়ে এলো এবং সমাজ জীবনেও তাহাদের বহু পরিবর্ত্তন ঘটল। উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রভুত উন্নতি সাধিত হ'ল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি যতদিন সমাজে ছিল না ততদিন নারীদের সমাজে একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে সেই বিশিষ্ট স্থানটী তাহারা হারায়ে ফেলল; এবং উৎপাদন বিষয়ে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয়ে সংসারে প্রবেশ করল। ইহাই হ'ল নারী জাতির আদিম ইতিহাস। সেদিন থেকে সমাজ পুরুষ দ্বারা শাসিত। স্ত্রীজাতির মানুষ হিসাবে সমাজে কোন স্বাধীনতা রহিল না এবং সম্পত্তির উপরও তাহাদের কোন অধিকার রহিল না। অর্থনৈতিক অবনতির সঙ্গে সঙ্গে নারী জাতির মান, সম্মান, স্বাধীনতা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত হ'ল।

পূর্বতন সমাজে মায়ের সম্পত্তিতে সন্তানের অধিকার ছিল। কিন্তু সমাজপতিরা ইহাকে অস্বীকার করলেন এবং পিতার সম্পত্তিতে সন্তানের অধিকার-প্রথা প্রবর্ত্তন করলেন। পিতৃত্ব বজায় রাখবার জন্য সমাজে এক বিবাহের প্রচলন হ'ল। পূর্বতন সমাজে বহু বিবাহেরও প্রচলন ছিল। অর্থনীতিক অবনতির সঙ্গে সঙ্গে বহু বিবাহের প্রচলনও বন্ধ হয়ে গেল; এবং সমাজে বিধি ব্যবস্থারও প্রচুর পরিবর্ত্তন হ'ল। গত দু'হাজার বৎসর সমাজে নানা বিপ্লব ও আন্দোলন ঘটেছে এবং নানা পরিবর্ত্তনও এসেছে, কিন্তু নারীদের সমাজে অধিকার ও স্বাধীনতার কোন পরিবর্ত্তনই হয়নি। নারীদের স্বাধীনতা সমাজপতিরা স্বীকার করে নেয়নি। তাহাদের মতে নারীদের স্বামীর নিকট আনুগত্যই তাহাদের মঙ্গল। কোন কোন বৈজ্ঞানিকেরা নাকি যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে স্ত্রীজাতি দুর্ব্বল ও অক্ষম; আত্মরক্ষার জন্য স্বামীর নিকট আনুগত্যই তাহাদের একমাত্র পন্থা। এমন কথাও শোনা যায়, জার্ম্মানীর হিটলারও নাকি নারীদের বলেছেন "Go back to the kitchen" তাহারই প্ররোচনায় জার্ম্মানীর বৈজ্ঞানিকেরা মেয়েদের নিকৃষ্টতা ও দুর্ব্বলতার কথা প্রমাণ করিয়াছেন। নারীদের আত্মরক্ষার জন্যই তাহাদের অন্দর মহলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে; তাহাদেরই মঙ্গলের জন্য। কোন কোন উচ্চ শিক্ষিতেরা মেয়েদের শারীরিক দুর্ব্বলতা, পুরুষের চেয়ে নিকৃষ্টতা—ইহা স্বীকার করে নেয়নি কারণ বর্ত্তমান যুগ—বৈজ্ঞানিকের যুগ। বৈজ্ঞানিক যুগে শারীরিক পরিশ্রমের চেয়ে মানসিক প্রতিভারই প্রয়োজন। কিন্তু কোন কোন গোঁড়া সমাজপতি কোন যুক্তির অবতারণা করার প্রয়োজন বোধ করেন না; তারা বলেন, মেয়েরা মায়ের জাতি, তারা দেবী তাহাদের রক্ষার জন্যই পরাধীনতার প্রয়োজন। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার, স্বাধীনতা না পেলে মানুষ বড় হ'তে পারে না, এসব বড় বড় ফাঁকা বুলি পণ্ডিতদের মুখে শোনা যায়—কিন্তু মেয়েদের স্বাধীনতার দিকে তাকালে লজ্জায় মাথা আপনিই হেঁট হয়ে আসে।

শোনা যায় পূর্ব্বকালে রোমের ধনিক শ্রেণী তাদের স্ত্রীদের ঘরে এক রকম তালাবদ্ধ করে রাখত—সতীত্বের অজুহাতে। সমাজে স্ত্রীজাতির স্বামী, পুত্র বা আত্মীয়স্বজনের উপরই নির্ভর করতে হয়; মান, সম্ভ্রম, সুখ ইত্যাদি এদের উপর নির্ভর ক'রে। আমাদের সংসারে অভদ্র অমার্জ্জিত স্বামীর অভাব নেই। নারীকে ইতর স্বামীর সমস্ত লাঞ্ছনাই নীরবে সহ্য করতে হয়, কারণ স্ত্রী স্বামীর উপরই নির্ভরশীল। কোন কোন ক্ষেত্রে অমর্জ্জিত স্বামীর লাঞ্ছনা এত চরমে উঠে যে স্ত্রী বাধ্য হয় সংসার ছেড়ে পালিয়ে যেতে।

মেয়েদের এই পরাধীনতার ও পরনির্ভরশীলতার প্রধান অন্তরায় হ'ল অর্থনৈতিক সমস্যা। বর্ত্তমান সভ্যতার এই আর্থিক পরাধীনতাই তাহাদের পূর্ণ বিকাশের পথে প্রধান বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা নাই, যার আর্থিক স্বাধীনতা নেই, যাকে অন্যের উপর নির্ভর করতে হয় তাকে সমাজ সম্মান করে না। আর্থিক সঙ্গতির উপরই মান সম্মান, সম্ভ্রম ইত্যাদি নির্ভর করে।

কিন্তু মার্কসবাদ বলেছেন, সমাজ উৎপাদক ব্যাপারে স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকার না থাকলে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়া ত দূরের কথা গণতান্ত্রিক সভ্যতাও প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে না। মার্কসের মতে সমাজে অবরোধ প্রথার প্রচলনের ফলেই নারী শ্রেণী অনভিজ্ঞ, দুর্ব্বল ও অক্ষম এবং পুরুষের পিছনে রহিয়াছে। এই অবরোধ প্রথাই নারীদের স্বাবলীল ও প্রগতির পথে প্রধান বাধাস্বরূপ। সেদিন নারী সমাজ সমাজের উৎপাদন ব্যাপারে পুরুষের সমান অধিকার পাবে সেদিনই নারী সমাজ পুরুষদের লাঞ্ছনা ও বর্ব্বরতা থেকে মুক্ত হবে। সোভিয়েট ব্লকের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই সেখানে নারী জাতি উৎপাদন ব্যাপারে সমাজে পুরুষের সমান। যৌথ খামারে তারা কর্ম্মী, কারখানায় তারা শ্রমিক এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ও তারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন করিয়াছে। নাতসী জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে তারা পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছে। চীনের দিকে তাকালেও আমরা নারীদের সমাজে পুরুষের সমান অধিকার দেখতে পাচ্ছি। পার্ল বাক্ চীনের নারী সমাজের

নির্য্যাতনের কাহিনী "Good Earth" এ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। এই কাহিনী থেকে আমরা জানতে পারি যে, সে সময়ে চীনের নারীদের সমাজে কোন স্থান ছিল না ; তারা ছিল সমাজের অবাঞ্ছিত ও নিকৃষ্ট। অর্থের বিনিময়ে তাদের বিক্রয় করা হ'ত। চীনের মেয়েদের দুর্ব্বল করে রাখবার জন্য এবং পায়ের শোভা বর্দ্ধনের জন্য পায়ে লোহার জুতা পরিয়ে রাখত। ইহাই তখনকার চীন সমাজের প্রথা ছিল। কিন্তু মার্কসবাদ প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে আমূল পরিবর্ত্তন ঘটেছে। চীনের বিপ্লবীরা নারীদের সমাজে পুরুষের সমান অধিকার দিয়েছে ; তাই তাহারা যুদ্ধের সময় পুরুষদের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছে। এবং পুরুষের সমকক্ষ হয়ে তালে তালে প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে।

আমাদের দেশের নারীরা এখনও সামাজিকতার বন্ধনে আবদ্ধ। তাই তাহারা এখনও অভদ্র ও অমার্জিত স্বামীদের হাতে লাঞ্ছিত হচ্ছে। বিশেষ অবরোধ প্রথায় সকলেই আজ তাহারা অজ্ঞ, নিরক্ষর ও কুসংস্কারপন্ন, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এই অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের জন্য সমাজপতিরাই দায়ী। আমাদের দেশে এখনও অনেক গোঁড়া লোক আছেন যারা স্ত্রী শিক্ষার বিরুদ্ধবাদী। ইহাদের অভিমত এই যে, স্ত্রী শিক্ষার প্রচলনের ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। কোন কোন উচ্চ শিক্ষিতেরা স্ত্রী শিক্ষার পক্ষপাতী এবং স্ত্রীকে শুধু ভোগের সামগ্রীরূপেই দেখে না ; তবে ব্যক্তিগত সামাজিক পদমর্য্যাদা এবং স্বাধীনতা স্বীকার করে নিচ্ছেন। সমাজে অধিকাংশ বিধবারাই দিনের পর দিন আত্মীয় স্বজনের নিকট লাঞ্ছনা ও নির্যাতন পেয়ে আসছে। এই লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতনের প্রধান কারণ হ'ল, আর্থিক পরাধীনতা ও পরনির্ভরশীলতা। এই নিসম্বল, অসহায়, লাঞ্ছিত ও নির্য্যাতিত মহিলাদিগকে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য আমাদের দেশে কিছু সংখ্যক "নারী শিক্ষা সমিতি" গড়ে উঠছে। গবর্ণমেন্ট ও কিছু-সংখ্যক নারী সমিতিকে সাহায্য করছে। কিন্তু সমুদ্রের কাছে গোষ্পদের তুল্য। এবং ইহাকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গবর্ণমেন্টকে আরও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া এই নির্য্যাতিত ও লাঞ্ছিত মহিলাদিগকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিতে তৎপর হইতে হ'বে। স্ত্রীজাতির এই অজ্ঞতার প্রধান অন্তরায় হ'ল শিক্ষার অভাব। আমাদের দেশে এখনও ব্যাপক শিক্ষা প্রসারতা লাভ করে নাই। কিন্তু ব্যাপক শিক্ষার প্রসারতার পথে প্রধান অন্তরায় হ'ল পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক সমস্যা। পশ্চিম-বঙ্গের অর্থ-নৈতিক কাঠামো আজ বিপর্য্যস্ত। দেশ বিভাগের পরে উদ্বাস্তু সমস্যা আজ জাতির এক বিরাট সমস্যা। পূর্ব্ববঙ্গের এক শ্রেণীর নরনারী আজ ধূলায় লুণ্ঠিত।

আজকাল এক শ্রেণী অভিজাত নারীর আমদানী হচ্ছে তারা নানা বর্ণে ও রংয়ের সমাবেশে সজ্জিত হয়ে, অধর রঞ্জিত করে নিজকে শিক্ষিত বলে পরিচয় দিতে দ্বিধা বোধ করে না। তারা আভিজাত্যের গর্ব্বে উৎকট বিলাসিতার মাধুর্য্যের হাওয়ায় ভেসে চলছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর "শেষের কবিতায়" এনামেলে পালিশ করা কেটী মিটারের চিত্রটীকে যে ভাবে তুলি দিয়ে অঙ্কিত করে নিজ সমাজের সম্মুখে তুলে ধরেছেন, ইদানিং আমাদের সমাজে ও ঐরকম দুই একটি কেটী মিটারকে দেখতে পাওয়া যায় ; যারা সিগারেট ফুঁকিয়ে চলাটা আভিজাত্য বলে বোধ করে। এরকম শিক্ষা সমাজের কোন কল্যাণেই আসবে না বরং সমাজের পক্ষে অনাদৃত ও হেয় প্রতিপন্ন হবে।

অন্য সব স্বাধীন রাষ্ট্রের নারী সমাজের তুলনা করলে আমরা অনেক পিছনেই রহিয়াছি কিন্তু এটুকুই আমার কথা যে আমাদের নারী সমাজ ও প্রগতির পথে একটু একটু এগিয়ে চলেছে। আমাদের নারী সমাজেও কেউ কেউ ডাক্তার, আইনজ্ঞ, ইঞ্জিনীয়ার হয়েছে, কেউ কেউ আইন সভার সদস্য হয়েছেন, কেউ কেউ মন্ত্রীর আসন ও অলঙ্কৃত করেছেন এবং রাজ্যের গবর্ণরও নিযুক্ত হয়েছেন। কেউ কেউ বা সমাজ সংগঠন ব্যাপারে ও এগিয়ে আসছে। শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হয়েছেন। ইহাতে ভারতের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভারতীয় নারী সমাজও গৌরবান্বিত হয়েছে। সমাজের প্রত্যেক নারীকেই উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে হ'বে তা নয়, সমাজের সংগঠন ব্যাপারে তাহাদের এগিয়ে আসতে হ'বে, আত্মনির্ভরশীল হ'তে হবে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যাপারে আত্মসচেতন হ'তে হবে, সমাজের গঠন কাজে আত্মনিয়োগ করতে হ'বে। তবেই নারীসমাজ সামাজিক পরাধীনতা থেকে মুক্ত পাবে।

কাঁটার লেশ—১৬ ঘরের

শ্রীমায়া ভট্টাচার্য্য বি-এ

১ম কাঁটা—৪ সোজা, সামনে সূতা ১ জোড়া সোজা, ১ সোজা, সামনে সূতা নিয়া কাঁটা সূতা দিয়া প্যাঁচাইয়া লইয়া ১ জোড়া সোজা, ৭ সোজা।

২য়—৯ সোজা, ১ উল্টা, ৩ সোজা। সামনে সূতা ১ জোড়া সোজা ২ সোজা।

৩য়—৪ সোজা, সামনে সূতা ১ জোড়া সোজা, সব সোজা।

৪র্থ—১৩ সোজা, সামনে সূতা ১ জোড়া সোজা, ২ সোজা।

৫ম—৪ সোজা, সামনে সূতা ১ জোড়া সোজা, ১ সোজা, সূতা সামনে আনিয়া কাঁটা সূতা দিয়া প্যাঁচাইয়া লইয়া ১ জোড়া সোজা (এরূপ ২ বার), ৬ সোজা।

৬ষ্ঠ—৮ সোজা, ১ উল্টা, ২ সোজা, ১ উল্টা, ৩ সোজা, সামনে সূতা ১ জোড়া সোজা, ২ সোজা।

৭ম—৪ সোজা, সামনে সূতা ১ জোড়া সোজা, ১৩ সোজা।

৮ম—১৫ সোজা, সামনে সূতা ১ জোড়া সোজা, ২ সোজা।

৯ম—৪ সোজা, সামনে সূতা ১ জোড়া সোজা, ১ সোজা, সূতা কাঁটার সামনে আসিয়া কাঁটাকে প্যাঁচাইয়া ১ জোড়া (এইরূপ ৩বার), ৬ সোজা।

১০—৮ সোজা, ১ উল্টা, ২ সোজা, ১ উল্টা, ২ সোজা, ১ উল্টা, ৩ সোজা, সামনে সূতা ১ জোড়া সোজা, ২ সোজা।

১১ দশ—৪ সোজা, সামনে সূতা ১ জোড়া সোজা, ৬ সোজা (সব সোজা)

১২ দশ—৬ ঘর বন্ধ করিয়া ১২ ঘর সোজা, সামনে সূতা ১ জোড়া সোজা, ২ সোজা।

(আপনারা এই সায়ার লেশটি সরু লোহার কাঁটা এবং সাদা ক্রুচেট সূতা দিয়া বুনিবেন, তাহা হইলে দেখিতে বেশ সুন্দর হইবে। বেশ আঁট করিয়া বুনিবেন।)



যখন সুদিন আসে

(ইতালীয়ান গল্প : লেখক : লুইজি পিরান্দেলো)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

—তেরেসিনা এ বাড়াতে থাকেন ?

সার্ট গায়ে চাকর—সার্টের উপর গলার-কলার-উল্টোনো-কোট···দরজার সামনে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। সে বললে—তেরেসিনা! সে আবার কে ?

তার ভ্রূ কুঞ্চিত বিরক্ত ভাব।

কথাটা জিজ্ঞাসা করেছিল এক তরুণ যুবা। মাথা নেড়ে তরুণ বললে—চিনতে পারছো না? তেরেসিনা! যিনি খুব ভালো গান করেন ?

চাকরের দুচোখ উঠলো কপালে! সে বললে—ওহো ···তাঁর নাম বুঝি তেরেসিনা!···বটে! তা···তুমি··· আপনি ?

তরুণ বললে—তিনি বাড়ী আছেন কিনা, আগে বলো।

তরুণের ভ্রূ হলো কুঞ্চিত। তরুণ বললে—তাঁকে বলোগে মিকুশিয়ো এসেছে—মিকুশিয়ো···

মুখে হাসির রেখা···চাকর বললে—কিন্তু তিনি বাড়ী নেই। মাদামসিনা মার্লিশ তিনি থিয়েটারে তো!

তাঁর মা···মাসি মার্থা ?···

—ও, আপনি বুড়ী-মার বোনের ছেলে!···চাকরের তবু নির্বিকার ভাব।

চাকর বললে—না মশায়, তিনিও বাড়ী নেই। তিনিও থিয়েটারে···বাড়ী ফিরতে একটা বাজবে। আজ মাদামের গ্যালা-রাত কিনা···খুব ধূমধাম।···মাদাম আপনার কে হন? মাসতুতো বোন ?

মিকুশিয়ো কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করলে। সে বললে—না, তা নয়। মানে, মাসতুতো বোন নয় ঠিক! তবে—আমার নাম মিকুশিয়ো বোনাভিলো। আমার নাম বললেই ওঁরা চিনতে পারবেন। এক গ্রামে আমাদের বাড়ী। আমি এসেছি বিশেষ দরকারে।

জবাব শুনে চাকরের কেমন একটু যেন কৃপা-করুণা হলো। গাঁয়ে থাকে···নিশ্চয় ছোকরা কিছু পয়সার প্রত্যাশায় এসেছে। এমন তো কত লোক আসে। সে বললে—তা এসো এখানে বসো। এলে দেখা হবে।

এ কথা বলে মিকুশিয়োকে এনে সে বসালে···রান্নাঘরের সামনে ছোট একটা অন্ধকার ঘরে। সেখানে একখানা বেঞ্চ পাতা। রান্নাঘর থেকে নাক-ডাকার শব্দ আসছে চাকর বললে—বসো এই বেঞ্চে। আমি আলো নিয়ে আসি!

নাক ডাকার শব্দ শুনে মিকুশিয়ো তাকালো রান্নাঘরের খোলা দরজার দিকে। ঘরের মধ্যে দেখলো, মেঝেয় বাবুর্চি আর একটা বয় পড়ে ঘুমোচ্ছে। খাবারের গন্ধ আসছে। সারাদিন কিছু খায় নি। ও গন্ধে মাথা তার ঝিমঝিম করে উঠলো। খিদের কথা মনে হলো। মনে হলো, তাই তো —কোন্ সকালে সেই খেয়েছে···এখন যদি কিছু খেতে পেতো! ট্রেণে আগের রাত আর আজ সারাদিন কেটেছে। অত্যন্ত ক্লান্তি···এখন আর কিছু। হোক, এক পেয়ালা কফি, কি চা!

চাকরটা আলো নিয়ে এলো···রান্নাঘরে বাবুর্চি নাক ডাকাচ্ছে···পর্দার ফাঁক দিয়ে রান্নাঘরে আলোর রেখা পড়তে তার নাক ডাকা বন্ধ হলো। সে বললে—কে রে ?

চাকর বললে—উঠে পড়ো···বনভিলো মশায় এসেছেন —মাদামের গাঁয়ের লোক।

মিকুশিয়োর রাগ হলো। বেয়াড়া চাকর! মিকুশিয়ো বললে—বনভিসিলো নয়···বোনাভিলো।

—আহা, তাই—তাই! বেনোভিলো। ওঠো···ওঠো··· খালি পড়ে পড়ে ঘুমোনো! যে আসবে, আমাকে গিয়ে দরজা খুলে দেখতে হবে।···কেন? তোমরা পারো না? সব তাতে আমি! একদণ্ড চুপ করে বসবো, সে উপায় নেই! উনি রান্না করবেন, আমাকে দিতে হবে তার জোগান। কেন গো বাপু···আমি মানুষ নই? না, আমার আরাম-বিরাম নেই?

বাবুর্চি একটা বড় হাই তুললে, সঙ্গে সঙ্গে আঙুলে বাজালে তুড়ি। বাবুর্চি বললে—মাদাম তো এখনো আসে নি?

—না।

—ঠিক আছে! বলে সে আবার আড় হয়ে শুলো, শুয়ে চোখ বুজলো!···

মিকুশিয়ো হাসলে। চাকরটা সেখানে আলো রেখে কোথায় গেল। আলো সামনে দেখা যাচ্ছে—খাবার ঘর···আলো-আঁধারির মধ্যে। মস্ত ঘর। ঘরের ওদিকে একটা আলো জ্বলছে—জোরালো বাতি। প্রকাণ্ড একটা টেবিল···টেবিলের দুদিকে কখানা গদি-মোড়া চেয়ার··· ওদিকে রান্নাঘরে উনুনের উপর চাপানো খাবার···গন্ধ যা আসছে, চমৎকার!

চাকরটা—তার হাতে ন্যাপকিন—এধারে-ওধারে আসছে যাচ্ছে। বাবুর্চির উদ্দেশে বক্‌বকানির অন্ত নেই। মিকুশিয়োর মনে হলো, বাবুর্চি নতুন বাহাল হয়েছে। পুরোনো লোক হলে এত কথা সে বরদাস্ত করতো না— জবাবে দুকথা শুনিয়ে দিত—যেমন হয়ে থাকে। মনে হচ্ছিল, চাকরটা তাকে গ্রাহ্য করছে না· ভাবছে, কে এসেছে তুচ্ছ গাঁয়ের মানুষ! জানে না তো—মিকুশিয়োর সঙ্গে তেরেসিনার বিবাহ হবে! আসুক ওরা ফিরে···যখন শুনবে বুঝ্‌বে—কি মজাই না হবে!

চাকর এদিক ওদিক ঘুরছে—যেন কত কাজ তার— সেই সব কাজ করছে। মিকুশিয়োর কি মনে হলো···সে জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা, শোনো তো বাপু···এটা কার বাড়ী?

—আমাদের বাড়ী···আর কার বাড়ী হবে! চাকর দিলে জবাব। মিকুশিয়ো শুনলো—শুনে শুধু মাথা নাড়লে!

মিকুশিয়ো ভাবলে, তেরেসিনা তাহলে বহুৎ পয়সা রোজগার করছে···খুব পশার এখানে। এমন বাড়ী ঘর— এমন আসবাব—ঐ চাকর—চাকরে অমন পোষাক-আশাক —একজন বাবুর্চি

গ্রামের কথা মনে পড়লো। মেশিনা গ্রাম—সেখানে মা মার্থা আর মেয়ে তেরেসিনা···কি কষ্টে দুজনের দিন কাটতো! কোনোদিন অন্ন জুটতো···আবার দু-তিনদিন নিরাহার! সে দুঃখের দিনে এই মিকুশিয়োই ছিল একমাত্র সহায়। তেরেসিনা বেশ গান গাইতো। চমৎকার গলা। সে গলা শুনে মিকুশিয়োর হঠাৎ মনে হলো, গাঁয়ে এ গলার কি দাম! যদি সহরে যেতে পারে তেরেসিনা— সেখানে যদি একটু শিক্ষা পায়···তাহলে ঐ গলার দৌলতে খ্যাতি অর্থ—কোনো অভাব থাকবে না হয়তো! এই মনে করে মিকুশিয়ো কত কথা বলেছে। কিন্তু তেরেসিনার বাপ কিছুতে রাজী নয়। বাপ বললে—ভদ্রঘরের মেয়ে তো বটে! না হয় গরীব! তা বলে মেয়ে গানের পেশা করবে! থিয়েটারে নটীর মতো! না—না—না!

তারপর বাপ মারা গেল। তখন তেরেসিনা আর তেরেসিনার মা ধরলো মিকুশিয়োকে, বললে—তুমি ব্যবস্থা করে দাও···সত্যি, এ দারিদ্র্য আর সহ্য হয় না!···

মিকুশিয়োর বুকে বেশ কাঁপন! তেরেসিনা তাকে কি ভালোই বাসতো···তার ভবিষ্যতের যা কিছু স্বপ্ন-রচনা··· সব মিকুশিয়োরের সঙ্গে মিলে! মিকুশিয়োকে কেন্দ্র করে, গানের খ্যাতি যদি হয় তখন দুজনের বিবাহ—তারপর সুখের সংসার।

মিকুশিয়োর মনে পড়ছে···এপ্রিল মাস···সকালে জানলার ধারে বসে তেরেসিনা চমৎকার একটা সিসিলিয়ান গান গাইছিল। সূর্য্যের আলোয় চারিদিক ঝলমলিয়ে উঠেছে ·জানলার ধারে বসে তেরেসিনা গলা ছেড়ে গান গাইছে···মিকুশিয়ো এসে নিঃশব্দে তার পিছনে দাঁড়ালো। সে গান শুনে বিমুগ্ধ মিকুশিয়ো···চুপি-চুপি গিয়ে তেরেসিনার মা মার্থাকে বললে—এমন গলা! না মাসিমা, ওকে সহরে নিয়ে চলুন। এ গলা—এর খ্যাতি···শুধু খ্যাতি নয়···কত টাকা রোজগার করবে!

মার্থা বললে—কিন্তু বাবা ··থিয়েটারের ষ্টেজ।

—না না—তেরেসিনার জন্য ভাববেন না। ও তেমন মেয়ে নয়, তা ছাড়া আমাদের বিবাহ হবে। দুজনেই যাবো—

সেইদিনই মার্থাকে রাজী করিয়ে মেশিনার বড় কনসার্ট পার্টিতে মিকুশিয়ো নিয়ে গেল তেরেসিনাকে। সে পার্টিতে মিকুশিয়োর প্রতিপত্তি···সেখানে কিছুদিন বাজনা শিখিয়ে মিকুশিয়ো তাকে পাঠালে নেপ্‌ল্‌সে—ভালো ওস্তাদের কাছে গান শিখবে। তার সব খরচ মিকুশিয়ো দেবে খুশী মনে! নিজে নেপ্‌ল্‌সে গিয়ে থেকেছে—তেরেসিনার সহায় হয়ে···এবারের খরচ মিকুশিয়ো জুগিয়েছে—নিজের বাড়ীর সঙ্গে বিবাদ করে··এক খুড়ার কিছু সম্পত্তি পেয়েছিল মিকুশিয়ো, সে সম্পত্তি বেচে! তেরেসিনা তার স্ত্রী হবে—তার এমন গলা—তুচ্ছ ঘর-সংসারের কাজে আটকে রেখে ও গলার ঐশ্বর্য্য নষ্ট করবে স্বামী? না, না। মিকুশিয়োর ভালোবাসা এত ছোট নয়—এমন স্বার্থের বিষে মেশানো হতে পারে না! তার পর নেপ্‌ল্‌সে গানে রীতিমত ওস্তাদ হয়ে তেরেসিনা বললে—সহরের ষ্টেজ···

মিকুশিয়ো বললে—নিশ্চয়।

মার্থা বললে—বিয়েটা, বাবা!

তেরেসিনা বললে—তুমি যা বলবে!

মিকুশিয়ো বললে—এখন না। বিয়ে পালাবে না। আগে কাজ। কে জানে, সংসারের চাপে যদি—

তাই হলো···তেরেসিনা এলো সহরে···তার কণ্ঠে সুরের তূণ নিয়ে দিগ্বিজয়ে। মিকুশিয়ো ভাগ্য-সন্ধানে এখানে-ওখানে—কি না করে বেড়িয়েছে! সেই বিদায়···তারপর দুজনে দেখা হয়নি আর···দু'বছর। চিঠি লেখালেখি···শুধু। প্রথম প্রথম হপ্তায় একখানা—দুখানা—তারপর মাসে দুতিনখানা, তারপর নমাসে ছমাসে চিঠি। মিকুশিয়ো চিঠি লিখেছে বরাবর—কিন্তু জবাব পায় কালে-ভদ্রে···।

তার পর তেরেসিনার কি খ্যাতি! তাকে কে না চায়! সহরের যত বড় বড় ঠিকেদার বহু টাকা সেলামি দেছে পায়ে! মফঃস্বল থেকেও কত ডাক—রাজার ঐশ্বর্য্য দেবে! মন্টি কার্লোয় তেরেসিনার কি জয়জয়কার, মাসিমা চিঠি লিখে খবর দেয় মিকুশিয়োকে! তেরেসিনার আজ বাড়ী গাড়ী···স্বজন-বন্ধু এ যেন এক নতুন দুনিয়া। মার্থা লেখে—তুমি আসবে কবে তোমাকে দেখবো। সুবিধা পেলেই একবার এসো—মার্থা লেখে, তেরেসিনা তোমার কথা কেবলি বলে। এতটুকু সে সময় পায় না—যে বসে তোমাকে চিঠি লিখবে। কখনো বা মাসীর চিঠির এক কোণে তেরেসিনা লেখে। দু'ছত্র—

প্রিয় মিকুশিয়ো—মা যা লিখেছে, তাই। এতটুকু সময় পাইনা যে বসে তোমাকে চিঠি লিখবো! ভালো আছো তো—সাবধানে থেকো? আমাকে ভুলো না। ভালোবাসা নিয়ো।

ছ বছর দুজনে ছাড়াছাড়ি। বিদায় নেবার সময় দুজনে কথা—পাঁচ বছর···ছ বছর দুজনে যুদ্ধ করছে। জীবন-সংগ্রাম। দিন কিনে নিতে হবে—তারপর বিবাহ—তাহলে সংসারে দুঃখ দৈন্য অভাব নয়, অভিযোগ নয়···

পাঁচ বছর ধরে এই সব চিঠি মিকুশিয়ো বুকে করে রয়েছে। একদণ্ড একখানি চিঠি পকেট-ছাড়া করে না। তারপর হলো মিকুশিয়োর অসুখ—বেশ শক্ত অসুখ। প্রাণের আশা ছিল না···রোজগার বন্ধ—অভাবের কি কষ্ট। চিঠিতে অসুখের খবর পেয়ে তেরেসিনা আর মার্থা তার ঠিকানায় অনেকগুলো টাকা পাঠিয়েছিল—এ টাকা মিকুশিয়ো চায়নি।

সে টাকার কতক খরচ হয়ে গেছে—সে অসুখে বাকি টাকা কৃপণের ধনের মতো সে বাঁচিয়ে রেখেছে। সে টাকা মিকুশিয়ো আজ নিয়ে এসেছে তেরেসিনার হাতে ফেরত দিতে! এক পয়সা সে চায়নি তেরেসিনার কাছে। এক পয়সা সে চায় না! দয়ার দান বলে নয়—সে কত টাকা খরচ করেছে তেরেসিনর গান শেখার জন্য—এখানে ওখানে যাওয়ার জন্য···থাকবার জন্য···তেরেসিনা যে-টাকা পাঠিয়েছে—তার চেয়ে অনেক বেশী টাকা মিকুশিয়ো খরচ করেছে তেরেসিনার ভবিষ্যতের জন্য! আজ তেরেসিনার এত বেশী টাকা হয়ে থাকে যদি···তাতে মিকুশিয়োর আনন্দের সীমা নেই! দৈন্য ঘুচিয়ে তেরেসিনা যে আজ এত টাকার মালিক হয়েছে···এ মিকুশিয়ার জন্য। এই আনন্দে মিকুশিয়া নিজের দৈন্য, নিজের অভাব অনায়াসে সহ্য করতে পারবে। এমন প্রতিভা···সে প্রতিভার এ আদর···মিকুশিয়ো সব হারিয়েও এর জন্য মনে কত আনন্দ, কত গর্ব্ব বোধ করে!

ভাবতে ভাবতে মিকুশিয়ো অধীর হয়ে উঠলে। উঠে দাঁড়ালে। তারপর সেই ছোট ঘরে পায়চারি। চাকরটা বললে—শীত করছে?···আর দেরী নেই। এঁরা এখনি আসবেন। রান্নাঘরে এসে বসো। সে ঘর সাফ আছে।

চাকরটার কথাবার্ত্তা আর ব্যবহার…মিকুশিয়ো তাতে রীতিমত বিরক্ত হলো। পয়সাওয়ালা মনিবের চাকর-বাকরগুলো এমনি লক্ষ্মীছাড়াই হয়। দুনিয়ার মানুষকে গ্রাহ্য করে না! এ জ্ঞান মিকুশিয়োরের আছে! এর আর অপরাধ কি। মিকুশিয়ো রান্নাঘরে গেল না—সেইখানে সেই বেঞ্চে বসে রইলো…মনে চিন্তার তরঙ্গ—

বাহিরের দরজায় ঘণ্টা বাজলো। চাকরটা ডাকলো বাবুর্চিকে—ওরে, ওঁরা এসেছেন। ওঠ্—ওঠ্।

চাকর ছুটলো সদরে…মিকুশিয়ো চললো তার পিছনে। চাকরটি দেখলো, বললে—তুমি এখানে বসো। আমার সঙ্গে এসো না। আমি আগে ওঁদের বলি। হ্যাঁ, কি নাম?

—মিকুশিয়ো।

—হুঁ্যা…হ্যাঁ।

মিকুশিয়ো সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলো…সদরের দিকে চেয়ে…

সদর খোলা হলো। ভারী পর্দ্দা টেনে এক স্থুলাঙ্গী বৃদ্ধা ঢুকলো বাড়ীতে। গায়ে দামী শাল…সুখে টলছে যেন! মিকুশিয়ো চিনলে—মার্থা।

মার্থা এলো ভিতরে। মিকুশিয়োর বুকখানা ধ্বক্ করে উঠলো। যেন আঘাত লাগলো! এ মূর্ত্তি দেখবে—মিকুশিয়ো কখনো ভাবেনি…

মার্থা বললে—বাবুর্চ্চিকে বল্, খাবার দেবে…আমি খাবার ঘরে যাচ্ছি।

মার্থা চললো খাবার ঘরে। বাবুর্চ্চি আর চাকর—দুজনে গাড়ী থেকে ফুলের বড় বড় দুটো ঝুঁড়ি নিয়ে মিকুশিয়োকে একরকম ধাক্কা দিয়েই খাবার ঘরে ঢুকলো। মিকুশিয়ো উঁকি মেরে দেখলো, খাবার ঘরে বড় বড় আলো জেলে দেওয়া হয়েছে…ঘর আলোয় আলো—খাবার ঘরে অনেক লোক। মার্থা…এক সুবেশা রূপসী…আর অনেক সৌখীন ভদ্রলোক। ঐ রূপসী…ও তেরেসিনা? চেনা যায় না! যেন রাজরাণী!—ওদিককার বড় দরজা দিয়ে ওরা গেছে খাবার ঘরে।

মিকুশিয়ো কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই ছোট ঘরে। তেরেসিনা হাসছে—কি জোরে হাসছে। তেরেসিনার হাসি এমন কদর্য্য বীভৎস হতে পারে—মিকুশিয়ো আশ্চর্য্য হলো!

মিকুশিয়োর যেন চেতনা নেই। সে কোথায়…কি দেখছে—কিছু মনে নেই! হঠাৎ চেতনা হলো…মার্থার আহ্বানে।

চেয়ে দেখে, মাথায় টুপি, গায়ে দামী ভেলভেটের ক্লোক—স্থুলাঙ্গী মার্থা! বললে—মিকুশিয়ো! তুমি এখানে!

মিকুশিয়ো কেমন কেঁপে উঠলো যেন! সে বললে—মাসি মার্থা!

মার্থা বললে—হঠাৎ!—কোনো খবর না দিয়ে! ব্যাপার কি? কখন এলে? সন্ধ্যার সময়? আহা হা!

মিকুশিয়ো বললে—আমি এসেছিলুম…মানে…

তার কথা শেষ হলো না। মার্থা বুঝলো তার কথা। মার্থা বললে—আচ্ছা। সবুর করো। তাই তো…এখন দেখছো ভিড়টা একবার। একদণ্ড ওকে ছাড়বে না! আজ আবার থিয়েটারে ওর বেনিফিট-নাইট গেল কি না… তাই। তা—আচ্ছা এখানে দাঁড়াও…আমি এখনি আসছি।

মিকুশিয়ো বললে—থাক, মাসি…যদি অসুবিধা হয়! আজ আমি যাই।

—না। না—এত রাত্রে কোথায় যাবে? তুমি দাঁড়াও, মার্থার কেমন অপ্রতিভ ভাব যেন!

মিকুশিয়ো লক্ষ্য করলে। মিকুশিয়ো বললে—মানে, সন্ধ্যার পর এখানে এসে পৌছুলুম কিনা…জানা কোনো জায়গা নেই বলেই এখানে…

এ কথা মার্থার কানে গেল না—সে চলে গেল। গেল খাবার ঘরে…ভিড়ের মধ্যে কোনো মতে ঢুকে তেরেসিনাকে কি বললে মার্থা মিকুশিয়ো শুনলে—সঙ্গে সঙ্গে তেরেসিনা বলে উঠলো—আচ্ছা, আপনারা একটু বসুন—আমি এখনি আসছি।

মিকুশিয়োর চোখের সামনে কেমন কালো ছায়া! তেরেশিনা তাহলে আসছে!

কিন্তু তেরেসিনা এলো না—খাবার ঘরে কথার ধুম চলেছে সমানে। খানিক পরে এলো মার্থা। মাথায় এবার টুপি নেই—গায়ে ভেলভেটের সে ক্লোক নেই, হাতে দামী দস্তানা নেই—কেমন একটু অপ্রতিভ ভাব! মার্থা বললে—দেরী হবে মিকুশিয়ো! ওদের ভোজ আছে, প্রীতি-ভোজ… খাওয়া-দাওয়া চলবে। আমরা এসো—ও-ঘরে গিয়ে খাবো। তোমার কথা শুনবো। কত বছরের কথা জমে আছে

—ও-ঘরে ওরা সব বোনেদী বড় ঘরের লোক—বুঝতেই পারছো তেরেসিনার গান শুনে ওরা একেবারে…নাম হয়েছে—ওদের খাতির অভ্যর্থনা না করে উপায় নেই, কিন্তু তুমি এত কাল পরে—সত্যি, আমার মনে হচ্ছে আমি বাবা! যেন স্বপ্ন দেখছি!

মার্থা অনর্গল বকতে লাগলো—মিকুশিয়ো সে কথার মধ্যে এতটুকু ফাঁক পাচ্ছে না—কিছু ভাববে বা কিছু বলবে। মার্থার কণ্ঠে স্নেহ-মায়া—সেই আগের দিনের মতোই!

ছোট ঘরে চাকর এসে ছোট টেবিল পাতলো। চটপট …তার ফুরসৎ নেই। খাবার ঘরে বিরাট ভোজ—গণ্যমান্য অতিথির দল—

মিকুশিয়ো বললে—আজ দেখা হবে কি? ভাবছি, এমন ব্যাপার। দেখা হবে না হয়তো!

মার্থা বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসবে না কি? নিশ্চয় আসবে। আমাকে বললে—দেখছো তো এত ভদ্রলোক—নিমন্ত্রিত অতিথি! মানে, একটু ফাঁক পেলেই সে আসবে।

মার্থা হাসলো। মিকুশিয়ো তার পানে চেয়ে আছে… দুজনে দুজনকে বুঝলো।

মিকুশিয়ো বুঝলে—মার্থার ও হাসিতে কতখানি অসহায়তা! মার্থা বললে—তুমি ভারী ভালো ছেলে মিকুশিয়ো—আমাদের উপর তোমার ভালোবাসা এখনো তেমনি। হ্যাঁ, খাবার দিতে বলি।

মিকুশিয়ো বললে—হ্যাঁ, আমার ভয়ানক খিদে পেয়েছে।

মার্থা হাঁকলো—আমাদের খাবার। চাকরটা এলো প্লেট নিয়ে খাবার নিয়ে। তারপর খাওয়া।

খিদে যা পেয়েছিল…মিকুশিয়ো আশ্চর্য্য হলো। চাকরটা করছে পরিবেশন—ও-ঘরে আগে দিয়ে পাত্র নিয়ে এ-ঘরে আসছে। আসতে যেতে দরজা খুলছে—দু-ঘরের মাঝখানে কাঁচের দরজা—দরজা খুলতেই ও-ঘরের হাসি গল্পের ঝাপটা আসছে…কি হাসি…কি গল্প! ওরা যেন পাগল হয়ে উঠেছে।

খাওয়ার পর মার্থা বললে—কোনো ড্রিঙ্ক?

—হ্যাঁ।

মার্থা একটা বোতল দিলে এগিয়ে। মিকুশিয়ো বোতল নিয়ে পাত্রে ঢালবে তরল পানীয়—ঢালা হলো না—হঠাৎ মাঝখানের সেই কাঁচের দরজা খুলে এ-ঘরে ঢুকলো তেরেসিনা।

—তেরেসিনা!

মিকুশিয়ো তাকালো তেরেসিনার পানে। এ সেই তেরেশিনা? অসহায়—দু-চোখে মিনতি ভরে সাহায্য চাইতো যে তেরেসিনা…সেই নিরুপায় দুঃখে-জর্জ্জর তেরেসিনা…

তেরেসিনা বললে—তার পর…মিকুশিয়ো। হঠাৎ কি মনে করে? তোমার খুব অসুখ করেছিল খবর পেয়েছিলুম, এখন ভালো আছো তো? আচ্ছা…পরে দেখা হবে! মার সঙ্গে কথা কও…

এইটুকু বলে ঝড়ের মতো মার্থা এসেছিল, তেমনি করেই ঝড়ের মতো তেরেসিনা এ-ঘর থেকে চলে গেল। গেল পাশের খাবার-ঘরে—হাসি-গল্পের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে!

মার্থা বললে—আর কিছু খাবে না?

মিকুশিয়ো তাকালে মার্থার দিকে—কোনো কথা বললে না।

মার্থা বললে—খাও।

—ও! মিকুশিয়োর যেন চমক ভাঙ্গলো। সে বললে—না, আর খাবো না। পেট ভয়ানক ভরে গেছে।

বলে সে চুপ করে বসলো। মনে শুধু একটি প্রশ্ন… তেরেসিনা এ কি হয়েছে আজ! এ সেই তেরেসিনা? আমার কামনার ধন…আমার…আমার…

মার্থা চুপ করে বসে আছে। তার মুখে কোনো কথা নেই।

মিকুশিয়োর মন বলে উঠলো—না, না, না! আমার যে স্বপ্ন…স্বপ্নই রয়ে গেল! অসম্ভব অসম্ভব! দুজনের মধ্যে আজ যেন সাগরের ব্যবধান। না, এ তার সে তেরেসিনা নয়! তার সে তেরেসিনার বিসর্জ্জন হয়ে গেছে!…মনে হলো, নির্বোধের মতো সে কি করেছে! বাড়ীতে মা-বাপ এই কথাই বলেছিলেন—যখন সে দুহাতে টাকা খরচ করেছিল তেরেশিনার ভবিষ্যতের জন্য আকাশে ইমারত রচনা করতে! আর আজ! কি নির্বোধের মতো কি দুরাশা বুকে নিয়ে এখানে এসেছে! ও ঘরের ঐ সব

সৌখীন ভদ্রলোক—আর এই চাকরটা! মিকুশিয়ো বোনভিনো এতদূর এসেছে···ট্রেণের কামরায় বসে··· তার কামনার ধনকে পাবার আশায় তার চিরদিনের প্রিয়া তেরেসিনা···অট্টহাস্যে এরা ফেটে পড়বে! বলবে··· এ পাগল! পাগল! পাগল! অথচ একদিন···

সেই মেশিনা গ্রামে তেরেসিনার কণ্ঠ শুনে মিকুশিয়োই তার গান শেখাবার ব্যবস্থা করে দেছে। তাকে বাঁশী কিনে দেছে, বেহালা কিনে দেছে—নেপল্‌সে পাঠিয়ে ওস্তাদদের কাছে তেরেসিনার শেখার আয়োজন, নিজের সর্ব্বস্ব খুইয়েছে এই তেরেশিনার ভবিষ্যৎ গড়ে তোলবার জন্য। তেরেসিনা তাকে কি ভালোবাসতো! দুজনে বসে প্রেমের কি কল্পকুঞ্জ না রচনা করতো। এ সেই তেরেসিনা! তার দৌলতে দিন কিনে আজ···

কিন্তু এ-সব ভেবে লাভ?···মনে হলো, অন্ধকূপ যেন—যত শীঘ্র এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায়।

মিকুশিয়া বললে মার্থাকে—আমি এসেছিলুম মাসি—আমার অসুখের সময় তোমরা কতকগুলো টাকা পাঠিয়েছিলে! কেন পাঠিয়েছিলে, জানি না—আমি তো চাই নি। সেই টাকাগুলো দিতে এসেছিলুম···ঋণ শোধ! তেরোসিনাকে যা দেখছি···মানে, ও এখন···যাক—যে-কথা ছিল, তা আজ হয় না আর! আচ্ছা···টাকাটা তুমি রাখো। তেরেসিনার সময় হবে না। ওখানে বড় বড় ধনীরা·· তুমি রাখো, ওকে দিয়ো। বলো, আমার অসুখের সময় পাঠিয়েছিল—অসীম অনুগ্রহ তার! কিন্তু এ টাকার দরকার হয় নি আমার। টাকাটা পুরোপুরি নেই—কিছু কম আছে। বাকি টাকা মাসখানেকেরমধ্যে আমি পাঠিয়ে দেবো।

মার্থা বললে—কেন বাবা, এ কথা বলছো?

মিকুশিয়ো বললে—আমার অসুখ তখন, আমার আত্মীয়-স্বজন আমাকে না বলে টাকাটা নিয়েছিল—কিন্তু খরচ হয়ে গেছে···সামান্যই। সেটা পাঠিয়ে দেবো। এগুলো রাখো। আমি উঠি।

মার্থা বললে—সে কি···এত রাত্রে! আজ রাতটা এখানে থাকো। ওরা চলে গেলেই তেরেসিনার সঙ্গে কথা হবে···শুনলে তো তেরেসিনা এসে বলে গেল—ওরা চলে গেলেই ও আসবে···তোমাকে থাকতে বললে।

—না, মাসি।

—একটু বসো। আমি ওকে বলি গিয়ে···

—বলে লাভ! মিকুশিয়ো বললে—আমোদ আহ্লাদ করছে তেরেসিনা···কেন ব্যাঘাত করবে!···আমি···মানে···কোথাকার কে—হতভাগা বৈ না···আমার জন্য ওর আমোদে ব্যাঘাত হয় কেন? না, না, মাসি, তোমাকে কিছু বলতে হবে না। ও লোকগুলো তাতে হাসবে—ওদের মাসি আমার সহ্য হবে না! আমি যাই···

মার্থা ধরলো মিকুশিয়োর হাত—তার দুচোখ জলে সজল—স্খলিত কণ্ঠে মার্থা বললে—মেয়েকে আমি বুঝোবো ও বুঝবে···ওকে আমি রক্ষা করবো, আমার সে সাধ্য আজ নেই বাবা। কি এ নেশা···

মিকুশিয়ো কোনো জবাব দিলে না—শুধু মার্থার পানে তাকিয়ে রইলো।

চোখের জল মুছে মার্থা বললে—তুমি এসো বাবা—সত্যি···তোমার পাশে দাঁড়াবে, ওর সে যোগ্যতা আজ নেই! আমি তখনি তোমাকে বলেছিলুম বাবা—আমার সে কথা যদি শুনতে!

মিকুশিয়ো বললে—আমি বুঝিনি মাসি, তুমি কেঁদো না। কেঁদে কি হবে? কিছু করতে পারবে না। যা বললে, নেশা, খ্যাতি, টাকা। দুনিয়ায় ঐ হলেই যদি সবচেয়ে বড় বলে ভেবে থাকে! আমি আসি।

মিকুশিয়ো উঠে দাঁড়ালো···যাবে—হঠাৎ ব্যাগ খুললো—খুলে ব্যাগ থেকে বার করলো টাটকা তাজা কমলালেবু···সিসিলের বিখ্যাত লেবু···যেমন রসালো তেমনি মিষ্ট গন্ধ! লেবুগুলো বার করে টেবিলে রাখলো মিকুশিয়ো···বললে—তেরেসিনার জন্য এনেছিলুম। ও ভয়ানক ভালোবাসতো এই কমলালেবু। তেরেসিনাকে দিয়ো···যদি খায়···মানে···এখন যদি এ লেবুতে রুচি থাকে···

লেবুগুলো টেবিলে রেখে ব্যাগটা নিয়ে মিকুশিয়ো বেরুলো সে ঘর থেকে। সদর দরজা খোলা—বাহিরে এলো।

নিঝুম নিস্তব্ধ রাত্রি···পথে লোক নেই···মনে হলো, এত রাত্রে পথে পথে কোথায় ঘুরবে? তার চেয়ে রাতটুকু এই বাহিরের সিঁড়িতে বসে···

সদর দরজা ভেজানো, মিকুশিয়ো বসলো সদরের বাহিরে সিঁড়িতে···মাথা ঝিমঝিম করছে···হাতে মাথা গুঁজে বসলে—দুচোখে যেন বন্যা নামলো!

ভিতরে খাবার ঘরে খাওয়ার পালা শেষ হয়েছে··· তেরেসিনা এলো সেই ছোট ঘরে···এসে দেখে, মা বসে আছে চেয়ারে নিথর-নিস্পন্দ···দুচোখে জল—সামনে টেবিলের উপর উচ্ছিষ্টের পাত্র···একদিকে কতকগুলো টাটকা তাজা কমলালেবু! কি খোশবু লেবুগুলোয়!

তেরেসিনা বললে—মিকুশিয়ো ?

মা কোনো জবাব দিলে না। মেয়ে বললে—চলে গেছে! ও! এ লেবু···

মা বললে সচকিত কণ্ঠে—মিকুশিয়ো এনেছিল তোমার জন্য।

—বটে। ও, বাঃ! বলেই দু-হাত ভরে কটা লেবু নিয়ে তেরেসিনা গিয়ে ঢুকলো খাবার ঘরে···লেবুগুলো শুঁকে অতিথিদের দিতে দিতে বললে—দেখছো···সিসিলির কমলালেবু···ট্যাঞ্জেরিন লেবু···চমৎকার লেবু! খেলে ভুলতে পারবে না!

শেষ

ভারতে খাদ্য পরিস্থিতির উন্নতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাধীনতালাভের পরবর্ত্তীকালে খাদ্য-সমস্যা ভারতের স্বাধীনতালাভের গৌরবকেও যেন ম্লান করিয়া দিয়াছিল। জাতীয় সরকার প্রচণ্ড খাদ্যাভাব ও খাদ্যমূল্যবৃদ্ধির চাপে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। মানুষের প্রয়োজনের হিসাবে অন্নের অগ্রাধিকার সন্দেহাতীত, অসংখ্য দেশবাসী অনশনে অর্দ্ধাশনে দিনযাপনে বাধ্য হওয়ায় সরকারকে খাদ্য-সমস্যা সমাধানে সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে হইল। অখণ্ড ভারতবর্ষও খাদ্যের হিসাবে পূর্ণ স্বাবলম্বী ছিল না, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ (কিছুটা উদ্বৃত্ত) পাকিস্তান পৃথক হইয়া যাওয়ায় ভারতে খাদ্যাভাব তীব্রতর হয়। ভারতের জাতীয় সরকার সাধ্যমত বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিতে থাকেন এবং "অধিকতর খাদ্য ফলাও" আন্দোলন (Grow more food campaign) প্রবর্ত্তিত করিয়া অন্তর্দ্দেশীয় খাদ্য উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা চালান। * ভারতের বিদেশী মুদ্রাভাণ্ডার শূন্যপ্রায়, বিদেশ হইতে প্রভূত পরিমাণ খাদ্য আমদানী হইতে থাকায় রপ্তানী বাণিজ্যে বা অন্যভাবে সংগৃহীত বিদেশী মুদ্রা তহবিলের অধিকাংশ ব্যয়িত হইয়া যাইতে থাকে। ইহার ফলে স্বভাবতঃই ভারতসরকারের পক্ষে প্রয়োজনীয় সর্ব্ববিধ পণ্য বিদেশ হইতে আমদানী করা অসম্ভব হইয়া উঠে এবং তাঁহারা আমদানী নিয়ন্ত্রণে বাধ্য হন। এই কারণে স্বাধীন ভারতে আর্থিক পুনর্গঠনের জন্য যন্ত্রপাতি আমদানীর প্রয়োজন অত্যধিক হইলেও যুদ্ধোত্তর চড়াবাজারে বিদেশী যন্ত্রপাতি তাঁহারা দরকার বা ইচ্ছামত আমদানী করিতে পারিলেন না। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মাত্র এই চার বৎসরে ভারতে বিদেশী খাদ্যশস্য আমদানী হইয়াছে ৭৫০ কোটি টাকার এবং এই খাদ্যশস্য দেশবাসীকে বিক্রয় করিয়াও সরকারকে লোকসান দিতে হইয়াছে বৎসরে ২০ কোটি টাকার বেশি।

যাহা হউক, প্রথম হইতেই জাতীয় সরকার ভারতের খাদ্য-পরিস্থিতির উন্নতির জন্য সচেষ্ট হন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহারা খাদ্যশস্য সম্পর্কে পরামর্শ দানের জন্য স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাসকে সভাপতি করিয়া একটি খাদ্যশস্য নীতি-নির্দ্ধারণ কমিটি (Food-grains Policy Committee) গঠন করেন। তৎপূর্ব্বে অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের আমলেই বর্ত্তমান রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ খাদ্যসচিব হিসাবে বিশেষ সচেতনতা ও তৎপরতার পরিচয় দেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী দিল্লীতে তিনি বিভিন্ন প্রদেশের খাদ্য-প্রতিনিধিবর্গের যে সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন, তাহাতে তিনি ভারতের খাদ্য-ঘাটতি পূরণের এক পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। এই পরিকল্পনার মোট খরচের শতকরা ৫০ ভাগ সরকারের এবং ৫০ ভাগ দেশবাসীর বহন করিবার কথা বলা হইয়াছিল। সরকার এইভাবে ব্যয়বহুল খাদ্যবৃদ্ধি ব্যবস্থায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ সুরু করেন। এ ছাড়াও এই সময় জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির (National Planning Committee) খাদ্য শাখা বিশেষ গবেষণাদি চালান এবং তাঁহারা পাঁচ বৎসরে এদেশে তিন কোটি টন খাদ্যশস্য বাড়াইবার একটি পরিকল্পনা রচনা করেন। এদেশে খাদ্য-পরিস্থিতির উন্নতিতে ভারতসরকার এই পরিকল্পনা হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছেন। আগেই বলা হইয়াছে, ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এদেশে অধিকতর খাদ্য ফলাইবার আন্দোলন সুরু হওয়ায় ভারতের খাদ্যশস্যের জগতে নবযুগের সূচনা হইয়াছে। জাপানী প্রথায় চাষ করিয়া ফলনবৃদ্ধিতে বিস্ময়কর সাফল্যও এই আন্দোলনের ফল বলা চলে।

দেশ বিভাগের বিপর্য্যয় কিছুটা সামলাইয়াই ভারতসরকার ১৯৫০

* স্বাধীনতা প্রাপ্তি হইতে ১৯৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতসরকার এদেশে "অধিকতর খাদ্যশস্য ফলাও" আন্দোলনের জন্য প্রায় ৬০ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ আর্থিক পুনর্গঠনের জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা করেন। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে ভারতের কৃষি, শিল্প ও নানাবিধ সমাজ কল্যাণের খাতে উল্লেখযোগ্য উন্নতির হিসাবে এই পরিকল্পনা রচিত হয়। পরিকল্পনায় প্রধানতঃ খাদ্যসমস্যা সমাধানের ভিত্তিতে কৃষির অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, শিল্পকে বহুলাংশে বেসরকারী প্রয়াসের (Private Sector) উপর নির্ভরশীল রাখা হয়। ২০৬৮ কোটি টাকার এই পরিকল্পনায় কৃষি ও সমাজ-উন্নয়ন খাতে ধরা হয় ৩৬০ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা এবং প্রধানতঃ কৃষি-উন্নয়নে সাহায্যকারী সেচ পরিকল্পনায় ধরা হয় ৫৬১ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা। পক্ষান্তরে শিল্পখাতে সরকারী হিসাবে ব্যয়বরাদ্দ হয় মাত্র ১৭৩ কোটি ৪ লক্ষ টাকা। পরিকল্পনায় আশা করা হয় যে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে, অর্থাৎ পরিকল্পনার মেয়াদ অন্তে ভারতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন পরিকল্পনার সূচনা-কালের তুলনায় ৭৬ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইয়া ৬ কোটি ১৬ লক্ষ টনে পৌঁছিবে। *

নানা বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ চলিলেও এই পরিকল্পনা ক্রমেই লক্ষণীয় সফলতা লাভ করিতে থাকে। শুধু সরকারী ক্ষেত্রে নয়, বেসরকারী ক্ষেত্রেও পরিকল্পনা প্রভূত উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করে এবং আর্থিক সংস্কারের উপযোগী আশাপ্রদ একটা আবহাওয়া সারা দেশে সঞ্চারিত হয়। পাকিস্তান হইতে আগত শরণার্থীরা দৈন্য-প্রপীড়িত হইলেও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য কর্ম্মোৎসাহী হওয়ায় এই আস্থাভাব অধিকতর পরিদৃশ্যমান হইল। ফলে পরিকল্পনার তিন বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের মধ্যেই ভারতে পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। উন্নতির পরিমাণ সম্প্রতি প্রকাশিত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার তৃতীয় বার্ষিক বিবরণী লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে। গত ২৯শে সেপ্টেম্বর পার্লামেণ্ট এই বিবরণী বা রিপোর্ট পেশ করিবার সময় কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা-সচিব শ্রীগুলজারীলাল নন্দ এই উন্নতিতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন :—"At the end of the first three years of the plan, the Indian economy presents a picture of added strength and stability which is satisfactory in itself and augers well for the future." পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ১৯৫৩-৫৪ খ্রীষ্টাব্দের রিপোর্টানুযায়ী নিম্নলিখিত হিসাব হইতে উন্নতির মাত্রা বুঝা যাইবে :—

কৃষি—১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় ১৯৫৩-৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে মোট ১ কোটি ১৪ লক্ষ ৪০ হাজার টন অধিক খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইয়াছে। এই সময় ভারতে তুলা বাড়িয়াছে ৯ লক্ষ ৬০ হাজার গাঁইট।

ক্ষুদ্রাকার সেচ ব্যবস্থা—বিগত তিন বৎসরে ছোটখাট যে সকল সেচ পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইয়াছে, তদ্দ্বারা ৫৩ লক্ষ একর জমি নূতন করিয়া জলসেচের সুবিধা পাইবে।

পতিত জমি উদ্ধার—পতিত বা অনাবাদী জমিতে চাষের এক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে এই শ্রেণীর মোট ১৪ লক্ষ একর জমি পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১৯৫১-৫৪ খ্রীষ্টাব্দে উদ্ধার করা হইয়াছে ৮ লক্ষ ১৬ হাজার একর জমি।

সেচ ও শক্তিসম্পদ—১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ৩ বৎসরে ২৮ লক্ষ একরের বেশি নূতন জমি সেচ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার কিলোওয়াট অতিরিক্ত বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইয়াছে।*

যাহা হউক, বিভিন্ন খাতে সাম্প্রতিক উন্নতির হিসাব এখানে আলোচনা করিবনা, খাদ্যশস্যের উন্নতিই আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের মূল বিষয়। পরিকল্পনার তৃতীয় বার্ষিক রিপোর্ট অনুযায়ী খাদ্যশস্যের হিসাবে ভারত যে দ্রুত স্বয়ং সম্পূর্ণতার দিকে চলিয়াছে, ইহা সবিশেষ আশার কথা। খাদ্য মানুষের সর্ব্বাধিক প্রয়োজনীয় পণ্য, খাদ্যপরিস্থিতির শোচনীয়তা ভারতকে দীর্ঘকাল বাহিরের মুখাপেক্ষী রাখিয়াছিল। এছাড়া অন্নসমস্যার তীব্রতার

---

* খাদ্যশস্য ব্যতীত এই সময় ভারতে অতিরিক্ত ১২ লক্ষ ৫০ হাজার গাঁইট তুলা, ২০ লক্ষ ৯০ হাজার গাঁইট পাট, ৭ লক্ষ টন ইক্ষু ও ৪ লক্ষ টন তৈলবীজ উৎপন্ন হইবে বলিয়া পরিকল্পনায় আশা করা হইয়াছিল।

* কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পখাতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনানুযায়ী উৎপাদন বৃদ্ধি হইয়াছে নিম্নরূপ :—

মিলজাত বস্ত্র ও সুতা—পরিকল্পনার মেয়াদ অন্তে ৪৭০ কোটি গজ উৎপাদন অনুমিত হইয়াছিল, ১৯৫৩-৫৪ খ্রীষ্টাব্দেই এই উৎপাদন ৪৯০ কোটি ৬০ লক্ষ গজে পৌঁছাইয়াছে। ১৯৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ১৪৭ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ডের স্থলে ১৯৫৩-৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৫২ কোটি পাউণ্ড সুতা উৎপন্ন হইয়াছে।

তাঁতের কাপড়—পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ১০০ কোটি গজের তুলনায় ১৯৫৩-৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ১২০ কোটি গজ তাঁতের কাপড় ভারতে উৎপন্ন হইয়াছে?

লৌহ ও ইস্পাত—১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ৯ লক্ষ ৭৬ হাজার টন ইস্পাত উৎপন্ন হয়, ১৯৫৩-৫৪ খ্রীষ্টাব্দে এই উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১০ লক্ষ ৮১ হাজার টন।

সিমেণ্ট—১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ লক্ষ ৯০ হাজার টন সিমেণ্টের স্থলে ১৯৫৩-৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ৪০ লক্ষ ৩০ টন সিমেণ্ট উৎপন্ন হইয়াছে।

রাসায়নিক সার—১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৪৬ হাজার টনের তুলনায় ১৯৫৩-৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ৩ লক্ষ ৭ হাজার টন এ্যামোনিয়াম সালফেট উৎপন্ন হইয়াছে।

রেলইঞ্জিন—১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ পর্য্যন্ত তিন বৎসরে ভারতে মোট ১৭৬ খানি রেলইঞ্জিন নির্ম্মিত হয়, ইহার মধ্যে চিত্তরঞ্জন কারখানায় হইয়াছে ১১৪ খানি। শুধুমাত্র ১৯৫৩-৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে নির্ম্মিত রেলইঞ্জিনের সংখ্যা ৮৬।

জন্য ভারতের আভ্যন্তরীণ গোলযোগও কম হয় নাই। ভারতে ১৯৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় ১৯৫৩-৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ৪৩ লক্ষ টন চাউল বেশি জন্মিয়াছে। ১৯৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বৎসরে ভারতে ২ কোটি ৭২ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হইবার আশা করা হইয়াছিল, ১৯৫৩-৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বা পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসরেই চাউলের উৎপাদন দাঁড়াইয়াছে ২ কোটি ৭১ লক্ষ টন। এইভাবে দু বৎসর হাতে থাকিতেই পরিকল্পনার লক্ষ্যে পৌঁছানো কর্তৃপক্ষের কৃতিত্বের কথাতো বটেই, অর্দ্ধভুক্ত ভারতের লক্ষ লক্ষ সাধারণ নরনারীর পক্ষে ইহা অতি ভরসার সংবাদ। পণ্যমূল্য হায় যোগান ও চাহিদার উপর নির্ভরশীল, কাজেই খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়িলে মূল্যাবনতিও আশা করা যায় এবং সে হিসাবে দরিদ্র দেশবাসীর আশ্বস্ত হইবার কথা। ভারতে জীবনযাত্রার মান অনুন্নত বলিয়া খাদ্যমূল্যের উপর এদেশের অধিকাংশ ভোগ্যপণ্যের মূল্য বা সাধারণ বাজারদর নির্ভর করে, কাজেই মনে হয় খাদ্যের দাম কমিবার সঙ্গে সমস্ত বাজারের বর্ত্তমান চড়াভাব বিদূরিত হইয়া মূল্যমান অতঃপর ক্রমেই দেশবাসীর আয়ত্তের মধ্যে নামিয়া আসিবে। এই নিম্নমুখিতা ধীরে ধীরে হইতে থাকিলে বাজার-মন্দাও কর্তৃপক্ষ প্রতিরোধ করিতে পারিবেন। গত বৎসর ভারতের উত্তর ও পূর্ব্বাঞ্চলে বন্যা এবং দক্ষিণাঞ্চলে অনাবৃষ্টির জন্য কিছু শস্যহানি হইয়াছিল, তাহা সত্বেও ১৯৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় ১৯৫৩-৫৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন মোট ৮০ লক্ষ টনের মত অতিরিক্ত ফসল পাওয়া গিয়াছে, খাদ্য শস্যের দিক হইতে ভারতের সুদিনই এখন আশা করা যায়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার এখনও দুই বৎসর বাকী, ইহার পর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইবে। সমাগত শরণার্থীদের এবং স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত লোকসংখ্যার কথা স্মরণ রাখিয়াও এহিসাবে সন্তোষ প্রকাশ করা যায়। খাদ্যশস্যের দিক হইতে ভারতের সম্ভাবনার কথা ইতিপূর্ব্বে বহু মনীষীই বলিয়াছেন, * নীরন্ধ্র হতাশার মধ্যে তাঁহাদের আশ্বাসে আস্থা স্থাপন কঠিন ছিল। বলিষ্ঠ পরিকল্পনার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সে আশ্বাস এখন ফলপ্রসূ হইতে চলিয়াছে, ইহা সত্যই আনন্দের কথা।

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত খাদ্যশস্যের পরিমাণ এত বেশি যে, কেহ কেহ সরকারের বিঘোষিত হিসাবের যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। জাপানী প্রথায় ৪ লক্ষ একর জমি চাষ করিয়া কারখানার রাসায়নিক সার জমিতে ব্যবহার করিয়া, ৮ লক্ষ একর পতিত জমি উদ্ধার করিয়া অথবা সমাজ উন্নয়ন (Community Projects) চালু করিয়া এত উন্নতি অসম্ভব বলিয়া তাহাদের ধারণা। কেহ কেহ এমনও মনে করেন যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মুখে দেশে আশ্বস্ততা রক্ষা করিবার জন্য এবং রেশন উঠিয়া যাইবার পর বাজারে খাদ্যশস্যের যোগান নিয়মিত রাখিতে সরকার হিসাব ফাঁপাইয়া একটা আস্থার ভাব সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন। যাহা হউক, রেশন তুলিয়া দিবার সিদ্ধান্তের সহিত দেশে খাদ্যসচ্ছলতার এক অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বর্ত্তমান বলিয়া সরকারী হিসাবের ভুল অনুমান করিয়া কোন লাভ নাই। দেশে অন্নযোগান ব্যবস্থা সুশৃঙ্খল রাখিবার দায়িত্ব সরকারী কর্তৃপক্ষের, কাজেই এসব হিসাবের যথার্থতা কালই বিচার করিবে। বলাবাহুল্য, হিসাবে ভুল থাকিলে তাহা অবিলম্বেই ধরা পড়িবে এবং সেজন্য বিশৃঙ্খলার দায়িত্ব সরকারী কর্তৃপক্ষকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

খাদ্যশস্যের উৎপাদন যদি বৃদ্ধি পাইয়াই থাকে, শস্য উৎপাদনকারী কৃষক কুল এই সুবিধা যাহাতে পায়, কর্তৃপক্ষের তাহাই এখন বিশেষভাবে দেখা দরকার। অসাধু ব্যবসায়ীরা বাজারে কৃত্রিম যোগান ও চাহিদার সৃষ্টি করিয়া পণ্যজগতে বিশৃঙ্খলা আনে। ইহাদের উৎপাতই পঞ্চাশী মন্বন্তরের জন্য অধিক দায়ী। এবারও যদি সরকার অবহিত এবং কঠোর না হন, উৎপন্ন বাড়তি খাদ্যশস্যের সুবিধা উৎপাদনকারী চাষী ও সাধারণ দেশবাসী না পাইয়া এই সব ব্যবসায়ীর তহবিল পুনরায় স্ফীত করিবে। খাদ্য বিনিয়ন্ত্রিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু খাদ্যশস্যের যোগানের ব্যাপারে সরকারের এখনও কিছু কিছু হাত আছে। ন্যায্য মূল্যের সরকারী বিক্রয়প্রথা চালু রাখিয়া এবং ব্যবসায়ীদের অবাঞ্ছিত মুনাফাবাজী ও পণ্য নিয়ন্ত্রণ সংযত করিয়া কর্তৃপক্ষ দেশে খাদ্যের চাহিদা ও যোগানে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করিলে খাদ্যমূল্য তথা জীবনযাত্রার সাধারণ ব্যয়হার নিম্নাভিমুখী হইবে এবং তাহাতে জনসাধারণ উপকৃত হইলে দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত হইবে।

* ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে প্রাদেশিক খাদ্যমন্ত্রীদের এক সম্মেলনে ভারত সরকারের তৎকালীন খাদ্যসদস্য শ্রীজয়রামদাস দৌলতরাম নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছিলেন :—"I have no doubt that, with determined effort backed by adequate financial support and organisational efficiency, India can before long free itself from anxeity with regard to food."





হয়ত’!

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

দুটো লোহার কড়াওয়ালা দরজা কাঠের প্লাটফর্ম থেকে দুটো সিপাহী টেনে তুল্‌লো। কাঠের সিঁড়ি ব’য়ে ওপরে উঠে এলো বাইশ বছরের একটি ছোকরা। সেসনস্‌কোর্ট তখন জনতায় ও কৌন্সিলে ভর্ত্তি হ’য়ে গেছে।

ছেলেটি চেয়ে দেখ্‌লে সাধারণ বাড়ীর আড়াইতলার সমান উঁচু হল্‌ঘর। জজসাহেব এলেন লাল গাউনে কালো বর্ডার লাগিয়ে। অশোক স্তম্ভ দেওয়ালে ঝক্‌মক্‌ করছে।

জুরীদের মধ্যে পাঞ্জাবিগায়ে জামাইবাবু মার্কা, হেডমাষ্টার-জাতীয় গলাবন্ধ কোট, টাই-লাগানো বাঙালী সাহেব।

আজ প্রথম দিন নয়, দ্বিতীয় দিন। চারিধারের আবহাওয়া তাই খানিকটা অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

তবু কান্না পায়, ডাক্‌তে ইচ্ছে করে ‘মাগো’ ব’লে।

চোখের সাম্‌নে জাগ্‌ছে শহরতলীর শান-বাঁধানো উঠন। রোদ্দুরে ভিজে চুল পিঠে ছড়িয়ে দিয়ে মা ডাল বাচ্‌ছে, ছেলে একটা বল নিয়ে ছুটোছুটি করছে।

মা ওদিকে মুখ রেখেই বল্‌লে, বল নিয়ে এখানে হুটোপাটি করিস্‌নি খোকন, মাঠে যা। আমার কাপড় ছোঁয়া গেলে তোমাকে রক্ষে রাখ্‌ব না ব’লে রাখ্‌ছি।

কাপড় ছোঁয়া গেল, মায়ের চোখে পড়লো, তখনি উঠে—দাঁড়াত’ আজ তোরই একদিন কি আমারি একদিন!

ছেলে খিড়কি দিয়ে ছুটে পালালো।

মা কাপড় তুল্‌তে তুল্‌তে চেঁচাতে লাগ্‌লো—এতবার বল্‌ছি—খেলিস্‌নি এখানে খেলিস্‌নি। কিছুতে শুন্‌লি না। আয় তুই বাড়ীতে। দেখ্‌ছি তোকে।

নাইতে খেতে পড়তে ছেলের সীমাহীন দুরন্তপনা।

জিনিষ ভাঙ্‌তে চুরতে হারাতে অদ্বিতীয়।

কত সাধের ফুলদানীটা ছেলে ইঁট মেরে ফেলে দিলে। মা ছুট্‌লো—খুন করব তোকে রাক্ষস। কত দিনের ফুলদানী আমার, এক্‌জিবিশন থেকে কেনা, তুই ভেঙে দিলি। দুনিয়ার জিনিস তুই ভাঙবি? তোকে মেরে আজ শেষ করব।

প্রায়ই তাকে ধরা যায় না, যদি বা কখনো যায়, মা নড়াটা ধ’রে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, বল্‌ পাজী কেন এ কাজ করলি? কেন করলি বল্‌ শিগ্‌গির! খালি অপাট্‌, খালি অপাট্‌!

জিনিসটার শোকে মায়ের চোখে জল আসে, ছেলের পিঠে যে চড়টা পড়ে তাতে জোর থাকে না। ছেলে ছুটে চ’লে যায়, বলে, লাগেনি।

ঝি চাকর অভিযোগ করতে আসে, মা, খোকন আমাদের গায়ে থুতু দিয়ে গেল, লাথি মেরে গেল!—মা ছোটে ‘দাঁড়াতো’ ব’লে। লোকজনকে বলে, কি করব বলো, দেখ্‌ছ ত রাতদিন শাসন করছি! বাছা একটা ভালো কথা আমার মুখ থেকে পায় না। অবোধ বালক, ওর কথা তোমরা ধোরো না। অত বড় অসুখ থেকে উঠে ওর মাথাটা এখনো দুর্ব্বল আছে।

বাপ বলে, কিছু দুর্ব্বল নয়, সব বদ্‌মায়েসি। একদিনে সায়েস্তা করা যায়।

মা ঝাঁজিয়ে ওঠে, তোমরা পুরুষমানুষ, শিশু মনস্তত্ত্ব বুঝ্‌বে কি! শোনো না ত রেডিয়োয় দুপুরবেলায় বলে, এক একটি ছেলে কেন এ রকম হয়? যাক্‌, তোমায় শাসন করতে হবে না। সেদিন এমন কান মুলে দিয়েছিলে জোরে, যে ছেলে কান কট্‌ কট্‌ ক’রে যায়। তোমায় কি দয়ামায়া আছে?

দয়ামায়া থাক্‌লে ছেলেমানুষ হয় না।

তোমরা মানুষ হ’লে কি ক’রে?

আমরা অমন বেয়াড়া ছিলুম না। তা ছাড়া আমার মা পিঠে চাবির গোছা, পাখার বাঁট ভেঙেছে, তাই আজ কোনো রকমে ক’রে যাচ্ছি।

ফলে যা হয়, ছেলে দুর্দ্দান্ত থেকে দুর্দ্দান্ততর হ'য়ে ওঠে।

একদিন এসে বলে, মা ক্লাসে একটি ছেলের ফাউণ্টেনপেন চুরি গেছ্‌লো কাল, আজ তার বাবা এসে সকলকার ব্যাগ সার্চ ক'রে গেল।

তোর ব্যাগে হাত দিয়েছিলো ?

দিয়েছিলো। আমার এমন অপমান-বোধ হচ্ছিলো !

ওগো শুন্‌ছ—ব'লে মা গেল স্বামীর ঘ'রে। বল্‌লে কার ছেলের ফাউণ্টেনপেন চুরি গেছে, আমার ছেলের ব্যাগ ঘেঁটে দেখ্‌তে এসেছে। তুমি হেড্‌মাষ্টারকে লিখে দাও, কেন এ রকম হয় !

বাপ সকালের খবরের কাগজখানা একপাশে রেখে বল্‌লে, ও যদি চুরি না ক'রে থাকে ত' অপমান কিসের ? কিন্তু দেখো ওর টানার মধ্যে কোনো ফাউণ্টেনপেন আছে কিনা।

ওর টানায় ফাউণ্টেনপেন থাক্‌বে কেন, এই ত টানা—ব'লে ড্রয়ার খুল্‌তেই চোখে পাওয়া গেল নতুন ফাউণ্টেনপেন।

ছেলে বল্‌লে—ওটা আমি কিনেছি।

বাপ গম্ভীর গলায় বল্‌লে—পয়সা পেলি কোথায় ?

ছোটমাসীমা সেদিন দিয়ে গেছে।

জিগ্যেস করব ছোটমাসীমাকে ?

কোরো।

ক' টাকা দিয়েছিলো ?

একটাকা।

কেন দিলে ?

—বল্‌লে—কিছু কিনে খাস্‌।

কলমটার দাম কত ?

বারো আনা।

চার আনা কি করলি !

টফি কিনেছি।

মা চ'টে উঠ্‌লো, নিজে ত সাতজন্মে একপয়সা ছেলের হাতে দিয়ে বলো না যে—যা গিয়ে কিছু কিনে খা। আমার বোন টাকা দিয়েছে, তোমার অত জেরা কেন ?

দিয়েছে কিনা সেইটেই সন্দেহ। সে ত শুধু নিতেই জানে। দেয় কবে কাকে ?

নিজের মতন সবাইকে ভেবো না। তোমার যেমন হাত দিয়ে জল গলে না !

স্বভাবতঃই এই ছেলের লেখাপড়া কিছু হল না।

মা বল্‌লে, কুড়ি বছরে ফাঁড়া আছে। ওর আর প'ড়ে দরকার নেই। বেঁচে থাকুক্‌।

কিন্তু ওর কুড়ি বছর বয়স পর্য্যন্ত মাকে বাঁচ্‌তে হল না। যাবার সময় স্বামীকে ব'লে গেল, তুমি আমার মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করো, আর বিয়ে করবে না, তাহ'লে ছেলে আমার ভেসে যাবে।

তারপর ছেলের দিকে চেয়ে বল্‌লে, ভালো হয়ে থাকিস্‌ বাবা। তোর ভাবনায় স্বর্গেও আমার শান্তি হবে না। পেট ভ'রে খাস্‌। ঠাণ্ডা লাগাস্‌নি। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিস্‌নি। তোকে কত মারধোর করেছি, বকেছি, কিছু মনে করিস্‌নি বাপ আমার। আয় খোকন, একটা চুমু খেয়ে যাই—

চুমু খাওয়া আর হল না। তার আগেই তলব এসে গেল।

ছেলের বয়স তখন এগারো বছর।

বাপ সারাদিন অফিসে থাকে, ছেলে পথে পথে ঘোরে। সন্ধ্যে বেলা তাকে পড়াবে ব'লে। টিকি দেখ্‌তে পায় না।

টিকি দেখ্‌তে পেলে বকে। ছেলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। বলে, আমার মা নেই ব'লে তুমি আমাকে এমন ক'রে বকছ। কিন্তু বাবা, এ বাড়ী আমার একটুও ভালো লাগে না, এখানে যে আমার মা নেই।

কথাগুলো পাকা পাকা হলেও বাপের চোখ ছলছল ক'রে ওঠে। কাছে ডেকে আদর করে। বোঝাতে চেষ্টা করে এমন ক'রে চল্‌লে ভবিষ্যতে কত কষ্ট।

ছেলে এদিকে লেখাপড়া না করলেও গোয়েন্দা কাহিনীর খুব ভক্ত। হাড়কাটাগলিতে খুন ! রামবাগানে বারবনিতা হত্যা। রিভলবার, বোমা, মোহরের গুপ্ত, নারীহরণ—রোমাঞ্চকর কাহিনী যত বন্ধুদের বাড়ী থেকে লাইব্রেরী থেকে এনে তার নিত্য পড়া চাই।

বন্ধুদের সঙ্গে ঘোরা চাই, টাকা নেওয়া চাই, দেওয়া চাই।

কাজেই পকেট কাট্‌তে হয়।

একদিন ধরা প'ড়ে বেদম মার খায়।

তবু বলে, পুলিসে দেবেন না, আমার বাবা গেজেটেড

অফিসার। ছেলের কীর্ত্তি জান্‌তে পার্‌লে হার্টফেল করবেন। তাঁকে শাস্তি দিইনি। শাস্তি দেবারও অধিকার আমার নেই।

বেটাচ্ছেলের ধর্ম্মজ্ঞান এদিকে খুব টন্‌টনে!—মন্তব্য শোনে জনতার মধ্যে।

খাওয়াপরার খরচের জন্যে ভাবতে হয় না। কিছু টাকা বাবার কাছেও পাওয়া যায়, আর উপদেশ—কিছু একটা করো!

কিন্তু অনেক ফূর্ত্তি বাইরে। যার জন্যে অনেক অর্থের দরকার।

গিল্টিকরা গয়নাই ও-পাড়ার সকলের। শুধু লক্ষীর আছে সোনার অলঙ্কার।

সহজে টাকা উপায়ের এই পথ। শোভানের ছোরাতেই কাজ হ'য়ে যাবে।

হলও তাই।

চলে গেল বাণীকে নিয়ে নৈনিতাল, যে বাণী সিনেমার কণ্ট্রাক্ট পেয়েছে।

ধরা পড়বার কোনোই সম্ভাবনা নেই। শিখ সেজে ও লক্ষীর ঘরে গেছলো। দু হাজার টাকা হাতে রয়েছে।

নৈনিতালের লেক আর বাণী—আর কোনো পাল তোলা নৌকো, এই ত স্বর্গ।

তাই ত পুলিস কাঁধে হাত দিতে চম্‌কে উঠ্‌লো। ফেলে আসা রুমালে ধোপার বাড়ীর চিহ্ন যে মগনগরীর একটা পলাতককে ধরিয়ে দিতে পারে এ কথা ও স্বপ্নেও ভাবেনি। এ দেশের পুলিসের কৃতিত্ব ওকে তারিফ করতেই হল।

তারপর সেশন্‌স্ কোর্ট।

এই হাইকোর্টের ধার দিয়ে কতবার সে গেছে, কখনো সেশন্‌স্ কোর্ট দেখেনি, আজ দেখা হল!

লাবণ্যময় মুখ দেখে কেউ ভাবতেও পারে না, এ খুনী, এ অসচ্চরিত্র।

সরকার দয়া ক'রে ওর পক্ষে কৌন্সিল দিয়েছিলো। খুনী আসামীকে দিতে হয়।

পিতৃপরিচয় ও কিন্তু কিছুতেই দেয়নি।

কিন্তু জনতার মধ্যে ও কি? তার বাবা! একটা দৃষ্টিতে যে এত কান্না, এত অনুশোচনা, এত অসহায় আর্ত্তনাদ থাক্‌তে পারে, ও কখনো ভাবেনি।

এইবার ও কামনা করলো ওর মৃত্যু হোক্।

সন্দেহের অবকাশে জুরীরা যেন ওকে ছেড়ে না দেয়।

ফাঁসীর হুকুম ইণ্টারপ্রীটার বোঝাবার আগে ও বুঝেছে, আর হাসিতে ওর মুখ ভরে গেছে।

সেশন্‌স্‌কোর্ট খালি হয়ে গেছে, একলা বাপ শুধু দাঁড়িয়ে আছে জুরার্স বেঞ্চে ঠেসান দিয়ে।

বাঙালী সার্জেণ্ট বল্‌লে চলুন।

কে শুনবে?

হয়ত পৌছে গেছে তখন ওর স্ত্রীর কাছে এই কথাটি বল্‌তে, ভাগ্যিস্ তুমি বেঁচে ছিলে না। বড্ডো আঘাত পেতে তোমার খোকনের কাণ্ডয়।

কিন্তু ছেলে দেখেছে, তার মা এসে জজের চেয়ারের পাশ থেকে ডাক্‌ছে—খোকন পালিয়ে আয়। আমি আর থাক্‌তে পারছি না!

তাই ত ফাঁসির দড়িতে তার মনে হল তার মা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে।

প্ল্যানচেটে একথা ও আধুনিক লেখককে জানিয়েছিলো। লিখে দিয়েছিলো মাকে সে পেয়েছে।

লেখকের স্ত্রী বল্‌লে, তাই বুঝি কখনো হয়? আমি মরে গিয়ে কামনা করতে পারি, ছেলে পৃথিবীর আলো হাওয়া ছেড়ে আমার কাছে চলে যাক্? একে বলে রাক্ষুসে মায়া।

হয়ত তাই।



পাট ও পীঠ

চন্দন গুপ্ত

সংস্কৃতি-মূলক কার্য্যকলাপে উৎসাহদানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার সচেষ্ট হইয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। রাজ্যসরকার নৃত্য, গীত ও অভিনয় শিক্ষাদানের জন্য একটি একাডেমী স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই একাডেমী স্থাপনের জন্য পরিকল্পনা রচনার ভার দেওয়া হইয়াছে প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী শ্রীউদয়শঙ্কর ও প্রখ্যাত নট শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর উপর। বর্ত্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশিষ্ট শিল্পীদের দ্বারা সঙ্গীত, নৃত্য ও নাট্যাভিনয়ের শিক্ষাদান করা হইবে। শিক্ষাদানের সময় হইবে তিন বৎসর। এই একাডেমীকে পূর্ব্বাঞ্চলের একাডেমীরূপে স্বীকৃতিদানের জন্য রাজ্যসরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাইবেন এবং যাহাতে এতদ্‌সম্পর্কে আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায় সেজন্যও অনুরোধ জানান হইবে। সাধু প্রচেষ্টা কার্য্যকরী হইলে সত্যই সুখের বিষয় হইবে।

*　　*　　*

গত ১৩ই অক্টোবর বেঙ্গল মোশান পিক্‌চার্স এসোসিয়েসনের প্রযোজক ও পরিবেশক বিভাগের এক যুক্ত সভায় পাকিস্থানে নির্ম্মিত চিত্রের আমদানী এবং ভারতে প্রস্তুত চিত্রের রপ্তানি সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল কারণ, পাকিস্থানের ব্যবসা সংক্রান্ত বিরোধের অদ্যাবধি মীমাংসা না হওয়া।



ষোড়শীর একটি বিশেষ দৃশ্যে দীপ্তি রায়, অরুন্ধতী ও অজিতপ্রকাশ

গত ১৯৫২ সালে লাইসেন্স প্রথা উঠিয়া যাওয়ার পর পাকিস্থান সরকার ভারতীয় চিত্রের আমদানী বন্ধ করিয়া দেন। যখন লাইসেন্স-প্রথা কার্য্যকরী ছিল, তখনও ভারত হইতে প্রেরিত চিত্রগুলি প্রকাশিত হওয়ার পর যে অর্থ পাওয়া যায় তাহাও ভারতে পাঠাইয়া দেওয়া লইয়া যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি করা হইয়াছিল। পাকিস্থান সরকার বর্ত্তমানে মাত্র দশখানি ভারতীয় ছবি পূর্ব্ব-পাকিস্থানে আমদানী করার স্থির করিয়াছেন। এর মধ্যে ৫ খানি বাংলা এবং অন্যান্য ভাষায় ৫ খানি। প্রকাশ যে, এই দশখানি চিত্রের মধ্যে ৯টির জন্য ইতিমধ্যে লাইসেন্স প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু লাইসেন্সের সর্ত্তে আছে চিত্রগুলি পূর্ব্ব পাকিস্থানে মুক্তিলাভ করার দিন হইতে এক বৎসরে

যে অর্থ উপার্জ্জিত হইবে তাহার শতকরা ২৫ ভাগ ভারতে পাঠাইতে পারা যাইবে। কিন্তু ঐ অর্থের পরিমাণ ২৫,০০০৲ টাকার উর্দ্ধে হইতে পারিবে না।

পাকিস্থান সরকারের এইরূপ সিদ্ধান্তের ফলে বেঙ্গল মোশান পিক্‌চার্স এ্যাসোসিয়েসন নিম্নলিখিত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

(১) ছবি দেখাইয়া সংগৃহীত অর্থের ২৫ ভাগ এবং অনূর্দ্ধ ২৫,০০০৲ যাহা পাঠাইতে পাকিস্থান সরকার স্বীকৃত হইয়াছেন তাহা অত্যন্ত কম।

(২) আমদানিকারকের অর্জ্জিত অর্থ কথাটির যথাযথ ব্যাখ্যা করা হয় নাই। কারণ উহা কমিশনসহ অথবা কমিশন ব্যতিরেকে যাহা অর্জ্জিত হইবে তাহার ২৫ ভাগ, তাহা সঠিকভাবে বলা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ



চলচ্ছবি লিমিটেডের 'মেজ-বৌ' চিত্রের নায়ক বিকাশ রায় ও নায়িকা সুচিত্রা সেন

রপ্তানিকারকের নিকট হইতে শুল্ক, বিক্রয়-কর, সেন্সর খরচ, প্রচার বাবদ খরচ ইত্যাদি কি ভাবে কাটিয়া লওয়া হইবে তাহা পরিষ্কারভাবে বলা হয় নাই। সে টাকা শতকরা ৭৫ ভাগের মধ্য হইতে বাদ যাইবে, না সর্ব্বসাকুল্যে বাদ দেওয়া হইবে তাহা সুস্পষ্ট নয়।

(৩) এক বৎসর পর ছবি দেখাইয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করা হইবে সেই অর্থ যদি ভারতে পাঠান না হয়, তাহা হইলে রপ্তানিকারককে ছবির প্রিণ্ট ফেরৎ দেওয়া হইবে না কেন?

(৪) রপ্তানিকারকের সমুদয় অর্জ্জিত হইতে আয়কর দিতে হইবে না, কেবলমাত্র ভারতে প্রেরিতব্য টাকার উপর আয়কর দিতে হইবে তাহা সুস্পষ্টভাবে বলা হয় নাই।

(৫) যে সকল প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইয়াছে ভারতীয় চিত্র ব্যবসায়ে তাহারা প্রখ্যাত নহে।

(৬) ঢাকার এমন এক চিত্র প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে যাঁহারা বেঙ্গল মোশান পিক্‌চার্স এ্যাসোসিয়েসনের কোন সভ্যের টাকা পাঠান নাই।

উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করিয়া সভা স্থির করিয়াছেন



চলচ্ছবি লিমিটেডের 'মেজবৌ' কথা চিত্রের একটি দৃশ্যে সুচিত্রা সেন ও শ্রীমান শ্যামলকুমার

পাকিস্থানের সহিত এই সকল বিষয়ে সন্তোষজনক মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত পাকিস্থানের সহিত আমদানী ও রপ্তানী উভয় প্রকার কার্য্যই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

কথায় বলে 'আপনার ধন পরকে দিয়ে, দৈবকী বেড়ায় হাত নাড়া দিয়ে।' এও তাহাই হইয়াছে। পাকিস্থানের সহিত ছবির ব্যাপার পরিকল্পনা বাদ দিয়া অতঃপর প্রযোজকদের ছবির নির্ম্মাণ বাবদ খরচা নূতন ভাবে করাই বোধ হয় শ্রেয়ঃ হইবে।

* * *

শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রযোজিত কয়েকটি চিত্রের প্রযোজককে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করিয়াছেন। আত্রে পিক্‌চার্স প্রযোজিত 'শ্যামচি আই' মারাঠি ভাষায় গৃহীত ছবিটি রাষ্ট্রপতির পদক প্রাপ্ত হইয়াছে। বিমল রায় প্রযোজিত ও হিন্দী ভাষায় গৃহীত 'দো-বিঘা-জমিন্' এবং বাংলা ভাষায় গৃহীত ও দেবকী বসু প্রযোজিত "ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" বিশেষ মানপত্র লাভ করিয়াছে।

ডকুমেণ্টরী চিত্র 'মহাবলীপুরম্' রাষ্ট্রপতির পদক এবং "হোলি হিমালয়াস্" ও "ট্রী অব্ ওয়েলথ" চিত্রকে মানপত্র প্রদান করা হইয়াছে। উপরোক্ত তিনটী চিত্রই ভারত সরকারের চলচ্চিত্র বিভাগ কর্তৃক গৃহীত হয়।



অরোরার শিশুচিত্র খেলাঘরের প্রযোজক শ্রীঅজিত বসু রাষ্ট্রপতি শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট হইতে মানপত্র গ্রহণ করিতেছেন

শিশু চিত্রের মধ্যে একমাত্র কলিকাতার অরোরা ফিল্মস্ কর্তৃক প্রযোজিত "খেলাঘর" চিত্রটিই মানপত্রলাভের অধিকারী হইয়াছে।

এই সকল চিত্রগুলি প্রথম রাষ্ট্রীয় পুরস্কারলাভের অধিকারী হিসাবে ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে সন্দেহ নাই।

* * *

সম্প্রতি রঙ্‌মহল থিয়েটারে শ্রীনীহার গুপ্তের 'উল্কা' নামক উপন্যাসের নাট্যরূপ সম্প্রতি মঞ্চস্থ হইয়াছে। উপন্যাসের নাট্যরূপ প্রদান করিয়াছেন গ্রন্থকার স্বয়ং। নাটকের পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীঅর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়।

নাটকটির কাহিনী বাস্তববর্জ্জিত হইলেও যেটুকু নাটকীয় সম্ভাবনা ছিল, তাহা mountingএর অভাবে এবং অহেতুক নূতন কাহিনী সংস্থাপনের ফলে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

'উল্কা'র ন্যায় Fantacy গল্পকে নাট্যরূপায়িত করিতে হইলে যেভাবে ঘটনা সংস্থাপনার প্রয়োজন ছিল, তাহা না করিয়া মূল-কাহিনীর সহিত অপর কাহিনী সংযোজিত করিয়া মোড় ঘুরাইয়া দেওয়ার ফলে, নাটকীয় গতি শ্লথ হইয়া পড়িয়াছে। সংঘাত সৃষ্টির যথেষ্ট অবকাশ থাকা সত্ত্বেও তাহা ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। কতকগুলি এমন চরিত্র সৃষ্টি করা হইয়াছে যাহা অহেতুক এবং কতকগুলি চরিত্রের পরিণতি দেখান হয় নাই। ফলে নাটকীয় ধর্ম্ম যথাযথ প্রতি-পালিত হয় নাই। প্রথম অঙ্কে যে গতিতে নাটক পুষ্টির পথে আগাইয়া আসিতেছিল, দ্বিতীয় অঙ্কে আসিয়া তাহা অপ্রত্যাশিত-ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং তৃতীয় অঙ্কে যে পরিণতি দেখান হইয়াছে সে নাটকীয় পরিণতি পূর্ব্বেই শেষ হইয়া যায়। অর্থাৎ নায়ক অরুণাংশু সেখানে আসিয়া মায়ের পায়ে ফুল দেয়। সুতরাং দর্শকদের ভরপুর মন লইয়া আর কিছু দেখার আগ্রহ থাকে না। দাদা-মশাইয়ের সংলাপ অশ্লীলের পর্য্যায়ে পড়ে এবং উক্ত চরিত্রটি অহেতুক। অভিনয়, আলোকসম্পাত, দৃশ্যপট মোটামুটি ভালই। অরুণাংশুর রূপ-সজ্জা অপূর্ব্ব! সুবীরের চরিত্রের রূপদানে যথেষ্ট দুর্ব্বলতা চোখে পড়ে।

* * * *

এবৎসর আন্তঃকলেজ সংগীত প্রতিযোগিতায় ছাত্রদের মধ্যে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান ত্রিদিব ভাদুড়ী দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। রবীন্দ্র সংগীত ও কীর্তনেও ইনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন



শ্রীমান ত্রিদিব ভাদুড়ী

করেন। প্রসঙ্গক্রমে ইহা উল্লেখযোগ্য যে ইনি 'ঢুলি' কথাচিত্রের একটি সংগীত প্রতিযোগিতায়ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়াছেন। ইনি যশস্বী সংগীত-শিল্পী শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের প্রিয় ছাত্র এবং ট্রপিকাল স্কুল অফ্ মেডিসিনের ডাঃ নিখিলবিহারী ভাদুড়ীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। আমরা ইঁহার আগামী জীবনের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

* * * *

সম্প্রতি দক্ষিণ কলিকাতায় তামিল নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। মাদ্রাজের টি, কে, এস্ ব্রাদার্স্ এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা। ইঁহারা পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক ও রূপক নাটক পর পর কয়েকদিন অভিনয় করেন। মাদ্রাজে কোন স্থায়ী মঞ্চ না থাকিলেও টি, কে, এস্ ব্রাদার্স্-এর পরিবেশনায় অভিনীত তামিল নাটকগুলি নাট্যরচনা ও নাট্য-প্রযোজনার দিক হইতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করিয়াছে। সাউথ ইণ্ডিয়া ক্লাবের সভাপতি শ্রীকে, রামাবাই সাংবাদিকদের সহিত টি, কে, এস্ ব্রাদার্স্-এর পরিচয় করাইয়া দেন। কলিকাতায় অভিনয় অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীসত্যনাথন্ বলেন—"দক্ষিণ ভারতের নাটকাভিনয়ের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রাজের নাট্য আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত হয়। পূর্ব্বে প্রাচীন ধারাতেই অভিনয় হইত, টি, কে, এস্ ব্রাদার্স্ নাট্যাভিনয়ের নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করেন।"

টি, কে, এস্ ব্রাদার্স্-এর প্রযোজিত নাটকগুলি সত্যই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

তুমি

শ্রীমতী নীলিমা বিশ্বাস এম্-এ,

সন্ধ্যায় দেখি ঝিকিমিকি করে,
চাঁদ, ফুল, আলো, তারা।
মানস মুকুরে ঝিলিমিলি করে
বলো দেখি আরো কারা ?
পথে চলা জন কথা কওয়া মনে
কথনো কি ছায়া ফেলে ?
তুমি কি কথনো থমকিয়ে বলো,
ভালো আছো ; কবে এলে ?

তুমি কি কথনো গুন্‌গুন্ গানে
ডেকে বলো, সে কোথায়
ছোটো পৃথিবীতে ছোটো ছোটো দিন
বৃথা বুঝি বয়ে যায়।
গোধূলিতে তবু ঝিকিমিকি করে
চাঁদ, সাঁঝ বাতি, তারা।
মনের আকাশে ভীড় করে জলে
ভুলে যাওয়া আরো কারা।

দেশের কথা

সাগুদানা ও ট্যাপিয়োকা—

কলিকাতায় একদল ব্যবসায়ী ট্যাপিয়োকা-দানা সাগু-দানা বলিয়া বিক্রয় করে। সেজন্য সম্প্রতি কলিকাতা পুলিসের এনফোর্সমেণ্ট বিভাগ ৪০ লক্ষ টাকা মূল্যের ২০ হাজার মন ট্যাপিয়োকা দানা আটক করিয়াছিল। ঐ বিষয় লইয়া পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট ও কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিরোধ হয়। শেষ পর্য্যন্ত ট্যাপিয়োকা দানাগুলি ঐ নামে বিক্রয় করার সর্ত্তে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু জনগণ যেন বিভ্রান্ত হইয়া ঐ সকল ট্যাপিয়োকা দানা সাগুদানা বলিয়া ক্রয় ও ব্যবহার না করেন। তাহা হইলেই বিরোধের নিষ্পত্তি হইবে। ভেজাল বা জাল দ্রব্য বিক্রয় সম্পর্কে পুলিস যে অভিযান চালাইয়াছে, তাহার ফলে সহরের অসাধু ব্যবসায়ীদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে। ক্রমে সহর হইতে ভেজাল দ্রব্য বিক্রয় বন্ধ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এ বিষয়ে ক্রেতাদের সহযোগিতা ও সাহায্য পাইলে পুলিস সত্বর তাহাদের অভিযান সাফল্য মণ্ডিত করিতে পারিবে।

কলিকাতায় দুগ্ধ সরবরাহ—

কলিকাতা সহরে প্রতিদিন ৬০০ মণ খাঁটি দুগ্ধ সরবরাহের জন্য ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে কাঁচরাপাড়ার নিকট হরিণঘাটায় বিরাট আয়োজন চলিতেছে, কলিকাতা হইতে জনসাধারণের ১২৭২০টি গাভী লইয়া গিয়া তথায় রাখিবার জন্য একটি গোশালা নির্মিত হইয়াছে। ঐরূপ আরও ২টি গোশালা এই বৎসরের মধ্যেই নির্মিত হইবে—ঐরূপ মোট ১৮টি গোশালা নির্মিত হইলে তথায় ২৮ হাজার গোমহিষের স্থান হইবে। কল্যাণী হইতে ৩ মাইল দূরে জমী লইয়া ৭১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তথায় পশুখাদ্যের চাষ করা হইবে—ঐ খাদ্য প্রত্যহ হরিণঘাটার গোশালায় সরবরাহ করা হইবে। পানাগড়ে ৩ হাজার একর জমী হইয়া একটি গোশালা করা হইতেছে—সেখানেও গৃহ নির্মিত হইলে ১২ হাজার গবাদি পশু রাখার ব্যবস্থা হইবে। দুধ আমাদের একটি প্রধান খাদ্য—তাহার অভাবে বাঙ্গালীর দেহ, মন ও বুদ্ধি দিন দিন দুর্বল হইয়া যাইতেছে। এই সকল গোশালা হইতে সুলভে ভাল দুগ্ধ পাওয়া গেলে তাহা খাইয়া এদেশের লোকের উন্নতি হওয়া স্বাভাবিক। আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই শুভ প্রতিষ্ঠাকে অভিনন্দিত করি।

রেলযাত্রীদের সুবিধা দান—

শ্রীযুক্ত এস-এস-বশিষ্ঠের নেতৃত্বে একদল প্রতিনিধি বিভিন্ন রেল-পরিচালন ব্যবস্থা দেখিবার জন্য বিদেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ইউরোপের কয়েকটি দেশ—(রুসিয়া সমেত) দেখিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা ভারতের রেলপথের কয়েকটি অসুবিধার কথা প্রকাশ করিয়াছেন—জনতা এক্সপ্রেসে যাহাতে সামান্য অতিরিক্ত অর্থ দিয়া যাত্রীরা রাত্রিতে ঘুমাইবার মত স্থান পান, সেজন্য রেলকর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইউরোপের রেলসমূহে সকল শ্রেণীর যাত্রীর জন্য নিদ্রার স্থান দেওয়া হয়। ভারতীয় রেলে তৃতীয় ও মধ্যম শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য খাবার-গাড়ী নাই। এদেশে সত্বর তাহা করিতে বলা হইয়াছে। সর্বত্র যাত্রীদিগকে গমনাগমনের সময় সম্পর্কে সংবাদ সরবরাহের ব্যাপক ব্যবস্থা করিতে বলা হইয়াছে। উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর যাত্রীদের প্রবেশ ও নির্গমের জন্য ষ্টেশনে পৃথক পথের ব্যবস্থা লোপ করিতে বলা হইয়াছে। আমরা 'জনগণের রাজ্য' প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইয়াছি—এখন ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিভেদ দূরীভূত করিয়া সকলকে সমান অধিকার দানের ব্যবস্থা করাই সঙ্গত হইবে। আমাদের বিশ্বাস, প্রতিনিধিদলের প্রস্তাবগুলি সত্বর কার্য্যে পরিণত করার ব্যবস্থা হইবে।

ভারতে চাউলের অবস্থা—

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে লোকসভায় বাণিজ্য ও শিল্প-মন্ত্রী শ্রীটি-টি কৃষ্ণমাচারী ঘোষণা করেন যে গভর্ণমেণ্ট এ-বৎসর বোম্বাই ও কলিকাতা হইতে ২ লক্ষ টন চাউল রপ্তানীর অনুমতি দিবেন। পরলোকগত খাদ্য-মন্ত্রী রফি আমেদ কিদোয়াই ঐ সময়ে বলিয়াছিলেন যে গভর্ণমেণ্ট আগামী ২ বৎসরের জন্য ধান্য মজুত করিয়া রাখিয়াছেন—বন্যা বা জলাভাব যাহাই হউক না কেন সে জন্য চাউলের ঘাটতি হইবে না বা দর চড়িবে না। উত্তর ভারতে বন্যায় বা অনাবৃষ্টিতে হয়ত শতকরা ১০ ভাগ চাল কম উৎপন্ন হইবে—কিন্তু দক্ষিণ ভারতের অতিরিক্ত চাউল আনিয়া সে অভাব পূরণ করা হইবে। গভর্ণমেণ্ট সরু ও মূল্যবান চাউল বিদেশে রপ্তানী করিয়া তাহার পরিবর্তে সুলভ ও মোটা চাউল বিদেশ হইতে আমদানীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট-গুদামে এখন ১৩ লক্ষ টন চাউল মজুত আছে—ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আসিলে তাহা ২২ লক্ষ টন হইবে। ঘাটতি অঞ্চলে হয়ত ৬ লক্ষ টনের বেশী চাল দিতে হইবে না। যাহা হউক না কেন, ভারতবাসী যেন সুলভে তাহাদের প্রয়োজনীয় চাউল পায় তাহা হইলে তাহাদের আর কিছু বলিবার থাকিবে না।

কলিকাতা বন্দরে চাকরী সমস্যা—

কলিকাতা বন্দরে পোর্ট কমিশনার্সের ছোট ছোট ষ্টীমার, মোটরলঞ্চ, বোট ইত্যাদির খালাসী, সারেং প্রভৃতি পদে প্রায় ৫ হাজার পাকিস্তানী কাজ করিয়া থাকে। এইরূপ এক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে শুধু পাকিস্তানীদের উপর যাহাতে নির্ভরশীল না হইতে হয়, সেজন্য ভারত সরকার কিছুদিন পূর্বে ভারতীয় যুবকদের এই সম্পর্কে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা

করেন। সেই ব্যবস্থা মত এ যাবৎ চার শতাধিক বাঙ্গালী যুবক—প্রধানতঃ পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু—খালাসী, সারেং প্রভৃতি পদের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করে ও তাহারা অস্থায়ী কর্মচারীরূপে নিযুক্ত হয়। কিন্তু তাহার পর হইতে পাকিস্তানী কর্মীরা ইহাদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়। এখন তাহারা দাবী করিয়াছে, ভারতীয় যুবকগণকে অপসারণ করা না হইলে তাহারা কাজ করিবে না। এই সমস্যা লইয়া কর্তৃপক্ষ বিপন্ন হইয়াছেন ও শুনা যাইতেছে—২৪ জন নূতন ভারতীয় কর্মীকে বরখাস্তের নোটীশ দেওয়া হইয়াছে। এইভাবে যদি চিরকাল পোর্ট কমিশনার্স কর্তৃপক্ষকে পর-মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়, তবে তাহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে। এ সময়ে কর্তৃপক্ষ কঠোরতা অবলম্বন না করিলে ভবিষ্যতে তাহাদের ধ্বংস হইতে হইবে। আশা করি, কর্তৃপক্ষ এ সমস্যার সমাধানের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থায় পশ্চাদপদ হইবেন না।

নূতন কাপড়ের কল ও বাস্তুহারা—

পূর্ববঙ্গ হইতে আগত বাস্তুহারাদের কর্ম সংস্থানের উদ্দেশ্যে শীঘ্রই ১ কোটি টাকা ব্যয়ে নদীয়া জেলার তাহেরপুরে একটি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করা হইবে। তাহাতে ১ হাজার তাঁত বসিবে ও সাড়ে ৩ হাজার লোক কাজ পাইবে। ঐ কলের জন্য খ্যাতনামা শিল্পপতি শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ৫০ লক্ষ টাকা দিবেন ও গভর্ণমেণ্ট ৫০ লক্ষ টাকা দিবেন। ১০০ বাস্তুহারা বালককে শীঘ্রই কাজ শিক্ষার জন্য কোন কাপড়ের কলে প্রেরণ করা হইবে। এই নূতন ব্যবস্থায় সকল শ্রেণীর লোকই উপকৃত হইবে, আশা করা যায়। বাঙ্গালায় এখনও অন্যান্য প্রদেশ হইতে বহু কাপড় আমদানী করিতে হয়—নূতন কাপড়ের কলের সেজন্য প্রয়োজন কম নহে। ঐ ভাবে বিভিন্ন বাস্তুহারা-প্রধান-স্থানে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইলে শিল্পের উন্নতির সহিত বেকার সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা হইবে।

হীরাকুন্দে যুবকগণকে শিক্ষাদান—

উড়িষ্যা রাজ্যে হীরাকুন্দে বাঁধ নির্ম্মাণ কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে—উড়িষ্যার রৌরকেলায় সুবৃহৎ ইস্পাত নির্ম্মাণ কারখানার কাজ আগামী বৎসরের প্রথমে আরম্ভ হইবে ও তাহাতে ১০০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। তাহার পূর্ব্বেই যুবকগণকে টেকনিকাল শিক্ষা দানের জন্য হীরাকুন্দের নিকট একটি পলিটেকনিকাল ইনিষ্টিটিউট খোলা হইবে—তাহার জন্য আপাতত সাড়ে ৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে—টাটা কোম্পানী ৩ লক্ষ টাকা দিবেন ও বাকী টাকা উড়িষ্যার রাজ্য সরকারকে দিতে হইবে। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টও হীরাকুন্দের নিকট একটি বড় শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতীয়গণকে ভারী যন্ত্রাদি ব্যবহার শিক্ষা দিবেন। হিন্দুস্থান ষ্টীল লিমিটেডের ম্যানেজার-ডাইরেকটার নিযুক্ত হইয়া শ্রীএস-এন মজুমদার সম্প্রতি এজন্য উড়িষ্যার শিক্ষাকেন্দ্রের স্থানগুলি দেখিয়া আসিয়াছেন। নূতন ইস্পাত কারখানার কাজের উপযোগী করিয়া যুবকগণকে টেকনিকাল শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থায় তিনি মনোযোগী হইয়াছেন। উড়িষ্যার এই নূতন কারখানার দ্বারা ভারতবাসী ইস্পাত সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়।

কলিকাতা বন্দরের উন্নতি—

কলিকাতা বন্দরকে সুরক্ষিত করিতে হইলে যে হুগলী নদী দিয়া জাহাজ যাতায়াত করে, তাহার উন্নতি বিধান ও তাহা ঠিক ভাবে রক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন। সে ব্যবস্থার জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ডহারবার হইয়া সমুদ্র পর্যন্ত পথের বহু স্থানে নদী অগভীর হওয়ায় জাহাজ চলাচলে প্রায়ই অসুবিধা হইয়া থাকে। নদী-নিয়ন্ত্রণ দ্বারা ঐ সমগ্র পথটি প্রায় ১২০ মাইলে—গভীর জলের ব্যবস্থা করাই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। বজবজ, ফলতা, ডায়মণ্ডহারবার, কুলপী ও কাকদ্বীপ হইয়া ঐ নদী-পথ সাগর দ্বীপের নিকট সমুদ্রে গিয়া পৌঁছিয়াছে। জলপথ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা সমগ্র দেশের উন্নতি বিধান এখন নূতন স্বাধীন গভর্ণমেণ্টের প্রধান ও প্রথম কর্তব্য। দামোদর ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি পরিকল্পনার পর গঙ্গাব্যারেজ নির্মিত হইলে ও কলিকাতা হইতে সমুদ্র পর্যন্ত পথ জাহাজ চলাচলের উপযোগী করা হইলে নদীর জলের দ্বারা বহু লোক বহু ভাবে উপকৃত হইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই ব্যবস্থার সংবাদে সকলেই আনন্দিত হইবেন।

পশ্চিমবঙ্গে তাঁত শিল্প—

পশ্চিমবঙ্গের তাঁতিরা যাহাতে উপযুক্ত ধরণের সুতা পায় সেই উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারত সরকারের সাহায্যে কয়েকটি সুতাকল স্থাপনের আয়োজন করিয়াছেন। এই সুতাকলগুলি উদ্বাস্তু পল্লী ও অন্যান্য স্থানে স্থাপিত হইবে। দুই তিনজন শিল্পপতি ইতিমধ্যেই ভারত সরকারের অর্থ সাহায্যের সর্তাধীনে এরূপ সুতাকল স্থাপনে সম্মত হইয়াছেন। তাঁতিদের পণ্য বিক্রয়ের জন্যও পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করিবেন। পশ্চিমবঙ্গের তাঁতিরা তাহাদের তাঁতে যে ধরণের সুতা ব্যবহার করে, পশ্চিমবঙ্গের কাপড়ের কলে সে ধরণের সুতা তৈয়ারী হয় না। ঐ সুতা সেজন্য দক্ষিণ ভারত হইতে আমদানী করিতে হয়। সেজন্য পশ্চিমবঙ্গে নূতন সুতা-কল স্থাপন করা দরকার। ভারত সরকার সুতা-কল প্রতিষ্ঠা ও পণ্য বিক্রয় ব্যবস্থা—উভয় কার্য্যের জন্যই প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করিবেন। এখন তাড়াতাড়ি নূতন ব্যবস্থা সম্পাদিত হইলে বাঙ্গালার বহু লোক তাঁত চালাইয়া জীবিকার্জন করিতে সমর্থ হইবে।

সাইবনা ও নন্দদুলাল জিউ—

২৪পরগণা জেলার বারাসত মহকুমার মধ্যে ও বারাকপুর মহকুমার সীমার নিকট অবস্থিত সাইবনা গ্রামে শ্রীশ্রীনন্দদুলাল জিউর মন্দির আছে। ঐ স্থান বারাকপুর রেল ষ্টেশন হইতে সাড়ে ৪ মাইল—বারাকপুর হইতে বারাসতগামী বাসে মাথারাঙ্গির মোড়ে নামিয়া পদব্রজে সওয়া মাইল যাইতে হয়—কাঁচা রাস্তা—বর্ষাকালে রিকসা বা মোটর যায় না। খড়দহ রেল ষ্টেশন হইতেও কাঁচা রাস্তায় সাড়ে ৩ মাইল

দূরে সাইবনা। ঠিকানা—গ্রাম সাইবনা, পোঃ তালপুকুর, জেলা ২৪পরগণা। সম্প্রতি ঠাকুরের সেবা অর্থাভাবে অসম্ভব হওয়ায় সেবাইতগণ তাঁহাদের স্বত্ব ত্যাগ করিয়াছেন এবং ১৮৬০ সালের ২১ আইনে রেজেষ্টারীতে এক সমিতির উপর ঠাকুর সেবা প্রভৃতির ভার আসিয়াছে। সাইবনা গ্রামনিবাসী, অধুনা পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় এই ব্যবস্থা সম্ভব হইয়াছে। বিচারপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সমিতির সভাপতি ও অমূল্যধনবাবু সমিতির সম্পাদক হইয়াছেন। সমিতি ৭জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভক্তকে ট্রাষ্টী নিযুক্ত করিয়াছেন। এখনও প্রতি বৎসর মাঘী-পুর্ণিমার দিন সাইবনায় হাজার হাজার যাত্রী সমাগম হইয়া থাকে। শ্রীরামপুরের নিকটস্থ বল্লভপুরের শ্রীশ্রীরাধা বল্লভ, খড়দহের শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর ও সাইবনার শ্রীশ্রীনন্দদুলাল একই প্রস্তর খণ্ড হইতে ৪শত বৎসর পূর্বে নির্মিত হইয়া একই দিনে (মাঘী পূর্ণিমা) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া ভক্ত হিন্দুগণ ঐ একই দিনে তিন ঠাকুর দেখিয়া থাকেন। সেদিন বল্লভপুর হইতে গঙ্গা পার হইয়া খড়দহ ও পড়দহ হইতে স্পেশাল বাসে সাইবনা যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে মন্দির ও তৎসংলগ্ন গৃহাদি ভগ্নপ্রায় সেগুলি আশু সংস্কারের জন্য প্রায় ১৫ হাজার টাকা প্রয়োজন। নীলগঞ্জ মাথারাঙ্গি হইতে সাইবনা—সওয়া মাইল পথ পাকা করিতে ৩০ হাজার টাকা লাগিবে। দেবস্থানে নিত্য সৎগ্রন্থ পাঠ, সৎ আলোচনা ও কীর্তনাদির ব্যবস্থার জন্য তথায় একটি উপযুক্ত বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সর্বশেষ—ঠাকুরের সেবার জন্য এখন যে সম্পত্তি আছে তাহার গড়ে মাসিক আয় মাত্র ৫০ টাকা—অথচ ১৫০ টাকা মাসিক ব্যয় না করিলে ঠাকুরের উপযুক্ত সেবাপূজা হওয়া সম্ভব নহে। সেজন্য ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা দ্বারা মাসিক ১০০ টাকা আয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্বাধীন ভারতে দেবস্থান রক্ষা করাও আমাদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। এ বিষয়ে আমরা ভক্ত ও হৃদয়বান দেশবাসীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আমাদের বিশ্বাস, ৪০০ বৎসরের প্রাচীন এই বিগ্রহ-সেবার জন্য অর্থের বা উৎসাহের অভাব হইবে না। ভাল পথ নির্মিত হইলে নিত্য যেমন শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ ও শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের মন্দিরে ভক্ত দর্শনার্থীর অভাব হয় না, শ্রীশ্রীনন্দদুলাল দর্শন করিয়াও ভক্তগণ নিজেদের ধন্য করিবেন।

মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিরক্ষা—

মহাত্মা গান্ধীর লোকান্তরের পর তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য ১১ কোটি টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল এবং ঠিক হয় যে নিম্নলিখিত কার্য্যে উক্ত অর্থ ব্যয় করা হইবে—(১) মিউজিয়াম স্থাপন করিয়া বিভিন্ন স্থানে গান্ধীজির জীবন সম্বন্ধে জিনিষ, পুস্তকাদি, চিঠিপত্র, তাঁহার হস্তলিপি প্রভৃতি রক্ষা (২) যে সকল স্থানের সহিত তাঁহার জীবন ও কর্মের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান, সে সকল স্থান উপযুক্তভাবে সংরক্ষণ (৩) তিনি যে ১৮ দফা গঠন কর্মের কথা বলিতেন, সে সকল গঠন কার্য্যকে উৎসাহ দান এবং বিশেষ করিয়া তাঁহার দ্বারা আরব্ধ গঠনকার্য্যে সাহায্য দান। গান্ধী স্মৃতি ভাণ্ডার হইতে নিম্নলিখিত ৪টি স্থানে আপাততঃ মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইতেছে—(১) দিল্লীর রাজঘাটে সমাধিস্থল (২) সবরমতী (আমেদাবাদ) আশ্রম—দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া গান্ধীজি তথায় ১৫ বৎসর বৎসর বাস করিতেন (৩) ওয়ার্দ্ধার সেবাগ্রাম আশ্রম—১৯৩২ সাল হইতে উহা গান্ধীজির কর্ম-কেন্দ্র (৪) দক্ষিণ আফ্রিকার মাদুরাই সহর—ঐ স্থানে গান্ধীজি প্রথম অস্পৃশ্যতা বর্জন আন্দোলন আরম্ভ করেন। ঐ সকল স্থানের মিউজিয়ামে শুধু পুস্তকাদি ও জিনিষপত্র রক্ষিত হইবে না—সঙ্গে পাঠাগার স্থাপন করিয়া ঐ স্থানগুলিকে গবেষণা কেন্দ্রে পরিণত করা হইবে এবং গবেষক ও ছাত্রদল যাহাতে তথায় যাইয়া ও থাকিয়া কাজ করিতে পারেন, তাহারও ব্যবস্থা করা হইবে। প্রাচীন যুগে যে ভাবে ভারতের নানাস্থানে বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষাকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল, আমাদের বিশ্বাস, ঐ ৪টি স্থানে সেইভাবেই গান্ধী-বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিবে। ঐ ৪টি স্থানেই কাজ আরম্ভ হইয়াছে—তবে মাদুরাই সহরের কাজ এখনও অধিক অগ্রসর হয় নাই। ভারতের নানাস্থানে বহু সহর ও গৃহ গান্ধীজির জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত—সে সকল স্থানে যাহাতে মিউজিয়াম করা হয়, সেজন্য স্থানীয় অধিবাসীরা অনুরোধ জানাইয়াছেন। কেন্দ্রীয় স্মৃতি ভাণ্ডারের পক্ষে সর্বত্র মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নহে—সেজন্য স্থানীয় জনগণ বা স্থানীয় রাজ্যসরকারকে সে কাজ করিতে অনুরোধ করা হয়। তবে কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার হইতে বিভিন্ন স্থানে ১৪টি স্তম্ভ ও ৭৫টি ফলক প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইবে—কমিটী সেজন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করিয়া সে সব স্থানে নির্মাণ বা ফলক প্রতিষ্ঠা করিবেন। ৪৫ একর জমি লইয়া দিল্লী রাজঘাটে বিরাট স্মৃতি-মিউজিয়াম করা হইতেছে—উহাই কেন্দ্রীয় ও প্রধান স্থান বলিয়া বিবেচিত হইবে। ২ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা ব্যয়ে গান্ধীজির জীবনের ২৩টি বিভিন্ন সময়ের ঘটনা লইয়া চলচ্চিত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুলি সাধারণের নিকট প্রদর্শিত হইয়াছে—(১) লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীজি (২) নোয়াখালিতে গান্ধীজি (৩) ১৯২৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজি ও গোখলে। তাহা ছাড়া নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি লইয়াও চলচ্চিত্র হইয়াছে—(ক) ১৯২২ সালে বিলাতী বস্ত্র দাহ (খ) ১৯৩০ সালে দাণ্ডী যাত্রা (গ) ১৯৩১ সালের করাচী কংগ্রেস (ঘ) ১৯৩০—৩২ আইন অমান্য আন্দোলন (ঙ) ১৯৩৬ সালে ফৈজপুর কংগ্রেস (চ) ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেস (ছ) ১৯৩৯ সালে দিল্লীতে বিরলা মন্দির উদ্বোধন (জ) ১৯৪২ সালে সেবাগ্রামের কাজ (ঝ) ১৯৪২ সালে ভারতে ক্রিপস্ মিশন (ঞ) ১৯৪৪ সালে বোম্বায়ে গান্ধী-জিন্না আলোচনা (ট) ১৯৪৫—৪৬ সালে সিমলা সম্মেলন, দিল্লী ও বোম্বায়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন প্রভৃতি (ঠ) ১৯৪৭ সালে গান্ধীজির ৭৮তম জন্মোৎসব (ড) ১৯৪৭ সালে পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ (ঢ) ১৯৪৭ সালে বিহার সফর (ণ) ১৯৪৭ সালে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে বড়লাট পদে নিয়োগ (ত) ১৯৪৭ সালে গান্ধী-মাউণ্টব্যাটেন সাক্ষাৎ (থ) ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট দিল্লী রেড ফোর্টে স্বাধীনতা দিবস উৎসব (দ) ১৯৪৭ সালে কলিকাতায় শান্তি-পরিক্রমা (ধ) নয়া দিল্লীতে এসিয়া-সম্মিলন (ন) ১৯৪৭ সালে নয়া দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভা ও (প) ১৯৪৮ সালের জানুয়ারীতে নয়া দিল্লীতে বিরলা-হাউসে

গান্ধীজির উপবাস। এইভাবে নানা উপায়ে জাতির জনক গান্ধীজির কথা ভারতবাসীর মনে যাহাতে সদা জাগ্রত থাকে, গান্ধী স্মৃতি ভাণ্ডার কমিটী সেজন্য চেষ্টা ও কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

স্মরণীয় দিবস—

১৯শে আগষ্ট ১৯৫৪ সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিবস। ঐ দিন ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু ক্যাণ্টন হইতে চীনের রাজধানী পিকিনে যাইয়া উপস্থিত হন। বেলা দ্বিপ্রহরে বিমানপোতে শ্রীনেহরু পৌঁছিলে নূতন জাগ্রত চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ-এন-লাই নেহরুকে সম্বর্দ্ধনা করেন এবং সমবেত ১০ লক্ষ জনতা "চীন-ভারতের বন্ধুত্ব জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবে" ঘোষণা করিয়া চীৎকার করে। বিমান-পোত হইতে সহর পর্য্যন্ত ১০ মাইল পথে ১০ লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিল। চীনের ইতিহাসে কোন বিদেশীকে এ ভাবে সম্বর্দ্ধনা করার কথা নাই। ঐ দিনই শ্রীনেহরু চীনের গণতন্ত্রের সভাপতি মাও-সে তুং এর সহিত দীর্ঘ দেড়ঘণ্টা কাল আলোচনা করেন। কম্যুনিষ্ট চীন ঐ দিন অ-কম্যুনিষ্ট ভারতকে সাদরে সম্বর্দ্ধনা করিল—দুইটি সুবৃহৎ, সর্বাপেক্ষা অধিক জনবহুল দেশের নেতা সমগ্র জগতের প্রতি কর্তব্য সাধনের জন্য মিলিত হইলেন—। এতদিন যুদ্ধের জন্য এক দেশ অন্য দেশের সহিত মিতালী করিত—গান্ধীজির শিষ্য শ্রীনেহরু, জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় একাগ্রভাবে জীবন উৎসর্গ করিয়া—ভারতের বাহিরে গমন করিলেন—। শুধু ভারতের ইতিহাসে নহে—জগতের ইতিহাসে দিনটি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

কাশ্মীর ও ভারত—

গত ১৯শে অক্টোবর ভারতের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ডাঃ এস-এস-ভাটনগর শ্রীনগরে জম্মু ও কাশ্মীরের বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দিতে যাইয়া বলিয়াছেন—এতদিন শিল্প ও দর্শন কাশ্মীরের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল এখন সুইটজারল্যাণ্ডের মত কাশ্মীরকে উন্নত করিবার জন্য দেশকে শিল্পী, এঞ্জিনিয়ার ও বৈজ্ঞানিকে পূর্ণ করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার যুবরাজ করণ সিং সমাবর্তন উৎসবে সভাপতি ছিলেন। ডাক্তার ভাটনগর সেখানে খনিজ দ্রব্য প্রভৃতির সমাবেশ দেখিয়া ও শিল্প প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা উপলব্ধি করিয়াই এই কথা বলিয়াছেন। সেখানকার জল, জঙ্গল, পাহাড় যেমন একদিকে সেখানকার দৃশ্য স্বাস্থ্য মনোরম করিয়াছে, আর একাদিকে সে সকল প্রাকৃতিক বস্তু জনকল্যাণে নিয়োজিত করিতে পারিলে সেগুলি সমগ্র ভারতবাসীর অশেষ মঙ্গল সাধন করিতে পারিবে। প্রকৃতি-দত্ত সম্পদ মানুষের কাজে ব্যবহারের ব্যবস্থা করাই বৈজ্ঞানিকের আসল কাজ। বৈজ্ঞানিক ভাটনগর কাশ্মীরকে সেই দৃষ্টি দিয়া দেখিয়াছেন ও সকলকে এ বিষয়ে অবহিত করিয়াছেন। আমরা এ জন্য তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। তাঁহার কাশ্মীর গমনের কয়দিন পরে গত ১লা নভেম্বর শ্রীনগরে কাশ্মীর জাতীয় সম্মিলনের ওয়ার্কিং কমিটীতে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হইয়াছে—ভারতের সহিত কাশ্মীরের সম্পর্ক স্থায়ী ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। কোন শক্তিই এখন বলপূর্বক এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত উল্টাইয়া দিতে পারিবে না। কাশ্মীর আজ ভারতের অংশ—কাজেই একদিকে ভারতগভর্ণমেণ্ট যেমন কাশ্মীর বাসীর উন্নতির সকল প্রকার চেষ্টা করিবে, অন্যদিকে তেমনই কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ব্যবস্থা করিবে। সে জন্যই গত পূজার সময় যাহাতে ভারতীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিরা দলে দলে কাশ্মীরে যাইবার সুযোগ পান, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আমাদের বিশ্বাস, ইহার ফলেই কাশ্মীরকে প্রকৃত সম্পদপ্রদ ভূস্বর্গে পরিণত করা সম্ভব হইবে।

কাম্বোডিয়ায় শ্রীনেহরু—

শ্রীজহরলাল নেহরু গত ৩১শে অক্টোবর সকালে কাম্বোডিয়ার রাজধানী নমপেন সহরে উপস্থিত হন। সেদিন তথায় রাজার ৩৪শ জন্মদিন উপলক্ষে বৌদ্ধ-উৎসব ছিল। সকালেই তিনি কম্বোডিয়ার প্রধান মন্ত্রী পেন নাটথের সহিত আধ ঘণ্টা আলোচনা করেন। আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বিরতি কমিশনের কাজে তথায় যে ভারতীয় সৈন্যদল রহিয়াছে, শ্রীনেহরু তাহাদের বাসস্থানে যাইয়া তাহাদের সহিত কথা বলেন—তিনি বলেন—কাম্বোডিয়ার সকল জিনিষের মধ্যেই তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির রূপ দেখিয়াছেন। সন্ধ্যায় যুদ্ধবিরতি কমিশনের সভাপতির সহিত তিনি এক প্রীতি-সম্মিলনে মিলিত হন—তথায় থাই মন্ত্রী মিঃ চামরাসের সহিত দেখা হয়—চামরাস নেতাজী সুভাষের আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টে কাজ করিয়াছেন। রাত্রিতে রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন। রাজার নাম নরোডাম শিহনউক। ১লা নভেম্বর তিনি সিয়েমরিপ নামক স্থানে কাম্বোডিয়ার প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখিতে যান। সেখান হইতে ফিরিয়া তিনি রেঙ্গুন হইয়া কলিকাতা যাত্রা করেন।

পাকিস্তানে নবযুগ—

ডাক্তার খাঁ সাহেব সীমান্ত-গান্ধী খাঁ আবদুল গফর খাঁর ভ্রাতা। ভারত বিভাগের পর উভয় ভ্রাতাকেই পাকিস্তানী সরকার কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তৎপূর্বে ডাক্তার খাঁ সাহেব সীমান্তের কংগ্রেস-নেতা ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। গত ২৮শে অক্টোবর পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল মিঃ গোলাম মহম্মদ ডাঃ খাঁ সাহেবকে করাচীতে ডাকিয়া পাকিস্তানী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় অন্যতম সদস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। পাকিস্তানের ইতিহাসে ঐ দিন নবযুগের আরম্ভ হইল। ডাঃ খাঁ সাহেবকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিযুক্ত করাই তাহার সূচনা।

ভারত পাকিস্তানে রেল—

স্বাধীনতা লাভ তথা ভারত বিভাগের পর হইতে পশ্চিম-পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সরাসরি রেল চলাচল বন্ধ ছিল। গত ২৮শে অক্টোবর ৭ বৎসর পরে প্রথম অমৃতসর হইতে লাহোর যাইবার রেল চলাচল আরম্ভ হইয়াছে। বেলা ১০টায় ২২৩ জন যাত্রী লইয়া প্রথম গাড়ী অমৃতসর হইতে লাহোর গিয়াছে। সীমান্ত-নেতা ডাঃ খাঁ সাহেবকে

কেন্দ্রে মন্ত্রিত্ব দান ও অমৃতসর লাহোর রেল চলাচল আরম্ভ—সত্যই অভিনব ঘটনা। আমাদের বিশ্বাস, ক্রমে ভারত ও পাকিস্তানে প্রকৃত হৃদ্যতা বর্দ্ধিত হইবে।

দালাইলামা ও শ্রীনেহরু—

তিব্বতের প্রধানদ্বয় দালাইলামা ও পাঞ্চেন লামা উভয়েই এখন পিকিং সহরে (চীন) রহিয়াছেন। গত ২৭শে অক্টোবর তাহারা উভয়ে শ্রীজহরলাল নেহরুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। পূর্বে দালাই লামা ও পাঞ্চেন লামার মধ্যে সদ্ভাব ছিল না—এখন উভয়ে একত্র হইয়া তিব্বতের উন্নয়ন কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, সাক্ষাতের সময় তিব্বতীয় ও ইংরাজি ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি সঙ্গে ছিলেন। তিব্বতের উন্নতির জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে লামাদ্বয় সে বিষয়ে শ্রীনেহরুর সহিত পরামর্শ করিয়াছেন। তিব্বতের সহিত ভারতের সম্বন্ধ ও যাহাতে বন্ধুত্বপূর্ণ হয়, সে বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল।

দার্জিলিংয়ে পর্বতারোহণ শিক্ষালয়—

গত ৪ঠা নভেম্বর সকালে দার্জিলিং বার্চ হিলে প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া পর্বতারোহণ বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই ধরণের প্রতিষ্ঠান ভারতে এই প্রথম। উৎসবে পশ্চিম-বঙ্গের রাজ্যপাল ডাক্তার হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রধান-মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। তেনজিং কর্তৃক এভারেষ্ট বিজয়ের স্মৃতি-রক্ষার জন্য এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। এখানে শিক্ষালাভ করিয়া বহু নূতন তেনজিং বাহির হইবে। ভিত্তি স্থাপনের পর পর্বতারোহণ কৌশল দেখান হইয়াছিল। আপাততঃ দার্জিলিং রায় ভিলায় একটি ভাড়াটে বাড়ীতে বিদ্যালয়ের কাজ হইবে—শ্রীনেহরু সে গৃহে যাইয়া তাহার উদ্বোধন করিয়াছেন। ভারতের এই প্রথম পর্বতারোহণ বিদ্যালয় দেশের কল্যাণ সাধন করুক ইহাই আমরা কামনা করি।

কবিতা

"ভাস্কর"

তুমি নাকি থাক সুনীল আকাশে
তারকার কুঞ্জবনে
তুমি নাকি থাক কোটি ঊর্মিময়
গহন অর্ণব সনে।
তুমি নাকি থাক মলয় সমীরে
জোছনায় ভেজা রাতে
তোমার নূপুরধ্বনি ভেসে আসে
শ্যামল প্রান্তর হ'তে।
তুমি নাকি থাক নিস্তব্ধ ছায়ায়
রবিবাসরের অলস সন্ধ্যায়।
প্রশান্ত উষায় গোধূলির রাগে
তোমার হাসিটি ছড়ায়ে,
মুগ্ধা তরুণীর আঁখির পলকে
তোমার সুষমা বিছায়ে।
তোমার অপূর্ব সুর নাকি বাজে
পেলব কুসুম সাজে,
চিন্তাহীন দুঃখহীন জীবনের
রঙীন স্বপন মাঝে।

চিরদিন আমি হেরেছি তোমারে
সকল ভুবন মাঝে,
অমা-অন্ধকারে তোমারি প্রতিমা
আর ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সাঁঝে।
মেঘের নিনাদ অশনি-গর্জন
তোমারি অরূপ রূপ,
তোমার হাসিতে রেখেছ আবরি,
সকল দুখের কূপ।
অমৃত ঢেলেছ গরলের মাঝে
কোমল করেছ কঠিনে,
ভুলায়ে তোমার মোহিনী মায়ায়,
ঢালি' রসধারা পাতায় পাতায়,
জীবনবিটপী মধুর করিয়া
রেখেছ রজনী দিনে।
নহ তুমি শুধু সুখবিলাসিনী
দখিন হাওয়ার রাণী,
বন্ধুর জীবন পথে তুমি বন্ধু
অমৃত তোমার বাণী।

সুমিতার সাধনা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

চতুর্থ দৃশ্য

সঞ্জীবের গ্রাম। সঞ্জীব স্মৃতিভবনের সম্মুখে সুসজ্জিত মণ্ডপ। মণ্ডপের উপরে পুষ্পমাল্য শোভিত সঞ্জীবের ছবি। মণ্ডপের মধ্যে উপবিষ্ট দেশনেতা পরমেশ্বর, আরও কয়েকজন ভদ্রলোক। সুমিতার বড় ভাই সুরেন ও বউদিদি প্রতিমাও বসিয়া আছেন। একপাশে অমর অন্যপাশে সুমিতা। নরেন ও জয়া অনুপস্থিত। কয়েকটি ছোট মেয়ে উদ্বোধন সঙ্গীত গাহিতেছে।

গান

হে বীর পূর্ণ কর।
তোমার আসন শূন্য আজি—
হে বীর পূর্ণ কর।

গান শেষ হইলে অমর উঠিয়া বসিল

অমর। উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ! আজ সঞ্জীব স্মৃতিমন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। সঞ্জীবচন্দ্র—আমাদের সঞ্জীবচন্দ্র—আমাদের গ্রামের মৃতপ্রায় জীবনে সঞ্জীবনী শক্তির আধারের মত একদিন আবির্ভূত হয়েছিলেন। সঞ্জীবদা'র সঞ্জীবনী শক্তির স্পর্শ এ গ্রামের প্রতিটি মানুষের বুকে আজও মাখানো রয়েছে। এ গ্রামের ধূলায় মাটিতে জলে আজও তার ধারা বেয়ে চলেছে। এ প্রতিষ্ঠান সঞ্জীবদা'ই নিজে হাতে গড়েছিলেন। তাঁর চোখে ছিল অমৃতের স্বপ্ন। এ স্বপ্ন দেখতেন তিনি তাঁর সেই কৈশোর থেকে। সেই কৈশোরে তিনি আমাদের ডেকে সামান্য কয়েকটি বালতী কিনে—আগুন নেভাবার কাজ নিয়ে সুরু করেছিলেন এই কাজ। এ গ্রামের লোকের কাছে সেই ইতিহাস সুপরিচিত, সুবিদিত। তার পুনরুক্তি আমি করব না। তবু একদিনের কথা না বলে পারছি না। প্রথম যৌবনে—একদিন গ্রামপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আপন মনে আবৃত্তি করছিলেন—

এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা.
এই সব ভগ্ন বক্ষে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।

আবৃত্তি করতে করতে হঠাৎ সঞ্জীবদা নতজানু হয়ে বসে নদীর চরের ধুলোর মাথাটা লুটিয়ে দিলেন। আমি অবাক হয়ে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—এ কি হ'ল সঞ্জীবদা'! সঞ্জীবদা বললেন—সংকল্প গ্রহণ করলাম ভাই। জীবনের সকল শক্তি সকল সাধ সকল আশা সব আকাঙ্ক্ষা ঢেলে দিলাম এই গ্রামের মাটিতে। সে সংকল্প একদিনের জন্যে তিনি বিস্মৃত হন নি। জীবনে সঞ্জীবচন্দ্র কৃতী ছাত্র ছিলেন। কৃতিত্ব গৌরবে—রাজকর্ম্ম তাঁর পক্ষে ছিল সহজলভ্য কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেন নি। তিনি দেশসেবায় কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন, কেন্দ্র থেকে তাঁকে আকর্ষণ করেছিল—তাঁকে চেয়েছিল, নেতৃত্বের আসন তাঁকে আহ্বান জানিয়েছিল—কিন্তু এই গ্রামের জন্য তাও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি বিবাহ করেছিলেন—দেশবিখ্যাত ধনী আমাদেরই গ্রামের মণীন্দ্র ঘোষাল মশায়ের মেয়েকে। দেশবিখ্যাত ধনী বিদগ্ধ ব্যক্তি, রাজধানীর শ্রেষ্ঠ নাগরিক সমাজে তাঁর স্থান হয়েছিল। তাঁর ছেলেরা নগরের মানুষ, বিদেশ প্রত্যাগত। তাঁর মেয়ে—কিন্তু আলাদা মানুষ। তিনি সঞ্জীবচন্দ্রের মধ্যে এই ব্রতধারী সন্ন্যাসীর সন্ধান পেয়েই গিরিরাজ কন্যা গৌরীর মত তাঁর কণ্ঠে দিয়েছিলেন মালা। নগর জীবন—বিলাস স্বাচ্ছন্দ্য সব বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছিলেন এখানে—স্বামীর ব্রতের অংশ নিয়ে। কালযুদ্ধ এসে সঞ্জীবদাকে আমাদের কেড়ে নিয়ে গেল। যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষাই তাই—যা কিছু শ্রেষ্ঠ—যা কিছু মহৎ—যা কিছু সুন্দর তাকে গ্রাস করেই তার দানবিক উল্লাস। আমাদের গ্রামের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে সে গ্রাস করেছে। কিন্তু তাতেও সঞ্জীবচন্দ্রের সঞ্জীবনী তপস্যাকে সে ধ্বংস করতে পারে নি। তপস্বী নাই—কিন্তু তপস্বিনী আছেন। স্বামীর তপস্যায় তপস্বিনী সঞ্জীবচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী—আমাদের গ্রামের কন্যা—আমাদের গ্রামের বধূ তিনি। তাঁর সর্ব্বস্ব দিয়ে আজ তিনি সঞ্জীব স্মৃতি মন্দির গড়ে তুলেছেন। তাঁর পৈত্রিক অর্থ তিনি দান

করেছেন। নিজের জীবন তিনি উৎসর্গ করেছেন এই কর্ম্মে। আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে, বিদেশী শাসক ও শোষকেরা আজ দেশ ছেড়ে চলে গেছে। সম্মুখে বহু বিপর্য্যয়। সে বিপর্য্যয় যেন তমসার মত জীবনের আকাশ আচ্ছন্ন ক'রে ঘনিয়ে উঠছে। এরই মধ্যে নানা দিকে অনেক সংগঠনও আরম্ভ হয়েছে। সমস্ত কিছুর মধ্যে আজ এই তপস্যা—এই সর্ব্বত্যাগিনীর তপস্যার মত তপস্যা দুর্লভ। এই তো সাক্ষাৎ অমৃত। এই তো সঞ্জীবনী। এরই প্রতিষ্ঠার মধ্যেই তো মৃত উঠবে বেঁচে, বেজে উঠবে অমৃতের গান। আজ এই প্রতিষ্ঠা যজ্ঞে পৌরোহিত্য করবেন—বরেণ্য দেশ নেতা—পণ্ডিত এবং সঞ্জীবচন্দ্রের গুরু। তিনি তাঁর সুগভীর মর্ম্মবেদনাকে সহ্য করেও এসেছেন প্রিয় শিষ্যের স্মৃতির প্রতি আশীর্ব্বাদ জানাতে; তিনিই এ যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়ে বলবেন—পূর্ণ হ'ল যজ্ঞ, প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত হল অমোঘ প্রাণশক্তি। তিনি আমার গুরুর গুরু। সঞ্জীবচন্দ্র শুধু আমার জ্যেষ্ঠই নন—তিনি আমার গুরু। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এবং তাঁর গুরু—আমার গুরুর গুরুর চরণে প্রণাম নিবেদন ক'রে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

পরমেশ্বর। কালী কালী বল মন। কালী কালী!

দেশনেতা। সাধু সাধু!

প্রায় পরমেশ্বরের সঙ্গে একসঙ্গেই সাধুবাদ দিলে

উপস্থিত জনতা করতালি দিয়া বক্তা অমরকে অভিনন্দিত করিল। সভায় উপবিষ্টা সুমিত্রা মাথা হেঁট করিয়া বসিয়াছিল। তাহার মুখ দেখা যাইতেছিল না। তাহার স্মৃতিপটে অতীত আজ নূতন করিয়া ভাসিয়া উঠিয়াছে। হৃদয় আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। চোখ দিয়া দুটি অবাধ্য জলের ধারা নামিয়া আসিয়া অনর্গল ঝরিয়া পড়িতেছিল

অমর। এইবার সভাপতি মহোদয়কে মাল্যভূষিত করব আমরা। এবং চন্দন তিলক দিয়ে বরণ করব তাঁকে।

মালা লইয়া দেশনেতার গলায় পরাইয়া দিল

পরমেশ্বর। (মাল্যদানের অবসরের মধ্যে সুমিত্রার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন) সুমিত্রা! দিদি!

সুমিত্রা। (অবনত মুখেই চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল) দাদু!

পরমেশ্বর। কাঁদছিস ভাই?

সুমিত্রা। নিজেকে সামলাতে পারছি না দাদু!

পরম। (তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন) কালী কালী বল ভাই। কালী বলে মুছে ফেল চোখের জল! আজ তো তোর কাঁদলে চলবে না। কালী ব'লে—কি বলে—আজ তোর কাঁদবার দিনও নয়। শিবের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে কালী বাপের বাড়ী গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলেন—শিবনিন্দা শুনে দেহত্যাগ করে। তারপর জন্ম নিলেন গৌরী হয়ে। ওরে দেহত্যাগ তোর হয়ে গেছে। আজ তোর পুনর্জন্ম। সঞ্জীব নাই—তার তপস্যা রয়েছে; দেহ নাই তার আত্মা রয়েছে। তার সঙ্গে আজ কালী কালী বলে নতুন ক'রে মিলন হবে। কাঁদলে চলবে কেন? কালী কালী বল! কালী কালী।

ইতিমধ্যে মাল্যচন্দন দান হইয়া গেল। সভাপতি উঠিয়া দাঁড়াইলেন

সভাপতি। আপনারা আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার গ্রহণ করুন। আমাদের শাস্ত্রে বলে—জীবনের পরম কাম্য হ'ল—পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম। অর্থাৎ পিতা গুরু এঁরা কামনা করেন—আমাদের পুত্র শিষ্য আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি অর্জ্জন করুক। মানুষের সাধনার যেন বর্ত্তমানেই ছেদ না পড়ে; সে এগিয়ে চলুক। আর পিতা গুরু—আমরা সেই গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে ধন্য হই। আমাদের চেয়ে সাধনায় সিদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ আমাদের পুত্র ও শিষ্যের শ্রদ্ধায় আমরা জীবনের শ্রেষ্ঠ স্বর্গে উপনীত হই। আপনাদের সঞ্জীব ছিল আমার তেমনি প্রতিভাবান শিষ্য। আমি তার অধ্যাপক আমি তার রাজনীতিক জীবনেরও অন্যতম উপদেষ্টা—গুরু। আমার ভাগ্য আর এই পৃথিবীর মর্ম্মন্তুদ মৃত্যুলীলার নিষ্ঠুর খেলার চক্রান্তে—আমাকেই আসতে হয়েছে—সেই শিষ্যের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে। অর্জ্জুনকে অভিমন্যুর তর্পণ করতে হয়েছিল। (সভাপতি থামিলেন।)

পরমেশ্বর। কালী কালী বল মন। কালী কালী!

সভাপতি। আমার দুর্ভাগ্য, আপনাদের দুর্ভাগ্য, দেশের দুর্ভাগ্য! কিন্তু কর্ত্তব্য করতেই হবে। শোক নয়। শোক-কাতর স্মৃতিকে—অশোকে প্রতিষ্ঠিত করতে আমরা সমবেত হয়েছি। আজ আমরা নূতন করে সঞ্জীবকে পাবার যজ্ঞানুষ্ঠানে রত হয়েছি। এ পাওয়া হারাবে না। এ পাওয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করে অমৃতের মধ্যে পাওয়া। সেই পাওয়ার যজ্ঞে—প্রথমেই আমরা মাল্য চন্দনে বরণ করব অমৃত সাধক সঞ্জীবচন্দ্রের স্মৃতিকে।

কর্ম্মসূচীতে দেখছি সভাপতি সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করবেন। কিন্তু এ বরণ আমি না ক'রে—যোগ্যতর—আমাপেক্ষা এবং এ সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও যোগ্যজনকে দিয়ে করাতে চাই। তপস্বীর তপস্যাকে বরণ করবেন তপস্বিনী। মৃত সত্যবানকে অমৃতে সঞ্জীবিত করবেন সাবিত্রী। রাত্রির অন্ধকার পার হয়ে সূর্য্যকে বরণ করবেন—প্রস্ফুটিত পুষ্পের অর্ঘ্য দিয়ে প্রণাম করবেন চির-প্রদক্ষিণ-রতা ধরিত্রী। সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিকৃতিতে মাল্যচন্দন দান করবেন তাঁর সহধর্ম্মিণী—সুমিতা দেবী।

বক্তৃতার মধ্যে সুমিতা বারবার চঞ্চল হইয়া উঠিয়া বলিবার চেষ্টা করিতেছিল—না—না—সে পারিবে না; সে পারিবে না। কিন্তু কিছুতেই সে বলিতে পারিতেছিল না। বক্তৃতা শেষ হইবামাত্র সে—বলিয়া উঠিল—

সুমিতা। আমি! আমি! আমি—আমাকে ক্ষমা করুন—আমি—পারব না—পারব না।

পরমেশ্বর! কালী বলে তোকে পারতেই হবে ভাই। না বললে কি চলে? ওঠ! নে ধর মালা। ধর আমার হাত ধর।

সুমিতা। কিন্তু আমার যে সহস্র অপরাধ! আমি—আমিই যে তাঁর—

সভাপতি। তুমি তাঁর সহধর্ম্মিণী। ওঠ মা। সভার মধ্যে সভাপতির আদেশ অমান্য করতে নেই। ওঠ!

অমর। (আগাইয়া আসিল) উঠুন বউদি!

প্রতিমা ও সুরেন। (উঠিয়া আসিয়া পিঠের কাছে দাঁড়াইল) সুমিতা!

সুমিতা এবার কোন ক্রমে আত্মসংবরণ করিয়া উঠিল। প্রতিমা তাহার হাতে মালা তুলিয়া দিল। সে ধীরে ধীরে ছবির দিকে অগ্রসর হইল। অমর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। প্রতিমাও চলিল। ঠিক এই সময়েই প্রবেশ করিল—নরেন তাহার সঙ্গে সঞ্জীব বা রঞ্জিত মুখার্জ্জীর প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ গুপ্ত।

নরেন। সুমিতা!

সুমিতা চমকিয়া উঠিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। সকলেই চকিত হইল। সুরেন বিরক্ত হইল। সে তিক্তস্বরেই বলিল

সুরেন। নরেন!

অমর। (আগাইয়া আসিয়া বলিল) কি চাই আপনার নরেনবাবু? অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় এই সভার মধ্যে আসতে আপনার লজ্জা হল না?

নরেন। না রে বাবা না। কিসের লজ্জা কিসের দৈন্য কিসের শঙ্কা কিসের ভয়?—এই ভদ্রলোক এসেছেন। with a great new—an astounding news—সঞ্জীব বেঁচে আছে। He has come back. ফিরে এসেছে সে! A rich man—বহু লক্ষ টাকার মালিক হয়ে সে ফিরে এসেছে! speak out, gentleman—speak out please.

গুপ্ত। আমি মিঃ সঞ্জীব মুখার্জ্জীর প্রাইভেট সেক্রেটারী। তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন।

পরমেশ্বর। জয় কালী! কালী আনন্দময়ী! কালী আনন্দময়ী!

সুরেন। কোথায়—কোথায় সঞ্জীব?

গুপ্ত। তিনি কলকাতায়—বালীগঞ্জ মণিভবনে রয়েছেন।

নরেন। মণিভবন—সে কিনেছে—মাড়োয়ারীর কাছ থেকে ডবল টাকা দিয়ে কিনেছে।

গুপ্ত। এই তাঁর চিঠি। মিসেস মুখার্জ্জীর জন্য গাড়ী পাঠিয়েছেন।

নরেন। A very big Car—একেবারে নতুন।

সুমিতার হাত হইতে মালাটা পড়িয়া গিয়াছিল। সকলেই আগন্তুকের দিকে তাকাইয়াছিল; সেই অবসরে সে নতজানু হইয়া—ছবি যে টেবিলখানির উপর রক্ষিত ছিল—সেই টেবিলের পায়া ধরিয়া যেন মুখ লুকাইয়াছিল।

পরমেশ্বর। চল ভাই, সুমিতা—কালী কালী বলে—। এ কি মালাখানি ফেলে দিলি কেন? তুলে নে—চল—মালা পরিয়ে দিবি তাকে। সুমিতা! সুমিতা! (সুমিতাকে স্পর্শ করিয়া) এ কি? সুমিতা!

প্রতিমা। এ কি? সুমিতা অজ্ঞান হয়ে গেছে! জল—জল!

পরমেশ্বর। কালী আনন্দময়ী। কালী আনন্দময়ী। এত আনন্দ সইতে পারে নি। ভয় নেই। কালী ব'লে ও এখুনি উঠবে।

নরেন। সঞ্জীব is great, দাদাকে পঞ্চাশ হাজার টাকার একখানা চেক পাঠিয়েছে, তোমার আর আমার নামে। বাবা যে টাকাটা সুমিতাকে দিয়েছিলেন—সেইটে—সেইটে সে ফিরে দিয়েছে। (ক্রমশঃ)

সোভিয়েট দেশে

শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

হোটেলে ফিরে এসে জলযোগ সেরে বিকালে আবার আমরা সদলে বেরুলুম—মস্কোর 'লাল-চত্বরে' (Red Square) লোকান্তরিত সোভিয়েট রাষ্ট্র-নায়ক লেনিনের 'Mausoleum' বা 'সমাধি-মন্দির' দর্শনে। মনীষী লেনিনের সমাধি-প্রান্তে ভারতবাসীদের তরফ থেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য-নিবেদনের উদ্দেশ্যে, আমরা পূর্বাহ্নেই ওদেশী সহচর-বন্ধুদের অনুরোধ জানিয়েছিলুম—টাট্‌কা ফুলের মালার ব্যবস্থার জন্য। আমাদের অনুরোধ-মত ওদেশী বন্ধুরাও ইতিমধ্যে সে ব্যবস্থা করেছিলেন যথোপযুক্ত ভাবেই।



লেনিনের সমাধি মন্দির—কাচের স্বচ্ছ-শবাধারে রক্ষিত লোকান্তরিত সোভিয়েট রাষ্ট্রগুরুর নশ্বর দেহ

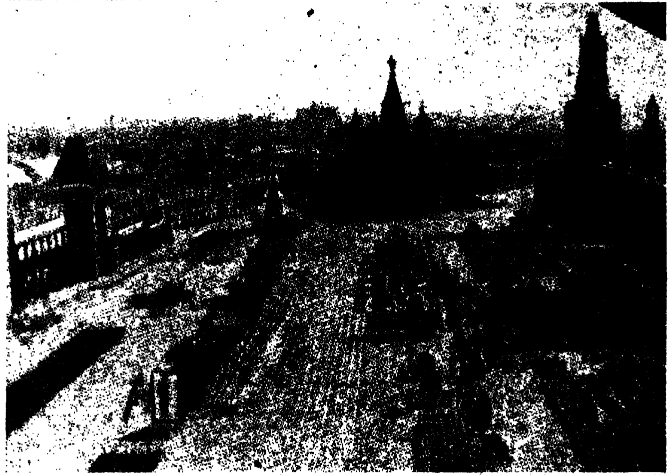
'হোটেল স্যাভয়' থেকে লাল-চত্বরে রচিত লেনিনের মর্ম্মর সমাধি-মন্দির' অল্প দূরের পথ। আমাদের যাতায়াতের জন্য সরকারী মোটর-গাড়ীর ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও, এ পথটুকু হেঁটে যাওয়াই আমরা সমীচীন বোধ করলুম। পথে বেরিয়ে 'লাল-চত্বরের' কাছাকাছি 'মস্কোভা' নদীর তীরে প্রাচীন 'ক্রেমলিন-দুর্গপ্রাসাদের পাশে সুদৃশ্য-বিশাল 'আলেক্‌জান্দ্রোভ্‌-উদ্যানের', (Alexandrov Gardens) সামনে এসে পৌঁছুতেই নজরে পড়লো—লেনিনের 'সমাধি-মন্দির' দর্শনাকাঙ্ক্ষীদের ভীড়! মৌন-আগ্রহে অসংখ্য ওদেশী লোক পথে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে...সবাই অপেক্ষা করছেন—'সমাধি-মন্দিরে' প্রবেশের জন্য! দেখে অবাক হলুম—এমন বিপুল জনসমাগম, অথচ কোথাও এতটুকু হুড়োহুড়ি, ঠেলাঠেলির হট্টগোল, কিম্বা বিশৃঙ্খলতার চিহ্ন নেই। পরে জেনেছি এমনি অপরূপ স্থৈর্য্য আর সুশৃঙ্খলভাবে ওদেশের ভক্ত-অনুরাগী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার দল নিজের নিজের পালা-অনুসারে লেনিনের 'সমাধি-মন্দিরে' প্রবেশ করে পরলোকগত রাষ্ট্র-নেতার পুণ্য-বেদীমূলে অন্তরের সভক্তি-প্রণাম জানানোর উদ্দেশ্যে সাগ্রহ-প্রতীক্ষায় গ্রীষ্ম, বর্ষা, এমন কি শীতকালে ওদেশের প্রচণ্ড তুষার-পাত উপেক্ষা করেও নিত্যদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা মস্কোর 'লাল-চত্বরে' দাঁড়িয়ে থাকেন। সোভিয়েট দেশবাসীদের কাছে লেনিনের অমর-স্মৃতি যে কতখানি প্রিয়, পবিত্র এবং মহান্—তার প্রকৃষ্ট-পরিচয় মেলে মস্কোর 'লাল-চত্বরে' সোভিয়েট-রাষ্ট্রগুরুর মর্ম্মর সমাধি-সৌধের সামনে নিত্য-প্রতীক্ষমান দর্শনাকাঙ্ক্ষীদের বিপুল ভীড় দেখলে।

সোভিয়েট-সহচর বন্ধুদের সংগৃহীত পুষ্প-মাল্যের সম্ভার হাতে নিয়ে অপেক্ষমান দর্শনাকাঙ্ক্ষীদের ভীড় পার হয়ে সদলে এগিয়ে চললুম আমরা লেনিনের 'সমাধি-মন্দিরের' দিকে। ভীড়ের মাঝে ছিলেন মস্কোর 'সেন্ট্রাল ডকুমেণ্টারী ফিল্ম ষ্টুডিওর' (Central Documentary Film Studios) চলচ্চিত্র-শিল্পীর দল—আমাদের এগুতে দেখে তাঁরা ক্যামেরা নিয়ে সোৎসাহে ছবি তুলতে সুরু করে দিলেন। পথে অপেক্ষমান ওদেশী-জনতার অনেকেই আমাদের বিদেশী-অতিথি হিসাবে, সাদর-অভিবাদন জানালেন। তাছাড়া 'সমাধি-মন্দিরের' দ্বার-প্রান্তে যে-সব দর্শনাকাঙ্ক্ষীরা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, পুষ্প-মাল্য হাতে

আমাদের এগুতে দেখে তাঁরাও ভারতীয়-অভ্যাগতদের সম্মানার্থ বিনা-প্রবেশ অনুরোধে পথ ছেড়ে দিলেন!

লেনিনের 'সমাধি-মন্দিরটি' অপরূপ বিচিত্র! ক্রেমলিন-দুর্গ-প্রাসাদের দুর্ভেদ্য-প্রাচীরের বাইরে, সুউচ্চ স্পাস্কায়া (Spasskaya Clock Tower) ঘড়ি-ঘরের ঠিক নীচেই সুপ্রসিদ্ধ 'Red Square' বা 'লাল-চত্বর' সড়কের দক্ষিণে চৌকোনো-আকারের 'পিরামিড'-ছাঁদের অভিনব-বিরাট মর্ম্মর-সৌধ...আগাগোড়া চকচকে পালিশ-করা লাল, কালো, আর ছাই রঙের 'গ্রেনাইট্' পাথর দিয়ে গড়া! ১৮২৪ সালের ২১শে জানুয়ারীতে মহাপ্রয়াণের পর এই মর্ম্মর-মন্দিরের নিভৃত-কক্ষে সযত্নে রাখা হয়েছে 'কমিউনিজ্‌মের' মন্ত্রগুরু সোভিয়েট জন-নায়ক-লেনিনের নশ্বর দেহাবসান। আগে এ 'সমাধি-মন্দিরটির' চেহারা ছিল অন্য ধরণের, পরে লেনিনের সুযোগ্য-শিষ্য সম্প্রতি-লোকান্তরিত সোভিয়েট-রাষ্ট্রনায়ক মার্শাল ষ্টালিনের নির্দ্দেশে ওদেশী স্থাপত্য-শিল্পী স্চুসেভ্ (Shuchusev) এবং ইয়াকোভ্‌লেভের (Yakovlev) যুক্ত-প্রচেষ্টায়, সোভিয়েট-সরকারের সুব্যবস্থায় এই স্মৃতি-সৌধটি আধুনিক-রূপে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে। সমাধি-সৌধের অভ্যন্তরে কাঁচের বিরাট-সুসজ্জিত স্বচ্ছ-আধারে সোভিয়েট দেশবাসীরা পরম-শ্রদ্ধায় লেনিনের নশ্বর-দেহটিকে ওদেশের সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ্ প্রোফেসর জবারস্কীর (Prof. Zbarsky) সুনিপুণ রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও বিচিত্র ঔষধের সাহায্যে সম্পূর্ণ অক্ষয়-অবিকৃত অবস্থায় সযত্নে সাজিয়ে রেখেছেন। [সম্প্রতি-লোকান্তরিত সোভিয়েট রাষ্ট্রনায়ক মার্শাল ষ্টালিনের দেহাবশেষও ইদানীং লেনিনের এই 'সমাধি-মন্দিরের' প্রকোষ্ঠে অনুরূপ কাঁচের স্বচ্ছ-আধারে সযত্নে রক্ষিত হয়েছে...দীক্ষা-গুরুর অন্তিম-শয্যার পাশেই স্থান মিলেছে তাঁর সুযোগ্য-শিষ্যের।] বিগত বিশ্ব ব্যাপী দ্বিতীয় মহাসমরের (World War II--1939-45) সময় হিট্‌লারের দুর্দ্ধর্ষ নাৎসী-বাহিনী যখন সারা সোভিয়েট দেশের বুকে তাণ্ডবের বিভীষিকা জাগিয়ে মস্কো-রাজধানীর দিকে দুরন্ত অভিযান চালায়, তখন নির্ম্মম জার্ম্মান-শত্রুদের যথেচ্ছচারিতার দাপট থেকে দেশের শ্রেষ্ঠ স্মৃতি-সম্পদ রক্ষাকল্পে মার্শাল ষ্টালিন, অভিনব রাসায়নিক-প্রক্রিয়ায় রক্ষিত লেনিনের দেহাবশেষটি 'লাল-চত্বরের' এই "সমাধি-মন্দির' থেকে সরিয়ে অন্যত্র স্থানান্তরিত করেন। জার্ম্মান-যুদ্ধ জয়ের পর, সোভিয়েট-রাজ্যে শান্তি-সুপ্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই মার্শাল ষ্টালিন দেশাভ্যন্তরের গুপ্ত-ঘাঁটি থেকে রাষ্ট্রগুরু লেনিনের দেহাবশেষটিকে আবার সযত্নে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন ক্রেমলিন-দুর্গ-প্রাসাদের পাশে 'লাল-চত্বরের' উপর রচিত বিরাট-অভিনব এই মর্ম্মর-সৌধের নিরালা-প্রকোষ্ঠে!

'সমাধি-মন্দিরের প্রবেশ-পথ পার হয়েই আগাগোড়া পাথরে-গাঁথা একটি সুদৃশ্য-বিরাট 'হল্' (Hall) বা 'অঙ্গন'...কোনো রকম সাজ-সজ্জা, বা পর্দা-পতাকার আড়ম্বর নেই—চারিদিক নিরাভরণ অথচ আগাগোড়া অপরূপ সারল্য-সৌন্দর্য্যে গম্ভীর! 'হলে'র প্রান্ত-সীমা থেকে পালিশ করা চক্‌চকে-কালো-মর্ম্মরের চওড়া সিঁড়ি নেমে গেছে নীচে। সিঁড়ি দিয়ে নেমেই সুপ্রশস্ত চৌকোনো-ছাঁদের পাথর-বাঁধানো দালান...দালানের মাঝখানে বিরাট নিরাভরণ মর্ম্মর-প্রকোষ্ঠ। সেই মর্ম্মর-প্রকোষ্ঠের ঠিক মাঝখানে স্ফটিক-পাথরের বৃহৎ বেদী...

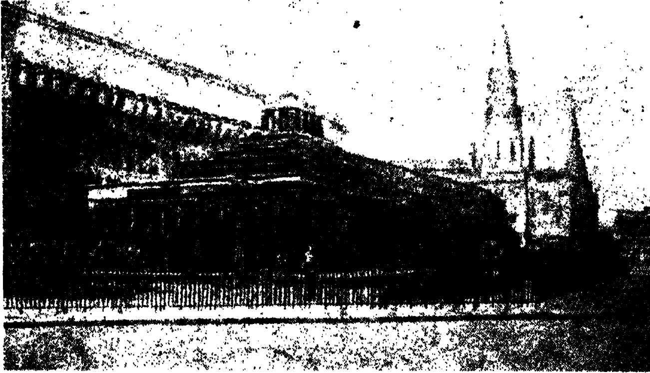


মস্কোর লাল চত্বরের উপর লেনিনের অধুনা কালের সমাধিমন্দির। চত্বরের সামনে জাতীয় উৎসব-দিবসে সোভিয়েট জনগণের শোভাযাত্রা

বেদীর উপরে কাঁচের তৈরী বিরাট এক স্বচ্ছ-আধারে সযত্নে রাখা রয়েছে লেনিনের প্রাণহীন দেহ! দেহের কোথাও এতটুকু বিকৃতি বা পচনের চিহ্নমাত্র নেই...এমন কি মুখের বা হাতের চামড়াতেও এতটুকু সংকোচনের রেখা চোখে পড়ে না...মাথার কেশ, চোখের ভ্রূ-যুগল কিম্বা দাড়ী-গোঁফ পর্য্যন্ত হুবহু বজায় রয়েছে—বেমালুম অক্ষত-অবস্থায়! দেহের চামড়ার রঙও রয়েছে অবিকৃত, অমলিন! মনীষী লেনিনকে চাক্ষুষ-দেখার সৌভাগ্য ঘটেনি আমাদের কারো, তাঁকে এ যাবৎ দেখে এসেছি আমরা কাগজে-মুদ্রিত নানান্ ছবির মারফৎ...এবারে সোভিয়েট-সফরে এসে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলুম তাঁর প্রাণহীন রূপ। কাঁচের স্বচ্ছ-আধারের অভ্যন্তরে অনাড়ম্বর শয্যায় অতি-সাধারণ গাঢ়-বাদামী রঙের একটি পশমী কোট-পাৎলুন, আর সুতীর কামিজ রয়েছে তাঁর পরণে...চোখ

দুটি মুদ্রিত—যেন গাঢ় ঘুমের আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে আছেন…হাত দুখানি বুকের উপর রাখা—পরম শান্তিতে বিশ্রামরত-ভাব!

সমাধি-মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারের দু'পাশে সদা-প্রহরারত দুই সোভিয়েট-শান্ত্রী…তাঁদের পার হয়ে ভিতরের সমাধি-বেদীর প্রকোষ্ঠে। সুশৃঙ্খলভাবে সারি দিয়ে মৌন-গম্ভীর মুখে এগিয়ে চলেছেন লেনিনের গুণমুগ্ধ অসংখ্য দর্শনাকাঙ্ক্ষী-অনুরাগীর দল। পুষ্প-মাল্য হাতে নিয়ে তাঁদের দলে ভীড়ে আমরাও এগিয়ে চললুম লোকান্তরিত মনীষী লেনিনের সমাধি-বেদীমূলে ভারতবাসীদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে। ভারতীয় চলচ্চিত্র-কর্ম্মী দলের পুরোভাগে বিরাট পুষ্পমাল্য বহন করে এগুলেন আমাদের নেতা বাঙলার সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ নট-নাট্যকার শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য (অধুনা লোকান্তরিত) আর বোম্বাইয়ের খ্যাতনামা চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী দুর্গা খোটে…তাঁদের অনুসরণ করে চললুম দলের বাকী ছয়জন আমরা। সমাধি-মন্দিরের অভ্যন্তরে এমন বিপুল জন-সমাগম স্বত্বেও—কোন রকম হট্টগোল, ঠেলাঠেলি বা বিশৃঙ্খলতার আভাস পেলুম না কোথাও…সর্ব্বত্রই অপরূপ গম্ভীর-নিস্তব্ধ ভাব!



লাল চত্বরের উপরে লেনিনের সমাধি মন্দিরের পূর্ব্বকালীন রূপ

সমাধি-মন্দিরের ভিতরটি আগাগোড়া স্বচ্ছ-নীলাভ 'ফ্লোরেসেন্ট্' (Florescent) বৈদ্যুতিক-বাতির স্তিমিত-আলোয় আলোকিত…দর্শনাকাঙ্ক্ষীদের কোনো অসুবিধা ঘটে না।

জনতার সারি অনুসরণ করে চৌকোনো-দালানের পরিবেষ্টনী পার হয়ে আমরা অবশেষে হাজির হলুম সমাধি-প্রকোষ্ঠে…লেনিনের স্বচ্ছ-শবাধার বেদী-মূলে। বেদীর দুই পাশে সদা-মোতায়েন থাকে দুই সোভিয়েট-শান্ত্রী…কোনো ভাব-প্রবণ দর্শক আবেগের ঝোঁকে সমাধি-বেদীর সামনে অযথা-বিলম্ব কিম্বা অহেতুক কৌতূহল-বশে বেদীর উপরকার পবিত্র শবাধার স্পর্শ না করে, সেদিকে সজাগ-দৃষ্টি রাখাই হলো এঁদের কর্ত্তব্য। শান্ত্রীরা সে দায়িত্ব পালন করেন এক অভিনব প্রথায়। সমাধি-মন্দিরে কাউকে নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম ঘটাতে দেখলে, হুমকী বা বল-প্রয়োগের বদলে এখানকার দেহ-রক্ষী শান্ত্রীরা তাঁকে সবিনীত-অনুরোধ জানিয়ে অপরের অসুবিধা সম্বন্ধে সচেতন করে দেন! তাছাড়া ওদেশের জন-সাধারণও অপরের সুবিধা-অসুবিধার সম্বন্ধে রীতিমত সজাগ-হুঁশিয়ার…মন্দিরের শান্ত্রী-প্রহরীদের অনুরোধ ছাড়াই তাঁরা নিজেরা সারি বেঁধে শান্ত-সুশৃঙ্খলভাবে পুণ্য সমাধি-বেদী প্রদক্ষিণ করে লোকান্তরিত লেনিনের প্রতি অন্তরের মৌন-শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে প্রকোষ্ঠের অন্যদিকের একটা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। নিত্য দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লেনিনের সমাধি-মন্দিরে অনবরত এমনি সারির পর সারি চলে দর্শনাকাঙ্ক্ষীদের ভীড়! ওদেশী-জনতার পিছনে-পিছনে এগিয়ে মনীষী লেনিনের শবাধার-বেদীমূলে ভারতবাসীদের শ্রদ্ধার্ঘ্য-নিবেদন করে আমরাও বেরিয়ে এলুম বাইরে।

সমাধি-মন্দিরের বাইরে সোভিয়েট সহচর-বন্ধুরা আমাদের দেখালেন—'লাল-চত্বরের' আশ-পাশের নানান্ দ্রষ্টব্য-স্থান। সমাধি-মন্দিরের সামনেই মস্কোর প্রসিদ্ধ প্রাচীন 'লাল-চত্বর' (Red square) সড়ক…এ-সড়কের সুপ্রশস্ত পাথর-বাঁধানো আঙ্গিনায় অধুনা বছরের বিশেষ-বিশেষ সময়ে বসে—সোভিয়েট-রাজ্যের জাতীয়-উৎসবের নানান্ আসর। এ-সব উৎসবের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো—১লা মে তারিখের 'May Day Parade', ৭ই নভেম্বর তারিখের সোভিয়েট সাম্যবাদী গণ-তান্ত্রিক-রাষ্ট্রের 'প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী'। সে-সব উৎসবের সময় লোকে লোকারণ্য হয়ে যায় সুপ্রসারিত 'লাল-চত্বরের' চারিদিক…আশ-পাশের বাড়ীগুলি বিচিত্র চিত্র-আলেখ্য, পুষ্প-মাল্য-নিশান প্রভৃতির অপরূপ বর্ণোজ্জ্বল শোভা-সজ্জায় ঝলমল করতে থাকে! পথে চলে সোভিয়েট-রাজ্যের পদাতিক, অশ্বা-রোহী এবং যান্ত্রিক সেনা-বাহিনীর মিছিল, উৎসব-মাতোয়ারা জন-কর্ম্মী এবং দেশের যুব-সম্প্রদায় ও ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দ-উৎফুল্ল দলের শোভাযাত্রা…আকাশের বুকে সারি দিয়ে উড়ে যায় সোভিয়েট বিমান-বাহিনীর নানা বিচিত্র আকাশ-যান। এই সব জাতীয়-উৎসবের দিনে সোভিয়েট-রাষ্ট্রের নেতারা এসে দাঁড়ান লোকান্তরিত জন-নায়ক লেনিনের সমাধি-সৌধের বারান্দায় …সেখান থেকে 'লাল-চত্বরের' বুকে সম্মিলিত দেশের অগণিত জনগণকে তাঁরা সাদর-অভিবাদন জানান। তারপর সুবিখ্যাত 'রেড-স্কোয়ারের' অঙ্গনে বয়ে যায় দেশের আনন্দ-মুখর জন-গণের নৃত্য-গীত-বাদ্য, হাসি-কলধ্বনিতে উচ্ছল মিছিল-শোভাযাত্রার অফুরন্ত-স্রোত! দূর-দূরান্ত থেকে দেশ-বিদেশের আমন্ত্রিত-অভ্যাগতরাও আসেন মস্কোয় 'লাল-চত্বরে' অনুষ্ঠিত সোভিয়েট দেশের এই সব 'জাতীয়-উৎসবে' যোগদান করতে…তাঁদের জন্য বিশিষ্ট-

আসনেরও পাকা-ব্যবস্থা রয়েছে দেখলুম—লেনিনের সমাধি-সৌধের দুই পাশে।

এই সব আসনের পিছনে সমাধি-সৌধের দুই পাশে মনোরম গাছপালায় সাজানো সুন্দর বাগিচার মাঝে-মাঝে ক্রেমলিন দুর্গ-প্রাসাদের বাইরে দিকের প্রাচীর-গাত্রে অনেকগুলি ছোট-ছোট 'স্মৃতি ফলক' চোখে পড়ে। যে-সব স্বার্থত্যাগী-সোভিয়েট-কর্ম্মবীর স্বদেশে সাম্যবাদী গণ-তান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং সংরক্ষণের কাজে সহিদের মত প্রাণ-বিসর্জ্জন দিয়েছেন—তাঁদেরই পুণ্য-স্মৃতিপূজার উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত হয়েছে এই সব বিচিত্র 'স্মৃতি-ফলক'গুলি!

লেনিনের 'সমাধি সৌধের পূর্বদিকে ক্রেমলিনের 'ঘড়ি-ঘরের' বাঁ দিকে সুপ্রশস্ত 'লাল-চত্বরের' প্রান্তে চোখে পড়ে সেকালের গ্রীক 'Byzantine' ছাঁদে-গড়া, অপরূপ চূড়া-বসানো, 'জার্' চতুর্থ আইভানের আমলের (১৫৩৩-৮৪) ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সুবিশাল ভজনালয়—সেন্ট বেসিল গির্জ্জা! সেকালে রোমান-ক্যাথলিক ধর্ম্মমতাবলম্বী রুশীয় 'জার্'-সম্রাটদের রাজ্যকালে এটি ছিল রাজ-পরিবারের উপাসনা-গৃহ··· ১৯১৯ সালে বলশেভিক বিপ্লবের পর সোভিয়েট-ব্যবস্থায় এ-গির্জ্জাটিএখন রূপান্তরিত হয়েছে দেশের বিশিষ্ট একটি 'যাদুঘর, রূপে···প্রাচীন রুশ শিল্পকলা-স্থাপত্যের বহু নিদর্শন সযত্নে সঞ্চিত রয়েছে আজ এই ঐতিহাসিক-ভবনের অন্দরে। সুপ্রাচীন সেন্ট বেসিল গির্জ্জার কিছু দূরে 'লাল-চত্বরের' আঙিনার পাশেই চোখে পড়ে অতীতের এক অপরূপ মর্ম্মর-স্মৃতি···পোলাণ্ডের বিদেশী-শত্রু-বিজয়ী দেশপ্রেমী রুশ-বীর কস্মো মিনিন্ আর ডিমিট্রি পোঝারস্কীর যুগল প্রতিমূর্ত্তি!

মস্কোর 'লাল-চত্বরের' অপর প্রান্তে, লেনিনের সমাধি-মন্দিরের পশ্চিমদিকে, ক্রেমলিন দুর্গ-প্রাসাদের অদূরে সেকালের সুবিখ্যাত 'আলেকজান্দ্রোভ্-উদ্যানের' (Alexandrov Gardens) প্রায় সামনাসামনি জায়গায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওদেশের অপরূপ স্থাপত্য-কলায় মণ্ডিত প্রাচীন-আমলের আরো একটি অভিনব বিশাল ভবন। সেকালের রুশ 'জার'-সম্রাটদের রাজ্যকালে এ-ভবনটি নির্ম্মিত হয়। তখনকার দিনে এটি ছিল রুশ-রাজ্যের 'Duma' বা 'রাষ্ট্রীয়-পরিষদ ভবন'। ১৯১৯ সালের গণ-বিপ্লবান্তে সোভিয়েট আমলে এ-ভবনে এখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ওদেশের 'State Historical Museum' বা 'রাষ্ট্রীয় ঐতিহাসিক যাদুঘর'!

'রেড-স্কোয়ারের' আশপাশের এ-সব দ্রষ্টব্য ব্যাপার দেখে [illegible] যখন আবার হোটেলে ফিরে এলুম তখন সহরের বুকে সন্ধ্যা নামতে সুরু করেছে।

হোটেলে ফিরে এসেই দেখি আমাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের উদ্দেশ্যে এসেছেন মস্কোর বিভিন্ন সংবাদ-পত্র প্রতিষ্ঠানের একদল প্রতিনিধি! বাইরে বেরিয়েছি জেনেও, আমাদের প্রতীক্ষায় বসে ছিলেন তাঁরা সুদীর্ঘকাল। কাজেই সদলে জমে গেলুম আমরা তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায়! কেউ লেখা চাইলেন, কেউ চাইলেন ছবি, কোনো-কোনো উৎসুক প্রতিনিধি জানতে চাইলেন আমাদের ভারতবর্ষের কথা, আবার কেউ বা অনুরোধ করলেন যে সোভিয়েট দেশে এসে আমাদের কি ধারণা হচ্ছে তারই কিছু-কিছু বিবরণ যেন বলি তাঁদের কাছে! এমনি নানান্ আলোচনা চলেছে আমাদের, এমন সময় আসরে এলেন মস্কো-রেডিওর এক প্রতিনিধি···ভারতীয় চলচ্চিত্র-কর্ম্মীদের প্রত্যেককেই সাদর-আমন্ত্রণ জানালেন, সুবিধামত যে কোনো সময়ে তাঁদের বেতার-কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে কিঞ্চিৎ বেতার-ভাষণের জন্য! অতঃপর এলেন—সোভিয়েট-রাষ্ট্রের চলচ্চিত্র-পরিবেশনা বিভাগ 'Sovexport' প্রতিষ্ঠানের প্রবীণ অধ্যক্ষ শ্রীযুত জিমিন্, তাঁর সহাধ্যক্ষ পূর্ব্ব-পরিচিত-বন্ধু শ্রীযুত মস্কোভ্স্কী আর শ্রীযুত আভিটিসভ্। তাঁরা এসে খবর দিলেন যে সোভিয়েট-রাষ্ট্রের চলচ্চিত্র-মন্ত্রী শ্রীযুত বোল্শাকভ্ আমাদের সঙ্গে পরিচয় করার উদ্দেশ্যে তাঁর বিরাম-স্থান থেকে মস্কো সহরে ফিরে এসেছেন আজ অপরাহ্নে। আগামী কাল রাত্রে মস্কোর সুপ্রসিদ্ধ 'মেট্রোপোল-হোটেলে' তিনি ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদের সম্বর্দ্ধিত করার জন্য—বিশেষ একটি ভোজসভার আয়োজন করেছেন সেখানে আমাদের প্রত্যেকের যোগদান করার উদ্দেশ্যে শ্রীযুত জিমিনের মারফৎ সোভিয়েট চলচ্চিত্র-মন্ত্রী মহাশয় সনির্বন্ধ-অনুরোধ জানিয়েছেন। আমাদের কারোরই আপত্তির কোনো কারণ ছিল না এ নিমন্ত্রণ রক্ষায়, কাজেই সানন্দে সোভিয়েট চলচ্চিত্র-মন্ত্রী



মস্কোর 'বোলশই অপেরা হাউসের' রঙ্গমঞ্চে সুপ্রসিদ্ধ গীতিনাট্য সাদকো পালাভিনয়ের একটি দৃশ্য

মহাশয়ের প্রস্তাবে রাজী হলুম! কথা-প্রসঙ্গে শ্রীযুত জিমিন্ আরো জানালেন যে, আজ রাত্রে 'বোল্‌শুই অপেরা হাউসে' ভুবন-বিখ্যাত রুশ-সুরশিল্পী রিমস্কী-কোর্সাকভ্ (N. A. Rimsky-Korsakov) রচিত সুপ্রসিদ্ধ 'সাদ্‌কো' (Sadko) গীতি-নাট্যের অভিনয় দেখার ব্যবস্থা করেছেন আমাদের জন্য। সুতরাং তখনকার মত ওদেশী সাংবাদিক-বন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে চটপট বেশভূষা-প্রসাধন সেরে আমরা সদলে এগুলুম হোটেলের খানাঘরের দিকে।

খানা-টেবিলে বসতেই আমাদের সহচরী-বান্ধবী আলেকজান্দ্রোভা হাতে এনে দিলেন মস্কোতে ব্রহ্মদেশের রাষ্ট্রদূতের পক্ষ থেকে শ্রীযুত মঙ্ ওনের (Maung Ohn) একখানি সাদর আমন্ত্রণ-লিপি! চিঠি পড়ে দেখি—প্রতিবেশী-বন্ধু হিসাবে ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রতিনিধি দলকে অভ্যর্থনা জানিয়ে শ্রীযুত মঙ্ ওন্ সাদরে নিমন্ত্রণ করেছেন আমাদের ব্রহ্ম-দূতাবাসের এক 'ঘরোয়া-ভোজসভায়'। বিদেশে প্রতিবেশী-বন্ধুর এই সাদর-আমন্ত্রণ…উপেক্ষা করা গেল না। দলের সকলের মতামত নিয়ে তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর পাঠালুম। সুদীর্ঘ পথ-পরিভ্রমণের ক্লান্তি এবং সারাদিন ঘোরাঘুরির অবসাদে আমাদের মধ্যে অনেকেই রীতিমত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন, কাজেই শ্রীযুত মঙ্ ওন্‌কে ধন্যবাদ দিয়ে লিখে জানালুম যে দলের সকলের পক্ষে সম্ভব না হলেও, আমরা ক'জন প্রতিনিধি কাল বিকালেই তাঁদের দূতাবাসে গিয়ে ব্রহ্মদেশী-বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে আসবো।

হোটেলে খানা-পিনার পালা সাঙ্গ করে পদব্রজেই বেরিয়ে পড়লুম আমরা 'বোল্‌শুই অপেরা হাউসের' পানে।

ঠিক আগের রাত্রের মতই লোকে লোকারণ্য 'বোল্‌শুই অপেরা হাউসের' আসর…কোথাও কোনো শূন্য-আসন চোখে পড়ে না! যথা-সময়ে সুললিত সঙ্গীত-বাদ্যের ঝঙ্কার-সহকারে ধীরে-ধীরে সরে গেল সুবিরাট রঙ্গমঞ্চের রঙীণ যবনিকা…চোখের সামনে ফুটে উঠলো অপরূপ-বিচিত্র দৃশ্য-পট, বর্ণোজ্জ্বল আলোর ছটা আর সুবেশ-সজ্জিত অভিনেতা-অভিনেত্রীর মনোমুগ্ধকর নাট্য-লীলা, সঙ্গীত-গীত-কাকলী! 'সাদ্‌কো' গীতি-নাট্যের কাহিনীটি সরল রূপক, তবে সঙ্গীত-সুর-লালিত্যে এবং অভিব্যঞ্জনার অভিনবত্বে অপরূপ কারুকলা-শ্রী-মণ্ডিত…নিমেষেই দর্শকের মন নিবিড়-আবেশে ভরে তোলে! নাটকের ওদেশী-ভাষা না বুঝলেও, কাহিনীটি আগেই জেনে রাখার এবং সহচর সোভিয়েট-বন্ধুদের প্রতি-বিষয় সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার দরুণ, অভিনয়ের রস-মাধুর্য্য উপভোগ করা এতটুকু অসুবিধা ঘটেনি আমাদের। সোভিয়েট-আমলে ওদেশের অভিনয়-কলা-কৌশল যে কতখানি উৎকর্ষতা লাভ করেছে, তারও প্রত্যক্ষ-পরিচয় পেলুম আমরা সে-রাত্রে 'বোল্‌শুই অপেরা হাউসের' 'সাদ্‌কো' গীতি-নাট্যের আসরে বসে। শুধু অপূর্ব্ব অভিনয়-লীলা, সুমধুর কণ্ঠ-গীত আর সুললিত সুর-সংযোজনাই নয়, সুবিশাল রঙ্গমঞ্চের বুকে ওদেশের দক্ষ-সুনিপুণ মঞ্চকারুকারের দল বিচিত্র আলোক-নিয়ন্ত্রণ আর দৃশ্য-সজ্জা সংস্থাপনের যে অভিনব-অপরূপ কলা-কৌশল-চাতুর্য্য দেখালেন—তা ইতিপূর্ব্বে আমাদের দেশে কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না! গীতি-নাট্যের একটি দৃশ্যে ছিল—নায়ক সাদ্‌কো সুসজ্জিত-বিরাট তরণীতে চড়ে চলেছেন তরঙ্গায়িত অসীম সাগরের জলে মানসী-প্রিয়ার সন্ধানে…নৌকার পিছনে দূরে চক্রবাল-রেখার কোলে উন্মুক্ত-বাতাসে উড়ে চলেছে ছোট-বড় নানান্ সব মেঘের টুকরো…এমন সময় সাগরের অতল তলদেশ থেকে সহসা আবির্ভূত হলেন অপরূপ সুন্দরী এক জলকন্যা! জলকন্যার মোহিনী-রূপে বিমুগ্ধ হয়ে নায়ক সাদ্‌কো অবিলম্বে আবেগ-আকুল কণ্ঠে নায়িকাকে প্রেম-নিবেদন করে বসলেন! সাগরের তরঙ্গে ভেসে জলকন্যা এগিয়ে এলেন তরণীর পাশে! সাদ্‌কো সাগ্রহ আমন্ত্রণ জানালেন তাঁকে তরণীতে উঠে আসার জন্য! কিন্তু জলকন্যা সাগর-জলের অধিবাসিনী…তাই জল ছেড়ে স্থলে বাস করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব।…সুতরাং প্রেমিক সাদ্‌কোকে তিনি আহ্বান করলেন সাগরের অতল তলে জল-পুরীতে নেমে আসার জন্য! জলকন্যার রূপে মুগ্ধ প্রেমিক সাদ্‌কো সে-আহ্বান উপেক্ষা করতে পারলেন না…সঙ্গীদের অলক্ষ্যে ভাসমান-তরণী ত্যাগ করে তিনি নেমে এলেন তরঙ্গায়িত সাগরের জলে…সাগ্রহে সাদ্‌কোর হাত ধরে জলকন্যা তখন অদৃশ্য হলেন সাগরের অতল তলে!

কল্পনা এবং বর্ণনার দিক থেকে এ-দৃশ্যটি যত সরল, সহজ, সুন্দর ও কবিত্বময় বলে মনে হয়, রঙ্গমঞ্চের উপরে নিখুঁতভাবে এই সব প্রত্যেকটি বিষয়ের বাস্তব-রূপদান করা তেমনি দুরূহ-কঠিন এবং দুঃসাধ্য ব্যাপার—সে-কথা যাঁরাই অভিনয়-কলার চর্চ্চা করেন, তাঁরাই অনুমান করতে পারবেন। অথচ দেখে অবাক হয়ে গেলুম, সোভিয়েট-দেশের কলা-কুশলী মঞ্চ-শিল্পীরা তরঙ্গায়িত সাগরের জল, ভাসমান তরী, আকাশের উড়ন্ত মেঘ প্রভৃতি এমন সুকঠিন দৃশ্য-সংযোজনার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয় শুধু যে রঙ্গমঞ্চের উপরে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাই নয়, অভিনয়কালে দর্শকদের মনে এমনই অপরূপ মরীচিকা-মায়ার সৃষ্টি করেছেন যে এ-সব মানুষের হাতে-রচা কৃত্রিম-কৌশল বা অলীক-ছলনা বলে কারো মনে এতটুকু সন্দেহ জাগে না! 'সাদ্‌কো' গীতি-নাট্যে এ-দৃশ্যটির পরে যে দৃশ্য দেখলুম সেটি আরো বিচিত্র!

জলকন্যার আহ্বানে সাদ্‌কোর সাগর-তলে অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই রঙ্গমঞ্চের বুকে নেমে এলো শাদা একটি যবনিকা…সে-যবনিকার উপরে ম্যাজিক-লণ্ঠনের ধরণে 'এপিডায়াস্কোপ' (Epidiascope) যন্ত্রের পদ্ধতিতে অপরূপ বর্ণচ্ছটায় প্রতিফলিত হলো—ঝাঁঝি, প্রবাল, সামুদ্রিক গাছ-গাছড়ায় ভরা সাগর তলের দৃশ্য…উচ্ছ্বল-তরঙ্গস্রোতে ছোট-বড় মাছের দল আনন্দে খেলে বেড়াচ্ছে চারিদিকে…নেপথ্যে ঝঙ্কৃত হচ্ছে—সুললিত সঙ্গীত-বাদ্যের কলতান! অল্পক্ষণ পরেই এ-যবনিকা সরে গিয়ে রঙ্গমঞ্চের উপর উন্মোচিত হলো—সাগর-তলে জল-বালাদের রাজপুরীর অঙ্গন! শিল্প-কারু-চাতুর্য্যের দিক দিয়ে এ-দৃশ্যটি আগেকার দৃশ্যের চেয়েও আরো অপরূপ সুন্দর! সামুদ্রিক গাছপালা, শুক্তি-প্রবাল, আর মণি-মুক্তার জৌলুশে ভরপুর…তারই মাঝে-মাঝে মৎস্যাদি নানা ধরণের সামুদ্রিক জীব স্বাচ্ছন্দ্য-লীলায় সুপ্রসারিত রঙ্গমঞ্চের এদিক থেকে ওদিকে ভেসে চলেছে! এরই মাঝে আবার চললো গীতি-নাট্যাভিনয়ের পালা। শুধু সঙ্গীতাভিনয় পরিবেশনই নয়…এই অপরূপ দৃশ্যটির সংস্থাপনেও সোভিয়েট নাট্য-শিল্পীরা যে উন্নত কলা-কৌশল-চাতুর্য্যের মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন—তা সত্যিই অতুলনীয়! তাঁদের এই অপূর্ব্ব কলা-নৈপুণ্যের পরিচয় পেয়ে শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা নত হয়ে এলো…তন্ময়-চিত্তে 'সাদ্‌কো' গীতি-নাট্যের পালাটি উপভোগ করলুম আমরা 'বোল্‌শুই অপেরা হাউসের' আসরে বসে!

অভিনয় শেষ হলো রাত প্রায় বারোটা নাগাদ! 'বোল্‌শুই অপেরা হাউস' থেকে হোটেলে ফিরে এলুম যখন, তখনও মন ভরে রয়েছে—'সাদ্‌কো' গীতি-নাট্যের সুমধুর সঙ্গীতালাপের রেশ আর অপরূপ অভিনয়-কলার আমেজে!

(ক্রমশঃ)



কংগ্রেসের নূতন সভাপতি—

গত ৮ই নভেম্বর দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভায় স্থির হইয়াছে যে শ্রীজহরলাল নেহরু আর কংগ্রেসের সভাপতি থাকিবেন না। সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হইয়াছে যে সৌরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী শ্রী ইউ-এন ধেবরকে আগামী কংগ্রেসের সভাপতি করা হইবে। মাদ্রাজের নিকট আবাদী নামক স্থানে আগামী ১৭ই হইতে ২৩শে জানুয়ারী কংগ্রেস হইবে। ১৭, ১৮ ও ১৯শে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভা, ১৯শে ও ২০শে জানুয়ারী বিষয় নির্বাচন সমিতির সভা এবং ২১, ২২ ও ২৩শে জানুয়ারী কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন হইবে।

আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস উৎসব—

আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস উৎসব উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেডের উদ্যোগে গত ৯ই নভেম্বর মঙ্গলবার সকাল ৯টার সময় কলিকাতা মাণিকতলা দত্তাবাদে বিদ্যাধরী মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির উৎসবমণ্ডপে এক বিরাট সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। মৎস্য মন্ত্রী শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর, তথায় সভাপতিত্ব করেন, খ্যাতনামা এডভোকেট শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু সমবায়-পতাকা উত্তোলন করেন, সমবায় সমিতিসমূহের রেজিষ্ট্রার শ্রীগুরুদাস গোস্বামী সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উদ্যোক্তাদের পক্ষ হইতে সর্বপ্রথমে সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। কলিকাতার ভূতপূর্ব চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীনগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পৌরোহিত্যে বর্তমান চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীমল্লিনাথ মুখোপাধ্যায় সমবায় সম্বন্ধে একটি প্রচার-পত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। উৎসবে বহু সরকারী ও বেসরকারী সমবায়-কর্মীর সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীসমরেন্দ্র চৌধুরী, শ্রীশিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুধীন্দ্র নিয়োগী প্রভৃতি বক্তৃতা করেন ও সর্বশেষে ইউনিয়নের সম্পাদক ও উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সমবায় দিবসের বাণী ও তাহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দেন। মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির ম্যানেজার শ্রীঅনিলবিহারী মুখোপাধ্যায় ও সম্পাদক শ্রীগোপালচন্দ্র বরের আগ্রহে ঐ স্থানে সম্মিলন সম্ভব ও সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। সভায় পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন সমিতির প্রতিনিধিগণ এবং কয়েক সহস্র স্থানীয় মৎস্যজীবী ও শ্রমিক সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন। বহু বক্তা সমবায় আন্দোলনের উপকারিতা, জগতের বিভিন্ন দেশের সমবায় প্রথা, সমবায় আন্দোলনের প্রগতি ও প্রচারে বর্তমান স্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বহুমুখী প্রচেষ্টা প্রভৃতির কথা বিবৃত করেন। উৎসব শেষে উপস্থিত সকলকে মৎস্য খাওয়াইয়া আপ্যায়িত করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত কালীপদ ভট্টাচার্য্য রচিত সমবায় বিষয়ক কয়েকটি গান সভায় শ্রীবিজয় গুপ্তের পরিচালনায় ভারত সঙ্গীতায়নের ছাত্র, ছাত্রী ও অধ্যাপকবৃন্দ কর্তৃক গীত হইয়াছিল। দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করিতে হইলে কৃষি, শিল্প প্রভৃতি সমবায় প্রথায় করা প্রয়োজন। সুখের বিষয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য যে কুটীর শিল্প প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করিতেছেন, তাহার কার্য্য সমবায় সমিতি-সমূহের মাধ্যমে করাই স্থির করিয়াছেন। এ সময়ে দেশে যাহাতে সমবায় পদ্ধতি ও নীতি প্রসারিত হয়, সেজন্য সরকারী সমবায় বিভাগেরও অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

কলিকাতায় দুষ্টের দমন—

গত ৮ই নভেম্বর কলিকাতা পুলিসের এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের ডেপুটী কমিশনার শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, গত ২২ দিনে কলিকাতার মোট ৩ হাজার ৫ শত দুষ্ট লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছেন—তাঁহার বিশ্বাস, বহু দুষ্ট লোক এখনও লুকাইয়া আছে, তাহাদের ধরা যায় নাই। তন্মধ্যে যাহাদের আদালতে পাঠান হইয়াছিল তন্মধ্যে ১৬৭জন দণ্ডিত হইয়াছে ও ৩১জন মুক্তি পাইয়াছে। আদালতে কয়দিনে মোট ৪৮৯৬ টাকা অর্থদণ্ড সংগৃহীত হইয়াছে। শুধু ৭ই নভেম্বর তারিখে

১৮৫জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এই ভাবে কলিকাতায় শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা শীঘ্র সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায়।



চীনযাত্রার পথে সকন্যা শ্রীনেহরু ও পশ্চিম বঙ্গের প্রাধন মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ফটো—শ্যামলকুমার বসু

নূতন এম-পি—

মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম—মেদিনীপুর কেন্দ্র হইতে উপজাতি আসনে নির্বাচিত এম-পি ভরতলাল টুডু পরলোক গমন করায় তাঁহার স্থানে শ্রীসুবোধ হাঁসদা নূতন এম-পি নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রজা সমাজতন্ত্রী প্রতিদ্বন্দ্বী অপেক্ষা ৯৭ হাজার অধিক ভোট পাইয়াছেন। শ্রীহাঁসদার বয়স মাত্র ২৭ বৎসর—তিনিই বোধ হয় সংসদে সর্বকনিষ্ঠ সদস্য হইবেন। তিনি বি-এস-সি পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন ও কৃতী খেলোয়াড় হিসাবে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

শ্রীঅমল হোম—

কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেটের প্রাক্তন প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন প্রচার-অধিকর্তা খ্যাতনামা সাংবাদিক শ্রীঅমল হোম সম্প্রতি দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের প্রচার বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত হইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম! পাঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের সময় তিনি লাহোর হইতে প্রকাশিত ট্রিবিউনে' স্বর্গত কালীনাথ রায় মহাশয়ের সহকারীরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বাংলার অন্যতম প্রবীণ সাংবাদিক হিসাবে তিনি সর্বজনপ্রিয়। আমরা আশা করি, তাঁহার দ্বারা ডি-ভি-সি প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হইবে।



পণ্ডিত নেহরু সাংহায়ে একটি নার্সারি স্কুল পরিদর্শনে রত

পল্লীতে ডাক্তার প্রেরণের চেষ্টা—

পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন যে ডাক্তাররা যাহাতে পল্লী অঞ্চলে যাইতে উৎসাহবোধ করেন, সেজন্য যে সকল ডাক্তার পল্লীতে যাইবেন, সরকার তাঁহাদের বেতনের সমপরিমাণ টাকা পল্লীভাতা হিসাবে দিতে সম্মত হইয়াছেন। বর্তমানে লাইসেন্সিয়েট ডাক্তারগণ সহরে মাসিক ১০০ টাকা বেতনে ও গ্র্যাজুয়েটগণ মাসিক ২০০ টাকা বেতনে প্রথমে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। পল্লী উন্নয়নের জন্য এইভাবে ডাক্তার প্রেরণ করিলে বহু পল্লীবাসী গ্রামে ফিরিয়া যাইতে পারিবে।

রাণাঘাট তরুণসঙ্ঘ—

গত শারদীয়া পঞ্চমীতে রাণাঘাট লালগোপাল বিদ্যালয়ে স্থানীয় তরুণসঙ্ঘের সাংস্কৃতিক বিভাগের পঞ্চম বার্ষিক চারুকলা-শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধনী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় পৌরোহিত্য করেন নদীয়ার জেলা-শাসক শ্রী এস, দত্ত মজুমদার এবং শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্র-কুমার গাঙ্গুলী আনুষ্ঠানিক ভাবে এই প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী তাঁর সুদীর্ঘ উদ্বোধনী বক্তৃতায় জাতীয় জীবনে শিল্প ও শিল্পীর বিশেষ অবদানের উল্লেখ করিয়া বলেন —"শিল্পী সমাজের অপরিহার্য্য সহায়ক, সেবক এবং অচ্ছেদ্য অঙ্গ। শিল্পীকে বাদ দিয়ে জীবনসাধনার কোন ব্যাপারই সিদ্ধ হয় না। যে সমাজে শিল্পীর উপর দাবী নাই, শিল্পীকে বাদ দিয়ে যে সমাজ চলতে চায় সে সমাজ ব্যাধিগ্রস্ত সমাজ, সে সমাজ মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শ-বর্জ্জিত যন্ত্রের সমাজ, পশুর সমাজ। শিল্পই সমাজের স্বাস্থ্যের নাড়ী-স্পন্দন। শ্রীগাঙ্গুলী রূপবিদ্যার নিত্য-পূজার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিয়া বলেন—"যে দেশে শিক্ষার আয়তনে রূপ-বিদ্যা এখনও নিষিদ্ধ ফল এবং যে দেশে রূপ-বিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা ও সাধনা বহুদিন লুপ্ত হয়েছে সে দেশে বৎসরে একটামাত্র প্রদর্শনী আমাদের সুপ্ত রূপবুদ্ধিকে জাগিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট নহে। কেবলমাত্র রবিবারে ধর্ম্ম-উপাসনা কোন সমাজকে ধর্ম্মে মাতাইবার পক্ষে যথেষ্ট কিনা তাহা চিন্তার বিষয়। বার্ষিক বা সাময়িক পূজা-পার্ব্বণের চেয়ে নিত্য-পূজার সাধনা অধিক কার্য্যকরী বলিয়া জ্ঞানীরা উপদেশ দিয়েছেন। সুতরাং রূপ-চর্চ্চার সাধনা সক্রিয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে নিত্য সাধনার উপযোগী চিরস্থায়ী চিত্রশালার প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক।" প্রদর্শনীর বিশেষ আকর্ষণ ছিল—শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিল্পাচার্য্য যামিনী রায়, অধ্যাপক গোপাল ঘোষ, চিত্রাংশু শিল্পীগোষ্ঠী এবং স্থানীয় উদীয়মান শিল্পী-বৃন্দের ছবিগুলি, প্রদর্শনীটী সপ্তাহব্যাপী সাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল।



বাম হইতে—রাণাঘাটের পৌর সভাপতি ডাঃ মণীন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত, জেলাশাসক মিঃ এস্ দত্ত মজুমদার ও বক্তৃতারত খ্যাতনামা শিল্প-সমালোচক শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্র—

গত অক্টোবর মাসের শেষ ভাগে কলিকাতা ধর্মতলা ষ্ট্রীটস্থ ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল ভবনে যে চারুকলা শিল্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল—তাহার আলোকচিত্র বিভাগে শ্রীশ্যামলকান্তি বসুর 'পটুয়া' নামক আলোকচিত্রখানি সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইয়া প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছে। প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ অন্যান্য ছবির সহিত এই



পটুয়া ফটো—শ্যামলকুমার বসু

ছবিখানি ও ভিয়েনার আন্তর্জাতিক তরুণ-উৎসবের (youth festival) প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিতেছেন।

শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা—

কলিকাতা পুলিসের ডেপুটী কমিশনার ও দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ মহামণ্ডলের সভাপতি শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গত ১৯শে কার্ত্তিক শুভ জগদ্ধাত্রীপূজার দিন দক্ষিণেশ্বর আন্তর্জাতিক অতিথি ভবনের সম্মুখে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্পর্শপূত বটবৃক্ষমূলে বাণেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ঐ উপলক্ষে তথায় যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হয় এবং বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন। মহামণ্ডলের সম্পাদক শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় উপস্থিত সকলকে প্রসাদ দান করেন। বর্তমান যুগে এই ধরণের অনুষ্ঠান কমিয়া গিয়াছে। সত্যেন্দ্রবাবুর কার্য্য সেজন্য বিশেষ প্রশংসনীয়। সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে ক্রমে এই ভাবে দেবস্থানে পরিণত করা হইলে সেগুলির মর্য্যাদা আরও বর্দ্ধিত হইবে এবং ভারতবাসীর ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা হইবে।

শোক-সংবাদ

পরলোকে দেবেন্দ্র চন্দ্র দে—

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম ডেপুটী মন্ত্রী ও কংগ্রেসদলের চিফ হুইপ, আজীবন নির্য্যাতীত কংগ্রেসকর্মী দেবেন্দ্রচন্দ্র দে গত ১লা নভেম্বর সোমবার সকাল ৬টায় কলিকাতা প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে মারা গিয়াছেন। ৩০শে অক্টোবর শনিবার রাত্রিতে শান্তিপুরের (নদীয়া) নিকট নিজে মোটর চালাইয়া যাইবার সময় তিনি আহত হন—ঐ মোটরে শান্তিপুর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান ও এম-এল-এ শশী খাঁ, তাঁহার দাদা ফণীন্দ্রনাথ খাঁ, কলিকাতাস্থ রিজেণ্ট নামক রেষ্টুরেণ্টের বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও সুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন—তাঁহারা সকলেই ঘটনাস্থলেই মারা যান। দেবেন্দ্রকে তখনই কলিকাতায় আনা হয়—ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় প্রভৃতির একান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহাকে রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। ১৯০৫ সালে দেবেন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। —কাজেই মৃত্যুকালে তাহার বয়স মাত্র ৪৯ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা, পত্নী ও ২ শিশুপুত্র বর্তমান। ১৬ বৎসর বয়সে দেবেন্দ্র রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করে ও প্রথম জীবনে বৈপ্লবিক কার্য্যে রত ছিল। বহু বৎসর তাহাকে পলাতকের জীবনযাপন করিতে হয়। সে সময়ে সে ব্রহ্ম, মালয়, সিঙ্গাপুর, জাভা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ পূর্ব এসিয়ার বহু স্থানে ট্রাম কণ্ডাক্টার, বাস ড্রাইভার প্রভৃতির কাজ করিয়াছিল। পরে সে নিজেকে এংলো ইণ্ডিয়ান বলিয়া পরিচয় দিয়া ও অন্য নাম গ্রহণ করিয়া স্যানিটারী ইন্সপেক্টারের কাজ শিখিয়াছিল। পুলিশ তাহার গ্রেপ্তারের জন্য সে সময় কয়েক হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিল। ১৯৩০ সালে সে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতা কর্পোরেশানে দীর্ঘকাল কাজ করিয়াছিল। তাহার মত অকুতোভয়, অসাধারণ সাহসী ও কর্মী লোক সচরাচর দেখা যায় না। সারাজীবন সে যে সাহসিকতার সহিত কাজ করিয়া যাইতেছিল, তাহাই তাহার জীবনান্তের কারণ হইল। ১৯৫২ সালে বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া সে অতি দক্ষতার সহিত তাহার কর্তব্য সম্পাদন করিতেছিল। তাহার সুমধুর, সহৃদয় ও অমায়িক ব্যবহার তাহাকে বিরোধী দলের ও প্রিয় করিয়া রাখিয়াছিল। ১৯৩৮ সালে সে বিবাহ করিয়াছিল। বর্তমানে তাহার দুইটি পুত্র। পুত্রদ্বয়ের বয়স মাত্র ৭ ও ৪ বৎসর। সে বহুকাল ইটালী (কলিকাতা) অঞ্চলে বাস করিয়াছিল এবং ঐ অঞ্চলের সকল জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। সে বহু বৎসর কংগ্রেসের কাজ করিয়া মধ্য কলিকাতা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি হইয়াছিল। তাহার মৃত্যু এমনই শোকাবহ যে, উহা তাহার পরিচিত ব্যক্তি মাত্রকেই অভিভূত করিয়াছে।

পরলোকে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার—

বাঙ্গালার খ্যাতনামা সাংবাদিক আনন্দবাজার পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্প্রতি মাত্র ৬১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। বাংলা দেশে নূতন ধরণে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা ও তাহার উন্নতি বিধানে সত্যেন্দ্রনাথের দান চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আনন্দ-

বাজার পত্রিকায় তাহার সম্পাদকীয় বহু বর্ষ ধরিয়া বাঙ্গালার রাজনীতিক ও সমাজ জীবনে প্রেরণা দান করিয়াছিল। মৈমনসিংহ জেলার খারিন্দা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। যৌবনে কলিকাতায় আসিয়া তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত ঘনিষ্ঠতা করেন এবং স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করে। পরে তিনি স্বামীজির জীবনী লিখিয়া খ্যাতিলাভ করেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতা দেশের মুক্তি আন্দোলনে যথেষ্ট সাহায্যদান করিয়াছিল। তিনি আজীবন অকৃতদার ছিলেন এবং নানাভাবে দেশের জনকল্যাণসাধনে ব্রতী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলার সাংবাদিক সমাজে এক বিরাট ব্যক্তিত্বের অভাব হইল।

পরলোকে নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়—

গত ৫ই অক্টোবরের প্রাতে নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় ৫৮ বৎসর বয়সে ২৬নং মহেন্দ্র বসু লেনস্থ নিজ বাস-



নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়

ভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইনি প্রথম বাঙ্গালী ও ভারতীয় হইয়া ভারত সরকারের অধীনে খনিজ বিভাগে সর্ব্বোচ্চপদ অধিকার করিয়া দীর্ঘ ২৮ বৎসরকাল চাকুরী করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় হিসাবে তিনি একমাত্র ঐরূপ গৌরবজনক পদের অধিকারী হইয়াছিলেন। ইনি দীর্ঘকাল পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করিয়া খনিজবিদ্যার সম্বন্ধে সর্ব্বোচ্চ উপাধি লাভ করেন। ইনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও দানশীল ছিলেন। ইঁহার দুই পুত্র, এক কন্যা, জামাতা, দৌহিত্র ও দৌহিত্রী, স্ত্রী ও বৃদ্ধমাতা বর্ত্তমান আছেন। বিখ্যাত নাট্যকার ও নট অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ইনি জামাতা।

পরলোকে মুণীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী—

সুপরিচিত কবি ও সামাজিক মুণীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয় গত ১৬ই আশ্বিন রবিবার ৭৯ বৎসর বয়সে তাঁহার

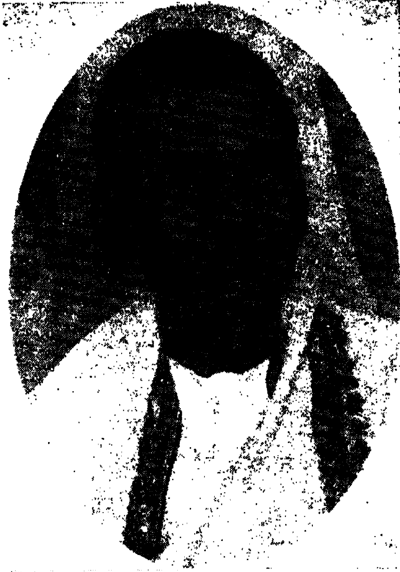


মুণীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী

কলিকাতার বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কলিকাতার বিখ্যাত সর্বাধিকারী বংশের প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলার দেবপ্রসাদ ও ডাক্তার সুরেশপ্রসাদের ভ্রাতা ছিলেন। প্রথম জীবনে বহু বৎসর তিনি সাংবাদিকের কাজ করেন ও পরবর্তী জীবনে কলিকাতার বহু সমাজ-সেবা প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সামাজিক জীবনে তাঁহার মত সুপরিচিত ব্যক্তির সংখ্যা কম। অধ্যাপক মৃণালচন্দ্র প্রমুখ দুই পুত্র ও বহু আত্মীয়স্বজন তিনি রাখিয়া গিয়াছেন।

পরলোকে জনরঞ্জন রায়—

নদীয়া নবদ্বীপবাসী খ্যাতনামা দেশকর্মী সুলেখক জনরঞ্জন রায় মহাশয় গত ১৯শে সেপ্টেম্বর ৭০ বৎসর বয়সে নবদ্বীপে নিজবাটীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। ধনী জমীদার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি যৌবনেই দেশসেবার কার্য্যে ব্রতী হন এবং ৪০ বৎসরেরও অধিককাল পূর্বে নবদ্বীপ মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়া ২০ বৎসরকাল পৌরসভার সেবা করিয়াছিলেন। তিনি নবদ্বীপে



জনরঞ্জন রায়

বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক রূপে সারা জীবন কাজ করিয়া গিয়াছেন। সুলেখক হিসাবেও তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষের সহিত দীর্ঘকাল লেখক হিসাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। নবদ্বীপের বৈষ্ণব সমাজ তাঁহাকে 'সাহিত্য মধুকর' ও বঙ্গীয় বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজ তাঁহাকে 'অমৃতাচার্য্য' উপাধি দান করিয়াছিল। দীর্ঘকাল তিনি কংগ্রেস আন্দোলনের সহিতও যুক্ত ছিলেন। নবদ্বীপের সকল প্রতিষ্ঠানই তাঁহার পরলোকগমনে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

পরলোকে জীবনানন্দ দাশ—

খ্যাতনামা আধুনিক-কবি জীবনানন্দ দাশ গত ২২শে অক্টোবর শুক্রবার রাত্রিতে কলিকাতা শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে ৫৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ট্রাম হইতে পড়িয়া গিয়া তিনি সাংঘাতিক আহত হন ও হাসপাতালে চিকিৎসিত হইতেছিলেন। কলিকাতার সাহিত্যিক সমাজে তিনি সুপরিচিত ছিলেন এবং বহু কবিতা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি হাওড়া বালিকা কলেজের অধ্যাপক ছিলেন।

পরলোকে কালীকিশোর স্মৃতিরত্ন—

ঢাকা সারস্বত সমাজের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় কালীকিশোর স্মৃতিরত্ন মহাশয় গত ১৬ই অক্টোবর কলিকাতায় ৯৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রচারে পণ্ডিত স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের দান অতুলনীয়। দীর্ঘজীবী হইয়া তিনি প্রায় ৮০ বৎসর কাল বাঙ্গালার সংস্কৃতির ইতিহাসের সহিত জড়িত ছিলেন এবং বহু ব্যক্তিকে নানাভাবে জ্ঞানদানে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

পরলোকে ডাঃ এস-এন-গাঙ্গুলী—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টার ডাঃ সমরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী গত ৭ই নভেম্বর প্রাতে বালীগঞ্জ বাসভবনে মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে সহসা হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। মেধাবী ছাত্র হিসাবে যৌবনেই তিনি পরিচিত হন এবং পরে অসাধারণ বুদ্ধি ও কর্মনিষ্ঠার দ্বারা অতি অল্প বয়সে শিল্প বিভাগের ডিরেক্টার পদ লাভ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।





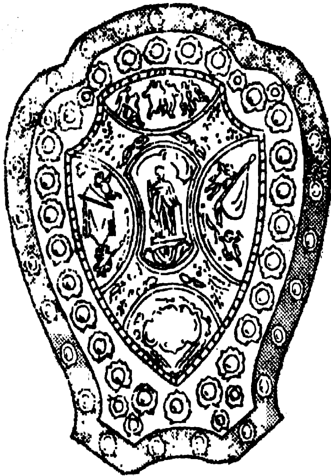
শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়



সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

আই এফ এ শীল্ড ঃ

১৯৫৪ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে এ বছরের প্রথম বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান ক্লাব ১-০ গোলে হায়দ্রাবাদ স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়ে একই বছরে লীগ কাপ এবং আই এফ এ শীল্ড জয়লাভের গৌরব লাভ করে। এবার নিয়ে মোহনবাগান ১০ বার আই এফ এ শীল্ডের ফাইনালে খেললো; শীল্ড পেয়েছে ৪ বার—১৯১১, ১৯৪৭, ১৯৪৮ এবং ১৯৫৪ সালে। ১৯৫২ সালে



আই এফ এ শীল্ড

মোহনবাগান বনাম রাজস্থানের আই এফ এ শীল্ডের ফাইনাল খেলাটি দু' দিন ড্র যাওয়ার পর পরিত্যক্ত হয়—রাজস্থান ক্লাব পুনরায় খেলতে রাজী না হওয়ায়।

আলোচ্য বছরে আই এফ এ শীল্ডের কোয়ার্টার ফাইনালে যে ৮টি দল খেলেছিলো তাদের মধ্যে স্থানীয় দল ছিল—মোহনবাগান, ই আই রেলওয়ে এবং মহমেডান স্পোর্টিং। বাকি ৫টি বহিরাগত দল—হায়দ্রাবাদ স্পোর্টিং ক্লাব, জামসেদপুর এফ এ, বিন্নিমিলস, ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে এবং উড়িষ্যা এ্যাথলেটিক এসোসিয়েশন। এক দিকের সেমি-ফাইনালে মোহনবাগান ২-০ গোলে ওয়েষ্টার্ণ রেল-দলকে হারিয়ে ফাইনালে যায়। অপর দিকের সেমি-ফাইনালে হায়দ্রাবাদ স্পোর্টিং ৩-০ গোলে বিন্নিমিলস-দলকে হারায়। ফাইনালে মোহনবাগান দলের রাইট-ইন এস ব্যানার্জি জয়সূচক গোলটি দেন।

বিশ্ব অপেশাদার বিলিয়ার্ডস চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

অষ্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব অপেশাদার বিলিয়াডস চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় অষ্ট্রেলিয়ার টম্ ক্রিয়ারী এবং বব্ মার্শাল যথাক্রমে ১ম এবং ২য় স্থান লাভ করেছেন। প্রতিযোগিতায় এই পাঁচজন খেলোয়াড় যোগদান করেন—টম্ ক্রিয়ারী এবং বব্ মার্শাল (অষ্ট্রেলিয়া), উইলসন জোন্স (ভারতবর্ষ), ফ্র্যাঙ্ক এডওয়ার্ডস (ইংলণ্ড) এবং টি জি রীস (দক্ষিণ আফ্রিকা)।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল

	খেলা	জয়	হার	পয়েণ্ট
টম্ ক্রিয়ারী	৪	৪	০	৪
বব্ মার্শাল	৪	৩	১	৩
ফ্র্যাঙ্ক এডওয়ার্ডস	৪	২	২	২
উইলসন জোন্স	৪	১	৩	১
টি জি রীস	৪	০	৪	০

ডেভিস কাপ ঃ

আমেরিকান জোনের ফাইনালে আমেরিকা ৪-১ খেলায় মেক্সিকো দলকে হারিয়ে ইণ্টার-জোনের ফাইনালে উঠেছে। আমেরিকা ইণ্টার-জোন ফাইনালে খেলবে ইউরোপীয়ান জোন বিজয়ী সুইডেনের সঙ্গে। ইণ্টার-জোন ফাইনালের বিজয়ী দেশ খেলবে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে। চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলাই প্রতিযোগিতার শেষ খেলা।

অল্ ইণ্ডিয়া রাগ্‌বী ফাইনাল ঃ

মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত অল ইণ্ডিয়া রাগ্‌বী ফাইনালে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব ৮-০ পয়েণ্টে সাউথ ইণ্ডিয়া আর. এফ. ইউ দলকে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি দু' বছর চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে।

বিশ্ব ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা ঃ

ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় ২৯ পয়েণ্ট লাভ ক'রে রাশিয়া চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। ৭টি ভারোত্তোলন অনুষ্ঠানের মধ্যে রাশিয়া ৪টিতে জয়ী হয়। ২য় স্থান লাভ করে আমেরিকা, ২৩ পয়েণ্ট পেয়ে। আমেরিকা ৩টিতে জয়ী হয়। ইরাণ ৪ পয়েণ্ট নিয়ে ৩য় স্থান পায়।

ধ্যানচাঁদ হকি ঃ

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ধ্যানচাঁদ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে ওয়েষ্টার্ণ রেলদল ৩-০ গোলে পুণার কিরকিন্স-দলকে পরাজিত করেছে।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল ঃ

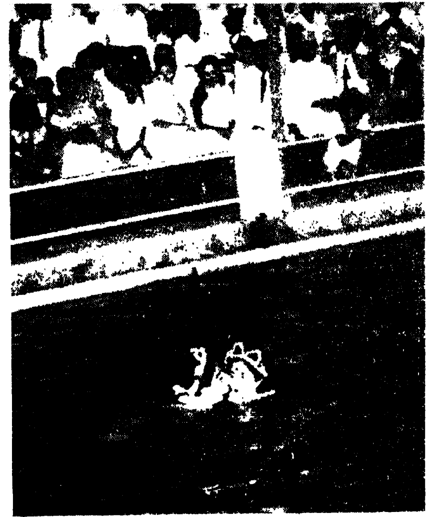
সাগরে অনুষ্ঠিত অন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ওসমানিয়া ২-১ গোলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলকে হারিয়ে স্যর আশুতোষ মুখার্জি ট্রফি লাভ করেছে। রানার্স-আপ হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্যর সুলতান আমেদ কাপ পেয়েছে।

বেঙ্গল টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

১৯৫৪ সালের প্রতিযোগিতায় পুরুষদের ফাইনালে রণবীর ভাণ্ডারী ২১-৮, ১৪-২১, ২১-১৮, ২১-১৭ পয়েণ্টে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান্ কল্যাণ জয়ন্তকে পরাজিত করেছেন। ভাণ্ডারী এই নিয়ে পাঁচ বার চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি উপর্যুপরি চার বছর চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেন, ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্য্যন্ত।

ইণ্ডিয়ান লাইফ্ সেভিং সোসাইটি ঃ

পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল মাননীয় ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌরোহিত্যে ঢাকুরিয়া লেক অঞ্চলে ইণ্ডিয়ান লাইফ্ সেভিং সোসাইটি ভবনে সমিতির ৩২তম প্রতিষ্ঠা উৎসব দিবস বিশেষ সমারোহে উদযাপিত হয়। সন্তরণ প্রতিযোগিতায় কৃতী সদস্যদের পুরস্কার বিতরণ



পরীরাণীর ভূমিকায় রীণা বন্দ্যোপাধ্যায় অপর এক পরীর ভূমিকায় অবতীর্ণা শ্রীজয়শ্রী মিত্রের কানে কানে কথা বলিতেছে

ফটো—সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

করেন রাজ্যপাল-পত্নী শ্রীমতী বঙ্গবালা মুখোপাধ্যায়। এই উৎসব উপলক্ষে সমিতির সদস্যগণ কর্তৃক 'মীনার স্বপনপুরী' নামে একটি মনোজ্ঞ জল-নাটিকা সোসাইটির নবনির্ম্মিত জলাধারে অভিনীত হয়। মীনার ভূমিকায় অনুরাধা, পরীরাণীর ভূমিকায় রীণা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জলদৈত্যের ভূমিকায় নলিন মালিক ভাল অভিনয় করেছিলেন। নাটিকাটির রচনা, পরিচালনা এবং ধারাবিবরণী প্রশংসনীয় হয়েছিল।

আজাদ হিন্দ বাগে অনুষ্ঠিত বেঙ্গল সুইমিং এসোসিয়েশন কর্তৃক পরিচালিত ছোট ছেলেমেয়েদের সন্তরণ প্রতি-

যোগিতায় ইণ্ডিয়ান লাইফ্ সেভিং সোসাইটির সদস্যরা যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে তার ফলাফল :

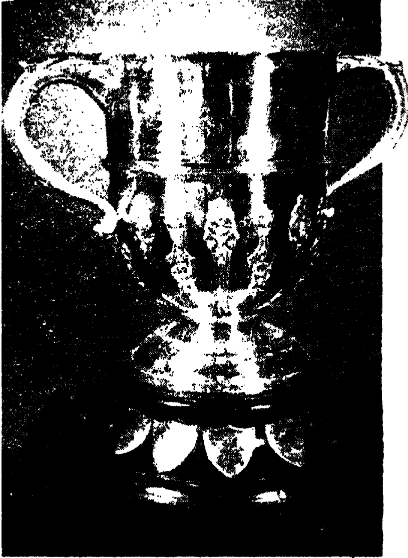
ব্যাক স্ট্রোক—ইন্দ্রজিৎ দেব (১ম)। সীমারেখা অতিক্রম করার দরুণ ফলাফল বাতিল হয়। অনুরাধা গুহঠাকুরতা (৩য়)।

ব্রেষ্ট স্ট্রোক—অনুরাধা গুহঠাকুরতা (১ম); রঞ্জনকান্তি বসু (২য়); স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় (৩য়)।

সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রেষ্ট স্ট্রোক অনুষ্ঠানে দর্শনীয় ষ্টাইলের জন্য পদক পুরস্কার লাভ করেন।

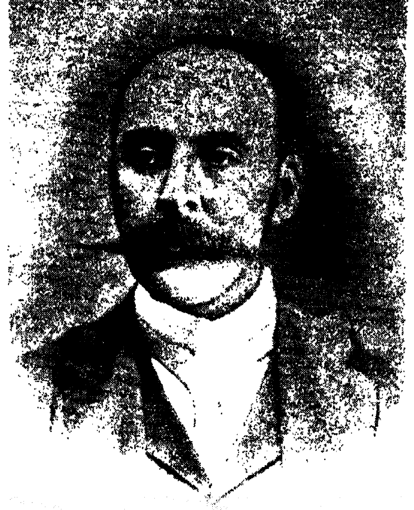
ডুরাণ্ড কাপ ঃ

১৯৫৪ সালে ডুরাণ্ড কাপ ফাইনাল খেলার দ্বিতীয় দিনে হায়দ্রাবাদ পুলিশ ১—০ গোলে বাঙ্গালোরের হিন্দুস্থান



ডুরাণ্ড কাপ

এয়ার ক্রাফ্ট দলকে পরাজিত ক'রে একই বছরে রোভার্স এবং ডুরাণ্ড কাপ জয়লাভের গৌরব লাভ করেছে। ১৯৫০ সালেও হায়দ্রাবাদ পুলিশ রোভার্স এবং ডুরাণ্ড কাপ জয়ী হয়েছিলো। আলোচ্য বছর ডুরাণ্ড কাপের ফাইনাল খেলাটি প্রথম দিন ১—১ গোলে ড্র যায়।



স্যার হেনরী মার্টিমার ডুরাণ্ড
- ডুরাণ্ড কাপের প্রতিষ্ঠাতা

রোভার্স কাপ ঃ

১৯৫৪ সালের রোভার্স কাপের ফাইনালে হায়দ্রাবাদ পুলিশ ২-১ গোলে পাকিস্তানের কিমারী ইউনিয়ন দলকে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি পঞ্চমবার রোভার্স কাপ জয়-লাভের গৌরব লাভ করেছে। রোভার্স কাপ কেন, রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতার সমতুল্য বিখ্যাত ফুটবল প্রতিযোগিতা আই-এফ এ শীল্ডে (বাংলা) অথবা ডুরাণ্ড কাপ (দিল্লী) প্রতিযোগিতার ইতিহাসেও এ পর্য্যন্ত কোন দল উপর্যুপরি এত অধিকবার জয়ী হ'তে পারেনি।

একদিকের সেমি-ফাইনালে হায়দ্রাবাদ পুলিশ ১-০ গোলে মহামেডান স্পোর্টিংকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে। অপর দিকের সেমি-ফাইনালে পাকিস্তানের কিমারী ইউনিয়ন ১-০ গোলে এ বছরের আই-এফ এ শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগানকে পরাজিত করে। মোহনবাগান গোল খাওয়ার আগেই একটি পেনাল্টি পায়। কিন্তু গোল দিতে পারেনি। তা'ছাড়া একাধিক গোল দেওয়ার সহজ সুযোগও নষ্ট করে।

জাতীয় টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

বরোদায় অনুষ্ঠিত ১৯৫৪ সালের জাতীয় টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় দলগত বিভাগের ফাইনালে বোম্বাই ৫-২ গেমে বাংলাকে পরাজিত ক'রে বার্ণা -বেলাক কাপ জয়ী হয়েছে।

ব্যক্তিগত বিভাগে ফাইনাল ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস : উত্তম চন্দ্রণা (বোম্বাই) ২১-১৭, ২১-১১, ২১-২৩, ২১-১০ পয়েণ্টে শ্যাম মতিয়ালাকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : এফ ইব্রাসী এবং এম আসমাই (মিশর) ১৩-২১, ২১-১৬, ১৯-২১, ২১-১৪, ২১-১২ পয়েণ্টে রণবীর ভাণ্ডারী এবং কল্যাণ জয়ন্তকে (বাংলা) পরাজিত করেন।

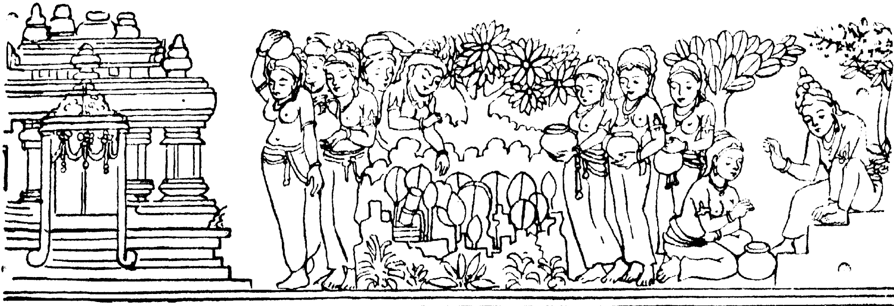
মহিলাদের সিঙ্গলস : মীনা পরাণ্ডে (মহারাষ্ট্র) ২১-১৮, ২১-১৭, ২১-১৯ পয়েণ্টে সৈয়দ সুলতানাকে (হায়দ্রাবাদ) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : সৈয়দ সুলতানা এবং বি নালনী (হায়দ্রাবাদ) ১৮-২১, ২১-৭, ২১-১২, ২১-১০ পয়েণ্টে মিসেস গুল নাসিকওয়ালা ও এনিড বোকারোকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : আর ভাণ্ডারী (বাংলা) এবং সৈয়দ সুলতানা (হায়দ্রাবাদ) ১৮-২১, ২১-১৩, ১৯-২১, ২১-১২, ২১-১৬ পয়েণ্টে উত্তম চন্দ্রণা এবং মিসেস গুল নাসিকওয়ালাকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

মহিলাদের দলগত বিভাগের ফাইনালে মহারাষ্ট্র ৩-১ খেলায় বোম্বাইকে পরাজিত ক'রে জয়লক্ষ্মী কাপ লাভ করেছে।

জুনিয়ার বিভাগের ফাইনালে দিল্লী ৩-২ খেলায় মহারাষ্ট্রকে হারিয়ে রামনুজম কাপ পেয়েছে।



সাহিত্য সংবাদ

লাল মাটি ঃ শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

রচিত হয়েছে ভাষার ইন্দ্রজাল। সে ইন্দ্রজালের সম্মোহন ভদ্রভাবে বরেন্দ্র ভূমির প্রাচীন ইতিহাস মানস বলয়ে স্পষ্ট হয়ে দেয় দেখা জাগ্রত স্বপ্নের মত স্পষ্ট। রাজা দ্বিতীয় মহীপালের বিধ্বস্ত রাজরক্তের উপর বিদ্রোহী দিব্বোক আর ভীমের বিজয় স্তম্ভ দেদীপ্যমান হয়ে উঠে চোখের সামনে। কৌশলী লেখক অধুনাতন বরেন্দ্র ভূমির বিদ্রোহীদের টেনে আনেন সেই দৃশ্য পটে। রক্তশোষী জমিদার কুমার ভৈরব নারায়ণ আর ফতেশা পাঠানের সঙ্গে সম্মুখে সংগ্রামে দাঁড়ায়। বিদ্রোহী সাঁওতাল, আহীর, ধাওয়া আর বাদিয়ার দল। এগিয়ে আসে হাজার মানুষের তরঙ্গায়িত ক্রোধের সমুদ্র। সত্যি বুঝি তারা ভেঙে দেবে, গুঁড়িয়ে দেবে, ধ্বসিয়ে দেবে বালির বানিয়াদে গড়া শিস্ মহলের স্বপ্নকে।" যুমনা আহীর, হোসেন বাদিয়া, রঞ্জন, আলীমুদ্দিন, নগেন ডাক্তার, ঝুমরি, কালোশশী, উত্তমা, সম্মোহনী মন্ত্রে গড়া এই সব চরিত্র কাহিনীকে বিচিত্র রসে ভরপুর করে রেখেছে।

অসংখ্য নিরীহ মানুষের রক্তে স্নান করে অগণ্য উদ্বাস্তু অপহৃতা ও ধর্ষিতার উচ্চরোলের মধ্যে জন্ম নিয়েছে পাকিস্তান। হিংসা ও ঈর্ষার মূর্তরূপ, স্বাধীন দেশ পাকিস্তান। কিন্তু কেন নেই সেখানে সকল মানুষের সমান মর্যাদা, সমান নিরাপত্তা? তার কারণ, লাল মাটির আলিমুদ্দিনের মত একটিও স্বাধীনতাপ্রিয় সৈনিক পাকীস্তানীদের দলে ছিল না। পাকিস্তানের নির্মাতা ফতেশা পাঠান, ইশ্‌মাইল, খোদাবক্স খন্দকার, অত্যাচার, শোষণ, নারীহরণের ক্ষুধা জলছে যাদের রক্তের অণুতে অণুতে। কোরাণ আর খোদাতালার পবিত্র নামের অমর্যাদা করে যাকে তারা ইসলামী জিগির তুলে নিজের পৈশাচিক স্বার্থ রক্ষার জন্য। লাল মাটির আলিমুদ্দিন যা আশঙ্কা করেছিলেন।

লাল মাটির আদর্শ সৈনিক আলিমুদ্দিন, তাঁর প্রতিজ্ঞা "হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, পতিত হোক, আর মৌলবীই হোক, শয়তান আর অত্যাচারীর জায়গা নয় পাকিস্তান। আল্লার রসুলের নাম নিয়ে আমরা গড়ব আজাদী দুনিয়া—সমস্ত শঠ বঞ্চকদের নিকাশ করব সেখান থেকে। গরীবের রক্ত যারা শুষে খায় তাদের টুঁটি টিপে ধরব।"

লাল মাটি নিছক কাহিনীই নয়;—এর মধ্যে নিহিত রয়েছে পাকিস্তানের কল্যাণ মন্ত্র। সে মন্ত্র প্রত্যেক দেশবাসীর, তথা প্রত্যেক পাকিস্তানীর কর্ণে, শুধু কর্ণে নয় মর্মে পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন,—যাতে মালিনী নদীর বাঁধের উপর যে আলিমুদ্দিন একদিন অত্যাচারীর গুলিতে প্রাণ দিলেন তাঁর নব জন্ম সম্ভব হয়, সম্ভব হয় হাজার হাজার আলিমুদ্দিনের বিজয়দীপ্ত অভ্যুত্থান যাঁরা প্রকৃত আজাদীর জন্য সংগ্রাম করবেন।

[প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। কলিকাতা—৬। দাম—৪।।০ আনা]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

কোন্ পথে ঃ শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

আলোচ্য গ্রন্থের গ্রন্থকার বিশিষ্ট চিন্তাশীল সাহিত্যিক। এঁর মনীষা সাহিত্য সমাজে স্বীকৃত ও বহুজনবিদিত। সন ১৩২৭ সাল থেকে ১৩৬১ সালের মধ্যে প্রবাসী, ভারতবর্ষ ও আনন্দবাজার পত্রিকায় (শারদীয়া সংখ্যা) প্রকাশিত সমাজ ও শিক্ষা বিষয়ক আটটী প্রবন্ধ আলোচ্য গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে। প্রত্যেকটি সুনির্ব্বাচিত ও বহু চিন্তনীয় উপাদেয় কথায় পূর্ণ। ভূমিকায় গ্রন্থকার বলেছেন—কেবল পাঠকের প্রীতি উৎপাদনের নিমিত্তই এই সকল প্রবন্ধ লিখিত হয় নাই। দীর্ঘকাল সমাজের নানাদিক লক্ষ্য করিয়া এই সকল প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার তাঁর লেখার মধ্যে সমগ্র সমাজের সাম্প্রতিক গতি ও প্রকৃতি ও তার ভবিষ্যতের অবস্থা সাহিত্যে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন, সে চেষ্টা এ গ্রন্থে সার্থক হয়েছে। প্রতীচ্য সভ্যতার সঙ্গে সংস্রবে এসে আমাদের মনে অনেক নূতন প্রশ্ন জেগেছে,—দু'টি মহাযুদ্ধের আবর্ত্তে আমাদের দেশ ও সমাজ বিপন্নও হয়েছেন। বর্ত্তমানে প্রধান প্রশ্ন হয়ে উঠেছে—স্বাধীন নববঙ্গের সামাজিক জীবন কোন্ ভিত্তির ওপর দাঁড়াবে? এ সম্বন্ধে গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থে তথ্য সন্ধানী ও তত্ত্ব বিশ্লেষণী দৃষ্টির দ্বারা রসালো করে বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। সাম্প্রতিক সভ্যতার অন্তঃসার শূন্য কৃত্রিম পরিবেশ ও মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের জটিল অবস্থা, আর স্বজাতির অসামাজিক ব্যবহার সমাচ্ছন্ন আত্ম-কেন্দ্রিকতা সম্বন্ধে গ্রন্থকারের ব্যাঙ্গোক্তি উপভোগ্য। গ্রন্থকারের মতে—আমাদের সমাজ পরিণামের পথ ধরিতে পারিতেছে না,—বিপ্লবের আবর্ত্তে ঘুরিতেছে। পশ্চিমের প্রবল প্রবাহে, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের বিমুখী স্রোতে, আবর্ত্ত জন্মিয়াছে। আজকের দিনে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মাধিকরণের মধ্যে এসেছে তীব্র দৃষ্টি ও আবহাওয়া। গ্রন্থকার এ সম্বন্ধে ও যে সব মন্তব্য করেছেন তা লক্ষ্য করবার বিষয়। গ্রন্থকার বলেছেন—'অবিরত ভাঙ্গা চলিতেছে, গড়ার দিকে মন নাই।......স্বেচ্ছাচারিতাকে বলে স্বাধীনতা; যেন স্বাধীনতার মধ্যে শাসন থাকে না—'উপসংহারে তিনি প্রশ্ন করেছেন—'আমাদের

প্রকৃতি কোন্ পথে চলিয়েছে?' 'ছোট ও বড়' প্রবন্ধটী খুব রসালো ও উপভোগ্য। এ প্রবন্ধের উপসংহারে গ্রন্থকার বলেছেন—'দেহে শক্তি না থাকলে কৈব্য হয় অহিংসা, মনে না থাকলে সত্যাগ্রহ হয় হত্যা দেওয়া।' শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি সব কিছুই 'কোন্ পথে'র মধ্যে আলোচিত হয়েছে। আত্মবিস্মৃত জাতি যাতে নিজের লুপ্ত স্বাস্থ্য ও সম্বিৎ ফিরে পায়, আর স্বদেশে আবার একটি রেনেসাঁস বা পূর্ণ জাগরণ হয়, সেই আশা আকাঙ্ক্ষা যে গ্রন্থকারের মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে, আলোচ্য গ্রন্থখানি পাঠ করে এই সত্যই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। উৎকৃষ্ট প্রাবন্ধিকতার ক্ষয়িষ্ণুতার যুগে 'কোন্ পথে'র আবির্ভাব প্রশংসনীয়। চিন্তাশীল বিদগ্ধ পাঠক পাঠিকা সমাজে এই গ্রন্থখানি সমাদৃত হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

[প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম—২॥০ আনা]

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

বেদান্ত-রহস্য ঃ শ্রীবসন্তকুমার সেনগুপ্ত, এম. এ.

বেদ হিন্দুদিগের আদি শাস্ত্র গ্রন্থ। বেদান্ত বা উপনিষদের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় কথিত আছে। বেদান্ত মতে পুরুষ চরম পরম তত্ত্ব। লেখক নানা শাস্ত্র ও বেদান্ত আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে—মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ "অক্ষরাৎ পরতঃপর কৃষ্ণচণ পুরুষ" এবং "কেবল রসাত্মক" চরম পরম তত্ত্ব। নিত্যানন্দ তত্ত্বের ব্যাখ্যা গ্রন্থখানির একটি বৈশিষ্ট্য। নিত্যানন্দই শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাশক্তি। সে লীলা পরম মধুর। এই গ্রন্থে লেখক পাণ্ডিত্যের বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। সুধী সমাজের নিকট পুস্তকখানি আদৃত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

[প্রাপ্তিস্থান ঃ শ্রীগুরুলাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য—৸০ বার আনা।]

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বর্ষপঞ্জী (১৩৬১-৮ম বর্ষ) ঃ সম্পাদক—শ্রীসন্তোষ রঞ্জন সেনগুপ্ত ঃ

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত 'বর্ষপঞ্জী' পাঠক সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থটি 'বর্ষপঞ্জী'র ৮ম বার্ষিক সংখ্যা। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত এই শ্রেণীর গ্রন্থের পক্ষে আট বৎসর জীবিত থাকা —রীতিমত অটুট স্বাস্থ্যের পরিচয়। প্রতি বৎসরের মত এই সংখ্যাটিও তাহার বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। এই ধরণের গ্রন্থ সংকলন এবং প্রকাশ করা কত যে শ্রমসাধ্য এবং ব্যয়বাহুল্য ব্যাপার তাহা গ্রন্থখানির বিপুলায়তন এবং বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যায়গুলিই প্রমাণ দেয়। সম্পাদক মহাশয়ের চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই। ইহার জন্য তিনি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী করিতে পারেন। গ্রন্থখানি বিভিন্ন বিভাগ সম্পাদনা করিয়াছেন খ্যাতিমান সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং বিশেষজ্ঞগণ। নানা নির্ভরযোগ্য সূত্র হইতে গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করা হইয়াছে। ফলে প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে ইহার গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বর্ত্তমান যুগের চিন্তাধারা এবং ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হইতে পারিলে জ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে নিশ্চুপ দর্শক হিসাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়।

এইদিক থেকে 'বর্ষপঞ্জী' তাহার প্রয়োজনীতা প্রমাণ করে, তাহার জ্ঞান ভাণ্ডারে অভাব-অনটন যেন নেই, স্বাস্থ্য সম্পদে সজীব। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কেরাণীজীবী, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, জননেতা—যে যে রকম বৃত্তি নিয়েই থাকুন না কেন 'বর্ষপঞ্জী' সকলেরই নিত্য সহচর হইবার দাবী রাখে। গ্রন্থখানির সুদীর্ঘ বিষয়-সূচীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম—সালতামামী—আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পর্যালোচনা, গতবছরের ঘটনাপঞ্জী, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রিসভা, আন্তর্জাতিক সন্ধি ও চুক্তি, ভারতীয় আদমসুমারী, অর্থনীতি, ব্যাঙ্কিং, বীমা, আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্য, শিল্প সম্পদ, যান-বাহন, উন্নয়ন পরিকল্পনা, জনশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, বেতার ও সিনেমা জগৎ, কংগ্রেস অধিবেশন, খেলাধুলা, পাকিস্তান সম্পর্কে তথ্য এবং ব্যক্তি পরিচয়।

গ্রন্থখানির ছাপা, কাগজ এবং বাঁধাই সুদৃশ্য এবিষয়ে অনেক নামকরা বিলাতী 'ইয়ার-বুক'কেও হারাইয়াছে। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

[প্রকাশক ঃ এস. আর সেনগুপ্ত এণ্ড কোং, ২৫এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১২। মূল্য ৪৲ টাকা।]

দ্রৌপদীর অভিমানে ঃ বররুচি ঃ

বইটি একটি ছোট গল্পের সংকলন। মোট কুড়িটি গল্প এতে স্থান পেয়েছে। প্রথম গল্পের নামেই বইটির নাম করণ করা হ'য়েছে। লেখক সাহিত্য ক্ষেত্রে নবাগত। সম্ভবত এইটিই লেখকের প্রথম বই। প্রথম বই হিসাবে বইখানির অন্যান্য যে সমস্ত ত্রুটি আছে সেগুলি উপেক্ষা করা গেলেও বইখানির অধিকাংশ গল্পে লেখক যে কুৎসিত বিষয়বস্তুর অবতারণ করেছেন তা মোটেই উপক্ষনীয় নয়। প্রথম গল্পের নায়ক এক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, প্রচণ্ড ঈশ্বর বিশ্বাসী ভক্ত এবং পণ্ডিত ব্যক্তি। গ্রামে তাঁর প্রতিপত্তির অন্ত নেই। গল্পের প্রথমে যাঁর বই পরিচয়। অকস্মাৎ সেই মানুষ—যে কোনো বৃহৎ কারণই তাঁর জীবনে ঘটুক না কেন—তিনি কেমন করে গুণ্ডায়

পর্য্যবসিত হন? আর কেমন করেই বা নারী হরণ, নারী ধর্ষণ করতে পারেন? লেখকের একথা জানা উচিত যে—এ যুগে নর-নারীর প্রতি অত্যাচার করে ভগবানকে পৃথিবীর মাটিতে আনা যায় না। অন্যান্য গল্পগুলির আর আলোচনার প্রয়োজন নেই। শুধু আমাদের এইটুকু বক্তব্য যে, এমন কুরুচিপূর্ণ গল্প লিখে লেখক যেন ভবিষ্যতে নিজের সাহিত্য-সৃষ্টি-শক্তির অপচয় না করেন।

[প্রকাশক: শ্রীভূমি পাবলিশিং কোং; ৭৯, হ্যারিশন রোড, কলিকাতা—৯। দাম—২৲ টাকা]

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

আচমকা: জ্যোতির্ময় রায়:

ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন, 'কমিক এ্যাক্টিং-সিচুয়েশন ডায়ালগ' ছাড়া সহজ ঘটনাপ্রবাহে হাস্যরসের অবতারণা করা এই কাহিনী রচনায় তাঁর প্রধান প্রয়াস ছিল। কিন্তু বইখানি পাঠ ক'রে আমরা দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে লেখকের সঙ্গে আমরা একমত হ'তে পারলাম না। বইখানির নামকরণ এবং অস্বাভাবিক ঘটনাসংস্থান গ্রন্থখানি যে প্রহসনমূলক—তার ইঙ্গিত দেয় বটে, কিন্তু সমগ্র বইখানিতে সামান্য কয়েকটি স্থান ব্যতীত হাস্যরসের উপাদান খুঁজে পাওয়া যায় না। দুই এক জায়গায় হাসির যে ছিটে-ফোঁটা আছে—তাও 'ডায়ালগ'-এই, ঘটনাপ্রবাহে নয়। পিতৃমাতৃহীন এক শিশুকে অনাত্মীয় যে লোক লালন-পালন ক'রলো, দুরন্ত কাল ব্যাধিতে আক্রান্ত হ'য়ে পরে তাকে কাছ-ছাড়া করবার জন্যে যে পন্থার সে আশ্রয় নিলো, তা অদ্ভুত। একজন অবস্থাপন্ন বেশ তুখোড় ছেলেকে 'বাবা' বল্লেই যে সে বাবা হ'য়ে যায় এবং তার পক্ষে ঐ ছেলেটাকে এড়ানো যে কোনও প্রকারেই সম্ভব হয় না—এ সত্য কেউ স্বীকার ক'রবে না। একমাত্র প্রহসনেই এমন আজগুবি ঘটনা সম্ভব—কিন্তু তাও লেখকের নতুন প্রচেষ্টার পেষণে বিনষ্ট হ'য়েছে। একটা ছেলে, যে অত অশান্তির সৃষ্টি ক'রেছে—তাতে অত অল্পদিনে তার প্রতি কারও মমতার উন্মেষও সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম ক'রেছে। তাকে খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানোর জন্যেও সবার অত উৎকণ্ঠার অর্থ হয় না। আর অত বড় ধেড়ে খুবু ছেলের ন্যাকার মত কথা বলা ও কাঠের ঘোড়ায় চেপে ঘুরে বেড়ানো পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটায়।

[প্রকাশক: ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিসিং কোং লিঃ, ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭। দাম—দুই টাকা।]

গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় সংকলিত "শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র"—৫৲
নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "রৈবতক" (৭ম সং)—৪৲
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "বিপ্রদাস" (১৪শ সং)—৪৲, "পরিণীতা" (৩৮শ সং)—১।৹
দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত রহস্যোপন্যাস "মরণের রণ-ভেরী" (২য় সং)—২৲
শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত উপন্যাস "শ্রীমতী"—২৲
সুবোধ বসু প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "গল্পলতা"—৪৲
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত রহস্যোপন্যাস "দুর্গম পথে শিখা"—৸৹
শ্রীস্বপনকুমার প্রণীত রহস্যোপন্যাস "প্রবালপুরী"—॥৹, "বাগান বাড়ি"—॥৹
অজিত গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "শকুন্তলা রায়"—৩৲
রমেন চৌধুরী কৃত মোপাসাঁর গল্পের অনুবাদ "অপমানিতা"—২৲ ও জীবনী-গ্রন্থ "বাঙলা সাহিত্যে মহিলা সাহিত্যিক" (১ম)—৩॥৹
শ্রীপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত "মঙ্গল কাব্যের গল্প"—৷৷৴৹
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "হরাণের রাণী" (৫ম সং)—১।৹
মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "ঝাঁন্সীর রাণী লক্ষ্মীবাই"—৩৲
জলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "কি ছিল, কি হ'ল"—৩৲
প্রতিভা বসু প্রণীত "স্বনির্বাচিত গল্প"—৪৲
নলিনীকান্ত সরকার প্রণীত চরিত্রচিত্র "হাসির অন্তরালে"—৩৲

ষাণ্মাসিক গ্রাহকদের প্রতি

অগ্রহায়ণ মাসে যে সকল ষাণ্মাসিক গ্রাহকের চাঁদার টাকা শেষ হইয়াছে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক ২৫শে অগ্রহায়ণের পূর্বে মণি-অর্ডারযোগে ষাণ্মাসিক চাঁদা ৬৲ টাকা পাঠাইয়া দিবেন। টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ করিবেন। ডাকবিভাগের নিয়মানুযায়ী ভি. পি.তে কাগজ পাঠাইতে হইলে, পূর্বাহ্নে আদেশপত্র পাওয়া প্রয়োজন। ভি. পি. খরচ পৃথক্ লাগিবে।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

দ্বিচত্বারিংশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড ; আষাঢ়—অগ্রহায়ণ ১৩৬১

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

চিত্র-সূচী—মাসানুক্রমিক